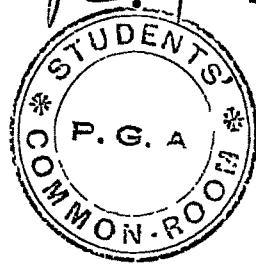


Cub-H04318-55-P30/28

55



বিষয়-সূচী

চিন মান্নিধ (কবিতা) — ববীজনাথ ঠাকুর	৩১৩	আসন-বটনে অত্নায়ের প্রতিবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৮৪
হুমত শ্রেণী-সমূহের উন্নতি-বিধানিনী		আসন-বটনের দোষোদঘাটন করি	
সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৬	কেন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৮৫
এপচয়-নিবারণে-রসায়ন বিদ্যা—		আলোচনা	১১১, ৫৩৩, ৮১৮
ঐশ্বলিনবিহারী সবকার	৪৯১	ঐশ্বলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৩৬
সবনতত্ত্ব স্বীকারে স্বত্বধরদের ত্রাব্য ও স্বাভাবিক		উইলিয়ম কেবীর শতবার্ষিক	
আপত্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৫৯০	স্বত্বিসভা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৯
অবনত-দিগের জন্ত আসন সংরক্ষণেব		উড়িয়ায় বাঙালী এবং বঙ্গের বাঙালী ও প্রবাসী-	
কুফল (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৫৯৭	বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৭
অভিনব মেঘদূত ও কাগিনাসের অবমাননা		উদ্বোধন—ববীজনাথ ঠাকুর	৫৪৯
—শ্রীবীরেশ্বর সেন	৪০৩	একাদশী—শ্রীসীতা দেবী	৩১৬
সভিধান—শ্রীতারাশদ মজুমদার	৪৮৫	এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-	
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৪	সম্মেলন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১১
সর্দকন্দ মার্কা ইম্পীরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রিজ		এলাহাবাদে বাংলার চর্চা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৯
লিমিটেড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৮	কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিব অধিবেশন	
সর্ধোদয়-যোগে—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	৮৬১	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৫৯৭
অর্ধোদয় যোগে স্নান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪০	কংগ্রেস পালেমেণ্টাবী দলের কার্যত:	
অলঙ্কার (সচিত্র)—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাত্মক	৯৯	দেশদ্রোহিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৩৪
আইন-সচিবের নিরপেক্ষ থাকা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৩৯	কংগ্রেসের গত অধিবেশন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	২৯৩
আড়িয়লের কাগজ (সচিত্র)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	২৬	কংগ্রেসের নুতন ওয়ার্কিং কমিটি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৭
আধুনিকা (কবিতা)—ববীজনাথ ঠাকুর	৮৩০	কথাকলি (সচিত্র)—শ্রীশরাদিন্দু সিংহ	৮৪৩
আধুনিকা (কবিতা)—শ্রীশুশীলকুমার ঘোষ	৬৭০	কনে-বউ (কবিতা)—শ্রীফান্দনী মুখোপাধ্যায়	৩৩৪
আফগানিস্থানের শীগপ্রবেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫১	কবি ও কন্ঠী অভুলপ্রসাদ—শ্রীরাধাকমল	
খান আবজল গফ্ফর খান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫২	মুখোপাধ্যায়	৩৯
খান আবজল গফ্ফর খান ও		কমিটির প্রস্তাবিত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের স্বরূপ	
বঙ্গদেশ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১২	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৩
তার আবজল মুহাওয়ারী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৪	শ্রীব্রজ ককণাদাস গুহ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৫৯৬
আবদন (কবিতা)—ববীজনাথ ঠাকুর	১৬৯	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষা	
আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্ত আমরা		(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৬
দারী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৫৮৯	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসঙ্গল কমিটি	
আমেরিকার দৃষ্টান্ত অননুসৃত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৮৩	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৯
আসন-বটন বহুত্ব অনুসারেও		কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মোৎসব	
নহে (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৮৩	(বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪০
আসন-বটন শিক্ষাযাত্রী ও নহে (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৮৩	কলিকাতা স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৭

কলিকাতার ধান আবহুল গফ্ফার খানের সম্বন্ধনা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৯	স্তর চাকচক্য ঘোষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৪৮
কলিকাতার প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন (সচিত্র) ...	৭১৩	চিরন্তনী (গল্প)—শ্রীপারুল দেবী ...	৬৪৫
কান্তা (কবিতা)—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ...	৬১২	চীনে লোকশিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩১২
কৌশিনারায়ণ—শ্রীননীমাধব চৌধুরী ...	৩৪৮	সীনের কবি ও কৃষক-পরিবার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ...	৩২৮
কুটির-শিল্প ও বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ (সচিত্র) শ্রীকল্পদাস গুহ ...	৬২৫	হেলেনসেয়েমের একত্র শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬০৩
কুলীনের মেয়ে—শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭৮১	হেটনাগপুরে সাহিত্য-সেবার উপাদান (সচিত্র) —শ্রীশরৎ চন্দ্র রায় ...	৪৬৩, ৬৫৩
কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিপূজা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৫২৬	জন্মনিরোধের ঔষধ ও যজ্ঞ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২৭
কোথার কত জন ভোট দিয়াছে? (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬০১	জলসেচন সহজে যুক্ত কে? (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২০
কোন্টি চান?—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ...	২৫৫	জাগরণী (কবিতা) শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস ...	৮২
কোন্ জাতি কাহার হিত করেন? (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৫৮৮	জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৫২৮
কোমিল অব ষ্টেটে দেশী রাজ্যের নবোদয়ের মতের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮৮৪	জানকীনাথ বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৫৬
কোমিল অব ষ্টেটে প্রদেশ অরুসারে আসন বণ্টন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮৮২	ভিত্তেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৩৭
কোমিল অব ষ্টেটের আসন বণ্টন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮৮২	মিঃ জিন্না কি চান? (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৩৮
ক্ষণিকের মারা (গল্প)—শ্রীষিদ্ধেন্দ্রলাল ভাট্টা ...	২১৭	মিঃ জিন্নার রফার সর্ব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮৮৭
ক্ষয়িকৃতার স্তম্ভ গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২১	জীবনায়ন (উপভাস)—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু ...	৫৫৫, ৭১৮, ৮৩৫
শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগীর ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃপ্রবেশ চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৬০	জীবিকা (গল্প)—শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩১
খাইবার সীমান্তে (সচিত্র)—শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ...	৫০৮	জেলার জেলার আলাদা পাঠ্য-পুস্তক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৭
ডক্টর গণেশ প্রসাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	২১০	ডাল কাগিয়া ও ডালাকাগিয়ান (সচিত্র) শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ ...	৬৬
গবর্ণমেন্টের বণিক-বুদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২১	ডিক্টেটর বা বৈর শাসক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৪৩
গভর্নমেন্ট আর্টস সন্থে চিত্র-প্রদর্শনী (সচিত্র) ...	৭১৭	ডোমীনিয়নস্বের অভিযুক্ত, না উল্টা দিকে? (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৪১
মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩০৯	ডোমীনিয়নস্বের প্রতিশ্রুতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২৬
গ্রাম্য শিল্পসভা সম্বন্ধে শুভব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৫২৭	ঢাকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শাখার বাঙালী এজেন্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৩৫
গিরিডির ঔপনিবেশিক বাঙালী (সচিত্র)— শ্রীসরোজ কুমার দে ও শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ...	৬৩০	তপশীলভুক্ত কোন কোন জাতির প্রতিবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২৭
গিরিডির বিবিধ প্রতিষ্ঠান (সচিত্র)—শ্রীসরোজ কুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ...	৭৬১	তৃতীয় শ্রেণীর রেলবার্তার সুবিধা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২৭
গৌড় জাতি (সচিত্র)—শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ...	২১০	দ্বিধির দুঃখ—শ্রীপ্রমীলা দেবী ...	৩৭১
গোপন কথা (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ বিনী ...	২১৬	দিবাস্ত—শ্রীসীতা দেবী ...	৮৫২
ঘাসের ফুল (গল্প)—শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭২	মহারাজ দিব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৩০
চরণ ঘোষকে প্রহার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮২৮	হুমিন পরে (কবিতা)—শ্রীসুধীর চন্দ্র কর ...	১৯১
চার অধ্যায়—শ্রীরাজশেখর বসু ...	৪৮৪	নৃষ্টি-প্রদীপ (উপভাস)—শ্রীবিহুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১১, ১৭২, ৪০৬, ৪৭১, ৬১৩, ৭৭০
“চার অধ্যায়” (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬০২	দেনা-পাওনা—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ...	৬
		মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈরাগ্য— প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ...	৫২২

দেশের কথা (সচিত্র) ১৪২, ২৮০, ৪২৩, ৫৭৩, ৭২৬, ৮৭২	প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৪৫, ৩০৫, ৪৪৯, ৫৯৯,
দেশের গুরুত্ব কেন এত ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন—প্রীতিলিতমোহন কর	৮১৪
বঙ্গদেশের নবোদয় ও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতীয়দের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	প্রবাসী বাঙালীর সম্মান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৮, ৫৯১
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	প্রশ্ন (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৬১
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	প্রাচীন ভারতীয় পুঁথির পরিচয় ও হুচী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৩
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের অধিবেশন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৩
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	প্রাথমিক বঙ্গদেশীয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৫
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	প্রোভ—প্রীতিলিতমোহন কর	৮০০
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	মিঃ ফজলুল হকের একটি বক্তৃতা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১২
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	ফিরদৌসির সহস্রবার্ষিক জন্মোৎসব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৬
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	ফ্রান্সের রবীন্দ্র বাঙ্কব সমিতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৪৭
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গদেশে ডাকাইতী বৃদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৮
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গীয় মহাকোষ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৯
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৮
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে অষ্টম শতাব্দীতে নৃপতি নির্বাচন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭২৯
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে আরও কাপড়ের কল চাই (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৬
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে কাপাসের চাষ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৮
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে ডাকাতী ও নারীহরণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৮
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে জলপান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৬
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে জলসেচন অনাবশ্যক, এ ভ্রম কাহার ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯০
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে চুর্ভিক্ষ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০২
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে নতুন ট্যাক্সের প্রস্তাব (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪৩, ৬০৪
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে বাঙালীর চাকরি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৯
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে কলের চাষ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১২
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৫৯৫
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে লবণ প্রস্তুত (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৭
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গে সম্মানবাদ উচ্ছেদের বেসরকারী চেষ্টা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৪৬
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গের ফরিক্ক অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯০
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গের গবর্ণমেন্ট তপস্বীভুক্ত জাতিসমূহ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৮৫
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গের পটচিত্র (সচিত্র)—প্রীতিলিতমোহন কর	৬৭৯
বঙ্গদেশের নবোদয়ের মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	বঙ্গের বাহিরে বাঙালীবিষয়ে (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩০৭

বঙ্গের বাণিজ্য-শুল্ক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৫	বিহারের কাজ বিহারী ও ওড়িয়ার জন্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮:
বঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৩	ব্রিটেনে ভারতে বাণিজ্যচুক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬
বুড় ও প্রাদেশিক লাটদের অসাধারণ ক্ষমতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮৯৮	বীরেন্দ্রনাথ শাসন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৪৮
বহু সিনেমা-চিত্রের অপকারিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩১২	বৃহৎসংহিতায় নারী—শ্রীভ্রমর ঘোষ ...	৫৮
বরিশালের ব্রহ্মমোহন ইন্সটিটিউশনের জুবিলী উৎসব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৬০	বেলুড়ে লোহাব কারখানা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৬
বর্তমান অর্থসঙ্কট—শ্রীঅনাথ গোপাল সেন ...	১৯৯	বৈরী—শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী ...	৬৮
বহির্ভূগৎ (সচিত্র) ১৬১, ২৮৯, ৪৩৩, ৫৫১		বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের দান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩০
বাংলাদেশে ব্যাংকচর্চা (সচিত্র)—শ্রীরাধেন্দ্রনারায়ণ ...	২৭১	বোম্বাইয়ে মহিলাদের লগিতকলা ও শিল্প-প্রদর্শনী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩
... গুহ ঠাকুরতা		বোম্বাই কংগ্রেসের প্রধান প্রধান কাজ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩
বাংলা দেশের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (সচিত্র) —শ্রীঅনাথনাথ বসু ...	৭৫৩	ব্যবস্থাপক সভায় ভ্রমপরাঙ্কর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৮
বাংলা ভাষার প্রশংসিত—শ্রীসত্যকুমার সিংহ ...	৬৭১	ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশের সাম্প্রদায়িক বাটোরারায় সম্মতির মূল্য (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭
বাঙালী বৈমানিকদের ভূপ্রদক্ষিণ সঙ্কল্প (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৫৯৩	ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর আত্মকথা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭
বাঙালীর প্রভাব হ্রাস (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮৮৬	ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের দাবী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮
বাকুড়ায় মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৪৬	ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালী—শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী ...	১০
বাণিজ্য চুক্তি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৭৫৫	ব্যঙ্গ-চিত্র ১৪০—	
বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয় (সচিত্র)—শ্রীচিন্তাবল্লভ চক্রবর্তী ...	৩০৩	ভারতরক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ মুন্সের বক্তৃতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়—শ্রীঅন্নদাচরণ সেন ...	৭০৫	ভারত সচিব ও ডোমিনিয়ন টেস্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বাগি আঁসিয়াছে—শ্রীবিমল মিত্র ...	৫১৯	ভাবত সম্বন্ধে লীগের ব্যবহার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বাকুড়ার পুরাকীর্তি রক্ষা (সচিত্র)—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ...	৬১৫	ভাবতে দেশী ও বিদেশী সৈনিক (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বাণীর সুর—শ্রীআশালতা দেবী ...	৬৩৮	ভারতে নিম্নজাতি সমস্যা—শ্রীহরকুমাররঞ্জন দাশ ...	
বিক্রমপুর একালে ও সেকালে—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ্র ...	৭৩৬	ভাবতে মনঃ সমীক্ষা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ...	
বিঠলভাই পটেলের উইল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৩৩৬	ভারতে বিদেশী চাউলের আমদানী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বিড়ালয়ে মধ্যাহ্নে জলযোগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৮৩৬	ভাবতের লিপিসমস্যা—শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী ...	
পণ্ডিত বিদ্যুশেখর শাস্ত্রীর লেকচারাব্যয় নিয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৪৬	ভারতের লিপিসমস্যা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	
বিমান-চালনার প্রতিযোগিতা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	৫০৩	ভারতে লিপিসমস্যা (আলোচনা)—শ্রীমুখীচন্দ্র আচার্য ও উমাদাস গুপ্ত ...	
বিলাতে অবাঙালী আসামবাসীদের প্রতিনিধি প্রেরণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৭	ভাবতে লিপিসমস্যা (উত্তর)—শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী ...	
বিলাতে হারকানাথ ঠাকুরের সম্মান—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৮	“ভারতীয়করণ এরূপে কখনও হইবে না” (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বিলাতে ভারতীয় তুলার ব্যবহার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১০৬	ভারতীয় পল্লীশিক্ষা সংঘ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বিশ্বকোষ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৮	ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বড়লাট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বিশ্বপুরের ইতিহাসের নতুন কথা—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত ...	২৪২	ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন-বণ্টনে অবিচার (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
বিহারে বাঙালীবিরোধ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	১৫৭	ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতি ও ডেপুটি সভাপতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	
		ভারতীয়দের পরিচ্ছদ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ...	

তবর্ষ ও আমেরিকান পুস্তক-প্রকাশকগণ

(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫১

তবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ পুথক করণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৫৮

তবর্ষে শিক্ষার প্রগতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫১

তবর্ষে একা উৎপাদন ও বিনাশ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৪১

তবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বাধীনতা সভা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫০

তবর্ষে ডিস্ট্রিক্ট (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১১৪

উত্তমকে হিন্দু-মহাসভার সভাপতি নির্বাচন

প্রত্যাব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫৮

১ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬০৫

৭৭ রিভিউর উনত্রিংশ বৎসর (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬০৪

৭৭-রিভিউর সঞ্চকে ডাঃ সান্তালার্যাদেশের মত
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৮

৭৭ বনে (কবিতা)—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী ... ৭২৫

৭৭ র মন্থনাথ মিত্র (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৮

৭৭ মহতীকুমার সুখোপাধ্যায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫২২

৭৭-সংবাদ (সচিত্র) ২৮৪, ৪২২, ৫৫০, ৭২৫, ৮৫০

৭৭-সব—শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৬৮

৭৭-৬ প্রোগ্রেসে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৪৫০

৭৭-৭ মানবেন্দ্রনাথ রায় (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫৭

৭৭ ও বিশাখপত্তনে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চর্চনা
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০৫

৭৭ ত মালবীরের উপর আক্রমণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩০৫

৭৭-৭ অভাব (কবিতা)—শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৫০৭

৭৭-৭ বেনের আমেরিকা-যাত্রা (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫১

৭৭-৭ (উপন্যাস)—শ্রীআশালতা দেবী ১১২, ২৪৫, ৩২৮

৭৭-৭ নাহি মম (কবিতা)—শ্রীমলিনা হালদার ... ৬২৪

৭৭-৭ রফেল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৭৪০

৭৭-৭ ধল কবি গোবিন্দদাস ঠাকুর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৭৫৪

৭৭-৭ ল সাহিত্যের জাতিজন্মক ও প্রজাদের দারিদ্র্য
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫৪

৭৭-৭ কুলেশান পরীক্ষার্থী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮২৯

৭৭-৭ পুর যন্ত্রা হ্রাসপাতাল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৬০৪

৭৭-৭ ৭ রাষ্ট্রিক আন্দোলন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৫

৭৭-৭ ৭ আত্মনি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৪৭

৭৭-৭ ৭ স্বাধীনতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬২০

৭৭-৭ ৭ বীর আসন বণ্টন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৮৮০

৭৭-৭ ৭ নারের স্বাধীন—শ্রীবিমল মিত্র ... ৩৫৭

৭৭-৭ ৭ গাথের পত্র ৪

৭৭-৭ ৭ গাথের প্রাণ-পুনরুজ্জীবন-চেইন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩০৯

৭৭-৭ ৭ কাব্যে প্রেমোবোধ ও আনন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৫

রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলার পল্লীচিত্র—শ্রীরাধামোহন

ভট্টাচার্য্য ... ২২৪

রাখালচন্দ্র সেন (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৫৬

রাজমহলের মালপাহাড়িয়া ধর্ম (সচিত্র)—শ্রীশশাঙ্ক-
শেখর সরকার ... ৪৩

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৭৩১

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন
(বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫৯

রাণুর দিদি—শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায় ... ২৬৭

রামকৃষ্ণ পরমহংস—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ... ৮৬৫

রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভট্টদেও—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
বিদ্যানিধি ... ১৯

রাজা রামমোহন রায়—শ্রীদীননাথ সাত্তাল ... ৮৬৫

রামমোহন রায়ের স্মৃতি (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৪৭

রাশিয়ার আইন-আদালত—শ্রীনিত্যনারায়ণ
বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬৬৫

রুশিয়ার রাজ-অলঙ্কার (সচিত্র)—শ্রীবিমলেন্দু কয়াল ৮১

রূপান্তর—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী ... ৫২১

পুণ্যবতী সাধবী রোকেয়া খানম (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৪৬০

রোমে ভারতীয় ছাত্রের দল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩০২

রোমের সাগরতীরে (সচিত্র)—শ্রীপ্রমথনাথ রায় ... ১১৯

লক্ষ্মীয়ে বাড়ালী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৩১০

লক্ষ্মী—শ্রীরামপদ সুখোপাধ্যায় ... ২৮৬

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রাদির প্রদর্শনী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৭৪৫

লণ্ডনে ভারতীয় ললিতকলা প্রদর্শনী (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৫২৯

লাভস্ট্রোক—আবুল হাছান ... ৬৯৭

লীগ অব নেশ্যন্সে রুশিয়ার যোগদান (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৪৯

লীগ ও নেপাল (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫১

লীগের সভা ভারতবর্ষ ও রুশিয়া (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ১৫০

লোঁজা, হুইজারল্যাণ্ড—শ্রীমুখীন্দ্রনাথ সিংহ ... ২৩২

শব্দ (গল্প)—শ্রীদ্বর্গলাল চৌধুরী ... ১২৫

শব্দপ্রসঙ্গ—শ্রীবিদ্যুৎশেখর ভট্টাচার্য্য ৪৮, ৩১৫

শরৎচন্দ্র বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ) ... ৫২৪

শান্তিনিকেতনে দৈনিক অধ্যাপকবৃত্ত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ১৪৯

শান্তিনিকেতনে হুইডিশ শর-শিকরিত (বিবিধ প্রসঙ্গ) ৩১১

শিখদের মহাপ্রস্থ—শ্রীকিষ্টিমোহন সেন ... ১৭১

শিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী (সচিত্র)—শ্রীবিমলেন্দু কয়াল ৩৮৫

শিব-ভাণ্ডব (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে ... ২৫৪

শীতের রোম—শ্রীপ্রমথনাথ রায় ... ৭৭৮

শুধু একটুখানি মুন—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ ... ১৯৭

শেষ পর্ব (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১

শের শাহের সিংহাসনারোহণ বৎসর (সচিত্র)—
শ্রীললিতাকান্ত ভট্টশালী ... ৪৮১

শ্যামদেশ ও খ্রীস (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৬	হুভাষচন্দ্র বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সংস্কৃতশিক্ষা ও জীবিকা—শ্রীবৈষ্ণবনাথ কাকু-পুরাণতীর্থ	৬৪৩	হুভাষচন্দ্রের পুস্তক বাজেন্দ্রাশ্রমী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সন্ধান (গল্প)—শ্রীশান্তা দেবী	৯০	হুভাষচন্দ্র বসুর স্বদেশ আগমন (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সমগ্র ভারতের জন্ত একীকৃত শাসনব্যবস্থা কি অসম্ভব ? (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৪	হুভাষবাবুর কয়েকটি মন্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সমগ্র ভারতীয় বঙ্গো (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৪	হুভাষবাবুর পুস্তক ভারতে নিষিদ্ধ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সংগীতালমে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৪২	হুভাষবাবুর পুনরুদার ইউরোপ-যাত্রা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সাংবাদিকের কার্য শিক্ষা (বিবিধ প্রসঙ্গ)	১৫৬	হুইডেনে ব্যায়ামদল বাঙালী (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সাগরিকা (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	৩৭	হুইডিশ সাহিত্য (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ	...
সাবিত্রী (কবিতা)—শ্রীঅমরেশ্বর রায়	৮১৭	সে-কালিনী ও আধুনিকা (কবিতা)—শ্রীঅপবাজিতা দেবী	...
সাবিত্রী শিক্ষালয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৭	ডাচিং চার্চ কলেজ অর্বেতনিক নৈশ বিদ্যালয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সামরিক ব্যয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৫	তিমিতায়মান (কবিতা)—শ্রীজীবনময় রায়	...
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৮৭	স্বরূপি—শ্রীশৈলজ্ঞানন্দ মজুমদার ১৩০, ৩৯৭, ৫৬৩,	...
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৭৪১	স্বপ্নপ্রতিমা (গল্প)—শ্রীসীতা দেবী	...
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনের প্রস্তাব- সমূহ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৩১০	স্বপ্নবজ্র (গল্প)—শ্রীমদোজ বসু	...
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিরোধী কনফারেন্স (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৩	জেনারেল স্টার্স ভারতে স্বরাজ চান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায়— শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪৩	ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নূতন দান (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সাহিত্যবিগাধ—শ্রীরাজশেখর বসু	৬০৭	হাউস অব কমন্স রক্ষণশীলদের জয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সারদা আইন সঙ্কেত বালাবিবাহ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৮৯৮	শ্রীমতী হালিদে এদীব হাফুজ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু—শ্রীসীতা দেবী	৫২৮	হিন্দুদের 'নৈশ অবরোধ' ও হিন্দু নারী হরণ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সিঙ্ড্রুমের তত্ত্ব (সচিত্র)—শ্রীগণেশীলাল রায়	৫৬৫	হিন্দু সমাজের কর্তব্য (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সিঙ্ড্রুমের শিল্পবিভাগে বাঙালী নিয়োগ (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৫৮	"হে মোর দুর্ভাগা দেশ" (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
সিঙ্ড্রু-তটে (কবিতা)—শ্রীগোপাললাল দে	৮৫২	হাভেল—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার পরীক্ষিতব্য বিষয় (বিবিধ প্রসঙ্গ)	৪৮৩	হাভেল—শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...
স্থবর স্মরণ (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণীন্দ্রমোহন কর	১১৬	হাভেল, আর্গেন্ট বিনকীল্ড (বিবিধ প্রসঙ্গ)	...
স্থানদার বিয়ে—শ্রীশান্তিময়ী দত্ত	৪১৬	হাভেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে	...

চিত্র-সূচী

শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত	৭৩৪	—উড়িয়ার হস্ত ও পদের গহনা	...
শ্রীঅখিলপদ ঘোষ	২৮২	—মস্তক ও কর্ণভরণ	...
অতুলপ্রসাদ সেন	৪১	—রূপার বাজু	...
শ্রীঅগ্রকাশচন্দ্র সেন	৮৯৪	—রৌপ্যের কর্ণহার	...
শ্রীঅমলা নন্দী	১৭৪	—সাতনরী হার	...
শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৭২৫	শ্রীঅসিতকুমার হালদার	...
অমৃতলাল ঘোষ	৭৬১	'আজান' (রঙীন)—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
অলঙ্কার		আড়িয়লের কাগজ	...
—উড়িয়ার অলঙ্কার	১০৪	—কাগজ পাশিশ করা	...

—কাগজী	...	২৭	গিরিডির উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের	...	৭৬৪
—কাপড়ের মাড়ুইয়া ফেলা হইতেছে	...	২৮	রন্ধন ও চরকা কাটা	...	৭৬২
—পচান-কাগজ মাড়াই হইতেছে	...	২৯	গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, সাধারণ ও নববিধান	...	৭৬৩
—পাট চূর্ণ করা	...	২৮	—র্যাটরে দাতব্য চিকিৎসালয়	...	৭৬৫
—ফালাহি	...	২৬	শ্রীগোকুলকৃষ্ণ দে খাড়া	...	৭৬৫
—চুর রহিম	...	৭৬৩	গৌড়জাতি	...	২২৫
—চুর গফ্ফর খান	...	১৫২	—গৌড়জাতির শস্তাৎসব	...	২১৩
—পনা চিত্র	...	৫৭৩	—গৌড়জাতির স্ত্রীলোকেরা শস্ত সংগ্রহ	...	২১৩
—আলেকজান্ডার ও রাণী মেরি	...	৪৩৫	করিতেছে	...	২১২
—প্রমের দৃশ্য (রঙীন)—শ্রীনন্দলাল বহু	...	১	—গৌড়শিল্প	...	২১১
—সেন	...	৩৪১	—গৌড়-সেবামণ্ডলের প্রধান গৃহ	...	২১৪
—শানচন্দ্র সুখোপাধ্যায়	...	৭৩৬	—গ্রাম্যমোড়ল	...	৫৭৫
—রশকর ও সঙ্গীদল	৪১৭—৪২০		—দাতব্য চিকিৎসালয়	...	২৯৮
—শক্তি (রঙীন)—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মিশ্র	...	৫৪৮	শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৩৪
—শিপেরজন বিশ্বাস	...	১৫৫	গোবিন্দরাও বলবন্ত প্রধান	...	৭১৭-৭১৮
—শ্রী (রঙীন)—শ্রীশৈলেন্দ্রভূষণ দে	...	৩১৩	ডক্টর গোরেবেলুস্	...	৭২৫
—হাবাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্মেলন	৬২২, ৪৩০		চিত্রকলা-প্রদর্শনী	...	৬৬৭
—ইস্ টেগনের	...	৩৪০	শ্রীমতী এম. চিত্র	...	৪৬৮
—এ, এডমিরাল	...	৪৩৬	ছিন্নমস্তার মন্দির	...	৬৫৪
—স	...		ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত প্রস্তর	...	৩২২
—খান আবদুল গফ্ফার খান	...	২২৩	জগন্নাথ মন্দির, রাঁচী	...	৮৭৭
—খাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ	...	২২৮	জাপানী চিত্র (রঙীন)—শ্রীবিধুর বহু	...	৪৬৫
—রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যর্থনা—শোভাযাত্রা	...	২২৭	জাপানে ভারতীয় নারীগণ	...	৪৬৪
—কুমারী সোফিয়া সোমজী	...	২২৩	জুয়াজ গ্রাম	...	৪৬৬
—কলির চিত্রাবলী	৮৪৫—৮৪৯		—জুয়াজ যুবক	...	৪৬৬
—কপিল দেবাই	...	২৮৫	—জুয়াজ রমণী	...	৪৬৭
—কমলা জামখণ্ডী	...	৪২২	—জুয়াজের পশু-ঘর	...	৬২৯
—কমলাদাস গুহ	...	৫২৬	জ্যাকার্ড ও ঠক্কটিক তাঁত	...	৪২৭
—কাকাতা গভর্নমেন্ট আর্টসুলে চিত্র-প্রদর্শনী	৭১৬, ৭১৭		জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের মৃত্যু	...	৫৫১
—কাকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসের চিত্র	৭২৮, ৭২৯		টোগো	...	৪২৫
—ক মুর্তি	...	৭১১	ডাভল্ শহর	...	৬৬
—কাল্যাণী চক্রবর্তী	...	৭২৫	ডালাকার্লিয়া	...	৬৮
—কাজা হাদশ	...	৩৪৪	—গোস্তাব ভাসার প্রস্তর মুর্তি	...	৬৮
—ফেলডট্	...	৩৪২	—গোস্তাব ভাসার স্থতিস্তম্ভ	...	৬৮
—ফক্স (রঙীন)—শ্রীগিরীজকৃষ্ণ বহু	...	৭৮১	—চন্দ্রালোকে সিলিয়ান হ্রদের দৃশ্য	...	৬৮
—শ্রী কপালনী	...	২৮৪	—জর্জ অঙ্কিত মধ্যরাত্রির সূর্য্যোভিনন্দন	...	৬৯
—হিন্দর বহু	...	৪২৭	—জর্জের অঙ্কিত নিজচিত্র	...	৭১
—দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৫০	—জর্জের চিত্রশালা	...	৭১
—জমোহন বহু	...	২৮২	—ডালাকার্লিয়ান বর ও কনে	...	৭০
—র-সীমাস্তের দৃশ্যাবলী	৫০৯—৫১৪		—কাল্ লারসনের বাসগৃহ	...	৭০
—গাঙ্গীর স্টা-চিত্র	...	৭২৮	—বাদ্যরতা মহিলা	...	৬৯
—গিরিডির উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়বাটী	...	৭৬৩	—মেয়েরা চরকায় মৃত্যু কাটিতেছে	...	

—রবিবার উপাসনা-গৃহের দিকে	৬৯	—রাজপ্রাসাদের নর্তক-নর্তকী	১
—শিল্পী জর্নের বাসগৃহ	৬৭	—রামায়ণের একটি চিত্র	২
ডেউয়ার	৫৫৫	—শান্তিকালের বিমানপোত	১
শ্রীতডিৎকুমার গুহ	২৮০	—শান্তিকালের বিমানপোতের অভ্যন্তর	১
শ্রীতারকনাথ দাস	৪২৪	—শ্রামরাজ্যের স্থাপত্যের নিদর্শন	২
৭ভিনকড়ি বহু	৭৬১	বাঁকুড়া জেলার বাহলাড়ার মন্দির	...
দ্বিষোর জয়ন্তন্ত	৭২৯	বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন	...
হুর্ঘোৎন (রঙীন)—শ্রীননীগোপাল দাসগুপ্ত	৬৫২	বাংলার বর্ষা (রঙীন)—শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত	...
দেওবব বিদ্যাপীঠে বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৮৭৪	বাংলা দেশে ব্যায়ামচর্চা	...
দেওবব রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ ও ছাত্রগণ	৮৭৩	—লেখক	২
শ্রীদেবেপ্রকুমার রায়	৫৯১	—সশিষ্য লেখক	২
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৩৫২	—হস্তীপদতলে লেখক	২
দ্বিজদাস দত্ত	৩৫২	—শ্রীহীরেন্দ্র দত্ত মটর টানিতেছে	২
শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৭১৪	বাগী (রঙীন)—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে	৫
মিঃ নল্ল	৩৩৩	বাগীবন বাগিকা-বিদ্যালয়ের চিত্র	৩৯৪
শ্রীননী চক্রবর্তী	৩৩১	বাধু	...
শ্রীনবগোপাল দাস	২৮৪	বিপুল সিংহ ও বমেন	...
শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার	৭১৬	স্বামী বিবেকানন্দ	৮
শ্রীনির্মলা সরকার	৭১৬	বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ভাটস-চ্যালেঞ্জার	৭২
নীল বাগিকা (রঙীন)—শ্রীশরদিন্দু সিংহ	৮১২	শ্রীবীরেন রায়	৬
পাড়াগ্রামের দেউল	৬৫৫	বুড়াডিহি গ্রাম	৬
পাড়াগ্রামের (রঙীন)—শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	৩৫২	বুড়াডিহি গ্রামের দেবমূর্তি	৬
শ্রীকৃষ্ণ খলৈই	৭৩৪	বুড়াডিহি গ্রামের প্রস্তর-মন্দির	৬
পুনর্মিলন (রঙীন)—শ্রীবিমল দেব	৬০৫	বেঙ্গল একাডেমি, রেজুন	৪
প্রজ্ঞাপক ও রাণী রমাবর্তী	৪৪০	বেলমান	৩
প্রকল্পচক্র বহু	৪৪৮	বোড়োয়ার মন্দিরে নবগুপ্তর	৬
প্রথম প্রয়াস (রঙীন)—শ্রীনীলিমা বিশ্বাস	৮৪৪	বোম্বায়ে মহিলাদের শিল্প-প্রদর্শনীর চিত্রাবলী	৩০০-৩
প্রথম বিলাতযাত্রী বাঙালী চিকিৎসা-শিক্ষার্থী ছাত্রকুল	৭২৯	ব্যঙ্গ-চিত্র	১৪০, ১৫
প্রয়াগে বিকলাঙ্গ ভিখারী	৮৭২	ডক্টর ভটনাগর	৩০
প্রব সী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে সীমারে শ্রীতিস্মিলনী	৭১৫	শ্রীভাগুভূষণ দাশগুপ্ত	৪৫
প্রিয় (রঙীন)—কুমারী নিবেদিতা বোষ	১২০	ভিক্টর রিডবের্গ	৩
প্রিয়দ্বন্দ্বা দেবী	৫৭৪	ভিয়েনায় দীপালী উৎসব	...
প্রেমলতা দেবী	৮৭৬	শ্রীমণীজমোহন মৌলিক	...
কিবদোদী	১৫৫	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	...
রানী ফুলকুমারী	৪২২	মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়	...
বঙ্গর পট-চিত্রাবলী	৬৮০—৬৮৪	মায়ী ভট্টাচার্য	...
বন্দিনী (রঙীন)—কুমারী বসুনা বহু	৮০	মাস্ত্রাজ গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলে চিত্র-প্রদর্শন	৭১৮, ৭
বর্ষা (রঙীন)—শ্রীকালীকিঙ্কর বোষ দস্তিদার	৪০	মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়	৭
বহির্জগৎ	...	মুচির ঘর (রঙীন)—শ্রীবজ্জের সাহা	...
—আধুনিক যুদ্ধ	১৬১	শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়	...
—চিত্রাবলী	২৯০	মুনোশিনী কর্জক অভিনন্দিত ভারতীয় ছাত্রীব্রন্দ	...
—বুদ্ধদেবের জীবনের একটি চিত্র	২৯১	মুনিকে ভারতীয় ছাত্রগণের স্মৃতিফলকে মাল্যদান	...

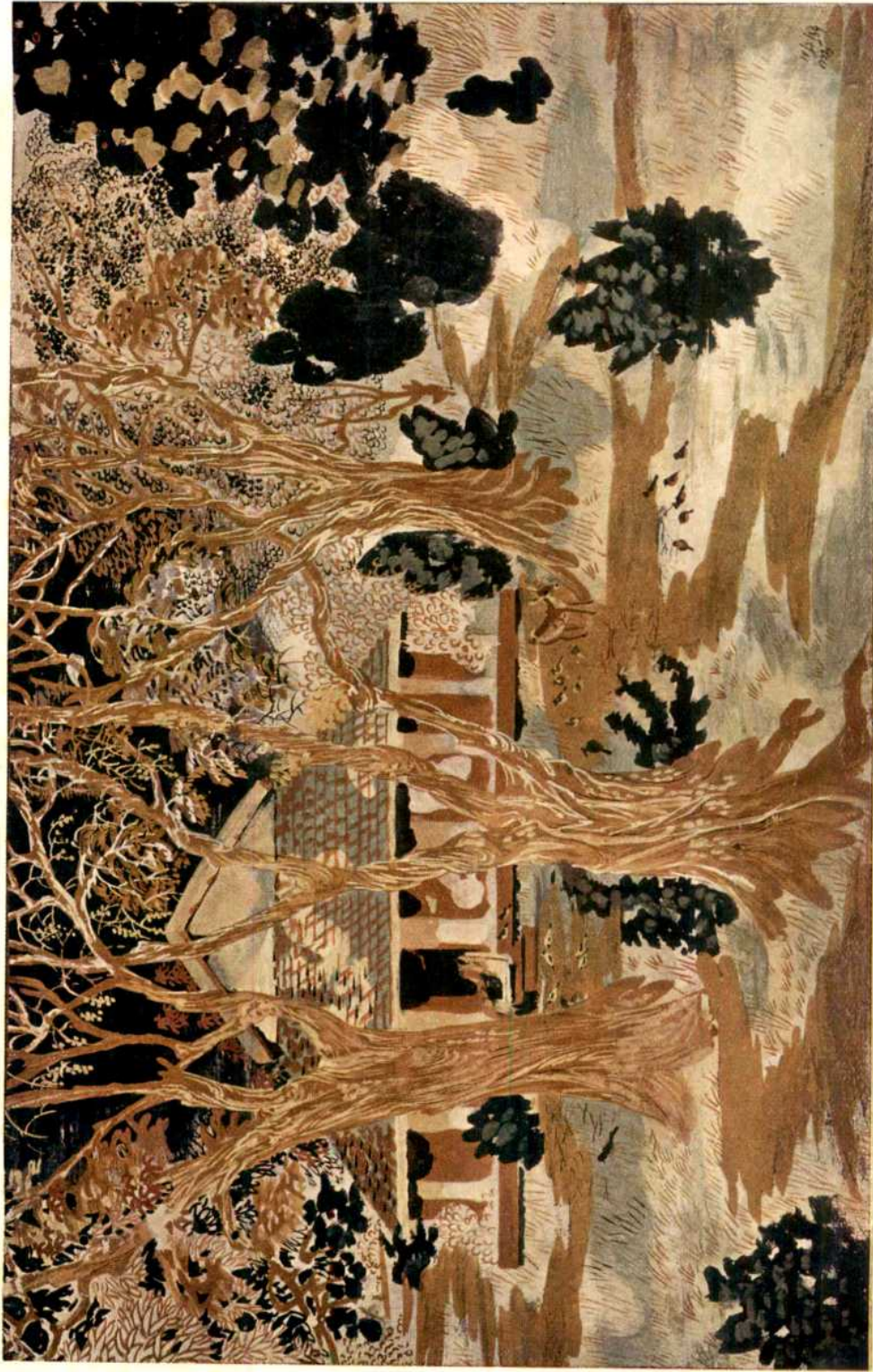
শোনা ও গোপাল (বড়ী)—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে	১৬৯	—ডাক্তার ষোলিয়া	২৩৬
সুদে বিমানপোত ও রণপোত	৪৩৭—৪৩৯	—ডেয়ারী	২৩৫
রমা কর	৮৫১	—পশ্চিম পার্শ্বের দৃশ্য	২৩৩
রাঁচির সাহিত্য-সম্মিলনী	৪২৮	—লেক্সার অপার দৃশ্য	২৩৪
রাজমহলের মালপাহাড়িয়া ধর্ম		—লেজেন্ডারি হোটেল	২৩৭
—গ্রামদেবতা ও জাগা গৌসাই	৪৪	—লে শালে ক্লিনিক	২৩৮
—ধার্মতী বহুমতী খান	৪৬	—সাধারণ দৃশ্য	২৩৯
—বুরনু খান	৪৪	—সুদ্র গ্রাম	২৩৪
—মালপাহাড়িয়া সম্পত্তি	৪৫, ৪৭	লেভেরটিন	৩৪৪
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	৭৩২	ল্যাগেরলফ	৩৪৩
রাধাকৃষ্ণ (বড়ী)	৬৯২	শ্রীশাক্তা সপ্তর্ষি	৮৫০
রামকৃষ্ণ পরমহংস (বড়ী)—জ্ঞানজ ডোরাক	৭৪৯	শারদ-শ্রী	৮৮
রামগড়ের পঞ্চ-রত্ন মন্দির	৬৫৬	শাসন মহাশয়ের শবাহুগমন	৪২৬
রামচন্দ্র ভদ্র দেও বাহাছর	২৫	শিকাগো প্রদর্শনীর চিত্রাবলী	৩৮৫—৩৯২
শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩৬	শ্রীমতী শুভ ভাটি শর্মা	২৮৫
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সর্জন	২৯৯	শ্রীশৈলবালা দেবী	৪৫০
শ্রীরাসবিহারী দে	৫৭৪	শ্রীনিবাস রায় মহাপাত্র	৮৭৬
কশিয়া		স্ট্রীওবের্গ, আগষ্ট	৩৪২
—‘ক্যাথারিন দি গ্রেট’র বিবাহ-সুকুট	৮৩	ষ্ট্যানলি, এ্যাডমিরাল	৪৩৬
—হুস্তাপ্য মণি	৮৪	শ্রীমতচরণ লাহা	৭১৪
—নর্মাণ উইলস্	৮২	শ্রীমতীশচন্দ্র ঘোষ	৮৭৭
—পত্রের অনুলিপি	৮২	শ্রীমতী সরলা দেবী	২৮৫
—পদ্মরাগ মণির সমারোহ	৮৫	সরিষা-আশ্রমে ছেলেনেয়েদের খেলা	৭৫৯
—রাজমহিষীর টায়রা	৮৩	সাঁওতাল মেয়ে—শ্রীমদলাল বহু	৭৫০
—রূপ সন্ধ্যার নৃত্যধার	৮৬	সাইকেলে দিল্লী-যাত্রা	৮৭৫
—সুন্দর ব্রোচ	৮৭	সাহাইয়ে রণপোত-সমূহ	৫৫৪
রেনেবের্গ	৩৪০	সারা ওরামবাগ	৪৩৩
রোমের সাগর-তীরে—		‘সারাটোগা’ জাহাজ	৫৫৩
—অস্তিরার সমুদ্র-জানের দৃশ্য	১২১	সিংহভূম তান্ত্রিকের দৃশ্য	৫৬৫—৫৭১
—সমুদ্রতীর	১২২	শ্রীমুনীকুমার নন্দী	২৮১
—সমুদ্রতীরস্থ প্রমোদসৌধ	১২৩	শ্রীবিমলচন্দ্র সবকার	৪৫১
—সমুদ্রতীরবর্তী রাজপথ	১২২, ১২৪	শ্রীমতী হুস্তাপ্য বাঈ গোসালিয়া	২৮৪
রাণী লক্ষ্মীবাই রাজবাড়ে	৮৫০	স্বভাবচন্দ্র বহু ও বন্ধুবর্গ	৭৩১
শ্রীমুক্ত লক্ষ্মীম্বরম	৭৩৪	স্বভাবচন্দ্র বহুর স্বগৃহে যাত্রা	৪৪৭
শ্রীমতী লতিফি	৪২২	মিঃ স্কট	৩০৪
লণ্ডন নৌ-বৈঠক	৫৫২	শ্রীমতী হানুম ও কমলা চট্টোপাধ্যায়	৭৩২
—বাণ্যনতা সেনগুপ্তা	৫৫০	হেইডেনষ্টাম	৩৪৩
—লালগোপাল মুখোপাধ্যায়	৪৪৯	হাভেল	৫৭৭
লেজেন্ডারি—আংশিক দৃশ্য	২৩৬		
—ইলেকট্রিক ট্রেন	২৩৫		

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীঅম্বিকুমার মুখোপাধ্যায়— বঙ্গের পটচিত্র (সচিত্র)	...	৬৭৯	শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য— মিলের অভাব (কবিতা)	...	৫৬৭
শ্রীমনাথগোপাল সেন— বর্তমান অর্থসঙ্কট	...	১৯৯	শ্রীগোপাললাল দে— শিব-তাণ্ডব (কবিতা)	...	২৫৪
শ্রীঅনাথনাথ বসু— বাংলা দেশের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সচিত্র)	...	৭৫৬	সিদ্ধ-তটে (কবিতা)	...	৮৪২
শ্রীঅন্নদাচরণ সেন— বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়	...	৭০৫	শ্রীচিন্তরঞ্জন চক্রবর্তী— বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয় (সচিত্র)	...	৩৯৩
শ্রীঅপরাজিতা দেবী— সে-কালিনী ও আধুনিকা (কবিতা)	...	৮২৯	শ্রীজীবনময় রায়— ত্মিমিতায়মান (কবিতা)	...	২২৩
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর— ঈ বী হাভেল	...	৫৭৭	শ্রীতারাপদ মজুমদার— অভিধান (গল্প)	...	৪৮৫
শ্রীঅমরেন্দ্র বোষ— তত্ত্ব একটুখানি হুন (গল্প)	...	১৯৭	শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়— কুলীনের মেয়ে	...	৭৮১
শ্রীঅমরেশ রায়— সাক্ষী (কবিতা)	...	৮১৭	ঘাসের ফুল (গল্প)	...	৭২
শ্রীঅমিয়কুমার বোষ— নিশীথে ডাকিল কে (গল্প)	...	৮২০	শ্রীদীননাথ সান্তাল— রাজা রামমোহন রায়	...	৮৬৫
শ্রীঅমিয়জীক মুখোপাধ্যায়— শ্রোত (গল্প)	...	৮০০	শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী— ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী	...	১৯৩
শ্রীঅমূল্যকুমার বিদ্যাকৃষ্ণ— অলঙ্কার (সচিত্র)	...	৯৯	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র— চীনের কবি ও কৃষক-পরিবার	...	৩২
শ্রীঅমৃতলাল শীল— পদ্মাবতের কবি	...	৩৫৫	শ্রীবিজ্ঞানেশ্বর ভাট্টাচার্য— ক্ষণিকের মায় (গল্প)	...	২১৭
শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়— হাভেল	...	৫১৯	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত— মৈথিল কবি গোবিন্দরাস ঝা	...	৭৫৪
আবুল হাছানাৎ— লাভস্ট্রোক	...	৬৭৯	শ্রীনীমাধব চৌধুরী— কীর্তিনারায়ণ (গল্প)	...	৩৪৮
শ্রীআশালতা দেবী— রুক্তি (উপন্যাস)	১১২, ২৪৫, ৩২৮		শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়— খাইবার-সীমান্তে (সচিত্র)	...	৫০৮
বাসীর সুর	...	৬৩৮	শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য— শের শাহের সিংহাসনারোহণ বৎসর (সচিত্র)	...	৪৮১
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য— দেনা-পাওনা	...	৬	শ্রীনত্যানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়— কুশিয়ার আইন-আদালত	...	৬৬৫
শ্রীকল্পদাস গুহ— কুটীর-শিল্প ও বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ (সচিত্র)	...	৬২৫	শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী— ভারতের লিপিসমস্তা	...	৩
শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী— বৈরী (গল্প)	...	৬৮৮	ভারতের লিপিসমস্তা (উত্তর)	...	৭০৫
শ্রীকিতমোহন সেন— শিখের মহাগ্রন্থ	...	১৭১	শ্রীপারুল দেবী— চিরসুখী (গল্প)	...	৬৪৫
			শ্রীপগাকীলাল রায়— সিংহভূমের তাম্রখনি (সচিত্র)	...	৫৬৫

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার—		শ্রীমলিনা হালদার—	
অপচর-নিবারণে রসায়ন-বিদ্যা	... ৪৯১	মৃত্যু নাহি মম (কবিতা)	... ৬২৪
শ্রীপ্রমথনাথ বিলী—		শ্রীমাপিক বন্দ্যোপাধ্যায়—	
গোপন কথা (কবিতা)	... ২১৬	জীবিকা (গল্প)	... ৩১
শ্রীপ্রমথনাথ বার—		শ্রীমুকুলচন্দ্র দে—	
রোমের সাগরতীরে (সচিত্র)	... ১১৯	হাভেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ	... ৫৭৮
শীতের রোম	... ৭৭৮	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—	
শ্রীপ্রমীলা দেবী—		সাগরিকা (কবিতা)	... ৩৭
মিদির ছন্দ	... ৩৭১	শ্রীবোগেশচন্দ্র বাগল—	
পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী—		নৌবহরের কথা ও জাপানের দাবি (সচিত্র)	... ৫৫১
মহর্ষি বেবেজনাথ ঠাকুরের বৈরাগ্য	... ৫২৯	শ্রীবোগেশচন্দ্র বার বিজ্ঞানিধি—	
শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়—		অর্ধোদয়-যোগ	... ৮৬১
কনে-বউ (কবিতা)	... ৩৩৪	কোনটি চান ?	... ২৫৫
শ্রীবিষ্ণুশেখর ভট্টাচার্য্য—		বাকুড়ার পুরাক্তি রক্ষা (সচিত্র)	... ৬৭৫
শব্দপ্রসঙ্গ	৪৮, ৩১৫	রাঙ্গা শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত বেণু	... ১৯
শ্রীবিত্তভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—		শ্রীরবীন্দ্রনাথ বোষ—	
দৃষ্টি-প্রদীপ (উপন্যাস) ১১, ১৭৯, ৪০৬, ৪৭১, ৬১৩, ৭৭০		ভারতে মনঃসমীক্ষা	... ৩৭৮
শ্রীবিমল মিত্র—		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—	
বাঘ আসিয়াছে (গল্প)	... ৫৩৯	অচিন মানুষ (কবিতা)	... ৩১৩
বঙ্গিলা নায়ের মাধি (গল্প)	... ৩৫৭	আধুনিকা (কবিতা)	... ৮৩০
শ্রীবিমলেন্দু কয়াল—		আবেশন (কবিতা)	... ১৬৯
কশিয়র রাজ অলঙ্কার (সচিত্র)	... ৮১	উদ্বোধন	... ৫৪৯
শিকাগো বিশ্বপ্রদর্শনী (সচিত্র)	... ৩৮৪	ধারাবাহী	... ৬০৯
শ্রীবীরেশ্বর সেন—		হুটু (কবিতা)	... ৮৫১
অভিনব মেঘদূত ও কালিদাসের অবমাননা	... ৪০৩	পত্র	... ৩৩৫
শ্রীবৈক্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ—		পত্রাবলী	... ৭৫১
সংস্কৃতশিক্ষা ও জীবিকা	... ৬৪৩	প্রশ্ন (কবিতা)	... ৪৬১
শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—		ভুল (কবিতা)	... ৬০৫
বিলাতে ছারকানাথ ঠাকুরের সম্মান	... ৩৮	বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বিন	... ৫৪৭
ভারতের লিপিসমত্তা	... ৫১৫	যুরোপের জীৱধর্মনীতি	... ৬২৩
শ্রীভ্রমর বোষ—		রবীন্দ্র-কাব্যে শ্রেয়োবোধ ও আনন্দ	... ১৯৫
বৃহৎসংহিতায় নারী	... ১৭৬	শেষ পর্ব (কবিতা)	... ১
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত—		সাঁওতাল মেয়ে (কবিতা)	... ৭৪৯
আড়িলের কাগজ (সচিত্র)	... ২৬	শ্রীমদ্রামদাস চন্দ্র—	
শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু—		বিক্রমপুর—একালে ও সেকালে	... ৭০৬
জীবনায়ন (উপন্যাস)	৫৫৫, ৭১৮, ৮৩৫	শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	
শ্রীমনোজ বসু—		সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায়	... ৫৪৩
স্বর্ণযজ্ঞ (গল্প)	... ৫১	শ্রীরাজশেখর বসু—	
		চার অধ্যায়	... ৪৮৪
		সাহিত্যবিচার	... ৬০৭

শ্রীরাধেন্দ্র নারায়ণ শুভ ঠাকুরতা— বাংলা দেশে ব্যায়ামচর্চা (সচিত্র)	... ২৭২	শ্রীসত্যকিন্দর চট্টোপাধ্যায়— গোড়জাতি (সচিত্র)	... ২১০
শ্রীরাধেন্দ্র শঙ্কর— নৃত্য-ধর্ম (সচিত্র)	... ৪১৫	শ্রীসনৎকুমার সিংহ— বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ	... ৬৭৪
শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়— কবি ও কল্পী অতুলপ্রসাদ	... ৩৯	শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়— গিরিডির ঔপনিবেশিক বাঙালী (সচিত্র)	... ৬৩০
শ্রীবাধামোহন ভট্টাচার্য— রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার পল্লীচিত্র	... ২২৪	গিরিডির বিবিধ প্রতিষ্ঠান (সচিত্র)	... ৭৬১
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়— লজ্জা (গল্প)	... ২৮৬	শ্রীসীতা দেবী— একাদশী (গল্প)	... ৩১৬
শ্রীকল্পীমোহন কর— স্থখের জন্মনা (কবিতা)	... ১৯৬	দ্বিবাংগ (গল্প)	... ৮৫২
শ্রীলক্ষ্মীধর সিংহ— ডালাকাগিয়া ও ডালাকাগিয়ান (সচিত্র)	... ৬৬	সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু	... ৫১৮
শ্রীউড়িশ সাহিত্য (সচিত্র)	... ৩৩৮	স্বর্ণ-প্রতিমা (গল্প)	... ১৩২
শ্রীললিতকুমার কর— প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সাম্রাজ্য	... ৮১৪	শ্রীহুকুমাররঞ্জন দাশ— ভারতে নিম্নজাতি-সমস্যা	... ৮২৫
শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়— ছোটনাগপুরে সাহিত্য-সেবার উপকরণ (সচিত্র)	৪৬৩	শ্রীহুদীকনাথ সিংহ— লেক্সী-হুইজারলাও (সচিত্র)	... ২৩২
ছোটনাগপুরে সাহিত্য-সেবার উপাদান (সচিত্র)	৬৫৫	শ্রীহুদীরচন্দ্র আচার্য ও শ্রীউমাদাস গুপ্ত— ভারতে লিপিসমস্যা (আলোচনা)	... ৭০৪
শ্রীশরদিন্দু সিংহ— কথাকল্প (সচিত্র)	... ৮৪৫	শ্রীহুদীরচন্দ্র কর— দু-দিন পরে (কবিতা)	... ১৯১
শ্রীশঙ্করশেখর সরকার— রাজমহলের মালপাহাড়িয়া ধর্ম (সচিত্র)	... ৪৫	নিশীথে (কবিতা)	... ৫১
শ্রীশান্তা দেবী— সন্তান (গল্প)	... ২০	কান্তা (কবিতা)	... ৬০
শ্রীশান্তিময়ী দত্ত— হুনন্দার বিয়ে (গল্প)	... ৪২৬	শ্রীহুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়— মহোৎসব	... ৭৬৮
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী— পরমহংস রামকৃষ্ণ	... ৮৬৮	শ্রীহুশীলকুমার ঘোষ— আধুনিকী (কবিতা)	... ৬৭০
শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার— স্বরলিপি	৩৯৭, ৫৬৩, ৮৭৮	শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী— শবরী (গল্প)	... ১২৫
শ্রীসজনীকান্ত দাস— জাগরণী (কবিতা)	... ৮৯	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত— বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের নূতন কথা	... ২৪২
		শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়— রাপুর দিদি (গল্প)	... ২৬৭
		শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী— মধুগন্ধি বনে (কবিতা)	... ৫২১
		রূপান্তর (গল্প)	... ৫২১



শান্তিনিকেতন
শ্রীমদজাণ বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নামমাশ্রয় ব্রহ্মহীনেন শতাঃ”

৩৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

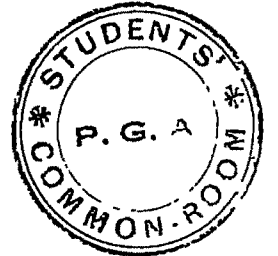
কাঙ্ক্ষিক, ১৩৪১

১ম সংখ্যা

শেষ পর্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেথা দূর যৌবনের প্রাসঙ্গসীমা
সেথা হ'তে শেষ অকণিমা
শীর্ণপ্রায়
আজি দেখা যায়।



সেথা হ'তে ভেসে আসে
চৈত্র দিবসেব দীর্ঘশ্বাসে
অক্ষুট মর্শ্বর,
কোকিলের ক্লাস্ত স্বর,
ক্ষীণশ্রোত তটিনীর অলস কল্লোল,
রক্তে লাগে মৃদু মন্দ দোল।—

এ আবেশ মুক্ত হে'ক ;
ঘোরভাঙা চোখ

পুত্র সুস্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক।
রঙ-করা ছুঃখ সুখ
সন্ধ্যার মেঘের মতো যাক স'রে
আপনারে পরিহাস ক'রে।

মুছে যাক্ সেই ছবি,—চেয়ে ধাকা পথপানে,
 কথা কানে কানে,
 মৌনমুখে হাতে হাত ধরা,
 রজনীগন্ধায় সাজি ভরা,
 চোখে চোখে চাওয়া,
 ছুরু ছুরু বক্ষ নিয়ে আসা আর যাওয়া ।

যে-খেলা আপনা সাথে সকালে বিকালে
 ছায়া অন্তরালে,
 সে খেলার ঘর হ'তে
 হ'ল আসিবার বেলা বাহির আলোতে ।
 ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত কাঁটালতা-ঘেরা,
 যেথা স্বপনেরা
 মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে
 গুন-গুন সুরে ।
 নেব আমি বিপুল বৃহৎ
 আদিম প্রাণের দেশে তেপ স্তর মাঠের সে-পথ
 সাত সমুদ্রের তটে তটে,
 যেখানে ঘটনা ঘটে,
 নাই তার দায়,
 যেতে যেতে দেখা যায়, শোনা যায়,
 দিনরাত্রি যায় চ'লে
 নানা ছন্দে নানা কলরোলে ।

থাক্ মোর তরে
 আপক ধানের ক্ষেত অজ্ঞানের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে ;
 সোনার তরঙ্গ-দোলে
 মুগ্ধ দৃষ্টি যার পরে ভেসে যায় চ'লে
 কথাহীন ব্যাধাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে,
 যেথায় অদৃশ্য সাথী লীলাভরে
 সারাদিন ভাসায় প্রহর যত
 খেলার নেকার মতো ।



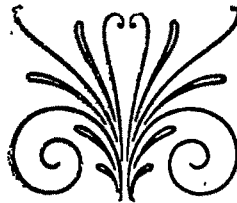
দূরে চেয়ে রবো আমি স্থির
 ধরণীর
 বিস্তীর্ণ বক্ষের কাছে
 যেথা শালগাছে
 সহস্র বর্ষের প্রাণ সমাহিত রয়েছে নীরবে
 নিস্তব্ধ গৌরবে ।

কেটে যাক্ আপনা-ভোলানো মোহ,
 কেটে যাক্ আপনার বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ,
 প্রতি বৎসরের আয়ু কৰ্ত্তব্যের আবর্জনাভার
 না করুক স্ত পাকার,—
 নির্ভাবনা তর্কহীন শাস্ত্রহীন পথ বেয়ে বেয়ে
 যাই চলে অর্থহীন গান গেয়ে গেয়ে ।

প্রাণ আর চেতনায় এক হয়ে ক্রমে
 অনায়াসে মিলে যাব মৃত্যুমহাসাগর-সঙ্গমে,
 আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে ক্ষীণ
 গোধূলি নিঃশব্দ রাত্রে যেমন অতলে হয় লীন ।



জোড়াসাঁকো
 .৫ এপ্রিল, ১৯৩৪



রবীন্দ্রনাথের পত্র

৬

নমস্কার পূর্বক নিবেদন

তোমাদের এক বাঙ্গ বই পাঠিয়ে দিয়েছি। হয়তো এ চিঠি পাষর হস্তাধানেক পরে পাবে। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বই অনেক আছে। আমার ইচ্ছা এইগুলো অবলম্বন ক'রে তোমরা ছেলেদের বক্তৃতা দাও। এক সেট বই পাঠিয়েছি তাতে বৈজ্ঞানিক প্রায় সকল বিষয়েই খুব মনোজ্ঞ ক'রে আলোচনা করেছে। তোমরা এক এক জনে তার এক একটা বিষয় নিয়ে ছেলেদের কাছে যদি আলোচনা কর তাহ'লে খুব উপকার হবে। আগে আমাদের বিদ্যালয়ে ছেলেদের মনের চর্চা এখনকার চেয়ে অনেক বেশী হ'ত—আজকাল ক্রমশই বড় বেশী বাস্তবিক হয়ে পড়েছে—ইহুদ মার্টারি মস্ত হস্তী সরস্বতী পদ্মবনে প্রবেশ কবেছে—ক্রমশই ঠুঁর বাসাটা একেবারে লুপ্ত হ'তে পারে। তোমরা ঐ চতুর্দিকে অধিক পরিমাণ প্রশ্ন দিয়ে না—অন্তত ওর যেখানে স্থান সেইখানেই আলানন্তে ওকে বেশ ভাল ক'রে বেঁধে রেখো—ওকে জননী বীণাপাণির পদ্মবনের অতিকার ভ্রমব'লে কোনদিন যেন ভুল ক'রো না।

আমার সেই বইটা ছাপাখানায় দেওয়া হয়েছে। ইয়েটস তার যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সেটা পড়েছি। পড়ে লজ্জা বোধ হয়। এটা আমার পক্ষে বহুল্য অলঙ্কার মনেই নেই, কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।—বোধ হয় পূর্বেই লিখেছি, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী এবং ডাকবরটা তর্জমা হয়ে গেছে। রোটেনষ্টাইন এগুলি ট্রেভেলিয়ান ব'লে এক জন কবিকে পড়তে দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি এ-সম্বন্ধে যে-রকম অভিমত প্রকাশ কবলেন তাতে বোধ হচ্ছে এগুলোও এ-দেশে চলবে—এমন কি তিনি এই নাটকগুলিকে অন্ত তর্জমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান। এই তিনটির মধ্যে কোনটা যে সব সেরা সেটা তাঁর স্বীর সঙ্গে কয় দিন ধবে আলোচনা ক'রে কিছুতেই স্থির করতে পারছেন না। প্রথমে তিনি স্থির কবেছিলেন,

চিত্রাঙ্গদাই ভাল, তাঁর স্বী স্থির করেছিলেন, ডাকবর, তারপরে মালিনীটা ভাল ক'রে পড়তে গিয়ে তাঁর মনে ধোঁকা লেগে গেছে। ইনি নিজে গ্রীক পৌরাণিক কথা নিয়ে নাটক লিখে থাকেন। আমার এই লেখাগুলিও মধ্যে তিনি সেই গ্রীক সাহিত্যের রস পান। আমাকে এগুলো সাহেব বলেছিলেন মালিনী পড়ে তাঁর গ্রীক নাটকের কথা মনে পড়ে। এগুলো সাহেবের সঙ্গে অল্প কয় দিনে আমার বেশ একটু স্বস্ততা হয়েছে। বড় চমৎকার সম্ভব লোকটি। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, দিল্লীতে তুমি আমাব সঙ্গে তিন মাস একত্রে যদি কাটাও তাহ'লে আমি তোমাকে গ্রীক অনেকখানি শিখিয়ে দিতে পারব। আমি তো মনে করছি এই নিমন্ত্রণটি গ্রহণ করব। তাঁরা অক্টোবর মাসেই ভারতবর্ষে ফিরবেন।

এই মেলেই কুমারস্বামী'র *Art and Swadeshi* নামক একটা বই পাঠিয়ে দেব। তাতে আমাব উপরে একটা প্রবন্ধ আছে। অজিতের একটা তর্জমার খাতা একবার তিনি দেখল ক'বে নিয়ে গিয়েছিলেন, এই লেখার কতক উপকরণ বোধ হচ্ছে তার থেকে পেয়েছিলেন—আমারও কতকগুলো তর্জমা দেখলুম এর মধ্যে আছে। একটা কথা তোমাদের ব'লে রাখি—আমাদের চিঠিতে আমার সম্বন্ধে এখনকাব লোকের যে-সব অভিমত পাও সেগুলো তোমরা কাগজে ছাপিয়ে দাও। এতে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ কবি। তোমাদের আমি আত্মীয়ভাবে লিখি সেগুলো বাইরে বাবার জিনিষ নয়। ইতি

২২। আশ্বিন

১৩১২

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ ক্রমোয়েল রোড

সাউথ কেন্সিঙটন

নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রবা একটা বড় জিনিষ লাভ করেছে যেটা ক্লাসের জিনিষ নয়—সেটা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে

আনন্দ-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার বোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক ক'ব। আমাদের ছেলেরা বৃষ্টিতে ছুটে বেড়ায়, জ্যোৎস্নারাজিতে আনন্দ ভোগ করে, তারা রৌদ্রকে ডরায় না, তাবা গাছে চড়ে বসে পড়া করে, এগুলোকে আমি সামান্য জিনিষ মনে করি নে। চারি দিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান খুঁটিয়ে দেওয়া, আনন্দেব ছোট বড় নানা বাতান্নাতের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড় লাভ তা বলে শেষ করা যায় না। এ যেন জগৎকে দান ক'বা। আমবা হতভাগ্যরা বিদ্যাসাধ্য খ্যাতিমান টাকাকড়ি বত সহজে পাই জগৎকে তত সহজে পাই নে—আমরা বাব দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি—ঈশ্বর বা আমাদের দিয়ে বসেছেন তা আমাদের তুলে নেবার শক্তি নেই—এই অসাড়তাটাব খোঁস ভেঙে কেলে ছেলেদের মন বাতে মুক্ত জগতেব মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধে সঞ্চরণ করবার অধিকার লাভ ক'রে এইটে আমি একান্ত মনে কামনা ক'বি।

বোলপুরের মাঠে আমাদের ছেলেরা এই জিনিষটা পাচ্ছিল—তাবা নিজেব ছোট ছোট মুঠো তুলে ভগবানের এই দক্ষিণ হস্তের দান গ্রহণ করছিল। তোমরা দেখো আমাদের বিদ্যালয়ে এই জিনিষটার যেন ব্যাবাস না হয়। বিশ্বপ্রকৃতিব সঙ্গে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের প্রত্যহ অব্যবহিত বোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় বিশেষত্ব। এইটেকে কোনোমতে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে দেওয়া চলবে না। আমি চলে আসার পব তোমাদের বিদ্যালয় থেকে অনেক পুরাতন অধ্যাপক একসঙ্গে চলে এসেছেন—তেজেশ, হীরালাল, কালীমোহন, বক্সি এ'রা সবাই পলাতক—ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে এ'দের জীবনের বোগসুত্র বেঁধে গিয়েছিল—হঠাৎ তাঁদের জায়গায় অনেকগুলি নূতন শিক্ষক এসেছেন—এ'রা ছেলেদের সঙ্গে আপনার জীবনকে তেমন ক'রে জড়িত করতে পারবেন কিনা কিছুই জানি নে। এই বোগটা কর্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা হ'তে পারে না—এর মূলে একটি উদাব প্রেম থাকা চাই—সেই প্রেমের উৎস যেন কিছুমাত্র শুকিয়ে না যায়, এই কথাই আমি বার-বার

ভাবি। বাধা হ'লেই দেখতে পাবে যা সবুজ ছিল তা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে হুন্দে হয়ে যাবে—বা প্রাণেব জিনিষ ছিল, তা কলের জিনিষ হয়ে উঠবে। অমৃত-নির্বাবিণী যদি না বয় তাহ'লে আমাদের শুষ্কতাকে কেউ দূর করতে পারবে না। আমাদের পরম্পরের মধ্যে প্রকৃতির পার্থক্য, শিক্ষার প্রভেদ, বাধাব্যবধান এমন কি, বিরুদ্ধতা কিছু-না-কিছু ছিলই এবং থাকবেই—কিন্তু তৎসঙ্গেও আশ্রমে সেই জিনিষটাই একান্ত হয়ে ওঠে নি—বেহুকের উপরেও সুর বেজেছে; গ্রহি বতই কঠিন হোক তা ক্রমশই শিথিল হবার দিকে গিয়েছে। এখনও সেই অমৃতের ধারাটিকে তোমরা রক্ষা ক'রে চ'লো—ছেলেদের হৃদয় প্রত্যহ পূর্ণ হোক, তাবা প্রত্যহ আনন্দিত হোক। তারা প্রত্যহই বড়র দিকে তাকাতে শিখুক। তাদের চিত্তের বোধশক্তি বিশ্বব্রহ্মতে ব্যাপ্ত হ'তে থাক—তাদের হাসি উজ্জ্বল হোক, তাদের আনন্দ গানের সুরে মুখবিত হয়ে উঠুক। সেই প্রাস্তবেব মধ্যে ছেলেদের আনন্দ-সঙ্গিলনের কলধ্বনি সমুদ্র পার হয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে—আনন্দের নির্মল আলোকে তাদের হৃদয়-মুকুল পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠুক এই আমি তাদের আশীর্বাদ করছি।

১০ই আশ্বিন, ১৩১১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লণ্ডন

কল্যাণীয়েষু—

অজিত, এখানে শীত কাটানোটা আমার একেবাবেই ইচ্ছা নয়। কিন্তু মোটের উপর শবৎকালটা ভ্রমব্যবহার করছে—মনে হচ্ছে গ্রীষ্মকাল-ভোর এখানকার আকাশ যে বকম মাৎলামি করছিল এখন তার জন্তে অহুতাপ প্রকাশ কবতে আবস্ত কবেছে—সেপ্টেম্বরের শেষ দুই সপ্তাহ দিব্য সূর্যালোক ভোগ করা গেছে। গত দুই দিন আবাব বাদলা ক'রে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে রৌদ্রে আকাশ ঝলমল করছে। আমাদের দেশে সূর্যালোকের তো কৃপণতা নেই কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত আমার সূর্যালোকের তৃষ্ণা মিটল না। যেদিন এখানে সূর্য দেখা দেয় সেইদিনই তার আত্মানে আমার মন উতলা হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে কোনো দূর সমুদ্রপাবে

আলোর দেশে গিয়ে ঘর বাধি—পিছনে আমার তমাল-
ভালীকনবাজিনীলা সমুদ্র-বলা, সামনে নিস্তর স্তম্ভ
বালুস্তম্ভ-পাশে নীলাবুবাশির সফেন চাকলা, পশ্চিম
তীরে পৃথিবীর আকাশমুখী ছরাশার মত পাহাড়
উঠেছে এবং ঝাউবনের ভিতর দিয়ে নদীটি বয়ে এসে
সমুদ্রে পড়েছে; আকাশে “সিঙ্কশকুন” উড়ে চলেছে,
নীলজলের উপর জেলেদের নৌকো শাদা পাল মেলে
দিয়েছে—এক এই সমস্ত দৃশ্যটির উপর অবাধ প্রসারিত আলো,
আমার কল্পচিত্রটিত অবকাশের গভীর পাত্রটি সোনার
আলোয় উপচে পড়েছে—এবং গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া বাজছে
আমার মনোবীণা আকাশের আলোর সমান হুরে সমান

তালে—সময় নদীর জলেব মত মুহুম্মদ কলসবে কালসমুদ্রে
মিলিয়ে বাচ্ছে, কেউ তাব কোনো হিসাব দাবি কবছে
না। মানুষকে বিধাতা মন্ববগামী করে সৃষ্টি করেছেন—
সে বোড়াব মত দোড়তে পারে না, পাখীর মত
উড়তে পারে না—তাব পালাবার পথে অনেক বাধা—
সেই জন্তেই সাহস ক’বে তাব মনের মধ্যে এত গতিসঞ্চার
ক’বে দিয়েছেন। নইলে আজ এমন সকালে কে আমাকে
ধবে বাধতে পাবত? ইতি

১৫ আশ্বিন
১৩১২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেনা-পাওনা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

চারিত্র-নীতির ইতিহাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে,
তারা জানেন যে মানুষের ভাল-মন্দের ধারণা চিরকাল
এক রকম থাকে না। ইতিহাসে এ-সব ধারণার অনেক
অদল-বদল ঘটিয়াছে। কোনও এক দেশে কিংবা এক
সময়ে যাহা ভাল, অন্য দেশে কিংবা অন্য সময়ে তাহাকেই
আবার লোকে মন্দ মনে করে,—এরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা
বহু। এ-সম্পর্কে একটা অতি পুরাতন, জীর্ণ দৃষ্টান্ত এই যে,
স্পার্টাতে ধরা না পড়িয়া চুরি করাটাকে এক সময়
শৌর্য্যগুণের অন্তঃপাতী মনে করা হইত; কিন্তু এখন
বোধ হয় এমন লোক খুব বেশী নাই, যারা চুরি-বিদ্যাকে সত্য
সত্যই বড় বিদ্যা মনে করে। এই ধরণের পরিবর্তনের
দৃষ্টান্ত আরও যথেষ্ট দেওয়া যায়।

অতীতকে অতিক্রম করিয়া বর্তমানে উপস্থিত
হওয়াটাই উন্নতি কিনা বলা কঠিন। কিন্তু অনেকেই
মনে করেন, চারিত্র-নীতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে
মানুষের ক্রমিক উন্নতিই হইতেছে। যে-সব ধারণা
আমরা ত্যাগ করিয়াছি, বর্তমানের তুলনায় সেগুলি অনুন্নত
ছিল; আর বর্তমানে আমরা যে-সব আদর্শ গ্রহণ

করিয়াছি, তাহা অতীতের চেয়ে উচ্চতর। শুধু তাই নয়,
এই বর্তমানও এক দিন অতীত হইবে; অনাগত যে
ভবিষ্যৎ তাহা আবার এই বর্তমানের চেয়েও উচ্চ। তাব
মানে এই যে, মানুষের ইতিহাস মোটের উপর উন্নতির
ইতিহাস, অবনতির নহে। অনেক প্রাচীনপন্থী মনে
কবেন, সত্য যুগ অতীত হইয়াছে; কিন্তু অন্য অনেকের
আবার ধারণা এই যে, উহা এখনও আসে নাই,—তবে
আসিবে।

মানুষের ইতিহাস সত্য সত্যই অনবচ্ছিন্ন উন্নতির
ইতিহাস কিনা, সে-বিচারে এখানে প্রয়োজন নাই। তা
ছাড়া কোন্টা উন্নতি, কোন্টা উন্নতি নয়, সে-বিষয়ে
সবলেব ঐকমত্য আছে কিনা সন্দেহ। তবে একথা
নিশ্চিত যে, আমাদের ভাল-মন্দের ধারণা সনাতন নহে—
উহা পরিবর্তন-সহ। বর্তমানে জগতের ভাবধারা ও কর্মধারা
যাঁহা ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া থাকেন, তাঁরাই লক্ষ্য
কবিবেন যে, আমাদের অনেক ধারণা এখনও চোখের সামনে
দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া বাইতেছে।

একটা সময় ছিল যখন মানুষ দেনা-পাওনা সম্বন্ধে

বড় সাবধান ছিল, এবং সে-সময়ে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কথারও একটা বড় দায় ছিল। বাহা ঋণ বলিহা মানিয়াছি, তাহা শেষ দিতেই হইবে—আর যেখানে যে-কথা দিয়াছি, সেখানে সে-কথা রক্ষা করিতেই হইবে—এইটি ছিল প্রাচীন কালের নৈতিক আদর্শ। ইহাতে কলাফলের বিবেচনার কোন স্থান ছিল না। প্রাচীন চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে ঋণ না-দেওয়া পাপ। ঋণী সাধারণতঃ নিজেই ঋণ করে; যেখানে ঋণ নিজকৃত সেখানে ঋণের সঙ্গে সত্য জড়িত থাকে। আমি স্বীকার করিয়াই লই, একটা সময়ে এক জনকে একটা কিছু দিব; এখানে বাহা দিব বলিয়াছি তাহা ঋণ; আর, দিব যে বলিয়াছি, উহা অঙ্গীকার। ঋণ না-দিলে পাপ, সুতরাং বাহা দিতে চাইয়াছি তাহা দেওয়া উচিত। আর, বাহা করিব বলিয়াছি তাহা না-করিলে সত্যবাক্যের অপলাপ হয়। সুতরাং স্ব-কৃত দেনা পরিশোধনা করা দ্বিগুণ পাপ।

অনেক সময় আবার ঋণ নিজকৃত নহে, ঘটনাচক্রে সঞ্চারিত হয়। সেখানেও অঞ্চণী হওয়া মানুষের কর্তব্য, ইহাই প্রাচীন ধারণা। যেমন, পিতার ঋণ পরিশোধ করা পুত্রের কর্তব্য। এ-সম্বন্ধে আইনের ব্যবস্থা সর্বত্র এক ছিল না হয়ত; কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস এই ছিল যে, পিতার নিকট হইতে বিত্তলাভ না করিলেও পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের ধর্মতঃ উচিত। “জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ ত্রিভি ঋণৈ ঋণবান্ ভবতি”—অন্যভাবেই ব্রাহ্মণ তিন প্রকার ঋণে ঋণী হইয়া পড়েন;—ইহা প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ। এই তিন প্রকার ঋণ—দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ। বস্ত্র, স্বাধার ও পুত্রোৎপাদন—এই তিন উপায়ে এই সব শোধ করিবার উপদেশ আছে। নিজের কথাধারা বাধ্য হইয়া ঋণ না করিলেও যে ঋণ শোধ করিতে হয়, এ-সম্বন্ধে প্রাচীনদের মনে আব কোন সন্দেহ ছিল না।

ঋণ যেখানে স্ব-কৃত সেখানে উহার দায়িত্ব আরও বেশী। সোক্রাটসের মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁর কোন শেষ ইচ্ছা জানাবার আছে কি না, তাহাও জানিতে চাইয়াছিলেন। তখন সোক্রাটসের অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, শরীর

আড়ষ্ট, অতি কষ্টে কথা কহিতে পারেন। কিছুক্ষণ চক্ষু নিম্নলিখিত রাখিয়া সোক্রাটস কহিলেন, “দেবতার কাছে আমার একটা ঋণ আছে—আমি একটা মোরগ মানত করিয়াছিলাম—তা দেওয়া হয় নাই। তোমরা সেটি দিও।” * এটাও ঋণশোধের একটা প্রমাণ। মানুষের কাছেই হউক, আর দেবতার কাছেই হউক, বাহা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা দেওয়া আমাব কর্তব্য—এই ছিল প্রাচীনদের চিন্তাপদ্ধতি।

শুধু অঙ্গীকৃত বস্তু প্রদান করাই যে কর্তব্য ছিল, তা নয়; কোন বস্তু দিতে অঙ্গীকার করা যেমন অঙ্গীকার, তেমনি কোন কার্য করিতে কিংবা কোন কার্য না-করিতঃ অঙ্গীকার করাও অঙ্গীকার। অঙ্গীকার হিসাবে উভয়ই রক্ষণীয়। কথা দিলে সে-কথা রাখিতে হইবে, ইহা অতি প্রাচীন আদর্শ। ইহাবই নামাস্তর সত্যপালন। পিতার সত্যপালন করিতে রাম বনে গিয়াছিলেন; নিজের সত্যপালন করিবার জন্য ভীষ্ম চিরকুমার ছিলেন। কথা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই এদের এত বড় ত্যাগটা কবিত্তে হইয়াছিল। ঋণও একপ্রকার সত্য; দিব বলিলেই কথা দেওয়া হইল; সুতরাং না-দিলে সে সত্য আর রক্ষিত হয় না।

এইরূপে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঋণশোধের পবিত্রতা-বোধ এই দুই কারণ হইতেই সাবেক কালের লোক ঋণ না-দেওয়াটাকে একটা বড় পাপ মনে করিত। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে একটি নূতন বিজ্ঞানের আধিপত্য প্রবল হইয়াছে—তার নাম ধনবিজ্ঞান। এখন আর দেনা-পাওনার প্রশ্ন শুধু চারিত্র-নীতির দিক দিয়াই বিচার করা হয় না—ইহাকে প্রধানতঃ ধনবিজ্ঞান অর্থাৎ ইকনমিক্সের প্রশ্ন হিসাবে দেখা হয়। ইহার ফলে, দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আমাদের যে উচিত-অনুচিত বোধ ছিল, তাহা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া বাইতেছে।

আগে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের সম্পর্ক শুধু ব্যক্তিতে

* “But now the parts around the lower belly were almost cold; when uncovering himself, for he had been covered over, he said, and ‘they were his last words, ‘Crito, we owe a cock to Aesculapius; pay it, therefore, and do not neglect it.’”—*Phaedo*, Plato (155).

ব্যক্তিতেই হইতে পারিত। কিন্তু এখন উহা একটা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছে। এখন এক জাতিও আর এক জাতিব নিকট ঋণী হইতে পারে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পরে জগতের প্রধান প্রধান জাতিগুলি প্রায় সকলেই এই সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জার্মেনী প্রভৃতি কয়েকটি জাতি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নিকট ঋণী হইয়া পড়িয়াছে এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতিও আমেরিকার নিকট ঋণী হইয়া আছে। ঋণের এই আধুনিক পরিণতি—ইহার এই আন্তর্জাতিক ভাব, শুধু যে ধনবিজ্ঞানের একটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তা নয়; ইহার ফলে জগতের জাতিসমূহের কর্তব্যাকর্তব্য বিচারেও একটা নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে। অধর্মণ যদি তাহার ঋণ অস্বীকার করে কিংবা উহা পরিশোধ করিতে না-চায়, তবে সেটা তার পক্ষে নিন্দনীয়; এখনও আমরা অনেকেই হয়ত তাই মনে করি। কিন্তু এই সেদিন ইংলণ্ড তার ঋণ দিতে অস্বীকার করিল;—অজুহাত ত্রায়ের দিক্ দিয়া কিছু নাই, কিন্তু অর্থনীতির দিক্ দিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। এ-সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানের যে-সব কূটতর্ক উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই খুব জটিল এবং শিক্ষাপ্রদ। ঋণ নগদ টাকা দিয়াও শোধ করা যায়, আবার সেই মূল্যে বাণিজ্যদ্রব্য দিয়াও শোধ করা যায়। এক জাতি যখন আর এক জাতির প্রাপ্য ঋণ শোধ করিবে, তখন এ-দুইয়ের কোন্ উপায়ে শোধ করিবে? কোন্ উপায়ে শোধ করিলে অত্যন্ত নিরপেক্ষ জাতির, অর্থাৎ সমগ্র জগতের উপকার হইবে? এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর আমেরিকা একরূপ দেয়, আর ইংলণ্ড দেয় আর এক রকম। উভয়ের মতের মিল হইল না, সুতরাং আপাততঃ ইংলণ্ড দেনা শোধ করা স্থগিত রাখিল।

তা ছাড়া, আবও এর চেয়ে বড় একটা তর্ক আছে। আমেরিকা অত্যন্ত ধনী দেশ—বহু নগদ টাকা ও সোনারূপা তার মজুদ আছে। এ-ক্ষেত্রে ইংলণ্ড যদি তার দেনা শোধ করিয়া আমেরিকাকে আরও ধনী করিয়া দেয়, তবে তাতে কি পৃথিবীর অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই? এই সব প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আন্দোলন চলিতেছে; এবং নিশ্চয়ই আরও কিছুকাল চলিবে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোন মত-প্রকাশ

আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা শুধু ভাবিতে চাই, চারিজন-নীতির উপর ইহার প্রভাব কিরূপ দাঁড়াইবে!

ইংলণ্ড ঋণ দিতে নারাজ হইয়াছে; সুবোগ বুঝিয়া জার্মেনীও তার দেনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। তার যুক্তি সরল; যে-দেনার বোঝা তার কাঁধে চাপানো হইয়াছে, সে-সব শোধ করিতে গেলে সে আব মাথা তুলিতে পারিবে না। এ-দেনা অবশ্যই এক সময়ে সে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সে ত দ্বারে পড়িয়া। তার পরাজয়ের সুবিধা পাইয়া বিজ্ঞেতার তাব স্বন্ধে যে ঋণেব ভার চাপাইয়াছিল, আজ সে উহা অস্বীকার করিবার মত শক্তি রাখে, সুতরাং উহা সে অস্বীকার করিতেছে।

মনে পড়ে ভীষ্মের কথা। পিতার একটা দুর্বলতার জন্ত হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী এক ধীরেব নিকট একটা কথা দিয়াছিল; বলিয়াছিল, বাজমুকুট পরিব না এবং চিরকাল অকৃতকার থাকিব। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া ধীর ভীষ্মের পিতাব সঙ্গে তার কন্তার বিবাহ দেয়। এই বিবাহের পর ভীষ্ম যদি বিবাহ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে হয়ত পারিতেন; আর পিতার মৃত্যুর পর যদি তিনি বিবাহ করিতে চাহিতেন, তবে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি ছিল না বাহা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিত। কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সুবিধা-অসুবিধা বিচার কবে নাই। আবার যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা নিঃসন্তান মারা গেলেন, তখন এই ধীর-কন্তা রাণী সত্যবতীই ভীষ্মকে দারপরিগ্রহের জন্ত কত অনুরোধ করিলেন! তথাপি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলিল না। কথা দিয়া সে-কথার অবমাননা হস্তিনাপুরের রাজ্যেব ছেলে করিতে পারে না। ভীষ্ম ত এ-কথা বলেন নাই, বিপদে পড়িয়া একটা কথা বলিয়াছি, এখন ত আর সে বিপদ নাই, সুতরাং সে-কথাও আর রক্ষা করা চলে না। আজ জার্মেনীর যে যুক্তি তাহা ভীষ্মের সময়েও যুক্তি হইতে পারিত, কিন্তু হয় নাই। এই ছিল প্রাচীন আদর্শ।

ব্যক্তির জীবনে এখনও এই আদর্শ বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখনও কথা দিয়া যে-কোন অজুহাতে যদি কোন ব্যক্তি সে-কথা পালন না করিতে চায়, তবে আমরা তার নিন্দা করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

ভিতর এ-আদর্শ আর থাকিতেছে না; তা যদি না হইত, তবে জার্মানীই বা তার দেওয়া কথা অস্বীকার করে কি করিয়া আব ইংলণ্ডই বা তার ঋণ অস্বীকার কবে কেমন করিয়া?

ঋণ-সম্বন্ধে জগতের জাতিসমূহ যে বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে, তাহার অর্থ এই যে, ঋণ অবশ্যই দেওয়া উচিত, তবে নিজের অত্যন্ত অনিষ্ট কিংবা অসুবিধা হইলে উহা না দেওয়াই উচিত। স্বীকার করিতেই হইবে, উহা ভ্রাতৃ-অভ্রাতৃ বিচারের একটা নূতন ধারা; আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই নূতন বিচারপদ্ধতি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইলে, ব্যক্তির এবং জাতির জীবনধারাও অনেক পরিবর্তিত হইবে। অনেক আগে, যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা খুব স্পষ্ট হয় নাই, তখন হয়ত এই প্রকার জাতীয় ঋণশোধ সম্বন্ধে জাতিসমূহের ধারণাও অস্পষ্টই ছিল। কিন্তু আজ জাতিতে জাতিতে সম্বন্ধটা একটা বিবট সভ্য; অথচ এই সম্বন্ধ-স্বীকৃতি সত্ত্বেও ঋণ-সম্বন্ধে জাতিসমূহ এক নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধই যে কেবল পরিবর্তিত হইবে এমন নহে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্বন্ধের উপরও ইহা প্রভাব অনিবার্য। মানুষের সামাজিক পদমর্যাদা, তাব ধনসম্পত্তি, তাব ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তাধারা—এক কথায় তার সমগ্র জীবন, তাব ভালমন্দের ধারণা দ্বারা নিবন্ধিত হইতেছে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, এই ভালমন্দের ধারণার পরিবর্তন ঘটিলে তাব জীবনপদ্ধতির পরিবর্তনও অপরিহার্য। একটা দৃষ্টান্ত সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। আমরা সাধারণতঃ কোন সভ্য গবর্নমেন্টকে টাকা ধার দিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। বিনা সন্দেহে যেমন দেশে ‘কোম্পানীর কাগজ’ কিনিয়া টাকাটা নিরাপদ হইল মনে করি, তেমনি ফ্রান্স বা জার্মানীর কাগজ কিনিতেও আমাদের কোন ভয়ের কারণ ছিল না, কেন না, ওরা সভ্য দেশ, টাকা দিতে এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। কিন্তু ক্রমে যদি এমন হইয়া পড়ে যে, অসুবিধা বোধ কবিলে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন গবর্নমেন্ট ঋণ দিতে অস্বীকার করিয়াছে, তখন আব লোকে অত সহজে দেশী কিংবা বিদেশী কোম্পানীর কাগজ কিনিতে চাহিবে না।

আরও একটা কথা। যারা অভাবে পড়িয়া কিংবা

নৈতিক আদর্শের পরিবর্তনের ফলে ঋণ দিতে অস্বীকার করে, তারা আগের ঋণ সব পরিশোধ করিয়া জগৎকে এই নূতন আদর্শের কথা জানাইয়া দিয়া শুধু ভবিষ্যৎ ঋণ সম্বন্ধেই এই নূতন নিয়ম অনুসরণ করে না। সুতরাং যে-মুহুর্তে কোন দেশ এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিবে, সেই মুহুর্তে বহু ধনী নির্ধন হইয়া যাইবে। কারণ, সে-দেশের কাছে টাকা ধার রাখিয়া অনেকেই নিজস্বগকে ধনবান মনে করিতেছিল; কিন্তু ঐ দেশ যখন তার ধাব-করা টাকা দিতে অসম্মত হইবে, তখনই ত ধনীদেব ধন কপূরেব মত উবিয়া যাইবে! কত লক্ষপতি শুধু কোম্পানীর কাগজে ‘লক্ষপতি’। এই কোম্পানীর কাগজেব টাকা পরিশোধ করিতে যারা প্রতিশ্রুতি কবিয়াছে, তারা যদি সে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার কবে, তবে আর লক্ষাধিপতিদের লক্ষ টাকা কোথায় রহিল! সুতরাং জগতের নৈতিক আদর্শের পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে ধনী-নির্ধন প্রভৃতি যে শ্রেণী-বিভাগ আছে তাহাও অবিকৃত থাকে না।

ঋণের আদান-প্রদান সম্বন্ধে যে নূতন ধারণা জগতে দেখা যাইতেছে, তাহা ইউরোপ আমেরিকার জাতিদের দেনা-পাওনাব মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গত দুই-তিন বৎসরের ভিতর বাংলায়, তথা ভারতবর্ষে, কয়েকটি আন্দোলন হইয়াছে, বাহার ভিতরও ঋণ-সম্বন্ধে এই নূতন ধারণার প্রভাব দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ কংগ্রেসেব অনুমোদন অনুসারে খাজানা বন্ধ করিবার জন্ত যে একটা আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতেও ঋণ অস্বীকারেরই প্রকাবাস্তর দৃষ্ট হয়। খাজানাও একপ্রকার ঋণ—এক হিসাবে দেখিতে গেলে, অর্জীকৃত ঋণ, সুতরাং তাহা না-দেওয়া ঋণ অস্বীকারেরই নামান্তর। এক সময়ের নৈতিক-ধারণা অনুসারে উহা অন্তায় বলিয়া মনে করা হইত, কিন্তু আজ যে একটা অবস্থা-বিশেষে উহা না-দেওয়ার উপদেশ হইল, তাহাতে ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইল যে, রাষ্ট্র বা সমাজের অবস্থা-বিশেষে ঋণ অস্বীকার করিলে কোন অন্তায় বা পাপ হয় না। সুতরাং মানুষের নৈতিক আদর্শের একটা পরিবর্তন যে ইহাতে সূচিত হইল, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কবা চলে কি?

কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াও বাংলা দেশের কোন কোন জেলায় খাজানা এবং কর্জ টাকা পরিশোধ না-কবার জন্ত

একটা আন্দোলন হইয়াছে—এবং এখনও ইহা একেবারে দুব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। খাজানা সম্বন্ধে আন্দোলনটা আপাততঃ কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কাৰণ শিষ্টমত অনুসারে বৰ্তমান বাজস্ব যেমন দেওয়া উচিত, জমিদারের খাজানাও তেমনি দেওয়া উচিত; এখন পর্য্যন্ত এই অভিমতই প্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কৰ্জ টাকা— অর্থাৎ অঙ্গীকৃত ঋণ সম্বন্ধে বৰ্তমানে শিষ্টসমাজেও প্রবল ধারণা এই যে, উহার ভিতর একটা জুলুম রহিয়াছে। দেনাদার অঙ্গীকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে দায়ে পড়িয়া; সুতরাং সমাজের উচিত তাহাকে রক্ষা করা এবং এই বক্ষার উপায়, তাহাকে এই অঙ্গীকৃতির দায় হইতে মুক্তি দেওয়া। এ-ধারণাই যদি প্রবল না হইত তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কিছুদিন হইল যে-সব আইন পাস করিয়াছে, তাহা হইত না। অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী না দেওয়ার জন্ত আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে দেনাদারের যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার কর্তব্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটান হইয়াছে। এক সময়ে হাজার অসমর্থ হইলেও সে মনে করিত, বাহা অঙ্গীকার কবা হইয়াছে; যেমন করিয়াই হউক তাহা দেওয়া উচিত। সে বোধটা আর তাহাব রহিল না। সে আজ শ্রায়-অশ্রায় সম্বন্ধে অল্পকপ ধারণার অধীন হইয়াছে। আইনের উপদেশ অনুসারে এখন সে ইহাই মনে কবিবে যে, স্বীকৃত হইলেও কৰ্জ-টাকার বেশী সুদ তাহার না দেওয়াই উচিত।

কিছুদিন পূর্বে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে এক জন এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, তিন বৎসরের জন্ত দেশের দেনাদারদের দেনা দেওয়া স্থগিত থাকুক এবং এ-তিন বৎসরের জন্ত তাদের দেনার সুদরুদ্ধিও বন্ধ থাকুক। এ-প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। তাতে কিছু আসে যায় না। শিক্ষিত সমাজে দেনা সম্বন্ধে যে একটা নূতন ধারণা ক্রমশঃ মাথা উঠু করিতেছে, তাহার প্রমাণ এই প্রস্তাবে পাওয়া যায়। আর, সেদিন বোধ হয় বেশী দূরেও নয়, যখন এক্ষণ প্রস্তাব অনারসেই গৃহীত হইয়া যাইবে।

এ-কথা আমরা বলিতে চাই না যে, এ-দেশে খাজানা ও কৰ্জ টাকার সম্বন্ধে যে-সমস্ত ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর অবিচারের লেশমাত্র নাই, যেমনটি ছিল

তেমনটিই উহা থাকা উচিত। আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, দেনাদার যদি শক্তিমান হইয়া দেনা অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে পাওনাদারদের আর্থিক অবস্থারই যে কেবল পরিবর্তন হয়, এমন নহে; ইহাতে সমাজের নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহারও পরিবর্তন ঘটে। এক কথায়, সমাজের গঠনই অত্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়। সুতরাং আইনের সাহায্য বা অন্য উপায়ে ঋণ-সম্বন্ধে নূতন ধারণার প্রবর্তনের ফল যে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ইহা আমাদের ভাবা উচিত।

এটা একটা সাধারণ সত্য যে, সমাজ মানুষের কর্তব্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক জনের বা অধিকার, আর এক জনের সেটাই কর্তব্য। পরস্পর লোভ না-করা আমাদের কর্তব্য বলিয়াই দ্রব্য-স্বামীর স্বামিত্ব রক্ষিত হয়। কেহ যদি তাহার কর্তব্য অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহাতে আর এক জনের অধিকার ধ্বংস হয়। ব্যাঙ্কে আমার যে টাকা আছে, আমার প্রয়োজন অনুসারে সে-গুলি আমার প্রত্যর্পণ করা ব্যাঙ্কের কর্তব্য। ব্যাঙ্ক যদি সে-কর্তব্য অঙ্গীকার করে এবং তাকে উহা স্বীকার করাইবার যদি কোন উপায় না থাকে, তবে তার ফলে আমি সর্বস্বান্ত হইয়া যাইতে পারি। আমার ধনসম্পত্তি এইরূপে অপরের কর্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে।

অত্বে আমি টাকা ধার দিয়াছি, এই আশায় যে, উহা আমি আবার পাইব। আর, আমার ধনসম্পত্তি হিসাব করিবার সময় আমি ঐ টাকাটাও গণনা করি। কিন্তু দেনাদারেরা যদি একবাক্যে সকল দেনা অঙ্গীকার কবে, তবে এক মুহূর্তেই জগতের সমস্ত উত্তমর্গ নিঃশ্ব হইয়া যাইবে না কি?

জাতিতে জাতিতে যেখানে ঋণসম্পর্ক রহিয়াছে, সেখানে এইরূপ ঋণ অঙ্গীকার করিলে উত্তমর্গ জাতি হুয়ত একেবারে নিঃশ্ব হইয়া যাইবে না; কিন্তু ব্যক্তির বেলায় যদি ঋণ অঙ্গীকৃত হয় এবং যদি ঐ অঙ্গীকৃত ঋণ আদায়ের কোন উপায়ান্তর না থাকে, তবে শ্রেণী-বিশেষের একেবারে সর্বস্বান্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

বাংলা দেশের সমস্ত লোককে যদি উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, উত্তমর্ণ-শ্রেণীর বেশীর ভাগই হিন্দু আর অধমর্ণ শ্রেণীর বেশীর ভাগই মুসলমান। শুধু তাই নয়; খাজানার পাওনাদার ও দেনাদারের মধ্যেও ঠিক এইরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগ রহিয়াছে। খাজানা দেয় বেশীর ভাগই মুসলমান—পায় বেশীর ভাগই হিন্দু; কারণ জমিদার বেশীর ভাগই হিন্দু। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্য। কেননা, এই ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শের পরিবর্তনের ফলে শুধু যে সমাজে অর্থনৈতিক সম্পর্কই পরিবর্তিত হইবে, এমন নয়; সাম্প্রদায়িক সম্পর্কটাও ইহার ফলে ঝটিল হইয়া পড়িবে এবং সম্প্রদায়গুলির পদমর্যাদাও পূর্বব্যব থাকিবে না।

এতকাল ধনী ও মজুরদের ভিতর যে কলহ চলিতেছিল, তার ভিতর দেনা-পাওনা সম্পর্কের আদর্শের একটা পরিবর্তনও লক্ষিত হইত। তার পব বিগত শতাব্দীতে সোসিয়ালিজম, কমুনালিজম প্রভৃতি যে-সব মতবাদ পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে, তাতেও সমাজের অর্থ-বিভাগ প্রভৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক আদর্শের

আমূল সংস্কারও অভ্যন্তরিত। সমাজে শ্রেণীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের অধিকার লোকের কর্তব্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই কর্তব্য-বোধের পরিবর্তন না ঘটাইলে তাইদেব অধিকার খর্ব বা নষ্ট হয় না। এইজন্যই বর্তমান ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযান চলিতেছে। ধর্ম একপ্রকার কর্তব্য-বোধের প্রশ্রয় দেয়; সেই কর্তব্য-বোধের উপর আবার শ্রেণী-বিশেষের অধিকার নির্ভর করে। সুতরাং এই সব শ্রেণীর অধিকার যদি নষ্ট করিতে হয়, তবে এই কর্তব্য-বোধও দূর করিতে হইবে এবং তারই জন্য উহার প্রশ্রয়দাতা ধর্মেরও উচ্ছেদ প্রয়োজন।

আজ যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এবং অন্তর্জাতিক অস্বীকার সমীচীন মনে করা হইতেছে, তাহাতে আপাততঃ অর্থনৈতিক যুক্তিরই প্রয়োগ দেখা গেলেও ভিতরে ভিতরে উহা ফলে মানুষের নৈতিক আদর্শের এবং তার কর্তব্য-বোধেরও প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইবে, এবং তার ফলে সমাজের একটা বিরাট পরিবর্তন অবশ্যস্বাবী। সমস্ত জগতে উহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে স্পষ্ট কল্পনা করা কঠিন; কিন্তু বাংলা দেশে উহার আশংকা যাহা হইবে, তাহা বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ ধনশালী হিন্দুসমাজে, প্রাণধানযোগ্য।

দৃষ্টি-প্রদীপ

ত্রিভুতীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৩

সন্ধ্যার সময় আটঘরা পৌছে দেখি সতিই মায়ের অস্থ। আমাদের ঘরখানায় মেজের ওপর পাতা বিছানায় মা শুয়ে। অঙ্ককারে আমার চিন্তে না পেরে ক্ষীণস্বরে বললেন—কে ওখানে—হাঙ্ক?

তাবপর আমার দেখে কেঁদে উঠে বললেন—কে জিতু, আয় বাবা আয়, এতদিন পরে মাকে মনে পড়লো তোর? আয় এই বাগিশের কাছে আয়—ওমা, একি হয়ে গিয়েচিস রে! রোগা, কাল চেহার—ওরা সতিই বলত তো!

মা একটি ঘরে শুয়ে—জনপ্রাণী কেউ কাছে নেই।

সন্ধ্যা হব-হব, ঘরে একটা আলো পর্যন্ত কেউ জ্বালে নি। এমনই বাড়ি বটে। কেন, এত ছেলে মেয়ে বোঁ বাড়িতে, এক জন কাছে থাকতে নেই? অথচ পরের দোষ দিয়ে লাভ কি, আমিই কোথায় ছিলাম এতদিন?

বললাম—মা, দাদা কোথায়? সীতা আসে নি?

মা নিশ্চয়ই কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ওরা কেউ চিঠি দেয় না, ব'লে ব'লে আজ বুঝি হাঙ্ক একখানা পত্র দিয়েছে সীতাকে।

—ক'দিন অস্থ হয়েচে তোমাব মা? ওরা কেউ দেখে না? জ্যাঠাইমা, কাকিমাবা আসে না?

—ভুবনের মা মাঝে মাঝে আসে। এই বিকেলে

সাবু দিয়ে গেল—তা সাবু কি খেতে পারি, ওই রয়েছে বাটতে। ছোটবো এসেছিল বিকেলবেলা। বটঠাকুর বাড়ি নেই বুঝি—আর কেউ এদিকে মাড়ায় না।

ভাবপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—হ্যারে জিতু, তুই নাকি সন্মিসি হয়ে গিয়েচিনু—দিদি, হারু, মেজবো, ঠাকুরপোরা সবাই বলে—সত্যি? বলে আর সে আসবে না, সে কোন্ দিকে বেরিয়ে চলে গিয়েছে। তার ঠিকানা কেউ জানে না। আমি ভাবি জিতু আমার ভুলে যাবে এমনি হবে? আবার ভাবি আমার কপাল ধারাপ নইলে এসব হবেই বা কেন—ভেবে ভেবে রাতে জেগে বসে থাকি।

—কেনো না, কান্দে না, ছিঃ। ওসব মিথ্যে কথা। কে বলেছে সন্মিসি হয়ে গেছি! এই দ্যাখ না শাদা কাপড় পরনে, সন্মিসি কি শাদা কাপড় পরে?

মনে বড় অনুতাপ হ'ল—কি অজ্ঞার কাজ করেচি এত দিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে! আর এদেরও কি অজ্ঞার, সবাই মিলে মাকে এমন ক'রে ভয় দেখানোই বা কেন, মা সর্বল মানুষ, সকলের কথাই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার দোষ ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মা আছেন দাদাব কাছে। নিশ্চিন্তু ছিলাম অনেকটা সেজন্তে। জিগ্যেস করলাম—মা, দাদা তোমায় নিয়ে যায় নি!

—সে অনেক কথা। নিতু নিতেও এসেছিল, বটঠাকুর বললেন—যাও, কিন্তু আমার এখানে আর আসতে পাবে না। সীতার খণ্ডরবাড়ির লোক ভাল না এখন দেখুচি—তারিও বটঠাকুরের হাতের লোক, বললে তা হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে সঙ্কট ঘুচে যাবে। মেয়ে তাবা আর পাঠাবে না। বোমাকেও এখনও দেখি নি, এমনি আমার কপাল। বটঠাকুর সে বউকে এ-বাড়ি নাকি ঢুকতে দেবেন না। তা নিতু আমায় লিখলে, মা এই কটা মাস যাক—কোথায় নাকি ভাল চাকরি পাবে—এখানে পাড়াগায়ে বাসাও পাওয়া যায় না। আমি আবার গিয়ে ওর খণ্ডরবাড়ি উঠবো সেটা ভাল দেখাবে না। মাঘ মাসে একেবারে নিয়ে যাবে এখান থেকে। এই তো নিতু ওমাসেও এসেছিল। আহা বাছাকে কি অপমান করলে সবাই মিলে! আমার

কপালে কেবল চারি দিকে অপমান ছাড়া আর কিছু জোটে না—

কেন চাকরি ছেড়ে দিলাম? কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই? এখন দেখতে পাচ্ছি সীতাব বিবাহ হয়ে গেলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে তাবা উচিত ছিল না। মাকে আমি উপেক্ষা ক'রে এসেচি এত দিন, দাদা সাধ্যমত অবিশ্রি করতে—কিন্তু আমি কিছুই করি নি। কেন আমার এমন ধারা মতিগতি হ'ল! কোথায় আমার কর্তব্য, সে-সম্বন্ধে এমন অন্ধ ছিলাম কেন?

সজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বললাম—মা আঙুর খাবে?...আঙুর এনেচি, ভাল আঙুর—শেরালদ' থেকে—ভূতাকে বললাম, একটা আমো দিয়ে আর, তা দেয় নি দেখচি—বলতে বলতে ছোটকাকীমা ঘরের দে'রের কাছে এসে আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কে বসে ওখানে?

আমি অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—আমি, কাকীমা।

এগিয়ে এসে বললেন—কে, নিতু?

—না, আমি।

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—ওমা, জিতু যে দেখচি, কোথেকে, কি ভাগ্যি তোমার মায়ের! তারপর কি মনে ক'রে?

কাকীমা বললেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হ'ব, তা ভেবেই পাই নে। একেবারে একটা বহর নিক্রমশ নিখোঁজ—আর এই এ-ভাবে মাকে ঘেলে রেখে? তোমাদের একটু জ্ঞান নেই যে এটা কার বাড়ি? এখানে কে দ্যাখে তোমার মাকে? সবই তো জ্ঞান—বয়েস হয়েছে এখনও এ-বুদ্ধি হ'ল না? বটঠাকুর বাড়ি নেই, একটা ডাক্তার-বাড়ি কে দেখায় তার নেই ঠিক। হরি ডাক্তারকে একবার আনতে হয়—টাকাকড়ি কিছু আছে? নেই বোধ হয়, সে দেখেই বুঝেচি—নেই? আচ্ছা, টাকী আমি দেব—এখন ভেব না, ডাক্তার আন।

ছোটকাকীমার পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছা হ'ল। এ-বাড়িতে সবাই পণ্ড, সবাই অমানুষ—সত্যিকার মেয়ে বটে ছোটকাকীমা।

রাখ্বেই ডাক্তার এল। ওষুধপত্রও হ'ল। দাদাকে পত্র দিলাম পরদিন সকালে।

আমায় নিয়ে খুব হৈ চৈ হ'ল। জ্যাঠাইমা আমার রান্নাবরের দাওয়ার বসে খেতে দেবেন না—আমি জাত-বিচার মানি নে, বাগ্দি-হুলে সবার হাতে খেয়ে বেড়াই, এসব কথা কে এসে গাঁয়ে বলেচে। নানা রকম অলঙ্কার দিয়ে কথটা রাষ্ট্র হয়েছে গাঁয়ে।

মায়েব অবস্থা শেষরাত থেকে বড় খারাপ হ'ল। সকালে আমাকে আর চিন্তে পারেন না—ভুল বক্তেও লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলচে ঘরের মেঝেতে—আমি একা বসে আছি মায়ের শিয়রে, এমন সময়ে বাইরে উঠানে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাটিতে আঁচল লুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢুকল। আমায় দেখে বললে, ছোড়মা? মা কেমন আছেন ছোড়মা? আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সীতা একেবারে বদলে গিয়েচে, মাথায় কত বড় হয়েছে, দেখতেও কি সুন্দর হয়েছে—ওকে যেন চেনা যায় না আর।

মাকে বললাম—মা, ওমা, সীতা এসেচে,—

মা চাইলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। বোধ হয় বুঝতে পারলেন না যে সীতা এসেচে।

সীতা খুব শক্ত মেয়ে। সে কেঁদেকেটে আকুল হয়ে পড়লো না। আমায় বললে—দাদা, আমার বালাজোড়াটা দিচ্ছি, তাই দিয়ে ভাল ডাক্তার নিয়ে এস। এখানকার হরিডাক্তার তো? তার কাজ নব।

আমি অক্ষমতার লজ্জায় কুণ্ঠিত হুবে বললাম—তার পর তোর খুন্সরবাড়ির লোকে তাকে বক্বে। সে কি ক'রে হয়—

সীতা বললে—ইস! বক্বে কিসের জন্তে, বালা কি ওদের? মায়ের বাঁশা, মা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। বাবা গড়িয়ে দি.ব.ছিলেন মাকে। তুমি বালা নিয়ে ব'ও, তার পর ওরা যা বলে বলবে—

এই সময় সীতার স্বামী ঘরে ঢুকল। আমি যে-বকম চেহারা কল্পনা করছিলাম, লোকটা তার চেয়েও খারাপ।

কালো তো বটেই, পেটমোটা, বোধ হয় পিলে আছে, কাঠখোঁটী গড়ন, চোয়ালের হাড় উচু—গায়ে একটা ছেলে-মাল্লখের মত ছিটেব জামা, একটা রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেরিসের জুতো। আমায় দেখে দাঁত বার ক'রে হেসে বললে—এই যে ছোটবাবু না? কখন আসা হ'ল? বড়বাবু বুদ্ধি এখনও আসবার ফুরসৎ পান নি—তাব পর, অহুখটা কি?...এখন কেমন আছেন?

তার পর সে খানিক ক্ষণ বসে থেকে বললে—বস তোমরা। আমি জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—একটু চায়ের চেষ্টা দেখা বাক, গরুব গাড়িতে গা-হাত ব্যথা হয়ে গিয়েচে।

ওর কথার ভঙ্গিতে একটা চাবাড়ে ভাব মাখানো। এই লোকটা সীতার স্বামী! সীতার মত মেয়ের! সীতাকেও আমরা সবাই মিলে উপেক্ষা করেছি।

এই সময় হঠাৎ শৈলদিদির কথা আমার মনে পড়ল। শৈলদিদ' ষ্টেশনে ছোট-বোঁঠাকুর বলছিলেন শৈলদি এখানেই আছে। সীতার বালাজোড়াটা নেবো না—ওকে তার জন্তে অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে সেখানে, ও যে-রকম চাপা মেয়ে, কোন অভিযোগ করবে না কখনও কার কাছে। শৈলদিদির কাছ থেকে টাকা ধার নেবো, মায়ের অহুখের পরে যে-ক'রে হোক, দেনা শোধ হবেই।

একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি সীতাব স্বামী ওদের রান্নাবরে বসে হ'কো-হাতে তামাক খেতে খেতে খুব গল্প জমিয়েচে—আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েদের সকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েচে এবং বোয়েরা সকলেই সম্পর্কে ওর শালাজ—তাদের সঙ্গে।

রাত দশটাব সময় শৈলদিদি এসে হাজির। আমায় দেখে বললে—এই যে সন্নিসি-ঠাকুর ফির এসেচ দেখচি। এই যে সীতা—এস এস, নাবিজী সমান হও, কখন এলে তাই? আমি সুনলাম এই খানিকটা আগে, আমাদের ও-পাড়ায় কে খবর দেবে বল।

আমি আব সীতা শুধু হবে মায়ের পাশে বসে। সীতার স্বামী খেয়ে দেয়ে শুয়েচে, অবিশ্রি সে বসে থাকতে চেয়েছিল—আমি বলছিলাম তার দরকার নেই। তুমি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—দরকার হয় ডাকব রাখে।

শৈলদিদিও বাত্রে থাকতে চাইল, বললে—আজ রাতে লোকের দরকাব। তোঁবা ছুটিতে মোটে বসে আছি। আমি খেয়ে আসি, আমিও থাকব।

আমি বললাম—না শৈলদি, আমরা দু-জনে আছি, ভগ্নীপতি এসেচে—তোমার আর কষ্ট করতে হবে না।

তারপর বাইরে ডেকে টাকার কথা বললাম। শৈলদি বললে—কত টাকা?

—গোটাকুড়ি দাও গিয়ে এখন। দুকাল সকালেই আমি তা হ'লে চলে যাই ডাক্তার আনতে—

—তা হ'লে কাল সকালে বাবার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। ওখান দিয়েই তো পথ—কেমন তো? ছোটকাকীমা এই সময় এলেন। শৈলদিদিকে দেখে বললেন—ঠাকুরঝিকে নিয়ে বেজায় মুন্সিল হয়েছে ভাই—ওরা ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে, নিতু এখনও তো এল না। হঠাৎ চার-পাঁচ দিনের জরে বে মাহুষ এমন হয়ে পড়বে তা কি ক'রেই বা জানবো। তবুও তো জিতু কোথা থেকে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল ভাই রক্ষে।

রাতে জ্যাঠাইমা এসেও খানিকটা বসে রইলেন। অনেক রাতে সবাই চলে গেল, আমি সীতাকে বললাম—তুই ঘুমিয়ে নে সীতা। আমি জেগে থাকি। রাতে কোন ভয় নেই।

সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে মার অবস্থা খুব খারাপ হ'ল। দশটার পর দাদা এল—সঙ্গে বৌদিদি ও দাদার খোকা। বৌদিদিকে প্রথম দেখেই মনে হ'ল শান্ত, সবল, সহিষ্ণু মেয়ে। তবে খুব বুদ্ধিমতী নয়, একটু অগোছালো, আনাড়ি-ধরণের। নিতান্ত পাড়ার মেয়ে, বাইরে কোথাও বেরায় নি বিশেষ, এই বোধ হয় প্রথম, কিছু তেমন দেখেও নি। গবস জলের বোতল গায়ে সেক করতে হবে শুনে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিপন্ন মুখে সীতার দিকে চেয়ে রইল। কাপড়-চোপড় পরবাব ধরণও অগোছালো—আজকালকাব মত নয়। বৌদিদি যেন বনে ফোটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে বাথবার সজিন্য নয়। আর একেবারে অজুত ধরণের মেয়েলী, ওব সবটুকুই নারীস্বের কমনীয়া মাখানো।

সীতা 'আমায়' আড়ালে বললে—চমৎকার বৌদিদি হয়েছে, ছোড়না। আহা, মা যদি একটবারও চোখ মেলে দেখতেন! আমাদের কপাল!

বেলা তিনটের সময় মা মারা গেলেন। যে মাঝেব কথা তেমন ক'রে কোনদিন ভাবি নি, আমাদের কাজ-কর্মে, উদ্যমে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উচ্চাভিলাষে মায়ের কেন স্থান ছিল না, সবাই মিলে থাকে উপেক্ষা ক'রে এসেচি এত দিন—আজ সেই মা কত দূরে কোথায় চলে গেল—সেই মায়ের অভাবে হঠাৎ আমরা অসুস্থব করলাম অনেকখানি খালি হয়ে গিয়েচে জীবনের। ঘরের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড ঘরজোড়া খাট থাকে, আজন্ম তার ওপর শুয়েচি, বসেচি, খেলেচি, ঘুমিয়েচি, সর্বদা কে ভাবে তার অস্তিত্ব, আছে তো আছে। হঠাৎ এক দিন খাটখানা ঘবে নেই—ঘরের সে পরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গিয়েচে—সে ঘরই যেন নয়, এক দিনে ঘরের সে নিবিড় সুপরিচিত নিজস্বতা কোথায় হাবিয়ে গেল, তখন বোঝা যায় ঘরের, কতখানি জায়গা জুড়ে কি, গভীর আত্মীয়তার ওর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল সেই চিরপরিচিত একঘেয়ে সেকলে খাটখানা—ঘরের বিবট ফাঁকা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবার নয়।

সীতার ঐর্ষ্যের বাধ এবার ভাঙলো। সে 'ছোট মেয়ের মত কেঁদে আবদার ক'রে যেন মাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। মা আর সে দু-জনে মিলে এই সংসারে সকালে সন্ধ্যায় দু-বেলা খেতে দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরম্পরের অনেক কাহাকাছি এসেছিল—সে-সব দিনের দুঃখের সজিনী হিনাবে মা আমাদের চেয়েও ওব কাছে বেশী আপন, বেশী বনিষ্ঠ—অভাগী এত দিনে সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হ'ল সংসারে। ওর স্বামী যে ওর কেউ নয়, সে আমার বুঝতে দেয় নি এতটুকু। কিন্তু ও হয়ত এখনও তা বোঝে নি।

দিন-দুই পবে বৌদিদি ছপুরবেলায় ওদের রান্নাঘরে একটা ঘড়া আনতে গিয়েছেন। 'জ্যাঠাইমা' বলেচেন—ওখানে দাঁড়াও, দাওয়াটাতে—অমনি হট ক'রে ঘরে ঢুকলে যে?

বৌদিদি অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন,

জ্যাঠাইমা ঘড়া বার ক'রে দিয়েচেন দাওয়াতে। বৌদিদি নিয়ে এসেচে। কিন্তু বুঝতে পাবে নি রূপারটা কি, বুদ্ধিমতী মেয়ে হ'লে তখনই বুঝত।

এ-কথা তখন সে কাউকে বলে নি।

পরদিন মেজকাকা আমার ডেকে বললেন—একটা কথা আছে শোন। তোমার মায়ের কাজটো এখানে না ক'রে অল্প জায়গা গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয় নি, বড়দাদাও নেই বাড়ি—এ-অবস্থায় শ্রদ্ধের সময় কেউ খেতে আসবে না। তোমার দাদার বৌকে আমরা সে-ভাবে ঘরে তো নিই নি? এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করো। ব'লো তোমার দাদাকে।

তলায় তলায় এরা সীতার স্বামী গোপেশ্বরকে কি পরামর্শ দিয়েচেন জানি নে, সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে চতুর্থীর শ্রদ্ধ সীতাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই করবে—অথচ আগে ঠিক হয়েছিল চতুর্থীর শ্রদ্ধ এখানেই হবে। কালই শ্রদ্ধের দিন, স্নাতক আজই সে সীতাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'ল। এর কোনও দরকার ছিল না, সীতা এখানে শ্রদ্ধ করলে তাতে কোনাে দোষ সমাজের মতেও হবার কথা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই কথা গুলে না। এই অবস্থায় বৌদিদিকে পেয়ে সীতা অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল—কিন্তু সে ওদের সহ্য না। বৌদিদির সঙ্গে সীতার বেশী মেশামেশিটা যেন গোড়া থেকেই আমার ভদ্রীপতি পছন্দ করে নি। নিজেই হোক আর ওদের পরামর্শই হোক।

বাবার সময় সীতা বৌদিদির গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমার আড়ালে বললে—ছোড়া আমার বনবাসে কেলে রেখে ভুলে থেকে না যেন, মাঝে মাঝে আসবে বল? আর শোনো, বৌদি কড় ভালমানুষ, ও এখনও জানে না যে ওর জন্তেই মায়ের কাজ এখানে করতে দিচ্ছে না ওরা। এ-কথা যেন বৌদিদির কানে না যায়, ব'লে দিও দাদাকে।

বৌদিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এখানে শ্রদ্ধ করতে খবচ বেশী পড়বে, কারণ জ্যাঠামশায়দের নাম বেশী, লোকজন নিমন্ত্রণ করতে হয় অনেক। গঙ্গাতীরে শ্রদ্ধের কাজ করলে অনেক কম খরচে হবে। বৌদিদি তাই বুঝে গেল।

বাবার সময় আমাদের ঘরের চারীটা ছোটকাকীমার হাতে দিয়ে বললুম—এ-বাড়িতে আর কাউকে আপন ব'লে জানি নে, কাকীমা। সীতার স্বৈরবর মাঝে মাঝে একটু নিও-ওর তো এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম মিটেই গেল।

ছোটকাকীমার চোখে জল এল। বললেন—আমার কোন ক্ষমতা নাই, নইলে নিজের বৌকে এ-বাড়ি থেকে আমাকে অল্প জায়গায় যেতে বলে?

আমি বললুম—সে-কথা ব'লো না কাকীমা। আমরা এখানে এসেছিলাম প্রার্থী হয়ে, পরের দয়ার উপর নির্ভর করে। এখানে কোন অধিকার নেই আমাদের।

কাকীমা বললেন—তুই ওকি কথা বলচিস্ জিহু? এ তোদের বে সাতপুরুষের ভিটে। জায়গা-জমি আব হুখানা ইট থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? এ ভিটেতে হাকর কি বোগেশের বে অধিকার, তোদের হু-ভায়ের অধিকার তার চেয়ে এক চুল কম নয়।

ছোটকাকীমার এক মূর্তি দেখেছিলাম বাল্যে, এ আর এক মূর্তি। এই এক জনই এ-বাড়ির মধ্যে বললে গিয়েচে একেবারে। গাড়ীতে যেতে যেতে সেই কথাটা বাব-বার মনে হচ্ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস পাঁচ ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে একবার গেলাম দাদার বাড়িতে।

দাদা ছিল না বাড়ি, বৌদিদি বাটনা-মাথা হাতে ছুটে বার হয়ে এল—আমার হাত থেকে পুঁচুটি নিয়ে বললে—এস এস ঠাকুরপো, রদুরে মুখ রাভা হয়ে গিয়েচে একেবারে। কই, আসবে ব'লে চিঠি দেও নি তো? তা হ'লে একখানা গরুর গাড়ী ষ্টেশনে যেত।

তখনই বৌদিদি চিনি ভিজিয়ে সরবৎ ক'বে নিয়ে এল। বললে—ঠাকুরপো তোমার মায়া নেই শরীরে। এত দেরি ক'রে আসতে হয়? উনি কেবল বলেন তোমার কথা।

বিকলে দাদা এল। আমার পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলো। কিসে আমার সুখ-সুবিধে হবে, কিসে আমার

বড় নাহ, ভালটা-মন্দটা খাওয়ারো যাবে, এই যোগাড়েরই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরা বেশ সুখে আছে। দাদা যা চাইত, তা সে পেয়েচে। সে চিরকালই সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে গৃহস্থালী নিয়েই ও সুখী, তাই নিয়েই ও থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে দাদাকে দেখে এসেচি, সংসার কিসে গোছালো হবে, কিসে সংসারের ছুখ ঘুচবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। লেখাপড়াই ছেড়ে দিলে আমাদের ছ-পয়সা এনে খাওয়ার জন্তে। কিন্তু পবের বাড়িতে পরের তৈরি ব্যবহার গভীর মধ্যে সেখানে তো কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজেই দাদার সে সাধ তখন মেটে নি। যার জন্তে ওর মন চিরকাল পিপাসিত ছিল, এত দিনে তার সন্ধান মিলেচে, তাই দাদা সুখী। দাদা ও বৌদিদি একই ধরনের মানুষ। নীড় বাঁধবার আগ্রহ ওদের রক্তে মেশানো রয়েছে। বৌদিদিব বাপের বাড়ির অবস্থা খারাপই। একান্নবর্তী প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে সে। তার বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে কষ্ট পায়, সবাই ছেঁড়া কাপড় পরে, একঘরে পুরনো লেপকাঁথা পেতে শীতের রাতে তুলো-বেকনো, ওরাড়-বিহীন ময়লা লেপ টানাটানি করে ছেলেপুলেরা রাত কাটায়—সব জিনিষই সকলের, নিজের ব'লে বিশেষ কোন ঘরদোরও নেই, তৈজসপত্রও নেই—সেই রকম ঘরে বৌদিদি মানুষ হয়েছে। এতকাল পরে সে এমন কিছু পেয়েচে যাকে সে বলতে পাবে এ আমাব। এ আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ঘরদোর—আর কারও ভাগ নেই এতে। এ অমূল্য বৌদিদির জীবনে একেবারে নতুন।

দাদা আমার তার পরদিন সকালে ওর কপির ক্ষেত, শাকের ক্ষেত, দেখিয়ে বেড়ালে। বৌদিদি বললে—গুহু ওলিক দেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি আমার গোয়াল দেখে যাও ভাই এদিকে। এই দ্যাখো, এই হচ্ছে মুংলী। মঙ্গলবারে সন্ধ্যাবেলা ও হয়, ওই সন্ধ্যাবেলায় তখন গোয়াল ছিল। ও হ'ল, সেই রাতেই বিষম ঝড় ভাই। গোয়ালের চালা তো গেল উড়ে। তার পর এই নতুন গোয়াল হয়েছে এই বোশেখ মাসে। বৌদিদি বাছুরের গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললে—বড় পয়সস্ত বাছুর,

বে-সাসে হ'ল সেই মাসেই ঔব সেই মনিব আমার শাখা-শাড়ী পাঠিয়ে দিলে, ওর দু-টাকা মাইনে বাড়ালে।

দিনকতক যাবার পরে বৌদিদির একটা গুণ দেখলাম, লোককে খাওয়াতে বড় ভালবাসে। অসময়ে কোন ফকির বৈষ্ণব, কি চুড়িওয়ালী বাড়িতে এসে খেতে চাইলে নিজের মুখের ভাত তাদের খাওয়াবে। নিজে সে-বেলাটা হবত মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিলে।

এক দিন একটা ছোকরা কোথা থেকে একখানা ভাঙা ধোলি বাড়ি করে এসে জুটলো। তার মুখে ও গালে কিসের বা, কাপড়-চোপড় অতি নোংরা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ছ-সাত দিন রইল, দাদাও কিছু বলে না, বৌদিদিও না। আমি এক দিন বৌদিদিকে বললাম—বৌদি, দেখচো না ওর মুখে কিসের বা। বাড়ির খাল-গেলানে ওকে খেতে দিও না। ও ভাল বা নয়, ছেলেপুলের বাড়ি, ওকে পাতা কেটে আনতে বললেই তো হয়, তাতেই খাবে। আট দিন পরে ছোকরা চলে গেল। বোধ হয় আরও আট দিন থাকলে দাদা বৌদিদি আপত্তি করত না।

বৌদিদি খাটতে পাবে ভুতেব মত। স্বি নেই, চাকর নেই, একা হাতে কচি ছেলে মানুষ-করা থেকে শুরু করে ধানসেদ্ধ, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—সমস্ত কাজই করতে হয়। কোনদিন ব্যাঙ্গার হ'তে দেখসাম না সে-জন্তে বৌদিদিকে।

এদের মায়ার আমিও যেন দিনকতক জড়িয়ে গেলাম। এরকম শান্তির সংসার কতকাল ভোগ করি নি—বোধ হয় চাবাগানেও না, কারণ সেখানে বাবা মাতাল হয়ে রাঙে কিরবেন, সে ভয় ছিল। ভেবে দেখলাম সত্যিকার শান্তি ও আনন্দভরা জীবন আমরা কাকে বলে কোনদিন জানি নি—শ্রোতের শেওলাব মত বাবা স্ত্রীপুত্র নিয়ে এ-চাবাগানে ও-চাবাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াঁতেন, শেবকালে না-হয় কিছুদিন উম্পা বাগানে ছিলেন—এতে মন আমাদের এক জায়গায় বসতে না-বসতেই আবার অন্য জায়গায় উঠে যেতে হ'ত—এই সব নানা কারণে নিজের ঘর নিজের দেশ, এমন কি নিজের জাতি ব'লে কোন জিনিষ আমাদের ছিল না। তবে অভাব যদিও আমরা কোনদিন অনুভব করি নি—অত অল্পবয়সে করবার

কথাও নয়—বিশেষ ক'রে যখন হিমালয় আমাদের সকল অভাবই পূর্ণ কবেছিল আমাদের ছেলেবেলাতে।

এখানে সকলের চেয়ে আমার ভাল লেগেচে বৌদিদিকে। আমি বৌদিদির ধরণের মেয়ে কখনও দেখি নি। যা তা জিনিষ দিয়ে বৌদিদিকে খুশী করা যায়, যে-কোন ব্যাপার যত অসম্ভবই হোক না কেন—বৌদিদিকে বিশ্বাস করানো যায়, খুব অল্পেই ভয় দেখানো যায়—ঠকিয়ে কোন জিনিষ বৌদিদির কাছ থেকে আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। অথচ একটি সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে বৌদিদি ধরকরা ও সংসার সম্বন্ধে দাদার চেয়েও ভাল বোঝে, বড় কিছু একটা আশা কখনও করে না, ভারি গোছালো, নিজের ধরণে ঠাকুরদেবতার ওপর ভক্তিমতী। কেবল একটা দোষ আমার চোখে বড় লাগে—নিজে যে-সব কুসংস্কার মানে, অপরকেও সেই সব মানতে বাধ্য করবে। অনেক ব্যাপারে দেখলাম ভাবটা এই রকম, আমার সংসারে যত ক্ষণ আছে তত ক্ষণ তোমায় মানতেই হবে, তার পর বাইরে গিয়ে হয় মেনো না-হয় না-মেনো। কড়া কথা বলে নয়, মিনতি অহরোধ ক'রে মানাবে। বড়া কথা বলতে বৌদিদি জানে না—টকের ভাঁজ নেই কোথাও বৌদিদির স্বভাবে, সবটাই মিষ্টি।

সপ্তাহ দুই পরে ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আসবার সময়ে দাদা বললে—শোন জিভু, আটঘরার বাড়ি সম্বন্ধে কি করা যাবে, তুই একটা মত দিস। ছোটকাকীমা ঠিকই বলেচেন—ওবাড়ি আমরা ছাড়বো না। আর একটা কথা শোন, একটা চাকরি দেখে নে, এরকম ক'রে বেড়াস নে। তোর বৌদিদি বলছিল এই বছরেই তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তার পর হুড়ো ঘরবাড়ি করি আর, দু-জনে মিলে টাকা আনলে ভাবলী কিসের সংসার চালাবার? সংসারটা বেশ গড়ে তুলতে পারবো এখন। আর দ্যাখ, পরমা রোজ্জগার করতে না পারলে, ঘরবাড়ি না থাকলে কি কেউ মানে? নিজের বাড়ি কোথাও একখানা থাকা চাই, নইলে লোকে বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

দাদার শুধু সংসার আর সংসার। আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি ভাবলে না-ভাবলে তাতেই বা আমার কি?

লেখাপড়া শিখলে না কিছু না, দাদা যেন কেমন হয়ে গিয়েচে। লোকে কি বলবে সেই ভাবনাতেই আকুল। দাদার ওই সব ছাপোষা গেরস্থালী-ধরণের কথাবার্তার আমার হাসি পায়, দাদার ওপর কেমন একটা মায়াও হয়। ভাবলুম, কোথায় যাওয়া যায়? কলকাতায় গিয়ে একটা চাকুরি দেখে নেবো? দাদা যদি তাতেই সুখী হয়, তাই না-হয় করা যাক। আমি নিজে বিয়ে করি আর না-করি, ওদের সংসাবে কিছু কিছু সাহায্য করা তো যাবে? নৈহাটির কাছে অনেক পাটের কল আছে, কলকাতায় না গিয়ে সেখানে গেলে কেমন হয়? পাটের কলে শুনেচি চাকুরি জোটানো সহজ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই এলাম। মাস দুই কাটল, একটা মেসে থাকি আর নানা জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করি। কোন জায়গাতেই কিছু সুবিধে হয় না।

এক দিন রবিবারে বারাকপুর ট্রাঙ্ক বোর্ড ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি, দমদমাও প্রায় ছাড়িয়েচি, হঠাৎ বড় বৃষ্টি এল। দৌড়ে একটা বাগানবাড়ির ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঘরটাতে বোধ হ'ল বহু দিন কেউ বাস করে নি, ছাদ ভাঙা, মেজের সিমেন্ট উঠে গিয়েচে। বাগানটাতেও জঙ্গল হয়ে গিয়েচে।

একটা লোক সেই ভাড়া ঘরে বারান্দাটাতে শুয়ে ছিল, বোধ হয় ক'দিন থেকে সেখানে সে বাস করচে, একটা দড়ির আলনায় তার কাপড়-চোপড় টাঙানো। আমার দেখে লোকটা উঠে বসল, বললে—এসো বসো বাবা। বেশ ভিজ্জে দেখচি বৃষ্টিতে? বসো।

লোকটার বয়েস পঞ্চাশের ওপর, পরনে গেরুয়া আলথেল্লা, দাড়ী-গোঁপ কামানো। আমার জিগ্যাস করলে—তোমার নাম কি বাবা? বাড়ি এই কাছাকাছি বৃষ্টি?

নাম বললাম, সংক্ষেপে পরিচয়ও দিলাম।

বললে—বাবা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েচেন আজ। তুমি বসো, তুমি আমার অতিথি। একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও—

আমি খেতে না চাইলেও লোকটা পীড়াপীড়ি করতে

লাগল। তার পর কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান হাতটা শূণ্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।...

আমি ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে বললে—
আর একটা থাকে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়েছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূণ্যে হাতখানা বাবুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটা! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি খেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আব নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুদর্শন পাই কলীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি আমি বাব হ'তে পারি, কুমার হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তাব পর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাব কি কুমার হয়ে যাব—আব একটা পায়ে জল থাকবে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতকীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোস্তাব সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিগ্যেস ক'বে আসতে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুনিলাম। এসব কথা আমার অবিবাস হ'ত যদি-না এই মাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আনতে না-দেখতুম। জিগ্যেস করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় বাসেন?

—না বাবা। মুরশিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটি চাড়াণেব মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েছি।

আমি চাকুরি-বাকুবী খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমার নিয়ে যাবেন? অবিদ্যা যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতিকষ্টে মত করলুম। তার পর মেসে ফিরে জিনিবপত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাটা যাক।

আমি বললাম—তা কেন? আমার কাছে টাকা আছে, ছ-জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাড়াণ মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখবার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেছি।

খাগড়াঘাট স্টেশনে পৌঁছতে বেলা গেল। স্টেশন থেকে এক-মাইল দূবে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌঁছেছি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দোকানের সামনে বটতলায় আমরা আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবার সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে! আত্মকাল আবার হয়েছে চোর-হেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখে তো?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ ত হাজার হোক, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম কোন ভয় নেই, দিন আমাকে। এই দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেছি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সব চেয়ে সেক—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙলো। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটা টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিবাস করাও দেখছি বিবম মুক্তি। ঘণ্টা-খানেক কাটল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নাই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা! মুদিটি আমার অবস্থা দেখে শুনে বললে—আমি চাল ডাল দিচ্ছি, আপনি রেখে খান বাবু। ভয়লোকের ছেলে, এমন জুরোচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? দামের জন্তে ভাববেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখুলো চিন্তে দেবি হয় না, আপনি বা দরকার নিন্ এখান থেকে। ভাগ্যিস আপনার হুটকেসটা নিয়ে স্বয়ং নি?

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম মুখে চললাম। আমার হুটকেসে একটা ভাল টর্চলাইট ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতে নিলে না।

ক্রমশঃ

রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৮৯ সাল। সে বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পর আমি দ্বিতীয় বার কটক কলেজে গেছি। দেখি, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের সঙ্গে এক সৌম্যমুর্তি শাদা-পেন্সিলেন-চাপকান-পরা এক ছাত্র আমার ব্যাখ্যান শুনছে। এ-পাশে সে-পাশে দৃষ্টি নাই, ধীর ও স্থির। বালকটি কে?

পরে শুনলাম ময়ূরভঞ্জের ভাবী রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও।

রাজপুত্রই বটে। শূকুমার মুখ আভিজাত্যের অভিমানে মণ্ডিত হয়েছে। মুহূভাষী, অল্পভাষী, বিনীত, নম্র। কেবল আমি নই, কলেজের অন্য শিক্ষকেরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

যিনি দু-তিন বছর পরে ময়ূরভঞ্জের রাজা হবেন, তাঁর সঙ্গে ভাব ক'বতে পারলে একটা-না-একটা ভাল চাকরি জুটবে। তাঁর সহপাঠীদের মনে এ চিন্তা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতাম। ব্যাখ্যানের অবকাশে শ্রীরাম ঘরের বাইরে এক ক্ষান্তদশী ছেঁচের তলায় দাঁড়িয়েছেন, সেই দু-তিনটি সহপাঠীর সঙ্গে কথা কইছেন, অন্য কোন ছাত্রকে দেখতে পেতাম না। হয়ত তারা কাছে যেতে সঙ্কুচিত হ'ত। 'আলাপ-বিষয়ের কাছে কেহ যায় না।

ওড়িয়ার বড় নদী, মহানদী। কটকের সাত-আট মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে। এর এক শাখা বেরিয়েছে। এই শাখার নাম, কাঠজুড়ি। দক্ষিণে কাঠজুড়ি, উত্তরে মহানদী। এই দুই নদী দু'মধ্যে ত্রিকোণ ভূমিতে কটক। কলেজ কাঠ-জুড়ির নিকটে। আমার ও কলেজের অন্য শিক্ষকদের বাসা কলেজের কাছে ছিল। মহানদীর দিকে, কলেজ হ'তে প্রায় দুই মাইল দূরে, একটা গ্রামের নাম তুলসীপুর। সেখানে একটা কুঠিতে শ্রীরাম থাকতেন। গোবিন্দবাবু তাঁর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তিনি শ্রীরামকে পুত্রবৎ চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর শিক্ষার গুণেও শ্রীরামের স্বভাব মধুর হয়েছিল। তিনি বেশভূষায় আড়ম্বর আসতে দেন নি।

কলেজের বাইরে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা হ'ত না। এক দিন শুনলাম শ্রীরামকে বিলাত পাঠাবার কথা হ'চ্ছে। 'দেবাৎ সেদিন ঘরের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইংবেজীতে, 'আপনার বিলাত যাবার কথা শুনছি। প্রজ্ঞারা বিরক্ত হবে না?' তিনি উত্তর করো-ছিলেন, 'বিরক্ত হবার কাবণ দেখি না। যদি কেহ হয়, বিলাত হ'তে ফিরে এলে সে কারণ পাবে না।' বুঝলাম, বালক বটে, বয়স আঠার বছর, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ও পরিণামদর্শী। পরিতাল্লিশ বৎসব-পূর্বে, বিশেষতঃ ওড়িয়ার, সমুদ্রযাত্রা ক'লে জাতি-নাশের শঙ্কা ছিল।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বিলাত যাওয়া হয় নাই। ইং ১৮৯০ সালে এক-এ পাস হ'য়ে কলেজে বি-এ পড়তেও আসতে পারেন নি। দুই বৎসর পরে তাঁকে 'রাজ্যভার' নিতে হবে, এখন বাঙ্গ'কর্ম শিখতে হবে, কলেজে পড়তে আসতে গেলে সে শিক্ষা হবে না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা। তিনি সেখানে থেকে ইং ১৮৯০ সালে জুন মাসে আমাকে এক পত্র লেখেন। এই আমাকে তাঁর প্রথম পত্র। তিনি লেখেন, 'তিনি বাড়ী বসে বি-এ পরীক্ষার জন্ত প'ড়বার সংকল্প করোছেন, বিজ্ঞান শাখা প'ড়বেন। ভূতবিদ্যা (Physics) শিখতে কি কি যন্ত্র কিনতে হবে, তার একটা তালিকা চান। তাঁর এই সংকল্পে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম, এবং যন্ত্র-মূল্যপুস্তকে চিহ্নিত করে তালিকা পাঠিয়েছিলাম। দিন পনের পরে তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানতে চান, আমি তাঁর কাছে যেতে পারব কিনা। নানা কারণে আমি সম্মত হ'তে পারিনি।

কটক কলেজে তখন মোহিনীমোহন ধর, এম-এ, বি-এল, গণিত-বিদ্যার 'লেকচারার' ছিলেন। তাঁর চাকরি বেশী দিন হয় নি। রাজা তাঁকে পত্র লেখেন, এবং মোহিনীবাবু কলেজের কর্ম ছেড়ে দিয়ে বাজাব কাছে চলে যান। অক্টোবর মাসে রাজা আমাকে লেখেন, তিনি কতক

যন্ত্র কিনেছেন, এবং মোহিনীবাবুকে বারিপদায় নিয়ে গেছেন। তিনি এঁর কাছে গণিত ও ভূতবিদ্যা পড়বেন, আইন শিখবেন, এবং বিচারপদ্ধতি জেনে নিবেন। বাঙ্গার শিক্ষা সমাপনের পব মোহিনীবাবু ময়ূভজের দেওয়ান (প্রধান বিচারপতি) হ'য়ে বারিপদায় র'য়ে গেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাকে অনুমতি দিলেন না, তাঁর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। কিন্তু বাড়ীতে পাঠ্য বিষয় শিখেছিলেন। একবার রাজা ছুখ করে আমার লিখেছিলেন, তাঁর অধিকাংশ সময় রাজকাৰ্ণে যাচ্ছে, পড়াব সময় হ'চ্ছে না।

নিসর্গে ও রাষ্ট্রে ওড়িয়ার দুই ভাগ। ব্রাহ্মণী, বৈতরিনী, মহানদী ও মহানদীর শাখাব পলি ও বালি দ্বারা বালেশ্বর, কটক, ও পুরী, এই তিন জেলার উৎপত্তি হয়েছে। এই তিন জেলা ওড়িয়ার পূর্বভাগ, পবে সমুদ্র। পশ্চিম ভাগ উন্নতানত, পর্বতময়, অরণ্যময়। ওড়িয়ার তিন ভাগের দুই ভাগ এই রূপ। পূর্বকালে সমুদ্র ওড়িয়া খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মোগলেরা পূর্ব দিকের সমস্থলী স্বীয় অধিকারে এনেছিল। এই হেতু এই ভাগের নাম মোগলবন্দী হয়েছিল। ব্রিটিশেরা ইং ১৮০৩ সালে মোগলবন্দী দখল করেন। বিধমস্থলীব রাজাবা অল্পস্বল্প কর স্বীকারে ব্রিটিশের সহিত সন্ধি করেন। রাজারা এক এক গড়ে থাকতেন। গড়, বৎসামান্ত গিরিজুর্গ। গড়ই তাঁদের রাজধানী। যত রাজ্য, তত গড়। এই কারণে করদরাজ্যগুলিব নাম গড়জাত (গড়সমূহ)। ব্রিটিশেরা এই সকল রাজ্যের নাম ওড়িয়ার গড়জাতমহল অথবা করদমহল (Tributary Mahals) রেখেছিলেন। কয়েক বৎসর হ'তে সামন্তরাজ্য (Feudatory States) নাম হয়েছে। ইংবেজ দণ্ডের নাম যাই হ'ক, সাধারণে গড়জাত জানে, গড়ের রাজা স্বীকার করে। এককালে ১৮টি গড় বা রাজ্য ছিল। অধিকাংশ ছোট ছোট। ময়ূভজ ও কেউবার (ও উচ্চারণে ও) সর্বাধিক বড়। দুই রাজ্যেরই আদি প্রতিষ্ঠাতা ভজ-বংশ। জয়েরই লাহন ময়ূর।

ব্রিটিশের সহিত সন্ধির পর বাঙ্গাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। যখন করদরাজ্য নাম ছিল, তখন ওড়িয়া-বিভাগেব অর্থাৎ বালেশ্বর কটক পুরী কমিশনার সাহেব

গড়জাতের অধ্যক্ষ (Superintendent) ছিলেন। সামন্ত রাজ্য নাম হবার সঙ্গে এক পৃথক অধ্যক্ষ (Political Agent) নিযুক্ত হ'য়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সময় ময়ূভজ ও অন্তত গড়ের ব্রিটিশ অধ্যক্ষ, ওড়িয়ার কমিশনার ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ময়ূভজ-রাজ্যধিকারী, তিনিই রাজা। ইং ১৮৯২ সালে তিনি রাজসদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা তাঁর পৈতৃক পদবী। ইং ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট তাঁকে মহারাজা উপাধি দি'য়েছিলেন। সেটা উপাধি, তদ্বারা তাঁর পদবৃদ্ধি হয় নি।

২

কটক কলেজে পৃথক বিজ্ঞানশালা ছিল না। এই অভাবহেতু কটকের সীমা ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র দেখে গেছিলেন। এজার (S. Ager) নামে এক সাহেব প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁকে ব'ল্যে ব'ল্যে দেখিয়ে দেখিয়ে কটে ফেলেও গবর্নেন্টের কাছে চিঠি লেখাতে পারি নি। তিনি টাকা চাইতে ভীত হ'তেন। কলেজের ছাত্র এখন রাজ হ'য়েছেন, তাঁর কাছে টাকা চাইতে লজ্জা কি? তাড়াতাড়ি একটা বিজ্ঞানশালার চিত্র লিখে নির্মাণব্যয় ১৮,০০০ নিরূপিত হ'ল। রাজাকে প্রার্থনামাত্র তিনি টাকা দিতে সম্মত হ'লেন। অবশ্য প্রিন্সিপাল পত্র লিখেছিলেন। সবকারী ইঞ্জিনিয়ার সে-টাকার গৃহনিমাণ ক'বিয়ে দিলেন। তখনকার পক্ষে সে গৃহ যথেষ্ট হ'য়েছিল।

রাজা হবার পাঁচ-সাত বৎসর পবে শ্রীরামচন্দ্র কটক এসেছিলেন। তিনি এসেছেন জানলে দেখা ক'বতে যেতাম। জানলাম তাঁরই নিমন্ত্রণে, রায়ে ভোক্তনেব নিমন্ত্রণ। সেবারে তিনি মহানদীব তীরে একটা কুঠাতে ছিলেন, আমাদের পাড়া হ'তে দেড় মাইল দূরে। তখন নীলকণ্ঠ মজুমদার কলেজেব প্রিন্সিপাল। তিনিও নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। তাঁর বেরতে দে'র হ'ল, ঘোড়ার গাড়ীব অখণ্ডলও যেতে দে'ব ক'রলে। প্রায় রাতি ৯টাব সময় কুঠাতে প'হছিলাম। দেখি, একটা বড় ঘরে গাশিচা পাতা কটকেব গণ্যমান্য পদস্থ বিশ-পঁচিশ জন বসোছেন, রাজা বরেরমাঝে, আব সাত-আট জন তাঁকে ঘিরে বসোছেন। সে বৃহ ভেদ করা আমার কঠিন, তাঁরও কঠিন। বাজা

একটা ছোট যাত্রাদল, বোধ হয় বালেশ্বর হ'তে, নিয়ে এসেছিলেন। তাবা সেখানেই ছিল। কিন্তু এক তাদের অভিনয় দেখে, রাজার সহিত বাক্যালাপ করো অধিক মনোবঞ্জন হ'চ্ছিল। একটু পবে রাজা উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে ভোজনের আসনে যেতে আহ্বান ক'রলেন। ঘরের পেছা, মহানদীর দিকে বারান্দায় আসন। আসন, ভোজ্য-পাত্র, আচমন-পাত্র প্রভৃতি দেখে বুঝলাম রাজা সে-সব গড় হ'তে আনিয়েছেন, পাচক পতিচাবক গড় হ'তে এসেছে। ভোজন সমাপন ও আচমন হ'য়ে গেল। একে একে উঠতে লাগলেন। দেখলাম পাশের এক ঘর দিয়ে পথ। রাজার পবণে কৌচানা ধুতি, গায়ে শাদা কোট, বা কাঁধে কৌচানা উড়ানী। তিনি ঘারে দাঁড়িয়ে, পাশে এক পরিচারকের হাতে একটা বড় থালায় বেলফুলের মালা, আর এক পরিচারকের হাতে চন্দনের বাটি। বিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, রাজা তাঁর কপালে চন্দনের তিলক, গলায় মালা দিয়ে করমর্দন ক'রছেন। আমার পালা প'ড়ল। আমি ভাবছি, দেখি শ্রীবাম কি করেন। তিনি ক্ষণমাত্র স্থির থেকে ব'ললেন, 'আমবা এখন বন্ধু' (We now meet as friends), আমিও হেসে ব'ললাম, 'নিশ্চয়' (certainly)। তথাপি হ'ত বাড়িতে পারলেন না, আমাকেই বাড়িতে হ'ল। তাঁর এই ব্যবহার শ্রবণ হ'লে আজিও আমার আনন্দ হয়। কি বা পরিচয়, কিছুই নব। কলেজ-ববে চল্লিশ-পঞ্চাশ ছাত্রের সঙ্গে তিনি ব'সতেন, ব্যাখ্যান শুনতেন, চল্যে যেতেন। ঘরের বাইরে এক দিন দু-তিন মিনিটের কথা হয়েছিল। এইটুকু আলাপ। তখন আমার বয়স ত্রিশ, গুরু মানাবার বয়স নয়। আমাদের দেশে গুরুভক্তি তুলনা নাই।

সেকালের একটা শিষ্টাচার এখন বাংলা দেশ হ'তে লুপ্ত হ'তে বসোছে। উত্তরীয় বিনা বাজা হ'ন, প্রজা হ'ন, কেহ কোন ভদ্রলোকের সহিত দেখা ক'রতেন না। গায়ে কিছু নাই, কিন্তু কাঁধে উত্তরীয় থাকত। নিজের বাড়িতে উত্তরীয় বিনা দেখা দিতেন না। ওড়িয়ায় এই রীতি সর্বদা দেখতে পেতাম, প্রশংসাও ক'রতাম। রাজার গায়ে কোট ছিল, কিন্তু সে কোট পর্যাপ্ত নয়, উড়ানী না থাকলে ভদ্রলোকদিকে অসম্মান ক'বা হ'ত।

কয়েক বছর পরেব কথা। এক দিন বিকালবেলা আমি বেড়াতে বেড়াতে মফুহুদন দাস-মশায়ের বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়ে পূর্বমুখে বাচ্ছিলাম। দেখি, রাজা সে পথে হেটে কোথায় আসছেন। পেছতে এক চাকর। কৌচানা ধুতি, গায়ে শাদা কোট, বা কাঁধে কৌচানা উড়ানী। কাছে এলে তিনি ডান হাত তুলে নমস্কার ক'রলেন, আমিও ক'রলাম। 'কবে এলেন' জিজ্ঞাসা ক'রতে বাছি, তাঁর কোটের দিকে চোখ প'ড়ল। শাদা ছ-আনা গজের জিনের কোট, তারও স্থানে স্থানে সূতা বেরিয়ে পড়োছে। বা পাশের পকেটের কাছে মনে হ'ল তালি দেওয়া। আমি বিস্মিত হ'য়ে কুশল প্রশ্ন ক'বতে ভুলে গেলাম। ব'ললাম, 'রাঙা, আপনাব কোটটি পুরানা হয়ে গেছে। দেখলে লোকে কি ব'লবে।' তিনি একটু হেসে পকেটের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'ললেন, 'নাঃ। তত পুরানা হয় নি।' পথে দাঁড়িয়ে অপব কথা হ'ল না, তিনি চল্যে গেলেন। আমি ভাবলাম, রাজা কি ক্লপণ হয়েছেন, জীর্ণ কোটকে ব'লছেন জীর্ণ হয় নি! বেধ হয় তিন মাইল দূরে রেল স্টেশন হ'তে হেটে আসছিলেন। কথাটা মনে রইল।

এর বছর-খানেক পবে রাজা তাঁর কয়েক জন উচ্চ কর্মচারী সঙ্গে ল'য়ে কটক এসেছিলেন। আমার জানবার সম্ভাবনা ছিল না। সে সময় এক দিন সন্ধ্যার পব মোহিনীবাবু ও আর এক উচ্চ কর্মচারী দেখা ক'রতে আমার বাসায় এসেছিলেন। অনেক কাল পবে দেখা, এক-কথা সে-কথা নানা কথা হ'তে লাগল। হঠাৎ সে কোটেব দশা মনে প'ড়ল। আমি মোহিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'বলাম, "আপনি রাজাকে অনেক দিন দেখছেন, মানুষটি কেমন?" তাবা ছুজনেই ব্যা উঠলেন, "মানুষ কেমন আর কি? আমরা প্রভু, কি তিনি প্রভু, আমরা বুঝতে পারি না।"

"রাজা বুদ্ধি অলস, আপনাদের কাজ দেখেন না।"

"অলস একটুকু ন'ন, খড়ির কাঁটা। কাজকম সব দেখেন, সব বুঝেন। কিন্তু কিছু বলেন না। আমাদের বিপদ এই। প্রাণপণে বখাসাধ্য ক'রতে হয়।"

"মোহিনী বাবু, আপনি যাই বলুন, রাজাটি দারুণ ক্লপণ।"

তারা বুঝতে পারলেন না; আমি কোটের বর্ণনা করলাম। তখন তাঁরা হেসে উঠলেন, আর বললেন, “যদি তাঁর খাস কামরা দেখতেন, আপনি চুকে চাইতেন না। ছুখানা চেয়ার, কোনখানা ভাল, তা দেখতে সময় লাগবে। টেবিলের চারদিকে কালী ব দাগ, এক কোণ ছোঁড়া। নিজের কাপড়চোপড় সবকিছু সম্পূর্ণ উদাসীন।”

“আপনার এজলাসের দশাও কি ঐ রকম?”

“আমার এজলাস ব্রিটিশ জজকোর্ট অপেক্ষা কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট নয়, বরং কোন কোন বিষয়ে ভাল।”

“তাহলে দেখছি, আপনিও বিগড়ে গেছেন। আপনি বসেন সুসজ্জিত ঘরে, আর আপনার রাজা যে ঘরে বসেন সে ঘরে আপনার কেমনীও বসতে চাইবে না। রাজাকে এই বিসদৃশ বলেন না কেন?”

“অনেকবার বলোছি, হাঁর মেনেছি। তিনি বলেন, পদগোরবেব বোগ্য ঘর ও বোগ্য সজ্জা চাই। তাঁর নিজের ওতেই চলো যাচ্ছে।”

“চলো যাচ্ছে বটে, চেনা বায়ুনের পইতার দরকার হয় না। তবু। রাজা কি বই পড়তে ভালবাসেন?”

“দর্শনের বই।”

এতক্ষণে বুঝলাম, রাজা দর্শন-জ্ঞান নিজের চরিতে ফলাতে চান। তিনি ব্যসন-মুক্ত।

পরদিন বৈকালে রাজার সহিত দেখা করতে গেলাম। পথেই দেখা হ’ল, তিনি হেঁটে কোথায় যাচ্ছিলেন। সঙ্গে এক জন চাকরও নাই। সেই নমস্কার। ছ-এক কথার পর আমি বললাম, ‘রাজা, আপনার মন্ত্রীরা আপনার অত্যন্ত অসুগত, অনেক চেষ্টা করোও আপনার নিন্দা করাতে পাবি নি।’ রাজা তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, আমি আমার কর্মচারী-সংগ্রহণে ভাগ্যবান (I am very fortunate in the choice of my officers)। কথাটা সত্য, যেমন প্রভু তেমন সেরক।

আমি রাজার সহিত কদাচিৎ পত্র-ব্যবহার করতাম, কদাচিৎ দেখা করতাম। যখন করতাম, তখন তাঁর রাজ্যের উন্নতি কামনা করতাম, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বাড়া করতাম। আর, আমার কি এক স্বভাব ছিল, আমি আমার ছাত্রদিকে বালক মনে করতাম। তিনি

রাজা হন, মহারাজা হ’ন, শ্রীরামচন্দ্রকে বালক মনে করতাম। তিনি মহারাজা হবার পরেও তাঁকে রাজা সম্বোধন করতাম। পত্রে ও আলাপে কখনও কখনও তাঁর বিবেচনার দোষ দেখাতাম। কিন্তু তিনি বীরভাবে উত্তর করতেন। আলাপের সময় আক্ষেপ একটু গুরুতর দেখলে তিনি ইংরেজীতে উত্তর করতেন। তাঁর ছ-একখানা উত্তর আমার পুরানা কাগজপত্রের মধ্যে পড়ো ছিল। একখানা দেখছি, ইং ১৯০২ সালে মার্চ মাসে লিখেছিলেন। ভাবে বুঝছি, বাণীর অকালে স্বর্গপ্রাপ্তির সংবাদে তাঁকে সান্দ্রনা করোছিলাম। পত্রখানি প্রতিপত্র। দারুণ শোকের সময় লোকের কপট সভ্যতা থাকে না। তখন অন্তরের গুঢ় বাসনা মনে আসে। পত্রখানিতে তাঁর প্রগাঢ় ধর্মভাব পরিস্ফুট ছিল। তখন তাঁর বয়স একত্রিশ বৎসর।

৩

অনেকে জানেন মিষ্টার পি-এন বোস (এমখনাথ বসু, প্রায় এক বৎসর স্বর্গগত) নব্বুভঞ্জে লোহার আকর আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সে আবিষ্কারের ফলে টাটা-কোম্পানীর বিপুল কাবখানার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অনেকে জানেন না, বহু-মশায় কি হুজ্রে মব্বুভঞ্জে এসেছিলেন। বহু-মশায়ও আদি বৃত্তান্ত জানতেন না। তিনি ইং ১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে গবর্মেণ্ট ভূবিদ্যা-বিভাগের কর্ম হ’তে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, ডিসেম্বর মাসে রাজার ভূবিদ্যাবিৎ হয়েছিলেন। তার পর মব্বুভঞ্জের গোকুমহিষানি পাহাড়ে লোহার আকর দেখতে পান।

আদি বৃত্তান্ত একটু লিখি। ইং ১৯০১ সালের জুনুআরি মাসে মধুহরন দাস-মশায়েব উদ্যোগে কটকে ওড়িয়ার শিল্পভবোর প্রদর্শনী হয়। এইটি প্রথম। সে সময়ে রাজা কটক এসেছিলেন। উদ্‌যোক্তারা বাজাকে ও আমাকে এক দ্রব্য-জাতের ভালমন্দ বিচারক করেছিলেন। ১২ টাব সময় যেতে হবে, আমি একটু আগে বেয়ে সব দ্রব্য একবার দেখে রাখলাম। প্রায় পনের আনা নানা গড় হ’তে এসেছে। একস্থানে চার হাড়ী কাল গুঁড়া মাটি ছিল।

মাটি কোথা হ'তে এসেছে, তাতে কি আছে, জেনে রাখলাম। ১২টার সময় বাজা এলেন। তাঁর সঙ্গে আবাব সব দেখতে লাগলাম। নানা প্রকার বস্ত্র, লোহার অস্ত্রশস্ত্র, পিতল-কাঁসার তৈজসপাত্র ইত্যাদি ছিল। ময়ূরভঞ্জ হ'তেও এসেছিল। আমবা এক একটি দেখি গুণপণার প্রশংসা করি। এক একটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীব, বর্তমান চোখে সব সুন্দর নয়, কিন্তু কত কালের উদ্যমে ও সাধনে কলাব তেমন উৎকর্ষ হয়েছে। আমি রাজাকে এক একটা দেখাই, আর বলি, 'বাজা, এই বে কলা, একি লুপ্ত হবে? এই বে কৌশল, একে একটু নুতন পথে চালিয়ে দিবার কেহ নাই কি?' জবাবলি রাজার কাছে নুতন ছিল না, কিন্তু তিনি গুণপণা ভেবে দেখেন নি। পরে সেই চার হাড়ীব কাছে এলাম। একটু কৌতুক ক'বো রাজাকে ব'ললাম, 'রাজা, গড়জাতী বুদ্ধি দেখেছেন, মাটি পাঠিয়েছে।' রাজাও দেখলেন মাটি। একটা হাড়ী তুলে ব'ললেন, 'ভারী ঠেকছে, মাটিতে কিছু থাকবে।' 'এক হাড়ী মাটি, ভারী ত হবেই।' কিছু মাটি নিয়ে দেখলাম, সোনার আঁধ চিক্চিক ক'রছে। কেরানী কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, 'বল ত কোথা হ'তে এসেছে।' 'এই হু-হাড়ী ময়ূরভঞ্জ হ'তে, এই হু-হাড়ী অমুক গড় হ'তে।' সোনা ও ময়ূরভঞ্জেব নাম শুনে রাজার আগ্রহ হ'ল, জায়গার নাম শুনে বিশ্বাস হ'ল। 'তাই ত, সেখানে সোনা পাওয়া যায়, আমি জানতাম না।' 'কে জানবে? ময়ূরভঞ্জ রাজ্য আপনার। আমাব মনে ক'রলেও আপনার ক্ষতি হবে না।' রাজা অবশ্য মম'বুললেন।

এব প্রায় পাঁচ-ছয় মাস পূর্ব হ'তে আমি কুস্তকলা জানতে বসেছিলাম। আমি তখন বাসায় কুস্তকার। এই কাজেব নিমিত্ত একটা পাথর খুঁজছিলাম। পাথরটা ইংরেজীতে ফেলস্পার (felspar), বোধ হয় সংস্কৃত নাম চপল। কটকের নিকটের পাহাড়ে পেলাম না। তালচেরেব বাজাকে (বর্তমান রাজা), কেঁওররের মহরাজা ও ময়ূরভঞ্জের বাজা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনাপত্র লিখলাম, তাঁদের রাজ্যে যত রকম পাথর আছে অনুগ্রহ করো এক এক টুকরা পাঠিয়ে দিবেন। সংক্ষেপে বাহুলক্ষণ দিবেছিলাম। তথাপি এই বুদ্ধি ক'রতে হয়েছিল। কারণ, থাকলে দেশী

নাম থাকবে, সে নাম আমি জানি না, সকলে বাহুলক্ষণ বুঝবে না, নমুনা পাঠালে খাটি ক্রিস্টাল (crystal) খুঁজবে, না পেলে 'নাই' ব'লবে। ইং ১৯০১ সালের মার্চ মাসে পত্র লিখি। তিন চার মাস মধ্যে তালচের ও কেঁওরর পাথরের অনেক টুকরা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু একটাও চপল নয়। বাজা শ্রীরামচন্দ্র আমাব পত্র পেয়েই লিখলেন, তিনি এক ভূবিদ্যাবিৎ দ্বাৰা ময়ূরভঞ্জের কিয়দংশ পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন, কিন্তু কাজ ভাল হয় নাই, স্থগিত রাখতে হয়েছে, অবসর পেলেই আবার করাবেন। আরও লিখলেন, তাঁর এক শিলা-সংগ্রহ আছে, আমার দেখবার তরে তিনি সেটি পাঠাতে পারেন, কিন্তু দিতে পারবেন না। আমি পত্র পেয়ে আশ্বাসিত হ'লাম, শিলা-সংগ্রহ পাঠিয়ে দিতে লিখলাম। রাজা লিখলেন, 'তাই ত। খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় গেল, কেউ ব'লতে পারছে না। মোহিনীবাবু জানতে পারেন, তাঁকে লিখবেন।' মোহিনীবাবুকে লিখলাম, তিনি শিলা-সংগ্রহ দেখেন নি, পাথর-টাথর চিনেন না। তিনি অবগ্য-বিভাগের এক কর্মচারীকে পষায়না পাঠালেন, আমার যখন যে পাথর দরকাব হবে, তিনি পাঠিয়ে দিবেন। অগত্যা আমাকে একে পত্র লিখতে হ'ল, কিন্তু ছ-মাস পরে ইনি সেরথানেক ওজনের ফটকের একটা ক্রিস্টাল পাঠিয়ে দিলেন। আমি হতাশ হয়ে আক্ষেপ করো রাজাকে লিখলাম, 'রাজা, আপনার রাজ্যে কোথায় কি আছে, কেহ জানে না, চিনে না।'।

সে বৎসর বোধ হয় এপ্রিল মাসে, টি-চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা ক'বতে আসেন। কথায় বুঝলাম, বাজা একেই শিলা-সংগ্রহে নিযুক্ত করোছিলেন। এ'র লম্বা লম্বা কথা শুনে আমার শ্রদ্ধা হ'ল না। ইনি সীসার আকর, 'গেলিনা'র (Galema) ক্রিস্টাল দেখালেন, ময়ূরভঞ্জে পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস হ'ল না। রাজা মূর্খ নহেন যে এই আবিষ্কারের মূল্য বুঝতে পারেন নাই। চৌধুরী-মশায়ের ইচ্ছা আমি রাজাকে পত্র লিখি, ইনি বোগ্য লোক, একে রাখলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি অবশ্য লিখলাম না।

সে সময়ে আমি বালেশ্বরের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের নিকট হ'তে পোলাটাক ভারী-একটা কাল-পাথর

পেয়েছিলাম। তাতেও আমার ধানিক কাজ চ'লতে পারত। পত্র লিখে জানলাম রাজা বাহাদুর রাজা শ্রীরামচন্দ্রের এক আলমারিতে পেয়েছিলেন। রাজাকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছুই জানেন না। দৈবক্রমে কিছুদিন পরে দুই রাজা কটকে এসেছিলেন, একত্র ছিলেন। আমি পাখরটি নিয়ে চক্ষুবর্ণের বিবাদ-ভঙ্গন ক'রতে গেলাম। রাজা শ্রীরামচন্দ্র বলেন, তিনি সে পাখর কখনও দেখেন নি; বাঙ্গা বৈকুণ্ঠনাথ বলেন, অমুক ঘরের অমুক আলমারিতে ছিল। ধানিক ক্ষণ তর্কাতর্কির পর আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে বললাম, 'রাজা, আপনার কত শিলা হারিয়ে যাচ্ছে, আপনি দেখছেন না।' (পাখরটি) আমার ভারি ভুগিয়েছিল। বস্তুতঃ সেটা কৃত্রিম কাচ)।

রাজা গড়ে বেয়ে মসখানেক পরে আমাকে পত্র লিখলেন, তিনি 'ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্টের কাছে এক জন ভূবিজ্ঞান-প্রাঙ্গ চেয়েছিলেন, কিন্তু গবর্নমেন্ট, কাকেও দিতে পারেন না, সম্মতি কেহ উদ্বৃত্ত নাই।' প্রমথনাথ বহু-মশায় রাজার পত্র দেখে থাকবেন, এবং সরকারী কর্ম হ'তে অবসর পেয়েই ময়ূরভঞ্জ এসেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি, লোহার আকর আবিষ্কার ক'রতে তাঁকে তেমন কষ্ট ক'রতে হয় নি। পূর্বে ওড়িয়ার তিন চার রাজ্যে আকর হ'তে লোহা কাড়া হ'ত; ময়ূরভঞ্জ হ'তেও হ'ত। কোথায় হ'ত, বহু-মশায় দেখতে পান। বিলাতী লোহা এলে এদেশের লোহার নাম দেশী লোহা হয়েছিল। দেশী লোহা 'টান লোহা', এর আদর ছিল। কামাবকে কাটাবী গ'ড়তে দিলে সে দেশী লোহা দিয়ে কাটাবীর ধার ক'রত। কেউক'রের দেশী লোহার সোতারেব তার হ'ত, কটকে কিনতে পাওয়া যেত। নিজাম হান্দারাবাদের তাব উৎকৃষ্ট ছিল। অনেক কাল পর্যন্ত তালচের বাজ্যে ও বামড়া রাজ্যে দেশী লোহা পাওয়া যেত। এই বাকুড়া জেলায় লোহার নামে এক জাতি আছে। তারা জানে না, তাদের পূর্বপুরুষ দেশে লোহা যোগাত। সস্তা বিলাতী কাপড় এসে তাঁতীর অন্ন মেরেছে, সস্তা বিলাতী লোহা এসে লোহারের অন্ন মেরেছে।

ক'রতে উৎসাহী ছিলেন। আমি দুইটাব বৃত্তান্ত জানি। কিন্তু গ্রহবৈশিষ্ট্যে দুইটাই বিফল হয়েছিল। ইং ১৯০৬ সালে কটক কলেজ হ'তে কৈলাসচন্দ্র ভরতকার বি-এ পাস হ'রে জাপানে কলা শিখতে ইচ্ছুক হ'ল। আমি তাকে কলিকাতায় Industrial and Scientific Association হ'তে জাপানে শিক্ষাবোগ্য কলা, কলাশালার প্রবেশের কাল, শিখবার সুবিধা অসুবিধা জানতে পাঠালাম। উক্ত সভা ভরতকারকে জাপানে বাবার জাহাজ-ভাড়া দিতে সম্মত হ'লেন, কিন্তু জাতব্য সম্বন্ধে কিছুই ব'লতে পারলেন না। ভরতকার ময়ূরভঞ্জেব প্রজা, কিমিতি (Chemistry) বিজ্ঞান বি-এ পাস। তার বুদ্ধিগুঞ্জিও মন্দ ছিল না। আমি রাজাকে পত্র লিখলাম। তিনি জাপানে থাকবার খরচ দিতে সম্মত হ'লেন। জাপান বাবার আগে আমি ভরতকারকে বুঝিয়ে দিলাম, 'বড় কলার দিকে যাবে না, সৌধীন কলার দিকেও যাবে না, একটা ছোট লোহা-কলা শিখে আসবে। লোহার তাবের পেবেক কিনছি, তুমি লিখে এসে এই রকম পেরেক দিও।' আমার বিশ্বাস ছিল, এই নির্মাণ অল্পব্যয়ে হ'তে পাবে, রাজাও টাকা দিবেন। ভরতকার জাপানে বেয়ে লিখলে, কলাশালার প্রবেশের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, জাপানী ভাষা শিখতেও ছ-মাস লাগবে, শুধু বসো না থেকে সে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ঢুকতে চায়, সেখানে তখনও ছাত্র নিতে পারে। আমি পত্র পড়ে হতাশ হলাম, তার জাপান যাওয়া বুখা, রাজার টাকা খরচও বুখা হ'ল। ছ-বছরের পর আরও ছ-মাস থেকে ভরতকার ফিরে এল। রাজার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল জানি না। আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এল। আমার জানা ছিল, তার বিজ্ঞা কোনও কাজেই আসবে না। কথাবার্তার তাই বুঝলাম। সে চীনি ক'রতে শিখে এসেছে, রাজা কারখানা খুলতে টাকা দিতে চান না। রাজা তাকে একটা চাকরি দিতে চান, জমি নিরিখের কাজ, সে-কাজ সবাই পারে, ইত্যাদি। ময়ূরভঞ্জ আখ্যাত্যেব জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল না, কেমনে চীনি হবে? একথারও উত্তর নাই। তথাপি রাজাকে লিখলাম, ভরতকার সে-বিজ্ঞা শিখে এসেছে, সে-বিজ্ঞাব ফলভাগী হওয়া উচিত। আমি রাজার উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লাম। তিনি লিখলেন, যাব জানের

পরিচয় নাই, কর্মসামর্থ্য জানা নাই, তাকে রাজকোষ হ'তে লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত হবে না। তিনি ঠিক লিখেছেন। ভরতকার আমাকে এত টাকার কথা বলে নি। ছুংথের বিষয়, এর বছরখানেক পরে ভরতকার হঠাৎ মারা যায়।

উত্তর শুনে বুঝলাম, বোগেশের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সে মন্ত্র চায়, যে-মন্ত্র জপ ক'রলে ময়ূরভঞ্জে তাঁতী লক্ষ্মীমন্ত হ'তে পারবে। কিন্তু সে ছাড়লে না। পরদিন রবিবারে দুই বৎসরের ও অতিরিক্ত আর এক বৎসরের শিক্ষাক্রম

আর এক কাজে রাজা আমার পরামর্শ চেয়ে ছিলেন। আমি প্রকারান্তরে নিরস্ত হ'তে বোলোছিলাম, কিন্তু তিনি শুনে নি। সালঃমেনে প'ড়ছে না। এক দিন সকালবেলা দেখি, বোগেশ উপস্থিত। তার পুরা নাম অবিকল আমার নাম। বোগেশ রাজার সঙ্গে প'ড়ত, পরে রাজার এক প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছিল। পদের ওড়িয়া নাম ব'লতে হ'লে, ছামুবেরতী (সম্মুখ ব্যবহৃত)। 'কেন এসেছ?' 'রাজা তাঁতীশালা খুলবেন, সেখানে কি শেখানা উচিত, ক মাসে শেখাতে পারা যাবে, ইত্যাদি জানতে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।' আমি অবস্থা বুঝলাম। 'রাজা বেশ লোকের কাছে পাঠিয়েছেন! আমি তাঁত-ট'াত জানি না। চিঠি লিখলে এত কষ্ট করে আসতে হ'ত না।'।

বোগেশ এত স্পষ্ট কথা মানলে না। প্রত্যহ আসতে লাগল, মনে ক'রলে আমার অবসর হ'লে আমি শিক্ষাক্রম লিখে দিব। এক দিন শনিবার, সন্ধ্যার পর আসতে ব'ললাম।

নিকটে মধুসূদন রাও-মশায়ের বাসায় ছিল, সন্ধ্যার পর এল। আমি ব'ললাম, 'দেখ বোগেশ, আমার বিশ্বাস, মন্ত্রগাটি রাজার নয়, তোমার। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, বল, ময়ূরভঞ্জে কত তাঁতী আছে? তারা কি কাপড়, কত রকমের কাপড় বুনে? কাট'তি কেমন? ছুংথ কিসের? ওড়িয়ায় এমন তাঁতী আছে, যাদের পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছা হয়। তুমি তাদিকে কি শেখাবে?'।



স্বর্গীয় মহারাজা শ্রী রামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুর

লিখে দিলাম। লিখন পতন গণন চিত্র-লিখন বয়ন-বিদ্যা বয়ন-কলা প্রথম দুই বৎসর। পরে যে ইচ্ছা ক'রবে, সূতা রন্ধাতে শিখবে। ওড়িয়ায় তাঁতী নিজে সূতা রন্ধাতে। মাস দুই পরে রাজার সঙ্গে দেখা হ'ল। কটক রেল-স্টেশনের কাছে। এক রাজপুরুষের আগমনে সম্মান দেখাতে যেতে হয়েছিল, রাজাও এসেছিলেন। পথে দেখা, দুই এক কথা

হ'তে পেরেছিল। তিনি বললেন, আমি তাঁতীকে দু-তিন বছর শেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কলিকাতা হ'তে তিনি জেনেছেন, ছ-মাস যথেষ্ট। আমি এই আশঙ্কা করো-ছিলাম। বললাম, 'রাজা আমি জানতাম না, আপনি কল-তাঁতী চান। আমি মানুষ-তাঁতী চিন্তা করোছি। কল-তাঁতী অনেক আছে। আপনার তাঁতীশালা চ'লবে না।'

পরে শুনেছিলাম, রাজার তাঁতীশালা উঠে গেছে। কতকগুলি টাকা অকারণে জলে পড়োছে। সে টাকায়

ঠক-ঠক তাঁত গড়িয়ে গ্রামে বিলিয়ে দিলে উপকার হ'ত। এক-শ টাকায় দশটা তাঁত হ'ত।

রাজার সঙ্গে আমার শেষ আলাপ এই।

রাজার ইচ্ছা ছিল, তিনি একটি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ খুলবেন। কৃষি, রাজ্যের প্রধান সম্পদ। কিন্তু আবহ-জ্ঞান বাতিরেকে অসম্ভব। পাবত ও জাঙ্গল দেশে কৃষি একমাত্র ভরসা হ'তে পারে না। দেশী কলা রক্ষার ও উন্নতির চেষ্টা না ক'রলে প্রজা-পরিপালন হ'তে পারবে না।

দেশের দুর্ভাগ্য, তিনি অকালে (ইং ১৯১২ সালে) এক-চল্লিশ বৎসর বয়সে চলো গেলেন।

আড়িয়লের কাগজ

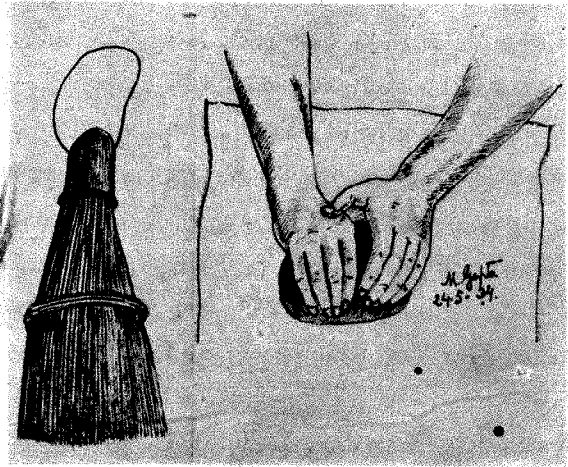
শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার কয়েকটি গ্রামে এক সময় প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত এবং বহু পরিবার ইহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিত। বড় বড় কারখানা হইতে বহু পরিমাণে নানাদ্রব্য আমদানী হওয়াতে যেমন অনেক কুটীরশিল্প বিনষ্ট হইয়াছে এই কুটীরশিল্পও তেমনি বালি, ত্রিরাশিপুর, টিটাগড়, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি মিলের কাগজের প্রচলন হওয়াতে বিনষ্ট হইয়াছে। পুঁথি, দোকানের হিসাবের খাতা, জমিদারী সেরেস্তার দলিল প্রভৃতির কাগজ পূর্বে হাতে তৈয়ারী হইত।

বর্তমান যুগ কলকারখানা ও প্রচুর উৎপাদনের যুগ হইলেও, বিবিধ কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবনেরও কথা শোনা যায়। মিলে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হইলেও খদ্দেরের প্রচলন হইতেছে। সেই 'রকম হাতে-তৈয়ারী কাগজের প্রচলন হইবে না কেন? অবশ্য এ-ব্যবসাকে আজকালকার দিনে পূর্নাবস্থায় ফিরাইয়া আনা একেবারে অসম্ভব; তবে আমার বিশ্বাস খুব অল্প আয়াসেই এ-কাগজের উন্নতি-বিধান এবং প্রচলন করা যাইতে পারে।

আড়িয়ল, ধাইরপাড়া, ছলিহাটা, কুরমিরা, নাগেরপাড়া,

দীঘিরপাড়া এই কয় গ্রামে কাগজের ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি এই কয় গ্রামের ভিতর আড়িয়ল বড় গ্রাম বলিয়া এখানকার



কালাহি

কাগজ পালিশ করা

কাগজ 'আড়িয়লের কাগজ' বলিয়াই পরিচিত। এক সময় ৭৫০টি পরিবার এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল; প্রত্যেক বাড়িতেই কাগজ তৈয়ারী হইত। ইহারা সকলেই

মুসলমান। এখন যদিও ইহাদের বংশানুক্রমিক ব্যবসা নাই, তবুও ইহার সাধারণের কাছে কাগজী বলিয়াই পরিচিত। বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে এই ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল ছিল। তার পর হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং সকলে অল্প ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাগজীরা এখন দপ্তরী, দরজী, দোকানদার, নোকার মাঝি, চাষী হইয়া জীবিকানির্ভাহ করিতেছে। লোহজঙ্গ, তালতলা বন্দরে এবং এতদঞ্চলে যে-সব নোকার মাঝি দেখা যায়, তাহাদের ভিতর অনেকেই কাগজী।

এখনও কাগজীদের অনেকের বাড়িতেই দেখা যায় কাগজ-নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। হাতে-তৈয়ারী কাগজের চাহিদা বাড়িলেই বহু পরিবার আবার পৈতৃক ব্যবসায় শুরু করিতে পারে। ধাইরপাড়া গ্রামের ৭৫০ পরিবারের জায়গায় এখন মাত্র একটি পরিবারের দু-তিন সরিক তাহাদের পৈতৃক ব্যবসা কোনও রকমে টিকাইয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রজ্জবালী কাগজী বড় কারিগর। তাহাদের দু-তিন সরিক নাকি এখন বৎসরে ৬০০ টাকার মত কাগজ বিক্রী করিয়া থাকে। ঢাকার কয়েকটি মনোহারী দোকানে ইহাদের কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। বাহিরে সামান্য কিছু চালান যায়। ফাল্গুন মাসে চাঁদপুর, ভৈরব, কুমিল্লা অঞ্চলের দোকানে দোকানে বিক্রী করার জন্য লাল খেরের বাঁধা হিসাবের খাতা চালান যায়; সঙ্গে কিছু আড়িয়লের কাগজও যায়। কাগজীরা পূর্বে তাহাদের নিজেদের তৈয়ারী কাগজেই এসব খাতা তৈয়ার করিত, এখন মিলের কাগজ ব্যবহার করিতেছে।

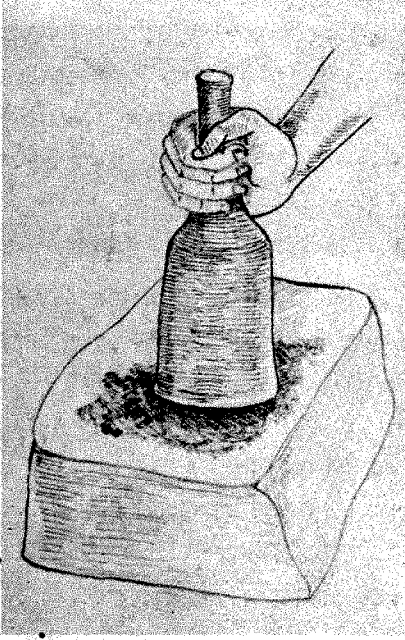
রজ্জবালী বলিল, সে নাকি তাহার বাপদাদার যুগে শুনিয়াছে বহুপূর্বে যখন মিলের কাগজের আমদানি হয় নাই তখন মীরকাদিমের এক হাটেই নাকি ১৫০০ টাকার উপর কাগজ বিক্রী হইত। ঢাকার সংখ্যাটা বোধ



কাগজী

হয় একটু আশ্চর্য্য রকম ঠেকিবে। কিন্তু খুব কম করিয়া প্রতি পরিবারে তিন জন করিয়া লোক ধরিলে ৭৫০ পরিবারে দুই হাজারের উপর লোক কাগজ নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল এবং সম্ভাহে দেড় হাজার টাকার কাগজ উৎপাদন করিত—ইহা অতীত বলিয়া মনে হয় না। মীরকাদিমের হাট হইতে বাহিরেও কাগজ চালান যাইত।

বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, শেষরাত্রি হইতেই কাগজীপাড়ায় ঢেঁকিতে কাগজের উপকরণ কুটিবার আওয়াজ পাওয়া যাইত। দু-তিন মাইল দূরের গ্রামের



পাট চূর্ণ করা

লোকেরাও ঢেঁকির শব্দ শুনিতে পাইত। সেই ঢেঁকি আজ একেবারে নীরব!

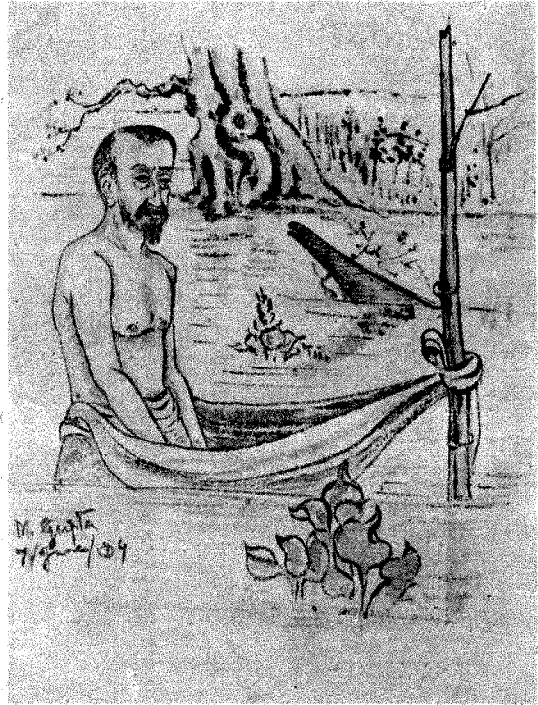
বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভঙ্গের সময় আড়িয়লের কাগজর কিছু চাহিদা হইয়াছিল; প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি পরিবার তখন কাগজ প্রস্তুত করিত।

কাগজপ্রস্তুতপ্রণালী

কাগজ-প্রস্তুতের প্রণালী খুবই সহজ; সাজসরঞ্জাম বিশেষ কিছুই নাই। কাগজ ও পাটের মণ্ড হইতে এই কাগজ প্রস্তুত হয়। এক মণ কাগজের সঙ্গে পাঁচ সের পাট মিশাইতে হয়। দপ্তরীদের দোকানে কাটা টুকরা কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। এগুলি খাতার চাঁট কাগজ। ছাপা কাগজেও কাজ চলিতে পার, কিন্তু তাহার মণ্ডে কাগজের রং পরিষ্কার হইবে না। এই কাগজ জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা হয়, কাগজ যাহাতে সহজে

গলে সেজন্ত কিছু সোড়া মিশাইতে হয়। এক দিন ভিজাইয়া রাখিলেই কাজ চলে।

পাট রাখিতে হয় চূর্ণের জলে ভিজাইয়া। যে-কোন পাটে কাজ চলে না; মিহি ও মোলায়েম পাটের প্রয়োজন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ক্ষেত হইতে কিছু কিছু পাট তুলিয়া ফেলা হয়; এ-সব ছোট ছোট পাটকে বাছ-পাটি বলে। আজকাল বখেট পরিমাণ কাগজ পাওয়া যায় বলিয়া কাগজ ও পাট দুই-ই মণ্ডপ্রস্তুতকার্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে শুধু পাট দিয়াই মণ্ড প্রস্তুত হইত। সেজন্ত



কাগজের মাড় ধুইয়া ফেলা হইতেছে

এখনকার কাগজ দেখিতে আগেকার অপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু আগেকার কাগজ বেশী শক্ত ছিল। পূর্বে যে পাট ব্যবহার করা হইত তাহাকে বলে মেছট পাট (পশ্চিম-বঙ্গ—মেছতা)। এ-অঞ্চলে মেছট পাটের চাষ ছিল না। চাঁদপুর ও করিমপুরে ইহার চাষ হইত। লৌহজঙ্গে এ-পাট কিনিতে পাওয়া যাইত। সাধারণ পাট হইতে মেছট পাট ভিন্ন। এ-পাটের বীজ কল ইয়ের মত বড়, ফুল হয় দেখিতে কতকটা ঢেঁড়স ফুলের মত।

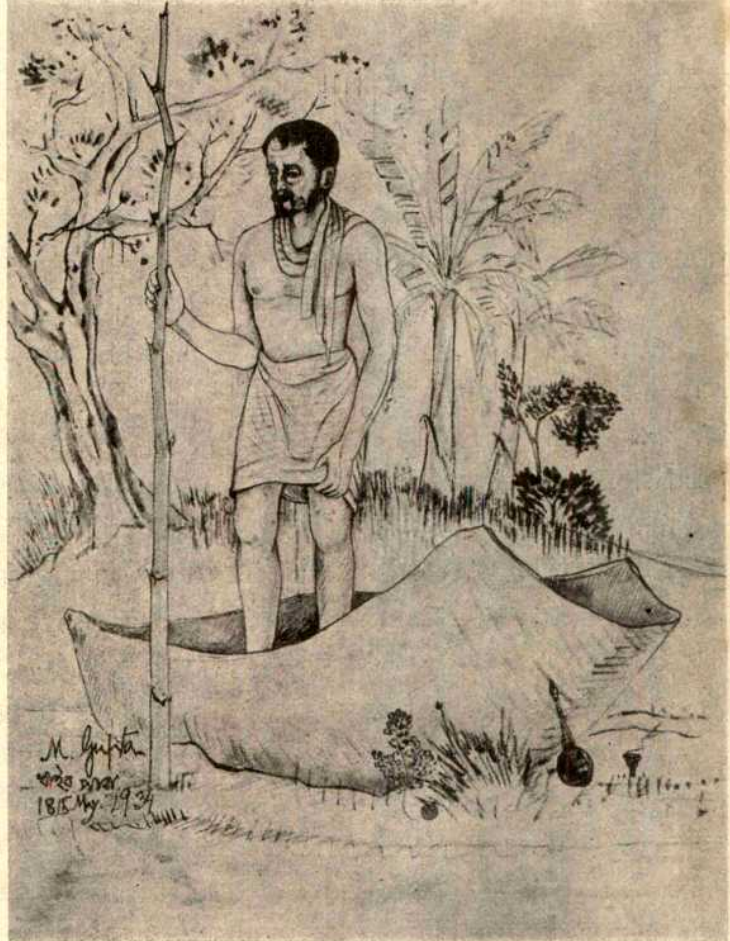
চূণের জলে পাট ভিজাইলে এর রং হলদে হইয়া যায়। খুঁটিয়া দিলে, মণ্ড জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এক রিম এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। এর কাগজ তৈয়ার করা যায় এ-পরিমাণ মণ্ড একটি জালার পর শুকনা পাট ঢেঁকিতে গুঁড়া করা হয়। এই ভিতর ধরে।

ঢেঁকি লম্বায় হাত-দশেক; ইহার মূলে লোহা পরান পুর্বে যে-সব কাজের কথা বলিয়াছি তাহা কেবল থাকে। কাগজীরা এই মূলকে ধরতম বলে। এই ঢেঁকি খুব ভারী; ইহাতে পাড় দিবার জন্ত তিন-চার জন লোকের প্রয়োজন হয়।

এখন প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয় না বলিয়া ঢেঁকির ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। এখন বড় একখণ্ড পাথরের উপর শুধু এই লোহারারা পাট ছেঁচা হয়। ইহার পর গুঁড়া পাট জলে-পচান কাগজের সঙ্গে মিশাইয়া পা দিয়া ভাল করিয়া চটকাইতে হয়। কিছু ক্ষণ এই জিনিষটাকে ভাল করিয়া পা দিয়া মাড়াইলে কাদা বা মাখা-ময়দার মত একটা জিনিষে পরিণত হইবে। এই হইল কাগজের মণ্ড—ইংরেজীতে ইহাকে বলে 'পেপার পাল্প'। নূতন কাপড়ের মত কাগজে মাড় লাগা থাকে। জলে ধুইয়া এই মাড় দূর করার প্রয়োজন। কাপড়ের এক অংশ কাগজীর কোমরে বাঁধা থাকে; অপর অংশ জলের ভিতরে পোতা একটি বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধিতে হয়, তাহার পর দুই হাতে জলের ভিতরে জিনিষটাকে ভাল করিয়া কচলাইতে

হইবে। এইরূপে কাগজের মাড় জলে ধুইয়া যাইবে। এবার এই জলে-ধোওয়া কাগজের মণ্ডকে জনপূর্ণ বড় একটা জালার ভিতরে রাখা হয়। খুব বড় জালা মাটির ভিতর পোতা থাকে; জালার উপরের অংশ কাটা থাকে। এখনও কাগজীদের বাড়িতে যে-সব জালা মাটিতে পোতা দেখা যায় সে সবই তাহাদের পূর্বপুরুষদের আমলের।

বাঁশের একটা কক্ষি দিয়া জালার ভিতরের জলটাকে



পচান-কাগজ মাড়াই হইতেছে

শারীরিক পরিশ্রমসাপেক্ষ। এইবার বাহা করিতে হইবে তাহাতে কাজে অভ্যাস ও কৌশলের প্রয়োজন। জালার ভিতর চালুনী (কাগজীদের ভাষায় ছাব্রি) ডুবাইয়া তুলিতে হয়। চালুনীর ফাঁক দিয়া জল ঝরিয়া পড়ে এবং মণ্ডের একটা স্তর চালুনীর উপর পাতলা সরে মত পড়িয়া যায়। এই হইল কাগজ। মণ্ডের স্তর সমানভাবে ফেলা কঠিন। চালুনীটা দেখিতে ছোট একটা চীকের স্তর; ইহা 'গুটান

যায়। বাহাতে টান হইয়া থাকে, সেজন্য সেটাকে রাখা হয় বাঁশের চাঁচারির মাচার উপর। এই চাঁচারির মাচাকে কাগজীরা খাপাহি বলে। চালুনির দুই পাশে যেখানে হাত থাকে, সেখানে দুটি আলাগা মোড়া (যে গাছ হইতে পাটী তৈয়ারী হয়) থাকে; কাগজ চালুনী হইতে তুলিবার সময় মোড়া দুটি খুলিতে হয়; পরে জালার ভিতর চালুনী ডুবাইবার সময় আবার লাগাইতে হয়।

চালুনী হইতে তুলিয়া কাগজ একটার উপর আর একটা রাখা হয়। কাগজের স্তূপের নিকট মাটির ভিতর একটা হাড়ী রাখা হয়, কাগজের স্তর হইতে জল চুইয়া গিয়া হাড়ীর ভিতর পড়ে। অনেক কাগজ জমা হইলে, তার উপর কলাপাতা এবং তক্তা রাখিয়া জন দুই লোক চাপিয়া বসে—ভিতরে যেটুকু জল আছে, সেটুকু ঝরিয়া পড়ে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রত্যেকটি কাগজ আলাদা আলাদা থাকে, গায়ে লাগিয়া যায় না। এবার টিনের উপরে মেলিয়া দিয়া কাগজ রোদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। টিনের উপর একটা ছোট কাঁটা (কাগজীদের ভাষায় ‘ফালাহি’) দিয়া কাগজটাকে সমান করিয়া ফেলিতে হয়। রোজ না পাইলে কাগজ প্রস্তুত করা চলে না, সেজন্য বর্ষাকালে আষাঢ় হইতে আশ্বিন এই চারি মাস কাগজ প্রস্তুত করা বন্ধ থাকে।

শুকান হইলে কাগজের চারিপাশ ছুরি দ্বারা সমান করিয়া কাটা হয়। আতপ চাউলের গুঁড়া দ্বারা মাড় প্রস্তুত করিয়া নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা কাগজের উপরে প্রলেপ দেওয়া হয়। এই মাড় দেওয়ার নাম হইল “কলপ” (সাইজিং) দেওয়া। কলপ না দিলে লিখিবার সময় কাগজে কালি চুপসিয়া যায়।

কলপ দেওয়া হইলে কাগজের দুই পিঠ পাথর দিয়া ঘষিয়া পালিশ করা হয়। পালিশের পর কাগজ প্রস্তুত শেষ হইল। হন্দে রঙের যে-কাগজ দেখা যায় তা শাদা কাগজে নারিকেলের ছোবড়ায় পিউরি রং লাগাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই রং প্রস্তুত করিতে পিউরির সহিত তেঁতুল-বিচির আঠা মিশাইতে হয়। স্থানীয় লোকেরা এই হন্দে কাগজকে তুলট কাগজ বলে এবং হন্দে রং লাগানকে তুলট করা বলে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা অনেক সময় শাদা কাগজ

কিনিয়া বাড়িতে নিজেরাই তুলট করিয়া লইতেন এবং বাঁশের কলমে লিখিতেন। অভিধানে “তুলট” শব্দের অর্থ যে-কাগজ তুলা হইতে প্রস্তুত করা হয়। এখানে কাগজ প্রস্তুত করিতে কখনও তুলা বা ত্রাকড়ার প্রচলন ছিল না।* পাট দিয়াই কাজ চলিতেছে।

কাগজ-প্রস্তুতের সমস্ত প্রক্রিয়াই ঘরের বাহিরে উঠানে গাছতলায় হয়, সেজন্য মণ্ডের ভিতর খুলা বালি খড় অনেক ময়লা উড়িয়া আসে, ঘরের ভিতরে করিতে পারিলে কাগজ আরও ভাল হইতে পারে।

পাঁচ জন এক দিনে এক রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে। আলোর আড়ালে ধরিলে কাগজে যে শাদা লাইন বা লেখা দেখা যায় তাহাও ইহার কারণেই। ইচ্ছা করিলে, সকলেই তাঁহাদের ট্রেডমার্ক এবং কোম্পানীর নাম কাগজে লিখাইয়া লইতে পারেন।

সাধারণতঃ বাজার-চলতি কাগজ ৪ রিম বা দুই হাজার তা কাগজ ইহারি রিম-প্রতি দুই টাকা হিসাবে ৮ টাকায় বিক্রী করে। ঢাকায় এ-কাগজ ৭০ আনা দিতা হিসাবে বিক্রী হয়। চার রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগে ১ মণ দপ্তরীর ছাঁট কাগজ, মূল্য ২৭ টাকা, পাট পাচ সের মূল্য ১৭০, সোডা ও চূণ ১৭০, মোট ৩৭ টাকা খরচ। ইহা হইল কেবল কাঁচা মালের দাম। মজুরী ধরিলে মোট খরচ আরও বেশী পড়বে। খরচ বাদ দিয়া কাগজীদের লাভ খুব বেশী থাকে না। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমাইতে হইয়াছে।

শিল্পীদের অনেক সময় চীনা, জাপানী ও নেপালী হাতে-তৈয়ারী কাগজে (হাওমেড্ পেপারে) ছবি আঁকিতে হয়; এ-সব কাগজ সহজলভ্য নয়। কিন্তু আমাদের ঘরের পাশেই বহুকাল হইতে উত্তম কাগজ তৈয়ার হইতেছে—শিল্পীরা তাহার খোঁজ রাখেন না। এই ধরণের কাগজেই একদিন মোগল বা কাংড়া চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—তখন কাগজ বিদেশ হইতে আসে নাই। এ-কাগজে ছবি আঁকিতে আরাম আছে, রং চমৎকার লাগে, অত্যন্ত সুবিধাও আছে, বাহা অল্প কাগজে পাওয়া যায় না।

* ত্রাকড়া হইতে প্রস্তুত কাগজ (rag-made paper) উৎকৃষ্ট। অন্ততঃ তুলা ও ত্রাকড়ার ব্যবহার ছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

জীবিকা

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কালুর বাবা মাধব দাস দিনমজুরী কবির জীবিকা অর্জন করিত। লোকে তাহাকে ভাড়া লইত দিনহিসাবে। মফস্বলে ঘণ্টা ধরিয়া সময়ের হিসাব নাই। ঘড়ি ক'জনেই বা রাখে! দিন যাহার আদি-অন্তহীন কীর্ষি সময়ের হিসাব করিতে মফস্বলের লোক কাজে লাগায় তাহাকেই। এই নিয়ম স্থির করা আছে। পূব দিকের গাছপালার মাঝামাঝি স্থান উঠিয়া আসিলে মজুর কাজে লাগিবে, আর পশ্চিমের গাছগুলির আড়ালে গেলে পাইবে ছুটি। ঘড়ির কাঁটা নয়, তরুছায়ার আবর্তন, পশ্চিম হইতে পূবে। মাঝখানে ছপুববেলা খাওয়ার জন্য কিছু ক্ষণের ছুটি। তা ছাড়া, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মজুর যদি পাঁচ মিনিট গাছের ছায়ায় বসিয়া তাহার কালো কলিকাটিতে তামাক টানিতে চায়, কাবও কিছু বলিবার নাই। একথা কে না জানে যে, মানুষ যন্ত্র নয়, মাঝে মাঝে সখ্য দম টানার আরাম না পাইলে মানুষ খাটিতে পারে না? মাধব কিন্তু চালাকি করিয়া খাওয়ার ছুটি ও তামাক টানার বিবাম ছাড়াও সুযোগমত ফাঁকি দিয়া আলস্য ভোগ করিয়া লইত। হয়ত সে বৈশাখী দ্বিপ্রহর। বর ছাইতে ছাইতে চালার উপরেই দারুণ বোঝে পিঠ দিয়া খানিকক্ষণ হাত পা শিথিল করিয়া বসিয়া থাকিতে সে আরাম বোধ করিত কিনা সেই জানে, কিছু কিছু ফাঁকি না দিলে তাহার চলিত না। কাজেব শেষে মজুরীরও শেষ। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া যদি ছুটি দিনও বরে বসিয়া থাকিতে হয়, দিনমজুরের সে অপূর্ণীয় ক্ষতি। মাধবের কাজ ছিল রকমারি। সে বর ছাইত, বেড়া বাঁধিত, কাঠ চেলাইত এবং এসনি আরও অনেক কিছু করিত। অল্প বয়সে কালুও এই-সব কাজ শিখিতেছিল। কিন্তু হারাণের ছেলে মধুর পাল্লায় পড়িয়া শেষ পর্যন্ত তাহাব জীবিকা অর্জনের পথটা দাঁড়াইয়া গেল অন্য প্রকার। হারাণ কুয়া খুঁড়িত আর হারানো জিনিষের সন্ধানে ডুব দিত বিশ হাত জলের তলে। সে-

কায়মসলুর বয়স ছিল কম, পেটভরা ছিল প্লীহা আর মাথাভরা বোকামি। মধুর সঙ্গে সে হারাণের জলে ডুববার প্রক্রিয়া দেখিতে বাইত। হারাণ জলের তলে অদৃশ্য হইয়া গেলে ছোট ছোট চোখ দুটি প্রাণপণে মেলিয়া মুখটা ই। করিয়া চেউতোলা জলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। কারও বারণ না মানিয়া এমন ভাবে কুয়ার মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িত যে এক দিন বিপদ না ঘটাই পাবে নাই। সাতাব কালু সেই বয়সেই মন্দ জানিত না। কিন্তু কুড়ি বাইশ হাত নীচে জলের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বোধ হয় পেটের প্লীহাতেই আঘাত লাগিয়া সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। হারাণ নীচে না থাকিলে সে-দিন সে আর বাঁচিত না। শুধু হারাণের জলেডোবা দেখিতে নয়, কাছে হোক দূরে হোক সে কুপ-খনন আরম্ভ করিলে প্রতিদিন সেখানে হাজিরা না দিলে কালুর চলিত না। হারাণ ও তাহার সঙ্গীরা কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া তুলিত, কালু কোতুলেব সঙ্গে চাহিয়া দেখিত। গর্তটি কিছু গভীর হইলে ভিতরে নামিবার জন্য তাহার মন ছটফট করিত। কিন্তু অতটুকু ছেলের ব্যাকুলতা কেহ বুঝিত না, নীচে তাহাকে কেহ নামিতেও দিত না। একফাঁকে সকলের চোখ এড়াইয়া নামিয়া গেলেও পাতালেব সেই কাম্য স্বর্গে কয়েক মুহূর্তের বেশী সে থাকিতে পাইত না, তাড়া খাইয়া উপরে উঠিয়া আসিতে হইত। কালুর কান্না আসিত। তার পর বয়স বাড়িবার সঙ্গে বৃকে কিছু সাহসের সঞ্চার হইলে জ্যোৎস্নারাজ্যে একা সে বাহির হইয়া বাইত গ্রামান্তরে অর্দ্ধসমাপ্ত ইদারার উদ্দেশে। জ্যোৎস্নালোকে ইদারার ধারে দাঁড়াইয়া সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। খানিক তফাতে মাটির স্তূপ, ইদারার মধ্যে রহস্যঘন গভীর অন্ধকার, আর এই মনোহর স্বর্গ ও পাতালেব কাছে একা সে উদ্গ্রীব বালক। যত ক্ষণ খুশী খেলা করুক, কেহ বারণ করিতে আসিবে না। কিন্তু খেলায় কালুর মন ছিল না, সে চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিত। কয়েক হাত গর্ত কাটিয়া চারি দিকে গোল কবিয়া ইটের গাঁথনি তোলা হইয়াছে। ভিতরের মাটি কাটিয়া তোলাব সঙ্গে সঙ্গে এই গাঁথনি নীচে নামিতে থাকিলে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া উপর হইতে গাঁথিয়া চলা হয়। ইঁদারা-সৃষ্টির এসময় কলকৌশল কিছুই কালুর অজানা নয়। দ্রোণাচার্যের অন্ত্যজ্ঞ শিষ্যের মত কেবল অথগু নিবিড় পর্যবেক্ষণের দ্বারা সে সব শিথিয়া ফেলিয়াছে। সাবধানে সে ইঁদারাব মধ্যে নামিয়া বাইত। তলার ভিজ্ঞা নরম, মাটিতে পা দিয়া শিহরিয়া উঠিত। পিপাসু ক্ষুধার্ত কীটের মত মুক্তিকার এই ক্ষতের মধ্যে সে বোধ কবিত অপরিমেব উল্লাস। মাংসের মত কোমল মুক্তিকার দুই হাতেব দশটা আঙুল ঢুকাইয়া দিয়া সে ধাবলা ধাবলা মাটি তুলিয়া ফেলিত। তাব পব আঙুল ব্যথা ববিতে থাকিলে ইটের আবেষ্টনীতে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া সে দেখিত স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখিত এমনি একটি বিষয়কর সৃষ্টির অবাধ অধিকারের।

কালুব এ-স্বপ্ন হয়ত সকল হইত না। হয়ত সে মাথবের মতই ঘরের চালে ধানের ক্ষেতে দিনমজুরী করিয়া মরিত। কিন্তু হারাণ মরিয়া গেলে মধু তাহাকে বাপের ব্যবসারে নিজের সঙ্গী কবিয়া লইল। এত দিনে কালুর স্বপ্ন দেখিবাব অভ্যাস বদ্ধ হইয়াছে। পেটে আর তাহার প্রাণ নাই, মাথাব জমজমাট বোকামিও সাফ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার আদিকালের সেই সৃষ্টির প্রেরণা আজও হইয়া আছে অক্ষয়। সকালে পূব নিকের গাছের ডগা পর্যন্ত স্বর্ধ্যা উঠিলে সে কোদাল তুলিয়া লয়। চকচকে ফলাটা বাব-বার মাথার উপর হইতে নামিয়া আঁসিয়া মাটিতে আমূল প্রোথিত হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে পাশেব ঝুড়িটি ভরিয়া ওঠে। পিঠ বহিয়া বুক বহিয়া দরদর করিয়া ঘাস ঝরিতে থাকে হাতেব ও বুকের মাংসপেশীগুলি এক সময় ব্যথা বরিভে থাকে, কোমর ধরিয়া যায়। স্বর্ধ্যা উঠিয়া আসে আকাশের মাথখানে।

মধু বলে, 'ভামুক খা কালু, একটানা কাঁহাতক চালাবি?'

অন্ত এক জন বলে, 'তোর যন্তনায় কাজ করা ভার বাপু, তোকে দেখিয়ে বাবু মোদের আলসে কব।'

কালু সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া কোমরের টনটনানিতে মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'বাবুকে ছ-কোপ কোদাল চালাতে বলিস, ভিস্মি বাবে'খন।'

মাটিব স্তব-বিভাগেব বৈচিত্র্যে কালু অবাক হইয়া যায়। এঁটেল মাটি, বালি মাটি, ধূসব পাটল কালো রঙেব মাটি, কত রকমের মাটিই যে পব-পব থাকে-থাকে সাজানো আছে! পৃথিবী যেন তাহাব সহিত তামাশা করিতে ভালবাসে। কোদাল বসে না এমনি শক্ত কাঁকব-মেশানো মাটিতে খুঁড়িতে আবস্ত কবিয়া পাঁচ-ছব হাত নীচে হয়ত বালি-মেশানো আলগা বুরবুরে মাটির দেখা মেলে, আরও খানিকটা খুঁড়িয়া পুনরায় শক্ত মাটি পাওয়া না গেলে সেখানে কূপ-খননই বদ্ধ কবিয়া দিতে হব। মাটির বর্ণ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য ছাড়া আরও অজস্র বিষয় কালুর জ্ঞান মাটির তলে সঞ্চিত হইবা থাকে। পনর হাত খুঁড়িয়া গাছের শিকড়ের দেখা পাইয়া কোঁতুহলভরে উপবে উঠিয়া সে চারি দিকে তাকায়। চারি পাশের গাছগুলির মধ্যে যে রসিক তরুটি রসদের সন্ধানে এত নীচে শিকড় পাঠাইয়াছে, সেটিকে বাছিয়া লইবার চেষ্টা করে। কোনদিন অসেক নীচে মাটির হাড়ি-কলসীর ভাঙা টুকুরা দেখিতে পায়, কোনদিন তাহার কোদালের ফলার উঠিয়া আসে মাহুষের হাতে তৈবি ইট, মাহুষেব ব্যবহৃত লোহার জিনিষের মরিচা! কালু আশা কবে এক দিন এমনিভাবে সে গুপ্ত ধনেব সন্ধান পাইবে। টাকা ও মোহর ভরা কলসীর গায়ে কোদাল ঠেকিয়া টং করিয়া একটি শব্দ হইবে। সে সাঙ্কেতিক আওয়াজ সে চিনিতে পারিবে চোখের পলকে। বৃষ্টিতে পারিবে, কলসীটি একক নয়, সে আর ছ'টি কলসীব নকিব কোদালের ঘা খাইয়া সাড়া দিয়াছে। সাত কলসী মোহর। মাটির বুকে গোপন-করা যত গুপ্ত ধনেব রূপকথা কালু শুনিয়াছে, সব সাত কলসী মোহরের, সোনার চকচকে মোহর, সাত কলসীর এক কলসী কম নয়। এত মোহর দিয়া সে কি কবিবে কালু তাহা জানে না। কল্পনায় ধনী হইতেও সে একান্ত অক্ষম। দশ-বিশ টাকাব ব্যবহাব সে জানে, তাব বেশী নয়। তবু,

পাইতে দোষ কি? সবগুলি মোহর সে তো একসঙ্গে খরচ করিবে না, একটি বাহিরে রাখিয়া সবগুলি পুঁতিয়া ফেলিবে ঘরের মেঝেতে। কর্ণেলবাজারে রাজীব পোন্ধাবেব কাছে মোহরটি ভাড়াইয়া সে-টাকা বত দিন না খরচ হইতেছে আর একটি মোহর বাহির করিবে কে? সুতরাং সাত কলসী মোহর পাইয়াও কালু অনারাসে তাহার ধারণক্ষম চরম উল্লাস বোধ করিতে পারে, দশ-বিশ টাকার অসীম সুখ, যে টাকার একটিও জমানোর দরকার নাই। কিন্তু লাভের কল্পনায় অনাবিল আনন্দ সে ভোগ করিতে পারে না। আবাম নয়, বিলাসিতা নয়, বশ ও প্রতিপত্তি নয়, যে-মাত্র সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া শুধু জীবিকা অর্জন করে, তার দিবাসরাত্রে ভিড় করিয়া আসে রাজির দুঃস্বপ্ন। সকলে জানিয়া ফেলিয়া যদি ভাগ চায়! যার জমি সে যদি সব মোহর দাবি করিয়া বসে! পুলিশ যদি কাড়িয়া নেয়! কালুব বুক যেন তবে ফাটিয়া বাইবে! তাব চেয়ে গুপ্ত ধনের সন্ধান না পাওয়াই যেন ভাল।

মোহরের কলসী নয়, কালু একবার একটা ঘটি পাইয়াছিল। তখন খাওয়ার ছুটির সময় হইয়া আসিয়াছে। বৈশাখের ঝলসানো আকাশ হইতে দিগন্তব্যাপী নিরেট আশ্বনের হলকার মত নামিয়া আসিতেছে রৌব। খানিক আগে কালুর তৃষ্ণা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, এখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। কড়া রোদে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ঘামিবার পর কড়া তাড়ির নেশার মত, শীতের দিনে উষ্ণ জলে ডুব দিবার মত, যে অবশ শিথিল শিহরণ থাকিয়া থাকিয়া সর্বদা বহিয়া যায়, কালু তাহা প্রায় উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময় কোদালের কলায় উঠিয়া আসিল কালো একটি ঘটি। ঘাসে কালুর দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল। কনুই পর্যন্ত হাত মাটি-ভরা, কাঁধের নীচে বাহুমূলে চোখ মুছিয়া কালু অবাক হইয়া ঘটিটার দিকে চাহিয়া রহিল। টাকা আছে? না মোহর?

আলগা মাটিতে ঘটিটা সে শুঁজিয়া দিল। এখান হইতে বাড়ি তাহার প্রায় তিন মাইল তফাতে, ভাত খাইতে সে বাড়ি যায় না। যিনি কুয়া কাটাইতেছেন মজুরী ছ-আনা কমাইয়া এক বেলা ভাতের ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিয়াছেন। কোদাল রাখিয়া উপর হইতে গামছাটা আনিয়া ঘটিটা

কালু গামছায় জড়াইয়া লইল। তার পর স্নান করিতে গেল পুকুরে।

মধু বলিল, 'বাম না মরলে জলে নেমো না কালু-দা, সর্দি-গর্দি হয়ে মরবে।'

কালু বলিল, 'ঘাটে বসব।'

'চল, আমিও বাই-এ'—বলিয়া মধু তাহার সঙ্গ নিল।

পুকুরেব ধারে তেঁতুলগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহার বিশ্রাম করিতে লাগিল। কালু কথা বলে না, উসখুস করে। মধু কি সন্দেহ করিয়াছে?

হঠাৎ মধু বলিল, 'গামছায় কি কালু-দা?'

'তোরা মাথা।' বাগের ভানে ভয় চাপা দিয়া কালু পুকুরে নামিয়া গেল, ঘাম মবিবার জন্য আর অপেক্ষা করিল না। 'সাতরাইরা ঘাটে গিয়া ঘাটের পাশে পাকের মধ্যে তখনকার মত ঘটিটা সে শুঁজিয়া বাঁধিয়া দিল।

খাওয়ার সময় সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল। ঘাটের পাশে ঘটিটা বাঁধিয়া আসিয়া তাহার ভয় করিতেছে। বোকা আর কাহাকে বলে। ঘাটে কত লোক স্নান করে, কত দ্রুস্ত ছেলে ঘাটের জল তোলপাড় করিয়া খেলা করে। ঘটিটা যদি কারও পায়ে ঠেকিয়া যায়?

কয়েক বার আড়চোখে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মধু বলিল, 'ভাব কি কালু-দা? থাবাপ লাগে নাকি শবীল?'

'জী? উহক। শোন দিকি মধু, কাল এক কাজ করিস, আমার বাড়ি রাস্তিরে তোর নিমস্তমো।'

দিনের কাজ সমাপ্ত হইল অপরাহ্নে, গাছের ছায়া যখন পূবে অনেক দূর আগাইয়াছে। সকলের শেষে নির্জন ঘাটে গিয়া কালু পুকুরে নামিল। ঘটিতে কিছু নাই শুধু মাটি। অর্ধেক গলিয়া গিয়াছে, বাকীটা হইয়া আছে কাঁদা।

বাড়ি ফিরিবার পথে অহুঙ্কল বৈরাগীব বিড়ির দোকানের সামনে মধু অপেক্ষা করিতেছিল। সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেরি হল যে?'

কালু বলিল, 'এমনি।'

মধু বলিল, 'হা কালু-দা, কাল নিমস্তমো কিসেব?'

'নিমস্তমো?' কালু সন্দেহ হাসিয়া উঠিল। 'তামাশা বুঝিস না মুখ্য!'

নিমন্ত্রণ অসাধারণ ব্যাপার। মধু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এবার নিশ্চিত হইয়া সেও হাসিল।

‘তামাশা? তাই বল! আমি ভাবলাম কি না কি!’

ডুবুরি কাজ পাইলে কালু বড় খুশী হয়। সর্কাসে সে ভাল করিয়া তেল মাখে। নাকে ও কানে তেল ভরিয়া দেয়। কুয়ার পাড় তিন বার স্পর্শ করিয়া কপালে হাত ঠেকাব। বিড়বিড় করিয়া কি যেন সে মন্ত্র বলে। তার পর দড়ি ধরিয়া ঝাঁজে ঝাঁজে পা দিয়া নামিয়া যায় ভিতরে। অল্পদূর নামিয়াই সে একটি জলসিক্ত নিবিড় শীতলতা অনুভব করে। ক্রমে উপরের পৃথিবীর শব্দ মুছ হইয়া আসে। কানে হাত চাপা দিলে যে গুঞ্জনিত স্তব্ধতা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই চারি দিকে থিরিয়া আসিয়া কালুকে যেন তাহার সদ্যঃপরিত্যক্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। জলে পৌছিয়া একটা ছোটখাট ডুব দিয়া সে মাথা পর্যন্ত ভিজাইয়া লয়। তারপর দড়ি ধরিয়া খানিক ক্ষণ ভাসিয়া থাকে। এই কুপখনের ইতিহাস হয়ত বেশী দিনের পুরনো নয়। তাবই ছেলেবেলায় হয়ত হারাণ ও তাহার সঙ্গীরা এই ছায়াচ্ছন্ন শ্রাওলাধরা গহ্বরটি সৃষ্টি করিয়াছিল। এমনি কত গহ্বরে সে কতবার নামিয়াছে, তবু কালুর মধ্যে অজানা জগতের একটি পরম উপভোগ্য ভয়ের উদ্ভেলনা জাগিয়া থাকে। ছায়া-অশ্বচ্ছ জলেব তলে বর্ণহীন অন্ধকারে কি বহুস্ত, কি বিভীষিকা লুকাইয়া আছে কে বলিতে পারে? সে জানে কুপের একটা তল আছে, কিন্তু তাহার সংস্কারবদ্ধ কল্পনায় কুপের গভীরতা বাস্তবতার সীমা ছাড়াইয়া পাতাল পর্যন্ত চলিয়া যায়, যেখানে বড় বড় গহ্বরে স্পর্শায়ত্ত কালো জল আবর্ত রচিয়া পাক ধাইতেছে। দড়ির নীচে পাখর বাধা থাকে। এক সময় জোরে জোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া ফুসফুসে যতখানি পারে বাতাস পুরিয়া দড়ি ধরিয়া সে তলাইয়া যায়। নিমেষে জলের আলিঙ্গন নিটোল স্পর্শ দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধবে। কুপের জল যে এত শীতল, এমন স্নিগ্ধকর, এক মুহূর্ত পূর্বে আকর্ষণ জলে ডুবিয়াও কালুর যেন সে ধারণা ছিল না। তাহাব শরীর জুড়াইয়া যায়। কে বলিল জীবিকার জন্ত? জীবনের বিরক্তি ও সন্তোষের সহবাস এড়াইতে স্বেচ্ছায় সে

এই প্রগাঢ় মধুব মমতায় নামিয়া আসিয়াছে। বালুর মনে একটি প্রশ্ন সন্তোষ দেখা দেয়। তাহার আরামের সীমা থাকে না। জলের পরিচিত ক্যাকাশে বং তাহার চোখের তারায় মাথা হইয়া বাইতে থাকে। এই ছায়ার আকাশে বালুকণাগুলি তারার মত উজ্জ্বল। কালুর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হয়, দেহের বিপরীত ভার, হাক্কা মুহু, উর্দ্ধগ। জল যেন তাহার সেই গোড়ার দিকে লাছুক নুতন বউয়ের মত তাকে সন্তর্পণে ঠেলিয়া দিতে চায়। তাব পর চারি দিক ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসে। বালুকা-তারগুলি নিশ্চয় হইয়া নিবিয়া যায়। কানে সে জলের চাপ অনুভব করিতে আরম্ভ করে। তলায় তরল পাকে পা ঠেকিলে অসংখ্য বৃহৎ চারি দিক হইতে তাহাব দেহে ঠেকিয়া ঠেকিয়া মুড়মুড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

কালু রূপকথাব দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এই তাহার বাল্য কামনার স্বর্গ।

এসব কাজে বিপদের ভয় কম নয়। ইঁদোবা-খনন অনেকটা নিবাপদ, ই.টর গাঁথনিতে চারি দিকের মাটি আটকানো থাকে। কিন্তু কাঁচা কুয়া খুঁড়িবার সময় সর্কদাই চারি দিক ধরিয়া পড়িবার আশঙ্কা। কুয়া বড় হইলে চারি দিকে তক্তা বসাইয়া আড়াআড়ি ভাবে কাঁঠের বীম দিয়া আটকাইয়া সাবধানতা অবলম্বন করা চলে, কিন্তু তাতেও বিপদের সম্ভাবনা একেবারে ঘুচিয়া যায় না। এই ব্যবস্থার খরচ আছে। যিনি কুপ খনন করান সংক্ষেপেই তিনি কাজ সারিবার চেষ্টা করেন। কতবার কাজ করিতে করিতে উপর হইতে রাশি রাশি আলগা মাটি কালু ও তাহার সঙ্গীদের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। এই কাপাবটাই আবণ্ড বিশদভাবে বাটিলে তাহাদের একেবারে জীবন্ত সমাধি। বিপদ ডুবুরীর কাজেও বথেষ্ট। জল বেশী গভীর হইলে জলের চাপে কানের পর্দা ছিঁড়িয়া বাইতে পারে। এ বন্ধিও কদাচিৎ ঘটে কতক বহুব জলে ডোবাডুবি কবিলে কানের আর কিছু থাকে না। হারাণ তো শেষ বয়সে বন্ধ কাশা হইয়া গিয়াছিল, স্বপ্নপাতের আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পাইত না। তার পর আছে ফুসফুস। ডুব দিবার কিছুক্ষণ পরেই বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতে আরম্ভ

হয়, প্রথমে আশ্বে, শেষে জ্যেষ্ঠে জ্যোবে। আটকান বাতাস এমন চাপ দিতে থাকে যে খানিকটা বাহির করিয়া দিতেই হয়। তখন বৃকের মধ্যে একটা নিঃশব্দ বেদনা স্পন্দিত হইতে আবিস্ত কবে। কান দিয়া, দুই ভ্রমর মাঝখান দিয়া, ঝাঁঝালো জ্বালা যেন হৃৎকার মত চারি দিকে নীতল জলে মিশিয়া যাইতে থাকে। কবেক বৎসব এমনভাবে চলিলে ফুসফুসের পেশীগুলি চিলা হইয়া দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট। নিঃশ্বাস টানিবার সময় মনে হয় পৃথিবীর বাতাস বৃষ্টি ফুটাইয়া গিয়াছে। শবীর শুকাইয়া বাইতে থাকে,—ধীরে ধীরে জীবনের মাঝাক্স স্তম্ভ অপচয়। নানা স্থানে দেহের শিরাগুলি নীল হইয়া ভাসিয়া উঠে। পরিশ্রম কবিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

তবু, জীবিকা অর্জনের এই পথ যখন সে বাছিয়া লইয়াছে সব সময় কাজ জুটিলেই কালু বাঁচে। জগতে যার বা পেশা, তাই তার তপস্যা। তাহা না হইলে কোন্ মৈনিক মাসিক কয়েকটা মূদ্রার জন্ত কামানের সামনে গিয়া দাঁড়াইত? কালু কাজ চায়, প্রত্যহ বিপজ্জনক কাজ তাহাব প্রয়োজন। তা সে পায় না। মফস্বলের যে শহরটির প্রান্তভাগে কালু বাস করে ধনীর সংখ্যা সেখানে এত বেশী নয় যে, সারা বছর কূপ ও ইঁদারা খননের মরহুম লাগিয়া থাকিবে। নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়াও সকলে বাড়িতে কুয়া কাটাইতে পারে না, পাড়াপ্রতিবেশীর অথবা সরকারী কূপ ও পুষ্করিণীতেই কাজ চালাইয়া দেয়। কালুর পশার শুধু শহরে নয়, আশপাশে দশখানা গ্রামে তাহাব নাম আছে। কুয়া কাটাইতে, কুয়া সাফ কবিত্তে, হাবানো জিনিষ তুলিতে লোকে তাহাকেই প্রথমে ধোঁজে। তবু কালুকে বছরের অনেকগুলি দিন বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। কালুর অসুবিধা বিশেষ করিয়া এই কারণে। সারা বছর অপেক্ষা করিয়া পুণ্য বৈশাখ মাসে লোকে কূপ খনন করায়—সকলে একসঙ্গে। বর্ষার আগে সিকলের একসঙ্গে কুয়া সাফ করাইবার ঝোঁক চাপে। দলে দলে আনাড়ি মানুষ কাজ পায়, মরহুম ফুরাইলে কালুব মত পাকা লোক কাজের অভাবে বসিয়া থাকে, পুষ্টি ভাঙিয়া যায়। বেশী দিন ভাঙিয়া থাওয়াব মত পুষ্টি, দিন মজুব সে, পাইবে কোথায়?

সে আয়পেটা খাব, বউ গালাগালি দেয়, ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় চোঁচামেচি করে,—অভাবের পীড়নে ক্ষেপিয়া উঠিয়া থাকে। ভাগীদার কমানোর জন্ত যে পিসি তাহাকে বৃকে করিয়া মানুষ কবিত্ত ছিল তাহাকেই কালু একদিন তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু পিসি যায় না। একবেলা মধুর বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া গুটি গুটি ফিরিয়া আসে। কালুকে শুনাইয়া বউকে ডাকিয়া বলে, ‘ছুটি চাল মেগে এনেছি বউ, ছেল্যাদের রেখে দে গো।’

এ-কাহিনী শেষ বর্ষার। ভাদ্রের শেষে কালু সর্বস্বাস্ত হইয়া যায়, ধান-কাটা শুরু হওয়া পর্যন্ত সর্বস্বাস্ত হইয়া থাকে। বিবা-তিনেক জমি তাহার আছে, রাখাল ভুঁইয়া চাষ করিয়া তাহাকে ধানব ভাগ দেয়। বত শীঘ্র সম্ভব সে ধান পরিবর্তিত হইয়া যায় চালে। মাঠে ধান কাটিতে গিয়াও কালু কিছু কিছু রোজগার করে।

এ-বছর ভাদ্রের গোড়াতে কাঁসাই-নদীর জল বাড়িয়াছিল। শহরের কাছে নদীর বাঁধ ভাঙিয়া বাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ার দিন-সাতক কালু বাঁধে মাটি ও পাথর ফেলিবার কাজ পাইয়াছিল। ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত আব কোথাও কাজের সম্ভান মেলে নাই। তার পর কালু পড়িয়াছে জরে, ম্যালেরিয়ায় আর হুশিহুয়ায়। ম্যালেরিয়া যেন ওৎ পাতিয়া থাকে। সাত দিন পেট ভরিয়া থাইতে না পাইয়া শরীর একটু কাবু হইলে সহসা হি হি করিয়া কাঁপাইয়া আসে জ্বর। সমিতি-বাবুদেব দেওয়া কুইনাইন গিলিয়া শরীর আবও কাবু হইয়া যায়। হোক, এমনি দুর্বল শরীর লইয়া কালু এক দিন কৃষ্ণেন্দু সরকারেব ইঁদারায় ডুব দিতে গেল। কৃষ্ণেন্দু সবকারেব ছোট-বোঁ হাতের অনন্ত খুলিয়া ইঁদারাব ধারে রাখিয়া গায়ে সাবান মাখিতেছিল, একটি অনন্ত কেমন কবিত্তা ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

কালু বলিল, ‘ভাল রকম বকশিস চাই, কর্তা।’

কৃষ্ণেন্দু সবকার বলিলেন, ‘দেব।’

বর্ষার জলে ইঁদারা ভরিয়া গিয়াছে। ইঁট-বাঁধা দড়ি নামাইয়া জলের গভীরতা মাপিয়া কালুব মুখ শুকাইয়া গেল। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, ‘জল বড় বেশী কর্তা।’

কৃষ্ণেন্দু সরকার বলিলেন, ‘পারবি না কালু? তবে তো . .

বিপদ হ'ল বাপু! কাল বাদে পরন্তু বোমা যে বাপের বাড়ি যাবেন! তাছাড়া, পুরনো ইদারার জ্বল কমতে কমতে পাকের মধ্যে কোথায় তলিয়ে যাবে শেষকালে হয়ত পাওয়াই যাবে না।'

কালু সায় দিয়া বলিল, 'আজ্ঞে সেও কথা বিবেচ্য বটে কর্তা।'

কৃষ্ণেন্দু সরকার বলিলেন, 'একবার নেমে দ্যাখ বাপু পারিস যদি। সাত ভরি সোনা আছে ওতে। পুরো একটা টাকাই দেব তোকে, যা।'

খানিক ভাবিয়া তেল মাখিয়া কালু ইদারার ভিতরে নামিয়া গেল। এ বড় সহজ কথা নয়। অবিশ্রাম গোলা-বৃষ্টির মধ্যে যে উন্মাদ আগাইয়া যায় সে সৈনিক, কালু তাব চেয়ে কম সাহসী নয়। সে পাকা ডুবুরী, জলের পেয়ণে মানুষ কি হইয়া যায় সে তাহা জানে। 'একটি টাকার জন্তই সে কি জানিয়া শুনিয়া কৃষ্ণেন্দু সরকারের পরিপূর্ণ ইদারায় ডুব দিল? অথবা এমনি ভাবে মানুষ জীবিকা অর্জন করে, ক্ষুধা ও তপস্যা প্রয়োজন ও কাব্যকে একত্র মিশাইয়া। কিন্তু তল কালু পাইল না। ভাসিয়া উঠিয়া মড়ার মত দড়ি ধরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

কৃষ্ণেন্দু সরকার হাঁকিয়া বলিলেন, 'পেলি?'

কালু শুনিতেও পাইল না, জবাবও দিল না। খানিক পরে অতিকষ্টে সে উপরে উঠিয়া আসিল। ইদারার পাশে বর্ষার শাওলায় পিছল সিমেণ্ট কব্জা স্নানের জারগাটুকুতে বসিলামাত্র গলগল করিয়া তাহার নাক দিয়া এক বলক বক্ত বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতেই সে বেন একটু হুঁহু বোধ করিল। বুকে একটা অসহ ভার চাপিয়া ধরিয়াছিল, রক্ত হইয়া তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। কালুর রক্তবর্ণ চোখ জ্বলে ভরিয়া গেল। সমস্ত জগৎ যেন অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সব স্তব্ধ, কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। এখনও সে বেন জলে ডুবিয়া আছে। এ শুধু আশ্চর্য নয়, এ ভয়ানক। সে কালা হইয়া গিয়াছে।

দিন-তিনেক সে বিছানায় শুইয়া রহিল। বুকের যন্ত্রণা একরাত্রি ঘুমাইয়াই, কমিয়া গেল। কিন্তু আকস্মিক বধিরতা সাবিত্রে সময় লাগিল। সম্পূর্ণ সারিলও না। কালু কানে কম শুনিতে লাগিল। হৃদস্পন্দনে গুঞ্জনিত

বে-স্বকতা এককাল কূপে ইদারায় তাহার প্রিয় ছিল, এখন তাহাই স্থায়ী ভাবে লাভ করিয়া কালুব মন নিরানন্দে ভরিয়া গেল। তাহার জগৎ এবার ক্রমে ক্রমে একেবারে শব্দহীন হইয়া যাইবে এই ভয় সে এক মুহূর্তের জন্ত ভুলিতে পারিল না।

কিন্তু সে মরে নাই। সে জীবিত। তাহান জীবিকা চাই।

সে আখপেটা খায়, বউ গালাগালি দেয়, ছেসেমেয়েগুলি ক্ষুধায় কাঁদে। কালু আবাব গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। বাড়ি বাড়ি খোঁজ করিয়া শুনিল, তাহাকে কাহাবও প্রয়োজন নাই। নদীর ধারে গিয়া দেখিল, অটুট বাঁধ দাঁড়াইয়া আছে, নদীর পঙ্কিল স্রোত শাস্ত। মাঠে ধানের শিষগুলিতে রং ধরে নাই, রোদ লাগিয়া সজ্জ রংকে হলদে দেখাইতেছে, ফাঁকি ঘুচিয়া এ-রং কামেসী হইতে অনেক দেরি। বর্ষার আগে যে যেমন পারিয়াছে ধরেন চাল মেরামত করিয়াছে, যে পাবে নাই সে কালুকে ডাকিবে না, কালুর মতই হয়ত সে আখপেটা খাইয়া দুদিনের পথ চাহিয়া আছে। শহরের পথে মন্বব পদে চলিতে চলিতে কালু লক্ষ্য কবে, জীবিকা অর্জনের মরমুম সকলের ফুরাইয়া যায় নাই। গাড়োয়ান কর্মমাক্ত পথে গাড়ী চালাইতেছে, ফিরিওয়াল হাঁকিয়া ফিরিতেছে, হলি মোট বহিতেছে, জাকরার ঘরে অবিবাম ইকইক শব্দ, কুমোরের দাওঘায় চাকার আবর্তন, ধোপাব পিঠে কাপড়ের বোঝা। দিনের পর দিন তাহার কোদাল চালানোর ইতিহাস কালু ভুলিয়া যায় : সৃষ্টির সেই অফুরন্ত উল্লাস, ইদারায় ডুব দিবার রোমাঞ্চ, সাত কলসী মোহরের স্বপ্ন, হুঁহু ও সচ্ছলতাব সেই সানন্দ দিনগুলি। সে ঈর্ষা বোধ কবে। তাহার আপশোষ হয়। ভাঙা রাস্তার যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির কুলিরা মাটি কেলিতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া সে জুক দৃষ্টিতে তাহাদের কাজ দেখে।

তার পর এক দিন সকালে দড়ি-হাতে গমছা-কাঁধে মধুকে সে কৃষ্ণেন্দু সরকারের বাড়ির দিকে যাইতে দেখিল।

'কোথা বাস্ মধু?'

'সরকার-মশায়ের বাড়ি। অনন্ত তুলে দিলে পাঁচ টাকা কবুল করেছেন।'

‘জল কত জানিবি? মরবি তুই মধু, মরবি।’

মধু উদাস ভাবে বলিল, ‘কপালে লেখা থাকে মরব—

অদেটে কে ঠেকাবে কালু-না, এ্যা?’

কালু মুখ কালো করিয়া বলিল, ‘চ, আমিও বাই।’

পাঁচ টাকা? কালুর বুকের ভিতবে কেমন করিতে লাগিল। বর্ষার জল প্রথমটা তাড়াতাড়ি কমিয়া যায়, ক’দিনে ইঁদারার জল না-জানি কত নীচে নামিয়া গিয়াছে। এখন হবত অনন্ত তুলিয়া আনা আর অসম্ভব নয়। পাঁচটা টাকা তাহা হইলে মধুই পাইবে? কালু আড়চোখে মধুর মুখের দিকে চাহিয়া রাগিয়া উঠিতে লাগিল। মধু এক দিন এ-ব্যবসায় হাতেখড়ি দিয়াছিল, তাই না পৃথিবী-সুখ সকলে বখন কাজে ব্যস্ত, পথের ধাক্কর মেধব পর্য্যন্ত, কাজেব মরহমের অপেক্ষায় ঘবে তাহার অন্ন নাই! আব সেই মধু আজ তাহাব হকের ধনে ভাগ বসাইতেছে। কৃষ্ণেন্দু সবকাব তাহাকে প্রথম ডাকিয়াছিল, অনন্ত তুলিয়া পুস্কার-লাভের অবিকার সে ছাড়া আর কাহারও নাই। এ কি অন্তায় মধুব! ওকি ডাকাত নাকি? সমস্ত পথ কালুর

বাগ বাড়িতে লাগিল। কৃষ্ণেন্দু সরকারের বাড়ি পৌছিয়া মধুর সঙ্গে সে এমন কলহ জুড়িয়া দিল বলিবার নয়।

কৃষ্ণেন্দু সরকারবই মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন। বলিলেন, ‘পারিস যদি, নাম, তুই-ই নাম বাপু।’

কালু সর্কাজে তেল মাখিল, নাকে ও কানে তেল ভরিয়া দিল, তাবপর দড়ি ধরিয়া নামিয়া গেল ইঁদাবাব ভিতরে। জল কয়েক হাত কমিয়াছে। ডুব দিয়া কালু ভাসিয়া উঠিল একেবারে অজ্ঞান অবস্থায়। জ্ঞান নাইবা রহিল, জ্ঞান ফিবিয়া আসিবে; দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া দেখা গেল, অনন্তটি সে শক্ত করিয়া ধবিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে, কালু জ্ঞান হারায় নাই। সম্বের অতিবিক্ত কিছু, বাহা জলের চাপ ছাড়া হয়ত আর কিছুই নয়, সহ্য করিয়া সে অশক্ত, বিহ্বল ও মুহমান হইয়া গিয়াছিল। গলগল করিয়া নাক দিয়া কয়েক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া যাওয়ার পব সে একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

সে পাঁচটা টাকা বোজগার করিয়াছে।

সাগরিকা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জগৎ জুড়িয়া যত ক্রন্দন, হা-হতাশ,

ফোঁস-ফোঁস-শ্বাস, আকুল বাপবিন্দু—

ছড়ানো বেদনা কুড়ায়ে কুড়ায়ে বারো মাস

ঐ বুকে তব বাঁধিয়া রেখেছি সিন্ধু!

অশ্রু তোমার শুকায় না তাই, জননি,

কভু তা’ জমিয়া মুক্তা শুক্ল-অঙ্কে

শোণিতের মাঝে ধনিত বে ব্যথা, জ্ঞান নি—

• রক্তপ্রবালে পরিণত তব পক্ষে!

চঞ্চলতাব শেষ নাই আর জীবনে

বৎসলতায় চিব অশান্ত চিত্ত,

আর্দ্র ধরার কল্যাণ মাগি’ বিজনে

কোটি জিহ্বায় অপো কার নাম নিত্য?

মাঝে মাঝে বুকি থাকিতে পার না নীরবে—

অস্তর তব গুমরিয়া উঠে গর্জনে,

বিসবিয়া তাই অপার উদাব গববে

ডুবাও স্রষ্টি ও তর্জনির তর্জনে

কোটি সন্তানে বেরিয়া আদরে চারিধাবে

পালন করিছ অমৃতসরস স্তনে,

বে স্নেহ তোমার বক্ষে বহিছে বারিধারে—

সে-কথা তোমাব কেমনে জানিবে অন্তে?

ওগো মহীয়সি প্রথমা জননি পৃথিবীর,

লহ মা প্রণাম হে আদি প্রকৃতি চণ্ডি,

কবে মুছাইয়া ক্ষুদ্র জীবের আধিনীর

পার করি’ দিবে হৃৎস্বপ্নের গভী?

বিলাতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মান

ত্রিভুজেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪২ সনের ৯ই জানুয়ারি সন্মানমন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম বাব বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বিলাত-প্রবাসের কথা সেকালের একখানি সাময়িক পত্রে যেটুকু বাহিব হইয়াছিল এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। কাগজখানির নাম—'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর'। প্রধানতঃ রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রই ইহা পরিচালন করিতেন।

(বেঙ্গাল স্পেক্টেটর, ১ অক্টোবর ১৮৪২)

আগষ্ট মাসীয় হলপথগামি ডাক।—এতদ্বাসীয়া ১৭ দিবসে বেলা ১০। সাড়ে দশ ঘটিকার সময় আগষ্ট মাসের হলপথগামি ডাক আসিয়া পহঁছিয়াছে, তদ্বারা অবগত হওয়া গেল, জীবিত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে বাগী তৎপরিবার এবং লর্ড প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তি ও অন্তান্ত শাস্ত্র ভ্রমলোকের নিকটে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন; উক্ত বাবু এবং জীবিত চন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাদিগকে লর্ড 'মেয়ার' ভোজ দিয়াছিলেন এবং বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর "রাজা দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদার" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবু মহারাণীর সহিত অনেকবার ভোজন করিয়াছেন কিন্তু এই খ্যাতি ইংলণ্ডেবরী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই; আমরা শুনিতে পাই এই বাবু ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের মধ্যবর্তি যে সকল গ্রামে শিল্পকর্মে প্রাচুর্য আছে তথায় অতিশীঘ্র গমন করিবেন।

(বেঙ্গাল স্পেক্টেটর, ১লা নবেম্বর ১৮৪২)

জীবিত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আগষ্ট মাসে স্কটলণ্ড দেশ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন; এডেনবর নগরের কোলেজিয়া এক মহাসভা করিয়া উক্ত বাবুর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তত্রস্থ মাজিষ্ট্রেট ও কোলেজিয়া নুতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং লর্ড প্রবোষ্ট সাহেব এই বাবুর স্বখ্যাতির বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে নগরবাসির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং বাবুও উত্তম বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তম প্রদান করিয়াছেন, তিনি কহিয়াছেন যে আমার শ্রোতারা আমাকে যে সম্রথ প্রদান করিলেন ইহাই আমার জন্মদেশের উপকারের চিরস্বরূপ, এবং বাহাতে বাঙ্গালা দেশের জীবিত হইয়া এতাদৃশ কর্মে তাঁহারা উৎসাহী হইবেন, এমন যদি জানিতে পাবি তবে আপনকার দিগের দৃষ্ট এই সম্রমকে অতিশয় কিস্তীয়রূপে গণনা করিব। শুনা গেল যে উক্ত বাবু সাধারণ উপকারজনক কর্মের মধ্যে নিরুত ভূমির বিষয়ে এক আবেদন পত্র তত্রস্থ প্রধান কর্মরূপ লোকদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা অবগত হইয়া আশ্চর্য হইলাম যে এই বাবু অক্টোবর মাসেব জাহাজে ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাপন করিবেন কারণ তিনি আব অধিক দিন তথায় বাস করিলে সেখানকার শীতে তাঁহার শারীরিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা হইত।

(বেঙ্গাল স্পেক্টেটর, ১ ডিসেম্বর ১৮৪২)

জীবিত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কটলণ্ড দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন; উক্ত বাবু কোন দিবস তথ্য হইতে ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাপন করিয়াছেন তাহা সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শুনা গেল যে তিনি ইংলণ্ডের মহারাণীকে এক মহামূল্য শাল এবং প্রিন্স আলবার্টকে এক কিস্তীয় ছোরা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন, এই বাবু ৩০ সেপ্টেম্বরে উইন্ডসর দেশেব রাজপ্রাসাদে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে মহারাণী ও প্রিন্স আলবার্টের নিকট যথেষ্ট সৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং এই স্থানেই মহারাণীর নিকটে স্বদেশে প্রত্যাপন কবিবার বিষয় লইয়াছেন। অবগত হওয়া গেল যে ইংলণ্ডেবরী উক্ত বাবুকে আপনাব ও প্রিন্স আলবার্টের এক প্রতিমূর্তি প্রদান করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন। এই বাবু ১৫ অক্টোবরে পেনিস নগরে গমনার্থে ইংলণ্ড পবিত্যাগ করিয়াছেন, তৎস্থান হইতে মারসেলিস এবং আলেকজেন্দ্রিয়াতে যাত্রা করিবেন। আমরা শুনিলাম, যে বাবু 'নাইট' উপাধি গ্রহণ করেন নাই তিনি সুপ্রসিদ্ধ গুণ মাসেব ২৫ পহঁছিয়া থাকিবেন ও আগামি মাসের শেষে এতদ্রূপে আসিতে পারিবেন।

(বেঙ্গাল স্পেক্টেটর, ১ জানুয়ারি ১৮৪৩)

জীবিত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বদেশে প্রত্যাপন করিবার নিমিত্ত মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণের পর বোর্ড অব কন্ট্রোলার সভাপতি লর্ড হিডলার লাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এই সাহেব জীমতী মহারাণীর আজ্ঞানুসারে উক্ত বাবুকে ইংলণ্ডেবরী পরমাত্ম-এবের চিরস্বরূপ এক স্বর্ণ সিঁদেল প্রদান করিয়াছেন, এবং বাবুর প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। ২১ অক্টোবর কোট অব ডিরেক্টরেরা এই বাবুকে তরুণ এক স্বর্ণসিঁদেল এবং তাহাৰ সাধারণপোশাকিও গুণের প্রশংসাত্মক এক পত্র প্রদান করেন, বাবুও অতিশয় সম্মান পূরসব তাহার প্রত্যাপন প্রদান করিয়াছেন। ২৮ অক্টোবরে তিনি ফ্রান্সদেশে গমন করত তথাকার বাজার নিকট যথেষ্ট অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, বাদসাহদিগের যে সকল নিয়ম আছে তাহা পবিত্যাগ করিয়া এই রাজা বাবুকে স্বীয় পরিবাহেব মধ্যে উপবেশন করাইয়াছিলেন। এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া রাণী ও অন্তান্ত রাজা এবং রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় করিয়া দিয়াছেন; এবং তাঁহার সম্মানার্থে রাজবাটী আলোকময় হইয়াছিল। আব রাজা বাবুকে বাটীর সকল অংশ দেখাইয়াছেন, এবং তাহাৰ সহিত ভারতবর্ষের অবস্থা ও তৎসংক্রান্ত আশ্রয় বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিয়াছেন এবং বাবুকে পুনর্বার ৩০তম দেশে বাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন, বাবুও ১৮৪৩ শালে শীতকালে বাইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত বাবু গত মাসের ১০ তারিখে এটলোটার জাহাজ দ্বারা বোম্বে উভীর্গ হইয়াছেন, এবং ধন আনয়নের নিমিত্ত ইটব প্রাইজ নামক যে জাহাজ বোম্বে প্রেরিত হইয়াছে তদ্বা তাহা তিনি মাস্তাজে আসিবেন, অমুমান হয়, অবিলম্বে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

হারকানাথ বাবু সাধারণের অথবা আপনাদের কোন কর্মের ভারগ্রস্ত হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন নাই, তিনি শুধু আমাদের নিমিত্ত ও নানাবিধ আশ্রয় বিবরণ সম্পর্কিত ও দেশভ্রমণের জন্ত গমন করিয়াছেন, বাহা হউক, বাকালিগিরের মধ্যে দেশভ্রমণার্থ উৎসাহ-প্রদানে কেবল তাঁহারি দৃষ্ট হইল। এক্ষণে অঙ্গদেশের অস্ত্রান্ত ধনাঢ্য জ্ঞানবান্‌ নম্বরেরা ইংলণ্ড গমনের এই এক দৃষ্টান্ত পাইলেন, কিন্তু এবিষয়ে আমরা যদিও আগাতত আশা করিতে পারি না তথাপি এই সকল মহাশয়গকে এই অঙ্গরোধ করিতে পারি যে তাঁহার স্ব স্ব সন্তান-পুত্রের শিক্ষা পূর্ণ করণার্থ একই বার তাহাদিগকে ইংলণ্ড স্বরূপ মহাতীর্থে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করুন। এখান হইতে ইংলণ্ডে যাইতে ৫০ দিন লাগে এবং ৪০ দিনে তথা হইতে এখানে আসা যায়, ইহাতে প্রায় তিন মাসের মধ্যেই গমনাগমন নিষ্পন্ন হয় আর সেখানে গিয়া

বিবিধ বিষয় দর্শন ও কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করণ ইহাও দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে অতএব সর্বশুদ্ধ হয় মাস অপেক্ষাও মাস কালে এই আশ্রয় দেশভ্রমণ নিষ্পন্ন হইবেক, আমাদের দেশের বারাদশী প্রয়াগাদি তীর্থ যাত্রিরা এই সময়ের মধ্যে তীর্থযাত্রা সাক্ষ্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন না।

(বেঙ্গাল স্পেক্টেটর, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৪০)

জনা বাইতেছে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির উৎসাহা সভা, এবং এতদেশের বিশেষ মুকলার্মি স্বেচ্ছা তামসন সাহেব... ইত্যাদি বাবু হারকানাথ ঠাকুরের সমস্তব্যাহারে এতদেশের বিষয় সকল উত্তমরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন; তাঁহার মানস এই, ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতবর্ষের প্রজাদিগের উপর যে ২ অত্যাচার হয় তাহার আন্দোলন করিবেন।

কবি ও কন্ম্যা অতুলপ্রসাদ

ডক্টর শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বেগমতীর শোকে শুধু বাঙালী নহে লক্ষ্যবাসী সকলে মুহমান, তাহা পাছে ভাষাকে লুপ্ত ও রুদ্ধ করে সেইজন্য আমার এই লিখিত অভিভাষণ। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব উদার ও বিশাল ছিল। তিনি যেমন বাঙালীর, তেমনি এদেশবাসীরও নেতা ছিলেন। এ-দেশবাসীর সঙ্গে নিবিড় সামাজিক প্রীতির নিগড়ে তিনি যাবজ্জীবন আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিও বাঙালীর রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি ছিলেন উদার লিবারাল। মনোমোহন বোষের মত গোথলেও ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক গুরু। বাঙালীর প্রাদেশিকতা ভুলিয়া তিনি কি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, একটা সমগ্র আদর্শ অনুধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এদেশের জননায়কত্বের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইজন্যই আমাদের বড় শোক যে তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শুধু যে তাঁহাকে হারাইলাম তাহা নহে। তাঁহার জীবন এদেশবাসীর কষ্ট, রাষ্ট্র ও সমাজনীতির সহিত একটা মিলন-গ্রন্থি ছিল। এই মিলন-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাওয়াতে আমরা প্রবাসের রাষ্ট্র ও সমাজজীবন হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইব। আমি কিন্তু এসবক্ষে একেবারে আশা ত্যাগ করিতে পারি না। কারণ বাঙালীর ব্যাপকতর জীবনের এই প্রতিভু, অতুলপ্রসাদ

সেনের সমগ্র জীবনের দান ও ভ্রাগধর্ম ও তাঁহার পরিশীলনেব প্রসারতা আমাদের সঙ্গীর্ণতা হইতে অনেকটা রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই।

১৮৭২ সালে ঢাকা শহরে ডাঃ রমাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র অতুলপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ সেনের সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। শিশু অতুলপ্রসাদ বাড়িতে অহরহ তাঁহার শুল্লিত সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি শুনিতে। তখন হইতেই একটা ছন্দের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এদিকে তাঁহার দাদামহাশয় শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্তের প্রভাব তাঁহার উপর কম হয় নাই। তিনি সে-সময়কার একজন প্রসিদ্ধ বাউলগান-রচয়িতা ছিলেন। প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় যে নিজেই বাংলা-সাহিত্যের বাউল বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন, সত্যই ইহাতে তাঁহার উত্তরাধিকার।

শুল্ল ছাড়িয়া অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। ইংলণ্ডে অবিলম্বে বোম্ব, মনোমোহন বোম্ব, শোকেন পালিত, চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার দেশী বিলাতী কার্যের

রসাস্বাদনে দিন কাটিত। বিখ্যাত ঘোষ-ভ্রাতার তখন বিলাতে কাব্যরচনায় খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সে-সময় আরভিঙের শেক্সপীয়রের নাটকগুলির অভিনয় বিলাতে এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় বহুদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য নাট্যকলায়ও সৌন্দর্য ও গাঙ্গীর্ঘ্য উপভোগ করিতেছিলেন। বিলাতে চিত্রকলার চর্চাও তিনি কিছু দিন অধ্যবসায়ের সহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেও একটি গবেষণা-পূর্ণ, রসাবিষ্ট প্রবন্ধ ইংলণ্ডে পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে প্রথম তাঁহার দেশীয় সঙ্গীতের স্বতন্ত্র ধারা সম্বন্ধে মত পরিষ্কৃত হইয়াছিল।

অথচ নেপলস বন্দরে যখন জাহাজ থামিয়াছে তখন গাঙ্গোলা-বিহারী ভিখারীদিগের মুখে কাউন্টের গান শুনিয়া তিনি ভাড়া ইটালীয় হুরে নূতন গান রচনা করিয়াছিলেন। যে-গানে বাংলার গান-বচনায় এক বকম প্রথম দেশী-বিদেশী হুরের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল, সেই গানটি হইতেছে—

উঠগো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আজি জগত-জন-পূজ্যা।
হুঃখ দেখে সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লক্ষ্মী!
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কব সন্ধ্যা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধায়ে!

১৮৯৫ সালে তিনি দেশে ফিরেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল বায়, গগনেন্দ্র ঠাকুর, ফরেশ সমাজপতি, লোকেন্দ্র পাণ্ডিত, নাটোরের মহারাজা জগদ্বিজনাথ রায় প্রভৃতি মিলিয়া একটা মঞ্চচক্র রচনা করিয়াছিলেন। সে বৈঠকটির নাম ছিল ‘খেয়ালী’। সেখানে অতুলপ্রসাদ সেন তাঁহার অনেক নূতন রচিত গান গাহিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আয়োজন বন্ধু তাঁহার সাহিত্য-সাম্রাজ্য কম সম্পদ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের হাসির গান অতুলপ্রসাদ এতই ভাল গাহিতেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই আসরে তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন ‘নন্দলাল,’ যে ‘নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ।’

এই যুগে ক্রমে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের প্রভাব এতই বেশী হইয়াছিল যে, অতুলপ্রসাদ সেনের অনেক মূল্যবান গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই লোকে গাহিত।

অতুলপ্রসাদও সাত বৎসর পবে তখন প্রবাসী হইলেন। হৃদয় প্রবাসে তাঁহার কাব্য ও গানেব নিবিড় রসসঞ্চার হইতে লাগিল। উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। যে উদার প্রাণে অতুলপ্রসাদ সেন এদেশের সামাজিক মিষ্টালাপে আপনাকে চালিয়া দিয়া এদেশবাসীর সহিত নিবিড় আত্মীয়তাব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কবি-জীবনের রসপ্রেরণা হইয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন যেমন তুলসীদাস ও কবীরের ভাব ও সাহিত্যে মাতিয়া গেলেন, তেমনই মুসলমানের গীতিকবিতাও তাঁহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই বাঙালী কবির পদাবলী উত্তর-ভারতে একটা নূতন ছাঁদ পাইয়াছে, বাহা বাংলা-সাহিত্যে একেবারে নূতন জিনিষ। যে-দেশে তুলসীদাস কবি, সেখানে সাহিত্য সার্বজনীন। সাহিত্যিক বলিয়া নূতন কোন জীব এদেশে দেখা দেয় নাই, কারণ সাহিত্যে সকলেব সমান অধিকার, সাহিত্যের অমুভূতি সহজ সরল লৌকিক অমুভূতি। কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাই কবি হইয়াও নিম্নের সঙ্গে অপরের কোন ব্যবধান সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কবিতাব সহজ লৌকিক আবেদন ও তাহার সরল ভাব প্রকাশের মূলস্থল এইখানে। যে-সমাজে তিনি কবি সে-সমাজে গায়ক, দোঁহা ও গজল রচয়িতার ভাব প্রকাশ বাংলা দেশ অপেক্ষা উদারতর ও আভিজাত্যহীন বলিয়া তাঁহার গান ও ছন্দ বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে, এমন কি নিরক্ষর অশিক্ষিতকেও এত আকৃষ্ট করিয়াছে।

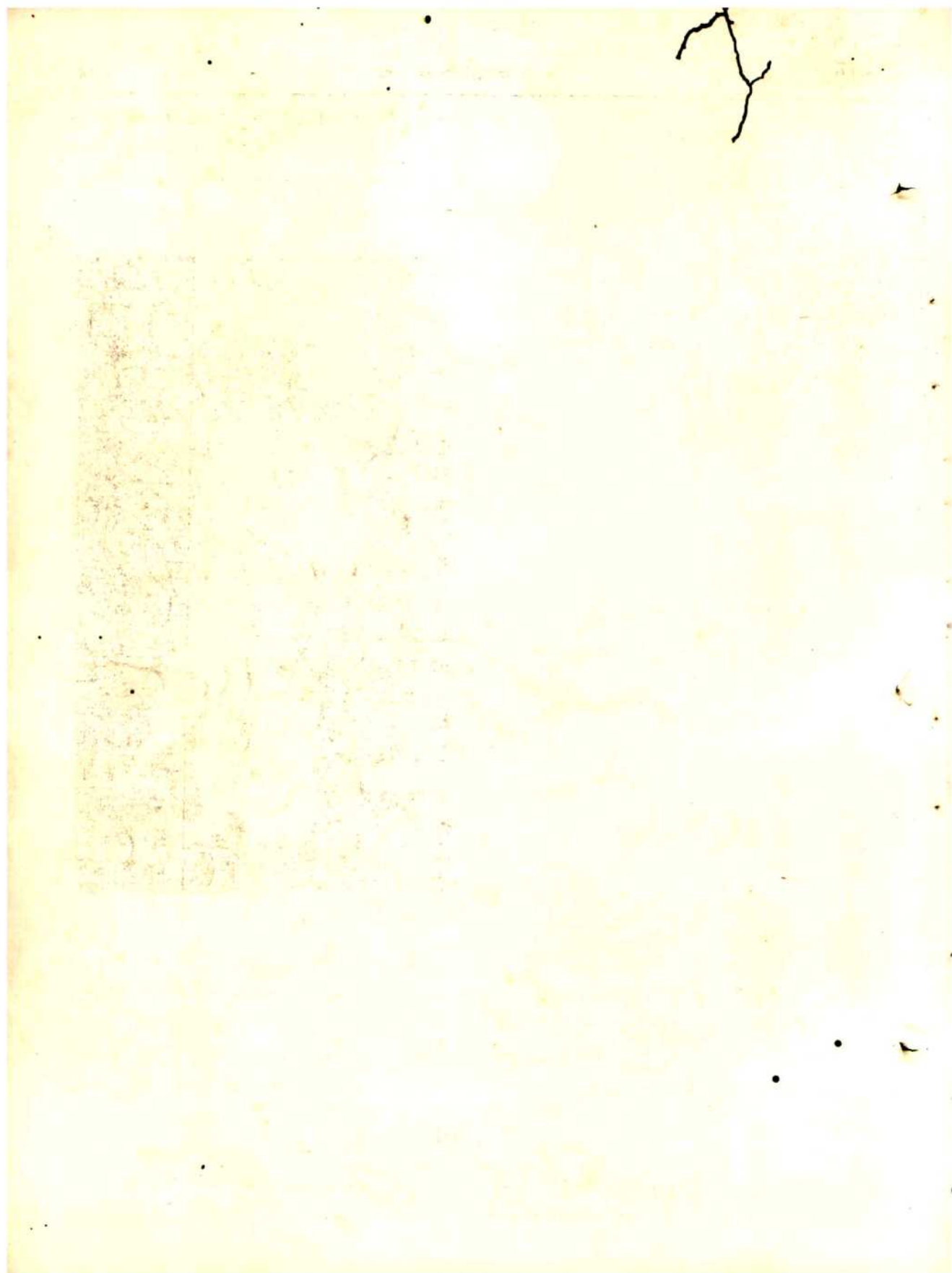
উর্দু ভাব ও সাহিত্য তাঁহার গান ও ছন্দকেও কম ভূষিত করে নাই। তাঁহার গানে ও ছন্দে আছে আরব-মঙ্গভূমির তৃষ্ণার জ্বালা, অপর দিকে আছে একটা কঠোর বৈরাগ্য। এক দিকে আছে ওয়েসিসের ভোগের চঞ্চল-চরণ-ভঙ্গ, অপর দিকে মায়ামবীচিকার পরপারে চিরশান্তি। প্রকৃতি ও জীবন তাঁহাকে যত দান করিয়াছিল তাহাদের সম্পদ, তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল অধিক,—মঙ্গজীবনের বিফলতা আনিয়া দিয়া, তৃষ্ণার জ্বলের পরিবর্তে গবলের পেয়ালা বাব-বাব তাঁহার শুষ্ক গুঠপুটে ধরিয়া,—



বর্ষা

শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দত্তিদার

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা



প্রেম-নীরে ভরি, আশার কলসী
কত নঃ যতনে সেচিল তায় !
ফুলদল আসি কহে পরিহাসি,
কোথায়, তব বঁধু কোথায় ?

কিন্তু জীবনের এই নিদারুণ পরিহাস তাঁহার অন্তরকে
তিন্ত না করিয়া বরং মধুর, স্নিগ্ধ ও কোমল করিয়াছিল।
কবি স্বল্পভাবী ছিলেন। উর্দু-মারীয়া ও গজল গানের
মর্ম্মস্বদ ছুঁথের আড়ালে একটা সহজ বিশ্বাস দেন তঁাহাকে
মুগ্ধ করিত তেমনই তাহাদের সহজ প্রকাশভঙ্গিও তিনি
আপনার রচনায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতি-
কবিতার এ ছাঁদ বাংলায় আর নাই। এমন ছন্দেরও
বৈচিত্র্য নাই। শুধু ছন্দের দিক হইতে

(পিলু)

বাদল কুম কুম বোলে,
না জানি কি বলে !
বৃষ্টিতে পারি না কথা,
তবু নয়ন উছলে !
কাহার নুপুরধ্বনি
শুনাইছে আগমনী ?

বিরহী পরাণ তারে যাচে ;
আশা-ময়ূরগুলি পুছ মেলি নাচে ;
রাখিব পরাণ-খানি তার চরণতলে ।

(সাওয়ন)

ঝরিছে ঝর ঝর
গরজে গর গর,
খনিছে সর সর
শ্রাবণ মাঃ।

এই গানগুলির সুর বাঙালীর প্রাণকে কাড়িয়া লইয়াছে
তাহাদের গতির চঞ্চলতা ও কমনীয়তার জন্ত। কিন্তু
বাংলার গ্রামে ও শহরে এই গানগুলি গাহিতে গাহিতে
দূর ভবিষ্যতে কবে কোন্ বাঙালী মনে করিবে টেরাইয়ের
সেই নিয়ম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রাত্রি, উদাস কবি যখন
বারেইচের ডাক-বাংলার বারাণ্ডার রেলিঙে ভর দিয়া
বৃষ্টির পর ঘণ্টা বর্ষাপ্রকৃতির বিরহবেদন ভোগ করিতেন,
অন্তর বাহির ছুই ভরিয়া একটা বন অন্ধকার দামিনীর
গুরুভাবে যখন তাঁহাকে অসীমের প্রেম-সম্ভাষণ জানাইত ?
তেমনই

চাদিনীরাতে কে গো আসিলে

বাংলা অপেক্ষা উত্তর-ভারতের তীব্রতর জ্যোৎস্নারাত্রির
রূপালি ছটা এই গানে নূতন ছন্দের সমাবেশ আনিয়াছিল।

বাস্তবিক উত্তর-ভারতের লৌকিক হোলি, কাজরী, চৈতী,
শাওরনী, লাউনী, ভজন, রামায়ণী ও গজলের সুর তাঁহার
অন্তরে নিগূঢ়ভাবে অহুপ্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের
ছন্দ ও তাল অতুলপ্রসাদের গীতি-কবিতায় লগিত নূতন



অতুলপ্রসাদ সেন

রূপ পাইয়াছে। এই সংযোজনাতেই তাঁহার প্রতিভার
কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য, দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও
কনক দাস তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া বাংলা দেশকে
তাঁহার সুর ও তালের সহিত নিবিড় পরিচয় করাইয়া
দিয়াছিলেন ; কিন্তু বাংলা দেশে তাঁহার গান অনেক সময়ই
পরিবর্তিত, এমন কি বিকৃত হইয়াও গীত হয়।

কিন্তু সুর ও তালের আবেদন অপেক্ষা তাঁহার
গীতি-কবিতার আকর্ষণ হইতেছে তাঁহার নিদারুণ ব্যথা,
শেলীর সেই নির্দেশ Our sweetest songs are those

that tell of saddest thoughts. জীবন-মরুতে তাঁহার গানগুলি যেন বাসরার গোলাপ, কাকটাস-বনের রক্তকুহুম। কাঁটার বনে বৈরাগী একতার। লইয়া যখন ব্যথাভরে গান সায়

হরতি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে—

শুধু কি ফুটাও কাঁটা? ফুটাও না কি মুকুল?

তখন বিনি ব্যথার ব্যথী তিনি চরণের ব্যথা দূর করিয়া অন্তর কুহুমের গন্ধে ভরপুর করিয়া দেন। এই যে আমাদের বাউল, অতুলপ্রসাদ, বাহার ‘অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে তাইরে নাইরে না,’ তিনি কিন্তু বাংলা দেশের মত বাউল নহন। তিনি যেন উত্তর-ভারতের পল্লীবাটের দরবেশ। উত্তর-ভারতের মাঠে মাঠে শিমূল পলাশের রক্তিম শোভা তাঁহার হৃদয়কে রাঙ্গিয়া দিয়াছে। রাজপুতানার মার্ভিও-পীড়িত ধূসর মাঠ তাঁহার হৃদয়কে বিদগ্ধ করিয়াছে। যমুনার ছকুল-প্লাবন কত প্রেম কত গানে এই দরবেশকে টানিয়াছে। গঙ্গা-সরযূর উদার শ্যামল অঙ্গ চৈত, কাজরী, বুলন ও হোলী উৎসব ঋতুপর্যায়ে তাঁহাকে আব্বান করিয়াছে। বিদ্যাগিরির পর্বতগাত্রে ও রামগড়ের উপত্যকায় যে বীর্ঘা ও স্বাধীনতা প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। সেই স্বাধীনতার হুঁসাহসের গান আজ কলিকাতার হাজার কর্পোরেশন স্কুল ছাত্রদের মুখে প্রতিধ্বনিত, “বল বল সব শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।” কিন্তু এই দরবেশের গান্নর উদ্গাদন। একটানা দুঃখ হইলেও তিনি গানগুলি বাজাইয়াছেন ভারতের স্মৃতি চুম্বকের কাজে, হৃদয় ও ছন্দের লীলাবৈচিত্র্যে। এদেশের ঘরে ঘরেই যে হৃদয়ের কারুশিল্প। উত্তর-ভারতের পল্লীবধুর কেশবিন্যাস ও নানাবর্ণ বিভূষণে, তাহার চিকণের শোভন বয়নে, যে সুখমা তাহার অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই এই দরবেশ আপনার গানে ধরিয়াছেন। তাই তাঁহার এক-একটি গান যেন গেরুয়া জমিনের উপর চিকণের কাজ-করা এক একখানি রুমালের মত। দুঃখময় ভগবানের দিকে বিপদের ঝটিকায় উদ্বেল হইয়া তাঁহার গানগুলি কত না লীলাতরঙ্গ ভাসিয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু আজ আমরা এই প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেনের গান

ও কবিতার আর আলোচনা করিব না। শুধু প্রবাস নহে, বাংলা দেশ হইতেও তাঁহার গীতি-কবিতার যথোচিত সমাদর আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকিব। তাহা ছাড়া আমরা বাহাকে হারাইয়াছি তিনি শুধু যদি কবিই হইতেন, তাহা হইলে আমাদের শোক এত আন্তরিক ও তীব্র হইত না। তিনি আমাদের প্রবাসী সমাজের নায়ক ছিলেন। আজীবন তিনি বাঙালী ইয়ং মেন্স য়াসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। সম্মিলিত বাঙালী ইয়ং মেন্স য়াসোসিয়েশনের ও বেঙ্গলী ক্লাবেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। সামাজিক হিসাবে তিনি লক্ষ্যবাসী বাঙালীর সঙ্গে এত নিবিড় ভাবে মিশিতেন যে, প্রত্যেক বাঙালী তাঁহার মৃত্যুতে ব্যক্তিগত শোক অনুভব করিতেছে। সেদিনকার বিরাট বিবাদবাতায় কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বাঙালী, কি অবাঙালী যে শোকে তাঁহার শবানুগমন করিয়াছে, তাহাও তাঁহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন। তিনি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের এক জন জন্মদাতা। উহার প্রথম অধিবেশন কানপুরে এবং গত অধিবেশন গোরক্ষপুর সভাপতি হইয়া তিনি প্রবাসী বাঙালীর সংহতির উপদেশ দেন। এমন কোন বাঙালী অন্তর্গত এ প্রদেশে নাই যাহা তাঁহার নিকট ঋণী নহে। তাঁহার দান কিন্তু জাতিধর্মনির্কির্শেষ ছিল। তিনি বহুকাল ধরিয়া অযোগ্য সেবাসমিতির সভাপতি ছিলেন এবং নানা লোকহিতকর কার্যে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-আন্দোলনেও তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বার চামার-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে দেখিয়াছি। এ-সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ পল্লীর সংস্কারে, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। গোথলে ভ্রাতৃ-সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। দূর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে কৃষকগণের নিকট দেশের বাণী পৌছাইয়া দিতেন। কবি ও ভাবুক হইয়াও তিনি এক জন অধ্যবসায়শীল কর্মী ছিলেন। লোকশিক্ষাপ্রচার, পল্লীগঠন, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, ত্রুভিক্ষ, বস্ত্র বা প্লাবন-পীড়িতের জন্ত কল্যাণ কর্ম—সব উদ্যোগে সর্বদাই অগ্রণী হইয়া তিনি দেশের লোককে আহ্বান করিতে জানিতেন। সে আহ্বান এদেশবাসী শুনিত। তিনি

রাজনীতিতে গঠনবাদী ছিলেন এবং দুইবার যুক্ত-প্রদেশের প্রাদেশিক উদারনৈতিক সম্মিলনের সভাপতি হইয়া গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিই বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ তাঁহাকে রাজনৈতিক নেতা বলিয়া চিনে, কিন্তু তিনি যে গান রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন এ-খবর বাংলার বাহিরে অবিদিত। লিবারাল-নেতা হইয়াও তাঁহার একটা বহুদর্শিতা সাহস ও ত্যাগ ছিল বাহা পুরাতন নেতাপ্রণীত মধ্য বিরল। তিনি আপনা ভুলিয়া দান করিতে জানিতেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বাভাবিক, অভ্যাসগত দানধর্মের ব্যত্যয় পাছে ঘটে এইজন্য নীরোগ না-হওয়া সত্ত্বেও অর্থাপার্জন তাঁহার মৃত্যুরও প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর পর তিনি যে দানপত্র রাখিয়া গিয়াছেন

তাহাতেও তাঁহার উদারতা, জাতীয়তা, ও নিঃস্বার্থ দান প্রকাশ পাইয়াছে। এমন একটি সুরসিক অথচ বৈরাগী, ভাবুক অথচ কর্মপ্রাণ, উদার অথচ সাহসী, ক্ষমতাশীল অথচ মৃদুকুহুম লোক পৃথিবীতে বিরল। এই মৃদুকুহুম লোকটির অন্তর হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর যে সুবাস ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের প্রবাস-জীবনকে ধন্য করিবে। যিনি গন্ধ বিতরণ করিয়া গেলেন তাঁহার জীবনের যে সার্থকতাই এই অবাচিত, অকুরন্ত দানে। তিনি নিজেই গাহিয়াছেন

ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে,
না হয় তাদের মত শুকিয়ে ঘাবি গন্ধ করি বিতরণ।*

* লক্ষ্মাবাসী বাঙালীর শোকসভায় সভাপতির অভিভাষণ।

রাজমহলের মালপাহাড়িয়া ধর্ম

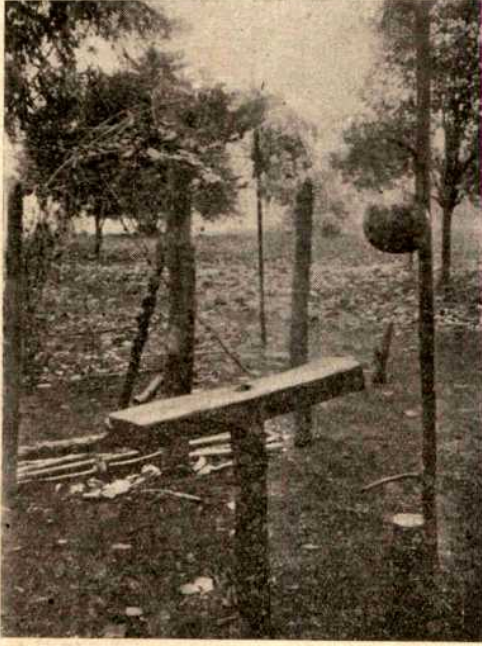
শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

সাঁওতাল-পরগণার রাজমহল পাহাড়ের বর্কর জাতি-গুলির মধ্য মালপাহাড়িয়ায় অপর জাতিগুলি অপেক্ষা কিছু সভ্য। ইহারা এককালে রাজমহল পাহাড়ের শিখরবাসী 'মালে' নামক দ্রাবিড়ভাষী জাতির অন্তর্গত ছিল। দৈহিক আকার, ধর্ম, কৃষ্টি, প্রভৃতিতে এখন এই দুই জাতির মধ্যে বহু সাম্য আছে; এমন কি দুই-এক জেলায় ইহাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহও চলিতে দেখিয়াছি। আদমশুমারীতে ইহাদিগকে বাঙালীর মধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে এবং 'ওয়েস্টার্ন ডারালেণ্ট অব বেঙ্গলি' নামক এক ভাষার ভাষী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, অথচ এখন ইহাদের মধ্যে অনেকে ইহাদের আদিম 'মালতো' ভাষায় কথা বলে এবং ইহাদের বাংলা ভাষার মধ্যে বহু 'মালতো' কথা আছে। মালপাহাড়িয়ায় এখন সমতল-ভূমিতে বাস করে এবং এই সমতল স্থানে বসবাস করার ফলে ইহারা অপরাপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাঙালীর কৃষ্টিই গ্রহণ করিয়াছে। সাঁওতাল কিংবা মালেদের মত ইহাদের নিজস্ব গ্রাম অতি অল্পই আছে। বিভিন্ন গ্রামে আসিয়া

অপরাপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাঙালীর সহিত প্রতিবেশীর মত বসবাস করিতেছে। নিজস্ব গ্রাম হইলে গ্রামের মোড়ল স্বজাতির মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতে পারে, কিন্তু মালপাহাড়িয়াদের এই স্বত্ব বহু গ্রামেই লুপ্ত হইয়াছে। জীবিকানির্বাহের জন্যই হউক, অথবা এক গ্রামে এইরূপ নবাগত জাতি বাহাতে গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা অধিক বিস্তার লাভ না করে গ্রামবাসিগণের এই স্বত্বের ফলেই হউক, মালপাহাড়িয়ায় সাঁওতাল-পরগণা ব্যতীত বাংলা দেশের বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাংলা দেশে বিগত আদমশুমারীতে ১১,৭৮৯ মালপাহাড়িয়া পাওয়া গিয়াছে।

মালপাহাড়িয়া ধর্ম এখন ইহাদের আদিম ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম, উভয় ধর্মেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঈষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনের পাকুড় স্টেশন হইতে পশ্চিমে গোড্ডা পর্যন্ত একটি মোটামুটি সরল রেখা অধুনা 'মালে' এবং 'মালপাহাড়িয়া'দের বিভাগস্থল। এই সরল রেখাটির উত্তর হইতে গঙ্গার উপকূল পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটি মালেদের বাস এবং এই রেখাটির

দক্ষিণ ভাগ মালপাহাড়িয়ারদের রাজ্য। যে-সকল মালপাহাড়িয়া এই রেখার সন্নিকটে থাকে তাহাদের মধ্যে 'মালে'দের প্রভাবই অধিক এবং এই অঞ্চলের কৃষ্টি-বৃন্দ সমাজতন্ত্রের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। সমাজের চক্ষে একে



গ্রাম-দেবতা ও জাঙা গোঁসাই (মালে)

গ্রাম—কুজুবোনা

অপরকে যথেষ্ট হীন চক্ষে দেখে, অথচ বিবাহের পদ্ধতি এক উভয়ের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদানও চলিয়া থাকে। একই দেবতা—সভা হইলেও দেবতার রোষের ভয় যায় না পাছে কখন কি অনিষ্ট হয়, অথচ যে দেবতাকে গোথাদক মালেরা পূজা করে তাহারা তাকে পূজা করে কিরূপে? দেবতাটি কাঠের একটি স্তম্ভমাত্র; তাহার পার্শ্বে একটি লম্বা বাঁশ বাঁধা—এই হইল আদি দেবতা। ইহাকে 'মালে'রা পূজা না করিয়া কোন কাজই করে না, কিন্তু মালপাহাড়িয়ারা ত ঠিক আর এইটিই পূজাই করিতে পারে না—তাই তাহারা বাঁশটি বাদ দিল—মালতো 'জাঙা গোঁসাই' নাম 'বুড়ন যানে' পরিবর্তিত হইল। কৃষ্টি-বৃন্দের প্রভাব এই পর্য্যন্তই—অন্তরের দেবতা অন্তরেই রহিল, বাহিরে তাহার রূপের পরিবর্তন হইল মাত্র। এই জাঙা গোঁসাই অতি নিরীহ দেবতা—লোকের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল করেন

না, কিন্তু যে-সকল দেবতা কিছু দিন পর পর হাস, মুরগী, পায়রা না পাইলে তুষ্ট থাকেন না তাহাদের পরিবর্তন করিতে এই মালপাহাড়িয়ারদের কোন সাহস হয় নাই—এই জন্য যে-সকল গ্রামে এই মালপাহাড়িয়ারা একেবারে বাঙালী হইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্বদা এমন একজন লোক থাকে, যে এই আদি বর্কর দেবতাগুলির পূজা করিয়া তাহাদের রোষ নিবারণ করিতে পারে।

মাহুষ যখন সর্বাস্ত্রংকরণে এবং ঘোড়শোপচারে দেবতাকে ডাকিয়া কোন প্রত্যক্ষ ফল পায় না তখনই দেবতার ঠাই আর অটল থাকিতে পারে না; আপন আপন দেবতাদের ফাঁকি সহজেই ধরা পড়ে এবং অপর এক ধর্মের দেবতা এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। 'মালে'দের মধ্যেও তাই বহু দেবতার ঠাই বিলুপ্ত হইয়াছে* আর মালপাহাড়িয়ার মধ্যে কালী, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীদের আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হিন্দু দেবদেবীদের পূজার জন্য মালপাহাড়িয়ারদের মধ্যে



বুরন খান। গ্রাম—কেরোছলি, পাকুড়

এখন হিন্দু পুরোহিতের প্রচলন হইয়াছে। হুমকা শহর হইতে প্রায় এগারো মাইল পূর্বে গান্দো নামক একটি গ্রাম আছে এবং এইখানে এক জন মালপাহাড়িয়া রাজা বাস করেন। এই রাজার সম্পত্তি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট

* বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০; রাজমহলের পাহাড়িয়া ধর্ম, পৃ. ৬৯৯-৭০৪।

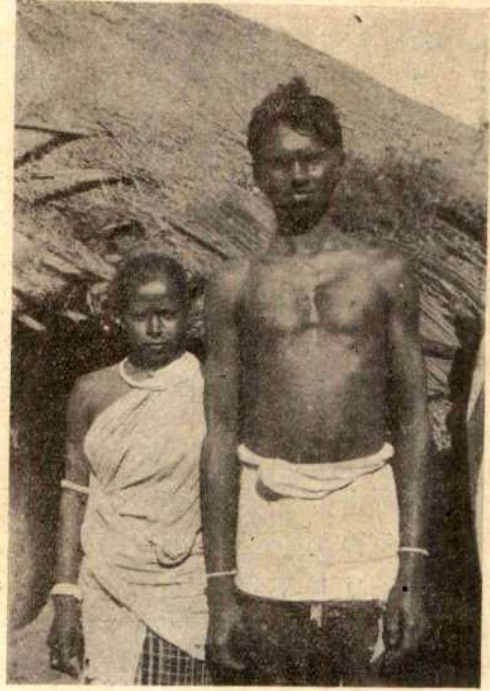
অফ ওয়ার্ডসের হস্তে আসে ; সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৩০,০০০ টাকা হইবে। এত বড় সম্পত্তি এই মালপাহাড়িয়াদের হস্তে কিরূপে আসিল তাহা আশ্চর্যের বিষয়। ছমকা জেলা আপিসের পুরাতন নথিপত্র আলোচনা করিলে এই বিষয়ে কিছু জানা যাইতে পারে। নথিপত্র সমস্তই ফার্সীতে লিখিত।

এই গান্দো-রাজবাণীতে কয়েকটি হিন্দু দেবদেবীর পূজা মহাসমারোহে হইয়া থাকে। রাজবাণীর সম্মুখে একটি বিরাট অঙ্গনে এই সকল পূজা হয়। একটি হিন্দু পুরোহিত এই পূজা করেন এবং তাঁহার উপর পূজার মধ্যে বতটুকু হিন্দুর কর্তব্য সেইটুকুর ভার থাকে। মালপাহাড়িয়া কৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া হিন্দু দেবদেবীদেরও কিছু পরিমাণে মালপাহাড়িয়া হইতে হয়। রাজবাণীতে ভূর্গা, কালী, সরস্বতী ও শিব পূজা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেবীর মূর্ত্ত-মূর্ত্তি স্থানীয় কুন্তকার দ্বারা করাইয়া পূজা করা হয়। এই স্থলে এই সকল হিন্দু দেবীদের পূজার মধ্যে মালপাহাড়িয়া অনুষ্ঠানগুলির আলোচনা করিব—

(১) ভূর্গাপূজা—মালপাহাড়িয়াদের মতে দেবী প্রথমে কুন্তকারের গৃহে আগমন করেন, পরে ডোমের গৃহে এবং পরে সপ্তমীর দিন বিষ্ণুবৃক্ষের নিম্নে আসেন। এই দিনের নাম ‘বেলগন্ধ’। এই দিন প্রাতঃকালে আর একটি দেবীকে পাহাড় হইতে আনা হয়। ইহারাইহাকে ‘পাতিঠাকুরাণী’ বলে এবং ভূর্গার নন্দ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। হরিদ্রা ও ধাত্তের চারা, একটি ডালিমের শাখা, দুইটি বেল এবং অশোক পুষ্প—এইগুলির সমষ্টিতে পাতিঠাকুরাণী প্রস্তুত হয়। পাতিঠাকুরাণীকে ভূর্গার বামদিকে বসান হয় এবং বসাইবার সময় একটি লালগান্ধারী শাকের চারা ও একটি কুমড়া বলি দেওয়া হয়। অষ্টমীর দিন ছাগবলি হয় এবং অপরাপর পূজাপাঠ হিন্দু পদ্ধতিতেই চলে। এই সকল পূজায় ধাত্তমদ ব্যবহৃত হয় না—বর্ষের দেবতাদের পূজায় এই সুরার প্রচুর প্রয়োজন হয়। হিন্দুপূজায় পশুবলিই প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। হিন্দুপূজায় সাধারণ মালপাহাড়িয়া খাদ্যাদিও ব্যবহৃত হয় না—পূজা সমাপন না-হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই উপবাস করিয়া থাকে।

কালীপূজার মধ্যে পশুবলির সংখ্যাই অধিক দেখা যায় এবং হিন্দু অনুষ্ঠানই প্রতিপালিত হয়।

সরস্বতী পূজার আবার মালপাহাড়িয়াদের নিজস্ব কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের মধ্যেই এই পূজায়



মালপাহাড়িয়া সম্পত্তি। গ্রাম—কোরাছলি, পাকুড়

আত্মমুকুল এবং যবের শীষের প্রয়োজন হয় ; কিন্তু মালপাহাড়িয়ারা ইহার উপর আরও কয়েকটি শাখা ও মুকুল প্রদান করে। আমন ও শালের নূতন শাখা দেওয়া হয় এবং ইহা বাতীত নিম্নলিখিত পুষ্পগুলি না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না। টগর, শাল, অশোক, ভাঁট, পিয়াল এবং ধংকী * ফুলের প্রয়োজন হয়।

চৈত্র মাসে শিবপূজা হয় এবং ইহাদের বিশ্বাস, এই মাসে শিব ও ভূর্গার বিবাহ হইয়াছিল। শিবলিঙ্গের মত কতকগুলি শিলাখণ্ডে এই পূজা হয়।

মালপাহাড়িয়াদের নিজস্ব দেবতাগুলি • ইহাদের ভৌগোলিক বিভাগের জন্ত দুই ভাগে বিভক্ত করা

* ধংকী ফুলের বাংলা নাম ইহাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই।

হইয়াছে। ইতিপূর্বে এই ভৌগোলিক বিভাগের কথা বলিয়াছি।

(ক) পাকুড় মহকুমা এবং পাকুর-গোড্ডা সংযোগস্থল

(১) রাক্ষসী থান :—ইহা একটি মালে দেবতা। গ্রামে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইলে এই দেবতার আরাধনা করা হয়। সিন্দূর দ্বারা একটি ব্যাঘ্রের আকার করিয়া গভীর বনের মধ্যে এই পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও মালপাহাড়িয়ারা ইহাকে গ্রামদেবতা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

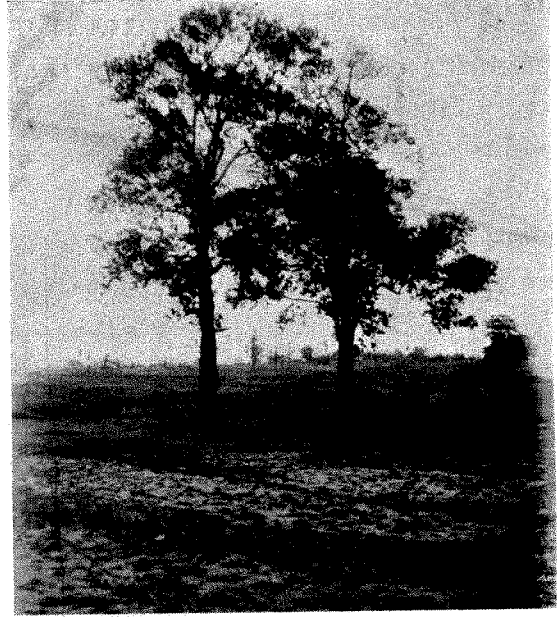
(২) কালী থান : মাঝি থান : বা বৃড়ন থান :—মাঝি থান হইল মালে দেবতার নাম। গ্রামের মোড়লের বাড়ির পার্শ্বে এই দেবতার স্থান প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম মাঝি থান। কোন কোন মালপাহাড়িয়া কালী দেবীর উপর গ্রামের মঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়া কালী থান গ্রামদেবতার সহিত সংশ্লিষ্ট। বৃড়ন থান সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

(৩) জাহির থান বা চালদই থান, এবং বোকা-পাহাড়ী :—ইহাও একটি মালে দেবতা। সাঁওতালেরাও জাহির থানের পূজা করে। বন, পাহাড় প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া এই দেবতা ইহাদের মধ্যে পরিচিত। ফাল্গুন মাসে শাল বৃক্ষের ফুল ফুটিলে এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা এক প্রকার শস্ত-দেবতা (harvest deity) বলিয়া মনে হয়। পাকুড় মহকুমার মালপাহাড়িয়ারা বোকা পাহাড়ী নামক দেবতাটির আবিষ্কারক। এখানকার মালপাহাড়িয়ারাও ইহাকে বনদেবতা বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহার পূজাপাঠ নূতন শস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ইহাকেও এক প্রকার শস্ত-দেবতার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৪) সিংমানী :—এই দেবতাটি মালপাহাড়িয়ারদের নিভস্ব দেবতা। বৎসরে দুইবার এই দেবতার পূজা হয়—একবার বর্ষাকালে আর একবার শীতকালে। একটি প্রস্তরফলকে এই দেবতার ঠাঁই প্রস্তুত হয় এবং ইহাকেও হিন্দু দেবতার মত পশুবলি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে হয় এবং ছাগ ও মহিষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণিবলি নিষেধ। সিংমানী শব্দটি সিংবাহিনী (সিংবাহিনী) শব্দের অপভ্রংশ। মালপাহাড়িয়ারা, বিশেষতঃ জুমকা মহকুমাবাসীরা, দুর্গাকে এই

নামে ডাকিয়া থাকে। পাকুড় মহকুমার মালপাহাড়িয়ারদের মধ্যে দুর্গাপূজার প্রচলন নাই বটে, কিন্তু জুমকার এই দেবতার নামটি আসিয়া পড়িয়াছে। পাকুড় মহকুমায় সিংমানীও শস্ত-দেবতারূপে পূজা হইয়া থাকে।

(৫) জোক :—গ্রাম রোগমুক্ত করিতে হইলে এই



ধারতী বহুমতী থান। গ্রাম—গান্দো, জুমকা

দেবতার পূজা করিতে হয়। নদীর তীরে দুইটি হাস অথবা পায়রা, কয়েকটি মোরগের ডিম এবং সিন্দূর দ্বারা এই দেবতার পূজা হয়।

(৬) কুরি আড্ডা ও শিব গোসাই :—কেবল মাত্র পাকুড়-গোড্ডা সংযোগস্থলের মালপাহাড়িয়া গ্রামে এই দেবতা দুইটির সন্ধান পাইয়াছিলাম। ইহারাও ‘মালে’ দেবতা। কুরি আড্ডা এক প্রকার গ্রামদেবতা এবং গো মহিষ প্রভৃতি পশ্বাদির আপদে শিব গোসাইয়ের পূজা হয়। এই মালপাহাড়িয়া গ্রামখানিতে এই দুইটি দেবতার স্থান ছিল না, তবে গ্রামবাসীরা তাহাদের আপদে এই দেবতার স্মরণ করিতে ভুলিয়া যায় না।

(খ) জুমকা মহকুমা।

(১) মাড়ো :—মালপাহাড়িয়ারদের মধ্যে বিবাহকালে

বরপক্ষ কতাপক্ষের গৃহে যাত্রার পূর্বে এই পূজা করিয়া থাকে। দুমকা মহকুমা ব্যতীত অন্ত কোথাও এই দেবতার নাম শুনি নাই। 'মালে'দের মধ্যে এই সময় রাঙ্গি দেবতার পূজা হয়। দুমকার মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে মালপাহাড়িয়া পুরোহিত কেবল এই পূজা করিতে পারে।

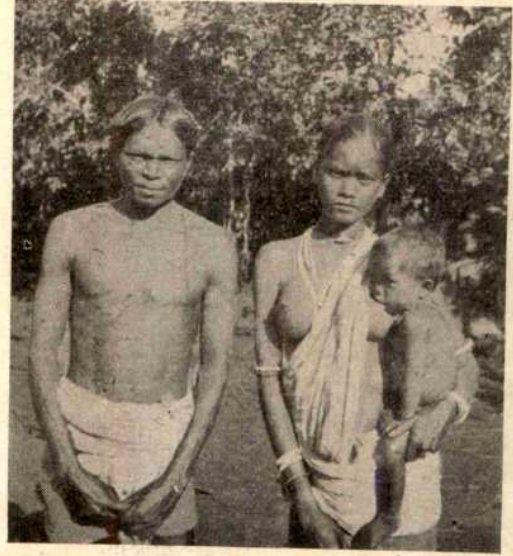
তিন শ্রেণীতে সারি সারি নয়টি খুঁটি পোতা হয় এবং এইগুলির মধ্যের খুঁটিতে এই পূজা করা হয়। খুঁটিগুলির মধ্যে এক্রপ বিস্তৃত স্থান রাখা হয় বাহাতে ইহার মধ্যে নৃত্যবাদ্য প্রভৃতি চলিতে পারে। পূজার সময় সাধারণতঃ একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়।

(২) সূর্য্যদেবতা :—মালপাহাড়িয়ারা অধুনা প্রতি রবিবার সূর্য্যপূজা করিয়া থাকে। পূজার সময় বে-সকল পশু বলি দেওয়া হয় তাহাতেই এই পূজার বিশেষত্ব। মুখে বে-কয়টি পশুর কথা প্রার্থনা করা হয় বলি দিবার সময় তাহার দ্বিগুণ দিতে হয়।

(৩) ধারতী বহুমতী :—ধারতী অর্থে ধরিত্রী বুঝায়। মাঘ এবং আষাঢ় মাসে যখন বীজ বপন করা হয় তখন এই দেবতার পূজা করা হয়। মালপাহাড়িয়া পুরোহিত এই পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া এই পূজা করা হয় এবং সাধারণতঃ পক্ষীই এই পূজার্থে বলির জন্ত ব্যবহৃত হয়। দুইটি শালবৃক্ষের নিয়ে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। 'মালে'রা এই পূজা গ্রাম-দেবতার নিকট করিয়া থাকে।

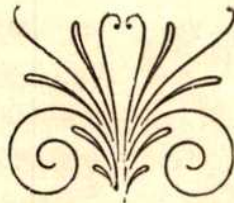
মালপাহাড়িয়াদের কোন এক ধর্ম-বিশেষের মধ্যে বিভক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। কয়েক বৎসরের মধ্যে হয়ত সমস্ত

জাতিটি হিন্দু ধর্মের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। কৃষ্টি-সংঘর্ষে পড়িয়া আপন বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে লোপ পাইতেছে; সভ্যতার চাপে মালপাহাড়িয়াদের সামাজিক অবনতি ঘটয়াছে, সমাজে নানা প্রকার জর্নীতি দেখা দিয়াছে।



মালপাহাড়িয়া দম্পতি। গ্রাম—কেরোহুলি, পাহাড়

নূতন গোত্রস্থাপনের ফলে স্বগোত্রে অন্তর্বিবাহও প্রচলিত হইয়াছে। ওদিকে 'মালে'রাও অনাহারে—অস্বাস্থ্যকর পাহাড়ের উপরের গ্রামগুলি ধ্বংসপ্রায়। মালপাহাড়িয়ারা আজ এই দুইটি অবস্থা হইতে মুক্ত, কিন্তু পাহাড়-জঙ্গলের ও-পারেই এই বিরাট সমতলভূমির জাতিগুলির সহিত সমান তালে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে কি ?



শব্দপ্রসঙ্গ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

হং হো, হ ম্ ভো, অ ম্ ভো ।

লৌকিক সংস্কৃতে 'সম্বোধন' অর্থে আমরা হং হো এই শব্দটিকে দেখিতে পাই। প্রাকৃতো (হেমচন্দ্র, ২.২১৭) ইহার প্রয়োগ আছে। সংস্কৃতে আছে "হং হো ব্রাহ্মণ" 'ওহে ব্রাহ্মণ!*' ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, এই আলোচ্য পদটি হ ম্ ভো (ঃ<স্) অথবা হং ভো (ঃ<স্) হইতে ভকারের স্থানে হকার হওয়ায় হইয়াছে, যেমন, বৈদিক মূল ১/গ্র ভ্ হইতে ১/গ্র হ্ হইয়া থাকে। ভ>হ প্রাকৃতো অতিপ্রসিদ্ধ; যেমন, বি ভা ন > বি হা ন। এই হ ম্ ভো শব্দটি সংস্কৃতে হ্রস্ব (দি বা ব দা ন, ৩৮৩. ৪, ৬২১. ২৬; মহা বস্তু, ৩য় খণ্ড, ২০৪.১৬, ২১৫.১) প্রাকৃত (হ্রস্ব নন্দ রী চ রি অ, অথবা 'ক হা, কাশী, ১১.২৩৪) ও পালিতে (জা ত ক, ১ম খণ্ড, ১৮৪, ৪৯৫) প্রযুক্ত হয়। পালিতে আমরা এই 'সম্বোধন' অর্থেই অ ম্ ভো শব্দও দেখিতে পাই (জা ত ক, ২য় খণ্ড, ৩)। এস্থলে হকারের খাসটা চলিয়া যাওয়ায় হ ম্-এর অ ম্-মাত্র থাকে। আবার এই হ ম্ ভো শব্দটি হইয়াছে সংস্কৃতে অ হ ম্ ভোঃ 'ওহে আমি' হইতে। কাহারো মনোবাগের জন্ত সংস্কৃতে অ হ ম্ ভোঃ বলিয়া ডাকা হয়। আমরা দেখিতে পাই, অ ভি জ্ঞা ন শ কু ত লে (পিশেল-সংস্করণ, ৪. ০. ২০) তুর্কাসা মূনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া (শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া) বলিতেছেন—"অয়মহম্ ভোঃ" 'ওহে এই আমি!' হং হো প্রভৃতির হং (অথবা হ ম্) হইয়াছে অ হং শব্দের আদিস্থিত অকারের লোপে, যেমন সংস্কৃতেই ধি< অ ধি, পি<অ পি, ব<অ ব; পালি-প্রাকৃতে তো কথাই নাই, যেমন, ব<ই ব, বি অথবা পি<অ পি, ইত্যাদি।

হ জে

সংস্কৃত নাটক- বা দৃশ্যকাব্য-সমূহের প্রাকৃত অংশে দাসীকে

বা কখনো-কখনো সখীকে* সম্বোধন করিতে হ জে এই শব্দটির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার আসল অর্থ কি? আমাদের কোশ-কারেরা বলেন 'ক জা' অর্থে হ জা শব্দ, এবং তাহারই সম্বোধনের একবচনে হ জে। আলোচ্য শব্দটির অর্থ যে, 'ক জা' তাহা তিব্বতী প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিতে পারা যায়। শ্রীহর্ষের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ না গা ন ন্দ নাটকের একখানি তিব্বতী অনুবাদ আছে। তিব্বতী ভাষায় ইহার নাম রু কু নু তু দ্ গা' ব। ইহাতে বহু স্থানে (দ্রষ্টব্য—তঞ্জুর, মদো, খে, পাতা ২৬৯ খ, ১; ২৭০ ক, ৫; ইত্যাদি) মূলের হ জে শব্দটিকে বুঝে এই শব্দ দ্বারা অনুবাদ করা হইয়াছে। বুঝে শব্দের অর্থ 'ক জা'। কিন্তু এই তিব্বতী অনুবাদের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নাই; কেন-না ইহাতে কেবলমাত্র সংস্কৃতকে অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং সাধারণতও তিব্বতী অনুবাদে তাহাই করা হইয়া থাকে। আমাদের কোশকারগণ হ জে শব্দের কোনো উপযুক্ত সমাধান দেখিতে না পাইয়া অগত্যা হ জা শব্দ কল্পনা করিয়াছেন, এক স্বামিনী ও দাসীর সম্বন্ধ মাতা ও কণ্ঠার সম্বন্ধের দ্বারা মনে করিয়া দাসীর সম্বোধনে প্রযুক্ত শব্দটির অর্থ 'ক জা' ভিন্ন আর কিছু সম্ভবতর হয় না বলিয়া উহাই ধরিয়া লইয়াছেন। বাহাই হউক, সংস্কৃতে এই হ জা হইতে হ ঙ্গ কা শব্দও কল্পিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত বাখ্যা মোটেই সন্তোষাবহ নহে। অতএব, যদি সম্ভব হয়, আরও একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা বাউক।

হ জে ইহা মূলত একটি শব্দ নহে, দুইটি ভিন্ন-ভিন্ন শব্দের যোগে ইহা হইয়াছে, হং আর জে। এখানে হং হইয়াছে পূর্বের দ্বারা অ হং হইতে, আর জে হইতেছে একটি অব্যয়। পালি ও প্রাকৃত উভয়েতেই এই জে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ কি? হেমচন্দ্র (২.২১৭) বলিয়াছেন, ইহা

* সাহিত্য দর্পণ (৬.১৯৮) অনুসারে মধ্যম শ্রেণীর পুরুষেরা পরস্পরকে এই শব্দে সম্বোধন করেন।

* সাহিত্য দর্পণ, ৬.১৫৫; দশরূপক, ২.১০৪; নাট্য শাস্ত্র, ১৭.৮৯।

“পাদ-পুরণের” জন্ত প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ কবিতার কোনো চরণ পূর্ণ কবিত্তে হইলে ইহার প্রয়োগ হয়। শুভচন্দ্র (২.১.৭৭) ও ত্রিবিক্রম (২.১.৭৬) হেমচন্দ্রেরই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পূর্বে ইহার একটা বিশেষ কোনো অর্থ ছিল, কিন্তু হেমচন্দ্রেরও সময়ে লোকেবা সেই অর্থটিকে ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই অর্থটি কি?

পালিতে নিম্নোক্ত ও তৎসদৃশ বাক্যে আমরা আলোচ্য শব্দটির প্রয়োগ দেখিতে পাই:—কালী নামে একটি দাসীকে তাহার কর্তা ডাকিতেছেন “হে জে কালি” (মজ্জিম নিকায়ে, ১.১২৬) ‘হে লো কালী’; “কিং জে দিরা উট্ঠাসি” (এ) ‘কি লো (এতটা) দিনে উট্ঠিসি?’ “ভো জে স্বং অনেকবারং মম সন্তিকং আগতা” (ধম্ম পদ—অট্ঠ কথা, ৪.১০৫) ‘ও লো, তুমি অনেকবার আমার নিকটে এসেছ’; বিশাখা নিজের দাসীকে আদেশ করিতেছেন—“গচ্ছ জে আরামং” (বিনয়পিটক, ১.২৯২) ‘ও লো বাগানে যাও।’ দ্রষ্টব্য বিমান বন্ধু—অট্ঠ কথা, ১৮৭ (“স চে জে বিহারে ঠপেছা বিসসরিতং”)। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, কেবলমাত্র “পাদপুরণের” জন্ত জে শব্দের প্রয়োগ হইত না, কারণ ইহা গদ্যেও প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বয়ং হেমচন্দ্র (২.২১৭) যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাও গদ্যেরই মধ্যে বলিয়া মনে হয়। অতএব তাহার মতে সম্ভবত ইহা পদপুরণের জন্ত (“পাদপুরণের” জন্ত নহে) একটি অব্যয় (enclitic)।

প্রাকৃত (মাহারাস্ট্রী, অর্ধমাগধী, ও জৈন মাহারাস্ট্রীতে) আমরা একটি জে শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই; অপভ্রংশে ইহার আকার হয় জি (হেমচন্দ্র, ৪.২২০)। কিন্তু এই জে শব্দের সহিত আমাদের আলোচ্য জে শব্দের কোনো যোগ নাই; কারণ, প্রথম জে শব্দটি মূলত সংস্কৃতের এ ব (> প্রাকৃত য়ে ব) হইতে ক্রমশ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারই অর্থে প্রযুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য Pischel, § 51৫০, ৩৩৬।

পূর্বে উক্ত পালি বাক্যগুলি হইতে স্পষ্ট জানা যাইবে যে, জে শব্দটিও লো প্রভৃতি শব্দের স্থায় কোনো ত্রীলোককে সাহস্রর ভাবে সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হয়। এই

জে, এবং অ হং শব্দের হং একত্র যুক্ত হইয়া হং জে অথবা হ জে।

কিন্তু জে শব্দের আসল অর্থ কি তাহা এখনো ধরা পড়ে নাই। আমরা আরও একটু চেষ্টা করিয়া দেখি। সংস্কৃতে, বিশেষত তাহার দৃশ্যকাব্যসমূহে, দেখা যায় যে, কোনো স্নেহাস্পদ বালককে জা ত (প্রা. জা দ, জা অ) ও বালিকাকে জা তে (প্রা. জা দে, জা এ) বলিয়া সম্বোধন করা হয়; যেমন, উত্তরার ম চ রি তে, ৪র্থ অঙ্কে, কৌশল্যা লবকে বলিতেছেন “জা ত কথরিতব্যং কথয়” ‘বাবা, ইহা বলা উচিত, বল’; অভিজ্ঞান শকুন্তলে ৪র্থ অঙ্কে গোতমী শকুন্তলাকে বলিতেছেন “জা দে* এসো দে* গুরু উবট্ঠিদো” ‘মা এই তোমার গুরু উপস্থিত হইয়াছেন।’ সংস্কৃতের জা তে প্রাকৃতের জা দে, জা এ। এই জা এ হইতে আকার ও একারের সম্মেলনে পালি বা প্রাকৃতের সন্ধির নিয়মানুসারে জে।

পূর্বে যেকপ আলোচনা করা হইল তাহাতে জানা যাইবে যে, সংস্কৃত জা ত ও জা তা শব্দে যথাক্রমে ‘পুত্র’ ও ‘কন্যা’কে বুঝা যায়। এখানে আমবা বুঝিতে পারি, কৌশল্যার বা হ জা শব্দের অর্থ যে, ‘কন্যা’ করিয়াছেন, তাহার মূল কোথায়। সম্বোধনের জা তে হইতে উৎপন্ন জে শব্দেরই অর্থ ‘কন্যা’, কিন্তু তাহার ঠিক ইহাই অনুসরণ না করিয়া সমগ্র হ জে শব্দটিরই ‘কন্যা’ অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংস্কৃতে জা ত ও জা তা শব্দ যথাক্রমে ‘পুত্র’ ও ‘কন্যা’ অর্থ কিরূপে প্রকাশ করে। ইহার উত্তর এই:—সংস্কৃত ভাষায় আমরা পিতাকে বলি জ ন ক (বৈদিক জ নি তা, লৌকিক জ ন য়ি তা), আব মাতাকে বলি জ ন নী (বৈদিক জ নি জী, লৌকিক জ ন য়ি জী)। এই উভয় শব্দেরই √জ ন হইতে উৎপত্তি, এবং ষৌগিক বা আক্ষরিক অর্থ ‘বিনি জনন বা জন্ম প্রদান করেন’। এখন পিতা ও মাতার নাম যদি যথাক্রমে জ ন ক ও জ ন নী হয়, তবে তাহাদের হইতে জা ত পুত্র ও কন্যার নাম যথাক্রমে জা ত ও জা তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

Pischel সাহেবের সংস্করণে সর্বত্র জা দে পদের স্থানে জা দ মুদ্রিত হইয়াছে। জানি না, ইহার কারণ কি।

মরাঠী ভাষায় “জে দেবা” ‘হে দেব’ ইত্যাদি স্থলে সসম্মানে সম্বোধন করিতে জে শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু যদিও মূলত ‘কর্তা’-অর্থে প্রযুক্ত জে শব্দের সহিত এই জে শব্দের কোনো সম্বন্ধ আছে কি না, একবারে ঠিক করিয়া বলা শক্ত, তথাপি মনে হয় ইহার উভয়েই অভিন্ন।

মরাঠীতে এই জে আব হিন্দী ও গুজরাতি প্রভৃতির জী একই, জে শব্দই জী এই আকারে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং কালক্রমে অবিশেষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে; যেমন, হিন্দীতে ‘করো জী’ (‘ওগো কর’); প্রশ্ন—‘তুমি বই গএ খে যা নহী’ (‘ওগো তুমি কি ওখানে গিয়াছিলে?’); উত্তর—‘জী হা’ (‘ওগো হা?’)। গুজরাতিতে ‘মাবে মাটে পুত্ৰ লারশো জী’ (‘ওহে আমার জন্ত বই আনিবে’)।

গে, হে গে।

মগহী ও বাঙলায় (অর্থাৎ বাঙলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের অর্থাৎ মালদহের চলতি কথায়) স্ত্রীলোকের সম্বোধনে গে শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, ‘কি গে?’ (‘ওগো কি?’)। কখনো-কখনো এই গে শব্দের পূর্বে হে শব্দও লাগান হয়; যেমন ‘হে গে মামী’ (‘ওগো মামী’)। এই গে আমাদের পূর্বে আলোচিত জে হইতেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডকার ও গকারের পরস্পর পরিবর্তন হয়, ইহা সুপ্রসিদ্ধ; যেমন, ১/গ ম হইতে জ গা ম, আর ১/জি হইতে জি গী বা। দ্রষ্টব্য Pischel, 234.

দে, হে দে।

প্রাকৃত দে একটি অব্যয় (হেমচন্দ্র, ২.১৯২); সিংহরাজ, ১৩.২৩; ত্রিবিক্রম, ২. ১. ৫৯; গুডচন্দ্র, ২. ১. ৬১)। প্রাকৃত ব্যাকরণ-সমূহে দেখা যায়, নিজের দিকে কাহারো মনোবোগ আকর্ষণ করিতে হইলে (‘সম্মুখী-করণে’) ইহার প্রয়োগ হয়। গদাধর ভট্ট হালের স ভ স ঙ্গ র টীকার (১৬, ৪৮) বলিয়াছেন যে, ইহা ‘সাম্মুখ-সম্বোধনে’ অথবা (৩৪৫) সাধারণত সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহা লিখিত হয় নাই, আব সাহিত্যেও দেখা যায় না যে, ইহা কেবল স্ত্রীলোকেরই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে। অবিশেষে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই ইহা দ্বারা সম্বোধন করিতে পারা যায়।

আমার মনে হয় এই দে আমাদের পূর্বে আলোচিত জে হইতে হইয়াছে। ডকারেব স্থানে দকার হওয়া বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন সং. (=সংস্কৃত) প্র. নে ন জি ৭, পা. (=পালি) প সে ন দি; সং. জি ৭ ৭ সা, পা. দি ব চ্ছা; সং. জা জ ল্য তে, পা. দা দ ল্ল তে; সং. জ্যো ৭ স্না, পা. দো সি না.; সং. জি হ্রা, সিং হ লী দি বা; সং. তে জ স্, সিং হ লী তে দ।

পূর্বে হে শব্দের বোলে এই দে শব্দের প্রয়োগ হে দে এই আকারে আমাদের বাঙলায় আছে; যেমন ‘হে দে হাভাতির কি’। এই বাক্যে দে স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পুরুষেরও সম্বোধনে বাঙলায় ইহার প্রয়োগ হয়; যেমন ‘হে দে ও নগরবাসী’।

হ ও, টে

প্রাকৃতে ও ভারতীয় প্রাদেশিক আখ্যাতা-সমূহে দকারের স্থানে ডকার হওয়ার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, সং. দং শ, প্রা. ডং স, বাঙলা ডাং শ; ইত্যাদি। এই নিয়মে দে হইয়া যায় ডে। এই ডে শব্দের পূর্বে হ জে শব্দের জায় অ হ ম্ অথবা অ হং শব্দের হ ম্ অথবা হং বোগ করিলে হ ও শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহা সাধারণত নীচ শ্রেণীর ব্যক্তিক সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেমন শ কু স্ত লায় (৬. ০. ২) বক্ষী পুরুষেরা জেলেদের বলিতেছেন—‘হ ও কুজিলআ’ ‘হা রে চোর’। আমাদের কোশ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হ ও একটি শব্দ আছে (ঠিক যেমন হ ও!)। ইহা নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বুঝায়। এই হ ও হইতেই সম্বোধনে হ ও। অতএব ইহা নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হ ও শব্দের সমাধান করিতে না পারিয়াই বে, হ ও শব্দ কল্পিত হইয়াছে ইহা না বলিলেও চলে।

দে শব্দ পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই দে শব্দ অব্যয় হইলে টে হইয়া যায়, অর্থাৎ দকার স্থানে টকার হইয়া পড়ে। বাঙলায় বর্তমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ও মালদহে এই টে শব্দ স্ত্রীলোকের সম্বোধনে প্রয়োগ করা হয়; যেমন ‘কি টে’, ‘আর টে’, ‘হা টে রামীর মা’, ইত্যাদি। অসমীয়াতে এই টে শব্দ স্থানে ‘টি’ দেখা যায়।



স্বর্ণযজ্ঞ

শ্রীমনোজ বসু

শশান-কালীতলার এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। চোঁহার বা জলুস,—সিদ্ধপুত্র-চুন্ননা হইয়া যায় না। রাধাচরণ সিকদার মহাশয় ভোরবেলা টেশনে নামিয়া বাড়ি আসিতে ছিলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া বর্ণনা দিলেন। দেখিতে দেখিতে কালীতলার মাঠ মানুষের মাথার ছাইয়া গেল। সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ। পরনে রক্তবাস, সমস্ত কপালটা ভরিয়া সিঁহরমাখানো, কাচের কড় ও রক্তাক্তের মালায় বুকের উপরে তিল পরিমাণ জায়গা নাই। ভক্তের দল জমায়েত হইয়া বিপুল উৎসাহে আধ্যাত্মিক আলোচনা জুড়িয়া দিল।

ধ্যান আর উহার মধ্যে টিকিবে কতক্ষণ। সন্ন্যাসী চোখ মেলিলেন। অমরনাথ অমনি সকলের আগন্তাগে গিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। তাঁর পর মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—ভৈলকন্দ চেন, বাবাঠাকুর?

সকলে হা-হা করিয়া উঠিল—ও হুকেশীর মা, পাগল ঠেকাও, পাগল ঠেকাও—

ভিড়ের মধ্য হইতে এক জন প্রোচা-গোছের বিধবা-মানুষ ছুটিয়া গিয়া পাগলের হাত ধরিলেন। কিন্তু অমরনাথ শুনিলার পাত্রই নয়। বলিতে লাগিল—দোহাই সন্ন্যাসী-ঠাকুর, জান ত বলে দাও—কোথায় পাওরা যায়। কাল-কেউটে রাত-দিন তার গোড়ায় পাহারা দিবে বেড়ায়; সে গোছের চারি দিকে তেল চুইয়ে চুইয়ে দশ-বিশ হাত জায়গা ভিজে জবজবে...

বগা-গোছের জন-হুই-তিন উঠিয়া ততক্ষণে বাড়ি খাড়া দিতে দিতে তাকে সীমানার বাহির করিয়াছে।

সন্ন্যাসী হাত নাড়িয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন এবং কেবল অমরনাথ বলিয়া নয়, হাতজোড় করিয়া সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—বাবা-সকল, মা-সকল, তোমরা বাড়ি-ঘরে যাও। আমি সামান্ত লোক, কিছু জানি নে। আজকে শনিবার, অমাবস্তা, রোহিণী নক্ষত্র—

সমস্ত হুপ্রসন্ন। একটা মন্ত কাজে বসেছি, তোমরা বাধা দিও না।—

বলিয়া নিক্কাকার মনে আবার তিনি চোখ বুজিলেন।

অশ্বখগাছের আশ্রয়ে একটি বছর-আষ্টকের ছেলে বসিয়া বসিয়া কিম্বাইতেছিল। ভিড় সরিয়া গেল, আর সে-ও কোলের কুলিটা ঠক করিয়া রাধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—বাবা।

কটমট করিয়া তাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ঠাকুর—

ছেলোটিও সংশোধন করিয়া লইল—ঠাকুর।

—হ্যাঁ, ঠাকুর—। সন্ন্যাসী কিস-কিস কবিতা তর্জুন করিতে লাগিলেন—এক-শ বার বলে দিইছি না!— কিন্তু এখন আব কিছু কথা নয়। রাত জেগে ঘুম পায় যদি, শিকড়ের ঐ ঐধানটার ঘুমিয়ে পড়।

পুনশ্চ ধ্যানস্থ হইবার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারি দিক দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, তখনও একটা লোক সাধা কাপড় মুড়ি দিয়া নদীর কিনারা বেঁসিয়া বসিয়া আছে।

—কে?

মেয়েলোক। কুণ্ঠিত পদে ধীরে ধীরে আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিল।

—এখনও বাড়ি যাও নি হুকেশীর মা?

কোমল কল্পনার স্বরে হুকেশীর মা তাঁহিয়া কেলিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—বড় কষ্ট তোর মা, প্রথম দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। ঐ পাগল বুঝি তোর ছেলে!

—ছেলে নয়, জামাই। আঁচল দিয়া চোখ রগড়াইয়া হুকেশীর মা ভাল হইয়া বসিলেন। বলিলেন—জামাই আমার মন্ত বিদ্বান। তাই দেখেই হুকেশীকে ওর হাতে সঁপে

দিই। কলেজে মজ চাকরি করত। তার পর কি হয়ে গেল। কত চেষ্টাই হচ্ছে, কিছুতে কিছু হয় না—

সন্ন্যাসী গভীর মুখে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

—কি করব মা, আমার যে নিষেধ রয়েছে। আমাব হাত-পা বাঁধা। ঝাড়-ফুক মস্তোর-তস্তোর—করিনি যে কখনও, তা নয়—চের করেছি এককালে। কিন্তু ও-সব হ'ল সিদ্ধাই, নীচের থাকের জিনিষ—

স্বকেশীর মা তখন একেবারে দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। তুমি মহাপুরুষ বাবা,—কিছু কবতে হবে না, শুধু ছুখিনী বাড়ি একটাবার পায়েয় ধুলো দিও। ওতেই মঙ্গল হবে...

মাথা তুলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া স্বকেশীর মা আবার বলিতে লাগিলেন—দয়াময়, দয়া কি হবে? সে স্তন্য না; ঐ পাদপদ্ম ছেড়ে উঠব না আমি তবে।...ঐ যে হাসছ, আমার দয়াল। কখন যাবে? ছপুরবেলা? ঐখানে আজকে সেবা হবে।

হাসিমুখে সন্ন্যাসী বলিলেন—শুধু যাব আর চলে আসব। গৃহস্থের বাড়ি আমি সেবা নিই নে।

—কিন্তু আমাব বাড়ি? সেখানে ত কোন অনাচার নেই।

সন্ন্যাসী বলিলেন—তাই কি বলা যায়?

এক মুহূর্তে স্বকেশীর মার চোখে যেন আগুন ফুটিয়া উঠিল।

—বলা যায় ঠাকুর, খুব বলা যায়। সমস্ত গ্রামের মানুষ বলবে। পঁচিশ বছর বয়সে ছ-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছি; সেও আজ বিশ-কুড়ি বছর হয়ে গেল। গ্রামস্থ মানুষকে জিজ্ঞাসা ক'বে দেখ। সবাই বলবে। তবু কিসে যে কি হচ্ছে—

একটু চুপ থাকিয়া আকুল হইয়া কাদিয়া উঠিলেন—ঠাকুর, হয় আমাব পাগল জামাই সেরে উঠুক, নয় ত স্বকেশী আমাব পাগল হবে বাক। আমি যে চোখের সামনে আর দেখতে পাবছি নে।

তখন বেশ বেলা হইয়াছে। মাঠের মধ্যে বৌদ্ধের তেজ খব হইয়া উঠিয়াছে। ওপারে কুকশিমার বিলে চাষীরা এক কোমর চাষ করিয়া ছায়ায় আসিয়া বসিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন—মা, বাড়ি বাও...

স্বকেশীর মা নিরুত্তরে উঠিয়া অস্থ-তলায় চেলা-সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। বলিলেন—তুমি সেবা না নেও ঠাকুর, আমি এই গোপালকে নিয়ে চললাম। গোপাল আমাব সেবা নেবে—

হাসিয়া কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিলেন—সেবা আমরা দুই জনেই নেব। তুই যে মহাভক্ত—তুই মুখ ভার করিস নে মা। একটি মুঠো চাল রেখে দিবি, মাত্র এক মুঠি—তার বেশী নয় কিন্তু, খবরদার। আমাব একেবারে হাত-পা বাঁধা, বড্ড কঠিন নিষেধ রয়েছে কি না...

চাল ঐ এক মুঠাই, কিন্তু ডাব-কলা-আতা-আনাবসে যখন একটা ঝুড়ি ছাপাইয়া দ্বিতীয় আর এক দফা বোঝাই হইতে লাগিল স্বকেশী কোন্ দিক হইতে দেখিয়া ছাপাইতে ছুটিয়া আসিল।

—রও, রও মা,—আমি একটা সাজাই; আমায় একটু পুণ্ডিভ ভাগ দেও। আজকে কয় নম্বর?

মা আমতা-আমতা করিয়া জবাব দিলেন—ছ-জন মোটে। একটি ত একেবারে বাচ্চা। কেমন ফুটফুটে হুন্দর। বলিতে বলিতে চোখের কোণ চকচক করিয়া উঠিল, স্বর গাঢ় হইল, বলিতে লাগিলেন—তুই অমন মোটে দেখিস নি স্বকেশী। ঠিক যেন আমাদের গোপালের মত। আজকে তুই রাগ করতে পারবি নে মা আমাব...

কিন্তু রাগ কোথায়, অকস্মাৎ আর্ন্ত অসহায়ের মত স্বকেশী কাদিয়া উঠিল।—ও মা, মা গো, তুমিও আগায় ছাড়লে! এক জনে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ক'বে সর্বস্ব ভাসিয়ে দেছে, আবার তুমি যদি ছেড়ে যাও, কার ছয়োবে যাব আমি?

—বালাই! তোর কিসেব অভাব মা?

ছেলে বয়স হইতে মেয়েব দেমাকই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজকাল সেই মেয়ে বখন-তখন এমনি কাদিয়া ভাসাইয়া থাকে। মা সকল আয়োজন ফেলিয়া স্বকেশীর চোখেব জল মুছাইতে লাগিলেন। বলিলেন—কেন মা, তোর কিসেব অভাব? আজকে সিদ্ধপুরুষ এক জন আসবেন বাড়িতে—তোরাই ভালর জন্তে—

—সিদ্ধ কচু—বলিয়া মায়ের হাত গরাইয়া দিয়া সুকেশী মুখেব উপর আঁচল চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

অতিথিরা যথাসময়ে দর্শন দিলেন। মা জল ও আসনের ব্যবস্থা করিয়া তাড়াতাড়ি উপরের ঘরে আসিয়া দেখেন, সুকেশী পরম নিকষে চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

—প্রণাম করতে যাবি নে?

—মাথা ধরেছে।

মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—সেই ছেলেটা এসেছে—

হু—বলিয়া সুকেশী পাশ ফিরিল।

—বড় চমৎকার চেহারা কিন্তু।—মা বলিতে লাগিলেন—চুলগুলো ঠিক আমাদের গোপালের মত—

খোকার কথা বলহ মা? সুকেশী উঠিয়া বলিল; চোখ দুটা ধক করিয়া জলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—ঐ গাঁজা-খেগো রোদ-পোড়া ছেলেটা আমার খোকা? হি হি, অমন কথা আর বলো না। প্রথমে একবার দেখে এলাম; আবার ভাবলাম, মা কি একেবারে মিথ্যে বলেছে? আবার গেলাম। ফিরে এসে মন বোঝে না—ফের আর একবার। অমন মিথ্যে করে আমার লোভ দেখিও না মা, গোপাল আমার আর ফিরে আসবে না—

মা চলিয়া গেলেন। তার একটু পরেই অমরনাথ আসিয়া হি হি করিয়া হাসিয়াই খুল। বলিল—মজা দেখে যাও গো, গজপুটে সাপ পাক হচ্ছে।...আমার একটা পরসা দেবে?

—কি হবে?

খরের অনুকৃতি করিয়া পাগল, কহিল—কি হবে! দেখো বিকেল নাগাত। সাপের মুখের মধ্যে একভরি পাবা। সেই পারীষ ছুইয়ে দেব, আর পরসা হয়ে বাবে সোনার মোহর। বিকেলবেলা দেখো।

স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ সুকেশী সজল কর্তে প্রশ্ন করিল—আমাদের খোকা কোথায় বল দিকি?।

—গোপাল চন্দ্রের বাবু? একগাল হাসিয়া অমরনাথ

বলিল—ঘুমুচ্ছেন বুঝি! কিন্তু খবরদার ওকে জাগিয়ে দিও না যেন। তা হ'লে আর ছাড়বে না।

সুকেশীর চোখে জল চক্চক করিতেছে, তাহারই মধ্যে হাসিয়া আবদারের ভঙ্গিতে বলিল—না, ডাকব আমি। খোকা—খোকা—

পাগল সভয়ে পিছাইয়া দরজা অবধি গেল। বলিল—ওরে বাসু রে, তা হ'লে রক্ষে থাকবে না; কেঁদে-কেটে এমন বায়না ধরবে...না না আমি চললাম। পরসাটা দাও—

সুকেশী শুনিয়া না—ওরে খোকা,—মাগিক,—গোপাল!

পরসা না লইয়াই অতি ব্যস্তভাবে অমর পলাইয়া গেল। তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুকেশী ভাবিতে লাগিল, যদি ইহা হইত, ডাক শুনিয়া খোকা তার এত ক্ষণে যদি জাগিয়া উঠিত! কোল ভরিয়া যেন খোকা ঘুমাইয়া ছিল, কত দিন কত বৎসরের পর জাগিয়া বসিয়া এই ঘর বারান্দা সমস্ত ছাপাইয়া দুপুরেব নিদ্রাঙ্গণ স্তব্ধতা মথিত করিয়া কচি অখচ হুচের মত ভীক্ষু গলার তেমনি করিয়া যদি খোকা অকস্মাৎ কাদিয়া উঠিত—মা, মা, মাগো—তবে গুর বাইতে হইত না আজ; আঙুল দিয়া সে খোকাকে দেখাইয়া দিত—ওরে খোকা, ধনু ধনু—ঐ দেখ, পালাচ্ছে...

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। মা অগ্নিমুর্ত্তিতে উপরে ছুটিয়া আসিলেন।—ওরে হারামজাদা মেয়ে, কি সর্বনাশ করেছিসু?

—কি?

—জান না কিছু? বলিয়া তিনি সুকেশীকে এক রকম টানিতে টানিতে নীচে নামাইয়া আনিলেন।

ঝুড়িভর্তি অত বে ফল, প্রত্যেকটি রসগোল্লার মত করিয়া কেরোসিনে চুবানো। ডাবের খোলেও জলের সঙ্গে অর্ধেকটা আন্দাজ কেরোসিন। সন্ধ্যাসী এক চোক মুখে লইয়া তার পর ধিল-ধিল করিয়া হাসিয়া আকুল। সুকেশীকে দেখিয়া বলিলেন—এই ক্ষেপীর কাণ্ড? আমার বড় মজা লাগে। এক বেটী ক্ষেপী ত নাকে দড়ি দিয়ে শশানে-মশানে ঘুরিয়ে মাঝে। ঘর-সংসার ছেড়ে তাবই খান্দায় সমস্ত জীবনটা গেল—

মা বলিলেন—পায়ে ধর।

অপ্রতিভ ভাব কাটিয়া হুকেণীর মুখ ক্রমশ কঠিন হইয়া আসিল। 'শুধু হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা বলিলেন—ধনু।

—কেরোসিন দিইছি, বিষ দিই নি ত? খর খর করিয়া ওষ্ঠ কাঁপিয়া ছুঁফোঁটা জ্বল হুকেণীর গাল বহিয়া পড়িল। বলিল—গোপালের নাম ক'রে কেন তুমি ঠকালে মা, তিন-তিনবার আমি এসেছি তাকে দেখতে। একবার ফিরে যাই আবার আসি।...সাদু-সন্ন্যাসীরা কত অসাধ্য সাধন করেন, শুনতে পাই। তোমার ঐ সিদ্ধপুরুষ একটা বার এক পলক তাকে দেখিয়ে দিলে ত পারতেন।

সন্ন্যাসীর হাসি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

মা'র কিন্তু অত রাগে একবারে জ্বল পড়িয়া গেল। সহসা কথা ফুটল না, তাব পর বলিলেন—কিন্তু ঐটুকু ঐ ছোট্ট ছেলে বে না খেয়ে থাকল তা-ও একবার ভেবে দেখলি নে, মা : মেয়েমানুষ হয়ে এমন নিষ্ঠুর তুই কি ক'রে হলি। ও যদি তোর ছেলে হ'ত?

হুকেণী বোমার মত কাটিয়া পড়িল।—আমার মরা ছেলের কথা বার-বার তুলো না বলছি, আমি এক্ষুনি একদিকে চলে যাব—

মা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িলেন—তুমি অভিষাগ দিও না ঠাকুর। মেয়ে আমার শোকে তাপে পাথর হয়ে গেছে। ওর মাথার ঠিক নেই।

একটি ছুঁটি করিয়া বারাণ্ডায় তখন ভিড় জমিয়া গিয়াছে। পাড়ায় আর একটি মেয়েলোক নাই। সন্ন্যাসী চেলার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হুকেণীর মা পথ আটকাইয়া দাঁড়াইলেন।—সে হবে না বাবা। আমি একদণ্ডেব মধ্যে সমস্ত আবার জোগাড় ক'রে আনিছি। সেবা না হ'লে যেতে দেব না, খুন হবে মনব।

—ঐ ত হ'ল বে—তাব পর হাসিয়া কেলিয়া সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—রাগ করি নি মা। বেদিন বরসংসার ছেড়েছি, ঐ আপদগুলোও সেদিন সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে এসেছি। আচ্ছা, এক কাজ করা বাকি বরং। আজকে দিনটা ভাল, যাবার সময় ভাড়াভাড়ি একটু হোম ক'রে দিয়ে যাই—

হুকেণীর মা কহিলেন—বেশ, ততক্ষণে আমি ওদিকে

যা'হয় শুছিরে কেলি, কিন্তু রাগেও এখানে ফিরে আসতে হবে—

—সে হবে, হবে। মা-সকল, ভাড়াভাড়ি আরোজন ক'রে দাও ত। এই—সামান্য একটু খি, দু-চার খান কাঠ...যা লাগে। আমার সময় বেশী নেই। খুব ভাড়াভাড়ি।

মা গেলেন সেবার জোগাড় দেখিতে, এদিকে ছুটাছুটি করিয়া হোমকাঠের ব্যবস্থা হইল, কুলা-ভাঙ্গি অপরাপর জিনিষ আসিল। তার এক কোণে একটা দেশলাই। সেটা হাতে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসী বলিলেন—বিলাতী আশুন। কি হবে এতে?

খাঁটি স্বদেশী আশুন আবার মিলিবে কোথায়? সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। দেশলাই ছুঁড়িয়া কেলিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এ অশুচি। এতে কাজ হবে না। আমার কাছে এ-সবের ব্যাভার নেই—

হুকেণী নিষ্পৃহভাবে একদিকে দাঁড়াইয়া ছিল, ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করিল—তবে?

সন্ন্যাসী বলিলেন—দেখতে পাবে মা-শক্তি, আগে একটু খুন্সি আর নারিকেলের খোলা আন দিকি।

মুখের কথা মুখে থাকিতে সমস্ত আসিয়া পড়িল। কৌতূহলে এতগুলি লোকের নিঃশ্বাস পড়ে কি না-পড়ে। এক জন ফিস ফিস কবিতা বলিল—মস্তোরে আশুন হবে বুঝি—

ভাচ্ছিলোর ভাবে হুকেণী বলিল—ছাই—

সন্ন্যাসী মুখ তুলিয়া আবার হাসিয়া উঠিয়া নিরুত্তরে তোড়জোড় করিয়া বলিলেন। খুন্সি, নারিকেলের খোলা হাড়ির খোলে রাখিয়া মস্ত আরম্ভ হইল। প্রথমটা ধীরে ধীরে, ক্রমে বেগ বাড়িল, শেষে আর মস্ত পড়া নয়—কথাগুলি মুখের উপর যেন টগবগ করিয়া ফুটতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মা-চণ্ডীর দোহাই—সে দোহাই আকাশ ছুঁড়িয়া মা-চণ্ডীর দেশে পৌছবার মতই বটে। কোলের ছেলে সব আংকাইয়া কাঁদিয়া ওঠে, মায়েরা হাত চাপা দিয়া কান্না ঠেকাইবার চেষ্টা করেন—ওরে, চুপ—চুপ! কিন্তু তা বলিয়া সাধ্য কি, কেহ ঐক পা নড়িয়া দাঁড়াইবে। চোখ ছুঁটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় দিয়া সন্ন্যাসী ডাকিতেছেন—দোহাই মা-চণ্ডী, দোহাই মা—

হুকেণী টিপ্পনী কাটল—কই হে ঠাকুর!

সন্ন্যাসী জবাব না দিয়া হাড়ির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বন-বন করিয়া পাক দিলেন। তার পর প্রবলতম আরও দু-তিনটা দোহাই পাড়িয়া একেবারে স্থির অচঞ্চল। ঘেন্না পাথরের মুঠি।

আর সঙ্গে সঙ্গে এদিকে বহু কণ্ঠের কোলাহল।

মানুষের ভিড়ে তখন আর তিলধারণের জায়গা নাই; যারা পিছনে ছিল, ছড়মুড় করিয়া আগের লোকের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। সত্যি হাড়ির মধ্যে মুহূর্ণা দেখা দিয়াছে। কেবল যে সত্যবুগেই মুখের কথার আশ্রয় অলিঙ্গিত, তাহা নয় তাহা হইলে। ধোঁয়া ক্রমশঃ বন হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ কি হইল—কি হইল—বলিতে না বলিতে হুকেশীর মা দড়ায় করিয়া একেবারে বাবা-ঠাকুরের পায়ে উপর।

সমাধি অস্ত্রে সন্ন্যাসী ঠাকুর মুহূর্ণা মা-মা করিতে লাগিলেন। একটু একটু করিয়া আবার সহজ মানুষ। হাড়িতে আশ্রয় গন-গন করিতেছে। সন্ন্যাসী চারিদিকে একবার সগর্ভ দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন; একটা যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এমন গোছের একটু হাসি মুখের উপর।

হুকেশীর মা তখনও পড়িয়া; যেন তার সম্বন্ধ নাই। মাধার মুহূর্ণা করাবাত করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ওহু, বেটী, ওহু...এই একবিদ্য একটু ছিটেফোঁটা—এতেই অরাক হোস...আর সে রক্তাকতের যে তল নেই। কত মণিমাণিকা হাকর-কুমীর তার কোলে পাশাপাশি রয়েছে, কিছু তার অবধি আছে?...

এবারে হোম আরম্ভ হইল। সে-ও নিতান্ত সহজে সমাধা হইল না। বেলা একেবারে ডুবিয়া গেল। যাবার মুখে হুকেশীর মা পুনশ্চ মনে করাইয়া দিলেন—বাবা, আসবে ত রাত্তিরে?

—হ্যা—

—তুমি—এ হোমের ফোঁটা দেও একটা হুকেশীর কপালে; একটু মাধার হাত রেখে ওকে আশীর্বাদ করে যাও। আর হতভাগী—

কিন্তু কোথায় সে! কখন-যে সরিয়া পড়িয়াছে। মা চীৎকার শব্দে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—হুকেশী, হুকেশী!

হুকেশী এদিকে একেবারে টিলে-কোঠায়। সে অনেকক্ষণ পলাইয়া আসিয়াছে, সন্ন্যাসী মন্ত্রবলে যখন আশ্রয় জলাইয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন ঠিক সেই সময়। একা নহে—আনিবার সময় দেখে, রোয়াকের উপর বাচ্চা সন্ন্যাসীটি কঙ্কণ শুক মুখে বসিয়া আছে—ইসারা করিয়া ডাকিতেই ছেলোট দালানের মধ্যে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি গো ধোকা-ঠাকুর, ভোগে যুৎ হয় নি?

মারিয়া কেলিয়াও আবার মড়ার উপর খাঁড়া চালায়; ইহার কথার জবাব কি? হেলোট চোর ছুটি, তুলিয়া কাঁদ-কাঁদ ভাবে হুকেশীব মুখে দিকে তাকাইল।

এবার নরম হুঁরে হুকেশী প্রশ্ন করিল—বিদে পেয়েছে?

—হ্যা—

—তুই গাঁজা খাস?

হাত-মুখ নাড়িয়া তাড়াতাড়ি ছেলোট সাফাই দিয়া উঠিল—না-না মা, কক্ষনো না।

—মা বললে আমি ভিজি নে, আমার মায়াদিয়া নেই—কক্ষ ভৎসনার কণ্ঠে হুকেশী বলিতে লাগিল—কে শিখিয়ে দিয়েছে, বল শীগু গির। ও তোদের ব্যবসাদারী ডাক—দশ ছয়োরে মেঙে খাস ও ব'লে ডেকে—না।

আবার নতুন করিয়া রাগের পাত্র হইয়া ছেলোট ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত হুকেশী শুক হইয়া তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া—হঠাৎ হিড়হিড় করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া, রান্নাঘরে পিড়ির উপর তাকে বসাইয়া দিল। তার পর নিজের হাতে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল—খা।

যেই মাঝ বলা-অমনি অরম্ভ। আর খাওয়া ত নয়, টপটপ করিয়া কোনগতিকে গোপ্রাসে গিলিয়া ফেলা। ঘেন্না কে আসিয়া কাড়িয়া লইয়া বাইবে, তার আগে যতটা বোঝাই করিয়া লওয়া যায়। চুপ করিয়া করিয়া হুকেশী ক্ষুধিত-বালকের খাওয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়িল আঁচল দিয়া মুছিয়া প্রশ্ন করিল—নাম কি তোরা?

—রতন।

—মা বেচে নেই?

রতন বাড় নাড়িয়া সন্ধেতে জানাইল—নাই। হাত ও মুখ সমানে চলিয়াছে, বাবংবার অত কথা বলিবাব ফুরসৎ কোথায়?

—বাবা?

বড় একটা গ্রাস কোঁৎ কবিয়া গিলিয়া ছেলোট জ্বাব দিল—হুঁ—উ—উ—

—তবে এই চুলোয় মরতে এসেছিস কেন?

ইহার সহুত্তর দেওয়া কঠিন। অস্তুতঃ হুঁ—হা করিয়া দু-এক কথার দিবার নয়। সভয়ে বতন মুখ তুলিল। এই অপরাধে পুনশ্চ কেরোসিন-ভোগের ব্যবস্থা না হইয়া যায়।

হুকেশী বলিল—এই চেলোগিরি এখন থেকে ছেড়ে দিবি, বুঝিল?

যাক—রক্ষা! রতন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচিল; বাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

—ঠিক ত! না মিথ্যে বলছিস?

—হ্যাঁ—বলিয়া রতন আবাব সজোবে বাড় নাড়িল

ঠিক এমন সময় চট ফট ফট করিতে কবিত্তে অমরনাথ।

—ঘরে আছ, ও হুকেশী?

—এস, এস—ছুটিয়া সে আগাইয়া গেল। বলিল—এই তিন পহর বেলায় মাখার এক 'কোঁটা' তেল জল পড়েনি যে...হায় আমার কপাল! একটু তেল মাখিয়ে এক ফট জল ঢেলে দিয়ে ভাল করে মুছে-টুছে দিই আমি...লজ্জাটি, দেব?

অধীৰ উত্থক্ত কণ্ঠে অমরনাথ বলিল—না, না, না,—সময় কোথায়? পাক শেষ হয়েছে, হাড়ি নামিয়েছি, কিন্তু পারদভঙ্গ্য খুঁজে পাচ্ছি নে। তাড়াতাড়ি একখানা আসন বিছাইয়া বসিয়া বলিল—চট ক'বে দাও ত চারটি। বড় খিদে পেয়েছে।

আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া স্বামীকে খাইতে বসাইয়া হুকেশী বাতাস করিতে লাগিল। দু-এক বার মুখে দিয়াই হঠাৎ অমরনাথ চিন্তিত মুখে খাওয়া বন্ধ করিল।

হুকেশী বলিল—কি?

জ্বাব নাই, সে যেন অস্ত্র এক জগতে।

হুকেশী ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—ওগো, কি হ'ল বলবে না আমার?

অমরনাথ বাব-করেক আপন মনে মাথা নাড়িল।

বহিল—পাবা পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ভাবছি—...সাপের দাঁড়ায় যদি লেগে থাকে। হুঁ—তাই-ই।

ভাত ফেলিয়াই সে উঠিল। হুকেশী খপ করিয়া হাত ধরিয়া বলিল—সাপ নিয়ে খাঁটাখাঁটি করতে আমি দেব না তোমায়—

—সেদ্ধ-করা মরা সাপ যে। হা-হা করিয়া অমরনাথ হাসিতে লাগিল। বলিল—জান্ত যখন ছিল তখনই ছিল ভয়। তখন কি আর টের পেয়েছ?...কিন্তু এত পারা দিলাম, এক কোঁটাও ত পাইনে—

এক মুহূর্ত চুপ থাকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আবার কহিতে লাগিল—শোন হুকেশী, দু-এক আনাও যদি পাই খুঁজে, একটু ক'রে লাগাব পয়সার গায়ে, আব পয়সা হয়ে বাবে বকবক মোহর। কপ্তিপাথবে ঘষে দেখবে, একেবাবে পাচ্চা সোনা। তব্বের কথা—তোমাব আমার নয়—। হাত ছেড়ে দাও, আমি যাই—

বার-কয়েক টানাটানি করিয়াও হাত ছাড়াইতে পারিল না। হঠাৎ পাগল হুকেশীর চোখাচোখি হইয়া টিপিটিপি হাসিতে লাগিল। বলিল—হুকেশী, দেখনহাসি, এ কাণ্ডখানা কি বল দিকি।

—মনে আছে? মনে পড়ল নাকি? আনন্দে হুকেশীর মুখ জলজল করিতে লাগিল। বলিল—কত দিন অমন ক'রে আমার ডাক নি বল ত? আর সেই যে কি ছাইভঙ্গ ব'লে ঠাট্টা কবতে...

—বলব? দেখবে, বলব? কৌতুকদীপ্ত চোখে মুখ ঘুরাইয়া সেই কতকাল আগেব মত অমরনাথ সুর ধরিল—

ও হুকেশী, দেখনহাসি,—জালো-ও-বাসি-ই-ই গো...

মুখ কিরাইয়া হঠাৎ ছিঃ ছিঃ কবিয়া সে থামিয়া গেল। জিব কাটিয়া বলিল—সর্বনাশ! ছেলের সামনে—

বতন তখন খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাগলে তাহার বড় ভয়। এমন-তেমন দেখিলে পিছনের দরজায় চম্পট দিবে এই মতলব। হুকেশীরও তার কথা মনে ছিল না। অপ্রভিত মুখে তাড়াতাড়ি সে স্বামীর হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ বলিতে লাগিল—বেশ তুমি বা হোক।

গোপাল চন্দ্রের বাবু ওদিকে পিটপিট ক'বে তাকিয়ে
রয়েছেন আর তুমি তার সামনে...বলিতে বলিতে
মুখ-চোখের ভাব কেমন এক অদ্ভুত ধরণের হইয়া উঠিল।
ব্যাকুল হই বাহু প্রসারিত করিয়া সে রতনের দিকে
ছুটিল—

—এস, এস,—মাণিক এস, সোনামণি এস। ভয়
কি রে পাগল্যা? সোনার লাটিম গড়িয়ে দেব, সোনার
বাটের ছাতি—। রতন ততক্ষণ এক ছুটে একেবারে ঘবের
বাহির।

অমরনাথ ধপ করিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া
হতাশ কণ্ঠে হুকেশীর দিকে চাহিয়া বলিল—এল না।

হুকেশী বলিল—আর আসবে না। পাগিয়ে গেছে।

—কোথায় গেল?

অশ্রুজ্বল কণ্ঠে হুকেশী বলিতে লাগিল—অনেক, অনেক
দূর। কত দেশ-বিদেশ ছাড়িয়ে বাতাসে মিশে সে চলে
গেল, আর আসবে না।

—কেন?

—তুমি তাকে ভালবাস না।—তুমি কেবল সোনা
সোনা ক'বে বেড়াচ্ছ, তার দিকে ফিরেও চাইতে না। তাই
সে রাগ ক'রে গেছে। আর আসবে না।—অশ্রু ঝর ঝর
করিয়া হুকেশীর গাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল। বলিতে
লাগিল—সে নেই, সে আর আসবে না। তুমিও
ভুলে গেছ। একা আমি থাকি কাকে নিয়ে?

—না আসে না-ই এল। বয়ে গেছে। হা-হা করিয়া
উদ্গাদ হাসিবে স্রোতে অমরনাথ ঘব কাটাইতে লাগিল।
বলিল—হৃৎ কিসেব হুকেশী? খোকা গেছে, তোমার
আমি সোনার খোকা গড়ে দেব—একেবারে পাকা সোনা,
কষ্টিতে ক'বে দেখো—

টলিতে টলিতে পাগল বাহির হইয়া গেল।

হুকেশী তখন রতনকে খুঁজিয়া আনিয়া একেবারে চিলে-
কোঠায় গিয়া দিল। বাক্স খুলিয়া খোকার পোষাকের
বোকা টানিয়া আনি। তিন বৎসর আগে খোকা গিয়াছে,
তিন বৎসর ধরিয়া সমস্ত পাটে পাটে সাজাইয়া বাঁধা—সে
জামা রতনের গায়ে কুলায় না, তবু টানিয়া ছিঁড়িয়া হুকেশী
অধীৰ আগ্রহে সমস্ত পরাইতে পাগিল। বলিল—সব

‘তোমার—সমস্ত। আরও কত দেব। তুই এখানে থাকবি—
বুঝলি?

রতন বলিল—হ্যাঁ।

—সন্ন্যাসীবা সব ঠক জোঁচোব। ভাল মানুষকে পাগল
ক'রে দেয়—ওদের পিছনে ঘুরে মানুষ ঘর-সংসার উচ্ছন্ন ক'রে
দেয়। ওদের সঙ্গে যাবি নে—বুঝলি?

রতন বলিল—হ্যাঁ।

এমনি সময়ে—হুকেশী! হুকেশী!

উপর-নীচে মা চীৎকার শব্দে ডাকিয়া বেড়াইতেছেন।

পোষাক খুলিতে রতনের মন সরে না। হাসিয়া
হুকেশী বলিল—কি পাগল তুই! এ গায়ে লাগে নি—
সবাই যে হাসবে। আমি তোমাকে নতুন নতুন কত
পোষাক কিনে দেব, বাবা। এ-ও থাকবে। চল, নীচে
যাই।

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ চোখে একবার হুকেশীর দিকে চাহিলেন,
তার পর রতনকে প্রশ্ন করিলেন—কোথায় ছিলি রে বেটা?

—মার কাছে।

সে হুকেশীকে দেখাইয়া দিল।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—তা বুঝেছি।
অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উজাড় করছিলে। কম পেটুক তুমি!
কিন্তু এদিকের সে সব—

—সমস্ত ঠিক আছে ঠাকুর?

—উত্তরসাধক?

রতন বলিল—হুঁ।

—শব? কবোটি? কাবণবাঁবি?

রতন বলিল—সমস্ত জোঁগাড় আছে, উত্তরসাধক
সে সব সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন।

সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন। উঠিয়া
দাঁড়াইয়া বলিলেন—আর বেলা নেই—চল বেটা।...
কিন্তু মায়েরা এদিকে কি মুস্থিলে ফেলেছেন দেখ। আমি
বলছি, এ সমস্ত কি হবে—

সামনে নৈবেদ্যের মত করিয়া সাজানো খান-পঞ্চাশেক
সিধা—বারকোশের উপর চাল ডাল তরকারী দু-একটা

পয়সা—ঠিক যেমনটি হইতে হয়। পাড়ার গৃহিণীরা সমস্ত সাজাইয়া গুছাইয়া চারি পাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—এ সব কি দরকার, মা-সকল? আজ যে বেলা নেই—নইলে মার কুপায় একদানা চাল না রেখে তোমাদের এই কয়জনকে ভর পেট প্রসাদ পাইয়ে দেওয়া যায়—

বলিতে বলিতে আড়চোখে একবার শূকেশীর দিকে চাহিলেন; সে-মুখে ব্যঙ্গের হাসি নাই—প্রত্যয় বা অপ্রত্যয় কোন ছবিই ফুটে নাই।

সন্ন্যাসী কাশিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—খবরের কাগজ পড় না মায়েবা? সেই সেবার রাজশাহীতে খড়ম-পায়ে পদ্মা পার হওয়া...লাটিসাহেব কাগজে তুলে দিরাইছিল—হাজার দশ হাজার মানুষ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, বড় দারোগা, নৌকো, ষ্টীমার সব কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে।...তাই বলি মা-সকল, ও-সব আমি নেব না—তোমরা বাড়ি চলে যাও।

কিন্তু ইতিমধ্যে রতন হাত পাতিয়াছে, মায়েরা সিঁধাব পয়সাগুলি ভুলিয়া ভুলিয়া দিতেছেন। দেখিতে পাইয়া সন্ন্যাসী চোক পাকাইয়া বলিলেন—কি হচ্ছে?

রতন আবদার ধরিল—আমি পয়সা নেব ঠাকুর।

—নেও বাবা, তাই নেও। যে-কজন বাকী ছিল, তাড়াতাড়ি তাহারিও রতনের হাতেব মধ্যে পয়সা গুজিয়া দিল।

সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া উঠিলেন—শোভী, অর্ধাটীন,—

কিন্তু তিরস্কারে শিশু বাগ মানে না; তেমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একবার সন্ন্যাসীর দিকে চায়, একবার আর সকলের দিকে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—ওরে বেহায়া, সেদিন অমনি হাত পাতলি—হু-হাত ভর্তি করে দিলাম না?

বতন বলিল—সে তৌ সোনার পয়সা ঠাকুর, এ বকম পয়সা আমার একটাও নেই—

রাগ ভুলিয়া সন্ন্যাসী অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—বলিস কি হতভাগা! চণ্ডীর কাছে আমার পয়সা চাইতে যাব? লজ্জা করে না আমার? সেই—সেই আদায়ই যদি করতে হয়—শ্রেফ সোনা—

—সন্ন্যাসী-ঠাকুর, সোনা করতে পাব তুমি?

হঠাৎ সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। কখন বে ইহাব মধ্যে অমরনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কেহ তাহা দেখে নাই। হঠাৎ সে ভীত আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, মুখে হাসিব বিদ্রোহ জলিতেছে, মেয়েদের ঠেলিয়া সবাইয়া সে আগাইতেছে আব বলিতেছে—সোনা কবতে জান তুমি? ঠিক তুমি তৈলকন্দের গাছ চিনেছ তা হ'লে। সাপের মুখে পারাভয় হয় না—সমস্ত ধান্না—আমি মিছে খেটে মবেছি—

এত কথা একটাও ধেন কানে যায় নাই এমনি ভাবে ধীরে হুস্বে আপন মনে সন্ন্যাসী রতনের হাত ধরিয়া চলিলেন। একবার বেগার দিকে চাহিয়া বলিলেন—একদম সন্ধ্যা হয়ে গেছে রে—চল, চল—

পিছন হইতে শূকেশীর মা ডাকিলেন—আসবেত ঠাকুর? —আসব। বড় শক্ত বাঁধনে বেঁধেছিলাম! ভক্তিব বাঁধন। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে তিনি অদৃশ্য হইলেন।

মাঠ ছাড়াইয়া গ্রাম ছাড়াইয়া নির্জন নদীকূলে গিয়া বতন ডাকিল—বাবা!

—চুপ! চুপ!—চারিদিকে তাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—বল, ঠাকুর। মানুষ নেই,—তাতে কি? ও অভ্যেসটাই খারাপ। কোন দিন মানুষের মধ্যে ডেকে বসবি।

রতন কল্প কণ্ঠে বলিল—না, তা ডাকব না, আজকে একটু ডাকি। উপরে নিয়ে গিয়ে আমার আজ কত জিজ্ঞাসাবাদ করলে, বলে—তোব বাবা কোথায় থাকে? আমি বললাম—কোথায় কে জানে?

—বেশ, বেশ! সন্ন্যাসী খুব বাহবা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—আজকে সমস্ত ঠিকঠাক হয়েছে, একটাও ভুল হয়নি। তবু কাজ কি, তুই ঠাকুর বলেই ডাকিসু।

নিঃশব্দে কয়েক পা গিয়া আবার সন্ন্যাসী কথা বলিলেন।

—এত লোকে বাবা বলছে, আর তুই বললেই যে সর্বনাশ হয়, তা নয়। কিন্তু তোর ডাকটা যে অল্প এক রকম—আমারই গোলমাল লেগে যায়। ঐ চেলা আছিল বেশ

আহিস—এই ভাল। কি জানি, কে কি ভাবে—যে দিনকাল হয়েছে...

বৈচিৎর, বাশ, সারি সারি গোটা তিন-চার ছাতিস গাছ। সেইখানে জঙ্গলের মধ্যে বাপ ও ছেলে চুরি করিয়া বসিয়া রহিল।

সেদিনের সেই অমাবস্তার অন্ধকার রাত্রে আকাশ ভরিয়া মেঘ করিয়া আছে, একবিদ্যুৎ বাতাস নাই, গাছের পাতাটি নড়ে না। সুকেশী ঘুমাইতেছিল, ঘুমের মধ্যে শুনিতে লাগিল গুন-গুন করিয়া গান হইতেছে—

ও সুকেশী দেখনহাসি,—ভাল-ও-বাসি-ই-হোগো—

মাথা হইতে পা পর্যন্ত তার থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোখ বন্ধ আছে, কিন্তু সে দেখিল, অস্পষ্ট ছায়ার মত এক-খানা মুখ—সে মুখ হুলিতে হুলিতে কাছে—খুব কাছে—তার চোখ দুটির চুল-পরিমাণ ব্যবধানে এক-একবার আসিয়া দাঁড়ায়—আবার ভাসিয়া চলিয়া যায়। ঘুম ভাঙিয়া কতবার সুকেশী উঠিয়া বসে—তখন আর মুখখানি নাই, গানের গুঞ্জন নাই, কিছু নাই—নীরন্ধ্র অন্ধকার, শূন্য বিছানা। চোখ বুজিতেই সঙ্গে-সঙ্গেই আবার—ও সুকেশী ও সুকেশী। মনে হইতে লাগিল, যেন এই রাত্রে জানালা দিয়া কত স্রোতস্রা আর কত বকুলফুল তার বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে!

খুব ভোরবেলা, অল্প অল্প অন্ধকার আছে, কেহ কোন দিকে জাগে নাই। সন্ন্যাসী কেবল খট করিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিলেন, অমনি সুকেশী স্বপ্নমূর্তির মত সামনে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াইল।

—সন্ন্যাসী-ঠাকুর, শশানে-শশানে ছোট ছেলে নিয়ে যেতে আছে—আর অমন রাত্রিবেলা?

সন্ন্যাসী অবাক হইয়া চাহিলেন।

সুকেশী বলিল—রতন তোমার সঙ্গে আর কোথাও বাবে না। ও এখানে থাকবে।

—কেন?

—ও আমার ছেলে।

বাড় নাড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—দেবী চণ্ডিকা ওকে

গ্রহণ করেছেন। ওর জন্মের রাশি-নক্ষত্র বড় চমৎকার। ওকে তুমি পাবে না মা।

ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া সুকেশী প্রশ্ন করিল—পাবে না?

দৃঢ়কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন—না। কোন আশা নেই। আমার চিরজীবনের সবস্তু সাধনা ওর উপর নিয়োগ করেছি। ঐ ছোট ছেলে দেখছ—কিন্তু ও ক্ষণজন্মা, অমৃত।

স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া, হঠাৎ মর্শ্বেদী আকুল কণ্ঠে সুকেশী বলিয়া উঠিল—তবে আমার গোপালকে এনে দাও।

সন্ন্যাসী বলিলেন—বঁসা তুমি মা।

রোয়াকের চাতালে সন্ন্যাসী বসিলেন, নীচে সুকেশী। ভোরের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া বহিতে লাগিল; মেঘ আর বড় বেশী নাই, প্রায় স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন—গোপাল—তোমার ধোকা?

মান ছলছল চোখে সুকেশী বলিল—শত্রুর। তিন বছর আগে চলে গেছে। সে-ও গেল,—উনিও ছন্নছাড়া। তারপর এই দশা। এক সন্ন্যাসী এসে সোনা-তৈরির খেয়াল ধরিয়ে দিল, এখন রাত-দিন কেবল বনে-জঙ্গলে—আর সন্ন্যাসী দেখলেই তার পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ান। সে থাকলে উনি কি অমনি ক'রে সর্বস্ব ভাসিয়ে দিতে পারতেন?

সুকেশী আঁচলে মুখ চাকিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—মৃত্যু অমোঘ, ওর হাত থেকে ভ্রাণ নেই। কেউ তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না মা—

—তবে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। সুকেশী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—সন্ন্যাসী-ঠাকুর, উনি ত বেঁচে আছেন, আবার ওকে আগেকার মত ক'রে দাও—

হতীক্ষু দৃষ্টিতে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস আছে তোমার?

সুকেশী বলিল—না। কিন্তু বিশ্বাস আমি করব। তা ছাড়া উপায় যে নেই। আমার কেউ নেই, একলা আমি থাকি কি ক'রে?

গর্জিতা নারী কান্নার ভারে আবার ভাঙিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ধীর পায়ে মাঠের মধ্য দিয়া চলিলেন। অনেক দূর অবধি গেলেন, আবার ফিরিলেন। এমন কতক্ষণ পায়চারি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার বথাস্থান বসিলেন। বলিলেন—তোরা ছেলের গায়ের সোনা বগনা চাই একটা কিছু—

—কেন ?

—ভেঙে ফেলব।

সুকেশী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—শোন তবে। ষড়রিপুর কাম প্রথম, ক্রোধ দ্বিতীয়, লোভ তৃতীয়, আর মোহ হ'লগে চতুর্থ। তোর স্বামীর সন্তান-মোহ বড় প্রবল ছিল। তাকে বড় স্নেহী ভালবাসতেন। নয় ?

সুকেশী মাথা নাড়িল—ঠিক।

—সেই মোহ এখন তৃতীয়ে পৌঁচেছে—লোভ, স্বর্গ-লোভ। এ কিছু অশুভ ব্যাপার নয়। 'ঈড়া আর সুঘুমার উপরে চৌধক প্রক্রিয়ায় বহির্ভেদ হয়েছে। এখন বিষম বিব্রমোষণম্'। সেই যে সন্তান-মোহ তারই অভিজ্ঞান-স্বরূপ তোর ছেলের গায়ের সোনা দিয়ে স্বামীর ঐ ভয়ানক স্বর্ণলোভের প্রতিক্রিয়া হবে। বুঝতে পারলি কিছু ?

সুকেশী বলিল—কিছু না।

সন্ন্যাসী মুহূ হাসিয়া বলিলেন—অশ্চর্য্য নয়। এ-সব গুহাৎ গুহতব। কেবল ঐ গহনা নয়, সিকি ভরি সিঁহুর চাঁদ, কপিশমূল—তালের ছটা, মোছবর—সে সমস্ত আমি গুছিয়ে নেব। সিঁহুর আর ঐ সমস্ত কারণবাবিহে গুলে তার মধ্যে সোনা ফেললে একদম মিলিয়ে যাবে।

—এক দম যাবে ? কোন চিহ্ন থাকবে না ? একটু খানি বাঁকা হাসি সুকেশীর মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী শাস্তকণ্ঠে বলিলেন—অবিশ্বাস হইত কাজ নেই।

—না-না। সুকেশীর মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। বলিল—আমার মনই এই রকম ঠাকুর, তুমি কিছু মনে ক'রো না। বিশ্বাস এবার আমাকে করতেই হবে। ডাক্তার, কবিরাস্ত্র, ককির, অবধূত, কালী, শীতলা, বেটু, মাকাল কিছু আব বাকী নেই। হাজর হাজার টাকা খরচ হয়েছে, একটা গয়নাব আর কি-ই বা দাম ? কেবল গোপালের গায়ের জিনিষ—তাই—

এতক্ষণে রতন উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সকল ব্যথা ভুলিয়া সুকেশী ক্ষিপ্র হাসিয়া উঠিল। তার মাথায় হাত বুলাইয়া মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কত রাজে এসেছিলি ? খাওয়া হ'ল কি না, আমায় ত একটা বার ডাকলি নে তুই রতন ?

সে কিছু না বলিতেই সন্ন্যাসী আগেভাগে বলিয়া উঠিলেন—মহাভক্ত তোমার মা। তিনি ভ্রমেরে ছিলেন, তাঁর সেবার কি কোন ক্রটি আছে ? তোমার ঘুম ভাঙাবে ও কি হুঃখে ?

সরল প্রশান্ত দৃষ্টি সন্ন্যাসীর মুখে স্থাপিত করিয়া সুকেশী বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, সন্ন্যাসীতে আমার বিশ্বাস নেই ;—কিন্তু রতন আমাব সন্ন্যাসী নয়, সে আমায় কাল বলেছে, তোমার অনেক ক্ষমতা। গোপালের গয়না চাও, যা চাও—দিচ্ছি, ওকে আবার তেমনটি ক'রে দাও, ঠাকুর।

ছেলের হাতের এক গাছি বালা আনিয়া তাঁর পদপ্রান্তে রাখিয়া সুকেশী প্রণাম করিল।

সেইদিন গভীর রাজে আনন্দের আতিশয্যে রতন আবার ভুল করিয়া ডাকিয়া বসিল—বাবা !

ব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এখন নয়, এখানে থাকতে নয়—

উজ্জ্বল মুখে রতন বলিতে লাগিল—গয়না কিন্তু আমাব—

—আচ্ছা।

—দাও তবে—।

—না, না—এখানে নয়।

রতন বায়না ধরিল—একটিবাব দাও শুধু আমি দেখে বেথে দেব—

সন্ন্যাসী বলিলেন—অন্ধকারে দেখবি কি'রে ?

—হাত বুগিয়ে দেখব।

বুগির মধ্য হইতে বালা বাহিব করিতেই হইল, না করিলে শোনে না।

সন্ন্যাসী বলিলেন—একটা রন্ধি পচা পোষাক, তোব

গায়ে পরিবেশ দিল সেদিন তাও তুই নিতে পারলি নে।
আর দেখ দিকি—আন্ত সোনার গয়না—কত ভারী
দেখেছিল?

রতন তখন গহনা পরিবার প্রাপণ চেষ্টায় আছে।

শেষে হতাশ হইয়া কহিল—হাতে ঢোকে না যে—

সন্ন্যাসী কহিলেন—ছোট্ট ছেলেব জিনিষ; চুকবে
কেন? বড় ক'রে দেব—

—মোটো এক হাতের হ'ল—

—আর একটা গড়িয়ে দেব।

নিশ্চিন্ত হইয়া শিশু তখন চোখ বুজিল। হাতের মধ্যে
বালাগাছি। সন্ন্যাসী লইতে গেলে কিছুতে দিল না।
ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মুঠি তবু ছাড়ে নাই।

তার পর দিন-তিনেক কাটিয়াছে। স্বপ্নাভিত সিঁহুর
প্রস্তরের নানাবিধ প্রক্রিয়া চলিয়াছে, সমাধা হইতে অতি
সামান্যই বাকী, আব একটা দিন মাত্র লাগিবে। ভক্তের
নিরীক্স ইতিমধ্যে সেবার বিষয়ে সন্ন্যাসী একেবারে হাল
ছাড়িয়া বসিয়াছেন, এক মুষ্টি চাউল লইয়া প্রথম দিনকার
মত জেদাজেদি আর নাই। দিনে রায়ে প্রহরে প্রহরে
নিরুপজব সাধুসেবা চলিতেছে। আজিকার রাত্রিটা
কাটািয়া আগামী দিন অতি প্রত্যাশে সন্ন্যাসী সুকেশীকে
সিঁহুর পরিয়া দিবেন, সিঁহুর পরিয়া সে গিয়া স্বামীর
সম্মুখে দাঁড়াইবে—সমস্ত ঠিকঠাক।

ছপুরবেলাটার হুজনে এক সঙ্কল পরামর্শ হইতেছিল,
এমন সময় অমরনাথ একেবারে দৌড়িতে দৌড়িতে
আসিল। কোটরের মধ্যে হইতে জবাফুলের মত চোখ
ছুটি টিকরিয়া বাহির হইতেছে, লম্বা লম্বা কক্ষ চুলগুলি সজ্জার
কাটার মত ঝাড়া, কেশ সুদীর্ঘ ডান হাত সন্ন্যাসীর মুখের
উপর তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল—তৈলকন্দের গাছ চেন
কি না বলে দাও—

সন্ন্যাসী বলিলেন—না।

মহাক্ষুদ্র হইয়া অমরনাথ কহিল—তবে যে বললে
সেদিন, মুঠোমুঠো সোনা তৈরি করেছ—

সন্ন্যাসী বলিলেন—তৈরি কোথায়?—চণ্ডী-মা দিলেন।

—মিথ্যে কথা। চণ্ডী-মা বাতাস থেকে দিলেন
না কি? স্বরপঙ্কায় পঙ্কায় চড়িতে লাগিল।—বাতাসে
সোনার গুড়ো ভাসে, তাই চণ্ডী-মা অমনি হাতের উপর
ধরে দিলেন। সোনার স্পেসিফিক প্রাতিটি কত জান?

সন্ন্যাসী চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু পাগল খামিল
না। বলিল—তুমি নিশ্চয় জানো তৈলকন্দ। কালকেউটে
সাপ রাতদিন সে গাছের গোড়ায় পাহারা দিয়ে বেড়ায়।
এমনি তাব বিষ, ছুঁচ বিধলে ছুঁচটা অবধি গলে মল হয়ে
যায়। ঠিক চেন তুমি—বলতে চাও না। কিন্তু আমি
ছাড়ব না।

বজ্রমুষ্টিতে সে সন্ন্যাসীর হাত ধরিল। রোগা লোকাট,
কিন্তু গোয়ে যেন অসুরের বল। হাতের কনুই অবধি
কড়-কড় করিয়া উঠিল।

—ওকি? কি কর—কি কব বলিতে বলিতে, সুকেশী
মাঝখানে আসিল। একক্ষণে অমরনাথ—সুকেশীকে
দেখিল। সন্ন্যাসীর হাত ছাড়িয়া দিল; আর সে মাফ
নয়, অকস্মাৎ হাহাকাব করিয়া উঠিল—হ'ল না সুকেশী।
সেই সাপ সিদ্ধ হ'ল কিন্তু পাবাভঙ্গ হয় নি। কাঁচা-পারা
জলের নীচে সব তলানি পড়ে রইল, কোন কাজে এল
না।

মাথায় হাত দিয়া সে বসিয়া পড়িল। বলিল—এ সমস্ত
বজ্রকণী সমস্ত প্রক্ষিপ্ত। আসিল হচ্ছে স্বপ্নভঙ্গ। কিন্তু
তৈলকন্দ যে চেনা গেল না। তিন বছর কনবাদাড়ে
ঘুরেছি, কত বেটা সন্ন্যাসী আশা দিয়েছে শেষে-পালিয়ে
গেছে। একে আমি ছাড়ব না কিছুতে।

আবার পাগল কথিয়া উঠিল। তাহাকে টানিয়া
পাশে বসাইয়া অনেক করিয়া সুকেশী শান্ত করিল। ভয়ে
হুঃখঃ সুকেশী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

—ভাল করতে গিয়ে এ আমার কি হ'ল, সন্ন্যাসী?
উনি নিজের মনে বলে বলে জঙ্গল বাঁটনে, মা-খুশী
করতেন—আজকে এ কি ভয়ানক রাগ।

সন্ন্যাসী সপ্তাভিত হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—
এ ত মজা, নিববার আগে অশোণটা দূপ-দগিয়ে জলে।
তৃতীয় বিপুল লোভ এবারে খিঁচীয়ে পৌছল। একোখ
আর কি-ই বা? এমন দেখেছি, খুনখারাপি কবতে যায়—

শান্ত মানুষ খুনের কথায় আবার লাফাইয়া উঠল
চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—আমিও খুন কবব
শীগ্গির তৈলকন্দ ব'লে দাও—নইলে জান থাকবে না—

গতিক আরও ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। বণ্টাখানেক
পরে দড়াম করিয়া দরজায় লাথি। চকচকে একখানা
বলির খড়্গ হাতে পাগল বরের মধ্যে আসিয়া লাফাইতে
লাগিল।

—গর্দানে একটা কোপ...ব্যস! বলিয়া হা-হা
করিয়া ছাত কাটাইয়া হাসি। বলিল—বলে দাও
শীগ্গির—

রতন সেখানে ছিল, আকুল চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল।
যে যেখানে ছিল, আসিয়া পড়িল। সুকেশী আনিতেই
ভালমানুষের মত তার হাতে ধাঁড়। দয়া পাগল হাসিয়া
বলিল—ঠাট্টা করছিলাম।

—কিন্তু ভাল কথা নয় মা। সন্ন্যাসীর মুখ শুকাইয়া গিয়া
এতটুকু; তাহারই মধ্যে একটু হাসির মত ভাব করিয়া
বলিতে লাগিলেন—আজকেব দিনটা ওকে শিকল দিয়ে
রাখ। একেবারে গোড়া ধরে টান দিয়েছি কি না, তাই
অমন। মস্তের ফলটা হাতে হাতে দেখে নাও।

—ছাই মস্তোব, মিথ্যে কথা। পাগল চোখ পাকাইয়া
উঠিল। বলিতে লাগিল—ঠাকুর, অনেক ঠকেছি। জবু-
খবু বুলিয়ে পালিয়ে যাবে—সে হচ্ছে না। রাতে আনি
ঘুমুই নি—তিন বছর ঘুমুই নি। ভাল চাও ত ব'লে দাও—
আর নয়ত একশ কুচি ক'রে রেখে যাব, কেউ ঠেকাতে
পারবে না—

বাস্তবিক, ঠেকানো মুশ্কিল। সুকেশী নিবস্ত করিতে
গেলে মাথা ঝাঁকাইয়া পাগল বলিয়া উঠিল—বলহ কি,
সুকেশী। ও জানে, তবু বলবে না। আমি থাইনে, ঘুমুই নে
—খোকা মরল চোখের দেখা দেখি নি—বর-সংসার সমস্ত
ভুলে গেছি—চাকরি ছাড়লাম,—পাগল হলাম—। কেবল
একটু...একটু...একটুখানি—সামান্য এতটুকু কান্ন—এ
গাছটা মাত্র বাকী। সন্ন্যাসী জানে, তবু বলবে না।

আর পাগলের প্রলাপ নয়, আগাগোড়া কাহিনী এমন
করিয়া বলিয়া বাইতেছে যে চোখের জল রাখা দায়।

সুকেশী মা সন্ন্যাসীর পায়ের উপর পড়িয়া মাথা কুটিতে
লাগিল—বাবা তুমি সমস্ত জান ব'লে দাও। বাছা
আমার সেরে উঠক—তুমি আমাদের বাঁচাও—

পাগলও আসিয়া নতজানু হইয়া মিনতি করিতে লাগিল
—ব'লে দাও—ব'লে দাও—

সন্ন্যাসী সুকেশীর দিকে চাহিলেন। করুণ সজল
চোখে সে চুপ করিয়া ছিল, সেও আসিয়া পায়ের উপর
পড়িল—ঠাকুর, আমি সমস্ত বিশ্বাস করি। তুমি আমাকে
বাঁচাও—ওঁকে ব'লে দাও—

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমরনাথকে ডাকিলেন—এস
আমার সঙ্গে—

হৃদয়ে সমস্ত বিকাল বনে বনে ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর এক
বোঝা গাছ-গাছড়া লইয়া উত্তরেব কোঠায় অধিষ্ঠান করিল।
তারপর দাউ-দাউ করিয়া উনান জলিল। পাত্তের উপর
জল ফুটিতেছে। ঘরে মাত্র একটা মিটমিটে আলো।
রাত্রি ক্রম গভীর হইল। জল টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।
আবহা অন্ধকারে উনানেব উপর বড় বড় ফুলকী উঠিতেছে।
গাঢ় নীল জলের বর্ণ। উগ্র কটু গন্ধে ঘরের বাতাস বিবের
মত লাগিতেছে।

আশ্বিনের তাপে অমরনাথের সর্কাজে ঘামের ধারা
চলিয়াছে। চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এইবার?

সন্ন্যাসী বলিলেন—সবু।

চারিদিকে আবার নিঃশব্দতা, কেবল আশ্বিনে ও কুটস্ত
জলে মিলিয়া একটা অদ্ভুত ধরণের ক্ষীণ আওয়াজ।

আবার খানিক পরে সন্ন্যাসী জলন্ত একখানা চেলাকাঠ
তুলিয়া আর একবার পাত্তের ভিতরটা দেখিলেন।

—এখন?

ঘাড় নাড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—উহ—

অমরনাথ অধীরকণ্ঠে কহিল—একেবারে শুকিয়ে গেল
কখন তবে?

—শুকোক। সন্ন্যাসী নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—
শুকিয়ে এক বিবৎ থাকবে, তখন কটাকরি দিয়ে তার
পর—

অমরনাথ নিবিষ্ট মনে কাঠি দিয়া জল মাপিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী টিপি-টিপি নিজেব ঘরে গিয়া ঘুমন্ত রতনের কাঁধে হাত দিলেন।

—ওরে রতন, ওঠ—বেটা, ওঠ—

বতন বার-হুই উ-উ কবিল, কিন্তু উঠবার লক্ষণ দেখাইল না। তখন সন্ন্যাসী হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। মূর্তির ভিতর সেই সোনার বালা, রোজ রাতে শুইবার সময় বালা তার চাই। ঠক করিয়া বালা মেজের উপর গড়াইয়া পড়িল।

মুহু পায়ের শব্দ।

মুখ বাড়াইয়া সন্ন্যাসী আবছা দেখিলেন, ঠিক দরজাব কাছে অমরনাথ চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিস্ত কণ্ঠে কহিলেন—আবাব এই অবধি ধাওয়া করেছ? বিকেল থেকে এক পা আগ-পাছ হ'তে দিচ্ছ না—বাপাবটা কি?

—না না ঠাকুর, তা নয়। ঘরের মধ্যে আসিয়া অমরনাথ দুই হাতে সন্ন্যাসীর পদখুলি মাখাষ লইল। হাসিয়া বলিল—অনেক ঠেকেছি কি না...ঘাবার সময় সাধু-মশাধরা প্রায়ই পায়ের ঘুলো না দিয়ে চলে যান... তাই—

উত্তরের কোঠায়-ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী কাঠি ডুবাইয়া জল মাগিয়া মুখ বিকৃত কবিলেন। বলিলেন—যা ভেবেছি তাই। এক বট বেশী শুকিয়েছে। দোষ তোমাব বাপু। পই পই ক'রে বললাম,—ফটকিরি না কলে তুমি আমার ডাকতে গেলে কেন?

—এতে হবে না?

সন্ন্যাসী বলিলেন—অসম্ভব।

—বেশ! তাতে কি? এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া অবিচল মুখে অমরনাথ পাত্র উপড় কবিয়া ঢালিল। তখনই পুনরায় চড়াইবাব উদ্যোগ। একটু ক্লান্তি নাই, একটি সেকেণ্ড তার নষ্ট করিবার উপায় নাই, এমনি ভাব।

সন্ন্যাসী দরজায় পা বাড়াইয়া বলিলেন—এবার আমার বিশ্রাম।

—আর একটু। বলিয়া পাগল পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। আবার সন্ন্যাসীর পায়ের খুলা লইয়া বলিল—ঠাকুর, সোনা যখন চকচক করবে ঐ জলের নীচে, বিশ্রাম-ট্রাম তখন...তার আগে পা বাড়ালে বাঁড়া দিয়ে দুই ঠ্যাঙে

দুই কোপ। বলিয়া উদ্দাম হাসিতে হাসিতে বলিল—ঠাট্টা করলাম, ঠাকুর—মিছে কথা।

ঠাকুর কিন্তু আবার স্বস্থানে ফিরিয়া কাঠ হইয়া বসিলেন। তখন আকাশে শুকতারা দপদপ করিতেছে, পূর্বাকাশে বক্তিম আভা। বিশাল পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া আবাব জল ঢড়িল। হিসাব করিয়া সমস্ত উপকরণ পরিমাপ করিয়া অমরনাথ জলের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

সকালবেলা সুকেশী আসিয়া সে ঘবে চুকিতেই সন্ন্যাসী হাসিলেন—অনেকটা কান্নার মত হাসি। বলিলেন—আজও সমস্ত দিন ছুটি নেই মা, এই সিদ্ধি হ'তে রাত্তির হয়ে বাবে। তত ক্ষণ এই ঘরে আটক।

বাড় কাৎ করিয়া হাসিমুখে আবদাবেব ভক্তিতে সুকেশী বলিল—না-না, আমি নিরে বাচ্ছি। আমাব একটু দরকার আছে। লক্ষ্মিটি, বাবে?

অমরনাথ হাসিয়া বলিল—খুব-খুব! তুমি ওঁর কথা বিশ্বাস কবলে, সুকেশী? সমস্ত ঠাট্টা—

বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী হাঁপ ছাড়িলেন।

সুকেশী বলিল—আমার সিঁহুর?

—কালকে ভাবে। আজই হ'ত, কিন্তু সমস্ত রাজি যে ছাড়লে না। না আব নয়, নেহাৎ ছাড়বে না যখন, আজই দেব সোনা ক'রে। কাল সকালে দেব তোর ভৈববী-সিঁহুর। তার পব তোদেব সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখে বিদায় নিয়ে চলে যাব—

সুকেশী বলিল—হবে ত ঠাকুর? সত্যি বলচ, হবে? তাব চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল। বলিল—ভাঙা কপাল, বিশ্বাস হ'তে চাষ না...আমাব গোপালেব গয়না কি ভেঙে ফেলেছ?

সন্ন্যাসী বলিলেন—হ'।

গাঢ়স্বরে সুকেশী বলিল—যেন সিদ্ধি হয় ঠাকুর। বড্ড সুখে ছিলাম, এখন আর কিছুই নেই। গোপাল নেই—তাব গয়নাও দিয়ে দিলাম—ওঁকে বেন ফিরে পাই।

নিঃশব্দে মাথায় হাত দিয়া সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। জল টগবগ ফুটিতেছে,

অমরনাথ নিম্পলক সেই-দিকে তাকাইয়া সারাদিন যায় নাই, তিলাকি উঠে নাই। এবারে রড় সাবধান; কিছুতেই কোন ক্রটিতে যাহাতে পণ্ড না হইতে পারে। সন্ধ্যাসীকেও সমস্তটা দিন একরকম ঠায় বসাইয়া রাখিয়াছে, উঠিবার চেষ্টা করিলে দেয়ালে-টাঙানো চকচকে সেই খাঁড়িখানা দেখাইয়া এমন ঠাট্টা করে যে উঠিতে ভরসায় কুলায় না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি হুকেশীকে ধব-দিয়া আনাইয়া সন্ধ্যাসী বলিলেন—আমার জন্তা নয় মা, আমার এই সমস্ত অভ্যাস আছে। যেমন কবে পার চারটি ওব মুখে দিবে দাও, নইলে অনর্থ কববে। যত্ন করে বুঝিয়ে-হুজিয়ে বস। আজকে শেষ-মুখ, তাই বড় বাড়াবাড়ি। খুব সাবধান আজকের দিনটা।

হুকেশী অনেক বলিয়া-কহিয়া অমরনাথকে খাইতে বসাইল। সেই বরেই—যব হইতে এক পা আজ সে নড়িতে পারিবে না। কয়েক প্রাস মাত্র মুখে পুবিয়াছে, সন্ধ্যাসী কাঠি দিয়া নীল জল নাড়িতেছিলেন, হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—দাও—ফটকির দাও এইবার—

অমরনাথ খাওয়া ফেলিয়া লাকাইয়া উঠিয়া ফটকিবির গুঁড়া লইয়া বসিল।

জল শুকাইতে লাগিল। হুকেশীর মাথা ছুটিয়া আসিয়াছেন, রতন আসিয়াছে, এতগুলি চোখের দৃষ্টি ঠিক করিয়া খাইতেছে। হুকেশীব বুকের মধ্যে এমন চিব-চিব কবিতেছে, যদি—

এমনি সময়ে জল শুকাইয়া পাত্রের মধ্যে ধকমক করিয়া উঠিল—

সোনা! সোনা! সোনা!

প্রকাণ্ড পাত্রটি অমরনাথ সিংহের বিক্রমে মেজের উপর উগুড় করিয়া ফেলিল। অল্প জল একপার্শে গড়াইয়া গেল—পড়িয়া রহিল ছোট একটি সোনার তাল হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, অমরনাথ তাড়াতাড়ি কটিপাথর লইয়া দু-তিনটা টান দিল। রেখাগুলি বিছাটের মত পাথরের গায়ে জ্বলিতে লাগিল।

সোনা!

সে চীৎকারে তাব হৃৎপিণ্ড বুঝি-বা কাটিয়া যায়। হালকা একটা পুটলীর মত সন্ধ্যাসীকে কাঁধের উপর

বসাইয়া অমরনাথ সারা বাড়িময় তাণ্ডব নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তারপর শান্ত হইল যখন, অমরনাথ একেবারে মুহু-স্বাভাবিক মানুষ।

সে-রাত্রে সে-অঞ্চলে যত কিছু মিলিতে পারে, সমস্ত দিয়া সন্ধ্যাসীর সেবা হইল। অমরনাথ স্নান করিল, তেল মাখিল, ফরশা জামা পরিল, দিবা সহজ মানুষের মত হাসিয়া আনন্দ করিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া খাইল। তার পর আবার ধীরে ধীরে উত্তরের কোঠার দিকে চলিল দেখিয়া হুকেশীব মা সময়ে প্রশ্ন করিলেন—ওদিকে যে?

সন্ধ্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া অমরনাথ বলিল—বাবা থাকতে থাকতে আর একটা জাল চড়িয়ে দিই গে। প্রক্রিয়াটা পাকাপাকি শিখে নেওয়া দরকার—ভুলচুক না থাকে। এবারে একেবারে শখানেক ভরির মত ব্যবস্থা করা যাক—

মা-তবু মুহু আগন্তি তুলিলেন—রাতিরটা থাকলে হ'ত। বাবা ত থাকবেন এখানে, আমি ছেড়ে দেব না।

—ক'দিন থাকেন ঠিক কি, আর একবার দেখিয়ে শুনিবে নেওয়া ভাল। দেরি কবা কিছু নয়—

অমরনাথ চলিল। পিছন হইতে হুকেশী বলিল—আমি যাচ্ছি গো, আমিও শিখে নেব। মাও হাসিয়া সজ ধরিলেন। একটি পাগল ছিল, সোনার এখন সবগুচ্ছ পাগল করিয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যাসী ক্রান্তকণ্ঠে বলিলেন—কিন্তু আমি যাব না। আমি বিশ্রাম চাই—

হুকেশী কাছে আসিয়া করজোড়ে মিনতি-করিতে লাগিল—একটুখানি,—আরম্ভটা বড় গোলমেলে শুনেছি। শুধু ঐটে আপনি দেখিয়ে দেবেন। এবারে আমি শিখে নিতে চাই।

সন্ধ্যাসী ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—ভৈরবী-সিঁহুর?

হুকেশী বলিল—থাক গে।

সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া কাজ শুরু করিতে দুপুর রাত্রি হইয়া গেল। অমরনাথ প্রণাম করিয়া কহিল—স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়ুন গে, বাবা। যদি আটকায় কোন জায়গায়, তখন না-হয় ডেকে নিয়ে আসব।

হুকেশীর মা আজ আর শোবার তদারক করিতে আসিলেন না, বলিয়া দিলেন—কম্বল-টম্বল পাতা আছে। আলো জ্বালা আছে। আমি বাব খানিকটা পরে। দেখে আসি এদের কাণ্ডকারখানা—

বলিয়া তিনিও ফুটন্ত জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী ঘরে আসিয়া দেখিলেন, ছুটি বিছানা পাতা—একটিতে রতন ঘুমাইয়া। নিজের বিছানার কম্বলটি তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইয়া রতনকে টানিয়া তুলিলেন।

ঘুমচোখে রতন বলিল—কি ?

সন্ন্যাসী বলিলেন—সেই পোষাকের বাক্সটাক্স বা দিয়েছিল তোকে—কোথায় নিয়ে আয় শীগ্গির।

এ কথ্য নূতন নহে এবং কিছু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবারও প্রয়োজন হয় না। ফিস-ফিস করিয়া রতন বলিল—পোষাক উপরের ঘরে; দরজায় তালা দেওয়া। চাবি খুঁজে দেখব ?

সন্ন্যাসী বলিলেন—না—না। একুণি হয়ত এসে পড়বে, আর ধরে নিয়ে উত্তরের কোঠায় ঢুকিয়ে দেবে। না, দেখে কাজ নেই, তুই চল—

তবু রতন এখানে-ওখানে হাতড়াইয়া বাহা পাইল লইল। পিছনের থিড়কী দিয়া জঙ্গলাবৃত গ্রাম-পথের উপরে আঁধারে আঁধারে দুই জনে উজ্জ্বল ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ সন্ন্যাসীর পিছনের কাপড়ে টান। দৌড়বার ঝোঁকে রতন হাঁপাইতেছে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল—ঠাকুর, বালা এনেছ ?

—হঁ—

—দাও আমাকে—

—দেব, চল—

দৌড়িতে দৌড়িতে গ্রাম পার হইয়া গাঙের সাঁকো পার হইয়া তারা বিলু আসিয়া পড়িল। সৰু আলপথ। হঠাৎ পা সরিয়া পড়িয়া রতন কাঁদিয়া উঠিল। বিনাবাক্যে সন্ন্যাসী তাকে কাঁধে তুলিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—হাতে কি রে ?

রতন শাস্ত হইয়াছে। বলিল—সেই নতুন হাড়িটা।

সেখানে পেলাম ত নিয়ে এলাম। ভাঙে নি ঠাকুর, ও ঠিক আছে।

বিল শেষ হইয়াছে। একটা বটতলায় তাহারা বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—বৌচকা খোল—

বৌচকা খুলিয়া রতন বাহির করিল গাঁদার কলিকা।

মুখ বাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ও এখন কোথায় কি হবে ? আর কিছু নেই ? দেখ দিকি খুঁজে—

এবং নিজেই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি বিড়ি বাহির করিয়া মুখে দিলেন।

রতন বলিল—আগুন ?

—মস্তোরে হবে। বলিয়া উল্টা গাট হইতে লাল দেশলায়ের কাঠি বাহির করিয়া হাড়ির তলার খস করিয়া টানিয়া আগুন ধরাইলেন। হাসিয়া বলিলেন—সেদিন আগুন করলাম, তুই ছ-হাত ভর্তি পয়সা নিলি, সব ভুলে গেছিস ?

শেষরাত্রির হিম হাওয়া বহিতেছে, লতাপাতা খসখস করিতেছে, রতন চুপি চুপি আঙুল দিয়া দেখাইল—ঠাকুর, সাদা কাপড় পরা...ঐ মানুষ—না ?

—দূর, উলুন। পোড়া বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বাপ রে বাপ ! বড় বেঁচেছি। একেবারে বাড়িহুচ্ছ পাগল ! অমন আর দেখি নি।

—এইবার আমার গয়না...

—গয়না কি আছে ? টানিয়া রতনকে একেবারে কোলের মধ্যে আনিলেন। কত দিন পরে শিশু আবার কোলে উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—বালা ভেঙেচুরে ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। নইলে রক্ষা ছিল ! বাদে গয়না, তারাই নিয়ে নিয়েছে, বাবা। এবারে আর হ'ল না।

—নিক গে—। স্নেহে গলিয়া গিয়া রতন খানিক ক্ষণ কথাই বলিতে পারে না। বলিল—গয়না আমি চাই নে। কিন্তু এবার আমি বাবা বলব। আর ঠাকুর বলে ডাকছি নে—

জুয়াচোর নিঃশঙ্কে ছেলের গালে চুমা খাইয়া মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

ডালাকার্লিয়া ও ডালাকার্লিয়ান

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানসমূহে ল্যাপ জাতি লোকেরা বাস করে। জাতিতে, জাতির সংমিশ্রণ ইউরোপীয় অন্ত্য দেশের তুলনায় ভাষায় ও আহাৰ-বিহারে ইহারা একেবারে ভিন্ন শ্রেণীর



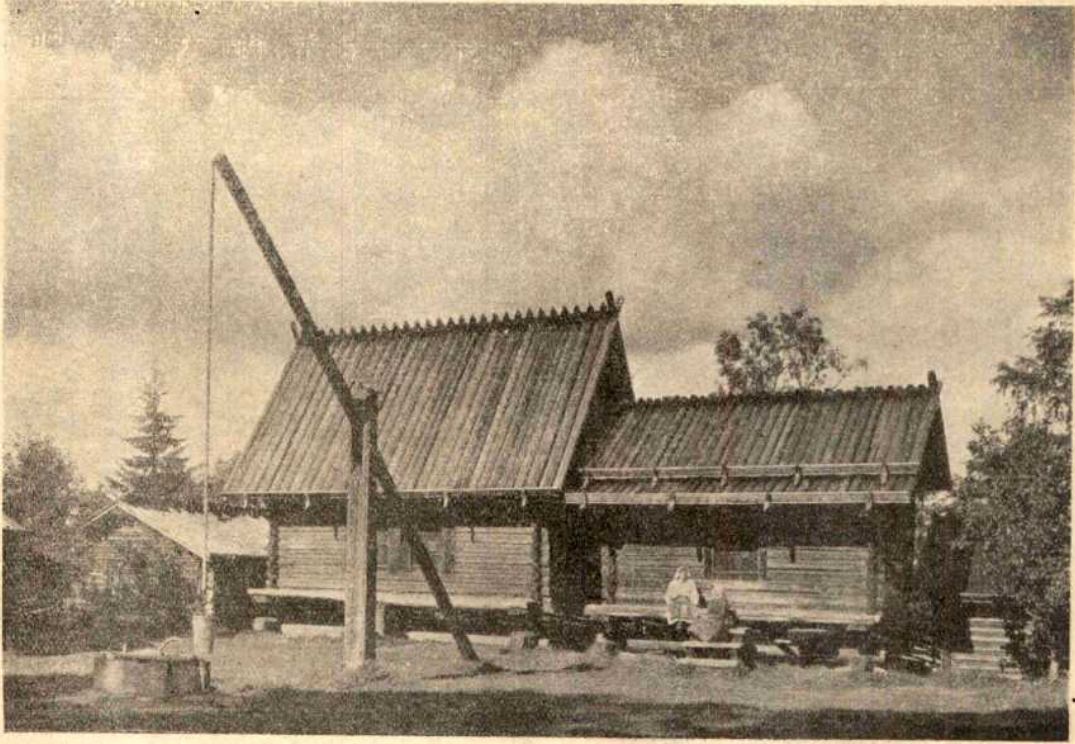
জন-নির্মিত বর্তমান সুইডেনের জন্মদাতা রাজা
গোস্কাব ভাসার প্রস্তর মূর্তি। ইহা জনের
নিজ শহর—মোরাতে স্থাপিত।

অপেক্ষাকৃত কম। হয়ত দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ইহার
কারণ। স্কাণ্ডিনেভিয়ার উত্তর-সীমান্ত প্রদেশ ও নিকটবর্তী



জনের অঙ্কিত নিজের চিত্র

লোক; অল্প ভাষায় বলিতে গেলে, ইহারা ইউরোপীয় সভ্যতার
প্রায় বাহিরে বাস করে। সমস্ত স্কাণ্ডিনেভিয়ার, যথা—
সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ডের, অধিবাসীরা
জাতিতে ও ভাষায় এক পরিবারের অন্তর্গত; সেই জন্ত
ইহাদের প্রত্যেকের ভাষা শব্দক ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইলেও



শিল্পী জর্নের বাসগৃহ । এখন ইহা মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে এবং সর্বসাধারণের সম্পত্তি

তাহাদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নহে। আজ এখানে শুধু সুইডেনের মধ্যস্থ একটি প্রদেশ—ডালার্না (Dalarna) ও ইহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।

ডালার্না প্রদেশের অধিবাসীদেরকে সাধারণতঃ ডালাকার্লিয়ান বলা হইয়া থাকে। ইহার সুইডেনের প্রাচীন অধিবাসীদের অন্ততম। এই দেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় লাভ করিতে হইলে উক্ত প্রদেশে ভ্রমণ করা নিতান্তই আবশ্যিক। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে আজও প্রাচীন অসংস্কৃত সুইডিশ ভাষা প্রচলিত; এখনও স্থানে স্থানে মেয়েরা সেকালের রঙীন পোষাক পরিয়া থাকে। উচ্চ পর্বত, সমভূমি, হ্রদ—এসমস্ত এমন ভাবে প্রদেশটিকে সজ্জিত করিয়াছে, যে, ইহাকে সুইডেনের প্রতিকৃতি বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ডালাকার্লিয়ানরা নিজেদের শৌর্য-বীর্যের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইহাদেরই সাহায্যে বর্তমান সুইডেনের জন্মদাতা বিখ্যাত রাজা গোস্টাব ভাসা ডেনিশদের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়াছিলেন।

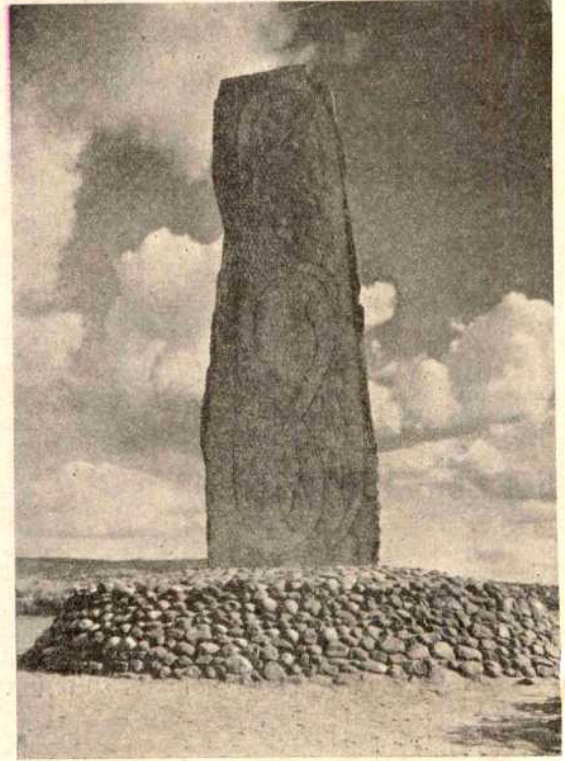
প্রবাদ আছে, যে, অল্পাধিক সাত শত বৎসর পূর্বে একদিন এক পার্কতা মেঘপালক দেখিল, একটি শ্বেতবর্ণ মেঘ-শাবকের গায়ের রং বদলাইয়া গিয়া পিঙ্গল লাল বর্ণে পরিণত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, পার্কতা চারপাশের পাথরের মধ্যে তামা রহিয়াছে; অগ্নির উত্তাপ ও জলবায়ুর সংস্পর্শে তামাযুক্ত পাথরের গায়ে ঐ রং কুটিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার সংস্পর্শই মেঘশাবকের রং বদলাইয়া যাওয়ার কারণ। কলে সেখানে যে তামার খনি আবিষ্কৃত হয়, তাহা উত্তর-ইউরোপের খনিসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। সম্ভবতঃ এই খনিতে সর্বপ্রথম ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে তামা সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই খনি হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টন তামা উত্তোলন করা হয় এবং

সেই সময়ে এই খনি দেশের রাজকোষের বড় সম্পদ ছিল। এই খনির গভীরতা উপরের সমভূমি হইতে প্রায় ১১৫০ ফুট এবং ইহার সমগ্র সুড়ঙ্গপথ বার মাইলেরও অধিক লম্বা।

হইয়াছে তাহাদের সকল প্রকার মডেল রক্ষিত আছে। ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানীর আসল ছাড়পত্র বা document



জন-অঙ্কিত মধ্যযুগের সূর্য্যাস্তনন্দন ও তদুপলক্ষে নাচগান।
মূল চিত্রটি স্থানস্থান মিউজিয়মে রক্ষিত



সিলিয়ান-হৃদয়ের তারে রেখাঙ্কিত নামক স্থানে
বার গোস্তাব ভাসার স্থতিস্তম্ভ

এই খনিতে কাজ চালাইবার জন্ত যে বৃহৎ কোম্পানী গঠিত হয়, তাহা ইউরোপের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহার নাম Stora Kopparberg Bergslags Aktiebolaget। উক্ত প্রদেশের প্রধান শহর ফালুন নামক স্থানে কোম্পানীর প্রাচীন অফিস অবস্থিত। এই শহরে কোম্পানী একটি বৃহৎ মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মিউজিয়মে প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যে-সকল যন্ত্রপাতি ও কলের সাহায্যে খনির কাজ করা



চন্দ্রালোকে সিলিয়ান-হৃদয়ের দৃশ্য

ও তা ছাড়া বহু খনিজ দ্রব্যও সেখানে সংরক্ষিত আছে। প্রাচীনকাল হইতে এই প্রদেশবাসীদিগকে সমৃদ্ধি দান এই খনি এখন অতি অল্পই তামা দান করে। তবে এই একই করিয়া আসিতেছে। গ্রেঙ্গ্‌গেসবের্গ নামক শহরের কোম্পানী এখন দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লৌহ-কারখানার মালিক। এই কারখানা ফালুন শহরের দক্ষিণে দমনারভেট (Damnervet) নামক স্থানে অনতিদূরে অবস্থিত। ডালএলবেন নদী ইহার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই নদীর মুখে স্কুটস্কার (Skutskar) নামক স্থানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাঠের কারখানা অবস্থিত। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে, ফালুন শহরের মিউজিয়মে সপ্তদশ শতাব্দীর বৃহৎ তাম্রমূদ্রা সংগৃহীত রহিয়াছে এবং ইহাদের ওজন একত্রে ৮০ পাউণ্ড।



রবিবার উপাসনাগৃহের দিকে বৃদ্ধারা স্রচিত পোষাকে চলিয়াছেন

বলা বাহুল্য, উক্ত খনিজ সম্পদও



ডালাকার্লিয়ার প্রতিবরে মেয়েরা চরকায় এইভাবে হতা কাটে

কাঠের ব্যবসা চারিদিকের পর্বতমালার উচ্চশ্রেণীর লৌহপূর্ণ প্রায় ৫০০ শত লৌহখনি রহিয়াছে। এই শহরে অবস্থিত বৃহৎ লৌহকারখানায় উক্ত খনিসকল বৎসরে গড়ে ২৫ কোটি টন লৌহধাতু সরবরাহ করিয়া থাকে। তা ছাড়া এই একই প্রদেশে কয়েকটি বৃহৎ কাগজের কারখানা ও ইলেকট্রিক কোম্পানী রহিয়াছে। প্রদেশের দক্ষিণ-সীমান্তে ভেট্টেরস নামক শহরে অবস্থিত “এশিয়া” ইলেকট্রিক কোম্পানীর কারখানায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ কাজ শিখিতে আসিতেছেন এবং কয়েক জন কাজ শিখিয়া আপাততঃ দেশে ফিরিয়াছেন। এখানকার সম্পদ ও সমৃদ্ধির কথা সংক্ষেপে লিখিলাম। অত্র দিকে স্বাণ্ডিনেভিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও আর্টিষ্ট, যাহাদের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়াছে, তাহাদের অনেকেই এই প্রদেশের লোক।

বিখ্যাত কবি কার্লফেল্ডট্, ডন আণ্ডেরসন, নামজাদা চিত্রকর কার্ললারসন, আণ্ডেস জর্ন, এই ডালাকার্লিয়া প্রদেশের সন্তান।

কবি কার্লফেল্ডট্ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন।

জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নোবেল প্রাইজ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯১৮ সালে তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু তিনি এই কমিটির



স্বহস্তে প্রস্তুত রঙীন পোষাকে ডালাকালিয়ান
গীটার বাজরত মহিলা

সেক্রেটারী বলিয়া উক্ত সম্মান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া স্থির হয়। ছুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার প্রাপ্য সম্মান তিনি জীবিতাবস্থায় দেখিয়া বাইতে পারেন নাই। উক্ত প্রদেশের ফাল্ক স্যারগা নামক স্থানে কবি জন্মগ্রহণ করেন। ভেটেরস শহরে উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া কালফেলডট উপসালা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তাঁহার কবি-

প্রতিভা ধরা পড়ে। তাঁহার রচনার অধিকাংশই উচ্চাঙ্গের প্রেমের কবিতা। ফ্রিললিন নামক নায়কের মুখ দিয়া তিনি তাঁহার কবিতায় সুর দিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের যৌবনের উচ্ছ্বাস ও কল্পনায় পরিপূর্ণ।

সিলিয়ান-হুদ ও পাখবর্তী গ্রাম-সকল—বিশেষ ভাবে মোরা (Mora), লেকসান্দ (Leksand) ও রেটভিক্ (Rattvik), এ দেশের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থান। বহির্জগতের প্রভাবের পূর্ণ বিস্তার সম্বন্ধে এই হৃদের তীরবর্তী গ্রামগুলিতে এখনও মেয়েরা ঘরে নিজেদের হাতে তাঁতে কাপড় বুনেন। হাতে-তৈরি রঙীন কাপড়-জামা এখনও অধিবাসীরা অন্ততঃ প্রতি রবিবারে ও গ্রীষ্মের ছুটির দিনে পরিয়া থাকেন। পুরুষেরা এখন প্রাচীন ধারার কাঠের নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ও খেলার জিনিষ ঘরে তৈরি করে। গৃহনির্মাণেও প্রাচীন ধারা সেখানে রক্ষিত। সিলিয়ান-হুদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ মাইল। এই প্রদেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে জ্ঞানলাভের জন্য গত জামুয়ারি মাসটা সিলিয়ান-হৃদের চারিদিক ঘুরিয়া কাটাইয়াছিলাম। তাহার রূপান্তর পরে লিখিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই প্রদেশের চিত্রকর আওগুস্ট জন ও কার্ল লারসন, সুইডেনের জাতীয় চিত্রকর বলিয়া খ্যাত। কালুন শহর হইতে মোটরে করিয়া বণ্টাখানেকের মধ্যে

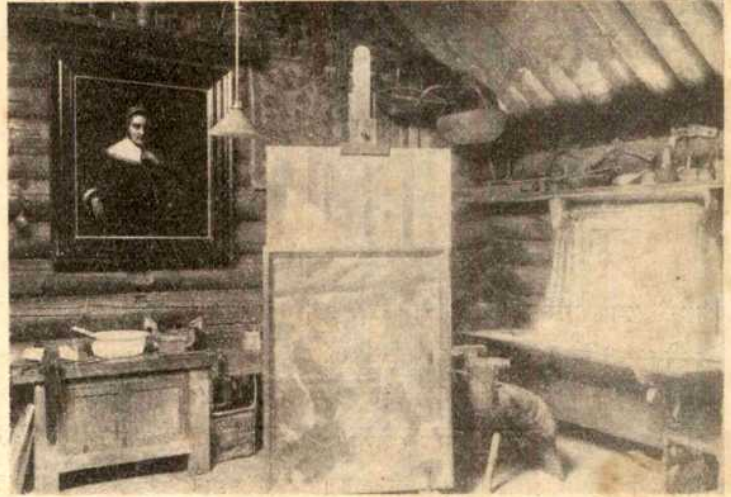


স্বপুর্ণ গ্রামে বিখ্যাত চিত্রকর কার্ল লারসনের বাসগৃহ

সুণ্ডবর্ন (Sundborn) নামক স্থানে কার্ল লারসনের বাড়িতে পৌঁছানো যায়। বাড়িখানি বাহির হইতে দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা চিত্রকরের বাড়ি,—চতুর্দিকের ঘরবাড়ির সঙ্গে ইহার পার্থক্য এত বেশী। তাঁহার অধিকাংশ প্রসিদ্ধ চিত্র এখন ষ্টকহলমের জাতীয় মিউজিয়মে রক্ষিত। তা সত্ত্বেও সুণ্ডবর্নে তাঁহার বাড়ির কয়েকখানা কোঠা এখনও তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে পরিপূর্ণ। বিশেষভাবে গ্রাম্য অধিবাসীদের বাড়ির ভিতরের দৃশ্য তাঁহার তুলিতে দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। বাড়ির ঘর দরজা ও আসবাবপত্রের সকল স্থানেই তিনি কিছু-না-কিছু ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার বাড়ির অংশবিশেষ মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে।

চিত্রকর জন প্রসিদ্ধ মোরা নামক

স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পরাজ্যে জনের প্রতিভা বহুমুখী এবং তাঁহার চিত্র-সংখ্যাও কম নহে। এটিং এবং জীবিত মানুষদের চেহারা আঁকায় তিনি সুইডিশ চিত্রকরদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার বহু ছবি নানা দেশের মিউজিয়মে



জানার চিত্রশালা



ডালাকালিয়ান পোষাকে বয় ও কনে

স্থান পাইয়াছে। তাঁহার দুইটি প্রসিদ্ধ চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দিতেছি। একটি গ্রাম্য বালিকার চিত্র, ইহার নাম কিংস কারিন (Kings Karin)। সাধারণতঃ গৃহস্থ ঘরের শান্ত সুস্থ সবল সরল মেয়ে; তাহার গালের হাড় দুইটি বেশ উঁচু, মুখখানা টুকটুকে লাল। সে যেন গ্রাম্য সরল পবিত্রচেতা সুইডিশ মেয়ের প্রতিমূর্তি, যে ধরণের মেয়েরা চিরকাল ধরিয়া পুরুষদের প্রাণে শক্তি ও শান্তি যোগাইয়া আসিতেছে।

তাঁহার আর একখানি চিত্র গোথেনবার্গ (Gothenberg) মিউজিয়মে রক্ষিত। ইহার নাম “মুক্ত বাতাসে” (“Out in the Open Air”)। চিত্রখানি দেশ-বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে সমাদর লাভ করিয়াছে। চিত্রিত বিষয়টি ও বিষয়ের আবেষ্টনী পুরোপুরি সুইডিশ। সমুদ্রের তরঙ্গাবাতে মস্তক কঠিন ধূসর রঙের পাথরের গায়ে স্নানোদেশে মাথায় পীত সোনালী রঙের চুলে ভরা দুই তরুণী নিরালস্য জলে নামিবার জন্ত প্রস্তুত। কঠিন পাথরের উপর তাকুণাভরা দেহ, নৌকাবিহার, মনের সহজ আমনের অভিব্যক্তি—

ইহা দেশের সামাজিক জীবনের অতি স্বাভাবিক চিত্র,— তাহাতে বিন্দুমাত্র পক্ষিতার আভাস নাই।

জনের অধিকাংশ ছবি তাঁহার বসত-বাড়ির মিউজিয়মে রক্ষিত। তাঁহার বিধবা স্ত্রী অতি সযত্নে সমস্ত রক্ষণা-

বেক্ষণ করেন। প্রতিবৎসর, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্ম কালে, দেশ-বিদেশ হইতে শত শত লোক উপমাবিহীন সিলিয়ান-হৃদ ও পাম্ববর্তী গ্রাম-সকল দেখিবার জন্ত সেখানে ভিড় করে।

ঘাসের ফুল

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগিগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাংলাটা কলিয়ারীর আপিস। আপিসের উত্তরেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা খড়ে ছাওয়া বাংলাটা কলিয়ারীর বাবুদের মেস। বাংলা দুটোর কোলে প্রকাণ্ড বড় খোলা মাঠখানায় অতুল পায়চারি করিতেছিল। চারিদিক অন্ধকার। ‘পিট’গুলার মুখে, প্রয়লারগুলোর চিমনির মাথায় শুধু আগুনের শিখা হু হু করিতেছে। আর এখানে ওখানে কুলীদের কেরোসিনের কুপী খন্দোতের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মেসের একটা ঘরে কুলী-বিজুটোর চন্দ্রকান্ত হুঁকা টানিতে টানিতে সার্ভেয়ারকে বলিতেছিল—আমার ভাই যোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা মিছে কথা।……সে আমি মিছে কথা বলব না।

বড় টেবিলটার উপরে খনির ম্যাপখানায় নূতন একটা লাইন টানিতে টানিতে সার্ভেয়ার উত্তর দিল—হুঁ—তাই নইলে চাকরি থাকবে কেন? আলোটা একটু বাড়িয়ে দেন ত চন্দ্রবাবু। চশমা নইলে আর চলছে না।

পাশের ঘরে লেবার-রেজিস্ট্রার সীতাপতি আপন মনে একখানা ছবি আঁকিতেছিল। সম্মুখে গম্ভীর ভাবে আর এক জন বসিয়া আছে স্থাগুর মত—চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না।

তার পাশের ঘরে বুদ্ধ কম্পাউণ্ডার চশমা-চোখে স্ত্রীকে পত্র লিখিতেছিলেন—“এখানে ৮৮টি খুবই হইয়াছে। ওখানে ৮৮টির অবস্থা কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবে। চাষ-আবাদীর অবস্থা বুঝিয়া ধাতুগুলি ধার দিবার ব্যবস্থা করিবে।”

আর একখানা ঘরে লটারির টিকিট কেনা হইতেছিল। ম্যানেজারের নামে একখানা লটারীর টিকিট-বই আসিয়াছে—সেইখানা হেডক্লার্ক বাবু লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। আট আনা করিয়া টিকিটের দাম। প্রথম পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা। কালীপদ একটা ছদ্মনাম খুঁজিয়া মারা হইয়া গেল। হেডক্লার্ক বাবু কলম ধরিয়া বসিয়া ছিলেন—বলিলেন—কি নাম দেবে বল হে কালীপদ?

কালীপদ বলিল—শ্রীবৎস—কি বলেন? ও নামে শনির দৃষ্টিও চলে না।……দাঁড়ান, দাঁড়ান,—মহালক্ষ্মী কেমন হবে বলুন দেখি?

একেবারে এ-পাশের ঘরে একটি তরুণ তরুণ হারমোনিয়ম লইয়া গলা সাধিতেছিল—‘কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!’ ছেলেটি কলিয়ারীর মালিকদের থিয়েটারে নায়িকা সাজে। এখানে চাকরিও তার সেই জন্ত। বেতন বাইশ টাকা ছিল—এখন দুই টাকা কমিয়া হইয়াছে কুড়ি।

পাশের বারান্দায় ষ্টোরকিপার অমূল্য কুলিদের তেল মাপিতে মাপিতে বলিল—তুমি একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়, বুঝলে বিনোদ! মোটা মাইনে হবে। কেন কুড়ি টাকার পড়ে আছ বল দেখি! গান থামাইয়া বিনোদ বলিল—ভারী চুক হয়ে গেছে গুদোম-বাবু! সেবার বীণাপাণি অপেরা আমাকে সাধাসাধি করলে। বলে—পর্যট্রিশ টাকা মাইনেতে তুমি ঢোক—তার পর ছ-মাস পরে পঞ্চাশ ক’রে দেব। তিন বছরে এক-শো টাকা। তা যাত্রার দল ব’লে আর—!

অমূল্য বলিল—আমি একটা দোকান করব ভাই।
বেগুনী-ফুলুরী কলাই-সেদ্ধ বুঝলে! বউ ক'বে দেবে,
একটা চোঁড়াকে দিয়ে বিক্রী করাব। ভারী লাভ।

শুটিতিনেক ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিনোদের
বিছানার ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বলিল—বাড়িতে
গান করতে হবে বিনো-কাকা। চল, মা ডাকছে।

অপর মেয়েটি নাকিসুরে বলিল—ধঁবে নিয়ে যাব হ্যাঁ।

ছোট ছেলেটি তখন হারমোনিয়মের রিড চাপিয়া
ধরিয়া একটা বেহুরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ
হাসিয়া বলিল—চল চল বাই। চিকুণীটা কোথায় রাখলেন
গুদাম-বাবু?...আমার আবার ডিউটী আছে—তা চল,
ছুধানা গান গেয়েই চলে আসব।

প্রথম মেয়েটি বলিল—বই নিয়ে যেতে বলেছে
মা।

কুঠীর মালিকদের কয়েক জন এখানে সপরিবারে বাস
করেন। বিনোদকে মাঝে মাঝে বাসার ভিতর গান শুনাইতে
হয়, রেলের বাবুদের লাইব্রেরী হইতে উপভাস আনিয়া
যোগানও তাহার একটা কাজ। নিজেই হারমোনিয়ামটা
লইয়া বিনোদ চলিয়া গেল। গুদামবাবু বলিলেন—দেখলে
হে বাবুর চুল আঁচড়ান?

বিনুর ঘরের অংশীদার বিনোদের পবিত্যস্ত চিকুণীখানা
লইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—হঁ।

তারপর আয়নাখানায় নানা ভঙ্গীতে মুখ দেখিয়া
বলিল—বেশ আছে বাবা। আর থাকবে নাইবা কেন
বল? চেহারা ভাল, গলা ভাল।

টোর-বাবু ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বই
যোগান—সেটা বল। আর মেয়েগুলোর দেখেছ!
টাইমবাবু বলতে পাগল।

অতুল ভাবিতেছিল, হেনরী ফোর্ড জীবন আরম্ভ
করিয়াছিল কার্টার মিস্ত্রী রূপে—এডিসন নামে একটি
ছেলে খবরের কাগজ বেচিত। অতুল এখানে আসিয়াছে
ষেড় শত মাইল পারে হাঁটিয়া—পথে বর্ষার নদী—
তখন হুকুল পাখাব সেই নদী সে সাঁতাব দিয়া
পার হইয়া আসিয়াছে। পারের পরসা দিতে গেলে
খাবাবের পরসাব অভাব পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। আজ সে

কলিয়ারীর ম্যানেজার হইতে চলিয়াছে। এক বৎসর পবে
মাইনিং পরীক্ষা দিবে।

অদূরে একটা আলোর পিছনে দুই জন বাবু আসিতেছিল।
এক জন উচ্চকণ্ঠে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। অতুল বুদ্ধিল
ম্যানেজার ও ওভারম্যান আসিতেছে। ম্যানেজার আসিয়া
বলিলেন—এই যে অতুলবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি।
আজ খাদে বারুদ জলে গেছে। ক্রমশঃই খাদ গরম হয়ে
উঠছে—এখন ফায়াব না হয়।

অতুল মুহূর্ত্তের প্রশ্ন কবিল—গান-পাউডার জলে গেল?
ওভারম্যান খাটো মানুষ, কিন্তু শক্তিশালী দৃঢ়দেহ। সে
কথা কয় যেন বক্তৃতা করে। হাত-পা নাড়িয়া অভিনয়
করিয়া প্রত্যেক কথাটি বুঝাইয়া দেওয়া তাহার স্বভাব।
সে বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দক্ষিণ দিকের মেন
গ্যালারীর পাশে ৫৮ নং জুঁদের মধ্যে—দেওয়ালে—হেই
—এতখানি এক চাঙড় করলা জমে আছে। ঠাণ্ডারাম
সদ্বার বললে—বাবু ওই করলাটা দেগে দি। টোটা তোয়ের
ক'রে ঠাণ্ডারামকে নিয়ে গেলাম দেখতে—বলি মিস্টার
চোখে একবার দেখে দি। হঠাৎ শুঁড়ি হইয়া ওভারম্যান
বলিল—ঠাণ্ডা বারুদের—জায়গা নামিয়ে রেখে—।

আবার খাড়া হইয়া হাত তুলিয়া বলিল—আমাকে
দেখাইতেছে—বলে বাবু—এ চাটা—আর ইদিকে অমনি
ফাঁস ক'রে নিয়ে নিয়েছে তখন। সঙ্গে সঙ্গে আলোর
একেবারে দিন দীপ্যমান।

একটু থামিয়া তাড়াতাড়ি হাত কয় পিছাইয়া গিয়া
ওভারম্যান আবার আরম্ভ করিল—আমি তখন হঠতে
লগেছি। বুঝতে পেরেছি কিনা। ঠাণ্ডা বেটা কিন্তু
হা ক'রে দাঁড়িয়ে।

হা করিয়া বুদ্ধিহীনের অভিনয় করিয়া সে থামিল।
তারপর আপনার বাঁ-হাতখানা ধপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া
বলিল—ধপ্ ক'রে বেটার হাতটা ধরে হিড় হিড় ক'রে
আনলাম টেনে।

তার পর সে পাণিপথক্ষেত্রে বিজয়ী আমেদ শার মত
গম্ভীর ভাবে নীরব হইল।

ম্যানেজারটি সাদাসিধা মানুষ—বুদ্ধির মত আকারেও
হুল। ভদ্রলোক বলিলেন—কি করা যায় অতুলবাবু?

অতুল চিন্তা করিয়া বলিল—ও ‘পিট’টার কাজ বন্ধ ক’রে দিন।

ম্যানেজার বলিলেন—কিন্তু যদি ফায়ারই হয় ধব।

হাসিয়া অতুল বলিল—ফায়ার ত হবেই।

মহাচিন্তাস্থিত ভাব ম্যানেজার বলিলেন—তা হ’লে?

—সে আর আমরা কি করব? আপনি, এখানে যারা মালিক আছে, তাঁদের জানান—আর হেড আপিসেও টেলিগ্রাম ক’রে দিন। তা হলেই খালাস।

ম্যানেজার বলিলেন—তাই ত হে—কলিয়ারীটা আমার নিজের হাতে তৈরি করা—

অতুল হাসিয়া বলিল—চললাম আমি তিন নম্বর পিটে। আমাব ডিউটি আছে।

* * *

প্রকাণ্ড লোহার বিম্ব—রাক্ষসটারে ছাঁদাছাঁদি করিয়া একটা অতিকায় কঙ্কালের মত গীয়ারহেডটা ঝাঁড়াইয়া আছে। তাহারই তলে বিরাটাকার সাড়ে তিন-শো ফুট গভীর একটা কূপ মাটির বুক ভেদ করিয়া নামিয়া গেছে। ওপাশে ইঞ্জিন-শেড। তাহার পাশেই দুইটা কয়লারের বুকব ভিতর রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। ইঞ্জিন-শেডের বিপরীত দিকে আর একটি ছোট শেড। এটি পিট-ক্লার্কদের আপিস। একদিকে ছোট একখানি বেঞ্চ—মধ্যে একটি টেবিল—এপাশে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে একটা হারিকেন চাবিগাশের বিপুল অঙ্ককাবের মধ্যে অসহায় ভাবে জ্বলিতেছিল। শেডের বাহিবেই একটা লোহার ঠেঙোর উপবেই একচাপ কয়লা দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে।

সেই আশুনে সঁকিয়া একটি কুলীর মেয়ে তাহার ভিজা বুড়িটা শুকাইয়া লইতেছিল। চেয়ারে অতুল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ওপাশের বেঞ্চে বিনোদ—সেই ছোট্ট একখানা খাতার কুলিদের উঠা-নামার হিসাব করিতেছিল। ওই ওর কাজ। লেবার-রেজিস্ট্রার পদবী। বিত্তর পাশে বসিয়া ছিল শ্রামপদ—দু নম্বর ওভারম্যান। বলিয়া উঠিল—এই—এই মাগী, বুড়িটো কি পোড়ায় দিবি না কি?

এদিকে পিটমাউথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ঘণ্টা-ঘণ্টা-ঘণ্টা। খাদের তলা হইতে সঙ্কেত হইতেছে, লোক উঠিবে।

উপরের ‘টালোয়ান’ ঘণ্টার সঙ্কেতে উত্তর দিয়া হাকিল—হো—ই। এ সঙ্কেত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে।

বিপুল শব্দে ইঞ্জিন গতিশীল হইয়া উঠিল। ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে গীয়ারহেডের চাকা বাহিয়া মোটা তাবের দড়ায় ঝুলান একটা লোহার ঝাঁটা সন্ সন্ শব্দে অন্ধকূপের গর্ভে নামিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর একটা দড়া উপবে উঠিয়া আসিতেছিল। সেই দড়া বাহিয়া একটা কেজ পিটের মুখে সশব্দে আসিয়া লাগিল।

খাঁচার মধ্যে চার জন লোক।

বিলু প্রশ্ন করিল—কাবা বটস রে?

উত্তর হইল—আমবা গো—ভক্তার দল। নাবাণ ভক্তা।

খাঁচার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল—জলসিক্ত, কয়লার কালিতে সর্বাঙ্গটাকা বীভৎস কালো মূর্তি। জলন্ত কয়লার আলোয় মনে হয় যেন প্রেত! নম্রপ্রায়—পরপে শুধু একটা কোপীন, কাঁধে গাঁইতি, হাতে একটা কেরোসিনের ডিবিয়া। মেয়েদেব হাতে বুড়ি। কয়লার কালিতে কালো দেহের মধ্যে সাদা দুইটা চোখ দেখিয়া ভয় হয়। কথা কহিলে দেখা যায় সাদা দাঁত। শেডের বাহিবে গিয়া তাহার উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়। অতুল ভাবিতেছিল—ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় সে প্রথম হইবে। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। খনি-বিজ্ঞান তাহাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। এই যে আশুন—পৃথিবীর বুকব ভিতর লক্ষ লক্ষ টন কয়লাব স্তরের মধ্যে যে বিরাট অগ্নিদাহ—যে আশুন জলে নিভিবে না—সে আশুন নিভাইবাব উপায় সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কেন সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পরের উপকাব কবিত্তে বাইবে! তাহার জীবনের মূল্য পঞ্চাশ টাকা নয়।

ঘণ্টা ঘণ্টা—

আবার সঙ্কেত হইল। একটা কেজ নামিয়া গেল, একটা উঠিয়া আসিয়া পিটের মুখে দাঁড়াইল—ঘণ্টা! কেজটার মধ্যে কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী—লেবার-রেজিস্ট্রার প্রশ্ন করিল—কি বটে—কয়লা না স্নাক? ওভার-

ম্যান এক জন কুলিকে বলিতেছিল—ওরে ইয়া—কি নাম তোব? গুরুচরণা—শুন শুন ইধারে শুন। হোই—হসিয়ার!

★ ছোট লাইনের উপর কয়লাভক্তি টবগাড়ীটা ঠেলিয়া ঠেলিয়া দিবা টালোয়ান হাকিয়া উঠিল। সশব্দে গাড়ীটা লাইন বহিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে পিটের মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল। কেজ ওঠে-নামে। গুরুচরণ বলিতেছিল—আমাকে খাদে নামতে বলছেন না-কি?

ওভারম্যান বিরক্তিতে বলিল—না—কলছি গুরুপুত্ৰব আমার হেঁথাকে বসেন দয়া ক'বে—আমি পা পূজা করব।

লেবাব-রেজিষ্ট্রার বিলু খাতা লিখিতে লিখিতে শুন শুন করিয়া গান করিতেছিল—‘ওহে হুন্দর তুমি এসছিলে আজি প্রাতে।’

অতুল মনে মনে একটু হাসিল। সত্যই বেশ আছে ছেলেটি! বাড়িতে মারের হেঁড়া কাপড়ে হয়ত চোখেব জল মুছিবার স্থান নাই—আর ও শোষাক পরিয়া রাণী সাজে। দুই টাকা মাইনে ওর কাটা যায়—আর ও বাড়ির ভিতর গান শুনাইবা কৃতার্থ হইয়া যায়। কয়লার হিসাব লিখিতে লিখিতে ও গায়—‘হুন্দর তুমি!’...

নীচে খাদের তলদেশ হইতে অন্ধকূপ বাহিয়া অতি ক্ষীণ মান্বরের সাড়া ভাসিয়া আসিল।

ওভারম্যান বলিল—হাকা-হাকা-হাকা!

পিটের মুখে টালোয়ান দুই জন একটু হুঁকিয়া সাড়া দিল—ও—ই!

অতুল একটু অনমনস্ক হইয়া চারিপাশের অন্ধকারেব দিকে চাহিল। চাবিদিকেব কলিয়ারীতে কয়লার চাপ গভীর অন্ধকারে রাজির অঙ্গে দ্রুত ক্ষতের মত ধব্ধ ধব্ধ করিয়া জলিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং।

এবার উঠিয়া আসিল আর কয়েক জন কুলি। বিলাসপুর অঞ্চলের অধিবাসী। মেয়েদেব অঙ্গে মোটা মোটা রূপদস্তার গহনা—হাতে তাগা, গলায় হাঁহুলি, পায়ে বাক, নাকে বেসর, কজিতে একহাত কাঁসার চুড়ি।

আবার থানিকটা বিরাম। ইতিন স্তব্ধ, কেজটা নিথর ভাবে স্থলিতেছে। শুধু বয়লারটা ষ্টীমের শক্তিতে কাঁপে—

সে কম্পনের আঘাত বান্ধুর বহিয়া শেডের খাপরার চালে আসিয়া চালের মধ্যেও কম্পন তোলে। চালের খাপরাগুলো কাঁপে—ছোট একটা জান্না—সেটাও ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধের মত থরথর করিয়া কাঁপে। অবসর পাইয়া কেজম্যান-‘টালোয়ান’ কড়ি গুণিয়া ‘বেজিং’এর হিসাব করে।

যেখানে লোহার হেঁজোটার কয়লাব চাপ জলিতেছিল সেখানে কুলিরা দুই-চারি জন করিয়া আসিয়া জমিতেছিল। ইহারো এইবার খাদের নীচে নামিবে। একটা কেরোসিনের ডিভের আলোতে একটি তরুণী বিড়ি ধবাইয়া দপ কবিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। সে বলিল—দে নামাই দে বাবু। ক-ত ব'সে রইব?

অতুল চিন্তা করে, এ ওদের নেণা না, ক্ষুধার প্রেরণা? বিলু বলিল—এখন খাদে গিয়ে ত ঘুমুবি। তার পর সেই রাতে কাজে লাগবি। ঘরে ঘুমুলেই ত পারিস।

তরুণীটি হাসিয়া বলিল—তবে তু একটি গান কর বাবু।

ওভারম্যান বলিল—হু নাচবি বল!

সে ঝিল ঝিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—মালকাটা যে মাদবে বাবু ধুমাধুম—গতর ভেঙে দিবে আমার। লইলে—

তার পর অকস্মাৎ এক বুড়ীকে ধরিয়া বলে—এই দেখ ই নাচবে। ইয়ার মালকাটা মরে গেইচে।

আশপাশেব তরুণীর দল হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। উপাশে জলন্ত কয়লার ধরে বসিয়া একটা আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে অকারণে জলন্ত চুল্লীটার ঢেলা মারিতেছিল। দূরে এই কুঠাবই সাইডিং-লাইনের উপর লোকোমোটিভের বাণী তীক্ষ্ণস্বরে বাজির উঠে। অতুল পিছন ফিরিয়া চাহিল। দক্ষিণে বহুদূরে রেলওয়ে জংসনের ইয়ার্ডে অগণিত বিজলী বাতি সারি সারি স্থির ধন্যোত্তের মত জলিতেছে। এ-পাশে বয়লারের চোঙ হইতে উর্জযুধী আগুনের শিখা সাপের ভ্রবেব মত লক্-লক্ করিতেছে। শিখার মাথায় অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়-কৃষ্ণ রাশি রাশি ধোঁয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিখার মাথায় হাঙ্গাবে হাঙ্গারে আগুনের ফুলকি ফুলঝুরির মত ধোঁয়ার রাশি ভেদ করিয়া বহু উর্কে উঠিতেছে, বৃষ্ণদের মত নিভিয়া বাইতেছে।

এদিকে তিন মিনিট চার মিনিট অন্তর কেজ ওঠে, নামে। একদিকে দলে দলে কুলি ওঠে, অন্য দিকে দলে দলে নামে। মানুষের দুর্দান্তপনায় বোবা রাজি অস্থির হইয়া উঠে। বিনোদ চমকিয়া উঠিল। কে তাহাকে ছোট একটা ঢেলা ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। লোহার কেজটা সন্ সন্ শব্দে নীচে নামিয়া গেল। কূপের মধ্যে খিল খিল হাসি অতি দ্রুত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

* * *

রাজি প্রগাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

খাদের মুখে সবারই চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। যন্ত্রগুলারও যেন ঘুম পাইয়াছে। কেজ—ইঞ্জিন স্তব্ধ—গুধু বয়লারের ষ্টীমের শব্দ উঠিতেছিল ফ্যাস—ফ্যা—স। কেজম্যানটাও বেদীর উপর বসিয়া চুলিতেছে। ওভারম্যান দেওয়ালে ঠেস দিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্ন—নিঃশ্বাস সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তন্ময়।

অতুলের মাথাও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। হেনরী ফোড়ি কি এডিসনের নাম এখন মনের মধ্যে নাই। মনে পড়ে বাড়ির কথা—মাকে মনে পড়ে। ইচ্ছা হয় ছুটি লইয়া একবার বাড়ি বাইতে হইব। অতুল একটা বিড়ি ধরাইল। খোঁয়াটা ছাড়িতে ছাড়িতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি ফুটিয়াছে। হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মেসের কোলাহল নীরব। ক্যাশিয়ার হয়ত অপের বোরে ক্যাশ মিলাইতেছে। ম্যানেজার হয়ত আঙ্গনের স্বপ্ন দেখিতেছে। কালীপদ হয়ত পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজটার খবরের বিলি-ব্যবস্থা করিতেছে।

বং—বং—বং। সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

কলিয়ারীর চৌকীদার এক চোখ কাণা সোমরা হাক দিয়া চলিয়াছে—হো—হো—ও—হো!

টালোয়ান বা কেজম্যান সজাগ হইয়া পিটের মুখে গিয়া সঙ্কেত করিয়া ইঞ্জিন-ড্রাইভকে হাকিল। ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিল।

ওভারম্যানেরও ঘুম ভাঙিয়াছিল—সে তন্ময়স্বপ্ন চোখে বলিল—চাকরে আমার কুকুরে সমান। চাকরি মানুষে করে? 

বিনোদও কখন সোজা হইয়া বসিয়াছে—সে মেসের নিস্তব্ধতাব দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এরা বেশ ঘুমুচ্ছে নয়?

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্বেই সশব্দে কেজটা আসিয়া পিটের মুখে আবদ্ধ হইয়া গেল। কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল পিটক্লার্ক বাবু।

সে বলিল—খাদের অবস্থা বড় খারাপ অতুলবাবু। বড় গরম হয়ে উঠেছে খাদ।

অতুল বলিল—সে আর আমি কি করব?

—খাদে মালকাটার টিকতে পারছে না।

অতুল নির্বিকার ভাবে বলিল—ম্যানেজার বাবুকে খবর দিচ্ছি।

—ওদিকের ক'টা হুঁদে ত খোঁয়ায় ভর্তি—আর উত্তাপ কি! ভেতরে কয়লাতে আগুন লেগেছে মনে হ'ল।

অতুল বলিল—সেগুলো ত বাদ দিতে বলছি।

—হ্যাঁ, সেগুলো বাদই আছে। কিন্তু ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে। একবার নীচে যেতে হবে মশায়। এ সব ত আমার ডিউট নয়!

অতুল হাসিয়া বলিল—বেশ আমি নীচে যাচ্ছি। আপনি আর ওভারম্যান বাবু বরং ম্যানেজারকে সব জানিয়ে আনুন। টালোয়ান, ঘণ্টা দাও নীচে।

গ্যাস-বাতিটা জালিয়া লইয়া সে কেজের মধ্যে গিয়া টাড়াইল।

উপরের শব্দ পিছনে ফেলিয়া অতুল গহ্বরের মধ্যে কেজটা সন্ সন্ শব্দে নীচে নামিয়া চলিয়াছিল। পিটের গাঁথনি দ্রুতবেগে উঠিয়া চলিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অস্বভূতি রন রন করিয়া উঠিল। প্রথম দিনের কথা মনে করিয়া অতুল একটু হাসিল। এখন এ-অস্বভূতি তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে। প্রথম তলার খাদটা পার হইয়া গেল। যে-কেজটা উপরে উঠিতেছিল সেটা পার হইয়া গেল। কোন সাঁওতালব মেয়ে ওই কেজে বসিয়াই গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া গেল। সে সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—ইঞ্জিনের শব্দও আর ভাল শোনা যায় না। দুই পাশে পিটের গা বহিয়া জল বরিংতেছে। নীচের জল বরার শব্দ ক্রমশঃ স্রুততর হইয়া আসিল।

কেজের গতি মন্দ হইয়া আসিয়া সশব্দে কেজটা এইবার থামিয়া গেল।

★ উপরে পিটের মুখে ও-কেজটাও সঙ্গে সঙ্গে থামিল।
বিনোদ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল—সে, বলিল—উঠে এলি
যে তুই?

কেজ হইতে বাহিব হইয়া আসিল সেই মেয়েটি। মেয়েটির
নাম চুড়কী। চুড়কী বলিল—যে খুঁয়ো আর গরম খাদে—
পালায়ে এলাম। তারপর কিছু করিয়া হাসিয়া বলিল—
তুর গান শুনতে এলাম।

বিনোদ বিরক্তিতে বলিয়া উঠিল—ভাগ্য এখান
থেকে। শেডের বাহিরে কয়লার ধুলার উপরেই আঁচল
বিছাইয়া চুড়কী শুইয়া পড়িল। বলিল—তুর ভারি
শুন্মোর হইছে, লয় গো বাবু!

বিনোদ কোন উত্তর দিল না।

চুড়কী আপন মনেই বলিল—তুর চেয়ে আমি ভাল গান
জানি। শুনবি। সঙ্গতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে নিজের
ভাবায় গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান করিয়া সে নীরব
হইল। কিছুক্ষণ পর আবার সে বলিল—আকাশে হই যি
তারটি দিপ্ দিপ্ করছে—ওইট ভুঙ্কো তারা, লয় গো বাবু?

বিনোদ তবুও কোন উত্তর দিল না। চুড়কী এবার
উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল, বলিল—একটি গান
তু কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুব গান শুনে-ছে।
আমাকে আমার মাঝি শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—
বলে—তু বাবুকে ভালো-বেসে ফেলাবি।

বিনোদেব ক্রমে যেন নেশা ধরিয়া আসিতেছিল।
তাহার নবজাগ্রত ঘোবন অহঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে
হাসিয়া বলিল—গান ত আমি তোকে শোনাব—তুই কি
দিবি আমাকে?

চুড়কী যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। তার পব বলিল—
★ একটি ক'রে রাঙা জবাফুল তুকে আমি রোজ দিব।

বিনোদ বলিল—ধোং, জবাফুল নিয়ে কি করব আমি?

—কেনে কানে পরবি—সমস্ত চুলে গুঁজবি। তু
আমাকে রোজ গান বলবি হোক।

* * *

প্রকাণ্ড একটা টানেলের মধ্য দিয়া অতুল চলিয়াছিল।

দু-পাশে কয়লার নিবিড় কঠিন স্তর। গ্যাসেব আলোকের
প্রতিচ্ছটায় কয়লার ভীষণ স্পন্দ কোণগুলি ছুরির মত চকমক
করিয়া উঠিতেছে। হাতেব আলোটা তুলিয়া অতুল তাহাতে
একটা বিড়ি ধরাইতে গেল। কিন্তু নিশ্বাসের ফুৎকারে
আলোটা নিবিয়া গেল। অন্ধকার! কোথাও কোন সাড়া
নাই, শব্দ নাই। ধোঁয়ার উত্তাপে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে
কষ্ট বোধ হইতেছে। অস্বস্ত—বিচিৎ। পকেট হইতে
দেশলাই বাহির করিয়া অতুল আবার আলোটা জালিয়া
ফেলিল। টানেলটা একটু বাকিয়া গিয়াছে। বাকটা ফিরিয়া
দূরে ধোঁয়ার মধ্যে জলন্ত অঙ্গারের মত শিখাহীন কয়টা
দীপ্তি দেখা গেল। মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়া
যাইতেছিল—কে আবার বাশীও বাজাইতেছে। টানেলের
পাশে পাশে কুলিরা দিব্য শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে।
ছাঁট ছেলে আপন মনে বাশী বাজাইতেছিল। কতকগুলি
মেয়ে গান করিতেছে। অতুল পশ্চিমের গ্যালারীর দিকে
মোড় ফিরিল। এইদিকেই আশুন। উত্তাপ—ধোঁয়া
ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতুল দাঁড়াইল। তাহার
জীবনের অনেক দাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোরা
সব পিটের মুখের কাছে গিয়ে বস। ম্যানেজার এলে
কাজে লাগবি।

* * *

অবস্থা দেখিয়া মালিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া
পড়িলেন। ম্যানেজার ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন।
অতুল বলিল—আমি পারি। অবশ্য যে-বায়গার আশুন
লেগেছে সেখানটা চিরদিনের মত বাদ যাবে। কিন্তু বাকী
খাদ নিরাপদ হবে।

মালিক তাহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—তাই করুন বত
ধরচ হয়, কোন ভাবনা নাই।

অতুল দ্বিধাহীন পরিকার ভাবে বলিল—কিন্তু কি স্বার্থে
আমার জীবন বিপন্ন ক'বে আপনার উপকার করব?
আমার পারিশ্রমিক কি দেবেন বলুন।

মালিক অবাক হইয়া গেলেন। তাহার মনে পড়িল,
কয় বৎসর পূর্বের ছিন্নবাস উপবাসক্লিষ্ট একটি ছেলের কথা।
সেদিন তিনি দয়াপববশ হইয়া তাহাকে একটি চাকরি
দিয়াছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—

একথাটা আপনাব কাছ থেকে প্রত্যাশা করি নি অতুলবাবু।

অতুল হাসিল, বলিল—বোধ হয় আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন সেই কথা ভাবছেন। কিন্তু এই যে এত দিন আপনার এখানে রয়েছি, বিনা পরিশ্রমে কোন দিন ত আপনার কাছে বেতন আমি নিই নি। আমি পরিশ্রম করেছি তার পারিশ্রমিক আপনি দিয়েছেন। খাঁটি বিনিময়—দান নয়। আজ পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্যে একবিন্দু অবহেলা করি নি।

মালিক বলিলেন—কি চান আপনি?

অতুল বলিল—এক জন বড় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যা নিত তাই নেব আমি। অবশ্য আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাদ দেবেন তা থেকে।

মালিক রাজী হইলেন। বলিলেন—তাই পাবেন।

অতুল বলিল—কন্ট্রাক্ট ঠিক বিধান মতে হওয়া দরকার। কাগজে কলমে একথানা চিঠি দিতে হবে আমাকে।

তাও হইয়া গেল। অতুল বলিল—ফায়ার ব্রিক্স আর ফায়ার ক্লে দরকার। যে গ্যালারীগুলোতে আগুন হয়েছে ওগুলো বন্ধ করে দিতে চাই আমি।

মালিক প্রশ্ন করিলেন—তাতে কি হবে?

অতুল হাসিয়া বলিল—তাতেই আগুন নিববে স্যব। নইলে অল্প খাদ ভর্তি কবেও নিববে না। যেদিন জল মেরে কাজ আরম্ভ করবেন সেইদিনই আবার গ্যাস হতে শুরু করবে।

ইঞ্জিনটা আজ নিস্তব্ধ—খাদ বন্ধ। শুধু ষ্টীমের শব্দের সঙ্গে পাম্পিংয়ের শব্দ উঠিতেছিল অলস ভাবে।

লরীর শব্দে কলিয়ারীটা মুখবিত হইয়া উঠিল। লরীতে জিনিষপত্র আসিতেছিল। বিপুল উদ্যমে দ্রুতবেগে উদ্যোগ-আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিয়া গেল বাধিল। কুলিরা কেহ নামিতে চায় না। কুলি-রিফটর কুলিদেব বড় গ্লিয়। সে দুয়ারে ছয়াবেঁ কবিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে কেউ নামতে চাইছে না। বলছে বিনা দম লিয়ে অর্ধাঙ্গ মরে যাব বাবু। উ আমরা লারব। কৃতকণ্ঠে কুলি কালরাত্রে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

হাকপ্যাণ্টের পকেটে হাত দুইটা পুরিয়া দিয়া অতুল বলিল—হু-টাকা ক'রে হাজরী দেব—চার ঘণ্টা কাজ। ফের আপনি গিয়ে কুন।

রিফটর চলিয়া গেল। অতুল নিজেই ফায়ার-ব্রিক্স বোঝাই একটা টবগাড়ী গিট দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—ইডিয়ট কোথাকার? টাকার ছনিয়া কেনা ঘর—মাহুষ কি ছনিয়ার বাইরে?

তারপর নিজেই ঘণ্টার সকেত করিয়া হাঁকিল—হো—ই! ইঞ্জিন চলিতে লাগিল।

* * *

মেসের ঘর ঘবে বাবুদের ব্যস্ততার সীমা নাই। কার কখন ডাক পড়িবে কে জানে। কালীপদ লটারীর টিকিটের নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছে। মার্ভেলার-বাবু প্লান খুলিয়া বসিয়া আছেন। কতদূর গ্যাস আগাইয়া আসিল, দাগের পর দাগ টানিতেছেন। বিহর হারমোনিয়মটা বন্ধ। কেরাণী সীতাপতির ছবির খাতা বাগ্নে বন্ধ হইয়া আছে—রঙের বাটগুলা শুকাইয়া গেছে। ষ্টেঁরবাবু জিনিষ জমা করিয়া আর খরচ লিখিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ খাদে নামিবার পোষাক পরিতেছিল। ঘরের উত্তর দিকে খোলা মাঠ। উত্তর দিকের জানলা হইতে কে বলিল—একটি গান কর কেনে বাবু।

বিনোদ ফিরিয়া দেখিল চুড়কী। শুধু চুড়কী নয় আর দুই-তিনটি মেয়ে। বিনোদ বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই কুত্ৰী কালো বর্কর মেয়েগুলো অত্যাচারে তাহার মানির আর পরিসীমা নাই। নানা জনে নানা কথা বলে। নিজেরও যুগা বোধ হয়। সে কহিল—যা—যা বিরক্ত কবিস না।

আর একটি মেয়ে বলিল—রাগ করছিস কেনে বাবু? একটি গান শুনায়ে দে আমরা চলে যাই।

এক জন বলিল—চুড়কী তুর লেগে জবাফুল এনেছে। দে গে—চুড়কী ব'ব্কে ফুলটি দে।

চুড়কী জবাফুলটি ছুড়িয়া বিনোদের বিছানার ফেলিয়া দিয়া বলিল—লে বাবু কানে উটি পর। বড়া ভাল লাগবে তুকে।



বিনোদের ইচ্ছা করিল ফুলটাকে ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাও সে পারিল না। এইটা তাহাব একটা অক্ষমতা—সে তাহা জানে। রুচভাবে কাহাকেও আঘাত করিতে সে পারে না। বিব্রত হইয়া বিনোদ অনুরোধ করিয়া বলিল—পালা বাবু তোরা এখন। আল্লাস নে আমায়। খাদে যাব দেখছিস্ না।

আশ্চর্য্যাবিত হইয়া চুড়কী বলিল—খাদ ত পুড়ে গেইছে তু.দর।

—তোদের মাথা হইছে। তোরা কাজ করবি না— আর তোদের কাজ আমাদেরিগে করতে হচ্ছে।

চুড়কী বলিল—সত্যি বলছিস্ তু? খাদে গেলে মরে যাবি না?

আপন মনেই হাসিয়া বিনোদ বলিল—আচ্ছা বোঁড়া জাত বটে বাবু।—মরে কেন যাবি? এই ত আমি চললাম। তোদিগে ছুটাকা তিন টাকা ক'রে হাজরী দেবে। আসবি তোরা?

একটি মেয়ে বলিল—হা—বাবু সত্যি—তিন টাকা ক'বে দিবি তু? আর মবে যাব নাই?

—না—না—না। কতবার বলব তোদের বল!

চুড়কী বলিল—তু থাকবি ত বাবু খাদে? না— আমাদেরিগে ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসবি?

—ভালা বিপদ বাবা। ওরে পালিয়ে আসবার যো কি? চাকরি যাবে যে।

নিজদের ভাষায় কি সব বলাবলি করিয়া চুড়কী বলিল—মালকাটাদিগে বলি গা বাবু। তুকে কিন্তু গান শুনাতে হবেক্।

তাবপর সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল—দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল চল।

বর্ষর কালো মেয়েগুলি নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর কয় জন মাঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি তু তিন টাকা ক'রে দিবি!

অতুল বলিল—তাই পাবি।

—হা বাবু—তু আামাদের সাথে রইবি ত?

হাসিয়া অতুল বলিল—তোদের পাশে আমি দাঁড়িয়ে

থাকব। তা ছাড়া রাজমিস্ত্রী থাকবে, অন্ত বাবু থাকবে। তোরা একা থাকবি না।

—বেশ্ বাবু তবে আমরা নামব। মাঝিন্ নামতে দিবি ত?

অতুল জানিত এই মাঝিন্দের ফেলিয়া ইহার কোথাও যায় না। রাজসিংহাসন পাইলেও না। সে হাসিয়া বলিল—বেশ তরাও নামবে।

ম্যানেজার ক্ষীণ ভাবে প্রতিবাদ কবিলেন—সে বে বে-আইনী হবে অতুলবাবু।

কেজে ব্রেকটা খুলিতে খুলিতে অতুল বলিল—নেসেসিটি হাজ নো ল। আইন মানতে গেলে খাদ পুডতে দিতে হবে।

তার পর হাঁকিল—হো—ই—ইটার গাড়ী লাও।

* * *

অন্ধকার খাদের তলে মানুষের কর্মকোলাহলের আর বিরাম ছিল না। উপরেও তাই। খাদের মুখে খাজাঞ্চী বাজ লইয়া বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলিদেব বেতন মিটিয়া বাইতেছে। শেডের মধ্যে বসিয়া বুড়া ডাক্তার। গীয়াবহেডের চাকা দুইটা অবিরাম ঘুরিতেছে—বং—বং—বং। নীচে হইতে সঙ্কেত আসিতেছে লোক উঠিবে।

টালোয়ান ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে সঙ্কেত করিল, হো—ই। মিনিট দুই পরেই বিপুল শব্দ করিয়া কেজটা উপবে আসিয়া লাগিল। এক জন বাবু একটি কুলি এক জন কামিনকে লইয়া নামিল। মেয়েটিব বুকে ব্যথা ধরিয়া খাস লইতে কষ্ট হইতেছে। অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের চাবি আলগা করিয়া দিয়া টিউবটা মেয়েটিব নাকের কাছে ডাক্তার ধরিয়া বলিল—ভর নাই।

নীচে হইতে আবার সঙ্কেত আসিল—বং—বং—বং।

আবাব লোক উঠিয়া আসিয়া বলিল—মাটি—মাটিব গাড়ী জলদি চালাও।

মাটির গাড়ী লইয়া কেজ নামিল।

খাজাঞ্চী হিসাব করিতেছিল—তিন দু-গুণে ছয়— এই লে মাঝি, ছটাকা হাজরী তোদের।

খাদের নীচে লাইন ধরিয়া মাটি-বোথাই টব-গাড়ীটা চলিতেছিল ধীরে ধীরে; এক জন আর্মি



সেটার গতি দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল। আবও ভিতরে যেখানটার আশ্রয় লাগিয়াছে সেখানে গ্যালারীর মুখে মুখে গাঁথনি উঠিতেছিল। বিশ-পঁচিশ মিনিট অন্তর লোক স্থান পরিবর্তন করিতেছে। গ্যাসে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, বিবর্ণ পাংশু মানুষগুলি টলিতে টলিতে অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের কানেলের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। অতুলের পিঠে ডুবুরীদের মত ছোট একটা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার বাঁধা, তাহার দুইটা নল নাকেব কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করিতেছে। সে অনববত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্যালাবীর মুখে মুখে ফিরিতে ছিল।

সে বলিল—জন্দি—জন্দি—আর মাত্র তিনটে গ্যালারী। চালাও ভাই চালাও। দেবি হ'লে সব নষ্ট হবে। গ্যাস-সব ঐ গ্যালারী দিয়ে বেরুতে আরম্ভ করবে।

বিনোদ একটা গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। চুড়কী বহিতেছিল কান, তাহার মাঝি ইট যোগান দিতেছিল। কানার পাখটা কেলিয়া দিয়া চুড়কী বলিল—শারব আর আমি। সে ঝাপাইতেছিল। বিনোদ বলিল—না-বা ঐখানে যা। বাতাস নিয়ে আস—বাতাস নিয়ে আর।

—হট বাও—হট বাও। ইটাকে গাড়ী যাতা হ'য়।

বিনোদ সরিয়া দাঁড়াইল, হড় হড় শব্দে গাড়ীখানা চলিয়া গেল।

—কাদা—কাদা—কানার-কে। অতুল ঝাকিতেছিল।

ওপাশ হইতে কে ঝাকিল—আদমী গিব গিয়া হিয়া। জন্দি লে বাও।

অতুল দ্রুতবেগে বিনোদের পাশ দিয়া বাইতে বাইতে বলিতেছিল—আর ছটো—আর ছটো গ্যালারী!

ধোঁয়ার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিনোদের রুট হইতেছিল। সে একটু সরিয়া আসিয়া ২৫ নম্বর গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইল। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। ওদিকে ২৮ নম্বরে কাজ চলিতেছে। ২৭ নম্বর বন্ধ হইলেই যুদ্ধের শেষ হয়। ধরলীগর্ভে আশ্রয় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া বাইবে। কে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল। বিনোদ এক ঝটকায় তাহাকে কেলিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। ক্রোধের আর তাহার সীমা ছিল না। চুড়কী

পড়িয়া গিয়াও থিল থিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। জুতার ডগায় চুড়কীর মুখে একটা চোমর মারিয়া বিনোদ বলিল—লাধি মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব আমি।

চুড়কী কৌপাইয়া কাদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিনোদ সেখান হইতে পলাইয়া গেল। বাইতে বাইতে সে আবার ফিরিয়া চাহিল।

ধোঁয়ার বাপে ভাল করিয়া দেখা গেল না। কিন্তু অফুট কানার শব্দ সে যেন তখনও শুনিতে পাইতেছিল। বিনোদ ফিবিলা। ডাকিল—চুড়কী—এই চুড়কী কাজে যা—উঠে যা।

—না—আমি যা-ব না। তু কেনে আমাকে লাঁথায় মেলা?

ওদিক হইতে হড় হড় শব্দে টব-গাড়ী আসিতেছিল, যে ঠেলিয়া আনিতেছিল—সে ঝাকিল—হো-ই হট বাও।

বিনোদের আব সাহস হইল না। সে পলাইয়া আসিল। সিলিণ্ডারের মুখে অক্সিজেন লইবার অছিলায় পিটের মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। হড় হড় শব্দে টবগাড়ী যন্ত্রপাতি ফিরিয়া আসিতেছে। কান্ন বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয় জনে কাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল।

—বন্টি মারো টালোয়ান—বন্টি মারো জন্দি। পাচ আদমী গির গিয়া।

পিছনে পিছনে আবার এক জন আসিল। বিনোদ প্রশ্ন করিল—কি—ব্যাপার কি হে?

—আর কি? গ্যাস একদিক দিয়ে জোব ধরেছে। ২৭ নম্বর আর বন্ধ হ'ল না। পিছিয়ে আসতে হ'ল।

—ক নম্বর পর্যন্ত পেছুতে হ'ল?

সন্ সন্ শব্দে কেজটা উঠিয়া গেল, উত্তর আব শোনা গেল না। বিনোদ দ্রুতপদে খাদের মধ্যে আগাইয়া গেল।

বন্ধ হইতেছিল ১৫ নম্বরের মুখ।

অতুল কাহাকে বলিতেছিল—উপায় নাই—বারোটা গ্যালারী ছেড়ে দিতে হ'ল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল—ভাঙো—গাঁথনি ভাঙো। ভেতরে লোক—

তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল—গেট-আউট।



বন্দিনী
কুমারী বহ্না বহ্ন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বিনোদ সঙ্কল্প দৃষ্টিতে চাহিয়া আর একবার বলিল—
চুড়কী—

বাধা দিয়া অতুল বলিল—ওপরে যাও তুমি।
তার পর ইংরেজীতে একটা চিরকুট লিখিয়া হাতে দিয়া
বলিল—ক্যাশিয়ারকে দাও গে।

কাশিয়ার কাগজখানা পড়িয়া কুড়িটা টাকা বিনোদের
হাতে দিয়া বলিল—তোমার ম'ইনে। এক ঘণ্টার মধ্যে
কলিয়ারী ছেড়ে চলে যাও। ছটু সিং!

—ছটু! ছটু সিং সেখানে হাজিরই ছিল।

—এক ঘণ্টার মধ্যে বাবুকে কুঠীর সীমানা থেকে বের
ক'রে দেব।

নীচ তখন কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতুল কামাল

কপাল মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিল—হি লাভ্‌স
হার। প্রকাশ ক'রে ফেলবে। ফুল! জানেন না বে-সম্পদ
বাচল তাতে ওই মেয়েটির মত কত হাজার স্ত্রী-পুরুষের
হীবিব'র সংস্থান হ'ল। প্যাকিং দ'ও—ক'য়ার-ক্রেয় প্যাকিং
দিয়ে দ'ও—নে এক বিন্দু গ্যাস না আসে।

আগুন ধামিয়া গেছে। আবার কলিয়ারী তেমন
চলে। কেজ ওঁ-নামে। রাজিতে কুলি-কামিন ভিড
করিয়া আসে—বাবু না ম লেখে।

টালায়ন হাকে—হো—ই।

ইনি চলে—কেজটা নামিতে থাকে।

রুশিয়ার রাজ-অলঙ্কার

শ্রী বিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

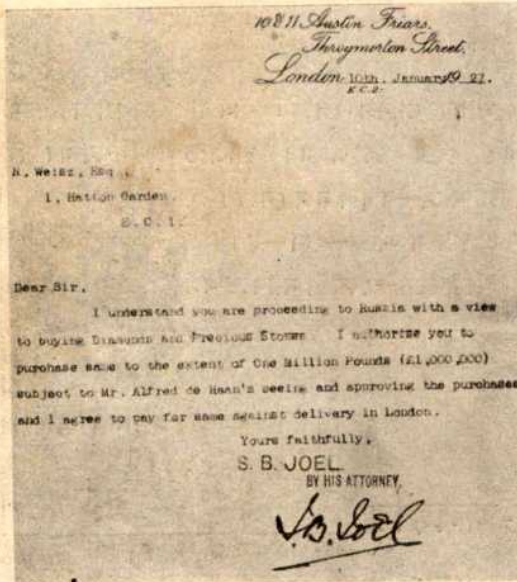
রাসপুটিনের হত্যাকা'রী র'ভকুম'র ইউয়ুপফ্‌, তাঁ'হ'র
কার্যাবলীর দ্বারা লণ্ডন শহরে প্রসঙ্গক্রমে রুশিয়ার রাজ-
ঐশ্বর্যের রহস্যময় কাহিনীর স্ব'রোদ্য'টন করিয়াছেন।
জগদ্বিখ্যাত মণিকার কাল'ফেবার্গ বিরচিত, 'জার' তৃতীয়
আলেকজান্ডারের স্বর্ণময় 'ইষ্টার এ'ও এই লণ্ডন শহরে
প্রকাশ্যে ব'নীলামে বিক্রয়ের জন্ত আনীত হয়। রুশীয়
বিপ্লবের অব্যবহিত পরে নিহত 'জার' ২য়-নি.কাল'সের সমুদয়
নিরুপস্থিত ও এইরূপে ইংলণ্ডে বিক্রয়ের নিমিত্ত আনীত
হইয়াছিল। এই ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাধান্য অভিনেতা মিঃ
নর্মান উইল্‌স্‌। ইনি বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মণিকার
বলিয়া পরিচিত। তাঁ'হ'র নিকট সাক্ষ'ৎপ্রার্থী
কোনও সংবাদিকের নিকট রুশীয় সম্রাটগণের নিভস্ব
অলঙ্কার'দি ক্রয়স্বত্ব তিনি নিয়লিখিত বিবৃতিটি
প্রদান করেন :—

যদিও আমি এক জন ইংরেজের তথাপি ইংলণ্ডের
প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমার জননী

ইংরেজী বৃষ্টি ও সাহিত্যে বিশেষ অগ্রগতি ছিলেন।
বোধ হয় এই কারণেই আমিও তাঁ'হার নিকট হইতে উক্ত
স্বত্ব প্রাপ্ত হই। আমি শৈশবকাল হইতেই বৃন্দাপেঠের
একটি বিখ্যাত মণিকারের অধীনে শিক্ষানবীশী করিতাম,
কিন্তু যখন আমি অষ্টাদশ বৎসরে পদ'র্পণ করিলাম তখন
এক দিন তিন শিলিং ছ-পেন্স এবং লণ্ডনের ক্রিকল্ডউডের
এক জন অধিবাসীর ঠিকানা মাত্র সম্বল করিয়া বৃটিশ
সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নগরী লণ্ডন শহরে উপস্থিত হইলাম এবং
উক্ত মণিকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চাকুরী প্রার্থনা
করিলাম। ভদ্রলোকটি বর্তমানে আমাকে কোনরূপ সাহায্য
করিত পারিবেন না জানাইলেন, তবে সুপ্রসিদ্ধ হাটন
গার্ডেন নামক ইংলণ্ডের প্রধান জহরী-কেন্দ্রের ঠিকানা
বলিয়া দিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রত্যেক জহরী-দোকানে
চাকুরী প্রার্থনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু জুর্ভাগ্যবশতঃ
কোথাও চাকুরী পাইলাম না। বোধ হয় বিদেশী বলিয়া
ও বাহ্য আকৃতির জন্ত চাকুরীর পথে আমার নিষ্প্রাণ

উপস্থিত হইল। বাহা হউক আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; অবশেষে একটি ছোট স্বর্ণকারের দোকানে কাজ পাইলাম। কাজের মধ্যে আমি নিজেকে একেবারে বিস্তৃত হইয়া গেলাম; এমন-কি রাত্রিকালে যখন আমার একমাত্র অবসরের

প্রাচীন মিশর দেশে ইহা পাওয়া যাইত, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব কেহ জ্ঞাত ছিলেন না। আমি এক দিন উক্ত প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্ত আমার এক অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত আমার বৎসামান্য সঞ্চিত অর্থসমেত বহির্গত হইলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধুটি আমার সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিলেন! ফুরাত আমাকে পুনরায় দারিদ্র্যের নিপেষণে বাকুল হইতে হইল; উপায়ান্তর না



সলি যোয়েল কর্তৃক মিঃ নর্থান উইসজকে লিখিত পত্রের অনুলিপি

সময় আসিত তখনও আমার বন্ধু-বান্ধবদের দু-একটি খুচরা কাজ করিয়া দিতাম। এই ভাবে কাজ করিবার পর এক বৎসরের মধ্যে আমি কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিতে সক্ষম হইলাম এবং তদ্বারা আমারই ছোট বেকার বন্ধুকে উচ্চ কমিশনে কর্মসংগ্রহের জন্ত নিযুক্ত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করিতে লাগিলাম।

এই সময় আমি খুব মূল্যবান প্রস্তরের কাজ পাইতাম না; সতরাচর যে-সকল কাজ পাইতাম তাহা অল্প মূল্য প্রস্তরের। একদিন প্রাতঃকালে এক জন ভদ্রলোক আমাকে একটি অসুরীতে ছোট সবুজ রঙের একটি পাথর বসাইবার জন্ত দিয়া গেল। যদিও এই শ্রেণীর প্রস্তরগুলি খুব মূল্যবান নহে তথাপি নূতন ধরণের প্রস্তর দেখিয়া আরও কতকগুলি এই প্রকারের প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্ত মনস্থ করিলাম।

আমি জানিতে পারিলাম এই প্রস্তরগুলি সাধারণতঃ পেরিডটস্ (Peridots) বলিয়া সমধিক পরিচিত;

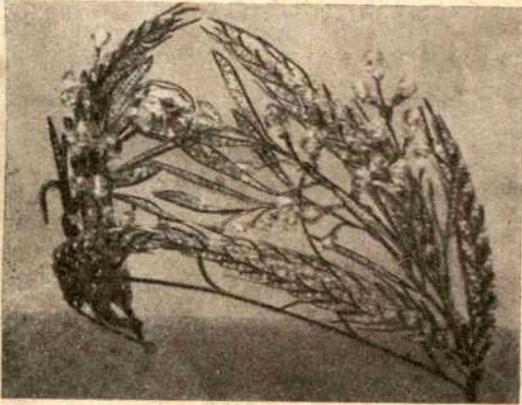


বিখ্যাত ইংরেজ জহুরী মিঃ নর্থান উইসজ। ইনিই রুশিয়ার রোমানক্ রাজ-বংশের বহু-অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছেন

দেখিয়া আর একটি স্বর্ণকারের দোকানে কর্মে নিযুক্ত হইলাম। এক দিন যখন আমি দোকানে কাজ করিতে ছিলাম তখন উক্ত বন্ধুটিকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। আমি দ্রুতপদে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, “শীঘ্র আমার সমুদয় অর্থ ফিরাইয়া দাও।” সে আমাকে একটি দরজার আড়ালে লইয়া গিয়া জানাইল যে সে তাহার সমস্ত অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার

কাছে এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা সে আমার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে। বাহা ইউক অনেক বাদানুবাদের পর সে আমাকে কতকগুলি ঐ প্রকারের প্রস্তর দিতে রাজী হইল।

যখন বুঝিতে পারিলাম আমার বন্ধুবরের নিকট হইতে অপেক্ষিত অর্থ উদ্ধারসাধনের আর কোনরূপ আশা নাই তখন অগত্যা প্রস্তরগুলি ও একটি জীর্ণ টাইপ-রাইটার হস্তগত করিলাম। পুনরায় আমার নিজ বাসকক্ষে পূর্বের ন্যায় বাবসা আরম্ভ করিলাম। দশ মাস পরে ঐ শ্রেণীর প্রস্তর সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, কারণ সাধারণতঃ ইহার মূল্য বেশ অল্প এবং ইহা অত্যন্ত সুদৃশ্য। দেখিতে-দেখিতে আমার বাবসা বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহার পর আমি আর কাহারও নিকট চাকুরী গ্রহণ করি নাই। তিন মাস পরে উক্ত প্রস্তরের খনির এক দালালের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং আমার এক মাসের সমস্ত সঞ্চয় ঐ খনির অংশ ক্রয়ের জন্ত নিযুক্ত করিলাম।

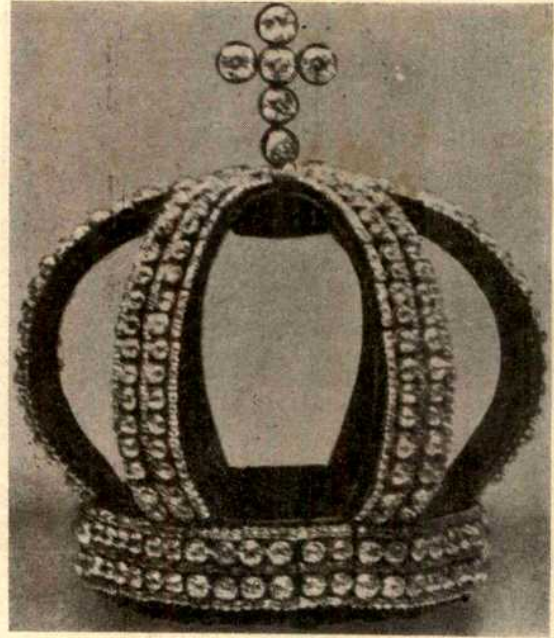


শেষ রুশ-রাজমহিষীর হীরক-বচিত টায়রা

আমার অবস্থা অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হইল। ক্রমে আমি উক্ত খনির সমগ্র স্বত্ব প্রাপ্ত হইলাম; ফলে অল্পমূল্য প্রস্তরের একচ্ছত্র বিক্রেতারূপে লণ্ডন শহরে পরিচিত হইতে সক্ষম হইলাম।

হীরা, মুক্তা এবং অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর পরীক্ষা করা এবং ক্রয় করা আমার চিরকালের ইচ্ছা ছিল, সুতরাং ইহা এখন আমার দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া দাঁড়াইল। সমগ্র দেশে আমার নাম ছড়াইয়া পড়িল। কোন মূল্যবান

প্রস্তরের যথার্থমূল্য নির্ধারণের জন্ত আমার সর্বত্র বাতায়ত করিতে হইত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ হইতে লোকেরা হাটন গার্ডেনে প্রস্তর ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্ত আগমন করিতেন। ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা



রাজা 'কাথারিন দি গ্রেটে'র অপূর্ণ মণিমুক্তাখচিত বিবাহ-মুকুট

ও মার্কিন ধনকুবেরগণের নিত্য আবির্ভাবে এই স্থানটি এক ঐশ্বর্যাশালী স্থানে পরিগণিত হইল। আমার সামান্য ঐকান্তিক অধ্যবসায় এবং অসাধারণ কর্মশক্তি শীঘ্রই বড়-বড় স্বর্ণকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

তখন সবেমাত্র ইউরোপের মহাবুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সকলেই নিজেদের সঞ্চিত অর্থগুলি মূল্যবান প্রস্তর ও স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় হঠাৎ চতুর্দিকে গুজব উঠিল রুশিয়ার সরকার ভূতপূর্ব 'জার'ের যাবতীয় ধনরত্ন বিক্রয়ে মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত ঐশ্বর্যাগুলি তাঁহার বিভিন্ন প্রাসাদে ও ছুর্গে পাওয়া গিয়াছে। শীঘ্রই এই সংবাদ আমরা অবগত হইলাম এবং ইহারই ফলে সমগ্র হাটন গার্ডেনে এক অননুভূত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

প্রথমে সকলে ইহাকে 'উড়ো' সংবাদ হিসাবে ধর্ম্মিয়া

অতি স্বল্প উন্নত ধরণের কারুকার্য-ক্ষেদিত স্বর্ণপাত্র যে গঠিত হইত তাহা আমার কল্পনারও অতীত। পাত্রটির ওজন সর্বসমেত ১০৮ আউন্স; ১৭৯১ সালে ইহা গঠিত হয়। পাত্রটির চতুর্দিক এক হাজার তিন শত পঞ্চাশটি বৃহদাকার এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড দ্বারা শোভিত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, বহু পূর্বে ইহা পূজার্চনার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সমসাময়িক পোপ কর্তৃক প্রদত্ত একটি অঙ্গুরীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট ছিল। হীরকখণ্ডগুলি কিঞ্চিৎ নীল আভাবিশিষ্ট ও স্বেত বর্ণের। স্বর্ণময় পাত্রটি পীটারসবার্গের গীর্জা হইতে আনীত হইরাছিল। পরবর্তী যুগে রাজকীয় সুরাপাত্র-হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ মণিকার মিঃ ওয়াটসকি ইহার স্বত্বাধিকারি।

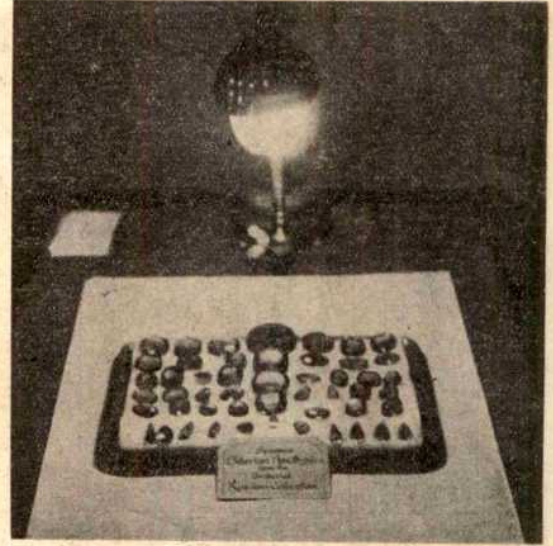
ইহার পর আমি যেখানে গমন করিলাম সেখানে এক সেট চায়ের সরঞ্জাম ছিল। স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কিন্তু এই মণিখচিত পানপাত্রের ঔজ্জ্বল্যে চতুর্দিক আলোকিত হইরাছিল। ইহা 'জার' দ্বিতীয় নিকোলাসের জগদ্বিখ্যাত স্বর্ণময় চা-পানের পাত্র। সর্বসমেত ছয়টি পাত্র ছিল। সবগুলিই স্বর্ণময়, কিন্তু ইহাদের হাতলগুলি সুদৃশ্য হস্তিদন্তে নির্মিত। ইহাদের মোট ওজন ২০ পাউণ্ড এবং ক্ষোদন-কার্য অতুলনীয়। কোন স্বর্ণকার যে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ পাত্রে তাঁহার নামের উল্লেখ ছিল না। তবে তিনি যে এক জন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ জহুরী ছিলেন সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

একতলার একটি প্রকাণ্ড কক্ষে গ্রীক ক্যাথলিক পুরোহিতের স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ ছিল। এই অপূর্ণ স্বর্ণ-সমারোহে আমার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। পরে আমি যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম সেখানে সোনার ফ্রেমে বাঁধান কতকগুলি ছোট ছোট ছবি দেখিতে পাইলাম। চিত্র-গুলির অঙ্কন এত সুন্দর যে সাধারণ শিল্পীর পক্ষে ইহা চিত্রিত করা সম্ভবপর নহে। পার্শ্বে টেবিলের উপর একটি কারুকার্যময় বাঁশরী শায়িত অবস্থায় ছিল, আজকাল এই প্রকারের একটি বৃহৎ হস্তিদন্ত অত্যন্ত দুর্লভ।

অতঃপর নানাবিধ জন্তু-জানোয়ার-ক্ষেদিত কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তর একস্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম।

পৃথিবীর মৃত জীবজন্তুদের ইহা এক ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইল।

ঐ কক্ষের আর একটি টেবিলে নানা প্রকারের হীরক ও অত্যন্ত প্রস্তর ক্ষোদিত হাতলওয়ালা একটি তরবারি

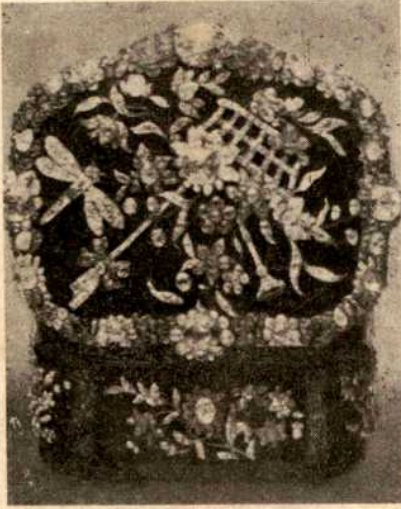


রোমানক্ রাজ-বংশের পদ্মরাগমণির সমারোহ

দেখিতে পাইলাম, ইহাই 'পীটার দি গ্রেটের' ব্যবহৃত অস্ত্র। এলিজাবেথ বার্গনারের প্রযোজনায় যে 'ক্যাথারিন দি গ্রেট' শীর্ষক চিত্রে ওদর্শিত হয় তাহাতে ডগলাস্ ফেয়ার-ব্যাধস্ (জুনিয়ার) 'পীটার দি গ্রেটের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া এই অস্ত্রের অনুকরণে রচিত একটি অস্ত্র ব্যবহার করেন। মারলিন ডিটারিক্ও এই অসিসংক্রান্ত একটি ছায়াচিত্রে তুলিবার আয়োজন করিয়াছেন; তিনি এই অস্ত্রটি ব্যবহারের জন্ত আমাকে অহরোধ জানাইরাছেন। বর্তমানে এই অস্ত্রটি আমার নিকট আছে।

রক্তবর্ণ ভেলভেটের উপর কোণাকুনি ভাবে স্থাপিত ছয়টি প্রকাণ্ড আসল প্রস্তর ও দুই সারি উজ্জ্বল ছোট ছোট প্রস্তর দ্বারা সমাচ্ছাদিত একটি মুকুট দেখিতে পাইলাম। ইহা সম্রাজ্ঞী 'ক্যাথারিন দি গ্রেট' বিবাহোৎসবের সময় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতঃপর একটি মহামূল্য মণিময় টায়রা দৃষ্টিগোচর হইল। ইহার সন্নিহিতে একটি প্রকাণ্ড হীরক-পত্র-ক্ষেদিত বোচ দেখিলাম; ইহার উপরিভাগে

কতকগুলি সুদৃশ্য চুনী-পান্না, মধ্যখানে দুইটি স্বচ্ছ রক্তময় মূল্যবান প্রস্তর এবং তিনটি প্রকাণ্ড আসল মুক্তা বসান ছিল। এই ধরণের কারুকার্যময় হুন্দের ব্রোচ আমি কোথাও কখনও দেখি নাই। মেঝের উপর একটি সবুজ



শেখ রুশ-সম্রাটের মরককুমণি-সন্নিবিষ্ট নস্তাধার

বর্ণের হুন্দের কোটা দেখিতে পাইলাম; ইহা পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে নির্মিত স্বর্ণ ও হীরকে খচিত একটি নস্তা ডিপা; চতুর্দিকে ইহার উজ্জ্বল আভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। ইহার পর আরও কতকগুলি স্বর্ণ পেটিকা, প্রস্তরক্ষেদিত বড়ি, হীরা-বসান চসমা এবং অস্ত্রাত্ত মহাখ জড়োয়া দেসিলাম। আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ কোন্ দ্রব্য আমি ক্রয় করিব। উত্তরে তাঁহাকে জানাইলাম, দরে ঠিক হইলে আমি সবগুলি ক্রয় করিব। লোকটি মূল্য বলিবার আগে জারের গ্রীষ্মাবাসে লইয়া গেল। এখানে জড়োয়া গহনা, জহরৎ অপেক্ষা আসবাবপত্র, কলাশিল্প, নানাপ্রকার প্রাচীন বাগ্গবত্ত ও উজ্জ্বল দর্পণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বীণা দেখিতে পাইলাম, ইহার অবস্থা তখনও পর্যাপ্ত বেশ ভালই ছিল। ইহা অপূর্ণহুন্দরী ফরাসী রাজ্ঞী মেরী এ্যাণ্টোইনেটকে একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠান উপহার-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিল। রুশ-ফরাসী সন্ধিকালে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী প্রেসিডেন্ট লোবে রুশিয়ার গ্রাণ্ড

ডিউক পলকে এই বীণাটি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। ইহা পরে জারের অধিকারে আসে।

রুশ-সরকার আমাকে চিত্তা করিবার জন্ত ২৪ ঘণ্টা সময় দিলেন। পরদিবস তাহারা আমাকে এই প্রস্তরাদি ক্রয় করিবার জন্ত আমি প্রস্তুত আছি কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানাইলাম যে তাঁহাদের চাহিদার উপর আমার ক্রয় নির্ভর করিতেছে। বাহা হউক তাঁহারা আমাকে যে-দর বলিলেন তাহা আমার নির্দিষ্ট অর্থ হইতে অল্প ছিল। সরকারের নিকট প্রতিশ্রুত আছি বলিয়া আমি মূল্যের কথা এখানে প্রকাশিত করিতে পারিলাম না।

সত্য কথা বলিতে কি এই মূল্যের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম। কারণ আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম জার্মান-সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি উক্ত ঐশ্বর্য্যগুলি ক্রয় করিবার জন্ত তিন মাস ধরিয়া মনোহাতে অবস্থান করিতেছেন। বুঝিতে পারিলাম জার্মান-সরকার রুশ-সরকারের চাহিদা অপেক্ষাও অল্প দিতে চান। যদি আমি ঐ দামে উহা গ্রহণ না করি তাহা হইলে রুশ-সরকার জার্মান-সরকারকে সমুদয় ঐশ্বর্য্য বিক্রয় করিবেন—সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বাহা হউক প্রথমে আমি ২০,০০০ পাউণ্ড কম দিতে চাইলাম, কিন্তু রুশ-সরকার আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের প্রার্থিত মূল্য দিয়া সমস্ত রুশ-রাজ-ঐশ্বর্য্য ক্রয় করিলাম। বৃটিশ ও রুশ সরকারের সর্বভ্রুখারী আমি ক্রীত মূল্যের দাম জ্ঞাপন করিতে পারিলাম না, কিন্তু মোটের উপর যে অর্থ আমি প্রস্তরাদি ক্রয় করিবার জন্ত লইয়া গিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

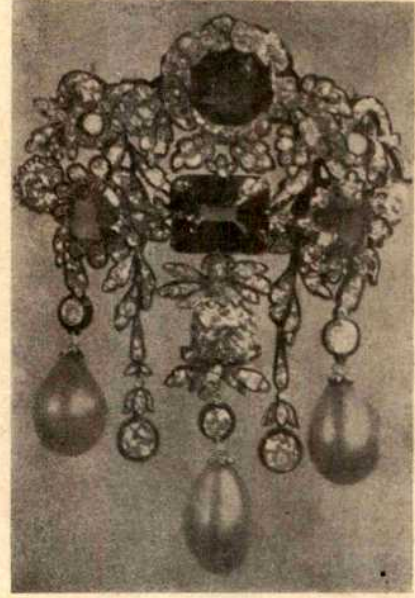
এখন ঐশ্বর্য্যগুলি চালান দেওয়াও একটি ভীষণ দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত আমার হৃদয় কৰ্ম-চারীর সাহায্যে সমস্ত জিনিষগুলি গুছাইয়া লইলাম। প্রত্যেক অলঙ্কারটি এত দৃষ্টি-আকর্ষণ যে আমি প্রায় কোনটারই কথা বিস্মৃত হই নাই। বাহা হউক আমাদের সর্ব অল্পসারে উক্ত রাজঐশ্বর্য্য জাহাজে চালান দেওয়ার পূর্ব পর্যাপ্ত সমস্ত অর্থ দিতে হয় নাই। আমাদের জাহাজটি লাইভিয়ার রাজধানী রিগাতে নোঙ্গর করিয়াছিল, সমস্ত মাল জাহাজে তোলা

হইলে রুশ-সরকারকে একটি মোটা রকমের চেক্ কাটিয়া দিলাম। বাহা হউক যত দিন আমি জাহাজে ছিলাম তত দিন আমি নিদ্রা যাই নাই।

কয়েক দিন পরে জাহাজটি নিরাপদে লণ্ডনের বন্দরে আসিলে হঠাৎ কাহার আহ্বান আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। ভাবিলাম আমার কোন পরিচিত বন্ধু বোধ হয় আমাকে লইতে আসিয়াছেন। কিন্তু পরে জানিলাম বন্দরের শুক্ক-কর্মচারী আমাকে ডাকিতেছেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি মিঃ নর্মান উইস্‌জ? উত্তর দিলাম, হা আমিই বটে।—আমি রুশরাজ্যে ধর্ম্য ক্রয় করিয়াছি কিনা সে-বিষয়ে আমাকে কর্মচারীটি প্রশ্ন করিলেন। আমি সম্পত্তিসূচক বাড়ি নাড়িলাম। এই সংবাদটি গোপন করিবার জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম আমার অজ্ঞাতসারে ইহা চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়াছে। কর্মচারীটি আমাকে জানাইলেন যে বর্তমানে মালগুলি শুক্ক-আফিসের গুদাম-ঘরে জমা হইবে। এই খবর শুনিয়া আমি একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। কি উত্তর দিব বুলিতে পারিলাম না। সমস্ত ব্যাপার ক্রমশঃ স্পষ্ট ভাবে বুলিতে পারিলাম।

যে বীণাটির কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি তাহা এক্ষণে অধিকারস্থত্রে ডিউক পলের বিধবা-পত্নী রাজমহিষী পেলীর প্রাপ্য; সুতরাং যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে আমি রাজ্যে ধর্ম্য ক্রয় করিয়া ফিরিতেছি তখন নিশ্চয়ই ঐ বীণাটি ও তাঁহার অজ্ঞাত সম্পত্তিও ক্রয় করিয়াছি। তিনি এক্ষণে ইংরেজ বিচারালয়ে এই বলিয়া দাবি উত্থাপন করিলেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কাহারও অধিকার নাই এবং কেহ উহা ক্রয় করিতেও পারেন না। বাহা হউক আমাদের কোতূহলোদ্দীপক বিচার আরম্ভ হইল। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্ত্রর পেট্রিক হেষ্টিংস ছিলেন আমার প্রধান কৌশল; ইহার হস্তে মোকদ্দমার ভার অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিত হইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি জয়লাভ করিবই করিব; রুশ-সরকারের কর্মচারিগণ আমার সাফল্য হইয়াছিলেন। কোর্ট রাজমহিষী পেলীকে আমার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ডিক্রী দিলেন; কিন্তু জানিতাম ইনি কপদকশূন্য, সুতরাং টাকার জন্ত তাঁহাকে

আমি পীড়ন করি নাই। তাঁহাকে আমি শুধু একটি অনুরোধ জ্ঞাপন করিলাম যে যেন উক্ত বীণাটি বিক্রয়ের সময় তিনি উপস্থিত থাকেন। রাজ্ঞী সহজেই সম্মত হইলেন এবং এক বার ঐ বীণাটি শেষ বারের মত বাজাইতে



পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর রোচ। ইহার কারুকার্য অপরূপ।

মধ্যভাগের মণিটির সাদৃশ্য নিতান্ত বিরল

দিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। এই ঘটনাটি অচিরে জগতের প্রত্যেক খ্যাতনামা সংবাদপত্রে ও চিত্রে প্রকাশিত হয়।

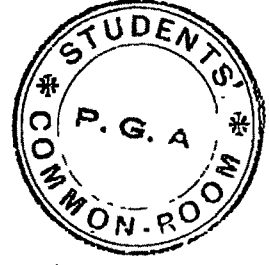
‘ক্রিষ্ট’তে রাজ্যে ধর্ম্য প্রকাশ্যভাবে নীলামে বিক্রয়ের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। ধনী গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, লেখকগণ ও অজ্ঞাত শ্রেণীর বহু দর্শক দলে দলে লণ্ডনে আগমন করিতে লাগিল।

এই বিশ্ব-আকর্ষণের কেন্দ্রস্থানীয় ছিলেন রাজমহিষী পেলী। মার্কিন ধনকুবেরগণ এই বিক্রয়ের শ্রেষ্ঠ ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইলেন, অধিকাংশ তাঁহারাই ক্রয় করিলেন। ইংরেজগণ ক্রেতা হিসাবে ইহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিলেন না। ফরাসী পোর্ভুগীজ এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা অল্প মূল্যের অলঙ্কারপত্র ক্রয়

করিলেন। এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে কাথারিন পড়িল, কিন্তু আমি এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জিনিষটি নিজের দি গ্রেটের বিবাহসমুহ, হারকগঠিত নৃত্যধার জয় রাখিয়াছি। অবশিষ্ট ঐশ্বর্য্য একসঙ্গে এক জনকে মণিময় টায়রাটি মার্কিন ধনকুবেরগণ ক্রয় করিয়াছিলেন। বিক্রয় করা হইবে; জানি না কাহার ভাগ্যে ঐ বিরাট ঐশ্বর্য্য লিখিত আছে; তবে সাধারণকে এগুলি পুনরায় ক্রয় করিলেন। বীণাটির কথা সর্বাপেক্ষা অধিক দেখান হইবে না। সম্ভবতঃ ঐশ্বর্য্যগুলি পৃথিবীর কোন প্রচারিত হইয়াছিল। সকলেই ঐট ক্রয়ের জন্ত ব্যস্ত হইয় দূরান্তরে স্থিত রক্ষণাগারের জন্ত ক্রীত হইবে।



শারদ-কী
শিল্পী—ঐযজ্ঞেশ্বর সাহা



জাগরণী

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা

আজ্ঞো জাগে নাই, আমরা কেন্দ্র করি,—

অসহ আবেগে চেউয়ে চেউয়ে ভাঙে স্থা,

মক-বালুতটে তিলে তিলে যায় মরি।

তব বালুতলে বহে কি সঙ্ক্কার,

তরঙ্গ মোর তাই নাহি পায় সাড়া ?

উন্মাদ চেউ উঠে পড়ে দ্বিধাহারা,

গুমরিয়া কাদে চিরদিবাবিভাবরী।

তুমি বলিয়াছ, তোমার মনের ক্ষুধা

আজ্ঞো জাগে নাই, আমরা কেন্দ্র করি।

মরুপথে আমি চলেছি উদাসীন,

শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি,

ভেবেছি মনে, শেষ হয়ে এল দিন,

মুক হয়ে এল মনের-মুখর বাণী !

তিমির কনানী উদার স্রব্ধকারে

চাকিবে আমার দুঃসহ দুঃভারে,

হেনকালে তুমি হুগোপন পদচায়ে

সহসা হুমুখে-দাঁড়ালে বনের রাণী,—

মরুপথে আমি চলেছি উদাসীন,

শুষ্ক স্রোতের শীর্ণ রেখাটি টানি।

দিনের রৌদ্র স্তিমিত পজ্রছায়ে

আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক,

প্রাণ-গহনে যেন স্বপ্নার বায়ে

ঘন কালো মেঘে উঁকি দিল বৈশাখ !

শ্রামতৃণমল ছুঁয়ে যায় রবিকর,

শাখা-অবকাশে হাসিছে দ্বিপ্রহর,

মায়া-গোধূলির এ নহে আড়ম্বর—

নির্ঝরক নহে, বাণী মোর হস্তবাক।

দিনের রৌদ্র স্তিমিত পজ্রছায়ে

আপনি আড়াল, ঘুঘু যেন দিল ডাক।

বিস্ময় মানি চাহিলাম আঁখি তুলে,

ফুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ,

মরুবুকে যেন তরঙ্গ উঠে তুলে,

দুই কূল ভেঙে ছোটে জীবনের বান !

তুমি গান গাহ বনের আড়ালে বসি,

আমার আকাশে পড়ে না উকা থসি,

এবে থরথরি, নহে ঝাদশীর শশী,

তরুণ দিবস, নহে দিব্যাবসান !

বিস্ময় মানি চাহিলাম আঁখি তুলে,

ফুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ।

প্রথম আবেগে ছুটি তব হাত ধরি

নিবে-আসা প্রেম নিবেদন করিলাম,

কোন অতীতের কোন পরিচয় স্মরি,

সহজ প্রণামে দিলে কি প্রেমের দাম !

বলিলে, 'আমার থাক' প্রণম্য তুমি,—

ছল ছল স্নল, হৃগভীর বনতুমি,

দুর্জয় স্রোত তটেরে চলে না তুমি—

থরবেগে তার পূর্ণ মনস্কাম।

প্রথম আবেগে ছুটি তব হাত ধরি

নিবে-আসা প্রেম নিবেদন করিলাম।

তখন বুঝি নি, আজ্ঞো না বুঝিতে পারি,

কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে,

আকাশের মেঘ-চালে অকারণ বারি,

আমি পড়ি-বাঁধা আপনার মায়াজালে।

তোমারে স্বপ্নিয়া তোমারেই ভালবাসি,
ভক্তিদাগর পার হবে প্রেমে ভাসি,
আপনার মনে রচিতা কান্নাহাসি,
প্রেমেব তিলক পরাই তোমাব ভালে ।
তখন বুঝি নি, অজ্ঞো না বুঝিতে পারি,
কি ছিল তোমার মনের অন্তরালে ।

ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমাবে বিরি,
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব,
দধিন পবন বহে যাবে ধীরে ধীরি,
আমারে একদা মনে হবে অভিনব ।
মরু-বালুতটে হাসিবে ভূণেব দল,
তারে ছুয়ে জল ছুটে যাবে কল কল,
তোমারে ছলিবে আমার মনের ছল,

চেউয়ে চেউয়ে কানে স্তবের বচন কব,
ক্ষুধা তব আজো জাগেনি আমাবে বিরি,
কবে তা জাগিবে, আমিও জাগিয়া রব ।

প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি,
লইলু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে,
আমার মনের কাটুক সকল গ্লানি,
তোমার নতির পুত মঙ্গলধূপে ।
শুভ জাগরণে যাক স্বপ্নের জালা,
দেহবেদীতলে পড়ে থাক ফুলডালা,
জানি একদিন তুমিই গাঁথিবে মালা—
পরিব একদা সেই মালা চুপে চুপে ।
প্রেয়সী, আজিকে তোমার প্রণামখানি,
লইলু প্রেমের প্রথম স্মরণরূপে ।

সন্তান

শ্রীশান্তা দেবী

বড় বউ প্রসাধনে ব্যস্ত । আয়না টেবিলের পাশেই
খাটের উপর ময়ূরকণ্ঠী, বেগুনফুলি ও আশুন বঙের
তিনখানা জরির জংলা বেনারসী শাড়ী পড়িয়া বহিয়াছে,
হাতকাটা কিংখাবের জামা ও চণ্ডা সুরাটি জরির পাড়-
বসানো হগুদ রঙেব জামা ছটিব ভিতব কোন্টি বেনারসীর
সঙ্গে বেশী মানাইবে ভাবিতে ভাবিতেই মুকুল চুলেব
রাশির ভিতর দিগা চিরুণী চালাইতেছে । টেবিলে একটা
ছোট গালাব কাঁজ-করা বাজের ডালার উপর একছড়া
মুক্তাব মালা ও একটি হীরার কণ্ঠী ঝকঝক করিতেছে ।
খোঁপাটা মুকুলের মনের মত হইল না, বড় ঘাড়ের কাছে
নামিয়া পড়িয়াছে ; আবাব গোড়ার ফিতাটা খুলিয়া ফেলিয়া
বড় চিরুণী দিয়া সমস্ত চুলের গোছা সে ঠেলিয়া মাথার
প্রায় মাঝখানে আনিয়া ফেলিল । ফিতাটা বাঁথিয়া
টেবিলেব আয়নার দিকে পিছন ফিরিয়া ঝাঁড়-করা আয়নার
ভিতর চাহিল, ছই হাতে আলগা খোঁপাটা তুলিয়া ধরিয়া

দেখিল এবার দিবা মানাইয়াছে ; উহু খোঁপার তলায়
অজন্তার ছবির মত চূর্ণ কুন্তলগুলি শুভ্র ঘাড়ের কাছে
ছলিতেছে । এমন খোঁপা কাপড় দিয়া চাকিয়া ফেলিতে
হইবে বলিয়া মনে দুখে হইতেছে বটে, কিন্তু যেমন
তেমন খোঁপার উপব মাথার কাপড়ই কি তেমন মানায় ?

ছোট ননদ মায়া বরে চকিয়াই গালে হাত দিয়া বলিল,
“বাপরে বাপ, আজ কার বিয়ে বৌদি, দাদার না—
ছোড়দার ? রূপে ত নূতন বৌদিকে হার মানিয়েইছ,
আবার সাজেও যদি সকলকে তাক লাগিয়ে দাও ত সে
বোচারীকে যে কেউ দেখবেই না ।”

মুকুল মুখনাড়া দিয়া বলিল, “তা কি করতে হবে
স্তনি ? মুখে খানিকটা কালি মেখে আর গয়না কাপড়গুলো
আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এলে যদি তোমাদের মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ হয় ত বল তাই না হয় করা যাচ্ছে ।”

মায়া বোচারী ভালমাসুব, তাড়াতাড়ি নরম হইয়া

বলিল, “না ভাই, তা কেন? তোমার দিকি ঝাড়া হাত পা, তুমি সাজবে না ত কি আর আমরা চারটে ছেলে কোলে কাঁধে ঝুলিয়ে সেজে বেড়াব?”

মুকুল ঠোঁট উন্টাইয়া বলিল, “ঐ ত বিপদ! ঝাড়া হাত-পার হিংসেতেও বাঁচ না, আবার যত দিন না একটি এসে চ্যা ত্যা করবে তত দিন নেই নেই ক’রে নাকে কান্নারও শেষ নেই। আমি বাপু ও-সবের ধার ধারি না। আমার কোনোদিনই ও-সব সাধ ছিল না। বাঙালীর ছেলে আজ পেট ছাড়ছে, কাল পিলে বাড়ছে, অমন সম্পদ একটি পেয়ে লাভের মধ্যে নিজেরও ত আহারনিজ্রা ধাব ঘুচে, তার চেয়ে যেমন আছি বেশ আছি।”

মায়ী বলিল, “তাই বলে একেবারে খালি ঝাঁ ঝাঁ বাড়ি আবার কাকুর ভাল লাগে শুনি নি।” মুকুল বেগুনফুলি শাড়ীটা ঘুরাইয়া পরিয়া মাথাব কাপড় টানিতে টানিতেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মায়ী কথার আর উত্তর দিল না।

মেজ পিসিমা পিছনের দরজা দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চুকিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, “হ্যাঁগা বোঁমা, মিষ্টির ঘরের চাবি খোলা পড়ে রয়েছে, সব যে লুট হয়ে বাসে বাছা।”

মায়ী বলিল, “বৌদি নিজের গয়না-কাপড়ের ভাবনাতেই অস্থির ত ভাঁড়ার সামুলায় কখন বল। এই ত সবে সাক্ষ শেষ ক’রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমাদের চারটে ছেলে টেনেও বিশ্ব মাথায় ক’রে বেড়াতে হয় আর এঁদের নিজেরদের খেয়ে শুয়েই কোনো কাজের আর অবসর মেলে না।”

পিসিমা বলিলেন, “বেঁচে থাক ওবা বেটের কোলে। তুই এসেছিস বলে তবু ঘরে ছোটো কচি-কাচার মুখ দেখে বাচ্ছি। নইলে বাড়ি নয়ত পিছরাপোল। ওদিকে দাদা বাতের ব্যাথা নিয়ে কোঁকাচ্ছে, এদিকে হাঁপানি নিয়ে আমি কোঁস কোঁস করছি। ছেলে ছোটোর ত সারা দিনে দেখা নেই, রাত দশটা বাজলে তবে ঘরে পা দেয়। বৌও হয়েছেন তেমনি, দোকান বাজার স্যাকরা আর দরজির সাজই তাঁর সম্পর্ক, ল্যাঞ্জে একটা মোটর বেঁধে সারা দিন ত তাই ক’রে বেড়াচ্ছেন। থাকত কোলে একটা কিছু ত দু-দণ্ড নাড়তে চাড়তেও ঘরে মন বসত।”

মায়ী বলিল, “সাত বছর ত হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে, আর কবে হবে বল? আমরাই ত বয়স, বৌদির বিয়ের সময়ই আমার পান্ন ছ-মাসের ছেলে। এইবার একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখালে পরে। বলতে গেলে ত মাঝে আসবে সব।”

পিসিমা বলিলেন, “তা পারতে আসবে বইকি! অমন স্বভাব না হ’লে আবি অমন কপাল হবে কেন? ছেলের মা হওয়া কত তপিস্তার ফল, তা কি আবি একালে কেউ বোঝে? হ’ত সেকাল ত বৃদ্ধত লো। কাকীমার আমার বিয়ের আট বছর পেরিয়ে বেতেই ঠাকুমা এনে গলায় সতীন গেঁথে দিলেন; ছিঁটা কাল সতীলক্ষ্মী সব সহ্য করেছেন, কিন্তু নিজের অদৃষ্ট ছাড়া কাউকে দোষ দেন নি। একটা সখের স্নিগ্ধ তখনও চোঁন নি, বলতেন—কোন্ ভাগ্যে আমি ও-সব ছোঁব, সিঁথির সিঁথুরটুকুই আমার বজায় থাকুক।”

মায়ী বলিল, “সে-সব সেকালের কথায় কাজ কি বাপু, এখন নতুন বৌটি বংশ বজায় রাখলেই আমরা বর্ডে বাই। এও মগু উনিশ বছরের মেয়ে, কেমন হবে কে জানে?”

পিসিমা বলিলেন, “তার মাঝ ত শুনি পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে। এই ভরসাতেই ত আনা যে বাহোক ছোটো-চারটে কিছু হবে। নইলে শুধু টাকা ওড়াবাব জন্তে ত বৌ করা নয়।”

মুকুল নববধূর বৌভাতের শাড়ীটা আলমারীতে তুলিয়া রাখিবার জন্ত ঘরে আসিতেছিল আঁড়াল হইতে কথটা শুনি। নিঃশব্দের জন্ত ডাহাব মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া সে ঘরে চুকিল। তখনও শুনি মায়ী বলিতেছে, “বাবার এই বিয়েছোড়া ঘরবাড়ি, মা’র কত সাধেব সংসার, ঠাকুরমারই কি কম স্বত্তি এর মধ্যে? খাট আলমারী বাসন-কোশন সোনা রূপো সবার সঙ্গে তাঁদের এতকালের মায়ী পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। বৌ দর যদি ছেলে পিলে না হয় তবে আর এ সবের অর্থ কি?”

মুকুল চৌকাঠে পা দিয়াই বলিল, “কেন ভাই ঠাকুরঝি অত ভাবনা কিসের? আমার মতই ত সবাই হয় না।

হলেও ত তোমার ছেলেরা বয়েছে, তারাই না হয় সংসার সাক্ষিয়ে রাখবে।”

পিসিমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “বৌমা, আপন মামী হও, যেটের বাছাদের এমন চেস দিয়ে কথা বলো না।”

২

মুকুল তাহার রূপ বোবন ও অলঙ্কার প্রসাধন লইয়া বেগ ছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচ সন্তানের এক সন্তান সে, বিবাহের আগে ঐশ্বর্য্য কি বিলাসের পরিচয় বিশেষ পায় নাই। ধনী আত্মীয়বন্ধুদের দেখিয়া যখন ইচ্ছা করিত বেনারসী শাড়ী পরে তখন তাহাকে শান্তিপুরে ডুরে পরিয়াই খুশী হইতে হইত, যখন ইচ্ছা করিত প্রতি অঙ্গক্ষেপে রত্ন অলঙ্কার ঝঙ্কার দিয়া উঠুক, তখন ছুই হাতে দুই গাছা তার-জড়ানো শাঁখা পরিয়াই তাহার দিন কাটিত। আয়নায় আপনার প্রসাধনের সহস্র ক্রটি দেখিয়া মন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিত, কিন্তু মুখে কিছু বলিবার উপার ছিল না—সে যে গরিবে ঘরের পাঁচটার একটা। উজ্জ্বল গৌবর্ণ রঙের জোরে হঠাৎ তাহার বিবাহ হইয়া গেল এমন ধনী লোকের ঘরে। মুকুল তাহার কুমারী জীবনের যত অপূর্ণ সাধ ও যত অনাস্বাদিত সুখের কথা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে ভয় পাইত, আজ তাহারা সব নিজ নিজ দাবি লইয়া উপস্থিত হইল। শাড়ী গহনা, গাড়ী আসবাব, আমোদ আলাদা কোনও ভোগের ইচ্ছাই সে মিটাইতে ভুলিল না। এখনও একটা ইচ্ছা আর একটা ইচ্ছা আগাইয়া তুলিতেছে। সাত বছরে মুকুল অনেক সুখের মধ্যে বুকিয়াছে মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। সারা জীবন যদি নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া যাওয়া যায় তাহা হইল জীবনে আর কাম্য রহিল কি? ইহাই ত জীবন। কিন্তু আনন্দের এই পূর্ণ পসরার মাঝখানে শিশুর কচি মুখ কোনদিন উকি দেয় নাই। মুকুল মনে করিত সে-সবের জন্ত জীবন ত পড়িয়াই আছে, এখন দুই দিন ও-সকল দায় ভুলিয়া জীবনটা ভোগ করিয়া লওয়াই ত পরম লাভ।

কিন্তু সাতটা বছর যে কাটিয়া গিয়াছে, সমস্ত সংসারে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহা মুকুল টের পাইল সুখস্বপ্নের মাঝখানে আজ প্রথম দেবরের বিবাহের পব।

ছোটবউ মাস-আষ্টেক হইল আসিয়াছে। তাহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। তাহার মা তাহাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন। তাহাবই ব্যবস্থা করিতে মুকুল আসিয়াছিল স্বামীব দরবারে।

দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ইজিচেয়ারের উপর বৈদ্যতিক পাখা চালাইয়া জয়ন্তবাবু মুসোলিনি-চরিত্রের বিশেষত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু নিজাদেবী বোহিনী মায়ায় ভুলিয়া তিনি প্রায় মুসোলিনিকে বিদর্জন দিতে বসিয়াছেন, এমন সময় মুকুল আসিয়া মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া বলিল, “ওগো শোন, পরশু একটা ভাল দিন আছে, আজ যদি হুবিধে-মত খবর দিবে দিতে পার, তাহলে ওরা পরশু সকাল-সকাল ছোটবৌকে নিয়ে যেতে পারে।”

জয়ন্ত চেয়ারের হাতল হইতে পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া অর্ধজড়িত স্বরে বলিলেন, “কেন, কেন, বৌমাকে নিয়ে যাবে কেন?”

মুকুল স্বামীকে একটা চোলা দিয়া বলিল, “কেন আবার? কাকামি রাখ! জান না বেন কিছুই। প্রথমবার, এ সময় বাপেব বাড়ি না পাঠালে কি চলে? মার মত যত্ন কে করতে পারবে?”

জয়ন্ত মুকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, “স্বকান্তও দু-দিন বাসে ছেলের বাপ হবে? এই সেদিন বই-বগলে কলেক্স কাঁকি দেবার মতলব আঁত, তাবলেও হাসি পায়।”

জয়ন্ত হাসিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার হাসিটা নিছক হাসির মতই শুনাইল না, মুকুলের কানেও সে হাসিটা বেসুরা ঠেকিল। সে চিরকালের মত হাত নাড়িয়া কানের বুঝা ছলাইয়া ঠাট্টার স্বরে কোনও জবাব দিতে পারিল না। জয়ন্ত মুকুলের হাতভরা চুড়িগুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজেই কথা তুলিল, “আর কি? এইবার স্বকান্তই হবে বড়ির কর্তা; বুড়ো বয়সে তার ছেলেপিলের হাততোলা খেবেই আমরা থাকব। তার চেয়ে লোকদেখানো সংসার ছেড়ে এখন থেকেই বানপ্রস্থ অভ্যাস করা যাক, কি বল?”

মুকুলের মনের ভিতর সজ্ঞারে একটা ধাক্কা লাগিল। সে নাবী হইয়াও একথা এতদিন ভুলিয়াছিল কি করিয়া?

লোকচক্ষে তাহার এ সাজোনো ঘর-সংসার আড়ম্বর আয়োজন অলঙ্কার প্রদর্শন সকলই নিরর্থক, সকলই মন ভুলাইবার ক্ষণিক চেষ্টা ছাড়া আর কি? সে যে সত্যসত্যই জীবনের আনন্দরস এই সকলের মধ্য হইতে আকর্ষণ পান করিতেছিল বলিল কে বিশ্বাস করিবে? জীবনযাত্রার এই সমারোহে বসন্তের পুষ্পসম্ভাবের মত বর্ণগন্ধের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু সৃষ্টিলাস্য এ যে নিষ্ফল, একথা সে আজ প্রথম অনুভব করিলেও স্বামী তাহার পূর্বেই বুঝিয়াছেন ভাবিয়া মুকুলের মন ব্যথার ভরিয়া উঠিল। তবু অভিমানের সুই জয়ন্তর গা বেঁধিয়া বসিয়া লাল চাকাই শাড়ীর পাড়টা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে সে বলিল, “কেন আমবা দু-জনে দু-জনের কি যথেষ্ট নই? আমাদের নিজেদের বর্তমান সুখ-সাধের কি কোনো মূল্য নেই? সবই ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে?”

জয়ন্ত মুকুলের গালে টোকা দিয়া বলিল, “মূল্য আছে বইকি মুকুল? কিন্তু বর্তমান কতটুক, একটা মুহূর্তেরও কম নয় কি? জীবন মানেই একটুখানি অতীত আর অনেকখানি ভবিষ্যৎ। সেই দিকে চেয়েই আমরা বেঁচে থাকি।”

মুকুল বলিল, “বাবা রে বাবা, দার্শনিকের তত্ত্ব-কথা এখন থাক। ও-সব আমার মাথায় ঢুকবে না। তোমাব যদি নিতান্তই ভবিষ্যৎ না হ’লে চলছে না ত সেকালের কষ্টাদের মত আর একটা বিবেচনা কর গে না।”

জয়ন্ত বলিল, “থাক মুকুল, তোমার মুখে ওসব কথা আর শুনতে চাই না। ও-সব বলবার জন্তে এখনও অনেক সেকেন্দ্রে-বুড়ো বুড়ী বেঁচে আছে।”

মুকুলের বকের ভিতর কে যেন একটা জ্বলন্ত ছাঁকা লাগাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে এক-কথাও তবে উঠিয়াছে। তাহার সাত বৎসরের ধর-সংসার, তাহার একান্ত নিজস্ব স্বামী, সমস্তই এক কথার অনারাসে মিথ্যা করিয়া দিবার কথা এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ ভাবিতে পারে? মুকুলের চোখ দুটি জলে টল টল করিয়া উঠিল। সে দূরে সরিয়া বসিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া স্বামীকে বলিল, “এসব কথাও তোমাদের হয়েছে, অথচ আমাকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ? আচ্ছা বেশ।” আর বেণী কথা মুকুলের জোগাইল না।

জয়ন্ত বলিল, “অন্তে যদি তোমার মনে কষ্ট দেবার মত কথা বলে তাহলেও সব এনে তোমাব কানে কানে ব’লে যেতে হবে?”

মুকুল অভিমানভরে বলিল, “তোমাব যদি শুনতে মিষ্টি লাগে ত আমাকে আর বলবে কেন বল?”

জয়ন্ত কথার উত্তর দিল না। আবার ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া বইয়ের পাতা উন্টাইতে লাগিল। মুকুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “কোন সেকেন্দ্রে বুড়ো বুড়ী বলেছে ও-কথা বল না একবার। সাত বছর এক সঙ্গে ঘর ক’রে মুখ বুজে কথা শুনে শুনে এলে, একটা জবাব দিতে পার নি?”

জয়ন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, “কি যন্ত্রণা? আমার গলা ধবে কি তা’বা বলতে এসেছিল যে আমি জবাব করতে যাব? ওঁরা বলাবলি করছিলেন আমি শুনেছি। এ-রকম অবস্থায় মানুষ অমন দু-চার কথা ব’লে থাকে, তাতে রাগ করবার কি আছে?”

“তুমিও তাই বলবে?” বলিয়া মুকুল হুম্ হুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৩

বিবাহ হইয়া পর্যান্ত মুকুল বাপের বাড়ি থাকে নাই। কখনও কিছু উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ থাকিলে সেই দিনই সন্ধ্যায় আবার স্বস্তরবাড়ি ফিরিয়া আসিত। একে ত জয়ন্তের বাড়ির বৌবা বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্ত প্রসিদ্ধ নয়, মস্ত মানী ঘর কিনা। তাহার উপর এ-বাড়ির ঐশ্বর্যের আড়ম্বর বাপের বাড়ি গিয়া দেখাইতে মুকুলের লজ্জা করিত; সে গরিবের মেয়ে, স্বস্তরবাড়ির ঐশ্বর্য দেখাইয়া বাপকে কেন ছোট করিতে যাইবে? অথচ এই-সব রাজসমারোহ ছাড়িয়া বাইতেও মন চাহিত না।

কিন্তু এত দিন পরে সামান্ত একটা ছুতা করিয়া স্বামীর সঙ্গে মস্ত কলহ বাধাইয়া সে বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা কে বলিয়াছিল জয়ন্ত কিছুতেই নাম করিল না, মুকুলের তাই প্রচণ্ড অভিমান।

বাপের বাড়ির সাদাসিধা সংসার। দুই ভাই, দুই ভাজ, দুই জনের কোলেই ক্ষুদ্র শিশু। তাহাদের সমস্ত ভাবনা-

চিন্তা সাধ-আফাদ এই শিশু দুইটিকে ঘিরিয়াই। বড়-বোঁ হুণাব মেয়ে আড়াই বছরের, ছোটবউ বীণার বোকা এই সব এক বছরের হইল। হুণার খুকী টুকু সারাদিনই তোতাপাখীর মত ছড়া বলে, “বিস্তি পলে তাপুল তুপুল,” নয়ত ছোট দুইটি কচি হাত মাথার উপর তুলিয়া পা বাকাইয়া নাচ শুরু করে, অথবা ছোট কোলটি পাতিয়া ভাইকে আদর কবিরার জন্য কচি দুটি হাত বাড়াইয়া কাকীমাকে সাধাসাধনা করে, “একটু বাচ্চাকে আমাল কোলে দাও না।”

টুকুর পাকামি দেখিয়া দুই জায়ের হাসাহাসির অন্ত নাই। টুকুর রাগ হইলে সে যখন কোলা কোলা গাল ছুটি আরও ফুলিয়া ঘাড়ের ভিতর মুখ শুষ্কিয়া বলিত, “তোমা'ল সঙ্গে আড়ি,” তখন হুণা ঘরসংসার সব ফেলিয়া ছুটিয়া আসিত খুকীকে কোলে তুলিয়া অজস্র চুমা দিয়া রাগ ভাঙাইব'র জন্য।

থোকনকে লইয়া ত বাড়িহুঙ্ক পাগল। একে সে ছোট্ট একরস্তি, তাহাতে আবার বাড়ির প্রথম পুত্র। ঠাকুমা তাহার জন্য সারাদিন পুরানো পাড়ের রঙীন হুতা তুলিতেন—আর ছোট ছোট কাঁথায় ছড়া সেলাই করিতেছেন—“আমাব বুক জুড়ানো ধন, আমার পল্লোলচন।” মা বিফালবলা রান্নাবান্না সারিয়া কাজল-লতায় কাজল পাড়িয়া থোকাকে সাজাইতে বসে; তার পর তাব-কপালে মস্ত একটা কাজলের ফোঁটা পরাইয়া আদর করিয়া বলে,

“সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে,

যে অ'ম'ব থোকনকে ধোঁড়ে

পুড়ে মর সে আঁধার কোণে”

থোকা কি বুঝে জানি না, কিন্তু থলু থলু কবিয়া হাসিয়া উঠে। বাপ জ্যাঠা অ'পিস হইত ফিরিয়া সকলের আগ থোকনমণিব খোঁজ করে। এক গা ধূলা-মাখিয়া হ'মা দিতে দিতে থোকা জ্যাঠার কুতা ছুটা গিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া বসিয়া নাচে। কোল উঠিবার ভিলা, সে যে আপনি উঠিতে জানে না। সেদিনও প্রতিদিনের মত সন্ধ্যায় থোকাখুকুকে ঘিরিয়া সভা বসিয়াছিল। কাকী বলিল, “টুকু, তুমি কাকে সবচেয়ে ভালবাস?” টুকু

বলিল, “মাকে, বাবাকে, তোমাকে, ছোটভাইকে ভাল ঠাকুমা'কে।”

মা বলিল, “সবাইকেই সবচেয়ে ভালবাসিস, মুখখু কোথা'কাব?”

কাকী বলিল, “আমাকে কতটা বাসিস?”

টুকু দুটি হাত যথ'সম্ভব ছড়াইয়া বলিল, “এই এতখানি।”

মা বলিল, “আর আমাকে?”

টুকু বলিল, “আলো আলো আকাশ পর্যন্ত।”

কাকী বলিল, “তবে রে ছুটু, তুমি না সবাইকে সমান ভালবাস?”

থোকা হামা দিয়া আসিয়া মার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “ডুট্টু বোকা।”

এমন কথা জগতে বে'ধ হয় আর কেহ কখনও বলে নাই। সকলে গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা দেখেছ, এরই মধ্যে ছেলের কি বে'লচাল! পাকা ছেলে কোথা'ক'র!”

টুকুও আঙুলতুলিয়া থোকা'র মুখের কাছে গিয়া নাড়িয়া বলিল, “পাকা ছেলে কোথা'ক'র।”

যতটুকু সময় অবসর হুণা বীণার মুখে থোকা খুকু ছাড়া অন্য কথা নাই, যেন পৃথিবীতে আর কোন ভীষ কি পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না—থাকায় তাহ'দেব কিছু আসিয়া যায় না। মুকুল'র অলঙ্কার শাড়ী দুই-দিন পুরাতন হইয়া যায়, তাহার পর নুতন একটার কথা না ভাবিল কোন রস প'ওয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের থোক টুকু যে নিত্যই নুতন। হাজার হাজার বার মানবশিশু যে কথা বলিয়াছে, যে লীলা-চাকল্যের লহর তুলিয়াছে তাহা এই থোকা-খুকুর ওতি কথায় প্রতি অজ্ঞপ্তে যেন সৃষ্টিতে প্রথম দেবা দিতেছে। মুকুল এই পৃথিবীতে পচিশ বৎসর বাস করিয়াও আজ তাহা প্রথম আবিষ্কার করিল।

থোক'র চোখে ঘুম আসিয়াছিল। মা তাহা'ক কোলের উপর টানিয়া আঁতে আঁতে দেল'ইয়া গান ধরিল—“ধন, ধন, ধন, এ-ধন যার ঘরে নাই তার বুধাই জীবন।” থোকা ছোট কচি মুঠিতে মা'র গলার হার চাপিয়া বকের কাছে আগাইয়া আসিল।

আজ মুকুল'র মন বেদনা'র কঁটা তাহাকে বুঝ'ইয়া দিল, ম'হুয এ-সকল কথা শুধু ছড়া কচিবার জন্যই লিখে

নাই। কত যুগ ধরিয়া কত মায়ের মনের কথা এই ছোট ছড়াটুকুর ভিতর পুত্রীভূত হইয়া আছে, তাহাদের বহু সাধনার আভাসও এই কথাগুলির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়ছে। তাই বুঝি তাহার আজ সত্যসত্যই বিশ্বাস হইল সম্ভানের অভাবে স্বামী হয়ত আবার বিবাহ করিয়াও বসিত পাবে। মুকুল হঠাৎ উঠিয়া গিয়া ঠাকুরবরে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া জোড়করে বলিল, “হে ঠাকুর, তোমার কোনো দিন ডাকি নি, আজ বড় দুঃখে ডাকছি। কাশা খোঁড়া যা-হোক একটা কোলে দাও ঠাকুর, কিন্তু সতীন-বজ্রণা দিও না।”

নীচে তখনও বীণা খোকনকে হুর করিয়া খুম পাড়াইতেছিল,

“তার কিসের গরব করে।

(তার) আশুনে পুড়ে কেন না মরে।”

মুকুলের মনে হইল বীণা যেন তাহারই ধন-ঐশ্বর্য্যকে বিক্রম কবিতা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছে।

৪

মুকুল আবার খুশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিধাতা তাহাব জন্ম বক্ষা করিয়াছিলেন তাহার অজ্ঞাতেই। সে জানিত না যে, যে-সন্তান না-হওয়ার দুঃখে ও অপমানে সে এত দিনের স্বামীর সংসার এক দিনেই ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল সেই সম্ভানকে সে তখনই আপনার শরীবে বহন কবিতা বেড়াইতেছে।

একথা বুঝিবার পর আর সে অভিমান করিয়া স্বামীর নিকট হইতে দূরে পড়িয়া থাকিতে পারিল না। এ-সুসংবাদ স্বামীর আগে আর কাহাকেও সে দিতে পারে না, দেওয়া চলে না।

বাড়ি আসিয়া মুকুল সবাব আগে তাহার রেশমের শাড়ীগুলো বাহির করিয়া কাটিতে বসিল। এই কাপড়ের বোঝা আলমারীতে সাজাইয়া রাখিয়া কি হইবে? তাহার চেয়ে তাহার অনাগত শিশুদেবতার পূজা ইহাতে করিলে মনে অনেক তৃপ্তি পাওয়া যাইবে।

জয়ন্ত দেখিয়া বলিল, “ওকি ওকি, এ আবার কি

রকমের পাগলামী? ছেলের মা'রা কি কেউ ভাল কাপড় আর পরে না? ওগুলোকে মিথ্যে কেটে কুটকুটি কবছ কেন? বাজারে এখনও অনেক সিকের দোকান আছে। তোমার ছেলের জামা-কাপড়ের কিছু অভাব হবে না।”

মুকুল লজ্জা পাইয়া বলিল, “না না, তার জন্তে নয়। ও কাপড়গুলো পরতে আর আমার ভাল লাগে না, তাই কেটে ফেলছি। মানুষের কাটলে তবু কোনো কাজে আসে, পোকার কাটল ত সবটাই লোকসান।” তার পর মুখ স্নান করিয়া বলিল, “তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে ছেলেরপিলে হওয়া, বাঁচব কি মরব কে জানে? তখন এক-আলমারী কাপড় দেখে তোমরা আপশোষ করবে, নয়ত সতীন এসে পরবে। বিবে ত তোমার ঠিকই হচ্ছিল, মাঝের থেকে আমি আবার ক'মাসের জন্তে বাগড়া দিলাম।”

জয়ন্ত বলিল, “আচ্ছা থাক, অত বাজে কথা বকে কাজ নেই। সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা স্কন্ধ মেয়ের বুড়ো বয়সে ছেলে হ'তে পারছে, আর তোমার বেলায় যমরাজা ওৎ পেতে ব'সে রয়েছেন আর কি?”

মুকুলের মনে সত্যসত্যই ভয় ঢুকিয়াছিল, হয়ত এবার তাহার ষাইবার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সব সুখ কি মানুষের বরাতে একসঙ্গে স্ফূর্ত হয়? তবু সে ভয়টা ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা কবিত আপনাকে নানা তত্ত্বকথা শুনাইয়া। মরণ ত মানুষের হই-বই এক দিন, দীর্ঘ আয়ু পিছনে চিরকালব্যাপী শূন্যতা ফেলিয়া রাখিয়া মরার অপেক্ষা এই মরণই ত তাহার ভাল। তাহাব স্বল্পাধু জীবনের মধ্যে হিন্দুনারীর কাম্য সকল সুখই সে ভোগ করিয়াছে; এখন ষাইবার বেলা যদি বংশধারাকে চিব-প্রবাহিত রাখিবার আশা ও গোবব লইয়া মরিতে পারে তাহা হইলে না-ই বা পৃথিবীতে আর কুড়ি-পঁচিশ বৎসর একই সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিল এবং একই অন্নজল বাব বার করিয়া খাইল! বাহা সে কোনদিন দেখে নাই সেই সম্ভানের মুখ একবারটি দেখিয়া হাসিয়া সে জগতের নিকট বিদায় লইতে পারিবে।

মুকুলের সম্ভানের অভ্যর্থনার নানা আয়োজনের সঙ্গে দিন-অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। ছেলের জামা,

মোজা, টুপি, দোলা, খাট, গাড়ী কোনটারই অভাব পিতা মাতা থাকিতে দিল না।

আখিনের পুজার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তদের বাড়িতে শঙ্খধ্বনির হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। পিসিমা, মায়ী সবাই মহা ব্যস্ত। মুকুলের খোঁকা হইয়াছে। পিসিমা বলিলেন, “ওরে ডাক রে ডাক, দাদাকে ডাক। ছই হাতে গিনি নিয়ে আসতে বল, এত দিনে বংশপ্রদীপ ঘব আলো করতে এসেছে।”

মায়ী বলিল, “গিনি হবে এখন, বৌদির ত চোখ উটে গিয়েছিল, সে আছে না গেছে তাই দেখে আগে। ছেলের আগে মাকে বাঁচিয়ে তোল, তার পর ওসব মাথা-মুণ্ড ক’রো বত পাব।”

খাত্তী বলিল, “না গো না দিদিমণি, বৌদিদি ঠিক সামলে উঠেছেন। তাঁর জন্তে কোনো ভয় নেই। সোনার চাঁদকে একবার দেখিয়ে দাও, সকল ছুখকষ্ট সব যন্ত্রণা এক মুহূর্তে ভুলে যাবেন।”

ঝি ছেলেকে তুলিয়া মুকুলের মুখের কাছে ধরিল। কি করুণ অসহায় মুখখানি। দেখিয়া মমতায় মুকুলের সারা প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। এ-ছেলে তাহার বাঁচিবে ত!

মোহর, গিনি, টাকা লইয়া, ঠাকুদাদা ঠাকুমা, কাকা পিসি সকলে দেখিয়া গেল। মুকুলের মনের ভিতর কেবলই ছুঁ ছুঁ করিতে লাগিল। ভগবান এত সুখ তাহার সহিবে ত? এ-ছেলে যেন তাহার কোলজোড়া করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

৫

মুকুলের বুকভরা ভালবাসা ও দেহ-মন-প্রাণের যত্ন আদর লইয়া মুকুলের ছেলে এক বছরের ইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুকুলের মুখের হাসি একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে। ছেলে তাহার এত দিনেও উপড় হইতে বসিতে কথা বলিতে

কিছুই শিখে নাই। কলিকাতা শহরের কোন চিকিৎসার সাহায্য লইতে মুকুল বাকি রাখে নাই, কিন্তু সকলেই বলিয়াছে এ-রোগ শিবের অসাধ্য। ছেলের মেরুদণ্ডই জন্ম হইতে বিকৃত। ইহার চিরজীবন এমনই করিয়া কাটিয়া যাইবে।

শিশু মাকে চিনিতে শিখিয়াছে, মাকে দেখিলে হাসে, মা চলিয়া গেলে কাঁদে। ডাক্তার বলে, “ইহার বুদ্ধির কোনো অভাব হইবে না। সবই বুঝিবে, তবে চিরজীবনই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে।”

মুকুল বলে, “ভগবান সবই যদি ওর বাদ দিলেন বুদ্ধিটুকুও না দিলেই পারতেন, আপনার জুর্ভাগ্য তা হলে আর কোনো দিন বুঝতে হ’ত না।”

ছেলে যত মার মুখের দিকে চাহিয়া হাসে, মার চোখ দিয়া ততই জল পড়ে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুকুলের ছই চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। সে দিবারাত্রি ছেলে লইয়াই পড়িয়া আছে, তাহার বেশভূষা আমোদ-আজাদ সব যেন পূর্বজন্মের বিশ্বস্তির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। এ-মুকুল যেন সে-মুকুলই নয়। জয়ন্ত দেখিল, এমন করিলে ইহাকে বাঁচানোও মুশ্কিল হইবে। মুকুলকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া সে বলিল, “দেখ, টুমাস্‌কেব পাঁচটা আঙুল কিছু সমান হয় না একটা ছেলে ভ্রমণ হয়েছে ব’লে তার জন্তেই কি প্রাণটা দিতে হবে। বেঁচে থাকলে আরও পাঁচটা ভাল ত হ’তে পারে। সবগুলোই অমানি হবে না।”

মুকুল বলিল, “আর আমার বেঁচে পাঁচটা ছেলে নিয়ে কাজ নেই। আমি স্বার্থপরের মত দেবতার দোর ধরে কাণা-ধোঁড়া ছেলে চেয়েছিলাম। ভগবান আমাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। এর চেয়ে আমার সতীন হওয়াও ভাল ছিল। ছুখ পেতাম আমিই পেতাম! আমার বন্ধা নাম বোচাতে চিরটা জীবন ধরে আমার প্রাণের বাড়ী বাছা ত ছুখ পেত না।”



বাঙ্গালী সাহিত্যে গদ্য—শ্রীহুমার সেন। রজন
প্রকাশালয়, কলিকাতা ১৩৪১। পৃ. ২২২।

শ্রীহুমার সেন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালী ভাষা সমালোচনার ক্ষেত্রে অপরিচিত নহে। তাঁহার এই সারগর্ভ পুস্তকখানি যে শুধু তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপরূপ হইয়াছে, তাহা নহে,—বর্তমান ভাষা-বিকৃতির যুগে একগুণ ঐতিহাসিক সমালোচনার ধৃষ্ট প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা সমবোধযোগীও হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকমাজেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালী দেশে উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যস্ত কালটির মধ্যে, গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিও একটি প্রধান কীর্তি। সেই গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস সাধারণ পাঠকের জ্ঞাত না হইলেও, খুব সম্প্রতি নহে। হুমার বাবু বহুপ্রযত্নসাধ্য রচনা, উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, সেই সাহিত্যের যে তথ্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ধসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহা শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরপ্রিয় হইবে। এ-পর্যন্ত এই বিষয়ে যে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাব মধ্যে অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য বিবরণ হইতে পারে নাই; কারণ, এই সকল রচনা হয় তথ্য ও অন্তর্ভুক্ত নিক্ষিপ্তে প্রহরণ করিয়াছে, অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে পর্যাবসিত হইয়াছে। জ্যোতস্ব তথ্য-সংগ্রহ ও সুস্থ বিশ্লেষণ হিসাবে হুমার বাবুর পুস্তক নান্দিত্যবর্ধক হইলেও মূল্যবান, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র বাঙ্গালী গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে, তাঁহার রচনাই পূর্ণাঙ্গবর না হইলেও, এ-পর্যন্ত একমাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ বাঙ্গালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছে।

কিন্তু হুমার বাবু যে-মনোভাব লইয়া তাঁহার গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-রসিকের নহে, তথ্যমাত্র সম্বন্ধী বৈয়াকরণের মনোভাব। ব্যাকরণ-অভিধানের দিক লইয়া ধারার চর্চা করিয়াছেন, তাহাদের পরিভ্রম নিরর্থক, এ-কথা বলিতেছি না, কিন্তু একটিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার জন্ত, নিছক বৈয়াকরণ অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া যেন। হুমার বাবু বাঙ্গালী গদ্য-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ব্যতিনামা লেখকদের গদ্য-রীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গবেষণা হিসাবে তাহার মূল্য কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু তাহার বৃত্তিনাটী বিশ্লেষণই কোনও বিশিষ্ট গদ্য-রীতিব প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় নহে। ইহা ভাষাতত্ত্ব হইতে পারে, কিন্তু তৎসকল সময়ে সত্য না হইতেও পারে। বহিঃশব্দে হয়ত গ্রামিণ শব্দের বিশেষণ-পদে ভ্রোপ্রত্যয়ের বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, অথবা অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রচুর ব্যাকরণ দৃষ্ট ব্যবহার কবিয়াছেন, অথবা তৎসম ও তৎসব শব্দের নিক্ষিপ্তে প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষণের দ্বারা কি বহিঃশব্দের অপূর্ণ গদ্য-রীতির প্রকৃত সৌন্দর্য-বোধ হইবে? দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, হুমার বাবুর বিবরণ পড়িয়া মনে হইল যে, লোকে বহিঃশব্দের গদ্য-রচনার অথবা অজ্ঞানত্বের কথাটি করে; বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রত্যয়মান হইবে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি বিশিষ্ট গদ্যই লিখিতেন। হুমার বাবুর বহু পরিভ্রমপ্রসূত পুস্তকের অথবা

গুণাপকরণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু তিনি পুস্তকের নামকরণ ব্যাপক নামকরণ করিয়াছেন—‘বাঙ্গালী সাহিত্যে গদ্য’। এ-ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নহে; কিন্তু সাহিত্যে গদ্য-রীতির বিচারে এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভাষার অস্থি-সংস্থান এবং তাহার দেহ-লাবণ্য এক বস্তু নহে; একেব বিচারে অপরিষ্কার উপর শাসন জারি করিলে, উজ্জ্বলতাই বিচার করা হয়।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

নরবোধ—শ্রীমদোজ বহু। বসন্ত সাহিত্য সংসদ, ১৫, রাজা বসন্তরায় রোড, কলিকাতা। মূল্য ২।

‘নরবোধ’ আর ‘মাধব’—এই দুইটি গল্পে প্রায় আধাআধি করিয়া ১৫০ পাতার বইখানি জুড়িয়া আছে।

যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভাবান লেখক একেবারে জয়পতাকা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নামেন, শ্রীমদোজ বহু তাহাদেরই মধ্যে এক জন। এর ত্রুত বাংলাকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করা। দেশের অন্তর্লব্ধীর পরিচয় পাইতে হইলে যেখানে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে সেই সর্বস্বলটির পথ লেখকের ভাল ভাবেই জানা আছে।

লেখার মধ্যে এমন একটি অপরূপ সরসতা আছে যে, যে-বিস্ময় আর অবোধ আনন্দের সহিত ছেলেবেলার রূপকথা শোনা যাইত, বইখানি পড়িবার সময় তাহারই যেন একটা আবছায়া স্মৃতি মনকে অভিভূত করিয়া বসে। ভাষা বেশ সুস্বাদু—মাঝে মাঝে স্বভাবের ফাঁত হইয়া উঠে। চরিত্রগুলি খুব সম্ভাব্য—ডাকিয়া সন্দেহ লইয়া ঘুরে।

এমন বইখানিতে এক সারগর্ভ কিন্তু একটু নিরাশ হইতে হইল। ‘নরবোধ’ গল্পটি ২৪ পাতার ‘আসি’ শেষ হইয়া গেছে; তাহার পর আর টানিয়া লইয়া যাওয়া ভাল হয় নাই। ২৪ হইতে ৭০ পাতার মধ্যেও লেখাব সব বিশিষ্টতাই বর্তমান; কিন্তু ঐ ২৪ পাতার জোড়ের কথাটা বরাবরই মনকে পীড়া দেয়। সম্পূর্ণতার বাহিরে আর নাই বলিয়া মাথুর গল্পটি নিঃশব্দ হইয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ—সবই বেশ ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকোষ—বঙ্গের বহু সাহিত্যিকের সহযোগিতায় প্রাচ্য-বিজ্ঞানমহাবিদ্যালয়, শ্রীমদোজ বহু সিদ্ধান্তবায়িবি তত্ত্বচিন্তামণি কর্তৃক সংকলিত ও ২০ নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, হইতে শ্রীবিভূতি বহু কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ৭০ পাতা, ১২ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫০, এক ভাগ বা ২৫ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ১০ টাকা।

বঙ্গভাষার এই বিখ্যাত এন্সাইক্লোপিডিয়ার পরিচয় আমরা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর দিয়াছি। ইহা নিরমিত রূপে পূর্ববৎ বিভাবতার সহিত সংকলিত ও সম্পাদিত হইতেছে। আবশ্যকমত ছবি ও মানচিত্র ইহাতে দেওয়া হইতেছে।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের শিক্ষাসংক্রান্ত সব প্রসঙ্গের, সাধারণ পুস্তকালয়ে এবং সম্বল অবস্থার লোকদের পারিবারিক পুস্তকসংগ্রহে ইহা রাখা উচিত।

পুরাতনই নূতন—“ভিকার বুলি” ও “মন পাগলের বুলি” ব অগ্রসর। “প্রেম ভিখারী” শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত। ৩০ নং মাকলাউড ক্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

২১৬ পৃষ্ঠা এই বহিখানিতে ছদ্ম খুব সহজ ভাষায় লেখা ২৪২টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি পারমার্থিক ও ধর্মনৈতিক তত্ত্বে পূর্ণ, কিন্তু নীরস নহে। অনেকগুলি গড়িয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্বলিত ও প্রকাশিত। “বিষভারতী” কর্তৃক প্রকাশিত, শান্তিনিকেতন। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা, ডাকমাওল এক আনা। ত্রৈমাসিক ১৪/০, ষাণ্মাসিক ৩৮/০, বার্ষিক ৬৮/০। মাসে এক খণ্ড প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষার এই বৃহত্তম অভিধানের পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়াছি। পর্কদশ খণ্ডে “আ” শেষ হইয়াছে। শেষ শব্দ “আহার” আহ্বান, প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বহুবর্ষব্যাপী অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার জন্য শ্রদ্ধাভাজন। অধিকন্তু তিনি ধনশালী না-হইলেও এবং কোনও বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশকের সাহায্য না-পাইয়া থাকিলেও যে নিজের বায়ে এতবড় একটি অভিধান ছাপাইতেছেন, তাহার জন্য বঙ্গসাহিত্যসুহাগী সকল ব্যক্তির নিকট হইতে উৎসাহ পাইবার দাবি করিতে পারেন। বাঙালীদের সমুদয় বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারে এই অভিধান ক্রীত ও রক্ষিত হওয়া আবশ্যিক। যে-কেহ বাংলা-সাহিত্যের চর্চা কবিতা চান, ইহা তাঁহারই কাছে লাগিবে।

বঙ্গবীণা—শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫৮+২২। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুখপাতের রচনা হইতে আঁকিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়াছেন। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই হৃদয় ও হৃমুক্তিত বহিখানি ২২২টি গীতিকবিতার সমষ্টি। পুস্তকখানির “পরিচয়” দিয়াছেন এবং কবিসংকলনের রবীন্দ্রনাথ। কবিতাগুলি ছাড়া ইহাতে কবি-পরিচয় ও কবিতা-পরিচয় আছে। তাহার সাহায্যে কবিতাগুলি স্মৃতিবার ও তাহার রস আশ্বাদন করিবার সুবিধা হইবে। কবিতাসমূহের প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক হুচী এবং কবিতার বর্ণানুক্রমিক হুচী থাকায় পুস্তকখানি ব্যবহার করিবার খুব সুবিধা হইবে। সংকলন ভালই হইয়াছে।

“ভূমিকা”র লেখা হইয়াছে, “বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনতম কাল হইতে আবস্ত কবিরা আধুনিক কাল পর্যন্ত লেখা গীতিকবিতাগুলি

হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া বঙ্গবীণার চারিটি খবক বচিত হইয়াছে।” “চতুর্থ-খবকে জীবিত কবিতার ১২০০ সাল পর্যন্ত লেখা কবিতা গৃহীত হইয়াছে।” এই সালটি কেন সকলকরা নির্বাচন করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথেরই বহু উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা ১২০০ সালের পাবে লেখা।

বিভাসাগর চরিত।—শ্রীমদ্বন্দ্যুনাথ রায়। প্রকাশক রায় এণ্ড কোং ২২০ কর্ণওয়ালিস ক্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং কয়েকখানি স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি।

এই পুস্তকখানি গড়িলে পাঠকগণ বিভাসাগর মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত, নানা প্রকারের কৃতিত্ব, বহু কৌশল ও তাঁহার চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। আগে যে-সকল বিষয় লেখক তাঁহার সম্বন্ধে পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধেও ইহাতে সম্বলিত হইয়াছে। বহিখানি সুসিদ্ধ। ভুল কিছু আছে। যেমন চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকার “জাঁকড়” বহু না লিখিয়া “জাঁকুর” বহু লিখিয়াছেন। বহিখানির ছাপা ভাল।

কালিদাসের পাখী।—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম-এ, পিএইচ-ডি, এফ-জেন্ড-এস, এম-বি-ও-ইউ, প্রবীণ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা ১২৩৪। মূল্য ছয় টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৬+১২। দুইখানি বহুবর্ণ ও এগাবখানি একবর্ণ স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। সম্বলিত কাগজে বাঁধান ও তাহার উপর মল্লর রঙান ছবি। পৃষ্ঠা “প্রবাসী”র চেয়ে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এক ইঞ্চি আলাদা হইতে।

পক্ষিতত্ত্ববিদ্যে তাঁহাদের কথা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়; ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বস্তুতঃ, বাংলা দেশে, পক্ষীদের সম্বন্ধে তাঁহার সমান জ্ঞান আর কাহারও আছে বলিয়া অবগত নহি। তাঁহার নিজের একটি চিড়িয়াখানা আছে। তাহাতে নানাজাতীয় পক্ষী পালিত হয় এই চিড়িয়াখানার সাহায্যে তিনি তাহাদের জীবনের সমুদয় ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করেন।

“কালিদাসের পাখী” বহিখানিতে তিনি কালিদাসের নাটক ও অন্যান্য কাব্যে বর্ণিত বা উল্লিখিত পাখীদের সম্বন্ধে কবি বাহা বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত তাহা দেখাইয়াছেন। কালিদাস ছিলেন কবি, কিন্তু কবি বলিয়া তিনি পক্ষীদের সম্বন্ধে কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় লেবেন নাই, পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি অবগত হইয়াছিলেন।

বহিখানি মনোহর। পাইবার পবই গড়িয়া শেষ করি। ইহার বিভারিত বর্ণানুক্রমিক হুচী ইহার একটি বিশেষত্ব। কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত প্রায় ত্রিশ বকমের পাখীর কোথায় কিভাবে কিরূপ উল্লেখ আছে, তাহা হুচীর সাহায্যে অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যাবে।

অলঙ্কার

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

“নাভি কা স্নগন্ধ মুগ নহী জানত।

দু চুত ব্যাকুল হোই ॥”

হরিণ দেখে তাহার চারিদিক্ স্নগন্ধে আমোদিত, সারা বন গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। হরিণ গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া বনের চারিদিকে, ঘোপের এদিক্-ওদিক্ অন্বেষণ করে; বৃষ্টিতে পারে না সে—এ মধুর প্রাণ-মাতান গন্ধ কোথা হইতে আসিল। গন্ধের আকর যে তাহারই মধ্যে বিরাজ করিতেছে, তাহারই অভ্যন্তরস্থ কস্তুরীর গন্ধ যে তাহারই আশপাশ সৌরভে মাতাইয়া তুলিয়াছে—অজ্ঞান হরিণ বেচারা তাহা বোঝে নাই; তাই সে চারিদিকে এমন করিয়া ব্যাকুল হইয়া ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছে।

সকল যুগে সকল অবস্থায় মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক। সে সৌন্দর্যের অন্বেষণে চিরজীবন ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, সেখানে সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্ত কিছু দিন সুখ-তৃপ্ত ভোগ করে, হাঁসে-কাঁদে, এই করিয়া মৃত্যুকে বরণ করে। কিন্তু যত দিন সে পৃথিবীতে থাকে, সৌন্দর্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সন্ধানের জন্ত ধন, ঐশ্বর্য, সুখ, বশ, প্রতিপত্তির মধ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণে সে ছোটে। সৌন্দর্যের জন্ত সে লালায়িত, কিন্তু জানে না সে, তাহার সৌন্দর্যোপলব্ধি কিসে হইবে। অথচ তাহার নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাকে পাইবার জন্ত সে নিরবধি অসহ দুঃখকষ্ট সহ করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে চায়। নিজের অজ্ঞাতসারে নিশ্চয়ই সে এমন একটা কিছুর আশ্বাদ পাইতেছে যাহাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে সেই অজ্ঞাত বস্তুর জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াই যেন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু সৌন্দর্যের আকর যে তাহারই মধ্যে মানুষ তাহা না বৃষ্টিয়া সংসারের আবর্তে নিরন্তর ঘুরিয়া মরিতেছে। আপনার শরীর ও মনের আশ্রয়ে সে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, যত দিন সে তাহাদের নিগূঢ় মর্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে

না পারে তত দিন সে বাহ্যসৌন্দর্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন তাহা আবিষ্কার করিবার জন্ত মানুষের প্রাণ আকুল হয়, তখন সে এই বিশ্বদমন্তার নিবিরোধ মীমাংসার জন্ত প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। কলে জীবের চরম লক্ষ্য কি তাহারই অনুসন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু যত দিন বাহ্যসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা বাহা তাহা লাভ করিবার সৌভাগ্য মানুষের না-হয়, তত দিন সে বাহ্যসৌন্দর্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে। এই বহিঃসৌন্দর্য্যভাবপ্রণোদিত হইয়াই, একদিকে নিজের মতিবুদ্ধি এবং অতৃদিকে সমাজের প্রচলিত কৃচির অনুবর্তী হইয়া মানুষ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। সমাজের সঙ্গে তাহার একটা সম্বন্ধ আছে, একথা সে কখনও ভোলে নাই। তাহার নিজের দায়িত্বের কথাও তাহাকে ভাবিতে হইয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দশ জনের এক জন হইয়া থাকিতে হইবে,—যতরাং তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে যে হইবে তাহাও সে উপলব্ধি করিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নানা বাধাবিঘ্ন অন্তরায়ের হাত হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে। শরীরে কোন ব্যাধি না হয় এবং পারিপার্শ্বিক ও দৈব ঘটনা হইতে তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্ত তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। এইজন্ত প্রথম প্রথম মানুষ আভিচারিক তন্ত্রে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিল। সঙ্গে রক্ষা-কবচ ধারণ করিল। ক্রমশঃ তাহার মধ্যে তাহার মূল সৌন্দর্য্যবোধ জাগিয়া উঠিল। দেশকালপাত্রানুসারে আত্মরক্ষা ও সৌন্দর্য্যপ্রকাশের প্রচেষ্টা হইতে রক্ষা-কবচগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। স্ত্রীপুরুষভেদে তাহাদের তারতম্য হইল। শনৈঃ শনৈঃ অলঙ্কারের সৃষ্টি হইল। বিবাহিত ও অবিবাহিতের পরিচ্ছদের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারেরও পার্থক্য ঘটিল। ব্যক্তিগত কৃচি এবং সমাজের প্রচলিত কৃচির প্রভাব অলঙ্কারকে নানা রূপ প্রদান করিল।

সমাজের সকল অবস্থাতেই অলঙ্কারের প্রতি ঝোঁক, সাজসজ্জার প্রতি ঝোঁক মানুষের রহিয়াছে। যখন মানুষে মৃৎপাত্রের ব্যবহার জানিত না, যখন তাহাদের মধ্যে কবির প্রচলন হয় নাই, যখন মানুষে জন্তুদিগকে গৃহে পালন



পজাবের সাতনরা হার

করিতে শেগে নাই, সেই আদি প্রত্নযুগেও মানুষের মনে শরীরকে অলঙ্কৃত, ভূষিত ও মণ্ডিত করিবার প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছিল। কুজিরান জাতি, আণ্ডামান দ্বীপের প্রাচীন জাতি প্রভৃতি যে-সকল আদিম জাতি আজও বাচিয়া থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শরীর-মণ্ডনের আদিম প্রথার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। আদি প্রত্নযুগের মানুষ শরীরের ত্রি ও

শোভা সম্পাদনের জন্ত স্থায়ীভাবে অঙ্গবিশেষের বিকৃতি সাধন করিত, উল্লি-চিত্রণে অঙ্গ বিভূষিত করিত, অঙ্গে রং ফলাইত এবং রক্তাভরণ প্রভৃতি দিয়া দেহ মণ্ডিত করিত। রক্তাভরণের মধ্যে কণ্ঠে পরিহিত হারের ব্যবহারই আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই হার নানা আকারে, নানা উপকরণে নিৰ্ম্মিত হইত। কণ্ঠাভরণ, নাসালঙ্কার, অধরভূষণ, হস্তাভরণ, চরণ-মণ্ডন ও কটি-মেথলা নানা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ, কাল ও জাতিভেদে রুচির বিভিন্নতা অত্যন্ত ব্যাপারের দ্বারা অলঙ্কারবিষয়েও সুস্পষ্ট। আদিম যুগে প্রকৃতিজাত সৌন্দর্য-উপকরণে অঙ্গাভরণের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। পাখীর পালকে শরীর অলঙ্কৃত করিবার প্রথা এখনও রহিয়াছে। প্রশান্ত-মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের অধিবাসীরা কাকের পালকে দেহ শোভিত করে। তাহারা কড়ির হারও পরে। ইউরোপের সুসভা ইংরেজ অথবা ফরাসী জাতি উটপক্ষী ও ময়ূর প্রভৃতির চাকচিক্যময় পালকের সজ্জা এখনও ভালবাসে। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগণ তাহাদের পূর্বপুরুষের চিত্রস্বরূপ জন্তু ও বৃক্ষাদি দেবক প্রভৃতি নিজেদের শরীরে প্রচ্ছান করিয়া থাকে। এক সময়ে মানুষ প্রজাপতির ডানা, নানাপ্রকারের বীজ, অতুল্য প্রস্তুত, বিচিত্র পত্র প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া তাহার অঙ্গশোভা বর্ধন করিয়াছে। তারপর জ্ঞান ও সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধাতুর অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। কেমন করিয়া এই সমস্ত প্রসাধনের ব্যাপার ঘটিল তাহা অসুস্কানের বিষয়।

যে করিয়া হউক অলঙ্কার-প্ৰীতি মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অলঙ্কার কোন দিন মানুষ ত্যাগ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা বলিয়া থাকি কামকান্দনত্যাগী সংসার-বিরাগী তাপসের অলঙ্কারের প্রতি বিরূপ। তাঁহারা কামিনী-কান্দন ত্যাগের জন্ত সাধনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও অলঙ্কার ছাড়িতে পারেন না। তাঁহারা যে জটাধারণ করেন, চীর ও উর্জপুণ্ড ধারণ করেন, ভস্ম বিলেপন করেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রথানুযায়ী রুদ্রাঙ্গ, দণ্ড, কমণ্ডল, সিন্দূর, কণ্ঠাভরণ, কটি-শৃঙ্খল, চিমটা, ত্রিশূলাদি ধারণ করেন।

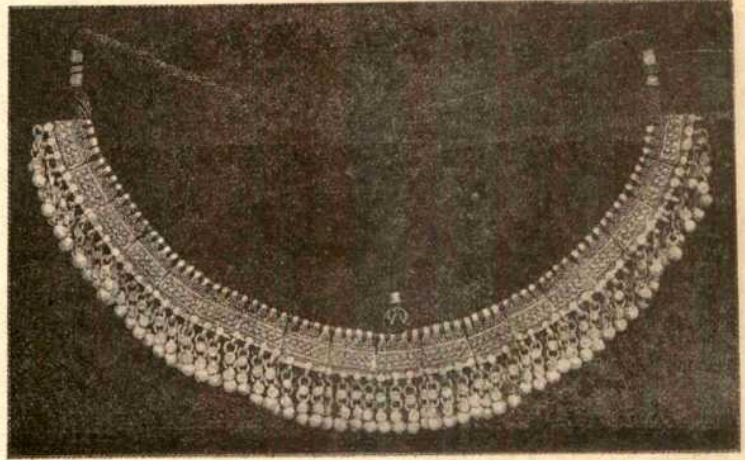
সেগুলি কি অলঙ্কারের রকমফের নয়? বৈষ্ণব-বৈরাগীর কোপীন, বহির্বাস, মালা, তিলক, শিখা, এগুলিও পুরাদস্তুর অলঙ্কার-প্রিয়তার নিদর্শন।

অলঙ্কার শোভা বর্ধন করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র তাহা বর্জন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যে-দেশের নীতি উপদেশ দেয় অর্থ অনর্থের মূল— অর্থমনর্থ ভাবয় নিত্য নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্,—সে-দেশে কেবল শোভা-সংবর্ধনের জন্ত অর্থসাপেক্ষ অলঙ্কারকে বিলাস-ব্যসনের নিদান ভাবা সুযুক্তি ভিন্ন আর কি বলিব? সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী অলঙ্কারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'ন হউন, কিন্তু গৃহীর পক্ষে অলঙ্কার তাগ করা দুষ্কর। একেবারে অনাবশ্যক এ-কথা বলিতে তো আমার সাহসে কুলায় না। অলঙ্কার আমাদের ধর্মকর্মের অন্তর্গত আমাদের সহায়।

বিবাহে আমাদের সালঙ্কারা কত দান করিতে হয়। সর্বকর্মের প্রারম্ভে দেবতা ও গুরুপুরোহিতের অঙ্গুরীয়-বরণ প্রয়োজন। পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি-বন্ধনে অলঙ্কার আমাদের প্রধান অবলম্বন। অর্থবিজ্ঞানের বহু সমস্তার সাধক অলঙ্কার। ইহার প্রসাদে কত শিল্প-কলা, কত বিজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে, কত ধাতু ও রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান জাগিয়া উঠিয়াছে।

সকল দেশের চেয়ে ভারতে গহনার আদর বেশী। প্রাচীনতম না হইলেও অপেক্ষাকৃত পুরাতন আর্য্যগণ অলঙ্কারের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের বড় বড় বীর যোদ্ধারা অলঙ্কার পরিতেন। আমাদের স্থাপত্যে গহনাপরা একরূপ যোদ্ধামূর্তি যথেষ্ট আছে। আর সেগুলি সবই এক ধরণের—উৎসবের বেশে সজ্জিত—তহুপাংগী আভরণে অলঙ্কৃত। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এই সমস্ত মূর্তি যেন একই ছাঁচে ঢালা—পরিবর্তন কাহাকে বলে তাহারা যেন জানেও না, বোঝেও না। আশ্চর্য্য, ভারতের আশপাশের দেশেও এই একই অপরিবর্তনীয় লীলার অভিনয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আর্য্যদের এবং আর্য্য-ঔপনিবেশিকদের

উৎসবোপযোগী অলঙ্কারের আকৃতি ও প্রকৃতি ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য দেশ-বিশেষের বিশেষ বিশেষ রুচি ও পদ্ধতির অনুবর্তী হইয়া একই অলঙ্কার বহু আকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্মী ও সায়ামে, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায়, বালি ও যবদ্বীপে রাজাদের উৎসব-বেশে,

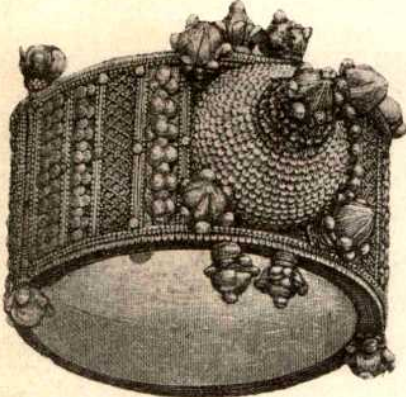


সিদ্ধদেশের রৌপ্যের কণ্ঠহার

বরকন্টার সাজসজ্জায় সেই পুরাতন ভারতীয় উৎসবের অলঙ্কার কথঞ্চিৎ সংস্কৃত আকারে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যশালাগুলিতেও যেখানে প্রাচীন চরিত্রের অভিনয় করিতে হয়, সেখানে প্রাচীন অলঙ্কারগুলিও বাদ যার না। আরও আশ্চর্য্যের কথা ভারতের অনাৰ্য্য-অধুসিত প্রদেশে, অথবা প্রাচীন হুসভ্য প্রদেশবাদী জাতি-সকলের নিয়ন্তরের মধ্যে প্রাচীন অলঙ্কারের নিদর্শন যত বেশী পাওয়া যায়, ভারতের প্রাচীন হুসভ্য রাজ্যগুলিতে তাহার একাংশেরও কল্পনা করা যায় না। হুসভ্য দেশে লোকে বেশভূষায় কালপ্রভাবেরই বশবর্তী হইয়া থাকে।

প্রাচীন অলঙ্কারের মধ্যে শিল্পরুচি ও শিল্পচাতুরী সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি অসাধারণ কারুকাৰ্য্যখচিত—শিল্পীর প্রশংসনীয় শিল্পবুদ্ধি অলঙ্কারের ভিতর দিয়া সর্বপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধদের ভাস্কর্য্য ও মৃৎশিল্পকৌশল কোনোদিন আসীরাণীদের অলঙ্কারের অভ্যাসসিদ্ধ একদেয়ে একটানা পদ্ধতির মধ্যে আত্মাবমাননা বিবোধিত করে নাই।

বেশভূষার দেহমণ্ডনের আকাজক্ষা সকলেরই মধ্যে প্রবল। আমরা বাঙালী, আমরা আবার অলঙ্কারের অতিমাত্রায় ভক্ত। বাঙালী কতকগুলি অলঙ্কারকে পুণ্যদায়ক মনে করে। অনন্ত তাহাদের মধ্যে একটি।



কটকর রূপার বাজু

নবরত্নের অঙ্গুরী, অষ্টধাতুর তাগা, নাভিশঙ্খের কেয়ুর আমাদের সৌভাগ্য বর্ধন করিয়া থাকে। কতকগুলি অলঙ্কার পতিপুত্রের কল্যাণবর্ধন করিয়া থাকে, নিজের আয়তি রক্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া স্ত্রীলোকের নিকট সেগুলি আদর, যত্ন ও পূজা পাইয়া থাকে। শাঁখ, নং, নোয়া—এই শ্রেণীর অলঙ্কার। সাধারণের বিশ্বাস, গলায় মাছলী, হাতে কবচ বা তাগা, আঙুলে আংটি, পায়ে কড়া প্রকৃতি ধারণে দেবরোষ, গ্রহদোষ ও রোগশাস্তি হয়, বিষদোষ নষ্ট হয়, ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না। কোনো কোনো রোগ সারাইবার জন্য লোকে কুমীরের নখ সোনা দিয়া বাঁধাইয়া কোমরে ধারণ করে। কেহ বা সোনা, রূপা ও তাঁবা একসঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গুরী করিয়া হাতে দেয়। মৃতবৎসার মণিরা শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের নাক ফুঁড়িয়া সোনা, রূপা বা লোহার মাকড়ি অথবা বামপদে লৌহমল কিংবা সোনার আবরণ দিয়া উচ্ছিষ্ট আমড়া, বাঘনখ ও কুমীরের দাঁত গলায় পরাইয়া দেয়।

আমাদের দেশে একই অলঙ্কার স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার্য হইলে আকৃতির পার্থক্য হয়। শিশু, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গহনার আকার ও প্রকারভেদ আছে। আমাদের দেবদেবীর অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য নানা

প্রকারের। এক দেবতার যে অলঙ্কার থাকিবে, অল্প দেবতার তাহা থাকিবে না। অলঙ্কার দেখিয়া অনেক সময় দেবমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেশবিশেষের ধাতুবিশেষ, রত্নবিশেষ, অলঙ্কারবিশেষ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এইরূপ বহু ব্যবহার ও সংস্কার লইয়া আমাদের অলঙ্কারতত্ত্ব বিপুলায়তন হইয়াছে। বাঙালীর গায়ে আজকাল কিছু বেশী মাত্রায় পশ্চিমে হাওয়া লাগিয়াছে ও শিক্ষাদীক্ষার রীতিও বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই আদর্শ ভিন্ন পথ ধরিয়াছে। তাহার উপর, কালে পরিবর্তনও অবশ্যস্বাভাবী। আগেকার গহনা এখন বেয়াড়া বেয়াপ্লা বোধ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তখনকার দিনে বাঙালীর কানের অনেক গহনা ছিল। ঝুমকো লতার ফুলের অনুকরণে 'ঝুমকা' বা 'ঝুমকো'; পোস্তদানার ফলের অনুকরণে চেঁড়ি,^১ —তাহার উপর ঘণ্টার মত ঝুমঝুম করিবে বলিয়া 'ঝুমকা চেঁড়ি'; ইহার আর চলন নাই। টাপাকুলের অক্ষুট কলি হইতে 'টাপা' —ইয়ারিঙ, তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পিপুলপাত, কর্ণফুল^২ বা কানফুল, মাকড়ি, ছল, কান, কানবালা, কনকবোলী,^৩ চৌদানি। পুরুষরাও কানে অলঙ্কার পরিত—নাম বীরবোলী^৪। এছাড়া আরও কানের গহনা ছিল। কর্ণভরণ ছিল—মটরমালা,—ঘুরিয়া ফিরিয়া আজকাল পুনরায় ইহার চলন হইয়াছে। আর ছিল টাপাকলি,—এটি চম্পক-কলিকার মালা, বোঁটায় বোঁটায় গাঁথা, দেখিতে অনেকটা নেকলেসের মত। হংসগ্রীবীর অনুকরণ করিয়া হাফুলী^৫; নির্বিষ হেলে সাপের লেজের অনুকরণে হেলেহার, কামরাঙা-হার, দড়াহার, কর্ণমালা, মুক্তমালা, তেনরী, ধুকধুকি, পাঁচ লহর বা পাঁচ হালীর পাঁচনরী, সাতনরী, দানা, মোহনমালা, ঝিলমিলি হার^৬

১ হিন্দুস্থানীদের মধ্যে আছে ঝুমক, ঝুমক।

২ 'চেঁড়ি টাপি মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল।'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

৩ 'স্বর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়,'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।—হিন্দুস্থানীদের 'করনফুল,' 'কনফুল'।

৪ 'স্বর্ণের কর্ণে বোঁলি রজতমুদ্রা পাণ্ডলি স্বর্ণের অঙ্গদ কর্ণ।'—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি

৫ হিন্দুস্থানীদের 'বাড়'।

৬ হিন্দুস্থানীদের ইফুলী।

৭ গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

প্রভৃতি অনেক রকমের হার ছিল ; মেয়েদের কটিভূষণ ছিল—কিঙ্কিণি,^৮ গোট, কোমরপাটা, মেথলা, চক্রহার। শিশুদের কটিভূষণ ছিল নিমফলের মত দানাগাথা নিমফল, কুলের আঁটির মত দানাগাথা সোনা-রূপার বোর, বোরপাটি, বোরপাটা—এগুলি বোর ও তাবিজের মত সোনা-রূপার পাতা গাথা ; তেঁতুলে বিহার অনুকরণে বিছা। তেঁতুলে বিহার আকৃতি হারও ছিল, তার নামও বিছা—নিমফলের অনুকরণেই হার নিমফল। শিশুদের কোমরে বেঙও দেওয়া হইত। আবার গোঁপ-হারও ছিল। গোঁপহারের কল্পনা কিছু উদ্ভট বা উৎকটও মনে হইতে পারে ; গোঁপের সঙ্গে এ হারের কোন সম্বন্ধ নাই—পশ্চিমবঙ্গের অনুশাসিকের পাল্লায় পড়িয়া হিন্দুস্থানী পুরুষদের গোঁপ নামক হার আমাদের মেয়েদের গোঁপহার হইয়াছে। বাহা হউক, রমণীদের করতলপৃষ্ঠের শোভা বর্ধন করিত রতনচূড়, তাহারা হাতে পরিত পলাকাঁটি, যবদানা, মরদানা, মুড়কী আকারে গড়া মুড়কী মাজুলী, মটরীকঙ্কণ, থৈয় কঙ্কণ, থৈয়ে নোয়া ; কঙ্কণ, খাড়ু, নারিকেল ফুল, বালা, শাঁখা,^৯ লবঙ্গফুল ; পৈছা, বাউটা ; উপর হাতে পরিত তাড়,^{১০} তাগা, বাছু,^{১১} জসম, ইত্যাদি। কুলুপা শব্দ অনেক দিন আগে বাঙ্গালায় চলিত। এটি নাচি-করা শাঁখা। সাধারণতঃ দু-সেট হইত। এক সেট হল্‌দে, এক সেট সবুজ। হল্‌দে সেটকে লক্ষণ বলিত, সবুজ সেটের নাম রাম। রামেশ্বরী সতানারায়ণে আছে—“কুলুপা দু-বাই শব্দ শ্রীরাম লক্ষণ”। বাই মানে সেট। মাথার অলঙ্কার ছিল, সীঁথি, বাঁপা, ঝাপটা,^{১২} শিরোমণি ; ধোঁপার শোভা ছিল—প্রজাপতি, ফুল, চিকুণী, কাঁটা ; রমণীদের নাসাশোভা ছিল নোলক, নথ, বেশর,^{১৩} লবঙ্গ,

শতেশ্বরী ইত্যাদি। পায়ের গয়না ছিল মল, বৈকি, বাকমল,^{১৪} ঘুমুরগাঁথা মল, ঘুসুর পাতামল, হীরাকাঁটা মল, নুপুর,^{১৫} নেউর, কেয়ুর, পাগুলি, আনট বিছা,^{১৬} গুজরিপঞ্চম, পঞ্চম, পাঁজর, মঞ্জীর, তোড়া, থলথলি, ছরা, কুমুর চরণচাপ প্রভৃতি। পায়ের বুড়ো আঙুলের গহনা আঙ্গট, কড়া, চুটকি। হাতের আঙুলের আংটি, মুদরি।

আমি দিগ্‌দর্শন হিসাবে অলঙ্কার সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিলাম। এইবার প্রাচীনতম যুগ হইতে আমাদের দেশে অলঙ্কারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আরও দুইটা কথা বলিব।

চারিখানি বেদের কোনো বেদে ‘অলঙ্কার’ বলিয়া কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। বেদে কিন্তু ‘অরংকৃত’, ‘অরংকৃতি’ শব্দ পাওয়া যায়—অর্থ অলঙ্কার। বৈদিক ‘অরম্’ শব্দ হইতে ‘অলম্’ শব্দ নিপ্পন্ন হইয়াছে। ঋ হইতে অর নিপ্পন্ন হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয়ার একবচনে অরম্ [অব্যয় (adv. Acc.)] ‘অরম্’ হইতে ‘অলম্’=ঠিক, যথেষ্ট (fit, fitly, justly)। ‘অলঙ্কার’ শব্দ বেদে নাই বলিয়া তখন নরনারীর অঙ্গশোভারূপ অলঙ্কার অথবা কাব্যশোভারূপ অলঙ্কার ছিল না, একথা বলা বাইতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভূষণ, আভরণ প্রভৃতি অলঙ্কার-পর্যায়ের কোন শব্দই বেদে নাই। বেদে অনেক অলঙ্কার বা গহনার নাম পাওয়া যায়। অলঙ্কারবাচক শব্দও বেদে নাই তাহাও নয়। ঋকসংহিতায় দেখা যায় মরুদগণ অলঙ্কারের বিশেষ প্রিয় ছিল (১.৬৪ ; ৮.২০ ; ১০.৭৮)। তাহারা হৃন্দর হৃন্দর অলঙ্কার পরিয়া শরীরের শোভা বর্ধন করিত। রুদ্রকে ঋগ্বেদে উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত ও কণ্ঠহারশোভিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মরুদগণ ও অশ্বিদেবেরও অনুরূপ বর্ণনা আছে। দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদেরও স্বর্ণ ও মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার ছিল। ঋষি কক্ষিবান্ স্বর্ণকুণ্ডল ও রত্নহার-শোভিত পুত্রের জগ্ন প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারাদির কথা আছে।

^৮ কটিতে কিঙ্কিণিগনি গুনি মনোহার। মনরাম

^৯ শব্দের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ
‘হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট।’—হেমচন্দ্র

^{১০} ভূজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজর।—মনরাম

^{১১} নানা ছন্দে বাজুবন্দ হেম বাঁপাধুরি। পরিয়া পাইল শোভা
পরম হৃন্দরী। শিবায়ন

^{১২} ‘মাথায় ঝাপটা সিখী কটিতে বেড়ি চক্রহার।’—মাইকেল

^{১৩} নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

‘বেশর খচিত—শতেশ্বরী গহিরল।’—ভূপতিনাথের পদ

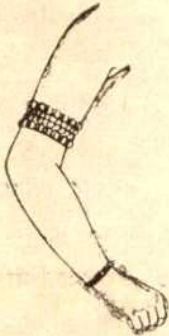
‘লবঙ্গবেসরে কারো মুখ করে আলো।’—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী

^{১৪} দুবাহতে দিব্যশঙ্খ রজতের মলবক স্বর্ণমুক্তা নানা হারগণ।—
চৈতন্যচরিতামৃত, আদি। ‘দুবাই শব্ধেতে শোভিল বিলক্ষণ।’
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

^{১৫} দুই পায়ে দিল তার রজত নুপুর।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

^{১৬} পাতামল, পাগুলি আনট বিছা পায়। গুজরিপঞ্চম আর
শোভা কিবা তায়।—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী

বৈদিক অলঙ্কার বুঝাইতে একটি সাধারণ শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। সে শব্দটি ‘অঞ্জ’ বা ‘অঞ্জি’। একটা উদাহরণ দেওয়া গেল—



উড়িয়া। কোণার্ক। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী।
কঙ্কণ, বলয়, বাজ, পাঞ্জোর ও পদভূষণ।
মণিসংযোজিত দৃঢ়সম্বন্ধ গহনার নিদর্শন।

চিত্রেরঞ্জিতবপুর্ষে বাজতে বক্ষঃস্থ কঙ্কণ। অধি যেষুতিরে শুভে।
অংসেধেবাং নি নিমৃক্ষুঃ ঋষ্টিয়ঃ সাকং জজিগ্নে স্বধয়ঃ দিবো নরঃ ॥

—ঋক্ ১.৬৪.৪.

—“শোভার জন্ম মরুদগ্গণ নানাবিধ অলঙ্কারদ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করেন। শোভার নিমিত্ত বক্ষে স্তন্য হার ধারণ করেন; অংসদেশে আয়ুধ ধারণ করেন, নেতা মরুদগ্গণ অন্তরাক হইতে স্বকীয় বলের সহিত প্রাহুত হইয়াছেন।”

ম্যাকডোনেল ও কীথ তাঁহাদের ‘বৈদিক স্মৃতি’তে মাত্র একশটি অলঙ্কারের নাম দিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়—

(ঋগ্বেদ)

১। আনুক। ২। ওপশ। ৩। কর্ণশোভন। ৪। কুরীর
৫। কৃশন। ৬। কৃশনি। ৭। খাদি। ৮। নিক। ৯। স্রোচনী
১০। পুণ্ডরীক। ১১। পুঙ্কর। ১২। প্রভূষণ। ১৩। বর্হন। ১৪। ভূষণ
১৫। মণি। ১৬। রত্ন। ১৭। কুম্ব। ১৮। কুম্বি।
১৯। ললামো। ২০। বরিমৎ। ২১। ব্যঞ্জন। ২২। বিবন।
২৩। শতপত্র। ২৪। সিবন। ২৫। হুনিক। ২৬। স্তূকা।
২৭। হিরণ্যয়া। ২৮। হিরণ্যশিপ্র। ২৯। হিরামৎ।

তৈত্তিরীয়-সংহিতার আরও কয়েকটি নূতন নাম—

৩০। পুণ্ড্রিশ্রজ্। ৩১। প্রাকাশ। ৩২। ভোগ। ৩৩। স্রজ্।

অথর্ববেদে আরও কয়েকটি নূতন নাম—

৩৪। কুম্ব। ৩৫। জীবভোজন (অঞ্জন)। ৩৬। দেবাজ্ঞন।
৩৭। নলদ। ৩৮। নিকথীব। ৩৯। নীনাহ (=কোমরপাটী)
৪০। প্রসাদন। ৪১। মধুলক। ৪২। কুম্বস্তরপ। ৪৩। ললাম।
৪৪। ললামন্ত। ৪৫। ললামা। ৪৬। সোমন। ৪৭। সুরুম্ব।
৪৮। সূত্র। ৪৯। স্বন্দাজি। ৫০। হরিতশ্রজ্। ৫১। হিরণ্যজ্।
৫২। হিরণ্যশ্রজ্। ৫৩। হৈরণ্য।

এইগুলির কোন-কোনটির অর্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন; যেমন গেল্ডনার (Geldner) বলেন, ‘আনুক’ শব্দের অর্থ ‘ভূষণ’; কিন্তু রোথ (Roth), লুড্‌ভিগ (Ludwig), ও ওলডেনবার্গ (Oldenburg) বলেন, ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ‘ভূষণ’ অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

উপরিলিখিত শব্দগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, বৈদিক যুগে স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমুক্তার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। তখন ‘ওপশ’ ছিল—কেশালঙ্কার। মাথার ভূষণ ছিল ‘কুম্ব’। কর্ণশোভন তো ছিলই। সে যুগে রমণীর মাথায় আরও একটা গহনা পরিত—তার নাম ছিল

‘করীর’। তাহার পায়ে পরিত ‘খাদি’। গলায় পরিত ‘নিষ্ক’। এ ছাড়া ‘প্রবর্ত’ নামে এক রকম গোলাকৃতি অলঙ্কার ছিল। তখনকার মেয়েরা মাথার সম্মুখের দিকে ঝালর-দেওয়া রত্নবর্তিত সীঁথি পরিত। এই সীঁথির মাঝখানে চন্দ্রাকৃতি খচিত থাকিত। খোঁপার সঙ্গে ইহারই একাংশ লাগাইয়া দেওয়া হইত। এই সীঁথি চার রকমের, তাহাদের নাম—ললাম, ললামী, ললাম্য ও ললামণ্ড। তাণ্ডমহাত্ম্যে সুবর্ণনির্মিত স্রকের কথা আছে। বৈদিক কালে সোনার অর্ধচন্দ্রাকৃতি একরকম হার ছিল তাহার নাম ‘কল্প’। ইহা বক্ষের শোভাসম্পাদন করিত। তারপর ‘কণ’ ‘প্রাকাল,’ ‘মণি,’ ‘মনা,’ ‘শঙ্খ,’ স্তূক—আরও কত রকমের ভূষণ ছিল।

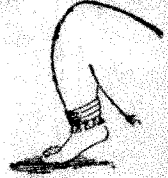
অলঙ্কার শব্দ চারি বেদে নাই বটে, কিন্তু উল্লেখের অভাব অনন্তিস্থের কারণ হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে অলঙ্কার শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায়—

“অঙ্গনাভ্যঞ্জে প্রযচ্ছতোষ ২ মাথুষোলঙ্কারঃ”

—১৩.৮.৪.৭; ৩.৫.১.৩৬

তারপর উপনিষদ্-যুগে অলঙ্কার শব্দের প্রচার হয়। যুত্মার পর পরজীবনে বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহারের জন্ত শব্দের সহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার দেওয়া হইত। অথর্ববেদে (১৮.৪.৩১) তাহার নিদর্শন আছে। উপনিষদেও তাহার নজির পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮.৮.৪) গহনা (ornament) অর্থে অলঙ্কার শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়—“প্রোতন্ত শরীরং বসনেনালঙ্কারেণ সংস্তুবন্তি” ৮.৮.৫। এখানে প্রোতের শরীরকে বসন দিয়া অলঙ্কার দিয়া সংস্কার করা হইতেছে। ছান্দোগ্যে গহনারও নাম আছে—রাজ্য জানশ্রুতি রৈক ঋষিকে ছয় শত গুরু, একটি নিষ্ক ও অশ্বতরী-যুক্ত রথ দান করিয়াছিলেন। এ নিষ্ক ছিল হার। “রৈকৈমানি ঘটশতানি গবাময়মশ্বতরীরথো হুমত্ৰতাং ভগবো

দেবতাং শাধি যাং দেবতা মুপাস্ম ইতি। তমুহপরঃ প্রত্যাচাহহারে স্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরন্ত” —৪র্থ অধ্যায়। বৈদিক যুগে ‘স্বহ্মা’ নামে অত্যুজ্জ্বল হারের নাম কঠবল্লীতে (১.১৬) পাওয়া যায়। যম নটিকেতাকে



খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িষ্যার হস্ত ও পদের গহনা। স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ-চাতুর্য্য ও চারু-পরিচালনার অভ্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন

একটি স্বহ্মা দিয়াছিলেন।

“তবৈব নামা ভবিতায়মগ্নিঃ স্বহ্মাকোমা মনেকল্পপাং গৃহাণ” (১.১৬)

গহনার নাম অলঙ্কার হইল কেন? প্রাচীন কালের ঋষিদের মধ্যে এক জন ইহা লইয়াও মাথা বামাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারীকে যতকিছু দাও না কেন, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। তাহাকে ভাল কাপড়, ভাল খাবার, ভাল জিনিস, যাহাই দাও, সে ‘না’ বলিবে না—যেমন তাহাকে গহনা দিবে অমনি সে খুণী হইয়া বলিবে ‘আর না’ ‘অলম্’ ‘বেশ হইয়াছে’। এই অলং-করা হয় বলিয়া গহনার নাম হইয়াছে ‘অলংকার’। অলঙ্কারের এটি একটি প্রাচীন সুরসিক শাস্ত্রিকের সরস তাৎপর্য্য।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্বে অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা কোথাও দেখা যায় না। পরবর্তী কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের নাম ও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের ২১শ

অধ্যায়ে ভরত অলঙ্কার লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি অলঙ্কারকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অলঙ্কার আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য। কুণ্ডলাদি আবেধ্য; শ্রেণীসূত্র, অঙ্গাদি বন্ধনীয়;



উৎকলের মণ্ডক ও কর্ণভরণ

নুপুর, বস্ত্রভরণ ক্ষেপ্য; স্বর্ণসূত্র ও নানাপ্রকার হার আরোপ্য।

চতুর্বিধস্ত বিজ্ঞেয়ং দেহস্তাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকম্ভুখা ॥
আবেধ্যং কুণ্ডলাদীহ যৎস্তাচ্ছ ভূষণভূষণম্।
শ্রেণীসূত্রাদৈর্মুক্তা বন্ধনীয়া বিনির্দিশেৎ ॥
ক্ষেপ্যং নুপুরং বিদ্যাদ্বস্ত্রভরণমেব চ।
আরোপ্যং হেমস্ত্রাণি হারান্চ বিবিধাশ্রয়াঃ ॥

নাট্যশাস্ত্র—২১, ১১-১৩

তারপর তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, চূড়ামণি আর মুকুট হইল শিরোভূষণ। কর্ণের অলঙ্কার—কুণ্ডল। মুক্তাবলী অর্থাৎ মুক্তাহার হর্যক এবং সূত্র কণ্ঠভূষণ। অঙ্গুলির আভরণ হইল বটিকা ও অঙ্গুলিমুদ্রা। কেশর ও অঙ্গদ—কূর্পরের ভূষণ। ত্রিসর ও হার গ্রীবা ও স্তনমণ্ডলের ভূষণ; তরল ও সূত্রক এই দুইটি কটিভূষণ ছিল। তখন দেহভূষণ বলিলে বুঝাইত মুক্তহার ও মালা। এগুলি সাধারণতঃ বেশ বিলম্বিত হইত। এই সমস্ত অলঙ্কার পুরুষরা পরিত।

চূড়ামণিঃ সমুচ্চৈঃ শিরসো ভূষণং স্মৃতম্।
কুণ্ডলং কর্ণমৈবৈকং কলাকরণমিষ্যতে ॥
মুক্তাবলী হর্যকম্ সূত্রং কণ্ঠভূষণম্।
বটিকাঙ্গুলিমুদ্রা চ স্তাদঙ্গুলিবিভূষণম্ ॥
ত্রিসরশ্চৈব হারান্চ গ্রীবারঙ্কোজভূষণম্।
তরলং সূত্রকশ্চৈব ভবেৎ কটিবিভূষণম্।
অয়ং পুরুষনির্বোগঃ কার্য্যস্তাভরণাশ্রয়ঃ।
ব্যালম্বিমুক্তিকা হারা মালাদ্যা দেহভূষণম্ ॥ ২১, ১৫-১৯

তারপর দেবতাদের ও মর্ত্যবাসিনী রমণীদের অলঙ্কারের কথা ভরত মুনি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারগুলির নাম ভরতনাট্যশাস্ত্রে (২১।১২-২১) এইরূপ—

শিখাপাশ। কুণ্ডল। শিখাজাল। খড়্গপত্র। যশপত্র। বেলীগুচ্ছ। চূড়ামণি। নারক। মকরিকা। ললাটতিলক। মুক্তাজাল। গুচ্ছ (জ এবং কক্ষের উপরিভাগে ধারণ করা হইত)। গবাক্ষি। কুহুম (নানা রকম ফুলের অঙ্কুরণে স্বর্ণভরণ)।

এ ছাড়া, কানের গহনার ন'ম (২১।২২-২৪)—কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, আপেক্ষক, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎপল, নানারত্নখচিত দন্তপত্র। গণ্ডস্থলেরও গহনার ন'ম—তিলক ও পত্রলেখা। বাস্তবের নিকট এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে শুধু অলঙ্কারের উল্লেখ আছে তাহা নহে, বিভিন্ন প্রকার নানা অলঙ্কারের নাম ও বর্ণনা আছে। একটা উদাহরণ দিতেছি—পাণিনি ব্যাকরণ লিখিত গিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। এক জায়গায় (৪.৩.৬৬) দুইটি ভূষণের নাম করিয়াছেন। কর্ণে থাকে বলিয়া একটি গহনার নাম 'কর্ণিকা', ললাটে থাকে বলিয়া আর একটি অলঙ্কারের নাম 'ললাটিকা'। তাঁহার সূত্র হইল—“কর্ণললাটাৎকনলঙ্কারে”। ইহার বৃত্তি এই—“কর্ণললাট-লঙ্কারাভ্যাং কন্ প্রত্যয়ো ভবতি তত্র ভব ইত্যতস্মিন্ বিবস্বেহলঙ্কারেহভিধেয়ে।” ‘বৎ’ প্রত্যয় (৪.৩.৫৫) না হইয়া সেইখানে আছে এই অর্থে ‘কন্’ প্রত্যয় হইবে।

রামায়ণে (স্থল ২.৬) লিখিত আছে, লঙ্কাপুরষোবিদ-গণের কর্ণে বজ্র অর্থাৎ হীরকখচিত বৈদূর্য্যমণিখচিত কুণ্ডল ছিল। মহাভারতেও (বন প-৫৭) মণিকুণ্ডলের উল্লেখ আছে। ভাগবতেও (১০.২৯.৪) গোপাঙ্গনাদের কৃষ্ণাভিসার বর্ণনায় তাহাদের বলা হইয়াছে—আজগুরস্তোত্র-মলক্ষিতোদ্যমাঃ সবত্র কান্তো জ্বলোলকুণ্ডলা। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের একটি স্ত্রীমূর্তির কর্ণে ‘তালপত্র’ নামক কর্ণভরণের নিদর্শন আছে। অমরকোষের বর্ণনার সহিত ইহার মিল আছে। ভুবনেশ্বরের (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo-Aryans) ৬৪ সংখ্যক চিত্রের কর্ণভরণ বাঙ্গালা দেশের ঝুমকার অনুরূপ। ৬৫ সংখ্যক মূর্তি—মণিকর্ণিকা। ৬৬ নং চিত্র পুরীর কাঠশিল্প হইতে গৃহীত। এই মূর্তির অনুরূপ কর্ণভরণ বাঙ্গালা দেশের ‘চেড়ী’ নামে পরিচিত। ৬৩, ৬৪, ৬৫ নং চিত্রের

কর্ণভরণগুলি সুবর্ণনির্মিত ও তাহাতে মণি-মুক্তা স্নগ্ধভাবে খচিত ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কালে বহুপ্রকার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। বহুবিধ কণ্ঠহাবের মধ্যে শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অববাটক ও তবলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মুক্তাহারের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। সমান আকৃতির মুক্তামাল্য হার রচনা করিয়া কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা দিয়া ‘শীর্ষক’ প্রস্তুত হইত। এইরূপ হারের কেন্দ্রস্থলে পাঁচটি বড় বড় মুক্তা থাকিলে তাহাকে উপশীর্ষক বলিত। ‘প্রকাণ্ডক’ ক্রমহ্রাসমান মুক্তামাল্য রচিত হারের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা থাকে। অববাটক সমান অবয়বের মুক্তামাল্য রচিত হইত। মুক্তাহারের কেন্দ্রস্থলে একটি উজ্জ্বল মুক্তা দিয়া যে হার রচিত হইত তাহার নাম—তবলপ্রতিবন্ধ। এক হাজার আট লহরে ‘ইন্দ্রচ্ছন্দ,’ ইহার অর্ধেক লহরে ‘বিজয়চ্ছন্দ’ এবং চৌদ্দটি লহরে ‘অর্দ্ধহার’ নামক মুক্তাহার রচিত হইত। এতদ্ব্যতীত চুয়ান গাছি মুক্তামাল্য লহবে ‘রশ্মিকলাপ,’ বজ্রিশ লহরে ‘শুচ্ছ,’ সাতাশ লহবে ‘নক্ষত্রমাল,’ চব্বিশ লহবে ‘অর্দ্ধশুচ্ছ,’ বিশ লহরে ‘মানবক’ এবং দশ লহরে ‘অর্দ্ধমানবক’ হার রচিত হইত। উপরোক্ত হাবগুলির ঠিক মধ্যভাগে একটি বড় মুক্তা বসাইয়া দিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইত; এইরূপ হার ‘বিজয়চ্ছন্দ-মানবক’ ‘অর্দ্ধহার-মানবক’ ও ‘রশ্মিকলাপ-মানবক’ প্রভৃতি অখ্যা পাইত।

অনেক গাছি মুক্তামাল্য লহরের হারগুলি আবার শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অববাটক এবং তবলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতির আদর্শও প্রস্তুত হইত। উপরোক্ত আদর্শে রচিত হাবগুলিকে ‘শুচ্ছহার’ বলিত; এইরূপ ‘ইন্দ্রচ্ছন্দ-শীর্ষক’ ‘ইন্দ্রচ্ছন্দ-উপশীর্ষক’ প্রভৃতি হার ছিল।

মুক্তামাল্য রচিত অন্ত প্রকার হারের নাম কলকহার; এই সঙ্কল হারের মধ্যভাগে তিনটি, পাঁচটি করিয়া চ্যাপ্টা মুক্তা বসান থাকিত; এইরূপ তিনটি চ্যাপ্টা মুক্তাখচিত হাবকে ‘ত্রয়লক’ এবং পাঁচটি মুক্তাখচিত হাবকে ‘পঞ্চলক’ বলিত। একগাছি লহরে রচিত মুক্তাহারকে ‘একাবলি’ এবং ‘একাবলি’র মধ্যভাগে একটি ‘মণি’ বসান থাকিলে

তাহাকে ‘ঘণ্টা’ বলিত। এইরূপে হারের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণমালা থাকিলে তাহাকে ‘বত্নাবলী’ বলিত।

পর পর এক গাছি করিয়া মুক্তাহাব এবং সমান অবয়বের স্বর্ণহারে রচিত হারকে ‘অপবর্তক’ হার বলা হইত। দুই-গাছি মুক্তাহারের মধ্যে একগাছি স্বর্ণলহব দিয়া ‘সোপানক’ প্রস্তুত হইত; এইরূপ হারের মধ্যভাগে একটি ‘মণি’ খচিত থাকিলে তাহাকে ‘মণি-সোপানক’ বলা হইত। স্বর্ণখচিত অপবর্তক, সোপানক, মণি-সোপানক, ঘণ্টা, একাবলি প্রভৃতি প্রাচীনকালে শিরোহার, কঙ্কণ, বলয় ও ঘুটিকা প্রভৃতি মুক্তাখচিত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রে স্বর্ণকারদের কথাও আছে। সদর রাস্তার কেন্দ্রস্থলে স্বর্ণকারের দোকান থাকিত; উচ্চবংশের সচ্চরিত্র নিপুণ কারিগর ভিন্ন অন্য কেহ দোকান খুলিতে পারিত না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বিভাগ বা ব্যবসায় বাহাতে সতত্বে সহিত চালিত হয়, সেই জন্য রাষ্ট্রের এক জন তত্ত্বাবধায়ক থাকিতেন; তাহার অধীনে ‘অক্ষশালা’ থাকিত। এই অক্ষশালায় স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইত এবং স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইত। স্বর্ণকারগণ স্বর্ণের গুণনির্ণয়ে এবং ধাতুদ্রব্যাদি সম্বন্ধে রসায়ন-বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অক্ষশালায় চাবিখানি বন্ধ এবং মাত্র একটি দ্বার থাকিত; অক্ষশালায় স্বর্ণকাবগণ এবং বাহাদের সেখানে কাজ বহিয়াছে তাহারা ভিন্ন কেহই প্রবেশ করিতে পারিত না; ইহার নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর ছিল। স্বর্ণকারগণ বিস্তৃত স্বর্ণের কাঞ্চন, পৃথিত (শূভগর্ভ), তষ্ট্রী বা মণিখচিত স্বর্ণ এবং তপনীয় প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতে নিযুক্ত থাকিত। অক্ষশালায় যে স্থানে বসিয়া স্বর্ণকারগণ কার্য করে, তাহাদের কোন কার্য যে-পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সেইস্থানে অসমাপ্ত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি থাকিত। তাহারা কার্যের অন্ত যে স্বর্ণ গ্রহণ করিত, দৈনিক কার্য সমাপন করিয়া তাহার হিসাব তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইত। যে-সকল অলঙ্কার সমাপ্ত হইত তাহা কারিগর ও তত্ত্বাবধায়কের শীলমোহবে বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

ক্ষেপণ, গুণ এবং ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার অলঙ্কারের কাজ ছিল। কাচের পানায় স্বর্ণখচিত-কবণের কাজকে

ক্ষেপণ বলা হয়। স্বর্ণের লহরকে গুণ বলিত। এতদ্বিত্তির নিরেট অথবা শূন্যগর্ভ বিবিধ মালা তৈয়ারী হইত, তাহাকে ‘কুণ্ড’ বলা হইত।

স্বর্ণকারগণকে স্বর্ণ দিলে সেই পরিমাণ রাজমুদ্রাও প্রস্তুত করিয়া দিতেন; সাধারণ লোকও এইরূপ স্বর্ণবিনিময়ে স্বর্ণকারগণের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারিতেন। স্বর্ণকারগণ এইজন্য বাস্ত্রের অধীনে বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইতেন।

মুদ্রকের মুছকটিকে এক জন মণিকারের বিপণি-বর্ণনায় আমবা মুক্তা, হীরক, মণিমাণিক্য, পদ্মরাগমণি, প্রবাল, গোমেধ, বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতির এবং স্বর্ণে খচিত বিবিধ মণি-মুক্তার কারুকার্যের উল্লেখ পাই। বিভিন্ন অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যবিচারে ইহাব উপাদান, দেশ কাল ও পাত্রভেদে ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও সংস্কৃতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়; শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পের উপাদান বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট; যে জব্য বা পদার্থ হইতে যে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, তাহার সঙ্গে সেই অলঙ্কারের মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কর্ণম অথবা পাথরে যে কারুকার্য করা হয়, তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই সূতার কারু-কার্যের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রত্যেক কারুকার্যেই একটি ছন্দ ও একটি সুর রক্ষিত হয়; তাহা দেখিলেই শিল্পীর কচি ও সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়।

কাব্যেও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। পুরুষরাও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিত। কয়েকটি উদাহরণ দি-তাই। মেঘদূতের যক্ষ “কনকবলয়ব্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ” —প্রকোষ্ঠ হইতে তাহার কনকবলয় ভ্রষ্ট হইয়াছে। আবাব ভাল কাজ করিলে তাহার পুংস্বরের জন্ত এগুলি দানও করা হইত। চারুদত্ত কর্ণপূরককে পুংস্বার দিতে উদ্যত হইলেন। পূর্বে তাঁহার ধন ছিল, তখন গহনা পবিতেন। এখন অদৃষ্টেব পরিহাসে তিনি নিঃস্ব—কিন্তু তাঁহার মনে নাই—তাঁহার অঙ্গে ভূষণ নাই; পূর্বে অভ্যাস-বশতঃ শীঘ্র অলঙ্কার খুলিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু অঙ্গের বেখানে বেখানে অলঙ্কার ধারণ করা হয়, সেই সেই স্থানে হাত দিয়া দেখিলেন—আভরণ নাই। তখন নিরুপায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাসসহ উত্তরীয় নিক্ষেপ করিলেন।

মুদ্রারাক্ষসে দেখা যায়, রাক্ষস অলঙ্কার পরিয়া মলয়কেতুর নিকট বাইতেছেন। পর্তকও এই অলঙ্কারগুলি পবিতেন। রাক্ষস নিবেদন করিতেছেন—“উচ্যতাং শকটদাসঃ। যথা পরিধাপিতা কুমারোণাভরণানি বয়ম্। তন্নমুত্তননলঙ্কৃতঃ কুমারদর্শনমহুভবিতুম্। অতো যন্তদলঙ্করণজ্ঞঃ ক্রীতঃ তন্মধ্যাদেকং দীয়তাম্।”—শকটদাসকে বল, কুমার আমার অলঙ্কার পরিয়াছেন; অলঙ্কার না পবিয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। সুতরাং যে তিনটি অলঙ্কার কেনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি যেন পাঠাইয়া দেন। “রসাকর” একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মল্লিনাথ মেঘদূতের চীফায় এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়ছেন। মল্লিনাথকৃত একটি বচন এই—

কচখাং দেহখাং পরিধেয়ং বিলেপনম্।

চতুর্থী ভূষণং প্রাচঃ ব্রাহ্মমন্ত্রচ দেশিবম্।

—উত্তরমেঘ, ১৩ স্লোকের চীফ।

এই গ্রন্থের মতে রমণীদিগের অলঙ্কার চতুর্বিধ (১) ‘কচখাং’, অর্থাৎ যাহা মস্তকে ধারণ করা হয়, (২) ‘দেহখাং’—অঙ্গশোভা অলঙ্কার, (৩) ‘পরিধেয়’—বস্ত্রাদি, (৪) ‘বিলেপন’—চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার ‘দেশিক’ নামে অভিহিত।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় তখন নুপুর, বলয়, কাঞ্চী, হার ও কুণ্ডলের খুবই প্রচলন ছিল।

বাল্মীকির ‘কপূরমত্তরী’তে পাই—

ময়ূর অমগ্রায়জ্ঞঃ চবাপ সে লম্বিতা বজ্রসাহিং।

ভীএ নিম্বকলএ পিবেসি অ শকরায মণিকলী।

দিয়া বলজা বলিও করকমল পট্টপাল জ্বলসি।”

—বয়স্করা চরণে নুপূব পরাইয়া দিল। নিতম্বকলকে পদ্মরাগমণির কাঞ্চী নিবেশিত হইল। করকমলে বলয়, ক.ঠ মুক্তাহার দেওয়া হইল, আর কর্ণ কুণ্ডলযুগল স্থাপিত হইল।

কপূরমত্তরীর অন্তস্থানেও পাওয়া যায়—সুন্দরী বহিঃশাল-লীলাব আন্দোলনের সহিত তাহার মণিনুপূব রণিত হইতেছে, হার ঞ্ নু কবিয়া বাজিতেছে, মেঘলাব কিঞ্চিপী কণিত হইতেছে, চঞ্চল বলয়ের মধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে।

তখনকার দিনে সূচতুব স্বর্ণকারদের দক্ষতাও লক্ষণীয়। মুছকটকের চতুর্থ অঙ্কে ইহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। শিল্পিগণ বৈদূর্য্য, মৌক্তিক, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল,

ক কঁতরফ, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতির রত্ন বাহাই করিতেছে। স্বর্ণ দিয়া মাণিক্য বসাইতেছে। সোনার গহনা তৈরি করিতেছে। লাগ রঙের সূত্র দিয়া মুক্তাভরণগুলি গাঁথিতেছে। বৈদূর্য্যমণি ধীরে ধীরে বর্ষণ করিতেছে। শম্ম কর্তন করিতেছে—শানে প্রবাল বর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীন কালে কণ্ঠাভরণ দুই রকমের ছিল। বাহ্য কণ্ঠে সংলগ্ন থাকিত তাহার সাধাবণ নাম ছিল ‘গ্রেবেরক’। ক্ষয়সঙ্গে কণ্ঠস্থিত হইলে তাহার নাম হইত ‘ললন্তিকা’। ললন্তিকা সোনার হইলে তাহাকে ‘প্রালম্বিকা’ বলিত—আর মুক্তার হইলে ‘উরঃসূত্রিকা’ নামে অভিহিত হইত।

সূত্রত (সূত্রস্থান ১৬ অংগায়) বলিয়াছেন—

রাজা-ভূষণনির্মিত্য বালন্ত কণ্ঠে বিঘ্যতে।

বাণ তাঁহার হর্ষচরিত ‘ত্রিকণ্টক’ নামক কণ্ঠাভরণের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

কম্বমুকুলমূলমুক্তাকলমুগলমধ্যাধ্যাসিত মরকতস্ত ত্রিকণ্টককর্ণাভরণস্ত
প্রথমতঃ প্রথম

শিশুপালবধে কৃষ্ণের কুণ্ডলে গারুড়াত-মণির কথায় পাই—

“ভক্তোদয়ং কান্ধকুণ্ডলাগ্র-প্রত্যঙ্গগাক্ষতররত্নভাসা”—২।৩০

তারপর শিল্পশাস্ত্রে ও কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের বেশ একটি পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিঘণ্টু ও যাৎকের নিরুক্ত ও পাণিনির পরে অমরাদির কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মিশ্রকল্প—পত্র, রত্ন ও অস্ত্রান্তের সংমিশ্রণ তৈরি। এইগুলি দেবতা ও রাজাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি।

সাধারণ অলঙ্কারের নাম—

পাশুপুত্র, কিবীট, মলিকা, কুণ্ডল, বলয়, মেখলা, হার, কঙ্কণ, শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ, বেলুব, কর্ণ, চূড়ামণি, বালগুটি, নক্ষত্রমালা (২৭টি মুক্তা দেওয়া), অর্দ্ধহার (৬৪ লঙ্ঘনযুক্ত), স্বর্ণসূত্র (ক্ষয়শোভা), বহুমালিকা, চির (চারঃক্ষরা নেকলেস), স্বর্ণকঙ্কণ, হিবণ্যমালিকা (সোনার চেন), লম্বহার, পাদজাল, মরুভূষণ, মিশ্রিত ও রত্নকল্প, (রাজা ও দেবতা ব্যবহার্য্য), রত্নপুষ্প, কঙ্কণ, লম্বপত্র, বলয়।

ময়মত প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্রে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় আছে। মানসারেও অনেক কথা আছে। মানসার বলে—শরীরের সাধারণ অলঙ্কারের নাম ‘অঙ্গভূষণ’—গৃহের আসবাব

‘বহির্ভূষণ’। মানসার-মতে অলঙ্কার চতুর্বিধ—পত্রকল্প, চিত্রকল্প, বস্ত্রকল্প ও মিশ্রিত বা মিশ্রকল্প। এগুলি দেবতার উপযোগী। তবে চক্রবর্তী রাজা পত্রকল্প ব্যতীত আর তিনটি ব্যবহার করিতে পারেন। অধিরাম ও নরেন্দ্র নামক রাজা বস্ত্রকল্প ও মিশ্রিত পরিতে পারেন। অস্ত্রান্ত রাজাদের ভূষণ মিশ্রকল্প। লতা ও পত্র হইতে তৈরি বলিয়া নাম হইয়াছে ‘পত্রকল্প’। পুষ্প, পত্র, অঙ্কন, বহুমূল্য্য প্রস্তর ও অস্ত্রান্ত অলঙ্কারের নাম চিত্রকল্প। রত্নকল্প—পুষ্প ও রত্ন (jewellery) দিয়া তৈরি।

মহতে স্বর্ণ-শিল্প একটি বিশিষ্ট জাতিব ব্যবসা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; স্বর্ণকারগণ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেন; মনু স্বর্ণ-ব্যবসায় কৃত্রিমতার জন্য কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অমরসিংহের অভিধানে মুকুট, কিবীট প্রভৃতি বিবিধ শিরোভূষণ, অঙ্গুরীয়ক, বিবিধ কর্ণ-কুণ্ডল, কর্ণপুষ্প, শতনরী প্রভৃতি বিভিন্ন হার, অনন্ত, বলয়, কঙ্কণ, মেখলা, বেটনী, হস্ত ও পদেব বিভিন্ন প্রকার কঙ্কণ, নুপুর ও বলয় প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে।

প্রাচীন যুগের অলঙ্কারাদির অধিকাংশই বর্তমান কালে প্রচলন না থাকিলেও ভুবনধর-মন্দির, মীচী ও অমরাবতীর খোদিত মূর্তি হইতে আমরা হস্ত, পদ, কোমর, কণ্ঠ এবং মস্তক প্রভৃতির বিবিধ অলঙ্কারের নিদর্শন পাই।

মীচী এবং অমরাবতীতে আমরা বলয়, কঙ্কণ প্রভৃতি যে-সকল অলঙ্কারের নিদর্শন পাই সেগুলি তত উন্নত পদ্ধতিব নহে; অবশ্য মীচী অপেক্ষা অমরাবতীর কারুকলা একটু উন্নত পদ্ধতিব। ভুবনেশ্বরের কারুকলা বিশেষ উন্নত ও পরিষ্কৃত।

মুকুট, কিবীট, চূড়া প্রভৃতির কারুকর্ষ্য বিশেষ সুন্দর ছিল। বাজপুরের দেবমন্দিরে ‘ইন্দ্রাণীর’ মুকুটের কারুকর্ষ্য অতুলনীয়। ইহা দেখিতে ইরাণীয় টুপির (cap) মত, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে বস্ত্রযুক্ত।

মণিমুক্তাখচিত কারুকর্ষ্যময় নাকছবি ও নাসানুত্রীক প্রভৃতি নাসিকার অলঙ্কারের প্রচলন এখনও বঙ্গদেশে এবং ভারতের সকল প্রদেশেই রহিয়াছে। এক জন অন্ধু-মহিলাব বর্ণনায় তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসেব সহিত নাসানুত্রীর সঙ্গে দোলায়মান মুক্তা ছলিতেছে—এইরূপ বর্ণনা সারদা-

তিলকে রহিয়াছে। প্রাচীন ভাস্কর্য বা স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীরগাত্রে খোদিত যে-সকল বড় বড় প্রতিমূর্তি রহিয়াছে, সেই সকল মূর্তিতে বিবিধ স্থলর হারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হারগুলি দেখিলে বোধ হয় মণিমুক্তাধতিত বিভিন্ন আদর্শের হারের প্রচলন ছিল।

হাতে বালা-পবা বাঙ্গালী মেয়েদের বিশেষ আদরের; বিশেষতঃ স্বামী বর্তমানে ইংরেজ মহিলারা বিবাহেব চিহ্নস্বরূপ। বিবাহ-অঙ্গুরীয়কে যেরূপ সন্মান দেয়, বাঙ্গালী মেয়েরা তমপেক্ষা অধিক সন্মান লৌহযুক্ত স্বর্ণবলয়কে দিয়া থাকে। উৎকলে বালার পরিবর্তে খাড়ু ব্যবহৃত হয়, খাড়ু একটু বড় ও উচ্চ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (*Indo-Aryans*, Vol. I, pp. 234, 235) ৭০ নং চিত্রে অন্ত প্রকার খাড়ু বনুনা আছে। ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪ নং চিত্রে বিভিন্ন প্রকার বালার নিদর্শন আছে। ৭৪ নং চিত্রেব অনুরূপ বালা বঙ্গদেশে পটুরী নামে পবিচিত। ৭৫, ৭৬ নং চিত্রে স্থপবিচিত শাখার চিত্র আছে, ইহা শাঁখ কাটিয়া প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে লোকের রুচিব পরিবর্তন হওয়ায় চুড়ি প্রভৃতিব প্রচলন হইয়াছে। বাজু, তাবিজ, তাড় প্রভৃতি হস্তভবণের পবিবর্ত্ত বাঙালী মেয়ে অন্ত অলঙ্কার অথবা সাদৃশিহা অলঙ্কার ধরিয়াছে। কিন্তু উড়িয়া প্রভৃতি দেশে বাজু, তাবিজ, তাড়, পেটা চুড়ী প্রভৃতি রোপ্য ও স্বর্ণভরণ এখনও প্রচলিত। ভগবতী ও কাষ্টিকেয়ের মূর্তিতে বাজু ও বলস্বব অতি উচ্চাঙ্গব নিদর্শন রহিয়াছে।

গ্রীকেবা মেথলা পরিণত ভালবাসিতেন। ইহা শুধু অলঙ্কার ছিল না, কটিবন্ধেব কাজও ইহা করিত। ভারত শুধু সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ক্ষত ইহা সজ্জাভরণ রূপে ব্যবহৃত হইত, শুধু স্ত্রীলোকেবা নহে বশস্ক পুরুষেরাও মেথলা পরিধান করিত। ইহা শুধু একটি নরীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেকগুলি নরীতে ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইত। চন্দ্রহার-মেথলা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শীতপ্রধান দেশে পায়েব কোনরূপ অলঙ্কার পরা কঠিন, কারণ গরম মোজা বা জুতা প্রভৃতি দ্বারা পদদ্বয় সব সময়েই ঢাকিয়া বাধিতে হয়; কিন্তু ভারতের অবস্থা ভিন্ন রূপ। প্রাচীন কালে পায়েব বহু প্রকার অলঙ্কার প্রচলিত ছিল; কিঙ্কিণী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা উভয়েই পরিত। পাঁজব, নুপুব, শুজরি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার এখনও প্রচলিত। নুপরের বুলুবুলু এবং কিঙ্কিণীর রিগিগিনি শব্দ এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

উড়িয়ায় প্রচলিত কহমালা অন্তরূপ পদাভরণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (*Indo-Aryans*,) ৮৪, ৮৫

এবং ৭৮ নং চিত্রের পদাভরণ শুধু উড়িয়া এবং তেলঙ্গী দেশে সীমাবদ্ধ ছিল। পাঁজর মুগলমান মহিল বা এখনও পরিয়া থাকেন। ৭৮, ৭৯ এবং ৮০ নং চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন কিঙ্কিণীব ছবি আছে। ৮১, ৮২ এবং ৮৩ নং চিত্রে যুষ্টিকার (যুজুরের) চিত্র আছে।

অতি প্রাচীন যুগের নিশ্চিত কোন অলঙ্কার পাওয়া যায় নাই; শুধু ভাস্কর্য্য চিত্রাদি হইতে আমরা মণিমুক্তাধতিত অলঙ্কারেব পরিচয় পাই। আলেকজাণ্ডবেব আক্রমণের বহু পূর্ব হইতেই কবমণ্ডল উপতুলে মুক্তা সমুদ্র হইতে আহরিত হইত তাহার প্রমাণ আমরা পাই। মন্তে মুশাবানু রত্ন ও প্রস্তবাদির উল্লেখ এবং ইহার ব্যবসায়ের বঠোর বিধান রহিয়াছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে মণিমুক্তাদি স্পর্শডোবে গ্রথিত করাব কথা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ স্ত্রীষ্টব জন্মেব অন্ততঃ ৮০০ শত বৎসর পূর্ব বচিতে। মণি ও রত্নাদিকে 'কাচ' বলা হইয়াছে; কাচ বলিতে পদ্মরাগমণি, হীবক প্রভৃতিকেই বুঝাইত।

বিভিন্ন যুগের কঙ্ক-শিল্প অথবা অলঙ্কার পরীক্ষা করিয়া তাহার বিভিন্ন ধাবা ও সংস্কৃতির ক্রমপবিণতি অতি সহজেই ধরা যায়।

কোন কোন আদর্শ অল্পভাবে অনুকরণ করা হইয়া থাকে, এবং শত শত বৎসরেও তাহার পরিণতি হয় নাই। পূর্বাতন হইতে নতনে যে পরিণতি, তাহাতে স্পষ্টভাবে পূর্বাতনের আভাস পাওয়া যায়। পরিণতির একটি উচ্চ আদর্শ লাভ কবির অনেক সময়ে শিল্পেব পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, শিল্পী তখন পুরাতনে ফিবিয়া যায়; এইরূপ অনেক দেশে প্রাচীন শিল্পের পুনরুত্থব হইয় ছে।*

* এই প্রবন্ধ-সকলনে নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। উল্লেখ গ্রন্থকারপ.ণর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বাকার করিতেছি:

- ১। P. K. Acharya—Dictionary of Indian Architecture.
- ২। Coomaraswamy—History of Indian and Indo-Chinese Art.
- ৩। R. L. Mitra—Antiquities of Orissa এবং Indo-Aryans.
- ৪। গিরীশচন্দ্র বোহাঙ্কতীর্থ—প্রাচীন শিল্পপরিচয়।
- ৫। Ruth Bunzel—Social Sciences.
- ৬। Westermarck—The History of Human Marriage.
- ৭। R. Kirtson—The Civilization of the South-American Indians.
- ৮। Frazer—Totemism and Exogamy.
- ৯। Haddon—Evolution in Art.
- ১০। Holmes—Origin and Development of Form and Ornament.
- ১১। F. Boas—Primitive Art.



আলোচনা



ঐক্য "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয় সমাপ্তে।

মাস্তব রত্ন—আগনি যে আখিনের প্রবাসীতে "জমশেদপুর বাঙালী" শীর্ষক প্রসঙ্গে বাঙালীদের উপর অবশ্য আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা সর্বত্রই আপনাদের উপস্থিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে আপনাকে কিছু তথ্য জানাইতেছি।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে মিঃ এ. আর. দালাল, এম-এ, আই-সি-এস (অবসরপ্রাপ্ত) এর "Contribution of Tatas to Bengal" শীর্ষক একটি লেখা দৈনিক সংবাদ-পত্রে (যুব সম্ভবতঃ অমৃতবাজারে) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে বাঙালী ও বঙ্গদেশ টাটা কোম্পানী হইতে কি উপকার পায়, দালাল-মহাশয় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দালাল-মহাশয় টাটা কোম্পানীর মানেজিং ডিরেক্টর; হুতরাং তাঁহার তথ্যসমূহ যে সম্পূর্ণ নিতুল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিও ইহা দেখাইতে পারেন নাই যে, জমশেদপুরের অধিকাংশ পদ বাঙালীর অধিকারে। পরন্তু তাঁহার প্রবন্ধ হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভারতের অনেক প্রদেশের তুলনায় জমশেদপুরে বাঙালীর সংখ্যা কম। প্রবন্ধটি দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইলেও 'ইতিমধ্যে' টাটা কোম্পানীতে যুব বেকী পরিবর্তন (বিশেষতঃ চাকুরার বিষয়ে) হওয়া সম্ভব নহে, হুতরাং প্রবন্ধে বর্ণিত অবস্থা বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য। দালাল-মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে কোন প্রদেশের কত লোক জমশেদপুরে টাটা কোম্পানীতে কাজ করিত তাহার তালিকা দিখাছেন :—

বিহার ৩৩৪২, বুদ্ধপ্রদেশ ২৭৪৫, মধ্যপ্রদেশ ২৬৫০, গুজরাট ২৫৪২, বাংলা ২৪৯৭, মাদ্রাজ ১৭৩০, উড়িষ্যা ১৬২৬, বোম্বাই ৬১০, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ৩২০, আসাম ২৩৬, বিদেশী ৯৮।

ইহার মাসের শেষে মাহিনা পায়। ইহা ব্যতীত সমগ্রদেশে শেষে মাহিনা পায় একরূপ লোকের সংখ্যা :—আদিম অধিবাসী ২৫০০, ছত্রিশপড়িয়া ২৪৪১, উড়িষ্যা ও তেলুগু ভাষী ৩০০।

এই স্থানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই তিন শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সবাই বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী।

দালাল-মহাশয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর (অর্থাৎ বাহারা মাসিক বেতন পায়) চাকুরীদের মধ্যে শতকরা মোটে ১৩ জন বাঙালী, অর্থাৎ ৩ অংশ অপেক্ষা কিছু বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণী (অর্থাৎ বাহারা মাস্তাহিক, বেতন পায়) তাহাদের সহিত মিলাইয়া হিসাব করিলে বাঙালীর অনুপাত আরও কম হইবে। ইহাই কি বাঙালীর একটোটা অধিকার স্থাপন?

কোম্পানীর মূলধন (subscribed capital) ১০,৪৫,৬৮,০০০ টাকা। ইহাতে কোন প্রদেশের কিরূপ অংশ আছে দেখা বাউক :—

বোম্বাই	৭,৪১,৪৭,০০০	গুজরাট	৫,৫২,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	৬৩,৪১,০০০	মাদ্রাজ	৫,৫৪,০০০
বাংলা	৪১,৪৫,০০০	উ. প. সীমান্ত	৩,০৪,০০০
আশ্রা-অবোধ্যা	১৮,৮৭,০০০	ব্রহ্মদেশ	৭০,০০০
মধ্যপ্রদেশ	১৭,২৮,০০০	আসাম	৩১,০০০

ভারতীয় দেশীরাজ্য সমূহ—১,৩২,৬৫,০০০ ও বিদেশ ৮,০৭,০০০।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বাঙালীর মূলধন মোটেই নগণ্য নহে। দেশী রাজ্যসমূহের মিলিত অংশ বার দিলে বঙ্গদেশ এ-বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

জামশেদপুরে ২৫০, ৩ জনপেক্ষা উচ্চবেতনের যে-সব কার্যে ভারতীয় নিযুক্ত আছে তন্মধ্যে শতকরা ৪১টি পদে বাঙালী আছে। কিন্তু এ-হিসাবে বিশেষী কর্তৃকারীদের মরিতে বাঙালীদের অনুপাত অনেক কমিয়া যাইবে। টাটা কোম্পানীতে ১৯০২ সালে ৯৮ জন বিদেশী চাকুরে ছিল। তাহাদের অধিকাংশ কিংবা প্রায় সবই ২৫০০ টাকা অপেক্ষা অধিক বেতনভোগী; এরূপ অল্পমান মোটেই অসম্ভব নহে। বাঙালীরা যে কিছু কিছু উচ্চপদ পাইয়াছে তাহা তাহাদের বোগ্যতার বলে। এ-বিষয়ে মিঃ দালাল বলিয়াছেন :—The proportion of Bengalees holding the higher posts is 41 p. c. and is by far the largest of any province. This is a fact which in itself is creditable to Bengal and it is only brought out here to show that competent and deserving men from the province have received due recognition of their merits at the hands of the Company." সর্বশেষে তিনি বলেন, "If Bengal has benefited by the establishment of Tata Iron & Steel Co.—it is due to the favourable geographical position of the province."

If the abilities and energies of the sons of Bengal have enabled them to capture a substantial proportion of the higher appointments in the Company's service and to play their part in the progress of this great national industry, that also should be a matter of gratification and of pride to Bengal."

নিবেদক

শ্রীমদ্বজ্রলাল সেন

আখিনের 'প্রবাসী' ৯০২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে 'ব্রহ্ম' সন্ধানে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে এবং যে দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ১৩০৯ সালের 'সাহিত্য-পরিবর্তন-পত্রিকা' দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৮ পৃঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু লেখক তাহা স্বীকার করা আবশ্যিক বোধ করেন নাই।

শ্রীকুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আখিন সংখ্যায় প্রবাসীতে প্রকাশিত "বাংলার মুৎশিল ও কুস্তকার জাতি" প্রবন্ধটি নাস্তির্ঘ, উপদেশ ও সমরোপযোগী। প্রবন্ধের চিত্তশুল্লিও মনোরম। লেখক-মহাশয় কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন, হরত ইহা তাঁহার অনিচ্ছাকৃত। প্রবন্ধের "রিইনকোর্সড পদ্ধতি নির্মিত যমুনা মূর্তি" ও "মদ্রু মূর্তিকা নির্মিত গণেশ-মূর্তি"র ডিজাইন শিল্পী জীযুক্ত নন্দলাল বহু মহাশয় কৃত। এই ডিজাইনগুলি কুস্তকার জাতি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীগণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

২১

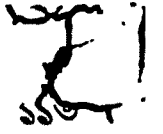
প্রত্যেক দিন সকালবেলায় ডাক আসিবার সময় দারোয়ানটা যখন ছেলের দ্বারা ডাকিয়া বেড়ায়, ‘চিঠি টি হায়!’ সে সময় প্রত্যেক দিনই যামিনীর স্বপ্নস্পন্দন দ্রুততর হইতে থাকে। মনে হয় দারোয়ান এইবারে তাহার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, এইবারে তাহার দিকে একখানা নীলাভ রঙের খাম হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিবে। তাহার নামও হস্ত চিঠি আছে। আর সে চিঠি লিখিয়াছে নিশ্চয় নির্মলা। কিন্তু কোনদিনই আশা পূর্ণ হয় না। প্রতীকার পালা দীর্ঘতর হইতে থাকে। কিন্তু এমনি দুর্বীর আশা যে আবার ঠিক পনের দিন চিঠি আসিবার সময় হইলেই তাহার পক্ষে কোন কাজ করা কি লেখাপড়া করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই কয়েকটি মুহূর্ত ব্যাকুল আশার উত্তেজনার কাটিয়া যায়। তাহার পরে তাহাব বারংবার প্রশ্নের জবাবে দারোয়ান যখন ঠিক একই ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিতে থাকে, না বাবু, আজও আপনার নামে কোন চিঠিপত্র নাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য তাহার মনের সমস্তটা একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়। একটা দিনের জন্য সমস্ত আশা গেল।

সেদিন বেলা ন’টাব সময় ডাক বিলি হইয়া যাইবার পরে যামিনী নিরাশ মনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় জাক্রানি পর্দা-ঝোলান পাশের বাড়ি হইতে খুব একটা সোরগোল, একটা স্ত্রী-কণ্ঠের আর্দ্রনাদ শোনা গেল। যামিনী সেইদিকের জানালাগুলি বরাবর বন্ধ রাখিত, টানিয়া খুলিয়া দেখিল গেটের সামনে গোটা দুই-তিন মোটর দাঁড়াইয়া আছে। একটা হল্লা উঠিয়াছে। নিখিলকে ডাকিয়া কহিল, “ওহে ব্যাপার কি? এত গোলমাল কেন? না, এ ঘর ছুঁটো আমাকে বদলাতে হ’ল দেখি। এমনিতেই ত দিবারাত্রি সাবোজিব নিকল, গানের সুর আর মাতালের অশ্রাব্য ভাবায় কান ঝালাপালা। তার উপরে কোন কোন দিন যদি বিশেষ পালা শুরু হয় তাহলেই ত চমৎকার!”

নিখিল সেই বাড়ীর ফটকের কাছে গেল ব্যাপার কি দেখিবার জন্য। কোন এক বেহারী বড় ভূমিদারের ছেল এক জন বক্ষিতাব মত স্ত্রীলোককে আনিয়া কিছুদিন হইত ওই বাড়ীতে বাখিয়াছে। লোকে এইরূপই বলে। অনেকটা আশ্রয়ও তাই হয়। মেয়েটিকে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে যামিনী অনেকবার দেখিয়াছে। কালো দীর্ঘ বনপশু চক্ষু। অপূর্ণ হৃদয়। চকিতের মত জাক্রানি পর্দা সরাইয়া তাহার কালো চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠে, আবার তখনই সরিয়া যায়। দিনের বেলায় সমস্ত ব’সটা নিশ্চয় থাকে। কেবল এক জন দাসীকে সদরদরজা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। কিন্তু সন্ধ্যা লাগিতে না-লাগিতে প্রকাণ্ড এক মোটরের হর্ণ ধন ধন বাজিতে থাকে। তাহা হইতে যে বেহারী ভদ্রলোক নামে তাহার পাচ আঙুলে পাঁচটা হীরার আংটি এবং বেশভূষা দিকে চাহিলেই তাহার শিক্ষা এবং রুচি সম্বন্ধ সংশয় করিবার আর অবকাশ থাকে না। তাহার পরে আরও দুই-একটা জুড়িগাড়ী লাগে ও নারারাত্রি ধরিয়া সুরা এবং বীভৎসতার যে প্রমত্ত লীলা চলে, দূর হইতেও ক্ষণে ক্ষণে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

নিখিল ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “হবে আবার কি, মাতাল ভূমিদারটা আজ অতদিনের চেয়ে মাত্রা উড়িয়েছে, তাই হয়ত বেধেচে কোন গোলযোগ। বাক্গে ও-সবে আর মনোযোগ দিয়ে কি হবে বল। দেখি যদি এই বকম রোজই চলে, তাহলে অল্প মেস দেখতে হ’ব। এখানে আর অল্প কোন ঘর ত খালি নেই। ভূমি কি বল? ‘কিন্তু এ-বাড়ীটা খুব সুবিধেব ছিল।’”

বাড়ী বদলাইবার নাম শুনিবামাত্রই যামিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। তাহার সমস্ত দেহ-মন যেন ক্লাস্তির অবসাদের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এতটুকু চেষ্টা উদ্যোগ তাহাতে আবহ সর্হিব না। চেয়ারটায় ভাল করিয়া হেলান দেয়া বসিয়া সে অর্ধনিশীলিত চক্ষে কহিল, “যাক, অত



হাজামে কাজ কি, বেশ আছি। ওসব গোলমালে কান না দিলেই হ'ল।”

নিখিল তাহারই নির্দেশমত সেইদিক্কার জানালা ছুঁটা আঁচা বন্ধ কবিয়া দিয়া আসিয়া স্নিতহাস্যে বলিল, “কিন্তু তাও বলি, তোমার অত বাড়ির ভাবনা কেন দাদা? বৌদির কাছে সোজা চলে যাও। সকালবেলায় উঠেই প্রাইমাস্ টোভের পাশ্প ঠেলতে হবে না চা'য়ের জন্তে। ববলু সেখানে সোনালি চা'য়ের সঙ্গে সোনার বর্ণের করকমলের যে ছায়টুকু এসে মিশবে তাতে ক'রে চা'য়ের স্বাদের আর অন্ত থাকবে না। তাই যাও না ভাই। অনর্থক অভিমান ক'বে শরীরপাত কেন?”

“বল কি!” যামিনী গভীর মুখে কহিল, “একবার ফেল করেছে। আমার পড়াশোনা?”

“আর পড়াশোনা? পড়াশোনা যা কবছ তা স্বর্গের দ্বার দেখছেন।”

“সত্যি কিছু পড়ছি নে। নয় নিখিল?” সে এমন ভাবে নিখিলের মুখের দিকে চাহিয়া এমন স্ববে কথাটা জিজ্ঞাসা করিল যে সেইটুকু প্রশ্নের মধ্যেই তাহাব অন্তরের অপরিসীম ভার, অসহ ব্যথা একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যেন চোখে পড়িল। নিখিল তাহারই পাশে নিজের চৌকিটা সবাইয়া লইয়া গিয়া যামিনীর একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “কি হয়েছে আমাকে খুঁলে বল যামিনী। সেই প্রথম যখন আই-এ পড়তে তুমি কলকাতায় এস, তখন থেকেই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আমার কাছে কিছুই লুকিও না।”

যামিনী ধীরে ধীরে হাতটা মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কিছুই হয় নি। এক দিন এক জনকে প্রাণপণে পাবার চেষ্টা ক'রে মনে করেছিলুম, বাইবের সব ব্যথা কাটিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারলেই বুঝি সমস্তই সুখগম হয়ে আসবে। এখন দেখতে পাচ্ছি বাইবের চেয়ে ভিতরের ব্যথাই বেশী। সেইটেই সবচেয়ে বড় সমস্যা নিখিল, যেখানে পাশাপাশি রয়েছে, অথচ মিলতে পাচ্ছি নে।”

“দেখ,তোমাদের নব্য পুরুষদের এই একটা ভারি দোষ—” নিখিল একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, “তোমরা আজকাল

মেয়েদের হার মানিয়েছ। বসে বসে স্তম্ভমরূপে ভাবা থেকে ভাবটুকু এবং তাৎপর্য হইতে তবুটুকু বেছে চিনে বার করা চাই। কিন্তু দোহাই তোমাদের, সংসারের সর্বত্র অত স্তম্ভ মনের আমদানী ক'রো না। যা সহজ এবং সরল মুখে মুখে ছড়াকেটে তাকেই কাব্য বানিয়ে তুলো না।”

যামিনী উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “ভাই নিখিল, আমাদের কথা তুমি বুঝতে পাববে না, সে চেষ্টাও ক'বো না। সংসারের বারো আনা লোক ঘরের গৃহিণীকে পেলেই সুখী হয়, স্বস্তিতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। কিন্তু আমার সে স্বস্তিতে দরকার নেই। আর সে সুখেও আবশ্যক নেই— না না, সুখ চাই নে এ কথাটা অবশ্য এখন অত জোব দিয়ে বলতে পারি নে। কারণ এখন অত স্বয়ংসীল হই নি। কিন্তু আমি যে-পরিপূর্ণতাকে চেয়েছি সে ত শুধু ঘরের গৃহিণীকে দিয়ে মেটে না। আমি তা'বই জন্ত অপেক্ষা ক'রে রইলুম। যদি কখন পাই তেমনি ক'রেই পাব। তার চেয়ে কমে আমার মন ভরবে না ভাই। এর জন্তে যদি সমস্ত জীবন অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় সেও স্বীকাব, কিন্তু আমাব চাওরাকে আমি ছোট কবব না।”

“হয়েছে গো মশাই হয়েছে। সাবাজীবন তপস্কাব পালা এখন শিকেন তোলা থাক, ছোটো মাস বিরহ সহ হ'লে বাঁচি। রোজ ডাক আসবাব সময় যখন হয়, তখন মনটা যেন মেঘের পানে চাতকের চেয়ে থাকাব মত সেই দিকপানে অনিমেষ হয়ে থাকে। দেখি, দাদা, আব ছোটো দিন সবু কব, ডাকটা আগে কোনদিক থেকে আসে!

২২

রাজি তখন প্রায় বারোটা। মেসের সমস্ত ঘর অন্ধকার। আলো নিবাইয়া দিয়া সকলেই ঘুমাইতেছে। যামিনী'ব পাশের ঘরে নিখিলও গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। কেবল সে নিজেই এত বাজি অবধি ঘুমাতে পারে নাই। আলোর অভাবে বই পড়িতে না পারিরা চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া ছটুকু করিতেছিল। এমন সময় তাহারই পাশের ঘরটায় কে যেন ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিল, “বাবু কেউ জেগে আছেন গো? ভারি বিপদে পড়েছি। দোহাই আপনাদের যদি জেগে থাকেন ত দোর খুলুন।”

স্বী-কণ্ঠের স্বর। কণ্ঠস্বর আর্ন্ত ব্যাকুলতা।

যামিনী মাথার কাছে টিগায়ে-রাখা মোমবাতি ও দেশলাই দিয়া আলো জালিয়া দরজা খুলিয়া দিল। খুলিয়া দিয়া ডাকিল, “কে? কি বলছে।”

সাদা পাইয়া স্বীলোকটি তাহার ঘরের দিকে আগাইয়া আসিল। যামিনী দেখিয়া তিনিল, ও-বাড়ীর দাসী। বাহকে প্রায়ই সে সদর দরজা খুলিয়া বাতায়ত করিতে দেখিয়াছে।

“কি হয়েছে?”

“সর্বনাশ হয়েছে বাবু। বাড়িতে দাঙ্গা হয়েছে। দিদিমণির মাথায় ছুরি মেবে...আব কি বলব বাবু? সে সব নোঙরা কথা। বগড়া-ঝাঁটির পর কে কোন্ দিকে পালিয়েছে। একা বাড়িতে কি করব ভেবে পাচ্ছি নে। এক জন ডাক্তার ডাকা ত দরকাব। কিন্তু কি করব, একলা তাঁকে ফেলে রেখে কোথায় বাব? এদিকে ডাক্তার ডাকতে বেক্ষণ দেরি হ’লে হয়ত ওনাকে বাঁচান যাবে না।” যামিনী কিছুকাল ভাবিয়া কহিল, “তুমি একটু দাঁড়াও, দেখি আমি কি করতে পারি।” নিখিলকে ডাকিয়া উঠাইয়া সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।

নিখিল গায়েব কাপড়টা টানিয়া লইয়া কহিল, “চল। বিপদের সময় আব কোন কথা ভাবতে নেই। একটা ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক’রে দিয়ে চলে আসব।”

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতালার বড় ঘরে আসিয়া সকলে দেখিল মেঝের ফরাস পাতা। দলিত ফুলের মালায়, সিসরেটেব পোড়টুকরায় সমস্ত জায়গাটা লগ্নভণ্ড। একধাংবে সোফার উপর মেয়েটি মুদিত চক্ষে শুইয়া আছে। জ্ঞান আছে কি না ঠিক বোঝা গেল না, রগের পাশে কালশিরার স্পষ্ট দাগ। নিখিল ছয়াবের কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, “ঘরের মধ্যে যেতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি চলুম। একটা ডাক্তার ডেকে এনে দিচ্ছি। ততক্ষণ তুমি বারান্দার ব’স।”

নিখিল চলিয়া গেল। যামিনী বাহিরে বসিয়া রহিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—অন্ধকার। আকাশের তারাগুলি যেন কাহার অনিমেধ দৃষ্টির মত স্থির হইয়া চাহিয়া আছে। সেই দিকে তাকাইয়া সে আপনাব চিন্তার মধ্যে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। দাসী পিছনে আসিয়া মুহূর্ত্তের কহিল, “কই

ডাক্তার বাবু ত এখন এলেন না। ঠুর কি আর জ্ঞান হবে না?”

যামিনী তাহাকে ভরে অভিভূত দেখিয়া কহিল, “চল ৫ ভিতরে গিয়ে দেখে আসি গে।” সোফার পাশে একটা টুল লইয়া গিয়া সে বসিল। দাসীকে বলিল, “তোমাদের বাড়িতে যদি গোলাপজল থাকে নিষে এস। আব অমনি একটা হাতপাখাও।” দাসী প্রার্থিত জিনিষপত্র খোঁজ করিয়া আনিতে গেল। ঘরের মধ্যে উক্ষল আলো। সেই বিমথিত, বিশৃঙ্খল কক্ষের মাঝে নিম্পন্দ নারীমূর্ত্তির দিকে সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। কী সুন্দর মুখ! মুকুমাংব ললাটখণ্ডটুকুতে কি অদহার করুণতা! সমস্ত মুখ বিবর্ণ। ইহারই মুখের দিকে তাকাইয়া কে বলিতে পারে দিন কাটে ইহাব নিঃশব্দ মানিতে, রাত্রি যাপন হয় প্রমত্ত লালসাব মাঝে। দাসী আসিয়া মাথায় গোলাপজলের পট দিয়া পাখা করিতে লাগিল। যামিনী তাহার হাতের মণিবন্ধ স্পর্শ করিয়া দেখিল নাড়ী ক্ষীণ।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সে চোখ খুলিয়া চাহিল। শূন্য অর্থহীন দৃষ্টি। বাড়িব গেটের কাছে একটা মোটরবেগ হর্ণ বাজিতে লাগিল। সিঁড়ির আলোটা জালিয়া দিয়া দাসী কহিল, “ওই যে ডাক্তারবাবু এসছেন।”

ডাক্তার আসিয়া কয়েকটা বলকারক ঔষধ লিখিয়া দিয়া গেলেন। খানিকটা গরম ছুখে ব্যাগ হইতে কয়েক ফোঁটা ব্র্যান্ডি মিশাইয়া পান করিতে দিয়া আবাত পবীক্ষা কবিয়া কহিলেন, “তেমন কিছুই নয়। হঠাৎ শব্দ পেয়ে এতক্ষণ জ্ঞান ছিল না।...আজ্ঞে, না। বাড়িতে আমি বত্রিশ টাকাই নিই।”

যামিনী তাহাব পার্স হইতে দশ টাকার চাবিখানা নোট বাহির করিল। নিখিল সেইদিকে চাহিয়া ক্রকৃষ্ণিত করিল। সোফা হইতে মেয়েটি ক্ষীণস্বরে কি কহিল ঠিক শোনা গেল না। ডাক্তার পকেট হাতড়াইয়া কহিলেন, “আমার কাছে চেঞ্জ নেই।” নিখিলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আপনি টাকাটা আর ঔষধ কয়েকটা নিয়ে যান আমার ডিম্পেনসারী থেকে। ঠুর বেরকম অবস্থা, আজ রাত্রিরেই হৃদাগ ঔষধ পড়া চাই।” নিখিল নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে বাহিব হইয়া গেল।

ববেব মধ্য প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। শিরের কাছে পাখা হাতে করিয়া দাসী চুলিতেছে। মেয়েটি চোখ খুলিয়া তাহার কালো চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি বামিনীর উপর মেলিয়া ধরিয়া কহিল, “এমন আমি কোথাও দেখি নি।”

কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের মত মধুর। বামিনী অন্তমনস্কের মত জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকারেব দিকে চাহিয়াছিল, চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, “কি বলছেন?”

“ভাবছি কি ব’লে আপনাদের কাছে পরিসর দেব। আমার নাম অমলা। আমার নামটাই যেন আমাকে করছে সকলের চেয়ে পরিহাস। হয়ত কত কি-ই ভাবছেন।”

“কিছুই ভাবছি নে। পরের সম্বন্ধে কোন রকম কিছু ভাবা আমার স্বভাব নয়। আপনি বা তাই। কিন্তু এখন আর বেশী কথা বলবার প্রয়োজন কি? ডাক্তার বলেছে আপনার শরীর এবং মস্তিষ্ক দুই এখন দুর্বল।”

মেয়েটিব মুখে আতঙ্কর গাঢ় কালিমা পড়িল। কহিল, “আচ্ছা, কি ক’বে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম, জানেন?”

“জানি নে। আমরা আপনাদের বাড়ির ঐ পাশের মেসে থাকি। আপনার দাসী গিয়ে আমাদের খবর দেয়।”

“জানি। আমি আমাব এই জানালা দিবে কতবার আপনাকে দেখেছি।”

অমলা কি যেন স্মরণ করিতে আবার চক্ষু মুদিল। বাহিরে নিখিলেব পায়েব আওয়াজ পাওয়া গেল। দাসীকে উঠাইয়া দিয়া বামিনী কহিল, “আপনাব ইতিবৃত্ত শে.নব’র জন্তে আমরা তত ব্যস্ত হই নি। আপনি শান্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। আমরা চললুম। যদি কোন প্রয়োজন হয় খবর দেবেন।”

নিখিলেব সঙ্গে আসিয়া বাস্তাতে পড়িতেই সে গভীর হইয়া কহিল, “বামিনী, বাড়ি বদলবার কথা বলছিলে, এবারে আর তামাসা নয়। এবার একটা ভাল বাড়ি দেখে কাল-পরগুই উঠে বাছি।”

“কেন কি হয়েছে? এত তাড়া কিসের?”

“তাড়া নয়ই বা কেন? রোজ-রোজ এই-সব কাণ্ড-কারখানা আরম্ভ হ’ল। আজ তো দেখছি একরাশ অর্থদণ্ড হ’ল। তবুও যদি এইটুকুর উপর দিয়েই যার তাহ’লে ভাগ্য ব’লে মানি।”

“এত ভয় কিসের?”

“ভয় আমার জন্তে নয় তোমাবই জন্তে ভাবনা। তোমাদের মত কোঁকালো, আবেগপ্রবণ লোকগুলোকে আমি বিশেষ ভরসা করি নে। তা’ব উপরে একবার শাসনের সন্ধান গেলে সহজে কি ওরা...”

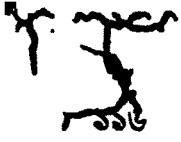
“নিখিল, কোন এক জন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অসম্মত ক’রে কথা ব’লো না।”

“ওই রে! কপালে বা ছিল এখন থেকেই তা ঘটতে শুরু হয়ে গেল ব্যুধি। স্ত্রীলোক আবার কি? গণিকা সম্বন্ধেও সম্মত ক’রে কথা কহিতে হয় না কি?”

“এত সব জানি নে নিখিল। মেয়েদের বাড়তির ভাগ সম্মত ক’রে ঠেকতে ববুজ রাজী আছি, কিন্তু আগেভাগে হিসেব ক’রে সাবধানী হ’তে পারব না।”

২৩

দুপুরবেলায় নিখিল কলেজ গিয়াছে। বামিনী তাহার ববেব বিহানায় শুইয়া ভাবিতছিল কাল বাত্ৰিবেলার ঘটনাস্থল। সে সমস্তই এত আচম্বিতে এত তাড়াতাড়ি ঘটয়া গিয়াছে যে এখনও তাহাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় অন্ধকার রন্ধনী’ব অন্তরাল ছিন্ন করিয়া কোন এক অসীক কাহিনী কয়েক মুহূর্তের জন্ত নামিয়া আসিয়াছিল। নির্মলা ছাড়া এ-অবধি কোন স্ত্রীলোকের পানে বামিনী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। তাহার কবি-প্রকৃতির সমস্ত নীরব পূজা এবং শ্রদ্ধা উদ্যত করিয়া ধরিয়াছিল তাহাবই দিকে। কিন্তু এত দিয়াও সে এক জনেব মন তেমনই করিয়া জাগাইতে পারিল না। কোনও ক্ষণে সে নিঃস্বপ্ন জন্ত দৃঢ় আশ্রয়-ভিত্তি রচনা করিতে পারিল না। তাই এই নিরন্তর গৃহতার মাঝে তাহাব সমস্ত মন অকুল তৃষ্ণায় চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছিল। কোন-কিছুতেই স্থিতি হইয়া মন বসে না, কোন কিছু’র জন্তই চেষ্টা করা, অগ্রহ করা ভাল লাগে না। মনের মধ্যে ক্লান্তি এবং শূন্যতা’ব ভাব ছাড়া আর কিছুই নাই। কিছু করিতে গেলেই এক জনেব উপব নিদারুণ অভিমান জাগিয়া উঠে। মনে হয় আমার কিছু করা, আমার ভাল থাকা সে যেন তাহারই গরজ। সেই যদি থাকিল উদাসীন হইয়া তবে এ-সব অর্থহীন চেষ্টার



দরকার কি? লেখাপড়ার আদৌ মন বসে না। সে চেষ্টা কর'ও সে এবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। খাটের উপর বিছানায় শুইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, আর কত দিন এই নির্মম নীরবতায় দিন কাটিবে। অভিমান ভাসাইয়া দিয়া সে-ই না হয় প্রথমে নির্মলাকে চিঠি লিখিবে। চিঠি লিখিবে স্থির করিয়া সে ফাউন্টেন পেন এবং কাগজ টানিয়া লইয়া বসিবে বসিবে করিতেছে, এমন সময় ওবাড়ির দাসী আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। যামিনী উঠিয়া দরজা খুলিবার উপক্রম করিতেই কহিল, “দরজা খুলবার দবকার নেই বাবু। তিনি ভাল আছেন। এই চিঠিখানা আপনাকে দিয়েছেন।”

একটা ফিকে ফিরোজা রঙের পুরু খাম তাহার হাতে জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া সে অন্তর্ধান করিল।

যামিনী নির্জন মধ্যাহ্নে সেই খামখানা হাত পাতিয়া লইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিতেই তাহার সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভবিয়া উঠিল। কিন্তু কৌতুহল সংবরণ করিতেও পারিল না। খামখানা ছিঁড়িয়া দেখিল লেখা আছে :—

“কাল তুমি যখন ঘর হইতে চলিয়া গেলে তখন মনে হইল আমার জীবনে একবার মাত্র আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও দপ করিয়া নিবিয়া গেল। তোমাকে তুমি বলিলাম বলিয়া রাগ করিও না। কারণ দূর হইতে অনেকবার তোমাকে মনে মনে তাহাই বলিয়া ডাকিয়াছি। মনে মনে বাহা করিয়াছি, প্রকাশেও তাহাই করিলাম; কারণ তোমাব কাছে আমার লুকাইবার কিছুই নাই। কিছু লুকাইব না, বোধ হয় সে সাধ্যও নাই। যদি আমার ইতিহাস শুনিতে তোমাব প্রবৃত্তি না হয় তবুও বলিব, কারণ না-বলিয়া আমার মুক্তি কোথায়? দূর হইতে জানালা দিয়া কতবার তোমার ধ্যানমগ্ন মুখের দিকে বিষয়ে ডুবিয়া গিয়া তাকাইয়াছি। মনে করিয়াছি কাহার এত ভাগ্য, কে এমন তপস্বী করিয়াছে, বাহার ধ্যানে তুমি নিজেব মনেই এত তন্ময় হইয়া আছ? না, সে আর কোন চিন্তা? কিন্তু থাক সে কথা, তোমার কথা জানিবার আমার কি অধিকার? কিন্তু আমার কথা যে তোমাকে শুনিতেই হইবে। আমার স্বামীব নাম বলিব না। তিনি বাংলা দেশের এক সুদূর পল্লীপ্রান্তের কোন এক নগণ্য

ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারী চাকরি কবি.তন। সেখানকার জমিদারের নন্দরে আমি পড়িয়া যাই। লোকে বলে আমি না-কি রূপসী, যদিও এ ছাই রূপের দিকে কোন দিন চোখ মেলিয়া চাহি নাই। তাহার পরে সেই অশিক্ষিত দোন্ধুপ্রতাপ জমিদার আমার স্বামীকে ভয় দেখাইয়া এবং বলিতে লজ্জা করে বিস্তর টাকা ধরিয়া দিয়া তাঁহারই সহিত ষড়যন্ত্র বোনে আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। স্বামী অত্যন্ত অকিঞ্চন। মাসান্তে পনেরটি টাকা করিয়া বেতন পান। বোধ করি টাকার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। এই ত আমার পুরুষের সহিত পরিচয়। কিন্তু আমাব অনন্ত দুর্গতির মাঝেও বিধাতাকে ধন্যবাদ যে এই পরিচয় সম্বল করিয়াই আমাকে মরিতে হয় নাই। তোমার পরিচয় পাইলাম। আমার জীবনের কালো অন্ধকারের মাঝে সোনার একটি রেখা পড়িল। হউক তাহা দুঃদণ্ডের। তবু ত তাহাকে দেখিয়াছি। কিন্তু কাল রাজি বলাকার ব্যাপারটা এখনও বলা হয় নাই। যিনি আমাকে এই বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, কয়েক দিন হইতে তাঁহার সহিত এক বেহারী ভদ্রলোক আমার বাড়িতে প্রায়শঃ পদধূলি দিতেন। ক্রমশঃ তাহার অন্তরঙ্গতা করিবার সুখ বাড়িয়া উঠিল। দুই জনের মাঝে সুক হইল ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা, কিস্বাদ। অবশেষে কাল রাজিতে দুই জনে একত্র হইয়া মদের ঝোঁকে মারামারি শুরু করে। আমি বাধা দিতে যাইয়া আহত হইলাম। আমাব জ্ঞান ছিল না। পরে দাসীর কাছে শুনিয়াছি বেহারী ভদ্রলোকটি খুব গুরুতর রূপে জখম হওয়ায় তাঁহার সঙ্গের লোকজন ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভয় পাইয়া জমিদার বাবুও মোটরে অন্তর্ধান করিয়াছেন, যদিও জানি ভয় ভাঙিলেই আসরে আবার আসিবেন। আবার আরম্ভ হইবে আমাব দুঃসহ গ্লানির জীবন। কিন্তু এই অবসবে, যে আমার দেবতা, দুব হইতে তোমাকে প্রণাম করিয়া লই। আমার কলঙ্ক-সমুদ্রের বহু, বহু উদ্ধে পূর্ণচন্দ্রে উঠিয়াছে। তাহারই জ্যোতিতে আমার সমস্ত কুল আলোকিত হইল। প্রভু, ভয় পাইও না। জোয়ারের জল তোমার উদ্দেশ্যে বতই উচ্ছসিত হইয়া

উঠুক, জানি তাহা তোমাব কাছেও পৌঁছাইতে পাবিব না। কিন্তু এক এক সময় ভাবি কাহার অভিশাপে আমার জীবনভরা এই অন্ধকার। বিধির বিধানে বিনাদোষে মরণের শেষদিন পর্যন্ত আকণ্ঠ পক্ষে নিমজ্জিত হইয়া থাক। ইহার কি শেষ নাই? এ জীবন হইতে কি উদ্ধাব নাই?”

যামিনী যদি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত তবে এই চিঠিব সাজান নাটকীয় ভঙ্গী হয়ত ধরিতে পাবিত। আমাদেব ত মনে হয় ত'হ'র ধরিতে পারা উচিত ছিল। কারণ আজকালকার দু-পয়সা তিন পয়সা দামের সামগ্রিক কাগজগুলোতে পতিতার কথা এবং পতিতার ব্যথা নাম দিয়া রসে-ভেজা বাষ্পগদগদ তাল তাল যে-সকল লেখা বাহির হয়, সে ধরণেব শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বহু উর্দ্ধে তাহার মন। কিন্তু সেই সময়ে যামিনীর মন অভিমান, বেদনায় এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, তাহাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা বলা চলে না। নির্মলার ব্যবহ বকে সে তাহার পৌরুষের অবমাননা বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। এক জনের কাছে আপনার স্বার্থ মূল্য না পাইয়া সে নিজের উপর নিজের শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছিল; ঠিক সেই সময়ে আর এক জনের কাছ নিজের স্ততির স্বার্থতা ধবিত্তে পাবিল না। তাহাকে স্বার্থ মনে করিয়া তাহ'র হৃদয় ক্ষীত হইয়া উঠিল। যে-ভাবায় চিঠিখানা লেখা, তাহা যে হৃদয়েব ভাষা নয়, তাহাতে আন্তরিকতা মাত্র নাই, এমনতর সহজ কথাটাও তাহার নজব এড়াইয়া গেল। তাহার অবমানিত পুরুষের চিন্তে যত করুণা যত শক্তি স্তম্ভ হইয়াছিল তাহারা একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল। মনে মনে সে কহিল, “আমি ত ইহার মধ্যে অভায় কোনখানটায় দেখিতে পাই না। কাবণ আমি কোন উদ্দেশ্য লইয়া তাহার কাছে ঘাইতেছি না। আমাব মধ্যে কোন আসক্তি নাই। কিন্তু কেহ যদি আমার কাছে মুক্তির উপায় খোঁজে, সাহায্য চায়, তব তাহা না-দিয়া থাকি কি করিয়া?”

তখন হুপুর বলায় মে-সব সমস্ত বাড়িটা খালি। যে বাহার কলেজ, কোর্ট আফিস গিয়াছে। খালনা হইতে চাদবটা টানিয়া লইয়া যামিনী পাশের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অমলা মুখের হাসি কোন রকমে চাপিয়া, গম্ভীর মুখে

যামিনীর হাত হইতে চাদবটা লইয়া রাখিল। সোরাই হইতে ঠাণ্ডা জল গড়াইয়া রাখিল। গোলাপ জল, সুগন্ধী পান বাহির কবিল। আপনাব হাতে হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, “আমার উপবে যে তোমার এত দয়া তা জানতুম না।” যামিনী কহিল, “থাক, আমার অত সবে প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে ডেকেচ তাই আমি এসেছি। যদি তোমার উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে ত বল। আমি যথাসাধ্য করতে রাজী আছি।”

অবরুদ্ধ হাতবেগে অমলার পক্ষে আপনাকে সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। মনে মনে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে সে মনে মনেই কহিল, “আমি ডেকেছিলাম অমনি এসেছ, এমন জানলে যে আরও আগেই ডাকতুম।”

কিন্তু মুখে বিবরণ সূত্রে কহিল, “উদ্ধার করবে কি ক'রে, একবার যখন এ-পথে আমাকে জোর ক'রে টেনে এনে ফেলা হয়েছে তখন সংসারে সমাজে আর ত আমার স্থান নাই।”

“তা না-ই থাক, কিন্তু তোমাকে স্বাধীন ভাবে সং উপায়ে জীবিকানির্ভারের কোন উপায় হয়ত দেখিয়ে দিতে পারি। কোন নারীমঙ্গল সমিতিতে—” যামিনী থামিল। ক্রকুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কাবণ এ-সব বিষয়ে তাহার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিছুই জানা নাই। ভাসা-ভাসা ভাবে লোকের মুখে শুনিয়াছে, কাগজে পড়িয়াছে মাত্র। অমলা হাত-পাখাটা তুলিয়া লইয়া আবার মুহু মুহু পাখা কবিত্তে করিতে কহিল, “আচ্ছা, সে ধীরে-দুস্থে ভেবে ঠিক করা যাবে। কিন্তু আমার কপালে যা-ই থাক আমার জন্তে যে ভেবে-ভেবে তুমি সারা হবে, সে আমার কিছুতেই সহিবে না। তুমি আমার জন্তে উদ্বিগ্ন হ'তে পাবে না। এখন ক'দিন আমি স্বাধীন। কাল রাত্তিরেব ব্যাপাবের পব ভয়ে সেই দু'টো লোকই আর এখন সহজে এমুখো হচ্ছে না। ইতিমধ্যে কিছু একটা উপায় ভেবে স্থির করছি।”

“তুমি এখন কেমন আছ?” যামিনী এতক্ষণ মুখ নামাইয়া ছিল। এইবারে মুখ তুলিয়া অমলার দিকে চাহিল। কাল রাত্তির দীপালোকে অবসন্ন বিবর্ণ নাবীমুষ্টি অন্তবকম লাগিয়াছিল, আজ দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাহাব অনাবৃত

প্রথমে সাজসজ্জা, মুখের উগ্র প্রসাধন, চৌকটের পানের দ'গ বড় বেশী স্পষ্ট হইয়া নজরে পড়িতে লাগিল। বাহিরে শান্ত নীলাকাশ, কতদূর একটা চিল উড়িয়া চলিতেছে। কপোতের বিশুদ্ধ কলশ্রবণ শুনা যাইতেছে। হঠাৎ যেন ভিতরের একটা ধাক্কা খাইয়া যামিনী ভীতের মত সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিতৃষ্ণ্য তাহার কণ্ঠবোধ হইয়া আসিল। মাতালের নেশা ছুটিলে যেমন কোন অপ্রত্যাশিত কদর্য স্থানে নিজে এক দেখিয়া লজ্জায় তাহাব মাথা কাটা যায়, তেমনি এই জনহীন নিস্তরঙ্গ মধ্যাহ্নে এই ঘরে এই জাতীয় স্ত্রীলোকের মুখ-মুখি বসিয়া তাহাকে চুপি চুপি প্রশ্ন করা, “তুমি কেমন আছ?” যামিনীকে কে যেন চাবুক দিয়া মারিল। সে উঠিয়া চেয়ারবেব উপব হইতে চাদরখানা টানিয়া লইয়া আর কোন কথা না বলিয়া, কোন কথার জবাব শুনিবার জন্ত অপেক্ষা না-কবিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বাস্তব সায়ান্স কলেজ হইতে নিখিল ফিরিয়া আসিতেছিল, যামিনী কোনদিকে না চাহিয়া হনু হনু করিয়া চলিতেছিল। তাহার সহিত ধাক্কা লাগিল। নিখিল অবাক হইয়া চাহিয়া কহিল, “এত ব্যস্ত কেন? হাওরাটা বইছে আজ কোথা দিয়ে?”

যামিনী কোন উত্তর দিল না। দুই মনে একসঙ্গে আসিয়াই বরে চুকিল। মনের অধীরতায় যামিনী বাইবার সময়ে অমল ব চিঠিখানা টেবিলের উপর তেমনি খোলা অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। নিখিল কিরোজা রঙের সেই খামখানার দিকে চাহিয়া সহাস্তে কহিল, “অনেক দিনেব প্রতীক্ষাব পরে আজ বুদ্ধি বোধির চিঠি এসেছে? যদি অভাব দাও তাহলে পড়ে দেখি।” যামিনীকে কথা বলিতে না দেখিয়া সে টেবিলের কাছে অগ্রসব হইয়া চিঠিখানা চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর হইয়া যামিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, “এই চিঠিখানা পেয়েই বুঝি সেই মেয়েটার কাছে দৌড়েছিলে?”

একথারও কোন উত্তর না দিয়া যামিনী নিখিলের হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া মুঠের মধ্যে দল পাকাইয়া জ্ঞানাল দিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, “তোমাব কাছে এখন

কৈফিয়ৎ দিতে পারব না নিখিল। আমার মন ভারি খাবাপ। আমি একটু একলা থাকতে চাই।”

নিখিল তীব্র দৃষ্টিতে একবর তহাব দিকে চাহিয়া ধব ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নিজেব ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল যামিনীকে এই বিগদ্ হইতে কি করিয়া উদ্ধার করা যায়। নির্মলাকে সেই বিবাহের দিনটিতে ছাড়া আর সে কখনও দেখে নাই। কিন্তু আজ তাহার উপর বিবিন্নত রাগ হইতে লাগিল। মন মনে সন্দ্বন্দ করিল, যদি প্রয়োজন হয় তবে নির্মলার সঙ্গে দেখা কবিয়া তাহার সহিত পবিত্র করিয়াও সে কিছু বলি ব। স্নেহের মুহু ভৎসনা করিয়া কহিল, ‘তোমার মত বেকা মেয়ে পৃথিবীতে আর ত ছুটি দেখি না। এত অতুল রূপশ্রেণেব অধীষতী হইয়াও তোমার কোমল কঠোর বসনে এক জনক বঁধিতে পারিলে না।’

মনেব আবেগ, বন্ধুব প্রতি অকৃত্রিম স্নেহেব উদ্বেগ সে আবেগ কত কি-ই না মনে মনে বলিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে লাল বাইকে কবিয়া টেলিগ্রামের পিয়নকে দেখিয়া সশব্দিত হইয়া বারান্দার বহির হইয়া আসিল। পিয়ন হলদে খামখানা বহির কবিয়া কহিল, যামিনীভূষণ রাঘের নামে জরুরি তাব আসিয়াছে। যামিনীর নামে সাইন করিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া দেখিল তাহার পিতার শব্দ অস্বস্ত, তাহাকে অবিলম্বে বাড়িতে বাইবার অনুবোধ।

যাক, নিখিল নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল, এ যা হইল ভালই হইল। তাহার বাবাব অস্বস্ত আত্ম না-হয় দু-দিন পবে সুরিবেই। কিন্তু এই উল্লেখ্য ঠিক এই সময়েই যামিনী যে কিছুদিন অন্ততঃ কলিকাতার বাহিরে গেল ইহাব চেয়ে ভাল আর কিছু হইতে পারিত না। সেই বাজেই সাড়ে নটাটাব এল্লপ্রেস যামিনী বড়ি গেল। নিখিল তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া কহিল, “তাড়াতাড়ি কববাব কোন দবকাব নেই। তোমার পরীক্ষার এখন ত প্রায় দু-মাস দেরি। তাহাড়া লেকচার-টেকচার সবই তোমার এটেণ্ড কবা বয়ছে, পড়াশোনাও প্রায় সব তৈরি। দিন-পনের আগে এলেই যথেষ্ট। তোমার বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হ'ল তবে এস।”

যামিনী তখন নিঃশব্দে ট্রেনের জানালার মুখ বার



করিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া, বাবার কি আর কখন লেখা হইবে না? নিয়তির অলজ্জা অমুখের কথাও চিন্তা করে নাই, গড়াশানার আদেশে সে লিপি কি চিরদিনই অলিখিত হইয়া থাকিবে? কথাও ভাবে নাই। ভাবিতছিল আজই দুপুরবেলায় স্বাধানে আসিয়া পড়িবে একটার পর আব একটা বাখ।

ক্রমশঃ

রোমের সাগরতীরে

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, এম-এ

মুসোলিনী ইটালীতে বাস করিয়া সুখ আছে। প্রকৃতি ইটালীকে শ্রী দিয়াছে। মুসোলিনী এদেশে বাস আরামপ্রদ করিয়াছেন।

মুসোলিনী স্বজাতির চরিত্র জানেন। কি করিয়া রাজ্য শাসন কবিত্তে হয় সে-কলাও তিনি ভাল করিয়াই জানেন। তিনি জানেন ইটালীয়ানদের জাতীয় চরিত্র তীব্র দাহিকাপ্রবণ উপাদানে গঠিত; ইটালীয়ানদের ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবন প্রবল ঈর্ষাতে ভরা। এদেশের লোকের ভিতর প্রাদেশিকতা অত্যন্ত প্রবল। ইটালীর ঐক্য স্থাপনের পূর্বকাল পর্যন্ত এদেশের ইতিহাসে এই প্রাদেশিকতার অনুভূতি ও প্রাদেশিকতার দোমাক সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হইয়াছে। এখন এই প্রাদেশিকতা অনেকটা সংযত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে নির্মূল হয় নাই। ম্যাট্রিসিনি গারিবন্ডী ও কাভুরের নেতৃত্বে ইটালীর যে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র। জাতির নৈতিক একতা সাধনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। যদি এই নৈতিক একতা সাধনের কাজে শৈথিল্য দেখা দেয় তাহা হইলে ইটালীয়ানদের ভিতর আবার ব্যক্তিগত দলাদলি ও রাজনৈতিক কলহ-বিবাদ কিরিয়া আসিবে।

মুসোলিনী এ সমস্ত জানেন। জানেন বসিয়াই তিনি কড়া ভাবে রাজ্য শাসন করেন ও কড়া শাসনের প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু তিনি এও জানেন, শাসিতের আরামের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন শাসনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। লোকের নিকট হইতে ট্যাক্স

আদায় করিতে হইবে? লোকে যদি ট্যাক্স দিয়া তার পরবর্ত্তে আরাম পায়, তাহা হইলে ট্যাক্স দিতে আপত্তি করিবেন। আমি যদি লোকের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখি তাহা হইলে লোকেও আমাব আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবে।

ইহাই মুসোলিনীর রাজ্য শাসন করিবার গৃহ বহুস্ত, তাঁর সাক্ষ্যের কারণ। তিনি লোকের মন্ত কি কবিরাজ্যে তাহারা সর্বদা স্বচক্ষে তাহা দেখে আর সুপ করিয়া থাকে। আনন্দের সুযোগ সকল শ্রেণীর লোকের জন্যে। পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু উৎসব লোপ পাইতেছিল, সেগুলির পুনরায় প্রচলন করা হইতেছে। মিনেমা ও থিয়েটারে টিকিটের দাম কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকের ভ্রমণের সুবিধার জন্য রেলের ভাড় সস্তা কবির দেওয়া হইয়াছে। একাধিপত্যের ফল যদি এরূপ সুন্দর হয় তাহা হইলে লোকে যে একাধিপত্য সহ্য করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

আমি হুন্দর বলিয়াছি। এই গরমের দিনে প্রতি রবিবার নামমাত্র ভাড়া পাহাড়ে কিংবা সাগরতীরে বেড়াইয়া আসিতে পারা কি হুন্দর নয়? মুসোলিনী জন-সাধারণের জন্য কতকগুলি বিশেষ ট্রেনের চলন করিয়াছেন। প্রতি রবিবার হাজার হাজার যাত্রী বোঝাই হইয়া এই ট্রেনগুলি পাহাড়ে কিংবা সাগরের ধারে কিংবা পল্লীতে যায় ও শহরের কলুষিত হাওয়ায় আবদ্ধ বাসিন্দাকে কয়েক ঘণ্টা প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটাইবার সুযোগ দেয়। ভাড়া অতি সামান্য। একটা উদাহরণ দিই, নেপলস্ রোম হইতে



প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। সাধারণ ট্রেনে শুধু যাইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪৮ লিরা। কিন্তু রবিবারের এই বিশেষ ট্রেনে রোম হইতে নেপলস্ যাতায়াতের ভাড়া মাত্র ১৮ লিরা। সকালবেলা উঠিয়া এইরূপে একটি বিশেষ ট্রেন ধরুন, যেস্থান আপনার পছন্দ হয় সেইখানেই বান (পূর্ক হইতেই খবরের কাগজে ট্রেন ছাড়িবার সময় ভাড়া ও স্থানের নাম ছাপাইয়া দেওয়া হয়), সারাদিন আনন্দে কাটাইয়া রাত্রে ১১টা ১২টার মধ্যে ফিরিয়া আসুন। এজন্য আপনার পকেট বেশী হাঙ্কা হব না, অথচ আপনি তৃপ্ত মনে ফিরিয়া আসেন।

মুসোলিনী রোমানদিগকে যে-সকল সুন্দর জিনিষ উপহার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকলের চেয়ে সেরা ও সুন্দর উপহার হইতেছে বোমের লি.দা বা সমুদ্রতীর। রোম সমুদ্রতীর হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে। কিন্তু এত দিন রোমের সমুদ্রতীর বলিয়া কোন কিছু ছিল না। মাত্র কয়েক বৎসর আগে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন এই সমুদ্রতীর বোমানদিগের পক্ষে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা কাটাইবার প্রিয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে। বোম হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক বেলওয়ায়ে আছে। ট্রেনে আধ ঘণ্টার পথ। ট্রেন প্রতি দশ মিনিট অন্তর ছাড়ে। মোটরে বাওয়ার জন্য একটি বিশেষ মোটর বোডও আছে। রাত্রে অসংখ্য দীপমালায় যখন এই পথ আলোকিত হয়, তখন মনে হয় স্বর্গের পথ ধরিয়া চলিয়াছি। স্নান কবিবার জন্য চমৎকাব বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছা হয় আপনি স্নান করিতে পারেন কিংবা কক্ষেতে বসিয়া বাজনা শুনিতে পারেন ও সমুদ্রেব হাওয়া সেবন করিতে করিতে তরঙ্গের খেলা ও স্নানার্থীদের দৃশ্য দেখিতে পারেন।

জনসাধারণের কাছে রোমের এই সমুদ্রতীর অস্তিত্ব নামে পরিচিত। প্রকৃত অস্তিত্ব এখন হইতে খানিকটা দূরে। প্রাচীন রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষে ভরা। সেই হৃদয় অতীতে অস্তিত্ব ছিল রোমের বাণিজ্য ও ভৌজ বন্দব। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সমুদ্র দূবে সরিয়া যায়। এই অপসরণের ফলে যে ভূখণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে তাহারই উপর নূতন অস্তিত্ব নির্মিত।

সেদিন ছিল রবিবার। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী ক্রমাগত

মানসিক পরিশ্রমের ফলে মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছিল। কি কবি ভাবিয়া না পাইয়া কোটটা গায় দিয়া রাস্তায় বাহিব হইয়া পড়িলাম। রাস্তা তখন জনবিবল। কদাচিৎ কোন পুরুষ কিংবা নারী যাইতেছিল। তখনও বাহিরে যাইবার সময় হয় নাই। উদ্বেগহীনভাবে কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মাথায় আসিল সমুদ্র-তীরে গেলে মন্দ হয় না। তৎক্ষণাৎ ট্রামে চাপিয়া বসিলাম ও আধ ঘণ্টার মধ্যে সেন্ট পলস্ গোট স্টেশনে পৌঁছিলাম। এই স্টেশন হইতে অস্তিত্বের ট্রেন ছাড়ে।

সেন্ট পলের গির্জার কাছে বলিয়া স্টেশনের নাম সেন্ট পলস্ গোট। এই গির্জাটি রোমের একটি অপরূপ সুন্দর অট্টালিকা। সেন্ট পিটারের গির্জাব খ্যাতি বেশী, কিন্তু এই গির্জার গঠন-শ্রী অধিক চিত্ততোষিত্বী। সেন্ট পিটারের গির্জা বৃহদায়তন ও জাঁকজমকে ভরা; এই আয়তন ও জাঁকজমক মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহা স্থপতি ধর্ম্মের উপর প্যাগান প্রভাবের পবিচায়ক। বেনাসাঁসেব যুগে প্যাগানিজমের যে বীজ ইটালীর উর্বর ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল এই গির্জা তারই একটি ফল। কিন্তু সেন্ট পলের গির্জার অনাড়ম্বর ও শাস্ত সৌন্দর্য্যে আধ্যাত্মিকতা অধিক পবিত্র, কাজেই মনেব উপর ইহাব প্রভাবও সূক্ষ্মতর।

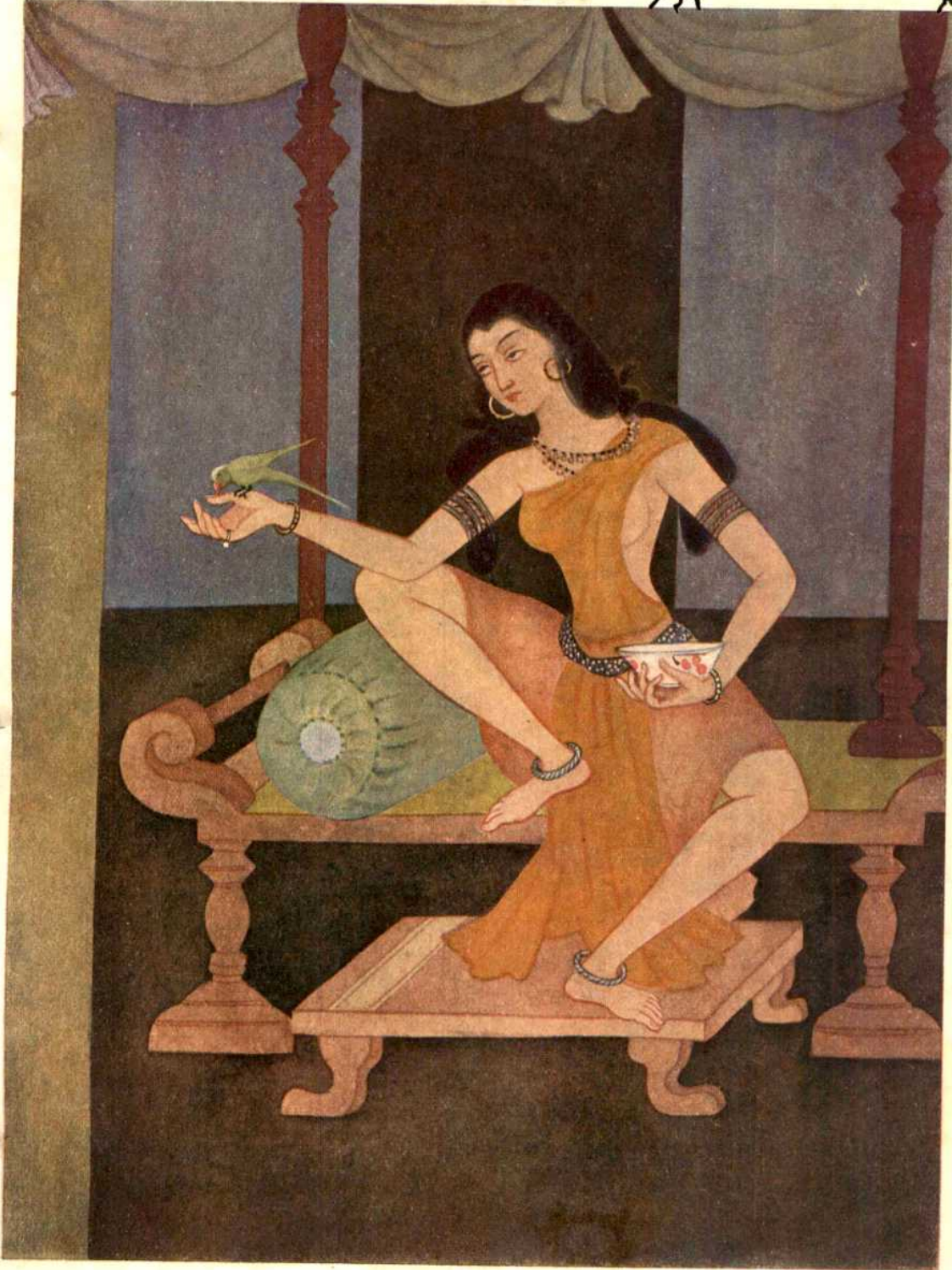
স্টেশনেব পাশেই ইংরেজদের সমাধিভূমি। এখানে দুই জন অমর ইংবেজের কবর রহিয়াছে—শেলি ও কীটসের। তাহাদের যশ ও তাঁহাদের কবরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ! ঘাস-চাকা দুইটি অতি সাধারণ কবর। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আগন্তকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কিছুই নাই। শুধু কবরের উপরকাব শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারি কত বড় দুই জন লোকের মৃতদেহ এখানে নিহিত রহিয়াছে। শেলির কবরের শিলালিপিতে লেখা আছে :—

Nothing of him doth fade
But doth suffer a sea-change,
Into something rich and strange.

কীটসের কবরের শিলালিপি এইরূপ :—

This grave contains all that was mortal of a young English poet, who on his death-bed, in the bitterness of his heart, at the malicious power of his enemies, desired these words to be engraved on his tomb-stone : Here lies one whose name was written in water.

আমি যখন স্টেশনে পৌঁছিলাম তখন একটা ট্রেন প্রায়



প্রিয়
কুমারী নিবেদিতা ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

15

34

ছাড়ে ছাড়ে। ছুটিয়া গিয়া একটা কামরায় ঢুকিলাম। কিন্তু বসিবার পূর্বেই ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। কামরাটা লোকে ভরা—সকল বয়সের লোক, ছেলে, মেয়ে, পুরুষ, নারী—প্রায় সকলেরই সেইরূপ সুন্দর মুখের গঠন যা আমরা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের প্রস্তর-মূর্তিতে দেখিতে পাই। এ-দেশের শিল্পে কেন যে দেহবাদ এত বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা এখানে বাস না করিলে বুঝা যায় না। ইটালীয়ান শিল্পীদের দেহ-প্রীতি বৃষ্টিতে হইলে ইটালীয়ান নরনারীর সৌন্দর্য্য পান করা দরকার। মাদোনারা এখানে আপনার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। মন সংস্কারবর্জিত ও খোলা রাখুন, আর এই সকল চলন্ত মাদোনাদের সৌন্দর্য্যের প্রভাব মনের ভিতর চুপি চুপি প্রবেশ করিতে দিন, তারপর

গ্যালারীগুলি দেখিতে যান। তখন আপনি পেরুজিনো ও ব্যাফায়েলের বিষয়প্রদ মূর্তিগুলি আরও দরদের সহিত বৃষ্টিতে পারিবেন, যে-প্রেরণা ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি দোনাতেল্লো, বত্তিচেল্লি, তিশিয়ান ও অন্যান্য অসংখ্য শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহা আপনার কাছে স্পষ্টতররূপে পরিষ্কৃত হইবে। ইটালীয়ান শিল্পের প্রাণ জুইট জিনিষে—ক্যাথলিক চার্চের আধ্যাত্মিকতায় আর ইটালীয়ানদের—বিশেষ করিয়া ইটালীয়ান নারীর—মদালস সৌন্দর্য্যে।

আমি সবেমাত্র একটু জায়গা খুঁন্দিয়া বসিয়াছি এমন সময় আমার নিকটবর্তী একটা বেঞ্চ হইতে কে এক জন ডাকিয়া বলিল—ভারতীয়? যে-দিক হইতে ডাক আসিল সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম আর এক জন ভারতীয় সেখানে বসিয়া। মধ্যবয়সী অল্প দাড়িওয়ালা লম্বা চেহারা, বেশ ষ্টুপুট, মুখ দেখিয়া বুঝা যায় জীবনযাত্রা বেশ সুখেই সম্পন্ন করিতেছেন। ইনি আমাদের গভর্ণমেন্টের এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আট মাসের ছুটি লইয়া ইউরোপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ক'ইরোতে ছিলেন, বাগদাদ, জেরুজালেম, ইস্তাম্বুল ও এথেন্স হইয়া আসিয়াছেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। কি কথোপকথন হইল তাহা এখানে আগাগোড়া তুলিয়া দেওয়া নিম্নয়োজন। নানাবিধ বিষয়েই আলাপ করিতে লাগিলাম—ইনি যে-সব দেশ



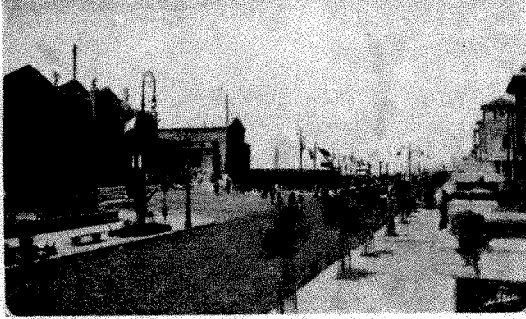
অস্তিয়ায় সমুদ্র-স্নানের দৃশ্য

দেখিয়াছেন সেখানকার অধিবাসী ও তাহাদের রীতিনীতি, সেখানকার জলবায়ু, সেখানকার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ইত্যাদি। ভদ্রলোক তাঁহার হাতবাগ খুলিলেন ও তাহার ভিতর হইতে আর একটা ছোট থলে বাহির করিয়া বলিলেন, “আপনি ত অনেক কাল পান-মুপারি কিছুই খান নি, নিন একটু।” এই বলিয়া তিনি আমাকে কিছু মুপারি দিলেন।

ট্রেন চলিতে লাগিল। কামরার ভিতর জনতার বাতালতা। বাহিরে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত শস্ত্রভরা ক্ষেত। এখানে-সেখানে ছ-একটা কৃষকের কুটীর। এখানে-সেখানে ছ-একটা গরু চরিতেছে। মাঝে মাঝে শস্তগন্ধ বহন করিয়া হঠাৎ বিকালবেলার হাওয়ার প্রবাহ কামরার ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

পথ ফুরাইয়াছে। আমরা অস্তিয়াতে পৌঁছিয়াছি। নবপরিচিতকে সঙ্গে করিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। সম্মুখে আনন্দ স্ফূর্তি হাসি কোলাহল ও জনতায় ভরা নূতন শহর; সুন্দর ঘরবাড়ি, সুন্দর রাস্তাবাট। দশ বৎসর আগে এখানে এই শহরের চিহ্নও

ছিল না। তখন যে-কেহ সমুদ্র স্নান করিবার জন্ত ইচ্ছা-
মত ময়দানে নির্বস্ত্র হইলে কেহ দেখিবার বা কিছু বলিবার
ছিল না। এখন সেই বসতিবিহীন ভূভাগ লোকালয়ে,
হোটেলে ও কফিখানায় ভর্তি, তাঁর ধরিয়া স্নানের জন্ত



সমুদ্রতীরবর্তী রাজপথ—অস্তিত্ব।

শত শত ক্যাবিন ও তাঁবু; বালুকার উপর সকল বয়সের
শত শত লোক সূর্যালোকে শায়িত, শত শত লোক
সমুদ্র-তরঙ্গের সহিত স্বাস্থ্যপ্রদ লড়াইয়ে মত্ত।

এ সমস্তই মুসোলিনী'র কাজ। তিনি যে বৎসর দেশের
শাসন-বজ্রা হাতে নেন, সেই বৎসরই তাঁর মনে রোমান-
দিগকে তাহাদের সমুদ্রতীরে কিরাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প জাগে
ও কালক্ষেপ না করিয়া রোম হইতে অস্তিয়া পর্যন্ত রেলপথ-
নির্মাণের আদেশ দেন, পর বৎসর ১৯২৪ সালের ১০ই
আগষ্ট এই রেলপথ খোলা হয়।

ইতিপূর্বে ১৯১৮ সালে জোসেফ এলমি নামে রোমের
এক বিনয়ী ও সাহসী বাসিন্দা অস্তিয়ার “রোম” নামে
স্নানের ঘাট নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২০ সালে
“বাস্তিস্তিনা” নামে ঘাট তৈয়ার হয়। ১৯২২ সালে তৈয়ার
হয় “প্রিলিপে” নামীয় ঘাট।

১৯২৪ সালের ১০ই আগষ্ট সকালবেলা রোম-অস্তিয়া
রেলপথ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সেণ্ট পলস্ স্টেশন নিশানে নিশানে
সাজানো হয়। বেলা ১০টার সময় মুসোলিনী সদলবলে
স্টেশনে হাজির হন ও সর্বপ্রথম গাড়ীতে আরোহণ করেন।
এই প্রথম ট্রেনে সর্বসম্মত পাঁচখানা গাড়ী ছিল। তাঁর
অমুচরেরা বাকী গাড়ীগুলি দখল করিয়া বসেন।

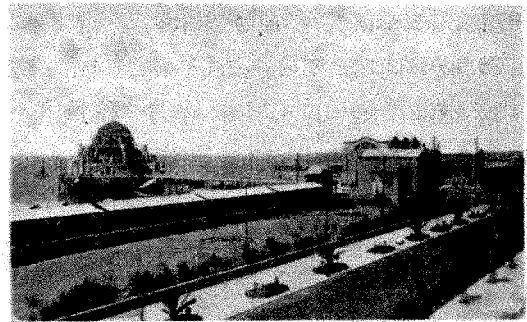
গাড়ী যখন প্রাচীন অস্তিয়াতে পৌঁছে তখন মুসোলিনী

ট্রেন হইতে নামিয়া সমবেত জনতার সম্মুখে এক বক্তৃতা
দেন ও জনতার নিকট হইতে তাহাদের কৃতজ্ঞতার অর্থ গ্রহণ
করেন। বক্তৃতাশেষে ট্রেন আবার চলিতে আরম্ভ করে ও
বেলা সাড়ে দশটার সময় লিদো স্টেশনে পৌঁছে। এখানে
পূর্বে হইতেই রোম হইতে আগত বহুলোক অস্থির ভাবে
মুসোলিনী'র আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসোলিনী
ট্রেন হইতে নামা মাত্র তাঁর উপর রীতিমত পুষ্প বর্ষণ
হইতে থাকে।

তারপর তিনি নূতন অস্তিয়ার মিউনিসিপালিটির ও
স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন।

সেইদিন হইতে অস্তিয়ার কি দ্রুত উন্নতিই না হইয়াছে!
স্নানের ঘাটগুলি ও লোকালয় ছাড়া এখন আরও
অনেকগুলি সুরমা সৌধ ও পার্ক এই শহরের শোভা
বাড়াইয়াছে। অনেকগুলি গৃহ ফিউচারিস্টিক খিওরী
অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে—সাদাসিধা সরলরেখায় তৈয়ারী।
বাহিরে ও ভিতরে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর।

ফিউচারিস্ট আর্টের মূলকথা আর্টের ভিতর হইতে
বক্ররেখার কাজ যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া। আঁকান-
বাকান, হেলান-তুলান কিছুই থাকিবে না; সমস্তই হইবে



সমুদ্রতীর—অস্তিয়া

সরলরেখার সৌন্দর্য্য। এই আর্ট যে শুধু গৃহ-নির্মাণ
আর চিত্রাঙ্কণেই আবদ্ধ তা নয়। ইটালীতে ঘরের
আসবাবপত্রও আজকাল এই আদর্শ অনুসারে তৈয়ার
হইতেছে। যে-ঘর এই ফিউচারিস্টিক আসবাবে সাজান,
সে ঘরের ভাড়াও বেশী।

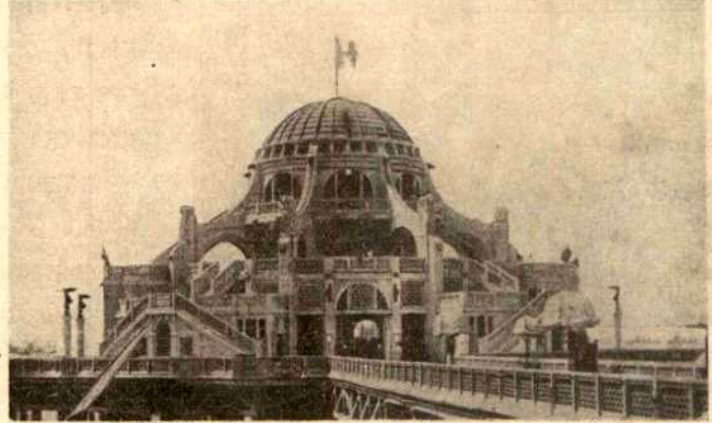
শহরের ভিতর দিয়া পায়চারি করিতে করিতে ভদ্র-

লোককে আমি এই সব কথা বলিতে লাগিলাম। তার পর স্নানের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে; স্নান করিবার সময় আর নাই, বিশেষতঃ আমরা স্নানের জামাও সঙ্গে আনি নাই। তাই সমুদ্রের উপরে স্থিত প্রকাণ্ড রেস্টোরাঁতে গিয়া বসিলাম। দুই গ্লাস ‘ভিনো’র অর্ডার দিলাম ও সমুদ্র-বায়ু বীজিত হইয়া স্নানের দৃশ্য ও চেউয়ের খেলা দেখিতে লাগিলাম। ভারতীয় হইয়া ভিনোর অর্ডার দিলাম বলিয়া দোষ দিবেন না। ভিনো মদ্য নয়। কবি ফাছুচি বলিয়াছেন ভিনো আঙ্গুরের রক্ত। তাছাড়া মনে রাখিবেন ইটালী ব্যাকাস-দেবতার দেশ; মনে রাখিবেন প্রাচীন রোমের নীতিবাগীশ কেটো নিজের বৃকে তরবারি চালনা করিবার পূর্বে চাকরকে ভিনোর জন্ত ছকুম করিয়াছিলেন।

রেস্টোরাঁ লোকে ভরা। শুধু আমরা দুই জন কালো আদমী। কাজেই ক্ষণেকের জন্ত সকলেরই দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িল। এক জন যুবক ও যুবতী আমাদের পাশের টেবিলে বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন—“ইজিপশিয়ান”। আমি তাহাদের ভুল সংশোধন করিবার জন্ত বলিলাম—“না, ভারতীয়”। তাঁরা ইহাতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, কারণ তাঁরা যে ভুল করিয়াছেন ও আমি যে তাহা সংশোধন করিয়া দিব, একথা তাঁহারা ভাবেন নাই। ব’হা হউক ইহা’র ফলে তাঁহারা নিজেদের টেবিল আরও নিকটে আনিয়া আমাদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও গান্ধী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। গান্ধীজীর নাম এখানে প্রায় সকলেই জানে। মহিল টি রবি ঠাকুরের কয়েকখানা বই পড়িয়াছেন। তিনি তাঁর কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। রবিবাবু যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন মহিল টি নাকি তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ রবিবাবুর চোখের গভীর দৃষ্টি নাকি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এখন পর্যন্ত তিনি সেই চোখের দৃষ্টি ভুলিতে পারেন নাই। আমাদের

দেশের দুই জন মনীষীর প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম। তবে এই শ্রদ্ধা কতদূর আন্তরিক বলিতে পারি না!

হঠাৎ রেস্টোরাঁতে চঞ্চলতা দেখা দিল। এক জন যুবো



সমুদ্রতীরস্থ প্রমোদনোথ—অস্তিয়া

ভারি চটপটে মহিলা ভিতরে ঢুকিলেন। সকলেই ইহাতে একটু উদ্গীৰ্ব ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আমরা একটু বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম এই মহিলাটি কে। ইটালিয়ান ভদ্রলোক বলিলেন—ইনি আমেরিকার ছায়াচিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী—গ্রীয়ে চিন্তাবিনোদনের জন্ত রোমে আসিয়াছেন। একটু যত্নসহকারে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। সিনেমাতে বহুবার এই সুন্দর মুখ দেখিয়াছি বটে। প্রজ্ঞাপতির মত হাস্য এর কাণিক আন্দোলন সকল সিনেমা-দর্শকের কাছেই পরিচিত।

আমাদের পক্ষে এই ছায়াচিত্রের অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয় করার আকাঙ্ক্ষা বামনের চাঁদ ধরিবার আকাঙ্ক্ষারই মত। কাজেই সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমরা ভিনোর শেষ বিদ্যু পান করিয়া রেস্টোরাঁ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

শহরের দক্ষিণে একটি পাইন-বন আছে। এই পাইন-বন “কাস্তেল ফুজানো” নামে সুন্দর পার্ক। এই পার্কে পূর্বে কোন সম্ভ্রান্ত রোমান পরিবারের বাগানবাড়ি ছিল। এখন ইহা সরকারী সম্পত্তি। সরকার হইতে ইহা’র দরজা সাধারণের কাছে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই পাইন-বনের দিকে চলিলাম।

সমুদ্রতীর এখন প্রায় জনশূন্য। অধিকাংশ সানার্থীই চলিয়া গিয়াছে অথবা কফিখানায় আশ্রয় লইয়াছে। পাইন-বনের ধারে সমুদ্রতীর আরও নির্জন।

আমরা একটা বেঞ্চেতে বসিলাম। আমাদের পিছনে



সমুদ্রতীরবর্তী রাজপথ—অস্তিয়া

পাইন-বনে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে ও বাতাস পাইনের ডালে ডালে শিশু দিয়া বাইতেছে। সম্মুখে সমুদ্রের অনন্ত প্রসার ও পৃথিবীর কানে কানে তার তরঙ্গের কলগীতি। মাথার উপরে বৃষ্টিফুলের মত একটি একটি করিয়া তার। ফুটিয়া উঠিতেছে।

“Era l'ora che volge 'I disio
A' naviganti, e 'ntenerisce il core,
Lo di' ch' han detts a' dolei amici addis :
E che lo nuovo peregrin d' amore
punge, se ode squilla di lontano
Che paia il giorno pianger che si muore.”

—এ সেই সময় যখন হৃদয় কোমলতায় ভরিয়া উঠে; যখন প্রিয় বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নাবিকেরা স্বদেশের কথা মনে করে। এ সেই সময় যখন গির্জার ঘণ্টাধ্বনি মরণোন্মুখ দিব্যর রোমন্থনের মত মনে হয় ও সে ধ্বনি শুনিয়া নব পথিকের মন প্রীতিরসে ভরিয়া উঠে।

দাঙের এই লাইন কয়টি মনে পড়িল। শাস্ত্র বিবাদে মন ভরিয়া উঠিল। গোপুলির অন্ধকারে প্রিয়জনমধুর হৃদয় স্বদেশের ছবি তার নদী গিরি বনের সকল সুসমা লইয়া

চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। হুকোমল চিন্তা, হুকুমার অনুভূতি ও হুমধুর স্মৃতি আমার মনে স্থান পাইবার জন্য ছোলাঠেলি করিতে লাগিল। ক্রমে শতাব্দীর সিঁড়ি ভাঙিয়া আমি হৃদয় অতীতে ফিরিয়া গেলাম,—সেই হৃদয় অতীতে, কণিক ও আগষ্টাসের দিনে, যখন রোমানদিগের নৌকা ভারতীয় বন্দরে আনাগোনা করিত ও মুক্তা, হুম্বুলা পাথর ও সুগন্ধি মশলায় বোঝাই হইয়া আবার রোমের বন্দরে ফিরিয়া আসিত, যখন ভারতবর্ষ রোমের রাজদরবারে দূত পাঠাইত, আমি সেই যুগে ফিরিয়া গেলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম দুই হাজার কিংবা ততোধিক বৎসর কাল পূর্বে হয়ত কোন ভারতীয় সন্তান গোপুলির মনোহর মুহূর্তে অধ-অন্ধকারে রোমের সমুদ্রতীরে বসিয়া আমারই মত স্বদেশের স্বপ্ন দেখিত ও মধুর স্মৃতিতে তার মন বেদনায় বিধুর হইয়া উঠিত।*

কতকক্ষণ আমি এই চিন্তায় ডুবিয়াছিলাম জানি না। ভদ্রলোক আমাকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, চলুন যাওয়া যাক। আমি স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখন সাড়ে নয়টা।

ভদ্রলোককে তাঁর হোটেলে রাখিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। গৃহকর্ত্তী ছুরার খুলিয়া মুহূর্ত্ত সনা করিয়া বলিলেন—signore e tardi, il cibo e freddo” (আপনার দেরি হয়েছে, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে)।

আমার কোন কৈফিয়ৎ ছিল না, কাজেই বিনা প্রতিবাদে ঠাণ্ডা খাবারই গলাধঃকরণ করিলাম।

* রোম ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা—লাটিন-লেখক প্লাভিয়াস, অরেলিয়াস ও কাসিয়াস লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ কর্তৃক প্রেরিত বহু রাজদূতের কথাও তাঁহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়

শবরী

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

মাকুইসের গৃহে সেদিন উৎসব। শিকারের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তাই এই উৎসব। সান্দ্যভোজ শেষ হইয়া গিয়াছে, টেবিলের উপর এখন শুধু ফুল আর নানাজাতীয় ফল সাজান। টেবিলের চারি ধার বিরিয়া অনেকগুলি মানুষ বসিয়া গল্পগুচ্ছ করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভিতর এগার জন প্রসিদ্ধ শিকারী, এক জন ঐ স্থানের ডাক্তার এবং বাকি আট জন মহিলা। মহিলাদের মধ্যে সকলেই তরুণী।

গল্পটা হইতেছিল প্রেমের বিষয়। দেখিতে দেখিতে তর্ক বাধিয়া গেল, যে, যথার্থ প্রেম জীবনে একবারই মাত্র অনুভব করা সম্ভব, না একাধিক বাব। জীবনে একবার মাত্র যথার্থ ভালবাসিয়াছেন, এমন অনেক লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, আবার এমন অনেকের কাহিনীও শুনা গেল যাহারা বহুবার ভালবাসিয়াছেন, অথচ সকলবারেই সমান প্রগাঢ়ভাবে।

পুরুষ অতিথিরা সকলেই প্রায় একমত দেখা গেল। তাঁহারা বলিলেন, ভালবাসা রোগের মত, উহা এক ব্যক্তিকেই বহুবার আক্রমণ করিতে পারে। প্রেমের পথে বাধা ঘটিলে উহাতে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়।

মহিলাদের কিন্তু মত দেখা গেল অল্প প্রকার। তাঁহাদের মত অবশ্য বেশীর ভাগ কাব্য পাঠ করিয়া গঠিত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাহাতে খুব বেশী ছিল না। তাঁহারা বলিলেন, যথার্থ প্রেম মাত্র জীবনে একবার অনুভব করা যায়। উহা ঠিক বজ্রপাতের মত ব্যাপার, মানুষের জীবনে একবার উহা আসিয়া পড়িলে জীবনকে একেবারে দগ্ধ ও শূন্য করিয়া দিয়া যায়, উহার ভিতর আর ভালবাসার স্থান মাত্রও প্রবেশ করিতে পারে না।

মাকুইস মহোদয় নিজে বহুবার প্রেমে পড়িয়াছেন, সুতরাং তিনি মহিলাদের মতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ভাবে তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন, মানুষ অনেকবার ভালবাসিতে পারে

এক সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই পাবে। আপনারা অনেক ব্যক্তির কাহিনী বলিলেন যাহারা হতাশ প্রণয়ে কাতর হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আমি শুধু এই বলিতে পারি, নৈ, তাঁহারা ঐ ভুলটি না করিলে, ঐ প্রেমবাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিতেন, এবং আবার বহুবার প্রেমে পড়িতেন। প্রেমিকের সঙ্গে মাতালের বিশেষ একটা সাদৃশ্য আছে। একবার মদ খাওয়া ধরিলে যেমন বাব-বাব না খাইবা থাকিতে পারা যায় না, তেমনি একবার প্রেমে পড়া সুরু করিলে, বার-বার প্রেমে পড়া অনিবার্য।”

সকলে মিলিয়া তখন বৃদ্ধ ডাক্তারকে সালিশ মানিয়া তাঁহাব মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার পূর্বে পাবিসে ব্যবসায় চালাইতেন, এখন শহর ছাড়িয়া মাকুইসের জমিদারীতে বাস করিতেছেন। তিনি বলিলেন, “এ বিষয়ে আমার যে কোনো একটা পাকা মত আছে তা নয়। তবে আমি একটি প্রেমের ইতিহাস জানি, যাহা পঞ্চাশ বৎসর সমানভাবে টিকিয়াছিল, এক দিনের ক্ষণও যাহার ভিতর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।”

মাকুইসের পত্নী আনন্দে করতালি দিয়া উঠিয়া বলিলেন, “কি সুন্দর! এই ভাবে ভালবাসা পাওয়া সুখস্বপ্নের মত মনোহর। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এইরূপ ভালবাসা যে-পুরুষ পাইয়াছে, সে বাস্তবিকই সুখী, জীবনে সে-ই যথার্থ আনন্দ পাইয়াছে।”

ডাক্তার হাস্ত করিয়া বলিলেন, “অপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি এই ভালবাসা লাভ করিয়াছিল, সে পুরুষই বটে। সে পুরুষটির নাম কবিলেই আপনারা তাহাকে চিনিতে পারিবেন। সে খ্রীষ্টীয় শতকে, এই স্থানের ঐযথ-বিক্রেতা। খ্রীলোকটিকেও চিনিতে পারিবেন। প্রতি বৎসর চেয়ারের মেলামত করিতে যে খ্রীলোকটি আপনার বাড়ি আসিত, আমি তাহাবই কথা বলিতেছি।

মহিলাদেব উৎসাহ এক নিমেষেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহাদের সকলের মুখেই দারুণ একটা অবজ্ঞার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, যেন ধনী এবং বনিয়াদী ঘরের মানুষ ভিন্ন আর কাহাবও ভালবাসা, ভালবাসা নামেরই যোগ্য নহে।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, “তিন মাস আগে আমাকে এই নারীটির মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া বাওয়া হয়। সে ইহাব পূর্বদিনে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার একখানা বোড়ার গাড়ী ছিল, উহাই সে গৃহস্থপও ব্যবহার করিত; বোড়াটা বৃদ্ধ ও শীর্ণ, আপনাবা সকলেই উহাকে দেখিয়াছেন। তাহার দুইটি কালো রঙের বড় বড় কুকুৰ ছিল, তাহাবাই ঐ স্ত্রী-লোকটির বন্ধু ও রক্ষকের কাজ করিত। আমি ভিন্ন, গ্রামের পুরোহিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রীলোকটি আমাদের দুই জনকে তাহার উইলের একজিক্যুটার নিযুক্ত করিল। তাহার অস্তিত্ব ইচ্ছাশুলিব মৰ্ম্ম বাহাতে আমরা ভালভাবে বুঝিতে পারি, এইজন্য সে আমাদের তাহার জীবনের ইতিহাস বলিয়া গেল। এই কাহিনীটির মত অদ্ভুত ও করুণ কাহিনী আমি আব-শুনি নাই। তাহার পিতামাতা উভয়েই চোর-মেরামতের কাজ করিত, গাড়ী-ভিন্ন, মাটির উপর নির্মিত গৃহে সে কোনো দিন বাস করে নাই। শিশুকালটা ছেঁড়া জ্বাকড়া পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়াই তাহার দিন কাটিয়া গিয়াছে।

তাছাড়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং সৰ্কদাই গ্রামের বাহিরে আসিয়া আস্তানা গাড়িত। মাঠের বেড়ার ধারে গাড়ী থামাইয়া তাহারা বেড়াটিকে খুলিয়া দিত। বেড়াটা মাঠে বাস খাইত, কুকুরগুলি গাড়ীর সামনে, থাবার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইত, এবং শিশুটি ঘাসের উপর খেলা করিত। উহর পিতামাতা গাছতলায় বসিয়া গ্রামের যত ভাঙা চোরের মেরামত করিত। এই ভায়ানান পবিব্রটিতে কথাবার্তা কহার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। কে গ্রামের পথে, “চোরের মেবামত করি গে,” বলিয়া হাঁকিয়া যাইবে, ইহা স্থির করার পরই তাহারা নীরবে বেত বুনিত আরম্ভ করিত। শিশুটি যদি খেলা করিতে করিতে বেশী দূর চলিয়া যাইত, অথবা গ্রামেব কোনো ছোকরার সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইল

উহাব বাবা রুটভাবে চীৎকার করিয়া উঠিত, “এদিকে আর বলছি লক্ষ্মীছাড়ী।”

ইহা ভিন্ন আর কোনো আদবের ডাক সে কখনও কানে শোনে নাই। যখন সে কিছু বড় হইল, তখন ভাঙা চোরের সংগ্রহ কবার জন্য তাহাব বাবা ও মা তাহাকে মাঝে মাঝে গ্রামের ভিতরে পাঠাইতে আবন্ত করিল। এখন সে এক-আধ জন গ্রাম্য বালকের সঙ্গে ভাব কবিতো আবন্ত করিল, কিন্তু বালকগুলির পিতামাতা এই সখ্যের চেষ্টা দেখিলেই চটিয়া আস্তন হইয়া যাইতেন। ছেলেদের ফিরিয়া আসিবার ক্ষণ ক্ষণেই ডাক দিয়া বলিতেন, “লক্ষ্মীছাড়ী চলে এস লক্ষ্মীছাড়ী ছেলে! যত বাজ্যেব ভিথিরীর বাজার সঙ্গে ভাব করতে হবে না।”

কখনও কখনও গ্রামেব বালকেরা এই ছেঁড়া কাপড়-পরা বালিকাকে চিল ছুড়িয়া মারিত। গ্রামের গৃহিণীরা কখনও কখনও দয়া করিয়া বালিকাকে দুই-চারিটি পয়সা দিতেন। সে-সেগুলি সবস্বত্নে জমা করিয়া রাখিত।

এক দিন এই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বালিকা বালক গুলকে দেখিতে পাইল। বালকের কোনো বন্ধু তাহাব হইতে দুইটি পয়সা কাড়িয়া লইয়াছিল। বালিকা সে সমাধিক্ষেত্রের পিছনে ঝাঁড়াইয়া বোদন করিতেছিল। এই দরিত্র বালিকার মনে বালকের বোদন এক অভূতপূর্ব ভাবে উদ্বেক করিল। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা সৰ্কদাই মূখী ও সঙ্কট থাকে, ইহাই ছিল তাহাব ধারণা। সে বালকেব নিকটে আসিয়া তাহার বোদনের কাণ শুনিতে পাইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে নিজের এতদিনের সঞ্চয়, সাতটি পয়সা ঢালিয়া দিল। পয়সাগুলি হাতে পাইয়া বালকের কান্না তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল, সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল। বালিকা আনন্দে আনন্দ হইয়া বালকেব চুম্বন করিতে লাগিল। ছেলেটি পয়সাগুলি নিরীক্ষণ করিতে ব্যস্ত ছিল, সে কোনো বাধা দিল না। গালাগালি বা মার না খাইয়া বালিকার সাহস বাড়িয়া গেল, সে গুলকে সঙ্কট হইয়া ধরিয়া, বারকয়েক চুম্বন করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

দরিত্র বালিকার মনে কি ভাবের ধারা বহিতে লাগিল, তাহা কেহই বলিতে পাবে না। বালকটির প্রতি তাহার

চিত্ত কেন যে এত আকৃষ্ট হইল তাহা বুঝা যায় ন। হয়ত তাহাকে নিজেব অতিকষ্টসঞ্চিত অর্থ দান করার জন্তই কোনোদিন বালিকা ছেলেকে ভুলিতে পারিল না, অথবা তাহাকেই ভালবাসিয়া প্রথম চুম্বন করিতে পাওয়ার জন্তই ভুলিল না। বয়োবৃদ্ধ বা বালকবালিকা, সকলেরই মনে এক রহস্যময় প্রবৃত্তি কাজ কবে।

অনেক মাস ধরিয়। সে শুধু এই বালকটির এবং সেই সমাধিক্ষেত্রের পিছনের জায়গাটির স্বপ্ন দেখিত। যদি তাহার সহিত আবার দেখা হয়, এই আশায় সে চুরি করিয়া পয়সা জমা করিতে লাগিল। চেয়ার-মেবামতের মজুরি হইতে কখনও কখনও সে দু-এক পয়সা সরাইয়া রাখিত, বাবা মা খাবার জিনিষ কিনিতে পাঠাইলে তাহা হইতেও এক-আধ পয়সা রাখিয়া দিত। এই গ্রামে আবাব যখন সে ফিরিল, তখন সে দুই ক্রী জমা করিয়াছে, কিন্তু তাহাব বালকবালিকাকে সে নিকট হইতে দেখিতে পাইল না। একবার মাত্র দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল, খুব ফিটফাট সাজিয়া সে নিজের বাবার ঔষধের দোকানের জানালাব ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই ধারে রঙীন কলের বোতল আর রঙীন কাঁচের ফুলদানি। জিনিষ-গুলিব সৌন্দর্য্যে বালিকা একেবারে মোহিত হইয়া গেল, বালকের প্রতি ভালবাসাও তাহার বাড়িয়া গেল।

বালকের চিরউজ্জ্বল স্মৃতি সে হৃদয়ের কোণে ঐশ্বর্য্যের মত সঞ্চিত করিয়া রাখিল। পবের বৎসর যখন সে তাহাকে আবাব দেখিল, তখন শুকে একটু বড় হইয়াছে, স্কুলের পিছনের মাঠে সে বন্ধুদের সঙ্গে গুলি খেলিতেছিল। বালিকা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এমন আবেগেব সহিত তাহাকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল যে, শুকে ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কান্না থামাইবার জন্ত বালিকা নিজেব এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ, দুই ক্রী, কুড়ি সেন্টিম, তাহাব হাতে গুঁজিয়া দিল। এত পয়সা বালক কোনো দিন একসঙ্গে হাতে পায় নাই। তাহার কান্না তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল, বালিকা বত ইচ্ছা তাহাকে আদব করিতে লাগিল, তাহাতে কোনো আপত্তি না করিয়া শুকে একদৃষ্টে বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া রহিল নিজের হাতের মুদ্রাগুলির দিকে।

ইহাব পর চার বৎসর ধরিয়। যখনই বালকের সহিত ঐ বালিকার দেখা হইত, সে তাহাকে যথা ইচ্ছা চুম্বন করিতে দিত, অবশ্য বালিকার সঞ্চিত পয়সাগুলির পরিবর্তে। একবার সে ত্রিশ স্ত্রী পাইল, একবার দুই ক্রী, আর একবার বারো স্ত্রী। এত অল্প পয়সা দেওয়ার জন্ত এই তৃতীয়বার বালিকা লজ্জা ও ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু বৎসরটা বড় ধারাপ যাওয়াতে কোনোমতেই সে ইহার বেশী সঞ্চয় করিতে পারে নাই। কিন্তু পরের বৎসব সে হৃদে-আসলে পোষাইয়া দিল। চক্চকে বড় একটি পাঁচ ক্রী মুদ্রা বালকবালিকার হাতে দিতেই আনন্দে সে হাসিয়া উঠিল, দরিদ্রা বালিকা ধন হইয়া গেল।

এই বালকটিই তাহাব জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালকটিও খুব উৎসুক ভাবে তাহার আগমনের জন্ত প্রতীক্ষা করিত, তাহাকে দেখিতে পাইলেই দৌড়িয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইত। ইহাতে বালিকা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইত।

হঠাৎ বালিকাটিকে আব গ্রামে দেখা গেল না। অনেক দ্বিভাসাবাদ করিয়া বালিক জানিতে পারিল, যে, তাহাকে এক বোর্ডিং স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন হইতে সে বাবা-মায়ের পিছনে লাগিল, বাহাতে তাহার। এই গ্রামে আসার সময়টা পরিবর্তন করে। স্কুল যখন ছুটি থাকে, তখন এখানে আসিলে সে বন্ধুকে দেখিতে পাইবে ইহাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। এক বৎসব চেষ্টা করার পব সে বাপ-মাকে রানী করিতে পারিল।

দুই বৎসর পরে সে বালককে আবার দেখিতে পাইল। শুকেব চেহারা ও ধরণধারণ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সে অনেক লম্বা ও সুন্দর হইয়াছে, ঝকঝকে পিতলের বোতাম-দেওয়া জামাতে তাহাকে এমন চমৎকার দেখাইতেছে যে, বালিকা প্রথমে তাহাকে প্রায় চিনিতেই পারে নাই। বালক এমন ভাণ করিল যেন সে বালিকাকে দেখিতেই পায় নাই, গম্ভীরভাবে পান কাটাইয়া সে চলিয়া গেল। দুই দিন ধরিয়। বালিকা অবিশ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিল। ইহাব পব হইতে সে নীরবে এই বেদনা সহ করিতে লাগিল।

প্রত্যেক বৎসরই সে এখানে ফিরিয়া আসিত। শুকের পাশ দিয়া চলিয়া বাইত, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা কহিতে সাহস পাইত না। শুকে তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিত না। এই মানুষটিকে ঐ ঘোবনোন্মুখী বালিকা পাগলের মত ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। মরিবার আগে সে আমার বলিয়াছিল, “ডাক্তার, আমি অত্র কোন পুরুষের দিকে এ-জীবনে চাহিয়া দেখি নাই, জগতে আব কোনো পুরুষ মানুষ যে আছে, তাহাই আমার মনে হইত না।” কিছুদিন পরে তাহার পিতামাতা উভয়েই মারা গেল। মেয়েটি তাহাদের ব্যবসা চালাইতে লাগিল। দুইটি প্রকাণ্ড বড় বড় কুকুর সংগ্রহ করিয়া রাখিল, তাহাদের ভয়ে কেহ আর উহার কাছে আসিত না।

এক বৎসর সবে সে গ্রামে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় দেখিল একটি যুবতী তাহাব প্রিয়তমের হাত ধরিয়া ঔষধের দোকান হইতে বাহির হইতেছে। যুবতী শুকের পত্নী, অল্পদিন হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে।

এখানে টাউন-হলের পাশে একটি ছোট পুকুর আছে, সন্ধ্যারান্ত্রে ভগ্নদম্মা নারী তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিন্তু আত্মবাহিনী হওয়াও তাহার অদৃষ্টে ছিল না। একটা মাতাল পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং টানিয়া তুলিল। কয়েক জন লোক ধরাধরি করিয়া তাহাকে গ্রামের একমাত্র ঔষধালয়ে বহন করিয়া লইয়া গেল। শুকে ড্রেসিং গাউন পরিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে নামিয়া আসিল। তাহার ভিজা কাপড় ছাড়ান হইল, গা ধরিয়া গরম করা হইল। যেন তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এমন মুখ করিয়া যুবক বলিল, “তুমি কি পাগল হয়েছ? এরকম বোকামী আর কখনও ক’বো না।”

এই কয়টি কথাতেই ঐ হতভাগিনী বসন্ত জ্বালায় যেন জুড়াইয়া গেল। প্রিয়তম তাহার সহিত কথা বলিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ইহাইই আনন্দে সে দিনেহারি হইয়া রহিল। যুবক ডাক্তার তাহাব শুক্রবার জন্ত টাকা লইতে রাজী হইল না, যদিও নারী টাকা দিবার জন্ত অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল।

এই ভাবেই তাহার জীবন কাটিয়া চলিল। চেয়ার মেবামত কবিতা কবিতা সে শুধু নিজের প্রিয়তমের স্মরণ

দেখিত। প্রত্যেক বৎসর গ্রামে আসিয়া সে তাহাকে দেখিয়া বাইত। অনর্থক দোকানে গিয়া, টাকা দিয়া নানা রকম ঔষধ কিনিত, বাহাতে সে তাহার কাছে বাইতে পারে, তাহাব সঙ্গে কথা বলিতে পারে, এবং তাহাকে কিছু টাকা দিতে পারে।

আমি গোড়াতেই বলিয়াছি, এই বসন্তকালে ঐ নারীব মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃখভরা জীবনকাহিনী বলা শেষ করিয়া সে আমাকে ও পুরোহিতকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে, যেন তাহাব চিরজীবনের সঞ্চিত অর্থ আমরা তাহার ভালবাসার একমাত্র পাত্রের হাতে পৌঁছাইয়া দিই। তাহাকে দিবার জন্তই সে কেবল অর্থ সংগ্রহ করিত। কাজ করিবার তাহার আব অত্র কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। নিজে ভাল কবিতা আহাির পর্যন্ত সে কবিত না, পাছে তাহার সঞ্চিত অর্থ অধিক না হয়। তাহার মৃত্যুর পর কিছু টাকা হাতে পাইলে শুকে একবার অন্ততঃ তাহাকে স্মরণ করিবে, এই ছিল তাহার আশা। আমাদের হাতে সে দুই হাজাব তিন শত সাতাশ ফ্রাঁ দিয়া গিয়াছিল। তাহার শেষনিবাস পড়িবার পর আমি তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্ত সাতাশ ফ্রাঁ পুরোহিতের হাতে দিয়া বাকি টাকা লইয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন দুপুরবেলা আমি টাকা লইয়া শুকের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্বামী-স্ত্রী সবেমাত্র তখন মাধ্যাহ্নিক আহাির শেষ করিয়া দুখানি চেয়ারে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুই জনেরই বেশ গোলগাল চেহারা, টকটকে বং এবং সজ্জা মুখের ভাব। ঘরখানি গন্ধদ্রব্য ও ঔষধের সৌরভে ভরপুর।

তাহারা তাড়াতাড়ি আমাকে বসিতে আসন দিল। আমি বসিয়া নিজের বস্ত্রব্য বলিতে আরম্ভ করিলাম। আবেগে আমার গলা ভাবি হইয়া আসিয়াছিল, আমাব ধারণা ছিল, কাহিনীটি শুনিয়া তাহারা কাঁদিয়া ফেলিবে।

শুকে যেই বুঝিতে পারিল, যে, ঐ দরিদ্রা ভিখারিণীর জায় স্ত্রীলোক, যে ভাঙা চেয়ার মেরামত করিয়া দিনপাত করিত, সে তাহাকে ভালবাসিতে সাহস করিয়াছিল, রাগে তাহার মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার বকম দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ হতভাগিনী

কোদাল নামাইয়া রাখিল, শেষকালে কাহার-না-কাহার কোপে পড়িয়া পৈতৃক প্রাণটা ধোয়াইবে? ত্রীকর্ষ যুক্ত-করে নমস্কার করিয়া বলিল, “বাগ্‌দী-জনম তোব সার্থক হয়ে গেল রে। মাকে তুই উদ্ধাব করলি।”

কোদাল রাখিয়া দিয়া সবাই হাত দিয়াই প্রতিমার চাব পাশেব মাটি সবাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রতিমাটি প্রায় সম্পূর্ণই বাহির হইয়া পড়িল। একেবাবে নিখুঁৎ সর্দাজ-সম্পূর্ণ মুষ্টি, কোথাও ভাঙিয়া চুরিয়া বা টোল খাইয়া নষ্ট হয় নাই। ত্রীমুষ্টি বটে, তবে কোন দেবীর তাহা অশিক্ষিত মজুবের দল বুঝিতে পাবিল না। দুর্গা-প্রতিমা নয়, কারণ ছইখানি মাত্র হাত; কালীমুষ্টি নয়, কাবণ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা; সবস্বতী নয়, কাবণ হাতে বীণা নাই। এক লক্ষ্মী হইলে হইতে পারে, যদিও লক্ষ্মীরও বিশেষ কোনো লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান নাই। ত্রীকর্ষ বোম্বাল ইহাদেব মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত, সে মনে মনে যুক্তি কবিতা ইহাই স্থির করিল। মজুরের দলকে ঠেলা দিয়া খানিকটা সবইয়া দিয়া বলিল, “সর বেটারা সব, তোদের ছায়াও যেন মা-লক্ষ্মীর গায়ে না লাগে। খববদাব কেউ হাত দিবি না, ব্রাহ্মণ ছাড়া। কেউ যেন স্পর্শ না করে। আমি বাবুকে খবব পাঠাচ্ছি, তাব কি সৌভাগ্য! ধন্ত হয়ে গেলেন। এ মায়েরই কাজ বে বেটারা। না-হ’লে আমাদের বুড়ীরগি ঠাকরুণ নব্বুই বছর বেঁচে থেকে এখনই বা মরবেন কেন, আর বাবুই বা তাঁব নামে দীঘি কাটাতে যাবেন কেন?”

মজুরের দলে একটা চাকল্য দেখা দিল। লক্ষ্মী-ঠাকরুণ এমন নিজ মুষ্টিতে দেখা না দিয়া, বজ্রত বা স্বর্ণমুদ্রা রূপে আবিলুতা হইলে তাহার যথেষ্ট বেশী খুশী হইত। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। লক্ষ্মীকে ভুগর্ভেব অঙ্ককারা হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া তাহাদের পুণ্যলাভ হইল বটে, কিন্তু পেট ত ভরিল না?

হুইজন মজুব উদ্ধ্বাসে কাছাবী-বাড়ির দিকে ছুটিল। জমিদারবাবুকে খবর দিতে হইবে, তিনি যাহাতে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্ত লইয়া আসিয়া যথাস্থ প্রতিমাটিকে মাটি হইতে উদ্ধার করেন। ত্রীকর্ষ গর্ভের পাশে পাহাবায় খাড়া

হইয়া রহিল, মজুবের দল চারি পাশে, কিন্তু কিছু দূবে, তাহাকে ঘিবিয়া বসিয়া বহিল।

খববটা শুধু যে জমিদারবাবুই পাইলেন তাহা নহে, হুই ক্রোশের মধ্যে যে যেখানে ছিল সকলেই পাইল। ধন্টা-দুয়েব ভিতর মাটিটা লোকে লোকাবণ্য হইয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও শীঘ্রই আসিতেছেন বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। গর্ভটিব কাছে ত তিল ফেলিবাব স্থান বহিল না, এবং পিছনের লোকেরাও আগাইয়া আসিবাব চেষ্টায় ক্রমাগত চারিদিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। একটা তুমুল কোলাহল বাধিয়া গেল।

জমিদারবাবু স্বয়ং কুলপুরোহিত এবং আরও কয়েক জন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জনতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পাইকদিগকে হুকুম দিলেন, ঠেলা দিয়া লোকজনকে একটু দূবে সবাইয়া দিতে, না হইলে তাহারাই যে গর্ভে পড়িয়া যাইবেন?

ঠেলাঠেলিতে গোলমাল আরও বাড়িয়া গেল, তবে গর্ভের চারি ধাবের ভীড়টা একটুখানি পাতলা হইল বটে। তখন ব্রাহ্মণ কয় জন মিলিয়া কালোচিত মস্তোচ্চাবণপূর্বক প্রতিমাটিকে ধরাধরি করিয়া মাটি হইতে তুলিয়া ফেলিল। স্থল্লর প্রতিমা, আশ্চর্য্য তাহাব গঠন-নৈপুণ্য। লম্বায় তিন ফুট প্রায় হইবে। জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের তৈরি ঠাকুর? পেতল ব’লে বোধ হচ্ছে না?”

পুরোহিত বলিলেন, “উত্তমরূপে মার্জ্জন প্রয়োজন, কলঙ্ক ধরে গেছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।”

পিছন হইতে নিতাই-স্যাকরা উঁকি মারিতেছিল। সে উৎসাহ সম্বরণ কবিতে না পাবিয়া বলিয়া উঠিল, “এজ্ঞে, আমার একবার দেখতে দিলে হ’ত। আমার যেন মনে হচ্ছে পিতল নয়, এ আসল মাল।”

জমিদারবাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বলিস কি বে, সোনা? দেখত ভাল ক’বে।”

স্বর্ণকাবের দেবীপ্রতিমা স্পর্শ করিবাব অধিকাব আছে কি নাই তাহা আগ্রহাতিশয্যে সকলেই ভুলিয়া গেল। নিতাই নিকটে আসিয়া মুষ্টিটিকে ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, “এজ্ঞে, সোনাই বটে।”

চারি দিকে একেবাবে হৈ হৈ বাধিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে

ঠিক এই সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, স্থানীয় একটি ঐতিহাসিক এবং এক জন প্রত্নতাত্ত্বিককে সঙ্গে করিয়া আসিয়া ছুটাতে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিতে বাধিতে থামিয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের মোটরটা দেখিযাই জনতা পিছন হাটিতে আরম্ভ করিল।

আগন্তুক তিন জন সোজাহুজি অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রতিমাটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকে প্রায় হাতাহাতি বাধিয়া গেল মূর্তিটি লক্ষ্মীর, না পদ্মিনীর, না যক্ষিণীর তাহা লইয়া। কোনো কিছুই সঙ্গে ইহা বিশেষ মেলে না, স্তম্ভরী বালিকা বা কিশোরীর মূর্তির মত, আলংকারিত কুস্তলা, সর্কাজে অলঙ্কার।

রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু কোনো মীমাংসাই হয় না। লক্ষ্মীমূর্তি বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, সুতরাং সোজাহুজি লইয়া গিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করাও চলে না। পদ্মিনী বা যক্ষিণী যাহাই হউক, জিনিষটি সোনার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেটিকে সহজে হাতছাড়া করিতে রাজী হইলেন না। স্থির হইল, ইহা সম্প্রতি তাঁহারই হেফাজতে থাকিবে, বিশেষজ্ঞের অভিমত লইয়া তাহাব পর যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাইবে। যদি দেবীমূর্তি বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে জমিদারবাবু উহা লইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, যক্ষিণী বা পদ্মিনী হইলে স্থানীয় মুজিয়ামে উহার স্থান হইবে, আব যদি কিছুই স্থির না করা যায়, তাহা হইলে উহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে।

মূর্তিটি ভারী কম নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞায় মজুরের দল তাহা বহন করিয়া লইয়া চলিল, তাঁহার মোটরে তুলিয়া দিবার জন্ত। এখন আব তাহাদের কোনো দোষ হইল না। জনতা ছুই ফাঁক হইয়া তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিল, এবং মূর্তিটি নয়নগোচব হইবামাত্র সকলে সেটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। সাহেব গাড়িতে উঠিয়া বসিবামাত্র মোটর সশব্দে গর্জন করিয়া উঠিল, এবং ক্ষুদ্র জনতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া মিনিট-দুইয়ের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। জমিদারবাবু মনের ক্ষেদ মনেই রাখিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। দীঘিকাটাব কাজ সেদিন আর অগ্রসর হইল না।

কিছুদিন ধরিয়া মূর্তিটি লইয়া ক্রমাগত তর্কাতর্কি ও

আলোচনা চলিতে লাগিল। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ আসিয়া ছুটিলেন, কাগজে কাগজে ইহার ছবি ও বিবরণ বাহির হইল, সংবাদ-পত্রেও অসংখ্য মন্তব্য ছাপা হইল, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত কিছুই প্রমাণ হইল না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মদন ও মোহন বাগদীকে দশ দশ টাকা পুরস্কার দিয়া ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। জমিদারবাবু নিষ্ফল জোখে গর্জন করিতে লাগিলেন। দেশের লোক প্রথম কিছুদিন স্বর্ণপ্রতিমার বিষয় উদ্যান্ত আলোচনা করিল, তাহার পর নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ভাবনায় তাহার ভাবনা ভুলিয়া গেল। কোন্ এক সময় বাপ্পীরপোতে চড়িয়া স্বর্ণময়ী মূর্তিটি ভারতবর্ষের তটভূমি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তাহার খোঁজও কেহ রাখিল না।

২

প্রতিমাটি দেবীমূর্তি নয়। ইহার আসল বিবরণ এই।

দেড় শত বৎসর পূর্বে, দেশের এই অংশ গভীর অরণ্যের প্রান্তবর্তী ছিল। কিন্তু দেশের মানুষের দেহে তখন ছিল অনুরের শক্তি, মনে ছিল অসীম বল। বাঘ, ভালুক, হাতীর সঙ্গে নিত্য দেখাসাক্ষাৎ করিযাই তাহাদের দিন কাটিত। বন্ধুকেব চলন প্রায় ছিল না, ভবু রামদা, বর্শা, কোঁচ, জাঠা প্রভৃতিব সাহায্যে এই ভীষণ জঙ্গদিগকে বধ করার মধ্যে লোকে তখন বিস্ময়কব কিছুই দেখিত না। স্ত্রীলোকে পর্যন্ত তখন অস্ত্রের ব্যবহার জানিত এবং প্রযোজন হইলে অকুতোভয়ে চোর-ডাকাত বা ব্যাঘ্র-ভালুকের সামনে দাঁড়াইত।

ঐ অংশের জমিদার ছিলেন তখন রাজবল্লভ রায়। বীরত্ব ও চরিত্রের খ্যাতি তাঁহার এমনই ছড়াইয়া ছিল যে দেশে-লোকে মিলিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল রাজা রাজবল্লভ।

রাজবল্লভ পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না। বনেব পশুদিগের রাজ্য জোর করিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষের কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই যেন ঐ অরণ্যচারী জীবদের প্রতিহিংসাবৃত্তি তাঁহাব পরিবারের বিরুদ্ধে সর্বদাই উত্তেজিত হইয়া থাকিত। তাঁহার পিতা প্রাণ হারাইয়াছিলেন হাঙ্গামার সিকার করিতে গিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ব্যাঘ্রের

পড়িয়া মাঝে যান। জামাতা নৌকাডুবি হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহ কেহ বা বলেন যে কুস্তীবে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্রৌঢ় বাজবল্লভের পরিবার বলিতে তখন এক পুত্র দেবকীনন্দন, বিধবা কন্তা যোগমায়া, এবং পৌত্রী চন্দ্রাননা। চন্দ্রাননাব মাতা অবশ্য ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতাব জন্ত প্রায় সকল সময়ই তাঁহাকে শুইয়া থাকিতে হইত, তাই তিনি যে একটা মানুষ আছেন, তাহা সব সময় লোকের মনে থাকিত না। দেবকীনন্দনের যদি পুত্র-সন্তান না জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে বাজবল্লভের বংশের এইখানেই অবসান, এই একটা দুশ্চিন্তা সকল লই মনে সাবাক্ষণ জাগিয়া থাকিত। চন্দ্রাননাব বয়স দশ-এগার বৎসব, ইহার পর আর তাহার মাতাব সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। দেবকীনন্দনের যে অবিলম্বে আবার বিবাহ করা উচিত, এই লইয়া ক্রমাগত কাণাঘুসা চলিত। দেবকীনন্দনের কানেও যে কথাটা না-বাইত তাহা নয়, কিন্তু বাব-ভালুক মারিয়া বেড়ানর দিকেই তাহাব সমস্ত মন পড়িয়া থাকিত, বিবাহের ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর ছিল না। সেই বীবস্তের জন্ত বিখ্যাত যুগেও সেবা বীব ও শিকারী বলিয়া দেবকীনন্দনের নাম রটনা গিয়াছিল। সংসার ও জমিদারী দেখিবার জন্ত বিধবা ভগিনী এবং পিতা ছিলেন, স্ত্রীকে কেহই দেখিত না চাকর দাসী ভিন্ন, কাজেই দেবকীর পুরা ছুটি ছিল। চন্দ্রাননা সকলেরই নয়নের তারা ছিল, সুতরাং তাহাব ভাবনাও তাহাব পিতাকে বিন্দুমাত্র ভাবিতে হইত না।

শরৎকালটা প্রাচীন যুগ হইতে বিখ্যাত মানুষকে ঘরের বাহির করিবার জন্ত। রাজাবা এই সময় দিগিজয়ে যাত্রা করেন, সওদাগর যান বাণিজ্যে, শিকারী যান মৃগয়ায়। অবিশ্রাম বর্ষণে বাধ্য হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া মানুষের প্রাণ হাফাইয়া ওঠে। তাই শরৎকালের নীল আকাশ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে। দেবে-রকম ছুতা পায়, তাহাই ধরিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

দেবকীনন্দনও দলবল লইয়া শিকারে বাহির হইবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। এ বৎসব বনের ধারের গ্রামগুলিতে ব্যাঘ্রের উৎপাত অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। বিশেষ

করিয়া একটা নব-খাদকের অত্যাচারে ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। তাহা বল যেমন অসাধারণ, বুদ্ধিও তেমনি অদ্ভুত। ভীত গ্রামবাসীদের চক্ষে তাহাব চেহারা পর্যন্ত অলৌকিক হইয়া ঠাড়াইয়াছিল। আকৃতি তাহাব এত বড় যে হঠাৎ দেখিলে বাঘ না মনে হইয়া বড় একটা ঘোড়া মনে হয়, পিঙ্গল চোখ দিয়া তাহার যেন নরকের আগুন ঠিকুরাইয়া বাহির হইতে থাকে। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর এই যে তাহাব দুইটার বদলে তিনটা চোখ বলিয়া ভ্রম হয়। কপালে অবিকল একটা চোখেব মত ছবি। উহা যে সাধারণ ব্যাঘ্র নয়, কোনো দেবতার অবতার, এই বিশ্বাস ক্রমেই গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাতে ব্যাঘ্রপ্রববেব হুবিধা বই অসুবিধা ছিল না। সে নির্ভয় সর্বত্র বিচরণ করিত, কুটীরেহুদ প্রবেশ করিয়া মানুষ টানিয়া লইয়া বাইত। ত্রস্ত গ্রামবাসীরা তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবারই চেষ্টা অধিক করিত। তাহাকে যে মানুষে মাঝিতে পারে, এ-বিশ্বাস ক্রমেই তাহাদেব চলিয়া বাইতেছিল।

ব্যাঘ্রপ্রববের বিবরণ দেবকীনন্দনেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে হাসিয়া বলিত, “আকাশ ফবসা হ’তে দাও, তারপর তিনটে চেখেব আগুনই একসঙ্গে নিবিষে দেব।” তাহার বয়সের দলও সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল কবিয়া হাসিত।

বাঘ মারিবার জন্তই এবার সে তাড়াতাড়ি বাহির হইবার আয়োজন করিতেছিল। আর তিন-চার দিন পরেই যাত্রা করার কথা। বত দূর থোলা মাঠ আছে, হাতীব পিঠে যাওয়া বাইবে, তাহাব পর পায়ে হাটিয়া স্থল-পথে, বা নৌকা করিয়া জলপথে। যতই ঘুবিতে হউক, নর-খাদকের আবাসস্থল তাহাকে আবিষ্কার করিতেই হইবে।

সারা দিনের ভিতর একবার মাত্র আহারের সময় দেবকীনন্দন অন্তর-মহলে প্রবেশ কবিত। সেদিন আসনে বসিবারাত্র চন্দ্রাননা তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, “বাবা, এবার যে বাঘটা মাঝবে, তাব ছানটা আমি নেব।”

দেবকীনন্দন হাসিয়া বলিল, “কেন বে? তুই কি সন্ধ্যাসি হবি?”

চন্দ্রাননা বলিল, “না ‘আ’মাব চাই, আমি আসন করব।”
 বোগমায়া তাড়া দিয়া বলিল, “নাম দেখি কাঁধেব
 উপব থেকে। ‘মানুষকে খেতেও দেবে না।’”

চন্দ্রাননা নামিয়া পড়িল। বোগমায়া ভ্রাতাকে বাতাস
 কবিত্তে করিতে বলিল, “বৌ একবার তার ঘরে যেতে
 বলেছে।”

দেবকীনন্দন জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?” বোগমায়া
 বলিল, “ওমা, এব আবার কেন কি? দশ দিন অন্তরও ত
 একবার ও-মুখো হও না, তার কি একবার ইচ্ছাও হয় না
 ছটো কথা কহিতে?”

দেবকীনন্দন সংক্ষেপে বলিল, “বেশ ঘাব।” তাহার
 পর নীরবে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

চন্দ্রাননা বা নিভাননীর বাল্যকাল হইতেই হাঁফ নির
 অস্থির ছিল। সকলে আশা করিয়াছিল বড় হইলে
 বিবাহাদিব পর্ব সারিয়া যাইবে। কিন্তু হইল অল্প রকম।
 রোগ বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে
 নিভাননীকে পাকাপাকি রকম শয্যা-গ্রহণ করিতে হইল।
 গত তিন বছর সে শুইয়াই আছে, দিন রাত্রে তাহার স্বস্তি
 নাই, বিশ্রাম নাই। খাইতে পারে না, ঘুমাইতে পারে না,
 তাহার যন্ত্রণা দেখাও মানুষেব পক্ষে কষ্টকর। তাই
 পারতপক্ষে কেহ তার ঘরে যায় না, বুড়ী দাসী তারিণী
 ছাড়া। চন্দ্রাননাকে সে-ই দিনে-বার-দুই-তিন মায়ের
 কাছে ধরিয়া লইয়া যায়, মেয়ে আবার তখনই পলাইয়া
 আসে। বোগমায়া ভক্ততার খাতিবে দিনে একবার
 কোনো মতে ভাজের কুশল প্রশ্ন কবিয়া আসে, এই পর্য্যন্ত।

আজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া দেবকীনন্দন ছুপুববেলা
 স্ত্রীর ঘরে একবার গিয়া প্রবেশ করিল। তাবিনী বসিয়া
 নিভাননীর প'রে হাত বুলাইতেছিল, দেবকীকে দেখিয়াই
 সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া
 গেল।

দেবকী স্ত্রীর কাছে একটা তারি চৌকি টানিয়া লইয়া
 বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ডেকেছ?”

নিভাননী কঙ্কালসার দেহ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল।
 পূর্বের অপক্লপ রূপের আর চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই,
 শুধু চোখ দুটি আগের মত আছে, তাও কটরগত। সে

বলিল, “দেখ, ঠাকুর ঝি ও বাবা—সবাই চান তোমার আর
 একবার বিয়ে দিতে, তুমি তাই কব।”

দেবকীনন্দন একটু ঘেন বিবস্ত হইয়া বলিল, “দিন-
 দুপুরে ডেকে নিষে এলে, এই বলবাব জন্তে? এ ত পরেও
 বলা চলত?”

নিভাননী বলিল, “আগে বললেও ক্ষতি নেই। ঘরে
 তোমার এক দণ্ডও মন বসে না। তোমায় আমি দোষ
 দিচ্ছি না। আমার দিকে একবার তাকালে যে আর
 ফিরে তাকাতে কারও ইচ্ছে কবে না তা আমি বুঝি। কিন্তু
 আমার ঘর ছেড়েছ বলে, সংসার ছেড়ে দেবে নাকি?
 আমি ক'দিন আর? কিন্তু তোমার মেয়ে রয়েছে, বংশের
 প্রতি কর্তব্য রয়েছে, সব ভাবনা ভুলে পাখ'মারার মত বনে
 বনে জঙ্গ মেয়ে ঘুরলেই ত চল'ব না? ও সব ছাড়া,
 দেখে-শুনে মনের মত বউ নিয়ে এস, এসে আবার সংসার-
 ধর্ম কর। বয়স বাড়ছে বইত কমছে না?”

দেবকী বলিল, “হঠাৎ এত মন্ত বক্তৃতা দেবাব কি কারণ
 ঘটল? আমি নূতন বউয়ের জন্তে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে
 উঠেছি, তাই বা কে তোমায় বললে?”

নিভাননী এতগুলি কথা বলিয়া হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল।
 সে আবার বালিশে ঠেস দিয়া এলাইয়া পড়িয়া বলিতে
 লাগিল, “বউয়ের জন্তে ব্যস্ত হ'লে কিছু অজায় হ'ত না।
 যে বয়সের যা ধর্ম। তা'ত কেউ বাগ করে না। কিন্তু এই
 যে চলেছ কোথা'কাব রাস্কুসে বাব মা'বতে, এটা ভাল হচ্ছে?
 বংশেব একমাত্র ভরসা ত তুমি?”

দেবকীনন্দন বলিল, “আছ ত শুয়ে পড়ে; এত কথা
 তোমাব কানে তোলে কে? বাঘ মারতে দোষ নেই, না
 মারলেই দোষ। এত লোকেব প্রাণ যাচ্ছে, তা'বা আমাদেরই
 প্রজা ত? তা'দেব রক্ষা করবার চেষ্টা করব না?”

নিভাননী বলিল, “তুমি ছাড়া আব লোক নেই?
 নিজের জীবনটার দাম তুমি বোঝো না।”

দেবকী বলিল, “ও হ'ল মেয়েমানুষের কথা, পুরুষ
 বাচ্ছায় এরকম ভাবতে পারে না। জীবনের মূল্য আছে বলে
 কি খাটেব তলায় লুকিয়ে থাকতে হবে? অমন জীবনে
 ধিক্।”

নিভাননী একেবারে শুইয়া পড়িয়া অশ্রুটকণ্ঠে বলিল,

“আমার কথায় কাজ হবে না, এ আমি জানতামই। কবে বা আমার কথা রেখেছে যে আজ রাখবে?”

১. দেবকীনন্দন উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “অসম্ভব কথা হ’লে কি ক’বে রাখব, নিভা? রাজবল্লভ বায়ের ছেলেকে তুমি কন্যেবোয়ের মত ঘরে লুকিয়ে থাকতে বল, বায়ের ভয়ে। একথা কি রাখব মত?” বলিয়া জ্বোরে জ্বোরে পা ফেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মাঝের তিনটা দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিনে হাতী, ঘোড়া, শিকারীর দল সাজাইয়া লইয়া দেবকীনন্দন যাত্রা করিয়া গেল। যাইবাব আগে সকলের সঙ্গে দেখা করিল, বাদ গেল শুধু নিভাননী। চন্দ্রাননাকে বলিয়া গেল, “বায়ের ছাল তুই ঠিক পাবি বোটা!”

তখনকার দিনে রেলগাড়ী ছিল না, সুতরাং দূরদেশ হইতে নিত্য খবর দেওয়া-নেওয়া চলিত না। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া যাইত আসিত, তাহাতেই খবর হয় খবর মিলিত।

দেবকীনন্দনেরও প্রথম খবর আসিল পাঁচ ছয় দিন পবে। গ্রামেব সীমানা ছাড়িয়া সে এবার বনের ভিতর প্রবেশের আয়োজন করিতেছে। যে কয় দিন সে গ্রামে ছিল, তাহার ভিতর সেই নবখাদক আর ওদিকে আসে নাই, ভয়েই বেন দূরে সরিয়া ছিল।

আবার কিছুদিন চুপচাপ গেল। তাহাব পর এক দিন অকস্মাৎ অশনিপাতের মত নিদ্রাঙ্গণ সংবাদ সমস্ত রাজবাটীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। দেবকীনন্দন সেই ভীষণ ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে। শিকারীরা উদ্ধারার্থে ছুটিয়া আসিতে-না-আসিতেই ব্যাঘ্র নিজেব হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া গহন বনে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ দাহ না করিয়া গো-শকটে লইয়া আসা হইতেছে।

বিকাল পড়িতে-না-পড়িতে শিকারীর দল নিহত জমিদার-পুত্রের দেহ লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। বিহ্বত অঙ্গনে তাহাকে স্নান করাইয়া মালাচন্দনে ভূষিত করিয়া শোয়ান হইল। রাজবল্লভ আসিয়া মৃত পুত্রের পাশে দাঁড়াইলেন। চন্দ্রাননা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়। দাঁড়াইল, এতক্ষণ সে কাঁদিতেছিল, পিতামহের ভীষণ জরুট-কুটিল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কান্নাও বন্ধ হইয়া গেল। অন্তঃপুর হইতে থাকিয়া থাকিয়া শুধু

যোগমায়াব করুণ আৰ্ত্তনাদ শুনা যাইতে লাগিল। রাজবল্লভ বজ্রনির্ধোয়ের মত স্বরে বলিলেন, “তোমরা শুনে রাখ, আমি মা ভবানীর নামে শপথ করছি। যে ঐ বাঘকে মেরে আনবে, আমার স্বজাতি হ’লে আমার একমাত্র পৌত্রী চন্দ্রাননাকে সে লাভ করবে। যদি স্বজাতি না হয়, আমার সমস্ত জমিদারী তাব। একবস্ত্রে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারণসী চলে যাব। যাও, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এ সংবাদ প্রচার ক’রে দাও।”

লোকজন ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এখন দাঁহর আয়োজন করিতে হইবে, আত্মীয়স্বজনকে আগ্রসর হইয়া আসিল।

হঠাৎ অন্তঃপুরের ক্রন্দনস্বনি উচ্চতর হইয়া উঠিল। সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, রক্তাশ্রয়া রক্তালঙ্কার-বিভূষিতা কঙ্কালের মত কে এক জন হাসিমুখে আগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া শব্দবের পায়ে প্রণাম করিয়া নিভাননী বলিল, “বাবা, অশীর্বাদ করুন, পরের জন্মে যেন স্বামীকে রেখে যেতে পারি।”

রাজবল্লভ অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, “যাও মা, সতীলোক তোমার অক্ষয় হোক।” চন্দ্রাননা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যোগমায়া ও দাসীবা তাহাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

দেবকীনন্দনের অপঘাতমৃত্যু, নিভাননীর সহস্ররণ ও রাজবল্লভের শপথের কথা দেশের সর্বত্র দেখিতে দেখিতে ছড়াইয়া পড়িল। ত্রিনেত্র ব্যাঘ্রকে বধ করিবার চেষ্টায় দেশস্থ শিকারীর আহা-নিজা ঘুচিয়া গেল, কিন্তু সেটাব আর কোথাও খোঁজ মিলিল না। দেশের অধীশ্ববেব প্রিয়তম পুত্রের প্রাণ হরণ করিয়া তাহার হিংসাবৃত্তি কিছু-কালের মত বোধ হয় চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই লোকালয়ে তখন আর সে মুখ দেখাইল না।

রাজবল্লভের বাড়িতে স্নেহ চিররাজি বাসা বাঁধিল। দূর হইতে দেখিলে কাহারও বোধ হইত না যে এই বিরাট পাষণ্ডপুত্রের ভিতর জীবিত মানুষ কোথাও কেহ আছে। চাকরদাসীরাও যেন হাঁটিতে চলিতে নিঃশ্বাসটুকু লইতেও ভয় পায়। রাজবল্লভের দিন কাটিয়া যায় ভবানীর মন্দিরেই, কখন-বা রাত্রেও সেইখানেই ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া

ধাকেন। বিধবা যোগমায়া একলা একবরে অশ্রুপাত করে। আর মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত এই জঙ্ঘকার পুর্বীতে খেলিয়া বেড়ার বিহুৎপিনী চন্দ্রাননা।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল। এ বৎসর আবার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ব্যাঘ্রের উৎপাতের কাহিনী শুনা যাইতে লাগিল। কিন্তু ইহা সেই ব্যাঘ্র কিনা তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

সময়েব প্রভাবে রাজবল্লভের হৃদয়ের বিবাক্ত ক্ষতের আলা একটু বেন জুড়াইয়া আসিয়াছিল। তিনি এক দিন হাসিয়া পৌত্রীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “দিদি, দেশে ত পুষ্কমানুষ আছে ব’লে মনে হচ্ছে না। অ’মাকেই না শেষে বাঘ মেরে তোকে বিয়ে করতে হয়।”

“খেং, তোমার মত টাক-পড়া বুড়াকে আমি বিয়ে করলাম আর কি?” বলিয়া চন্দ্রাননা তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বড়মানুষের কথা পড়িতে পার না। রাজবল্লভের এই ক্ষেত্ৰকুণ্ড লোকের মুখে মুখে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যুবক দল জুড় হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিল বটে, কিন্তু ব্যাঘ্র-এবর তখনও নির্ভয়ে বিচরণই করিতে লাগিলেন। কি কারণে জানি না তাহার গ্রামে চুকিয়া উৎপাত করার কথা আর শোনা যাইত না, যেন কিছু সাবধানী হইয়া পড়িয়াছিল। তবে গরু চরাইতে গিয়া বা কাঠ কাটিতে গিয়া অনেক হত-ভাগ্যই এখনও যে এই মুর্খমানুষের সাক্ষাৎ পাইতেছে, তাহার ভয়-বহ কাহিনী প্রায়ই শুনা যাইত।

এ বৎসরটাও কাটিয়া গেল। চন্দ্রাননার বয়স তের ছড়াইয়া চলিল। আসন্নবোনা কিশোরীর অঙ্গ অঙ্গে বেন সৌন্দর্যের বান ডাকিয়া যাইতেছিল, তাহার দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ ধাঁধিয়া যাইত।

চতুর্থ বৎসরের শরৎকাল আসিয়া পড়িল। রাজ-বল্লভের শরীরে ভাঙন ধরিয়াছিল। এক দিন অন্তঃপুরে আসিয়া তিনি কস্তা ও পৌত্রীকে বলিলেন, “এবার কালী-পূজার এক-শ মহিষ বলি দিতে হবে। যা যদি দয়া করে এ-দেশের ভেড়াব পালে একটু শৌর্য দেন। নইলে ত আশা কিছু দেখছি না।”

রাজবল্লভের মানসিক ইচ্ছা দেবী মহাশক্তি বোধ হয়

শুনিতে পাইলেন। এক শত মহিষ বলি হইবার আগেই বোধ হইল ভেড়াব পালের ভিতর দুই একটা বাঘের বাচ্ছাও আছে। ধবর পাওয়া গেল ঝাঁকুড়িয়ার ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী এবং কুমারপুরের নরনারায়ণ গুহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে মাস ঘুরিতে-না-ঘুরিতে তিন-চোথো বাঘেব ব্যাঘ্রলীলা তাঁহারা ঘুচাইয়া দিবেন।

শুনিয়া রাজবল্লভ হাসিয়া পৌত্রীকে বলিলেন, “দিদি, তুই যে একেবারে পৌরাণিক বাজকজাদেব দলে ভর্তি হয়ে গেলি। স্বয়ম্বর-সভায় কার গলায় মালা দিস দেখা যাবে।” চন্দ্রাননা ঝম্ ঝম্ করিয়া নুপুর বাজাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

কালীপূজা আসিল, মহা ধুমধামে সম্পন্নও হইয়া গেল। দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিল বলি ও ভাসান দেখিতে। সকলেবই মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ যে এই রাজবল্লভের শেষ পূজা, বংশে আর কেহ রহিল না যে তাঁহাব কীর্তি বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে।

ভাসানের পরদিন সকালে রাজবল্লভ ভবানীর মন্দির হইতে কিরিতেছেন, এমন সময় দুই জন পাইক ছুটিয়া আসিয়া ধবর দিল যে ব্যাঘ্র মারা পড়িয়াছে। গোয়ানে তাহাকে লইয়া আসা হইতেছে, সঙ্গে আসিতেছে শিকারীর দল এবং সাত গ্রামের লোক।

রাজবল্লভ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া তাঁহ’র একটু উক দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সেই এক অশুভ দিনের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল, যখন এমনি করিয়া দেবকীন্দনকে তাঁহার গৃহে শিকারীর দল বহন করিয়া আনিয়াছিল। আজ আসিতেছে সেই পুত্রহস্তাকে লইয়া, ইহাকেও সমুচিত ভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত। তাহা ছাড়া একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ চন্দ্রাননার স্বয়ম্বর, আজ তাঁহাব অতি আনন্দের দিন।

পাইকদিগকে দেওয়ানের সম্মানে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অন্তঃপুরে ধবর পাইবা সকলে হলহুল বাধাইয়া দিল। এত দিনের গভীর শোকের আঁধার-বেন এক নিমেষে কাটিয়া গেল। যোগমায়া চন্দ্রাননাকে জোঁব কবিয়া ধরিয়া আনিয়া রত্নালঙ্কারে বহুমূল্য বস্ত্রে সাজাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুর-বাসিনীর দল, প্রতিবেশিনীর দল সার দিয়া দাঁড়াইয়া গেল মৃত নরখাদককে দেখিবার জন্ত। বিস্তীর্ণ অঙ্গন,

জমিদার-বাড়ির দাস-দাসীরা পরিস্কার করিয়া ফেলিল। চারিধারে জনতা ভীড় করিয়া দাঁড়াইল, মাঝের জায়গাটা খালি বহিল শিকারীর দলের জন্ত।

শিকারীর দলকে দূর হইতে দেখিবার জন্ত জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনেকে তাহাদের আগ বাড়াইয়া আনিবার জন্ত ছুটিয়া চলিল, অনেকে নিজ স্থানে দাঁড়াইয়াই উৎসুক-নেত্রে আগন্তুকদিগের দিকে চাহিয়া বহিল।

বজ্রাশ্রোতের মত মানুষের শ্রোত আঙ্গিনার ভিতর হুড়হুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। গরুর গাড়ী বটে, তবে গরু তাহাতে নাই, গ্রামের লোকেই মহোৎসাহে তাহা টানিয়া আনিতেছে। গাড়ীর উপর বিপুলাকার ব্যাঘ্রের দেহ, মস্তকটা তাহার দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এত বড় বাঘ তখনকার দিনের মানুষও দেখে নাই, যদিও বাঘের সঙ্গে দেখা-শুনা তাহাদের ছই বেলা হইত বলা যায়। মৃত পশুর কপালের তৃতীয় নেত্র দেখিবার জন্ত পিছনেব লোক ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

অঙ্গনেব মাঝখানে গাড়ীটা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ছই পাশে ছই ব্যক্তি ভীড়ের ভিতর হইতে আলাদা হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্রের বাম দিকে যিনি তিনি ধর্মাকৃতি, অতি বলিষ্ঠ দেহ, কাঁধ অবধি বাববী চুল, হাতে বর্ষা, তাহার অগ্রভাগ বস্তুরঞ্জিত। ইনি কুমারপুরের নরনারায়ণ গুহ। দক্ষিণ পাশে দাঁড়াইয়া ঝাঁকুড়িয়ার ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী। ইনি নরনারায়ণ অপেক্ষা অল্পবয়স্ক, শবীর দীর্ঘ একহারা, বর্ণ উজ্জ্বল শ্রাম। মুখত্রী অতি সুন্দর, শবীরের নানাস্থান ক্ষতবিক্ষত, বস্তাক্ত।

রাজবল্লভ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। একদৃষ্টে মৃত প্রহরস্তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহারপর শিকারীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মা ভবানী তোমাদের কল্যাণ করুন, বাংলার পুরুষের তোমরা মান রক্ষা করোহ। কিন্তু ব্যাঘ্র বধ করেছে কে আমার জানা আবশ্যক। আমার পৌত্রীকে তার হাতে সম্প্রদান করতে চাই।”

অন্তঃপুরবাসিনীদের দল ভেদ করিয়া যোগমায়া বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রাননার হাত ধরিয়া। তাহার রূপ-জ্যোতিতে সমস্ত দিক যেন আলো হইয়া উঠিল। নরনারায়ণ ও ভবানীপ্রসাদ একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “বাঘ আমরা হু-জনে বধ করেছি, নরনারায়ণ সাহায্য না করলে হয়ত একলা আমাব দ্বারা একাজ সম্ভব হ’ত না। তবে আমাব আপনার বিচার মেনে নিতে রাজী আছি।”

রাজবল্লভ মহা কঁাকরে পড়িলেন। উভয়েই তাঁহার স্বজাতি, কাহাকে বাধিয়া কাহার হস্তে তিনি পৌত্রী সমর্পণ করিবেন।

কুলশুক্ল পশুপতি শর্মান দিকে চাহিয়া বলিলেন, “শুক্লদেব, কি উপায় করা যায়?”

পশুপতি হাসিয়া বলিলেন, “নাভনীকে নিজে নির্বাচন করতে বলুন। ব্যাপারটা ঠিক পৌরাণিক যুগেব মত, ব্যবস্থাও সেই রকম হোক।”

রাজবল্লভ নাভনীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তাহার দ্বারা এ-কাজ হইবে বলিয়া ত বোধ হয় না।

বাজবল্লভ বলিলেন, “শুক্লদেব, পৌরাণিক সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তীর মত দৃঢ় মন এখন কোন মেয়ের পাবেন? চন্দ্রাননা স্বয়ম্বর হ’তে পারবেন না। অন্ত উপায় দেখুন, যাতে আমি সত্যভ্রষ্ট না হই, সকলেই যেন উপযুক্ত পুরস্কার পায়।”

পশুপতি শর্মা নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা কবিলেন। তাহার পব বলিলেন, “দ্বাপর যুগে কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা একবার ব্রত ক’রে স্বামী দান করেছিলেন। দেবর্ষি ন বদ কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাবার উপক্রম করাতে, ত্রীকৃষ্ণের সকল মহিষী অতি কাতরভাবে রোদন করতে থাকেন। তাত শেষে দেবর্ষি ত্রীকৃষ্ণের ওজনের স্বর্ণ পেলে তাঁকে মুক্তি দিতে স্বীকৃত হন। আপনিও তাই করুন। ছই জনকে কস্তাদান অসম্ভব। কস্তার স্বর্ণময়ী মূর্তি এক জনকে দান করুন, আর এক জনকে কস্তাদান করুন। এ ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত।”

রাজবল্লভ বলিলেন, “তাই হোক। কিন্তু কস্তা যিনি গ্রহণ করবেন তিনি তাতেই যেন সম্মত হন। স্বর্ণময়ী মূর্তি প্রস্তুত করতে আমার প্রায় যথাসর্বস্ব বিক্রীত হবে যাবে।” বলিয়া তিনি শিকারীদ্বয়ের দিকে চাহিলেন।

ভবানীপ্রসাদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া রাজবল্লভকে প্রণাম কবিয়া বলিলেন, “আপনার পৌত্রীকে পেলেই আমি নিজেকে ধন্ত মনে করব।”

নরনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, “বৎস অল্প ভাষা তোমার।”

স্বর্ণময়ী মূর্তি ও চন্দ্রাননাব সম্প্রদান প্রায় একই দিনে হইয়া গেল। উদ্ভূত সামান্য সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া, ভবানী-পূজার ব্যবস্থা করিয়া, পৌত্রীর বিবাহান্তে রাজবল্লভ বার দেশভ্রমণ করিলেন। যোগমায়াও গেলেন তাঁব সঙ্গে। কান্ধিতেই তাঁহাদের দেহান্ত হয়।

ভবানীপ্রসাদের বংশ এখনও টিকিয়া আছে। নরনারায়ণের বংশ কিছুদিন পরে লুপ্ত হইয়া যায়। জমিদারী অস্ত্রের হস্তগত হয়, কিন্তু বিখ্যাত স্বর্ণময়ী মূর্তিটিকে আব দেখা গেল না। নরনারায়ণ মৃত্যুকালে কোথায যে সেটি লুকাইয়াছিলেন, তাহাও কেহ জানিতে পারিল না।

ব্যঙ্গ-চিত্র

(আমেরিকার সংবাদপত্র হইতে সংকলিত)

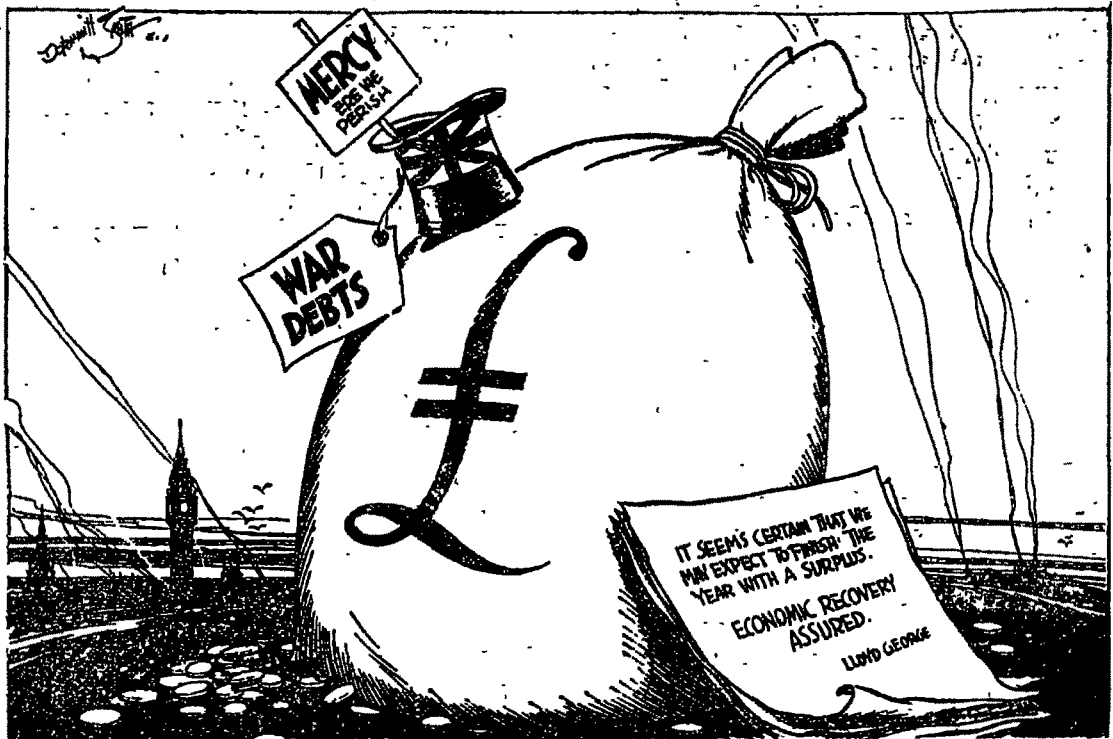
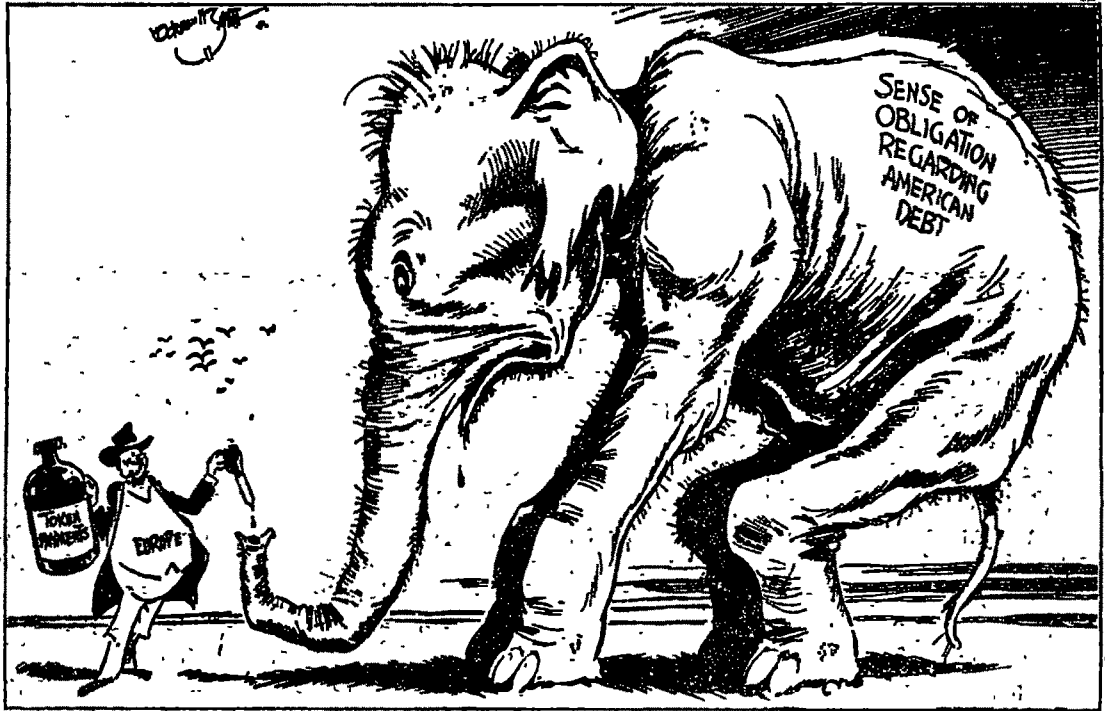


১। ইউরোপের একটি রাষ্ট্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ঋণী, জার্মানী আবার এই রাষ্ট্রের নিকট টাকা ধারে। রাষ্ট্রটি যুক্তরাজ্যকে বলিতোছে যে, তাহার ধার শোধ করিতে পারিবে না। অথচ ইহা জার্মানীর নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে বাস্তব। এই রাষ্ট্রের ব্যাধকুলিতে জার্মানীর রত টাকা গৃহীত আছে তাহা বাজেরাগু করিবার জন্য ব্যবসা-পরিষদে একটি আইন পাস করাইয়া গইয়াছে। এক-কিনল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপের আর সকল ঋণী রাষ্ট্রেরই এইরূপ ব্যবহার। এই চিত্রখানি হইতে ইহার সঙ্গ বুঝা যাইবে।

২। যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে বিত্তর ঋণগ্রহণ করিয়াছিল। তখন ইহার যুক্তরাজ্যের কতই না খোশামোদ করিতোছে; কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও তখন ইহার গুরুত্ব ছিল। কিন্তু এখন ইহার পরিবর্তন ঘটয়াছে। এখন অল্প অল্প ঋণ দিয়া বুঝাইতে চাহিতেছে, যে, ঋণশোধের চেষ্টা হইতেছে, আর ইহারাই সুদেশে রূপসজার বাড়িবার জন্য বিত্তর ঋণগ্রহণ করিতেছে। চিত্রখানিতে ইহাই সংপ্রকাশ।

৩। ইংলণ্ডের লন্ডনে জর্জ প্রভুতি রাষ্ট্রনাতিবিশারদগণ এই বলিয়া পূর্ব অনুভব করিতেছেন যে, সেখানকার আর্থিক অবস্থা দিন-দিন ভাল হইতেছে। অথচ সেই দেশেরই একদল প্রতিনিধি আমেরিকায় গিয়া যুক্তরাজ্যের সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।



দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

নারী-শিক্ষা সমিতি—

নারী-শিক্ষা সমিতির মহিলা শিল্প-প্রদর্শনীর সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সমিতির সম্পাদিকা মাননীয় শ্রীমতী লেডী অবলা বহু মহোদয়া বলেন,—

আজ এই পৃথিবীব্যাপী অর্থহীনতার দিনে, ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিগ্না দেশে দেশে গৃহশিল্পের পুনঃ-প্রবর্তনের যে মহতী প্রচেষ্টা চলিতেছে, আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর আয়োজন তাহারই ক্রীণা আভাস মাত্র। যুগের বিবরণ, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী জননায়কগণ বুকিতে পারিতেছেন, ইহা কেবলমাত্র ধনী কলনাবিলাস নহে; যদি স্বয়শিল্প ও কলকারখানার যুগে ব্যাপকভাবে গৃহে গৃহে কুটির-শিল্পের প্রচার সহজতর ভাবে সাধিত হয় তাহা হইলে ইহা কেবলমাত্র এই অল্পহীন, শ্রীহীন দেশে আর্থিক কষ্ট মোচনে সহায়তা করিবে না, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গৃহের শুচিতা, দেশের সৌন্দর্য এবং পারিবারিক জীবনের সুখ ও শান্তি অনেক পরিমাণে কিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে। যুগের বিবরণ, আজ এই অত্যাচার প্রয়োজনীয় কার্যের গোয়েহিত্য করিতে এমন এক জন মনোবীকে আমরা পাইয়াছি যিনি কেবলমাত্র এই কলিকাতা মহানগরের মহানায়ক হিসাবে নয়, প্রতিভাশালী অর্থনীতিবেত্তা হিসাবে, নানা-প্রকার সংস্কারমূলক প্রদান করিয়া আমাদের এই কার্যে বিশেষভাবে উত্সাহ দিতে পারিবেন।

বাণী-ভবনের সংগঠিত মহিলা শিল্পভবনের উদ্যোগে প্রতি বৎসর এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে, মহিলা শিল্পভবন একটি অবৈতনিক শিল্প-বিদ্যালয়। এ-পর্বান্ত প্রায় ১০০টি মেয়ে এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া নানারূপ শিল্পকার্যে পারদর্শী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতেছেন এবং অনেকে এখান হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত আয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ-পর্বান্ত এই ভবনের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত নানা প্রকার শিল্পসজ্জার প্রায় ১২০০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। দেশের দুঃস্থ এবং আমাদের অতাব্যব প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে এই পরিমাপ ইতর সামান্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা ও আন্তরিকতার দিক হইতে ইহা কিছুমাত্র অগৌরবের নহে। আজ এই উৎসবক্ষেত্রে ৬ প্রতিভা সেনগুপ্তার কথা স্মরণ করিতেছি। বাণী-ভবনের আরম্ভ হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সর্বসময়ে ইহার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি মাত্র কিছুদিন হইল আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আজ এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে সেই স্বর্গগত মহিলার স্মরণীয় মুখ, প্রতিভা-বজ্রক নীতি ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের স্মরণপথে উদ্ভিত হইতেছে।

কুটির-শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা কেবলমাত্র মহিলা শিল্পভবনের ও বাণী-ভবনের কতিপয় মহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; যাহাতে হৃদয় পল্লীগ্রামে পর্যন্ত গৃহশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহার জন্যও সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সকল-সফলভাবে মূলে যেমন জন্ম, আন্তরিকতা, কর্তৃপক্ষ ও উত্সাহের প্রয়োজন, তেমনি ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করিতে হইলে দেশের শিক্ষিত ও অর্থশালী ব্যক্তিগণের স্তম্ভ ইচ্ছা ও অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এই ভাণ্ডারহীন দেশে স্খ্যবিশিষ্ট হিন্দুসমাজের বিধবাদের অবস্থা যে কতদূর দুঃস্থ তাহা আজ আপনাদিগকে বিশদ করিয়া বলিতে চাহি না। তাহাদের

জীবন যাহাতে হঠাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া-দেশের ও দেশের মঙ্গলসম কার্যে লাগিতে পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া দশ বৎসর পূর্বে দুইটি মাত্র বিধবা লইয়া বাণী-ভবনের ভিত্তি স্থাপনা হয় দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আজ সেই শুভদিন আগত, আপনাদের শুভেচ্ছায় এবং সমবেত চেষ্টায় এই সমিতি মাথা শুজিবার মত একটি গৃহ পাইয়াছে। এই আশ্রমে কিঞ্চিদিক ৬০টি বিধবা বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষারিতা হইয়া পল্লীগ্রামে পল্লীগ্রামে সমিতির প্রতিনিধিত্ব-বিশ্বাসে সহায়তা করিতেছে, নারীশিক্ষা সমিতি বালিকাদিগের জন্য ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে এবং ইহাদিগকে নিঃসঙ্গ ভাবে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছে। এপর্যন্ত এই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে প্রায় ৫৫০০ ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছে। তের বৎসর হইল নারীজাতিকে দেশের কল্যাণকারিণী হইবার উপযোগী শিক্ষার শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই নারীশিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের এই পরিকল্পিত আদর্শের পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহা আমরা জানি না—তাহার বিচারভার আপনাদের হস্তে। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমাজ-জীবনের জড়দেহে এক অতৃতপূর্ব সাড়া আনিয়াছে। আজ আমরা কণ্ঠস্ব, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তৃপক্ষিত আজ অর্ধা-ভাবে নিশ্চল, প্রারম্ভ কার্যমুখী আজ উৎকর্ষিত; তের বৎসর পূর্বে যে ক্রীণা দীপশিখা লইয়া পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইরাছিলাম, বহুপণ, আপনাদের সমবেত চেষ্টা এবং শুভেচ্ছা সেই ক্রীণা দীপশিখাকে স্থির ও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলুক—বাহার দীপ্তি প্রায় হইতে প্রাশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া এই তমসাজ্জয় দেখকে আলোকিত করিয়া তুলুক—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

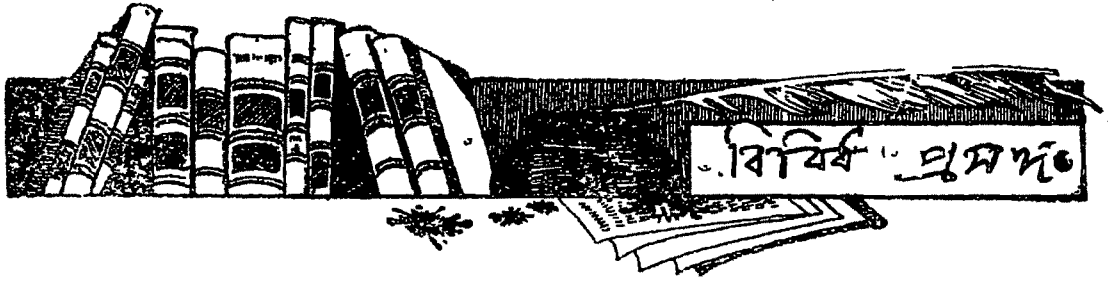
অদেশী ঔষধের কারখানা—

এক জন মনোবী বলিয়াছেন—‘আয়ুর্বেদ অনাদি’। ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ-প্রস্তুতির আয়োজনও যথেষ্ট ছিল। প্রতীচীর চিকিৎসা-বিজ্ঞা ‘এলোপ্যাথি’ নামে খ্যাত। আয়ুর্বেদের জ্ঞান ইহার ঔষধও গাছ-গাছড়ার নির্বাস হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতের জলবায়ুর উগাযোগী করিয়া ভারতীয় গাছ-গাছড়ার নির্বাস হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা সম্ভব হইলে স্বল্প মূল্যে রোগ-প্রতিষেধক নানা ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। দরিদ্রজন-অধ্যুষিত দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক।

বাংলা দেশের সৌভাগ্য যে, কিছুকাল যাবৎ এইরূপ অদেশী ঔষধ প্রস্তুত হওয়ার দেশবাসীর আশেব কল্যাণ সাধিত হইতেছে। বেঙ্গল কেমিকেল, ঢাকা শক্তি ঔষধালয়, কলিকাতা রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রভৃতি কতকগুলি কারখানা এইরূপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ‘ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস’ নামে এইরূপ একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। রোগ-প্রতিষেধক অদেশী ঔষধ যতই প্রস্তুত হইবে ততই মঙ্গল।

এলাহাবাদে শোকসভা—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে এলাহাবাদে কবি অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পরলোকগমনে একটি শোকসভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় দেড় শত স্থানীয় প্রবাসী বাঙালী মহিলা সভায় যোগদান করেন। কবি অতুলপ্রসাদের জীবনী ও কবিতাদি সম্বন্ধে সভায় বক্তৃতা হইয়াছিল।



ডিক্টেটর বা স্বেয় শাসক

ইংলণ্ডে ৭১ বৎসব ধরিয়া স্টেটসম্যান্ ইয়াব-বুক নামক একটি বার্ষিক নানাতথ্যপূর্ণ পুস্তক বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার সহিত অবগু কলিকাতার স্টেটসম্যান্ কাগজেব কোন সম্পর্ক নাই। বর্তমান ১৯৩৪ সালে যেখানি বাহির হইয়াছে, তাহাব ভূমিকায় সম্পাদক বলিতেছেন :-

"A statesman surveying the world at the end of the first quarter of 1934 would be struck by the fact that an increasing number of countries is being ruled by Dictators, and that many countries have so changed their constitution as to grant enlarged powers to the executive."

তাৎপর্য। "১৯৩৪ সালের প্রথম তিন মাসের শেষে কোন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ পৃথিবী পবিবিক্ষণ করিলে এই তথ্যটি তাহার মনে মুদ্রিত হইবে, যে ক্রমশঃ অধিকতবসংখ্যক দেশ স্বৈয় শাসকদের দ্বারা শাসিত হইতেছে এবং অনেক দেশ নিজ মূল রাষ্ট্রবিধি একপ ভাবে পরিবর্তিত করিবাছে, যে, তাহার দ্বারা কর্মনির্বাহকদিগকে বিস্তৃততব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।"

ইহা সত্য কথা। পৃথিবীর অনেক দেশের অবস্থা এইরূপ হওয়াব একটা রব উঠিয়াছে, যে, গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীব পরীক্ষায় বুঝা যাইতেছে, যে, উহা ব্যর্থ এবং অকাজে। প্রকৃত কথা কিন্তু এই, যে, গণতান্ত্রিকতার পরীক্ষা ঠিক মত হয়ই নাই। ইহার ঠিক পবীক্ষা করিতে হইলে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়া আবশ্যক। কেবল বর্ণপরিচয় বা লিখনপঠনক্ষমতা এই শিক্ষা নয়। তাহার সঙ্গে হিসাব করা বা বাখা বোগ কবিয়া দিলে বতরুকে শিক্ষা হয়, তাহাও যথেষ্ট নহে। সর্বসাধারণের মধ্যে, বাহার বুদ্ধিতে ও রুচিশ্রুতি অনুসাবে যতটা শিক্ষালাভেব সম্ভাবনা আছে, তাহার ততটা শিক্ষা পাওয়া দরকার, এবং তন্নিম্ন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষার পর যদি কোন দেশেব লোক রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য পালনে সতত অবহিত থাকে, তাহা হইলে সে দেশে গণতন্ত্র কখনই

ব্যর্থ হইবে না, সে দেশেব লোকদের স্বাধীনতা বহিঃশত্রু বা অন্তঃশত্রুব দ্বারা বিলুপ্ত হইবে না।

মানুষেব বেগন শ্রমশীলতা আছে, তেমনই আলস্তে কাল কাটাইবাব ইচ্ছাও আছে। যখন রাষ্ট্রিক কর্তব্য সাধনে মানুষ আলস্ত করে বা অসমর্থ হয়, তখন দেশের বাহির হইতে আগত বা দেশেব মধ্যস্থ একপ লোকদের অভাব হয় না বাহাদেব দ্বাব দেশেব স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। ইংবেঙ্গীতে যে একটি কথা আছে, "Eternal vigilance is the price of liberty," "সদা জাগ্রত অশেষ সতর্কতা স্বাধীনতাব মূল্য," তাহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কয়েক বৎসব অন্তর প্রতিনিধি নির্বাচনের সমব একবাব ভোট দিয়া, তাহাব পর প্রতিনিধিরা কর্তব্য সাধন করিতেছেন কিনা, সে দিকে দৃষ্টি না বাখিলে, সামান্য মিউনিসিপালিটিব কান্নই ভাল করিবা হব না, রাষ্ট্রেব কাজ ত দুবেব কথা।

যে-সব ডিক্টেটর বা স্বেয় শাসকদের কথা হইতেছে তাহাদেব ও স্বেয় নৃপতিদের মধ্যে একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। স্বেয় নৃপতিরা হয় উত্তবাধিকারস্থত্রে রাক্ষস প্রাপ্ত হয় ও নিজেব প্রভুত্ব নিজেব বংশধরদিগকে দিয়া যাইতে চায়, কিংবা স্বয়ং সিংহাসন ও রাজত্ব দখল কবিবা বংশধরদিগকে তাহা দিয়া যাইতে চায়। ডিক্টেটররা গোড়ায় দেশেব লোকদের ভোটব জোবেই প্রভুত্ব অধিকার কবে এবং তাহার জোবে পবে দেশেব লোকদের মধ্যে স্বাধীনচিত্ত বিরুদ্ধবাদী লোকদের উপব অত্যাচার করে, কিন্তু নিজেব প্রভুত্ব নিজ বংশে পুঙ্খানুপুঙ্খে স্থায়ী করিবা চেষ্টা সাধারণতঃ ডিক্টেটররা করে না, করিলেও সেদপ চেষ্টা সাধারণতঃ সফল হইবাব কথা নয়। কাহাকেও স্বেয় নৃপতি থাকিতে বা হইতে দেওয়া এবং কাহাকেও ডিক্টেটর হইতে ও থাকিতে দেওয়া কোন দেশের লোকদেরই উচিত নহে। কোন দেশে স্বেয় নৃপতি কিংবা স্বেয় শাসক

থাকিলে তাহার দ্বারা সে দেশের লোকদের আলস্য, অসামর্থ্য ও অযোগ্যতা সূচিত হয়।

ভারতবর্ষে ডিক্টেটরত্ব

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ইংবেজ জাতি ইহার শাসনকর্তা। ইংরেজদের শাসন থাকিতে এ দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেমন হইতে পারে না, সৈর শাসকের প্রাজ্ঞতাবও সেই রূপ হইতে পারে না। তবে যদি ইংলণ্ডেই কেহ ডিক্টেটর হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ডিক্টেটরও সে কিংবা তাহার অনুগত কোন লোক হইতে পারিবে। ইংলণ্ডে যে ডিক্টেটরের আবির্ভাব হইতে পারে না, এমন নয়। গত মহাযুদ্ধের সময়, নামে না হইলেও, কার্যতঃ মিঃ লস্লেড জর্জ ডিক্টেটর হইয়াছিলেন। আজকালও ইংলণ্ডে যে ক্যাশিষ্ট দল গড়িবাব চেষ্ঠা হইতেছে, তাহাব পরিণামেও ইংলণ্ডে ডিক্টেটরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অল্প যে-সব ইউরোপীয় দেশ এখন ডিক্টেটরের অধীন, তাহাদের ডিক্টেটররাও গোড়া হইতেই সৈর শাসক হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে নাই, ক্রমশঃ সব ক্ষমতা আয়সাৎ করিয়াছে। ইতালীতে প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদী (socialists) ও নাম্যবাদীদের (communistsদের) বিরুদ্ধে কালকোর্তা-পরিহিত ক্যাশিষ্ট দল গঠিত হয়। তাহাদের নেতা মুসোলিনি পরে ডিক্টেটর হইয়াছেন। ইংলণ্ডে স্তর অসোআল্ড মোসলী (Sir Oswald Mosley) কালকোর্তা দল গড়িতেছেন। এখনই এই দলের কর্মিষ্ঠ ও চাঁদা দাতা ১৭০০০ সভ্য হইয়াছে। ইংলণ্ডের “স্বাধীন শ্রমিক দল” যখন খুব প্রভাবশালী, তখনও ইহার দ্বিগুণের চেয়ে বেশী সভ্য তাহাব ছিল না। সুতরাং অল্প সময়ই যখন ব্রিটিশ ক্যাশিষ্ট দলের এত সভ্য জুটিয়াছে, তখন অচিরে তাহা আবও প্রভাবশালী ও পুষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার সভ্যদের অনেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক। তাহারা আধ-জঙ্গী (অর্ধনাসরিক) কুচ-কাওয়ারাজ করে, তাহাদের কয়েকটি সঁজোআবুল গাড়ী (armoured cars) আছে, এবং আপাততঃ পাঁচ-ছয়টি এরোপ্লেন লইয়া তাহারা বিমানবাহিনী গঠন করিতেছে। যাহা হউক, ইংলণ্ডে কেহ ডিক্টেটর

হইলেও ভারতবর্ষে ডিক্টেটর তখন তখন কেহ হইবে না। আমরা অন্তবিধ ডিক্টেটরের কথা বলি।

অসহযোগ আন্দোলনের গোড়া হইতে, নামে না হইলেও কাজে, মহাত্মা গান্ধী ডিক্টেটর আছেন। উহা যখন জোবে চলিতেছিল এবং যখন উহার প্রতিকূল আইনেও জন্ত কংগ্রেস-সমিতিগুলির অধিবেশন সম্ভবপব ছিল না, তখন অসহযোগীরা অগত্যা প্রাদেশিক ও জেলাব ডিক্টেটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি ডিক্টেটর অসহযোগ আন্দোলনের সকল অবস্থাতেই গান্ধীজী ছিলেন। ইহা কতটা তাহার অভিপ্রেত ছিল, কতটা বা তিনি ইহাতে সায় দিয়াছিলেন বলিয়া ঘটিয়াছে, বলা যায় না। কিন্তু তিনি এখন ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন, এবং যে-সব কারণে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিবেন বলিতেছেন ইহা তাহার মধ্যে একটি। তাহাতে কংগ্রেসেব ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহার আলোচনা আমরা করিব না; কিন্তু ইহা স্পষ্ট, যে, এমন অল্প কোন কংগ্রেসনেতা নাই, যাহার পরিচালনা গান্ধীজীর পরিচালনা যত লোক মানে, তত লোক মানিবে; সুতরাং কংগ্রেসে আবও দল বাড়িবার সম্ভাবনা ঘটিবে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, নানা লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে, যে, আমাদের দেশে স্বরাজ স্থাপিত হইলে ডিক্টেটরত্ব স্থাপিত হইবাব সম্ভাবনা আছে।

ভারতবর্ষে গুরুবাদ বড় প্রবল। হিন্দু সমাজেব নানা সম্প্রদায়ে ত গুরু আছেনই, মুসলমানদের মধ্যেও গুরুস্থানীয় নানা পীর আছেন—আগা খাঁ ত এক জন খুব প্রভাবশালী ও বিত্তশালী গুরু। অতএব, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও এদেশে গুরুস্থাপী ডিক্টেটর বেশ মানানসই হইবে। ইহাতে আমরা ভীত। প্রত্যেক মানুষকে ভগবান বুদ্ধি দিয়াছেন। তাহার ব্যবহার করা সকলেরই কর্তব্য। ধর্মবিধয়েই হউক, আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই হউক, বকলম দেওয়া বেশ আরামদায়ক বটে। কিন্তু তাহা কুফলপ্রদ।

যুদ্ধ ও রাষ্ট্রিক আন্দোলন

যুদ্ধের সময় নেতার হুকুম মানা দরকার। না মানিলে যুদ্ধে জয় হয় না। এই জন্ত সৈনিকদের এই বাধ্যতা, এই নিয়মানুবর্তিতা প্রাথমিক পাইয়াছে। ইংরেজদের সহিত ঝগড়ের ক্রিমিয়ান যুদ্ধে ইংরেজদের লাইট ব্রিগেড হয়ত বুঝিয়াছিল, যে, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে তাহারা যে হুকুম পাইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত।* তথাপি ব্যাল্যাকলাভার যুদ্ধে ছয় শত বোদ্ধা অগ্রসর হয় এবং অধিকাংশ মারা পড়ে। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া টেনিসন তাঁহার ‘চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড’ কবিতা লিখিয়াছেন—লিখিয়াছেন—

‘Forward the Light Brigade!’
Was there a man dismay’d?
Not though the soldier knew
Some one had blundered:
Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,
Theirs but to do and die:
Into the valley of Death
Rode the six hundred.

তাৎপর্য। ‘হও আওয়ান, লাইট ব্রিগেড’ এ হুকুমে তারা কেউ কি ভয় পেয়েছিল? না, যদিও তারা বুঝেছিল কারও ভুলে এমন হুকুম হয়েছে। জবাব দেওয়া তাদের কাজ নয়, যুক্তিতর্ক করা তাদের কাজ নয়—তাদের কর্তব্য ছিল কেবল হুকুম তালিম করা ও মরা। তাই সেই ছয় শত বোদ্ধা বৃথাই উপত্যকায় বোড়ার সওয়ার হয়ে এগিয়ে গেল।

যুদ্ধকালে সৈনিকদের এই যে নিয়মানুগতা ও বাধ্যতা, ইহা ভারতীয় কোন কোন বাস্তবনৈতিক নেতা বাস্তবনৈতিক প্রচেষ্টাতেও দেখিতে চান। কিন্তু বাস্তবনৈতিক প্রচেষ্টা ঠিক যুদ্ধ নয়। স্তব্ধতা যুদ্ধের সময় কোন সৈনিক যেমন হুকুম না-মানিলে সামরিক আদালতের বিচারে বা বিনা-বিচারেও তাহাব প্রাণদণ্ড হইতে পারে, বাস্তবনৈতিক প্রচেষ্টায় দলের কোনও সভ্য হুকুম না মানিলে তাহার তেমন কিছু শাস্তি (অবশ্য প্রাণদণ্ড নহে!) হইতে পারে না।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, কেহ কোন বাস্তবনৈতিক দলের সভ্য হইলে সেই দলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী তাহাকে মানিতে হইবে, না-মানিলে তিনি সভ্য ছাড়িয়া দিবেন, কিংবা সভ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু দলের

* হুকুমটা যে ভ্রান্তিগ্রস্ত তাহা ইংরেজদের দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই কাণ্ডে এক জন করাসী সেনাপতি অথারোহী লাইট ব্রিগেডের প্রচণ্ড বোম্ব শত্রু আক্রমণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ‘ইহা খুব জমকাল চমকপ্রয় ব্যাপার, কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে (‘It is magnificent but it is not war’)

কার্যনির্বাহক কমিটির জন চার-পাঁচ লোক একটা কিছু নির্দাণ করিলেই তাহা দলেব মূল উদ্দেশ্যের ও নিয়মাবলীর অঙ্গীভূত হইয়া যায় না, তাহা না-মানিলে দলেব নিয়ম ভঙ্গ হয় না। অথচ দেখিতেছি, ক্রীমতী সর্বোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল প্রভৃতি ‘ডিসিপ্লিন চাই, ডিসিপ্লিন চাই’ (নিয়মানুগতা চাই, নিয়মানুগতা চাই), বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিব জন চার-পাঁচ মানুষ সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোয়ারা সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতেই ত কংগ্রেসের আদর্শেব বিরোধী কাজ করা হইয়াছে। স্তব্ধতা ডিসিপ্লিনেব আবশ্যক যদি কাহাবও হইয়া থাকে, ত তাহা তাঁহাদেরই। এক গণ্ড বা দেড় গণ্ড মানুষ যাহা স্থির করিবেন, তাহাই সকলকে মানিতে হইবে, কংগ্রেসেব আদর্শ ও নিয়মাবলীর মধ্যে এমন কোথাও কিছু লেখা নাই। আমরা যদি কংগ্রেসেব সভ্য হইতাম, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক ভাগবীটোয়ারা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটিব নির্দাণ কখনই মানিতাম না।

যুদ্ধে যে অনেক সৈনিক নেতার হুকুম ভ্রান্ত জানিয়াও, মরণান্ত বাধ্যতা দেখায়, তাহাতে তাহাদের সাহস ও বশ্যতা প্রমাণিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যাহা মানুষকে নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অগ্রাহ করিয়া অন্তর হুকুম মানিতে বাধ্য কবে, সেদপ জিনিষ ভাল নয়। যুদ্ধ সেইরূপ একটা জিনিষ। স্তব্ধতা যুদ্ধের অবিচারিত বাধ্যতা শাস্তিকালীন কোন প্রচেষ্টায় আমদানী করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেব দ্বাদশ অধিবেশন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় হইবে, ইহা পাঠকেবা খবরেব কাগজে দেখিয়া থাকিবেন। এবারকার অধিবেশনের জন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টেব অবসরপ্রাপ্ত জজ স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টেব প্রধান বিচারপতির কাজও কিছু দিন করিয়াছিলেন। তাহার বিচক্ষণতা উপলক্ষ্যে স্যার তেজবাহাদুর

সাপ্তাহিক মত প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যক্তি মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের আইনজ্ঞান, স্বাধীনচিন্তা ও নিরপেক্ষ বিচার-ক্ষমতার বর্ণনা করেন এবং বলেন, যে, তিনি এক জন 'গ্রেট জজ' (মহৎ বিচারপতি)। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের জন্ত বিচক্ষণতার সহিত দীর্ঘকাল বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে।

এই সম্মেলনের নাম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইলেও ইহাতে বাঙালীর সংস্কৃতির শিল্প বিজ্ঞান সঙ্গীত প্রভৃতিরও আলোচনা হইয়া থাকে—কেবল বাঙ্গালীতির আলোচনা হয় না, হইতে পারে না; কারণ গবর্নমেন্টের কর্মচারী অনেকে ইহাতে বোগ দিয়া থাকেন।

কলিকাতায় ইহাব অধিবেশন এই উদ্দেশ্যে করা হইতেছে, যে, বাহাতে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা মিলিত হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার উদ্বোধন কবিত্তে স্বীকৃত হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে অনেক বাঙালী আছেন। তাঁহারা সম্মেলন উপলক্ষ্যে যত অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আগমন করিবেন, অধিবেশন তত অধিক সফল্যলাভ কবিবে। কলিকাতার অধিবেশনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সকলকে সাদর ও সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে বহু লক্ষ লোককে নিমন্ত্রণ করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য সংবাদপত্রের মারফতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বঙ্গের সকল বাঙালীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বঙ্গের সব বাঙালীকে বঙ্গের বাহির হইতে আগত অতিথিদিগের আদরযত্ন করিতে হইবে। আমরা বঙ্গের বাহিরে গেলে প্রবাসী বাঙালীরা বৈরুপ আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত হইলেও আদর্শস্থানীয় নিশ্চয় বটে। বঙ্গের বাঙালী সমাজ মনোযোগী হইলে কিছু অতিথিসংকার আমরা করিতে পারি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত

বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেকচারার নিয়োগ

খবরের কাগজে দেখিলাম, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে এক জন লেকচারার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই নিয়োগ হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়ের বোগ্যতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে 'আন্ততঃ সংস্কৃত-অধ্যাপক' নিযুক্ত করিলেই তাঁহার বোগ্যতার ঠিক আদর করা হইত। কলিকাতার দেশী প্রধান প্রধান দৈনিক এবং কোন কোন সাপ্তাহিক শাস্ত্রী মহাশয়ের বোগ্যতার বর্ণনা কবিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে বোগ্যতম বলিয়াছিলেন। অবশ্য, বোগ্যতম লোকেরাই যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ললিতকলার অধ্যাপক নিয়োগের সময় দেখা গিয়াছিল, যে, বোগ্যতা অপেক্ষা তদ্বির ও মুকুবিব দ্বারা বেশী ফল পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয় যে আর বিশ্বভাবতীর্থ বিদ্যাভবনের প্রিন্সিপ্যাল থাকিবেন না, ইহাতে বিবাদ অনুভব করিতেছি। বিশ্বভারতীর্থ ক্ষতি হইবে বলিয়া হুঁশিঁত হইতেছি। আশা করি শাস্ত্রী মহাশয় কোন-না-কোন প্রকারে বিশ্বভারতীর্থ সেবা ভবিষ্যতেও কবিত্তে পারিবেন।

বঙ্গ সন্ত্রাসনবাদ উচ্ছেদের বেসরকারী চেষ্টা

বঙ্গ সন্ত্রাসক দল যখন হইতে গঠিত হইয়াছে বলিয়া সন্ত্রাসক কার্য দ্বারা বুঝা গিয়াছে, তখন হইতেই খবরের কাগজের মারফতে এক সভাসমিতির বক্তৃতা ও প্রস্তাবের দ্বারা উহার বিরুদ্ধে বেসরকারী মত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তাহার উপর গত মাসে কলিকাতায় জনসাধারণের একটি সভায় সন্ত্রাসনবাদ উচ্ছেদের জন্ত একটি কার্য-প্রণালী ধার্য হইয়াছে। এই সভা ও তাহাতে নিযুক্ত কমিটির উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি

আছে। অবাস্তব কোন কোন বিষয়ে আমাদের বাহা বক্তব্য ছিল, তাহা অক্টোবর মাসের মর্ডার রিভিউ পত্রিকায় লিখিয়াছি।

গবর্নেন্ট বরাবরই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন যেন বেসরকারী লোকেরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট কিছু করেন নাই। উদ্যোক্তাদের কার্যপ্রণালী খুব ব্যাপক। তাঁহার কিছু কবিত্তে পারিলে গবর্নেন্ট তাহা যথেষ্ট মনে করিবেন কিনা, আগে হইতে বলা যায় না।

কিন্তু বেসরকারী পক্ষের এই ধারণাটাও গবর্নেন্টের তুলিয়া না-বাওয়া দরকার, যে, গবর্নেন্ট দমনাত্মক আইন ও কাজ ছাড়া এমন আর কিছু করেন নাই বাহির দ্বারা সম্মানবাদের মূল নষ্ট হইতে পারে। উহার মূল উচ্ছেদ করিতে হইলে ভাবতবর্ষকে স্বশাসনের অধিকার দেওয়া আবশ্যিক, এবং সকল দিকে স্বা বয়সের লোকদের কার্যক্ষেত্র উন্মুক্ত করা ও বাধা অবশ্যক।

রামমোহন রায়ের স্মৃতি

১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরে পরলোকগমন করেন। প্রতিবৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের অনেক নগরে ও গ্রামে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ত জনসাধারণের সভাব অধিবেশন হয় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের নানা দিক্ আলোচিত হয়। এ-বৎসরও তাহা হইয়াছে। সকল সভার উল্লেখ করা মাসিক কাগজের পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা ছটির উল্লেখ কবি।

দার্জিলিংয়ের সভায় ঐতিহাসিক স্মরণ যদুনাথ সরকার মহাশয় বাহা বলেন, তাহাব প্রতিবেদন এসোসিয়েটেড প্রেস এইরূপ দিয়াছেন :—

"It will be a wrong reading of the Raja's life to consider him as a type of wild passionate youth aspiring to be a nation's leader," said Sir Jadunath Sarkar, in presiding over a public meeting held yesterday evening at the local Brahma Mandir Hall to commemorate the death of Raja Rammohun Roy. Sir Jadunath added, "The Raja made long arduous preparations for his life's chosen task of founding a religion of concord. He went into the original sources of the chief religions of his day, by mastering Sanskrit, Arabic, English and Hebrew and probably some amount of Tibetan. Mere emotionalism could not have created for him such a commanding position in the world of thought. Emotion is like alcohol administered to a sinking patient; it can create a temporary stimulation, but if it is given as a

permanent diet, it promptly kills him.

"The Raja's success had a more solid foundation than frothy rhetoric. He was truly a pioneer—like the early North American explorers, who blazed a trail across the dark unknown and dangerous primitive forests to reach the West. At Rammohun's birth the old Indian civilisation was almost dead, and Rammohun was the prophet of a new Indian civilisation, uniting the best elements of the East and the West, so that the Hindu race did not perish in the new age, as the American Indians have done.

"In Europe the Renaissance and the Reformation were two distinct movements. But in India they were united in the person of Rammohun. All modern Indians, Hindus, Muslims, Brahmans and Christians, irrespective of their special creeds, are the heirs of the rich legacy of spiritual and intellectual culture left behind by Rammohun Roy."

Concluding, the speaker said, "To contemplate his life and achievements is to ennoble our minds like glimpses of the pure, lofty, serene Himalayan heights caught amidst our low daily surroundings."

তাৎপর্য। জাতীয় নেতা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপোষক অসংযত-ভাবোন্মত্ত ধাঁচের এক জন যুবক বলিয়া রামমোহনকে মনে করিলে তাঁহার জীবন ভুল বুঝা হইবে। মিলন ও সামঞ্জস্যের ধর্ম স্থাপনরূপ তাঁহার জীবনের নির্দ্বিধিত কার্যের জন্ত তিনি দীর্ঘকাল দুঃসাধ্য শ্রম দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সন্তুস্ত, আরবী, ইংরেজী, হিব্রু এবং সম্ভবতঃ কিছু তিব্বতী শিখিয়া তিনি তাঁহার সময়কাল প্রধান ধর্মগুলির মূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কেবল ভাবোচ্ছ্বাসপরাধতা চিন্তাবাজ্ঞা তাঁহাকে একপা উচ্চ স্থান দিতে পারিত না। ভাবাবেশ শ্রমসাধ্য রোগীকে প্রদত্ত স্বরাসদেবের মত। উহা সাময়িক উত্তেজনায় সজ্জিত করিতে পারে, কিন্তু উহা নিত্যগ্রহণীয় পাণ্ডুরূপে দিলে অচিরে তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।

রাজার কৃতকার্যতার সৌখিন বাগ্মিতা অপেক্ষা দৃঢ়তাবিশিষ্ট উপব নিশ্চিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত পথনির্ধারতা অগ্রদূত ছিলেন। রামমোহনের জন্মকালে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা মৃতপ্রাণ হইয়াছিল। রামমোহন নূতন এক ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্তক হইয়াছিলেন, বাহ্যতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে, এবং বাহ্যের কলে নব যুগে হিন্দুজাতি লোপ পায় নাই।

ইউরোপের বেনেডিক্টিন (প্রাচীন সভ্যতার নব অভ্যুদয়) এবং রিকর্মেন্ট (ধর্মের ও সমাজের সংস্কার) দুটা আলাদা প্রচেষ্টা। কিন্তু ভাবতবর্ষে এই দুটি এক। রামমোহনের জীবনে মিলিত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান—সমুদয় আধুনিক ভারতীয়, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্মমত নির্বিশেষে, রামমোহনের আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদের উত্তরাধিকারী।

আমাদের দৈনিক জীবনের নিয়ন্ত্রণের পরিবেষ্টনের মধ্যে হিন্দুধর্মের উচ্চ প্রশাস্তি নির্মল শিখবসমূহের ঈশ্বর কৃপিক দর্শন যেমন আমাদেরকে উন্নত করে, তাঁহার জীবন ও অবদানপরম্পরার পরিচিন্তনও আমাদেরকে সেইরূপ উন্নততর লোকে লইয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে রামমোহন স্মৃতিসভার অধ্যাপক

কতিমোহন সেন শাস্ত্রী-এম-এ, বলেন,

সমগ্র হিন্দু-ভারত-সম্প্রদায়ের এই সমস্ত পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করিয়া পাইব। এমন একটি সময়ে ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ

সম্মানের স্মৃতির প্রতি প্রকট প্রমাণ নিবেদন করিবার সুযোগ হওয়ার ভাবই হইয়াছে। রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত মহামানবত্বের বীজিতে সমুদাসিত। তাই তিনি দেশকে একটি পৌরবন্দ্য লোকের দিকে লইয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক সেন বলেন, তাঁহার বিশ্বাসী-বুধা-উত্তবোত্তর বুদ্ধি পাইয়া অবশেষে সেই নিত্যজ্ঞানময়ের চরণেই তাঁহার নম্র দেহ উৎসর্গীকৃত হয়। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানানুরাগের তুলনায় দেশপ্রেম ছিল আরও অধিক। তাই তিনি জগতের নিকট দেশের সর্বদা বুদ্ধিব জন্ত আত্মাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি সাহসের উপর ভর করিয়া নতুন যুগের সূচনাকল্পে কামেব জ্ঞক আহ্বানে একটা নতুন ভাব-ধারা বহন করিয়া আনিলেন, সেই ছিল তাঁহার জীবনের একটা যুগ-প্রবর্তনকারী শুভ মুহূর্ত। এই সময় দেশে সহসা বাহির হইতে একটা নতুন ভাবের বজ্র প্রবেশ করিয়া দেশবাসীকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটাৎ মুগ্ধ ও বিমোহিত করিল। তাহারই জন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল এই মহামানবের। জাতীয় ইতিহাসের ইহা ছিল অতিশয় সঙ্কটমুহূর্ত; পুরাতন বাহ্যিকিছু ছিল, তাহার বিকল্পে চলিতেছিল একটা মারাত্মক অভ্যাস। পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্পর্কে ইহারা আসিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষের বহিঃ প্রক্ষলিত হইতে লাগিল। এই সময় আসিলেন রামমোহন। তিনি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিগত এবং অসামান্য-বুদ্ধিবলে হৃদয় নাবিকের মত এই বিজ্ঞান শ্রোতাবর্ষ হইতে জাতীয় ভাবধারাকে একটা হুনিয়ত্রিত পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতিগত পরাজয়ের ধানি হইতে ভারতকে রক্ষা কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামমোহন প্রাচীন আদর্শকে একেবারে বর্জন করেন নাই। ঐক্লপ কোনও ভাব তাঁহার মনে স্থানও পায় নাই। কারণ, ভারতের বিশাল ধর্ম-ঐক্যবলা পাঠ করিয়াই তিনি পরিপুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধর্মের মূলমন্ত্রকে আধুনিক জ্ঞানালোকের সাহায্যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। তাহা সংস্কারবাদী ও সনাতন উত্তরের পক্ষেই মঙ্গলজনক হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা চেষ্টাধারা তিনি জীবনের একটা নতুন আদর্শ সৃষ্টি করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা ভারতের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

অধ্যাপক সেন আরও বলেন, যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রামমোহনের বিশেষ দান রহিয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেমের কথা পুনরায় বলা নিত্যাঙ্গাজন। জাতীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকারকল্পে তিনিই প্রথম ইংলণ্ডে গিয়া আলোচন করিলেন। শিক্ষাসম্পর্কে তিনি ইংলণ্ডে যে প্রস্তাব প্রেরণ করেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাংলা গদ্যসাহিত্যেও তাঁহার দান কম নহে।

উপসম্বোধে অধ্যাপক সেন বর্তমান ভারতের যুবকদিগকে এই মহৎ জীবনের ভাবধারা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবার জন্ত অনুরোধ করেন।—আনন্দবাজার পত্রিকা

শ্রু. চারুচন্দ্র ঘোষ

শ্রু. চারুচন্দ্র ঘোষ অনেক বৎসর ধরিয়া হাইকোর্টের জজিয়তী করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে চারিবার প্রধান বিচারপতির কাজ স্বাক্ষরী ভাবে করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে স্থায়ী দেশী প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। শ্রু. শাদীলাল।

বঙ্গে যে কোন দেশী লোক স্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ পান নাই, তাহা যোগ্যতার অভাবে নহে। জজ হইবার পূর্বে যখন শ্রু. চারুচন্দ্র উকীল ও পবে ব্যারিষ্টার ছিলেন, তখন রাজনীতিক্ষেত্রেও সার্বজনিক হিতকর্মের সহিত তাঁহার কর্মময় যোগ ছিল; জজ হইবার পরেও বাস্তবনৈতিক ভিন্ন অল্পবিধ অনেক দেশহিতকর কার্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। এইরূপ আশা ছিল, যে, তিনি জজিয়তী এবং পরে বঙ্গীয় শাসনপরিষদের সভ্য হুইয়া দিবার পর স্বাস্থ্যলাভানন্তর অংবার রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও উদারনৈতিক দলেব সঙ্গে যোগ দিয়া কাজ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা পূর্ণ হইল না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ অতিক্রম করিয়াছিল।

কুমার মনুধনাথ মিত্র

কুমার মনুধনাথ মিত্র পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ হইয়াছিল। দেশহিতকর অনেক কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বঙ্গবিভাগের পর যখন জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়, তখন তিনি তাহাতে অনেক টাকা দিয়াছিলেন এবং টাকা সংগ্রহের জন্ত থালি পায়ে ঘারে-ঘারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থিত সঙ্গীতসমাজের গৃহে তিনি চব্বাষ হুতা কাটা শিখাইবার জন্ত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ঝামাপুকুরে তাঁহাদের বংশের প্রাসাদে অনেক দরিদ্র ছাত্র ও অন্ত্র দরিদ্র লোক প্রত্যহ আহাৰ পাইত ও অনেক বোগী ঔষধপথ্য পাইত। গরিব লোকদের এই উভয়বিধ সেবার কাজ সেখানে এখনও হয়। ইহা স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। কুমার মনুধনাথ সাহিত্যানুরাগী এবং মণিরত্ন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও সুনির্বাচক ছিলেন।

মর্ডান রিভিউ সম্বন্ধে ডক্টর সাণ্ডাল্যাণ্ডের মত

আমেরিকার ভারতবন্ধ ধর্মচারী ডক্টর সাণ্ডাল্যাণ্ডের নাম শিক্ষিত ভারতীয়দের নিকট সুবিদিত। তাঁহার বয়স তিরানব্বই বৎসর হইয়াছে, অথচ তিনি এখনও নতুন

গ্রন্থ লিখিতেছেন এবং আমেরিকার ও ভারতবর্ষে অনেক কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তিনি সম্প্রতি মডার্ণ রিভিউ

ও প্রবাসী সম্পাদককে এই চিঠিখানি লিখিয়াছেন :—

Editor of "The Modern Review,"
Calcutta, India.

MY DEAR SIR:

I have long had in mind sending you some brief words expressing my high appreciation of the monthly magazine which for so many years you have edited and published: I have taken it almost from the beginning of its issue, and consider it indispensable. It is a constant wonder to me on account of the breadth and wealth of its contents, covering as it does, and with such intelligence, the wide fields of politics, history, literature, art, education, economics, industries, social reform and religious reform. I speak with care when I say, that we do not have in America, nor is there in England, any monthly review that covers so wide a field, and does it with such accuracy of scholarship and at the same time so interestingly. One might well suppose that your Review would confine itself to Indian affairs. As a matter of fact, it gives a larger amount of important Indian matters than any other periodical with which I am acquainted, while at the same time it takes the world for its field, and is surprisingly rich in information regarding everything of most importance that is going on in all countries.

It ought to have a large circulation in foreign lands, as well as in India. I know of no other periodical that so truly and adequately represents the real India, giving to the world what the world ought to know about India's civilization, her great past, the present condition of her people, the real nature and effects of British rule, and the meaning of her great struggle for freedom.

I regard *The Modern Review* as not only an invaluable asset to India; but as a messenger to the outside world, the importance of which increases with every year of its publication.

My dear Mr Chatterjee, I trust you will pardon these frank words from me, which I am sure will surprise you. But my personal debt to your able monthly is so great that I could not forgive myself if I refrained longer from expressing them.

Sincerely,
J. T. SUNDERLAND.

New York,
September 1, 1934.

ভারতবর্ষে ডক্টর সাগল'গাও "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" নামক গ্রন্থে লেখক বলিয়াই পবিচিত। কিন্তু তিনি "দি অরিজিন এণ্ড ক্যারাক্টার অব দি বাইবল," "ইণ্ডিয়া ইন ওয়াল্ড ব্রাদারহুড," "রিলিজিয়ন এণ্ড ইভলিউশ্যন," "এমিনেন্ট গ্যামেরিকান্স্ হু ইণ্ডিয়া অট টু নো," প্রভৃতি আরও অনেক বই লিখিয়াছেন। এখন পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম সম্বন্ধে একখানি এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষী এমার্সন সম্বন্ধে একখানি বই লিখিতেছেন।

শান্তিনিকেতনে চৈনিক অধ্যাপকদ্বয়

ইউনাইটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন—

বিশ্বভারতীয় কর্মসূচি গ্রহণের রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক তান ইউন সান এবং অধ্যাপক চেন ইউ-সেনকে চীনে প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে এক প্রীতিভোজে সন্মিলিত করেন। উক্ত অধ্যাপকগণ চীন-ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত বিদ্যুৎসেখর শাস্ত্রী তাঁহাদের শুভবাচনা কামনা করেন এবং চীন-ভারতীয় সংস্কৃতির ত্রাতৃৎ-বন্ধন বৃদ্ধিকল্পে তাঁহারা যে অল্পাংশ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই চীন বন্ধুত্বের সত্য সত্যই প্রভু বুদ্ধের বাণীতে অন্তর্গত। প্রভু বুদ্ধ এক সময় তাঁহাষ শিষ্যবৃন্দকে বাণী প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাও তাহাই কবিত্তেছেন। বক্তা আশা করেন যে, তাঁহাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে। তিনি আরও আশা করেন যে, সেই সময় খুব দূরবর্তী নহে, যখন ইহাদের চেষ্টায় চীন ও ভারত জগতের শান্তি ও স্বথের জন্য একযোগে কাজ করিবে।

অধ্যাপক চেন মিঃ ঠাকুর ও বিশ্বভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দকে তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ দেন। কবি রথীন্দ্রনাথ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেসকল বক্তৃতা করিয়াছেন ও রচনা তাঁহাকে তাঁহারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা বাহ্যতে কবি ও শাস্ত্রী মহাশয়ের আশীর্বাদের যোগ্য পাত্র হইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের কামনা। তাঁহার তদুচ্চ বিশ্বাস যে, তাঁহাদের সহযোগিতা ও সদিচ্ছা পাইলে তাঁহারা শান্তিনিকেতনে একটি চীন নগর নির্মাণ কবিত্তে সমর্থ হইবেন। সেখান চীন ও ভারতীয় কৃতী ছাত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া উভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন।

অধ্যাপক তানও অমুগ্ধ বক্তৃতা করেন। আপাততঃ-বিদ্যাব-সম্ভাবনাস্তে সকলে প্রস্থান করেন।

অধ্যাপকগণ কলিকাতা হইতে ২৮ অক্টোবর চীনে বণন হইবেন।

লীগ অব নেশ্যন্সে রুশিয়ার যোগদান

রুশিয়া জেনিভার মহাজাতি-সংঘের (লীগ অব নেশ্যন্সের) সভ্য হইয়াছেন। লীগের সভ্য আর যত রাষ্ট্র আছে, সবগুলি ধনিকপ্রভুত্বের দেশ এবং বাহারা লীগে প্রভুত্ব করে তাহার। সাম্রাজ্যবাদী ধনিকপ্রভুত্বের দেশ। রুশিয়া শ্রমিকপ্রভুত্বের রাষ্ট্র। লীগের যে আধিবেশনে রুশিয়াকে তাহার সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাতে রুশিয়ার প্রতিনিধি লিটভিনক বলেন,

"নিজের কোন বিশেষ বর্জন না করিয়া এবং নিজ ব্যক্তিগত অটু রাশিয়া নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি স্বরূপ রুশিয়া লীগে যোগ দিয়াছে, এবং জগতে শান্তি স্থাপনার মহাজাতি-সমূহের মঙ্গলসাধার নিজেব ক্ষমতা ও সর্বত্র অনুভূত স্বাধীনতা অঙ্গীকার করিতেছে।"

লীগ ছোট ছোট কোন কোন জাতির স্বগড়া মিটাইয়া দিয়া যুদ্ধ নিবারণ করিতে পক্ষদয়ী, ইহা স্বীকার্য; কিন্তু

পরাক্রমশালী জাতিদের (যেমন জাপানের) বেলায় কিছু করিতে পারেন নাই। তা ছাড়া, সাম্রাজ্যবাদ জিনিষটাই যুদ্ধের-অন্ত প্রস্তুত থাকিবার এক প্রকার স্থায়ী অবস্থা ও ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের গবর্নেন্টসমূহ সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিয়া যদি নিজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে স্বশাসক করিয়া দেন, তাহা হইলে জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। নতুবা শক্তিশালী কোন দেশ অল্প কোন দেশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে গেলে যখনই লীগের কর্তারা যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির পক্ষে ওকালতী করিতে যাইবেন, তখনই সেই শক্তিশালী জাতি বলিবে, “তোমরা ত আগে আগে যুদ্ধ করিয়া নিজেদের সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছ, এখন আমাদের সেই প্রকার কাজে বাধা দাও কোন যুদ্ধে? আগে নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে স্বাধীনতা দাও, তাহার পর আমাদেরকে উপদেশ দিতে আসিও।” জাপান যে চীন সাধারণতন্ত্রের মাফুরিয়া প্রভৃতি বৃহৎ ভূখণ্ড কার্যতঃ গ্রাস করিয়াছে, কাহারও নিষেধ উপদেশ মানে নাই, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে উক্তপ্রকার মনোভাব।

কশিয়া লীগের সভ্য শক্তিশালী অল্প সব রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করাইতে পারিবে কি? না পারিলে শান্তি স্থাপিত হইবে না। কশিয়া অল্পদিগকে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করাইতে না-পারিয়া নিজেই যদি সাম্রাজ্যবাদী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার লীগপ্রবেশ ক্ষুণ্ণপ্রদ হইবে মনে হয় না।

লীগের সভ্য ভারতবর্ষ ও রুশিয়া

লীগ অব নেশন্সের একটি কার্যনির্বাহক সমিতি আছে; তাহার নাম লীগ কৌন্সিল। ইহার সভ্যসংখ্যা পনের। এই পনেরটির মধ্যে পাঁচটির আসন স্থায়ী ভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মেনী ও জাপানকে দেওয়া হইয়া আছে। জাপান লীগ ত্যাগ করার একটা আসন খালি হয়। তাহা রুশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ লীগের সভ্য হইলেই সে স্থায়ী ভাবে লীগ কৌন্সিলেরও সভ্য হইবে, এই স্তরে সে সভ্য হয়।

অন্ত দিকে, ভারতবর্ষ কখনো লীগে যোগ দিবে তাহা হইতেই

লীগের সভ্য; কিন্তু এ-পর্যন্ত লীগ কৌন্সিলের স্থায়ী সভ্য হওয়া দূরে থাক, এক বৎসরেরও অল্প অস্থায়ী সভ্যও তাহাকে করা হয় নাই। নিজের একটা ভোট বাড়াইবার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষকে গোড়া হইতেই সভ্য করাইয়াছে, কিন্তু কৌন্সিলের সভ্যদের মর্যাদায় পরাধীন ভারতবর্ষ উন্নীত হয়, তাহা গ্রেট ব্রিটেনের ইচ্ছা নহে। নতুবা গ্রেট ব্রিটেন প্রস্তাব করিলে অন্ততঃ একবারও ভারতবর্ষ কৌন্সিলের অস্থায়ী সভ্য নির্বাচিত হইতে পারিত।

রুশিয়ার স্বাধীনতা ও পরাক্রম এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও দুর্বলতা লীগে রুশিয়ার ও ভারতবর্ষের মর্যাদার পার্থক্যের কারণ।

ভারত সংস্কে লীগের ব্যবহার

সাতাশটি রাষ্ট্র লীগ অব নেশন্সের সভ্য। লীগের বার্ষিক খরচ যত হয়, তাহাকে ১০১৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক একটি ভাগকে য়ুনিট বা একক বলা হয়। শক্তি, মর্যাদা, ধনবস্তা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এক একটি রাষ্ট্রসভ্যকে কয়েকটি য়ুনিট চাঁদা দিতে হয়। ভারতবর্ষ দেয় ৬৬ য়ুনিট। ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী য়ুনিট দেয় আর কেবল পাঁচটি রাষ্ট্র। সুতরাং, শুধু ভারতবর্ষের বিশালতা ও লোকসংখ্যা হিসাবে নহে, তাহার প্রদত্ত চাঁদা হিসাবেও তাহার লীগ কৌন্সিলের সভ্য হইবার দাবি রহিয়াছে এই অধিকতর চাঁদাদাতা পাঁচটি মাত্র রাষ্ট্রের পরেই। কিন্তু, যেমন সংস্কৃত প্রবচনে বলে, “দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী,” তেমনি বলা যাইতে পারে, যে, পরাধীনতা-দোষে অল্প সব গুণ বা যোগ্যতা ধ্বংসিত হইয়া যায়।

লীগ যে ভারতবর্ষের প্রতি অনেক কর্তব্য করেন নাই, তাহা অনেক বার বলিয়াছি। ১৯২৬ সালে লীগের নিমন্ত্রণে জেনিভা যাইবার পর আমরাই বোধ হয় এদিকে সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লীগের একটা অবিচারের কথা আবার বলিতেছি।

লীগের খরচের ১০১৩ য়ুনিটের মধ্যে ৬৬টা য়ুনিট অর্থাৎ শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগের কিছু বেশী ভারতবর্ষ দেয়। অতএব লীগের অধীন চাকরির শতকরা সাড়ে পাঁচটা

ভারতীয়দের ভায়তঃ পাওয়া উচিত। কিন্তু মোটামুটি ৭০০ (সাত শ) টাব মধ্যে ভারতীয়েরা স্থায়ী ভাবে ছয়টাতে এবং অস্থায়ী ভাবে তিনটাতে নিযুক্ত আছে। শুধু স্থায়ী চাকবিশুই গণনাব মধ্যে ধরা উচিত। তাহা হইলে ভারতীয়েরা শতকরা একটি চাকবিও পায় নাই। যদি অস্থায়ী তিনটিও ধরা হয়, তাহা হইলে ভারতীয়েরা শতকরা ১৩.৩৮ চেয়েও কম চাকরি পাইয়াছে, অথচ চাঁদা দেয় শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগেরও বেশী। তন্নিম্ন, আবও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, ভারতীয়েরা লীগের কোন বিভাগ বা উপবিভাগেই উপবের কোন কাজ পায় নাই, অধস্তন চাকবিতাই নিযুক্ত আছে।

আফগানিস্থানের লীগ প্রবেশ

আফগানিস্থানও লীগ অব নেশনসেব সভ্য হইয়াছে। লীগের বে অববর্ণনে আফগানিস্থানের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়, তাহাতে আগা খাঁ ভারত-গবর্নমেন্টের অন্ততম প্রতিনিধি-রূপে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, “লীগ কেবল প্রতীচ্যের এবং একই ধর্মের (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মের) প্রতিনিধি হইবার আশঙ্কা থাকায় ইহার উদ্যোগ ও বিশ্বজনীন হইবার পক্ষে বাধা রহিয়াছে। অতএব তাহাব (আগা খানের) মত এক জন মুসলমানের বিবেচনায় আর একটি মুসলমান দেশের লীগের সভ্য হওয়া কম কথা নহে। আফগানিস্থানের লোকদের ধর্ম বাহা, ভারতবর্ষের ৭ কোটি লোকেরও ধর্ম তাই।”

ভবী ভুলবার নয়! লীগ অব নেশনসেবও ধর্ম অনুসারে বখরা চাই। কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাই, ওয়েটেসেব আশা নাই।

বাহাই হউক, ধর্মের কথা এখন উঠিয়াছে, তখন বলিতে হয়, যে, ভারতবর্ষে হিন্দু আছে প্রায় ২৪ কোটি, অন্ততঃ ও অল্পস্বল্প আছে, এবং হুইটেক্সবস্ র্যালম্যান্ডাক অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ২১ কোটির কিছু কম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য আছে কেবল নেপাল।

লীগ ও নেপাল

শৌর্য্যে ও লোকসংখ্যায় নেপালের চেয়ে নিম্নস্থানীয় কয়েকটি রাষ্ট্র লীগ অব নেশনসেব সভ্য। সুতরাং নেপালও তাহাব সভ্য হইতে পারে। তা ছাড়া, দাসবিগেব মুক্তিদানরূপ লীগেব একটি কর্তব্য, নেপাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিয়াছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত শাসনকর্তা। তাহাকে মহারাজা বল। বর্তমান মহারাজা যুধা শম্ভের জং বাহাদুর রাণা ইংলণ্ডে নেপালের দৌত্যের

ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ লীগ অব নেশনসেব সভ্য হইবাবও চেষ্টা তিনি করিবেন।

মীরা বেনের আমেরিকা যাত্রা

এক জন ইংরেজ নোসেনপতিব কন্যা কুমারী স্টেড্ মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য হন। তাহাব ভারতীয় নাম হয় মীরা বেন (ভগিনী মীরা)। তিনি বিলাত গিয়া শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের কাছে গান্ধীজীর বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের শ্রম্য দাবিব কথা তাহাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি গড়ে প্রত্যহ একটা এবং গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পঁয়ষট্টিটা সভ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে তিনি আশ্চর্য রেম্পল্ (সাড়া) পাইয়াছেন। এই সাড়াব অকপটতা ও ক্ষমতা ফল দ্বারা অনুমেয় হইবে।

এখন মীরা বেন আমেরিকায় গিয়া চৌদ্দ দিন থাকিবেন এবং সেখানে লোকদিগকে ভারতবর্ষ ও মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে সভ্য কথা শুনাইবেন। অবশ্য, সেখান হইতেও তিনি সম্ভবতঃ আশার কথা ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবেন। আমেরিকার ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্ দেশটার আয়তন তিন লক্ষ বর্গ মাইলের অধিক, ভারতবর্ষের দেড়গুণেরও বেশী। অতবড় দেশে চৌদ্দ দিনে কিছু কবা বড় কঠিন। তা ছাড়া, আমেরিকাতে সকল দেশের সকল লোকের কল্যাণকামী স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ অনেক থাকিলেও, আমেরিকান জাতিটা ভারতবর্ষেব জন্ত ইংলণ্ডের উপব চাপ দিবে, এরূপ আশা করা দুরাশা। প্রসিদ্ধ লেখক ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ড আমেরিকাব রাষ্ট্রিক (সিটিজেন)। তাহাব একটি অভিজ্ঞতা হইতে এ-বিষয়ে ভারতীয়দের সোধ খুলিতে পাবে। তাহাব বিষয় নীচে লিখিতেছি।

ভারতবর্ষ ও আমেরিকান পুস্তক-প্রকাশকগণ

সবাই জানেন, মিস্ মেনোব ভারতবর্ষের নিম্নাপূর্ণ বহির আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে কাটিতি খুব হইয়াছে। তাহাব বহি প্রকাশ করিতে তাহাকে কোনই কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। তাহাব অনুবাদও কয়েকটা ভাষায় হইয়াছে।

অন্ত দিকে ডক্টর সাণ্ডার্ল্যাণ্ডেব ভারতবর্ষ-বিষয়ক বহি প্রকাশের জন্ত তাহাকে কিন্নপ বেগ পাইতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে শুনুন। তিনি আমাদিগকে আমদেব কোন একটা জিজ্ঞাসা উপলক্ষে গত ৩০শে জুলাই লেখেন :—

“I tried 14 publishers before I found one that would touch my book, with one exception :

the Putnams would issue it and handle it for 6,000 dollars, but would guarantee nothing and would not advertise it. All were afraid of Britain. Copeland was sympathetic with India, but I had to pay him 2,000 dollars down, and 1,000 dollars more later on for advertising. In all, my book cost me over 4,000 dollars," etc.

তৎপর্য্য। “আমার বহি যে ছুইবে (অর্থাৎ কোন সন্তে প্রকাশিত করিতে রাজী হইবে) এ রকম কোন প্রকাশক পাইবার আগে আমি চৌদ্দ হাজার ডলার চেষ্টা করিয়াছিলাম—একটি ব্যক্তিক্রমস্থল আছে। পুটনামরা বলে, যে, তাহাদিগকে প্রকাশব্যয়-স্বরূপ ৫ হাজার ডলার দিলে তাহারা উহা প্রকাশ করিবে এবং দোকানে বাথিয়া কেহ চাহিলে দিবে, কিন্তু বহিখানাব বিজ্ঞাপন দিবে না এবং বিক্রীত থেকে যে খরচ কিছু উঠিবে বা কিছু লাভ হইবে, তাহাব গ্যারান্টি দিবে না। সকলেই ব্রিটেনের ভয়ে ভীত। কোপল্যান্ড (যে প্রকাশক বহিখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন) ভারতবর্ষের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু আমাকে তাহাকে আগাম দু-হাজার ডলার দিতে হইয়াছিল, এবং পবে বিজ্ঞাপনের জন্য আরও এক হাজার ডলার দিতে হইয়াছিল। সর্বসমেত, আমার বহিটির অন্ত আমাব চারি হাজার ডলারেরও উপর খরচ হইয়াছিল,” ইত্যাদি।

এক ডলার মোটামুটি তিন টাকার সমান।

ডাঃ সাণ্ডার্সাণ্ড ভারতবর্ষের অন্ত যে শুধু ইহাই করিয়াছেন, তাহা নহে, বিনা পারিশ্রমিকে বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের অনেক পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন।

খান আবদুল গফ্ফার খান

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসনেতা খান আবদুল গফ্ফার খান বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া শান্তিনিকেতনে তাঁহার পুত্রকে দেখিতে এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকাবের অন্ত সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সেখানকার ছাত্র। ইহা হইতেই তাঁহাব মনের ভাব বুঝা যায়। সেখানে কবি ও আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহার আন্তরিক সন্তোষ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অভ্যর্থনা হয়। ত্রিমুক্ত নন্দলাল বহু তাঁহার যে উৎকৃষ্ট রেখাচিত্রটি আঁকিয়াছেন, বহু মহাশয়ের সৌজন্যে এখানে তাহাব প্রতিলিপি দিতেছি।

খান সাহেব কলিকাতাতেও আসিয়াছিলেন এবং এখানেও তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়াছিল।

বাহাবা-ভীকতা বহু: মৃত্যুভয়ে বুদ্ধ করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষপাতের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কিন্তু পাঠানরা সেরূপ জাতি নহে। যুদ্ধের সাহসী পাঠানদের মধ্যে অহিংসা প্রচার করিয়া খান আবদুল গফ্ফার খান এক লক্ষ সভা

লাইয়া “খুদা-ই-খিনমদগার” (ঈশ্বরের সেবক) দল গড়িয়া ছিলেন। এই দলের মূলমন্ত্র ছিল অহিংসা। তাহারা



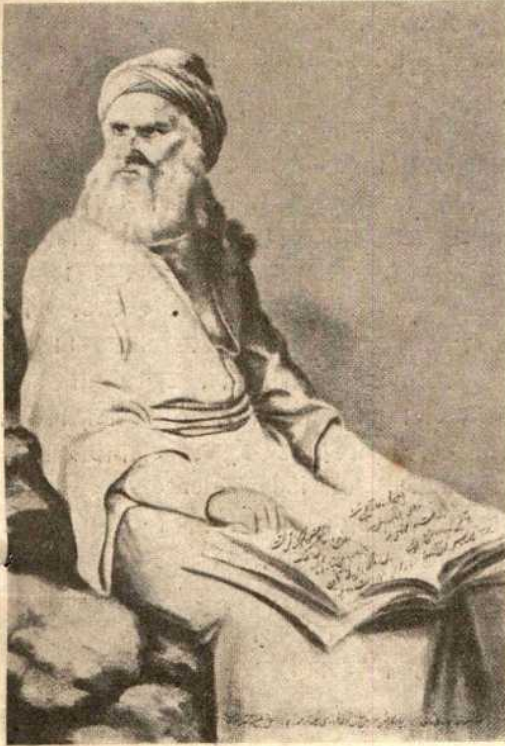
খান আবদুল গফ্ফার খান

লাল কোর্ভা পবিত বলিয়া তাহাদিগকে লালকোর্ভা দল বলা হইত, কিন্তু রক্তপাতের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

পারশ্ব মহাকবি ফিরদৌসীর সহস্রবার্ষিক জয়ন্তী

শাহ-নামা প্রণেতা মহাকবি ফিরদৌসীর জন্ম হয় প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে। পারস্যের বর্তমান নৃপতি রিজাশাহ্ পহলবী তাঁহার সহস্রবার্ষিক জয়ন্তী করিতেছেন। শাহ-নামা সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক প্রচলিত আছে, যে, গজনবীর সুলতান মামুদ বলেন, যে, ঐ মহাকাব্যের প্রত্যেক

হাজার শ্লোকের জন্ত এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কবিকে দিবেন। হুলতান প্রধান মন্ত্রীকে তদনুসারে আদেশ দেন। মন্ত্রী ফিরদৌসীকে দ্রব্য করিত। যখন মহাকাব্যটি সম্পূর্ণ করিয়া কবি তাহা হুলতানকে উপহার দিলেন, তখন মাহমুদ কবিকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে আদেশ করিলেন।



মহাকবি ফিরদৌসী

দ্রব্যায়িত মন্ত্রী স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে মোহর-করা কতকগুলি খলিতে করিয়া রৌপ্যমুদ্রা পাঠাইয়া দিল। যখন খলিগুণি ফিরদৌসীর গৃহে পৌঁছিল তখন তিনি স্নানাগারে ছিলেন। খলি খুলিয়া রৌপ্যমুদ্রা দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল হুলতান তাঁহাকে অপমানিত করিতে চাহিয়াছেন। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ হান্সামীকে (স্নানাগাররক্ষকে) ২০,০০০, শরবৎ-বিক্রেতাকে ২০,০০০ এবং যে দাস খলিগুলি আনিয়াছিল তাহাকে বাকী ২০,০০০ বখশিস দিলেন। দাসকে বলিলেন, “আমি ধনের জন্ত লিখি নাই, বশের জন্ত লিখিয়াছিলাম।” সমস্ত খবর হুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি উজীরের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু খুর্ত উজীর বলিল, “আপনি যাহা দিবেন, তাহাই সম্মান বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। অতএব, ফিরদৌসীর অত্যন্ত বেদাদবী হইয়াছে।” এইরূপ আরও অনেক কথা

বলিয়া উজীর পরিশেষে কবির প্রতি হুলতানের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে। ফলে কবিকে পলায়ন করিয়া নানা কষ্টভোগ করিতে হয়। কবিও হুলতানের সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপূর্ণ কবিতা রচনা করেন।

পরিশেষে হুলতানের রাগ পড়িয়া যায় এবং তাঁহার মনে কবির প্রতি দরার সঞ্চার হয়। তিনি তাঁহাকে ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন। এক দিন কবি বাজারে বেড়াইবার সময় শুনিলেন একটি বালক তাঁহার রচিত হুলতানের প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। তিনি মুর্ছিত হইয়া পড়েন, এবং গৃহে নীত হইবার পর একটিও কথা না বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন হুলতানের উপহার ৬০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পৌঁছে। কবির কবিতাকে তাহা দিতে চাহিলে তিনি এই বলিয়া তাহা লইতে অস্বীকার করেন, যে, তাঁহার পিতা তাঁহার জীবিত কালে যাহা গ্রহণ করেন নাই, সেই প্রত্যাখ্যাত উপহার গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অশোভন হইবে।

আরবদিগের দ্বারা পারস্ত বিজিত হইবার পূর্বেকার পারস্ত-নৃপতিগণের সম্বন্ধে শাহনামা মহাকাব্য রচিত। ইহা ছাড়া ফিরদৌসীর রচিত কতকগুলি কবিতা ও গজল আছে। তন্মিহীন তাঁহার যুযুৎ-উ-জুলেইখা নামক কবিতাও পারসীক সাহিত্যে সুবিদিত।

বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু

কলিকাতার কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক ইউনাইটেড প্রেসের মারফৎ প্রাপ্ত “রিকন্সিলিয়েশন” নামক বিলাতী মাসিকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ২রা অক্টোবর প্রকাশিত করিয়াছেন। উহা এয়ার মেলে (বিমান-ডাকে) প্রাপ্ত বলিয়া উপরে লিখিত আছে। “রিকন্সিলিয়েশন” কাগজের গত এপ্রিল সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়। আমরাও গত সেপ্টেম্বর মাসে ঐ সংখ্যা এক খানি পাই। এপ্রিলের কাগজ সেপ্টেম্বরে কেন পাইলাম বলিতে পারি না। ইউনাইটেড প্রেসই বা উহা সেপ্টেম্বর মাসে বিমান-ডাকে কেন পাইলেন, জানি না। তবে, উহা যখন সম্প্রতি এদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন সে-সম্বন্ধে কিছু বলি।

ঐ প্রবন্ধটি রিকন্সিলিয়েশনের এপ্রিল সংখ্যায় ১০৪-৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পরে ১০৫-৬ পৃষ্ঠায় “আদার ইণ্ডিয়ান ভিউজ” নাম দিয়া ঐ বিলাতী কাগজের ছ-জন পত্রপ্রেরকের চিঠি ছুখানি ছাপা হইয়াছে। বিলাতী কাগজখানি গোপনে ভারতবর্ষে আসে নাই, গবর্নমেন্টের ডাক-

বিভাগ উহা পৌছাইয়া দিয়াছে। উহা সন্ত্রাসকদের বা বিপ্লববাদীদের কাগজ নহে। বিলাতে “ফেলোশিপ অব রিকলিলিয়েন্সন” নামক একটি খ্রীষ্টীয় সমিতি আছে। উহা তাহার এবং অল্প কয়েকটি তৎসদৃশ খ্রীষ্টীয় সমিতির মুখপত্র। গবন্মেণ্টের গোয়েন্দা-বিভাগের ইহার অস্তিত্ব না-জানিবার কথা নহে।

প্রবন্ধটি যদিও ৬ মাস পূর্বে লিখিত ও পাঁচ মাসের অধিক পূর্বে বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি উহা সংপ্রতি বঙ্গ প্রকাশ করা অনাবশ্যক হয় নাই। কারণ, উহাতে গবন্মেণ্টের যে-যে কর্তব্য স্থচিত হইয়াছে, গবন্মেণ্ট তাহা পূর্বে না-করিয়া থাকিলেও, এখনও করিলে সফল কলিতে পারে।

মুভাষবাবু বলিয়াছেন, যখনই রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ক্ষমা করিবার কথা উঠিয়াছে, তখনই পুলিশের রাজনৈতিক শাখা তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কখনও যথেষ্ট সংখ্যায় উদ্ধারিত ও মহাপ্রাণতার সহিত মুক্তি দেওয়া হয় নাই, এবং যাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহাদেরও পশ্চাতে গোয়েন্দা-বিভাগের লোক সর্বদা একরূপ লাগিয়া থাকে, যে, তাহাদের ঐ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার অবস্থা প্রায় যন্ত্রণাভোগের অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং রাজকুমারে তাহাদের প্রাণ জুড়ায় না।

তিনি বলিয়াছেন, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নিদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু গবন্মেণ্ট তাহা করাইতে রাজী হন নাই। মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লেকটেক্টাণ্ট-কর্ণেল বার্কলে-হিল এই ধরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মুভাষবাবু বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইচ্ছা ছাড়া বঙ্গ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি কারণ, মেকলে যখন বাঙালী জাতির অপমানকর নিন্দা করিয়াছিল তদবধি বাঙালীদের জাতীয় হীনতা উৎপাদন চেষ্টা।

মুভাষবাবুর তৃতীয় কথা এই, যে, যদিও মধ্যে মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সহিত (যেমন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু প্রভৃতির সহিত) বুঝাপড়ার চেষ্টা গবন্মেণ্ট করিয়াছেন, কিন্তু বৈপ্লবিক দলের সহিত একরূপ বুঝাপড়ার চেষ্টা করেন নাই। তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন, যে, ভূতপূর্ব গবর্নর স্যার ষ্ট্যানলী জটকসন স্বর্গীয় বতীক্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যবর্তিতায় একরূপ বুঝাপড়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ, যে রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত কথা হইতেছিল তাহারা চাহিয়াছিলেন গবন্মেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা চালান, পুলিশের মধ্যবর্তিতা বা মারফতে নহে, কিন্তু গবন্মেণ্ট তাহাতে রাজী হন নাই।

মুভাষবাবু বলেন, বঙ্গের অনেকের আন্তরিক অনুভূতি এই, যে, বুঝাপড়ার প্রধান অন্তরায় পুলিশের রাজনৈতিক শাখা; তাহারা নিজেদের প্রণালী অনুসারে কাজ চালাইতে চায়, এবং অক্লান্ত ভাবে বলিয়া চলিয়াছে, বিপ্লবীরা অপরিতোষণীয় (“irreconcilable”)। উক্তের মুভাষবাবু বলেন, কংগ্রেসও ত পূর্ণ স্বাধীনতার কমে সন্তুষ্ট হইবে না বলিয়াছে, অতএব কংগ্রেসও অপরিতোষণীয়; অথচ গবন্মেণ্ট কংগ্রেসনেতাদের সহিত বুঝাপড়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই শ্বেদোক্ত কথাগুলি মুভাষবাবু ছয় মাস পূর্বে লিখিয়াছিলেন। তখন এগুলি যতটা সত্য ছিল, এখন ততটা নাই। এখনও কংগ্রেস-নেতারা বলিতেছেন বটে, যে, তাহাদের লক্ষ্য সেই পূর্ণস্বরাজ বা পূর্ণস্বাধীনতাই আছে; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ দ্বারা আংশিক স্বরাজের আন্দোলন চালান সম্ভবপর হইলেও, পূর্ণস্বরাজ তদ্বারা সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যাইতে পারে না। মুভাষবাবু কথাগুলি যখন লিখিয়াছিলেন, তখনও শাস্ত্রিক ভাবে, নামতঃ, তাহা সত্য থাকিলেও, বাস্তবিক সত্য ছিল না— কারণ মহাত্মা গান্ধী তৎপূর্বেই, স্বাধীনতার সারভাগ (“substance of independence”) পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন, প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন। এই সারভাগের একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত ডোমীনিয়ন স্টেটস্। ইহা অল্প সত্য, যে, স্বয়ং মুভাষবাবু, পণ্ডিত জগদাহরলাল নেহরু এবং অল্প কোন কোন নেতা বলেন নাই, যে, তাহারা সারভাগে রাজী হইবেন।

যখন দুই পক্ষে বিবাদ চলে, তখন পরস্পরের শক্তি-সামর্থ্য বুঝিয়া কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ আপোষে নিপত্তি করিতে অগ্রসর হয়। লর্ড আক্কাইন তাহার আমলে যে গান্ধীজীর সহিত একটা চুক্তি করিয়াছিলেন (যদিও সেই চ’লে কংগ্রেসের পরাজয় হইয়াছিল), তাহার কারণ, অসহযোগ-প্রচেষ্টা প্রায় জয়যুক্ত হইতে বসিয়াছিল। ইহা আমাদের কথা নহে, বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব গবর্নর লর্ড লয়েড এই কথা বলিয়াছেন। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা প্রায় জয়যুক্ত হইতে বসিয়াছে, একরূপ অবস্থা কখনও ঘটে নাই। গবন্মেণ্ট যে বৈপ্লবিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কখনও বুঝাপড়ার চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাহার একটা কারণ, আমাদের অনুমান এইরূপ। কলিকাতা পুলিশ ও বন্দী পুলিশের সর্বাধুনিক রিপোর্ট যিনি পড়িবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন, সন্ত্রাসক ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গবন্মেণ্টের চেষ্টা ক্রমশঃ অধিকতর সফল হইতেছে।

অসহযোগ বা অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার সহিত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত

সাংবাদিকের কার্য শিক্ষা

কলিকাতায় যে ভারতীয় সাংবাদিক সভা (Indian Journalists' Association) আছে, কয়েক বৎসর পূর্বে তাহা সাংবাদিকের কার্য শিক্ষাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিবেন স্থির করেন। কি কি বিষয় শিক্ষাইতে হইবে, ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। তাহার সভ্যদের মধ্যে উক্তর নলিনাক্ষ সাত্তাল খুব উদ্যোগী ছিলেন। শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়, এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরিতও হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কিছু করেন নাই।

সম্প্রতি পূর্বোক্তরূপ প্রস্তাব আবার হইয়াছে, এবং লাটসাহেবদের কাছে যেমন প্রার্থীর দল যায় সেইরূপ কয়েক জন সাংবাদিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। ত্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু তাঁহার একটি বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক একরূপ শিক্ষাদানের নজীর এবং বৌদ্ধিকতা দেখাইয়াছেন। আমরা একরূপ শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে মনে করি। অনেক স্বাধীন দেশে বেরূপ যোগ্য সাংবাদিক আছেন, এদেশে তেমন না-থাকিতে পারেন, এবং শিক্ষা দিবার লোক বিদেশের মত তত ভাল না-জুটিতে পারে। কিন্তু অত্র সব বিষয়ের শিক্ষাদান যেমন ভারতীয় অধ্যাপকদের দ্বারা চলিতেছে, সাংবাদিকের কাজ শিখানও সেইরূপ চলিতে পারিবে। যত ছাত্রছাত্রী ইহা শিখিবে, সকলেরই যে কাজ জুটিবে, এমন নয়—হয়ত অধিকাংশেরই জুটিবে না। কিন্তু তথাপি ইহা শিখিলে জ্ঞান বাড়িবে, মানসিক উন্নতি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত আরও অনেক বিদ্যা চাকরিপ্রাপ্তি হিসাবে কাজে লাগে না। স্বাধীন রাজগারের উপায় হিসাবে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শত শত যুবকের কোনই কাজে লাগে না, এমন কি ডাক্তারী পাস করিয়াও অনেকের অন্ন হয় না বলিলও চলে। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয় নানা বিদ্যা ও কতগুলি বৃত্তি শিক্ষাইতেছেন। সংবাদিকের কাজ বহি পড়িয়া ও ব্যাখ্যান শুনিয়া সবটা শিক্ষা যায় না বটে, খবরের কাগজর সংশ্রবে কাজ করিয়া অনেকটা শিখিতে হয়। কিন্তু উকীলের কাজ, ডাক্তারের কাজ প্রভৃতিও অনেকটা ঐ প্রকারে শিখিয়া পরে এপ্রেক্ষিসী করিয়া শিখিতে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক-বিদ্যা শিক্ষাইবার বন্দোবস্ত করিল এবং কোন কোন সংবাদপত্রের সচিত সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিল, বিশ্ববিদ্যালয়র কর্তৃপক্ষ ক'ম মনে রাখিতে হইবে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঐসব সংবাদপত্রের সমুদয় মন্তব্য বা অবস্থা বিশেষে তুচ্ছস্বাভাবিক সাধনাতার সঙ্গিত বিবেচ্য।

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি

বাংলা দেশ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতি-বিধায়িনী সমিতির ১৯৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এই বৎসর সমিতির তত্ত্বাবধানে ৪৪৪টি বিদ্যালয় ছিল এবং তাহাতে মোট ১৮২৬৯টি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছিল। সমিতির মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬৭০৪১৮/৮। ইহার স্থায়ী ফণ্ডে ৩৬২১২।০ টাকা জমা হইয়াছে। স্থায়ী ফণ্ডটিকে এক লক্ষ টাকা পরিমিত করিবার সঙ্কল্প আছে। তাহার সুদ হইতে সমিতির চলতি ব্যয়নির্বাহের সুবিধা হইবে। নানা কারণে কয়েক বৎসর হইতে সমিতির আয় যথেষ্ট হইতেছে না। ইহা সাতিশয় দুঃখের বিষয়। নিরক্ষর লোকের সংখ্যা এদেশে অত্যন্ত অধিক। সমিতি বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা গত ২৫ বৎসর নিরক্ষরতা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আয় যত বাড়িবে, ইহার বিদ্যালয়ের ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তত বাড়িবে, এবং বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার উৎকর্ষসাধনও সেই পরিমাণে করা চলিবে।

ইহার ৪৪৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৮টি বালিকা-বিদ্যালয়। ছাত্রের সংখ্যা ১২৯৭৮, ছাত্রীর সংখ্যা ৫২৯১। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে এই সব বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে ও পড়ে।

বিদ্যালয় ছাড়া সমিতির পাঁচটি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য লাইব্রেরী এটি গ্রামে আছে, দুটি ব্রতী বালক দল দুটি গ্রামে আছে, বিপদ আপদের সময় সাহায্য করিবার জন্ত ৪টি গ্রামে চারিটি সেবাসমিতি আছে, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্ত মাসিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা করিবার বন্দোবস্ত আছে।

বাংলা দেশ ও আসামে কোন বেসরকারী সমিতি ইহার মত মিতব্যয়িতার সহিত এত অধিক বিদ্যালয় এ-পর্যন্ত চলান নাই। সকলেরই ইহাকে মত সাহায্য করা উচিত। সাহায্য ইহার সম্পদক শ্রীযুক্ত ডাক্তর প্রাণরক্ষা আচার্য্য, এম-এ, এম-বি, মহাশয়কে ৪০ কারব লা টাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইলে তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিবেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রভৃতি ইহার কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্গ জলপ্লাবন

এ-বৎসর বঙ্গর বহির জলপ্লাবন হইয়াছে, বঙ্গের অনেক জেলাতেও হইয়াছে। ত্রীহট, মালদহ, রংপুর, পাবনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলার জলপ্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে।

তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে না। অর্থের এবং কর্মীরও অপ্রাচুর্য্য অনুভূত হইতেছে। এই বৎসর নানা নৈসর্গিক বিপৎপাতে বদান্ত লোকেরাও আর সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। অন্দের ত কথাই নাই। যথেষ্ট কর্মী এই কার্য্যে অগ্রসর না হইবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। বিস্তর উৎসাহী যুবক বিনা বিচারে বন্দী হইয়া আছে। মর্লী যে বলিয়াছিলেন, “It is silly to be in such hurry to root out the tares as to pluck up half your wheat at the same time,” “তোমার গমের ক্ষেতের আগাছা উপড়াইয়া ফেলিবার অতিবাস্ততায় অর্ধেক গমও যুগপৎ উপড়াইয়া ফেলা মূঢ়তা,” একথা মিথ্যা নয়। অনেক যুবক অসহযোগ আন্দোলনের বিফলতায় সকল কাজে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। দানের ও সংকর্ম্মশীলতার প্রেরণা নূতন করিয়া আমাদের মধ্যে আসা আবশ্যক হইয়াছে।

পূজার বাজারে বাঙালীর তৈরি কাপড়

পূজার সময় হিন্দু বাঙালীরা ত নূতন কাপড় কিনিবেনই, তাহারা হিন্দু নহেন তাঁহারাও অনেকেই ছেলেমেয়েদিগকে নূতন কাপড় দিয়া থাকেন। সকল বাঙালীর বক্ষে উৎপন্ন খন্ডর ও হাতের তাঁতের অল্প কাপড় এবং বক্ষে স্থিত বাঙালীর কলে প্রস্তুত কাপড়ই ক্রয় করা একান্ত কর্তব্য।

বাংলা দেশে যে কয়টি কাপড়ের কল আছে, তাহার অনেক গুণ বেশী কল লাভের সহিত চলিতে পারে। সব বাঙালী কেবল বক্ষে স্থিত বাঙালীর কলে তৈরি কাপড় কিনিলে ইহা সহজেই সম্ভব হয়।

জেলায় জেল'য় আল'দা পাঠ্যপুস্তক

বঙ্গব ভিন্ন ভিন্ন জেল'য় ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য পুস্তক চাল ইব'র এচটা প্রস্তাব হইয়াছে। এই স তিশয় - নিষ্ঠ-কর প্রস্তাব অহমার কখনও কাজ হও'। উচিত নয়।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান

হুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়র কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গ বায়'মাদির দ্বারা দৈহিক উন্নতি সাধন'র্থ নিজের লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। তিনি নিজ খুব বলিৎ পুরুষ। এই সংকর্য্য দ্বারা সফলর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

বিলাতে অবাঙালী আসামবাসীদের প্রতিনিধি প্রেরণ

আসামের অবাঙালী অধিবাসীদের কয়েক জন প্রতিনিধি বিলাত বাইতেছেন। তাঁহারা ইংরেজদিগকে ও ব্রিটিশ সরকারকে দুটি প্রার্থনা জানাইবেন : (১) আসামে উৎপন্ন পেট্রলের শুষ্কের ও পাটের শুষ্কের সব টাকা আসাম-গবন্মেণ্টকে দেওয়া হউক। ইহা আমরা ত্রায়সঙ্গত মনে করি। (২) খ্রীষ্টকে বঙ্গের সামিল করা হউক। যদি আসামের অল্প বাঙালীপ্রধান জেলা ও মহকুমাগুলিকেও বঙ্গের অন্তর্গত করা হয়, তাহা হইলে আমরা ইহার বিরোধিতা করিব না ; নতুবা আমরা ইহার বিরোধী।

বিহারে বাঙালীবিদ্বেষ

বিহারে ভূমিকম্পে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ দান সব প্রদেশের লোকেই করিয়াছে, বাঙালীরাও করিয়াছে : বিপন্নের সাহায্যার্থ অবৈতনিক বাঙালী কর্ম্মীরাও খাটিয়াছে। কিন্তু বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় মৌলবী গনি বলেন, ভূমিকম্পে বিপন্নদের সাহায্যার্থ গবন্মেণ্ট যে-সব লোক নিযুক্ত করিবেন তাহারা যেন বিহারীই হয়। বাবু নন্দকুমার ঘোষ বলেন, অত্যন্ত প্রদেশের লোকেরাও টাকা দিয়াছে, অতএব বিহারী না হইলেও যোগ্য অল্প লোকদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। বলা বাহুল্য, বিহার এই অল্প লোকদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। বিহারের অল্পতম বিহারী নেতা, অমৃতবাজার পত্রিকার পরম বন্ধু, মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ চাতুরী মহাকারে বলেন, অত্যন্ত প্রদেশের লোকেরা দানের পরিবর্তে প্রত্যাশকারের আশায় দান করে নাই, সুতরাং বিহারী ছাড়া আর কাহাকেও চাকরি দেওয়া উচিত নয়। দাতারা প্রতিদানের আশায় দান করেন নাই, ইহা সত্য ; কিন্তু ইহ'ও সত্য, যে, তাহারা দান করিয়াছেন, কাজ দিবার বেলায় তাহাদের প্রদেশের লোকদিগকে বাদ দেওয়া হইব, এ সম্ভাবনাও তাহাদের মনে আসে নাই। ভূমিকম্পসম্পর্কীয় কাজে যাহাতে কেবল বিহারী যুবকেরা কাজ পায় এবং কেবল বিহারী ঠিকাদররা কণ্ট্রাক্ট পায়, তাহার জন্য মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, বাবু শ্রীক্ষপ্রসাদ ও মিঃ হাফেজ খুবই আগ্রহান্বিত। বিহারীরা বিহারে কাজ পাইবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক ; কিন্তু বিহারবাসী অবিহারীদিগকে বাদ দিল অন্য সব প্রদেশের সাহায্য বিহারীদের আশা করা উচিত নয়, এবং অন্য সব প্রদেশ বিহারীরাও বাদ পড়িত পারেন।

ইংরেজ জাতি নিশ্চিন্ত থাকুন—ভারতবর্ষের লোকেরা একরূপ সংকীর্ণমনা, যে, এখানে জাতিধর্ম্মভাষাপ্রদেশ-নির্কির্ষেবে একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূরপর্য্যন্ত।

ভারতরক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জের বক্তৃতা

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুনিয়ন সোসাইটি দ্বারা আহৃত এক সভায় হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ মুঞ্জ বলেন—

ভারতবর্ষ স্বরাজ্যলাভের জন্ত আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু স্বরাজ পাওয়া গেলে তাহা রক্ষা করা এবং বিহিংস্র হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করা কি প্রকারে হইতে পারে, সেদিকে ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের দৃষ্টি পড়ে নাই। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত প্রাচীন কাল হইতে আক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। সীমান্ত রক্ষা সোজা কাজ নয়। স্থলে সীমান্ত ৭০০০ মাইল লম্বা; তা ছাড়া সমুদ্রোপকূল আছে। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কথাও ভাবা উচিত। তাহা এখন নিরাপদ হইলেও বরাবর নিরাপদ না থাকিতে পারে।

ভারতবর্ষের কারখানাসমূহ অগ্নাধিক জ্বালেনীর কারখানাসমূহের মত করিয়া গড়া উচিত। সে দেশের কারখানাগুলি শান্তির সময় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে, যুদ্ধের সময় যে-কোন কারখানা দেশরক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে (অর্থাৎ তাহাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে পারে)। মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন নির্মাণের কারখানা ভারতবর্ষের নানা স্থানে স্থাপন করা উচিত। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসকলে ব্যায়ামশিক্ষা ও বন্দুক-ছোড়া আবশ্যিক হওয়া উচিত। প্রাথমিক যুদ্ধশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। অনেক রাইফল-সমিতি গঠন করা আবশ্যিক। যুবকদিগকে সঁতার শিখান উচিত। স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, লাঠিহস্তে ড্রিল শিক্ষার ক্লাস স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা যুবকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা আবশ্যিক। তাহা করিতে পারিলে দশ বৎসরের মধ্যে দেশের চেহারা বদলাইয়া যাইবে, এবং তখন গবর্নেন্ট বলিতে পারিবেন না, যে, আমরা স্বরাজের উপযুক্ত নহি। (এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে—প্রবাসীর সম্পাদক)

ডাক্তার মুঞ্জ বাহা বলিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি নাগপুরে কোন কোন দিক সেইরূপ কাজ হইতেছে। সেখানকার যুবকদিগর লাঠি-ড্রিল দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলম। ডাঃ মুঞ্জ নাগপুরে বেরাইফল্ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে অনেক যুবক বন্দুক চালাইতে শিখিয়াছে ও শিখিতেছে।

বঙ্গে ডাকাতী ও নারীহরণ

বাংলা-গবর্নেন্ট সদস্যদের হাত হইতে রক্ষার জন্ত সব ইংরেজ কর্মচারীর—বিশেষতঃ শাসন ও পুলিশ বিভাগের

কর্মচারীদের—জন্ত সশস্ত্র রক্ষীর বন্দোবস্ত করিয়া নিজের কর্তব্য পালন করিয়াছেন। তন্মিত্র, ঐ সকল কর্মচারীর নিজেদেরও অস্ত্র আছে। কিন্তু ডাকাতদের হাত হইতে লোকদের—বিশেষতঃ গ্রামের লোকদের—রক্ষার জন্ত যথেষ্ট সরকারী ব্যবস্থা নাই, এবং পশুপ্রকৃতি লোকদের হাত হইতে নারীদের রক্ষার জন্তও যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই।

অর্দ্ধচন্দ্র-মার্ক ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল

ইণ্ডাস্ট্রিজ্ লিমিটেড

খবরের কাগজের পাঠকেরা জানেন, “ইম্পীরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড” নামক একটি কোম্পানীকে ভারত-গবর্নেন্ট ৫০ বৎসরের জন্ত পঞ্জাবের কোন কোন স্থানের খনিজ কোন কোন জিনিস উত্তোলন ও ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার দিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। ভারতে রেজিস্ট্রী হইয়া থাকিলেও ইহা ইংরেজদের কোম্পানী। ভারতের এক ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড রেডিং ইহার চেয়ারম্যান। ভারতীয়দের অজ্ঞাতদারে ইহা গঠিত এবং ইহাকে একচেটিয়া অধিকার প্রদত্ত হয়। ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেক একচেটিয়া অধিকার ইহাকে দেওয়া হইবে। সকল দেশের জাতীয় (National) গবর্নেন্ট নিজ নিজ জাতির লোকদের (Nationalsদের) দ্বারা নিজ নিজ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষের গ্রাশিয়াল গবর্নেন্ট না থাকায় সেইরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। লর্ড রেডিং বড়লাট থাকা কালে দেশশাসন করিতেন, এবং অবসর সময়ে হয়ত পেন্সান লইবার পর ভারতবর্ষ হইতে আরও অর্থ সংগ্রহের জন্ত কোথায় কি খনিজ সম্পত্তি আছে, তাহার খবর রাখিতেন। এখন তাহা কাজে লাগিল।

এই কোম্পানীর আয়োজন যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা জানিতাম না। ৩০শে সেপ্টেম্বরের অমৃত বজ্র পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সমগ্রপৃষ্ঠাব্যাপী ইহার বিজ্ঞাপন বুঝিলাম, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, রেঙ্গুন, কোলোম্বো, কানপুর, পাটনা, আহমদাবাদ, কোচিন, কালিকট, বিজাগাপাটাম, করাচী ও অমৃতসরে ইহার গদী স্থাপিত হইয়াছে।

ইহার ট্রেডমার্ক অর্থাৎ ব্যবসার মার্ক ক্রেসেন্ট অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র। যথার্থোগ্য বটে! ইহার প্রসাদ কত দেশী রাসায়নিক ব্যবসার অদৃষ্টে মর্ত্যলোক হইত অর্দ্ধচন্দ্র লাভ ঘটিব, তাহা অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

পূজায় পশুবলি

দুর্গাপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষ্যে অনেক পশুবলি হইবে। আমরা বলির বিরোধী। স্বর্গীয় পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর দিক হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে ‘প্রবাসী’তে পশুবলি যে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারেও অত্যাৱশ্যক নহে, তাহা দেখাইয়াছিলেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতি

নির্বাচন

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে। বিহারের কংগ্রেসনেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্বাচন ঠিক হইয়াছে। ইহার আগেই কোন অধিবেশনের সভাপতি তাঁহাকে করা উচিত ছিল। তিনি বিদ্বান্ ও কশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি যখন ওকালতী ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, তখন ওকালতীতে তাঁহার বেশ পসার ছিল এবং পসার ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কালক্রমে তাঁহার হাইকোর্টের জজ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় হইত না। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার তাঁহার সাংসারিক অসুবিধা খুবই হইয়াছে। তাঁহাকে কারাকান্ডও হইতে হইয়াছিল। বিহারে ভূমিকম্পের পূর্বেও তিনি জনহিতকর কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। ভূমিকম্পের পরে যে তিনি বিপন্নদের সহায়ক প্রধান কর্মী হইয়া আছেন, ইহা সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই জানেন। তিনি চরিত্রবান্ নহ্ন প্রকৃতির মানুষ।

কলিকাতায় খান আবদুল গফ্ফার খানের সম্বন্ধনা

কলিকাতার নাগরিকগণ টাউন হলে সমবেত হইয়া খান আবদুল গফ্ফার খানের সম্বন্ধনা দ্বারা গুণীর আদর করিয়াছেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রণদক্ষ পাঠানদের মধ্যে অহিংসাবাদ প্রচার করিয়া “সীমান্ত গান্ধী” আখ্যা পাইয়াছেন।

টাউন হলে সম্বন্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ হিন্দু মুসলমান সকলেরই দেশ। ভারতবর্ষে যে-কেহ স্থায়ী ভাবে বাস করে, ইহা তাহারই দেশ, ইহা সত্য কথা। কিন্তু “আমার দেশ” বলিলে কে কি বুঝে, তাহার আলোচনাও, অন্ততঃ মনে মনে, সকলের করা উচিত, এবং আত্মপরীক্ষা করা উচিত। লোহার সিদ্ধক ও তাহার মধ্যস্থিত টাকাগুলি আমার, রসগোল্লা

হাড়িটি আমার, অর্থগুরু ও পেটুক লোক এতদূর বলিলে তাহার উক্তি “আমার” শব্দের মানে যাহা হয়, “আমার দেশের” “আমার” শব্দের অর্থ কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ তাহা হওয়া উচিত নয়। “আমার দেশ” বলিতে প্রকৃত দেশভক্ত লোক ইহা বুঝেন না, যে, ইহার ধন রত্ন সুখসুবিধাগুলি আমার, কিন্তু ইহার জন্ত হৃৎখণ্ডভোগ ও আত্মোৎসর্গ করিবার অধিকার বা দায় অস্ত্রের, ইহার সেবা করিবার ভার অস্ত্রের। বস্তুতঃ দেশের লোকদের সেবা যে করিবে, দেশের নৈসর্গিক সম্পদ দেশের লোকদের কাছে যে লাগাইবে, দেশকে হৃন্দর, স্বাস্থ্যকর, কার্যমোক্ষময় যে করিবে ও রাখিবে, দেশ তাহার। খান আবদুল গফ্ফার খানের এবং তাঁহার মত অন্ত লোকদের ভারতবর্ষকে “আমার দেশ” বলিবার অধিকার আছে।

অল্পদিন পূর্বে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় একটি বিতর্ক হয়। ছাত্রেরা মুসলমান। এক জন ছাত্র এই প্রস্তাব পেশ করেন, যে, “মুসলমানদের ভারতবর্ষে থাকিবার অধিকার নাই”। ইহার সপক্ষে বক্তৃতা ছাত্রেরা করেন, বিপক্ষে বক্তৃতা বয়োবৃদ্ধ খেতাবধারী মুসলমানেরা করেন। শেষে ভোট লওয়ায় খুব বেশী ভোটের জোরে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। ইহার সপক্ষে বাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই ছিল, যে, মুসলমান নেতারা স্বার্থপর এবং নিজেদের সাংসারিক সুবিধা দেখেন : দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা না-করিলে, তাহার কল্যাণ-চেষ্টা না-করিলে সে-দেশের অধিবাসী ইহবার অধিকার কাহারও নাই। এই শেষোক্ত কথাটি সত্য। কিন্তু আলীগড়ের ছাত্রদের বিতর্ক-সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা সর্বাংশে ত্রায়া বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, ভারতের সব মুসলমান-নেতা বা সব সাধারণ মুসলমান স্বার্থপর ও কেবল নিজ নিজ সাংসারিক সুবিধা দেখেন, ইহা সত্য নহে। তাঁহাদের মধ্যেও পরার্থপর ও দেশসেবক লোক আছেন। অন্ত দিকে হিন্দুদের মধ্যে স্বার্থপর ও স্বসুবিধা-লোলুপ নেতা ও সাধারণ লোকের অভাব নাই। সুতরাং মুসলমানদের অনেকের স্বার্থপরতার দোষে যদি ভারতবর্ষের সাত কোটি মুসলমানের কাহারও ভারতবর্ষে থাকিবার অধিকার নাই বলা হয়, তাহা হইলে এমন অন্ততঃ সাত কোটি হিন্দু খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না বাহাদুরেরও ভারতবর্ষে থাকিবার অধিকার নাই।

ভারতবর্ষের হিন্দু ও অহিন্দুদের মধ্যে একটি প্রভেদ উল্লেখযোগ্য। ভারতপ্রেমিক কোন হিন্দু তাঁহার হৃদয়ে কোন দেশকে ভারতবর্ষের চেয়ে উচ্চ স্থান দেন না, কিন্তু ভারতপ্রেমিক অহিন্দু তাহা দিতে পারেন। অবশ্য হিন্দু হইয়া জন্মিয়াও যে কেহই সুবিধালাভ বা অন্ত কারণে

ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প দেশকে পছন্দ করে নাই, তাহা নহে।

খান আবুল গফ্ফার খান হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপর খুব জোর দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের পরস্পরের ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তাহা হওয়া অবশ্যই উচিত। তাহাতে সদ্ভাব বাড়িতে পারে। উভয়ের শাস্ত্র ও সভ্যতার উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইলে, নিকৃষ্ট অংশ কিছু থাকিলে তাহা বর্জন করাও আবশ্যিক। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজবিধি সম্বন্ধে ইহা করিবার বা করাইবার জন্য সমালোচনা নিরাপদ। কিন্তু মুসলমান শাস্ত্র ও সমাজবিধি সম্বন্ধে ইহা করা অনেক মুসলমান বিপৎসঙ্কুল করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সকলেরই নিজ নিজ শাস্ত্র, ধর্মপ্রবর্তক ও উপদেষ্টাদিগকে অম্রান্ত ও নিখুঁত মনে করিবার অধিকার আছে; কিন্তু অল্প কেহ তাহার বিপরীত কথা বলিলে তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার কাহারও নাই।

পরস্পরের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলে পরস্পরের সদ্ভাব ও মিলন গভীর হয়। রাষ্ট্রনৈতিক মিলনও হইতে পারে। কিন্তু যত দিন কোন সম্প্রদায় নিজের জন্য, যে-কোন ওজুহাতেই হউক, বিশেষ সুবিধা ও বেশী সুবিধা চাহিবে, তত দিন এই মিলন হইবে না।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

যে-ভাবে ও বেরূপ বায়ে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উহা কমাইয়া গবন্মেণ্ট পাটের মূল্য বাড়াইতে চাহিতেছেন, তাহাতে সুফললাভ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। পাটচাষ এখন যে-যে জমিতে হয়, তাহার যে-অংশে পাটের চাষ করা হইবে না, লাভজনক অল্প কি ফসলের চাষ তাহাতে করা যাইতে পারে, তাহা চাষীদিগকে বুঝাইয়া তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা আবশ্যিক। শুধু সরকারী লোকদের চেষ্টায় লাফলা লাভ করা কঠিন। সরকারী লোকদের উপর চাষীদের বিশ্বাস কতটা আছে, তাহা বিবেচনা করা দরকার। চাষীদের অসুবিধা এবং ক্ষতি করিয়াও যে-সব

শ্রেণীর লোক লাভবান হইয়াছে ও হইতে চায়, তাহাদের ও তাহাদের প্রভাবের অধীন লোকদের পরামর্শ গ্রহণ ও সহযোগিতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নহে।

বরিশালের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের জুবিলী উৎসব

অগ্নীয়া অগ্নিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন বাংলা দেশে কেবল ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার-কল্পে সাহায্য করিয়াছে, এমন নহে, বিস্তার ছাত্রের প্রাণে ধর্মভাব ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপিত করিয়াছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ইহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করা উপলক্ষ্যে উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সভাপতিরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অত্রা কথার মধ্যে বলেন :—

আমাদের দেশে শিশুসুতার হার অধিক; মাতৃঘের মধ্যে ষটে, এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও ষটে। পঞ্চাশবৎসরব্যাপী অস্তিত্বের গৌরব করিতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়। ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন এই পঞ্চাশ বৎসর কাল কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখে নাই,—ইহা মানবপ্রাণে প্রেরণা জাগাইয়াছে, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচার করিয়াছে। ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন কেবল মাটি কুলেট প্রস্তুত করিবার কারখানা নহে; ইহা অগ্নিনীকুমারের আদর্শবাদের মূর্ধ প্রতীক। যাহাতে কিশোর ও তরুণদল উত্তরকালে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে, মনুষ্যত্বের গৌরবে সমুন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে, তাহাদিগকে তদ্রূপ শিক্ষাদানই ছিল অগ্নিনীকুমারের লক্ষ্য। তিনি ছাত্রদিগকে কেবল পুথিগত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দিয়া আদর্শ মানুষ করিয়া তুলিতেন।

বিজ্ঞাপন

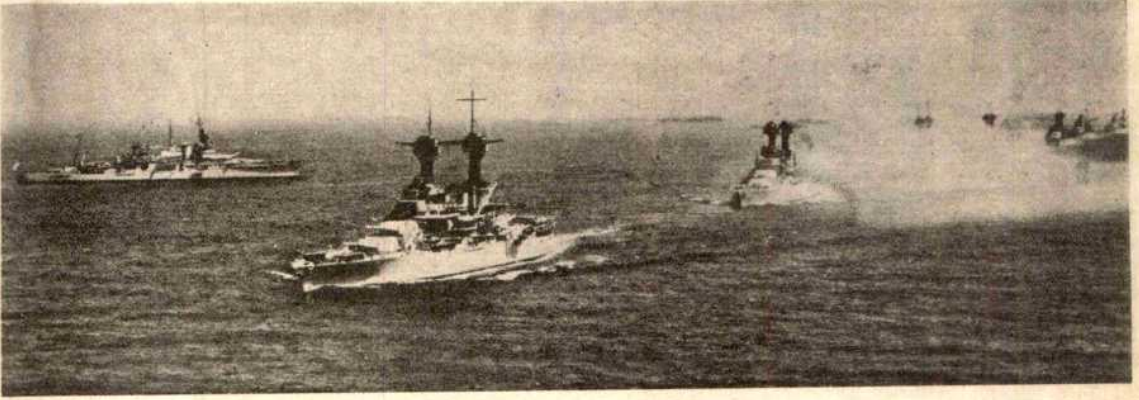
প্রবাসী-কার্যালয় আগামী ২৭শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর হইতে ১১ই কার্তিক ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে যে-সব চিঠিপত্র আসিবে, ১২ই কার্তিক ২৯শে অক্টোবর হইতে সেই সকলের জবাব দেওয়া বা তদনুযায়ী অত্র কাজ করা হইবে।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

স্বত্বাধিকারী

বহির্জগৎ

বিশ্বের রণসজ্জা



আধুনিক যুদ্ধ—জল স্থল ও আকাশ ব্যাপী

সমুদ্র-শক্তির অভাব থাকিলে কোনও সামরিক জাতির পক্ষে বিজয় লাভ সম্ভব নহে। এইজন্ত জলযুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধপোতের মূল্য অর্থাৎ কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। চিত্রে যুক্তরাজ্যের একটি নৌবহরের কুচ-কাওয়াজ দেখান হইয়াছে। সমুদ্রের বৃহৎ যুদ্ধপোতগুলিই (ব্যাটলশিপ) নৌযুদ্ধে সর্বপ্রধান অক্রমণের অস্ত্র। অস্ত্র সকল প্রকার পোতই—কি জলের উপরে, নীচে বা আকাশে—সুইগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি বা নষ্ট করার জন্ত ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে এরোপ্লেন এবং সাবমেরীন প্রধান।

গত মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই বলেছিলেন যে, এই যুদ্ধ 'যুদ্ধের মনোবৃত্তিনাশের জন্ত,' অর্থাৎ এই যুদ্ধই শেষ মহাযুদ্ধ! ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধারম্ভের সময় রেনে ব্যাজাঁ নামে প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী বলেছিলেন, "এই যুদ্ধে মানবজাতির শুদ্ধি হইবে। মানুষের জীবন এখন অত্যন্ত লব্ধ, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরিভূতিপ্ৰমুখ। ঐশ্বর্যের পূজা, সাম্রিক ওণাবলীর প্রতি অবহেলা, ধর্মকে হেয়জ্ঞান করা, এই সকল এখন আমাদের জীবনের প্রধান অংশ। ইহার জন্ত আমাদের অনেক দুঃখ পাইতে হইবে এবং বহু অর্থনাশ ও জীবন নষ্ট হইবে, কিন্তু যখন আমাদের শিরে বিজয়মুক্ত আসিবে, তখন ঐ সকল মানবজীবনের পাপ (বা পাপো) চিরকালের জন্ত লুপ্ত হইবে।"

ঐ যুদ্ধ আজ বোল বৎসর পূর্বে শেষ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে "লীগ অব নেশন্স" ইত্যাদি শক্তি ও জাতিসংঘে অনেক চেষ্টা হয়ে গেছে অস্ত্র সংকেপ করার জন্তে, যুদ্ধ নিরোধ করার জন্তে। কিন্তু যতবারই কোনরকম চুক্তি বা আন্তর্জাতিক সংকল্পের ব্যবস্থা হয়েছে, কোন-না-কোন জাতি স্বার্থের আঘাতের ভয়ে তাতে বাধা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধও অনেকগুলি হয়ে গিয়েছে এবং প্রত্যেকবারই যুদ্ধবহির শিখায় সমস্ত পৃথিবী শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

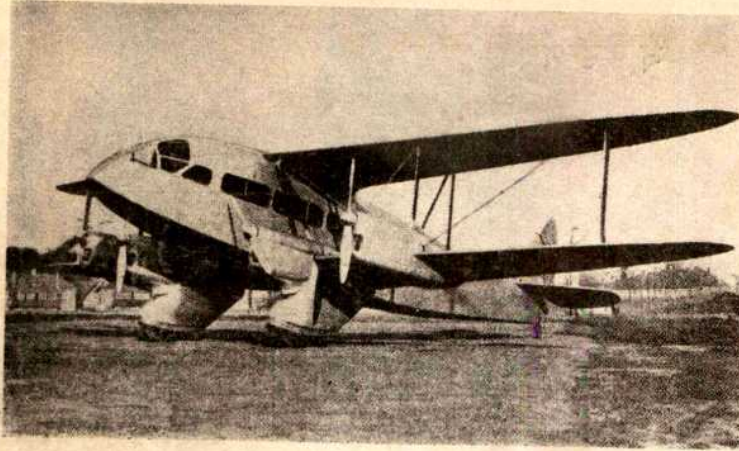
বর্তমান অবস্থা কি? জার্মানিতে হিটলার সামরিক বয়স শতকরা চল্লিশ ভাগ বাড়িয়েছেন এবং সামরিক এক্সেলেন্সের জন্ত খরচ তিন গুণ বাড়িয়েছেন বলেছেন। সঙ্গ সঙ্গ তিনি জাতিসংঘকে জানিয়েছেন যে, হয় পৃথিবীর অস্ত্র শক্তিবর্গকে অস্ত্রতাগ করতে হবে, নয় ত জার্মানীকে অস্ত্রধারণের অধুমতি দিতে হবে।

বেলজিয়াম আবার তাহার "মাজিনো" নেওয়াল—অর্থাৎ দুর্গমালা গঠন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এবার এটা হচ্ছে ফ্রান্সের সীমান্তের দিকে। স্পেনের ক্ষুদ্র যুদ্ধ-নৌবহর বাড়ান হবে, তার জন্যে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সুইসজাতি সেনাবিভাগ পুনর্গঠনের জন্ত উঠে পড়ে লেগেছে। আমেরিকায় পকেট যুদ্ধজাহাজ যোলখানি ভাসান হয়ে গেছে এবং আরও তৈরি হচ্ছে। ফ্রান্স, পোলাও, জাপান, রুশ, এ'রা ত আপাদমস্তক অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই আছেন।

অবশেষে ইংরেজও বহু বৎসর ধরে যুদ্ধ নিরোধের চেষ্টা করে, হিটলারাইট জার্মানী জাতিসংঘ থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটি "হোয়াইট পেপার" বিলি করে আবার অস্ত্রসজ্জায় মন দিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন ইংরেজের উদ্দেশ্য ফ্রান্সের সমান যুদ্ধশক্তি সঞ্চয় করা অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ যুদ্ধধেন এবং অস্ত্রাস্ত্র সমরসজ্জার ব্যবস্থা করা। শিকাগোর দৈনিক পত্র 'টাইম' বলেন, ইংরেজের এই হতাশ হওয়ার অর্থ "যুদ্ধনিরোধ" চেষ্টার অন্ত্যস্তিক্রিয়া।

ওদিকে চীন-জাপান-রুশ ঝগড়াটি দিনের দিন বেড়েই চলেছে। এখন ইউরোপের চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরকূলেই জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। কয়েক মাস আগে জাপান সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়েছিল যে, "চীনের সঙ্গে কারচুপি অস্ত্র কাছাকাড়ি জাপান করতে দেবে না, অর্থাৎ চীনকে যুদ্ধধেন, যুদ্ধশিক্ষক বা যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করা, বা রাজনৈতিক বাপারের জন্ত টাকা ধার দেওয়া এ সকলে জাপান বাধা দিবে।"

সমস্ত পৃথিবীকে এরকম সরাসরি ভকুম দেওয়া কোনো জাতির



শান্তিকালের বিমানপোত

ডি-হাভিল্যান্ড এরোপ্লেন। ইহা এখন ইংলণ্ড-ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিমান-পথে বাবহৃত হইতেছে। যুদ্ধের সময় সামরিক শক্তির দ্রুত চলাচলের জন্ত এই প্রকার পোতের বিশেষ প্রয়োজন

পক্ষেই সহজ বা নিরাপদ নয়। তবে জাপান এ রকম করল কেন? কারণ খুঁজতে হ'লে কয়েকটি বিষয় জানা দরকার।

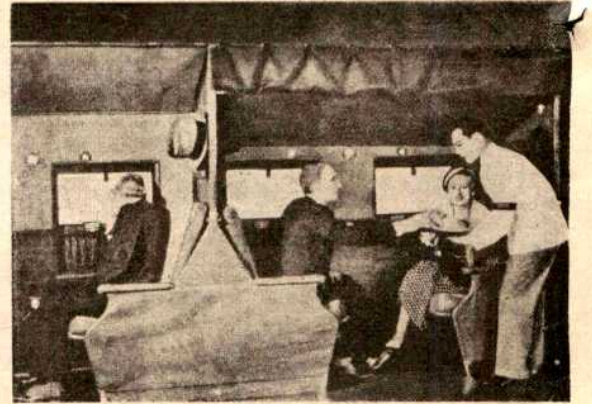
শিকাগোর "টাইম" পত্র থেকে "ওরিয়েন্টাল ওয়াচম্যান" কয়েকটি বিষয়ের বৃত্তান্ত দিয়েছেন :

"প্রথমতঃ জেনারেল হান্স ফন সিয়েস্ট, পৃথিবীর এক জন অত্যন্ত সেনাশক্তি গঠনকারী ঘোঁড়া, চীনের সমরশক্তি অসাধারণ ভাবে আধুনিক ও দৃঢ়শক্তি করে তুলেছেন। এই সমরকৌশলী প্রৌঢ় ভদ্রলোক গত মহাযুদ্ধের পরে জাপানীর অল্পসংখ্যক রাষ্ট্র সৈন্যদলকে জগতের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র সৈন্যদলে পরিণত করেন। ইনি হিটলারের পক্ষপাতী নহেন, বরঞ্চ ১৯২৬ সালে হিটলারের দেশ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ—এবং হিটলারের প্রাণরক্ষার জন্ত পলায়ন—হয়েছিল ই'হারই হাতে। সুতরাং জাপানী হিটলারের হাতে বাওয়ায় ইনি স্বদেশ ছেড়ে এখন চীনদেশে গিয়ে বসেছেন।

"দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের দুই প্রসিদ্ধ বিমানবীর, ফ্রাঙ্ক হকস এবং জেমস ডুলিটল, চীনে বড় শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিক যুদ্ধপ্লেন বিক্রয় করছেন। ইহারা গত বৎসর প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার যুদ্ধপ্লেন চীনকে বিক্রয় করেন এবং আরও অনেক বেশী বর্তমান বৎসরে বিক্রয় করবেন আশা করেন। ইটালীর এক দল ফাসিস্ট বিমানবীর এই দেখাদেখি বিক্রয় চেষ্টায় চীনদেশে গিয়েছেন। পৃথিবীর এরোপ্লেনের দ্রুতগতি ও উর্দ্ধগতির "রেকর্ড" ইহাদেরই, এবং বিমানবিহারে ইহারা একেবারে নিভাঁক। তাহার পর কর্ণেল জেমস জোয়েট নামক যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ বিমানসেনা-নায়ক—এখন অবসরপ্রাপ্ত—এখন হাংচাঙে চীন সামরিক বিমান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।"

"তৃতীয়তঃ টি. ভি. হুং, চীনের অর্থনৈতিক মন্ত্রী, যে ভাবে জাপানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে চীনে বৈদেশিক অর্থবল ও রসদের আমদানী করছেন তাহাও একটা কারণ। জাপানের চেষ্টা ছিল বাতে বিদেশ হ'তে চীন কোনও রূপ গ্রহণ করলে তা জাপানের সম্মতি ও সাহায্য ভিন্ন না হ'তে পারে।"

জাপানের এই ঘোষণার ফল কি হয়েছে? চীন উচ্চকণ্ঠে বলছেন, "জাপান জগতকে হেয়জ্ঞান করে এই বাহুক্ষেপিতন করছে। এইরূপ দস্তপূর্ণ ঘোষণাকে কি সমস্ত জগৎ উপেক্ষা করার ভান করবে?"



শান্তিকালের বিমানপোতের অভ্যাস্তর

ফ্রাঙ্ক বলছেন, "আমরা জানবার চেষ্টা করছি যে, জাপানের কি ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, অথবা মাঝুক্যে বাবস্থায় জগতের সম্মতি নেবার ইহা একটি উপলক্ষ।"

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অতি ভদ্রভাবে জাপানকে "নাইন পাওয়ার ট্রীটি"র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমেরিকা যুক্তরাজ্য বলেন, "জাপান অকারণ এইরূপ ঘোষণা করেছেন। যুক্তরাজ্য চীনদেশে কোনও সামরিক শিক্ষক বা বাবস্থাবিশারদ পাঠান নাই। যদি কেউ অবসর-প্রাপ্তির পর গিয়ে থাকেন, তবে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গিয়েছেন।"

কেন 'কুন্তলীন'

ব্যবহার করিব ?

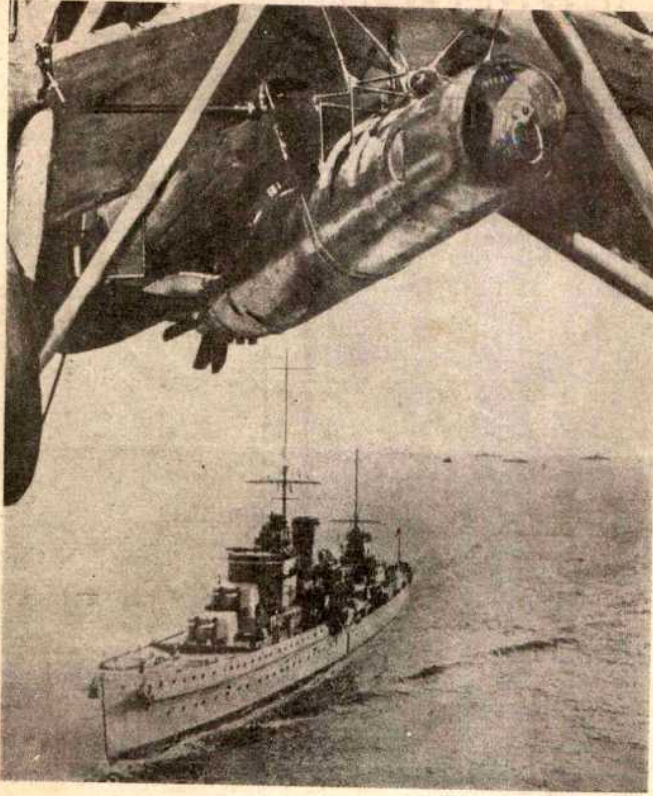


কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলেন—কুন্তলীন তৈল আমরা দুই মাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদগম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।”

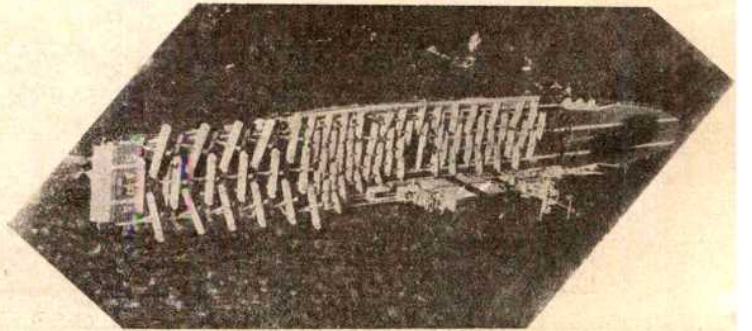
একথা হয়ত অনেকই মনে করিতে পারেন যে “বাড়ারে এত রকমের সস্তার তৈল থাকিতে কেন “কুন্তলীন”

ব্যবহার করিব” ? “কুন্তলীন” কেন যে নিত্য-ব্যবহাৰ্য্য তৈল তাহার কয়েকটি কারণ নীচে দেওয়া হইল :—

- ১। ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত বলিয়া ইহাতে তৈলের স্বাভাবিক রজন, ফার, অম্ল, মোম ও গন্ধক নাই। এই জন্যই ইহার ব্যবহারে চুলের কোনওরূপ অনিষ্ট ও চুলে আঠা হয় না।
- ২। ইহাতে ‘কৃত্রিম গন্ধ’ (Artificial perfume) নাই এবং সেইজন্য কোনও প্রকার মীসা, পারা বা তাপিন তৈল নাই।
- ৩। ইহার ব্যবহারে চুলে জটা না হওয়ায় কেশ-বিচ্ছাদের সময় অমৃতা কেশ কমিয়া যায় না।
- ৪। সাধারণ কেশ-তৈলের দ্বারা ইহাতে বাজে অপরিষ্কার তৈল ব্যবহার করা হয় না। এই কারণে দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য কোনও প্রকার তীব্র গন্ধ ব্যবহার করার দরকার হয় না। ইহার গন্ধের মধুরতা দুলভ।
- ৫। মস্তক ঠাণ্ডা রাখিবার ক্ষমতা ‘কুন্তলীনের’ বিশেষত্ব। এইচ, বস্তু, কলিকাতা।



যুদ্ধে সামুদ্রিক বিমানপোতের ব্যবহার
'প্লেনের নীচে বিরাট বোমা রহিয়াছে, এইরূপ একটি বোমার বিস্ফোরণে বৃহত্তম
যুদ্ধপোতও অচল বা ধ্বংস হইতে পারে।



এরোপ্লেনবাহী যুদ্ধপোত

জাহাজের দক্ষিণ অংশে বিরাট "গুল্‌তি" (কাটা পণ্ট) আছে, বাহার দ্বারা এরোপ্লেন
নিমেষের মধ্যে গুল্‌তি ছুড়িয়া দেওয়া যায়। বিপক্ষের নৌবহরের সন্ধান ও আক্রমণের জ
এইরূপ জাহাজ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেগুলির আক্রমণে বিপ
বাতিবাস্ত হইয়া পড়ে।

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

হাফটোন ব্লকের আধুনিকতম সরঞ্জাম নিয়ে
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্লক প্রস্তুত
ক'রে ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও যে সফলতা লাভ
এবং সমঝদার সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে,
আজ বিনীতভাবে সকলের কাছে তা' নিবেদন করছি।

* * *

বিশ্ববিখ্যাত কবি
রবীন্দ্রনাথ বলেন :—
“ভারত ফোটোটাইপ
ষ্টুডিও থেকে ছবির
প্রতিলিপি দেখে আনন্দ
লাভ করেছি।”

* * *

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী

অবনীন্দ্রনাথ বলেন :—

“এই ষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীযুক্ত বলিতমোহন গুপ্ত আমার
অনেক ছবির প্রতিলিপি
করিয়াছেন সকলগুলিই সঠিক ও
কাজহিসাবে অত্যন্তম। গত
ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া ইনি এই
কার্য্য করিতেছেন।”

* * *

বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
বলেন :—
“তাহার কাজ সমঝদার
লোকদের প্রশংসা
পাইতেছে।”

* * *

শারদীয় উপহার-পত্র

পূজায় প্রিয়জনকে ইহার একটি উপহার না দিলে আপনার শারদোৎসবের আনন্দ
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পীগণের সুললিত রচনা ও
সুচারু আলিঙ্গনে প্রত্যেকটি উপহার-পত্র সৌন্দর্য্য সুসমায় বাস্তবিকই অনুপম।

বড় কার্ড ৯/১০ পয়সা, ছোট /০ আনা

নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হয়েছে—আজই সংগ্রহ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভিঃ-পিঃতে পাঠানো হয় না।

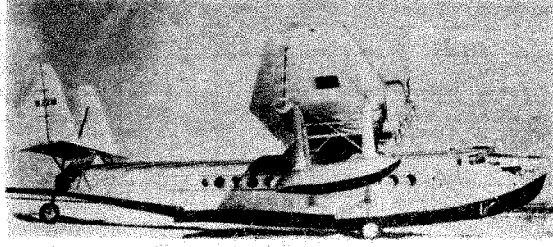
আমাদের এখানে সর্বোৎকৃষ্ট মুদ্রণ-যন্ত্রে একবর্ণ ও বহুবর্ণের ছবি অতি সুন্দররূপে ছাপিয়ে
দেবার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। ছাপার কাজ দেখে আপনাকে সন্তুষ্ট হতেই হবে।

ফোন—
বি, বি, ৩৯৬২

৭২-১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম—
“মোফোটিক”

বহিঃগত পর পৃষ্ঠায় দেখুন



সামুদ্রিক এনোপ্লেন—শান্তিকালে

করটিস্—এস্ ১২; ইহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ডাক-
সরবরাহে ব্যবহৃত হয়। এক টানে ১২০০ মাইল দশ ঘণ্টায় যায়।
বত্রিশ জন যাত্রী, পাঁচ জন কর্মচারী এবং প্রায় পনেরো মণ ডাক
লইতে পারে।

এখন জগতের প্রধান সমস্তা পূর্ব-এশিয়ার এই দুটি মহাজাতি-
সমষ্টিকে নিয়ে। একই পরিবারের ন' হ'লেও এরা যে কুটুম্ব, সে বিষয়ে
সন্দেহ নাই। সভ্যতার আদিকাল থেকে এদের কুটির ধারা একই
শ্রোতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এখন কালের চক্রে একের বাহা আদর্শ
তাহাতে অস্ত্রের সর্বনাশ। দুই হাজার বৎসরের সম্পর্কের এই ফল।

সমস্তা জটিল হয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যখন রুশজাতি বরফশূন্য
বন্দরের সন্ধানে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে মাঙ্কুরিয়ার এসে উপস্থিত
হন। তারপর ইংরেজ, আমেরিকান, জার্মান ইত্যাদি সকল বণিক ও
সাম্রাজ্যবাদী জাতিই একে একে এসে উপস্থিত হন—কেহ বাবদার
চেপ্টায়, কেহ সাম্রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টায়। ইতিমধ্যে আমেরিকা জাপানের



পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার “চন্দন”

“চন্দন লেখা দ্বারে দ্বারে আজি

চন্দনমালা ছ'লিছে বা'য়ে—

গৃহলক্ষ্মীদের কমনীয় দেহে

লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিতে

অদ্বিতীয়—

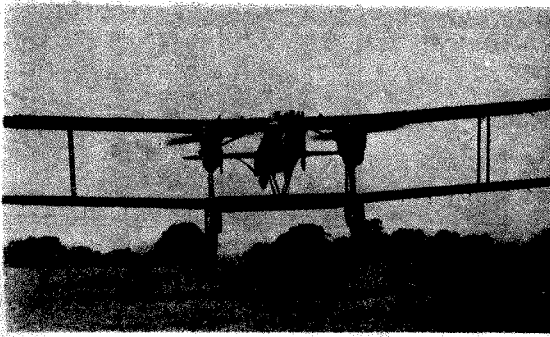
স্রাণে — সৌন্দর্যে; — অতুলনায়

কলিকাতা সোপ—বালিগঞ্জ

চোখ ফুটিয়ে দেয়—অনেক অপমান অনেক আঘাত দিয়ে। জাগ্রত জাপান যেদিন দেশের সীমানার বাইরে দেখতে শিখল, সেদিন প্রথমেই তার দৃষ্টি পড়ল এই পাশ্চাত্য অর্থ ও সাম্রাজ্যলোভী জাতিসত্ত্বের উপর।

তারপর নিজের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অস্ত্রের শক্তি বিচারও করতে আরম্ভ করল এবং নিজের ও অস্ত্রের বলবৃদ্ধির (যার অস্ত্র অর্থ সাম্রাজ্যবুদ্ধি) সুযোগ ও বাধার কথাও ভাবতে লাগল। এই ভাগ্য-গণনার প্রথমই তার দৃষ্টি পড়ল রুশের বস্তুকপাণবৃত্ত প্রসারিত হস্তের উপর। রুশ তখন মাকুরিয়ার দ্বারে উপস্থিত।

ইহারই ফলে ১৮৯৫-৯৬ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ হয়। চীন তখনও



বুদ্ধের এরোপ্লেন

হাওলি-পেজ-হোফার্ড, বোম্বার্কপণকারী এরোপ্লেন। ইহা ৩৫ মণ বোমা লইয়া ১৫০০০ ফুট উচ্চে উঠিয়া ৭ ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ মাইল দূরে বোমা ফেলিয়া কিরিয়া আসিতে পারে। বোমাগুলিও একপ ভয়ানক যে উহা যেখানে পড়ে তাহার ১০০ গজের মধ্যে সকল স্থানই বিধ্বস্ত হয়।

‘গভীরতর মধ্যে বসে। জাপান দ্রুতগতিতে বর্তমানের সীমানায় পৌছেছে। বুদ্ধ জাপান জয়ী হয়েও কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের চক্রান্তে বুদ্ধজয়ের ফল থেকে বঞ্চিত হ'ল। এই যে আজকের জাপান সন্ধিগুচিতে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র দাঁড়িয়ে উঠেছে, ইহা ঐ বুদ্ধের ফললাভের নৈরাশ্যের কথা মনে করাই। তারপর আমেরিকা যুক্তরাজ্য জাপানের ‘ভদ্রলোকের সন্ধি’ ভেঙে আমেরিকানরা জাপানীদের যুক্তরাজ্যে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ঐ উন্নত জাতির প্রাণে বিষম আঘাত লাগে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও জাপানের আধুনিকতম কলকারখানা এবং কৌশলী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় অস্ত্র সকল জাতি হটে গিয়ে জাপানী পণ্যবোঝার বিরুদ্ধে বিরাট গুচ্ছের দেওয়াল তুলে দিয়েছে। এতে জাপানের ভবিষ্যৎ আবার অন্ধকার হয়ে আসছে।

সময় অর্থ-প্রসূ



অনর্থ সময় নষ্ট না করিয়া ঘরে বসিয়া

প্রত্যহ ৩ হইতে ৩০

উপার্জন করুন

সহজে পরিচালনযোগ্য ৩২৫ টাকা মৌজা বুনার কল বা ৪,৭০০ টাকার গেঞ্জী বুনার কল দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়। উপদেশ সম্বলিত আমাদের পুস্তক দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা যে কেহ অল্প কয়কদিন মধ্যেই শিখিয়া অতি উত্তমরূপে আর করিতে পারিবেন। প্রস্তুত মাল আমরা গ্রহণ করার গ্যারান্টি দিতেছি।

সহস্র সহস্র লোক মৌজা, গেঞ্জী, আঁটারওয়ার ইত্যাদি বয়ন করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জন করিতেছে।

—প্রশংসাপত্র—

লর্ড হাডিং (ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট) এবং লর্ড কারমাইকেল (বাঙ্গালার লর্ড) কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

ইহার গবর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগের বড়কর্তা লিখিতেছেন :—“আপনাদের মেশিন নিবন্ধাটেই কাজ দিতেছে।”

তাজউদ্দিন এম. আদম করচাওয়ালা রিটার্ড হেড, ড্রাপ্‌টসম্যান করচা পোর্ট ট্রাষ্ট লিখিতেছেন :—“ঘরের কোণে বসিয়া দৈনিক ৩০-৪০ টাকা উপার্জন করা যায় দেখিয়া আমি সমস্তোৎসাহ লাভ করিয়াছি।”

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টি. এম. চৌধুরী লিখিতেছেন “আমার পত্নী খুব সহজে মৌজা ও সাইকেল মৌজা ইত্যাদি বুনিতে শিখিয়াছেন।”

—সংবাদপত্রের অভিমত—

ন্যাশনাল কল :—“যে কোন ব্যক্তি ঘরে বসিয়া ৩০ টাকা হইতে ৩০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিতে পারে। নারীদের স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের পক্ষে এই কলটি বিশেষ সহায়তা করিবে। ইহা দেশবাসীর সহায়ত্ব লাভ করিবে আশা করা যায়।”

মাদ্রাজ মেন :—এই কার্খ কেবল কাজ শিখাইয়াই দিয়া যায় না, পরন্তু হুতাও সরবরাহ করে এবং তৈয়ারী মাল নিজেরা লয়।”

এডভান্স :—“আমরা আশা করি, ভারতের গৃহে গৃহে এই কল প্রতিষ্ঠিত হইবে, কারণ শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ যে কেহ এই কল চালাইতে পারে।”

কমার্শিয়াল গেজেট :—“এই কল দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্তা ঘুচিবে।”

লিবার্ট :—“এই কল দ্বারা শত শত নরনারী স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করিতে পারিবেন।”

বিত্তত বিবরণের জন্য পাঁচ পয়সার টিকিটসহ চিঠি লিখুন।

দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানী

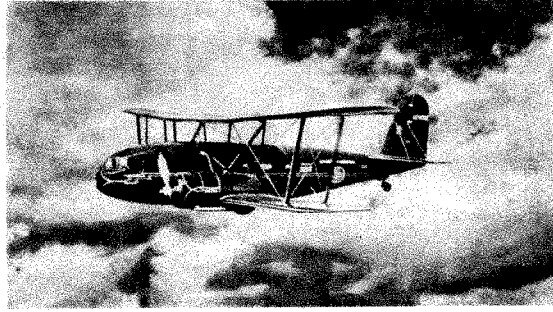
১২৬ এ।১ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা বা ফোর্ট বোম্বাই।

আমাদের নিকট ব্রেইজি, টুইস্টিং ইত্যাদির কল, বাবিন,

শাটল, হুতা ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

কোন—ক্যাল ৩৮৩৭

“তার—Taukalto” কলিঃ।



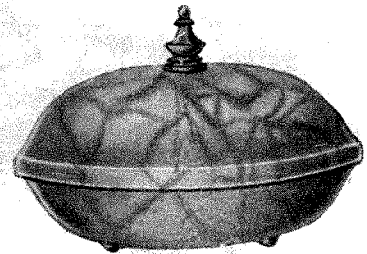
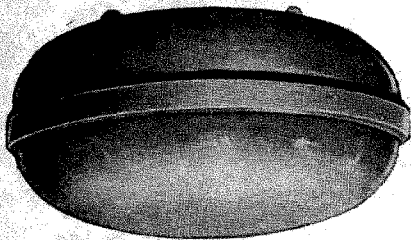
শান্তিকালের এরোপ্লেন

কার্টিস-কগুর; ইহা যুক্তরাজ্যে স্থলপথে যাত্রী ও ডাক সরবরাহে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বারো জন যাত্রী দিনে আরামে বসিয়া রাতে বিছানায় শুইয়া পথযাপন করিতে পারেন।

সুতরাং জাপানের সমস্তা ক্রমেই জটিল হয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমীও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। জাপান কি চায় তাহা জাপানের পররাষ্ট্রসচিব কাউন্ট ইনাই স্পষ্টই বলেছেন—

“উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আধুনিক জাতিসত্ত্বের পরিবারে প্রবেশ করার সময় হ’তে অচ্যাবধি জাপানের পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি মাত্র—সমকক্ষতা ও নিঃশঙ্কতা।”

বিদেশী সেলুলইড্‌ ড্রবোর আমদানিতে প্রতিবৎসর দেশের
ষাট লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে।

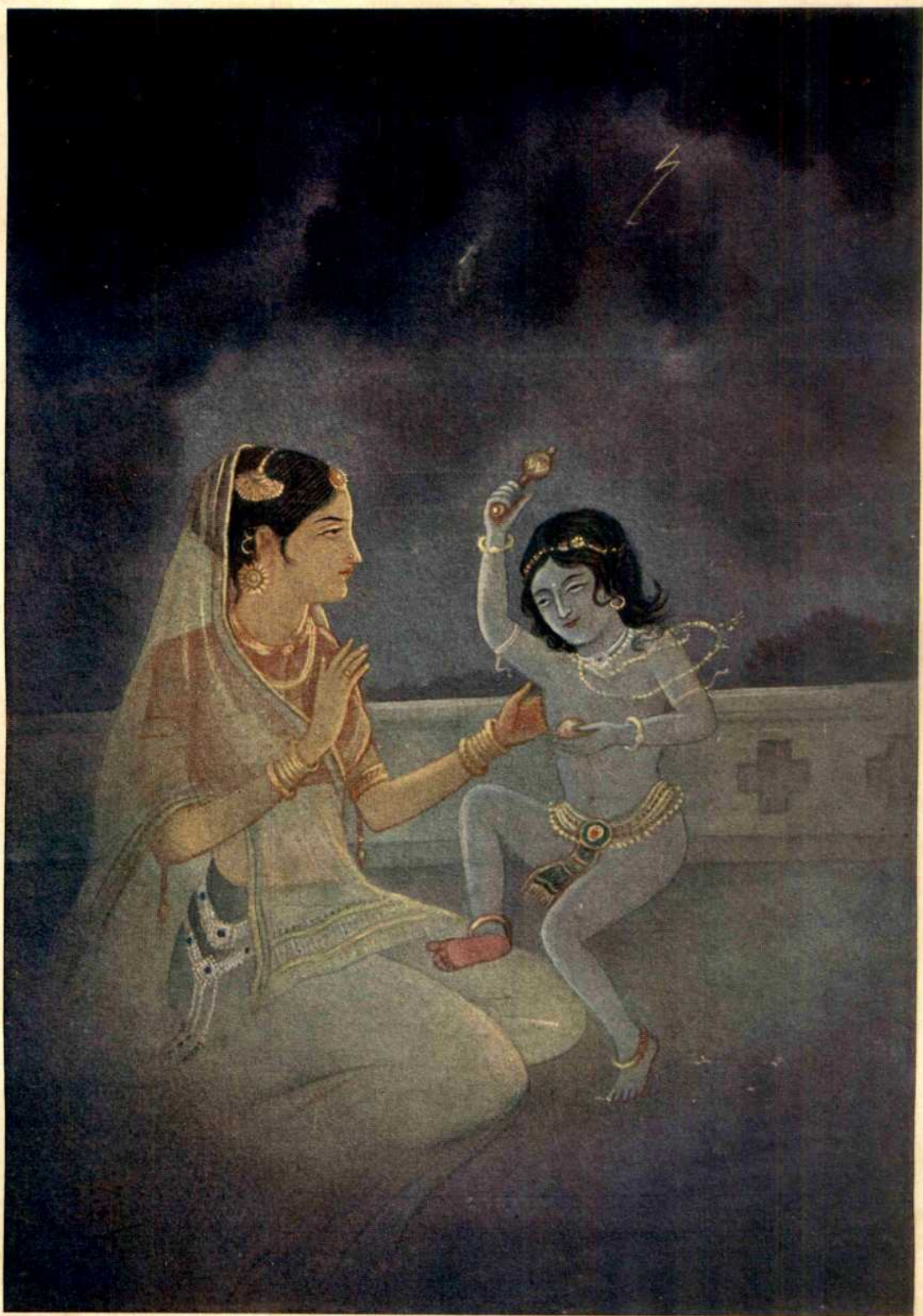


‘ইণ্ডিয়া সেলুলইড্‌ ওয়াকসের’ প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে
বদ্ধপরিকর হউন এবং এইজন্য গৌরব অনুভব করুন।

সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীদ্বারা প্রস্তুত এবং ভারতবাসীর স্বত্ব
সকল ব্যবসায়ীর নিকটেই পাওয়া যায়।

সোল এজেন্টস্—রায় এণ্ড কোং,

৪৬, স্ট্রিকেন্‌ হাউস্, ৪৮, ডালহাউসী স্কোয়ার।



যশোদা ও গোপাল
কীর্তিচন্দ্র দে

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৬৪শ ভাগ

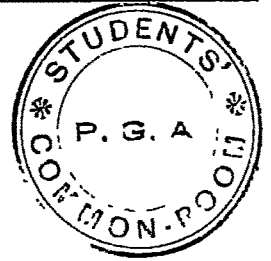
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

২য় সংখ্যা

আবেদন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পশ্চিমের দিকসীমায় দিনশেষের আলো
পাঠালো বাণী সোনার রঙে লিখা,—
“রাতের পথে পথিক তুমি, প্রদীপ-তব জ্বালো,
প্রাণের শেষ লিখা।”
কাহার মুখে তাকাব আমি, আলোক কার ঘরে
রয়েছে মোর তরে,
সঙ্গে যাবে যে আলোখানি পারের ঘাটপানে
এ ধরণীর বিদায়বাণী কহিবে কানে কানে ;
নম ছায়ার সাথে
আলাপ যার হবে নিভৃত রাতে ।
ভাসিবে যবে খেয়ার তরী কেহ কি উপকূলে
রচিবে ডালি নাগ-কেশর ফুলে
তুলিয়া আনি চৈত্রশেষে কুঞ্জবন হ’তে
ভাসিয়ে দিবে শ্রোতে ?

আমার বাঁশি করিবে সারা যা ছিল গান তার,
সে নীরবতা পূর্ণ হবে কিসে ?

তারার মতো সুদূরে-যাওয়া দৃষ্টিখানি কার
মিলিবে মোর নয়ন অমিমিষে ?
অনেক কিছু হয়েছে জমা, অনেক হ'ল খোঁজা,
আশাতৃষার বোঝা

ধূলায় যাব ফেলে ।

ধূলার দাবী নাইকো যাহে সে ধন যদি মেলে,
সুখ-হুখের সব শেষের কথা,
প্রাণের মণিখনির যেথা গোপন গভীরতা
সেথায় যদি চরম দান থাকে,
কে এনে দেবে তাকে ?

যা পেয়েছিছু অসীম এই ভবে

ফেলিয়া যেতে হবে,

আকাশ-ভরা রঙের লীলাখেলা,

বাতাস-ভরা সুর,

পৃথিবী-ভরা কত না রূপ, কত রসের মেলা,

হৃদয়-ভরা স্বপন মায়াপুর,

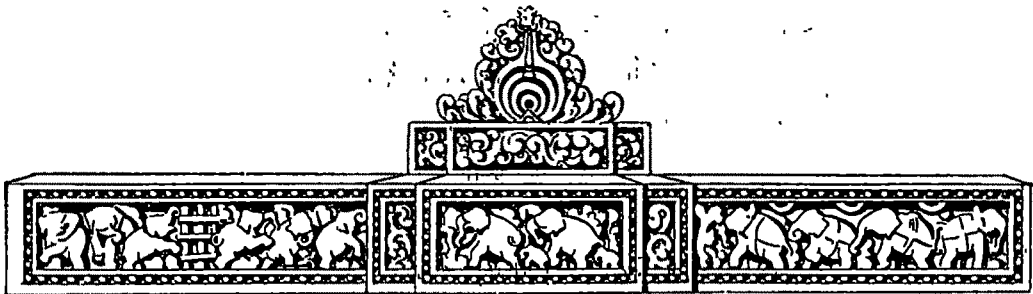
মূল্য শোধ করিতে পারে তার

এমন উপহার

যাবার বেলা দিতে পারো তো দিয়ো

যে আছ মোর, প্রিয় ।

সেপ্টেম্বর ১৩৪৪



১৩৪৪ সালের ১৩৪১

শিখদের মহাগ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন

বেদপন্থীর যেমন বেদ, বুদ্ধপন্থীর যেমন ত্রিপিটক, খ্রীষ্টপন্থীর যেমন বাইবেল ও মহান্দপন্থীর যেমন কোরান, নানকপন্থীর তেমনি গ্রন্থসাহেব। এই গ্রন্থসাহেব বলিতে কি বুঝায় তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ত বাংলা দেশে সকলের নাও থাকিতে পারে। তাই গ্রন্থসাহেবের একটু পরিচয় ও কেমন করিয়া তাহা গড়িয়া উঠিল তাহার একটু ধারা দিবার চেষ্টা করা যাইবে।

তৃতীয় গুরু অমরদাসের কন্যা ভানী বিবি বাল্যকাল হইতেই ছিলেন সরল নিষ্পৃহ ও ধর্মপরায়ণ। অমরদাস বাল্যকালে বৈষ্ণবভাবেই পালিত হওয়ার তাহাব মধ্যে ধর্মের ঐকান্তিক নির্ণ ও রসের প্রাচুর্য দেখা বাইত। সেই বৈষ্ণবোচিত মৈত্র ও নিষ্ঠা ভানী দেবীতেও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বয়স হইলে ভানী দেবীর বিবাহ হইল পরম ধর্মপরায়ণ ভক্ত জেঠার সঙ্গে। পরে এই জেঠাই হইলেন চতুর্থ গুরু রামদাস। ইহাদের প্রথম পুত্রের নাম পৃথীচন্দ। তাহার জন্ম হয় ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাদের দ্বিতীয় পুত্র ভক্ত মহাদেব, তৃতীয় পুত্র গুরু অর্জুন। মহাদেব ছিলেন সংসারবিরাগী। অর্জুনকেই যোগ্য জানিয়া করা হইল সম্প্রদায়ের গুরু। পৃথীচন্দ অসন্তুষ্ট হইয়া এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্তন করিলেন। শিখেরা সেই সম্প্রদায়কে বলেন 'মীনা'। মীনা রাজপুত নার এক দস্যু জতির নাম।

পৃথীচন্দ গুরু নানকের নামে সব বুঠা পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শিখদের হইল মহা ভয়। কি উপায় করা যায়। গুরু অর্জুনের প্রধান চিন্তা হইল কেমন করিয়া গুরু নানক ও অন্যান্য গুরুদের ঋণী পদগুলি একত্র করা যায়।

গুরু নানকের পদগুলি প্রথমে লেখা হইত সংস্কৃত অক্ষর। পঢ়াব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সংস্কৃত বর্ণমালায় ৪২টি অক্ষর ছাড়া, 'ক', 'ত্র', 'জ' এই তিনটি বর্ণ লইয়া ছিল ৫২টি অক্ষর। অথচ পঞ্চনদের প্রাকৃতে ৩৫টি

অক্ষরেই কাজ এক বকম চলিয়া যায়। গুরু অঙ্গদ নিজেও প্রথম লিখিতেন সংস্কৃত অক্ষরে। পরে তিনিই কান্দীরের 'সারদা' অক্ষর ও পঢ়াবের উত্তর-ভাগস্থ পর্বতে প্রচলিত 'টাকরা' অক্ষর ও 'লহংড়া' মিলাইয়া গুরুমুখী অক্ষরের পত্তন করিলেন। অঙ্গদের নিজেরও কিছু পদ রচনা ছিল।

নানা ভাবেই গুরু অর্জুন শিখ ধর্মকে একটি নিজস্ব রূপ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই শিখদের বিখ্যাত 'হরমন্দির' রচনায় প্রবৃত্ত হন। এখন যেখানে অমৃতসর পূর্বে সেখানে এক বোগীর স্থান ছিল। সেই খানেই ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সরোবর রচিত হয় ও তাহার মধ্যস্থলে হয় হরমন্দিরের স্থান। এই সরোবরের আরম্ভ হইয়াছিল গুরু অমরদাসের সময়ে। গুরু রামদাসও এই জন্ত প্রভূত শ্রম করিয়া গিয়াছেন। বাহা ইউক, এই সরোবর-রচনা সমাপ্ত হইলে তাহার মধ্যস্থলে শিখদের পরম মন্দির মহামন্দির হইল প্রতিষ্ঠিত।

গুরু অর্জুন চেষ্টা করিতেছিলেন বাহাতে শিখদের ধর্ম, আদর্শ, নীতি, আচার, দিন-রুতা, সব একটি সংগ্রহের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। কান্দীরের শিখরাও বলিলেন তোমাদের শাস্ত্র ধর্ম ও আচার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও আচারের সঙ্গে গুলাইয়া বাইতেছে। শিখদের ধর্মের ও আচারের একটি নিজস্ব সংগ্রহ সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয় গুরু অমরদাসের দানী ভানী নামে ছিলেন দুই কন্যা। ভানী দেবীর কথা আগেই হইয়াছে। আর মোহরী ও মোহন নামে ছিলেন দুই পুত্র। কিন্তু অমরদাস আপন জামাতা রামদাসকেই যোগ্য জানিয়া গুরুপদ দিয়া বান। মোহরী ও মোহন উপেক্ষিত হইয়া মনে মনে বিব্রত রুঠ হইলেন।

চতুর্থ গুরু রামদাসের তিরোধানের পর অর্জুনদেব হইলেন পঞ্চম গুরু। তিনি নানা স্থান হইতে গুরু নানকের বণী, দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ ও তৃতীয় গুরু অমরদাস ও চতুর্থ গুরু

রামদাসের সব পদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই কার্যে তাঁহার মাতুল-সম্পর্কীয় ভাই গুবদাস হইলেন তাঁহার পরম সহায়। গুরু অঙ্গন প্রবর্তিত গুরুমুণী অক্ষরে ভাই গুবদাস সব লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আদিগুরুর আসল একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ ছিল গোহিন্দ্রবালে অমরদাসের পুত্র মোহনের কাছে। সেই সংগ্রহখানা না পাইলে আর কাজ চলে না। অগতঃ তাহা পাইবার উপায় কি?

গুরু অর্জুন ভাই গুবদাসের লিপিসৌন্দর্য্যে ও তাঁহার রচিত “ব’র” বা গুরুদেব মহিমাগানের রচনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুরু অর্জুন প্রথমে ভাই গুবদাসকে গোহিন্দ্রবালে মোহনের কাছে পাঠাইলেন। মোহন তাঁহাকে একেবারে আমলই দিলেন না। অগত্যা গুরু অর্জুন নিজেই গেলেন ও নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া মোহনকে প্রসন্ন করিলেন। সেই সংগ্রহ গুরুর হস্তগত হইল।

এখন অর্জুনের ভাবনা হইল কেমন কবিরা তাঁহাদের মহাগ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়। নানা স্থান হইতে গুরু সব পদ একত্র করেন ও মুখ বুলিয়া বান। ভাই গুবদাস তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এই উপলক্ষ্যে গুরু অর্জুন, হিন্দু ও মুসলমান নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেকের কাছে সেই মহাগ্রন্থ রচনার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রসঙ্গ ভারতের নানা স্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের সব নির্ঝাঁকিত ভক্তজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাংলা দেশ হইতে জয়দেবের ভক্তগণ তাঁহাদের নির্ঝাঁকিত লোক পাঠাইলেন। ভক্ত নান্দেব, বনমন্দ, রবিদাস, কবীর ও ফরীদ প্রভৃতি সাধক-দলের প্রতিনিধিরাও আসিলেন।

ভক্ত পিলো, ভক্ত কাহু (কৃষ্ণ), ভক্ত ছজ্জ, সাধক শাহ হুসেন প্রভৃতি বহু ভক্ত এই উপলক্ষ্যে আসেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা গৃহীত হয় নাই। কাশী হইতে বৃদ্ধ পণ্ডিত হরলাল ও কৃষ্ণলাল আসিয়া বলিলেন, গুরু নান্দেব কাছে তাঁহারা অনেক উপদেশ পাইয়াছেন। তাহা তাঁহারা এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করাইবার জন্য আসিয়াছেন। যে সব কবিবা শিখার্থ্য গ্রহণ কবিয়াছিলেন তাহাব ও তাঁহাদেব রচিত নানা শুভস্তুতি এই জন্ত আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

পদগুলি লেখক অনুসারে ভাগ না করিয়া ভাগ করা হইল। বাগ অনুসারে। গ্রন্থসাহেবের মধ্যে ৩১টি রাগ দেখা যায়। এক একটি রাগের মধ্যে প্রথমে প্রথম গুরুর পদ, প্রথম মহলা নামে, দ্বিতীয় গুরুর পদ দ্বিতীয় মহলা নামে, তৃতীয় গুরুর পদ তৃতীয় মহলা নামে—এইরূপে সাজান হইল। এক এক রাগে শিখ গুরুদের পদ সাজান হইলে তাহার পর ঈশদেব, রামানন্দ, কবীর, রবিদাস প্রভৃতি ভক্তদের পদ হইল সাজান।

গ্রন্থসাহেবের পরিশিষ্টে ‘রাগমালা’ বলিয়া একটু অংশ আছে। তাহা মুসলমান কবি আলিমের কাব্য হইতে গৃহীত। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিম এক কাব্য রচনা করেন, তাহার নাম “মাধবনাল সঙ্গীত”। এই কাব্যের নায়ক মাধবনাল ও নায়িকা কামকন্দলা। এই কাব্যের ৬৩-৭২ পদগুলিতে যে রাগ-পরিচয় আছে গ্রন্থসাহেবের পরিশিষ্টে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

অমৃতসরের সবোবতীরে বসবাস স্থানে বসিয়া গুরু অর্জুন বলিতেছেন ও ভাই গুবদাস লিখিতেছেন, এমন কবিরা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র শুক্লাপ্রতিপদে এই গ্রন্থসাহেব সংগ্রহ সমাপ্ত হয়। ইহাই আদি গ্রন্থ। ইহার পরে আরও দুইবার গ্রন্থসাহেবের সংগ্রহ হয়। এই আদি গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে এই গ্রন্থের বোগ্য স্থান অমৃতসরে হবসন্ধিরে ইহা রক্ষিত হইয়াছিল।

পদ্মাবত অস্তর্গত গুরুরাত জেলাব মজত গ্রামে ভাই বরো নামে এক জন ভক্ত ছিলেন। গ্রন্থসাহেব রচিত হইলেই তিনি গ্রন্থখানি একবার স্বগ্রামে লইয়া গিয়া দেখিতে চাহিলেন। গুরু অর্জুন বলিলেন, “যাও গ্রন্থখানি লইয়া, কিন্তু তোমার গ্রামে গিয়া এক দিনের বেশী রাখিও না।” ভাই বরো পথে বিশ্রাম করিতে করিতে অতি দীর্ঘে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথেই তিনি গ্রন্থখানির আদ্যন্ত প্রতিলিপি করিয়া লইলেন। গ্রামে বাইয়া গ্রন্থখানি এক দিন রাখিবারও প্রয়োজন আর হইল না। পরে তাহাতে এমন অনেক পদ বরো বসাইলেন বাহা গুরু অর্জুনের আদি গ্রন্থে বাদ গিয়াছিল। গুরু তাঁহাকে বলিলেন, “তোমার সংগ্রহ তোমাবই থাকুক। আমাব সংগ্রহ যেমন ভাবে সমাপ্ত হইয়াছে তেমনই চলুক।” কেহ কেহ বলেন,

লাহারে গ্রন্থসাহেব বাখাইতে আনিয়া ভাই বন্মো প্রতিলিপি করাইয়া লন ও তাঁহার সংগ্রহ তাহাতে বসাইয়া দেন।

গুরু হরগোবিন্দর কাছে পরে বিখিচন্দও এই আদি গ্রন্থখানির একখানি প্রতিলিপি করাইয়া লইবার অনুমতি লভ করেন। মূল গ্রন্থখানি অগ্রামে লইয়া গিয়া বিখিচন্দ অতিশয় নির্ভর সহিত প্রতিলিপি করাইতে লাগিলেন। বিখিচন্দ যখন কিল'দল রাগ পর্যন্ত প্রতিলিপি করাইয়াছেন অর্থাৎ অন্ধকের অধিক যখন লেখা হইয়া গিয়াছে তখন এক দিন গুরু হরগোবিন্দ বিখিচন্দকে তাঁহার সঙ্গে সপরিবারে কীরাতপুরে বাইতে অনুবোধ করিলেন। সকলেই বাজা করি লন কিন্তু গুরুদিস্তর পুত্র ধীরমল সঙ্গে গেলেন না। ধীরমল ভাবিলেন, “যদি আমি না বাই তবে আমি সমস্ত ধন-সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিব, বিশেষভাবে ঐ গ্রন্থসাহেবখানা আমারই হইবে।” বাইবার সময় বিখিচন্দ ধীরমলকে গ্রন্থসাহেবখানা আনিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন ধীরমল বলিলেন, “চিন্তা কি, আপনি চলিয়া যান, আমি পরে পাঠ ইয়া দিব।” গুরু হরগোবিন্দ ধীরমলের কাণ্ড শুনিয়া বলিলেন, “চিন্তা নাই, শিখদের ধন শিখরাই উদ্ধার করিবে।”

গুরু তেগ বাহাদুরের সময় শিখরা ধীরমলের সর্বস্ব নুটিয়া আনে। অবশ্য তাহার অন্য কারণও ছিল। গুরু শিখদের উপর ইহাতে বিবস্ত্র হইয়া ধীরমলকে তাঁহার সর্বস্ব ফিরাইয়া দেন। গ্রন্থসাহেবের প্রতিলিপিখানিও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন।

মীরা মুতু্যাকালে তাঁহার সাধনার সহচরীদেব বলিয়াছিলেন, আমার এই কায়ার অবসান ২টি লও আমার জীবনের অবসান হইবে না, আমি তোমাদের সাধনাতেই বাচিয়া থাকিব। তাই মীরার দেশে প্রায় সব নারী সাধিকাই আপন আপন নাম লুপ্ত করিয়া মীরার নামেই দিয়া ছন ভগিতা। সেইরূপ সকল গুরুই দিয়া গিয়াছেন নানকেব নামে ভগিতা। তবে মহল্লাব সংখ্যা দিয়া কোন গুরুর রচনা তাহা বুঝা যায়। সকল গ্রন্থসাহেব এক গুরুময় মহাতীর্থ। তাহার এক এক মহল্লায় এক এক গুরু করিতেছেন বিরাম।

পূর্বেই বলা হইয়াছে গুরু অর্জুনের সংগৃহীত গ্রন্থ-

সাহেবের পর দ্বিতীয় সংগ্রহই হইল ভাই বন্মোর। ভাই বন্মোর মূল গ্রন্থখানি এখনও গুজরাত জেলায় মজত গ্রামে রক্ষিত আছে। তাহাতে মীরা বাজির একটি গান আছে, আদি গ্রন্থে এই গানটি নাই। সাধারণ গ্রন্থসাহেবে সারংগ রাগে সুরদাসের একটি প্রখ্যাত পদ আছে—“হরিকে সংগ বসে হরিলোক” ইত্যাদি। ভাই বন্মোর গ্রন্থসাহেবে সারংগ রাগে সুরদাসের আর একটি পূর্ণ পদ আছে—
ভক্তিহীনদের সঙ্গ ত্যাগ করিবার উপদেশ প্রসঙ্গে—“ছাড়ি মন হরি বিমুখনকো সংগ” আদি গ্রন্থসাহেবে ঐ একটি মাত্র পংক্তিই আছে। কিন্তু বন্মো তাহাব সংগ্রহে পুরা পদটিই দিয়াছেন। গুরু অর্জুনের সংগৃহীত মূল আদি গ্রন্থসাহেব কর্তারপুরে রক্ষিত আছে। কর্তারপুরের গ্রন্থসাহেবেও প্রথমে পুরা পদটি লেখা হইয়াছিল পরে কি জানি কেন ঐ একটি পংক্তি বাধিকা বাকীটা কলম দিয়া কাটিয়া তাহাব উপর আবার হরিতান্তের রং আগাগোড়া লেপন করিয়া লুপ্ত করিয়া ফেলা হয়।

ভাই সুরদাসের গ্রন্থসাহেবের প্রথম সংগ্রহের পব হইল ভাই বন্মোর দ্বিতীয় সংগ্রহ। তাহার পর তৃতীয় সংগ্রহ হইল গুরু গোবিন্দসিংহের সহ'রতায় ভাই মণিসিংহের সংগ্রহ। এই গ্রন্থকে অনেকে দশম বাদশাহের সংগ্রহ-গ্রন্থ বলেন, যদিও এই নাম গুরু গোবিন্দ বা মণিসিংহের দেওয়া নহে। এই সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লখযোগ্য গুরু গোবিন্দ-বলিত জাপজী, অকাল স্তুতি বা পরমেশ্বরের বন্দনা, বিচিত্র নাটক এবং মর্কণ্ডের পুরাণের দেবীম হাওয়ার তিন তিনটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, জ্ঞানপ্রবোধ, চতুর্বিংশ অবতারতত্ত্ব, “হজারে দে সবদ,” সৈয়দা, শত্ননামমালা, স্ত্রীচবিত্র, জাফনামা বা আওরংজেবকে লেখা গুরু গোবিন্দের স্তত্র, ও কয়েকটি পারসী গল্পের অর্থাৎ “হিকায়তে”ব অনুবাদ; এই অনুবাদও কবিতাতেই করা হইয়াছে।

যুদ্ধ অপরিহার্য্য মনে করিয়া গুরু গোবিন্দ সেই ভাবেই শিখধর্মকে চাহিলেন চালনা করিত। তাই তাঁহার সংগ্রহগ্রন্থে শত্ননামমালা, মার্কণ্ডের চণ্ডীর তিন তিনটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রভৃতি বিষয় আছে। গুরু গোবিন্দ “জাপজী”কে কেহ যেন নানকের জপজী বলিয়া ভুল না

করেন। নানকের “জপজী” হইল শিখধর্মের সার ও মূলমন্ত্র। ইহা প্রত্যেক শিখ-ভক্তের প্রভাতে নিত্য-স্মরণীয়। গুরু গোবিন্দের “জাপজী” হইল বিধাতার সহস্র নাম। গুরু গোবিন্দ বিধাতার যে-সব বীরত্বচক্ৰ-নাম বিশেষ ভাবে চালাইয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বেশ ভাবিয়া দেখিবার মত।—অকাল, সর্বকাল, মহানকাল, অসিধ্বজ, অসিকেতু, ধ্বজকেতু, অসিপাণি, সর্বলোহ (লোহময়), মহানল ইত্যাদি।

গ্রন্থসাহেবে গুরু নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জুনের বাণী ছিল। কঠোরপূরে যে মূল আদি গ্রন্থসাহেব আছে তাহাতে নবম গুরু তেগ বাহাদুরের কোন পদ নাই। গুরু গোবিন্দ দমদমার মঠের গ্রন্থসাহেবে তেগ বাহাদুরের পদাবলীর স্থান করিয়া দেন, গোবিন্দরাল ও খাদুরের মাঝামাঝি একটি স্থানের নাম পরে হয় “দমদমা।” গুরু অমরদাস তাঁহার গুরুপদ গ্রহণের পূর্বে প্রতিদিন প্রভাতে গোবিন্দরাল ও খাদুরের মধ্যে যাতায়াতের মাঝে এখানে একটু বিশ্রাম করিতেন ও জপজী পাঠ করিতেন। “দমদমা” শব্দের অর্থই হইল একটু বিশ্রাম অর্থাৎ দম লইবার স্থান। সেইখানে পরে এক শিখমঠ প্রস্তুত হয়। গুরু গোবিন্দেরও একটি শ্লোক গ্রন্থসাহেবের মধ্যে গৃহীত হয়।

গ্রন্থসাহেবের মধ্যে শিখধর্মের বাহিরের এই কয় জন ভক্তের পদ গৃহীত হইয়াছে :—জয়দেব, নামদেব, ত্রি.লান, পরমানন্দ, সধনা, বেণী, রামানন্দ, ধনুনা, পীপা, সৈন, কবীর, রত্নদাস, সুরদাস, ফবীদ ও ভীখন। ফরীদ ও ভীখন এই দুই জন মুসলমান-বংশীয় ভক্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাই বন্ধার সংগ্রহ মীরা বাজিবও একটি পদ আছে ও সাবংগ রাগে সুরদাসের দুইটি পূবা পদ আছে। আদি গ্রন্থসাহেবে সুরদাসের একটি পূরা পদ ও একটি পংক্তি মাত্র আছে। ভাই বন্ধো তাঁহার সংগ্রহে সেই পংক্তিবৃত্ত পদটি পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

গুরু অর্জুন নিজের মুখে আদি গ্রন্থসাহেবের পদগুলি লিখাইলেও নিজেকে ভগবানের দিক হইতে প্রত্যাদিষ্ট মনে করিয়া এই পদগুলি সংগ্রহ করাইয়াছেন।—বখন সত্ৰাট জাহঙ্গীর এই গ্রন্থসাহেব হইতে মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চাবিত বাণীগুলি তুলিয়া দিতে বলেন তখন গুরু অর্জুন

বলিলেন তাহা অসম্ভব। কাবণ এই গ্রন্থ ক’হ’ও পক্ষে বা বিপক্ষে বা কোনো উদ্দেশ্য করিয়া বচিত নহে, ইহা পবন সত্যের সহজ প্রকাশ। কাজেই ইহাতে হাত দেওয়া অর্থ ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্ৰোহাচরণ। গুরু অর্জুনকে এই জন্ত অশেষবিধ নির্যাতন সহিয়া প্রাণ দিতে হয়। তবু তিনি তাহাতে এক চুলও বিচলিত হন নাই। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাচতুর্থাতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। “দবীস্তান-ই-মজাহিব”—প্রণেতা মুহসিন ফানীর মতে গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ডের অত্র কারণ ছিল। মজাহিবীরের প্রতিশ্রুত খুসরুকে এক সময় সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গুরু অর্জুনকে এই দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। অথচ অর্জুন খুসরুকে অতিথি ভাবেই সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা না করাও তাঁহার পক্ষে শিখধর্মের বিরুদ্ধ হইত। আদিগ্রন্থসাহেবের সংগ্রহ ও রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে শিখদের এত দূর নিষ্ঠা যে তাঁহারা ইহার কিছুমাত্র পরিবর্তন সম্বন্ধে করিতে পারেন না।

ভাই মণি সিংহ বখন গুরু গোবিন্দের আজ্ঞাসারে তাঁহার গ্রন্থসাহেব সংগ্রহ করেন তখন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে রাগ অনুসারে পদগুলির বিভাগ না হইয়া যদি গুরু অনুসারে বিভাগ হয় তবে অনেক দিকে সুবিধা হয়। সেই ভাবে তিনি করিয়াও তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সমস্ত শিখমণ্ডলী এমন বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে মণি সিংহ সকলের কাছে বিনীত ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পরিশেষে সেই সব সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করিতে বাধ্য হন।

গ্রন্থসাহেবের মধ্যে কোথাও কোন ছন্দ বা বিচ্ছেদ নাই। অক্ষরের পর অক্ষর সমান ভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহা বদলাইয়া শব্দগুলি পদবিভাগ-মত বলাইলে সুবিধা হয়, কিন্তু উপায় নাই। এই সব শব্দবোজনা ঠিক মত না পড়িলে অর্থ এক হইতে আর হইয়া যায়। একবার এক শিখকে এই রূপ ভুল ভাবে পড়িতে দেখিয়া গুরু গোবিন্দ গ্রন্থের পাঠ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবার ব্যবস্থা করেন। “গ্রন্থী” বলিয়া বিশেষ এক শ্রেণীর লোককেই গ্রন্থ পড়িতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও যে কত ভুল হয় তাহা একটু খোঁজ করিলেই দেখা যায়। এখন কোথাও কোথাও গ্রন্থসাহেব বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া মুদ্রিত

করিবার কথা চলিয়'ছে। আমার এক ছাত্র ত্রিম'ন জয়ন্তী-
লাল অ'চার্য এই কাজে হাতও দিয়াছেন। তবে এখনও
ইহা সমাপ্ত হইতে বিস্তর বিলম্ব আছে।

গুরু গোবিন্দের আদেশ ভাই মণি সিংহ এই গ্রন্থ সংগ্রহ
আরম্ভ করিলেও ইহা সমাপ্ত হয় গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর
ছাবিশ বৎসর পবে। গুরু গোবিন্দ এক ধর্ম্মীক পাঠানের
হস্তে নিহত হন। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক শুক্লাপঞ্চমী
বৃহস্পতিবারে তিনি পবলোকগমন করেন। ১৭৩৪
খ্রীষ্টাব্দে ভাই মণি সিংহর সংগ্রহ-গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। সেই
গ্রন্থ এখন পাতিয়ালায় অন্তর্গত তলবস্তী গ্রাম-মঠে
রক্ষিত। এই মঠে শিখরা দমদমার মঠ বলেন। দমদমা
মঠের কথা আগুও বলা হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দর সংগ্রহ অনেক শিখর কিছু কিছু আপত্তি
ছিল। উহাতে 'প্রী চরিত্র' ও পারস্ত ভাষার 'হিকায়ত'
বা মনোরমক গল্প প্রভৃতি বাহা আছে তাহা তাঁহাদের মতে
ঐ সংগ্রহে না থাকিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে থাকা উচিত।
যখন এইরূপ তর্ক চলিয়াছে তখন বিকানের হইতে মিরান-
কোটবাসী মহতাব সিংহ নামে এক শিখ আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। তিনি শপথ করিয়াছিলেন মঙ্গা হংবর নামে
এক মুসলমান রাজপুরুষের প্রাণ লইবেন। মঙ্গা নাকি
অমৃতসরের গুরুমন্দির করায়ত্ত করিয়া সেই ধর্ম্মমন্দিরের
অসমান করিবার জন্ত সেখানে নৈর্ভকীর নাচ চালাইতেছিল।
মহতাব সিংহ কহিলেন যদি আমি অ'ম'র শপথ পূর্ণ করিয়া

এখান ফিরিয়া আসি তবে গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ ঠিক এমন
ভাবেই রাখিত হইবে, আর যদি এই চেষ্টায় আমার
প্রাণ যায় তবে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামুসারে গুরু
গোবিন্দের গ্রন্থসাহেবকে বণ্ডিত করিতে পার। মহতাব
সিংহ শপথ পূর্ণ করিয়া দমদমায় ফিরিলেন, কাজেই ঐ
গ্রন্থ ঠিক তেমন ভাবেই রহিয়া গেল।*

* শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে এম্, এ, মেকলিক সাহেব ইংরেজীতে যে ছয়
খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে গুরুমুখী না জানিয়াও শিখধর্ম্মের
অনেক খবর পাওয়া যায়। তিনি কয়েক জন শিখ সন্ন্যাসীর সহায়তায়
মূল বাস্তবগুলির অনুবাদ করেন। তবু সেই সব অনুবাদে বিস্তর ভুলভ্রান্তি
ঘটিয়াছে। মেকলিক সাহেব শিখধর্ম্মের জন্ত যে প্রচুর শ্রম
করিয়াছেন তাহার জন্ত আমবা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, তবু
তাঁহার পক্ষ মুখিল হইয়াছে তিনি ভারতীয় অগ্রাঙ্ক ধর্ম্মের কোনো
পরিচয় না লইয়াই শিখধর্ম্মকে ভারতীয় সাধনার জগতে একটি
বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে করিয়া তাঁহার কাজে হাত দিয়াছেন। বরং
তাঁহার মধ্যে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা দেখা যায় যে ভারতের
অগ্রাঙ্ক সাধনার সঙ্গে শিখধর্ম্মের কোন যোগ থাকা স্বাভাবিক নয়।
ইহার মূল কি উদ্দেশ্য আছে জানি না, তবে এই বিষয়ে পরে
আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি নিজে
এখনও বিশেষভাবে কিছু কাজ প্রকাশ করি নাই। তাহার কারণ
তাঁহার বিস্তর শিক্ষিত ভক্ত আছেন। আমি এখন প্রায়ঃতঃ এমন
সব পছন্দইলা কাজ কবিত্তেছি বাহাদের বিষয় এখনই কিছু না করা
হইলে তাঁহাদের বহু অমূল্য রত্ন নষ্ট হইবে। শিখধর্ম্মের সে বিপদ
নাই। আমার কয়েক জন প্রীতিভাজন কর্ম্মসহচর এই কাজে হাত
দিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের দ্বারা এই বিষয়ে অনেক অনেক
ভিতরর কথা জানিতে পারিবেন। আমার সেই সব প্রীতিভাজন
সহকর্ম্মার প্রয়োচনায় এই শিখধর্ম্মের আলোচনাতেও আমাকে
ভবিষ্যতে কিছু কিছু কাজ সম্ভবতঃ করিতে হইবে।



‘বৃহৎ-সংহিতা’র নারী

শ্রী ভ্রমরীষেব, এম-এ

বরাহমিহিবদ্ধ বৃহৎ-সংহিতা মনোবোগ সহকারে পাঠ করিলে স্বতঃই একটি কথা মনে প্রতিফলিত হয় যে এ-যাবৎ “স্ত্রী-বৃত্তান্ত” সংগ্রহের নিমিত্ত যে-সমস্ত শাস্ত্রকাবের সহিত তাঁহাদের গ্রন্থের মধ্য দিয়া পরিচয় হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহৎ-সংহিতাকার বরাহমিহিরের জ্ঞান নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা অতি বিরল।

ঋগ্বেদে নারী সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নই, কারণ ইহা কতকগুলি ঋক্ বা জুতির সমষ্টি মাত্র। তবে ইহার বিষয়বস্তু হইতে অনুসন্ধান দ্বারা আমরা নারীসম্বন্ধীয় তথ্য কতকটা বাহির করিয়া লইতে পারি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি বিংশতি সংহিতাকাবগণের শাস্ত্রে এবং অন্যান্য পরবর্তী শাস্ত্রে আমরা স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বিশেষ সারগর্ভ বিবরণ প্রাপ্ত হই। উক্ত-সংহিতাগুলির কতকগুলি অধ্যায়ে সম্পূর্ণভাবে এবং কতকগুলি অধ্যায়ে আংশিকরূপে নারীবিষয়ক আলোচনা আছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহার অধিকাংশ স্থল পাঠ করিলেই একটা ভাব সকলের মনে জাগে যে, নারী সর্ববিষয়েই পুরুষ হইতে হীনতবা ও কূটস্বভাব। এক-একটি সংহিতায় অধ্যায়ের পব অধ্যায়ে স্ত্রীলোকগণের নিকট হইতে আশ্রয়লাভ ও তাহাদের দুঃসংসর্গ-দোষ হইতে মুক্তির উপায় ও সংস্কার বিবৃত রহিয়াছে। সমাজে এতাদৃশ বিরুদ্ধ ভাব স্ত্রী-সমাজের পক্ষে বিশেষ সম্মানসূচক নহে। কি কি কাবণে সমাজে স্ত্রীলোকেব স্থান অবনতির স্তরে ধাবিত হইল, ইতিহাস-পাঠে তাহা জানা যায়। বৈদেশিক আক্রমণ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসে কলঙ্কলেপন করিয়াছে ও খুব সম্ভব বৈদেশিক সংসর্গেই ভারতীয় জাতীয়তায় তখন অবনতি আনয়ন করিয়াছিল।

সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে যখন বিজ্ঞাতীয় ভাব প্রবেশ করিল, তখন ভারতবর্ষে স্ত্রী হুমত্যা দেশ পৃথিবীতে বিরল। অপরাপর দেশ ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় এক রূপ

অসভ্য ছিল বলিয়াই ধরা হয়। এই সকল অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির অনুরূপ চিন্তাধারা ধীরে ধীরে ভারতের হৃদয়ে প্রবেশ করিল; সমাজে অল্পবিস্তর পবিবর্তন ঘটিতে লাগিল। বৈদেশিকগণের লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষাব নিমিত্ত সমাজে অবরোধপ্রণালী সৃষ্টি ও তৎসঙ্গে অল্পবিস্তর স্ত্রীলোকগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখা যাইতে লাগিল। এই সন্দেহের বিষয় ফল এককালে স্ত্রীজাতির গোবর্ভ অল্প অল্পে হরণ করিল। সমাজসংস্কারকগণও তাঁহাদের স্ববুদ্ধিপ্রণোদিত শাস্ত্রাদির সাহায্যে স্ব স্ব মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঋগ্বেদের কালে যে সময়ে আমরা স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার দেখিতে পাই, সে সময়েও স্ত্রীলোককে পুরুষ হইতে হীন কবা হইয়াছে। ঋগ্বেদে ঋষিকৃত ঋকেও আমরা দেখিতে পাই যে স্ত্রীলোকগণের স্বভাব নাকি “হিংস্র বৃকেব তুল্য”। “সালাবুকাণাং হৃদয়াণ্যোতা” ঋং ১০। ১৫। ১৫; তাঁহাদের স্বয়ং স্নেহ ও প্রেমবর্জিত (“ন বৈ স্নেহানি সন্ধানি”) এবং তাঁহাদের মন শাসনের অযোগ্য (“স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ” ঋং ৮। ৩৩। ১৭)। ঋগ্বেদে স্ত্রীঋষি কর্তৃক রচিত (অর্থাৎ ‘দৃষ্ট’ — ‘ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টাবঃ’) কতকগুলি ঋক্ আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহাদের রচিত ঋকে কোনস্থানেই তো পুরুষের নিন্দা নাই। মালুয হিসাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি দোষ ও গুণ বর্তমান আছে বাহা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সকল দোষ-গুণ-সমন্বয়ে গঠিত মানব বে হঠাৎ শ্রেণীভেদে কেহ কাহারও অপেক্ষা উচ্চতর অথবা নিম্নতর হইতে পারে ইহা বুঝায় না। শাস্ত্রকুৎসংগ প্রায় সকলেই পুরুষ ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রসমূহ যে পক্ষপাতিত্ব-দোষে ভুগে একথা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। এ-যাবৎ সমাজের বৃকে এবং বিধি অন্তায় ও পক্ষপাতিত্ব-ভুগে শাস্ত্রের নীতি অবলম্বন করিয়া নারীগণের প্রতি অত্যন্ত অন্তায় আচরণ করা হইয়াছে। বরাহমিহিরই

একমাত্র ঋষি—বিনি অতি নির্ভীকভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় এই অত্যাশ্চর্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বৃহৎ-সংহিতার পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে তিনি বলি.তছেন—

প্রকৃত সত্যং কতরোহনানাম গোবোধিতি বে' নাচরিতো মনুষ্যঃ

অর্থাৎ, যথার্থ বল দেখি, স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইয়ের মধ্যে অন্ননাশনের এমন কি দোষ আছে বাহা পুরুষ কর্তৃক আচরিত হয় নাই?

পুরুষের যে সকল গুণ রহিয়াছে স্ত্রীগণের তদপেক্ষা অধিক গুণাবলি বিস্তারিত। স্ত্রীলোকগণ বরাহমিহিরের মতে পুরুষ হইতে অধিক-গুণ-সম্পন্ন—“গুণাধিকাস্তাঃ”। তবে কেবলমাত্র পুরুষের ঋষ্টতা নিমিত্তই স্ত্রীগণকে সকল অধিকারচ্যুত করা হইয়াছে।

ধাট্টোন পুত্তিঃ প্রমদা নিরজা

বরাহমিহিরের ক্ষদ্রে স্ত্রীজাতির আসন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট সমুদ্র পদার্থের মধ্যে সার সৃষ্টি ‘নারী’—

প্রথমঃ দৃষ্টং ননং স্পষ্টং স্মৃতমপি বৃথাং হ্যামজননং
ন বহুং স্ত্রীভ্যোহন্তং কচিদপি কৃতং লোকপতিনা।

তিনি স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র অবলার আসনে আসীনা দেখেন নাই। তিনি যথার্থ স্নেহ, ভক্তি ও স্নায়বশ্বের দ্বারা স্ত্রীজাতিকে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার স্নায়-চক্ষুব সম্মুখ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই দোষগুণ বর্তমান। তিনি একদিকে যেদিক স্ত্রীলোকের আগন্তুক ‘চপলতা’র প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করিয়াছেন, সেইরূপ আবার নারীর প্রকৃতি-সিদ্ধ সরলতার নিকট পুরুষের স্বভাবমূলত কপটতার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। নৈসর্গিক সরলতা হেতু স্ত্রীলোক যেদিক প্রতি পদে ব্যথা পায় ও অনুপকৃত হয় তাহা বরাহমিহিরের স্নায় ঋষির স্নান-চক্ষুর অবিস্মৃত ছিল না। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, “স্ত্রী লোক সংসারে প্রত্যবিত হইয়াও সূক্ষ্মজ্ঞতা হেতু মৃতপতিঃক অঙ্গে গোপিত কবিতা সপ্তজিহ্বা অনলে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া থাকেন।”—

পুরুষশটলানি কামিনীনাং কুবন্তে যানি ব্রহ্মা ন তানি পশ্যৎ।
সূক্ষ্মজ্ঞতয়াগ্না গতাঃ ন বশন্তঃ প্রবিশন্তি সপ্তজিহ্বম।

বরাহমিহিরের মতে বাহারা স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র দোষই দেখিয়া থাকেন তাঁহারা চূর্জন। তাঁহার মতে পুরুষজাতি কৃত্য যে স্ত্রীজাতি পুরুষের জননী, জায়া,

ভগিনী ও কণ্ঠা রূপে শোকে, দুঃখে ও আনন্দে শান্তি আনয়ন করেন, সেই নারী-জাতির নিন্দা করা কি অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা নহে?

তাঁহার মতে ‘সংযম’ বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্নায় অসাধারণ ক্ষমতা পুরুষের বিন্দুমানও নাই। গাহ’স্থ্য-ধর্ম্মই ‘শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম’ এবং গৃহেতেই ধর্ম্ম, অর্থ ও স্ত্রীমুখ ও বিবয়-মুখ ঘটিয়া থাকে এবং এই গৃহের স্ত্রী-জাতিই লক্ষ্মীস্বরূপ। স্ত্রীর মানদন পুরুষগণ কর্তৃক সত্যত তাঁহাদের রক্ষা করাই কর্তব্য কার্য্য।

অত্যাশ্চর্য্য যিগণেব স্নায় তিনিও স্ত্রীজাতির ‘পবিত্রতা’ সম্বন্ধে একমত। স্ত্রীলোক সর্বদা শুচি ও তাঁহাদের সর্বত্র পবিত্র। তাঁহারা কোনকালেও দূষিতা হন না—“নৈতা দূষ্যন্তি...কহিচিৎ”। মনু ও অত্যাশ্চর্য্য সংহিতাকার এবং বরাহমিহিরের মতে চন্দ্র স্ত্রীজাতিকে ‘শৌচ,’ গন্ধর্ব্বগণ ‘সুভূত বাক্য’ এবং অগ্নি তাঁহাদের ‘সর্ব-মেধ্য’ প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্তই লোকসমাজে তাঁহারা স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ স্বরূপ।

সোমস্তাসামধাচ্ছেচং পঞ্চর্ষাঃ শিক্ষিতাঃ গিরম্।

অগ্নিঞ্চ সর্বমেধ্যং তন্মারিক্সমাঃ স্নিঃ।

স্ত্রীজাতির চপলতার কথাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু এই তরলতাকে তিনি নারীর ‘আগন্তুক’ বা কাদাচিৎক ধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ কবিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই তিনি ‘অন্তঃপুর চিন্তা’ নামক অধ্যায়ে কোন্ নারী অনুরক্তা বা বিরক্তা এই বিষয়ে অগ্রে পরীক্ষা করিয়া লইবার নানাবিধ উপায় বলিয়াছেন। বিদুরথ রাজার মহিষী বেণীমধ্যে অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া স্বামীকে নিহত করিয়াছিলেন এবং কাশিরাজের বিরক্তা স্ত্রী বিষ-প্রদিক্ষ নুপুর দ্বারা পতির বিনাশ সাধন কবিয়াছিলেন—এই সমস্ত ইতিবৃত্তও তাঁহার (বরাহমিহিরের) অবিস্মৃত ছিল না এবং তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। বরাহমিহির স্ত্রীলোকের শারীরিক সুলক্ষণ-সমূহও বর্ণনা করিয়াছেন। বরাহমিহির পুরুষগণকে সুলক্ষণ পত্নী গ্রহণে আদেশও করিয়াছেন। “ব্রাহ্মণগণের পাদবৃগল পবিত্র, গোজাতির পৃষ্ঠ পবিত্র, কিন্তু স্ত্রীজাতির সর্বত্র পবিত্র”—একথা তিনি পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বরাহমিহির বলেন, “নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণেই উচ্চতর এবং

নারীচরিত্রের দোষকে অত্যন্ত স্থগার চক্ষে দেখেন এবং সেইজন্য নারী নিজ চরিত্র পবিত্র বারিবার জন্ত প্রাণ পর্যন্ত পাত করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষ নিজ চরিত্র বিগুহ্য রাখিবার কোনই চেষ্টা করেন না এবং নিজ চরিত্রজনিত দোষকে স্থগার চক্ষেও দেখেন না।

দম্পত্যোর্বৃত্তমে দোরঃ সমঃ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতঃ ।

নারী ন তমবক্ষন্তে তেনাত্ত বরমঙ্গলাঃ ।

মহাভারতে আমরা নারীজাতির সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। যদিও মহাভারতে দুষ্টা নারী হইতে সাবধান থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, তথাপি স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি ও সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত দেখা হইত। নারী হইলেই দৃষ্টিচরিত্র হইবে, কপটা বা মায়াবিনী হইবে, একপ ভাব তখন ছিল না, পক্ষান্তরে ভাষা কত্কা বা ভাগিনীকে স্নেহ ও বিশ্বাসের চক্ষেই দেখা হইত। মহাভারতে এইজন্যই ভাষাকে হৃৎ-রোগের মহৌষধ ও প্রকৃষ্ট বন্ধ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

নাস্তি ভাষ্যসমং কিঞ্চিৎ নবভারত ভবজন্ম ।

নাস্তি ভাষ্যসমা বন্ধানস্তি ভাষ্যসমা গতিঃ ।

নাস্তি ভাষ্যসমো লোকে সহায়ো ধর্মসংগ্রহঃ ।

(শাস্তি, ১৪৪-১৪৬)

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পৌরাণিক যুগে—অন্ততঃ পুরাণসমূহে নারী মাত্রকেই দৃষ্টিচরিত্র বলা হইয়াছে। নারী কখনও পবিত্রা নন—সচরিত্রা হইতেই পারেন না—

তা সে কুলরমণীই হউক আর অস্ত্র স্ত্রীলোকই হউক—

নম্রচ নারীশ্চ সমস্তভাষাঃ

স্বতন্ত্রভাবে গমনক্ষমক ।

তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি

নম্রো হি কুলানি কুলানি নার্যাঃ ।

আবার—

নারী পাতক্যতে কুলং, নারী পাতক্যতে কুলম্ ।

নারীগাক নরীনাং বচনং ললিতা গতিঃ ।

স্ত্রীলোক নাকি সর্বসময়েই বিধম ও তাহাদের নাকি মান ও সম্মান দ্বারা ভুট করা যায় না, এমন কি সরল ব্যবহার ও সেবা দ্বারাও নাকি বাধ্য করা যায় না—

ন দানেন ন মানেন নার্কবেন ন সেবয়া ।

ন শাস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ সর্বথা বিবদাঃ স্ত্রিণঃ ।

আবার পুরাণান্তরে বলিতেছেন, নারী নাকি নির্ধন

পাপের উৎস এবং নারী হইতে অধিকতর খাপসাদী নাকি আর কেহই নাই।

ন জীভাঃ কিস্বিন্দ্রিয়ং বৈ পাপীয়ন্তরুদিত্তি বৈ ।

স্ত্রিণো যুলং হি পাপানাং তথা হমপি বেষ হ ।

নারী নাকি সংকুলসত্ত্বা হইলেও এবং নাথবতী

হইলেও সর্বদা মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন।

কুলীনা নাথবত্যশ্চ রূপবত্যশ্চ যোষিতঃ ।

মর্যাদাহীন ন তিহস্তি স মোঘঃ স্ত্রীম্ নারদ । ।

এই নারীজাতি যে পুরুষের সহধর্মিণী হইয়া ধর্ম-কর্মে সহায়ত্বতা হন, পুরাণবিশেষ তাহাও অস্বীকার করিতেছেন এবং পূর্বে পূর্বে মহর্ষিগণ দ্বারা ভাষাকে সহধর্মিণী আখ্যা দিয়াছেন (যথা, মহাভারতে “সহায়ো ধর্মসংগ্রহঃ”) তাহাদিগকেও বিজ্ঞপ-বাণে জর্জরিত করিয়াছেন। যথা—“যদিহং ‘সহায়ম’তি পূর্বযুক্তং মহর্ষিভিঃ। সঙ্গোহঃ সহমানের বিরুদ্ধ ইতি মে গতিঃ।” এই শ্রেণীর পুরাণশাস্ত্রকারগণ কি কখনও কুলস্ত্রীকে পতির জন্ত হস্তমুখে মৃত্যু বরণ করিতে দেখেন নাই অথবা শ্রবণও করেন নাই যে কুলস্ত্রীগণ—

জীবতি জীবতি নীর্থে মৃত্যু মৃত্যু বা মৃত্যু মৃত্যু মুদিত্তে ।

সহস্র-সহস্র-সরলা কুলবিনিতা কেন তুল্যা জ্ঞাৎ ।

এই শাস্ত্রকারগণের উক্তি যে অব্যর্থকভাবে দুষ্ট তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই সমস্ত শাস্ত্রকারকে লক্ষ্য করিয়াই বরাহমিহির বলিয়াছেন—

অহো ধাষ্ট্যাসাদুনাং নিম্নতামনশাঃ স্ত্রিণঃ ।

মুক্তাসিবি চৌরাণাং তিষ্ঠ চৌরেতি জ্ঞাতব্যম্ ।

অর্থাৎ, চোর যেমন নিজে চুরি করিয়া অপরাধে “চোর! চোর!” বলিয়া ধরাইয়া দিতে যায়, ইহাদের প্রচেষ্টাও অনেকটা সেইরূপ।

জননী জায়া ও ভগিনীর জাতিকে পুরুষে যে কি করিয়া একপ নিন্দা করেন তাহা সত্যই বুঝিতে পারি না। সত্যই বরাহমিহির পরিস্ফুট ভাবে তথাকথা বলিয়াছেন—

জায়া বা ভাঙ্কনিত্রী বা সম্ভবঃ স্ত্রীকৃতে নৃণাম্ ।

হে কৃতদ্বন্দ্বোনি নারীঃ কৃতদ্বন্দ্বাঃ বঃ কৃতঃ শুভম্ ।

স্ত্রীলোকের জন্তই ধর্ম অর্থ সমস্ত প্রাণ লাভ করিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বরাহমিহির, সেই জন্ত বিশদরূপে মনে করাইয়া দিতেছেন—

তদ্ব্যর্থং ধর্মার্থৌ হৃতবিষয়সৌখ্যানিচ ততো ।

পুংহে লক্ষ্মো দাত্তা সত্যতমবলা মানবিত্তবৈঃ ।

মহুও বলিয়াছেন—

বর নাথিক পুঁজিতে রসমন্তে তর দেবতা।

বরাহমিহিরের এতাদৃশ যথার্থোক্তি-সংকল 'সত্যাই' মনে
প্রকার উদ্বেগ করে। বলিলে অতীতি হইবে না যে, ইনিই
একমাত্র ঋষি যিনি স্ত্রী-পুরুষকে স্ত্রীর তুল্যদণ্ডে স্থাপিত

করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়াছেন। এরূপ মনীষীর
উদ্দেশ্যে কখন স্বতঃই প্রকার পরিপূরিত হইয়া উঠে।
এরূপ মহামুভব ও ভ্রাতৃদর্শী ব্যক্তি সত্যই বিরল।
ইনি প্রকৃতই ঋষি। সমস্ত স্ত্রীসমাজ ইহার নিকট

কৃতজ্ঞ।

দৃষ্টি-প্রদীপ

ত্রিবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

৩

পঞ্চ ইটি, একেবারে নিঃস্বপ্ন অবস্থা। সন্ধ্যা কিছ্র
আগে একটা বড় পাকুড়গাছের তলায় পথের ধারে—
জনকস্বয়ং লোক দেখে সেখানে গেলাম। চাই জন পুরুষ
মানুষ ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রী-লাক—তার
গাছতলায় উঠুন জেলে রাখবার উদ্দেশ্যে করছে।

এক জন বললে—ক'ন থেকে আসছেন বাবু?

—খাগড়াবাট থেকে। তোমরা আসিচ কোথা থেকে?

—আমরা আসতেছি তো' বড় দূর থেকে। বাবু
কেহলীর মেলায়।

এক জন তামাক সেজে নিয়ে এসে বললে—তামাক
ইচ্ছে করুন বাবু। ও জুড়ন, বাবুকে বসবার কিছ্র দে—

—আমি তামাক খাই'নে, তোমরা খাও। তোমরা দেশ
থেকে বেরিয়েচ কতদিন?

জুড়ন বৈরাগী এগিয়ে এসে সঙ্গীর হাত থেকে
হুকোটো নিলে। বললে—বাবু বড় কষ্ট, আর পুসিমেতে
বাড়ির বার হওয়া হয়েছে। রাত্তার কি অনাবিষ্ট,
কি অনাবিষ্ট! তিনদিন ধরে আর খায়ে না, জিনিষপত্র
ভিলে একটা, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কোশ এখান থেকে—
নওদা চেনেন? সেই নওদার সম্মিততা আমাদের বাড়ি,
হাঁতীবাধা গ্রাম, বশেরি জেলা।

গল্পগুচ্ছে আধঘণ্টা কাটলো। জুড়ন বললে—

দাদাঠাকুরের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? এক রুজ
করুন দাদাঠাকুর, আমাদেব সঙ্গে সবই আছে, রহুই
করুন, আমরা পেরসাদ পাব এখন। ভ্রাতৃপণের পাতের
অন্ন কতকাল খাই নি। ও কাপাসীর মা, পুরুর থেকে
জলভা নিয়ে এস, আর রাত কোবো না।

আমি বিশেষ কোন আপত্তি করলাম না। এদব
সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগছিল, এই রাত্রে তা ছাড়া
বাবুই বা কোথায়? রান্না চড়িয়ে দিলাম। কাপাসীর মা
আলু বেগুন ছাড়াতে বসল। ওদের মধ্যে এক জনেব
নাম বাবুরাম—সে পুরুরে চাল ধুতে গেল। জুড়ন শুকনো
কাঠকুটো কুড়িয়ে অন্তে গেল।

পথের ধারে এই দরিত্র, সরল মানুষগুলির সঙ্গে
গাছতলায় রাত্রিযাপন, ভীবনের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।
রাতটিও বেশ, কি রকম স্থলর জ্যোৎস্না উঠেছে! নির্জন
মাঠে জ্যোৎস্নার অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

এই জ্যোৎস্নারাতে আমার কেবলই মনে হয় আমি
আর সে-সব জিনিষ দেখি'নে। কতদিন দেখি নি। যখন
চিন্তে শিথি নি, তখন রোগ ভেবে বাক্য ভয় করেছি
কত, এখন তা হারিয়ে বুকেছি কি অবল্য সম্পদ ছিল
তা ভীবনের। বোধ হয় মাঠের ধারের এই সঙ্গ দূরী
বাসের শয্যা শুয়ে চৌক বুজ ভ'লে আবার দৃষ্টিশক্তি
ফিরে পাই—এই সব বিজন মাঠে শেখরহরের জ্যোৎস্নার
রাত্রে মুখ উচু করে চেয়ে থাকলে অনন্ত পথের বাতীর

দেখা যায়...ওপর আকাশের জ্যোৎস্নামাখা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে পথে দেহগন্ধে সুরভি হয়—পরের হৃৎথে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী-সমুদ্রে ঝিঙ্ককের মধ্যে পড়লে তা থেকে মুক্তা হয়, বিলবাওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মমধুর সৃষ্টি করে...আমার নিবে-বাওয়া দুটি-প্রদীপে আলো জ্বলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

সীতার কথা মনে হয়। আচ্ছা, এই রাত্রে এককণ সে কি করছে? যে-জীবনের মধ্যে সে আছে, সে-জীবনের জন্তে সে তৈরি হয় নি। হয়ত রান্নাঘরে বসে এককণে এইরকম রাখছে, ও অত বই পড়তে ভালবাসে, তাদের ঘবে একখানাও বই নেই, বই পড়া হয়ত সেখানে বোর অপরাধ, যেমন ছিল জ্যাঠাইমার কাছে। জীবনের যে-কোন আনন্দভরা অভিজ্ঞতার সময়েই সীতার ব্যর্থ জীবনের কথা আমার না মনে এসে পারে না।

সবাই মিলে খেতে বসলাম। রান্না হ'ল বড়ি বোল, আলুভাতে, পটলভাত। কাপাসীর মা অবিম্ভি দেখিয়ে দিল। কাল ঠিক এই সময়ে খাগড়াঘাটের পথে বটতলায় চৌধুরীঠাকুর ভজন গাইতে। কি খরাপ লোকটা। টাকার দরকার ছিল, আমার বললে তো আমি দিতামই। চুরি ক'বে কি হ'ল।

জুড়ন বৈরাগী খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করতে ল'গল। বললে—জুড়ন দাঁড়াঠাকুর, এই যে কাপাসীর মা দেখছেন, এর বাবা অনেক টাকা জমিয়ে মারা গিয়েছিল। খেতো লা, শুধু টাকা জমাতো। মরবার সময় ভাইকে বল ল, আমুক জায়গায় ম'লসায় টাকা পৌতা আছে, নিয়ে এসে আমার দেখা। তা এই পানচাল'র কোণে ভাঙা উম্মনের রাখি ম'লসা পৌতা ছিল—কেউ জ'নুতা না। মরবার সময় তাই টাকার ম'লসা সামনে নিয়ে খোলে। টাকা দেখুতি দেখুতি মরে গেল।

—সে টাকা কে পেলে তার পর?

—তারপর বুড়া তো মরে গেল। তাব ভাই রটালে ম'লসাহুত্বে টাকা সেই রাতি গোলমালে চুরি হয়ছে। এমন-কি টাকার অভাবে বুড়োর ছেরান্দিটাও হ'ল না। পেটের ওপর বাগিন্দি ক'রে টাকা জমিয়ে গেল, নিজের

ভোগে ত লাগলোই না—একটিমাত্র মেয়ে এই কাপাসীর মা, তার ভোগে ত হ'ল না। টাকার ম'লসা রাতারাতি কে যে কোথায় সরিয়ে ফেললে—

কাপাসীর মা ক'ব্বের সঙ্গে ব'লে উঠল—হ্যাগো হ্যা। সরিয়ে ফেলতে এসেছিল পাড়ার লোক। যে নেনার সে নিয়েছে। আমি কি আর কিছু জানি নে না বুঝি নে? ধন্য আছেন মাখার ওপর—তিনি দেখবেন। ছ-মাসের নেয়ে নিয়ে বিধবা হয় লোকের দোর-দোর ঘুরিটি ছুটো ভাতের জন্তি—আমায় বিনি বাপের ধনে—

বাবুরাম বললে—আর শাপমন্তি কোরো না বাপু। তোমার অদেটে থাকত, পেতে। বাদ দেও ওসব কথা। উম্মনে আশ্বন আছে কিনা দেখো তো, আর একবার কল্কেটা ধরাই।

ওদেব মধ্যে আর এক জন বললে—ও জুড়নখুড়ো, হরপগের বাজারে কাল ছপুরের আগে পৌছনা বাবে না?

—হুটোব কম হবে না। ছ'ভী কোশ, তার আগেই খাওয়া-দাওয়া ক'বে নেওয়া বাবে।

বাবুরাম বললে—এবার কৈহলি মেলায় লোক বাচ্ছে কই তেমন জুড়নখুড়ো?...সে বছর দেখেছিলে তো? পথে সারারাতই লোক হাটতো।

অমুত লাগছিল এ রাতটি আমার কাছে। এত কথাও মনে এনে দেয়! ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম মানুষ এত অল্পেও হুখী হয়! আর হুখ জিনিবটা কি অনির্দেশ্য রহস্যময় ব্যাপার—এই নির্জন রাত্রে মুক্ত অপবিত্রিত প্রান্তরের মধ্যে তারাবিত্ত আকাশের নীচে শুয়ে সবাই হুবেব স্বপ্ন দেখছে—কিন্তু এক জনের হুখের ধারণার সঙ্গে অ'র অ'র এক জনের ধারণার কি বিবম পার্থক্য! সন্ধ্যা ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেই হাটি। রাত দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে পথ। বাঙা বালি, লিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মাঝে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দীঘি, তালবন বেরা। কি কাঁকা ভায়গা এসব! মনে হ'ত যেন সীমাহারা দিক্‌সমুদ্রে ভেলা অসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বননীর উপকূলে গিয়ে তিড়বো, কোনখানে তমালতরুনিকরে বনভূমি শামায়মান, সেখানে গন্ধভরা অন্ধকার বীথিপথ বেয়ে

অতিসারিকারা চিরদিন পা টিপে টিপে হাটে; বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভাবতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেশিকদেবের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদেরও যাওয়ার শেষ হবে না, আমারও না।

(৪)

মাঠের পথের প্রথমটায় কঁকালি মেলার লোকজনের সঙ্গ দেখা হ'ত। পবে আর পথে তেমন লোক দেখি নি, এত বড় মাঠের মধ্যে অনেক সময় আমি একাই পথিক। এই ধু ধু সীমাহীন প্রান্তরে স্বর্ঘ্যাস্তের কি মূর্ধি! আমাদের অঞ্চলে কোনোদিন তা দেখি নি। অন্ধকার হ'লে মাঠের মধ্যেই কতদিন রাত কাটিয়েছি। ছেলেবেলার চা-বাগানে কাটিয়ে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম, রাজিতে যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, একথা মনেই ওঠে না। শীতের দেশ নয়, ঘন হিমারণ্যের হিংস্র স্থাপদ নেই এখানে—নিতান্ত নিরীহ, নিরাপদ দেশ—এখানে নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ার তলায় মাটি ওপর যা-হয়, একটা কিছু পেতে রাত কাটানোর মত আনন্দ খাট-পালকে শুয়ে পাই নি।

একদিন এই অবস্থায় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল। একটা অপূর্ণ নাম-না-জানা অমৃত্যুর অভিজ্ঞতা। মুখে সে-কথা বলা যায় না, বোঝানো যায় না, শুধু সে-ই বোঝে, যার এ রকম-হয়েছে।

সকালে বামনহাটি ব'লে একটা গ্রামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের অতিথি হয়েছিলুম সেদিন তাঁর স্ত্রী একটি রণচণ্ডী—বতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তার গালবায়ের বিরাম ছিল না। আমি গিয়ে সবে বসেছি, তিনি দোরের আড়াল থেকে আমার উদ্দেশে আরম্ভ করলেন—ও অলপ্পরে মিন্সে, আমার সঙ্গ তোমার এত শত্রুরতা কিসের বল দিকি? রান্নাবরের রোরা'কে চালা তুলতে তোমার বলেছে কে?

গরমে একে ঘরের মধ্যে-টেকা যায় না উঠুন জলুলে, যাও বা একটু হাওয়া আসতো, চালা তুললে হাওয়া আসবে তো ও ডাকরা? ওই অগ্নিকুণ্ডর মধ্যে তোমার জন্তে পিণ্ডি রাখবে খেও।

স্ত্রী চলে গেলে কবিরাজ-মশায় বললেন—আর বলেন কেন মশাই, হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল। শুনলেন তো

দাঁতের বাড়ি—ওই বকম সদাসর্বদা চলছে। আর যোব শুচিবাই, ছনিয়ার জিনিষ সব অশুদ্ধ। দিনের মধ্যে সাতবার নাইছে, নিয়ুনিয়া হয়ে যদি না মরে তবে কি বলছি। আজ এক বছর ধরে ওই গোয়ালের একপাশে ভক্তপোষ পেতে শোয় আলাদা—ঘরের জিনিষ সব অশুদ্ধ যে, সেখানে কি শোয়া যায়? ওরকম ছিল না মশায়, ছেলেটা মবে গিয়ে অবধি ওই রকম—

তারপর যে কথা বলছিলাম। বামনহাটি থেকে বিকেলে বাব হয়ে ক্রোশ-তিনেক যেতে-না-বেতে ফ্র্যা হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা ছোট নদী, রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদী এত ছোট যে তাকে আমাদের দেশ হ'লে বলতো খাল। ছ-পাড়ে রাঙা কাঁকর বিহানো, ধারে ধারে কাঁটা-ঝোপ আর তালগাছ। সেখানে রাজি বাপন কব'বা ব'লে মাটি ওপর ছোট সতবন্ধিখানা পেতে তার ওপরে বসলাম। কোনদিকে জনপ্রাণী নেই।

খালের ওপারে একটা তালগাছের মাথায় শুকনো পাতা হাওয়ায় খড় খড় শব্দ কবছে—এই অন্ধকার প্রদোষে তালগাছের মাথার ওপরকার আকাশে নিঃসঙ্গ একটা তারা—আমি একবার তারার দিকে চাইছি, একবার চারিদিকের নিস্তব্ধ, পাতলা অন্ধকারের দিকে চাইছি! হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। সে আনন্দ এত অদ্ভুত যে বেদনা থেকে তা বেশী পৃথক নয়, সে পৃথক চোখে জল এনে দিলে, মনে কেমন একটা অনির্দেশ্য অতাবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যেন।

কিছুক্ষণ আগেও যে-জগতে ছিলাম, এ বেন সে-জগৎ নয়

এ জগৎ যুগযুগের তুচ্ছ জনকোলাহল কত গভীর মাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার জগৎ। ফুল ফুটে নিৰ্জনে ঝরে পড়ার জগৎ...অজানা কত বন প্রান্তরে কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থে জগৎ...কত স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া... কত আশার হাসি মিলিয়ে যাওয়া...

শুধু নিৰ্জনে চূতবীধির, তালীবন-রৈখ্য মাথার ওপর শ্রামলতার পাড়টানা সীমাহীন নীল শূন্য বহুদূরের কোন ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের সঙ্গে এ জগৎ এক...শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত লক্ষ মনের আনন্দ, আশা, গর্ক, হাসি, দৃষ্টি-

কমতার বাহাদুরী কোথায় মুহুরিবে নিয়ে ফেলে দেয়, ফ্রীপ হুর্কল হাত প্রিয়কে নির্দম জীবনের প্রাণ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, না বুঝে হাসে, খুশী হয়, আশার স্বপ্নজাল বোনে...

অন্ধকার কোন ধনিগর্ভে চূনাপাথর হয়ে যায় তাদের হাড়...

আবার নবীন বুকে নবীন বুকে নবীন অনন্দ ভ্রোগে ওঠে। আবার হাঁসি, আবার খুশী হওয়া, আবার আশার স্বপ্নজাল বোনা... অথচ সব সময় তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত কালির প্রবাহ ছুটছে, পুরনো পাতা ধীরে পড়ে, নতুন গান পুরনো হ'য় যায়। গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে কর্তৃদুঃখ, অদৃষ্ট লোকে, কত অজানা ভীত জগতেও এরকম বেদনা, দীনতা হুঃখ। দূরের সে-সব অজানা লোকে ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদী দীর্ঘ বনগাঁছের ছায়ায় বয়ে যায়, তাদের শাস্ত বন-বীথির মূল প্রিয়জনেরা বহুদিন-হারি প্রিয়জনের কথা ভাবে—নদীর স্রোতে শেঙলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তব স্বপ্ন দেখে... যে অনন্ত তার চার ধার বিবে আছ সব সময়, তার নিঃশ্বাসে, তবুকের অন্ময় প্রাপ্তস্রোতে, তার মনের খুসীতে, নাক্তরিক শূন্যপারের মিট মিটে ভারের আলোয়। দূরব ওই দিগন্তের বেধানে চুপি চুপি পৃথিবীর পানে মুখ নামিয়ে কথা কইছে, শূন্যপথে অদৃষ্ট চরণে দেবদেবীর বেন 'এই সন্ধ্যার ঔধানে নেমে আসেন'। বখন নদীকূল শেষরৌদ্রে চিক্ চিক্ করে, হুল হুল অন্ধকার ফিরে আসে, পানিকলসে শেঙলার কুল কালো জল সন্ধ্যার ছায়ার ঢাকা পড়ে যায়—তখনই। আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে—বেন জ্যাঠাইমাসের শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়। অটবরাব বটতলার সেই পাথরের প্রাচীন মুষ্টিটার চেয়ে বড়, মহাপুরুষ শ্রীষ্টব চেয়েও বড়—চক্রবালিরেখার দূরের স্বপ্ন রূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিখাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যার রূপে, মাথার ওপর উড়ে-বাওয়া বালিহাসের স'ই স'ই পাখির ডাকে।...সেই দেবতা আমার পক্ষে দেখিয়ে দিন। আমি ব'ইবিয়েছি তা আর চাইনে, আমি চাই আভিকবি সন্ধ্যার মত 'অনন্দ, এবং 'যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহুর্তের ক্ষণে জগতটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে

জানি, সে 'অনন্দ' জীবনে অক্ষয় হয় না জানি—কিন্তু আর একবারও বেন অনন্ত: তাঁরা আসে আমার জীবনে।

নবম পরিচ্ছেদ

১

পরদিন দুপুরে সন্ধান মিলল ক্রোশ-চারেক দূরে হারবাসিনী গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়ি আছে, সেখানে মাঝে মাঝে ভাল ভাল বৈকব সাধু আসেন। গানের বইরে আখড়া-বাড়ি, সেখানে থাকবার জায়গাও মেলে।

সন্ধ্যার সন্ধ্যা আগে হারবাসিনীর আখড়াবাড়িতে পৌঁছলাম। গ্রামের প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে অনেক-গুলো গাছপালা—ছায়ামুগ, কঁকরভরা, উষর খু খু মাঠের মধ্যে এক জায়গায় টলটলে স্বচ্ছ জলে ভরা পুকুর। পুকুর-পাড়ে বহুল, বেগ, অশোক, তমালি, নিম গাছের ছায়াভরা, ঘনকূট ছ-চারটে পাখির সন্ধ্যা কাকলি—মকুব বুকে শ্রামল মকুবীর মত মনে হ'ল। 'এ-অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া। আমি যেতেই এক স্নান প্রৌঢ় বৈকব, গলায় তুলসীব মালা, পরে মোটা তর্পণের বহিরাস, উঠে এসে জিগোস করলে, কোথেকে আসা হচ্ছে বাবু? তার পর তালপাতার ছোট্ট চোঁট পেতে দিলে বসতে, হাত-হুঃখোর জল নিজেই এনে দিলে। গৌলমত উঠোনের চারিদিকে রাঙা মাটির দেওয়াল-তেঁলা ঘর, সব ঘরের দেওয়ালেই দুটি-তিনটি বৈকব, খুব সম্ভবতঃ আমার মতই পথিক, রাতের জন্তে আশ্রয় নিয়ে ছি।

সন্ধ্যার পরে আমি তালপাতার চোঁটাইয়ে বসে একটি বৃদ্ধ বৈকবের একতারা বাজনা ও গান শুনছি—এমন সময় একটি মেয়ে আমি'ব সামনে উঠানে এসে জিগোস করলে—আপনি রাত্তিরে কি থাকেন?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমি'ব বলচেন? মেয়েটি শক্তি হুঁরে বললে—হ্যাঁ। রাত্তিরে কি ভাতি থাকে?

আমি থতমত খেয়ে বললাম—যা হয়, ভাতই থাকে। 'আপনার বাঁতে সুবিধে।

মেয়েটি বললে—আমাদের সুবিধে নিজে নয়—এখানে

আপনার বা ইচ্ছে হবে যেতে তাই বলবেন। চা খান কি আপনি?

এ-পর্যন্ত কোন জায়গায় এমন কথা শুনি নি, কোন মন্দিরে বা বৈষ্ণবের আশ্রিতেই নয়। ডেকে কেউ স্নিগ্ধ করে নি আমি কি যেতে চাই। বগলান—চা খাওয়া অত্যন্ত আছে, তবে হরিষে না হ'লে—

মেয়েটি আমার কথা শ্রব হওয়ার আগেই চলে গেল এবং মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়াল চা নিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে আমার হাতেই দিলে। বললে—চিনি ঠিক হয়েছে কিনা দেখুন।

আবার তাকে দেখলান রাঙে ধারার সমরে। লম্বা মাওয়ার সারি দিয়ে সাত-আট জন লোক যেতে বসেছে, মেয়েটি নিজের হাতে সবাইকে পরিচয় করিয়ে। প্রকাণ্ড বড় ভাতের ডেক্কা নিয়ে ছ-হাতে ধরে নিয়ে এসে আমাদের সামনে রাখলে—তা থেকে খাওয়া করে ভাত নিয়ে সন্তকে দিতে লাগল। আমার পাশের লোকটিকে বললে—ও কি শ্রামা কাকা, নাড়িরে বড় দিয়ে আর ছোটো খান। ওরলা ত প্রাণাই হয় নি?

সে সময়ে বলল—না ব্রিটিশাঙ্ক, আমাকে বলতে হবে না আপনার। পেটে ভরসা নেই। তেঁতুল মেখে বরং ছোটো খাবো—

—হ্যাঁ কাসছেন, তেঁতুল না খেলে চলবে কেন? ছখ দিচ্ছি—তারপর আমার সামনে এসে বললে—আপনার বোধ হয় ওবেলা খাওয়াই হয় নি, আপনাকেও ছখ দিচ্ছি।

এতগুলো লোক যেতে বসেছে, ছখ দেওয়া হ'ল মোটে তিন জনকে—কিন্তু সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনবিশেষে এবং তার বিচারকর্তী ওই মেয়েটিই। আমার কোঁতুক হ'ল তারি।

রাঙে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম চমৎকার মেয়েটি ত! দেখতে সুন্দরী বটে, তবে খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু আমি ওরকম সুখের গড়ন কখনও দেখি নি, প্রথমে সন্ধ্যাবেলায় ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। বার-বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়—সে ওর সুন্দর ডাগর চোখ দুটির জন্তে, না ওর সুখের একটি বিশিষ্ট ধরণের লাবণ্যময় গড়নের জন্তে, রাঙে তা ভাল বসতে পারি নি। মেয়েটি কে?

নিভাস্ত ছেলমানুষ তো নয়—সারাদেহে যৌবনী হুটে উঠেছে পরিপূর্ণ ভাবেই—এখানে ওভাবে থাকে কেন? আশ্চর্য সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? নানা প্রশ্ন মনে উঠে ঘুম আর আসে না।

পরদিন সকালে মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার দেখা হ'ল। অভিযানের কারও জব্ব্ব অহবিশে না হয় সেদিকে দেখলাম ওর বেশ দৃষ্টি আছে। এ-অঞ্চলে চালে কাকব ব'লে সে নিজে সকাল কুলো নিয়ে বসে প্রায় আধ মণ চাল কাড়ল। বেলা রটার সময় হঠাৎ এসে আমার বলল—আপনার ময়লা জামা-কাপড় যদি পুটুলিতে থাকে ত দিন কেড়ে দেবো। আপনার গায়ের জামাটাও ময়লা হয়ে গিয়েছে খুল দিন। খুব রোদ, ছপরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আমি প্রথমটা একটু সঙ্কচিত হয়ে পড়েছিলাম। তার পর দেখলাম সে সকলকেই জিগ্যাস করছে কারও ময়লা কাপড়-চোপড় কিছু আছে কিনা। এক জন বৃদ্ধ বাউলের গেকরা আগ্রহে ময়লা হ'রছিল ব'লে খুলিয়ে নিয়ে গেল। পরে তখনায় মেয়েটি ওরকম প্রায়ই করে, আশ্চর্যতে ময়লা জামা-কাপড়ে থাকার বো নেই।

এখানে দিন দুই কাটবার পবে আর একটা জিনিষ আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল যে মেয়েটির মধ্যে কোন মিথ্যে সঙ্কোচ নেই। সহজ সিধে ব্যবহার, কি কাল্পে, কি কথাবার্তার। সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চারিত্রী দীপশিখা যদি শ্রামাদী মেয়েকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে বললে—পুকুরপাড়ের বাগান দেখেছেন? আহন দেখিয়ে নিয়ে আসি। এই কথাটা। আমার বড় ভাল লাগল—এ পর্যন্ত আমি কোন মেয়ে দেখি নি যে বাগান ভালবাসে, ঘেরাবার জিনিষ র'লে মনে করে।

ওর সঙ্গে গেলাম। অনেক গাছ আমাকে সে চিনির দিলে। কানন কুলের গাছ এই প্রথম চিনলাম। এক কোণে একটা বড় তামালগাছের তলার ইটের একটা তুলসীমঞ্চ ও বেদী দেখিয়ে বললে—রাত্রে এখানে বসে জপ করতেন।

জিগ্যাস করলাম—আপনার বাবা এখন কোথায়? মেয়েটি কেমন যেন একটা বিষয়ের দৃষ্টিতে আমার

দিকে চেয়ে বললে—বাবা ত নেই, এই চার বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। এই যে পুকুরটা, বাবা কাটিয়েছিলেন, আর ওই বকুলগাছের ওপাশে বিষ্ণুমন্দির তুলছিলেন, শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

এই কথা শুনে খুঁজে পেলাম ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জিগেস করবার। এ দু-দিন কাউকে ওর সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি, পাছে কেউ কিছু মনে করে। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—আপনার বাবাব নামেই বুঝি এই আখড়া?

—কি লোচনদাসের আখড়া? তা নয়, আমরা ব্রাহ্মণ, আমার বাবার নাম ছিল কালীধর মুখুয্যে। লোচনদাস এই আখড়া বসান, কিন্তু মরবার সময়ে বাবার হাতে এর ভার দিয়ে যান। তারপর বাবা আট-ন বছর আখড়া চালান। আখড়ার নামে বত ধানের জমি, সব বাবার। আহুন, বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না?

মনে ভাবি বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, কিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে যেতে বাজী আছি। পুকুর-পাড়ের একটা বকুলগাছের পাশে একটা আখড়েরি ইটের ঘর। মেয়েটি বললে—গাঁথা শেষ হয় নি ত, হঠাৎ বাবা—তাইতে আন্দেক হয়ে আছে। কাঁচা গাঁথুনি, আর-বছরের বর্ষায় ওদিকেব দেওয়ালের খানিকটা আবার ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বকুলগাছে কি লতা উঠেছে, দেখিয়ে বললাম—বেশ ফুল ফুটেছে ত? কি লতা এটা?

ও বললে—মালতী লতা।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—জানেন? আমার নাম—

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হ'ল এ এখনও ছেলেমানুষ। বললাম—আপনার নাম মালতীলতা? ও! কাল উদ্ধবদাস বাবাজী রুনি বলে ডাকছিলেন আপনাকে, তাই ভাবলাম বোধ হয়—

ও সলজ্জ মুখে বললে—লতা নয়, মালা।

জু-জুনেই আখড়াবাড়ির নাটমন্দিরে ফিরে এলাম। তার পর মালতীকে আর দেখতে পেলাম না, সেই বে সে রান্নাঘরে কি কাজ নিয়ে ঢুকল রাত দশটা পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে বেরল না।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে কেমন এক ধরণের মধুর অনুভূতি। মালতীকে যেন স্বপ্নে দেখেছি—ওর প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থিব অস্তিত্ব যেন নেই। স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনে পড়ল, বকুলতলায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, সে হাসিমুখে নিজের নাম বলেছে, তার চোখমুখের সেই সচেতন নারীত্বের সলজ্জতা অথচ বালিকাব প্রগল্ভ কৌতুকপ্রিয়তা—তার সাবা দেহের হঠাৎ লাগণ্য, এ-সব যেন অবাস্তব স্বপ্নজগৎ থেকে সংগ্রহ করা স্মৃতি। কিন্তু মনে সে বেদনা অনুভব করলাম না, বা আসে এই কথা ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখেছি ওসব মিথ্যে, ছায়া, মায়া—ও আর পাব না, ও ছায়ালোকের রচা স্বর্গ, ওর চন্দ্রালোকিত নির্জন পর্বতশিখরও মিথ্যে, ওর দিব্যজনারাও মিথ্যে। মালতী এইখানেই আছে, কাছে কাছেই আছে, তাকে আরও কতবার দেখবো। মালতী আসবে ত?

মালতী সকালে একরাশ তুলো পিঁজতে বসল। বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সে আর কোন কাজে গেল না। প্রথম এখানে এসে যে প্রোট বৈষ্ণবটিকে দেখেছিলাম, তার নাম উদ্ধবদাস—সেই লোকটি মালতীর অভিভাবক, কার্যতঃ কিন্তু মালতীর খেয়ালে তাকে চলতে হয়। সেও মালতীর কাছে বসে তুলো পিঁজতে ব্যস্ত আছে, মালতীর কথা চেলবার সাধ্য তার নেই।

২

মালতীর ইতিহাস উদ্ধবদাসের মুখে একদিন ইতিমধ্যে স্তন্যম। উদ্ধব বাবাজীকে একদিন আখড়াব বাইরেব মাঠে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে মালতীর কথা জিগেস করতেই ও বললে—ওর বাবা আমার পাঠশালার পোড়ো বন্ধু। ওরা ব্রাহ্মণ, এদেশের সমাজে কুলীন। মালতীর ঠাকুরদাদা ত্রীধর মুখুটি বেশ নাম-করা কীর্তন-গাইয়ে ছিলেন। নিজের দল ছিল। দু-পয়সা হাতে করেছিলেনও। একদিন রাত্তিরে বাইরে বেরুচ্ছেন, দরজার চৌকাঠের কাছে বাড়ির বেড়াটা যেন কিসের সঙ্গে খেলা করছে। ফুটফুট করছে অনন্তচুদ্রীর রাত, ভাদ্র মাস, যেমন বাইরে পা দিতে গিয়েছে অমনি সাপে ছোবল দিয়েছে পারে। সাপ ছিল চৌকাঠের বাইরে, আলো-অঁধারে লেগে বুড়ো তা টের

পায় নি। ঘরে তখন ছেলের বৌ মালতীর মা, মালতীর বাবা বাড়ি নেই। টেচিয়ে বললেন—বৌমা, শীগগির আলো জালো, আমার এক গাছা দড়ি দাও শীগগির। দড়ি নিয়ে বাঁধন দিয়ে উঠোনে গিয়ে বসলো। বললে—আমায় আর ঘরে যেতে হবে না বৌমা, তলব পড়েছে। লোকজন এল, ঝাড়ানো হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ভোর রাতে মারা গেল।

মালতীর বাবা পৈতৃক কিছু হাতে পেয়ে একটা লবণ-কলায়েব দোকান করলে। তার মত অতিথিসেবার বাতিক আগি, কখনও কারও দেখি নি। দোকান ত ছাই, বাড়ি হয়ে উঠল একটা মস্ত অতিথিশালা। যত লোকই বাড়িতে আলুক, কিরতো না। একবার রাত দুপুরের সময় পচিশ জন সাধু এসে হাজির, গঙ্গাসাগর বাঁচে, অনেক বুর থেকে শুনে এসেছে এখানে জায়গা পাবে। দোকানের জিনিষপত্র ভাঙিয়ে পচিশমুষ্টি সাধুর সেবা হ'ল। সকালে তারা বললে, আমাদের জনপিছু দু-টাকা প্রণামী-দাও। অত টাকা নগদ কোথায় পাবে? সাধুরা বললে—না দাও তো অভিসম্পাত দেবো। আমি বললাম—মিতে, অভিসম্পাত দেয় দিক, টাকা দিও না ওদেব। ওরা লোক ভাল না। সে বললে—অভিসম্পাতের ভয় কবি নে, তবে আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেখান থেকে পাই, নিয়ে এসে দেবোই। মালতীর মায়ের নাকের মাকড়ী আর কাঁদি নথ জীমন্তপুরের বাজারে বিক্রী ক'রে টাকা নিয়ে এল। তাতেও কুলায় না, আমি বাকী সাতটা টাকা দিলাম—তবে সাধুবা বিদেয় হয়।

মালতী তখন ছোট, একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে এসে বললে—দ্যাখ আর সংসারে থাকবো না। স্ত্রী বললে—আমায় সঙ্গে নাও। স্ত্রীকে বললে—বাঁশবাগানের ওই হাড়িটা পড়ে আছে, নিয়ে এসে ধুয়ে ওতে ভাত রাঁধো। খেয়ে চলো। লবণ-কলায়েব দোকান বিলিয়ে দিলে। ডোমপাড়া থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—বার বা খুশী নিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে দোকান সাফ। সবাই বললে—পাগল হয়ে গিয়েছে। তার পর বৌ আর মেয়ের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। বছর দুই পরে এসে ওই লোচনদাস বাবাজীর আখড়ায় উঠলো। বাবাজী

তখন বড়ো হয়েছেন, বড় ভালবাসতেন, তিনি বললেন—বাবা, মহাপ্রভু তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার আখড়ার ভার তোমায় নিতে হবে, আমি আর বেশী দিন নয়। পরের বছর বাবাজী দেহ রাখলেন, ওই পুকুরপাড়ের তমালতলার তাঁকে সমাজ দেওয়া হ'ল। ক্রমে মালতীর বাবার নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

গৌসাইজী বলতো সবাই। গৌসাইজীকে দেবতা ব'লে জানতো এ-দেশের লোক। অমন নিঃশব্দ, অমন অমায়িক লোক কেউ কখনও দেখে নি। শরীরে অহঙ্কার ব'লে পদার্থ ছিল না। আর অমন মুক্ত মানুষ হয় না—কোন বাঁধন, কোন নিয়ম গভীর ধার ধারত না। আমাদের বোষ্টমের সমাজেও অনেক আইন-কানুন আছে, মেনে না-চললে সমাজে নিষে হয়, বড় বড় মচ্ছবের সময় নেমন্তন্ন পাওরা যায় না। সে গ্রাহ্যও করতো না, একেবারে আপনতোলা, সদানন্দ, মুক্ত পুরুষ ছিল। ষারবাসিনীর কামারদের গাড়ীর কাজ আছে কলকাতায়, একবার তাদের বাড়ি কাঙালীভোজন হচ্ছে বেশ বড়লোক তারা। কামারদের মেজকর্তা রতন বাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন—এমন সময় দেখেন গৌসাইজী কাঙালীদের সারিতে পাতা পেতে বসে থাকছেন। পাছে কেউ টের পায় ব'লে থামের আড়ালে বসেছেন। হৈ হৈ কাণ্ড, বাড়িহুকু এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালো। এ কি কাণ্ড গৌসাইজী, আমাদের অকল্যাণ হয়ে বো! লোকটা এত সবল—কোনো লম্বা চণ্ডা কথা নয়, কোনো উপদেশ নয়, অবাক হয়ে বললে, তাতে দোষ কি? আমি শুনলাম কাঙালীভোজন হয়ে, ভাল-মন্দ খেতে পাওয়া বাবে, তাই এসেছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জ্ঞাত মানতো না, সমাজ মানতো না, আপন-পর বুঝতো না, নিয়ম-কানুনের ধার ধারতো না। কতলোক মত্ত নিতে আসতো। বলতো—মত্ত কি দে.বা? আপনাকে ভাববে সবাইয়ের চাকর, বাস, এই মত্ত। মালতীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গৌসাইজীর নিজের মরণও হ'ল স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পরে। একদিন কোথা থেকে বৃষ্টিমাখায় ভিজ্ঞে আখড়ায় এলেন। তার পরদিন সকালে আমার বললেন—উদ্বব, কাল আমার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু ঘেন জ্বর মত হয়েছে। আজ আর ভাত খাব না কি বলো? দু-দিন পরে জ্বর

নিসোনিয়ার দাঁড়ালো। বৃষ্টিতে পেরেছিলেন নিজে বাঁচবেন না, মেয়েকে মরণের আগের দিন ডেকে ব'লে গেলেন—মালতী মা, তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না; তা আমার বলা রইল যাকে তোর মন চায়, তাকেই বিয়ে করিস। তিনি তো চলে গেলেন, মালতীকে একেবারে নিঃস্বল অবস্থায় কলে রেখে। হাতে পরমা রাধতে জানতেন না। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেন না—সেটা আমি গুণ বলি নে, দোষই বলি—বিশেষ ক'রে অতবড় মেয়ে—আর ওর কেউ নেই ক্রিসসারে। বাপ নেই, মা নেই, পরমা নেই, বাড়ি নেই, ঘরবাড়ি এই আধুড়া। মালতীও যে দেখছেন—ও মেয়েও, পাগল, ও বাপের, দারায়, গিয়েছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে, সেবাধ্ব করছে—ওই নিরেই থাকে। কিছু মানে না, ভয় করে না। অত, মেয়ে হ'লে এই সব পাড়াগাঁয়ে, কত বদনাম রটতো—গৌসাইজীর মেয়ে ব'লে সবাই মানে, তাই কেউ কিছু বলে না।

(৩)

দিন-পনের কেটে গেল। মালতীব বাবার ইতিহাস শুনে বুঝেছি আমি। এখানে ছ-মাস থাকলেও এরা আমার চলে যেতে বলবে না—বিশেষ ক'বে মালতী তো বলবেই না। কিন্তু আমার পক্ষে থাকাও যেমন-অসম্ভব হবে উঠছে, চলে যাওয়া তার চেয়েও অসম্ভব যে। মালতীকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি ওর বাবার পরিচয় শুনে পরীক্ষা। মালতীর বাবার মত লোকের সন্ধান কত ঘুরেছি, এতদিন পরে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হ'ল না। জগতের সকল নিঃস্বার্থ, নির্মৎসর লোক পরস্পরের সংগোষ্ঠ—তা সে লোক গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের আকাশেই। প্রথম দিনের আলো দেখুন, কিংবা দেখুন কপিলাবাস্ত বা প্যাগেটাইন বা আসিসির ওপরকার ইটালীর ইন্দ্রনীল আকাশের তলে। মালতীকে কত কথা বলবার আছে ভারি, কিন্তু ওর সঙ্গে আর আমার যেমন নির্জনে দেখা হয় না। আমি দেখি মালতীর আশাতেই আমি সারাদিন বসে থাকি—ও কখন আসবে। ও থাকে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত—হয়ত দেখলাম ঘর থেকে ও বার হ'ল, ভারি আমার

কাছেই আসছে বৃষ্টি—কিন্তু তা না এসে থালা-হাতে কাকে ভাত দিতে গেল। নয়ত আল্নাতে কাপড় টাঙাতে ব্যস্ত আছে। হয়ত একবার থাকতে না পেরে ডেকে বলি—ও মালতী।

মালতী বললে—আসছি।

আমি বসেই আছি, বেলা ছপুর গড়িয়ে গেল। ও এল কই?

দিনগুলো প্রায়ই এই রকম। তা ছাড়া আমার ওপর ওর কোন বিশেষ পক্ষপাত আছে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রথম দিনকতক যে সে রকম ধারণা না হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। ও সকলকে যেমন বন্ধ করে, আমাকেও তেমনি কবে।

একদিন ব'লে উদ্ধবদাসের একতারা মেরামত করছি—মালতী দেখতে পেয়ে উঠনের ওকোণ থেকে চঞ্চলপদে এসে সামনে দাঁড়াল। সকৌতুক হয়ে বললে—ও! কাকার সেই একতারাটি? আপনি সারাচ্ছেন নাকি? কি জানেন, আপনি একতারা সারানোর?

আমি অপ্রভিত না হয়ে বললাম—জানাজানির কি আছে এতে? থানিকটা তার হাতে এসেছিল—তাই পরিচয় দিচ্ছি। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে চোখ তুলে চাইতেই ওর সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হ'ল মালতীকে এখানে একা নিঃসহায়, নির্ভীক, রিক্ত অবস্থায় কলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওর এখানে কে আছে? একপাল অনাচার, অশিক্ষিত গোত্রো বৈকবের মেলাব মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যাব কি ক'রে? তারা ওর কেউ নয়। তারা ওকে বুঝবে না। তার চেয়ে আমার মনের দেশে ও আমার অনেক আপন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী।

ভাবলাম মালতীকে সব কথা বলি। বলি, মালতী; সংসারে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তুমি সাধু বাপের সতী মেয়ে, তোমার সংসার-বিরাগী আপন ভোলা বাপের আশীর্বাদ ওই শ্যামসুন্দর তমালতরু ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে জানি, কিন্তু আমিও যে-সন্ধান বেরিয়েছি, সে-সন্ধান সফল হবে না তুমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াও।

কিন্তু তার বদলে বললাম—ভাল কথা মালতী, তোমাকে অনেক দিন থেকে বলব ভাবছি। উদ্ধব বাবাকে বলে আমার এখানে একটা পাঠশালা করার ব্যবস্থা ক'বে দিতে পার? আমার কিছু হয় তা থেকে।

মালতী এসে দাঁড়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। ওর মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছে, একটা সুসুমার লাবণ্য যেন ওর মুখে চাবিপাশে ঘিরে আছে—এক ধরণের স্নানব মুখ আছে মনে হয় যেন তাদের মুখে চাবিপাশে একটা অদৃশ্য সৌন্দর্য-জ্বালের বেটনী রয়েছে, যখন কথা না বলে চুপ করে থাকে; তখন তাদের মুখের এই ভাবটা ফুটপাঠ হয়ে ফুটে ওঠে—মালতীব মুখ সেই ধরণের। আমার কথায় ওর মুখচোখ চিন্তাকুল হয়ে উঠল, যেন কি একটা বিষম সমস্যা তার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছি। বললে—কিন্তু এখানে যা ভেবে করবেন, তার কিছু হবে না। এখানে মাইনে দেবে না কেউ। এখানে ভদ্রলোক নেই। ষারবাসিনীতে কামারেরা আছে, ওদের কলকাতার গাড়ীর কারখানা, সেইখানেই থাকে। সরকারেরা তিন বছর পরে এসেছিল পুজোর সময় দেশে। তারপর হেলে ছেলেমানুষের মত ঘাড় হুলিয়ে বললে—ধান নিয়ে ছেলে পড়াতে পারবেন? এদেশে মাইনের বদলে ধান দেয়। না, সে-সব আপনাব কাজ নয়। তা আপনি ত এখানে জলে পড়ে নেই? হাতে কিছু নেই, একদিন হবেই। বতদিন না হয়, এখানে থাকুন। আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দেব না। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, না? সত্যি কথা বলুন।

—সত্যি কথা কি সব সময় বলা যায় মালতী?

—কেন, বলুন না কি কথা বলবেন?

—এখন থাক, আমার কান্স আছে। শোন, উদ্ধবদাসের একভারাটা এখানে রইল, ব'লো তাকে। তোমার জন্তে সারানো হ'ল না।

মালতী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে—কোথায় যাবেন? শুনুন। বা রে, অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি?

বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এই এক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে আমার চোখে। মালতী ও কথা বললে কেন যে আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দিতে পারব না? এই

সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে ষারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—কিন্তু মালতীর মুখের একটা কথাই সব এত সুন্দর, এত অপূর্ণ; এত মধুময় হয়ে উঠল কেন?

ঠিক সেই অদ্ভুত রাজিতির মত—মাঠের মধ্যে নির্জন নদীব ধারে শুয়ে যেমন হয়েছিল সেদিন। অহুত্ব-হিসেবে ছই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই দেখলুম। কোথায় সেই বিরাট দেবতা, আর কোথায় এই মালতী!

তারপর দিন-কতক ধরে মালতীর সঙ্গে কি জানি কেন আমার প্রায়ই দেখা হয়। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে ও আমার সামনে যখনই এসে পড়ে কিংবা কাছ দিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে ছোটো কথা না বলে যায় না। হয়ত অতি তুচ্ছ কথা—বসে আছি, সামনে দিয়ে যাবার সময় ব'লে গেল—বসে আছেন? একথা বলবার কোন প্রয়োজনই নেই—কিন্তু সারাদিনের এই টুকরো টুকরো অকারণ কথা, একটুখানি হাসি, কৃত্রিম ধ্রু, কখন-বা শুধু চাহনি—এর মধ্যে দিয়ে ওর কাছে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই—ও আমার কাছে এগিয়ে আসে। এতে ক'রে বুঝি ও আমার অন্তিমকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না—ও আমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়।

বিকলে যখন ওর সঙ্গে এক-এক দিন গল্প করি, তখন দেখি ওর মনের চমৎকার একটা সজীবতা আছে। নিজে বেশী কথা বলতে ভালবাসে না—কিন্তু শ্রোতা-হিসাবে সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। যে-কোন বিষয়ে ওর কৌতূহল জাগানো যায়—মনের দিক থেকে সেটা বড় একটা গুণ। এমন ভাবে সকৌতূহলে ভাগর চোখ ছুটি তুলে একমনে সে শুনবে—তাতে যে বলছে তার মনে আরও নতুন-নতুন কথা জোগায়, ওকে আরও বিস্তৃত করার ইচ্ছে হয়।

মালতী বড় চাপা মেয়ে কিন্তু—এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন উদ্ধবের মুখে শুনলাম যে ও বেশ সংস্কৃত জানে। ওর বাবার এক বন্ধু ত্রিগুণাচরণ কাব্যতীর্থ নাকি শেষ বয়সে এই আখড়ায় ছিলেন, এখানেই মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না—মালতীর বাবা তখন বেঁচে—তিনিই এখানে তাঁকে আশ্রয় দেন। ত্রিগুণা-পণ্ডিতেরই কাছে

মালতী তিন-চার বহর সংস্কৃত পড়েছিল। মালতীকে জিগেস করতই মালতী বললে—এখন আর আমার ওসব চর্চা নেই, ভুল গিয়েছি। সামান্য একটা খাতুর রূপও মনে নেই। তবে রত্নর শ্রোক অনেক মুখস্থ আছে, যা যা ভাল লেগেছিল তাই কিছু কিছু মুখস্থ করেছিলাম, সেইগুলো ভুলি নি। তবে সহজ ভাষা যদি হয়, পড়লে মনেটা খানিকটা বৃত্তে পড়ি। সে এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। উদ্ধব-জ্যোষ্ঠা আবার তাই আপনাকে গিয়েছে বলতে—উদ্ধব-জ্যোষ্ঠার যা কাণ্ড!

বৈষ্ণব-ধর্মের আবহাওয়ার মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন কিছুই মানে না—এই ভাবের। কখনও কোন পূজা-অর্চনা ওকে করতে দেখি নি, এক ওর বাবার বিষ্ণুমন্দির ওদীপ দেখানো ছাড়া। আখড়ার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার জোগাড় করে উদ্ধব নিজে, মালতীকে সেদিকে বড়-একটা বেসুত দেখি নি। তা ব'লে ওর মন ওর বাপের মত সংস্কারমুক্তও নয়। ছোটখাটো বাচ-বিচার এত মানে যে, আখড়ার লোকে অতিষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলা ষিঙে তুলেছিল ব'ল একটি বাবাজীকে মালতীর কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। হোঁরাছুরির বাংলা বড়-একটা নেই—মুচির হেলেকেও ঘরের দাওয়ার বসিয়ে থাওয়াচ্ছে, কাওরা পাড়ায় অহুহ হ'লে সাবু ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে আসতে দেখেছি।

একদিন বিকেলে আখড়ার সামনের মাঠে পাঠশালা করছি, মালতী এসে বললে—দিন আজ ওদের ছুটি। আহুন একটা জিনিষ দেখিয়ে আনি।

আখড়ার পাশে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে একটা রাজা মাটির টিলা। তার ওপরে শালপলাশের বন—টিলার নীচে ঘন বনসিদ্ধির জঙ্গল। টিলার ওপায়ে পলাশবনের আড়াল একট ছোট মন্দির। মালতী বললে—এই দেখাতে আনলাম আপনাকে। নন্দিকেশ্বর শিবের মন্দির—বড় জাগ্রত ঠাকুর—খুঁটান মানুষ হ'লেও মাথাটা নোয়ান—দোষ হবে না।

মন্দিরের পূজারী ছানা বাতাসা দিয়ে আমাদের জল দিলে। সে উড়িয়াবাসী ব্রাহ্মণ, উপাধি মহাস্তি, বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা জানে ভাল। মালতীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসিছে।

তারপর আমরা তিন জনেই মন্দিরের পশ্চিম দিকের রোয়াকে বসলাম। মালতী বললে—মহাস্তি-কাকা, বনুন ত এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা এ'কে? ইনি আবার খুঁটান কিনা, ওসব মানে না—

আমি বললাম—আঃ, কেন বাজে বকছে, মালতী? কি মানি না-মানি—মানে প্রত্যেক মানুষের—মালতী আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—আপনার বক্তৃতা রাখুন। শুনুন, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা—বনুন তো মহাস্তি-কাকা?

মহাস্তি বললে—এইখানে আগে গোয়ালাদের বাধান ছিল, বছর-পঞ্চাশ আগেকার কথা। রোজ তাদের দুধ চুরি যেত। দু-তিনটে গরু সকালে একদম দুধ দিত না। একদিন তারা রাত জেগে রইল। গভীর নিশুতি রাতে দেখে টিলার নীচের ওই বনসিদ্ধির জঙ্গল থেকে কে এক ছোকরা বার হ'লে এসে গরুর বাটে দুধ দিয়ে দুধ খাচ্ছে। বেসব গরু বাছুর ভিন্ন পানায় না, তারাও বেশ দুধ দিচ্ছে। ছোকরার রূপ দেখে ওরা কি জানি কি বুঝলে, কোন গোলমাল করলে না; ছোকরাও দুধ খেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পবের দিন সকালে বনে খোঁজ ক'রে দেখে কিছুই না। খুঁজতে খুঁজতে এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। ওই বে শিবলিঙ্গ দেখে মন্দিরের মধ্যে। মাঘমাসে মেলা হয়—তারি জাগ্রত ঠাকুর।

মালতী গর্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলেন পাদ্রি-মশাই? মানে না যে বড় কিছু?

আমি বললাম—আমি বেড়াতে বেড়াতে অনেক জায়গায় এরকম দেখেছি। কত গায়ে প্রাচীন বটতলার নুড়ি, বটীদেবী, ওলাবিবি, কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠার মূলে এই ধরনের প্রবাদ আছে। লোকে কত দুব থেকে এসে পুণ্ড্র দেয়, তাদের মধ্যে সত্যিকার ভক্তি দেখেছি। এক পাড়ার এক বোষ্টমের আখড়ায় একখানা পাথর দেখেছিলাম—তার ওপরে পায়ের চিহ্ন খোদাই করা, আখড়ার অধিকারী পরসার লোভে বাতীদেব বলতো ওটা খোদ শ্রীকৃষ্ণর পায়ের দাগ, সে বৃন্দাবন থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছে পাথরখানা। আমি দেখেছি একটি তরুণী ভক্তিমতী; পল্লীবধুকে চোপের জলে আকুল হয়ে পাথরটা গজাজলে ধুয়ে নিজের মাথায়

লম্বা চুল নিয়ে মুছিয়ে দিতে। কি জানি কোথায় পৌঁছালো ওর প্রণাম? কোন্ উর্জমূল অবাকপথে দেবতা ওক সেবা গ্রহণ করতে সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুপল্লবিত বাহু?

কি অপূর্ণ স্বর্ঘ্যাস্ত হচ্ছে বিশাল পশ্চিম দিগন্তে! দূরের তালগাছের মাথাগুলো যেন বাঁধাকপির মত ছোট দেখাচ্ছে, শুঁড়িগুলো দেখাচ্ছে যেন সরু সরু নলখাগড়ার ডাঁটা— আর তার ওপরকার নীলাকাশে রঙীন সেবলোকে পিঙ্কল বর্ণের পাহাড়, সমুদ্র, কোন্ স্বপ্নসাগরের অজানা বেলাভূমি। ...পায়ের নীচের মাটি সারাদিন রোদে পুড়েছে—বাতাসে তারই স্ফুর্জ।

মালতী বলল—বিক্রমসিন্ধুরে সাজ জলে নি এখনও।
প্রদীপ দিইগে চলুন—

সেখানে ওর বাবার মন্দিরে প্রদীপ দেওয়া হয়ে গেল। আমি পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের মোটা শেকড়ে বসলাম, ও দাঁড়িয়ে রইল। বললাম—আমার তুমি যে খুঁটান খুঁটান কর, তুমি আমার কথা কিছু জান না। তার পর ওকে আমার বালাজীবন, মিসনরী মেসেজের কথা, আমাদের দারিদ্র্য, মা, সীতা ও দাদার কথা সব বললাম। বিশেষ করে উল্লেখ করলাম অমাব সেই দৃষ্টিশক্তি ক'রাটা—বা এখন হ'রিয়েছি। ছেলেবেলার ঘটনা আমার এখন আর তেমন মনে নেই—তবুও বললাম বা মনে ছিল—বেমন চা-বাগানের ছ-একটা ঘটনা, বাল্যে পানীর মৃত্যুদিনের ব্যাপার, হীরা রায়ের মৃত্যুর কথা, মেঘবাবুর পুত্রসন্তান হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার।

বললাম—বীণুখুঁটকে ভক্তি করি ব'ল অনেক লাক্ষনা সহ করেছি জীবন। কিন্তু সে আমার দে'য নয়, ছেলেবেলার শিক্ষা। ওই আবহাওয়াতেই মানুষ হ'রছিলাম। আমি এখনও তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর কথা কিছু জান না—বুদ্ধ চৈতন্ত যেমন মহাপুরুষ, তিনিও তেমন। মহাপুরুষদের কি জ্ঞাত আছে মালতী? কর অ'দ'য় করতা লেভি, ইহুদী-সমাজে সে ছিল নীচ, পতিত, সমাজের স্তম্ভ। সবাই তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে বেত। বীণু তাকে বললেন—লেভি, তুমি নীচ কে বলে? তুমি ভগবানের সন্তান। লেভি আনন্দে কেঁদে ফেলল। সমাজের যত হে'ব লোককে তিনি কোল দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ্যা ছিল,

জালজীবী ছিল, কুড়ী ছিল। তাঁকে সবাই বলত পাগল, ধর্মহীন, আচারভ্রষ্ট। তাঁর রাগ, মা, ভাই আগ্নার জনও তাঁকে বলতো পাগল—তারা জানত না ঈশ্বরকে যে জেনেছে, তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম সেবার ধর্ম।

তার পর আমি ওকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। পুকুরের ওপারে দূরবিগর্ষিত আকাশের দিকে চোখ রেখে আমার মনে এল যে রাঢ়দেশের এই সীমাহীন রাঙামাটির মাঠের মধ্যে সেদিন আমি অস্ত্র এক দেবতার স্বপ্ন দেখেছি। সে কি বিরাট রূপ! ওই রাঙা গোখুলির মেঘে, বর্ণে, আকাশে তাঁর ছবি। তাঁর আসন সর্বত্র—তালেব সারিতে, তামালনিকুণ্ডে, পুকুরে-কোটা মৃণালদলে, ছাংখে, শোকে, মানুষের মুখের লাগণে, শিশুর হাসিতে—সে এক অদ্ভুত দেবতা। কিন্তু কতটুকুই বা সে অনুভূতি হ'ল! যেমন আসা অমনি মিলিয়ে যাওয়া!...

মালতী, আগেই বলেছি, অদ্ভুত স্রোতা। সে কি অদ্ভুত মনোযোগের সঙ্গে শুনে ব'খন আমি বকে গেলুম। চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, যেন কি ভাবছে।

তার পর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। প্রেম ও সেবার ধর্ম কি শুধু বীণুখুঁটের দেওয়া? আমাদের দেশে ওসব বুঝি বলে নি? আমাদের আখড়ায় লোচনদাস বাবাজী ছিলেন, ঠ্যাং-ভাড়া কুকুর পথ থেকে বকে ক'রে তুলে আনতেন। একবার একটা বাঁড়ের শিং ভেঙে গিয়েছিল, ঘায়ে পোকা থুক থুক করছে, গন্ধে কাছে বাওয়া যায় না। লোচন-জ্যাঠা তাকে ছোর ক'রে পেড়ে ফেলে দা থেকে লম্বা লম্বা পোকা বার ক'রে কিনাইল দিয়ে দিতেন ত্রাকড়া ক'রে। তাতেই এক মাস পরে দা সারলো।

—এসব কথা বলবার দরকার কবে না, মালতী। আমি তোমাকে বলেছি তো। ধর্মের দেশকাল নেই, মহাপুরুষদের জ্ঞাত নেই। যখন শুনি তোমার বাবা গরিব প্রতিবেশীদের মেয়ের বিয়েতে নিজের বাড়ি থেকে দান-সামগ্রীর বাসন বার ক'রে দিতেন—দিত দিতে বাসনের পৈতৃক আমলের বড় সিন্দুক খালি ক'রে ফেলেছিলেন—তখনই আমি বুঝেছি ভগবান সব দেশেই অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর বাণী প্রচার

করছেন, কোন বিশেষ দেশ বা জাতের ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই। মাহুকের বৃকের মধ্যে বসে তিনি কথা কন, বারি কান আছে, সে শুনতে পার।

ওর বাবার কথায় ওর চোখ জলে ভরে এল। অন্তমনস্ক হয়ে অন্তরিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কখন দেখেছি মালতী শুকুচোখে ওর বাপের কথা শুনতে পারে না। সন্ধ্যা হয়েছে। উঠছি এমন সময় তমালছায়ার বিষ্ণুমন্দিরের দিকে আর একবার চোখ পড়তেই আমাদের গ্রামের পুকুরপাড়ের বটতলার সেই হাতভাঙা পরিত্যক্ত হুন্দের বিষ্ণুমূর্তির কথা আমার কেমন ক'রে মনে এল। মনে এল ছেলেবেলার সীতা আর আমি কত ফুলের মালা গাঁথে মূর্তির গলার পরিয়েছি—তার পর আব কতদিন সেদিকে ঘাই নি, কি জানি মূর্তির আজকাল কি দশা হয়েছে, সেখানে আছে কি-না? কেমন অন্তমনস্ক হয়ে গেলুম যেন, মালতী কি-একটা কথা বললে তা আমাব কানেই গেল না ভাল ক'রে। বারে, পুকুরপাড়ের সে ভাঙা দেবমূর্তির সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

বিষ্ণুমন্দির থেকে দু-জনে যখন ফিরেছি, আখড়ায় তখন আরতি আরম্ভ হয়েছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠের প্রান্তে গাছপালার অন্তরালবর্তী এই নিভৃত ছোট দেবালয়টির সন্ধ্যারতি প্রতিদিনই আমায় কেমন একটা অপূর্ণ ভাবে অরুপ্রাণিত করত—আমি কিন্তু আমার আনন্দ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেল। তার ওপর আজ এক জন পথিক বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী একতারায় অতি হৃৎসরে গাইলে—আমাব মানসবৃন্দাবনের কংশীবটমূলে কিশোর হরি চিরকাল বাঁশী বাজান, আমার প্রাণের গোষ্ঠে তাঁর ধেনুদল চরে; সেখানে তাঁর থেলাধুলো চলে বাথাল-বালকদের নিয়ে দীর্ঘ সারাদিন, দীর্ঘ সারারাত।

কেন এত আনন্দ আমার মনে এল কে বলবে? আমি যেন অল্প জন্ম গ্রহণ করেছি। যুম আর আসে না—সে গভীর রাত্রে তমালশাখার আড়ালে চাঁদ অন্ত গলে আমি আখড়ার সামনের মাঠে গাছের তলায় এসে বসলুম। আকাশের অন্ধকার দূর করেছে শুধু জলজলে স্ক্রুতারার আলোয়।

কে জানে হয়ত ওই স্ক্রুতারার দেশের নদীতীরে, জ্যোৎস্নাশাখা বনপ্রান্তরে, উপবনে যত্নহীন, জরাহীন

দেবকন্তারা মন্দারবীথির বন ছায়ায় প্রণয়ীদের সঙ্গে গোপন মিলনে সারারাত্রি কাটায়...তৃপ্তিহীন অমর প্রেম তাদের চোখের জ্যোৎস্নায় জ্বলে থাকে, লজ্জাভরা হাসিতে ধরা দেয়। পীত সূর্য্যাস্তেব আলোর করুণ হ্রস্ব বহু দুবের শূন্য বেয়ে সেখানে ভেসে এসে সাক্ষ্য আকাশকে আরও মধুর ক'রে তোলে—কোথা থেকে সে হ্রস্ব আসে কেউ জানে না...কেউ বলে বহু দুবেব কোন নক্ষত্রলোকে এক বিরহী দেবতা বসে বসে এমনি তাঁর বীণা বাজান, সেই হ্রস্ব ভেসে আসে প্রতি সন্ধ্যায়...ঠিক কেউ বলতে পারে না...কেবল আধ-আলো আধ-ছায়ায় পুষ্পবীথিতে লুকিয়ে বসে সুখী প্রেমিক প্রেমিকা হঠাৎ অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে...তাদের চোখে অকারণে জল এসে পড়ে...অবাক হয়ে তারা পরস্পরের মুখেব দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আমার সামনে অস্পষ্ট অন্ধকারে এক জন তরুণ যুবক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে—এস আমার সঙ্গে—

তার গেক্সা উত্তরীয় আমার গায়ে এসে পড়ছে উড়ে। আমি বলি—কোথা যাব? কে আপনি?

নবীন বৈষ্ণব বললে—আমি জীবগোস্বামী—আমারই পদাবলী তুমি সন্দেহেবলা শুনবে যে। এত শীগগির ভুলে যাও কেন হে ছোকরা? এস আমি বৃন্দাবনে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়াই চাই। আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্তে দেখছ না পাগলের মত পথে পথে বেড়াচ্ছি?

—আপনি ত মারা গিয়েছেন আজ তিন-শো বছরের ওপর। আপনি আবার কোথায়?

—পাগল! কে বললে আমি মরেছি। আর মলেই কি আমার বাওয়া ফুরিয়েছে নাকি? এসো...এসো...আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্তে। দেখছ না পাগল হবে পথে পথে বেড়াচ্ছি?

এমন ভাবে কথাগুলো সে বললে আমি যেন শিউরে উঠলুম। বললাম—তাতো দেখতে পাচ্ছি, পাগলের আবাকী কি? আপনি বান, আমি বীণাধরের ভক্ত, আমি বৃন্দাবনে যাব না। তা ছাড়া মালতীকে ছাড়া এক পাও এখান থেকে নড়াছি নে আমি।

ভক্তগণ বাড়ল হেসে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেল—পথের মাঝে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে, যেতে

যেতে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে-গেলাম... অন্ধকারের মধ্যে থেকে
তার গলার মিষ্টি হুব তখনও যেন ভেসে আসছে...

মধু রিপূরুপ মদারম্

মধু রিপূরুপ মদারম্

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। বাহের গুঁড়িতে
হেলান দিয়ে শেষ রাতের, ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম
কে জানে—শিশিরে কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে গিয়েছে। ফরসা
হবার আর দেরি নেই। (ক্রমশঃ)

দু-দিন পরে

ঐশ্বর্যচন্দ্র কর

তোমার বাওয়ার পরে
হ'ল দিন দুই।
ছপুরের তাতে
রিম্‌রিম্ আকাশে বাতাসে।
চারিদিক চূপ।
গাছগুলি শুক্ক যেন নিরোধি' নিশ্বাস।
মাঝে মাঝে ডাকে ঘুঘু,
বাগানে বিবশ বেলি।
কাঠবিড়াল নেমে আসে শিয়ুলের শাখা হ'তে,
ছোট ছোট পায়ে ভর কবি'
উঠিয়া দাঁড়ায়,
সচকিতে চাহি চাহি
মাটি হ'তে কি যে লয় খুঁটে
চ'লে যায় ফিরে অ'সে,
আবার পালায়।
দূর মাঠে এখানে ওখানে
এলোমেলো
পালে পালে গরু চরে।
তালের ছায়ায়
রাখাল রয়েছে শুয়ে।
দিগন্তের বাকা লাল পথে
গরুর গাড়ীটি চলে ধীরে।
লক্ষ্যহীন আখির সমুখে
জলের চেউয়ের মত
ভেসে যায় ছবি।

কোথাও লাগে না ভাল।
এ-বরে ও-বরে ফিবি—
অবশেষে দেখি
কোনক্ষেণে উপনীত
তোমারি সে ছেড়ে-বাওয়া
ছোট কক্ষটিতে।
বেদনা-পাণ্ডুর দৃষ্টি
চিরাত্যাসে খোঁজে হারাধন।
জানি তুমি চলে গেছ,
তবু থাকি থাকি
ভাবি অতি ব্যগ্র কৌতুহলে—
ঐ যেন এলে ঘরে
আসিতে আসিতে যেন
থেনে ঐ বহিলে দাঁড়াবে
ছয়ার গোড়ায়।
আঁচল অসম্বৃত
লুটায় পড়িল মেঝে,
তুলি' বাম হাত
কপাটের পাট আছে ধ'রে।
তারই গায়ে মাথা কাৎ করা,
মুখ সমুজ্জ্বল।
হাসির দোলায়
তুলতুলে পুরু রাঙা ঠোঁটে
উথলি' গড়াবে পড়ে
চেপেরাখা শঙ্কিত
সকৌতুক পুলকের চেউ।

হুটুহুটু আঁধি দুটি
 চকুলিয়া
 শুধায় আঁধরে মম
 “দেখে নি তো কেউ ?—
 আর যদি দেখেই-বা,
 কি বা আসে যায় !”
 ষাটের তলার থেকে
 শুনি উন্মুখ—
 চেয়ে দেখি,
 ল্যাক্স মুড়ে
 মুখ শুঁজে
 আছে শু.য়
 পোয়া তব আদরের মেনি ।
 জানাশার ঋতুলতাগুলি
 উঁকি মেরে যায় বারেবারে
 বাতাসের দোলে ।
 তাদের ফুলের গন্ধে
 মনে পড়ে,—
 বলিব, কি মনে পড়ে ?
 —তোমারি সে চুলবাধা ।
 ঐ বে দেবরাজ 'পরে
 ল্যাভেণ্ডার আধশিশি,
 ক্রীম আছে,
 কোঁটার ঢাকাটি খোলা ।
 হাত-আরনা ঝড়করা একধারে ।
 আটপোরে ফিকে নীল শাড়ী,
 প্রায়ই বাহা পরিতে অমনি
 তা-ও আছে আলনাতে ছাড়া ।
 ষাটে বিছানার গদি ।
 শিররের কাছে
 ধোঁপার খলিত গুঁক
 মালতীর মালা ।
 বাজে কাপড়ের টুকরো
 মেঝেতে ছড়ানো,
 তার সাথে কপোলের স্বেদ-মোছা
 রুমালখানিও ।

আর আছে সেই খাতা !—
 —গতবার ভ্রমদিনে
 শুঁজে দিয়ে হাতে
 বলেছিলে—“কিছু লিখে দাও ।”
 আজি সে টেবিলে কেনা
 ধূসর মলিন
 তুলে নিয়ে পড়ে দেখি—
 লেখা তার প্রথম পাতায়,—
 “মনে যে রাখার নয়,
 —তাই মনে ক'রে দিতে
 রাখিছ স্বাক্ষর ।”
 সেদিন কি জানি,
 আমারই হাতের বাণ
 সন্ধানি ফিরিছে শেষে
 আমারই ললাট
 বিধাতার পরিহাসে এতই নির্দম ।

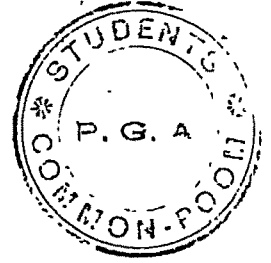
তুমি তো ভুলিয়া গেছ
 মনে বা লেগেছে বোঝা ।
 ঘরদোর খাতাপত্র
 আসবাব যত—
 মুক এরা, এরা জড়—
 জানায় নি কোনো প্রতিবাদ,
 করেও নি করুণ মিনতি,
 অথবা চাহে নি ফিরে
 অশেষ ক্ষণিক চাওয়া ।
 কিন্তু মানুষের প্রাণ !—
 সে কেমনে রয় স্থির ?
 শাস্তি থাকে,
 প্রাণ ছাড়া কোথায় সাক্ষ্য তার
 তাও ভাবিলে না,
 গেলে চলি ।
 এতদিন প্রতি ভোরে
 পেয়েছি প্রথম দেখা
 সূর্যের আগে ।

দেখা ফিরে দিনশেষে—
দিনটি সার্থক হ'ত,
বুঝিতাম,—বেচে আছি
মানিতাম,—ধরণী মধুর ;
—অপূর্ণ হৃদয়ের এই মানবজীবন
কামনার ধন বটে।

এমন আমার তুমি
তুমি চলে গেলে !
—তা-ও যদি জানাতে আতাসে
কিছু অগেগ!

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী

অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী, এম্.এ



পত ১৯৩১ সালের আদমশুমারীর বিবরণ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মদেশে প্রায় চারি লক্ষ বাঙালী অর্থাৎ বঙ্গভাষা-ভাষী লোক আছেন। এই বিবরণেরই অপর এক স্থলে দেখান হইয়াছে, যে, সমগ্র ব্রহ্মদেশে ৪৮৬৮২ জন বাঙালী এবং ১৬৩৯১২ জন চট্টগ্রামবাসী আছেন। আবার অন্য এক স্থলে দেওয়া হইয়াছে, সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রায় ১৮০০০ বাঙালী হিন্দু, প্রায় ২৯০০০ বাঙালী মুসলমান, প্রায় ১৫৮০০০ চট্টগ্রামবাসী মুসলমান এবং প্রায় ৪৯০০ চট্টগ্রাম-বাসী হিন্দু আছেন। এই ভাবে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভাবে বাঙালী ও চট্টগ্রামবাসী ভেদে বঙ্গদেশের অধিবাসী-দিগের যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা খুব সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ মুসলমানদের সংখ্যায় ভুল হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাহা হইলেও উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি হইতে মোটামুটি ইহা বেশ বুঝা যায় যে চারি লক্ষাধিক বাঙালী হৃদয় ব্রহ্মদেশে নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে। ইহাদেব মধ্যে আবাকানেই বাঙালীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। চট্টগ্রাম হইতে স্থলপথেও আরাকান গমন করা কষ্টসাধ্য নহে। তজ্জন্তই প্রধানতঃ চট্টগ্রাম ও তৎপার্বত্য জিলাগুলি হইতে বহু বাঙালী আরাকানে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী এবং অত্যন্ত স্থানের জায় তাঁহাদের অনেকেই এই স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন।

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে ব্রহ্মদেশীয়া নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ভাবে এই দেশে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই শ্রেণীব লোক হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যেই খুব বেশী। কিন্তু একটি গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। মুসলমানেরা বিবাহ করিবার পূর্বে এই নারীকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিয়া লন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধর্মান্তরকরণ ঠিক যথাযথ ভাবে সম্পন্ন না হইলেও, এই ব্রহ্মনারীর গর্ভজাত সন্তানেরা সকলেই মুসলমানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, এবং অত্যন্ত মুসলমানদের সহিত সামাজিক মিশামিশা এবং বিবাহ প্রভৃতিদ্বারা সম্বন্ধ স্থাপনে কোনও বাধা হয় না। এই ভাবে ব্রহ্মদেশে একটি খুব বড় সঙ্কব জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে 'জৈনবাদী' নামে যে বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা মূলতঃ ভারতীয় এবং প্রধানতঃ বাঙালী মুসলমান এবং ব্রহ্মদেশীয়া নারীর মিশ্রনোৎপন্ন সন্তানগণ দ্বারা গঠিত। এই সকল বাঙালী মুসলমানেরা অনেক সময়ে নিজ নিজ ব্রহ্মদেশীয় পত্নীকে স্বদেশেও লইয়া আসেন। কিন্তু অধিকাংশ এই দেশেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন।

কিন্তু বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মদেশীয়া নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণের ভবিষ্যৎ নানারূপ সমস্যাসঙ্কল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ ধর্মান্তরিত করিয়া ব্রহ্মদেশীয়া বৌদ্ধ নারীকে হিন্দু করিয়া লইবার

কোনও সামাজিক উপায় না থাকাতে, ঐক্যপ বাঙালীদের সন্তানগণ প্রায়ই ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিয়া ফিবিজ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল বাঙালী হিন্দু ব্রহ্মদেশীয়া নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া বরাবর তাহাকে পত্নীর মর্যাদা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ইচ্ছা ছিল, যে, তাঁহাদের সন্তানগণ যেন বাঙালী হিন্দু সমাজে স্থান পায়। তজ্জন্ত তাঁহারা অনেক সময়ে নিজ নিজ সন্তানদিগকে কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং বাঙালীভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায়ই বাঙালী সমাজে অগ্রসর পায় নাই। দুই একটি স্থল ভিন্ন প্রায় সর্বত্রই এই সকল উদ্ভ্রলোকের উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্তানেরা ব্রহ্মদেশীয় নাম গ্রহণ পূর্বক ঐ দেশের লোকেরই সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে এতদপূর্ব দেখা গিয়াছে, যে, বাঙালী পিতামাতার সন্তান ব্রহ্মদেশীয় নাম গ্রহণ ও ব্রহ্মদেশীয় আচারব্যবহাব অবলম্বন পূর্বক 'বর্ণা' বনিয়া গিয়াছেন। নিম্নব্রহ্মের কোন স্থানের এক প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙালী ব্যবহারজীবীর পুত্র 'বর্ণা' সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মদেশীয় নাম গ্রহণ পূর্বক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন।

ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে পূর্বোন্নিখিত ব্রহ্মনারীব গর্ভজাত সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ দিবার প্রয়াস পান। কিন্তু দু-একটি স্থল ভিন্ন প্রায়ই এ-বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাঙালী ভিন্ন অত্র প্রদেশবাসী হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে ব্রহ্মদেশীয় পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি আর্য সমাজের পক্ষ হইতে ঐ সকল দম্পতির সন্তানগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রদানের চেষ্টা হইতেছে। আশা করা যায় এতদ্বারা ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়েরা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

আনন্দেরূপে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নির্দাসিত

কবিবার ব্যবস্থা হইবার পূর্বে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম ভাগে আরাকানের উপকূলে এবং নিম্নব্রহ্মের কোন কোন স্থানে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নির্দাসিত করা হইত। ঐক্যপ নির্দাসিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে ঐ স্থানই পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক স্থায়ী ভাবে ঐ দেশেই বসবাস করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার বাঙালীদের বংশধরগণ অনেকে মৌলসেন, সাঙোরে প্রভৃতি স্থানে এখনও বাস করিতেছেন। অনেকে আবার পুরাপুরি বর্ণা অথবা ফিবিজ বনিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে আর এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। যাহারা ঠিক বাংলা দেশের অধিবাসী না হইলেও ধর্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহারাদির সাদৃশ্য হেতু বাঙালী হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তাঁহারা ব্রহ্মদেশে পোনা নামে পরিচিত। এই পোনা বা মণিপুরের অধিবাসী এবং বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। ব্রহ্মদেশের সহিত আসাম ও মণিপুরের বনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্বন্ধ বহুকাল হইতেই বর্তমান রহিয়াছে। এই পোনা নামে পরিচিত মণিপুরবাসীরা ব্রহ্ম-রাজসভার বিশেষ সমাদৃত হইতেন এবং রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহাদের বিশেষ প্রভাবও ছিল। মান্দালয় নগরীতে এখনও বহু পোনা বাস করেন। ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীন নরপতি খিবর প্রদান রাজ-জ্যোতিষী এক জন পোনা ছিলেন। এখনও ব্রহ্মবাসীদের সামাজিক জিরাফার্মাদিতে পোনা-দিগকে আহ্বান করা হয় এবং তাঁহাদিগকে পুরোহিতের বোণ্য সমাদর প্রদর্শন করা হয়।

আমার পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে ব্রহ্মদেশে চাকুরীজীবী বাঙালীদের ভবিষ্যৎ খুবই সমস্তাব বিবয় হইয়া উঠিয়াছে। চাকুরী পাওয়া ত ছলভ হইয়াছেই, অধিকন্তু ঐ দেশীয় ভাষা এক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত অবশ্যশিক্ষণীয় হওয়াতে ব্রহ্মদেশের স্কুলকলেজসমূহে শিক্ষণীয় করা ভারতীয় মাত্রেরই অতি কঠিন হইয়া উঠিতেছে। অনেক স্থলে, অপর কোন বাধা না থাকিলেও শুধু ভারতীয় বলিয়াই বিজ্ঞানাদিতে ছাত্রদিগকে গ্রহণ করা হয় না। এই সকল কারণেই ব্রহ্মদেশবাসী বহুসংখ্যক ভারতবাসীদের অবস্থা দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের গভীর চিন্তার বিবয় হইয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শ্রেয়োবোধ ও আনন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীস্বৰূপ—

তোমার “রবীন্দ্রপিতা” বইখানিতে আমার গর্ব করবার বধেষ্ট বিষয় আছে—কিন্তু আমাব কাছে ওর মূল্য কেবল সে জন্যে নয়। নিজের কবিতার মধ্যে নিজের অন্তরতম যে পরিচয় স্বত উন্মোচিত হয়, নানা ভাববৈচিত্র্যের মধ্য থেকে তার একটিকে অ বিচার করা কবির পক্ষে, এমন কি অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই, অসাধ্য। যে চিত্তদর্পণে নিজের স্বরূপ প্রতিফলিত হ’লে নিজেকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া সম্ভবপর হয়, সেই স্বচ্ছ দর্পণ দুর্লভ। তোমার বইখানি পড়তে পড়তে তোমার উপলব্ধির মধ্যে আমার কবি-প্রকৃতিকে অনুভব ক’রে আনন্দ পেয়েছি। ইতিপূর্বে কোন কোন গ্রন্থে আমার কাব্যের ব্যাখ্যা দেখেছি, কিন্তু সে যেন শরীরতত্ত্বগত দেহের বিশ্লেষণ, তত্বে মর্মগত প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তুমি সেই প্রাণ-রহস্য উন্মোচিত করেছ ব’লে মনে করি। তাতে অনেক জায়গায় আমার নিজেকে ভাবতে হয়েছে।

তার একটা দৃষ্টান্ত, বখা, তুমি লিখেছ আমার কাব্যে শ্রেয়োবোধের প্রাধান্য নেই। যদিও তার কোন কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যায়, তবু আমার মনে হ’ল মোটের উপরে তোমার কথাটা সত্য। আমার বোধ হয় একথাটা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে খাটে। যুরোপীয় খৃষ্টান ধর্ম ভাল মন্দ পাপ পুণ্য ঘটিত স্বর্গের সংঘাত সবচেয়ে প্রবলরূপে দেখা যায়। এই জন্যে সে ধর্ম শ্রেয়োবুদ্ধিপ্রধান। ভারতীয় আধ্যাত্মিক, সে ধর্ম স্বাধীনতায় পরিপূর্ণতার জন্যে প্রয়াসী। কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা নিঃসন্দেহ আমার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবত তার আদর্শ যুরোপীয় শিক্ষা থেকেই আমার মনেব মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এই আদর্শ হুঃসাধ্য প্রয়াসে আমাকে কঠোর ভাবেই

প্রবর্তিত করেছে। কিন্তু আমার কাব্যের মধ্যে আমার চিত্তের যে গূঢ় লক্ষ্য দেখা যায়, সে কর্তব্যবুদ্ধির অভিমুখে নয়। তাতে দেখতে পাই কর্মকে অতিক্রম করে যে অমৃতময় অবকাশ দেবভোগ্য, তাবই জন্ত আমার বথার্থ উৎকণ্ঠ। এই নৈষ্কর্ম্য অক্রিয় নয়। এর গভীরতার মধ্যে যে-ক্রিয়া আছে তা স্বাভাবিকী, তা সৃষ্টিসংকল্পের সহজ আনন্দে বেগবতী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই জন্তই শিশুকাল থেকে আমাকে এমন নিবিড় আনন্দ দিয়েছে। সে আনন্দ ইক্ষুল-পালানে ছেলের ছুটির আনন্দ আমাব কাব্যে আমার ছুটি, আমার ছবি আঁকাতেও তাই। আমি শান্তিনিকেতনে যে আশ্রম রচনা কবতে নামলেম, তার প্রবর্তনা তপোবনের আদর্শে। আনন্দের দ্বারা সৌন্দর্যের দ্বারা শিক্ষার সাধনাকে অবকাশের মধ্যে ফলবতী ক’রে তুলব, এই কল্পনার আনন্দই একদা আমাকে এই কাজে আকর্ষণ করেছে—যে-অসীম অবকাশের মধ্যে চন্দ্রস্বর্গগ্রহতারকার নিরন্তর উদ্যম দীপালি উৎসবের মত প্রকাশ পেয়েছে, যে-অবকাশের মধ্যে ফুল ফুটে, ফল ফলচে, শস্য উঠচে পেকে, তাদেব প্রাণের চেষ্টাকে নেপথ্যগত ক’রে তাদের প্রাণের প্রকাশ বিশ্বের কাছে উৎসৃষ্ট হচ্ছে—সেই অন্তর্গূঢ় প্রাণপূর্ণ অবকাশকেই আমার কর্মের মধ্যে কামনা করেছি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে জাতীয় অনুষ্ঠান নানা স্বভাবের নানা লোককে নিয়ে সম্পন্ন করতে হয়, সেখানে “আনন্দাচ্ছোব ধর্মমাসি ভূতানি জায়ন্তে” মন্ত্রটি চাপা পড়ে, সেখানে প্রকাশ হ’তে থাকে “স তপস্তপ্তা সর্কসমুজ্জত বদিদং কিঞ্চ।” অর্থাৎ সেখানে শ্রেয়োবুদ্ধিই স্বর্গের সমাধানে সর্কসমুজ্জত হয়ে থাকে। এই নিরন্তর সংগ্রামের মাহাত্ম্যবোধ আমরা যুরোপের কাছে পেয়েছি। সুতরাং এই সংগ্রামে নানা ক্ষেত্রেই আমাদের নামতে হয়েছে। তবুও কর্মের মধ্যে তার প্রয়াসটাই বদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে আমার মন বলতে থাকে বিপুল ক্ষুধাশালী গরুড় যে জন্মেছিল সে কেবল খাদ্য ও আশ্রয়

খুঁজে বেড়াবার জন্তে নয়, বিহুকে বহন করবার জন্তেই। গরুড় যখন গৌণ হ'ল তখনই সে সার্থক হ'ল। আমার মধ্যে যে কবি সে কণ্ঠের উর্ধ্বে এই দীপ্তিমান দিব্য অবকাশকেই চেয়েছে, পেয়েছে কি না সে-কথা এই চিঠিতে আলোচনা করবার নয়। ভাবতবর্ষের দেবতা বাজিয়েছেন বাঁশি, ভারতবর্ষের দেবতা নেচেছেন নাচ, সে-কথা শাস্ত্রে মানেন এমন ধীমান বিদ্বানের অভাব নেই। তাঁরা হয়ত ভাবেন না, সেই গানে সেই নাচেই সৃষ্টিব কাজ আপিসের কাজ হয়ে ওঠে নি—দেবতার বা-চাপা কুণ্ডিত হন নি আমি সেই মনোরম চপলতাকে আমার কর্মজুহুতে আহ্বান করেছি, আমার সৃষ্টিকর্মে আমি বিশ্বসৃষ্টিকর্তার অনুসরণ করতে চেয়েছি। তোমার বইখানি পড়ে এই কথাটি বিশেষ করে আজ আমার মনে হ'ল। আমার অনেক

পণ্ডিতবন্ধু এ সমস্তকে শ্রেয় নয় ব'লে থাকেন। কিন্তু আমি কবি, শ্রেয়ের উর্ধ্বে তাঁকে মানি আনন্দরূপ অমৃতত্ব যথিতান্তি।

যাই হোক, তোমার বইখানি এই জন্তই আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে যেহেতু তোমার কাব্য-আলোচনা কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক নয়। তুমি যাকে বলেছ “সাংস্কৃতিক,” এ তাই। এতে তুমি সমগ্রভাবে কাব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করেছ, এই জন্ত তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সময় অল্প, শরীর অপটু, তবু চিঠিখানা বড় হয়ে গেল, সে কেবল মনের আবেগে। ইতি

১২ অক্টোবর, ১৯৩৪

তোমা দর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন্ত হয়েছনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত।

সুখের জম্পনা

শ্রীকৃষ্ণগীমোহন কর

একদা ধীর এক পৌষের নিশিতে,
মৎস্য ধরি ফিরে ধরে কম্পমান শীতে।
ছড়া কাঁথা গায়ে, বসি আগুনের পাশে,
ন নর আবেগে তার প্রিয়ারে জিজ্ঞাসে—

“রাভারগী বুঝি আজি এ দারুণ শীতে,
উন্নতের ধারে বসি থাকে ছুইটি ত;
কাঁথা-গায়ে, তাড়ি দিয়ে তাজা মুড়ি খায়।
প্রিয়া কহে, “কত সুখী তারা তবু হায়।”

শুধু একটুখানি নুন—

ঐ অমরেন্দ্র বোষ

বার বার তিনবার ।—

এব'রও যম উমেশের খুঁটি ধরিয়া টানাটানি করিয়া অবশেষে শূন্য মুঠিতেই ফিরিয়া গেল। সে যেন ধস্তাধস্তি করিয়াই রহিয়া গেল।

এক, দুই...

তিন, চার...

এমন কবিতা গণিলে দূর হইতে পরম নিশ্চিন্তমনে তার দুই পাঞ্জরের হাড় করেকখানা গণিয়া লওয়া বার—ভুল করিবার কোনও আশঙ্কা থাকে না।

যাহা হউক, ক্রমশঃ সে দুই পায়ে ভর করিয়া উঠিয়া ষাঁড়'ইল বটে, কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা করিয়া কোনও কাজ-কর্মে নামিতে পারিল না।

মট্কার বাধন ছিঁড়িয়া ঘরের চাল দুইখানা একেবারে উপুড় হইয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। উঠানের একপাশে ছায়ায় বসিয়া উমেশ ভাবে আর বিমায়—যেন পরম বৃদ্ধ একটা ষাঁড়া দাঁড়কাক। এত খড় মাঠে লুটপাট হইয়া গেল, সে এক আঁটিও আনিতে পারিল না। বৈশাখ মাস সন্মিকট, ঝড় উঠিবে, তখন উপায় হইবে কি? ডাগর মেয়ে ও কচি ছেলেটাকে লইয়া ষাঁড়াইবে কোথায়?

‘বাবা! হীকট গেল কোথায়? আর ত, ব'সে থাকা যায় না—বেলা শেষ হয়ে এল বে!’

‘কি জানি মা, তার কি সে খেয়াল আছে? হয়ত কোনও পুকুরে খেলাসকুটি দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, নয়ত মেঠো বকের পিছু পিছু কিয়ুছে তাড়া ক'রে— একেবারে পাগল মা, পাগল! ওর জন্ত ব'সে ব'সে আর বেলা না ডুবিয়ে তুই খেগে বা!’

‘ধাব কি!...সকালে সেই যে ছুটি খানেক পান্ডাভাত মুখে দিতো-না-দিতোই, ‘খাবো না, খাবো না, মিছে কথা’ ব'লে উঠে নাচতে নাচতে বের হ'ল আর দেখা নেই।

কত ডাকলাম, ভাইটি লক্ষ্মী আমার শো না, শোনো—তাকে আর কার কথা কানে তোলে!’

‘তুই কি ব'লছিলি যে অমন ক'রে বেবিয়ে গেল?’

‘বলেছিলাম, খেয়ে দেখ—ভাতের সঙ্গে মেখে দিয়েছি।’

‘কি, বামন বুঝি?’

এইবার জীবৎ নিম্নস্ববে লক্ষ্মী জবাব দিল, ‘না বাবা—নুন!’

‘নুন!’ উমেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। ‘কাল মুখুন্ডাদের বাগান থেকে দুখানা নারকেলের ডেগো আন'লও ত পারতিস চেয়ে। তাই পুড়িয়ে নিলেই হ'ত।’

‘আমি ত ব'বা, গিয়েছিলাম আন'ত কিন্তু—’

‘দিলে না তারা? তা দেবে কেন? আমাদের যে কিছু নেই! থাক্ত জমিদার—মা, পারত বন্ধক রেখে গ্রাস করতে ত'ব দিত, নিশ্চয় দিত।’

উমেশ আবার নীরব হইল। ভাঙা ঘরের চাল হইতে কতকগুলি পচা ও আলগা খড় বাতাসে উড়িয়া তার পায়ের কাছে অ'সিয়া পড়িল।

লক্ষ্মী বিধাস্ত্রাঙ্কিত কণ্ঠে শুধাইল, ‘ব'বা! এ ন দেব বার্লিটুকু—ধাবে এখন?’ বিধা করিবার কারণ ব'লষ্ট আছে। একে উমেশ বার্লি খাইতে নিতাস্তই অনিচ্ছুক, আর কত দিনই-বা ভাল লাগে, তাহা ছাড়া আজ অব'র ঘরে চিনি—মিছবিত দু'রব কথা সামান্য একটু নুনও ব'ড়স্ত। তার পিতা অতখানি বার্লি মিষ্টি কিংবা নুন ছাড়া কি করিয়া শুধু গলাধঃকরণ করিবে? সেও ত মানুষ—হয়ত সকাল-বেলার মত বলিয়া বসিবে,—ক্ষুধা নই।

উমেশ মুখ না-তুলিয়াই বলিল, ‘এ ন দে।’ আজ আর কেন জানি আশঙ্কি করিল না।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল এবং একবার টি বার্লি হ'ত করিয়া, ফিরিয়া আসিল কিছুক্ষণ বাদে। ‘এখান এস, এই

খুঁটিটাব কাছে।' লক্ষ্মী দাঁড়ার উপর দাঁড়াইয়া বলিল, 'একখানা পিঁড়ি এনে দিচ্ছি' বলিয়া, সে ভাঙা ঘরের জীর্ণ ঘুন-ধরা খুঁটিটা নির্দেশ করিয়া দিল।

উমেশ উঠিয়া গেল, কিন্তু ঐ থকথকে ঘন বার্দিশিরঃ প্রতি নজর পড়িতেই তার অন্তরাঙ্গ বিদ্রোহ করিয়া বসিল। স্বাদ নাই, গন্ধ নাই—তাহাতে আবার আলুনি। না, না, ইহা সে খাইবে না, খাইতে পারে না। সে নিতান্ত বালকের মতই যেন অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

'ও-কি বাবা,—ব'সে থেকে না, খাও।'

'না মা, আমার বড় গা-বমি করছে—খাবো না।'

লক্ষ্মী শুধু দেখিতেই বড় হয় নাই, হৃৎ-মস্তকের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া সে এই বয়সেই অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। সকলই সে বোঝে। পিতার নিকটে আসিয়া তাঁর কপালের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া স্নেহে বলিল, 'ছিঃ বাবা, অমন করে কি? খাও।' তার পর মমতা-মেহুরচাহনি দুইটি ঝুপ বাপের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল।

'কি ক'রে খাই, তুই-ই বল না লক্ষ্মী! একটুখানি নুনও যদি না জোটে—' অত্যধিক উত্তেজনার তার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

উপারাস্তর না দেখিয়া লক্ষ্মী পিতার মনোভাব লবু করিবার আশায় নান হাসি হাসিয়া বলিল, 'ধাবে আর কি ক'রে—চট্, ক'বে চুমুক দিয়ে। তাড়াতাড়ি ভাল হ'য়ে ওঠ, আবার সব জুটবে, সব হবে।'।

মেয়ের কথায় উমেশের মনোভাব হাল্কা হইল বটে, কিন্তু বার্নি খাইবাব স্পৃহা জন্মিল না মোটেই।

উঠানের উপরের মরা কুলগাছ হইতে কতকগুলি রোমে-পোড়া ফুধার্ত কাক তারস্বরে কা-কা করিয়া উঠিল। পিতা ও কত্না একসঙ্গে চাহিয়া দেখিল যে, শ্রীমান হীরা টিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে আসিতেছে। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, নুন এনেছ?'

'না।'

'তবে আমি খাবো না, চললাম।'

আবার চলিয়া যায় দেখিয়া লক্ষ্মী অগ্রসর হইয়া তার

একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।—'কি বোকা ছেলে, কিচ্ছুর খপর রাখে না!'

হীরা খতমত খাইয়া ভগ্নীর মুখের উপর সপ্রশ্ন দৃষ্টি স্থাপন

করিল।

'আজ জানিস তুই, মুখ্যো-মশাই খাজনা চাইতে এসে কি ব'লে গেছেন?'

'না ত দিদি?'

'তা জানবে কেন? আজ ওর নামও ক'রতে নেই?'

'কিসের?'

'কিসের আবার, ওই যে—শুধু কি তাই, খেতেও নেই।'

এইবার হীরা বুখিল। উমেশ রহিল অবাক হইয়া কান পাতিয়া। লক্ষ্মী বলে কি।

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন রে দিদি?'

'তুই ত কিছু জানবিও না, বললেও শুনবি না।'

'শুনবি দিদি, শুনবি বল।'

'আজ হুন-সাগরের পুজো—তাই আলুনি খেতে হয়! হুনের নাম ক'রলেও দোষ হয়।'

'বা রে! তবে তুই ক'রলি যে?'

'আমি ক'রলাম, আমি, আমি,...আমি ক'রলে দোষ হয় না!' লক্ষ্মীর বুক ছক ছক করিতে লাগিল। এইবার বুঝি সব ধরা পড়িয়া যায়।

'দোষ হয় না! কেন রে দিদি?'

'আমি যে মেয়েমানুষ। বেটাছেলেদের ওর নাম ক'রতেও নেই, খেতেও নেই। ওই দেখ, বাবাও আলুনি খায়।'

'আচ্ছা দিদি আজ আলুনি খেলে কি হয়?'

'খুব পুণ্য হয়—তার আর হুনের অনাটন হয় না কথনো। বস্তা বস্তা হুন রোজগার করতে পারে, খুব বড়লোক হয়।'

'দূর!'

'হ্যা, হ্যা—দূর না, সত্যি।'

হীরা যেন প্রত্যয় জন্মিতে চায় না। সবিস্ময়ে পিতার নিকট প্রশ্ন করিল, 'বাবা! সত্যি না কি?'

উমেশও ক'লর পুতুলের মত জ্বাব দিল, 'হু'।

'তবে চল্ চল্ দিদি,—একুনি আমার ভাত দিবি।

আমি আনুনি খাব, আনুনি খাব রে।' হীরা হুতা শুরু করিয়া দিল।

অবোধ মা-মরা ভাইয়েব এ আনন্দে লক্ষ্মীর ছই চোখ ভরিয়া জল আসিল। নিজেকে কেমন জানি অপরাধী বলিয়া বোধ হইল। সে বলিল, 'চল্ দাদা।'

হীরা যাইতে যাইতে হঠাৎ ঘুবিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দিদি, তবে বাবা যে খেল না এখনও?'

হীরা আবার না বেকিয়া দাঁড়ায়। ত্রস্তে উমেশ বালির বাটিটা মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

উমেশ আর আপত্তি করিল না।

আপত্তি করিবার কোনও হেতুই ত নাই।

তার চোখেব জলেই ত আনুনি বালি চমৎকার লোনা হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান অর্থসঙ্কট

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আর্থিক জগতে যে ছুঁদেব দেখা দিয়াছে তাহা কাটিবার কোন লক্ষণই বিশেষ দেখা যাইতেছে না। কোথা হইতে কি করিয়া এই বিশ্বব্যাপী অনর্থের স্রুতপাত হইল তাহা কেহই বড় ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; কিন্তু অসীম ধৈর্যের সহিত আশা করিয়া আছেন, স্বর্গের কিংবা মর্ত্যের অধিপতিবা শীঘ্রই ইহার একটা প্রতিকার করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মর্ত্যের দেবতাও হালে পানি পাইতেছেন না, স্বর্গের দেবতাও বিমুখ। বিকল যন্ত্রটাকে লইয়া নানারূপ কাবসাজি চলিয়াছে, মাঝে মাঝে যন্ত্রটা একটু নড়িয়া-চড়িয়াও উঠিতেছে, কিন্তু তাব প্রাণেব স্পন্দন বেনীক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। মানুষের হুঃখ বখন হুবার হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহা লইয়া নিজেদেব মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও সাময়িক আয়বিস্তৃতি ঘটতে পারে।

রোগের কাবণ সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত হইলেও একথা ঠিক যে পূর্বকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্ত কোন দৈবধ্বিপাকে খণ্ডশস্ত্র ধ্বংস হইয়া যে অভাব-অনটন বা দুর্ভিক্ষের প্রাচুর্য হইত, ইহা তাহা নহে। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব হইতে এই সঙ্কটের উদ্ভব হয় নাই। মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বা সংগঠনশক্তি যে অপূর্ণ

শিল্পসম্ভারের জন্মদান করিয়াছে, তাহার অভাব হইতেও এই সমস্তার সৃষ্টি হয় নাই। এ সঙ্কট বস্তুজগতে প্রাচুর্যের সঙ্কট—অভাবের সঙ্কট নহে। তবে কি বৃত্তিতে হইবে সমগ্র পৃথিবীর অভাব আজ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে? মানব মাত্রেই কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আজ আর অপূর্ণ নাই—ভোগ তাহার আজ আকর্ষণ হইয়াছে? তাহাও ত সত্য নহে। প্রকৃতির দানে কার্পণ্য ঘটে নাই, মানুষের সৃষ্টি তেমনি অবিবাম চলিয়াছে ইহা যেমন সত্য, সকল রকমে বঞ্চিত নিঃশ্বের অসম্ভাবও পৃথিবীতে কিছু মাত্র ঘটে নাই, ইহাও তেমনই সত্য। বিশ্ব-অধিবাসীর এক পঞ্চমাংশ ভারতীয়দের দিকে তাকাইলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক জন ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—“Human demand is illimitable and will be until the last Hottentot lives like a millionaire.” “মানুষের চাহিদা অসীম, এবং বতদিন পর্যন্ত না শেষ হট্টেন্টট ক্রোড়পতির মত চা'লে জীবন যাপন করে, ততদিন অসীম থাকিবে।”

হুতরাং আমবা দেখিতে পাইতেছি, মানুষের অভাব পূর্ণ হয় নাই এবং অকস্মাৎ স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব না হইলে, সে অভাব পূরণ হইতে এখনও সম্ভবতঃ বহু যুগের আবশ্যক। অথচ অত্র দিকে পণ্যসম্ভার আজ শিল্পী ও বণিকের কাছে

ভূতের বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে—মানুষের ভোগে তাহা আসিতে পারিতেছে না। ভোজ্যও প্রচুর, বৃত্তকুণ্ড সংখ্যাতীত। বৃষ্টিতে পারা বাইতেছে কোন কারণে দুইয়ের যোগসূত্রের বিচ্ছেদেই এই প্রাণান্তকর নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। যে বাক্য ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি ও স্বার্থ মধ্যে সামঞ্জস্য বক্ষা করিয়া উভয়ের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহার ভিতরে কোন ছিদ্রপথে আজ যুগ ধরিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বর্তমান সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হিসাব লইলে দেখা যাইবে ১৯২৯ সালের পর এই দুর্দিনের শুরু হইতে, পণ্য ও শিল্পের উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের মূল্যও অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে; অথচ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বিবিধ জিনিষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে ছাড়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য হেতু এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, আমাদের এই অনুমান ঠিক নহে বৃষ্টিতে হইবে।

কাঁচা মাল বা তৈরি জিনিষ, কাহারও আজ আর বধেট চাহিদা নাই, ইহাই হইল বর্তমান দুর্গতির গোড়ার কথা। ইহার মূলে রহিয়াছে, যে-মূল্যে ক্রেতাগণ ক্রয় করিতে সমর্থ এবং যে-মূল্যে বিক্রেতা ক্ষতি স্বীকার না করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ এই দুই ক্ষমতার তারতম্য। কোন জিনিষের প্রয়োজন থাকা ও বাজারে তাহার চাহিদা থাকা এক জিনিষ নহে। প্রয়োজন বা সখ আমাদের বহু জিনিষেরই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সব প্রয়োজন বা সখ মিটাইবার শক্তি আমাদের সকলের আছে কি? প্রয়োজন তখনই চাহিদায় পরিণত হয় যখন মূল্যদ্বারা প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিবার শক্তি আমরা অর্জন করি। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জিনিষের চাহিদা নির্ভব করে দুইটি জিনিষের উপর—প্রথমতঃ, তাহার প্রয়োজনীয়তা; দ্বিতীয়তঃ, তাহার মূল্য। মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ সম্বন্ধে কাবখানার মালিক যদি ঠিক অনুমান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পণ্যদ্রব্য লইয়া যেমন শুকতর অবস্থায় পড়িতে হইবে, অর্থনীতির

মাংসপ্যাচে জিনিষের মূল্যহ্রাস ঘটিলেও তাঁহাকে তেমন বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অর্থনীতির সহিত মূল্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে এখানে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন দেশের অর্থ-নৈতিক ও অন্তান্ত নানা কারণে কমিতেছে বাড়িতেছে। কোন দেশে চলতি অর্থের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অর্থসমষ্টির সংকোচন (deflation) ঘটিল, জোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুযায়ী অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; অর্থাৎ জিনিষের মূল্য হ্রাস পাইবে। পক্ষান্তরে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (inflation) হইলে অর্থের মূল্য কমিবে অর্থাৎ জিনিষের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

অনেকে মনে করেন পণ্যবিনিময়র বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে মুদ্রার আবির্ভাব এবং একাধিপত্য এই শুকতর সমস্তার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। সেই জন্য এক দল নুতন পণ্য পণ্যের হাট হইতে এই খামখেয়ালি মধ্যবর্তী প্রভুটিকে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় পুনঃপ্রবর্তন করিয়া আদিকালের ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতি বর্তমান সমস্তাকে কিভাবে প্রভাবিত করিতেছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা অন্তান্ত কারণগুলির অনুসন্ধান করিতে চাই।

দেহরক্ষা ও প্রাণধারণের উপযোগী নিত্যান্ত প্রয়োজনীয় কয়টি জিনিষ বাদ দিলে সুখস্বচ্ছন্দতা বা আরামের জন্য আজ মানুষের যে অসংখ্য প্রকার বিলাস-সামগ্রীর প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে একই শ্রেণীর জিনিষ নিত্য নুতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রেতাদিগকে বিভ্রান্ত ও বহুবিভক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের পছন্দ বা সখের আজ আর অন্ত নাই। হালফ্যাশনরূপে আজ যাহা সাগ্রহে গৃহীত হইতেছে, কাল তাহা পুরাতন ও সেকেলে হিসাবে পরিত্যক্ত হইতেছে। অস্থিরমতি ক্রেতার এই দৌরাণ্ড্য বর্তমান যুগের কারখানার মালিকগণের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কারিকরের সংখ্যা ছিল বহু ও বিস্তৃত এবং শক্তি ছিল কম। বাজারের অবস্থা বৃষ্টিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা তাহারা সহজেই সমন্বয়যোগী করিয়া লইতে পারিত। এক্ষণে এক একটি জিনিষ প্রস্তুতের জন্য

এক একটি বিশাল যৌথকারবারের সৃষ্টি হইয়াছে ; তাহার বিরাট আয়োজন। একই হাঁদে একই জিনিষ তাহার উদর হইতে বাহির হইতেছে শতে শতে রা সহস্রে সহস্রে।- নুতন ফ্যাশন, নুতন গড়ন একটি চলতি জিনিষকে বাতিল করিয়া দিলে, নুতন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়ান এই সব বহুৎ পাকা ইমারত ও চালাই লৌহ-ইস্পাতের পক্ষে পূর্বের তায় সহজসাধ্য হয় না। ব্যবসায়ক্ষেত্রে এমনি একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, বাহাতে একটা বড় কারখানার অবস্থা কাহিল হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া বহু দূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। বাংলার চাষীর অবস্থা হীন হওয়ার তাহার পূর্বের তায় বস্তাদি ক্রয় করিতে পারিতেছে না এবং ফলে বিলাতি ও দেশী কাপড়ের কলের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এখানেই শেষ নহে—কলওয়ারীদের তুলার প্রয়োজন পূর্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার ভারতের ও আমেরিকার তুলার ব্যবসায়ীর অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কাপড়ের কলের কারিকর ও মজুরদের অবস্থা হীন হওয়ার খরচ সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে হাত গুটাইতে হইয়াছে। ফলে যে-সব ব্যবসায়ী তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া লাভবান হইতেছিল তাহাদের ব্যবসায় ভাটা পড়িতে শুরু করিল। একমাত্র পাটের মূল্য হ্রাস হইতে যে অবস্থাব প্রথম শুরু হইয়াছিল তাহার শেষ পরিণতি কোথায় তাহা বলা কঠিন। এক স্থানের জের আজ সারা হুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কারণ দেশকালের ব্যবধান ঘুটিয়া গিয়া সারা হুনিয়া আজ এক হাটে মিলিয়াছে। ব্যবসায়-জগতে একের অন্তকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া চলিবার উপায় আর নাই।

বর্তমান অর্থসঙ্কটকে অনেকেই ট্রেড সাইকেল (trade cycle) এরই একটা সাধারণ পর্যায় মাত্র মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা এতদিনে ঘুটিয়াছে। অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করেন না যে, ব্যবসায়জগতেবও একটা ভাগ্যচক্র আছে এবং তাহা পর্যায়ক্রমে উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। উন্নতির পর অবনতি এখানকারও স্বাভাবিক

নিয়ম। কোন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ও অর্থগণ আরম্ভ হইলেই ব্যবসায়িগণ অধিক লাভের আশায় অতিরিক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া বাজারে ছাড়িতে শুরু করেন। ফলে মূল্যহ্রাস ও লাভের ঘবে শূন্য পড়িতে থাকে এবং নুতন ব্যবসা-বাণিজ্য পণ্ডন ও অর্থব্যয়ের সব পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ অবস্থা আসিলে অবিজ্ঞিত মাল যে-কোন মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। তখন আবার জিনিষের চাহিদা স্বল্পমূল্যতার দরুন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ব্যবসায়জগতে নুতন প্রাণ সঞ্চারের সৃষ্টি করে। ইহারই নাম ট্রেড সাইকেল। কতকগুলি লোকের দূরদর্শিতার অভাব, উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য, ইত্যাদি সাধারণ কারণে মাঝে মাঝে এরূপ অবসাদ ব্যবসা-জগতে আসিয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান অবসাদেব গুরুত্ব ও বিস্তৃতি যেমন অননুভূতপূর্ব, ইহার বৈশিষ্ট্যও তেমনই অসাধারণ ; কারণ পণ্যের অভাবনীয়রূপ মূল্যহ্রাস সম্বন্ধে বিবেচনা হাটে মালের চাহিদা তেমন বাড়িতে পারিতেছে না।

অনেকে মনে করেন অর্থনৈতিক ও বিগত যুদ্ধ চিত্ত কারণ ব্যতিরেকেও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ও কৃষকের অবস্থার অধোগতি অনিবার্য ছিল। শিল্পজাত পণ্যের প্রয়োজনীয়তার শেষ নাই সত্য ; কিন্তু কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে একথা প্রবোজ্য নহে। মানুষের হৃদয়শক্তির একটা সীমা আছে, ভোক্তাদের রকমারি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের পরিমাণ কমিয়াছে। যানবাহন ও চাষাবাদের দ্রুত গতি ও ঘোড়ার স্থান মোটর অধিকার করার গতি ঘোড়ার দ্রুত যে পবিত্র ধর্মের আবগুক হইত তাহারও আর প্রয়োজন হইতেছে না। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের কল্যাণে ভাল সার ও উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ হইয়া প্রতি একর উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বহুল পবিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব কারণে অনেকে মনে করেন সর্বক্ষেত্রে আজ যে অবসাদ দেখা যাইতেছে তাহার গোড়ায় রহিয়াছে কৃষি ও কৃষকের দুরবস্থা। সেখান হইতেই বর্তমান দুর্গতির সূত্রপাত।

তার উপর বিগত লড়াই চাউদিকে বাণিনিষেধের সৃষ্টি করিয়া মাল-সরবরাহের সাধারণ ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া দেয়। যুদ্ধে নিবৃত্ত দেশসমূহ বিভিন্ন দেশ খাদ্যশস্ত্র বা সেই সময়কার প্রয়োজনীয় সকল জিনিষের রপ্তানি

বন্ধ করিয়া দেয়। অস্ত্র দিকে অবরোধ (blockade) নীতিও চলিতে থাকে। কৃষিয়ার গম বাহিরে যাইতে না পাবার আমেরিকা তাহার গমের চাব এই সুযোগে খুব বৃদ্ধি করিয়া ফেলে। যুদ্ধের অবসানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিবিয়া আসিলে দেশা যায়, পৃথিবীর প্রয়োজন অপেক্ষা গমের সরবরাহ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এবং জাপান লড়াইয়ের সময়ে তাহাদের কাপড়ের কল যথাসাধ্য বাড়াইয়া ফেলিয়া ল্যাক্সাশারের বাজার অধিকার করিয়া ফেলিল। লড়াই অন্তে ল্যাক্সাশারের কল যখন পুনঃ পুরা মনে চলিতে লুফ করিল তখন সকল কলওয়ালারই হইল ফ্যাসাদ। যুদ্ধের সময় জিনিষের আমদানি বা রপ্তানি কষ্টসাধ্য হওয়ায় প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি ও সরবরাহের ব্যবস্থা নিজ দেশেই করিয়া লইতে বাধ্য হয়। কাজেই বৃদ্ধিশেষে আমদানি রপ্তানি পুনরায় আরম্ভ হইলে জিনিষের প্রাচুর্য লক্ষিত হইতে থাকে। আয়োজনের সহিত প্রয়োজনের, কৃষির সহিত শিল্পের এই আকস্মিক বৈষম্য বিগত যুদ্ধেরই অপর পরিণাম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করিবার অন্ততম কারণ।

এই ত গেল পণ্যের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কীয় সমস্যা— একের অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থা; অপরের ধামধেলা। যোগান ও চাহিদার মধ্যে যে জিনিষটি সার পদার্থ, মধ্যস্থ হইয়া বিনি উভয়ের সংযোগ সংঘটন করেন, সেই সকল অনর্থক গোড়া অর্থ সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আর একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। আমাকে স্থিরচিত্তে কাজ করিতে হইলে আমার পূর্বাঙ্কে জানা দরকার, যে-মধ্যস্থ মাপকাঠির সাহায্যে আমার পণ্যের দর নির্দিষ্ট হইবে তাহার মাপ বা মূল্য ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক থাকিবে। বোল গিরার মাপে গজ হিসাব করিয়া পাইকারী দবে কলিকাতা হইতে কাপড় কিনিয়া আনিলাম পল্লী হাটে খুচরা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইব। কিন্তু মাল পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে গজের মাপ যদি বোল গিরার স্থলে বজ্রিগ গিরি নির্দিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে লাভেব ঘবে আমাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বক্ষণ দেখিতে হয়। যে অর্থকে মধ্যস্থ রাখিয়া আমরা বেচাকেনার কাজ করি, লাভ ক্ষতি নির্ণয় করি, তাহার মূল্যই যদি পরিবর্তনশীল হয়,

তাহা হইলে আমাদেরকে নিত্যন্ত নিরুপায় হইয়া বলিতে হয়, “বল্ মা তাবা, ঝাঁড়াই কোথা?” অর্থ বলিতে আধুনিক যুগে আমরা শুধু রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা বুঝিব না; কাবোন্সি নোট, চেক, ড্রাফ্ট, বিল, মায় খাব করিবাব মর্যাদা (যাহাকে ইংরেজীতে ক্রেডিট বলা হয়) এই সবই আজ অর্থপর্যায়ভুক্ত। আমার হাতে টাকা নাই, কিন্তু বাজারে মর্যাদা (Credit) আছে। আমি লক্ষ টাকার মাল ধারে ক্রয় করিতে পাবি। এখানে অর্থের প্রয়োজন আমি নিজ প্রতিপত্তির দ্বারা মিটাইয়া লইতে সমর্থ হইতেছি। লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া দু-চাব লক্ষ টাকার কারবার হয়ন্ম চলিয়াছে বর্তমান ছনিয়ায়। তাই অর্থশাস্ত্রে ক্রেডিটও আজ টাকার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই ক্রেডিটের পরিমাপ করা চলে না। এই সব কাণে দেশবিশেষেব বা ছনিয়ার অর্থের পরিমাণ একেবারেই স্থির রাখিতে পাবা যাইতেছে না। শুধু খাতব মুদ্রা ও গবর্ণমেন্ট-প্রচলিত নোট ভিন্ন অর্থের প্রয়োজন অস্ত্র কোন ভাবে মিটাইবার উপায় না থাকিলে এবং বহির্জগতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সকলপ্রকার সম্বন্ধ বিছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলে, কোন দেশের অর্থের পরিমাণ হয়ত অনেকটা স্থির রাখিতে পারা যাইত। কিন্তু বিশ্বের হাট আজ ঘরের ছয়ারে আসিয়া ঝাঁড়াইয়াছে। আমাদের কাছে তাহার দ্বিবার ও নিবার আহ্বান আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহার মূল্য যেমন পাইতেছি তেমনি দিতেছি। এই সব আন্তর্জাতিক লেনাদেনার ভিতর দিয়া দেশের অর্থভাণ্ডার অবিরত বাড়িতেছে কমিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্যও স্থিৰ থাকিতেছে না। আর একটু পবিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। ধরা যাক্, বাজাবে পাঁচটি রোহিত মৎস্য আসিয়াছে; এবং সমবেত ক্রেতাদের পকেটে মোট পঁচিশটি টাকা আছে। এ অবস্থায় একটি মাছের দর ৫ টাকার বেশী হইবার উপায় নাই। মৎস্য-ব্যবসায়ীকে অগত্য এই মূল্যেই তাহার মাছ বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ২৫ টাকার স্থলে যদি হাটের ক্রেতাদের নিকট ৩০ টাকা থাকিত তাহা হইলে ৬ টাকার দরেও মাছগুলি বিক্রয় হইতে পারিত। পক্ষান্তরে ক্রেতাদের নিকট ২০ টাকার বেশী না থাকিলে বিক্রেতাকে ৪ টাকার মূল্যেই মাছগুলি বাধ্য

হইয়া বিক্রয় করিতে হইত। টাকার পরিমাণের উপর জিনিষের দর কি ভাবে নির্ভর করে ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিব।

অর্থনীতির মারপ্যাচ ব্যতিরেকেও জিনিষের মূল্য যে হ্রাসবৃদ্ধি পাইতে পারে এখানে সে কথাটাও আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যিক। এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির সহিত অবশ্য বর্তমান সমস্তার কোনরূপ যোগাযোগ নাই এবং ইহা অন্তায় বকসে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিও করে না। শিল্পীর চেষ্টা ও বিবেচনার ফলে কোন পণ্য প্রস্তুত করিবার ব্যয় হ্রাস পাইতে পারে; কোন নূতন আবিষ্কারের কল্যাণে শ্রমের লাঘব হইয়াও ধবচেব সাশ্রয় হইতে পারে। এইরূপ যোগ্যতার দক্ষন মূল্য-হ্রাস ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অনিষ্টকর ত নহেই, বরঞ্চ স্বাস্থ্যকর—কারণ, অর্থেব মূল্য বা ক্ষয়শক্তি নড়চড় না হইয়া জিনিষের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মে তাহার চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শিল্পোন্নতির ইহাই সত্যকার পরীক্ষা। এ-ভাবে মূল্য-হ্রাস জিনিষ-বিশেষের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে—সকল জিনিষের ক্ষেত্রে কখনও একসঙ্গে এভাবে মূল্য-হ্রাস সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্তমান সমস্তার মূলে জিনিষমাত্রেরই অসম্ভব রকমের মূল্য-হ্রাস আমরা দেখিতে পাই। ইহা উল্লিখিত যোগ্যতার স্বাভাবিক পুরস্কার নহে, অর্থনৈতিক কাবণের অস্বাভাবিক পবিণাম। ইহাব মূলে রহিয়াছে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কোচন বা Currency deflation। এখানে ইহাও উল্লেখ করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, ভূয়োদর্শিতা ও যোগ্যতা দ্বারা জিনিষের তৈবি-খরচ কমাইয়া কোনই লাভ নাই—যদি মুদ্রা-মূল্য আমবা স্থির রাখিতে না পারি। কারণ মুদ্রা-মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে জিনিষের দর আপনাই চড়িয়া যাইবে এবং কারিকর তাহার যোগ্যতার ত্রাঘ্য পুংস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে।

লড়াইয়ের জীবন-মরণ সমস্তার সময় অর্থের প্রয়োজন হইল সর্বাপেক্ষা অধিক। স্বর্ণমুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে নিজ নিজ দেশে অত্যধিক পরিমাণে কাগজের নোট চালাইতে শুরু কবিলেন। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে ধারে চলিতে লাগিল। এইরূপে পৃথিবীর অর্থতহবিলকে অস্বাভাবিকরূপে জোর করিয়া

অত্যন্ত কাঁপাইয়া তোলা হইল। ফলে লড়াইয়ের সময় জিনিষের দর কল্পনাভীত বৃদ্ধি পাইয়া গেল। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সকল দেশই যখন স্বর্ণমান পুনঃ প্রচলন করিতে উদ্যত হইলেন তখন সকল জিনিষের মূল্যের উপরই হঠাৎ একটা গুরুতর চাপ পড়িল। ধোর হুদ্দিনে যে ‘মেকি’ মুদ্রা ও মর্যাদাকে একপ্রকার জোর করিয়া চালান হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল এবং মুদ্রাতহবিলের ক্ষীতি অকস্মাৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল—সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দরও চারিদিকে একেবারে পড়িয়া গেল। বর্তমান ব্যবসামন্ডার মূলে মুদ্রানীতির অদৃশ্য হস্ত যে অনেকখানি দায়ী তৎসম্বন্ধে আব ভুল নাই। নরমেধ-যজ্ঞের উদ্ঘাপন সকল করিবার জন্ত ষাঁহারা ভূয়া অর্থসৃষ্টি করিয়া মানুষের অর্থ-লালসাকে অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন, যুদ্ধের শেষে এক কলমের খোঁচায় তাঁহারাই সেই ‘মেকি’ অর্থের অন্তর্দান ঘটাইলেন বটে, কিন্তু মানুষের ছরাশাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কারিকর, মজুর হইতে শুরু করিয়া উপরওয়ালার সকলেই লড়াইয়ের সময়কার মজুরী দাবি করিতে ছাড়িলেন না; কিন্তু সেই দাবি মিটাইবার জন্ত তহবিলে আর তখন অর্থ নাই। জিনিষের তৈরি খরচ কমিতে চাহিল না, অথচ ক্রেতার ক্ষয়শক্তি হ্রাস পাইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে বৈষম্যের ইহাও অন্ততম প্রধান কারণ।

অর্থশাস্ত্রের সঙ্কোচন বা প্রসারণ নীতির ফলে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে আর্থিক জগতে তাহার অপব কি পরিণাম হইতে পারে তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। রামেব নিকট আমি যখন টাকা ধার করি তখন টাকার যে মূল্য বা ক্ষয়শক্তি ছিল এক্ষণে তাহা যদি কমিয়া অর্ধেক হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আমাব দেনা আপনা হইতে অর্ধেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। কি প্রকারে, বলিতেছি। ধরা যাক্—আমি যখন টাকা ধার করিয়াছিলাম, তখন এক মণ চালের দর ছিল ৫ টাকা। এক্ষণে টাকার ক্ষয়শক্তি অর্ধেক হ্রাস পাইয়া সকল জিনিষের মূল্যই দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এক মণ চালের মূল্য ১০ টাকা এবং আধ মণ চালের মূল্য ৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যে ৫ টাকা ধার করিয়া আমি

এক মণ চাল কিনিয়াছিল। সেই ৫০ টাকা যখন বন্ধকে অমিক্রিয়ায় দিলাম তখন তিনি তাহা ধারার আশ্রয় মগ্নে বেশী চাল আর খরিদ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার অর্ধেক টাকা হাওয়ার উড়িয়া গিয়া তাঁহার দেনদারের পকেটে আশ্রয় লইয়াছে। মানুষের টাকার প্রয়োজন টাকার জন্ত নহে, তাহার সাহায্যে তাহার অন্ত প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায়ক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক দেনা-পাওনা লইয়া। অপরের নিকট আমার যেমন টাকা প্রাপ্য আছে তেমনই আবার অপরেও আমার নিকট টাকা পাইবে। কিন্তু মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এই দেনা-পাওনা স্থির থাকে না এবং নিত্যন্ত অকারণে একজনের পাওনা বাড়িয়া দেনা কমিয়া যায় কিংবা দেনা বাড়িয়া পাওনা কমিয়া যায়। এইরূপে অর্থ যখন অত্যন্ত রকমে হাত বলায় তখন নূতন ধনী নূতন পছন্দ ও নূতন দাবি লইয়া বাজারে উপস্থিত হয় এবং দোকানদার তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতা ও আয়োজন লইয়া একেবারে বোকা বনিয়া যায়। ইহাও ব্যবসায়জগতে বর্তমান বিশৃঙ্খলাব অগ্রতম কারণ মনে করা বাইতে পারে।

একটি দুর্গতি অপর দুর্গতিকে আহ্বান করিয়া আনে; , দেহেব একটি অংশ বিকল হইলে তাহার অপর অংশও ধীরে ধীরে অক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জিনিষের কাটতি পড়িয়া গিয়া ব্যবসা-মন্ডার সৃষ্টি হইতেই মানুষের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। দোকানে বা গুদামে মাল পড়িয়া আছে, কিন্তু হাতে অর্থ নাই। কাজেই মহাজন- তাহার পাওনার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ধারে কাজ করিতে কেহই তার ভরসা পাইতেছে না। চারিদিকে কেমন একটা অবিশ্বাস বা অনাস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাহার কিছু টাকা আছে তিনি সে টাকা আর হাতছাড়া করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়া বেতার-সমস্তাব গুরুত্ব যেমন বাড়িতেছে, কেনাবেচা আরও কমিয়া গিয়া চলতি ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও আবও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অন্ত সবকিছুতে আস্থা হারাইয়া লোকে শুধু নগদ টাকা পুঁজি করিতে ব্যস্ত হইয়াছে এবং এই মনোবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষকে ছাড়াইয়া প্রত্যেক দেশের

গভর্নমেন্টের মধ্যে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক গভর্নমেন্টই বিদেশে মাল চালান কবিতা নিজ দেশে অর্থাগমের জন্ত যেমন এক দিকে ব্যস্ত, অন্য দিকে বিদেশ হইতে মাল আমদানি হইয়া দেশের অর্থ বাহাতে বাহিরে চলিয়া বাইতে না-পাবে তাহার জন্তও তেমনই উৎকণ্ঠিত। আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভালই মনে হইতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে প্রত্যেক দেশই যদি এই পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসাই বা চলিবে কিরূপে? আর যে উদ্দেশ্যে এই পথ অবলম্বন করা তাহাই বা সিদ্ধ হইবে কেমন করিয়া? যেখানে সব সেখানে সেখানে কোলাকুলি, সেখানে এ-পথ যে আশ্রয়কার পথ নহে, এ-পথে পবের যাত্রা ভঙ্গ হইলেও নিজের নাককানও যে আস্ত থাকিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

অপরের ব্যবসা নষ্ট করিয়া নিজেব ব্যবসা প্রসারের এই ব্যর্থ চেষ্টা চলে ছুই উপায়ে। প্রথমতঃ, বিদেশী জিনিষের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইয়া উহার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশের কারখানাকে অর্থসাহায্য করিয়া অর্থাৎ subsidy দিয়া নিজেদেব অক্ষম প্রচেষ্টাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হইতেছে। উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরেব নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আজ অচল হইয়া থাকে তবে তাহার জন্ত বিধাতাপুরুষকে দোষ দিলে তিনি তাহার জবাব দিবেন না সত্য; কিন্তু এ অবস্থা হইতে মুক্তিও আমাদের মিলিবে না।

বর্তমান অবস্থার জন্ত বিশেষ ভাবে দায়ী এবং বিগত লড়াইয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট দুইটি কাবণ এখনও আমাদের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা হইতেছে—সমর-ঋণ ও বিজিত দেশসমূহের উপর ক্ষতিপূরণের দাবি। এই দুই দাবি একত্র কবিলে এক শত কোটি টাকার উপর প্রতি বৎসরে অধমণদেব দেয়। এই টাকাটাব প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আমেরিকার এবং অবশিষ্ট ক্রান্তান্তের প্রাপ্য। বিশ্বের হাট হইতে প্রতি বৎসর এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা অপমৃত হইয়া দুইটি দেশের অর্থভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে থাকিলে

এবং তদ্বন্ধন অধমর্ণ দেশসমূহ এতগুলি অর্থের সদ্যবহার হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার পরিণাম ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এতগুলি টাকা ঋণপরিশোধের জন্য ব্যয় হওয়ার অর্থ এই পরিমাণ মূল্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের হানি হওয়া। ষাঁহাদের ভাঙারে টাকা বাইতেছে তাঁহারা যদি উহা সঞ্চয় না করিয়া উদার ভাবে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলেও এতটা ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাঁহারা উহা ব্যয় না করিয়া উহা দ্বারা নিজ নিজ স্বর্ণ-তহবিল সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছেন। নগদ মুদ্রা না লইয়া তৎপরিবর্তে তাঁহারা যদি অধমর্ণদিগের নিকট হইতে ঐ মূল্যের প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রহণ করিতেও স্বীকৃত হইতেন তাহা হইলেও হতভাগ্য অধমর্ণদেব বাঁচিবার উপায় হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার উপায় নাই; অধিকন্তু অধমর্ণ ও অত্যন্ত দেশ হইতে পণ্যের আমদানি বন্ধ করিবার সব ব্যবস্থাই বিধিমত ঠিক আছে। নিরুপায় হইয়া দেশদ্বার দেশসমূহ দেশের টাকা যথাসম্ভব বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বিদেশী মালের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ঋণপরিশোধের জন্য যে-কোন মূল্যে বিদেশে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, পুনরায় স্বর্ণমান পরিহাব কবিয়া নিজ নিজ দেশের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করতঃ বিদেশে নিজ মাল সম্ভবচালাইবার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।* ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অধিকতর বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, জিনিষের চাহিদা ও মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশদ্বারের দেনার পরিমাণও আপনা হইতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এতগুলি দেশকে পঙ্গু করিয়া শুধু একা সুখী ও লাভবান হওয়া বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে সম্ভবপর নহে। তাই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও বড় সুখে নাই।

এই যে নিজ হাতে তৈরি গোলকধাঁসার মধ্যে সভ্যতাভিমানী মানবজাতি চোখে হুঁলিবাঁধা জঙ্ঘবিণেবের মত ঘুরিয়া মরিতেছে, এই অবস্থার প্রতিকার কি? বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ইহা একটা মীমাংসা হয়ত তেমন কঠিন নহে;

কিন্তু মীমাংসাকে কার্যে পরিণত করাই দুঃস্বপ্ন। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট এই আন্তর্জাতিক ব্যাধির প্রতিকার কবিতে হইলে প্রথমেই উগ্র জাতীয়তাবাদের মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব, মানবপ্রীতি ও স্বর্ষভাব সে হারে বৃদ্ধি পায় নাই। মনীষা দ্বারা যে অদ্ভুত সৃষ্টি সে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছে, স্বদেশের উদারতার অভাবে আজ সে তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সমগ্র মানবজাতিকে সে নিজেই আহ্বান করিয়া একত্র মিলিত কবিয়াছিল; আজ এই মিলনকে আবার সে নিজেই ক্ষুদ্র লোভ ও স্বার্থ-বুদ্ধির অধীন হইয়া পণ্ড করিতে বাসিয়াছে। মানুষের উন্নতিকে অব্যাহত রাখিয়া ভাল ভাবে বাঁচিতে হইলে আমাদের একসাথে বাঁচিতে হইবে—অগ্র জাতির স্বাস রোধ করিয়া যদি বাঁচিতে চাই তাহা হইলে বিধির অমোঘ বিধান অদ্ভুত উপায়ে তাহার শোধ লইবে এবং আঁথেরে কাহারও মঙ্গল হইবে না। ভাবত-রূপ কামধেনুর বাঁট আজ একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়ায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সকল দেশেরই ক্ষতি ও চিন্তার কাবণ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্য-বিক্রয়ের সুবিধার জন্যই রাজ্য ও রাজত্বের আয়োজন, সেই জন্যই এত রেযারেখি, এত যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু সেই পণ্য অর্থ-সামর্থ্য না থাকিলে কে কিনিবে? গোটা দুনিয়ার মাল চালাইবার এতবড় হাট এই ভারতবর্ষ। এই হাট যদি তাহাদের মাল বিক্রয় বন্ধ হয় তবে এ-সব দোকানদারের জাত কি করিয়া বাঁচিবে? যে ব্যবসা-বাণিজ্য উনবিংশ শতাব্দীর “অবারিত দ্বার” (Free Trade) নীতির অনুকূল হওয়ার অব্যাহত গতিতে পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশলাভ করিয়াছিল, আজ তাহাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে নানা কলকৌশলে বিদূরিত কবিতে চাহিলে তাহা বক্ষা পাইবে কিরূপ? আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বাঁচিতে হইলে আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তির আবশ্যক—ইউরোপের স্বার্থকলুষিত তীব্র জাতীয়তার হাওয়া তাহার পক্ষে মারাত্মক।

অবশ্য আর একটি পন্থা আছে—বিদেশীর সহিত সমগ্র ব্যবসা-সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া আত্মসর্বস্ব হইয়া বাঁচা। প্রত্যেক দেশের অভাব ও প্রয়োজন নিজ দেশ হইতে মিটাইবার আয়োজন ও ব্যবস্থা করা এবং দেশের শিল্প ও

* বিগত বর্ষের প্রবাসীর আবার সংখ্যায় প্রকাশিত “স্বর্ণমান” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্যকে শুধু নিজ দেশের-প্রয়োজনেই নিষেধিত করা। আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ, রুশিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী প্রকাণ্ড দেশসমূহের পক্ষে এ-পথে চলা তেমন অসাধ্য নহে। কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ-পথ-বিনাশের পথ। প্রথম কথা, বৎসরে ছ-মাসের খোরাকও ইংলণ্ডের নিজ দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশের সহিত তাহার বাণিজ্য বন্ধ হইলে ইংলণ্ড অনাহারেই মারা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যে-সব পণ্য পৃথিবীর হাট-বন্দের ছাইয়া ফেলিয়াছে, সে-সব তৈরির কাঁচামাল আসে সব বিদেশ হইতে। তাহাবই বা কি উপায় হইবে? অল্প দিকে, উল্লিখিত বৃহৎ দেশগুলি ঐক্যের খনি হইলেও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহারা অনেকে নূতন ব্রতী ও অনভিজ্ঞ। বিদেশ হইতে আধুনিক কলকজা ও অত্যন্ত নানাবিধ সাজ-সবজায় আমদানি করিতে না পারিলে তাহাদের চলিবে না। সকলের চাইত বড় কথা এই যে, বিশ্বের সম্পদ ও জ্ঞানভাণ্ডার আজ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকট সকলের প্রয়োজনে উন্মুক্ত হইয়াছে। আমরা কি চীনাপ্রাচীর খাড়া করিয়া দিশা নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কিরিয়া গিয়া আবার কুপমণ্ডুক হইয়া বসিব? ইহাতে কি জগতের প্রগতিককে শত সহস্র বৎসর পিছাইয়া দেওয়া হইবে না? আমরা নিজ দেশের মধ্যে আত্মসর্পস্ব ও পূর্ণমনস্কাম হইয়া থাকিতে পারিব না; অথচ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ও বাণিজ্যকেও স্বাভাবিক পথে চলিতে পদে পদে বাধা দিব—আমাদের বর্তমান বিপত্তির গোড়ার গলদই এই পরস্পর-বিবোধী নীতির অনুসরণে। সুতরাং মানবজাতির স্বাভাবিক বিবর্তন ধারাকে যদি আমরা ঠিক রাখিতে চাই, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ভাবে ও বস্তুব আদান-প্রদান যদি আমরা অব্যাহত রাখিতে চাই, তাহা হইলে পরস্পরকে অত্যন্ত রকমে আঘাত করিবার যত উপায় তাহা আমাদেরই পরিচালনা করিতে হইবে। শুষ্ক-প্রাচীর (Tariff Wall) ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। তেলো মাথায় তেল দেওয়া (subsidy) বন্ধ করিতে হইবে। শিল্প-অনুষ্ঠানে নূতন ব্রতী কোন কোন দেশের পক্ষে ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রবলের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য একপ প্রাচীরের ও সাবসিডি়র সাময়িক

প্রয়োজন থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাব, প্রয়োগ আমাদের তায় দুর্বল ও অনুন্নত জাতির জন্য যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক এবং তদনুকূলে জাতিসম্মেলন (League of Nations এর) অনুমোদন থাকা সঙ্গত। অবশ্য সেই সম্মেলনে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

সমস্ত গোলমালের মূলোচ্ছেদ করিবার আর একটি হুঁসাহসিক পন্থা আছে। কিন্তু তাহা যেমনই নূতন তেমনই ধনতান্ত্রিকদের পক্ষে মারাত্মক। পণ্য-বিনিময়ের সময় যে অর্থরূপ দালালটি মধ্যস্থ হইয়া কাজ করেন তিনি সমস্ত অনর্থের মূল; কারণ তিনি বহুদলী, তাঁহার রূপের বা মূল্যের কিছুই ঠিক নাই। এই দালালটিকে একেবারে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় করিতে পারিলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়। মানুষের ভোগের দ্রব্যই শিল্প ও পণ্যসম্ভারের প্রয়োজন—অর্থ পণ্যসম্ভারকে মানুষের নিকট প্রয়োজন ও সুবিধামত পৌছাইয়া দিবার একটি সহজ উপায় মাত্র। ইহা ভিন্ন অর্থের অল্প কোন সার্থকতা নাই। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই খামখেয়ালি দালালটিকে মাঝে রাখিবার দরকার কি? এই প্রশ্নাবে শ্রমিক বা সাধারণ সম্প্রদায়ের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে ধনিক সম্প্রদায়ের সমুদয় ক্ষতিব কারণ রহিয়াছে। সেইজন্যই একপ প্রশ্নাবে তাহারা একেবারে আঁতকাইয়া উঠিয়াছেন এবং এই পথের পথিক রুশিয়াকে সকলে মিলিয়া কোণঠাসা করিবার চেষ্টায় আছেন। ধনী অর্থ চাষ শুধু ভোগের সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নহে, ব্যক্তির খাতায় হিসাবের অঙ্কটাকে যথাসম্ভব বড় করিয়া দেখিবার জন্য। ইহা প্রয়োজনের দাবি নহে,—ইহা নিছক লোভ ও যুগযুগান্তের সংস্কার। সাধ মিটাইয়া ভোগ করিবার বিলাস-সামগ্রী ইহাঙ্গিকে দিলেও ইহার অর্থের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। অথচ ইহাদের এই লোভের ফলে ছনিয়ার ধন আসিয়া কতিপয় ব্যক্তির হাতে জড় হইতেছে, কিন্তু ব্যবহারে লাগিতেছে না। কারণ মানুষের ভোগবিলাসিতার সীমা আছে। অল্প দিকে নানাবিধ পণ্যসম্ভার পড়িয়া আছে, অর্থাভাবে ছনিয়ার অধিকাংশ মানুষ তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে পারিতেছে না। বিনিময়ের জন্য তৈরি না হইয়া

পণ্যদ্রব্য যদি মানুষের ব্যবহার ও ভোগের জন্য তৈরি হইত এবং দেশের শাসনতন্ত্র যদি তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকুশলতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করিতেন (যেমন আজ কৃষিয়ার চলিয়াছে), তাহা হইলে ধনীসম্প্রদায়েব ববে বসিয়া টাকায় তা দেওয়া বন্ধ হইত বটে, কিন্তু দুনিয়ার বঞ্চিতেরা কিঞ্চিৎ খাইয়া-পিয়া বাচিতে পারিত। এই ব্যবস্থার ব্যক্তিগত ধনে কাহারও অধিকার থাকিবে না। দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে—তাহার ফলভাগী হইবে দেশের সকলে সমভাবে যোগ্যতানুসারে। অর্থ থাকিবে না বটে, কিন্তু অভাবও থাকিবে না; কাণে সকলের সকল রকম অভাব মিটান হইবে সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে। ব্যক্তিগত ধনাধিকার কিংবা কর্মক্ষেত্রেব স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচাৰ এ-ব্যবস্থায় স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের নিজেদের গভর্ণমেন্ট যদি আমাদেরকে খাটাইয়া লইয়া পবম যত্ন ও বিশেষ বিবেচনা সহকাৰে আমাদের দৈনিক মানসিক সৰ্ব্ববিধ অভাব পূরণ কবিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে সৰ্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানবেব সৰ্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ মঙ্গল হইবে না কি? যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইবার ভয় আমরা করিতেছি, বর্তমান অবস্থায় মানবজাতির সে অধিকার কি পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে না?

এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃষিয়া আত্ম আশ্চর্য ফল পাইয়াছে। সেখানে বেকার-সমস্ত নাই, জিনিষ সেখানে পড়িয়া থাকিতে পায় না। দেশবাসী সকলের সকল অভাব মিটাইয়া যে জিনিষ উদ্ভূত হয় যে-কোন মূল্যে বিক্রয়ের জন্য তাহারা তাহা বিদেশে চালান করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত লাভের জন্য জিনিষ তাহারা তৈরি করে নাই, লাভক্ষতি বিচার করিয়া বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করিবার তাহাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। জিনিষের বিনিময়ে তাহারা বিদেশ হইতে যাহা পায় তাহাই তাহাদের লাভ। ১৯২৯ সালের পর ইউরোপ আমেরিকা সর্বত্র বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে ও জিনিষেব উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র কৃষিয়ার উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-সম্মার পবেও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সব

দেখিয়া শুনিয়া একদল লোক সমাজ হইতে অর্থের একাধিপত্যকে নির্বাসিত করিতে চাহিতেছেন এবং কৃষি-প্রবর্তিত সমাজ ও অর্থনীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। বর্তমান অর্থসঙ্কটের মধ্যে ইহার ব্যক্তিগত ধনবাদের চিরসমাধির স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ধন ও ধনী-সম্প্রদায়কে রক্ষা কবিয়া যদি এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথমেই ধন বা অর্থের স্বাম্যথেনাল ও স্বেচ্ছাচারকে বন্ধ কবিতে হইবে। অন্তথা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে বন্ধ কবিবার আর অন্য পন্থা নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন মুদ্রার বিভিন্ন মূল্য, পরস্পরেব মূল্যমধ্যে আবার অনিশ্চয়তা, পৃথিবীর মুদ্রাসমষ্টিব হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি কি করিয়া মানুষেব সকল হিসাবকে পণ্ড করিয়া দিয়া ব্যক্সাবাণিজ্যকে থরু করে তাহাব পরিচয় আমবা পূর্বেই কিঞ্চিৎ দিয়াছি।* অর্থের এই সর্ব্বনেশে খেলা বন্ধ করিতে হইলে প্রথমেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতাব একান্ত আবশ্যক। সেইজন্যই লড়াইয়ের পর জেনেভা কনফারেন্সে স্বর্ণমান পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব তাড়াতাড়ি গৃহীত হয়। ইহার ফলে স্বর্ণমান পরিহারেব দক্ষন বিভিন্ন দেশের মুদ্রামধ্যে বাট্টা বা বিনিময়েব হার লইয়া বে অনিশ্চয়তাব উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সকল মুদ্রার সমষ্টিগত মূল্যেব স্থিরতা লাভ কবা গেল না। কারণ বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে পরস্পরেব আপেক্ষিক মূল্য নির্দিষ্ট হইয়া গেলেও পৃথিবীর মুদ্রা বা অর্থের মোট পরিমাণ স্থির বাধিতে না পাবা মুদ্রামূল্যও স্থির রহিল না। সমগ্র পৃথিবীর মোট মুদ্রার পরিমাণ একটি সংখ্যাধারা নির্দেশ করিয়া দিতে হইলে সকল দেশের গভর্ণমেন্ট ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের একমত হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মনোবৃত্তি বর্তমান সময়ে যেক্ষপ ঘোবতর পরস্পরবিরোধী ও জর্ষাপাবরণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই সম্ভাবনা হৃদর-পরাহত।

বিভিন্ন দেশ ও তাহাদের ব্যাক্সসমূহ একমত হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ

* বিগত বর্ষের প্রবাসীর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “ভারত মুদ্রানীতি” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নির্দেশ কবির দেওয়া আরও একটি কারণে একপ্রকার অসম্ভব। আধুনিক জগতে বাজার-মর্যাদা বা credit কিল্পে অর্থের স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে যদিবা সমর্থ হন, কিন্তু এই নিরাকার credit পদার্থটিকে আত্মসাৎধানে আনিবেন কি প্রকারে? কোন দেশে কোন ব্যক্তির কি পরিমাণ ধাব পাওয়া উচিত, তাহাকে কি পরিমাণে ধারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা হুঃসাধ্য বলিলেই হয় অর্থের পরিমাণকে স্থির রাখিয়া তাহার মূল্য স্থির রাখিবার পথে ইহা একটি গুরুতর অসুস্থরায়। কিন্তু পছা হুঃহুঃ হইলেও সকল দেশের সমবেত চেষ্টায় এই প্রতিবন্ধকতা দূর করিতে না পারিলেও চলিতেছে না। সেইজন্যই সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেন্টের হাতে হইতে তুলিয়া লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শক্তির উপর দিবার কথা উঠিয়াছে। পরস্পর বিবদমান জাতিসমূহের মধ্যে এক্রপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কতদূর সম্ভব তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়।

বর্তমান অবস্থার আন্তঃপ্রতিকার করিতে হইলে অধমর্গ জাতিসমূহের স্বল্প হইতে সমবর্ণণ ও ক্ষতিপূরণের গুরুভার অবিশেষে তুলিয়া লইতে হইবে। সকলের সম্মিলিত পাপেব বিরাট বোঝা শুধু পরাজিত জাতিসমূহের স্বল্পে চাপাইয়া দেওয়ার ইহা বা আজ মরিতে বসিয়াছে। পৃথিবীর এতখানি জয়শক্তিকে এভাবে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিলে ব্যবসা-বাণিজ্য কোন প্রকারেই পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে না। কেবল সমরঞ্চণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করিলেও চলিবে না—পৃথিবীর যেখানে যত জাতি নিফল ঋণের চাপে মুবড়িয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকেও রেহাই-দিতে হইবে। নতুবা পৃথিবীর জয়শক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। ইউরোপের বহু মনীয়ীও এ-কথা আজ স্বীকার করিতেছেন। ভারতের বিরাট পূর্ব ঋণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় বিনা স্বার্থে ও বিনা কাবণে শুধু আমাদের বিধিনির্দিষ্ট অতিভবকের উপকারের কিঞ্চিৎ প্রত্যাশারার্থে আমাদিগকে নুতন করিয়া বিরাট ঋণভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সব ঋণের

চাপ না কমিলে আমাদের আর্থিক উন্নতির আশা সুদূর-পর্যন্ত। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক হ্রাস পাওয়ায় কৃষিপ্রধান দেশসমূহের ঋণমুক্তি অধিকতর। আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমান অবসাদ দূর করিতে হইলে যাহা বা টাকা লইয়া গ্যাট হইয়া বসিয়া আছেন তাহাদিগকেও হাতের টাকা ছাড়িতে হইবে। ধরনাও করিবার কথা কেহ অবশ্য তাহাদিগকে বলিতেছেন ন একটা অনন্তসাধারণ কুণ্ঠা ও অবিশ্বাস হইতে তাহা বা যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে হাত শুটাইয়া বসিয়া আছেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবেই নুতন ব্যবসার পত্তন হইবে, বাজারে অর্থ নুতন করিয়া চলিতে শুরু করিবে, মানুষের জড়তা ও অবসাদ কাটিয়া গিয়া ব্যবসা-জগতে নুতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ আমাদিগকে অধিক কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; এবং ফলে ছুনিয়ার সকল অর্থ বাজার হইতে মানুষের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। এই অর্থ পুনরায় ঘরের বাহির না হইলে মৃতপ্রায় ব্যবসা-বাণিজ্য আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে আরও একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ফলে ধারে কার্য করিবার সুযোগও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষকে এই সুযোগ ফিরাইয়া দিতে হইবে; তাহা বা কণ্ঠ-ক্ষমতার উপর আবার বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। কারণ মানুষের এই মর্যাদা (credit) অর্থের প্রয়োজন যে কতখানি মিটাইতে পারে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মানুষকে তাহার কর্মকুশলতা অনুযায়ী খানিকটা বিশ্বাস না করিলে কেবল নগদ অর্থ দিয়া সকল সময় কাজ করা কঠিন। তাই অর্থের সঙ্কোচন দূর করিতে হইলে অকাতরে অর্থব্যয় করা যেমন অত্যাশঙ্ক হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই মানুষকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা বা credit দান করারও প্রয়োজন হইয়াছে। অর্থব্যয়-সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট ও ধনীসম্প্রদায়ের দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা বেগী; কারণ শক্তি ও সুযোগ তাহাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বে শুধু লড়াই বাধিলে গভর্ণমেন্ট অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। তত্ত্ব সাধারণ অবস্থায় তাহাদের ব্যয়ের ধারা একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু

বর্তমান কালে দেশেব নানাবিধ বিরাট জনহিতকর অমুষ্ঠানের (public utility concernএর) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্তান্ত দেশেও আজকাল গভর্ণমেন্ট বেলওয়ে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, সেচ, খাল-খনন, বৈজ্ঞানিকশক্তি সরবরাহ, জাহাজনির্মাণ, সাধারণের বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি নানা বিভাগের কর্তৃত্বভার নিজহাতে গ্রহণ করিতেছেন। বর্তমান সময়ে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও লাভবান কার্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনীসম্প্রদায়কেও এই সব অমুষ্ঠানে অর্থনিয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহাবাও লাভবান হইবেন, দেশের বেকারের সংখ্যাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা ও অর্থব্যয় করিয়া বাজারের বাট্টি টাকা পূরণ না করিলে এই অসচ্ছল অবস্থা যে কিছুতেই দূর হইবে না, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন শিল্পজগতে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বর্তমান অবস্থার জন্য অংশতঃ দায়ী। নিত্য-নূতন সৃষ্টিব ফলে অপ্রয়োজনে যে অর্থব্যয় হইতেছে, প্রকৃত প্রয়োজনে তাহা ব্যয় হইলে জনসাধারণকে এতটা ভুগিতে হইত না। ধনী ক্রেতাব্যয় অপব্যয় বাঁচিয়া যাইত; এবং বিক্রেতাকেও নিত্য-নূতন জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া হয়বান ও নাকাল হইতে হইত না। তাই

আজ এমন কথাও উঠিয়াছে যে, কিছুকালের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক!

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রতিকারের পথ থাকিলেও তাহা অনুসরণের উপায় নাই। বর্তমান সঙ্কট সমরে বাঁচিতে হইলে যে দুর্জয় সাহস, উদার বিশ্বাস ও একান্ত সহযোগিতাব আবশ্যক তাহা আজ কোথায়? পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন জাতির মনোভাব দেখিলে আমাদের একটি পুরাতন গল্পের কথা মনে পড়িয়া যায়। দুইটি ভদ্রলোক এক ট্রেনে যাইতেছিলেন। উহাদেব মধ্যে একপাটি চটি বদল হইয়া যায়। এই ভুল ধবা পড়ে একজনর ষ্টেশনে নামিবার পর। ততক্ষণে ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে। প্ল্যাটফর্মের যাত্রীটি গাড়ীর যাত্রীকে তাঁহার পাছকাটি প্ল্যাটফর্মের ফেলিয়া দিবার জন্য চীৎকার করিতে কবিত্তে ছুটিতে থাকেন, এবং গাড়ীর যাত্রীটিও তাঁহার পাছকাখানি গাড়ীর ভিতর ছুঁড়িয়া দিবার জন্য বলিতে থাকেন। কেহই কিন্তু ভরসা করিয়া অপরের জুতাটি আগে হাতছাড়া করিতে পাবিলেন না। দেখিতে দেখিতে গাড়ীটি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। প্ল্যাটফর্মের যাত্রীটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িলেন, গাড়ীর যাত্রীটি জানালা দিয়া ব্যাকুলনয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিণামে একপাটি চটি লইয়া উভয়কে ঘবে কিরিতে হইল!



গোঁড়জাতি

খ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ভাবতবর্ষে বে-সব পার্কিতা জাতি আছে তাহাদেব মধ্যে গোঁড়জাতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়, প্রায় ত্রিশ লক্ষের অধিক হইবে। বনভূমিশোভিত সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর সর্বত্র, ম্যালেরিয়া-প্রদীপিত সুন্দর চিন্দ্‌বারা প্রদেশের জায়গীরগুলি, বেতুলেব নদীসমূহব তীব্রভূমি, সিয়োনীর মনোরম পাহাড়গুলি—এই জাতিব বাসস্থান। চন্দা, ওয়ারধা, নবসিংপুৰ এবং আসাম প্রদেশেও ইহারা বাস করিয়া থাকে।

গোঁড়েরা দ্রাবিড়ী ভাষায় কথাবার্তা বল, চলতি কথায় তাহাদিগকে রাবণবংশী বলা হয়। সম্ভবতঃ তাহাবা দাক্ষিণাত্য হইতে মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। আদি বাসস্থান সম্বন্ধে সঠিক কিছু তাহারা বলিতে পারে না। তাহাদেব ভাষায় ‘ভুলে বাওয়া’ শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ‘মনে রাখা’ শব্দের উল্লেখ নাই। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত প্রবাদ এবং পৌরাণিক উপাখ্যান খুব অল্পই পাওয়া যায়। বেতুলে তাহাদেব উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে :—

প্রাচীন সমুদ্রে সিঙ্গমালী পাখীর ডিম হইতে ইহাদের আদি পিতামাতার উৎপত্তি। সাগরমাতা বনভূমিকেই যেন তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ কবিতা দিয়াছিলেন এবং তাহাবা নীলকণ্ঠ পাখীর পালক ও ময়ূবপুচ্ছসংযোগে তথায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়া লইয়াছিল। ঐষ্টানদের আদিমাতা ঈত ধেরূপ নিবিদ্ধ ফলভক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, গোঁড়দের আদিমাতাও সেরূপ হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের উদ্ভব এবং এই বিষজোড়া ছুঃখের হা-ছতাশ। শেষে অক্লান্তমসাহসে পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিতব বনের বাজা ও বীর রাইলিঙ্গের অত্যাশঙ্কিত কাহিনী আসিয়া পড়িল। যে-রাইলিঙ্গ রাজা আর্থার, যে-বাইলিঙ্গ ফরাসী দেশেব লুই, সেই মানবদেহধারী রাণীর শিরস্ত্রাণ হইতে উদ্ভূত একটি অবতারস্বরূপ। কিন্তু তাহার জন্ম সম্বন্ধে রাণী

সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইহা তাঁহার পক্ষে একটি মন্তব্য অভিলাষ; তাই তিনি শিশুটিকে জীবন্তে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার জন্ত দুইটি বালিকাকে আদেশ দিলেন। কিন্তু বালিকাবা শিশুটির দিকে তাকাইতেই সে তাহাদিগকে দেখিয়া দ্রব্য হাঙ্গল; ঐ প্রীতিভরা হাসিতে মুগ্ধ হইয়া বালিকারা তাহাকে পুঁতিয়া ফেলার বদলে একটা বটগাছের মূল লুকাইয়া রাখিল। এমন সময় এক শকুন-রাণী তাহার পর্বতস্থিত বাসা হইতে আহার অন্বেষণে বাহির হইল এবং রাইলিঙ্গকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাসায় চলিয়া গেল। বালক রাইলিঙ্গও সেখানে মনের সুখে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে তীর ধনুক লইয়া শিকার অন্বেষণে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার নিজ জন্মভূমিতে তাহার মাতার কাছে আসিয়া পড়িল। অল্প ছয় জন বড়ভাই থাকা সত্ত্বেও মাতা রাইলিঙ্গকেই রাজ্যাসন দিল, কিন্তু ভাইয়েরা ইহাতে দ্বৈষাপরায়ণ হইয়া তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা রাইলিঙ্গকে তাহাদিগের স্ত্রীদর নিকট রাখিয়া দিয়া বাণিজ্যযাত্রায় বাহিব হইল। তাহাদিগের কাছে তাহার নিরুণ্য চরিত্র প্রতি রাজ্যে ব্যাহত হইতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতেই তাহাদের কামনা পূর্ণ করিতে চাহিল না, অবশেষে হতাশ হইয়া তাহাবা পারাবত শিঙারের জন্ত রাইলিঙ্গকে বনমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাব বস্ত্র উন্মোচন কবিতা দিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জার ভাব প্রকাশ পাইল না। অনন্তোপায় হইয়া স্ত্রীগণ একটি বিড়ালকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাগাইয়া দিল এবং ঐ কুদ্ধ বিড়ালের আঁচড়-কামড়ে তাহারা পীড়িত হইল। তাহাদেব স্বামীরা ফিরিয়া আসিলে তাহারা জানাইয়া দিল যে, রাইলিঙ্গ তাহাদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে। তখন ভাইয়েরা মিলিয়া রাইলিঙ্গকে প্রাণে মারিবার জন্ত তাহাকে উদ্ভগু লোহার কড়ায় ফেলিয়া

দিল। কিন্তু তিন দিন পরে যখন ভাইয়েরা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতে গেল তখন দেখিল যে সে জীবিত। তখন তাহারা বুঝিল যে, পুণ্যাত্মার নিকট বমরাজের অপ্রতিহত শক্তি থর্ক হইয়াছে। ভাইয়েরা তাহাদের স্ত্রীগণের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া রাইলিঙ্গকে অতিশয় সম্মানের সহিত মুক্ত করিল। রাইলিঙ্গের কোনরূপ প্রতিবাদ না শুনিয়া তাহারা স্ত্রীদের পায়ে বেড়ি পরাইয়া দিল এবং তাহাতে বলদ জুতিয়া দিয়া তাহাদের চরম দশা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের চারিদিকে ঘুরাইতে লাগিল। পরে রাইলিঙ্গ অগ্নির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া বন গিয়া তাহার ভ্রাতাদের জন্ত নূতন রাণী ও অগ্নি সংগ্রহ করিল এবং সে নিজে বিবাহ করিতে অসম্মতি জানাইল। সে বলিল, “তোমরা তোমাদের রাজধর্ম ও সাংসারিক ধর্ম পালন কর—আমার সংসারী হইবার প্রবৃত্তি নাই।” তারপর সে তাহাদের সকলকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইল এবং অমরধামে প্রস্থান করিল।

এই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত।

চতুর্দশ শতাব্দীর পরে বেতুল, চিন্দাবারা, মাণ্ডুলা ও চন্দার গৌড়জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাদের কোন মূল ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। উহাদের আধিপত্য প্রায় দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া স্থায়ী ছিল, সেজন্ত দেশও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তখন ভারতের অতীত গৌরবপ্রচারের পক্ষাশ্রয়ী পৃষ্ঠপোষক ছিল না বলিলেই হয়, তবুও “মধ্যপ্রদেশের সরকারের অনুমতানুসারে প্রকাশিত” একখানি গ্রন্থে আছে :—

“গৌড় শাসনকর্তাদের নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ শাসনে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, গোমেবাদি পশুর সংখ্যাধিকা এবং রাজকোষ ধন-রত্নে পূর্ণ ছিল।...গৌড় রাজাদের এরূপ একটি হুম্মর নিয়ম ছিল, যে, কোন লোক পুষ্করিণী খনন করাইতে সম্মত হইলে রাজারা সেই পুষ্করিণীর জমি তাহাকে নিষ্করভাবে দান করিতেন।”

চন্দার জরীপ-বিভাগের প্রধান কর্মচারী গৌড়শাসন-কর্তাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“তাহাদের রাজত্বকালে দেশ হুম্মসিত ও শান্তিপূর্ণ ছিল। অট্টালিকাশোভিত হুম্মর নগরগুলি স্থপতিবিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর

হইয়াছিল। যাহারা এক সময় রাজপদ অধিষ্ঠিত ছিল আজ তাহাদের দুর্দশা দেখিলে এই সকল ঘটনা স্বতঃই আমাদের স্মরণ হয়।”

বে-সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী এক সময় মনোহর দৃশ্যের লীলাভূমি ছিল, আজ তাহার উপর অশেষ দুঃখের যবনিকাপাত হইয়াছে। যদি কেহ এখানে আসে তাহা হইলে সে এখানকার পীড়িত মানবতার বিষাদমাখা



গৌড়জাতির গ্রাম্য মোড়ল

কাতরধ্বনি শুনিতে পাইবে। গৌড়েরা এখন জগতের আপদগ্রস্ত জাতির মধ্যে গণ্য। বর্ত্তমানে তাহারা প্রত্যেক আগন্তকের কাছে চক্ষুশূল হস্তা পড়িয়াছে। তাহারা এখন দারিদ্র্যের চরমসীমায় আসিয়া পৌছিরাছে; তাহাদের গড়পড়তা দৈনিক আয় এক আনা মাত্র; তাহাদের সন্তানকে পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই খাটিয়া খাইতে হয়; আহাৰ্য্য তাহাদের অতি সাদাসিধা, কেবলমাত্র ফেনসমেত ভাত; পরিচ্ছদের দৈন্ত এরূপ যে



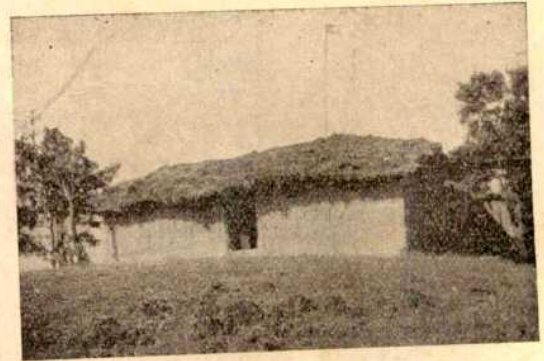
ঝড়ের পরে গোড়গ্রালোকেরা শস্ত সংগ্রহ করিতেছে

শীতকালে পার্শ্বপ্রদেশের আতান্তিক শীত কোনক্রমেই
রক্ষা হয় না। তাহাদের পোষাক সম্বন্ধে একজন কবি
বলিয়াছেন—

আত্মরূপের টান পড়েছে
করছে তাদের ছন্নছাড়া,
কোঁপীনেতে অর্ধজাঙ্গ
লজ্জা ঢাকে সর্বহার।

তথাপি অর্ধভুক্ত, অবজ্ঞাত, ধ্বংসোন্মুখ এই জাতি
মদ্যবিভ্রতা, কুসীদজীবী ও তহশীলদারের হাতে প্রতিনিয়ত
উৎপীড়িত। এই জাতিকে ভূমির, কৃষিবস্ত্রাদির, গবাদি
পশুর এবং ভোজন-পত্রের উপর, এমন কি, গৃহাদি সংস্কার ও
পরিষ্কার করিবার জন্ত যে মৃত্তিকার প্রয়োজন তাহার
উপরও করভার বহন করিতে হয়। আগেকার মত প্রাণিবধ
করিয়া তাহারা আর খাজ সংগ্রহ করিতে পারে না, কারণ
এখন ধনীলোকের মৃগয়ার সাধ মিটাইবার জন্ত বনের
জীবজন্তু স্তম্ভসংকীর্ণ। তাহাদের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার

যথেষ্ট হইয়াছে। যেন কোথা হইতে এক বক্ষা আসিয়া
গ্রীষ্মের আতপ-তপ্ত পক্ষ শস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।
বায়ু, ভল্লুক ও চিতা এখন তাহাদের মেঘপাল গ্রাস করে;
রাত্রিকালে কখনও কখনও ইহারা তাহাদের কুটারে প্রবেশ
করিয়া তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ও অন্ধকারে চোখের উজ্জ্বলতায়
তাহাদের ঘুমন্ত শিশুসন্তানগুলিকে ছঃস্বপ্নের মত জাগাইয়া
দেয়। বায়ুর অপেক্ষাও ভীতিউৎপাদক ও রক্তপিপাতৃ
মহাজন তাহাদের বিবাহ ও অন্তোষ্টিক্রিয়ার সময় টাকা
লম্বী করিবার জন্ত তাহাদিগকে নানারূপ শোকাবাক্য
প্রয়োগ করে। এই সকল মহাজনের শোষণের পর
তাহাদের যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সভ্যসমাজে অদৃত
ও রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষিত আফিং ও মদ্যে নিঃশেষিত
হইয়া যায়। নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও তাহাদের
এই অপব্যয়ের অংশ পাইয়া থাকে। সকলদিকে
উপায়বিহীন, একেবারে অজ্ঞ ও নিঃসহায় হইয়া এই জাতি
সহজেই নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তাহাদের সাহায্যের
জন্ত কোন সাধারণ তহবিল নাই। সুতরাং বংশান্তক্রমে
তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। মালেরিয়া তাহাদিগকে
পঙ্গু করিয়া দিতেছে, তাহাদের চিকিৎসাদির কোনরূপ



গোড়-সেবামণ্ডলের প্রধান গৃহ (করঞ্জিয়া)

ব্যবস্থা নাই। খাদ্যাভাবে তাহাদের সন্তানগুলি মৃত্যুমুখে
পতিত হইতেছে। তাহাদের রাজপদ বা রাজসম্মান
আজ স্মৃতিপথ হইতে বিনুগ্ন হইতে বসিয়াছে!

কিন্তু কি সাহস ও উদ্যমের সহিত এই অদৃত জাতি
তাহাদের ছঃস্বপ্নের সম্মুখীন হইয়াছে! ইহাদের অপেক্ষা

কোতুকপ্রিয়, সদানন্দ, কমণীয় জাতি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মর্যাদাবোধ অরণ্যাতীত হইলেও রক্তের সহিত প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত। এখনও তাহাদের আচরণ রাজোচিত, তাহাদের বংশ অতি প্রাচীন।

তাহাদের এই শক্তির মূল উৎস কোথায় যে নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। অনুপ্রেরণাহীন মানব-মনও বনভূমির নিগূঢ় তত্ত্ব কিছু

কিছু অনুভব করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। তাই শ্রীযুক্ত এম. ডি. পাতিয়াল গোঁড়-সেবামণ্ডলে কিছু দিন কাজ করিয়া বনভূমির প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“এই জাতির অন্তরাত্মা স্বাচ্ছন্দ্যপ্রয়াসে ইহা পৃথিবীর নগ্নবন্ধ দাঁখনিংখাসে পরিপূর্ণ করিতেছে। বনের পরাজির মর্গরক্ষণের সহিত ইহার দাঁখাস নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দূরবর্তী পশু-পক্ষীর হুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে আত্মার এই কাতর ক্রন্দনের সমবেদনা মুগ্ধরিত হয়; অদৃশ্য পতঙ্গের অবিরাম সঙ্গীতপ্রবাহ উহার আকুলতাকে প্রাবিত করে। তাহাদের অন্তর হইতে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক উদ্বেগ অন্তর্হিত হয়; তাহাদের হৃদয়ের এই ভাব একটি স্বর্ণীয় বস্তু। বাহ্য প্রকৃতির এই প্রভাব কখনও কখনও অতি অল্প সময়ের জন্তও পানাহার এবং পরিচ্ছদের চিন্তা তাহাদের মন হইতে বিচ্যুত করে; তাহাদের দুঃখে প্রপীড়িত আত্মা ক্ষণিকের জন্ত আত্মবিশ্রুত হইয়া যেন একটা বিমল আনন্দের রাজ্যে প্রবেশলাভ করে এবং তাহা তাহাদের আনন্দদায়ক পার্শ্বত্যা জীবনের ক্ষণিক স্বপ্ন উপভোগ করে। তাহাদের স্বাধীনতা যেন কিরিয়া আসে, দারিদ্র্য-দুঃখ যেন তাগের আনন্দে পরিণত হয়। তাহাদের এই বহু জীবন মানবাত্মার একচেয়ে-একটানা ভাব হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখে। এই বনভূমির মধ্যে তাহাদের আভিজাত্যে-ভরা হৃদয় স্পন্দিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে শান্তিনিলয় এই বনদেবার বক্ষে তাহারা ক্ষণিক আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। এই ইন্দ্রজালই গোঁড়দিগকে অবিরত বনভূমির দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া যায়। যে-প্রকৃতিদেবী তাঁহার মেহসিক্ত মঙ্গলময় হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে লালনপালন ও সাহুনা প্রদান করেন, তাহারই সহায়ভূতি ও ভালবাসার গৌরবময় রহস্ত তাহারা এই বনভূমিতেই উপলব্ধি করে। এখানে লীলাময়ের হৃদয়-কন্দরে তাহারই প্রেমের গান প্রকৃতিদেবীর শত সহস্র হুরে ধ্বনিত হয়। এই বনভূমির বক্ষে তাহারা দুর্ভাগ্যপীড়িত অসহায় শিশুর স্থায় তাহাদের মর্শ্বোচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করে। ভগবানের এই সমস্ত লীলা-বৈচিত্র্য তাহারা সামান্য অনুভব করে মাত্র; অথবা ইহারই ভিতর দিয়া অসীমে পৌঁছিবার পথের সন্ধান পায়। ইহা কল্পনা নয়, স্বপ্নও



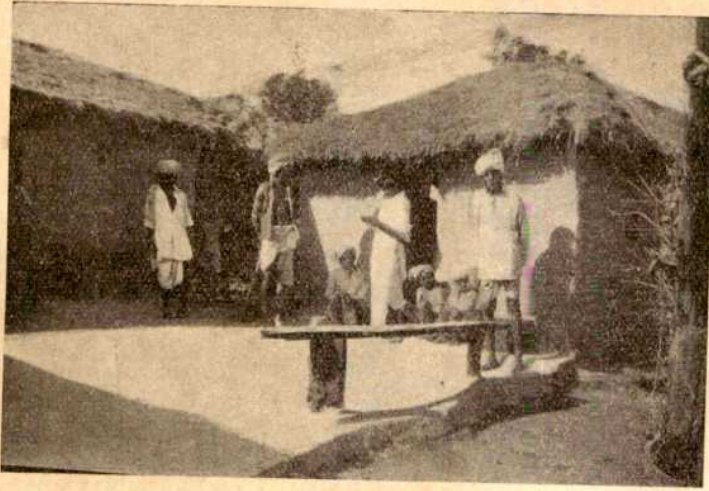
গোঁড়-শিশুরা মট্টেসরী শিক্ষাপ্রণালীর যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেছে

নয়। ইহা কেবলমাত্র ক্ষণিক দীপ্তিতে প্রকাশিত হয় এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই বিস্মৃতি-গর্ভে লীন হইয়া যায়।

মুহূর্ত্তের এই আত্মবিশ্রুতিই গোঁড়জাতির জীবন-প্রবাহের উৎস। ধর্ম, শিল্পকলা, বাহুবলি এবং সঙ্গীত—সমস্তই এই বহুজাতির নিজস্ব। অল্প স্থানে এবং অল্প সময়েও তাহারা সতত এই সমস্ত বাস্তবের সান্নিধ্যে থাকিবার জন্ত ও সেই সচ্চিদানন্দ অজ্ঞাতের রহস্ত ভেদ করিবার জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনাভিলাষে এই অনির্গতনীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। যে বিধাতা তাহাদিগকে এই বিশ্রাম ও হৃদয়ের গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন জীবনসংগ্রামে তাঁহারই পরাক্রম উত্তীর্ণ হওয়াই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব সমগ্র জীব-জগতের স্থায় তাহাদের জীবন কল্পনা ও উচ্চ আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই সকল কল্পনা আবার সেই পরমাত্মার হৃদয়নিঃসৃত মহাবোধের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তিপ্রসূত।”

পাতিয়াল সাহেব গোঁড়দের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকিয়া গোঁড় বনিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পূর্বে সভ্য সমাজের ধারণা ছিল যে, অসভ্য জাতির মধ্যে কেবল ভূতের ভয় ছাড়া কোন ধর্ম নাই; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী যে ধারণা দূরীভূত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

গোঁড়জাতির জীবনবাণপ্রণালী ও আচার-ব্যবহার এত অল্প পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। রাসেল সাহেবের রচিত মধ্যপ্রদেশের বর্ণ ও জাতি-সমূহ (Tribes and Castes of the Central Provinces) নামক পুস্তকে উহা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এই ধরণের পুস্তকে বাহ্যিক বর্ণনাটা যেমন বেশী থাকে ইহাতেও সেইরূপ আছে। এই সকল পুস্তকে যে যে স্থলে ভ্রাতৃবান্দীর আচার-ব্যবহারের



গোড়-সেবামণ্ডলের দাতব্য চিকিৎসালয়

প্রশংসা করা হইয়াছে সেই সেই স্থান নিতুল বলিয়া বোধ হয়। আর যে যে অংশে ভারতীয় আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে সেই সেই অংশ ঠিক নহে। গোড়-জাতির বন্ধুপ্রথা সন্দেহে পাতিয়াল সাহেব যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন আর কোনও পুস্তকে সেরূপ নাই। তাহাদের বন্ধুত্বের আদর্শ উচ্চ। বন্ধুপ্রথাকে তাহারা একটা কলাবিদ্যায় পরিণত করিয়াছে বলিলেও চলে। এই বন্ধুত্ব স্ত্রী-পুরুষের সংস্পর্শজাত নয়। কেননা, তাহাদের বন্ধুত্ব স্ব স্ব জাতির মধ্যে আবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি ভালবাসার গভীরতা অনুসারে তাহাদের বন্ধুত্ব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। বথা—ভাজলি, সখী, জওরা, মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল।* এই পাঁচটির মধ্যে ভালবাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ভাবে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে অধিকতর এবং দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টিতে আরও বেশী ভালবাসা দৃষ্ট হয়।

গোড়জাতির জীবনব্যাপনপ্রণালী কিরূপ সুন্দর ও মাধুর্যময় তাহা আংশিক বলা হইল। এইবার তাহাদের কি কি স্কিনিষের অভাব আছে সে-সম্বন্ধে সন্ধান লওয়া যাক। সভ্য মানবসমাজ তাহাদিগকে বহু শতাব্দী ধরিয়া অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহাদিগকে কি কি সুযোগ

* আমাদের সভ্য বাঙালী জাতির মধ্যেও সখী, মহাপ্রসাদ এবং গঙ্গাজল—এই তিনটি প্রচলিত আছে।

দেওয়া উচিত? সর্বপ্রথম প্রয়োজন, —তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা। এই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হওয়া চাই, যে-সে শিক্ষা নহে। বর্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড যে শিক্ষা দান করে তাহা কোন প্রয়োজনেই লাগে না। এই শিক্ষা তাহাদিগকে কিছু সভ্য করিয়া তোলে বটে, কিন্তু উহা তাহাদের মানসিক শক্তি দমিত করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ দাসত্বের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মাকে মুক্ত বা স্বাধীন করা। অতএব যে-শিক্ষা

আত্মাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহার চিত্তবৃত্তির সম্যক পরিস্ফুরণের অবসর দেয় সেই শিক্ষাই তাহাদের দরকার। ভূগোল এবং বিজ্ঞান চর্চা করাও প্রয়োজন। তাহাদিগকে রাজারাজড়া বা যুদ্ধের ইতিহাস না শিখাইয়া সেই সাধু-সন্ন্যাসীর ইতিহাস শিখাইতে হইবে, যাহারা জগতে মহৎ কার্য্য করিয়া মহত্ত্বলাভ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-নীতি এবং সঙ্গীতবিদ্যা তাহাদিগকে শেখান উচিত। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যাদ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য পুষ্পশোভিত গৃহসকল নির্মাণ, উদ্যানরক্ষা, উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য বরন এবং উৎকৃষ্ট গৃহনির্মাণের জন্য স্বত্বধরের কার্য্যও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, ভারতের অধিকাংশ বালক-বালিকাই রুগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট ও কঙ্কালসার। যতদিন না ভারতে বহুলপরিমাণে হাসপাতাল ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন কেহই ভারতবাসীর স্বাস্থ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না।

কর, বিশেষতঃ গোমহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর উপর কর, উঠাইয়া দিতে হইবে। উত্তমর্ণের কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে এবং যে-সকল আইন-ব্যবসায়ী দরিদ্রের কলহ হইতে নিজেরা বেশ ছ-পয়সা উপায় করে তাহাদের হাত হইতেও ইহাদিগকে রক্ষা

করিত হইবে। দূরবর্তী স্থানগুলির শাসনকর্তাদের উপর উচ্চ রাজকর্মচারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও উচিত। বনে শিকার করিবার অধিকার তাহাদিগকে দিতে হইবে। গরিব লোকেরা ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্তই শিকার করে, আর ধনীরা করেন আমোদ উপভোগের জন্ত। গরিব লোকদিগকে শিকারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ধনীদের সেই অধিকার দিলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর পক্ষপাতিত্ব আর কি হইতে পারে? প্রাণিবধ করাই অত্যাচার। অনাহারক্লিষ্ট লোকের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত প্রাণী বধ করিতে হয় তাহা বরং মার্জনীয়, কিন্তু মাহুবে কেবলমাত্র তাহার আনন্দ উপভোগ ও ধর্মের নামে পণ্ডিত্য করিবে ইহা নিতান্ত গর্হিত।

আমরা সমাজের উন্নতি করিব, গ্রামের উন্নতি করিব বলিয়া বৃথা চীৎকার করি। আমাদের এই সব বিষয় আলোচনা করিবার কোনই অধিকার নাই। চোর যেমন গৃহস্বামীর নৈতিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ গ্রামবাসীদের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে পারি না। বনবাসীদের উন্নতির বিষয় আমাদের চিন্তা করিতে বাওয়া আরও উপহাসের বিষয়। কেননা, তাহাদের বংশ আমাদের অপেক্ষাও প্রাচীন এবং তাহারা যে-সব গুণ তথা অবগত আছে তাহা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। যে শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করিয়া আমরা এক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হই সেই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যে তৃপ্ত থাকিয়া তাহারা সারাদিন কাজ করিয়া বাইতেছে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নৃত্যাদি আনন্দে কাটাইতেছে। তাহারা যে ধৈর্য ও আনন্দের সহিত তাহাদের এইদারুণ ছুঃখময় জীবন পরমানন্দে উপভোগ করিতেছে তাহার অর্ধেক পাইলও আমরা কৃতার্থ হই।

তবে কেন আমরা তাহাদিগকে বর্ষের বলিয়া নিন্দা করি? শ্বেতবর্ণের উত্তরীয়বিশিষ্ট, মস্তকে শোলার টুপী-ধারী, রাজস্ব কার্যালয়ের বাবুর নিকট হইতে সেলাম-প্রাপ্ত নাগরিকের পাশে বস্তু বৈগা অথবা কোকু কুংসিত বা কদাকার বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করা বাইতে পারে, কে বা কাহারো প্রকৃত বর্ষের—বিশ্বশিল্পী-নির্মিত পদবৃগলকে গায়ের জোরে চন্দ্রপিঞ্জরে প্রবেশ



গৌড়জাতির শস্তোৎসব

করান এবং বিদেশী বস্ত্রের কুংসিত গোলকার মোজার ভিতর পা ছুইটিকে রক্ষা করা এবং গাধার গলদেশের রজ্জুর ত্রায় গলবন্ধদ্বারা গলদেশ বন্ধন করা, না হস্তপদকে উন্মুক্ত রাখিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বনানীর মধ্যে পরিভ্রমণ করা? ইহাদের মধ্যে কোন্টি প্রকৃত 'জঙ্ঘলী'?

শ্রীযুক্ত রেন্ডা আধুনিক সভ্য বালিকার যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এবং রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল ললনার যে রূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও নিম্নে দেওয়া গেল। ছুইটিই পাশাপাশি রাখিয়া পাঠক বিচার করুন কোন্টি বর্ষের নামে অভিহিত হইবার যোগ্য :—

“এ-বুগের সভ্য ললনাগণ শরীরটিকে একটি ছবি বা প্রতিমা বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাদের টোটে রঙ, গলায় হার, কানে ছল, চুল কৌকড়ান, বকিম জ—এসব তাহাদের সহজ স্বাভাবিক ভাব দূর করিয়া তাহার পরিবর্তে কৃত্রিম ভাব ধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল রমণীদের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

সাঁওতাল রমণীরা সর্বদা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তাহাদের শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ, গতিবিধি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল; কার্যকুশলতায় তাহাদের

সজাবতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সর্বদা ধূলি-সংস্পর্শে থাকিলেও তাহাদের স্ফুগোল, স্বাস্থ্যব্যাঞ্জক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি মলিন বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমানে সভ্য নারীসাবান, এসেন্স, হেজলীন, পমেন্ট ইত্যাদি কৃত্রিম সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপকরণ সাহায্যে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাদের স্বাস্থ্যব্যাঞ্জক স্বভাব-সৌন্দর্য্যের নিকট সে চাকচিক্য কোনরূপে তুলনা করা চলে না।”

এই বস্তু ভ্রাতা ভগিনীদিগকে ভালবাসার চোখে দেখা প্রত্যেক ভারতবাসীরই একান্ত কর্তব্য। এখন এই এক কোটি অশী লক্ষ লোকের প্রতি মহাহুত্বিত প্রদর্শন ও অর্থসাহায্য করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়াও তাহাদের উপকার করা বাঞ্ছনীয়। যদিও তাহারা তাহাদের অভ্যুদয়ের জন্য কোনও লোকের মুখাপেক্ষী নহে, তথাপি যদি কেহ তাহাদের নিকট বন্ধুরূপে তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে তাহা

হইলে তাহারা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রতিদানের আশা যেন তাহারা না করে।

নব্য ভারতবাসীর ধমনীতে বনভূমির আদিম অধিবাসি-গণের শোণিত প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। এই শোণিত তাহাদিগকে নববলে বলীয়ান করিবে। অরণ্যই ভারতের হৃদয়স্বরূপ। অরণ্যই একদিন মুনিঋষিদিগের আশ্রম ও আবাসস্থল ছিল। অরণ্যেই একসময় ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য ও দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং অরণ্য ও অরণ্যবাসীকে ভারতবাসী অশ্রদ্ধা করিতে পারে না।*

* ১৯৩৩ সালের নবেম্বর মাসের ‘সডার্ণ রিভিউ’ পত্রে প্রকাশিত ভেরিয়ার এলউইন্ সাহেবের ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে।

গোপন কথা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[প্রাচীন পারস্যক হইতে]

গোপন কথাটি সখি আমার তুমি রে !
মনে বাহা জানা যায়, নাহি যায় বলা,
ছায়া সম আভাসিয়া বেহাগের মীড়ে
বাসনারে করে বাহা বেদনা-বিহ্বলা।

যে-কথাটি প্রভাতের প্রথম কমল,
প্রদোষের প্রভীক্ষিত গোপুলির তারা,

ঘুমভাঙা মধ্যরাতে অশ্রু-উত্তরোল
রজনীগন্ধার তুমি আকুল ইসারা।

তুমি মোর সেই কথা, বাহিরে আনিলে
আলোকে ঝরিয়া যায়, এত স্নেহমার !
আপনি দেখি না যারে, পাছে পরশিলে
বিরহের তপ্তখাসে খসে দল তার।

তুমি মোর সেই কথা স্মরণের পারে
নিজেরে বঞ্চিত করি রাখিয়াছি যারে !



P. G. A.
COMMON ROOM

মুচির ঘর
শ্রীনাথেশ্বর সাহা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ক্ষণিকের মায়া

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য

পাত্রের বয়স বছর বোল এবং পাত্রীর বয়স নয় কিংবা দশ। পাত্র আমি স্বয়ং এবং পাত্রী হইতেছে আমার মামার মনিব পল্লীবাসী কোন এক ছোট-খাট জমিদারের তৃতীয় বা চতুর্থ কন্যা। অতএব এখানে মাতুলই খটক বলা বাহুল্য। তিনি মায়ের কাছে কন্যার বিবরণ দাখিল করিলেন, “মেয়ের বয়স তো এখন তেমন কিছু হয়নি। তবে বলতে পারি রং বেশ পরিষ্কার, মুখ-চোখ-নাকও মোটের ওপর ভালই। মেয়ের গড়ন ধারাপ এ-কথা কাউকে বলতে শুনিনি। বয়সকালে দেখে নিয়ো এ-মেয়ে কেমন সুন্দরী হ’য়ে দাঁড়ায়।” তাঁহার বক্তব্যের সরলার্থ হইতেছে যে, এই আত্ম-মুকুলের অনতিসৌরভের মধ্যেই তাহার ভাবী মিষ্ট-সম্ভাবনার প্রাচুর্য্য সম্পষ্টরূপেই ব্যক্ত।

মা মামার সহোদরা, তত্পরি একাধারে নারী ও মাতা। সুতরাং কন্যার এবস্থিধ রূপবর্ণনায় তাঁহার মনটা ভিজিয়া কাদার মত নরম হইয়া ওঠাই স্বাভাবিক। তত্রাচ মামা রূপের সঙ্গে গুণেরও একটা আন্দাজ দিলেন এবং সে গুণাবলী রীতিমত কাঁচা, অতএব গড়িয়া-পিটিয়া মনোমত ধরণে পাকা করিয়া লওয়া চলে,—ইহা জানাইতেও ক্রটি রাখিলেন না। তারপর পরিশিষ্টরূপে যোগ করিলেন, “বলেছে দেবে-থোবে মন্দ নয়। গুঁদেরও হাত খুব আছে।”

ইহার পর যে-কেহ অসংশয়ে বলিতে পারে, আমার মায়ের মানসচক্ষুর সামনে ভাবীকালের কতকগুলি সুন্দরন ছবি ভীড়, কবিতা আসিয়া হাজির হইয়াছে, অনেকটা চলচ্চিত্রের চঞ্চল চিত্রলেখার মত। আমি তাহার দৃষ্টান্তও দিতে পারি, যথা,—ছোট্ট একটি ফরসা রঙের মেয়ে, ডুয়ে-শাড়ী পরা, মা’র সঙ্গে সঙ্গে ফাই-ফরমাস খাটিয়া ঘুরিতেছে ফিরিতেছে; ছুটির আবেদন কোচারীর মুখে-চোখে

ছুটিয়া উঠিতেই মা হাসিমুখে দরখাস্ত মঞ্জুব করিতেছেন, “যাও মা, এখন একটু থেলা ক’রো গো।” কিংবা, ছেলে-বোয়ে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁহাকেই সালাসি মানিয়াছে, এবং তিনি বিচারের তুল্যদণ্ড হাতে লইয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিতেছেন, “তোদের জালায় আমি আর পারি না বাপু।” এমনি করিয়া ছবির পর ছবি ইচ্ছামত আকিয়া যাওয়া চলে কিন্তু ছবিগুলোকে সত্যাকারের করিয়া তোলা নির্ভর করে ইহার আবেদনটুকু বোগ্যস্থানে সার্থকভাবে পৌছাইয়া দেওয়ার উপর। সে বোগ্যস্থান এই ক্ষুদ্র সংসারচক্রের মূল্যধারে; সেখানে বসিয়া আছেন একটি কর্তা, নিষ্কিন্দ্র পুরুষ মানুষ,—স্বল্পভাবী এবং নির্বিরোধী ব্যক্তি; দশে-পাঁচে থাকেন না,—তবুও তাঁহার গান্ধীর্ষ্যের ছায়া কিংবা স্মিতহাসির ছিটাকোঁটা চক্রের গতিনির্দেশ নির্ধারণ করিয়া দেয়।

অতঃপর সময় বুঝিয়া কথাটা বাবার কানে উঠিল। বাবা বলিলেন, “ছেলে যে অত্যন্ত ছেলেমানুষ।”

মাও সায় দিলেন, “ছেলেমানুষ তো বটেই। তাই ব’লে কি তোমার ছেলের আর বিয়ে হবে না?”

মাতুলও সেখানে উপস্থিত। তিনি হুব দিলেন, “তোমার ঘরও নেহাৎ ধারাপ নয়। গুঁদের অবস্থা বেশ ভালই। কুটুম্বিতায় কিপ্‌টেমি করতে কখনও দেখি নি। অগ্র মেয়েদের বিয়ে তো আমার চোখেব সামনেই হয়েছে, ঘরচ-পত্তর সবই আমার হাত দিয়েই হয়েছে।”

বাবা মন দিয়া শুনিলেন, তারপর অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, “বড় ছোটবর।”

উত্তর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার তাৎপর্য্য অস্পষ্ট নয়। মামা যুক্তি খাড়া করিলেন, “গুঁদের সব কাজই কুলীনের ঘরে হয়েছে। সেদিক থেকে আজকালকার যুগে গুঁদের কুলীন বলা চলে—জান?”

বাবা হাসিয়া উঠিয়া আমার পিঠ চাপড়াইলেন, “শালার বুদ্ধি কি !”

ইহার পরই আমার মায়ের হু-চোখে অশ্রুর বান ডাকিয়া ওঠা উচিত ছিল এবং তাহার সঙ্গে দুর্জয় অভিমান, কারণ তাঁহার ভাইকে বাবা অহেতুক গালি দিয়াছেন। বোধ করি কিছু হইয়াও থাকিতে পারে, কিন্তু সে নাটকীয় দৃশ্য আমার চোখে পড়ে নাই। এইটুকু মাত্র শুনিয়াছিলাম, মামা বলিতেছেন, “ছেলে ওদের চোখে ধবেছে বলেই এত খরচ-পত্তর করতে ওঁরা পেছপাও হচ্ছেন না।”

অর্থাৎ এই পাত্র কতাপক্ষের দেখা এবং খুব ভানা। কারণ ইঙ্কলের ছোট-বড় নানা ছুটি উপলক্ষে এই পাত্র যখন মাতুলালয়ে যাইত, তখন তাহার দিন কাটিত ঐ কতাপক্ষের বাড়িতেই। মধ্যাহ্ন-আহার কালে কত্ভার পিতা আমার ডাকিতেন, “এস, বাবাজীবন, পাতা হয়েছে।” ‘বাবাজীবন’ ডাক জামাতাবাবাজীউ করাব অভিলাষে পরিণত,—এরূপ সন্দেহ করা চলে।

এই ভূমিকার পর কতাপক্ষের দিক হইতে আর কোন সাড়াশব্দ আসিল না। বাবা নিশ্চিন্ত। শুধু মা ছোটখাট দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, “বেশ ভালই হয়েছে। মেয়ের বাপের বড় গুমোর।” মাঝখান হইতে আমার মাতুলালয়ে যাতায়াত কঠিন নিষেধে বন্ধ হইয়া গেল।

বলা নিশ্চয়োজন যে বিবাহ হইল না। শুধু তাই নয়, আমার বাবার সেকেলে দূরদর্শিতায় নিষিদ্ধ প্রেমের কোন জটিল কাণ্ডও জন্মিল না। ঘটনাটা বহু পুৰাতন, কিন্তু মনের মধ্যে সহসা এই বিগত দিবসের স্মরণটা আজই বা কেন ঝাঞ্জিয়া উঠিল ভাবিতেছি।

যাই বলি না কেন অতীত বস্তুটা মন্দ নয়। অতীতের স্মৃতি মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত মোহ রচনা করিতে পারে। তাহা না হইলে এই পৃথিবীহৃদ নর-নারী অমন করিয়া ঐ অতীতের পানে চাহিয়া থাকিবেই বা কেন! তাই আমি এত বিপর্যয়ে মধ্য দিয়া আসিয়াও আজ বসিয়া গিয়াছি পুরাতন দিবসের ঝাপসা পাতা উল্টাইতে।...হার রে সেকাল! কোথায় গেল বা আমার সেই মামার বাড়ি, মামা-মামীর আদরযত্ন, মায়ের ভালবাসা, আর বাপের মেহনীড়! মায়ের ভীক বুকের তলার একটি ঘোমটা-চাকা

ছোট বোঁ লইয়া ঘর করার যে-সব সাধ লুকাইয়া রহিয়াছিল, কালের কোলে তাব কোন চিহ্নেরথা আজ নাই। স্মৃতির এই রেশটুকু না থাকিলেও চলিত, কোন ক্ষতিই হইত না; তবে এই নিভৃত আঁধারে একেলা বসিয়া এমনি করিয়া মনের সঙ্গে বঙ্গ-বিলাস রসিয়া বসিয়া উপভোগ করা হইত না।

এইখানে একটু ভুল বুঝিবাব আশঙ্কা আছে বলিয়াই বলিতেছি, আমার এই কোমার্থ্য বা ভবঘুরে জীবনযাত্রার সঙ্গে উক্ত ঘটনাব এতটুকুও সম্বন্ধ নাই। এমন কি, বর্ণনামতই যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল তাহাও নিশ্চিত করিয়া জানি বলিতে পারি না। বর্ণনাটা আমাব অনুমান মাত্র। আর আমারও নিশ্চল-নীড় রচিত হইতে বিলম্ব নাই। মাসখানেক হইল শ্রীমতী নিভাননীর সঙ্গে আমার আলাপ জন্মিয়াছে এবং সময়ের অল্পতা সংস্বেও আমরা পরস্পরকে বেশী করিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছি। ইহার অবশ্যস্তাবী কলস্বরূপে একটি নির্দিষ্ট শুভদিনে তিনি আমার আকাশে ধ্রুবতারার মত উদিত হইতে সলজ্জে স্বীকৃত হইয়াছেন। সংবাদটা ঘটা করিয়া বহুমহলে প্রচার করার আবশ্যক বোধে আমবা দু-জনে পরামর্শ করিয়া নিমন্ত্রণপত্র আজই ছাপিতে দিয়া আসিবাছি।

ইহার পর এই স্মৃতি-নুবব গুঞ্জনকে বার্ষ প্রেমের হতাশ প্রণয়ীর হতাশোচ্ছ্বাস বলা চলে না। উপস্থিত বলা চলে, আমার মনের বর্তমান অবস্থা অনেকটা অত্যন্ত আত্মদে কাঁদিয়া ফেলার মত। তাই এই রঙীন স্বপ্ন নিজেই নিরালা আঁধারে পাইয়া বিস্মৃত স্মৃতির পটে হঠাৎ জমকালো রং চড়াইতে শুরু করিতেছে এবং বোধ কবি তাহাব সঙ্গে বাপের সেকেলে মতি-গতিকে সংগোপনে স্ততি করিতেছে।

তবুও এমন করিয়া রং চড়ানোর পর্যাণ্ড হেতু ইহা নয়। এখন মনে পড়িতেছে, ইহার হেতু রহিয়াছে, মাস-কয়েকের পূর্বের একটি ঘটনায়। সেই কথাটা বলি।

দেশমাতার সেবা উপলক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, বলিতে গেলে আমার পেশাই এই। তাই এক স্তবুর পল্লী হইতে ডাক পড়িয়াছিল, বক্তৃতায় যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গায়ে একটি স্বায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া দিয়া আসার জন্ত। বড় বক্তা নই, তবে এই কপালে আঁকা ছিল

কারাবাসের রাজটীকা, তাই বড় বড় নেতাদের মত বিপুল ভিড়ের হর্ষধ্বনি অদৃষ্টে না জুটিলেও, আদর-অভ্যর্থনার ক্রটি হইত না।

ষ্টেশন হইতে গ্রাম দূরে। গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য প্রকারের বানবাহন এখানে ছিল না। তাই স্থির করিলাম, গল্প করিতে করিতে পায়ে হাঁটিয়া চলাই হইবে যুক্তিমুক্ত।

“আপনার যে কষ্ট হবে—”

“চল তো বাবু। হেঁটে কে হারে আর কে জেতে আমি দেখে নেব।”

গ্রামের সীমানার মধ্যে পৌছাইতেই মনে হইল, এ গ্রাম আমাব খুবই পরিচিত।

ঐ আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পথ, গাছেব পাতায় সূর্য্যের কিরণ, বা পাশের বাঁশের ঝাড় আর পাতাব খস্ খস্ শব্দ, ঐ পুকুর পাড়ের তাল-নারিকেল গাছের সারি, পূব দিকের পর্ণকুটীর,—এবা সবাই যেন আমাকে অতি পরিচিতের সুরে সাদরে আহ্বান করিতেছে। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ ছিল না; তবুও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইবার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কোন্ বহমতপুর হে?”

সঙ্গীবা আমাব প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝিল না। আর বুঝিবেই বা কি করিয়া? একজন গ্রামের ইতিকথা দিয়া পরিচয় দিতে চাহিল, “বাদশাহী আমলে...”

আমি তাহার বক্তব্যে বাধা দিয়া জানিতে চাহিলাম যে, আমার মাতুলের নাম তাহাদের কাছে পরিচিত কি না। কিন্তু প্রশ্নটা উহার। অন্য অর্থে লইল, কেন-না তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই বলিল, “আপনার থাকবার জাগা করা হয়েছে হরবিলাসবাবুর বৈঠকখানায়। আপনার কোনো অহুবিধেই হবে না। হরবিলাসবাবু চমৎকার লোক।”

হরবিলাসবাবু! তারপর পথের ছোটখাট নির্দেশের জন্য আর আমাকে সঙ্গীদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল না। নিত্য-নূতনের চাপে পুরাতন চাপা পড়িলেও একেবারে অতলে তলাইয়া যায় না।

গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌছাইতেই একটি বৃদ্ধ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, “এই যে, আহুন, আহুন। বড় কষ্ট হ’ল আপনার—”

চিনিতে কষ্ট হইল না। পদগুলি লইয়া আমি কৌলিক পরিচয় দিলাম। বৃদ্ধের মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল,—“তুমি আমাদের সেই জীবন, এতবড় হয়েছে—আমি তো চিনুতে পারি নি। কতকাল আগে দেখেছি, তখন তুমি ছেলে মানুষ।...এস বাবা এস। তুমি তো ঘরেরই ছেলে—”

সন্ধ্যার পর অন্দব মহলে আমার ডাক পড়িল। মামাবাড়ির সম্পর্কে আমি হরবিলাসবাবুর স্ত্রীকে মামীমা বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্ত। সাক্ষাৎ হইতেই তিনি আমার মামা-মামীর অকাল বিয়োগের জন্য কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিলেন, “তুমি যে কোন কালে আসবে, একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। ভাগ্যে স্বদেশীর হজুগ উঠেছিল তাই তোমার দেখা পাওয়া গেল।”

তারপর আমার পারিবারিক খুঁটিনাটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিয়া দিলেন। দেখিলাম, আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের অল্প-বিস্তব সংবাদ তিনি রাখেন। বলিলেন, “তোমরা আমাদের ভুলে যেতে পার, আমরা তো আর পারি না। লোকজন পেলেই খবর নি’, আমাদের জীবন কেমন আছে, ভাল আছে তো? বেথানেই থাক না, বাবা, স্নেহে থাক, এই কামনা করি।”

কথাটা সত্য। ষাঁহাদের মেহছারার এককালে দিন কাটাইয়াছি, তাঁহাদের এমনি কবিতা ভুলিয়া যাওয়া বার্থই অমার্জনীয়। তাই এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছুই ছিল না।

ঘরের মধ্যে সহসা একটি মেয়ের আবির্ভাব হইল। মেয়েব চেয়ে বুড়ী নারী বলাই ভাল। মনে হইল, ইহাকে দ্বিপ্রহরে মলিন বাসে ও অনাবৃত রক্ষ কেশে আমার সম্মুখ দিয়া ধাতায়্যাত কবিতা দেখিয়াছি। খুব সম্ভব এই বাড়িরই কোন বিধবা দাসী, তবে তাহার গতিবিধির সঙ্গে দাসীত্বের কোন সঙ্গতি ছিল না বলিয়াই মনটা তখন অকারণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মেয়েটি আমার সামনে আসিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়া বলিল, “আপনি বিয়ে করেন নি?”

প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অহেতুক এবং অত্যন্ত বিরক্তিকর। ঘরে

প্রদীপের আলো, কাছের লোকের মুখ তৈমন স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। আর আমার ইচ্ছাও হইল না।

সে পুনশ্চ প্রশ্ন কবিল, “আপনার বুদ্ধি বলতে লজ্জা করছে?”

“না, আমি এখনও বিয়ে করি নি।”

“কেন?”

“হুঁহুং হয় নি ব’লে।”

“ওমা, কি রকম মানুষ গো, স্বদেশী করলে কি মানুষের বিয়ে ক’বাব একটু সময়ও ছোটে না,”—হাসিয়া উঠিয়া সে কোন জিনিষ লইয়া ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ে মামীমার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, “কি তুমি চিন্তে পারলে না? ও যে অহু।”

ইহাব পরও চিন্তিতে না পারা উচিত হয় না, কিন্তু নামেব স্ত্রী ধরিয়া মনের পুরানো পাতা উল্টাইয়া দেখা গেল পরিচরের কোন ঠিকানাই মিলে না। অথচ লজ্জায় আর স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করাও চলে না! মুখ নীচু করিয়া বসিয়া বহিলাম। মামীমা বলিতে থাকিলেন, “অহু দুব থেকেই তোমাকে চিন্তে পেরেছিল। ওই তো গিয়ে খবর দিলে—মা, যে এসেছে সে দেখতে ঠিক জীবন-দাদার মত, বাবাও জীবন জীবন বলছেন।”

এখন অহু কে অ’ল্লাজ ক’বা কঠিন নয়। ভাগ্য ভাল যে দাসী স্থির কবিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তরে কিছু কটুক্তি কবিয়া বসি নাই।

মামীমা অহুর ছুঁচুগোর ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। বিবাহ হইয়াছিল কুলীনের ঘবেই। অবস্থা ভাল, মোটা ভাত কাপড়ের অভাব না হইবারই কথা। অবশ্য বর দোজ-পক্ষের, তবে বয়সও যে খুব বেশী তা নয়। কিন্তু মেয়ের পোড়া কপাল, শহিল না; ছ-বছর না ঘুবিতেই হাঁতেব নোয়া খসাইয়া, সিঁহুর মুছিয়া হতচ্ছাড়ী আবার বাপের বুকে আসিয়া বসিয়াছে। সঙ্গে আনিয়াছে সতী নর একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। সে মেয়েরও কি আশ্চর্য্য বাড়ন্ত গড়ন, পাব করিতে আর বিলম্ব করিলে চলিব না। মামীমা বলেন আর আঁচল দিয়া চক্ষু মার্জনা করেন।

আমি সাস্থনা দিবার অস্ত্র বলিলাম, “কি করবেন বলুন, অদৃষ্টের উপব তো আর কারুর হাত নেই।”

“হা বাবা, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলেন, “অহুকে তোমাদের ঘরেই দেবার ইচ্ছা ছিল। সদাশিব ঠাকুরপোকে দিয়ে আমরা একবার তোমাব বাবার কাছে কথাও পেড়েছিলুম। আমবা তোমাদের চেয়ে নীচু ঘর ব’লে তোমার বাবা বাঙ্গী হ’লেন না। হ’লে যে কত সুখের হ’ত! হতভাগী কি অদৃষ্ট নিয়েই এসেছে,—নিজে পুড়েছে, আমাদেবও পুড়িয়ে মারছে।”

বুঝিতেছি, বেচারী অহুর অকাল বৈধব্য মামীমার বুকে বড়ই লাগিয়াছে। ঐ সব কটু বিশেষণ শ্রোয়োগে অহুর অদৃষ্ট-দেবতা স্তম্ভসন্ন হইবে না,—মা’র মন ইহা বোঝে না। তিনি এইভাবে ভ্রূণের একবেয়ে পুনরাবুত্তি করিবার চলিলেন।

অহুই আসিয়া আমাকে এই অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে মুক্তি দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “আপনি আমার চিন্তে পাবেন নি?”

আমি খুব লাহস করিয়া তাহাব মুখের উপব দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা কবিয়া উত্তর দিলাম, “পারব না কেন? খুব পেরেছি।”

“আপনার চিন্তে পাবাব বুদ্ধি এই নমুনা?”

উত্তর না দেওয়াই শোভন।

মামীমা বলিলেন, “তোব কি-যে কথা অহু, সেই কত ছেলেবেলায় দেখেছিল, তাবপর কত বদলে গেছে, চেনা কি সহজ?”

অহু মা’র কথা গায়ে মাখিল না। সে বলিল, “তব এখনও ঘরে বৌ আসে নি। স্বদেশী করতে এসে বোনকে দেখে যদিও বা একটু মন পড়ে, বিয়ে করলে সেটুকুও মন থাকবে না।—তাই না জীবন-দা?”

“বিয় করার সময়ই জুটুক—”

“তার মানে? সন্নিগি হয়েছেন না কি?”

ভারি গেছেব উত্তর দিয়া মুখ বন্ধ করিব ভাবিতে-ছিলাম, কিন্তু সৎ-মেয়ের ডাকে অহু চলিয়া গেল, হতরাং আমাব উত্তর শোনান হইল না।

অনুব কথার স্তব্ধ ধরিত্রী মাঝীমা বলিতে শুরু করিলেন,
“হা বাবা, এ রকম ছন্ন-ছাড়া দিন কাটান একটুও
ভাল দেখায় না। বিয়ে কর, সংসারী হও, ছেলে-পুলে
নিয়ে ঘর সংসার কর। আমরা দেখে শুনে মরি।”

মুখ-মুখের প্রসঙ্গ সাজ কবিতা, ক্লাস্ত দেহ-মন লইয়া
আসিলাম শুইতে। কিন্তু ঘুম যেন আসিয়াও আসে না।
প্রদীপের অলুপ্ত আলোয় অনুর মুখখানা সম্পূর্ণ করিয়া
দেখিতে পাই নাই, তবুও বেটুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতেই
মনে হইয়াছিল, বৈধ বার কঠিন কৃষ্ণতায় ওর বর্ণের ঔজ্জ্বল্য
হইয়া উঠিয়াছে নান ও রুম্ম,—হাই-চাপা স্তিমিত আঙনের
মতই। ওর হাসি-খুসী, ওর গতিচঞ্চল্য সর্বত্রই যেন
চাপা, উৎলাইলেও কখনও হু-তুল ছাপাইয়া উচ্ছ্বসিত
হইয়া ওঠে না। মন মনে অনুশোচনা হইতে লাগিল,
ওকে দাসী-পর্যায়ে ফেলা আমার সঙ্গত হয় নাই,
আমি ওর স্বাভাবিক প্রাণে অতটা বিরক্তিবোধের কোন
সঙ্গত হেতুও ছিল না।

কাঠের জানালা খুলিয়া দিতেই তারাতারা নিশীথ
আকাশখানির নিঃশব্দ সঞ্চরণ অনুভব করিলাম।
দেখিলাম, এই সমাহিত নিস্তব্ধতার জনশূন্য মহারণ্যে আমিই
একা জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছি।

এই শান্ত নীরবতার প্রতিবেশের অবসরে হঠাৎ
আমাব এই মনটা বন্ধন-ছিন্ন পাগুলা বোড়ার মত দিকুবিদিকু
জনশূন্য হইয়া দিল ছুট। তারপর রমায়ণ-বৃগের
মুখপোড়া হনুমানের মত বিশাল বিস্তৃত অতীতের সাগর
ডিঙাইয়া সেই ঘোল বছরেব বয়সটায় গিয়া হাজির হইল।

মানুষের মন শুধু অস্তিত্বই নয়, তাব নিঃশব্দতারও
তুলনা নাই। কারণ সে দেখা শুরু কবিয়াছে, আমার মা
প্রচুর চোখের জল খরচ করিতেছেন, “এ মেয়ের সঙ্গেই—”
বাবা গতান্তব নাই দেখিয়া রাঙ্গী হইলেন। এবং
আমার ক’নে ঐ নয়-দশ বছরের মেয়ে অমু,—এক
হাতে এক মুঠা লবণ এবং কৌঁচড় ভরিয়া কাঁচা কুল লইয়া
সজিনীদের ডাক দিতেছে, “আর না ভাই, আমগাছতলায়
বসে কুল খাই গে—”

কিংবা ধরা বাঁক, আমার ক’নে আমার হাত ধরিয়া

টানাটানি শুরু করিয়াছে, “জীবন-মা ভাই, দুটো কাঁচা
আম পেড়ে দাও না ভাই।”

মন্দ নয়। বোমটা টানিয়া এই অমু আমার ইসারায়
ডাকিবে,—মন্দ কি?

এই ছোট্ট অমুর মনোরমতার ভাবনায় আমার মাথায়
দেশোদ্ধারের স্বপ্ন স্থান পাইত না। ছোট্ট ষাট শাস্তি-
অশান্তির জ্বালায় মন সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিলে এই মুক্তি
কমনার প্রচণ্ড স্বপ্ন-ক্ষুধার হাত এড়ান বাহিত।

মনকে শাসাইতে লাগিলাম, এ বড় অস্তায়। দেশ-মায়ের
অশ্রুসিক্ত মুখ, শৃঙ্খলের নিদারুণ বেদনা—এ ছাড়া আর কিছু
ভাবার তোমার অধিকার নাই।

যে কাজের জন্ত আমি আহুত, সে কাজ সাফল্যমণ্ডিত
বলা যায়। ছেলেরা কাজেব জন্ত এক টুকরা জমি সংগ্রহ
করিতে পারিয়াছে এবং প্র.ম. প্রামে ঘুরিয়া অর্থসংগ্রহও
মন্দ হয় নাই। তাই ছেলদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, আমি
তাহাদেব সম্ভব কর্ণধার হইয়া বসি। আমার ভবঘুরে
জীবন, কোন স্থানে স্থায়ী হইয়া বসিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ
করা অদৃষ্ট লেখা নাই। কিন্তু হইলে ভালই হইত।
পল্লীমাতার গেহছায়ায় বসিয়া কাজ করা দেশ-দেশান্তরে
শুধু বস্তুতাবাদি কবিতা বেড়ানোর চেয়ে চের ভাল।
এতে তবু ঘবের মায়ার কিছু আশ্বাদ পাওয়া যায়।

তাই বিদায়-দিবসে অনুভব করিতেছি, আমার উৎসাহ
যেন নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, একটা অলস ক্লান্তিতে
আমাব সর্ব দেহমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে ছ।
দেখিতেছি, এই অপরাহ্নের অবসন্ন বৌদ্র ও ছায়ার লীলার
প্রতিবেশে মানুষ ও মাটির মধ্য একটা অতি অদ্ভুত মায়ার
স্নেহনীড় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বাধন কাটানো কম
কঠিন নয়। তাই বেধ করি, পল্লীমায়ের ছেল বৃহত্তব
জীবনের সন্ধান বাহির হইতে গেলেই দেখে মায়ের জলভরা
চোখের নীরব হাতছানি, আর শ্রামল তকলতার পিছুটানে
তাহার গতি হয় বারে বারে প্রতিহত।

এই ক’দিনই মাঝীমা বৈকথাটার প্রতি অস্পষ্ট আভাস
দিবার চেষ্টা করিয়া ছন, আজ তাহা হইল একটু স্পষ্ট।
জানাইলেন, অমুর সং-মেয়ে পাণ্ডী হিসাবে মন্দ নয়,
বয়স অল্প হইলেও খুব বাঁড়ন্ত গড়নের মেয়ে এবং তার ওপর

বিয়ের জল পড়িলেই ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া উঠিবে, হুতরাং যখন ঘর-গোত্রের আটকায় না তখন কোন দিক হইতেই যেমানান হইবে না। আমি হাসিয়া উঠিলাম। এই রকম উচ্চ হাসির প্রত্যুত্তর দেওয়া হাড়া আমার গতাস্তর ছিল না। অন্তর কথাটাকে অল্প রকম আকার দিতে চাহিল, “মা বলছেন, আপনার সঙ্গে অনেক ছেলেব আলাপ, আপনার মত স্বদেশী ক’রে বেড়ায়, তাদের মধ্য থেকে একটা হুপাস্তর আমার মেয়ের জন্য যোগাড় করে দিতে পারেন তো।”

ব্যাপার মন্দ রহস্যের নয়। যে-অনুর একদিন বোঁ হইয়া তর্জনী হেলাইয়া শাসন করার সম্ভাবনা ছিল, সেই অন্তরই দুদিন বামে সং-স্বাক্ষরী হইয়া বলিবে, “ও-টুকু ছুধ কেলে উঠে না বাবা,—”

হাসি চাপিয়া রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু অনুর মনোভাব স্পষ্ট বুঝিলাম না, এবং আমার মত পুরুষের বোকাও সাধ্য নয়।

যাত্রার সময় আসিয়াছে। আমি প্রণাম করিলাম। হরবিলাসবাবু আশীর্বাদ করিলেন, “বড় হও, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।”

মামীমা আশীর্বাদ করিলেন, “বেঁচে থাক বাবা, সংসারী হ’য়ে জুখে ঘরকন্না কর।” তার পর অনুরোধ করিলেন, “আবার সময় পেলে এসো বাবা। এমন ক’রে এসে তোমাব মামা-মামীদের একটু খোঁজ নিয়ে বাবা।”

এখানে কিছু পুঁতাতনের আবির্ভাব স্বাভাবিক এবং ইহার ফলে এই মুহূর্তের বাতাস একটু করুণ রসে আর্দ্র হইয়া উঠে।

অনু বুঝি কাছেই ছিল। সে ইহার মধ্যে একটা লবুতার ছন্দ আনিয়া দিয়া এই বিদায় ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া দিল। একটু হাসিয়া বলিল, “আপনার বিয়ের সময় কিন্তু আমাদের নিয়ে যাবেন, ফাঁকি দেবেন না।”

হাসিয়া কহিলাম, “যদি করি তো নিশ্চই নিয়ে যাব।”

“আবাব যদি—” শাসনের এই চপল ভঙ্গী আমার স্বচ্ছন্দতায় জড়তা ছড়াইয়া দিল।

গরুর গাড়ী করিয়া যাত্রা। গরু ছটিকে আমাব জন্ত

এতটা কষ্ট দিতে আমাব বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, কিন্তু সকলেরই সনির্বন্ধ অনুরোধ,—মনঃক্লম হইবেন। তাই তাড়াতাড়ি অন্তর হইতে বাহির হইয়া বাইতেছি, অন্তর বাধা দিয়া বলিল, “একটু দাঁড়ান, তাড়াতাড়িতে ছাতাটা ফেলে যাবেন না।”

বলিয়া ছাতাটা আমার হাতে তুলিয়া দিল; তাব পর নতজানু হইয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া আমাকে একটি প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে অনুরোধ জানাইল, “আবার আসবেন কিন্তু—”

বইয়ে পড়িয়াছি সময়-বিশেষে মানুষেব কণ্ঠস্বরও কাপড়-জামার মত ভিজ্জা হব। আমার কানে অনুর কণ্ঠস্বর ঐ রকম ভিজ্জা-ভিজ্জাই ঠেকিল। শুধু তাই নয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই অনুর মুখখানি হুস্পষ্ট দেখিলাম। দীর্ঘ আয়ত চক্ষু, ঘন পত্র-পক্ষ, এবং তাহারই তলে কৃষ্ণ আঁখি-তার। গভীর কালো দৃষ্টি সেই দীর্ঘ পক্ষের ছায়ার চরম ক্রান্তিতে বেন কোন্ মুহূর্তে হারাইয়া গিয়াছে। একটি উদ্দেশ্য-বিহীন প্রতীক্ষা ওই তরী ঋতু তনু বেষ্টন করিয়া কোন্ পবন বেদনার উগ্র তপস্যা করিতেছে।

পুরুষের কঠিন মন কখন কি করিয়া লতিকাটিব মত দুর্বল হইয়া উঠে, মেয়েদের মতই ভাবাবেগের ভারে হুইয়া পড়ে,—বলা ভাবি কঠিন। তখন সে বাহা দেখে, বাহা শোনে, সবই ভুল, আগাগোড়া মিথ্যা। তাই আমিও দেখিয়াছিলাম, ঐ নারীটির চোখের কোলে জলের স্বচ্ছ কাজল-রেখা। তার চেয়েও কিছু বেশী দেখিয়াছিলাম, কোন জানালার অন্তরালে দাঁড়াইয়া এখনও সেই জলভরা চোখ ছুটি এই অন্তর্মিতপ্রায় রবিব রক্তবস্ত্রিতে গরুর গাড়ীর মন্বব গতি নিরীক্ষণ করিতেছে।

মনকে এই বলিয়া ক্ষমা কবিলাম, এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণের মাঝালীলায় তাহার অজুত-কিছু দেখা মার্জনার যোগ্য।

ব্যাপারটা শ্রীমতী নিভাননীকে বলা আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু প্রেমে-পড়া মানুষ শুধু ভেড়াই হয় না, নারীর অধমও হয়, অর্থাৎ তাহাব পেটে কোন কথাই লুকান থাকে না। নিভাননী বলিল, “হরবিলাসবাবুকে নেমস্তন্ন চিঠি পাঠানো অভ্যস্ত অস্তায় হয়েছে।”

আমি বলিলাম, “তুমি ভুল করছ। হরবিলাসবাবু,

মানীমা, অহু,—এঁরা এতে খুব খুশী হবেন। অহুর ঐ
ব্যাপারটা ভুল বুঝে না। ওটা আমার নিছক কল্পনা। অহু
আমার মনের মধ্যে ওরকম কল্পনা জাগিয়ে দিয়েছিল বলেই
আমি তোমাকে দেখে মাঝেই এত ভালবেসে ফেলেছি।”
“অর্থাৎ তুমি বলতে চাও আমরা—এই মেয়েজাতটা
তোমাদের খেলাব পুতুল?”

“এ তো বড় মুক্তির কথ। ওসব ছেড়ে দিয়ে
এস একটু মুখোমুখি হ’য়ে ব’সে ভালবাসার স্বপ্ন
দেখ।”
উত্তর আসিল, “আমার এখন ভাল লাগছে না। তুমি
এখন বাও, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।”
তারপর শ্রীমতী ভাবিতে বসিল।

স্তিমিতায়মান

শ্রীজীবনময় রায়

তোমাব গভীর চিন্তে ধাব ধ্যানে তুমি অবহিত,
সে ত আমি নহি;
আনন্দের পাত্র মোর ছিল রিক্ত, সুধায় বঞ্চিত;
আনিয়াছ বহি।
তোমাব মঞ্জুল কণ্ঠে মধুরস-বিধ্বল সঙ্গীত—
নিব্বার উচ্ছল;
আমার সাগরতীরে তাবই মন্দাকিনী তরঙ্গিত
লীলায় চঞ্চল।

দীর্ঘ দিন জীর্ণ তবী বাহিয়া এসেছি চলি আজ
দিনান্তের তীরে,
ব্যর্থ বুদ্ধিক্ত চিন্তে, অন্তরে বহিয়া দৈন্য লাজ
ঘুরিয়াছি কিরে;
বারংবার যার পরে স’পিয়াছি চিত্ত ছরাশায়,
অসীম নির্ভরে,
হ্রস্ব হৃদ্যে মোরে ত্যজিয়া গিয়াছে নিরুপায়;—
অবহেলা ভরে।

আজি সেই ভগ্নতরী প্রতীক্ষিয়া সিন্ধু অবসান
নিঃসঙ্গ অতলে,
চলিছে মস্তুর গতি বন্ধুর তরঙ্গ-থরসান
মৃত্যু-রসাতলে।
দিগন্তে ঘনায় মেঘ বিদ্যুতিছে প্রলয় ইঙ্গিত;
মরণের কোল
আমারে দিগন্তে ডাক;—ধ্বনিতছে ধ্বংসের সঙ্গীত
সিদ্ধ উত্তরোল।

এই নিঃশ্বাসে হৃৎসময়ে কোথা হ’তে করিছ আহ্বান,
কারে ডাকো মিছে।
মোর কোথা অবসর শুনিবারে জীবনের গান!
মৃত্যু নিঃশ্বাসিছে
আমার শিরে বসি। স্তিমিত এ নয়নের আলো
অবসন্ন প্রাণ;
সম্মুখে প্রলয়-সিদ্ধ হৃৎস্তীর সিন্ধুতায় কালো
পূর্ণ মহাত্মাণ।

নয়নে নিবিছে দীপ্তি; জলস্থল আকাশ অকূল
সাগবসঙ্গমে;
পথহাবা বিহঙ্গমা কুকারিয়া ডাকিছে আকূল
নীড়-বিহঙ্গমে।
সন্ধ্যাতাবা অশ্রু-অঁধি; দিগন্তে তিমির-অজাগর
ঘেরিল জলধি;
ডাকিছে সঘন রাত্রি, ডাকে ঐ অঁধার সাগর,
শূন্য-নিরবধি।

ফিরিবার নাহি পথ; সম্মুখে অনন্ত মৃত্যু-রাশি
হানে উর্শ্বেদল;
ছিন্নপাল ভগ্নতরী ঝুঁকি উঠে গগন-বিলাসী
নিষ্ঠুর চঞ্চল।
পশ্চাত্তের স্মৃতি আজ অন্ত গেছে অতীত পাথারে,
বিদায়ের গানে;
মরণের বাতী, তারে মিছে ডাকা জীবনের পারে,
সন্ধ্যা অবসানে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার পল্লী-চিত্র

শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র-প্রতিভা সোনার কাঠি। যা ছুঁয়েছে তাই সোনা হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য মণি-ভাণ্ডার। সে-ভাণ্ডারে অগণ্য অপরূপ মণি-মুক্তা ছড়ানো আছে বললে কম বলা হয়, বলা উচিত, মণি-মুক্তা দিয়ে তা ঠাসা, বোঝাই। আমাব স্থির বিশ্বাস যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যেব কোন একটা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সব চেয়ে সুন্দর হব খালি রবীন্দ্র-নাথের সেই সম্বন্ধীয় কথাগুলি তুলে দেওয়া এবং নিজে কিছুই না বলা এবং হৃদয় শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে হবেও তাই, তবু নেহাৎ ‘আলোচনা’ কথাটাব জাতিবন্ধার জন্তেও যা রবীন্দ্রনাথের নয় এমন কথা গোটাকয়েক অন্ততঃ বলতেই হবে, এই কথা মনে রেখে ভূমিকা শেষ করা যেতে পারে।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথের শাসন ছিল ভৃত্য-তন্ত্র। ছেলেদেব খবরদারি কবাব একটা অতিশয় সহজ এবং সরল উপায় তারা বেব ক’রে ফেলেছিল—তাদের একেবাবে বাড়ির বাইরে যেতে-না-দেওয়া। সুতরাং বাড়ির বাহিরটা রবীন্দ্রনাথের শিশু-মনে বহুদিন ধবে একটা দুঃখাপ্য আনন্দের উৎস ছিল। সে-আনন্দের প্রায় সবটাই নিজেব মনেব মধ্যে গড়ে নিতে হ’ত অতি সামান্য মূলধন থেকে—চাকরদেব হাত থেকে হঠাৎ পালিয়ে পাওয়া কোন গ্রীষ্ম-দুপুরে চুবি-করা অবকাশে, ছাদের আলিসাব ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, কিংবা তেতলার জানলাব গরাদে দিয়ে বাড়ির পেছনের বাগান নামধারী যে ছোট রাজ্যটুকু দেখা যেত তারই চীনেবট, নারিকেল-সারি, ঘাটবাধানো পুকুর আব ওপরের টুকরো টুকরো মেঘ-ওড়া নীল আকাশের মধ্যে চিলের :তীক্ষ্ণ ডাক থেকে। এইটিকে যে সামান্য মূলধন বললাম, এ আমার বলবার ক্রটি ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ তখনকাব সেই বন্দী শিশুব কাছে এই ছিল এক প্রকাণ্ড অনাবিস্কৃত বিশ্বের রাজ্য। রবীন্দ্রনাথের মনেব যে গুণ তাঁকে আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ব’লে প্রতিভাত করেছে তাই ছিল ঐ ছেলেবেলাকার বাড়িব পেছনের বাগানের বট-নারিকেলবেবা পুকুরঘাটে পরী-রাজ্য

খোঁজায়। যাক, যে কথা বলছিলাম। এই হ’ল রবীন্দ্রনাথের পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। যদিও জায়গাটা ছিল জোড়াসাঁকো, তাহলেও তখনকাব কলকাতার ভেতবে ফাঁকে ফাঁকে এমন অনেক ছোট টুকরো ছিল বার সঙ্গে পল্লী বলতে যা বোঝায় তার কোন ভেদ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই বলি, ‘তখন সহর আর পল্লী অল্প-বয়সের ভাইবোনেব মত অনেকটা একরকম চেহাৰা নিয়ে প্রকাশ পেত।’ এই পরিচয়টিকে কেমন ছিল তা পাই রবীন্দ্রনাথের একাল্ল বছব বয়সের লেখা ‘জীবনস্মৃতি’তে

“জানালার নীচেই একটা ঘাট-বাধানো পুরুর ছিল। তাহার পূর্ব দ্বারের প্রাচীরেব গায়ে একটা প্রকাণ্ড চীনা-বট—দক্ষিণদ্বারে নারিকেল-শ্রেণী।”

এই বটটির সঙ্গে তাঁর বড়ই সখ্য, কিন্তু তাব ঘন পাতার আবছায়ায় ঝুরি-নামা, আশ-অন্ধকার সঁাতসঁোতে তলাব মাটিতে অনির্দেশ্যের সঙ্গে একটু যে ভয়ের আশেজ্ঞ আনত না তা বলা যায় না। এই বটকে লক্ষ্য করেই লেখা—

নিশি নিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় ল’য়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট ?
মনে কি নেই সামান্য দিন বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে বইত চেয়ে অবাক হুন্মনে ?
মনে হ’ত তোমার ছায়ে কতই কি যে আছে—
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে ঘুঘু ডাকত গাছে।
মনে হ’ত তোমার মাঝে কাদের যেন ঘব,
আমি যদি তাদের হ’তুম, কেন হ’লেব পর ?—পূবাণো বট
(কড়ি ও কোমল)

“পশুবন্ধনের বন্দী আমি গ্রাব সমস্ত দিন জানালার খড়বাড়ি খুলিয়া সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতন দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীবা একে একে স্থান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের গ্রানেব বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহবা দুই কাপে আঙুল দিয়া ঝুপঝুপ করিয়া দ্রুতবেগে কয়েকটা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহবা ডুব না দিয়া গামছার জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় চালিত; কেহবা জলের উপরিভাগের মলিনতা কাটাইবার জন্য বার-বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময়ে ব’ী কবিবা ডুব পাড়িত; কেহবা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহবা জলের মধ্যে নামিতে

নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলো শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহবা ব্যস্ত, কোনো মতে শ্রান সারিয়া গৃহে কিরিবার জন্ত উৎসুক, কাহারো বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই, ধীরে হৃদয়ে শ্রান সাধিয়া, পা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কৌচাটা দুই তিন বার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছুবা ফুল তুলিয়া, বৃহৎশয় সোদুলগতিতে দানবিন্দু শরীরের আশ্রমটিকে বাবুতে বিকীর্ণ করিতে কবিত্তে গৃহের দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুংর বাকিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুরুষের ঘাট জনশূন্য নিম্নক। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলো সারাবেলা ছুব দিয়া ভগলি তুলিয়া ধায়, এবং চক্চালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাক করিতে থাকে।” (জীবনস্মৃতি, ১৩ পৃ.)

এই হ’ল পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অতি-প্রথম পরিচয়। আমরা একেবারে পল্লী-প্রকৃতিই বলব। এর কিছু দিন পরে ডেঙ্গুজরের কল্যাণে উহার সপরিবারে গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে কিছু দিনের জন্ত চলে যান। সেইখানে উন্মুক্ত বিস্তৃত পরিসরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ। সামনেই গঙ্গার জোয়ার ভাটা, নৌকার চলাচল, মেঘবৃষ্টিতে সমস্ত ঝাপসা হয়ে যাওয়া, এদিকে পেছনের দিকে খিড়কীর পুরুষের প্রাচীরঘেরা ছায়া-চাকা সজ্জিত একটু-খানি ঘোমটা-পর্য্য সৌন্দর্য—যেন ঘরেব বধু। এইগুলি তাঁর নুতন-পাওয়া স্বাধীনতাকে সুধাপূর্ণ করে তুলত। বাড়ির বন্দীশালার ইট কাঠ দরজার গুণী ছাড়িয়ে পল্লী-প্রকৃতিব সঙ্গে ত জানাশোনার আরম্ভ হ’ল, কিন্তু পল্লী-জীবনের ত কিছুই জানা হ’ল না। আসল যে পাড়াগাঁ তার চণ্ডীমণ্ডপ, রাস্তাঘাট, হাটমাঠ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—এর ভেতরে প্রবেশ করবার জন্তেও বালক রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ঐ ত খিড়কীর বাগানের পরেই গাঁয়ের পথ, ঐ পথে বেরিয়ে পড়লেই ত সব জানা হয়ে যায়, কিন্তু একলা বেরিয়ে পড়বার সাহস তখনও জোগায় নাই। একদিন সকালে বাড়ির হু-জন বড়লোকের পেছান পেছনে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েওছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ধরা পড়ে বাড়ি ফিরে যেতে হ’ল। তাঁর কথায়—

“একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুই জন পাড়ার বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগে সামলাইতে না পারিয়া তাহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘন বনের ছায়ার সেওড়ার বেড়াদেওয়া পানাপুরুষের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড় আনন্দে এই ছবি আমি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অতঃবলার পুরুষের ধারে ধোলা গায়ে ঠানন করিতেছিল তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গেছে। এমন সময় আমার অগ্রবর্তীর হঠাৎ টের পাইলেন আমি পিছনে আছি। তখনি ভৎসনা করিয়া উঠিলেন—যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও।”

ফিরে আসতে হ’ল। এই যে পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচয়ে বাধা, এ বাধা সম্পূর্ণরূপে কাঁবজীবনে কখনই ঘুচল না। জন্ম ও পারিপার্শ্বিকতার জন্ত এই জীবনের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না, কিন্তু কুতূহলী দর্শক হিসাবে যে পরিচয়ের সম্ভাবনাটুকু ছিল তাও তাঁর জীবনে বেশ ঘেরিতে এসেছিল। এর ফল তাঁর সাহিত্যে কি দাঁড়িয়েছে সে কথার প্রসঙ্গ আসবে পরে।

পেনেটির পর তামরা আবার পল্লী-আবেষ্টনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পাই এর বেশ কিছুদিন পরে যখন তাঁর বয়স কুড়ি। ইতিমধ্যে মহাবীর সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণ, বাড়ি-ফিরে ইত্থলে পড়বার বৃথা চেষ্টা, প্রথমবার মেজদাদার সঙ্গে বিলাত-যাত্রা, ফিরে আসবার পর ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্তে আবার বিলাতযাত্রার চেষ্টার অর্ধেক পথে পরিসমাপ্তি—এত কাণ্ড হয়ে গেছে। কেবল পিতৃদেব ছাড়া আর সকলে তাঁর এই ছন্নছাড়া ভাবে একটু হতাশ, একটু দ্বিঃখিত। তাঁর নিজের, পরিপূর্ণ অবসর ভোগ করা ছাড়া আর কোন কাজ নাই। এই অবস্থায় আবার রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনগরে গঙ্গার তীরে ফিরে এলেন।

“আবার সেই গঙ্গা। সেই আলম্বে আনন্দে অনির্বচনীয় বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, সিন্ধুভাসল নদীতীরের সেই কলধ্বনি করুণ দিন রাত্রি।...আমার পক্ষে,—বাংলাদেশের এই আকান্দভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্ত, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঞ্চখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—ভূকার মল ও ক্ষুধার ধাত্তের মতই আবশ্যক ছিল।”

কুড়ি থেকে প্রায় চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কবির জীবন ভরাট আনন্দ ও নির্ভাবনার মধ্যে চ’লছিল। এরই মধ্যে তাঁর ভাবজীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি আসে—বেদিন সদর ষ্ট্রীটের বাড়িতে এক মধুর সকালে হঠাৎ তাঁর চোখে পৃথিবীর সবকিছু সাধারণ জিনিষ, আশপাশের যা-কিছু সব এক নুতন এক সহজ আনন্দের প্রতীক বলে প্রতিভাত হয়ে উঠল।

এদিকে লেখার ক্ষেত্রে বোল বছর বয়সের ‘কবিকাহিনী’ থেকে আরম্ভ করে ‘বনফুল’, ‘ভয়ঙ্কর’, ‘রক্তচণ্ড’ (নাটিকা), সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, বৌদ্ধাধারিত হাট, ছবি ও গান, প্রকৃতির পবিশোধ, ভাসুসিংহের পদাবলি, প্রকৃতির ভিতর দিয়ে কড়ি ও

কোমলে এসে পৌঁছেছি। কবিশঃপ্রার্থী তরুণ রবীন্দ্রনথের এরই মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের আসরে সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এই লেখাগুলির মধ্যে বাংলার পল্লীর ভাস্কর ত নব্বই—বহিঃপ্রকৃতিরও বিশেষ জায়গা হয় নাই। প্রথম কারণ সাক্ষাৎ-পরিচয়ের অভাব, দ্বিতীয় কারণ গ্রন্থ-সমালোচনা, গান, কাব্য, নাটক ইত্যাদিতে প্রথম বয়সের আবেগ ও উচ্ছ্বাস যথেষ্ট অবসর পাচ্ছিল। আমাদের পক্ষে এটা ভালই হয়েছিল, কারণ এব পর যখন রবীন্দ্রনাথ পল্লী-চিত্রের মুখোমুখি আসবার সুযোগ পেলেন তখন মনের ভিতবে, এবং বাহিরে প্রকাশ-ভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিণতি এসে গেছে, সুতরাং সেই চিত্রগুলি হয়েছে যেমন মধুর তেমনি সাবলীল।

১৮৮৪ সালের মে মাসে, অর্থাৎ বাইশ-তেইশ বছর বয়সে, কর্তব্যাবু, দাদা ও বৌদি সমভিব্যাহারে নিজেদের 'সরোজিনী' জাহাজে-চড়ে গঙ্গা বেয়ে লক্ষ্য পাড়ি দেবার ব্যবস্থা হয়। সেই বাজার গঙ্গার দুই তীর-তীর চোখে যেমন ঠেকেছিল তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়, এবং আমার মনে হয় এইখানেই আমরা প্রথম যখনকার-দেখা তখনকার-লেখা বাংলার নিভৃত দৃশ্যের বর্ণনা পাই। আমি আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের লেখার সবচেয়ে বড় স্তুতি হবে সেই লেখাটি অবিকল উদ্ধৃত করা, সুতরাং এখানেও তাই করি—

“বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুত্রের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা ছায়া কুটির নরনের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম ছলিতেছে। কতকগুলি সূর্য্যস্তিরণ সেই ছায়ার মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মন্থ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নোকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কলকল শব্দে, মুহু মুহু সোল খাইয়া বড় আশ্রমের ঘুম ঘুমাতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের শনজারায় মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটি পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁধে জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদায় উপর পড়িয়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া ভাষি মাতামতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙাঘাটগুলির কি শোভা! মাঘের! যে এ ঘাট ধাধিরছে তাহা একরকম ভুলিয়া বাইতে হয়; এও যেন গাছপালার

মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় কাটলের মধ্য দিয়া অশ্বগাছ উঠিয়াছে, বাগগুলির ইটের ঝাঁক দিবা ঘাস গজাইতেছে। বড় বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপর শেয়ালা পড়িয়াছে; এবং তাহার রঙ চারিদিকের জামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সম্মিলিত মিশিয়া গেছে। মাঘের কাছ কুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের বঙ লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সপর্ক ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন।

গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর সেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুণ্যতন স্মৃতির মত অতিশয় ভক্তিজাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেরদের নোকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙার তোলা, কতকগুলি তাঁবে উপড় করিয়া মেঘামত করা হইতেছে; তাহাদের পাজরা দেখা বাইতেছে। কুড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনো কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু চরিতেছে; গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্করীর মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উল্লঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেঙেন ক্ষেতের সামনে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। ঝড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়ি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে।

আবার আর একদিকে চড়ার উপরে বড়দূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিলোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গার নোকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গাব পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অম্পদ সৌন্দর্য্যছবির বর্ণনা সম্ভবে না ... (সরোজিনী প্রয়াণ—ভারতী)

এতখানি পড়ে যেতে একবারও কোথাও আটকায় না, এবং মনেই পড়ে না যে আমরা একটা দৃশ্য-বর্ণনা পড়ছি। একেই যথার্থ বলা যেতে পারে চিত্র। এর কিছু দিন পবে—কবির বয়স তখন ছাব্বিশ—জীবনে বা-কিছু কাম্য তার অপ্রমিত প্রাচুর্য্য অবাধ আনন্দ এবং পাশাপাশি প্রিয়বিরোগের গভীরতম দুঃখ, দুই মিলে যখন তাঁর মনের পরিণতির প্রায় আর কিছু বাকী রাখে নি, তখন একদিন গঙ্গার গাড়ী চড়ে পেশোয়ার অভিযানের বদলে তলব এল বোটে ক’রে জমিদারী পর্যবেক্ষণে। পেশোয়ার অভিযানটা হালেও একটা অজুত রকমের সুন্দর কিছু আমরা পেতাম নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বদলে শিলাইল, সাজাদপুর অভিযানের ফলই আমাদের আজকের আলোচনার সবচেয়ে বড় পর্ক। এখন থেকে সাত-আট বৎসরের মধ্যেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের চরম স্ফূর্তি। এই কয়েক বৎসব রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লী-প্রকৃতির

একেবারে মুখোমুখি কাটিয়েছেন এবং তার ফলে কবিতার, প্রবন্ধে, ছোটগল্পে, সবার উপরে বিভিন্ন জনকে লেখা পত্রদ্বারাতে এমন অপূর্ণ সুন্দর পল্লী-চিত্রের সৃষ্টি হয়েছে বার তুলনা আর কোন সাহিত্যে আছে বলে আমার জানা নাই।

আগেই বলেছি এই সময়ের ঠিক পূর্বেই জীবনের যা-কিছু জানবার তা প্রায় কবির জানা হয়ে গেছে। এখন নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকা এবং রঙ্গক্ষেত্রের নির্নিপুণ দর্শকের মত দূর থেকে জীবনটাকে সহানুভূতিপূর্ণ করণার চোখে দেখা, এ ছোট্টই তাঁর পক্ষে খুব সহজ হয়ে এসেছে। চাবি পাশের জগৎ তাঁর চোখের ও কানের ভিতর দিয়ে মনে আনন্দের সাড়া তুলছে, কিন্তু সে আনন্দের মধ্যে উজ্জ্বল একেবারেই নাই, আছে একটি অপার দাক্ষিণ্যের ভাব। ঠিক এই কারণেই তাঁর পক্ষে ক্রমাগত সাত-আট বৎসরের বেলীর ভাগ সময় হয় পদ্মাব উপর বোটের মধ্যে, নয় জমিদারীর কাছারি-বাড়িতে, প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো মোটেই কষ্টকর হয় নাই বরং অনাবিল আনন্দপূর্ণ ছিল; এবং আমার মনে হয় এই জীবনের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। আমার মতে এই সময়টাই কবির জীবনে পূর্ণ ফসলের সময়। সাধনার যুগ (১২৯৮, অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২, কার্তিক) সমস্তটাই এর মধ্যে পড়ে। 'সাধনা'র প্রায় সমস্তটাই চালানো ছাড়া ঠিক এই সময়ের বচনা—রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মানসী, চিত্রাঙ্গনা, গোড়ায় গলদ, ছোট-গল্প, সোনার তবী, বিদায় অভিশাপ, বিচিত্র গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড), কথা-চতুষ্টয়, চিত্রা, গল্প-দশক, ইত্যাদি, ছিন্ন-পত্র যেগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি এবং আরও অনেক পত্র, চৈতালি, বৈকুণ্ঠর খাতা, পঞ্চভূত, কণিকা, কথা, কাহিনী এবং ঠিক এর পবেই ক্ষণিকা। পল্লী-চিত্র বলতে এই লেখাগুলিতেই সবচেয়ে বেগী পাওয়া যায়, এবং স্বদেশ, সমাজ, লোক-সাহিত্য প্রভৃতিতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়, যদিও এগুলি অনেক পরের। এই সময়টিকে আমরা মোটামুটি শিলাইদহের যুগ বলতে পারি।

আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা আলোচ্য বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ কবব। প্রথম, পল্লী-প্রকৃতির বাহিরের চিত্র; দ্বিতীয়, পল্লী-জীবনের চিত্র। পদ্মাবন্ধ, এপারের

ছোট ছোট গ্রাম, বাধাঘাট, খেয়া-পারাপার, ওপারের বালিধুধু কবা চর, মাত্র এই পটভূমিকার উপর সকাল, সন্ধ্যা, হুপুঁর, রাত্রি, নীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এর ফিরে ফিরে আসা—এইগুলিকে কেন্দ্র করে যে একটা পূর্ণ সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে এ ধারণা করা শক্ত হ'য়ে উঠত যদি-না রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক তাই করে যেতেন। চিত্র-হিসাবে এগুলির বোধ হয় তুলনা নাই। সেই একই আবেষ্টনী, কিন্তু প্রত্যেকটি চিত্র সমানভাবে উপভোগ্য। সেই পদ্মাব উন্মুক্ত প্রশান্তি, অতিদূরবাসিত দুই পার, সকালের সোনালি আলো, সন্ধ্যার শান্ত ছায়া, গ্রামের বধূদের ঘাটে ঘাটে আনাগোনা—ফিরে ফিরে এরাই আসে, কিন্তু কোন চিত্রটিকেই অনাদব করার কথা কারণ মনে আসতেই পারে না। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ—রবীন্দ্রনাথের মনে এর প্রত্যেকটি বে গভীর এবং অনাবিল আনন্দ নিয়ে আসত, তা যেন আমাদেরও মনে অবশ্যজ্ঞাবী রূপে সঞ্চারিত হ'য়ে পড়ে, যেমন—

আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বহুর মত; হৃদয় বাতাস
মুখ চক্ষু বক্ষ আসি লাগিছে মধুর—
অদৃষ্ট অকল যেন হস্ত দিখবু
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্রির বন্ধের উপরি
তরল কলোদল। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রোত্র পোহাইছে; ভাঙা উচ্চ তীর;
খনছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্রশীর্ণ পথবাণি দূব গ্রাম হ'তে
শক্তকেন্দ্র পার হয়ে নামিয়াছে শ্রোতে
তুফান জিহবার মত; আমবধূগণ
অকল ভাসায় জলে আবণ্ড মগন
ফরিছে কোতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জল কলধরে মিশি পশিতেছে আলি
কর্ণ মোর; বসি এক বাধা নৌকা পরি
বৃদ্ধ জেল গাঁথে ভাল নত শির করি
রোদ্রে পিঠ দিয়া, উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপিয়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্তে; বৈধাময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার রেহ-আলাতন।

... ... আতপ্ত গবদে

ভীর উপবন হতে কত আসে বহি
আব্রমুকুলের গন্ধ; কতু রহি রহি
বিহঙ্গের প্রান্ত স্বর

আজি বহিতেছে

প্রাণে মোর শাস্তিধারা, মনে হইতেছে
হৃৎ অতি সহজ সরল— (হৃৎ—চিত্রা)

একটির পর একটি যতই চিত্র উঠে যাই, মন ক্লান্ত বা
বিমুগ্ধ হয় না, আরও নূতনতর চিত্রের অন্ত উন্মুগ্ধ হ'য়ে ওঠে।
এ-পারের সন্ধ্যা-বর্ণনায়—

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
হুগুপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিরাছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-বেরা শ্রান্ত গাভী গুটি হুইতিন
কুটীর অন্ধনে বাঁধা ছবির মতন
তরুণায়। গৃহকারী হ'ল সমাপন—
কে ওই গ্রামের বধু ধরি বেড়াখানি
সন্মুখে দেখিছে চাষি, তাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

ও-পারের সন্ধ্যা আরও চমৎকার—

সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া প'ড়েচে—একটি কোমল
বিবাহ—টুক অশ্রুজল নয়—একটি নিনিমেষ চোখের বড়ো বড়ো
গম্বের নীচে গভীর ছলছলে ভাবের মত। এমন মনে করা যেতে
পারে—যা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আগুন ছেলেপুলে, কোলাহল
এবং ঘরকরনার কাজ নিরে থাকে, যেখানে একটু কঁাকা, একটু
নিঃসৃত্য, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল ছদয়ের
অন্তনিহিত বৈরাগ্য এবং বিবাহ ফুটে ওঠে সেইখানেই তার
গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়। (ছিন্নপত্র—৪৬ পৃ.)

কোন জিনিষ যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার
চার দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়। কখনও
শিলাইদহে, কখনও কালিগ্রামে, কখনও সাজাদপুরে
রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি প্রায় পরিপূর্ণ অবসরের মধ্যে
কাটছিল, সুতরাং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ একে একে
আসত আর প্রত্যেকটিকেই তিনি পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে
ডেকে নিতেন। শীতের মধ্যাহ্নের একটি চিত্র পাই
কালিগ্রাম—এই মাঘ, ১৮৯১এর চিঠিতে—

বেশ ফুড়েনি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক
নেই, যেন পৃথিবীতে অত্যাশঙ্কক কাজ বলে কিছু নেই। এখানকার
চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট নদী আছে বটে,
কিন্তু তাতে কাগাকড়িও শ্রোত নেই, সে যেন আগুন শৈবালদাহের
মতো জড়াভূত হ'য়ে অজ বিস্তার ক'রে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবচে যে
যদি না চললেও চল তবে আর চলবার দরকার কি? জলের মাঝে
মাঝে যে জলজ ঘাস আর উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না
এলে সেগুলো সমস্ত দিনেই মাথা একটু নাড়া পায় না।...বারো
ঘটা প'ড়ে প'ড়ে কেবল রোদ পোহার, এবং অবশিষ্ট বারো ঘটা ধুব
গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিভা দেয়।

খাতুর মধ্যে বর্ষা কবির চিত্তকে যেমন নাড়া দিয়েছে
এমন আর কোনটি নয়। কখনও পদ্মা, কখনও ইছামতী

কিংবা গোরাই নদীর ওপর বাসকালে বর্ষার যে
অন্তরঙ্গ সৃষ্টি কবি দেখেছিলেন তার প্রচুর বর্ণনা রয়েছে,
খব্রোতা পদ্মার উপর চাবিদিকে যত দূর দৃষ্টি যায়
অঁধে জলের নৃত্য, সুপরাপ বৃষ্টির শব্দ, পাছপালা নদী
সব স্থাপনা একাকার, কোথাও বা গাছের মাথা-জাগা
হু-একটা গ্রাম; ছোট নদীগুলির ভরাধোবনে তীরের
কেতকী কদম গাছের তলা-ছোঁয়া জলের ছলছলানি, গৃহস্থ
বধূদের জলে ভিজে ভিজে কাজ করা, এই সমস্ত চিত্র অজস্র
পাই। সোনার তবীর—

পরপারে দেখি আঁকা
তরুণায়া মসী-মাথা
আঁখানি মেখে ঢাকা
প্রভাত বেলা

* ভরা ভাদরের

কদম গাছের সার
চিকণ পলবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো

ইত্যাদি মাত্র হু-একটি দৃষ্টান্ত।

বর্ষার পবে আসে মেঘমুক্ত স্মৃতির শরৎ, সোনালি
আলো গাঢ় সবুজ আর নির্মল নীলে ভবা। তখন প্রাচুর্যে
প্রকৃতির শোভা ধরে না—

মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক' আর
পারে না বহিতে নদী জলধা-...

হয়ত

ধানের ক্ষেত ধর ধর ক'রে কাঁপচে—আকাশে সাদা সাদা মেঘের
স্তূপ—তারি উপর আম এবং নারিকেল গাছের মাথা উঠেচে—নারিকেল
গাছের পাতা বাতাসে খুর খুর করচে—চরের উপর চুটো একটা ক'রে
কাপ ফুটে ওঠবার উপক্রম ক'বেচে। ঘরে ঘরে মিলনের আগ্রহ,
এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই
খিরখিরে বাতাস, এবং পাছপালা তৃণগুপ্ত নদীর তরঙ্গ সকলের
ভিতরকার একটি অবিভ্রাম সঘন কম্পন—

সমস্ত মিলিয়ে কবির চিত্তকে অপূর্ণ ভাবে অভিভূত এবং
কাণায় কাণায় পূর্ণ ক'রে ফেলত।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রথম ভাগ অর্থাৎ নিছক
পল্লীদৃশ্যের চিত্র সম্বন্ধে আলোচনার এইখানেই শেষ।
কারণ শিলাইদহ-যুগের পরে আর কোন লেখায় এ-রকম
চিত্র পাই না। এর পরের সমস্ত লেখায় যেখানে প্রকৃতিকে
আঁকতে হয়েছে সেখানে এই যুগের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার
সাহায্য ক্রমশই গোঁপ হয়ে এসেছে। উদাহরণ-স্বরূপ

বলা যায়—অনেক পরের লেখা ‘কতুরঙ্গ’ (১৯২৭) যখন

বৈশাখের কথা পাই, তখন বৈশাখ আব

নির-বৃক্ষ বন-শাখা শুদ্ধ শুদ্ধ পুষ্পে ঢাকা

আব্রবন তাত্র কলমর—

কিংবা

ঝড়িমাছ ছায়াহীন নিঃবসিছে উদাসীন
শুভ্রে চাহি আপনার মনে...

(কৃষ্ণানি—মনসী)

দূরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধু হু
বাঁকা পথ শুদ্ধ তপ্ত কায়—

একপে আসচে না,—তখন শুনি—

বৈশাখ হে, মোরী তাগস, কোন্ অতলের বাগ্নি এমন
কোখায় ধুঁজে গেলে?

তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মধুর মেঘখানি এল
গভীর ছায়া কেলে?

কিন্তু এগুলিকে পল্লীচিত্রের পর্যায়ে কেলা যায় না, এবং এর সঙ্গে পূর্বের যুগেব নিছক চিত্রগুলির যোগ নেহাৎ কম। ‘কণিকা’র কয়েকটি কবিতাতে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শিলাইদার ছবি তখনও তাঁর মনে খুব জাগরুক, কিন্তু সেই ছবিকে বাহন করে, এবং তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে ‘আব কিছু যোগ করে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। যেমন, ‘আমরা দু-জন একটি গাঁয়ে থাকি’ কবিতাটিতে—

দুইটি পাড়ায় বড়ই কাছাকাছি
মাঝে শুধু একটা মাঠের ঝাঁক,
তাদের বনের অনেক মধু-সাহি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।

তাদের ঘাটে পুজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধা ঘাটে,
তাদের পাড়ার কুহুম ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি ধলনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঙ্গনা,
আমার নাম ত’ গ্রামে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঙ্গনা।

কিংবা ‘দুই তীরে’ কবিতাটিতে—

তোনার আমার মাঝখানেতে
একই বহে নদী।
দুই তীরে একই গান সে
শোনার নিরবধি।

আমি শুনি, শুনে
বিজ্ঞান বাণু ভূ রে,
তুমি শোন কাঁধের কলস
ঘাটের পরে ঘুমে।

তুমি তাহার-গানে
বোঝ একটা মানে
আমার কুলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

এখন আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করতে পারি অর্থাৎ পল্লীজীবনের কথা। পাড়াগাঁয়ের ধনী, গরিব, মধ্যবিত্ত, ভাল মন্দ, চাষী-বাসীদের ঘরের কথা, তাদের আপন আপন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কাহিনী; বেলীর ভাগ সেই সময়কার লেখা ছোটগল্পগুলিতেই পাওয়া যায় এবং কিছু কিছু ‘পঞ্চভূত,’ ‘লোক-সাহিত্য,’ ‘গ্রাম্য-সাহিত্য,’ ‘স্বদেশী সমাজ,’ ‘স্বদেশ’ প্রভৃতি আলোচনায় পাওয়া যায়।

শিলাইদা-যুগটা ছোটগল্পরচনার পক্ষে ভারী উপযোগী হয়ে উঠেছিল। চারিদিকের প্রভাব টুকরো টুকরো ভাব প্রকাশের একান্ত অমুকুল ছিল। মনকে বেশী না খাটিয়ে, আস্তে আস্তে বহিঃপ্রকৃতির তালে তালে তাকে বলগা ছেড়ে দিবে, ছন্দোমিলের জন্তে যতটা চেষ্টা করা দরকার তারও মধ্যে না গিয়ে, ছোট ছোট গল্প রচনাই ছিল সেই সময়ের প্রধান আনন্দ। গল্পের চরিত্র-গুলিও সেই জন্তে হয়েছে আশপাশের গাঁয়ের মানুষ, যাদের রোজ দেখতেন—হয় জমিদারীর দরবারে প্রজা হিসেবে, নয়ত বোটের ওপর থেকে উৎসুক দর্শক হিসেবে। তাদের মনের কথা, তাদের ঘরের কথা, প্রায় সম্পূর্ণই সৃষ্টি, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেরই আরম্ভ, এবং প্রায় সবগুলিরই পটভূমিকা, কোন-না-কোন একটি দৃশ্য—যা কোন-না-কোন সময়ে তাঁর চোকে পড়েছে। অবশ্য প্রকৃতি এই আরম্ভ মাত্রই যোগাত, বাকিটা আস্ত নিজের মন থেকে, কিন্তু গল্পগুলি পড়বার সময় সে-কথা প্রায় মনেই হয় না—এমনই ভরতবে তাদের গতি। ঠিক এই কথাটির উল্লেখ পাই—সাজাদপুর—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪এর একটি চিঠিতে (ছিন্নপত্র, ২৯০-৯১ পৃ.)—

বাইরের জগতেব একটা সজীব প্রভাব যবে অবাধে প্রবেশ করে—আলোতে, আকাশে, বাতাসে, শব্দে, গন্ধে, সবুজ ফিলোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিরে কত গল্পের ছাঁচ তৈরী হয়ে ওঠে।...

আমার এই সাজানপুঁর দুপুর বেলা! গল্পের দুপুর বেলা। দুপুরের উত্তাপ, নিস্তরতা, নির্জনতা, পাখীদের, বিশেষতঃ কাকের, ডাক এবং হৃদয়ের হৃদয় অবসর—সবগুণ আমাকে উদাস ক'রে দেয়। এই সময়ে এই টেবিলে ব'সে আপনার মনে ভোর হ'রে 'পোষ্ট-মাস্টার' গল্পটি লিখছিলাম। আমিও লিখছিলাম এবং আমার চারিদিকে আলো বাতাস ও তরু-শাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ ক'রে দিচ্ছিল।

পোষ্ট-মাস্টার ব'লে একটি লোক ছিল বটে, তাঁকে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্প কবতে দেখা যেত বটে, কিন্তু গল্পের পোষ্ট-মাস্টারের সঙ্গে তার যোগমাত্র ঐটুকু। তার মধ্যে 'রতন' মেয়েটি এবং মোটের উপর গল্পের কল্পণ ভাবটি—কবির সম্পূর্ণ নিষ্কল। এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে আখ্যান বলতে প্রায় কিছুই নেই, আছে শুধু চিত্র এবং সে চিত্রের মধ্যে পল্লী-দৃশ্য না মানুষগুলি—কোনটি যে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করবে তা সব সময় ঠিক ক'রে ওঠা যায় না। যেমন—'ঘাটের কথা' গল্পটিতে নদীর ধাব, পুনো ঘাট, না 'কুহুম'—কোনটি যে চিত্রের আসল বস্তুভাগ তা ঠিক করা যায় না এবং তাব ক্ষেত্রে আনন্দের কিছু ক্রটিও হয় না।

'ছুটি' গল্পের কল্পণ বেদনার চিত্রটি অপূর্ণ, কিন্তু এটিরও গোড়ায় রয়েছে একদিনকার চোখে-দেখা ছেলেদের খেলাধুলার চিত্র। গল্পটির আরম্ভে দেখি বালক-সদার ফটিক তার সান্ধোপাড় নিয়ে নদীর ধারে প'ড়ে-থাক। মন্ত একটা মাস্তুল গড়ানোর খেলায় মগ্ন। খেলায় বাধা উপস্থিত কবল ছোটভাই মাখন—সে গিয়ে মাস্তুলটাব উপর চড়ে বসল। খেলায় বাধা পাওয়াতে ফটিক চটে গেল খুব, এবং মাখন কিছুতে নাম ত রাজী না হওয়াব ফলে তাকে হুক গড়িয়ে দিয়ে খেলার আমোদ বোল আনা থেকে আঁঠারো আনার পৌছ'ন হ'ল। ঠিক এই রকমের একটি দৃশ্য এর আগে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছে ('ছিন্নপত্র', ৭৯ পৃ.) এবং এই সমান্তর ব্যস্ত ভূমিকা থেকে হুক ক'রে বোটে বসে আপন অবসর মিলিয়ে যে গল্পটির সৃষ্টি হয়েছে তা অপূর্ণ। 'সুভা' গল্পটিতেও দেখি তাই—চলীপুরের গৃহস্থবরের মেয়েটির মত ছোট নদীটিই সত্য-হরত প্রকৃতির মেয়ে বোবা সুভার মত কেউ নজরে প'ড়ে থাকবে, হয় ত বা নয়। সাজানপুঁবে একদিন ঘাটে অনেক মেয়েছেলের জটলা হয়েছে, কে যেন কোথায় বাবে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ের প্রতি কবির মনোযোগ বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট

হ'ল। মেয়েটির বয়স বছর বারো-তেরো, কিন্তু স্বাধোয় গুণে একটু বড়ই দেখাচ্ছে। দেখবার বিষয় হচ্ছে তার ছেলেদের মত ক'রে চুল-হাঁটা, এবং বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ, সহজ ও সরল, আধা-ছেলে আধা-মেয়ের মত ভাব। পরে এই মেয়েটিই 'সমাধি' গল্পের 'মুগ্ধা'রূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং গল্পের খাতিবে আর যে ক'টি চবিজ সৃষ্টি করতে হয়েছে তার মধ্যে বি-এ পাস গ্রাম্য যুবক অপূর্ণ রায়ও অন্ত সকলের মতই এক জন। 'মেঘ ও রোদ্দ' গল্পটিতে শশীভূষণ ও গিরিবালা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে বটে, কিন্তু সেই যে সেদিন "আকাশে মেঘ ও রোদ্দ পরস্পরকে শিকাব করিয়া ফিরিতেছিল"—এই চিত্রটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমা দর মনে গাঁথা থেকে যায়।

এই রকমের উদাহরণ দিতে গেলে একটার পর একটা খালি বেড়েই চলে। এদের মধ্যে দিয়ে আমার বলবার কথা হচ্ছে যে, এই গল্পগুলিতেও আমরা যে চিত্র পাই তা সেই মানুষগুলির চেয়ে সেইখানের এবং সেই সময়ের বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত ছায়া, আলোক, বর্ণ ধ্বনিকেই যেন বেশী ক'রে ফুটিয়ে তুলছে। যে-সব দৃশ্য, লোক, ঘটনা, কল্পনা করা হয়েছে তাদের চারিদিকে সেই একই নদীস্রোত, রোদ্দবৃষ্টি, নদীভীরের শরবন, সেই বর্ষার আকাশ, ছায়া-বেষ্টিত গ্রাম, জলধারা প্রকুল শস্যের ক্ষেত, সেই মেঘমুক্ত বর্ষার স্নিগ্ধ রোদ্দ রচিত ছোট নদী গাছের ছায়া এবং গ্রামের অগাধ শান্তি সৌন্দর্য্যে ও সজীবতায় বিশেষ ফুটে উঠেছে।

নিছক গ্রাম্য-জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যা-কিছু অভিজ্ঞতা তা দুব থেকেই, কারণ তিনি থাকতেন গ্রাম থেকে দূরে—নদীর ওপার, কিংবা কাছারিবাড়ির দেউড়ির ভিতর 'জমিদার বাহাদুর' রূপে। তবু সেখান থেকেই এই জীবনের বা চিত্র এঁকেছেন তা এক তিনি বলেই সম্ভব হয়েছে। পাড়াগাঁয়ের ব্যস্ততাহীন মন্থর জীবন-বাজারের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন—

এখানকার জীবন দ্রুত এজিনের মত হাঁস-কাঁস করিয়া কিঞ্চিৎ ভক্তভারাক্রান্ত গরুর গাড়ীর ঢাকার মত আর্দ্রনাথ কবিত্তে করিতে চলিতেছে না। গাছের তল' নিখা একটুখানি শীতল নিশ্বাস যেমন-ছায়ার ছায়ায় কুল কুল করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া বাহিতেছে।

'লোক-সাহিত্য' ও 'গ্রাম্য-সাহিত্য' সংগৃহীত ছড়াগুলির

থেকেও আমরা সেট সময়ের এবং তার আগেকার কালের গ্রাম্যজীবনের চমৎকার চিত্র পাই। বাংলা দেশের গৃহস্থদের মেরেকে শস্তরবাড়ি পাঠানো ব'লে যে একটি কঠিন অন্তর্বেদনা আছে, তার চমৎকার চিত্র রয়েছে এই ছড়াটিতে—
—‘বাপ কাঁদেন, মা কাঁদেন’... ইত্যাদি। বাপ মা ত কাঁদবেনই কিন্তু—

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন ভাতারখাকী ব'লে।

এই ছড়াগুলি কতকালের কে জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কেমন ক’রে এইগুলি এবং ‘হর-গোরী’ ‘কৃষ্ণ-রাধা’ বিষয়ক আরও অনেক ছড়ার ভিতর দিয়ে বাংলাব চিরন্তন আনন্দ-বেদনাগুলি রূপ পেয়ে এসেছে। এ ছাড়া ‘স্বদেশ’, ‘স্বদেশী সমাজ’ ‘সমাজ’ ‘শিক্ষা’ ইত্যাদি পরের লেখাগুলিতেও আমরা সংস্কারকের চোখে তৎকালীন পল্লীজীবনের চিত্র কিছু কিছু পাই।

আগেই বলা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের লেখা গাঁয়ের জীবনের কথা নিয়ে বিচার ক’রতে গেলে বরাবর মনে রাখতে হবে তিনি কখনই গাঁয়ের এক জন ছিলেন না, মাত্র কিছুদিনের জন্য গাঁয়ের বাইরের এক জন ছিলেন। সুতরাং এ চিত্রগুলিকে চিত্র-ছাড়া ফটোগ্রাফির বিচার দিয়ে দেখতে গেলে এগুলির উপর অত্যয় করা হবে। এ-কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-কথা বেশ ভাল ক’রে জানতেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের বহু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার যখন ‘ফুলজানি’ উপন্যাসখানি লিখলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন—

বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিত্যন্ত বাঙালীদের স্বপ্ন-দুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলেন নি।... আমাদের এই চিরশীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল বাস্তবিকভাবে প্রচণ্ডকর্ণশীল পৃথিবীর এক নিতৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো ক’রে বলেন নি।... আপনাদের লেখার মধ্যে সেই বাংলার সন্ধান পাওয়া যায়। আপনাদের লেখার মধ্যে বাংলার ছেলেমেয়ের প্রতিদিন গৃহের মধ্যে যে বকম কথা ক’র ও যে রকম কাজ করে তাই দেখতে পাওয়া যায়। অল্প কারও অথবা স্ত্রী আমার লেখা সেইট হবার ঘো নেই।” (ছিন্নপত্র—১১-১০ পৃ.)

এর মধ্যে বিনয় অনেকখানি থাকলেও বানিকটা অন্তত সত্য ছিল।

পল্লীজীবন বলতে শুধু চাষাভুষো কিংবা মধ্যবিত্ত

গ্রাম্য গৃহস্থদের কথাই সব নয়, পল্লীব মধ্যে প্রবলপ্রতাপ জমিদারও থাকেন এবং অতি সহজ কারণে রবীন্দ্রনাথ যেখানে এই রকম কোন চিত্র এঁকেছেন সে চিত্র সাধারণ গ্রাম্য জীবনের চিত্রের চেয়ে বেশী বাস্তব হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ‘ঠাকুরা’ গল্পের নয়ানজোড়েব বাবুরা তাঁদের গায়ে লাগবে ব’লে তাঁরা ঢাকাই মসলিনের কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরতেন, বিড়ালেব বিয়েতে লাখ টাকা খরচ ক’রতেন, রাত্রে দিনেব আলো করবার জন্তে আতসবাজির ওপর আকাশ থেকে সাঁচা রূপোর জরি ছড়ি’র ফেলতেন। ‘যোগাযোগে’র মুকুন্দলালের বর্ণনা একবার পড়লে আমার কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতীয়মান হবে—

পুৰাতন কালের প্রথমত মুকুন্দলালের জীবন দুই মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর এক মহলে ইয়ার্কি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্প, আর এক মহলে একাদশ অকর্প। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা-অর্চনা, অতিথি সবা, পান-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালা-বিদ্যাক্ত ব্রাহ্মণ-ভোজন, পাড়া-পড়শী, গুরু-পুরোহিত। ইয়ার-মহল গৃহ-সীমার বাইরেই, সেখানে নবাবা আমল, মজলিসি সমাবোহে সবগরম ইত্যাদি।

আমরা আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ ক’রে এনেছি। এ-কথা মনে হ’তে পারে যে, আলোচনাব ক্ষেত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মাত্র একদেশ ভাগে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তা বটে, কিন্তু সেটা অবশ্যস্বাভাবী, কারণ উপরিউক্ত সময়ের মধ্যেই আমাদের আলোচনাব বিষয়বস্তু সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। এব পরই বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কর্ম বা ব্রতজীবন আরম্ভ হ’ল (শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয় ১৯০১এব ২২শে ডিসেম্বর তারিখে) এবং বাংলার এক পল্লী-আবেষ্টনী থেকে আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন বক্রমের পল্লী-আবেষ্টনী মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত হ’লেও জীবন ও ভাবধারা নূতন পথে চলতে আরম্ভ ক’রল। সমস্ত অবসর দিন শুধু বাংলার পল্লীচিত্র দেখা ও আঁকা, এর আর সময় রইল না। বহু পরে রচিত ‘শুভ উৎসবের’ পালাগুলিতে শুধু ছয় খণ্ডের যে রূপগুলি ধরা দিয়েছে, সেগুলিকেও ‘পল্লীচিত্রের’ পর্যায়ে ফেললে ভুল করা হবে।*

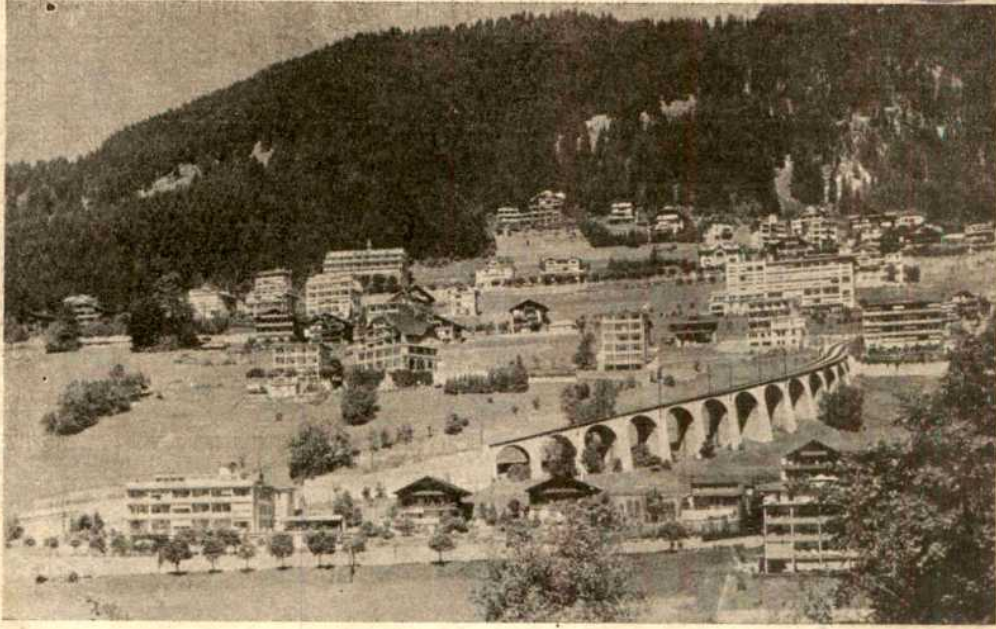
*‘রবীন্দ্র-পদক’ পুরস্কার প্রাপ্ত।

লেজা—সুইজারল্যান্ড

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এসসি, এম-বি

অনুপম নৈসর্গিক শোভা সুইজারল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্মই পৃথিবীতে এই দেশটার এত খ্যাতি, এ-কথা আমরা শৈশবকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আদর্শ ধরা হয় এই সুইজারল্যান্ডকে। কান্সারকে আমরা ভূস্বর্গ বলিয়া থাকি। আবার ভারতবর্ষের “সুইজারল্যান্ড” এই আখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে। কান্সারের বিবরণ পুঁথি-পুস্তকে বতটা অবগত হইয়াছি তাহাতে এই দুইটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনে হয়, বরষা-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনায় সুইজারল্যান্ডকে দেখিয়াছি নিছক সৌন্দর্যের ভাণ্ডার রূপে। সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল এবার সুইজারল্যান্ডে আসায়। দেখিলাম কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কোন পার্থক্য নাই, বরং বাস্তব হয়ত কল্পনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুইজারল্যান্ডের সৌন্দর্য্য সত্যই মন মুগ্ধ করে এবং ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রাণে অভূতপূর্ব তৃপ্তির সঞ্চার করে; এই পাহাড়ময় দেশটার যে এত সৌন্দর্য্য তা চোখে না-দেখা পর্যন্ত সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। আমাদের চোখে এ সৌন্দর্য্য আরও বিচিত্র লাগে, যখনই দেখি মানুষ তার প্রয়োজন ও অভিকৃতি অনুসারে কত পরিবর্তন করিয়াছে এবং করিতেছে। প্রকৃতি আর মানুষ এই দুইয়ের সমবেত চেষ্টার সমস্ত দেশটা একটা ছবির মত গড়িয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দেশটা জুড়িয়া পাহাড়, ছোট ছোট নদী আর হ্রদ। অবশ্য আমাদের দেশের মত বড় বড় নদী এদেশে নাই। পাহাড়গুলি প্রধানতঃ বড় বড় পাইন গাছে ঢাকা, আর যে পাহাড়গুলি গাছশূন্য সেগুলি বরফে ঢাকা। মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর সমতল ভূমি। গ্রাম, শহর সবই প্রায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে অবস্থিত—স্থানে স্থানে সমভূমির উপর। পাহাড়ের বুকে বড় বড় পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম ও শহরগুলি এত চমৎকার দেখায়—কর্ণনা করা চলে না, চোখে দেখিয়া

উপভোগ করিতে হয়। লোজান, জেনেভা প্রভৃতি বড় শহরগুলি প্রায়ই হ্রদের তীরে প্রতিষ্ঠিত। হ্রদের তীর হইলেও একেবারে সমভূমি নহে। অধিকাংশ স্থলেই পাহাড় ক্রমশঃ ঢালু হইয়া হ্রদে গিয়া নামিয়াছে। সাধারণতঃ এইরূপ জমির উপর বড় বড় শহরগুলি অবস্থিত। পার্শ্বভ্রমণে হইলেও ভূমি খুব উর্বর। এ যাবৎ যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলি বাদ দিলে অল্পবিস্তর ভূমি চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সমভূমির ত কথাই নাই, এমন কি ঢালু পাহাড়ের গায়ে পাথর দিয়া বাঁধিয়া স্তরে স্তরে কৃষিক্ষেত্র করা হইয়াছে। শস্তজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ দ্রাক্ষা, ফলমূল, শাকসব্জী, আলু, অগ্নাত তরকারী, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বসন্তকালে সমস্ত দেশটা ভরিয়া যায় নানা রকমের নানা রঙের ফুলে—সমস্ত দেশটা যেন মস্ত একটা ফুলের বাগান। প্রকৃতির এমনি বিচিত্র লীলা—লীতকালে সব সাদা হইয়া যায়। পাহাড়, নদী, হ্রদ, গাছ, বাড়ি, মাঠ সব সাদা। তখনকাব চেহারা দেখিয়া কল্পনায়ও আসে না যে বরফ পড়া বন্ধ হইলে এই দেশটাই আবার সবুজ হইয়া বাইবে! ভ্রমণকাবীর দল দেশ-দেশান্তর হইতে ছুটিয়া আসে সুইজারল্যান্ডে এবং বোধ হয় সেই ক্ষুদ্র দেশটা ভরিয়া হৃদয়ের প্রশস্ত রাস্তা হ্রদের পাশ দিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে শহর ও গ্রামের ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। ভ্রমণকারীর দল কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া, কেহ বা রেল, কেহ বা মোটরে সমস্ত দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ বা উঠিতেছে সমস্ত বিপদ বাধা তুচ্ছ করিয়া পর্বতের চূড়ায়। যেন সকলের ভিতর একটা প্রতিবন্ধিতা লাগিয়া গিয়াছে—কে সবচেয়ে বেশী আনন্দ লুটিয়া লইবে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের ভাণ্ডার হইতে। বিদেশীদের ত কথাই নাই, এই দেশবাসীদেরও অস্বস্ত ভ্রমণ-লিপ্সা। ছুটির দিনে



লেজ ১র পশ্চিম পার্শ্বের দৃশ্য

যখন গতাহুগতিক কাজের চাপ থাকে না, দলে দলে গ্রী-পুঙ্কব সব বাহির হইয়া পড়ে সমস্ত দিনটা কোথাও পাহাড়ে, জঙ্গলে বা হ্রদ কাটাইয়া দিব বলিয়া। এদের এ লিপ্সায় বয়সের কোন বাধা নাই। সকলেরই সমান উৎসাহ। প্রায় সকলের পৃষ্ঠেই একটা করিয়া থলি— তাহাতে আছে খাবার ও পানীয়। অনেকে অতি-প্রত্যাষে সূর্যোদয়ের আগেই বাহির হইয়া পড়ে—আবার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া আসে। প্রত্যেকের হাতে থাকে কুলর গোছা; যেখানে গিয়াছে সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এ-রীতির ব্যতিক্রম দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের আকাঙ্ক্ষা, যত দিন বাচিবে তত দিন জীবনটাকে ততদূরসম্ভব আনন্দময় করিয়া রাখিবে।

সুইজারল্যান্ডের আবহাওয়া অতি উপাদেয়। সেই জন্ত স্বাস্থ্যদেবীর দল চিরকাল এখানে আসে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার আশায়। দেশ-দেশান্তর হইতে লোকের আসার বিরাম নাই। সেই জন্তই সমস্ত দেশটায় হোটেল,

স্বাস্থ্যানিবাসের অভাব নাই। হোটেল এবং স্বাস্থ্যানিবাস পরিচালনা এ-দেশের একটা প্রধান ব্যবসায়ের পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রভূত অর্থাগমও হইয়া থাকে। এদেশের আবহাওয়া এবং সূর্য্যকিরণের অসাধারণ সম্ভাবনীয় শক্তির গুণে বন্দু-রোগীদের সহজ এবং অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়। চিকিৎসকরা বাহাদের নিরাশ করিয়া দিয়াছেন—মৃত্যু বাহাদের সময়সাপেক্ষ, তাহারা আসে তাহাদের জ্বরল কঙ্কালসার দেহ লইয়া এই সুইজারল্যান্ডের কোলে। হয়ত আবার প্রাণে জীবনীশক্তির সঞ্চার হইবে— হয়ত মৃত্যুকে এড়ান যাইবে। আবার হয়ত সুস্থ সবল দেহ ফিরিয়া পাইবে—আবার হয়ত কর্ম্মকোলাহলময় সংসারে ফিরিয়া যাইবে। সুখে দুঃখে জড়ান এই পৃথিবীর মায়া কাটান বড় কঠিন—এ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে কেহ বড় একটা চায় না—সুস্থ কর্ম্ম দেহ লইয়া লোকে বাচিতে চায়। দারিদ্র্যের নিশ্চয় পেয়ণও লোকে সহ্য করিতে পারে যদি তার সুস্থ কর্ম্মফল দেহ থাকে। সুইজারল্যান্ডও ইহাদের প্রতি সদয়। এদেশের আবহাওয়ার গুণে, এদেশের

অনাবিল নিকলক সূর্যারশ্মি সেবনে মৃতপ্রায় রোগীদের জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে কিরিয়া আসে, আবার তাহারা সুস্থ সবল মানুষ হইয়া উঠে। এই ভাবে এই সুন্দর দেশটার বৃকের অমৃতধারায় আজ কত শত যক্ষ্মারোগী বাঁচিয়া উঠিতেছে!



পর্বতগাত্রে ক্ষুদ্র গ্রাম

স্বানাটোরিয়ামগুলিতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পর্যন্ত শুধু যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসাই হইত। অবশ্য সুইজারল্যান্ডের বাহিরে অন্যান্য দেশেও স্বানাটোরিয়াম আছে। কিন্তু আরহাওয়া ও সূর্যারশ্মি দ্বারা অস্ত্রোপচারে টিউবারকুলোসিস রোগের (Surgical tuberculosis) চিকিৎসা এই সুইজারল্যান্ডের অন্তর্গত লেজাঁ নামক স্থান ছাড়া অত্র কোথাও হয় না। গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার অগাষ্টা রোলিয়া নামে এদেশের একজন চিকিৎসক নূতন পদ্ধতিতে এই রোগের চিকিৎসা লেজাঁতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্বে এ চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। ডাক্তার রোলিয়া এবং তাহার নূতন প্রণালীগত চিকিৎসার খ্যাতি আজ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—শুধু পৌছে নাই আমাদের ভারতবর্ষে। এখানকার সাধারণ লোকের কথ ছাড়িয়া দিলে চিকিৎসকদের ভিতর খুব অল্প সংখ্যকই এ

সংবাদ অবগত আছেন বলিলে অত্যন্ত হইবে না। এই চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আমাদের দেশের জনসাধারণ, বিশেষতঃ চিকিৎসকগণের গোচরীভূত করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বর্তমান প্রবন্ধে লেজাঁর একটু বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে তাহার অধ্যবসায়-গুণে লেজাঁ আজ জগদ্বিখ্যাত সেই সূর্য-উপাসক ডাক্তার রোলিয়া প্রধানতঃ কি সূত্র হইতে সূর্য-চিকিৎসক হইয়া পড়িলেন সে-সম্বন্ধে সামান্য দুই-একটি কথা বলিতে চাই।

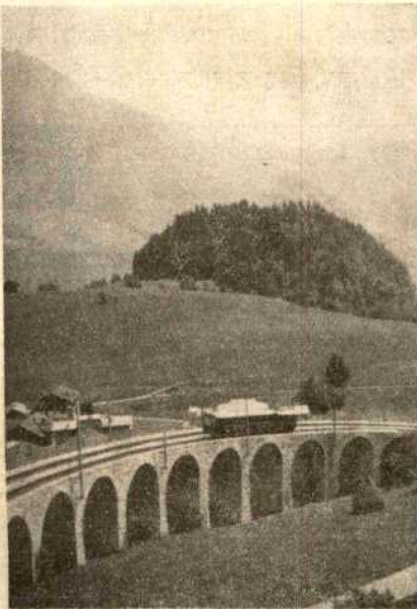
অগাষ্টা রোলিয়ার নিবাস সুইজারল্যান্ডের অন্তর্গত লোজানের (Lausanne) নিকটবর্তী নোশাতেল নামক স্থানে। তাহার পিতা এক জন অধ্যাপক ছিলেন। অগাষ্টা স্কুলে অধ্যয়নকালে তাহার সহপাঠীদের ও নিজের গায়ের রঙের পার্থক্য লক্ষ্য করেন।



লেজাঁর অপর দৃশ্য

তাঁহার চামড়ার রং ফাকাশে আর কৃষ্ণকদের ছেলেদের রোদে পোড়া। শারীরিক শক্তিতে কৃষ্ণকদের ছেলেরা তাঁহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সব ছেলেদের নিশ্চয়ই ভাল আহার-বিহারের ব্যবস্থা ছিল না। তবে তাহাদের শক্তি তাঁহার চেয়ে বেশী কেন? তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন রোদ লাগিয়া উহাদের শরীরের

চামড়ার রংও বদলাইয়াছে এবং দৈহিক শক্তিও বাড়িয়াছে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের শরীরেও রোদ লাগাইতে শুরু করেন। ইহাই তাঁহার সূর্যোপসনার ভিত্তি। আব একটা (সাধারণের দৃষ্টিতে সামান্য) ঘটনায় সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা



ইংলকট্টক ট্রেন বাইতেছে

দৃঢ়তর হয়। তাঁহার কুকুরের পিঠে একটা গুন্ডা (tumour) হয়। তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতেই অস্ত্রবিদ্যার প্রতি আস্থা ছিল। কাজেই কুকুরের পিঠে ছুরি চালাইলেন এবং অস্ত্রোপচারের পর যত্নসহকারে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার রোগীটি কিছুতেই ডাক্তারের বা ডাক্তারের ব্যাণ্ডেজের মর্যাদা রাখিল না। সে বিনা দ্বিধায় বিনা সন্দেহে দাঁত এবং নখের সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়িয়া নিশ্চিত হইল। ডাক্তারও ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনরায় রোগীর পিঠে ব্যাণ্ডেজ চাপিল। রোগীও কম বেহায়া নয়। এমন সুন্দর ব্যাণ্ডেজ অল্পক্ষণের ভিতরেই টুকরা টুকরা হইয়া ধূলিবিগুণ্ডিত হইল। প্রত্যহই এই ব্যাপার চলিতে লাগিল। তার পর এক দিন রোলিয়া হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, রোগী নির্দিকারচিত্তে তাহার পিঠে রোদ লাগাইতেছে—ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ অক্ষত। এই ভাবে রোদ

লাগাইয়া কয়েক দিনের ভিতরেই কুকুরের ক্ষত সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেল।

বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক কোচার (Kocher) ছিলেন ডাক্তার রোলিয়ার গুরু। এই কোচারই সর্বপ্রথম অস্ত্রোপচার দ্বারা আংশিকভাবে থাইরয়েড্‌ গ্রাণ্ডের অপসারণ করেন। ইহার হাতবশ অদ্ভুত এবং অসীম ছিল। কিন্তু গুরু শিষ্যত্বকালেই রোলিয়া উপলব্ধি করিলেন যে কোচারের ছুরি ব্যাধি-মুক্ত করে বটে, কিন্তু পঙ্গুত্ব নিবারণ করিতে পারে না, এমন কি অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই উপলব্ধি তাঁহার মনে প্রবল



ডেয়ারী—লেজাঁ

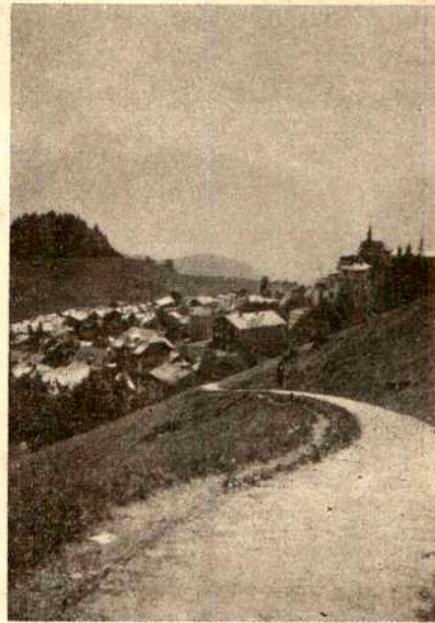
আঘাত করে। পঙ্গুত্ব আর মৃত্যু রোধ করিতে পারে না এই অস্ত্রোপচার—তবে? অগাধের এক বন্ধু দি'ড়ির উপর পড়িয়া গিয়া আঘাত পাওয়ার ফলে কটদেশে টিউবার-কুলেসিস্ হয়। রোগী মনে করিলেন, বিশ্রাম লইলে আরোগ্যলাভ করিবেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়ার কোচারের নিকট গমন করেন—সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বের্ন নগরে। কোচার ছুরি চালাইয়া অতি সন্তপণে বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত ও বিকলিত অংশসমূহ সম্পূর্ণরূপে



ডাক্তার অগাথা রোলিয়া

নিশ্চল করিয়া অপসারিত করেন। ফলে রোগীর পা দৈর্ঘ্যে একটু ছোট হইয়া গেল। রোগী মনে করিলেন, ইহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না বরং পরম আনন্দের বিষয় এই যে, চিরদিনের জন্ত এই দুঃস্থ ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত হওয়া গেল। রোগী আবার স্বকাজে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। হাঁটুতে রোগের আক্রমণের লক্ষণ পুনরায় দৃষ্টিগোচর। কোচার আবার ছুরি চালাইলেন। কিন্তু রোগ তবুও ছাড়িল না। ক্রমে ক্রমে পায়ের এক অংশ ও একটি আঙুলেও ছুরি চলিল। তবুও রোগের শেষ নাই। অবশেষে হতভাগা রোগীর স্বদ্ধ আক্রান্ত হয়। কোচার সেখানেও অস্ত্র চালাইলেন। কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। রোগী ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না; রোগী আত্মহত্যা দ্বারা জীবনের অবদান করিল। রোলিয়ার মনে পলক আঘাত লাগিল। এই ভাবে চারি বৎসর

কাটিল; রোলিয়ার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। তাই ত কোচারের অস্ত্রোপচারের পরও শতকরা ৫০ জন রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়! ইহার প্রতীকার কি? ক্রমশঃ এই মৃত্যু-বিভীষিকা হইতে রোলিয়ার মনে এক তথ্য জাগিয়া উঠিল। যক্ষ্মা-বীজাণু দেহের সর্বত্র ছড়ান থাকে—যদিও আক্রমণ স্থানবিশেষে নিবদ্ধ থাকিতে পারে। সুতরাং অস্ত্রোপচার দ্বারা আক্রান্ত অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া যাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে রোগ শরীর হইতে দূর



লেজার আশ্রমিক দৃশ্য

হয় না। সুতরাং এমন চিকিৎসা চাই যাহাতে রোগ শরীর হইতে বিদূরিত হয়। রোলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে আর একটি ঘটনা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল একেবারে লেজারে। যাহাকে জীবনসঙ্গিনী করিবেন স্থির করিয়াছেন দুঃস্থ যক্ষ্মারোগে তিনি মরণাপন্ন। তাঁহাকে লেজারে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে রোলিয়া তখন বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করিতেছিলেন;—তাঁহার পসার-প্রতিপত্তিও কম নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ—এসকলের মায়া কাটিয়া চলিয়া আসেন। প্রায়শ্চিন্দ সঙ্গে লেন্সেটে এবং এই দুই গুণে



‘লেজাঁর্শিদ’ হোটেল

চিকিৎসা-ব্যবসা শুরু করেন। ইহাই ভবিষ্যৎ। ক্ষুদ্র গ্রাম লেজাঁ চিকিৎসা-জগতে অনন্ত খ্যাতি লাভ করিবে ইহাই নিশ্চয় বিশ্বনিয়ন্তার বিধান ছিল, নতুবা ঘটনা-পরম্পরায় রোলিয়ার এই ক্ষুদ্র গ্রামে সাধারণ গ্রামা চিকিৎসকরূপে চিকিৎসা আরম্ভ করার কোন হেতুই ছিল না। তিনি এই সামান্ত গ্রামে আড়ম্বরশূন্য চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সামান্ত গ্রাম, তাঁর নিজের বয়সাদিও সামান্ত এবং উপযুক্ত ঔষধপত্র এবং অত্যন্ত উপকরণেরও বর্ধেষ্ঠ অভাব। তবুও চিকিৎসা চলিল—অস্ত্রোপচার, দাত্রী-বিজ্ঞাবিষয়ক (Obstetrician), প্রসূতিবিদ্যাবিষয়ক (Gynaecologist) সকল প্রকার চিকিৎসাই তাঁহাকে করিতে হইত। কিন্তু শহরের সংস্কার তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই; তাই তিনি দেবীয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, এত অপরিচ্ছন্নতার ভিতরেও রোগীরা বেশ সহজেই আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। অস্ত্রোপচারে ক্ষত বেগ শুকাইতে লাগিল, প্রসূতিরও সহজেই সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অথচ শহরের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখিয়াছেন সর্বপ্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও সর্বত্র পচনক্রিয়া (sepsis) প্রতিরোধ করা যায় না। কেন এমন হয়,—রোলিয়া দিনরাত ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এক মনীষীর চোখের সামনে আসিয়া উঠিল

ছেলেবেলার খেলার মাথীদের ছবি— তাহারা সব ছিল রোদে-পোড়া, কোনদিন অস্থির করে নাই। ভাসিয়া উঠিল সেই কুকুরের স্বর্ষাচিকিৎসার দৃশ্য, আর সেই আশ্চর্য্যাত্মী হস্ত-ভাগ্য বন্ধুর ছবি কোচারের মত বশস্বী অস্ত্রচিকিৎসকও তাঁহাকে নীরোগ করিতে পারিলেন না— তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না! তবে অস্ত্রোপচারের উপর কিরূপে ভরসা করা যায়? আবার অতদিকে চোখের সমনে লেজাঁর রোগীদের

দৃশ্য। কি এ অদ্ভুত শক্তি বাহার প্রভাবে এত দারুণ অপরিচ্ছন্নতার ভিতরও এত সহজে রোগীরা নিরাময় হইয়া উঠে? ভাবিতে লাগিলেন আর ক্রমশঃ যেন সব পরিষ্কার হইতে লাগিল। এদিকে তাঁর প্রেয়সীও ক্রমশঃ লেজাঁর আবহাওয়া ও স্বর্ষ্যরশ্মির গুণে সুস্থ সবল হইয়া উঠিলেন। এই মহিলাকে এখন দেখিয়া কেহ বলিতে পারিবে না ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রোলিয়ার মনে কোন দ্বিধা রহিল না, বুঝিলেন স্বর্ষ্যরশ্মির অদ্ভুত এবং অনন্ত ক্ষমতা, তাই তিনি এই শক্তিকে মানুষের হিতার্থে নিয়োজিত করিতে ব্রতী হইলেন। আজ ত্রিশ বৎসরের উপর হইল রোলিয়া তাঁহার এই ব্রতে ব্রতী আছেন। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর কত মৃতপ্রায় রোগীকে এই সজীবনী শক্তিদ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছেন, কত রোগীকে পশু হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব-সমাজ এই মহাপুরুষের কাছে চিরঋণী থাকিবে। রোলিয়ার প্রশস্ত বক্ষ, সুদীর্ঘ শক্তিময় দেহ দেখিয়া কেহ ধারণাও করিতে পারিবে না ইহার বয়স আটবাড়ি বৎসর। চলনভঙ্গী দেখিলে মনে হয় শক্তিশালী যুবক। শরীরের চামড়া রোদে পুড়িয়া অনেকটা আমাদের চামড়ার রং ধারণ করিয়াছে। রোদের সময় তিনি ছাতা বা টুপী ব্যবহার করেন না। সদাপোষক ক্ষুধা, মিষ্ট চাড়া কখনও কটু কণা বা



‘লে শালে’ ক্লিনিক

সামান্য মাত্র বিরক্তিবাজক কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। আজ চার মাসের উপর হইল প্রতিনিয়ত তাঁহার সঙ্গে ক্লিনিক ক্লিনিকে ঘুরিয়া কত রোগী দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি, কিন্তু মনে হয়না কোন দিন তাঁহার মুখে হাসি ছাড়া বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখিয়াছি। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মেজাজের রোগী—প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন সব হাসিমুখে! এ যে কত বড় সংঘম তাহা কল্পনা করা যায় না। ‘একপ সংঘম’ দেখিয়াছি’ বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে দেখিলে রোগীদের যে কিরূপ আনন্দ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার মত। চিকিৎসক এমনই হওয়া দরকার। রোগীরা জানে রোলিয়া তাহাদের আরোগ্য করিবেন, তাঁহার উপর রোগীদের অগাধ বিশ্বাস। এ বিবৃতি কণামাত্রও অতিরিক্ত নহে। একপ অভিজ্ঞতা, ডাক্তার ও রোগীর এমন মধুর সম্পর্ক—এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছি বলিয়া গৌরব বোধ করি। এ বয়সেও তিনি এত পরিশ্রম করেন দেখিলে অবাক হইতে হয়। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজ করিয়া বাইতেছেন—ক্রান্তি নাই, অবসাদ নাই, কাজের ভিতর কোথাও কোন ক্রটি নাই, বিশৃঙ্খলা নাই। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রায় চল্লিশটি ক্লিনিক। সবগুলি

ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া দেখিতে হয়। রোগী দেখা ছাড়া তিনি নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন। লোজান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের লেকচার দিতে হয়। এতদ্বিন্ন আরও অনেক কাজ ইহাকে করিতে হয়। আর একটা বড় কাজ—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে পত্রব্যবহার। লেজাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের জন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ডাক্তাররা আসেন এবং সাধারণ লোকও এখানকার

ক্লিনিকগুলি দেখিবার জন্ত আসিয়া থাকেন। এই আশঙ্ক্যদের সব দেখান-বুঝান এও একটা বড় কাজ। নান্য দেশের ভাষা রোলিয়াকে শিখিতে হইয়াছে। এসব ছাড়া নিজের পুস্তক ইত্যাদি লেখা আছে। যতই এই লোকটিকে দেখিতেছি ততই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। পৃথিবীজোড়া তাঁহার নাম, অথচ কোন আশ্বাসন নাই, আড়ম্বর নাই, নাম জাহির করার আগ্রহ নাই, নীরবে কাজ করিয়া বাইতেছেন। আলস্য, অবহেলা, বিরক্তি তাঁহার ক্রিসীমানায় আসিতে পারে না। নিজের সাধনায় ডুবিয়া আছেন—অথচ বহির্জগতের সঙ্গেও যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। শুধু অবাক হইয়া দেখি কত মহান এই সরল সদাপ্রকৃত মানুষটি! মাথা আপনিই ভক্তিত নত হইয়া আসে—ইহারাই জগদ্বরেণ্য, ইহারাই সত্যিকার মানুষ।

আলপস্ পর্বতমালার ভাডায়া অংশে অবস্থিত একটি গ্রাম লেজাঁ। গ্রামটি অতি প্রাচীন। এই গ্রামটির উল্লেখ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এত প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও লেজাঁকে ছোটখাট গ্রামরূপেই পাই; তবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্ত ইহার খ্যাতি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। লেজাঁ এবং ইহার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য

বহুকাল ধরিয়া ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করিতেছে। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধা ও বাসোপযুক্ত গৃহের অভাবের দরুন ভ্রমণকারীর সংখ্যা খুব কম ছিল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও চিকিৎসকগণ তাহাদের কোন কোন রোগিকে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত এখানে পাঠাইতেন। যে-সব রোগী লেজাঁতে আসিত তাহাদের স্বাস্থ্যের অতি দ্রুত ও আশ্চর্যজনক উন্নতি দেখা যাইত। বোধ হয় এই কারণেই দু-একটি করিয়া যক্ষ্মারোগীও লেজাঁতে আসিতে



লেজাঁর সাধারণ দৃশ্য

থাকে। লেজাঁয় অবস্থানকালে এই রোগীদের স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হওয়ায় ক্রমশঃ এই গ্রামটির দিকে চিকিৎসক ও অপরাপর লোকের দৃষ্টি পড়ে। ইহার আবহাওয়ায় অদ্ভুত জীবনীশক্তি আছে—এই ধারণায় এখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়, এবং পরীক্ষা দ্বারা ইহার আবহাওয়ায় সন্নিবেশিত আশ্চর্য্য রকম তথ্য জানা যায়। যক্ষ্মারোগীরা এই আবহাওয়ায় থাকিয়া রোগ-বীজাণুর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করিতে পারিবে এই ধারণায় রোগীদের বাসের জন্ত শ্রানাটোরিয়াম নির্মাণের স্থচনা হইল। এতদ্ভেদে “লা সোসিয়েটে ক্লিমাটেরিক দ্য লেজাঁ” (La Societe Climaterique de Leysin) নামক প্রতিষ্ঠানটি সংগঠিত হয়। এই সোসাইটির চেষ্ঠায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে “গ্র্যাণ্ড হোটেল শ্রানাটোরিয়াম” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লেজাঁতে এত অধিক-সংখ্যক ক্ষয়রোগী আসিতে থাকে যে আর একটি শ্রানাটোরিয়ামের প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষ অনুভব করিতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্ট ব্লাঁ (Mont Blanc) নামে আর একটি সুবহু শ্রানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়। ইহার পর হইতে লেজাঁর সৌভাগ্যবিশিষ্ট অতি দ্রুত উদ্ভিত হইতে থাকে। লোকসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের অসুবিধা দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এখানে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রচলন হয়। ফলে যাতায়াতের

অসুবিধা দূর হইয়াছে। লেজাঁ হইতে প্রায় চার হাজার ফুট নীচে এগল্ (Aigle) পর্যন্ত এই গাড়ী চলে। এগল্ সুইস ফেডেরেল রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। এগল্ হইতে ট্রেনে লেজাঁ পর্যন্ত আসিতে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় লাগে। পূর্বাঙ্কে রেল-কোম্পানীকে জানাইল রোগীদের জন্ত বিশেষ গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এজন্ত কিছু অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন—সুইজারল্যান্ডের সমস্ত রেলগাড়ী বৈজ্যতিক শক্তিতে চলে।

ট্রেনের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অল্পপ্রকার উন্নতিও পরি-লক্ষিত হয়। বহু গৃহ নির্মিত হইতে লাগিল, দোকানপাট বসিল, শ্রানাটোরিয়ামের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। ক্রমশঃ দু-একটি করিয়া হোটেল গড়িয়া উঠিতে থাকে। পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের চেষ্ঠাতেই গোড়াতে গ্রামটির উন্নতি হইতে থাকে। প্রথম দিকে এই সোসাইটিই অধিকাংশ গৃহ নির্মাণ এবং পূর্ব হইতে যে-সব গৃহ বর্তমান ছিল তাহার কতক কতক প্রয়োজনানুযায়ী ক্রয় করে। ক্রমশঃ আরও শ্রানাটোরিয়াম নির্মিত হয়।

টুর দ'আই (Tour d' Ai) নামক পাহাড়ের ক্রমশঃ ঢালু দক্ষিণ ভাগে লেজাঁ গ্রামটি অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। স্থানটি দুই ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশের নাম ফেডে (Feydey) এবং নিম্নভাগ লেজাঁ গ্রাম

বলিয়া অভিহিত। অবস্থানহেতু স্থানটির আবহাওয়া অতীব উপভোগ্য। পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া উত্তরের অতিশয় ঠাণ্ডা হাওয়া লেজাঁর উপর বহিতে পারে না। যে পাহাড়ের গায়ে লেজাঁ অবস্থিত সেই পাহাড়ই উন্নত প্রাচীরের স্তায় উত্তরের হাওয়ার সামনে দণ্ডায়মান। এই প্রাচীরে লাগিয়া উত্তরের ঠাণ্ডা কনকনে ঝড়ো হাওয়া প্রতিহত হয়। লেজাঁতে প্রায় সর্বদাই অতি মুহূ হাওয়া বহিতেছে। কদাচিৎ ঝড়ো হাওয়া বা প্রবল হাওয়ার উদ্বেক হয়। এই মুহূ হাওয়ার জন্তই সূর্য্যরশ্মি-চিকিৎসার পক্ষে স্থানটি এত বাঞ্ছনীয়। যেখানে জোর হাওয়া চলে সেখানে রোগীরা এমন ভাবে অনাবৃত দেহে সূর্য্যরশ্মি লাগাইতে পারে না, বিশেষতঃ শীতকালে রোদ লাগান অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানে সাধারণতঃ নবেম্বর মাসে তুষারপাত আরম্ভ হয়। ডিসেম্বরের শেষভাগে প্রবল তুষারপাত হয়, কিন্তু প্রবলতা দিন-কয়েকের বেশী স্থায়ী হয় না। তুষারপাতের পরই আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া উজ্জ্বল সূর্যালোকে ভরিয়া যায় এবং রোগীরা সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৪টা পর্য্যন্ত অনাবিল সূর্যালোক উপভোগ করিতে পারে। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে লেজাঁর আবহাওয়ার একটা নমুনা পাওয়া যাইবে :—

গ্রীষ্মকাল—দৈনিক উত্তাপ (গড়ে)

১২°৭ ডিগ্রী (সেটিগ্রাড)

শীতকাল ... ০°৫০ "

গড়ে জলীয় কণা ৬৫°৮%

বাৎসরিক প্রেসিপিটেশন্ ১২১৯ মিলিমিটার

গ্রীষ্মে—দিবাভাগের পরিমাণ (গড়ে)

" (জুন) ১৯৪ ঘণ্টা

" (জুলাই) ২১৯ "

শীতকালে " (ডিসেম্বর) ৯৬ "

" (জানুয়ারি) ১১০ "

" (ফেব্রুয়ারি) ১৩৩ "

লেজাঁর দক্ষিণে ও পশ্চিমে সুবিভীর্ণ রোন্ উপত্যকা এবং তাহার পর ডেন্ট ডু মিডি (Dent du midi), ব'ল্লী প্রভৃতি

পর্বতমালা রক্তাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই উপত্যকার ভিতর দিয়া রোন্ নদী প্রবাহিত হইতেছে। লেজাঁ হইতে প্রায় চার হাজার ফুট নীচে এই উপত্যকা। এখান হইতে এই উপত্যকার শোভা পরম মনোরম দেখায়। মুসোরী হইতে ডুন ভেলীর দৃশ্য বাহারা দেখিয়াছেন তাহারা এই দৃশ্য সহজে কল্পনা করিতে পারিবেন। রাত্রি যখন উপত্যকার বিভিন্ন গ্রাম এবং শহরগুলিতে বৈহাতিক আলো জলিয়া উঠে, তখন মনে হয় অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্র এই উপত্যকার বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দৃশ্য কত সুন্দর, কল্পনায় উপলব্ধি করা অসম্ভব। স্ত্রানাটোরিয়াম এবং ক্লিনিকগুলি এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে সম্মুখেই তুষারাবৃত পর্বত ও রোন্ উপত্যকা চোখে পড়ে। লেজাঁর আশপাশে বহু বিস্তৃত মাঠ—তাহার কতকগুলি গোচারণভূমি। বসন্তকালে এই সব মাঠ ফুলে ভরিয়া যায়। এক্রপ ফুলের মাঠ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শীতকালে বরফে সব সাদা হইয়া যায় এবং শীতের সঙ্গে সঙ্গে বরফ লুপ্ত হইয়া যায়। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এখানে আসিয়া দু-এক স্থান ছাড়া বরফ দেখা যায় না। অবশ্য কতক কতক পাহাড়ে সারা এপ্রিল মাসে বরফ থাকে। আবার কতক কতক পাহাড় চিরতুষারাবৃত। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এমন খোলা যে সমস্ত দিন লেজাঁ উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত থাকে। মাত্র ৫০ বছর পূর্বেও লেজাঁ সাধারণ গ্রাম মাত্র ছিল। তখন লোকসংখ্যা ছিল মাত্র চারি শত। আর এই ৫০ বছরের ভিতরে ইহা শহরে পরিণত হইয়াছে—বদিও গ্রামই বলা হয় এবং লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। উন্নতির পরিমাণ ইহা হইতে ধারণা করা যায়। আজ সমস্ত পৃথিবী লেজাঁর খোঁজ রাখে। পাঁচ-ছয়-সাত তালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি—কোনটা স্ত্রানাটোরিয়াম, কোনটা ক্লিনিক, ছোটবড় নানা প্রকার হোটেল, রকমারী দোকান—সমস্ত মিলিয়া ৫০ বছর পূর্বের ক্ষুদ্র লেজাঁকে আজ শহরে পরিণত করিয়াছে। বৈহাতিক আলো, জলের কল, মোটর গাড়ী, সিনেমা, রেডিও কোন কিছুই অভাব নাই। সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা লেজাঁর আশপাশে এবং দূরে—বহু দূরে গিয়াছে। এমন কি, ইটালী, ফ্রান্স, প্রভৃতি বিভিন্ন

দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে সুন্দর রাস্তা। পায়ে হাঁটরা অথবা মেটরে বেড়ানোব খুব সুবিধা এবং দর্শনীয় স্থানেরও অভাব নাই। একটি স্থল প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকটা জুনিয়র কেমিস্ট্রির সমান পড়া হয়। বিশেষতঃ এই যে, ছাত্রছাত্রীদের বেতন ত লাগেই না উপরন্তু ব্যবসায়ী খরচাও কর্তৃপক্ষ যোগাইয়া থাকেন। বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা আম'দেব দেশেও আজকাল ক্রমশঃ হইতেছে; কিন্তু পুস্তক, পেনসিল, কাগজ সমস্তই স্থল হইতে দেওয়া হয় বিনা মূল্যে—এ ব্যবস্থা খুব কমই আছে।

মিউনিসিপ্যালিটিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে সব ডেনর পাইথ'না (flush system)। কিন্তু জল-সরবরাহের কর্তৃক "সোসাইটি ক্লিম'টেরিক দা লেজার" হাতে। মিউনিসিপ্যালিটি লীম্বই সে কর্তৃত্ব ক্রম করিয়া লইবন এক্সপ ব্যবস্থা হইতেছে। লেজার স্থানে স্থানে হুম্ব ছোট ছোট উদ্যান এবং রাস্তার মাঝে মাঝে বসিবার আসনের ব্যবস্থা আছে। লেজার উন্নতির ব্যবস্থা এই সোসাইটি করিয়া থাকে। অনেকটা অ'মা'দর ইমপ্রভ-মেন্ট ট্রাষ্টের মত। বৈজ্ঞানিক আলো সরবরাহ করে একটি কোম্পানী। লেজার হইতে কিছু দূরে হাইড্র ইলেকট্রিক কোম্পানীর পাওয়ার হাউস। এখানে প্রত্যেক বাড়ির আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বেশ ভাল। প্রত্যেক বাড়ির সামান্য একটি কবিতা মুখ-চাকা ডাষ্টবিন আছে। সমস্ত আবর্জনা উহাতে নিক্ষেপ করা হয়। প্রত্যহ সকালে মোটর লবি করিয়া এই ডাষ্টবিনগুলি দূরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে জমি তবাত করাব জন্ত এই আবর্জনা ব্যবহৃত হয়। ঐ স্থানে পৌছিবার পূর্বে 'ডাষ্টবিন'ব মুখ খোলা হয় না। সমস্ত আবর্জনা নিক্ষেপ করিয়া সেগুলি আবার নির্দিষ্ট বাড়ির সম্মুখে রাখিয়া যায়। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে তারের ঝুড়ি ঝুলানো আছে।

কাগজ ইত্যাদি রাস্তাঘনা ফেলিয়া ঐ ঝুড়িতে ফেলিবার অনুরোধ করিয়া বিজ্ঞাপন লটকান রহিয়াছে। রাস্তার উপরে কাহাকেও কোন আবর্জনা ফেলিতে দেখি নাই। এমন কি লোকে খুখু, কাশও ফেলে না। এখানে দুইটি সিনেমা আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সানাতোরিয়ামে মাঝে মাঝে কনসার্ট বা থিয়েটার হয়। স্থানীয় ইউনিভার্সিটি স্তানাতোরিয়ামে

মাঝে মাঝে নানা বিবরে বক্তৃতা দি হয়। সময় সময় অল্প স্থান হইতে স'কাস, ম্যাজিক প্রভৃতির দল আসে। অধিক বাস্তি পর্য্যন্ত কে'নপ্রক'র আ'মাদ-প্র'ম'দ এখান নিষিদ্ধ। বে'গী'দর পক্ষে সেসব অনিষ্টকর কুবস'র'ল্‌স্ (Kursaal) ন'ইট ক্ল'ব প্রভৃতি লেজার'তে ন'ই। শীতকালে যখন সমস্ত জ'রগ'টি বরফ চাকিয়া যায় তখন নানা প্রকার জীড়া-কৌতুক চল। তখন ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে বহু লোক লেজার'তে আসে। শীতকালটা এখানকার শ্রেষ্ঠ সময়—'স্বাস্থ্যের দিক দিয়া। লেজার'তে রুবিলাত দ্রব্যের মতো ম'ত্র আলু হয়। ব্যবসায়ী ভরিতবকারী এবং খ'দাদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত স্থান হইতে আমদানি হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে একটি বিশেষ বাজার বসে। বহুদূর হইতে নানা জিনিষ আমদানি হয়—ত'হ'ব অগ্নিচাংশই খাদ্যাদ্রব্য এক ন'না প্রকারের ফুল। অবশ্য স্থানীয় দে'কানগুলিতে সমস্তই পাওয়া যায়। জিনিষপত্রের দাম অ'ম'দেব দেশের তুলনায় খুব বেশী।

এখানে প'চ-ছয়টি বেশ ভাল হোটেল আছে। ইংরেজীতে বাহারী কথাবার্তা বলেন তাঁহাদের পক্ষে লেজার'শিদ্দ ("Les Orchidies") হোটেল থাকা সুবিধাজনক। এখানে ফরাসী ভাষা চলন। জার্মান ভাষাও কিছু চলে। কিন্তু ইংবেজীব চলন খুব কম। বর্ণ-বৈষম্যজনিত বিদ্বেষ এখানে আদৌ নাই, অন্ততঃ এ-পর্য্যন্ত অ'মি কিছুমাত্র উপলব্ধি করি নাই। সুইস পরিবারেও মিশিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু আন্তরিক সঙ্গীয়তা ছাড়া অন্য ভাব টেব পাই নাই। এখানকার লোকগুলি মোটের উপর বেশ প্রফুল্ল ও অমায়িক এবং অ-শ্বেত লোকদেব সঙ্গও বেশ সবলভ'বেই মেশে। ইহার একটা প্রধান কারণ অ'ম'র মন হয় এই যে, পৃথিবীর নানা স্থানের লোকের সঙ্গে ইহাদেব আদ'ন-প্রদান চল'হিতে হয়। কাজেই অনুদার হইয়া বা স'ল চামড়'র গৌরব লইয়া থাকিলে পেট ভরিবে না; কাজেই মতিগতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তার পর সবচেয়ে বড় কথা চামড়ার রং লাগানো এখানকার চিকিৎসাব একটা প্রধান অঙ্গ। এমতাবস্থায় এখানকার লোকদের মনে সাদা-কালোর প্রভেদ থাকা সম্ভব নহে এবং থাকিলে অস্বস্তি হইয়া দাঁড়ায়। বিস্ময়কর সুরবরাহের জন্ত একটি ডেয়ারী স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সব ব্যবস্থা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত।

মাখন এবং ক্রিম এই ডায়েরীতে প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন গ্রাম বর্তমানে লেজাতে প্রায় পর্য্যটনটি স্থানান্তরিত হইতে ছুখ আনিয়া, শোখন করিবার পর সরবরাহ এক প্রায় চল্লিশটি ক্রিনিক আছে। ডক্টর রোলিয়া এই ব্যবসায় ক্রিনিকের কর্ণধার।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নূতন কথা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ শালিত

বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাষির দহ্য-সদার ছিলেন। ইতিহাস এইরূপ বলে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুঁথি চুরির গল্প শুনিবাছি। বলরামদাসেব 'প্রেম বিলাস' বা নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর' দেখি নাই। ধর্ম্মের মহিমায় তন্দ্রাও সাধু হয়—বিলাস কবি। আচার্য্যঠাকুরেব কথা হেমলতা দেবীর শিষ্য, কবি বহ্ননন্দন ব্যাপারটা এইরূপ বলিবাছেন :—

শ্রীপুস্তকসোত্তম দরসনে প্রভু-জ্ঞান কৈল।
বন পথে পথে প্রভু আনন্দে চলিল।
চৌরগণে পুস্তক হরিয়া নিলেক পথে।
রাজ্যপাস গেলা প্রভু পুস্তক নির্মির্থে।
সেইখানে এক বিপ্র ভ্রমর গিত পড়ে।
ব্যাখ্যা করে শুনি প্রভু হাসে বালি আড়ে।
রাজা নিবেদিল তবে বিনয় করিরা।
আপনে করহ ব্যাখ্যা ককণা করিঞা।
প্রভু ব্যাখ্যা করিল জোক গোষ্ঠামির মত।
শুনিয়া হইল রাজা জেন উনমত।
প্রণাম করিঞা পাএ পড়ে ততিক্ষণ।
প্রভু কৃপা কব মোরে লইন স্মরণ।
মর ভূপতি নাম শ্রীবিষ হাষিব।
কৃপা কৈলা তারে প্রভু সদয় গধির।

পুঁথিগুলি বীরহাষিরেব লোকজন চুরি করে নাই,—
চুবি কবিয়াছিল চোরে। ঘটনাস্থল অবশ্য বিষ্ণুপুর রাজ্যেরই
অন্তর্গত ছিল। প্রতিকারকল্পে আচার্য্যঠাকুর বীরহাষিরেব
নিকট উপস্থিত হইলে, সেখানে তখন ভ্রমর গীতা পাঠ
হইতেছিল—ভাগবতব্যাখ্যা নয়।

বিষ্ণুপুরেব মদনমোহনও নাকি চোরাই মাল। বীব-
হাষিরেবই কীর্ত্তি। এই মদনমোহন শুধু 'মদনমোহন'ই নন,

তিনি আবাব বাকা মদনমোহন। রকমাবি 'মদনমোহন-
বন্দনা' শুনিয়াছি। বতন কবিবাজেব 'মদনমোহন বন্দনা'র
কথা শুনি নাই। আমার নিকট একখানি পুঁথি আছে।
ইহাতে ঐতিহাসিক মালমসলা বহিয়াছে দেখিতেছি।
মদনমোহন বাকা কেন হইলেন তৎসম্বন্ধে বতন কবিরাজ
এইরূপ বলিতেছেন :—

একান্ত করিয়া মন : বন্দ প্রভু মদনমোহন :
বিষ্ণুপুরে জাহার ক্ষিপ্রাতি।
একবার মহিমা সিদ্ধ : বন্দ পাই একবিলু :
দেলে ২ জাহার ক্ষিপ্রাতি।
জেন সমুদ্রের তিরে : চান্দকুড়া মন্ত্রবুলে :
নির্ণয় করিতে সিদ্ধ চায়।
পবন জিনিয়া গতি : মন্ত্র বুলে দিবাবাতি :
নারে মন্ত্র কবিত্তে নির্ণয়।
প্রভুর মহিমা তেন : মন্ত্র বুলে মোব মন :
নির্ণয় করিতে নাহি পারে।
বলি তোরে ওরে ভাই : টের নাহিক পাই :
ভাসি ভাসি বুলি তার ধারে।
শুনহে জতেক বিপ্র : ইথে না করিহ কল্প :
কহি কিছু তিলয়াধ সিমা।
মন দিরা শুন সর্কে : জে কথা শুনেছি পূর্বে :
মদনমোহন প্রভুর মহিমা।
অভিধাম গোষ্ঠামি বলি : হে গোষ্ঠামি মহাবলি :
তার শুন মহিমা প্রচুর।
অভাতের রবি জেন : অন্ধের বরণ তেন :
দণ্ডবতে কাটএ ঠাকুর।
প্রভুর মহিমাহনি : বিষ্ণুপুরে আইলেন তিনি :
তিন দণ্ডবত একে একে।
ভক্ততে বাড়তে হরি : আপনাকে খাট করি :
কেবল কিস্তি অঙ্গ বাঁকে।
তখন গোষ্ঠামি কন : ছাড়ি ভূমি বিদ্যাবন :
ভুলে আই পায় মর সেবা।

এখানে বসিয়া ওসি : ইহা নাহি জানি আমি :
কোন কাজে বিন্দাবন জাবা :
এতক রচন বলি : নিল প্রভুর পদ-খুলি :
নিজাঙ্গরে করিল গমন :
দরশন করি দেখ : সেই পদ মনে বাধ :
বাকা আছেন মদনমোহন :

এই অভিরাম গোস্বামী কৃষ্ণনগরের অভিরাম গোস্বামী
নন ত ? যখনমদন, শ্রীনিবাস আচার্যের নীলাচল হইতে
বৃন্দাবন যাইবার পথে, কৃষ্ণনগরে গোস্বামীদর্শন বর্ণনা
করিয়াছেন :—

আসি কৃষ্ণনগরে : অভিরাম গোস্বামী দ্বারে :
বসিলেন অতি দীনজন :
বৈরাগ্য পরিকা লাগি : কৈল আগে দুঃখ ভাগি :
পরিক্রিয়া হুপ্রসন্ন মন :
কহে জাহা মাগ তুমি : তাহা তোরে দিব আমি :
রাজ্য ধন জন নিত্য জত :
সর্বজন বিমোহিনী : রূপ দিয়ে কাম জিনি :
মাগ কিবা তোর অভিমত :
আচার্য ঠাকুর কহে : আমি কিছু না মাগিএ :
মোরে বর দেহ কৃপা করি :
রাগাধুগা পথে ভক্তি : গোপাঙ্গনাজন সক্তি :
তাহা দেহ এই সাধ করি :

রতন কবিরাজ মদনমোহনের আর এক মহিমার
কথা বলিতেছেন :—

আর এক মহিমা হন : কিস্তিচন্দ্র আইল পুন :
হাজার পাঁচ ছয় ঘোড়া-সঙ্গে কর্যা :
সইয়া সকল কোজে : মাস দুই তিন যুঝে :
নিরবধি গড় কোটি ঘেরায়া :
করিয়া, গুল, বুলি : রসব করিয়া বুলি :
জুগে কামিনী-গাহের উপরে :
থান্যতে জলুজু কাটে : কড়াপিড়ি নাই আটে :
কর কিছু কেরিতে রাণারাজ :
তাজপদ বিনা দুএ : মার গেল দুজা-নিরে :
টানে-ঘোড়া এক রাগ কর্যা :
আজামানে ভরিয়া ছিটা : সিন্ধুগতি দিল বিটা :
আড়াই সর্ষ ঘোড়াগেল মারা :
জাকর বাঁজমাধার : মার গেল ভাগিনা তার :
তথাপি কিরিয়ানাই চার :
নিসিতে সরনে থাকে : প্রভুকে সপনে দেখে :
ইসা ঘোড়া নিল জামা পায়া :
প্রভুব-রূপায় আমি : গড় পরাজয় আমি :
নিসি এসে পালায় সর্ষ :
আইল নিজ ঘেসে : নবাবের ভলপ-রাইসে :
বসি হইল চোখ বর্জর :
হুজুয়া-আইল চড়ি : সঙ্গে কোজ হাজার হুজি :
আইল কোজ-বিল্যত লুটীয়া

প্রভুর মোহিয়া পায়া : রাজারে সিরপা দিয়া :
কিরিয়া সেলেন তিনি যারে :

কীর্তিচন্দ্র সম্ভবতঃ বর্ধমানের রাজা হইবেন।
বর্ধমান-রাজ পূর্বেই মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার
করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর-রাজ প্রথম রঘুনাতের মুসলমানগণ
কর্তৃক কৌশলে বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়াছি। এখন
দেখিতেছি না মুজা বিষ্ণুপুর-রাজকে ‘সিরপা’ও
দিয়াছিলেন।

ইহার পরেই মদনমোহন প্রভুর অপব এক মহিমার
কথা :—

চাক লুটী হইল বিজ : চড়া রাইল মহাসিংহ :
ঠেকার তলায় জাহার মোকাম :
দিন কত বসেছিল : আপুনি পালাবে গেল :
হুজা কিছু প্রভুর মহিমা :

মহাসিংহ—শোভাসিংহ হইতে পারে। বিষ্ণুপুরের
নিকটে কোথায় ঠেকারতলা স্থান আছে। শোভাসিংহ
সম্ভবতঃ ঠেকারতলায় ছাউনি করিয়া থাকিবেন।
১৩২৫ সালের ফাস্তুন সংখ্যা প্রবাসীর ৪৩০ পৃষ্ঠার
‘চাকা নিতে হ’য়ে ধিঙ্গি। যেয়ে এল শোভাসিংহ’
প্রবাদ বচনটির উৎপত্তি সম্ভবতঃ রতন কবিরাজের
‘মদনমোহন বন্দনা’ হইতেই।

মদনমোহন প্রভুর আর দুই মহিমা :—

আইলেন কলন্দর : সঙ্গে অনেক লস্কর :
হলুর করিয়া বলে :
প্রভুর মহিমা হনি : কিরিয়া সেলেন তিনি :
এইরাসে গেল তীরচালে :
কলন্দর কে—বেকি কঠিন : বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য
‘হলুর’ শব্দের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া একটা
কহিকেন্তা-কিড়া কবিত্তে পারিবেন। ‘তীরচাল’ কোথাকার
রাজা ছিলেন অনুসন্ধান আবশ্যক।
ভারতবর্ষ পণ্ডিত বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে গোপালসিংহ
গড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন বিশ্বাস করিবার
কারণ নাই। রতন কবিরাজ মদনমোহন কর্তৃক মারহাটা
বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

স্বাক্ষর পণ্ডিত আইল : বাজালায় মার গেল :
কোজের রাহিক রহমান :
স্বাবার চৌধার : মুরহাটা বলাব :
হুজা সব রাজার ভদ্রান :

পালায় বাজা সিকরভূঞা : হাজার পাচ ছয় লোক নিঞা :
এইরূপ ভক্তের পালান ।

পালায় রাজা বিরভূঞা : হাজার পাচ ছয় লোক নিঞা :
উবু মুখ বশে তোবা তোবা ।

পালায় রাজা রামগড়া : গড় কোটা সব ছাড়া :
তুঙ্গ-মানের নাহি খবর খোজ ।

পালায় লক্ষের পতি : পাঁচ সত্ত পালায় ক্ষেত্রি :
পাছু ধায় পাঁচ সর্ষ কোজ ।

ধল ভূঞা রাজা জায : পাছু পানে নাহি চায :
রামকান্ত গেল এইরূপে ।

অগাধ বনের মাঝে : পালায় সামন্তরাজে :
একে একে গেল সব ভূ প ।

সকল পালায় রাজা : নানা স্থানি হৈল প্রজা :
কেবল অটল মল্লবর ।

হরি নামের মালা হাতে : সদাই মগন তাথে :
বস্ত্রা বাহিন পাটের উপর ।

ইহা হইতে গোপাল সিংহের সময়ে বিষ্ণুপুর রাজ্য
কতদূর বিস্তৃত ছিল ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিতে
পারিবেন। অনুমান করিলে 'তুঙ্গমান' ও 'রামকান্তের'ও
খবর অবশ্য মিলিবে।

ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুরে আসিয়া পড়িয়াছে—শুভঙ্কর
আসিয়া গোপাল সিংহকে সংবাদ দিতেছেন :—

আইলন ভাস্কর : খবর কাহ শুভঙ্কর :
তিন লক্ষ-বোড়া সঙ্গে কর্যা

শুনিয়া চিন্তিত রাজা : নান স্থানি হৈল প্রজা :
ভাবনা করএ মনে মন ।

এই শুভঙ্করই বিখ্যাত 'শুভঙ্করী' প্রণেতা। শুভঙ্কর
গোপাল সিংহের অমাত্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি
চৈতন্য সিংহের আমলের লোক। ক'হ'রও মতে গোপাল
সিংহেরও পূর্বেকাব। দুইটি ধারণাই ভুল। শুভঙ্কর সম্বন্ধে
ভিন্নপ্রবন্ধ বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।
উপস্থিত রতন কবিবাজের মতে মদনমোহন কেমন করিবা
বর্গী তাড়াইয়াছিলেন দেখা যাক।—

রাজার ভাবনা দেখি : প্রভু হৈলা মনে ছবি :
নিসি সেব কহিল সপন ।

দ্রোণদির লজা রাখি : তাহারে কবিলা স্থখি :
আনলে রাখিলে দত্যাশ্রয় ।

পাণ্ডবের অশ্রায় হইবা : দুর্জোধনে নিপাতিয়া :
রাজা কৈলে হস্তিনাপুরিতে ।

ইন্দ্রসেন বাদ কবি : ধরি গোবর্দ্ধন শিবি :
গোকুলে রাখিলে গোপগণে ।

কঙ্কট মারিয়া নির : উর্দ্ধারিল নৃপতিরে :
বিশ্র সিংহ দিয়া প্রাণ দানে ।

ছত্রিস জোটি দেবতা সাধ : মনি আইসে মরনাথে :
তথাপি না দিব গড় নিতে ।

নাহস হজা গড় নিব : মদনমোহন কে বলিব :
কোন ছাঁর ভাস্কর পণ্ডিত ।

রাজারে নির্ভর করি : গেলা প্রভু তরাতরি :
নিসি গেল উদয় তপনে ।

প্রভুর পদ ভরসা করিয়া : ভক্তকে বারাম দিয়া :
মহারাজ বসিল শিবানে ।

হেনকালে গোল উঠ : হুগে ঘাটিতে কামান হুটে :
খবর আনিতে লোক চলে ।

ঘাটে আইসে লাগেছিল : মার খাখা পালাইল :
রাজারে খবর জাবে বলে ।

শুনিয়া গোপাল সিংহ : তিলয়াধ নাই রিঙ্গ :
কাজিগনে বলিছেন বচন ।

ভাবনা করহ সর্ষে : ভাস্কর কিরিয়া জাবে :
আছেন প্রভু মদনমোহন ।

দুই পাখা পসারিয়া : পশ্চিম বাহিনি হজা :
কির প্রভুর মন্দির উপর ।

অস্তুরিক্ষে পতি : গড়ে আইসেন গড়পতি :
ভাস্কর-হইয়া নিঠুর ।

বেষ্টিত তিনখান কোষ : ভাস্কর তাহার মাঝে :
নিজা মার পালখে শুটিয়া ।

পুনরাজি প্রহার : প্রভু দেখা দিল তারে :
উঠ ভাস্কর চমকিত হবা ।

বলে ভাস্কর পণ্ডিত : কি দেখিলাম আচম্বিত :
হেনকালে নিসি আগুসার ।

আইল সব জমাদার : সঙ্গে সব আসোয়ার :
ভাস্কর করিল হুহার ।

ভাস্কর কহে জমাদার : হুতাই হন সমাচার :
আহকার নিসির সপন ।

কহিতে পিঠের রজ : দেখাছি জেমন রজ :
ভয়ে মোর কাঁপিছে জিবন ।

ভাস্কর পুন কর : বএস বএসর নর :
কির সিংহ গড়ের উপর একা ।

সনালি কাঁড়ের চেমা : গায়ে দেখি নিল জামা :
মাথাব পাগড়ি দেখি বাকা ।

সনার কাটাঘ টেড়ি : তাহে লাল পাগড়ি :
তাহে বান্ধা ছহরি ২ তলয়ার ।

গৌব কামান হাতে : সনা বাঁধা খট তাথে :
শিটে ছলে কনকের ঢাল ।

শ্রবণে কুণ্ডল ছলে : বনমালা দেখি গলে :
প্রভুর পায় রতন নগুণ ।

জলজ জিনিয়া তম্ব : ডানি বরে দেখি বেহু :
কে টা বেড়া সনালি ঘুঘুর ।

বাউল উকমাল বোড়া : গলা বেড়া পদক ছড়া :
জিনি দেখি অরুন বরুন ।

বোড়া বাঁছে পাছ : টাঙালই মোর কাছে :
কহেন কিছু কর্কশ বচন ।

হনরে ভাঙ্গর তুমি : পরিচয় দিয়েচামি ;
 মনমোহন মোর নাম ।
 আমা' বিলাত দুট . আমারে বাস্তাছ খাট :
 বিধাতা হইল তোরে বান ।
 গাপি হয় বাচে গেলি : মুক্ত হতে আমি ছুলে :
 অ'তক বাটিল তোর প্রাণ ।
 আমার মোহিমা পাবে : বাজালাতে মার জাবে :
 এত বলি হৈলা অন্তর্ধান ।
 এত শুনি মমচার : তরু হৈল জমাদার :
 ভাঙ্গরে বলেন উত্তর ।

এখান হৈতে চল জাব : এখানেতে নাহি রব :
 জানা গেল ঠাকুরের গড় ।
 আত্মা দিল ভাঙ্গর : কমর বান্ধে' লঙ্কর :
 ভোরে' বিলাত হৈল পার ।
 এমন প্রভুর রঙ্গে : সব জমাদার সঙ্গে :
 নবাবের হাতে গেল মার ।
 মল' রাজার ধন : কেবল প্রভু মনমোহন :
 নজরে রাখেন প্রিথিবিত ।
 ঢৌকিল প্রভুর ঠাকি : পান্না পার পাতে নাকি :
 রতন কবিরাজ বিরোচন ।

মুক্তি

শ্রীআশালতা দেবী

২৪

নির্মলা অভিজ্ঞতের মত তাহার রাজির শব্দার উপর বসিয়াছিল। হাত-দুইখানি কোলের উপর জড়ো কবা। এতদিন যে তরুণী সংসারের বাহিরে পুণ্ড্রিত জ্ঞানের রাজ্যে ডুবিয়া ছিল, ভোরের আকাশ বাহার কল্পনাকে জাগ্রত করিয়াছে এবং স্বর্ঘাস্তকালের বর্ণলীলা যাহার ক্ষয়কে রাঙাইয়াছে, সে অ'জ সংসারের মর্ষস্থানের পরিচয় পাইয়া বিশ্বের স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল, “এ কি! এতদিন যাহাকে জ'নিতাম এ তো সে নয়। ইহার সহিত কেনবিন আমার পরিচয় নাই। এত অস্তাব এত দৈন্ত এমন শীর্ণমূর্খি কঙ্কাল এই সুন্দর জগতের কোন্ কোণে লুক'ইয়াছিল।”

তা'হাব এমন ভাবনার কাবণ ছিল। চন্দ্রকান্তের সংসারে এই দু'তিন মাসের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটয়া গিয়াছে। সেই যে মাসখানেক আগ' ইনস্টিটিউটের মত জবে তিনি দিন-পনের ভুগিয়াছিলেন, তাহার পরে জর সাবিল বাট, কিন্তু কাশির জের খানিকটা বহিয়াই গেল এবং এমনই দ্রুত তা'হার শরীর খারাপ হইয়া আসিল যে বন্ধুবান্ধবেরা দুই বেলা দেখিতে আসিয়া চোক টেপা-টেপি করিতে লাগিলেন। তা'হার যে দুই ছেলের বিবাহ হইয়াছিল তাহারা নিজের বাড়ির

গতিক দেখিয়া শ্বশুরবাড়িতেই কায়েমি হই। বসবাস করিতেছিল। এক জন উকিল হইয়া শাম্শা-মাখার নিত্য আশ্রয় কোটে বাতায়ন করিত। আব একজন শ্বশুরের একমাত্র মেয়েকে বিবাহ করিয়া তা'হাব চালের গদি ত দুই বেলা বসিয়া কাজকর্ম শিখিত। বাড়ির সহিত তা'হাদের সম্বন্ধ প্রায় ছিল না বলিলই চলে। কাবণ বাড়ির প্রতি ছিল তা'হাদের তীব্র অভিমান। চন্দ্রকান্তের নিজের বিস্তার ঋণ তা'হার নানা বন্ধুবান্ধবের কাছে। তাহারা চন্দ্রকান্তের শরীরের গতিক দেখিয়া বোজ বেগী কবিয়া মুখভার করিতেছিল। জোয়াবের জল সবিয়া গেলে নদীর ঘাটের উত্তর পাথরগুলো যেমন বাহিব হইয়া পড়ে তেমনি এ সংসারের জীর্ণ অস্থিপত্রগুলোও ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছিল।

চন্দ্রকান্তের সেক্স ছেলে মুবলী মার্জেন্ট আকসি পঞ্চত্রিংশ টাকা মাহিনার কেরানীগিরি করিত। তাহার বিবাহ হয় নাই। আপাততঃ তাহার ক্ষুদ্র আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই স্ত্রীলোকে সংসারের সমস্ত চালাইতে হইত। সংসারের নানা দুঃখদৈন্তের মধ্যে পড়িয়া তা'হার আজন্ম-সহিষ্ণু স্বভাবেরও যেন ব্যতিক্রম হইয়াছে। গুতিমা-গুন্দরী নির্মলা আসিবার কয়েক দিন পরেই বাপের বাড়ি চলিয়া

গিয়াছে। আর কম বলিয়া ঠিকা ঝিকেও শুনীলা ছাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে উদয়াস্ত একলা পরিশ্রম করিতে হয়। নির্মলা তাঁহাকে একটু সাহায্য করিতে গেলেই তিনি যে দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকান তাহা তিরস্কারেরও বাড়া। এ-সংসারের দুঃখদৈন্ত এমন অব্যবহিত ভাবে নির্মলা আব কখনও অনুভব করে নাই। সে যেন এত দিন স্বপ্নের ঘোরে কোন এক অর্ধশুট চন্দ্রালোকে বুমস্ত বাজছেব উপর দিয়া যাইতেছিল। অনতিশুট জ্যোৎস্নার বমণীয়তার সমস্তই মধুব, সমস্তই স্পর্শ লাগিতেছিল। জাগিয়া উঠিয়া রুঢ় দিবালোকে সমস্তটাই চেহারা আব একরকম দেখাইতেছে।

এই একটু আগে তাহার ভাই মূলী আকিস হইতে আসিয়া জীর্ণ পুরান ব্যাপারখানা গায়ে দিয়া ভাঁড়ার ঘবেব দাওয়া হইতে ডাকিল, “মা, চাট্ট মুড়ি।” শীতের বিকাল বেলায় তাহাব আকিস হইতে ফিরিতেই প্রায় সন্ধ্যা লাগিয়া গিয়াছে। সারাদিনেব পরিশ্রম এবং অপরিণীত ক্ষুধার চিহ্ন তাহার সমস্ত মুখে একেবারে স্পষ্ট করিয়া আঁকা।

রান্নাবরের পৈঠার উপর একটা কেরোসিনের ডিপে হইতে একটুখানি আলো এবং অপরিণীত ধূম নির্গত হইতেছে। চুল্লিতে আগুন জ্বলিতেছে। রান্না চড়াইবেন বলিয়া শুনীলা কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। তাহাব দেরি দেখিয়া নির্মলা আব থাকিতে পাবিল না। ভাঁড়ার ঘরে চুকিয়া একটা রেকাবিতে করিয়া চারটি মুড়ি ও কয়েক খণ্ড নারিকেলের টুকরা লইয়া মূলীর সামনে রাখিল। মূলী বেন দস্তর মত সমস্ত হইয়া উঠিল। নির্মলা আসন পাতিতেছিল; তাহার হাত হইতে তাড়াতাড়ি আসনটা টানিয়া লইয়া সে বলিয়া উঠিল, “থাক, থাক।”

নির্মলা বধন বাবার ঘরে থাকে তখন সর্বদাই পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্রকান্ত বাবু প্রায়ই বলেন, “মা আমার, এই নিবানন্দ রোগীর কক্ষে কেবল তোমাব দিকে যখন চাই, তখনই আমার সমস্ত মন ভরে ওঠে। মনে হয় যেন অন্ধকারের মাঝে একটুকু চাঁদের আলো।” আজও তাই সে বিকাল বেলায় গা ধুইয়া একখানি কাশো ছুরে কাপড় পবিয়াছিল। গায়ের ব্লাউসে একটু স্নায়ের গন্ধ। মূলী তাহার হাত হইতে খাবারের

রেকাবিখানা লইবার সময় অতি সঙ্কুচিত ও বিপর ভাবে তাহার দিকে চাহিল। তাহার দীন ভাব এবং জীর্ণ বেশ আজ এত সুস্পষ্ট হইয়া সেই চাহনির মধ্যে ধরা পড়িল যে, নির্মলা বেদনায় কাতব হইয়া পড়িল। প্রগাঢ় কুয়াশার মধ্যে পথিক অন্ধেব মত চলিতে চলিতে হঠাৎ সূর্যের আলো প্রকাশ পাইলে যদি চমকিয়া দেখে পায়ের কাছে অতলস্পর্শ গন্ধব তাহা হইলে সে যেমন ত্রাসে বিষয়ে স্তম্ভিত হয়, নির্মলাও ধূমকলঙ্কিত অনুজ্জ্বল আলোকে মূলীর সঙ্কুচিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তেমনি সুগভীর লজ্জা বিষয় এবং ব্যথায় যেন স্তব্ধ হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্তের মধ্যে তাহার মনে বিধেব চিন্তা ভিড় করিয়া আসিল। এই তাহার নিজের ভাই, এই তাহার আশ্রয়বের সংসার! যেখানে এত দুঃখ এত দৈন্ত সেখানেও সকল দীনতা হইতে আবৃত করিয়া এতকাল এ সংসার তাহাকে কেবল অমৃত দিয়াছে। কিন্তু নির্মলার আজ আত্মজ্ঞানের সহিত বারংবার মনে হইতে লাগিল, কেন ছোট হইতে তাহাব বাবা তাহাকে এমন করিয়া আগুলাইয়া মানুষ করিয়াছেন? কেন দুঃখে অভাবে দৈন্তে সে সকলের সহিত এক হইতে পারে নাই? আজ আববণ খসিয়া গেল। নারী আজ ককণাক্রপিত হইয়া নিজেকে খুঁজিয়া পাইল। যে আঘাতে যে বেদনায় সে জাগিল, জাগিয়া যে পৃথিবীতে আসিয়া দাঁড়াইল, সে জগৎ পৃথিবী জগৎ নয়, সে পৃথিবী সুহৃৎ সৌন্দর্যে ঘেরা, নিভৃত স্থান নয়। সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা এবং অকিঞ্চিৎকরতার মাঝখানেও যেখানে দিয়া স্নেহ, প্রেম, ককণাব ধারা নিত্য প্রবাহমান, সেইখানেই সে নিজেকে জাগিতে দেখিতে পাইল।

নির্মলা তাই ভরাকান্ত মন লইয়া আপন শয্যাব উপর বসিয়া ভাবিতেছিল। কিন্তু যে বেলী কণ বসিল না। বারাকে হবলিয়া করিয়া দিবার সময় হইয়াছিল। উঠিয়া একটা ছোট ঠোঙ ধরাইয়া হরলিয়া তৈরাকী ককণা শেষ হইলে, পেয়ালা-হাতে চন্দ্রকান্তের ঘবে চুকিল। আজকাল তিনি অধিকাংশ সময়ই বিছানায় শুইয়া থাকেন। দেহ দুর্বল, ক্ষয়ক্ষীণ। ঘরের মধ্যে আলো এবং অন্ধকার মেশামিশি। বিজলীবাতির পরিবর্তে ঘরের এক কোণে রেডিব তেলের স্নেহ জ্বলিতেছে। তাহাতে ঘরের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়

নাই। চক্রকান্ত তজ্জাচ্ছন্ন মত পড়িয়াছিলেন। নির্মলা সবেমাত্র পেরালাটি টেবিলের উপর নামাইয়াছে, বাহিরে ছুতাব আওয়াজ পাওয়া গেল। নিখিল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহাব ঘরে ঢুকিবাব শব্দে চক্রকান্ত চমকিয়া কহিলেন, “কে?”

অপবিচিত দেখিয়া নির্মলা মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া আন্তে আন্তে পাশ কাটাইয়া সরিয়া বাইবার উপক্রম করিল। নিখিল নমস্কার করিয়া কহিল, “বৌদি, বাবেন না। আপনার কাছে কিছু আবেদন আছে, তাই সাহস ক’রে এসেছি। আমাকে চিন্তে পারছেন না, কিন্তু সেটা শুধু আমার লক্ষীছাড়া চেহারার দোষ। আমাকে আপনি দেখেছেন বামিনীর বিয়ে সম্বন্ধে। আর আমার কথা হয়ত অনেক শুনেছেন তার মুখে। আমি বামিনীর বন্ধু নিখিল।”

চক্রকান্ত বিছানা হইতেই বলিলেন, “তুমি নিখিল! ঘরে বেণী আলো নেই তাই প্রথমটায় ঠাহর কবতে পারি নি। তুমি বোস। মা নির্মলা, নিখিলকে একপেরালা চা তৈরি কবে খাওয়াও।”

নির্মলা আব বাহিরে না চলিয়া গিয়া চক্রকান্তের বিছানার কাছে সরিয়া গিয়া হরলিক্সের পেমালা তাহাব মুখের কাছে ধবিল। তিনি বামিনীর বন্ধুকে দেখিয়াই তাহার খবর পাইবার জন্ত ভিতবে ভিতরে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন; কহিলেন, “তার পব, সব ভাল আছ ত?”

নিখিল তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, “আমরা ভালই আছি। কিন্তু আপনি যে এমন অসুস্থ সে কথা ত আগে জ্ঞানতাম না। একটা কথা আপনাকে বলি, বৌদিব সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনার ঘরে বকাবকি ক’রে আপনাব শান্তি ভঙ্গ করতে চাই নে। অতিথিকে আপ্যায়ন কববাব আদেশ দিলেন তাঁকে, যদি অনুমতি কবেন তবে ষ্টোভটা খবিরে দিয়ে, চায়েব জলটা চড়িয়ে দিয়ে তাঁকে কিছু সাহায্য করি।”

চক্রকান্ত বুঝিলেন বামিনী নিশ্চয় তাহার বন্ধুর মারকতে স্ত্রীকে কিছু বলিয়া পাঠাইয়াছে। সে কথা গোপনে বলিবারই কথা, তাহার বন্ধুকে বলিবার নয়। বুঝিয়া

তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, “বাও মা, বাইরের ঘবে নিখিলকে বসিয়ে ছুটো গল্প-টল্প করো গে। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। তাছাড়া বোগীর বন্ধ ঘবে তাং বসিয়ে কেন ছুঃখ দেবে? তোমবা পাশেব ঘরে যাও।”

পাশের ঘবে আসিয়া তাক্ হইতে ষ্টোভটা পাড়িতে পাড়িতে নির্মলা বলিল, “আমাকে কিছু বলবেন?”

“চা কবতে হবে না। আপনি স্থি ব হয়ে সামনের চেম্বারটায় বসুন।”

নির্মলা বসিল।

নিখিল নিজেই ষ্টোভটা টানিয়া লইয়া স্পিরিট চালিতে চালিতে কহিল, “আচ্ছা, আমিই ধবাই। ষ্টোভের শব্দে আমাদের কথা বাইরের কেউ শুনতে পাবে না।”

“সে কি কারও শোনবার মত কথা নয়?”

নিখিল কিছুকাল অধোবদনে থাকিয়া কহিল, “এ কথার কি জবাব দেব জানি নে। কিন্তু আপনার বাবার না শুনলেই ভাল। তাঁব দেহেব অবস্থা দেখলুম ভাল নয়।”

বাবার অসুস্থতার কথা মনে পড়িয়া বাওয়াতে নির্মলা বিষণ্ণ হইয়া কহিল, “হ্যা, সেই বে ইনফ্লুয়েন্সার পড়লেন, সেই থেকে কিছুতেই আর ভাল রকম সেবে উঠতে পারছেন না। একটু কাশি আর সামান্য জরের মত লেগেই রয়েছে।”

এখনই আধাঅন্ধকারে চক্রকান্তেব সমস্ত শরীরেব উপর বে ব্যাখির প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখিয়া আসিয়াছে, নিখিলের সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, “তিনি বোধ হয় আর বেশদিন বাচবেন না, তাঁর বোধ হয়...” বলিতে বলিতে নির্মলার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল।

“বলুন না, থামলেন কেন? তাঁর কী হয়েছে? লোকে বা বলে সত্যিই কি তাঁব তাই হয়েছে? আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নে।”

নিখিল তাহাব ভুলের পরিমাণ বুঝিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতে কহিল, “যে অসুখই হোক, ভাল ক’রে চিকিৎসা করালে সব রোগই সারে। আপনি ঠুকে নিয়ে কোথাও হাওয়া বদলিয়ে আসুন না। তাতে ঢেব উপকার পাবেন। এই স্ত রাজগীরে বামিনীদের একটা প্রকাণ্ড বাথলোবাড়ি

পড়ে রয়েছে। হৃদয়ে মিলে ঝুঁকে নিঃশব্দে বসে আছেন।
তা আপনি তো আজকাল বামিনীর খোঁজ-খবরই রাখেন
না। সে আজকাল কি করছে বলুন দেখি?”

“কি করছেন?”

“একটা কথা আপনাকে আগে থেকে বলে রাখি।
আজ আপনাকে যা-কিছু বলব অপরাধ নেবেন না।
মনে রাখবেন, সে আমার কত দিনের বন্ধু আমি যা-কিছু
করছি যা-কিছু বলছি কেবল তার প্রতি একান্ত শুভকামনা
বশতঃই বলছি।”

“এত ক’রে ভূমিকা করছেন কেন?”

তখন অনেক দ্বিধা পর নিখিল সমস্ত কথা বলিল।
কহিল, ‘দেখুন, তার বাবার অসুখের সংবাদ এসেছিল বলে
দিন দুই তিন হ’ল তাকে টেনে তুলে দিয়ে এলুম, এর
মধ্যেই চিঠি দিয়েছে শীর্ণার আবাব ফিরে আসছে। আমি
আমার সন্দেহের কথা বললুম মাত্র। আজ আপনাকে দেখে
আপনার সঙ্গে ভাল ক’রে আলাপ হ’লে মনে বড় কষ্ট
হ’ল। আপনার মত এমন স্ত্রী থাকতেও সে...’

‘থাক ওসব কথা।’

‘আপনি কি রাগ করলেন?’

‘রাগ নয়। কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট হচ্ছে না।
তিনি যদি আর কাউকে ভালবেসে থাকেন আমার তাতে
বাধা দেবার কি অধিকার?’

‘এটা আপনার অভিমানের কথা হ’ল। কিন্তু আব
কোন মেয়েকে ভালবাসবার কথা তো আমি বলি নি। আমি
বলছি আপনি যদি আশ্রয় না দেন তবে আপনার স্বামীর
বিপক্ষে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।’

‘চারের জলটা তো ফুটে উঠল। এইবারে ঠোঁটটা
নিখিলে দিয়ে চা তৈরি করি।’

‘আচ্ছা, চা খাচ্ছি। কিন্তু আমার কথার জবাব
পেলায় না।’

‘আপনার কথার জবাব কি দেব বুঝতে পারছি না।’

‘আপনারই তো বোঝবার কথা। সত্যি কথা বলতে
কি, আপনাকে আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে। কি
রকম একটা অনাসক্তির ভাব। অথচ আপনি যে ক্ষমতাবান
তাও তো নয়। এইমাত্র যে দেখে এলুম আপনার লক্ষীর

হাতের সেবা। সেই একটুবানিতেই অনেক ইঙ্গিত পেয়েছি।
আচ্ছা, সত্য ক’বে বলুন। ত.সংসারে বাবা ছাড়া আর কি
কখনও কাউকে ভালবাসেন নি? আমার এসমস্ত
প্রশ্নে রাগ কবলে চলবে না। বৈধব্য ধ’রে স্তন্যদেহে আর
ক্ষমা করতে হবে এই ভেবে, যে, আপনাদের জন্তে আমার
মনে মনে একটি উদ্বেগ রয়েছে।’

‘রাগ কিছুই করি নি। বরঞ্চ আজ আপনার সঙ্গে কথা-
বার্তা বলতে পেয়ে মনেব তার অনেকটা কম হ’ল। নিজের
মনে আজকাল এই সব প্রশ্ন নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া
করেছি। খুব পরিষ্কার ক’রে কিছু সীমাংসা করতে
পারি নে। আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন;
একমাত্র সংসারে তাঁর সঙ্গেই আমার মনের যোগ হয়েছে।
তাঁর ভালবাসায় স্নেহের সঙ্গে আছে উদার শাস্তি।’

নিখিল তাহার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল,
‘কিন্তু ওইটুকু গভীর ম’ঝে নিজেকে চিরকাল আবদ্ধ ক’রে
রাখলেই তো আর চলবে না। আমরা কি চিরদিন বাইরে
হাতজোড় ক’রে দাঁড়িয়ে থাকব? আমার মনে হয় বামিনীকে
আপনি আজও ভাল ক’রে বুঝতে পারেন নি। সে এখন
যাকে চায় তাকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কামনা কবে। সে
চাওয়াব মধ্যে এত বেশী জোর, যে, অনেক সময় তাকে
অত্যাচার বলে মনে হয়। ও যাকে চাইবে, তাকে যেন
অনুগ্রহ নিজের সমস্ত দিয়ে বিরে থাকবে। আপনার সঙ্গে
তার বিয়ের আগের দিনগুলোও তো মনে পড়ে। সে তার
কি অসহ্য আবেগ! দিনরাত ঐ একই কথা, একই ভাবনা।
সেই জন্তেই তো আমার এত ভয়। ও যাকে দেয় তাকে
কিছু হাতে বেধে বিচার ক’রে দেয় না। সে কি, সে কেমন,
সে সকলও ভেবে দেখা আবশ্যক বোধ কবে না।’

চা তৈরি হইয়া গিয়াছিল। নিখিল পেয়ালাটা তাহার
হাতে আগাইয়া দিল। নিখিল চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ
করিয়া কহিল, ‘এবারে আমি উঠি। আলাপ যখন করলেন
তখন মাঝে মাঝে আদব। এসে বিরক্ত কবব। ভাল কথা,
বামিনী আপনাকে চিঠিপত্র দেয় তো? না বাবার অসুখ
বলে ব্যস্ততায় দিতে পারে নি? আজ তার চিঠি পেয়েছি।
সেখানকার সকলে ভাল আছেন।’

নিখিল বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল,

একদিনেই ইহাকে বেশী নাড়া দেওয়া হইল। নির্মলাকে দেখিয়া তাহার ভাল লাগিয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে বিস্মিতও হইয়াছিল। তরুণীর চাবিদিকে বেন প্রত্যুষ বেলিকার নির্জন কুশাশর ঘোর। একটু একটু কাটিয়া আসিতেছে কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। একটা স্তম্ভ ঘুম ভাঙিয়া ওঠার ভাব। রাত্রির অন্ধকার হইতে সহসা আলোকিত জগতে চোখ মেলিয়া চাওয়ার একটা বিহবলতা।

আজকালকার আধুনিক শিক্ষিতা যত মেয়ের সঙ্গে নির্মলের আলাপ ছিল তাহাদের সহিত কোনও খানে সে নির্মলার এতটুকু মিল খুঁজিয়া পাইল না। সে বেন ভিন্ন জগতের অধিবাসিনী।

২৫

চন্দ্রকান্ত সচকিতের মত পড়িয়াছিলেন। নির্মলা ঘবে ঢুকিতেই প্রশ্ন করিলেন, “নিখিল চ’লে গেল?”

“হা, তুমি বুঝছ, পাছে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় তাই এ ঘরে আর এলেন না।”

“হামিনীর কথা কিছু বললে না কি? সে এখানেই আছে তো? ভাল আছে?”

“হা ভাল আছেন—” নির্মলা একটু ভাবিয়া কহিল, “কিন্তু এখানে নাই। তাঁর বাবার খুব অসুখ তাই বাড়ি গেছেন।”

“নিখিল আর কিছু ব’লে গেল না কি?” উৎসুক ভাবে চন্দ্রকান্ত মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

নির্মলা মুখ নীচু করিয়া মুহূর্তের কহিল, “না।”

জীবনের মধ্যে প্রথম সে বাবার কাছে সত্য গোপন করিল। মনের ভাব লুকাইল। ইহাতে সে মনে মনে যে-পরিমাণে সন্তুষ্ট হইল তাহার চেয়ে বেশী কাতর হইয়া ভাবিল, “আমার জন্ত আমার বাড়ির কাহারও মনে সুখ নাই। আমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার পিতা পীড়িত, মা তো আমাকে দেখিলে বিতৃষ্ণার মুখ ফেরান। আমার ছেঁহু ভাইরা আমার মত স্বার্থপরকে পর মনে করে। কাছে গেলে সন্তুষ্ট হয়। এত বড় নিরামনের বোঝা কেন আমি সকলের বাড়ে চাপাইলাম। হে প্রভু, ইহার হাত হইতে

কি আমার মুক্তি নাই? আমি ভাল ভাবিয়া বাহা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্য কেন তাহাই মন্দ হইল?”

এই কয়েক দিনের হৃদয়ভার তাহাকে বিষম, চিন্তাশীল করিয়া তুলিয়াছিল। আগে সে মানুষের হৃদয়টাকে লক্ষ্য করিত না। সত্যকেই সবচেয়ে বড় মনে করিত। কিন্তু এখন কথা বলিবাব আগে ভাবিতে শিখিয়াছে অপরের মনে ইহাতে আবাত লাগিবে কি না।

চন্দ্রকান্ত কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “হামিনীর বাবার বুঝি খুব অসুখ? সেই জন্তেই সে ইদানীং আব খোজখবর নিতে পারে না। তা তুমি মা আজই তাকে একখানা চিঠি লেখ গে। বাড়িতে তাদের এত বড় বিপদ, যদি দরকার হয় তো তুমিও যাবে।”

নির্মলা হাটু গাড়িয়া তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, “না বাবা, তোমার এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।” “কেন মা, আমি তো বেশ ভালই আছি। আচ্ছ, বাওয়ার কথা পরে হবে। এখন তাকে একটা চিঠি লেখ গে। নিজের বাড়ির বিপদে এমন চুপ ক’বে থাকা কি ভাল?” “নাচ্ছি। তোমাকে ঘুম পাড়িবে বেখেই যাব।”

চন্দ্রকান্তের কাসির মত উঠিয়াছিল, কিছুক্ষণ কাসিবার পর নির্মলাবের মত হইয়া কক্ষ ঘরে হঠাৎ বসিয়া উঠিলেন, “না বলছি কর গে না নির্মলা।” নিজেব মত নিয়ে বাতদিন জিন্দ কর কেন? আমি এখন ঘুমোব না, ঘুমোব না। আমার চোখে ঘুম নেই। শও।”

নির্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। নিজের ঘরে আসিয়া আলো জালিয়া চারিদিকে চাহিল। পরিপাটি করিয়া ঘরটি সাজান। শেলফের উপর সাজান বই। শুভ্র স্তম্ভের বিছানার কাছে টিপাইয়ের উপর একটি প্লেটে করিয়া ছয়ের টব হইতে তুলিয়া-আনা এক গোছা রজনীগন্ধা ফুল। একদিকে নির্মলার হ্যান্ডোনিয়াম ও কাপড়ের তোরঙ্গ। দেওয়ালে রেশমের ঘেরাটোপের মধ্যে সেতার টাঙান। ঘরের চারিদিক তাকাইয়া নির্মলা আবার বাহির হইয়া আসিল মনে মনে বারংবার কহিল, “না না, এ কখনই হইতে পারে না। এ রকম করিয়া আর আমি কখন থাকিব না। সংসারের সমস্ত দুঃখকষ্টের

সংগ্রাম দেখানে, সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের মনে নিমগ্ন হইয়া থাকিব না। সকলের মাঝে অতি সহজে নিজের স্থান করিয়া লইব।’

নিজের ঘর হইতে বার হইয়া সে রান্নাঘরের দিকে গেল। দূর হইতে দেখিল জ্বলন্ত চুল্লির সম্মুখে বসিয়া স্থলীলা বাঁধিতেছেন। তাঁহার চোখে ছ-কেঁটা জল। বোধ হয় অজ্ঞাতসাবে পড়িয়াছে, মুছিয়া লইতে ভুলিয়া গেছেন। পাশে একটা বেতেব মোড়ায় বসিয়া মুরলী তাঁহাকে কি বলিতেছে। প্রত্যুত্তরে তিনি জোরের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ‘না না বাবা, সে হবে না। ও মেয়েকে দিয়ে কিছু হবে না। ও অলসী বেদিন খন্তুবাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আমার সংসাবে চুকেছে, সেইদিন থেকেই এ-সংসারের কপাল ভেঙেছে। ও মেয়েকে আমি নিজ থেকে কিছু বলতে পাবব না। ওব দিকে মুখ তুলে চাইতে অবধি আমার বিতৃষ্ণা আসে।’

মুরলী আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে একটা নিখাস ফেলিয়া বিষন্ন মুখে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। নির্মলা আর রান্নাঘরে চুকিতে পারিল না। আবার নিজের ঘরে আসিয়া বিছানার উপর চুপ কবিয়া বসিল। ব্যথিত মনে ভাবিতে লাগিল, বিবাহের আগে সেই যে আনন্দময় নির্মল নির্জনতার দিন কাটিত তাহা ইহারই মধ্যে আকাশের দিগন্তে একেবারে নিঃশেষ হইয়া কেমন কবিয়া মিলাইয়া গেল। ইহারই মধ্যে এমন কি ঘটিল যাহাতে তাহাকে আশ্রয় কবিয়া তাহাদের সংসাবে এত অশান্তি এমন গ্লানি এত চিন্তা ঘনাইয়া উঠিতেছে। সে হিন্দুর মেয়ে হইয়া স্বামীসংসার ছাড়িয়া পিতৃগৃহে আসিয়া বসিয়া আছে, এটা কিছু অপবাদ বটে, কিন্তু তাহারও কি বথেট কাবণ নাই? আমার বাপের বাড়ির লোকেও কি তাহ বুঝিবে না? সে কাগজ-কলম বার কবিয়া বামিনীকে একটা চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু অনেকক্ষণ আঁকি-ঝুঁকি কাটিয়াও একটা লাইনও লিখিতে পাবিল না। হৃদয়ের প্রান্ত অবধি চাহিয়া দেখিল সেদিক একেবারে অন্ধকার। সেখানে যে অনুরাগেব রেখা একদিন দেখা দিয়াছিল আজ তাহা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। শুধু মনে পড়ে কে এক জন কিছুদিন তাহাকে একেবারে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিল,

অবীর আগ্রহে সমস্ত দিনরাত্রি অনিমেষ অতন্ত্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহাতে নির্মলা তেমন করিবার সুখ পায় নাই। বরঞ্চ মনে হইত তাহা হইতে মুক্তি পাইলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়। সেদিকে যেটুকু আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল পিতাব পীড়ার চিন্তায় তাহাকে আজ আর সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই যে আজ সন্ধ্যাব সময় বহুর অমঙ্গলের আশঙ্কায় উৎকর্ষা পূর্ণ হইয়া নিখিল আসিয়া তাহাকে কত কথাই না বলিয়া গেল। কিন্তু নির্মলার মনে হইতেছিল সে যেন কাহাবও গল্প শুনিয়া যাঁতেছে। মাঝে মাঝে মন সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে চাহিতেছিল বটে, কিন্তু সে পিতৃসেবাব হানি করিতেছে ভাবিয়া আপনি আপনাকে শাসনে সংযত করিয়াছে। শেষে লেটার প্যাডের ছ-তিন পৃষ্ঠা নষ্ট কবিয়া সে চার লাইনের এক চিঠি লিখিল :—

“প্রিয়তমকে

আজ আপনার বন্ধু নিখিলবাবুর মুখে আপনার বাবার পীড়িত হওয়ার সংবাদে বিশেষ চিন্তিত আছি। কেবল ডাকে তাঁহার সংবাদ দিবেন। আমার প্রশ্ন লইবেন। ঠিক

বিনোদ.
নির্মলা।”

চিঠি লেখা শেষ হইল সে বাজনার ডালটা খুলিয়া বাজাইতে লাগিল। যখন মন খুব খারাপ থাকে তখন সে নিজের মনে জানালার ধারে-রাখা এই তাহার অর্গ্যানের কাছে বসিয়া বাজায়। মৃদুস্বরে দুই একটা গান করে। বাজাইতে বাজাইতে মনে হইল জানালার কপাটের ফাঁকে একটা লাল রঙের লেফাফা। উঠিয়া গিয়া সেখান টানিয়া আনিয়া দেখিল তাহাকেই সম্বোধন করিয়া লেখা, বর্ণাঙ্কিত ভরা একখানা চিঠি। তাহার অগণ্য বানান ভুল সংশোধন করিলে অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়,—

ওগো

অগ্রিশিখা। তোমার সঙ্গীতের বহিতে আমি যে দগ্ধ হইতেছি। তোমাদের বাড়ির ঠিক পাশে যে এক সার খোলার ঘর দেখিতে পাও, তাহাবই একটা ভাড়া লইয়া আমি পড়াশোনা কবিতে আসিয়াছি। দরিদ্র ছাত্র। কিন্তু তুমি তাহাকে এমন কবিয়াছ যে তাহার পড়াশোনা মাথায় উঠিয়াছে। রাতদিন শুধু তোমার ঘরের ঐ জানালার কাছে ভূষিতেব মত চাহিয়া থাকি যদি কখনও তোমার মুখখানি একবার দেখিতে পাই। যখন এই পথে যাত্রায়ত কব তখন কখনো কখনো তাহা দেখিতেও পাই। কিন্তু সে মুখ এত গ্লান। আকাশের তারার চাবিদিকে এমন বাষ্প জমিয়া থাকে কেন? তোমার সেই বিষন্ন মুখ আমার দিবা-রাত্রিকে অসহ্য করিয়াছে। আর সকলের

চেয়ে উতলা করিয়াছে আমাকে তোমার পান। নয় করিয়া অন্ততঃ পেন্সিল দিয়াও ছ-ছত্র লিখিয়া তোমার শরনঘরের জানালা-পথে ফেলিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা উপায় করিও। ইতি

তোমারই অপরিচিত 'সেই'।

চিঠিটা নির্মলা ছি'ড়িয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। মনে হইতেছিল একটা ক্লেশাক্ত পক্ষিল পদার্থ যেন সে হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। উঠিয়া গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। তাহার পরে দুই করতলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বসিতেই তাহার চলছিল চক্ষু ছাপাইয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত আঘাত হইতে নিরুদ্ধ অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এই অশ্রুচিহ্ন এই অসম্মান হইতে কে যেন এখনই ইচ্ছা করিলেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। সে কে? সে কি তাহার স্বামী? তাহার কথা এতদিন সে কিছুই ভাবে নাই, যেদিকে মনকে বাধিয়া রাখিবার কোন শৃঙ্খলা কোন স্মৃতি কোন আলোক-ছিল না, সেই দিক্‌চিরহীন অন্ধকারের মধ্যেই নির্মলা অজানা কাহাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিত লাগিল। ফুলের কুঁড়ির মত যে নারী-প্রকৃতির অক্ষট-কোরকগুলি এতদিন মুখ খুলি-খুলি করিয়াও খোলে নাই, আজ বাহির হইতে সংসারের বিরুদ্ধ এবং বিচিত্র বেদনার তাপে তাহারা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। নির্মলা চোখ মুদিয়াছিল, তেমনি করিয়াই চক্ষু নিম্নীলিত করিয়াই বহিল। বাত্রির অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ বীজের অঙ্কুর মাটির তলা হইতেও সূর্যালোকের স্বপ্ন অন্তরে লইয়া যেমন করিয়া উপরে মাথা তুলিতে চায় তেমনি করিয়া তমসাবৃত সংসারের মধ্যস্থল হইতে নির্জ্ঞান নিশীথে তাহার অন্তরশায়ী প্রেম জীবনেরথেকে স্রবণ করিবার জ্ঞাত সেই অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

২৬

নির্মলার চিঠি যেদিন যামিনীর হাতে পৌঁছিল, তাহার পূর্বরাত্রে তাহার বাবাব হার্টফেল করিয়া হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। বাড়িরময় ক্রন্দনের রোল। মুর্ছিতপ্রায় মাতার নিকট হইতে সেইমাত্র সে উঠিয়া আসিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিল। নির্মলার চিঠিখানা থাম হইতে না খুলিয়াই সে অনেকক্ষণ অতিশয় মমতাব সহিত হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।...কত দিনের প্রতীক্ষা, কত দিনের স্বপ্ন... নির্মলার কাছ হইতে এই তাহার প্রথম চিঠি। কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া

বসিয়া থাকিয়া তাহার পর এখন খুলিয়া সেই ছ-ছত্রের চিঠি পড়িল তখন তাহার মুখের রেখাগুলি আরও কঠিন হইয়া উঠিল।

সেইরাত্রেই সে কলিকাতার চলিয়া আসিল। বড়বৌদি মুখে মুখে দীর্ঘচ্ছন্দে বিলাপ রচনা করিতে করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'সেকি ঠাকুরপো! বাড়িতে এতবড় বিপদ, আর তুমি আজই বাড়ি ছেড়ে চললে? ছোটবৌকেও ধন্য মেয়ে বলতে হয়। এ'স্ত্রী মানুষ, সেই সে তেজ ক'রে গায়ের গয়নাগাঠি খুলে ফেলে দিয়ে ফরফর ক'রে বেরিয়ে গেল তাব পবে এতবড় বিপদ-আপদেও আর খোঁজ নেই।'

সংসারের প্রতি বিরাগে ও জীবনের নবলব্ধ বৈরাগ্যে যামিনীর সমস্তই ব্যর্থপরনাই বিতৃষ্ণাকর লাগিতেছিল। কাহারও কাছে আসিয়া সম্মান দেওয়া, কাহারও কোন কথার জবাব দেওয়া, এসবই তাহার কাছে অসহ্য লাগিতেছিল। বড়বৌদির কৈফিয়তের হাত এড়াইতেই সে সংক্ষেপে কহিল, 'তাকেই আনতে চললুম। কি আর বলব, মা রইলেন, তোমরা রইলে, তাঁকে দেখো।'

'তা যাও ভাই। আমায় সব দেখবো শুনব। এসব বিষয়ে তোমাকে কিছুটা ভার্য্য হবে না।'

নিখিল অনিগ্রাকান্ত আরক্ত চক্ষু যামিনীকে তাহার শ্বেত উত্তরীয় সমেত দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল, 'হঠাৎ এমন বেশে যে?'

'বাবা বৃহস্পতিবার ভোরে হার্টফেল ক'রে মারা গেছেন।'

নিখিল বন্ধুকে সাধনা দিল। মেসের বাসায় অশৌচ পালনের বাঁধা-কিছু করা সম্ভব সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কহিল, 'এমন সময়ে বাড়ি থেকে চলে এলে কেন?'

'ভাল লাগল না।'

'তাহলে', নিখিল একটু দ্বিধা করিয়া কহিল, 'এ সময়ে মেসে না পড়ে থেকে বৌদির কাছেই চল না।'

দেহ-মনের এই শোকার্ত আত্মর অবস্থায় নিখিলের এই কথাটা তাহার মনে মোহের মত সৃষ্টি করিল। কিন্তু তখনই মনে পড়িয়া গেল নির্মলার সেই কাটাছোঁড়া সংক্ষিপ্ত চিঠি। বলিল, 'মেসে পড়ে থাকব না কিন্তু তুমি যেখানে বলছ সেখানেও যাব না। আমি নিজে বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকব।'

‘সে কি! তুমি এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে না কি?’

‘তাই তো মনে করেছি।’

‘পবীক্ষাটা দেবে তো?’

‘উকিল হয়ে আব কী হবে? বাবা নেই।’

‘তোমার দাদা রা নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করবেন।’

‘দাদাসেব কথা আমাকে মনে পড়িয়ে দিও না। আমার সমস্ত মনে জ্বালা ধরে। আমি বাড়িতে বাব না। এখানে থেকেই স্বাধীন ভাবে উপার্জন করব।’

‘গাফ। উপার্জনেব কথা পবে ভাবলেও চলবে। আপাততঃ সুস্থিৰ হও।’

‘না না, নিখিল তুমি বুঝতে পাবছ না। একে বে বলবে এই ছেলেরা ছবার ল ফেল ক’বে বাপের পরসার ব’সে থাক, আমি তা কিছুতেই সহ ক’ব না।’

‘অত উত্তেজিত হ’য়ো না যামিনী। বাপের পরসার ব’সে খাওয়ার চেয়েও ঢের বেশী দুষ্কার্য বড়লোকের ছেলেরা ক’রে থাকে। ও সব চিন্তা ছেড়ে আগে দেহ-মনে শান্ত হও। একবার ও-বাড়িতে বাবে না কি? শুনেছি চন্দ্রকান্ত বাবুও অতিশয় অসুস্থ।’

‘দেখা বাবে।’

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাকালে যামিনী নিজেব ঘরে চুপ কবিতা বসিয়াছিল। হঠাৎ সেই জাকবাণ-বড়ের পর্দা-ফেলা অমলাব বাড়ির দিকে নজর পড়িয়া বাওয়ার দেখিতে পাইল ঘরে উজ্জল আলো জলিতেছে। আগেকার মত মাঝেজির আওয়াজ। গেটের কাছে মোটর ঝাড়াইয়া আছে।

সমস্তই পূর্কের মত বথানিয়সে চলিতেছে অথচ... একটা অদ্ভুত হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল। সে কি বোকা!...অথচ এক মুহূর্তেব জন্ত সে কত গভীর সম্বল লইয়া ওই বাড়ির ছ্যারে ঝাড়াইয়াছিল। ভাবিতেও হাসি পায়। আলনা হইতে চানরটা টানিয়া লইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। পথে পথে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানও ভাল। কিন্তু ওই বাড়ির ওই জানালার হুমুখে বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর। ভিতরে ভিতরে নারীদেহের ছায়ার প্রতিও তাহাব ঘন বিভূষণ ধরিয়া গিয়াছিল।

২৭

আব কয়েক দিন পরে নিখিলের এম-এসসি পবীক্ষা। আজকাল তাহাকে পড়াশোনার বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয়। যামিনী এ মেসু হইতে উঠিয়া গিয়া ধর্মতলা অঞ্চলে খুব বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে। সে এখান হইতে অনেক দূর। নিখিল এখনও একদিনও সেই বাসায় বাস নাই। মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, পরীক্ষার পড়ে ধীরেদুস্থে একদিন বাইবে। ভাবিয়াছিল, এতদিনে তাহাদের ছোটখাট মনোমালিন্য নিশ্চয় দূচিয়া গিয়াছে। যামিনী যখন আলাদা বাসা করিয়াছে তখন নির্মলাকে নিশ্চয় লইয়া গিয়াছে। বন্ধুর বাসায় হঠাৎ একদিন গিয়া পড়িয়া তাহাকে পুলকিত এবং বিস্মিত কবিতা তুলিবে। নির্মলার সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া আদ্যার করিয়া তাহার হাতের ঢালা চা এবং তাহার হাতের সাজান খাবার চাহিয়া চাহিয়া থাকিবে। এমনি আবও নানা ছোটখাট সুখের কল্পনায় তাহাব পুস্তকাকীর্ণ আসন পবীক্ষাব দিনগুলো ভালই কাটিতেছিল। কেবল মনের মধ্যে একটু অভিমান ছিল যামিনী নিজের বাড়িতে গিয়া অবধি একদিনও এখানে আসে নাই।

দিন কুড়িক পরে পবীক্ষা হইয়া বাইবার পরদিনেই নিখিল বিকাশের দিকে বন্ধুর বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। বগন সেখানে পৌছিল তখন সবোন্ন সন্ধ্যা শুরু হইয়াছে। বাস্তায় গ্যাসেব বাতিগুলো জলিয়া উঠিয়াছে। নিখিল অবা ক হইয়া দেখিল মস্তবড় বাড়ি। গালিচার, ছবিতে, সোকা কেন্দারায় একেবারে আকীর্ণ। এতবড় বাড়ি এবং গৃহসজ্জাব এমনতব রুচি যামিনীব কবে হইতে হইয়াছে সে ভাবিয়া পাইল না। সামনের ঘরটার কড়া আলো জলিতেছে। শূন্ত ঘর, কেহ কোথাও নাই। সামনে এক জন ভৃত্যকে পাইয়া প্রশ্ন কবিল, ‘বাবু কোথায়?’

‘ভিতরে আছেন।’

কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সে ঠিক করিল নিজেই ভিতরে বাইবে। মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, বন্ধুবর বহুদিনের বিরহের পর স্ত্রীকে কাছে পাইবা অন্তঃপুরের মধ্যেই নিমগ্ন। এখন বাহিরে আসিবেন কি? ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল কোণের

দিকের একটা ঘরে একা বসিয়া বামিনী কি করিতেছে। নিখিল কাছে আসিয়া পিছন হইতে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল। বামিনী এমন ভাবে চমকিয়া উঠিল যে, নিখিল অত্যন্ত আশ্চর্য হইল। সে যেন কোন একটা গভীর ছদ্মভাব মাঝে ধরা পড়িয়া গিয়াছে,—এমনই তাহার ভাব। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মুখে, শুক হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, “চল বাইবে গিয়ে বসি গে। তাব পর? এত দিন বাদে হঠাৎ কি মনে ক’রে?”

নিখিল বাইরে গেল না। তাহার কদমে টেবিলের উপর যে কয়েকটা জিনিষ রাখা ছিল তাহা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কয়েকটা কাঁচের গ্লাস, একটা সোডার বোতল এবং হইন্সির বোতলের ছিপিতে কৰ্ক-জু আঁটা।

নিখিল মুখ তুলিয়া বন্ধুর দিকে চাহিল। তখন আশ-পাশের বাড়িতে সন্ধ্যার শব্দ বাজিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সেই কল্যাণপূর্ণ শান্তির মাঝখানে বামিনীর মুখে সে অশান্ত বেদনাব কালিমা দেখিতে পাইল। তাহার হাতটা আপন হাতে আবদ্ধ করিয়া কহিল, “চল, একটু বেড়িয়ে আসি গে। কথা আছে।”

‘এখন!’—বামিনী ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, ‘এখনই দেবীপ্রসাদ আসবে। তার সঙ্গে একটু কাজ রয়েছে। কাজটা সেবে যাবে।’

‘দেবীপ্রসাদ কে?’

‘তার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ। যে ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা জমা আছে সে আগে তার খাতাফি ছিল। পাকা লোক। তার সঙ্গে একযোগেই তো ব্যবসাসে নেমেছি।’

‘এমন পাকা পবামর্শদাতা কবে থেকে জোটাতে? কিসের ব্যবসা? তোমার মন এত অস্থির। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখনই ব্যবসা করবার কি দরকার ছিল?’

‘কিছু একটা না করতে পারলেই বরঞ্চ মন অস্থির হয়। লোকে যে বলবে আমি কিছু কাজ করি নে সেইটাই আমার পক্ষে অসহ্য।’

‘বামিনী, আমি বলছি তোমার মন কখনই স্থস্থ নেই। অনেক সময় কিছু না ক’রে চুপ ক’রে থাকতে পারাই মনের পক্ষে ভাল। কিন্তু যাক ওসব তর্ক। কেবল একটা কথার

আমার জবাব দাও; এ সব কি?’ নিখিল অঙ্গুলি দিয়া টেবিলের উপর গ্লাস এবং বোতল দেখাইয়া দিল।

বামিনী অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ‘আমি মাতাল হবার জন্তে খাই নে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় মনটা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে থাকে। রোজ ঠিক এই সময়েই দেবীপ্রসাদ খবর আনে সমস্ত দিনের শেরার মার্কেটের কলাফল। মনের অধীরতা কিছুতেই চুপ ক’বে সহ্য করতে পারি নে। কাল ঠিক এই সময়ে তিন হাজার টাকা লস দিয়েছি, কিন্তু তাব আগের দিন সাড়ে চার হাজার টাকা পেয়েছি।’

‘তুমি শেরার মার্কেটেব খেলা খবেছ? কিন্তু ও যে এক বকম জুয়াখেলা।’

চাকর আসিয়া খবর দিল বাইবে দেবীপ্রসাদবাবু আসিয়াছেন। বামিনী চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, ‘আমি এখনই আসছি। আধ ঘণ্টার বেশী দেবি হবে না।’

নিখিল চুপ করিয়া বসিয়া বহিল। সে অন্তঃপুর হইতে কোনখানে একটু চুড়ি বিগিঠিনি, কোনখানে একটু ঠোঙের সাড়া, চারের পেশবার হুঁঠাং আগুয়াজ, কোন-খানে একটু সুকোমল পদশব্দ শুনিবাব জন্ত উৎসুক হইয়া রহিল। কিন্তু কোনখানে কোন ধ্বনি নাই। নিরানন্দ বাড়ি নিঃশব্দ। কিছুক্ষণ পরে একটা চাকর ঘরে ঢুকিল। নিখিল তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “মাজী কি এবাড়িতে নাই?”

‘মাজী!’ সে এমন অবাক হইয়া তাহাব দিকে চাহিল যে নিখিল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল নির্দ্বন্দ্বা এখানে নাই বা কোন দিন আসে নাই। চাকরটা টেবিলের উপরকাব গ্লাস ও বোতল উঠাইয়া লইয়া বাহিরের ঘবে চলিয়া গেল।

মিনিট কুড়ি পরে এলাচ দেওয়া পান চিবাইতে চিবাইতে চান্দরে অন্তর মাখিয়া প্রহ্লাদ মুখে বামিনী এ ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

তাহাব এত করিয়া সুগন্ধ মাখিয়া আসাব এবং এলাচ খাওয়ার ঝটাব ভিতরকার কারণটা বুঝিতে পারিয়া নিখিলের চোখে জল আসিয়া পড়িল। মনে মনে একটু যেন বিতৃষ্ণার সহিতই ভাবিল, এই ধরণের সেক্টিমেন্ট্যাল

লোকেদের প্রকৃতির মধ্যে কোন একটা ধারাবাহিকতা নাই।
ভাবের রসে বৃন্দ হইয়া সপ্তম স্বর্গে উঠিতেও ইহাদের যত ক্ষণ,
একেবারে মাটিতে লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতেও তত ক্ষণ।
তাহার এতদিনের বন্ধুর শেষে এমন শোচনীয় অধোগতি
হইয়াছে যে তাহার চোখের সুস্থে মদ এবং সোডা গ্লাসে
মিশাইতে না পারিয়া চাকরকে দিয়া অপর কক্ষে লইয়া
গিয়াও থাইয়া আসিল। একথা মনে হইতেই তাহার সমস্ত
মন বেদনার ভরিয়া উঠিল।

হু-জনেই বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। কথা হারাইয়া
গিয়াছে। তাহাদের বন্ধুত্ব যেন নিশ্রাণ নিশ্রাণ।

নিখিল চেয়ারটা, টেলিগ্রাফ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,
‘এবারে উঠি। এত ক্ষুধি কেন? খবর ভাল?’

‘ভাল। দেবীপ্রসাদ খবর দিয়েছে কাল মার্কেটের দাম

চড়বে, যে শেষাবশ্তলো কেনা রয়েছে তাহাদের ছাড়লে মোটা
চাকা পাওয়া যাবে।’

‘ভালই। আচ্ছা, আজ আসি।’

নিখিল উঠিয়া ছয়ারের কাছ পর্যন্ত গিয়াছিল। যামিনী
টেবিলের উপরকার ব্ল্যাট প্যাডে আঁচড় কাটিতে কাটিতে
কহিল, ‘আচ্ছা, চক্রকান্তবাবু কেমন আছেন জানো?’

‘অনেক দিন ওদিকে যেতে পারি নি। পরীক্ষার
তাড়া ছিল। তুমি মনে করিয়ে দিলে এইবারে যাব।
চল না আমার সঙ্গে। কত দিন তো যাও নি।’

‘আমি! আচ্ছা চল। দু-মিনিট সবুর কর। মুখটা
ধুয়ে আসি। আমার আবার দু-বেলাই দাঁতমাজা অভ্যাস
আছে কি না।’

ক্রমণঃ

শিব-তাণ্ডব

শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ

দখিন সমীর বনে বহে ধীব পত্রশবন বচি,
কোণে কোণে উঠে বিকশি কুঞ্জে শ্যামল পত্রকুচি,
গন্ধবিঘ্ন মঞ্জরী এল অমিলকী সহকায়ে,
পলাশেতে গেল ছেঁয়ে বনতল কাঞ্চন কোবিদাবে,
শুভ্ররি অলি, ঝঙ্কারি পিক ‘বসন্ত বধু’ গাহি
নন্দন এল কোন্ পথে আজ কবিদলমুখ চাহি।
হেনকালে একি শ্রলয় ঝঙ্কা ধুমল জশানপানে
বিজ্ঞাৎক্ষণা বিধারি ‘কালীর’ বজ্রব বিষ হানে,
নাশে জীবকুল বনানী আকুল ধবণী ধ্বংসে ঢাকে,
বনস্পতির কেঁপে উঠে শির ছিন্ন লতিকা শাখে;
হায় কোথা এব মিল,
হুম্বব এষে সর্কনাশেব চরণে মরণ-নীল!

নদীর কিনাবে যুগ যুগ ধরে ছায়ানব প্রান্তরে,
বাখালেব স্নেহ বাশরী শাসনে খেলুমেঘপাল চবে,
অদূরেতে গ্রাম, আঁকা-বাঁকা পথে গেহগুলি সাবি সারি,
স্নেহ প্রেম দয়া হুংখ হুংখতে বাস করে নরনারী;
মাঠে মাটি চষে’ শস্ত জাগায় আঙনে ফুটায় ফুল
বত সহি বহি যতটুকু লাভে, হায় কোথা তার ভুল।

তবু হুখে থাকে,—হেনকালে আসে বিভীষণ মহামারী,
ধর্ণী ঝঙ্কা, প্লাবনী বজ্রা পুঞ্জিত রোষে তারি;
অতর্কে রহে শত নাগবিক শ্রান্ত শবনতলে,
কম্পিষা উঠে বিপুল বহুধা বাহুকীর ফণা টলে;
শ্মশান রচিয়া যায়,
বিহগীর নীড়ে কাল-ভুজঙ্গ কেন নাহি বুঝা যায়।

এ কি অকারণ পরিহাস তর, ভগবান্! ভগবান্!
শত ‘তৈমুরী’ শ্মশান বচিয়া চলে তব অভিধান!
পলক ফেলিতে সহ্যে না ক. স্বর ধরণীবে দ্বিধা করো,
অতি অসহায় নিরপরাধেরে লক্ষ জঠবে ভরো,
তুমি দেছ মাটি কোটি বরষের তুমি দেছ জলবায়ু,
স্নেহ পরসাদ রবি শশী দেছ সুদীর্ঘ পরমায়ু,
তুণে দেছ ফুল, কীটেরে বরণ, বিহগেব গলে গান,
তরু-সম্মর বায়ু-হিল্লোল নদীবুকে কলতান;
তুমিই আবার ধুজ্জটি বেশে গগনে এলায়ে জটা
হুনীল লোহিত! অকাবণে হানো তৃতীয় নয়ন ছটা;
মূঢ় বিস্মিত হায়,
শিব-তাণ্ডব মূবতি তোমার কিছু নাহি বুঝা যায়!

কোনটি চান ? ৩৮

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

দশ বৎসর পূর্বে একবার কলিকাতায় বর্ষা তিন মাস ছিলাম। মেহোবাক্সার ষ্ট্রীটের নিকটে বৈঠকখানা রোডের এক গলিতে বাসা ছিল। বাড়ীটি নূতন, ছতলা, তেতলা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে খোলা। নূতন পাড়া, নূতন বাসায় গেলে জানতে ইচ্ছা হয়, পাশে কে থাকে, কি করে। আমি সকালে বেলা ৮টার সময় বাসায় উঠি। পশ্চিমের ছতলার বারান্দা হ'তে দেখলাম, সমুখে ছোট উঠান, ইট-বাধা, বাঁ-দিকে এক অট্টালিকার বাম ও পশ্চাৎ পার্শ্ব। ডীনদিকে একটা একচালা, একচালাতে গোটা চাবি গাই আছে, বড় বড় গাই। একচালার বাইরে একটি বাছুর, পুটুদেহ, ঈড়িয়ে। কাছে একটি লোক বসে ছিদ্র, দীর্ঘাকাব, দীর্ঘনাসা, এককালে বলিষ্ঠ ছিল, বিহারী আহীর হবে। উঠানের বাঁদিকে অট্টালিকার গায়ে জলের একটা বড় চৌবাচ্চা, নিকটে জলের ছটা কল। কে এই প্রাসাদে থাকে ?

বেলা ১১টার সময় দেখি দশ, পাঁচ, পনের বালক চৌবাচ্চার জল খুঁচি খুঁচি মাথায় চালছে, কেহবা জলের কলের তলে কাপড় কাচছে, আর কেহবা গামছা আছড়ে আছড়ে, বোধ হয়, স্নাতা বার করে ফেলছে। আবার দশ বারটি এল, তারাও মাথায় খুঁচি খুঁচি জল ঢেলে কাপড় কাচতে ও গামছা আছড়াতে লেগে গেল। ছেলেদের বয়স বার হ'তে সত্তর আঠার বছর হবে, বাঙ্গালী নয়, পশ্চিমাঞ্চলের।

খুঁচাখানেক পরে দেখি, কোন ছেলে লে'হ'র তাওয়া, কেহ পিতলের থালা, কেহ পিতলের বাট্লে মাজতে বসে গেছে। এমন মাজছে বেন কত কালের কি মলা লেগে ছিল।

বেলা ৩টার সময় অট্টালিকার একতলার সামনেব ঘরে দেখি ছেলেরা বসে গেছে, পাঠ পড়ছে। এটা কি পশ্চিমাঞ্চলের ছেলেদের টোল ?

বেলা ৫টার সময় দেখি জলের চৌবাচ্চা ও কলের কাছে মধ্যাহ্ন কাণ্ড চলছে। মাথায় খুঁচি খুঁচি জল পড়ছে, কিন্তু এখন কাপড় ও গামছা কাচার ধুম নাই।

সন্ধ্যার পর তাদ্ভিত-দীপ জ্বলো উঠল। এখন সে ঘরে অনেক ছেলে, সবাই চুপ করে বসে আছে; কে যেন কি বলছে। আষাঢ়টার পর, বোধ হয়, শতকণ্ঠে এক মন্ত্র হুস্ব দীর্ঘস্বরে উচ্চারিত হ'তে শুনলাম। তার প্রথম ভূটা শব্দ, 'হবে মুরারে'।

রাত্রি ১০টার দীপ নির্বাণিত। অত বড় অট্টালিকায় সাড়াশব্দ নাই। রাত্রি ৩৥ টাব সময় ঘণ্টা বাজতে লাগল, ঘর আলোকিত। ছেলেরা কে'থায় বেরিয়ে যেতে লাগল।

পরদিন সকালে ৬টার সময় দেখি দলে দলে ছেলে এসে কলের কাছে কাপড় কাচছে, গামছা কাচছে। দশ পনের জন নয়, চল্লিশ পঞ্চাশ হবে, কি আরও বেশী। ৭টার সময় সেই ঘরে ছেলেরা বসেছে, কে যেন কি বলছে, তারপর সেই মন্ত্র। শ্লোকটি বৃষ্ণতে পারলাম।

হরে মুরারে মধুকটভারে।

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশোরে ॥

তারপর সে ঘরে জনকনৈকে পড়তে দেখলাম। এক মধ্যবয়স্ক অধ্যাপক পড়াচ্ছেন। প্রত্যহ এই ব্যাপাব দেখি।

বর্ষাকাল—ঝম্-ঝম বৃষ্টি হ'চ্ছে, ছেলেদের দৃকপাত নাই, ভিজতে ভিজতে গঙ্গানান করে কলতলার আসছে। ভিজতে ভিজতে তাওয়া, থালা, বাট্লে মাজছে। ছাতা নাই। বৃষ্টির পর শীত পড়লে গায়ে চাদরও নাই। এত ছেলে, তিন মাসের মধ্যে ঝগড়া মারামারি দেখি নি, কলরবও শুনি নি।

এরা কে ? কে পড়ায় ? কে দেখে শুনে ? জানতে প্রবল ইচ্ছা হ'ল। একদিন হু'বোগও পেলাম। আমরা বঙ্গদেশে ত্রীপক্ষমীর দিন সরস্বতী-পূজা করি। ওড়িয়া ও পশ্চিমাঞ্চলে গণেশ চতুর্থীর দিন গণেশ-পূজা হয়। আমি

পূজার পূর্ব দিন নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম। উঠান হ'তে অধ্যাপকেরা আমায় দেখেছিলেন, কখনও বই-হাতে, কখনও সংবাদপত্র-হাতে; ভেবেছিলেন আমিও এক পড়ুয়া। বয়স হয়েছে, শ্বেত কেশ-শ্রবণও আছে। স-ধর্মী প্রতিবেশীকে পূজার নিমন্ত্রণ অবশ্য কর্তব্য।

পরদিন বেলা ৯টার সময় পূজা দেখতে গেলাম। বৈঠকখানা রোড হ'তে আমহাট্ট ষ্ট্রীট পোস্টাপিসে যেতে ডোন দিকের ৯৩৩ নম্বর বাড়ী। অট্টালিকাব উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'শিবকুমার সংস্কৃত-বিদ্যার্থী ভবন।' ভিতরে ঘরে দেখলাম নীচের প'ড়বার ঘরখানি বনমালার সম্বিত হয়েছে, এখানে ওখানে ফুল ঝুলছে। এক মৃন্ময় গণেশ-প্রতিমার পূজা হয়েছে। ঘরের ভিতরে ত্রিশ চল্লিশ বালক এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, কিন্তু চোঁচামেচি নাই। সন্ধ্যার সময় আবার গেলাম, অনেক গণ্যমান্ত মারআড়ী ও বাঙ্গালী বসোছেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এক ব্যাখ্যান শুনলাম।

পবদিন বেয়ে শিবকুমার-ভবনের বৃত্তান্ত শুনলাম। মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী-জ্যোতিষ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কর'তে এসেছিলেন, দেখলেন সেখানে বিদ্যার ক্রয়-বিক্রয় হ'চ্ছে। তাঁকেও বিদ্যা বিক্রয় কর'তে হ'ব। তিনি এই দৃব্য কর্ম ছেড়ে দিয়ে এই বিদ্যার্থী-ভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক অধ্যাপক বাঙ্গালী, তাঁর নাম পণ্ডিত ত্রীচণ্ডীচরণ তর্কবন্ধু। তাঁর দশ বৎসরের এক পুত্রও ভবনে থাকে। শতাবধি বালক বিনাব্যয়ে সংস্কৃত বিদ্যা লাভ কর'ছে। এদের সঙ্গে পাঁচ-ছ জন অধ্যাপক থাকেন। ভবন হ'তে ভোজ্য এবং মাসিক কুড়ি-পঁচিশ টাকা পান। বাসকেরা চাঁল, ডাল, আটা, ঘি পায়। কাঠ, হুন ও যৎসামান্ত আনান্ন নিজের পরসায় কেনে। এরা কিন্তু কোথাও ভিক্ষা কর'তে যায় না। ভবনও কাবও কাছে হাত পাতে না। পুণ্যালীর অঘাতিত দানে ভবনের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

বহির্দ্বারের বা-দিকে একখানি ছোট একতলা ঘর আছে। সেখানে আবুর্বেদ শিক্ষা দেওয়া হ'ত। অধ্যাপক মহাবাহুবীর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এই বর্ষাকাল, শতাবধি বালকের মধ্যে কত জন রোগে পড়ে? কি রোগে

পড়ে? তিনি বললেন, এমন কিছু নয়, তিন চারি জন কখন সামান্য উদরাময়ে কখনও সামান্য জরে পড়ে। লক্ষ্মণ ও পাচনেই প্রায় সেবে যায়। কদাচিৎ অল্প ঔষধ দিতে হয়। বালকদিকে দেখেও মনে হ'ল, দেহ পুষ্ট নয় বটে কিন্তু স্বস্থ। ভবনের অত্যন্ত বৃত্তান্ত সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

২

আমার বাসার ডোন দিকে ছ-সাত ফুট দূবে আর এক প্রাসাদ। আমার ঘরের জানালা ও সে প্রাসাদের জানালা দিয়ে একটা ঘর দেখতে পেলাম। এ প্রাসাদে কে থাকে? দেখলাম, এক যুবা, কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উত্তম টেরিকটা, গায়ে গেঞ্জি। একটা দোড়িতে তিন চারিটা ক্রমাল ও তিন চাবিটা রঙ্গিন মোজা ঝুলছে। বোধ হয় সাবান দিয়ে কাচা হ'য়ে শুখাতে দেওয়া হয়েছে। যুবাটি ঘেঁই হ'ক, সৌখিন বটে। বর্ষাকাল, কাদাজলের ছিটা মোজায় লাগবাবই কথা, জুতাও কোন্-না তিন চারি জোড়া আছে।

১১টার সময় আহাবের পর আমাকে আয়বণ্টা বিছানায় গড়াতে হয়। ১১টা হবে, সেইমাত্র শুবেছি, সে ঘর হ'তে দেবদারু কাঠের বাক্সের বাজনা বাজছে। গড়ের গোবাব চাক। একটু পবে তক্তাপোষের শুড়গুড় ধ্বনি উঠছে। আমি নুতন শুনছি। কানের কাছে নানা পবং বাদ্যে ঘুম আর হ'ল না। ৩টার সময় সে ঘর হ'তে তর্কাতর্কি শুনতে পেলাম, পবে শব্দ শুনে বোধ হ'ল মুষ্টিবদ্ধ চ'লছে। তারপব একবার বাঁশী, একবার হারমোনি বাজছে। এটা পর্যন্ত এরকম চ'লতে লাগল। সন্ধ্যার পর তাড়িত-দীপে ঘব আলো হ'য়ে উঠল, শুনতে পেলাম ততিন জন গল্প কর'ছে। পরদিন সকাল বেলা, ৬টা হবে, সে ঘর হ'তে কে 'রাজাল' 'রাজাল' বল্যে ডাকছে। নীচের তলা হ'তে কে উত্তর দিলে, "এই বাচ্ছি"; বুঝলাম রাজাল। আমি রাজাল নাম কখনও শুনি নি; নামটা রাখাল না আব কিছু, কে জানে। বোধ হয় চায়ের গরম জল দরকার।

ছতিন দিন এই রকম শুনতে শুনতে কৌতূহল হ'ল, কার বাড়ী, কে থাকে? মেছোবাজার হ'তে কলিকাতা মিন্সিপালটির গাও-খানা পাশে রেখে পথ আছে। নামটা গাও-খানা, কিন্তু তখন বোড়াখানা হয়েছে। বাস্তার ময়লা বইবার গাড়ী ও বোড়া থাকে। দেখি প্রাসাদ-ভিত্তি স্থল,

বেন যুগান্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। এদিক হ'তে কোন সন্ধান পেলাম না। আমহাট' স্ট্রীটে যেয়ে বুঝলাম, সেণ্ট পলস্ কলেজের হোষ্টেল। সৌবিন যুব টি কলেজের ছাত্র, কিন্তু পড়ে কখন? খ্রীষ্টান সমাজে বস্ত্র কিছু বেশী লাগে, কিন্তু বিনাপাঠে ডিগ্রি পাওয়া যায় না।

৩

ইকুলেব ও কলেজের হি দু ছেগেদের হোষ্টেল আছে। ইকুলেব হোষ্টেলে বাবুগিরি কিছু কম, কিন্তু কলেজের হোষ্টেলেব যুবাদের অর্থব্যয় কম হয় না। প্রাসাদে হোষ্টেল, এতে দোষ নাই। কত কত ছাত্র, কত বৎসব বৎসর থাকবে। শিবকুমার-ভবনও প্রাসাদ। দরিদ্র বালকেরা আছে, কিন্তু টাকা নাই বল্যে ব্রহ্মচারী, একথা ব'লতে পারি না। শিবকুমার-ভবন একটা মঠ, কেন যে 'ভবন' নাম হয়েছে, জানি না। মঠ দেখি; আর ইকুল, কলেজ, হোষ্টেল বিদেশী। সেখানে বিলাতের হাওয়া বইতে থাকে। সে হাওয়ায় দেশের মানুষের মত থাকা কঠিন। ইংরেজী নামগুলো আমাদেরকে বিদেশী করে ফেলে। তথাপি নাস্তিকেরা নামের মাহাত্ম্য মানে না।

নাম-মাহাত্ম্যের একটা উদাহরণ দি। জলে সাঁতার দেওয়া, খেলা করা বিলাতী আবিষ্কার নয়। দেশে নদী, পুকুর, দীঘি আছে, গ্রীষ্মও প্রচুর। পূর্বীত জগন্নাথদেবের চন্দন-যাত্রার সময় (বোধ হয়) একমাস নরেন্দ্র-সরোবরে হাজার হাজার লোক বিকাল বেলা জল-ক্রীড়া করে। ধুতি পরা গামছা কাঁধে নবোজর বাটে আসে, মাল-কোচা করে, কেঁমরে গামছা বাঁধে, জলে বাঁপিয়ে পড়ে। কেঁহবা ধুতি ছেড়ে গামছা পব্যে লাঙ্কিয়ে পড়ে। গামছা সাত হাত লম্বা, বহবে খটি। দাঁড়া সাঁতার, চিংসাঁতার, ভাসা সাঁতার, যে যেমন পারে, দেয়। আনাড়ীরা কলসী নেয়, কেঁহবা সোনার আঁটি ছ-বগলে দিয়ে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে

জল দাঁড়িয়ে থাকে। দলে দলে গানও গাইতে থাকে। বেশির ভাগ, পাণ্ডা। এই জল-কেলি যে বহু পূর্বকাল হ'তে আছে, তাব একটা প্রমাণ দি। যারা সৌবিন, তাবা কাঁধে মর্কটশিশু (লীলামৃগ), কিম্বা হাতে শূকপক্ষী (লীলাশূক) নিয়ে আসে। কলিকাতার গোলাদীঘি নামে পুকুরে বালক ও যুবকদের জলখেলা দেখেছি। শুনি, এরা সাঁতার

দেয় না, swimming exercise করে। আর যদি swimming, তা হ'লে swimming costume চাই। এটা দাদিয়া-গেঞ্জি, গায়ে লেপটে থাকে। এটা শাদা হ'লে মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হবে, নীল রঙ্গের হওয়া চাই। বাজারে কিনতে হয়। চাপকা পণ্ডিত থাকলে ব'লতেন, 'বাণু, যখন নৌকার চ'ড়বে, তখন সাঁতাবের নীল পোষাকটি সঙ্গে বেখো, কি জানি নৌকাডুবি হ'তে পারে।'।

রাঁচিতে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় আছে। আমি দেখি নি। নামটা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, না ব্রহ্মচাণি বিদ্যালয়, মনে প'ড়ছে না। বছব আষ্টেক আগে, জনকয়েক ছাত্র ইংরেজী ইকুলে পড়্যে মেট্রিক পাস হ'তে বাঁকুড়ায় এসেছিল। এক ছাত্রের কলিকাতাবাসী পিতার অনুরোধে তাদের বাসায় গেছলাম। পুত্রের নাম, তারক গাঙ্গুলী। তারা এক ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে থাকত, দশ বার জন। দেখি, এক পাচক আছে, ভৃত্য নাই। ছাত্রেরাই চাঁল, ভাঁল কিনে আন। ছ'এক জন প্রত্যহ বাস্কার যায়, নিজেরাই আনাঙ্গপাতি ব'য়ে আনে। একদিন দেখি, তারকের কাঁধে একটা বড় ভারী বাক্স। সে রুয়ে রুয়ে চল্যেছে। তাকে দেখে আমার কষ্ট হ'ল। আমি ব'ললাম, 'তারক, তুমি এত ভারী বাক্স বইতে পাববে কেন?' সে ব'ললে, 'এত পথ আনতে পেবেছি, ঐ ত বাসা দেখা যাচ্ছে।' রাজপথের মাঝে, কতলোক আসছে যাচ্ছে তাব সঙ্কেচ হয় নি। তার পিতা দরিদ্রও নহেন, মুটে-খরচ অক্লেশে দিতে পারতেন। দিলে কিন্তু ছেলেকে ব্রহ্মচারী ক'বতে পারতেন না। যে গেরুয়া ধুতি পব্যেছে, গেরুয়া উত্তরীয় নিয়েছে, (গেরুয়া 'পাতাবী' কিন্তু অবিধি), বার পায়ে এই কাঁকরো পাথর্যে পথে জুতা নাই, সে মুটের মাথায় বাক্সটি দিয়ে ফুলবাবু সেজে গেছ গেছ যেতে পারে কি? বিবয়-ভোগ ও ব্রহ্মচর্য পবম্পর বিরোধী।

৩

কলিকাতায় হাজার হাজার ছাত্র কলেজে পড়ে। যাদের নিবাস কলিকাতা, তারা কলিকাতায় থাকবে, প'ড়বে। কিন্তু যাদের নিবাস কলিকাতায় নয়, তারা কলিকাতার কোন্ গুণেব জন্তে, কোন্ মুখের আশায় সেখানে প'ড়তে আসে? কলিকাতায় বাসেব সুখ নাই। কেমন

করোই বা থাকবে? একটা জেলার লোক জড় হয়েছে। এই চলিত ইংবেঙ্গী সাগের শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, তিন ঋতু কলিকাতায় কাটিয়েছি। কাজকর্ম ছিল না, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় অবাহত ছিল। শীতকালে দেখি, সকালবেলা ৮টা ৯টা পর্যন্ত কুআসা। এই কুআসা ভালও নয়, ইনফ্লুঞ্জা বয়ে আনে। এবার সকাল বেলা নাকে কালি পাই নি, কিন্তু ঘরের মেয়ের কালি, শাদা বিছানার কালি। হু-বেলা রাত্তা ধোআ হ'চ্ছে, মোটর দৌড়ানাব খুলাও প্রায় নাই, কিন্তু ঘর এত খুলা হয় কেন? হু-দিন নিকানা না হ'লে কোণে কোণে কাপড়ের আঁশ জমা হয়। কলিকাতায় বেক্টিরিয়া-বিৎ আছেন। তাঁরা খুলা নিবীক্ষণ করেছেন কি না, জানি না।

প্রকৃতিকে জব্ব করাই সভ্যতা। কলিকাতা সভ্য, পঞ্চইন্দ্রিয়কে কর্মচ্যুত করেছে। গ্রীষ্মকালেও দেখেছি, সকলেরই গায়ে জামা। বড় বড় বাস্তার পাশে ঠাঁড়িয়ে দেখেছি, হাঁজাব হাঁজার লোক চলোছে, কেবল সেখানে সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ববি-কর দেহ স্পর্শ ক'রতে পাবে না। বর্ষাকালের হুপর বেলার পচা গরমে ঘামের স্রোত বইছে, দেহেই শুখাচ্ছে! কেবল অসভ্য মুদী ও ময়রা, মুটে ও রিকশ-টানক আতুড় গায়ে আছে। কদাচিত্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বোধ হয় গেরো, উড়ানীখানা আধ-কাঁধে ফেলে চলোছেন। এই সব অসভ্যদেব শরদী-গরমী হয় না, এরা ১০৫ ডিগ্রি গরম টের পায় না।

কলিকাতায় বাড়ী আব গাড়ী। বাড়ী নয়, এক এক অট্টালিকা, এক এক প্রাসাদ। গাড়ী অল্প, খুজতে হয়। মোটর-বথ শূকরের মত ঘেঁঁৱ ঘেঁঁৱ ক'রতে ক'রতে সোজা দৌড়েছে, তুমি পাশে, মব আব বাচ, দেখতে পায় না। রথ এমন কদাকার হ'তে পাবে, না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। কিন্তু এত ঘন বোম্বাই শহরেও আছে কি না, জানি না।

একটা জেলাব লোক কলিকাতায়, কিন্তু আধ কাঠা সাগের ক্ষেতও নাই। বাসি আনাজ, বাসি মাছ, জাল-দেওয়া বাসি দুধ অপরিপুষ্ট পাওয়া যায়, রেল পাতা আছে, দেশ-বিদেশ হ'তে আসছে। প্রফুল্ল এক শিরোমণি হোটেলে থাকে, হু-বেলা খেতে পায়, মাসে মাসে তের টাকা দেয়। তাঁর

নিবাস রাঢ় দেশে, বেদেশে ষাণ্ডসামগ্রীর স্বাদ আছে। সে কলিকাতা শহরে নুতন চাকবি ক'রতে এসেছে। সে ভাতের সঙ্গে এক খামচা নুন না মাখলে ভাত খেতে পাবে না, ভাতের স্বাদ নাই। চার পাঁচটা ব্যন্ন পায়, ঝালব আশ্বাদ পায়, আনাজেব ও মাছের আশ্বাদ পায় না। তার আবও বিপদ, ১টা বাজতে না বাজতে ক্ষিদেয় চোখে দেখতে পায় না। ময়রাদের পোয়া বার, এক এক জন দশ বার বছরের মধ্যে দু'একখানা বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে। একদিন আমহাষ্ট্রী ষ্ট্রীটে এক ময়রার দোকানের সামনে ঠাঁড়িয়ে লুচিভাজা দেখছিলাম। কলিকাতার ময়বার লুচি হাওয়ায় উড়ে যায়, আর গাছের ডালে লাগলে চিটিয়ে যায়। এর লুচি মোটা ও ছোট। 'হে হে মোদক, মোটা লুচি ক'রছ, ভেসে উঠতেই তুলছ বে।' সে একটু হাসল, দেখলে দাড়ি পাকিয়েছি বটে কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি। 'এ লুচি নয়, পুরী।' 'এতক্ষণ কাছে আছি, ঘিয়ের লুচি-ভাজা গন্ধ পাচ্ছি না?' সে আবার হাসল, গেরো মানুষকে কত বুঝাবে। বৌ-বাজারে এক ময়রার দোকানে একগালা কাল কাল এক নুতন মিষ্টান্ন দেখলাম। 'ও হে, ঐ কালগুলার নাম কি?' 'গোলাপজাম।' 'কিসের, কেন এত কাল করোছ?' 'গোলাপজাম, লাল-কাল ক'রতেই হবে।' ময়রাটির মনেও বস ছিল। 'আজ্ঞে, শুনবেন, এটি আমার আবিষ্কার নয়। অমুকের দোকানে দেখলাম, খুব বিক্রি হচ্ছে, নুতন কি-না। সে ছোট ছোট পানভুয়া ক'রছিল, কি এক কাজে তাড়াতাড়ি উঠে গেছিল। ফিবে এসে দেখে, বস চুঁয়ে গেছে। পাঁচ-ছ সের জিনিস ফেলে দিতে পাবে কি? গোলাপজাম নাম দিলে, আব হ হ করে বিক্রি হয়ে গেল। কত ছেনা আছে, ভাবতেও হ'ল না।'

কলিকাতায় বাসাভাড়া বেশী, হোটেলে ঠাণ্ডি-ভাড়াও বেশী। স্কটস্ লেনে আমাকে এক যুবকের সন্ধান ক'রতে হয়েছিল। সে এক মেস-বাড়ীতে অর্থাৎ একান্নভোজীর বাসায় থাকত। বাব হ'তে বাড়ীটা প্রাসাদ। চাকরোর সঙ্গে কলেজের জনকয়েক ছাত্রও থাকত। বাব সন্ধানে গেছিলাম সে চাকরো, পঞ্চাশ টাকা বেতন পায়। বাড়ী চুকে একজনকে জিজ্ঞাসলাম, 'এখানে অবনী থাকে কি?'

তিনি নাম শুনে হাঁ করে রইলেন, ‘অবনী?’ এখানে থাকে?’ আব একজনকে ‘জিজ্ঞাস্তে তিনি বললেন, ‘কি জানি, আপনি উপরে বেয়ে দেখুন।’ আমি বললাম, ‘উপরে যেবে কোন ঘরে খুঁজব?’ এই ভর সন্ধ্যায় সিঁড়ি বাইতে বেয়ে পা খসে পড়তে পারে। আপনি একটু কষ্ট কবো জেনে আছেন।’ বয়সেব ও শাদাচুলের মান আছে। ‘আপনি এই ঘরে বহন, দেখে আসছি।’ ঘরে ঢুকে দেখি তিনখানা ছোট ছোট তক্তাপোষ পড়োছে। ৯×১১ ফুট ঘর, উঁচুও ১০ ফুট। তক্তাপোষ বসে কোথায় বে পা নামিয়ে রাখি, জায়গা পাই না। ঘরের তিনজন সজ্জন, বোধ হ’ল, চাকরো, কিন্তু কি কষ্টে আছেন, সে বোধ হারিয়েছেন। অবনীকে পেলাম। কিন্তু আমার আশ্চর্য ঠেকল সে সে-বাসায় বৎসবাবধি আছে কিন্তু বাসার সকলে তাকে চেনে না; সে নামের কেউ আছে কিনা জানে না। ছাত্রেরা কলিকাতায় এই দুর্গতিভোগ কেন করবে?

কলিকাতায় নির্মল বায়ু নাই, গড়ের মাঠেও নাই। যদি থাকে বহু দক্ষিণে, গঙ্গার ধারে। সংস্কৃত কলেজের সামনেব রাস্তায় তত গাড়ী চলাচল হয় না, কিন্তু এক ‘রেস্তাবান’র পলাও বহনের গন্ধে নাক জ্বলো উঠে। সব গলিতে চুকবার জো নাই। বোদ নাই, যত রাজ্যের পচা গন্ধ আছে। সরু গলি বৃক্স-গৃহের গন্ধ তেতলায় হাওয়া-খানায় নিশ্চয় বইছে। প্রজ্ঞানন্দ পারক নামে একটা চারি পাঁচ বিরা খোলা জায়গা আছে, হাজাব ছেলেমেয়ে বিকাল বেলা একটু হাঁক ছাড়তে আসে, কিন্তু পাশের আমহাষ্ট স্ট্রীটেব ফুটপাথে দুটা বড় বড় আস্তাকুড় আছে, কত পচা মাছের, কত রকম মশের গন্ধে সে পথ ভয়ভয় কবতে থাকে। একদিন নয়, দুদিন নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সে পথ দিয়ে শতশত লোক যাচ্ছে আসছে, প্রায় সবাই নাক খুলে রেখে বেতে আসতে পারছে। গন্ধ-বহু অ-দৃশ্য; যদি দৃশ্য হ’ত দেখতাম সে বাতাস ছেলেমেয়েদের নাকে চুকছে, তাদের open air excursion দবকার হচ্ছে। যারা কলিকাতায় থাকেন, তাঁরা গন্ধ টের পান না। কিন্তু যখনই আমি কলিকাতা গেছি, তখনই হাওয়া টেশনে এক রকম ভদ্রকা গন্ধ পেয়েছি। পরে আর সে গন্ধ পাই না। কলিকাতাবাসী যে নাকে খাট, তাব এক অকাটা

প্রমাণ পেয়েছি। তিল তেল পেলে গ্রীষ্মকালে গায়ে ও মাথায় মাখি। সুবাসিত হ’লে উত্তম। যেটা পরে আসে সেটা আগের চেয়ে ভাল হ’লে থাকে। এই সামান্য বিধি অবণ করে একটা হালি তেল কিনে আনলাম। এক শিশির দাম ৮/০ আনা। শিশিব চেপটা আকার দেখে সন্দেহ হ’ল, শিশিটা টেবিলে সাজিয়ে রাখবার, না শিশিব তেল মাখবার। বিজ্ঞাপনের বাহার দেখে, সে সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছিল, মাথায় মাখতে সাহস হ’ল না। একটা কোঁটা মাথার এক পাশে মাখলাম, আর তার উৎকট গন্ধে মাথা ধরো গেল। তৈলকারের নাক নিশ্চয় ভোঁতা হ’য়ে গেছে, মুহু মুহুর গন্ধ টের পায় না। তেলটায় সত্য সত্য তেল আছে, না কেরাসিন আছে, দেখা হয় নাই।

কলিকাতাবাসীর কানকেও ধন্য। রাত্রি-দিবা ‘লবি’র বড় বড়ানি, মোটরের পৌ-ভেঁা শৃঙ্গধ্বনি, বিশেষ করে পৈশাচিক কিড়কিড়ানিতে কর্ণ-পটহচম’ ছিঁড়ে যায় না! তার সঙ্গে ‘রিকশ’র একতালা ঠাং ঠাং সইতে হবে। দুই এক দিন পরে দেখি আমিও শুনতে পাচ্ছি না! শুনতে পাই আর না পাই, কর্ণ-পটহচম’ ও কর্ণাস্থি নিশ্চয় বেগে ন’ড়তে থাকে। শুনি, অমুকেব nervous break-down হয়েছে। বাত-নাড়ী কোমল পদার্থ। ন’ড়তে ন’ড়তে মাথার খুলি ভাঙ্গে না, এই আশ্চর্য।

চোখেরই বা দোষ কি। যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেদিকেই সামনে শাদা দেওয়াল। শিশুকাল হ’তে কাছের জিনিস দেখতে দেখতে, বইর ছোট ছোট অক্ষর দেখতে দেখতে চোখও হুস-দৃষ্টি হ’য়ে পড়ে। ডাক্তার অভয় দিচ্ছেন, চশমা পরাচ্ছেন। অল্প বয়স, চোখে চশমা; এটা যে বিসদৃশ হ’চ্ছে, সে ভাবনা তাঁর নাই, আমাদেরও নাই। দিনের বেলা, ছপার বেলা, বাঙ্গালা দেশে, এই কলিকাতায় যেখানে সূর্য বছরে দুবার মাথার উপরে আসে, দীপ জ্বলে পঠন-পাঠন চলোছে, কিছুই বিসদৃশ ঠেকছে না। দীপও যেমন তেমন নয়। ‘এটা কত?’ ‘পঞ্চাশ বাতি’ ‘ওটা কত?’ ‘দুশ বাতি!’ ‘এত প্রখর দীপ কেন বসানা হয়েছে?’ ‘নইলে দেখতে পাওয়া যায় না।’ আমরা রেড়ীর তেলে সলিতা জ্বলে প’ড়তে পারি। সেটা কলিকাতাবাসীর অসম্ভব। ‘প্রবাসী’ ও ‘ভারতবর্ষ’ বার-মাসিকের চিত্র দেখে অনেক দিন

হ'তে জানতে ইচ্ছা হয়েছে, নববঙ্গীয় চিত্রকরদের নিবাস কোথায়। মনে হয়, তাঁরা কলিকাতাবাসী। তাঁরা দিনের আলোতে ঝাপসা দেখেন। আগে আগে দেখতাম, মানুষের, —দৈত্যের নয়, দৈত্যানীর নয়—মানুষের হাতের পায়ের আঙ্গুলের শেষ নাই। এখন বছর দুই হ'তে দেখছি, দেব দেবীই হউন, মানুষ মানুষীই হ'ক, সব আঁধারে বসে ঝাড়িয়ে আছে। এক এক চিত্রে এত অন্ধকার যে দ্রষ্টা বিভ্রান্ত না হ'লে কোথায় কি আছে, দেখতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রদেব শরীর দেখতে এক কমিটি নিযুক্ত কবোছেন। কমিটি দেখেছেন, কলিকাতার কলেজের ছাত্রদের শতকে ৩৩ জনের চোখ খরাপ। সোজা কথা, ৩৩ জন অন্ধ হ'তে বসেছে, পঞ্চাশ বছর আগে দুই এক জন দেখা যেত।

কলিকাতা-বাসের কষ্ট হাজাব হ'ক, লোক বাড়ছে, বাড়বে। সেখানে টাকা ছড়ান আছে, কত দেশের কত লোক বুদ্ধিবলে হু-হাতে কুড়াচ্ছে, কেহ আইন বাঁচিয়ে কেহবা আইনের চোখে ধুলা দিয়ে লুঠছে। কত কত ভদ্র অতিভদ্র, শিক্ষিত অতিশিক্ষিত লোক দ্বি-রূপ। তাঁদের এক রূপ বাইরে, আর এক রূপ ভিতরে। বাইরের রূপ দেখে মুর্খের ঠকে, আর ফেল-ফেল চেয়ে থাকে।

টাকা উড়াবাব এমন জায়গা আর কোথাও নাই। কলিকাতার অলিতে গলিতে কত সিনেমা, কত থিয়েটার, ও 'কার্ণিভাল' ছবি দেখিয়ে গান শুনিয়া বাজনা বাজিয়ে পথিককে মুগ্ধ করছে। কলেজ-ছাত্রেরা যুবা, তারাও মানুষ; তারা কি লুট হয় না?

যারা টাকা রোজগার ক'বতে চায়, তারা কলিকাতায় আসে। আর, যারা টাকা উড়াতে চায়, তারা আসে। কলেজের ছাত্র বিদ্যার্থী, এই হু-দ-ল-র বাইরে। সে কেন আসে?

৫

বেঙ্গল গবর্নমেন্টের এক বিজ্ঞপ্তি হ'তে জানছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫১টা কলেজ আছে, বিশ হাজার ছাত্র পড়ছে। ৫১টা কলেজের মধ্যে ৬টা কল্যাণ-কলেজ। বাকি ৪৫টার মধ্যে ১২টা কলিকাতায়, ৩৩টা অন্য স্থানে। ২০,০০০ ছাত্রের মধ্যে কলিকাতায় ১২,০০০, বাইরে ৩৩টা কলেজে মাত্র ৮,০০০। এই গনতিতে টাকা কলেজ নাই।

থাকলেই বা কি হ'ত? ১,৩০০ বাড়ত। কলিকাতার ১২টা কলেজে ১২,০০০ ছাত্র সমান চারিয়ে নাই। প্রতি কলেজে ১,০০০ ছাত্র হ'লেও কর্তাদিকে হিমসিম খেতে হ'ত। হাজার যুবার তত্ত্ব রাখা কি সোজা কথা? কিন্তু শুনি, কোন কলেজে ৩,০০০, কোন কলেজে ২,০০০ ছাত্র! কলেজে চারি বর্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সমধিক। একই বর্ষের পাঠ নিশ্চয় তিন চারি ঘরে হ'তে থাকে। বোধ হয় সকলের ভাগ্যে সমান ভোজ্য পড়ে না। পাঠ্য বিষয়ের যত রকম সংযোগ বিবোগ হ'তে পারে, সবই আছে। সকালে, দুপুরে, বিকালে কলেজের ঘব কখনও খালি হয় না, ঘবের ভিতরের গ্যাস বেরিয়ে বেতে সময় পায় কিনা, কে জানে। এই সব মহা-মহা-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা অবগু হচ্ছে, কিন্তু এসব শান্তিনিকেতন হ'তে পারে না।

দেখেছি কলিকাতানিবাসী ছাত্রও ছোট কলেজে যায়। কমল, তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তাকে জিজ্ঞাস্যাম, 'কমল, তুমি বড় কলেজে না ঢুকে সেন্টপলস্ কলেজে ঢুকলে কেন? সে কলেজের নাম তেমন শুনি না।' কমলের পিতা কলিকাতানিবাসী, ধনবান, বিদ্বান, বিচক্ষণ, ভূয়োদর্শী। তিনি ছেলেকে বেছে বেছে ছোট কলেজে দিয়েছেন। এই কলেজের হাওয়া নাকি ভাল। ফটক হ'তেও দেখেছি, জায়গা অনেক, তৃণ আছে। আর বোধ হয় দুপুর বেলা তাড়িত-দীপ জেলে প'ড়তে হয় না। কমলকে দেখেও মনে হয়েছে, সে দেশী হাওয়ার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক সমাগমে, ভাইস্-চেন্সলার স্যর হুসেন সুরওয়ার্দি বলেছিলেন, কলিকাতার বাইরের কলেজে শুণী শিক্ষক নাই, কলিকাতার কলেজে আছেন, ছাত্রও জুটে। যদি গুণবান শিক্ষক নাই থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেন দেখেন না? গুণহীন শিক্ষককে ইজিতে সরাতে পারেন।

পাশ গণ্যে কলেজের গুণের পরীক্ষা। বিজ্ঞাপনে দেখি, অমুক কলেজে হু-শ ছাত্র আই-এ পাশ হয়েছে, অমুক কলেজে বি-এ পাশ বেশী হয়েছে। এর দ্বারা কলেজের গুণ বুঝতে পারা যায় না। বলা উচিত,

২য় বর্ষে ছাত্র ছিল	...	এত
পরীক্ষা দিতে পেরেছিল	...	এত
পাশ হয়েছে	...	এত

এই তিনটি সংখ্যা না পেলে কলেজের গুণ বুঝতে পারা যায় না। যদি দেখি, মনে করুন, ২২ বর্ষে ছাত্র ছিল ছ-শ, তাদের মধ্যে পাঁচ-শ পরীক্ষা দিতে পেরেছিল, আর দু-শ পাশ হয়েছে, তাহলে, সে কলেজের কোন্ গুণ আছে? ৩০০ মধ্যে ২০০ পাশ হয়েছে!

কলেজের গুণ পরীক্ষা আর এক রকম কবাব হয়। দেখ, ২০০ মধ্যে কতজন প্রথম বিভাগে পাশ হয়েছে। পরীক্ষাটি কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। ছাত্রের ধার না থাকলে প্রথম বিভাগে পাশ হতে পারে না। যে কারণেই ইউক, যদি কোন কলেজে ধারাল ছাত্র বেশী জুটে, তাহলে প্রথম বিভাগে পাশও বেশী হবে। কলেজের গুণপণ্য ছুঁচীর জন প্রথম বিভাগে উত্তরে যেতে পারে, কিন্তু ছাত্রের ঈশ্বরগুণ ধারই আসল কারণ।

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ ছাত্র চুকতে পার, আর দুই বিভাগে পাশ ছাত্র পার না। ব্যবস্থাটি ভাল। অম পারে উত্তম দান কর্তব্য নয়। দেশে মতিমান, বিদ্যাবান চাই। বাছা বাছা প্রোফেসর, বাছা বাছা ছাত্র। ছাত্রকে বেতনও কম দিতে হয় না। তথাপি কলেজের খরচ কুলায় না, রাম শ্রাম বহু হরি বছর দেড় লক্ষ টাকা বোগাচ্ছে। এই কারণে তারা জানতে চায়, ২২ ও ৪র্থ বর্ষের কত ছাত্রের মধ্যে কতজন পাশ হয়, ১ম বিভাগে কত হয়। কলিকাতার অব এক কলেজে বাছট ছেলে ভর্তি হতে পার, রাশিক অত্র কলেজে চুকতে হয়। বাছট কলেজের সঙ্গে রাশি কলেজের তুলনা কবা অস্তায়।

কলেজে ধারাল ছাত্র আনবার উপায় করতে হয়েছে। পূর্বকালে বাজারের ছোকরা ভাঙ্গানা হ'ত। কোন অধিকারী তিন চারি বছর লেগে থেকে ছোকরা তালিম ক'বল, অত্র এক দলের লোক এসে দু টাকা বেশী দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেল। এখন বোধ হয় চুক্তি লেখাপড়া চলছে। কলেজে কিন্তু ছোকরা ভাঙ্গানা মন্দ চলছে না। বছর দুই হ'ল বাঁকুড়ার এক ইকুল হ'তে এক ছাত্র প্রথম বিভাগে, ২০ টাকা বৃত্তি পেয়ে মেট্রিক পাশ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণনায় ছাত্রটি মেট্রিক-গণনাব এক তারকা। আমি তাকে কেপ্টেন বলতাম। যখন সে ইকুলর চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত, তখন আমার বেড়াবার

মাঠে তার দল ফুটবল খেলত, সে কেপ্টেনি করত। এখানে কলেজ আছে, সে এখানে পড়বে। কেপ্টেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। গুনলাম, কলিকাতার এক কলেজ হ'তে ভাঙ্গাতে চিঠি এসেছে। 'তুমি এখানে আসবে, থাকতে খেতে খরচ লাগবে না, কলেজের বেতন লাগবে না, আর, জলপানি ১৫ টাকা পাবে।' কেপ্টেন লোভে পড়ল। তাব পিতা এখানে থাকেন, ইকুলে মাঠারি কবেন, টাকাব টানাটানি নাই, তথাপি টোপ গিললেন। ছেলে কলেজে চুকতে না চুকতে মাসে মাসে ৩০ টাকা রোজগার করবে, লোভটা কম নয়। ফলে হ'ল এই, এই কলেজ এক ধাবাল ছাত্র পেতে পেতে পেলেন না।

পুত্র মেট্রিক পাশ হয়েছে, পিতা গ্রামে থাকেন। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, কলিকাতার না পড়লে ছেলে মানুষ হবে না, চোখ ফুটেবে না। এ কলেজে, সে কলেজের শিক্ষকদের নামও দু একটা শুনে রেখেছেন। পুত্রের মাকে বুঝালেন, ওঁদের কাছে পড়ো যুখ, পাশ হয়েও যুখ। তিনি ভাবলেন না, কলেজের পঞ্চাশ শিক্ষকের মধ্যে নামজাদা শিক্ষক দুই-এক জন। পুত্রের ভাগ্যে তাঁদের দর্শন-লাভ ঘটবে কিনা সন্দেহ। আর এক ছাত্র এক কলেজে ভর্তি হ'ল, দু-চার দিন পরে পিতাকে বললে, এ কলেজে পড়া ভাল হয় না, এখানে পড়লে পাশ হতে পাবেন না। সে জানে না, ইকুল হ'তে কলেজে উঠবার ধাপ উঁচু, এক মাসের কম উঠতে পারা যায় না। পিতা কি করেন, তাঁকে পাশ হতে হবে না, ছেলেকে হবে, ছেলেকে কলিকাতা পাঠালেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এক বছর পরে সে ছেলে যখন বাড়ী আসবে, তাকে চিনতে পারা যাবে না। ইকুলে পড়বার সময় তার টেরি থাকত না, এখন টেরি দেখা যাবে, হয়ত আরও উন্নত সভ্যতা মাথায় প্রকাশ পাবে, মাথার সামনের চুল পেছ দিকে ঘুরানো থাকবে। এখানে ৪২ ইঞ্চি বছরের কাপড়ে চলত, এখন ৪৬ ইঞ্চি কাপড় হয়েছে, কোঁচার ফুল জামার বাঁ পকেটে রয়েছে। এখানে মুড়ি খেত, মুড়ির সঙ্গে কাঁচা শুড় পেলে খুশী হ'ত। এখন মুড়ি রোজ খাওয়া যায় না, কচুরী নিমকি আর অপক স্পঞ্জ রসগোল্লা চাই। কলিকাতায় মাসে মাসে ৪০ টাকা খরচ করবে। বি-এ পাশ হয়ে

চল্লিশের সিকি, দশ টাকাও আনতে পারবে না, গাঁয়েব লোক ব'লবে, যাঁড়ের গোবর। তা বলুক। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ-বিদ্যালয় দেখতে চাই না। তার দোষ কি? যৌবন ভোগের দিকে টানে, কলিকাতাব হাওয়া ভোগের উপকরণ পথে পথে বয়ে বেড়াচ্ছে। এই প্রথম বর্ষের ছাত্র চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রকে সঙ্গী পেয়েছে। পথে বেতে বেতে দেখলে 'কেবিন'। 'ওহে চল, একটু চা খেয়ে আসি।' বালকটি বাড়ীতে চা খেত, কিন্তু 'কেবিন'র পেয়ালায় মুখ দিতে তার গা যিন-যিন ক'বতে লাগল। কিন্তু 'না' ব'লতে পারলে না, অসাড়তা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে, তাকে গৌরো ভূত ব'লবে। তা ছাড়া চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বিদ্যাজ্যোষ্ঠ, বয়োজ্যোষ্ঠ, তাঁকে সঙ্গী করা স্বাভাবিক। মন বলিষ্ঠ হ'লে 'না' ব'লতে পারত, ব'লতে পারত 'না, আমি কেবিনেব চা খাব না।' কিন্তু মন আপনই বলিষ্ঠ হয় না। শবীরের ব্যায়াম দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ হয়, মনের ব্যায়াম দ্বারা মন বলিষ্ঠ হয়।

৬

আমরা চাই ছাত্রেরা স্বস্থ, সচিবিত্ত ও জ্ঞানী হয়। এই তিন গুণ পেতে হ'লে কলেজকে ছোট হ'তে হবে। নিয়ম ক'রতে হবে কোন কলেজে পাঁচ শতের বেশী ছাত্র থাকবেনা। ৬ টাকার অধিক বেতন হবে না। পাঁচ শত ছাত্র পাঁচটা হোষ্টেলে থাকবে। আমি হিন্দু ছাত্র ও হিন্দু হোষ্টেল চিন্তা ক'রছি। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যাহ ব্যায়াম ক'রতে হবে। মুসলমানের কোরাণ, খ্রিষ্টানের বাইবেল আছে। হিন্দুর ধর্ম ও কর্ম এক। ছাত্রদের পক্ষে কর্মযোগ এক মাত্র পথ। ইচ্ছলে অভ্যাস আবস্ত হবে, কলেজে সে অভ্যাস চ'লতে থাকবে। লোক চিনে হোষ্টেলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'বতে হবে। তিনি কলেজে আধা শিক্ষক, হোষ্টেলে ছাত্রের পিতা ভ্রাতা ও সুহৃদ হবেন। এ'রই কাজ সকলের চেয়ে কঠিন। বাহ্য অনুষ্ঠান ভিন্ন ধর্ম অনুষ্ঠান অসম্ভব। হোষ্টেল নাম তুলে দিয়ে মঠ ব'লব। মঠবাসীকে ধর্ম ও নিয়ম পালন ক'রতেই হবে। কখন শয্যা ত্যাগ ক'রবে, কখন স্নান ও আহার ক'রবে, কখন ঈশ্বরের স্তোত্র আবৃত্তি ক'রবে, কখন প'ড়বে, কখন ব্যায়াম ক'রবে, কখন শয়ন ক'রবে, এ সব বিষয়ে ছাত্রের স্বাধীনতা থাকবে না। মঠে যে কাপড় ইচ্ছা প'রবে, কিন্তু

মঠের বাইরে গৈরিক প'রতে হবে। বেড়াতে যেতে চায়, স্বচ্ছন্দে বাবে, যেখানে ইচ্ছা বাবে, কিন্তু গৈরিক পর্যায়ে যেতে হবে। গৈরিক ধুতি ও পাঞ্জাবী দেখলেই বুঝব, কে। সম্রাসী ক'ববার মতলাবে গৈরিক নয়। ধুতি ও পাঞ্জাবী কোন এক রঙ্গের চাই। গৈরিক সুসাদ্য। অধ্যক্ষ যথা-যোগ্য ব্যবস্থা ক'রবেন। উপরে কেবল নীতির আভাস দিলাম।

আমি ব্যায়ামের পক্ষে, ক্রিকেট ফুটবলের পক্ষে নই। ব্যায়াম দ্বারা দেহ বলিষ্ঠ ও সুজোঁল হয়। ব্যায়াম ক'বতে মাঠ খুঁজতে হয় না, খরচও হয় না। প্রত্যাহ ক'রতে পারা যায়, কলেজ হ'তে ছাড়পত্র পেয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ক'রতে পারা যায়। দল বেঁধে বিলাতী খেলার দোষ অনেক। প্রথম দোষ, এ সব খেলা এক এক বাসন। ব্যায়ামের মাত্রা ঠিক রাখতে পারা যায়, বাসনের মাত্রা ঠিক থাকে না, শরীর মন অবসন্ন হয়, খেলার পর পড়া অসম্ভব হয়। দ্বিতীয় দোষ, কু-সংসর্গ জুটিয়ে দেয়। একথা ঠিক, বারা খেলায় পাকা হয়, তারা প্রায়ই বিদ্যায় কাঁচা। অথবা বিদ্যায় কাঁচা বলোই খেলায় মাতে। ফুটবল কত জনই বা খেলে? বাকিরা কি করে? খেলায় জিতলে হুরা-পানের 'কাপ' পুরস্কারলাভ হয়। মঠে হুরাপান-তুরাপান চ'লতে পারে না।

যে ছেলে ফুটবল খেলার দিকে ঝুঁকেছে, তাকে বাগিয়ে রাখা কঠিন। সলিলকুমার কলিকাতায় জ্যেষ্ঠার কাছে থাকে, বৌবাজারের এক ইচ্ছলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। পিতা ডেপুটি, কলিকাতার বাইরে থাকেন। আমি তাকে ছেলেবেলা হ'তে জ্ঞানি। অনেক দিন পরে দেখছি, দেখে হুংহ হ'ল। 'সলিল, তোমাকে রোগা দেখছি কেন?' 'কই, আমি কিছু বুঝতে পাবি না।' 'বলত তুমি দিনের মধ্যে কখন ক্রি কর।' শুনলাম, সে ৪টার সময় ইচ্ছল হ'তে বাড়ী এসে কিছু খেয়েই গড়ের মাঠে ফুটবল খেলতে ছুটে। বাড়ী হ'তে গড়ের মাঠ ২ মাইলের কম হবে না। জ্যেষ্ঠামশায়ের কড়া হুকুম, ৭টার মধ্যে ফিরতে হবে। সেও ৭টার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী ফিবে, বই নিয়ে বসে, আর বাড়ীতে ৯টা দেখতে থাকে। তাব পর খেয়ে পবদিন সকালবেলা ৭টার সময় উঠে। বাড়ীতে মাষ্টার আসেন, এক মাষ্টার ন-ন, পরে পরে দু মাষ্টার। ৯টা বাজে, সলিলও নেয়ে খেয়ে ইচ্ছলে দৌড়ে। সে নিজেই স্বীকার ক'বলে, খেলা বেশী হয়,

over exercise হয়। কিন্তু সে জানে না, তার ৪টার সময়ের খাবার কম হয়, তাকে এক বাটি চা খেয়ে ক্ষিদে মারতে হয়। সে ইঙ্কলের পড়া পারে না, বাড়ীতে পড়বার যে গতিক, পারবার কথাও নয়। তার পিতা কিন্তু বুঝে রেখেছেন, ছেলেটার বুদ্ধি মোটা। সত্য সত্য মোটা কিনা জানি না। কিন্তু জানি, কারও না কারও অবহেলায় অনেক সলিল হুঁনীল অনিল প্রনীলের বুদ্ধি মোটা হয়েছে।

শিক্ষার যে ব্যবস্থা করি, এই খানে আটকে যায়। পিতামাতা স্বভাবতঃ চান, পুত্র কাছে থাকে। মাতার স্নেহ প্রবল, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা হাব মানে। তিনি পুত্রকে চোখে চোখে রাখতে চান। কিন্তু পারেন কি? পিতা নিষ্কর্ষ্য বসে থাকেন না, নিজের ও সংসারের ধান্দায় ঘুবেন। পিতা পাবেন না, খুড়ো জ্যেষ্ঠা মামা মেসো পিসের কথাই নাই। কেহই পুত্র ও আশ্রিতের হিতের প্রতি উদাসীন নন, কিন্তু এ কথা সত্য অনেকে ছেলে মানুষ করতে জানেন না, পারেন না। এক এক বাড়ী আছে, সেখানে দিনের সব কাজ কলের মতন চলে, ছেলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয় না। এমন বাড়ী অতি অল্প।

একটা অনেক দিনের কথা মনে পড়ল। এক কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র ভর্তি হ'চ্ছিল। অধ্যক্ষ দেখলেন, একজন বুদ্ধিমান কিন্তু রোগা, মেলেরিয়ায় ভুগে এসেছে, মুখ এখনও ফেকাভে, চোখ হলদে। সে কলেজের হোস্টেলে থাকল। অধ্যক্ষের ভার দ্বিগুণ হ'ল। মাস খানেক গেছে, ছেলেটি একটু সেবে আসছিল, এক দিন অধ্যক্ষ ছাত্রের পিতার এক পত্র পেলেন, পুত্রকে বার দিন ছুটি দিতে হবে। কেন ছুটি, কিছু লেখা নাই। 'কেরানী শুনেছিলেন, ছেলেটির বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে, পাঁচ হাজার টাকা বরপণ ধার্য হয়েছে।' পিতা শিক্ষিত, ডেপুটি। বরপণের জন্তে নয়, পুত্রের হিতের জন্তে অধ্যক্ষ ছুটি দিলেন না। পিতা অবাক; রেলে ঘণ্টাখানেক দূরে থাকতেন, অধ্যক্ষের কাছে এলেন।

পিতা। আমি পিতা, ছুটি চেয়েছি, আপনি দিবেন না?

অধ্যক্ষ। ছুটির প্রয়োজন কি?

পিতা। প্রয়োজন বাড়ীর।

অধ্যক্ষ। আমি শুনেছি, প্রয়োজনটা কি। আমি

পুত্রের হিতের তরে ব'লছি, সে প্রয়োজন দুই এক বছর থাক। বয়স ত মাত্র বোল সতর।

পিতা। আপনি কি পিতার চেয়েও তার হিত চিন্তা করছেন?

অধ্যক্ষ। নিশ্চয়। আপনি পিতা, আপনার বাৎসল্য স্বাভাবিক, আপনার সংসাবচিন্তাও স্বাভাবিক। আমার বাৎসল্য গোপ, আমি আপনার সংসার হ'তে বিছিন্ন হয়ে বালকের হিত ভাবছি।

পিতা। আপনি এ অধিকার কোথায় পেলেন?

অধ্যক্ষ। আপনিই দিয়েছেন। যখনই আপনার পুত্রকে এই কলেজে দিয়েছেন, হোস্টেলে রেখেছেন, তখনই আপনি আমাকে তার পিতৃহানীয়া করিয়েছেন। ইচ্ছা করলে, সে অধিকার তুলে নিতে পারেন।

পিতা তাই ক'বলেন, পুত্রের নাম কাটিয়ে তাকে নিয়ে গেলে।

যে নগরে কলেজ সে নগরে পিতামাতার কাছে পুত্র না থাকে মঠে ঘেয়ে থাকবে? প্রথম প্রথম আশ্চর্য ঠেকবে। কিন্তু এইটি সুব্যবস্থা। মঠের অদৃশ্য শাসনোপক্রেমঃ বি-ন-য় শিক্ষা হবে। এই শিক্ষা মহামূল্য। বিনয় হিন্দুধর্মের মূল। সলিলকুমার পাঠে মন লাগাতে পারে না, ঘমনিয়মের মঠে দু-মাস থাকলে দেখতে তাব মন অনেকটা বশ মেনেছে। তার সহপাঠীরা ভোরে উঠেছে, কেউ কিছু না ব'ললেও সে ভোরে উঠত। সে অবশ্য প্রথম প্রথম শনিবারে শনিবারে বাড়ী যেতে চাইত। কিন্তু মাস দুই পরে চাইত না। মঠে এত সঙ্গী, সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেও পেত না। দেশ নিঃসন্দেহে পিতাকে ব'লতে পারেন, 'পুত্র তোমার একাব নয়। তোমার ভাগ্য ভাল, আমি তোমার পুত্রকে একাব নয়। তোমার ভাগ্য ভাল, আমি তোমার পুত্রকে মানুষ করবার ভার নিয়েছি।' পিতার এক আপত্তি থাকবে, তাঁকে মঠে থাকবার খরচ দিতে হবে। দেখতে গেলে তাঁকে অর্ধেক দিতে হবে, নিজের কাছে রাখলে অপর অর্ধেক পড়ত। কলেজের কাছে মঠ; কলেজে সকালে বিকালে পঠন-পাঠন চলতে পারবে, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম।

এখন নগরে নগরে কলেজ হয়েছে, মহানগরে আসবার প্রয়োজন নাই। সব কলেজে সেই খোড়-বাড়ি-খাড়া। কোনটার হয়ত কোন বজ্রান ভাল রাঁধা হয় না, কিন্তু

সকল ব্যয়ন বিশ্বাস হয় না। যদি কোনটা হয়, অধ্যক্ষের গোচরে আনলে দক্ষপাচক নিবৃত্ত হ'তে পাবেন। আর, যদি কোন শিক্ষক ছুটা কথা ভুলই শিখান, সে ভুলে কিছুই এসে যায় না। নগরে নগবে মহাবিদ্যালয়; নগরে নগরে সরস্বতীর অর্চনা হ'তে থাকবে, মুখেও দু-একটা মন্ত্র শুনতে পাবে। মধ্যে মধ্যে কলেজও নগরবাসী ও গ্রামবাসীকে সবস্বতীর প্রসাদ পেতে ডাকবেন, ইংরেজী-শিক্ষিত ও ইংবেজী-অশিক্ষিতের অন্তর কমে যাবে। এই এক কারণেই কলিকাতার গ্রাম হ'তে নগর রক্ষা উচিত। অনেক ব'লছেন, গ্রামে ফিরে যাও। আমি বলি, মহানগর হ'তে প্রথমে নগরে ফিরে এস।

কিন্তু পাঁচ শত ছাত্র, ও ছাত্রের বেতন ৬ টাকা, ধরো বি-এ, বি-এসসি কলেজ চালানো যেতে পারে কি? পারে, পাবেও না। এখন বিশ হাজার ছাত্র, চল্লিশটা কলেজের দবকার। চল্লিশটা আছে। অনেক কলেজ বদান্তেব দান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রিষ্টান মিশনারী কলেজ, মিশন হ'তে অর্থসাহায্য পান। দেশেব পক্ষে এটা নিন্দাব কথা। বিদেশী, তোমার আমার পুত্রে মানুষ করে দিয়ে যাবেন, আর আমবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকব, নিন্দার কথা বই কি। নিন্দা সহিব, টাকাও দিব, ছুটা হ'তে পারে না। আমি ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয় পূর্ব মিশনারী কলেজ গবর্নেন্টের কাছে হাত পাততেন না। সে বা হ'ক, ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে, কলেজের সংখ্যাও বাড়তে হবে। দেশহিতৈষী বদান্তও জুটবেন।

একটা মোটামুটি হিসাব করি। ৫০০ ছাত্র, ৬ টাকা বেতন, মাসিক আয় ৩০০০ টাকা। পাঠ্যের নানা ওড়ন-পাড়ন অনাবশ্যক মনে কি। মানুষ হ'তে যে জ্ঞান তোমাব পুত্রের চাই, সে জ্ঞান আমার পুত্রেরও চাই। তথাপি পঁচিশ শিক্ষক চাই। হারাহারি ২০০ টাকা বেতন ধ'রলে মাসে ৫০০০ টাকা চাই। এব উপর অন্ততঃ ১০০০ টাকা চাই। এই ৬০০০ টাকার অর্ধেক ছাত্রের পিতাবা দিবন, অপর অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয় দিবেন। এখন ৫০টা কলেজ আছে। যদি প্রত্যেককেই ৬০০০ টাকা দিতে হয়, তা হ'লে গবর্নেন্টকে বৎসরে আঠার লক্ষ টাকা দিতে হবে। এ আব-বেলী কি। শিক্ষকদের বেতন হারাহারি ২০০ টাকা ধরোছি। বর্তমানে

এটা কম মনে হবে। কিন্তু এই বেতনে কোন কোন কলেজ চলছে। আর এটাই স্থায়ী বেতন হবে। দশ পনর বৎসরের মধ্যে গবর্নেন্টের স্বাভাবিক বিভাগের মাথাপের বেতন নেমে যাবেই যাবে। তখন অপবেব বেতনও অল্প স্বল্প নামবে, তুলনায় মনঃকষ্ট হবার কারণ থাকবে না।

গবর্নেন্ট কয়েকটা কলেজ খুলেছেন, এখনও হাতে রেখেছেন। খুলবাব প্রয়োজন ছিল, অল্প কলেজ ছিল না। এখন সে প্রয়োজন গেছে। শুনি, 'মডেল' কলেজ হয়ে ছ। আদর্শের প্রয়োজন অবশ্য আছে, চিরকাল থাকবে। কিন্তু সে আদর্শ অধ্যবসায়ী প্রবন্ধের উদ্দেশ্য থাকলে কোন ফল নাই। হাতের লাগাল না পেলে সেটা উপহাস। আদর্শ কলেজে পাঁচ শতের বেশী ছাত্র থাকবে না, ছাত্রপ্রতি বৎসরে ১৪৪ টাকার বেশী খবচ পড়বে না, এই নিয়মে আদর্শ দেখাতে পাবলে আনন্দের বিষয় হবে।

যে পিতা পুত্রের চোখ দুটোতে তাকে কলিকাতার কলেজে দিয়েছেন, তিনি অবশ্য এই ভাবনা হেসে উড়িয়ে দিবেন। তিনি ব'লছেন, কলিকাতায় কত সাধু পুণ্যাত্মা আছেন, বিদ্বান্ মহাবিদ্বান্ আছেন, উপাধ্যায় মহা-মহা উপাধ্যায় আছেন, কত বিদ্যালয় মহামহাবিদ্যালয়, গ্রন্থশালা পাঠশালা আছে, কত সভা, সম্মেলন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যান চলছে! এ সব দেখা ও শোনা যে মত্ত শিক্ষা। এরই জন্তে হাজার অশ্লুবিধা হ'লেও কলিকাতায় থাকা উচিত। যুক্তিটা কিছু সত্য, বেলীর ভাগ কালনিক। সাধু ও উপাধ্যায় তোমাব পুত্রের কল্যাণ-চিন্তায় ব্যস্ত নাই। কলিকাতা দেখা চাই, উত্তমরূপে দেখা চাই। কিন্তু দেখা ও শোনার কালাকাল আছে। যদি দেখতে ও শুনতে মন করো কলিকাতা যাই, তা হ'লেই দেখা ও শোনা সত্য হবে। পুত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতায় বিশ পঁচিশ দিন থেকে এক-মনে দেখতে ও শুনতে পারে। যেটা আনমনে দেখি ও শুনি, সেটা দেখা ও শোনা নয়। এটাই ত মহাহুঃখ, ছাত্রেরা চোখ কান বুজে থাকে। তারা বই পড়ে, 'টেবু টিউব' ধরে, আর সময় পেলে গল্পের-রস-পান করে। এখন বাংলা ভাষা শিখতে হবে কিনা। সোজা নয়, ১০০ নম্বর রাখতে হবে!



সাগরিকা—ঐহরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত; প্রকাশক—
শ্রীবাসেশ্বর দে, চন্দ্রনগর। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বাক্যাদ্য দেশের যে অল্প কয়েক জন লেখককে mystic আখ্যা দেওয়া
বাইতে পাবে, ঐযুত চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার
রচনার রূপ ও রূপকের একর সমাবেশে সাধারণ পাঠকের নিকট উহা
তেনন উপভোগ্য না হইলেও প্রকৃত রসবেত্তার নিকট উহা বিশেষ
উপাদেয়। এই গ্রন্থটি একটি গল্পপুস্তক, ইহাতে চাষি আখ্যায়িকা
আছে—আদিকথা, সাগরিকা, বঙ্গনা ও কবি। আদিকথায় লেখক
সেই চিরন্তন কথা তুলিয়াছেন—নরনারীর সঙ্গ ভিন্ন অপূর্ণ, উভয়ে
একত্র মিলনে বহুর উদ্ভবেই সৃষ্টির ঐশ্বর্য। 'বঙ্গনা' গল্পটির প্রটের
কতকটা স্থিতিগত করাসী লেখক খেওকিল গোতিয়ের 'লাস্তান্ দ'র'
নামক গল্পের প্রট ইহাতে গৃহীত, কিন্তু উপসংহারের নিকে কিছুমাত্র
মিল নাই; 'বঙ্গনা' গল্পটিকে বিবোধগম্য করিয়া লেখক পূর্বাপর
একটা রসের সঙ্গতি অক্ষুর রাখিয়াছেন। 'সাগরিকা' গল্পটি কতকটা
রূপকধার ধরণে রচিত, সাহসের সংসর্গে হাসিকান্নার ভেদাভেদ-জ্ঞান-
বিবর্তিতা মন্ত-কস্তার নারীজ লাভ ও হৃদয়ঃখাহুত্ব। "কবি"
গল্পটিকে আখ্যায়িকা না বলিয়া একটি চিত্র বলা চলে; কবি বধন
নির্জন পল্লীর দ্বিধা আসনে ছিল তখন তাহার গানে তাহার কাব্যে
ফুটিত জীবনের কথা, সৌন্দর্যের কল্পনা; কিন্তু রাজাহুগ্রহপুট
হৃদয়ঃখের মধ্যে কবির বসবাসের সময়ে আর সৌন্দর্য বা জীবনের
হর তাহার কাব্যে ফুটিল না, ফুটিল হৃৎক ও কুংসিতের কল্পনা, তাহাতে
প্রাণের তারে পুরাতন হর আর ধনিত হইল না। লেখকের বলিবার
জ্ঞানী বড় হুন্দর, ভাষাও সতেজ ও সবল। মাঝে মাঝে ভাবোচ্ছ্বাসের
মাঝে একটু বেশী হইয়া রচনার সৌন্দর্য কিছু নষ্ট করিয়াছে,
বিশেষতঃ সাগরিকা গল্পে। বাহা হউক, গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় একখানি
বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সব হুন্দর।

শ্রীশুকুমাররঞ্জন দাশ

সন্ধি (উপন্যাস)—সারবাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ। প্রকাশক
বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২.০

যতীন্দ্রবাবু বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে হুপরিচিত। উপন্যাসখানি পড়িয়া
ভাল লাগিবাছে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। "প্রাচীনপন্থী লেখক"
বধন "অতি আধুনিক ব্যাপার অর্থাৎ নারীপ্রগতি" অবলম্বন করিয়া
উপন্যাস রচনা করিতে বান, তখন হয় তাঁহার নূতনের নকল করিতে
গিয়া বিলাট ষ্টান না-হয় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করেন। ইহাদের
কোনটাই রসবোধের পরিচায়ক নহে; হুতরায় সেবপ রচনা উপভোগ্য
করা যায় না। রসজ্ঞ লেখকের বয়স দিয়া রচনার বিচার চলে না।
যতীন্দ্রবাবু প্রবীন হইলেও রসিক; তাই তিনি অতি আধুনিক ব্যাপার
লইয়াও একটি উপভোগ্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এই অতি
আধুনিকতার যুগে এগুপ উপন্যাস পাঠকের চিত্তে প্রসাদরস জাগায়।

বিজোহী রাজা রামমোহন—শ্রীসত্যচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
মূল্য পুস্তকালয়, ২৭ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ২১। মূল্য ১।

বিশেষত্ববর্জিত (এক নামে ছাড়া) ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ রাজা রামমোহন
রায়ের জীবনকাহিনী। গ্রন্থকার রামমোহন সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই
বলিতে পারেন নাই। পুরাতন কথাও নূতনভাবে সাজাইতে পারেন
নাই। লেখকের ভাবার মৈত্রের পরিচয় প্রতি পৃষ্ঠায় রহিয়াছে।
তাহা ছাড়া এত ছাপার ভুল যে পাঠ করা অসম্ভব। একপ গ্রন্থ
ছাপিবার কোন যৌক্তিকতা দেখিতে পাই না।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

নীটুশের বাণী—শ্রীললিতাকান্ত গুপ্ত। রামেশ্বর এণ্ড
কোং চন্দ্রনগর। ১৩৪১। ৪৭ পৃঃ।

লেখক নীটুশের সমস্ত শিক্ষার মূলকথা প্রথমে বিবৃত করিয়া পরে
তাঁহার বাণী হইতে কিছু কিছু অম্ববাদ কবিতা দিয়াছেন। এই সকল
বাণীর মধ্যে স্থানে স্থানে অম্ববাদের ভাব প্রকট হইলেও ইহাতে বঙ্গ-
সাহিত্যের পৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং লেখক নীটুশের কথাগুলির যে
বিচার পূর্বকভাবে দিয়াছেন তাহা হুন্দর এবং সঙ্গত হইয়াছে।

মুক্তিমন্ত্রে মুসলিম নারী—মোহাম্মদ মোহাম্মদের। প্রাপ্তি-
স্থান, ২১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

বাংলা দেশে মুক্তিমন্ত্রের সাধনা যে নাই তাহা নহে, কিন্তু অল্প দেশে,
বিশেষতঃ মুসলিম নারীদের সমাজে, এই সাধনা কতদূর অগ্রসর
হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়াই পুস্তকখানির উদ্দেশ্য।
বিশেষতঃ এখনও বহু বাক্যলী মুসলমানের মনে ধারণা আছে যে,
পদ্মা-প্রণা তুলিবা দেওয়া বা লেখ-পড়া শিখানো বৃষ্টি ধর্মশাস্ত্রবিকল্প।
লেখক তুরস্ক, পারস্য, ইরাক, আফগানিস্তান, মিশর—এই কয় দেশের
বর্তমান ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন, সে-মত কতখানি ভ্রান্ত। তুর্কী
জননী হালিদা হাহুম, লেডী এসকান্দেব্রী, এসমা খানম বাহাবি,
রাণী সৌরিনা, মাদাম জলুল যে ভেজুখিতা ও সাহসিকতার পরিচয়
দিয়াছেন, বাক্যলী পাঠক-পাঠিকার তাহা স্মরণ রাখা উচিত। এই
তথ্যপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিলে শুধু বাক্যলী মুসলমান নয়, বাক্যলী হিন্দুও
উপকার হইবে। খিলাফত সম্বন্ধে ও বাক্যলী মুসলমানের পক্ষে
বিদেশী মুসলমানের সাহায্য করিবার কথার হালিদা হাহুম বাহা
বলিয়াছিলেন তাহা হিন্দু-মুসলমান সমস্তার সমাধান করিতে ধাঁহারা
চেষ্টা করেন তাঁহাদের জানিরা রাখা উচিত।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্-এ
বি. সি. এস. প্রকাশক—শ্রীতরীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। ৬৯ নং
আনোবাস লেন, ঢাকা। পৃঃ ১০-১০-১০-১০। মূল্য ১.০ জানা।

হিন্দু অবতাব রামচন্দ্র ও ইব্রাণীর ধর্মগুরু জরথুষ্ট্র এবং তাঁহাদের
প্রচারিত ধর্মমতের বিতৃত আলোচনাই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য
বিষয়। এই প্রসঙ্গে জরথুষ্ট্র মতবাদের সহিত অশ্রান্ত ধর্মমতের সম্বন্ধ—
বিশেষ কবিতা ইসলাম মতের সহিত জরথুষ্ট্র মতের অঙ্গাঙ্গিতাব
সম্বন্ধ এবং সেই ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের সহিত ইহার অনিষ্ঠতা—এই গ্রন্থে

বিশেষ ভাবে আশোচিত হইয়াছে। ধর্মের মূল তথা বুঝিয়া হিন্দু ও মুসলমানের পূর্বাপর বিরোধ দূর করিবার সহায়তা করা গ্রন্থকারের এই গ্রন্থ-প্রণয়ণের অন্ত্যম সাধু উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের সমস্ত মত ও ব্যাখ্যায় সহিত আমবা একমত হইতে না-পারিলেও গ্রন্থখানিকে আমরা আন্তরিক ভাবে প্রশংসা করি। ইহা গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। হিন্দু, মুসলমান ও ইরাণীয় ধর্মসাহিত্য ত্রিনি তুল্যভাবে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে আলোচ্য-বিষয়-নির্দেশক পাণ্ডিত্য এবং তাহার একটি বিস্তৃত সূচী সংযোজিত হইলে পাঠকের বিশেষ হবিষ্য হইত।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রাসপুটিন—শ্রীমদ্রজনানন্দ রাব। সব্বতী লাইব্রেরী।
১, রমানানন্দ মজুমদার স্ট্রীট। দাম বারো আনা।

কৃষিবার হবিষ্যত ধর্মবাজক ও বহুধর্মকাব্য রাসপুটিনের জীবনী সবল ভাবায় ছেলেদের জন্য লেখা। লেখায় ওপে পাঠকের মনের কোতুলক শেষ পর্যন্ত জাগ্রত করিবার চেষ্টা। কাগজ ও ছাপা ভাল।

দায়ী—হাসিয়াশি দেবী ও প্রভাবতী দেবী। প্রি. এন্ড. পারিশিং হাউস। ২১, নন্দরাম সেনের স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২/-।
যে উপগ্রাস পিতৃবৎস হৃদয়কে কড়া আছে, পরিচ্ছদে পরিচ্ছদে নুতন পাঁচ কন্য হই, উপগ্রাস পড়িলে মনে হয় উপগ্রাস পড়িতেছি না তাব গল্পের সাবংশটুকু পড়িতেছি—হৃদয় নারিকা হঠাৎ বিবাহ হইয়া বাগের বাড়ি আসিয়া নাথকের গধ নিফটক করিয়া তোলে—এখানিও সেই ধর্মের একখানি মাণ্ডলি উপগ্রাস। চরিত্র-গুলির সুখের কথাবার্তী নাটকের ধর্মের সংক্ষিপ্ত। শরৎচন্দ্রের ভাবা ও রচনা রীতির অক্ষম অমুকুতির ছাড়া বহুদলে হৃদয়। ছাপা ও বাধাই ভাল।

হুহিতা—শ্রীশান্তা দেবী। প্রবাসী প্রেস, ১২০২ আগার সাকুলার রোড। মূল্য এক টাকা। পৃ. ১৩০।

নিপুণ লেখিকার এই সবল অনাড়ম্বর গল্পটি আমাদের সত্যি আনন্দ দান করিয়াছে। বিশেষ কোন গুরুতর সমস্যার অবতারণা নাই—(সামান্য বা একটা পরিবারিক সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল কল্যাণীর জীবনে বইয়ের শেষের দিকে—কল্যাণী নিজেই অতি সূচক-ভাবে তাহার সীমানা কবিয়াছে) বা জটিল মনস্তত্ত্বের বিবরণ নাই—বাঙালী সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা সহজ ও হৃদয় ভাবে ফুটাইয়া তোলা। হাত নিপুণ না হইলে গল্প এত অনাড়ম্বর ভাবে সাঙানো যায় না বা দু-চার কথার ভিত্তর বিধা এমন সম্ভব চরিত্র-সৃষ্টিও সম্ভব হয় না। শিশু নাবাংলী, কাতারনট, নারায়ণী, মা, সেজবো কল্যাণী, হোবালাল—এরা সবাই জীবন্ত, এসব গল্পের মূর যেন শুনিতে পাই, এদের মুক্তি হৃদয়ভাব চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। এই চরিত্রগুলির প্রধান সহায়ক হইয়াছে, চরিত্রগুলির সুখের কথাবার্তী—সেগুলি যেমন স্বাভাবিক ও আড়ষ্ট গার্হস্থিক, অল্পদিক ভেমনি নাটকে ভাববিহীন।

মিসান-মালা—শ্রীচরকেশ্বর সেন শাস্ত্রী। প্রকাশক—শ্রীশশি-ভূষণ বিশ্বাস, উকাল, জজকোর্ট, আলিপুর। মূল্য ৫/-।

সামাজিক উপগ্রাস। প্রবন্ধাকারে লিখিলে বোধ হয় বক্তব্য বিষয়টি শুধাইয়া বলা চলিত। উপগ্রাস হিসাবে বর্ণ্য রচনা।

অজ্ঞাতশত্রু—শ্রীলালদাস হবিষ। প্রকাশিকা শ্রীমতী আশাসিতা বড়ুয়া, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন।

মঙ্গলরাজ অজ্ঞাত শত্রুর জীবনী সরল ভাবায় ছেলেদের জন্য লেখা।

ই-এক স্থানে ছাপায ভুল থাকিলেও ছাপা মোটের উপর ভাল। ছবিগুলি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাতুকুতু—শ্রীবিকাশ দত্ত। দাম ১/- আনা।

টাকুডুমডুম—শ্রীবিকাশ দত্ত ও শ্রীবিমল দত্ত। দাম ১/- আনা।

শ্রীওড়া গাছের কালোমাণিক—শ্রীবিকাশ দত্ত ও শ্রীবিমল দত্ত। দাম ১/- আনা।

প্রকাশক—চাক সাহিত্য কুটীর। পি-৩৪ মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা।
“কাতুকুতু” কবিতার বই। এতে আছে অনেকগুলি মজার মজার কবিতা, আর আছে পাঠ্য-পাঠ্য হাসির ছবি। ছেলে-মেয়েরা এ বই হাতে গেলে আপনা-আপনিই হেসে গড়গড়ি যাবে; তাদের কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে হবে না।

“টাকুডুমডুম” বইখানিও সচিত্র। আর এতে কয়েকটি মজার গল্প ও মজার কবিতা আছে। ছেলে-মেয়েদের খুবই ভাল লাগবে।

“শ্রীওড়া গাছের কালোমাণিক” কিন্তু অল্প ধরণের বই। এতে আছে কয়েকটি ভূতের গল্প, যা পড়লে এবং যাব ছবি দেখলে, ছোট ছেলে-মেয়েরা আনন্দের চেয়ে ভয়ই পাবে বেশী। ভূত-প্রেতের গল্প শুনিতে ছোটবেলাতেই ছেলে-মেয়েদের মনে ভয় ঢুকিয়ে না-দেওয়াটাই বোধ হয় ভাল। তার চেয়ে ভূতের গল্পের অবতারণা করে ভূত-প্রেত মিছে এই কথা যদি ছেলে-মেয়েদের মনে বহুমূল করে দিতে পারা যায়, তা হলেই তাদের বেশী উপকার করা হবে বলে মনে হয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর—

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়; প্রবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত পৃ. ২৪৮, ৭
ত্রিবার্ষ প্রচ্ছদপট; তিনটি ত্রিবার্ষ ও প্রায় ২০টি একবার্ষ চিত্র।
ছাপা ও বাধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ২৪/-

আজকাল বঙ্গ ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। ইহাদের অবিকার্যশই আধুনিক প্রণয় লিখিত—পাঠ করিলে মনে হয় যেন ভ্রমণটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাকে আশ্রয় করিয়া একটি উপগ্রাস সৃষ্টি করাই লেখকের আসল উদ্দেশ্য। তাই পথের দুখাবলীর বর্ণনা অপেক্ষা উপগ্রাসোচিত চমকের সাহায্যে রস-সৃষ্টি আধুনিক ভ্রমণ-কাহিনী লেখার মূল মন্ত্র। ইহাতে গন্তব্য পথের অস্পষ্ট বর্ণনার জন্ত লেখকের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কোন ধারণাও করিতে পারা যায় না; এমন কি, অনেক সময়ে তাঁহার কথার সঙ্গেই করিবার অবকাশ পর্যাপ্তও ঘটে।

প্রমোদবাবুর বইখানি অল্প ধরণের। উপগ্রাস-সৃষ্টির জন্ত রোমাঞ্চ-যুক্ত কল্পনার আশ্রয় না লইয়া তিনি তাঁহার যাত্রাপথের বর্ণনা বর্ণনা কবিতা গিয়াছেন এবং উহা স্পষ্টতর করিবার জন্ত প্রায় ২০টি বেথা-চিত্রের সাহায্য লইয়াছেন। বইখানি পাঠ করিলে তাঁহার বর্ণনার সরসতার মুগ্ধ হইয়া যেন তাঁহার সহিত দুর্গম পথে হোঁচট খাইতে খাইতে চলিতে হয়; পণ্ডিতজী, কবি দেবী, দেবন-হাসি, লালাজী প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে আমাদের নিকট অতি পরিচিত হইয়া উঠে, পার্শ্বতা প্রদেশের লোকদের পথের দুর্গম আমাদের নাকে আসিয়া লাগে। বর্ণনার দিক দিয়া বিচার করিলে বইখানিতে লেখকের পরিচয় সার্থক হইয়াছে বলা যায়—ভ্রমণ-কাহিনীর ইহাই একমাত্র উপাদান। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে ইহার স্থান পাওয়া উচিত।

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাণুর দিদি

ঐহেম চট্টোপাধ্যায়

শীতলক্ষ্যার এখন আর সে প্রবাহ নাই। ঘোড়াশালের কাছে রেলওয়ে কোম্পানী মন্ত এক রেলের পুল বাঁধিয়া তাহার গর্ভ খর্ব করিয়াছে। নদীপথে এখনও ষ্টীমার, বোট, পানসী, ডিঙা, মহাদানী নৌকা সর্বদাই বাতায়াত করে। শীতের নদী শীতলপাটির মত স্থির, ধীর ও নীরব হইয়া যায়, কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভেই খরস্রোতে আবার মুখরিত হইয়া ওঠে!

পূজা আসন্নপ্রায়, লক্ষ্যায় দিন-দিনই নৌকার ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়া বাইতেছে। আশ্রয় ও-বাড়ির ছেলেমেয়েরা আসিয়াছে, কাল চন্দ্রমামা আসিবেন, সীতানাথ এবার আসিতে পারিবে না, তাহার সাহেব বড় কড়া। সেদিন বড়বাড়ির জামাইবুরা আসিলেন ছোটবাড়ির জামাইদের আশ্রয় দেখাশোনা নাই। ভান্স পথের দিকে চাহিয়া আছে, গাঙের ঘাটে কোন নৌকা ভিড়িলে সে ছাদের ওপর ছুটিয়া আসে, কিন্তু স্নান মুখে ফিরিয়া বাইতে হয় অপরিচিতের মুখখানি দেখিয়া। হুনীলের এখানে আসিবার কথা আছে, কেন যে আসে নাই, কে বলিবে।

জমিদার-বাড়ির চত্বরের হ্রদে মেয়েরা সার বাঁধিয়া ছুটাছুটি খেলিতেছিল। ভান্স এই দলের নেতা, তাহার মত ছুটুমেয়ে এ অঞ্চলে পাওয়া ভার। সে জমিদার জগদীশ বাবুর মেয়ে, সেদিন মাত্র বিবাহ হইয়াছে, বালিকা-হুলভ চপলতা এখনও একটুও কমে নাই। চেহারাখানি এমন মিষ্টি যে সাত গাঁয়েও এমন একটি কিশোরী মেয়ে খুঁজিয়া পাওয়া ভার! ছুটাছুটিতে তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি খামিয়া লাল টুকটুকে হইয়া গেছে। একটি ছুটুমেয়ে ছড়া কাটিয়া হর ধরিয়া কহিল,

রাঙা মাথায় চিকণী

বর আসবে এতদিন,

শুনিয়া ভান্স হো-হো কহিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—
বেশ ত আশুক না। তোর তাত্তে কি?

ও-পাড়ার একটি ছেলে কবিতা আওড়াইয়া কহিল—
'হুনীল গগনে সোনার ভান্সটি হেমের বরণে হাসে,...'

ভান্স সে কথায় কান না-দিয়া কহিল—চুপ কর টুলু, মার খাবি কিন্তু, শীগগীর বল,—

খুকী গো খুকী তোমাদের ছাগলছানা কোথায়?

টুলু ভয়ে ভয়ে কহিল—মথুরার ডাঙায়—

মেয়েরা আবার হর ধরিয়া কহিল,—কি খায়?

—আঁশপাতা, বাঁশপাতা, কাঁঠা...ল পাতা খায়।

কেউঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া প্রেতিমায় রঙ দিতে-ছিল, ধমক দিয়া কহিল—কাল বোধন, তোমরা যদি এখানে সব গোলমাল কর, তাহলে ত ঠাকুর চিত্র করা হবে না, আশ্রয় বাড়ি যাও সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বসন্ত-খুঁড়ো সেখানে বসিয়া এক ছিলাম তামাক পোড়াইতে পোড়াইতে মনের আনন্দে গান ধরিয়াছিল,

কবে মা আসবি বলে সেই থেকে গো বসেই আছি

মা-হারা সন্তান ওগো আর কতদিন বেসনে বাঁচি।

শরতের নির্মেষ আকাশে জ্যোৎস্নার মুহূর্ত আলো আমবনের ভিতরে বাঁশঝাড়ের ওপর দিয়া উঁকিঝুকি দিতেছিল। দু-একটা রাতের পাখী কল্পন কণ্ঠে ডাকিয়া আবার চুপ হইয়া গেল। আকাশের কয়েকটি তারা ছায়া-পথের আশেপাশে ঝিকঝিক করিতেছিল।

গাঙের বুকে দাঁড় বাওয়ার ঝুপঝাপ শব্দ তীর হইতে ল্পষ্ট শোনা যায়, কে যেন দূরন্ত হাওয়ার নৌকার গাল তুলিয়া দিয়া মনের হৃদে গান ধরিয়াছে। জ্যোৎস্নার আবছায়ায় মনে হয় যেন একখানি শাধা কাপড় গাঙের বুকে ছুটিয়া বাইতেছে। নদীর তীরে বাধানো ঘাট আশ্রয় সন্ধ্যা হইতেই ছেলেবুড়োর ভিড়। ঘাটলায় বসিয়া আলাপ-আলোচনা না-হয় এমন বিষয়ই নাই। কিন্তু রাজি অধিক হইতেই যে যার দিকে সরিয়া পড়িল। আকাশের চাঁদ ডুবুডুবুপ্রায়। একখানি ডিঙা গাঙে—

ঘাটে ভিড়িল। মাঝিরা ভীরে আসিয়া দেখে হুসুবে বড় বড় গাছ, আশপাশ ঘোর জঙ্গল, কিনারে কাশফুলের অন্ত নাই, সেখানে বাতাসে চেউ খেলিতেছে। একটা বুনো ফুলের মিঠা গন্ধ আচমকা ভাসিয়া আসিতেছিল। মাঝি কোনমতে জঙ্গল ঠেলিয়া বাগানের ভিতর গিয়া হারিকেনের সাহায্যে পায়ে-আঁকা পথ বাহিব কবিয়া কহিল, “বাবু, এই রূপগঞ্জ!” হুনীল একবার মাত্র এই গ্রামে আসিয়াছিল, আর কখনও আসে নাই? জিজ্ঞাসা কবিল তোমরা আস নি কখনও?”

—আজ্ঞে না, আমরা উজান চরের মাঝি, সেদিকেই বেশী নৌকা বেয়ে বাই।

হুনীল ছইয়েব বাহিরে আসিয়া কহিল—কই, মঠ কোথায় রে?

মাঝি চারিদিকে আবাব ভাল করিয়া চাহিয়া জবাব দিল—আজ্ঞে মঠ ত এখানে নেই।

হুনীল একটুখানি ভাবিয়া কহিল—গাঙের ভিতরে গিয়ে দেখ দেখি, সাদা মঠের চূড়া দেখা যায় কিনা?

মাঝি কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বৈঠা টানিয়া গাঙেব বাকের কিনাবা ধরিয়া কিছুদূর যাইতেই মঠের অস্পষ্ট চূড়া ধীরে ধীরে দেখা গেল, তার পর ঝাউগাছের মত এক সারি গাছ, রূপগঞ্জের বাজারের টিনেব ঘর, তার পর বাবুদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাশ্রেণী।

হুনীল চণ্ডীমণ্ডপে পা দিতেই ভানু সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। বাজি বারোটা বাজে, কেষ্ঠাকুর বাঘের চোখ আঁকিতে গিয়া ভুল করিয়া শেষে রাগের চোটে পাড়ার মেয়েছেলেদের ধমকাইয়া ক্ষান্ত হইল না। মাঝিরা একটু ভানুকু সেবনের জন্ত সেখানে বারবার আগুনের হাড়িটিব ব্যর্থ সন্ধান কবিয়া ফিরিতেছিল। কে-একজন বুঝি গলা বাড়াইয়া ‘প্রতিমা-বানানো’ দেখিতেছিল, কেষ্ঠাকুর চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল—কিরে তোরা সব পেয়েছিস কি? গান্ধী-আমল কি শেষে তোরা এসে মায়ের পূজোর ঘরে ঢুকবি? যতসব অনাস্থি কাণ্ড!

বেচারী মাঝিরা কোন কথাবার্তা না বলিয়া চুপিচুপি ভাড়া লইয়া নৌকায় ফিরিয়া গেল।

জামাইবাবুকে দেখিয়া ছোট ছেলে-পিলের ভিতরে

চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল। হুনীল বারান্দায় গিয়া পৌছিতেই জামাইবাবুকে দেখিয়া ভানুর ছোট বোন রাণু হুনীলেব গা বেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মুহু হাসিয়া কহিল—কি জামাইবাবু, কাল এলেন না যে? আসতে আর ইচ্ছা হয় না বুঝি?

হুনীল মুহু হাসিয়া জবাব দিল—এই তো এসেছি।

এমন সময় বৌদি আসিয়া দাঁড়াইতেই হুনীল প্রণাম করিয়া কহিল—ভাল আছেন বৌদি?

বৌদি সে কথায় কান না দিয়া কহিলেন—খুব ভাল এলে কাল।

—এমনই দেবি হয়ে গেছে,.....মা কোথায়? ভাল আছেন ত?

—মা পূজায় বসেছেন, একুনি আসছেন। বাড়ির সব ভাল ত? তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

রাণু চোখ টিপিয়া কহিল—এ ক-দিন কি চোখে ঘুম ছিল বৌদি? দেখ না চারিদিকে চেয়ে কি দেখছেন!

বৌদি ধমক দিয়া কহিলেন—চুপ কর, ফাজলামি করতে হবে না তোমাকে। আর ত বেশী দেরি নাই, নিজের বেলা দেখা যাবে।—বলিতেই রাণু ছুটিয়া পলাইল।

হুনীল হাসিয়া কহিল—কোথায় লুকতে গেলে?

বৌদি কহিলেন—লুকোচুরি খেলা ত ওর দিদির বরের কাছেই শিখেছে।

হুনীল গম্ভীর মুখে জবাব দিল না।

ভানুর চোখে মুখে আজ আর হাসি ধরে না, বৌদিকে ইসারায় ডাকিয়া কহিল—ওর খাবাব তৈরি, ঠাকুর ভাত নিরে বসে আছে।

বৌদি হাসিয়া কহিলেন—আব দেবি ক'রো না হুনীল, মুখহাত বুয়ে খেতে যাও।

সকালবেলা পায়রাব ঝাঁকের মত একদল মেয়ে নতুন জামাইকে দেখিতে আসিয়াছিল। বিয়ের পর আর হুনীল এ অঞ্চলে আসে নাই, থাকেও অনেক দূরে,—হুদুর আসামে।

মেয়েরা জামাইবাবুকে দেখিয়া মুখ টেপাটেপি কবিয়া হাসিল। কনক হাসিতে হাসিতে রমার পিছনে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল, উমা চাকর রূপসী মেয়ে কামাক্সেস

স্থলে এক সময়ে পড়িত, শহরের আদবকায়দা জানে, ধমকের সুরে বলিয়া উঠিল—হুনীল বাবুকে দেখে হাসবার মত কি আছে বল ত ? কি রকম অসভ্য ।

হুনীল বিছানায় উঠিয়া বসিল। বসিতেই কনক হাসিয়া কহিল—কাল সারারাত ঘুম হয় নি বুঝি ?

উমা হুনীলের হইয়া জবাব দিল—না, হয় নি ত বেশ, কি করবে বলে !

বৌদি ঘবে ঢুকিতেই সরগরম সভা ভঙ্গ হইল। মেয়েরা চলিয়া যাইতেই হুনীল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বাঁচলেন বৌদি !

বাহির-বাড়িতে সেদিন ভোব না-হইতেই বোধনের সানাই বাজিয়া উঠিয়াছিল।

চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামেব প্রবীণরা আসিয়া জুটিয়াছিলেন। গ্রামেব মধ্যে পূজার যত আমোদ-প্রমোদ এ-বাড়িতেই। লোকজনের হৈ-চৈ, খাওয়া-দাওয়া, মহিষ পাঠ্য বলি, এ-বাড়ির মত আর অল্প কোথাও নাই। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে। হুকা-হাতে লইয়া ভগবান-দাদা সভার তোড়জোড় করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। কথার আগাগোড়া বোকা ভার। মাঝখানে তর্ক উঠিল, কলীর মেয়ে এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে। তাহার বিবাহের কথা উঠিতেই সেই মেয়ে বলে কিনা, তাকে যেমন ছেলের পক্ষ দেখিতে আসিবে, সেও ছেলেটকে আগে দেখিতে চায়।

হরেন্দ্র বোবাল সমাজপতি, কুব দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—কেন ফণীর চেয়ে ফণীর মেয়ের বিদ্যাবুদ্ধি বেশী হয়েছে নাকি। তাহলে আর বিবাহের সময় মুখচঞ্জিকার চারি চক্ষের মিলন কেন বলে, আগেই তা শেষ করে নিতে হবে কোন্ আইনে ?

মুকুন্দ গাঙ্গুলি গর্জিয়া উঠিলেন, সীতা-সাবিত্রীর যুগে কোন্ স্থল-কলেক্সটা ছিল ? তাঁরা কি বিহবী ছিলেন না ? এ-যুগের মেয়েদের চেয়ে কম শিক্ষিতা ছিলেন ?

কে এক জন তরুণ ছোকরা পিছন হইতে মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিল—সেদিনও নেই। সে কালও নেই।

কথাটা আরও অনেক দূর গড়াইত, কিন্তু ছোটবাড়ির

নতুন জামাইবাবু আবির্ভাবে কথার প্রসঙ্গটা একরকম চাপা পড়িয়াই গেল।

মুকুন্দ চোখ-ইসারায় হরিহরের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কবিল—কে হে ছেলেটি ?

—ছোটবাড়ির জামাই।

—কে, হুনীল ? চেহারা ত মন্দ নয়, ওদের জামাই-ভাগিই ভাল। মেয়েগুলো চোরে ছেলেগুলিও দেখতে খারাপ হয় নি, যেন একেবারে চক্রবর্ত্ত্য।

ভগবান-দাদা মুকুন্দের নুথের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন,—চক্রবর্ত্ত্য কি বলছে, একেবারে সাক্ষাৎ নারায়ণ-আব লক্ষ্মীঠাকরুণ।

ততক্ষণে হুনীল ও রাণু নেশানে আসিয়া পৌছিয়াছে।

—এস বাবা, এস, ভাস ত সব,...বলিয়াই ভগবান-দাদা উভয়কে লইয়া বাড়ির ভিতরে গেলেন।

ভিতর হইতে একদল বহরুপী বাহিরের আঙিনায় আসিয়া নাচগান শুরু করিয়া দিল। তাহারা স্বদেশী গান বাউল হইতে আরম্ভ করিয়া খেমটা, বৈঠকী, টপ্পা, শেষে একটা ধ্রুপদ পর্য্যন্ত গাহিয়া বিলায় লইল।

বোবাল-বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া তাহারা কাদম্বিনী-পিসীর বাড়ির দিকে বাইতেছিল। পথের ধারেই একটা প্রকাণ্ড বকুলগাছ ডালে-পাতায় ভর্ত্তি। খেয়াবাটের পাশ দিয়া যত লোক এই পথে বাতায়ত করে, সকলেই এই বকুলগাছের নীচে দাঁড়াইয়া একবার বিশ্রাম লাভ করিয়া যায়। রাণু বকুলতলার আসিয়া গাছটির দিকে চাহিয়া কহিল—জামাইবাবু, এই বকুলগাছের কথা মনে আছে ত ? এই গাছে না, সেবার কি এক মজার কাণ্ড হয়েছিল, ভুল গেছেন বুঝি।

হুনীল চক্ষু দুইটি কপট বিষয়ে বিস্ফারিত করিয়া কহিল—কি কথা ? তেমার দিদিকে বরং জিজ্ঞাসা করো। তার মনে থাকতে পারে।

নদী-তীরের পথ। ওপরের কাশফুলে হাওয়া খেলে নির্নিদ্র। এ পারের লোকেরা ওপারের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে বলারলি বরে ; এইটুকু লক্ষ্যা, আজ কত বড় হয়ে গেছে, সেদিনও কত লোক খেয়ার নদী

পাবাপার হয়েছে বর্ষাকালে, এখন আর শীতকাল ছাড়া নদীতে পাড়ি দেয় কার সাধ্য !

খেয়াবাটে নৌকা ছিল না, কে এক জন যুবক সাতার কাটিয়া অনায়াসে গহীন নদী পার হইয়া গেল।

এদিক বিয়ের বাড়িতে 'বর কোথায়, বর কোথায়', নতুন জামাইয়ের খোঁজ নেই...বিয়ম হলুহুল পড়িয়া গেছে। জামাই কোথায় গেল, এই জইয়া হাটে মাঠে ঘাটে খোঁজ-খোঁজ রব। চাবিদিকে লোক ছুটিল। বরযাত্রীব সংখ্যাও কম ছিল না, তাহারাও পই-পই করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। বরর পিতা স্বয়ীকেশ বাবুর মুখ চুণ হইয়া গিয়াছে। ছেলে বে এমন বিবাহসভায় তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া যাইবে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত। তিনি মাথায় হাত দিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। জগদীশ বাবু—ভায়র বাবা, এমন বে একটা অনাহুত কাণ্ড সহ্য ঘটবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। না হইলে, তাঁহাদের দেশ হইতে বর পলাইয়া যাইতে পারে, তাঁহারই চোখের ওপর ! হেলোটিকে ভাল জানিয়া শুনিয়া তিনি এ সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছিলেন। তিনি লোকের কোন কথাই কান দিলেন না। বিবাহের লগ্ন রাত্রি তিনটা অবধি ছিল, হুতরাং চিন্তার বিষয় কোন কারণ নাই। দিকে দিকে লোক ছুটিয়াছে ; জামাই নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে।

মেয়েমহলে আশঙ্কার প্রাবন বসিয়া গেল। এদিকে ভানু বিয়েব কনে সাজিয়া রঙ-বেবঙের গহনা, গরমের চেলি পরিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া আছে। তাহার কানেও বে এসব ঘটনা আসিয়া না-পৌছিয়াছিল এমন নয়। ব্যাপার সতীর্ণ দেখিয়া সে বড় ছাদে আসিয়া হাঁক-ছাড়িয়া বাটিল। তাহারও কিশোর মনে নানা রকম দৃষ্ট বুদ্ধি খেলিতছিল।

ভাবী জামাই কেন অন্তর্ধান হইল, এ-বিষয়ে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হইল। কেহ বলিলেন, অন্ধকালের ছেলেছোকরার। এমনি কত রকমের রোমান্স করিয়া থাকে। কেহ বলিলেন, এখনই ফিবে আসবে, নিশ্চয়ই দেখো।

আর এক জন বলিলেন—মেয়ে পছন্দ হয়েছিল ত ! তার! যে অন্ধ ! লক্ষ্মীশ্রী, হুন্দবী চোহারার আজকাল মূল্য নেই। নাচিয়ে গাইয়ে কায়দা কর্ত্ত মেয়ে না হ'লে আজকাল বাবুদের মন ওঠে না !

এমন সময় ভিড় লিয়া থাকী কোটপ্যান্ট-পর্য এক জন দারোগা বাবু একদল চৌকীদার, দফাদার, কনষ্টেবলের সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া তড়াতাড়ি কহিলেন—আপনাদের বাড়িতে আমবা সার্চ করবো মশায়, ডাকাত তাড়া করেছিলাম, নদী সাতরে এসে আপনাদের কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে...এই রামসুন্দর, মঙ্গলরাম, বাড়িটা বিরে ফেল।—হাপাইতে হাপাইতে দারোগাবাবু দাড়ি নাড়িয়া কহিলেন—যে দিন-কাল পড়েছে, গ্রামে আর হুখে শান্তিতে থাকবার জো নেই। ভদ্রলোকের ছেলেরা এখন শুরু করেছে চুরি-ডাকাতি, আমরা কোথায় বাই বলুন। থানায় ব'সে কাল রাত্রির রিপোর্ট লিখছি, এমন সময় মাধব চৌকিদার এসে খবর দিতেই "দে ছুট, দে ছুট," আমরা কি মশায় ষাওয়া-দাওয়ারও একটু সময় পাব না। সেদিন লাটসাহেব এসে গেলেন, সারারাত পথের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু মশায় পুলিশের নামে কত কানায়ুসা ! আমরা কি শুধু জীবনপাত করতেই এসেছি...

উপস্থিত কয়েক জন গ্রাম্য ভদ্রলোক সান্তনার সুরে কহিলেন—আপনারা আছেন বলেই ত আমরা আছি। না হ'লে দেশে কি আর বসবাস করা যেত।

তলতল করিয়া খুঁজিয়াও ডাকাত ধরা পড়িল না। পাড়ার মুন্সিবরা কহিলেন—কি সোনার দেশ ছিল, আর এখন হয়েছে কি !

দারোগা সাহেব বিয়ম রাগিয়া কহিলেন—কি হবে আর ! আমরা থাকতে আপনাদের ভয় কি ? মারতে আমরা, বাচাতেও আমরাই ! এখন ডাকাত ধরা পড়লেই হয়।

ভগবান-দাদা পাক লোক, অবসর বুঝিয়া হাসিয়া কহিলেন—আপনারা আছেন বলেই ত আমরা পরম সুখ বাস করছি, একেবারে রাম-বাজ্ঞে...

দারোগা বাবু খুশী হইয়া অনেক কথাই কহিলেন। নয়সড়ক ধরিয়া ডাকাতেবা পথ চলিয়াছিল, তাড়া খাইয়া নদী পার হইয়া এ গ্রামে আসিয়া ঢুকিয়াছে ইত্যাদি। সে-কথা শুনিয়া সকলে পদস্পর্ষের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

জ্যোৎস্নার আলো তখনও আকাশে লাগিয়াই ছিল। খিড়কি-দরজা দিয়া ভানু বাহির হইয়া আসিয়া নদী-

তীরের বেঁপড়াভঙ্গি খুঁজিয়া বেড়াইল। তাহারও চিন্তা কম নহ, হেলমানুসি বুদ্ধিতে আর কি সে করিতে পারে।

তবু সে বুদ্ধিমতী।

এমন সময় মিস্ত্রিবন্দর বাগানে চৌকিদার দফাদারেরা বিয়ম হস্তা কবিতা উঠিল, বোধ করি দু-একটা বনব শিয়াল সেখানে আশ্রয়লা করিতেছিল। ভানু ভয় পাইয়া ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ বকুলগাছের ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা বাহিয়া অ'গ-মাখ রূপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ছোটবেলায় এই বকুলের ডালে তাহার দে'লনা খেলিবাছে, ফুল কুড়'ইয়া মালা গাঁথিয়াছে, ফল খাইয়াছে, গাছের ডালে বসিয়া পাড়াব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লুকেচুবি খেলিয়াছে, এ গাছ ত তাহার কত জানাশোনা।

গাছের আগডালে বসিতেই দেখিতে পাইল, কে এক জন লোক গ'র একটু উপরে বসিয়া থব থর কবিতা ক'পিতেছে এবং সেই কাঁপুনিতে গাছের ডালপালা মুহ মুহ নড়িতেছিল। ভানু অস্তব'য়া এফ-একব'র ক'পিয়া উঠিল, মনে সাহস সঞ্চয় কবিতা কহিল—গাছের ওপরে কে রে, শীঘ্র বল, নইলে চৌকিদারদের ডেকে দেব কিন্তু।

ভানু এই মাত্র শুনিয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের বাড়ির চতুর্দিকে ডাকাতরা আশ্রয়গোপন করিয়া আছে, সে যে তাহাদেরই এক জন এ-কথা বুলিতে তাহাব বিলম্ব হইল না। নিকটই পুলিশ প্রহরীরা ছুটাছুটি করিতেছিল সুতরাং ভয়েবও কোন কারণ নাই।

ভানু পুনরায় বলিয়া উঠিল—ডাকবো? তুমি ডাকাতি কবতে এসছিলে, না?

জবাব আসিল, ...না, না...আমি এ-বাড়ির বিয়ের বব, ...বির করতে এসে...

ভানু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

নিরন্তর দেখিয়া ভানু পুনরায় ধমক দিয়া কহিল—কি চুপ ক'রে রইলে যে? ডাকবো নাকি পুলিশ?

কঁদকঁদ স্বরে জবাব দিল—আজ্ঞে নয়! সড়ক দিয়ে পালিয়ে বাচ্ছিলাম,—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জ'ম ইব'ব পুনরায় কহিলেন—আপনি এই গ্রামের লোক? অ'ম'র বাঁচান, আমি বড় বিপদে পড়েছি।

ভানু ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিল—পালিয়েছিলে কেন ব'লা, শীঘ্র বলো, ...ওই ওবা এদিকেই আসবে এফুনি! জামাইবাবু নিরন্তর।

ভানু পুনরায় কহিল—না, তুমি বলবার লোক নও, আচ্ছা, দাঁড়াও, ...বলিতেই জামাইবাবু জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে মেয়ে নাকি বিয়ম কালো...

ভানু মনে মনে একটাট হাসিয়া রাগত ভাবে কহিল—কালো হয়েছে ত কি হয়েছে, কালো মেয়ের বিয়ে হবে না তা ব'লে! কালো, তুমি নিজ দেখেছ?

—না!

—এ-মুসংবাদ কে দিলে তোমায়?

—পাড়ার ছুট ছেলেরা বলাবলি কবছিল, জামাইয়ের বউ কি কালো হবে বে...

—তুমি ছেল দর সে কথা শুনে একেবারে দে ছুট! শীঘ্র নেমে এস যদি প্রাণে বাঁচতে চাও।—পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া ধমকের স্বরে কহিল—লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হয়েছে তোমাব, তুমি না বি-এ পাস করেছ?

বেচরী মুখখানি কঁচুমাচু করিয়া জবাব দিল—আজ-কালের ছেলেবা সব ই বি-এ পাস ক'র।

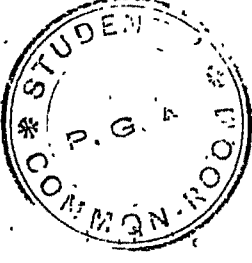
বকুলগাছ থেকে নামিবাব সময় পরাণ দফাদার দেখিয়া ফেলিয়াছিল। ভানু একদোড়ে চোখে নিমিয়ে যে কোথায় অস্তহিত হইয়া গেল, কেহ তাহা জানিল না। মঙ্গলরাম তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া বাগানের ভিতর পথ হারাইয়া বিয়ম চেঁচামেচি শ্রু কবিতাছিল। ধরা পড়িল, ... নুতন জামাই! বেচাবী একেবারে মরমে মরিয়া গেল।

গভীর বাজে ছোটবাড়িতে বিয়ের বাজনা বাজিয়া উঠিল। পাড়াপড়সীরা অ'বাব ছুটিয়া চলিল। সকলের মুখই এক কথা—জামাই ধরা পড়েছে।

বেচরী ভানু কবে যে হুণীলের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল, সে খবর আমরা ভাল জানি না, কিন্তু এই বাপার লইয়া যে তরুণ দম্পতির রীতিমত একটা বে'ঝা-পড়া মাঝে মাঝে না হয়, এমন নয়।

তবে ভানুর কাহিনী গ্রামের দশ জনের কাছে শেষে ব্যক্ত হইয়া গিয়াছিল।

মিছামিছি দাবোঁগা বাবু হররাণ হইয়া শেষে মিষ্টমুখ করিয়া থানায় ফিরিয়া গেলেন।



বাংলা দেশে ব্যায়ামচর্চা

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরত

“আজকাল ব্যায়াম সম্বন্ধে নানারূপ মতামত শুনিতে পাওয়া যায়; বাহার যেকোন অভিজ্ঞতা তিনি সেইরূপ ব্যায়াম ভাল বলিয়া থাকেন।” অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও পুষ্টিগত বিদ্যাব উপর নির্ভর করিয়া কিংবা লোকমুখে শুনিয়া, ভালমন্দ বিচার-শক্তি না-থাকা সত্ত্বেও নিজের মতামত প্রকাশ করিতে জট কবেন না। আজকাল একদল লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ড্রিল, খালিহাতে ব্যায়াম, ক্যালিষ্টেনিক্‌স্ ব্যায়াম, গেমস্, স্পোর্টস্ ও পল্লীশুভাদি ব্যতীত অন্যান্য ব্যায়াম শরীরকে ক্ষিপ্ত, চপল, উদ্যমশীল, পরিশ্রমী ও কার্যকর করিতে পারে না। ইহাদের মতে এই গুণগুলি লাভ একমাত্র উপরি কথিত ব্যায়াম গুলিদ্বারা ই সম্ভব। অধিকন্তু অন্যান্য যান্ত্রিক ও কষ্টসাধ্য ব্যায়ামগুলি দ্বারা মস্তিষ্কেব শক্তির হ্রাস হয়, ধমনী ছিঁড়িয়া যায়, আয়ু কমে এবং ভবিষ্যৎ জীবন অকর্মণ্য ও নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। বকসিং, যুয়ুংহু, লাঠিখেলা প্রভৃতি আশ্চর্যকার কৌশলগুলির সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, এমন কি কাহারও মতে এইগুলি ভদ্রসন্তানদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, আবার মাংসপেশী বড় হইলে নাকি ক্ষিপ্ততা ও চাপল্য নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাহার কাহার মতে কুস্তিতে মেধাশক্তি কমিয়া যায় এবং শরীর স্থূল ও চর্বিযুক্ত হইয়া যায় বলিয়া উহা অনিষ্টকর। যান্ত্রিক ব্যায়াম দ্বারা শরীর গঠন ও শক্তিতে শারীরিক শক্তি-পরিচায়ক খেলা, যথা—ভার-উত্তোলন, লৌহদণ্ড বক্রকরণ, চলন্ত মোটর গাড়ীর গতিবোধ এবং বৃকে হাতী বা বোলের গ্রহণ প্রভৃতিকে ইহারা কেবল মাত্র সার্কাসের কৌশল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং এইগুলি প্রদর্শনের যে কোন উপকারিতা আছে তাহা ইহারা মনে করেন না বা স্বীকার করেন না।

ড্রিল ও খেলা।—যে প্রথায় স্থূল প্রভৃতিতে ড্রিল ও

খেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা কেবল মাত্র ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে উপকারী, আনন্দদায়ক ও শৃঙ্খলারক্ষার সহায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ছেলেরা রোদ্দে, টাঁড়াইয়া ক্ষুধিত ক্লান্ত অবস্থায় ড্রিল ও খেলা করিতেছে। ইহাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। বিশেষতঃ এইরূপ ড্রিল ও খেলা বয়স্ক ও কলেজের ছেলেদের ক্ষতিবিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, কতিপয় কলেজে এইরূপ বাধ্যতামূলক ব্যায়ামশিক্ষার প্রচলন চেষ্টা দ্বারাও আশাহরূপ ফললাভ হইতেছে না। দেখা যায়, প্রায় বিশ বৎসরেরও অধিককাল বাবৎ স্থলে (পরীক্ষা স্বরূপ) ড্রিল, খালিহাতে ব্যায়াম ইত্যাদি করান হইতেছে অথচ ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অথচ এইরূপ ব্যায়ামকেই বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম বলিয়া প্রচািব করা হইতেছে এবং এইরূপ ব্যায়ামের বাধ্যতামূলক প্রচলন চেষ্টা কলেজেও চলিতেছে।

খালিহাতে ব্যায়াম।—খালি হাতে ব্যায়াম নানা প্রকার, তন্মধ্যে এনাটমিক্যাল একসারসাইজ—ডন, বৈঠক বিশেষ উপকারী। তবে এই ব্যায়ামগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত বাহাদের মাংসপেশী সম্বন্ধে জ্ঞান নাই বা নির্দিষ্ট পেশীতে ক্ষোব দিতে পারে না তাহাদের পক্ষে তত উপকারী নয়। বাহারা দুর্বল এবং বয়স্ক দ্বারা ব্যায়াম করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে খালিহাতের ব্যায়ামগুলি উপকারজনক।

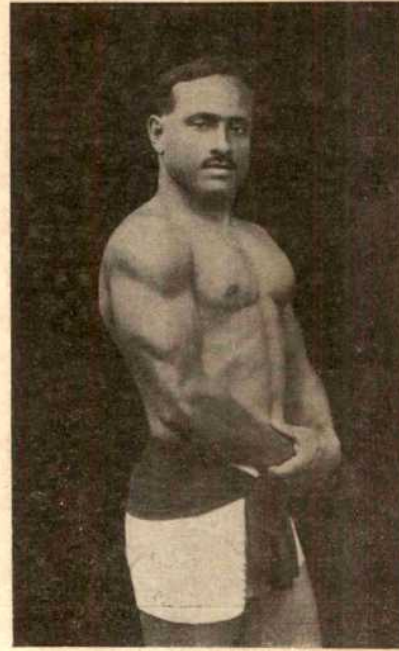
বাহারা ডন বৈঠক করিবার উপযুক্ত তাহারা নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করিলে সুফল পাইতে পারে। ডন, বৈঠক স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও নিজের ক্ষমতানুযায়ী ক্রমশঃ বাড়িয়া লওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত শরীরকে নানা প্রকার বক্রীকরণ, স্কিপিং, এব্‌ডোমিনাল একসারসাইজ, আসন দ্বারা ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে অমূলক। সোজা ভাবে লম্বা পা ফেলিয়া খোলা বাতাসে সাধানুযায়ী হাঁটা এবং

আন্তে আন্তে দৌড়ান বিশেষ উপকারী ; ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, পেটের চর্পি কমায়, এবং বিস্তৃত অন্নজন্য বাপ পাওয়া যায় বলিয়া স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে ।

ক্যালিস্থেনিক একসারসাইজ।—ভিলের মত দল বাঁধিয়া একসঙ্গে হাল্কা মুগুর, ডাম্বেল, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা ব্যায়াম যদিও সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর তথাপি আদেশানুযায়ী সকলের একসঙ্গে করিতে হয় বলিয়া হৃৎকলদের পক্ষে হানিকর । এইরূপ ব্যায়াম করাইতে হইলে প্রথমে স্বাস্থ্য ও শক্তি অল্পায়াগ্রী শ্রেণীবিভাগ করিয়া লওয়া উচিত ।

খেলাধুলা।—বাস্কেট বল, ভলি বল, হকি, টেনিস, ইত্যাদি কুটবল বাতীত অত্যন্ত খেলাগুলি সাধারণতঃ শীতকালে খেলিত হয় বলিয়া এবং ইহাতে কুটবল অপেক্ষা কম সময় লাগে বলিয়া শরীরের ক্ষতি না হইয়া বরং ক্ষিপ্ৰতা চাপিয়া ইত্যাদি সহজই অনয়ন করে এবং শরীর কণ্ঠ্য হয় । তবে অনিয়মিত বা অপরিমিত ভাবে খেলিলে বা পরিশ্রম উপযোগী থাকের অভাব হইলে শরীরের অনিষ্ট সাধিত হয় । স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দ্বয় পক্ষেই এই সকল খেলা উপযুক্ত ।

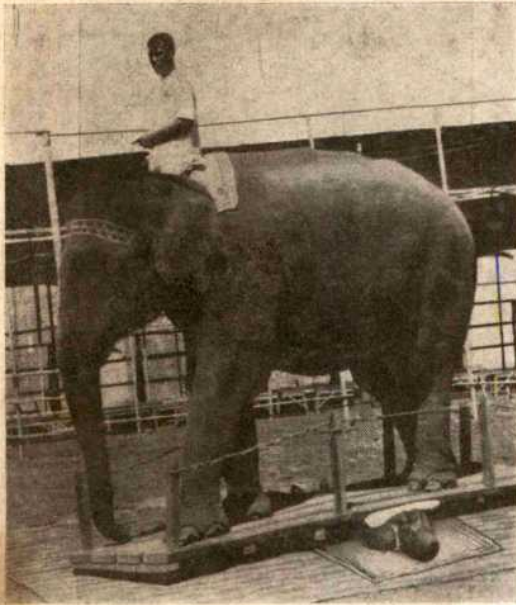
ফুটবল।—নিয়মিত খেলিলে কুটবল খেলায়ও অত্যন্ত খেলার গুণগুলি লাভ করিতে পারা যায় । কিন্তু দেশ ও ঋতু ভেদে খেলিবার সময় নিরূপণ, পরিশ্রম অনুযায়ী খেলা, শরীর গঠনোপযোগী খাওয়া, নিয়মিত অভ্যাস ও শিক্ষার অভাবে এবং অত্যধিক পরিশ্রম হেতু শরীরের ক্ষয় হওয়ার অধিকাংশ খেলোয়াড় অতিগীর্ণ ভয়স্বাস্থ্য হইয়া পড়ে এবং ছুই-চারি বৎসরের অধিক খেলিত সমর্থ হয় না । আজকালকার বাঙালী কুটবল দলের অবস্থা দেখিলে আনন্দ না আসিয়া দুঃখই বেশী হয় । এই সব দলের মুঠমেয় খেলোয়াড় (বাগরা শরীর-গঠন ও স্বস্থায়কতার প্রতি যত্ন লইয়া থাকেন) বাতীত অত্যন্ত সকলেই শক্তি-সামর্থ্যবিহীন বলিয়া সহজেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে । বিদেশী খেলোয়াড়দের যেমন গঠন, তাঁহারা তেমনই শক্তিসম্পন্ন, উজ্জমশীল ও পরিশ্রমী । ইহার একমাত্র কারণ নিয়মিত শিক্ষা, অভ্যাস, শরীররক্ষা ও পরিশ্রমোপযোগী খাওয়া । কুটবল খেলার সময় চলিয়া গেলে, তাঁহারা শরীর কণ্ঠ্য হাল্কা ও গঠনোপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেন । বাঙালী দলগুলির এইরূপ ব্যবস্থা না থাকায় ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে । কুটবল শীতপ্রধান দেশের খেলা, সে-সব দেশে একঘণ্টা খেলিলেও স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না । আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে স্বল্প ব্যায়াম করা উচিত । অত্যন্ত খেলাগুলি একঘণ্টা খেলিলে যেরূপ পরিশ্রম হয়



লেখক

কুটবলে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক হয় । অতএব শীতকালে এই খেলার প্রচলন হওয়া উচিত । এই খেলা শিখিবার সময় নিজ স্বাস্থ্যানুযায়ী কে কতটুকু সময় খেলিবার উপযুক্ত তাহা পরীক্ষা করিয়া ঠিক ততটুকু সময় খেলিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বাড়াইয়া লওয়া উচিত । এইরূপ নিয়ম না খেলিলে অধিক পরিশ্রম হেতু দম কমিয়া যায় । সাধারণতঃ দেখা যায়, নূতন ও পুরাতন সকল খেলোয়াড়ই এক ঘণ্টা খেলিতেছে, ইহাতে শিক্ষার্থীদের অবগুই ক্ষতির সম্ভাবনা । তাহা ছাড়া পরিশ্রমানুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা সর্বদা কর্তব্য । সর্বাঙ্গপরি বখন কুটবল খেলা শেষ হইয়া যায় তখন স্কিপিং, দৌড়, এব্‌ডোমিনাল একসারসাইজ এবং অল্পরূপ শরীর-গঠনোপযোগী ব্যায়াম অবশ্যকর্তব্য ।

দেশীয় খেলা।—দেশীয় খেলাগুলির মধ্যে দাড়িয়া বাঁধা, গোল্লাছুট, বুড়িছি ও হাড়ু প্রভৃতি খেলা বয়স্ক ও ছোটদের উভয়ের পক্ষেই উপকারী । সময়-নির্দেশানুযায়ী নিয়মিত অভ্যাস করিলে ইহাতে যেমন দম বাড়ায়, তেমন চাপলা, ক্ষিপ্ৰকারিতা ইত্যাদি সহজেই অনয়ন করে এবং শরীর কণ্ঠ্য হয় । হাড়ু খেলায় সাহস বাড়ি ও কৌশল শিক্ষা হয় । এই সকল খেলা যেমন আনন্দদায়ক তেমন স্বাস্থ্যোন্নতিকর, শক্তিপ্রদ ও



হস্তী-পদতলে লেখক

শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী; অথচ ফুটবল প্রভৃতি খেলা অপেক্ষা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ।

স্পোর্টস।—নানা রকম দৌড়ান, লাফান, বলনিষ্ক্ষেপ ইত্যাদি খেলাগুলি নিয়মাবলীভাবে খেলিতে হইলে ডিলের মত সর্বদা আদেশানুবর্তী হইয়া চলিতে হয় না এবং অনেকটা ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারা যায় বলিয়া মনে ক্ষুণ্ণি বাড়ায়। যে কাজ স্বাধীনভাবে করা যায় সে কাজে উৎসাহ বাড়ে। বিশেষতঃ খেলা ও ব্যায়ামের বেলায় ঐরূপ হওয়াই বিশেষ দরকার। খেলিবার উপযোগী শরীর গঠন করিয়া পরে খেলা ইত্যাদি অভ্যাস করিতে হয়, তাহা না হইলে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়।

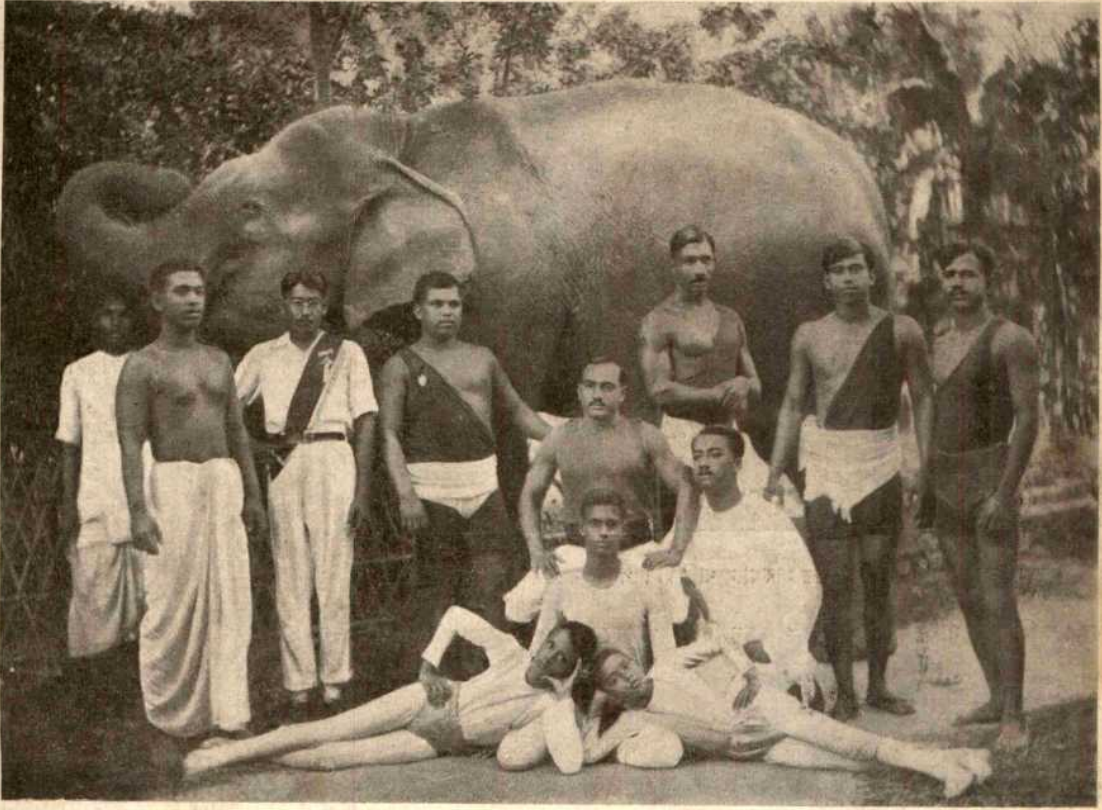
পল্লীনৃত্য।—পল্লীনৃত্য খুব আনন্দদায়ক; ইহাতে অভ্যাসবলে ব্যায়াম হয় অর্থাৎ নিজে বুঝিতে পারে না যে কোন মাংসপেশীর কাজ হইতেছে। নাচ ও তালমানের সহিত মনঃসংযোগ করিতে হয় বলিয়া ব্যায়ামের প্রতি দৃষ্টি থাকে না এবং নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত পরিশ্রান্ত হইলেও তালমান ঠিক রাখিবার জন্য থামিতে না পারায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় বলিয়া অপকারী। প্রথম শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট গান এবং তদনুযায়ী নাচের ব্যবস্থা করিয়া (অর্থাৎ বাহ্যতে তাহাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম না হয়) ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইয়া লইলে উপকার হইতে পারে।

বাল্মিক ব্যায়াম।—প্রথম শিক্ষার্থীদের খালি হাতে কোন মাংসপেশীর উপর জোর দিতে বলিলে অনেকেই

বুঝিতে না পারিয়া অনিচ্ছাসহে বিরক্তির সহিত গা ছাড়িয়া দিয়া হাত-পা নাড়িতে থাকে। এমত অবস্থায় যন্ত্র হাতে লইয়া ব্যায়াম করিতে গেলে উহা তুলিতেও কিছু-না-কিছু শক্তি সেই পেশীর উপর পড়ে বলিয়া অনেক কাজ হয় এবং ধীরে ধীরে বুঝিতে পারে যে কতটা জোর দিতে হইবে। যন্ত্রাদি দ্বারা ব্যায়াম করিতে গেলে যন্ত্রব্যবহারজনিত একটা উৎসাহ ও মনোবোণ হয় এবং ব্যায়াম করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন নির্দিষ্ট পেশীর উপর শিক্ষার্থী জোর দিতে শেখ তখন খালি হাতে ব্যায়াম করিয়াও তুল্য ফল পাইতে পারে। শরীরের বিশিষ্ট মাংসপেশী বা অংশ অপূরণ থাকিলে বিভিন্ন মাংসপেশী গঠনোপযোগী যন্ত্রাদি ব্যবহারে অংশগুলির যত সহজে পূরণ হয় অত্যান্ত ব্যায়াম দ্বারা তত সহজে হয় না। শক্তিশাল্যের পক্ষে যন্ত্রাদি দ্বারা ব্যায়ামই প্রধান সহায়, বিশেষতঃ ড্রিল বা ঐরূপ অত্যান্ত ব্যায়াম একসঙ্গে আদেশানুযায়ী করিতে গিয়া যেমন দুর্বল ব্যক্তিদিগের কষ্ট ও অধিক পরিশ্রম হয় ইহাতে তাহা না হইয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ খাওয়া শক্তি ও অভিরুচি অনুযায়ী ব্যায়াম করিতে পারে; কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না বলিয়া ইহা অধিক উপকারী। নানা রকম যন্ত্রাদি দ্বারা ব্যায়াম করিতে হয় বলিয়া অত্যান্ত ব্যায়ামের মত একঘেয়ে না হইয়া ইহা বরং ক্ষুণ্ণি আনয়ন করে। ইহা ছাড়া অত্যান্ত ব্যায়াম অপেক্ষা ইহাতে সময় লাগে। নিয়মিত ব্যায়াম করিলে বাল্মিক ব্যায়ামের কোন প্রকার অপকারিতা আমি স্বীকার করি না। অতিরিক্ত সকল বিষয়ই খারাপ।

ব্যায়াম করিবার নিয়ম।—সপ্তাহে চারিদিন শরীর-গঠনোপযোগী ব্যায়াম, একদিন শক্তিরচর্চা, একদিন দৌড়ান লাফান ইত্যাদি এবং একদিন বিশ্রাম। প্রত্যহ ব্যায়ামের পর সামান্য অনুযায়ী আস্তে আস্তে দৌড়ান এবং অন্ততঃ মিনিট পনের খোলা বাতাসে বেড়ান দরকার। যেদিন যে ব্যায়াম করিতে ভাল লাগে সেইদিন সেইরূপ ব্যায়াম করা উচিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যায়াম করিলে লাভ না হইয়া ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, নিজের শক্তি ও থাদ্যানুযায়ী ব্যায়াম করিলে সহজেই উন্নতি লাভ করা যায়। সংযমী না হইলে শুধু ব্যায়াম করিয়া কোনই লাভ হয় না।

যুগ্মশু, বন্ধি ও লাঠি।—অনেকের মতে যুগ্মশু, যুগ্মশু, লাঠিখেলা প্রভৃতি ভদ্রলোকের রুচিবিরুদ্ধ। আম'র মতে নিয়মিত অভ্যাস করিলে ইহাতে শরীর কন্দর্প হয়, আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা হয় এবং সাহস বাড়ে। আত্মরক্ষা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য এদেশে ইহাই প্রধান সহায়।



সশিষ্য লেখক

কোন গুণাকর্ষক আত্মীয়-স্বজন অক্রান্ত হইলে তাহাকে গুণ্ডার হাতে ছাড়িয়া দিয়া জীবনরক্ষার জন্ত পলায়ন অপেক্ষা শত্রুহস্ত হইতে তাহার মুক্তি ও শত্রুকে বাধাদান করাই কর্তব্য।

বড় মাংসপেশী।—অনেকে বলেন, বড় মাংসপেশী থাকিলে শরীরের চাপল্য নষ্ট হইয়া যায়। মাংসপেশী বলিতে কি তাঁহারা অতিরিক্ত চর্চা দ্বারা আবৃত মাংসল দেহকেই মনে করেন? না পরিমিত, চর্চাব্যুক্ত, সুগঠিত এবং কন্ঠ পেশীকে মনে করেন, তাহা জানা দরকার। যদি প্রথমটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু দ্বিতীয়টি তাঁহাদের আলোচনার বিষয় হইলে আমি বলিব এইরূপ গঠিত ও বড় পেশীবৃত্ত শরীরের ওজন অপেক্ষাকৃত কম হয় ও কন্ঠ হয় বলিয়া অভ্যাস করিলে সকল প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। পাশ্চাত্য দেশে বড় মাংসপেশীবৃত্ত অনেক ব্যায়ামবীর আছেন যাহারা অভ্যাসমত দৌড়াইতে লাকাইতে ও সাঁতার কাটিতেও পারেন। এদেশে যাহাদের মাংসপেশী বড় হইয়াছে তাঁহারা এগুলি চর্চা করেন না বলিয়াই

অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মত পারিণা উঠেন না। সেইজন্য এই প্রকার শরীর গঠনোপযোগী ব্যায়াম বা এই প্রকার শরীর গঠন করা যে ধারাপ তাহা বলা যায় কি? যাহার ঘেরূপ দরকার সে সেইরূপ অভ্যাস করে এবং প্রয়োজনীয় মনে করে।

কুস্তি।—কাহারও কাহারও মতে কুস্তিতে মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হয় ও শরীরের শ্বেদ বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি বলিতে তাঁহারা কি মনে করেন, কতকগুলি বই মুখস্থ করিতে পারিলে বা কতকগুলি সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা প্রকাশ পায়? আমার তাহা মনে হয় না। যে-কোন বিষয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কার করাই কি মস্তিষ্কের শক্তির পরিচায়ক নয়? এক জন কুস্তিগীর কোন ক্রতী ছাত্র হইতে কম মস্তিষ্কসম্পন্ন কিসে? কুস্তিগীরগণেরও নূতন নূতন তথ্য ও কৌশল আবিষ্কার করিয়া কুস্তির প্রীতি সাধন করিতে হয়। তাহাতে কি তাহাদের কম উপস্থিত-বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হয়? পরীক্ষা-স্বরূপ একজন ছাত্রকে ও একজন কুস্তিগীরকে যদি পরস্পরের শিক্ষণীয় বিষয় পরিবর্তন করিয়া লইতে বলা হয় তাহা হইলে কেহই কাহারও



শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মোটরের মাঝখানে থাকিয়া চাপ সহ্য করা দেখাইতেছেন

অপেক্ষা অধিকতর মস্তিষ্কের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। এক জন ছাত্র হয়ত বিদ্যার্জন অথবা অর্থোপার্জনের উচ্চাশা লইয়া লেখাপড়া শিখ, সেইরূপ একজন কুস্তিগীরও পৈতৃক ব্যবসায়ে ধ্যান অর্জন করিবার জন্ত সেই বিষয়ে অধিকতর অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে কোনটা মস্তিষ্কের ক্ষমতার পরিচায়ক বলা কঠিন। কুস্তিতে শরীর চর্চাযুক্ত হইয়া যায়, এ ধারণা ঠিক নয়। সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর পালোয়ানদের বেশ সুগঠিত দেহ থাকে। পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও খাদ্য গ্রহণ কর এবং ক্রমশঃ খাদ্যের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া ব্যায়ামের মাত্রা কমানিয়া দেয় ও বিশ্রামের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া আয়াস-প্রিয় হইয়া পড়ে বলিয়া চর্চাযুক্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ ইচ্ছা করিয় ই নিজের সুবিধার জন্ত শরীর ভারী করে, অথচ যাহাতে তাহাকে না নড়াইতে পারে। অতএব কুস্তি করিলে মেদ বৃদ্ধি হয় এ ধারণা ঠিক নয়। নিয়মিতরূপে করিলে অত্যন্ত ব্যায়াম অপেক্ষা কুস্তিতে অনেক কম সময়ের মধ্যে জোর দিবার ক্ষমতা ও দম বাড়ায়; উপরন্তু আয়তনকার কৌশল শিক্ষা হয় ও সাহস বাড়ে। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরাই ইহা করিবার উপযোগী। অত্যন্ত ব্যায়াম অপেক্ষা অধিক সময় নষ্ট হয় বলিয়া সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়।

শক্তির কৌশল।—অনেকে বলিয়া থাকেন মোটরের গতিরোধ, লৌহদণ্ড বাঁকান, ওজন তোলা, বুকে ওজন ধারণ ইত্যাদি শক্তির পরিচায়ক কৌশলগুলির প্রদর্শন নিম্নয়োজন এবং এগুলি কেবল সার্কাসের খেলা মাত্র। মোটর থামান,

বুকে হাতী নেওয়া প্রথম যখন প্রফেসর রামমূর্ত্তি দেখাইতেন ও রাশিয়ান স্যাণ্ডো ক্রমার সাহেব লৌহদণ্ড বাঁকান দেখাইতেন, তখন কত লোক তাঁহাদের দেবতা জ্ঞান করিতেন বা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া কুতর্ভ হইতেন। আর আজ বাংলা দেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙালী যুবকগণের মধ্যে হইতে নানারূপ অভাব-অভিযোগ ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দেশ অপেক্ষা কম ও সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করিয়া যতটুকু করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা কি গৌরবের বিষয় নয়? আমি অত্যন্ত দেশের শক্তিমানে লোক অপেক্ষা ইহাদের প্রশংসাই বেশী করিব, কারণ এদেশ সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকের জনপ্রতি মাসিক পাঁচ-ছয়

টাকার বেশী খুব কম লোকেই আহাৰ্য্যে ব্যয় করিতে পারে। এই সকল খেলা যাহারা দেখাইয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবিত্ত সংসারের লোক।

স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে ব্যায়াম অবশ্য প্রয়োজনীয়। আজকাল বাংলার ছাত্রসমাজে ও সাধারণের মধ্যে যে শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য একটা সাড়া পড়িয়াছে ইহাই একমাত্র ব্যায়াম-প্রদর্শনের ফল। পূর্বে প্রফেসর রামমূর্ত্তি এবং ভীম ভবানী ও মুখ দুই-তিন জন ব্যায়ামবীর সার্কাস ব্যবসায়ীরূপে এইরূপ অনেক খেলা দেখাইতেন। তাঁহারা সাধারণের নকট প্রচার করিতেন যে বোগ, প্রাণায়াম শিক্ষা ব্যতীত এইরূপ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। এই কারণে কেহই এই কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। ছাত্রজীবনে ও ব্যক্তিগত কর্মজীবনে যে নিরুপদ্রবে ব্যায়াম দ্বারা অতুল স্বাস্থ্য ও শক্তিশালী করা যায় তাহা সাধারণের ধারণার বাহিরে ছিল। যদিও বাংলায় পূর্বে কালে শক্তিচর্চা ও ব্যায়ামের বহুল প্রচার ছিল এবং অনেক শক্তিমানে ও সাহসী বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু চর্চার অভাবে ইহা ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতছিল। সুখের বিষয়, আজকাল বাংলা দেশ হইতে অন্ততঃ দুই শত বাঙালী পাওয়া যায় যাহারা প্রফেসর রামমূর্ত্তির সকল খেলা অথবা কিছু-না-কিছু খেলা দেখাইতে সমর্থ হয়। বিশেষ আনন্দের বিষয়, ছাত্র-সমাজের মধ্যে এইরূপ ব্যায়াম সম্বন্ধে উৎসাহ দেখিয়া সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় ইহার উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতি।—

এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতি (Students Welfare Committee) সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। উক্ত সমিতি প্রত্যেক বৎসর স্থল ও কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ছাত্রগণের স্বাস্থ্য কিরূপ ভাল হইতে পারে বা ব্যাধিমুক্ত হইতে পারে, এরূপ উপদেশ বা ব্যবস্থা করিতে না পারিলে শুধু এইরূপ স্বাস্থ্যপরীক্ষা দ্বারা এ-বাৎ ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি উন্নতি হইয়াছে বা হইতে পারে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমার মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের স্বাস্থ্যমান্তি করিতে গেলে প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলির ছাত্রদের তিন মাস অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া আবশ্যিক-মত উপদেশ ও ব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে—কতজনের স্বাস্থ্য ভাল হইল, কি কি রোগ মারিল তাহার তালিকা রাখিতে হইবে এবং মাসে একবার করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ এবং প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তনের সময় বাংলা দেশোপযোগী খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। ইহা বিশেষ কঠিন কাজ নয়।

ছুঃখের বিষয়, কমিটির সভ্যদের মাত্র দুই-তিন জন আছেন ইহারা ডাক্তার বা স্বস্থের চর্চা করেন। তাছাড়া এমন অনেকে আছেন ইহারা নিজেদের কাজকর্মের চাপে এ-বিষয় বেশী চিন্তা করিবার সময় পান না। আমার মনে হয়, ইহারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা ও চর্চা করেন এইরূপ কয়েক জন ও চারি-পাঁচ জন ডাক্তার কমিটিতে থাকিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। সুখের বিষয় কমিটি একজন স্বাস্থ্য-বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছেন কিন্তু কমিটির নিজেদের কোন ব্যায়ামাগার বা খেলিবার মাঠ নাই।

পাশ্চাত্য প্রথায় ব্যায়াম।—আজকাল পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এদেশে ব্যায়ামের প্রচলন করিয়াও সুফল পাওয়া যাইতেছে না, তাহার একমাত্র কারণসে দেশের লোক সাধারণতঃ ঘেঁরুপ নিয়মে ও শান্তিতে জীবনযাপন করেন তাহার শতাংশের একাংশও আমরা পারি না বা তাহারা জন-প্রতি মাসিক আহারের জন্ত বাহা ব্যয় করেন তাহা আমরা বিশ জনের জন্তও করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত শীতপ্রধান দেশের লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শতগুণে ভাল।

প্রতিষ্ঠান।—আরও বিশেষ অসুবিধা এই বাংলা দেশোপযোগী কোন ব্যায়াম-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এখানে নাই। বাহা দুই-একটি আছে তাহা পাশ্চাত্য লোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রাজুয়েট এবং অন্ত্য প্রার্থীগণকে ছয় মাস হইতে এক বৎসর শিক্ষা দেওয়া হইয়া

থাকে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে উপাধি লাভ করিয়া স্থল বা কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের প্রধানতঃ পাশ্চাত্য প্রথায় কেতাবী ও হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদিগকে প্রায় দশ-বারা খানা বই পড়িতে হয়। ফলে হাতে-কলমে শিক্ষা বিশেষ কিছু হয় না। দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী কিরূপ ব্যায়াম ও খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা পর্য্যন্ত এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে এদেশের লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য বা জীবনযাপন প্রণালী বিষয়ে কোন খোঁজ রাখেন না। অতএব ইহারা ব্যায়াম-শিক্ষক হিসাবে কতদূর কৃতকার্য হইতেছেন বা হইবেন তাহা ভাবিবার বিষয়। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান-পত্রের মধ্যে এমন অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় বাহা উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শেখানো হয় না। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যায়াম প্রচার চেষ্টা (খালিহাতে ব্যায়াম ও ড্রিল) কার্যকরী হয় নাই। তাহার একমাত্র কারণ, ইহারা খোঁজ রাখেন না যে ঐ সমস্ত দেশে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার সরকারী ব্যায়ামবিদ আছেন। সেই জন্তই উহা ঐ দেশ সম্ভব হইয়াছে।

শিক্ষক।—আজকাল গ্রাজুয়েটগণ শরীচক্রায় মন দিয়াছেন দেখিয়া সকলেরই আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ছুঃখের বিষয় দুই চারিখানা এনাটমি, হাইজিন প্রভৃতি বই পড়িয়া, মাত্র ছয় মাস এক বৎসর ব্যায়াম সম্বন্ধে দীর্ঘাবদ্ধ কতগুলি বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া অনেক গ্রাজুয়েট নিজদিগকে শিক্ষিত ব্যায়াম-শিক্ষক বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। আর ইহারা চৌদ্দ-পনের বা ততোধিক বৎসর বাৎ ব্যায়ামচর্চা ও এ-বিষয়ে উন্নতিসাধন এবং শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্কার অভাবে এবং উপরোক্ত ব্যায়াম-শিক্ষালয়ের ছাপ না থাকায় অনেকে তাহাদিগকে অশিক্ষিত ব্যায়াম-শিক্ষক অথায় অভিজ্ঞ করিয়া থাকেন। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন প্রকৃত ব্যায়াম-শিক্ষক হওয়া তখন ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহার যত অভিজ্ঞতা তাহাকেই ততদূর শিক্ষিত ব্যায়াম-শিক্ষক বলা বাইতে পারে। আর যদি গ্রাজুয়েট বলিয়া তাহাদের অভিমান থাকে তাহা হইলে বলা যায় চৌদ্দ বৎসরের চেষ্টায় যেমন গ্রাজুয়েট হইতে হয়, সেইরূপ অন্ততঃ বার-তের বৎসর চেষ্টা করিলে তবে ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই সকল উপদেষ্টাগণের কাহারও কাহারও মতে ব্যায়াম সম্বন্ধে তাহারা যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত অথবা এরূপ ধরণের ব্যায়াম বাতীত অন্যান্য ব্যায়াম দরকার করে না। যদি তাই হয় তবে ইহাই

কি মনে হয় না যে, তাঁহাদের মতে বর্ণপরিচয়ই বিদ্যার্জনের পক্ষে যথেষ্ট? স্কুল-কলেজে ক্রমোন্নতির জন্ত যেরূপ শ্রেণী-বিভাগ আছে শরীর-চর্চা বিষয়েও তদ্রূপ। দেখা যায়, ব্যায়ামাগার আছে বলিয়াই পঞ্চাশ-বাট বা একশত জন ছাত্র নিজের ইচ্ছায় ব্যায়াম করিয়া থাকে; এইরূপ ব্যায়ামাগার না থাকিলে নিজের ইচ্ছায় দুইটি ছাত্রও ব্যায়াম করিত কিনা সন্দেহ, বিশেষতঃ কলেজে ব্যায়ামাগার ব্যতীত নানারূপ খেলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত থাকে বলিয়া সকল রকম ব্যায়ামই ইচ্ছানুযায়ী করিয়া থাকে। কলেজে যেরূপ বিজ্ঞান পড়াইবার সময় বীক্ষণাগারের অভাবে পেন্সিল দেখাইয়া টেবিল টিউবের কাজ সারিতে গেলে ছেলেদের বুদ্ধিতে অমুবিধা হয় বা বোঝে না, সেইরূপ শরীরচর্চাও এক প্রকার বিজ্ঞান। এ বিষয়েও মুখে ‘শুধু এটা কর সেটা কর’ বলিলে শিক্ষার্থীগণ কিছুই বুঝিতে পারে না। সেই জন্ত ব্যায়ামাগারের দরকার হয়। ব্যায়ামাগারে প্রত্যেক ব্যায়ামার্থীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বাস্থ্য, শরীর ও কৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ব্যায়ামের, খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয় বলিয়া অন্ততঃ শতকরা ৮০ জনের স্বাস্থ্য ও শরীর ভাল হইতে দেখা যায়। আজকাল যে ছাত্রদের মধ্যে শরীরগঠন, স্বাস্থ্য, শক্তিশালিত ও ব্যায়ামের প্রতি এতদূর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উৎপত্তির মূল এই ব্যায়ামাগারগুলি। কিন্তু একসঙ্গে দল বাঁধিয়া ডিলের মত ব্যায়াম করাইতে গেলে প্রত্যেকের শরীর ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা যায় না এবং একই প্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা হয় বলিয়া সকলের শরীর ও স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে তাহা উপকারী নহে। অত্যাঁত যে-সকল প্রতিষ্ঠানে এইরূপ দল বাঁধিয়া ব্যায়াম করান হয় সে-সকল স্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া একই প্রকার স্বাস্থ্যের লোকদিগকে লওয়া হয় বলিয়া তাহাদের ক্ষতির সম্ভাবনা নাও থাকিতে পারে, কিন্তু স্কুল-কলেজের ঐরূপ ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া ব্যায়াম করাইতে হইলে যেরূপ প্রশস্ত জায়গার দরকার হয়, অনেক স্কুল-কলেজেই তাহার অভাব। ব্যায়ামাগার একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যেই হইতে পারে। কলেজে এইরূপ প্রকোষ্ঠের অভাব থাকিলেও কলেজ-সংলগ্ন ছাত্রাবাসেও ঐরূপ একটি প্রকোষ্ঠ পাওয়া যাইতে পারে এবং কলেজ ও ছাত্রাবাসের সহযোগিতায় একটি ব্যায়ামাগার তৈয়ারী হইতে পারে।

আজকাল দেখা যায়, শুধু ডিল, গেমস, স্পোর্ট ইত্যাদি কোন একটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই অনেকে ব্যায়াম-শিক্ষক নামে নিজকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ত কেবলমাত্র একটি বিষয় জানিলেই

চলিবে না, কারণ বিভিন্ন প্রকারের ছাত্র তাহার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্ত আসে। প্রকৃত ব্যায়াম-শিক্ষক হইতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাঁহাদের সংযমী ও চরিত্রবান হওয়া দরকার। শরীর ও খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, স্বাস্থ্য ভাল করার ও রোগ-প্রতিষেধক ব্যায়াম (কতকগুলি রোগ আছে বাহাতে ব্যায়াম দ্বারা সহজেই উপকার পাওয়া যাইতে পারে) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁহাদের দরকার। ব্যবস্থানুযায়ী ব্যায়ামগুলি বাহাতে ছাত্রকে নিজে করিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন সে বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি থাকা উচিত। নানা প্রকার ব্যায়াম সম্বন্ধে কার্যকরী অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ শরীরের অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করিবার ব্যায়াম ও ব্যায়ামকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিবার ক্ষমতা—এই গুণগুলি তাঁহাদের থাকা একান্ত আবশ্যক এবং এই সকল বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। ব্যায়াম-শিক্ষকদের পক্ষে স্বাস্থ্য ভাল হওয়া, সুগঠিত দেহ ও শক্তি থাকাই উক্ত বিষয়ে পারদর্শিতার চিহ্নস্বরূপ। এতদ্ব্যতীত শিক্ষার্থীগণের সহিত বন্ধুভাবে মিশিবার ক্ষমতা ব্যায়াম-শিক্ষকদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, ব্যায়ামার্থীরা প্রথমে আসিয়াই শিক্ষকের নিকট উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিজ নিজ আবশ্যকানুযায়ী ব্যবস্থা চায় এবং ব্যায়ামার্থীগণের মধ্যে অনেকের এমন কতগুলি গোপনীয় বিষয় আছে বাহা আত্মীয়-স্বজনের নিকটও বলিতে লজ্জা হয়, অথচ সংশোধন মানসে শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করিতে তাহারা লজ্জা বোধ করেন না।

ব্যায়ামে বাধা—ব্যায়াম করিলেই পুলিশের নজরে পড়িতে হইবে এই আশঙ্কায় পূর্বের তায় আজকাল অনেকেই ব্যায়ামচর্চা করিতে সাহস করেন না। আমার মনে হয়, ইহার মধ্যে যত ক্ষণ রাজনীতির গন্ধ অথবা সরকারের ক্ষতিকারক বিষয় প্রবেশ না করে, তত ক্ষণ তাহারা শুধু ব্যায়াম করিলেই পুলিশের কোপে পড়ে না। ১৯০৬ সালে স্বদেশী যুগের সময় অনেক ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান ছিল, যখন ঐগুলির মধ্যে রাজনীতি ঢুকিল তখনই উহা নষ্ট হইয়া গেল। অতএব ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে রাজনীতি মিশাইয়া দুইটাকেই নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত নয়।

বাংলা দেশে ব্যায়ামচর্চার উন্নতির জন্ত স্বাস্থ্য-বিদগণের একটা সম্মেলন থাকা উচিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে আমাদের উপযোগী ব্যায়ামের একটা আদর্শ এবং ধারাবাহিক নীতি স্থির করা কর্তব্য। আমার মনে হয়, আমরা সম্মত হইয়া প্রতিবাদ করিতে পারিব না বলিয়া বাহার বাহা খুশী তিনি তাহাই প্রচার করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন না। প্রচারের জন্ত আমাদের একটা মুখপত্র

থাকা দরকার এবং প্রতি বৎসর অলিম্পিকের অনুকরণে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া তাহার রেকর্ড রাখা দরকার।

শেষ কথা।—মানবজীবন কর্মময়। কর্মপ্রেরণা লইয়াই মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কর্মই মানবজীবনের একমাত্র সাধনা। জীব মাত্রই জরা মৃত্যুর অধীন, কিন্তু যত দিন বাঁচিয়া থাকা যায় তত দিন শয্যাগত মৃতপ্রায় হইয়া বাঁচিয়া থাকা যন্ত্রণাদায়ক, অশান্তিময় ও পৃথিবীর বোঝা বলিয়া মনে হয়। ভগবানের সৃষ্টি নিয়ম দ্বারা গঠিত এবং জীব মাত্রই প্রকৃতির নিয়মাধীন। তন্মধ্যে মানুষই সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। মানুষ নিয়ম পালন করিয়াই দেবতা হয়, আবার অনিয়মে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। অতএব মানুষ চেষ্টা করিলে সকল কার্যেই অগ্রসর হইতে পারে।

কর্ম করিতে হইলে শরীর ও মন সুস্থ ও সবল রাখা দরকার। শরীর ও মন সুস্থ না থাকিলে ঐশ্বর্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও প্রকৃত সুখের অনুভূতি হয় না। যাহাদের শরীর প্রকৃত সুস্থ নহে তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ কোন বিষয়েই মন নিবিষ্ট হয় না।

শরীর মূল্য হি সুখ,

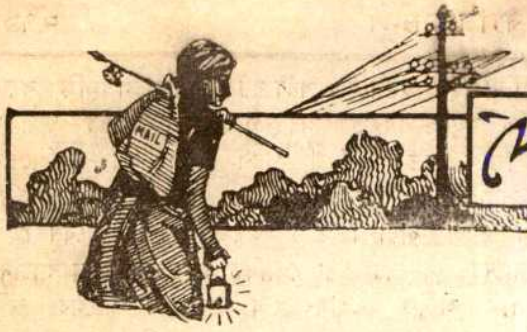
শরীরমান্য খলু ধর্ম সাধনম।

প্রাচীন মহাজনগণের এই নীতিবাক্যগুলি তাহাই প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। অতএব দেখা যায়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে মানুষের সুখশান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শরীরের সহিত মানুষের মনের খুবই নিকট সম্বন্ধ, শরীর সুস্থ থাকিলে মন প্রফুল্ল থাকে; আবার শরীর অসুস্থ থাকিলে মন জ্বলন্ত হয় ও বিষয় হইয়া পড়ে। শরীররক্ষার্থে খাদ্য, জল, বায়ু, আলোক, পরিচ্ছদ, বিশ্রাম ইত্যাদির যেমন বিশেষ প্রয়োজন, সেইরূপ ব্যায়ামও শরীর-রক্ষার একটি অন্ততম উপাদান।

শরীরকে সুস্থ এবং কর্মঠ করিবার জন্য যে-কোন প্রকার অঙ্গচালনার নামই ব্যায়াম। ব্যায়াম দ্বারা আহার্য

জিনিষ সহজে হজম হয়, শরীরের রক্তচলাচল বৃদ্ধি করে, প্রতি মুহূর্তে বিকৃত অবস্থাপ্রাপ্ত মাংসপেশীর সূক্ষ্মতম অংশগুলি নূতন করিয়া পূরণ করে এবং রূপিণ্ডের রক্ত-চলাচলের দরুন হৃদপিণ্ড সবল হয়। সর্বদা স্বাস গ্রহণ দ্বারা ভিতর অন্নজান বায়ুর প্রবেশ হেতু আমাদের ফুসফুসের রক্ত শোধিত হইতেছে, কিন্তু ব্যায়াম-কালীন অধিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও তাগের জন্য অন্নজান বায়ু আমাদের শরীরের দূষিত রক্ত অধিক পরিমাণে শোধন করে। ব্যায়ামে শরীর কর্মঠ হয়, চাপলা, সহিষ্ণুতা ও মনের উৎসাহ বাড়ে, মাংসপেশীগুলি সবল হয় ও নানারূপ ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। ব্যায়াম করিতে হইলে স্বাস্থ্য ও শরীর সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার, কারণ কোন রকম যত্ন ব্যবহার করিবার পূর্বে সেই যত্নের ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে কাজ করা যেমন সহজসাধ্য হয়, সেইরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলে সহজে অধিক দিন স্থায়ী স্বাস্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। সাধানুযায়ী, কৃতি অনুসারে ও নিয়মিত রূপে যে কোনরূপ ব্যায়ামই করা যাক না কেন তাহাই আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই কিছু-না-কিছু ব্যায়াম করা উচিত এবং যাহাতে উপরিউক্ত গুণগুলি লাভ করিয়া শরীরের অনুপাত ঠিক রাখা যায়, সেইরূপ চেষ্টা করাই দরকার এবং যাহাতে শরীরের কমনীয়তা ও লাভ্যতা বৃদ্ধি করে সেইরূপ ব্যায়াম করা বিশেষ প্রয়োজন। মাংসপেশীগুলি যদি পরিমিত চর্চিদ্বারা আবৃত থাকে তবে শরীরকে বিশেষ কার্যক্ষম করে, শরীরের কমনীয়তা বাড়ায় ও শরীরকে অধিক শক্তিশালী করিয়া তোলে। শরীর-অনুপাতে যাহাদের চর্চি কম থাকে (অর্থাৎ যাহাকে পাকান শরীর বলে) তাহাদের সাধারণতঃ শক্তি ও শরীরের কমনীয়তা কম হয় এবং কম পরিশ্রমী হইতে দেখা যায়।





দেশ-বিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

গোয়ালিয়রে বাংলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা—

গোয়ালিয়রে প্রবাসী বাঙালীগণ কর্তৃক সম্প্রতি একটি বাংলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোয়ালিয়র সরকারের স্থায়ী ইঞ্জিন রর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভাট্টা এই উদ্দেশ্যে পিনার স্মৃতিরকার্য পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। গোয়ালিয়র ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজী-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরলাল চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী; তথায় প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা অত্যন্ত হইলেও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা-যত্ন এই গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। প্রবাসী বাঙালীর বাংলা-সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ ও সাহায্য দান করা বাঙালীমাত্রেয়ই কর্তব্য।

কাশী ভারত-স্বা-মহামণ্ডল—

গত ১লা অক্টোবর তাহরপুর-রাজকন্যা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারী দেবীর সভানত্রীত্বে কাশী ভারত-স্বা-মহামণ্ডলের অধিবেশন সূচ্যক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি ভদ্রমহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় শ্রীমতী পূর্ণশ্রী দেবী, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, শ্রীমতী সৃষ্টিশ্রী দেবী ও শ্রীমতী মলিনা চন্দ্র বসুত্বা করন ও প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী পঠান্তে ছোট বড় কার্যকরী বালিকা কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য কর। সভাস্থ মহিলাগণ পুষ্পমালা, সিদ্ধুর, খেতচন্দন ও তাহুল দ্বারা পরস্পরকে অভ্যর্থনা করেন। সভানত্রীকে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বিঠলভাই পটেলের দান—

বাবু-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি বিঠলভাই পটেল মহাশয় গত বৎসর স্ট্রটস্টারল্যাণ্ড বেহতাগ করেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার জন্ত তিনি এক লক্ষ পনের হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র বসু বা তাহর মনোনীত কোনও ব্যক্তি উক্ত উদ্দেশ্যে ইহা ব্যয় করিতে পারিবেন—উইলে এইরূপ নির্দেশ আছে।

রেঙ্গুন বেঙ্গল ক্লাব পঞ্চবিংশতি-বার্ষিকী—

রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল ক্লাব ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীর সর্বপ্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গত ২৬এ হইতে ২৮এ অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ক্লাবের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজুনিবৃত্ত মুখোপাধ্যায় উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। প্রথম দিনের সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত ও সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ আন্ত সভাপতি মহাশয় ক্লাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। এই দিন অপরাহ্নে সাহিত্য-সভা আয়োজিত হয়। সভায় কয়েকটি হৃদয়ঙ্গম প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন বেঙ্গল একাডেমী হলে রবাক্সনাথের “শেষ-রক্ষা”র

অভিনয় হয়। শেষ দিন, কীর্তন গানের পর সভাগণের জলযোগান্তে উৎসব শেষ হয়।

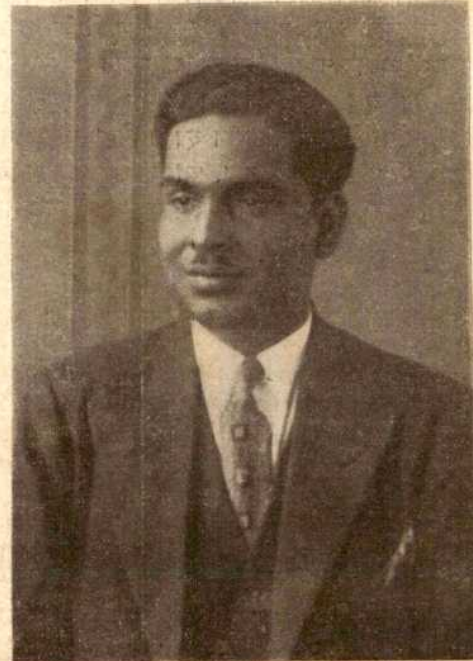
বাংলা

আর্ভিসেবায় দান—

কলিকাতা ৬২ নং আমহাষ্ট রো-স্থিত শ্রীযুক্ত নির্মলনলিনী বসু বর্গগতা স্বামীর স্মৃতি-উদ্দেশ্যে আর্ভিসেবায় জন্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানগুলির নাম—কাশী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোম অফ সার্ভিস, কালকাতা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতাল, কালকাতা কলেজ অফ হোমিওপ্যাথি ও প্রতাপ মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথি কলেজ। এই মহীয়সী মহিলার দান সকলেরই অনুকরণীয়।

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

(১) ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সিংহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গত বর্ষে বিলাত



শ্রীযুক্ত তর্কিকুমার গুহ

গমন করেন। গত মার্চ মাসে তিনি এডিনবরা হইতে এক-আর-সি-এস

পরীক্ষা সম্পন্নের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে, লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিলের তত্ত্বাবধানে শরীর-তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইদানীং এই পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হইয়াছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের দলে মধ্যে সিংহ মহাশয়ই একমাত্র ভারতীয়।

(২) শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি গুহ জাৰ্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট ও অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দন্ত-চিকিৎসা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এ-বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছেন। বাঙালীদের মধ্যে ইনিই এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম দন্ত-চিকিৎসায় ডিপ্লোমা পাইলেন।

(৩) শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার নন্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র। তিনি সেখান হইতে এম্-এসসি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে

সম্মত ও রত্নকার চর্চার জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার ছাত্র উল্লার-স্বভাব, মিষ্টভাবী ও দানশীল ব্যক্তি বিরল। তিনি বংপু রর কাকিনা রাজস্টেটে কাব্য করিয়া বিশ্ব কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

মফঃস্বলে শিক্ষাপ্রচার—

ভগলী জেলার ইলছোবা-মোওলাই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় একটি স্থাপত্য প্রতীক। ১৮৫৬ সনে রামগোপাল বোষ মহাশয় ইহা স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে ইহা শিক্ষাপ্রচারে বিশ্ব সহায়তা করিয়া আসিতেছে। এরূপ প্রতিষ্ঠান যাহাতে উত্তরার জনশিক্ষার কার্যে অগ্রসর হইতে পারে সেইজন্য দেশবাসীর আন্তরিক সহায়তা প্রয়োজন।

কৃতী শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস—

শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস, আই-সি-এস, অর্থনৈতিক বিষয়-গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বীরেশ্বর মিত্র



শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। পরে, রামগোপাল বোষ মহাশয় কলেজ অফ টেকনোলজি হইতে শরীর-শিক্ষা বিষয়ে মর্কোচ্চ এ-আর-টি-সি পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সেখান হইতে শরীর উৎপাদন বাপারে অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত মরিসস্ রূপে গমন করেন। তিনি সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পরলোকে সুরেন্দ্রভূষণ সেন—

‘বেঙ্গল কেমিক্যাল’ কোম্পানীর মানেজার সুরেন্দ্রভূষণ সেন সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি উক্ত কোম্পানীতে সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইয়া অসামান্য প্রতিভা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই কোম্পানীর মানেজারর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যুগেকালে তাঁহার বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন একনিষ্ঠ কর্মী হারাইল।

পরলোকে কুঞ্জলাল রায়—

পাবনা-নিবাসী কুঞ্জলাল রায় বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে এবং



শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস

স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। আই-সি-এস কৰ্মচারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পদক পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

স্বাবলম্বী বাঙালী যুবকের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত অখিলপদ ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জামসেদপুর টাটার লৌহ কারখানায় দৈনিক আট আনা মজুরিতে শিক্ষানবীশ হইয়া প্রবেশ করেন। নিজের দক্ষতায় এবং কর্মতৎপরতায় চার বৎসরের মধ্যে তাঁহার বেতন বেড়ে শত টাকা হয়। তাহার পর তিনি লোকোমোটিভ সঞ্চকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার জন্ত নিজের চেষ্টায়, নিজের সঞ্চিতে অর্থে বিলাত গমন করেন। সেখানে সুপ্রসিদ্ধ কার ষ্টুয়ার্ট এণ্ড কোম্পানীর কারখানায় মাড়ে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি দেশ



শ্রীঅখিলপদ ঘোষ

বিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া 'এ-এম-টি-মেক-ই' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরতা প্রত্যেক বাঙালী ছাত্রের অনুকরণীয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বহুর সাক্ষ্য—

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বহু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এমসি



শ্রীযুক্তক্ষেত্রমোহন বহু

উপাধি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল 'ওয়েভ মেকানিক্স' (Wave Mechanics)। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

পালিত অধ্যাপক ডি এম বহু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এন্ বহু এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অধীনে ভূত-বিদ্যা (physics) বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সংমেলন, দ্বাদশ অধিবেশন—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সংমেলনের সাহিত্য-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন জানাইয়াছেন—

আগামী বড়দিনের ছুটির সময়ে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সংমেলনের দ্বাদশ অধিবেশন হইবে। সংমেলনের সাক্ষ্য সাধারণের সুবিধা ও সহায়ত্বের উপর নির্ভর করে। সাহিত্য-শাখায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার জন্য বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের নিকট সুনির্ভর অনুপ্রেরণা জানাইতেছি। যাহারা সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক আগামী ২২শে অগ্রহায়ণ (২৮শে ডিসেম্বর) তারিখের মধ্যে সাহিত্য-শাখার সম্পাদকের নিকটে তাঁহাদের নাম, প্রবন্ধের বিষয় ও সাবমর্গ পাঠাইয়া দিবেন।

কৃতী শ্রীমণীন্দ্র মাহন মৌলিক—

রোমের রয়াল ইটালিয়ান ইনস্টিটিউট শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মৌলিক মহাশয়কে সম্প্রতি একটি বৃত্তি দিয়াছেন। ইহার পরিমাণ ৩০০০ লিরা।



শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

মণীন্দ্রবাবু ইটালীতে তথাকার বাবসা সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া মৌলিক মহাশয় এই বৃত্তি পাইয়াছেন। তিনি বীমা সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক রচনা ও পত্র সম্পাদন করিয়াছেন।

অর্থ নৈতিক প্রসঙ্গ

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণে সরকার—

বাংলা-সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। কৃষি-শিল্প বিভাগ হইতে গত ২০শে সেপ্টেম্বর এই মর্মে একটি সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। পাট-তদন্ত-কমিটি আইন দ্বারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের ফসলের জন্ত, এবং কৃষকগণ যাহাতে স্বেচ্ছায় পাটের চাষ হ্রাস করে সেজন্ত অধিকতর প্রচারকাৰ্য্য চালাইবার হুপারিশ সরকার গ্রহণ করিলেন। শতকরা কি পরিমাণ হ্রাস করা হইবে জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হইবে। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত এক জন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন। প্রতি জেলায় প্রচারকাৰ্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা তাহার কর্তব্য হইবে। ইহা বাতীত পাট-সম্পর্কীয় নানাবিধ সংবাদও তিনি সরবরাহ করিবেন। এই কর্মচারীর উপদেশানুসারে ও সহায়তায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রচারকাৰ্য্য চালাইবেন। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি “চার্জ” বিভক্ত হইবে এবং “চার্জ”গুলি এক-এক জন কর্মচারীর অধীন স্থাপিত হইবে। এই সাল “চার্জ অফিসার” প্রায়ই বেসরকারী বাতী হইবেন; তিনি স্থানীয় কর্মচারীদের সহকারিতায় গ্রামা-কৃষকগণের মধ্যে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্ত সমিতি গঠন করিবেন। এই প্রচারকাৰ্য্যের ব্যয়নির্বাহের জন্ত ৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই তারিখে প্রচারিত একটি “প্রেস নোটে” প্রকাশ যে এই কর্মচারী “কন্সাল ডেভেলপমেন্ট কর্মচারীর” অধীনে কার্য্য করিবেন। সম্প্রতি দার্জিলিং জেলা-বার্ড সমূহের চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন সভায় কৃষিক্ষেত্রী উহাদিগের সহায়তা আবেদন করিয়াছেন। সরকারী মন্তব্য ও শাসন পারিষদের সমস্ত স্তর নাজিমুদ্দিন এই প্রচারকাৰ্য্যে মঞ্চস্থল অঙ্গণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

রায়-মাহেব দেবেশ্রনাথ মিত্র এই সম্পর্কে বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। উভয়মধ্যে পাটচাষ পরিকল্পনার কাৰ্য্য অগ্রস্ত করিবার এবং রবিশস্ত্র চাষের প্রচারের জন্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট উপদেশাবলী প্রেরিত হইয়াছে। একজন প্রচারিত হইয়াছে যে, চীনাবাদাম, তামাক, তিষি, রহন, পিরাঁজ, বিলাত, শাকশস্ত্রী, আলু ও ইক্ষু চাষে ভাল ফল আশা করা যায়। যে-সব জেলায় রশিশস্ত্র বাজ পাইতে অসুবিধা, সে-সব জেলার কলেজের নিকট কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর বাজ প্রেরণ করিতেছেন।

ভারতের বহির্বাণিজ্য। বাৎসরিক হিসাব—

বর্তমান বৎসরের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব-নিরূপণ দেখা যায়—আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বাড়তির দিকে চলিয়াছে, যথা—(লক্ষ টাকায়)

	বাৎসরিক হিসাব	বাড়তি+
	১৯৩৩	১৯৩৪
আমদানি	৫৫৪৯	৬২,১৩
রপ্তানি	৭১,০৪	৭৩,৯৫
পুনঃ রপ্তানি	১,৬১	১,৩৬
মোট রপ্তানি	৭২,৬৫	৭৫,৩১
আমদানির উপর		
রপ্তানির উৎস	১৭,১৬	১৩,১৮

ঋণ ও রোপোর আমদানি-রপ্তানির হিসাব এইরূপ (লক্ষ টাকা)

	বাৎসরিক হিসাব	বাড়তি+
	১৯৩৩	১৯৩৪
ঋণ—আমদানি	৫৫	৫৪
রপ্তানি	২৪,১৬	২২,২৫
রোপা—আমদানি	২৮	৪০
রপ্তানি	৪৩	১৩৯

ঋণ রপ্তানি—

গত পাঁচ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ-হইতে যে ঋণ রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ :—

১৯২৯-৩০	৪৯,৫৫০
১৯৩০-৩১	৪৯,৫৫,৯০
১৯৩১-৩২	৫০,৭০,১৮,০০
১৯৩২-৩৩	৫০,৫০,৩০,৫০
১৯৩৩-৩৪	৫৩,৬৩,৯২,৩২

ভারতে বীমা-ব্যবসায়—

ব মা-ব্যবসায় সম্পর্কে ভারত-সরকারের একটি বীমা বাৎসরিক (ইনসিওরেন্স ইয়ার বুক) সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১২ সালের ভারতীয় জীবনবীমা আইন ও ১৯২৭ সালের ভারতীয় বীমা আইন মতে গঠিত ব মা কোম্পানীগুলি ১৯৩৩ সাল যে কাৰ্য্যবিবরণ সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন, তাহার উপরই এই সরকারী রিপোর্ট রচিত। ব্রিটিশ ভারতে মোট ৩১৯ কোম্পানী কাৰ্য্য করিয়াছে তন্মধ্যে ১৬৯টি এদেশে গঠিত, যথা—

বোম্বাই ৬৮, বাংলা ৩১, মাদ্রাজ ২৬, পঞ্জাব ১৯, দিল্লী ৯, বিহার-উড়িষ্যা ৫, অজমীর-মাড়ওয়ারা ৩, মধ্যপ্রদেশ ৩, যুক্তপ্রদেশ ৩, আসাম ১, ব্রহ্ম ১। যে ১৫০টি বৈদেশিক কোম্পানী এদেশ কাজ করে তাহাদের স্বদেশ এইরূপ :—যুক্ত-রাজ্য ৭১, ব্রিটিশ ডমিনিয়ন ও উপনিবেশ সমূহ ৩১, যুক্ত-প ৮, মার্কিন ১৬, জাপান ৯, জাভা ৫।

কাৰ্য্য হিসাবে বীমা কোম্পানীগুলি নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত, যথা—

	ভারতীয়	অ-ভারতীয়
জীবনবীমা—	১২৪	১১
জীবন ও অগ্নি বীমা—	২৯	১৩
অগ্নি প্রকার বীমা—	১৬	১২৪৬

আলাচনা বর্ষে ৩০টি নূতন কোম্পানী ভারতে গঠিত হইয়াছে, যথা—

বোম্বাই ৮, বাংলা ৫, মাদ্রাজ ৪, পঞ্জাব ৩, বিহার-উড়িষ্যা ৩, যুক্তপ্রদেশ ২, দিল্লী ২, মধ্যপ্রদেশ ১, অজমীর-মাড়ওয়ারা ১।

ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর কাৰ্য্য বাড়িতেছে, যথা—

	নূতন কাজ (লক্ষ)	বৎসরান্তে মোট (লক্ষ টাকা)
১৯২৩	৫,৮৫	৩৯০০
১৯২৪	৬,৮৯	৪২০০
১৯২৫	৮,১৫	৪৭০০
১৯২৬	১০,৩৫	৫৩০০
১৯২৭	১২,৭৭	৬০০০
১৯২৮	১৫,৪১	৭১০০
১৯২৯	১৭,২৯	৮২০০
১৯৩০	১৬,৫০	৮৯০০

১৯৫১ ১৭,৭৬ ১৮০০
১৯৫২ ১৯,৬৬ ১০৬০০

জীবনবীমা ব্যতীত অপরাপর বীমায় প্রিমিয়াম আয় এইরূপ
হইয়াছে—

১৯১২ সনের আইন মতে ভারতীয় কোম্পানীগুলি মোট
১,২১,৫২,০০০ টাকা সরকারের নিকট জমা রাখিয়াছে।

ভারতীয় পলিসির গড়ে টাকার পরিমাণ ১৬৭৪, অ-ভারতীয়
কোম্পানীর ৩,৩৭৩।

ভারতীয় কোম্পানীগুলির কিছু কার্য ভারতের বাহিরেও হইয়া
থাকে।

	ভারতীয়	অ-ভারতীয়	মোট
অগ্নি (লক্ষ টাকা)	১৮৫	২৭৫	১২৬
নৌ (marine)	৭৫	৩৬৫	৪৪
অপরাপর	২৮	৪৭৫	৭৫৫

সমুদায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ ৩১৫ কোটি
টাকা। অ-ভারতীয় কোম্পানীর ভারতীয় বিস্তার পরিমাণ ১৭৫ কোটি
টাকা।

মহিলা-সংবাদ

ইনিই সর্বপ্রথম নির্বাচিত মহিলা সদস্য। ইনি এক জন
একনিষ্ঠ কংগ্রেস-কর্মী।



শ্রীমতী জ্যোতি কুপালানী

শ্রীমতী জ্যোতি কুপালানী করাচী কর্পোরেশনে সর্বাপেক্ষা
অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।



শ্রীমতী সুভদ্রাবাই গোস্বামী

শ্রীমতী সুভদ্রাবাই গোস্বামী সম্প্রতি বোম্বাই
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।
কাথিয়াবারের মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই উপাধি
লাভ করিয়াছেন।



শ্রীমতী কপিলা ভাণ্ডারী দেশাই
শ্রীমতী কপিলা ভাণ্ডারী দেশাই ব্রোচ জেলাবোর্ডের
মনোনীত সর্বপ্রথম মহিলা সদস্য।



শ্রীমতী শুভ ভাট শর্মা
শ্রীমতী শুভ ভাট শর্মা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

এ-বৎসর বি-টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সারস্বত
ব্রাহ্মণ সমাজের মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই
উপাধি পাইলেন। ইনি এখন সিমলা অর্যা-বালিকা-
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।



শ্রীমতী সরলা দেবী

উৎকলের শ্রীমতী সরলা দেবী কটক কেন্দ্রীয়
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সর্বপ্রথম মহিলা ডিরেক্টর নিযুক্ত
হইয়াছেন। তিনি নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির
এক জন সভ্য। অগ্নিতরু জনহিতকর কার্যেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ
যোগ আছে।

লজ্জা ?

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দুইটারের ছুটি অস্ত্রে ফিরিতেছিলাম এলাহাবাদ হইতে। মধ্যম-শ্রেণীর কামরায় ভিড় মন্দ নহে। কিন্তু আমার ভাগ্যে ততটা ভিড় সহ্য করিতে হয় নাই। প্রথম বেঞ্চে বসিয়াছিলেন—দুটি তরুণ-তরুণী ও তাঁহাদের এক বন্ধু; দ্বিতীয় বেঞ্চখানিও ঐরূপ এক দম্পতি এলাহাবাদ হইতে উঠিয়া অধিকার করিলেন, সঙ্গে বন্ধুবান্ধব কেহ নাই—এক দেবর এবং তৃতীয় বেঞ্চখানিতে আমরা জন-পাঁচেক ঠাসা-ঠাসি হইয়া বসিলাম। বেলা এগারটা। পশ্চিমের গরম, তাহার বর্ণনা দেওয়া বাহুল্য। পাঁচ-সাতটা জলভর্তি কুঁজা কক্ষে ছিল, বেলা চারিটা পর্যন্ত দশ-এগারটি প্রাণীর তৃষ্ণা-নিবারণ তাহার সব কয়টিই শূণ্যগর্ভ হইল—তবু কি তৃষ্ণা মিটিতে চাহে! লেবু, বরফ, লেমনেড—এ সব তা ছিলই। উত্তপ্ত কামরার পাখর হাওয়া আর কতটুকু শান্তি দিবে! বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলাম।

দুটি বেঞ্চের তরুণ তরুণীরা জাগিয়া রহিলেন এবং মুহূর্তে জল পান করিতে করিতে হাসি-গল্পে অসহ্য গুমোটকে পরাজিত করিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

মাঝের বেঞ্চে যে দু-জন স্বামী-স্ত্রী বসিয়াছিলেন তা বোধ হইল তাঁহারা নববিবাহিত। তরুণ কাজ করেন এই রেলেই এবং তাহার সংসার বৃহৎ। ছুটিতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন শ্বশুরালয়ে। উভয়ের পরনে সূক্ষ্ম বিদেশজাত সুন্দর ফ্যাশনের কাপড় জামা, সর্বক্ষেত্রে এসেম্বলের উপগন্ধ এবং বেঞ্চের উপর যে-সব সৌখীন চাদর বিছাইয়াছিলেন তাহাও ভারতজাত নহে। দুটি ঝালর-দেওয়া শুভ্র বালিশে লেখা ছিল ‘হুইট ড্রিম’।

তরুণ-তরুণীর নয়ন হইতে গতরাত্রির পূর্ণিমার আলোক একেবারে নিবিয়া যায় নাই, তাঁহারা বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। গাড়ীতে আরও অনেক নবীন প্রবীণ যাত্রী থাকিলেও তাঁহারা জল্পেপ করিলেন না। জানি না তাঁহাদের বাড়ির গভী এ-বিষয়ে কতটা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাঁহাদের সর্ববিষয়ের অকুণ্ঠিত আলাপ দেখিয়া

মনে হইল, মনুষ্যসমাজে বন্ধন বা শালীনতা বলিয়া কিছু নাই, লজ্জাও দাসত্বের নামান্তর। প্রকৃতির পুত্র-কন্যা প্রকৃতির কোলে হাসিবে খেলিবে তাহাতে একটা মানব-রচিত শাসনের পদা ফেলিয়া সে স্বাচ্ছন্দ্যকে চাকা দিবার হাত্যকর প্রয়াস কেন? ও-পাশের বেঞ্চে যে তরুণ-তরুণী বসিয়াছিলেন তাঁহাদের বেশভূষার সেরূপ বাহুল্য ছিল না। তরুণীর এলো খোঁপার সঙ্গে চোখের চশমাটি মানাইয়াছিল বেশ, কথা-বার্তায়ও সুন্দর ক্রটির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবে বোধ হয়, তাঁহারা পুরাতন ধর্মের আভুতা কাটাইয়া নূতন সমাজের রৌদ্রালোকে সবেমাত্র নয়ন মেলিয়াছেন।

আমার পাশেই বসিয়াছিলেন আপাদমস্তক খন্দর-বিভূষিত এক প্রৌঢ়। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ‘হুইট ড্রিম’র যাত্রীব্যয়কে বিদ্ধ করিয়া আমার চুপি চুপি বলিলেন,— দেখেছেন কাণ্ডখানা? এক গাড়ী লোকের সামনে...ছিঃ!

বলিলাম,—কালের হাওয়া কি দিকারে ঠেলে ফেলা যায়?

কথাটা ভদ্রলোকের মনঃপূত হইল না, বিরক্ত-ভরা মুখে অকুটি হানিয়া চুপ করিলেন।

বিরক্ত হইব রই কথা। তিনি ফিরিতেছেন কোন একটা পল্লী-হাঁতবী সন্ধান হইতে। হৃদয়ে তাঁর দুঃখের প্রাক্কলিত অনল, সর্ব অঙ্গ ত্যাগের শিখা। দেশের তরুণ-তরুণীদের তিনি সর্বকর্ষ ফেলিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। তিনি চাহেন না, দেশের এই সঙ্কট সময়ে বিবাহের আনন্দ-উল্লাস হয়, বিলাসিতার অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয় এবং ক্লাব, পিকনিক, থিয়েটার, সিনেমা, মোটর, সখের ভ্রমণ ইত্যাদিতে দেশের লোক মাতিয়া উঠে। আগাছার মত এই সমস্ত বাহুল্য বা বিলাসকে সবলে উপড়াইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে শুধু কন্দের বীজ। ত্যাগের সলিলে তাহার অকুর বাহির করিয়া সাধনার সূর্যালোকে তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া

তুলিত হইবে। তার পর কালজয়ী সাধনা যখন নববিকশিত পত্রপল্লবে সুশীতল ছায়া সৃষ্টি করিয়া পথক্রান্তকে তৃপ্তি-স্নান করাইয়া দিবে, তখন তাহার তলে ইচ্ছা করিল বাধিতে পার নীড়, তুলিতে পার আনন্দের কলরব এবং হাসিতে পার এমন প্রাণপূর্ণ হাসি বাহ্য সব শালীনতা লজ্জাশীলতার উল্কাশে বিচরণ করে। কিন্তু যত দিন অন্ধুর মহীকূহে পরিণত না হয় তত দিন শুধু তপস্যা,—কঠোর তপস্যা।

ভদ্রলোকের আর শৈথ্য রহিল না। উঠিয়া নরম গরম ভাষায় উপরিউক্ত ভাবগুলি প্রকাশ করিলেন।

দেখিলাম, ‘হুইট ড্রিম’র তরুণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, লজ্জায় নহে, ক্রোধে এবং ও-পাশের চশমা-ধারিণীও বিশেষ স্নেহমূল্য সূত্রসম দৃষ্টিতে বক্তার মুখের পানে চাহিলেন না। বাঙ্গাল্য হাসি তরুণ কয়টির মুখে ফুটিয়া উঠিল।

আমি বক্তাকে টানিয়া বসাইলাম। বলিলাম—এ বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে কেন ওদের হাসির মাত্রা বৃদ্ধি করছেন, স্থির হয়ে বসুন।

তিনি জলন্ত কটাক্ষে উহাদের পানে চাহিয়া বলিলেন—বেহুয়া যত, লজ্জা নেই। এই ঠিক ছপুর-বলয়—

বলিলাম, সে-কথা বলা বাহুল্য। রোদের বেগ খুব প্রখর এবং মাংসের মাথায়ও তার ক্রিয়া বিশেষ রকমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

জামার আন্তরিক গুটাইয়া ভদ্রলোক বলিলেন,—কি বলছেন?

বলিলাম, ওদেরই বলছি। দেখছেন না দলে ওরা ভারী। বিশেষ রকমের একটা দুর্ঘটনা হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়।

সে কথার বাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া ভদ্রলোক নীরব হইলেন।

বোধ হয় চুনার স্টেশন। ঝাঁকা-মাথায় এক ব্যক্তি দরজার হাতলটা ঘুরাইতই কক্ষমধ্য প্রায় সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ‘দেড়া হার’ ‘দেড়া হার।’

মধ্যম-শ্রেণীর যাত্রী হইতে হইলে এ একটা জিনিষের কী-তিমত কসরৎ করা দরকার। গলায় স্বরটি

হওয়া চাই কঠিন, স্পষ্ট এবং প্রভূতবাক্যক। অবোধ নিরক্ষর যাত্রীদল কার্টের ও কাঠাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম কঠিন গদী-আটা বেঞ্চে বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারে না; এক-একটা দলে লোকও থাকে দশ-পনের জন। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলেই ট্রেন থামিলে বাগ্র ভাবে যেখানে পায় উঠিবার চেষ্টা করে—অমনই নিষেধের কঠিন স্বরে মধ্যম-শ্রেণীর যাত্রীদের জানাইয়া দিতে হয় তোমরা যে শ্রেণীর জীব এটি তাহা অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর জন্ত, সুতরাং সাবধান। প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন থামিলে তাই আমাদের কামরার সমস্ত যাত্রী প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছিলেন, ‘দেড়া’, ‘দেড়া’।

লোকটি সমবেত চীৎকারে কর্ণপাত করিল না, হাতল ঘুরাইয়া দুয়ার খুলিয়া ফেলিল। কক্ষমধ্যস্থিত সকলেই সম্মত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ দেশে শূদ্রের ছায়া মাড়াইয়া ব্রাহ্মণেরা এমনই জাতিপাতের আশঙ্কায় সম্মত হইয়া উঠেন কিনা, জানি না।

লোকটি তাহার ভারি বোঝাটিকে ততক্ষণে কক্ষমধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে।

খন্দর-পরা ভদ্র লোকটি উঠিয়া আসিয়া কক্ষ কণ্ঠে বলিলেন—বাত নেই গুনতা? দেড়া হার—

কালো নেংটি-পরা হেঁড়া জামা গায়ে সেই লোকটা। অল্লান বদনে উত্তর দিল—ম’লুম হার।

মুখ বিচাইয়া ভদ্রলোক বলিলেন—তবু? বা বাটা নামিয়ে নিয়ে যা বলছি।—বলিয়া মোটটার একটা ট্রেল দিলেন।

লোকটি শশব্যস্তে মোটটি ধরিয়া বলিল—লাথ দেবেন না, বাবু—। এতে চুনারের জিনিষ আছে—ভেঙে যাবে।

ভদ্রলোক বলিলেন—ভেঙে যাবে ত বাবে। কেন উঠেছি এ গাড়ীতে? দেখি তোঁর টিকেট?

লোকটি অহনয় করিয়া বলিল—বাবু, আমি এ গাড়ীতে উঠবো না। এই বোঝাটা শুধু রইল। খাউ কিনাসে যে ভিড়—কিছুতেই তুলতে পারলাম না। দয়া করে—

এমন সময় গার্ডের বাণী বাজিল। লোকটি আমাদের

দয়া আকর্ষণের জন্য আর একবার করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেমন পিছন ফিরিয়াছে, অমনই বন্-বন্-বনাং ।

শব্দ তীরের মত গিয়া লোকটির বুকের মাধ্যা যেন বিধিল। একটা আন্তর্জাতীকার করিয়া সে পাগলের মত দরজার হাতলটা ঘুরাইয়া চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল ও সেই প্রকাণ্ড বুড়িটার পাশে বসিয়া পড়িয়া ভাঙা মটির খেলনাগুলি বাহির করিতে করিতে ক্ষয়ভেদী স্বরে আন্তর্জনাদ করিতে লাগিল।

আমরা জানি,—খন্দরধারীর ছোট ফুটকেন্সটির গায়ে বুড়ির এক প্রান্তে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছিল বলি। তিনি হৃৎকম্পিত দমন করিতে না পারিয়া দিয়াছিল লন উহাতে এক প্রচণ্ড ল'খি কদ ইয়া।

‘হুইট ড্রিম’র ভদ্রলোক বলিল—বেশ ক’রেছেন মশাই, যেমন বাটা শুনল না।

চশমা-পরা তরুণীর বন্ধু বলিল—ছোটলোকের স্পর্শও কম নয়। এই সময়ে ঢেকার ওঠে ত বেরিয়া যায় বাটার কান্না।

জিনিষ গিয়াছে—ভালই হইয়াছে, তৃতীয়-শ্রেণীর টিকেট কিনিয়া মধ্যম-শ্রেণীতে বসিয়া কঁদ’টাও বেধ হয় নীতিবিরুদ্ধ—সেই কথাটাই ট্রেনের আরও কয়েক জন প্রাণপণ বেঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

খন্দরধারী ন বয়ো ন তস্থী অবস্থায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই করুণ ক্রন্দন শুনিতেছিলেন। তাহার ক্ষুদ্র ফুটকেন্সটিকে নীচ সম্পর্শ হইতে বাড়াইবার জন্য এইমাত্র তিনি যে কাজ করিয়াছেন তাহা হয়ত পল্লীসেবকের

দুখে কষ্ট ও আত্মত্যাগের আর একটা আলাকরেখাশূন্য দিক, তাহা তিনি মর্শে মর্শে অনুভব করিয়াছিলেন।

মন্তব্য অনেকেই অনেক রকমের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লোকটি কিন্তু ভাঙা খেলনাগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া একতাবেই কঁদিতে লাগিল। সে গরিব, মহাজনের এই ক্ষতি পূরণ করিবার সাধ্য তাহার নাই এবং ভবিষ্যতের এক মুষ্টি চানা সংগ্রহর আশাও বোধ হয় মহাজনের রক্ত-চক্ষুর অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। বরে শিশু-সন্তান কয়েকটি ও রুগ্না স্ত্রী। কঁদিত কঁদিতে সে এই সব ইতিহাসেরই আবৃত্তি করিতে লাগিল।

দেখিলাম সেই নিলজ্জা আত্মপ্রাপ্ত ‘হুইট ড্রিম’র তরুণী উঠিয়া ধীরে ধীরে লোকটির নিকটে আসিল ও অঞ্চল হইতে কয়েকটি টাকা খুলিয়া মধুর কণ্ঠে ক’হল,—রোও মং। এই লেও, বাবা।

লোকটি কঁদিতে কঁদিতে মাথা তুলিল এবং মাথা তুলিয়াই অকস্মৎ তরুণীর ছটি পায়ে উপর শুইয়া পড়িয়া খাবলা-খাবলা করিয়া হয়ত ট্রেনের ধূলিই মাথায় তুলিয়া লইয়া বুকভরা দীর্ঘনিশ্বাস মুক্ত করিয়া বর-বর বলিতে লাগিল—মায়ী, মেরা মায়ী।

খন্দরধারী মাথা নীচু করিয়া টলিতে টলিতে আসিয়া নিজের জায়গার বসিয়া পড়িলেন। ট্রেনস্থল সকলকারই মাথা নিদারুণ লজ্জার আঘাতে অবনত হইয়া গেল। শুধু সেই লজ্জাহীনা দয়াময়ী পদতলুগিত হতভাগ্যের পানে ব্যথাভরা ছুটি মিথ্র চক্ষু তুলিয়া মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর মতই দাঁড়াইয়া রহিলেন।





বহির্জগৎ

শ্রামরাজ্যের ভবিষ্যৎ

গত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রামরাজ্যে কয়েকটি বিপ্লব হওয়ায় ইহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নানা দেশে নানা পথে এখনও এই রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ, শ্রামের রাজা প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কারণ, রাজার বিনা অনুমতিতে অপরাধিকে মুহুরদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া যাইবে—তথাকার ব্যবস্থা-পরিষদ এইরূপ একটি আইন পাস করিয়াছেন।

পরিষদের কয়েক জন প্রতিনিধি আইনটির মর্ম বুঝিয়া দিয়া রাজাকে তাহার বর্তমান সম্বল হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিলম্বিতা করিয়াছেন। রাজা প্রজাধিপক চকু-চিকিৎসার জন্য এখন বিলাতের সারে নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।

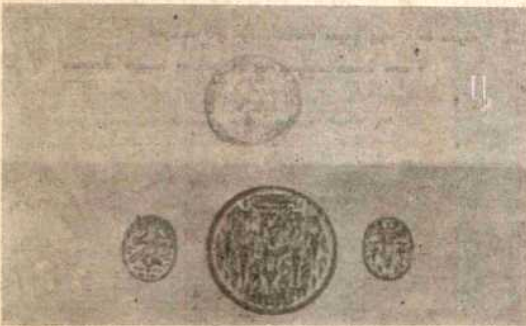
ভারতবাসীরাই আর একটি কারণে শ্রামরাজ্য সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। শ্রাম ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতি-সংশোধনে ভারতবর্ষের আয়াজ। শ্রামের অধিবাসীদের শতকরা আটানব্বই জন বৌদ্ধ। সম্রাট অশোকের সময়ে শ্রাম বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়।



শ্রামরাজ্যের স্থাপত্যের একটি নিদর্শন

আইন। বিবিধ করিতে হইলে রাজার সম্মতি প্রয়োজন। রাজা প্রজাধিপক এই আইনটিতে সম্মতি না দিয়া উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পরে একটি সংবাদে জানা গিয়াছে, শ্রামের ব্যবস্থা-

ইহার পূর্বকার ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই—এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান শুরু হইয়াছে মাত্র। তবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পূর্বে শ্রামরাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ



আছে। রাম, সীতা, বিষ্ণু, গণেশ ও অন্যান্য দেবতার মূর্তি ও রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রাবলী শ্রামরাজ্যের মঠ ও মন্দির অলঙ্কৃত করিয়া আছে। অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, বিজুলোক ইত্যাদি জায়গার নাম—লোকের নামও ভারতীয় নামের অনুরূপ। এমন কি 'শ্রাম' নামটিও ভারতীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রামজাতিরা আৰ্য্য ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত।



বাল্লব রাজ প্রাসাদের মধ্যস্থিত 'ভাট ক্রা কেও' মন্দির। এই মন্দিরে প্রসিদ্ধ মরকতমণি নিগ্ধিত বুদ্ধ মূর্তি অবস্থিত। বাহিরে সিংহ ও দানবের মূর্তি

শ্রাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। তাহার আভ্যন্তরিক বিপ্লবের কথা শুনিলে এশিয়াবাসীর ক্রুদ্ধ হওয়া আশ্চর্য্যক। আশঙ্কা, বুদ্ধি-বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াখণ্ডের একমাত্র হিন্দু (বাপক

চিত্র—বামপার্শ্বে উপর হইতে

রাজা প্রজাবিপ্লব গণতন্ত্রমূলক শাসনপত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন।

শাসনপত্র রাজা প্রজাবিপ্লবের নিকট এই ভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে।

শাসনপত্রে রাজার স্বাক্ষর ও সিলমোহর।

রাজার স্বাক্ষরের পর শাসনপত্র হস্তে জন-পরিষদের সভাপতি দ্বারা বিজয়নতি। এক জন রাজ কর্মচারী ইহা পাঠ করিতেছেন।

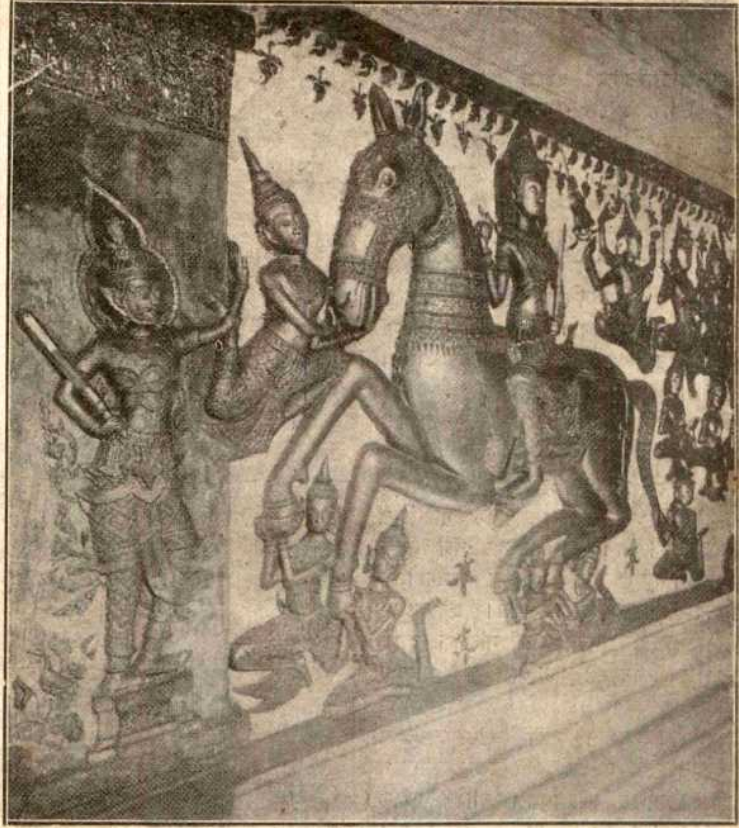
অর্থে) স্বাধীন রাষ্ট্র স্বরায়্য বিপ্লবের ফলে পরপরলাপ্তিত হইতে থাকিবে। কিন্তু একপাশে শাসনার ঘে কারণ নাই গত ছই বৎসরের ঘটনাবলী তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

নানা উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া গ্রাম ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান চক্রী-রাজবংশের অধীনে আসে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জা বুদ্ধ যোদ ফা চুলালক। ইনি গ্রামের রাজধানী আয়ুথিয়া (আযোধ্যা?) নগরী হইতে ব্যাককে লইয়া আসেন। আজিও ব্যাককেই গ্রামের রাজধানী। প্রজাধিপক এই বংশের সপ্তম রাজা। প্রথম ছয় জন রাজা সরকারী ভাবে প্রথম রাম, দ্বিতীয় রাম ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন।

রাজা পঞ্চম রাম চুলালকরণের রাজত্বকালে (১৮৬১-১৯১০) গ্রামদেশে নানা বিষয়ে উন্নতি হইতে থাকে। এই সময়ে গ্রামের সর্বত্রই রাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রীতদাস-প্রথা লোপ, বিচার-বিভাগ সংস্কার, রেল প্রচলন, জল ও স্থলবাহিনী পুনর্গঠন প্রভৃতি কার্যের

দক্ষিণ পার্শ্বে—

বুদ্ধদেবের জীবনের একটি চিত্র। রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাত্রিকালে অথ-পুটে আরোহণ করিয়া চিরতরে কপিলাবস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন। উত্তর গ্রামের কিংসাহুলকস্ত মন্দিরে ইহা অবস্থিত।



দ্বারা পঞ্চম রাম চক্রী-রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ষষ্ঠ রামের আমলে (১৯১০-১৯২৫) গ্রাম সর্বত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-এশিয়ার বহু দেশ ইউরোপীয় শক্তিসমূহ পুরাপুরি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; গ্রাম স্বাধীনতা অটুট রাখিলেও সন্ধি-পত্র বা চুক্তি-পত্রের ছলে তাহাদের প্রভাবে পড়িয়াছিল। গ্রামরাজ ষষ্ঠ রাম বিদেশী শক্তিবৃন্দের প্রভাব বিমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন এবং কতকাংশে সফলকাম হন। গ্রামের বাটানীতি এই সময়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির নানা আয়োজনও চলিতে থাকে। এই সময় প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রামবাদীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

গ্রামের বর্তমান অধিপতি রাজা প্রজাধিপক ১৯২৫ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বামপার্শ্বে—

রামায়ণের একটি চিত্র। গ্রামরাজ্যে নর্তকরা এইরূপ অভিনয় করে।

উঁহাৰ ৰাজত্ব কাল কয়েকটি কাৰণে চিহ্নস্বৰূপী হইয়া থাকিব।

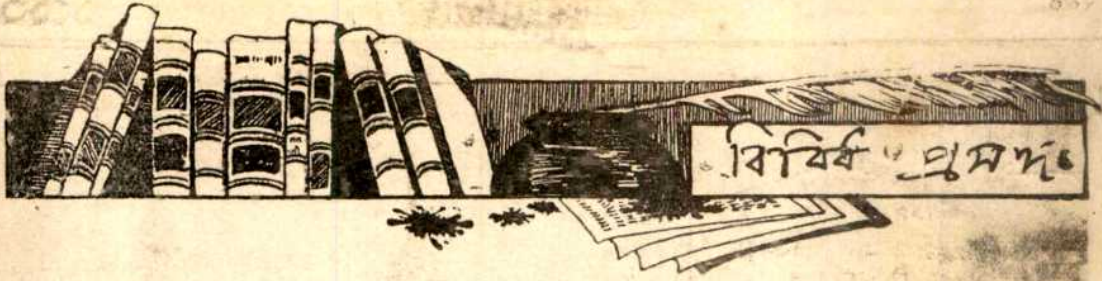
পঞ্চম ৰামেশ্বৰ সময় হইতে শ্বামেশ্বৰ বিভিন্ন দিকে উন্নতি হইতে থাকিলেও কোন ৰাজাই গণতন্ত্ৰমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা কৰিতে অগ্রসৰ হন নাই। ৰাজা চিহ্নচিহ্নিত প্ৰথায়ে সৰ্ব্বময় কঠোৰপেই বিৰাজ কৰিতেন। সরকারী সঞ্চোচ্চ হইতে সৰ্ব্বনিম্ন পদটি পর্যন্ত শ্বাম ৰাজ-পরিবারের বা ৰাজ-পরিবারের সহিত সংবন্ধ লোকই নিযুক্ত হইতেন। ইহাতে স্বেচ্ছাচাৰিতারও অবশি ছিল না। শ্বামবাসী জননেতাদের ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ কৰিয়াছেন, বিদেশের বিভিন্ন শাসন-প্ৰথায়ে সজ্ঞে সাক্ষাৎ ও পৰোক্ষ ভাবে পরিচিত হইয়াছেন; ৰাজপদ অবাহত ৰাশিয়া কল্পে গণতন্ত্ৰমূলক শাসন-নীতি প্ৰচলিত হইতে পারে এখন তাঁহাৰই উপায়-চিন্তা কৰিতে লাগিলেন। কোথাও সারা-শব্দ নাই, ১৯৩২ সনের ২৪এ এপ্ৰিল শ্বামৰাজ্যে অস্তিত্ব ধৰণের বিপ্লব দেখা দিল। জননেতারা নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীর সাহায্যে ৰাজ-পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্ৰাসাদে আটক কৰিলেন। ৰাজধানী ব্যাধক ও সমগ্ৰ শ্বামৰাজ্যের জনগণের মধ্যে বাহাতে কোনরূপ চাকল্যের সৃষ্টি না-হয় পূৰ্ব হইতেই তদন্তৰূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। বাহির হইতে কেইই বহিৰ্ভি পাবিল না যে, শ্বামৰাজ্যের শাসনতন্ত্ৰের ওলট-পালট হইয়া বাহিতেছে। ৰাজা ও ৰাণী এই সময় জয়া হিন নগরে অবস্থিত কৰিতেছিলেন। একটি নৌবাহিনী তাঁহাকে ৰাজধানীতে আনিবার জন্ত প্ৰেৰিত হইল। ইতিমধ্যে তাঁহাৰোপেই নেতারা শাসন-তন্ত্ৰ পরিবৰ্তনে ৰাজ্যৰ সম্মতি পাইয়াছিলেন। ৰাজা-ৰাণীৰ প্ৰত্যাগমনে ব্যাধক নগৰীতে একটা সড়ো পড়িয়া গেল। তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা কৰিবার জন্ত ব্যাধকের নৱ-নৱী বিবিধ আয়োজন কৰিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জননেতারা গণতন্ত্ৰমূলক একটি শাসন-তন্ত্ৰৰ প্ৰস্তাব প্ৰস্তুত কৰিলেন। ইহা অল্পাধিক ব্ৰিটিশ ৰাজতন্ত্ৰের অন্তৰূপ। ইহা দ্বারা ৰাজ্যৰ নিকট আশ্ৰয়তা স্বীকাৰ কৰিয়া জনপ্ৰতিনিধিৰ সরকারী সৰ্ব্ববিধ কাৰ্য্যই সম্পন্ন কৰিবার ক্ষমতা অৰ্জন কৰিয়াছেন। ৰাজা প্ৰজাবিপক্কের প্ৰাৱস্তিক অহমতিজন্মে ব্যবস্থা-পরিবদে আলোচনা হইবার পূৰ্ব একটি চৰম নিয়মপত্ৰ গঠিত হইল। ১৯৩২ সনের ১৫ ডিসেম্বৰ ৰাজা ইহাতে স্বাক্ষৰ কৰিলেন। ইহাৰ পূৰ্ব ১৯৩০ ও ১৯৩৪ সনের প্ৰাৱস্তেও শাসনব্যাপারে কিছু কিছু পরিবৰ্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বিদেশে প্ৰকাশ পাইল—শ্বামে বিপ্লব উপস্থিত। সে বাহা হউক, শ্বামেশ্বৰ এই 'বিপ্লব' সম্পূৰ্ণ রক্তপাতবিহীন ভাবেই হইয়াছে। ইহাতে জগতের দৃষ্টি আৰও বেশী কৰিয়া শ্বামেশ্বৰ দিক আকৃষ্ট হইয়াছে।



ৰাজ প্ৰাসাদৰ নৰ্তক-নৰ্তকী। প্ৰাচীনকালের ভারতবর্ষীয় দেবমন্দিরের নৰ্তক-নৰ্তকীদের আদর্শে ইহারা শৈশব হইতে এই শিক্ষা লাভ কৰিয়া থাকে।

এবাবে ৰাজা প্ৰজাবিপক্ক কেন সিংহাসন ত্যাগ কৰিতে সন্মত কৰিয়াছেন তাহা প্ৰাৱস্তেই বলিয়াছি। শ্বামেশ্বৰ ব্যবস্থা-পরিবদ যতটা পরিবৰ্তন সাধন কৰিতে চান তিনি ততটা চান না। তিনি আৰও বলিয়াছেন, শ্বামেশ্বৰ ব্যবস্থা-পরিবদ ততটা জনপ্ৰতিনিধিমূলক নহে। কাজেই একৰূপ আইন পরিবৰ্তন ব্যাপারে জনগণের ভোট লওয়া প্ৰয়োজন। শ্বামৰাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখন মানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

শ্বামেশ্বৰ কথা বলিতে গেলে আৰও একটি দিকে আমাদেৱ দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। শ্বামেশ্বৰ মঠ-মন্দিৰ সৰ্বদাশে প্ৰশংসিত। ৰাজ-প্ৰাসাদের মৰকতমণি শিথিত বৌদ্ধমূৰ্তি কাৰুকাৰ্য্যে ও গঠন-ৰীতিতে অতুলনীয়। অযোধ্যা, ব্যাধক প্ৰভৃতি নগৰীতেই যে হুন্দৰ হুন্দৰ মন্দিৰ আছে তাহা নহে। হুন্দৰ পন্নীপ্ৰান্তেও অন্তৰূপ কাৰুকাৰ্য্য-খচিত মন্দিৰ বিৰাজ কৰিতেছে। মন্দিরের মূৰ্তি ও চিত্ৰাবলী হইতে মনে হয় শ্বামৰাজ্যে ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মের পূৰ্ণ বিকাশ হইয়াছে। কাৰণ ইহাৰ দুইটি প্ৰধান অঙ্গ হিন্দু ও বৌদ্ধধৰ্মের নৈসৰ্গিক মিলনে শ্বামৰাজ্য গঠিয়ান।



কংগ্রেসের গত অধিবেশন

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের গত অধিবেশন খুব আড়ম্বরের সহিত হইয়া গেল। “প্রতিনিধি”র সংখ্যা মোটামুটি আড়াই হাজার হইয়াছিল। দর্শক এত বেশী হইয়াছিল, যে, অভ্যর্থনাসমিতি সমুদয় আয়োজন খুব ঘটার সহিত করা সত্ত্বেও তাঁহাদের হাতে হাজার ত্রিশ টাকা উদ্ধৃত থাকিবে।

শুভে লিখিয়াছেন, যে, কংগ্রেসওয়ালারা (তাঁহাদের সভাপতিও) হোয়াইট পেপারের সমালোচনা করে বটে, কিন্তু তাহাতে কি আছে স্পষ্টতই তাহা জানে না, অথচ অত্র এক পৃষ্ঠায় সভাপতির অভিভাষণের অধিক অংশ, “Congress President’s Elaborate Analysis of White Paper” “কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের হোয়াইট পেপারের



বানু আবদুল গফ্ফর বান (কলু দেশাই অঙ্কিত)

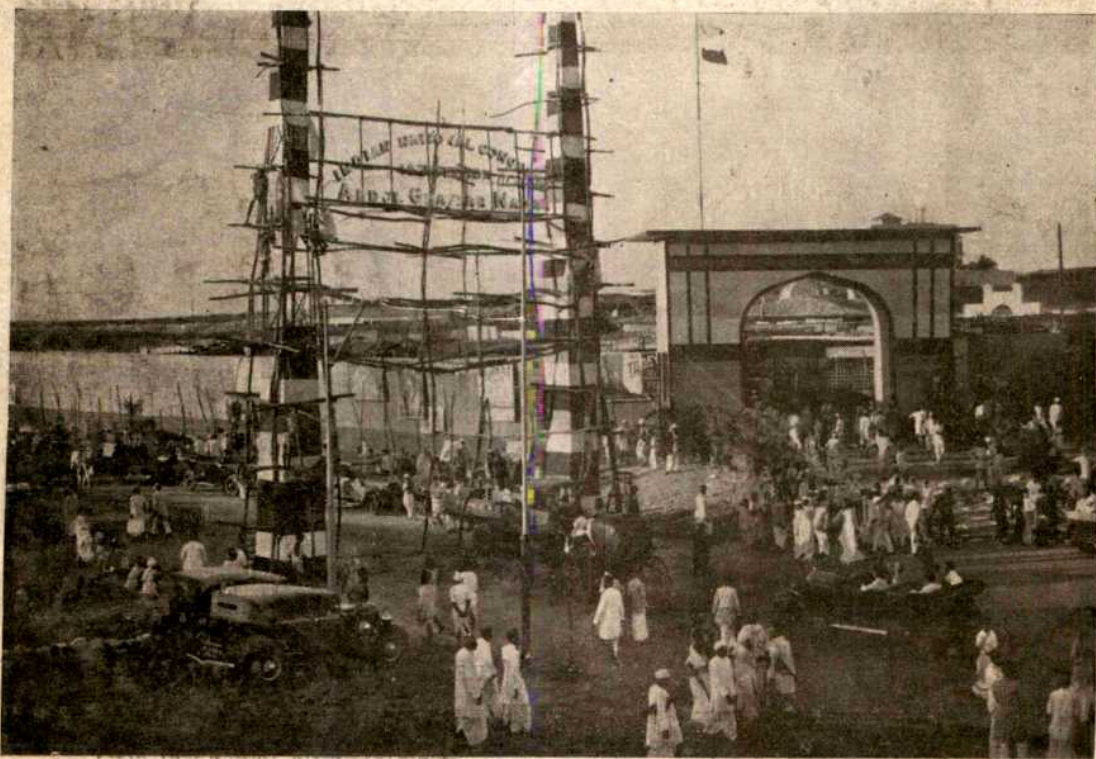
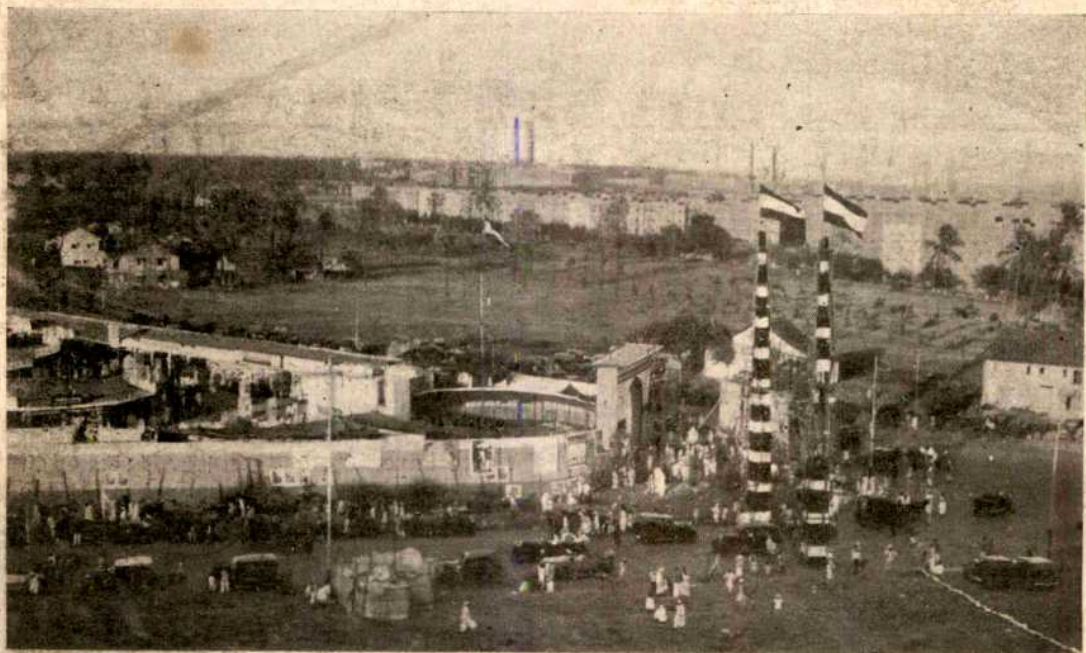
বোম্বাইয়ের টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া ইংরেজদের কাগজ। কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভিভাষণের প্রতিকূল সমালোচনা করিতে গিয়া এই কাগজ সম্পাদকীয়



কুমারী সোফিয়া সোমজী। বোম্বাই কংগ্রেসের মহিলা-স্বৈচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর নেত্রী

সবিস্তার বিশ্লেষণ” শিরোনাম দিয়া ছাপিয়াছে! সুতরাং এই কাগজখানার মতে হোয়াইট পেপারে কি আছে তাহা না জানিয়াও তাহার সবিস্তার বিশ্লেষণ করা চলে!

এইরূপ শত্রুভাবাপন্ন কাগজও লিখিতে বাধ্য হইয়াছে,

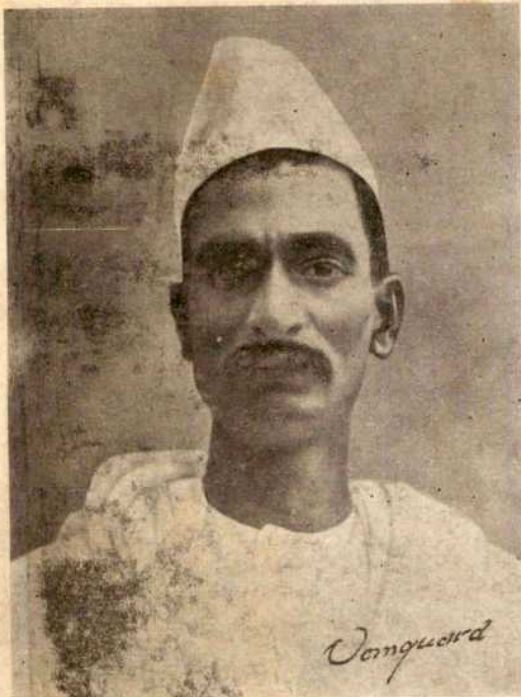




কংগ্রেস-নগরের দৃশ্য



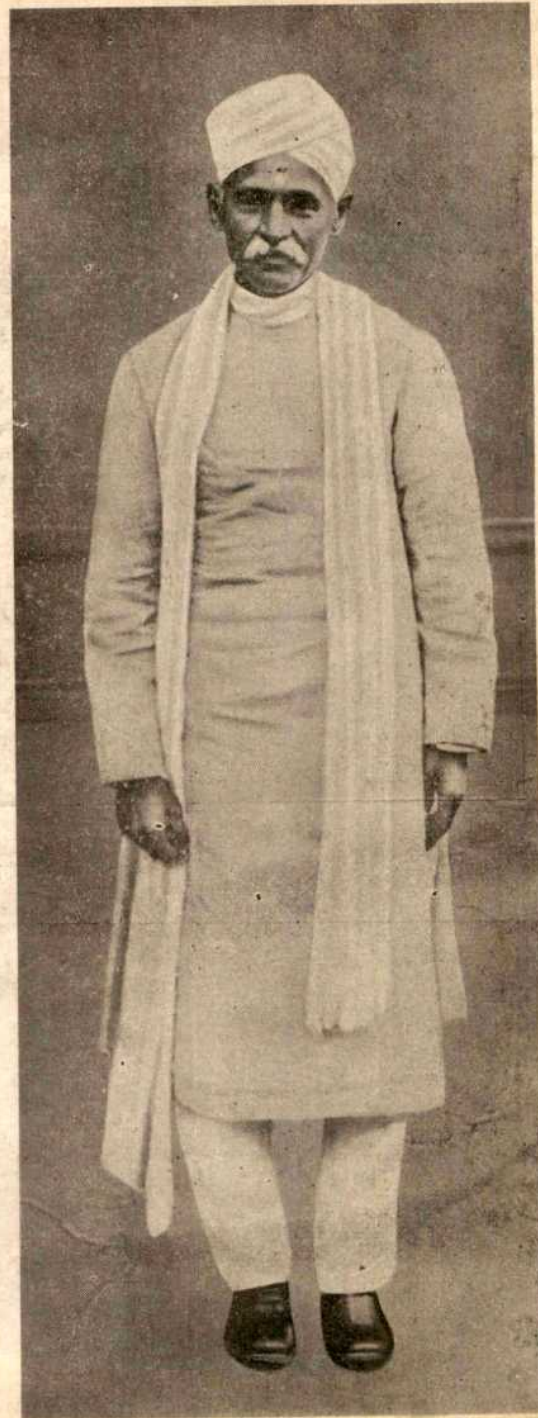
কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন। উপবিষ্ট—গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বলভভাই, মাননীয় প্রত্নতি



কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ



কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনের অধ্যক্ষ-সমিতির সভাপতি
মিঃ কে এফ নারিমান



পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া

যে, কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে, “দর্শনযোগ্যতার দিক দিয়া কেবল অসাধারণ সাফল্যশ্রুতি বলিয়াই বর্ণনা করা যায়।” বাট হাজার লোক বসিবার মত জায়গা করা হইয়াছিল। পেছাসেবক ও দেশসেবিকা নামধারিণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের দ্বারা বিশাল জনতার গতিবিধি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। দেশসেবিকাদের নেত্রী ছিলেন কুমারী সোফিয়া সোমজী। মধ্যে মধ্যে গোলমাল যে হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু মোটের উপর সুশৃঙ্খল ভাবেই কাজ চলিয়াছিল। উচ্চ ও বিস্তৃত একটি বেদীতে সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা এবং সমধিক অর্থদাতা অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা বসিয়া ছিলেন। বক্তাদের জন্য একটি উচ্চতর মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। ধ্বনির উচ্চতাবিধায়ক যন্ত্রের (loud-speakerএর) সুবন্দোবস্ত থাকায় প্রত্যেক বক্তার ও সভাপতির কথা সুবিস্তৃত সভাস্থলের দূরতম স্থান হইতেও স্পষ্ট শোনা গিয়াছিল। যখনই



বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যর্থনা সভাপতির দৃশ্য

কোন বক্তা মঞ্চে ঠাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন, অমনি চারিদিক হইতে তাঁহার উপর বৈজ্ঞানিক আলোক নিক্ষিপ্ত হইত এবং এই প্রকারে দূরতম স্থানের লোকেরাও তাঁহাকে দেখিতে পাইত। সভাপতি মহাশয়ের উপরও মধ্যে মধ্যে এইরূপ আলোক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহাকেও সকলে দেখিতে পাইত।

কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে ওর্লী (Worli) নামক শহরতলীতে। অভ্যর্থনা-সমিতি বোম্বাই শহর হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প দূরে ও উৎকৃষ্টতর প্রশস্ত স্থানে কংগ্রেস ও প্রদর্শনী করিতে চাহিয়াছিলেন। গরম্বোট্টে সেই স্থান না-দেওয়ায় ওর্লীতে

ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার দুটি অধুবিধা ছিল। প্রথম, বোম্বাই হইতে ইহার দূরত্ব; দ্বিতীয়, বোম্বাইয়ের সমুদয় নদীমা ইহার অনতিদূরে সমুদ্রে পড়ায় মধ্যে মধ্যে জর্জর বিস্তার। এই কারণে, অভ্যর্থনা-সমিতির প্রদত্ত কংগ্রেস-পুরীর নাম আবহুল গফ্ফর নগরের পরিবর্তে বিদ্রূপকারীরা উহাকে গাটার (gutter অর্থাৎ নদীমা) নগর বলিত।

কাজের মধ্যে মধ্যে বেদীর উপর আসীন নেতাদের পরস্পরের সহিত পরামর্শ এবং গল্পগুজবও চলিত। বেদীতে কিছুক্ষণ থাকায় ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য সাংবাদিক বলিয়া প্রথমে প্রায় সাত আট শত



বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ (কম্বু দেশাই অঙ্কিত)

সাংবাদিকের জগৎ নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট ছিল না। পরে অভ্যর্থনা-সমিতির অন্ততম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পাটিল আমাকে বেদীতে লইয়া যাওয়ায় মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই পটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মিঃ নারিমান বক্তৃতা করিতেছিলেন। মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন আছেন এবং কত দিন আগে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর তখন বেদীতে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তৃতা খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশন সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে অনেক রাজি পর্যন্ত হইত। করাচীতে উহার গত অধিবেশন যেমন আকাশের নীচে অনাবৃত স্থানে হইয়াছিল, বোম্বাইয়ের

গত অধিবেশনও সেইরূপ হইয়াছিল, মণ্ডপে বা চত্বারতপের নীচে হয় নাই।

বিশেষ ঘটনা সহকারে কংগ্রেসের অধিবেশন বোধ হয় এই শেষ বার হইল। কারণ, অতঃপর উহার প্রতিনিধির সংখ্যা ছই হাজারের বেশী হইতে পারিবে না।

নিখিলভারতীয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলন

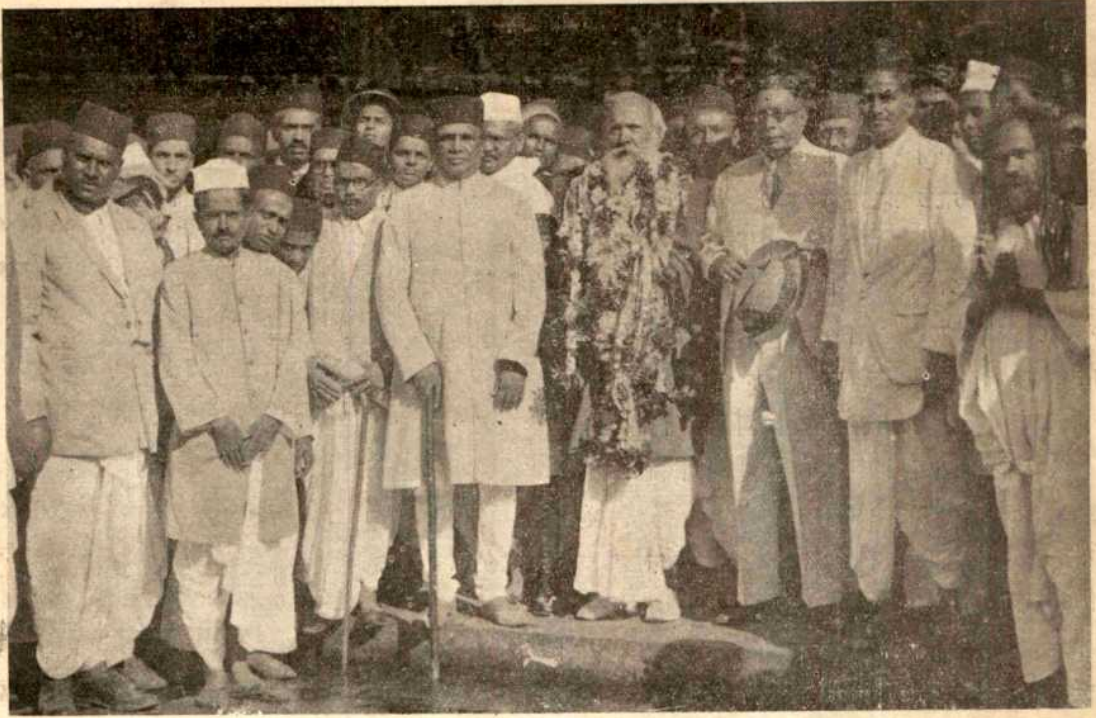
বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের একদিন আগে ২৫শে অক্টোবর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাবিরোধী সমগ্রভারতীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ২৬শে তাহা শেষ হয়। প্রবাসীর সম্পাদককে তাহার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব রাজস্ব-সচিব স্যাডভোকেট



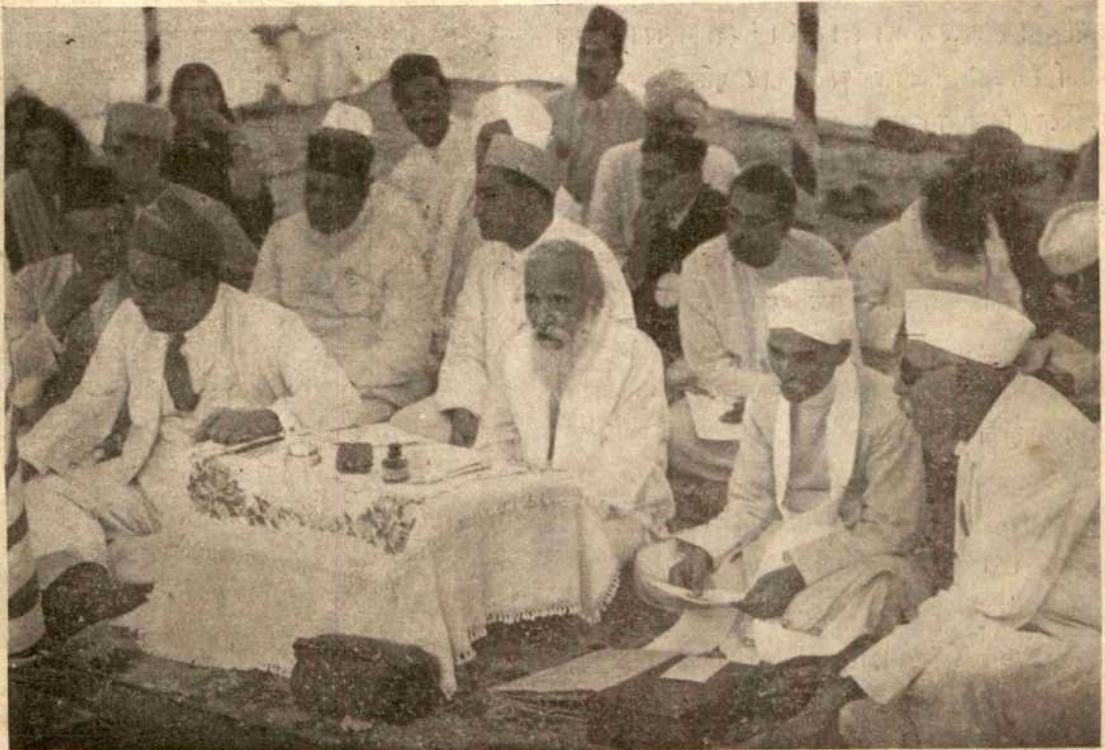
নিখিলভারতীয় সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্ত্রী গোবিন্দরাও বলবন্ত প্রধান

স্ত্রী গোবিন্দরাও বলবন্ত প্রধান ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হন।

এই সম্মেলনে প্রতিনিধি ও শ্রোতাদের সংখ্যা যে



বোম্বাই রেলওয়ে স্টেশনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যর্থনা



নিখিলভারতীয় সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনে শ্রী গোবিন্দরাও প্রধান, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি

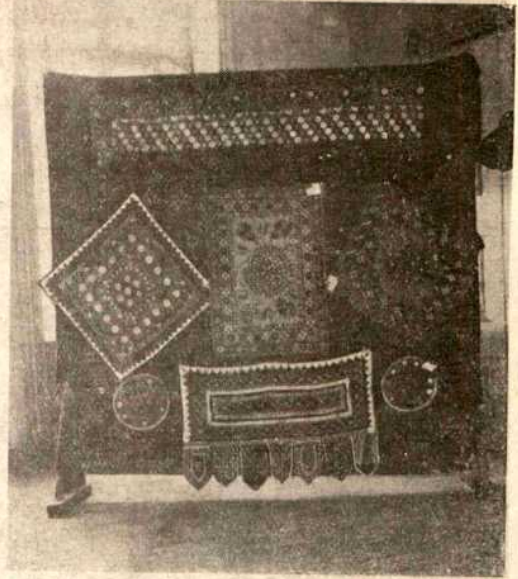
কংগ্রেসের মত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইবার কথাও নহে। কারণ এরূপ সম্মেলন এই প্রথম হইল, ইহার পশ্চাতে কংগ্রেসের মত কৃত্ত্বপূর্ণ ইতিহাস ছিল না এবং ইহা কেবল একটিমাত্র জিনিষের বিরোধিতা করিবার জন্ত আহূত হয়। তবে, কংগ্রেসওয়ালাদের কোন কোন কাগজে ইহার প্রতিনিধি ও শ্রোতার সংখ্যা যেরূপ কম বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। প্রতিনিধি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া ইহার উদ্বোধন করেন। তাহার বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। তাহার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রী গোবিন্দরাও প্রধান তাহার অভ্যর্থনা পাঠ করেন। তাহাতে তিনি সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রয়োগ করেন। অতঃপর সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাহার বক্তৃতার কিয়দংশ পড়েন। ইহাতে, সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা-সম্পর্কে বে-বে বিবয়ের ও যুক্তির আলোচনা আবশ্যিক, তাহা করা হইয়াছে বলিয়া ইহা দীর্ঘ। ইহা নবম্বর মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইয়াছে। সম্মেলনের বিরোধী কোন কাগজ ইহার কোন উক্তির বা অংশের প্রতিবাদ বা ভ্রমপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহার কোন যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

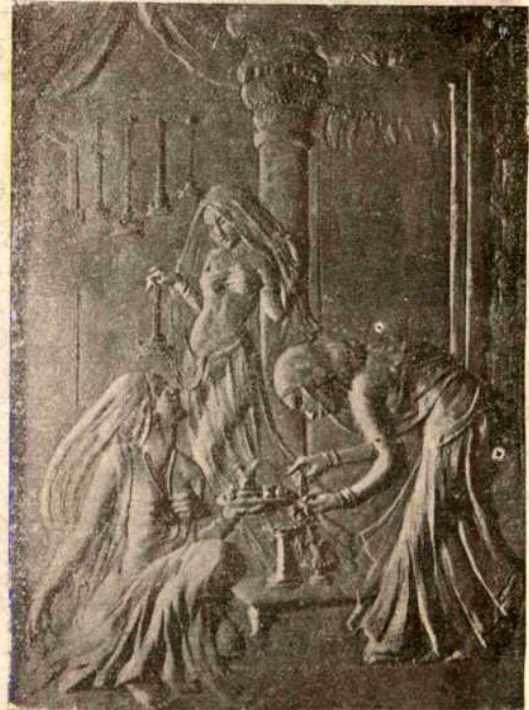
সভাপতির বক্তৃতার পর প্রথম দিনে একটি—ও তাহার পরদিন তিনটি—প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রী গোবিন্দরাও প্রধান, শ্রীযুক্ত যমুনালাল মেহতা, শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ সাভারকর প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বোম্বাইয়ে মহিলাদের ললিতকলা ও শিল্প প্রদর্শনী

কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় বোম্বাইয়ের টাউন হলে মহিলাদের ললিতকলা ও কারুকার্যের একটি প্রদর্শনী হয়। "গুজর টী ক্রীসহকারী মণ্ডল" ইহার উদ্যোগ করেন। যে কমিটির দ্বারা সাফাং ভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পন্ন হয়, শ্রীমতী হংসা মেহতা তাহার নেত্রী এবং সদস্যদের মধ্যে

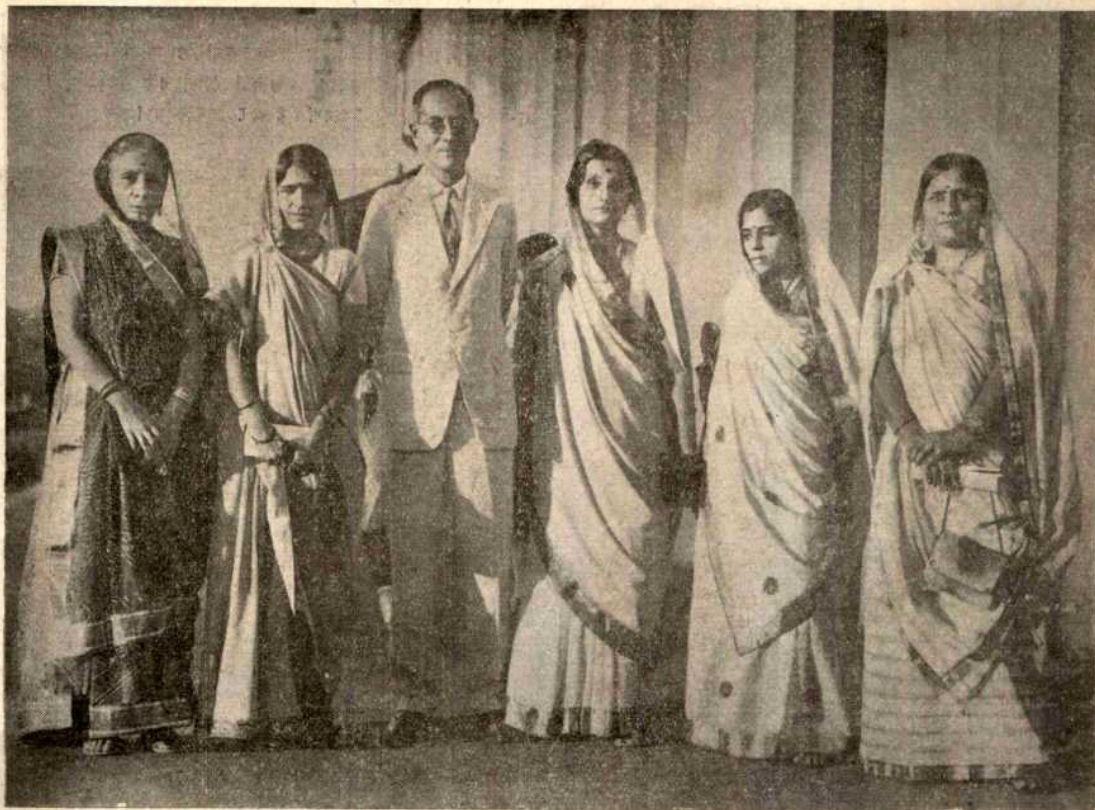


কচ্ছদেশের হুচীকর্মের নিদর্শন



ভাস্কর্য—'দীপাবলী'। শিল্পী শ্রীমতী যমুনা রাওতে

অধিকাংশ মহিলা। ইহাদের আছরানে একদিন প্রদর্শনী

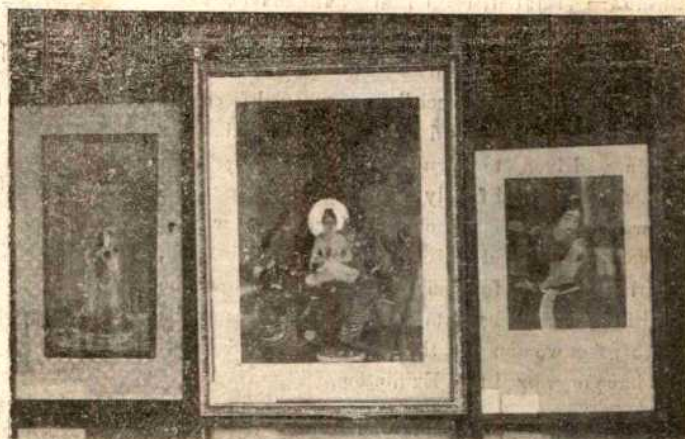


বোম্বাই টাউন হলে মহিলাদের শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্তর চুনালাল মেহতা ও সভ্যবৃন্দ

দেখিতে গিয়াছিলাম। এক জন কর্মকর্তা সৌজন্য সহকারে সমুদয় জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। প্রদর্শনীটি চারিটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। (১) তৈলচিত্র ও অন্তবিধ চিত্র, (২) ললিতকলানুকারী ফোটোগ্রাফ, (৩) মূর্তিশিল্প, এবং (৪) স্থূচির কাজ ও অন্ত্যত কারুকার্য। সকল বিভাগেই নানাবিধ কাজের নমুনা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কতকগুলির ক্ষুদ্র ফোটোগ্রাফ দিলাম।

প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির তালিকার পুস্তিকার ভূমিকায় ত্রীমতী হংসা মেহতা লিখিয়াছেন :—

Women are by nature artists and good craftsmen.



দ্রব্যমকি হইতে :—(১) বিরহিণী—শিল্পী কুমারী শিখোদিয়া, (২) বৃদ্ধ—শিল্পী কুমারী চৌহার, (৩) নর্তকা—শিল্পী কুমারী হুমেন দিভেচা

So far they have flirted with art and taken only amateurish interest in them. It is time women realized



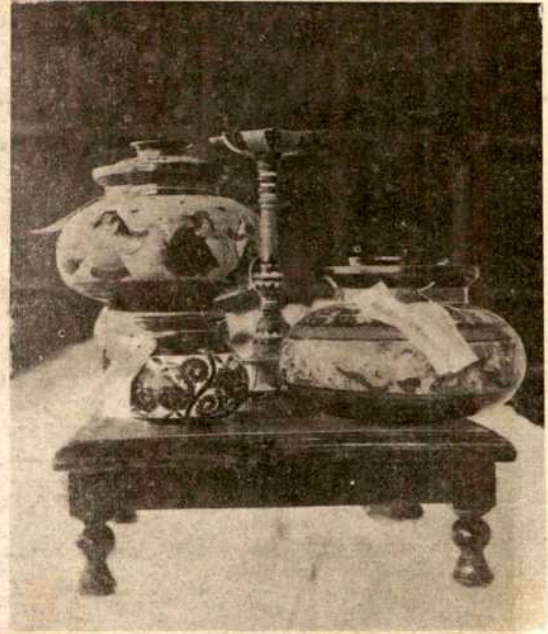
আলোকচিত্র—“কাশ্মীরী বালিকা”। শিল্পী কুমারী মনোরমা দেশাই

that arts and crafts can also be a good means of earning their livelihood, more especially so when life economically is becoming more and more complex and more women are driven to earn their own living or to supplement their small family income.

It was with the object of helping those women who have made arts and crafts their occupation in life, by securing a market for their work, and to show the possibilities of making arts and crafts a means of a new career for women that the Gujarati Stree Sahakari Mandal have organized this Exhibition.

তাৎপর্য। নারীরা স্বাভাবিকই রূপকার এবং উৎকৃষ্ট কারুশিল্পী। এ পর্যন্ত তাহারা সৌখীন ভাবে ললিতকলায় কিছু মন দিয়া আসিয়াছে। ললিতকলা ও কারুকার্য যে জীবিকা উপার্জনেরও একটা ভাল উপায় হইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিবার এখন সময় আসিয়াছে—বিশেষতঃ যখন জীবন-যাত্রা আর্থিক দিক দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর জটিল হইয়া উঠিতেছে এবং নারীরা অধিকতর সংখ্যায় নিজের জীবিকা অর্জন করিতে বা সামান্য পারিবারিক আয়ের প্রচুরণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

যে-সকল নারী ললিতকলা ও শিল্পকে তাহাদের জীবনোপায় করিয়াছেন তাহাদের তৈরি জিনিষ বিক্রয় ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে এবং ললিতকলা ও কারুকার্যকে মেয়েদের একটা কার্যক্ষেত্র করিবার সম্ভাবনা দেখাইবার নিমিত্ত, “গুজরাটী স্ত্রী-সহকারী মণ্ডল” এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন।

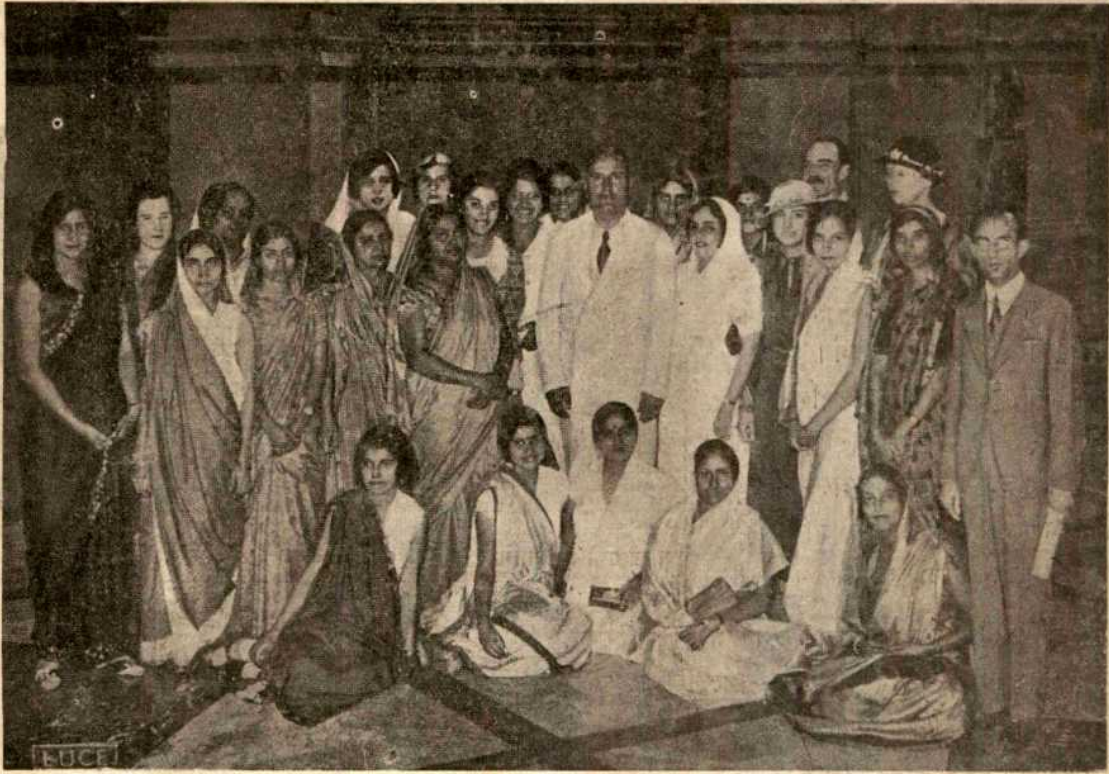


কারের উপর চিত্রাঙ্কণ—শিল্পী ‘ভগিনী সমাজের’ সভাবন্দ

কলিকাতায় নারীশিক্ষা-সমিতিও এইরূপ উদ্দেশ্যে—এই প্রকার প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত কয়েক বৎসর হইতে করিয়া আসিতেছেন।

রোমে ভারতীয় ছাত্রীর দল

কুড়িটি ভারতীয় ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী ইউরোপের নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষালাভার্থ কয়েক মাস পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাহাদের নানা অভিজ্ঞতায় আনন্দিত হইয়াছেন। তাহারা যে-সব দেশ দেখেন, ইটালী তাহাদের মধ্যে একটি। সেখানে তাহারা ১৪ দিন ধরিয়া নানা প্রাচীন কীর্তি এবং চিত্র, মূর্তি, গির্জা ও প্রাসাদ দেখিয়া মুগ্ধ হন। রোমে ইটালীর একছত্র শাসক মুসোলিনির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। মহিলারা বলিয়াছেন :—



মুসোলিনী কর্তৃক অভিনন্দিত ভারতীয় ছাত্রীবৃন্দ

“মুসোলিনী আমাদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন— খুব দ্রুত নহে কিন্তু খুব সৌজ্ঞেয় সহিত। তিনি বলেন,— তিনি ভারতের মহান্ অতীত যুগ, তাহার দর্শন ও চিন্তা এবং তাহার আশ্চর্য্য সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখন তিনি বনিষ্ট অভিনিবেশ সহকারে ভারতবর্ষের প্রগতির ও উচ্চ আশার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। গত ত্রিষ্টমাসের সময় তিনি প্রাচ্য ছাত্রদের কনফারেন্সে ভারতীয় ছাত্রদের সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখন তিনি কতকগুলি ভারতীয় মহিলাকে নিজের দেশে আনন্দের সহিত ‘স্বাগত’ করিতেছেন।”

ইহার উত্তরে ভারতীয়রা কিছু বলেন। ইতিমধ্যে ফোটোগ্রাফার তাঁহার ক্যামেরা ফোকাস করিয়া প্রস্তুত হন। তাহা লক্ষ্য করিয়া মুসোলিনী সুধান, “আমার সঙ্গে একটা ফোটোগ্রাফ তোলা কি আপনাদের ইচ্ছা?” সকলে “হ্যাঁ” এবং “নিশ্চয়” বলায়

তিনি খুব হাসেন। ছাত্রীদের পরস্পরকে ঠেলিয়া তাঁহার পাশাপাশি দাঁড়াইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে খুব উপভোগ্য হইয়াছিল।

এই ফোটোগ্রাফের একটি প্রতিলিপি রোম হইতে প্রকাশিত “ইয়ং এশিয়া” (“তরুণ এশিয়া”) নামক সাময়িক পত্র হইতে আমরা মুদ্রিত করিলাম।

বিমান-চালনার প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি লণ্ডন হইতে অষ্টেলিয়ার মেলবোর্ন পর্য্যন্ত বিমান-যোগে আকাশপথে যাইবার এক প্রতিযোগিতা হয়। তাহাতে ইংলণ্ডের একটি বিমান জয়ী হইয়াছে। তাহাতে রথী ছিলেন ইংরেজ বৈমানিক স্কট ও ব্র্যাক। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন ২১শে অক্টোবর আমি এলাহাবাদে ছিলাম। তাহার নিকটবর্তী বামরাওলীতে একটি প্রধান বিমান-আড্ডা আছে। সেখানে গিয়াছিলাম।

মিঃ ও মিসেস্ মলিনের বিমান সকলের আগে আসিতেছিল কিন্তু তাঁহাদের আকাশযানটি করাচীর কাছাকাছি বিগড়াইয়া বাওয়ার তাহারা পিছাইয়া থাকিতে বাধ্য হন। স্কট এবং ব্রাক সর্বপ্রথম বামরাওলী পৌছেন। তাঁহাদের বিমানখানি লাল রঙের বলিয়া আকাশে খুব উজ্জ্বল থাকার সময়ও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। স্কট দীর্ঘকাল বলিষ্ঠ পুরুষ। চিত্রে তাঁহাকে লম্বা কোট ও নাইটক্যাপ-পরিহিত দেখা যাইতেছে। বামরাওলীতে সে-দিন যেন একটা পর্ব পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙালী ভদ্রলোকেরা অনেকে মাঠে



বামরাওলী ষ্টেশনে মিঃ স্কট (লম্বা কোট পরিহিত)। ইনি লণ্ডন-মেলবোর্ন বিমান-চালনা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছেন

তঁাবু ফেলিয়া আবালাবুদ্ধবিনিতা সেখানে গিয়াছিলেন, এবং গল্পগুজব জলযোগ আদি চলিতেছিল। অবশ্য তাহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের গিয়াছিলেন।

আমরা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম—“দিন আগত ঐ ভারত তবু কৈ!”

বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের দান

অধ্যাপক ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভটনাগর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নীবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। তিনি বহু রাসায়নিক গবেষণা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। পঞ্জাবে খনিজ তৈলের ব্যবসায়ী একটি ইংরেজ কোম্পানীর অমুরোধে তিনি ঐ তৈলের সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করায় কোম্পানী তাঁহাকে দক্ষিণা স্বরূপ দেড় লক্ষ টাকা দিতে চান। তিনি ঐ টাকা নিজে না লইয়া পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক গবেষণার জন্য পাঁচটি বৃত্তি দিবার নিমিত্ত ঐ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি ধনী লোক নহেন—অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ধনী নহেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ প্রশংসনীয় দান এদেশে বিরল। বঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রকার দান করিয়াছেন। ডক্টর



ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভটনাগর

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ও এইরূপ দান করিয়াছেন। ডক্টর ভটনাগর ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে একটি চিঠিতে

অগ্রহায়ণ বিবিধ প্রসঙ্গ—মাদ্রাজে ও বিশাখপত্তনে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধনা ৩০৫

লিখিয়াছেন, যে, আচার্য্য রায়ের দৃষ্টান্তই তাঁহাকে এইরূপ দান করিতে অনুপ্রাণিত করে।

এই ব্যাপারটিতে অধ্যাপক মহাশয়ের দানশীলতা ও বিজ্ঞানানুবাগ প্রাশংসনীয় এবং বিদেশী কোম্পানীতে কলস্কর ব্যবহারও প্রীতিপ্রদ। কোম্পানীটি বিদেশী না হইয়া স্বদেশী হইলেই ব্যাপারটি অবিস্মিত আমন্ত্রণের কারণ হইত।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আদ্য অধিবেশন হইবে। আগেকার এগারটি অধিবেশন বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে হইয়া গিয়াছে। এবার বঙ্গের রাজধানীতে ইহার অধিবেশন হইবে বলিয়া বঙ্গের বাহির হইতে প্রতিনিধি অত্যন্ত বার অপেক্ষা সংখ্যায় অধিকতর হইবে। সেই জন্য উপরক্ত আয়োজনও অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইবে। বঙ্গের বাহিরের বাঙালী ভ্রাতাভগিনীরা এবার আমাদের অতিথি হইবেন। তাঁহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই জন্য সকলের আর্থিক ও অন্তবিধ সাহায্য প্রার্থনীয়।

কলিকাতার অধিবেশনে সাধারণ সভাপতি হইবেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ ও অস্থায়ী প্রধান জজ শ্রী বালাগোপাল মুখোপাধ্যায়। তন্নিম্ন বেসে শাখার সভাপতি এ পর্য্যন্ত মনোনীত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

সাহিত্য—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক।

বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমানবিহারী দে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের বসায়নী-বিদ্যার অধ্যাপক।

ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ডক্টর বিজয়রাজ চট্টোপাধ্যায়, মীরাট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক।

ধনবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত ডক্টর ভানুভূষণ দাসগুপ্ত, সিংহলের কোলোম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার এবং তথাকার ব্যাংকিং কমিশনের সদস্য।

শিল্পকলা ও শিল্প—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মাদ্রাজ স্থল অব্ আর্টসেব প্রিন্সিপ্যাল, এবং চিত্রকর ও মুদ্রিকার।

শিক্ষাবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত ডক্টর সুবিনয়চন্দ্র সরকার, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও পাটনার ট্রেনিং কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল।

মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী হইবেন দিল্লীর শ্রীযুক্ত শৈলবালা দেবী। ইনি কবি ও দিল্লীর বাঙালী মহিলাদের অন্ততম নেত্রী। ইহার স্বামী শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত সেন দিল্লীর প্রখ্যাত ডাক্তার এবং পুত্রকল্যাণ সংকলন ইত্যাদি।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর উপর আক্রমণ গত ২০শে কাশ্মির পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর নাগপুরে বক্তৃতা করিতেছিলেন। কতকগুলি লোক তাঁহার উপর ইট-পাটকেল ছুড়িয়াছিল। সভা ভাঙিবার পর তিনি ও ডাক্তার মুন্সে এক গাড়িতে চড়িয়া সভা হইতে ঘাইতেছিলেন। পুরোক্ত লোকেরা তাঁহাদের গাড়ীও আক্রমণ করে। ইহা অসহযোগ বটে, কিন্তু অহিংস কিনা, ভবিষ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। গত বার-তের বৎসব ভারতবর্ষে এক দলের ভারতীয়দের দ্বারা অন্য দলের ভারতীয়দের উপর এইরূপ আক্রমণ বাড়িয়াছে। কয়েক বৎসর ত এরূপ হইয়াছিল, যে, কংগ্রেসওয়ালারা ভিন্ন বা কংগ্রেসের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন প্রকাশ্য সভায় অস্ত্র কাহারও বক্তৃতা করিবারই জো ছিল না।

মাদ্রাজে ও বিশাখপত্তনে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধনা

মাদ্রাজবাসীদিগের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ গিয়াছিলেন, সঙ্গে বিশ্বভারতীর কতকগুলি ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীরা ছিলেন। সেখানে নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে বিপুল জনতা রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার সম্বন্ধনা করে। পরে পৌরস্বত্বের প্রতিনিয়ন্ত্রণে মেয়র মিঃ ডব্লিউ. জাডেন তাঁহাকে মানপ্রদ প্রদান করেন। ছাত্রসমাজ ও অন্ত কোন কোন সমিতির কর্তৃকও তিনি সম্বাদিত হন। কয়েকটি বিষয়ে বক্তৃতা ছাড়া মাদ্রাজে বিশ্বভারতীর শিক্ষা-প্রদর্শনীও হয়, এবং “শাপমোচন” নামক নৃত্যগীতবহুল নাট্যকাব অভিনয় হয়। বিজয়নগরের মহারাণীর আয়ত্নে

তিনি বিশাখপত্তন গমন করেন। সেখানেও শাপমোচনের অভিনয় এবং কোন কোন বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

বিলাতে ভারতীয় তুলার ব্যবহার

১৯৩২ সালের প্রথম নয় মাসে যত ভারতীয় তুলা ইংল্যান্ডের মিলওয়ালারা কিনিয়াছিল, বর্তমান ১৯৩৪ সালের প্রথম নয় মাসে তাহার তিন গুণ ভারতীয় তুলা তাহারা লইয়াছে, প্যারিসে একটি প্রেমের উদ্ভব ইহা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকেরা যাহাতে বেশী পরিমাণে লাক্ষ্যেরে প্রস্তুত কাপড় কেনে, তাহার জন্য তথাকার বস্ত্রনির্মাণকারী ভারতীয় তুলার প্রতি সদয় হইয়াছেন। ইহা মন্দের ভাল। অবিমিশ্র বাহনীর অবস্থা হইবে তখন, যখন ভারতবর্ষের যত তুলার কাপড়ের প্রয়োজন সমস্তই ভারতীয় তুলা হইতে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইবে। তাহার জন্য যত তুলা আবশ্যক, তাব চেয়ে বেশী তুলা ভারতবর্ষে তখন উৎপন্ন হইলে তাহা সেই সব দেশ রপ্তানি হইতে পাবিবে, যে-সব দেশ তুলা জন্মে না।

বঙ্গে আরও কাপড়ের কল চাই

ইহা গেল সমগ্র ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। এখানে কাপড়ের কাটুতিও বেশী। বঙ্গে বিক্রীত কাপড়ের অধিক অংশ বাহির হইতে আসে। বঙ্গের কাপড়ের কলে বঙ্গের অভাব মোচন অল্পই হয়। বঙ্গে আরও অনেক কাপড়ের কল চলিতে পারে। তাহাতে বাঙালীর মূলধন খাটিলে এবং বাঙালীরা তাহাতে শ্রমিকের ও অন্ত রকমের কাজ পাইলে বঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। বাঙালীদের বয়লার খনির কয়লাব কাটুতিও তাহাতে বাড়িতে পারে।

বঙ্গের নানা স্থানে উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মিতে পাবে। বঙ্গীয় সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এইদিকে কৃষি-মন্ত্রীর দৃষ্টি পড়িলে ভাল হয়।

ফিরদৌসীর সহস্রবার্ষিক জন্মোৎসব.

ইরানের মহাকবি ফিরদৌসীর সহস্রবার্ষিক জন্মোৎসব

ইরান (পারস্ত) দেশে তথাকার নৃপতি রিজা শাহ, পহলোবী ও জনসাধারণের উদ্যোগে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ফিরদৌসী সম্বন্ধে গত মাসের 'প্রবাসী'তে আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম। ইনি যে "শাহনামা" নামক মহাকাব্যের রচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত, তাহাতে যে-সকল ইরান-নৃপতির অবদান-পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মোহমুদীর্থ্যাবলম্বী ছিলেন না। ঐ ধর্ম প্রবর্তিত হইবার পূর্বে তাহার রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কারণে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কাব্য রচনা করায় ফিরদৌসীর জীবিত কালে গোড়া মুসলমানদের পক্ষ হইতে, তিনি বাহাতে সম্মান না পান, সে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

ভারতবর্ষের মুসলমানেরা "রযুবংশ" রচয়িতা কালিদাসের জয়ন্তী, কিংবা তাঁহার মত অন্ত কোন মহাকবির জয়ন্তী যদি করেন বা তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই কাজ কতকটা পাবসীকদিগেব অনুষ্ঠিত ফিরদৌসী-জয়ন্তীর অনুরূপ হইবে।

বিঠলভাই পটেলের উইল

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাব ভূতপূর্ব সভাপতি পরলোকগত বিঠলভাই পটেল তাঁহার উইলে ভাবতের উন্নতিকর কার্যে ব্যয় করিবার জন্য ১,১৫,০০০ টাকা বাখিয়া গিয়াছেন। তিনি উইলে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর দ্বারা বা তাঁহার নির্দেশমত তাঁহার মনোনীত কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা বিদেশে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর প্রচারকার্যে ঐ টাকা ব্যয়িত হইলে ভাল হয়। সুভাষ বাবু অন্ত কোন ভারতহিতকর কাজেও উহা লাগাইতে পারিবেন।

ইউরোপে পটেল মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্বে সুভাষ বাবুই তাঁহার সেবাসুপ্রসার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অন্ত কোন ভারতীয় রোগশয্যায় তাঁহার নিকটে ছিলেন না। পটেল মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার শব ভারতবর্ষে প্রেরণের ব্যবস্থাও সুভাষ বাবু করিয়াছিলেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীবিদ্বেষ

ভারতের এক একটা প্রদেশ কেবল সেই সেই প্রদেশের লোকদেব জন্ত হওয়া উচিত, বাংলা দেশ কেবল বাঙালীদের জন্ত হওয়া উচিত, এই প্রকাব রব বাঙালীরা আগে তুলে নাই। বাংলা দেশে অবাঙালী কাহারও ব্যসা-বাণিজ্য, শ্রমিকের কাজ, বা চাকরি কবায় বাঙালীরা প্রথম প্রথম আপত্তি করে নাই। বরং বাঙালীরাই প্রথমে সমগ্রভারতীয় মহাজাতি গঠনের কল্পনা ও তদনুরূপ বক্তৃতা দি করিয়াছিল। “বিহার কেবল বিহারবাসীদের জন্ত” ইত্যাদি রব বহু বৎসর ধরিয়া চলিবার পর এত দিন পরে, যখন বাঙালীরা বঙ্গেও সকল কার্যক্ষেত্রে হইতে বিতাড়িত ও বেদখল হইতে বসিয়াছে, যখন বঙ্গে অত্র প্রত্যেক প্রদেশের যত লোক উপার্জন কবে বঙ্গের তাহা অপেক্ষা অনেক কম লোক সেই সেই প্রদেশে উপার্জন করে, কেবল তখনই বাঙালীদিগকে বলিতে হইতেছে, যে, বঙ্গের সব কার্যক্ষেত্রে বাঙালীবই অধিকার সর্বাপেক্ষা। অথচ অত্র প্রদেশবাসীরা বাঙালীদিগকেই সর্বাপেক্ষা প্রাদেশিকসঙ্গীর্ণতাগ্রস্ত বলে! কিন্তু কার্যতঃ দেখিতে পাই, সিমলায় বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাহারা বেদখল হইয়াছে, দিল্লীর বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং কমিটি

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সাধারণ সম্পাদক—পণ্ডিত জাহাঙ্গীরলাল নেহরু, ডাঃ সৈয়দ আমুদ ও আচার্য্য কৃপালনী।

কোষাধ্যক্ষ—শেঠ যমুনালাল বজাজ।

সদস্যগণ—সদ্যর বল্লভভাই পটেল, খান আবদুল গফ্ফর খান, শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু, সদ্যর শাদুল সিং কবীন্দ্র, ডাক্তার আব্দারী, মোলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচাৰি, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধরনাথ দেশপাণ্ডে, ডাক্তার পট্টাভি সীতারামায়া, এবং শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম।

কংগ্রেস সাক্ষাৎ ভাবে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতকে ২১টি দেশে ভাগ কবিয়াছেন। সেই জন্ত আমরা আগে আগে লিখিয়াছিলাম, যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ সদস্যসংখ্যা ন্যূনকল্পে একুশ হওয়া উচিত; তাহা হইলে কোন প্রদেশই ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিনিধিশূন্য হয় না। নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে সর্বাপেক্ষা জনবহুল প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব কেহ নাই। কোন কোন তরফ হইতে বলা হইতেছে বটে, যে, মোলানা আবুল কালাম আজাদ বঙ্গের প্রতিনিধি। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কেন না, মোলানা সাহেব উর্দুতে কথা-বার্তা চালান, তাহা বাঙালীরা বুঝিতে পারে না। তিনি বাংলা জ্ঞানের বুধেন বলেন কিনা জানি না। মোলানা আকরম খান বা মোলবী মুজীবুর রহমানের মত বাঙালী কেহ কংগ্রেস কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হইলে বলা চলিত যে এক জন বাঙালী বঙ্গের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটিতে বঙ্গের কোন প্রতিনিধি না-থাকায় বঙ্গের নানা কাগজে—এমন কি করওয়ার্ডেও—অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক বাদ দিবার এই একটা কারণ দেখান হইয়াছে, যে, এখানে কংগ্রেসের দুই দলে খুব দলাদলি; কোন এক দলের লোক লইলে অত্র দলের লোক অসন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু তাহার জন্ত উভয় দলকেই কি অসন্তুষ্ট করা উচিত? দলাদলি অত্র কোন কোন প্রদেশেও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে দলাদলি-প্রযুক্ত মারামারি ও মানহানির মোকদ্দমা পর্যন্ত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের কংগ্রেসের প্রত্যেক দলের একটা কবিতা দৈনিক ত নাই-ই, কংগ্রেসের কোন দৈনিকই সেখানে নাই—সুতরাং প্রত্যেক দলের কথাকাটাকাটি এবং কটুক্তি খবরের কাগজে স্থান পায় না। বঙ্গে প্রত্যেক দলের কাগজ থাকায় অবস্থা অন্তরূপ হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে সভাপতি প্রভৃতিকে লইয়া বে পনর জন লোক আছেন, তাহার মধ্যে দু-জন বিহারের, দু-জন সিন্ধদেশের, এক জন মধ্যপ্রদেশের, অন্ততঃ দু-জন বোম্বাইয়ের, এক জন দিল্লীর, এক জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, এক জন পঞ্জাবের, এক জন অরুণাচল, এক জন তামিল

দেশের। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আদি নিবাস কোথায় জানি না।

বোম্বাই কংগ্রেসের প্রধান প্রধান কাজ

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের গত অধিবেশনে সকলের চেয়ে বেশী সময় গিয়াছে সাবেক ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার না-গ্রহণ না-বর্জন সিদ্ধান্ত কয়েম রাখিতে। দু-দিন ২।১০ ঘণ্টা ধরিয়া কেবল ঐ বিষয়েই বাদ-প্রতিবাদ হয়। 'গোঁড়া' কংগ্রেসওয়ালারা এখনও বলিতেছেন, "হোয়াইট পেপার আমবা গ্রহণ করিব না, উহা বাতিল হইলেই উহার অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাও বাতিল হইবে; কিন্তু আমবা এখন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা গ্রহণ করিতেছি বলিব না, বর্জন করিতেছিও বলিব না।" এবম্বিধ অদ্ভুত কথাব আলোচনা আগে ইংবেজীতে ও বাংলায় অনেক কবিয়াছি। নূতন করিয়া আব কিছু বলিতে ইচ্ছা কবে না। তবু বলি, ব্যাপারটা এইরূপ—

একটা হাড়িতে চাল ডাল পেরোজ ও আলু দিয়া খিচুড়ী বাঁধা হইয়াছে। কংগ্রেস বলিতেছেন, "আমরা ঐ খিচুড়ী গ্রহণ করিব না, বর্জন করিব; কিন্তু তাহাব অন্তর্গত ডাল গ্রহণও করিব না, বর্জনও করিব না।" আমরা বলি, "যখন বলিতেছেন, খিচুড়ী লইব না, তখনই ত বলা হইয়া গেল, যে, তাহার উপাদানীভূত চাল ডাল পেরোজ আলু সবই বর্জনীয়। নানা উপাদানে প্রস্তুত একটা সমগ্র জিনিষ অগ্রাহ্য করিলে, তাহা বর্জিত হইলে, প্রত্যেকটি উপাদানও ত অগ্রাহ্য করা হইল ও বর্জিত হইল, সহজ বুদ্ধিতে ত ইহাই বুঝায়।"

এবারকাব কংগ্রেসের অন্য প্রধান কার্য, কংগ্রেসের মূল নিয়মাবলী পরিবর্তন এবং ভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ স্থাপন। এই দুটির কোনটিব দ্বারাই সাক্ষাৎ ভাবে রাজনৈতিক কোন কাজ হইবে না, যদিও পরোক্ষ ভাবে দ্বিতীয়টির দ্বারা ভারতীয় মহাজাতি রাজনৈতিক প্রচেষ্টার জন্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে। বস্তুতঃ অহিংস অসহযোগ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন স্থগিত রাখার পব কংগ্রেস তাহার জায়গায় নূতন কোন রাজনৈতিক কার্য-প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

কংগ্রেসের কতকগুলি লোক করিবেন বটে, কিন্তু উহা পুরাতন প্রণালী।

কংগ্রেসের মূল নিয়মাবলীর ধ্বংস পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার দ্বারা জাতীয় এই প্রতিষ্ঠান অধিকতর কার্যক্ষম হইবে।

ভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ

কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নিখিলভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ স্থাপনের প্রস্তাবে সায় দিয়াছেন। তাঁহাব প্রস্তাবের মূলীভূত তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই, যে, পল্লীগামসকলের উন্নতিসাধনের এবং পল্লীসংগঠনের জন্ত বিলুপ্ত ও ধ্বংসোন্মুখ গ্রামাশিল্পসকলের পুনরুজ্জীবন আবশ্যক; কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচেষ্টাব সহিত সম্পর্ক বর্জিত হইলেই এই পুনরুজ্জীবনের কাজ ভাল করিয়া হইতে পারে। মহাত্মাজীব পবামর্শ অনুসারে শ্রীযুক্ত জে সি কুমারাপ্পা "নিখিল-ভারতীয় পল্লীশিল্পসংঘ" নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিবেন। ইহা পল্লীগাম অঞ্চলের বিলুপ্ত শিল্পসকল পুনরুজ্জীবিত করিবে, ধ্বংসোন্মুখ শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিবে, এবং গ্রামবাসীদিগেব শাবীবিক ও নৈতিক উন্নতিব ব্যবস্থা করিবে; এই উদ্দেশ্যে সংঘ নিজের গঠনবিধি বচনা করিয়া অর্থসংগ্রহ ও অস্ত্রান্ত কাজ করিবে; এবং কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় "নিখিলভারতীয় সুতাকাটুনী সংঘের (All India Spinners' Association) সহযোগে শিল্পপ্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়া পল্লীবাসীদের আমোদের সহিত শিক্ষাব ব্যবস্থা করিবে।

এই সংঘের কাজ সুপরিচালিত হইলে ইহার দ্বারা দেশের খুব উপকাব হইবে। হবিজনসেবা এবং এই সংঘ পরিচালন—এই উভয়বিধ প্রচেষ্টা মহাত্মা গান্ধীকে সম্ভবতঃ প্রভূত শক্তিশালী করিবে। কিন্তু তিনি, কংগ্রেসেব কতক লোকের উপর প্রভাব হাবাইয়াছেন বলিয়া এই ভাবে শক্তি পুনর্লাভের চেষ্টা করিতেছেন, সিদ্ধান্তেশ্বর অন্ততম কংগ্রেসনেতা স্বামী গোবিন্দানন্দের তাঁহার উপর এই উদ্দেশ্যারোপ মানিয়া লওয়া যায় না।

মহাত্মা গান্ধীর বিস্তর লোকের উপর প্রভাব আছে।

তাহার মধ্যে অনেকে অর্থশীলী। টাকা-তিনি অনেক পাইতে পারেন। তাহার সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি রচনা ও তদনুসারে কাজ করাইবার ক্ষমতাও আছে। এই সব কারণে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা

এখানে ইহা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না, যে, গান্ধীজী এখন যে কাজ করিতে বাইতেছেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বৎসর ধরিয়া বিখ্যাতরতীর একটি শাখার দ্বারা সেই কাজ করাইতেছেন, এবং তাহার আগেও এইরূপ প্রামোহিতব কাজ তাঁহাদের বাড়ির জমিদারীর কোন কোন অঞ্চলে করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক এই, যে, রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভারতীয় কোন পরিকল্পনা ও সমিতি বচনা করেন নাই, প্রথমে কেবলমাত্র একটি জেলার একটি অংশে কার্য্যভ্যাস করিয়া সন্নীচীন ও শ্রেয়ঃমণ্ডল করিয়াছেন— যদিও তাঁহার এই কাজের কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জিলার শ্রীনিবেশন হইতে বঙ্গের বাহিরের কোন কোন অবশ্যশীলী ছাত্রও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন। হৃৎকণ্ঠের বিষয়, তিনি তাঁহার এই কাজটিতে স্বদেশবাসীদের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য পান নাই। তাহার একটি কারণ বোধ হয় তাঁহার ধনশালিতার অপবাদ।

মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস হইতে অবসরগ্রহণ

মহাত্মা গান্ধী দম্ভর-অনুযায়ী পদত্যাগপত্র প্রেরণ দ্বারা কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করিয়াছেন। গত ২৩শে অক্টোবর কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচন সমিতিতে তিনি এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই প্রকার—

“আমি যদিও অনেক আগেই আমার মন স্থির করিয়াছিলাম, তথাপি নূতন পথ অবলম্বনের পূর্বে আপনাদের আশীর্বাদ চাহিবার জন্য এখানে আসা আমি কর্তব্য মনে করিয়াছিলাম। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, যে, আমি রুগ্ন হইয়া কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতেছি না; কংগ্রেস বাহাতে সাকল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তৎক্ষণাৎ আমি প্রসন্নচিত্তে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে চাই। কিছু দিন হইতে আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, কংগ্রেসে থাকিয়া আমি কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখিতেছি, কংগ্রেস তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইতেছিল না, কংগ্রেস একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

“পণ্ডিত জরায়রলালের নিকট হইতে গত্র গাইবার পর আমার কংগ্রেস ত্যাগের এই অত্যাশ্রয় ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনেকে সম্মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু সেসকল ধারণা আপনাদের মনে স্থান দিবেন না। এ গত্রের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। আমার এই মনোভাব আমি পূর্বেই বাংলার বঙ্গগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম। যিনিও গত্র আমার এই মনোভাব ক্রমেই প্রবল হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত আমি আর উহা মন করিতে সমর্থ হই নাই। ইহাই আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ।

“কর্তব্য ভাণ্ডারের বা কংগ্রেসের কার্য্য পরিত্যাগ করিবার বিদ্যমান আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। কংগ্রেসকে বিদ্যমান রাখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি বাহাতে আমার আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে পারি এবং সত্ত্ব সূত্র বাহাতে কংগ্রেসকে তাহার আদর্শ অনুসরণের সুযোগ দান করিতে পারি, তাহার জন্তই আমি অবসরগ্রহণের সংকল্প করিয়াছি। অকৃত্রিম অহিংসার অন্তর্নিহিত শক্তির উন্নতিসাধনের জন্তই আমি কংগ্রেস হইতে অবসরগ্রহণ করিতেছি।

“আইন-মজলু আন্দোলন ব্যতীত যে পূর্ণরাজ্য লাভ হইতে পারে না, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের অবলম্বিত নিকল্লব প্রতিরোধ কার্য্যমনোবাক্যে অহিংস হয় নাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে, আইনমজলু যোগ দিয়া দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে আমি কোন প্রমাণ পাই নাই। অতীত সমস্ত জাতির ইতিহাসই আমার জ্ঞান আছে বলিয়া আমি দাবি করিতেছি না। তবে আমার বক্তব্য স্মরণ আছে, তাহাতে আমি বলিতে পারি যে, কোন জাতি কেবল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা প্রাপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। নিকল্লব প্রতিরোধ ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। আমরা এত দিন যাহা করিয়াছি তাহা শুধু খেলা, প্রকৃত জীবন নইয়া কিছু করি নাই। সেই হেতু আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের মূলনীতি সভ্য ও অহিংসাকে যেখানে উহার সমস্তগণ প্রথম স্থান দান করেন নাই, সেখানে কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতে আমি বিফলপ্রয়াস হইব। আমরা যদি কার্য্যমনোবাক্যে অহিংস হইতে পারিতাম, তবে এই অর্ডিন্যান্সের শাসন সম্ভব হইত না।

“আমি আপনাদের নিকট খোলাখুলিভাবে আমার মনোভাব বর্ণনা করিলাম। ভিন্নরূপ বিশ্বাস-সম্বন্ধে আমার কংগ্রেসে থাকা উচিত এইরূপ অনুবোধ না করিয়া এক্ষণে আপনাদের আশীর্বাদসহ আমাকে বাইতে দেওয়াই আপনাদের উচিত। আমি আপনাদের নিকট হইতে কিছুই চাই না। আমি দরকষাকষির মনোভাব নইয়া এখানে আসি নাই। আমাকে অবসর গ্রহণ করিতে দিন। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন দেখি যে কংগ্রেস চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে প্রকৃতই অহিংসে রহিয়াছে, তখন আত্মন মাত্রই আমি কংগ্রেসের সেবার প্রস্তুত হইব, “এবিধে” আমি আপনাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমি গোপীশঙ্কর বা ভূপতি যেখানেই থাকি না কেন, যদি আপনাদের অহিংস মনোবৃত্তি দেখিতে পাই, তবে পুনরায় আপনাদিগকে পরিচালনের ভার গ্রহণ করিব।

পরিশেষে গান্ধীজী বলেন—

“আমি বোড়িয়া পলাইতেছি না। আমি একজন সিপাহী। আমি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমি অল্পের দ্বারা আমোদ চাহিতেছি। আমি আজ কংগ্রেসের পক্ষে অনাবশ্যক। আমাকে আপনাদের আশীর্বাদসহ বাইতে দিন।”

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর এবং মহাত্মাজীর নিজের অনুরক্ত অনেক সহকর্মী তাঁহাকে তাঁহার সংকল্প হইতে নিবৃত্ত কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অটলভাবে নিজের সংকল্প কার্যে পরিণত করিয়াছেন।

কংগ্রেসওয়ালারা সত্যচারী এবং কায়মনোবাক্যে অহিংস হন, তিনি ইহা চান। কিন্তু তাঁহার কংগ্রেস-ত্যাগের পরেও দেখিতেছি, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের দুই পক্ষেরই প্রার্থীদের অনেক সমর্থক আসতোর আশ্রয় লইয়াছেন—মহাত্মাজীর উপদেশ, দৃষ্টান্ত এবং সুবিবাদ কংগ্রেসত্যাগ তাঁহাদের ধর্মবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। অহিংসতার অবস্থাও ঐরূপ।

মহাত্মাজী আবশ্যক মত কংগ্রেসনেতাদিগকে পরামর্শ দিবেন, ইহা আশার কথা। কিন্তু তাঁহারা যেন নিত্যন্ত সঙ্কট-অবস্থা ভিন্ন অন্য সময়েও মহাত্মাজীর পরামর্শ না-চান। "ধ্বংস-তখন পরামর্শ চাহিলে তাঁহার আত্মনির্ভরশীল হইতে পাবিবেন না, নেতৃত্বের যোগ্যতা তাঁহাদের জন্মিবে না। যদি মহাত্মাজীর অবসরগ্রহণের ফলে অন্য কোন কোন সত্যচারী অহিংস নেতা দেশকে চালাইবার যোগ্য হইয়া উঠেন, তাহা হইলে মহাত্মাজীব কংগ্রেসের সম্পর্কত্যাগ সার্থক হইবে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ

পূর্বেই লিখিয়াছি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ দীর্ঘ হইয়াছিল। উহার বাংলা অনুবাদ ছোট অক্ষরে ছাপিলেও প্রবাসীর গ্রন্থপুষ্ঠা হইবে। একটি বক্তৃতার জন্য প্রবাসীতে এত জায়গা দেওয়া যায় না। এই জন্য আমরা কেবল সম্মেলনে সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মর্ম্মানুবাদ নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

১। "যেহেতু গবর্ণমেন্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত জাতীয় ও গণতন্ত্রের বিরোধী, কোন হিন্দুিষ্ট মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বৈদেশিক প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে, জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে, ষাণ্ডিষপূর্ণ গবর্ণমেন্টের ভিত্তি নষ্ট করে, ধর্মবিধাসের ভিত্তিতে কোন সাম্প্রদায়িক বিশেষ হবিষা প্রদান করে কোন সাম্প্রদায়িক করে না, অন্য সাম্প্রদায়িক ক্ষতি করিয়া কোন কোন সাম্প্রদায়িক ক্ষাযো-

অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে, হিন্দু সংখ্যা-পরিষ্ঠতা বিবিধ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করে, এই জন্য এই সম্মেলন ঐ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং ঘোষণা করিতেছে যে, উহা সর্বোপযোগী গ্রহণের অযোগ্য।

"কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কার্যতঃ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার, যে-জাতীয়তা কংগ্রেসেব ভিত্তি, বাহার জন্য কংগ্রেস সর্বশ্রেণীর সমর্থন লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহা ভুল হইয়াছে। কার্যকরী সমিতির নির্দ্ধারণ রূপ করিয়া দিবার জন্য সম্মেলন কংগ্রেসকে অনুরোধ করিতেছে।"

২। "এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায় সমস্তার সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় বিশ্বরাষ্ট্র সম্ভব (লীগ অব নেশন্সেব) প্রবর্তিত সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা-পদ্ধতির মূলনীতি অনুসরণ করা। ঐ পদ্ধতি বর্তমানকালে ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হইয়াছে। উক্ত সম্ভব কার্যকরী সমিতির সভাপতি নিজেই এ কথা ঘোষণা করিয়াছেন।"

৩। "এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, জাতি, বর্ণ, পুংস ও ধর্ম-বিধাস নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলী এবং সমান নির্বাচনাবিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনরূপ প্রতিনিধি-নির্বাচন প্রণালী গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এই সর্বপালিত হওয়া আবশ্যক, যে, কোনও সাম্প্রদায়িক ক্ষা বা স্বার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে না।"

(৪) "সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত রূপ না-হওয়া পর্যন্ত উহার বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন স্থাপিত হইল।

"সাম্প্রদায়িক দলনির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক-সিদ্ধান্ত-বিরোধী যে কোন ভারতবাসী এই সম্মেলন সভা হইতে পাবিবেন। সভাদের চানার পরিমাণ চারি আন।"

লঙ্কোয়ে বাঙালী

পয়ত্রিশ বৎসর পরে সে দিন লঙ্কো গিয়াছিলাম। অনেক পরিবর্তন দেখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বরবাড়ি ও অন্যান্য ব্যবস্থা বহু অর্থব্যয়ে করা হইয়াছে। এখানে অনেক বাঙালী অধ্যাপক আছেন। তাঁহারা কয়েকটি বিভাগে অধ্যাপনা ব্যতীত গবেষণার কাজও করিতেছেন। এখানকার আর্ট ও কালেক্টরির বিদ্যালয়ে অত্যন্ত শিক্ষাদাতাদের মধ্যে চারি জন বাঙালী অধ্যাপক আছেন। তাঁহারা নিজ নিজ কাজ দক্ষতার সহিত করিতেছেন।

বঙ্গের বাহিরে কোথাও গেলে প্রথমেই জানিতে ইচ্ছা হয়, সেখানকার বালকবালিকারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিতেছে কি না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা সযত্নেই জানিবার ইচ্ছা বেশী হয়; কারণ আমাদের মধ্যে বালিকাদের শিক্ষাতেই অবহেলা অধিকতর। লঙ্কোয়ে বাঙালী মেয়েদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। ইহার নাম হরিমতি বালিকা-বিদ্যালয়। তথাকার সম্ভ্রান্ত ও

সঙ্গতিপন্ন সাম্রাজ্য-পরিবারের, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যের পিতামহীর নাম অনুসারে উহার ঐ নাম হইয়াছে। উহার নিজের বাড়ি নাই। শুনিলাম, সাম্রাজ্য মহাশয়েরা ইচ্ছা করিলে নিজেই বাড়ি করিয়া দিতে পারেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু যেসকল কর্মক্ষম লোক তাহাতে, সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থে যদি না করেন, অন্ততঃ নিজেদের চেষ্টা ও অর্থে করিতে পারেন বলিয়া মনে হয়।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্মেলন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্মেলন প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর পূর্বে ইহার আবিষ্কার হয়। প্রধানতঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয় ও পরিচালিত হইতেছে—এই ক্ষুদ্র গত বৎসরের অধিবেশনের সভাপতি মেজর ডাঃ দেশরাজ রণজিৎ সিং এবং বর্তমান বৎসরের সভাপতি বিহারী নেতা শ্রীযুক্ত সচিদানন্দ সিংহ তাহাকে ধন্যবাদ দেন। এ বৎসর আগ্রা-অবোধার শিক্ষামন্ত্রী শ্রী জালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ও স্বরাষ্ট্র সদস্য (Home Member) কুমার জগদীশপ্রসাদও তাহার প্রশংসা করেন। পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে কুমার জগদীশপ্রসাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ফ্যাকাল্টি না-থাকা আগ্রা-অবোধা প্রদেশে সঙ্গীতের সম্যক উন্নতির পক্ষে একটি বাধা।

এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও দেশী রাজ্য হইতে ওস্তাদেরা আসিয়া নিজ নিজ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তন্মিষ্ট, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীত ও নৃত্যে পাবদর্শিতার পরীক্ষা হয় এবং তাহাদের মধ্যে সুদক্ষেরা পুরস্কৃত হয়। এ বৎসর ৫৫টি পুরস্কারের মধ্যে ২৪টি প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েরা পাইয়াছে। তাহাদের নাম ও দক্ষতার বিষয়—

কণ্ঠসঙ্গীতে অল্পপূর্ণা বিশ্বাস, শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী মিত্র, সাধনা ভট্টাচার্য; নৃত্যে সাধনা ভট্টাচার্য; হার্মোনিয়মে মিনতি ঘোষ; এপ্রাক্সে মিনতি ঘোষ; তবলায় সাধনা ভট্টাচার্য। এই বালিকাসকলের বয়স নয় বৎসরের কম। নয় বৎসরের কম বয়সের বালকদের মধ্যে পুরস্কার পাইয়াছে—কণ্ঠসঙ্গীতে নিবন্ধন ভট্টাচার্য, বেহালায় সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলায় নিবন্ধন ভট্টাচার্য, পাখোয়াজে মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, নৃত্যে নিবন্ধন ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলায় শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং হার্মোনিয়মে প্রজ্ঞেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে এলাহাবাদে বাঙালী কোন ছাত্রী নাই, কিংবা পরীক্ষা দেয় নাই, বা পুরস্কার পায় নাই। অষ্টম শ্রেণীতে নয় বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে মণিকা সান্না, এবং চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে গৌরীরাণী ঘোষ, স্বরগারানী ঘোষ, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও উমা মিত্র এবং হার্মোনিয়মে বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় পুরস্কার পাইয়াছে। ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালকদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষুদ্র দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পুরস্কৃত হইয়াছে। সঙ্গীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গুড় বৎসরের ছাত্র এবং সাত ও ভট্টাচার্য-পরিবার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে সুইডিশ শয়-শিক্ষয়িত্রী হাতের দ্বারা নানা রকম শিল্পের কাজ, কারুকার্য, সুইডেনে “স্নয়েড” নামক পদ্ধতি অনুসারে শিখান হয়। স্নয়েডের ক্ষুদ্র সুইডেন বিখ্যাত। শান্তিনিকেতনের শয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীধর সিংহ সুইডেনে ইহা শিখিয়াছিলেন। তিনি পুনর্বীর সেখানে গিয়াছেন। তিনি গত ১৮ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আমাদিগকে সুইডেন হইতে লিখিয়াছিলেন, “শান্তিনিকেতনে হাতের কাজ শিখাইবার নানা জিনিষ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছি। টাকা সংগ্রহ করিয়া মেরেদিগকে স্নয়েডের কাজ শিখাইবার ক্ষুদ্র এক জন শিক্ষয়িত্রী পাঠান হইয়াছে। আশী করি এবার সেখানে ভাল কাজের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে।” কাগজে দেখিলাম, এই শিক্ষয়িত্রী মিস জে জীলন শান্তিনিকেতন পৌছিয়াছেন এবং সদাশয় সুইডেনের প্রদত্ত হাতের তাঁত ও অন্যান্য স্নয়েড শিখাইবার যত্ন আনিয়াছেন। শিক্ষয়িত্রীর সমস্ত ব্যয়ও সুইডেনের কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রনহিলা দিবেন। কাউন্টেন্স হামিটন তন্মধ্যে প্রধান। ইহারা সকলে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। লক্ষ্মীধর বাবু যে ধন্যবাদার্থী, তাহা বলাই বাহুল্য—তাঁহার চেষ্টাতেই এই সব হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছেন, “[আমি] নিজে দেশেব অন্তর্য কাজের চেষ্টায় আছি।” এতদূর যোগ্য ও উৎসাহী শিক্ষককে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কাজে লাগান উচিত। বাংলা দেশকে তাঁহাব নৈপুণ্য হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

পাটের পরিবর্তে অন্য ফসল

বঙ্গে পাটচাষ আবশ্যিক মত কমিয়া তাহার জায়গায় অন্য ফসল প্রবর্তনের চেষ্টা সরকারপক্ষ হইতে করা হইতেছে। এ-বিষয়ে “সঙ্গীবনী” লিখিয়াছেন—

সর্বত্র বহুল পরিমাণে রবিশস্ত বপনের ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে। পাটের বদলে চীনাবাদাম, তামাক, তিসি, পিঁয়াজ, রহন, বিলাতী তরি-তরকারী, আগু ও আখের চাষ করা বাইতে পারে। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর যে সকল জেলায় রবিশস্তের বীজ পাওয়া দুষ্কর সেই সকল জিলার কালেক্টরদের ন্যায়কণ্ঠে রবিশস্তের বীজ সরবরাহ করিতেছেন।

এই ইস্তাহার পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পাট যে কৃষিতে ক্ষম, তাহা নিম্ন। তাহা জলে ভুবিয়া যায়। সেখানে তামাক, তিসি, পিঁয়াজ, রহন, তরি-তরকারী বা চীনাবাদামের চাষ করা বাইতে পারে না।

জেনার্যাল স্মাইটস ভারতে স্বরাজ চান

স্কটল্যান্ডের ডাডী শহরে এক বক্তৃতায় দক্ষিণ-আফ্রিকার বিখ্যাত বৃদ্ধ নেতা জেনার্যাল স্মাইটস বলিয়াছেন,

সব ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল মিলিয়া ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেওয়া উচিত; ব্রিটেনের দক্ষিণ-আফ্রিকাকে স্বরাজ দানের নজীর ভারতবর্ষে অমুহূর্ত হওয়া উচিত। উচিত বটে, কিন্তু হইবার সম্ভাবনা কোথায়? দক্ষিণ-আফ্রিকাকে ব্রিটেন স্বশাসন-অধিকার দিয়াছিল এই জন্ত, যে, বুঅররা একতার, শক্তির, ও স্বাধীনতাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করিবার প্রমাণ দিয়াছিল এবং খেতকারী খ্রীষ্টিয়ানদের অধিকৃত দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষের মত প্রভূত অর্থাগমের সম্ভাবনাও ছিল না।

বহু সিনেমা-চিত্রের অপকারিতা

সিনেমায় চিত্র দেখাইয়া দর্শকদের জ্ঞান বাড়ান যায়, তাহাদিগকে বিস্তৃত আমোদ ও শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু শুনিয়াছি, সিনেমার অনেক ক্ষিত্র অনিষ্টকর, তাহাতে মানুষের নানাক্রপ পাপপ্রবণতা বাড়ে। বঙ্গের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আজিজুল হকও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। জননায়কগণের ও গবর্নমেন্টের এক-যোগে সিনেমায় অনিষ্টকর চিত্রপ্রদর্শন বন্ধ করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

মিঃ ফজলুল হকের একটি বক্তৃতা

বঙ্গীয় মুসলমান যুবকদের কনফারেন্সে মিঃ ফজলুল হক বঙ্গের সর্বত্র মুসলমান ছাত্রদের জন্ত আরও অধিক-সংখ্যক ছাত্রাবাস চাহিয়াছেন। ছাত্রাবাসে থাকিবার মত ছাত্র ভূমিবে সন্মুখারে গৃহনির্মাণ অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু বঙ্গের 'আধুনিক' সরকারী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষারিপোর্টে (১৩ পৃষ্ঠায়) দেখিতেছি, যে, কেবল রাজশাহী মাদ্রাসা ছাড়া অন্য সব মুসলমান ছাত্রাবাসে রিপোর্টাদীন পাঁচ বৎসর বিস্তর জায়গা ছাত্র অভাবে খালি ছিল এবং কয়েকটি ছাত্রাবাস ছাত্রাভাবে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় ফজলুল হক সাহেব আরও ঘববাড়ি কেন চান?

তিনি মুসলমান যুবকদিগকে আশ্বোৎসর্গপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্তের জন্ত স্মিয়াছিলেন সার্ভেটসের যুগের স্পেনে! অমুসলমানরা ভারতবর্ষে যদি আশ্বোৎসর্গের দৃষ্টান্ত নাই দেখাইয়া থাকে, ভারতবর্ষে মুসলমানরা সহস্রাধিক বৎসরেও তাহার দৃষ্টান্তে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। যদি দেখাইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহার সন্ধানে স্পেনে গেলেন কেন?

খান আবদুল গফ্ফর খান ও বঙ্গদেশ

গত এই অক্টোবর খান আবদুল খানকে কলিকাতায় যে সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে মানপত্র দেওয়া হয়, তাহার উত্তর প্রদান উপলক্ষে তিনি বলেন,

“গবর্নমেন্ট যদি আমাকে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাইতে না-দেন, তাহা হইলে আমি শৌর্যসম্পন্ন বঙ্গদেশে বাস করিব এবং এখানে গ্রামসেবার আন্দোলনোপকবিব।”

বঙ্গে ফলের চাষ

আগ্রা-অবোধা প্রদেশে ফলের চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতিব জন্ত চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গেও সামান্য পরিমাণে হইতেছে। ফলভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা চিকিৎসকেরা কিছুদিন হইতে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সকলের ব্যবহারের পক্ষে সম্ভাব্যে যথেষ্ট ফল এখনও পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের সর্বত্র নানা রকম ফলের চাষ হইতে পারে। অনেক বৎসর হইল, স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, দার্জিলিং জেলায় হিমালয়ের গায়ে ইউরোপের অনেক ভাল ফলের চাষ হইতে পারে, বাঙালীদের এই কাজে লাগা উচিত।

চীনে লোকশিক্ষা

নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্ত চীনে লোকশিক্ষার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। অনেক জায়গায় প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষক না পাওয়ার লিখনপঠনকর্ম বালকদের দ্বারা এই কাজ করান হইতেছে। তাহার দিনের বেলায় নিজে পড়ে, সন্ধ্যার পব-অন্ত লোকদিগকে পড়ায়। মহিলাদের মধ্যে শিশু শিক্ষকবা খুব কার্যক্ষমতা দেখাইয়াছে। একটি পরিবারে একটি ছয় বৎসরের নাতী তাহার ষাট বৎসরের ঠাকুরমাকে অল্প সময়ের মধ্যে পড়িতে শিখাইয়াছে।

বঙ্গে এই প্রণালী প্রবর্তিত হইতে পারে। তা ছাড়া, এত শিক্ষিত যুবক ও শিক্ষিতা যুবতী এখানে বেকার আছেন, যে, অল্প ব্যয়েই তাহাদের দ্বারা বাংলা দেশ হইতে নিরক্ষরতা বহু পরিমাণে দূর হইতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে থাকিলে আমরা, যথেষ্ট সরকারী ঋণ করিয়াও, এই কাজ করিতাম।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রকুমার সেন

দিল্লীর হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের ৪৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ মৃত্যুতে, শুধু দিল্লী নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ এক জন কৃতী শিক্ষক হারািয়াছে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু মৈত্রিক কারণে নিযুক্ত হন নাই। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের প্রধান, এবং অন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক সভার সভ্য ছিলেন। বাঙালীদের কৃতিসম্পর্কীয় সব কাজে তাহার বনিষ্ঠ বোগ ছিল। অন্য সব সমাজেও তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন।



উর্বশী

শ্রীশৈলেন্দ্র ভূষণ দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাস্মি বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ

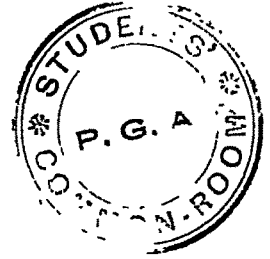
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৪১

৩য় সংখ্যা

অচিন মানুষ

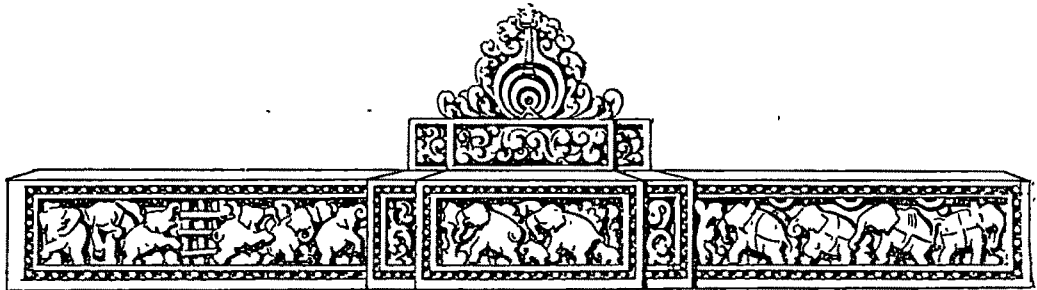
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



তুমি অচিন মানুষ ছিলে গোপন আপন গহন তলে
কেন এলে চেনার সাজে ?
তোমায় সাজ সকালে পথে ঘাটে দেখি কতই ছলে
আমার প্রতিদিনের মাঝে ।
তোমায় মিলিয়ে কবে নিলেম আপন আনাগোনার হাটে
নানান্ পাশ্চদলের সাথে,
তোমায় কখনো বা দেখি আমার ভণ্ড ধুলার বাটে
কভু বাদল-বরা রাতে ।
তোমায় ছবি আঁকা পড়ল আমার মনের সীমানাতে
আমার আপন ছন্দে ছাঁদা,
আমার সরু মোটা নানা তুলির নানান্ রেখাপাতে
তোমার স্বরূপ পড়ল বাঁধা ।
তাই আজি আমার ক্লাস্ত নয়ন, মনের চোখে দেখা
হ'ল চোখের দেখায় হারা,
দৌহার পরিচয়ের তরীখানা বালুর চরে ঠেকা
সে আর পায় না স্রোতের ধারা ॥

ও যে অচিন মানুষ, মন উহারে জানতে যদি চাহো
 জেনো মায়ার রং-মহলে,
 প্রাণে জাগুক্ তবে সেই মিলনের উৎসব উৎসাহ
 যাহে বিরহ-দীপ জ্বলে।
 যখন চোখের সামনে বসতে দেবে তখন সে আসনে
 রেখো ধ্যানের আসন পেতে,
 যখন কইবে কথা সেই ভাষাতে তখন মনে মনে
 দিয়ো অশ্রুত সুর গৌণে।
 তোমার জানা ভুবনখানা হ'তে সুদূরে তার বাসা
 তোমার দিগন্তে তার খেলা।
 সেথায় ধরা-ছোঁওয়ার অতীত মেঘে নানা রঙের ভাষা
 সেথায় আলো-ছায়ার মেলা।
 তোমার প্রথম জাগরণের চোখে উষার শুকতারা
 যদি তাহার স্মৃতি আনে
 তবে যেন সে পায় ভাবের মূর্তি রূপের বাঁধনহারা
 তোমার সুরবাহারের গানে॥

শান্তিনিকেতন
 ৩০ কার্তিক, ১৩৪১



শব্দপ্রসঙ্গ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

নিম্নলিখিত শব্দ কয়টির মূল অনুসন্ধান। বাঙলায় ইহাদের প্রয়োগ আছে; তিব্বতী ভাষায় ইহাদের অনুরূপ শব্দ আছে। মনে হয়, ইহারা অথবা ইহাদের কয়েকটি তিব্বতী হইতে বাঙলায়, অথবা বাঙলা-প্রভৃতির সম্বন্ধে তিব্বতীতে গিয়াছে।

ভূ রা

‘নিরুষ্ট চিনি’ অর্থে ভূ রা শব্দ বাঙলায় পাওয়া যায়; যেমন,

আট পণে আনিয়াছি আধ সের চিনি।

অন্ত লোকে ভূ রা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥

—ভারতচন্দ্র।

তিব্বতীতে সাধারণত ‘চিনি’ বুঝাইতে বু. র ম* এই শব্দটির প্রয়োগ আছে। ‘আক’ বা ‘ইকু’কে তিব্বতীতে বলে বু. ব. শিঙ। শিঙ শব্দের অর্থ ‘গাছ’। বু. র. শিঙ আক্ষরিক অর্থ ‘চিনির গাছ।’ এখানে বু. র ম না বলিয়া কেবল বু. ব. লা গিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। অতএব বু. ব ও বু. র ম বস্তুত একই। মূল তিব্বতী ভাষায় ভ-ধ্বনি নাই। তিব্বতী হইতে শব্দটি বাঙলায় আসিলে বলিতে হইবে তিব্বতীর অল্পপ্রাণ ব বাঙলায় মহাপ্রাণ ভ হইয়াছে।

বো রা

‘ছালা’ বা ‘চটের বড় থলিয়া’ অর্থে হিন্দী-প্রভৃতি ও বাঙলায় আছে বো রা। কোথা হইতে ইহা আসিল? তিব্বতীতে ঐ একই অর্থে আছে বো র. র।

চো না

‘গোমুত্র’ বুঝাইতে আমরা চো না শব্দ প্রয়োগ করি।

* তিব্বতী শব্দসমূহের শেষের বাঙ্গালি হসন্ত বৃত্তিতে হইবে; যেমন, র ম উচ্চারিত হয় র ম্।

† দ্রষ্টব্য Laufer : *T'oung Pao*, Vol. xvii, 1916, pp 404 ff: No. 46; বর্তমান লেখকের *Loan words in Tibetan in Archiv Orientalni*, Vol 6 (1934); No. 2, p. 354, No. 38

ইহাব মূল কি? মনে হয় তিব্বতী। ঐ অর্থেই তিব্বতীতে আছে গ চি ন (=গ. চি ন. প)। ব্যঞ্জননের পূর্ববর্তী গকারের উচ্চারণ হয় না। তাই গ চি ন উচ্চারিত হইয়া থাকে চি ন।

পে ছা

বর্তমান, বীৰভূম, ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ‘টুকরী’ বা ‘বুরি’ অর্থে পে ছা শব্দ আছে। নিশ্চয়ই ইহা কোনো সংস্কৃত শব্দ হইতে আসে নাই। জল-প্রভৃতি বহনের জন্য ‘চামড়ার থলিয়া’ বা ‘মশক’ বুঝাইতে তিব্বতীতে প. চে= (চ. = ts, দস্ততালবা চ) শব্দ আছে। আর একটি শব্দ আছে ক. ছে (ছ= tsh, দস্ততালবা ছ)। ইহা সাধারণত ‘ছালা’ ‘বোবা’ বা ‘থলিয়া’ অর্থে প্রযুক্ত হয়। মনে হয় এই তিব্বতী শব্দযুগলের সহিত পে ছা শব্দের যোগ রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য—F. W. Thomas: *Some Notes on the Kharosthi Documents in the Acta Orientalia*, Vol. xiii. Pars. I, pp. 54-56.

ঠি ক, ঠি ক-ঠি ক

‘সত্য’, ‘উপযুক্ত’, ‘সমান-সমান’ ইত্যাদি অর্থে বাঙলায় ও হিন্দী-প্রভৃতিতে ঠি ক শব্দের প্রয়োগ আছে। হিন্দীতে উচ্চারণ ঠী ক। তিব্বতীতে ‘উপযুক্ত’ ও ‘সমান-সমান’ (‘কমও নহে, বেশীও নহে’) থ্রি গ. থ্রি গ শব্দ আছে। উচ্চারণে থ্রু=ঠ। অতএব থ্রি গ. থ্রি গ উচ্চারণে ঠি গ. ঠি গ। ঘোষ গ অবোষ হইলে ক হয়। তদনুসারে ঠি গ. ঠি গ হইতে ঠি ক ঠি ক হইতে পারে।

ফে র, ফি রা

‘আবার’ অর্থে ফে র শব্দ বাঙলায় আছে। যেমন, সার দামজলে “ফে র একি আলো এল।” এই অর্থে হিন্দী শব্দ ফি র। বাঙলায় আরো আছে ফি রে; যেমন

শি বা র নে “ফি রে অন্ন রাখে উমা দেখে গিরিরাণী।” ‘পশ্চাৎ’ অর্থেও আমরা ফি রে অথবা ফি রিয়া বলিয়া থাকি। ইহাদের মূল কি? তিব্বতীতে ‘আবার’ ও ‘পশ্চাৎ’ এই উভয় অর্থেই ফি র শব্দ আছে। ফি র. ও উ. ব ইহার অর্থ ‘ফিরিয়া আসা’। ‘ভ্রমণ’ অর্থেও বাঙলাতে ফি রা শব্দের প্রয়োগ আছে; যেমন, সে ফিরিতেছে। তিব্বতীতে ফি র এই শব্দের অপর অর্থ ‘বাহির’; যেমন, ফি র. ল ‘বাহিরে’। এই ‘বাহির’ হইতে ‘বাহিরে যাওয়া’ ও তাহা হইতে ‘ভ্রমণ’ অর্থ হইয়া থাকিবে।

এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। তিব্বতীতে অনেক প্রদেশে ফ্য উচ্চাৰিত হয় ছ। আমাদের তিব্বতী শিক্ষক মহাশয় বলেন সুশিক্ষিত লামারা এই পরিবর্তিত উচ্চারণ করেন না। ইহা হইলে তিব্বতী ফি র হইতে আলোচ্য বাঙলা শব্দটির আসিতে বাধা থাকে না। অথবা

বাঙালী প্রভৃতিই ঐ তিব্বতী শব্দটিকে নিজেদের মত উচ্চারণ করিয়া লইয়াছেন।

বো ল

বাঙলা প্রভৃতিতে ‘শব্দ’ অথবা ‘বলা’ অর্থে কোনো-না-কোন আকারে বো ল শব্দ আছে; যেমন হ রি বো ল ইত্যাদিতে। হেমচন্দ্রের দে লী না ম মা লা র (৬.৯০) ইহাকে দেশী শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, এবং বহু প্রাকৃত গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ আছে। হেমচন্দ্র নিজের প্রাকৃত ব্যাকরণের ধাতু-আদেশ প্রকরণে √ ব ল্ ধাতুর স্থানে বো ল আদেশ কবিয়াছেন। ইহা দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে, √ ব ল্ ধাতু বো ল আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাব প্রমাণ নাই। তবে বো ল শব্দ কোথা হইতে আসিল? তিব্বতীতে ‘আহ্বান’ অর্থে বো ল-পো শব্দ আছে। (এখানে পো ধর্ষব্যের মধ্যে নহে।) ইহাই কি বাঙলা-প্রভৃতিতে আসে নাই?

একাদশী

ত্রীসীতা দেবী

প্রৌঢ়বয়সে বিধবা হইয়া নবজুর্গা ঘন একেবারে অথই জলে পড়িয়া গেলেন। স্বামী ব্রতী পক্ষের স্ত্রী তিনি, সতীনপো, সতীনবিত্তে বাড়ি ভাঙি। তথাপি আদরের স্ত্রী বলিয়া, এই ত্রিশ বৎসরের বিবাহিত জীবন তাঁহার আনন্দে না কাটুক, উগ্রবকম স্বাধীন ভাবে কাটিয়াছিল। তিনি কোন দিন কাহারও মুখ চাহিয়া থাকেন নাই, পরিবার-পরিজন সকলেই তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকিত। সংসারের উপর তাঁহার ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা, স্বামীমুগ্ধ কখনও তাঁহার কথার উপর কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মৃত্যু পক্ষীকে তিনি মৃদু করিতে পারেন নাই, তাহা বৃদ্ধ খুব হাড়ে হাড়ে বুঝিতেন, হুতরাং বাহা লইয়া সে ভুলিয়া থাকে থাক বলিয়া নবজুর্গার অন্তায়রকম প্রভুত্বপরায়ণতায়ও কখনও বাধা দিতেন না।

প্রথম পক্ষের মেয়ের বিবাহ হইয়া বাইবার পর পারতপক্ষে আর বাপের বাড়ির ছায়া মাড়াইত না।

সতীনপুত্রদের বিবাহ করিয়া আবও ঘন জালা বাড়িয়া গিয়াছিল। এক কানে সৎমায়ের গালাগালি শুনিত, আর এক কানে স্ত্রীদেব নালিশ শুনিত। উভয়ের তাহাদের কিছু বলিবার ছিল না। বাপের খায় তাহার, বাপের গৃহিণীর মুখের উপর কথা বলিবে কি করিয়া? হাতে হাত ঘষিয়া চুপ করিয়া যাইত। একমাত্র তাহাদের আশার বিষয় ছিল এই যে, নবজুর্গার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। বৃদ্ধ পিতা, আর কয়দিন? তাহার পর তাহারও দেখিয়া লইবে। এক ভয় বাপ পাছে উইল করিয়া সৎমায়ের বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া যান।

সেই ইচ্ছাই বাপেরও ছিল। পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহার বাহা ছিল, তাহা অবশ্য পুত্রদেরই প্রাপ্য, তাহা তিনি বেহাত করিতে পারেন না। কিন্তু নগদ কিছু টাকা জমাইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় মাঝারিগোছের একখানি বাড়ি করিয়াছিলেন। এইগুলি নবজুর্গাকে উইল করিয়া

দিয়া যাইবার কথা ছিল। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বৈধব্য আসিয়া নবহর্গার লল-টে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল। কর্তা সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন।

সতীনপুত্রের উল্লসিত মুখের দিকে চাহিয়া নবহর্গার বুকের ভিতর দ্রুত করিতে লাগিল। পিতৃবিয়োগের শোকও তাহাদের এই নিষ্ঠুর আনন্দকে দমাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। নবহর্গা এই মহা সর্বনাশের মধ্যেও নিজের কাছে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না যে, তাহাদের এরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করিবার হেতু তিনিই জুটাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি অত পরিপূর্ণরূপে সৎমা-গিরি না ফলাইতেন, তাহা হইলে ইহারাও হয়ত এমন দানবের মূর্তি ধরিত না।

কিন্তু সব দোষ কি তাঁহারই? প্রথম ধোবনের সমস্ত আশা, সব রঙীন নেশা তাঁহার এমন করিয়া ভাঙিয়া দিলেন কেন? পনের-বোল বৎসব বয়সে তাঁহার বিবাহ হইল। বিধবা মাতার কন্যা তিনি, আত্মীয়স্বজনে কোনমতে বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল। শুভদৃষ্টিতে ক'নের চোখে যে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা ত কেহ দেখিল না? ফুলশয্যার রাত্রে দারুণ অহুস্থতার ভান করিয়া সে যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল, তাহাও কেহ জানিল না।

আশাভঙ্গের, আনন্দহীন জীবনের বে দারুণ আলায় নবহর্গার অস্তিত্ব ভরিয়া উঠিয়াছিল তাহার সব ধাক্কাই পোহাইতে হইয়াছিল তাহাব স্বামীর প্রথম পক্ষের সম্ভানগুলিকে। দোষী তাহাবা অবশ্য নয়, কিন্তু জগতে দোষী-নির্দোষীর বিচার অত চুল চিরিয়া ত হয় না? এক জনের দোষে আর এক জন ভুগিতেছে, এ ত সদাসর্বদাই দেখা যায়।

অশৌচের দিন ক'টা কোনমতে কাটিয়া গেল। তিনি একলা আপনার ঘরে মুক্তিকান্যায় পড়িয়া থাকেন, একবার খান কি না-খান, তাহারও খোঁজ কেহ করে না। বাড়িতে হবিষ্যকারীদের জন্ত গাওয়া ঘি, দুধ, ফলমূল, মিষ্টান্ন, ভায়ে ভায়ে আসে; তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত সেগুলির এক কণাও পৌঁছায় না। নামে অশৌচ, কিন্তু সকলের ব্যবহারে ও মুখেব ভাবে মনে হয়, বাড়িতে মহা একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটয়া গিয়াছে।

শ্রাদ্ধ-শাস্তি কোন প্রকারে চুকিয়া গেল। কর্তা গ্রামের ভিতর মানী ব্যক্তি ছিলেন, তাহার উপযুক্ত ভাবেই তাঁহার কার্য হইয়া গেল।

পরদিন সকাল হইতেই বড় পুত্রবধু তাঁহার ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “ছোটমা, উঠেছ নাকি গো?”

ইতিপূর্বে ছেলেরা বাহাই বলুক, বধুরা তাঁহাকে মা বলিয়াই ডাকিত। এখন তাহাদেরও ডাক বদলাইয়াছে। যাক, তাহাতে নবহর্গার কিছু আসিয়া যায় না। পাতান মা হইবার জন্ত তাঁহার কোন ব্যস্ততা নাই। বলিলেন, “উঠেছি, বাছা।”

বধু বলিলেন, “তোমার ছেলে বলছিলেন কি, দিন-কতক শাখরাইল ঘুরে এস। শরীর মনটা ভাল হোক। আমাদেরও একবার হাওয়া বদলাতে যাবার কথা হচ্ছে।”

শাখরাইলে, অর্থাৎ নবহর্গার মামার বাড়িতে, দুই মামাতো ভাইয়ের সংসার। সেখানে যে তাঁহার খুব সাদর অভ্যর্থনা হইবে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু ছিল না। তবু তাঁহাকে মান রাখিবার জন্ত বলিতে হইল, “হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা আমি করেছি, কালই যাব। তোমাদের আর তা মনে করিয়ে দিতে হবে না।”

ঠাকরুণ ভাঙেন তবু মচকান না। বড়বোঁ মুখখানা বিকৃত করিয়া সরিয়া গেল।

বলিয়াছেন যখন তখন নবহর্গাকে যাইতেই হইবে। গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে লোক পাঠাইয়া, তিনি জিনিষপত্র গুছাইতে বসিয়া গেলেন। এ-গৃহে আব তাঁহাব স্থান হইবে কি না তাহা কেই বা জানে? যতদূর সম্ভব নিজের বাহা কিছু আছে তাহা লইয়া বাওঁয়াই ভাল। বাহা লইয়া যাইতে পারিবেন না নিতান্তই, তাহা পাড়াপ্রতিবেশীঘরে বাখিয়া বাওঁয়া ভাল, কাবণ এ বাড়িতে রাখিয়া গেলে তাহা আর ফিরিয়া পাওঁয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু কি যে তাঁহার নিজের জিনিষ তাহা ত ভাবিয়া পাওঁয়াও ভাব। নিঃসন্তান বিধবা তিনি, তাঁহাব কিসেই বা অধিকার আছে? পরনের কাপড়-চোপড় এবং গহনা-পাটি ভিন্ন হিন্দুসংসারে স্ত্রীলোকের কিছুই আপনার বলিতে থাকে না। কাপড়-চোপড় নবহর্গার ঢের ছিল,

কর্তা সেদিকে কোন কাপণ্য করেন নাই। কিন্তু সেগুলি এখন কোন্ কাজে লাগিবে? নিজের মেয়ে নাই যে পরিবে, ছেলেও নাই যে হবে একটি বউ লইয়া আসিবে। তিনি বরং ঐ হাজার-বারো-শ টাকার কাপড় জ্বালাইয়া দিবেন, তবু ঐ উনানমুখী সতীনপো-বোদের দিয়া বাইতে পাবিবেন না। থাক্ তাঁহার সঙ্গেই এসব, যে-বাড়িতে আশ্রয় পাইবেন, সে-বাড়ির বো-ঝিদের দিলে বরং তাহাদের মন পাওয়া যাইবে। গহনা এতদিন গায়ে পরিয়াছেন ত বধেষ্ঠ, কিন্তু সেগুলির উপর তাঁহার অধিকার আছে কি? কর্তা ছিলেন হিসাবী মানুষ, বড়গিন্নী-ব সিন্ধুক ভর্তি গহনা ছিল, তাহার ভিতর হইতেই বেশ গা-সাজান অনেকগুলি গহনা তিনি ছোটগিন্নীকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। অনর্থক স্নাকুরাকে একরাশ টাকা বানি দিয়া হইবে কি? ছেলের বউরা স্বর্গগতা শান্তুড়ীর গহনা সৎ-শান্তুড়ীর সঙ্গে দেখিবা রাগে জ্বলিয়া বাইত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় ছিল না। স্বামীদের কাছে নালিশ করিলে তাহারা বলিত, “তোমরাও ত অনেক পেয়েছ বাপু, তা অত হিংসে কেন? ওটা যমের বাড়ি বাক্, তারপর সবই তোমাদের হবে।”

ছোটগিন্নী যমের বাড়ি ত গেলেন না, কিন্তু পাছে গহনা লইয়া বাপের বাড়ি পলায়ন করেন, সেই ভাবনা তিন বো অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বড়বো একবার সৎ-শান্তুড়ীর দরজা ঘুবিয়া আসিয়াছে, সে আর বাইতে রাজী হইল না। বলিল, “লাভ হ’লে সকলের হবে, আমি একলা নিমিত্তের ভাগী হব কেন?”

অগত্যা মেজবো এবার চলিল। সাহস সঞ্চয় করিয়া সোজামুজি নবহুর্গার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল, “জিনিষ-পত্রব গোছান হয়ে গেল নাকি?”

নবহুর্গা রাগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, “একলা হাতে বতদূর হবার তা হয়েছে।”

আজ্ঞা আব তাঁহার রাগকে কেই বা গ্রাস কবে? মেজবো বলিল, “তোমার ছেলে বলছিলেন কি, গহনা-গাটিগুলো যেন নিতে গিবে পথে-বিপদ বাধিও না। রাস্তা-বাট ভাল না, তার উপর একলা যাচ্ছ।”

এই ভয়েই এতক্ষণ নবহুর্গা করিতেছিলেন। সতীন-

পুত্ররা তাঁহাকে শূণ্য হাতেই বাড়ির বাহির করিয়া দিতে চায়। বাপের বাড়ি হইতে তিনি সোনার মাকড়ী আর মাখার ফুল কাঁটা ভিন্ন কোন সোনার গহনাই পান নাই। বড় বরকে অমন লক্ষ্মীরাপিনী মেয়ে ধরিয়া দেওয়া হইল, আবার সোনার গহনাও দিবে? অত আর না। নবহুর্গাব সারা অঙ্গ যে পঞ্চাশ-ষাট ভরির সোনার গহনা ঝক্ ঝক্ কবিত, সবই এ-বাড়ির দেওয়া। কর্তা যদি গড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে কোন ছোটলোকের বেটীকে আর কথা বলিতে হইত না। কিন্তু এ যে সতীনের গহনা, তাঁহার দাবি কোথায় এগুলি উপরে? জোর করিয়া কিছু বলিতে গেলে শেষে অপমানিত হইয়া বিদায় হইতে হইবে। কাজ কি বাপু?

গহনার বাস্তুটা বড় ঠাঁক হইতে বাহির করিয়া তিনি ঠক্ করিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিলেন। তাহাব ভিতর হইতে ফুল কাঁটা ও মাকড়িগুলি বাছিয়া লইতে লইতে বলিলেন, “নিয়ে যাও গো, তোমাদের গহনাতে আমার কাজ নেই, বুকে ক’রে আগলে বাধ। হাতেব নোয়াই যখন ঘুচল, তখন ও-সব ছাইভস্মে আমার কাজ কি?”

মেজবো আনন্দে আটখানা হইয়া গহনার বাস্তুটা উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। এগুলি উদ্ধারের আশা তাঁহার ভরসা কবিয়া এতদিন করিতে পারেন নাই। তিন বউয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছেলেরাও আসিয়া বোগ দিলেন। গোলমালের মধ্যে নবহুর্গা বিদায় হইয়া গেলেন। গহনা পাওয়ার সকলে তখন এত খুশী যে সৎ-মা ঘটিবাটি লইয়া পলায়ন কবিতেছে কিনা তাহা আর কেহ দেখিতে আসিল না।

বহু বৎসর পরে নবহুর্গা মামার বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। স্বামী বিবাহের পব সেই যে লইয়া গিয়াছিলেন, আব ফিরিয়া পাঠানোর নাম করেন নাই। বাড়িব গৃহিণীব অত বড় সংসার ফেলিয়া সারাক্ষণ হটম্ হটম্ করিয়া মামার বাড়ি যাওয়া পোষায় না, তা আবাব বাপের বাড়িও না। তাঁহার একটা মানস্ক্রম ছিল ত? নবহুর্গার মা এ সংসারে আশ্রিতা বিধবা ভগিনী ছিলেন, তাঁহার আর কিইবা প্রতিপত্তি? অনেক ঝগড়া-ঝাঁট করিয়া বড় মামাতো

ভাইয়ের বিবাহে নবহর্গা একবার আসিয়াছিলেন, আর আসা তাঁহার ঘটয়া ওঠে নাই। সেবারে তাঁহার গহনা কাপড়ের ঘট দেখিয়া মামী এবং মামাতো বোনরা কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতাই হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

বাহা হউক, তখন মঃ বাচিয়াছিলেন, দিদিমাও বাচিয়াছিলেন। এখন তিনি একেবারেই পরের সংসারে আসিতেছেন। মামাতো ভাইয়ের বৌদের মধ্যে বড়টিকে সেই বিবাহের কনে-বৌ রূপে দেখিয়া গিয়াছেন, ছোটটিকে একেবারেই দেখেন নাই। তাহাদের মধ্যে এক জন সাত ছেলের মা, এক জন পাঁচ ছেলের মা। কি ভাবে সকলে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কেইবা জানে? এত দিন নবহর্গার মনে বড়ই বেদনা ছিল তিনি বহুটা বলিয়া, আজ এক-একবার মনে হইতে লাগিল ভগবান ভালই করিয়াছেন। এই কপাল লইয়া তিনি ছেসেসেয়ে মানুষ করিতেন কিরূপে? আবার মনে হইতে লাগিল, পেটের এক-আধটা থাকিলে তাঁহাকে এমন ভাবে বিদায় করিয়া দিতেই বা কাহার সাহস হইত?

বাহা হউক, মামার বাড়িতে পা দিবামাত্রই কোন ঋণটন ঘটিল না। ভাইবোরা বধোচিত আর্ন্তনাদ সহকারেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পাড়ার যত মহিলা আসিয়াও কান্নাকাটিতে যোগ দিলেন। একদল ছেলেমেয়ে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বিব্রা রহিল। ঘণ্টাখানেক ত এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

তাঁহার পর প্রতিবেশিনীরা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল, ছেলেমেয়ের দলও খেলা এবং খাওয়ার সন্ধানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নবহর্গার বন্ধ বিছানা ভাঁড়ার ঘরে উঠিল, তিনিও তখনকার মত সেইখানেই গিয়া বসিলেন। আশা করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহাকে অন্ততঃ একখানা আলাদা ঘর দেওয়া হইবে, কিন্তু দেখিলেন তাহা হইবার নয়। তাঁহার মাও চিরকাল ভাঁড়ার-ঘরেই দিন কাটাইয়াছেন। তবে দিদিমা তখন বাচিয়াছিলেন, তাঁহার ঘরটা কার্যতঃ নবহর্গাদের দখলেই ছিল, 'কাজেই' তাঁহাদের কোন অসুবিধা ঘটিল না। ভাঁড়ার-ঘরখানি বেশ বড়, এক কোণে তক্তাপোষও পাতা আছে। অল্প ঘরের চেয়ে বং

এ-ঘরে হাওয়া আলো বেশী। তবু মানে ত আঘাত লাগে? নবহর্গার মনের ভিতরটা ঝুঁকুঁ করিতে লাগিল। বড়-বৌকে তিনি সোনার তাবিজ দিয়া মুখ দেখিয়াছিলেন, ছোটবৌদের বিবাহের সময় আসিতে পারেন নাই, কিন্তু একশ টাকা নগদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে কিছু গহনা গড়াইয়া দিবার জন্ত। দিদিমার শ্রদ্ধে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহারা কি আর ইচ্ছা কবিলে তাঁহাকে আর একটু সমাদর করিতে পারিত না? কিন্তু বৃদ্ধ সিংহের মুখে ব্যাঙও লাখি মারিয়া যায়। তাঁহার আজ কপাল ভাঙিয়াছে, কাহাকে আব কি তিনি বলিবেন?

হুপুরের খাওয়া তিনি খাইয়াই আসিয়াছিলেন, কাজেই সেদিনের মত নিশ্চিন্ত। বিকালে একটু হুঁফ ও ফল খাইয়া গুইয়া পড়িলেন। হৃদয়স্তার গুরুভাব তবু ঘুমের আড়ালে খানিকক্ষণের মত তাঁহার বুকের উপর হইতে নামিয়া গেল।

পবদিন সকাল হইতেই তাঁহার সব দুঃখহর্ভাবনা আবার ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এতটা কাল ঝি চাকর এবং পুত্রবধূদেব হুকুম করিয়াই তাঁহার কাটিয়াছে, কোন দিন কুটাটি ভাঙিয়া ছুইখানা করেন নাই। আজ বুঝিলেন নিজেব সকল কাজ ত তাঁহাকে করিতেই হইবে, উপবি সংসারেব কাজও কিছু তিনি করিবেন, ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিবে। হিন্দুব বিধবার কাজ একলার হইলেও নিতান্ত সামান্ত নয়। জল বহিয়া আনিতেই তাঁহার প্রাণান্ত হইবার জোগাড় হইল। পুকুরটা নিতান্ত কাছেও নয়। ভাঁড়ার-ঘরটা দুইয়া মুছিতে গিয়া তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িলেন। বড়বৌ বাহির হইতে উকি মারিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি দেখি কাজের বার হয়ে গেছ একেবারে। তা দিন-কয়েক করতে করতেই সয়ে যাবে।"

দিন-কতক কাজ করিয়া সহিয়া বাইবার আগেই তিনি না মরিয়া যান, এই ভাবনাই নবহর্গার হইতে লাগিল। জল টানিয়া, ঘর মুছিয়া এবং বাঁসন মাজিয়া তাঁহার সর্বাজে এমন ব্যথা হইল যে প্রায় নড়াচড়া বন্ধ হইবার জোগাড়। কলিকাতায় তাঁহার এক মাসীর বাড়ি। তিনি বিধবা হইলেও নিজের সংসারের কর্তা, যদি দিন-কয়েক হতভাগিনী

বোনঝিকে লইয়া বান ত নবহুর্গা একটু বিশ্রাম করিয়া বাচেন। মাসীর কাছে কান্নাকাটি করিয়া একখানা চিঠিই লিখিয়া ফেলিলেন তিনি।

মাসীমা চলিয়া আসিতে লিখিলেন। যাইবার খবর অবশ্য পাঠাইলেন না। বড়মাসুকের গৃহিণী বলিয়া আত্মীয়মহলে নবহুর্গার এত নামডাক ছিল, তাঁহাকেও যে আবার পঞ্চাশটা পাঠাইতে হইবে তাহা কেহ ভাবিতেও পারিত না। নবহুর্গা সামান্য কিছু টকা মাত্র লইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতেই কিছু ভাঙিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বড় মামাতো ভাইয়ের একটি শ্রালক, প্রায় বারো মাসই দিদির বাড়িতে অতিথি থাকিত, সে বিনা-খরচায় কলিকাতা বেড়াইয়া আসিবার শোভে তাঁহাকে লইয়া যাইতে রাজী হইল।

ভাজু ছ-জন বলিলেন, “তা ঠাকুরঝি ঘুরে এস দিন-কতক। এখন এক জায়গায় মন বসতে দেবি লাগবে।”

নবহুর্গা খার্ড ক্লাসে চড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। মাসীর একটি ঘরজামাই ছিল, সে খাইত-দাইত, এবং স্ত্রী ছ-কথা শুনাইয়া দিলে শাওড়ীও কাছে গিয়া নালিশ করিত। শাওড়ীও তাহার উপর বিশেষ স্নেহ ছিল। এই জামাতাটিকেই তিনি নবহুর্গাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য টেনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

নবহুর্গা নামিতেই ছেলোট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে টিপ কবিরী একটা প্রশ্নাম করিল। বলিল, “আমি আপনাকে সেকেণ্ড ক্লাসে খুঁজে খুঁজে হয়রান, আপনি বে খার্ড ক্লাসে আসবেন তা জানব কি করে?”

ছেলোটর বুদ্ধির দোড় দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া নবহুর্গা বলিলেন, “আর কি সেকেণ্ড ক্লাসে চড়বার দিন আছে তাই?”

মাসীর ঘরজামাই আবার বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিল, “তা হ’লে ঘোড়ার গাড়ীই একখানা ডাকি?”

নবহুর্গা বলিলেন, “তাই ডাক।”

কলিকাতায় বহু দিন পূর্বে একবার আসিয়াছিলেন, তার পর এই। শহরটা আশ্চর্য্য, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, কিছুই আর চিনিবার উপায় নাই। বিবট

রাজধানীর বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি নিজের হুর্ভাগ্যের ভাবনাস্রব্ধ ভুলিয়া গেলেন।

মাসী তাঁহাকে আদর করিয়াই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৈধব্যের শোকে বেশী যে কান্নাকাটি করিলেন না, তাহাতে তিনি একটু বাঁচিয়াই গেলেন। এখানকার ঘর-দুয়ার ভাল, কলের জল আছে, তরি-তরকারি, দুধ-ঘি, ফল-মিষ্টান্ন অনেক রকম পাওয়া যায়, তাঁহার ক্লিষ্ট দেহ-মন একটু যেন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। স্নান করিয়া, নিজের কাপড় কাচা ছাড়া আর বেশী কিছু করিতে হইল না। মাসী বেশ শক্ত আছেন, রান্নাবান্না নিজেই করিতে পারেন। বাড়িতে আর এক জন আত্মীয়্য বিধবা আছেন, তিনিও করেন। নবহুর্গা খাইয়া-দাইয়া সুস্থির হইয়া বেশ এক ঘুম দিয়া উঠিলেন। সম্ভ্রামণ্ড এখানে জলখাবারের এলাহি রকম আয়োজন। ক্ষীর, নুচি, রসগোল্লা কত কি।

দু-একটা দিন ভালই কাটিল। নবহুর্গা কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, পবেশনাথের মন্দির সব বেড়াইয়া আসিলেন।

মাসীর মেয়ে রাজলক্ষ্মী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “দিদি ক-দিন আছ এখানে?”

নবহুর্গা বলিলেন, “দেখি ভাই, কত দিন থাকতে পারি।”

রাজলক্ষ্মী কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। নবহুর্গা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এখনই এ প্রশ্ন কেন? মাসীমা কিছু বলিয়াছেন নাকি? সারারাত ভাবিয়া সকালে উঠিয়াই নিজের বাক্স হইতে খুব সুন্দর একখানা জরির চৌখুপি শাড়ী বাহির করিয়া রাজলক্ষ্মীর ঘরে গিয়া হাজির হইলেন।

রাজলক্ষ্মী তখন সব উঠিয়া বসিয়া কোলের ছেলোটাকে পিটাইতেছে। তাহার ছেলে একটা, মেয়ে একটা। মেয়ে ত মায়ের ধাবেও ঘেঁষে না, দিদিমার কাছেই থাকে। ছেলোটর নিতান্ত এখনও খাত্তের জন্য মায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, কাজেই তাহার রাজলক্ষ্মীর কাছে থাকা ছাড়া উপায় নাই। তা হতভাগা ছেলের জালায় রাখে কি ছ-দশ ঘুমাইবার উপায় আছে? চ্যাঁ, চ্যাঁ, চ্যাঁ, চিলের মত চীৎকার তাহার মুখে লাগিয়াই আছে।

নবভূর্গার হাতেব শাড়ীখানা দেখিয়া রাজলক্ষ্মী হঠাৎ মার থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওমা, এ শাড়ীখানা কাব গা বড়দি? ভারি জেল্লা ত কাপড়খানার।”

নবভূর্গা বলিলেন, “এই আমারই কাপড় ভাই। একবারমাত্র পবেছি, তাবপর তোলাই ছিল। কাল ভাবলাম কাপড়খানা তোকে মানাবে ভাল, তা পরা কাপড়—”

রাজলক্ষ্মী তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, “ওমা তাতে কি হয়েছে? তুমি আমার নিজের মায়ের পেটের বোনের মত, তোমার পরা কাপড় পরব, তাতে আবার কথা কি?” বলিতে বসিতে ছেঁ। মারিয়া কাপড়খানা তুলিয়া লইল। নবভূর্গা তাহার ছেলের সহিত ভাব-জমাইবার একটু চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু সকালে উঠিয়া চড়-খাইয়াই তাহার মেজাজ ধারাপ হইয়া গিয়াছিল, সে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ কবিল। রাজলক্ষ্মী বলিল, “ও হতভাগাকে ছুঁয়ে না, ও একেবাবে মানুষ না। তোমার অনেক কাপড়-চোপড় আছে না বড়দি?”

নবভূর্গা বলিলেন, “পাড়াগেয়ে মানুষ ভাই আমরা, আমাদের কতই বা থাকবে? তবু ছ-চাবখান আছে।”

রাজলক্ষ্মী বলিল, “খাওয়া-দাওয়া চুকে থাক, তার পর গিয়ে তোমার কাপড় দেখব এখন। আমি বাপু ভাল শাড়ীব বেজার ভক্ত। তা যেমন কপাল, দেয় কে? খেতে যে পাচ্ছি তাই চের। সেই বিষের সময় মা বা ছ-দশখানা দিয়েছিল, তাই নেড়েচেড়ে দিন কাটছে।”

নিজের বাক্স ডেস্ক লোকের সামনে খুলিতে নবভূর্গাব একেবাবেই ইচ্ছা ছিল না। নিজের দৈন্ত সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া লাভ কি? তাহারা সকলে ভাবে তিনি প্রচুর ধনরত্নের অধিকারিণী, ভুল করিয়াও ভাবুক না কিছুদিন।

ছপুরবেলা ঠিক রাজলক্ষ্মী তাঁহার কাছে আসিয়া হাজির। হতভাগা ছেলে সবেমাত্র ঘুমাইয়াছে, এখন খানিকক্ষণ তাহাব সবে সবে নিশ্চিন্ত। নবভূর্গা শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। রাজলক্ষ্মী বলিল, “আহা, উঠছ কেন? চাবিটা আমায় দাও না বড়দি, আমিই বাক্স খুলে দেখি।”

বড়দিব তাহাতে আরও অমত। তিনি উঠিয়া বসিয়া বাক্স খুলিয়া এক একখানা করিয়া সব শাড়ী জামা বাহির

করিতে লাগিলেন। বহু নারীর জিনিব, অতি পবিপাটি করিয়া বন্ধে রাখা, কিছুই নষ্ট হয় নাই। এক একখানা করিয়া তিনি বাহির করিতে লাগিলেন, বেনারসী, আনারসী, ঢাকাই, বালুচরী, বিষ্ণুখরী গরদ, শান্তিপুকের কাপড়, ফরাশডাঙ্গার কাপড়, টাঙ্গাইলের কাপড়। লোভে রাজলক্ষ্মীর চোখ দুইটা জলজল করিতে লাগিল।

বলিয়া বসিল, “এত সব কাকে দিয়ে যাবে বড়দি? সতীনপো বোদের? নিজের ত কিছু একটা আপনার বলতে নেই?”

নবভূর্গা বলিলেন, “ও মুখগুড়ীদের দিতে গোলাম কেন? ওরা আমার কে? যারা দুঃখের দিনে আমার দেখলে না তারা যদি আপন ত পর কে?”

শাড়ীগুলি বোরা পাইবে না তাহা ত বুঝা গেল, কিন্তু কাহারো যে পাইবে তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। রাজলক্ষ্মী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “গহনার বাক্সটা কোথায় রেখে এসেছ বড়দি? ছিদাম-দাদার বিয়েতে তোমার সেই বে সাতনহর আর চুড়জোড়া দেখেছিলাম, তা এখনও আমাব চোখে ভাসছে। এমন গড়ন আজকাল আর বড় দেখা যায় না।”

নবভূর্গা ইচ্ছা করিলেই একটা মিথ্যা কথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু কে যেন মনের মধ্যে তাঁহার দিক্কার দিয়া উঠিল। ছিঃ, কি হইবে মিথ্যা কথায় লোক ভুলাইয়া? তিনি দরিদ্র, দরিদ্র বলিয়াই তাঁহাকে লোকে জামুক। বলিলেন, “গহনার বাক্স আর কি আছে ভাই আমাব? বাদের জিনিব তাংদেব কাছেই আছে।”

রাজলক্ষ্মীর চোখ দুইটা প্রাণ স্বস্থান ছাড়িয়া কপালের মাঝামাঝি উঠিয়া গেল। গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা, কোথায় যাব। গায়েব গহনা ক-খানাও খুলে নিয়েছে গা?”

নবভূর্গার ইচ্ছা করিতে লাগিল উঠিয়া ছুটিয়া পালান। এ-সব কথা যেন তাঁহাব কানে ছুঁচ কুটাইতে থাকিত। কিন্তু কিছু না বলিয়াই বা উপায় কি? বলিলেন, “সে সবই বড়গিন্নীব গহনা বে, তাব ছেলে-বোয়ে ছাড়বে কেন?”

রাজলক্ষ্মী বলিল, “ওমা, তাহলে তোমার কি ব্যবস্থা ক’রে গেল বড়ো? একেবারে পথে বসিয়ে গেছে নাকি?”

মাসী এবং তাঁহার সেই আশ্রিতা বিধবাটিও ইতিমধ্যে

আসিয়া জুটিয়াছিলেন। নবদুর্গার প্রতি প্রস্তুত মাসী শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “তোকে কিছুই দিয়ে যায় নি নাকি? ওমা কি হবে গো। বাব জন্তে অমন সোনার পিরন্তিমে বুড়ো ঘাটেব মড়ার হাতে দেওয়া হ’ল, সেই আশাতেই শেষে ছাই পড়ল? ওমা, তুই তবে দাঁড়াবি কোথায় গা?”

নবদুর্গা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এমন সময় চীৎকারপরায়ণ শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া রাজলক্ষ্মীর স্বামী আসিয়া ধরে ঢুকিল, বলিল, “দিব্যা আড্ডা মারছ, ছেলেরা বে গলা শুকিয়ে মবল?”

রাজলক্ষ্মী স্বামীর দিয়া উঠিল, “বেশ কবছি আড্ডা দিছি, কারুর খেয়ে ত আড্ডা দিই নি? তুমি না-বইতে পার ফেলে দিয়ে এস ঘবে।”

তাহাব স্বামী আহত ভাবে শান্তুড়ী দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “দেখলে মা, একে ভাল বললে মন্দ হয়।”

শান্তুড়ীও মেজাজ ভাল নাই দেখা গেল। তিনি বলিলেন, “তা বাছা, সব ছন্দও একটু চুপ ক’রে বসেছে, এমন সময় ও ঢিলকে আবার নিয়ে আসা কেন? মানুষের হাড়ে কতই সয়?” বলিয়া তিনি অস্ত্র ধরে চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মীও উঠিয়া পড়িয়া বকবক করিতে কবিতে স্বামীর পিছন পিছন চলিয়া গেল।

একলা হইবামাত্র সব শাঙীগুলিকে নির্দয়ভাবে ভালগোল পাকাইয়া নবদুর্গা ট্রাকের ভিতর ঠাসিয়া দিলেন। সেগুলিব প্রতি তাঁহার আব কিশুমাত্রও মমতা ছিল না। কি কুক্ষণেই তিনি রাজলক্ষ্মীকে কাপড় দিতে গিয়াছিলেন।

রাতে আজ শুধু ফল ও মিষ্টি জুটিল। লুচি বা ক্ষীরের চিহ্নও দেখা গেল না।

পরদিন সকালে উঠিতেই মাসীমা বলিলেন, “আজ তারার শরীরটা ভাল নেই। চান ক’বে এসে বস্কাব জোগাড়টা ক’ব না একটু?”

নবদুর্গা গস্তীর মুখে স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। রান্না বেশ ভাল করিয়াই করিলেন, তবে খাওয়ার তৈয়াস কুচি চলিয়া গেল। মাসীমা বলিলেন, “খেলি না কেন কিছু? পোড়া অদৃষ্টে একবারের বেশী ত জুটবেনা?”

নবদুর্গা বলিলেন, “হোক গে মাসীমা, শরীর ভাল নেই।”

মাসীমা বলিলেন, “বিধবা মানুষেব আর ভাল থাকা-খাকি কি? তবে যে-কটা দিন জগতে আছি, পেটে ছোটো না দিলে ত চলবে না? তোব আবার কাজকর্ম মোটে অভ্যেস নেই, জামাই দিয়েও যাব নি কিছু, কি ক’রে যে দিন কাটাবি তাই ভাবছি।”

নবদুর্গা একটু থামিয়া বলিলেন, “বৈচে থাকলে দিন কেটেই যাবে। খেতে খাব, কত লোকে ত খাচ্ছে?”

মাসীমা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “তা বইকি বাছা, কত লোকেই ত খাচ্ছে? এই দেখ না তাবাকে? আমার সব কাজ ক’বে দেয়, দিব্যা খেতে-পরতে পায়।”

বাত্রে শুইয়া শুইয়া নবদুর্গা ভাবিতে লাগিলেন, বসিয়া খাওয়ার একে কাম্য তিনি মনে করিয়াছিলেন কেন? এই বকম সাত-দুয়ারে ঝাঁটা খাইয়া ফিরিয়া হইবে কি? কিন্তু কি কাজই বা তিনি করিতে জানেন? বসিয়া কর্তৃত্ব করা ভিন্ন আব কিছু ত শেখেন নাই? বাঁধুনীগিবি করিতে কি মন উঠিবে? কাশী চলিয়া যাইবেন কি? সেখানেও কত নিঃস্ব বিধবার ব্যবস্থা হইতেছে। মাকড়ী, ফুল, কাঁটাগুলি বেচিলে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন। রাজলক্ষ্মীর স্বামীকে বলিলে সে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবে।

সকালে উঠিতেই আবার কাজের ফরমাশ আসিয়া জুটিল। মাসী বলিলেন, “ঠাকুরঘরের কাজটা তুই নে না? তাবা একলা পেরে ওঠে না?”

নবদুর্গা হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, “হু-দিনের জন্তে ভার নিয়েই বা কি হবে? আমি ত আর চিবকাল থাকছি নে?”

মাসী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, “তা থাকলেই বা? কোথাও এক জায়গায় ত থাকবি? আমার ঘবে থাকায় অপমান নেই কিছু।”

নবদুর্গা বলিলেন, “কাশী গেলে কেমন হ’ব?”

মাসীমা বলিলেন, “কাশীতে ভারি সুখ তা মনে কোরো না। দশ জনেব মধ্যে থাকা আর কচকচি শোনা সে এক জ্বালাতন। বুড়ীগুলো জালিয়ে মারে। তার চেয়ে দাসীবৃত্তিও ভাল।”

ঠাকুরঘরে গিয়া নবদুর্গা করছোড়ে ভিক্ষা কবিতে

লাগিলেন, “হে ঠাকুর, আমাব গতি তুমিই কবে। দুনিয়ার ঠাই না হব, বিদায় ক’রে দাও।”

পাখবের ঠাকুর নীরব হইয়াই বহিলেন। নবহুর্গা পুষার আরোহণাদি করিয়া গিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একাদশী দিন এ বাড়িতে নিরঙ্ক উপবাসের ব্যবস্থা। মাসীমা ও তাবা ঠাকুর মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতেছেন। নবহুর্গাও অগত্যা তাহাই করিতেছেন। তৃণ্য তাহাব কর্তরোধ হইয়া আসিতেছে। মাসীমা তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, “তুই না-হয় এক চোক গঙ্গা জল মুখে দে, মরবি কি শেষকালে?”

নবহুর্গা বলিলেন, “তোমরা সবাই জল খাও ত পারি।”

মাসীমা পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলেন, “না বাছা, ওতে যে তার অমঙ্গল হবে।”

নবহুর্গাব হঠাৎ হাসি পাইল। কোথায় কাহাব অমঙ্গল হইবে? তাহাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথাও কেহ ভাবিল না, যদিও বক্তমাংসের দেহ লইয়া তাহারা বজ্রগায় ছটকট করিতেছেন।

দিন কাটিতে লাগিল। দুঃখ-দুর্গতিই বাড়িতে লাগিল, সুখ বাড়িল না। তারার আঙ্গ অস্থ, কাল পিসীর বাড়ি নিমন্ত্রণ লাগিয়াই আছে। মামাব বাড়ি হইতে নবহুর্গার কাছে চিঠি আসিয়াছে, ভাজ বাপের বাড়ি যাইবেন, আর এক জনের শবীর অতি অস্থ। সংসার চালায় কে? নবহুর্গা যেন অতি শীঘ্র চলিয়া আসেন।

রাজলক্ষ্মীব কাপড়ের বাহানা লাগিয়াই আছে। একখানির পর একখানি ভাল শাড়ী সে ক্রমাগত হস্তগত

করিয়া চলিয়াছে। মাসীমাকে বাতে ধবিসাছে, তাহাব হাত-পা টেপাব উৎপাত অহোরাত্র লাগিয়াই আছে।

আবাব একাদশী। মাসীমা ঘবে শুইয়া কাৎরাইতেছেন। তাবা-ঠাকুর কল-বরে গিয়াছেন। হঠাৎ হস্তদন্ত হইয়া তিনি ছুটিয়া ঘরে চুকিলেন, “ওগো তোমাব গুণের বোনঝি কাণ্ড দেখ গে।”

মাসীমা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “কি করেছে সে?”

তারা বলিলেন, “আশ হেসেলে ব’চে ছাঁচড়া দিয়ে পিণ্ডি গিলছে।”

“ওমা, সে কি গো।” বলিয়া মাসীমা বিহ্বলগে উঠিয়া পড়িলেন। ছুটিয়া গিয়া নবহুর্গার পিঠে এক লাথি মারিয়া বলিলেন, “এ কি হচ্ছে লা শতেক খোয়ারী, মুখপুড়ী? সকলের নাম ডোবালা?”

নবহুর্গা ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে বলিলেন, “আমাব ভাবনা যখন কেউ ভাবলে না মাসি, আমিই বা তাদের ভাবনা অত কেন কবতে বাই?”

মাসী বলিলেন, “নিজের পথ দেখ বাছা। এ-বাড়িতে ও-সব অনাচার সইবে না।”

নবহুর্গা ধীরে হুস্থে খাওয়া শেষ করিয়া বলিলেন, “তা ত দেখবই গো। খেটেই যখন খাব, তখন খাটুনি আর খাওয়া-ছটোই যাতে ভালমতে হয়, তা ত দেখতে হবে। বসে থাকার ব্যবস্থা যদি কেউ ক’রে যেত তহ’লে তাব ক্ষন্তে শুকিয়ে বসে থাকতাম।” বলিয়া উঠিয়া গিয়া নিজের পোটলা-পুটলি বাঁধিতে বসিয়া গেলেন।



চীনের কৃষি ও কৃষক-পরিবার

শ্রীদেবেশ্বরনাথ মিত্র

ভারতবর্ষের মত চীনও কৃষি-প্রধান দেশ। ইহার লোক-সংখ্যা মোটামুটি চল্লিশ কোটি; তন্মধ্যে শতকরা আশী জন লোক চাষ-বাঁস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। প্রকৃতপক্ষে চীন দেশেব কথা ভাবিতে গেলে ইহার ক্ষমতামূলী সন্মতিদেব কথা, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কথা, বাজনীতিবিশারদদিগেব কথা কিংবা যুদ্ধবিদ্যা-অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা মনে আসে না; প্রথমেই মনে আসে সেই দেশের অসীম পরিশ্রমশীল ও অদ্ভুত মিতব্যয়ী বিপুল কৃষকশ্রেণীর কথা।

আমাদের দেশের কৃষকদিগের মত চীন দেশের কৃষক-দিগেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত, তাহাদের কৃষি-পদ্ধতিও ভারতের কৃষি-পদ্ধতির মতই অতি পুরাতন, কৃষি-যন্ত্রাদিও সাবেক ধরণের ও নিতান্ত সাধারণ রকমের। গর্দভ-চালিত ডলুনা, কাঠের লাঙ্গল, ১৩ ইঞ্চি প্রশস্ত কোদালীই তাহাদেব প্রধান কৃষি-যন্ত্র; তাহারা বিদেশী বাসায়নিক সারের ধার ধারে না; নিজেদের প্রস্তুত সারই তাহাদের প্রচুর শস্ত উৎপাদনে সাহায্য করে।

বাস্তবিক চীন দেশের কৃষকেবা নিজেদের অসীম পরিশ্রমেব ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের দ্বারা কি উপায়ে তাহাদের বিপুল জনসংখ্যাব গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করে, তাহার বিবরণ পড়িলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। কিছু দিন পূর্বে অ্যান্ ব্রিজ্ বেতারেব সাহায্যে চীন দেশের কৃষক ও কৃষক পরিবারেব একটি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন।

অধ্যাপক টনি চীন দেশের কৃষকদিগেব ভীষণ গোঁড়ামি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, চীনের কৃষকেবা তাহাদের কৃষি-পদ্ধতিতে নূতন কোন উন্নত প্রণালী প্রচলন করিতে একেবারেই নারাজ। কিন্তু অ্যান্ ব্রিজ্ বলেন যে, উহাদেব এইরূপ গোঁড়ামি ও নূতন কোন কৃষি-প্রণালীর প্রবর্তনের

অনিচ্ছার যথেষ্ট কারণ আছে; তিনি বলেন, আমরা তাহাদিগকে কি শিখাইতে পারি? তাহারা চার হাজার বৎসর ধরিয়া তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পরীক্ষিত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিশেষ সফলতার সহিত চাষবাস করিয়া আসিতেছে। সংবাদপত্রের ভাষায় বলা হয়, “চীন দেশের অতি বিপুল জনসংখ্যা” (China's teeming millions)! চীনের কৃষকেরা কিরূপে এই বিপুল জনসংখ্যার আহাব বোগায় তাহার মোটামুটি আভাস জানিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

উত্তর-চীনের অন্তর্গত সান্টুং প্রদেশেব ৭৥ বিঘা আয়তনের একটি কৃষিক্ষেত্র হইতে সেই দেশের একটি পরিবারের বার জন লোক, একটি গরু, একটি গাধা এবং দুইটি শূকরের খাদ্যের সংস্থান হইয়া থাকে। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, সেখানকার ১২০ বিঘা জমি ১৯২ জন লোকেব আহার বোগাইতে পারে, অর্থাৎ কর্ষিত জমিব প্রতি বর্গ-মাইলেব দ্বারা ৫০৭২ জন লোক প্রতিপালিত হয়। অপর একটি কৃষিক্ষেত্র, বাহার আয়তন ৫ বিঘা মাত্র, তাহা দ্বারা একটি পরিবারেব দশ জন লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়; এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, কর্ষিত জমির প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৪০ জন লোক প্রতিপালিত হয়। চীন দেশে এইরূপ হাজার হাজার ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র আছে; এই ছোট ছোট কৃষি-ক্ষেত্রগুলিই তাহাদের মালিকদিগকে খাওয়া-পরার অভাব হইতে এত দিন বাঁচাইয়া বাধিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার “মরুভূমিতে সোনা ফলন” প্রবন্ধে চীন দেশেব কৃষকদিগের আয়েব যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা বৎসবে এক একর জমি হইতে ১৬০ হইতে ২০০ ডলার পর্য্যন্ত উপায় করে; এক ডলারের মূল্য তখন প্রায় ৩ টাকা ছিল, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এক বিঘা

জমি হইতে চীনেব কৃষকেরা অন্ততঃ ১৬০৭ টাকা আয় করে।

চীন দেশেব কৃষকেবা কৃষি-কার্যেব জন্ত কিরূপ অমৃত পবিশ্রম কবে তাহা উত্তর-চীনেব অন্তর্গত চিলি ও সান্টুং প্রদেশের কৃষকগণের দুই-একটি কার্যের বিবরণ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কৃষি-কার্যেব পক্ষে অমুকুল আবহাওয়া অতি প্রয়োজনীয়; এই সম্বন্ধে উত্তর-চীনেব কৃষকগণকে সৌভাগ্যবান বলা যাইতে পারে। প্রবল ঝড়-ঝাপটার প্রাক্তর্ভাব সেখানে নাই; সেখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম, মাত্র ২৪ ইঞ্চি; ইহার মধ্যে বৎসরের চারি মাসেব মধ্যেই (জুন, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর) অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এই চারি মাসেব বৃষ্টিপাতের গড় ১৭ ইঞ্চি। এই অঞ্চলের আবহাওয়া বড়ির কাঁটার মত স্থনির্দিষ্ট ও সঠিক। কখন কিরূপ আবহাওয়া হইবে তাহা সেখানকার কৃষকেরা পূর্বে হইতেই নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে। অসময়ে অতি-বৃষ্টিব ক্ষত তাহাদেব কসল নষ্ট হইবাব আশঙ্কা থাকে না; কিংবা শীতকালে জমি অতিবিক্ত ভিজা থাকার জন্ত লাজল দেওয়ারও অমুবিধা ঘটে না। ভূট্টা ও মিলেট-জাতীয় শস্ত এইরূপ আবহাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া তাহাবা এই দুইটিকে প্রধান খাদ্য-শস্ত হিসাবে উৎপন্ন কবে; ইহা ছাড়া ইহাবা নাসপাতি, খুবানী ও বিলাতী গাব্-জাতীয় এক প্রকার ফলেব চাষ কবে। গম, চীনাবাদাম ও মিঠা আলু সাহায্যকারী ফসল হিসাবে জন্মায়।

চীনেব কৃষকেরা বিদেশী রাসায়নিক সাব ব্যবহার না করিয়াও একই জমি হইতে চারি হাজার বৎসর ধরিয়া বখেষ্ট পরিমাণে শস্ত উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু আমেরিকাব যুক্ত-রাজ্যে একই জমি এক শত বৎসর চাষ কবিবাব পবেই প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া সেই জমি হইতে শস্ত উৎপাদন করা আবশ্যক হইয়াছিল। চীন দেশের কৃষকেরা কৃষি-কার্যের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি বিশেষ ভাবে অ্যয়ত্ত কবিয়াছে। তন্মধ্যে পর্যায়ক্রমে শস্ত-উৎপাদন ও শস্ত-মিশ্রণ, জমিতে সবুজ সাব প্রয়োগ এবং সকল প্রকার আবর্জনা হইতে সাব প্রস্তুত বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; তাহাবা অতি দক্ষতার সহিত একই জমিতে অনেক

প্রকার শস্ত জন্মায়। শীতকালে ২৮ ইঞ্চি অন্তর সারি করিয়া গম জন্মাইয়া থাকে; বসন্তকালে সেই গমের মাঝে মাঝে মিলেট-জাতীয় শস্ত বপন করে; গম উঠাইয়া শিম-জাতীয় শস্তের আবাদ করে; আবার মিলেট-জাতীয় শস্ত কাটািব পর শিম-জাতীয় শস্ত পাকে। এইরূপ ভাবে একই ক্ষেত্রে সারি করিয়া নানাবিধ শস্তের আবাদ কবিলে, সকল প্রকার শস্যেরই সুন্দর রূপে বস্তু ও পরিচর্যা কবা সহজ হয়। ইহার ফলে জমি বেশ আলুগা থাকে এবং তাহাব জন্ত জমিতে রসও সঞ্চিত থাকে। শস্যক্ষেত্রগুলি বাজা-মহাবাজার, সুন্দর সুন্দর ফুলবাগানের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখায়। শহরের নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত শস্তের সহিত তরি-তরকারীর বাগানও থাকে। পিয়াজ, আলু, বাঁধা-কপি, মুলা, সালাদ প্রভৃতি ফসল একটিব পর একটি অতি নিপুণতার সহিত আবাদ কবে।

চীনের কৃষকেরা বিশেষ ভাবে জানে যে কোন প্রকার শস্ত বোপণ করিলে জমি হইতে ঐ শস্ত যে-সকল খাদ্য গ্রহণ করে, সেই সকল খাদ্য পুনরায় জমিতে সববরাহ করা একান্ত আবশ্যক। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণার পর প্রকাশ কবিলেন যে, শুঁটিপ্রদ শস্ত (বেমন, ধোঁকে, মটর, শিম ইত্যাদি) আবাদ কবিলে মাটিতে বস্কারজ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চীন দেশের কৃষকগণ ইহার বহুকাল পূর্বে হইতেই তাহাদেব পুরুষামূলক-অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি জানিত এবং তদনুসারে অতি পরিশ্রমের সহিত এই পদ্ধতিটি তাহারা পালন করিয়া আসিতেছে। তাহাবা কাঁচা অবস্থায় শুঁটিপ্রদ শস্ত কাটিয়া আনিয়া গর্তের ভিতরে স্তবে স্তবে সাজাইয়া, খাল বিলের কাঁদা মাটি কিংবা ক্ষেত্রের নিম্নস্তবেব ভিজা মাটি দিয়া স্তরগুলিকে ঢাকিয়া দেয়। পরে কিছুদিন অন্তব-অন্তর স্তরগুলিকে বার-বার ওলট-পালট করিয়া দেয়। ইহার ফলে স্তরের সকল অংশের কাঁচা গাছগুলি সমান ভাবে পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া তাহারা সকল প্রকার আবর্জনা ছোট ছোট গর্তে ফেলিয়া উহার সহিত মাটি ও ছাই মিশাইয়া দেয়। এই আবর্জনাও কিছু দিন পবে সম্পূর্ণভাবে পচিয়া উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। জীবজন্তুর মলমূত্রাদি

বাবতীর অপবিত্র পদার্থেব কোনটিই অপচয় করে না, সমস্তই মূল্যবান সাবে পবিত্র করিয়া কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার কবে। তাহাবা কি ভাবে জীবজন্তুর মলমূত্র সংবক্ষণ কবে তাহা জানিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দুইটি গ্রামের মধ্যে যে অপ্রশস্ত স্থান থাকে, তাহার মাঝে মাঝে মাটি চাচিয়া লইয়া ইহার। এক-একটি অগভীর খাত প্রস্তুত করে। সেই খাতের দুই ধাৰে সাধারণ বাস-জঙ্গল জন্মাইয়া বেড়া দেব। পথিকেরা যখন উহার নিকটবর্তী পথ দিয়া উট গাধা প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার লইয়া যায়, তখন ঐ সকল খাতের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারগুলিকে ছাড়িয়া দেয়। তখন ঐ পশুগুলি ঐ খাতে মলমূত্র ত্যাগ করে। পরে ঐ মল-মূত্রমিশ্রিত মাটি খাত হইতে উঠাইয়া সাররূপে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ইহা হইতে দেশা যায় যে, দেশের সর্বসাধাবণেই দেশেব কৃষি-কার্য্যের উন্নতিব জন্তু পরস্পর সহায়তা করে। কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্তু তাহাদের চেষ্টার কথা বাস্তবিকই অদ্ভুত! চীনেব কৃষকদের ঘরের মেঝে কাঁচা, সেই জন্তু মেঝের মাটিতে ববক্ষারজন সঞ্চিত হয়। মাঝে মাঝে তাহারা মেঝের তিন ইঞ্চি পরিমাণ মাটি চাচিয়া সাররূপে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। কি অদ্ভুত জাতি! কি ভাবে নিজেদের পবিত্রম ও বুদ্ধির দ্বারা জমির উর্বরতা-শক্তি রক্ষা করিবা আসিতেছে!

চীন দেশেব কৃষি-কার্য্যেব প্রধান গোপন কথা এই যে, চীনেব কৃষকেবা কৃষি-কার্য্যেব দ্বারা কি ভাবে তাহাদের এই জনবহুল দেশের অন্নসংস্থান কবিতে পারে, তাহা অতি কঠোব ভাবে শিখিয়াছে। সেই শিক্ষা আব কিছুই নহে, প্রত্যেকটি জিনিষ বাহা খাণ্ডে, জালানি কাঠে অথবা সাররূপে পরিণত কবিতে পারা যায় তাহাব অপচয় না করিয়া কাজে লাগাইবাব জন্তু অসীম পরিশ্রম করিতে কখনই নাবাজ হয় না।

কৃষি-কার্য্যেব জন্তু কৃষকদিগকে যেমন অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, ঘব-সংসাবেব কাজ করিবাব জন্তুও তাহাদিগকে সেইরূপ কঠোব পবিত্রম কবিতে হয়। উত্তব-চীনে বড় বড় গাছপালা নাই বলিলেই চলে। সেই জন্তু তাহাদের জালানি কাঠের অভাব খুব বেশী। কমলা কিংবা কাঠ-কমলা কিনিবা ব্যবহার কবা তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় না।

অতি পরিশ্রমের সহিত তাহাদিগকে জালানি কাঠ সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাবা দেওধান-জাতীয় গাছেব শক্ত সাত আট ফুট লম্বা কাণ্ডগুলি বেড়ার জন্তু এবং ঘরের চালের ছাউনীর জন্তু ব্যবহার করে। আবাব এই সকল গাছের শিকড় ও ফলের খোসাগুলি শুকাইয়া রান্নার কাজে লাগায়। তাহারা ভুট্টাগাছের কাণ্ড ও পাতা ছোট ছোট কবিয়া কাটিয়া গরুকে খাওয়ায়।

চীনের কৃষকেরা শয়ন-গৃহ গরম বাধিবাব জন্তু ঘরের মধ্যে কাঁচা উনান প্রস্তুত কবে। ঐ উনানেব চিমনির ইটও কাঁচা। এই চিমনিগুলি সাধাবণতঃ চারি বৎসর পরে কাটিয়া যায়। সেই সময় ঝুলসমেত চিমনির ইটগুলি গুঁড়া করিয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। উনানের ছাঁইও সাব-হিসাবে জমিতে দেয়। ভুট্টা ও মটর গাছেব কাণ্ড ও শিকড় ইত্যাদি জালানি রূপে এই উনানে পোড়ান হয়। সেই জন্তু তাহারা এই সকল শস্য কাটিয়া আনে না, শিকড়সমেত টানিয়া তুলিয়া আনে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, চীনের কৃষকেরা কোন জিনিষ অপচয় করে না। জালানি কাঠ সংগ্রহের জন্তু কৃষকদের স্ত্রীলোকেবা ও বালক বালিকাগণ পুঙ্খবদিক্কে বধেট সাহায্য কবে। তাহাবা নীল রঙের হুন্দর হুন্দর টিলা পোষাক পবিয়া অতি আনন্দের সহিত পাহাড়-পর্বত ও রাস্তাঘাট হইতে ভুট্টা ও মটর গাছেব শিকড় কাণ্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে।

চীন দেশেব কৃষকদের খাদ্য প্রধানতঃ নিবামিষ। তাহাবা মাংস অতি অল্প পরিমাণে খায়; দুধ মোটেই খায় না; গম ও ভুট্টা হইতে প্রস্তুত ময়দা বা পিঠাই তাহাদের প্রধান খাদ্য। ইহার সঙ্গে মিলেট-জাতীয় শস্য সিদ্ধ করিয়া ভাতের মত খায়। এই খাদ্যের সহিত সবজী চাটনী ইত্যাদি ব্যবহাব কবে, কিন্তু লবণ খায় না। এই সাদাশিধে-ধরণের খাদ্য খাইয়াও তাহাদের স্বাস্থ্য অতুলনীয়। স্ত্রীলোকগণ হুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী, বালক-বালিকাগণ পুষ্টিকার, লাণ্যময় এবং সর্বদাই জীড়াসক্ত।

চীন দেশেব কৃষকদিগের মত তাহাদের স্ত্রীলোকেবাও কষ্টসহিষ্ণু। স্ত্রীলোকেবা বাজারে গিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি ও গৃহস্থালীর অত্তান্ত জিনিষ কিনিয়া আনে। তাহারা হাসি-মুখে খাল ও নদীতে কাপড়-চোপড় কাচে, খাতা চালাইয়া

ময়দা প্রস্তুত কবে, গ্রামেব কূপ হইতে কাঁধে বহিয়া সকাল-সন্ধ্যায় জল আনে, ক্ষেত্রেব কাজে পুকখদিগকে সাহায্য কবে এবং ফলের বাগান হইতে নানাবিধ ফল তুলিয়া আনে।

চীন দেশের স্ত্রীলোকেরা সেলাইয়ের কাজেও বিশেষ পটু। ষতদিন পর্য্যন্ত সম্ভব ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পোষাক-পরিচ্ছদগুলি পুনঃ পুনঃ সেলাই করিয়া ব্যবহার করে এবং বধন ঐগুলি একেবারে ছিঁড়িয়া যায়ও সেলাই করিয়া ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবা পড়ে, তখন উহাদিগকে জালানি হিসাবে কাজে লাগায়। পরিশেষে উহা হইতে যে ছাই পাওয়া যায় তাহাও নষ্ট না করিয়া জমিতে প্রয়োগ করে।

কনুকে নীতেও চীনেরা তাহাদের ঘরদোব গরম রাখিবার জন্য সন্ধানসন্ধান তাণ্ডন জালে না। তাহাদের নীতকালে ব্যবহারের উপযুক্ত পোষাক আছে বটে, কিন্তু উহা খুবই সাদাসিধে। উহারা মোটা ওভার-কোট ব্যবহার করে না; উহাব পরিবর্তে সুতীর পোষাকেব নীচে তুলাব জামা ব্যবহার কবে। এই জন্য সকল সময়ই তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ স্নান ও হালকা দেখায়। ভারী পোষাক না থাকিতে সকল কাজ অনায়াসে করিতে পারে।

বদিও চীনেব কৃষক-পরিবারকে জীবনধারণের জন্য অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি উহারা সন্তান-সন্ততিগণকে যত্নের সহিত পালন কবে। ছেলেমেয়েদের প্রতি উহাদের ব্যবহার অতি মধুব। প্রত্যেক গ্রামেই কষ্ট-পুষ্ট, পরিশ্রমী ও প্রকৃষ্ট বালক-বালিকাদিগের দল দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট মেয়েরা বড়ীন কিতায় চুল বাধিয়া এবং গালে লালচে রং মাখিয়া বাস্তাঘাটে ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়াই। খাবারওয়াল দেখিলেই তাহারা আনন্দে নাচিতে থাকে এবং ছুটিয়া গিয়া দুই এক পয়সার খাবার কেনে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার প্রতিও চীনের কৃষকেবা অমনোযোগী নহে। প্রায় সকল গ্রামেই স্কুল আছে। স্কুলেব বাড়ি জমকালো নয়, সাদাসিধে ধরণের, কিন্তু দেখিতে স্নান। গ্রীষ্মকালে সকল ছাত্রটার সম্বন্ধে ছেলেমেয়েরা দল বাধিয়া গ্রাম্য সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে স্কুলে যায়। স্কুলে বসিবার জন্য বেঞ্চ বা টুল নাই;

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাগলের চামড়ার আসনে বসিয়া লেখা পড়া করিতে হয়।

চীন দেশের অল্পসংখ্যক কৃষকই লিখিতে ও পড়িতে পারে। তাহাদের প্রধান আশ্রয় প্রাণভরা হাসি, আমেরিকার সিগারেট এবং লোকেব মুখে মুখে সকল খবর জানা। মাটিই চীনেব কৃষকদের প্রধান সঙ্গী ও শিক্ষক। মাঝে মাঝে যুদ্ধ-সম্পর্কিত দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া রাজনীতি যে কি জিনিষ তাহারা জানে না। তাহারা যে দেশেব খবর বিশেষ রাখে না, তাহা একটি কথা বলিলেই বুঝা যাইবে। চীন দেশে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত হইবার পনের বৎসর পবেও পিকিং শহর হইতে ২০০ মাইল দূরবর্তী স্থানের কৃষকগণ চীনের সম্রাটের খবর জানিবার জন্য কোতুহল প্রকাশ করিত। সকল অবস্থাতেই তাহাদের মনের তৃপ্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহাদের মধ্যে দুঃখ-দাবিদ্র্য যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহাব মধ্যে কিছুমাত্র মলিনতা ও অবসাদ নাই। নৈতিক ক্রটির জন্যই মলিনতা আসে এবং হতাশা, দুঃখ-বিপদে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ও বা হয় হউক এই ভাব উপস্থিত হয়। চীনেব কৃষকদিগেব মধ্যে এই সকল নৈতিক ক্রটির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা কোন বিষয়েই হাল ছাড়িয়া দেয় না, কোন কাজকেই মন্দ হইতে মন্দতব অবস্থায় পৌছিতে দেব না, প্রাণপণে উহাকে সফল করিতে চেষ্টা করে। কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিয়া তাহারা এই কঠোর সত্য ও শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং এই শিক্ষা সমস্ত জাতির মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কোন জিনিষেব অপচয় তাহাদিগকে অন্তস্ত আঘাত দেব। অদম্য পবিত্রম, অসীম উৎসাহ, প্রকৃতির সহিত সারা জীবন যুদ্ধ এই প্রাচীন জাতিকে মানুষ্য কবিয়া তুলিয়াছে।

চীনেব কৃষক-পরিবারের উপযুক্ত বিবরণ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, কৃষিকার্যে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালী অবলম্বন না-করিয়াও তাহারা কেবল মাত্র কঠোর পরিশ্রম ও তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানেব দ্বারাই ঐ দেশের চল্লিশ কোটি লোকেব অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে। আমাদের দেশেব কৃষকদের মত তাহাবা অদৃষ্টবাদী ও উৎসাহহীন নহে। সকল কাজই তাহাবা

সম্পূর্ণ আশা ও আনন্দের সহিত সম্পন্ন করে। এ-বিষয়ে অল্প পরিমাণে আমি চাষবাস করিয়া বে বে কাবণে মনের তৃপ্তিই তাহাদের প্রধান সহায়। তাহারা যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় আছে, তাহা ভারতের কৃষকদিগের ভাবতবর্ষের কৃষকদিগের মত পুরাতন কৃষি-পদ্ধতি অনুসারে অনুকরণের যোগ্য।

মুক্তি

শ্রী আশালতা দেবী

২৮

ঘরের মধ্যে ক্ষীণ দীপের আলো। বিছানার পাশের কাছে একফালি ছোয়াৎলা আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রকান্ত শব্যাস্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর পূর্বের চেয়েও ক্ষীণ। মুখ পাণ্ডুর। নির্মলা শিয়রের কাছে বসিয়া তাঁহার মাথার চুল হাত বুলাইতেছিল। তাহার চোখের কোণে কালিমার রেখা, মুখের ভাবে ধীর-গভীরতা। আগেকার নির্মলার সহিত এখনকার নির্মলার অনেক তফাৎ। তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত, সে যেন অনায়াসে পুষ্পের মত কুহুমকুহুম। তখন তাহাব ঘনপল্লব চক্রুর মধ্যে ছিল কেবল স্বচ্ছ অতলতা। এখন সেই কালো চোখে বেদনার নিবিড় সজ্জলতা এবং ককণার স্নিগ্ধতা আসিয়া নাশিয়াছে। সব জড়াইয়া আগেকার নির্মলার বেটুকু অপূর্ণতা ছিল এখন আর তাহা নাই। তাই তাহার মুখের কাস্তি নানা হুশিচস্তায়, বোগীর সেবায়, রাত্রিঙ্গাগরণে স্নান হইলেও রূপের প্রভা আরও পরিপূর্ণ, পরিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্রকান্তের অন্তর যে সারিবার নয়, এখন সে কথাটা তাঁহার পরিবারের সকলের কাছেই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া কয়েক দিন হইতে তাঁহার শরীরের অবস্থা খুবই খাপ খাইয়াছে। কিছুকণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া তিনি ডাকিলেন, ‘নির্মলা!’

‘কি বলছ বাবা?’

‘আমি বেশ বুঝতে পেরেছি আমি আব বেনী দিন খাচব না। কিন্তু শান্ত হয়েই আমি যেতুম, কেবল শান্ত হ’তে

পারছি নে তোমাব কথা ভেবে। সেই এতটুকুটির থেকে আর কাউকে তোমার কাছে আসতে দিই নি। নিজেই তোমাকে ঘিরে ছিলুম। আজ আমার ভুলটা যে হয়েছে কখনো, তা বেশ স্পষ্ট ক’রে বুঝতে পেরেছি।’

নির্মলা চোখের জল সংবরণ করিয়া লইয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল, ‘তোমার আবার ভুল হয়েছে কখনো বাবা? যদি আমার জীবনে কোথাও গোল বেধে থাকে সে আমারই দোষ। কিংবা আমার ভাগ্যের দোষ।’

‘না না, তা নয়। তোমার মত ভাল কারও ভাগ্য নয়।’
মা। আমার ভুলের কথাটা কেন আজকাল প্রায়ই আমার মনে হয় জান, আমি নিজের জীবনের সমস্তটাই আগাগোড়া এখন দূর থেকে দর্শকের মত দেখতে পাই। আগে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখতে পেতুম না। তাই অনেক কথার অর্থই অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু মৃত্যু বত এগিয়ে আসছে, ততই এখন আমার কণ্ঠের সঙ্গে আমার বেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। কোন জিনিষের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে তার ভালমন্দ তেমন বোঝা যায় না। কিন্তু অনেকটা দূর থেকে দেখলে তার ভুলভ্রান্তি বাঁকাচোরা সবই চোখে পড়ে, আমার অবস্থা হয়েছে এখন সেই বকম।’

‘বাবা, আজকাল তুমি এত বেশী কথা বল কেন?’

‘আর কাবও সঙ্গে ত বলিনে মা। তোমার সঙ্গেই বলি। আমার ভুলের কথা তোমার কাছে স্বীকার করে না গিয়ে, তার সংশোধনের উপায় ঠিক না ক’রে আমি ত মনে শান্তি পাব না।’

‘আজ তুমি ক্রমাগত ঐ একই কথা বলছ।’

‘হা, আজ ওই কথাটাই মনে বেশী বাজছে। আসলে কি হয়েছে জান নিশ্চল? আমার জীবন একদিক থেকে বার্থ। প্রথম যৌবনে সংসারে নানাদিক থেকে নানা আঘাত পেয়েছি। সে আঘাতে সবারই দিক থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়ে এসে নিজের নিঃসঙ্গতার মাঝে আপন মনে ছিলুম। তা’ব পবে পেলুম তোমাকে। বঞ্চিত, ক্ষুধিত চিন্তেব সমস্ত ব্যগ্রতা নিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরলুম। তুমি যে কেবল আমার বাৎসল্যের ক্ষুধা মিটিয়েছ তা ত নয়, তুমি আমার বার্থ জীবনকে আশ্রয় দিয়েছ। আমি আমার সমস্ত অসাক্ষ্য এবং একাকীত্ব নিয়ে তোমাকে আবেষ্টন কবেছিলুম।’

‘তাতে কি হয়েছে বাবা? তুমি যদি আমার কাছে কিছু পেয়ে থাক, আমি কি তোমার কাছে তর চেয়েও কিছু বেশী পাই নি?’

‘তার উত্তর ত আমি দিতে পাবব না মা। কিন্তু আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে তোমাকে এমন করে না জড়ালে হয়ত তোমাব মনেব বিকাশ এত অসম্পূর্ণ হয়ে থাকত না। তুমি সংসারকে, সবাইকে চিনতে শিখতে। আমি তোমাকে বতই ভালবাসি, একথাটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পাবব না নিশ্চল, যে, জীবনের পথে একটা বাঁকের কাছে গিয়ে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি করতেই হবে। শুধু বাইরের ছাড়াছাড়ি নয়, জীবন-মরণের যেখানে বত গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে বাঁধন পড়েছে সে সমস্তই আলগা করতে হবে। তা নইলে যে তুমি তোমাব জীবনের পরম কল্যাণকে খুঁজে পাবে না। আব তোমাকে তোমাব আনন্দিত সংসারের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত না-দেখতে পেয়ে আমিও মনে মনে শাস্তি পাব না। শকুন্তলাকে তাব নবজীবনের পথে ঋষি কথ খানিকটা দূর অবধি আগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরে আর ত তাঁব অগ্রসর হওয়া চলে নি। তারপর থেকে সেই তাপসকন্তার জীবনেব বিচিত্র জটিলতা, অপমান, বেদনা, সাধনার পালা—সে সমস্তই যে তাঁর একলার সামগ্রী ছিল। এই কথাটাই কতদিন থেকে আমি ভাবছি মা।’

‘তুমি বা বলতে চাইছ তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার এই দুর্বল অবস্থায় বেশী কথা ব’লো না বাবা।’

‘বেশী কথা কম কথায় আমার আব কি ক্ষতিবুদ্ধি করতে পাবে, নিশ্চল? কিন্তু এ-ও আমি ভাবছি যে আমার বেশী দেবি নেই। এবাবে আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাব। কিন্তু সে মুক্তি বেন নিশ্চল না হয়। এবারে বেন তুমি নিজের মাঝে নিজেকে খুঁজে পাও।’

‘অমন করে ব’লো না বাবা। আমার বড় কষ্ট হয়।’

মুবলী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, ‘নিখিলবাবুর সঙ্গে জামাইবাবু এসেছেন।’

‘কে? বামিনী এসেছে!’ চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ‘তাকে এই ববেই একেবারে সোজা নিয়ে এস না।’

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন রোগীব ববে বধাসম্ভব কম লোক বেন আসে, আব তাঁহাকে কোন কাবণেই বেন উত্তেজিত না-করা হয়। তাই মুবলী একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। এমন সময়ে গেটেব কাছে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল। নিশ্চল জানালার কাছে মুখ বাড়াইয়া কহিল, ‘ছেটনা, ডাক্তারবাবু এসেছেন, সঙ্গে ক’বে নিয়ে এস।’

‘ডাক্তার চলে গেলেই ওদের এঘরে নিয়ে আসছি।’ বলিয়া মুবলী বাইরে চলিয়া গেল।

চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়া কহিলেন, ‘নিশ্চল মা, তুমি একবার ওঘবে যাও।’

‘এখনই যাব বাবা। ডাক্তার বাবুকে একবার কেবল তোমাব টেম্পাবেচারের চার্টটা বুঝিয়ে দিয়ে যাব। আব কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।’

‘না না, তুমি এখনই যাও।’

নিশ্চল শাস্ত চরণে বাহিরে চলিয়া গেল।

ছব্বারের কাছে নিশ্চলার শাড়ীর চওড়া পাড়টা দেখিয়া নিখিল তাড়াতাড়ি একটা অছিল্য কবিয়া ছাদে চলিয়া গেল। নিশ্চল আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম কবিল। বলিল, ‘তুমি একটু ব’সো। ওঘরে ডাক্তার এসেছে। আমি এখনই আসছি। চায়ের জল চড়িয়েছে, কিছু না-খেয়ে যেও না বেন।’

তাহার মুখে ম্লান সজল শাস্তি। তাহাব কথায়, তাহার ভাবভঙ্গীতে মনে হইতেছে এত দিন যে বামিনীর সঙ্গে তাহার

দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, এত দিন যে এত শ্রোত বহিয়া গেল, সে-সমস্ত যেন তাহার জীবনে কোন চাক্ষু্যই আনে নাই। যামিনী মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার সমস্ত মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরে, দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতাপের বিগলিত অশ্রুতে তাহাকে ভাসাইয়া দেয়। কিন্তু সেই শান্ত বিবাদপ্রতিমার দিকে চাহিলে সমস্ত উচ্ছ্বাস আপনা-আপনি শান্ত হইয়া আসে। মনে হয় যেন তাহার কাছে বাইবার উপায় নাই। নিজের চারিদিকে সে কোন এক হৃদুবতার বেঠন দিয়া আপনাকে সকলের কাছ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছে।

যামিনী তখনও তাহার দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। নির্মলা আবার কহিল, 'তুমি একটু ব'সো। আমি এখনই আসছি।'

সে চলিয়া গেল। নিখিল কিছুক্ষণ পরে ছাদ হইতে আসিয়া যামিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, 'তুমি তাহ'লে রাত্রিটা এখানেই থাকবে ত? আমি একবার চন্দ্রকান্তবাবুর খবর নিয়ে বাড়ি যাই।'

'থাকব।' যামিনী তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, 'থাকব? না না, আজ থাক, নিখিল। আজ আমার কেমন যেন ভয় করছে।'

'ভয় কিসের? পাগলের মত কি বা-তা বলছ? আসবে আর চলে যাবে? নিজের তুচ্ছ খেয়ালের জন্তে তুমি অনর্থক কত লোকের মনে কষ্ট দাও।'

'না না, খেয়াল নয়। আজ আমি কিছুতেই থাকতে পাবব, না নিখিল।' তাহার কণ্ঠস্বরে অত্যন্ত ব্যাকুলতা, ছেলেমানুষের মত একটা অবুর ভাব। নিখিল অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

যামিনী তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, 'চল।'

'দাঁড়াও। অন্ততঃ খবর নিয়ে আসি চন্দ্রকান্তবাবু কেমন আছেন। ডাক্তারে কি ব'লে গেল।'

'তবে তুমি যাও। ভালই আছেন নিশ্চয়। আমি ততক্ষণ রাত্তার দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি।...নিখিল, তোমার পকেটে এলাচ আছে? ছোট এলাচ?'

'এলাচ।'

'হ্যাঁ, এলাচ। তুমি বুঝতে পাবছ না, আজও যে আমি সন্ধ্যার...এখনও যে আমার মনে হচ্ছে মুগ্ধে গন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় ওর সামনে। না না, আজ নয় আজ নয়। অন্ত দিন।' যামিনী অত্যন্ত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে চলিয়া গেল।

বিমুগ্ধের মত ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া নিখিল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

নির্মলা বাবার বুকে মাশিশ করিতেছিল। চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'নির্মল মা, এবারে তুমি ওববে যাও মা। বাত হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এখনই যাব বাবা।'

মুরলী তাঁহার ঘরের ঘড়ীতে দম দিতে আসিয়াছিল। চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কটা বাজলো? যামিনীর খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত? আজ তাকে এঘরে আসতে বাবণ ক'রো। রাত অনেক হয়েছে। সে নিশ্চয় ক্লান্ত।'

মুরলী কহিল, 'কে, জামাইবাবু? তিনি ত তখনই চলে গেছেন। সে যে অনেক ক্ষণ হ'ল। চা ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁকে কত ডাকাডাকি কবলুম। নিখিলবাবু বললেন, 'তাঁর বিশেষ জরুরি কি কাজ ছিল। আর এক মিনিটও বসবাব সময় নেই। আবার কাল আসবেন।'

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ অসাড়ের মত পড়িয়া থাকিয়া তাহার পর বলিলেন, 'নির্মলা! এবারে তুমি যাও। আর আমাকে মাশিশ করবার দরকার নাই।' নির্মলাব কোনরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। সে সবত্বে ধীবে ধীরে তাঁহার বুকের বোতাম বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, 'বাবা, তুমি কিছু ভাবনা ক'রো না। সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।'

'সত্যি বলছ? হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি ঠিক হবে। তার আর বড় বেশী দেরিও নেই। আমি যেদিন তোমায় মুক্তি দিয়ে যাব সেদিন থেকেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।' অর্দেক তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বিজড়িত স্ববে তিনি একই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন।

নির্মলা তাঁহাকে আর বেশী উদ্বেজিত করিবার ভয়ে আন্তে-আন্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল। বাইবার সময় আলোটা কমাইয়া দিয়া গেল।

২৯

‘মা, তুমি বুঝতে পারছ না এই রিট্রেক্‌মেন্টেব (চাকরি ছাঁটার) ধুমে আমার যদি চাকরি যায় তবে সংসার চলবে কি ক’রে?’—বান্নাঘরের দাওবার সুশীলা বসিরাছিলেন। মুরলী ভাত খাইতে বসিরাছিল। মিটমিটে একটি কেরোসিনের ডিবে জলিতেছে। ঘরে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া ছুই জনে বসিয়া আছেন। কাছাকাছি আর কেহ নাই। নির্মলা সদরে চন্দ্রকাস্তুর ঘরে আছে।

মুরলীর কথার উত্তরে সুশীলা বলিলেন, ‘আমি বুঝতে পারছি সব। কিন্তু কি করব বল? অত টাকা আমি কোথায় পাব? আমাদের আসল অবস্থাটা যে কি, সে ত তুমি নিজেও জান। তোমার দাদাদের ব’লে দেখেছ?’

‘তাদের ওখানে হাঁটাইটি ক’রে যে উত্তর পেয়েছি সে উত্তর তোমাকে বলতে প্রবৃত্তি হয় না।’

‘তবে?’

মুরলী নিঃশ্বাস ফেলিল।

আসলে ব্যাপারটা হইয়াছিল বিট্রেক্‌মেন্টের জন্ত মুরলীদের আপিসে কর্মচারী ছাঁটিবার আয়োজন হইতেছিল। বাহার উপর বিবেচনা কবিয়া দেখিবার ভার ছিল তিনি আকার-ইঙ্গিতে এমন ভাব দেখাইয়াছিলেন যে, হাজার-খানেক টাকা খুস পাইলে তিনি মুরলীর নামটা অনাবশ্যকের লিষ্টে ফেলিবেন না। মুরলীর কর্মতৎপরতায় তাহাদের ফার্মেব যে বিভাগে সে কাজ করিত সেই বিভাগের বখেই উন্নতি হইয়াছিল। গত মাসে তাহার মাহিনাও বাড়িয়া যাট টাকা হইয়াছিল। কিন্তু সে মনে মনে জানিত তাহার এত দ্রুত উন্নতিতে আপিসের অনেক উপরওয়ালার কর্মচারী সন্তুষ্ট ন’ন। যিনি টাকা চাহিয়াছিলেন তিনিও সেই দলের। এদিকে সে সবেমাত্র আই-এ পরীক্ষা পড়িয়াই চাকরিতে বছরখানেক হইল চুকিয়াছে। এখন চাকরি গেলে সে কি কবাবে, আবার কোথা দিয়া জীবন যুগ করিবে, এই ইকনমিক ডিপ্রেসনের দিনে, এই ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার দিনে, আবার কোথায় ঘারে ঘারে চাকরির জন্ত উমেদারী করিয়া ফিরিবে, এই সকল চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই উপর আপিসের আরব্যার এবং তহবিল মিলাইবার ভাব ছিল। সে আপিসের তহবিল হইতেই মরিয়া হইয়া

টাকাটা লইয়াছিল। মনে করিয়াছিল মাসখানেক পবে যখন হিসাব মিলাইয়া দিবার সময় হইবে তখন আর কোথাও টাকা না পাক, মায়েব গহনাগুলো আছে। এমন ব্যাপার শুনিলে তিনি সেই গুলোই বাহির কবিয়া দিবেন।

সে-প্রসঙ্গ তুলিতে সুশীলা কহিলেন, ‘আমার গহনা হাতে এই ছ-গাছি বালা ছাড়া আর অঁকিছুই নেই।’

‘কেন মা, তোমার যে সর্বস্বকমে প্রায় তিন-চার হাজার টাকার গহনা ছিল। তা’ছাড়া এখন সোনার দাম খুব চড়া... অত ভাবছ কেন? আমি যদি এই চাকরিটা বজায় রেখে চলতে পারি খুব শীগ্‌গির উন্নতি হবে। তখন আবার কত গহনা...’

সুশীলা ক্ষীণ হাসিয়া কহিলেন, ‘ওরে বাবা, এই বুড়ো মাগীকে কি আবার গহনাব লোভ দেখাতে হবে বে! কিন্তু এই তিন-চার বছর আমি সংসার চালিয়েছি কি ক’বে বল ত? এই যে আর বছবেই যোগেনেব আইনের বই আর পরীক্ষার ফীতে কত টাকা লেগে গেল। সে-সব এল কোথা থেকে?’

মুরলী বিবর্ণ মুখে কহিল, ‘সে কথা জানতুম না মা। মনে করেছিলুম নির্মলার বিয়েতে যখন তোমার একখানা গহনাও খরচ হয় নি, তখন সেগুলো বুঝি আছে।’

‘তোমাদের জানতে পারার কথা নয়। সে-সব অতি গোপনে বিক্রী করেছি, পাছে কর্তার কানে যায়। তিনি মনে হুঁখ পাবেন। কিন্তু তুই অত ভাবিস নে বাবা। চাকরির জন্তে অত ভাবনা কেন? ভগবানের উপর নির্ভর ক’রে থাক, তিনি সব ঠিক ক’রে দেবেন।’

‘না আর ভাবব না।’ মুরলীর মুখে একটু হাসির মত ফুটিয়া উঠিল। সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। কেবল তাহার ভাবনার কথা আর প্রকাশ করিয়া বলিল না। এখন ভাবনাটা ঝাঁড়াইয়াছে কেবল চাকরির জন্ত নয়। ইহা তাহার চেয়েও গুরুতর। নানা চিন্তায় দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া অবশেষে সে শেষদিনে আপিসের তহবিল হইতেই টাকা সংগ্রহ করিয়া উপরিওয়ালাকে খুস দিয়াছে। মাস-কাবাবেব আব পনেরটি দিন বাকী আছে। ইহারই মধ্যে তাহাকে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া তহবিল মিলাইয়া রাখিতে হইবে।

মুরলী সেখান হইতে উঠিয়া নির্মলার ঘরের দিকে গেল।

ঘরে আলো নাই। অন্ধকার ঘবে গুরুপক্ষের জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ায় একটুখানি আলোকিত হইয়াছে। খাটের উপর নির্মলা চুপ কবিতা বসিয়া আছে।

মুন্সলী মনে আঘাত লাগিল। এ-বাড়িতে চন্দ্রকান্তের পবেই সে নির্মলাকে স্নেহ কবিত। অবশ্য দুই ভাই-বোনে সমস্ত দিনের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় হইতই না। কিন্তু দূর হইতে নিঃশব্দে এই স্বল্পভাষিনী ছোট বোনটিকে মুন্সলী মনে মনে খুব ভালবাসিত। অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে অমন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বুঝিতে পাবিল নিজেব মনের সঙ্গে তাহাব বোঝাপড়া চলিতেছে।

নির্মলাকে সে বুঝিতে পারিত না, তাহাব জীবনকেও সে বুঝিত না। বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদেব মন জোঁগাইয়া, স্বামীকে কখন-বা তোষামোদ কখনও শাসন করিয়া হাতেব মুঠার মধ্যে রাখিবে। সাধারণ মেয়েদেব মত এক-গা গহনা, দিয়া কাপড়-জামা পবিত্র হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে। তা নয়, সব থাকিতেও কেমন উদাসীনের মত ভাব। সত্যি কথা বলিতে নির্মলাকে সে আদৌ বুঝিত না। তাহাব সাদাসিধা সাধারণ মনের সাহায্যে মানুষেব মনেব গভীর, সুন্দর, বিচিত্র জটিলতাময় অনেক দুঃখই সে বুঝিত না। তাহা ছাড়া অস্বাভাবিক মধ্যবিত্ত পরিবারে দিন কাটাইতে হইলে শরীর-মনেব যতটা সঙ্কোচন হয়, মুন্সলীরও তাহা হইয়াছিল। না-বুঝুক, কিন্তু নির্মলার প্রতি তাহাব এক প্রকারের স্নেহ ছিল। তাই আজ সন্ধ্যাবেলাকার খটনাগুলো মনে অলোচনা করিয়া দেখিল, জামাইবাবু হঠাৎ এত দিন পবে আসিয়াই চলিয়া গেলেন। ভিতবে ভিতরে কিছু একটা ঘটিয়াছে। কোবাব মন খাবাপ। আজ থাক। টাকার কথাটা আব দু-এক দিন পবেই তাহাকে না-হয় বলিবে। বিশেষ করিয়া জামাই বাবু কাছ হইতেই যখন টাকাটা জোগাড় কবিত হইবে তখন...। ...না এখনও সময় আছে। মুন্সলী ভাবাক্রান্ত মনে সে ঘবে আর না-চুকিয়া নিজের ঘবে চলিয়া গেল।

৩০

ইহাবই দিন দুই তিন পরে নিখিল চন্দ্রকান্ত বাবু খবর

লহিতে আসিয়াছিল। বামিনী আসে নাই। এ-বাড়িতে এখন মুন্সলী সবচেয়ে অধীর চিন্তে তাহার আগমন প্রতীক্ষা কবিতেন। নিখিলের সহিত তাহাকে না-আসিতে দেখিয়া সে জামাইবাবুর সংবাদ জানিবার জন্য নিখিলের কাছে আসিয়া বসিল, এবং মনের ব্যগ্রতায় এ-কথা সে-কথার পর আসল কথাটাই বলিয়া ফেলিল। সমস্ত ব্যাপারটা শুনিবাব পবে নিখিল কিছুকাল ভাবিয়া কহিল, ‘এ আব শব্দ কি? বামিনী ইচ্ছে কবলে দু-মিনিটেই তোমাকে হাজাব টাকা বার ক’রে দিতে পারে। আচ্ছা, এক কাজ কর না, তোমার বোনকে সঙ্গে নিয়ে আজকালের মধ্যে তার বাড়ি একবার বাও।’

এই কয়েক দিন টাকাব ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া মুন্সলী পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। সে ভাবনা একবারে তাহাব একার ভাবনা। আব কাহাকেও বলিবা বো নাই যে, দিন-দশের মধ্যে টাকাটা না-পাইলে তাহাকে জেলে বাইতে হইবে। এমন কথা কাহাব কাছে বলিবে যে, সে তহবিল ভাঙিয়াছে, চুরি করিয়াছে। নিখিলকেও ভিতরের কথা কিছু বলে নাই। কেবল বলিয়াছিল, বিশেষ কোন কাবণে তাহাব হাজারখানেক টাকার দবকার।

এখন নিখিলেব কথায়—মজ্জমান লোকে যেমন বাহা পায় তাহাকেই আঁকড়িয়া ধবে তেমনি করিয়া—অসহায় হুরে কহিল, ‘সত্যি নিখিলবাবু? যা বলছেন তা হ’তে পাবে?’

‘হবে না কেন? আপনি বাবেন অবশ্য আপনাব বোনকে নিয়ে।’

নিখিলের মনে ছিল এই উপলক্ষ্যে যদি নির্মলা তাহাব নিজের বাড়িতে গিয়া সে-বাড়ির শাসনভাব আপন হাতে তুলিয়া লব এবং আর একটি মানুষকেও তাহার শাসন-পাশে বাঁধিয়া আসে, তবে চাই কি বামিনীর জীবনের গতিটাও বদলাইয়া যাইতে পাবে।

ধর্মতলাব বামিনীর বাড়ির ঠিকানাটা দিয়া নিখিল উঠিল।

বাত তখন আটটা বাজে। মুন্সলী একটা টাক্সি আনিয়া নির্মলাকে কহিল, ‘আমার বন্ধু সতীশ কিছুক্ষণ বাবাব কাছে বসুক। তুমি একবার চল আমাব সঙ্গে, কাজ আছে।’

‘কি কাজ দাদা?’

‘এস। পথে যেতে যেতে বলব।’

মুবলী কহিল, ‘আমাব কয়েক দিনেব মধ্যে এক হাজার টাকাব দরকার। টাকাটা তুমিই চেয়ে দাও। তোমাকে তোমাব নিজেব বাড়িতেই নিবে যাচ্ছি।’

নির্মলা কিছুক্ষণ ভাবিয়া ব্যাপাবটা বুঝিল। সে আর সমতাই ভুলিয়াছিল, ভুলিতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই তুচ্ছ গহনার প্রসঙ্গ হইয়া পিতার অপমান ভোলে নাই। বিশেষতঃ বাবা এখন মৃত্যুশয্যা। বলিল, ‘ছোটদা, ওঁদের কাছে কিছু চাইতে আমার আত্মসম্মানে বাধে।’

মুবলী কহিল, ‘কিন্তু আমার সে টাকাটার এত প্রয়োজন যে, তোমার আত্মসম্মানে বাধলেও আমি চাইতে অনুরোধ করব। এর চেয়ে বেশী আব কিছু ব’লতে পারব না। এর থেকেই তুমি বুঝতে পাববে আমি কত অসহায়।’

‘আচ্ছা চল।’

তাহারা বখন ধর্ম্মতলার বাঁড়িতে পৌঁছিল তখন সে-বাড়িব আব সমস্ত ঘর অন্ধকার। কেবল বামিনীর শয়ন-কক্ষে আলো জলিতেছে। সেইমাত্র একটু আগে দেবীপ্রসাদ আসিয়া খবর দিয়া গিয়াছে শেয়ার-মার্কেটে তাহার অনেক টাকা লোকসান পড়িয়াছে। তাহার উপর সেই যে দুই-তিন দিন আগে মুহূর্ত্তেব জন্ত নির্মলাকে দেখিয়াছিল সেই হইতে বামিনীর মন অশান্ত, চঞ্চল। প্রতি নিমেষে তাহাব মনে হইতেছে সেখানে ছুটিয়া যায়, তাহাকে আর একবার দেখে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই একটা ভয়েব মত হইতেছে। ...বদি সে সমস্ত জানিতে পারে, বদি সে বুঝা কবে। তাই তাহার মনে সাহসও নাই, শাস্তিও নাই।

বামিনীব অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাহাব মহদোষ সে অতিবিস্তৃত দুর্বল। তাহাব মত ধরণের মানুষবা যদি জীবনের সফলতার সোপানে একবার উঠিতে আরম্ভ করে তবে আব কোন দিকে তাকায় না, কিছু ভাবে না; প্রকুল মনে উৎসাহে ভব কবিয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু বদি কোন কাবণে একটুখানি স্বলন হইয়া পড়ে, অমনি অন্ধকাবে তাহাদের সারা চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অবিরত ভাবিতে থাকে, ‘আমাব সব গেল, আমার সব গেল।’

বামিনীও উজ্জ্বল আলোকিত শূন্য ঘবে একা বসিয়া

গ্রাসে কি একটা পদার্থের সহিত সোড়া মিশাইতে মিশাইতে তাহাই ভাবিতেছিল। এই ভাবনার অন্ধকারে সে অল্প দিনেব চেয়ে অনেক বেশী মদ খাইবা ফেলিয়াছিল। ছয়াবের কাছে মুরলীব সঙ্গে যখন নির্মলা আসিয়া দাঁড়াইল তখন হাতের গ্রাসটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আপন মনে কি বিড়বিড় কবিয়া বকিতেছিল। গ্রাসের পানীয় মেঝেব উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তীব্র গ্যালকোহলের গন্ধে সমস্ত ঘব এবং বাহিরের হাওরাকে ভাবাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পায়ের আওয়াজ গাইয়া মুদিত চক্ষেই কহিল, ‘কি বাবা দেবীপ্রসাদ, আবার এসেছ? এবারে কি খবর মাইবি বলছি সত্যি ক’বে বল দেখি।’

নির্মলা সেই অন্ধকাব বারান্দাতে দাঁড়াইয়াই অক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, ‘ছোটদা, ও যে মাতাল! আমি ঘরে যাব না।’

ব্যাপাব দেখিয়া মুবলী নিজেও অবাক কম হয় নাই। তথাপি কহিল, ‘ভয় কি? তুমি ঘবে যাও। ওঁকে শুক্রবা ক’রে সুস্থ করাও ত দরকার। না-হয় আজ আমরা রাস্তিটা এখানেই থাকব। তা’হলে আমি একবাব কেবল বাড়িতে গিয়ে খবর দিমে আসি। আর সতীশকে ব’লে আসি, সে রাত্রিবেলায় বাবার কাছে থাকবে।’

নির্মলা মুরলীব পাঞ্জাবির খুঁট চাপিয়া ধবিল। ভীত আর্ত কণ্ঠে কহিল, ‘ছোটদা আমাব ভাবি ভয় করছে। আমার হাত-পা কাঁপছে। তুমি আমাকে এ-বাড়িতে একা ফেলে কোথাও যেও না। আমি...না না, মাতালে কি কবে ছোটদা? ও কি আমার মরবে?’

মুবলী ক্ষণকালের জন্ত নিজেব চিন্তা বিস্মৃত হইয়া নির্মলার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ‘আচ্ছা, বাড়ি ফিরে চল, কিন্তু আমি কেবল ভাবছি বোন, নিজেব স্বামীকে দেখে তোমাব এত ভয়। এব পবে দুই-তিন-রাত্রি তোমাব কাটবে কি করে?’

৩১

নিখিলেব মুখে খবর পাইয়া বামিনী অপবোধীব মত চক্রান্তেব শোকার্ত্ত বাড়ির দ্বারপ্রান্তে আসিয়া আবাব দাঁড়াইল। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে মুবলী বিব খাইবা আত্মহত্যা কবিয়াছে। কাহাকেও কোন কাবণ বলিয়া যায় নাই।

কেবল কাগজে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া গিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় সানন্দে সম্মানে এই কাজ করিয়াছে। পাশের ঘর হইতে লুপ্তিত মাতার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। ঘরে আপাদমস্তক গায়েব কাপড়ে ঢাকিয়া চন্দ্রকান্ত মুতের মত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। মাথার কাছে বালিশের উপর মুখ শুষ্কিয়া নির্মলা বসিয়া আছে। বাহিবে জুতা খুলিয়া রাখিয়া বামিনী নিঃশব্দ পদসঙ্করে পা টিপিয়া সেই আলো-অন্ধকারময় ঘবে ঢুকিল। তথাপি যেটুকু শব্দ হইল, তাহাতেই চন্দ্রকান্ত চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, ‘কে কে? সে আবার এল নাকি।’

নির্মলা মুখ তুলিল। তাহার দুই চোখেব নীচে নিকব-কৃষ্ণ পাথরের মত কালিমা। সে বলিল, ‘না না, সে ত নেই। সে ত মরে গেছে।’ বামিনী তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, ‘নির্মলা, আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর। আমাকে দয়া কর।’

সেই ক্ষীণ আলোয় কাহার চক্ষু দিয়া অজস্র জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বামিনী নিজেব অস্বাভাব্যে সেই রোদন-প্লাবিত বিবশ মস্তক দুই হাতে নিজের কাছে টানিয়া আনিল। চন্দ্রকান্ত ক্ষণকালের জন্ত চক্ষু মেলিয়া থামিয়া থামিয়া অনেক কষ্টে কহিলেন, ‘তোমাদেব এই মিলন স্থায়ী হোক, সত্য হোক। আর যেন না তোমাদের বিচ্ছেদ হয়। নির্মলা, আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলুম। আমার সংসারকে মুক্তি দিয়ে গেলুম। আমার বঞ্চিত, ব্যর্থ, অভিশপ্ত জীবনের ছায়ায় আর যেন না তোমাকে বিড়ম্বিত হ’তে হয়। এই মুক্তি তোমার জীবনে সার্থক হোক না।’

নির্মলা তাহার বুকের উপর মাথা রাখিল। চন্দ্রকান্তের নিশ্বাস যেন আরও ক্ষীণ হইয়া আসিল।

বামিনী সন্নেহে নির্মলার কক্ষ চুলের রাশির উপর হাত রাখিয়া কহিল, ‘নির্মলা, কেঁদ না। ওঠ। এখনও যে উনি বেচে আছেন। তুমি যে আমাকে ক্ষমা করলে, আমি যে তোমাকে পেলুম, তা শুঁকে ভাল ক’রে দেখে যেতে দাও।’

(সমাপ্ত)

কনে-বউ

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

নবম নরম, নীলাম্বরীটি
ময়ূরকণ্ঠী পাড়
কে জানে কে ওকে কিনি দিয়েছিল—
কি যে আনন্দ তাব!
সারাদিনটাই প’রে থাকে আর
উঠানে বেড়ায় যুব, .
ছটি পায়ে ওর কপার বাঁঝর
বাজে মনটানা সুবে।
বোনটি আমার, ভাইটি আমার
থাকে ওব কাছে কাছে;
আমি শুধু ভাবি, ‘যাব কি যাব না,
যেতে আছে কি না আছে’
লজ্জা-সরম বুঝি কি তখনও—?
তব লজ্জাই হবে,

কোন দিন আমি যেতে পারি নাই
সঙ্গীর গৌরবে।
মনটা কেবলই পিপাসিত হয়ে
ঈর্ষা জাগাত মনে,
আমি শুধু ওর খেলার সঙ্গী
হই নাই কি কাবণে!
চালাঘব থেকে জানালার ফাঁকে
আড়চোখে চোখে দেখে
ওর কথা, ওর হাসি, ওব সব
নিরেছি গায়ে মেখে,—
তবুও দেখার পিপাসা মেটে নি,
নিবন্ধনে পেলে কাছে,
আদরে সোহাগে দিয়েছি আমার
বাকিছু দেবার আছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Alfred Place W.
South Kensington.
London, S. W.

ভাবে—তাব যদি কিছু দাম থাকে সে দামের পাওনা
আমার নয়।

কল্যাণীয়েষু,

এবারকাব মডার্ন বিভিন্নিতে একটা ভুল খবর বেরিয়েছে।
যিনি আমাকে দেখলেই পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম
করেন তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ছিলেন না।
তিনি কি, ও কে, আমি বলব না, তাহলে তোমরা
কাগজে বের ক'রে দেবে। রোটেনষ্টাইন ঠিক জানতেন না
তাই আমাকে ভুল বলেছিলেন। অতএব সেটা যেন
সংশোধন করা হয়। ও সংবাদটা পড়ে আমার অত্যন্ত লজ্জা
বোধ হ'ল। ওটা কি প্রকাশ করবার যোগ্য? আমি
এ পৃথিবীতে প্রণাম বাচিয়ে চলতে চাই; যদি পাই তবে
সেটা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি নে—কেননা, ওটা কিছুতেই
আমাব পাওনা নয়। পৃথিবীতে কবিব দাবিব উচ্চ সীমা

কোলাকুলি পর্যন্ত—প্রণামের দ্বারা তার জাত যায়—আমি
কবি ছাড়া যে আর কিছু নই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহমাত্র
নেই। আমি তোমাদের স্বপ্নের সমভূমিতেই দাঁড়াতে
চাই—সেইখানেই আমাব যথার্থ স্থান—উচ্চভূমিতে আমি
সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমি তোমাদের বার-বার বলেছি আবার
বলছি—আমাকে ভুল আসনে তোমরা বসিয়ে না—
সেটা হয়ত সম্মানের আয়গা হতেও পারে কিন্তু তেমন
অনুধের আয়গা আব কিছু নেই—বে পাগড়ি মাথায় হয় না
সেই পাগড়ি পরার মত—সর্বদা মনে হয় পড়ে বাবে এবং
মাথা ধরে ওঠে। আমি তোমাদের বন্ধু, কিছু দেব, কিছু
নেব। যদি আমার ভাগ্যক্রমে দেওয়া-বিষয়ে আমার
জিত হয় তবু সে বন্ধুত্বেরই দান, হুতরাং তাব জন্তে ফিরে
আমি কিছু দাবি করব না। গুরু পদ আমার নয়, নয়, নয়।
আমি নিজে কিছু শিখি নি এবং কাউকে শেখাতেও
পারব না; আমি পৃথিবীতে সব জিনিষ যেমন ক'রে
নিষেছি তেমনি করেই দিয়েছি অর্থাৎ নিতান্ত পড়ে-পাওয়া

বার্গসোঁ সম্বন্ধে একটি চিঠি বই তোমাকে শীঘ্র পাঠাব।
সেটা ভারি চমৎকার, সহজে গুঁব মতটা ব্যাখ্যা। ক'বে দিয়েছে।
উনি যে দিকটা দেখিয়েছেন সেটা খুব চমৎকার—কিন্তু অন্য
দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করবার কোনো মানেই নেই।
গতি-তত্ত্বও যেমন সত্য, স্থিতি-তত্ত্বও তেমনি সত্য—এক
সেইজন্তেই গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই
পারি নে—সেটা কেবল মাত্র আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মায়ান নয়
—সেটা সত্য ব'লেই তার হাত আমবা এড়াতে পারি নে।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঙ

কল্যাণীয়েষু,

আজ এখানকার একটি পাড়ারগায়ে কিছুদিনের জন্তে
যাচ্ছি। সেখানে গেলে বোধ হয় একটু সময় পাওয়া বাবে।
এখানে কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। আজ তাড়াতাড়ি
তোমাদের চিঠি লিখে দিচ্ছি।

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। তোমাব সেই তর্জমার
কথা পূর্বেই লিখেছি। তুমি আমাব সেই কবিতা তর্জমাব
কথা জিজ্ঞাসা করেছ। সেগুলো এদের সকলের বিশেষ
ভাল লেগেছে সে সংবাদ এত দিনে শুনে থাকবে। তোমরা
বে-কটা দেখেছিলে তার পরে জাহাজে অনেকগুলো লিখেছি,
এখানে এসেও কম লেখা হয় নি। সবসময় বোধ হয়
একশোটা পেরিয়ে গেছে। সেই লেখাগুলো নিয়ে ইয়েটস
নর্দ্যাণ্ডি গেছেন। সেখানে বসে তিনি তার একটা
introduction লিখবেন—তার পরে ইণ্ডিয়া সোসাইটি
থেকে সেটা ছাপা হবে। সেদিন ষ্টপ্‌কোর্ড ক্রক্সের সঙ্গে
দেখা হয়েছিল। তিনি আমার লেখাগুলি manuscriptএ

পড়েছেন। এঁদের যে এইগুলো এত ভাল লাগতে পারবে সে কথা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। এঁরা মনে করছেন আমাব এই লেখাগুলি এঁদের পক্ষে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শুনে আমাব মনে খুব আনন্দ হ'ল। যখন বোলপুবে বসে দিনের পর দিন এই গানগুলি একটি একটি ক'রে লিখছিলুম তখন কল্পনাও কবতে পারতুম না এগুলো সমুদ্রপারে কারও কোন প্রয়োজনে লাগবে। এমন কি আমি নিজের কত বার মনে করেছি এবং তোমাদেরও বলেছি বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার বোধ্য নয়—এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা। আমারই প্রয়োজনে লেখা—নিতান্তই নিরলস্কার। এখন মনে হচ্ছে কেবলমাত্র নিজের জন্তে লিখলেই সেটা যথার্থ সকলের জন্তে লেখা হয়—এবং অলস্কারটা বাদ দিলেই মূল্যটা বেড়ে ওঠে। কিন্তু একথা নিয়ে তোমাদের আমি বেশী কিছু বলতে ইচ্ছে করি নে—পাছে তাতে এর মধ্যে কিছু বিকৃতি এসে পড়ে। সেই কারণেই এখানে সকলে আমাকে যে আদব জানিয়েছেন তার বিষয়ে তোমাদের বিস্তারিত ক'রে লিখতে পারি নি। এই সম্মানে তোমাদের সকলের আন্তরিক আনন্দ হবে এবং সেইটেই আমাব সকলের চেয়ে আনন্দের বিষয়—কিন্তু তৎসঙ্গেও এই ব্যাপারটাকে আমি নিজের আলোচনার ক্ষেত্র থেকে এক পাশে সবিয়ে রেখেছি।

আমার 'ডাকঘর'-টা এখানকার একটি বাঙালী ছাত্র তর্জমা করেছেন। তাব ভাষাটা অত্যন্ত বেশী আড়ম্বর-বিশিষ্ট হয়েছিল—আমাকে আবার সেটা অনেক পরিমাণে নবম ক'রে আনতে হয়েছে—তবুও মনের মত হয় নি। রোটেনষ্টাইন এইটে পড়ে আনন্দিত হয়েছেন। তিনি বলছেন অক্টোবরে এটা তিনি ষ্টেজ সোসাইটিকে দিয়ে অভিনয় করাবার ব্যবস্থা করবেন।

আমার শান্তিনিকেতন থেকে কতকগুলি প্যারাগ্রাফের মত বেছে নিয়ে আমি তর্জমা করবাব চেষ্টায় আছি। আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে বোধ হচ্ছে এগুলো এঁদের বিশেষ কাজে লাগতে পারে। তুমি তোমার অবশ্য মত কিছু কিছু তর্জমা পাঠিয়ে দিলে এঁদের হাতে দেওয়া যেতে পারবে।

এখানকার একজন নাট্যকার—তাঁর নাম 'Calderon', আমার দালিয়া গল্পটা থেকে একটি ছোট্ট নাটক লিখেছেন। সেটা সেদিন অভিনয় হয়ে গেছে। দর্শকদের ভাল লেগেছিল। পড়তে বোধ হয় আমাদের বিশেষ মনোহর হবে না। কাবণ, তাব মধ্যে যথেষ্ট বিলিতি গন্ধ আছে। তাতে আমি একটি ছোট্ট গান লিখে দিয়েছিলুম, সুরও আমার। এই প্রথম কবিতায় লেখবাব চেষ্টা।

কিন্তু আজ আমার আর সময় হবে না। সকালেই ট্রেন ছাড়বে—এখনও জিনিষপত্র গোছানো হয় নি।

ছেলেদের সকলকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে। তাদের কথা আমার সর্বদাই মনে হয় এবং মনে হলেই শব্দীবাটা-হৃদ তদভিমুখে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ঠিকানায চিঠি দিও
21, Cromwell Road
South Kensington
London, S. W.
২৬শে ভাদ্র, ১৩১২

কল্যাণীয়েষু,

অজিত, এবাবকার মেলে তোমাদের জন্তে কিছু লিখে পাঠাতে সময় পেলুম না। কুমারস্বামীব ইংবেজ স্ত্রী কতকগুলি ভাবতবর্ষীয় গান লিখেছেন, সেগুলি নোটেশন ক'রে ছাপাচ্ছেন, কুমারস্বামী তাব লগ্না ভূমিকা লিখেছেন; আমাকে তার একটি ছোট মুখবন্ধ ক'রে দেবাব জন্তে ধরেছেন; সেইটে আমাকে লিখতে হ'ল। কুমারস্বামীব স্ত্রীব গান একদিন শুনতে গিয়েছিলুম। তিনি তানপুরা কোলে নিয়ে এমনি দিশি ধরণে তাল মান লয়ে গান করলেন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কানাড়া প্রভৃতি খুব ভাবি সুরে রীতিমত মীড় দিয়ে গাইলেন—সে আমাদের ওস্তাদের চেয়ে ভাল বই ধারাপ নয়। আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধ হয় কমে এসেছে; সেটা ঠিক হবে না; ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনে বাইরের প্রাপ্তবল্লী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি

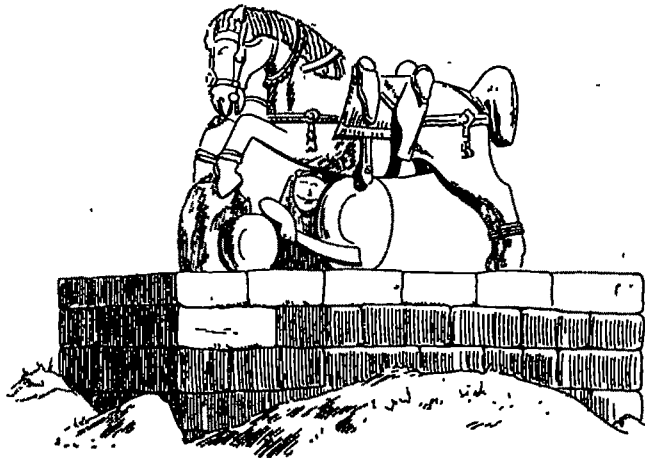
ক'রে তোলে তেমনি গানও জীবনকে হৃদয় ক'বে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান। এতে ক'রে ওদের জীবনের প্রাচীরে একটা বড় জানলা খুলে দেওয়া হচ্ছে ; সেইখান দিয়ে নন্দনের গন্ধ নিয়ে দক্ষিণের হাওয়া ওদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ কববার পথ পাবে। ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয় কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়। কিছু বেতন দিয়ে একজন গাইয়ে যদি তোমরা জোগাড় করতে পার ত মন্দ হয় না।

কতক-বা ব্যক্তিগত কতক-বা অজ্ঞাত নানা কারণে তোমাদের অনেকের মনে আমার আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিধা লক্ষণ দেখেছিলুম। এ সব কাজে জোর করা চলে না, বার বেটা পছা তার সেই দিকেই জীবন নিয়োগ করতে হবে। তোমাদের সেদিকে যদি বাধা থাকে তাহলে কোনো কথা বলবার নেই। কিন্তু যদি মনের কোথাও কোন ব্যক্তিগত কাঁটা বিষ বটাচ্ছে মনে হয় তাহলে সেটাকে উৎপাটিত করে ফেলাই বার্থ পৌরুষ হবে। বড় কান্দেব একটা সার্থকতাই এই তাকে সাধন কবতে গেলে পদে পদে নিজের ক্ষুদ্রতাগুলো ধবা পড়ে এবং কেবলমাত্র বড় কাজ করবার বেগেই সেগুলো বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে। আমরা নিজের দৈন্ত বাইরের অবস্থার উপর আবোপ কবি। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদেই এ পর্য্যন্ত কোনো মহৎ সঙ্কল্প আপনার সম্মুখে সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থা পায় নি। আমাদের

বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বার-বার আমরা দেখে আসছি, প্রতিকূলতার আনুহ্যই সব চেয়ে সত্য,—যখনই সমস্ত সহজ হয়েছে যখনই মনে করেছি এইবার চোক বুজে চলব তখনই একটা-না-একটা বড় ঠেকার ঠেকেতে হয়েছে। কিন্তু এ কথাটা অত্যন্ত পুরাতন—এত কবে এটা বলবার দরকার নেই। কোনো সঙ্কল্পের মহত্ব যখন আমরা বার্থভাবে উপলব্ধি করি তখন অন্তরের মধ্যে যে আনন্দ পাই সেই আনন্দের প্রবল বেগেই আমাদের পৌরুষ আপনি ক্ষান্ত হয়ে ওঠে—তখন সামনে ছোট-বড় কোনো বাধা দেখে মনের মধ্যে কোনো কুঠা আসতেই গারে না। সেই আনন্দের দ্বারা আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। সেই আনন্দের অভাবেই আমরা আপনাকে প্রচুররূপে দান করতে পাবছি নে, ত্যাগ করতে পারছি নে ; আমবা সমস্ত বাধাকেই বড় ক'বে দেখছি। বার আছে সেই পায়, বাইবেলের। এই কথাটা খুবই সত্য। যে পেয়েছে সেই পাচ্ছে। যেখানে আমাদের দৈন্ত আছে সেইখানেই সেটা মোচন হওয়া কঠিন। দৈন্ত আপনার শূন্যতা পূরণ করবার পক্ষে আপনিই সব চেয়ে বড় বাধা—নিজের জীবনে এইটেই বরাবর দেখে আসছি। জীবনের একটা জায়গায় যেখানে ঐশ্বর্য্যের পথ মুক্ত হয় সব জায়গাতেই সেখানে দৈন্তের বাধা শিথিল হ'তে থাকে।

তোমাদের

ব্রহ্মসূত্রের ঠাকুর



সুইডিশ সাহিত্য

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

স্কান্ডিনেভিয়াব অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের, সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যসমাজে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিষাছে। ইবসেন, হামসুন, ষ্ট্রীণ্ডবের্গ, ল্যাংগেরলফ, কার্লফেল্ডট প্রমুখ নামজাদা সাহিত্যকর্মে লেখার সঙ্গে সকল সভ্যদেশের সাহিত্যাহরাগী পার্শ্বকমণ্ডলীই কমবেশী পবিচিত। বিশেষ কোন দেশের সাহিত্যের প্রগতির আলোচনা করিতে হইলে সেই দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে ও প্রকৃতির পরিচয় লওয়া প্রয়োজন, তাহা না জানিলে সেই দেশের সাহিত্যের পূর্ণরূপ উপলব্ধি করা কঠিন। এই প্রবন্ধে ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব পর্যন্ত বিগত অর্ধশতাব্দীর সুইডিশ সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইডিশ সাহিত্যে বড় দুর্দিন ঘনাইয়া আসে। ইহাব পূর্ববর্তী কালে রাজা তৃতীয় গোস্তাভের রাজত্বকালে সুইডিশ সাহিত্য-গগন মধ্যাহ্ন-কিরণে সমুজ্জ্বল। তৃতীয় গোস্তাভ শুধু সাহিত্যমোদী ছিলেন না, তখনকার নাটক, গান, আর্ট, কবিতা ও কবিদের প্রধান অনুরাগী ও পবিপোষক ছিলেন। রাজপ্রাসাদ তখন কবিশ্রেষ্ঠ বেলমানের গানে মুগ্ধিত। বেলমান স্কান্ডিনেভিয়ার ঊনবিংশ শতাব্দীর অমর কবি ও গায়ক। তাঁহার গান না-জানে, এমন একটি লোকও সমস্ত সুইডেনে খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। নেপলিয়নের যুদ্ধের বিভীষিকার পব সাহিত্য-গগনে কবি বেলমানেব উদয় হয়। কবির ভাষায় বলিতে গেলে, বেলমানের কবিতার ছন্দে ও গানের সুরে অতি সহজ সরলভাবে দেশের ও সমাজের চিত্র বাঁধা পড়িয়াছে, তাহাতে দেশের চিত্র মুক্তিলাভ করিষাছে। বেলমানেব পর স্কান্ডিনেভিয়ার সাহিত্যে জার্মান-দেশীয় ভাবসম্পদ ও রোমাণ্টিকম আপন প্রভাব বিস্তার করিতে আবিস্ত কবে। তখনকার খ্যাতনামা সাহিত্যিক এসাইস টেগনের (Esais

Tegner)। তিনি বোমাস্টিক ভাবধারার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার প্রধান সাহিত্যিক রচনা 'ফ্রিটিফ সাগা' (Fritiof Saga)। সাহিত্য-নদীতে এই নূতন বস্তাব সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও নানা পরিবর্তন আসে। স্কান্ডিনেভিয়ার পৃথক তিন অঙ্গ-তখন একত্রীভূত এবং স্কান্ডিনেভিয়ানিজম তখনকার সাহিত্যের মূলমন্ত্র। সেই যুগের আর এক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ফ্রিড্রিখ হুইড, বোহান লোডভিক বোনেবের্গ (Johan Ludvik Runeborg)। "লেক্টেজেন্ট ষ্টোলেব কাহিনী" লিখিয়া তিনি সুইডিশ সাহিত্যে আপনার স্থান অক্ষর করিয়া বাখিষা গিরাছেন। ১৮০৮-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কশিয়ার বিপুল সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে ফিনল্যান্ডের নগণ্য সৈন্তদের যুদ্ধ ও ইহাদের বীরত্ব-কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

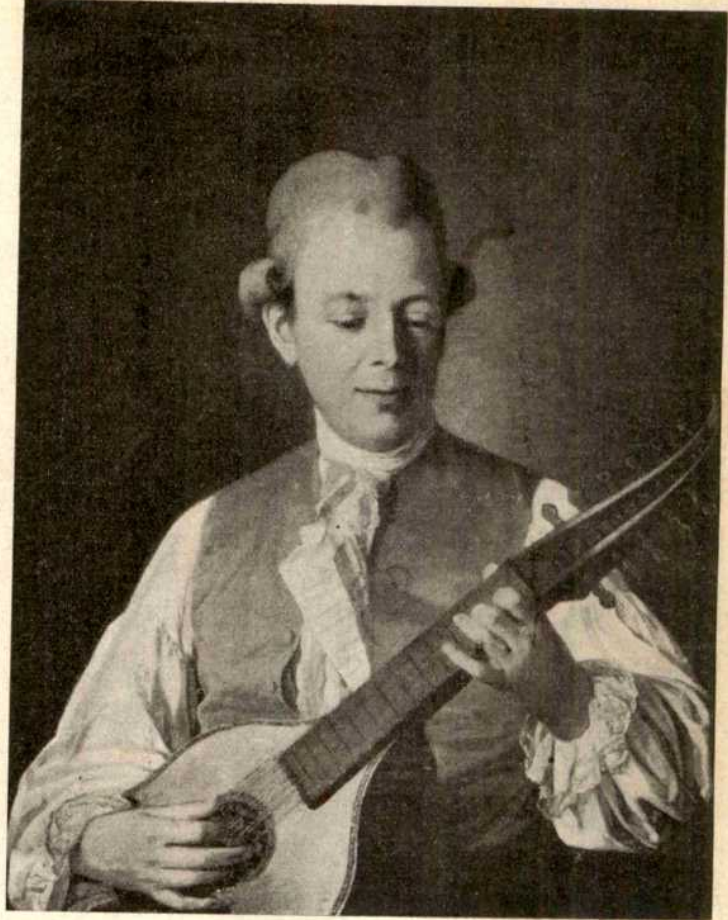
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোনেবের্গ পবলোকগমন করেন, এই সময়ে লিবার্যালিজম দেশের রাজনীতিতে আপন আধিপত্য বিস্তার কবে; কলে পালেমেণ্টের আইনকানুনেব নূতন সংস্কার সাধিত হয়। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা উক্ত পবিবর্তনের ফলে বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে, কিন্তু অন্তরিক্ত বাহিবেব রাজনীতিক্ষেত্রে দেশে ক্রমাগত পরাজিত হইতে থাকে। বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া কার্যতঃ কোন বাধা না পাইয়া ডেনমার্কের কতক অংশ দখল করে। ইউরোপীয়ালিজম পূর্ণগতিতে দেশে প্রবেশ করিতে থাকে। দেশে নূতন নূতন সমস্তার উদ্ভব হয় ও ইহাদের সমাধান-চিন্তা দেশের চিন্তকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিষা বাধে। এইভাবে লিবার্যালিজম ও আদর্শবাদ যুগের এক বকম অবসান ঘটে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পববর্তী সময়ে পক্ষান্তরে বাহিরের জগতেব সঙ্গ মেলামেশা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশীয় ভাবধারা ও মতবাদ দেশে অবাধ গতিতে প্রবেশ করিতে থাকে।

নূতন ভাবধারা অনেক সময়ে সামাজিক প্রচলিত রীতি-নীতিকে ওলটপালট করিয়া দেয়, অথচ নিজকে কোন রূপ দিতে পারে না। ফলতঃ সমস্ত স্কান্ডিনেভিয়ার সাহিত্য-জীবনের অবস্থা তখন ঐ প্রকার। ইংলণ্ড হইতে ডার্কইনবাদ ও স্পেনসারের ক্রমবিবর্তনবাদ, ফরাসীদেশ হইতে কোঁতের (Comte) পজিটিভিজম্, জার্মানী হইতে শোপেনহাওয়ারের (Schopenhauer) দুঃখবাদ ও নিট্শের (Nietzsche) মতবাদ সমস্ত স্কান্ডিনেভিয়ার সাহিত্য-চিত্তকে গত ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ক পর্য্যন্ত দখল করিয়া রাখে।

উক্ত মতবাদসমূহ প্রথমে নরওয়েতে প্রতিপত্তি ও বিকাশ লাভ করিতে আরম্ভ করে। হেনরিক ইবসেন সেই যুগের অগ্রণী সাহিত্য-পুরোহিত। ইবসেনকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যিক দলের অভ্যুদয় হয় তাঁহারা সকলেই দেশের আভিজাত্যের আঁচলে ঘেরা সামাজিক পক্ষিলতাকে

সাহসের সহিত সাহিত্যের মধ্য দিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করেন। ইবসেনের 'ব্রাণ্ড' (Brand) নামক নাটকে তখনকার সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। 'ব্রাণ্ড' তখনকার নবীন সাহিত্যসমাজের নিকট বাইবেল-স্বরূপ। এই ট্রাজেডির প্রধান বক্তব্যঃ—সকল প্রকার সামাজিক অসত্য ও চাটুকারিতার বিরুদ্ধে নৈতিক যুদ্ধবোধণা এবং সত্যের ধাতারে ও কর্তব্যপালনের জ্ঞান আয়বিসর্জন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে ডেনমার্ক হইতে সহস্রা নূতন সুর প্রতিধ্বনিত হয়। গের্গ ব্রাণ্ডেস (Georg Brandes) প্রচলিত রোমান্টিসিজম্কে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেন এবং টাইনে ও জোলার (Taine and Zola) পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সাহিত্যে আমূল



সুইডেনের কবিগুরু বেলমান

পরিবর্তনবাদের (Radicalism) বস্ত্র আনিতে চেষ্টা করেন।

উপরিউক্ত ঘটনাবল মতবিপ্লব কিন্তু তখনকার প্রচলিত সাহিত্যধারাকে একেবারে নিম্নূল করিয়া দিতে পারে নাই। এই মতবিপ্লবের দিনে সাহিত্যতরীর কাণ্ডারীর পদে অধিষ্ঠিত হন দার্শনিক সাহিত্যিক ভিক্টর রিডবের্গ (Victor Rydberg)। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও লেখায় সাময়িক বহু মতবাদ সামঞ্জস্য ও ঐক্য লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর সকল সাহিত্য-ভাবধারা, যথা, রোমান্টিসিজম্, প্রেটোর আদর্শবাদিতা, গথিসিজম্, লিবার্যালিজম্ প্রভৃতির সময়স্রাৱ সাধন করিয়া তিনি তখনকার সাহিত্যে পূর্ণতা দান করেন। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমের

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সমগ্রামূলক ভাবধারার সৃষ্টি হয়, সে-সম্বন্ধেও রিডবের্গকে ক্রমে ক্রমে নিজের মত ব্যক্ত করিতে হয়। সার্বজনীনতা ও ঐক্য রিডবের্গের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

রিডবের্গের পরে সাহিত্যক্ষেত্রে ষ্ট্রাণ্ডবের্গ আবির্ভূত হন। তাঁহার আগমন যেন আগুনের ফুল্লীর মত। ব্যক্তিত্বে ও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একেবারে নূতন রকমের। ষ্ট্রাণ্ডবের্গ কে?



রোমান্টিক সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এসাইস টেগনের

তিনি নিজেকে চাকরাণীর সন্তান* বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার বিদ্রোহী মতবাদ সম্বন্ধে প্রথমেই রহস্যজনক ধারণা পাঠকের মনকে বিচলিত ও আকৃষ্ট করে। প্রধান শহর ষ্টুকহলমের স্বল্প আয়ের এক অভিজাত পরিবারে “অকারণ ভীতি ও নীরব অনশন-অর্দ্ধাশনে”র মধ্যে তিনি বড় হইয়াছিলেন। ফলে বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাকে দৃষ্ণার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছিলেন। ষ্ট্রাণ্ডবের্গের সাহিত্য-

* “চাকরাণীর সন্তান” নামক পুস্তকে তিনি নিজের জীবনের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

জীবনের তুলনা দেওয়া কঠিন। মনে হয় যেন তিনি মজুরশ্রেণীর লোকদের ছঃসহ জীবনের ছঃথকে লোকের চক্ষে ধরাইয়া দিবার জন্ত কলম ধরিয়াছিলেন; বোধ হয়, তিনি সাম্যবাদ প্রচারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন;



প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ফিন হাইড রোনেবের্গ

আবার অনেকের পক্ষে ইহাও মনে করা সহজ, যে, তিনি সামাজিক সকল ব্যবস্থা ও রীতিনীতিতে অশ্রদ্ধাবান অভিজাতশ্রেণীর লেখক এবং নিট্শের চিন্তা-ধারার অনুগামী। এইরূপ মত তিনি তাঁহার “সমুদ্র-তীরে” নামক রোমান্সের নায়কের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে প্রচলিত রীতিনীতি ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি-বুদ্ধির অবতারণা করা হইয়াছে।

তাঁহার জীবনী পড়িলে মনে প্রশ্ন উঠে, তিনি কি ভগবান ও তাঁহার সৃষ্ট সকল-কিছুতেই অবিধ্বাসী ছিলেন? ধর্ম্মনৈতিক জীবনে বা-কিছু পবিত্র বলিয়া পরিগণিত, সেই সমস্তকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পদদলিত করাই কি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল?



স্বানডিনেভিয়ার অমর কবি ইবসেন

তিনি অপ্রিয় সত্যের উদ্ঘাটন করার ভার লইয়াছিলেন বলিলেও তাঁহার সঙ্কে সমস্ত বলা হয় না। স্বদেশে ঈশ্বরবাদীদের নিকট ঈগুবের্গে আত্মার অশান্তিতে রুগ্ন পুরুষ বলিয়া বিবেচিত; তাঁহাদের মতে তিনি যে ভগবৎ শক্তিকে সারাজীবন অপমান অসম্মান দেখাইয়াছেন, সেই শক্তির নিকটই তিনি অবশেষে অলক্ষিত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এক সমালোচক ঈগুবের্গের সঙ্কে বলিয়াছেন যে, তিনি (ঈগুবের্গ) বহুদর্শী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনে ক্রমাগত ভাবপরিবর্তন হইয়াছিল, তিনি কোন ভাবই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন নাই।

‘মাষ্টার ওলভ’ নামক নাটকখানা তিনি তেইশ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, সন্দেহ-জালে জড়িত নিজের চিন্তা ও অহুভূতির মধ্যে কি দারুণ

দ্বন্দ্ব! একদিকে ভগবৎ-শক্তিতে বিশ্বাস, জীবনে কর্তব্যের ডাক, দান-ধর্ম, আশা-নিরাশা, অপর দিকে সত্যের বার্থ স্বরূপ সঙ্কে সন্দেহমূলক নানা ব্যাখ্যা ও সভ্যতার আবর্তনে মানুষের ক্রমমুক্তি এই নাটকের প্রধান বিষয়। ইহার নায়ক-নায়িকা ঐতিহাসিক হইলেও চক্ষের সম্মুখে এখনও অতি-জীবন্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

“রেড রুম” (লাল কক্ষ) অতি উচুদরের রোমান্স। ইহাতে প্রকারান্তরে সামাজিক অবস্থার সমালোচনা করা



দার্শনিক সাহিত্যিক ভিক্টর স্ট্রিন্ডবের্গ

হইয়াছে। ভদ্রতার কৃত্রিমতার চাক্ষ সামাজিক বর্ধরতাকে তিনি এমন ভাবে আঁকিয়াছেন, যে, ইহাকে প্রায় সমাজের কলঙ্ক-কাহিনী বলা চলে। ভদ্রতার মুখোশ-পরা সামাজিক আদান-প্রদানে, অফিসারদের ব্যবহারিক জীবনে, রাজনীতিতে, সাংবাদিকতায়, সাহিত্যে, শিল্পে সর্বত্রই তিনি শুধু লুকাচুরি লক্ষ্য করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি ষ্টকহলম ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী সহস্রাধিক দ্বীপ বা দ্বীপোদ্যান, হ্রদ, সমুদ্র, বন, পশুপক্ষী সঙ্কে যে-বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

তাঁহার প্রথম বয়সের লেখাতেই খ্রীষ্টাতির সঙ্কে অবিশ্বাসের ভাব ধরা পড়ে। তখনকার আদর্শ রোমান্টিক



স্বনামখ্যাত আগস্টিনী ওবের্গ

প্রেমের গোড়ায় তিনি দুর্নীতির গন্ধ পাইয়াছেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত জীবনের মাঝখানে হঠাৎ এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে; নিজের বিবাহিত জীবনের মধ্যে অশান্তি আসিয়া পড়ে। গৃহমধ্যে স্ত্রীর সখীদের অবাধ গতি এবং তাহাদের অসার গল্পগুজব তাঁহার উত্তেজনা-প্রবণ মনকে অস্থির করিয়া তুলে। মেয়েদের প্রভাব তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। “বিবাহ” শীর্ষক উপন্যাসগুলিতে তাঁহার তখনকার মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ‘পৌরুষের প্রতিদান’ উপন্যাসখানি বিজ্ঞপাত্তক রসিকতায় পরিপূর্ণ। ‘প্রেম ও তৃণগন্ধ’ উপন্যাসখানায় তিনি কতকটা ইবসেনের ডল্‌স্‌ হাউসের (Doll’s House) অনুকরণে ব্যঙ্গ-রসিকতার দ্বারা প্রোফ্‌ কুমার দেবাসের (Devas) পক্ষ লইয়া ঔদাহিক সঘন্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই, যে, পুরুষ-নারীর ভালবাসা শুধু রোমান্সে গঠিত নহে, তাহা আর্থিক সচ্ছলতা ও দৈহিক আকর্ষণের আবেষ্টনে আবদ্ধ; পুরুষ-নারীর প্রেম শুধু মানবদের জন্তই—স্বর্গের

দেবতাদের জন্ত নহে। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে নারী-প্রেমের উপর বিজ্ঞপ এত বেশী যে তাহাতে রচনা-সৌষ্ঠবের হানি হইয়াছে। ইহার পরের রচনায় স্ট্রীওবের্গের এই মনোভাব একেবারে উদ্দাম হইয়া ফুটিয়াছে, “পিতা” ও “মৃত্যুহতা” নাটক দুইখানা ইহার চরম দৃষ্টান্ত। এই উভয় বিয়োগাত্মক নাটক পাঠক ও দর্শকের মনকে গভীর ভাবে আলোড়িত করে।



কবি কার্ল হেফেলডর্গ

একটি রচনায় তিনি খ্রীষ্টিয় উপাসনা-রীতিকে অত্যন্ত বাস্তবহুৱে সমালোচনা করেন। ফলে সমাজ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায় এবং ইহার প্রতিশোধও লয়। কিন্তু সমাজের আক্রোশ তাঁহার মনের উত্তেজনাকে আরও বাড়াইয়া তোলে, “দি ফেটস্‌ এণ্ড অ্যাডভেঞ্চার অফ্‌ সুইডস্‌” (The Fates and Adventure of Swedes) লিখিয়া তিনি সমাজকে প্রতিআক্রমণ করেন। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে ক্রমশঃ ও বাকুলের মতবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। অনেকের মতে স্ট্রীওবের্গ

তখন স্নায়বিক উত্তেজনায় কাতর। আশ্চর্যের বিষয়, ষ্ট্রীণ্ডবের্গ যখন নিজের বিবাহ-বন্ধনকে ছেদন করিবার চেষ্টায় রত এবং তাঁহার মানসিক অশান্তি প্রবল, তখন তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে অতি উচ্চ ধরনের “হেমগ্লোবাসী” রোমাঞ্চ থানা রচনা করেন, নিতান্ত অ-রোমাঞ্চিক ভাবে হেমগ্লো-দ্বীপবাসী কৃষক ও মৎস্যজীবীদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, দ্বীপের চারিদিকে সমুদ্রের গর্জন, জলের কলকল শব্দ—এক কথায় দ্বীপের চিত্র



সেলমা ল্যাগেরলফ

এমন নিখুঁত ভাবে আঁকিয়াছেন, যে, বইখানা পড়িয়া শেব করিলে মনে হয় এই দ্বীপ ও দ্বীপবাসীদিগকে এ-দেশের কোন সাহিত্যিকই তাঁহার মত প্রাণ দিয়া অলংবাসিতে পারেন নাই। পরবর্তী বৎসরে তিনি আপনাকে নিউশের ভক্ত বলিয়া প্রচার করেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মবিশ্বাস প্রবলভাবে বাড়িতে থাকে। এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসপরাগততা তাঁহার ছুঁয়োগের দিন ঘনাইয়া আনিতেছে বলিয়া দেশের লোকের মনে ভয় জাগাইয়াছিল। কায়িক, মানসিক, বিশেষভাবে সন্দেহবাদ



ভেনার ভন্ হেইডেনষ্টাম

রোগে ও বিবেক-ভৎসনায় জড়িত হইয়া ষ্ট্রীণ্ডবের্গ অবশেষে ধর্ম্যচিন্তার মধ্যে শান্তি খুঁজিবার চেষ্টায় রত হন। তাঁহার ধর্মমত অবশ্য ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলে না; তাঁহার মতে মানুষের সকল প্রকার কাজ অদৃশ্য শক্তির হাতে রহিয়াছে; কুকার, কুকার্ম বা অধর্ম্য নিজেই নিজের শাস্তি বিধান করিয়া বিবেকের আলো জ্বলাইয়া দেয়। এই মত অনুসরণ করিয়া তিনি বর্তমান সুইডেনের জন্মদাতা বীর রাজা “গোস্তাভাসা” নাটকখানা রচনা করেন। এই নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে তিনি গোস্তাভাসার চিত্রকে অতি জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন।

ষ্ট্রীণ্ডবের্গের সাহিত্য ও ব্যক্তিগত জীবন এইভাবে শেব পরিণতি লাভ করে। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নানা সমালোচকের নানা মত থাকিলেও এক বিষয়ে তাঁহার স্বদেশবাসীরা একমত, যে, তিনি সুইডিস্ ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে নূতন করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন।



রাজা দ্বাদশ কাল

নাট্যকার হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ সাহিত্যিক আজ পর্য্যন্ত স্কান্ডিনেভিয়ায় কেহ জন্মান নাই।

ষ্ট্রাওবের্গের জীবিতাস্থায় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এক দল নবীন লেখকের অভ্যুত্থান হয়। তাঁহারা নিজের দলকে নবীন সুইডেন বলিয়া অভিহিত করেন। রোমান্সিজমের কেন্দ্র প্রধান শহর ষ্টকহলম্ ও বিশ্ববিদ্যালয়-শহরগুলি তাঁহাদের আক্রমণের বিষয়। এই দলের অধিকাংশ সাহিত্যিকই সাংবাদিক ও মহিলা। এই নূতন সাহিত্যের ভিত্তি পজিটিভিজম্। অনেকটা ইবসেনের অনুকরণে এই যুগের সাহিত্যে, সমাজে, ব্যক্তিগত

জীবনে সত্যতা, জায়, কর্তব্যপরায়ণতা ও জীবনের সকল স্তরে আদর্শের সামঞ্জস্য রক্ষার দাবি বড় করিয়া ধরা হইয়াছে। ফলতঃ, এই সময়েই নানা প্রকার সামাজিক সমস্তার আলোচনায় দেশের চিত্র ব্যাপ্ত। একরূপ সময়ে সাধারণতঃ অন্ত্রাত্ম ক্ষেত্রে বাহ্য বটম্মা থাকে, সুইডেনের সাহিত্যজীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল; অর্থাৎ নানা মত ও মতবিশেষের আলোচনায় সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি নানা প্রকারে বাধা পাইয়াছে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ



ওস্কার লেভেরটিন

তখন প্রশস্ত হয়। মহিলা-পাঠকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। নারীরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী ও সমস্তা-সম্পর্কীয় সাহিত্যের জন্ত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করে। নারী-সমস্তা সমাধানে নারীরাই অগ্রসর হয়। ফলে মহিলা-সাহিত্যে—নবেলে, রোমান্সে—পুরুষজাতির উপর আক্রমণ চলে। পুরুষদের কাপুরুষতা, মেয়েদের প্রতি তাচ্ছিল্য, দুর্নীতি, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অবিচার সাহিত্যে বড় করিয়া ধরা হয়।

সাহিত্যে ষ্ট্রাওবের্গের আসন অক্ষয় হইলেও তিনি সাহিত্যকে কোন বিশেষ পথে চালাইতে চেষ্টা করেন নাই। সেজন্য সাহিত্য-তরীর হালে গোস্তাভ অফ যেইজেরষ্টাম্ (Gustav af Geijerstam) আবির্ভূত হন। কিন্তু তাঁহার রচনা উদুদরের হইলেও গুরু পদে অধিষ্ঠিত হইবার মত প্রতিভা তাঁহার ছিল না। তাঁহার প্রসিদ্ধ লেখার অধিকাংশই গল্প, গ্রাম্য কৃষকশ্রেণী ও মৎস্যজীবীদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র। লোক-চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার স্বভাবদত্ত ক্ষমতা খুব গভীর। যৌবনে তিনি অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেন, কিন্তু শেষ বয়সে সেই সমাজেরই এক জন সাধারণ লেখক হিসাবে পরিগণিত হন।

তদানীন্তন মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে য়াহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আনে চারলত্তে লেফ্লোর (Anne Charlotte Leffler) ও ভিক্টোরিয়া বেনেডিকসনের (Victoria Benedicsson) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ উত্তোক্তা; উভয়েই সাহিত্য-জীবনের প্রথম ভাগে অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের নির্মম কঠোরতা ও প্রচলিত মিথ্যাবাদকে—বিশেষ করিয়া বিবাহসম্পর্কে ও দাম্পত্য জীবনে, পুরুষদের স্বেচ্ছাচারকে আক্রমণ করেন। উভয়েই নানা গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া গৃহচিত্র নিপুণভাবে আঁকিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দুই জনের জীবনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ বর্তমান। লেফ্লোর ষ্টকহলমে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ও রাশীকৃত পুস্তকের মধ্যে সকল সমস্তা পাঠ করিয়াছিলেন। পরে ইটালীর এক জন ডিউককে স্বামীরূপে বরণ করিয়া অল্প বয়সেই মারা যান।

বেনেডিকসন (ছদ্মনাম এর্নষ্ট আলগ্রেণ, Ernst Ahlgren) দক্ষিণ সুইডেনের স্কোনে প্রদেশের এক গ্রামপ্রান্তে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দুর্গতিপূর্ণ ছিল। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই। পারিবারিক দুঃখ-হৃদশা ও অনশনে তাঁহার মনে অনেক সময় আত্মঘাতিনী হইবার সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিত। কিন্তু অল্প বয়স হইতেই স্বাবলম্বীভাবে তিনি নিজকে শিক্ষা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অনেক সামাজিক চিত্র ও গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ফ্রু মারিয়ানে” (Fri Marianne) ও “অর্থ” (Money)। প্রথমখানি বাহির হইবার পর কোপনহেগেনের প্রসিদ্ধ “পলিটিকেন” (Politiken) কাগজে নামজাদা সমালোচক গের্গ ব্রাণ্ডেস ইহার প্রতিকূল সমালোচনা করেন। আলগ্রেণ নিজে ব্রাণ্ডেসের ভক্ত ছিলেন; সেই জন্য সমালোচনাটি তাঁহার জীবনে বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিল। বেনেডিকসন বনাম আলগ্রেণের জীবনী সুইডেনের অন্ততম মহিলা সাহিত্যিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ এলেন কেই (Ellen Key) লিখিয়া গিয়াছেন। সেই যুগের প্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিকদের কেহ কেহ অকালে মারা যান এবং অনেকে কঠোর সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

বেশী দিন বাইতে-না-বাইতেই সাহিত্যের ধারা আবার প্রাচীন পথে বহিতে শুরু করে। রোমান্টিসিজম্ হঠাৎ স্বাভাবিকতার বাঁধ ভাঙিয়া বক্তা-প্রবাহের মত সাহিত্যে প্রবেশ করে। ইহার কারণ সম্বন্ধে সমালোচকদের মত এই যে, নীরস বস্তুতান্ত্রিকতা সুইডিশ-চরিত্রে থাপ থায় না। সুইডিশ-মন ভাবুক, গীতি-কবিতায় তাহার স্বপ্রকাশ স্বাভাবিক, সত্য ও সহজ। পূর্বকার রোমান্টিক যুগে সাহিত্যিকগণ কল্পনাবলে রচনার খোরাক আহরণ করিতেন, কিন্তু পরবর্তী রোমান্টিক সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে আপন ঘরে, আপন দেশের মাটির রসে ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। গত যুগের রক্তমাংসহীন আদর্শবাদিতা সুইডিশ-সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করে। বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী এই সময়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। বহির্জগতের সঙ্গে তাঁহাদের এই সংস্পর্শ সুইডিশ গীতি-কবিতা ও চিত্রশিল্পকে নানাভাবে সম্পদশালী করিয়াছে। ইহার ফল সুইডেনে দুই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বাহিরের জগতের সংস্পর্শে আসিয়া সুইডিশ সাহিত্যিক ও শিল্পীগণ নিজেদের ও জাতীয় ঐতিহাসিক সম্পদের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হন; দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যে প্রাদেশিকতা স্থান লাভ করে। অবশ্য উক্ত প্রাদেশিকতা রাজ-নৈতিক প্রাদেশিকতা নহে—প্রতি প্রদেশের বিশেষত্ব, যথা—ঐতিহাসিক ও সামাজিক কীর্তি ও রীতিনীতিকে সাহিত্যে চিত্রিত করিয়া পূর্বপুরুষদের কথা জাগরুক

রাখিবার চেষ্টা চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সাহিত্যে বহু ঐতিহাসিক চরিত্র ও তথ্যের আলোচনা হয়। ঐতিহাসিক সাহিত্যিকগণ বীর রাজা দ্বাদশ কাল, কবি-রাজা তৃতীয় গোস্বামীর রাজত্বকালের ঘটনাবলি স্মৃতি-গুলিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া একত্র করেন; ফলে তখন দেশে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান হয়। একই সময়ে ষ্টকহলমে “স্কানসেন” (Skansen) ও “নরডিস্কা মিউজিয়াম” প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কানসেন ষ্টকহলমের এক কোণে এক দ্বীপের মুক্তপ্রকৃতির কোলে সকল প্রাদেশীয় প্রাচীন গ্রাম্য সভ্যতার স্মৃতিগুলিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং শেষোক্ত মিউজিয়ামে বা বাতুঘরে প্রাচীন স্কানডিনেভিয়ার সভ্যতার সকল প্রকার স্মারক বস্তু রক্ষিত আছে। বলা বাহুল্য, ইণ্ডোইয়ালিজমের প্রভাবে প্রাচীন গ্রাম্য সভ্যতার রূপ তখন দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইতেছিল। কবি কার্লফেল্ডটের (Karlfeldt) কবিতায় ও লেখিকা ল্যাগেরলফের রচনায় অতীতের সামাজিক চিত্র চিরনূতন হইয়া উঠে। বস্তুতঃ, এই সময়ে প্রায় সকল প্রদেশেই সাহিত্যিকের জন্ম হয় এবং কম-বেশী সকল লেখকই নিজেদের প্রদেশের গ্রাম্য জীবন ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে সকল প্রকার রং দিয়া আঁকিয়াছেন।

ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পূর্ববর্তী সময় হইতে বিভিন্ন। ধর্মবিধাসের প্রতি সাহিত্য অনেকটা নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করে। অসম্মান দেখাইবার উদ্দেশ্যে কেহ কাহারও ধর্মমতকে আক্রমণ করে নাই। নারী-পুরুষের সম্বন্ধ, যথা—দাম্পত্য প্রেম, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে পরস্পরের আক্রমণ মন্দীভূত হইয়া আসে; সাহিত্যে বাঙ্গ-বিজ্ঞপের স্থান অধিকার করে রসিকতা। জাতীয় জীবন-তত্ত্বীর তারগুলি একোর হুরে এমন ভাবে বাজিয়া উঠে, যে, দেশ নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া উঠে। এমন কি, হৃৎকষ্ট ও মৃত্যুর মধ্যেও সাহিত্য শুধু শান্তির আলোক আহরণ করিতে থাকে।

সাহিত্যে স্বাভাবিকতার গতি রোমাণ্টিক ও রূপকের পথে চালনা করেন দুই জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ইহাদের এক জন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত ভেনার ভন

হেইডেনষ্টাম (Vener von Heidenstam) ও দ্বিতীয় জন ওস্কার লেভেরটিন (Oskar Levertin), প্রসিদ্ধ সাহিত্য-ইতিহাস-লেখক।

যে প্রদেশে হেইডেনষ্টামের জন্ম, সেখানকার টিভেদেন (Tiveden) নামক গভীর অন্ধকারময় পার্বত্য বনরাজি ভেভেন নামক বৃহৎ অশান্ত হৃদের মুক্ত তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। সেই প্রদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য সভ্যতা অনধিক কাল পূর্ব পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। কবি হেইডেন-ষ্টামের পিতা ছিলেন ভলটেরারের মত স্বাধীনচেতা ও উদার প্রকৃতির লোক। তাঁহার নির্দেশ ছিল যেন মৃত্যুর পর তাঁহার দেহকে অগ্নিসংকার করিয়া ভেস্তের্নের জলে নিক্ষেপ করা হয়।

যুবক হেইডেনষ্টাম শারীরিক অসুস্থতার দরুণ কয়েক বৎসর কাল পূর্বদেশসমূহে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার কবি-প্রতিভা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বদেশবাসীদের সহজ সরল অথচ আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা-প্রণালী, সেখানকার নীলাকাশ, তপ্ত সূর্য্যাকিরণ, মহিমময় চন্দ্রালোক তাঁহার হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। তাঁহার সেই সময়কার কবিতা ভাবপ্রবণ সুইডিশ-মানে গভীর আনন্দের সঞ্চার করে। কিন্তু পূর্বদেশে যুগ্ম জীবনের মাঝখানে কবি অনুভব করেন, যে, তাঁহাকে তাঁহার আধুনিক সমাজেই সারা জীবন কাটাইতে হইবে—যে সমাজের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগ নাই। কিন্তু পূর্বদেশে কয়েক বৎসর কাটিতে-না-কাটিতেই হৃদুর উত্তরে অবস্থিত আপন দেশের মাটির টান কবির মনকে পাইয়া বসে। কবি-মনের এই বিপরীতমুখী ভাব তাঁহার “তীর্থযাত্রীর ঐষ্টজন্মগীত” নামক কবিতাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। হান্স আলেনিউস (Hans Alenius কবির ছদ্মনাম) নামক ব্যক্তি সারা হুনিয়াটা ঘুরিয়াছেন, সর্বত্রই অনেক বন্ধু জুটাইয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি একাকী, কোথাও যেন মাটির সঙ্গে তাঁহার যোগ নাই! তাঁহার আপন দেশ ভূবারশীতল ও অন্ধকারময় হইলেও নিজ কুটীরের জন্ত তাঁহার প্রাণ কঁাদে। এই বিষয়ে কবির অভিজ্ঞতা হয়ত তাঁহার সমশ্রেণীর লোকদেরই মত। যে-দেশের মাটিতে তাঁহার জন্ম সেই দেশের বন্ত

প্রকৃতি দীনতার আবরণে নিজের সম্পদ কবির নিকট হইতে প্রথমে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে দেশ আপন বক্ষস্থিত সম্পদের মহিমা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। স্বদেশের সঙ্গে কবির পুনর্মিলন ও দেশের নূতন প্রকাশ বা রূপের অভিব্যক্তি তাঁহার প্রধান ও প্রসিদ্ধ রচনা “কারলিনা” গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। এই রচনার প্রধান চরিত্র বিখ্যাত সুইডিশ রাজা দ্বাদশ কাল।

যুদ্ধের সময়ে কালের নিজের দলের লোকজনেরা অনেক কার্পণ্য ও নীচতার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু যখনই কাল তাঁহাদের নিকট পৌকষের দাবি করিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেক অচিন্ত্যনীয় বীরের আবির্ভাব হইয়াছে। পলটাভা (Poltava) যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়া কালের সৈন্তদলের এক নায়ক লিখিয়াছেন, “যে-বিজয়-মুকুট কাল নিজের জন্ত রচনা করিয়াছিলেন তাহা রাজ-মস্তক হইতে গড়াইয়া নিম্নপদস্থের মাথায় শোভা পাইয়াছে।” হেইডেনষ্টাম গাঢ় রঙে কালের জীবনের এই ট্রাজেডি চিত্রিত করিয়াছেন। কালের সত্যিকার চিত্র হেইডেনষ্টামের রচনায় বাদ পড়িয়াছে। গ্রন্থকারের মতে রাজার ও রাজ্যের এই আত্ম-বলিদান জাতীয় জীবনকে মহত্ব দান করিয়াছে,—দুঃখ-দৈত্রেয় উপরে লইয়া যাওয়ার সুযোগ দিয়াছে, দুঃখবহনশক্তি জাতীয় চরিত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে। আবার দেখি, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত কারলিনা নির্বাসনে মৃতপ্রায় হইয়াও আনন্দ বোধ করিতেছে; আনন্দের কারণ—একদিন হয়ত সত্যই সে আপন মাতৃভূমিতে মাথা ঠেকাইতে পারিবে—দেশের পাথরকে চুষন করিয়া ধন্ত হইতে পারিবে। হেইডেনষ্টাম ‘কারলিনা’ লিখিয়া সাহিত্য-আসরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

পরবর্তী সময়ে তাঁহার লেখনী দুইটি বিভিন্ন ধারা লইয়াছে। এক দিকে সুইডিশ ইতিহাসের অতি-মানবদের জীবনী—যেমন, সেট বিরগিস্তার ভ্রমণ (Heliga Birgittas Pilgrimsfärd)—তাঁহার লেখনীর বিষয়ীভূত হইয়াছে, অন্য দিকে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে দেশের বক্তব্য কবিতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করেন। এখানে

উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাঁহার “সুইডেন” নামক সঙ্গীত বন্ধিমের ‘বন্দে মাতরমের’ ছায় এদেশে গীত হইয়া থাকে। বর্তমান বৎসরে (৬ই জুন, ১৯৩৪) তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি নোবেল প্রাইজ একাডেমির একজন সভ্য।

ওস্কার লেভেরটিনই সর্বপ্রথম ইহুদী-জাতীয় সুইডিশ যিনি সাহিত্য ও শিল্পের রাজ্যে খ্যাতিলাভ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি গৃহকোণে আবদ্ধ ছিলেন, এই কারণে দেশের প্রকৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল কম। তাঁহার রচিত সুইডেনের প্রকৃতি-বর্ণনা অনেকটা কল্পনায় গড়া। সুইডিশ সমালোচকদের মতে তাঁহার ভাষাও স্থানে স্থানে এমন যে, তাহা পড়িবার সময় সুইডিশ পাঠককে তাঁহার বিদেশীয়তার কথা মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু ব্রাণ্ডেসের ছায় তিনি সুইডেনে নিজেকে পরদেশী বলিয়া বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি সুইডেনকে এমন ভাবে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন, যে, দেশের সাহিত্য-ইতিহাস রচনায় ও সাহিত্যিকদের চরিত্রবিশ্লেষণে তাঁহার সমকক্ষ বিরল বলিলেও চলে। সমালোচনা-কার্যে তাঁহার স্বজাতির বিশিষ্ট গুণগুলি, যথা—চিন্তাশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা—পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। সাহিত্য-সমালোচনা তাঁহার কলমে বড় আর্ট হইয়া উঠে, প্রথমে উপশালা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ষ্টকহলমের কলেজে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

এই শ্রেণীর অন্য এক জন সাহিত্যিকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁহার নাম পের হালষ্ট্রম (Per Hallström)। হেইডেনষ্টাম প্রবাসে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করিয়াছিলেন এবং পূর্বদেশবাসীদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু পের হালষ্ট্রমের ক্ষেত্রে তাহা অন্তরূপ হইয়াছে। যৌবনে ইঞ্জিনিয়ার রূপে তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কয়েক বৎসর বাস করেন; কিন্তু সেখানকার নাগরিক জীবন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার ছায় কেহই নিজের আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে

পারেন নাই। তিনি সৌন্দর্যের উপাসক সত্য, কিন্তু নীতিবাদ তাঁহার জীবনের চরম কথা। গল্পে উপন্যাসে সর্বত্রই তিনি নীতিবাদের উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যের উপকরণ গ্রীসের ইতিহাস, বাইবেল, মধ্যযুগের বীর-কাহিনী, ইটালীর নবজীবন, ফরাসী-বিপ্লব ও বর্তমান যুগের বহু ঘটনা হইতে গৃহীত।

তাঁহার অধিকাংশ রচনায় জীবন-মরণের সম্বন্ধ ও সমস্তা বড় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শিশুদিগকে ভালবাসেন, কারণ তাহারা মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যৌবনকে তিনি সমাদর করেন, কারণ যৌবন বিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞেপ করে না।

বা বিশেষ সচেতন নহে; আবার ভবিষ্যতের জীবন-চিত্র সম্বন্ধেও যৌবনের ধারণা অস্পষ্ট, কিন্তু তবুও যৌবন আপন শক্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে সমস্ত হৃদয় লইয়া বাস করে। থানাতস (Thanatos) নামক উপন্যাসগুলিতে তিনি অতি কঠোর নিশ্চয় প্রকৃতির লোকের চরিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, কি ভাবে পাষণ্ড ও মৃত্যুর সন্নিকটে পৌছিয়া বদলাইয়া যায়, কি ভাবে অনুশোচনা দ্বারা নিজকে পবিত্র করে। তাঁহার রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের বহু অভিজ্ঞতা ও লোকচরিত্র মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

পের হালট্রুম নোবেল প্রাইজ কমিটির বর্তমান সেক্রেটারী।

কীর্তিনারায়ণ

শ্রীনীমাধব চৌধুরী

ভৈরব রায়ের বংশের দেশজোড়া অখ্যাতি ছিল যে সে-বংশের বড়ছেলেরা নাকি খুনে হয়।

এ-অখ্যাতির মূল কোথায় কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, এ-বংশের বড়ছেলেরা সকলেই কতকটা খুনে প্রকৃতির এবং কেহ কেহ বাস্তবিকই খুন করিয়াছে। খুন করিয়া কি উপায়ে তাহারা আইনের হাত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে লোকে তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিয়া বলিত,—

—আরে বাপু, আইনের কথা আর ব'লো না, আইন কি বড়লোকের জন্ত তৈয়ারী হয়েছে? আর ভৈরব রায়ের বংশের লোককে আইনের প্যাচে ফেলবে কোম্পানীর আমলে এত বড় আইনবাজ লোক জন্মাতে দেরি আছে। খুনের কিনারা যে করবে সাক্ষী-সাবুদ পাবে কোথায়? এ-তল্লাটে কার ঘাড়ে দুটো মাথা কবে ছিল যে ঐ বংশের লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে? জ্যান্ত মানুষ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ একদিন গুম হয়ে গেল। হু-চার দিন কানাঘুষো চলল, কান্নাকাটি চলল, বাস্! তারপরে সব চুপ।

কি ভাবে ভৈরব রায়ের সময়ে রায়-বংশ লোপ পাইল সেই গল্প এক দিন শুনিলাম।

বলা বাহুল্য, ভৈরব রায় বংশের বড়ছেলে। প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বর্তমান ছিল কেবল ঐ বৃদ্ধ, গুটি দুই-তিন বিধবা আর ভৈরব রায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র। পুত্র বহুকাল হইল গত হইয়াছেন। পিতৃহীন পৌত্রকে ভৈরব রায় নিজ হাতে মানুষ করিয়াছিলেন। শিশু পৌত্রের লালনপালন ব্যাপারে বাড়ির আর কাহারও হাত ছিল না, সে ব্যাপারে স্ত্রীলোকের করণীয় অংশটুকু করিবার অধিকার পাইয়াছিল ব্রজদাসী নাম্নী এক কৈবর্ত-জাতীয় পরিচারিকা। এই ধৈর্যবননা শান্ত গম্ভীর স্ত্রীলোকটিকে দেখিলে কেহ দাসী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। ভৈরব রায়ের স্ত্রী পৌত্রের জন্মের অনেক আগেই মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্তরের কর্তৃত্ব বর্তিয়াছিল তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠা বিধবা ননদের উপর, কিন্তু কার্যতঃ প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল ব্রজদাসীর হাতে। দিনান্তে একবার ছেলেকে দেখিয়াই বিধবা পুত্রবধূকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত, একটবার ছেলেকে কোলে লওয়া দূরে থাকুক

স্পর্শ করিবার অধিকার পর্যাপ্ত তাঁহার ছিল না। কর্তাকে লুকাইয়া ব্রজদাসী মাঝে মাঝে ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দিত, কিন্তু কর্তা একথা জানিতে পারিলে কি অনর্থ ঘটবে সেই আশঙ্কাতেই তিনি এত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন যে, ছেলেকে আদর করিতে ভরসা পাইতেন না, এক মুহূর্তের জন্ত তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াই ব্রজদাসীর কাছে ফিরাইয়া দিতেন।

সেই পোত্র আজ বড় হইয়াছে। ভৈরব রায় পোত্রের নাম দিয়াছিলেন কীর্তিনারায়ণ। বাহির মহলে কাছারী-বাড়ির দক্ষিণে যে বৈঠকখানা দালানে ভৈরব রায় থাকিতেন তাহার সম্মুখে ছিল এক প্রশস্ত, বাধানো আঙ্গিনা। বৈঠকখানা দালানের রকের উপরে যেখানে দুই বাড়ি জুই ফুলে শাদা হইয়া চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইত ও বড় বড় পদ্মকরবীর গাছ দুইটিতে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল ফুটিয়া থাকিত সেখানে একখানা খেত পাথরের জলচোকির উপর বসিয়া ভৈরব রায় পোত্রের শিক্ষাবিধান করিতেন।

প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একমাত্র এই বৈঠকখানার দালানটিই অক্ষত দেখে দাঁড়াইয়াছিল। অন্দরমহলের মাত্র কয়েকটি কোঠা ব্যবহারযোগ্য ছিল, বাকী সব পরিত্যক্ত বিশাল ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। ছোট-বড় নানা আকারের অশ্বখগাছ ভগ্নস্তূপের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়াছিল, সেই সকল গাছ বাহিয়া উঠিয়াছিল নানা জাতির কণ্টকলতা। অন্দরের সীমানার মধ্যে ছিল কালীদহ নামে পুকুরটি—চারিদিক ভগ্নস্তূপে পরিণত যেন একখানি স্বচ্ছ কাচখণ্ড। সান-বাধানো ঘাট ও উচ্চ পাড়ের নীচে স্ফটিকের মত জল টল টল করিত। কালীদহের চারিটি পাড় জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছিল, শুধু সানবাধানো ঘাটগুলি সেই জঙ্গলের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। উত্তর দিকের ঘাটের ডানপাশে একটা অদ্ভুত গম্বুজাকৃতি কোঠা, চূড়ায় একখানি লোহার ত্রিশূল দেখিয়া বোঝা যায় যে এককালে শিবমন্দির ছিল। কালীদহের জল কাকচক্ষুবৎ পরিষ্কার হইলেও সে জলে কেহ স্নান করিত না, একমাত্র পরিচারিকা ব্রজদাসী ছাড়া। তাহার এই বিশেষ অধিকারে কেহ কোনও প্রশ্ন করিত না।

অন্দরের সঙ্গে ভৈরব রায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁহার হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ অন্দরের সীমানার মধ্যে কখনও প্রতিধ্বনিত হইত না। তাঁহার স্নান, ভোজন, শয়ন বহির্কোণে সম্পন্ন হইত, সন্ধ্যাহিক ও বহির্কোণের মধ্যে অবস্থিত ভগ্নপ্রায় মন্দিরের একাংশে চলিত। বৈঠকখানা দালানে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ইহার একদিকে পাশাপাশি রক্ষিত দুইটি পালঙ্কে পোত্র ও পিতামহ শয়ন করিতেন। পালঙ্কের শিয়রে দেয়ালের গায়ে সারি সারি নানা আকারের তরবারি ও ছোরা সজ্জিত ছিল, কোনখানির বাট সোনার, কোনটি রৌপ্যের। পায়ের দিকে বহুসংখ্যক বল্লম ছক দিয়া দেয়ালের গায়ে আবদ্ধ ছিল, ইহাদের কোনটির মাথা দুইদিকে করাতির দাঁতের মত, কোনটির মাথা টান্নির মত, কোনটি হ-ফলা, কোনটি এক ফলা। ঘরের অন্তরালে গোলাকার একটি খেত পাথরের প্রকাণ্ড টেবিল, তাহার দুই দিকে দুইটি প্রকাণ্ড আলমারী।

একটির মধ্যে নানা আকারের সেকালের তৈয়ারী বন্দুক—কয়েকটি তাহাদের দৈর্ঘ্যের জন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হইত যে, এত লম্বা ও এত ভারী বন্দুক সাধারণ মানুষ কোনকালে ব্যবহার করিত। অপর আলমারীতে ছিল ছোটবড় নানা আকারের খানকয়েক খাপখোলা তরবারি ও ছোরা, মরিচা পড়িয়া একেবারে অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে, আর শুটি তিনেক অদ্ভুত চেহারার বেটে বন্দুক—রিভলভারের মত কতকটা। লোকে বলিত এইগুলির প্রত্যেকটি নররক্তরঞ্জিত, এজন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। দুইটি আলমারীর পাশে অনেকগুলি চামড়া-বাধানো ঢাল দেওয়ালে আবদ্ধ। খেতপাথরের টেবিলের উপরে গম্বুজাকৃতি কাঁচের আবরণে ঢাকা কয়েকটি বড় বড় সেকলে বড়ি, একটি বাদে বাকী সব-গুলি বন্ধ। যে বড়িটি চলিতেছিল সেটি একটু অদ্ভুত রকমের। একটি পরীমূর্তি হাতে একটি ছোট হাতুড়ী লইয়া দাঁড়াইয়া। বাজিবার সময় হইলে পরীটি হাত তুলিয়া সম্মুখের একটি কাঁশীর মত বস্তুতে আঘাত করিত আর স্নলতরঙ্গের বাজনা বাজিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের গান শোনা যাইত। টেবিলের এক পাশে ছোট

একটি দামামা, পিতলের দেহ, কতকটা বড় বাটীর আকারের। তাহার একধারে দুইটি পিতলের ডাঙা, মাথা গোল বলের মত। এই অদ্ভুত দামামা সম্বন্ধে নানারকম কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল।

এই সকল কিংবদন্তীর মধ্যে কিছু সত্য ছিল কিনা বলিতে পারি না। লোকে বলিত মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহর রাত্রে পৃথিবী যখন নিবিড় সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, হঠাৎ গুমগুম শব্দ করিয়া দামামা বাজিয়া উঠিত, কেমন একটা অস্বাভাবিক, অশুভ ধ্বনি অন্ধকারের বুক চিরিয়া পল্লীবাসীদের কানে আঘাত করিত—আর এক অজানা আতঙ্কে তাহারা শিহরিয়া উঠিত। এই দামামা বাজিয়া উঠিলেই নাকি এক জন বিশালকায় বৃদ্ধ কুস্তিগীরের মত ল্যাডটপরা, বান্ধিকোর ভাৱে কুজ্জদেহ, প্রকাণ্ড শাদা গৌফে মুখের অন্ধেক আবৃত ও লম্বা শাদা দাড়ির অগ্রভাগটি দুইদিকে টানিয়া দুই কানের সঙ্গে বাঁধা, বাঁ-কোমরে একখানি বাঁকানো তরবারি, পিঠের দিকে একখানি ছোরা, ডান হাতে একগাছা সূতীক্ষ বল্লম লইয়া—ছায়ামূর্তির মত ধীরে ধীরে বৈঠকখানার রকের উপর আসিয়া দাঁড়াইত। দাঁড়াইয়া লোহা-বাঁধানো বল্লমের গোড়ার দিকটা রকের উপর তিনবার ঠকিত, সঙ্গে সঙ্গে দামামার চীৎকার হঠাৎ থামিয়া যাইত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই বিশালকায় বৃদ্ধটি রকের উপর উঠিয়া শব্দ করিবার পর যে-মুহূর্তে দামামার শব্দ থামিয়া যাইত তার ঠিক পরমুহূর্তে একটা চাপা কান্নার শব্দ শোনা যাইত। লোকে বলিত যে, রকের নীচে আগ্নিনার প্রান্তে পশ্চিমদেশীয়া স্ত্রীলোকের পোষাকে একটি স্ত্রীলোক মুখটি হৃদীর্ঘ ঘোমটার আবৃত করিয়া বৃদ্ধের পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং তাহারই হৃদীর্ঘ ঘোমটার মধ্য হইতে চাপা কান্নার শব্দ আসিত।

এই স্ত্রীলোকটি কয়েক বৎসর আগে মারা গিয়াছে। সে ছিল বিশালকায় বৃদ্ধটির স্ত্রী আর বৃদ্ধটি ছিল ভৈরব রায়ের দেহরক্ষী ও লাঠিয়ালবাহিনীর সর্দার লাল সিং। অনেক কাল এই দম্পতি সুখে যরকন্না করিয়াছিল। তার পর হঠাৎ কি এক কাণ্ড হইয়া গেল—তাহাদের একমাত্র সন্তান বয়স্থা মেয়েটি গেল মারা। কি অপরূপ স্তম্ভরীই সে ছিল।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দোঁড়প্রতাপশালী রায়-পরিবারের বংশপ্রদীপ, বৃদ্ধ ভৈরব রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্রটিও হঠাৎ মারা গেলেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কাহিনী আজিও এক রহস্যজালে আবৃত রহিয়াছে, সে রহস্যজাল লোকে কোন-কালে ভেদ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। কতাকে হারাইয়া লাল সিংহের স্ত্রী দীর্ঘকাল জীবিত ছিল না। কিন্তু এতদিন পরেও যখনই গুম-গুম শব্দ করিয়া দামামা গভীর রাত্রে, সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরিয়া বাজিয়া উঠিত তখনই তাহার ক্রন্দনরত ছায়ামূর্তি স্বামীর পিছনে পিছনে কি যেন অকথিত অভিযোগ লইয়া ভৈরব রায়ের বৈঠকখানার রকের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইত।

দামামার শব্দ থামিয়া গেলে ভৈরব রায় বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেন। ঋজু, দীর্ঘ, মেদবর্জিত দেহ—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দাড়িগৌফ পরিষ্কার করিয়া কামানো, গুরুকেশ ও ঘন যুগ্মজ, গলায় যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগা, বামহস্তের মণিবন্ধে একটি অষ্টদাতুর সন্ধ বালা, পায়ে হাতীর দাঁতের খড়ম। দেখিলে মনে হয় যে বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু দাঁড়াইবার ও চলিবার কঠিন দৃষ্ট ভঙ্গী ও গুরুবর্ণের বিশাল যুগ্মজর দ্বারা অর্ধ আচ্ছাদিত দুই চোখের উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখিয়া বয়সের পরিমাণ অনুমান করা সহজ হইত না। কণ্ঠস্বরের সতেজ গাঙ্গুীয়া ও মধ্যবয়স্ক শক্তিশালী পুরুষের মত।

হাতীর দাঁতের খড়মের ঠকঠক শব্দ করিয়া ভৈরব রায় রকের উপর আসিলে কি যেন মস্তবলে সেই কুজ্জদেহ বৃদ্ধ হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইত, দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাংগতিতে কোমরের বাঁকানো তরবারি খাপ হইতে খুলিয়া সামরিক কান্দায় অভিবাদন করিত। সঙ্গে সঙ্গে আগ্নিনার স্ত্রী-মুক্তিও মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত।

তার পর ভৈরব রায় নিম্নকণ্ঠে কি যেন আদেশ করিতেন, প্রভুভক্ত বৃদ্ধ নির্বাক ভাবে শুনিত। প্রভুর বক্তব্য শেষ হইলে আবার অভিবাদন করিয়া বল্লমের দ্বারা রকে ঠক করিয়া একবার শব্দ করিত। সঙ্গে সঙ্গে যেন উহার প্রত্যুত্তরেই গুম করিয়া দামামার একবার গভীর প্রতিধ্বনি হইত। রক হইতে নামিয়া কুজ্জদেহ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আগ্নিনা পার হইয়া যাইত, পিছনে পিছনে

চলিত সুদীর্ঘ বোমটার আবৃত্তি ক্রন্দনরতা স্ত্রীর ছায়ামূর্তি।

লালা সিং আজিনা পার হইয়া অন্তর্হিত হইলে ভৈরব রায় রকের উপর পায়চারি করিতে আরম্ভ করিতেন— ঠক্ঠক্ ঠক্ঠক্ করিয়া হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ হইতে থাকিত।

বৈঠকখানা দালানের সেই রকের উপরে যেখানে ছই ঝাড় জুই অজস্র ফুল ফুটিয়া শাদা হইয়া থাকিত ও বড় বড় পদ্মকরবীর গাছ ছইটিতে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুল ফুটিয়া থাকিত সেইখানে একখানি শ্বেতপাথরের জলচৌকির উপর বসিয়া ভৈরব রায় পৌত্র কীর্তিনারায়ণের শিক্ষাবিধান করিতেন। ক্ষুদ্র বালক মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী বাধিয়া বা-হাতে ছোট একখানি ঢাল ও ডান হাতে তরবারি লইয়া কুজদেহ বৃদ্ধ লালা সিংহের সঙ্গে তরবারি খেলিত—কখনও বা কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখে রাখিয়া একাই খেলিত বা কল্পিত পলায়মান আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বর্শা ছুঁড়িত। লালা সিংহের শিক্ষার গুণে ক্ষুদ্র বালক ইতিমধ্যেই ওস্তাদ লাঠিয়াল হইয়া উঠিয়াছিল। মালকৌচা দিয়া কাপড় পরিয়া ছোট লাঠিখানা হাতে লইয়া ডাক ছাড়িয়া লাফাইয়া লাফাইয়া সে যখন লাঠি ঘুরাইত, বন-বন শব্দ করিয়া বিদ্রোহের মত তাহার হাতে লাঠি ঘুরিতে থাকিত, দেখিয়া ভৈরব রায়ের ছই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

পৌত্রকে অশ্বারোহণ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন ভৈরব রায় স্বয়ং। একটি দোআঁশলা তেজী শাদা রঙের ঘোড়ায় জিন কসিয়া মুসলমান সহস্র আজিনার একপ্রান্তে তাহার লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রভুপুত্র কাছে আসিলে সে লাগাম ছাড়িয়া দিয়া হেঁট হইত, তাহার আনত পিঠের উপর পা রাখিয়া লাফাইয়া বালককে ঘোড়ায় চড়িতে হইত। পিঠে সোয়ার চাপিলেই ঘোড়াটি পাগলের মত পিছনের ছই পা শূণ্ণে ছুঁড়িতে আরম্ভ করিত, দেহ বাঁকাইয়া আন্দোলিত করিয়া আরোহীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিত।

প্রথম দিন ঘোড়ায় চড়িয়া বালক ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অদূরে দণ্ডায়মান পিতামহের চোখের

দিকে চাহিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইবার জন্ত অনুরোধ করিতে সাহস পায় নাই। ঘোড়ার কাঁধের উপর হেঁট হইয়া প্রাণপণে তাহার কেশর আঁকড়াইয়া সে পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে ঘোড়া লাফাইতে শুরু করিলে সে লাগাম টানিয়া সিঁধা বসিয়া রহিল। দশ মিনিট কাল লাফালাফি করিবার পর ক্ষুদ্র সোয়ারটিকে লইয়া সদর কটক পার হইয়া ঘোড়াটি উল্লম্বসে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে সে কেবল চেষ্টা করিতে লাগিল কোন কান্কে পথ ছাড়িয়া পথিপার্শ্বের আগাছার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কখনও বা এমন ভাবে বড় বড় গাছ ঘেঁষিয়া ছুটিতে লাগিল যে প্রতিমুহূর্তে বালকের পা গাছের কাণ্ডে বাধিয়া ছড়িয়া বাইবার, উটাইয়া তাহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া বাইবার আশঙ্কা হইল। বালক লাগাম দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া চাবুকের উল্টা দিক দিয়া ছই হাতে তাহার বাড়ে ও পাশে আঘাত করিয়া তাহাকে পথে ঢালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়েক দিন এইভাবে চলিবার পর ঘোড়া বুঝিতে পারিল যে তাহার সোয়ারটি ক্ষুদ্র হইলেও ভয় পাইবার পাত্র নহে। ক্রমে সে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল।

এইভাবে কীর্তিনারায়ণের পদোপযোগী শিক্ষাদীক্ষা চলিতে লাগিল।

কীর্তিনারায়ণের বয়স যখন আঠারো বছর পুরিল তখন এক দিন পিতামহ তাহাকে কাছে ডাকিলেন, নতমস্তকে পিতামহের সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি আদেশ করিলেন কালীদেহে স্নান করিয়া পূজার কাপড় পরিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে হইবে। কালীদেহে স্নান করিবার আদেশ পাইয়া কীর্তিনারায়ণ একবার বিস্মিত ভাবে চোখ তুলিলেন, পরক্ষণেই নতমস্তকে অন্তরের দিকে চলিয়া গেলেন। পৌত্রকে স্নান করিবার আদেশ দিয়া ভৈরব রায় রকে পায়চারি করিতে লাগিলেন—ঠক্ঠক্ ঠক্ঠক্ করিয়া হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ হইতে লাগিল। বন ঘন সে শব্দ শুনিয়া মনে হইল বৃদ্ধ ভৈরব রায় আজ যেন একটু উত্তেজিত ও অগমনস্ব।

কীর্তিনারায়ণ কালীদেহে স্নান করিতে নামিলেন। কালীদেহের কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ, স্থির জলে নামিয়া ডুব দিতেই তাঁহার মনে হইল কত বিগুরু সমুদ্রের তরঙ্গমালা একটির

পর একটি করিয়া অবিশ্রামে যেন তাঁহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িতেছে; দুই কানের কাছে ঝম ঝম করিয়া কিসের যেন শব্দ হইতে লাগিল, তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত হইল। মনে হইল তাঁহার মাথার উপরে কালীদেবের ক্ষুদ্র বৃকে যেন প্রলয়ের তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে, গাছপালা উপড়াইয়া বায়ুবেগে তৃণধণ্ডের মত ছুটিতেছে, দালান কোঠা ভাঙিয়া-চুরিয়া সমস্তে কালীদেবের জলে পড়িতেছে, প্রবল ভূকম্পনে কালীদেবের অর্থে জলরাশি বিধম বেগে তাঁহাকে লইয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে—

প্রাণভয়ে কীর্তিনারায়ণ জল হইতে মাথা তুলিলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ, নিবুম, কালীদেবের জলরাশি আগেকার মতই কাকচক্ষুবৎ স্বচ্ছ, স্থির। প্রেততাড়িত ব্যস্তির ত্রায় কীর্তিনারায়ণ জল হইতে উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্দান্দ কাঁপিতেছিল। তার পর তিনি কি করিলেন, কি কি ঘটনা ঘটিল সে সকলের কোন পরিষ্কার স্মৃতি তাঁহার নাই। মনে হইল যেন বিশ্বের ঘুম তাঁহার দুই চক্ষুতে ভর করিয়াছে, চেতনা আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই অর্দ্ধশুম্বরে অতি অদ্ভুত, বিচিত্র ঘটনাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পিতামহ তাঁহার হাত ধরিয়া এক অন্ধকার, অজ্ঞাত পুরীতে লইয়া গেলেন—বায়ুহীন, স্যাৎসেতে, দুর্গন্ধ বাষ্পপূর্ণ পথ সেই পুরীতে যাইবার। সেখানে একটি বেদীর সম্মুখে স্তিমিত প্রাদীপালোকে তাঁহাকে নতজাহ্ন হইয়া বসিতে হইল, পিতামহ হাতে সন্ন চুড়ির মত কি একটা পরাইয়া দিলেন। তার পর কোথা হইতে অজস্র আলো ঝরিয়া পড়িল, তিনি দেখিলেন এক জন ষেতবস্ত্রভূষিতা স্ত্রীলোক আঁচলের চাবি দিয়া একটা রুদ্ধ কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। পিতামহের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন দেয়ালের সঙ্গে গাথা অনেকগুলি লোহার সিঁদুক। পিতামহের ইচ্ছিতে সেই স্ত্রীলোকটি সিঁদুকগুলি একে একে খুলিতে লাগিল, ভিতরের বিপুল ধনরাশি দেখিয়া তাঁহার দুই চোক ঝলসিয়া গেল; ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইতে লাগিল। চেতনা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইবার পূর্বমুহুর্তে সেই স্ত্রীলোকটির মুখ তিনি দেখিতে পাইলেন—সে পিতামহের পরিচারিকা ব্রজদাসী!

তার পরের কোনও ঘটনা কীর্তিনারায়ণের আর স্মরণ

নাই। ভৌতিক ঘটনা বলিয়া ব্যাপারটিকে তিনি উড়াইয়াই দিতেন, কিন্তু হাতের সেই অষ্ট ধাতুর বালা স্মরণ করাইয়া দিল যে-অভিজ্ঞতা তাঁহার লাভ হইয়াছে তাহা অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, ভীতিজনক হইলেও মিথ্যা নয়। সেই বিপুল, অগণিত ধনরাশি বাহা তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা তবে পিতামহের, তাঁহার নিজেরই পৈতৃক সম্পদ। সেই গুপ্ত ধনরাশির কথা মনে পড়িয়া, উহা এক দিন তাঁহারই হইবে মনে করিয়া কীর্তিনারায়ণের দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হঠাৎ একটা কথা মনে উদ্ভিত হইতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন—এই বিপুল অগণিত ধনরাশি যেখানে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহার চাবি ব্রজদাসীর হাতে! ✓

এত লোক থাকিতে ব্রজদাসীর হাতে কেন চাবিগুলি দিয়াছেন? কে সে? কেন তাহার উপর এতখানি বিশ্বাস? সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে? ব্রজদাসী পরিবারের পরিচারিকা হইয়াও কেন সকলের উপরে কর্তৃত্ব করে? গুজব পিতামহের সঙ্গে তাহার গুপ্ত, অবৈধ সম্পর্ক আছে। থাকুক গুপ্ত, অবৈধ সম্পর্ক, তাই বলিয়া এক জন ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোককে এত বিশ্বাস? এ-সকল কথা ভাবিতে-ভাবিতে তাঁহার মনে বিজাতীয় জ্বাংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। কীর্তিনারায়ণের মনে পড়িল না কি অসমসাহসের সঙ্গে ব্রজদাসী পিতামহের দ্রোহবহি হইতে অন্তঃপুরিকাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, কি ভাবে বুদ্ধ পিতামহের সমস্ত সেবাশুশ্রূষার ভার কেবল ব্রজদাসী বহন করে, কি অগাধ মেহে কোলে পিঠে করিয়া তাঁহাকে সে মাহুষ করিয়াছে, সকল আদার-অত্যাচার সহিয়াছে।

পাঁচ বৎসর বয়সের পর হইতে ভোজনের সময় ছাড়া কীর্তিনারায়ণের অন্তরে যাইবার ছকুম ছিল না। পিতামহের সঙ্গে যে সময়টা তাঁহাকে থাকিতে হইত : না সে সময়—দিবসের অধিকাংশ সময়—কাটাইবার জন্য তাঁহার তিনটি সঙ্গী ছিল ব্রজদাসী, বুদ্ধ লাল সিং ও লাল সিংহের স্ত্রী। রায়-বাটীর সংলগ্ন বৃহৎ উদ্যানের এক পার্শ্বে দুইটি হুজীরে বুদ্ধ লাল সিং ও তাহার স্ত্রী বাস করিত। পরিষ্কার করিয়া নিকানো প্রাঙ্গণটি তকতক করিত। প্রাঙ্গণের একদিকে বাগের আড়ায় একটি পিতলের পাঁচা বুলিত,—



পাহাড়তলী

হিরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

খাঁচায় ছিল একটি সুন্দর ময়না। স্বর্ঘ্যোদয়ের বহু পূর্বেই ময়নাটি পবিত্র মানুষ্যের কণ্ঠে ডাকিত “জয় সীতাপতি,” “জয় সীতাপতি”। তার পরেই সে চেঁচাইত—“বুড়ীমা, ও বুড়ীমা, ওঠ, ওঠ।” বৃদ্ধ লাল সিং “জয় সীতাপতি” বলিতে বলিতে কুটীরের বাহিরে আসিত, আসিয়া ময়নাটিকে একটু আদর করিত। তার পর মুখহাত ধুইয়া প্রাঙ্গণের অপব দিকে অবস্থিত ছোট বাগানটুকুর তদ্বির করিত। চারি দিকে বাথারির বেড়া-দেওয়া সুন্দর ছবিখানির মত বাগানটি, বেড়া জড়াইয়া উঠিয়াছে তরুণতা, ছোট ছোট লাল ফুলে অপক্লপ তাহার শোভা। একদিকে একটি নাতিবৃহৎ স্থলপদ্ম গাছ, ফিকে গোলাপী বঙের বড় বড় ফুলে গাছ ভরিয়া থাকিত। অপব কোণে একটি শিউলী গাছ, শরৎকাল আসিবার বহুপূর্বেই গাছের তলা শিউলী ফুলের আন্তরণে ঢাকিয়া বাইত। সন্ধ্যাবেলা শিউলীর মৃদুগন্ধে ছোট কুটীরখানি আমোদিত হইত। তাব পবেই খানিকটা জায়গায়—বড় বড় ভুট্টার গাছ, সাবি সাবি লক্ষা ও বেগুনের চারা লাগানো, গাছগুলিব অঙ্গশ ফলন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইত।

বালক কীর্তিনারায়ণ তত্বে প্রাঙ্গণেব মধ্যে একটি ছোট বেতের মোড়ায় বসিয়া খেলা করিত। “বুড়ীমা, ও বুড়ীমা, ওঠ, ওঠ” ময়নাকে এ বুলি সে-ই শিখাইয়াছিল। ভুট্টা পাকিলে লাল সিংহের স্ত্রী আশুনের মালসায় সঁকিয়া দিত আর বেতের মোড়ায় বসিয়া বালক কীর্তি মহা আত্মাদের সহিত তাহা খাইত। মাঝে মাঝে ব্রজদাসী আসিয়া লাল সিংহের স্ত্রীকে বকিয়া-ঝকিয়া অর্দ্ধভক্ষিত ভুট্টা বালকের হাত হইতে কাড়িয়া লইত। ক্রুদ্ধ বালক কিল-চড় মারিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ব্রজদাসীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিত; যত ক্ষণ বুদ্ধা ঘর হইতে একটি সরের নাড়ু আনিয়া হাতে না-দিত তত ক্ষণ তাহার রাগ পড়িত না। নাড়ু হাতে লইয়া ব্রজদাসীব কোলে চড়িয়া “বুড়ী মা বাই” বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া বাইত।

সেই কীর্তিনারায়ণ আজ বড় হইয়াছে। বৃদ্ধ লাল সিং দেখা হইলেই তাহাকে নমস্কার করে। শুধু ব্রজদাসীব ব্যবহারে কোন পরিবর্তন হয় নাই। যুবক কীর্তিকে বকাঝকা করিতে সে আজও কিছুমাত্র ভয় পাইত না।

যুবক কীর্তিনারায়ণ আগেকার মতই কসরৎ করিতেন, ঘোড়ায় চড়িতেন, বন্দুক লইয়া দলবল সঙ্গে শিকারে বাইতেন। তাঁহার গতিবিধিতে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল,—অন্যরে গিয়া ইচ্ছামত সময় কাটাইতে আব কোন নিষেধ ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনেব নিভৃত কোণে অহরহ এই চিন্তা জাগিয়া থাকিত যে রায়-পরিবাবের বিপুল ধনরাশি একটি ইতবজাতিয়া স্ত্রীলোকের হাতে রহিয়াছে।

ব্রজদাসীর সংসারে কেহ ছিল না। সাত বছর বয়সের সময় দূর গ্রামের স্বজাতীয় নয় বৎসরের একটি বালকেব সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। এক বৎসবেব মধ্যে সে বিধবা হইল। তাহার বৃদ্ধা মায়ের মৃত্যু হইবার কিছুদিন পূর্বে পনেব বছর বয়সের সময় সে রায়-পরিবারে চাকুরী করিতে আসে; সদ্যবিপত্নীক ভৈরব রায়ের বয়স তখন ত্রিশ। ক্রমে ক্রমে সে বৃহৎ রায়-পরিবাবেব প্রকৃত গৃহিণী হইয়া উঠিল। স্বল্পভাবিণী, শাস্ত, মৃদুস্বভাবা ব্রজদাসীকে দেখিলে কেহ কি বলিয়া মনে করিতে পারিত না—করিতও না। কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ ধরিয়া সকলে তাহাকে ডাকিত, ব্যবহারও সেইরূপ করিত। ছই পুরুষ পূর্বে বঙ্গদেশের পল্লী-অঞ্চলেব সম্ভ্রান্ত ঘরে এই ব্যাপার নিত্যনৈমিত্তিক ছিল, কাহারও চোখে ইহা বিসদৃশ ঠেকিত না, ইহা লইয়া পরিবারেব কাহারও গাভ্রদাহ হইত না। নামে পরিচারিকা হইলেও এই শ্রেণীব পরিচারিকাবা পরিবারের আত্মীয়া বলিয়া গণ্য হইত, পারিবারিক সকল বিষয়ে তাহাবাও মতামত প্রকাশ করিত। যেমন অকৃত্রিম স্নেহ তাহার। সকলকে বিল-ইত তেমনই স্নেহ নিজেরাও পাইত। বুদ্ধি-বিবেচনা, স্বভাব ও কার্যদক্ষতার গুণে কেহ কেহ ষথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারিণীও হইত। ব্রজদাসী ছিল এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক। ব্যবহারগুণে সকলকেই সে বলীভূত রাখিয়াছিল। কর্তার সুখ-স্বাস্থ্যদ্বয়ের বিধান যেমন তাহাকে না-হইলে চলিত না, কর্তার পিতৃহীন পৌত্রকে মানুষ করিবার কাজেও সেইরূপ তাহাকে না-হইলে চলিত না।

কীর্তিনারায়ণ এই ব্রজদাসীব কোলে-পিঠে চড়িয়া মানুষ হইয়াছিল, নিজের মায়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক

ছিল না। প্রোচা ব্রজদাসীকে সে ডাকিত দাদী বলিয়া, নিজের পোক্তের মতই তাহার অনুগতও ছিল।

কিন্তু কালীদেহে স্নান কবিতা সেদিনকার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর হইতে কেমন কবিতা যেন তাঁহার চিত্তে ধারা বদলাইয়া গেল। কি এক অদম্য ঘৃণা ও ভয়ের বশে ব্রজদাসীকে প্রতি সকল ভালবাসা মুছিয়া গিয়া কুৎস, বার্থ আক্রোশে তাঁহার চিত্ত আলোড়িত হইতে লাগিল। নিজের মনের এই অদ্ভুত অবস্থান্তর অনুভব করিয়া তিনি ভীত হইয়া উঠিতেন। আত্মসংযম কবিবার সকল প্রয়াস বার্থ হইতে দেখিয়া অসহায়ভাবে বিলাপ করিতেন। ক্রমে রায়-পরিবাবের হিংস্র বক্তৃতা তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে কি যেন এক ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বহিয়া চঞ্চল হইয়া ছুটিতে লাগিল।

বুদ্ধ ভৈরব রায় সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া বৈঠকখানার দালানের রকে বসিয়া আছেন,—ছই ঝাড় জুই গাছ ফুলে শাদা হইয়া গিয়াছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত। সেই গন্ধের প্রভাবে তাঁহার চিত্ত আজ নির্মল; উদার, প্রশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র চারি দিকে অজস্র রূপালী আলো ছড়াইয়া দিয়াছে, সুদূর অতীতে লুপ্তনদী উদ্যানে এমনই দিনে এক মানবশিশু শোকতাপ-ব্যথিত ধরণীর সান্নিধ্যের জন্য শান্তিবাহী বহিয়া জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আত্মসমাহিত ভাবে কতক্ষণ তিনি বসিয়াছিলেন খেয়াল নাই। হঠাৎ একটা দূরগত, অস্পষ্ট আর্তনাদ শুনিয়া তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন।

শব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া ভৈরব রায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এক অজানা আতঙ্কে তাঁহার দীর্ঘ দেহ শিহরিয়া উঠিল। উত্তেজিত ভাবে তিনি রকে পায়েচালাই করিতে লাগিলেন, হাতীর দাঁতের খড়ম ঠক্ঠক্ ঠক্ঠক্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন জ্যোৎস্নাধোত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পাব হইয়া একটি ছায়ামূর্তি ভ্রমিতে ভ্রমিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, কে? ছায়ামূর্তি আরও অগ্রসর হইল, আরও নিকটে আসিল, তার পর বকের সিঁড়ির নীচে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

ভৈরব রায় দেখিলেন ব্রজদাসী। ব্রজদাসী মাটিতে না দাঁড়াইয়া একটু উপবে স্থির হইয়া আছে, ব্রজদাসীর মাথা বকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ব্রজদাসীর অঙ্গে অসংখ্য আঘাত-চিহ্ন, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়া সর্বদিকে কে যেন খোঁচাইয়াছে, দেহ বাহিয়া রক্তধারা নীচে পড়িতেছে।

ভৈরব রায়ের সকল অঙ্গ হিম হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ছই চক্ষু কাটিয়া প্রাণ যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। তার পর চমক ভাঙিল।

হঠাৎ পল্লীবাসী সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল গুম-গুম, গুম-গুম শব্দ কবিতা ভৈরব রায়ের দামামা কর্কশ কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল। পূর্ণচন্দ্র ঘনকৃষ্ণ মেঘের অন্তর্ভালে লুকাইল, ছাই-বঙের অসংখ্য মেঘখণ্ড মাথার উপরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎরেখা সমস্ত নভস্তল চিরিয়া কেলিতে লাগিল। তখনও গুম-গুম করিয়া কর্কশ কণ্ঠে ভৈরব রায়ের পাগলা দামামা বাজিতেছে।

কুজদেহ বৃদ্ধ লাল সিং কখন তাহার বাকানো তরবারি কোমরে বাধিয়া রকের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রভুর আদেশ বহন করিয়া কখন সে চলিয়া গেল, ভৈরব রায়ের হাতীর দাঁতের খড়মের ঠক্ঠক্ ঠক্ঠক্ শব্দেব তখনও বিবাম নাই।

দেখিতে দেখিতে পূর্বাকাশ লাল হইয়া উঠিল, মনে হইল কালীদেহের পাড়ে যেন আগুন লাগিয়াছে। লক্ লক্ করিয়া মেঘের লোলশিখা আকাশে যেন ধাইয়া উঠিল। মনে হইল শত শত শিবা অশুভ চীৎকার করিয়া উঠিল। মনে হইল বহু কণ্ঠের কল্পন কল্পন বোলে চবাচর মুর্ছিত হইয়া পড়িল।

শব্দ বস্ত্রে সর্বদেহ আচ্ছাদিত করিয়া স্বল্পভাবিনী, শাস্ত, মুহূর্ত্তাবা ব্রজদাসী আর ফিরিল না, স্কন্দোপম উজ্জ্বল রূপ লইয়া রায়-বংশের শেষপুরুষ যুবক কীর্তিনারায়ণ আব ফিরিলেন না, বাকানো তরবারি কোমরে বাধিয়া নিমকহালাল কুজদেহ বৃদ্ধ ভৃত্য লাল সিং আর ফিরিল না।

পাগলা দামামা নিস্তক হইয়াছিল, কালীদেহের পাড়ে

বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র শান্তোজ্জ্বল হাসি হাসিতেছিল। কিন্তু বৈঠকখানা-দালানের রকের কঠিন বন্ধে যেখানে দুইটি ঝাড়ের শাখা জুঁই ফুলের গন্ধে ও শুচ্ছ শুচ্ছ পদ্রকরবীৰ শোভায় চাৰিদিক আমোদিত ও উজ্জ্বল হইয়াছিল, ভৈরব রায়েব হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ তখনও সেখানে নিস্তব্ধ হয় নাই।

সাহসিক কোন পল্লীবাসী বৈশাখী পূর্ণিমায় রায়-বাড়ির ভগ্নস্তূপের সন্নিকটে দাঁড়াইলে এখনও দেখিত যে কালীদহের পাড়ে আকাশের গায়ে পূর্ণচন্দ্র বিবাট ভগ্নস্তূপের উপর স্নান ছায়া বিস্তার করিয়াছে, আর শুনিতে পাইত, সেই ভগ্নস্তূপের অন্তর হইতে আসিতেছে কঠিন রকের বৃকে হাতীর দাঁতের খড়মের শব্দ—ঠক্ঠক্ ঠক্ঠক্।

পদ্মাবতের কবি

শ্রীঅমৃতলাল শীল

পদ্মাবতের কবির নাম মলিক মহম্মদ জায়সী (জায়স নগর নিবাসী)। আশ্চর্য্যকাল যে স্থানে “নবাব” শব্দ ব্যবহৃত হয়, তুগলক ও খিলজী-বংশীয় সম্রাটদের সময়ে সেই স্থানে মলিক [বাল্লী মল্লিক] শব্দ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কবি মহম্মদ স্বয়ং এই উপাধি অর্জন করেন নাই, বা কোন মলিকের বংশে তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি স্বয়ং আপনার নামের সহিত এই মলিক শব্দ জুড়িয়া দিয়াছিলেন অথবা তাঁহার সঙ্গী বন্ধুবা তাঁহাকে মলিক বলিয়া ডাকিতে আবন্ত করিয়াছিল ঠিক জানা নাই; তবে তিনি আপনার এক হিন্দু বন্ধুকে মলিক উপাধি ধারণ করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন ও তাহার বংশে এখন পর্য্যন্ত মলিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

মহম্মদ দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন। জন্মের অল্প পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, মাতা গৃহস্থদের বাগীতে শরীর খাটাইয়া অতিকষ্টে পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন। শৈশবেই মহম্মদ বসন্তরোগে একটি চন্ড ও একটি কর্ণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখখানি এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে লোকে দেখিলে না-হাসিয়া থাকিতে পারিত না। আট নয় বৎসর বয়সে মহম্মদের মাতারও মৃত্যু হইল, তখন বালক একেবারে নিরাশ্রয় হইল। লোকে তাহার বিকৃত মুখ দেখিয়া হাসিত কিন্তু এই হাসি বালকের হৃদয়ে শেলের মত বিধিত, সেইজন্য বালক সমস্ত দিন গ্রামের উপকণ্ঠে বনে বনে নিষ্কণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইত, গ্রামে

প্রবেশ করিত না। বনে যদি ফলমূল কিছু পাইত তবে তাহাই খাইত কিংবা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইলে বাজে অঙ্কাবে গ্রামে আসিয়া ভিক্ষা করিত, অথবা বন হইতে কাষ্ঠ কুড়াইয়া কিছু অর্জন করিত। বালক এক দিন দেখিল বনে একদল হিন্দু সন্ন্যাসী রাত্রি-বাস কবিবার উদ্যোগ করিতেছে ও পাক আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় বালক তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলে সন্ন্যাসীদের দলপতি তাহার করুণ কাহিনী শুনিয়া তাহাকে আদর করিয়া খাওয়াইলেন ও বলিলেন—এরূপ কষ্ট করিয়া কয় দিন কাটাঁইবে, আমাদের সঙ্গে চল, আমবা পরিব্রাজক, এক স্থানে দু-এক দিনের বেলা থাকি না, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াই, ভগবান আমাদের অন্ন জুটাইয়া দেন। আমাদের সহিত থাকিলে তোমাকে আমাদের ক্ষমতা-মত ভাল শিক্ষা দিব, ভবিষ্যতে তুমি এক জন ভাল সাধু হইতে পারিবে। মহম্মদ তাহাদের সহিত জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা নগরের বা গ্রামের বাহিরে আসন করিয়া নগরে ভিক্ষা করিতে বাইতেন, কিন্তু মহম্মদ কখনও গ্রামে প্রবেশ করিতেন না। তাঁহাদের শিক্ষাতে মহম্মদ হিন্দুদের পুরাণের অনেক কথা শিখিয়াছিলেন ও কালে ভাল বোগী হইয়াছিলেন। কিছুকাল তাঁহাদের সহিত সমস্ত ভারতের তীর্থ পর্য্যটনের পর মহম্মদ হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক মুসলমান সূফী সাধুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও মুসলমান মতে যোগ সাধন করেন। এইরূপে তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় মতে যোগে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ইহাব পর তিনি কয়েকটি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া পরিত্রাজক-রূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ পবিত্রাজক যোগী সম্প্রদায়ে তোতাপক্ষী-রূপী আশ্রার নানা রূপক গল্প প্রচলিত আছে, তিনি ঐগুলি শিখিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাতে যোগ-সম্বন্ধে হিন্দী ও আববী উভয় ভাষার পাবিত্রাজিক শব্দ পাওয়া যায়। মহম্মদের হাতের লেখা পাওয়া যায় নাই, বোধ হয় লিখিতে পাবিতেন না, অথবা লিখিতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু পরিত্রাজক গুরুর সহিত ঘুরিয়া হাত পাকাইবাব অবসর পান নাই, কিন্তু কবিতা-বচনায় তাঁহার দ্বৈতবদন্ত ক্ষমতা ছিল। তিনি ছোট ছোট সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন ও তাঁহার শিষ্যবা গ্রামে গ্রামে সেই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। এক দিন তাহার জায়স গ্রামে তাঁহার রচিত এক বারমাসা গাহিতেছিল। এই জায়স গ্রাম মোগলসরাই হইতে ১৩২ মাইল দূরে লখনউব পথে প্রতাপগড় ও বায়বেরেলীব মধ্যে বেলের ধাবে অবস্থিত। গ্রামেব জমিদার বা রাজা ঐ গীতে আকৃষ্ট হইয়া বালকদেব সম্পূর্ণ বাবমাসা গাহিতে বলিলেন ও গীত কাহার বচিত জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকরা বলিল, এ গীত আমাদের গুরুর বচনা, তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, কখনও কোন গ্রামে প্রবেশ করেন না। এই কথা শুনিয়া বাজাব শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল, তিনি স্বয়ং গ্রামের বাহিরে গিয়া মহম্মদেব সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও অনুময় করিয়া আপনার এক বড় বাগানে আসিয়া তাঁহাকে বাস করিতে বলিলেন। মহম্মদ-উজ্জান-বাটিতে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন তাঁহার জন্ত বাগানের এক নির্জন অংশে এক খড়্বেব কুটারী বাধা হইল, সেই কুটারীতেই তিনি জীবনের শেষ অংশ কাটাইয়াছিলেন। জয়সের রাজাব বাটীব কাছেই তাঁহার গোব এখনও সন্মানিত বা পূজিত হইতেছে।

এই বাজার অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচে নাই। মহম্মদের আসিবার পর (তাঁহার আলীক্সাদের ফলে) এক পুত্র হইয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছিল বলিয়া বাজা, বাজবংশ ও অনেক গ্রামবাসী তাঁহার ভক্ত হইবা পড়িলেন। ঐ বাগানে বাসকালে

মহম্মদ পদ্মাবৎ রচনা করেন। যোগী-সম্প্রদায়ে আশ্রার পাখীব সহিত তুলনা অন্ত দেশেও প্রচলিত আছে। ইবানেব প্রসিদ্ধ শূকী সাধু ও কবি ফরীদ-উদ্দীন অভারেব আশ্রা সম্বন্ধে “মনতক-উল-তাব” [পাখীর কথা] নামক পুস্তক ফার্সী শূকী-সাহিত্যে একখানি অতি উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইংরেজ কবি ফিট্‌স্‌জিরালাউ এই পুস্তকেব কয়েকটি কবিতাব ভাব লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার “ওমর খৈয়াম” নামক কবিতা-পুস্তকে আছে। ভাবভের যোগী-সম্প্রদায়েও তোতার গল্প নানা আকারে প্রচলিত আছে, মহম্মদ সেই রূপক বর্ণনা পদ্মাবতে করিয়াছেন, ক্রমে লোকে তাঁহার রূপককে ইতিহাস ভাবিয়াছে। একপ ভ্রম অন্ত স্থানেও হইয়াছে, শুনিয়াছি অনেকে বর্দ্ধমানের বাজাবাটীর নিকট মালিনীব মালঞ্চ ও সুন্দরের খনিত স্তূপের স্থান নির্দেশ করিবাব চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। মহম্মদ বোধ হয় রত্নসিংহ ইত্যাদিব নাম শুনিয়াছিলেন, সেই নামগুলি আপনাব কবিতাতে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র, চিত্তোর-অবরোধেব সময়ে অলাও-উদ্দীন কি কি করিয়াছিলেন তাহাব সবিস্তার বর্ণনা মহম্মদ জানিতেন না। সেকালে ইতিহাস কেবল ফার্সী ভাষাতে ছিল, মহম্মদ সে ভাষা জানিতেন না, তাঁহার সঙ্গীরাও ভিখাবী সাধু-সন্ন্যাসী বা বৈবাগীব দল ছিলেন, কেহ ফার্সী ভাষার ধার ধারিতেন না। তবে অন্ত কোন লোকেব মুখে ১৪০ বৎসর পূর্বের যুদ্ধের গল্প শোনা সম্ভব বটে, কিন্তু সে শোনা-গল্পও অত্যাশ্চর্য হওয়া সম্ভব। সেকালের হাতে লেখা পুস্তকও ছুট্টাপা ছিল, নানা দিক্-দিয়া চিন্তা করিলে মহম্মদের মত লোকেব বিশ্বাস্য ইতিহাস না-জানাই সম্ভব বোধ হয়। ইহা ছাড়া কবির উদ্দেশ্যও ইতিহাস লেখা নহে, গল্পে যেমন এক বাজা ও তাঁহার ছদ্মো স্ত্রী বাগীব কথা বলা হয় সেইরূপ গল্প বলিয়াছেন, কেবল বাজা-বাগীর একটা নাম দিয়াছেন মাত্র। চার শত বৎসর পবে তাঁহার বাজা ও বাগীর যে জীবনের খোঁজ করা হইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ওরূপ ভাবিলে তিনি হযত রাজা-বাগীব নাম দিতেন না।

আজকাল পদ্মাবৎ গল্প বা কবিতা দেবনাগর অক্ষরে ও উর্দু অক্ষরে লিখিত ছই প্রকার পাওয়া যায়, তাহাদেব পাঠে

অনেক প্রভেদ আছে। দেবনাগর অক্ষরে লেখা পুস্তক হিন্দী ভাষায় বিদ্বানদের হাতে ছিল ও উর্দু অক্ষরে লেখা পুস্তক-খানি মুসলমানদের হাতে ছিল। মহম্মদ অশিক্ষিত ছিলেন, তাঁহার কবিতাতে ব্যাকরণ ও ছন্দেব অনেক ভুল ছিল, হিন্দী পণ্ডিতরা অনেক ভুল সংশোধন করিয়াছেন, অতএব উভয়েব পাঠে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। উর্দু অক্ষরে লেখা পুস্তকখানি মহম্মদের আসল অবিকৃত বচনা বোধ হয়, মুসলমানরা সংশোধন চেষ্টা করেন নাই।

জায়সী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে তাঁহার বিকৃত মুখ দেখিয়া হাসিলে তিনি মনে বড় আঘাত পাইতেন, সেইজন্য

তিনি সকলের সম্মুখে বাহির হইতেন না। জায়সের বাজাব এক বন্ধু জমীদার তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া রাজার অতিথি হইয়াছিলেন, পরে কবিকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহম্মদ বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়া কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে দেখিয়া হাসিতেছ? হাড়ি দেখিয়া হাসিতেছ, না কুমোবেব প্রতি বিদ্রূপ করিতেছ? অর্থাৎ আমার মুখ দেখিয়া হাসিতেছ, না আমাকে যে কুম্বকাব এইরূপ কদাকার গড়িয়াছে তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছ? জমীদারটি বড় লজ্জিত হইলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রঞ্জিনা নায়ের মাঝি

শ্রীবিমল মিত্র

সন্ধ্যাবেলা বউ-ডুবির-চরে নৌকা বাধা হইল। আশাব আব আনন্দের সীমা নাই। ষতদূর চাও কেবল জল—ছল-ছল কল-কল শব্দ করিয়া নৌকাব গায়ে আসিয়া ঢেউগুলি আছাড় খাইতেছে। পাশের বউ-ডুবির-চরে ঘন জঙ্গল। অনেক দিনের পুরাতন চর; জঙ্গলও অনেক দিনেব। বালুব চব চালু হইয়া জলেব উপব নামিয়া আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আশা একেবারে আশ্বহাবা হইয়া গেল।

মাঝিবা দুই জন নৌকা বাঁধিয়া তামাক সাজিতে বসিয়াছে। চবে নামিয়া হাত-পা ধুইয়াছে। সঙ্গে চিঁড়া মুড়ি আছে—তাহা দিয়া তাহারা শেষবাবেব মত আহার সমাধা করিবে। বিকালবেলা সূর্য্যাস্তের সময় এবং তাহাব আগেও তাহারা গান করিয়াছে। হু-হু-কবা বাতাসের সঙ্গে তাহাদের গান চমৎকার লাগিয়াছিল। বনমালী আর আশা সাবা বিকাল ধরিয়া একমনে তাহাই শুনিয়াছিল। চমৎকার গলা; গানটি কাহাব রচনা কে জানে—কিন্তু বড় করুণ। পাড়ারগেয়ে গান; গানের তাৎপর্য্য : মাঝিকে ডাকিয়া কোন্ বিরহী বলিতেছে, নাইয়া তুমি তো কত দেশ ঘোব, কত দরিয়া পাড়ি দাও, তুমি কি আমার বধুর খবর রাখ?...

বদি কখনও তার দেখা পাও, তাকে বলিও আমি তাহাব পথের দিকে চাহিয়া এখনও বসিয়া আছি,...

হইয়ের এধারে গলুই-এর কাছে বসিয়া আশা পা দিবা জল ছিটাইতেছিল। নূতন বউ—বিয়ে হইয়াছে সেদিন—বছরখানেকও হয় নাই—কিন্তু এমন চঞ্চল! বনমালী বদি হুকুম দেয় তো আশা এখনই চবে গিয়া বেড়াইয়া আসিতে পাবে—তাহাব এতটুকু ভয় কবিবে না—

বনমালী মানা কবিল—উছ—পা দিও না জলে—দিও না বলছি—বধু শুনিবে না। জলের ওপর পা দিলে বে কি দোষ হয় তাহা তাহার বোধগম্য হইতেছিল না। বনমালীব কথা না-শুনিয়া আশা তেমনই পা দিয়া জল নাড়াইতে লাগিল। বনমালী বলিল—দিও না বলছি পা, ও আশা, পা দিও না—তবু বদি কথা শুনবে—যে-কথাটি বলব, সেইটি—জলে কত কুমীর-হাঙোর আছে—সাপ-খোপ আছে—

আশা হাসিয়া ফেলিল—হ্যা, জলে নাকি আবাদ সাপ থাকে!

বনমালী এবার বাগ দেখাইল—থাকে না তো থাকে না বেশ—সাপ থাকে না, কুমীর থাকে না, কিছু থাকে না— এই সঙ্কেবেলা জলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে থাক— শেষকালে সুষমার মত তোমাকেও কামড়ে দিক—আমি কিছু ছুটি বলব না—

আশা তবু পা তুলিল না—কিন্তু বনমালী ব মুখের ওপর চোখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুষমা কে?...কে সুষমা?

—কে আবার! নিতান্ত ভাচ্ছিয়াভরে বনমালী ওধারে চাহিয়া উত্তর দিল—সুষমাব নাম শোন নি? মার কাছে কোনদিন শোন নি? সুষমা—সুষমা—তিন অক্ষরেব সেই অতিপ্রিয় নামটি বনমালী স্পষ্ট কবিতা উচ্চারণ করিল দুই দুই বার?

—ওঃ দিদিব কথা বলছ?...

এবার আশা বুঝিতে পারিয়াছে। বনমালী ব আগের পক্ষের বউয়ের নাম সুষমা!

আশা বলিল—দিদিকে ত সাপে কামড়েছিল, না?

বনমালী চুপ কবিতা গম্ভীর হইয়া ছিল। কি কথা বলিতে বলিতে কি কথা উঠিয়া গেল! কোথা দিয়া কি হইল—আজ এতদিন পবে হঠাৎ কথায় কথায় তাব কথা কেন মনে পড়িয়া গেল! আগে আগে সুষমাব কথা ভাবিতে গেলে বনমালী ভাবী অন্তমনস্ক হইয়া পড়িত—কাঁদিতা ফেলিত এক এক সময়; সুষমার একটা ফটোও বাঁধাইয়া রাখিয়াছিল ঠিক বিছানার উপর দিকের দেওয়ালের গায়, কিন্তু এই আশা আসিবার পর সেটা বনমালী ভাঙিয়া ফেলিয়াছে! কি হইবে রাখিয়া? সাব জীবন মন খারাপ রাখিলে বাচিবে কেমন করিয়া? কিন্তু এতদিন পরে সেই কথাটি আবার কেন মনে পড়িল! বনমালীর মনে হইল, মনে না-পড়িলেই বুঝি ভাল হইত। বাহাবা চলিয়া যায় তাহাদের কেন মনে রাখা! কেন তাহাদের আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা! সুষমাকে আব মনে রাখিবার দরকার নাই। সুষমাকে এবার হইতে বনমালী একেবারে ভুলিয়া যাইবে। সেই বিপুল জলরাশির দিকে চোখ রাখিয়া বনমালী চুপ কবিতা বসিয়া বহিল। তাই ভাল তাই ভাল—সুষমাকে সে একেবারে ভুলিবে।

আশা বলিল—আচ্ছা, আমার যদি সাপে কামড়ায় তুমি কি কর?

বনমালী বাগিয়া উঠিল—কি সব তোমাব অনুকূণে কথা—আব কোনও কথা নেই তোমাব মুখে—তোমার কি হ'ল বল ত...?

আশা তাহার প্রথম প্রশ্নের জের টানিয়া বলিল—দিদির মতন যদি আমি মরে যাই—তুমি আবার বিবে. করবে ত?...বল না—ওগো—চুপ ক'রে বইলে কেন—বল—উত্তর দাও—

বনমালী এবাব ভীষণ রাগ করিল। বলিল—কথখনো বলব না—বলব না ত—কেন, মরা ছাড়া বুঝি তোমাব আর কোনও কথা নেই মুখে—মরা মরা—মরতে তোমাব বড় সাধ—আব আমি যদি মরে যাই?...

টপ করিয়া আশা বনমালীর মুখে হাত চাপা দিল। বলিল—ওগো, আব কথখনো বলব না—কথখনও না—আমার ঘাট হয়েছে—হ'ল ত এবাব? মা গো—তোমাব মুখে কিছু আটকায় না—তুমি সব পার—

এই ঘটনায় বনমালীর আর একটি দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও সুষমা ঠিক এমনি করিয়া তাহার মুখ চাপা দিয়াছিল। একটা কথাও বলিতে দেয় নাই। তাব পব দেশে গিয়া বনমালীর নাম করিয়া চণ্ড-ভৈরবেব মন্দিরে পূজা দিয়া আসিয়াছিল। ইহারা সবাই এক বকম। সেদিনকাব সুষমার সঙ্গে আজিকাব আশার এতটুকু তফাৎ নাই। এই আশা তাহাকে যেমন ভালবাসে সুষমাও ঠিক তাহাকে তেমনই করিয়া ভালবাসিত। তবে তাহাকে বনমালী এমন করিয়া ভুলিয়া গেল কেন? চোখের আড়ালে যে চলিয়া যায়—মনেব আড়ালেও সে যে চলিয়া যায় না সে কথা কে বলিল। মিথ্যা কথা—চিরকাল কেহ কখনও কাহাকে মনে রাখিতে পারে?...সে-ও যে সুষমাকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার কি দোষ!

ক্রমে চারিদিকে আরও অন্ধকার হইয়া আসিল।

অস্পষ্ট কুয়াশার মত চাবিদিকেব প্রত্যক্ষ বাস্তবতা অন্ধকাবে মিলাইয়া গেল। কেবল অন্ধকার—সামান্ত একটু চাঁদেব আলো পড়িয়া জায়গায় জায়গায় চিক্ চিক্ কবিতা উঠিতেছে; চবেব জঙ্গলে একসঙ্গে অসংখ্য ঝিল্লী

কলরব জুড়িয়া দিয়াছে—ইহানের মধ্যে বসিয়া বনমালী আর আশা সীমাহীন কাল হইতে খসিয়া পড়া এক একটি মুহূর্ত জুড়াইয়া সঞ্চয় করিতে লাগিল।

জোয়ার আসিবে রাত্রি ছুটায়—সেই জোয়ারে নৌকা ছাড়া হইবে। মাথাভাঙাব উত্তর দিকে খালের ভিতর দিয়া বড় নদীতে পড়িবে—সেখান দিয়া গিরা বাবুইঘাটার জেটিতে ষ্ট্রামার ধরিতে হইবে। চিঁড়া মুড়ি বাহির করিয়া মাঝিরা খাওয়া শেষ করিয়াছে—বনমালীও সঙ্গে কবিতা খাবার আনিয়াছিল, হু-জনে মিলিয়া শেষ করিল। খাওয়ার শেষে এক জন মাঝি হু কবিতা গান ধরিয়াছে—

...কোন বন্ধুকে লক্ষ্য কবিতা কে বেন বলিতেছে—
তোমার লাগিয়া আমার চক্ষের পানি আর বক্ষের বাধা
বাধা মানে না—তোমার আশায় সারা জীবন আমি পথের
পাশে বসিয়া আছি—তুমি বারেক আসিয়া আমার দরদ
জুড়াও...

হুরে কথায় গানটি বনমালীর ভারী চমৎকার লাগিল। আশাও তন্ময় হইয়া গিয়াছে। এই পবিপূর্ণ উন্মুক্ত আবহাওয়ায় আর মনের এই অতি-পরিচিত প্রতিবেশে গানটি বনমালীকে অবশ করিয়া দিল।

আশা পাশে বসিয়াছিল। আরও পাশে আসিয়া বলিল—তুমি তো বাঁশী বাজাতে এককালে, না ?

বনমালী বলিল—কে বললে তোমায় ?

—কে আবার বলবে! সবাই ত জানে। পাড়ার সবাই বলে—সেদিন ভগ্নদেব বড়বো বলছিল—যাত্রায় নাকি তুমি কেউ সেজে বাঁশী বাজাতে, মা'র কাছে শুনিছি—এই-টুকু বেল খেকে বাঁশীর সখ ছিল তোমার—একবার বাঁশী কেড়ে নিয়েছিল ব'লে কি কারা তোমার—ভাত খাও নি কিছু না—আচ্ছা অত সখ, এখন আর বাজাও না কেন ?

বনমালী কথা কহিল না।

—হ্যাঁ গো সে বাঁশীটা গেল কোথায় ?...আমার বিয়ের পরে ত দেখতে পাই নি—তুমি নাকি বাঁশী বাজালে পাখীরা ডেকে উঠত—সত্যি সত্যি এক দিন শুনিও আমাকে, বাঁশী শুনে আমি ভারী ভালবাসি—সে বাঁশী রেখেছ কোথায় বল ত ?

বনমালী বলিল—এই গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি—

আশার বিশ্বাস হয় না। বলিল—আহা, সব কথাতেই তোমার ঠাট্টা, সাধের বাঁশীটা জলে ফেলে দিলে?...কার ওপর বাগ করেছিলে, শুনি ?

—তোমার দিদির ওপর—

আশা বুঝিতে পারে নাই। বলিল—দিদি কে ?

—হুম্মা—

কথাটা বলিয়াই বনমালী বুঝিল মিথ্যা কথাটা বলা তাহার উচিত হয় নাই। সত্য সত্যই হুম্মার উপর রাগ ত সে করে নাই। বাগ হইয়াছিল বাঁশীর ওপর—সেই রাগেই সে বাঁশী বাজান ছাড়িয়া দিয়াছে। নিশীথ রাত্রে এক-এক দিন বনমালীর বখান ঘুম আসে না—বন-ভুলসীর গন্ধে বাতাস উন্মত্ত হইয়া ওঠে—তখন সেই সময়ে ছাদে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে তাহার ইচ্ছা করে। ইচ্ছা কবে—বাঁশীব ফুটা দিয়া প্রাণের সমস্ত গোপন কথা আকাশে এবং আকাশেব তারকালোকে ছড়াইয়া দেয়। যেখানে মর্ত্য-লোকের বাঁশী পৌঁছায় না, সেই গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে তাহার বাঁশী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া মকক!...

আশা বলিল—চুপ ক'রে রইলে যে বড়—বললে না ত ?
—কি বলব ?

আশা বলিল—কেন দিদির ওপর রাগ কবেছিলে...

—সে অনেক কথা—

আশা বলিল—হোক অনেক কথা, বলতেই হবে—না' বললে শুনিব...আমাকে বলতে তোমার কি হয়েছে—আমি ত তোমার পব নই—

সে আজ চার বছর আগের কথা। গ্রীষ্মকাল। জমিদারীর কাজে বনমালীকে শহরে আসিতে হইবে! অনেক বুঝাইয়া-জুঝাইয়া হুম্মাকে বনমালী শাস্ত করিয়াছিল। বাহিরে গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—পৌটলা-পুটলি লইয়া বনমালী উঠিতে বাইবে এমন সময় বলা-নাই কওয়া-নাই এক গলা ঘোমটা দিয়া হুম্মা সরাসরি গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

তখন আর কেইবা বোঝে—আর কেইবা বোঝায় সে সময় নাই তখন।

বনমালী শুধু বলিয়াছিল—কোথায় বাবে তুমি ?

কি জানি কেন—বোধ হয় অকাবণেই—স্বপ্না বলিয়াছিল—“চুলো”—

বনমালীও রসিকতা কবিতা বলিয়াছিল—চল সেখানেই তোনার নিয়ে বাচ্ছি—

শহরের তিন মাইল দূরে সুষমাব বাপের বাড়ি। সেখানেই বাওয়া আপাততঃ স্থির হইল। নৌকার পথে দু-দিন কাটাইতে হয়। চেউয়ের দোশার ছলিতে ছলিতে একটা গোটা দিন বেশ কাটিয়া গেল। চাঁদের আলোয়—আর অবাধ খোলা হাওয়ার সুষমাব কি ক্ষুধি—কোলে নাখা রাখিয়া শুইয়া শুইয়া আকাশ দেখা—মাঝির গান শোনা; রাজিবেলা দুবে অন্ধকারের মাঝে টিম্ টিম্ করিয়া দুই একটা আলো জলে—কোন নৌকাব আলো হয়ত। এই তীব—এই একেবাবে অকুল পাথর। পৃথিবীর কোনও ভাবনা নাই—দুঃখ-দৈন্তরয় পৃথিবীকে এড়াইয়া যেন তাহার অমর্ত্যলোকে আসিয়াছে।...

দ্বিতীয় দিন ভোর বেলা মাঝিরা একটা চরে নৌকা বাধিল। চাবি দিক তখনও বেশ অন্ধকার—সকাল ভাল কবিতা হয় নাই। বাত্রে বনমালীর ভাল ঘুম হয় নাই তাই আব মিছামিছি ঘুমাইবার চেষ্টা না করিয়া বাঁশীটা লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিল—

সামনে কেবল জঙ্গল। চবের উপর কতদিনকার গাছপালা নদীর জল পাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে ঠিকানা নাই। কত ভয়ানক জীবজন্তু উহার ভিতর আছে কে জানে। ঘনসন্নিবিষ্ট ডালপালার দৃষ্টি যায় না। এক-একবার হাওয়া আসে, সারা বনস্থলীতে একটা থম্ থম্ আলোড়ন হয়।

বনমালী বাঁশী লইয়া বাজাইতে লাগিল।

সুরে আবস্ত হইয়া উঠিতে পড়িতে কোমল রেখাব কোমল গাকার ছুইয়া ছুইয়া ভৈরবী উপরে চড়িতে লাগিল। কোমল ধৈর্যেতে ঠাঁড়াইয়া হেলিতে ছলিতে কোমল নিখাদ ছুইল—তার পর কত পথে সুর চলিল। অপক্লপ কপ-লাক্যময়ী একটি পাহাড়ী মেয়ে কোমরে কলসী লইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড়ী পথে ঘুরিতে ফিরিতে সোজা ও নীচু হইয়া গ্রামে চলিয়াছে। তাহারই চলিয়া বাওয়াব ছন্দ—তাহারই বিবহবিধুর অন্তরেব হৃন্দ—তাঁহাব

গতিভঙ্গীর সরস ব্যঙ্গনা লইয়া বাঁশীব গান বাজিয়া চলিল। সুরের শবজালে আকাশের আবহাওয়া আচ্ছন্ন হইয়া চলিল। নিবিড় অনুভূতি লইয়া বাতাস চুপ কবিতা কান পাতিয়া আছে—জলের তরঙ্গ যেন নিশ্চল হইয়া গিয়াছে—আকাশ মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মস্তমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

নৌকার ভিতর সুষমা ঘুমাইতেছিল—কখন বাঁশীব শব্দে জাগিয়া উঠিয়া পাশে আসিয়া বসিয়াছে। মাঝিরাও ঘুম হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। পৃথিবীর জড় জীব সমস্ত যেন সুরের মধ্যে অবশ হইয়া আছে। জলের মৃদু-শ্রোতের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে সুর চলিল। সেই ভোর-বেলা সমস্ত বনস্থলী যেন সুরের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সুরের চেউ ভাসিতে ভাসিতে দূরে অনেক দূরে কোন গ্রামান্তের কোন তীরে, কোন গৃহকোণে কোন বিরহীর বক্ষে কাঁদিয়া কুটিকুটি হইতে লাগিল। সীমা নাই—শ্রান্তি নাই—নূতন নূতন বেদনা-সম্ভার লইয়া সেই ভরা-বুক নদীর দুই কিনার ভাসাইয়া দুই কূল ছাপিয়া সুরের জোয়ার ছুটিল! এ সুরে বেন নেশা আছে—এ যেন মানুষকে বড় দুর্বল করিয়া দেয়। তখন সব ভুলিতে হয়—এই পৃথিবীর শ্রান্তি ক্লান্তি ব্যর্থতা নীচতা দৈন্ত—সব সেই বাঁশীর সুরে মিলাইয়া যায়, সুরেব মোহিনী মায়ার অতিবড় দুর্বল জঙ্ঘও কেমন নিজেব অস্ত্রাতে মাথা নীচু করে, এ বাঁশীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন হয়। সেদিন সেই নদীপারের চরের উপর বাঁশী এক অপূর্ণ কান্না কাঁদিতে লাগিল...

সকলেই চুপ,—হঠাৎ সুষমার কি হইল কে বলিবে—একটা পা নৌকা হইতে জলের উপর ঝুলাইয়া দিল।... আবাম করিয়া বসিবার জন্ত হয়ত।...

কিন্তু পা ঝুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে সুষমা ‘মা গো’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে।

বাঁশী ফেলিয়া রাখিয়া বনমালী সুষমাকে ধরিতে গেল—সুষমাকে ধরিল—কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেখা গেল একটা সাপ কিলবিল করিতে কবিতা চরের উপর দিকে চলিয়া গেল।

অভাবনীয় কাণ্ড!

বেদনার চীৎকার কবিতা কবিতা সুষমা নৌকাব উপর

ছটকট করিতে লাগিল। খুব বিবাক্ত সাপ নিশ্চয়ই—
অন্ধকাবে যতটা দেখা যায় সাপের চেহারা দেখিয়াই
বনমালী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

ক্ষতস্থানেব ঠিক উপবেই বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল—
কিন্তু হইলে কি হয়—সারা শরীর ক্রমে নীল হইয়া আসিতে
লাগিল। চোখের দৃষ্টি বোলা হইতেছে; সে কী যন্ত্রণা-
কাতর চীৎকার—অত যে লাঞ্ছন মেয়ে সে-ও গলা ছাড়িয়া
আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া চোঁচাইতেছে। দেখিতে দেখিতে
ক্রমে এক বণ্টার মধ্যেই সব যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে
লাগিল—বনমালীর চোখের সামনে তাহার কোলের উপর
মাথা রাখিয়া সুখমা মরিতে চলিল...

তার পর সেই নৌকা করিয়াই যত লীম্ব পারা যায়
কাছাকাছি কোন গ্রামে তাহাকে আনা হইল—বাঁচাইবার
চেঁটা যথাসাধ্য হইল—কোথার ডাক্তার কোথায় বন্দি—ওই
বে অনেক দূবে একটা কালো জঙ্গল মতন দেখিতেছে—
ওইখানে অশানে তাহাকে পোড়াইয়া বনমালী একলা
নৌকা করিয়া ফিরিয়াছিল...

গল্প শেষ কবিয়া বনমালী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আশা এতক্ষণ তন্নয় হইয়া শুনিতেছিল। বনমালী
খামিতেই বলিল—তার পব?...বাঁশী বাজান সেই দিন
থেকেই ছেড়ে দিলে?

—সেদিন থেকে নয়—তার পরদিন থেকে—সুখমা
মারা যাবার পর একদিন শুণ্ড বাজিয়েছিলাম, তার পরদিন
সন্ধ্যাবেলা—

আশা ছেলেমানুষের মত কাছে ঘেঁষিয়া জিজ্ঞাসা
করিল—কেন—সেদিন কি ছিল?...

—তবে শোন—

সব কাজ শেষ হইয়াছে—ভোরবেলা অশান হইতে
ফিরিয়া বনমালী বাড়ি ফিরিয়া যাইবে। সমস্ত ঠিক
বন্দোবস্ত হইয়া আছে। এমন সময় মাঝি আসিয়া
বনমালীকে তাহার বাঁশীটি ফিরাইয়া দিয়া গেল। বনমালী
ভুলিয়া আগেব দিন নৌকায় উপরেই কেলিয়া রাখিয়া
আসিয়াছিল। বাক, বাঁশীটি হাতে আসিতেই বনমালী
ঠিক করিল আবার একবার সেই চরে যাইতে হইবে।

হু-জন মাঝি ছাড়া আরও হু-জন লোক চলিল লাঠি-

শড়কি লইয়া। বিকালবেলা আবার সেই চরে গিয়া তাহার
পৌছিয়াছে। আগের দিনের মত ঠিক সেই জায়গায় নৌকা
বাঁধা হইল। সন্ধ্যা আরম্ভ হইয়াছে কি হয় নাই—
এমন সময়ে সেই ছুটি লোককে লইয়া বনমালী চরে নামিল।

একটু ঝোপ-জঙ্গলময় অথচ কাঁকা জায়গা বাছিয়া লইয়া
বনমালী বাঁশী-হাতে সেখানে বসিল। ছুটি লোক, তাহারও
বনমালীর হু-পাশে হু-জন বসিয়াছে! বাঁশীর সুরে সেই সাপকে
ডাকিয়া আনিয়া লাঠি দিয়া ঠেঙাইয়া হত্যা করা হইবে!
যে সাপ সুখমাকে কামড়াইয়াছে তাহাকে আর পৃথিবীতে
বাঁচিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহার নিকাশ করিয়া তবে
বনমালীর অন্ত কান্ন। আবার বাঁশী বাজিতে লাগিল।

তেমনি সুরের মুহূর্ত্তনায় মীড়ে তানে অপকণ্ঠ হইয়া
বনমালী সচকিত হইয়া উঠিল। বনমালীর বুকে বত বেদনা
বত কান্না আছে সব বাঁশীর ফুটাতে নিঃশেষে ঢালিয়া দিল।
জ্বরের অন্তস্তল পর্যন্ত কে যেন বড় নিষ্কণ্ঠ ভাবে মোচড়
দিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ধরণীর মাঝপথে
আসিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ আসিতেছে না।
তাহার পাশেব ছুটি লোক হু-জোড়া সন্ধানী চক্ষু দিয়া আশে
পাশে নজর দিতে লাগিল—কেহ ত আসিতেছে না।
অন্ধকার তখনও তরল। সুব বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে।
বনমালী মরীয়া হইয়া উঠিল—তাহাব সমস্ত শক্তি একজ
করিয়া একমনে বাঁশী বাজাইয়া চলিল। বাঁশী বাজিতেছে—
এখনই বুঝি আকাশ গলিয়া পড়িবে—নদীব জল সমস্ত
বুঝি এখনই চব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—আরও—আরও
করণ কবিয়া বনমালীর বাঁশী কাঁদিয়া চলিল—

তিন জনেই দেখিল—কল ফলিয়াছে...

সাপ আসিতেছে; বনমালীর মনে হইল যেন ঠিক সেই
সাপটাই! আসিতেছে—আসিতেছে—আসিয়া পড়িল—
কিছু দূরে আসিয়া সাপ চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া গেল। স্থির
নিশ্চল মুষ্টির মত—কেবল সুরের তালে তালে যেন একটু
মাথা দোলাইতেছে; উহার চোখে ঘোর লাগিয়াছে—
সুরেব নেশা উহাকে পাগল কবিয়াছে...

লোক দুটি ইঙ্গিতে পরস্পরে একসঙ্গে তৈরি হইতেছিল।
আর এমন সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়, লাঠি হাতে লইয়া
ঠিক হইতে যাইবে—এমন সময় বনমালী দেখিল সাপ একটু

নয় ছুটি। একজোড়া! দম্পতি উহারা! পাশাপাশি এ উহার গায়ে হেলান দিয়া রহিয়াছে। লোক ছুটিও দেখিল—একটি সাপ নয় ছুটি! মারিতে হইলে ছটিকে একসঙ্গেই শেষ করিতে হইবে! লোক ছুটি পুনর্বার প্রস্তুত হইয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছে...

হঠাৎ বনমালী তাহাদের ইঙ্গিতে বসিতে বলিল।

বনমালী বাণী বাজাইতে বাজাইতে আস্তে আস্তে পিছনে হটিতে লাগিল। লোকছুটিও সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া আসিতে লাগিল। তাব পর নৌকার কাছে আসিতেই বনমালী নৌকার উপর লাফাইয়া উঠিয়াছে; লোকছুটিও উঠিল। নৌকাতে উঠিয়া দেখা গেল—বহুদূরে সাপছুটি বনের মধ্যে কোথাব অদৃশ্য হইয়া গেল।...নৌকা ছাড়িয়া দিল।...

নৌকার উঠিয়া বনমালী একটাও কথা বলে নাই। চুপ করিয়া গলুইয়ের কাছে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।...

লোক ছুটি বনমালীর অসঙ্গত আচরণ বুঝিতে পারে নাই। কাছে আসিয়া বলিল—কি হ'ল বাবু—মারলেন না যে?

বনমালী বলিল—ওদের কি মারতে আছে? এক জোড়া এসেছিল—ওরা যে স্বামী-স্ত্রী—

সত্য-সত্যই প্রাণ গেলেও উহাদের বনমালী কখনও মারিতে পারিত না! একটা যদি আসিত তবে হয়ত মারা সহজ ছিল। কিন্তু এক জোড়া—স্বামী-স্ত্রী উহারা—জন্ত হউক আর বাহাই হউক—উহাদের মারা বড় নিষ্ঠুর কাজ! কবে এক ব্যাধ কোন এক পক্ষী-মিথুন মারিয়া ঋষির শাপে ত সারা জীবন ভবঘুরে হইয়া বেড়াইল—ঘর পরিবাস নীড় রচিবার অধিকার তাহার জীবনে হইল না—; শেষে কি বনমালীও তেমনই অভিশাপ কুড়াইবে! উহারা জু-জনে সুখে থাকুক—মহুয়া-বিবর্জিত দেশে উহারা স্বাধীন চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াক—মানুষ কেন উহাদের দেশে আসিয়া অনধিকারপ্রবেশ করিবে! মানুষেরই অন্তর—

গল্প শেষ করিয়া বনমালী চুপ করিল।

আশা বলিল—তার পর?

—তার পর বাণীটা নিম্নে অনেক দূর নদীর জলে ছুঁড়ে

ফেলে দিলাম; সেই থেকে বাণী আর ছুঁই নে—ও সর্ব্বনেশে বাণী আর বাজাই নে!...

ইহার পর আশা আর বনমালী জু-জনেই থানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। জলের স্রোত প্রায় স্থির হইয়া আসে-আসে। আর ঘণ্টা-দুই পরেই জোয়ার আসিবে। আকাশের গায়ে শুক্লা-একাদশী চাঁদ সারা নদীটিকে রূপালী পাতে মুড়িয়া দিয়াছে; থমথমে আবহাওয়া; মাঝিরা গল্প করিতেছে আস্তে আস্তে। এখানে আশার একান্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে বনমালী! কাছাকাছি বসিয়া আছে বটে, কিন্তু মন তাহার চার বছরের উজ্জান ঠেলিয়া বহুদূর পশ্চাতে চলিয়া আসিয়াছে!... লোকান্তরের প্রান্তসীমায় একটি চঞ্চলা প্রীতিমতী মুখ স্মরণ করিয়া বনমালীর বুকখানা ভাঙিয়া বাইতে লাগিল। তবু আজ সে স্নহমাকে ভুলিতে বসিয়াছে—আশা আসিবার পব. হইতে স্নহমাকে তাহার খুব কমই মনে পড়ে...

আশা হঠাৎ কথা বলিল—আচ্ছা, দিদি তোমাকে খুব ভালবাসত, না?

বনমালী কি উত্তর দিত কে জানে!

হঠাৎ ওধার হইতে এক জন মাঝি হুব করিয়া গান ধরিল। আগেকার সেই গানটি! কেন বিবাহী যেন বলিতেছে—ও গো রজিলা নায়ের মাঝি, তুমি ত কত দরিয়া পাড়ি দাও—তুমি কি আমার বন্ধু খবর রাখ? যদি তাহার দেখা পাও ত বলিও—আমি তাহার পথের দিকে চাহিয়া এখনও বসিয়া আছি—তাহাকে আমি ভুলিতে পাবি নাই—আর বলিও, তাহার জন্ত আমি সারা জীবন এমনই বসিয়া থাকিব।...

গান শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বনমালী মনে মনে গর্জন করিয়া উঠিল; মিথ্যা কথা! সমস্ত মিথ্যা! কেহ কাহারও জন্ত বসিয়া থাকে না!...কেহ কাহাকে চিরকাল মনে রাখে না! সবাই ভুলিয়া যায়।...ভুলিয়া যায় সবাই—চোখের আড়াল হইলেই সব ভালবাসা সব প্রেম ধূলিসাৎ হইয়া যায়। স্নহমা বাইবার পর আশা আসিয়াছে—আশা চলিয়া গেলে আর এক জন আসিবে! বিরহ মিথ্যা—প্রেম মিথ্যা—সব মিথ্যা—কেহ কাহারও নয়—সবাই একক—

অনহৃত্ত এক বিচ্ছেদ-বেদনা আসিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বনমালীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ভারতের লিপিসমস্যা

অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী, এম-এ

ভারতবর্ষের নানা সমস্তার মধ্যে ভাষা ও লিপিসমস্যা একটি প্রধান, কেননা, আমাদের দেশে জাতি ও ধর্মের বৈচিত্র্য যেমন, ভাষা ও লিপির বিভিন্নতা তা থেকে কিছু কম নয়। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা এক কৃষ্টিব অন্তর্গত হ'লেও এই ভূমিখণ্ডে প্রায় ১৬০টি মূলভাষা ও ৬০০টি উপভাষা বা dialects আছে। লিপিসম্বন্ধেও এই বৈচিত্র্য কতকটা পাওয়া যায়, যদিও প্রধানতঃ লিপির দুটি ধারা এখন প্রচলিত—একটি, দেশীয়, দেবনাগরী, ও অত্রটি বিদেশীয়, আরবীসম্মত ফার্সীলিপি। ভাষার ইতিহাসে যেমন, আমাদের দেশীয় লিপিমালার ইতিহাসেও তেমন দেখা যায় যে এক মূল লিপি থেকে ক্রমাগত পরবর্তিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লিপির উদ্ভব হয়েছে, বখা, দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত হয়েছে হিন্দী, মারাঠি, গুজরাতী, গুরুমুখী, কান্নেখী, মৈথিল, বাংলা, উড়িয়া ইত্যাদি, এবং দেবনাগরী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে তামিল, তেলুগু, সিংহলী প্রভৃতি লিপি। কিন্তু এই সকল লিপিপ্রণালী মূলতঃ এক পরিবারের হ'লেও এই পরিবর্তনের ফলে তারা পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হয়ে পড়েছে। এই ভাবে ভাষা-বৈচিত্র্যের স্রায় লিপি-বৈচিত্র্যও ভারতবর্ষে এক মহা সমস্তার সৃষ্টি করেছে এবং নানা ভাবে ভারতের জাতীয়তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লিপিপ্রণালীগুলির নানা পরিবর্তন সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে ভাষা ও লিপির পরস্পরের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ বা স্বাভাবিক যোগ নেই। একই ভাষা নানা লিপিতে লেখা যেতে পারে, তাতে মূল বস্তুর ভাব বা চিন্তার কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটে না, কারণ ভাষার প্রাণ “ধ্বনি,” অক্ষর বা লিপি নয়। এক একটি ধ্বনিসমষ্টি বা “শব্দ”র (word) সঙ্গে আমাদের চিন্তা বা ভাব প্রথিত, কিন্তু লিপির সঙ্গে ভাব বা চিন্তা কোনও অচ্ছেদ্য যোগ নেই, কেননা, লিপি ধ্বনির প্রতীক

(symbol) মাত্র, তাব নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, কেবল “ধ্বনি”কে দৃশ্যতঃ প্রকাশ কবাই তার কাজ। এইজন্য একই ভাষা নানা লিপিতে স্বচ্ছন্দে লেখা যেতে পারে এবং লেখা হয়েছে থাকে।

সকল দেশেব লিপিপ্রণালী সম্বন্ধেই একথা খাটে, যদিও সকল লিপিপ্রণালীর প্রকৃতি কিছু এক নয়। এক-এক প্রণালীতে এক-একটি বিশেষত্ব আছে, কেননা, সবলরেখা, বক্ররেখা ও বিন্দুব নানা সমাবেশ ও আবর্তন-বিবর্তনের উপর লিপির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। এই সকলের আধিক্য কোন অক্ষবমালা নিতান্ত জটিল ও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আবার এদের সংযত ব্যবহারে কোনটি বা সরল ও সহজ হয়েছে। নানা দেশের লিপিমালার তুলনা ক’রে দেখলেই লিপি বা অক্ষরের সাধারণ প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রকার লিপিমালার গুণাগুণ বা সুবিধা-অসুবিধা সহজেই বিচার করা যায়, এদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ও কোনটি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, কিংবা লিখন ও মুদ্রণ বিষয়ে কোনটি আদর্শস্থানীয় তা নির্ণয় করা যায়। অবশ্য গুরুপাতশূন্য হয়ে বিচার করা প্রয়োজন, নইলে নিজের নিজের লিপিমালাই প্রত্যেকের কাছে ভাল, সহজ ও সুবিধাজনক ব’লে মনে হবে।

কিন্তু আদর্শলিপির (ideal script) লক্ষণ কি কি? প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, এই লিপির প্রত্যেকটি অক্ষরের রেখাচয় যথাসম্ভব আবর্তন-বিবর্তনবর্জিত হবে অর্থাৎ অক্ষবগুলি স্পষ্ট ও জটিলতাহীন হবে, যাতে সহজে তাদের পরিচয় পাওয়া যায় ও সহজে লেখা যায়। এই গুণটি লিপি সম্বন্ধে সর্বপ্রধান। ধ্বনিকে প্রকাশ করাই বখন অক্ষরের কাজ, তখন অক্ষর ইচ্ছামত সহজ বা জটিল করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অক্ষরকে অনর্থক জটিল কবাতে কোন গৌরব বা কৃতিত্ব নেই। দ্বিতীয় কথা, আদর্শ লিপির অক্ষবগুলি অগ্রগতিশীল হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষরের অন্ত্যরূপাপাত বা শেষ-

লেখার গতি সম্মুখগামী হওয়া উচিত, কেননা, তাহ'লে লেখনী একটি অক্ষর থেকে অল্প অক্ষরে সহজে অগ্রসর হ'তে পারে। যদি অক্ষরগুলির শেষ-লেখার গতি সম্মুখের দিকে না হয়ে পশ্চাতে, নীচে বা উপরে হয়, তবে প্রাতি

লিপিচিত্র

DEVA-NAGRI	BENGALI	ORIYA	GUJRATI	TELEGU	ENGLISH
अ	অ	ଅ	અ	ఆ	a
आ	আ	ଆ	આ	ఁ	ā
इ	ই	ଈ	ઈ	ఁ	i
ई	ঈ	ଈ	ૈ	ఁ	ī
उ	উ	ଉ	ઉ	ఁ	u
ऊ	ঊ	ଊ	ઊ	ఁ	ū
ए	এ	ଏ	૬	ఁ	e
ऐ	ঐ	ଐ	ૈ	ఁ	ai
ओ	ও	ଓ	ઑ	ఁ	o
औ	ঔ	ଔ	ઔ	ఁ	ou

দেবনাগরী বাংলা উড়িয়া গুজরাটী তেলুগু ইংরেজী পদে লেখা বাধা পাবে এবং যত সামান্য ভাবেই হোক না কেন লেখার অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হবে। তৃতীয়তঃ, আদর্শলিপির অক্ষরগুলি এমন ভাবে গঠিত হবে যে, প্রত্যেক অক্ষরের শেষলেখা পরের অক্ষরের প্রথম রেখাপাতের সঙ্গে

সহজে ও বিনা জটিলতায় যুক্ত হ'তে পারবে, অর্থাৎ লেখার ক্রমেব অবাধ গতি থাকবে অথচ পাঠে কোন বিঘ্ন হবে না। এ গুণ না থাকলে লেখনী দ্রুত অগ্রসর হতে পাবে না এবং এক অক্ষর থেকে অল্প অক্ষরে সহজে বাওয়া যায় না। চতুর্থ কথা, আদর্শলিপিতে এক-একটি অক্ষর লিখতে লেখনী বার-বার উঠাতে হবে না, অথবা এক-একটি ধনিসমষ্টি বা word এর মাঝখানে লেখনী তুলিবার প্রয়োজন হবে না। লেখনী বার-বার উঠান দবকাব হয়ে পড়লে অলক্ষ্যে হাতের বৃথা পরিশ্রম বাড়ে, কেননা, যতবার আমাদের লেখনী উঠবার প্রয়োজন হয় ততবারই হাতের কিছু কিছু ক'বে পরিশ্রম হয় এবং লেখনী বাধা পায়। প্রথমে ব্যাপারটি সামান্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু লেখার সময়ে মনোযোগ করলে এ-কথার বাধার্থ্য সহজে উপলব্ধি করা যায়। শেষ কথা, প্রত্যেকটি অক্ষর অল্প পরিসরে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মুদ্রাবন্ধ-ব্যবসায়ীরা জানেন যে সকল ভাষার অক্ষর সমান ছোট মাপেব হব না; কোন কোন লিপির অক্ষর খুব ছোট মাপেব ব্যবহার করা যায়, কিন্তু অন্তঃস্থলি অক্ষর অত ছোট মাপের ব্যবহার করা চলে না, কেননা, অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয় না এবং পাঠে অসুবিধা হয়। এই সকল গুণ বে-লিপিতে পাওয়া বাবে তাকে আদর্শলিপি বলা যেতে পারে।

এখন আদর্শলিপির লক্ষণানুসারে দেবনাগরী ও তৎসম্মত লিপিগুলির বিচার সাধাবণ ভাবে করা যাক। এই প্রবন্ধের লিপি-চিহ্নখানিতে দেবনাগরীসম্মত কয়েকটি লিপিমালার গঠন তুলনার জন্য দেওয়া গেল এবং এ-থেকেই বক্তব্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যাবে; অন্ত্যতঃ দৃষ্টান্ত আমরা বাংলা লিপি থেকেই গ্রহণ করিব। প্রথমতঃ অসংযুক্ত অক্ষর—দেবনাগরী ও তার বংশজাত লিপিগুলি অসংযুক্ত অক্ষরগুলিকে জটিলতাহীন একেবারেই বলা যেতে পারে না; অনেক স্থলেই সরল ও বক্রলেখার প্রাচুর্য্য এবং আবর্তন-বিবর্তনে অক্ষরগুলি জটিল হয়ে পড়েছে এবং তার অন্ত্রে সহজপাঠ্য না হয়ে এদের বর্ণগরিচর-চেষ্টাও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। মনে হয়, দেবনাগরী থেকে লিপিপ্রণালী যত দূরে গিয়েছে অক্ষরগুলি ক্রমশঃ তত বেশী জটিল হয়ে উঠেছে, যেমন, উড়িয়া-

যে-সব দোষ বা ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত অংশ আরও নিবিড় ভাবে সংযুক্ত অক্ষরগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলি আরও অধিক জটিল, অগ্রগতি-হীন, পার্থক্যপ্রধান, শেখনীর বাধা উৎপাদক। উপরন্তু

DEVANAGRI	BENGALI	ORIYA	GUJRATI	TELEGU	ENGLISH
अव्ययस्य प्रसङ्गात्प्रत्ययस्य सप्त	অব্যয়স্য প্রসঙ্গাৎ প্রত্যয়স্য সপ্ত	ଅବ୍ୟୟସ୍ୟ ପ୍ରସଂଗାତ୍ପ୍ରତ୍ୟୟସ୍ୟ ସପ୍ତ	અવ્યયસ્ય પ્રસંગાત્પ્રત્યયસ્ય સપ્ત	అవ్యయస్య ప్రసంగాత్ప్రత్యయస్య సప్త	K Kk G Gg N n C Ch J j H h T t D d Dh dh

মেঘনাগরী বাংলা উড়িষ্যা গুজরাট তেলেগু ইংরেজী

ছাটি, তিনটি এবং সময়ে সময়ে চারটি অক্ষর যুক্ত হয়ে
একে অন্তের স্বন্ধে আরোহণ করে এবং যত বকমে পারে

লেখনাকে বাধা দান করে। কেবল তাই নয়, এক-এক সময়ে অক্ষবগুলি হঠাৎ বন্ধুত্বপূর্ণে আবদ্ধ হয়ে এমন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় যে তাদের আব পৃথক ভাবে চেনা যায় না। রসায়নে যেমন “হাইড্রোজেন” এবং “অক্সিজেন” মিলিয়ে দিলে “জল” উৎপন্ন হয়, কিন্তু চর্মচক্ষে ঐ উপাদানগুলিকে আর দেখা যায় না, তেমনি আমাদের বর্ণমালায় কোন এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় দুটি বা তিনটি অক্ষর মিলে এমন একটি নূতন অক্ষর উৎপন্ন হয় যে তাতে মূল অক্ষরগুলির পরিচয় আর চর্মচক্ষে পাওয়া যায় না। বাংলা লিপিতে তাব অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে, যেমন, ক+ত=ক্ত; ক+র=ক্র; ক্ষ+ঞ=ক্ষ; হ+ম=ক্ষ; ক+ষ=ক্ষ; ন+ত+উ=ক্ট। আবার একই অক্ষর অল্প অল্প অক্ষরের সঙ্গে মিলিত হলে নানা রূপ ধারণ করে, যেমন, ব+ণ=ফ; হ+ণ=ফ। কোন কোন স্ববর্ণের সময় অবস্থাটা আরও বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়ায়, দৃষ্টান্তস্বলে “উ” বখন অল্প অক্ষরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন চারটি বিভিন্ন রূপ ধারণ কবে—কু, কু, শু, হ। এই রূপান্তরের আবার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে দেখা যায় যে এক বাংলা লিপিতেই প্রায় ৫৫০টি পৃথক পৃথক অক্ষর সম্ভব এবং মুদ্রণে অতগুলি অক্ষর বা টাইপেব প্রয়োজন হয়। এই অক্ষরবিভ্রাটে মুদ্রণ যে কত কঠিন ও জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা ১৩৩৯ সনের পৌষ-মাঘ ও চৈত্র মাসের “প্রবাসী”তে “বাঙ্গালা টাইপ ও কেস” শীর্ষক প্রবন্ধ পড়লেই সহজে স্বয়ংসম্ভব হবে। এই অক্ষরবাহুল্যের বিড়ম্বনা যে কেবল বাংলা লিপিতেই আছে তা নয়, দেবনাগরীসমূহ সমস্ত লিপিতেই এটা পাওয়া যায় এবং যদি এই অনুপাতে অক্ষরের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তবে দেখা যাবে যে কেবল দেবনাগরীসমূহ ভাষাগুলিতেই প্রায় চাব বা পাঁচ হাজার অক্ষর (type) লেখায় এবং মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়।

সহজেই এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ’তে পারি যে দেবনাগরী বা দেবনাগরীসমূহ কোনও লিপিতে আদর্শলিপি বলে গ্রাহ্য হ’তে পারে না, কেননা, আদর্শ-লিপির বে-সকল লক্ষণ বা গুণ থাকা উচিত এগুলিতে

তা নেই। এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে যদি কোন আদর্শলিপি পাওয়া যায় আমরা তা গ্রহণ করব না কেন, এবং সেটা গ্রহণ করা যদি উচিত মনে কবি তবে ভারতের সকল ভাষা ও উপভাষা এই আদর্শলিপি গ্রহণ করবে না কেন?

এ-পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে এ দেশের লিপির অক্ষর-পরিচয় কত কঠিন ও হুঃসাধ্য ব্যাপার তা সহজেই অনুমের; আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে অন্ততঃ পক্ষে এই প্রায় ৫৫০টি অক্ষর পৃথক পৃথক ক’রে শিখিতে হয় এবং বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় স্তরের জটিল ও বহুরূপী বর্ণমালাব ভীষণ অরণ্যেব মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া এই লিপি-বিভ্রাটেব আব একটি দিক ভাববার আছে। ভাবতেব প্রত্যেক ভাষা ও উপভাষার লিপিপ্রণালী ক্রমশঃ এত পৃথক হয়ে পড়েছে যে ভাষার সাদৃশ্য সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রদেশের লোক পরস্পরের নিকট অপরিচিত ও বিদেশী ব’লে গণ্য হচ্ছে। এক প্রদেশের লোক অল্প প্রদেশের লিখিত ভাষা শিক্ষা কবতে গেলেই তাকে এই অসংযুক্ত এবং সংযুক্তাক্ষরের বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হ’তে হয়; একে জয় না-করতে পারলে তাব পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেহ অল্প প্রদেশের ভাষা বা সাহিত্যেব সহিত পরিচিত হ’তে প্রবৃত্ত হয় না। এই কারণে নানা প্রকারেব “অক্ষর” ভাবতেব বিভিন্ন ভাষা ও জাতির মধ্যে একটা প্রাচীর বা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে আমরা সকলেই মূলতঃ একই ভাষা বলি, অনেক সময়ে পরস্পরেব কথিত ভাষা বুঝতে পারি, কিন্তু সেই কথাগুলিই লিখিত হ’লে আব বুঝতে পারি না। এক প্রদেশের সাহিত্য বা সংবাদপত্র বা পত্রিকা অল্প প্রদেশ বুঝতে পারে না, ভাবের বা আদর্শের আদান-প্রদান হয় না, জ্ঞানপ্রসাবে বাধা হয়। ফলে যদিও আমরা সকলে নিজেদের ভারতীয় বলি তবু আমরা নিজেদের এক জাতি ব’লে অনুভব করতে পারি না, সকল বিষয়ে নিজেদের পৃথক ব’লে মনে করি, অথচ অধিকাংশ সময়ে পরস্পরের কথিত ভাষা বুঝতে পারি। একই বিষয়, একই বিদ্যা, একই জ্ঞান আমাদের প্রত্যেক পৃথক লিপিতে

পুনরাবৃত্তি করা না হ'লে সকল প্রদেশের লোকের তা জানবার উপায় নেই। এই মহা বিগ্রাটের মূলে প্রধানতঃ লিপিগত পার্থক্য এবং এই পার্থক্য আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে কত হানিকর তা বিশদ ভাবে বুঝাবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এই নানা লিপিবিভ্রাটের পরিবর্তে যদি আমরা একটি আদর্শলিপিকে সাধারণ লিপি বা Common Script ব'লে গ্রহণ করি তবে দেশের যে কত কল্যাণ হয় তা বলা যায় না। এই সাধারণ লিপিমাল্য বিশেষ ক'রে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করবে, সহজে পরস্পরকে বুঝবার সুবিধা হবে, বিভিন্ন প্রদেশের ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান, পরস্পরের জ্ঞান ও সকল প্রকারের অভিজ্ঞতা সহজে বিনিময় করা সম্ভব হবে। ইহার ফলে সকল প্রকার সাহিত্যের পুষ্টিলাভ ও চিন্তার প্রসার আশা করা যায়। আবার এক সাধারণ লিপিমাল্য প্রচলিত হ'লে সকলেরই নিজ নিজ প্রদেশের সঙ্গীর্ণ গভীর বাইরে যাওয়ার চেষ্টা স্বভাবতই হবে, কেননা, লেখকেরা স্বতঃই বুঝতে পারবেন যে তাঁরা কেবল তাঁদের নিজেদের প্রদেশের জন্যই লিখছেন না, বরং তাঁরা সমস্ত ভারতের জন্যে লিখছেন এবং তাঁদের পাঠক-সম্প্রদায় অনেক স্থান বেড়ে গিয়েছে। ভাবের ও আদর্শের ক্ষুদ্রতা দূরে যাবে, এক সাহিত্য থেকে অন্য সাহিত্যে নূতন আদর্শ বা পরিকল্পনা সহজে প্রসার লাভ করবে। সকল প্রদেশের জীবনে ও আদর্শে এক মহা পরিবর্তন উপস্থিত হবে, কেননা পরস্পরকে বুঝবার ও বুঝাবার চেষ্টা থাকলে সাহিত্যের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী। সকল প্রদেশের সাহিত্যের ভাষা সহজ ও সরল হবে এবং ধে-ধে বিষয়ে মিলন ও সাদৃশ্য আছে বা মিলন সম্ভব ক্রমশঃ সে সকলের উৎকর্ষ সাধিত হবে। হুতরাং সকল দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে হয় যে যদি কোন আদর্শ-লিপি পাওয়া যায় তবে এই সকল কারণেও অবিলম্বে আমাদের তাহা ভারতের সাধারণ লিপি ব'লে গ্রহণ করা উচিত।

পৃথিবীতে যত প্রকার লিপিশ্রাণালী প্রচলিত আছে তার মধ্যে মনে হয় একমাত্র রোমান বর্ণমালাকেই—

Roman Script—বাকে এদেশে আমরা “ইংরেজী অক্ষর” বলি, ‘আদর্শলিপি’ বা Ideal Script বলা যায়, কেননা, ফিচার ক'রে দেখলে খুব সহজেই প্রমাণিত হবে

DEVA-NAGRI	BENGALI	ORIYA	GUJRATI	TELEGU	ENGLISH
अ ब क ख ए	অ ব ক খ এ	ଅ ବ କ ଖ ଏ	અ બ ક ખ એ	అ బ క ఖ ఎ	a b c d e
इ ऋ ॠ	ই ঋ ৠ	ଈ ଋ ୠ	ઈ ૐ ૠ	ఱ ఱ ఱ	f g h i j
उ ॡ	উ ৡ	ଊ ୠ	ઉ ૡ	ఱ ఱ ఱ	k l m n o
ए ओ	এ ও	ଏ ଓ	એ ઓ	ఱ ఱ ఱ	p q r s t
अ इ	অ ঈ	ଅ ଇ	અ ઇ	ఱ ఱ ఱ	u v w x y
इ ए	ই ঐ	ଈ ଐ	ઈ ે	ఱ ఱ ఱ	z

দেবনাগরী বাংলা উড়ি়া ওজরাটী তেলুগু ইংরেজী

যে রোমান বর্ণমালায় আদর্শলিপির অধিকাংশ লক্ষণই পাওয়া যায় এই অক্ষরমালা সহজ, স্পষ্ট ও জটিলতাহীন, পরিচয়ে ব্যাঘাত হওয়ার কিছু নেই এবং রেখাপাতের আবর্তন-বিবর্তন বধ্যসম্ভব কম। অক্ষরগুলির অন্তরেধার

গতি অধিকাংশ সময় সমুখগামী, পশ্চাদ্গামী বা নানাদিগ-
প্রসারিত নয়, অর্থাৎ অক্ষরগুলি অগ্রগতিশীল। প্রায়
প্রত্যেকটি অক্ষর এক ধারা বা “টানে” লেখা যায় এবং
প্রত্যেকটি অক্ষরের অন্ত্যরেখাপাত পরের অক্ষরের প্রথম
রেখাপাতের সঙ্গে সহজে মিলিত হয়, সুতরাং অক্ষরগুলি
ক্রমগতিশীল, বাব-বাব লেখনী তুলিতে হয় না, বস্তুতঃ
রোম্যান বর্ণমালাব আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটাই
এক ধারায় লেখা যায়। পুনশ্চ এতে যুক্তাক্ষরের উৎপাত
নেই অথচ বৃত্তবর্ণি সহজেই প্রকাশ করা যায়; স্বরবর্ণের
“কার” বা ব্যঞ্জনবর্ণের “ফলা”-ব উপদ্রব নেই, কেননা,
এতে স্বব বা ব্যঞ্জন কোন বর্ণই রূপান্তর গ্রহণ করে না।
এই সকল কারণে ছেলেমেয়েরা অনেক সহজে এই বর্ণমালা

করা যায়। উপরন্তু চলতি টাইপরাইটারের সামান্য কিছু
পরিবর্তন ক’রে নিলেই তাকে দেশী ভাষায় ব্যবহারোপযোগী
ক’বে নেওয়া যেতে পারে। অতএব যে দিক দিয়েই
দেশী যাক না কেন রোম্যান বর্ণমালা যে আদর্শলিপি
অতি নিকট তাহা অস্বীকার করার উপায় নেই,
সুতরাং ভারতবর্ষের সকল লিপিমালায় পরিবর্তে এই
লিপিই আমাদের গ্রহণ করা বিধেয় ব’লে মনে হয়।
ভারতের সব লিপিই যে রোম্যানে প্রকাশিত হ’তে পারে
লিপিচিহ্নধানিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ ভিন্ন আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে রোম্যান লিপি
ব্যবহারের উপযোগিতা দেখে স্বতঃই মনে হয় যে, এই
লিপিই আমাদের গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। সকলেই জানেন
যে বিদেশী লোকদের হিন্দী, উর্দু ইত্যাদি দেশী ভাষা
শেখাবার ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই আজকাল রোম্যান
অক্ষরমালা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ভারতের
অনেক লিপিহীন পার্বত্য ও অসভ্য জাতিকে
তাদের নিজেদের ভাষা রোম্যান বর্ণমালায় সাহায্যে
শেখান হচ্ছে। আবার সকলে হয়ত জানেন না যে,
ভারতীয় সামরিক-বিভাগের সকলেই “হিন্দুস্থানী” ভাষা
এবং এই ভাষা রোম্যান অক্ষরমালায় পড়া ও লেখা
শিখতে বাধ্য। এ আর একটা প্রমাণ যে রোম্যান অক্ষর-
মালা আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং
সহজেই এটা চলতে পারে। আবার এই রোম্যান অক্ষর
ভারতীয় সকল জাতি গ্রহণ করলে নাগরী ও আরবী
অক্ষরের যে উৎকট দ্বন্দ্ব সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে তার
বিবাদভঞ্জন অতি সহজেই হবে যায়, কেননা, এ অক্ষরে
কাহারও জাতি বা ধর্মজনিত বিদ্বেষগত কোন আপত্তি
হওয়ার কথা নয়। উপস্থিত হিন্দুরা বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা
ও নাগরী বর্ণমালা প্রচার করতে যেমন ব্যগ্র, মুসলমানেরা
উর্দুভাষা ও ফার্সী বর্ণমালা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে
ততোধিক ব্যস্ত, ফলে কেবল বিবাদ-বিসম্বাদই বেড়ে বাচ্ছে,
অথচ দেবনাগরী ও তদ্ব্যবহৃত লিপিগুলিতে যে ক্রটি-
গুলির আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে ফার্সীলিপিতে
সেই সকল ক্রটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, উপরন্তু লেখনী
একধারায় প্রায় এক পদও চলিতে পারে না। কিন্তু হিন্দু

DEVANA- NAGRI	BENGALI	ORIYA	GUJRATI	TELEGU	ENGLISH
अ	অ	ଅ	અ	ఁ	a
आ	আ	ଆ	આ	ఁ	A
इ	ই	ଈ	ઇ	ఱ	i
ई	ঈ	ଈ	ઈ	ఱ	I
उ	উ	ଉ	ઉ	ఱ	u
ऊ	ঊ	ଊ	ઊ	ఱ	U
ए	এ	ଏ	એ	ఱ	e
ऐ	ঐ	ଐ	ઐ	ఱ	E
ओ	ও	ଓ	ઓ	ఱ	o
औ	ঔ	ଔ	ઔ	ఱ	O
अं	অং	ଅଂ	અં	ఱ	an
आं	আং	ଆଂ	આં	ఱ	Aa
इं	ইং	ଈଂ	ઇં	ఱ	in
ईं	ঈং	ଈଂ	ઈં	ఱ	Ii
उं	উং	ଉଂ	ઉં	ఱ	un
ऊं	ঊং	ଊଂ	ઊં	ఱ	Uu
एं	এং	ଏଂ	એં	ఱ	en
ऐं	ঐং	ଐଂ	ઐં	ఱ	En
ओं	ওং	ଓଂ	ઓં	ఱ	on
औं	ঔং	ଔଂ	ઔં	ఱ	On

দেবনাগরী বাংলা উড়িয়া গুজরাটী তেলুগু ইংরেজী

শিখে ফেলে এবং ইংরেজী কথা অল্প আয়াসে ও অল্প
সময়ের মধ্যেই পড়তে ও শিখতে পারে। অনেক অল্প-
সংখ্যক টাইপ (type) এতে প্রয়োজন হয়, কেননা,
ভারতীয় এক-একটি ভাষার সাড়ে পাঁচ-শ ছ-শ
টাইপের পরিবর্তে পঞ্চাশ-বাটটি টাইপে ভারতের
সমস্ত ভাষাব কাজ সুচারুরূপে চলতে পারে। এক-একটি
টাইপ অল্প স্থান অধিকার কবে এবং অক্ষরগুলি স্পষ্ট ও
জটিলতাবর্জিত ব’লে টাইপ অনেক ছোট পর্য্যন্ত ব্যবহার

ও মুসলমান যদি সকল সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করে নিজের নিজের সঙ্গীর্ণতা ছেড়ে “হিন্দুস্থানী” ভাষা ও রোম্যান অক্ষরমালা একযোগে গ্রহণ করেন তবেই এই বিশাল দেশের ভাষা ও লিপিসমস্যার একটি সহজ সমাধান হয়।

কি ভাবে ও কি উপায়ে তবে আমরা রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করতে পারি? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ প্রস্তাব কিছু নূতন নয়, কেননা, এখনও অনেক ক্ষেত্রে এ-বর্ণমালা ব্যবহার করা হচ্ছে; তাছাড়া অনেক দিন থেকেই প্রাচ্যবিদ্যারূপী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে রোম্যান বর্ণমালায় এদেশের ভাষা, বিশেষতঃ সংস্কৃত ও পালি, লিখবার প্রণালী প্রচলিত আছে। এই প্রণালীর তাঁরা নাম দিচ্ছেন Transliteration, যার পরিভাষা করা যেতে পারে “প্রতিলিখন”। প্রাচ্যবিজ্ঞা সুগম করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের বর্ণমালা অবলম্বন করে প্রত্যেকটি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনি এক বা ততোধিক রোম্যান অক্ষরের সাহায্যে স্থির করে নিয়ে সেই প্রণালীতে সংস্কৃত ও পালিতে লিখিত দর্শন সাহিত্য ইতিহাস ইত্যাদি অনেক পুঁথি ও পুস্তকের প্রতিলিপি রোম্যান অক্ষরে করে নিয়েছেন। এতে যে কত সুবিধা হয়েছে বলা যায় না, কেননা, সভ্যজগতের সমস্ত পণ্ডিতই এখন বিনাক্রমে ভারতের মূল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। চলিত প্রতিলিখন তাঁরা যেভাবে স্থির করেছেন তাহা লিপি-চিত্রে দ্রষ্টব্য। এই লিপি-চিত্র থেকে বুঝতে পাবা যাবে যে দেবনাগরী বর্ণমালার জন্ম, উচ্চারণ বা ধ্বনি, কোনটারই এখানে ব্যতিক্রম করা হয় নি, আমাদের প্রথাগত জিনিষগুলি সমস্তই রক্ষা করা হয়েছে, কেবল অক্ষরের রূপ পরিবর্তিত করা হয়েছে মাত্র। তবে এ ব্যবস্থাকে একেবারে নিষ্পত্তি বলা হয়ত যাবে না এবং ব্যাপকভাবে রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করা স্থির হলে প্রয়োজনমত কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে।

আর একটি কথা এই সঙ্গে আসে। রোম্যান বর্ণমালায় “বড়” ও “ছোট”, অর্থাৎ Capital ও Small অক্ষর ব্যবহারের রীতি আছে, কিন্তু কোন ভারতীয় বর্ণমালায় তা নেই, সুতরাং যদি আমরা রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করি তবে ঐ “বড়” ও “ছোট” অক্ষর ব্যবহারের

রীতিও গ্রহণ করিব কি না বিবেচ্য। যদি তা না করে কেবল ছোট অক্ষর ব্যবহার করি তবে অনুমান পঞ্চাশ-ষাট অক্ষরেই আমাদের কাজ হয়ে যায়, নতুবা তার দ্বিগুণ অক্ষর লাগবে। অবশ্য লিপির এ পরিবর্তন যদি আমরা স্বীকার করে নিই তবে “অঙ্ক”ও (numerals) আমাদের রোম্যান, অর্থাৎ ইংরেজী, গ্রহণ করতেই হবে। রোম্যান যতিচিহ্ন (punctuation) ত আমরা অনেকটা গ্রহণ কবেছি।

আমাদের লিপিবিভিন্নতা ও অক্ষর-বাহুল্যের অসুবিধা অনেকেই অনুভব করেছেন এবং সেজ্ঞে অনেকে অনেক রকম উপায় এ-পর্যন্ত উপস্থিত করেছেন। কেহবা দেবনাগরীর সঙ্গে যথাসাধ্য যোগ রেখে লিপি সংস্কার করতে চেয়েছেন, কেহবা মূদ্রণের ক্ষমতা অক্ষরসংখ্যা কমানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ-সকল চেষ্টার বিশেষ কিছু লাভ আছে বলে মনে হয় না, কেননা, আমাদের লিপির প্রকৃতিগত বৈ-সব ক্রটি ও অসুবিধার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সে ক্রটি থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কেহ এ-পর্যন্ত বলতে পারেন নি। অতএব রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণই একমাত্র পথ বলে মনে হয়।

এখন সংক্ষেপে বিষয়টি এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :—

১। ভাবার প্রাণ ধ্বনি; লিপি ধ্বনির প্রতীক বা আকার মাত্র; ভাবার সঙ্গে লিপির কোন ঘনিষ্ঠ বা স্বাভাবিক যোগ নেই।

২। আমরা যে লিপি ব্যবহার করি তাহা বহু পরিবর্তনের পর বর্তমান আকার ধারণ করেছে; তাতে মূল ভাবার ভাব বা চিন্তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি।

৩। আমাদের লিপি জটিল এবং লিপির আদর্শ বা হওয়া উচিত তার তুলনায় এর নানা ক্রটি আছে।

৪। রোম্যান অক্ষরমালা আমাদের লিপির চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ, জটিলতাহীন এবং আদর্শলিপির নিকটবর্তী।

৫। সুতরাং আমাদের এই রোম্যান বর্ণমালা গ্রহণ করা উচিত; গ্রহণের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক কোন আপত্তি নেই, বরং এর সপক্ষে বলবার অনেক কিছু আছে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, কোন বর্ণমালাই ক্রটিহীন হ'তে পারে না, কিন্তু তুলনায় যেটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুবিধাজনক মনে হয় সেইটিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, বৃথা কোন কারণে ভয় পেলে হবে না। যদিও এই পরিবর্তন প্রথমে বিপ্লবজনক মনে হ'তে পারে, তবু এটা কঠিন বা অসম্ভব একেবারেই নয়। অনেক দেশেই এখন এ-বিষয়ে চেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবং অনেকেই রোমান অক্ষর গ্রহণ করছে। তুর্কীতে কেমাল পাশা সম্প্রতি আরবী বর্ণমালা দূর ক'রে দিয়ে রোমান বর্ণমালা প্রচলন করেছেন, সকলেই জানেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এটা করতে সমর্থ হয়েছেন, কেন না, তিনি এখন তুর্কীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসনকর্তা। তিনি আদেশ করা মাত্র পুর্বাতন বর্ণমালা দূব হয়ে গেল, বিভ্রালবে ত কথাই নেই, পথে ঘাটে নূতন বর্ণমালার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পট স্থাপন ক'রে আবালবৃদ্ধসকলকে শেখান আরম্ভ হয়ে গেল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তুর্কীরা তাদের স্বীয় তুর্কীভাষা অক্ষর রেখে নূতন বর্ণমালা গ্রহণ করিল। জার্মানীতে বহুকাল থেকে “গথিক” বর্ণমালার ব্যবহার চলে আসছে এবং এখনও চলছে, কিন্তু রোমান বর্ণমালার নানা সুবিধার জন্ত জার্মানরাও ক্রমশঃ “গথিক” ছেড়ে দিয়ে রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করছে। এতেই মনে হয় যে সকল প্রগতিশীল জাতিই ক্রমে ক্রমে রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করবে এবং আমাদেরও উচিত মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে এই বর্ণমালা অবিলম্বে গ্রহণ করা। এ উদ্দেশ্য সাধনে ভারতীয় প্রধান ভাষাগুলির প্রতিনিধিরা গঠিত

একটি কেন্দ্রীয় সমিতিতে ভাবভববর্ষে সকল প্রচলিত বর্ণমালার বিশদ পর্যালোচনা ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষ জন্ত রোমান বর্ণমালায়্যারী একটি সাধারণ বর্ণমালা—Common Script—প্রস্তুত করাই প্রশস্ত।

এই নূতন পথ অবলম্বন করতে হ'লে ভারতের কোন একটি প্রদেশকে সাহস ক'রে অগ্রসর হ'তে হবে, তাহলেই আশা করা যায় অত্রাণ্ড প্রদেশগুলি ক্রমশঃ এর সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা জয়জয় করতে পারবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখন অনেক স্থলেই আদৃত, সুতরাং বাংলা দেশ যদি এ-বিষয়ে অগ্রসর হয় ও রোমান লিপিতে পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত করতে আবিস্ত ক'রে, তবে লেখক বা প্রকাশক কাহারও কোন ক্ষতি হওয়ার ভয় ত নেই-ই, বরং লাভ হওয়ার কথা, কেননা, একপ করলে ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকার পাঠক-সম্প্রদায় অনেক বিস্তৃত হয়ে বাবে এবং অত্রাণ্ড প্রদেশের লোক, যারা বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন অথচ পড়তে পারেন না, তাঁরা আগ্রহ ক'রে বাংলা বই ও পত্রিকাদি পড়বেন। এ-কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলা ভাষা বুঝতে পাবেন অথচ পড়তে পাবেন না, এ-রকম লোকেব সংখ্যা ক্রমশঃ খুবই বেড়ে যাচ্ছে। রোমান অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক বা পত্রিকার আপাততঃ কিছুকাল দেবনাগরী বর্ণমালা অনুসারে প্রতিলিখনের একটি লিপিপত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন হবে। “প্রবাসী,” “ভারতবর্ষ,” “বিচিত্রা” ইত্যাদি পত্রিকায় এর পরীক্ষা ক'রে দেখলে ফল পাওয়া বাবে, আশা করা যায়।



দিদির দুঃখ

শ্রীপ্রমীলা দেবী

শাল-কাঠালের শাখায় শাখায় বনলতার শ্রামসমারোহে পাহাড়ের কুশ্রী রক্ষ মুষ্টি আব দেখা যায় না। তারই পাদদেশে ছোট বাড়ি, মনে হয় খেলাবব। অদূরে ব্রহ্মপুত্রের ধ্রুব বেটনী। নীলাকাশতলে বনানীর শ্রামলতাব সহিত গৈরিক বালুচরের মিশন-লীলায় মুগ্ধ অনিলের সেই ছোট বাড়িতে থাকিয়াও মনে হয় এ তাব কানন-স্বর্গ, আর শচী তার বনলক্ষ্মী।

শচীর মন কিন্তু ভোলে না—এর চেয়ে মনোহর তাদের সেই আমতলার বাড়ি। নাইবা রইল সেখানে নদী, পাহাড়, তবু কেমন ছায়াশীতল—ঘন বৃক্ষছায়ায়। হোক-না ভাঙাচোরা তবুও শচীর জগতে তার চেয়ে মনোরম স্থান আর নাই। পাশেই সেনেদের পরিত্যক্ত বাড়ি। পাড়ার ছেলেমেয়েদেব খেলার আড্ডা সেখানে। শূন্য ভিটাগুলি তাহাদেব কুম্ভীকে এড়াইবাব উপযুক্ত ডাঙা, খেলার কুম্ভীরেব কার্নিক নদীটিও অতি বৃহৎ। শৈশবের যত মাধুর্য্য সেখানেই ত সঞ্চিত। ফুল তুলিতেও শচীবা সেখানে জুটিত। অঘত্ববর্জিত অপরাধিতাব লতাটিও ফুলে নীল হইয়া থাকে, শিশুমন মুগ্ধ করিতে ক্ষীণকাহ্না কুঞ্জলতায় লাল ফুল কোটে। বাগানের শেষ প্রান্তে ঠিক পুকুরের ধাবটিতে জলে ডুবিয়া-মরা সেনেদের ছোট্ট মেয়েটিকে যে বেদীতলে রাখা হইয়াছে—শচীবা নিত্য সেখানে ঘুরিয়া আসিত একবার। রেলিঙে-বেবা স্থানটিতে ছোট্ট মেয়েটিকে রেহ দিতে দিবিয়া আছে শুধু হু-চারিটি কুলগাছ। আহা যাত্রাকালে অসহায় কন্তাকে স্মরণ করিয়া মেয়েটির মা'র কি কান্না। মনে করিলে এখনও শচীব চোখে জল আসে।

সেই একাকিনী বালিকার ভ্রতই অপবাহে অজস্র সন্ধ্যা-মালতী জাগে। শচীরা কাহাকেও সে ফুল ছুইতে দিত না। রাত্রে সেই ফুলেব দলে ডুরে-শাড়ীপরা খুকুরাণী ঘুরিয়া বেড়াইবে হয়ত। তাই ক্ষুদ্রে দ্রোণফুলে-হাওয়া ছোট গাছগুলি হইতে ধৈর্য্য ধরিয়া শচীবা খুঁটিয়া ফুলগুলি

তুলিত। ঐ ফুলেব চক্ষুফেন শুভ্রতায়ই ত মহাদেব খুশী। শুধু মধুলোভে চঞ্চল ছোট ভাই-বোনদেব ভয়ে কাঠি-দিয়া-জোড়া বটপাতায় সঞ্চিত ফুলগুলিকে সবত্রে লুকাইতে হয়, এই বা মুকিল। নিঃসঙ্গ প্রবাসে মধুভরা সেই দিনগুলি শচীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। নিঃসঙ্গ বইকি! অনিলের সাবান্নি কাজ, মধ্যাহ্নে একবার ঝাইতে আসে শুধু। সন্ধ্যার অবসরটুকুও তার পাশার আড্ডায় কাটে।

দেহের ক্লান্তি ঘুচাইতে সেই তার একমাত্র স্থান। বাড়ি ফিরিয়া ঝাইতেও তার তব সয় না। সারা দিনে শচীর তাই প্রচুর অবসর। সামান্য কাজ—ছোট বাড়ি, হুথানি মাত্র ঘর শচীর নিপুণ কবম্পর্শে ঝকঝকে পরিষ্কার। কাজশেষে পাহাড়ের দিকে বাগ্নার একচালার পাথরের সিঁড়িটিতে দাঁড়াইয়া শচী পাহাড়ের দৃশ্য দেখে। পাহাড়ের গায়ে আবও সব বাড়ি। শচীদের বাড়িব মাথার সব চেয়ে কাছে লতাপাতা-ঘেবা বে বাড়িটি, শচীর মনে হয় হাত বাড়াইলেই ছুইতে পারিবে বেন সেটিকে। বে ফিরিজি-পরিবার সে-বাড়িতে আছে তাদের গৃহিণীর চাল-চলন শচীর কাছে কোতুলজননক দৃশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এদিকে তাব বৈশীক্ষণ থাকিবার হুকুম নাই। ফিরিজিদেব উপর কেনই যে অনিলের এত অশ্রদ্ধা শচী তাহা ভাবিয়া পায় না। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় ওদেরই হাসি-গান আর নাম-না-জানা কোন বাজনার টুং টাং শব্দ শচীব নিস্তরু গৃহে সঙ্গী হইয়া ঝাঁড়ায়। নির্জন মধ্যাহ্নেও নিজেকে তাব বড়ই একাকিনী মনে হয়, শোবার ঘর হইতে বাগ্নাঘরের মাঝখানের একফালি আঙিনায় ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এক কোণে তার স্নানের ঘর। একখানি কালো পাথর অবলীলার কেমন সমতল মন্থন হইয়াছে। তাহারই চারি দিকে বেড়া-দেওয়ান, বেড়াব উপরে শচীও বুনো লতা তুলিয়া দিবে। তাহা হইলে কলিকাতায় বড়দির বাড়ির আলোকোজ্জ্বল তৈল-মন্থন বাথরুমের চেয়ে শচীব স্নানঘর মন্দ হইবে না। না,

দেশটা একেবারে মঙ্গল নয়, শচীর বিয়ের সময়ে কেনই যে সকলে এত ভয় পাইয়াছিলেন! আসাম দেশটা নাকি জঙ্গল আব বাঘ-ভাঙ্কে ভরা। একটিবার চোখে দেখিলে তাহাদের ভুল ভাঙিত। তবু শচী ঐ কিরিঙ্গি মেমটার মত সমস্ত রাস্তা, পাহাড় ঘুরিতে পার না। ঘোমটার আড়াল হইতে বতরু সে দেখে তাহাতেই শচীকে সঙ্কট থাকিতে হয়। বাড়ির সামনের দিকে বারান্দা হইতে নামিলেই পথ, আর তার পাশেই খাড়া বালুচরের নীচে নদী; রাস্তার ঐ দিকটার ফণি-মনসার ঝোপ আর মাঝে মাঝে আগাছার জঙ্গল ছাড়া নদীকে আড়াল করিতে আর কিছু নাই। এই দিকেব জানালা উন্মুক্ত করিয়া শচী সেখানে বসিয়া সারা দ্বিপ্রহর কাটায়, এই পথে যখন ষ্টামার যায় শচীর মনও সেই সঙ্গে চলিতে থাকে। ডেকে আরাম-মগ্ন নরনারী ও কৰ্মব্যস্ত খালাসী হইতে চটের পর্দা-ঘেরা কামরায় বিছানা তোরঙ্গ ছাড়ি কুড়ির মধ্যবর্তিনী কিশোরী বঙ্গবধূই তাহাকে অধিক আকর্ষণ করিতে থাকে। ঘোমটার ঢাকা কচি মুখ দেখিলে তাহার মনে কেমন সমবেদনা জাগে। শচীরই মত ঐ বোটি ভাই-বোনদের ছাড়িয়া আরও দূরে বাইতেছে হয়ত! কতদূরে বাইবে এরা? গোহাতি নাকি আরও দূরে? জলপথে তাই কয়েক দিনের জন্ত কেমন সংসার পাতিয়াছে।

ষ্টামার ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়, শচীব মন তবু চলিতে থাকে, দেশ-দেশান্তর ছাড়িয়া ছায়া-হুনিবিড় শান্তির নীড় কোন্ পল্লীতে সে উপস্থিত হয়—বহু অশান্তির মাঝে শচীর লক্ষ্মীস্বপ্নিণী মা যেখানে সহিলু মেহে সন্তানের মঙ্গল কামনায় বত। পর পর তিন মেয়ের বিবাহে জীর্ণ-জীর্ণ শচীব পিতা সন্তানগুলির উপর তিস্ত রুক্ষ বাক্যবাণ অহর্নিশি বর্ষণ করিয়া যান, শচীর মাকেই তাহা দুই হাতে আবরিয়া চলিতে হয়। ক্ষমতাও তাহার অধিক নয়। শচীর দাদাই সংসারের কর্তা, অল্প আবে সংসারের স্বচ্ছলতা বতই দুর্লভ হইতে থাকে সেজন্ত বোনগুলিকে দারী কবিশা দাদাব বিরক্তি ততই বাড়িয়া চলে। অভাবের গঞ্জনা যেন বোনদেরই প্রাপ্য। ভ্রাতৃজ্ঞানার মুখনিঃসৃত হলাহলের আশ্বাদও তাহারা পায় সেই সঙ্গে। সর্বস্ব মেয়েদের চালিয়া দিয়া এখন রাবণের গোষ্ঠীর উদর চলে

কিসে,—সে চিন্তায় তাহারও ঘুম হয় না। ভ্রাতৃজ্ঞানাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না; ঘোম বহর হইতে হুঙ্ক কবিশা এই বাইশ বছর বয়সে সে পাঁচটি সন্তানের জননী হইয়া শরীরের সঙ্গে বচনের লালিত্য একেবারে হারাইয়াছে। উদয়ান্ত তাহার ছেলেশুলিকে শান্ত বাধিবাব চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিতে হয়। এখনও বিয়ে দিতে একটা বোন বাকী। দাদা বলে ভিটেটুকু যাবে তার পর। একথা ভাবিতেও শচীর বুক শুকায়। ছোট ছোট আবণ্ড তিনটি ভাইকে কে যে মানুষ করে! শচী যদি একটি ভাইকে কাছে আনিয়া রাখিতে পারিত! তা কি অসম্ভব! স্বামীকে বলিয়া দেখিবে একবার! বোন বলিয়া ভাইদের হৃৎথে উদাসীন সে থাকে কি করিয়া? নিঃসঙ্গ দিনবাপন না করিয়া একটি ভাইকে শচী নিশ্চয় মানুষ করিতে আনিবে।

অনিলকে কথাটা বলিতে বিলম্ব হয় না। শচীর একক জীবনের কষ্ট অনিলও বোঝে।—কিন্তু অর্থমন্ডল। সেই চিরদিনের অপূর্ণ অভিলাষের বিধাতা শচীব ইচ্ছা পূরণে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। মাসান্তে চল্লিশটি টাকা আর বার—একটি লোককে কুড়ি টাকা খরচ কবিশা আনিবাব চেষ্টারও তাহাকে বহু সঙ্কটে পড়িতে হয়। তবু অনিল সঙ্গদয়, টাকাটা কোনরূপে জোগাড় করিতে পারিলেই শচীর সাধ সে পূর্ণ করিবে।

সব চেয়ে ছোট ভাইটিকেই শচীর আনিতে সাধ। মায়ের আদর নিঃশেষে ভোগ করিতে পাষ বলিয়া স্বভাবটি তার মিষ্টি। অল্প ভাইদের মত রুক্ষ মেজাজ তার নহে। দিদিব। স্বস্তরবাড়ি গেলে সেই শুধু তাহাদের খুঁজিয়া বেড়ায়। আবার মাকে সাবুনা দিয়া বলে, “আমি বড় হয়ে ওদের নিয়ে আসবো দেখো।” শচীব আসাব সময়ে এবার সে তাব নিজের খেলার কড়িগুলি দিদিব আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া অশ্রুচাকা সলজ্জ হাসিতে কেমন বলিয়াছিল, “আমার কড়িগুলি তোমার খেলতে দিলুম সেজদি,—একলাটি থাকবে কি না। আমার গোলোকখামখানি যে ছিঁড়ে গেছে ভাই, নইলে তাও দিতুম।”

শচীব সে কড়ি লইতে ইচ্ছা ছিল না, শুধু মা’র অমুরোধেই কড়িগুলি সে বাসে তুলিয়াছিল। এখন বাসের ডালা তুলিলেই কড়িগুলির সঙ্গে কালো ঝাঁকড়া

চুলের মাথখানে নিটোল সুন্দর মুখের বড় বড় ছুটি চোখের দৃষ্টি শচীব মনে পড়িয়া যায়। মুখখানাই তার অমন, নইশে শরীরে তার কিছু নেই। জরে ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থির চেহারা, বুকের হাড় ক'খানি বুঝি গুগিয়া বলা যায়। কড়িগুলি কিরাইগা দিলে তার বড়ই হুঃখ হইত, সনিধাসে শচী মনে ভাবে।

শচীর অদৃষ্ট প্রসন্ন। উপরের সেই কিবিল্লি বদলি হইয়া গেল। এবাব বারা আসিয়াছে তারা বাকালী। শচীদেব মতই স্বামী-স্ত্রী হু-জন শুধু। কিন্তু তাদের জীবনধারা নীচের বাড়িব মত নিঃশব্দে বহিয়া যায় না। দাস-দাসীর কোলাহলে সে বাড়ি প্রাণময়। নিতাই উৎসব চলিয়াছে যেন! উহাদেব দেখিতে শচীর কৌতুহল হয় কিন্তু সাহস হয় না, সমপদস্থ না-হইলে নাকি আলাপ করে না কেউ,—অনিল বলিয়াছে! তবু অজ্ঞাতে চোখ কেমন করিয়া উপরেব দিকে যায়। এইরূপে একদিন বাতায়ন-পথে এক কিশোরীর সুন্দর মুখের আভাস পাইয়া চোখ নীচু কবিত্তেই শুনিতে পাইল, “চেয়ে দেখই না ভাই, তোমার চেয়ে এতই কি বিচ্ছিন্ন দেখতে?”

শচী সপুলকে হাসিয়া বলে, কি যে বলেন! ইহার পরে উপরের জানালায় পাতাব আড়ালের উজ্জ্বল গোলাপটির মত সে কিশোরীর মুখ অহরহই ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু চোঁচাইয়া কতক্ষণ কথা বলা যায়? বাধাহীন আলাপের জন্য উপরের বোঁটি ছুটিয়া আসিত। অনেকটা পথ,—ছুখানা বাড়ি বেসিকে, বাস্তা সেদিকে নব। পাহাড়ের অন্তরিকে ছায়াচ্ছন্ন চালুপথে নামিয়া অনেকটা পথ ঘুরিয়া তবে তাহাকে আসিতে হয়। আলাপেও সেই পটু। অপ্রতিভ শচীকে লজ্জা দিতে সেই বলে,—বসতে দেবে না ভাই? আপনি, আজ্ঞে, বলা আমার চলেবে না—আগেই বলে রাখছি কিন্তু। তোমার নামটি কি ভাই?

বোঁটির অসঙ্কোচ আলাপে পবিত্র শচী হাসিয়া বলে, আগে নিজের নামটি বলতে হবে যে। অপর তখন চৌকী টানিয়া স্বচ্ছন্দ হইয়া বসিয়াছে। শচীর কুঠাব ভাব তাহার মিষ্টি লাগে, চোখে মুখে হাসির মধু বর্ষণ করিয়া সে বলে,—দাঁতভাঙা নাম শুনতেই হবে?—বলে তাহলে চেষ্টা ক’রে—ইজ্রাণী—। সার্থক নাম!

চেহারায় স্বভাবে মিলাইয়া কে এমন নাম রাখিয়াছিল? নিজের নাম বেন শচীব উপহাস বলিয়াই মনে হয়। শৈশবে তাব মুখে কি বৈশিষ্ট্য দেখিয়াই বেমা নাম রাখিয়াছিলেন, শচীরানী। সে নামে শচীর দিন-দিন কুঠা বাড়িয়া চলিয়াছে! রাণী হইয়াও বিয়ের বেলায় তার বাপ-মাকে বিন্দুমাত্র কম লাঞ্ছনা দেয় নাই! তবু সেই নামই শচীকে বলিতে হয়।—শচী, ওমা, কি আশ্চর্য্য মিল, ছাখে। তুমি আমি একই লোক তাহলে। ইজ্রাণীর আনন্দ ধবে না, বলে, এতদিনে এক হলুম আবার। তুমি ভাই নাম করতে পারবে না আমাব; নিম্বেব নাম বলে কি কেউ? এস মিলন পাতাই আমরা,—কি বল? হ’লবা পুরনো তবু কেমন মিষ্টি,—শচী ধূলী হইয়াই পাতানো ডাকটি মানিয়া লয়। এতটা তার সাহসই হইত না! তারপর চলে অজ্ঞস্ত গল্প। যাওয়ার বেলায় আবার দেখা হওয়ার অনুরোধ। ইজ্রাণী বলে,—একটিবার তুমিও আসবে ভাই; নইলে ক্যাংলা ব’লে আমার বড়ই ঠাট্টা করবে যে!

ইজ্রাণী চলিয়া যায়, কিন্তু তার সম্মুখে হৃদয়ের মধু-সৌরভ শচীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কি মিষ্টি তার কথাগুলি, নিংড়াইয়া সুখ ছানিয়া লয় শচী। সখীত্বের বন্ধন ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসে—সুখ মধ্যাহ্ন আর শচীকে নদীর দিকে চাহিয়া কাটাইতে হয় না। সখীব হাসি কথা তাহাকে ঘিরিয়া থাকে এখন। ইজ্রাণীর স্নেহময় স্বভাব শচীর জীবনে ইজ্রলোক আনিয়া দিয়াছে বেন।

হাসাইতেও ইজ্রাণী ওস্তাদ। কখনও স্বামীর চালচলন তার বর্ণনার বিষয় হইয়া পড়ে! অশোকের সামান্ত ক্রটি লইয়া এত সে রং ফলায়!—হাসিয়া ক্লান্ত শচী বাধ্য হইয়া বলে—থামো ভাই, স্বামীকে অত বিজ্ঞপ করতে নেই।—

—হঁ, হেসে নিলে কেমন! আবার বাড়ি গিয়ে তোরা কথাও বর্ণনা করব।—সেকি ভাই? সজ্ঞাসে শচী বলে,—আমি আবার কি অপরাধ করলাম?

—আহা তোমারই বেন কোন খুঁৎ নেই! এই কেমন মিনমিনে ভাব—তিনবাব ডেকে তবে সাড়া পাওয়া যায়।

কথাটা ঠিক, ইন্ড্রাগিব তুলনায় শচী যেন জীবনহীন। সখী ব্রহ্মপনা তার ধাতেই আসে না। বাড়ির পাশে এত সুন্দর জায়গা থাকিতে ইন্ড্রাগিব যখন বালুচরে পিকনিক করিতে সাধ যায়, তখন শচী বাধা না-দিয়া পারে না। কিন্তু ইন্ড্রাগিব অসীম উৎসাহ। জ্যোৎস্নালোকে, জলে-ভেজা কাশো, বালুচরের পাশে রূপালি নদী ঝলমল করিতে থাকে, উতলা পূবন কচিং বনফুলের মুহু মুহু সৌরভ বহিয়া আনে। তবু সবত্বপরিবৃত্ত তবকারিপাতিতে যখন বালি কিচ্ কিচ্ করিতে থাকে, তখন শচীর বিরক্তি ইন্ড্রাগিব কলহাস্তেব স্বকারকে ছাপাইয়া ওঠে। ইন্ড্রাগি সে-সব গ্রাহ্য করে না। শচীকে একপাশে সরাইয়া সে নিজে হাতে সব করে। স্বামীবাও সেখানে নিমন্ত্রিত! রান্নার ভার ইন্ড্রাগিব। আনাড়ি হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইবে বলিয়াই না এত আয়োজন! কিন্তু শচীকে একদণ্ড বসিতেও দেয় না সে। কখনও ডাকে—আচ্ছ না ভাই, গেল বুঝি ষিচুড়িটা ধবে, হাতা চালা না একটাবাব। নদীর দিকে উপবিষ্ট অশোক হয়ত চেঁচাইব বলে,—রান্নাটা না-হয় ঊর হাতেই ছেড়ে দাও। দিনবাত যত খুশী উপজব সরেই থাকি—রসনার উপব অত্যাচারটা না হয়—

ইন্ড্রাগি ঝাঁঝিয়া উঠে; শচীকে বলে,—তুই নে ত ভাই, দেখা বাবে পাতে কিছু পড়ে থাকে কি না। শচী হাসিয়া সরিয়া যায়। পরমুহূর্ত্তে আবার ডাক পড়ে, 'চাটনীতে কি-ফোড়ন দিতে হয় তুলে গেলুম যে, ব'লে দেনা ভাই।' হাসি কথায় ইন্ড্রাগি সবাইকে অস্থির করিয়া তোলে। বোচাবা অশোককেও তাহার কাছে হার মানিয়া চূপ করিতে হয়। তবু ইন্ড্রাগিব ব্যবহারে বেশমাত্র তিক্ততা শচী খুঁজিয়া পায় না। পৃথিবীর মালিন্য তাহার সখী ব্রহ্মপে কোথাও যেন ঠাঁই পায় নাই। যন বর্ষণশেষে নির্মল চন্দ্রালোকের মতই তাহা সকলের মনকে ছুঁইয়া যায়। বাড়ি ফিরিয়াও শচী ভাই সখীর তুচ্ছতম হাসি কথাটুকু বার-বার অনিলের নিকট বর্ণনা করে। অনিল যখন বলে, তোমাব সই ছাড়া জগতে আব কিছু আছে? তখন লজ্জিত হইয়া শচী চূপ কবে। নিরুপায়! শচীব জীবনে সখীপ্রেমের ভাগীবখীধারায় এ যে তটপ্লাবন। বে-সুধারস

তাহাব জন্মের কানায় কানায় উপচাইয়া পড়িতেছে—শচীর সাধ্য নাই তাহাকে গোপন করিয়া রাখে।

এত হুখের মধ্যেও ভাইকে আনিবার কথা শচী ভোলে নাই। অনিলও চেষ্টায় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই নটু আসিয়া পড়িল। সে সবচেয়ে ছোটটি নয়। কোলের ছেলেকে মা ছাড়িতে পারেন নাই। তাই সেজো ভাই নটু আসিয়াছে। বছর-চৌদ্দ তার বয়স, কিন্তু মুখে অত পাকামী না থাকিলে চেহারায় বা শিক্ষায় তাহার বয়স আন্দাজ করা বাইত না। যা হোক শচীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে এবার। লেখা-পড়া সে বয়স-অনুপাতে কিছুই জানে না। পাঠশালায় বাইত কিনা জিজ্ঞাসা কবিয়া শচী উত্তর পাইল—পরনে যাদেব বস্তোর জোটে না তাব আবার ত্রাকাপড়া। তবু শচীর খুশীর অন্ত নাই। মা'র কথা ভাইবোনদের কথা সে খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করে। গুলু আসিতে পায় নাই বলিয়া মা'র উপব অভিমানে কেমন মুখ ভাব করিয়াছিল তাহা বাব-বার শুনিয়াও তার তৃপ্তি হয় না।

কথাবার্তার অন্তরালে নটুর লেখাপড়ার কথা শচীব মনে সজাগ হইয়া আছে। অনিলেব সঙ্গে জুলে দেওয়ার পবামর্গ চলিতেছে। তার আগে একটু ঘসিয়া-মাজিয়া দিতে হইবে। নটুব কিন্তু লেখা-পড়ার দিকটা পছন্দ নয়। তার চেয়ে জামাই বাবুর সৌখীন জিনিষগুলি পছন্দ হয় বেশী। শচী সক্রম চিন্তে ভাবে, আহা কখনও কিছু পায় নি ত। নটুর পড়ায় অনিচ্ছার তাহাকে মনে মনে পীড়িত কবিয়া তোলে। লেখা-পড়ায় একটু মন যদি ওদের থাকিত! মেজ ভাইটি নাকি পড়ার সংশ্রব একেবারেই ছাড়িয়াছে। নটুই বলে মেজদার কিছু হবে না—এর মধ্যেই সে মাকে জিজ্ঞেস না-ক'রে কোথায় যে চলে যায়, মা শুধু কাঁদেন। মেজদা বলে, পরেব বই নিয়ে কেউ আবার পড়তে পারে, লেখাপড়া শেখ—সব উপকথার গল্প। ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া শচীর ক্লোভ-হুখের সহিত বিশ্বয়েরও সীমা থাকে না। তারাও অনেক কটি ভাইবোন শৈশবে মার হুখের অন্ন বাঁটিয়া বাইত। কিন্তু এমন ধারা কথাবার্তা তারা শেখে নাই। মারই হুখ, নইলে ছেলেবা এমনিখাবা হয়? শচী যেন মনে মনে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। নট্টকে লেখাপড়া শিখাইবেই সে! কিন্তু সম্ভাব শেষ নাই। নট্টর কাপড়-চোপড় একেবারেই নাই বে। দেশে শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে গ্রস্থি দিয়া পরা চলিত—বিদেশে তাহাতে মাথা হেঁট হয়। স্বামীকে বেশী বলিতে লজ্জা বোধ হয়। নট্টর আসার খরচ অনিল কষ্ট করিয়াই জোগাড় করিয়াছে। তবু সে নিজেই নট্টকে একজোড়া যুতি কিনিয়া দিয়াছে। এখন দুটি জামা তৈরি কবাইতে পারিলেই হয়। শচী অনিলকে এখন আর কিছু বলিবে না। কোন রকমে জামার কাপড় কিনিবে সে। সেলাই শচী জানে না, কিন্তু ইজ্রাণী জানে। ভাইফোঁটার সময় নিজ হাতে ভাইদের সে জামা তৈরি করিয়া পাঠায়। ইজ্রাণীর পাশে বসিয়া শচী কতদিন তার ছাঁট-কাট দেখে—সেলাইয়ের কলের শব্দের সঙ্গে ইজ্রাণীর মুখও চলে। কত গল্প কবে ইজ্রাণী—স্বামীর জন্মদিনে তসবের পাঞ্জাবী সেলাই করিয়া দিয়া চরকা-ব্রোচ উপহার পাইয়াছিল—শচীব এসব অজানা থাকে না। শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তাব কেন মনে হয়—গরিবের ঘন কিছুই শিখিতে নাই। সেলাই জানিলে যে গরিবেরই কাছে লাগে বেশী। নট্টর জামাব জুত তবু তার চিন্তা লাঘব হয় কতকটা। নিজেব অক্ষমতা সে সখীর নিকট পুঁবাইয়া লইবে। এখন কাপড়-কেনার টাকা হইলেই হয়। প্রত্যহ আনাঙ্গপাতি কেনার কিছু পরমা অনিল তার কাছে বাখে। সে-পরমা বাঁচাইয়া কাপড় কিনিতে গেলে অনেক দেবি। শচীব মনে পড়িয়া যায়—শুণ্ণববাড়ি আসব সময় মা সিন্দুরকোঁটার একটি টাকা বাধিয়া শচীব আঁচলে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মা'ব কষ্টসঞ্চিত মেহেব দান শচী প্রাণ ভরিয়া সে টাকা খরচ করিতে পারে নাই। এখন তার মনে হয় এব চেবে কি আর ভাল কাজে লাগিবে এ টাকা! ভাবিয়া শচী উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সেদিনই মূল্যবান রত্নের মত যত্ন করিয়া রাখা টাকায় নট্টর জামাব কাপড় কেনা হয়।—ইজ্রাণীর সেলাই করিয়া দিতে বা দেরি।

ইজ্রাণী উৎসাহ করিয়াই সেলাই করার ভাব লইয়াছে। কিন্তু শচীকে কাছে থাকিয়া শিখিতে হইবে, এই তার সূঁত। কঠিন সেলাই সে নিজে করিয়া দিবে। আব সব শচীকে করিতে হইবে। পবদিন শচী তাড়াতাড়ি কাজ শেষ

করিয়া সখীর বাড়ি ছুটিল। এখন যাওয়ার সাথীব অভাব নাই, নট্ট আছে। দুই সখীর হাসি-গল্পের মধ্যে জামা বখন শেষ হইল শচী একেবারে মুগ্ধ। কে বলিবে দর্জি করে নাই? শচীর অপটু হাত কোথাও ধরা যায় না। ইজ্রাণীর নিপুণ হাতের গুণেই অবশ্য ইহা সম্ভব হইল। বাড়ি গিয়া বোতাম কটি বসাইয়া লইলেই নট্ট জামা গায়ে দিতে পারিবে।

বেলা পড়িয়া গিয়াছিল। শচী বখন পাহাড়ের নীচে নাগিল তখন পথে জনতার চাঞ্চল্য পবিস্ফুট। সখীকে বিদায় দিয়া ইজ্রাণীও ব্যস্ত হাতে কাজে মন দিল। অশোকের আসার সময় হইয়াছে। অশোকের জলখাবার নিজে তৈরি করে সে। আজ তাহা হয় নাই। শেষ করিবাব আগেই অশোক আসিয়া পড়িল। পত্নীব অপরিচ্ছন্ন বেশ তাব চোখে পড়িতেই সে সহাস্ত মুখে বলিল—সখী-সমাগম হইয়াছিল বুঝি।

অশোকের পরিচর্যা শেষ করিয়া ইজ্রাণী নিজেব দিকে একটু মন দিবার চেষ্টা করিতেছিল, অশোক ডাকিয়া বলিল—ঘড়িটা কোথায়? আজ নিয়ে যেতে মনে ছিল না। কোথায় তুলে রেখেছ বল ত? ইজ্রাণী উঠিল না, চুলে চিকণী চালাইতে চালাইতে বলিল—জাখো না ঐ দেবাজেব কাছটিতেই তুমি যেখানে বাধ সেখানেই আছে ত!

—না-না নেই, সরিয়ে বেখে হুঁইুমি কবা হচ্ছে।—ইজ্রাণী তথাপি নড়িল না, এ শুধু তাকে কাছে লওয়াব ফন্সী। ঘড়ি সে কিছুক্ষণ পূর্বে পানের ডিবা আনিতে গিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু অশোকের ব্যস্ততার চুলবাবা ফেলিয়া উঠিতে হইল শেষ পর্যন্ত। বাপেব বাড়ি হইতে আনা, পুবাতিন দাসী মুখীও বলিতেছে, জামাই বাবু খুঁজে হারবান হলেন, তুমি একবার দেখছ না দিদিমণি।

তার পর সকলের মিলিত তল্লাসেও প্রার্থিত দ্রবাটি কাহারও নঃনগোচব হইল না।

অশোক বাগিয়াছিল। কেউ নিষেছে ঘড়ি, ডাক চাকব-বাকব সবাইকে। ইজ্রাণীও শঙ্কিত হইয়াছিল। কে নিতে পারে? জ্ঞল যে দেয় সে ত ধরেই আসে না। ঠাকুর রান্না করিয়াই ভ্রমণে যায়, সম্ভ্রায় কেবে। শুধু ঐ নূতন চ'কব 'আপা'—উদ্যত ক্রোধে অশোক তাহাকে

দেবী করিতে লাগিল। তরুণ ভৃত্য বালক বলিলেও চলে। ভয়ে সে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। জবাব দিতে কথা জড়াইয়া বাইতেছে। অপরাধীর কুণ্ঠিত ভাব। নিশ্চিত সন্দেহে অশোক তাহাকে ছই চড় বসাইয়া দিতেই ইচ্ছা গী ছুটিয়া আসিল,—আহা দোষী কিনা তার ঠিক নেই,—আগে থেকে মার-ধোর ক'রো না।'

ইচ্ছা গীর মনে অস্ত সন্দেহ জাগিতেছিল।

অশোক ভৃত্যকে ছাড়িল বটে, কিন্তু রাগ কমে নাই তখনও। বলিল, ঘড়ি আমি আজই বার করতে চাই। অস্ত দামী ঘড়ি-চোরকে আমি পালাতে হুবিধা দিচ্ছি না। বাড়ির লোকজনের সামনে ঘড়ি উড়ে গেল? ঠাকুর কোথায়?

ইচ্ছা গী কুণ্ঠিত মুখে উত্তর দিল, সে আসে নি ত। তার যাব'র পবেও ঘড়ি দেখেছি আমি। বলিয়া ইচ্ছা গী আলনা হইতে স্বামীর গানের চাদরখানি টানিয়া পাশের দরজা দিয়া হঠাৎ কোথায় বাহির হইয়া গেল।

শচীর কাজেও সেদিন বিশৃঙ্খলা লাগিয়াছে। অনিল ফিরিয়া আসিল, রান্না তখন মোটে হুস্ক হইয়াছে। অনিল বার-বার তাড়া দিয়া রান্নাঘরের পাশেই ঘুরিতেছিল। শচী ঝোল নামাইয়া ভাত চড়াইয়াছে, এমন সময় তাহাদের বিস্মিত করিয়া ইচ্ছা গী আসিয়া দাঁড়াইল। অনভ্যস্ত বেশে চাদর জড়াইয়া সে আসিয়াছে—সঙ্গে চাকরও নাই। উভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই ইচ্ছা গী বলিল—অনিল বাবু, আপনি একটু বাইরে নান, শচীর কাছে আমার দবকার।" অনিল বাহিরে গেলে সে শচীকে জিজ্ঞাসা করিল, নটু কোথায় ভাই? তাকেই আমার বড় দরকার। শচী বলিল, সে ত এসেই বেড়াতে গেছে। একটি দিনও বাড়ি থাকে না, আর এর মধ্যে কি ক'রে বে দলবল জুটিয়েছে। কি কান্ড ভাই, বল না আমার।

ইচ্ছা গী বারেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, ও'ব সোনার ঘড়িটা সেই থেকে পাওয়া বাচ্ছে না। জানত ভাই কি সৌখীন লোক, ঘড়ি ছাড়া এক দণ্ড থাকেন না। সেই নটু যেখানে ছবি দেখছিল সেইখানে ঘড়িটা ছিল কি না। কিছু মনে ক'বো না ভাই,—ছেলেমানুষ ভুলে যদি হাতে

নিরেই থাকে। শচী থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে শুক কণ্ঠে কোন মতে শুধু বলিল—নটু?

—হ্যাঁ ভাই,—নটু ছাড়া আর কেউ সে ঘরে বায়নি। একবার ঘড়িটা তাকে নাড়তে দেখেছিলাম। ঘড়িটা যদি এনেই থাকে চুপি চুপি আমার ফিরিয়ে দিও ভাই, কেউ জ্ঞানুতে পাবে না। ইচ্ছা গী যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতপদে ফিরিল।

অনিল শোবার ঘরে দাঁড়াইয়া ছিল। গর্হিত জানিয়াও সে আড়াল হইতে ইচ্ছা গীর কথা শুনিয়াছে। ইচ্ছা গী চলিয়া বাইতেই সে শচীকে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পথে বাহির হইয়া গেল। তার চোখে মুখে জ্বালা ধরিয়াছে যেন। শরীরও কাঁপিতেছে। যদি মিথ্যা হয়—ভ্রুততার মুখোসকে চিনিয়া রাখিল এবার।

ঘণ্টা দুই পরে অনিল ফিরিল। নটুর হাত তাহার বস্ত্রমুষ্টিতে আবদ্ধ। চক্ষের পলকে শচী ব্যাপারটা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিল। ভাত ছুটি নামাইয়া সেই বে কখন শচী ভুঁয়ে বসিয়াছে আর উঠে নাই। জল দিতে আসে বে লোকটি সে-ই শচীকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া কল্পণায় একটি আলো জ্বলাইয়া গিয়াছে।

অনিলের মুখ যেন কাটিয়া পড়িতে বাকী। গরিব সে, কিন্তু সত্যতার সম্মান বে তার জীবনের সম্পদের ভিত্তি। এই জন্তই না সে সকলের প্রিয়পাত্র। কিন্তু সে বিশ্বাস দূরে থাক, লোকে বলিবে চোব পরিবাব। এই জ্ঞানগায় কেমন করিয়া সে আব থাকিবে, মুখ দেখাইবে?

শচী নিঃসাড় হইয়া বসিয়া ছিল। অনিল তাহাকে শুনাইল কি করিয়া নটু ঘড়িটাকে পাথরে হুকিয়া চুরমার করিয়াছে। ভাবিয়াছিল কেহ চিনিতে পারিবে না কিন্তু নামের অক্ষরগুলি যে ডালার পিছনে বোদা তা আর বুদ্ধিমানের নজরে পড়ে নাই। ভাঙা ঘড়ি বলিয়া কৰ্ম্মকারকে বিক্রি করিয়া বন্ধুবর্গ লইয়া মেঠাই খাওয়া হইতেছিল। ভাগ্যে অনিল সে সময় বায় নইলে কুড়ি টাকার মধ্যে পোনেব টাকা ফিবিয়া পাওয়া বাইত না। কত কষ্টে কৰ্ম্মকারকে ভয় দেখাইয়া ঘড়ি আদায় করিয়াছে। এত লাঞ্ছনাও অনিলের পাওনা ছিল! অশোকের বাড়িতে তাহাব অবশিষ্ট-টুকু পূর্ণ হইয়াছে। যদিও অশোক তাহার চিরাচরিত

ভদ্রতায় ভাড়া বড়িটি গ্রহণ করিয়া নটর শাসনের ভার তাহার হাতেই দিয়াছে তবু তাহাদের দাসীর কষ্ট ভিতর হইতেই তাহাকে শুনাইয়া বলিয়াছে, তখনি বলেছিলুম— নিদ্রাসীর হয়রান শুধু ওদের পেটে পেটে এত। ঐটুকুন ছেলে, কে জানে ওদের শিক্ষা কেমন? নিজে থেকে কি আর অত কাণ্ড মাখায় আসে।

কেন যে অনিল স্ত্রীকে খুলী করিতে নটকে আনিয়াছিল! নির্যোদ্ধ, নইলে অজানা একটা ছেলের ভার লইতে যায়? কল্পিত কষ্টে বলিতে বলিতে সে নটকে হুই-চার বা গ্রহার দিতে লাগিল। এ অপমানের জালা তাহাকে চিরদিন বহিতে হইবে। শচী সমস্ত শুনি—শরীর মন তাহার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। নটর আর্ন্ত রোদনেও সে নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। নট কাদিতে কাদিতে সেখানেই ঘুমাইলে অনেক রাতে অনিলকে ছুটি খাইতে দিয়া শচী হাড়িতে জল ঢালিয়া দিল।

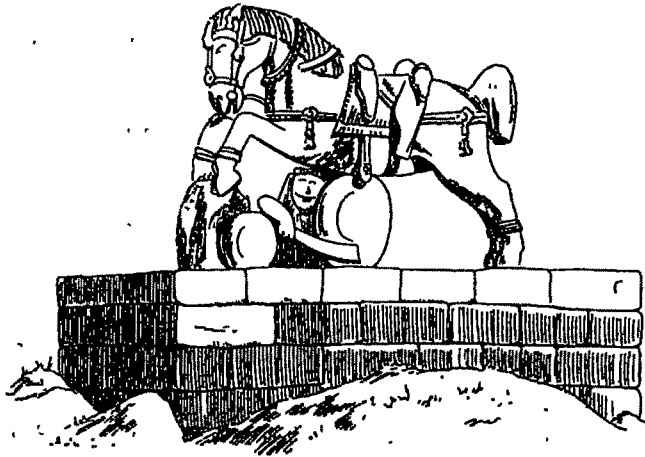
যেমন আনিয়াছিল সেইরূপ অমুনয়ে শচী আবার নটকে পাঠাইল দেশে। এবার বাওয়ার খরচ দিতে তার কানেক মাকড়ীজোড়া শচী বিক্রী করিয়াছে।

আবার সেই নিঃসঙ্গ দিনযাপন। ভাইকে মায়াব করা দূরে থাক শচীর জীবনে যুগ ধরিয়াছে যেন! কোন কাজে উৎসাহ নাই, দিনব্যাপী অবসাদ শুধু তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সে আর উঠানে দাঁড়ায় না। ইল্লাণীর দিকে চোখ পড়িলে তখনি চোখ ফিরাইয়া নেয়। ইল্লাণীর চোখেও ইহা এড়ায় না। সনিখাসে সে ভাবে কিছু ত বলি

নি আমি। সখীর ভাব দেখিয়া তারও কেমন সঙ্কোচ আসে।

শচীর কাজ এমনই অগোছাল হইয়াছে, কে বলিবে আগেকার সেই শচী। নানাবিধ রন্ধনে সে আর অনিলকে তৃপ্ত করে না। কুমড়ালতায় ফুল ধরিয়া আপনিই শুকায়, ভিল পিঠালি মুড়িয়া ভাজিতে শচী ভুলিয়া গিয়াছে। অনিলের খাওয়া শেষ হইলে আর নড়িবার লক্ষণ দেখা যায় না। তবে পুরাতন সাথী সেই ব্রহ্মপুত্র, তাহার দিকে চোখ রাখিয়া কি বে ভাবে শচী! গত দিনগুলির সুখের চিত্র কল্পনার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে কখনও মনে জাগে মমতাময়ী ইল্লাণীর করুণাসহাস হাসি। সেইখানে বসিনাই বেলা শেষ হইয়া যায়। অনিল তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া কান্নের ক্রটিগুলি মার্জনা করিয়াই চলে। সন্ধ্যার অন্ধকার ন ছাইলে শচীর উঠিবার তাড়া দেখা যায় না আর। শচীব ভাই যদি মরিয়া যায়। শচী ভাবে বারি খেতে পায় না মরণ নাকি তাদের সহজ, ওরা যেন মরে যায় ঠাকুর। ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতে কখন শচীর চোখে জল ঝরিতে থাকে—পাহ ড়েব অল্প দিকে নরসিংহ-বাড়ির আরতির কাঁসর-বট্টা বাজিনা উঠে, শচীর তখন হুঁস হয়। অশ্রুসিক্ত আঁখি অঞ্চলপ্রান্তে বার-বার মুছিয়া করজোড়ে সে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলে— আমার ক্ষমা কর ঠাকুর, ক্ষমা কর।

ভাইদের অকল্যাণ-কামনার ম্লানিতে অতৃপ্ত চিত্তে সেখানে বার-বার মার্জনা ভিক্ষা করিয়া পুনরায় বলে—তাদের ক্ষমতি দিও ঠাকুর, ক্ষমতি দিও শুধু।



ভারতে মনঃসমীক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

মনঃসমীক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্দ Psycho-analysis। এই নববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, স্রষ্টা, এবং প্রচারক ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়ড। তিনি নিজে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মনঃসমীক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস (On the History of Psycho-analytical Movement) নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, “মনঃসমীক্ষা আমার সৃষ্টি” (“psycho-analysis is my creation”)। মনঃসমীক্ষার সৃষ্টিতে প্রকারান্তরে অনেকে সাহায্য করেছেন। ডাঃ ব্রয়ব (Brewer), ডাঃ সারকো (Charcot) ও ডাঃ শ্রোবাক (Chrobak)-এর সাহায্যে ডাঃ ফ্রয়ড যখন মানসিক রোগের আলোচনা ও পরীক্ষা করছিলেন তখন থেকেই তিনি মনঃসমীক্ষার ইঙ্গিত পান। কিন্তু যখন মনঃসমীক্ষা বিজ্ঞান হয়ে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের সামনে এসে হাজির হ’ল, তখন যে নিন্দা ও অশ্রদ্ধা এই নবমুকুলিত বিজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করে এবং স্রষ্টার ওপর বর্ষিত হ’তে লাগল, ফ্রয়ডই হলেন তার একমাত্র লক্ষ্য।

মনঃসমীক্ষার জন্ম হয়েছে মানসিক রোগের ধারা ও নিরামবতার উপায় অন্বেষণ করার ফলে। ১৮৮০-৮২ সালে ব্রয়ব সাহেবের কাছে শিক্ষানবীশীকালে ফ্রয়ড যখন এক হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য করবার চেষ্টা করছিলেন তখন তিনি মনঃসমীক্ষার পথ খুঁজে পান। রোগীণী নিজের গত জীবনের ঘটনাবলী সহানুভূতি-সম্পন্ন চিকিৎসকের কাছে নিঃসঙ্কোচে ব’লে বান। এই ব’লে যাওয়ার ফলে তাঁর মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। যে-ব্যক্তি কোষ্ঠবদ্ধতার কষ্ট প’চ্ছেন, কান্নিক চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক উন্নতিব জন্ত জ্বোলাপের ব্যবস্থা ক’বে থাকেন। জ্বোলাপের সাহায্যে দেখে আবদ্ধ মল নিষ্করণের পথ পায় এবং এই নিষ্কৃতি দৈহিক অবস্থাকে সহজ ক’বে দেয়। ফ্রয়ড মনের নিরুদ্ধ অবস্থাকে বাইবে আনবার জন্ত ঐরূপ উপায়ের সাহায্য

নিরেছেন এবং এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন Catharsis বা বিরেচন।

এই বিদ্যার উদ্ভাবন ও প্রচলনের আগেও মনের রোগের কারণ নির্ণয় ও আরোগ্যের চেষ্টা চিকিৎসকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। সাইকিয়েট্রী (Psychiatry) নাম নিয়ে বে-বিদ্যা পিনেল (Pinel)-এর সময় থেকে চলে আসছিল, তাবও একটা উদ্দেশ্য মানসিক রোগের আলোচনা। ফ্রয়ডের সময় ডাঃ সারকো এই দলের নেতা। ফ্রয়ড তাঁর কাছে ছাত্র-হিসাবে বান। সাইকিয়েট্রীর যুগে মনের রোগ সারাবার ব্যবস্থা হ’ত রোগীকে সংবেশিত (hypnotize) ক’বে। সংবেশনের (hypnosis) সাহায্যে রোগীর স্বাভাবিক মনের বাধাকে নিষ্কিয় ক’বে চিকিৎসক তার ওপর অভিভাবের (suggestion) প্রয়োগ ক’বতেন। তার ফলে রোগের মাত্রার কিছু উপশম হলেও রোগী সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক হ’ত না। পূর্বতন মন-চিকিৎসকগণ (Psychiatrists) রোগীর মনের বিকাশ ও প্রকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। উক্ত উপায়ে চিকিৎসা ক’বাব পর রোগীর সেই মানসিক ব্যাধি থেকে পুনরাজন্মের সম্ভাবনা থেকে যেত। আবও দেখা গেল, অনেক ব্যাধিগ্রস্তকে সংবেশিত করা সম্ভবপর নয়।

ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়ডই প্রথম রোগীর মানসিক বোগের উৎপত্তির ইতিহাস ও ধারা অবলম্বন ক’রে তাব মনেব সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রধানুযায়ী মনেব বিকার লক্ষ্য ক’রে মনের স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও ধারণা ক’বা যায়। কি ক’রে তিনি এই বিস্তার ভিত্তি বিজ্ঞানের সংজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন সে- সব কথার বিশদ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। ফ্রয়ড নিজে তিনটি প্রবন্ধে তার আলোচনা ক’বেছেন—প্রথম ১৯১০ সালে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে *The Origin and Development of Psycho-analysis* শীর্ষক প্রবন্ধে,

১৯১৪ সালে *On the History of Psycho-analytical Movement* এবং তার পর *The Problem of Lay-analysis* পুস্তকে নিজের স্বত্বিকথার মধ্যে মনঃসমীক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর বহু কৃতী ছাত্র এবং সহকর্মী উক্ত বিষয়ে বহুস্থানে যথেষ্ট বিচার করেছেন। এখানে দ্রুততীয় তত্ত্বের মূলকথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

দ্রুততীয় তত্ত্ব মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের সুস্থ করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু যখন এই বিজ্ঞা পরিবর্তিত ও পবিত্রীকৃত হয়ে মনঃসমীক্ষা বিজ্ঞানে পবিত্র হ'ল তখন তার প্রযোজ্যতা ও প্রয়োগের পবিধি অনেক বেড়ে গেল। আমাদের মানসিক বিকারকে সুস্থ অবস্থায় এনে জীবনযাত্রাকে সহজ কববার প্রয়াস মনঃসমীক্ষার যেমন আছে, তেমনই স্বাভাবিক মানুষের মন ও ব্যবহার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান বিতরণে সে বিজ্ঞান সমর্থ। মন ও বস্তুকে নিয়ে সমস্ত পৃথিবী গঠিত। বস্তুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সেগুলির ব্যবহারিক ও জ্ঞানবিষয়ক দুই গুণ আছে। মনঃসমীক্ষার বিষয়বস্তু মন হলেও এই বিজ্ঞান সেই প্রকাব গুণায়ক। কিন্তু প্রত্যেকে আমবা নিজ মনের ও তৎসম্বন্ধীয় গর্কের অধিকারী ব'লে মন-সম্বন্ধে জ্ঞানকে আমরা অপরের কাছ থেকে গ্রহণে পরান্বিত। যদিবা সে বিদ্যার জ্ঞান-বিষয়ক গুণকে আমরা স্বীকার করি, তাব ব্যবহারিক উপকারিতাকে নানা কারণে উপেক্ষা করি। এই উপেক্ষার মধ্য দিয়ে মনোবিজ্ঞানকে বাঁচতে হয়েছে ও হচ্ছে। তাই এর প্রচাব তত বহুল নয়। চ'ল'স মায়ার (Meyer) ১৯২৯ সালের মে মাসের 'রিয়ালিষ্ট' (Realist) পত্রিকায় 'ইন্ডাক্সিয়াল সাইকলজি' নামক প্রবন্ধে সে-সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। মনঃসমীক্ষাকে উপেক্ষা কবার কারণ আরও গুরুতর। মনঃসমীক্ষা নির্জান মন নিয়ে আলোচনা কবে, তাই তাব সৃজগুলি সাধারণের কাছে প্রীতিকর নয় বরং পরিহার্য, এবং নিরুদ্ধ ইচ্ছার স্থিতি নির্জান মনে ব'লে তার জ্ঞান আমাদের কাছে স্বীকারযোগ্য নয়। কামজ প্রবৃত্তির সঙ্গে মনঃসমীক্ষা জড়িত ব'লে এবং কামজ প্রবৃত্তি আলোচনার সম্পূর্ণ অযোগ্য ব'লে ধারণা

সাধারণের মনে দৃঢ় থাকার মনঃসমীক্ষা উপেক্ষার কারণ হয়েছে।

মনের যে-অংশটুকুকে এতদিন মানুষ মন ব'লে যে অস্পষ্ট কল্পনা ক'রে এসেছে সেই সংজ্ঞান (conscious) মনেব সঙ্গে নির্জান মনের সম্বন্ধ আলোচনা কবে মনঃসমীক্ষা। লেখার ভুল, বলার ভুল, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি নির্জান মনের প্রকাশকে তুচ্ছবোধে সভ্যতা এতদিন আলোচনাব বাইবে বেধে এসেছিল। কিন্তু মনঃসমীক্ষা এই তুচ্ছ ব্যাপারকে অবলম্বন ক'রে নির্জান মনেব পবিচয় পায়। সাধারণতঃ যে-সব অভিজ্ঞতা আমাদের রূঢ় আঘাত দেয় এবং জীবনযাত্রার পথে বাধা হয়ে পড়ে, সেগুলিকে আমরা অস্বীকার কববার চেষ্টা কবি, সম্ভব হ'লে ভুলে যাই। কিন্তু সেগুলি সংজ্ঞান মনে স্থান না-পেলেও নির্জান মনে বাসা ক'রে সংজ্ঞান মনে আসতে চায়, কিন্তু প্রতি পদেই বাধা পায়, তাই তাকে চাতুরী ও ছলনার সাহায্য নিয়ে অতর্কিত ভাবে সংজ্ঞান মনে উপস্থিত হ'তে হয়। নিরুদ্ধ ইচ্ছাব এই অতর্কিত আক্রমণ হ'তে চেতনা বাঁচতে গিয়ে সেগুলিকে ভুল বিবেচনা ক'রে তাব কারণ অনুসন্ধান থেকে বিবত থাকে। প্রত্যেক কাল্বেব একটা কাবণ আছে, কিন্তু সব সময়ই আনবা যে কাবণকে উপলক্ষ্য ক'রে কাল্বেব অনুসরণ ক'রে থাকি, তা নয়। অনেক কাল্বে ক'রে ফেলে পরে সুবিধানুযায়ী তার একটা কারণ গড়ে নিই। সেই কারণ যদিবা সত্য্য হয় তবু বাস্তব নয়। সভ্যতার গুণে মানুষ নিজেকে ছোট ভাবে চায় না এবং পারে না, তাই নিজের ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রেখে তার অনুযায়ী একটা কারণ সৃষ্টি ক'রে নেয়। দৈনন্দিন ব্যাপারে নির্জানের প্রভাব (Psycho-pathology of Everyday Life) এ স্ক্রুড তাব বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেদিন পর্যন্ত স্বপ্ন আমাদের কাছে সমস্তার এবং বিশ্বাসের বস্তু ছিল। মনঃসমীক্ষা স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা কবে। আমাদের মনের নিরুদ্ধ ইচ্ছাগুলি আমাদের সংজ্ঞান মনের অগোচবে ছদ্মবেশ নিয়ে স্বপ্নে এসে হাজিব হয়ে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হয়। স্বপ্নকে বিশ্লেষণ ক'রে মনঃসমীক্ষক আমাদের নির্জান মনের কার্যকলাপ বুঝতে পাবেন। ভাষায় যেমন আমবা বহুলোকের মনেব ভাব একই রকম প্রতীকেব (symbol)

সহায়তায় প্রকাশ ক'রে থাকি, স্বপ্নেও তেমনই যে-সব প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি সমার্থবোধক। এই সব প্রতীকেব ব্যাখ্যা ক'বে স্বপ্নের অর্থ আমাদের জ্ঞানভ্রম হয়। মনঃসমীক্ষাকে যৌনতত্ত্ব ব'লে অনেকে অপবাদ দিয়েছেন। মনঃসমীক্ষকেব কামজ বৃত্তির স্বাধারণ সাধারণেব যৌনমতের মত নিকৃষ্ট এবং হেয় নয়। তা ছাড়া মানসিক ব্যাধির আলোচনা ক'রে দেখা গেছে, কামজ বৃত্তি আমাদের জীবনেব এবং কার্যাবলীর অনেকখানি অধিকার ক'রে আছে। যৌন প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাব তৃপ্তির পথে সভ্যতা অনতিক্রমণীয় বাধার সৃষ্টি ক'রে বেছেছে। কাজেই সমাজে বাস করতে গিবে মানুষকে যৌনসংক্রান্ত অনেক ইচ্ছা দমন কবতে হয়। পরে সেই সব ইচ্ছা নিকৃষ্ট হয়ে মানসিক ব্যাধির কাবণ হয়ে পড়ে।

এদেশে পুরাকালে মন-সম্বন্ধে বহু আলোচনা হ'ত। কিন্তু সে-সব আলোচনা দর্শনের প্রকৃতি ত্যাগ ক'রে বিজ্ঞানের পর্যায়ে আসে নি ব'লে মনে হয়। যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রাচীন ঋষি এবং যোগীবা মনের ওপর অধিকার স্থাপনে এবং মনের গতিকে সংযত ও সুসংবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তবুও একথা বলা চলে না যে একালের মনঃসমীক্ষা সে-যুগের জ্ঞানেব পুনরাবৃত্তি বা নবসংস্করণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রাবস্তে ভারতবর্ষে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ব্যক্তিগত ভাবে কয়েক জনের মধ্যে আরম্ভ হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রথম এদেশে মনঃসমীক্ষার চর্চা শুরু করলেন। ইউরোপে ক্রয়েডের মত, এদেশে বসু-মহাশয় মনঃসমীক্ষাব প্রথম প্রতিষ্ঠাবান প্রচারক।

১৯১০ সালে শ্রীযুক্ত গিবীন্দ্রশেখর বসু কাব-চিকিৎসাব (Medical) শিক্ষা শেষ করেন এবং তখন থেকেই তিনি মানসিক ব্যাধির কাবণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ক্রয়েডের মতই তিনি গোড়াতে সংবেশনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসাও করতেন। তারও অনেক পবে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology) পডবার ব্যবস্থা কবলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে

শ্রীযুক্ত মনমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ঐ বিষয়ে এম-এ পাস করলেন। ঐ বিষয়ের ছাত্র-হিসাবে গিরীন্দ্রবাবু তাঁর পরে বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষামন্দিরে এসেছেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পাঠ্য-বিষয়ে মনঃসমীক্ষার স্থান স্পষ্টতঃ ছিল না এবং উক্ত বিষয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। পরে মনঃসমীক্ষা পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যাব মধ্যে গ্রা্য স্থান অধিকার ক'রে নেয়। মনঃসমীক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত ক'বে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান সঙ্গে মনঃসমীক্ষাব অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্বীকার ক'বে নেন। একমাত্র ভাবতবর্ষেই প্রায় প্রথম থেকে মনোবিদ্যার সঙ্গে মনঃসমীক্ষা যোগ্য আসন পেয়ে এসেছে। পৃথিবীর অন্ত দেশে মনঃসমীক্ষাকে অন্ত ক্ষেত্রে বর্ধিত হ'তে হয়েছে, পবে সেই বিকশিত বিজ্ঞান মনোবিদ্যার অন্তর্গত স্বীকৃত হয়েছে। যখন এদেশের মনঃসমীক্ষার নেতা প্রথম উক্ত বিষয়ে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানার্জন করছিলেন তখন তাঁর অহুবিধা ছিল—উপযুক্ত বইয়ের অভাব। আমরা এদেশে ইংবেজীর সাহায্যে বিদ্যালান্ত এবং পৃথিবীর অন্ত দেশেব ভাবধারা বুঝে থাকি। ১৯০৯-১৯১০ সালে অষ্ট্রিয়াতে মনঃসমীক্ষাব চর্চা হ'ত এবং তার বাহন ছিল জার্মান ভাষা। সেই সব চর্চাব বিবরণ ইংবেজী ভাষাতে প্রায় অনুদিতই হ'ত না, ইংলেণ্ডে তখন মনঃসমীক্ষা প্রকট হয়ে ওঠে নি ব'লে। ১৯২১ সালে প্রকাশিত অবদমনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় 'কনসেপ্ট অফ রিপ্রেসন' (Concept of Repression) পুস্তকের ভূমিকায় গিরীন্দ্রশেখর সে বাধার উল্লেখ করেছেন। ঐ অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয়ে তিনি নিজের প্রতিভাব অনুসন্ধিসাথে প্রকাশ করতেন নিজে রোগের পবীক্ষা এবং আলোচনা ক'বে। ইউরোপের মনঃসমীক্ষাব নেতাব সঙ্গে এদেশের মনঃসমীক্ষার নেতার সেদিক থেকে মিল আছে। আজ মনঃসমীক্ষা-শিক্ষার বিধিমতে নিজেব মনকে সমীক্ষিত হ'তে দিতে হয়। কিন্তু ঐদের আগে স্ব-স্ব দেশে মনঃসমীক্ষক ছিল না ব'লে, নিজেদের মনকে নিজেরই সমীক্ষিত করেছেন স্বপ্ন প্রভৃতি বিশ্লেষণ ক'রে। সে সময়ের অনেক পরে ডাঃ সবসীলাল সরকার এবং শ্রীযুক্ত রত্নীন্দ্র হালদাব মনঃসমীক্ষার আলোচনা করেছেন বাংলা ভাষার প্রবন্ধ লিখে, কিন্তু ঐদের ছ-জনকে যথার্থ সমীক্ষক

বলা বাব ফিনা সন্দেহ। ১৯১৯ সালে ডাঃ বার্কলে হিল রাঁচিবি পাগলাগাবদেব তত্ত্বাবধায়ক হয়ে এদেশে আসেন। তিনি মনঃসমীক্ষার চর্চা করেছেন এবং নিজে সমীক্ষক। তিনি বিলাতে সমীক্ষিত হয়েছিলেন ১৯২১ সালে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায় এবং ইউরোপীয় পত্রিকায়। ১৯২২ সালে ডাঃ গিবীন্দ্রশেখর বসু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়েব অপমনোবিদ্যাব (Abnormal Psychology) শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি মনঃসমীক্ষার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অপমনোবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে শ্রীযুক্ত মনমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর পরে শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মনোচিকিৎসক (Psychiatrist), কিন্তু সমীক্ষক নন।

মনঃসমীক্ষার কেন্দ্রীভূত আলোচনার সুবিধার জন্ত ১৯২২ সালে ডাঃ গিবীন্দ্রশেখর বসু তাঁর কয়েক জন বন্ধু এবং সহকর্মীর সাহায্যে একটি পরিষদ গড়ে তোলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য মনঃসমীক্ষা অহুশীলন, শিক্ষা ও প্রচাৰ। ১৯২২ সালে মনঃসমীক্ষা-পরিষদ (Indian Psycho-analytical Society) স্থাপিত হয়ে আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা-সমবায়ের (International Psycho-analytical Association) সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ডাঃ বসু তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং তাঁর বাড়িতে পরিষদের কার্যালয় এবং সভা হ'ত। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র বোরা, হরিপদ মাইতি, যুগ্ম চন্দ্র মিত্র ও গোপেশ্বর পাল—ভারতীয় মনঃসমীক্ষা-পরিষদের প্রথম সভ্যব দল। তখন পৃথিবীর মধ্যে আটটি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা-সমবায়ের মাত্র আটটি শাখা-পরিষদ ছিল। আমেরিকায় দুইটি, ইংলণ্ডে একটি, জার্মানীতে একটি, এবং হলান্ড, সুইটজারল্যান্ড, হাঙ্গেরী এবং অষ্ট্রিয়া প্রত্যেক দেশে একটি ক'বে শাখা-পরিষদ ছিল। এশিয়ায় একটিও ছিল না। জাপানে ভাবভববর্ষের পরে শাখা হয়েছে। এই সমবায়ের মুখপত্র ভাবে জার্মান ভাষায় একটি এবং ইংবেজীতে একটি পত্রিকা আছে। ১৯২২ সালে ভারতের মনঃসমীক্ষার নেতা আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা-সমবায়ের ইংবেজী মুখপত্র ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সাইকোএনালিসিস্-এব

সাহায্যকারী-সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হন। এর অনেক আগে থাকতে তিনি বিলাতী কাগজে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন।

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা-পরিষদের একটি পুস্তকাগার আছে। মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকই সেখানে থাকে এবং উৎসুক ছাত্রগণের মধ্যে মনঃসমীক্ষা-শিক্ষার জন্ত একটি কেন্দ্র আছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাট্রই সেখানে উক্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেন। ভাবভব নানা জায়গা থেকে এখানে ছাত্র আসে। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা-পরিষদের সভ্যতালিকায় অনেক ইউরোপীয় এবং সৈন্ত-বিভাগের চিকিৎসকেরা আছেন। বাবা চিকিৎসা-ব্যাপারে সম্যকভাবে মনঃসমীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন এমন বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা উক্ত পরিষদ তৈরি করেছেন। এই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণই পরিষদকর্তৃক সমীক্ষক ব'লে গণ্য এবং আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা-সমবায় দ্বারা অনুমোদিত। বাবা শিক্ষার্থী হয়ে আসেন তাঁদের মানসিক ব্যাধি না থাকলেও সমীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী নিজেব মন অপব সমীক্ষকের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমীক্ষিত হ'তে দিতে হয়। প্রায় তিন বছর শিক্ষালাভের পর তিনি সমীক্ষণ কাজে অধিকারী ব'লে গণ্য হন। এই সম্পর্কে বলা দরকার, এক ভারতবর্ষেই প্রথম থেকে মনঃসমীক্ষা কাব-চিকিৎসক ব্যতীত অপবেব মধ্যে আলোচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাবা কার-চিকিৎসক নন অথচ সমীক্ষা ক'রে থাকেন তাঁদের সাধারণতঃ 'লে-এনালিস্ট' (Lay-analyst) বলা হয়। এঁদের মানসিক ব্যাধিব চিকিৎসাব অধিকার নিয়ে ইউরোপে বিতর্ক উঠেছিল এবং তাঁদের অধিকার স্বীকার ক'রে ক্রয়ড নিজে প্রবন্ধ লিখেছেন। তবু তাঁদের সম্পর্কে 'লে-এনালিস্ট' ব'লে তাঁদের সঙ্গে এক হ'তে বাধা আছে, প্রমাণ কবা হয়েছে। ভাবভবর্ষে সে ভাব সাধাবল কিংবা সমীক্ষকদের মনে আসে নি।

১৯২২ সালে ভারতীয় মনোবিদ্যা সমিতি (Indian Psychologica Association) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৫ সাল থেকে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকলজী

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালেই মনঃসমীক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ—‘মনঃসমীক্ষায় অবাধ ভাবামুখ্য পদ্ধতি’ (*Free Association Method in Psycho-analysis*—G. Bose) প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তখন থেকেই মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে ও মনঃসমীক্ষার আলোচনার ক্ষেত্রাভাবে ভাবতে মনঃসমীক্ষা আন্দোলনকে পত্রিকাখানি যথেষ্ট সাহায্য করে এসেছে।

ভারতের দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মনঃসমীক্ষার প্রবন্ধ বেরিয়েছে। ১৩২৭ বঙ্গাব্দেব শ্রাবণ মাসের ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রতীন হালদার লিখিত ‘মনের বোগ’, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যাব ‘ভাবতবর্ষ’ ডাঃ গিরীজ্ঞেশ্বর বসু ‘কাবণতত্ত্ব’ (Causality) এবং সেই সালের পৌষ সংখ্যায় ডাঃ সবসীলাল সরকারের ‘মনের যাতপ্রতিযাত’ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর পবে ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতি পত্রিকায় মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে অনেক বাংলা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তা ছাড়া বাংলা ভাষায় ঐ বিষয়ে দুখানি বই আছে। ডাঃ সবসীলাল সরকারের ‘মনের কথা’ ১৩৩২ সালে এবং ডাঃ গিরীজ্ঞেশ্বর বসুর ‘স্বপ্ন’ ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। সরসীবাবুর ‘মনের কথা’ বাংলা ভাষায় প্রথম মনঃসমীক্ষা-বিষয়ক বই। ১৯২৪ সালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সভা (Indian Science Congress) মনোবিদ্যাকে পৃথক বিজ্ঞান বিবেচনা করে সর্বপ্রথম আলোচনার সুযোগ দিলেন এবং সেই বৎসর গিবীজ্ঞেশ্বর ইচ্ছা-বন্দ তত্ত্ব (*The Theory of Opposite Wish*) নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে মনোবিদ্যা-শাখার অধিবেশনে মনঃসমীক্ষার আলোচনা হয়ে থাকে। ১৯৩৩ সালে মনোবিদ্যা-শাখার সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ গিবীজ্ঞেশ্বর বসু ‘মনোব্যাপারের নূতন ব্যাখ্যা’ (*A New Theory of Mental Life*) পড়ে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মত এবং মনঃসমীক্ষার সাহায্যে মানুষের মন সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞান লাভ কবেছেন, তা ব্যক্ত করেন।

১৯৩১ সাল থেকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বাৎসরিক স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Hygiene) শাখা খোলা হয়ে আসছে। সেখানে মনঃসমীক্ষার জ্ঞান

মনোবিদ্যার পাশাপাশি ছবি ও বিজ্ঞাপনের মধ্য দিবে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। মানসিক ব্যাধির কারণ-নির্ণয়ে এবং আবোগ্যালাভে মনঃসমীক্ষা সাহায্য কবতে পারে,—প্রতি বৎসর ডাঃ বসু তাঁর সহকর্মী এবং ছাত্রগণের সহায়তায় ছবি, বিজ্ঞাপন, ও বক্তৃতার মধ্যে দিবে একথা বুঝিয়ে থাকেন। মনঃসমীক্ষার জ্ঞান মানসিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে এটা বোঝাবার জন্যে দুইখানি পুস্তিকা বিনামূল্যে প্রদর্শনীর দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং শিক্ষাদান কল্পে বে মানসিক স্বাস্থ্য সমিতি (Indian Association for Mental Hygiene) আছে তার ভারতীয় শাখাব অধিবেশনে সমবেত ইউরোপীয় ও ভারতীয় নরনারীদের মধ্যে ডাঃ গিরীজ্ঞেশ্বর বসু, ডাঃ বার্কলে হিল, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিতগণের দ্বারা বক্তৃতার অনুষ্ঠান হয়। প্রতি মাসে এক দিন করে ঐ অধিবেশন হয়। যে-কোন ব্যক্তি উক্ত সভার অধিবেশনে উপস্থিত হ’তে পারেন এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করতে পারেন। এ-সমিতি প্রথমে ইউরোপীয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি এ বর্তমান সম্পাদক।

মানসিক ব্যাধি ব্যাপারে যাতে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া সর্বসাধারণের কাছে সুসাধ্য হয় সেই জন্য ১৯৩৩ সালের ১লা মে থেকে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে একটি মানসিক চিকিৎসাগার (Psychological Clinic) খোলা হয়। ডাঃ বসু এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং তিনি নিজে উপস্থিত থেকে প্রতি মঙ্গল ও বুধস্পতি বার সকালে আটটা থেকে দশটার মধ্যে নিয়মিত ভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে থাকেন। প্রয়োজন বিবেচনা করলে এবং রোগীর সামর্থ্য হ’লে মনঃসমীক্ষার সাহায্য দেওয়া হয়। অন্ত্যস্ত চিকিৎসা-বিধির মত সমীক্ষণ কিন্তু ‘আউট ডোর’-এ ব্যবহৃত হ’তে পারে না, তবু সমীক্ষণের জ্ঞানের সাহায্যে তাদের রোগের কারণ বাব করা হয় এবং বত দূর সম্ভব তার সাহায্য দেওয়া হয়।

এই মানসিক চিকিৎসাগার খোলবার আগে ১৯৩১ সালের মার্চ মাস থেকে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের

মনোবিজ্ঞান-বিভাগের কর্তৃক মানসিক রোগীদের পরীক্ষা কববার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি ও শ্রীযুক্ত মন্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উক্ত কার্যে সাহায্য করেছেন। আজ পর্যন্ত অনেক রোগী এই ‘ক্লিনিক’-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। বাংলা-সরকাব তরুণ অপরাধীদের অপরাধনির্ণয়ে এবং তাদের স্বাভাবিক মানুষ্যে পরিণত করবার জন্তে এই চিকিৎসাগারের সাহায্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজ্যতাকে স্বীকার কবেছেন। যদিও এই রোগীদের প্রতি সমীক্ষণের যথার্থ বীতি প্রয়োগ করা হয় নি, তবুও বলা যায় মনঃসমীক্ষার জ্ঞানের সাহায্যে রোগকে বিচার কববার চেষ্টা হয়েছে।

মনঃসমীক্ষার প্রচাবেব জন্ত ভারতের মনঃসমীক্ষকগণ সাধারণ সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ কবেছেন। ডাঃ বার্কলে হিল, ডাঃ বহু, মন্থনাথ বাবু ও ডাঃ মুহম্মদ চন্দ্র মিত্রের নাম সেই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

ভাবতবর্ষে মনঃসমীক্ষার ওপর নিন্দা বা কটুক্তি বর্ষিত হয় নি, এমন কি মনঃসমীক্ষার নেতাকে বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত সহিতে হয় নি। মনঃসমীক্ষার বিকল্পে আজ পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় লেখা হয় নি। তাই ব’লে বলা যায় না, এদেশে মনঃসমীক্ষা যথেষ্ট আদৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার মধ্যে মাত্র কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মনঃসমীক্ষা অপমনোবিদ্যার অধীনে অধীত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ থেকে এখানে শিক্ষার্থী আসছে এবং আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞান সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষার পাঠ্যবস্তুগুলির মধ্যে স্থান পাবে। বাংলা-সাহিত্যে অনেক সময় মনঃসমীক্ষার জ্ঞানকে ভুল বুঝে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আগেই বলেছি, নিজের সমীক্ষক না-হ’লে সমীক্ষার জ্ঞান সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা গেছে কোন কোন লেখক ক্রয়ডের মতকে বোঝবার চেষ্টা না-ক’বে বিকল্পমতপোষক কোন ইংবেজ লেখকের বই পড়ে মনঃসমীক্ষার প্রতি অবস্থা বক্রদৃষ্টি দিয়েছেন। কোন কোন উপভাস পড়ে মনে হয়, লেখক নায়ক-নারিকার চরিত্র-অঙ্কনে মনঃসমীক্ষাকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করেছেন। বিজ্ঞানের ধাৰা হচ্ছে, কতকগুলি

বিশেষ শব্দ ব্যবহার ক’রে সংজ্ঞা তৈয়ার করা। মনঃ-সমীক্ষার সেরূপ সংজ্ঞাপূর্ণ শব্দ আছে। তাহাদের ব্যবহার এবং অর্থ বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী, তাই বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য লেখকের সেগুলি প্রয়োগ করবার সময়ে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত।

আগেই বলেছি, ডাঃ গিরীজাশেখর বহুর সঙ্গে ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়ডের কিছু পার্থক্য আছে। ডাঃ গিরীজাশেখর ভাবতে মনঃসমীক্ষা-আন্দোলনের নেতা, এই কারণে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের কিছু আভাস দেওয়া দরকার। ফ্রয়ডের মতে সমাজ, বশ, আচার, ধর্মের রীতিনীতি, ভয়, ঘৃণা, ইত্যাদি মানসিক বৃত্তির অনুশাসন আমাদের মনের ইচ্ছার প্রকাশে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের কন্ড ইচ্ছা নির্জান মনে স্থিতি লাভ করে। ডাঃ বহুর মতে ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি ইচ্ছানিরোধেব ফল,—কাবণ নয়। এই ইচ্ছানিবোধ (Repression) সম্বন্ধে ডাঃ বহু বলেন, বতক্ষণ-না দুইটি ইচ্ছা বিপরীতগামী হয়, ততক্ষণ তাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা নেই। পদার্থবিজ্ঞানে শুনে থাকি দুইটি গতি একই ক্ষেত্রে অবস্থিত হ’লে এবং তাদের গতিদিশ্বেখা (Line of Force) সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী না-হ’লে সম্পূর্ণ বিবোধ অসম্ভব। ইচ্ছার কাপাবে সেই সত্য আছে। ধরুন, আমার মনে ইচ্ছা আছে, আমি বামকে মারতে চাই। এ ক্ষেত্রে, (১) আমি গ্রামকে মারতে চাই। (২) শ্রাম রামকে মারতে চায়। (৩) শ্রাম আমাকে মারতে চায়। (৪) রাম শ্রামকে মারতে চায়—এবং একটিও ‘আমি রামকে মারতে চাই’ ইচ্ছার বিপরীতমুখী হ’ল না। এদের যে-কোন একটি এবং প্রাথমিক ইচ্ছাটি একসঙ্গে মনে বিনা-বিবোধে থাকতে পারে। এমন কি, ‘আমি রামকে মারতে চাই না’ প্রাথমিক ইচ্ছার বিপরীত হ’ল না, মাত্র এক্ষেত্রে ইচ্ছার বিবোধ অজানা রইল। কিন্তু মনে যদি ইচ্ছা থাকে আমি রামের দ্বারা প্রকৃত হ’তে চাই তবেই বিরোধের সৃষ্টি হ’ল এবং এক্ষেত্রে যথার্থ নিরোধ সম্ভব। ডাঃ বহুর মতে এই ধরনের যুগ্ম ইচ্ছা আমাদের মনে দেখা দিচ্ছে। শিশুর ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কি উপায়ে তার মন তৈরি হয়। মনঃসমীক্ষা-সম্বন্ধে ডাঃ বহু ফ্রয়ড প্রভৃতির চেয়ে কিছু পৃথক্। তিনি বোঙ্গির কথাবারার ওপর যৌক দেন

এক চিন্তা লিখতে উপদেশ দেন। এখন মনঃসমীক্ষার উপায় সম্বন্ধে কিছু বলব।

সমীক্ষাকারী এবং সমীক্ষক কোন নির্জন স্থললোকিত ঘরে বসেন। সমীক্ষকের দিকে মাথা ক'রে সমীক্ষার্থী সোজা এক সহজভাবে শুয়ে চোখ বন্ধ ক'রে বা মনে আসে সব ব'লে যেতে থাকেন। এখানে সমীক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে নিতে হয় যে অযৌক্তিক, রহস্যজনক, বা অসংবদ্ধ যে-কোন ভাব বা চিন্তাকে তিনি নিঃসঙ্কেতে ব'লে যাবেন। সমীক্ষক একখানি খাতায় সেগুলি বর্ণনাসম্মত সমীক্ষার্থীর কথায় টুকে যাবেন। সমীক্ষার্থীর ভাব-ভঙ্গী ও অন্তঃপ্রবাহ তিনি লক্ষ্য ক'বে যাবেন, এবং পূর্বোন্নিখিত চিন্তা এবং এগুলি ভেতর দিয়ে সমীক্ষক নির্জন মনের যে খবর পেলেন সমীক্ষার্থীকে-সব বুঝিয়ে যাবেন। দিনেব পব দিন এই রকম ভাবে দু-জনে বসতে হবে যতদিন-না বোগ সাবে। বিনা-পারিশ্রমিকে এই কার্য সম্ভবপব এবং ফলদায়ী নয়। দায়িত্বহীন ব্যাপার নির্জনের কাছে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে ৫০০ শত অধিবেশন প্রয়োজন। মানসিক ব্যাধি উপশমের জন্য ২৫০ এব কম অধিবেশন আশা করা যায় না। সময়ানুবর্তিতা অতি কঠোর ভাবে সমীক্ষার্থীর কাছ থেকে আশা করা হয়। সমীক্ষা-কার্যে নিজ গত

জীবনের গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করতে স্বাভাবিক অনিচ্ছা ব্যতীত নির্জন থেকে শুরুতর বাধা এসে সমীক্ষণের অন্তরায় হয়ে টাঁড়ায়। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বাধা ধীরে ধীরে অপসারিত ক'রে রোগীকে সহজ ক'রে নিয়ে আসতে হয়। সমীক্ষণ খুব সাবধানে এবং বিবেচনার সঙ্গে করতে হয়। সমীক্ষণ আরম্ভের কিছুদিন পবে সময় সময় রোগীদের কাছ থেকে অত্যন্ত কঠোর নিন্দাসূচক বাক্য শুনতে হয়, সমীক্ষক এসব অবচলিত ভাবে সহ ক'বে যাবেন, পরে দেখা গেছে এ-সব রোগী নিবাময় হয়ে সমীক্ষককে দেবতার মত ভাবেন।

ভাবতবর্ষে মনঃসমীক্ষার কথা বলতে গিয়ে বাংলা এবং বাঙালীর কথা বলতে হয়েছে। অত্র দেশের কথা বলতে পারলে সুখী হতাম। তবে উপসংহারে একটা কথা মনে পড়ছে, সেটা আমাদের মাঝে সমীক্ষণীভাব। শিশুদের মধ্যে মানসিক ব্যাধি দেখা যায় এবং এদের স্বভাববিকৃত শিশু (Problem Child) বলা হয়। বিকৃত (neurotic) শিশুদের মনঃসমীক্ষা সমীক্ষণীদের দ্বারা ভাল হয়। ইউবোপে আনা ক্রয়ড, মিলেইনে ক্লাইন, হেলেন ডরেন প্রভৃতি সমীক্ষণীবা; শিশুদের সমীক্ষণ ক'রে থাকেন। বাংলার এবং ভাবতবর্ষের অন্তর স্বভাববিকৃত শিশু; অভাব নেই।

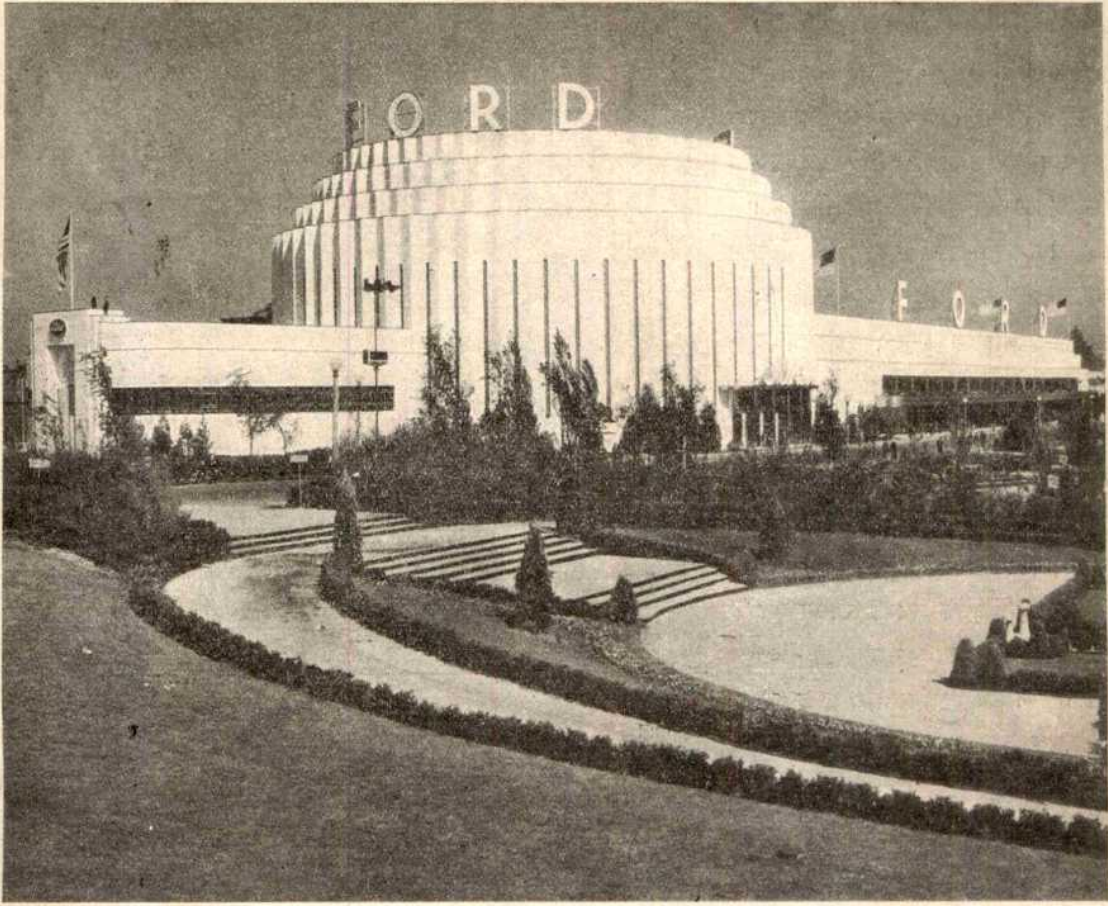
শিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

চল্লিশ বৎসর পূর্বে শিকাগোর নিখিল-বিশ্ব-প্রদর্শনীর প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি ইহা সভ্যতা ও সময়ের সহিত সমভাবে পদবিক্ষেপ করিয়া ক্রম ও অধিকতর উন্নতিব পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই স্থানেই একদিন আমাদের বিবেকানন্দ বঙ্গনির্বোধে হিন্দু ধর্মের সার্বভৌমত্ব বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের অনুসরণ করিয়াও মানব কিরূপে এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃত্বের মহান বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিবার

জন্য এই প্রদর্শনীতে পূর্বের ত্রায় গত বৎসরও পৃথিবীর সমগ্র ধর্মাবলম্বীদের এক মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখিয়া দর্শকগণের স্পৃহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে; গত অধিবেশন বেন ঋণ্ডিত ও অপরাপ্ত ছিল, সেইজন্য বর্তমান বৎসরে অধিবেশনের অধিকতর সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। গমনাগমন ও অত্রান্ত নানা বিষয়ে পূর্বোপেক্ষা অনেক সুবন্দোবস্ত হওয়ায় প্রদর্শনী আবও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর



ফোর্ড মোটর কোম্পানীর প্রদর্শনী-গৃহ। ইহার নির্মাণকল্পে ২০০০,০০০ ডলার ব্যয়িত হইয়াছে

২৩,০০,০০০ থানা অগ্রিম প্রবেশ-পত্র বিক্রয় হইয়াছিল; এ-বৎসর অগ্রিম বিক্রয় হইয়াছিল ৪০,০০,০০০ থানা। গত গ্রীষ্মকালে অধিবেশন আরম্ভ হয়; আমেরিকাবাসী দর্শকের দল গ্রীষ্মাবকাশে অল্প ভ্রমণ করিতে না গিয়া গৃহবাসী হইয়াছিলেন। এই কারণেই বর্তমান বৎসরে এত জনসমাগম হইয়াছে। এ-বৎসরের অধিবেশন গত বৎসরের অনুবৃত্তি মাত্র। সেইজন্য এখানে গত বৎসরের প্রদর্শনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯৩৩ সালের অধিবেশন ১৭০ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। তজ্জন্ত কর্তৃপক্ষের ৪৭,৮৩,৮৩৯ ডলার ব্যয় হইয়াছে। স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

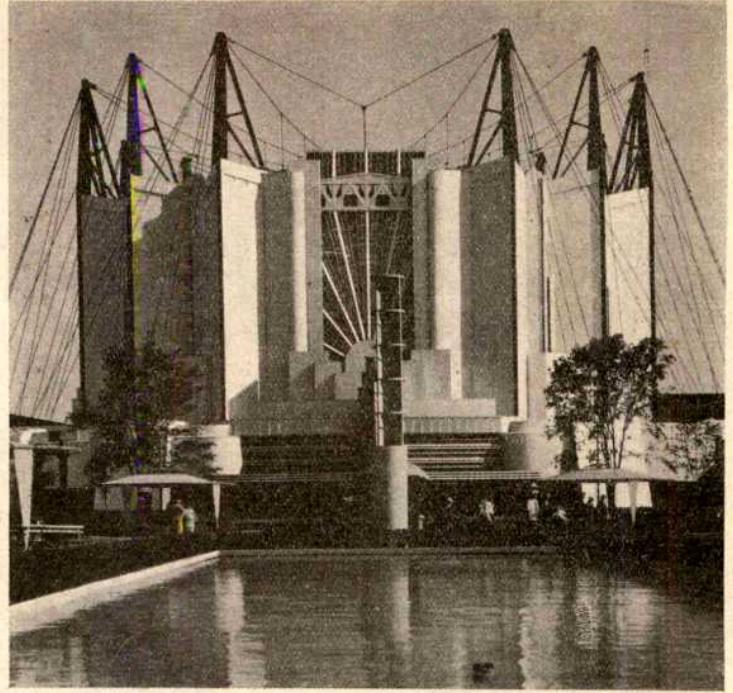
সম্মিলিত ব্যয়ের সমষ্টি ১,০০,০০,০০০ ডলার। গত বৎসরে প্রদর্শনীতে ২২,৫৩৫,৮৫৯ জন লোকের সমাগম হইয়াছিল। আমেরিকার কোনও প্রদর্শনীতে পূর্বে কখনও এত লোকের সমাগম হয় নাই। প্রবেশ-পত্র কিনিতে দর্শকগণের বাহ্য ব্যয় হইয়াছে তাহার সমষ্টিগত পরিমাণ হইবে ৩,৭২,৭০,০০০ ডলার। প্রত্যেক প্রবেশ-পত্রের মূল্য ছিল প্রায় সওয়া-এক ডলার (১ ডলার ১৭ সেন্ট)। চুক্তিপত্রে সই করিয়া পরিচালকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ ১,০০,০০,০০০ ডলার। ১৯৩৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে তাঁহারা ঋণের অর্ধেক পরিশোধ করিয়াছেন। অন্যান্য ঋণ প্রভৃতি পরিশোধ করিবার পরও

পরবর্তী অধিবেশনের জন্ত কর্তৃপক্ষের হাতে ১২,০০,০০০ ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। রেলযোগে ৪০,০০,০০০ জন, মোটরবান যোগে আরও এক লক্ষ এবং অন্যান্য যান-বাহনাদিতে ৪০,০০,০০০ লোক গত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত সমস্ত রাজপথ বিচিত্র আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছিল; পত্নপুষ্প-সুশোভিত সুবৃহৎ তোরণদ্বারে জাতীয় পতাকা বায়ুতরে তরঙ্গায়িত হইল; সমগ্র রাজপথ ও পাছশালা যানবাহনাদি ও বিচিত্র-বর্ণের নানা পোষাক-পরিহিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন-সমাগমে বিকীর্ণ হইয়া উঠিল। জলরেখা-পরিবেষ্টিত নগরী দীপমালায় শোভিত হইয়া এক অপূর্ণপ শ্রী ধারণ করে। বিভিন্ন জাতির উপস্থিতি এই বৈচিত্র্যকে আরও বিচित्रিত করিয়া তোলে!

গত প্রদর্শনীর দুইটি বিশেষ অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল; একটি নিখিল বিশ্বের ধর্ম-সম্মেলন, অপরটি বিশ্বের স্ত্রীমহা-সম্মেলনের অধিবেশন।

বিচিত্র বর্ণের জনসমাগমে দীপায়িতা নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, শিখ, জৈন, মুসলমান, সিণ্টে, কনফুসিয়ানী, শিহদী, আশান্তি, নিগ্রো ও পারসীকের বিচিত্র শোভা দর্শকের হৃদয়ে এক অনন্তভূত কোতূহলের উদ্বেক করে। ‘মহামানবের সাগরতীরে’ দণ্ডায়মান হইয়া এই মহাদৃশ্য দর্শন করিলে চিত্ত আপনা-আপনি উদ্বেলিত ও জাগরিত হইয়া উঠে।

মরিসন পাছশালায় এই বিশ্বজাতির মহা-সম্মেলন বসিয়া-ছিল। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত ডক্টর শ্রামশঙ্কর (হিন্দু), ডক্টর ভগৎ সিং (শিখ) ডক্টর মানেক এঞ্জেল সারিয়া (পার্সী), শ্রীযুক্ত চম্পৎ রায় (জৈন), পণ্ডিত অবোধাশ্রমদ (আর্যাসমাজ), সুফী মুতিহর রহমান (আহমদিয়া), ডক্টর মূলবাগলা (শঙ্করপন্থী)



যান-বাহনাদির প্রবর্তনী গৃহ। উপরের ছাদকে রক্ষা করিবার জন্ত কোনও স্তম্ভ নাই

প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্যের বহু সুপণ্ডিত ও বক্তা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড় সভার উদ্বোধন-প্রসঙ্গে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্ত বেদাদি হইতে এক স্তোত্র পাঠ করিয়া সভায় মঙ্গলাচরণ করেন। নেপালের রাজা জয়পৃথ্বী বাহাদুর সিংও সভায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, শ্রুর অলিভার লজ, বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের সভাপতি মিঃ আর্থার হেগারসন ও মঁসিয়ে রোঁনা রোঁলা সভার সাফল্য কামনা করিয়া তার করিয়া-ছিলেন। এই শেখোক্ত মনোবী তঁাহার প্রেরিত বার্তায় বলিয়াছেন...

The sublime cry of Vivekanand, "My God, the suffering people"—is a fitting appeal to our energies. He who loves God let him defend Him among the millions of those who are oppressed by injustice and social inequality.

অর্থাৎ, ‘জরা-জর্জরিত মানবের দুঃখকষ্ট স্মরণ করিয়া তাহাদেরই



দক্ষিণ পাশ্বে হইতে প্রদর্শনীর সাধারণ দৃশ্য

ফলাপকল্পে শ্রীবৈকানন্দ বিশ্বনিয়ন্ত্রার কাছে যে করুণ কামনা জানাইয়াছিলেন, আজ আমাদেরও মর্ধ্য-প্রদেশে তাহারই আবেদন বনিত হউক। হাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন তাঁহারা অসমতা ও পবিচারের ভাৱে প্রপীড়িত অসংখ্য আৰ্ত্তের মাঝে তাঁহাকে রক্ষা করেন।”

প্রথম দিনের সভায় মিঃ চার্লস ক্রেডরিক ওয়েলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে অসংখ্য জয়ধ্বনির মাঝে বরোদার গায়কোয়াড় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ধর্মের স্থান।’ বর্তমান জগদ্ধাপী অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কুহেলিকার কালো মেঘ বিদূরিত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে এক জ্যোতিষ্মান জগতের উদ্ভব হইবে বলিয়া তিনি সভাস্থ সকলকে আশ্বস্ত করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্ত

মহাশয় সমগ্র ধর্মের উপযোগী এক প্রার্থনা রচনা করেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘শান্তি’।

এই বিশ্বধর্ম সভার অবৈতনিক সভাপতি শ্রীযুক্তা জেন য়াডামস্ উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

“I am sure the soul of this complex age of ours must be discovered through the bringing together of many people from various parts of the earth.”

“বহু দূরবর্তী দেশ-বিদেশ হইতে আগত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি-গণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান কালের নিগূঢ় অন্তরাস্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে; এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।”

এ-কথা সত্য—বহু দূরদেশ হইতে বহু জাতির প্রতিনিধি এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মাত্মসরণ করিয়াও কিরূপে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে

উপনীত হওয়া যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
কখনও মিলিত হইবে না, কবি
কিপ্লিঙের এই অভিজাতমূলভ
সদস্ত উক্তি এখানে মিথ্যা প্রতিপন্ন
হইয়া গিয়াছে। ফরাসী দেশের
এক মহা মনীষী ভিক্টর হুগো
বলিয়াছেন—

There is one thing grander than
the sea ; that is the sky. There
is one thing grander than the sky ;
that is the human soul.

অর্থাৎ, “সাগরের চেয়ে মহান একটা পদার্থ
আছে, তাহা নীলাকাশ। নীলাকাশের চেয়েও
মহামহিমময় এক বস্তু আছে, তাহা মানবের
অন্তরঙ্গ।”

সেই মানবের অন্তরঙ্গ্যের অন্বেষণের
জন্তু জাতিধ্বনির্কির্ষে এই
মিলনভূমির আয়োজন হইয়াছে।
সকলেই নিরীক্সাদে স্ব-স্ব সম্প্রদায়গত
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমতী
রুক্মিণী অরুণডেল ভারতীয় ব্রহ্মবাদের
সবিত্তার আলোচনা করিয়াছেন।
তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল “অতীতে ও
বর্তমানে বিশ্বের উন্নতিকল্পে ভারতের

দান।” স্বনামধ্যাত কুমারী মুরিয়েল লেষ্ঠার নানা তথ্যের পর
সবরমতীর ধ্বির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার বক্তব্য
বিষয়ের উপসংহার করেন।

পরিশেষে, সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক মিঃ ম্যান্লে হল
বলেন,—

“ব্রহ্ম, জিহোবা, আল্লা, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে এক বিরাট
পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া থাকি বলিয়া আমরা প্রকৃত ধর্মবিদ্যাসী আপা
পাইতে পারি না ; তাহার কেহই পৃথক নহেন—সেই একই পরমেশ্বরের
বিভিন্ন দেশ ও ভাষাভাষ্যত মানবীয় পরিকল্পনামাত্র। এই কারণেই
আমাদের মধ্যে এত ঘেঁষ-হিংসার সৃষ্টি।”

এই কারণেই আমরা আমাদের মধ্যে ভেদাভেদের এক
সদ্বীর্ণ সীমারেখা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের চারিপাশের
দিগন্তবিস্তৃত বহুজ্ঞার কথা ভুলিয়া গিয়াছি।
মিঃ সাগারল্যাণ্ড যথার্থই বলিয়াছেন—



রাজা জয়পুথী

To think the world is to be superior to the world.
To know the stars is to be greater than the stars.

শিকাগোর পামার হাউসে মহিলা-মহামণ্ডলের
অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলন পাঁচ দিন স্থায়ী হইয়াছিল।
বত্রিশটি দেশ তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন।
সভায় আলোচনার বিষয় ছিল “শান্তি ও সভ্যতা”।
শ্রীযুক্তা লেনা ম্যাডেসিন ফিলিপস্‌এর নেতৃত্বে সভার
কার্য সুন্দর ও স্ফূর্তিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। সভায়
বৈচিত্র্যের অপূর্ণ সমাবেশ হয়। বিচিত্র বেশ-পরিহিতা
এক চৈনিক মহিলার পার্শ্বে এক জন আমেরিকান মহিলা
উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার পার্শ্বে বিচিত্র-বেশ এক তুরস্ক
যুবতী, তৎপার্শ্বে প্যারিসের রুচিমার্জিত বিভিন্ন বর্ণের রঞ্জিত
রোমানিয়ার এক মহিলা অধ্যাপক ; তৎপরে আমেরিকার



বিশ্ব-প্রদর্শনীর পতাকা-শোভিত তোরণ-দ্বার

পোষাকে বিভূষিতা এক অনিন্দ্যসুন্দরী ইতালীয় রূপসী ; তাঁহারই পার্শ্বে হলাণ্ডের স্বাস্থ্যবতী এক মহিলা, অবশেষে আর্জেন্টিনার এক নমিতাঙ্গী তরুী তরুণী, অদূরে ভারতের মহিমময় নারী-প্রগতির উদ্বোধনবাণী বহন করিয়া শ্রীমতী মুখলক্ষ্মী উপবিষ্ট ছিলেন।

বিশ্বের নারী-প্রগতির ঐক্যবাহিনী বিষয় সভায় পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচিত হইয়াছিল, শিল্প সাহিত্যসঙ্গীত ও কবিতা রচনা বিষয়েও মহিলাগণের দানের প্রসঙ্গ সভায় আলোচিত হয়। তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তির এক স্থানে লিখিত আছে—

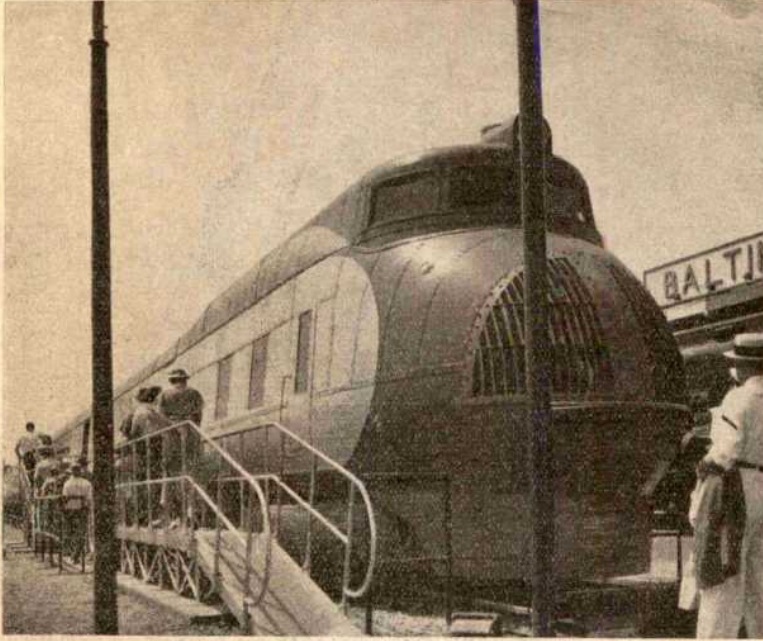
“Hence it is against social systems, not men, that we launch our second women movement.”

“সমাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমরা আমাদের দ্বিতীয় নারী আন্দোলন চালিত করিব—পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে।”

বর্তমান বৎসরের অধিবেশন আরও বৃহত্তর, জনপ্রিয় ও সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। গগনস্পর্শী অট্টালিকা, সাজসজ্জার

পারিপাট্য, প্রদর্শিত দ্রব্যের বৈচিত্র্য অনেকাংশে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা মনকে আকৃষ্ট করে প্রদর্শনীর অগণিত সৌধশ্রেণী। ইহার নানা বর্ণের ও নানা কারুকার্য-সম্বলিত স্থপতিবিজ্ঞা ও ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ সগর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রদর্শিত দ্রব্য অপেক্ষা ইহার অধিকতর মনোহারী। গত দুই সহস্র বর্ষ ধরিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিগণ স্থাপত্য-শিল্পে প্রাচীন গ্রীসের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। দ্বিজিগট ও ব্যাবিলোনিয়ার মর্ম্মর-সৌধ তাঁহাদিগকে কম আকৃষ্ট করে নাই, কিন্তু বর্তমানে লৌহ প্রভৃতি ধাতু ও গৃহনির্মাণের অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্য পূর্বাপেক্ষা শুলভ হওয়ায় এখানে সেই প্রাচীনতম রীতির আর অন্ধ অনুকরণ করা হয় নাই। তজ্জন্ত প্রাচীন রীতির কোনও স্পর্শ বা লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া অনেকে প্রদর্শনীর



সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিৰ্মিত 'ইউনিয়ন প্যাসিফিক' লাইনের ট্রেন। ইহা প্রদর্শনীর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টব্য। ঘণ্টায় ইহা ১১০ মাইল যায়

ভবন-শিল্প হুন্দের হয় নাই বলিয়া মন্তব্য করেন। গৃহস্থালীর নানা দ্রব্য-সম্ভারে সুশোভিত ও আলোকমালায় বিভূষিত আদর্শ গৃহ (Model Homes), বিজ্ঞান-সৌধ (Hall of Science), শাসন পরিষৎ-মন্দির (Administration Building) প্রভৃতি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালী ও রুচি সম্মত।

সর্বশ্রেণীর দর্শকদের মনোহরণ করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষ সর্বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। একদিকে বিজ্ঞানপ্রসূত দ্রব্যাদি, অতদিকে আমোদ প্রমোদ, দূরে ধর্ম-সংক্রান্ত দ্রব্যের প্রদর্শনী, অদূরে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিদর্শন, তৎপরে বিচিত্র চাকরকার সমারোহ! তাহার পার্শ্বে, অদূরে শিশুদের মনোহরণের জন্ত মায়া-দ্বীপ। একদিন ৫০০,০০০ শিশু প্রদর্শনীতে এই কারণেই আগমন করিয়াছিল। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ভবন-শিল্পী মিশিগান হুন্দের উপর এই মায়া-কাননের রূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন।

সমগ্র প্রদর্শনী ব্যাপিয়া অতি অভিনব ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে আলোকের বর্ণ-বৈচিত্র্য রচনা করা হইয়াছে। সতত পরিবর্তনশীল বিচিত্র বর্ণের

রশ্মিকে আমাদের পৃথিবীতে আসিতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর লাগে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে যে আলোকরশ্মি এই নক্ষত্র হইতে বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ-রূপে উইসকনাসন নামক স্থানে অবস্থিত ইয়র্কস মানমন্দিরের সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে প্রতিফলিত হয়; সেখান হইতে ফোটোইলেকট্রিক সেলের সাহায্যে এই অতিক্ষীণ আলোক-রেখাকে বৈজ্ঞাতিক শক্তিতে পরিবর্তিত ও রেডিওর সাহায্যে পরিবর্তিত করিয়া শিকাগোর পথে ধামিত করা হইয়াছে। ইহাই প্রদর্শনীকে আলোকিত করিতেছে। বহু দূরাগত নীহারিকার এই আলোক-ধারায় জ্ঞান করিয়া বিশ্ব-নগরী ধত্ত হইয়াছে!

বিজ্ঞান-সৌধে (Hall of Science) এক শত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কি-কি উপকার সাধিত হইয়াছে তাহারই নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে। স্থানীয় কলেজের বিশিষ্ট ছাত্রগণ দর্শকবৃন্দকে সমস্ত বিবয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। অঙ্কশাস্ত্রের যাবতীয় নিগূঢ়তম এক দিকে, পদার্থবিদ্যার নিদর্শন অত্র দিকে রহিয়াছে। হিলিয়ম

আলোকসম্পাতে এখানে এক স্বপ্নপুরীর পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহা এক বিশ্বময়কর ঘটনা। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কতদূর সফল হইয়াছে ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যান্ড ওয়াশিংটনে একটি বোতাম টিপিয়া দূরবর্তী কলম্বিয়া-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্বাটন করেন। এ-বৎসরও বহু বহু কোটি মাইল দূরবর্তী আর্কটুরস (Arcturus) নামক অতি জ্যোতিয়ান নক্ষত্রমালার সম্পাতে প্রদর্শনী আলোকিত করা হইয়াছে। প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল বেগে ধাবিত হইলে এই নক্ষত্রের আলোক-

গ্যাস ও পারার সাহায্যে এক অভিনব গ্যাস-থার্মোমিটার রচিত হইয়াছে। শব্দ, আলোক ও বিজ্ঞানের পরীক্ষাও এই সৌধে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে এক পার্শ্বে শত বৎসরের মধ্যে রসায়ন-শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও ভূবিদ্যার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান-সৌধের অতি সন্নিহিতে ‘সমাজ-বিজ্ঞান-সৌধ’ (Hall of Social Sciences)। তোরণদ্বারে হিন্দু পুরাণ হইতে নানা দেব-দেবীর মূর্তি খচিত হইয়াছে। তাঁহারা আলো, অন্ধকার, ঝটিকা ও অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লিয়ো ক্রিডল্যান্ডার নামক সুবিখ্যাত ভাস্কর এই শোভন কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতার প্রথম নিদর্শন ফরাসী দেশের ম্যাগনন-গুহার চিত্র দেওয়ালে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণের তিন যুগের কৃষ্টির পরিচায়ক স্তূপাকৃতি গৃহ, বৃহৎ বানর ও আদিম মানবের মাথার খুলি ও অস্ত্র নানাবিধ নৃত্যের কাহিনী এই অট্টালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

“সাধারণ প্রদর্শনী-গৃহ” ১৪৩৮ সালে স্থাপিত জার্মানীর যোহানেস গুটেনবুর্গের প্রথম ছাপাখানা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎকালোচিত হাও মেশিন এবং গুটেনবুর্গ টাইপও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুটেনবুর্গ প্রকাশিত প্রথম বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠাও প্রদর্শনীর সম্পদ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে।

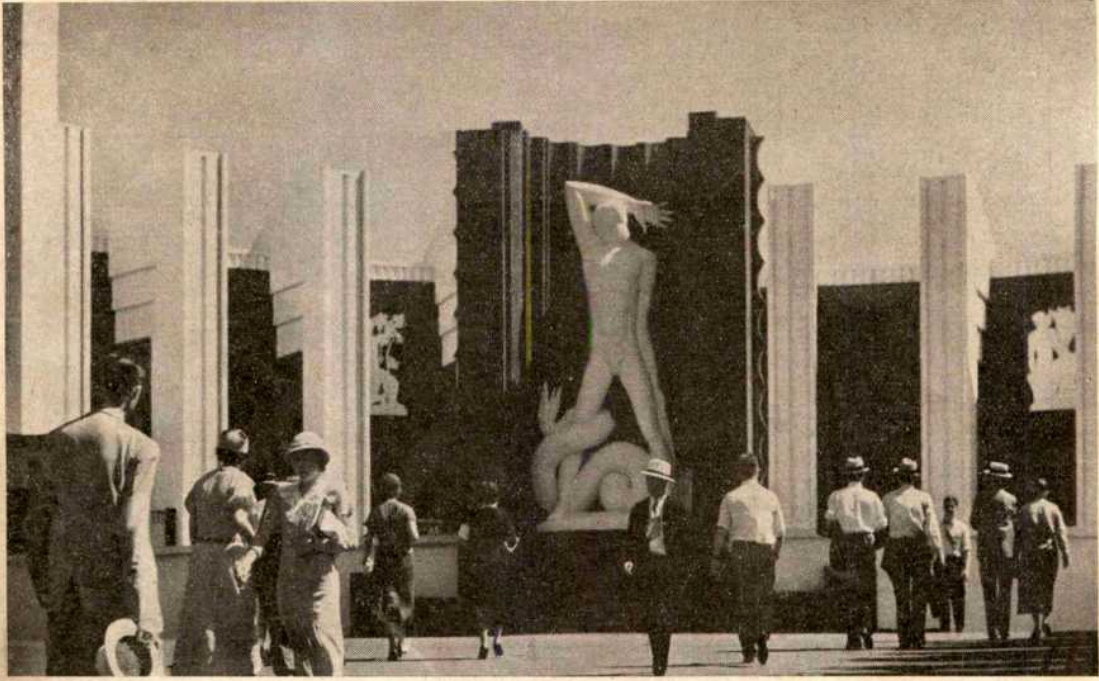
অন্য একটি গৃহে নানাবিধ মূল্যবান ও অধুনা-ছাপা মণি-মুক্তার সমারোহ বসিয়াছে। মেক্সিকোর সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের একটি প্রকাণ্ড নীল হীরকখণ্ড, দক্ষিণ-



প্রদর্শনীসংলগ্ন উদ্যান-বাটিকা—বিভিন্ন লতা ও বৃক্ষের সমারোহ

আফ্রিকার বহু মণি-মুক্তা ও হীরকখণ্ড, হীরকপ্রসূ কীয়ার্লির ত্রিশ টন ওজনের নীল মুক্তিকা প্রভৃতি এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অন্য এক কক্ষে চারি শত মহিলার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্বারা অতীত কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নারীগণের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যায়। শিকাগো-বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্তা মিনা. এম. স্কিমট ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের পদ্মিনী, মীরা বাঈ, মুমতাজ, বাঁসীর রাণী এবং তরু দত্তের মূর্তি এই কক্ষে স্থান পাইয়াছে।



‘বিজ্ঞান-সৌন্দর্য’র উত্তর প্রবেশ-পথে স্থাপিত বীরের মর্মের মূর্তি,—অজ্ঞতার অঙ্গগুরুকে
পদদলিত করিয়া জয়োম্মালে দাঁড়াইয়া আছে

মধ্যস্থলে হাভেলিন থার্মোমিটার প্রতিষ্ঠিত; উচ্চতায় ইহা ২২৭ ফুট। পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্বোচ্চ ও অদ্বিতীয়। রাত্রিকালেও ইহাতে টেম্পারেচার দেখা যায়।

ফোর্ড, ক্রিসলার প্রভৃতি মোটর বিক্রেতাদের যুগ্মত্ব অটালিকাও এখানে নিশ্চিত হইয়াছে। অদূরে একটি বৃহৎ ঝরণা আছে; প্রতি মিনিটে ইহা হইতে ৬৮,০০০ টন জল নিঃসৃত হয়। শাদা, নীল, সবুজ ও লাল রঙের আলোক ইহার উপর প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রও নিজেদের কার্যাবলীর প্রচারকল্পে এক বৃহৎ প্রদর্শনীগৃহ এখানে নিৰ্মাণ করিয়াছেন।

টুয়েলভথ্, ষ্ট্রীটের গোড়া হইতে বিজ্ঞান-সৌন্দর্য পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাইল ব্যাপী রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বর্ণের পতাকা বায়ুভরে তরঙ্গায়িত হইয়া এক বিচিত্র দৃশ্যের উদ্ভাবন করিয়াছে। ফরাসী, গ্রীস, আলাস্কা, সুইডেন, চেকোস্লোভাকিয়া, ইতালী ও অন্যান্য বহু দেশের

সরকার এখানে তাঁহাদের শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছন। চীন দেশও নানা দ্রব্যের পসরা বসাইয়াছে। প্রদর্শনীতে স্থানভাব বশতঃ যদি কোনও দেশের দ্রব্যাদি প্রদর্শিত না হয় তবে প্রদর্শনীর মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানে সেই দেশের আদর্শে ছোট-ছোট গ্রাম বিরচিত হইয়াছে। এখানে সেই-সেই দেশের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতির অনুশীলন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে লামা-মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা জিহ্বালের স্বর্ণ-শিবির নামে খ্যাত। নিকটে বান-বাহনাদির উন্নতি-বিষয়ক নিদর্শন এক প্রকাণ্ড সৌধে রক্ষিত আছে। এই স্থানে ট্রাম, মোটর, বাস, রেল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের ভবনে চাক্ষুষের প্রদর্শনী বসিয়াছিল; গৃহে সর্বসমেত ৪৩টি গ্যালারী আছে; তাহাতে ৭৪৪খানি চিত্র ও ১৩১টি ভাস্কর্য্যশিল্প প্রদর্শিত হয়। ছই ভাবে চিত্রগুলি সজ্জিত হইয়াছে। প্রথম অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত আমেরিকার চিত্রকর-



দুইটি জাপানী চিত্র

শ্রীযুত বিশ্বরূপ বসু কর্তৃক প্রস্তুত কাঠের ব্লকের প্রতিলিপি হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গণের অঙ্কিত চিত্র ; দ্বিতীয় ইউরোপীয় চিত্রাবলী । নিম্নে কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল :—

(১) হুইস্টলারের ‘মাদার’—ইহা ১,০০০,০০০ ডলারে বীমা করা হইয়াছে ।

(২) ‘হোয়াইট গাল’—অনেকে বলেন ইহা প্রথমটির অপেক্ষা ভাল হইয়াছে ।

(৩) এলগ্রোকোর—‘ভার্জিন’ । ইহা বিখ্যাত স্পেনীয় শিল্পীর পরিকল্পিত ।

(৪) এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পাঁচটি চিত্র ক্রয় করা হয় । তাহাও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

রেখ্যাণ্টের ‘জোশেফ এণ্ড পটিকাফস ওয়াইফ,’ টারবর্কের ‘মিউজিক লেসন,’ ওয়াটিউ-এর ‘লে মেজেষ্টিন,’ ফন গগের ‘লে কাফে দা মুইট,’ সেজেনের ‘ম্যাডাম সেজেন ইন দি কনজারভেটরী ।’

(৫) জুলেস ব্রেটনের ‘দি সঙ অব দি লার্ক’ অতি সুন্দর হইয়াছে ।

(৬) ফ্রা এঞ্জেলিকোর ‘গ্রেবিয়ল’ ও ‘ভার্জিন’ও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রাচ্যকলারও বহু নিদর্শন এখানে আছে । তন্মধ্যে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের রচিত গান্ধার-শিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ এক খণ্ড প্রস্তর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক্যাম্বোডিয়া এবং পারস্যের শিল্প-প্রতিভার নিদর্শনও এখানে আছে ।

এতদ্ব্যতীত আমোদ-প্রমোদের বহুবিধ ব্যবস্থা হইয়াছিল । নৃত্য-গীতাদির সমারোহ প্রত্যেক রাত্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে । বিভিন্ন দেশের অনুকরণে পরিকল্পিত যে ক্ষুদ্র গ্রামের প্রতিষ্ঠা এখানে হইয়াছে সেখানেও সেই-সেই দেশের প্রচলিত নৃত্যগীতাদিরও আয়োজন হইয়াছিল । ইহা ছাড়া শিশুদর্শকগণের মনোহরণের জন্ত শিশুমূলভ নৃত্যগীত এবং আমোদ-প্রমোদেরও অনুষ্ঠান যথোচিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল । এক কথায়, প্রদর্শনীকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর সর্বদেশের বিশেষ ও কোতূহলোদ্দীপক দৃশ্য, সাজসজ্জা, নৃত্য-গীত ও বস্তুনিচয়ের একত্র সমাবেশ করিয়াছিলেন ।

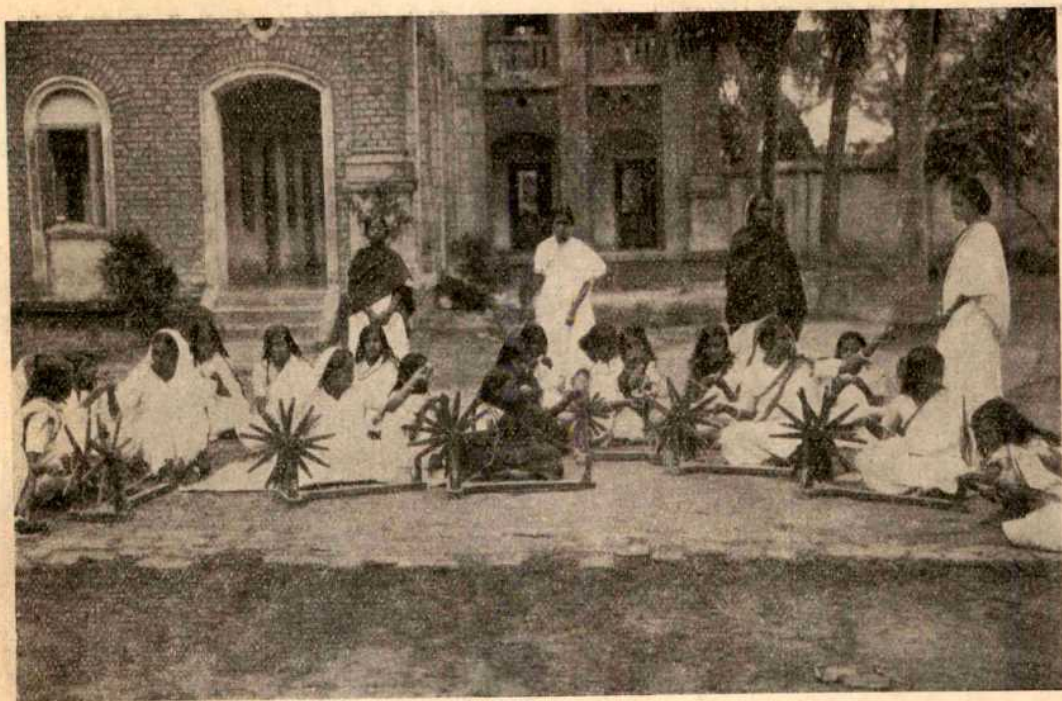
বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়

শ্রীচিন্তরঞ্জন চক্রবর্তী, বি-এ, বি-টি

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্ত যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলিতেছে । সহ-শিক্ষার প্রবর্তনের দ্বারা ইহা আরও প্রসারলাভ করিয়াছে । কিন্তু এ-সমস্ত উত্তোাগই শহরবাসীদের চেষ্টায় ও তাহাদের জন্ত । গ্রামের দরিদ্র বালিকাদের জন্ত এ-পর্যন্ত খুব কম আয়োজনই হইয়াছে । অথচ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামবাসী ও দরিদ্র । গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্ত যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান আজকাল কাজ করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই শহরে সংঘটিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের সাহায্যে উহাদের কার্য সাধারণে সুপরিচিত । আজ একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের বিবরণ আপনাদের নিকট

উপস্থিত করি তছি যাহা একটি নগণ্য গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াও গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে ।

‘বাণীবন’ হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া মহকুমার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম । উহা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উলুবেড়িয়া স্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর অবস্থিত । উলুবেড়িয়া কলিকাতা হইতে বিশ মাইল মাত্র দূরে । বাণীবন গ্রামটি ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্তই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে কয়েক জন ব্রাহ্ম কার্য উপলক্ষ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন । তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রকন্তাদের জন্ত নিজেদের



বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ চরকায় পুতা কাটিতেছে



বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কৃষি-শিক্ষা করিতেছে

বাড়িতেই প্রথমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে পল্লীতে ব্রাহ্মের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। তখন শুধু নিজেদের নয় গ্রামের অন্তরাল বালক-বালিকাও বাহাতে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে সেই জন্য তাঁহারা একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্থানটি কলিকাতার নিকটবর্তী হইলেও শিক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। সেই জন্য কর্তৃপক্ষ ব্রাহ্ম বাতীত স্থানীয় অন্তরাল বালিকাদিগের নিকট হইতে কোন বেতন লইতেন না এবং এখনও তাহারা বিনা বেতনেই পড়িতেছে।

ক্রমে বিদ্যালয়টির উন্নতি হইতে থাকে এবং গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সতের বৎসর হইল বিদ্যালয়-সংলগ্ন একটি ছাত্রীনিবাস খোলা হইয়াছে। ঐ ছাত্রীনিবাসে বঙ্গদেশের বিভিন্ন দশ-বারোটি জেলার, এমন কি সুদূর আসাম ও মাদ্রাজ হইতেও বালিকারা আসিয়া বাস করিতেছে। ছাত্রী-নিবাসে কুমারী ও বিবাহিতা অল্পবয়স্ক বিধবাকে লওয়া হয়।

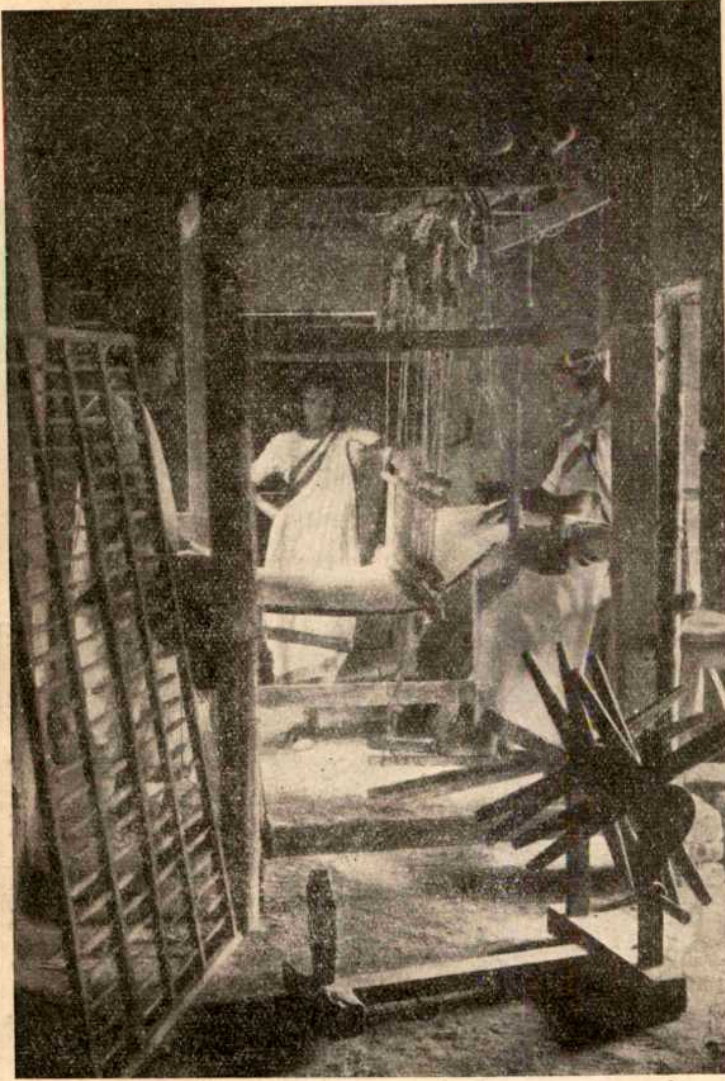
অল্প-আয়-বিশিষ্ট গরিব ভদ্রলোকদের সুবিধার জন্য বেতন যথাসম্ভব কম করা হইয়াছে। বোর্ডিং ও স্কুলের বেতন একত্রে মাসিক সাত টাকা মাত্র। বেতন এত কম করিতে বহু দরিদ্র বালিকা ও বালবিধবা আজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে।

সাধারণ শিক্ষা বাতীত এখানে সেলাই, অঙ্কন, মডেলিং, চরকা ও তাঁত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বালিকাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সর্বপ্রকার উন্নতি বাহাতে



বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ খেলিতেছে

হয় সেই চেষ্টাই বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ ও কর্তৃপক্ষ সর্বদা করিয়া থাকেন। ছাত্রীনিবাসে বালিকাগণ বিলাসিতা-বর্জিত অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করিতে শিক্ষা লাভ করে। গৃহের তায় এখানেও তাহাদের কিছু কিছু গৃহস্থালীর কাজ করিতে হয় এবং তাহারা বাহাতে সাংসারিক কর্মে নিপুণ হইতে পারে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রতিদিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া বালিকাগণ খেলাধুলা করে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে নানা স্থানে বেড়াইতে লইয়া



বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়—ভাঁড়ের ঘর

বাওয়া হয়। বেরা-পুষ্করিণীর মধ্যে বালিকাগণ সাঁতার শিক্ষা করে। তাহারা ইচ্ছানুযায়ী সঙ্গীত ও নানা-প্রকার বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করিতে পারে। লিখিবার ও বলিবার শক্তি বিকাশের জন্য ছাত্রীদিগের দ্বারা পরিচালিত একটি 'জ্ঞানদায়িনী সভা' আছে এবং একটি সুন্দর হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা আছে। ইহা ছাড়া ছাত্রীদের নৈতিক জীবনের উন্নতির জন্য একটি 'নীতিবিদ্যালয়' আছে।

এই বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীদের

দ্বারাও সর্বত্র প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা হুশিক্ষা ও চরিত্র গুণে সর্বত্রই সমাদর লাভ করিতেছে। অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর ও নানা প্রকার সমাজসেবার কাজে ব্যাপৃত আছে। প্রসিদ্ধ নৃত্যকুশলা অমলা নন্দী ও অমৃপমা রায় এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। গত বৎসর এই বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী মধ্য-ইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষায় বর্ধমান-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে অবনত শ্রেণী, বিশেষতঃ নমঃশূদ্র জাতি, বিশেষ সহায়ভূতি ও সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে একটি নমঃশূদ্র বিবাহিত বালিকা বৃত্তি-পরীক্ষায় বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী উভয় বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মধ্য-ইংরেজী বৃত্তি পাইয়াছে। আরও দুইটি নমঃশূদ্র বিবাহিতা বালিকা মধ্য-বাংলা বৃত্তি পাইয়াছে।

এক হিসাবে দেখিতে গেলে এই বিদ্যালয়টি বাংলা দেশে একক। কারণ একমাত্র এই মধ্য-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়েরই সংলগ্ন ছাত্রী-

নিবাস আছে, অন্যত্র কোথাও তাহা নাই। এই-সব নানা কারণেই এক জন ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর ইহাকে "ইউনিক ইনসটিটিউশ্যন" (unique institution) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহু কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল-ইন্সপেক্টর ও ইন্সপেক্ট্রেস এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি অকুণ্ঠিত চিন্তে এই বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং যথাসাধ্য সাহায্যও করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকা

- আছে। বর্তমানে ঐ অট্টালিকাতেই ছাত্রীনিবাস এবং বিদ্যালয় অবস্থিত। ছাত্রীনিবাসের জন্য স্থান-সঙ্কলান না হওয়াতে, বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। ঐ ভবন নির্মিত হইলে বর্তমান অট্টালিকাটি সম্পূর্ণভাবে ছাত্রীনিবাস রূপে ব্যবহৃত হইবে।

এই বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে আছেন ব্রাহ্ম সমাজের অত্যন্ত নেতৃস্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। তিনিই এই বিদ্যালয়ের স্থায়ী সভাপতি। তাঁহারই আশ্রয় চেষ্টায় এবং অর্থ-সাহায্যে এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব অট্টালিকা ও অন্যান্য উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বহু দরিদ্র ছাত্রী তাঁহার অর্থ-সাহায্য পাইয়া এই বিদ্যালয়ে বিদ্যালভ কবিয়াছে এবং কবিত্তেছে।

এই বিদ্যালয়ের এক জন ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ডাঃ বজ্রনীকান্ত দাস, এম-এ, এম-এসসি, পিএইচ-ডি,

বর্তমানে লীগ অব নেশন্সে কাজ করিতেছেন। আর এক জন, ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, আমেরিকা হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ কবিয়া দেশে ফিরিবার পথে বিগত মহাযুদ্ধের সময় লুসিটানিয়া জাহাজের সহিত মহাসমুদ্রে অত্যা সমাধি লাভ কবিয়াছেন। বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায়-বিশ্ব বৎসরের অধিক কাল যাবৎ বালিকাদিগকে পিতার মত শিক্ষাদান ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সময়েই বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং গঙ্গা হইতে আমতা পর্য্যন্ত যে কুশি-খাল গিয়াছে, তাহার উত্তর পাড়েই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। কলিকাতার বাহিবে অথচ নিকটবর্তী স্থানে বালিকাদের এইরূপ একটি শিক্ষা-নিকেতন বাড়ালী ব্রাহ্মী সম্পদ। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে এইরূপ অল্প বৈতনের বোর্ডিং-স্কুল আবণ্ড থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়।

স্বরলিপি

গান



কাছে থেকে দূর বচিল কেন গো আধারে
মিলনের মাঝে বিবহ-কারায় বাঁধা বে।
সমুখে রয়েছে সুখাপাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তাব
কেমনে সরাব কুহেলিকাব এই বাধা বে।

আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তাবি বাণী—
জানি তারে আমি তবু তাবে নাহি জানি,
শুধু বেদনার অন্তরে পাই
অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই
আমার ভুবন ববে কি কেবলি আঁধারে ॥

—শাপমোচন

কথা ও সুর - শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি - শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[রা রসা সনা]

সা	সা	সা	সনা	সা	-পা	মা	জরা	সা	সা	-	-	গা	গা	গা	মা	পা	ধা
কা	ছে	থে	কে	দু	র	র	চি	ল	০	০	০	কে	ন	গো	আ	ধা	০

মা	পা	মা	জা	মা	জা	মা	মপা	পা	পা	পা	পা	ধা	গা	সঁ	গঁ	গধা
রে	০	০	০	০	০	সি	ল	নে	র	মা	ঝে	বি	র	হ	কা	রা

পা - পা | মা - পা | মগা - - | মা পা - | মপা মা জবা | সা সা - পা |
বা ০ ০ | ধা ০ ০ | বে ০ ০ | ০ ০ ০ | কা ছে থে ০ | কে দু ব

{ মা মপা পা | পা পা মা | পসাঁ সঁ সঁ | সঁ সঁ - রা | গসাঁ সঁ - গা | ধা গা গা |
স সু ০ বে | ব রে ছে | সু ০ ধা পা | বা বা দু | না ০ গা ল্ | না পা র

ধসঁ সঁ গা গা | ধা পা - গা | পা - গা - | ধা পা - গা | পধা পা - | পা - - |
তু ০ বু জা | ধি তা র | না ০ ০ | ০ ০ ০ | পা ০ ০ | ০ ০ ০ }

সঁ সঁ সঁ গা | গধা ধপা পা | ধপা ধপা ধপা | মা গা গা | সা - গা | মা - পা |
কে ম নে | স০ রা ০ ব | কু হে লি | কার এ ই | বা ০ ০ | ধা ০ ০

মা পা মা | জা মা জা ||
রে ০ ০ | ০ ০ ০ ||

{ না না না | না না - সা | সঁ - জা - | জবা মজা বসা | সা বা জা | বা সা - বা |
জা ডা লে | জা ডা ০ | লে ০ ০ | শু নি ০ ০ | শু দু তা | রি বা ০

না - - | সা - - | (সা পা পা | পা পা বা | ধসাঁ সঁ গা | ধা পা ধা |
গী ০ ০ | বে ০ ০ | জা নি তা | বে আ মি | তু ০ | তা বে ০

মপা মগা গা | মা - পা | মমা জা - | জা - বসা) }
না হি ০ | জা ০ নি | বে ০ ০ | ০ ০ ০ ০ }

{ পসাঁ - সঁ - সঁ | সঁ - সঁ রা | গসাঁ - গা গা | ধা গা গা | সঁ গা গা | গা ধা গা |
সু ০ দু বে | দ না র | অ ন ত | বে পা ই | অ ন ত | রে পে যে

সঁ সঁ গা | ধা পা - গা | গা - - | গা ধা গা | পধা পা পা | পা - - |
বা হি বে | হা রা ই | হা ০ ০ | ০ ০ ০ | বা ০ ই ০ | ০ ০ ০ }

সঁ সঁ গা | গা ধা পা | ধপা ধপা ধপা | পা মা গা | সা - গা | মা - পা |
আ মা র | তু ব ন | র বে কি | কে ব লি | জা ০ ০ | ধা ০ ০

মা পা মা | জা মা জা ||
রে ০ ০ | ০ ০ ০ ||



(১) প্রাচীন আসামী হইতে (২) বিদ্যাসুন্দর—

শ্রীশ্রমধনাথ বিন্দী। রত্নন প্রকাশালয়, কলিকাতা, ১৩৪১। প্রাপ্তিস্থান, শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য এতাকাট ৫০।

কবি শ্রমধনাথ বিন্দী বয়সে তরুণ হইলেও, তাঁহার রচনা যে আধুনিক তাক্য-ব্যাপি হইতে আশ্চর্য্য করিয়াছে, তাহা কম সৌভাগ্যেব কথা নহে। কারণ, তাঁহার পূর্বরচিত 'বসন্তসেনা' এবং আলোচ্য কাব্য দুইটিতে যে শক্তির পরিচয় আছে, তাহার আর অগচয়ের সম্ভাবনা বা দুর্ভাবনা রহিল না। আধুনিক কবি হইলেও, শ্রমধনাথ প্রাচীনপন্থী। কিন্তু প্রাচীনপন্থী বলিয়া তিনি গুণগুণত্ব নহেন। যে প্রাচীন পন্থা কাব্যেব চিরন্তন পন্থা, তিনি তাহারই অমূল্য কবিগণের; এবং ইহার ফলে তিনি যেটুকু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এই কবিত্ববর্জিত কিন্তু বহুকবি-সমাকুল যুগে আপা ও আশাসের বিষয়। যে কাব্য-বোধ ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণা যুগ-পরম্পরায় কবি-মানসের উপলব্ধি, তাহাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রস-পিপাসাকে উজ্জ্বল করিয়াছে; এবং তাহাকেই তিনি কাব্য-সাধনার দুর্ভাগি স্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বর্তমান সাহিত্যিক স্বেচ্ছাচার ও আত্মশৈথিল্যের যুগে তাঁহার দুইটি রচনা হৃৎসবল গঠন-সৌন্দর্যে ও প্রকাশভঙ্গীতে নিজস্ব রসরূপ লাভ করিতে পারিয়াছে। বাক্যলাভ্যার সনাতন স্বরূপটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য যে-সাধনার নিদর্শন এই দুইটি রচনার রহিয়াছে, তাহা আধুনিক ভাষা-বিকৃতির যুগে হৃৎসবল বলিয়াই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইজন্য, কবির ভাব ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য, স্বচ্ছন্দ শব্দনির্বাচনে ও সত্যক ঐচ্ছন-বীতিব সহজ ভঙ্গীতে, আপনাই আপনায় রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রমধনাথ প্রাচীন পন্থী বলিয়া কেহ বেন মনে না করেন যে তাঁহার নব 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী চর্চিত-চর্চণ মাত্র। প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের কল্পনা ও কামনার বসে অভিব্যক্ত কবিতা, ব্রহ্মপুত্রের বালুচরে ধানশ্রী নদীর তীরে অভিনীত কোনও আধুনিক বয়েসপূর্ণ হৃদয়ের ভাব-জীবনের চিত্র, কবি বাস্তব হৃৎ-হৃৎখের গাঢ়তায় ও বৈচিত্র্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'প্রাচীন আসামী হইতে' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেও, ধানশ্রীতীরনিবাসিনী 'সুন্দরী' অসমীয়ার উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলি, ব্রহ্মপুত্রতীরনিবাসী আধুনিক কবিত্ব প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি। বর্তমান যুগেব ভাব-জীবন, যে সত্য ও স্বপ্নের, যে বাস্তব হৃৎ ও অহর্বেষ দ্বারা আন্দোলিত ও উৎক্লিষ্ট হইতেছে, তাহাই এই শ্রেণিক কবির গভীরতর চেতনা ও অন্তরতম অনুভূতির মধ্যে অপূর্ণ বস-পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভাবপ্রবণ হইলেও কবি দেহ-বাহী; কিন্তু দেহ-তাত্ত্বিক নহেন। জীবন তাঁহার নিকট সত্য, সেজন্য দেহ ও মন উভয়ই তাঁহার নিকট সত্য। কিন্তু জীবন সত্য বলিয়া যে-সত্য জীবনাতীত তাহাকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। শ্রমধনাথের কবিতা ভাবাবেশময়ী, কবিত্ব-স্বপ্নময়ী, কিন্তু এই ভাব ও স্বপ্ন ছাড়া-শব্দীয় নহে, হৃৎকার কবিত্ব-হৃৎকারে বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বপ্নেব ইঙ্গজাল তাঁহার

কবি-দৃষ্টিকে যথেষ্ট প্রলুব্ধ করিয়াছে, কিন্তু ইঙ্গিরের দ্বার বন্ধ করিয়া তিনি কেবল স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন নাই, ধরণীর মুক্তিকার উপরই কাম্য শ্রেয়সের সন্ধান করিয়াছেন। সেইজন্য, এই নবীন কবির প্রবীণ রচনা, বাস্তবদায়িত্বহীন আত্মবিকৃত্যবর্জিত অক্ষম লেখকের শিথিল-প্রস্থি বাক্যপর্বপরায় পর্য্যবসিত হইবে নাই। ইহা অহুহ চিন্তের অপূর্ণ কাকলা নহে, সহজ অনুভূতিব সবল উক্তি। হৃৎব্যাং আশা কথা যাব যে, এই দুইখানি কাব্য বর্তমান বাক্যলা সাহিত্যে, স্বল্প হইলেও একটি নিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীশ্রীশীলকুমার দে

যে সাথে ফুল ফোটে না—শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, ২ নং স্ক্রামচট্রপ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

ইহা একখানি উপজ্ঞাস, প্রেমের উপাখ্যান। অল্প বয়সে বিধবা 'বিশ্বা' গোপনে ভালবাসিত, কিন্তু তাহাব প্রেম ছিল নিয়ন্ত্রিতের। সত্তাবিহিতা 'নুসিতা'ও দুঃসম্পর্কীয় দেব 'প্রভাত'কে ভালবাসিয়া ছিল। লেখক বলিয়াছেন যে তাহাদিগের প্রেম পরম্পরের সাহচর্যেও নিকল্লব রহিয়াছিল। আধ্যাত্মিক হানে হানে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে বলিয়া মনে হয়। ভাবার দিক দিয়া পুস্তকখানি ক্রেশপাঠ্য নহে, ভাষা সজ্জ ও সরল। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ—সবই হুম্মর।

চলুটি পথের বাঁশী—শ্রীনবমোগাল দাস প্রণীত। ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ইহা একখানি উপজ্ঞাস। আধ্যাত্মিক-ভাগে নুতনত্ব আছে। নায়ক 'অসিত' এক জন ভাবপ্রবণ কর্মপাগল যুবক, কর্মের উন্মাদনা ভিন্ন তাহার অন্য দিকে লক্ষ্য ছিল না। কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে সে পিতৃবন্ধুর কন্যা 'মীরা'ব হৃদয় অধিকার কবিয়াছিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সে ভগিনীব মত তাহাকে দেখিয়াছিল, হৃৎব্যাং অন্ত ভাবে সে তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিল না, বিশেষতঃ তাহার কর্মের আদর্শকে মূর কবিতা। ঐচ্ছানি হৃৎপাঠ্য হইবাছে। ভাষাও সহজ ও সুবোধ। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ—সকলই ভাল।

ফরাসী-বিপ্লব—রেজাউল করীম, বি-এ। বর্ধপণ পাবলিশিং হাউস, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৩০। এক টাকা।

লেখক চার্লিপার্সে বাঙালী পাঠককে ফরাসী-বিপ্লবের কথা জানাইবাছেন। ইউরোপ যাহা কিছু করে তাহাই দেখিবার জন্য আমাদেব চক্ষু একান্ত উৎসুক, কিন্তু এই অমুরাগ ষাণা সঙ্কেও আমাদেব ইতিহাসের স্পষ্ট জানের অত্যন্ত অভাব। রেজাউল করীম সাহেব এই পুস্তকে ফরাসী-বিপ্লবের মূল কথাগুলি শুছাইয়া বলিয়াছেন, ইতিহাসের শিক্ষা পাঠক বাতে ভুল করিয়া না বসে সেজন্য তিনি বার-বার তাহাকে সাবধান কবিতা দিয়াছেন। পুস্তকে কিন্তু বহু মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে; অনেক ইংবাজী কথা আছে তাহাদের

বাংলা দেওয়া হয় নাই; দুই জাখপায় সভার বিভিন্নদের এসবকে নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন বৎসরের কোন সংখ্যা তাহা কিছু বলা হয় নাই। আশা কবি পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই সকল বিষয়ে অবহিত হইবেন।

শান্তি-সোপান বা পাঙ্খ প্রদীপ—অম্ববাদক ও প্রকাশক খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, জমিদার, বলিয়াপী (ঢাকা)। প্রাণ্ডিস্থান—প্রকাশক, ঢাকা, অথবা ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পাটুয়াহাটী, ঢাকা। মূল্য ২।০।

শান্তি-সোপান, হজরত এমাম গাজালী প্রণীত মেনু হাজ্জোল আবেরিন ও ছেরাজোহু হালেকিন নামক গ্রন্থের অনুবাদ। পুস্তকের উদ্দেশ্য তৎকাল ইসলাম সমাজকে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা দান করিয়া তাহাকে তৎপারিত নেতা ও ছদ্মবেশী মৌলানাদিগের নিকট হইতে আশ্রয়ক করিতে শিক্ষান। পুস্তকখানি সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ নহে, ইহার আলোচনা সরস করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। ধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, সাধন-ভজনের সংসাবাদি বিব্র, অন্ন-চিন্তাদি প্রতিবন্ধক, সাধন-ভজনের নিমিত্ত কারণ, অকপটতা, ভগবানের গুণ-আরাধনা প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা পাঠক ইহাতে পাইবেন। ইহার উপদেশাবলী ধর্ম-জীবনের পক্ষে সহায়তা করিবে; গ্রন্থের ভিত্তি সংঘের উপর করুণ প্রতিষ্ঠিত তাহা দুইটি উপদেশ হইতে বুঝা যাইবে। (১) “অন্যায়ীরা হৃদয়ের বৃত্তী রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা শযতানের বিঘ্ন-নিবেদিত একটি তৎকাল শরবিশেষ।” (২) “সর্ব কাঙ্ক্ষা ও সর্বপ্রকার সর্ববিষয়ে তুমি তোমার নিজের জন্য বাহা পছন্দ কর ও ভালবাস, অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ করিও, ও ভালবাসিও, এবং নিজের পক্ষে বাহা বাঞ্ছনীয় মনে কর না, বা পছন্দ কর না, অন্যের পক্ষেও তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করিও না বা পছন্দ করিও না।” যে-সমাজের হিতসাধনের জন্য খান-বাহাদুর বুদ্ধ বয়সে “অক্লান্তভাবে মোট চারি শত পত্রের মত” পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা পাঠে সেই সমাজের উন্নতি অবধারিত। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়, এবং ইহাতে ব্যবহৃত আরবী পারস্য শব্দের অর্থ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং অল্প সমাজের ধর্মশীল পাঠকদেরও বোধ-সৌকর্য্য হইবে।

প্রিয়রঞ্জন সেন

আকাশ-পাতাল—শ্রীপেঙ্গনাথ মিত্র। প্রকাশক শ্রীসিলকুমার মিত্র, ১২ নাবিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৪; মূল্য ৮।০।

কৈশোরের প্রথম দিকে ছেলেরা রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়িতে ভালবাসে। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় এরূপ কাহিনীর সংখ্যা বিয়ল। গ্রন্থকাব সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। আকাশে, পাতালে, বনপার্শ্বে ও সমুদ্রের তলদেশে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া মানুষ যে রোমাঞ্চকর অস্তিত্ব সঞ্চয় করিতেছে তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার এই কাহিনীচতুষ্টয় বচন করিয়াছেন। বাংলা দেশের ছেলেরদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য লেখক চারিটি বাঙালী ছেলেকে এই গল্পগুলির নায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান গ্রন্থে তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। চেষ্টাসম্মত তাহার কাহিনীগুলি একান্ত অবাস্তব ও কষ্টকল্পিত হইয়াছে। এজন্য বিষয়বস্তুর উপর দোষ দেওয়া চলে না। গ্রন্থকাব ইংরেজী ভাষায় অমুকপ গ্রন্থ পড়িবা দেখিতে পারেন, সেখানে কেমন করিয়া অতি সহজে রোমাঞ্চকর ও বাস্তবের

মিলনসাধন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থের ভাষা অসংযত ও শুকচালা দোষদুষ্ট। “উত্তরায়” ও “মগডাল” একসঙ্গে চলে না।

শিশু-পরিচর্যা—শ্রীমুন্দরীমোহন দাস, এম. বি. প্রণীত। বৃ: ৩২, মূল্য ১।০। প্রাণ্ডিস্থান—১৭/১১এ রাজা দীনেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যে বাংলা দেশে বাৎসরিক ৩৩ লক্ষ শিশুর মধ্যে এক বৎসরের মধ্যেই শুধু “পেটের অম্ববেই” অন্ততঃ পনেরটি শিশু মাথের কোল বৃত্ত করে, সে-দেশে শিশুপালনের যে বিষয় ক্রটি আছে, তাহা যতঃসিদ্ধবৎ মনে হয়, এবং এই শিশুমেধ দেখিয়া প্রবীণ চিকিৎসক গ্রন্থের ডাক্তার দাস যে চকল হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? তাহার বত শিশু ও প্রসূতি কল্যাণে একনিষ্ঠত্বা অর্ধ শতাব্দীর ভূষোদর্শনের মল যে-ভাবে উক্ত পুস্তিকার সহজ ভাষায় হৃদয়ের ভিত্তিতে, বিভিন্ন “অধিকারে” (হেডিং-এ) সাজাইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ বাঙালী মায়েই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। পুস্তকখানি মূল্যকলেবর হইলেও অমূল্য। আশা করি, ঘরে ঘরে মায়েরা এক খণ্ড রাখিয়া অনেক বিপদ বালাইয়ের হস্ত হইতে নিজ নিজ শিশুদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

নারীজীবন ও প্রসূতি-পরিচর্যা—ডাক্তার শ্রীঅমরকুমার স্ত্রকার, এম-বি, ডি-পি-এইচ প্রণীত। ৩২৫ পৃষ্ঠা। প্রাণ্ডিস্থান, দাসগুপ্ত কোম্পানী, ৪৪/৩ কলেজ ষ্ট্রীট। মূল্য ২।০।

গ্রন্থকার করিমপুরের হেলথ অফিসার। আলোচিত বিষয় ৩২টি, বিষয় বুঝাইবার জন্য স্থানে স্থানে কতিপয় চিত্র আছে। বিবাহ ও “নন্দিত জীবন” সম্বন্ধে অনেক প্রত্যয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাংলা দেশে বাল-বিধবার সংখ্যা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকাব দেবাবিধাছেন। প্রায় ৭ লক্ষ বালিকা ১৯২১ সালে সমাজের গলগ্রহস্বরূপ ছিল। তন্মধ্যে ১ বৎসরের কম বয়স্কের সংখ্যা ছিল ২৮০।

শ্রীমুন্দরীমোহন দাস

বিংশ শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক—শ্রীমুনোরঞ্জন চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীদীনেশচন্দ্র বর্মণ, আর্ধ্য পাবলিশিং কোং ২৬ নং বর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

যে-সকল লক্ষপ্রতিষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যিক বিগত ১৯০২ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত ‘নোবেল প্রাইজ’ লাভ করিয়াছেন তাহাদের জীবন-কথা ও সাহিত্যচর্চায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তিকার প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বের বিশাল সাহিত্য-জগতের বাঙালীর নিকট এখনও একরূপ অসুস্থিত রহিয়াছে। আশা করা যায়, এই জাতীয় আলোচনা-গ্রন্থ ক্রমে বাঙালীর চিত্তে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক নিদর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে। স্থানে স্থানে ভ্রমের জড়তা ও বর্ণাশুদ্ধি এই পুস্তিকাকে কথঞ্চিৎ কলঙ্কিত করিয়াছে সত্য, তবে ইহার মধ্যে নানা প্রত্যয় বিষয়ের সমাবেশ হওয়ায় আশ্রয় ইহা সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত হইবে।

প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেনীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট লিখিত ভূমিকাসহ। শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমৎ ভিক্ষু উত্তম, মহাবোধি সোসাইটি, ৪১ নং কলেজ রোড, কলিকাতা।

এই গ্রন্থে তক্ষশিলা, নালন্দা, পাটলিপুত্র ও বিক্রমশিলা এই কয়টি বিদ্যাপীঠের যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ এবং ত্রৈবৃত্ত বিহার, পণ্ডিত বিহার, কনকভূষণ বিহার ও ব্রহ্মদল বিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্তিম পর্বেই প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাও মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য থাকিলেও এই গ্রন্থে তাহা ঠিক প্রাসঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক অনেক নূতন ধরনের জ্ঞানিতে পাবিবেন এবং উপকৃত ও পরিভূক্ত হইবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পথ বিজ্ঞান—শ্রীমোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

খটনার বৈচিত্র্য আর সেই বৈচিত্র্যের সংঘাতে মানব-মনের নূতন নূতন ভাবে সাড়া দেওয়া, নূতন আলোকে এবং নবতর বিন্মতে ফুটিয়া ওঠা—যা লইয়া সৌরীন্দ্রবাবুর বন—বইখানিতে তা যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। এক শুধু কীকা-দাত্তিক লাটুবাবুর চরিত্রটা একটু অতিরঞ্জিত ঠেকিল, তা ভিন্ন সব চরিত্রগুলিই বেশ হৃদোল হইয়া পড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধান নারী-চরিত্রগুলিতে হৃৎসংঘাত আধুনিকতার ‘টাচ’ বড় সিল্প লাগিল।

বইখানিতে চরিত্রগুলির মুখে বড় বেশী বকম ‘নম্ভেস’, ‘উপদ্ভাস’, ‘রোম্যান্স’-এর দোহাই দেওয়া হইয়াছে। যেমন—‘এ রোম্যান্সের পাতায়ই আছে,’ ‘এ ভালবাসার পরিণতি উপদ্ভাস নাটকে যেমন হয়...’ ইত্যাদি চরিত্র বা ঘটনাগুলিতে বাস্তবিকতার ছাপ দিবার জন্য উপদ্ভাসের পাতায় এ-ধরনের মন্তব্য এক-আধ বাব চলে; কিন্তু বাড়াবাড়ি হইলেই বেখাপ্পা শোনার, তাই সামান্য হইলেও এই জটিলকুর কথা উল্লেখ করিলাম।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই ভাল। মূল্য দুই টাকা।

মাসীমা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার। শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩/১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

একটি ছোট গল্পের দলকে লেখক উপদ্ভাসে লাগাইয়াছেন, কলে অনেক অবাস্তব কথা চুকিয়া পড়িয়া বইখানিকে কিকা করিয়া দিয়াছে।

বইয়ের প্রথমার্শে ভাবার প্রয়োগে কিছু কিছু ভুল আছে। শেষের দিকে সেটা কাটিয়া গিয়াছে এবং এই লেখকেরই লেখা ‘পথের ধূলি’র ভাষা বেশ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। এটা একটা আশার কথা। ছাপার অল্পশ্রম শেষ আছে। বহিরাবরণ ভালই।

পথের ধূলি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার। শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ৬০।

ছোট গল্পের বই, কিন্তু দলের অভাবে প্রথম দিকের কয়েকটি গল্প গল্পই হয় নাই। আর একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব—কইটতে অল্পে পড়ার বড় বাড়াবাড়ি। বইখানি আগাগোড়াই করুণবাস্তবিক তাহাতে অল্পে-অল্পে যেন আশও নিষ্কাঁচ হইয়া পড়িয়াছে। গল্পের মোড় কিরূপেই হইলেই পাত্রপাত্রীদের ধাঁচ কবিতা অল্পে কেসা বাংলা লেখকদের একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেইজন্য কথাটার উল্লেখ করিলাম। ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি সবই ‘মাসীমা’র মত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মসূত্রম্—শ্রীকীরোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত সরল সঙ্গীত ভাষ্যসম্বলিত। ৫ নং উড স্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২১ টাকা।

গ্রন্থকার পাশ্চাত্য বিদ্যাধি অপরিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। তিনি ‘স্বাধীন ভাবে’ অর্থাৎ কোন বিশেষ আচার্যের অনুসরণ না করিয়া ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন আচার্যের মতানুসরণে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাও কলে সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্যের একা সংরক্ষিত হয় নাই।

পূর্ব ও উত্তর পক্ষ অবলম্বনে তিনি সরল বাংলা ভাষায় স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ঐ ভাষা তাহাও পাঠিত্যের পরিচায়ক হইলেও তাহা ভাষা হইলেও মর্মার্থ সর্বত্রই অপরিস্কৃত হয় নাই—গ্রন্থের মর্মার্থও সর্বত্রই সঙ্গত হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে তাহা গ্রন্থকারের অনবধানতারই পরিচায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২৩/৪০ সূত্রের ভাষা দ্রষ্টব্য। পূর্বাভাসও স্থানে স্থানে ভ্রমপূর্ণ। গ্রন্থে শুকতর ভাষাগত দোষ ও মুত্রাকর-প্রমাদ বর্তমান। রীতিয় সংস্করণে দোষমুক্ত হইলে গ্রন্থখানি সকলের আদরপ্রিয় হইবে আশা করা যায়।

শ্রীশিশানচন্দ্র রায়

পত্রলেখা—শ্রীকনকলতা বোথ। প্রকাশক শ্রীসালিলচন্দ্র বোথ, ৪৪ বাহুড় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৫ পৃঃ, মূল্য ১০০।

অঙ্গসিদ্ধ হৃদযেব মর্মবেদন পত্রাকারে এই গ্রন্থে প্রকাশলাভ করিয়াছে। মরদী হৃদয়ের সহায়ত্ব লিখিকা গাইবেন। বইখানির ভাষাও ভাল।

শ্রীমদভগবদ্ গীতাপনিষদ্, দ্বাদশ অধ্যায়—শ্রীকীরোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভূষা, এম্-এ. বি-এল; এডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট, প্রণীত। “অষ্টাবিংশতি কলিযুগে ৫০০৪ মহাব্যাক্ষ” প্রকাশিত। প্রকাশক বোথ হয় গ্রন্থকার নিজেই, কেননা তাহার কোন উল্লেখ নাই।

নামেই গ্রন্থখানার পরিচয় রহিয়াছে। বাংলা টীকাটি সহজবোধ্য ও সুব্যাখ্য হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্রোহী বালক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমদ্ব্যংগুশেখর গুপ্ত, ১০ ইন্ডিয়া রোড বোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি শিশুপাঠ্য উপদ্ভাস। ইহার দল বিলাতী, কয়েকটি চরিত্রও খাঁটি বিলাতী। সেজন্য এ-দেশের আবহাওয়ায় তাহারা নিতান্ত বেমানান, এমন কি অস্বস্ত। তবে গল্পটি প্রথম দিকে জমিয়াছে বেশ, কিন্তু মাঝ হইতে শেষ অবধি সেবগ নয়।

ছাপা ও কাগজ ভাল। প্রচ্ছদপটখানি বর্জন করিলে ভাল হইত।

লক্ষ্মীহারী—শ্রীকীরোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—গোলাপ পাবলিশিং হাউস, ১২ হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

একখানি উপদ্ভাস। দেশের দুঃখ-দাবিয়ে লেখকের গভীর বেদনাবোধ ইহাতে জাগ্রত; আর, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া গ্রন্থখানি

রচিত হইয়াছে। এ-শ্রেণীর উপস্থাপন আমাদের সাহিত্যে অতি অল্প।
লেখকের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। ছাপা ও কাগজ ভাল।

স্বপ্নসুন্দরী—শ্রীগদাধরসিংহ রায় প্রণীত। গুরুদাস
লাইব্রেরী। ২০৩।১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০।

জ্ঞানক নাটিকা।

রাজা গণেশ—শ্রীহরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—
বিজ্ঞান সাহিত্য-মন্দির, কালীধাম ও রাজসাহা! দাম এক টাকা।
নাটক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উনপঞ্চাশৎ—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, ৩২ বীডন রো, কলিকাতা।
পৃষ্ঠা ১২৮, মূল্য বায়ো আনা।

এক্ষে উনপঞ্চাশটি গান স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার
জমিদার, তাহার বন্ধু সঙ্গীতরস জীবন্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়
ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“গোপালদাস বাবুর এই সঙ্গীতগুলিতে
প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে।” হৃৎকের বিষয়, আমরা
তাঁহার এই সম্ভব্য সমর্থন করিতে পারিলাম না। গানগুলি মোটামুটি
ভাল, এতদধিক প্রশংসার দাবি এই গানগুলি করিতে পারে না।
শ্রীব্রজ কবিরচন্দ্র নন্দী গানগুলির হর-বোজনা ও স্বরলিপি
করিয়াছেন। তাঁহার স্বরলিপি-প্রণালী অতি সুন্দর ও সহজে
বোধগম্য। পুস্তকখানা সঙ্গীতশিক্ষার্থীর অনেক উপকারে আসিবে
বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

বাজালার পল্লীসংস্কার ও বেকারের উপায়—
শ্রীসারদাপ্রসাদ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবনবিহারী চৌধুরী।
৭৮।১ হারিসন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩৮। মূল্য দুই আনা।

লেখক নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া
পল্লীসংস্কারকারীদের বিশেষ উপকারসাধন করিয়াছেন। বেকার-সমস্যা
বাংলায় একটি কঠিন সমস্যা। ইহার সমাধানকল্পে যতই আলোচনা
হয় ততই ভাল। পুস্তকখানিতে এ-বিষয়ে চিন্তার ধোরাক যথেষ্ট
মিলিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বান্ধারভিল-কুহুর—শ্রীকুলদারজ্ঞান রায়। এম-সি, -সরকার
এও সল লি: কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৫।

এই বইটি প্রসিদ্ধ লেখক কনান-ডয়েলের ইংরেজী ডিটেক্টিভ

উপস্থাপনের অনুবাদ। কুলদা বাবুর অনুবাদে মূল বইয়ের চিত্তাকর্ষণশক্তি
প্রায় সমস্তই বজায় আছে। ছেলে-বুড়া সকলের কাছেই এইরূপ বইয়ের
সন্মান আদর পাইবার কথা। মূল বই পাশ্চাত্য ভ্রমণে বিখ্যাত, এতদিনে
এদেশেও তাহার খ্যাতি বিস্তার হইবে বলিয়া মনে হয়। কুলদা বাবুর
বিশেষত্ব এই যে তিনি নির্দোষভাবে লিখিত রোমাঞ্চকর বিষয়বস্তু
বাংলা পাঠকের কাছে অনেকবার দিয়াছেন। আলোচ্য বইটিও সেই
পর্বায়ে পড়িবে।

ক. চ.

দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ—শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস।

২৫।১ জাটিন্স চন্দ্রমাধব রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।
মূল্য ২১ টাকা।

ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে মাত্রাজ প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও
মহিশূরের ন্যূনাধিক দেড় শত তীর্থস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।
ইহাদের মধ্যে অতি অল্প করেকটি তীর্থের বিবরণ ইতিপূর্বে বাংলা
পুস্তকে ও মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতের একটি
বিশুদ্ধ মানচিত্র এই পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত
বেলপথ ও প্রধান প্রধান তীর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনটি
পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রথমটিতে ভৌগোলিক বিবরণ, দ্বিতীয়টিতে
প্রধান প্রধান তীর্থসমূহে ভ্রমণের ভ্রম, এবং তৃতীয়টিতে দক্ষিণ-ভারতে
প্রচলিত চারিটি ভাষায় প্রয়োজনীয় অনেক শব্দ ও তাহাদের বাংলা
প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে পরবর্তী ভ্রমণকারীর
অনেক সুবিধা হইবে। কেবল ভ্রমণকাহিনী হিসাবে এই গ্রন্থের
উপযোগিতা নহে, বাহাতে এই পুস্তক পাঠ করিয়া পাঠক বর্ণিত
তীর্থসকলের মহিমা উপলব্ধি করিতে এবং তাহাদের মাধুর্য্য
আশ্বাদন করিতে পাবে তাহার দিকে লেখক মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য
রাখিয়াছেন। তিনি তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে বহু ভক্তি-
ভাবোদ্দীপক কবিতা গান ও সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে
তাঁহার রচনায় একটা বিশেষ মাধুর্য্য ও স্নেহপ্রাণিতা ফুটিয়া
উঠিয়াছে। এই তীর্থপ্রসঙ্গ পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন কোন
ভাবুক ভক্ত তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। গ্রন্থের ভাষা বেশ
সরল এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত-বর্ণনায় একান্ত উপযোগী। উপসংহারে
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও ভাবতের চারি জন প্রধান বৈকুণ্ঠাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত
জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বেশী
হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ অতি বিরল এবং ইহার
সমধিক প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি
সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীশুকুমাররঞ্জন দাশ:

অভিনব মেঘদূত এবং কালিদাসের অবমাননা*

শ্রীবীরেশ্বর সেন

মেঘদূত কালিদাসের এক চমৎকার সৃষ্টি। ইহার কবিত্ব যেমন অসাধারণ, ভাব্য গৌরবও তেমনই, বরং ইহার কবিত্ব অপেক্ষা ইহার ভাব্য গৌরবই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কালিদাস যেমন কবি ছিলেন তেমনই ভাব্য উপরও তাঁহার অসাধারণ আধিপত্য ছিল, কিন্তু তিনি যে মেঘদূতের রচনায় অনবদ্যভাবে শব্দ-নিরীক্ষণ করিয়াছেন সেই বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত। এ-পর্বাঙ্ক কোন পণ্ডিতসম্মত লোকই এমন কথা বলেন নাই যে মেঘদূতের ভাব্য দোষ আছে এবং তাহার সংশোধন হইতে পারে, তবে ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিখিত পুস্তকে মেঘদূতের কয়েকটা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে কালিদাসের ভাব্য সেই সেই স্থানে স্ফুট ছিল না বলিয়া অল্প লোকে ইচ্ছা করিয়া পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকল পাঠ-ভেদের অল্প কারণও থাকিতে পারে। এক জনের হস্তাক্ষর আর এক জন কোন কোন স্থানে পড়িতে না পারিয়া সেই সেই স্থানে নূতন পাঠ প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন। অধিকতর সম্ভাবনা এই যে মেঘদূত রচিত হইলে গুণগ্রাহিগণ তাহার প্রতিটি লইবার পর কালিদাস নিজেই তাহার সংস্কার করিয়া কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এইরূপ হইয়া থাকিলে মেঘদূতের বর্তমান পাঠ-ভেদ দেখা যায়—সেগুলি সমস্তই কালিদাসের নিজের এবং সেই সকল পাঠ-ভেদের যেগুলি উৎকৃষ্ট তাহাই কালিদাসের শেষ সংস্করণের ফল। কোন কোন পাঠ উৎকৃষ্ট তাহা মরিনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অজ্ঞান বহু পণ্ডিত টিক করিয়া মিলাছেন।

তাঁহাদের নির্দ্ধারিত পাঠই বহুকাল হইতে বিস্তৃত পাঠ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার কেহই নূতন পাঠ প্রস্তত করেন নাই। এ-পর্বাঙ্ক কেহই উক্ত প্রকাশ করিয়া এমন কথা বলেন নাই যে প্রচলিত মেঘদূতের অমূলক অমূলক স্থানে উক্ত মহোদয়গণের পাঠ-নিরীক্ষণ সৌভাগ্যবশত হইয়াছে এবং কেহই নূতন পাঠ প্রস্তত করিয়া মেঘদূত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সন্দেহিত এক জন বাঙালী এই কার্য করিয়াছেন। তিনি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি মেঘদূতের এক শতেরও অধিক স্থানে ভাষা পরিবর্তন করিয়া মেঘদূতের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, “এই পুস্তকে বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠকে নির্দিষ্টায়ে গ্রহণ করা হয় নাই। আধুনিক বিচারের আলোকে পাঠ-সংস্কারের একটা চেষ্টা করা হইয়াছে। সেই দায়িত্ব আমারই। এই সংস্কার-কার্যে প্রধানতঃ বঙ্গভাষার ও জিনসেনের মত পাঠের উপরই নির্ভর করিয়াছি। যে-যে স্থানে আমাদের পাঠ-বাংলায় প্রচলিত মরিনাথের পাঠ হইতে পৃথক হইয়াছে তাহা গ্রন্থের শেষে ‘মেঘদূত প্রসঙ্গে’ উল্লেখ করিয়াছি বঙ্গভাষার পাঠ যে মরিনাথের পাঠের চেয়ে অধিকতর সঙ্গত তাও দেখান হইয়াছে। প্রকৃষ্ট শ্রোতৃগণকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত না করিয়া মরিনাথ-মত বহু প্রচলিত নমস্ত শ্রোতৃগণেরা রাখা হইল, তবে মরিনাথ নিজে যে-গুলিকে প্রকৃষ্ট বলিয়াছেন সেইগুলি সবই পরিমার্জিত হইয়াছে।……যে-সব আশায়া বাংলা দেশের অভ্যন্তর পাঠ গ্রহণ করিলে কাব্যে ভাবগত কোন অসঙ্গতি-ঘটে না সে-সব স্থানে পাঠ পরিবর্তন করা হয় নাই। যে-সব স্থানে ঐ অসঙ্গতি-দোষ ঘটে কেবল সে-সব স্থানেই পরিবর্তন

করা হইয়াছে ও ‘মেঘদূত-প্রসঙ্গে’ তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে পাঠ-সংস্কার করিয়া বাঙলা দেশে মেঘদূতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন এখনও রহিল।”

কিন্তু প্রবোধ বাবু শতাধিক স্থানে পাঠ পরিবর্তন করিয়া মাত্র সাতটা পরিবর্তনের কথা স্বীয় ‘মেঘদূত-প্রসঙ্গে’ স্বীকার করিয়াছেন। তাহারও কোনটা বঙ্গভাষার, কোনটাই বা জিনসেনের তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই সকল পরিবর্তনের যে হেতুবাদ বা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা *ipse dixit* ভিন্ন কিছুমাত্র অধিক নয়। তাঁহার প্রত্যেক কৈফিয়তেরই মর্ম এই যে তাঁহার বিবেচনায় তাঁহার মত পাঠই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। তাঁহার স্বীকৃত সাতটা পরিবর্তন ব্যতীত তিনি আরও যে শতাধিক পরিবর্তন গোপনে ‘বেমানান’ভাবে করিয়াছেন তাহা কোন স্থানেই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পরিবর্তনে কিরূপ অপকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা সংস্কৃত কাব্যের মর্মজ্ঞ পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমে প্রবোধ বাবুর স্বীকৃত সাতটা পরিবর্তনের আলোচনা করিয়া পরে তাঁহার গোপনে কৃত পরিবর্তনগুলি বিবৃত করিব।

প্রবোধ বাবুর স্বীকৃত পরিবর্তন—(১) পূর্বসম্বন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে ‘কৌতুকাধান হেতু’ ছিল; প্রবোধবাবু সে স্থানে ‘কেতকাধান হেতু’ করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহার পাঠই “অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। বর্ধাকালে কেতকী বা কেয়াফুল ফোটে।” প্রবোধ বাবু ভাবিলেন না যে বর্ধাকালে কেবল কেতকী বা কেয়া ফোটে না। নীপ, ককট, কুটজ প্রভৃতি বহু ফুলের নাম মেঘদূতেই আছে। এইগুলির মধ্যে ‘হইতে কালিদাস মেঘকে কেবল কেয়া ফুলের আধান হেতু বলিবেন কেন? অল্প পক্ষে নববর্ষের আগমনে যে-কোন লোকের মনে অনন্ত কৌতুক বা কৌতুহল বা বিস্ময় উৎপাদন করে ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

(২) নবম শ্লোকে যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—“চাতক স্তে স্বগন্ধ” অর্থাৎ চাতক তোমার নিজেরই লোক। এরূপ বলার কবিত্ব আছে, কিন্তু প্রবোধবাবু এই পাঠস্থলে পাঠ দিয়াছেন ‘চাতক স্তোষ গুধু’। এই পাঠে কবিত্বের লেশমাত্রও নাই। প্রবোধ বাবু ভাবিয়াছেন ‘তোয় গুধু’ই পাঠ ছিল, লিপিকব-প্রমাদে ‘তে স্বগন্ধ’ হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিয়াছেন ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি হইতে পারে। শকুন্তলার দুয়ান্ত বলিতেছেন যে হবিগুণ্ডলা শকুন্তলার স্বগন্ধ এইমন্ত শকুন্তলা হরিণ ভালবাসেন।

(৩) বত্রিশ শ্লোকে প্রবোধবাবু ‘ধূপ’ স্থানে ‘ধূন’ পাঠ দিয়াছেন। কালিদাস যে এখানে ধূপ শব্দ দ্বারা লক্ষণা নামক অলঙ্কার-প্রয়োগ করিয়াছিলেন প্রবোধবাবু তাহা ভাবিতে পাবেন নাই। বর্তমান সময়ে আমরা তামাক খাওয়ার কথা বলি কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লোকে তামাকের ধূমই সেবন করে।

(৪) এই শ্লোকের ‘লক্ষ্মীং পশ্যন্’ স্থলে প্রবোধ বাবু ‘নৌকা রাত্রিঃ’ পাঠ

* শ্রীপ্যারামোহন সেনগুপ্ত কৃত বাংলা ‘মেঘদূত’ সহিত মুদ্রিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্কৃত ভাগের সমালোচনা।

বানাইয়া দিয়া এই বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, “লক্ষ্মী পশ্চন্ পাঠে কোন সঙ্গত অর্থই হব না। অধ্যাপক কে. বি. পাঠকও মমিনশের এই পঠ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।” “লক্ষ্মী” শব্দের অর্থ বে ‘শোভা’ হয় তাহা প্রবোধ বাবু অভিধান দেখিলেই জানিতে পারিতেন। হস্ত্য অর্থাৎ প্রাসাদের শোভা দেখিতে বলার অসঙ্গতিটা কোথায় হইয়াছে? অধ্যাপক কে. বি. পাঠকও কি ‘লক্ষ্মী পশ্চন্’ পাঠ কাটিয়া দিয়া নূতন পাঠ সংযোজন করিয়া মেঘদূত ছাপাইয়াছেন? যদি তাহা করিয়া থাকেন তাহা হইলে পাঠক-মহাশয়ও কম ধনুর্দ্ধর নহেন। সমস্ত চরণটি এই ‘লক্ষ্মী পশ্চন্ ললিত বনিতা পাদরাগকিত্তে’। ইহার অর্থ এই যে হস্ত্য নারীদিগের পদচিহ্নযুক্ত বাড়ীর শোভা দেখিয়া। এখানে লক্ষ্মী শব্দের পর ললিত শব্দ থাকার অর্থ একটু অশুশ্রাস হইয়াছে। মেঘদূতের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অল্পাধিক অশুশ্রাস আছে ও প্রবোধ বাবুর পাঠে এই অশুশ্রাস নষ্ট হইয়াছে। ‘রাগাকিত্তে’ শব্দটা যে পূর্ব চরণের ‘হস্ত্যে’ শব্দের বিশেষণ প্রবোধ বাবু এবং পাঠক-মহাশয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

(৫) একাদশ শ্লোকে ‘পশ্চাচ্ছলবী’ স্থলে প্রবোধ বাবু ‘পূর্বাচ্ছলবী’ করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন, “এই পাঠ সম্প্রতি কারণবশতঃ পশ্চাচ্ছলবী পাঠে চরে অধিকতর হস্ত্য।” কেন, তাহা লেখা প্রবোধ বাবু উচিত মনে করেন নাই।

(৬) একষটি শ্লোকে ‘বলবল্লিশেষদষ্টলোদগীর্তোয়ং’ কাটিয়া দিয়া প্রবোধ বাবু পাঠ দিয়াছেন ‘জনিতসলিলোদগার মন্তঃপ্রবেশান।’ এই পাঠ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে প্রচলিত পাঠাপেক্ষা ইহা “অনেক স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।” তিনি আরও লিখিয়াছেন, “হিমালয়ের নানা স্থানে মেঘ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃষ্টিপাত করে তাহাতে ঐ গৃহ সত্য-সত্যই যন্ত্রণার গৃহস্থ প্রাপ্ত হয়।” পাঠ-পরিবর্তনের চমৎকার বৃত্তি।

(৭) উত্তর মেঘের একাদশ শ্লোকের ‘স্তন পরিসরঙ্গিহ্ন হৃদৈশ্চ হারৈঃ’ কালিদাসের এই পাঠের পরিবর্তে ‘মুক্তালগ্নস্তন পরিসরঙ্গিহ্ন হৃদৈশ্চ হারৈঃ’ করিয়া দিয়া প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন যে তাঁর কল্পিত পাঠ “অধিকতর সঙ্গত ও স্বাভাবিক। পবিত্র মনে চন্দনপত্র প্রভৃতি মর্দনক্রমে হৃৎক অঙ্কলেপন। মেঘেরা স্তনেও পরিসর লেপন করিত। পতিকল্পনে সূতা ছিঁড়িয়া ঘাওয়ার পথে হাবের মুক্তা পড়িয়া বহিয়াছে, এবং ঐ মুক্তায় স্তনের পরিসর লাগিয়া রহিয়াছে।”

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উল্লিখিত সাতটা পরিবর্তন যাহা প্রবোধ বাবু প্রকাশ্যভাবে করিয়াছেন তাহার একটাও বসন্তদেবের অথবা জিনসেনের দৃঢ় পাঠ নহে, কেননা পূর্বকালীন আচার্যগণ মোটেই কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলেন না। অতিদাস্তিকতা বশতঃই প্রবোধ বাবু কালিদাসের উপর কলম চালাইয়া এই সকল অপপাঠ সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রবোধ বাবু যে-সকল পরিবর্তন গোপন ভাবে করিয়াছেন অর্থাৎ এমনভাবে করিয়াছেন যে যাহারা প্রশ্নমবার মেঘদূত পড়িতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সংস্করণ পড়িবে তাহার ভাবিবে যে তাহার কালিদাসের প্রচলিত রচনাই পড়িতেছে এবং সম্ভব মাত্র করিবে না যে তদ্ব্যতীত অন্তরেও কৃত্রিম আছে। এখন আসি সেই সকল পরিবর্তনের কথাই বলি। এই সকল পরিবর্তনের সংখ্যা এক শতেরও অধিক হইবে। এইরূপে কোন বিখ্যাত গ্রন্থকাবে তাহা কাটিয়া দিয়া তৎস্থানে কুৎসিত পাঠ দিয়া পূর্ণ করিয়া পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিলে ক্রেতাগণকে প্রতারণা করা হয় কিনা তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পূর্বমেঘে গোপনে কৃত পরিবর্তন

১। দশম শ্লোকে ‘সদ্যঃপাতি’ স্থলে প্রবোধ বাবু ‘সম্পঃপাত’ পাঠ দিয়াছেন।

২। বোড়শ শ্লোকের ‘ব্রজলগ্নগতিঃ’ স্থানে প্রবোধ বাবু ‘প্রবলগ্নগতিঃ’ এই ভ্রমশ্র পাঠ দিয়াছেন।

৩। বিশ শ্লোকে ‘জঘৎকুজ’ স্থানে প্রবোধবাবু পাঠ ‘জঘৎকুণ্ড’।

৪। একুশ শ্লোকে ‘নবজল’ স্থলে ‘জললব’ এই দেওয়া হইয়াছে।

৫। তেইশ শ্লোকে ‘পরিপত ফল’ স্থলে ‘ফল পকিগতি’ পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

উপবি উক্ত পাঠটি পরিবর্তন প্রবোধ বাবু কিরূপ বিচারালোকের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা হয়। কালিদাসের যে পাঠ ছিল তাহাতে প্রবোধ বাবু কি দেখ দেখিয়াছিলেন যে সেই পাঠ কাটিয়া নূতন পাঠ বানাইয়া দিয়াছেন?

৬। ছাব্বিশ শ্লোকে ‘নগনদী’ স্থানে প্রবোধ বাবু পাঠ ‘বননদী’। পার্বত্য নামে একটা নদাকেই যে কালিদাস নগনদা নামে অভিহিত করিয়াছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

৭। বত্রিশ শ্লোকে ‘বেদং নয়নঃ’ কালিদাসের এই পাঠ কাটিয়া দিয়া ‘বিদ্যাস্তবাক্ষঃ’ পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে অপর দুইটি পরিবর্তনের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। তেত্রিশ শ্লোকে কালিদাসের ‘বাক্যমান’ স্থলে ‘দুগ্ধমান’ পাঠ দিয়াছেন। দুগ্ধমান বলিলে ‘সাধারণভাবে দেখা’ বুঝায়, ‘বাক্যমান’ বলিলে ‘মনোবোগের সহিত দেখা’ বুঝায়।

৯। সাঁইত্রিশ শ্লোকে ‘তোষোৎসর্গঃ’ স্থলে ‘তোষোৎসর্গঃ’। ইহাতে অর্থের অপকর্ষ হয় নাই বটে, কিন্তু উৎকর্ষও কিছুমাত্র হয় নাই।

১০। একচত্রিশ শ্লোকে ‘বিবৃত’ স্থলে ‘পুলিন’ পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

১১। বিষাশ্লিশ শ্লোকে কালিদাসের ‘কনিত’ স্থানে প্রবোধ বাবু ‘গুণিত’ পাঠ দিয়াছেন।

১২। পঁয়তাল্লিশ শ্লোকে কালিদাসের ‘সর বন ভব’ স্থলে প্রবোধ বাবু ‘সরবন ভব’ পাঠ দিয়াছেন। স্বল্প বা কাস্তিকের অর্থ সরবনে হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে সরবনভব বলে। কিন্তু প্রবোধ বাবু নিশ্চয়ই এই ভাবিয়াছেন যে সরবনট স্বল্পের স্রমিদারী ছিল। একপ না ভাবিলে তিনি ‘সরবন ভব’ পাঠ প্রস্তুত করিলেন কেন?

১৩। সাতচত্রিশ শ্লোকে কালিদাসের ‘কুক্ষাশব’ স্থলে প্রবোধ বাবু ‘কুক্ষাসার’ পাঠ দিয়াছেন। ‘শ’ ই যে ঠিক সে-বিষয়ে মমিনাথের সম্ভবা জটুবা। এখানে কুক্ষাসার শ্লোকের কোন প্রসঙ্গ নাই।

১৪। আটচত্রিশ শ্লোকে ‘অভাববৎ’ পাঠ কাটিয়া প্রবোধ বাবু ‘অভাসিকৎ’ পাঠ বসাইয়া দিয়াছেন। জলধারা বর্ষণ এবং অশ্রুধারা বর্ষণ লোকে বলিয়া থাকে। কিন্তু অশ্রুধারা সিঞ্চন কখনও হইতে পারে না।

১৫। ঊনপঞ্চাশ শ্লোকে চতুর্থ চরণে ‘শুভ্র’ কাটিয়া ‘সুচ্ছ’ পাঠ বসাইয়া দিয়াছেন।

১৬। একাদশ শ্লোকে কালিদাসের ‘অসৌ’ পাঠ কাটিয়া দিয়া প্রবোধ বাবু ‘সৌ’ পাঠ দিয়াছেন। যদি ‘সৌ’ থাকিত তাহা হইলে প্রবোধ বাবু নিশ্চয়ই অসৌ করিয়া দিতেন।

১৭। বাহান্ন শ্লোকে ‘শুভ্র’ কাটিয়া দিয়া প্রবোধবাবু ‘রম্যঃ’ পাঠ বসাইয়া দিয়াছেন।

১৮-২৭। চার্লস শ্লোকের প্রথম দুই চরণ ছিল :—

বে সংরক্ষোৎ পতন রজসা স্বাক্ত ভদ্রায় তস্মিন্
মুক্তাঙ্গানং সপদি শরতা লজ্জাযেব্বর্তনম্।

এবোধ বাবু তৎস্থলে করিয়াছেন—

বে হ্যং মুক্তাঙ্গানংসহনঃ কারভদ্রায় তস্মিন্
দপৌংসেকাহুগরি শরতা লজ্জাযেব্বর্তনম্।

আবার তৃতীয় চরণে ‘পাদ’ শব্দ স্থানে ‘হাস’ করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস মেঘদূতেরই অন্তরে যেতবর্ষ কেনের সহিত হস্তের তুলনা করিয়াছেন। এবোধ বাবু বৃষ্টির সহিত হস্তের তুলনা করিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, মুক্তাঙ্গান কাহাকে বলে? কালিদাস বিবিলিঙের প্রয়োগ করিয়া একটা সম্ভাবনা বা চেষ্টার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এবোধচন্দ্র লুপ্ত প্রয়োগ করিয়া বাহা লজ্জন করা যায় না তাহাকেই লজ্জন করাইয়াছেন।

২৮-২৯। পঞ্চম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ‘উপচিত’ স্থলে ‘উপকৃত’ করা হইয়াছে। চতুর্থ চরণে ‘সংকল্পস্তে’ স্থলে ‘কল্পস্তেহস্ত’ পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

৩০-৩৩। চার্লস শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ‘সংসক’ স্থানে ‘সংরক্ত’ করায় কেবল যে অসুপ্রাস নষ্ট হইয়াছে তাহা নহে অর্থেরও কিছু পার্থক্য হইয়াছে। তৃতীয় চরণে ‘নিহাদ’ স্থলে ‘নিহাদি’ এবং ‘কন্দরেয়’ স্থলে ‘কন্দরাহ’ এবং চতুর্থ চরণে ‘সমগ্র’ স্থলে ‘সমস্তঃ’ এই পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

৩৪। সাতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে ‘অহসরেঃ’ পাঠ ছিল, এবোধ বাবু সেখানে অভিসরেঃ পাঠ দিয়াছেন। অতএব মেঘের বাতীটিকে এবোধ বাবুর মতে অভিসার বলা যাইতে পারে।

৩৫। ঊনষাট শ্লোকের তৃতীয় চরণে কালিদাসের লিখিত ‘শোভা’ শব্দ কাটিয়া তৎস্থলে ‘নীলা’ শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩৬-৩৯। বাট শ্লোকের প্রথম চরণে ‘তস্মিন্’ শব্দ কাটিয়া ‘নীলং’, দ্বিতীয় চরণে ‘বিচরেৎ’ কাটিয়া ‘বিহরেৎ’, তৃতীয় চরণে ‘জলৌষঃ’ কাটিয়া ‘জলৌহস্তাঃ’ এবং চতুর্থ চরণে ‘পদত্ব’ স্থানে ‘হৃদপদ’ করা হইয়াছে।

৪০-৪৩। একষষ্টি শ্লোক ছিল,

তত্রাবস্ত্রং বলয়কুলিশোঃপটলোদগীর্ভোয়ঃ

এবোধ বাবু করিয়া দিয়াছেন—

তত্রাবস্ত্রং জনিতসলিলোদগারমস্তঃ প্রবেশান্।

৪৪-৪৮। বাষষ্টি শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ‘কামং’ স্থলে তাহার অর্থ সম্বন্ধাত্মক। এবোধ বাবু করিয়া দিয়াছেন ‘কামাৎ’ বাহার অর্থ কাম-ভাব হইতে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ এইরূপ ছিল,

বুধন কল্পকম কিসলয়াস্তং শুকানিব বাট

নারী চেষ্টেজলল ললিতৈঃ নিবিশেষন্ত নগেন্দ্রম্।

এবোধ বাবুর পরিবর্তন এইরূপ,

বুধন বাটৈঃ সম্ভল পৃথিতৈঃ কল্পবৃক্ষাং শুকানি

হার্যভিঃ কটিক-বিশদং নিবিশেষঃ পর্বতম ত্বম্।

হস্তরাং এক পূর্বক্কেবেই তিনি চার্লসটা পরিবর্তন করিয়াছেন অথচ এই পরিবর্তনের কথা তাহার প্রকাশিত পুস্তকের কোনও স্থানে উল্লেখ করেন নাই।

অতঃপর উত্তরমেঘে তিনি যে-সকল পরিবর্তন না করিয়া অর্থাৎ গোপনভাবে করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিতেছি।

উত্তরমেঘে গোপনে কৃত পরিবর্তন

১-২। দ্বিতীয় শ্লোকের ‘অলকে’ স্থলে ‘অলকং’ এবং ‘আননে’ স্থলে ‘আনন’। এবোধ বাবু নিশ্চয়ই ভাবিয়াছেন যে ‘অগ্নিবিক্র’ শব্দটা বিশেষণ এবং নির্বোধ কালিদাস ভুল করিয়া বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই দুইটা পরিবর্তনে শ্লোকে যে ক্রমভঙ্গ ঘোষ হয় তাহা এবোধ বাবুর বুদ্ধিগম্য হয় নাই। ‘হস্তে, অলকে, আননে, চূড়াপাশে, কর্ণে এবং সীমস্তে এই ছয়টা শব্দেই’ কালিদাস সপ্তমী বিভক্তি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইটায় এবোধ বাবু আধুনিক বিচারালোকের সাহায্যে সপ্তমী বিভক্তির লোপ করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল ক্রমভঙ্গ হইয়াছে তাহা নহে, ভাবাগত ভুলও হইয়াছে।

৩-৭। সপ্তম শ্লোকে ‘উচ্ছৃসিত’ স্থানে ‘উচ্ছৃসন’, ‘বিষাধরাণাং’ স্থলে ‘বক্ষাঙ্গনানাং’, ‘কৌমং’ স্থানে ‘বাসঃ’, ‘বাগাং’ স্থানে ‘কামাৎ’, ‘প্রেরণা’ স্থলে ‘প্রেরণঃ’।

কালিদাস যে ‘উচ্ছৃসিত’ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে আমরা এখন বতরানে অনুভাগান্ত শব্দ ব্যবহার করি কালিদাস সে-সমস্ত স্থলেই ইত ভাগান্ত পদ ব্যবহার করিতেন। ইহার বোধ হয় প্রায় এক শত দৃষ্টান্ত মেঘদূত হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে। কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি—পঙ্কিত, স্বলিত, কুঞ্জিত, প্রভৃতি স্থলে আসরা, পঙ্কন, স্বলন, কুজন প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কবি।

৮-১০। অষ্টম শ্লোকের তৃতীয় চরণ ‘জালমার্গঃ’ কাটিয়া দিয়া ‘বক্ষালৈঃ’ এবং চতুর্থ চরণে ‘নিপুণাঃ’ স্থলে ‘নিপুণং’ করা হইয়াছে।

১১-১৩। নবম শ্লোকে প্রথম পংক্তিতে ‘আলিঙ্গিত’ স্থানে ‘আলিঙ্গন’ এবং তৃতীয় চরণে ‘চন্দ্রপাশৈঃ নিশীথে’ স্থানে ‘চাতিতাচন্দ্র-পাশৈঃ’ করা হইয়াছে।

১৪-১৬। এগার শ্লোকে কালিদাসের ‘পত্রচ্ছেদৈঃ’ কাটিয়া দিয়া এবোধ বাবু ‘কুণ্ডলচ্ছেদৈঃ’ এবং ‘মুক্তাঙ্গালতনপরিমর’ কাটিয়া দিয়া ‘মুক্তাঙ্গালতনপরিমলৈঃ’ করিয়া দিয়াছেন।

১৭। ত্রয়োদশ শ্লোকে ‘বিসলবান্’ স্থলে ‘বিসলয়ৈঃ’ বলা হইয়াছে।

১৮-২১। একবিংশ শ্লোকে ‘হরিণী’ স্থলে ‘হরিণ’ এবং ‘প্রেক্ষণা’ স্থলে ‘প্রেক্ষণীঃ’

২০। ষাটশ শ্লোকে ‘জানাবাঃ’ স্থলে ‘জানীয়াঃ’।

২১-২২। ত্রিবিংশ শ্লোকে ‘প্রিবারা’ স্থলে ‘বহুনাং’ এবং ‘অহসরণ’ স্থানে ‘উপসরণ’।

২৩। পঞ্চবিংশ শ্লোকে ‘তত্রীমাত্রাঃ’ স্থলে ‘তত্রীবাত্রাঃ’।

২৪-২৬। বিহারদিবস স্থলে ‘অন্নদিবস’, ‘স্থাপিত’ স্থানে ‘প্রস্তুত’ এবং ‘অসঙ্গম’ স্থলে ‘সংযোগ’।

২৭-২৯। সপ্তবিংশ শ্লোকে ‘গীত্রেয়ঃ’ স্থলে ‘ধেমরেৎ’, ‘অলং’ স্থলে ‘অতঃ’ এবং ‘সৌষ’ স্থলে ‘আসন্ন’।

৩০। ঊনত্রিশ শ্লোকে ‘ছাদবস্ত্রাঃ’ স্থলে ‘ছাদবস্ত্রাঃ’—এটি ছাপাখ ভুলও হইতে পারে

৩১-৩২। ত্রিশ শ্লোকে ‘অপিতবেৎ’ স্থলে ‘উপনমেৎ’।

৩৩। একত্রিশ শ্লোকে ‘উষেষ্ঠনীরা’ স্থলে ‘উষোচনীরা’।

৩৪। বত্রিশ শ্লোকে ‘পেশল’ স্থলে ‘পেশলঃ’।

৩৫-৩৬। চৌত্রিশ শ্লোকে ‘কোভাচল’ স্থলে ‘কোভাকুল’।

৩৭-৩৮। ছত্রিশ শ্লোকে ‘বদিনা’ স্থানে দরিতা, ‘হৃদা’ স্থানে বদি।

৩৯-৪১। সাঁইরিশ শ্লোকে বিদ্বাংগর্ভ স্থলে বিদ্বাংগর্ভে, ত্তিমিত স্থলে নিহিত, ধীরং স্থলে ধীরঃ।

৪২-৪৪। আটত্রিশ শ্লোকে সন্দেশৈঃ স্থলে সন্দেশাং, হ্রদয স্থলে মনসি, নিহিতৈঃ স্থলে নিহিতাং। এই শ্লোকের পাঠ-পরিবর্তনটা মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কালিদাসের পাঠ্যপেক্ষা কিছুতেই উত্তম নহে।

৪৫। চম্পিশ শ্লোকে অস্বনঃ স্থলে আস্বনা।

৪৬। একচম্পিশ শ্লোকে প্রতনু স্থলে তদুচ। এই চ এখানে মোটেই হইতে পারে না, কেননা তাহাতে ভাবাধ এবং ব্যাকরণে দোষ হয়।

৪৭। বিবামিশ শ্লোকে অদৃষ্ট স্থলে অগমা।

৪৮। তেতামিশ শ্লোকে চণ্ডি স্থলে ভীক।

বন্ধ স্বীয় প্রণব কুপিতাং পত্নীর কথা ভাবিতেছিলেন তাহা পরবর্তী শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়। সেইজন্য চণ্ডি বলিয়া সোধোন উপবৃত্তই হইয়াছে। কিন্তু প্রবোধ বাবু ঔৎসুক্য বশতঃ সে কথা ভাবিবার অবকাশ পান নাই।

৪৯। ছেচমিশ শ্লোকে পূর্বং স্থলে পূর্ব।

৫০। আটত্রিশ শ্লোকে নিভবাং স্থলে হৃতরাং।

৫১। উনপঞ্চাশ শ্লোকে শেষাৎ মাসান্ স্থলে মাসানস্তান্।

৫২। একান শ্লোকে ধ্বসিনঃ স্থলে হ্রাসিনঃ।

৫৩-৫৪। বাহান্ন শ্লোকে বিরহাং স্থলে বিরহ, উগ্রশোকাঃ

স্থলে উগ্রশোকাঃ। তুলনীয়—ছিল কটিন, শুকমহাশয় কেটে করিলন শুকটিন।

উপসংহার

সুতরাং উত্তরসমে কালিদাস যে চুরান্নটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন প্রবোধ বাবু তাহার চুরান্ন স্থানে ভাবা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। ইহা সাধারণ বাহ্যিক নহে। পূর্বসমেও প্রবোধ বাবু চুরান্ন স্থানের ভাবা গোপনভাবে পরিবর্তন করিয়াছেন। এতদ্বিল্ল উভয় মেঘে প্রকাশ্য ভাবে তিনি সাতটা পরিবর্তন করিয়াছেন, সুতরাং প্রবোধ বাবু কৃত পরিবর্তনের সংখ্যা এক শত পনের। আরও দুই-চারিটা পরিবর্তন হয়ত আমার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। এতগুলি পরিবর্তন করিয়া বই ছাপাইয়াও প্রবোধ বাবুর তৃপ্তি হয় নাই। কেননা তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে “সম্পূর্ণরূপে পাঠ সংস্কার করিয়া বাঙলা দেশে মেঘদূতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন এখনও রহিল।”

ইহাতে বোধ হয় যে প্রবোধবাবু কালিদাসকে নিতান্ত গর্ভিত ছাত্র ভাবিয়া তাহার রচনা কাটরা ছুটিয়া দিয়াছেন। কালিদাসকে যখন প্রবোধ বাবু এমন নির্বোধ গর্ভিতই মনে করেন, তখন কষ্ট করিয়া তাহার রচনা প্রবোধ বাবুর প্রকাশ করাই একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি করিলেনই তাহা হইলে মোটে সাতটা পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া অবশিষ্ট এক শত আটটা পরিবর্তনের কথা গোপন করিলেন কেন?

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম পরিচ্ছেদ

১

দেখতে দেখতে এখানে ছ-সাত মাস হয়ে গেল। এখানে সময় কাটে কোথা দিয়ে বুঝতে পারি নে। সকালে আখড়ার কাজ করি, বিকেলে গোটাকতক ছেলে নিয়ে ছোট একটা পাঠশালা করি, তাতে যা পাই উরু বাবাজীব হাতে তুলে দিই। এক দিন মালতী আমায় বললে—ছেলে পড়িয়ে যা পান, তা আপনি উরু-জ্যাঠার হাতে দেন কেন? থাকা-খাওয়ার দরুন টাকা নেওয়া ত এখানে নিয়ম নেই, ও-টাকা আপনি নিজের বেধে দেবেন, আপনাবও ত নিজের টাকার দরকার আছে। আমি বললাম—তা কি ক’রে হয় মালতী, আমি এমনি খেতে পারি নে। আর আমি ত খাওয়া থাকা বলে টাকা দিই নে, বিগ্রহের সেবার জন্তে দিই। এতে দোষ কি?

সেদিন মালতী আর কিছু বললে না। দিন-চারেক পরে আবার এক দিন ওই কথাই তুললে। টাকা আমি কেন দিই? আখড়া ত হোটেলখানা নয় যে এখানে টাকা দিবে খেতে হবে? ওতে তার মনে বাধে। তা ছাড়া আমার ত টাকার দরকার আছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি, টাকা না-দিতে দিলে আমার এখানে থাকা হবে না। চলে যেতে হবে। সেদিন থেকে মালতী এ-নিরে আর কিছু বলে নি।

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলো অল্পত কাটে। দীঘি পাড়ে, রাঙামাটির উঁচু বাঁধে এ-সময়ে একবকর ফুল ফোটে, ছায়া পড়ে এল মাঝে মাঝে একা গিয়ে বসি। বাগদীদেব মেয়েরা হাঁটুপর্যন্ত কাপড় তুলে মাছ ধরে, আখড়ার গোয়াল থেকে সাঁজালের ধোঁয়া ঘুবে ঘুরে ওড়ে—তালের দীর্ঘ সারির ফাঁক দিয়ে এই সন্ধ্যার কতদূর দেখতে পাই—মাদার দোকান,

দাদাব বাতাসাব কাবখান, সীতার ষণ্ডর-বাড়ি, হুয়ারাবত কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিমটাদের বৌ শৈলদি।...

মালতীর স্বভাব কি মধুর! কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায়—এক দিন উচু কথা শুনি নি ওর মুখে—করও ওপব রাগ দেখি নি—বাপের মেয়ে বটে!

আখড়ায় ছোট একটা অখখ-চারি আছে, উদ্ধব দাস রোজ স্নান ক'বে এসে গাছটা প্রদক্ষিণ কবে, গাছটাতে জল দেয়। এ তাব রোজ করাই চাই। এক দিন মালতীকে ডেকে বলি—তোমাব উদ্ধব-জ্যাঠা পাগল নাকি? ও-গাছটার চারি পাশে ঘোবাব মানে কি? মালতী বললে—কেন ঘুববে না; সবাই ত আর আপনাব মত নাস্তিক না। অশদগাছ নারায়ণ—ওর সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়—জানেন কিছু? আমি বললুম—তাহ'লে তুমিও সেবাটা হুঙ্ক ক'রে পুণি কিছু ক'রে নাও না সময় থাকতে? মালতী শাসনের সুবে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা থাক। আপনি ও-রকম পরের জিনিষ নিয়ে টটকিরী দেন কেন? ওদের ওই ভাল লাগে, কবে। আপনার ভাল লাগে না, করবেন না। তা নয়, সাবাদিন কেবল এর খুঁৎ ওর খুঁৎ—ছি, আপনার এ-স্বভাব সাববে কবে?

বললাম—তোমার মত উপদেশ দেওয়ার মানুষের দেখা পেতাম যদি তাহ'লে এত দিন কি আর স্বভাব সারে না? তা সবই অদৃষ্ট!

কথা শেষ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেই মালতী বাগ ক'বে আমার সামনে থেকে উঠে গেল।

বিকলে কিন্তু ওকে আমার কাছেই আসতে হ'ল আবার। নিকটে নকাশিপাড়া, গাঁয়ে একটা বাজার দল ছিল, তাদেব অধিকারী এসে উদ্ধব দাসকে বলে—বাবাজী, তিন মাস ব'সে আছি, বায়না-পশুর একদম বন্ধ। দল ত আর চলে না। কালুনা থেকে ভাল বাজিয়ে এনেছিলাম—চোলকে যখন হাত দেবে, আঃ যেন মেঘ ডাকচে, বাবাজী। তা আপনাদেব আখড়ায় এক দিন শ্রামহুন্দরজীউকে শুনিয়ে দিই। কিছু খরচ দিতে হবে না, তেল তামাক আর কিছু জলখাবার—

—জলখাবার-টাবাব হবে না পাল-মশায়। তা ছাড়া আসর খাটানো ওসব কে করে? এখন থাক। মালতী আমায়

এসে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলুন, বাতে বাজাটা হয়। আমি জলখাবার দেব, জ্যাঠাকে সেজ্ঞতে ভাবতে হবে না। আপনাকে কিন্তু আসরের ভার নিতে হবে। আমি বললাম—আমার ঘারা ওসব হবে না। আমি পাবব না।

মালতী মিনতির সুবে বললে—লক্ষ্মীটি, নিতেই হবে। বাজা বে আমি কতকাল শুনি নি! দেশের দলটা উৎসাহ না-পেলে নষ্ট হয়ে বাবে। আপনি আসরের ভাব নিলেই আমি ওদের ব'লে পাঠাই।

—না, আমি পারবো না, সোজা কথা। তুমি ওবেলা ও-রকম রাগ ক'রে চলে গেলে কেন?

—তাই রাগ হয়েছে বুঝি? কথায় কথায় বাগ।

—বাগ জিনিষটা তোমাব একচেটে যে! আর কাবও কি বাগ হ'তে আছে?

—আচ্ছা, আমি আর কখনও ও-রকম কবব না। আপনি বলুন ওদেব—কেমন ত?

বাজা হয়ে গেল—মালতী ওদের ছানা খাওয়ারে পেট ভ'বে। বললে—বাবা রাত্তা থেকে লোক ডেকে এনে খাওয়ারে আব আমবা মুখ হুটে বারা খেতে চাইছে, তাদেব খাওয়ার না? দলে ছোট ছোট ছেলেরা আছে, তাবা রাত জেগে চেঁচিয়ে শুধু-মুখে ফিরে বাবে, এ কখনও হয়?

মালতী অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েছে। সম্ব পলেই বিকলে আমার কাছে বই নিয়ে আসে, হু-জনে পুকুর-পাড়ে গাছেব ছায়ায় গিয়ে বসি। আমাব হয়েছে কি, সব সময় ওকে পেতে ইচ্ছে কবে, নানা কথাবার্তায় ছল-ছুতোয় ওকে বেশীক্ষণ কাছে বাধতে ইচ্ছে কবে। কিন্তু বিকলেব দিকে ছাড়া সারাদিন ওব দেখা পাওয়া ভাব। ওর কাছে বুদ্ধের কথা বলি, সেন্ট ফ্রান্সিসেব কথা বলি। ও আমাকে খ্রীষ্টতত্ত্বের কথা, ত্রীকক্ষের কথা শোনায়।

এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার কবা গেল মালতী বই লেখে। কি কাজে পুকুরের ঘাটে গিয়েছি হুগুবের পবে, দেখি বাধানো-সিঁড়ি উপব জামগাছেব ছায়ায় একখানা খাতা প'ড়ে আছে—পাশেই দোয়ান্ত কলম—খাতাখানা উন্টে দেখি মালতীব হাতেব লেখা। এপানে ব'সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে গিয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল—না-দেখে

পারলাম না, প্রথমেই ওর গোটা গোটা মুক্তার হাঁদে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা :—

অনর্পিত চরাং চিত্রাং ককশায়বতীর্ণঃ কলৌ -

সদা হৃদয়কলশে সুরতু বঃ শটীনলনঃ

তার পরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-কর্ণি, বৃন্দাবনের প্রকৃতি বর্ণনা মাঝে মাঝে। খাতাব ওপরে লেখা আছে—
“পাষাণদলন গ্রন্থের অন্তর্করণে লিখিত।”

দেখছি, এমন সময় মালতী কোথা থেকে ফিরে এসে আমার হাতে খাতা দেখে মহাব্যস্ত হয়ে বললে—ও কি ? ও দেখছেন কেন ? দিন আমার খাতা—

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম—এইখানে পড়ে ছিল, তাই দেখছিলাম কার খাতা—

—না দিন ও দেখবার যো নাই।

—যখন দেখে কৈলেছি তখন তার চরা নেই। কে জানতো তুমি কবি ! এ শ্লোকটা কিসের ? মালতী সলজ্জ হুরে বললে—চৈতন্যচবিতামৃতের। কেন দেখছেন দিন—

—শোনো মালতী—লিখছি এ বেশ ভাল কথাই। কিন্তু তোমার এ লেখা সেকলে ধরণের। পাষাণদলনের অন্তর্করণের বই লিখলে একালে কে পড়বে ? তুমি আজকালকার কবিতাব বই কিছু পড় নি বোধ হয় ?

মালতী আগ্রহের হুরে বললে—কোথায় পাওয়া যায়, আমায় দেবেন আনিরে ? আমি ত জানি নে আজকালকার কবিতার কি বই আছে—আনিবে দেবেন ? আমি দাম দেবো।

দাম দেওয়ার কথা বলাতে আমার মনে যা লাগল। মালতী কাছে থেকেও বেন দূরে। বড় অদ্ভুত ধরণের মেয়ে, ও একালেবও নয়, সেকালেরও নয়। এই পাড়ারগায়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোন আধুনিকতার চেউ এসে পৌছয় নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন, যে, আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরি হয় না। এমন সুলভ চা করে, শ্রীরামপুরে শৈলদিবা অমন চা করতে পারত না। নিজে মাছমাংস খায় না, কিন্তু আমার জন্তে এক দিন মাংস রাঁধলে বাগ্নাবরের উল্লুনেই। আমায় প্রায়ই বলে—আপনি যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবেন। আপনি ত আর বৈফব হন নি যে

মাছমাংস থাকেন না। আমায় বলবেন, আমি রেঁধে দেব এখন।

২

মালতী উজ্জ্বল শ্রামাঙ্গী বটে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। ওর টান-ক'রে বাধা চুল ও ছেলেমাংসের মত মুখশ্রীর একটা নবীন, সতেজ হুকুমার লাভণ্য—বিশেষ ক'রে যখন মুখে ওর কিছু কিছু দাম দেখা দেয়, কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ও মুখ উচু ক'রে হাসে—তখন সে বিজয়িনী, তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে হৃন্দরী মৎস্তনারীব মত মুগ্ধ ক'রে ক্লেব কাছেব অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অর্ধে জলে নিয়ে বেতে পারে। কিন্তু ওর সেন্সপ যখন-তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে দৈবাৎ হয়ত একবার চোখে পড়তে পারে। আমি একবার মাত্র দেখেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পবে সাবানিন ধরবোজ ও গুম্বটের পরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ জুড়ে ফেললে এবং হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। আখড়ার বাইরের মাঠে কাঠ, ধান, ছোলা, তুলো সব রোদে দেওয়া ছিল। কেউ তোলে নি, আখড়ার আবার ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টোতে লোকজন কেউ নাই। আমিও ছিলাম না। মাঠের মধ্যে বেড়াচ্ছিলাম—ঝড় উঠতেই ছুটে আখড়ায় এসে দেখি মালতী একা মহাব্যস্ত অবস্থায় জিনিষপত্র তুলছে। আমায় দেখে বললে—দৌড়ে আলোটা জ্বলে আহুন, অন্ধকারে কিছু কি ছাই টেব পাচ্ছি—সব উড়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি...

ওকে দেখলাম নতুন চোখে। কোমবে কাপড় জড়িয়ে সে একবার এখানে একবার ওখানে বিদ্র্যেভেব বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল—অদ্ভুত কাজ করবার শক্তি—দেখতে দেখতে সেই বোর অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টিব মধ্যে ক্ষিপ্তনিপুণতার সঙ্গে অর্ধেক জিনিষ তুলে দাওয়ার নিয়ে এসে ফেললে। এদিকে আমি অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি নে দেখে ছুটে এসে বললে—কোথায় দেশলাই রেখেছিলেন মনে আছে ? কোথা থেকে হাতড়ে দেশলাই বার করলে—তার পর সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে আলো জালা—সে এক কাণ্ড। অন্ধকারে জ্বজনে মিলে অনেক চেষ্টার পবে শেষে ওই ক্ষিপ্ততা ও কৌশলে আলো জ্বলল।

আলো জ্বলে আমার হাতে দেশলাই দিয়ে ভাঁজার মুখের অসহায় ভাঁজীর দিকে চেয়ে গলা কেমন এক ধরণে উচু ক'রে হেসে উঠল—ছুটোছুটির কলে কানের পাশের চুল আলুথালু হয়ে মুখের দু-পাশে পড়েছে, ফুল প্রমোজল গওদেশে কিছু বিদ্যুৎ ঘাম। চোখে উজ্জল কৌতুকের হাসি—হৃদয়ে মিলে আলো ধরাচ্ছি, ওর মুখ আমার মুখের অত্যন্ত কাছে—সেই মুহূর্তে আমি ওর দিকে চাইলাম—আমার মনে হ'ল মালতীকে এতদিন ঠিক দেখি নি, আমি ওকে নতুন রূপে দেখলাম, ওর বিজয়িনী নারী রূপে। মনে হ'ল মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্ণ সুন্দরী।—কিন্তু বেশীক্ষণ দেখার অবকাশ পেলাম না ওর সেরূপ, আলো জ্বলেই ও আবার ছুটল এবং আমার আনাড়ি-সাহায্যের অপেক্ষা না ক'রেই বাকী জিনিষ আধ-ভেজা, আধ-শুকনো অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দাঁড়ায় এনে জড়ো করলে।...

এক দিন পুকুরে সকালের দিকে ঘড়া বৃকে দিবে সাঁতার দিতে দিতে মালতী গিয়ে পড়েছে গভীর জলে। সেই সময় আমিও জলে নেমেছি। আমি জানতাম না যে ও এসময়ে নাইতে এসেছে, কারণ সাধারণতঃ ও জান করে অনেক বেলায়, আখড়ার কাজকর্ম মিটিয়ে। নাইতে নাইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মালতী নেই, তার ঘড়াও নেই। আমি প্রথমে ভাবলাম মালতী মাঝপুকুরে ইচ্ছে ক'রে ডুব দিয়েছে বোধ হয়। বিশেষতঃ সে সাঁতাব জানে—কিন্তু খানিক পরে যখন ও উঠল না, তখন আমার ভয় হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি সেখানটাতে সাঁতার দিয়ে গেলাম, হাতড়ে দেখি মালতী নেই, ডুব দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ওকে পেলাম—চুলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে কেমন বেকায়দায়, অতিকষ্টে তাকে ভাসিয়ে নিজে ডুবে জল খেতে খেতে ডাঙার কাছে নিয়ে এলাম। মালতী তখন অধঃ-অচৈতন্য, আমাব ডাক শুনে আখড়া থেকে সবাই ছুটে এল—মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ওর শরীর সুস্থ হ'ল। উদ্ধব বাবাজী বকলে, আমি বকলাম, সবাই বকলে।

এই দিনটা থেকে ওর ওপব আমার একটা কি যে মায়া পড়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলই মনে হ'তে লাগল ও এখানে নিঃসহায়, একেবারে একা। ও সবার জন্তে

থেটে মরে। ওর বাপের ধানের জমির উপস্থিত আখড়া-সুস্থ বৈষ্ণব বাবাজীরা ভোগ করছে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই? ও সকলের ময়লা জামা-কাপড় কেচে বেড়াবে, ভাত রেখে থাকবে—সর্বস্বকমে সেবা কববে, ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ওকে মুখের নিষ্টি তোষামোদে নাচিবে নিজেদের স্বার্থ বোল আনার ওপব সতের আনা বজায় রাখছে, কিন্তু ওর সুখ-দুঃখ কেউ দেখছে? এই যে আজ পুকুরের বাটে ডুবে যবে বাচ্ছিল অব একটু হ'লে আমি যদি না থাকতাম!

ভগবান আমাকে এ কিসেব মধ্যে এনে ফেললেন, এ কি জ্বালে দিন-দিন জড়িয়ে পড়ছি আমি। এদের আখড়াতে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁকে এরা মানুষের মত সেবা করে। সকালবেলা তাঁকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরের ভোগ ত আছেই। ভোগের পর দুপুরে বিগ্রহকে খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৈকালে বৈকালিক ভোগ দেওয়া হয়—কল, মিষ্টান্ন। বাজ্রে আবাব খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেয়—শীতের রাতে বিগ্রহের গায়ে লেপ, আশপাশে বালিশ। উদ্ধব দাস বাবাজী সেদিন লাল শালু কাপড়ের ভাল লেপ ক'রে এনেচে বিগ্রহের ব্যবহারের জন্তে—আগের লেপটা অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব পুতুল-খেলা দেখলে আমার হানি পায়, সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বললাম—তোমাদের এতদিন হুঁস ছিল না মালতী? ছেঁড়া লেপটা এই শীতে কি ব'লে দিতে ঠাকুরকে? যদি অসুস্থ-বিসুস্থ হ'ত, এই তেপান্তরের মাঠে না ডাক্তার, না কবিরাজ, দেখত কে তখন? ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড তোমাদের?

মালতী রাগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ও এ-সব কথা আর কাউকে ব'লে দেয় না ভাগ্যে, নইলে উদ্ধব দাস আখড়া থেকে আমার বিদেয় ক'রে দিতে এক বেলাও দেরি করত না। অনেক কথা আমি বলি ওদের আখড়া সম্বন্ধে, উদ্ধব দাস সম্বন্ধে—বা অপরের কানে উঠলে আমার অপমানিত হয়ে বিদেয় হ'তে হ'ত, কিন্তু মালতী কোন কথা প্রকাশ করে নি কোনদিন। আজকাল মালতী আমাব দিকে একটু টেনে চলে ব'লে আখড়ার অনেকের কাছে সেটা চক্ষুশুলেব ব্যাপার হয়ে উঠেছে—আমি তা বুঝি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমার পাঠশালা গেল উঠে। আর আমার এখানে শুধুহাতে থাকা অসম্ভব। মালতীকে এক দিন বললাম—শোন, আমি চলে যাচ্ছি মালতী—

সে অবাক হয়ে বললে—কেন চলে যাবেন?

—কতদিন এসেছি ভাবো ত এখানে? প্রায় দশ মাস হ'ল—

মালতী চুপ ক'রে থেকে বললে—যুরে আবার আসবেন কবে?

—ভগবান জ্ঞানেন। নাও আসতে পারি।

মালতীর মুখে স্বাভাবিক হাসি-হাসি ভাবটা যেন হঠাৎ নিবে গেল। বললে—কেন আসবেন না? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই? ওব মুখ দেখে আমার আবার মনে হ'ল ওব কেউ নেই, এখানে ও একেবারে একা। ওকে বুঝবার মানব এই গ্রাম্য অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে কে আছে? আমার কাছেই ওর যা-কিছু অভিমান আবদ্ধ থাকে—ওর মধ্যে যে লীলাময়ী কিশোরী আছে, সে তার নারীত্বের দর্প, গর্ব ও অভিমান প্রকাশ ক'রে মুখ পায় একমাত্র আমার কাছে—আমি তা জানি। তা ছাড়া, ও এখনও বালিকা, ওব ওপর আমার মনে কি যে একটা অনুকম্পা জাগে...ওকে সকল দুঃখ, বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখি ইচ্ছা হয়। শ্রাবণ মাসে নীল মেঘের রাশি দ্বার-বাসিনী চারি ধাবের দিগন্তবিস্তৃত তালীবনশোভী মাঠের ওপর দিবে উড়ে যায় রোঙ্গ বোঙ্গ...আমি দীর্ঘি ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দেখে দেখে মনে কত কি অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ছোট্ট কোন কলহনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘবে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতরো...আমরা দু-জনে এমনি সব বর্ষা-মেহুর শ্রাবণ-দিনে ব'সে-ব'সে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব, ওকে ব'ধতে দেব না, কাজ কবতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—কত বিশ্বাসের কথা, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, ভগবানের কথা, সাধু-মোহন্তদের কথা, আকাশের তাবাদের কথা—ও আমায় বুঝবে, আমি ওকে বুঝবো। কিন্তু তা হবার নয়। মালতী ওর বাপেব

আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—আমি অনেকবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'বে ওব মনের ইচ্ছা বুঝছি। আমি ওকে চাই একান্ত আমার নিজস্ব-ভাবে—এখানে থাকলে ও দিনে বাতে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওকে সে-ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এই আখড়াই হয়েছে ওর আব আমার মধ্যে ব্যবধান। আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আমিও এখানে থাকতে পারব না চিরকাল। মালতীকে ভালবাসি, কিন্তু ওকে বিবাহ ক'বে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল কি ক'রে কাটাবো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সঙ্কে? আমি ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

এক দিনের একটা ব্যাপারে মালতীকে আবও ভাল ক'বে চিনলুম। দ্বারবাসিনী গ্রামের বৃদ্ধ শঙ্কু বাঁড়ুয়ে চার-পাঁচ দিনের জরে মারা গেলেন। তিনি এখানকার সমাজে একববে ছিলেন—এটা আমি আগেই জানতাম। তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা নাকি উঠেছিল—তাই থেকেই গ্রামে শঙ্কু বাঁড়ুয়ে একববে হন। শঙ্কু বাঁড়ুয়ে কোথাও যেতেন না, কাবও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর হাতেও দু-পয়সা ছিল—সবাই বলত টাকাব গুমর।

বেলা পাঁচটার সময় মালতী এসে বললে—শুনছেন ব্যাপার? শঙ্কু বাঁড়ুয়েকে এখনও বেব কবা হয় নি—আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। সেই দুপুর থেকে এক জুঃ লোকও ওদের বাড়ির উঠোন মাড়ায় নি। মড়া-কোলে মেয়েটা দুপুর থেকে ব'সে আছে—ওর মা ত বাতে পঙ্কু, উঠতে পারে না। আপনি আহুন, দু-জনে মড়া ত দোতলা থেকে নামাই—তার পব উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলেছি আখড়ার লোকজন নিজে আমাদের সঙ্গে যাবে—ব্রাহ্মণেব মড়া অপর জাতে ছুলে ওদের মনে কষ্ট হবে—তাই চলুন আপনি আর আমি আগে নামাই—তার পর আমাদেরই নিয়ে বেতে হবে অজ্ঞেবর ধাবে—পাবেন ত? তিন জনে ধরাধরি ক'রে সেই ঘোরানো ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মড়া নামানো—ওঃ সে এক কাণ্ড আব কি! মালতী আর শঙ্কু বাঁড়ুয়ের মেয়ে নীরদা এক দিকে—আমি অত্র দিকে। নীরদা দেখলুম খুব শক্ত মেয়ে—বয়সে মালতীর চেয়ে বড়—বছর বাইশ হবে ওর বয়েস, মালতীর মত মেয়েলী-গড়নের মেয়ে নয়, শক্ত, জোরালো হাত-পা, একটু পুরুষ-ধবণের।

মালতী খুব ছুটোছুটি করতে পারে বটে, কিন্তু ওর গায়ে তেমন শক্তি নেই। নীরদার সাহায্য না পেলে সেদিন শুধু মালতীকে নিয়ে মড়া নামানো সম্ভব হ'ত ব'লে মনে হয় না। শেষপর্যন্ত গায়ের লোক এল এবং তারাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে গেলুম, মেয়েদের যেতে হ'ল না, মালতী রইল নীরদার কাছে। নীরদা আমার বললে—দাদা, শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু আপনাকে সব ভার নিতে হবে। আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না। রুণি ত আছেই, আপনাকে অন্ত কিছু খাটাবো না, ভাঁড়াবের ভাব আপনাকে হাতে নিতে হবে, নইলে এসব পাড়ারগায়েব ব্যাপার আপনি জ্ঞানেন না।

বেশ ষটা ক'রেই শ্রাদ্ধ হ'ল। মালতী বুক দিয়ে পড়ে কি খাটুনিটাই খাটুলে! মালতী তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। ঘুম নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বসা নেই—কিসে কাজ সর্দারহুন্সর হবে, কেউ নিষেধ করবে না ওদের, কোন জিনিষ অপচয় না হয় ওদের, সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। পরের কাজে এমনি ক'রে নিজেকে ঢেলে দিতে তুমি পার তোমার বাবার বক্তৃতোমাব গায়ে বইছে বলে।

নীরদাকেও চিনলুম সেদিন।

বাত দশটা। বাগাববের দবজাব কাছে শুল্ল ডালের গামলা, লুচির থামা, ডালনার বালুতির মধ্যে নীরদা দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন কি খাটুনি খেটেছে সে! চরুকীর পাক বুবেছে মালতীর সঙ্গে সমানে সেই সকাল থেকে—এর মধ্যে আবার পীড়িতা মায়ের দেখাশুনা করেছে ওপরে গিয়ে। খামে ও শ্রমে মুখ রাজা, (নীরদার রং বেশ ফর্সা) চুল আলুথালু হয়ে মুখের পাশে কপালে পড়েছে।

আমি বাইরের ক-জন লোককে খাওয়ার ব'লে কি আছে না-আছে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নীরদা বললে—দাদা, কিছু নেই আর। ক-জন লোক? আচ্ছা দাঁড়ান, ময়দা মাখু'ছি, দিচ্ছি ভেজে।

আমি বললুম—আর তুমি আগুনের তাতে যেও না নীরদা। তোমার চেহারা যা হয়েছে! আচ্ছা দাঁড়াও—মালতীকে বলি একটু মিছরির সরবৎ তোমায় বরং দিয়ে—

নীরদা বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান দাদা। রুণি কতবার খাওয়াতে এসেছিল—সে কি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে?

তার পর হেসে বললে—আজ যে একাদশী, দাদা।

আমার চোখে জল এল। আর কিছু বললাম না। মেয়ে-মানুষের মত স্নেহ করতে পারে কোন জাত? অনেক শিখলাম এদের কাছে এই ক-মাসে।

মাকে দেখেছি, বৌদিদিকে দেখেছি, সীতাকে দেখেছি, শৈলদিকে দেখেছি, এদেরও দেখলাম। অথচ এই নীরদাকে ভেবেছিলুম অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, ওর কথাবার্তায় রাত দেশের টান বড় বেশী ব'লে।

মালতী আখড়ার ফিরে এসে আমার বললে—অনেক-গুলো সন্দেশ এনেছি, থান—নীরদা-দিদি জোর ক'বে দিলে। ভাল সন্দেশ, ছাব্বাসিনীতে এ-বকম করতে পারে না, শিউড়ি থেকে আন'নো।

তার পর কেমন এক ধবণের ভক্তি ক'রে হাসতে হাসতে বললে—বহন, ঠাই ক'রে দিই আপনাকে। ওবেলার লুচি আছে, দই আছে,—নীবদা-দিদি এক বাশ খাবার দিয়েছে বেঁধে—

ওকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় এই-সব সময়ে!

বরে কেউ নেই, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে ব'সে ও আমার খাওয়ালে—খেতে খেতে একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি অপূর্ণ স্নেহ-সমতামাখা দৃষ্টি ওর চোখে! মালতীর কাছে এত ঘনিষ্ঠ বস্তু এই কিন্তু প্রথম। বললে—আমি কি আর দেখি নি যে আজ সারাদিন আপনি শুধু খেটেছেন আব পরিবেশন করেছেন, খাওয়া যা হয়েছিল ওবেলা আপনাব, তার আমি সন্ধান রাখি নি ভেবেছেন? থান,—না—ও লুচি ক-খান। খেতেই হবে।

খাবো কি, লুচি গলায় আটকে যেতে লাগল—সে কি অপূর্ণ উল্লাস, আমার সারাদেহে কিসেব বেন শিহরণ। আজ সারাদিনের ভূতগত খাটুনিব মধ্যেও মালতী দৃষ্টি রেখেছিল আমি কি খেয়েছি না-খেয়েছি তার ওপর।

২

ঘন বর্ষা নামল। সারা মাঠ আঁধার ক'বে মেঘ ঝুপসি হয়ে উপুড় হয়ে আছে। এই-সব দিনে মালতীকে সর্দার পেতে ইচ্ছা করে—ইচ্ছে করে বরের কোণে বসে ওর সঙ্গে সারা দিনম'ন বাজে বকি। কিন্তু ও আসে না, এমনই সব বর্ষার দিনে আখড়ার বত সব খুচুরো কাজে ও ব্যস্ত থাকে।

হু-একবার বখন দেখা হয় তখন বলি—মালতী, এস না কেন ?

মালতী বলে সে আসবে। তাব পর এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা কেটে যায়, ও আসে না। আমার রাগ হয়, অভিমান হয়। ও যদি আমার জন্তে একটুও ভাবত, তাহ'লে কি আব না-এসে পাবত। ওব কাছে কাজই বড়, আমি কেউ নই। কিন্তু হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মালতী এসে পড়ে। প্রায়ই আসে বিকেলের দিকে এমন কি সন্ধ্যার সময়। চুলাটি টান-টান ক'বে বেঁধে, পান খেয়ে ফুল ওষ্ঠাধর রাঙা ক'বে হাসিমুখে আমার দাওয়ার সামনে এসে বলে—কি করছেন ?

—এস মালতী, সারাদিন দেখি নি যে ?

—আপনার কেবল—সাবাদিন দেখি নি, আব এই তখন ডাকলুম এলে না কেন, আব কেন আস না—এই-সব বাস্তব কথা। আসি কখন ? দেখছেন ত। খেয়ে উঠেছি এই ত ঘণ্টাখানেক আগে। কাজ ছিল।

—কি কাজ ছিল আমি আব জানি নে মালতী ? উদ্ধব-বাবাজীব কোণের ঘবে মেজেতে চোটেই পেতে ব'সে তোমাব সেই কবিতাব বই লিখছিলে—আমি দেখি নি বুঝি ?

—বেশ দেখেছেন ত দেখেছেন। আহ্নন বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখিয়ে আসি—একা ভয় করে।

বাস্তবিকই আমি ওকে একমনে বই লিখতে দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখি। মালতী ঠিক পাগল, আচ্ছা, পাশওদলনের অনুকরণে লেখা ওর বই কে পড়বে বে রাত নেই দিন নেই বই লিখছে ! ওর মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওই এক খেয়াল ওর। মালতীব সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। মালতীব এই এক গুণ, ও যখন মেশে, তখন মেশে নিঃসঙ্কোচে, উদ্বাব ভাবে। সে-সম্বন্ধে কোনো বাধা বা সংক্কাব ও মানে না। কেন এই সন্ধ্যাতে আমার সঙ্গে একা বাবে পুকুরপাড়ের বিষ্ণুমন্দিরে—এ-সব সঙ্কোচ নেই ওর। মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে হ'ল মালতীকে পেয়ে আমার এই বর্ধাসন্ধ্যাটি সার্থক হ'ল। ওকে ছেড়ে আর কিছু চাই নে। কাঞ্চনফুলতলায় গিয়ে বললাম—সে গানট' গাও না, সেদিন গাইছিলে গুণগুণ করে !

মালতী ছেলেমানুষের মত ভক্তিতে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠা যে শুনতে পাবেন ?

—তা পাবেন, পাবেন।

—তবে আহ্নন পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।

মালতীব মুখে গানটা বেশ লাগে—হু-তিন বাব শুনলাম।

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা ফুরে মোর রাধা-প্যারী
আমার বুকের কোমল ছায়ায় লুকিয়ে খেলে বনবিহারী

গান শেষ হ'লে বললাম—শোন একটা কথা বলি মালতী, তুমি এস না কেন ? তোমাকে না-দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ সাবাদিন বসেছিলুম ঘবেব দাওয়ার, এমন বর্ধা গেল—তুমি চৌষটিবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাও, একবার ত এলে পারতে ? তোমার সে-সব নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এই যে তোমাকে পেয়েছি, আব আমার ঘেন সব ভুল হয়ে গিয়েছে—সত্যি বলছি মালতী।

মালতী মুখ নীচু ক'রে হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে বইল।

আমি বললাম—হাসলে চলবে না মালতী। কথার আমার উত্তর দাও। তুমি কি ভাবো আমি তোমার এখানে পড়ে আছি খেতে পাই নে বলে তাই ? তা নয়।

—কে বলেছে আপনাকে যে না-খেতে পেয়ে এখানে আছেন ? বলেছি আমি আপনাকে নাকি ?

—যাক ওসব বাজ্ঞে কথা। আমার কথার উত্তর দাও।

মালতী আবার ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে। মুখ নীচু ক'রে হাঁটুর কাছে ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসিমুখে হাত দিয়ে সানের ওপর কি আঁকজোক কাটতে লাগল, কখনই ওর কাছে আমার কথার সোজা জবাব পেলাম না।

এক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঁধেব ওপব ব'সে আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলুম। আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যে নড়বাব সাধ্য নেই এতটুকু। ও আমার জীবনের সব-কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে—কি উদ্দেশ্যে এই হু-বছর পথে পথে ঘুরেছি সে উদ্দেশ্য এখন হয়ে পড়েছে গোণ। এখন মালতীই সব, মালতীই আমার বিশ্বের কেন্দ্র, ও যখন আসে তখন জীবনে আর কিছু চাইবার থাকে না, ও যেদিন আসে, যেদিন হেসে কথা বলে—আমাব মত সুখী লোক সেদিন জগতে আর কেউ থাকে না, মাঠের ওপব হৃদ্যাস্ত সেদিন নতুন বস্ত্রে রঙীন হয়, বিচালি-বোঝাই গাড়ীগুলো দ্বার-

বাসিনীর হাটের দিকে যায়, তাদের চাকার শব্দও ভাল লাগে, আখডাব বাবাজীবা নিমগাছে উঠে নিমপাতা পাড়ে— সেই বেন এক নতুন দৃশ্য। মালতী যেদিন আসে না, কি ভাল ক'রে কথা বলে না, সরাদিন আমার মনে শান্তি থাকে না, ওরই কথা ভাবি সারাক্ষণ—কতক্ষণে দেখা হবে, কতক্ষণে কথা বলবো। মালতী আমার এমন জালেও জড়িয়ে ফেলেছে।

হয়ত আমি এখান থেকে যেতাম না—হবত শেষ-পর্যন্ত থেকেই যেতে হ'ত—কিন্তু যেদিন মালতী আমার কাছে ব'সে পুকুরবাটে গান গাইলে পবদিনই ছুপুবে পবে উদ্ধব-বাবাজী আমার ডেকে বললে—একটা কথা বলি আপনাকে—কিছু মনে করবেন না। আপনার এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, আমাদের আখড়ার নিয়ম অনুসারে তিন দিন মাত্র এখানে অতিথি-বোষ্টমের বাখবাব কথা। আপনার প্রায় এগারো মাস হ'ল—আমি চুপ ক'রে রইলাম, কারণ ওব মুখ দেখেই আমার মনে হ'ল এটা কথাব ভূমিকা—আসল কথাটা এখনও বলে নি। ঘটলও তাই। একটু ইতস্ততঃ ক'রে উদ্ধব বললে—তাতেও কিছু না—কি জানেন, আপনার ক্লণিব সঙ্গে এই মেলামশাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আপনার কাছে ব'সে পুকুরবাটে বিকেলে গান গেয়েছিল—একথা নিয়ে সবাই—বুঝলেন না, মেবেমানুষের নামে ছর্দাম বটুতে দেরি লাগে না। আমি ওব অভিভাবক—এসব বাতে না হয় আমার দেখা উচিত ব'লেই আপনাকে জানাচ্ছি এ-কথা। ক্লণি-মা সেবকম মেবে নব। আমি সেটা খুবই জানি, কিন্তু লোকে ত—রাগ করবেন না, ভেবে দেখুন। লোকে যদি ওর নামে পাঁচটা কথা ওঠায় বা বলে সেটা আমার উচিত, হতে না-দেওয়া—নয় কি?

আমি বললাম—সেটা আমার অত্যায হয়েছে স্বীকার কবি। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি ত বলেছিলেন, মালতীর যদি ইচ্ছে হয়—ওর বাবাব ওব ওপব আদেশ আছে—

—কিন্তু ওব বাবা কষ্টীধারী বৈষ্ণব ছিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ বটে, বৈষ্ণব নন, তাব ওপব আপনি খুষ্টানী মতব লোক, আপনার সঙ্গে কি ক'রে ওব বিয়ে হ'তে পারে?...

ও বৈষ্ণবের মেয়ে, বৈষ্ণবের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তবে মালতীব এতে কি ইচ্ছে জানুন, সে যদি বলে আমার আপত্তি নেই। ওর বাবা ওরই ওপব সে ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওকে নির্জনে পেলাম। ওকে বললাম—একটা কথা বলব মালতী? তুমি অভয় দেবে?

মালতী কৌতুকেব হুঁরে বললে—উঃ মাগো—যাত্রাব দলের মত কথা শুনে আর বাঁচি নে। কি বলবেন বলুন না?

—তুমি কি চিরকাল এই ভাবে জীবন কাটাবে? না হাসিখুশী না, দরকারী কথা। সব তাতেই হাস কেন—ভেবে দেখ আমি কি বলছি—

—কেন এ জায়গা কি ধারাপ? এমন চমৎকাব মাঠ, দীঘি—আপনি সেদিন কি কবিতাটা বলছিলেন সেই—

মালতী কথা শেষ না-ক'বেই ছেলমানুষী হাসি শুরু করলে। আমি বললাম—না, মালতী লক্ষীটি, ওভাবে কথা উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় চাই। তোমায় বিয়ে ক'রে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। কি বল তুমি?

মালতীব মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল—সে কেমন বিষয়-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে—তাব পরেই তাব মুখে-চোখে ঘনিয়ে এল লজ্জা। ওব এ-ধবণের লজ্জা আমি কখনও দেখি নি। বেশ খানিক ক্ষণ কেটে গেল। মালতীর মুখে উদ্ভব নেই। বললাম—ভেবে উত্তর দিও। এখুনি চাই নে তোমাব উত্তব। তাড়াতাড়ি কিছু না-বলাই ভাল।

মালতী প্রতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ছিল—এইবার মুখ তুলে কিন্তু অস্ত্র দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এ-জায়গা ছেড়ে যেতে হবে কেন?

ছেড়ে যেতে হবে এই জন্তে মালতী যে, আমি ত তোমাকে এখানে আখড়ায় থাকতে দিতে পারব না। আমিও এখানে চিরদিন কাটাতে পাবি নে। মালতীর মুখেব ভাবে আমার মনে হ'ল আমার মুখে এ-কথা বেন ওব পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ও কি ভেবেছে আমিও চিবকাল এই আখড়াতেই থেকে বাব? ওর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার এ-কথায় ও মনে বেদনা পেয়েছে। আমার মন মমতায় ভরে উঠল। আমি কথাটা বতদূর সম্ভব নবম করতে পারা যায় ক'রে বললাম—তুমি এখনও ছেলমানুষ। নিজের সম্বন্ধে বিচাব ক'রে দেখতে পাবার ক্ষমতা এখনও

হয় নি। তুমি একা এখানে কি করবে বল? উদ্ধব-বাবাজীও চিবকাল থাকবেন না। এই মাঠের মধ্যে আখড়ায় চিরজীবন কাটাতে একা একা?

মালতী মুখ নীচু ক'বেই আস্তে আস্তে নবম স্তরে বললে—বাবা মরণকালে এর তার সঁপে দিয়েছিলেন উদ্ধব-জ্যোতীর ওপর নয়, আমারই ওপর। বাবার বিষ্ণুহৃদয়ের আমার শেষ ক'বে তুলতে হবে। উদ্ধব-বাবাজী চিরদিন থাকবেন না বলেই ত আমার এখানে আরও থাকা দরকার। বাবাব ধানের জমি পাঁচ জনে লুটেপুটে থাকে অথচ আখড়াব দোব থেকে অতিথু-বোষ্টম গবির লোকে ফিবে যাবে যেতে না পেয়ে, এ আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না। তাতে কোথাও গিয়ে আমার শাস্তি হবে?

মালতীর মুখে এ-ধরণের গভীর কথা—বিশেষ ক'রে ওব নিজেব জীবন নিয়ে—এই প্রথম শুনলাম। সব জিনিষ নিয়ে ও হালকা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়, এই ওব স্বভাব। ও এ-ধরণের কথা বলতে পাবে তা আমি ভাবি নি। বললাম—মালতী, এটা কি তোমার মনের কথা? জীবনটা এই ক'রে কাটাতে? এতেই শাস্তি পাবে? আমি যে প্রস্তাব করেছি, তাতে তুমি তাহ'লে রাজি নও? কারণ আমি এখানে থাকতে পারব না চিরকাল এটা নিশ্চয়।

শেষ কথাটা বলতে আমার বুক বেদনায় টনটন ক'রে উঠল, তবুও বলতে হ'ল।

মালতী অনেক ক্ষণ বিমুখী হয়ে ব'সে রইল। কাপড়ের একটা আঁচল পাকিয়ে অন্তমনস্ক ভাবে ছেলেমানুষের মত সেটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে অনেক ক্ষণ। আমার মনে হ'ল ও হয়ত কাঁদছে, নয়ত কান্না চেপে রাখিব চেষ্টা করছে।

তাব পবে আমার দিকে একবার চেয়েই আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি করব বলুন, আমার অদৃষ্টে ভগবান এই লিখেছেন, এই আমায় করতে হবে।

আমার কেমন একটা অভিমান হ'ল, বললাম—এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা? বেশ মালতী। মালতী কথাব উত্তর না-দিয়ে চুপ ক'রে রইল মুখ নীচু ক'রে। আবার আমার মনে হ'ল ও কাঁদছে, কিংবা কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে—একবার মনে হ'ল ওব ডাগর চোখ

ছুটি জলে ভ'রে এসেছে—কিন্তু অভিমানের আবেগে আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না।

রাত্রে বাইরে ব'সে ভাবলুম। সারারাত্রিই ভাবলুম। মালতীকে ছেড়েই বেতে হ'ল শেষ-পর্যন্ত?

ও না এক দিন আমার বলেছিল...আখড়াব কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

আমার ওপর কিসের দাবিতে একথা বলেছিল ও?

সে-দাবি অগ্রাহ্য ক'বে নির্ভর ভাবে যাব চলে?

যদি না বাই—তবে এখানে আখড়ার মোহান্ত সেজে চিবকাল থাকতে হবে। এই গ্রাম্য বৈষ্ণবদের সঙ্গীর্ণ গভীর ও আচার-সংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

নিস্কল তারাত্তর বাজি। দীঘির পার থেকে হ-হ-হাওয়া বইছে।

নীল আকাশের দেবতা, যাব ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়, এই বকম তাবাত্তর অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে তাঁকে পাওয়া আমার হঠাৎ হৃদয়ে না যায়...যে-দেবতা সকল ধর্মের অতীত, দেশ কালের অতীত...যার বেদী যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাস্ত নীলাকাশে, অনন্ত নক্ষত্রগুলোর মধ্যে...মর্ত্য ও অমর্ত্য তাঁব সৃষ্টি-বীণার দুই তার...আমাব মনে হোমের আগুন তিনি প্রজলিত রাখুন সুদীর্ঘ বৃগসমূহের মধ্যে...শাস্ত সমব যোপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড়, তাই দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাই। গভীর মধ্যে তিনি থাকেন না।

পরদিন খুব ভোরে—আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে উঠে নি—কাউকে কিছু না-জানিয়ে আমি ছাববাসিনীব আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিসের সন্ধানে বেরিয়েছি তা আমি জানি নে—আমার সে সন্ধানের আশা আলোরাব মত হয়ত আমাকে পথভ্রান্ত ক'বে পথ থেকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—শুধু আমি এইটুকু বুঝি যে, যে-কোন গভীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার চোখের অন্ধচ্ছ দৃষ্টির সামনে তার প্রবুদ্ধমান রূপ ক্ষীণ হয়ে আসবে—আমার কাছে সেই সন্ধানই সত্য—আব সব মিশে, সব ছায়া।

(ক্রমশঃ)

নৃত্যধর্ম

শ্রীরাজেন্দ্র শঙ্কর

জন্মে আবেগের যে উত্তাল তরঙ্গ উঠে, ঘটনা-পরম্পরায় যে অভিজ্ঞতা জন্মে, প্রকৃতি যে সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করে, অভিনয়ে, পদ-সঞ্চালনে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে ও প্রচলিত মুদ্রান্যাসে তাহার অভিব্যক্তিই নৃত্য।

ভারতবর্ষে দেবগণ হইতে এই নৃত্যের প্রথম প্রচলন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও শুভ পর্বে পুণ্যাহ্নে যে তাণ্ডব নৃত্য প্রচলিত, তাহা আজও 'তণ্ডু'র নামই বহন করিতেছে। মহাদেবের অমৃতচর নন্দীই তণ্ডু নামে পরিচিত।

কলামূর্ত্তি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। হয়ত সে উপভোগ হয় সৌন্দর্য্যের অন্তর্নিহিত ভাবের উপলব্ধিতে, হয়ত বা বাহিরে মূর্ত্ত বিকাশে, হয়ত বা উভয়ের একত্র-সমাবেশে। যুগে-যুগে এই সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি সম্পর্কে মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্তন হইয়াছে। জগতের চিন্তানায়কগণের মতবাদ আলোচনা করিলে ইহার রহস্য উল্কাটিত হইতে পারে।

ফবাসী লেখক ভেরোঁ বলেন যে, প্লেটোর যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত রসকলা প্রকৃষ্ট কল্পনা ও মানবজ্ঞানাতীত রহস্যের অপূর্ণ মুহূর্ত্তিশ্রী। এই খেয়াল ও রহস্যেই সৌন্দর্য্যের কল্পনা; এই সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়, বাস্তব পদার্থের আদর্শ।

বোজার ফ্রাই বলেন, রসকলা ইন্দ্রিয়ভোগ-সুখ-পরায়ণতা হইতেই অঙ্কুরিত। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি, দর্শন ও ধর্ম্ম দ্বারা ইহার উৎকর্ষসাধন বা বিস্তৃতিতেই ইহার মূল্য। প্রতীচ্য দেশের ত্রায় ভারতীয় ইন্দ্রিয়সুখভোগ-পরায়ণতা অনুধ্যান দ্বারা কপাঙ্গুরিত হয় না, ইহা একাধারে ধর্ম্মভাবপ্রবণ এবং প্রধানতঃ প্রেমমূলক।

বমগারটেন বলেন যে, কামনা উদ্দীপ্ত ও তৃপ্ত করাই সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য, প্রকৃতিতেই সৌন্দর্য্য পরিদৃশ্যমান, প্রকৃতি অনুকরণ করাই রসকলাব সর্বোচ্চ আদর্শ। পক্ষান্তরে বিনু কেলম্যানের মত এই যে, সকল কলারই লক্ষ্য ও নীতি

একমাত্র সৌন্দর্য্য—মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য, ভাবে সৌন্দর্য্য, বিকাশে সৌন্দর্য্য। তিনি ইহাও বলেন যে, বিকাশে সৌন্দর্য্যই বসকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং প্রাচীন কালেই ইহা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, আধুনিক শিল্পিগণ প্রাচীন কলাব অনুসরণ করিলেই ভাল হয়। কুমারস্বামী বলেন যে, জীবনবাগানে যেমন বিবেকবুদ্ধি প্রকাশ পায়, বিতর্ক যেমন চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি প্রমাণও বিদ্যু বা নিঃস্রো ও লক্ষণে প্রকাশ পায়। যে-কলা এইরূপ শাস্ত্রমাত্র অনুসারে পরিকল্পিত তাহাই প্রকৃতপক্ষে মনোহর, কমনীয়—অপরগুলি কিছুই নহে।

সেক্টেসবারী বলেন যে, তাহা সূন্দর তাহা সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সামগ্রান্ত্যবিশিষ্ট, স্তূত্রাং সত্য। যাহা সূন্দর ও সত্য তাহাই শ্রীতিপ্রদ, উত্তম ও সুমঙ্গলজনক।

লর্ড কামেস বলেন, যে, সংকীর্ণতম আয়তনে ভাবের প্রের্ষা, পূর্ণতা, বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্যে চরম সমাবেশই রসকলা।

শিবনৃত্য অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, আদি ছন্দোবদ্ধ ওজোভাব প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য। হিন্দু-প্রতিমা-বিজ্ঞানে শিব লুসিয়ানের এবসু প্রটোগোনােসের সহিত তুলনীয়। তিনি বলেন যে, সর্ব পদার্থের আদিতে নৃত্যের সৃষ্টি। এবসেব সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রকাশ, কাবণ নক্ষত্রপুঞ্জের ঐক্যানুতো, গ্রহতারার নিয়মাবদ্ধ স্থান-বিনিময়ে আমবা এই আদি নৃত্যের বিকাশ দেখিতে পাই।

গোপীনাথ বলেন যে, ইহারা প্রথম প্রাক-আর্য্য পর্বত-দেবতার পূজার জন্ত প্রচলিত হয়ত বা প্রথম ওজোবশতঃ নৃত্য করিয়াছিলেন, ইহারা শিবনৃত্যের এই অতিগভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই পর্বত-দেবতাই পরবর্ত্তী যুগে শিবে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম বা বসকলার 'মোটিক্' ও সঙ্কল্প-কালে সার্বজনীন হইয়া পড়ে, লোকে জন্মে যে ভাবৈকর্য্য

পোষণ করে, ইহাতেও তাহার বিকাশ দেখিতে পায়। শিবনৃত্য-সম্পর্কে একপ কথিত হইয়াছে যে, আমাদের পাপ দূরীকরণার্থ আত্মার পূর্ণজ্ঞান নৃত্য করে। ইহাতেই মায়ার অন্ধকার কাটিয়া বাষ, কর্মমালার স্ত্র ভঙ্গ হয়, ভগবৎরূপা বসিত হয়, এবং আত্মা আনন্দসাগরে অবগাহন করে। এই নিগূঢ় রহস্যবৃত্ত নৃত্য দর্শনের সামর্থ্যভেদে আত্মার আব পুনর্জন্ম হয় না।

ফিক্টের মতে প্রকৃতি দ্বৈতভাবের, বিকাশ—এক দিকে ইহা আমাদের অক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে, অপর দিকে চিন্তাধাৰা ও কর্মক্ষমতাব অসীমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করে। সুতবাং স্তম্ভের অনুভূতি আমাদের মনোবৃত্তির উপবেই নির্ভব কবে। এই স্তম্ভের প্রদর্শনই রসকলাব উদ্দেশ্য; সমগ্র মানবকে জ্ঞানদানই ইহার অভিপ্রায়। শিল্পীতে স্তম্ভের আত্মার অবস্থিতিতেই—বাহিরের কিছুতেই নহে—সৌন্দর্য-ধর্ম নিহিত।

হাচিনসন মনে করেন যে সৌন্দর্যপ্রকাশই রসকলার উদ্দেশ্য; সামা ও বৈষম্যের অনুভূতি জাগ্রত কবাই ইহার মূলমন্ত্র। বার্ক বলেন যে, আত্মরক্ষা ও সমাজেব নির্দেশেই মহান ও স্তম্ভের কল্পনা জাগে এবং ইহার প্রদর্শনই রসকলাব লক্ষ্য।

ইংবেজদেব মত ফরাসীগণও মনে করেন যে, সৌন্দর্য-জ্ঞান রুচির উপবেই নির্ভব করে—এই রুচি স্বেচ্ছাচারী, কোন বিধিনিষেধ মানিয়া চলে না। পেবী আঁদ্রে সৌন্দর্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—স্বর্গীয়, প্রাকৃতিক, কৃত্রিম। বেস্ট বলেন যে, উপভোগই রসকলার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি-অনুকরণই উপভোগ।

ইটালীর মনোবৃত্তি অনুরূপ। স্পালেটি বলেন যে, আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে যে আত্মানুরাগপ্রদর্শী অনুভূতি জন্মে তাহাই রসকলা। বার্কও প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেন।

ওলন্দাজ-লেখক হেমস্টার লুইস বলেন যে, বাহ্য স্তম্ভদান করে তাহাই রসকলা, সংকীর্ণতম কালে বহুলপরিমাণে বাহ্য অনুভূতি জাগ্রত করিতে পাবে তাহাই স্তম্ভদানে সমর্থ।

কাণ্টের মতে মানুষ নিজেব বাহিরে প্রকৃতির জ্ঞান ও প্রকৃতিতে আত্মজ্ঞান লাভ কবে। বহিঃপ্রকৃতিতে

সে ধোঁজে সত্য, আপনাতে সে চায় মঙ্গল। এই বাস্তব যুক্তি ব্যতীতও একটা বিচার-ক্ষমতা আছে, ইহা যুক্তির অপেক্ষা বাধে না, ইহা প্রবৃত্তি ব্যতীতও স্তম্ভদান করে। কাণ্ট ইহাকেই সৌন্দর্য্যানুভূতি বলিতে চাহেন। বাস্তব স্তম্ভবা বা যুক্তিতর্ক ব্যতীত স্তম্ভদান আত্মোপলব্ধিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য। কিন্তু কোন বস্তুব ব্যবহারিকতা অথবা হিতকাবিতার ধারণা ব্যতীত তাহার যোগ্যতার রূপদানই বাস্তব সৌন্দর্য্য। বোধ হয় কাণ্টের অনুসরণ করিয়াই শিলার বলেন যে, বাস্তব স্তম্ভবা ব্যতীত স্তম্ভেব স্রষ্টা সৌন্দর্য্যই রসকলাব লক্ষ্য। শিলাবের মতে নৃত্য ক্রীড়ামাত্র, অবশ্য এই ক্রীড়া লঘু কার্য্য নহে, শুধু রূপ-বিকাশের জন্তই অপর উদ্দেশ্য ব্যতীত জীবনের সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন। হেগেল বলেন যে, ভগবান আপনাকে স্তম্ভের রূপে প্রকৃতিতে ও শিল্পে বিকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসীর মনের কথাই যেন এই বৈদেশিক পণ্ডিতের রসনার ভাষা পাইয়াছে।

টলষ্টয়ের মতে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সৌন্দর্য্য এক বিশেষ শ্রেণীব স্তম্ভদান কবে, কিন্তু বাস্তব অনুভূতিতে পদার্থের পূর্ণীকৃতার ধারণা জন্মে। এই ধারণাতেও একটা স্তম্ভের উপলব্ধি হয়। এক কথায় উভয় অনুভূতিতেই একই প্রকাব সৌন্দর্য্যেব ধারণা জাগে—কিন্তু কামনা জাগে না। অনেকের নিকট ইহা ভাববিহীনতা এবং কলে তাঁহার রসকলার একমাত্র ও চরম আদর্শরূপে সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করিতে পারেন না।

বর্তমান যুগের শিল্পী—তিনি যতই ধর্মভীরু হউন না কেন—সম্মুখে অনতিক্রম্য বাধাবিপত্তি। যে-শিল্পী প্রাচীন হিন্দু-বৃত্তের পুনরুদ্ভাবন-প্রয়াসী তাহার পক্ষে প্রাচীন পুস্তকে নির্দিষ্ট স্তম্ভগঠিত সমাজের ও দর্শকমণ্ডলীর অভাবে এবং অজ্ঞতা ও মতবাদের অনেক ইত্যাদির প্রাচুর্য্য—এই উভয়-সঙ্কটে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। প্রাচীন পুস্তকাদিতে যে বিধান আছে, সে-মতে বর্তমান যুগে কোন নৃত্য প্রচলিত নাই। সুতবাং প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। পুস্তকাদিধারা কি জ্ঞান লাভ সম্ভব? ভরতের নাট্যশাস্ত্র এ-সম্পর্কে আদর্শ পুস্তক; নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয় সম্পর্কে অতি বিশদ বিধান ইহাতে



রাজপুণ্ড্র বেঙ্গল নৃত্য উদয়নর



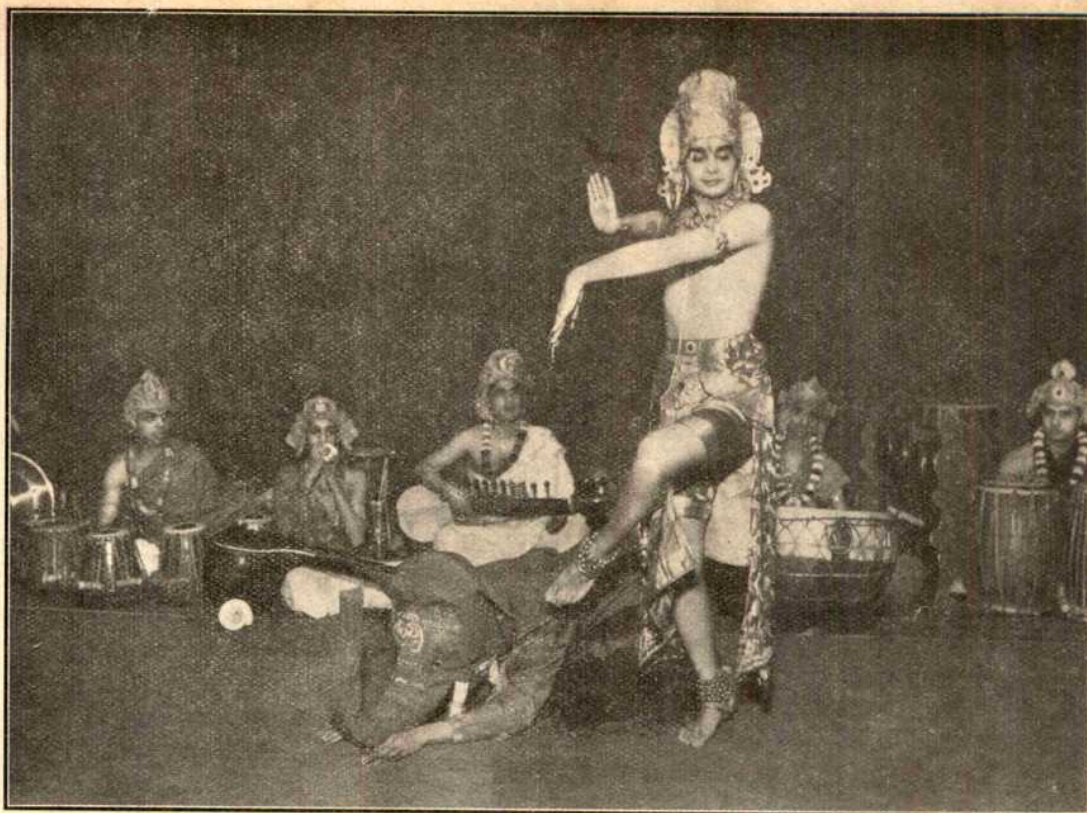
তরবারি-নৃত্যে পঞ্জাবী বালিকা বেঙ্গল উদয়নর নৃত্যশিল্পী কুমারী সিন্ধু



সাপুত্ৰিয়া-বেশে উর্মিলাসেন



উর্মিলাসেনের আত্মীয় ও শিষ্য। কুমারী কনকলতা



১। শিবমূর্ত্য—গজাসুরবধ—নটরাজ ভঞ্জিমায় উদয়শঙ্কর হস্তদ্বয়ে, 'অভয়া' ও 'বরদা' বিস্তারিত,
উত্তোলিত বামপদে আশ্বদান, দক্ষিণপদে ধরণীর পাপদমন

২। রামলীলা—কৃষ্ণের ভূমিকায় উদয়শঙ্কর
প্রথম সারি (বাম হইতে) কুমারী সিন্ধুকা, কুমারী কনকলতা, উদয়শঙ্কর, দেবেন্দ্র
দ্বিতীয় সারি (বাম হইতে) রাজেন্দ্র, বিজুদাস, তিমিরবরণ, রবাক্স, শিশিরশোভন



দ্ব্যভিধিমা
(বামে) কুমারী সিন্ধুকী (দক্ষিণে) কুমারী কনকলতা



তরবারি-মুতা
বাম হইতে—কুমারী কনকলতা, উদয়শঙ্কর, কুমারী সিন্ধুকী

আছে, কিন্তু পূর্ণভাবে ইহার অনুবাদ করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। ইহার যে-সকল অনুবাদ প্রচলিত আছে, তর্কের খাতিরে তাহা নির্ভুল ধরিয়া লইলেও, প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, ইহার সাহায্যে কেহ উচ্চ শ্রেণীর নর্তক, গায়ক বা অভিনেতা হইতে পারে কি? প্রথমে নৃত্যে অঙ্গ-ভঙ্গীর কথাই ধরা যাক। পুস্তকে বহু প্রকরণের উল্লেখ আছে—কিন্তু বিশদ বিবরণের একান্ত অভাব। ইহা যেন দ্রুহ শব্দাদির অর্থসংগ্রহ। মুদ্রাপ্রকরণে আদর্শের নাম এবং হস্ত-বিজ্ঞাসের প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু শিল্পীকে অনেক জিনিষই কল্পনা করিয়া লইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অঙ্গুলিবিজ্ঞাসের নির্দেশ থাকিলেও অপরাপর অঙ্গুলি-সম্পর্কে কোনই উল্লেখ নাই। একই মুদ্রা বহু ভাবের দোতক। তখন অঙ্গুলি-বিজ্ঞাসের নির্ণয় করা বড়ই দ্রুহ। অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর সংলগ্ন করিয়া প্রসারিত করতল পতাক-হস্ত। এই পতাক-হস্ত নিম্নলিখিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া উল্লেখ আছে—ক্রোধ, প্রেরচনা, উল্লাস, গর্ব, আত্মসন্তোষ, অগ্নি, পুষ্পবৃষ্টি, অভিষেক, অনুমতি, উপঢৌকন, ঘাস, ভূমিতে ছড়ানো জিনিষপত্র, লুকাইত বস্তু, গুচ্ছ, আত্মগোপন, ঝড়, ঢেউ, উৎসাহ, মহৎ ব্যক্তি, তরবারির আঘাত, পক্ষসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস, ধোঁত করা, পরিস্কৃত করা, নমনীয় করা, চূর্ণ করা, পর্কত উত্তোলন, উন্মোচন। কখন কিরূপ ভঙ্গীতে এই পতাক-হস্ত রক্ষা করিতে হইবে, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। অপর দিকে একই ভাব প্রকাশার্থ বহু প্রকার মুদ্রার বিধান আছে। সঙ্গীতরত্নাকর, নাট্যশাস্ত্র, চিলাপ্তিকরম, হস্তলক্ষণপ্রদীপিকা, অভিনয়দর্পণ প্রভৃতি পাঠ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সর্ববাদিসম্মত কোন সংকেত নাই। মালাবারে কটু, কথাকলি, উত্তম তুল্লাল প্রভৃতি নৃত্য প্রাচীন পদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বৈষম্য অনেক। ত্রিভঙ্গীতে এক ভঙ্গী যে ভাব প্রকাশ করে হয়ত ইহা কোচিনরাষ্ট্রে কেবল কলমওলমে ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। নীরব অভিনয়ে

আখ্যানবস্ত্র হয়ত এক, অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাব কিংবা অভিপ্রায় একই, কিন্তু প্রদর্শনে অনেকা জাজল্যমান। ইহাতে এই প্রশ্ন হয় যে কোন এক বিষয়ে দুই জনে একমত না হইতেও পারে; সামাজিক রীতিনীতি, যুগ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দান করে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, একই ভিত্তি হইতে গতি আরম্ভ হইলেও এবং একই ধর্ম্যভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও কাল, রাষ্ট্রশাসন এবং ধর্ম্মোৎসাহে ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন নৃত্যের নিকলঙ্গ স্বরূপ সম্ভবপর হইলেও পুনঃপরিবর্তন সমীচীন নহে। কারণ কালধর্ম্মে আমাদের কচির যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস আমরা আর অবনতশিরে স্বীকার করি না। স্মরণাতীত যুগের প্রভাবাবিহীন পদ্ধতি এখন আর আমাদের সন্তোষবিধান করিতে পারে না। প্রাচীন যুগে যেমন, বর্তমানে আর তেমন ভাবে নৃত্যের সম্ভব নাই। এখন নৃত্যে চিত্তরঞ্জনেরই প্রয়াস, রসকলার বাণী দ্বারা লোকের মনোবৃত্তির উন্মেষসাধন নহে।

রসকলা প্রগতিশীল, ইহা স্বজনক্ষম। প্রকৃতির সীমাহীন আয়তন ইহার সাম্রাজ্য, কল্পনার গতিতে ইহার অনুভূতি, অনুধাবন-ক্ষমতার ইহার সাধনা, মানবদেহ ইহার কর্ম্মক্ষেত্র, অঙ্গসঞ্চালনে ইহার বিকাশ। প্রাচীন কাহিনী ও উপকথা এবং ভাবপ্রকাশের বিধিবদ্ধ প্রণালী আমাদের যাত্রাস্থান, প্রগতির বিস্তৃত বীথিকা আমাদের সীমাবদ্ধ পথ, আদর্শের পরিপূর্ণতা আমাদের লক্ষ্য।

বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইহাকে পুনরায় গঠন করিতে এবং বর্তমান যুগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান দ্বারাই ইহার বিচার করিতে হইবে। এই জন্ত চাই আমাদের বাবতীয় নৈপুণ্য ও সৌকর্য্যের প্রয়োগ। আমরা চাই মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার; যুগধর্ম্মানুযায়ী প্রেম ও শক্তি বলেই তাহা সম্ভবপর।

মহিলা-সংবাদ

কন'টকের শ্রীমতী কমলা জামখণ্ডী শিক্ষা-বিভাগে কার্যা করিয়া বর্ষ অর্জন করিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ডব্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা-বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি উচ্চতম উপাধি লাভ করেন।



শ্রীমতী কমলা জামখণ্ডী

তিনি বিজাপুরের মহিলা-স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতির অবৈতনিক সম্পাদিকা এবং কন'টক শিক্ষক-সঙ্ঘের ও নিখিল ভারতীয় শিক্ষক সমিতির কার্যানির্বাহক-সমিতির সভ্য।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ শহরে অযোধ্যা নারী-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শেরকোটের রাণী ফুলকুমারী সভানেত্রীর কার্য্য করেন।



রাণী ফুলকুমারী



শ্রীমতী এ. লতিফি

শ্রীমতী এ. লতিফি পঞ্জাব স্ত্রী-শিক্ষাবিদায়ক সম্মেলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন।



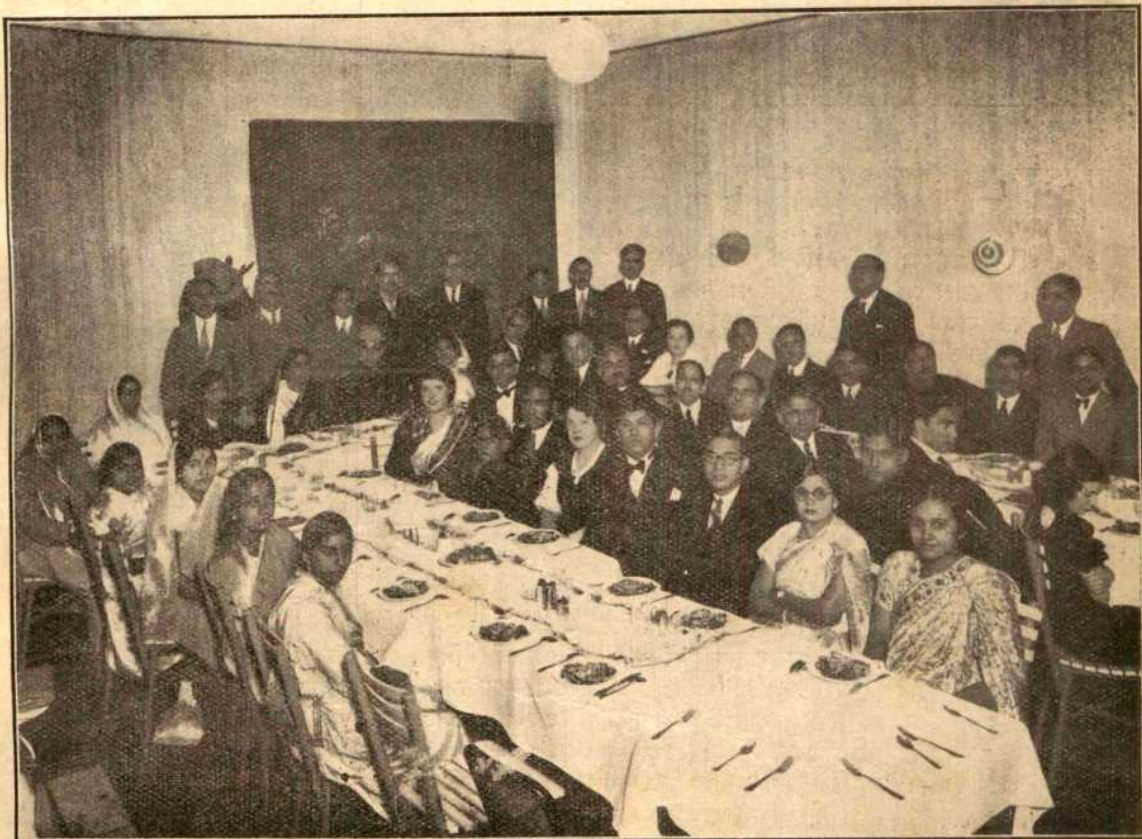
দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

ভিয়েনা শহরে দীপালী উৎসব—

ভিয়েনা-প্রবাসী ভারতীয়েরা গত ৬ই নবেম্বর দীপালী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অধিনায়কত্বে একটি ভোজ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুভাষবাবু এই ভোজসভায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ভিয়েনায় ভারতীয়ের সংখ্যা

মেশা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান একাডেমিক্যাল সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। বহু মহাশয় সমবেত সকলকে সময় ও অর্থ দিয়া এই সমিতিতে সাহায্য করিতে। অনুরোধ জানান। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সুভাষবাবু ছাড়া শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান, মেজর মিশ্র, ডক্টর শর্মা, ডক্টর পাল, ডক্টর নেশাই, ডক্টর চোকসি, শ্রীযুত হীরলাল ও ডক্টর শ্রীমতী মহাস্তোর নাম উল্লেখযোগ্য।



ভিয়েনা শহরে দীপালী উৎসব উপলক্ষে ভোজ

ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। এই জন্ত এই সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহাতে ভারতীয়গণ পরস্পর মেলা-

জান্নানীতে ভারতীয় ছাত্র—

জান্নানীর অন্তর্গত ম্যুনিখের ডয়টশে একাডেমি প্রতি বৎসর

কয়েকটি ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই বৃত্তির সাহায্যে তাহারা জাৰ্মানীর বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করেন। গত ২৭এ অক্টোবর উয়ট্শে একাডেমির বৃত্তিভোগী ছাত্রগণ মুনিকে সমাগত হইয়া গত বৃদ্ধ সৈনিক জীবন দিয়াছেন তাহাদের স্মৃতিফলকে মালা প্রদান করেন। এই উৎসবে মুনিকের মেয়রের প্রতিনিধি, মুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, জাৰ্মানীস্থিত বিলাতের সহকারী রাজদূত ও অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।



গত বৃদ্ধ সৈনিকদের স্মৃতি-ফলকে মুনিকে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রগণ কর্তৃক মালা প্রদান

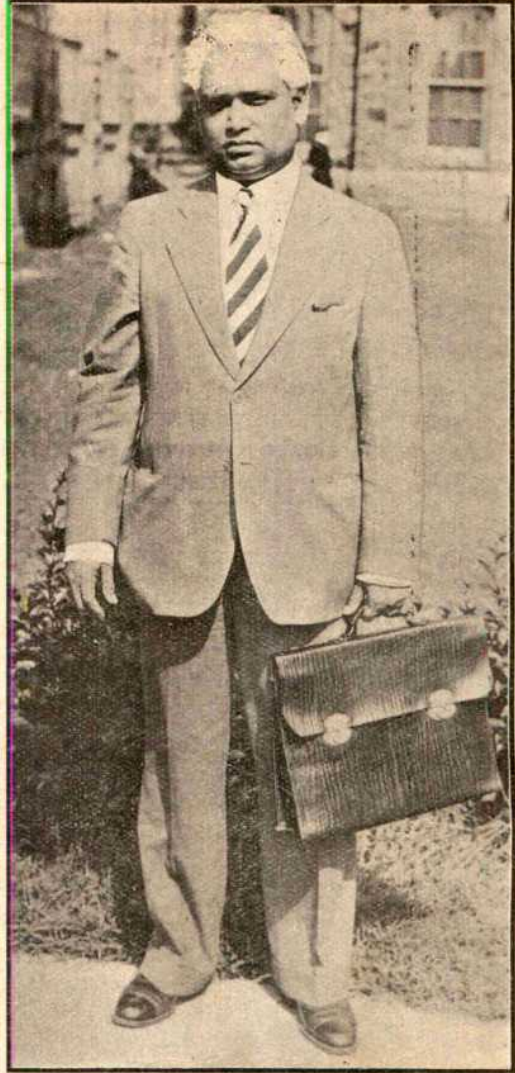
ভারতীয় ছাত্রগণ প্রধানতঃ বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য জাৰ্মানীতে গেলেও যাহাতে তাহারা জাৰ্মানীগণের সঙ্গে সামাজিক মেলো-মেশা হইতে বঞ্চিত না হন, মুনিকের উয়ট্শে একাডেমি সৈনিক বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই জন্য তাহারা মাঝে মাঝে অন্তর্জাতিক ভোজের আয়োজন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এইরূপ দুইটি ভোজে আধুনিক জাৰ্মানীর উপর ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব আলোচিত হয়।

গত বৎসর উয়ট্শে একাডেমির বৃত্তিভোগী সাত জন ভারতীয় ছাত্র সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাহাদের নাম ও উপাধির বিবরণ এইরূপ—

সি আর বরাট (কলিকাতা), ডক্টর ইং (টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, মুনিক); এন্স কে মজুমদার (কলিকাতা), ডক্টর ফিল্ (ইউনিভার্সিটি, মুনিক); জে এন্স মুখোজা (কলিকাতা), ডক্টর ইং (টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ষ্টাটগার্ট); আর কে এন্স আয়ান্দার (মহাশূর), ডক্টর ইং (টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, হানোভার); আর কে দত্তরায় (ময়মনসিংহ), ডক্টর ইং (টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, হানোভার); জে মিশ্র (পাটনা), ডক্টর ফিল্ (ইউনিভার্সিটি, কনিগস্‌বের্গ); বি পিলানি (লাহোর), ডক্টর ওয়েক (কমার্শ্যাল ইউনিভার্সিটি, হানবের্গ)।

বিদেশে বাঙালীর সন্মান—

যে-সব বাঙালী বিদেশে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ডক্টর তারকনাথ দাস এক জন। তিনি গ্রন্থকার ও সাময়িক পত্রের লেখক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ডক্টর দাস ভারতবর্ষের বাহিরে থাকিয়াও



ডক্টর তারকনাথ দাস

[অধ্যাপনা-গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে গৃহীত চিত্র]

বিশ্বের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নানা সমস্তার কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি আমেরিকায় ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিভাগে ‘প্রাচ্য রাজনীতি’র লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যাব্যবস্থার উপায়—

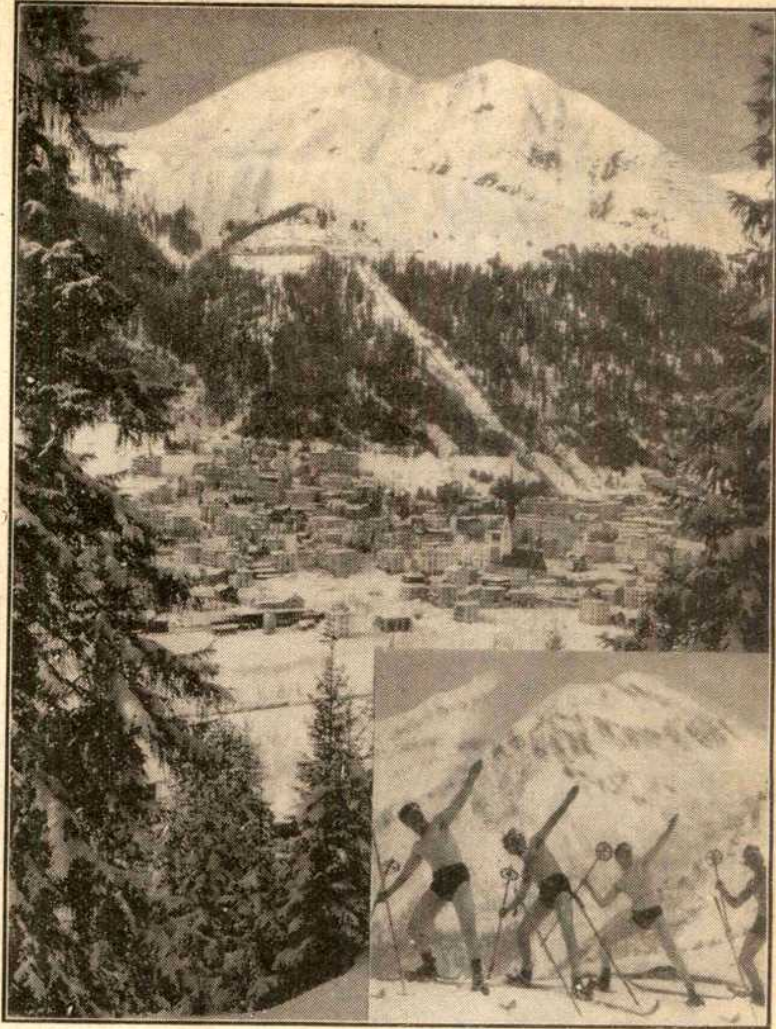
ডাঃ শৈলেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এল-এম-এফ, লিখিতেছেন—

পৃথিবীর জোড়ে জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ তিনটি অমূল্য সম্পদ আমাদের জীবনধারণে সাহায্য করিয়া থাকে—প্রথমতঃ পিতামাতা, দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য, তৃতীয়তঃ প্রকৃতির দানসমূহ। একের অভাবে অন্যটি সম্যক কার্যকরী হয় না। প্রতিনিয়ত এই তিনটির কার্যের সামঞ্জস্য থাকে বলিয়া দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সবল শরীরে জনসমষ্টি জাতির মেরুদণ্ড।

বর্তমান ভারতে যে জাতীয়, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও শারীরিক পুনর্গঠনের একটি অদম্য উৎসাহ সকলের প্রাণে জাগিয়াছে তাহা দেশের মঙ্গলের সাংকেতিক চিহ্ন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা লোকের দিন-দিন বাড়িতেছে। চেকোস্তোভাকিয়ার সোকল (Sokol) প্রতিষ্ঠান, ইটালীর জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা, জার্মানির যুব-সভা, জাপানের স্বাস্থ্যনীতি, সুইজারল্যান্ডের চিকিৎসা-প্রণালী ও নানা সভ্য দেশের বিবিধ প্রচেষ্টার আদর্শে আমাদের দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শহরে ও গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার ও উৎকর্ষের চেষ্টাই ইহার নিদর্শন। শুধু গৃহস্থালীই নহে, লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা ও মৃত্যুচর্চা দ্বারা বালিকাদের মধ্যেও শরীর-গঠনের চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। এ-সকল আয়োজন সবেও স্বাস্থ্যের মূর্তি বা শিশুযুগের সংখ্যা তেমন হ্রাস পায় নাই। অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকায় বা রোগের প্রথমাবস্থায় হুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করার অন্তর্গত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশেষতঃ বাংলা দেশে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাবশতঃ অনেক কার্যক্ষম নর-নারী যৌবনেই অকাল মৃত্যুতে, অথবা রুগ্ন অবস্থায় কার্যে অক্ষম হইয়া আমরণ শয্যাশায়ী থাকিয়া সাম্প্রতিক ক্ষতি ও দারিদ্র্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করিতেছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহ এক একটি জীবনকে অমূল্য

সম্পদ জ্ঞান করে। জাতির ও দেশের পক্ষে একগুণ মূল্যবান সম্পদ রক্ষার উপায়সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আশ্চর্য্যামিত হইতে হয়। কেবলমাত্র তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার পদ্ধতি হইতে আমরা স্বদেশে থাকিয়াও অনেক মূল্যবান তথ্য আহরণ করিতে পারি।

উপরের চিত্রখানি সুইজারল্যান্ডের ডাবস্ (Davos) নামক একটি মনোরম স্থানের। বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস স্থানটি তুষারাবৃত থাকে। গাছ, মাঠ, পথ প্রভৃতি সকলই বরফে ঢাকা। এখানকার আবহাওয়া শুষ্ক, অথচ ক্রান্তার নামগন্ধ নাই। বরফের মধ্যে সূর্য্য-কিরণেরও কিছুমাত্র অভাব নাই। ডাবস্ পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৎসরের সব সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে যক্ষ্মা, ইপানি, সর্দিকাশি প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য বহু লোক আসিয়া যথাসম্ভব দীর্ঘ পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ



ডাবস্ শহরের একটি দৃশ্য—তুষার-ক্রীড়া

করিয়া থাকে। যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য এখানে একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে।

ডাবস্ একটি ক্ষুদ্র স্থান হইলেও এখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। সরকার কর্তৃক দুধ সরবরাহ, আবর্জনা পরিষ্কার, পাঁড় হইতে শহরের মধ্যে বরগার জল সর্বক্ষণ আনয়ন করা হইতেছে। রোগীদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান হাসপাতাল রহিয়াছে। ধনী দরিদ্র সকলের উপযোগী হোটেল, স্বাস্থ্যাবাস বা আবাসস্থল এখানে আছে। সাধারণতঃ লণ্ডন হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমতল ও পার্বত্য রেল যোগে ডাবস্ পন্নী ও ডাবস্ শহরে পৌঁছান যায়।

স্বাস্থ্যকামী রোগীরা আরোগ্যলাভের সময়ে বিবিধ প্রকারের ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সব খেলা বা ইহাদের অনুরূপ কিছুই আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই। অবশ্য আইস্ রিক্‌স্, বব্-রান,

টোবোগান্ রান্ বা স্টি জাম্প প্রভৃতি আমাদের দেশে সম্ভবপর না হইতে পারে। এখানকার জনসাধারণ ক্রীড়াকৌতুক দ্বারাও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন অনেক স্বাস্থ্যকামী নরনারী দেখিয়াছি বাঁহারা অনেক অর্থব্যয় করিয়া কোন পার্কে অঞ্চলে গিয়াও মোটেই পাহাড়ে উঠেন নাই; পাদদেশ হইতেই গিরির উচ্চ শিখরদর্শনে আনন্দলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

প্রত্যেক মানুষের সবল স্বস্থ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার একটি ইচ্ছা আছে, এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আরও কিছুদিন বাঁচিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে অনেক রোগীকে দেখিয়াছি। উপরিউক্ত সুইজারল্যান্ড দেশের ডাক্তার যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিয়া বহু যক্ষ্মা ও অন্যান্য শ্বাসরোগাক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্ত আসিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঐ সকল চিকিৎসা-আবাসে ত্রিখ্যাত সিরোলিন রচি ইত্যাদি নিরাপদ ও কার্যকর ঔষধ ব্যবহার ও অল্প প্রকার চিকিৎসা—যথা, অল্পপ্রয়োগ—করিয়া থাকেন। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদের প্রভূত উপকার হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, হুপিংকাফ, সর্দি কাশি প্রভৃতি রোগেও ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে।

বাংলা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে পদক ও পুরস্কার ঘোষণা—

নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনার জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে :—

পদক	প্রবন্ধের বিষয়
১। হরপ্রসাদ স্বর্ণপদক—	হিন্দু-রাজত্ব রাঢ়।
২। অক্ষয়কুমার বড়াল স্বর্ণপদক—	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও আলোচনা।
৩। কালীকৃষ্ণ স্বর্ণপদক—	আধুনিক বাঙ্গালা গল্প-সাহিত্যের গতি।
৪। হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক—	বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান।
৫। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক—	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে করুণ রস।
৬। হরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক—	মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।
৭। বিপিনচন্দ্র পাল রৌপ্যপদক—	বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিপিনচন্দ্রের দান।



পরলোকগত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের শব লইয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের অভিমুখে যাত্রা



শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের আরতি-মূর্তা
পুরস্কার

১। রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০০)—বৈদিক যুগে
আর্য্য ও অনার্য্য।

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যিক।
৪র্থ বিষয় ছাত্রগণের জন্ম এবং ৫ম বিষয় মহিলাগণের জন্ম নির্দিষ্ট।
অন্তান্ত বিষয়ে সর্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। বর্তমান বর্ষের
চৈত্র-সংক্রান্তির মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে
২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রবন্ধ
পাঠাইতে হইবে।

ভারতবর্ষ

পরলোকে প্রবাসী বাঙালী—

মর্টগোমারির সিভিল সার্জন পঞ্জাব-প্রবাসী ক্যাপ্টেন কুপাহন্দর
বহু মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। কর্মস্থলে নানা
স্থানে গমন করিয়া তিনি ধর্মপ্রাণ সত্যপ্রিয় ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তি
বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি বঙ্গের
বাহিরের বাঙালীর মর্যাদা বাড়াইতে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

বহু মহাশয় ১৮৮০ সনে ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার
পিতা কার্ঘ্যোপলক্ষে ঢাকা—বিজয়পুর হইতে ভাগলপুরে আসেন
ও তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কুপাহন্দর ভাগলপুর হইতে



শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের আরতি-মূর্তা

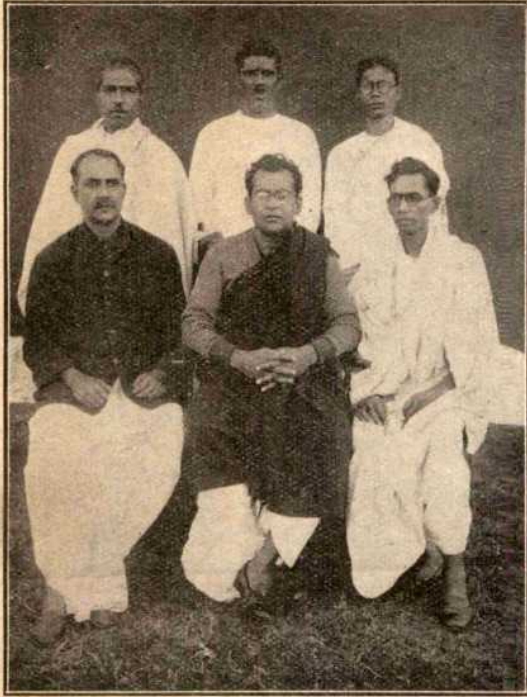


ক্যাপ্টেন কুপাহন্দর বহু

এফ—এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৮ সনে লাহোর মেডিক্যাল কলেজে
প্রবেশ করেন। ১৯০৩ সনে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর
পরে এসিষ্ট্যান্ট সার্জনরূপে পঞ্জাব-সরকারের মেডিক্যাল সার্ভিসে প্রবেশ
করেন। বিগত মহাযুদ্ধে তিনি বসুরা ডাক্তার হইয়া যান ও চারি বৎসর
পর আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি ১৯৩১ সনে সিভিল সার্জনের
পদে উন্নীত হন। এই পদে থাকা কালীন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রাঁচি বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন ও শিল্প-প্রদর্শনী—

গত ৭, ৮, ৯, ও ১০ই নভেম্বর রাঁচি হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব



বাম দিক হইতে (দণ্ডায়মান) শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজানন্দ সেন (সম্মিলনের সম্পাদক)।

(উপবিষ্ট) শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী।

সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগে বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলন প্রত্নতত্ত্ব, স্থচীশিল্প ও চিত্রশিল্পের একটি প্রদর্শনীও হইয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নানামধ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট মহাশয়। সুনীতি বাবু তাহার অভিভাষণে বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। অভিভাষণ-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ মৃত্তকবিৎ রায়-বাহাদুর শরৎ চন্দ্র রায়, এম-এ, এম-এল-সি মহাশয়। সমাগত ভ্রমণগণকে সাবধানে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করিয়া তিনি মৃত্তক সম্বন্ধে একটি উচ্চাঙ্গের অভিভাষণ পাঠ করেন। সুনীতিবাবু তাহার অভিভাষণ ছাড়া সম্মিলনীতে ছায়াচিত্রসহযোগে আরও দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা করেন, বিষয় যথাক্রমে—‘ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত’ এবং ‘গ্রীক ভাস্কর্য’। স্থানীয় বহু সাহিত্যিক এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া সভার নোষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

প্রবাসী বঙ্গীয় সঙ্গীত-সম্মেলন, পাটনা।—

বিগত অক্টোবর মাসে মহালয়ার ছুটিতে পাটনায় এই সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ

দক্ষিণদার মহাশয়ের অরাস্ত পরিশ্রমে ও অপরিমিত যত্নে ইহা সম্ভব হইয়াছে। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জুর কোর্টনী টেরেল মহোদয় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা ও বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল। পরে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় যে-সব ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিলেন তাহারা গুণানুসারে নিম্নোক্তরূপ রৌপ্য-পদক লাভ করিয়াছেন—

ছাত্রী

ক্রম-প্রথম—শ্রীমতী মণি দেবী, ভাগলপুর।

দ্বিতীয়—শ্রীমতী আরতিদাস বর্মা, পাটনা।

যেয়াল—প্রথম—শ্রীমতী সুপ্রভা সেন, পাটনা।

দ্বিতীয়—শ্রীমতী প্রভারাণী গুহ, বরিশাল।

তৃতীয়—শ্রীমতী বিজলী জয়শ্যামল, পাটনা।

ছাত্রী ও টপ্পা—প্রথম—শ্রীমতী সুপ্রভা সেন, পাটনা।

ভারতীয় নৃত্য—প্রথম—শ্রীমতী আরতি ঘোষ, পাটনা।

দ্বিতীয়—শ্রীমতী নিবেদিতা বসু, পাটনা।

আধুনিক বাংলা সঙ্গীত—প্রথম—শ্রীমতী আরতি ঘোষ, পাটনা।

দ্বিতীয়—শ্রীমতী রেণু সেন, পাটনা।

তৃতীয়—শ্রীমতী অরুণা মিত্র।

কীর্তন ও বাউল—প্রথম—শ্রীমতী দুলালী চক্রবর্তী, ঢাকা।

ছাত্র

ক্রম-প্রথম—শ্রীমান অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাটনা।

দ্বিতীয়—শ্রীমান গিরিশকুমার সিংহ, পাটনা।

যেয়াল—উচ্চপ্রশংসিত—শ্রীমান অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাটনা।

বীণেশর বীণী—প্রথম—শ্রীমান মন্ট, পাটনা।

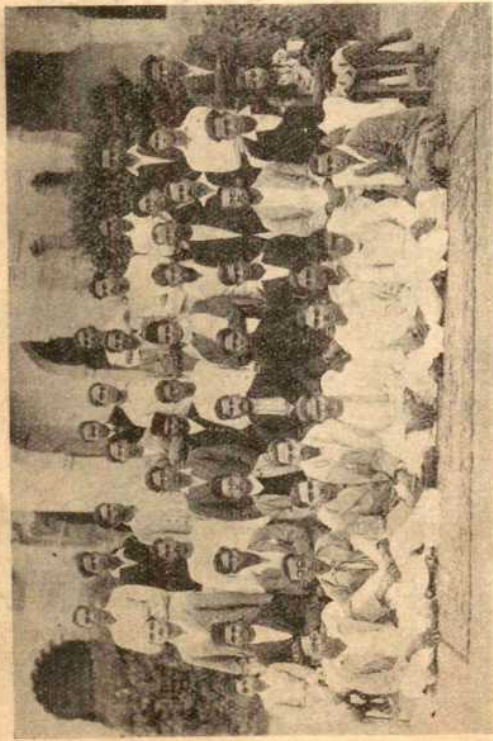
এই সম্মেলনে একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির নাম “সি মিউজিক্যাল সোসাইটি অব বিহার এণ্ড ওড়িশা, পাটনা।” পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সভাপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি সঙ্গীত-সম্মেলন—

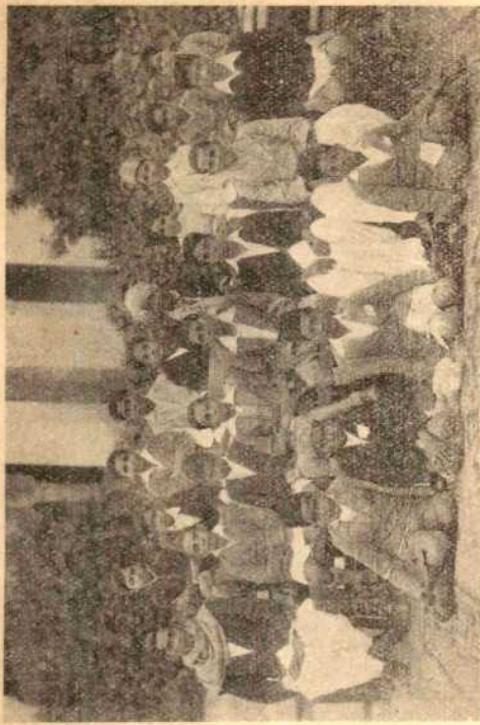
গত নবেম্বর মাসে এলাহাবাদে ইউনিভার্সিটি সঙ্গীত-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পূর্ব বারের মত এ-বৎসরেও প্রধানতঃ উক্ত দক্ষিণারঙ্গন ভট্টাচার্যের চেষ্টা-যত্নে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষা-সচিব শ্রীযুক্ত জে পি শ্রীবাণ্ডব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সভাপতি হইয়াছিলেন পাটনার শ্রীযুক্ত সচিদানন্দ সিংহ মহাশয়। সকলেই একবাক্যে উক্ত দক্ষিণারঙ্গন ভট্টাচার্যের কর্তৃকশলতার প্রশংসা করেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্রকান্তার সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। গত বৎসরের ছায় এবারেও তাহার সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহার নৃত্য, বাজ ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসিত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে এই কয় জনের নাম উল্লেখযোগ্য :

কণ্ঠসঙ্গীতে—শ্রীমতী শান্তিলতা বাঁড়ুজো, শ্রীমতী প্রভাবতী মিত্র, শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য, শ্রীমান সুধীরলাল চক্রবর্তী, শ্রীমতী চম্পক লক্ষ্মী, শ্রীযুক্ত এন্ আর ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পণ্ড, শ্রীমতী গৌরীরাণী ঘোষ, শ্রীমতী সুখমা দে, শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ চাট্জো, শ্রীযুক্ত কে সি মজুমদার, শ্রীযুক্ত ডি জে জোশী। নৃত্যে—শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মায়ী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী শোভা ভট্টাচার্য। সেতার—শ্রীমতী উষাধেবী গোভিল, শ্রীমতী রেণুকা সাহা, শ্রীযুক্ত এন্ আর ভট্টাচার্য। বেহালা—শ্রীমান সমরকুমার বাঁড়ুজো। হারমনিয়ম—শ্রীমান হেমচন্দ্র

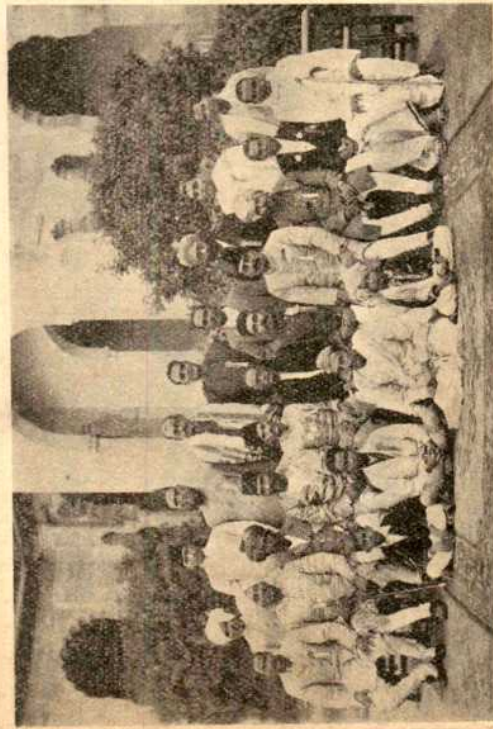
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মীত-সম্মেলন ১৯৩৪



প্রতিযোগী বালকগণ (বড়)



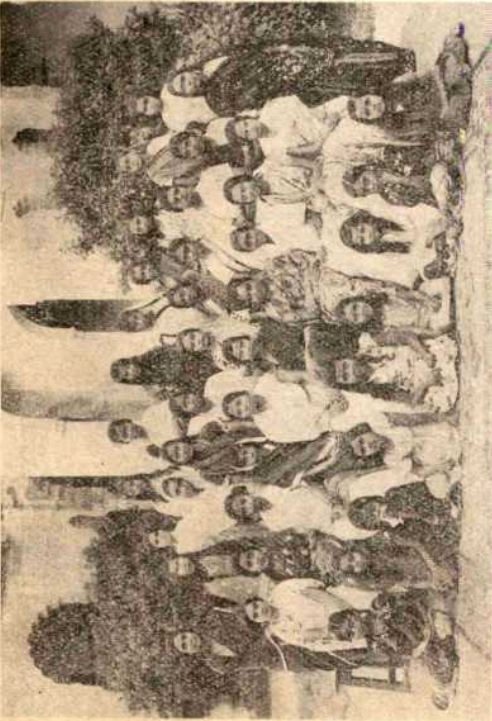
প্রতিযোগী বালকগণ (ছোট)



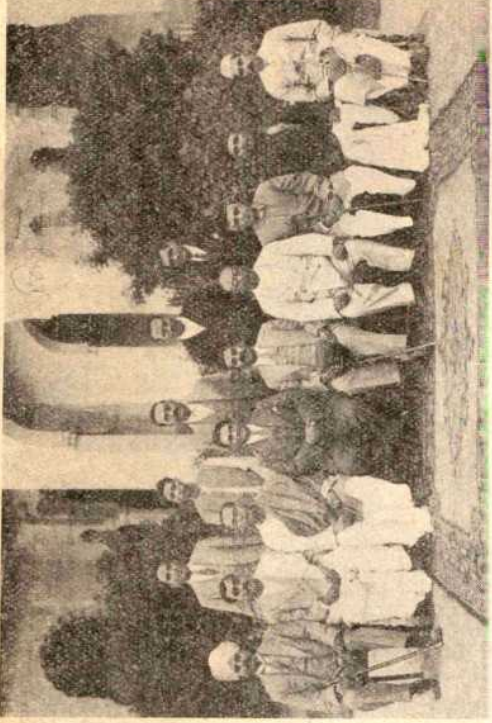
গায়কবৃন্দ



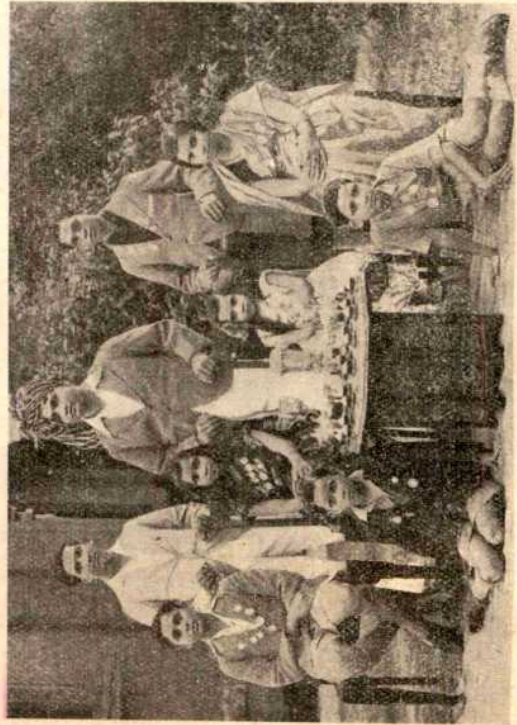
মাইক্স বাণ্ড দল



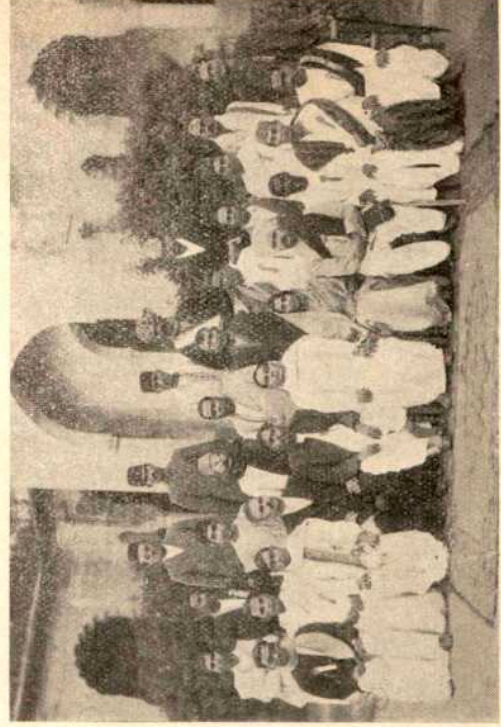
অতিথিগণী দলিকাগণ



সভাপতি, বিচারক ও অভ্যর্থনা-সমিতি



ভট্টাচার্য-পরিবার—চেম্পিয়ান কাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন



গায়কবৃন্দ

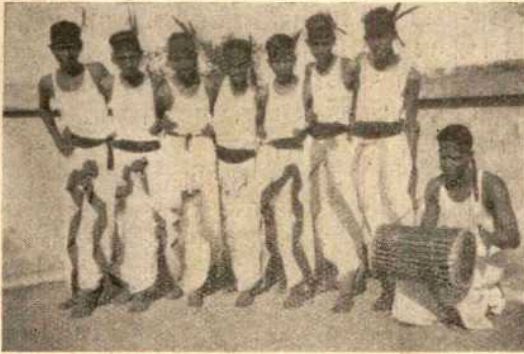
জেশী, শ্রীমান্ জগদীশ, শ্রীমতী বাণাপাণি মুখ্যজ্যো, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী
রায়; তবলা—শ্রীমান্ ফুল মুখ্যজ্যো, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র জেশী, শ্রীমান্
নিশিতেশ বাড়ুজ্যো, শ্রীযুত স্ব্যাকুমার পাল, শ্রীযুত এম্ আর ভট্টাচার্য্য,
শ্রীযুত অনাথনাথ মুখ্যজ্যো, শ্রীযুত জ্ঞানদানাথ মজুমদার; সারিঙ্গ—শ্রীযুত
রাধিকামোহন মৈত্র; পাখোয়াজ—শ্রীযুত প্রতাপনারায়ণ মৈত্র।

এলাহাবাদে অক্ষ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এলাহাবাদে যে পঞ্চম সম্মত-
সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতার খাতনামা অক্ষ-গায়ক
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে গত ৭ই ও ৮ই নবেম্বর গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ
করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের মহা নবাব সার মহম্মদ ইউসুফ,
সরকারী উকীল মিঃ মজিদ প্রমুখ প্রদত্ত বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।
৯ই পার্ক রোড ক্লাবে ও ১০ই লয়েন্সগঞ্জে তাঁহার গান হইয়াছিল।
কৃষ্ণাবাবু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন—তের বৎসর বয়সে তাঁহার
চন্দ্রবর নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি তিনি সঙ্গীতচর্চা করিতেছেন।
তাঁহার এই সাফল্যে বাঙালীমাত্রেই গৌরব অনুভব করিবে।

রেঙ্গুনে বেঙ্গল একাডেমীর উৎসব—

গত ১১ই অগ্রহায়ণ রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমির পঞ্চবিংশতি
বৎসর পূর্ণ হয়। এতদুপলক্ষে একটি উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।
কলিকাতার মুষ্টিযোদ্ধা ও তরুণ ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্রনাথ
সরকার লোক-নৃত্য ও অস্ত্রাস্ত্র নৃত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্ত সেখানে
নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁহার কার্যের দক্ষতার পরিচয় দিয়া বহু প্রশংসাপত্র
ও পুরস্কার লাভ করেন।



রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমি—সিলভার জুবিলী উৎসব

মাননীয় প্রধান বিচারপতি মিঃ পেজ ও তাঁহার সহধর্মিণী
সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে
উৎসব আরম্ভ হয়। ছাত্রদের মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, রোমান-রিং ও
ছাত্রদের ভারত-বরণ, বর্গামঙ্গল, স্বপ্নভঙ্গ প্রভৃতি নৃত্য আমোদ-
প্রমোদের প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়
অবর্তিত পরানৃত্য রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালী ও অস্ত্রাস্ত্র অধিবাসি-
গণকে শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম দেখাইলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের
ছাত্র শ্রীমান্ সুবোধ চৌধুরী রোমান-রিং দেখাইয়া শ্রীমতী
জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে একটি স্বর্ণ-গর্ভ রৌপ্যপদক



রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমি—সিলভার জুবিলী উৎসব



রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমি—সিলভার জুবিলী উৎসব



শ্রীযুত ননী চক্রবর্তী—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ইনি সম্ভরণে
১৯৩৪ সনে সর্বাধিক স্থান অধিকার করিয়াছেন

লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বায়াম-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার চক্রবর্তী ও তাহার স্নযোগা ছাত্র শ্রীমান জ্যোতিষ খাঙ্গারীর জাপানী যুগ্মত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হয়ছিল বালিকাদের নৃত্য; ছোটদের নমস্কার 'হে স্বামিনামি' এবং কিশোরীদের 'বর্ধমঙ্গল' নৃত্যটি সকলের ভাল লাগিয়াছিল। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মায়াালের 'স্বপ্নভঙ্গ' নৃত্যটি সকলের মনে সর্বাপেক্ষা বিস্ময় উৎপাদন করে।

পরে পুরস্কার বিতরণ ও শ্রদ্ধেয় বতীশরঞ্জন দাসের প্রতিকৃতি প্রভৃতি উন্মোচন করা হয়।

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

জয়েন্ট-পারলামেন্টারী রিপোর্ট ও ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক—

ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইলে আশঙ্কা আছে যে, (ক) ভারতে ব্রিটনীয় বাণিজ্য-স্বার্থের বিরোধিতার এবং (খ) ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী সম্পর্কে আইনগত ও শাসনগত বৈষম্যের সৃষ্টি হইতে পারে। হতরায় জয়েন্ট-পারলামেন্টারী কমিটি ভারতে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্ত কতিপয় সুপারিশ করিয়াছেন—

(১) যুক্তরাজ্য (ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ড) হইতে ভারতে যে সকল পণ্যদ্রব্য আমদানী হইবে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত কিংবা শাসনগত বিধান নিরোধ করিবার ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেলের থাকিবে।

ভারতীয় কোন আইন পরিষদ কিংবা কোন সরকারের অধিকার থক্ক করিবার জন্ত এই বিশেষ ক্ষমতা দানের প্রস্তাব নহে। যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, কোন আইনের উদ্দেশ্য ভারতের স্বার্থ বৃদ্ধি বা রক্ষা নহে, যুক্তরাজ্যের স্বার্থহানি, তবেই এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করা হইবে।

(২) যুক্তরাজ্যের অধিবাসী কোন "ব্রিটিশ" প্রজার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার অধিকার থক্ক করিয়া কোন আইন খাটিবে না। তবে কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে বহিষ্কার করিবার অধিকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

(৩) বাসস্থল, স্বদেশ, বাসকাল, ভাষা, জাতি, ধর্ম বা জন্মভূমি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া কোন সর্ব বা নিষেধমূলক কোন আইন যুক্তরাজ্যবাসী কোন ব্রিটিশ প্রজার উপর ট্যাক্স, ভ্রমণ, বান, বিত্তরক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা বা বৃত্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।

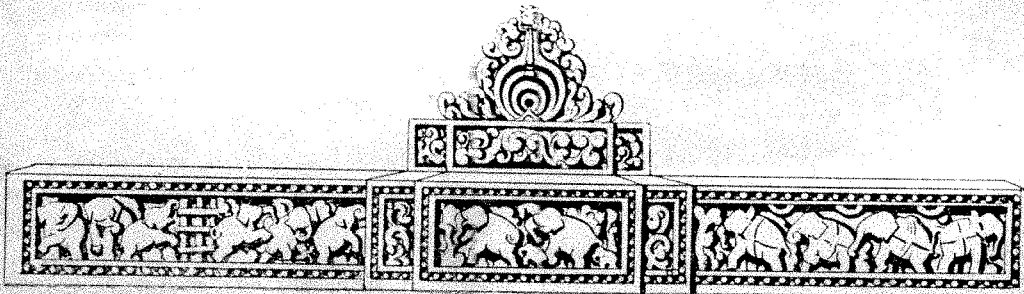
(৪) যুক্তরাজ্যে যে সকল বোধমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে বা হইবে, সেগুলি ভারতে যদি ব্যবসা কার্যে রত হয় তবে ডাইরেক্টর, অংশীদার, এজেন্ট ও কর্মচারীদের বাসস্থল, ভাষা, জাতি, ধর্ম, জন্মস্থান কিংবা মণ্ডলীর গঠনস্থান সম্পর্কে ভারতীয় আইন মান্ত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) ভারতে যে সকল বোধমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে বা হইবে, যুক্তরাজ্যবাসী ব্রিটিশ-প্রজা যদি তাহাদের ডাইরেক্টর, অংশীদার, এজেন্ট বা কর্মচারী হয় তবে ঐ সকল সম্পর্কে ভারতীয় আইনে নির্দিষ্ট সর্বগুলি পূরণ করা হইয়াছে ধরিতে হইবে।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড—

গত ৩১শে মার্চ ১৯৩৪ এই কোম্পানীর পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই বৎসরের জন্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। "অগ্রি"-শাখায় আলোচ্য বর্ষে নিট প্রিমিয়ামের পরিমাণ মোট ৩৪,৭২,৪১৫/০ আনা, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ২,৫২,০৮৪/৮ পাই কম। ব্যয়ভার পূর্ব বৎসরের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৪২.৯ ভাগ হইতে বাড়িয়া ৪৫.১ ভাগ হইয়াছে। কিন্তু এই বিভাগের সর্বপ্রকার রিজার্ভ ফাণ্ড নিট প্রিমিয়ামের পূর্ব বৎসরের শতকরা ৭৯.৮ হইতে বাড়িয়া ৯৮.৫ হইয়াছে। "সমুদ্র"-বিভাগে নিট প্রিমিয়াম পূর্ব বৎসরের অপেক্ষা ১,৩৫,৩০৮/১১ পাই কমিয়া ১২,৩৬,০২৬/৭ পাই দাঁড়াইয়াছে। ব্যয়ভার প্রিমিয়াম-আয়ের ১৬.১ ভাগ হইতে বাড়িয়া ১৭.৭ ভাগে উঠিয়াছে। মোট তহবিল পূর্ব বৎসর ছিল প্রিমিয়াম-আয়ের শতকরা ১১৩.৫ ভাগ, আলোচ্য বর্ষে ১২৮.১ ভাগ। "ডুগটনা"-বিভাগে নিট প্রিমিয়াম পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ২৩,৪৪৭/০ বাড়িয়া ৫,৪১,৯৪৪/২ পাই দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় প্রিমিয়াম-আয়ের শতকরা ৩৭.৮ হইতে ৪১.৪ উঠিয়াছে। ইহার রিজার্ভ পূর্ব বৎসরে ছিল প্রিমিয়াম-আয়ের শতকরা ৮৮.২, এবার শতকরা ৯৫.৩। "জুবন"-বিভাগে আলোচ্যবর্ষে ১,৪২,৯৯,৫৫০ টাকার পরিমাণে ৬,৬১৪ প্রস্তাব আসিয়াছে। পূর্ব বৎসরের বকেয়া প্রস্তাব ও এ-বৎসরের প্রস্তাব হইতে মোট ৫,৩৯০ "পলিসি" হইয়াছে, টাকার পরিমাণ ১,১১,৬৫,৪০০ মাত্র। এতদ্ব্যতীত ২২,০০০ টাকার ছুটি এন্ট্রিটি বণ্ড ও ২,০০,০০০ টাকার একটি "লীজহোল্ড রিডেম্পশন পলিসি" হইয়াছে। ১১,৮০৮ সংখ্যক সাধারণ পলিসি আলোচ্যবর্ষে বলবৎ, দাবির পরিমাণ ২,৮৪,২৫,৮৩৪/০ মাত্র। কোম্পানীর সর্বপ্রকার মোট তহবিলের পরিমাণ ১,৬৫,৯৪,৯৫৭/৮ পাই মাত্র। আলোচ্যবর্ষের কার্যদ্বারা তহবিলের পরিমাণ ২,০৩,৯৬৪/৯ পাই বাড়িয়াছে।

ভারতীয় বীমা মণ্ডলীর মধ্যে নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।



বহির্জগৎ

সারের ভবিষ্যৎ—

ফ্রান্স ও জার্মানীর সীমান্তে, সার নদীর উপকূলে, যে ক্ষুদ্র উপত্যকা আছে কিছুকাল যাবৎ জগতের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। এই সার (Saar) প্রদেশ বাংলার অনেক জেলার অপেক্ষা ছোট এবং যদিও জায়গাটি জনবহুল, এর লোকসংখ্যা আট লক্ষের বেশী হবে না। কিন্তু বর্তমান বছরে যুরোপের অল্প কোন প্রদেশ সার উপত্যকার অর্ধেক প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। এই অসাধারণ খ্যাতির কারণ— আগামী ১৩ই জানুয়ারী সারের অধিবাসীবৃন্দের ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হবে তাদের দেশ জার্মান রাইশের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, না ফ্রান্সের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, অথবা যে ভাবে আছে সেই ভাবেই থাকবে।

১৯১৯ সনের ভাসাইয়ের সন্ধিতে এই ক্ষুদ্র প্রদেশটিকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র শাসনাধীনে আনা হয়।

সার কয়লার খনিতে ভরা। যুদ্ধের আগে এই কয়লার খনিগুলি প্রধানতঃ প্রুশিয়া ও বাভেরিয়া গভর্নমেন্টের হাতে ছিল। এই সব কয়লার খনিতে ষাট হাজার লোক খাটত এবং ১৯১২-১৩ সনে বছরে এক কোটি ব্রিশ লক্ষেরও বেশী কয়লা উৎপন্ন হত। প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে জার্মানীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দেড় লক্ষ লোক এখানে এসে নতুন করে বসবাস স্থাপন করেছে।

যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কয়লার খনিগুলি দাবি করে, কলে, কয়লার খনিগুলি, বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্র, রেলপথ, স্কুল, মন্ড-বাড়ি, হাসপাতাল ইত্যাদি ফ্রান্সের সম্পত্তি হয়ে যায়। এই সবের মূল্য জার্মানীর নিকট প্রাপ্য ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

মার্কিনের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ইচ্ছানুসারে ইহার শাসনভার বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের হাতে সম্ভূত হয়। তিনি প্যালেস্টাইন কিংবা সিরিয়ার স্থায় সারকে কোন বিশেষ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখতে চান নি, কারণ সার স্বায়ত্ত-শাসনের অযোগ্য এ কথা বলা ভুল। পক্ষান্তরে, ডানসিগ শহরের শাসনপদ্ধতি বেশী স্বাভাবিক মনে হওয়ায়, অল্প ব্যবস্থা করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। অতএব, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের ওপর এই দেশের শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে একটি শাসন-পরিষদ (Governing Commission) সারের গভর্নমেন্ট পরিচালনা করেন। এই পরিষদের পাঁচ জন সদস্য—এক জন ফরাসী, এক জন সারবাসী, এক জন ফিন্ (ফিনল্যান্ডের লোক), এক জন যুগোস্লাভ ও এক জন আইরিশমান। আইরিশমান জেওফ্রে জর্জ নকস শাসন-পরিষদের বর্তমান সভাপতি। তিনি এই কাজে দু-বছরের বেশী নিযুক্ত আছেন। এই পরিষদ সকল কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন এবং যে-কোন প্রয়োজনীয় শাসন-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। সার সম্বন্ধে ভাসাইয়ে-সন্ধির নির্দেশের ব্যাখ্যা ভোটাধিকারে নিরূপণ করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। অবশ্য মনে রাখা দরকার, সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাষ্ট্রসংঘের হাতে। সারের আইন ও তার পরিচালনা-ব্যবস্থা পূর্ববৎ আছে, শুধু কয়েক জন

আন্তর্জাতিক আইনজীবী নিয়ে একটি উচ্চতম আদালত নতুন করে স্থাপন করা হয়েছে।

জার্মানী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বরাবরই আন্দোলন করে এসেছে। হিটলারের শাসনভার নেবার পর থেকে এই আন্দোলন বিশেষভাবে



সারা গুম্বাচ। এই মার্কিন মহিলা সারের ভোটাগণনা পদ্ধতির নির্দেশ দিবেন



সারের শাসন-পরিষদের সভাপতি নক্স

বেড়ে উঠেছে। যে জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা মাত্র দু-জন ফরাসী সেই জায়গা জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যুক্তিহীন, কিন্তু জার্মানরা ১৮৭০-৭১ সনের ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধের পর যেমন আলসেস-লোরেইন জেতা দখল করে বসেছিল ফরাসীদেরও গত মহাযুদ্ধের পর সেইরকম কিছু করার ইচ্ছা যে ছিল না, তা বলা যায় না। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে সে ক্ষতির অর্ধেকও পূরণ হয়নি। সে যা হোক, ভাসাইয়ে-সন্ধির সর্ব অস্থায়ী রাষ্ট্রসংঘ ১৯২০ সনের ১০ই জানুয়ারী থেকে পনের বছর অতীত হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব সারবাসী কার শাসনাধীনে থাকতে চায় ভোট নিয়ে তা জানতে এবং সেই নির্দেশমত ব্যবস্থা করতে বাধ্য।

গত ১লা জুন ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে টিক হয়েছে যে আগামী ১৩ই জানুয়ারী এই ভোট নেওয়া হবে। রাষ্ট্রসংঘের মহত্ত্ব-সভা এটা মেনে নিয়েছেন এবং ভোট নেবার ব্যবস্থা করার জন্ত কতকগুলি ট্রাইবিউন্সাল, কমিটি, কমিশন, ইত্যাদি নিযুক্ত করেছেন।

এই ভোট গণনা সাধারণ নির্বাচন নয়। জার্মানীর বিপক্ষে ফ্রান্স ও অন্যান্য “মিত্র” শক্তি এই প্রদেশ বর্তমান শাসনে রাখতে চান। যদিও সারবাসী ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাই-ই হবে, তথাপি সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ কিন্তু কেহ আশা করেন না। জার্মানীও নিজের জায়গা ফিরে পেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জার্মানী সার প্রদেশ ফিরে পেতে কতটা উদগ্রীব তা বোঝা যায় হের হিটলারের কথা থেকে। তিনি বলেছেন, একমাত্র সার ছাড়া



সারের অধিবাসীদের মনে দেশাত্তবোধ উদ্ভোধনকল্পে ডক্টর গোয়েবেলস একটি সার বালিকার নিকট হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিতেছেন

আর কোন প্রদেশ নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর বিবাদ নেই। তিনি একথাও বলেছেন যে, যদি কোন গোলমাল না হয়ে এই সমস্তার মীমাংসা হয়ে যায়—অর্থাৎ, জার্মানী যদি সার ফিরে পায়, তাহলে দুই দেশের মধ্যে স্বগড়া করার কিছু থাকবে না। অতএব নিরীক্সবাদে সার-সমস্তার মীমাংসার ওপর বর্তমানে যুরোপের শান্তি অনেকটা নির্ভর করছে এবং এইজন্য সার এত প্রাধান্য লাভ করেছে। ফ্রান্সের প্রতি হের হিটলারের এইরূপ অনুরোধের কারণ, সারবানী কোনদিকে ভোট দেবে সে-বিষয়ে জার্মানীর যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। যদিও সারবাসীরা বেশীর ভাগই জার্মান, তাদের মধ্যে অনেকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হতে নারাজ। এর প্রধান কারণ, বর্তমান জার্মানীতে নাৎসিদের আধিপত্য। গত দু-বছরের মধ্যে অনেক কমিউনিষ্ট ইহুদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক পলাতক সারের আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মুখ থেকে নাৎসিদের কর্তী-কাহিনী অনেকই শুনেছে এবং তাদের মধ্যে সেখানকার রাইশ গভর্নমেন্টের প্রতি একটা প্রবল বিতর্পিতা জেগে উঠেছে। বিশেষতঃ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী, ইহুদী, সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীর লোক কোন মতেই নাৎসিদের হাতে পড়তে নারাজ! প্রতিবুল ভোটের ভয়ে কিন্তু নাৎসিদের উচ্চম আঁও বেড়ে গেছে। সারের মধ্যে একটি নাৎসি দল ও তাদের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। হের হিটলার ও তাঁর দল সর্বপ্রকারে সারস্থিত তাঁদের পক্ষপাতী দলকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছেন। দুই দিকেই সভা, সমিতি ও আন্দোলন খুব প্রবলভাবে চলছে। নাৎসি গভর্নমেন্ট সারের আন্দোলন চালাবার জন্তে গত বছর ভাইস-চ্যান্সেলার হের ফন পাপেনকে নিযুক্ত করেন, এ বছর পাপেন মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগ করবার পর পালাটিনেটের নেতা হের জোসেফ ব্র্যেগেলকে সেই পদে নিযুক্ত করেছেন। নাৎসি গভর্নমেন্টের প্রচার বিভাগের স্ত্রী ডাক্তার জোসেফ গোয়েবেলস এই কাজে বিশেষ অগ্রণী। তাঁর কাজ বেতার ও সংবাদপত্রের সাহায্যে সারবাসীদের পিতৃভূমির প্রতি দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা। বড় বড় সভা করে সারের নাৎসিদের জন্তে অর্থ জুগিয়ে, সারের বেকার যুবকদের জার্মানীর শ্রমিক-আজ্ঞায় এনে তাদের ভরণ-পোষণ করে সারবাসীদের গত দেড়

বছরে জানানো হয়েছে সার জার্মানীর কত প্রিয়! কিন্তু এতেও সারবাসীর ভোটের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে না পেরে নাৎসিরা ভোটের দিনে বিপক্ষদলকে বাছবলে হারাতে মনস্ত ক'রে ভিতরে ভিতরে বড়বয় করেছে। সারের প্রেসিডেন্ট নক্স নাৎসি দলের এই সব অস্থায়ী আচরণের পক্ষপাতী নন, তাই তিনি এই বড়বয় দমন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু সারের পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের বেশীর ভাগ লোকই নাৎসিদলভুক্ত, তাই শান্তি রক্ষা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে উঠেছে। এই জায়গারী যতই এগিয়ে আসছে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ততই বাড়ছে। কিছুকাল আগে নক্স সাহেব রাষ্ট্র-সংঘকে জানান যে, ভোট গ্রহণ করার দিন তিনি বাইরের বিনা সাহায্যে শান্তিরক্ষা করতে সমর্থ হবেন না। যদিও একথা সত্য যে, অন্যান্য সন্ত্রাসী অবস্থায় তিনি করাসী-সৈন্যের সাহায্য নিতে পারেন, তথাপি জার্মানীর এতে প্রবল আপত্তি থাকতে এই পন্থা কেহ যুক্তিঙ্গত মনে করেন না। অতএব ঠিক হয়েছে, বুটেন, ইটালী, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশের সৈন্য সারের ভাগ-নিয়ন্ত্রণের দিন শান্তি রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

যদিও সারে জার্মানদের বড়বয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রি এন্ লাভাল ও হের ফন নররাথ উভয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করেছেন যে, কোন প্রকারে কোন পক্ষ হইতে অস্থায়ী চেষ্টা হবেনা, তবুও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুশ্বির হওয়া কঠিন। প্রথমতঃ, জার্মানীর কথার তেমন মূল্য নেই। ভোট যদি তার বিরুদ্ধে যায় তা হলে তার জ্রোণ ও অসন্তোষ দ্বিগুণ হয়ে জ্বল উঠবে। অষ্ট্রিয়াতে নাৎসিদের আচরণে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাৎসিরা যেখানে আইনতঃ উদ্বেগ সাধন করতে পারে না সেখানে পক্ষবিক শক্তি নিয়োগ করতে তাদের দ্বিধা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, ভোট গণনার দ্বারা সারবাসীর কি নির্দেশ বোঝা যাবে? সারবাসীর সামনে এখন তিনটি পথ রয়েছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন যদি জার্মানীর পক্ষে ছ-জন, সার স্বতন্ত্র থাকবাব পক্ষে চার জন ও ফ্রান্সের পক্ষে তিন জন—এই অনুপাতে সারবাসীরা ভোট দেয় তাহলে কি সিদ্ধান্ত হবে? জার্মানীর পক্ষে সবচেয়ে বেশী ভোট, অতএব জার্মানী দাবি করবে সার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু যেহেতু তার বিরুদ্ধে মিলিত ভোট-সংখ্যা বেশী, সেইজন্য দ্বিতীয়বার ভোট নেওয়া দরকার হবে এবং এই দ্বিতীয় বারে যদি সারের পক্ষে এবং জার্মানীর বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা অধিক হয়, তখনও আর একবার ভোট নিয়ে দেখতে হবে যে যখন ফ্রান্স ও জার্মানীর সঙ্গে মিলিত হওয়াই দুটি মাত্র উপায় তখন সারের জনমত কোন দিকে।

রাষ্ট্রসংঘ কিন্তু এ কথা বলেছেন যে, সন্ধির সর্ব অন্তিম সারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মত নিয়ে ঠিক হবে সেই সেই অংশ ভবিষ্যতে কোন শাসনাধীনে থাকতে চায়। জার্মানী যে এতে আপত্তি করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভোট দেবার দিন অনেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করবে কিনা, কারণ নাৎসিরা অনেক দিন ধরেই তাদের বিপক্ষদলকে শাসিয়ে আসছে এই বলে যে

* প্যারীর বিখ্যাত সংবাদপত্র ল্য মাভ্যা (Le Matin) বলেছেন, এই প্রাতি কিন্তু যুদ্ধের আগে ছিল না, এবং সার ফিরে পাবার পর থাকবে কিনা সন্দেহ।

“সার একবার আমাদের হাতে আমুক, তারপর তোমাদের দেখে নেব।” নাৎসিরা যে অনেককে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইরূপ আতঙ্ক-স্থিতির ফলে যদি বেশীসংখ্যক ভোট জার্মানীর পক্ষে যায় তাহলে প্রেসবাইট ট্রাইবিউনাল তা নাকচ করে দিতে পারেন।

এক জন সাংবাদিক রোম থেকে খবর দিচ্ছেন যে, সিনর মুসোলিনী সারবাসীদের একটি স্বাধীন শাসনতন্ত্র উপহার দিতে মনস্থ করেছেন। এই খবর সত্য কি মিথ্যা এখনও জানা যায় নি, তবে এটা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে ১৩ই জানুয়ারীর ভোটের ওপর সব নির্ভর করবে। একজন বিচক্ষণ সংবাদদাতা বলছেন ৩০এ জন জার্মানীতে যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে তাই দেখে অনেকে “পিতৃভূমির” প্রতি বিমুগ্ধ হয়েছে এবং আগে এই ভোট-মুগ্ধ জার্মানীর জয় হবার যে সম্ভাবনা ছিল তা এখন বিলীন হয়েছে। সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র মতাবলম্বীরা ও ক্যাথলিক পাদরীরা তাদের মতভেদ ভুলে গিয়ে আশ্চর্যরূপে মিলিত হয়েছে। এখন সাধারণ ক্যাথলিকদের ওপর সারের ভাগা নির্ভর করছে। অনেকে আশা করেন, ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ এই বিষয়ে সারের ক্যাথলিকদের জার্মানীতে ফিরে যাবার বিরুদ্ধে ভোট দিতে আজ্ঞা দিতে পারেন, কারণ গত বছর হিটলারের সঙ্গে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তি হিটলার ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু পোপের ইচ্ছা থাকলেও এইরূপ কোন নির্দেশ দিতে বোধ হয় সাহস করবেন না কারণ, তাহলে জার্মানীতে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিকদের ওপর আরও অত্যাচার হতে পারে।

নাৎসিদের পথে যতই বাধাবির থাকুক তারা কিন্তু চুপ করে বসে নেই। জার্মানী সকল জায়গায়, এমনকি হুদুর কানাডায় পর্যন্ত, যে সকল লোকের সার প্রদেশে ভোটাধিকার আছে তাদের খুঁজে বের করছে। জার্মান গভর্নমেন্ট তাদের যাতায়াতের খরচ বহন করবেন। এই উৎসাহ দেখে মনে হয়, শেষ পর্যন্ত হিটলারই জয়ী হবেন। কিন্তু তাঁর এই আশা যদি সফল না হয় তাহলে সার যুরোপে আর একটি মহাযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফ্রান্স, ব্রুটেন, ইটালী—যারা ১৯১৪ সনে নিপীড়িত বেলজিয়ানদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, আজ বিপদগ্রস্ত নাৎসি-বিরোধী সারবাসীদের পিছনে দাঁড়িয়েছে। ফলাফল কি হয় দেখতে জগতের লোক উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে।

মাসাইয়ে হত্যার জের—

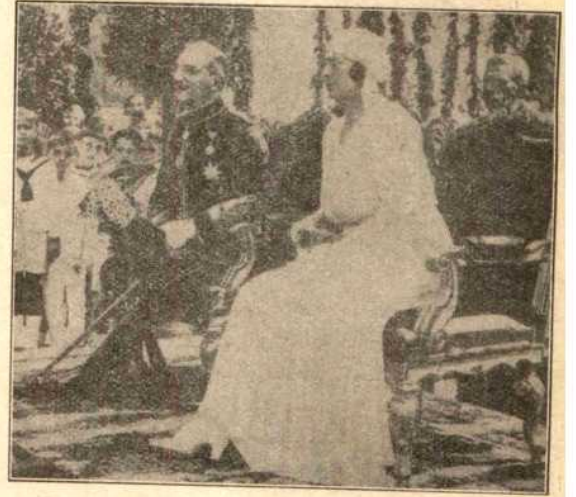
মাসাইয়েতে অক্টোবর মাসের প্রথমে যে হত্যাকাণ্ড ঘট তার ফলে হাঙ্গেরী ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বিরোধ আরও প্রকটাকার ধারণ করেছে।

যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্ডার ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব এম্ বাথু যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্বর্তী জোট প্রদেশের বিপ্লবীদের বড়ঘরে নিহত হন। এই ঘটনার পর আততায়ী কালেমানের যে-সকল সহকারী ধৃত হয়েছে তাদের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, তারা এই কার্য করার জন্য হাঙ্গেরীতে বিশেষ ভাবে তৈরী হয়েছিল। হত্যাকারী কালেমান ও তার সহচরবৃন্দ সকলেই ইতিপূর্বে নানা দোষে দণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু দণ্ড গ্রহণের পূর্বেই তারা পালিয়ে গিয়ে হাঙ্গেরীতে আশ্রয় নেয়। গত মাসে যুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব এম্ য়েভ্ টিট্চ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে হাঙ্গেরীর ওপর দোষারোপ করে বিশ্বরাষ্ট্রসভায় যে লিপি পেশ করেছেন কয়েক দিন হাল এর কাউন্সিলে তার আলোচনা হয়ে গেছে। হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি

হের একহাউট্ এম্ য়েভ্ টিট্চের দোষারোপে বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করেন। এই আলোচনার সময় বিশেষ চাকল্যের স্বত্ব হয়।



ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব বাথু



যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্ডার ও রাণী মারি

এম্ য়েভ্ টিট্চ রাষ্ট্রসভায় এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, যুগোস্লাভিয়া থেকে বিপ্লবী পলাতকরা হাঙ্গেরীতে সর্বদাই আশ্রয় পেয়ে থাকে। গত ছ-বছরের মধ্যে হাঙ্গেরীর সীমান্তের নিকটবর্তী যুগোস্লাভিয়ার স্থানবিশেষে বহু হত্যাকাণ্ড ও অশান্ত সন্ত্রাসবাদ-মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই অপকর্মকারীরা সকলেই হাঙ্গেরী থেকে ওখানে গুপ্তভাবে এসে থাকে। ইহারা হাঙ্গেরীতে থেকে বিপ্লব ঘটাবার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করেছে। এই সকল অভিযোগ দলিল-দস্তাবেজ ও আলোকচিত্রের সাহায্যে সমর্থিত হয়েছে। যে বড়ঘরের ফলে মাসাইয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তাতেও হাঙ্গেরীর অনেক রাজ-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি বলেন, এই অভিযোগ তাদের বিপক্ষ ক্ষুদ্র মিত্রশক্তিবার্গের* (Little Entente) রাজনৈতিক চাল, কিন্তু পরিশেষে রাষ্ট্রসভার সদস্যদের মিলিত অনুরোধে হাঙ্গেরিয়ান ও পলাতক ক্রোটিয়ানদের দোষ তদন্ত করতে এবং তার পর অপরাধীদের শাস্তি দিতে সন্মত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্য যুরোপীয় শক্তিবর্গ একটা অসম্মত বিপদের হাত হতে মুক্ত হয়েছেন।

১৯১৪ সনে সার্বিয়ায় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের হত্যার ফলে মহাসমরের আগুন জ্বলে ওঠে। এবার হাঙ্গেরী ও যুগোস্লাভিয়ার বিরোধ বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ আপোষে নিষ্পত্তি করেছেন। বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ না থাকলে এর ফল যে কি ভয়াবহ হত তা সহজেই অনুমেয়।

লণ্ডন নৌ-শক্তি সম্মেলন—

বিগত মহাযুদ্ধের পর জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তঃসত্ত্বার এত ক্রত গতিতে বেড়ে উঠেছে যে, কোন প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা ইহা নিরোধ বা হ্রাস করার পন্থা অবলম্বন করতে সকল রাষ্ট্রই এখন উৎসুক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক কারণে সকলের আর্থিক অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও শক্তিবর্গের অন্তঃসত্ত্বার ক্রমশঃই বেড়ে উঠছে।



এ্যাডমিরাল স্ট্যান্ডলি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের প্রধান উপদেষ্টারূপে লণ্ডনের নৌ-সম্মেলনে যোগদান করেন

১৯০২ সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আলোচনা চলে আসছে কিন্তু তার ফলে আজ পর্যন্ত জগতের এই ভয়াবহ অস্ত্র-সমস্তার কোনও মীমাংসা হয় নি। সম্প্রতি মার্কিনের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল্‌হাউ ও বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যেক্ষণ মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয় নিরস্ত্রীকরণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু গত জুন মাসে জেনিভায় শেষ চেষ্টা করে এসে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান পুনর্বার কথাবার্তা আরম্ভ করেন। গত জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তাদের নৌ-বহর সীমার মধ্যে রাখার কথাবার্তা বন্ধ ছিল। গত নবেম্বর মাসে লণ্ডনে এই আলোচনা আবার আরম্ভ হয়।† ওয়াশিংটনে ১৯২২ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য, আমেরিকা, জাপান,

ফ্রান্স ও ইটালী—এই পাঁচটি শক্তি তাদের তখনকার নৌ-শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকের নৌবহর এক একটা বিশিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে সন্মত হন। পরস্পরের নৌ-শক্তি রেবারেধি করে না বাড়িয়ে আপোষে এই সমস্তার মীমাংসা করার এই প্রথম চেষ্টা—এবং ইহা



জাপানের প্রধান মন্ত্রী এ্যাডমিরাল ওকাডা

আংশিক ভাবে সফল হয়। বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজগুলির সংখ্যা ও মিলিত 'টনেজ' এই সম্মেলনে নির্ধারিত হয়। কিন্তু সকল শ্রেণীর রণপোতের সংখ্যা ও টনেজ সীমাবদ্ধ না হওয়ায় ১৯২৭ সনে যখন জেনিভায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের প্রারম্ভিক আলোচনা চলছিল তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কুলিজের আহ্বানে একটি নৌ-বৈঠক বসে। কিন্তু এই বৈঠক সম্পূর্ণ বিফল হয়। পরে, ১৯৩০ সনে লণ্ডনে আর একটি নৌ-বৈঠক বসে। তাহাতে ১৯২৭ সনে জেনিভায় উপস্থাপিত সমস্তা-গুলির সমাধান হয় ও জুজার, ডেস্ট্রয়ার ও সাবমেরিন সম্পর্কে এক চুক্তি হয়। শুধু প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কেই পাঁচটি শক্তি নিজেদের মধ্যে একপ্রকার বাবস্থা অনুমোদন করেন।

লণ্ডন-চুক্তির নির্দেশ মত ১৯৩৫ সনে আবার মিলিত হয়ে এই পাঁচটি প্রধান নৌ-শক্তির আগেকার দুই চুক্তিই আলোচনা করবার কথা। এই সভায় যদি কোন নূতন চুক্তি খাড়া না করা যায় তাহলে ১৯৩৬ সনের শেষ দিনে লণ্ডন নৌ-চুক্তির মেয়াদ স্বতঃই শেষ হবে। যদি একটি কিংবা একাধিক শক্তি তাঁর বা তাঁদের ইচ্ছা ১৯৩৬ সন শেষ হবার আগে জ্ঞাপন করেন তাহলে ওয়াশিংটন নৌ-চুক্তি এই সঙ্গে রদ হবে। ১৯৩৬ সনের মে মাসে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে জাপান অস্বাভাবিক স্বাক্ষরকারীদের জানায় যে, সে অস্বাভাবিক তুলনায় নিজের জন্ত বৃহত্তর নৌবহরের দাবি করবে। জলপথে আমেরিকা ও বৃটেন তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। এরা এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়েছে। অতএব আশা করা যায় যে, জাপান যখন ওয়াশিংটন-চুক্তি নাকচের বিষয় বিজ্ঞাপিত করবে। এমন কি, এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী ফরাসী ও ইটালীকে সে এই কার্যে যোগ দান করতে আহ্বান করেছে, কিন্তু এই দুই শক্তিই এই বিষয়ে জাপানের সঙ্গে একমত হতে পারে নি।

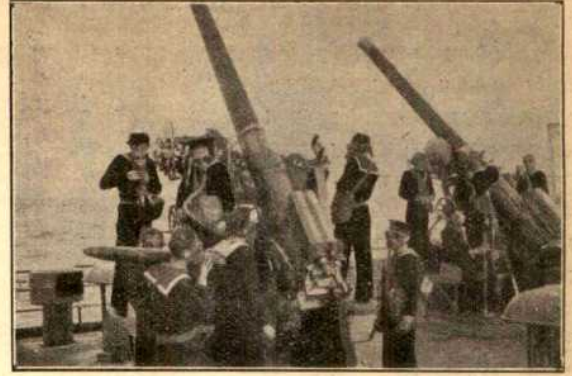
আগেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে প্রতিযোগিতার মূলে রাজনৈতিক কারণ বর্তমান। অতএব

* রুমিনিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া।

† লণ্ডন হইতে প্রেরিত গত ১২ই ডিসেম্বরের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, এই আলোচনা আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রবাসীর সম্পাদক।

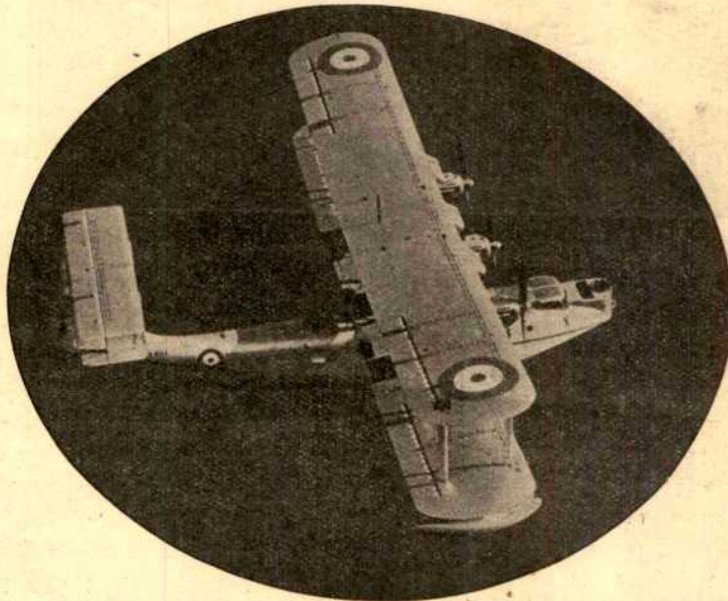
জাপানের দাবির পেছনে কোন অভিসন্ধি নিহিত আছে কি-না জানা প্রয়োজন।

১৯২২ সনে ওয়াশিংটনে যে-সকল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নব-শক্তি-চুক্তি (Nine Power Treaty) ও চতুষশক্তি-প্রশান্ত-মহাসাগরিক-চুক্তি (Four Power Pacific Treaty) তাদের অন্তর্গত। এইগুলিকে ভিত্তি করেই ওয়াশিংটন নৌ-চুক্তি রচনা হয়। প্রথম দুটি চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন চীনের তার পুরোপুরি স্বাধীনতা অর্জন করতে সাহায্য করা। শক্তিবর্গ গত মহাযুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে লিপ্ত থাকায় জাপান মাফুরিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তার করে এবং একশটি দাবি করে চীনের কাছ থেকে নানা স্বকম হবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। স্থানটান্ডের জার্মান উপনিবেশও সে দখল করে। ১৯২১-২২ সনে ওয়াশিংটনে এইজন্ম জাপানী সাম্রাজ্যবাদেরই বেশী সমালোচনা হয়। পরিশেষে, নব-শক্তি-চুক্তিতে চীনদেশে “খোলা দরজা”র (“open door”-এর) নীতি বিশেষভাবে বর্ণিত হয় এবং স্বাক্ষরকারী নয়টি শক্তি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, চীন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও পর্তুগাল—প্রতিশ্রুত হন যে, তারা প্রান্তিক প্রাচীতে (Far East) শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবেন, চীনের স্বার্থ ও দাবি মেনে চলবেন এবং চীন ও অষ্টান্ত শক্তির ভেতর সমভাবে মেলামেশার স্বত্র স্থাপন করবেন।



‘হুড’ রণপোতে যুদ্ধনীতি শিক্ষা

এর আগে, অষ্টান্ত সকলেই হবিধামত পরের দেশ অধিকার করেছে; জাপানও ১৯৩১ সনে মাফুরিয়ায় ঠিক তাই করেছে। বিদেশী শক্তিবর্গের মধ্যে আমেরিকাই জাপানের এই অষ্টায় অধিকারের সবচেয়ে বেশী আপত্তি করেছে। এবং মার্কিন



ব্রিটিশ আকাশ-বাহিনীর জন্ম নবনিশ্চিত তিনটি রোলস্-রয়েস্ যন্ত্রবিশিষ্ট সামুদ্রিক বিমানপোত। সমুদ্রভাগে গোলাবর্ধন করিবার স্থান আছে

কিন্তু জাপান তার এই অস্বীকার রক্ষা করে নি। তার সাম্রাজ্য-লালস! তাকে যে-সকল অষ্টায় কাজে প্রণুত করেছে সেই-গুলিই আজ প্রশান্ত মহাসাগরে এক প্রকাণ্ড সমস্তার সৃষ্টি করেছে। ‘জাপানী বয়কট’ প্রভৃতি আন্দোলনে চীনের অষ্টায় আচরণ হয়েছে, এই অজুহাতে জাপান চীন আক্রমণ করে তার মাফুরিয়া প্রদেশ ও জেহোল দখল করে বসেছে। এর ফলে অষ্টান্ত শক্তির স্বার্থের হানি হয়েছে এবং সকলেই আপত্তি করেছে।

যে তার নৌ-বাহিনী বাড়ানোর সঙ্কল্প করেছে তার মূলে যে প্রধান কারণ বর্তমান তা এই—জাপানকে সে চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরে ইচ্ছামতো রাজ্যবিস্তার করতে দিতে চায় না। জাপানের মাফুরিয়া-অধিকারে ওয়াশিংটন কনফারেন্সের সেই পুরাতন সমস্তার (কি ভাবে জাপানের সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করা যায়) আবার উদয় হয়েছে। এই ব্যাপারে জাপান যে নব-শক্তি-চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্ম আজ পর্যন্ত একটি যুদ্ধ রাষ্ট্র ছাড়া

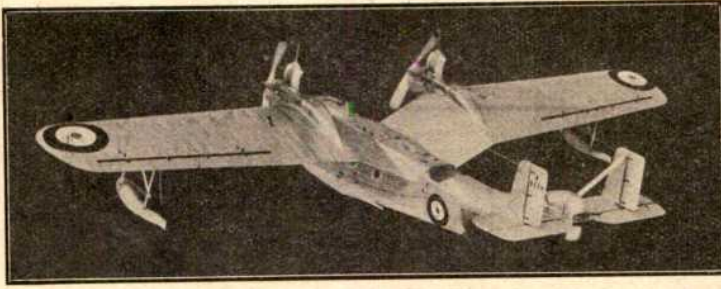
জগতের অন্য কোনও রাষ্ট্র জাপানের প্রতিষ্ঠিত 'মাকুয়ো'কে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নি।

ওয়াশিংটনের চতুঃশক্তি-প্রশান্তমহাসাগরিক-চুক্তি কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান ও ফ্রান্স প্রশান্তমহাসাগরে পরস্পরের স্বার্থের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে স্থির হয়, এবং এই নতুন চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ১৯০২ সন থেকে যে ইঙ্গ-জাপান মিত্রতা চলে আসছিল তা রদ করা হয়। আমেরিকা এই চুক্তির ফলে আগের চেয়ে নিরাপদ হয় বটে, কিন্তু ব্রিটেন এই নতুন ব্যবস্থায় প্রশান্তমহাসাগরে তার শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং বৈঠকের দু-বছর পরেই সিঙ্গাপুরে তার নৌবাহিনীর নতুন ঘাঁটি নির্মাণ আরম্ভ করে। এই ঘাঁটি প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করবার জন্ত তৈরী হয়েছে। চীনদেশে জাপানের কার্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রিটেনের এই ভয় বা অবিধাস অমূলক নয়। পক্ষান্তরে, জাপান কিন্তু এই নতুন ঘাঁটি রচনাকে স্বনজরে দেখতে পারে নি। এই আয়োজন যে তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সরঞ্জাম, একথা নিয়ে জাপানী সাংবাদিকেরা

কোন শক্তির না থাকে তাহলে যতই কেন না আপোষ বা চুক্তি হোক কোনটোতেই কোন ফল হবে না। সাংবাদীতে যখন বিনা দোষে হাজার হাজার চীনের জীবন জাপানী গোলা-বারুদে শেষ হল এবং তারপর যখন জাপান চীনরাষ্ট্রের দুর্বলতার সুবিধা নিয়ে তার এক বিশাল ভূখণ্ড দখল করল তখন বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের চুক্তি, নব-শক্তি-সন্ধি ও কেলগ-রিয়ঁ প্যাক্ট সকলই উবিয়ে গেল। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের লিটন কমিটির নির্দেশ ও অন্ত্যায় রাষ্ট্রের চীনের পক্ষ সমর্থন তার পছন্দ না হওয়ায় সে এই সজ্ঞ ত্যাগ করল।

যদি বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ বা কেলগ-রিয়ঁ প্যাক্টেরই এই পরিণতি হয় তাহলে লণ্ডন নৌ-চুক্তিরই বা কতটুকু সার্থকতা থাকতে পারে?

আরও মনে রাখতে হবে যে, যদি বা বড় বড় রণতরীর কামান ও টেনেজ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় তথাপি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা বা তার আশঙ্কা কিছুমাত্র কমবে না। কার্যন যুদ্ধের উপকরণ শুধু এইগুলিই নয়। এরোপ্লেন ও বিমান গ্যাসের ক্ষমতা এদের চেয়ে অনেক বেশী। সাধারণ এরোপ্লেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধের উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। বিমান গ্যাস



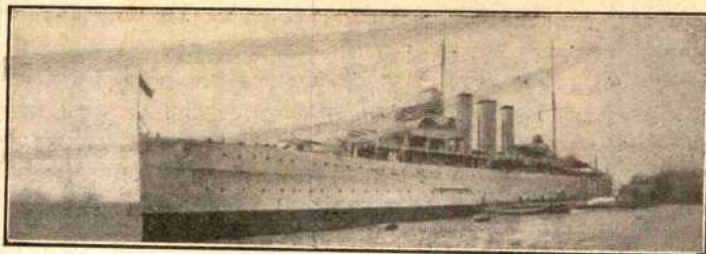
আধুনিক সামুদ্রিক বিমানপাত। ইহার বিস্তারিত পক্ষদ্বয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

তাদের দেশে প্রভূত আন্দোলন করেছেন। বর্তমানে জাপান ওয়াশিংটন ও লণ্ডন চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা ও ব্রিটেনের নৌবাহিনীর মাত্র তিনপঞ্চমাংশ রাখতে পারে। জাপানের নৌবিজ্ঞান-বিশারদগণ কয়েক বছর আগে বলেছিলেন তাঁদের দেশের শক্তি আর একটু বর্ধিত করলেই তা বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এখন কিন্তু জাপান দাবি করছে—ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে তার সমতা চাই! জাপানের এই নতুন দাবির অন্তর্নিহিত কারণ, জাপান মার্কিনকে যেমন এতদিন ভবিষ্যতের শত্রু বলে মনে করে এসেছে, ব্রিটেনকেও বর্তমানে সেইরূপ একটি শত্রু মনে করে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপানের শক্তি ওয়াশিংটন চুক্তি মতে ৫:৫:৩ এই অনুপাতে ধার্য হয়েছে, মধ্যপ্রশান্তমহাসাগর কেন্দ্রে এদের শক্তি ৪:২:৩ অঙ্কে ফেলা যায়। অধিকন্তু জাপান আমেরিকা ও সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে এবং এতদূর থেকে তাকে আক্রমণ করা সহজ নয়। তা ছাড়া ব্রিটেন ও আমেরিকার স্বার্থ জগৎব্যাপী এবং তা রক্ষাবেক্ষণের জন্ত তাদের বৃহত্তর নৌবাহিনী প্রয়োজন। অতএব ইহা নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে, জাপানের দাবি মেনে নিতে ব্রিটেন কিংবা আমেরিকা কেহই রাজি হবে না।

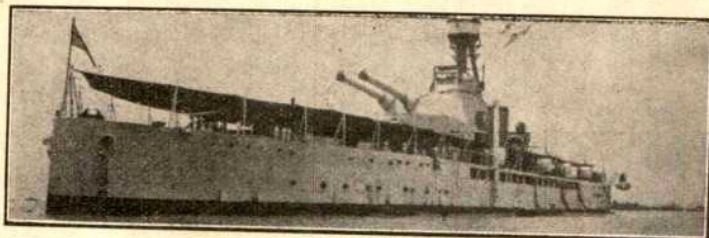
এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শান্তিরক্ষার সাধু ইচ্ছা যদি

মেয়েদের জন্ত সুগন্ধি দ্রব্যাদি, মোটরের তেল অথবা রোগীদের জন্ত ওষুধ তৈরীর কারখানায় প্রস্তুত করে অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায়। তারপর এ কথাও টিক যে, সন্ধিসমর্ত্তগুলি লঙ্ঘন না করেও প্রভূত অর্থব্যয়ে যে-রকম যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ করা যায় তা এই প্রকার সন্ধির মূল কুঠারখাত করে। জাপানীরা পকেট রণতরীগুলি এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভাসাইয়ে সন্ধির যুদ্ধসম্পর্কীয় ধারণাগুলি কঠোরতর করে মিত্রশক্তিবর্গের দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, জাপানীরা যুদ্ধ করবার ক্ষমতা একেবারে বিনষ্ট হল। কিন্তু ইদানীং জাপানী গবেষণা ও অর্থব্যয় করে যে যুদ্ধসত্তার রচনা করেছে তার ভয়ে জাপানীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আজ উদ্ভিগ।

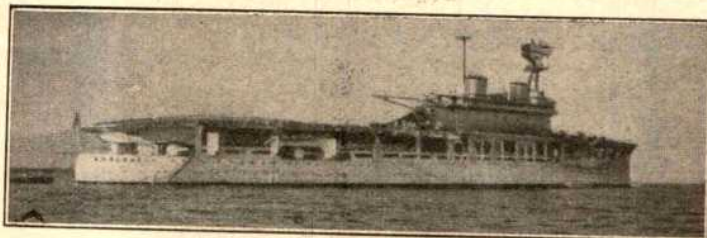
এইসব কারণে আগামী বছরের নৌ-সম্মেলনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু আগামী বছরের নৌ-বৈঠক বসবে কি-না সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে! জাপান যে তার নৌবহরে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে সমতার দাবি করেছে জগতের শান্তির ওপর তার ফলাফল উপেক্ষা করা যায় না। একথা মনে রাখা দরকার যে, একমাত্র জাপানীরা অসম্মতিতে কিছুকাল আগে নিরস্ত্রীকরণ-সম্মেলন যে সমস্তায় পড়েছেন সে সমস্তার আজও সমাধান হয় নি।



সিঙ্গাপুর নৌ-বহরের ব্রিটিশ জাহাজ 'কেপ্ট'



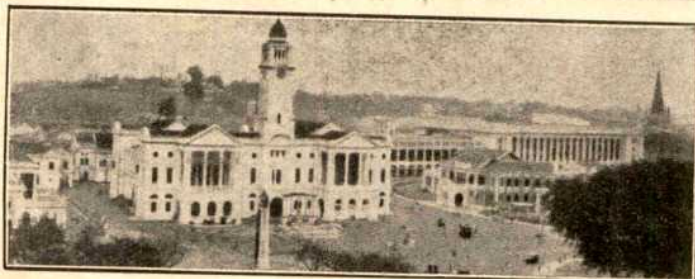
সিঙ্গাপুরের তাঁর প্রদেশ রক্ষাকল্পে নিয়োজিত
ব্রিটিশ রণপোত—'টেরর'



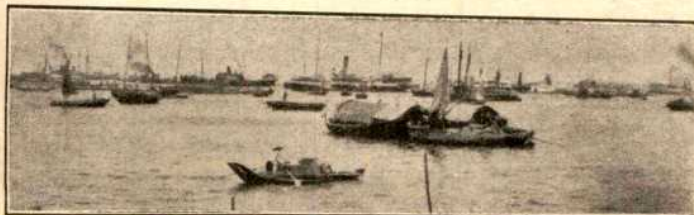
সিঙ্গাপুরে বিমানপোতবাহী রণতরী 'ঈগল'



সিঙ্গাপুর হইতে নোম্বাটিতে বাইবার পথ



সিঙ্গাপুরের ভিক্টোরিয়া উদ্যানের দৃশ্য



সিঙ্গাপুর বন্দরের দৃশ্য

জাপানের বর্তমান দাবির পেছনে কঠোর দৃঢ়তা রহিয়াছে। নৌবহর-সমগ্র জাপানের জাতীয় সমগ্র। দু-বছর আগে প্রধান মন্ত্রী ইশ্বাকায়ী যে আততায়ীর হস্তে নিহত হন তার উদ্দেশ্য ছিল এই কার্যদ্বারা জাপানের নৌ-শক্তি ও সামরিক শক্তির স্বল্পতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। গত জুলাই মাসে জাপানের একটি স্ববৃহৎ নৌবাহিনী গঠনের পক্ষপাতী নৌবহরের বাট জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁদের সম্রাটের কাছে নৌবহরসম্পর্কিত সন্ধিগুলি ছিঁড়ে ফেলবার ও আমেরিকা ও

ইংলণ্ডের সমান নৌ-শক্তি দাবি করবার জন্ত যে লিপি পেশ করেন তারই ফলে স্যাডমির্যাল ভাইকাউট সাইটোর মহিমণ্ডলের পতন হয়। বর্তমানমহিমণ্ডলের প্রধান কাজ সেই দাবি কার্যে পরিণত করা। অতএব জাপান যে সর্বপ্রকার আপোষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে, তা আর আশ্চর্য কি? কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থবলের দ্বারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌ-বাহিনী রচনা করতে সক্ষম সেই অর্থবলের কাছে একে হার স্বীকার করতে হবে।

শ্রীকরণা মিত্র

গ্রামরাজ্যের সমগ্রা—

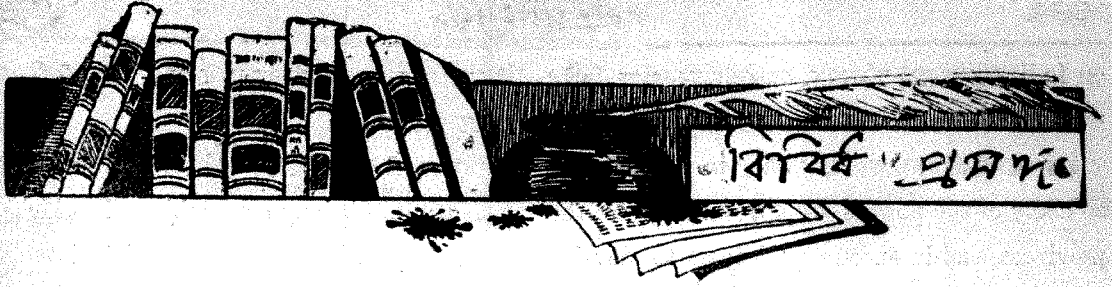


গ্রামরাজ্যের রাজা প্রজাপিক ও রাজী রমাবাই

আমরা গতমাসে গ্রামরাজ্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। গ্রামরাজ্যের রাজা প্রজাপিক বর্তমানে ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। স্বরাজ্যে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত কয়েকজন প্রতিনিধি

তথায় গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, প্রতিনিধিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।





ডোমিনিয়নত্বের অভিযুক্ত, না উল্টা দিকে ?

ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতবর্ষের সম্রাট কালক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অল্প ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের স্থানপ্রাপ্তির আশা দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আক্‌ইন ও লর্ড উইলিংডন এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডও এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। আরও যে যে রাজপুরুষ এই রকম লোভ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের উল্লেখ অনাবশ্যক। বাঁহারা আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দায়িত্ববিহীন লোক নহেন, অনধিকারচর্চা করেন নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল। তাঁহারা কেবল যে ভারতবর্ষের প্রতি দয়া করিয়া এরূপ কথা বলিয়াছিলেন তাহা নহে, ব্রিটেনেরও কল্যাণ-উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতবর্ষের অনেক লোক ভাবিয়াছিলেন, (আমরা তাঁহাদের মধ্যে কখনও ছিলাম না), শীঘ্র না-হউক বিলম্বেও ভারতবর্ষের ডোমিনিয়নত্ব লাভ ঘটিবে—এক লাফে না-হউক, ভারতবর্ষ ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে উচ্চতর রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করিবে। সুতরাং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, এবার জয়েন্ট প্যারলিমেন্টারী কমিটি ভারতবর্ষের জন্য যে শাসন-পদ্ধতির প্রস্তাব করিবেন, তাহা খুব কম পরিমাণে হইলেও ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নত্বের দিকে কিছু অগ্রসর করিয়া দিবে—কিছু চূড়ান্ত ক্ষমতা ভারতবর্ষকে দিবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ঐ কমিটির রিপোর্টে যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নত্বের বিপরীত দিকে লইয়া যাইবে। হোয়াইট পেপার ডোমিনিয়নত্বের বিপরীত দিকে ভারতকে যতটা লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, উক্ত কমিটির রিপোর্ট তার চেয়ে আরও অনেকটা বেশী উল্টা দিকে লইয়া যাইতে চায়।

ইহাতে আমরা বিস্মিত, নিরাশ বা হুঃখিত হই নাই। কিন্তু একথাটা নিশ্চয়ই আমাদের মনে হইয়াছে, প্যারলিমেন্টের

বড় বড় সভ্য (তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের বড়লাট মেজলাট ছোটলাট কয়েক জনও আছেন) লইয়া গঠিত কমিটি নিজেদের দেশের রাজার কথার, প্রধান মন্ত্রীর কথার, রাজপ্রতিনিধিদের কথার মান কেমন রাখিয়াছেন! রাজা বলিলেন, ভারতবর্ষ কালক্রমে ডোমিনিয়ন হইবে; ঐ কমিটি ডোমিনিয়ন কথাটি পর্যন্ত তাঁহাদের প্রকাণ্ড রিপোর্টে কোথাও একবার ব্যবহার করিলেন না এবং প্রস্তাবগুলি এমন করিয়াছেন যাহা ডোমিনিয়নত্বের ঠিক উল্টা!

এখন ভারতবর্ষের বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটেরা এবং সিবিলিয়ান ও পুলিশ যেরূপ ক্ষমতামালা, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবাবলীতে তাঁহাদিগকে তার চেয়েও নিরঙ্কুশ ক্ষমতামালা করিতে চাহিয়াছিল। জয়েন্ট প্যারলিমেন্টারী কমিটির রিপোর্ট তাঁহাদিগকে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে বলিয়াছে এবং ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে ও মন্ত্রীদিগকে চূড়ান্ত ক্ষমতা সামান্য কোন বিষয়েও দিতে বলে নাই।

ভারতবর্ষের ঐক্য উৎপাদন ও বিনাশ

ভারতবর্ষ কি কি কারণে পরপদানত হইয়াছে, দুই-এক কথায় তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ অনেক রকম অনৈক্য থাকা যে একটা কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে প্রদেশভেদ, ধর্মভেদ, জাতিভেদ, ভাষাভেদ প্রভৃতি আছে। তাহার উপর আঠার রকম নির্বাচক-মণ্ডলীতে দেশের লোককে ভাগ করিয়া হোয়াইট পেপারের অঙ্গীভূত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ছাড়াছাড়ির ভেদবুদ্ধির আর একটা প্রবল কারণ জুটাইয়াছে।

জয়েন্ট প্যারলিমেন্টারী কমিটির রিপোর্টে আছে—“We have spoken of unity as perhaps the greatest gift which British rule has conferred

on India.” “আমরা বলিয়াছি, যে, বোধ হয় একত্ব ব্রিটিশ শাসনের ভারতবর্ষকে প্রদত্ত সকলের চেয়ে বড় দান।” তাহার পর কমিটি বলিতেছেন, “but, in transferring so many of the powers of government to the provinces, and in encouraging them to develop a vigorous and independent life of their own, we have been running the inevitable risk of weakening or even destroying that unity.” “কিন্তু গবন্মেণ্টের এতগুলি ক্ষমতা প্রদেশগুলিকে হস্তান্তর করিয়া এবং তাহাদের এক-একটা সতেজ ও স্বাধীন জীবন বিকাশ করিতে তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া আমরা [পূর্বাভাস] একত্বকে ক্ষীণ করিবার অথবা এমন কি তাহাকে বিনষ্ট করিবার বিপদের মধ্যে যাইতেছি।”

এই কথাগুলি বিশেষ চিন্তার বিষয়।

ভারতীয় অনেক রাজনৈতিক নেতা প্রভিন্সিয়াল অটনমি বা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের নামে যেন দিশাহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, যে, অতীত কালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা ভূভাগ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ছিল বলিয়াই, অক্রমণকারীদের পক্ষে ভারতবর্ষ জয় করা সহজ হইয়াছিল। বহুপূর্বেই অনেক ইংরেজ বুলিয়াছিল, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পার্থক্য রক্ষা করা এবং তাহাদের আন্দোলনের কারণীভূত কোন অভিযোগ এক হইতে না-দেওয়া আবশ্যক। ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ লোকদের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহার সমক্ষে ১৩ই জুলাই মেজর উইন্গেট সাক্ষ্য দেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তাহার উত্তর কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহাতে প্রাদেশিক স্বাভাবিক নিগূঢ় মর্শ্ব বুঝা যাইবে। মেজর উইন্গেটকে জিজ্ঞাসা করা হইল :—“You speak of the dangers that arise from a central government and you say that it leads to a community of aims and feelings that might be dangerous?” “আপনি কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট হইতে যে-সব বিপদের উৎপত্তি হয় তাহার কথা বলিতেছেন? এবং আপনি বলিতেছেন, যে, তাহা হইতে প্রজাদের মধ্যে যে

উদ্বেগ ও ভাবের সাধারণত্ব বা একত্ব জন্মে তাহা বিপজ্জনক হইতে পারে?”

মেজর উইন্গেট উত্তর করিলেন, “Yes. I think that if there be any one subject in which the whole population of India would be interested, that is more likely to be dangerous to the foreign authority, than if a question were simply agitated in one division of the empire; if a question were agitated throughout the length and breadth of the empire, it would surely be much more dangerous to the foreign authority than a question which interested one Presidency only.” “হাঁ। আমি মনে করি, যদি একটা কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের সব লোকের লাভালাভ মঙ্গলামঙ্গল সুবিধাঅসুবিধা জড়িত থাকে, তাহা হইলে তাহা বিদেশী [ব্রিটিশ] কর্তৃপক্ষের পক্ষে যত বেশী বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা, একটা প্রশ্ন ভারত-সাম্রাজ্যের একটা কোন অংশে আন্দোলিত হইলে তত বিপজ্জনক হইবে না; একটা প্রশ্ন যদি কেবল একটা প্রেসিডেন্সীর লোকদের স্বার্থ জড়িত বা মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা তত বিপজ্জনক হইবে না, যত বিপজ্জনক উহা বিদেশী [ব্রিটিশ] কর্তৃপক্ষের পক্ষে নিশ্চয়ই হইবে যদি বিষয়টা লইয়া দেশের সর্বত্র আন্দোলন হয়।”

এই প্রশ্নোত্তরের পর ১৮৫৮ সালের ঐ পার্লামেন্টারী কমিটির অন্ততম সভ্য মিঃ ড্যানবী সীমুর মেজর উইন্গেটকে প্রশ্ন করিলেন, “Is what you mean this, that all the people of India might be excited about the same thing at the same time?” “আপনি যাহা বলিতেছেন তাহার মানে কি এই, যে, ভারতবর্ষের সমস্ত লোক একই বিষয় সম্বন্ধে একই সময়ে উত্তেজিত হইতে পারে?” তাহার উত্তরে মেজর উইন্গেট বলিলেন, “হাঁ।”

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব হইলে অধিকাংশ বিষয়ে আইন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমে হইবে।

তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের জীবনের গতি ও আদর্শ, হুঃখ অভিযোগ, আন্দোলন আলাদা আলাদা রকমের হইবে। সুতরাং একটা কোন বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকেরা উত্তেজিত হইয়া একসঙ্গে আন্দোলন করিলে ব্রিটিশ গবর্নেন্টকে যতটা উদ্ভিগ্ন বা বিপন্ন হইতে হয়, তাহা হইত হইবে না। তা ছাড়া, প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব হইলে যে-যে প্রদেশের যে-যে বিষয়ে গবর্নেন্টের প্রতি অসন্তোষ নাই, তাহার সেই-সেই বিষয়ে অসন্তুষ্ট অগ্র প্রদেশগুলির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে না। তাহার প্রমাণ এখনই পাওয়া যাইতেছে। এখন প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি, বাংলা দেশের জন্ত যে-যে রকম কড়া আইন হইয়াছে, অগ্র প্রদেশের জন্ত তাহা হয় নাই। সেই জন্ত, অগ্র কোন প্রদেশের নেতারা এবং তথাকথিত সমগ্রভারতীয় নেতারা বঙ্গের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নহেন—বদিও প্রত্যেক প্রদেশের লোকদেরই বঙ্গের হুঃখ হুঃখী হওয়া উচিত, কারণ প্রত্যেক প্রদেশের লোক বাংলা হইতে যত ধন উপার্জন করেন, ব'ঙালীরা কোন প্রদেশ হইতেই তত টাকা রোজগার করে না।

জয়েন্ট পাল্‌মেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট হইতে আমরা এই নিবন্ধিকাটির গোড়ায় যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই ইহা বুঝা যায়, যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষের একত্ব সম্পাদন করিয়াছেন বা করিতেছিলেন ইহা তাঁহারা জানেন, এবং ইহাও তাঁহারা জানেন, যে, প্রদেশগুলির শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব তাঁহারা এ প্রকার করিতেছেন যাহাতে ভারতীয় ঐ ঐক্য অতি ক্ষীণ, এমন কি বিনষ্টও হইতে পারে।

এই কুফল নিবারণ করিতে হইলে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় অর্থাৎ সমগ্রভারতীয় গবর্নেন্টকে এমন করা চাই, যাহাতে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের দরুন যাহারা স্ব-স্ব পথে পরস্পর হইতে দূরে যাইতে পারে তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ রাখা যায়। জড় ভগ্ন বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছে এবং সক্রিয় আছে ছাট বিপরীত শক্তির প্রভাবে। একটি কেন্দ্র-বিমুখ বল (Centrifugal force), অর্থাৎ কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি (Centripetal force)। ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বে প্রথম শক্তিটি কার্য্য করিবে।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের প্রভাবে প্রদেশগুলি পরস্পর হইতে দূরে যাইবে ও সম্পর্কশূন্য হইবে। যদি ভারতবর্ষের এই সমুদয় অংশকে লইয়া একটি ফেডারেশন বা রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি কার্য্য করিবে এবং যাহারা পরস্পর হইতে দূরে যাইতেছিল, তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও পরস্পরের সহিত মিলিত করিয়া রাখিবে। কিন্তু জয়েন্ট পাল্‌মেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের প্রস্তাবে প্রদেশ-গুলিকে অবিলম্বে আলাদা করিয়া দিবার তাগিদ আছে, ফেডারেশন কখন হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই—কখনও না-ও হইতে পারে। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের বলেই হউক, বা অগ্র যে-যে কারণেই হউক, ভারতবর্ষের যে একত্ব আগে হইতেই ছিল, বা ইংরেজ রাজত্বে জন্মিয়াছিল, বা জন্মিতেছিল, কমিটি তাহা জানিয়া শুনিয়া কমানিবার, এমন কি বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু যাহা করিলে ঐ একত্ব ক্ষীণ বা বিনষ্ট হইত না, সেই ফেডারেশন জিনিষটিকে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার ও অবগুণ্ঠাবী করিবার প্রস্তাব ও ব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই।

কমিটির প্রস্তাবিত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের স্বরূপ

সকল প্রদেশকে লইয়া একটি ফেডারেশন বা রাষ্ট্রসংঘ গঠিত না হইলে যে শুধু প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের দ্বারা ভারতবর্ষের মহা অনিষ্ট হইবে, তাহা আগে লিখিয়াছি। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া, জয়েন্ট পাল্‌মেণ্টারী কমিটি যে-প্রকার প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, তাহাতে প্রাদেশিক গবর্নরদের এবং তাঁহার অধীনস্থ সিভিলিয়ানদের ও পুলিশের আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে বটে, কিন্তু প্রদেশের, প্রাদেশিক জনগণের, ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধিদের কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে না। নানা সেক্‌গার্ড বা “রক্ষাকবচ” দ্বারা এবং গবর্নরের বহুবিধ বিশেষ দায়িত্ব দ্বারা তাঁহাকে প্রভূত নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে। তাহার উপর তিনি ইচ্ছা করিলেই অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন,

ব্যবস্থাপক সভার সহযোগ ব্যতিরেকে, এমন কি আশুতি সত্ত্বেও, “গবর্ণরের আইন” নামক নানা স্থায়ী আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন, ব্যবস্থাপক সভায় পাস করা আইন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, যেকোন বিভাগের কোন মন্ত্রী বা সকল বিভাগের সব মন্ত্রীর হস্তে গুস্ত বিষয় সকলের ভার নিজে লইতে পারিবেন, এবং মূল শাসনবিধি (constitution) একেবারে রদ করিয়া যত দিন আবশ্যক মনে করিবেন নিজ ইচ্ছা অনুসারে দেশ শাসন করিতে পারিবেন। সিভিলিয়ানদের ও পুলিশ সাহেবদের নিয়োগ, কেমন, পেন্সান, পদের উন্নতি অবনতি প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। মন্ত্রীরা গবর্ণরকে রাজী না করিয়া পুলিশ আইন কানুনের (Police Acts ও Regulations এর) কোন প্রকার রদ বদল বা তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। বর্তমান স্বৈরাজ্য বা ডায়াকি বিলুপ্ত হইবে বলা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা কেবল মাত্র নামে। এখন রিজার্ভ্‌ড্‌ (“সংরক্ষিত”) বিষয়গুলিতে মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা নাই, ট্রান্সফার্ড বা হস্তান্তরিত বিষয়গুলিতে আছে, এইরূপ বলা হয়; কমিটির প্রস্তাব অনুসারে সকল বিষয়েই মন্ত্রীদের হাত থাকিবে বলা হইয়াছে; কিন্তু আমরা উপরে বলিয়াছি, বস্তুতঃ কোন বিষয়েই মন্ত্রীদের চূড়ান্ত কোন ক্ষমতা থাকিবে না। এখন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে সংরক্ষিত বিষয়গুলির জন্ত যথেষ্ট টাকা আগে রাখিয়া লইয়া বাকী অথেষ্ট টাকা মন্ত্রীদের হাতে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের জন্ত রাখেন। কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতেও অল্প নাম দিয়া ঠিক এই প্রকার বরাদ্দ হইবে—গবর্ণর তাঁহার “বিশেষ দায়িত্ব”-সমূহ অনুযায়ী কাজ করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে লইবেন, তাহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার মত থাক্ বা না থাক্।

জয়েন্ট প্যালেমেন্টারী কমিটির সভ্যরা তাঁহাদের রিপোর্টে এইপ্রকার ‘বোকা বুঝাইবার’ চেষ্টা করিয়াছেন, যে, গবর্ণরদিগকে যে-সব ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব দিয়া স্বৈরাচারী শাসনকর্তা করা হইয়াছে, সেইরূপ ক্ষমতা প্রভৃতি ইংলণ্ডে রাজার আছে, আমেরিকার নির্বাচিত দেশপতির (প্রেসিডেন্টের) আছে, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের এংলো-

ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালারাও এইরূপ বলিতেছে। ঠিক কি কি ক্ষমতা আদি তাঁহাদের আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। মানিয়া লওয়া যাক্, যে, ইংলণ্ডের রাজার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রকৃত সব ক্ষমতা আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তাঁহারা তাঁহাদের দেশের লোকদের সম্মতি ক্রমে ঐ সকল ক্ষমতা ভোগ করেন, অল্প দিকে আমাদের বিদেশী গবর্ণরদিগকে যে-সব ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের লোকদের সম্মতি নাই; ইংলণ্ড ও আমেরিকার কল্যাণের জন্ত ঐ সব ক্ষমতা তথাকার স্বদেশী রাজা ও প্রেসিডেন্ট ভোগ করেন, কিন্তু আমাদের বিদেশী গবর্ণরদিগকে যে-সব ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহা ইংলণ্ডের প্রভু ও স্বার্থ রক্ষার জন্ত, ভারতের কল্যাণের জন্ত তৎসমুদয়ের প্রয়োজন নাই; ইংলণ্ডের রাজা বহুকাল ঐ সব ক্ষমতার ব্যবহার করেন নাই, করিলে ইংলণ্ড সাধারণতঃ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সঙ্কট অবস্থায় কচিং ব্যবহার্য্য বলিয়া শাসকদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তৎসমুদয়ের ব্যবহার সাধারণতঃ প্রায়ই হয় এবং যে গবর্ণর বা গবর্ণর-জেনার্যাল তাহা করেন তিনি অপসারিত হন না বা তজ্জন্ত ভারতবর্ষ সাধারণতঃ হইয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া জবরদস্ত হইলে তাঁহার পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকে না, অল্প দিকে ভারতবর্ষের জবরদস্ত গবর্ণর ও গবর্ণর-জেনার্যালদের খ্যাতি তাঁহাদের স্বদেশে খুব বাড়ি, এবং আমাদের সমালোচনাঃ তাঁহাদের কিছুই আসে যায় না।

পাটের চাষ কমাইবার চেষ্টা

পাট বাংলা দেশের প্রধান বাণিজ্যিক ফসল। ইহা চাষীরা সামান্যই নিজেদের কাজে লাগায়, প্রায় সমস্তই বিক্রী করে। যে বৎসর চাহিদা বৃদ্ধি হয়, তার চেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হইয়া থাকিলে, চাষীরা ভাল রকম দাম পায় না। এই যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া মোটামুটি মনে করা হইয়া থাকে, যে, যদি পাটের চাষ কমাইয়া উৎপন্ন ফসল কমাইতে পারা যায়, তাহা হইলে চাষীরা তাহাদের

মাল চড়া দরে বিক্রী করিতে পারিবে। কিন্তু অল্প দিকে ইহা বলিতে পারা যায়, যে, চাহিদা যত হইবে মনে করা যায় উৎপন্ন ফসল তার চেয়ে খুব কম হইলে চাহিদা দর চড়া পাইতে পারে বটে, কিন্তু যথেষ্ট মাল তাহারা দিতে না-পারায়, যথেষ্ট দিতে পারিলে তাহারা পাট বিক্রী করিয়া মোট যত টাকা পাইতে পারিত তত পাইবে না। এই জন্য চাহিদা যত হইবে তদনুযায়ী মাল তাহারা যদি উৎপন্ন করিতে পারে এবং নিজেদের নিষ্কিষ্ট লাভজনক দরে তাহা বিক্রী করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের সুবিধা হয়। সুতরাং কোন্ বৎসর চাহিদা কত হইবে, তাহা স্থির করা একান্ত আবশ্যক। চাহিদা স্থির করিতে হইলে কাঁচা মাল এদেশে কত মজুদ আছে ও ভারতবর্ষের বাহিরে কোথায় কত মজুদ আছে এবং ভারতবর্ষের পাটকলগুলি ও বাহিরের পাটকলসমূহ কত কাঁচামাল ব্যবহার করিবে, জানা আবশ্যক। নিরপেক্ষভাবে এবং যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে এই সকল সংখ্যা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে কি না জানি না।

পাটের চাষ ও ব্যবসা সম্বন্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, যে, পাট কোন বৎসর কম উৎপন্ন হইলেই যে দর বাড়ে বা বেশী উৎপন্ন হইলেই যে তাহা কমে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নীচে কতকগুলি সংখ্যা দিতেছি। কোন্ বৎসর কত হাজার একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল, ৪০০ পৌণ্ডের এক এক গাঁটের কত হাজার গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং কলিকাতায় এক এক গাঁটের দাম কত টাকা হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় লিখিত হইল।

বৎসর। হাজার একর। হাজার গাঁট। গাঁটের দাম।

১৯২২	১৮০০	৫৪০৮	৮৭৬/৫
১৯২৩	২৭৮৮	৮৪০১	৬৮১/১০
১৯২৪	২৭৭০	৮০৬২	৭৫৬/৫
১৯২৫	৩১১৫	৮৯৪০	১১৯১/৯
১৯২৬	৩৮৪৭	১২১২৩	৯৮১/৬
১৯২৭	৩৩৭৪	১০১৮৮	৭৬১/৬
১৯২৮	৩৪৪৪	৯৯০৬	৭৫২/১১
১৯২৯	৩৪১৫	১০৩৩৫	৭১১/০

১৯৩০ ৩৪৯২ ১১২০৫ ৫০১৯

১৯৩১ ১৮৫৯ ৫৫৩৫ ৩৭১১/১০

পাটের কল আগে কেবল ভারতবর্ষে (কলিকাতার আশেপাশে) এবং বিলাতের ডাণ্ডী শহরে ছিল। এখন জাপানে এবং মধ্য-ইউরোপ ও দক্ষিণপূর্ব-ইউরোপেও অনেক হইয়াছে। তাহাদের যন্ত্রপাতি এদেশের কলগুলার যন্ত্রপাতির চেয়ে আধুনিক ও উৎকৃষ্ট। সেই জন্য তাহারা এখানকার চেয়ে কম ব্যয়ে চট ও থলি প্রস্তুত করিতে ও কম দামে বিক্রী করিতে পারে। এই বিদেশী অট্রিটিশ চটকলওয়ালারা বাহাতে পাটের কাঁচা মাল না-পায়, সেই উদ্দেশ্যে এখানকার চটকলওয়ালারা ও ডাণ্ডীর চটকলওয়ালারা একযোগে চায়, যে, বাহাতে তাহাদের নিজেদের দরকারের চেয়ে বেশী পাট ভারতবর্ষে না-জন্মে। ভারতের প্রায় সব চটকলওয়ালারা এবং ডাণ্ডীর চটকলওয়ালারা এক জাতি—ব্রিটিশ। জাপান এবং মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের চটকলওয়ালাদিগকে জব্দ করিবার জন্য ভারতের ও ডাণ্ডীর এই ব্রিটিশ চটকলওয়ালারা গবন্মেণ্টকে আর একটা উপায় অবলম্বন করাইতে চায়। বিলাতী ফিন্যান্সাল টাইমস্ এই বৎসর জুলাই মাসে লিখিয়াছিল:—

“Dundee traders have an important scheme, for which they are seeking Calcutta's co-operation, believing that, in the face of foreign competition, the producers of both centres should combine in persuading the British and the Indian Governments to impose an additional export duty on raw jute from India in parts not within the British Empire.

“As jute is produced within the Empire, it is contended that Empire manufacturers should have preference over foreign competitors. The unsatisfactory condition of trade both in Dundee and Calcutta has influenced manufacturers in these centres towards co-operation.

তাৎপর্য। ডাণ্ডীর পাট ব্যবসায়ীদের একটা বড় রকমের কল্যাণ আছে, যাতে তারা কলিকাতার ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চায়। ডাণ্ডীওয়ালাদের বিশ্বাস, যে, যখন কলিকাতার ও ডাণ্ডীর ব্যবসায়ীদের বিদেশীদের (অর্থাৎ জাপানী ও অট্রিটিশ ইউরোপীয়দের) প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখন উত্তর কেন্দ্রের ব্রিটিশ চট-উৎপাদকদের উচিত ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ও ভারত-গবন্মেণ্টকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে রপ্তানী পাটের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইতে প্রবৃত্ত করা।

যেহেতু পাটের চাষ কেবল সাম্রাজ্যের মধ্যে হয়, সেই জন্য এই তর্ক করা হয়, যে, সাম্রাজ্যের চট-উৎপাদকদের সাম্রাজ্যের বাহিরের চট-উৎপাদকদের চেয়ে অতিরিক্ত হবিধা পাওয়া উচিত। ডাক্তারী ও কলিকাতা উভয়ত্র ব্যবসার অসম্ভাব্যকর অবস্থা উভয় কেন্দ্রের কল-ওয়ালাদিগকে পরস্পরের সহযোগিতা করিতে প্রভাবিত করিয়াছে।

গত ২৯শে এপ্রিলের ষ্টেটসম্যানও পাট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে,

“...in practice the manufacturer is often not averse to a situation the immediate result of which is that he gets his raw material cheap. In so far, therefore, as he does nothing to promote a crop restriction scheme, he may be said to be the aider and abettor of his foreign competitor, who fights him with all his looms and not with a percentage only.”

তাত্পর্য। অনিয়ন্ত্রিত পাটচাষজনিত যে অবস্থায় বঙ্গের চটকল-ওয়ালারা সস্তায় তাহাদের কাঁচা মাল পায়, তাহার প্রতি কার্য্যতঃ তাহার বিরূপ নহে। [কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ভাবে পাটচাষ হইলে ভারতবর্ষের ও বিলাতের বাহিরের অট্রিশ চটকলওয়ালারাও সস্তায় কাঁচা মাল পায়, এবং তাহাদের যন্ত্রপাতি আধুনিক ও উৎকৃষ্ট হওয়ায় তাহারা চট অপেক্ষাকৃত সস্তায় উৎপাদন করিতে ও বেচিতে পারে।] অতএব, বঙ্গের চটকলওয়ালারা পাট-নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির প্রবর্তন ও বিস্তৃতির জন্য কিছু না-করিলে অট্রিশ বিদেশী চটকলওয়ালাদের সাহায্যকারী হয়। এই বিদেশী চটকলওয়ালারা ভারতের ও ডাক্তারী ব্রিটিশ চটকলওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতা করে তাহাদের সমুদয় তাঁতের দ্বারা—শতকরা কেবল কয়েকটি দ্বারা নহে। [বঙ্গের ব্রিটিশ চটকলওয়ালারা নিজেদের চটের দাম বাড়াইবার জন্য সব তাঁত না চালাইয়া কিছু চালায় ও উৎপন্ন চটের পরিমাণ কমাইয়া তাহার দাম বাড়াইবার চেষ্টা করে।]

পাটের চাষ কমাইয়া কাঁচা মাল কম উৎপাদন করিলে পাটের দর বাড়িতে পারে না, আমরা এরূপ মনে করি না। কিন্তু ইহাও মনে করি না, যে, কাঁচা মাল কম উৎপন্ন হইলেই তাহার দর চড়িবে, বা বেশী উৎপন্ন হইলেই দর নামিবে। পাটচাষী ও চটকলওয়ালাদের মধ্যবর্তী ব্যাপারীরা ও স্পেকুলেটররা নিজেদের সুবিধার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়া পাটের দর কম করিতে ও রাখিতে পারে। তন্নিম্ন, ষ্টেটসম্যান ও বিলাতী ফিন্যান্সাল টাইমসে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা পড়িয়া এরূপ ধারণা জন্মে না, যে, কেবল পাটচাষীদেরই হিতের জন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতেছে। ভারতীয় ও অভ্যন্তরীণ ব্রিটিশ চটকলওয়ালারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার সহায়। তাহাদের প্রাণ পাটচাষীদের জন্য বরাবর কঁদিয়াছে বলিয়া সমসাময়িক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্য ডিসেম্বরের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় আছে।

পাটের বদলে অন্য ফসল

পাটের চাষ না করিয়া পাটের কতক জমিতে অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। কৃষি সম্বন্ধে আমাদের পুণ্ডিগত বা কার্য্যজাত জ্ঞান না-থাকায় এই সব পরামর্শ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন মত প্রকাশ করিতেছি না। তবে, যে-রকম জমিতে চীনে বাদাম হইতে দেখিয়াছি, পাটের জমি সেইরূপ কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। পাটের জন্য যে জমি ভাল, তামাকের জন্যও কি তাহা সমান ভাল? পাটের বদলে রবিশস্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু শুনিয়াছি, পাট উৎপাদন ও কর্তন করিয়া, তাহার পরও সেই জমিতে অনেক চাষী রবিশস্ত্র দেয়; অর্থাৎ একই জমিতে একই বৎসর পাট ও রবিশস্ত্র পরে পরে উৎপাদিত হয়। ইহা ঠিক হইলে, যেখানে ছুটা ফসল হইত সেখানে কেবল একটা ফসল উৎপাদন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। অন্য যে-সব ফসল পাটের পরিবর্তে আর্জাইবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা উৎপাদন করিয়া কিরূপ লাভ হইবে, তাহাও বিবেচ্য।

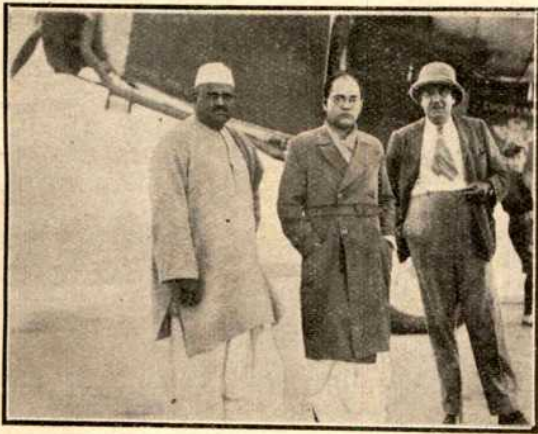
সুভাষচন্দ্র বসুর স্বদেশ আগমন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা অত্যন্ত পীড়িত থাকায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে বাড়ি আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন এবং গবন্মেণ্টকে অনুরোধ করেন, যে, তাঁহাকে ঘেন আসিতে দেওয়া হয়। খবরের কাগজে এইরূপ সংবাদ বাহির হয়, যে, গবন্মেণ্ট তাঁহাকে আসিবার অহুমতি দেন নাই। সুভাষচন্দ্র নিজেও বহুবৎসর কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন এবং অস্ত্রোপচারের জন্য ভিয়েনায় বাস করিতেছিলেন। এরূপ ব্যক্তিকে কেবল পিতাকে দেখিতে আসিবার অহুমতি না-দিবার অতি-প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আমরা অসমর্থ—বিশেষতঃ যখন দেখিতেছি কর্তৃপক্ষীয় উচ্চতম ব্যক্তিদের দ্বারা



দমদম বিমান-ঘাট হইতে পুলিশের মোটর গাড়ীতে
ক্রীত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বগৃহে যাত্রা

[ফোটা আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]



বামরাউলি ষ্টেশনে সুভাষচন্দ্র ও গোবিন্দ মালবীর।

‘লাডার’ কর্তৃক গৃহীত চিত্র

বিপজ্জনক ব্যক্তি বলিয়া বোধিত (যদিও দেশের লোকেরা তাহা মনে করেন না) তাঁহার ভ্রাতা শরচ্চন্দ্রকে পিতার নিকট একাধিক বার আসিতে দেওয়া হইয়াছে। বাহা হউক, ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্সালকে সুভাষচন্দ্র মাতার টেলিগ্রাম দেখানতে তিনি তাঁহাকে এরোপ্লেনে ভারতবর্ষ আসিবার ছাড়পত্র দেন। কিন্তু সুভাষ বাবু করাচী পৌঁছিয়া অবগত হন, যে, তাঁহার পিতা জীবিত নাই। তাহার পর তিনি দমদমা পৌঁছিবামাত্র গবন্মেণ্ট তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়িতেই বন্দী করেন। তাহার পর আবার তাঁহার উপর এই হুকুম হয়,

যে, তাঁহাকে কলিকাতা পৌঁছিবার সাত দিনের মধ্যেই ভিয়েনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাঁহাকে কড়া পাহারায় অবরুদ্ধ রাখিয়াও তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়া যাইবার অগেই ইউরোপ চালান না-দিলে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের কি বিপদ ঘটিতে পারে আমরা তাহা অনুমান করিতে অসমর্থ। শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়াও শ্রাদ্ধ হইয়া যাইবার পূর্বেই চলিয়া যাওয়া যে হিন্দু সংস্কারের কত বিকৃত, তাহা গবন্মেণ্ট কি কোন হিন্দু পরামর্শদাতার নিকট হইতে শুনে নাই? সুভাষ বাবু গবন্মেণ্টের নিকট পিতৃশ্রাদ্ধ হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। গবন্মেণ্ট এই আবেদনের কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার রোগের পরীক্ষার জন্ত একটি মেডিক্যাল বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৪ই ডিসেম্বর ২৮শে অগ্রহায়ণ তাঁহারা তাঁহাদের কাজ করিবেন।

ফ্রান্সের রবীন্দ্রবান্ধব সমিতি

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মিলন-স্থাপনের নিমিত্ত ফ্রান্সে রবীন্দ্রবান্ধব সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি কি কি কাজ করিতেছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথকে জানাইবার জন্ত এই সমিতির দু-জন সভ্য সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁহারা বৎসরাধিক পূর্বে প্যারিস হইতে স্থলপথে রওনা হন এবং স্থলপথেই ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ অতিক্রম করিয়া বালুচীস্থানের অন্তর্গত কোয়েটার পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তাঁহারা মানবজাতির ঋণিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ আছে।

হিন্দুদের “নৈশ অবরোধ” ও হিন্দুনারী হরণ

সম্মানবাদ ও সম্মানসক কার্য্য দমনের জন্ত বাংলা-গবন্মেণ্ট কোন কোন স্থানে দীর্ঘকালের জন্ত এইরূপ হুকুম জারি করেন, যে, হিন্দুরা স্বর্ঘ্যাস্তের পর ও স্বর্ঘ্যোদয় পর্য্যন্ত বাড়ির বাহিরে যাইতে পারিবে না। ইহাকে কেহ-কেহ “সান্ডা আইন” বলেন। কিন্তু এই নাম হইতে উক্ত হুকুমের স্বরূপ বুঝা যায় না। এইরূপ হুকুম দ্বারা হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর নৈশ অবরোধের হুকুম চাপান হয়। গবন্মেণ্টের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই, যে, কোন হিন্দু যেন

নিশাচর না হয়। কিন্তু ফলে অনেক অহিন্দু দুর্বৃত্তের হিন্দুনারী হরণের সুবিধা হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মেদিনীপুর শহরে গুপ্ত-প্রকৃতির মুসলমানগণ চারি-পাঁচ মাসের মধ্যে বহু নারী অপহরণ করিয়া নিকাহ করিয়াছে অথচ কাহারও শাস্তি হয় নাই। মেদিনীপুর শহরের কতকগুলি মুসলমানের বাড়ি হঠাৎ তল্লাস করিলে যে অনেক অপহৃত হিন্দু রমণীকে পাওয়া যাইবে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

(১) চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক সরস্বতী দাসীকে স্বামী ও অভিভাবকগণের অনুপস্থিতিতে কয়েক জন মুসলমান প্রায় এক মাস পূর্বে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অনেক চেষ্টাতেও তাহার উদ্ধার হয় নাই।
(২) তাহার জন্ম সার্চ ওয়ারেন্ট লইয়া তল্লাস করিতে গিয়া কর্নেল কোলায় এক মুসলমান ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচম্যানের গৃহে অমলা নামে এক হিন্দু নারীকে দেখা যায়। অমলার আত্মীয়গণ তাহার উদ্ধারের কোন চেষ্টা করে নাই, এমন কি পুলিশে ডায়েরীও করে নাই।
(৩) কুড়ি বৎসর বয়স্ক সধবা শিবানী দাসী সরস্বতীর নিকট-আত্মীয়, উভয়েই এক বাড়িতে থাকিত। প্রায় এক বৎসর পূর্বে “সান্দা আইন” বলবৎ থাকার সময় এক সন্ধ্যায় মুসলমানগণ তাহাকে অপহরণ করিয়া নিকাহ করিয়া নিরাপদে ও নিঃশঙ্কভাবে বাস করিতেছে। এক বৎসর পূর্বে এক বাড়িতেই এই দুইটি নারীহরণ ঘটয়াছে।
(৪) সিপাই বাজারের এক বাড়িতে আর এক হিন্দু নারীকে মুসলমানগণ সন্ধ্যার পর অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া ঐ বাড়ির বাহির হইতে তাল্লা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাহাকে উদ্ধার করিয়া পাঁচ মাস পূর্বে হিন্দু অবলা আশ্রমে পাঠান হইয়াছে। নালিশ করার সাহস না থাকায় অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয় নাই।—সম্ভাবনা।

এরূপ অবস্থার প্রতিকার আবশ্যক। কিন্তু তাহা কে করিবেন? হিন্দুরা? মুসলমানরা? গবন্মেণ্টি? না, সকলেই?

প্রবাসী বাঙালীর সম্মান

ইন্দোরের হোলকার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বসু আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার যেমন গবন্মেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হন, আগ্রায় সেরূপ নহে। তথায় ভাইস-চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদিগের দ্বারা নির্বাচিত হন। এই কারণে তথাকার ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়া সদস্যদিগের আস্থার পরিচায়ক।

ডক্টর বসু কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯১১ সালে ধনবিজ্ঞানে এবং ১৯১৬ সালে পুনর্বার ইতিহাসে এম-এ উপাধি পান। মধ্যে ১৯১৩ সালে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ সালে তিনি ইতিহাসে গবেষণার জন্য “শ্রুত আওতোষ মুখোপাধ্যায়



প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বসু, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের “বৃহত্তর বঙ্গ” শাখার সভাপতি।

স্বর্ণপদক” প্রাপ্ত হন। ১৯২৩ সালে তিনি ধনবিজ্ঞানে পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। তিনি কিছু কাল কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানের ও ইতিহাসের অত্যন্ত অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সাল হইতে তিনি ইন্দোরের হোলকার কলেজে ঐ দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৪ সালে তথাকার সহকারী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন, এবং ১৯২৬ সাল হইতে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপালের কাজ করিতেছেন। আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে তিনি ১৯২৬ সালে এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক কোমিসলের সদস্য ছিলেন। আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর তিনি ১৯২৭ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দুই বার আগ্রার ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের ডীন নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সালে এডিনবরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের যে কংগ্রেস হয় তিনি আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। রাজপুতানা ও মধ্যভারতের উচ্চ বিদ্যালয় ও ইন্টারমীডিয়েট শিক্ষা-বোর্ডের তিনি ১৯৩২ সাল হইতে সভাপতি আছেন। ইন্দোরে হোলকার সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতিত্বও তিনি ১৯৩২ সাল হইতে করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান বৎসরে তিনি আগ্রা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর। ইংরেজীতে তিনি “Indo-Aryan Polity,” “Economic Development of India,” “Principles of Economics,” ও “Economic Condition of the Middle Class People in Calcutta” লিখিয়াছেন। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ হস্তরসিক নাট্যকার মোল্ল্যার প্রণীত একখানি নাটক অবলম্বন করিয়া তিনি বাংলায় “কুপণ” নামক একখানি নাটক লিখিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রশংসিত হইয়াছে।

উক্ত বহু কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে “বৃহত্তর বঙ্গ” শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

অগ্রহায়ণের ‘প্রবাসী’তে আমরা কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের কতকগুলি সংবাদ দিয়াছি। এই অধিবেশন সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ জানিতে হইলে ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র রায়কে ৪৪।১, বোবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা, ঠিকানায় চিঠি লিখিতে হইবে।

গীহার প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রবেশিকা পাঁচ টাকা করিয়া লাগিবে, প্রবাসী ছাত্র প্রতিনিধিদের তিন টাকা। প্রবাসী মহিলা প্রতিনিধিদিগকে কোন প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না। অভ্যর্থনা-সমিতি



শ্রীযুক্ত অর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

সমুদয় প্রতিনিধির বাসস্থান ও আহ্বারের বন্দোবস্ত করিবেন। ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর এই পাঁচ দিনের ব্যবস্থা করা হইবে। কে কবে কোন ট্রেনে আসিবেন, অগ্রহণ করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন। প্রতিনিধিরা দয়া করিয়া বিছানা লেপ কম্বল ও মশারি আনিবেন।

বঙ্গদেশের সাহিত্যিকদিগের দুই টাকা প্রবেশিকা ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যবৃন্দের অন্যান্য পাঁচ-টাকা চাঁদা দিবার নিয়ম করা হইয়াছে।

দর্শকদিগকে প্রথম দিনের জন্ত এক টাকা প্রবেশিকা দিতে হইবে। অতীত দিনে তাঁহাদিগকে কিছু দিতে হইবে না, আপাততঃ এই রূপ স্থির আছে; কিন্তু স্থানাভাবের সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে পারিলে কিছু প্রবেশিকা লইবার বন্দোবস্ত হইতে পারে।



শ্রীযুক্ত কেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি।

২৬শে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্বাটন করিবেন। ইহার পর আর চারি দিন সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন ও শাখা সভার অধিবেশনগুলি কলিকাতার টাউন হলের দ্বিতলে হইবে।

প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনার জন্ত কয়েকটি প্রীতি-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ষাঁহারা ইহার ভার লইয়াছেন, অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। একটি প্রীতি-সম্মিলনীর ভার লইয়াছেন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার। আর একটির ভার লইয়াছেন ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা তাঁহার আগরপাড়াস্থিত বাগান-বাড়ি ও চিড়িয়াখানায়। তিনি সেখানে প্রতিনিধিদিগকে তাঁহার পোষা পাখী সব দেখাইবেন এবং পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। তৃতীয় সম্মিলনীটি হইবে ষ্টামারে। কলিকাতার মিলনী ক্লাব ইহার ভার লইয়াছেন। চতুর্থ প্রীতি-সম্মিলনী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে পরিষদের উদ্বোধনে ও কর্তৃত্বে হইবে। কেবল

মহিলা প্রতিনিধিদের জন্ত ডাঃ শ্রুর নীলরতন সরকারের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লেডী নির্মালা সরকার প্রীতি-সম্মিলনীর



শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী।

ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তন্নিম্ন রবীন্দ্রনাথের “তপতী” নাটকের অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইতেছে।

এই দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন কবি-সার্ক্সভোম রবীন্দ্রনাথ ১১ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর। প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যামুরাগীদিগের সহিত বঙ্গের মনীষীদিগের সাক্ষাৎ পরিচয় জন্ত এই সাধারণ উদ্বোধন এবং প্রত্যেক শাখার উদ্বোধনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এইরূপ স্থির হইয়াছে, যে, বিজ্ঞান শাখার উদ্বোধন করিবেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু; মহিলা-বিভাগের উদ্বোধন করিবেন তাঁহার সহধর্মিণী লেডী শ্রীমতী অবলা বসু; সাহিত্য-শাখার উদ্বোধক হইবেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী; ইতিহাস-শাখার শ্রীযুক্ত শ্রুর যজ্ঞনাথ সরকার; শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার শ্রীযুক্ত শ্রুর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী; ধনবিজ্ঞান-শাখার



শ্রীযুক্ত উত্তর ভানুভূষণ দাশগুপ্ত
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ধনবিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত উত্তর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; ললিতকলা ও শিল্প-শাখার শ্রীযুক্ত অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়; বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার; এবং দর্শন-শাখার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণী সঙ্গীত-শাখার উদ্বোধন করিবেন।

কোন দিন কোন অধিবেশন বা অত্র অনুষ্ঠান হইবে, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল। আবশ্যক হইলে ইহার অল্পাধিক পরিবর্তন হইতে পারিবে। সমুদয় অনুষ্ঠানের তালিকা ও ক্রম শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

১০ই পোষ ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রদর্শনীর উদ্বোধন; সন্ধ্যায় রেডিও দ্বারা সঙ্গীতাদি; তৎপরে পরিচালক সমিতির অধিবেশন।

১১ই পোষ ২৭শে ডিসেম্বর কবিসার্কভোম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সমগ্র সম্মেলনের উদ্বোধন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতা, সভাপতি শ্রীযুক্ত হর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ, ইত্যাদি। এই দিন গত অধিবেশনের কার্যবিবরণপাঠও হইবে। সাহিত্য-শাখার

উদ্বোধন এবং তাহার সভাপতির অভিভাষণ-পাঠও এই দিন হইবে। অপরাহ্নে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন



শ্রীযুক্ত উত্তর হরিশলচন্দ্র সরকার
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

সরকারের প্রীতি-সম্মিলনী। সন্ধ্যায় পর সম্মেলনের বিষয়-নির্ধারন সমিতির অধিবেশন।

১২ই পোষ ২৮শে ডিসেম্বর দর্শন-শাখার উদ্বোধন ও তাহার সভাপতির অভিভাষণ, এবং প্রবন্ধপাঠ। সাহিত্য-শাখার প্রবন্ধপাঠ। “বৃহত্তর বঙ্গ” শাখার উদ্বোধন ও তাহার সভাপতির অভিভাষণ, এবং প্রবন্ধপাঠ। ইতিহাস-শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ, এবং প্রবন্ধপাঠ। ষ্টামারে মিলনী ক্লাবে প্রীতি-সম্মিলনী। সন্ধ্যায় পর সঙ্গীত ও অভিনয়।

১৩ই পোষ ২৯শে ডিসেম্বর ললিতকলা ও শিল্প-বিভাগের উদ্বোধন, সভাপতির অভিভাষণ ও প্রবন্ধপাঠ। বামিনীরঞ্জন রায়ের চিত্রাগার দর্শন। শিক্ষাবিজ্ঞান-শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণপাঠ, ও প্রবন্ধপাঠ। বিজ্ঞান-

শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ ও প্রবন্ধপাঠ।
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার উদ্যান ও পক্ষিনিবাসে প্রীতি-
সম্মিলনী ও পক্ষিতত্ত্বের আলোচনা। মহিলা-সভার
উদ্বোধন, তাহার সভানেত্রীর অভিভাষণ, প্রবন্ধপাঠ এবং



শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ললিতকলা ও শিল্প-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্তা লেডী নির্মলা সরকারের মহিলাদের জ্ঞাত
প্রীতিসম্মিলনী। বিষয়-নির্বাচন সমিতির অধিবেশন।

১৪ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর শেষ দিবস ধনবিজ্ঞান-শাখার
উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ, ও প্রবন্ধ পাঠ।
সঙ্গীত-শাখার উদ্বোধন, তাহার সভাপতির অভিভাষণ ও
প্রবন্ধপাঠ। সুলসভার অধিবেশনে প্রস্তাবাদির আলোচনা ও
গ্রহণ, এবং ধন্যবাদ প্রদান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে
প্রীতিসম্মিলনী।

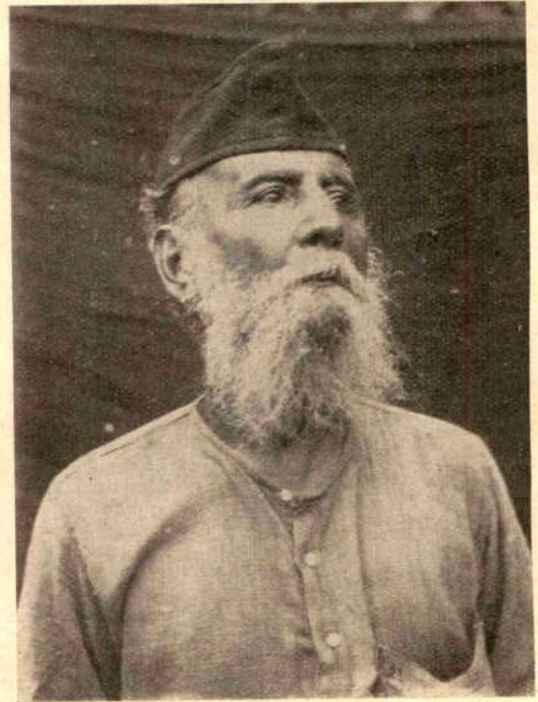
“তপতী” অভিনয়। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সভাপতিত্বে বিদায়-বাসর। বিদায়-ভোজ।

একই দিনে কতকটা একই সময়ে দুই শাখার অধিবেশন
যে-যে স্থলে হইবে, তাহা টাউন হলের দ্বিতলের ভিন্ন ভিন্ন
কক্ষে হইবে।

বাংলা-সাহিত্যের ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির অনুরাগী বাংলা
দেশের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী স্রষ্টাবৃন্দকে এই সম্মেলনে
যোগ দিবার জ্ঞাত অভ্যর্থনা-সমিতি সাদর ও সাহ্ননয় আহ্বান
করিতেছেন।

অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত

কুমিল্লার অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত ৮২ বৎসর বয়সে
দেহতাগ করিয়াছেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত কর্মিষ্ঠ ছিলেন।
কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার



৩ দ্বিজদাস দত্ত

পর তিনি কুবিবিদ্যা শিখিবার জ্ঞাত সরকারী বৃত্তি লইয়া
ইংলণ্ডে গমন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি ডেপুটী কালেক্টর
নিযুক্ত হন। পরে তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে
অধ্যাপক হন। তিনি চাষীদের পরম হিতৈষী ছিলেন,

এবং তাহারা ইন্দীয় মালিক হয়, তাহা এই মত নানা প্রকারে প্রচার করিতেন। কৃষিবিদ্যায় তাহাৰ অধ্যয়নলাভ ও কাৰ্য্যগত অভিজ্ঞতা-গ্রহণ জ্ঞান ছিল। তিনি 'প্রবাসী'তে বহুবৎসর পূৰ্বে ইহা দেখাইয়াছিলেন, যে, পাটের চাষ করিয়া চাষীদের বাস্তবিক লাভ হয় না। যখন “লাভ” হয়, তখন বাহাকে লাভ বলা হয়, তাহা মজুরী মাত্র; এবং অনেক বৎসর সেই পারিশ্রমিক এবং চাষের গোন্ধ রাখিবার খরচও পোষায় না। তাহাৰ লিখিত “পাট বা নালিতা” শীৰ্ষক ধাৰাবাহিকরূপে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। অন্ত্যন্ত বিষয়েও তাহাৰ অনেক পুস্তক আছে।

গত কয়েক বৎসর ধৰিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনের জন্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাহাৰ সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি বৈদিক ধৰ্ম্মোপদেশ ও কোরানেব ধৰ্ম্মোপদেশের একা বিস্তারিতরূপে পাণ্ডিত্যেব সহিত দেখাইতেছিলেন।

তিনি নিৰ্ম্মল চরিত্র ও স্বাধীনচিন্তার জন্ত পরিচিত ছিলেন।

সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় পরীক্ষিতব্য

বিষয়

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় যে-সকল বিষয়ের পরীক্ষা হয়, তাহা হইতে দেশী ভাষা, দৰ্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বাদ দিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে শুনা যায়। পাস-করা সিভিলিয়ানরা যে-দেশের শাসন ও বিচার কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইবেন, সেই দেশের কোন ভাষায় তাহাদের ব্যুৎপত্তি না-থাকা খুবই উচিত! শাসক ও বিচারকদের পক্ষে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকাও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক! সুতরাং দৰ্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অকাজো জিনিষ।

কোন দেশে জন্মিলেই বা বাস করিলেই যে সেই দেশের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানী হওয়া যায়, ইহা সত্য নহে। সত্য হইলে ইংরেজদের ছেলেরা জুলে কলেজে ইংরেজী পড়িত না।

যে-কয়টি বিষয় বাদ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সে-কয়টি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখান হয়; অত্ৰ কোন-কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়, কিন্তু কলিকাতাতেই বেশী করিয়া ও বিশেষ ভাবে হয়। এই বিষয়গুলি বাদ দিবা বাঙালী প্রতিযোগীদিগকে অহুবিধায় ফেলা উচিত নয়—যদিও সেরূপ উদ্দেশ্য না-থাকিতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় পুথির পরিচয় ও সূচী

অনেক বৎসর খাটিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতবর্ষেব সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষার বিস্তর প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এগুলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেব প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে এবাবৎ রক্ষিত ছিল। বহু বৎসরেব চেষ্টায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এইগুলি ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিৰপদে রক্ষণাবেক্ষণপূৰ্বক তৎসমুদয়ের পরিচয় ও সূচী প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই কাজটি সুনিৰ্বাহিত হইলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টিব আলোচনা অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়

স্বাভাৱিক সভা

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার নুতন করিয়া যে সদস্য নিৰ্বাচন হইয়া গেল, তাহাৰ ফলে দুই প্রকাৰের কংগ্রেসওয়াল ও অত্ৰ স্বাভাৱিক সভা কত জন নিৰ্বাচিত হইলেন, তাহাৰ সংখ্যা এখন ঠিক কবিয়া বলা যায় না। কংগ্রেসওয়ালারা বলিতেছেন, তাহারা স্বয়ং ও অত্ৰ স্বাভাৱিকেরা মোট সভ্যসংখ্যার অৰ্দ্ধেকের কিছু অধিক হইবেন, ব্যবস্থাপক সভায় জৰ্জেন্ট পার্লেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের প্রতিকূল সমালোচনা করিবার লোক পঁচাত্তর জন পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে সমালোচনা দ্বারা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটা বিনষ্ট হইবে না—তাহাৰ জন্ত প্রবল, ব্যাপক ও দীৰ্ঘকালস্থায়ী চেষ্টা করিতে হইবে। এই বাটোয়ারা স্থায়ী হইলে তাহাৰ

সকলের চেয়ে কুফল এই হইবে, যে, তাহা সমুদয় ভারতীয় লোককে উচ্চতর রাষ্ট্রীয় অবস্থার উপনীত হইবার জন্য সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করিতে বাধা দিবে। সুতরাং এখন যে মুসলমান ও “অবনত” হিন্দুরা উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন, সাম্প্রদায়িক ঝাঁটোয়ারা যত দিন আছে, তত দিন তাঁহারা, অমুসলমান ও অনবনত হিন্দুদেরই মত দাস-জাতিরই অঙ্গীভূত থাকিবেন, স্বাধীন জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন না, এবং স্বাধীনতামূলক স্তানবক্তা, পৌরুষ ও বাণিজ্যাদি-সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য লাভ কবিত্তে পারিবেন না—প্রভুর উচ্ছিষ্ট একটু বেশী করিয়া হয়ত পাইবেন।

—

সমগ্রভারতের জন্য একীকৃত শাসনব্যবস্থা

কি অসম্ভব ?

ভারতবর্ষকে একত্ব দান ব্রিটিশ-শাসনের মহত্তম দান, এই দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি করিয়াছেন। অথচ এই কমিটিই তাঁহাদের রিপোর্টে অন্তর্জ বলিতেছেন—

“A completely united Indian polity cannot, it is true, be established either now or, so far as human foresight can extend, at any time.”

“ইহা সত্য, যে, বর্তমান সময়ে অথবা, যত দূর পর্যন্ত মানবীয় ভবিষ্যদৃষ্টি বাইতে পারে, কোন সময়েই সম্পূর্ণরূপে একীকৃত শাসননীতি বা শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।”

ইহা কি সত্য? ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই যদি ব্রিটিশ-শাসন একত্ব দিয়াছে, তাহা হইলে এক শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থা, বর্তমানে না-হউক, ভবিষ্যৎ কোন সময়েও কেন কল্পনাতীত ?

—

মোগল-সাম্রাজ্যের জাঁকজমক ও প্রজাদের

দারিদ্র্য

জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির বিপোর্টে মোগল-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে, “The imperial splendour became the measure of the people’s poverty,” “সাম্রাজ্যিক জাঁকজমক প্রজাদের দারিদ্র্যের মাপকাঠি

হইয়াছিল।” অর্থাৎ সম্রাটদের জাঁকজমক যত বাড়িতেছিল, প্রজাদের দারিদ্র্যও সেই পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছিল।

এইরূপ মন্তব্য অতীত ও বর্তমান সমুদয় সাম্রাজ্যের পক্ষে সত্য কিনা বলিতে হইলে সব সাম্রাজ্যের অধীন প্রজাদের অবস্থা পর্যালোচনা করিতে হয়। তাহা আমরা করি নাই। সুতরাং এমন কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি না বাহা সকল সাম্রাজ্যে প্রযোজ্য। তবে, ইহা দেখিতেছি বটে, যে, ভারত-সাম্রাজ্যে শাসকদিগের জাঁকজমকের অভাব নাই। সাম্রাজ্যিক দরবার খুব ঘটার সহিত দিল্লীতে আগে হইয়া গিয়াছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বকাল পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে আগামী বৎসর যে দরবার হইবে, তাহাতে জাঁকজমকের অভাব হইবে না। ভারতবর্ষের লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে লিখিত হইয়াছিল, যে, “The immense mass of the people are poor, ignorant, and helpless far beyond the standard of Europe,” “ভারতবর্ষের বিশাল জনপুঞ্জ এরূপ দরিদ্র, অজ্ঞ ও অসহায় যে ইউরোপে তাহার তুলনা মিলে না।” আবার বর্তমান ব্রিটিশ অশ্বের গত নবেম্বর মাসে প্রকাশিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির বিপোর্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে, “The average standard of living is low and can scarcely be compared even with that of the more backward countries of Europe,” “গড়ে এসশের লোকদের বাসগৃহ, প্রাসাদাদান ও চালচলন এমন গরিবানা রকমের, যে, তাহাব সহিত ইউরোপের অধিকতর অনুন্নত দেশগুলার লোকদের সেই সমুদয়েরও তুলনা করা যায় না।”

অথচ জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির এই রিপোর্টেই অন্তর্জ বলা হইয়াছে,

“... it can be claimed with certainty that in the period which has elapsed since 1858, when the Crown assumed supremacy over all the territories of the East India Company, the educational and material progress of India has been greater than it ever was within her power to achieve during any other period of her long and chequered history.”

তাৎপর্য। “ভারতবর্ষের দীর্ঘ ও দশাবিপর্ধ্যপূর্ণ

ইতিহাসের কোন যুগে এদেশের যেকোন আর্থিক ও শৈক্ষিক প্রগতি করিবার ক্ষমতা ছিল না, তার চেয়ে ইহার অধিকতর প্রগতি ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর হাত হইতে রাজস্ব ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনস্থ হওয়ার পর হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া দাবি করা হয়।”

ভারতবর্ষ অতীত কোন কালেই তত ধনী ও জ্ঞানী ছিল না যত ধনী ও জ্ঞানী ইহা ১৮৫৮ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ৭৬ বৎসরে হইয়াছে, ইহা সত্য কিনা বলিতে হইলে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের কয়েক হাজার বৎসরের একরূপ নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক বাহা আমাদের নাই—এবং বেয়াদবী মাপ করিলে বলিতে চাই, যে, জয়েন্ট পাল্‌মেন্টারী কমিটির সভ্যগণেরও এবং কোন সভ্যেরই নাই। তাহার একটা কারণ এই, যে, ভারতবর্ষের পুরাকালের ইতিহাস এখনও তেমন করিয়া, আধুনিক রীতি অনুসারে, লিখিত হয় নাই, যেকোন লিখিত হইলে সেই ইতিহাস পড়িয়া এত বড় একটা দাবি করা যায় বা তাহা খণ্ডন করা যায়। তবে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে অবশ্যই উদ্ভিত হইতেছে, যে, প্রাচীন কাল হইতে যে নানা দেশের লোকেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহা কি তবে বাণিজ্য নহে? তাহা কি বাণিজ্যব্যপদেশে মরুভূমিতে স্বর্ণ-রত্নের নামাস্তর ছিল? না, বাণিজ্যব্যপদেশে বুদ্ধিস্কিত অতি নিঃশব্দ অতি অসভ্য দেশে অন্নগন্ধ খুলিবার জন্ত আগমন ছিল?

বাহাই হউক, দাবিটা ঠাঁটি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, ভারতবর্ষের লোকদের ধনশালিতা সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট ও জয়েন্ট পাল্‌মেন্টারী কমিটির রিপোর্ট হইতে যে-সুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাকে ভিত্তি করিয়া কোন সাহস্কার দাবি করা চলে কি?

কোন দেশের লোক গড়ে কত বৎসর বাঁচে বা বাঁচিবার আশা করিতে পারে, তাহা সেদেশের লোকদের ধনশালিতার একটা প্রমাণ। ১৯৩১ সালের ভারতবর্ষীয় সেলস্‌ রিপোর্টের প্রথম ভাগ্যের প্রথম ভাগের ১৭১-৭২ পৃষ্ঠায় একটি তালিকা দেওয়া আছে, তাহাতে লেখা আছে, জন্মকালে গড়ে শিশুরা কোন দেশে কত বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারে। বৎসরের সংখ্যাগুলি বালিকা-শিশু ও

বালক-শিশুদের আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে জাতীয় শিশু ও পুরুষজাতীয় শিশু সকলের চেয়ে বেশী বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারে অষ্ট্রেলিয়ায়—যথাক্রমে ৫৮.৮৪ ও ৫৫.২০ বৎসর, এবং সকলের চেয়ে কম বাঁচিবার আশা করিতে পারে জাপানে—যথাক্রমে ৪৪.৮৫ ও ৪৩.৯৭ বৎসর। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার বাঁচিবার আশা করিতে পারে—যথাক্রমে ২৩.৩১ ও ২২.৫৯ বৎসর!

ভারতবর্ষের এই ধনশালিতা কি গর্ব করিবার বিষয়?

ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রগতি

কোন দেশে শিক্ষার প্রগতি কিরূপ হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইলে জন-কয়েক ডি-এস্‌টি, পিএইচ-ডি, এম্-এ, বি-এ কে গণিলে চলিবে না, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কত দূর হইয়াছে, তাহাই স্থির করিতে হইবে। ভারতবর্ষে শতকরা ৯২ জন মানুষ নিরক্ষর। পৃথিবীর অন্ত কোন সভ্যদেশের শতকরা এত জন লোক নিরক্ষর নহে। ইহা কি অহঙ্কারের বিষয়? এবং ইহাও সত্য নহে, যে, ব্রিটিশ-শাসনকালের পূর্বে নিরক্ষরতার পরিমাণ বরাবর ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল। নিরক্ষরতা যে ইহা অপেক্ষা কম ছিল তাহার প্রমাণ আমরা আগে আগে অনেকবার ইংরেজদের লেখা হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও অনেক বেশী ভোট পাইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নির্বাচন যখন জানা গেল, তখন এই সংবাদও পাওয়া গেল, যে, তিনি সাংস্‌হাতিক পীড়াগ্রস্ত। তাহাব ছয় দিন পরে অকালে তাঁহার মৃত্যু হন। ইহা অতি শোকাবহ ঘটনা।

তিনি তেজস্বী, সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্ত তিনি অনেক স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন

ও অনেক হুঃখ সহিয়াছিলেন। তিনি অনেক গরিব লোকের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে ব্যারিষ্টরী করিতেন।

করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুণগ্রাহিতা ও নানা বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচায়ক।

জানকীনাথ বসু

কটকের ভূতপূর্ব গবর্নেন্ট উকীল শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার অল্প সকল সন্তান নিকটে ছিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনা হইতে এরোপ্লেনে আসিয়াও ঠিক সময়ে পৌঁছিতে পারেন নাই। বাল্যকালেই জানকীনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া জ্ঞানলাভে ব্যাপৃত থাকেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার শিক্ষার অনেক সাহায্য করেন। বি-এ পাস করিবার পর জানকীনাথ জেনার্যাল এসেমব্লীজ্ ইনস্টিটিউশ্যনে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহা এক্ষণে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি বি-এল পাস করিয়া কটকে ওকালতী আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার খুব পসার ও প্রভূত অর্থাগম হয়। গবর্নেন্ট তাঁহাকে সরকারী উকিল নিযুক্ত করেন ও পরে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় তিনি ঐ উপাধি পরিত্যাগ করেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। গত বৎসর বধন আমবা রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কটক গিয়াছিলাম, তখন তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতী। তাহার মধ্যে বাজ-নৈতিক কর্মিষ্ঠতার জন্য শরৎ চন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র সমধিক বিখ্যাত।

রাখালচন্দ্র সেন

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেনের অকালে নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বিদ্বান ও সাহিত্যাহুরাগী ছিলেন। কবি শ্রীমতী কামিনী রাধেব মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীর সুন্দর সমালোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের নূতন বাংলা বহি “জীবনবাণী”র যে ইংরেজী সমালোচনা তিনি

হাউস অব কমন্সে রক্ষণশীলদের জয়

এখন ইংলণ্ডে যে গবর্নেন্ট চলিতেছে, তাহাকে ন্যাশনাল গবর্নেন্ট অর্থাৎ সমগ্রজাতীয় গবর্নেন্ট বলা হয়, কারণ তাহাতে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক ও শ্রমিক তিন দলেরই কিছু কিছু লোক আছে এই দাবি করা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা রক্ষণশীল দলেরই গবর্নেন্ট, ঐ দলের সভাই হাউস অব কমন্সে খুব বেশী। উদারনৈতিক দলের এক-আধ জন মন্ত্রীসভায় থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের খুব বড় এক জন রাজনীতিজ্ঞ মিঃ লয়েড জর্জ এই গবর্নেন্টের বিরোধী। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোন্ডাল্ড নামে শ্রমিকদলের, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিজের পদটি বজায় রাখিবার জন্য বহুদূরী।

হাউস অব কমন্সে ভারত-সচিব স্ত্রী সামুয়েল হোব এই মর্শ্বের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যে, জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হউক এবং ভারত-শাসন আইনের তদনুযায়ী একটি পাণ্ডুলিপি পার্লামেন্টে পেশ করা হউক। শ্রমিকদলের সভ্যেরা ইহার বিরোধিতা করিয়া অনাস্থাস্থক একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সবাই জানিত, আমরাও জানিতাম, শ্রমিকদল পরাজিত হইবেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের পক্ষে ৪৯ এবং বিরুদ্ধে ৪৯১ জন পার্লামেন্ট-সভ্য ভোট দেন। স্ত্রী সামুয়েল হোবের মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পক্ষে ৪১০ ও বিরুদ্ধে ১২৭ জন ভোট দেন।

তিন দিন ধরিয়া এই যে সাড়ম্বর তর্কবিতর্কের অভিনয় হইল, এ-বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোন কৌতুহল না-থাকায় রয়টার বক্তৃতাগুলি যে চুপক টেলিগ্রাফ-যোগে পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহা এ-পর্যন্ত পড়ি নাই। পারি ত অবসরমত পড়িব। হাউস অব লর্ডসের তর্কবিতর্কভিনয়ের পরি-সমাপ্তির খবর অর্থাৎ ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখের প্রাতঃকালীন খবরের কাগজে পাওয়া যায় নাই।

রাজবন্দী মানবেন্দ্রনাথ রায়

রাজবন্দী মানবেন্দ্রনাথ রায় বরেন্দ্রী জেলে কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন। তাঁহার রোগের সেখানে উপশম হইতেছে না। এই জন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার মুক্তির দাবি করা হইতেছে। বঙ্গের অনেক সংবাদপত্রে এবং কোন কোন জনগণ-সভাতেও তাঁহার মুক্তির প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই, যে, কয়েক দিন আগে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এতদর্থে যে সভা হয়, তাহার বিজ্ঞাপনে বক্তাদের মধ্যে 'প্রবাসী'র সম্পাদকের নাম ছিল। কখন কখন 'আমাকে না-জানাইয়া কোন কোন সভার বিজ্ঞাপনে বক্তাদের মধ্যে আমার নাম দেওয়া হয়। ইহা অব্যাহীনীয়। কিন্তু এই সভাটির বিজ্ঞাপনে আমার নাম দেওয়া আরও অগ্রায় হইয়াছিল এই জন্ত, যে, আমাকে টেলিকোনে একজন উদ্যোক্তা জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁহাকে আমার নাম দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কারণ, ঐ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পরেই ভবানীপুরে অত্র একটি সভায় আমার বক্তৃতা করিবার প্রতিশ্রুতি ছিল, এবং আমি অস্থগু হিলাম। সেই জন্ত আমি নাম দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, যদিও শরীর ভাল থাকিলে অল্পসময়ের জন্ত হয়ত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যাইতাম।

শ্রীব্রজ মানবেন্দ্রনাথ রায়কে মুক্তি দিয়া এখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে তাঁহাদের সাধ্যমত তাঁহার উৎকৃষ্টতম চিকিৎসা করাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাঁহাকে ছয় বৎসরের জন্ত কারাবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সময়ের অধিকাংশ তিনি ইতিমধ্যেই কারাগারে যাপন করিয়াছেন। সুতরাং কিছুকাল পরে তাঁহাকে ত মুক্তি দিতেই হইবে, এখন মুক্তি দেওয়ায় ক্ষতি কি? এক দিকে তাঁহার যেমন কারাবাসেব কিছু বাকী আছে, তেমনি অত্র দিকে তার চেয়েও বেশী হৃৎকর রোগভোগ তাঁহার হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং যদি এখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেও হরদরে ছয় বৎসর কারাবাসের চেয়ে কম শাস্তিভোগ তাঁহার হইবে না। বিচারক যখন তাঁহাকে ছয় বৎসরের জন্ত কারাদণ্ড দেন, তখন শুধু কারাদণ্ড দিয়াছিলেন, রোগভোগের দণ্ড দেন নাই। অবশ্য জেলের

কর্তৃপক্ষ তাঁহার রোগ জন্মাইয়াছেন এরূপ বলিতেছি না, তিনি রোগভোগ করিবেন, বিচারকের ইহা অনুমান বা অভিপ্রায় ছিল না ইহাই বলিতেছি। বিচারে যখন তাঁহার ছয় বৎসর কারাবাসদণ্ড হইয়াছিল, প্রাণদণ্ড হয় নাই, তখন তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিচারকের মতে তিনি এমন কোন অপরাধ করেন নাই যাহাতে আইনতঃ তাঁহার মৃত্যু হওয়া আবশ্যিক। অতএব জেলে তাঁহার মৃত্যু আইনের ও বিচারকের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং যদি তাঁহার রোগ এরূপ যে জেলে তাঁহার যথোচিত চিকিৎসার ও রোগমুক্তির অগ্রান্ত অবস্থার সমাবেশ ঘটতে না-পারে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গবর্নমেন্টের একান্ত কর্তব্য। তাঁহার বোগেব প্রকৃতি ও অবস্থা নির্ধারণের জন্ত কেসরকারী ও সবকারী বড় কয়েক জন ডাক্তারের একটি বোর্ড গঠন করিয়া তাহাব দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা গবর্নমেন্টের অন্ততঃ নিশ্চয়ই তরান উচিত। এরূপ বোর্ড দ্বারা এবকম পরীক্ষা গবর্নমেন্ট অত্র কোন কোন রোগী রাজবন্দী করাইয়াছেন।

সাবিত্রী শিক্ষালয়

কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলের সাবিত্রী শিক্ষালয় একটি বালিকা-বিদ্যালয়। প্রাচীনপন্থী হিন্দুরাই প্রধানতঃ এই অঞ্চলের বাসিন্দা। বিদ্যালয়টিতে এখন প্রায় তিন শত ছাত্রী পড়ে আজকাল, কতকটা মত-পরিবর্তন-বশতঃ, কতকটা অগ্রান্ত কারণে, হিন্দু বালিকাদের অগ্রগতির মত অল্প বয়সে বিবাহ হয় না। তাহাদিগকে অশিক্ষিত অবস্থায় বাড়িতে বসাইয়া রাখা উচিত নয়। এই জন্ত কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, নূতন পাড়াগুলিতে ত বাড়িতেছেই, পুৰাতন পল্লীগুলিতেও বাড়িতেছে। সাবিত্রী শিক্ষালয়ে এরূপ বয়সের অনেক হিন্দু ছাত্রী দেখিয়া প্রীত হইলাম, আগেকার কালে যাহাদের নিশ্চয়ই বিবাহ হইয়া যাইত ও যাহারা নিরক্ষর থাকিত। ইহা বলিবার অর্থ এনহে, যে, আমরা বিবাহের বিরোধী! বিবাহের আমরা বিরোধী ত নই-ই, বরং শ্রমিকার পর উপযুক্ত ও অনধিক বয়সে বিবাহ হওয়াই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় মনে করি।

সাবিত্রী শিক্ষালয়ের অধ্যাপনা কাশিমবাজারের মহারাজার শিল্পবিদ্যালয়ের বাড়ি ছুটিতে প্রাতঃকালে হয় বলিয়া এবং সেই ক্ষুদ্র ইহার অধিকাংশ শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক নামমাত্র বেতন কাম করিতে পারেন বলিয়া ইহা চলিতেছে। ক্রমশঃ ইহাকে নিজস্ব বাড়ি ও ক্রীড়াক্ষেত্রের অধিকারী হইতে হইবে। তখন সকল সময়ে সেই বাড়িতে ইহার নানাবিধ কাজ চলিবে, এবং শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকদিগকে যথোচিত বেতনও দিতে হইবে। কিন্তু যত দিন সে অবস্থান ঘটে, তত দিন যে এই ভাবে ইহা চলিতে পারিবে, ইহা সন্তোষের বিষয়। দেশের সর্বত্র, যেখানে যেখানে ছেলেদের বিদ্যালয় আছে ও তাহার বাড়ি আছে, সেইখানেই মেয়েদের বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বাড়ি নির্মাণ করিবার বা ভাড়া লইবার এবং পূর্ণ বেতনে শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক নিযুক্ত করিবার টাকা না-থাকিলে, সাবিত্রী শিক্ষালয়ের মত বন্দোবস্তে প্রাতঃকালে ছেলেদের বিদ্যালয়ের গৃহে মেয়েদের বিদ্যালয় চালান উচিত। এই প্রকারের নানা উপায় অবলম্বিত না হইলে আমাদের দরিদ্র দেশে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইতে বহু বিলম্ব ঘটবে।

“বিশ্বকোষ”

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব গ্রন্থের নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংকলিত “বিশ্বকোষের” দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে। ইহার প্রথম ভাগের ত্রয়োদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত আগে বাহির হইয়াছিল। তাহার পরিচয় আগে ‘প্রবাসী’র কোন কোন সংখ্যায় দিয়াছি। সম্প্রতি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংখ্যা পাইয়াছি। এই দুই সংখ্যায় ৪১৭ হইতে ৪৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। এই দুই সংখ্যাও পূর্বে পূর্বে সংখ্যার মত নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। আবশ্যিক-মত চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথক-করণ

জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে আলাদা করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব আছে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবেন। ব্রহ্মদেশীয়দের অধিকাংশ রাজনৈতিকজ্ঞানবিশিষ্ট লোক এই বিচ্ছেদের বিরোধী, কতক লোক ইহাও মপক্ষে। ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়েরাও ইহার বিরোধী। যদি কেবল তাঁহারা ইহার বিরোধী হইতেন, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারিত, যে, তাঁহারা কেবল নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি হইতে বিরোধিতা করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় বহু শিক্ষিত লোকও ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বর্তমান মিলিত অবস্থার পক্ষপাতী হওয়ার কথা বলাইতেছে, যে, এই মিলনে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম উভয়েরই লাভ আছে। এই দুই ভূখণ্ডকে আলাদা করিয়া দিলে ইংবেঙ্গদের তাহা শোষণ করিবার সুবিধা বাড়িবে।

বর্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়েরা একটি কনফারেন্সে ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের কুফল আলোচনা ও তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের বন্দোবস্ত করিবেন।

ভিক্ষু উত্তমকে হিন্দু মহাসভার

সভাপতি নির্বাচন প্রস্তাব

ভিক্ষু উত্তমকে হিন্দু মহাসভার আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার সংজ্ঞা অনুসারে, যে-কেহ ভারতবর্ষজাত কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন, তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষু উত্তমকে সভাপতি নির্বাচন করিতে বাধা নাই। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয় কোন কোন ভাষাও জানেন—তাঁহাকে বাংলা বলিতে শুনিয়াছি। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে ক্রটিমূলক মিলনের তিনি পক্ষপাতী। বহু ছঃপ্রভোগ ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার মনুষ্য প্রমাণিত করিয়াছে।

সিংহলের শিল্পবিভাগে বাঙালী নিয়োগ

রাজ্য শিল্পবিভাগের গ্রন্থক কল্পদাস গুহ সিংহল-গবর্ণমেন্টের শিল্প-বিভাগে বার্ষিক ৮,৪০০ টাকা বেতনে পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বঙ্গ, মহীশূরে ও ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। জার্মেনীতেও তিনি অনেক

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। রাসায়নিক নানা শিল্পকার্যে তিনি গবেষণা করিয়াছেন এবং অন্তবিধ সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও তাঁহার আছে।

মাৎগুড় প্রয়োগে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি

আত্মা-অবোধা প্রদেশের বিজ্ঞান-পরিষদের সম্প্রতি যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধব একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে বলেন, যে, মাৎগুড় বা ঝোলা গুড়ের প্রয়োগে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। সাধাবগতঃ চিনির কারখানায় এই জিনিষটি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ধরের এই গবেষণাটি কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে বিশেষ স্নফলপ্রদ হইবার কথা।

“বঙ্গীয় মহাকোষ”

প্রধান সম্পাদক রূপে অধ্যাপক শ্রীঅমলচরণ বিদ্যাবূষণ বহু বিদ্বান্ সহকারী সম্পাদক এবং বিভাগীয় সংযেব সম্পাদকের সাহায্যে “বঙ্গীয় মহাকোষ” নাম দিয়া একটি বৃহৎ বাংলা এনসাইক্লোপীডিয়া বাহির কবিতো সংকল্প করিয়াছেন। ইহার নমুনা-সংখ্যাটি দেখিয়া আশাবিত্ত হইয়াছি। নমুনা-সংখ্যাটির কাগজ ও ছাপা ভাল, জিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রগুলিও উৎকৃষ্ট। লিখিত বিষয় যতটুকু পড়িলাম, তাহা সুলিখিত ও প্রামাণিক মনে হইল। মহাকোষখানি এই নমুনার মত হইলে ইহা সাহিত্যানুবাগী ও জ্ঞানপিপাসু লোকদের অতি আদরনীয় এবং অধ্যয়নকালে নিত্যসহচর হইবে।

উইলিয়ম কেরীর শতবার্ষিক স্মৃতিসভা

১৮৩৪ সালে বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিশনারী উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু হয়। গত মাসে কলিকাতায় ‘প্রবাসী’র সম্পাদকের সভাপতিত্বে তাঁহার শতবার্ষিক স্মৃতিসভা হয়। তাহাতে প্রিন্সিপ্যাল জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী

গাঙ্গুলী, স্টেটসম্যানের সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর, স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর আর্কাট, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, এগ্রি-হর্টিকালচার্যাল সোসাইটির মিঃ পার্সি-ল্যাক্টেটাব, স্তর হাসান মুহাওয়ার্দি, শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এক্সস, কেরী সাহেবের প্রপৌত্র উইলিয়ম কেরী, এবং সভাপতি তাঁহার জীবন ও চরিত্রের নানা দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আর্কাটসাহেব তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কেরী সাহেবের নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত করেন :—

“Its structure is such that it abundantly uses words requiring much care for their right formation, and which yet yield it its peculiar perspicuity and elegance. Convinced as I am that Bengali is intrinsically superior to all other spoken Indian languages, and second in utility to none, I cannot consent to what degrades it in the College”

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঞ্জল কমিটি

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঞ্জল কমিটি ছাত্রদেব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঠিক ঠিক তথ্য প্রকাশ করিয়া তাহা উন্নতির চেষ্টা করা যে কত আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। গত ১৯৩৩ সালের বিপোর্টে দেখিতেছি, পবীক্ষিত ছাত্রদেব মধ্যে শতকরা ৬২ জনের স্বাস্থ্য অসন্তোষজনক ছিল, পূর্ব বৎসর শতকরা ৫৯.৫ জনের স্বাস্থ্য অসন্তোষজনক ছিল। ছাত্রদেব স্বাস্থ্য কি ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে?

এলাহাবাদে বাংলার চর্চা

এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর ১৯৩৩-৩৪ সালের রিপোর্টে দেখিতেছি, ঐ বৎসর পাঠকেরা প্রাচ্যভাষাসমূহের নিম্নলিখিতসংখ্যক বহি পড়িবার জন্য বাড়ি লইয়া গিয়াছিলঃ— সংস্কৃত ১৭১, হিন্দী ১৩৮৮, আরবী-ফারসী ৩২১, উর্দু ৭০৪, বাংলা ৭৫৫। এলাহাবাদে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু সংখ্যা অনেক বেশী এবং উহা হিন্দু একটি প্রধান তীর্থ। তাহা সত্ত্বেও সেখানে সংস্কৃত অপেক্ষা আরবী-ফারসী বহি লাইব্রেরী হইতে বেশী গৃহীত হইয়াছিল। হিন্দী-

উর্দুভাষীদেব তুলনায় বাঙালীর সংখ্যা সেখানে খুবই কম। বাংলা বই লাইব্রেরীতে আছেও খুব কম। তথাপি ৭৫৫ খানা বাংলা বই গৃহীত হওয়া মন্দ নহে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃপ্রবেশ চেষ্টা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী দীর্ঘকাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি পুনর্বীর, বর্ধমান-বিভাগ হইতে, ভাবতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপদপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার কাজ বিশেষ যোগ্যতার সহিত নির্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতা এত অধিক, যে, যখন স্তব (তৎকালে মিঃ) যথুধম্ চেষ্টা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন তিনি বিদেশে না-থাকিলে তিনিই নির্বাচিত হইতেন, দিল্লীতে এই মত খুবই প্রচলিত। নানা প্রয়োজনীয় তথ্যের জ্ঞান, ধীরতা এবং তর্কবিতর্ক-শক্তি তাঁহার খুব আছে। মেদিনীপুর জেলায় যে তদন্তকমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর সরকারী আদেশে তাহা নিষিদ্ধপুস্তকতালিকাভুক্ত ও বাজেয়াপ্ত হই, ক্ষিতীশ বাবু সেই কমিটির সভ্যরূপে ঘটনাস্থলে গিয়া সব বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞানিয়া আসেন। হাকিমের আদেশে পুলিশ তাঁহাকে ও কমিটির অন্ত কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে। তিনি অত্যাচারিতদের কথা নির্ভীকভাবে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। সকলের তাঁহাকেই ভোট দেওয়া উচিত।

পুণ্যবতী সাধ্বী রোকেয়া খানম্

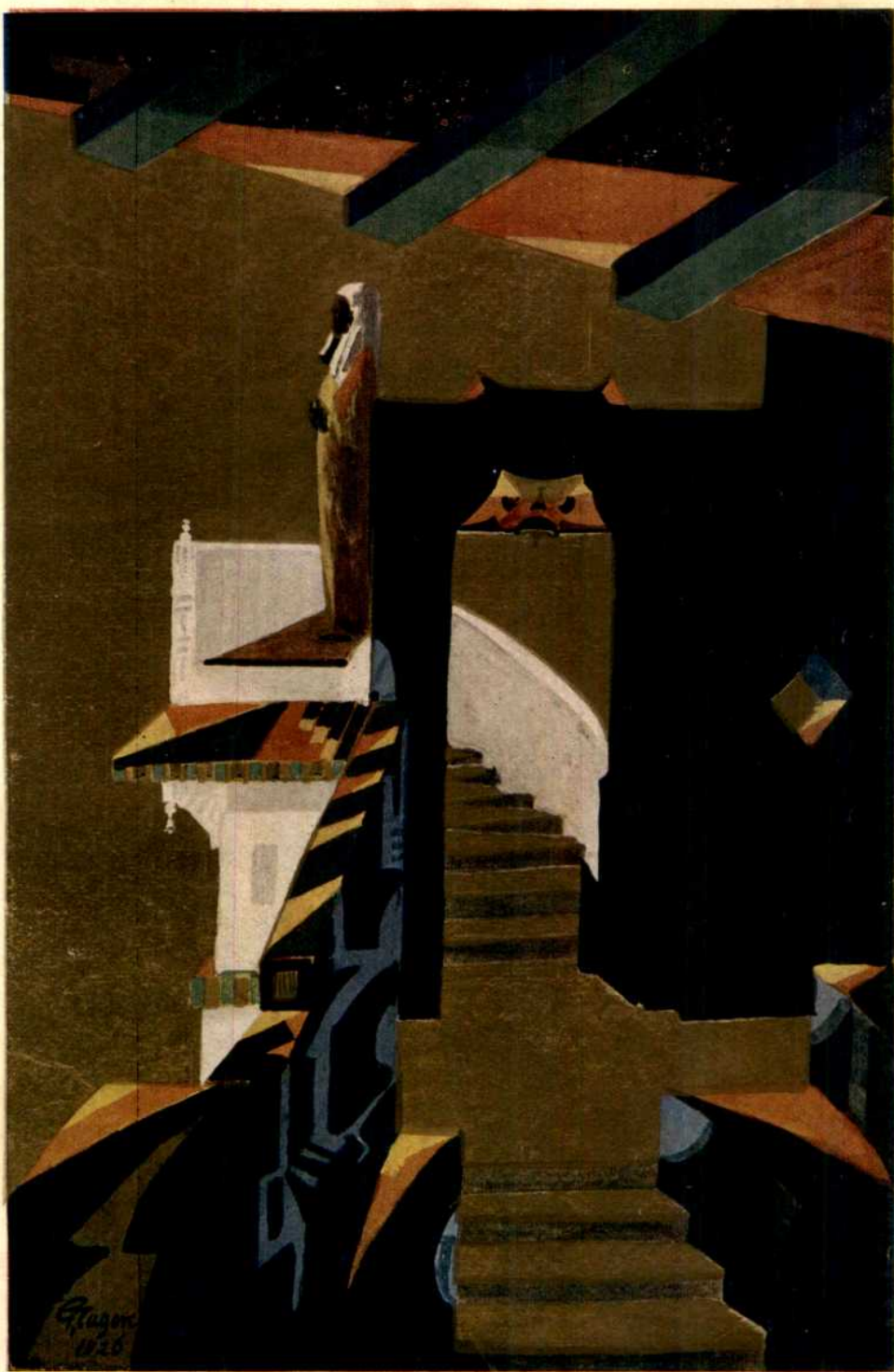
পুণ্যবতী সাধ্বী রোকেয়া খানম্ মুসলমান-সমাজে মিসেস সাখাওৎ হোসেন নামে পরিচিত। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন। স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সাখাওৎ হোসেন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করেন।

তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিসভায় মৌলবী সাঈদ আলি আবদুল বলেন—

“উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশে বোকেয়া খানমের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জহীব-উদ্দীন মোহম্মদ আবু আলি। বংশের প্রাচীনত্ব ও শবীকত্বই ছিল বেগম রোকেয়া খানমের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাত। তাঁহার পিতা মোহম্মদ আবু আলি সাহেব স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যে-বয়সে সাধারণ বালিকারা প্রথম স্কুলে বাইতে আরম্ভ কবে, সেই বয়স হইতেই রোকেয়া খানমকে পর্দার আড়ালে অন্ধকারের ভিতর লুকাইয়া ফেলা হইয়াছিল। কিশোরী বোকেয়া খানম্ বাংলাব শত সহস্র মুসলিম কিশোরীর মত এই অত্যাচার নীতিতে সন্তুষ্ট করেন নাই। তিনি পিতার সমস্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে স্কোষ্ঠ সহোদর আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাহেবের নিকটে সামান্ত বাংলা ও ইংরেজী প্রথম ভাগ শেষ করিয়া ফেলেন। কিশোরী বোকেয়ার এই বিদ্বেষী জীবনের ইতিহাস বাংলাব মুসলিম-নারী-মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়। তিনি কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পর্দা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষাব বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া গিয়াছেন।

প্রায় ষোল বৎসর বয়সে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওৎ হোসেনের সহিত বেগম রোকেয়া খানমের বিবাহ হয়। উচ্চশিক্ষিত জদয়বান স্বামীর সাহচর্য্যে তিনি ইংরেজী ভাষায় সুপাণ্ডিতা হইয়া উঠেন।

রোকেয়া খানমের বিবাহিত জীবন দাম্পত্যপ্রেমেব এক অতুল্যজ্বল কাহিনী, স্বামীর অকাল মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই, অন্তরের সমস্ত গ্লানি-যন্ত্রণা নীরবে অন্তরে বহিয়া এই গরীয়সী নারী জীবনের সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া সেবার যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহা বাংলার সেবার ইতিহাসে অতুলনীয়—শুধু প্রেমময়ী পত্নীরূপেই নহে, স্নেহময়ী সমাজ-সেবিকারূপেই তাঁহার জীবনের সাধনা কল্যাণশ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।”



‘আজান’

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নাগমায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৪শ ভাগ

২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪১

৪র্থ সংখ্যা

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা
দেহের দেহলীতে জাগায় দেহের অতীত কথা ।
খাঁচার পাখী যে বাগী কয়
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তারি মধ্যে করণ ভাষায় সুদূর অগোচর
বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্য মর্ম্মর ॥

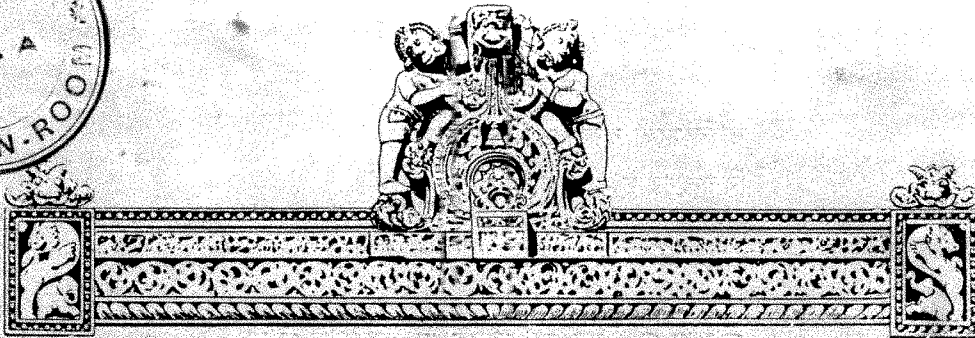
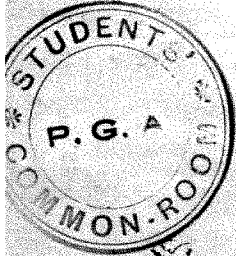
চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারি জাল-বোনা,
কোন্ অলঙ্কার ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা ।
শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে
দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে
দিখলয়ের ইঙ্গিত-লীন উধাও কল্পলোকে ॥

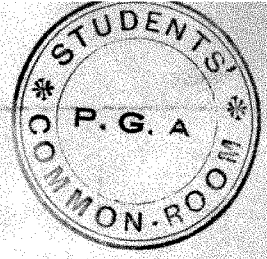
ভালোমন্দে বিকীর্ণ এই দীর্ঘ পথের বুকে
 রাত্রি-দিনের যাত্রা চলে কত ছুঁতে স্মৃতে ।
 পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই
 শেষ হবে কি ? আর কিছু নেই ?
 দিগন্তে যার স্বর্ণলিখন, সঙ্গীতের আহ্বান,
 নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান ?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন তলে
 চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ বৃষ্টিজলে,
 স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে
 অভাবিতের গভীর টানে,
 অন্ধকারে এই যে ধ্যান স্বপ্নে কি তার শেষ ?
 উষার আলোয় ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ ?

১৫ নবেম্বর

১৯৩৪





ছোটনাগপুরে সাহিত্য-সেবার উপাদান

শ্রীশরণ চন্দ্র রায়

ছোটনাগপুরে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার অপরিণত ও অপরিপক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। পরিতাপের বিষয়, সে-সব উপাদান অস্পৃশ্য হরিজনদের মত বহু যুগ হইতে অনাদৃত, অনাহত ও অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলনের পক্ষে ছোটনাগপুর একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু যদিও এই ক্ষেত্রে ‘আবাদ করিলে সোনা ফলিতে’ পারিত, হুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত ‘চাষের মতন চাষ করার’ লোকের অভাবে এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত বা অকর্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। কেবল গত শতাব্দীর ছই-চারি জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্মচারী এই ক্ষেত্রে উপর-উপর আঁচড় দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যদিও তাঁহারা এই ক্ষেত্র গভীর ভাবে কর্ষণ করিবার অবকাশ বা সুযোগ পান নাই, তবুও সম্যক কর্ষণে কিরূপ সোনার ফসল লাভ হইতে পারে তাহার আভাস দিয়া তাঁহাদের পরবর্তী কৃষকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে ব্ল (V. Ball), ব্লাণ্ডফোর্ড (W. T. Blandford) ও কর্ণেল টিকেল (Col. Tickell) প্রমুখ কয়েক জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ছোটনাগপুরের ভূতপূর্ব কমিশনার কর্ণেল ডাল্টন (Col. Dalton) এবং মানভূমের ভূতপূর্ব সহকারী কমিশনার এবং পরে ভারত-গবর্নমেন্টের হোম মেম্বার স্যার হারবার্ট রিজলি (Sir Herbert Risley) পথ-প্রদর্শকের কাজ করিয়া আমাদের চিরঋণী করিয়াছেন। অবশ্য ইঁহারা দেশীয় সহকারী ও পত্রপ্রেরকদের সহায়তায় তথ্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই নাম অজ্ঞাত।

১। প্রাগৈতিহাসিক যুগ

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ছোটনাগপুরে এখনও সবিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। ক্যাপ্টেন বীচিং (Captain

Beeching), ব্ল (V. Ball), কর্ণেল টিকেল এবং আরও ছই-এক জন অনুসন্ধিৎসু ইংরেজ কর্মচারী অল্প তত্ত্বের অনুসন্ধান উপলক্ষে দৈবক্রমে ছই-চারিটি প্রস্তর-যুগের কুঠারফলক প্রাপ্ত হন এবং আনুমানিক ভাবে সেগুলির পরিচয় দেন।

ছোটনাগপুরের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধেও ভূতপূর্ব ইংরেজ সিবিলায়ান মুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন (Sir George Grierson) এবং ছই-চারিটি ইউরোপীয় পাদ্রীর (Father Hoffmann, Rev. Dr. Noltrott, Rev. Hahn, ও Father Grignard-এর) নিকট আমরা ঋণী। এই সব বিদেশীয় পণ্ডিত যে-জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন আমরা এখানে তাহার সম্মুখে থাকিয়াও এত দিন সেই উন্মুক্ত দ্বারের আহ্বান অবহেলা করিয়া আসিতেছি।

সম্প্রতি ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও কলকারখানা দ্বারা উৎপাদন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ স্বাবলম্বনের স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধেও স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানচাষ্যেরা সেইরূপ আত্মনির্ভরতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন এবং সাহিত্য ও ইতিহাসাদি সেবার ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যার বজ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণও সেইরূপ আত্মনির্ভরের পরিচয় দিতেছেন। এখন আর গত শতাব্দীর অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয় আমরা ভারতের অমূল্য প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব উজ্জাটনের ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারের জন্ত এবং আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্ত বিদেশীয় পণ্ডিতদের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী নহি। যদিও পূর্বগামী বিশেষজ্ঞ কতকগুলি বিদেশীয় পণ্ডিতের ও তাঁহাদের মতানুবর্তী কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিতের



জুয়াক যুবক (১)

জুয়াক যুবকের (২) পার্শ্বভাগ

জুয়াক যুবক (২)

জুয়াক যুবকের (১) পার্শ্বভাগ

নিকট ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের উদ্ধার ও সম্যক অর্থবোধ ও ব্যাখ্যান এবং নূতন বা অনাস্তত তথ্যের আবিষ্কার বা আহরণ দেশীয় বিদ্বানগণের দ্বারা বৈরাগ্য সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে সেরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

যে নব্য বিদ্যগোষ্ঠী বাংলা দেশে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণার নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি আজ এই ‘পাণ্ডুবর্জিত’ ছোটনাগপুরের দিক্‌ক আকৃষ্ট হওয়ায় স্থানীয় সাহিত্যসেবীদের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। তাই আশা করি, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার কিরূপ উপকরণ ছোটনাগপুরে পাওয়া যাইতে পারে—এই প্রশ্ন এই অভিভাষণের অনুপযোগী হইবে না। তবে ভাষার দারিদ্র্যের জন্ত ও যথাযথ ব্যাখ্যানের শক্তির অভাবে আমার এই অভিভাষণ হয়ত শ্রোতাদের ক্রেশদায়ক হইয়া পড়িবে।

ছোটনাগপুরের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারী ভূতত্ত্ব-বিভাগের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ছোটনাগপুর ভারতের মধ্যে একটি সর্বপ্রাচীন প্রদেশ। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ বর্তমান স্থলভাগ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তখনই ছোটনাগপুরের ভূপঞ্জর গঠিত হইয়াছে। যে-যুগে পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ হয় নাই, সেই জীবহীন (Archaean বা Azoic) যুগে

Gneiss, Granite, Quartzite ও Epidiorite প্রভৃতি প্রস্তরে ছোটনাগপুর, বিশেষতঃ রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলা, পরিপূর্ণ। আর কেবল কোন কোন অংশে পুরাতন জীব-যুগের (Lower Paleozoic) ধারোয়ার ও গোণ্ডোয়ানা শ্রেণীর প্রস্তর বর্তমান। সুতরাং ভারতের এই একটি প্রাচীনতম প্রদেশে ভূবিদ্যার আলোচনা ও গবেষণার প্রচুর উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

আর এখানে লৌহ-অভ্র-কয়লা-চূণ প্রভৃতির অনেক খনি থাকিতে খনিজ-বিদ্যা সম্বন্ধেও গবেষণার সুযোগ আছে। উদ্ভিদ-বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধেও অরণ্যবহুল ছোটনাগপুরে অনুসন্ধান ও গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বর্তমান। তারপর প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার জন্ত ছোটনাগপুরে বৈরাগ্য প্রচুর উপকরণ আছে, উত্তর-ভারতে সিদ্ধু-নদের উপত্যকা ছাড়া সম্ভবতঃ আর কোথাও সেরূপ নাই। যে-প্রদেশের ভূস্তর-সংগঠন (land formation) ভারতের বা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতমের একটি সেই স্থান যুগযুগান্তর হইতে মানবের আবাস-ভূমি হইয়া আসিতেছে, এ তথ্য কেবল অনুমানমাপেক্ষ নয়। পুরাতন প্রস্তর-যুগ, মধ্য-প্রস্তরযুগ, নূতন প্রস্তর-যুগ, প্রস্তর ও তাহের মিশ্রযুগ, তাম্র-যুগ ও পুরাতন লৌহ-যুগ—ইহার নিদর্শন ছোটনাগপুরের মালভূমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান। কেবল অনুসন্ধানকারীর কোদালীর অপেক্ষা করিতেছে।

আপনারা সকলেই জানেন যে আদিমানবের বিশেষ

কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। আদিমানব স্বাভাবিক অস্ত্র ব্যবহার করিত, অর্থাৎ নিজের হাত পা নখ এবং গাছের ডাল বা পাথরের টুকরাই তাহার একমাত্র অস্ত্র ছিল। হয়ত জলশ্রোতে ঘষিয়া কিংবা নৈসর্গিক কোনরূপ চাপে ইঁচালো বা তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত ছই-চারখানা পাথর দেখিয়া কোন আদিম মানবের মনে প্রস্তরখণ্ডকে কোশলে ভাঙিয়া বা ঘষিয়া ধারাল করিবার কল্পনা প্রথমে উদ্ভূত হয়। এই প্রথম মানব-হস্তনির্মিত শিলা-অস্ত্রগুলির উদা-শিলা (Eolith) নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে মানব-সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হইল। ক্রমে এক-একখানা প্রস্তরখণ্ড অস্ত্র প্রস্তরের দ্বারা বিশেষ আকারে ভাঙিয়া লইয়া কিনারা-গুলি সেইরূপে ছিলিয়া (chipping) ও ধার-যুক্ত করিয়া বিশেষ আদর্শ (pattern) অনুযায়ী আদিম মানবেরা কুঠারফলক প্রভৃতি নির্মাণ করিতে লাগিল। এরকম ফলকযুক্ত ছিলি (chipped) বা অসমান (rough) প্রস্তরাস্ত্র বহু সহস্র বৎসর ব্যবহৃত হইত। ঐ যুগকে পুরাতন প্রস্তর-যুগ (Rough Stone Age বা Palæolithic Age) বলা হয়। তার পর ক্রমান্বয়ে গঠন-প্রণালীর ও নমুনার উন্নতি ও কার্যোপযোগিতা ও সৌন্দর্যের উৎকর্ষ অনুসারে মধ্য-প্রস্তরযুগ (Mesolithic Age) ও নূতন প্রস্তর-যুগ (Neolithic Age)-এর উদ্ভব হইল। এই যুগে পাথরের ধার অস্ত্র পাথরে ঘষিয়া করা হইত;—ছিলিয়া নয়। এইরূপে আবার কত সহস্র বৎসর কাটিল; সভ্যতার ক্ষুব্ধ মন্দ গতিতে চলিতে থাকিল। তার পর মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর হইল তাহার এবং পরে ব্রোঞ্জের (তিনিমিশ্রিত তামার) আবিষ্কার হইল। আর পাথরের অস্ত্রের অহু করণে তামার অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে শুরু হইল। প্রথম প্রথম কিছুকাল প্রস্তরাস্ত্র ও তাম্র-অস্ত্র দুই-ই ব্যবহার হইতে লাগিল। ঐ যুগকে তাম্র-প্রস্তর-যুগ (Chalcolithic Age) নাম দেওয়া হইয়াছে। পরে, ভারতের বিমিশ্র তাম্র-যুগ ও ইউরোপের ব্রোঞ্জ-যুগ। যখন আর্যেরা ভারতে প্রথম আগমন করেন তখনও হয়ত ভারতে তাম্র-যুগ শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ তখন তাম্র ও লৌহ যুগের সন্ধিকাল। কারণ, ঋগ্বেদে বে 'অয়সে'র উল্লেখ আছে তাহাকে কোন কোন পণ্ডিত তাম্র অর্থে গ্রহণ করেন।

সর্বশেষে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হইল। এই লৌহ-যুগকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; প্রথম বিভাগ পুরাতন লৌহ-যুগ (Early Iron Age) ও অপরটি নূতন লৌহ-যুগ (Later Iron Age) নামে অভিহিত হয়। এখন আমরা এই নূতন লৌহ-যুগে আছি।



একটি জুয়াড় গ্রাম

২। নৃতত্ত্ব

এই প্রসঙ্গে আর্যদের আগে ভারতে পর-পর কোন্ কোন্ জাতি আসিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হইবে না। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের অনেকেই অনুমান করেন যে, সর্বপ্রথমে কালো, বৈটে বর্তমান আন্দামানবাসী কিংবা মেলেনেসিয়াবাসী নেগ্রিটোদের মত এক বা বহু জাতি ভারতের অধিবাসী ছিল। তাহারাই ভারতের পুরাতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিয়াছিল। তাহারা মুগয়ালক পশুপক্ষী বা বন্য ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিত। এখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যে কাডার (Kadar), উরালি (Uruli) প্রভৃতি জাতি আছে, তাহারাই ভারতের সেই সর্বপ্রথম অধিবাসীদের, অমিশ্র না হইলেও বিমিশ্র (remnants) বংশধর। তার পর বর্তমান মুণ্ডা-গোঁড়ার জাতিদের পূর্ব-পুরুষেরা ভারতে আসে। কোথা হইতে এবং কোন্ পথে আসে সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতের অমিল আছে। আগেকার নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মনে করিতেন এবং এখনও কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, তাহারা ভারতের উত্তর-পূর্ব দিক হইতে ব্রহ্মদেশ ও আসাম হইয়া এ-দেশে

আসিয়াছিল; কিন্তু ইদানীন্তন অনেক পণ্ডিতের মতে উহারা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। উহাদের উত্তর-পূর্ব পথে আগমনের সপক্ষে বলা যায় যে, প্রথমতঃ ভারতের পূর্বস্থ মলয়-দ্বীপের সাকেই (Sakei) ও সেমাং (Semang) জাতিদের ভাষা ব্রহ্মদেশের ওয়া (Wa), পালোং (Palaung) প্রভৃতি ভাষা, পেশুর মন্স (Mons) বা তেলাইঙ্গ (Telaing) ভাষা ও আসামের খাসি ভাষার সহিত ভারতের মুণ্ডা-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির গঠনে ও কিছু কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দাবলীতে সাদৃশ্য দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশে নূতন প্রান্তর-যুগের যে স্বকল্পিত কুঠারফলক পাওয়া যায়, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল



জুয়াঙ্গ রমণী

পরগণাতেও সেইরূপ প্রস্তরায় পাওয়া গিয়াছে। আর আসামেও তদনুরূপ স্বকল্পিত লোহার অস্ত্র ও খানিকটা তদনুরূপ প্রস্তরের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, কোন কোন মুণ্ডাজাতির মধ্যে মোঙ্গোলিয়ানদের মত ক্ষুদ্র চক্ষু ও বাঁকা চক্ষু কিংবা অপর কোনও অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট মোঙ্গোলিয়ান লক্ষণ কখনও কখনও দেখা যায়।

এই মতের সপক্ষে আরও দুই-একটি তথ্যের উল্লেখ করা

যাইতে পারে। উড়িয়ায় জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ী ভূঁইয়া রমণীদের জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধানকালীন জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ী ভূঁইয়াদের গলার থাকে-থাকে যে লাল অনেকগুলি করিয়া কাঁচ-বর্জুলের মাল্য দেখিয়াছি তাহা নাগা প্রভৃতি মোঙ্গোলীয় রমণীদের গলার ঐরূপ পুঞ্জীকৃত মাল্যর কথা মনে করাইয়া দেয়। আর কোন কোন জুয়াঙ্গ ও পাহাড়ী ভূঁইয়া যে শূকর ও ছাগলাদি রাখিবার জন্ত ছোট ছোট মাচার উপর ঘর নির্মাণ করে, সেগুলিও আসামের নাগাদের আবাসগৃহ বা “চাঙ্গ” ঘরের স্মারক।

অপর পক্ষে, অনেক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদিগকে যে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে আগত ককেসীয় জাতির একটি নিম্নস্তরের কৃষ্ণ-দৃশ্যখা (low form of Caucasian Melanochroi) বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই মতের সপক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ প্রদর্শিত হয় যে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে টার্নভিল পীটার (Turnville Petre) গ্যালিলি প্রদেশের ‘রবার্স কেভ’ নামক গিরিগুহায় যে-ধরণের (Neanderthaloid) নরকঙ্কাল প্রাপ্ত হন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারি (W. E. Barrey) দক্ষিণ-আফ্রিকার রোডেসিয়া প্রদেশের ‘ব্রোকেন্ হিল্’ পাহাড়ের গুহায় রোডেসিয়ান্ মানুষের যে কঙ্কাল প্রাপ্ত হন তাহার গঠন অস্ট্রেলিয়ানদের দৈহিক গঠনের অনুরূপ, এবং মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের হৃদয় সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। যদিও অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক কালের নিয়াণ্ডারথাল্-মানবের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা আধুনিক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেকেই অস্বীকার করেন, তবুও সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ হার্ডলিসকা (Hardlicka) এবং ভারতীয় প্রাগৈতিহাস-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর কর্নেল সিউয়েল ঐ পুরাতন মতের পুনরুত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু গ্যালিলিতে প্রাপ্ত নিয়াণ্ডারথাল-মানবের করোটি ব্যতীত প্যালেস্টাইনের মাউন্ট কার্মেলের াথলিট (Athlit) গুহা এবং শুখা (Shukhah) গুহাতে যে নরকঙ্কালবিশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পরবর্তী যুগের Neanthropic বা নূতন মানুষের। অস্ট্রেলিয়ায় যে দুইটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঙ্কালবিশেষ (Talgai skull ও Cohuna skull) এ-পর্যন্ত পাওয়া

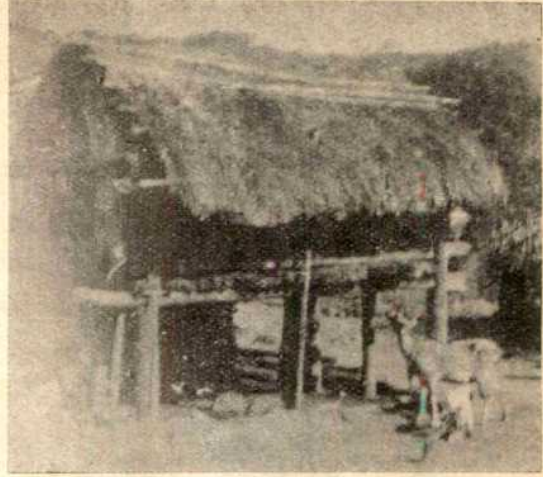
গিয়াছে তাহা উভয়েই সমজাতীয় এবং অনেকাংশে নিয়াগোরথাল আদিম মানবের (Homo Primigenius-এর) অনুরূপ। স্ত্রীর আর্থার কীথের মতে :—

“Both skulls represent the proto-Australian type out of which the modern aboriginal type has been evolved.”—*New Discoveries relating to the Antiquities of a Man*, p. 308.

দ্বিতীয়তঃ, মুণ্ডাগাতির মধ্যে যেটুকু মোঙ্গোলিয়ান সংমিশ্রণের আভাস পাওয়া যায় তাহা, সম্ভবতঃ সমুদ্রযোগে, দক্ষিণ-মোঙ্গোলীয় (Pareoan) জাতির লোকেরা এখানে আনিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মুণ্ডা-গোষ্ঠীর agglutinative ভাষাগুলির সহিত শুমের-দেশীয় ভাষার সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করেন।

সে বাহাই হউক, মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী নেগ্রিটো জাতিদের আংশিক উচ্ছেদসাধন করে এবং অবশিষ্ট অংশের কতক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবক্রমে লয়প্রাপ্ত হইল, কতক বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীয়দের সংমিশ্রণে পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিল। কেবল তাহাদের কিছু কিছু অংশ দক্ষিণ-ভারতের উক্কলা, কাড়ার, চেণ্ডু প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে সম্ভবতঃ রহিয়া গিয়াছিল। মুণ্ডা-গোষ্ঠীয়দের কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, এক সময় তাহারা—অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে প্রধান জাতিগুলি—শোণ, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদনদীর উপত্যকায় বাস করিত এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিত। ইহারাই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম কৃষিকার্য্য করে। উত্তর-ভারতের পশ্চিম হইতে পূর্ব সীমা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহাদেরই শাখা-প্রশাখা ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব-মহাসাগরের মলয়-উপদ্বীপ হইয়া আরও দূরে যায়। দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপের বেদদারাও (Vedda) ইহাদেরই একটি প্রশাখা এইরূপ অনুমান হয়। ইহাদের মধ্যে বাহারা আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইয়া আরও পূর্বে চলিয়া যায়, তাহাদের এক দল মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ইণ্ডো-নেসিয়ান জাতিতে পরিণত হইল। ইহার অনেক পরে আবার সেই ইণ্ডোনেসিয়ানদের মধ্যে কতক আসামে গিয়াছিল এবং দক্ষিণ-ভারতের উপকূলেও তাহাদের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

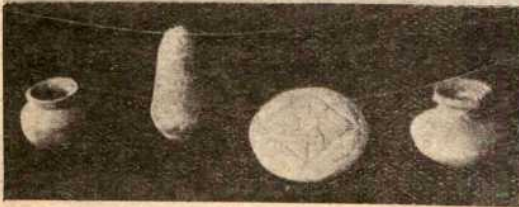
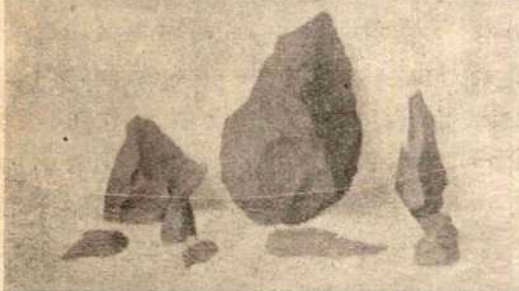
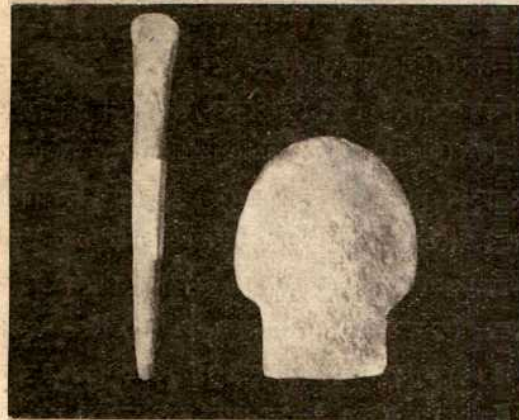
যখন মুণ্ডা-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা সমগ্র ভারতে



জয়ান্দের ছাগল শূকর প্রভৃতি রাখিবার ঘর। ইহা নাগা (মোঙ্গোলিয়ান) জাতির মাচার উপরে নির্মিত ‘চান্দ’ গৃহের অনুরূপ

পরিব্যাপ্ত ছিল এমন সময়ে এদেশে আর একটি নূতন জাতির আবির্ভাব হয়। ইহাদের পূর্ববাসস্থান এবং কৃষ্টিগত উদ্ভবস্থল (area of characterization) ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি বা তন্মিকটবর্তী স্থানে। এই জন্ত ইহাদিগকে অমুর জাতি (Mediterranean race বা Proto-Mediterranean race) বলা হয়। ইহার দলে দলে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সম্ভবতঃ বেলুচিস্থান হইয়া ভারতে প্রবেশ করে। বেলুচিস্থান ও ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে বেব্রাহই (Brahui) জাতি আছে তাহাদের ভাষা ইহাদেরই ভাষার সমজাতীয়। হয়ত পরে জলপথেও এই অমুর জাতির কোন কোন দল ভারতে আগমন করিয়াছিল।

এই নবাগত অমুর জাতির কোন কোন দল উত্তর-ভারতে মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের প্রভাব দেখিয়া দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইল এবং সেখানকার অপেক্ষাকৃত হীনবল নেগ্রিটো জাতিদের বিধ্বস্ত করিয়া ক্রমে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত অধিকার ও দ্রাবিড়-সভ্যতার পত্তন করিল। দক্ষিণ-ভারতে মুণ্ডা-গোষ্ঠীর যে-সব জাতি ছিল তাহারা ক্রমে নবাগত অমুর জাতিদের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আর অমুর জাতির মধ্যে বাহারা উত্তর-ভারতে বসবাস করিল তাহাদের এক দল সিন্ধু-উপত্যকায় ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতের বাহিরের অন্ত্যন্ত জাতির



সংস্পর্শে ও সম্ভবতঃ আংশিক সংমিশ্রণে সভ্যতার সান্নিধ্য উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল, মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে এরূপ অনুমান হয়। ভারতের আরও পূর্বে অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, তাপ্তী, নর্মদা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় যে মেডিটারেনিয়ান জাতির দলেরা বসবাস করিয়াছিল তাহাদের সংঘর্ষে অপেক্ষাকৃত অনভ্যাবরূপ মুণ্ডা-জাতিগুলি (জুয়াঙ্গ, বিরহোড় প্রভৃতি) পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় লইল; কেবল মুণ্ডা, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী মুণ্ডা-গোষ্ঠীয় 'কোলজাতি' শোণ, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদনদীর উপত্যকায় স্থানে স্থানে নিজেদের প্রভাব কোন রকমে বজায় রাখিতে সমর্থ হইল এবং কালে আশপাশের অসুর জাতিদের সঙ্গে তাহাদের কতক কতক সংমিশ্রণও হইল।

মুণ্ডাগোষ্ঠীয় জাতির ভারতে আগমনের বহু কাল পরে এবং সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-জাতীয়দের আগমনের কিছু পরে ককেসীয় জাতির আরও একটি শাখা ভারতে আসিয়াছিল এরূপ অনুমান হয়। ইহারাই বাঙালী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ। পুরুষ-পরম্পরা আলসু পর্বত-শ্রেণীর মালভূমিতে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করায় ইহাদের গোলাকৃতি মস্তক এবং দৈহিক গঠনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জন্মে; সেই জন্ত ইহারাই এবং ইহাদের জাতি-জাতিরা আলপাইন জাতি নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ উত্তর-ভারত অসুর ও মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের প্রাভুত্ব ও প্রাধান্য দেখিয়া ভারতে আগত এই আলপাইন জাতির এক

চিত্র-পরিচয়

(উপর হইতে)

- ১। ছোটনাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক "অসুর"-ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত প্রস্তর-নির্মিত বৃষ।
- ২। ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত নব-প্রস্তর-যুগের কুঠার-ফলক।
(বাম হইতে দ্বিতীয়টি 'স্কন্ধ'-যুক্ত)
- ৩। ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত তাম্র-অস্ত্র।
- ৪। ছোটনাগপুরে প্রাপ্ত পুরাতন-প্রস্তর-যুগের অস্ত্র।
- ৫। ছোটনাগপুরের "অসুর"-ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত দগ্ধ মৃত্তিকায় (terra cotta) প্রবাদি। দ্বিতীয়টি লিঙ্গের প্রতীক।

দল গুজরাটে অবস্থান করে; এক দল আবব-উপসাগরের উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে মহীশূর, কুর্গ প্রভৃতি প্রদেশে যায় ও আর এক দল মধ্যভারত ও বিহারের পূর্ব প্রান্ত হইয়া বাংলা দেশে যায়। ইহাবাই গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী ও বাঙালী জাতির পূর্বপুরুষ। 'বোব' 'মিড' 'নাগ' 'পাল' প্রভৃতি কয়েকটি পদবী বাঙালী কায়স্থদের মধ্যে এবং গুজরাটী নগর-ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দেখা যায়। ইহা হইতে একগণ অনুমান হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে আর্যদের সঙ্গে সংমিশ্রণের পূর্বে বাংলা দেশের কায়স্থগণ বাঙালী সমাজে এবং গুজরাটের নগর-ব্রাহ্মণেরা গুজবাটী সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিত; সম্ভবতঃ বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জাতিভেদ সংস্থাপিত হইবার পর তখনকার সর্বোচ্চ শ্রেণীর বাঙালীদেব মধ্যে ঐহারা বজ্রন-বাজ্রন করিতেন তাঁহারা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইলেন, আর ঐ সর্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ঐহারা বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা কায়স্থ পদবাচ্য হইলেন। বর্তমান কায়স্থ জাতির পূর্বপুরুষদের এক দল জাতি বা অশ্রেণী ছাড়াও কাতকুজ প্রভৃতি হইতে আগত কতিপয় আর্য ব্রাহ্মণ-বংশ ও এই উভয়ের সংমিশ্রণ-সম্মত বংশগুলি মিলিয়া বাঙালী ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়। ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে সরকারী তদন্তে রিজলি সাহেবের Anthropometrical measurements-এর মাপ হইতে জানা গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের Average Cephalic index গড়পড়তা ৭৮.২ এবং বাংলা দেশের কায়স্থদের মাথারও ঠিক ঐ মাপ (৭৮.২), কেবল নাসিকার মাপ বাঙালী কায়স্থ এবং পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ দুয়েরই গড়পড়তা ৭০.৩ অর্থাৎ লম্বা ও নক; কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের ব্রাহ্মণদের গড়পড়তা ৭১.৯ অর্থাৎ ঈষৎ বেশী মোটা নাক। পরে কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ যে মাপ করিয়াছেন তাহাতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে বাহা হউক, বঙ্গদেশের কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের মধ্যে দৈহিক গঠনে বা সহজ মানসিক ক্ষমতায় বা সংস্কৃতিতে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

ঐকিক ভাষাভাষী মুণ্ডাগোষ্ঠীয় জাতি, মেডিটারেনিয়ন-গোষ্ঠীয় ড্রাবিড়ভাষী অমর জাতি ও আলপাইন-গোষ্ঠীয় জাতিগুলি ছাড়া ভারতে আর একটি প্রধান জাতি

মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। ঐতিহাসিক হুগেই ইহাদের অধিকাংশ উত্তর-পূর্ব অভিমুখ হইতে আসামে এবং সামান্য কতক হিমালয়ের উত্তর দিক হইতে হিমালয়ের দক্ষিণ-পাদমূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। উত্তর-পূর্ব হইতে মোঙ্গোলীয়দের আগমন এখনও একেবারে কাল্পনিক হয় নাই। আসামের অধিকাংশ অধিবাসী ইহাদের বংশসম্মত; উত্তর-বঙ্গের কোচ জাতি এবং উত্তর-বিহারের খাড়ু জাতিও মধ্যে মোঙ্গোলীয় বক্তের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিজলি-প্রমুখ সাবেক নৃতত্ত্ববিদেরা বাঙালী জাতির যে মোঙ্গোলিয়ান ও ড্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে উৎপত্তি নির্দেশ করেন তাহা ত্রমাস্কক বলিয়া আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন।

পরিশেষে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় কি তৃতীয় সহস্রকে, হয়ত বা তৎপূর্বেই, আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতে আগমন করেন। প্রথমে পঞ্চনদতীরে আর্যদের সঙ্গে ভারতের অমর (Mediterranean) জাতির সংঘর্ষ হইল। মর-দেবতার উপাসক আর্যেরা উত্তর-ভারতের এই আর্যদেরেরেবী মেডিটারেনিয়ন জাতিদের 'অমর' নামে অভিহিত করেন। দিকু-উপত্যকায় নহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পা প্রভৃতি স্থানের অমরেরা কোন অজ্ঞাত কারণে তৎপূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হয়। মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি মুণ্ডাগোষ্ঠীর মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিরা শোণ-নদ ও গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় তখন বাস করিত তাহারাও আর্যদের তাড়নায় ক্রমে পূর্বে ও দক্ষিণে সরিয়া যাইতে লাগিল। উত্তর-ভারতের পঞ্জাব হইতে মগধ পর্যন্ত মেডিটারেনিয়ন-গোষ্ঠীর দেশে অমর আর্যদের আগমনের পূর্বে আধিপত্য করিত তাহারা ক্রমে ক্রমে আর্যদের নিকট পরাভূত ও কতক বশীভূত হইয়া কালে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিল। অনুমান হয় যে, তাহাদের মধ্যে উচ্চবংশীয় কতকগুলি পরবার আর্যদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়াছিল; কতক বা পূর্ববর্তী আলপাইন জাতিদের মধ্যে মিশিয়া গেল। আর নিম্নস্তরের অমরেরা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

সম্ভবতঃ এই অমর জাতিরই একটি প্রশাখা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ছোটনাগপুরের পার্বত্য প্রদেশে অধিষ্ঠিত

হইয়া বহুকাল হইতে নির্বিবাদে বাস করিত। ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদেব কিংবদন্তী এইরূপ যে পুরাকালে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে ‘অম্বর’দের একটি হুদুর বিচ্ছিন্ন দলের বাস ছিল; যখন মুণ্ডারা গজার—পরে শোণ-নদের—উপত্যকা হইতে ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত হইয়া ছোটনাগপুরের মালভূমিতে প্রবেশ কবে তখনও এই অম্বরদের এখানে পূর্ণ প্রভাব। ছোটনাগপুরের ধাতব জব্বের নিৰ্মাণ ও প্রচলন এই অম্বরদের দ্বারাই হয়, কিংবদন্তী এইরূপ। তাম্র-যুগের এবং পুরাতন লোহ-যুগের যে-সব নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়, জনশ্রুতি এই যে সেগুলি এই অম্বরদের নিৰ্ম্মিত। এই জন্তই তাহাদের পরবর্তী কালের যে মুণ্ডাভাষাভাষী অসভ্য জাতি এখানে এখনও আছে এবং আকরজাত ধাতু (ore) হইতে লোহা-গলানো পেশা অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে ‘অম্বর’ নামে অভিহিত করা হয়; বস্তুতঃ, তাহাদের সঙ্গে ছোটনাগপুরের তাম্র-যুগের অম্বরদের কোন জাতিগত সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদে অম্বর জাতির সঙ্গে আৰ্য্য জাতির দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। ছোটনাগপুরের তাম্র-যুগের অম্বরদের সম্ভবতঃ তাহাদেরই হুদুরবিক্ষিপ্ত একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। ঋগ্বেদে অম্বরদিগকে ‘শিশ্নু-দেবাঃ’ বলা হইয়াছে; সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা ‘শিশ্নু-দেবাঃ’ শব্দের অর্থ করেন ‘লিঙ্গ-উপাসক’। ছোটনাগ-পুরের অম্বরদের ধ্বংসাবশেষগুলিতে প্রস্তর-লিঙ্গ ও অনেক পোড়ামাটির লিঙ্গ-প্রতীক পাওয়া যায়।

সে বাহা হউক, সম্ভবতঃ নব প্রস্তর-যুগ হইতে লোহ-যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এখানে এই তথাকথিত অম্বর জাতির প্রভাব ছিল; মুণ্ডাদের কিংবদন্তী এইরূপ সাক্ষ্য দেয় এবং তাহার বস্তুগত প্রমাণও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। আবার ঐ যুগে প্রাপ্ত প্রস্তরস্ত্র প্রভৃতির দুই-একটিতে মৌর্য্য-যুগের ধ্বংসস্ত্র বা ‘লাট’ এবং মৌর্য্য প্রস্তর-মুষ্টির পালিশের অনুরূপ মন্থণ ও চিকণ পালিশ

দৃষ্ট হয়। ঐ পালিশ যদি প্রস্তরবিশেষের স্বাভাবিক পালিশ না হয় তাহা হইলে মৌর্য্য-যুগের ঐ শিল্প-বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী প্রস্তর-তাম্র-যুগের দান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

অবসর-মত ছোটনাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাধিস্থানগুলি ও আবাসস্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি খনন ও অন্বেষণ করিয়া পুরাতন ও নূতন প্রস্তর-যুগের, মিশ্র প্রস্তর ও তাম্র-যুগের ও অবিশিষ্ট তাম্র-যুগের অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও তৈজসপত্রাদির কিছু কিছু নিদর্শন পাইয়াছি; তাহার অধিকাংশই পাটনার সরকারী বাহুবলে রক্ষিত আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, তাম্র ও টিনের সংমিশ্রণে যে ব্রোঞ্জ ধাতু প্রস্তুত হয় ইউরোপে বিমিশ্র তাম্র-অস্ত্রের পরিবর্তে সেই ব্রোঞ্জের অস্ত্রাদিই বেশী পাওয়া যায়। টিনের খনি ভারতে তেমন বেশী নাই। সেই জন্ত সম্ভবতঃ ভারতে ব্রোঞ্জ-যুগের পরিবর্তে তাম্র-যুগ প্রচলিত ছিল। তবে ছোটনাগপুরের এবং ভারতের অন্ত কোন কোন স্থানে ব্রোঞ্জ নিৰ্ম্মিত তৈজসপত্র কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছোটনাগপুরে এমন কি একটি ব্রোঞ্জের কুঠার-ফলকও পাইয়াছি। ইহা বর্তমানে পাটনার সরকারী বাহুবলে আছে। ভারতের আর কোথাও ব্রোঞ্জের অস্ত্র-আবিষ্কারের কথা আমার জ্ঞান নাই। যদি এগুলি সেকালে ভারতের বাহিব হইতে আমদানী হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ছোটনাগপুরের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহিজগতে বোঁগ ছিল বুদ্ধিতে হইবে। যদিও পাণ্ডবদের দ্বিবিজয়-যাত্রার পথে ছোটনাগপুর সম্ভবতঃ বাদ পড়িয়াছিল, তথাপি বাহিরের সঙ্গে ছোটনাগপুরের বোঁগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এরূপ মনে হয় না।*

* বিগত ২২শে কার্তিক (বাঁচি) হিঙ্গ ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে অধ্যাপনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশ পরিচ্ছেদ

২

লোচনদ্বারের আঁখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন দিকে যাব তার কিছুই ঠিক নেই। বর্ষাকাল কেটে গিয়েছে, আকাশ নির্মল, শরতের শাদা লঘু মেঘখণ্ড নীল আকাশ বেয়ে উড়ে চলেছে, মণিহারী ঘাটের কাছে গঙ্গা পার হবার সময় দেখলুম গঙ্গাব চরেব কাশ-বনে কি অজস্র কাশফুলের মেলা! থানিকটা রেল থানিকটা পায়ে হেঁটে এলাম কহলগাঁয়ে। গঙ্গাব ধারে নির্জন স্থানটি বড় ভাল লাগল। ষ্টেশনের কাছেই পাহাড়, সামনে বে পাহাড়টা, তার ওপরে ডাক-বাংলা—এখানে একটা রাত কাটলাম। ডাক-বাংলার কাছে কি চমৎকার এক প্রকার বস্ত্রফুল ফুটেছে, জ্যোৎস্না রাত্রে তার স্তম্ভে ডাক-বাংলাব বারান্দা আমোদ করে রেখেছে।

এক দিন কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে স্তন্যলাস ক্রোশথানেক দূরে গঙ্গার ধারে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে এক জন সাধু থাকেন। একপানা নৌকা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। বটেশ্বরনাথ পাহাড় দূর থেকে দেখেই আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গা আমি কমই দেখেছি, এখানে শান্তি ও আনন্দ পাব। গঙ্গার ধারে অল্পটুকু পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল, নানা ধরণের বুনো গাছ, এক ধরণের হলদে পাপড়ি বড় বড় ফুল ফুটেছে পেয়ারাগাছের মত গাছে, নাম জানি নে। একটা বড় গুহা আছে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের চালুতে জঙ্গলের মধ্যে। গুহার মুখের কাছে প্রাচীন একটা বটগাছ, বড় বড় বুরি নেমেছে, ঘন ছায়া, পাকা বটফল তলায় পড়ে আছে রাশি রাশি। সাধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, বাড়ি ছিল তাঁর মাদ্রাজে, কিন্তু কথাবার্তায় চেহারায় হিন্দুস্থানী। সাধুটা খুব ভাল লোক, লম্বাচওড়া কথা নেই মুখে, বাড়ালী বাবু দেখে খুব খাতির করলেন। নিজে কাঠ কুড়িয়ে এনে চা করে খাওয়ালেন, আমার সম্বন্ধে জু-একটা কথা জিজ্ঞেস

করলেন। বললেন, আপনি এখানে যত দিন ইচ্ছে থাকুন, এখানে খরচ খুব কম। আমি এর আগে মুন্সেরে কষ্ট-হারিণীর ঘাটে ছিলাম, শহরবাজার জায়গা, এত খরচ পড়ত যে টিকতে পারলাম না। তাও বটে, আর দেখুন বাবুজী, সাধুবা চিড়িয়ার জাত, আজ এখানে, কাল ওখানে—এক জায়গায় কি ভাল লাগে বেশী দিন?

লোকজন বিশেষ নেই, স্থানটি অতিশয় নির্জন, কথা বলবার লোক নেই, তাব প্রয়োজনও বোধ করি নে বর্তমানে—সারা দিনের মধ্যে সন্ধ্যার সময় সাধুজীর সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করি। এত দিন কোথাও যে-শান্তি পাই নি, এখানে তার দেখা মিলেছে, এক দিন পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি-পথ পেলাম। পাহাড়ের গা কেটে পথটা করা হয়েছে, ডাইনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালটা, বায়ে অনেক নীচে গঙ্গা, চালুটাতে চামেলীর বন, একটা প্রাচীন পুষ্পিত বকাইন গাছ পথের ধারে। কিছু দূর গিয়ে দেখি, পাহাড়ের গায়ে ধোদাই-করা কতকগুলো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি—গবর্ণমেটের নোটিশ টাঙানো আছে এই মূর্তিগুলো কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইত্যাদি। আমি জানতাম না এদেব অস্তিত্ব। জায়গাটা অতি চমৎকার, সূর্যাস্তের সময় সেদিন পীতপতিব অল্পটুকু শৈলমালার ওপরের আকাশটা লাল হয়ে উঠল, গঙ্গার বুকে আকাশজোড়া রঙীন মেঘমালার ছায়া, ধোদাই-করা দেবদেবীর মূর্তি গোমুগির চাপা আলোয় কেমন একটা অনির্দেশ্য শ্রী ধারণ করেছে—সে শ্রী বড় অজুত, কোন মূর্তির নাক ভাঙা, কোনটার হাত নেই, বেশীর ভাগ মূর্তিরই মুখ খসে গিয়েছে—কিন্তু গোমুগির রক্ত-গিজল আকাশের ছায়ায় যক্ষ্মী যেন জীবন্ত হয়ে উঠল; পাথরে কাটা পীন স্তন্যগুল যেন রক্তমাংসের ব'লে মনে হ'ল, লুধিনী উদ্ভানের ছায়াতরুগুলো শায়িতা আসন্ন-প্রসবী মায়াদেবী চোখের পলক যেন পড়ে পড়ে...তার পর চামেলীর বন কালো

হয়ে গেল, গঙ্গার বুকে নোঙর-করা বড় বড় কিস্তীব মাঝিরা হুমানজীর ভজন গাইতে হুকু ক'রে দিলে, পাহাড়ের পূর্ব দিকে ছোট কেওলিন বনিটাতে মজুরদের ছুটির ঘণ্টা পড়ল—আমি তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছি।...রাঢ় দেশের মাঠে সেই খালের ধারের তালবনে সেদিন যে অতুত ধরণের শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটা আবার পাবার আশায় কত ক্ষণ অপেক্ষা করলুম—কিন্তু পেলাম কই? তার বদলে একটা ছবি মনে এল।

আমি জানি এ-সব কথা ব'লে কি কিছু বোঝানো যাবে? যায় না হয়েছে, সে কি যরের লেখা পড়ে কিছু বুঝতে পারবে, না আমিই বোঝাতে পারবো? মনে হ'ল কোথায় যেন এক জন পথিক আছেন ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন...চলেছেন...কোথায় চলেছেন নিজেই হবত জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে কেউ ভালবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য—তিনি আছেন বলেই আছে।

আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়ে পুতুলখেলাব বিকল্পে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ ক'বে আসছি। তিনি বিবাত, মানুষে দশ হাজার বছর তাঁকে যত বুঝে এসেছে আগামী দশ হাজার বছরে তাঁকে আরও ভাল ক'রে বুঝবে। এক-আধ জন মানুষে কি করবে? সমগ্র মানব জাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধি পথে চলেছে। আমি তাঁকে হঠাৎ বুঝে শেষ করতে চাই নে—কোটা যোজন দূরব তারার আলো যেমন লক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবীতে আসছে...আসছে...তেমনি তাঁর আলোও আমাব প্রাণে আসছে...হয়ত সিকি পথও এখনও এসে পৌছয় নি—কত যুগ, কত শতাব্দী, এখনও দেরি আছে পৌছবার। এই ত আমার মনের আসল স্যাডভেনচার (adventure), এ যেন আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়। আমি খুঁজে বেড়াবো...এই খোঁজাই আমার প্রাণ, বুদ্ধি, জ্ঞয়কে সঞ্জীবিত রাখবে, আমার দৃষ্টিকে চিরনবীন রাখবে।

আমি হয়ত এজন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও

বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমাব মনের বেদীতে হোমের আগুন কখনও নিবে বেতে না-দেন, শান্ত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যোপে। আমি চাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর, কলনাদিনী গঙ্গা, দূরের নীহারিকা পুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য, ওই হলুদ-ডানা প্রজাপতি, এই শোভা, এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে।

লোচনদ্বারের আঁখিতে সবাই বললে, আমি নাস্তিক, কারণ আমি বলতাম নাম-জপ করা কেন? ঈশ্বর নাম দিতে পেরেছে কে? শেষ-পর্যন্ত উদ্ধব বাবাজী আমাকে আঁখি ছাড়িয়ে দিল এই জন্তে বোধ হয়।

এক দিন বৈকালে গঙ্গায় নাইতে নে:মছি—কাটারিয়ার ওপারের বহুদূর দিকচক্রবালের প্রান্ত থেকে কালো মেঘ ক'রে ঝড় এল, গঙ্গার বুকে বড় বড় চেউ উঠল, আমার মুখে কপালে মাথায় বুকে চেউ ভেঙে পড়ছে, ওপারের চরের উপর বিহ্বল চমুকাচ্ছে, জলেব হুয়াণ পাচ্ছি—এরকম কত ঝটিকাময় অপরাহ্ন ও কত নীরন্ধু, অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা মনে এল—আমারই জীবনব কত সুখদুঃখময় মুহূর্তের কথা মনে এল—

মনে কেমন একটা অপূর্ণ ভাবের উদয় হ'ল, তাকে আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে। বটেব্রনাত্মের পাহাড়টার ঠিক ধূসর স্তূপের দিকে চেয়ে, দুব, দুব, দিগন্তের দিকে চেয়ে যেখানে বাংলা দেশ, যেখানে মালতী আছে, যেখানে এমন কত হৃন্দর বর্ষার সন্ধ্যা মধুর আনন্দে কাটিয়েছি, কত জ্যোৎস্নারাজে শুকনো মকাই-ঝোলানো চালাঘরের দাঁওয়ার তলায় ব'সে ছ-জনে কত গল্প করেছি, তার মুখে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে...কতবার অপ্ৰত্যাশিত মুহূর্তে সে এসেছে—আবার কতবার ডাকলেও আসে নি, কতবার চোখোচোখি হলেই হেসে ফেলেছে—এ কথা মনে হয়ে আমার মনে কেমন একটা উন্মাদনা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি আরও কত কি ভাবের উদয় হ'ল একটা বড় ভাবের মধ্য দিয়ে। ওই একটার মধ্যে সবটা ছিল। তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না—কিন্তু তারই প্রেবণায় আমার আঁতুল আপনা-আপনি বেকে গেল, গঙ্গার জলে

মা, বাবা, হীরা-জ্যাঠার নামে তর্পণ করলুম, ভগবানের নামে সমস্ত দেহ-মন হয়ে এল, জলের ওপরই মাথা নত করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলুম। সীতার জন্ত করুণ সহানুভূতিতে চোখে জল এল। হঠাৎ ঘোর বৈষয়িকতার জন্ত জ্যাঠামশায়ের প্রতি অনুকম্পা হ'ল—আবার সেই স্মৃষ্টিছাড়া অপরাধ মুহূর্তেই দেখলুম মালতীকে কি ভালই বাসি, মালতীর সহায়হীন, সম্পদহীন, ছন্নছাড়া মুষ্টি মনে করে একটা মধুব স্নেহে, তাকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচাবার আগ্রহে তাকে রক্ষা করবাব, আশ্রয় দেবাব, ভালবাসবাব, ভাল করবাব, তার মনে আনন্দ দেবাব, তার সঙ্গে কথা বলবাব আকুল আগ্রহে সমস্ত মন ভেবে উঠল—কি জানি সে মুহূর্ত কি করে এল সেই মেঝেফার বর্ষণমুখর সন্ধ্যাটিতে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই মহামুহূর্তে আমাব মধ্য দিয়ে তার সমস্ত পুণ্যকে, গোববের, অনুভূতির সঞ্চয়হীন বিপুল দানে আত্মপ্রকাশ কর'ল। সেদিন দেখলুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরণেব, একই জাতীয়। যেখানে ঈশ্বরের অনুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্ববও নেই। ভগবানের প্রতি সেদিন যে ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ণ আনন্দের রূপে—সত্যিকার ভক্তি একটা Joy of life...আত্মা, দেহ, মন সেখানে আনন্দে, মাধুর্যে আত্মত হয়ে যায়।

ঠিক মালতী আমাকে ভালবেসেছে বা আমি মালতীকে ভালবেসেছি এই ভেবে যেমন হয় তেমনি। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র। এতেও মন অবশ হয়ে যায় আনন্দে—ওতেও।

উপলব্ধি করে বুঝলুম যদি কেউ আমাকে আগে এ-সব কথা ক'ত, আমার কখনই বিশ্বাস হ'ত না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সামুজ্জী সন্ধ্যাবেলা রোদ ধর্মকথা পড়েন। আমি মনে মনে বলি সামুজ্জী আপনি জীবন দেখেন নি। ভালবেসেছেন কখনও জীবনে? প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন? যে কখনও নরুণ হাতে নিতে সাহস করে নি, সে যাবে

তলোয়াব খেলতে? শুকনো বেদান্তেব কথার মধ্যে ঈশ্বব নেই—যেখানে ভাব নেই, ভালবাসা নেই, ঈশ্বরের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই। ঈশ্বরের খেলা যে আত্মদ কবেছে, ও রস কি জিনিষ যে বোঝে—ভগবানকে ভালবাসার প্রথম সোপানে সে উঠেছে।

আমি মালতীর কথা এত ভাবি কেন? সে আমাকে এত অভিতুত করে রেখেছে কেন দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা?...এই বিক্রমশিলা বিহারের পাহাড়মালা, বন-শ্রেণী, পাদমূলে প্রবাহিতা পুণ্যশ্রোতা নদী: সন্ধ্যার পটে রাঙা সূর্যাস্ত, বনচামেলীর উগ্র উদাস গন্ধ—এ-সবের মধ্যে সে আছে, তার হাসি নিয়ে, তার মুখভঙ্গি নিয়ে, তার গলার হুব নিয়ে, তার শতসহস্র টুকবো কথা নিয়ে, তার ছেলেমানুষী ভঙ্গি নিয়ে। কেন তাকে ভুলি নি, কেন তার জন্তে আমার মন সর্বদাই উদাস, উন্মুখ, ব্যাকুল, বেদনায় ভরা, স্মৃতির মাধুর্যে আত্মত, নিরাশাব যন্ত্রণাময়—হঠাৎ তাকে এত ভালবাসলুম কেন? তার কথা মনে যখন আসে, তখন কেওলিন খনিব উপরকার পাহাড়চূড়াটার একটা বকাইন গাছেব গুঁড়ি চেসু দিয়ে সারাদিন তার কথা ভাবি—খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না, ভালও লাগে না—তার মুখের হাসির স্মৃতিতেই যেন আমার শাস্ত্রিয়, নিভৃত, গৃহকোণ, তার কথার হুর দু'রেব ব্যবধান ঘুচিয়ে, মাঠ নদী বন পাহাড় পাব হয়ে ভেসে এসে আমার প্রদীপ-জ্বালানো, শান্ত আঙিনায় ছোট্ট খড়ের রান্নাবরের এক পাশে উপবিষ্ট নিরীহ গৃহস্থ সাজার—জীবনে তাই যেন চেয়ে এসেছি, সব দুরাশা, সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়...এদিকে রোদ চড়ে ওঠে কিংবা সূর্য চলে পড়ে, বটেশ্বরনাথের পাহাড় রঙে রঙে রাঙা হয়, পাখী'ব গান হঠাৎ বায় থেমে—সামুজ্জীর ঢেলা বর্ম্মনারায়ণ আমাকে খুঁজতে আসে চা খাবার জন্তে...তখন অনিচ্ছা সবে উঠতে হয়...গঞ্জার ধোঁয়ার অন্ধকার সাধু-বাবাজীর গুহার সামনে ব'সে দুধবিহীন কড়া চা খেতে খেতে হনুমানচরিত স্তনতে হয়।

সামুজ্জী আমাকে ভালবাসে। এই জন্তেই ওর এখানে আছি। এখানে পয়সার খরচ নেই বললেই হয়। বাবোটা:

টাকা এনেছিলুম, সাধুজীর হাতে তুলে দিয়েছি—নিতে চান নি—আমি পীড়াপীড়ি করে দিয়েছি। একবেলা খাই মকাইয়ের ছাতু, একবেলা কুটি আর চেঁড়সের তরকারী। অন্ত কিছু এখানে মেলে না। কেওলিন খনিব ম্যানেজার মাঝে মাঝে কহলগাঁও থেকে মাছ আনায়, সেদিন ওর বাংলাতে আমায় খেতে বলে—কারণ সাধুব এখানে ওসব কারবার হবার ঘো নেই।

মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে না? কিন্তু কি করে হবে তা ত বুঝি নে। আমি আবার সেখানে কোন্ ছুতোয় যাবো? উদ্ধবদাস বাবাজী আমায় ভাল চোখে দেখতো না। হু-একবার অসন্তোষ প্রকাশও করেছিল, মালতীর সঙ্গে যখন বড় মিশছি—তখন। হু-একবার আমায় এমন আভাসও দিয়েছিল যে এখানে বেশী দিন আর থাকলে ভাল হবে না। ও সবে আমি ভয় করি নে। সপ্তসিদ্ধপাবের দেশ থেকে, মালতীকে আমি ছিনিয়ে আনতে পারি, যদি আমি জ্ঞানতাম যে মালতীও আমায় চায়। কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের জন্তেই ত বেদনা, যা-কিছু যন্ত্রণা। কি জানি, বুঝতে পারি নে সবখানি। রহস্যময়ী মালতীব মনের খবর পুরো এক বছবেও পাই নি। এক-একবার কিন্তু মনে কোন সন্দেহ থাকে না। মনে হয় তা নয়, আমি তাকে পেয়েছিলাম। আমার মনের গভীর গোপন তল থেকে কে বলে, অত সন্দেহ কেন তোমার মনে? তোমার চোখ ছিল কোথায়? মালতীকে বোঝ নি এক বছরেও?

মালতী—কি মাধুর্যের রূপ ধরেই সে মনে আসে! তার কথা যখনই ভাবি, অন্ত-আকাশের অপরূপ শোভায়, পাহাড়ের ধূসর ছায়ায়, গঙ্গাব কলতানের মধ্যে, ওপারের খাসমহলের চরে কলাইওয়ালীরা মাখায় কলারের বোঝা নিয়ে ঘরে যখন কেরে, যখন শাব্দা পাল তুলে বড় বড় কিস্তি কহলগাঁয়ের ঘাট থেকে বাংলা দেশের দিকে যায়...কিংবা যখন গঙ্গার জলে রঙীন মেঘের ছায়া পড়ে, ধোয়ার মাঝিরা নিজেদের নৌকাতে বসে বিকট চীৎকার করে ঠেট্ হিন্দীতে ভজন গায়—সমস্ত পৃথিবী, আকাশ পাহাড় একটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে আমার মনে—ওই দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত গ্রামের

কোণে মালতী আছে, যখন আবার বর্ষা নামে, খুব বড় ওঠে, কিংবা পুকুরের ঘাটে একা গা হুতে যায়, কি বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখায় সন্ধ্যায়—আমার কথা তাব মনে পড়ে না? আমার ত পড়ে—সব সময়ই পড়ে, তাব কি পড়ে না?

মালতীকে নিয়ে মনে কত ভাঙা-গড়া কবি, কত অবস্থার হু-জ্ঞনকে ফেলি মনে মনে, কত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করি, আমাব অস্থ হয়, সে আমার পাশে বসে না ঘুমিয়ে সারাবাত কাটায়—কত অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে হু-জ্ঞনে সংসার করি—সে বলে—ভেবো না লক্ষ্মীটি, মদনমোহন আবার সব ঠিক করে দেবেন! তার ছোটখাটো সুখসুখ, আখড়ার বিগ্রহের ওপর গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস, তার সেবা—আমার ভাল লাগে। মনে হয় কত মেয়ে দেখেছি, সবারই খুঁৎ আছে, মালতীব খুঁৎ নেই। আবার মেয়েবা যেখানে বেশী রূপসী, সেখানে মনে হয়েছে এত রূপ কি ভাল? মালতীর স্নিগ্ধ শ্রামল সুকুমার মুখের তুলনায় এদেব এত নিখুঁৎ রূপ কি উগ্র ঠেকে! মোটের ওপর বেদিক দিয়েই যাই—সেই মালতী।

এক-এক বার মনকে বোঝাই মালতীর জন্তে অত ব্যস্ত হওয়া হুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কি? তাকে আর দেখতেই পাব না। তাদের আখড়াতে আর যাওয়া ঘটবে না। স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকি কেন? কিন্তু মন যদি অত সহজে বুঝতো!

মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মত মনে উদয় হয়। তখন সবই হুন্দব হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, সাধুর বকুনি, পাণ্ডা-ঠাকুরর জ্ঞাতি-বিরোধেব কাহিনী—অর্থাৎ কি করে ওর জ্যাঠাতো ভাই ওকে ঠকিয়ে এতদিন বটেবর শিবের পাণ্ডাগিবি থেকে ওকে বঞ্চিত রেখেছিল তার হুদীর্ঘ ইতিহাস—সব ভাল লাগে। কিন্তু কোন কথা বলতে ইচ্ছে কবে না তখন, ইচ্ছে হয় শুধু বসে ভাবি, ভাবি—সারা দীর্ঘ দিনমান ওরই কথা ভাবি।

৩

বটেবরনাথ পাহাড়ের দিনগুলো মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায় কানায়

ভরা! কি সে-সব অপূর্ণ দিন! অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের অমর মধু মুহূর্তগুলির ছায়াপাতে তাদের স্মৃতি আমাব কাছে চিরশ্রামল। শবতেব হৃৎপরে নিভৃত পিরালতলায়, নিভৃত বননিবিড় অধিত্যকার চুপ ক'রে ঝরা পাহাড়ী কুড়চি ফুলের শব্দায় ব'সে চারি দিকে বৌদ্ধদীপ্ত পাহাড়শ্রেণীর রূপ ও শবতের আকাশের শাদা শাদা মেঘখণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে মালতীরই ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। তিনটাকার মাঠে বটগাছেব সবুজ মগডালে শাদা শাদা বকের সারি ব'সে আছে, যেন শাদা শাদা অজস্র ফুল ফুটে আছে—কত কি রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তার পর কালো সবুজ গাছপালা, তার ওপরের পর্দায় নীলকণ্ঠ পাহাড়, তার ওপরে হুনীল আকাশ ও শাদা মেঘস্তুপ, সকলের নীচে কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি। কিসে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায় মনে পড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর,
বুঝি দূরে—অতি দূরে সাগর,
তাই গতি মন্থর,
শান্ত, শান্ত, পদসঙ্কার ধীর।

আগে প্রেম কা'কে বলে জানতাম না, জীবনে তা কি দিতে পারে, তা ভাবিও নি কোনদিন। এখন মনে হয় প্রেমই জীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা নয়—স্বর্গ এই পিরালতলায়, স্বর্গ তার স্মৃতিতে। নয় ত কি এত রূপ হয় এই শিলাস্তুত অধিত্যকার, ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওই পুণ্যসলিলা নদীব, ওই বননীর দিগন্তরেখার।

দিনে বাতে মালতী আমার ছাড়ে কখন? সব সময় সে আমার মনে আছে। এই ছপুব, এখন সে আখড়ার দাওরায় পরিবেশন করছে। এই বিকেল, এখন সে কাপড় সেলাই করছে নয় ত মুগকলাই ঝাড়ছে। এই সন্ধ্যা, এখন সে টান-টান ক'রে তার অভ্যস্ত ধরণে চুলাটি বেঁধে, ফুঁসাধরে মুছ হেসে বিষ্ণুমন্দিরে প্রাদীপ দেখাতে চলেছে। আজ মঙ্গলবার, সারাদিন সে উপোস ক'রে আছে, আরতির পরে ছুধ ও ফল খাবে। সেই নিঃসঙ্কোচে পুকুরের বাটে বসে বসে আমাকে গান-শোনান, আমার সঙ্গে শিবের মন্দিরে যাওয়া—খাতা পড়ে শোনান—সকলের ওপরে তার হাসি, তার মুখের

সে অপূর্ণ হাসি। কত কথাই মনে এসে নির্জনে বাপিত। প্রতি প্রহরটি আনন্দবেদনায় অলস ক'রে দিত।

দূরের গিরি-সাহুর গারে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘরাজির মধ্যে এমন কি কোন দয়ালু মেঘ নেই যে এই কুটঙ্গ কুহুমাতীর্ণ নিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিরালতলার এই নির্বাসিত যক্ষের বিবহবার্ভাটি শুনে জেনে নিয়ে বাংলা দেশের প্রান্তরমধ্যবর্তী অলকাপুতীতে পৌছে দেয় তার কানে?

কতবার মনে অনুশোচনা হয়েছে এই ভেবে যে কেন চলে আসতে গিয়েছিলুম এমন চুপি চুপি? তখন কি বুঝেছিলুম মালতী আমার এত ভাবাবে! কি বুঝে আখড়া ছেড়ে এলাম পাগলের মত! এমনধারা খামখেয়ালী স্বভাব আমার কেন যে চিরকাল, তাই ভাবি। আমার মাথার ঠিক নেই সবাই যে বলে, সত্যিই বলে। এখন বুঝেছি কি ভুলই কবেছি মালতীকে ছেড়ে এসে! ওকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনা করতে পারছি নে—এও যেমন ঠিক, আবার এও তেমনি ঠিক যে আর সেখানে আমার ফেবা হবে না।

না—মালতী, আর কিরে যাব না। কাছে পেয়ে তুমি যদি অনাদর কর? তা সইতে পারব না। তোমার খামখেয়ালী স্বভাবকে আমার ভয় হয়। তার চেয়ে এই ভাল। আমার জীবনে তুমি পুকুরের বাটের কত জ্যোৎস্না-রাত্রি অক্ষয় ক'রে দিয়েছ, সেই সব জ্যোৎস্না-রাত্রিব স্মৃতি, তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দিরে কত সন্ধ্যায় প্রাদীপ দেওয়ার স্মৃতি—তোমার সে সব আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

এক বছর কেটে গেল, আবার শ্রাবণ মাস।

হঠাৎ দাদাব শালাব একখানা চিঠি পেলেম কলকাতা থেকে। দাদার বড় অন্থ, চিকিৎসার জন্তে তাকে আনা হয়েছে ক্যান্সেল হাসপাতালে।

পজ পেয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সাহুজীর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলাম। হাসপাতালে দাদার সঙ্গে

দেখা কবলাম। সামান্য ত্রণ থেকে দাদার মুখে হয়েছে ইরিসিঙ্গাস, আজ সকালে অস্ত্রও করা হয়ে গিয়েছে। দাদা আমার দেখে শরীরে বেন নতুন বল পেলে। সন্ধ্যা পর্যন্ত হাসপাতালে বসে রইলাম দাদার কাছে। দাদা বললে, এখানে বেশ খেতে দেয় জিহু। রোজ প্রতিবেশায় একখানা বড় পাউরুটি আর আধ সের ক'রে ছুধ দিয়ে যায়। দেখিস এখন, এখুনি আনবে। খাবি রুটি একখানা?

পরদিন সকালে আবার গেলাম হাসপাতালে। আজুর কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, বোবাজারের মোড় থেকে, দাদাকে ব'সে ব'সে খাওয়ালাম। ছপরের আগে চলে আসছি, দোর পর্যন্ত এসেছি, দাদা পেছু ডাকলে—জিহু, শোন।

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে—তার চোখ দুটিতে যেন গভীর হতাশা ও বিবাদ মাখানো। বললে—জিহু, তোব বৌদিদি একেবারে নিপাট ভালমাহুয, সংসারের কিছু বোঝে না। ওকে দেখিস—

আমি বিশ্বরের সঙ্গে বললাম—ও কি কথা দাদা! তুমি সেরে ওঠ, তোমার বাড়ি নিয়ে যাব, তোমার সংসার তুমিই দেখবে।

দাদা চুপ ক'রে রইল।

বিকলে দাদার ওয়ার্ডে চুকবার আগে মনে হল' দাদা ত বিছানাতে বসে নেই! গিয়ে দেখি দাদা আগাগোড়া কবল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে চার্চে দেখি জর উঠেছে ১০৪ ডিগ্রির ঘরে। পাশের বিছানার রোগী বললে—আপনি চলে যাবার পরে খুব জর এসেছে। কোন কথা বলতে পাবেন নি, আপনি আসবার আগে ডেকেছিলাম, সাড়া পাই নি।

সেদিন সারাদিন তেমনি ভাবে কেটে গেল। পরদিনও তাই, দাদার জ্ঞান আর কিরে এল না—জরও কমল না, পরদিন রাত্রে আমি রোগীব কাছে রইলাম।

ওঃ, কি বর্ষা সে রাত্রে! ঘনকন্ড শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, নির্ণরীক্ষ্য অন্ধকারে কোথাও একটা তারা চোখে পড়ে না। একখানা বই পড়ছিলাম দাদার বিছানার ধারে ব'সে। রাত বারোটায় একবার নার্স এল। আমি তাকে বললাম—রোগীর অবস্থা

খারাপ—একবার রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসারকে ডাকাও। ডাক্তার এল, চলেও গেল। রাত তখন দেড়টা। বাইরে কি ভীষণ যুঘলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি পৃথিবীর ওপরে—হঠাৎ বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ছাত্র এসে রোগী দেখে বললে—ইন্জেকশন দিতে হবে।

আমি বললাম—বেশ দিন—

তার পর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘন মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। হাসপাতালের বারান্দাতে কুলিরা ঘুমুচ্ছে। টিটেনাস ওয়ার্ড থেকে অনেক দূর থেকে আর্ন্ত পত্তর মত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একবার সেটা থামছে, আবার জোরে জোরে হচ্ছে। ডিউক-অফ-কনট ওয়ার্ডে সেম নার্সটা ঘুবে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছড়ু লাইট আলিয়ে একখানা মোটর এসে ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়াল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট তদারক করতে এসেছেন। দাদাকে তিনি দেখলেন। নার্সকে কি বললেন। ছাত্রটিকে ডেকে কি জিগোস করলেন। ছাত্রটি আর একটা ইন্জেকশন দিলে।

রাত আড়াইটা। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দায় ওদিকের আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে—অনেকটা অন্ধকার।

দাদার সঙ্গে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছেলেবেলাকার কথা, দার্কিলিঙের কথা। সেই আমরা কাঁট রোড ধ'রে উম্মাং-এর মিশন-হাউস পর্যন্ত বেড়াতে যেতুম, মনে আছে দাদা? একদিন থাপা ভোমাকে আমাকে কাদার পুতুল গড়িয়ে দিয়েছিল। মুরগীর ঘরে লুকিয়ে তুমি আর আমি মিছরী চুরি ক'রে সববৎ খেতুম? তুমি দোকান করলে আটঘরাতে বাবা মারা যাওয়াব পরে পাঁচ সের হুন, আড়াই সের আটা, পাঁচ পোয়া চিনি নিয়ে—সবাই ধার নিয়ে দোকান উঠিয়ে দিলে! বৌদিদিকে কি বলব দাদা?

এবার এসে দাদার খাটের পাশে বসে রইলাম। একটানা বৃষ্টিপতনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল টিটেনাস-ওয়ার্ড থেকে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও

সেই আর্ন্ত চীৎকারটা শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলের টনসিল কাটা হয়েছিল—সে একবার ঘুম ভেঙে উঠে খাবার জল চাইলে। কুলিটা উঠে তাকে জল দিলে।

এই কুলিগুলো, ওই বুড়ো মেথরটা, নার্সেরা—এরা ঘুমোয় কখন? সারারাত জেগে জেগে রোগীদের ফাইফরমাজ্ খাটছে। দাদার অবস্থা খাবাপ ব'লে সবাই এসে একবার ক'বে দেখে যাচ্ছে। নার্স'বে কতবার এল! সবাই তটস্থ...দাদাকে বাঁচাবার জন্য সবাইই যেন প্রাণপণ চেষ্টা। বাঁচলে সবাই খুশী হয়। নার্স' একবার আমার বললে—ভুমি এবটু ভুমিয়ে নাও বাবু। সারারাত জেগে ব'লে থাকলে অসুখ করবে তোমারও।

হাসপাতালটিকে আমার মনে হ'ল স্বর্গ। আর্ন্তের সেবা বেখানকার মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে করে, সে স্বর্গই। ওই বুড়ো মেথরটা এখানকার দেবদূত। যেদিন কয়েক শতাব্দী আগে শ্রীচৈতন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিংবা শঙ্করাচার্য সংসারের অসাবস্থ সঙ্কটে চিন্তা করেছিলেন—তাঁদের স্বপ্নে এই স্বর্গের কল্পনা ছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গীর্ভনের দলে নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে এই বুড়ো মেথরটা যোগদান করতে পারত, তিনি ওকে কোল দিতেন, ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীক্ষেত্র রওনা হবার সময়ে ওকে পাশ্চর ক'রে নিতেন। রাত সাড়ে তিনটে। রাত আজ কি পোয়াবে না? রুটি একটু খেমেছে। আকাশ কিন্তু মেঘে মেঘে কালো।

এই সময়ে দাদার নাভিস্থাস উপস্থিত হ'ল! কলের ঘোলা জল দাদার মুখে দিলাম। কানের কাছে গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম। এই বিপদের সময় কি জানি কেন মালতীর কথা মনে পড়ল। মালতী যদি এখানে থাকত! আটঘরার অশ্বখতলার সেই বিষ্ণুমূর্তির কথা মনে পড়ল—হে দেব, দাদার ষাওয়ার পথ আপনি সুগম ক'বে দিন। আপনার আশীর্বাদে তার জীবনের সকল ক্রটি, সকল মানি ধুয়ে মুছে পবিত্র হোক; যে সমুদ্রে আপনাব অনন্ত শয্যা, যে লোকালোক পবিত্র আপনার মেথলা—সে-সব পাব হয়েও বহুদূরের যে পথে দাদার আঙ্গ যাত্রা, আপনার রূপায় সে পথ তার বাধাশূন্য হোক, নির্ভয় হোক, মঙ্গলময় হোক।

পাশের বিছানার রোগী বললে—একবার মেডিকেল অফিসারকে ডাকান না?

আমি বললাম—আর মিথ্যে কেন?

তার পর আবও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার ঘুম এসেছে, ডয়ানক ঘুম, কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারি নে। এর মধ্যে নার্স' হু-বার এল, আমি তা ঘুমের ঘোবেই জানি—আমার জাগালে না। পা টিপে টিপে এল, পা টিপে টিপেই চলে গেল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হবাব দেরি নেই, হাসপাতালের আলো নিশ্চয় হয়ে এসেছে—কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকা দিনেব আলো যদিও একটু থাকে, বোঝা যাচ্ছে না। দাদাব খাটের দিকে চেয়ে আমি বিষ্ময়ে কেমন হয়ে গেলাম। এখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি? দাদাব খাটের চারি পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরাব সেই হীরা রায়—জ্বালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা-বাগানেব নেপালী চাকর খাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে সে কোলে-পিঠে ক'বে মানুষ করেছিল। তাব পবই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটকাকীমার মেয়ে পানী। এদের মুষ্টি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হ'ল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। পাশের খাটের রোগীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে যদিও জেগে আছে এবং মাঝে মাঝে দাদার খাটের দিকে চাইছে—কিন্তু তাব মুখ চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল দুখু দাদাকে ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। অথচ কেন দেখতে পাচ্ছে না, এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সজীব মানুষগুলোকে কেন যে ওরা দেখে না—এ ভেবে ছেলেবেলা থেকে আমার বিষ্ময়ের অন্ত নেই।

আমি জানি এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষচোখে যা দেখে না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজি হয় না। এই জন্য হাসপাতালের এই রাত্রিটির কথা আমি একটি প্রাণিকেরও বলি নি কোনদিন।

হু-তিন মিনিট কেটে গেল। ওরা এখনও রয়েছে।

আমি চোখ মুছলাম, এদিক-ওদিক চাইলাম—চোখে জল দিলাম উঠে। এখনও ওরা রয়েছে। ওদের সবারই চোখ দাদার খাটের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানীর কাছে দাঁড়ালাম। ওরা সবাই হাসিমুখে আমার দিকে চাইলে। কত কথা বলব ভাবলাম মাকে, বাবাকে, পানীকে—খাপা কবে মরে গিয়েছে জানি নে—সে এখনও তাহ'লে আমাদের ভোলে নি?...তাকেও কি বলব ভাবলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এই সময়ে নাস' এল। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছি নাস' কি এদের দেখতে পাবে না? এই ত সবাই এরা এখানে দাঁড়িয়ে। নাস' কিন্তু এমন ভাবে এল যেন আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে—এ ত হয়ে গিয়েছে—এ কুলি, কুলি—

কুলি খাটটাকে বেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দিতে এল।

তখনও ওরা রয়েছে।...

তার পর আমার একটা অবসর ভাব হ'ল—আমার সেই সুপরিচিত অবসর ভাবটা। যখনই এরকম আগে দেখতাম, তখনই এরকম হ'ত। মনে পড়ল কত দিন পরে আবার দেখলাম আদ্র—বহুকাল পবে এই জিনিষটা পেরেছি—হাবিয়ে গিয়েছিল, সন্ধান পাই নি অনেক দিন, ভেবেছিলুম আব বোধ হয় পাব না—আজ দাদার শেষশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তা ফিবে পেরেছি। আমার গা যেন ঘুরে উঠল—পাশের চেয়াবে ধপ্ করে ব'সে পড়লাম।

নাস' আমার দিকে চেয়ে বললে—পুওর বর!

২

জীবনে নির্ভর ও হৃদয়হীন কাজ একেবারে করি নি তা নয়, কিন্তু বৌদিদিকে দাদার মৃত্যু-সংবাদটা দেওয়ার মত নির্ভর কাজ আর যে কখনও করি নি, একথা শপথ করে বলতে পারি। বেলা ছোটর সময় দাদার বাড়ি গিয়ে পৌছলাম। পথে দাদার শ্মশর-বাড়ি এক সরিকের সঙ্গে দেখা। আমার মুখের খবর শুনেই সে গিয়ে নিজের বাড়িতে অবিলম্বে খবরটি জানালে। বোধ হয় যেন বৌদিদির ওপর আড়ি করেই ওদের বাড়ির মেয়েবা—যাবা দাদার অহুখের সময় কখনও চোখের দেখাও দেখতে আসে নি—চীৎকার

করে কান্না ছুড়ে দিলে। বৌদিদি তখন অত বেলায় দুটো রে'ধে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিচ্ছে। নিজে তখনও খায় নি। পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে বৌদিদি বিস্ময়ের সুরে জিগেস করছে—হ্যাঁ রে বিহু, ওরা কাঁদছে কেন রে? কি খবর এল ওদের? কারও কি অহুখ-বিহুখ?

এমন সময়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমার দেখে বৌদিদির মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—ঠাকুবপো! তোমার দাদা কোথায়?

আমি বললাম—দাদা নেই, কাল মারা গিয়েছে।

বৌদিদি কাঁদলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বইল আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পাশের বাড়িতে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ছন্দে ও সুরে শোকপ্রকাশের বটা কি! পাড়াব অনেক মেয়ে এলেন সাশ্বনা দিতে বৌদিদিকে। কিন্তু একটু পবে যখন বৌদিদি পুকুরের ঘাটে নাইতে গেল সঙ্গে এক জন বাঙলা দরকাব নিয়মত—তখন একটা অজুহাতে যে যার বাড়িতে গেল চলে। আমি বিস্মিত হ'লাম এই ভেবে যে এবা তো বৌদিদির বাপের বাড়িরই লোক! তার একটু পরে বৌদিদি থানিকটা কাঁদলে। হঠাৎ কান্না ধামিয়ে বললে, শেষকালে জ্ঞান ছিল ঠাকুরপো? আমি বললাম, বৌদিদি তুমি ভেবো না, এখানে যে-রকম গতক দেখছি তাতে এখানে থাকলে দাদার চিকিৎসাই হ'ত না। এখানে কেউ তোমায় তো দেখে না দেখছি। হাসপাতালের লোকে যথেষ্ট কবেছে। বাড়িতে সে রকম হয় না। আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে হাসপাতালই ভাল।

বৌদিদির বাবা মা কেউ নেই—মা আগেই মারা গিয়েছিলেন—বাবা মারা গিয়েছেন আব-বছব। একথা কলকাতাতেই বৌদিদির ভাইয়ের মুখে শুনেছিলুম। বৌদিদির সে ভাইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ নিতান্ত অপদার্থ—তার ওপর নিতান্ত গরিব, বর্তমানে কপর্দকহীন বেকার—তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বয়েসও অল্প, সে কলকাতা ছেড়ে আসে নি, সেখানে চাকুরীর চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখলাম এদের সংসারের ভার এখন আমিই

না-নিলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। দাদা এদের একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেছে। কাল কি করে চলবে সে সংস্থানও নেই এদের। তার ওপর দাদার অস্থির সময় কিছু সেনাও হয়েছে।

৩

এদের ছেড়ে কোথাও নড়তে পাবলুম না শেষ পর্যন্ত। কালীগঞ্জেই থাকতে হ'ল। এখান থেকে দাদার সংসার অল্প স্থানে নিয়ে গেলাম না, কারণ আটঘরা ত এদের নিয়ে যাবাব যো নেই, অল্প জায়গায় আমার নিজের রোজগারের সুবিধা না-হওয়া পর্যন্ত বাড়িভাড়া দিই কি ক'রে?

এ সময়ে সাহায্য সত্যি সত্যিই পেলুম দাদার সেই মাসীমার কাছ থেকে—সেই যে বাতাসাব কারখানার মালিক কুণ্ডু-মশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—সেবার যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। এই বিপদের সময় আমাদের কোন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে-রকম সাহায্য আসে নি।

ক্রমে মাসের পর মাস যেতে লাগল।

সংসার কখনও করি নি, করবো না ভেবেছিলুম। কিন্তু যখন এ-ভাবে দাদার ভার আমার ওপর পড়ল, তখন দেখলাম এ এক শিক্ষা—মায়ুষের দৈনন্দিন অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে, ছোটখাটো ত্যাগস্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পরের জন্তে খাটুনি ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পাবিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে এই যে এতগুলি প্রাণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার গুরুভার নিজের ওপর নিয়ে সংসার-পথের চলাব দুঃখ—এই দুঃখের একটা সার্থকতা আছে। আমার জীবন এর আগে চলেছিল শুধু নিজেকে কেন্দ্র ক'রে—পরকে সুখী ক'রে নিজেকে পবিত্র করার শিক্ষা আমায় দিয়েছে—মালতী। পথে বেরিয়ে অনেক শিক্ষার মধ্যে এটিই আমাব জীবনে সব চেয়ে বড় শিক্ষা।

কত জায়গায় চাকরি খুঁজলাম। আমি যে লেখাপড়া জানি বাজারে তার দাম কাণাকড়িও না। হাতের কোন কাজও জানি নে, সব তাতেই আনাড়ি। কুণ্ডু-মশায়ের স্ত্রীর সুপারিশ ধরে বাতাসাব কারখানাতেই খাতা লেখার কাজ জোগাড় করলাম—এ কাজটা জানতাম, কলকাতায় চাকরির

সময় মেজবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় শিখেছিলাম তাই রক্ষে। কিন্তু তাতে ক'টা টাকা আসে? বৌদিদির মন্ত গৃহিণী তাই ওই সামান্য টাকার মধ্যে সংসার চালানো সম্ভব হয়েছে।

কান্ডান মাস পড়ে গেল। গাংনাপুরের হাটে আমি কাজে বেরিয়েছি গরুব গাড়ি ক'রে। মাল্লি-বারো দূর হবে, বেগুন-পটলের বাজারর ওপরে চটের থলে পোতে নিয়ে আমি আর তরু চৌধুরী ব'লে। তরু চৌধুরীর বাড়ি নদীয়া মেহেরপুরে, এখানকার বাজারের সাহাবের পাটের গদির গোমস্তা, গাংনাপুরে খবিকারের কাছে মাল দেখাতে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতে তরু চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়ল বাজারর ওপরেই। আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। পথের ধারে গাছে গাছে কচি পাতা গড়িয়েছে, বোঁকুলের ঝাড় পথের পাশে মার্চের মধ্যে সর্বত্র।

শেষরাতে বেবিয়েছিলুম, ভোর হবার দেরি নেই, কি সুন্দর বিরঝিরে ভোরের হাওয়া, পূব আকাশে জলজলে বৃত্তিক রাশির নক্ষত্রগুলি বাশবনের মাথার ঝুঁকে পড়েছে—বেন ওই দ্যুতিমান তারার নগলী পৃথিবীন সকল সুখদুঃখের বাস্তবতার বন্ধনের সঙ্গে উর্দ্ধ আকাশের সীমাহীন উদার মুক্তির একটা যোগ-সেতু নির্মাণ করেছে—বেন আমাদের জীবনের ভাবক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংকীর্ণ পরিসরের প্রতি নক্ষত্রজগৎ দধাপরবশ হয়ে জ্যোতির দূত পাঠিয়েছে আমাদের আশার বাণী শোনাতে—বে কেউ উঁচু টিমে চেয়ে দেখবে, চলতে চলতে সেই দেখতে পাবে তার শাশ্বত মূর্ত্যাহীন রূপ। যে চিনবে, যে বলবে আমার সঙ্গ তোমাব আধ্যাত্মিক বোগ আছে—আমি জানি আমি বিশ্বের সর্ব সম্পদেব, সকল সৌন্দর্যেব, সকল কল্যাণের উত্তরাধিকারী—তাব কাছেই ওর বাণী সার্থকতা লাভ করবে।

এই প্রফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমাব মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, বেন কি পেয়েছিলুম হারিয়ে ফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্যের অরুণ রাগ অতীত দিনেব কত কথা মনে এনে দেয়। সব সময় আমি সে-সব কথা মনে স্থান দিতে রাজি হই নে, অতীতকে আঁকড়ে ধবে বসে থাকা আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। হঠাৎ দেখি

অন্তমনস্ক হয়ে কখন ভাবছি, স্বারবাসিনীর আখড়া থেকে সেই ভোরে যে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম—কাউকে না জানিয়ে, মালতীকে ত একবার জানালে পারতাম—মালতীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলুম কেমন করে।

ওকথা চেপে যাই—মন থেকে বেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। আগে যতটা কষ্ট হ'ত এসব চিন্তায় এখন আর ততটা হয় না, এটা বেশ বুঝতে পারি। মালতীকে ভুলে থাকি—কিছুদিন পরে আবও যাব। এক সময় যে অত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আজ সপ্তসিদ্ধপারের দেশেব রাজকন্টার মত অবাস্তব হয়ে আসছে। হয়ত এক দিন একেবারেই ভুলে যাব। জীবন চলে নিজেব পথে নিজের মর্জিমত—কারও জন্তে সে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে—যখন ভাবি বহুদিন আগে রাতের বননীল দিখলয়ে ঘেরা মাঠের মধ্যে যে-দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলুম তিনি আমার ভুলে বান নি। তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, তিনি পথও দেখিয়েছেন। এই অনুদার রুদ্ধগতি জীবনেও তিনি আমার মনে আনন্দের বাণী পাঠিয়েছেন।

এতেও ঠিক বলা হ'ল না। সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন কি করি, কি বলি কিছু জ্ঞান থাকে না—সে এক অন্ত ব্যাপাব। আজও তাই ঠিক হ'ল। আমি হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় নেমে পড়লুম গাড়ী থেকে। তহু চৌধুরী বললে—ও কি, উঠে এস। তহু চৌধুরী জানে না আমার কি হয় মনের মধ্যে এ-সব সময়ে, কারও সাহচর্য এসব সময়ে আমার অসহ্য হয়, কারও কথায় কান দিতে পারি নে—আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিখের ছানাপুলো খাদ্যকণা খুঁটে থাকে বেদিকে, তাদের অসহায় পক্ষভঙ্গিতে কি বেন লেখা আছে—একবার চাই তিসির ফুলের রঙের আকাশের পানে—স্বলমল প্রভাতের সূর্য্যকিরণের পানে, শস্যশ্যামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ! এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার বিজ্ঞপ্ত, এক গোঁবসমৃদ্ধ, পবিত্র নবজন্ম।

মনে মনে বলি, আপনি আমার এ-রকম করে দেবেন না, আমার সংসার করতে দিন ঠাকুর। দাদার ছেলেমেয়েরা,

বৌদিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওদের অন্নের জন্তে, ওদের আমি ত ফেলে দিতে পারব না! এখন আমার এ-রকম নাচাবেন না।

বৈকালের দিকে পায়ে হেঁটে গাংনাপুরের হাটে পৌঁছলাম। তহু চৌধুরী আগে থেকেই ঠিক কবেছে আমার মাথা ধারাপ। রাস্তার মধ্যে নেমে পড়লাম কেন ওরকম?

ফিরবার পথে সন্ধ্যার রাঙা মেঘেব দিকে চেয়ে কেবলই মনে হ'ল ভগবানের পথ ওই পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘ-পর্দার ওপারে কোনো অজানা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে নয়, তাঁর পথ আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু-গাড়োয়ান যে পথ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও। আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলছেন এই মুহূর্তে—আমি আছি তাই তিনিও আছেন। যেখানে আমার অসাফল্য, সেখানে তাঁরও অসাফল্য, আমার যেখানে জয়, সেখানে তাঁরও জয়। আমি যখন হৃন্দরের স্বপ্ন দেখি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আদর করি, পরেব জন্তে ধাটি—তখন বুঝি ভগবানের বিরাট শক্তির সপক্ষে আমি দাঁড়িয়েছি—বিপক্ষে নয়। এই নীল আকাশ, অগ্নিকেতন উদ্ধাপুঞ্জ, বিহ্বাৎ আমার সাহায্য করবে। বিশ্ব যেন সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিব ও হৃন্দরের মধ্যে নিজের সার্থকতাকে খুঁজতে, কিন্তু পদে পদে সে বাধা পাচ্ছে কি ভীষণ! বিশ্বের দেবতা তবুও হাল ছাড়েন নি—তিনি অনন্ত ধৈর্য্যে পথ চেয়ে আছেন। নীরব সেবারত সূর্য ও চন্দ্র আশায় আশায় আছে, সমগ্র অদৃশ্যলোক চেয়ে আছে—আমিও ওদের পক্ষে থাকব। বিশ্বের দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারব না। জীবনে মানুষ তত ক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিষই, যত ক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না-হয়। আগে প্রোতের শেওলার মত ভেসে ভেসে কত বেড়িয়েছি জীবন-নদীর ঘাটে ঘাটে—তটপ্রান্তবর্তী যে মহীৰুহটি শত স্মৃতিতে তিলে তিলে বর্ধিত হয়ে স্নানার্থিনীদের ছায়ালীতল আশ্রয় দান করেছে—সে হয়ত বৈচিত্র্য চায় নি তার জীবনে—কিন্তু একটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর সূর্য্য তার মাথায় কিরণ বর্ষণ করেছে, তার শাখা-প্রশাখায় ঋতুতে ঋতুতে বনবিহঙ্গদেব কৌতুক বিলাস কলকাকলী নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—

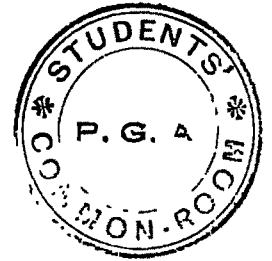
তার মুহূ ৩ বীর, পরার্থমুখী গম্ভীর জীবন-ধারা নীল আকাশের অদৃশ্য অশীর্বাদতলে এই একটি শতাব্দী ধবে বয়ে এসেছে—বৈচিত্র্য যেখানে হয়ত আসে নি—গভীরতায় সন্ধান করেছে বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ। প্রতিদিনের সূর্য্য স্তম্ভতারার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীব অন্ধকারে অদৃশ্য হন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ আসে—দেখি যে পুকুরের ধারে বর্ষার ব্যাঙের ছাতা সূর্য্যের অমৃত কিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠছে—দেখি উইয়ের চিবিতে নতুন শাখা ওঠা উইয়ের দল অজানা বায়ুলোক ভেদ করে হয়েছে মরণেব বাজী, শরতের কাশবন জীবন-সৃষ্টির বীজ দূরে, দূরে, দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে বিস্তার মধ্যই পরম কাম্য সার্থকতাকে লাভ করেছে—দারিদ্র্য বা কষ্ট

তুচ্ছ, পৃথিবীর সমস্ত বিলাস-লালসাও তুচ্ছ, আমি কিছুই গ্রাহ্য করিনে যদি এই জাগ্রত চেতনাকে কখনও না হারাই—যদি হে বিশ্বদেবতা, বাণ্যে তুমারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন সকালবেলাকার সূর্য্যেব আলোর সোনার বঙে রঞ্জিত হ'তে দেখতুম—তেমনি যদি আপনি আপনার ভালবাসার বঙে আমার প্রাণ রাঙিয়ে তোলেন—আমিও আপনাকে ভালবাসি যদি—তবে সকল সংকীর্ণতাকে, হৃৎককে জয় ক'রে আমি আমাব বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পণে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে আবার কোন আনন্দ-ভরা নবজন্মের অজানা রহস্যের আশায়।

(ক্রমশঃ)

শের শাহের সিংহাসনারোহণ বৎসর

শ্রীনিলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ-ডি



হুমায়ুন-বিজয়ী পুরুষসিংহ শের শাহের সিংহাসনারোহণ বৎসর লইয়া গোলযোগ বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে ডক্টর কানুনগো মহাশয়ের অশেষ পরিশ্রমের ফল “শের শাহ” নামক পুস্তকই প্রামাণ্য। কিন্তু কানুনগো মহাশয় শের শাহের সিংহাসন আবোহণের যে বৎসর অনেক বিচার-বিতর্ক করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, নূতন আবিষ্কারের ফলে দেখা যাইতেছে যে তাহা এক বৎসর পিছাইয়া দিতে হইবে। কানুনগো মহাশয়ের নির্দ্ধারিত বৎসর ১৪৬ হিজরি,—এই হিজরি বৎসর ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে আরম্ভ।

এখন, নূতন আবিষ্কার কি হইল, বলা দরকার। গত বৎসর ঢাকার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং হাকিম শ্রীযুক্ত হবিব রহমান ঝাঁ তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহের কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ঢাকা মিউজিয়মে উপহার প্রদান করেন। এই সংগ্রহে শের শাহের মোট ৫৯টি মুদ্রা আছে,

উহাদের কতকগুলিতে সাতগাঁ, শরিফাবাদ (বর্ধমান), কথাবাদ (কতেহাবাদ—ফরিদপুর) ইত্যাদি টাকশালের নাম আছে, কতকগুলিতে আবাব কোন টাকশালের নাম নাই। একটি ছাড়া বাকী সমস্ত মুদ্রারই তারিখ ১৪৬ হিঃ হইতে ১৫২ হিঃ পর্য্যন্ত। কিন্তু উক্ত একটি মুদ্রাই ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য গণিত হইবে, কাবণ উহার সনাক্ষ স্পষ্ট ১৪৫ হিজরি। নিম্নে মুদ্রাটির বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। মুদ্রাটির তারিখবুক্ত দ্বিতীয় পৃষ্ঠের ছবি দেওয়া গেল, পারস্য ভাষায় অভিস্কৃত পাঠক ছবির সহিত বর্ণনা মিলাইয়া লইতে পারিবেন।

মুদ্রাটির কিনারায় বৃত্তরেখা বা অস্ত্র কোন অলঙ্করণ-রেখা নাই। প্রথম পৃষ্ঠে একটি সমচতুর্কোণের অভ্যন্তরে মুসলমান-ধর্মের মূলমন্ত্র কলিমা অর্থাৎ “লাইলাহু ইল্লাহু, মুহম্মদ রহুল আল্লাহ্,” লিখিত আছে। ইহার পরে একটি সরল রেখা টানিয়া চতুর্কোণকে দুই ভাগ করিয়া নীচের ভাগে সোপাধি

সম্রাটের নাম আরক্ হইয়াছে—“আল্ হুলতান্ আল্ আমিল্।” মুদ্রাব কিনারা এবং চতুষ্কোণের চারি বাহুর মধ্যে যে চারিটি কক্ষ আছে, তাহাতে মুহম্মদের চার-ইয়ারের নাম, যথা “আব্ বকর, ওমর, ওসমান, আলি” লিখিত আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠেও লেখার বিস্তার প্রথম পৃষ্ঠেরই মত।



“তাইফুর”



“বকর”



“হাকিম”

কিনারার চারিটি কক্ষে হুলতানের নামাংশ উৎকীর্ণ, যথা—“ফরিদ। আল হুনিয়া। ও আলদিন। আব্ আল মুজঃফর।” পড়িবার কালে ইহার উচ্চারণ হয়—“আস্ হুলতান্ আলদিন্ ফরিদুন্নিয়াউদ্দিন আবুল মুজঃফর।” পবে চতুষ্কোণের অভ্যন্তরে রাজাব আসল নাম, তাহার রাজত্ব স্থায়িত্বের জন্ত প্রার্থনা এবং সনাক আছে, যথা—“শের শাহ আস্-হুলতান্ খলজুল্লাহ্ মুক্ ৯৪৫।” ইহার পরে আবার দেবনাগর অক্ষরে সম্রাটের নাম আছে—“শ্রী শেব শাহী।” মুসলমান-অধিকারের আদিবৃগে মুসলমান হুলতানগণ মুদ্রায় পারসীর সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও নিজেদের নাম লিখিতেন। বহুকাল অবধি এই প্রথা লুপ্ত ছিল। শেব শাহ আবার এই প্রথার প্রবর্তন করেন এবং শের শাহ-বংশীয় প্রত্যেক হুলতানই এই হিন্দু বমনোরঞ্জক প্রথা মানিয়া চলিয়াছিলেন। মোগল-বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আবার অদৃশ্য হয়।

শেব শাহের এই মুদ্রাটি ভাবতের বাঙ্গলেনৈতিক ক্ষেত্রে যে কত বড় পবিবর্তনের সূচক, তাহা মুদ্রাতত্ত্ববিৎ মাত্রেই জানেন। মুদ্রাটি প্রায় নিখুঁৎ গোলাকার,—উপাদান বিশুদ্ধ রৌপ্য,—অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন এবং সর্বত্রকমেই ইহা মুদ্রানিশাণ-শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলায় হুলতানগণের মুদ্রা লইয়া বাঁহা নাড়াচাড়া করিয়াছেন এবং উহাদের পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের নিকট এই মুদ্রাটি অপ্রত্যাশিত সম্পদের মত। গঠন-নৈপুণ্য এবং পরিচ্ছন্নতায়

বাংলায় হুলতানগণের মধ্যে একমাত্র ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের মুদ্রা শের শাহের মুদ্রার সহিত উপমিত হইতে পারে। পরবর্তী হুলতানগণের কাহারও মুদ্রাই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। শের শাহের পূর্ববর্তী হুসেনী হুলতানগণের অধিকাংশ মুদ্রাই গঠন-পারিপাট্যহীন। তাহার উপরে আবার এক বিষম বিপদ জুটিয়াছিল। এই হুলতানী আমলে মুদ্রা জাল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল,—জালিয়াংগণ ভিতরে তামা ভরিয়া উপরে কৌশলে পাতলা রূপার পাত দিয়া মুদ্রা তৈয়ার করিয়া তাহা খাঁটি রৌপ্য-মুদ্রা বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই টাকা ভাড়াইবার সময় পোন্ধরগণ ছেনি দিয়া পাঁচ সাত স্থানে না-কাটিয়া আর কোন টাকা ভাড়াইয়া দিত না। ফলে মুদ্রাগুলির এমন দুর্দশা হইত যে উহাদের সন, তারিখ, টাকশালের নাম ত পড়া যাইতই না, কোন্ বাজার মুদ্রা তাহা ঠিক করিতেই গলদবন্দ্য হইতে হইত। এই ত গেল বাংলার হুলতানগণের মুদ্রার অবস্থা।

দিল্লীর হুলতানগণ মিশ্র ধাতুব মুদ্রার (Billion Coins) প্রচলন করিয়াছিলেন—সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে ঐ মুদ্রারই প্রচলন বেশী ছিল। এই মুদ্রাগুলিতে কতখানি সোনা আছে বা কতখানি রূপা আছে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা স্থির করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কাস্বেই ওজনে সমান হইলেও কোন্ মুদ্রার মূল্য কি, পোন্ধরগণই তাহাব নির্দ্ধারক ছিল। ইহাতে জনসাধারণের যে কি পরিমাণ অনুরোধ হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। শের শাহ বিশুদ্ধ স্বর্ণে, বিশুদ্ধ রৌপ্যে এবং বিশুদ্ধ তাম্রে মুদ্রা প্রচলিত করিয়া নিমেষে এই সমস্ত গলদ দূর করিয়া দিলেন। আর শেব শাহেব মুদ্রাকে জনসাধারণ এবং পোন্ধরগণও কি পরিমাণ সন্মম ও শ্রদ্ধাব চোখে দেখিত তাহার প্রমাণ এই যে আমি শেব শাহের শত শত মুদ্রা পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু পোন্ধরের ছেনি-কাটার দাগ উহাদের প্রায় কোনটিতেই এযাবৎ দেখি নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, ডক্টর কানুনগো তাহার ‘শের শাহ’ নামক পুস্তকে (পৃ. ২০৬ এবং পরবর্তী) ১৪৬ হিজরা সনকে শের শাহের সিংহাসন-আরোহণের বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই মুদ্রার সনাক হইতে

দেখা বার বে, উহা এক বছর পিছাইয়া দিতে হইবে। যদি মাত্র একটি মুদ্রাতেই এই তারিখ পাওয়া যাইত তবে সন্দেহ করা চলিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অনুরূপ আরও দুইটি মুদ্রা এ-বাং পাওয়া গিয়াছে। হাকিম সাহেব তাঁহার মুদ্রা-সংগ্রহ ঢাকা মিউজিয়মে উপহার দিবাব অব্যবহিত পবেই আবাব আর একটি মুদ্রা-সংগ্রহ ঢাকা মিউজিয়মে উপহাব প্রদত্ত হয়। এই দ্বিতীয় উপহারদাতার নাম শ্রীযুক্ত সৈয়দ এ-এস-এম্ তাইফুর। ইনি ঢাকার একটি প্রাচীন এবং সম্মানিত জমীদার-বংশসম্ভূত। হাকিম সাহেব তাঁহার সংগ্রহ-গঠনে তাইফুর-সাহেবের নিকট বথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং উভয় সংগ্রহে মুদ্রাবলি প্রায় একই রকমের। তাইফুর-সাহেবের উপরত মুদ্রার মোট সংখ্যা ২০৯। এই মুদ্রাগুলির মধ্যেও শের শাহের ৯৪৫ হিজরাব একটি মুদ্রা আছে। তাইফুর-সাহেবের সংগ্রহে আরও একটি ৯৪৫ হিজরাব মুদ্রা ছিল, কিন্তু এই মুদ্রাটি তিনি এক বন্ধকে উপহার দিয়াছেন। হস্তান্তর করিবার পূর্বে তিনি আমাকে এই মুদ্রাটির একটি ফটো রাখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারেই সেই ফটোগ্রাফ এখানে মুদ্রিত হইল। এই মুদ্রা তিনটি বথাক্রমে “হাকিম” “তাইফুর” এবং “বন্ধু” বলিয়া বিশেষিত হইল।

মুদ্রা তিনটি পবীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ‘হাকিম’ এবং ‘বন্ধু’-চিহ্নিত মুদ্রা দুইটি একই ছাঁচের, কিন্তু ‘তাইফুর’ চিহ্নিত মুদ্রাটি ভিন্ন ছাঁচের। এই দুই ছাঁচের মুদ্রার লপি যদিও অবিকল একই, কিন্তু অক্ষরগুলির সংস্থান এক নহে। ৯৪৫ সনাদটি প্রথম ছাঁচে লিপির শেষ ছত্রের সহিত একই লাইনে লিখিত, দ্বিতীয় ছাঁচে উহা ভিন্ন আর এক লাইনে লিখিত। ৫ অঙ্কটির আকৃতিও উভয়ত্র এক বকম নহে। যাহা হউক, বিচার্য্য এই যে, ৯৪৫ হিজরার মুদ্রা ছাপিতে বখন একাধিক ছাঁচের প্রয়োজন হইয়াছিল তখন বুঝিতে হইবে যে মুদ্রিত মুদ্রাব সংখ্যা নিতান্ত অল্প না-হওয়ারই সম্ভাবনা,—যদিও মাত্র এই প্রকারের তিনটি মুদ্রা আমবা এ-বাং পাইয়াছি। ঢাকা জেলায় নবাবগঞ্জ থানাব অন্তর্গত রাইপাড়া গ্রামে কয়েক বৎসর আগে শের শাহ—ইসলাম শাহের এবং তাঁহাদের পূর্ববর্তী

বাংলার হোসেনী সুলতানগণের বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। এই মুদ্রাপ্রাপ্তিব’ সম্পূর্ণ বিবরণ শ্রীযুক্ত টেপলটন সাহেব বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৯২৮ সনের মুদ্রাবিষয়ক ক্রোড়পত্রে দিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রার কতক অংশ মাটি কাটিতে নিযুক্ত কুলিদের হস্তগত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি ঢাকার বাজারে পোদ্ধারগণের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই ৯৪৫ হিজরার মুদ্রা তিনটি তাই মূলতঃ বাইপাড়ার পাওয়া মুদ্রা বলিয়াই মনে হয় এবং তাই এতদূর অনুমানও অসঙ্গত নহে যে মুদ্রা তিনটি সম্ভবতঃ বাংলা দেশেই মুদ্রিত মুদ্রা, যদিও উহাদের গারে কোন টাকশালের নাম লিখিত নাই।

৯৪৫ হিজরার কোন মাসে এই মুদ্রাগুলি মুদ্রিত হওয়া সম্ভব, এইবার তাহার একটু বিচার করা যাউক। ডক্টর কানুনগোর ‘শের শাহ’ হইতে এই যুগের ঘটনাবলি নিয়ে সম্বলিত হইল। নূতন সম্রাটেরা নিজ নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া এবং মসজিদে প্রার্থনা কবাইয়া নিজেদের রাজ্য-প্রাপ্তি বিধোষিত কবাইতেন। প্রথমটির নাম সিদ্ধা, দ্বিতীয়টির নাম খুত্বা। কাজেই সিদ্ধা বখন প্রচারিত হইয়াছিল, শের শাহ সিংহাসনেও সেই সময়ই আরোহণ করিয়াছিলেন,—এই সিদ্ধান্তই বরিতে হইবে।

জামুয়ারী—১৫৩৬। শের খাঁর বঙ্গাভিযান। (১১৮ পৃঃ)

মার্চ—১৫৩৬। শের খাঁ গোড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ বহু অর্থ উপহার দিয়া তাহাকে ফিরাইলেন।

ডিসেম্বর—১৫৩৬। হুমায়ূনের তক্তারটি-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন (১৩২ পৃঃ)।

অক্টোবর—১৫৩৭। শের খাঁর দ্বিতীয় বার বঙ্গাভিযান।

ডিসেম্বর—১৫৩৭। হুমায়ূন অগ্রা হইতে শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। (১৩৩ পৃঃ)

জামুয়ারী—১৫৩৮। হুমায়ূন চুগুর পৌঁছিলেন। (১৪২ পৃঃ)

আহম্মানিক মার্চ—১৫৩৮। শের খাঁর রোহতাশ-দুর্গ অধিকার। (১৫২ পৃঃ)

৬ই জুলকাদা, ৯৪৪ হিঃ। } গৌড়ের পতন এবং বাংলার সুলতান
৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮। } মাহমুদ শাহের পলায়ন। (১৫৪ পৃঃ)

মে—১৫৩৮। চুগুর-দুর্গের পতন। (পৃঃ ১৫৮, পাণ্ডটাকা)

জুন—১৫৩৮। হুমায়ূন বঙ্গাভিযানে অগ্রসর হইলেন। (৯৫ হিজরা ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে আরম্ভ হইয়া ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে শেষ হইয়াছিল)

জুনের শেষ, ১৫৩৮। নোকাযোগে শের খাঁ গোড় পৌঁছিলেন। (পৃঃ ১৬২)

জুলাই মধ্যভাগ—১৫৩৮, শের শাহ গৌড় পরিত্যাগ করিলেন এবং অব্যবহিত পরেই হুমায়ুন গৌড়ে প্রবেশ করিলেন।

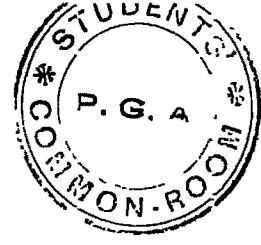
মার্চ—১৫৩৯। হুমায়ুন গৌড়ে এক বঙ্গ সৈন্ত রাখিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। (১৮১ পৃঃ)

জুন ২৭, ১৫৩৯। চৌসার ক্ষেত্রে শেরের হস্তে হুমায়ুনের সম্পূর্ণ পরাজয়।

শের শাহের সিংহাসনাবোহণ-প্রসঙ্গে ডক্টর কানুনগো মন্তব্য করিয়াছেন যে, শের শাহের রাজত্বকালের বিবরণ-লেখক আব্বাস শারওয়ানী, কখন এবং কোথায় শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। এই কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আব্বাস শারওয়ানীর পুস্তক এলিয়ট (Elliot) এবং ডাউসন (Dowson) সাহেবদ্বয়ের সম্পাদিত *History of India by its own Historians* নামক অষ্টপঞ্চাশক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে অনূদিত আছে। শারওয়ানী-প্রদত্ত শের শাহের সিংহাসনারোহণের বর্ণনা উহার ৩৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য। তাহাতে দেখা যায়, শারওয়ানীর মতে এই ঘটনা ৯৪৬ হিজরার চৌসার যুদ্ধের (১০ই সফর, ৯৪৬ হিজরা—২৭শে জুন, ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) অব্যবহিত পরে সম্ভবতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটেই কোথাও ঘটিয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, শারওয়ানী স্থান এবং কাল দুই-ই দিয়াছেন বা তাহার বর্ণনা হইতে ধরিয়া লওয়া যায়,—এবং এই বিষয়ে আব্বাস শারওয়ানী বিশ্বাসযোগ্য নহেন। তারিখ-ই-দাউদী মতেও (শের শাহ—২০৭ পৃঃ) চৌসার যুদ্ধের পবেই সিংহাসনাবোহণ এবং সিদ্ধ-প্রচার ও খুতবা-প্রচলন সম্ভবিত হইয়াছিল—কাজেই তাবিখ-ই-দাউদীর গ্রন্থকারও আব্বাস শারওয়ানীর মতই ভুল খবর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু শের শাহ যে বাংলা দেশে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থেই তাহার সমর্থন আছে। ডক্টর কানুনগো বলেন, তাহার নিকটে ‘মখজান-ই-আফখানা’ নামক ইতিহাসখানি যে হাতে-লেখা পুঁথি আছে, তাহাতে দেখা যায়, শের শাহ বাংলা দেশে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে,

নিজামুদ্দিন-প্রণীত তবকাৎ-ই-আকবরী, ফেরিস্তা-প্রণীত ইতিহাস এবং বদাওনী-প্রণীত মুস্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ মতে শের শাহের সিংহাসনে আরোহণ বাংলা দেশেই সম্ভবিত হইয়াছিল। এ-যাবৎ সারা উত্তর-ভারতময় শের শাহের বহু সহস্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অত্র কোথাও আর ৯৪৫ হিজরার মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। এখন বাংলা দেশ হইতেই ৯৪৫ হিজরাব তিনটি মুদ্রা বাহিব হইল দেখিয়া বাংলা দেশেই প্রথম শের শাহের মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যুক্তিসঙ্গত; কাজেই বাংলা দেশেই অর্থাৎ গৌড়েই শের শাহ সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কোন্ মাসের কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তাবিখের মধ্যে শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া সহজেই বলা যায়। পূর্বেই দেখিয়াছি, ৯৪৫ হিঃ, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে আরব্দ হইয়া ১৫৩৯-এবং ১৮ই মে শেষ হইয়াছিল। পূর্বসম্বলিত ঘটনা-পঞ্জী হইতে দেখা যাইবে, এই দুই তারিখের মধ্যবর্তী অধিকাংশ সময়েই শের শাহ সৈন্ত লইয়া অথবা অত্র উদ্দেশ্যে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গৌড়ের পতন হইলেও তিনি তৎক্ষণেই গৌড়ে যাইতে পারেন নাই। জুন—১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চুণারের পতনের পর হুমায়ুন যখন বাংলা দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তেলিবাঘরি-সঙ্ঘটে তাহাকে বাধা দিয়া আটকাইয়া রাখিবর ব্যবস্থা করিয়া শের ক্ষতগামী নৌকাযোগে গৌড় পৌঁছিলেন। জুনের শেষে শের গৌড়ে পৌঁছিলেন এবং জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি গৌড় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। এই এক পক্ষকাল সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৫৩৮-এর জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই, তিনি গৌড়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৯৪৫ হিজরার মুদ্রাবলি প্রচারিত করিয়া থাকিবেন। এই সময় ৯৪৫ হিজরার দ্বিতীয় মাস সফর চলিতেছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে এবং ৯৪৫ হিজরার সফর মাসের মধ্যভাগে শের শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।



অভিযান

শ্রীতারাপদ মজুমদার

প্রকৃতির ব্যবস্থা করিয়া কলেজ-পল্লভন করিলে ফাঁসির
ছকুম হয় না;—কিরীটি সটান হোটেলে আসিয়া
উপস্থিত।

ঐ একঘেরেমি কি প্রত্যেক দিন ভাল লাগে? সংস্কৃতের
ক্লাসটায় বরং একটু রসেব আনন্দ পাওয়া যায়। শাস্ত্রী-
মহাশয় বধন মুহুরে শুরুর করেন,—‘কাজ্জল্যন্যো বদন-
মদিরাং—’, নাঃ, এই সমস্ত ভাবিয়া এই বাদ্যের দিনে
হা-হতাশ না বাড়াইলেও চলবে। কালিদাস নিশ্চয়ই কেরানী
ছিলেন এক মুখর। গৃহিণীর মুখনাড়ার চোটে, অধিকন্তু
বড়বাবুর তাড়াহুড়ো খাইয়া দেশভাগ করিয়াছিলেন।
তার পর বিজ্ঞানদিত্যের বদান্ততায় ভূরিতোজনে ভুঁড়ি
পাকাইয়া স্থাপ্তি করিয়াছিলেন এই সমস্ত আদ্যরস।

...ঐ দিক্কার ছাদে সেই মেয়েটি প্রত্যহ চুল শুকাইতে
আসে। ছবদৃষ্ট! সে-ও আজ আসে নাই। কি বোকা!।
আজ এই অবিশ্রান্ত রুটিতে চুলগুলি ভিজাইতে আসিবে
না কি? কিন্তু ঐ জানালাটির পাশে আসিয়া না-
দাঁড়াইবার ক্ষমতা কে তাহাকে মাথার দিয়া দিয়াছিল? বহু
পূর্বে একদিন, মাত্র একদিন তাহাকে ঐ বাতায়ন-পার্শ্বে
উপবিষ্ট দেখা গিয়াছিল; মুখখানি সেদিন তাহার এত বর্ষার
মেঘের মতই ছিল অন্ধকার। সুন্দর মুখে অভ্যমান ও
মানায় বেশ। সেদিন নিশ্চয়ই বাড়িতে কাহারও সহিত
ঝগড়া করিয়া সে...কিন্তু আজ কি একবার ঝগড়াও করিতে
নাই? বাড়ির লোকগুলি কি তাহার কোন কাজে
কোনও ত্রুটি দেখিতে পাইয়া একটা ধমক দিতেও জানে
না?—খালি খালি রাগাইয়া দিতেও জানে না?

...দেখে গেলে, বৌদিদি হাসি-ঠাট্টা কবিতো খুবই
মজবুত, কিন্তু কই একটা বিবাহের ব্যবস্থা ত তাহার মস্তিষ্কে
আসে না? ক্ষমতা নাই এক তিল, কেবলই মুখ-ভাগবত!
বেশ, একবার রাগিয়া চটিয়া একটা গলায় ঝুলাইয়া দিন
দেখি! তবে জানা যাইবে তাহার যোগ্যতা, হ্যাঁ...!

—বাবু বইছেন না কি?—ভেজানো দরজা ঈষৎ ঠেলিয়া
ভূতটি দর্শন-পংক্তি বিকশিত করিল।

কিরীটি ভেজাইয়া উঠিল,—রইছেন কি রইছেন না,
দেখতে পাইছেন না?...কি ছকুম শুনি? একটু যদি ঘুমবাব
চেষ্টা করব, তাও আসবে বাবা বাগ্‌ড়া দিতে!

ভূতটি নিতান্তই ভূত, নচেৎ মেসের ঘর বাঁট দিতে
আসিবে কেন? চিলেকোঠায় বসিয়া কুক বই বাখিয়া
কাব্যি করিতেও ত পাবিত! অর্দ্ধশায়িত ভাবে জানালাব
বাহিরে ‘হা’ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কিরণে নিদ্রার চেষ্টা
কবা যায়, ভূতটির তাহা বোধগম্য হইল না; বলিল—
চিঠির বাক্সে এই পুষ্টকাদখানা ছিল, কার দেখুন দিকি?

কিরীটি হাত বাড়াইয়া কার্ডখানি লইল; তাহারই
কুম-মের্ট অশ্বিনীর চিঠি। একেবারে বাজে! অশ্বিনীর
তক্তপোষের উদ্দেশে চিঠিখানি ছুড়িয়া কেলিয়া দিতে গিয়া,
কেন বলা যায় না, চিঠিখানা একবার সে না পড়িয়া
পারিল না। পড়িতে পড়িতে তাহার ললাট সঙ্কুচিত
হইল, চক্ষুদ্বয় অপেক্ষাকৃত বড় হইল; অঙ্কটে উচ্চাবিল,—
হঁ। লাকী চাপ্ এই অশ্বিনীটা ছুই মাসও
হয় নাই, সুন্দরী পত্নী লাভ কবিয়াছে, তার ইহাবই মধ্যে
বার-ছুই অন্ততঃ সেই শ্রীধামে পাড়ি দিয়াছে। এবার আবার
কোন এক দিদি-শান্তভীব নিমন্ত্রণ। বিবাহের সময় তাঁহার
পশ্চিমে ছিলেন, নবজামাতাকে দেখিতে পান নাই, তাই এই
আবাহন। আবাব লিখিয়াছেন, খণ্ডবাড়ির পরিবর্তে
দিদি-শান্তভীব বাড়ি গেলেও অশ্বিনীর লাভ বই লোকসান
হইবে না। তার পর কি লিখিয়াছেন, ‘চাটিয়া দিয়াছেন,
পড়া যায় না।...লাভ ত বোল আনা! ছুধের তেষ্ঠা
বোলে? হুঃ! অশ্বিনী যদি নিবেট্ হয়, তবেই
গরদের পাঞ্জাবী গায় চড়াইবে।...কিন্তু...তাচ্ছা, এক কাজ
করিলে হয় না? ইহার কেহই ত অশ্বিনীকে চেনেন না!
...অল্ রাইট্!...

কাড়খানি পকেটে ফেলিয়া কিরীটি স্মিতমুখে উঠিয়া পড়িল।

—কি রে থিয়েটারে না কি? একবারে যে জামাই-বাবুটি সেজে।

কেনন একরকম হাসিতে হাসিতে কিরীটি জবাব দিল,—আর বলিস কেন ভাই, বাবার হুকুম, বাড়ি যেতে হবে একবার।

—হুঁ রে, বলিয়া অস্থিনী লাফাইয়া উঠিল,—আমার বাতাস গায়ে লাগুন না কি? তা আগে থেকে বলিস নি কেন ভাই? একেবারে পাকা দেখা না কি? যাই হোক, যথাসময়ে ইতর জনদের বেন স্মরণ রাখিস?

—নিশ্চয়ই। এখন পাকাপাকি হয়ে গেলেই মজল। না আঁচালে ত বিশ্বাস নেই। যে আমার ভাঙা কপাল! অয়রন সেফ ভর্তি করতে না পেলে কোন কথাই কইবেন না বাবা।

হাসিতে হাসিতে অস্থিনী উত্তর দিল—মুন্ডে ঘেয়ো না ভায়া, এখন থেকেই মুন্ডে ঘেয়ো না। আচ্ছা, এখন এস, উলু-উউ...

বুক ছক্ ছক্ কবে। তবু ইহার মধ্যে আছে রোম্যান্স, নিছক জালিয়াতি। অস্থিনীর গৃহলক্ষ্মীটি ওখানে থাকিলেই বিপদ। বন্ধু-পত্নীর উপর স্বেচ্ছাচারী আদৌ যুক্তিবদ্ধ নয়। তা ছাড়া চিনিয়া ফেলিবে যে! তখন ত লজ্জার পরিসীমা থাকিবেই না, উপরন্তু পৃষ্ঠদেশটিও অক্ষত লইয়া ফিরিতে হইবে না। এই ত বেশ! দুই-তিন দিন দিদিমার সহিত হাস্য-পরিহাস করিয়া ঘরের ছেলে হবে ফেরা বাইবে। কেহই ধরিয়া-ছুইয়া পাইবে না। লাভ হইবে তাহার দিনকয়েক জামাই-আদবে ভোজন; চাই কি, শ্রালিকা-বন্ধ থাকিলে একটু আধটু খুনহুটি! মন্দ কি?

...ষ্টেশন হইতে গ্রামের দিকে চলিতে চলিতে কিরীটি গুণ্ণু কবিয়া হুঁর ভাঁজিতে লাগিল,—‘অতিথি এসেছে ঘরে...’

পাঁচছাতি ধুতি-পরা একটি ব্রাহ্মণ একগাছা দড়ি

হাতে আসিতেছিলেন। কিরীটি হাকিল,—ও মশাই, শুনছেন?

—ঐ রাগিণী আবাব কে শুনতে পাবে না মশাই বলুন?

—কৈলাস বাবুর বাড়িটি কোন দিকে?

—কোন কৈলেস? নায়েব-কৈলেস, না হাবা কৈলেস, না...

কৈলাসের ধূলপরিমাণ! কিরীটি হাসিয়া ফেলিল,—ক’টা কৈলেস আছে মশাই এখানে? আপনি কি কৈলেস? দড়ি কৈলে...

—বান্ বান্ মশাই, দেখে নিন্ গে, আমি জানি নে।... আমার ছাগলটাকে যেতে দেখেছেন ইদিকে? বলিয়া ব্রাহ্মণটি হুঁ হুঁ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভদ্রলোকটিকে রাগাইয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। কিন্তু কৈলাসের নামের তালিকাখানিবও তারিফ করিতে হয়। বাপু! গড়গড় করিয়া বেন গুরুমহাশয়ের সম্মুখে পড়া দিতেছে।

অদূরে একটি ছেলে গরু চরাইতেছিল, তাহার সমীপস্থ হইয়া কিরীটি জিজ্ঞাসা করিল,—বাপধন, কৈলাস বাবুর বাড়ি চেন?

একগাল হাসিয়া বাপধন উত্তর দিল,—তা আর চিনি না! আমি বে তেনাদেরই কিব্বেণ গো। আপনি কুন গাঁ থেকে আসছ?...হাতের পাঁচন গাছটি উচাইয়া ধরিয়া বলিল,—উই যে টিনের আঁটচালা খানা দেখ্চেন, উবই পাশে; চলে বাও নাঙ্কেব সোজা।

নাকের সোজা গিয়া কিরীটি একটি দাওয়ার একটি ভদ্রলোককে উপবিষ্ট দেখিল।

—মশাই, কৈলাস বাবুর বাড়িটা...

—ওই যে গেটওলা ওই বাড়িখানা।...ওরে হুরো, চাবুকগাছটা অনু ত?

চাবুক! কিরীটি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। তবু ভাল। ভদ্রলোকটির বিশাল বপুর অন্তরালে দুইটি বালক পাঠাভ্যাস করিতেছে; সম্ভবতঃ তাহাদেরই কাহাবও পৃষ্ঠদেশের সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য বেত্রপ্রার্থনা!

... ..

গলা শুকাইয়া আসিতেছে। প্রথম-দর্শনটা ভগবানের

ইচ্ছায় নির্ঝিল্লি কাটাইতে পারিলেই...কিরীটি দরজায় করাঘাত কবিল।

প্রশ্ন আসিল,—কে?

—আজ্ঞে আমি এই...

দবজা খুলিয়া একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ কিরীটকে দেখিয়া যেন একটু হকচকাইয়া গেলেন।

কিরীটি কি বলিয়া পরিচয় সূত্র কবিলে, মনে মনে তাহারই মুসাবিদা কবিতোছে। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকাব হুর্নিবাব ছুঁচুস্তাও! —কি দাছ সাহেব, চিনিয়া ফেলিলে না কি? দোহাই বাবা, তোমার নাৎজামায়ের দিয়া, চিনিতে পারিও না যেন। তাহা হইলে আমাতে আর আমি থাকিব না। বৃদ্ধ তুমি, কেন এই সব চেনাচেনির ঝঞ্জাটে বাইতে চাও? দু-দিন ভালটা-মন্দটা, একটু-আধটু হাসি-তামাশা, এর বেশী আশা ত আমার নাই। প্রকাশে হাসিয়া বলিল—আমায় চিন্তে...হেঃ, আমি অশ্...

দাদাসাহেব লাফাইয়া উঠিলেন—আরে এস ভায়া এস। দোষ নিয়ো না ভায়া। আমি ত তোমায় দেখি নি আগে।

বাক্, বাচা গেল। যুহ হাসিতে হাসিতে কিরীটি বলিল,—না দেখলে কি কেউ কারকে চিন্তে পারে? আমিও ত চিন্তাম না। হাজার জায়গায় জিজ্ঞেস করতে করুতে...

কিরীটি সাদরে অভ্যর্থিত হইল। সন্দেশ রসগোল্লা, ক্ষীর, পায়স, পরমান্ন কিছুর অভাব হইল না।

পায়ে খড়ম, হাতে ছ'কা,—কৈলাস চাটুজ্জ তদীয় গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন; হ্যা গা?

—কি গা?

—নাৎজামায়ের ত খুবই খাতির সূত্র করলে,

কোলকাতার সব ছোঁড়াগুলোই তোমার নাৎজামাই নাকি?

—তার মানে?

—মানে অতি সহজ। আমরা কেউই ত অশ্বিনীকে চিনি নে। এখন এই শালাই যে জোচ্ছুরি ক'রে আসে নি তাই বা কে বললে? ললিতা তোমায় লিখেছিল না, 'সত্যি দিদিমনি, কপালের উপর কাটা দাগটুকু না থাকলে

তোমার কথামতই মেনে নিতাম তোমাব নাৎজামাইটি মধুর-ছাড়া কার্তিক?'

বিস্ময়ে মাথা তুলিয়া কৈলাস-গৃহিণী কহিলেন,—হ্যা তা ত লিখেছিল?

—কিন্তু এ-শালাব কপাল একেবারে সমতল। কোথাও কাটাকুটি নেই, তবে লাঠালাঠি আছে কিনা কে জানে?

—তাই নাকি গা?

—তাই ত মনে হচ্ছে। তবে অশ্বিনীর বিশেষ বস্তুটুকু কেউ হবে বোধ হয়। বাক্ তুমি যেন এখন থেকে ওর বেখাতির কিছু ক'রো-টবো না। আগে ভাল ক'বে দেখি।

বৃদ্ধেব কর্মভোগ!—অর্দ্ধ মাইল দূরে স্টেশনে গিয়া 'তার' করিলেন :—

“অশ্বিনী সুখার্জি, স্প্রিং হোটেল, বাজাবাজার, কলিকাতা, ললিতা বিপন্ন, শ্রীষ এস।—কৈলাস, রাজগাঁও।”

সন্ধ্যার প্রাকালে বেচাবা অশ্বিনী শুক্লযুগে রাজগাঁও স্টেশনে অবতরণ করিল।

ক্ষুদ্র স্টেশন। মাত্র চারি-পাঁচটি যাত্রী ট্রেন হইতে নামিল। তাহাদের মধ্যে অশ্বিনীকেই কেবল ভদ্রবেশ-পরিহিত দেখিয়া দাদামহাশয় অগ্রসর হইলেন। অশ্বিনীর ছুঁচুস্তাক্রিষ্ট মুখখানি দেখিয়া দাদামহাশয় বুলিলেন, তাহাব সংশয় অমূলক নহে। মনে মনে বলিলেন,—বহৎ আচ্ছা, তুমি আসিতেছ বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে; আর এদিকে এক জন আমার বাড়িতে বসিয়া লুচি চিবাইতেছে!

অশ্বিনীর বকের মধ্যে তখন তুফান চলিতেছে। ঐ যে বৃদ্ধটি আগাইয়া আসিতেছেন, নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়। 'বিপন্ন'! কি বিপদ? অসুখ? তবে কি ললিতা একেবারে...হ্যা! তাই পূর্নাঙ্কেই একটু সান্দ্রনা দিতে ইনি...তাহা হইলে সে কিন্তু এক পাও স্টেশন হইতে নড়িবে না। ললিতা, কিসের জন্ত এই জংলা দেশে আসিয়া বিবোবে প্রাণটা খোয়াইলে? অশ্বিনীর অজ্ঞাতসারে দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার গাণ্ড বাহিয়া পড়িল।

দাদামহাশয় অপ্রস্তুত! গাছে না-উঠিতেই এক কাঁদি! শালা চক্ষে একেবারে বান ডাকিয়া গেল। এদিকে যখন ললিতাসখী ঘণ্টাখানেক পরে সদলবলে

হাজির হইবেন, তখন? তখন শালার চক্ষু দুইটি শুকাইয়া
আমচুর হইয়া যাইবে যে! সমীপস্থ হইয়া কহিলেন,
আপনি—তুমিই অশ্বিনী বাবু?

—আজ্ঞে হাঁ, আপনি...?

—অধীন তোমার লগিতের খাসমহলের খিদমৎগার,
নাম কৈলাস চাট্জি।

অশ্বিনী নত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল। এক ফোঁটা
অশ্রু বৃদ্ধের পদচুম্বন করিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—
এটাকে আমি বিবহাশ্র বলিই মেনে নিলাম, কারণ শ্রীমতী
লগিতে বহাল-তব্বিতে আছেন এবং আর কিছুক্ষণ পরেই
হজুবে হাজির হবেন।

অশ্বিনী 'থ'।—অর্থ্যাৎ? পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া
টেলিগ্রাম হাতড়াইতেছে।

—হ্যাঁ, টেলিগ্রামটি নকল নয়, তবে তার বিষয়টুকু
নকল। তুমি 'ধৈর্য্য ধর'—বলিয়া তিনি আত্মপূর্ব্বিক
সমস্তই বলিলেন।

অশ্বিনী চোখ পাকাইয়া উঠিল।—স্কাউণ্ডেল!
চেহারাটা কেমন বলুন ত? দোহারা? বড় বড়
চুল? ডান চোখটা সামান্য ছোট দেখায়? (একটু
ভাবিয়া) গায় একটা মুগার পাঞ্জাবী? র্যা? তাই?
ঠিক হয়েছে। কিবীটি। আমার ক্রম-মেট্। উঃ, কি
শয়তান! আজ কিলিয়ে ওর ঘাড়ের ভূত নামাব আমি।
অশ্বিনীর মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উদ্ভিত হইল।

পশ্চাতে মস্তকটি ঈষৎ হেলাইয়া বৃদ্ধ কহিলেন—
একটু সামলে ভায়া। তোমাদের ওই স্তম্ভ-উপস্থল্লেখ
দ্বন্দ্বের মধ্যে আমার যেন নিমিত্তের ভাগী ক'রো না। বুড়ো-
খুড়ো মানুষ আমি। আর তা'ছাড়া সে বন্ধুই ন্ত।
একটুখানি মজাই না-হয় করলে। তোমারও ত লাভ
বই লোকসান হচ্ছে না; লগিতা লাভ হচ্ছে ত?

—কি যে বলেন আপনি। এটা কি ভদ্রলোকের
কাজ? আর যদি লজ্জা-লগিতা সেখানে থাকত! নিতান্ত
কাতর কণ্ঠে অশ্বিনী কথাটা শেষ করিল।

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—থাকলেই বা?
তর্জ্জনী উচাইয়া লগিতা-স্তম্ভবী তাহাকে কহিতেন, 'বেরোন্
এক্সুনি।' সে ত সনাক্ত করতে পারত? বিয়ে ত

তুমিই করেছিলে না কিরীটিকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলে
সে সময়!

—দূর, তা কেন!

—তবে?...অতএব মেজাজ সরিফ, রাধো। সম্পর্ক
ধরতে গেলে কিরীটির সঙ্গেও ত আমার তামাশার সুবাদ
হচ্ছে। বাটপাড়ি একটু করাই যাক না? একান্তই
আমাদের গেরো বানিয়ে যাবে?

পথ চলিতে চলিতে উভয়ের মধ্যে কত কি যুক্তি হইয়া
গেল। অশ্বিনী দাদামহাশয়ের গৃহে না উঠিয়া দ্বিতীয়
একটা গৃহে আস্তানা লইল।

পরবর্তী ত্রৈনে অগ্রজ প্রভুলেব সহিত লগিতা আসিয়া
অশ্বিনীর রশ্মি টানিয়া ধরিল।

কিরীটির স্মৃতি দেখে কে? এই গেরো ভূতকরটির
চোখেই যদি ধূলি নিক্ষেপ করিতে না-পারিল ত বুঝাই
সে এত দিন ডিটেক্টিভ্ নভেলগুলি চর্চণ করিয়াছে, গল্প
লিখিয়া মাসিকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে।...কিন্তু অশ্বিনীব
শালীটালী কেহই তেমন যে'যিতেছে না। পল্লীগামের
লাজুক মেয়ে আর কাহাকে বলে? জামাইবাবুদের উপর
শ্রালিকা-সম্প্রদায়ের যে অথও প্রতাপ তাহা কি ইহাদের
জানা নাই? আমাব কাছে আসিলে কি কুস্তকর্ণের মত
উদরসাৎ করিয়া ফেলিব? কাল বৈকালে সেই যে একবার
আসিয়াছিল, টুলি না কি তাহাব নাম? ভাল নাম
এই যেমন রেবা কি তপতী নিশ্চয়ই একটা আছে। বেশ
মেয়েটি! সবচেয়ে বেশ তাহার চক্ষু দুইটি, আর ঠোঁট
দুইখানি! সেই যে, "তব্বী শ্রামা শিখরদশনা পক
বিদ্যাবরোজি"। কালিদাস বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে
আমার বিবাহের ঘটক নিযুক্ত করিতাম।...দোতলায় ড্রেসিং
টেবলের সম্মুখে কিরীটি ক্ষৌরকার্য্য করিতেছিল।
আয়নাতে একখানি ফুল আননের প্রতিবিম্ব পড়িতেই সে
কুচ্ করিয়া তাহার গণ্ডের একাংশ কাটিয়া ফেলিল।
গ্রাহ না করিয়া ফিরিয়া চাহিল, টুলি—শিখরদশনা! চোখ
নামাইয়া কহিল,—কি খবর? কাল থেকে আর দেখাই নেই
যে? বোচারা মরল কি বাঁচল একটু খোঁজও নিতে নেই?

—দাদামণি আপনাকে একবার ডাক্চেন নীচের,
আমুন শীগগির।

কিরীটির বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ধরা পড়িয়া গেল না কি! চাবুক প্রস্তুত?...বারকয়েক ঢেঁক গিলিয়া গলাটা একটু ভিজাইয়া লইল।...ছোঁড়া কি ছাইভস্ম সে ভাবে দিন-রাত্রির! চেষ্টাকৃত সহজ কণ্ঠে কহিল একুনি? দাড়িটা কামিয়ে নিয়ে...

বাড় নাড়িয়া টুলি বলিল—উহ, একুনি চলুন, এসে। কামাঝেন।

কি হুন্দর গ্রীবাভঙ্গি! কিরীটির মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। একদিক্ কামানো অবস্থাতেই কলের পুতুলের মত উঠিয়া বলিল—চল, শুনেই আসি?...কিন্তু এত জরুরি! বুকটা বাণ মানে না, চিপ্ চিপ্ করিয়াই চলিয়াছে।

দাদামহাশয় বিবাদ-গস্তীর মুখে একখানি মোড়ায় বলিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে বেশ কষ্টপুষ্ট একটি ভদ্রলোক একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট; সুতীক্ষ্ণভাবে চারিদিকে চাহিতেছেন।

—আমায় ডেকেছেন?

—হ্যাঁ বোস।...ওরে আর একখানা চেয়ার দিয়ে যা ত?

—থাক্ বসছি আমি।—ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কামাতে কামাতেই...হেঃ...

ভদ্রলোকটি চাহিলেন—হ্যাঁ, মানাইয়াছে বেশ। একটি গাল দিব্য পরিকৃত, অন্তটিতে সাবানের ফেন পুঞ্জীভূত।

দাদামহাশয় খুবই কাতর কণ্ঠে কিরীটিকে কহিলেন,—কি সাংঘাতিক ব্যাপার শোন এঁর কাছে, বলিয়া ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাসিয়া, ঈষৎ নড়িয়া-চড়িয়া শুরু করিলেন,—কর্তব্যের খাতিরে কত অগ্রিয় কাজই করতে হয় আমাদের...

দাদামহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—পেটেব দায়ে হাকুরী করতে হয়, নইলে এই সব পাঞ্জি কাজ কি মাছুয়ে কবে? উনি আজ এখানে এসেছেন, ওঁকে নিয়ে আপনারা কোথায় একটু আমোদ-আহ্লাদ করবেন, তা না...

কিরীটিব দিকে পুনরায় চাহিলেন,—আপনার নাম অশ্বিনী মুখার্জি? খুবই দুঃখের সহিত জানাচ্ছি আপনার নামে একটা গ্যারেন্ট আছে। দয়া করে একবার থানায়

যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি ইন্ডেপ্টগেশন্ ব্রাঞ্চের লোক।

বিবাদভরে দাদামহাশয়ের মস্তক নত হইয়া পড়িল।

কিরীটির অবস্থা? সে তখন অত্যাঁচে উদ্ভীর্ণমান এয়ারোপ্লেন হইতে হৃদয় নিঃসৃত ভীষণ সমুদ্রবক্ষে পড়িয়া যাইতেছে এবং নিম্নেও একটি বৃহদাকার কুস্তীর বিশাল মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে যেন সাদবে অভ্যর্থনা করিতেছে, আমি প্রস্তুত, এস!—

বলিয়া উঠিল,—আমি কিবী...আমি—আমি যদি অশ্বিনী...না হই?

গস্তীর হাসি হাসিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন—প্রমাণ না পেয়েই কি একটা ভদ্রলোককে মিছামিছি অপমান কবতে এসেছি, স্তর?—কি চাটুক্ষে-মশাই, আপনার কিছু বলবার আছে এতে?

—আমি আর কি বলব? জামিনও চলবে না, শুন্লাম। দাদামহাশয় ব্যস্ত দৃষ্টি অন্ত দিকে ফিরাইলেন।

কিরীটি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি, আমি অশ্বিনী নই?

—সে কি মশাই, কৈলাসবাবুর নাৎজামাই, আপনি অশ্বিনীবাবু, কাল এখানে এসেছেন; এখন আবার এসব কি বলছেন?...লেবু রগড়ালে তেতো হয়; ...এসব ব্যাপারে চুপচাপ আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিরীটি আর আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। দাদামহাশয়ের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—মাফ্ করুন, দাদামশাই, আমি আপনাদের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছি। আমার নাম কিবীটি বাঁড়ুজ্জ। অশ্বিনীব বন্ধু আমি, সেখানে এক হোষ্টেলেই থাকি।

দাদামহাশয়েব নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত!—সে কি মশাই? আপনি, আপনি ভদ্রলোকের মান-সম্মান নষ্ট করতে এসেছেন? হ্যাঁ, আপনি...

ভদ্রলোকটি অবাক! বলিলেন—উঃ কি সাংঘাতিক, দাদামহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বলেন তো এই অপরাধেই এঁকে...

দরজার ওপাশ হইতে ললিতার হাসি মুখখানি দেখা

গেল। গুর মামলাটা এবাব আমাদের এজলাসেই ছেড়ে দিন্ দাদামশাই? শাস্তিব ব্যবস্থা আমরাই করছি।

কিরীটির সব গোলমাল হইবা গেছে। হুগ্গহ রহস্ত! মুখ তুলিবা বজ্রীব দিকে চাহিতে বাইবে, সম্মুখে অস্থিনী! ভদ্রলোকটির পিঠে হাত দিবা বলিতেছে—আর না প্রতুল-দা, একটু দয়ামায়াও কি নেই আপনাদের?...চল রে কিরীটি, উপরে চল।

ওঃ!...প্রতুল ত অস্থিনীর বড় শ্রালকের নাম! চেয়াবেব পিঠ ধরিয়৷ কিরীটি সম্মুখেব দিকে থানিকটা বুঁকিয়৷ পড়িল।...সমস্ত বাড়িখানির মধ্যে তখন হাস্য-বৃষ্টি হুগ্গ হইবা গিয়াছে। দবজার ফাঁকে ফাঁকে, থামগুলির আড়ালে আড়ালে, পাতকুরার ওপাশে যেন হাজাবো সংবত কঠ এক-সঙ্গে হাসির ঐকতান জুড়িয়া দিয়াছে।—হা-হা, হো-হো, হি-হি। টুলির ছোটভাইটি, কি বুঝিয়াছে সেই জানে, অথবা দেখাদেখি, ছোট মাথাটিকে প্রবল ভাবে দোলাইয়া দোলাইয়া হাসিতেছে থিথুথি—থি—থুথি।

বহুমতী আশ্রয় দাও মা! কিরীটির মস্তকের মধ্যে ধন ধন করিতেছে, কর্ণাভ্যন্তর হইতে যেন অগ্নি বাহির হইয়া আসিতেছে। চোখেও যাহা দেখা যায়, সব বিকৃত, যেন দাদামহাশয়, প্রতুল, অস্থিনী, চেয়াব, মোড়া সব গলিয়া এক স্থানে পিণ্ডীভূত।

কিরীটি পলায়নের উদ্দেশ্যে স্ট্রাটকেস গুছাইতেছে। অস্থিনী প্রবেশ করিল।—কিরীটি?

—কেন?

—কিরীটি, শুনছিস?

—বলই না ছাই?

—তোর কি শাস্তি হয়েছে জানিস?

উদাস কণ্ঠেই কিরীটি বলিল,—ছ-মাস ফাঁসি!

—ঠিক অমনটি নয়। যাবজ্জীবন তাঁবেদারি।

—তাঁবেদারি? কার?

—টুলির।

‘তবী শ্রামা’। মন্দ কি?—কিরীটিকে নিলজ্জই বলিতে হয়। কহিল,—সত্যি, না এবার আবাব কোন নতুন চাল? তাহ’লে কিন্তু...

ওষ্ঠাধরে তর্জনী রাখিয়া অস্থিনী বলিল—চূপ! পাখবর্জী কক্ষ নির্দেশ করিয়া মুহূষরে কহিল—শুনতে পাচ্ছিস?

তথায় ললিতার কঠ শুনা গেল,—সব ঠিক।

টুলি বলিল—হঁ!

—কি বুঝলি যে হঁ বললি?

—মা তোমাদের ঠিক।

—কি ঠিক বল্ দিকি?

—তুগিই বল দিকি?

—তবে না-জেনেশুনে উত্তর দিস্ কেন?...বিয়ের সব ঠিক।

—ক’র বিয়ে, অস্থিনীবাবু?

ঝাঁজালো গলায় উত্তর হইল,—এমন এক চড় লাগাব তোকে!

—তবে সোদ্রাপ্তজি বললেই ত হয়, বাবু!

—তোর বিয়ে, তোর তোর, মা গো, মেয়ে যেন শোনবার জন্তে নিস্পিস্ করছে!

—তাই না কি? কিছু নেই দিদি, নইলে মিটি মুখ করাতাম তোমায়, এমন খবরটা...

—ইয়াবকি নয়, সত্যি।

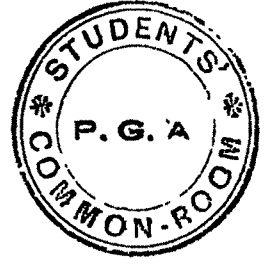
—কার সঙ্গে?

—কিরীটিবরের সঙ্গে।

—বয়েই গেছে ওই জোচ্চোরটাকে বিয়ে করিতে।

—তা হ’লে মানা ক’রে দিচ্ছি গে?

—বা রে! শেষটার আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাও? কিছু করিয়া টুলি হাসিয়া ফেলিল।



অপচয়-নিবারণে রসায়ন-বিদ্যা

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার, এম্-এসসি

অনেক মনীষীর মতে মানুষের অভাববোধ জন্মাইয়া দেওয়া মানেই তাহাকে সভ্য করিয়া তোলা। পক্ষান্তরে যে-জাতির প্রয়োজন যত বেশী, সে-জাতি তত সভ্য। ভগবানের প্রথম সৃষ্ট মানব-দম্পতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক নরনারীর সাজসজ্জা, বসনভূষণ, আহার-বিহার প্রভৃতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা অনেকটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—মাখার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে পেটের অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে। মানব-জ্ঞানের পরিধি তার পর অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে—বিধাতার অভিসম্পাতও সেই অনুপাতে কঠোরতর হইয়াছে। শুধু মস্তকের নয়, সর্কশরীরের ঘর্শে কেবল পদযুগল নয়, নিম্নস্থ ধরণীতল সিক্ত করিয়াও আজ মানব ছই বেলা ছই মুঠা খাবার জোগাড় করিতে পারিতেছে না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা হয়ত উন্নতির প্রায় চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে নতুবা চারিদিকে এত হাহাকাব, এত অসন্তোষ, এত মারামারি কাটাকাটি কেন? তারপব, মা-ষষ্ঠীর কুপায় “পুত্রকণ্ঠা বস্ত্রার মত” নামিয়া আসিয়া সমগ্র ধরণীতল ছাইয়া ফেলিতেছে—এক শতাব্দীতে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৬০ হইতে ২০০ কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জন্ম-নিরোধের প্রতি ক্রটিবাগীশদের প্রবল বিতৃষ্ণা, শাস্তিকামী মহাপুরুষদের পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরতরে বিদূরিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা, উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে মানবের মৃত্যুহার হ্রাস ও নবযৌবন-বিধান প্রভৃতির ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। পেটের তাড়নার কলম্বুসের আবির্ভাব হইয়াছে ইদানীং অনেক—কিন্তু আমেরিকা আর কোথায়? অতি দুর্গম মেরুপ্রদেশস্বয়ং ও পিরাম্বী (Peary) ও আমুনসেন (Amundsen) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। স্থানবৃদ্ধির একমাত্র উপায় গ্রহান্তরে চলিয়া যাওয়া—আকাশযান মঙ্গলগ্রহবাঁজা সুগম করিবে

কিনা, আর করিলেও, সে ছোট তরীতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঠাঁই হইবে কিনা, কে জানে? তাই বর্তমান যুগের মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা—পুনরায় অসভ্য হওয়া নয়, অজ্ঞান-তিমিরে ফিরিয়া গিয়া পূর্বপুরুষ-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নয়—সমস্ত আত্ম, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন ও সুগম্যাক্ষয়ের ব্যবস্থা করা। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলভক্ষণহেতু যে ছুংখের উৎপত্তি, জ্ঞানের চর্চা ও পরিবর্ধন দ্বারা তাহার প্রতিকর করিতে মানুষ বদ্ধপারিকর। তারই ফল আজিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিতকলার অত্যন্ত বিকাশ। উন্নত কৃষি, পণ্যোন্নতি ও অপচয়-নিবারণ দ্বারা এই কঠোর সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ উপায়ের মূলে রসায়ন-বিজ্ঞান জ্ঞান। অপচয়-নিবারণে রসায়ন-শাস্ত্র কতখানি সাহায্য করিয়াছে এবং তাহার ফলে নিত্যন্ত তৃচ্ছ ও অব্যবহার্য দ্রব্য হইতে কেমন সুদৃশ্য ও মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হইয়া দেশেব ধনবৃদ্ধি ও বেকার-সমস্যা দূর করিতেছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

আলুকাভ্রার সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। বর্ণেব ঔজ্জ্বল্য, স্বাদের তীব্রতায়, অঙ্গরাগের যোগ্যতায়—এক কথায়, রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে জিনিষটি একেবারে অনবদ্য। যেখানে নগর আলোকিত করিবার দৃঢ় পাথরকয়লা গ্যাসে পবিণত করা হয় সেই গ্যাসের কারখানায় এবং লৌহ প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুত করিবার দৃঢ় যেখানে কাঠ কিংবা পাথর-কয়লা আংশিক পুড়াইয়া কোক তৈয়ারী হয় সেই কোক-ওতেনে এই রূপে-গুণে অতুলনীয় বস্তুটি একান্ত অব্যাহিত (by-product)রূপে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কারখানার মালিকগণ ইহা কি ভাবে এবং কোথায় ফেলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইবেন কিছুদিন আগেও তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। আলুকাভ্রার সদ্যতির কথা তাহাদের কল্পনায়ও আসিত না—কেহ ইহা লইতে

স্বীকৃত হইলে তাহাকে বরং কিছু দিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু রসায়ন-শাস্ত্রেব কৃপায় আজ ইহা মানুষের অনেক কাজে লাগিতেছে। আলকাতরা হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে-সব মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে তাহার শুধু তালিকা দিলেই পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা আছে। তাই মাত্র অভিপ্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্যের উল্লেখ করা গেল।

বায়ু-বিহীন পাণ্ড্রে আলকাতরা উত্তপ্ত করিলে কঠিন ও তরল কতকগুলি যৌগিক দ্রব্য পাওয়া যায়—বেনজিন (benzene), কার্বলিক এসিড, জাপথেলিন, ক্রিয়োজোট (creosote), টোলুইন (toluene), য়ানথ্রাসিন (anthracene) ইত্যাদি। প্রায় অর্ধেকটা পীচরূপে পাণ্ড্রের তলদেশে পড়িয়া থাকে। রাস্তানির্মাণ-কার্য্যে ও 'ব্রিক্লেট' (briquette) তৈয়ারী করিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আজ পর্য্যন্ত অবিহৃত কেরোসিনের খনি সংখ্যায় খুব বেশী নয়, কিন্তু পাথর-কয়লা অনেক দেশেই প্রভূত পরিমাণে আছে। অধুনা শুধু বান-বাহন হিসাবেই নয়, অন্তান্ত অনেক কাজেও মোটর ব্যবহৃত হইতেছে। ফলে পেট্রোল-সমস্তা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপে পেট্রোলের সহিত বেনজিন মিশ্রিত হইয়া মোটর-ইন্ধন-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ জলে না ভিজাইয়া অত্যন্তকাল মধ্যে পরিষ্কার করিতে বেনজিন যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ইহাকে 'ড্রাই ক্লিনিং' বল। জাপথেলিন জিনিষটির সহিত আমরা অনেকেই পরিচিত—পোকাকব উপদ্রব নিবারণ কবিত্তে জাপথেলিন-গুটিকা আমরা কাপড়ের ভাঁজে বাধিয়া দিই। কিন্তু ইহার চাহিদা সবচেয়ে বেশী হয় কৃত্রিম রং প্রস্তুত করিতে। বেনজিন ও য়ানথ্রাসিনও সেজন্ত দরকার হয়। বাজাবে যত রকম রং দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ আলকাতরা হইতে প্রস্তুত। যে-সকল বস্তুর স্থায়িত্ব, ঔজ্জ্বল্য ও মনোহারিত্ব সম্বন্ধে একবাক্যে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র দিবেন আমাদের তরুণীরা—শাড়ী ব্লাউজের রং পছন্দ করিতে বাহাদেব ঘর্ষাজ-কলেবর হইতে হয়, অতি-কুৎসিত আলকাতরা হইতে সেই সকল রঙের উৎপত্তি শুনিয়া তাঁহারা হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন।

আরব্য-উপভাস-বর্ণিত আলাদিনের প্রদীপ ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে যে ইহা সম্ভব হইতে পারে জনসাধারণকে তাহা বিশ্বাস করান শক্ত। জার্মানী ও ইংলণ্ডের সুবৃহৎ বহু-সংখ্যক রঙের কারখানায় শত সহস্র শোক কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার রং বিক্রী করিয়া দেশ সমৃদ্ধ হইতেছে। জীব-রসায়নের (Organic Chemistry) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারে নানাবিধ যৌগিক পদার্থ মানবের রোগ-নিবারণে ব্যবহৃত হইতেছে। ক্ষত আরোগ্য করিতে ও সাপ মারিতে আমরা কার্বলিক এসিড ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা রোগের বীজাণুনাশক। ফিনাইল জিনিষটি কার্বলিক এসিড-জাতীয় কতকগুলি পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। ঘরবাড়ি, নর্মা পবিষ্কার করিতে ফিনাইল নিত্য ব্যবহৃত হয়। এ-সকলই আলকাতরা হইতে উৎপন্ন হয়। উপদংশের একমাত্র মহোদয জালভার্সন (অথবা ৬০৬) এবং অনির্জা-নিবারক নানা প্রকার ঔষধও আলকাতরা হইতে তৈয়ারী হয়। সব-চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—হুনিয়াব মিষ্টতম জিনিষ স্যাকেরিনও আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। ইহা চিনি অপেক্ষা অন্ততঃ ৫০০ গুণ বেশী মিষ্ট। বহুমুত্র রোগীবা চিনি হজম করিতে পারে না—প্রায় সমস্তটা প্রস্রাবেব সহিত অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্গত হয়। অথচ দৈনন্দিন আহারে মিষ্টি ছাড়া চলে না। স্যাকেরিন তাহাদিগকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে বিবিধ বিস্ফোটক ও বিধাত্ত গ্যাস অপব্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের সুবিধাও অনেক। তাই ভবিষ্যৎ কালে যুদ্ধে (যদি সত্যই যুদ্ধ কখনও আবার বাধে) এই সকল দ্রব্যের প্রচুরতর প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়। আলকাতরা হইতে প্রস্তুত নানা রকম যৌগিক পদার্থ হইতেই অধিকাংশ বিধাত্ত গ্যাস ও বিস্ফোটক তৈয়ারী হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় একা ইংলণ্ডই আলকাতরা হইতে ৩,০০,০০০ টন টি. এন. টি. (T. N. T.) এবং পিক্রিক এসিড উৎপন্ন করিয়াছিল। টোলুইন হইতে টি. এন. টি. এবং কার্বলিক এসিড হইতে পিক্রিক এসিডেব জন্ম। ছেলোদের নানা প্রকার খেলনার উপাদান ব্যাকেলাইট (bakelite)—ইহা কার্ব-এসিড-সম্মত।

শহরেব আবর্জনার ব্যবস্থা করা মিউনিসিপালিটির একটা বড় সমস্যা—স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়াও বটে, সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়াও বটে। আমাদের দেশের শহরগুলিতে পোড়ো জায়গায় আবর্জনারাশি শুষ্কীকৃত করিয়া রাখাই সনাতন প্রথা। উৎকট দুর্গন্ধে এগুলি চারিদিকের বাতাস দূষিত করে। মুখিকুল আসিয়া ইহার মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এই সকল আবর্জনা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত হয়। শিশি-বোতলগুলি পরিষ্কৃত করিয়া ব্যবহৃত হয়, ভাঙা কাঁচ দ্রবীভূত করিয়া নূতন জিনিষ তৈয়ারী হয়। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। অব্যবহার্য্য নৌহাও হইতে হীরাকশ (Ferrous Sulphate) তৈয়ারী হয়। কালি প্রস্তুত করিতে ইহার চাহিদা। ছিন্ন পাত্ৰকা চূর্ণীকৃত হইয়া জমির উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করে। টিনেব টুকরা হইতে ক্লোরিন-সংযোগে 'টিন ক্লোরাইড' প্রস্তুত হয়। কাপড়ের কলে ইহার প্রয়োজন। অবশিষ্ট দ্রব্য পোড়াইয়া যে তপ পাওয়া যায় তাহা বৈজ্ঞাতিক শক্তিতে পরিণত হইয়া কল চালায়, শহর আলোকিত কবে। যে ভয় পড়িয়া থাকে তাহা দিয়া প্রস্তুত কন্ক্রিট (concrete) গৃহনিৰ্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যে অংশ ধুলিতে পরিণত হই তাহারও নিস্তার নাই—বৈজ্ঞাতিক উপায়ে তাহা একত্র করিয়া শুষ্ক রক্ত, ফসফরিক এসিড এবং সোরার সহিত মিশ্রিত হইয়া জমির সাব হয়। আমেরিকায় এই সকল আবর্জনা হইতে প্রচুর স্নেহ-পদার্থ (fat and grease) উদ্ধার করা হয়। সাবান তৈয়ারী করিতে ইহা লাগে। হালিকান্ন শহরে কসাইখানার রক্ত হইতে ব্লাড সিরাম (blood serum) প্রস্তুত হইয়া থাকে। রসায়ন-বিদ্যার রূপায় আবর্জনাও মিউনিসিপালিটির একটা আয়ের পক্ষা হইয়াছে। বার্মিংহাম শহরে আবর্জনা হইতে বার্ষিক আয় প্রায় ৫৩,০০০ পাউণ্ড—গ্রাসগো নগরের আয় আনুমানিক ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড। আশ্চর্য্যের বিষয়, এশিয়ার বৃহত্তম শহর কলিকাতায়ও (যে কর্পোরেশনের আঁয় আসাম প্রদেশের চেয়ে বেশী) বিপুল আবর্জনারাশি আদি ও সনাতন প্রথাই স্থানে স্থানে পুত্রীভূত হইয়া এখনও নগরের শোভা বর্ধন করে।

জার্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগ (Liebig) বলিয়াছিলেন—যে-দেশ যত সাবান ব্যবহার করে সে-দেশ তত সভ্য। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাবানের চাহিদা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। নানা প্রকার প্রাণি ও উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে কষ্টিক সোডা সংযোগে সাবান প্রস্তুত হয়। এই সকল তৈলের অন্ততম প্রধান উপাদান—গ্লিসারিন। সাবান তৈয়ারী ব্যাপাবে ইহা কোনই কাজে লাগে না। আগেকার দিনে সাবানের টুকরা লইয়া গেলে জলের সহিত মিশিয়া এই গ্লিসারিন নর্দমায়া স্থান লাভ করিত। নোবেল সাহেবেব ডিনামাইট আবিষ্কারের পর হইতে গ্লিসারিনের চাহিদা বাড়িয়া গেল। তাহাবই ফলে আজকাল সাবানের কারখানা হইতে গ্লিসারিন উদ্ধার করা হয়। সারা পৃথিবীতে গড়ে প্রতি-বছর ৮০,০০০ টন গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। গত মহাবুদ্ধের আগে ইহার শেষ বিলুপ্ত আসিত সাবানের কারখানা হইতে। বর্তমানে এই প্রতিযোগিতাব দিনে সাবানের কারখানার উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে এই গ্লিসারিন উদ্ধারের উপর। বস্তুতঃ, গ্লিসারিন হইতে সাবান-তৈয়ারী খরচ উঠিয়া যায়—সাবান থাকে লাভের অঙ্কে। কলিকাতায় অনেক সাবানের কারখানা হইয়াছে, কিন্তু কোনও কারখানায় গ্লিসারিন উদ্ধার করে বলিয়া অবগত নহি।

মালফিউরিক এসিড-সংযোগে কাপড় কাচিবার সোডা প্রস্তুত করিতে প্রভূত পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস উদ্ভিত হইয়া আগেকার দিনে চতুর্পাক্ষ অধিবাসীদের স্বাস্থ্য হানি করিত—ঘর-বাড়ি ও গাছপালা নষ্ট করিত। এক্ষত ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন (Alkali Act) বিধিবদ্ধ হইল—হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস বাতাসে ছাড়িয়া দিলে আইনভঃ দণ্ড পাইতে হইবে। তখন সোডার কারখানা সংখ্যা কম ছিল—লাভ হইত প্রচুর। হাইড্রোক্লোরিক এসিড উদ্ধার করিবার প্রয়োজনীয়তা কাবখানার মালিকগণ অনুভব করিত না। কিন্তু জগতের বৃহত্তম সোডার কারখানা—ক্রেপার-মণ্ড এণ্ড কোং নূতন উপায়ে সস্তায় সোডা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। পুরাতন কাবখানাগুলিও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড উদ্ধার করিতে না-

পারিলে। শাপে বর হইল—হাইড্রোক্লোরিক এসিড বিক্রী করিয়া কারখানাগুলি টিকিয়া রহিল। আজকালও বহু পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই ভাবে প্রস্তুত হয়। ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী করিতে ক্লোরিন লাগে—হাইড্রোক্লোরিক এসিড হইতে এই ক্লোরিন পাওয়া যায়।

ভারতের নানা স্থানে অফুবন্ত কাঁচা মাল রহিয়াছে, কিন্তু সে তুলনার কারখানার সংখ্যা অতি অল্প। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু আজকাল শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতির চলিতে পারে না। দেশের ধন-বৃদ্ধির উপায় ত্রিবিধ—কৃষি, পণ্যোৎপাদন ও সরবরাহ এবং বাতায়ান্তের উপায়-বিধান। দেশেব লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্প ত্রিবিধ উপায়ে ধনবৃদ্ধির চেষ্টা না-করিলে দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর হইবার নহে। সেজন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কলিত-বসায়নের জ্ঞান। রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে জ্ঞান অল্প আয়াসে ও অল্প অর্থ ব্যয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রভূত ধনাগম হইতে পারে। মাস্তাজের মালাবার উপকূলের মৎস্ত-ব্যবসায়ীরা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্ত উন্মুক্ত সমুদ্রের তীরে রৌদ্রে শুকাইয়া জমির সাব প্রস্তুত করিয়া বিক্রী করিত। এই সকল মৎস্তে তৈলের পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া খাদ্য-হিসাবে অব্যবহার্য। উগ্র গন্ধও অত্যন্ত প্রধান কারণ বটে। ১৯০৯ সালে মাস্তাজের সবতরী মৎস্ত-বিভাগ অত্যন্ত সহজ উপায়ে মাছ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিবার এক অভিনব প্রণালী প্রচলিত করেন। সুবহু লোহপাত্রে মাছের টুকরা বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া তাহা থলিয়ার পুবিয়া চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হইতে লাগিল। যে তৈল আগে পচিয়া দুর্গন্ধে সন্নিকটস্থ অধিবাসীদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, তাহার শেষবিন্দু ইংলণ্ড ও জার্মানীতে সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত মূল্যে রপ্তানী হইতে লাগিল। থলিয়ার অবশিষ্ট কঠিন অংশ (fish guano) জমির উৎকৃষ্ট সার-রূপে সিংহলে প্রেরিত হইল। গত বিশ বছরে অনুন আড়াই শত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। সে দেশের অধিবাসী-দিগের আয়ের একটা নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে—জনসাধারণের অবস্থাও এজন্য কথঞ্চিৎ সচ্ছল হইয়াছে। প্রতি-বৎসর প্রায় ৬,০০০ টন তৈল প্রস্তুত হইতেছে।

১৯১৯-২০ সালের সবকারী বিবরণ হইতে জানা যায়—১,০৫,৩১৩ টাকার তৈল এবং ১১,৫৭,৮৮৪ টাকার সার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহাতে কোন দক্ষ রাসায়নিকের প্রয়োজন হয় নাই—রসায়ন-শাস্ত্রের সামান্য জ্ঞান কাজে লাগান হইয়াছে মাত্র।

এই মৎস্ত-তৈল কিছুদিন আগেও বিশেষ কোন কাজে লাগিত না। উগ্র দুর্গন্ধহেতু ইহা সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি নিষ্কাশন-কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারিত না। সমুদ্র-তীরবর্তী দেশে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মৎস্ত পাওয়া যায়—নরঙরে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের অনেক লোকের জীবিকা নির্বাহের উপায় মৎস্ত ধরা। সুদীর্ঘকালব্যাপী ব্যর্থ চেষ্টার পর রাসায়নিক ইহার গন্ধ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম নিকেলকণার বর্তমানে হাইড্রোজেন-সংযোগে এই সকল তৈলের গন্ধ নষ্ট করা হয়। ঘনীভূত তৈলের কাঠি সংযুক্ত হাইড্রোজেনের পরিমাণেব উপর নির্ভর করে। এই আবিকারের পর হইতে দুর্গন্ধযুক্ত নানা প্রকার তৈল সাবান, মোমবাতি তৈয়ারী করিতে, এমন কি খাদ্যহিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এদেশে উদ্ভিজ্জ ঘিের আবির্ভাব খুব বেশী দিনের কথা নয়। কৃত্রিম মাখন অবশ্য আমাদের দেশে প্রায় অচল। ঘনীভূত তৈল এজন্য ব্যবহৃত হয়—খাদ্যহিসাবে এগুলি নিকট নয়, দামেও যথেষ্ট সস্তা। ভারতের তৈলবীজের সংখ্যা যেমন বহুল, উৎপাদনের পরিমাণও তেমনি বিপুল। অথচ অধিকাংশ তৈলবীজ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কৃত্রিম মাখন বা ঘি সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে—এ দরিত্রের দেশে এই সুলভ খাদ্যের শীতল যথেষ্ট প্রচলন হইবে আশা করা যায়।

জমিতে সার দেওয়া আজকালও আমাদের দেশে বিলাসিতা বলিয়া গণ্য হয়। অথচ এদেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক। দিন দিন লোকসংখ্যা যেমন হ্রাস করিয়া বাড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়, কারণ জমির উর্বরতাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অব্যবহার্য জিনিষ হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া জমির সার সাধারণতঃ খুব সস্তা। পাশ্চাত্য দেশে মৃত পশু, কসাইখানার রক্ত, পশুর শিঙের টুকরা, ক্ষুর, ছেঁড়া পশমী

বস্ত, চামড়ার কারখানার পরিত্যক্ত অংশ, নরবিষ্ঠা প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া সাররূপে বিক্রী হয়। বলা বাহুল্য, এগুলি আবর্জনাযাত্র, কিন্তু বসায়ন-বিদ্যা এই জঞ্জাল শুধু দূর করিবার উপায় বাহির করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই—এগুলি হইতে অর্থাগমের ব্যবস্থাও করিয়াছে। ফলত বলিয়া সে দেশের কৃষকগণ জমির সার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। সারযোগে জমির উৎপাদিকা শক্তি কেমন অবিস্ম্য রকমে বৃদ্ধি পায়, একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝা যাইবে। বিলাতী বেঙ্গন নাসিকে আগাছাব মত অপৰ্যাপ্ত জন্মে। কিন্তু এ-পর্যন্ত বছরে প্রতি একবে নয় টনের বেশী পাওয়া যায় নাই। ইংলণ্ডের ওয়ালথাম-ক্রাস পচা ঘাস সাব দিয়া এক একর জমিতে পঞ্চাশ টন উৎপন্ন করা হইয়াছে। আর আমেরিকার এক জায়গায় উৎকৃষ্টতম সার দিয়া একই পরিমাণ জমিতে এক বছবে আঠার হাজার টাকার বিলাতী বেঙ্গন উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের দেশে মোটর গাড়ী ও দ্বিচক্রে যানের আমদানীর পরিমাণ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। রবার-টায়া-ওয়াল গাড়ীর গাড়ীর সংখ্যাও নিত্যন্ত কম নয়। ফেঁড়া টায়ারের পরিমাণও তদনুপাতে বাড়িয়াছে। এ-দেশে অত্যন্ত অকেজো জিনিষের জায় ইহা আবর্জনাস্থানে স্থান লাভ করে। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় এই সকল অব্যবহার্য টায়ার নূতন রবারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া নূতন টায়ার প্রস্তুত হইতেছে। পরীক্ষাধারা দেখা গিয়াছে শতকরা পঁচিশ ভাগ পুরাতন রবার মিশাইলে তৈয়ারী টায়ার কিছুমাত্র কম-টেকসই হয় না। বস্তুতঃ, সেগুলি যে পুরাতন টায়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও ধরা শক্ত। ১৯২৬ সালে শুধু আমেরিকায় ৯২,০০০ টন পুরাতন টায়ার এই ভাবে কাজে লাগান হইয়াছে। আতকাল কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে সত্য, কিন্তু এই ভাবে অপচয় নিবারণ করিতে না-পারিলে তাহা সবেও টায়ারের দাম বাড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই।

লৌহ ও স্বর্ণের বিবাদ আমরা ছোটবেলায় কবিতায় পড়িয়াছি। তার পর যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসাব ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লৌহের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ, লৌহ এবং কয়লা—এই দুইটি অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইলে জাতির ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। হাজার হাজার টন লৌহ টাটার কারখানায় দৈনিক প্রস্তুত হইতেছে। আর তৎসঙ্গে প্রভূত পরিমাণে ভস্মাবশেষ (slag) কারখানাব চারিদিকে শুপু পীকৃত হইতেছে। বিশ বছর আগেও লৌহ-নির্মাতারা এই ভয়ের কি উপায় করা যায় তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। চাবি দিকে ইহা বিক্ষিপ্ত করিয়া জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ফলে চতুর্পার্শ্বের জনপদের নাম হইয়াছিল কৃষ্ণদেশ (Black Country), কিন্তু রাসায়নিক এ সম্বন্ধ হইতে তাহাদিগকে জ্ঞান করিয়াছে। আজকাল এই ভয় হইতে বহুল পরিমাণে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রস্তুত হইতেছে। গত যুদ্ধের পর হইতে ইহা রাস্তা-নির্মাণ ও অন্যান্য কাজের জন্য কনক্রিট (concrete) প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইতেছে। বলা অনাবশ্যক, কারখানার মালিকগণ শুধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন নাই, আয়ের একটা নূতন পন্থা হওয়ায় উৎফুল্লও হইয়াছেন। দার্শনিকদের মতে আবর্জনা মানে অস্থানে কেন দ্রব্যের অবস্থিতি। বস্তুতঃ যেখানে যে-জিনিষের কোন প্রয়োজন নাই সেখানে তাহা থাকিলেই তাহাকে আমরা জঞ্জাল বলি। যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিলেই তাহা আবার মূল্যবান কাঁচা মালে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে দামী জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে।

‘Waste not, want not’ কথাটা পাশ্চাত্য দেশ বর্তা মানিয়া চলে আমরা ততটা চিনি না, আর সেই জন্যই কমলার কুপাকটাক্ষ তাহাদের ভাণ্ডে লাভ হইয়াছে। আংশিক পচা ফল আমরা নষ্টময় ফেলিয়া দি। কিন্তু দে-দেশের লোকেরা তাহা হইতে রাসায়নিক উপায়ে ‘পেকটিন’ বাহির করিয়া লয় এবং তাহা দিয়া নানা প্রকার ফলের আচার তৈয়ার করিয়া থাকে। সুদৃষ্ট বিলাতী বোতলে অগ্নিমূল্যে আমরা সেই সব কিনিয়া থাকি। সুস্বাদুতে দেখিতে গেলে বাতাসের নাইট্রোজেনও সেদিন পর্যন্ত অব্যবহার্য দ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল। বায়ুমণ্ডলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন। অক্সিজেন-তরলীকরণ (dilution) ছাড়া আর কোন কাজেই ইহা লাগিত না। যুদ্ধের সময় বাতাসের নাইট্রোজেন জার্মান বৈজ্ঞানিক হাবার হাইড্রোজেন-

যোগে এমোনিয়া তৈয়ারী কাজে লাগাইলেন। একদিকে ইহা হইতে নাইট্রিক এসিড ও অত্র দিকে সাল্ফিউরিক এসিড সংযোগে জমির সার প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার পর হইতে নানা দেশে এই ভাবে নাইট্রোজেন্‌ কাজে লাগান হইতেছে। বিশাল ভূখণ্ডের এই সর্বব্যাপী কাঁচা মাণ ভগবান অপক্ষপাতে সকল জাতিকে দিয়াছেন—ইহা মুলাবিহীন। ইহা কাজে লাগাইয়া দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা সকল জাতিই করিতে পারে। বাংলা দেশের প্রকৃতির অবাচিত অপৰ্যাপ্ত দান—কচুরীপানাসমূহেও এই কথা

খাটে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ, শুধু বাংলায় ৪২৬৯ বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া ইহা অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতির এই অহেতুক কৃপায় স্ববকুলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আর্সেনিক-যোগে কচুরী ধ্বংস করিবার সরকারী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই জিনিষটির সদগতি-বিধানের ভার বাংলার রাসায়নিকদের উপর। ইহা হইতে সুবা ও পটাশ ঘটিত লবণ প্রস্তুত করিবার উপায় ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা শীঘ্র কার্যে পরিণত হইলে সুখের বিষয় হইবে।

সুনন্দার বিয়ে

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

(১)

সুনন্দা যখন বি-এ পাস করিয়া বন্দ্রাদেশে পিতা-মাতার গৃহে ফিবিলা, তখন দুমস্ত শহবাটব মধ্য একটা সাদা পড়িয়া গেল। বাঙালীবিলে অঞ্চলে এমন ধরণের মেয়ে কেহ আর দেখে নাই। একটি মাত্র মেয়ে সুনন্দা যখন বালিকা, তখন হইতেই ইন্দুবাবু কলিকাতায় ডায়োসেন্স কলেজের বোর্ডিঙে রাখিয়াছিলেন। সেইখানেই সে স্কুলেব এবং কলেজের পড়া শেষ করিয়াছে।

সুনন্দা যখন আই-এ পাস করিল, তখন হইতেই ইন্দুবাবুব স্ত্রী সরলা স্বামীকে ব্যভিচার করিয়া তুলিয়াছেন, “মেয়ের আমার বিয়ে হ’ল না, এর পরে বুড়ো মেয়ের বর কোথা পাবে,” ইত্যাদি অসংখ্য অভিযোগে। ইন্দুবাবু স্ত্রীর কথায় কোনদিনই মনোযোগ দিতেন না, মেয়েকে সুশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, এইটুকুই সব চেয়ে বড় সত্য বলিয়া বুঝিতেন। এইবার যখন মেয়ে ইংরেজীতে অনার্স লইয়া সম্মানে উত্তীর্ণ হইল, তখন ইন্দুবাবু উৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন, “এম-এ-টাও পাস ক’রে ফেলুক, আর ত ছোটো বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে”—গৃহিণী সরলা মুখ খিঁচাইয়া হাত নাড়িয়া কর্তাকে শোনাইলেন, “তোমার সব যত

অনাচ্ছিষ্ট কথা, এতদিন পরে মেয়েটাকে মাথাগলে বেড়াতে নিয়ে বাবার লোভ দেখিয়ে বাড়ি আনিয়েছি, এখন আবার উনি এম-এ পড়ার ফ্যাচাং তুলছেন। জন-মনিষ্যির সঙ্গে ঘরকন্নার একথানা কাজ জানে না। আদব-কায়দা রেখে কথা কইতে শেখে নি, কেবল দিঙ্গিপনা শিখেছেন মেয়েদের ইস্কুলে থেকে। এবার আর যেতে দিচ্ছি না আমি।

ইন্দুবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, “আব ত ছোটো বছর মাত্র, কেন মেয়েটার মনে দুঃখ রাখবে? বিয়ে ত হবেই; ঘরকন্নাও সারাদ্বীবন করবে, হেঁসেলে একবার চুকলে কি আর ওসব হবে? কি আব বয়েস হয়েছে এমন?”

গৃহিণী হঠাৎ আঁচলে চোখ ঢাকা দিয়া কাঁদ-কাঁদ হুবে বলিলেন, “হবে গো সবই হবে, কেবল আমাব অদেষ্টে দেখার সুখ ঘটবে না। ঐ ত পাশের বাড়ির দুর্জ্জন সিংয়ের মেয়ে আঠার বছবে পড়েছে, তিন-চারটা ছেলের মা হয়ে কেমন ঘরকন্না করছে!” কর্তা এমন সুবৃষ্টিপূর্ণ অভিযোগের উত্তরে কি বলিবেন বুঝিতে না-পারিয়া সম্প্রতি গৃহিণীকে খুশী কবিবার জন্য বলিলেন, “তোমার অদেষ্টে ওদের চেয়ে কি কম ভাল? দুর্জ্জন সিং মাথার ঘাম পার ফেলে যা’ ছ-পয়সা আনছে, ঐ

শুষ্টির পেটও ভবছে না তাতে ; এমনই জামাই এ.ন.ছে, হতভাগা কাশাকড়ির বিদ্যো ধরে না পেটে, 'অঁথচ স্বস্তরের' পরসায় মদ খেয়ে মাতলামি করতে বাধে না।' ঐ কচি মেয়েটাকে দেখলে বুক কেটে বাঁধ। তোমার মেয়ে আজ বি-এ পাস ক'রে ঘরে এসেছে, কত জন জেরাও করছে, আবার কত লোক প্রশংসাও ক'বছে। সেদিন জজ সাহেব বললেন, তোম'ব মেয়েকে দেখে বড় খুশী হয়েছি। তোমার মত সব বাঙালী-বাপ যদি এমন ক'বে মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাত! ক'ল ত ডেপুটি কমিশনার উ-পের বাড়ি একটা টি-পাটি অ'ছে, অ'মাকে মেয়ে নিয়ে যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন। তোমাকেও নিয়ে যেতে বলেছিলেন, আমি বলেছি তুমি কোথ'ও বেরোও না।"

মুহুর্তর মধ্যে সরলার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, উৎসাহে বলিলেন, "ওমা, এ কথা ত আগে বল নি। কাল টি-পাটি? গয়নার কি হবে? তোমাব মেয়ে ত আবার সেকলে গয়না প'বে না, নইলে কি অ'ম'র গয়নার অভাব? মুক্তো-বস'নো, পাতলা পিনপিনে চুড়ী ছ-গাছা হাতে দিয়েই সব জায়গায় যায়। স'মনেব বাড়ির মা-টির একটা মুক্তোর কণ্ঠী দেখে খুব পছন্দ করেছে, তাই সেই বকমই এক চড়া গড়াতে দিয়েছি। তুমি এবুনি স্নাকবাব বাড়ি তাদা দিয়ে লোক পাঠাও। বড় মেয়ে ও'ক একা পাঠানো কি ভাল দেখায়? আমিই সঙ্গে নিয়ে যাব। বর্মী বাড়ি ত ; ব'ঙালী কেউ না খ'কু'লই হ'ল।"

ঈন্দুবাবু বলিলেন, "বাঙালী বড় বড় নামজাদা ছ-চার জন থাকবে বইকি। তবে মেয়েটাকে ডাক-ধমক ক'বো না সেখানে, পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ-প'বিচয় ক'বতে দিও।"

(২)

সুন্দর সবুজ বাসে চাকা লনে টি-পাটি চলিতেছে। এক দিকে টেনিস কোর্ট, এক দল খেলিতেছেন, এক দল খেলা দেখিতে দেখিতে চা পান ক'বিতেন।

গৃহস্থামিনী মিসেস্ উ-পে গাচ সবুজ রঙের লুঙ্গী পরিয়াছেন—লুঙ্গী গানিবে প্রশ্ন অর্জেক অংশ সুন্দর ফুল লতা-পাতা আঁকা। তানাখা-মাখা পা ছইখানিতে সোনার ছই গাছি মল, সবুজ ভেলভেটের বর্মী ফানা পরিয়া, বেশ দ্রুত

চলাফেরা ক'বিতেন। বিবাট টোপব-হোঁপাটির ডান দিকে এক গোছা মেইড্‌ন-হোয়ারেব মধ্যে কয়েকটি বেলফুল গৌড়া রহিয়াছে, বাতাসে স্তম্ভ সবুজ পাতাগুলি উড়িয়া উড়িয়া কপালের উপর পড়িতেছে—কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করিয়া ফুলগুচ্ছটি স্থানস্থানে আছে কিনা হাত দিয়া দেখিতেছেন। উ-পেব মেয়েটি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁহাতে ঘুরিতেছে। তাহার প'নে উঁচু ফ্রক, হাই-হিল জুতা ও মোজা, ব'ব ক'বা চুলের এক পাশে ছোট একটা ফুলের গুচ্ছ ক্লিপে আঁটা বহিয়াছে। মায়ের সহিত এবং নিমজ্জিতদের সহিত মিহি সুবে ইংবেজী বলিতেছে।

সুন্দা একটা টেবিলের নিকটে বসিয়া গা খাইতেছিল, দৃষ্টি তাহার টেনিস কোর্টেব দিকে। সরলা দেবীর ছই জন মহিলাবন্ধু সুন্দার সহিত আলাপ ক'বিবান জন্ত উৎসুক। সুন্দা উত্তর দিবার আগেই তাহার মা সব কথাব জবাব দিয়া ফেলিতেছেন, কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে টেনিস খেলা দেখিতেছে।

এমন সময় গৃহস্থামী উ-পে সুন্দাব নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মিস্ দে, আপনাব সঙ্গে আলাপ ক'রব'র জন্তে অনেকেই উৎসুক, একবার এদিকে আসুন কি?" সুন্দা মাকে বলিল, "মা, আমাকে ও'বা ডাকছেন, আমি বাচ্ছি।" সরলা দেবী একটু বিবস্ত হইয়া বলিলেন, "যাও, তবে বেশীক্ষণ পুরুষদের দিকে থেকো না, এ জাফগা বড় ভাল না, একটা নিয়ে তুলে দিতে দেবি হবে না।"

টেনিস খেলা শেষ হইয়াছে, খেলোয়াড়বা এক এক গ্রাস বরফ-পানীয় হাতে লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন। সুন্দাকে লইয়া উ-পে সেখানে উপস্থিত হইতেই সকলে চেয়াব ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

উ-পে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "ইনি মিস্ দে, আমাদের সরকারী উকিল মিঃ দে'র কন্যা, এই বৎসব ইংবেজীতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।" তাব পর একে একে নানা জাতীয় ভদ্রলোকের সহিত কবমর্দন করিয়া সুন্দা হাঁপাইয়া উঠিল। এমন সময় নীর্ধাকৃতি, গৌরবর্ণ, স্ত্রী একটি যুবক ব্যাকেট-হস্তে সেখানে উপস্থিত হইতেই উ-পে বলিলেন, "মিস্ দে,—মিঃ দলীপ সিং, ইনি বর্মার টেনিস্ চ্যাম্পিয়ন—

এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট এন্জিনিয়ার” —উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মিঃ সিং হুনন্দার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “আপনি কি টেনিস খেলেন?”

হুনন্দা বলিল, “খেলি বটে, কিন্তু আপনাদের মতন চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে কি খেলতে পারি? সত্যি, আপনি কি হুন্দের খেলেন! আমার ভাল খেলা দেখতে খুব ভাল লাগে।”

মিঃ সিং উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “আহুন না—এক সেট খেলি।”

হুনন্দা লজ্জায় রক্তিম হইয়া বলিল, “না-না, আপনার সঙ্গে কিছুতেই না।” মিঃ সিংয়ের জিদ বাড়িয়া গেল, সে ইন্দুবাবুকে গিয়া ধরিল হুনন্দার সঙ্গে একবার খেলিবেই। ইন্দুবাবু সানন্দে সম্মতি দিলেন কিন্তু হুনন্দা বলিল, “আজ নয়, আমার পায়ে গ্লিপার বয়েছে, আর এত লোকের সামনে আমি খেলতে অভ্যস্ত নই।”

মিঃ সিংয়ের আবদারে অগত্যা হুনন্দাকে রাজী হইতে হইল—পর দিন সেই বাড়িতেই আসিয়া খেলিবে।

সেই দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার পর হুনন্দা মা-বাবার নিকট বলিল, “এ জায়গাটা যত বিদ্রী লেগেছিল প্রথমে এখন দেখছি তত খারাপ নয়। একেবারে ভঙ্গল ত নয়, বেশ ভাল ভাল শিক্ষিত লোকও ত অনেক আছেন। যে-কয়টা বর্মীদের বাড়ি গিয়াছি—কি হুন্দের অভ্যর্থনা! মিসেস উ-পেও ভারী নম্র, বিনয়ী মেয়ে। কর্তব্যের জট কোথাও খুঁজে পাবে না। উ-পেব মেয়ে, এখানকার কনভেন্টে পড়ে। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, ধরণ-ধরণ একেবারে মেম-সাহেবী, লুঙ্গী পরে না ত দেখলাম। ইন্দুবাবু বলিলেন, “শিক্ষিত লোক যাবা আছেন এখানে তাঁদের সঙ্গে মিশলে ভালই লাগবে। বাঙালী ধারা আছেন, তাঁরা লোক যে ভাল নয়, তা বলাই না কিন্তু বহুকাল বিদেশে পড়ে আছেন, দেশের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে কোনো যোগ রাখেন না, খবরও রাখেন না বলেই বোধ হয় মন বড় সঙ্কীর্ণ হয় গেছে। এই দেখ না, সেদিন ক্লাবে ঢুকে দেখি মহা আলোচনা চলছে। আমি যেতেই সব থেমে গেল। মল্লিকবাবু বললেন, ‘এই যে দে-বাবু! আপনার মেয়েটি ত তিন-চার মাসের মধ্যে এখানে খুব নাম ক’বে ফেলেছে। বাব-লাইব্রেরীতে সকলের মুখেই

মিসু দে-র কথা। মেয়েকে পাস ত করালেন, এখন বোগ্য বর জোটাতে ত প্রাণ বেরবে।’

হুনন্দা পিতার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “আচ্ছা বাবা, শুঁদেব এত মাথা-ব্যথা কেন?”

পিতা বলিলেন, “বন্ধু-মানুষ, যা বলছেন কিছু মিথ্যে নয়। সত্যিই আজকাল পণ ছাড়া ভাল ছেলে পাওয়া দুষ্কর।”

হুনন্দা বলিল, “আচ্ছা, বাবা, আমাদের ছেলেরা এমন অপদার্থ কেন? বিয়ে ক’রে খুশুদের টাকা নিয়ে ভিক্ষে ক’বে বড়লোক হ’য়ে কি সম্মান বাড়ে তাদের?”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “ভিক্ষা কই? দস্তুর-মত জোর-জবাবদস্তি করেই ত নেয়। এমন ভাব—যেন তোমার মেয়ে বিয়ে ক’রে আমি তোমার এবং তোমার চোন্দপুরুষ উদ্ধার কবলুম।”

হুনন্দা বলিল, “বাবা, আমি তোমাকে ব’লে রাখছি আমি কিন্তু এক কড়ি পণ দিয়েও বিয়ে করব না।”

মেয়ের কথাটুকু শুনিতে পাইয়া সরলা ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “কি বেহায়া মেয়ে হয়েছিস্ তুই? তোর বিয়ব খবর তুই কি জানবি? আমরা যা ভাল বুঝে ব্যবস্থা করব, তাই করবি তুই।”

হুনন্দা বিরক্ত হইয়া বলিল, “মা, বাবার কাছেও নিজের মনের কথা বলব না ত কার কাছে বলব? যে বা বলবে, মুখ বুজে করব, এই যদি চেয়েছিলে, দশ বছর বয়সে বিয়ে দাও নি কেন? রাগ কর আর যাই কব, আমি চিরদিন অবিবাহিত থাকব, তবু পণ দিয়ে কখনও বিয়ে করব না।” হুনন্দা সজোবে পা ফেলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ইন্দুবাবু গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তুমি বড় বকে! মেয়েটাকে। ও এখন বড় হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে, ওর সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার ক’রো।”

সরলা ঠোঁট উন্টাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “রাগ কবলে ত বয়েই গেল—তোমার মতন আমি মেয়েকে অত আত্মারা দিই না।”

(৩)

পরদিন বিকালে চারটার সময় মিঃ দলীপ সিংয়ের গাড়ীখানা দরজার দাঁড়াইল। ইন্দুবাবু কোর্ট হইতে শীঘ্র

ফিরিয়া হুনন্দাকে উ-পের বাড়ি লইয়া বাইবেন, স্থির ছিল।
মিঃ সিংয়ের গাড়ী দেখিয়া হুনন্দা নীচে নামিয়া আসিল।
মিঃ সিং গাড়ী হইতে নামিয়া সসম্মুখে অভিবাদন করিয়া
বলিলেন, “আপনাকে নিতে এসেছি, খেলার কথা মনে
আছে ত?”

হুনন্দা বলিল, “আমার বাবা আমাকে অপেক্ষা করতে
বলেছেন, তাঁর সঙ্গে যাবার কথা ঠিক আছে। আপনিও
এসে বসুন না।”

মিঃ সিং বলিলেন, “খেলার ত একটু দেরি আছে,
আমরা একটু ড্রাইভে যেতে পারতাম, আপনি এখানকার
পাহাড়ে উঠেছেন কখনও?”

হুনন্দা বলিল, “না, আমার এখনও বিশেষ কোথাও
বেড়ানো হয় নি। আপনার স্ত্রী বৃষ্টি খেলেন না?
আপনাকে সর্বদা একা বেরোতে দেখি বে?”

মিঃ সিং হুনন্দার বেড়াইতে বাইবার সঙ্কোচের কারণ
বুঝিতে পারিয়া বলিল, “আমি চিরদিনই একা। বিয়ে
এখনও করি নি।”

হুনন্দা অপ্রস্তুত হইয়া আলোচনার বিষয় বদলাইবার
ইচ্ছায় বলিল, “আমাদের বাগানটার কি হুনন্দার গোলাপের
বেড হইছে, দেখবেন আসুন। আমার বাগান করতে
বড় ভাল লাগে।”

মিঃ সিং বলিলেন, “আমারও বাগান করা একটা ‘হবি’।
অদ্ভুত! আমাদের ড-জনের খেয়াল দেখছি একই রকমের।

হুনন্দা মহা উৎসাহে মিঃ সিংকে বাগান দেখাইতে
দেখাইতে বলিল, “কলকাতার আমাদের কলেজের
কম্পাউন্ডে আমরা কয়েক জন মেয়ে মিলে কি হুনন্দার বাগান
করেছিলাম। এখানে একা-একা কোন কাজে উৎসাহ
লাগে না।”

মিঃ সিং বলিলেন, “যদি অমুমতি দেন, আপনাকে
আমি সাহায্য করিতে পারি। আমাদের পি-ডব্লিউ-ডি
আপিসে বাগান দেখেছেন? আমি অবসর সময় ঐ বাগান
নিয়ন্ত্রণে কাটাই।”

হুনন্দা বলিল, “আমি বাবার সঙ্গে যাব এক দিন আপনার
বাগান দেখতে।”

মিঃ সিং হুনন্দার চোখের উপর নিজের অভিমানে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “কেবল বাব আর বাবা!
কেন আপনি কি কচি খুকী মে বাবা-ছাড়া এক পা চলতে
পারেন না?”

হুনন্দা চক্ষু নামাইয়া পা দিয়া একটা ইঁট সরাইতে
সরাইতে বলিল, “আমরা বড বড়ই হই না, বতই লেখা-
গড়া শিখি না কেন, আমাবেব পাবেব বেড়ী কোনদিন
ধসবে না।”

ফটকের সম্মুখে একখানি মোটর থামিল। ইন্দুবাবু
গাড়ী হইতে নামিয়া ডাকিলেন, “হু, তুমি প্রস্তুত ত?
আমাব কি দেবি হ’য়েছে?”

ইন্দুবাবু এন্জিনিয়ার সাহেবেব করমর্দন করিয়া বলিলেন,
“হুনন্দার দেরি দেখে বৃষ্টি আপনি নিয়ে যেতে এসেছিলেন?”

মিঃ সিং বলিলেন, “আপনার মেয়েকে নিয়ে যাবার
সৌভাগ্য আমার হ’ল না, তিনি আমার সঙ্গে বে:ত বাজী
হন নি।”

ইন্দুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “না-না, সে কি
কথা? আমার মেয়ে আপনার সঙ্গে পেলে খুবই সুখী হ’ত
নিশ্চয়ই, তবে আমার সঙ্গে যাবে কথা ছিল ব’লে বোধ হয়
যায় নি। আপনি ছুঃখিত হবেন না।

ইন্দুবাবু মিঃ সিংকেও নিজের গাড়ীতে আহ্বান
করিলেন। হুনন্দাও বলিল, “চলুন না এবসঙ্গেই যাই।”

মিঃ সিং আপত্তি না করিয়া ড্রাইভারকে গাড়ী লইয়া
যাইতে হুকুম দিয়া ইন্দুবাবুর পাশে উঠিয়া বসিলেন।

হুনন্দা আজকাল আব বর্ষাদেশের প্রভেদ বিহীন নয়।
বাবা যখন বলেন, “এই মগের মূলক ছাড়তে পারলে ষাঁচি।
দিন-দিন যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, ভারতবাসীদের অল্পজল
বেশীদিন এদেশে নেই বোধ হয়।”

তখন হুনন্দা বলে, “তা ও দব দেশ, ওরা নিজেদের
লোকেদের ব্যবস্থা করবেই ত? তোমরা রাগ করলে চলবে
কেন?”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “হ্যা, সে কথা ঠিক, তবে ষাঁচি
চাকরিতে আগে ঢুকেছেন, তাঁদের ত তাহা পাওনা এবং
দাবি থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়?”

গৃহিণী বলেন, “এদেশটা মন্দ কি? আমার ত বেশ ভাল
লাগে বাপু। মেয়েটাব বিয়ের জন্তেই ঘন ঘন দেশে

যাবার দরকার, নইলে এখানে যেমন রাজার হালে আছি, দেশের বাড়িবরে সে আরাম কোথায়? এখানে যদি ভাল পাত্র একটি পেতাম, তবু বড় সুবিধাই হ'ত। হাজার টাকা হলে ফেলে যাওয়া-আসা করি, ঘটকের কিও কিছু কম দিই না। তবু যদি একটা পছন্দসই জামাই জুটত!”

সুনন্দা বলে, “তোমার শুধু ঐ এক কথা, মা। কে বলে তোমায় বাজে খবচ করতে?”

মা রেগে জলে উঠেন—এসব বাজে খরচ, আর গুঁর বি-এ, এম্-এ পড়ার খরচগুলোই সব কাজের হ'ল? স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, “হ্যাঁগা, বিলেত-ফেরৎ সেই ডাক্তার ছেলের খবব নিয়েছিলে? কত চায় সে?”

ইন্দুবাবু ইচ্ছা নয় মেয়ের সাক্ষাতে তাহার বিবাহের আলোচনা হয়। স্ত্রীকে বলিলেন, “দ্যাখ, আমি কিন্তু কালকে দুই তিনটি বন্ধুকে চা খেতে বলেছি। হুন্স, তুমি কিন্তু মা, কাল হোস্টে হ'বে, কোথায় চা খাওয়াবে বল ত?”

সুনন্দা বলিল, “বাবা, আমাদের ফুলবাগানে করলে হয় না? ওখানে ছোট ছোট টিপয় দিয়ে ব্যবস্থা করলে দশ-বার জনকে চা খাওয়ান যায়।”

গৃহিণী বলিলেন, “ঐ দ্যাখ, মেয়েব যত বিদ্যুটে পছন্দ। এমন ভাল চেয়ার, সোফা, টেবিল, বড় বড় আয়না, ছবি দিয়ে সাজানো কান্দীরা কাস্পেট পাতা ড্রিং রুমটা তোমার পছন্দ হ'ল না, পছন্দ ঐ ঝোপে, ঝাড়ে আর জঙ্গলে। নেমন্তর করছ ক'কে শুনি?”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “রেন্ডুন থেকে আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধু মিঃ গুপ্তের ছেলে এখানে এসেছে, সে, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার, আর আমাদের সিং সাহেব।”

মিঃ সিংয়ের নাম উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দার মুখখানা একটু বিশেষ রকম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ইন্দুবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সুনন্দা বলিল, “বাবা, আমাদের বাগানের ও-পাশে যে অনেকখানি জায়গা জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, সেখানটা পরিষ্কার করিয়ে, সমান ক'রে নিয়ে একটা মাড্-কোর্ট ক'বা দায় না?”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “গুড্ আইডিয়া, খেলবে কে?”

সুনন্দা বলিল, “আচ্ছা, বাবা, মিঃ সিংকে বললে তিনি

নিশ্চয় এখানে খেলতে আসেন, আরও কত লোককে খেলতে দেবি, খেলার লোক জুট বাবেই।”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “বেশ, কাল চায়ের টেবিল কথাটা তুলো।”

(৪)

সুনন্দা ড্রেসিং-টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধনে ব্যস্ত। কুক্কুমের একটি টিপ্ কতবার পরিতোছে, আবার মুছিতে ছ। বড় মুক্তোর এক ছড়া লম্বা হাব, গাঢ় নীল রঙের মারাঠী শাড়ী, আধ হাত চওড়া লাল বেশমের পাড়ের নীচে শাদা রেশমী সূতোর কল্কা, ভয়েলেব ছোট হাতার ব্লাউসের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম লেসের এম্ব্রয়ডারীর কারুকার্য, কানে দুটি বড় বড় মুক্তোর ছল, পায়ে এক জোড়া গাঢ় নীল ভেলভেটের উপর সাদা পুঁতির কাজ ক'বা বন্দী চটি।

সুনন্দাকে সুনন্দী বলা যায় কিনা, সে-বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। সে গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু কালোও বলা যায় না। চোখের তারা দুটি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, তাহার চাউনির মধ্যে এমন একটু মাধুর্য আছে, যাহাতে তাহার মুখের অস্ত্র সকল খুঁৎ চাকা পড়ে। মুখখানি বুদ্ধির প্রাচুর্য উজ্জ্বল, স্বভাবের কোমলতায় মোলায়েম।

জানালার পর্দার ফাঁক দিয়া দেখা গেল একটি ট্যান্সি বাগানে চুকিতেছে। অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, সে কথা মনে পড়িতেই আয়নার শেঁষ একবার মুখখানা দেখিয়া লইয়া সুনন্দা দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

ট্যান্সি হইতে যিনি নামিলেন, সুনন্দা তাহাকে চেনে না। ইন্দুবাবু তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া বলিলেন, “এই যে এস, এই আমার মেয়ে সুনন্দা, আর ইনি আমার বন্ধুপুত্র সুখিমল।” সুনন্দা বলিল—বাবা, একেবারে বাগানে গিয়েই বসি, এখানে বড় গরম, না?

অতিথিরা একে একে উপস্থিত হইলেন। সরকারী ডাক্তারটি হাসিখুশী মানুষ, নানা দেশ ঘুরিয়া, নানা জাতীয় খবর জানেন, গল্প করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সুনন্দা বলিল—ডাঃ চ্যাটার্জী, আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না, আর এক প্লেট আইসক্রীম নিন না!

ডাঃ চ্যাটার্জী বলিলেন—নিতে পারি, যদি আপনি



বাগী

শ্রীশৈলেন্দ্রভূষণ দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



একটা গান শোনান। কলকাতা ছেড়ে অবধি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি, ভাল বাংলা গান শুনতে পাই না।

এক জন অ-বাঙালী উপস্থিত থাকায় কথাবার্তা সব ইংরেজীতেই চলিতেছিল।

মিঃ সিং বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ একটা ইংরেজী গান হোক। বাংলা গান আমি কি বুঝব?

সুবিমল বলিলেন—বাংলা আর ইংরেজী দুটোই আপনার কাছে বিদেশী ভাষা, বাংলা তবু ভারতবর্ষীয় জিনিষ, খানিকটা রস গ্রহণ করতে পারবেন।

মিঃ সিং বলিলেন—সুবিমলবাবু বুঝি ইংরেজী সুর ভাল-বাসেন না? আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে ইংরেজী সুরগুলি।

সুনন্দা বলিল—আমি ইংরেজী সুর ভালবাসি না, তা'নয়, কিন্তু গাইতে বিশেষ ভাল লাগে না, ওতে যেন আমাদের মন খোলে না। মিঃ সিং, আপনাকে বরং আমি ভাল ভাল ইংলিশ রেকর্ড শোনাব।

সিং সাহেব বিরক্তির সুরে বলিলেন—রেকর্ড কে শুনতে চায়? আপনার গান শোনাই আসল।

মিঃ সিং আজ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সুনন্দা দুইটি যুবক বাঙালী বন্ধু পাইয়া, তাহাদের লইয়াই একটু ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার মনে বেশ একটু সন্দেহ উদ্ভূত হইতেছিল। সুনন্দাও নিজের ক্রটি বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইল এবং চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—চলুন ঘরে যাই, এখানে ত বাজনা নেই?

মিঃ সিং বলিলেন—আমি তা'হলে এখান থেকেই বিদায় নি, আমার এক জায়গায় ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, আর একদিন আপনার গান শোনার ইচ্ছা রইল।

সুবিমল ছেলেটি বি-এ পাস করিয়া ব্যবসা করিতেছিল। বর্ষাদেশেই তাহার জন্ম, পিতা আইন-ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন। পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া উপযুক্ত করিবার সংকল্প ছিল, কিন্তু পুত্রের অভিপ্রায় অনুরূপ ছিল। সে শান-ষ্টেটে আলুর চাষ করিত, সেই আলু সমস্ত বর্ষার এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে চালান দিয়া বেশ উপার্জন করিত।

অর্থ উপার্জন যথেষ্ট হইলেও পুত্র জঙ্গ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার বা এন্জিনিয়ার কিছুই হইল না বলিয়া পিতা এবং বন্ধুগণও প্রায়ই হৃৎপ্রকাশ করিতেন। সুনন্দাও তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—আপনি এত ভাল স্থলার ছিলেন,

বিলেত গেলে ত একটা ডক্টরেট নিয়ে আসতে পারতেন। এসব ব্যবসা কি শিক্ষিতদের ভাল লাগে?

সুবিমল বলিল—আমার এরকম স্বাধীন ব্যবসা করতে বেশ লাগে। মাটি চাষ ক'রে ফসল তুলে কি আনন্দ তা যে না করে, সে বুঝে না।

সুনন্দা সুবিমলকে শ্রদ্ধা করিলেও তাহার পছন্দকে প্রশংসা করিতে পারিল না।

(৫)

সুনন্দার দিন বেশ কাটিতেছিল, তাহার আর এখন সন্দীর অভাব বোধ হয় না। ইন্দুবাবু গৃহিণীর আবদারে মাঝে মাঝে পাত্রের অনুসন্ধান করেন। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু সকলেই পাঁচ হাজার সাত হাজার হাঁকে। মেয়ের কাছে প্রস্তাব আসিলেই মেয়ে ক্ষেপিয়া উঠে। ইন্দুবাবু গৃহের অশান্তি সহ্য করিতে না পারিয়া বলেন—কি ঝকঝক করেছি এই বর্ষাদেশে এসে! সমুদ্রের এপার থেকে কি ওপারে ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করা যায়? চেষ্টার ত ক্রটি করছি না।

কত ছেলের নামের লিষ্ট আসছে, কিন্তু ব'দের পছন্দ হয়, তাদের কেউ চায় পাঁচ হাজার নগদ, কেউ চায় মোটর গাড়ী, হীরের গয়না, সুনন্দার মেয়ে। কেউ বলে বিনয় ক'রে, নগদ টাকা চাই না, ডিসপেন্সারী মাজিরে বসিয়ে দাও। আমার ত তবু একটা মেয়ে, যার ঘরে পাঁচ ছয়টি, তাদের কি জুড়না! তাই আজকাল মেয়ের বাপেরা এখানেই যেমন-তেমন ছেলে ধ'রে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।

সুনন্দা বলে—সে কি মন্দ কথা, বাবা? এখানে বিয়ে দিতে পারলে কি করতে দেশে যাবে অত ধরচ ক'রে?

বাবা বলেন—হ্যাঁ মা, ভাল পাত্র সকলের মেলে কই? এই ত সেদিন এক বন্ধু মেয়ের বিয়ে দিলেন, পাত্রটির বয়সও বেশী, আর জলজ্যান্ত একটি বশিণী, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরসংসার করছিল।

সুনন্দা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বাবা, কি বলছ? এমন জেনেও বিয়ে দিলেন?

ইন্দুবাবু বলিলেন—জেনে কি আর দিয়েছেন? ভদ্রলোক থাকেন সেই মিচিনায়—মেয়েটির উনিশ বছর বয়স হয়েছিল

লেখাপড়াও শেখে নি কিছু। চোদ্দ বছর দেশে যান নি, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। মিয়ং সিয়াতে এক বজুর কাছে এই পাত্রের খবর পেয়ে বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেন। বিয়ের পর মেয়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়ে দেখে সতীন সংসার গুছিয়ে রেখেছেন।

গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলেন, বত সব বাজে গল্প মেয়েকে শোনাচ্ছ! এমনি মেয়ে ত বিয়ের নাম শুনতে চায় না। এসব শুনলে কি আর রক্ষে আছে? বা হুনন্দা, তোর কাজকর্ম কর গিয়ে।

হুনন্দা মায়ের কথায় মনোযোগ দিল না। বলিল—আচ্ছা, বাবা, এদেশে ত নানা দেশীয় লোকের বাস, বেশ মেলামেশাও চলে। অ-বাঙালীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেই পারে।

ইন্দুবাবু বলিলেন—অ-বাঙালীর সঙ্গে কি আমাদের থাপ থায়, মা? এক ভাষাভাষী না-হ'লে কি মনের মিল হয়? যাক সে কথা।

আগামী সপ্তাহে আমাদের কোর্ট ছুটি হবে, দিন-দশেক বন্ধ থাকবে। চল, আমরা ম্যাঙালে, মেমিও বেড়িয়ে আসি।

হুনন্দা বেড়াইতে বাইবার আনন্দে উঠিয়া পড়িল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—“পাঁচটা বাজে, মিঃ সিং আজ খেলতে এল না বে? দেয়ালে ঝোলানো র্যাকেটট নামাইয়া লইয়া বলিল—এস না বাবা, তুমি আর আমি তত জগ সিংগলস্ খেলি।

ইন্দুবাবু মেয়ের আবদারে পড়িয়া টেনিস খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহিণী সরলারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। টেনিস-কোর্টে বসিয়া খেলা দেখেন, খেলার পর বোলের সরবৎ, রস-গোলা, পীপর-ভাজা প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন। বহুকাল বর্ষাদেশের মফস্বলে থাকিয়া বর্ষা ভাষা বলিতে শিখিয়াছেন, আলাপ জমাইতেও পারেন তাই।

ম্যাঙালের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীরমানাথ দাস মহাশয়ের বাড়িতে ইন্দুবাবু সপরিবারে অতিথি হইয়াছেন। দাসবাবুর ছোট ভাই সুধীন্দ্র এম-এ পাস করিয়া কলিকাতা হইতে সস্ত্রাতি আসিয়াছেন। ইন্দুবাবু ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা

বলিয়া বেশ খুশী হইলেন। দাসবাবু বলিলেন—সুধীন্দ্র আপনাদের সঙ্গে নিয়ে মেমিওর গোটিক্ ব্রিজ দেখিয়ে আনবে। আজ বিকেলে এখানকার প্যালেসটা দেখে আসুন। আপনার মেয়েটি ত বেশ হুন্দের গান করে, মেয়েটিকে ত সব রকমেই আকম্পিশড্ করেছেন।

ইন্দুবাবু মেয়ের প্রশংসায় বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন, একটু বিনয়সহকারে বলিলেন—এই ত শিক্ষার বয়েস, বেণী আর কি শিখেছে। শিক্ষার আরম্ভ হয়েছে বলতে পারেন?

আপনার ভাইটিকে দেখেও আমি বড় খুশী হয়েছি। বেশ বুদ্ধিমান, বিনয়ী ছেলেটি, কি করবেন এখন?

দাসবাবু বলিলেন—বিলেত পাঠাবার ইচ্ছা আছে। বিলিতি ছাপ একটা না-মেরে আসলে কোথাও ভাল চাকরি হয় না।

বিকালে সুধীন্দ্র ইন্দুবাবুদের লইয়া ম্যাঙালে শহরের বা-কিছু দর্শনীয় আছে, সব দেখাইয়া আনিল। মেমিও বেড়াইয়া আসিয়া হুনন্দা বলিল—এই আপনাদের মেমিও! এত যার প্রশংসা শুনতাম? এর চেয়ে শিলং দার্জিলিঙ অনেক হুন্দর।

সুধীন্দ্র বলিল—এইটেই বর্ষার দার্জিলিঙ। হিমালয় পর্বতের সৌন্দর্য্য এখানে কোথায় পাবেন?

ইন্দুবাবুর ছুটি কুরাইয়া গেল, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, সুধীন্দ্রও তাহাদের সহিত রেলস্নান পর্য্যন্ত আসিল।

সুধীন্দ্র কলিকাতায় অনেক মেয়ে দেখিয়াছে, তাহাদের কলেজেই ত কত মেয়ে পড়িত কিন্তু তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। হুনন্দাকে দেখিয়া এবং একত্রে বেড়াইবার সুযোগ পাইয়া সে অত্যন্ত খুশী হইয়াছিল। হুনন্দারও সুধীন্দ্রকে বেশ পছন্দ হইল।

গৃহে ফিরিয়া কর্তা গৃহিণী নিতৃত্তে যেন কি আলাপ করেন, হুনন্দা আসিলেই চুপ করিয়া যান। হুনন্দা বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ঠিকই অনুমান করিল। গৃহিণী হুনন্দাকে কাটালগ দেখাইয়া গহনার অর্ডার দেন, শাড়ী, ব্লাউস করান।

প্রতিবেশিনী মা-টির হুন্দের পছন্দ, তাহাকে ডাকাইয়া

গৃহিণী সুনন্দার জন্ত মুর্শিদাবাদ-সিক্কের থানের উপর পাড় আঁকাইয়া শাড়ী করাইবার ফরমাস দিলেন। মা-চি গরিবের মেয়ে, লুক্কীতে এমব্রয়ডারী করিয়া দোকানে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করে। লেখাপড়া কিছুই জানে না, তবু কারও গলগ্রহ হয় নাই। বিধবা মা এবং দুই ভাইয়ের সব খরচ চালায়।

মা-চি এক দিন সরলাকে বলিল—মা, তুমি কেন মিঃ সিংয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও না? সে তোমার মেয়েকে বড় ভালবাসে। বিলেত-ফেরৎ সাহেব, পাঁচ-শ টাকা মাইনে পায়, সরকারী ঘর, চাকর-বাকর সব পায়, কত সম্মানও তার। তোমাদের একটাই সম্মান, কাছেও রাখতে পারতে।

সরলা বলিলেন—ওমা, ও যে পাঞ্জাবী, ভিন্ন জাতে আমরা মেয়ে বিয়ে দিই না।

মা-চি বলিল—তবে ঐ ডাঃ চ্যাটার্জীকে দাও না। সেও ত ভাল চাকরি করে। সে তোমাদের জাতের ছেলে, না?

সরলা হাসিয়া বলিলেন—না না, ও বাঙালী বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ যে, অস্ত্র জাতের। তুমি ওসব বুঝবে না। ওদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে চলে না, নইলে অমন সোনার টাঁদ ছেলে জামাই পেলে আমি খুবই খুশী হতুম।

মা-চি বলিল—বাপ রে বাপ! তোমাদের এতও বাচ-বিচার আছে! ভাল ছেলে, ভাল রোজগার করে, পছন্দও হয়, তবু বিয়ে দেবে না। এত জাত, জাত কর কেন? ফায়ার কাছে সবাই সমান। বলিয়া দেয়ালের কুলুঙ্গীস্থিত বুদ্ধমূর্তির দিকে উদ্দেশ্য করিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিল।

একদিন ইন্দুবাবু আপিস হইতে আসিয়া সুনন্দাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন—“মা, সুধীন্দ্র ছেলেটি বেশ ভাল, নয়? ওর দাদা তোমাকে খুব পছন্দ করেছেন, আমাদেরও ছেলেটি পছন্দ হয়েছে। তুমি এ-বিষয়ে আপত্তি করবে না? আমরা কিন্তু এই ফাস্টন বিয়ের দিন স্থির করেছি, এই দাখ টেলিগ্রাম এসেছে। আর পনের দিন মাত্র সময় আছে। রেজুনে গিয়ে বিয়ে দিতে হবে, ছেলের পক্ষ এখানে আসতে রাজী নন। বিয়ের পরে একবার তোমাকে মাণ্ডালে গিয়ে দিনকতক থাকতে হবে।

তার পর ছেলে বিলেত বাবে, তখন তুমি আমাদের কাছে চলে আসবে। এব্যবস্থায় তুমি খুশী নিশ্চয়।

সুনন্দা অনেক ক্ষণ মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

পিতা বলিলেন—বেশ, তোমার সম্মতি আছে বুঝলাম।

সুনন্দা বলিল—বাবা তুমি কি এ-সম্বন্ধে একেবারে কথা-বার্তা ঠিক ক’রে ফেলেছ?

ইন্দুবাবু বলিলেন—হ্যাঁ মা, সবই ঠিক।

সুনন্দা নীরবে উঠিয়া গেল। নিজের ঘরে একা বসিয়া অনেক ভাবিল। সুধীন্দ্রকে যতটুকু দেখিয়াছে, মানুষটাকে তাহার ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু দুই-এক দিনের দেখায় কি হয়? একেবারে অপরিচিত একটি বুকের সঙ্গে আজীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা পড়িতে বাইতেছে, অথচ তাহাকে চিনিবার সুযোগও সে পাইল না। বিয়ের পরই আবার বিলাত বাইবে, দুই বৎসর পরে যখন ফিরিবে তখন হয়ত আরও কত পরিবর্তন হইবে। এক-এক বার ভাবিল পিতাকে গিয়া বলে, এ বিবাহ সে করিবে না, অন্ততঃ এখনই না। বয়ঃ এত দিন বাহাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও বিবাহ করা তাহার পক্ষে সহজ। কিন্তু সে ত হইবে না। মা, বাবা বলেন, স্ববর্ণে ছাড়া বিয়ে হইতে পারে না। আচ্ছা, মিঃ সিং এই সংবাদ পাইয়া খুশী হইবেন কি? কখনও নয়। আর ডাঃ চ্যাটার্জী? আঃ, কেন যে এসব কল্পিত বাধা আমাদের সমাজের?

সুধীন্দ্র যেন কেমন একটু ভীকুগোছের। সব সময় বলেন, “দাদা বা ঠিক করবেন।”

মোটরের হর্ন কানে আসিতেই সুনন্দা চম্কাইয়া উঠিল, এখনও সে গোবাক করে নাই। আজ যেন তাহার খেলায় উৎসাহ নাই। মা আসিয়া বলিলেন, “কি রে সুহু, চুল বাধিস্ নি এখনও? শুনেছিস্ সব? বর পছন্দ হয়েছে? সুধীন্দ্র ছেলে ভাল, তবে বিলেত পাঠাবার খরচটি বড় কম পড়বে না। অর্ধেক খরচ দেব বলেছি, তাতেও যেন দাদাটি সন্তুষ্ট নয়। পারলে সবটুকু আদায় করতেন। আমাদেরও ত খরচ কম নয়, ভাণ্ডে-ভাণ্ডীগুলি যে ঘাড়ে পড়েছে, নইলে কি আর টাকার ভাবনা?

সুনন্দা গভীর হইয়া বলিল, “মা, আমি কি তোমাকে বলি নি পণ দিয়ে আমি কোন ছেলেকে বিয়ে করব না? তোমরা এ-বিয়ের আয়োজন ক’রো না।”

মা বলিলেন, “পাগলামী করিস্ না। পণ কেন? তোর বাপ যদি দিতে পারেন, দেবেন না কেন?”

সুনন্দা বলিল—ইচ্ছা ক’রে কি তোমরা এত টাকা দিচ্ছ? আর তোমরা হয়ত দিতে পার, ঘর ঘরে পাঁচটি মেয়ে, সে কি ক’রে প্রত্যেক মেয়ের জন্যে এত টাকা দেবে? না-দিতে পারলে সে ভাল পাত্র পাবে না? তুমি কি বলতে চাও বরপক্ষ টাকা দাবি করেন নি?

মা বলিলেন—তোমার অত খোঁজের দরকার কি? বিয়ের কনে, চূপ ক’রে থাকবে। অত বাড় ভাল নয়।

সুনন্দা রাগ করিয়া সেদিন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রহিল, খেলিতে গেল না। ইন্দুবাবু বার-বার ডাকিয়াও আসে যেন ঘর হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। অস্থির হইয়াছে, অজুহাত দিয়া বন্ধুবান্ধবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

পরদিন ইন্দুবাবু সুনন্দাকে অনেক বুঝাইলেন। সুনন্দা শান্ত ধীর ভাবে উত্তর করিল, “তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর, আমি আর আপত্তি করব না।”

ইন্দুবাবু মেয়ের সম্মতি হইয়াছে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

(৭)

রেঙ্গুনের বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে “শশী নিয়োগী হল” দুই দিনের জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া বিবাহের স্থান ঠিক হইয়াছে। ইন্দুবাবু মফস্বলের বাসিন্দা, কাজেই রেঙ্গুন শহরে পরিচিত বন্ধুবান্ধব খুব কমই ছিল। কিন্তু বরপক্ষীয়েরাই চার শত বরবাত্রীর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

সুনন্দার স্কুলের সহপাঠিনী দুই তিনটি বিবাহিত মেয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের সহিত বহুকাল পরে সুনন্দার সাক্ষাৎ হওয়ায় সে খুব আনন্দিত হইল। তাহারা সুনন্দাকে সাজাইতে মহা ব্যস্ত। সুনীতা বলিল, “হা, রে তুই না বলতিস, যে-ছেলে পণ চাইবে, তাকে কখনও বিয়ে

করবি না, এখন যে রাজী হলি? ছেলেটিকে খুব পছন্দ বুঝি?”

সুনন্দা বলিল—কে বলেছে পণ নেবে?

সুনীতা বলিল—উনি ত বলছিলেন, সুবীজ বাবু নাকি বিলেত বাবার টাকা না-পেলে বিয়েই করবেন না, বলেছিলেন। তোর বাবা নগদ দু-হাজার টাকা, গয়না, বিয়ের দিন দেবেন আর দু-বছর মাসে মাসে তিন-শ টাকা ক’রে বিলেতের পড়ার খরচ পাঠাবেন, এই কড়ারে নাকি ছেলে রাজী হয়েছে। কি জানি ভাই, সত্যি কি মিথ্যে!

নীরজা বলিল—এ আর আশ্চর্য্য কি? আজকাল পাস-করা শিক্ষিত ছেলেদেরই ত ইঁকটা বেশী। মনে করেন, পাস ক’রে যেন সকলের মাথা কিনে নিয়েছেন। আমরা যেন মুখ্য মেয়ে, আমাদের জন্যে টাকার দাবি তবু মানায়, তোদের মতন পাস-করা মেয়ের জন্যেও টাকা চাইতে লজ্জা করে না ওদের?

সুনন্দার মুখ লজ্জার, অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে কি নির্বুদ্ধিতা করিয়াছে, কেন সে পিতার নিকটে সম্মতি দিল? বাবা বলিলেন, সব ঠিক হইয়াছে, তারিখ পর্য্যন্ত। মায়ের কাছে কিছু বলিতে যাওয়া অসম্ভব। কেন সে পিতাকে নিজের অসম্মতি জোর করিয়া বলিতে পারিল না? সুবীজকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে ত সুনন্দাকে ভালবাসিয়া বা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেছে না। সে বিলাত যাইবার টাকা চায়। যদি সুনন্দার বাবা অর্থ দিতে সমর্থ না-হইতেন তবে কি সে সুনন্দাকে বিবাহ করিত? অর্থের মূল্যে আজ সে নিজেকে বিক্রয় করিতেছে? কোথায় গেল তাহার আদর্শ, কোথায় গেল তাহার শিক্ষা? যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার হৃৎকেন্দ্রে, অপমানে, ক্রোধে দেহ মন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সাজ-সজ্জা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল।

কেবল মনে হইতে লাগিল, এখনও কি কোন উপায় নাই?

বন্ধুরা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল তাহার মনে কোন সংগ্রাম চলিতেছে। অরুণা বলিল—কেন ভাই, তোরা ওসব কথা এখন তুললি? দাখ ত ওর মনটা কি রকম বিমর্ষ হয়ে গেল? মেয়েদের কত রকম

আশা, আকাঙ্ক্ষা, মতামত গ'ড়ে ওঠে, কিন্তু সে-সব কি আর পূর্ণ হয় কোনদিন? ছেলেবয়সে মানুষ কত স্বপ্ন দেখে, কত আদর্শের পূজা করে, বাস্তব-জগতে যখন জেগে ওঠে, তখন সে-সব কোথায় মিলিয়ে যায়, ভেঙে-চূরে যায়! মেয়েমানুষের নিজস্ব ব'লে কি কিছু বজায় থাকে? কিছু না—কিছু না। সুনন্দা, তুই ভাই বিয়ের কনে, ও-রকম গোমড়া-মুখ ক'রে থাকলে চলবে না। ও কি, চোখে জল কেন? চন্দনের ফেঁটা মুছে বাবে বে? ঐ বুঝি বর এল—শাঁক বাজছে, চল সবাই বারাণ্ডায় গিয়ে দেখে আসি। সুনন্দা কাঁদিস্ না কিন্তু। আর হাসি ফুটতে দেবি হবে না, বরের মুখ দেখলে।

* * *

অন্দরের শান-বাঁধানো উঠানে বরকে দাঁড় করান হইয়াছে। চারি দিকে মেয়ের ভিড়, স্ত্রী-আচারের জ্ঞত এয়োস্ত্রীরা ডালা-কুলা-হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় এক জন মহিলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওমা কনে কেন এখানে? যাও যাও তুমি ঘরের ভিতর, একি সব বেহায়া কাণ্ড!”

সুনন্দা সকলকে ঠেলিয়া সোজা বরের নিকটে আসিয়া বলিল, “মিঃ দাস, একবার এই দিকের ঘরে আসবেন? বিশেষ কথা আছে।”

সুধীন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিল—এখন কি কথা? আপনি ঘরে বান, পরে হবে।

সুনন্দা কঠিন স্বরে বলিল, “পরে নয়, এখনই প্রয়োজন, আপনি না-গেলে আমি এখানেই বলছি শুনুন—আপনি আমার বাবার কাছে একটি পয়সাও দাবি না-ক'রে আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না, আমি এখনই জানতে চাই।”

সুধীন্দ্র বলিল—ওসব বিষয়ে আমার কোন স্বাধীন মতামত নেই, সব আমার দাদা জানেন। আপনি কি পাগলামী করছেন, সকলে কি ভাবছেন বলুন ত!

সুনন্দা বলিল, “আমি আবার বলছি—আপনি যদি বিনা-পণে আমাকে আপনার জীবনের সহযাত্রী ক'রে নিতে সম্মত থাকেন, তবেই আমাদের বিয়ে সম্ভব, নইলে আমি এ-বিয়েতে প্রস্তুত নই।”

সুধীন্দ্র বলিল—আমার দাদার অহমতি বাতীত আমি কোন কাজ করতে পারি না, আপনি আমার ক্ষমা করুন।

“তবে আমারও ক্ষমা করবেন আপনারা” বলিয়া সুনন্দা সবেগে বিবাহ-সভার মধ্য দিয়া ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

সুধীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া উঠানে বসিয়া পড়িল। বর্ষীয়সী মহিলাগণ “আহা আহা! পুরুষমানুষের একি অপমান গো! অস্ত্র ছেলে হ'লে লাথি মেরে মেয়েটাকে দূর ক'রে দিয়ে চলে যেত” ইত্যাদি সাঙ্ঘনা-বাক্য বলিয়া সুধীন্দ্রের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যুবতী মেয়ের দল মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল—“বাবা মেয়ের কি তেজ!” সুনন্দার মা ভাঁড়ার-ঘরে ব্যস্ত ছিলেন, খবর পাইয়া উঠানে আছড়াইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন।

সভার তত ক্ষণে সকল সংবাদ পৌছিয়াছে। ইন্দুবাবু একটা হাঁহর বন্ধুবান্ধব ফিগু বরযাত্রীদের শান্ত করিতে ব্যস্ত! রমানাথ বাবু সুধীন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গাড়ীতে উঠাইয়া বসাইলেন। বাইবার সময় ইন্দুবাবুকে অভ্যর্থনা কিছুর জন্য হাইতে জট করিলেন না।

সুনন্দার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সে বিবাহ-আসরে প্রবেশ করিয়াই পিতাকে খুঁজিয়া না-পাইয়া পাগলের মত রাস্তায় বাহির হইয়া গিয়াছে! দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া সে কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে নিজেই জানে না। পিছন হইতে কে যেন বলিল—“কোথায় যাচ্ছেন মিস্ দে, বলুন কোথায় যাবেন, আমি পৌছে দেব!”

সুনন্দা ফিরিয়া বলিল—সুবিমল বাবু! আপনি আমার রক্ষা করুন, আমার আর কোথাও স্থান নেই; কোথায় যাব বলুন। আমি বা করেছি, এর পর আমার বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন, সমাজ, কেউ আমাকে ক্ষমা করবেন না, জানি।

সুবিমল সম্মুখে একখানি গাড়ী দেখিয়া ডাকিয়া সুনন্দাকে হাত ধরিয়া গাড়ীতে বসাইল। তারপর বলিল, “আপনি এখন এত উত্তেজিত, এখন কোন কথা বলা চলে না। কান্নটা উত্তেজনার বেশ ক'রে ফেলেছেন এমনই,

যার ধাক্কা সামলান সোজা ব্যাপার নয়। আপনার মা, বাবা, আপনাকে না-পেয়ে আরও ব্যস্ত হবেন, চলুন ঘাই ওখানে।

হুনন্দা বলিল, “না, না, ওখানে কিছুতেই নয়। আমি এ-বিষয়ে কিছুতেই করব না। আমাকে আমার মামার বাসায় পৌঁছে দিন, আমি একটু বিশ্রাম চাই।”

হুমিল হুনন্দাকে তাহাদের গৃহে লইয়া গিয়া একখানা সোফায় বসাইল এবং পাখাটা খুলিয়া দিল। হুনন্দা কিছু ক্ষণ মাথাটা তাকিয়ার উপর রাখিয়া চোখ বুজিয়া রহিল।

হুমিল বলিল—আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

হুনন্দা বলিল—বিশেষ নয়, মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে, আপনি যাবার সময় আমার আয়টাকে ভিতর থেকে একটু ডেকে দিয়ে যাবেন?

হুমিল বলিল—আমি যাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, তবে ওঁরা আপনার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন, তাই ভাবছি খবরটা দিয়ে আসি।

হুনন্দা বলিল—আপনি কি আমাকে তৃণা করছেন এরকম কেলেঙ্কারী করলাম বলে?

হুমিল বলিল—তৃণা! মোটেই না, আপনার মনের বলকে আমি শ্রদ্ধা না-ক’রে পারছি না। আমি মনে করি It is never too late to mend. ভুল বুঝতে পারা মাত্রই শোধরাণোর চেষ্টা করা উচিত। মনের বিকলতা নিয়ে কোন কাজই করতে নাই, আর এত সারাজীবনভরা সমস্তা! তবে আমি আশা করেছিলাম আপনার মত শিক্ষিত মেয়েরা আরও একটু সাহসী এবং বিবেচনাশীল হবেন। নিজের মতামত, নিজে বা বিচার দ্বারা সত্য বলে বুঝবেন, তা প্রকাশ করা এবং নিজ মতে দৃঢ় থাকার নৈতিক সাহস চাই। অল্প কয়েক দিন আগে আপনি যদি এ-বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত অসম্মতি জানাতেন, তবে আজকের এই অতি অশোভন ব্যাপারটি ঘটত না। যাক—আমি আবার নীতি উপদেশ দিয়ে ফেলছি, ক্ষমা করবেন। আপনি বিশ্রাম করুন, উঠবেন না একেবারে, এই প্রতিশ্রুতিটুকু দাবি করতে পারি কি?

হুনন্দা কৃতজ্ঞতা-ভরা কক্ষণ কোমল দৃষ্টিতে হুমিলের দিকে চাহিয়া বলিল—নিশ্চয়ই। আপনি আমার গুরু,

আপনার ঋণ শুধতে পারব না। হুমিল হাত বাড়াইয়া দিতেই হুনন্দা আগ্রহে হাতখানি ধরিয়া বলিল—আপনি আজ আমায় বা দিয়েছেন—কি বলব? এমন বন্ধুর সহায়তা পেলে জীবনে ভুল হয় না বোধ হয়।

হুমিল হুনন্দার কোমল স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—হাতখানি একটু চাপিয়া বলিল—নেবে কি তোমার জীবনসঙ্গী ক’রে? আমি ত এক বৎসর আগে তোমায় যেদিন প্রথমে দেখেছি, সেদিন থেকেই তোমায় ভাল-বেসেছি। হুনন্দা, আজ এই সাজেই আমাদের মালা-বদল হয়ে যাক না।

হুনন্দা মালাটি খুলিয়া হাতে লইয়া বলিল—মা-বাবার আশীর্বাদ চাও তবে।

আয়া এক পেয়ালা গরম কাফি হাতে ঘরে প্রবেশ করিয়া হুমিলকে ও হুনন্দাকে ঐ ভাবে দেখিয়া বিস্মিত হইল। টেবিলের উপরে পেয়ালাটি রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। এমন সময় দরজায় গাড়ী থামিল। ইন্দুবাবুর গলার আওয়াজ শুনিয়া হুমিল নীচে নামিয়া গেল। ইন্দুবাবু বলিলেন—এই যে হুমিল, হুমু নাকি বাড়ি এসেছে?

হুমিল বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠুকে রাস্তার একা ছুটতে দেখে আমি গাড়ী ক’রে বাড়ি এনেছি। এত ক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছেন। সরলাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া ইন্দুবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “বরপক্ষ ত তখুনি গালি-গালাজ ক’রে বর উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। বরের এক আত্মীয় বলে গেলেন, “ডিফামেশন স্যুট আনবে।” আমার ত লোকমান বা হ’ল তা বলবার নয়, মেয়েটিরও আর গতি হবে না। মুখ দেখাবে কি ক’রে সংসারে তাই ভাবছি।”

গৃহিণী কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, “আমার পোড়া অদেউ, নইলে এমন মেয়ে পেটে ধরি? এখন রেঙ্গুন শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালাতে পারলে বাঁচি। ঐ পোড়ারমুখীকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, এম-এ পড়ুক গিয়ে, চাকরি ক’রেই ত আজীবন খেতে হবে!”

কর্তা গৃহিণী ঘরে আসিয়া বসিয়া একটু শান্ত হইলে

পর সুবিমল বলিল—“এস হুনন্দা, আমরা মা-বাবাকে প্রণাম ক’রে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।”

হুনন্দা সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া সুবিমলের পাশে দাঁড়াইল এবং দু-জনে একত্রে মা-বাবাকে প্রণাম করিল।

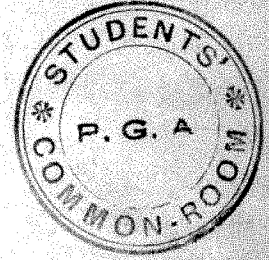
ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিতেই সুবিমল বলিল—আমাদের দু-জনের মিলিত জীবনে আপনার আশীর্বাদই সব চেয়ে বড়। মা, আপনিও অনুমতি দিন।

সরলা বলিলেন—ও মা, তুমি যে বদীর ছেলে, কি ক’রে আমাদের মেয়ে নেবে?

সুবিমল বলিল—মা, ভগবানকে দাক্ষী ক’রে আমরা দু-জনে মিলিত হব, সমাজের নিয়ম না-ই বা মান্লাম!

ইন্দুবাবু বলিলেন—তাহ’লে কাল একবার ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসে এ-সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে হবে। একটা আইনের আশ্রয় ছাড়া দাঁড়াতে কোথায়, বল?

গৃহিণী হাসিমুখে কর্তার কানে ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিলেন—“আমি জানতুম, সুবিমল হনুকে ভালবাসে। আমারও ছেলেটিকে বেশ পছন্দ ছিল। তবে সমাজে আর থাকতে পারলুম না!”



মিলের অভাব

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কৃষকের ডাকি বলিলেন বাবু

মিষ্টমুখে,—

“জীবন তোদের কাটাস্ নাকি রে

অপার মুখে?

তোদের মুখের কথা যে কবিতা

করেন গান—”

কৃষক বলিল,—“অনাহারে মোরা

ক্লিষ্টপ্রাণ!”

গ্রামবাসীদের ডাকিয়া বলিল

শহরবাসী,—

“তোমরাই ভোগ কর প্রকৃতির

রূপের রাশি;

প্রকৃতির রূপ শহরে মোদের

নাই যে, হার—”

তাহারা বলিল,—“ম্যালেরিয়া ভুগে

প্রাণ যে যায়!”

গ্রাসাদ-মালিক কুটীর-মালিকে

বলিল ডাকি,—!

“কত স্থখ তুমি পাও বল দেখি

কুটীরে থাকি?

কবিতা বলেন, কুটীরগুলিতে

শান্তি ভরা—”

উত্তর এল,—“ভল-ঝড়ে হেথা

বাঁচিয়া মরা!”

কবির কাব্যে এমনি কত কি

আছে যে লেখা,—

বাস্তব সাথে সে কল্পনার

হয় না দেখা।

হতাশ হইয়া ভাবিতেছি ব’সে

আজিকে তাই,

বাস্তবে আর কবির কাব্যে

মিল যে নাই!

২২. ১০. ১৩৩২. ১৩
১৯৮০

থাইবার-সীমান্তে

শ্রীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, সেই থাইবার স্ফক্ষে দেখবার আকাজ্ঞা বহুদিন হতেই ছিল; এবার পূজার ছুটিতে যখন লক্ষ্মী-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের ছাত্রদের উত্তর-ভারতের মুঘল স্থাপত্য দেখাবার জন্ত রওনা হলাম, তখন স্থির ক'রে ফেললাম যে থাইবার অবধি পাড়ি দিতে হবে—ভাগ্যে বাই ঘটুক। ছাত্রেরা আনন্দে সন্মতি দিলে, মনে হ'ল তাদের কাছে থাইবার আগ্রার তাজের চাইতেও বেশী লোভজনক। আমাদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর তিন জন অধ্যাপক ছিলেন, শ্রীমুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ও মিষ্টার এফ-টি-রয়, তাঁরাও আমার মতই সীমান্ত-প্রদেশ দেখবার জন্ত সমুৎসুক। অতএব আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি দেখার পরই সদলবলে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করা গেল।

নৈশ অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের আলোকোজ্জ্বল প্লাটফর্মের এসে দাঁড়াল, আমরা সত্যি সত্যিকার হয়ে উঠেছিলাম। থাইবারের তলদেশে অবশেষে এসে পৌঁছেছি এই উল্লাসে ও তৃপ্তিতে তখন আমরা মশগুল। ভ্রমণের ক্লান্তি, অবসাদ ও বিরক্তি বেন এক নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। পেশোয়ার-প্রবাসী আমাদের একটি মুসলমান ছাত্র বাসোপযোগী একটি বাড়ি আমাদের জন্ত কালীবাড়ি অঞ্চলে আগে থেকেই স্থির ক'রে রেখেছিল—সেইখানেই আমরা আস্তানা নিলাম। ছাত্রটির পিতা মিষ্টার আহমাদ-সার খাঁ স্থানীয় মিলিটারী-বিভাগে চাকরি করেন। তিনি অতি সদাশয় ও ভদ্র ব্যক্তি। তাঁর অতিথি-সৎকারের আয়োজনে আমরা যেমন বিস্মিত তেমনই প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। পেশোয়ারে যে-ক'টা দিন আমরা ছিলাম তিনি সর্বদা আমাদের সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

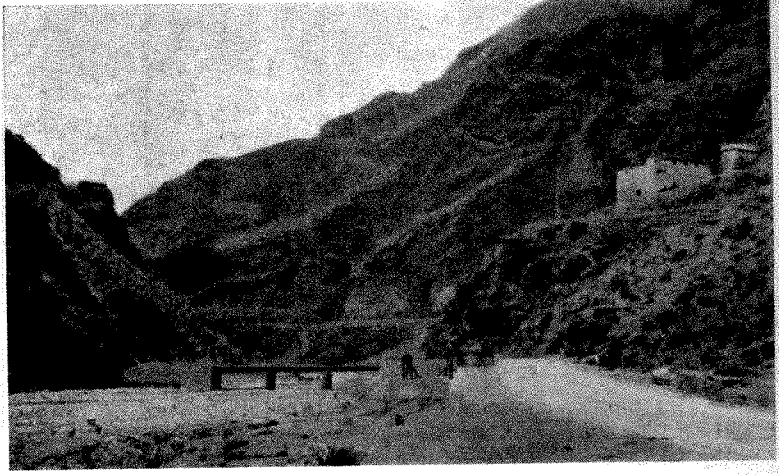
রেখেছিলেন ও স্বয়ং আমাদের সেবার তৎপর থাকতেন। মুসলমান আতিথেয়তা, সভ্যতা ও রীতিনীতির একটি খাঁটি প্রতীক স্বরূপ তাঁকে আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

পরদিন সকালে একটি ভাড়াটে মোটর-বাস্ রিজার্ভ করা হ'ল তাতেই আমরা প্রাতরাশ সেরে থাইবারের পথে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে বাস্ চলল, প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তা। দূরে শৈলশ্রেণী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের তোরণদ্বারের রক্ষীর মত। ছ-ধারে বিস্তৃত উপত্যকাভূমি—যার বৃক্কের ওপর দিয়ে অতীত যুগ হ'তে কত অসংখ্যবার শত্রু ভারত আক্রমণ করেছে। অল্পক্ষণ পরেই আমরা কাঁটাতারের বেড়া পার হলাম। এখানে বলা আবশ্যক, পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টের চারি দিকে সম্প্রতি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে সীমান্তবাসীদের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজন হ'লে তা তড়িৎযুক্ত করা যায়। মাঝে মাঝে যে প্রবেশ-পথ বা ফটকগুলি আছে তা রাত্রি নিয়মিত ভাবে বন্ধ করা হয়। রাত্রি তার বাহিরে যাওয়া নিরাপদ নয়, সীমান্ত-প্রদেশের এমনি আপৎসঙ্কুল অবস্থা।

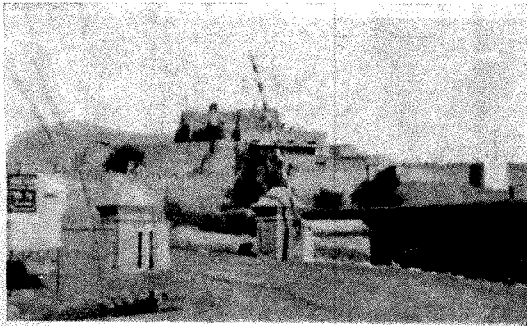
পথে ইসলামিয়া কলেজ দেখা গেল। এ-প্রদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এইটি। মনোরম ও বৃহদায়তন উদ্যানের মাঝে প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি সমস্ত উপত্যকার মাঝে একটি দর্শনীয় জিনিষ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই কেন্দ্র হয়ত দূর ভবিষ্যতে এই দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সহিত জীবনের ধারা পরিবর্তিত ক'রে দেবে। তবে যুদ্ধবিলাসী হৃদয় পাঠান কবে যে বন্ধু ছেড়ে কেতাব পছন্দ করবে তা বলা শক্ত।

পেশোয়ার থেকে দশ মাইল পরে বিখ্যাত জামরুদ-হুর্গ। স্বনামধন্য শিখ-সেনাধ্যক্ষ হরিসিং নালবা কর্তৃক

এই দুর্গ নিশ্চিত হয়। রণজিৎ সিংহের সেনানী হরিসিং নালবার নামে এক সময়ে সীমান্তবাসী ভয়ে কম্পমান হ'ত, এখনও এ-দেশের পাঠান-জননী দুরন্ত শিশুকে ঘুম-পাড়াবার সময় “হরিয়্য”র নাম করে, এইরূপ প্রবাদ আছে। জামরুদ থেকে খাইবার-গিরিপথের প্রারম্ভ ; সেই জন্ত এখানকার দুর্গের প্রয়োজনীয়ত্ব সহজেই অনুমেয়। এইখানে পথের উপর একটি প্রকাণ্ড ফটক



খাইবার-গিরিপথের একটি দৃশ্য



জামরুদ-দুর্গ ও পথের ফটক

আছে—সন্ধ্যায় বন্ধ করা হয়, তার পর এ পথে বাওয়া-আসা নিষিদ্ধ। জামরুদে সরকারী কর্মচারী আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য প্রভৃতি জিজ্ঞাসা ক'রে যাবার অনুমতি দিলে, ও বিকাল সাড়ে পাঁচটার ভিতর বে আমাদের অবশ্য ফেরা উচিত সে-বিষয়ে আমাদের সচেতন ক'রে দিলে।

জামরুদ থেকে বাস্ ক্রমশঃ পাহাড়ের পথে ছুটে চলল, আঁকাবাঁকা দুর্গম গিরি-বন্য শৈলশিখরের গা বেয়ে চলেছে। সে এক অভিনব দৃশ্য। চারি দিকে একটা রহস্যপূর্ণ নিস্তরঙ্গতা, শুধু মাঝে মাঝে কাবুলগামী দু-একটি বাস্ পথের সেই মৌনগাভীর্ষা ফণেকের তরে ভেঙে দিচ্ছিল। পথের পাশে কখনও বা দূরে দেখা যায় খাইবার রেলের লাইন মেথলার মত পাহাড়ের কটিতট ঘিরে রয়েছে। কয়েক মাইল চড়াই ওঠার পর সাহগাই-দুর্গ দেখা গেল।

এটি আধুনিক ব্রিটিশ দুর্গ, ইহাতে বৃহৎ সেনানিবাস আছে। কাছেই সাহগাই রেল-স্টেশন, সেটিও একটি দুর্গবিশেষ ও তার প্রাচীরগুলি সুরক্ষিত। এই স্থানটি সমুদ্রতীর থেকে প্রায় এক হাজার ফুট উচু। এর পর ক্রমশঃ পথ একে-বেকে উপরে উঠেছে—স্থানে স্থানে শৈলশিখরের ওপর ছোট ছোট সেনানিবাস। শোনা গেল, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি খাসাদার-সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত ও বাকীগুলিতে ব্রিটিশ ফৌজ আছে। প্রত্যেক শিবিরে বেতার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে ও তিন মাসের উপযোগী রসদ সর্বদা ভর্তি থাকে। এই ছোট ছোট ফাঁড়িগুলির দ্বারা খাইবার-গিরিপথ আগাগোড়া রক্ষিত হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

সাহগাই ছাড়িয়ে আমরা বণিকদের একটি উল্লেখ্যবাহিনী দেখলাম,—অসংখ্য উষ্ট্র, বলদ, গর্দভ প্রভৃতি মাল-বোঝাই হয়ে চলেছে মন্বরগতিতে পেশোয়ার অভিমুখে। মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে দ্রব্যসামগ্রী তারা এমনি করে প্রাচীন যুগ হ'তে ভারতে বহন ক'রে আসছে। শুনলাম সীমান্ত-প্রদেশে প্রবেশ করবার পূর্বে নিদ্বারিত স্থানে সরকারী নিয়মানুসারে বণিকদলকে নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র বন্দুক প্রভৃতি জমা রাখতে হয়, তার পর তাদের জামরুদ অতিক্রম করতে দেওয়া হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় তারা সেগুলি ফেরত পায়। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক



খাইবার-গিরিসঙ্কট

হবে না যে, পেশোয়ারের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে মধ্য-এশিয়ার সহিত এই বহির্বাণিজ্যের ওপর। পারশ্ব, আফগানিস্তান প্রভৃতি থেকে কার্পেট, মেওরা, ফল, প্রভৃতি আমদানি হয় ও পেশোয়ার থেকে তা সমগ্র ভারতে প্রেরিত হয়। এই বৈদেশিক বণিকেরা আবার পেশোয়ার থেকে ভারতের দ্রব্যসম্ভার আহরণ করে নিয়ে যায়। বাতে এই বাণিজ্য দুরন্ত সীমান্ত-বাসিগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত বা লুণ্ঠিত না-হয় সেজন্য সরকারী ফৌজ ও থাসাদারদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

নিবিড় গিরিশ্রেণী ছ-ধারে উন্নতশিরে আকাশ পানে চেয়ে আছে—পথ যেন সংকীর্ণ ও ভয়াবহ মনে হয়। অদূরে রেলের লাইন সাহগাই-এর পর হুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছে। পাশে গভীর খাদ, তার তলায় শীর্ণ খাইবার-নদী দেখা যায়। মাথার ওপর কৌজশিবির স্থানে স্থানে পথ রক্ষার জন্ত অবস্থিত। একটু পরেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলিমাসজিদ-দুর্গ ও গিরিসঙ্কট। এইখানে রেলপথ অনেকগুলি হুড়ঙ্গ ভেদ ক'বে খাড়াই হয়ে লাণ্ডিকোটাল অভিমুখে গিয়েছে। পথের সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। প্রকৃতির এক ধ্যানস্তিমিত বিরাট রূপের সন্ধান মেলে এখানে, তা যেমন হৃন্দর, তেমনই ভীতিজনক। পাহাড়ের গায়ে গাছের নামমাত্র নেই—শুধু নগ্ন পাবাণশিলা ও কোথাও বা মাত্র কণ্টকশূন্য দেখা যায়, তা সত্ত্বেও সমস্ত দৃষ্টে এমন

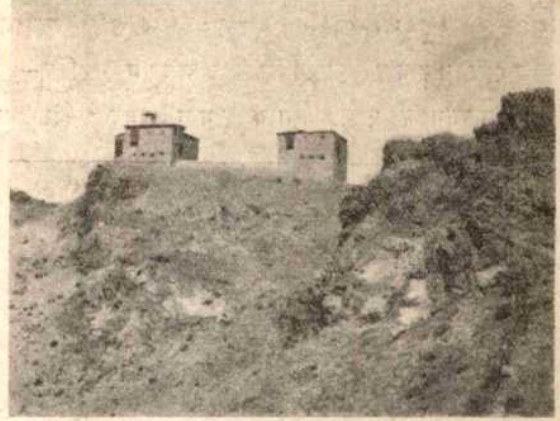
একটা অব্যক্ত গাভীর্ষ্য আছে যা সহজেই মনকে অভিভূত করে। হঠাৎ চোখে পড়ে দূরে সুরক্ষিত দুর্গসদৃশ আফ্রিদিদের গ্রামসমূহ। প্রত্যেক গ্রাম উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা, ও তার মাঝে একটি ক'রে উঁচু বুরুজ দেখা যায়। অপর গ্রামবাসীদের সহিত যখন বিবাদ বাধে, তখন সেই বুরুজ থেকে গ্রামস্থ লোকে পালা ক'রে পাহারা দেয়।

আলিমাসজিদ পার হওয়ার পরেই খাইবার-গিরিসঙ্কট চোখের

সম্মুখে ভেসে উঠে। ছ-পাশে হুঁচক গিরিশৃঙ্গ যেন পরস্পরে কোলাকুলি করবার জন্ত অগ্রসর—মাঝ দিয়ে সাপের মত সরু লিকলিকে পথ পাহাড়ের তলা বেয়ে দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে। সেইটিই হচ্ছে খাইবার-গিরিসঙ্কটের অন্তস্তল। স্থানটিতে আলো-আঁধারের যেন লুকোচুরি খেলা চলে। শৈলশৃঙ্গে এখান একটি দুর্গ রয়েছে। এই দুর্গ থেকে শুধু গিরিপথই রক্ষিত হয় না, দূরে তীরা, মোহমান্দ, প্রভৃতি প্রদেশেও নজর রাখা হয়। পথ এর পর খাইবার-গিরির উচ্চতম প্রান্তে এসে পৌঁছায়, যেখানে লাণ্ডিকোটাল-দুর্গ ও সেনানিবাস অবস্থিত। লাণ্ডিকোটাল সমুদ্র থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। এখানকার দুর্গ ও শিবির সমস্ত খাইবার প্রদেশ ও ভারতের প্রবেশদ্বারকে রক্ষা করছে। লাণ্ডিকোটাল-দুর্গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্মিত—এর সুরক্ষিত প্রাচীরগুলি দেখবার মত জিনিষ। দুর্গের বহির্ভাগে বড় বড় গুদাম ও বাজার। গুদামগুলিতে গুনলাম সব সময়ে তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য ও অত্যন্ত মাল মজুত থাকে। যুদ্ধ বা বিদ্রোহ বাধলে, বা কোন কারণে খাইবার অবরুদ্ধ হ'লে ফৌজের বহুদিন খাদ্যাভাব হয় না।

লাণ্ডিকোটালে দলের অনেকেই স্থানীয় পোষ্ট-অফিসে থাম পোষ্টকার্ড কিনে আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে চিঠি লিখলেন। এখানে আসাটা স্মরণ রাখবার জন্ত। বাসের চার ধারে পাঠানরা বিরে দাঁড়াল, তাদের চক্ষে আমরা যেন এক

অপরূপ জীব। এইখানে কাবুল থেকে আগত অনেকগুলি মালবাহী বাস দেখা গেল, একটি থেকে আমরা কাবুলী খরমুজ বা সরদা কিনলাম খুব সস্তায়। সরদার হুমিষ্ট আসাদ খাঁর জানেন তাঁদের অধিক বলা নিশ্চয়োজন। লাণ্ডিকেটাল থেকে বাস চলল ভারতের সীমান্তের অভিমুখে। এখান থেকে পথের উৎরাই আরম্ভ হয়। ঈষৎ বক্রগতিতে গিরিপথ পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে যেন গড়িয়ে চলেছে। শীঘ্রই লাণ্ডিখানা সেনানিবাস দেখা গেল—এটি আপাততঃ পরিত্যক্ত হয়েছে। লাণ্ডিখানা থেকে আরও ক্রোশখানেকের পর বাস টোরখান নামক পল্লীতে এসে দাঁড়াল—এইটাই ব্রিটিশ ভারতের সীমানা। পথের উপর প্রকাণ্ড ফটক—তার এক দিকে সশস্ত্র ব্রিটিশ খাসাদার-গ্রহরী, অপর দিকে দুটি আফগান সৈনিক—মাথায় তাদের লোহার হেল্মেট, যদিও পরনের পোষাক দেখে শ্রদ্ধা হ'ল না, তা এমনই শ্রীহীন ও দারিদ্র্যবাজক। কাবুল-রাজ্যের দৈন্ত ও



শৈলশিখরে ছোট ছোট সেনানিবাস

ছবি তোলাতে সাগ্রহে সম্মত হ'ল। ফটকের পাশে আমাদের একটি 'গ্রুপ' ফোটো তোলা হ'ল। ফটকের এক পাশে একটি ইস্তাহার দেখা গেল—সেটি বাংলায় অনুবাদ করলে এইরূপ দাঁড়ায়।—

“ভারতের সীমান্ত—

পাসপোর্টের নিয়ম না মেনে যাত্রীগণের এই নোটিশবোর্ড অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।”

ফটকের দক্ষিণ দিকে একটি উচু টিলা আছে, সেখানে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম ও সরদাগুলির সন্ধ্যাবহার করা গেল। দূরে চোখে পড়ে জালালাবাদ ও কাবুলগামী মোটর-বাস একটির পর একটি আসছে বা যাচ্ছে। কাবুল সরকারের পেট্রোলবাহী বাস অনেকগুলি চোখে পড়ল, কারণ শুনলাম প্রতাহ পেশোয়ার থেকে পেট্রোল কাবুলে পাঠানো হয়। টোরখান পাহাড়ের মাঝে উপত্যকাবিশেষ। এইখানে এক পাশে ভারতবর্ষের সীমানা, অপর দিকে কাবুল-রাজ্যের আরম্ভ। স্থানমাহাত্ম্য এমনই যে মনের ভিতর একটা অপূর্ণ বিস্ময় ও আনন্দের ভিড় লেগেছিল। নিজের দেশকে এমন ভাবে এর পূর্বে কখনও অনুভব করি নি—যেমন সেদিন দেশের সীমানায় এসে করতে পেরেছিলাম। সেই নির্জন নিস্তর স্থানে সকলেই কেমন যেন আনুগত্য হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কানে এল বাস-চালকের চীৎকার, —“বাবু দেরি করবেন না, জাম্বুদের ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।”

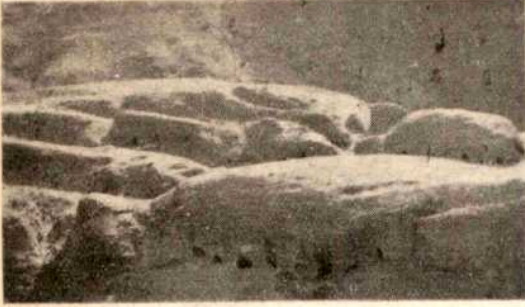


খাইবার-পথে রেল

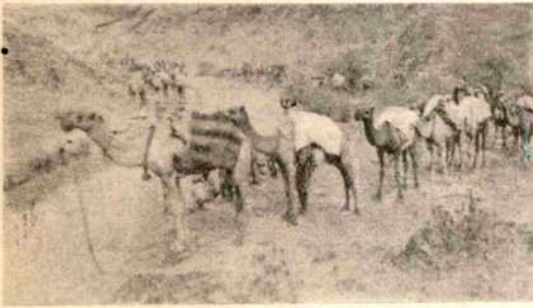
বিশৃঙ্খলা যেন তাদের আকারে ও পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। আকৃতিতেও তারা মোটেই বলিষ্ঠ বা দীর্ঘ নয়। ক্ষীণাকৃতি বাঙালীকে সামরিক সাজে ধ্বংস দেখায় অনেকটা সেইমত তাদের বোধ হচ্ছিল।

আমাদের দলের কয়েক জন তাদের ফোটো তুলতে চাইলেন, কিন্তু তারা ইঙ্গিতে অসম্মতি জানালে। বন্ধুবর শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ও মিষ্টার এফ. টি. রয় কিন্তু কৌশলে তাদের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্রিটিশ খাসাদার-গ্রহরী কিন্তু বেশ সপ্রতিভ ও অমায়িক লোক, আফগান সৈনিকদের মত অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর নয়। সে সঙ্গিত ভাবে আমাদের সহিত আলাপ করলে, ও আমাদের সহিত

বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি সকলে বাসে এসে বসলাম। স্থানটি ছেড়ে আসতে মন কেমন করছিল; তার ওপর কাবুলের পথ যেন বার-বার হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছিল—সে আহ্বান আমাদের দলের অনেকেই মনে এমনই গভীরভাবে



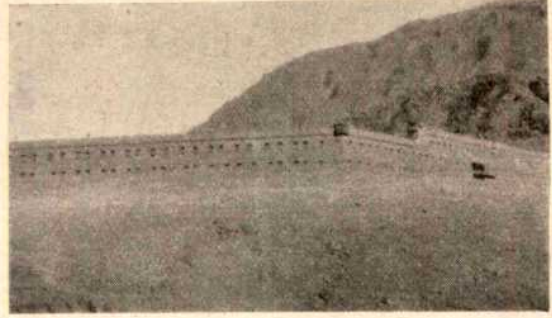
খাইবার-পথে গিরিগহা



বণিকদল ও উষ্ট্রবাহিনী

বেজেছিল যে তাঁরা সোৎসাহে প্রস্তাব করেছিলেন, “কাবুল গেলে কেমন হয়?” কিন্তু বলা যত সহজ, কার্য্যতঃ ততটা নয়। পাসপোর্ট জোগাড় করতে সময় লাগে অনেক, এবং যথেষ্ট হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। তার ওপর শোনা গেল, এ-সময়ে কাবুল বিদেশীর পক্ষে নিরাপদ নয়, যেহেতু নাদির শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের অবস্থা খুবই অশান্ত ও সঙ্কটময় যাচ্ছে।

ফেরবার পথে আমরা লাণ্ডিকোটালের বাজার দেখলাম। মন্দ নয়। মিষ্টার আহমাদ-রার খাঁ আগে থেকে এখানে তাঁর এক সহকর্মীকে টেলিফোনে ব’লে রেখেছিলেন— তাঁরই সুব্যবস্থায় চা-পান ও জলযোগ সমাধা করা গেল। আমাদের নতুন বন্ধু মিষ্টার আবহুল বাকী খাঁ যত্নসহকারে লাণ্ডিকোটালের প্রায় সমস্তই দেখিয়ে দিলেন। অবশ্য



সাহগাই-দুর্গ

সময় অল্প ছিল ব’লে দুর্গের ভিতর যাওয়া হয় নি। চা-পানের পর আমরা পেশোয়ার অভিমুখে রওনা হলাম। এবার সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক হলেন মিষ্টার আবহুল বাকী খাঁ স্বয়ং। তিনি বহুদিন যাবৎ এদেশে রয়েছেন, কাজেই অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট, তিনি পথে খাইবারের সমস্ত র্ত্তাস্ত ও খুঁটিনাটি আমাদের সম্যক্রূপে বোঝাতে লাগলেন। সে-সমস্ত কথা স্থানাভাবে এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে সীমান্তের পার্শ্ববাসীদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা সংক্ষেপে এখানে বলা অমুচিত হবে না।

সীমান্তবাসীদের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বা একই গোষ্ঠীর ভিতর রেবারেযি ও বিবাদ সর্বদাই লেগে আছে বললে অত্যাুক্তি হয় না। তুচ্ছ কারণে শোণিতপাত তাদের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যাপার। লোকেরা সাহসী, নির্ভীক ও বেপরোয়া,—জীবন নিয়ে তাদের চিরন্তন খেলা। এর মূল কারণ অবশ্য তাদের দারিদ্র্য। অহুর্কর পার্শ্বদেশের ও নিশ্চয় পারিপার্শ্বিকের মাঝে তারা শান্তিশিষ্ট জীবনযাপন করবার সুযোগ বা প্রেরণা পায় না, সেই জন্যই সীমান্ত দেশে রক্তপাত, বিদ্রোহ, লুণ্ঠন, মাছুষচুরি প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এই অশান্তি অনাদি ও অনন্ত বলেই মনে হয়, এর প্রতীকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না, অন্ততঃ যত দিন না এ-অঞ্চলে সভ্যতার আলোকপাত ঘটে।

পাঠানদের নৈতিক জ্ঞান যতই নিম্নস্তরের হোক, তারা তিনটি বিষয় অবশ্যকর্ত্তবা মনে করে। প্রথম, তারা

আশ্রয়প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করে না; দ্বিতীয় অতিথি নিদারুণ শত্রু হ'লেও তার যথোচিত সংকার করে; তৃতীয়, অপমানের প্রতিশোধ নিতে তারা জীবনে ভোলে না। পেশোয়ার-প্রবাসী বাঙালী কংগ্রেস নেতা ডাঃ চাক্রচন্দ্র বোষ মহাশয়ের সহিত আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়। তিনি বহুকাল পাঠানদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তাঁর মত এই যে, পাঠানদের লোকে যতটা খারাপ



টোরখান, সীমান্তে বিজ্ঞাপন

ব'লে মনে করে, ততটা মন্দ তারা নয়। মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ ও মিষ্টার আহমাদ-রাহা খাঁ কিন্তু বলেছিলেন, “বোষ-মহাশয় ডাক্তার মালুম, রোগের চিকিৎসা করেন বা বিপদে মুক্তহস্তে সাহায্য করেন সেই জন্তই পাঠানরা তাঁকে খাতির করে স্বার্থের বশে।” বাই হোক, সাধারণ পাঠান যে অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ ও নির্ভর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ বলেছিলেন যে, তিনি এমন অনেক ঘটনা জানেন যা শুনে আমাদের বিশ্বাসে অবাক হ'তে হয়। পারস্পরিক বিবাদে পাঠানরা শত্রুপক্ষীয় শিশুদের বা মেয়েদের গুলি ক'রে মারতে কুণ্ঠিত হয় না—এমনি তাদের দারুণ বৈরনির্যাতন-প্রবণতা। প্রতিশোধগ্রহণার্থ তারা শত্রুকে কন্যাদান পর্যন্ত করে, পরে নিমজ্জিত জামাতাকে স্রবোণ পেয়ে কোশলে হত্যা করে—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে—এরূপ ব্যাপার মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁ অনেক দেখেছেন। শত্রুতা ও হত্যার জের এমনই ক'রে বংশানুক্রমিকভাবে চলে—এর অবসান কখনও কখনও অর্থদ্বারা ক্ষতিপূরণ করার পর হয়ে থাকে। আজকাল হত্যার পর নির্দারিত একটা মূল্য দেওয়ার প্রথা ক্রমশঃ প্রচলিত হচ্ছে। পথে আমাদের সহিত মিষ্টার আবদুল বাকী খাঁর পরিচিত এক আফ্রিদি ‘মালিক’-এর সহিত দেখা হ'ল—তিনি নিজের মোটর নিজেই চালিয়ে পেশোয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে অতি ভদ্র ও শিক্ষিত



সীমান্তে খাসাদার প্রহরী

ব'লে মনে হ'ল। পরে কিন্তু শুনলাম ইনি অনেকগুলি নরহত্যা করেছেন স্বহস্তে—তবে প্রত্যেক বার টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে ভোলেন নি। গ্রামে গ্রামে, পরিবারে পরিবারে, বংশে বংশে বিবাদ বাদে হয় “জন্” (স্বর্ণ), বা “জন্” (স্ত্রীলোক), বা “জমীন” (ভূমি) নিয়ে। কোন কোন গোষ্ঠীতে নিজেদের ভিতরই এত রেষা-রেবি যে তারা



আমাদের দলের কয়েক জন

অপর গোষ্ঠীর সহিত ঝগড়া বাধাবার, বা শত্রুতা করবার অবসরই পায় না। সাধারণতঃ স্বগোষ্ঠীয়দের ভিতর ঐক্য সহজেই স্থাপিত হয়, কারণ প্রত্যেক গোষ্ঠীর “জিৎগা” বা সমিতি সর্বদা শান্তিরক্ষার চেষ্টা করে।

পাঠান ছুনিয়ায় ভয় ও শ্রদ্ধা করে একমাত্র তাদের মোল্লাদের ও ধর্ম্মে বিশ্বাস তাদের প্রগাঢ়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর কতকগুলি ক’রে মোল্লা থাকে, তারা যেমন গৌড়া, তেমনই ধর্ম্মাঙ্ক—তাদের প্রতিপত্তিও অপরিময়। তাদের প্ররোচনায় ধর্ম্মের নামে সীমান্তে কত যে বিদ্রোহ ও রক্তপাত আজ অবধি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মোল্লাদের একটি কথায় সীমান্তবাসী ধর্ম্মযুদ্ধের জন্ত প্রাণত্যাগ করতে কাতর হয় না। কাজেই মোল্লারা তাদের একাধারে পুরোহিত ও নেতা।

আমরা একটি বিষয় সকলে লক্ষ্য ক’রে বিস্মিত হয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে, কোন পাঠানকে আমরা বন্দুক-ছাড়া দেখি নি। প্রত্যেকের নিজস্ব বন্দুক বা রাইফল আছে। বারা অর্থশালী ‘মালিক’ তাদের পিস্তলও থাকে। এগুলি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হয়। ছোট ছোট ছেলেদের হাতেও বন্দুক দেখলাম। মিষ্টার আবছল বাকী খাঁ বললেন আজকাল পাঠানরা এমন-সব বন্দুক নিজেরা তৈরি করছে, যা বিলাতী বন্দুকের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। আমাদের দলের একটি ছাত্র কয়েকটি পাঠানের সহিত আলাপ ক’রে তাদের বন্দুক পরীক্ষা করলে। তার মুখেও শুনলাম যে এত বড় চোঙ ও ছিদ্র-যুক্ত রাইফল সে কখনও দেখে নি। আগে এ-দেশের লোকে সাধারণতঃ ব্রিটিশ

সেনাদলে ভর্তি হয়ে বন্দুক চুরি করত, বা হুধোগ পেলে লুণ্ঠ করত। সামরিক-বিভাগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হওয়ায় পাঠানরা পারশ্ব উপসাগর থেকে আনা বন্দুক অসম্ভব রকম মূল্য দিয়েও কিনতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি অনেকে নিজেরা বন্দুক ও রাইফল প্রস্তুত করছে। মিঃ আবছল বাকী খাঁ নিজে একটি বন্দুকের ঝুঁকারখানা দেখেছেন



আজিদি পাঠান

বললেন। ডাক্তার ঘোষ মহাশয়ও এই রকমের কারখানা অনেকগুলি জানেন বললেন। তিনি আমাদের একটি দেখাবার জন্তও প্রস্তুত ছিলেন। তবে সময়াভাবে ও বিপজ্জনক ব’লে আমাদের তা দেখা সম্ভব হয় নি।

সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা জামকদের

ফটক পার হয়ে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম নিরাপদে ও বাহাল-তব্বিতে ফিরে আসার আনন্দে। তার পর সকলে বথন শ্রান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় বাসায় এসে উপস্থিত হলাম, তখন শুধু এই কথাই মনে হয়েছিল যে, এমন দিনের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় চিরদিন সঞ্চিত থাকবে। সীমান্ত-রক্ষণ-নীতির যে চিরন্তন ও বিচিত্র সমস্তার কথা এত দিন কেবল বইয়েই পড়া ছিল, সে-সম্বন্ধে বাস্তবের সহিত আংশিক পরিচয় কম লাভের কথা নয়।

ভারতের লিপিসমস্যা

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত মাসের 'প্রবাসী'তে ভারতের লিপিসমস্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার বাংলা বর্ণমালার স্থলে রোমান বা ইংরেজী বর্ণমালা গ্রহণের পক্ষপাতী, কারণ বাংলা বর্ণমালা অপেক্ষাকৃত জটিল। ইহার পূর্বেও কেহ কেহ বাংলার পবিত্র বোমান বর্ণমালা প্রচলনের সপক্ষে আলোচনা করিয়াছেন।

লিপিসংস্কারের এই আন্দোলন নূতন নহে। শত বর্ষ পূর্বেও কেহ কেহ লিপিসংস্কারের এবং দেশীয় বর্ণমালা স্থলে বোমান বর্ণমালা প্রচলনের আবশ্যিকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এমন কি অনেকগুলি বাংলা পুস্তকও সে-সময় রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। লিপিসংস্কার সম্বন্ধে এই-সব আলোচনা প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' নামক সংবাদপত্রে। ১৮৩৪ সনের ২ই আগষ্ট তারিখের 'সমাচার দর্পণে' রোমান বর্ণমালা প্রচলনের সপক্ষে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হয়; প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

(সমাচার দর্পণ, ২ আগষ্ট ১৮৩৪/২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে।

যে সকল ব্যক্তি সপক্ষ দূতরূপ ধরনের কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গালা ও অন্তঃ ভারতবর্ষীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিবার উপায় সকলকে নিবেদন কর গিয়াছে কিন্তু অনেকেই ইহা করিয়া হইবে ও কি নিমিত্তে হইবে ইহার স্বার্থ তাৎপর্য্য বোধ করেন নাই এপ্রযুক্ত তাঁহাদেরিগের মূগোচর অল্প সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে অতএব এই নিবেদন যে এতদেশীয় বিদ্বৎ ও পণ্ডিত মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা কর্ণ প্রদান করেন।

প্রথম ঐ নিবেদনের মর্ম্ম এই যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গালা ইত্যাদি ভাষার বাক্য ও শ্লোক অথবা ঐহিক বেবনাগরী ও পারস্য অথবা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত না হইয়া সকলি ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা যায়। অর্থাৎ কিম্বা এ একটি হিন্দুস্থানী কথা নাগরী অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Kisi).....পারস্য অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লিখিত হয় (Bapoo) ও "পিতাকে" বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Pita'ko) এইপ্রকারে অল্প সমুদায় এতদেশীয় ভাষার ভাব্য শব্দ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয়। এইরূপে এক ইঙ্গরেজী বর্ণমালা সর্বত্র প্রচলিত হইলে তদ্বারা ভারতবর্ষীয় ভাষ্য বর্ণমালায় যে কার্য্য হয় তাহা হইবে।

অতএব ইহা বোধ্য যে এমত নিবেদন এতদেশীয় লোকদিগের প্রতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহারা কি বহুকালাবধি এক ভাষার শব্দ অল্প ভাষার অক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন না। এবং এ বিষয় হাড়ী মজুর ধাড়ী ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যাতিরেকে কি অল্প সকলে জ্ঞাত নহেন। ইহার প্রমাণ হিন্দুস্থানী কথা পারস্য অক্ষরে সচরাচর লিখিত হয় বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে ইহা চলন অধিক আছে এবং নাগরী অক্ষরে পারস্য ও আরবী কথা লিখিত হয় এবং উরদু ভাষা অর্থাৎ পারস্য ও হিন্দুস্থানীমিশ্রিত যে ভাষা তাহা প্রায় পারস্য অথবা নাগরী অক্ষরে লেখা যায়। তবে কিম্বা এতদেশীয় সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা হইতে পারিতে না। তন্নিম্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চল্লিকাসম্পাদক কুলীন মহাশয় ও মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং অন্তঃ বিদ্বৎ ও মান্ড ব্যক্তির সংস্কৃত কথা ও শ্লোক ইত্যাদি কি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া থাকেন না। তবে তাঁহারা কিম্বা সংস্কৃত শ্লোক ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিবেন না। এই অক্ষর দেশাধ্যক্ষদিগের ভাষার বর্ণ এবং এ ভাষা অসীম জ্ঞানভাণ্ডারপ্রযুক্ত অতিশয় বিখ্যাতহওয়াতে ইহাতে বিভ্রাট জন্মিলে মনুষ্য উত্তম ও জ্ঞানী ও প্রধান এবং কথ্যপণ্ডিত হয়।

যেহাঙ্গু অনায়াসে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে তাহার দুই এক দৃষ্টান্ত এখানে লিখিলাম।

সংস্কৃত শ্লোক নাগরী অক্ষরে লিখিত।

নাগরী অক্ষরে।

অনেকসংশয়োচ্চেদি পরাম্ভার্থস্য দর্শক।

সর্বস্য জ্ঞানং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যংঘ এব সঃ ॥

বাঙ্গালা অক্ষরে।

অনেক সংশয়োচ্চেদি পরাম্ভার্থস্য দর্শক।

সর্বস্য জ্ঞানং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যংঘ এব সঃ ॥

রোমান অক্ষরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক।

Aneka sanshay oohchhodi paroxsharthasya darshakang
Sarvasya jnanang shastrang yasya nasyandha ova sah,

...

...

...

দ্বিতীয় ঐ নিবেদনকরণের তাৎপর্য্য এই যে তাহা মনুষ্যদিগের উপকারক হয়।

কেহ বা অজ্ঞানতার দ্বারা এবং কেহ বা কটিলতা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ব দেশীয় ভাষা পরিভাষ্য কবিবাতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে বৈরতি ও ক্রোধ উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই বিবেচনা বিপরীত সেই তাহার স্বার্থ তাৎপর্য্য জানিবেন এই পরামর্শের প্রধান কারণ এই যে এতদেশীয় মনুষ্যদিগের স্বদেশীয় ভাষা বিজ্ঞাত্যাসের পথ স্থগণ করিলে ঐ ভাষা রক্ষা পাইয়া সর্বত্র প্রবল হয় এবং তদ্বারা তাঁহারা লভ্য শ্রাণ হন বর্ণমালা সম্বন্ধেই লিপির কারণ এক বর্ণমালা স্থির হইলেই মনুষ্যদিগের

অন্তঃকরণে বৈরতি থাকিতে পারে না বরং ইহাতে তাহাদের ভাব্য বৈরতির নিবারণ হয়।

যদি এক ব্যক্তি উদ্ভানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকে এবং তাহার প্রতিবাদী ঐ সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবা একটি নিষ্প্রবৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে তবে তাহার এমত প্রার্থনা অবশ্য ক্ষতিজনক হইবে কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবা প্রতিবৎসর বহুফলদায়ক একটি উত্তম আশ্রবৃক্ষ সেই স্থানে রোপণ করিতে চাহে তবে কি তাহার এমত প্রার্থনা ক্ষতিকারক হইবে। তাহা বখানো নহে বরং সকলে ঐক্যপূর্বক কহিবে যে ইহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা নাই বরং স্বার্থ লভ্য হইবে। পূর্বোক্ত প্রার্থনারও ঠিক এই ভাব জ্ঞানিবেন। এমত ইচ্ছা নহে যে কোন সামান্য বর্ণমালা প্রবৃত্তকরণের দ্বারা অল্প সমস্ত এতদেশীয় বর্ণমালার লোপ করা যায় এ কারণ প্রার্থনা ভাল নহে কিন্তু বাহ্য! এই যে-বর্ণমালার দ্বারা অসংখ্য লভ্যের উৎপত্তি হইতে পারে এমত একটি বর্ণমালা নিষ্করণ করণের দ্বারা অল্প সকল বর্ণমালার নিবারণ হয়। যে অল্প সমস্ত বর্ণমালা একত্রিত হইলেও তাহাতে সম্ভাবনা হয় না এমত লভ্যজনক যে বস্তু তাহাকে অবশ্য উত্তম বলিবা! মাস্ত্র করিতে হইবে এ বিষয়ে যেন তোমাদিগকে কেহ আর না ভুলায় এ কারণ ঐ প্রার্থনা-হইতে যে লভ্য উৎপত্তি হইবে তাহার কিয়দংশের ব্যাখ্যা করা বাইতেছে। আমরা জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত হিন্দুস্থানীয় মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি তাহারা প্রবণ করিয়া ইহার বিচার কন।

১ এতদেশীয় অনেক বর্ণমালাতে পঞ্চাশ বর্ণ এবং প্রায় অসংখ্য মূল বর্ণ আছে ইহাতে শিক্ষকদের অতিশয় বৈরতি ও বিলম্ব জন্মে কিন্তু এই ভাব্য বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অবলু বর্ণের দ্বারা প্রতিবাসিত হইতে পারে কেবল মধ্যে এই চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয়। এমতে ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস অতি দ্রুত এবং অনায়াসে হইতে পারে।

২ হাঁহা কক্ষোপযুক্ত ও খাতাপন্ন এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করেন তাহাদিগের ইঙ্গরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক হয়। ইহাতে যদি তাহারা বালককালে আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া তৎপরি ইঙ্গরেজী লেখা পড়া করিয়া আসিতে থাকেন তবে তাহারা অত্যন্ত কালে এবং অনায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন।

৩ ইঙ্গরেজী বিদ্যা উপার্জন ব্যতিরেকে অনেক ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করা হিন্দুস্থানস্থ লোকের আবশ্যক কিন্তু ইহা উত্তম রূপে বিদিত আছে যে নূতন বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক কালক্ষেপ হয় এবং স্বীয় ভাষার দ্বারা সেই নূতন অক্ষর লেখাতে তৎপর হইতেও অনেক কাল অপেক্ষা করে কিন্তু সর্বত্র ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের চরম হইলে মহাশয়দিগকে বহু কালীন নিষ্প্রবৃক্ষ পরিগ্রহ করিতে হইবে না।

৪ এতদেশীয় সকল ভাষার মূল সংস্কৃত কিন্তু সংপ্রতি প্রত্যেক ভাষার বর্ণের পৃথক আকার হইয়াছে এই প্রকৃষ্ট এ দেশের হিন্দু লোক অসংখ্য কবে যে অল্প দেশীয় হিন্দুদের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথক এমত প্রকারে তাহারা পরস্পর আপনাদিগকে ও বিদেশীয় উন্নীত জ্ঞান করে। এইক্ষণে যদি এ সকল দেশীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে দেখা যাইবে ও স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহারা পরস্পর এত বিশেষীয় উন্নীত নহে ও তাহাদের আদি ভাষাও এক এবং যে প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য আমরা এইক্ষণে কহিতে অক্ষম এবং এত ভিন্ন জাতীয় বর্ণের সত্রা নিত্য অসম্ভব বোধ হয় এমন তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য এ রূপে হইবে।

৫ সংস্কৃত হইতে প্রায় সকল হিন্দুস্থানস্থ লোকের ভাষার উৎপত্তি জ্ঞানিবেন একারণ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে এক ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইলে অল্প প্রত্যেক ভাষার বহুতর শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন অতএব যদি সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে কোন পণ্ডিত

কিবা মুন্সি কেবল এক কিবা দুই তিন বিদ্যা বর্তমান কালের দ্বারা উপার্জন না করিয়া অনায়াসে ভাব্য হিন্দুদিগের ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে। যে প্রার্থনা দ্বারা এক আধারে এ রূপ সমূহ গুণ-বাণ হয় তাহাকে অবশ্য উত্তম প্রার্থনা কহিতে হইবে।

৬ ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা স্বার্থরূপে পরিবার এবং নামাধি ও বিশেষ ভাবি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে কিন্তু হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের স্বভাব ও আকার-হেতুক ইহা তত্ত্বাবধানে হইতে পারে না। তবে যদি ইঙ্গরেজী বর্ণে ঐ সমস্ত ভাষা লেখা যায় তবে এমত কল্পনা দ্বারা সহস্র হিন্দুস্থানীয় বালকদিগের আপন ভাষা লিখিবার ক্ষমতা অকল্পনীয় উপকার হয়। তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন এবং ভিন্নতা ও আশ্চর্য-বোধক চিহ্ন এবং পরের লিখিত কি কথিত বাক্যবোধক চিহ্ন ইত্যাদি মুদ্রিত কি লিখিত পুস্তকে সহজে পাঠ করিবার ও ঝটতি অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই কিবা যদিও থাকে তথাচ সে সম্পূর্ণরূপে নহে। এই সকল এই রোমাণ অক্ষরে অনায়াসে সেওয়া যাইবে এবং তাহাতে কালক্ষেপ না হইয়া কালের রক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং এই উপকারব্যতিরেকে যে অল্পকালেতে হিন্দুস্থানীয় ভাষাসকল কোনপ্রকারে স্বৈর্য কিবা অলঙ্কারবিশিষ্ট হইতে পারিবে না এই উপকার দ্বারা সেই অল্পকালেই তাহা অনায়াসে হইতে পারিবে।

৭ ইহা বাস্তবিক বটে যে বেল্লপ ইঙ্গরেজী অক্ষর ক্ষুদ্র অক্ষর স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতে পারে তজ্জন হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের অনেকেরি মূলতাপ্রকৃত ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ইহাতে মুদ্রাক্ষিতকরণে দ্বিগুণ কাগজ এবং প্রায় দ্বিগুণ মূল্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ নগরী পাবনী ইত্যাদি অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রাক্ষিত হয় তাহার ব্যয় ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাক্ষিত গ্রন্থ হইতে প্রায় দ্বিগুণ হয়। অতএব এমত পথে প্রবৃত্ত হওনে বালকদিগের পিতা মাতারা কি সন্তুষ্ট হইবেন না। এই মতের দ্বারা তাহাদিগের সন্তানের বিদ্যাভ্যাসজনক কেবল অল্পের মূল্য গ্রন্থ পাইতে পারিবে এবং যে মতের দ্বারা প্রত্যেক বালকের পিতার প্রতিবৎসবে এত টাকা বাঁচিবে সে মত কি এপ্রদেশের মধ্যে অতিউত্তমরূপে গণ্য হইতে পারিবে না।

৮ বহুবিধ বর্ণপ্রকৃষ্ট এদেশীয় ভাষার অভ্যাসবিষয়ে অতিশয় কঠিন-হওয়াতে তদ্বিদ্ভাব অক্ষর বর্ণরূপান্তরাদি অপ্রকাশ রহিয়াছে তন্নিমিত্ত জ্ঞানরূপ ধন বাহাতে বর্জ্য তাহা অগোচর হইয়াছে সে কেবল ইউরোপীয় মহাশয়দিগ হইতে নহে কিন্তু এদেশীয় মহাশয়দেরও হইতে জ্ঞানিবেন। এদেশীয় কোন ব্যক্তি বরং কোন ভট্টাচার্য ও পণ্ডিত যিনি সহস্রমহোপাধ্যায়রূপে বিখ্যাত তিনিও যেপরিচয় এতদ্বিধ বর্ণের ব্যবহার থাকিবে সেপরিচয় কখন আপন পূর্বপুরুষের লিখিত শাস্ত্রের দশমাংশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এবং আশ্চর্য ইতিহাস ও অলঙ্কারশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র ও আত্মশিক্ষা ও জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমাণবিকবিদ্যা যাহা পূর্বে জ্ঞানবান্ লোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন যদি এইক্ষণে কোন পণ্ডিত তাহার দশমাংশও জ্ঞাত হইতে অক্ষম হন তবে ইহাতে আরও দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকের কি সন্দেহ করিবে না যে হিন্দু লোকেরদের বিদ্যা কখন হয় নাই। তাহারা অবশ্য এমত সন্দেহ করিবে তবে এ সন্দেহ কিপ্রকারে নিবারণ হইতে পারে এবং সকল দেশের মহাশয়দিগকে কিপ্রকারে জ্ঞানান যাইতেও পারে যে হিন্দুদিগের এত রাশি শাস্ত্র লিখিত আছে; কিন্তু তাহা এইক্ষণে বন স্বল্প বহুবিধ নূতন এবং নানারূপ বর্ণের ব্যবহারের দ্বারা অবিস্মৃত আছে। এইক্ষণে এইমত কল্পনা করা যাইতেছে যে যদি হিন্দুস্থানীয়দিগের ইচ্ছা হয় তবে তাহাদিগের সমুদায় শাস্ত্র একইপ্রকার অক্ষরে লেখা যায় এবং সে অক্ষর সর্বত্র বিখ্যাত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা

ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিল্প ও পণ্ডিত লোকসিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে।

যদি হিন্দুগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপনঃ বিশেষঃ অক্ষর তাগ করিয়া ইংরেজী অক্ষর স্বীকার করেন তবে কেবল ইংরেজ লোকের সমুদয় বর্ধন করিবেন। তাহার প্রমাণ এই যে সন্দেশ ও জগৎ টক্ট ইত্যাদি বিশেষ অক্ষরেতে ইংরেজ লোক আপন ভাষা লিখিতেন কিন্তু ক্রমেঃ সে সকল অক্ষর দূর করা গেলে রোমান অক্ষর অর্থাৎ যে অক্ষর এইক্ষণে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে সেই অক্ষর অল্পঃ তাবৎ অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহার করা গেলে তাহাতে সেই সময়ের সেই অক্ষরের পরিবর্তনে কি ইংরেজী পুস্তকসকল লুপ্ত হইয়াছে এমনত বোধ করা যায় নয় বরং যে অক্ষর ইউরোপীয় তাবৎ লোক চিনিতে পারিল সেই অক্ষর ঐ সকল পুস্তক প্রকাশিত হইবে প্রবৃত্ত তাহা আরও ক্ষুদ্ররূপে বিখ্যাত হইল এবং অদ্যাবধিও পুরাতন অক্ষরেতে যে ঐ লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক জ্ঞাত করাইবার কাহারও প্রয়োজন হয় সেই পুস্তক তাহার রোমান অক্ষরে পরিবর্তন করে তাহাতে প্রায় স্রজতর নীমাপর্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোক তাহা জ্ঞাত হয়। এই কারণে যদি কেহ এই পরামর্শমুতাবে অক্ষরে পরিবর্তনের বোধ করে তবে তাহাকে তুমি এই উত্তর দেও যে এই স্রজতর মধ্যে অধিক সভ্য ও সর্ববিস্তারিত ইংরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া বখার্ব পাইয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞানি লোকেরদের বিচার কি কর্ণের ভ্রান্তভ্রম স্থির করা যায় না।

অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি অসুমান করেন যে এই বর্তমান কল্পিত নকশাব ব্যবহার হইলে হিন্দুশাস্ত্র অস্পষ্ট থাকিবে এবং তৎপ্রযুক্তকারিগের গুণেরও বিবচনা হইবে না কিন্তু ইহার দ্বারা তাহা না হইয়া তাবৎ হিন্দুশাস্ত্র উত্তমরূপে স্পষ্ট হইতে পারিবে এবং তৎপ্রযুক্তকারিগের উচিত সন্ময় ও মর্যাদা হইবে। অক্ষরের পরিবর্তন হইলে কথায় কিম্বা তারিখের অথবা নামের পরিবর্তন হইবে না। এদেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ও সমুদায় ইতিহাসসম্বন্ধীয় তারিখ এবং তাবৎ মনুষ্যের ও স্থানের এবং ঘটনাব নামের পরিবর্তন হইবে না এবং যেপৰ্যন্ত এই নকশাব ব্যবহার হইবে সেপৰ্যন্ত তাহার অপরিবর্তনীয় থাকিবে। যদি হিন্দুগণ বখার্বরূপ প্রার্থনা করেন যে তাহার আদ্য অধিককাল অজ্ঞান ও মূর্খরূপে গণ্য না হন এবং পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যই জানেন যে তাহারদিগের এত আশ্চর্য্য রাশিঃ এই আছে তবে তাহারদিগের উচিত হয় যে তাহার শীঘ্র এক প্রধান সভায় একত্র হইয়া তাহারদিগের এই ইংরেজী অক্ষর লিখিতে ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে স্থির করেন। যদি তাহার ইহা করেন তবে তাবৎ হিন্দুস্থানীয় প্রযুক্তকারি উপযুক্ত জ্ঞানিতে পারগ হইবেন।

এ নিবেদনর বিষয়ে কাহারও যে কোন সন্দেহ না জন্মে তৎপ্রযুক্ত কোবার্টলি রিবিউ নাম গ্রন্থ বাহা গুত অস্ত্রাবর মাসে লণ্ডনেতে প্রকাশিত হয় তাহার প্ররোপ আমরা এ স্থানে করিতেছি। অনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত জানেন যে কেবল ইউরোপ দেশের মধ্যে নহে কিন্তু সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে এ গ্রন্থ অসিঃশ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থে বাহা উক্ত আছে তাহা শ্রবণ করুন “যদি সংস্কৃত ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইত তবে অনেক লোক নিদান সে বিদ্যা প্রধান সোপান পাইতে পারিত কিন্তু প্রথমই নূতন বর্ণের কঠিনত্বদর্শনে এ বিদ্যা উপাঙ্গনে তাহারদের উদ্যোগ ভঙ্গ হয়” এইক্ষণে হিন্দুগণের মধ্যে ইহারঃ জ্ঞানবান ও পণ্ডিত তাহারদিগের এই অভিলাষের এই উত্তম পথ খোলা আছে। যদি তাহার তাহাবদিগের সমস্ত গ্রন্থ ইংরেজী অক্ষরে লিখেন তবে তাহারদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা এবং ধর্ম সর্বত্র ইউরোপে এবং অল্প তাবৎ শিল্প দেশে বিখ্যাত হইবে।

তবে এমনত অল্প কে আছে যে এই বর্তমান কল্পিত নকশাব আশ্চর্য্য গুণ বিবেচনা করিতে অক্ষম হইবে।

হিন্দুদিগের বর্ণমালাব পরিবর্তে ইংরেজী অক্ষর লিখনের দ্বারা অনেক লভ্য হইবে তাহার কিম্বদঃশের বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে সে সমস্ত লভ্যের সংখ্যা সংক্ষেপরূপে লেখা বাইতেছে।

১ ইংরেজী বর্ণে লিখন দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুস্থানীয় লোকের স্বীয় ভাষা অভ্যাসের বখেষ্ট হ্রগম হইবে।

২ তদ্বাচা তাহার ইংরেজী শিখিবারও বখেষ্ট হ্রগম হইবে।

৩ তদ্বাচা তাহার ব্যবহার্য্য অনেক অল্পঃ দেশীয় বিদ্যোপাঙ্গন হ্রগম হইবে।

৪ হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে তদ্বাচা তাহার নিবারণ হইয়া তাহারদিগের পরস্পর অনায়াসে ঐক্য ও কথোপকথন ও লিপির দ্বারা আলাপ ও আপনঃ ইচ্ছা প্রকাশ সমুদায় দেশ হইবে।

৫ তদ্বাচা সামান্য কন্যাপুত্র ঘৈর্যাবলম্বি হিন্দুবা এদেশীয় প্রায় তাবৎ বিদ্যাত ব্যাপন্ন হইবে এবং তদ্বাচা তাহার অসংখ্য জ্ঞানি ও বংশের উপকার করিতে পারগ হইবে।

৬ তদ্বাচা বালক ও প্রাচীন ব্যক্তির কোন ভাষা বখার্বরূপে লিখিতে ও পড়িতে বিলম্ব পারগ হইবেন।

৭ ইহা হইলে বালকের প্রয়োজনীয় পুস্তকের মূল্য অনেক কম হওয়াতে প্রত্যেকের পিতা মাতার অধিক লভ্য হইবে।

৮ তাহাতে হিন্দুস্থানীয় তাবৎ পূর্বকালীন হিন্দু লোকেরদের কিং শাস্ত্র আছে তাহা জ্ঞাত হইবে এবং পূর্বকালের জ্ঞানি প্রযুক্তকারিদের জ্ঞান কত দূরপৰ্যন্ত তাহা স্রগঃসামাপর্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোকেরদের নিকটে প্রকাশিত হইবে।

অতএব প্রার্থনা যে অতিউত্তম তাহা এ সমস্ত বিবরণের দ্বারা যি সমগ্রণ হইবে না এবং তদ্বাচা যে এদেশীয় সমুদায় বখেষ্ট উপকার ও মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি এ সমস্ত বিবরণকর্তৃক হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে ইহার ইহাতে প্রতিবাদ আছে তাহার বিপক্ষ অভিপ্রায় না থাকিলেও কি এ দেশীয় মনুষ্যদিগের বিপক্ষ নহেন। এবং ইহার ইহাতে উদ্ভাসী তাহার কি তাহাবদিগের মিত্র নহেন।

আমরা মহাশয়দিগকে বিজ্ঞ জ্ঞানিরা নিবেদন করিলাম মহাশয়ের ইহার বিবেচনা করিবেন

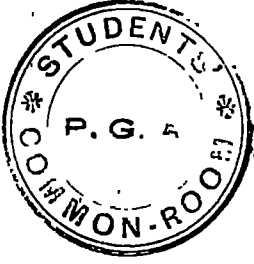
হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের পরমবন্ধু।

*. বঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ঐ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়েরা সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তাহারদিগকে জানান বাইতেছে যে কলিকাতার লালমুখার উত্তরপূর্বকোণে পুস্তকালয়কর্তা অষ্টেল সাহেবের নিকটে চিঠি লিখিলে কিম্বা তাহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্য পাওয়া বাইবে।

‘সমাচার দর্পণ’ সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব রোমান বর্ণমালা গ্রহণের অসুফুল ছিলেন না; তিনি এই আলোচনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

“বিশেষ অমূল্যধর্মের দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্তে ইংরেজী অক্ষর ব্যবহারকরণ বিষয়ে এতদেশীয় লোকেরদের প্রতি এক আবেদন পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম।...আমাদের সম্মত ক্ষিপ্র ও আমরা যদিও এতক্রপ অক্ষর পরিবর্তনের উচিতা বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে ঐ পত্র লেখকের প্রতিকূল বোধ হয় তথাপি ঐ নিয়মের পক্ষে যে অতিপ্রবল যুক্তিগত বাহ্যি কথা বাইতে পারে তাহার চূষক আমাদের পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রস্তাব

করণের যে এই সুযোগ হইল ইহাতে আমাদের পরমানন্দ আছে ফলতঃ এই নতুন নিয়মের দোষহীনক দুই এক পত্র পূর্বে আমরা দর্পণে প্রকাশ করিয়াছি এবং ঐ পত্র যত্বেও লঘুতর তথাপি তাহা প্রকাশ করণের এই উত্তর আমাদের দর্পণে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইল। যদিও এই নতুন নিয়মের দ্বারা এতদেশীয় ভাষা প্রচলিত অক্ষরের সমুলোৎপাটন না হয় তবু উদ্যোগীভার বলিয়া যে ঐ নিয়ম নিষ্পন্ন হইবে এমত কথা বাইতে পারে যায় না।”



সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু

শ্রীসীতা দেবী

মানুষের জীবনের নানা কর্মক্ষেত্রে, অর্থাৎ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম কান্ড করিতেছে দেখা যায়। এক রক্ষণশীলতার ধর্ম, আর একটি নতুনকে আহ্বান করিয়া আনার ধর্ম। এই দুইটিই প্রয়োজন আছে। সমগ্র-বিশেষে একটি আর একটির অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পুরাতন বাহা-কিছু তাহাই শুধু আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত তাহারই জয়গান করিলে যেমন চলে না, নতুন বাহা-কিছু তাহাকেই নির্বিচারে ডাকিয়া আনিগেও সেইরূপ চলে না।

আমাদের আজ বঙ্গসাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিবার দিন। সাহিত্যকে নানা দিক দিয়া দেখিয়া, নানাভাবে তাহার আলোচনা করিয়া অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি ইহার মধ্যে সংক্ষেপে খালি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। বাংলা-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় আজ আমরা কোন ধর্ম অবলম্বন করিব? পুরাতন বাহা ছিল, দ্বিধানাজ না করিয়া, তাহার দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে একেবারেই না-তাকাইয়া, ভিন্নদেশীয় সাহিত্যের সহিত তাহার তুলনামাত্র না-করিয়া, তাহাকেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব, না কোথায় ইহার অভাব, কোথায় ইহার ক্রটি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া সে ক্রটিগুলি মোচনের চেষ্টা করিব? সাহিত্যের ভাষা এবং সাহিত্যের বস্তু দুইটির বিষয়ই এখন ভাবিবার সময়

আসিয়াছে। সাহিত্যের ভাষা কি হওয়া উচিত তাহা লইয়া ত আজকাল যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। দারুণ সংস্কৃতগন্ধী পুরাতন যে বাংলা ভাষা আমরা শিশুকালে দেখিয়াছি, এবং এখনও মধ্যে মধ্যে দেখিতেছি, তাহাই কি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইবে, না, অতি হাল্কা ও পল্কা, মেরুদণ্ডহীন, প্রাদেশিকতাভূষ্ট অভিনব যে বাংলা ভাষার আজকাল আবির্ভাব হইয়াছে তাহাকেই যথার্থ বাংলা ভাষা বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে? উভয় পক্ষেই মহামহা রথী তর্ক করিতে প্রস্তুত আছেন। আমাদের মত বাহারি যুদ্ধে অকর্তীর্ণ হইতে নারাজ, তাহারি ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন এই তর্কযুদ্ধের ফলাফলেব জন্ত। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব একটা প্রাণশক্তি আছে, উহা কাহারও অপেক্ষা না-করিয়া কাজ করিয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে আমরা ঐ উভয় শ্রেণীর ভাষা ভিন্নও বাংলা ভাষার আর একটি রূপ দেখিতে পাইতেছি, বাহাতে কান্ড বেশ চলিয়া যাইতেছে, এবং বাহাকে লইয়া কোন ভুল তর্ক বাধিয়া উঠিবারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই ভাষার গঠনপ্রণালী পুরাতন বাংলার মত, কিন্তু শব্দসম্ভার এত গুরুভার নয়, সচরাচর যে-ভাষার আমরা কথা বলি, তাহার সহিত সাদৃশ্য ইহার অনেকটাই আছে। ইহা পড়িতে চক্ষু কাতর এবং মন ভারাক্রান্ত হয় না এবং শিশুদিগকে এই

ভাষা শিক্ষা দিতে গেলে পদে পদে ছোট খাইতে হয় না। শব্দের বানান-প্রণালীতেও বৈচিত্র্য ইহার মধ্যে তত খানি নাই, যত খানি আছে আমাদের আধুনিকতম বাংলা ভাষার মধ্যে। তবে ভাষার এই রূপটি লইয়া তুমুল তর্ক হয় না। লিখিয়াছি বটে, তাই বলিয়া ছোটখাট তর্ক যে নাই তাহা নহে। এ ভাষায় যত ক্ষণ প্রবন্ধ রচনা করা হইবে, তত ক্ষণ কোনো ভাবনা নাই, কিন্তু গল্প বা উপভাস লিখিতে গেলেই মহা গোলযোগ বাধিয়া যায়। গল্প-উপভাসের পাত্র-পাত্রীরা কথা কহিবেন কোন্ ভাষায়? যদি লেখ্য ভাষায় বলেন তাহা হইলে পড়িতে ভাল লাগে না, যথেষ্ট বাস্তবদৃশ (realistic) হয় না। যদি কথা ভাষায় বলেন তাহা হইলে কোথাকার কথা ভাষা ব্যবহার করিবেন? কলিকাতার ভাষা হইবে, না ঢাকার ভাষা হইবে এই লইয়া বিবাদ বাধিয় যায়। এক্ষেত্রে তর্ক করিয়া কিছু স্থির করা অসম্ভব, কারণ মানুষের মন তর্কের যুক্তিকে স্বীকার করে না, নিজের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য, এই নীতির অনুসরণ করাই নিরাপদ।

সাহিত্যের বস্তু লইয়াও চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার প্রভাব আজ বাঙালীর মনকে বিশেষরূপে বিচলিত করিয়াছে দেখা যাইতেছে। সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায় সর্বত্র পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোত আমাদের সনাতন বাহা-কিছু ছিল তাহা ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। এতটাই কি সম্ভব? ইহাকে বাধা দিবার কোনো চেষ্টাই কি করিতে হইবে না? এখন চিত্রকর আঁকিতেছেন ভিনাসের ছবি, কবি লিখিতেছেন আর্টিমিস (Artemis) ও হেলেন (Helen) সম্বন্ধে কবিতা, গল্পে এবং উপভাসে নায়ক-নায়িকারা ভুল বা ঠিক ইংরেজী ভাষায়, মধ্যে মধ্যে ফরাসী ভাষায়, কথা বলিতেছেন এবং তাহাদের চালচলনে, সাজসজ্জায়, এমন-কি প্রসাধন-দ্রব্যগুলির উৎকট বিজাতীয় নামে সকলকে চমক লাগাইয়া দিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন। আনন্দের বিষয় যে, এইরূপ আজগুবি সাহিত্য এখন পর্যন্ত একটি বিশিষ্ট দলের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, দেশব্যাপী মহামারী রূপে দেখা দেয় নাই। কিন্তু মহামারী উপস্থিত হইবার পূর্বে যেমন সতর্ক নগরবাসী

প্রতিবেশক সেবন ও টীকা লইবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, আমাদেরও সেইরূপ প্রতিবেশকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যের মোহে ভাসিয়া যাওয়ার বিপদ যতখানি, কেবল মাত্র প্রাচ্যকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিয়া, হুই-চোথ বুজিয়া বাহিরের বাহা-কিছু, সমস্তই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, তাহাতেও বিপদ কম নয়। আমাদের দেশ-স্বভাবতই রক্ষণশীল, নূতন সমস্ত-কিছুকেই অতি সন্দেহের চক্ষে দেখা আমাদের অভ্যাস। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অন্ধতার পরিচয় যথেষ্টই পাইতে হয়। সুতরাং ইহাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করা সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে নিরাপদ নয়। দেশ-বিদেশের সমস্ত জিনিষ সমান আদরে গ্রহণ না-করিয়া তাহার ভিতর হইতে মার জিনিষটুকু গ্রহণ করিয়া লইতে পাবিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কিন্তু সে ক্ষমতা আমাদের আছে কই? বাহিরের স্রোতকে আমরা এত ভয় করি যে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টায় নিজেদের ভাষার ও সাহিত্যের স্রোতের চারিদিকে মাটির বাঁধন দিয়া তাহাকে পানাপুকুরে পরিণত করিতেও আমাদের বাধে না। ফলে বাহিরের বিশ্বের সহিত সকল সম্পর্ক আমাদের দূর হইয়া যায়, সাহিত্যের সম্ভাবিতা নষ্ট হয় এবং সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ না হইয়া শ্মশানের ছবি হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য তাহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আপন খেলাল-খুশীতে মানুষ লেখে বটে, কিন্তু সাহিত্যিকের ব্যবসায়ে দারিদ্র্যও আছে অনেকখানি। সাহিত্যই যে সকল জীবনকে অনুসরণ করিয়া চলে তাহা ত নয়, জীবনও মধ্যে মধ্যে সাহিত্যকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত ভিন্নদেশেও দেখা গিয়াছে, আমাদের দেশেও একেবারে দেখা যায় নাই, এমন নয়।

রবীন্দ্রনাথ “গোরা” লিখিবার আগে, “গোরার” মত ভাষায় কোনো যুবককে কথা কহিতে আমরা শুনি নাই, বা তাহার মত দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখিতেও কোন মানুষকে দেখি নাই। সূচরিতা বা ললিতার মত মেয়েও যে ঘরে ঘরে দেখা বাহিত তাহা নয়। কিন্তু মধ্যে এই যে কতকগুলি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে ত দেখিতেছি বইয়ের পাতা হইতে

এই মানুষগুলি মাটির পৃথিবীতে নামিয়া, চলিয়া কিবিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা গোরা, হুচরিতা, ললিতাব নিঃং ফোটোগ্রাফ না হইলেও, একই জাতের যে মানুষ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ছুঁড়াগোর বিষয়, সংসারে ভাল জিনিষের অনুকরণের বহু পূর্বেই মন্দ জিনিষের অনুকরণটা আরম্ভ হয়। তাই আধুনিকতম লেখকদের এক দল যে অতি বিকৃত ও অতি অসার কতকগুলি নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহাদেরও অনুকরণে ঐরূপ স্ত্রীপুরুষ গড়িয়া উঠিয়াছে ও দেশের ছুঁড়াগব্যবৃত্তি: এদিক-ওদিকে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে গল্পের পাতায় যখন এই সব অতি-আধুনিক ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন হাসিয়াই উড়াইয়া দিতাম যে এ রকম জীবের আবির্ভাব আমাদের দেশে অসম্ভব। কিন্তু ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, "Talk of the devil, and he appears," "শয়তানের কথা বলিতে-না-বলিতে শয়তানের আবির্ভাব হয়," আমাদেরও অবস্থা হইয়াছে তাই। ক্রমাগত শয়তানের কাহিনী বর্ণনা করিয়া করিয়া আমরা আজ শয়তানকে মর্ত্যলোকে সশরীরেই টানিয়া আনিয়াছি। ইহার অস্ত্র ঐ অসৎ ও অসার সাহিত্য একবারেই যে দায়ী নয়, তাহা কোনোক্রমেই বলা যায় না। সুতরাং

আজকাল সাহিত্যসেবী মাত্রকেই কলম ধরিবার পূর্বে ভাবিতে হইবে। নিজের সংসারে, ভাই-ভগিনী, পতি-পত্নী বা পুত্র-কন্যা রূপে যাহাদের কল্পনা করা অসম্ভব, সেইরূপ কতকগুলি অতি-বিকৃত চরিত্রকে ছাপার অক্ষরে চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছাটাকে যথাসাধ্য দমন করিয়া যাওয়াই উচিত। বস্তুতাত্ত্বিকতার (Realism-এর) নামে কত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক জিনিষই যে আজকাল সাহিত্যে স্থান পাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। বাস্তব (Real) ত অনেক জিনিষই। ভদ্র, শ্রীল, ও সৎ হইলেই সে জিনিষগুলির বাস্তবতা কিছু নষ্ট হইয়া যায় না। তবে সেগুলি বাদ দিয়া যত অভদ্র ও অশ্রীল বাস্তবের প্রতি এত পক্ষপাত কেন, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মাদ্রাস ইন্ডিয়ান (Mother India) কুখ্যাত লেখিকা মিস্ মেয়াকে যে-কারণে মহাত্মা গান্ধী নর্দমা-ইন্সপেক্টর (Drain Inspector) বলিয়াছিলেন, সেই কারণেই এই ধরনের বাস্তব চিত্রের চিত্রকরদের নর্দমা-ইন্সপেক্টর এবং পাগলাগরদের পরিদর্শক বলা চলে। যাহা লিখিব তাহা চিরকাল শুধু কাগজেব উপরে ছাপার অক্ষরে থাকিয়া যাইবে না, মহাশয়মাঝে মুষ্টি ধবিয়াও বিচরণ করিবে, এই সম্ভাবনাটা আজকাল সকলেরই মনে রাখিয়া চলা ভাল।



রূপান্তর

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

অগ্নিমার দেহ যখন উঠানে নামানো হ'ল, বীরেশ্বরকে সারা বাড়িময় কোথাও পাওয়া গেল না। মৃত্যু-যজ্ঞগায় যখন অগ্নিমার মুখ বিবর্ণ হয়ে এসেছে, ঘন ঘন নাভিস্থাস উঠছে, ধীরে ধীরে পা দু'টো শক্ত হ'য়ে এল, তার পর হাত, তার পর ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ হ'য়ে আসছে হিমশীতল—এ দৃশ্য সহ্য করার মত শক্তি বীরেশ্বরের নেই। তাই তাঁকে সারা বাড়িময় কোথাও পাওয়া গেল না।

একথানা সাধা চাদরে অগ্নিমার দেহ ঢাকা হয়েছে, শুধু পা দুটি আর মুখখানি এবং একরাশ রক্ত চুল সেই মুখখানির দুই পাশে—এই দৃশ্য! এরোরা আলতা নিয়ে এসে পা দুটিতে মাখিয়ে দিলেন, সীঁথির উপর ঢেলে দিলেন সিঁদুর—মনে হ'ল যেন অগ্নিমার দেহ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে, লাল রঙটা এমনি জিনিষ!

‘ওরে, কাগজ নিয়ে আর রে, একথানা কাগজ নিয়ে আর, মা'র আমার ফটো নেই, পায়ের ছাপ-দু'টো তুলে রাখব! তবু কেউ বড় হ'য়ে বলতে পারবে, আমার মা'র পায়ের ছাপ!—কি বলো দিদি!’—অগ্নিমার শাওড়ীর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে এল।

‘ওগো, ঐ সিঁদুর আমাকে একটু দিতে পার? সতীলক্ষ্মী মেয়ের মাথার সিঁদুর, ওগো, দেবে একটুখানি?’

‘আ মর পাগলী, ছুঁস্ নে—ছুঁস্ নে, আমার কেউর অকল্যাণ হবে! যা, যা, স'রে যা, দিচ্ছি আমি সিঁদুর—যা সর এখন!’

কেউর বয়স তিন বছর, বীরেশ্বরের একমাত্র সন্তান, অগ্নিমার শেষ স্মৃতি। তার পর কতকগুলি বলগালী কণ্ঠের সমবেত হরিধ্বনি! নারীকণ্ঠের জন্মের রোল—তার পর অগ্নিমার দেহ ধীরে ধীরে তার ঘোবনের লীলানিকেতন থেকে চিরবিদায় নিল।

প্রতিবেশিনীরা ফুঁপিয়ে কাঁদছে গাছভায়া, টাদের

আলোর! অমন মেয়ে আর হবে না গো, আহা সতীলক্ষ্মী মেয়ে!

স্মশান থেকে ফিরে এসে বীরেশ্বরের মনের আশ্বস্ত আর নেবে না। অমন হৃদয় দেহ কি হ'য়ে গেল আশ্বস্তে, ফটু ফটু বাশ ফাটার মত সমস্ত দেহটা দেখতে দেখতে ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল, কত কণা বীরেশ্বরের মনে পড়ল—কত প্রেম, কত কাব্য ঐ দেহ নিয়ে। দূর ছাই, কি হবে আর সংসার ক'রে?

সেই থেকে বীরেশ্বর সন্ন্যাসী, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরণে গেরুয়া! মুখময় দাড়ি—চোখের দৃষ্টি উল্লাসী! মা আছেন যখন, তখন কেউর সম্বন্ধে চিন্তা কবাই বৃথা! আজ কাশী, কাল গয়া, পরশু হবিষ্কার—এই ভাবে বীরেশ্বর জীবন কাটাতে লাগল।

একবার হরিদ্বার থেকে বীরেশ্বর বাড়ি এলে পর, তার মা গোপনে চোখের জল মুছলেন। ‘আহা, ছেলের আমার কি চেহারা হয়েছে গো! এ দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না!’—ভাবতে লাগলেন তিনি আপন মনেই। মায়ের প্রাণ, এই বয়সে ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে সংসার ছেড়ে চলে যাবে—একথা ভাবতেও যে কেমন করে! বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে—কত সাধের সংসার!

মায়ের এই ভাবনা বীরেশ্বরকে বোধ হয় তার নিজের অজান্তসারেই আঘাত করতে লাগল। পবদিন দেখা গেল, সে দীর্ঘ জটা ছেঁটে ফেলেছে, সবদেহ দাড়ি কামিয়েছে। স্নান করে উঠে সে মার কাছে যখন একথানা ধোয়া কাপড় চেয়ে বসল তখন মা আপন মনেই ভাবলেন, ছেলেকে সংসারী দেখে না গেলে স্বর্গে গিয়েও বোধ হয় তাঁর তৃপ্তি হ'ত না।

থেকে ব'সে বীরেশ্বর বলল, ‘মা, ছ-বেলা রান্না-বাশা

করতে বোধ হয় তোমার কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া, রান্নাও ত আগের মত আর সুস্বাদু হয় না মা! বীরেশ্বরের ওঠের এক প্রান্তে একটু হাসির বিহ্বল থেলে গেল।

মা ঈষৎ আহত হলেন। বললেন, 'আর পারিনে বাপু বুড়ো হয়েছি, তোমাকে সংসারী দেখে যেতে পারলে আমি নিষ্কৃতি পাই।'

ক্রমশঃ বীরেশ্বর তার অবহেলিত সংসারধর্মের প্রতি আত্মবান হয়ে উঠতে লাগল। কেষ্ঠের সম্বন্ধে অকস্মৎ সে অতি সচেতন হ'য়ে উঠতে লাগল। তাকে এখন থেকে পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট ক'বা দরকার নইলে তার ভবিষ্যতের কি হবে? পুত্রের ভবিষ্যৎ বীরেশ্বরের মনকে বিচলিত ক'রে তুলল। বীরেশ্বর এত বেশী বিচলিত হয়ে উঠল যে, তার মা'র কোনো কাজই আর তার পছন্দ হয় না। কেষ্টকে যদি তার মা কিছু বলেন, অমনি সে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। অবশেষে এক শুভদিনে দীর্ঘশিখা-সমন্বিত এক ঘটকের শুভাগমন হ'ল বাড়িতে। তাঁর যাতায়াত চলতে থাকল।

একদা শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় বীরেশ্বর বড় আশা ক'রে সংসারী হয়েছিল। আবাব এক ফাস্তনের প্রসন্ন সন্ধ্যায় বীরেশ্বর সংসারে পুনঃ প্রবেশ করল। সংসার বাকে ডাকে, তাকে এমনি ক'বেই ডাকে। সকলেই বলল, আহা বীরেশ্বরের ববাত খুব ভাল, সেবাবও একটি লক্ষী মেরেকে বিয়ে করে এনেছিল, এবারেও বৌটি এসেছে খাসা।

বীরেশ্বরের মা বেশী ধুমধাম করতে দেন নি বিয়েতে। বেশী খরচপত্র করে জাঁকজমক দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ছেলের যে ববাত, তাতে কোনো কিছুই ভরসা হয় না।

একদল ব্যাগপাইপওয়ালা বাইরের বাড়ির সম্মুখে আশ্রয় নিয়ে সারাক্ষণ বাজিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময় চারিদিকে হলুদধূসর পড়ে গেল। বৌ এসেছে, নতুন বৌ! বীরেশ্বরের মা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোলে রয়েছে কেষ্ট, সে ব্যাগপাইপের সঙ্গে সঙ্গে কান্নার বাজনা আরম্ভ করেছে। তাকে একটি মেরের কোলে ছেড়ে দিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। নতুন বৌ-কে তখন সব এয়ারা বরণ করছে।

বরণ করার সময়ে তিনি স্থির হ'য়ে ছান্দাতলার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর আর এক দিনের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। এমনি ক'রেই আর একটি বধু এসেছিল, বাবার সময় সে বড় দাগা দিয়ে গেছে, তার কথা সহজে ভোলা যায় না। বরণ শেষ হ'য়ে গেছে, গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায় বীরেশ্বর ও বধুর এখন ঘবে ওঠার কথা। সহসা বীরেশ্বরের মা ব'লে উঠলেন, 'ওগো, তোমরা গ্যাসের আলোটা একবার তুলে ধরো, মা'র মুখখানি আমি একবার দেখব।'

গ্যাসের আলো তুলে ধরা হ'ল। বধুর মাথার চেলির গুঠনের চারিদিকে কতাপত্রিকা। সেটিকে একটু সরিয়ে গুঠন তুলে ধরা হ'ল। বধু নতনেজে শান্তুড়ীর পদপ্রান্তে চেয়ে বইল। মা'র বুকে একবার ধক ক'বে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি বধু চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'মুখটি একবার তোলো ত মা, তাকাও, তাকাও আমার দিকে, ভয় কি তোমার?'

টানা টানা স্তম্ভের ছুটি চোখ।

ভুরুহুটি যেন কোনো শিল্পীর হাতে রূপ নিয়ে ছ।

সিংখির প্রান্ত থেকে চূর্ণ চূর্ণ কালো চুল নেমে এসেছে মাথার দু-পাশ দিয়ে—সেইদিকে একবার চেয়ে বীরেশ্বর ব'ল মা'র চোখে জল এল। এমন সাদৃশ্য ত স্বপ্নেও ভাবা যায় না—এ যেন অগিমাই আবার ঘুরে এল। বধুকে কোলে টেনে নিয়ে কান্না তাঁব' যেন আর থামতেই চায় না।

বধুর নাম সুরমা।

প্রকাণ্ড বড় দালানের ভিতর দিয়ে সুরমা হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকল, 'অগিমা'। সুরমা তাকিয়ে দেখল, তার শান্তুড়ী। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'ওমা, এমন ভুলও মানুষের হয়! হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল—কিছু মনে ক'রো না মা!'

সুরমা লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে সুরমা, এ-কথাটি মনে নিতে এ-বাড়ির শোকদের বোধ হয় কিছু দেরি হবে। সুরমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হ'ল। কে অগিমা? তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুরমার কি যোগ আছে?

মুহুর্তে সুরমা জানাল যে, সে কিছু মনে করে নি।

কিন্তু তার মন যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে এবই মধ্যে !
 যে এখানে ছিল, সে অগ্নিমা তার সেই শূন্যস্থানে
 দাঁড়িয়ে সুরমার আজ অবলম্বন কোথায় ? ঘরের
 দেওয়ালে অগ্নিমার আঙুলের দাগ, পুরানো বাক্সের
 একদিকে অগ্নিমার অঙ্কন চিঠিপত্র—বীরেশ্বরকে
 লেখা ! -শেলফের এক দিকে চুল-বাঁধবার একটা ফিতের
 কতকগুলি মাথার কাঁটা জড়ানো। অগ্নিমার দেহ-গন্ধ যেন
 আন্ধ্র নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি—ছোটখাট বহু তুচ্ছ জিনিষে
 তার আভাস যেন আন্ধ্র পাওয়া বাচ্ছে। সুরমা ভাবলে,
 তার স্থান এব মধ্যে কোথায় হবে ? নির্জন ঘরের মধ্যে
 জানালার শিকগুলিতে মাথা রেখে সুরমা ভাবতে লাগল,
 “বৌ ম'রে গেলে, মাহুষ কেন আবার বৌ নিয়ে আসে ?”
 সেই অবস্থায় সুরমা অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাইবের
 বারান্দা থেকে শাড়ীভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “বৌমা, একা
 একা চুপুটি ক'রে ঘরের মধ্যে থেক না ! রান্নাঘরে এস—
 আমার কাছে এসে ব'স মা !”

সুরমা তবু সেই অবস্থায় অনেক ক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে
 রইল। চৈত্র মাসের শেষ, আমেব মুকুলের গন্ধ ভেসে
 আসছে বাতাসে। ঘরের মধ্যে প্রবলবেগে সেই হাওয়া প্রবেশ
 ক'রে ছোটখাট হাক্সা জিনিষ এখানে-ওখানে সরিয়ে
 দিচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুরমার মনে হ'ল ঘরের মধ্যে
 কে যেন নিঃশব্দে ঘুবে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কে যেন কান্নার
 সুরে ডেকে উঠল, “মা, ও মা !”

সুরমা সচকিত হ'য়ে পিছন ফিরে দেখে,—কেউ দাঁড়িয়ে
 দাঁড়িয়ে ছ-হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। ঐ মা-ডাকটির
 মধ্যে এমন কিছু আছে, যা হঠাৎ অবহেলা করা যায় না।
 সুরমা ভাড়াভাড়ি জানালার কাছ থেকে স'রে এসে কেউকে
 কোলে তুলে নিল। তার চোখ মুছিয়ে কোলের কাছে
 টেনে নিয়ে সুরমা বলল, “কেই, আমি ত তোমার মা নই !”
 কেউ সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে সুরমার মুখের
 দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, “মা, তুমিই ত মা, মামা-বাড়ি ছিলে
 তুমি, ঠাকুমা ব'লেছে।”

সুরমার মন মুহূর্তে বিদ্রোহ ক'রে বসল। কেউকে কোল
 থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, “ঠাকুমা বলেছে, ঠাকুমা কি
 বলেছে—ঠাকুমা বলেছে আমি তোমার মা ! কখনো না,

আমি তোমার মা নই—”। তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে
 সুরমা বলল, “ভাল ক'রে দেখো ত কেউ, আমি তোমার
 মা কি না !”

ক্ষুদ্র শিশু অনাদরের কারণ বুঝতে পারে না, কিছু ক্ষণ
 শূন্যদৃষ্টিতে সুরমাব দিকে চেয়ে থাকে, তার পব উচ্চ চীৎকারে
 ঘর ভরিয়ে তোলে।

তখন বাধা হ'য়ে সুরমা তাকে কোলে নিয়ে আদর
 করত থাকে। বলে, “না বাবা, লক্ষ্মী মাণিক আমার, চুপ
 করো, চুপ করো—আমি তোমার মা, তোমার মা, তোমার
 মা !” কেউ এততেও শান্ত হ'ল ব'লে মনে হ'ল না।
 অন্ধকারেব মধ্যে মায়ের হাত বুলিয়ে সে দেখল যে, এখানে
 কিছু ক'কি নেই ; তখন সে সন্তুষ্ট হ'য়ে বলল, “মা, চাঁদ
 দেখব।”

এই চাঁদ দেখাটি তার অভ্যাস। অগ্নিম'ব সন্ধ্যার একটি
 কান্নাই ছিল কেউকে চাঁদ-দেখানো। অন্ধ্র আর বাঁশ গাছের
 মাথার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠছে—এই দৃশ্যটি
 কেউর দেখা চাই।

সুরমা বলল, “চল, চাঁদ দেখে আসি।”

কেউকে সঙ্গে নিয়ে সুরমা ছাদে উঠেছে, দালানের মধ্যে
 দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়।
 যেতে যেতে সুরমা শুনতে পেল কে যেন বলছে, বৌদিদির
 আমাদের হেঁটে বাওয়াব চণ্টাও তাঁরই মত—আহা বেঁচে-
 বর্তে থাক্। একটি লঘু নিঃশ্বাসের শব্দও সুরমার কানে
 এল।

না আর ভাল লাগে না বাপু ! কেবলই সে, আর সে !
 মাহুষেব সঙ্গে মাহুষের কখনও কি মিল হয় ? এরা কেন
 ত'র পিছনে লেগেছে এমন ক'রে ? খি-চাকর পর্যন্ত সেই
 একই মন্তব্য করছে—মনের বিরক্তি যুখে প্রকাশ হ'য়ে
 গেল—“ছেলে যেন বাহ্যুর। আবার চাঁদ দেখবার সখ
 কেন হ'ল রে বাপু ?”

“ও মা, তা বুঝি জানেন না বৌদিদিমণি। ওর মা যে
 ওকে বোম্ব কোলে ক'রে নিয়ে ঐ কাণ্ড করতেন ?—
 কান্দামণি প্রদীপের স্বল্পালোকে দালানের এক কোণ থেকে
 এই মন্তব্যটি ক'রে বসল।

চাঁদ-দেখানোর মধ্যেও সেই অগ্নিমা ! আচ্ছা দেখা যাক্,

চাঁদ-ই ও কত দেখতে পারে?—মনে মনে এই ভেবে সুরমা কেটকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

অন্ধ আব বীশ বনের জটিলার পার থেকে চারি দিক আলোক ক'বে চাঁদ উঠছে। কয়েকটি ছোট ছোট পাখী সেই স্তম্ভবিশিত আলোক-পথটির উদ্দেশ্যে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ছাদের উপর থেকে কেটকে চাঁদ দেখাতে হবে। সুরমা আলসের কাছে দাঁড়িয়ে কেটের দিকে চেয়ে বলল, 'ঐ দেখো কেট, চাঁদ উঠছে!'

কেট তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠল, 'আর, তারা!'

'আবার তারাও দেখাতে হবে?'—সুরমা বলে উঠল।

'হ, হবে, তারাও দেখতে হবে!—কেটের চেয়ে এ কণ্ঠস্বর ঢেব বেশী গম্ভীর; বীরেশ্বর ছাদে ব'লে বই পড়ছিল, সুরমাকে দেখে উঠে এসেছে।

সুরমার আর তারা-দেখানোর বৈধব্য রইল না।

তাড়াতাড়ি কেটকে বীরেশ্বরের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নীচে চ'লে গেল।

বীরেশ্বর ছেলেকে কোল তুলে নিল। প্রকাণ্ড ছাদের উপর তাকে কোলে নিয়ে বীরেশ্বর ঘুরতে লাগল। একটি ছুটি ক'রে অনেকগুলি তারা উঠেছে আকাশে। কেটকে আদর করতে করতে বীরেশ্বর বলল, 'কেট, কোন্ তারাটি তোমার?'

কেট বিহ্বলভাবে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে!'

বীরেশ্বর দেখল বীশগাছের পিছনে খুব বড় একটা তারা দপ্-দপ্ ক'রে জ্বলছে। কেটের দিকে তাকিয়ে চেয়ে সে বলল, 'কেট ঐটে তোমার?'

কেট তখন আর একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'না, ঐ যে!'

বীরেশ্বরের মনে পড়ল ঠিক অমনি ক'রেই অগ্নি তার ছেলেকে নিয়ে তারাদের সঙ্গে খেলা করত। বীরেশ্বর কেটকে ভিজ্ঞাসা করল, 'কেট, তোমার মা কোথায়?'

কেট তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'মা? মা নীচে আছে।'

বীরেশ্বর বলল, 'না কেট, মা তোমার ঐখানে আছে।'—ব'লে সে আকাশের দিকে বীশগাছের পিছনের সেই বড় তারার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

কেট কিছুতেই তা স্বীকার করে না। সে ক্রমাগত ব'লে চলল, 'মা নীচে আছে!'

বীরেশ্বরের মনটা প্রসন্ন হ'ল এই ভেবে যে, ছেলে যদি সুরমাকে এখনই মা ব'লে চিনে নিয়ে থাকে, তা'হলে পরিণামে ভয়ের আর কোনো কারণ থাকে না। অবশেষে সে ছেলের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে বলল, 'হ্যাঁ কেট, মা তোমার নীচেই আছে।'

শুভ স্থান ক্রমশঃ পূর্ণ হয়ে আসছে। শান্তি, কেট বি-চাকর সকলেই সুরমার মধ্যে অগ্নিকে প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছে। সেই হাসি, সেই মধু কথাবলার ভঙ্গী, সেই কর্মশীলতা—আর কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। সংসার প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানুষের কাছ থেকে বা আশা কবে, দাবি কবে, সুরমার কাছ থেকে তা পাওয়া যাচ্ছে—আর কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। যেটা অগ্নির প্রাপ্য, সেটা তাই সুরমার পদতলে অনায়াসে সমর্পিত হ'তে থাকল। অত শান্তির মধ্যেও কিন্তু সুরমার মনের ক্ষোভ মেটে না। অগ্নির ব্যক্তিত্বের কাছে তার হ'ল পরাজয়, তার যে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, সেই রূপটির দিকে কেউ তুলেও চাইল না। একটা মনগড়া, সাঙ্ক্যার সাদৃশ্যের মধ্যে সেটা লুপ্ত হ'য়ে যেতে উদ্যত। অগ্নিকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এরা অগ্নিকে তুলতে চায়, কিন্তু যেদিন সমস্ত শান্তি আর প্রসন্নতার মধ্যে সুরমার তুচ্ছতম কোনো ক্রটি ঘটবে সেদিন অগ্নি তার সমস্ত বিগত ঐচ্ছল্য নিয়ে জেগে উঠবে। হায়, সেদিন সুরমার স্থান কোথায় হবে?

একটা স্থান যদি কোথাও তার থাকত,—তার নিজের!

বীরেশ্বরকে সুরমা আঙ্গু চিন্তে পারে নি—প্রচ্ছন্ন, গম্ভীর; নিজের চারি দিকে সে যেন একটি দুর্ভেদ্য গম্ভীর রচনা করেছে। সুরমার তৃপ্তিহীন ক্ষুব্ধ মন সেই গম্ভীর অতিক্রম করতে পারে না।

অনেক সময় বীরেশ্বরকে দেখলে সুরমার কেমন যেন ভয় হয়। বীরেশ্বর যেন জীবনের বহু অভিজ্ঞতার প্রাপ্তে এসে দাঁড়িয়ে স্থির হ'য়ে আছে। সেই অবিকলিত প্রশান্তি সুরমাকে যেন আঘাত করে—এই লোকটির জীবনের যে

অগ্ন্যাগ্নি হুমাব কাছে অজ্ঞাত, সেই অগ্ন্যাগ্নির সমস্ত খুঁটিনাটি হুমাব জানতে বড় ইচ্ছা করে; কিন্তু বীরেশ্বর তার মনের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে সেখানে অতি সতর্ক পাহারা বসিয়েছে। ভুলে যেতেই চায় বীরেশ্বর, ভুলে গিয়ে তার নতুন জীবনের আনন্দ সে পেতে চায়—বীরেশ্বরের এই অভিজ্ঞ হুমার কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু বীরেশ্বরের সমস্ত উৎসাহ এই সতর্ক পাহারায় নিঃশেষিত হয়ে যায়—মনের যে নতুন শাখাটিতে পল্লব মুঞ্জরিত হবে, মুকুল ধরবে, সেদিন বীরেশ্বরের কেমন যেন একটা সঙ্কোচ।

সংসারের এক দিকে এই সঙ্কোচ, সাবধানতা আর গাভীরা আব একদিকে শুধু ‘অগ্নিমা’ ‘অগ্নিমা’ রব—হুমার জীবনে অবিশিষ্ট শান্তি আনতে দিল না।

‘দেখ, হুমমা, কেউকে একটু-আধটু পড়িও, মা’র কাছ থেকেই ছেলেরা শিক্ষা পায় প্রথম’—বীরেশ্বর একদিন বলল হুমাকে।

হুমমা তখন অতি যত্নে কাপড়গুলি কুঁচিয়ে রাখছিল। তার মনের সেই মধুর নিষ্ঠার ভাবটি যেন আহত হ’ল বীরেশ্বরের কথায়। হুমমা অতি ধীরভাবে বলল, এত অল্পবয়সেই কি পড়বে, আরও কিছুদিন যাক, তবে ত।’

‘দৈখ ঠিক ঐ কথাই অগ্নিমা বলত, বলত—’ বীরেশ্বরের মুখের কথা অর্ধ পথে থেমে গেল, কারণ, এর আগে ছ-এক বার অগ্নিমা-সহজে হুমার অসহিষ্ণুতার পরিচয় সে পেয়েছিল। অগ্নিমার নাম শুনেই হুমমা তাড়াতাড়ি কাপড়-কোঁচানো শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে কেউকে কেন্দ্র করে কথাবার্তা আর তেমন জমতে পেল না।

নদীর স্রোতের মাঝখানে কে যেন বাধ বেঁধে দিয়েছে। উপচায়মান জলভার বাধের প্রান্তদেশে এসে কলরোল তুলেছে। প্রবাহের বাধাহীনতার ভাবটা যেন আর আসে না কিছুতেই।

মা এসে সম্মুখে বসেছেন, বীরেশ্বর খেতে বসেছে। বীরেশ্বরের খাওয়া প্রায় অর্ধেক হয়েছে, এমন সময় মা বললেন, ‘একটা কথা বলি বীর তোমাকে। বোমাব আমার শবীর শুকিয়ে যে আধখানা হয়ে গেল, অথচ তুমি

কোনো ব্যবস্থাই করলে না, না ডাক্তার, না বন্ধি, কিছু!’ —তার পর কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামিয়ে বললেন, ‘অগ্নিমাও ঐ রকম শুকিয়ে যাচ্ছিল, তার পর এক দিন কঠিন বোগ দেখা দিল; পঙ্কীঘাতী-বোগ আছে তোমার—আমি বা বলি শোন, ভাল ডাক্তার নিয়ে এসে হুমাকে দেখাও, এই বয়সে আর রোগ-তাপ ভাল লাগে না বাপু।’

বীরেশ্বর কোনো কথা না বলে একমনে খেয়ে যেতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল সমস্তই ব্যর্থ হবে, হুমমাও একদিন হয়ত এ বাড়ি থেকে বিদায় নেবে। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বলল, ‘কি আর হবে ডাক্তার দেখিয়ে মা? সারাবা হ’লে ও আপনিই সেবে যাবে, তোমরা অগ্নিমার নামটি শুব কাছে বেশীবার ক’রো না। তাকে ভুলে যাও মা, তাকে ভুলে যাও।’

মা ঈষৎ আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, ‘ভোনা কি সহজ কথা পাগল? তবে হুমমাও তার কাছে কোনো অংশে খাটো নয়। তাকে হয়ত ভুলে যেতে পারি, কিন্তু একে ভুলতে পারব না, আমি বলি, তুমি শীগগীর ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা করো।’

বীরেশ্বর শুধু সংক্ষেপে বললে, ‘আচ্ছা তাই হবে।’ সেদিন সন্ধ্যায় বীরেশ্বর আর বাড়িব বার হ’ল না। নির্জন ঘরের মধ্যে ধূপের একটা চমৎকার গন্ধ আসছে; কেউ কোথাও নেই! এই অবকাশে সে হুমার একটু সত্যিকার সান্নিধ্য অনুভব করতে চায়।

হুমমা ঘরে ধূপ দিয়ে জানালার বাইরে চেয়ে আছে। মনটা তার নিরুদ্দেশের দিকে ভেসে যেতে চায়। কোথায় তার ঘর? ঘরের অস্তিত্ব তার কাছে নিরর্থক—আর এক জনের শূন্য আসনেব উপব সে প্রাণপণে নিজের অধিকার দাবি করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যথা, সে আসনেব কিছুমাত্র মর্যাদা তার কাছে নেই। তার একটা নিজের স্থান কি কোথাও নেই?—মায়াজ তার মনের মধ্যে সেই একই চিন্তা বাবে বারে জেগে উঠছে।

এই বকম ভাবছে হুমমা, এমন সময়ে বীরেশ্বর নিঃশব্দে ঘবে এসে দাঁড়াল। ঘরে আলো নেই, শুধু ধূপের একটা মৃদু সৌরভ আসছে এক জানালা দিয়ে বহিরের সন্ধ্যাকাশের

বেটুকু মান বিষয় আশো আসছে, তারই সম্মুখে হুরমাকে যেন একটা অস্পষ্ট ছায়াসুঁত্রের মত মনে হ'ল বীরেশ্বরের।

শান্তকণ্ঠে বীরেশ্বর বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে?—হুরমা কি?'

হুরমা সপ্রস্তুত হ'ল না, বিচলিত হ'ল না, হুত্ব রহস্তলোকবাসিনীর মত নিঃশব্দে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

বীরেশ্বর ধীরে ধীরে হুরমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে তার মাথাটি বুকের উপর টেনে নিয়ে মিস্ত্র কণ্ঠে বলল, 'কি হয়েছে তোমার হুরমা? আমার বলবে না কি?'

হুরমা বলল, 'কই, কিছুই ত হয় নি! আমি ত বেশ ভাল আছি।'

'কোথায় ভাল আছ তুমি? শরীর এত খারাপ হ'ল কি করে?'

হুরমা সংক্ষেপে বলল, 'না, ও কিছু নয়।'

'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোমার। অথচ তুমি বলছ, কিছুই হয় নি—আমি ত এ-কথা বিশ্বাস করতে পারি নে।'

'আমি জানি, আমার কিছু হয় নি, তুমি বিশ্বাস না করলে কি হবে?'

'না, বলা লক্ষীট, ডাক্তার ডাকতে হবে—অস্বাভাবিক সত্যিই কিছু হ'য়ে থাকে, তার ব্যবস্থা ত আমার করা দরকার।'

'ব্যবস্থা করবে, ব্যবস্থা? কি ব্যবস্থা করতে পার তুমি? মরে গেলে আবার একটা বিয়ে করবে, এই তোমাদের পেশা?'

হুরমার কণ্ঠস্বর দৃঢ়, সতেজ। বীরেশ্বর সহসা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না এ-কথার। যে কথা বলবে ব'লে ভেবেছিল, সব কোথায় গোলমাল হ'য়ে গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় সে শুধু বলল, 'এখানে তোমাব ভাল লাগছে না হুরমা, কোথাও চেঞ্জ যাবে কি?'

সেই নির্জন ঘরের মধ্যে হুরমা ধিলুধিলু ক'রে হসে উঠল! বলল, 'চেঞ্জ? কিসের চেঞ্জ? না, সে সব দরকার নেই, এইখানেই বেশ আছি।'

বীরেশ্বর কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে হুরমার

কাছ থেকে স'রে দাঁড়াল। তারপর শান্ত বিপ্রকণ্ঠে বলল, 'তাই হ'বে হুরমা, এইখানেই থাক।' আরও যেন কিছু তার বলবার ছিল, কিন্তু সে কথা আর সে বলতে পারল না—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বীরেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হুরমার হাসিটা বীরেশ্বর ভুলতে পারল না। ঐ রকম অদ্ভুত হাসি ছিল অগ্নিমার—মন যখন তার ক্ষুব্ধ হ'ত, তখন সে ঐ ভাবে হেসে উঠত, শাপিত ক্ষুরধারের মত সেই হাসি, বিদ্রোহের কষাঘাতের মত সেই হাসি—মনের এবং ধরের। বিরল নিস্তব্ধতাকে কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেয় যেন সেই হাসি। নির্জন ছাদের উপর পায়চারি করতে করতে বীরেশ্বর কিছুতেই অগ্নিমার হাসির সঙ্গে হুরমাব হাসির অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা ভুলতে পারে না!

ইন্ডি-চোরারটা বারান্দাব এক পাশে টেনে নিয়ে চাকরকে চা আনবার কথা ব'লে দিয়ে বীরেশ্বর তখন হ'য়ে ভাবতে লাগল।

'এ-ও কি কখনও সম্ভব হয়?—একজনের সঙ্গ আর এক জনের সাদৃশ্য—এও কি সম্ভব? মানুষের মনগড়া কল্পনার শক্তি কি এত বেশী?'

'কিন্তু মা ওকে অগ্নিমা ব'লে ডাকলেন কেন? আর অস্পষ্ট সন্ধ্যায় তারার মান আলোয় কেউ কি ক'রে হুরমাকে মা ব'লে চিনতে পারল? কই, আমার ত তেমন মনে হয় নি কখনও! কিন্তু ঐ দিনেই সেই হাসি, ওঃ, ভাবতে পারা যায় না একেবারেই!'

টি-পয়ের উপর চাকর কখন চা দিয়ে গেছে, বীরেশ্বরের সে খেয়াল নেই। সম্মুখের নারকেল গাছের একটি মাত্র পাতা অকারণে ঢুলছে। বীরেশ্বরের মন পড়ল ঠিক এই রকম সময়টাতে অগ্নিমা এসে তার কাছে বসত। মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত গল্প সে করত—কই, এখানে ত হুরমার দেখা পাওয়া যায় না। তবে, আর সাদৃশ্য কি ক'রে সম্ভব?

'না, ওসব একেবারে বাস্তব কথা! কোথাও ভিত্তি নেই ওর! এই সব পাগলামি চিন্তা যত কম হয়, ততই ভাল! খুব কাজের মধ্যে থাকা দরকার, যাতে এক মুহূর্তের জল্পও ওসব চিন্তা মনে না আসে, সেই রকম ব্যবস্থার দরকার।'—বীরেশ্বর এই রকম ভাবতে ভাবতে

ইঞ্জিয়ার ছে.ড উঠে আবাব ছাদে পাঁয়চারি করতে আরম্ভ করল।

সুমনার মনটা আজ ভাল নেই। চেঞ্জ বাওয়ার কথা বলেছিলেন, সে সময়টার ও-রকম হাসা তার উচিত হয় নি, আর সেই কথাটা বলা একেবারেই ঠিক হয় নি—কেমন যেন হ'ল তার সেই সময়ে, নিজে থেকে সে সামলাতে পারল না। তাব যে ঠিক কি হচ্ছে, সে বুঝতে পারে না, শুধু শুধু সকলের উপর সে অকাবশে বিবস্ত্র হ'য়ে ওঠে। দিদির নাম শুঁরা করেন, তাতে এমন কি হয়েছে;—কিন্তু বড় বেশী বার সেই নাম তাকে শুনতে হয়, তাতেই মনটা ধরাপ হয় কি না! আচ্ছা, এবার যদি চেঞ্জ বাওয়ার কথা বলেন, তা হ'লে বেশ ভাল হয়। এক কথাতেই সুমনা রাজি হ'য়ে যাবে।

উঃ, মাথাটা তার বড় ধবছে, একটুও ব'সে থাকা যায় না। এই সময়টার যদি তিনি আসতেন একবার! বলতেন, তোমাকে ক্ষমা কবেছি সুমনা, মনে আমার কোনো গ্লানি নেই, তা হ'লে বেশ হ'ত, না?

এই বকম ভাবতে ভাবতে কখন যে সুমনা তার সুন্দর বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়েছে, তাব নিজেরই সে খেয়াল নেই। মা এসে কতবার ডাকলেন খাওয়ার জন্য, সুমনার তখন গভীর তজ্জা। গায়ে মাখার হাত দিয়ে মা বললেন, 'না বাপু, কিছুই ভাল বুঝছি নে আমি। স্বীকৃৎরকে বললাম এক-শ বার, ডাক্তার নিয়ে এসে দেখাও, আমার কথা কি ও শুনবে?'—এই ব'লে তিনি নীচ চলে গেলেন।

সুমনার বিছানার পাশে তারই মত আর একটি মেয়ে এসে বসল। এক রাশ এলা চুল তার মাথায়, অপক্লপ তাব চোখের চাহনি।

সুমনা'ব মাখার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সেই মেয়েটি। 'কি হয়েছে তোমার সুমনা?' সুমনা তাব মুখের দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। কথা কইতে পারে না।

'অস্থ করছে তোমার? আমি ত ছিলাম এই-খানেই, আমাকে ডাক নি কেন?'

সুমনা স্থিৎব হয়ে তার কথা শোনে। গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে বে পাখী ডাকে, সেই পাখীর সুরের মত তার কণ্ঠস্বর। কত অরণ্য, কত পর্বত, কত স্বচ্ছসলিলা নদীব পরপার থেকে সেই সুর যেন ভেসে আসছে। অজ্ঞাত বিদগ্ধে সর্কশরীর রোমাঞ্চিত অবস্থায় সুমনা সেই সুর শুনতে থাকে, মুখে তার ভাষা জোগায় না।

'আমাকে ডাকলেই ত পারতে সুমনা', আমি তোমার অস্থ সারিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার কেউ কোথায়? তাকে ত দেখতে পাচ্চিনে আমি!'

'কি বললে? এইখানেই আছে, ভাল আছে। অনেক দিন তাকে দেখি নি আমি,—তা তোমার কাছে আছে, ভাল আছে শুনেও স্থ। কিন্তু তোমার অস্থ আমি সারিয়ে দেব সুমনা। তুমি উঠে এস আমার সঙ্গে!'

সুমনা যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল। তার সর্ক শরীর তখন একটি লতার মত কাঁপছে।

'কাঁপছ কেন? এস, আমার সঙ্গে—ভয় কি? আমাকে চিন্তে পারছ না তুমি, আমি যে অগ্নিমা, দেখ না আমার দিকে চেয়ে! দেখ!'

সুমনা চেয়ে দেখল, গভীর ছুটি কালো চোখের দৃষ্টি। সেদিন কেউকে সে বে তারা দেখিয়েছিল, অস্থগাছের ওপারের সেই বড় তারাটি—সেই তারার দীপ্তি যেন তার ছই চোখে জ্বল জ্বল করছে।

খোলা বরজার বাইরে ছাদ, সেই ছাদের উপর থেকে অগ্নিমা ডাকছে যেন সুমনাকে, 'এস, এস—বাইরে বেবিয়ে এস, দেখ, এখানে কত আলো, ধরের মধ্যে থেক না!'

সুমনা নিশঙ্কে ছাদে এসে দাঁড়াল। একটি বড় প্রজাপতি যেন তার সম্মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাদা, স্বচ্ছ, লঘু এবং সুন্দর প্রজাপতি।

'দেখ, আর বেশী দূর এস না। এই আলসের পাশে চুপ ক'রে শুয়ে থাক। গারের কাপড়টা দিয়ে পা ছুটা ঢেক ফেল। জ্যোৎস্না এসে পড়ুক তোমার শরীবে, হাওয়া এসে লাগুক। সব অস্থ সেরে যাবে।'

সুমনা বড় আলসের পাশে পা ছুটি ঢেকে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে দেখল সেই বড় প্রজাপতিটি ছাদ পেরিয়ে

জামগাছ পেরিয়ে বাঁশবন পার হয়ে অনেক দূরে চলে গেল, অনেক দূর।

তারায় ভরা আকাশ। হুরমা তাবা শুন্তে লাগল, এক, দুই, তিন—এক, দুই, তিন—তার পবে আর গোণা যায় না। সর্বশরীর ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসছে, ঘুম, গভীর ঘুম হুরমাকে যেন জড়িয়ে ধরেছে, হুরমা নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বীরেশ্বর সেদিন একটু বেশী রাত্রে বাড়ি এসেছিল। ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে হুরমা ঘুমুচ্ছে। তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বীরেশ্বরও ঘুমিয়ে পড়ল পাশেই।

রাত্রে খোলা জানালাটা দিয়ে হু-হু ক'রে হাওয়া আসছে ভিতরে। বীরেশ্বর হঠাৎ জেগে উঠে পাশে চেয়ে দেখে হুরমা নেই।

সচকিত হয়ে বীরেশ্বর কয়েক বার ডাকল, 'হুরমা, হুরমা।'

কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে সে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে বাইরে ছাঁদে বেরিয়ে এল।

পশ্চিম আকাশের প্রান্তে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। বাতাসের দোলা লেগে বাঁশবন বন হলে ছলে উঠছে। ছাদের উপর ঝাঁড়িয়ে বীরেশ্বর ডাকল, 'হুরমা!'

কোন উত্তর নেই।

কোথায় গেল হুরমা? কই, কোনোদিন ত সে রাত্রে এমন সময় বাইরে যায় না। এখনই হয় ত কবে আসবে এই মনে ক'বে বীরেশ্বর ছাদের ওপর যুবে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে দেখে পূর্বদিকের আলুসের পাশে কে যেন শুয়ে আছে চান্দবুড়ি দিয়ে।

কাছে গিয়ে দেখে হুরমা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। মাথার চুলগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে। মুখখানা মৃতের মত পাণ্ডুর, বিবর্ণ।

বীরেশ্বরের বুকের ভিতরটার তখন যেন নিদারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ম্লান চাঁদের আলোর তাব মনে হ'ল, গেল, গেল সব গেল—আবার তাকে সম্মাসী হতে হবে! আবার সেই গল্পা, কান্ধী, হরিদ্বার।

তাড়াতাড়ি হুরমার পাশে বসে সে তার কানেক কাছে

মুখ নিয়ে গিয়ে প্রাণপণে ডাক্ত লাগল, 'হুরমা, হুরমা!'

হুরমা ধীরে ধীরে উঠে বসল। অসম্ভূত বেশ-বাস। দীর্ঘ চুলগুলো মূখের উপর এলোমেলো হ'য়ে পড়েছে; চাহনি অদ্ভুত—যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত!

ধীরে ধীরে তার হাত ধরে বীরেশ্বর তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। আর এক রাত্রির কথা তার মনে পড়ল। অগ্নিমা ঠিক এইরকম ভাবে এক দিন ঐ পূর্ব দিকের আলুসের পাশে এসে শুয়েছিল। সর্বাঙ্গে সাদা চান্দর মুড়ি দিয়ে অগ্নিমা শুয়েছিল। তার ঠিক এক মাস পরেই তাব সেই নিদারুণ অস্থির আরম্ভ হ'ল। বীরেশ্বরের সর্বাঙ্গ ধর-ধর ক'রে কাঁপছে—এমন অলৌকিক ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ তার স্বপ্নেরও অগোচর। কি জানি এর পরে কি আছে? আশঙ্কায় বীরেশ্বরের মন যেন মূর্ছিত হত।

খাটের উপর হুরমাকে বসিয়ে বীরেশ্বর নিজে তাব পাশে বসে তার একখানি হাত হাতের মধ্যে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'হুরমা, হঠাৎ ছাদে গিয়েছিলে কেন?'

তড়িতস্পৃষ্টের মত হুরমা উঠে দাঁড়াল, খাট থেকে নেমে ঠিক বীরেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আমি হুরমা নই, আমি অগ্নিমা—ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, দেখ, তুমি!'

বীরেশ্বর নির্ঝক বিস্ময়ে হুরমাব দিকে চেয়ে রইল। মৃতের মত পাণ্ডুর, বিবর্ণ বিশ্রী—কপালের পাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত শবীরটা তার বেতসলতার মত কম্পমান। আর, সব চেয়ে আশ্চর্য্য, মৃত্যুর দুর্ভাগ্য ব্যবধান পার হয়ে অগ্নিমা দুটি দীপ্ততাবা চোখে যেন হুরমার দুটি নিষ্ক চোখের মধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে। দুটি বড় শুকতারা যেন জল-জল ক'রে জলছে।

বীরেশ্বর স্থিরদৃষ্টিতে হুরমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি অগ্নিমা—তুমি হুরমা নও?'

তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে হুরমা উত্তর দিল, 'না, হুরমা মবেছে, আমি অগ্নিমা!'

বীরেশ্বর বড় হ'তে লাগল, কিন্তু সে কাউকে জাগাল না। সেই নিদ্রিত পুরীর মধ্যে বীরেশ্বর ভ্রমারহীন চোখে প্রহর জাগতে লাগল।

হুরমাৎ ক বৃকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার মাথায় মুখে কপালে হাত বুলিয়ে দিত দিত বীরেশ্বর বলতে লাগল, 'অগ্নিমা, কতদিন পরে তুমি এলে! আমার জীবনে যে কোনো সুখ নেই অগ্নিমা! তুমি আস নি ব'লে আমার জীবন শ্রীহীন—দেখ, মনে আমার সুখ নেই অগ্নিমা! কত ঘুরে বেড়ালাম, কত তীর্থ, কত দেশ—কোথাও ত তোমাকে দেখতে পাই নি! আজ এতদিন পরে তুমি দেখা দিলে! আমি বাচলাম অগ্নিমা, তুমি এসেছ, তোমাকে এইবার সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নেব। আমি আবেব বেরিয়ে পড়ব অগ্নিমা,—তোমার ছেলে, তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও, এ সব বেঁকা আমার বইবার শক্তি নেই!'—বীরেশ্বরও যেন স্বপ্নাবিষ্ট, কথার তবঙ্গ বেন তার বৃকের মধ্যে তোলপাড় করছে। অশ্রুসজ্জল চোখে বীরেশ্বর তার হৃদয়কে নিঃশেষে উজাড় ক'বে দিতে চায়।

বীরেশ্বরের বাহুবন্ধনেব মধ্যে হুরমা হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কঁদেছে, নিস্তব্ধ রাত্রে শিশির ঝরে পড়ছে বাইরে ঘাসেব উপর।

বীরেশ্বরের কথায় তার স্বপ্নেব ঘোব কেটে গেছে—সে যে হুরমা এই বোধ যখন তাব ফিরে এল, তখনও বীরেশ্বর

ব'লে চলেছে, 'আমার জীবনে যে কোনো সুখ নেই অগ্নিমা—কোনো সুখ নেই!'

হুরমার সমস্ত মনেব মধ্যে একসঙ্গে কারা যেন উচ্চরবে হাহাকার ক'রে উঠল। তখন তার চোখের দৃষ্টি হয়ছে শাস্ত, প্রকৃতির স্বপ্নাবিষ্ট উগ্রতা কোটে গেছে। বীরেশ্বরের দিকে শাস্ত ভাবে তাকিয়ে সে বলল, 'আমিই তোমাব সেই অগ্নিমা! মনে আমার কোনো ক্ষোভ নেই আর! দিদি আমাকে দেখা দিয়েছেন আজ, তাঁকে আমি স্পষ্ট দেখেছি!'

রাত্রি ভোরের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতিদিন ভোরে কেউ ঠাকুরাব বিছানা ছেড়ে দিয়ে তার বাবার দবজায় এসে ধাক্কা দিয়ে তাদের জাগিয়ে তোলে। প্রতিদিনেব অভ্যাস মত কেউ একটা কোট গায়ে দিয়ে এসে বাইরের দরোজার ধাক্কা দিচ্ছে। ডাক্ছে, 'মা, ওমা, ও—দরজা খুলে দাও!'

'এই যে, বাই বাবা'—ব'লে হুরমা বিছানা ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলতে গেল। এতক্ষণ পবে বীরেশ্বর নিশ্চিন্ত মনে ভাল ক'রে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈরাগ্য

পরলোকগত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী

[৮ পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে লিখিত]

আজ মহর্ষিদেবের বৈরাগ্যের ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা কিছু বলি—বৈরাগ্য না জন্মিল আত্মানন্দের আনন্দ পাওয়া যায় না, যেমন দুঃখের জ্ঞান না হইলে সুখের জ্ঞান হয় না, অন্ধভাবে না পড়িলে আলোকের স্তম্ভ রশ্মির রমণীয়তা উপলব্ধ হয় না। সংসারে মহর্ষির বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, এমন কি বে-ব্রাহ্মধর্ম-প্রচাবে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই ব্রাহ্ম সমাজের লোকদের অনেকের মধ্যে ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহাব বৈরাগ্য তীব্রতব হইল। তিনি সমস্দের কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি

বলিলেন, "প্রকাশ হ'ল না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আসিলাম। দুঃখ ও পবিত্রতাপ যে আপনার কাজ আপনি ভুলে রয়েছি। কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আসিলাম, আবাব কোথায় বাইব, অত্ৰাপি আমার নিকট প্রকাশ হইল না। অত্ৰাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায় তাহা আমার জ্ঞান হইল না। আর আমি লোকেব সঙ্গে হো-হো কবিশা বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা কবিশা আর সময় নষ্ট কবিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে ঐহাব জন্ত কঠোর তপশ্চা কবিব। আমি বাড়ি হইতে চলিয়া বাইব, আর ফিবিব না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আমাকে

উপদেশ দিতেছেন,—কন্তুঃ বা কুত্ আয়াতঃ। তব্ তদিম্ চিস্তয় ভ্রাতঃ—কার তুমি এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ হে ভ্রাতঃ, এই তথ্যটি চিন্তা কর।” এই সময়ে ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে তিনি বরাহনগরে গোপাললাল ঠাকুরের বাগানে থাকিতেন এবং এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতেন। পড়িতে পড়িতে এই শ্লোকটি তাঁহার মনে লাগিয়া গেল, “আমায় বশ ভূতানাং জায়তে যেন স্ত্রুত তদেব জ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুন্যতি চিকিৎসিতং।” অর্থাৎ হে স্ত্রুত, জীবদিগের যে-রোগ যে-দ্রব্য দ্বারা জন্মে সে-দ্রব্য কখনও রোগীকে আরাম দিতে পারে না। অতএব তিনি ভাবিলেন যে, “আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ-বোঝে পড়িয়াছি। অতএব এ-সংসার আর আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব এখান হইতে পালাও।” সন্ধ্যার সময়ে তিনি এই বাগানে গজাভীরে বুদ্ধদিগের সঙ্গে বসিতেন। বর্ষা বনমেব তাঁহার মাথার উপর আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল-নীল তখন তাঁহাকে বড়ই সুখ দিত। বড়ই শান্তি দিত। তিনি মনে কবিতেন, এই মেঘ কেমন কামচাঁচ, কেমন মুক্তভাবে যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচাঁচ হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে চলিয়া যাইতে পারি তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। চান্দ্রাগ্য উপনিষদে আছে যে, “য ইহাশ্চান-মহাবিদা ব্রহ্মস্বতোতাং সত্যান্ কামাংস্তেযাং সর্বেষু লোকেষু কাম্যবো ভবতি।” অর্থাৎ, যাহাবা এই মর্ত্যে থাকিয়াই পবমান্নাকে জানে এবং তাঁহাতে যে-সকল সত্য কামনা আছে, তাহা জানে তাহার পরকালে সকল লোকেই কামচাঁচ হয়, সকল লোকেই ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করিতে পারে। এইটিই তাঁহার বড় লোভনীয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি এখান হইতে গিয়া লে কলোঁকাস্তর ঘুরিয়া বেড়াইব। অব্যব উপনিষদের ভাষ্যে এখন দেখিলেন যে, “ন ধনে ন প্রজ্ঞা ন কৰ্ম্মণা ত্যাগে ন কেনা মুক্তঃ মানুঃ”—না ধনের দ্বারা না পুত্রের দ্বারা না কৰ্ম্মের দ্বারা কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারা এই অমৃত তত্ত্বকে ভোগ করা যায়—তখন এ-পৃথিবী আর তাহার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলই তাঁহাব

ভাঙিয়া গেল, তখন তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কখন আশ্বিন মাস আসিবে—কখন এখান হইতে পলাইবেন, সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন, আর ফিরিবেন না। তিনি হৃৎকেন্দ্রের ভাষায় নিজেকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তোরা জন্মদি বারে অধ-সেজনন সন্ধির
নয়ানমঃ কে দবীদামগাহে দে ওহুতান অন্ত্।

সপ্তম স্বর্গ থেকে তোমার আহ্বান আসিতেছে না জানি এই পৃথিবীর মোহপাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে।

তিনি যে আশ্বিন মাসেব স্ত্রুত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা উপস্থিত হইল। তিনি কাশী পর্য্যন্ত একখানি বোট ভাড়া করিয়া তাহাতে আবোহণ করিলেন। তিনি সংসার ছাড়িয়া তাঁহার প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিয়া যাইতেছেন। তাহাতে তাঁহার কি আনন্দ, কি উৎসাহ! তিনি বলিয়াছেন, “১৭৭৮ শকেব ১৯শে আশ্বিন বেলা ১১টার সময়ে গঙ্গায় ফ্লোয়াব আইল আমাব মনেও নব উৎসাহের উৎস ছুটিল। আমি গিয়া নৌকাতে আরোহণ করিলাম। নৌঙ্গর উঠিল, বোট চলিল। আমি ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া বাঁলাম,

কীৰ্ত্তিঃ এ নসিন্তগানহম্ অ্যায় বাম সয়ত বার্থজ
বাসদ কে বাজ বিনয়ীম দীদারে আসনারা।”

আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি, হে অশুকুল বাঘ; তুমি ওঠ হস্ত আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।”

মহর্ষি মহিমাতে সেই মহিমময়কে দেখিতে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। মুন্দের গিয়া প্রথমে তিনি সীতা-কুণ্ড দেখিতে বান। মন্দির হইতে ভোর চারিটাব সময় রওনা হইয়া ছাটিয়া তিন কোশ দূরে, স্বর্ঘ্যাদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানকার সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আবার সেই তিন কোশ ছাটিয়া ক্ষুধিত তৃষিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বোটে ফিরিলেন। “পরিশ্রান্তে-স্ত্রিয়াস্বাইহং তুট পরীতো বুদ্ধক্ষিতঃ।” তাহার পরে ফতুয়ার বিত্তীণ গঙ্গার মধ্য দিয়া যাইতেছেন এমন সময় প্রবল ঝড় উঠিল। তাড়াতাড়ি বোট ডাঙাব দিকে লইয়া গেল। ডাঙায় ত গেল, কিন্তু প্রতিকূল ঝড় গঙ্গাব উচ্চ পাড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল। নৌকা ভাঙে, আর কিছুতে রক্ষা পায় না। মহর্ষি সেই দোলায়মান নৌকা হইতে উঠিয়া পাড়ের উপবে দাঁড়াইলেন। মহর্ষি বলিয়াছেন, সেখানে ভূমিতে যদিও আমার প্রতিষ্ঠা হইল,

কিন্তু ঋড়ে আমি অস্থির, চড়ার বালু যেন ছিটার গুলির মত আমাব শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া গঙ্গার সেই ভীষণ প্রমত্ত স্রুতির মধ্যে সেই “মহত্ত্বং বজ্রমুদ্যৎ” পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে পানসীখানা সকল আহার্য সামগ্রী লইয়া গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়া গেল। মহর্ষি এই ভাবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে দেখিতে কখন বা ডুলিতে চড়িয়া আশ্বাশা হইয়া লাহোরে পহঁছিলেন।

এলাহাবাদে এক রাত্রি গঙ্গার পূর্ব পারে খেয়া-নৌকাতে রাত্রিাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীতে স্থানন্দ স্বামীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই স্থানন্দ, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য, ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের আদি সমাজের প্রথম আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। স্থানন্দ মহর্ষিকে বলিয়াছিলেন যে, “আমি এবং বামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দের শিষ্য।” সুদীর্ঘ কত পথ কত ক্লেশ সহ্য করিয়া মহর্ষি তখন সিমলা পাহাড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিমলা হইতে যখন তিনি আরও উত্তর হিমাদ্রিতে পর্যটনে গিয়াছিলেন তখন একদিনের পথের বৃত্তান্ত তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—“...পর্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণলতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ সকল বর্ণেরই পুষ্প যথাতথ্য হইত নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য তাহাদের নিম্নলিখিত পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল। যদিও তাহাদের বেনন রূপ তেমন গন্ধ নাই। কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্প গুল্লুসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদয় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। আমার সঙ্গে এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পিত শাখা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমাব চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া বহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে

কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে। তথাপি তিনি কত বস্ত্রে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া লতাতে সাজাইয়া বসাইয়াছেন। তাঁহাব করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা তখন আমাদের উপরে না জানি তোমার কতই করুণা। তোমার করুণা আমাব মন-প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমাব করুণা আমার মন-প্রাণে এমনই বিদ্ধ হইয়া আছে যে যদি আমাব প্রাণ যায় তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।” এই পুষ্পগুলি হাতে করিয়া এবং হাফেজের উপরি উক্ত ভাবাপন্ন কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্ববে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণা রসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্বে সায়াংকালে হুজুরী নামক পর্বত-চূড়াতে উপস্থিত হইলেন। দিন কখন চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পাবিলেন না।

যখন মহর্ষি সিমলাতে ছিলেন তখন এক দিন পৌষ মাসের প্রাতঃকালে দেখেন যে রাতে হুই-তিন হাত পুরু বরফ পড়িয়া সকল পথবাট বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সেই বরফের পথেই বেড়াইতে বাহির হন। ক্ষুণ্ণ ও আনন্দে তিনি এতদূর এত বেগে চলিয়া গেলেন যে সেই শীতকালে বরফের মধ্যে তিনি গ্রীষ্ম অনুভব করিলেন এবং তিতরের বস্ত্র ঘামে আর্দ্র হইয়া গেল। তখনকার তাঁহার শরীরের বল ও সুস্থতার এই পবিচয়। দুই প্রহরের সময় তিনি ঘ্রানে বসিয়া বরফমিশ্রিত জল, আপনা-আপনি মস্তকে ঢালিয়া দিতেন। নিমেষের জন্ত তাঁহার মেহে শোণিত-চলাচল বন্ধ হইয়া যাইত এবং পরক্ষণেই তাহা দ্বিগুণ বেগে চলিয়া তাঁহার শরীরে সমধিক ক্ষুণ্ণ ও তেজের সঞ্চার করিত। পৌষ মাস মাসের শীতেও তিনি গৃহে আগুন জ্বালাইতে দিতেন না। শীত শরীরে কতদূর সহ্য হয় তাহা পবীক্ষার জন্ত এবং তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্ত তিনি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বাজে শয়ন-বরেব দরজা খুলিয়া রাখিতেন, রাত্রির সেই শীতের বাতাস তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি কখন জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাফেজের

কবিতা গান করিতেন—“যোগী জাগে,—ভোগী রেণী
কোথায় জাগে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান রস পান
শ্রীতি ব্রহ্মে বার সেই জাগে।

“ইয়ারব আ সামা বরাক রোজ কাসনাএ কীন্তু।

জানমা সোখৎ বগোসাঁদ কে জানানএ কীন্তু।

“কে-দাপ রাত্রিকে দিন করে সে-দাপ কাহার?—আমার ত
তাতে প্রাণ দণ্ড হ'ল। জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হ'ল কার?”

যে-রায়ে মহাবিদেব ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব
করিতেন, মত্ত হইয়া অতি উচ্চৈশ্বরে বলিতেন, “আজ আসার
এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই
পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।”

তিনি রাত্রি ত এইরূপ আনন্দে কাটাইতেন, দিনের
বেলায় গভীর ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, প্রতিদিন হুই
প্রহর পর্যন্ত তিনি দৃঢ় আসনবদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে স্বাক্ষর
মূল তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতেন।

এই সাধনবলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে,
বাহ্য মূল তত্ত্ব উহার উ-টা ভাবনা মনেতেও স্থান পাইতে
পারে না, তাহা কোন মনুষ্যের ব্যক্তিগত সংস্কার নহে,
কালনির্কীর্ণশেষে সর্ববাদিসম্মত। মূল তত্ত্বের প্রামাণিকতা
আর কাহারও উপরে নির্ভর কবে না, তাহা আপনি
আপনার প্রমাণ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতুক আধ্যাত্মিক
প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। এই মূল তত্ত্বের উপর নির্ভর
করিয়া উপনিষদের পূর্ব ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—
দেবৈশ্ব্যেব মহিমাতু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম চক্রং।
পরমদেবেরই এই মহিমা বাহার দ্বারা এই বিশ্বচক্রঃ ভ্রাম্যমান
হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিত মোহে মুগ্ধ হইয়া
বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে জড়ের অক্ষশক্তিতে কেহ কেহ
বা বলেন কোন কারণ ব্যতীত কেবল কালেরই প্রভবে
এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে, কিন্তু আমি বলি পরমদেবেরই
এই মহিমা বাহার দ্বারা এই বিশ্বচক্র চলিতেছে।

“স্বভাব মেকে করায় বদন্তি কালন্ত বাস্তে গহ্মিহু মাত্রা:

দেবন্তেব মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম চক্রং

যদিনং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

—বাহ্য কিছু এই সমুদ্র জগৎ প্রাণবাক্য পরমেশ্বর হইতেই নিঃসৃত
হইয়াছে এবং প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে।

এই দেবতা বিশ্বকর্মা মহাত্মা সর্বদা লোকদিগের হৃদয়ে
সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। মূলতত্ত্বের এই অকাট্য সত্য-
সকল ঋষিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উজ্জ্বল।

সম্মুখে সে বৃক্ষ যে আছে তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ
করিতেছি, কিন্তু সেই বৃক্ষ যে-আকাশে আছে সে-
আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও
পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হই-
তেছে, ফুল হইতেছে ফল হইতেছে, এ সকল দেখিতেছি কিন্তু
তাহার সেই মূল কারণকে দেখিতে পাই না, বৃক্ষ যে-জীবনী-
শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে
পুষ্ট করিতেছে, যে-শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায়
শিরায় কাণ্ড করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা
দেখিতেছি কিন্তু সেই শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না
এবং সর্বেষু ভূতেশু শুভোদ্যান প্রকাশতে। এই গুঢ়পরমাত্মা
সর্বভূতে ও সর্ব বস্তুতে আছেন। কিন্তু তিনি প্রকাশিত
হন না। ইন্দ্রিয়সকল বাহিরের বস্তুই দেখে, অন্তরের
বস্তুকে দেখিতে পায় না—ধিক ইন্দ্রিয় সকলকে।

“পরাক্রিয়ানি ব্যতুণঃ স্বরস্তুত্ত্বান্যং পরাণ্ড পঞ্জতিনাস্তবায়নু
কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্য আবৃত চক্ষুরমৃতম্ মিচ্ছন।

স্বরস্তু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে বহিমুখ করিয়াছেন, সেই
হেতু তাহার বাহিবেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না।
কোন দীর অমৃত তত্ত্বকে ইচ্ছা করিয়া, মুদ্রিত চক্ষু হইয়া
সর্কাস্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন। উপনিষদের এই উপদেশ
শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া নিষিধ্যাসন করিয়া ঐ ব্রহ্ম-
বস্তুভূমি হিমালয় হইতে মহর্ষি দেবেজনাথ ঈশ্বরকে দেখিতে
পাইলেন। চন্দ্রচক্রে নর জ্ঞানচক্রে। মহর্ষির
প্রতি উপনিষদের আদেশ এই—“ঈশবাস্তু মিদং সর্বং।”
ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন কর। তিনি ঈশ্বরের
দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন করিলেন। এবং বলিলেন—
বেদাহামেতং পুরুষং মহাস্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরন্ত্যং।
আমি এই তিমিরাতীত আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষকে
জানিয়াছি—

“বাদ আজি হুয় বা একাক দহনু অজ দিলে খেব। কে বহুবৈদ
ক্লানমন গোবার আখের সোদ।”

—এখন অবধি ক্ষোভাতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে
ছড়াইব। যেহেতুক আমি সূর্য্যোতে পৌছিরাছি ও অন্ধকার
বিনাশ হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেজনাথের এই বৈরাগ্য ও সাধনের ফলই
ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান।

আলোচনা

কলিকাতা ও মফস্বলের কলেজসমূহের তুলনা

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় “কোনটি চান?” নামক একটি হৃতিস্তিত প্রবন্ধে কলিকাতা ও মফস্বলের কলেজসমূহের তুলনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কলিকাতার স্বাধ্য ভাল নয়, সেখানকার খবচ বেশী, সেখানে বিলাসিতার প্রাবল্য উন্নয়ন, এবং সেখানকার কলেজগুলির শিক্ষাপ্রণালী মফস্বলের কলেজগুলির শিক্ষাপ্রণালী হইতে যে উৎকৃষ্টতর এমন প্রমাণ নাই। কাজেই তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—এত বেশী ছাত্র কলিকাতায় কেন আসে?

রায় মহাশয়ের উল্লিখিত কারণসমূহ এবং অন্তান্ত কারণে (যেমন অত্যধিক ছাত্র বিশিষ্ট কলেজসমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে জ্ঞানার্শোনা থাকিবার সুযোগের অভাব) কলিকাতার প্রতি ছাত্রদের এতটা আকর্ষণ অব্যাহত নহই, এবং সরকারী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্টেও (১৯২৭-৩২) তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রেরা যে মফস্বলে থাকিতে চায় না তাহার কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ—“বিষবিদ্যালয়ের গত বার্ষিক সমাপ্তিতে, ডাইস-চেন্দ্রসাব্য স্তর হসেন হুবওয়ার্দি বলেছিলেন, কলিকাতার বাইরের কলেজে গুণী শিক্ষক নাই, কলিকাতার কলেজে আছেন।”

এ-কথা সকল স্থানে সত্য না হইলেও অনেক স্থলে সত্য। মফস্বলের কলেজের কর্তৃপক্ষগণ আর্থিক অভাববশতঃ অনেক সময় বোগ্যতম অধ্যাপক নিয়োগ করিতে পারেন না। যোগ্য ব্যক্তিরা অনেক সময় ভাল বেতন পাইলেও মফস্বলে থাকিতে চাহেন না। কারণ সেখানে গবেষণা কবিবার সুযোগ নাই এবং যথেষ্টসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সাহচর্য পাওয়া যায় না। তার পূর্ব বর্তমান সময়ে স্থানীয় প্রভাব, দলদলি, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রভৃতি বিবিধ কারণে অনেক সময় বোগ্যতম প্রাধ্যাপকের দাবি উপেক্ষিত হইয়া থাকে। রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে বিষবিদ্যালয়ের কলেজের “ভগবান শিক্কে ইজিতে সরিতে পারেন।” ইহা সব স্থলে সত্য নয়; কারণ অধ্যাপক নিয়োগ সম্বন্ধে বিষবিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ নাই। যদি বিষবিদ্যালয় এবং পূর্বসংগঠিত সম্মিলিতভাবে এমন একটি নিয়োগক বোর্ড গঠন করেন তাহার অনুমোদন ব্যতীত কোন বেসরকারী কলেজে কোন অধ্যাপক নিয়োগ হইতে পারিবে না, তবে এই সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধান হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মফস্বল শহরের আবহাওয়া সাধারণতঃ জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি ও তাহার তৃপ্তির পক্ষে অসুবিধাজনক। “কলিকাতায় কত সাধু পুণ্ড্রা আছেন, বিদ্যানু মহাবিদ্যানু আছেন, উপাধ্যায় মহা-মহা উপাধ্যায় আছেন, কত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়, গ্রন্থালা পাঠশালা আছে, কত সভা, সম্মেলন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যান চলছে। এ সব দেখা ও শোনা যে মনস্তৃপ্তি।” রায় মহাশয়ের মতে এই “হৃতিস্তি কিছু সত্য, বেশীর ভাগ কাল্পনিক।” কিন্তু আমার মত বীহারী মফস্বল ও কলিকাতা, এই দুই স্থানেই পড়াশোনা করিয়াছেন, তাহার জ্ঞানে যে মফস্বলে যথার্থ শিক্ষার্থীর অবিধা কত বেশী। সেখানে অধ্যাপক-চক্রের বাহিরে এমন লোক কমই থাকেন যাঁহাদের সংস্পর্শ, উপদেশ ও সাহায্যে মানসিক উন্নতিলাভ সম্ভবপর হয়।

তৃতীয়তঃ, মফস্বল কলেজসমূহে বিষবিদ্যালয়ের আইনমত স্বেচ্ছা-পঠিতব্য সমস্ত বিষয় পড়াইবার বন্দোবস্ত থাকে না, এবং সেখানে ইংরেজী প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ বিষয় ব্যতীত অন্তর বিষয়ে “অনাদ” নেওয়া যায় না। কোন কোন কলেজে বিজ্ঞান-অধ্যাপনার ব্যবস্থা নাই; আবার যেখানে আছে সেখানেও প্রায়ই পরার্থবিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যা ব্যতীত অন্তর বিষয় পড়া যায় না, এবং যন্ত্রাদির বিশেষ অভাব থাকে। এই কারণে বহু ছাত্র বাধ্য হইয়া কলিকাতায় যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে মফস্বলের উৎকৃষ্ট কলেজগুলিতে ছাত্রের অভাব হয় না, এবং সেখানে রায় মহাশয়ের আদর্শ অনুসারে পাঁচ শতের বেশী ছাত্র না-সইবার ব্যবস্থা হইলে বহু প্রবেশার্থীকে নিরাশ হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারি যে, ১৯৩২ সনে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এক হাজারের বেশী, কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্টের কলেজে ৬৫০ (১৯২৭ সনে ৯৯০), দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে ২২০ (১৯২৬ সনে ৭৫০), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ৫০, রঙ্গপুর কামাইকেল কলেজে ৫০, এবং ময়মনসিংহ আনন্দ-দাহন কলেজে ৭৩ জন ছাত্র ছিল। সরকারী কলেজগুলির মধ্যে হুগলীতে ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, কৃষ্ণনগরে বৈজ্ঞানিক বস্ত্রাদি ক্রয় করিলে এবং কয়েকটি নূতন বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলে আরও ছাত্র পাওয়া যাইবে, চট্টগ্রামের স্থানান্তর সঙ্কেও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে এখন কম-সংখ্যক ছাত্র সন্তুষ্টি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং রাজশাহীতে ১৯৩২ সনে ৩১৭ জন ছাত্র ছিল (১৯২৭-২২ সনের পঞ্চমবার্ষিক শিক্ষা-রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।) মফস্বল কলেজসমূহের মধ্যে নড়াইল (ছাত্রসংখ্যা ১০০), হেতমপুত্র (১০৫), উত্তরপাড়া (৫০) এবং কাঁচা (৪৬) প্রভৃতি বেসরকারী স্থানে ছাত্র অত্যন্ত কম, সেখানে পড়াশোনার ব্যবস্থাও অত্যন্ত খারাপ।

“বাংলা দেশে ব্যায়াম-চর্চা”

শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা মহাশয় বাংলা দেশে ব্যায়াম চর্চা নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, উহার একস্থানে (২৭৫ পৃষ্ঠা, ব্যায়াম করিবার নিয়ম) আছে, “যেদিন বে ব্যায়াম করিতে ভাল লাগে সেইদিন সেইরূপ ব্যায়াম করা উচিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যায়াম করিলে লাভ না-হইয়া ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।” একথা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না। এ-সম্বন্ধে আমার বাহা অভিমত, সংক্ষেপে তাহা এই :—

প্রত্যেকের শরীরের বাঁহুনি, শক্তি ও সহনশীলতা একরূপ নয়;—বিশেষতঃ কোন ব্যায়ামে কিরূপ ফল লাভ হয়, বলিতে গেলে বাংলা দেশের শতকরা ৯৯ জনেরই সেই জ্ঞান নাই। সেই অবস্থায় নিজ অভিকর্ষিত ব্যায়াম করিলে লাভ না-হইয়া শুকতর ক্ষতিও হইতে পারে। ধরা গেল, কোনো এক ক্ষীণকায় ব্যক্তির ক্রুসকৃৎসর জোরে বেন খুবই কম; অথচ, সে যদি কোন উপযুক্ত গুরু উপদেশ ছাড়া কেবল মাত্র নিজে খেয়ালের বশবর্তী হইয়া বড় বড় ব্যারবেল সইয়া কঠিন কঠিন ব্যায়াম করিতে মূক করে, তবে তাহার যে অকাল মৃত্যু ঘটবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? রোগী যেমন কুপথ্য গ্রহণের জন্য বাস্তব হয়, তেমনি দুর্বল লোকেরও অনেক সময় কঠিন কসরৎ

করিবার ইচ্ছা হয়; সেইজন্য কি তাকে সেই কসরতই করিবার অমুখতি দেওয়া উচিত?

প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মাবলী থাকা চাই। তাহা না হইলে সবই ব্যর্থ হইবার কথা। একই ব্যক্তি যদি কৃষ্টি, ভারোত্তোলন, সম্ভরণ, মৃত্যু প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম করে তবে সে কোনদিনই উহার কোন একটি বিষয়েও নৈপুণ্য অর্জন করিতে সমর্থ হইবে না—তবে, তাহার সহনশীলতা সাধারণতঃ অল্প সকলের চেয়ে বেশী হইবে। বাহারা কোন একটা বিশেষ বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে শুধু সেই বিষয়টি শিক্ষা না দিলে উদ্বেগ সিক্ত হইবে না। শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিবার পূর্বে শিক্ষককে ইহাও পরীক্ষা করিতে হইবে যে, কোন বিষয় শিক্ষা দিলে তাহার ছাত্রের প্রকৃত উন্নতি হইবে।

রাজেনবাবু বলিয়াছেন যে, ষাড়েব পরিমাণ টিক রাশিয়া ও ব্যায়ামের মাত্রা কমাইয়া এবং বিশ্রামের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেই কৃতিগীরগণ ক্রমশঃ মোটা হইয়া পড়ে। ইহা আংশিক সত্য হইলেও প্রকৃত কারণ নয়। পঞ্জাবী মুলমান পালোয়ানগণ বৃদ্ধ বয়সেও বেল্লপ ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয় এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী যৌবনেও মূলকায় ছিলেন। আসল কথা এই, মাটির মধ্যে এমন একটা রস আছে, যাহার সংস্পর্শে শরীর ধীরে ধীরে মোটা হইয়া উঠে এবং কৃতিগীরগণ কৃষ্টি লড়িবার সময় খুব দিয়া খুব জোর খস-প্রখাস গ্রহণ করে ও ছাড়ে বলিয়াও উহা তাহাদের শরীর ভারী করিবার সহায়তা করে। যাহারা খুব বড় পালোয়ান, তাহারা উপরি উক্ত অবস্থার অনেক গুণ কৃষ্টি লড়ে বলিয়াই শীঘ্র শীঘ্র মূলকায় হইয়া পড়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বড়-গামাকে জানি, পূর্বাপেক্ষা এখন তিনি ব্যায়াম অনেকটা কমই করেন, তবু তাহার শরীরের এখনকার গাপ পূর্বাপেক্ষা কিছু কম।

গৌদজাতি

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

অগ্রহারণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সত্যকিব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৌদজাতি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন। গৌদজাতি সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে কিনা জানি না। তবে তিনি প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলি নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি গত বোল বৎসর মধ্যপ্রদেশের পল্লীতে বাস করিতেছি এবং গৌদবহুল তিনটি জেলার বিভিন্ন পল্লীখানে বাস করিয়াছি এবং কবিত্তেছি। গৌদজাতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞত ব্যক্তিগত। প্রকৃত উচ্চারণ গৌদ, গৌড় নয়।

গৌদরা জাতিবৃদ্ধি বা অনার্য ভাষার কথা বলে এবং তাহার সতপুত্রা পর্বতশ্রেণীর উপত্যকাভূমিতে অনাদিকাল হইতে বসবাস করিতেছে। তাহার মধ্যপ্রদেশের আদিম অধিবাসী। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “সত্তবতঃ তাহার দাক্ষিণ্য হইতে মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে”—এই উক্তি অসম্মান বা প্রক্ষেপ। দাক্ষিণ্যাত্যের কোন আদিম অধিবাসীদেব সহিত ইহাদের কোন প্রকার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সাদৃশ্য নাই। ইহারা অত্যন্ত ধরুণ ও ব্রহ্মণশীল। ইহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—রাজ-গৌদ ও সাধারণ গৌদ।

রাজ গৌদের পূর্বপুরুষগণ আদিমকাল হইতে মধ্যপ্রদেশ শাসন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আধ্যাত্মগণের সংঘর্ষে তাহারা পরাজিত, নিহত এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখনও রাজ-গৌদের বংশধরগণ করদমিত্র রাজ্যরূপে মধ্যপ্রদেশে বাস্তার, বারগড়, সারগড় প্রভৃতি রাজ্য শাসন করিতেছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত গৌদজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীর ঐতিহাসিক কোন মূল্য নাই।

গৌদের সভ্যতা, সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পাঠক-গণকে কিছু জানাইতেছি। মধ্যপ্রদেশ পৌরাণিক যুগ বা প্রাচীনকাল হইতে ছোট ছোট বহু ক্ষুদ্র গৌদ-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকল রাজ-গণেরই নিজ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেলা ও দৈত্য-সামন্ত ছিল এবং তাহারা আপন আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এখনও বনে জঙ্গলে অনেক স্থানে প্রাচীন যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলা দেখা যায়। কোন গৌদরাজ্যবংশই নিজেকে রাজ্যেশ্বরী আখ্যা দেন নাই বা বড় ব্রহ্মের দ্বিগুণ করেন নাই। গৌদ-রাজগণ রাম-রাজত্বের সময়ও নিজদের আবাসভূমিতে স্বাধীন ভাবে বাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশ সাধারণতঃ পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও অশিশু অমুর্ষব, সেইজন্য ভারতের একচ্ছত্র রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

গৌদরা স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয় ও রক্ষণশীল। সমাজে স্ত্রী-পুরুষের দাবি সমান, বয়স সমাজে নারীর মর্যাদা উপরে। কস্তার মাতাপিতা বা অভিভাবকদের নিকট বয়স্কের লোকেরা বিবাহের প্রস্তাব করিয়া থাকে। কস্তাগণের অভিভাবকদের বিবাহ-প্রস্তাব মর্যাদাহানিকর। বনিয়াদী গৌদ-বংশের কস্তারা অনেক স্থানে চিরকুমারী থাকে এবং ইহা সমাজে আদৌ নিন্দনীয় নয়। সমাজে নারীর কোনরূপ পর্দা নাই। সামাজিক ভোজে নর-নারী একসঙ্গে বিভিন্ন পংক্তিতে ভোজন করে। আহাৰ্য্য-দ্রব্যের কোন বিধিনিষেধ নাই। মদ্য, পুরুষ-মাংস, গো-মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে। তাহারা নিজদের দেবদেবী, ভূত-প্রেত ছাড়াও হিন্দুদের মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেব-দেবীদের মাঙ্গ বা পূজা করে। চুরি, জুয়াচুরি, বাহাড়ম্বর ও অমিত-বাবিতা গৌদ-জাতির স্বভাব নাই। তবে যে-সমস্ত তকণ গৌদ শহরের বা কারখানার আবহাওয়ার বর্ধিত হইতেছে, তাহারাও অত্যন্ত ভারতীয়দের মত আধুনিক সভ্যতার আবর্জনা মাখিতেছে। গৌদের প্রকৃতিগত ধর্ম বা স্বভাব—সহৃদয়, ধৈর্য, শান্তিপ্রিয়তা ও নিত্যব্রতা।

যদি পৃথিবীতে কোন জাতির প্রকৃত মহাব্যর্থ থাকে, তাহা গৌদ-জাতির আছে। তাহাদের স্বাধ্য অটুট, রোগে তাহারা ক্ষতীভূত চিকিৎসার বিনা-শ্রমে আরোগ্যলাভ করে। তাহাদের আহাব ও জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত সাদাসিধে। তাহাদের পেশীতে বাঙালীর চেয়ে দশ গুণ বল। স্ত্রী-পুরুষে সমানভাবে পরিচর্য্যে অভ্যস্ত বলিয়া গৌদ-নারী অবলা নয়, সাক্ষাৎ শক্তিশালী। স্বামীর মৃত্যুতে বা পুরুষের হৃদয়ে গৌদ নারী নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ। গৌদের আত্মসম্মানজনক সভ্য-নামধারী বাবুভারাদের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষীয় রাজকর্পচারিগণ কেবলমাত্র গৌদের উপর অযথা অত্যাচার করেন, এই উক্তি অমূলক। রাজভৃত্যগণ চিরকালই প্রজাগণের নিকট অস্ত্রের আবরণ ও প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে।



গ্রহমুক্তি—ঐশ্বরচন্দ্র সেন। প্রকাশক—শ্রীমুসিহেপ্রসাদ সেন। ২৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট। দাম বাবো আনা।

নাটক। শুধু টানা টানা বহুতা এবং ভাবের উচ্ছ্বাস। আখ্যান-ভাগও নিতান্ত স্থূল, মোটেই কোতুহল জাগে না। ভাষাও স্থানে স্থানে নিতান্ত গতিহীন ব্রহ্মবৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছে।

নাটকের মধ্যম টোন বা নৈতিক চরিত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু লেখক মনে রাখিবেন শুধু ঐচ্ছিক দ্বিরাই আজকাল দর্শকের মন ভরান বাধ না।

বহিরাবরণ মামুলী।

কৃপণের দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ অজিতকুমার দে, প্রকাশক—ভারত লাইব্রেরী, ২০৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। দাম তিন আনা।

ছোট একটি কোতুহল-নাট্য। এক বিবেক-পাগলা কৃপণের এক চানচূরওয়ালার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল—কতকগুলি ছেলেছোকরার যড়যন্ত্রে মাঝে মাঝে প্রকৃত হস্তবসের ছিটকোঁটা আছে, তবে বেশীর ভাগই মামুলী।

মানবের শত্রু নারী—ঐশ্বরবোধ বহু : প্রকাশক—পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, ২ নং শ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম ১।০

নারীকে, প্রেমকে অস্বীকার কবিত্তে কবিত্তেও তাহাদের পানে অগ্রসর হইতে হয়, এমনই তাহাদের অনতিক্রম্য মোহ—লেখক এই ভাবটি বইখানিতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। গল্পাংশটা বৈচিত্র্যহীন হওয়ায় এবং ভাষার মধ্যে অতিরিক্ত শিথিলতা আর জ্বাকামি থাকায় বইখানি জমে নাই।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল।

বিবর্তন—জীবামৃদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—পি. সি. সরকার এণ্ড কোং। দাম এক টাকা।

সাতটি ছোট গল্প লইয়া বইখানি ১১২ পাতায় শেষ হইয়াছে। গল্পগুলি সব দিক দিয়াই বেশ ভাল লাগিল। ভাষার স্বল্প গতি এবং গাভীয়া মনে বেশ তৃপ্তি আনে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে লেখক কি ভাষা, কি ভাব উভয় বিষয়েই বেশ সিতব্যয়ী।

গল্পগুলিও বেশ স্বাভাবিক অথচ নিতান্ত গতাশ্রয়নিক নয়। মোটের উপর বইখানি বেশ ভালই হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ভাল।

অমুচ্চারিত—ঐশ্বরনীনাথ রাব। প্রকাশক—পি. সি. সরকার এণ্ড কোং। দাম এক টাকা।

লেখক জীবনের ছোটখাট ঘটনা এবং কয়েকটা কিম্বদন্তীকে আশ্রয় করিয়া বাহা লিখিয়াছেন তাহার সবগুলি টেকনিক-দ্রষ্টব্য গল্প না হইলেও স্বথপাঠ্য হইয়াছে—কেননা বেশ দরদ দিয়া দেখা। প্রথম গল্প 'অমুচ্চারিত' পাকা হাতের পরিচয় দেয়।

ছাপা, বাঁধাই স্বচ্ছসিদ্ধ।

ছুই নারী—ঐআশালতা দেবী। কাত্যারিনী বুক ষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাত সিকা।

বেশ সবেশ একখানি ইন্টেলেকচুয়াল নভেল অর্থাৎ সেই জাতীয় উপজ্ঞাস বা বুদ্ধিকে কোতুহলী কবিবা তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কবিত্তে প্রয়াস পায়। বিবব, সেই ইটাম্বলান্ ট্র্যাঙ্কল্ বা ত্রাঙ্কিকা প্রেমের সমস্তা; কিন্তু প্রতিভার আলোয় যে ওটাকে নিতুই নতনভাবে দেখান যায়, এই বইখানি তাহাব প্রমাণ। অবশ্য লেখিকা বাহা বলিয়াছেন তাহাব সবটুকুতে মায় দেওয়া বাব না—তাহা হইলেও তাহার বলিবাভ ভঙ্গি মোহন এবং আশ্রপক্ষ সমর্থন করিবারও সাহস ও ক্ষমতা আছে। এই বইবে কাহারও প্রেমই একনিষ্ঠ নহ—বুদ্ধি দিয়া ক্রমাগতই তাহাকে বাচাই করিতে গেলে এবং স্বাধীনতার সঙ্গে পদে পদে তাহার সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে সে প্রেম সম্ভব নয়। তবু এই যে নিত্য-পাণ্ডা আব নিত্য-হারাপোব প্রেম, যা আদর্শ না হইলেও এই ধূলিমলিন পৃথিবীর নিত্যবস্তু—তাহাই কি কম মধুর? বইখানিতে এরই মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এর ট্র্যাঙ্কোডি, আধুনিক আধুনিকাব অতি হৃদয়গ্রহণাত্মক ট্র্যাঙ্কোডি—এই অমুচ্ছৃতি বিশ্লেষণে লেখিকা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষিত অভিজ্ঞাত সমাজের ছবিটি হৃদয় ফুটিয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

অনন্তা—ঐঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস। ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।

একটি প্রতিভাসম্পন্ন আধুনিকার জীবন সমাজের তথা দরিদ্র সলোরে গাওনা মিটাইতে মিটাইতে কেমন করিবা নিম্নল হইয়া গেল—লেখক উপজ্ঞাসখানিতে তাহাই দেখাইয়াছেন। চরিত্রগুলির অধিকাংশই এবং ঘটনাগুলিও বেশীভ ভাগ টাইপ হিসাবে লওয়া, সুতরাং নালিসটা তাহার ব্যাপকই। সমাজ যে এখনও নারীপ্রতিভা-বিকাশের অক্ষুণ্ণ হয় নাই তাহা সত্যই এবং তাহার চৈতন্যোদয়ের জন্য এরকম লেখার দরকারও যথেষ্ট। তবে যে-পিতা শত বাধা ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া কস্তার প্রতিভা বিকশিত করিয়া তুলিল তাহাকে লেখক শেষ পর্যন্ত অমন বদর্শনভাবে স্বার্থপর করিয়া তুলিলেন কেন বুঝা গেল না। পিতার চরিত্রের এই অসামঞ্জস্য বইয়ের এক দিকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

খুব বেশী রকম এ্যাবস্ট্রাক্ট (abstract) কবিত্তে গিয়া ভাষা মাঝে মাঝে এই রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে—“বীণা নিঃশব্দে একটা আর্তনাদ কবে উঠল,” “তার শরীরে ছিল না এতটুকু শারীরিকতা,” “কথা কি মানুষের অনেকগুলির মধ্যে আরেকটা ব্যর্থ আবিষ্কার নয় বা তার অতীত সেই ইসারাকে হৃদয় কবিত্তে দিয়ে বোঝাতে গিয়ে সেই অকল্পনীয়তা ফেলে হারিয়ে?”

—শেষের এই গোলকর্ধ্যাধার পড়িয়া কি মনে হয় না যে ও-ছাই-কথার আবিষ্কার না হইলেই ছিল ভাল?

বাঁধাই, কাগজ, ছাপা ভাল।

কণ্ঠিপাথর—জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। আর, পি, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৬৩ বীডুন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

তিন অঙ্কর একটি সামাজিক নাটক। বইখানি বেশ ভাল লাগিল। সব চরিত্রগুলি বেশ স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোথাও কটকটনা গীড়া দেব না। সমস্ত নাটকটির পটভূমিকা দেশচর্যা, তাহারই মধ্যে তিনটি ফলস্বরূপ প্রেমের কাহিনীটি স্থলর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের স্থলর অনুভূতিও আছে এবং প্রকাশের ভাষাও সাবলীল।

শেষের দিকে এক সন্ন্যাসীর অবতারণা করা হইয়াছে; এমন কিছু দোষের কথা নয়, তবে সন্ন্যাসী আসিলেই যেন মনে হয় সব দিকটা সামলাইয়া লইবেন; ইহাতে পাঠকের আভাবিক উৎকণ্ঠা নষ্ট হয়। এ-যুগে ওঁদের ছুটি দেওয়াই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণবপদাবলী (চয়ন)—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১০। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের জন্য সংকলিত আলোচ্য পদসংগ্রহগ্রন্থটিতে ভূমিকাংশ ১/০ পৃষ্ঠা হইতে ১১০ পৃষ্ঠা এবং পদটীকা সমেত মূল্যংশ ১১১০ পৃষ্ঠা। গৌরানন্দ-বিবরণ পদ, প্রার্থনা, বাল্যলীলা ও কালীযমদন, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বংশীশিক্ষা নৃত্য ও মান, আত্মনিবেদন, মাধুর্য, মিলন ও ভাবসম্মিলন—এই কবিতা গীর্ধকে মূল্যংশে সর্বসমেত ১২০টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি দাশরথি বায়ের গান এবং একটি কৃষ্ণকমল গোখারামীর তুল্য বা আখরসমষ্টিও আছে। পুস্তকটির কাগজ, ছাপা ও বাধাই উত্তম।

শ্রীসুকুমার সেন

বার্ষিক শিশুসাধী—২২ বর্ষ ১৩৪১ সাল। সম্পাদক শ্রীহরিন্দ্র রায়চৌধুরী। প্রকাশক—আজতোব লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা মূল্য দেড় টাকা।

বার্ষিক শিশুসাধী, শিশুসাধী নামক মাসিকপত্রের বার্ষিক সংস্করণ। বইখানি প্রকাণ্ড। স্থলর কাগজ, ছাপা অতি পরিপাটি, ছবিও বিস্তর। ছেলেমেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় এতে অনেক আছে। গল্প ও কবিতাগুলি থেকে তারা আমোদও পাবে প্রচুর। কিন্তু বইখানি নামে শিশুসাধী হলেও, শিশু বলতে বাদেব বোঝায়, ট্রিক হাফের উপযোগী হয়েছে বলে মনে হয় না। অনেক প্রবন্ধ ও গল্পের ভাব ও ভাষা দুর্বোধ্য; কোন-কোন স্থলে প্রাদেশিকতা-দোষে ভুগে। শিশুদের কি বিষয় দিতে হবে, আব কি ভাবেই বা তা দিতে হবে, এই এক বস্তু সমস্তা রয়েছে লেখকদের সামনে। এই বইখানির বহুস্থলে তার সমাধানের অভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

বৈজ্ঞানিক ভোজ—ডক্টর শ্রীশ্রীলাল মিত্র প্রণীত, ২৭১১ ফড়িয়াপুরের স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বই; ইহাতে সর্বস্বল্প চারটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—বৈজ্ঞানিক বয়স্কী-সংস্করণ, অচেনা সই, ভানী রাম-বাহাদুর ও ফুলের পরী। শেষোক্ত গল্পটি একটি জাপানী রূপকথার ছাপা অবলম্বনে লিখিত। গল্পগুলি বেশ সহজ সরল ভাষায় এবং বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জননের উপযোগী করিয়া লিখিত, উহাতে হাস্যরস ও বৈচিত্র্য উভয়ই আছে। ইহারিগের মধ্যে “বৈজ্ঞানিক ভোজ” গল্পটি একেবারে মৌলিক এবং বিশেষ আমোদপ্রদ। ছাপা, কাগজ ও বাধাই বেশ স্থলর।

মহামাহুয মুহসিন—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রণীত। ২৩ ক্রেমেন্টোরিয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বায়োরো জানা।

হাজী মুহাম্মদ মুহসিন বাংলা দেশের এক জন বয়স্ক সন্তান, শ্রেষ্ঠ ত্যাগী ও দানবীর; তাহার ত্যাগ, সন্ন্যাস ও দানশীলতা, তাহার পরহুঃখকাতর নিরহঙ্কার চিত্ত, ধার্মিকতাব সহিত অপূর্ণ উদার দৃষ্টি, তাহার বিদ্যা, জ্ঞান ও ভূয়োদর্শন—সকলই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। স্ততবাং হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের একটি বিশদ জীবনীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, ওয়াজেদ আলী সাহেব সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। লেখকের ঘটনাসম্মিলন ও বর্ণনার ক্ষমতা অতি স্থলর, ভাষা সরল ও সাজসজ্জা, সমস্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে একটুও ক্লেশ হয় না। ওয়াজেদ আলী সাহেব বাংলা ভাষার এক জন লক্ষ্যপ্রতিষ্ট লেখক, এই গ্রন্থ রচনারও তাহার সেই বশ অনুগ্রহ বহিয়াছে। বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান বালক ও যুবকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকখানার ছাপা, কাগজ ও বাধাই বেশ স্থলর।

ছুতোরের ছেলে রাজা—শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত এবং গ্রন্থকার কর্তৃক কাশীধাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য নয় আনা।

ইহা আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সভাপতি এব্রাহাম লিন্কলনের জীবনচরিত। এই পুস্তকখানি W. M. Thayer প্রণীত “Abraham Lincoln And How He Became President” গীর্ধক গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত। কিরূপে দুঃখমারিত্রয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়াও নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা রাষ্ট্রবৃদ্ধ হইতে পারে লিন্কলনের জীবনী তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাংলা ভাষায় তাহার জীবনী প্রকাশ করিয়া লেখক মহাশয় বাংলা দেশের বালক ও যুবকদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পুস্তকখানি বেশ স্বপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা সরল, বর্ণনাবাহুল্য নাই। জীবনের মূল ঘটনাগুলি সহজভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কাগজ ও ছাপা স্থলর।

মায়াদ্রোণী—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। পি, সি, সরকার এণ্ড কোং, ২ শ্যামাচরণ মে স্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক; ইহাতে সর্বস্বল্প পাঁচটি গল্প আছে—তপনকুমারের একরাতি, পাগল জগাইয়ের কাহিনী, একাদশী দাদা, গোল সিঁড়ি ও ককিরের ভিটে। গল্পগুলি বালক ও কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও দুই একটি গল্প প্রবীণদেরও ভাল লাগিবে, বিশেষতঃ গোল সিঁড়ি ও ককিরের ভিটে এই দুইটি গল্পে বেশ নূতন আছে। গল্পগুলি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এবং বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। শুধু একাদশী দাদা গল্পটি মাঝে মাঝে অবাস্তব কথার অবতারণায় তেমন জমিতে পারে নাই। মোটের উপর পুস্তকখানি স্বপাঠ্য হইয়াছে। কাগজ, বাধাই, ছাপা স্থলর।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

(১) হায়দার আলী, (২) টিপু সুলতান—

শ্রীআবদুল কাদের। প্রকাশক—ইতিকথা বুড়িগোলা, ৩৮ কড়িয়া রোড, কলিকাতা। প্রত্যেকখানির মূল্য ১০।

আমরা ভারতবাসী আত্মবিশ্বস্ত জাতি। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার অবশিষ্ট নাই।...যে সকল পুণ্যলোক বীরের কাহিনী আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের কথা আমরা প্রাণেই ভুলিয়া থাকি। হুতরাং যখন কোন লেখক সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। মৌলভি আব্দুল কাদের সাহেব এই গ্রন্থ দুইটিতে সেই চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজের শক্তিবিস্তারের প্রথম আমলে হাযদাব আলী ও টিপু সুলতান যে অপূর্ব বীরত্বসহকারে সেই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সাময়িক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার এই দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-দুইটি ইতিহাস-সম্পন্ন প্রণালীতে লিখিত; তাহাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর, বর্ণনা হৃদয়গ্রাসী হইয়াছে। অধুনা যে এক প্রকারের উর্দু-মিশ্রিত বাংলা বাংলার মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, গ্রন্থকার সেকপ ভাষা ব্যবহার না করিয়া স্বাধীন বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। জাতিধর্মভেদে আমাদের মাতৃভাষার রূপভেদ না করাই উচিত। তেমনি ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসেও জাতিধর্মভেদ না করাই উচিত। ধর্মনিরপেক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সকল বীরই আমাদের পূজার্য। হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের এই কাহিনী দুইটি হিন্দু মুসলমান সকল পাঠকেরই পক্ষে উপভোগ্য হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

—সুপজী—গুরু নানক কৃত ও কিরণচাঁদ দরবেশ কর্তৃক অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীহৃদাধোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আউধ বরবী, বারানসী। মূল্য আট আনা।

গুরু নানক কৃত শ্রীজগদীশ-সাহেব শিখগণের প্রতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। গুরু নানক কিরণচাঁদ দরবেশ কবিতা ভাষার অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদের সহিত মূলও দেওয়া হইয়াছে। মুখবন্ধে গুরু নানকের জীবনকাহিনী ও সাধনাব্য একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। গ্রন্থ-ধার্মিক দ্বিতীয় সংস্করণ করার প্রয়োজন হইয়াছে দেখিলেই বোঝা যায় যে গুরু পাঠকগণের নিকট ইহা বোঝা আদ্য হইয়াছে। অনুবাদক গুরুগণের কথা মনে রাখিয়াই এই অনুবাদ করিয়াছেন; হুতরাং সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার করেন নাই। সাধারণ পাঠক বোধ কবি মূল গুরুমুখীর বিশুদ্ধ পাঠ ও আক্ষরিক অনুবাদ (বভ্রূর সম্বন্ধ) পাইলে খুশী হইতেন। অবশ্য একথা সত্য যে, আক্ষরিক অনুবাদে প্রসাদগুণের অভাব হইবে ও মূল গুরুমুখীর বাংলা-লিপ্যন্তর সহজ হইবে না। গুরু নানককে গুরুবাদী বলিলে বোধ কবি তাঁহার মতের প্রতি উচিত বিচার করা হয় না। অন্ততঃ গুরুবাদ বলিতে আমরা সাধারণতঃ বাহা বুঝি, নানক সে ভাবের গুরুবাদ স্বীকার করেন নাই। শিখধর্মে গুরু ও ব্রহ্ম এক নহে। শেখ গুরু একথা পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, যে তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মনে করিবে সে ভুল করিবে। শিখধর্ম আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নানক মূলতঃ ব্রহ্মবাদীই ছিলেন।

বিজ্ঞানকাহিনী—শ্রীহৃদাধোগোপাল দরবেশ। প্রকাশক—দি বুক স্টল, ১৬২ রাসা রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১৪৬। মূল্য বারো আনা।

(১) বিজ্ঞানের নানা কথা, (২) বিজ্ঞানের খবর—শ্রীহৃদাধোগোপাল দরবেশ। প্রকাশক—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স ১০ কলেজ স্টোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ১২২। মূল্য বারো আনা।

বাংলা ভাষার ছেলেমেয়েদের পড়িবার উপযোগী বিজ্ঞান-গ্রন্থের অভাব এখনও দূর হয় নাই। জগদানন্দ রায় মহাশয় এ অভাব দূর করিবার

যত্নে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতি সহজভাবে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ৬৬ হইয়াছিল বৃন্দাবন তাঁহার শ্রদ্ধাঙ্গন অধিকার করিবার লোকের অভাব ঘটবে। কিন্তু এই গ্রন্থ কয়টি দেখিয়া সেই ভয় দূর হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীহৃদাধোগোপাল দরবেশ এই তিনটি অতি মনোহর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া শুধু ছেলেমেয়েদের নয় আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চিত্ত ছোটবেলা হইতেই বাহাতে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহার স্বল্প কোন বিশেষ প্রয়োজন আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে দুর্ভাগ্যক্রমে নাই। অথচ চারি দিকে প্রকৃতির দৃশ্যবৃত্ত সে নান'রহস্য অহরহ আমাদের চোখে পড়ে তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইতেই শুধু বিজ্ঞান-শিক্ষার নহে সকল শিক্ষারই আবশ্যক। সেই জন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্থান এত উচু। হুতরাং ছেলেমেয়েদের উপযোগী বিজ্ঞানগ্রন্থের এত প্রয়োজন। যিনিই সে অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবেন তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন।

‘বিজ্ঞানকাহিনী’ নামক গ্রন্থে লেখক আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, এডিসন প্রমুখ কয়েক জন বৈজ্ঞানিক মনীষীর জীবনকাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের আবিষ্কারগুলির সংক্ষিপ্ত ও সর্বল ইতিহাস মোটামুটি ভাবে দিয়াছেন। ‘বিজ্ঞানের নানা কথা’ ও ‘বিজ্ঞানের খবর’ নামক গ্রন্থ দুইটিতে হৃদয়গ্রাসী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে-সকল প্রাকৃতিক ঘটনা (যথা, লোহা জলে ভাসে কেন, জল আঁশ-নিবার কেন, গাছপালায় সহিত বাতাসের সম্বন্ধ, রঙের কথা, দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখা যায় না কেন, ইত্যাদি) আমাদের মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করে তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রত্যেকটি গ্রন্থই অতি সুন্দর হইয়াছে। হৃদয়গ্রাসী ভাষা মনোহর ও বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে গ্রন্থগুলির আদর হইবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বইগুলির ছাপা ও বাঁধাই ভাল, মূল্যও কম। তবে ‘বিজ্ঞানকাহিনী’ কাগজ ও ছাপার কালির দ্রবীভবন ভাল হইতে পারিত বলিয়া মনে হয়। দু-এক জায়গায় ছাপার ভুল ও ‘বাপ্পীভবন’ প্রভৃতি কয়েকটি ক্রমিক শব্দ চোখে পড়িল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ধর্মমোড়শী—শ্রীশ্রীভট্টচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ, বিদ্যানিধি প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক আগরতলা (ত্রিপুরা স্টেট) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিকের মূল তথ্য সম্বন্ধে বোলটি স্থলিখিত গ্রন্থের সমাবেশ এই পুস্তক অধিত। হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার আগাততঃ নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয় সত্য, কিন্তু যুগান্তে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, এইগুলির অন্তরালে এক গভীর রহস্য বর্তমান রহিয়াছে। এই কথাই গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁহার যুগান্তের পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী.

শ্রীশ্রীব্রজদর্শন—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম্-এসসি। প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রজ বিশ্বাস, ৪ সেন্ট জেমস স্টোয়ার, কলিকাতা। ১৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ টাকা মাত্র।

বৈখান্য ব্রহ্মবৈদ্যের ব্রহ্মসূত্র। গ্রন্থকার উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক

এবং পরম বৈষ্ণব ও ভগবদ্বিধাসী। গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও ব্যক্তি রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে প্রদত্ত ব্রহ্মণ্ডলেশ্ব মানচিত্রটি নূতন তীর্থযাত্রীর উপকারে আসিবে।

বৈষ্ণবীক আচার নিদর্শন গ্রন্থকারের ভাষায়ও রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বৈষ্ণব-নামের পূর্বে অন্ততঃ একটি শ্রী শব্দ তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন— এমন কি, নবদ্বীপ, শান্তিপুত্র, নামের পূর্বেও (৭ পৃ.)। বিশেষ বিশেষ নামের পূর্বে একাধিক ‘শ্রী’ও ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, ‘শ্রীশ্রীব্রজধাম,’ ‘শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল’ ইত্যাদি। মোটের উপর, ‘ঈদাম’ ‘হুশ্রী’ প্রভৃতি শব্দের ‘শ্রী’ এবং গ্রন্থকার ও প্রকাশক প্রভৃতির নামের পূর্বে ‘শ্রী’ কর্তৃক বাদ দিয়াও ১৭৬ পৃষ্ঠার বইয়ে অন্ততঃ ৫৫০টি ‘শ্রী’ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ গড়ে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রায় ৩-৪টি এবং প্রতি ৭ ছন্দে একটি করিয়া ‘শ্রী’ বহিয়াছে। কিন্তু অ-বৈষ্ণব নামের পূর্বে ‘শ্রী’র ব্যবহার তত উদারভাবে করা হয় নাই; বরং, ৫৫ পৃষ্ঠায় কয়েকটি মহাদেবের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁরা সবই স্বর্গীয়—অর্থাৎ ৮চিরন্তন; অথচ ‘শ্রী’কৃষ্ণের প্রণোদ ব্রজনাভ এখনও স্বর্গীয় হন নাই, ‘শ্রী’হুত।

গ্রন্থকারের ভক্তি ও বিশ্বাস অসাধারণ। গোবর্ধন সিবিকে তিনি দ্বন্দ্ব কিনিয়া খাওয়াইয়াছেন, কিন্তু পাহাড়টির যেটি মুখ কল্পনা করা হয়, সেখানে দ্বন্দ্ব চালিতে হইলে পাহাড়ের গায়ে পা ঢেকে, তাই তিনি নিজে দ্বন্দ্ব চালিতে পারেন নাই; পাণ্ডা কিন্তু অজ্ঞান বদনে তাহা পারিয়াছে। “ব্রজবাসী সেবাইতের অবস্থা এতে কোন দোষ হয় না, নচেৎ সেবাই চলে না” (১২২ পৃ.)।

বৃন্দাবনে কয়েকটি তমালবৃক্ষে গ্রন্থকার শালগ্রাম দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে “খুব সম্ভব এগুলি অতি প্রাচীন ভগবন্ত, ভগবান এঁদের অঙ্গকে আপনায় অঙ্গ বলেই মনে করেন, তাই এঁদের অঙ্গে আপনায় অঙ্গ প্রকাশ কবেছেন (১৭৬ পৃ.)। বর্তমান সমালোচকও এ-সকল দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনে এ-সিদ্ধান্ত জাগে নাই। এইখানেই ভক্তির তফাৎ।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সঙ্গীত পরিবর্তন—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ গায়ক, তিনি জীবনে সঙ্গীতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাত্যর্থ-গণকে নিন্দা করিয়াছেন। ক্রপদ গানের দ্বন্দ্ব পরিবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি সঙ্গীতাত্যর্থ কুরুধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষারোপ করিয়াছেন। যদি হুব হুন্দর হইয়া থাকে তবে পরিবর্তন অসম্বন্ধীয় অপরাধ নহে। বহুভট্ট ও কুরুধন বাবু ইহজগতে নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা না-করাই ভাল ছিল। সঙ্গীতাত্যর্থ ভাষ্যগুণের সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও না লিখিলেই শোভন হইত। মোটের উপর নিজের প্রাধান্য দেখাইতে গিয়া অপরাধে ছোট করিবার চেষ্টা সকলের পক্ষেই পরিহার্য।

বৈজু বাওরা ও তানসেন—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার সঙ্গীত-বাজ্যের দুই জন দিকপালের জীবনী তাঁহার নিজ অনুসন্ধান ও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বইখানা বিশেষত্ববর্জিত, তবে কিম্বদন্তীগুলি হৃদয় বলিয়া গল্পের স্রাব একটানা পড়িয়া ফেলিতে কষ্ট হয় না।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য

অতি বোগাসু—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সনস্, ২০৩।১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১।০।

ছোটগল্পের বই। বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নাই। বইখানির ছাপা ভাল, অনেকগুলি ছবিও আছে।

পোড়ো জমি—জাবুল কালাম শামসুদ্দীন। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী। ২১, আপার সাফুলার বোড়, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। বইখানি টুর্গেনিভের Virgin Soilএর অনুবাদ। মূলপুস্তকের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক—সাহিত্যরসিক স্বীকৃতি উক্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের সহিত হুপরিচিত। অনুবাদটি সরস ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

স্বপনকুহেলী—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক—সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ১৫নং ভুবন সরকাব লেন, কলিকাতা। দাম ১।০।

একখানি কবিতার বই। অনেক স্থলে রবীন্দ্রনাথের বার্ষ অঙ্করণ। কিন্তু লেখকের নিজস্ব শক্তি যথেষ্ট পরিচয়ও নানা স্থলে হুস্পষ্ট। প্রথম রচনার তিনি যে প্রভাব কাটাটরা উঠিতে পারেন নাই, মনে হয় যে পরবর্তী জীবনে সেই প্রভাবই তাঁহাকে নিজের পঞ্চটি চিনিয়া লইতে সাহায্য করিবে। বইখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই অতি হৃদয়। ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি ভাল লাগিল।

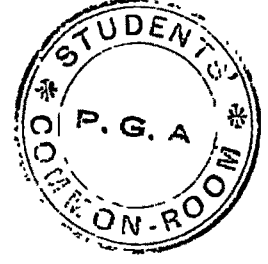
শ্রোত—শ্রীজুবনমোহন মিত্র। নারায়ণ সাহিত্য-মন্দির, ৮ নং রাধামাধব গোস্বামীর লেন, বাগবাজার। দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নীলাম্রি ও স্বয়ংগার চরিত্রটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। গ্রামলার ছবিটিও বরদ মিরা আঁকা। তবুও বলিতে হয় উপন্যাস হিসাবে বইখানার সার্থকতা তেমন নাই—উপন্যাস না-বলিয়া বড় গল্প বলিলে ইহাও স্বরূপ ঠিক বোঝা যাইবে। ভাষা ভাল ও স্বরস্বরে।

ছায়াপথ—শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সনস্, ২০৩।১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি আমাদের কাছে আনন্দ দিয়াছে। লেখিকা চরিত্র-অঙ্কনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—হুশ্রীয়া ও বিভাসের ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অকৃত্রিম। প্রকৃতির বর্ণনাতেও লেখিকার পাকা হাত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



বাঘ আসিয়াছে—

শ্রীবিমল মিত্র

খবরটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে।

মতি মল্লিক বৃদ্ধ অর্থহীন মানুষ। বাতে ভাল নড়িতে পাবেন না বলিয়া দাওয়ার বসিয়া দড়ি পাকাইতেন; কয়েক দিন হইল তাঁহাকেও আর দেখা গেল না। বলেন—
হাঁ বাপু, প্রাণ অমুনি সস্তা নয়—খাই-না-খাই হবে পড়ে থাকব, তা বলে বাইরে বেরুচ্ছি নে—

নন্দ কলুর ডোবাটার পাশের দিকে একটু জঙ্গল মতন। কয়েকটা শাঁড়া আর আসগ্রাওড়া গাছ জন্মিয়া বহুদিন হইতে জায়গাটি অগম্য। তথাপি বর্ষাব দিনে ডোবার বখন জল ভরিয়া উঠিত, পাড়ার বো-ধিরা ওই ডোবা হইতে কলসী-কলসী জল বহিয়া লইয়া যাইত; ভয় বলিয়া কোন দিন কিছু ছিল না। কিন্তু খবরটা জানাজানি হইবার পর হইতে ঐদিকে আর কেহ মাড়ায় না, বিকাল হইতে-না-হইতে গ্রাম ঘেন খাঁ-খাঁ করিতে থাকে।

রাজে সারা গ্রাম বখন নিশুতি—অন্ধকারের তন্দ্রা ভেস করিয়া কত বিকট শব্দ সকলের কানে আসে—সকলেই গুনিতে পায় বেন কাছাকাছি পোয়াটাক পথ দূরেই সারা পল্লী চকিত সমস্ত করিয়া দিয়া শব্দ হইতেছে—
ফেউ-ফেউ—

শব্দটা কানে আসিতেই সকলেই ঘুম ভাঙিয়া যায়। জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে প্রায়কালে ঘরের ভিতর থাকা যায় না, কিন্তু উপায় নাই। ঘরের ভিতর গরমে বন্ধ থাকিবে তবু অপঘাতে কেহ প্রাণ দিবে না। সন্ধ্যা হইতেই সকলে শয্যাগ্রহণ করে, আবার ওদিকে রোজ উঠিয়া বেলা হইলে তবে সকলে বিছানা ছাড়িয়া উঠে। দিনের আলো থাকিতে থাকিতে যে-বাহার কাজ সারিয়া লয়—সন্ধ্যাবেলা বাহির হইয়াছে কি অমুনি গলার টুটি চাপিয়া ধরিয়া প্রাণটি বাহির করিয়া লইবে।

প্রথম প্রথম দু-এক জন বিশ্বাস করিতে চায় নাই।

শশিনাথ ছেলেবেলা হইতেই ডানপিটে, বলিষ্ঠ,—হ্যাঁ, বাঘ অমুনি বললেই হ'ল কি না—ও বাঘ-টাঘ নয়, বুঝলি অমেরতো—কুঁদো শালু-গালু হবে আর কি—

কিন্তু এক দিন সকলেই বিশ্বাস কবিল। গ্রামের চৌকীদার গিরিধারীকে কয়েক দিন ধরিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। চাবিদিকে খোঁজ পড়িল। পবের দিন দেখা গেল বিলেব ধারে শুকনো নলখাকড়ার গাদার ধারে মরিয়া পড়িয়া আছে। কতবগুলি শকুনি শেয়াল দেহটি খাইয়া অর্ধেক নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।

অমৃত বলিল,—এ যদি সেই শালার কীর্তি না হয় ত এই দিককার গৌফ আমি কামিয়ে ফেলে দেব—দ্বিবি করলাম—

খবরটা যে মিথ্যা নয় তাহাব প্রমাণ পাওয়া গেল আর এক দিন। নিত্যানন্দ পিওন গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করিয়া দিয়া পোষ্টাপিসে ফিরিয়া যায়। পোষ্টাপিস সেই গাঙ্গনায়। ফিরিতে তাহার রাতই হইত। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা জলাহাটিব ধানক্ষেত হইতে ডাঙ্গার উপর উঠিতেই কি রকম একটা গৌ গৌ শব্দ নিত্যানন্দের কানে আসিয়াছিল।

নিত্যানন্দ বলিল,—বুঝলি অমেরতো, ভয় ত আমার কোনও কালে নেই ভাই—কিন্তু এই তোর গা ছুঁয়ে বলাছি, সেই শব্দ না শুনে ঘেন ঠিক থর থর করে কাঁপতে লাগলাম, বুঝলি—পাশে ছিল একটা তেঁতুলগাছ, আর কিছু নেই—পেছন পানে কেবল ধানক্ষেত আর সম্মুখে কেবল ছাড়াছাড়া জঙ্গল—ছুগা বলে গাছের ওপর উঠে গে পড়লাম—তার পর দেখি কি জানিস—ঘেথানটার ঢালু জায়গাতে একটুখানি জল জমেছে, ঠিক সেখানে একটা ছাগল ধরে চিবোচ্ছে—তোকে বলবো কি—যেমন তেমন নয়—মাপলে যদি পুরোপুরি দশ হাত না হয় ত...

মতি মল্লিক ঘরের ভিতর বসিয়া পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কাল কাকে নিলে গা, পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা বলিল,—আমাব রামীর বাছুরটাকে পাচ্ছি নে মতিকাকা, সেই কালোপানা বকনা বাছুরটা—দেখি একবার ও-পাড়ার খোঁজ ক’রে—

মতি মল্লিক বলিলেন,—ও উলোর বাঘ, বুঝলে পাঁচুর মা, নোনাগাটিব জঙ্গল কাটা হচ্ছে কি না, তাই এখনে এসেছে পেছায় বড় বড় বাঘ—বাছুরটাকুর আর ছেড়ো না—

বারোয়ারীতলায় একটা মাচার উপর বহুকাল হইতে আড্ডা বসিত, অমৃত, শশিনাথ, এমনি আবও অনেকে আসিয়া সেই আড্ডায় জুটিত। হুই হাতে চলিত তাস, সকাল হুপু এবং রাত্রি বারোটা অবধি। নিত্যানন্দ-পিওন চিঠি বিলি করিয়া ফিরিয়া বাইবার সময় এক হাত তাসও মাঝে মাঝে খেলিতে বসিত। কোন-কোন দিন ডুগি তবলা হারমোনিয়ম লইয়া গান-বাজনাও চলিত। কিন্তু বাব আসিবার পর হইতে সেই আড্ডাটি মৃতপ্রায়। দিনেব বেলা কেহ কেহ আসিয়া হয়ত নামমাঞ দেখা দিয়া যায়—কিন্তু আড্ডা আর জমে না—এ যেন বর্গী-আসারও বাড়ী।

সেদিন হুপুরবেলা জনকয়েক মিলিয়া মিলিয়া মাচার বসিয়া সেই কথাই বলিতেছিল। এমন করিয়া আর কত দিন চলে? এখন না-হয় একটি দুইটি বাঘ আছে—কিন্তু এমনি ভাবে চালালে গ্রামে কি আর মানুস থাকিবে! আজ দুটি বাঘ আছে—কাল তাহাদেরই বাচ্ছা হইয়া হইবে তিনটি! এমনি করিয়া বাঘের বংশ বাড়িতে চলিলে গ্রামে যে বাস করা দায় হইয়া উঠিবে! এইবেলা সকাল সকাল একটা কিছু উপায় কবিতে না পাবিলে চলিতেছে না আর!

শশিনাথ বলিল,—খাঁচা বানাও—আব সেই খাঁচার ভেতর রাখো ছাগল-ছানা বেধে—তারপর বা ব্যবস্থা করবার আমি করবো’ধন—

বুড়ো অক্ষয়ের তিন-চারিটা ছাগল-ছানা আছে। এই সেদিন সবে হইয়াছে। অক্ষয় জানে তাহার ছাগলগুলির উপবই সকলের লোভ! বলিল,—খাঁচা যেন হ’ল—ছাগল-ছানা কে দেবে?...আজকাল বা দর ছাগলের—

স্বর্ঘ্য কামার বলিল,—তুমিই দাও না খুঁড়ো একটা, তোমার অতগুলো ছাগল, কোনদিন গোয়ালহুঙ্কু ধরে

নিয়ে যাবে—তা’র চেয়ে একটা দিবে যদি হয়, দেখ না—

বুড়ো অক্ষয়ের রাগ বেশী। বলিল,—কেন শুনি, চাঁদা তোলা না, কত আর পড়বে—তিনটে টাকা দিলে একটা ছানা ছাড়তে পারি—নইলে এই মাগিগণ্ডার বাজারে—ছেলেপুলে নিয়ে আমার বাস করতে হয়—ছাগল আমি মাংগনা দিতে পারবো না, তা ব’লে রাখছি—বলিয়া আর কোন উপায় না দেখিয়া অক্ষয় আড্ডা ছাড়িয়া এক-পা এক-পা করিয়া বাড়ি মুখে চলিতে আরম্ভ করিল—

সেদিনকার মত কোনও কিছুই মীমাংসা হইল না—এমন কি, শুধু সে দিনই নয় কতদিন ধরিয়া যে এমনি কথাবার্তা চলিল—পরামর্শ হইল, তাহাব ইয়ত্তা নাই। কিন্তু একটা-না-একটা কিছু বিয় আসিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া দেয়। কেহ এতটুকু স্বার্থভাগ কবিবে না,—কাহারও ব্যক্তিগত দায় হয় বলিয়া কেহ নিজেব ঘাড়ে দায়িত্ব লইতে চায় না। পরের উপর দিয়া কাজটা হুসমাধা হইয়া গেলেই যেন সকলে খুশী!

কিন্তু অসুবিধা হইল সকলের চেয়ে বেশী প্রসন্ন ঠাকুরেব।

গ্রামের এক দিকে বহুদিনকার এক দেবীর মন্দির আছে। সারদেশ্বরী বলিতে দশখানা, গ্রামের লোক অজ্ঞান। এ-অঞ্চলকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন দেবী সারদেশ্বরী। গ্রীষ্মকালে আকাশে এক খণ্ড মেঘ নাই—এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই—মাঠের ধান মাঠে শুকাইয়া যাইতেছে—দশখান গাঁয়েব লোক আসিয়া দেবীর পূজা দিয়া গেল; তার পর দিন দেখিতে দেখিতে ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া মাঠ ঘাট পুকুর ডোবা ভাসাইয়া দিয়া গেল।...মান্নের এমনি রূপা! প্রকাণ্ড গম্বুজওয়াল মন্দির; মন্দির বহু পুরান কালের—মাহাত্ম্য তাই অনেক বেশী—

প্রসন্ন ঠাকুর সেই মন্দিরেরই পুর্বোহিত।

প্রসন্ন ঠাকুরের ঘববাড়ি সবই আছে—একটু দূরে। কিন্তু দিনের বেলা প্রসন্ন ঠাকুর বাড়িতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া দেখা-শুনা সবই করিয়া আসে। রাজ্জে মন্দিরের দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া থাকে। মন্দিরের দরজাঘ একটা প্রকাণ্ড তালা লাগানো থাকে—জার বাহিরে প্রসন্ন ঠাকুর ঘুমায়।

বউ কত দিন বলিয়াছে—বাড়িতে তোমার কে শত্রু আছে শুনি যে বাইরে যাবে ঘুমুতে ?

প্রসন্ন ঠাকুর বলিত,—ঘুমুই কি সাধ ক'রে ?...

সে কথা সত্য ! শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, প্রসন্ন ঠাকুর যে মন্দিরেব ভাঙা দাওয়ার উপর শুইয়া থাকে তাহা সাধ করিয়া নয়। তাহার কারণ আছে। সে-কারণ সকলকে প্রকাশ করিয়া বলা যায় না !

চুপি চুপি প্রসন্ন ঠাকুর বউয়ের কানে কানে বলিত,—চল্লিশ ভরি সোনার গয়না ঠাকুরের গায়ে আছে—এই হুভিক্ষের বাজাবে—এ-দেশের যে আকালে লোক—এরা সব পারে—

চল্লিশ ভরি সোনার লোভে যে এ-দেশের লোক ঠাকুরের গায়ে হাত দিবে তাহা বউ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু প্রসন্ন সে-কথা শুনিবার পাজ নয় ! মানুষে কি না পারে ? পরসার জন্ত লোকে যখন নিজের বাপকে খুন করিতে পারে—তখন পাথরের দেবতা কোন্ হার ! মানুষে সব পারে।

হুপুরবেলা সেই আড্ডায় আসিয়া প্রসন্ন ঠাকুর বসিল। বলিল,—একটা উপায় তোমরা ক'রে ফেল শশি, তোমরা হুচ্ছ জোয়ান লোক, গায়ে ক্ষমতা আছে—আমি ত আর পারি নে,...রাতের বেলা দাওয়ার শুয়ে থাকি, কোন দিন টেনে নিয়ে যাবে বাবে,...সেইটাই ভাল হবে ?...

শশিনাথ বলিল,—শিগিগবই একটা ব্যবস্থা করছি ঠাকুর মশাই—কিন্তু দাওয়ার শোওয়া তোমার আর চলবে না—বাড়িতে ঘরে গিয়ে শুতে হবে—মন্দিরের দরজায় তালা দেওয়া থাকে ত, তবে আবার ভয় কিসের তোমার, শুনি ?

প্রসন্ন ঠাকুর বলিল,—চোর-টোর—বুঝলে না,—বলা যায় কি, কার মনে কি আছে ?

—চোর ? অমৃত ভাবিতেছিল। বলিল—চোর হাত দেবে ঠাকুরের গায়ে। বল কি ঠাকুর মশাই ? দেবতার গায়ে হাত ?...কুষ্ঠ হবে না ? হাত যে খ'সে পড়বে—তার কি গতি হবে ?...জয় মা সারদেবী—কি যে বল ঠাকুর মশাই ! আর চোরের কি বাঘের ভয় নেই ভেবেছ ?

দেবতা না-হয় যদি রেহাই দেয়, বাঘ ত আর ছাড়বে না তা'বলে—?

উপস্থিত সকলেই সেই কথা বলিল। চোরই হোক—আব বাহাই হোক বাঘের ভয় কবে না, এমন প্রাণী ত জিভবনে নাই ! প্রাণেব মায়ী সকলেবই আছে।...প্রাণ অমন কাহারও সত্তা হয়।...

সেদিন সত্য সত্যই মন্দিরেব দাওয়ার আর শোওয়া হইল না। পুরোহিত বলিয়া বাঘ ত আর তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না ! বাঘের যদি অত বুদ্ধি থাকিবে, তবে আব ভগবান তাহাকে বাঘ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন কেন ! প্রসন্ন ঠাকুর সেদিন বাড়ি আসিয়া শুইল।

রাজিবেলা দুই প্রহরে শশিনাথ আসিয়া অমৃতকে ডাকিল,—ও অমেরুতো, অমেরুতো, অমেরুতো রে, ওঠ—উঠে পড়—

অমৃত ধড়কড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। আগে হইতেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া ছিল। বাহিবে আসিয়া অমৃত বলিল—লোহাব ডাঙাটা নিয়েছি'ত ? সমস্ত ঠিক।

নিঝুম পল্লীর দ্বিপ্রহরের নিদ্রা—তল্লাচ্ছন্ন আকাশ ! বাঘের ভয়ে সারা পৃথিবী কেন অবশ হইয়া আছে ! বে-বাহার বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। কোথায় এতটুকু টু-শব্দ নাই—নিস্তরঙ্গতার সমুদ্রে এখন নিটোল নিস্তরঙ্গ।

তালা ভাঙিয়া মন্দিরে ঢুকিতে হইবে।

তা শশিনাথ ওস্তাদ লোক ! তালা ভাঙিতে তাহার দেবি হইল না ; দরজা খুলিয়া শশিনাথ আর অমৃত ভিতরে ঢুকিল। ফস্ করিয়া একটা দেশলাই-কাটি জ্বালিতেই ঘরের ভিতরটা আলোময় হইয়া উঠিল।

কিন্তু বিষয়ের উপব বিষয় !...শশিনাথ দেখিল—অমৃতও দেখিল।...দেখিয়া দুই জনের চক্ষুই কপালে উঠিল।

এমন ঘটনা যে ঘটবে তাহা দু-জনের মধ্যে কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। শশিনাথ অমৃতের দিকে চাহিল, অমৃত চাহিল শশিনাথের দিকে। দেশলাই-কাটিটি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল।...

অতকালের পুরান জাগ্রত দেবী! সকলেই দেখিরাছে
সোনায় মোড়া তাহার দেহ! চলি শরি সোনা কম নয়।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এক ভিল সোনা তাহার গায়ে নাই।
নিরলস্কার পাখরের দেহ বড় স্নান!

শশিনাথ বলিল—এ ঐ বেটার কাজ!...

—কোন বেটার?

—ঐ পুরুত বেটার।

সত্যসত্যই হু-জনের কাহারও সন্দেহ রহিল না যে,
প্রসন্ন ঠাকুরই নিজের বাড়িতে সব সরাইয়া কেলিয়ছে।
কয়েকটা বাসনপত্র—ঘটি নৈবেদ্যের থালা ইত্যাদি বাহা ছিল
তাহাই হু-একটা নিল শশিনাথ, হু-একটা নিল অমৃত!

পরের দিন প্রসন্ন কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির।

লোকের সামনে গিয়া বুক চাপড়ায়, আর বলে,—হার
হায়, কি হ'ল—কি হ'ল—

ব্যাপারটা লম্বা নয়, সারসংক্ষেপেই গহনা চুরি! প্রাণময়
হৈ চৈ পড়িয়া গেল সেই দিনই। প্রসন্ন চোখের জলে বুক
ভাসাইয়া ফেলে আর বলে—মা'র গহনা চুরি ক'রে সে ভোগ
করতে পারবে না, তা দেখো! কুঠ হবে না? ...হে-হাত
দিয়ে নিয়েছে সে-হাত খ'সে পড়বে না? কদিন খাবে
খাব না—মা'র ঠিক দৃষ্টি আছে—উপরে উপরওয়ালো যিনি
আছেন—তিনি দেখছেন ঠিক—

হুগুরবেলা কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল বারোয়ারীতলার
আড্ডায়। বলিল—তোমরাই ত বললে শশি, আমার ঘরে
গিয়ে শুতে, এখন দেখ ত!...তা এ আর দেখতে হবে না,
মা'র রাগ চড়ে গেছে। কি যে ক'রে বসেন কে জানে!
শীগিরই একটা কিছু বিপদ ঘটবে!...কাল রাত্রে, মা
কি স্বপ্ন দিয়েছেন, জান?...আমার বকের উপর পা দিয়ে
বললেন—বেখান থেকে পারিস আমার গহনা আবার গড়িয়ে
দে...এখন কি করা যায় বল ত—গহনা না দিলে ত
সব রসাতলে যাবে, কিছু কি আর থাকবে? হয় আবার
গহনা গড়িয়ে দাও—নয় ত—

শশিনাথ আর অমৃত হু-জনে চোখ-চাওয়াচাওয়ি
করিল।

বুড়ো অক্ষয় বলিল—বেটা চোরের কি বাঘের ভয়ও
নেই রে?

যেখানে বতলোক ছিল—কেবল শশী আর অমৃত ছাড়া
—আর সবাই তখন সেই কথাই ভাবিতেছিল...বেটা
চোরের কি বাঘের ভয়ও নাই?

প্রসন্ন ঠাকুর আবার বলিল—তোমরা আমার ঘরে
শোওয়ালে, গহনা-চুরির অপরাধ তোমাদের যদি লোকে
দেয় লোককে 'না' বলব কোন মুখে?

শশী ও অমৃতের মুখে জবাব আটকাইয়া গেল।



সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় শিক্ষা-বিস্তারের অন্তরায়

(সরকারী রিপোর্টের সাক্ষ্য)

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতিক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া বর্তমান ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়সমূহের অল্প অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা কি মুসলমানদিগের মধ্যেই শিক্ষার উপযুক্ত রূপ বিস্তার হইতেছে? সরকারী শিক্ষাবিবরণীগুলি ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছে—না। কেবল ইহাই নহে, উহাদিগের দ্বারা সাধারণেব অর্থের (যাহাব অধিকাংশ হিন্দুর প্রদত্ত) উক্ত প্রকার অপব্যয়ের জন্য এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও পার্থক্য ভাব বৃদ্ধি হয় বলিয়া, দেশেব অসাম্প্রদায়িক সাধারণ স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে।

ভারত-গবর্ণমেন্টের ১৯২৭-৩২ সালের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-বিবরণীতে মুসলমানদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া

উপসংহারে বলা হইয়াছে :—

যত দিন পর্যন্ত পৃথক বিশেষ (সাম্প্রদায়িক) বিদ্যালয়সমূহ এত অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন মুসলমানদিগের (শিক্ষার) উন্নতি স্তম্ভতরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। (পৃ. ২৪৪)।

উক্ত রিপোর্টেই শিক্ষায় অপব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে, বিহার-উড়িষ্যার ডিরেক্টর সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়সমূহের কুফলের বর্ণনা করা হইয়াছে :—

বিহার-উড়িষ্যার ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন ১৯২২-২৭ সালের পঞ্চবার্ষিক বিবরণীতে, সাম্প্রদায়িক পার্থক্যভাবের প্রতি ক্রমবর্দ্ধনশীল অনুমানের ফলে (শিক্ষায়) যে অনাবশ্যক অর্থব্যয় হইতেছে, তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন :—

গ্রামের সাধারণের জন্য একটি বিদ্যালয়ের পরিবর্তে বাহাতে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেই জন্য একটি আন্দোলন চলিতেছে...আমরা এখন এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইতেছি যে এতোক গ্রামই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মন্ডব, ও একটি পাঠশালা চাহিতেছে। অধিকন্তু, ইহাও দাবি করা হয় যে নিম্ন-প্রাথমিক ক্ষেত্রেও বালিকাদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয় দরকার, এবং অনেক স্থানে, অল্পমাত্র শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের জন্যও পৃথক বিদ্যালয় আবশ্যক। এইরূপে, ভারতের দরিদ্রতম প্রদেশে, প্রতি গ্রামে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দিতে আমাদেরকে বলা হইতেছে।'

দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁর আর্থিক অনটনের সম্মুখেও, এই সতর্কতা-হ্রস্ব কথামূল্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহার সদ্য-প্রকাশিত রিপোর্টে ডিরেক্টর মহাশয় বলিয়াছেন যে—

‘পাঁচ বছর পূর্বে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এখনও প্রযোজ্য। বিহার-উড়িষ্যা একটি দরিদ্র প্রদেশ এবং অতিব্যয় সহ্য করিতে পারে না; এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলি অতিব্যয়ের কারণ। অপরিমিত ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই অতিব্যয়মূলক বিদ্যালয়গুলি উপকারপ্রসূ নহে, কাবণ মন্ডব ও পাঠশালাগুলির শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয় পড়াইতে এত অক্ষম যে তাহা সর্বজনবিদিত।’

তার পর, পূর্ব পূর্ব বিবরণীতে ইহা লক্ষ্য করা হইয়াছে যে পঞ্জাবে অত্যধিক সংখ্যক সাম্প্রদায়িক মধ্য-বিদ্যালয় (Secondary schools) আছে বলিয়া উহার ফলে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিবাসিতা হয়, এবং তাহার জন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মাবলী (discipline) লোপ ও কর্মক্ষমতা (efficiency) হ্রাস পাইয়াছে; তথাপি, এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ব্যয়ের প্রতিকারের জন্য কোনরূপ সংহত ও সাহসিকতাপূর্ণ চেষ্টা হইয়াছে, এরূপ ইঙ্গিত পঞ্জাবের রিপোর্টে নাই। (ভারত-গবর্ণমেন্টের দশম পঞ্চবার্ষিক বিবরণী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫)*

উদ্ধৃত কথামূল্য পড়িতে পড়িতে মনে এক কোতুলকের উদয় হয়। ভারত-গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-বিভাগের কমিশনার মহোদয়, এবং অন্ততঃ একটি প্রাদেশিক ডিরেক্টর (বাংলার বিপোর্টেও এরূপ মত দেখা যায়) সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়-গুলিকে অবাঞ্ছনীয় বস্তু মনে করিবেন এবং ঐগুলি দ্বারা ঘটিত অপব্যয়ের প্রতিকার হয় নাই বলিয়া দুঃখিত। অথচ সাধারণে জানে যে সাধারণেব অর্থের ঐ অপব্যয়ের প্রতিকার, যাহারা ‘হা-জুতাশ’ করিতেছেন, সেই উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারী-দেবই হাতে। তাঁহাদের ঐ সব সহজি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য বর্তমান কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাব প্রস্তাবের মত, “ধরি মাছ না ছুই পানি,” এই নীতির পরিচায়ক।

যাহা হউক, ভারত-গবর্ণমেন্টের উক্ত রিপোর্টের ৩০ পৃষ্ঠায়, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের বালক-বালিকার জন্য পৃথক

* Tenth Quinquennial Review (Progress of Education in India, 1927-32, Vol. I.)

পৃথক্ বিদ্যালয়ের (Segregate Schools for Children of particular communities) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান এইগুলি মুসলমানদিগের মক্তব-মাদ্রাসা ও মোল্লা-বিদ্যালয় (Mulla school) এবং হিন্দুদিগের মক্ত পাঠশালা; এবং ব্রহ্মদেশে বহুসংখ্যক (বৌদ্ধ) মঠাশ্রিত (monastic) বিদ্যালয়...

যে ছাত্রদিগকে বর্তমান যুগের জীবনযাত্রার উন্নতি করিতে হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ (অথবা ত্রুটিপূর্ণ)। শিক্ষা-বিভাগের গুরুতর অর্থ-অপচয়ের জন্তও ঐ সকল বিদ্যালয় বহুলাংশে দারী, কারণ উহাদের মক্ত একই কাজ দুইবার করার দরকার (overlapping) হয়।

এই স্থলে, রিপোর্টে উল্লিখিত “পাঠশালার” কথা আলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, “মুসলমানদিগের মক্ত মক্তব-মাদ্রাসা আর হিন্দুদিগের মক্ত পাঠশালা”। ইহাতে বুঝা যায়, যেমন মক্তব-মাদ্রাসা কেবল মুসলমানদিগের মক্ত, তেমনি পাঠশালা-গুলিও কেবল হিন্দুদিগের মক্ত। এই উক্তি অসত্য অথবা অতিরঞ্জিত মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্ততঃ, বাংলা দেশে সাধারণ শিক্ষার মক্ত বে-সকল পাঠশালা আছে, তাহা হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলের মক্ত। অতঃকোন প্রদেশেও সরকার এই অতুলনীয় মুসলমান-খ্রীষ্টিয় ও প্রাকান্ত ধারাবাহিক হিন্দু-উপেক্ষার দিনে কেবল হিন্দু বালক-বালিকার মক্ত মক্তব-মাদ্রাসার ত্রায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় সাধারণের অর্থে চালাইবেন, বা চালাইতে দিবেন, ইহা অবিধাঙ্গ।

যদি “পাঠশালা” অর্থে সংস্কৃত-বিদ্যালয় অর্থাৎ টোল বুঝি, তথাপি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কথা। বাংলা দেশের দৃষ্টান্ত ধরিলে, ১৯৩১-৩২ সালে টোলের মক্ত সাধারণ ধনভাণ্ডারের (public funds) অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের নিজস্ব, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির টাকা বে-পরিমাণে ব্যয় হইয়াছে, তাহার বোল গুণ অর্থ মক্তব-মাদ্রাসাব মক্ত ব্যয় হইয়াছে* (১৯২৭-৩২ সনের বঙ্গদেশের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষাবিবরণী)। ভারতের অতঃকোন প্রদেশে বে সরকার মুসলমানদিগের প্রতি এই বিষয়ে কম পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন, এবং হিন্দুদের প্রতি অধিক উদারতা

দেখাইয়াছেন, এইরূপ মনে কবিলে শিক্ষা-বিভাগের বর্তমান চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা হয়। সুতরাং, মক্তব-মাদ্রাসাব মক্ত সজে সজে “হিন্দুদের মক্ত পাঠশালা” এইরূপ বলিবার কারণ বোধ হয় এই যে, মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক শিক্ষার নিন্দাব সজে সজে যদি হিন্দুদের সকাবণ বা অকারণ একটা নিন্দা জুড়িয়া না-দেওয়া যায় তবে লোকে কি বলিবে? এই সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সবকাবী কোন রিপোর্টে কদাপি ইহা বলা হয় নাই যে সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবাহুল্যবশতঃ হিন্দুদের শিক্ষাব উন্নতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু সরকারী রিপোর্টেই বারংবার এই কথা লিখিত হইয়াছে যে, “পৃথক-সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়”গুলির সংখ্যাধিক্য মুসলমান-সমাক্ষের শিক্ষার অন্নতির একটি কারণ। যথা, বাংলা-গবর্ণমেন্টেব ৭ম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা বিবরণীতে† (১৯২২-২৩—১৯২৬-২৭ সালের) এইরূপ লিখিত দেখা যায় :—

...পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক বিবরণীতে বাহা বাহা প্রদর্শিত হইয়াছে সেই শক্তিগুলিই উন্নতির বাধা ঘটাইতেছে—জনসাধারণের (অর্থাৎ মুসলমান সাধারণের) উদাসীনতা...মুসলমানদিগের কর্তৃত্বাধীন মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রকারের বিদ্যালয়, বাহাতে ইসলাম ধর্ম ও অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎপ্রতি (মুসলমানদিগের) অনুরাগ। এই কারণগুলি এখনও বর্তমান এবং, আপাতঃদৃষ্টিতে বোধ হয় যে, অন্তর শক্তিতেই বর্তমান (পৃ. ৭২)।

উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে ১৯১২-১৭ সালের রিপোর্টে, মুসলমানদিগের মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি বে তাহাদেরই শিক্ষার উন্নতির অন্তরায়, শিক্ষা-বিভাগের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে (Eighth Quinquennial Review) অর্থাৎ ১৯২৭-৩২ সালের রিপোর্টেও সেই একই কথা :—

মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতিতে বে-সকল শক্তি বাধা দেয়, তাহা পূর্ববৎ রহিয়াছে। সেগুলি এই—সাধারণ বিদ্যালয়ে বে অ-সাম্প্রদায়িক (liberal) শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই বিভ্রাটচর্চা প্রতি উদাসীনতা...মক্তব-মাদ্রাসার মক্ত বিশিষ্ট শ্রেণীর বিদ্যালয়, যেখানে সাধারণ শিক্ষার সজে ইসলাম ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎপ্রতি মুসলমান অভিভাবকগণের পক্ষপাতিত্ব। (পৃ. ৭৩)

* মুসলমানদিগের ইসলামিয়া কলেজ ও হিন্দুদের সংস্কৃত-কলেজের ব্যয় ধরিলে, পার্থক্য হয় ১৭ গুণের বেশী।

† Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the years 1922-23—1926-27.

দেখা বাইতেছে যে, মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের প্রতি অমুরাগ মুসলমান-সমাজের শিক্ষার উন্নতির বাধা ঘটাইতেছে। এই বাধা অকস্মাৎ এখন উপস্থিত হইয়াছে, এমন নহে। ইহা অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের পুরাতন ; এবং সরকারী রিপোর্টে ইহার বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাংলার শিক্ষা-বিভাগেব যদি এই মত হয়, তবে সেই বিভাগই আবার ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য সাধারণের অর্থ অপবিমিত মাত্রায় ব্যয় করিতেছেন কেন ? এই বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের ক্ষেদ্র এত বেশী যে, বাংলা দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষা “আবশ্যিক” (compulsory) হইতে চলিলেও, মক্তবগুলি যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই আশ্বাস সম্প্রতি দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে ভাল করিয়া দেখা যাউক, ভারত-গবর্ণমেন্টের অভিমত কি। দশম পঞ্চবার্ষিক রিভিউতে* মুসলমান-দিগের শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি দেখা যায় :—

হার্টগ্ কমিটি (Hartog Committee) ‘পৃথক্’ (separate) ও ‘বিশিষ্ট’ (special) বিদ্যালয়ের প্রভেদ দেখাইয়াছেন।... মক্তব, মাদ্রাসা, কোরাণ বিদ্যালয়, মোদ্রা বিদ্যালয় এইগুলি বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান ; এইগুলি ‘বিশিষ্ট বিদ্যালয়’। এই সকল বিদ্যালয়ে যে ছাত্রেরা পড়ে তাহাদের মধ্যে মাত্র নগণ্য সংখ্যাই পরবর্তী জীবনে উন্নতি করিবার মত উপযুক্ত পরিমাণে সাধারণ বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে।’ (পৃ. ২৪২)।

পুনরায় :—

কিন্তু শিক্ষার উচ্চ স্তরে উন্নতির বৃহত্তম অন্তরায় হইতেছে এই যে, ক্রমবৃদ্ধিশীল সংখ্যায় (মুসলমান) বালক-বালিকার পৃথক (segregated) বিভাগের ভিত্তি হইয়া থাকে।

হার্টগ্ কমিটি এই মত সিদ্ধি করিয়া গিয়াছেন যে অসাম্প্রদায়িক ও সাধারণের কর্তৃত্বাধীন বিভাগসমূহে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহা যদি একমাত্র সুবিধা হইত, তাহা হইলে বাহা হইত, এই সকল বিদ্যালয় (মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদি) যে তপস্কে অধিকতর বিচ্ছিন্নভাবে (অর্থাৎ বৈশী সংখ্যায়) এবং দ্রুততর মুসলমান ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষার ব্রতী করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসাম্প্রদায়িকের সহিত তুলনায়, মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষার সাধারণ নিরিখ উন্নত করিবার মত প্রায় কিছুই এই সকল বিভাগের দ্বারা করা হয় নাই। এই সকল বিভাগের বহু

সংখ্যায় চলাইতে থাকিলে তদ্বারা মুসলমানদিগের নিজের এবং জনসাধারণেরও স্বার্থের অনিষ্ট করা হইবে। (পৃ. ২৪৩-২৪৪)†

হার্টগ্ কমিটির এই মত উদ্ধৃত করিয়া ভারত-গবর্ণমেন্টের রিপোর্টে মুসলমানদিগের শিক্ষার আলোচনার অধ্যায়ের উপসংহারে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধেব প্রথমেই দেখান হইয়াছে।

মুসলমান ছাত্রদিগকে হিন্দু ছাত্র অপেক্ষা বেশীসংখ্যক ভাষা পড়িতে হয়, এবং ইহা উহাদিগেব শিক্ষার উন্নতিব একটি বাধা এইরূপ বলা হয় সে-সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশেব রিপোর্টে এইরূপ আছে :—

এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে দুইটি ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা মুসলমান বালক-বালিকাদিগের উন্নতির বাধা জন্মায়। কিন্তু, এ-বিষয়ে গবর্ণমেন্ট, ঐ সম্প্রদায়ের ইচ্ছাধারা পবিচালিত হইয়াছেন এবং শিক্ষা-বিভাগ বিচ্ছিন্নতার সহিত (loyalty) এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিয়াছেন—যদিও ইহা উপলক্ষি কবা হইয়াছে যে, মুসলমানেরা যদি স্থানীয় মাতৃভাষা-ক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করিয়া লবেন এবং অসাম্প্রদায়িকের সহিত প্রতিযোগিতা করেন, তবে তাহাদেরই অধিকতর সুবিধালাভ হইবে। (ভারত-গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট পৃ. ২৪২)।

বোম্বাই প্রদেশে অল্পত্রুৎ বাহা মুসলমান সম্প্রদায়েব অপেক্ষাকৃত অধিকতর হিতকর, তাহা না-করিয়া বাহা অহিতকর, তাহাই করা হইতেছে ; কারণ মুসলমানেরা শ্রেয়োক্ত ব্যবস্থাই চাহেন। এই উদ্দীপ্ত-প্রীতিব কারণ ভারত-গবর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শার্প (Sharp) সাহেব স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—

উহাদিগের সংখ্যাগততা কখন কখন উহাদিগকে (মুসলমানদিগকে) নিজদের দৃঢ় একতা ও আত্মরক্ষাব জন্য উদ্ভূতভাবার সংরক্ষণ অথবা পুনরুৎপাদন করিতে প্ররোচিত করে, যথা; মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমানেরা, বাহাদের মাতৃভাষা তামিল, উর্দু দিকে অগ্রসর হইতেছে ; বোম্বাই প্রদেশের দেই জেলাসমূহে, যেখানে সাধারণ লোকের কাছে উর্দু প্রায় অজ্ঞাত, সেখানেও উর্দু জন্ত একটা আন্দোলন চলিতেছে।‡

যেখানে উর্দু মুসলমানদিগের মাতৃভাষা নহে, সেখানেও উহা তাহারা মাতৃভাষা করিতে চাহেন কেন, তাহার কারণ শার্প সাহেবের কথায় বুধা গেল। আমরা, হিন্দুরা, অসম্মান করিলেও, সে কথা হয়ত “বিষেবের” কথা হইত।

† Hartog Report, page 199.

‡ Progress of Education in India 1907-12, Vol. I, p. 249.

* Tenth Quinquennial Review on the Progress of Education in India for the Years 1927-32, Vol I.

যাহা হউক, বাংলা দেশে মৌলবী ফজল হক প্রভৃতিবা যে উর্দু জ্ঞাত এত আগ্রহ দেখান, তাহারও উদ্দেশ্য মুসলমানদের সংগঠন (cohesion)। মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও প্রধানতঃ এই সংগঠন, ইহাও সহজেই বুঝা যায়। মুসলমানদের “আত্মরক্ষার” কথাই কোন অর্থ নাই। যে-সুগে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত, এবং ভারতের “পূর্ণ-স্বরাজে”র অভিলାষী শ্রেষ্ঠ স্বদেশসেবক মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট নেতা পর্যন্ত অনেকেই মুসলমানদিগের আবদার-পূরণে অতি ব্যগ্র, সে-সুগে “আত্ম-রক্ষা”র জন্ত মুসলমানদিগকে মোটেই চিন্তা করিতে হইবে না।

যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় মুসলমানদিগের শিক্ষায় উন্নতির অন্তরায়—এ-কথা শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্মচারীরা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। হার্টগ কমিটি বলেন যে, এই সকল বিদ্যালয় বহু সংখ্যায় বাধা শুধু মুসলমানদের নহে, সর্বসাধারণের স্বার্থহানিকারক (কারণ, ঐরাপে ব্যয়িত অর্থ, সাধারণ শিক্ষায় ব্যয় করা যাইত।) অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ও সরকারী কর্মচারীদিগের এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট এই সকল বিদ্যালয় অতিরিক্ত সংখ্যায়, সাধারণের অর্থে,

পোষণ করিয়া আসিতেছেন।* কাবণ বোধ হয়, এই যে মুসলমানেরা উহা চাহেন, এবং তাহাদের ঐ ইচ্ছা “সত্যিকার” (loyalty) পূরণ করা শিক্ষা-বিভাগের কর্তব্য।

মক্তব-মাদ্রাসাগুলির গুণবত্তা সম্বন্ধে একজন ইন্সপেক্টর যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব :—

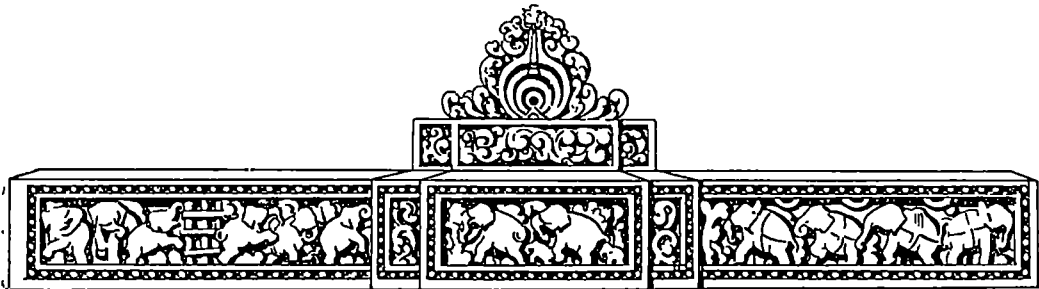
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মত অল্প কিছু ধারাই বর্তমান, তুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য এত অধিকরূপে চিরস্থায়ী করা হইতে পারে না।

...মক্তব-মাদ্রাসাগুলি অতিশয় (শিক্ষাদানে) অগাধ। ইহা বিশেষমূলক সমালোচনা নহে, কিন্তু মুসলমান ইন্সপেক্টরদিগের সর্বসম্মত অভিমত।...এরূপ প্রতিষ্ঠানের স্বল্প-স্বরূপ ছাত্রেরা যে সাধারণ উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথাপি কৃতকার্য হইবে ইহার সম্ভাবনা খুবই কম।†

সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্ত অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায় বিচারের ঋতিরে এবং সর্বোপরি মুসলমানদেরই মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্ত গবর্ণমেন্টের মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি অত্যধিক ভরসা কমান উচিত।

* অধিকন্তু মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা বেশী হইলে, যে-কোন সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কার্যতঃ মক্তবে পরিণত করার জন্ত বাংলার শিক্ষা-বিভাগের একটি নিয়ম আছে। সম্ভব হইলে তাহা পরে আলোচনা করা হইবে।

† Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the years 1922-23-1926-27.



যশ্চায়ম্ আত্মনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজ্ঞানের পথে মানুষের শক্তি যে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করেছে তাব তুলনা নেই। বহু শতাব্দীর চেষ্টায় জ্ঞান-সাধনা যে ফল লাভ করেছিল এই অল্পকয়েক বৎসবে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে। শুধু যে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে তা নয়, পূর্বে বিজ্ঞানের যে ভূমিকা ছিল তা পর্য্যন্ত নতুন কবে তৈরি করেছে। সভ্যতাব প্রথম যুগে মানুষ সভ্যকে খুঁজেছিল বাইরে; আহার বাসস্থান প্রিয়জনদের সঙ্গ ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, এই দিকেই তার শক্তি ধাবিত হয়েছিল। এই চেষ্টার ভিতর দিয়ে বাহ্য প্রকৃতিব সঙ্গে তব পবিচয় হয়েছে। নানা প্রক্রিয়ার অনুবর্তী হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তার এই প্রথম সঙ্গ, তার বুদ্ধির ও শক্তিব লীলার এই প্রথম আরম্ভ। সঙ্গী সীমাব মধ্যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি তখন নিবিষ্ট ছিল—বতটুকু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তারই আবেষ্টনে তার সকল পবীক্ষা সকল আশঙ্কা ছিল আবদ্ধ। সেই এক দিন স্বল্প পাথের নিয়ে মানুষ জ্ঞানর সাধনায প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার পর বহু পথ অতিক্রম কবে মহাবিশ্বের যে-পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে গভীরে উদ্ধে, দূরে নিকটে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, মানুষ এক দিন সেই পরিচয় পেয়েছে—তার শক্তির সীমা এখন রুদ্ধনা কবাও যায় না; মানুষ যে বড় তাতে কোনো সন্দেহ নেই—সে কথা নিয়ে আমাদের উৎসব করবার কাণ আছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য, মানুষের যখন এই অপরিসীম উন্নতি ঠিক সেই সময়ে তাব এ কী পরিচয়, এ কী হানাহানি, এ কী অসামান্য হিংস্রতা! মানুষের প্রতি মানুষের অন্তহীন শত্রুতা! সমস্ত যুরোপধণ্ডে মানব-স্বাধীনতাব বিরুদ্ধে এ কী অভিধান! গৌরব করব কিসের?

এই থেকে বৃহতে হবে, হওয়ারটাই বড়ো কথা, পাওয়ারটা নয়। পাওয়ার দিকে জানাব দিকে সংগ্রহের দিকে জয়ী হয়েছে মানুষ, বাইরের দিকে বত ঐর্ষ্যা সে জড়ো করেছে—তার সমস্ত সাধনা চেষ্টা সে দিয়েছে বাইরের পাওয়া ও

কাজেব দিকে, বিশ্বশক্তিকে আত্মগত কবে স্বশক্তিকে বড়ো করার দিকে। প্রাকৃতবিজ্ঞানীরা অসীম আকাশে মনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন, পৃথিবীর দেশে দেশে তাবায় তারায় বুদ্ধিকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু ভুলে যাই, আরেক অসীম আছে, যা'র পথ রুদ্ধ হ'লে বাইরের ঐর্ষ্য অপরিসীম হ'লেও দারিদ্র্য ঘৃণতে চায় না। বাইরের দীনতায় তো শুধু অন্নবস্ত্রের হুঃখ, কিন্তু অন্তরের দীনতায় দেখা দেয় সর্বনেশে দানবিক হিংস্রতা। সভ্যতা আপনি-আপনার বিষ উৎপন্ন করেছে; বুদ্ধির যোগেই মানুষ মরবে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রত্যহ মানুষ প্রথরতর অস্ত্র আবিষ্কার করেছে—এমনি ক'রে সে প্রচণ্ড দক্ষতার জোরে বিনাশের পথে যাচ্ছে। আকাশে আলোকে যিনি আছেন, যিনি আছেন “আত্মনি,” তাঁকে অস্বীকার ক'রে মানুষের কী পরাভব প্রত্যহ তা দেখতে পাচ্ছি। সে অসীম তো বস্তুব্যক্ত নয়, তাঁকে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু তাঁকে তো সঞ্চয় করা যায় না। অন্তরতম তাঁর উপলব্ধি আপনার মাঝখানে, যেখানে “হওয়ার” জায়গা। বাইরের শক্তিতে আমরা ধন পাই, অন্তরের সত্যে পাই মুক্তি—সে আরেক ঐর্ষ্য। সেই ঐর্ষ্যকে পেয়েছিলেন আমাদের দেশেব সাধকেরা; বিজ্ঞান যেমন পেয়েছে দেশগত কালগত অসীমকে তেমনি আমাদের দেশের স্ববি পেয়েছিলেন আত্মগত অসীমকে। কত বড়ো সাহসের সঙ্গে তাঁরা বলেছিলেন, আমরা ব্রহ্মের মধ্যে আপনাকে পাব। অসীমেব মধ্যে পরম পুরুষের মধ্যে আপনার ব্যক্তিরূপকে দেখে মুক্তি লাভ করব। বলেছিলেন—

বেদাহমেত্যং পুরুষং মহাশুভম্।

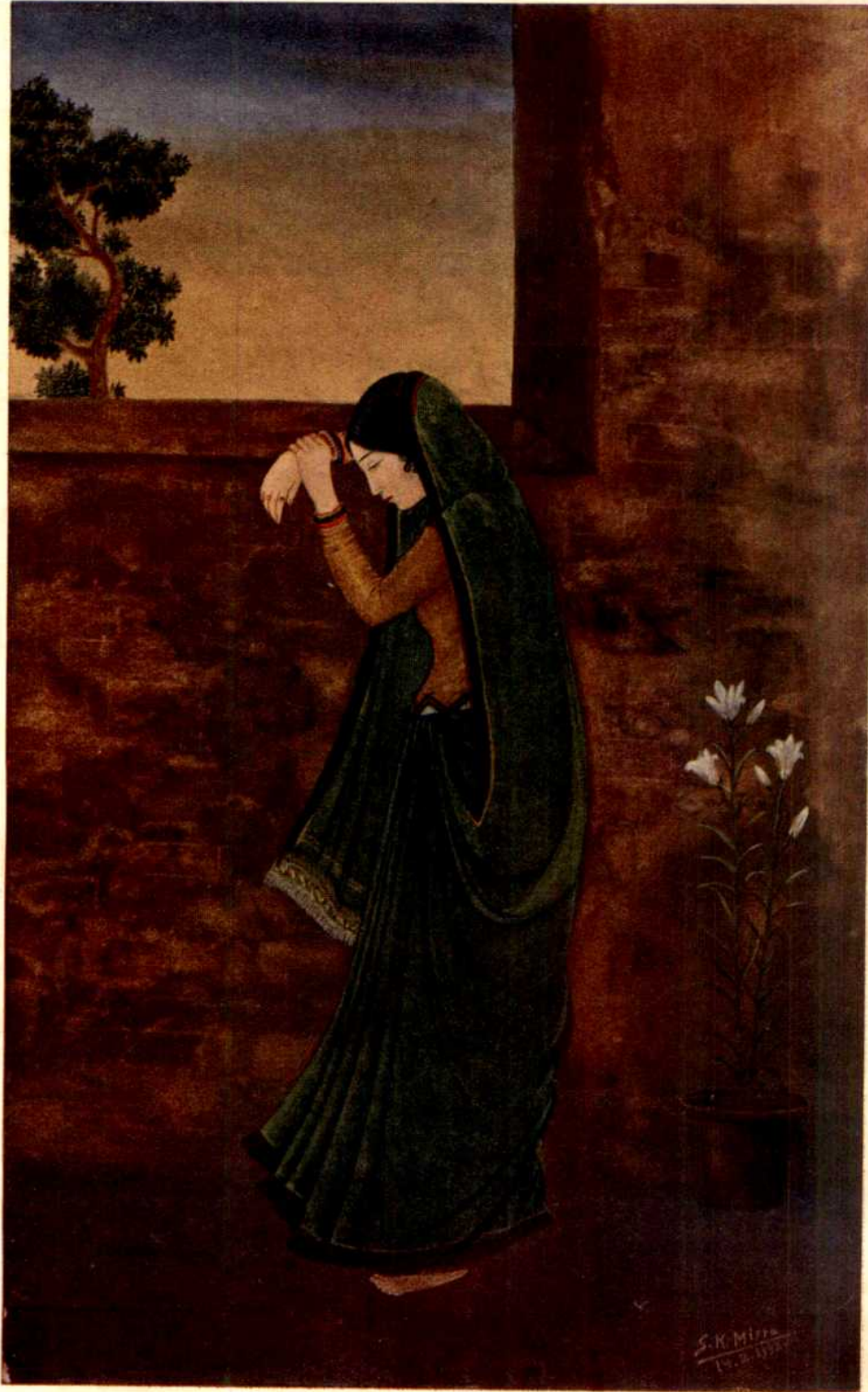
দেশবিদেশে কত তথ্য আজ আবিষ্কৃত হয়েছে—সে তো বুদ্ধিগত দৈহিক জগতের। কিন্তু এ কী কথা! মহান পুরুষকে দেখেছি, ধাব বাহিবের ধর্ম নেই, আপনাতে যিনি আপনি আলোকিত। এ তো বস্তু জগতের কথা নয়, আমাব দেখে

সেখানে আছে, যেখানে আছেন নানা আরোহণ, তার কথা নয়। এর রূপ নেই ভার নেই; এর আশ্রয় চক্ষু সূর্য্য বিশ্বকে নিয়ে নয়। এই কথা বলতে পাখি নে বলেই আজ এত হানাহানি। পৃথিবী রসাতলের দিকে চলেছে, কী কলুষ তাই আজ চার দিকে! রক্তে রক্তাক্ত আজ এই সুন্দর পৃথিবী। আত্মার মধ্যে পরমাত্মার যোগ, আশ্রয় আমাদের এই কথাটি কবে অজ্ঞকার বিশ্বব্যাপী হৃদকোলাহলের উর্ধ্বে ধ্বনিত হবে! পূজা দেব কোথায়? ছোটো ঘর থেকে মানুষ বাইরে যায়, কারণ সেখানে দেয়ালের মধ্যে দেহের মুক্তি-আকাজ্জা ছাড়া পায় না, মন ক্লান্ত হয়, তাই অব্যাহতকে আমরা চাই।—ঘরের মধ্যে বদ্ধ মন যেমন বৃহদাকাশকে খোঁজে তেমনি মহান পুরুষকে সন্ধান করে সংসারে বদ্ধ মন। কোথায় রাখব আমাদের পূজা? এই দেশকালের সীমানার? উপনিষৎ বলেছেন,—না, বাইরের সংসারে এই দেশকালের ঐশ্বর্যতনের মধ্যে তো আত্মার মুক্তি নেই—মহান পুরুষের মধ্যে যে অসীম আশ্রয় সেই তো বড়ো আশ্রয়। বিজ্ঞান প'ড়ে দেশকালগত বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ আমরা অভিভূত হই—কিন্তু সেও তুচ্ছ আত্মার অসীমতার কাছে। সেইখানে যে-মুক্তি মানুষ তারই সন্ধান করেছে, এই কথা দেখি ইতিহাসের মধ্যে। সে-পথে তার কত বিকৃতি কত পতন, কিন্তু তার মধ্যে এই অর্থই নিহিত, এই ভূমার আকাজ্জা। সমস্ত বিকৃতির মধ্য দিয়ে চিরদিন মানুষ এরই সন্ধান করেছে। অবশেষে দেখলে, আত্মার তৃপ্তি বস্তুরূপে না, দেশকালের মধ্যে না। আত্মার মধ্যে তাঁকে দেখো, সেখানে যদি তাঁকে পাও তবে সব সত্য হবে—এই কথাটি যেমন ক'রে ভারতবর্ষের ঋষি বলেছেন তেমন আর কোথাও কেউ বলেন নি। বাইরের অর্থে আমাদের পূজা নয়, হওয়ার দিকেই আত্মার পূর্ণতা আমাদের চিরকালের বাঞ্ছিত। সেখানে সত্য হ'তে পারলে আমাদের

সব পূজা সার্থক। অস্ত্রের আত্মায় আপনার আত্মাকে এক ক'রে দেখো—উপনিষদের এই তত্ত্বটি বুদ্ধ ব্যবহারে রূপ দিয়েছিলেন “মৈত্রীর” তত্ত্বে। বাইরের জগতে আলোক যে ঐক্য আনে অধ্যাত্মলোকে সেই আলোকই প্রেম, সেই আনন্দ, সকলের প্রতি প্রসারিত আনন্দ। বিজ্ঞান বলে, জ্যোতিঃ-কণার সন্নিবেশেই অণুপরমাণু, তাতেই সৃষ্টি, উপনিষৎ বলেছেন আনন্দেই সৃষ্টি। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে তো তার দেখা পাবার উপায় নেই, বাইরের থেকে সে প্রতিহত হয়ে ক্রিরে আসে। আত্মার মধ্যে তার সন্ধান করতে হবে। বাইরের সাধনা কৃত্রিম—যিনি আনন্দরূপময়তম সর্বত্র তাঁর আনন্দ পাওয়া চাই। প্রেমের দ্বারা আত্মার ঐক্যার্থ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেইখানেই তো অধ্যাত্মলোক। সেইখানে পৌছতে পারে নি বলেই তো মানুষের এত দ্বন্দ্ব। অন্তরে তার বেদনা, কিন্তু সে পায় নি, যেমন ক'রে সে বাইরের এই মহাবিশ্বকে পেয়েছে তেমন ক'রে আত্মাকে পায় নি। তাকে লাভ করবার জন্যই তো মহাপুরুষের আহ্বান—সে আহ্বান জগতপের জন্ত নয়, পরম মুক্তির জন্ত সে আহ্বান। কত বড়ো বিশ্বাসে বুদ্ধ আহ্বান করেছিলেন, বলেছিলেন “যেমন ক'রে এক পুত্রকে মাতা ভালবাসেন, তেমনি করেই মৈত্রীর সাধনা করতে হবে।”

আত্মার অর্থ প্রেম। সেই বাণী ভুলি নে যেন। সংসার আজ পীড়িত। আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যলুপ্ত হয়েছি এই বেদনা মনে জাগা চাই—অধ্যাত্মলোকে আশ্রয়ের অভাব যদি আমাদের পূর্ণ হয় তবেই আমরা বাঁচলুম। সেই সত্যের কামনা মনের মধ্যে বেধে সাধনাকে যেন আমরা জাগ্রত ক'রে রাখতে পাবি।*

* গত ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে মন্দিরে আচার্যের উপদেশ।



উপেক্ষিতা
শ্রী শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

উদ্বোধন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান—“তুমি আপনি জাগাও মোরে।”

আজ এখানকার কর্মসংসারে আমাদের নববর্ষের প্রথম দিন। প্রতি বর্ষে আজকের দিনে আমাদের অন্তরের এই প্রার্থনা। সব সময়ে সে প্রার্থনা সফল না হ’তে পারে, বারেবারেই তা আমরা বিস্মৃত হই, জাগ্রত চিত্ত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারি নে, চিত্তকে সরিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত নৈপুণ্যে বস্তুর মতো কাজ করি হৃদয় তাতে যোগ দেয় না। কর্মই যেখানে শেষফল সেখানে এতে কোনো ক্ষতি হয় না, নৈপুণ্যের যোগে সেখানে সিদ্ধি লাভ ঘটতে পারে, কাজ হয় নিখুঁত, বরাবরকার অভ্যাস বশত সহজেই কাজের ঢাকা চলে। কিন্তু এই আশ্রমের কাজে বাইরের সম্পূর্ণতাটাকেই তো আমরা মুখ্য ব’লে স্বীকার করি নি, সত্যের সাধনাকেই উদ্ধে তুলে রাখতে চেয়েছি।

এখানে আমরা কর্মের যোগে মিলিত। কিন্তু তার লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যাতে এই মিলনের পথে জীবন সার্থক হয়। তার তো আর কোনো উপায় নেই। একলা ব’সে পূজা ধ্যান, একলার মধ্যে অধ্যায়রস সন্ভোগ—তার কোনো মূল্য নেই, এমন কথা বলছি নে। কিন্তু সত্যকে পাবার প্রথম সোপান, ত্যাগের দ্বারা সকলের মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করা। তারই উপলক্ষ্য আমরা এখানে রচনা করেছি; এই জন্তই আমরা একে বিদ্যালয় বলি নে, বলি আশ্রম, কেন-না এর মধ্যে আশ্রয়ের ভাব আছে। এখানে মিলনের সূচনা হয়েছে—সেই মিলন যাতে পরম মিলনের বার্তা আনে; তারই জন্ত আমাদের সাধনা। আফিসে অনেক স্থানেই তো আমরা অনেক মানুষ জড়ো হই, কিন্তু সেখানে আমরা একত্র হই, মিলিত হই নে। সকলের শক্তিকে কর্মের রঞ্জুতে মিলিয়ে কর্মকর্তা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। রিপু সেখানে পরস্পর মিলনে বাধা দেয়, ঈর্ষা বিদ্বেষ নিরস্ত হয় না। সেই জন্তই আজ আমাদের এই প্রার্থনা—“তুমি

আপনি জাগাও মোরে”—সমস্ত জড়তা হ’তে তুমি আমাদের জাগাও, কর্মের মধ্যে পরম মিলনে তুমি আমাদের চিত্তকে জাগাও, একান্ত অব্যবহিত যে উপলব্ধি, সত্যের আলোকে সেই সহজ উপলব্ধি আমাদের মনে উদ্ভূত করো। এই আশ্রমের চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সে-সাধনার অনুকূল্য আছে—আজকের প্রভাতের সেই মিষ্ট সৌন্দর্য্য সেই বার্তাহ বহন করে আনছে। সকল সাধনার উপরে সত্যের সাধনা, অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তুলে সেই কথাটিই বলতে হবে—সংকল্প যেন ব্যর্থ না হয়, সমস্ত চৈতন্য যেন আজকের প্রভাতের এই আলোকে উদ্বোধিত হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বাধায় সংশয়ে আবিল; উপর থেকে আলোক নামুক আমাদের অন্তরে। রাত্রির অন্ধকারকে ভয় করি নে, সে তো আনে বিশ্রাম; ভয় করি সংশয়ের কুহেলিকাকে, বুদ্ধির অহমিকাকে, বাইরেই যে আপনার শক্তি ব্যয় করে ফেলে। পৃথিবীর ঘরে ঘরে আজ এই সংশয়; এমন মানুষ ক’জন আছে যে নিকৃতি পেয়েছে এই বিশ্বব্যাপী কুহেলিকা থেকে, যে-কুহেলিকা প্রভাতের নিশ্চলতাকে অস্বীকার করে, যে-তর্কজাল আপন আকাশকে অস্বচ্ছ করে পৃথিবীতে সর্বত্রই এই সংশয় আজ অল্প-বিস্তর প্রবেশ করেছে—যাদের সঙ্গে, যাদের জন্ত কাজ করি সর্বত্রই এই বিজ্ঞপের হাসি। সহজ উপলব্ধি নিয়ে বিশ্বাস করি, একথা বলতে বুদ্ধি অভিমানী সাহস করে না। এই চারিদিকের ভীকৃতাই সাধনায় আমাদের বাধা। সেই বাধাকে অতিক্রম করে আমরা যেন সত্যকে অন্তরে প্রবেশ করতে দিই, যে আলোক আপনি নেমে আসছে তাকে স্বীকার করি। চারিদিকের কোলাহল হৃদয়বিদেহ যেন আমাদের কর্মকে নিষ্প্রভ না করে। কর্মলোভী না হয়ে তার চেয়েও বড়ো ফল যেন আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে পারি। নববর্ষের সর্বপ্রথম দিনে এই আমাদের প্রার্থনা। বাইরে যিনি বিশ্বকে জাগান আলোকে, আমাদের চিত্তকেও তিনি জাগরিত

করুন। আলোককে প্রমাণ করবার জন্ত যুক্তিতর্কের সহজে যেন তাকে স্বদয়ে গ্রহণ করতে পারি, এই প্রয়োজন হয় না, কোনো পণ্ডিতের কাছে যেতে হয় না— প্রার্থনা।*

আপনাকে সে আপনি সপ্রমাণ করে; সত্যের আলোক, সেও তেমনি চিত্তের মধ্যে আপনাকে সপ্রমাণ করে—

*গত ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে মন্দিরে আচার্য্যেয় উদ্বোধনীয় বক্তৃতা।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী লাবণালতা সেনগুপ্তা

শ্রীমতী লাবণালতা সেনগুপ্তা ঢাকা বোর্ডের অধীনে 'শান্তিলতা বহু রায়' স্বর্ণপদক লাভ করেন। পর ১৯২৬ সনে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯২৮ সনে আই-এ পরীক্ষায় বৎসর ডায়োসেনন কলেজে বি-টি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া কুড়ি টাকা করিয়া হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩০ সনে বেথুন কলেজ হইতে গত এম-এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থান লাভ গণিতে অনার্স লইয়া তিনি বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং করিয়াছেন।

বহির্জগৎ

নৌবহরের কথা ও জাপানের দাবি

১

বৎসর-তিনেক পূর্বে এক বিশিষ্ট বন্ধু ইউরোপ-ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের যুদ্ধগণ আবার যুদ্ধের জন্ত উৎসাহ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায় তখন কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু গত তিন বৎসরের ঘটনাপ্রসঙ্গায় এখন আর একথা অবিদ্যাস করা যায় না। হলবাহিনীর ছায় নৌবাহিনী ও নবনব আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক কালের রাষ্ট্রবর্গের প্রধান সম্পদ—আধুনিক যুদ্ধেরও প্রধান উপকরণ। বিমান-পোত ও সাবমেরিনও যুদ্ধের সময় বেশ কাজে লাগিয়া থাকে। সাবমেরিনের মহিমা গত মহাযুদ্ধে প্রকট হইয়াছিল। ইদানীং পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি নিজের রণসম্পত্তার বাড়াইবার জন্ত উত্তিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মহাযুদ্ধ আসন্ন কি-না কে বলিতে পারে?

ব্রিটেন, মার্কিন ও জাপান এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে নৌবহর নিয়ন্ত্রণের জন্ত বর্তমান বৎসরে একটি বৈঠক হইবার কথা। গত ১৯৩৩ সনের শেষভাগে লণ্ডনে আগামী বৈঠকের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে ইহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই ইহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হয় আগামী নৌবৈঠকও বার্থ হইবে। জাপান কিছুকাল যাবৎ নৌবহর সম্পর্কে ব্রিটেন ও মার্কিনের সমান হইবার দাবি করিতেছে। প্রকাশ, জাপানের এই অত্যধিক দাবিতেই আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। ইহার উপর গত ২১এ ডিসেম্বর জাপান মার্কিনকে ১৯২২ সনের ওয়াশিংটন নৌচুক্তির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছে। এদিকে সিঙ্গাপুর ঘাঁটিতে ব্রিটিশ নৌবহরের মহড়া হইয়া গিয়াছে। এই সব কারণে নানা লোকে নানা পত্রে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

এই সব আলোচনার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। ব্রিটেন ও মার্কিনের পক্ষে ওকালতির অভাব নাই। বেচারী জাপানই যেন সকলের কোপে পড়িয়াছে। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। আমরা বিদেশ হইতে সংবাদ পাই রয়টারের নারকত। বিদেশী মতামতের পরিচয় পাই প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়া। এগুলির অধিকাংশই আবার ইংরেজ ও মার্কিনীদের লেখা। ইহাদের মধ্যে জাপানের বিরোধী ভাবই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে। সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপে বুরিলান, জাপানের বিরুদ্ধ মতামত প্রাচ্যবাসীদের চিন্তাধারাও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, নৌবহর সম্পর্কে জাপানের কোন দিকই নাই, অর্থাৎ তাহার তরফ হইতে বলিবার কিছুই নাই। এই জন্ত জাপানের বর্তমান দাবির কথা আলোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজন।

২

গত শতাব্দীতে বঙ্গকবি জাপানকে অসভ্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর চেষ্টায় তাহার সে অপবাদ ঘুচিয়া গিয়াছে। জাপান

বর্তমানে অগ্রতম হৃদয় দেশ। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি সব দিকেই সে অগ্রসর। জাপান সৌন্দর্যের উপাসক, এবং এই কারণে জগতের আদর্শস্থল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যখন প্রাচ্যও লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছিল তখন জাপান মা ভৈঃ রবে মাথা তুলিয়া



ম্যাডমিরাল টোগো। ইনি ১৯০৪ সনে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় পোর্ট আর্থারে রুশ রণতরী ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। ইনি গত মে মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তাহা রোধ করিয়াছিল। ১৯০৪ সনে পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে এ্যাডমিরাল টোগো রুশ নৌবহর ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিলে প্রাচ্যও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সমশক্তি অর্জন করিতে পারে—এমন কি প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে হারাইরা দিতেও সক্ষম। প্রাচ্যের বহু ভূগুণ ইতিপূর্বে বিদেশীর

করতলগত হইলেও নবাকরণ রঙে রঞ্জিত স্বাধীন জাপানের দিকে চাহিয়া তাহারা আশস্ত হইয়াছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্যও একই স্বভেদে গাঁথা, কাজেই একের শ্রীবুদ্ধিতে অশ্রের উৎফুল্ল হওয়া স্বাভাবিক।

জাপানের 'অত্যধিক দাবি'র স্বরূপ জানিতে হইলে ওয়াশিংটন নৌচুক্তির কথা আলোচনা করা আবশ্যিক। গত মহাযুদ্ধের বিভাবিকার ছায়ায় ১৯২২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তখন জেতা বিজিত সকলেই পরিশ্রান্ত ও হীনবল। নিছক আশ্রয়কা ছাড়া যুদ্ধান্ত হিসাবে নৌবহর বাহাতে না বাড়ান হয় সেদিকে সকলেরই চোনে দৃষ্টি।

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে ওয়াশিংটন নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সময়ে আরও কতকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু নৌচুক্তিকে ঘিরিয়াই বর্তমানের আন্দোলন। এই চুক্তির অস্ত্র নাম পঞ্চশক্তি-চুক্তি। কারণ ব্রিটেন, মার্কিন, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালি এই পাঁচটি শক্তির প্রতিনিধিগণ ইহাতে স্বাক্ষর করেন। পরে শেষোক্ত দুই সরকার এই চুক্তি স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে ইহা ওয়াশিংটন নৌচুক্তি বলিয়াই অভিহিত হয়। কাজেই, ব্রিটেন মার্কিন ও জাপান সম্পূর্ণ সর্বগুলিই এখানে বিবেচ্য।

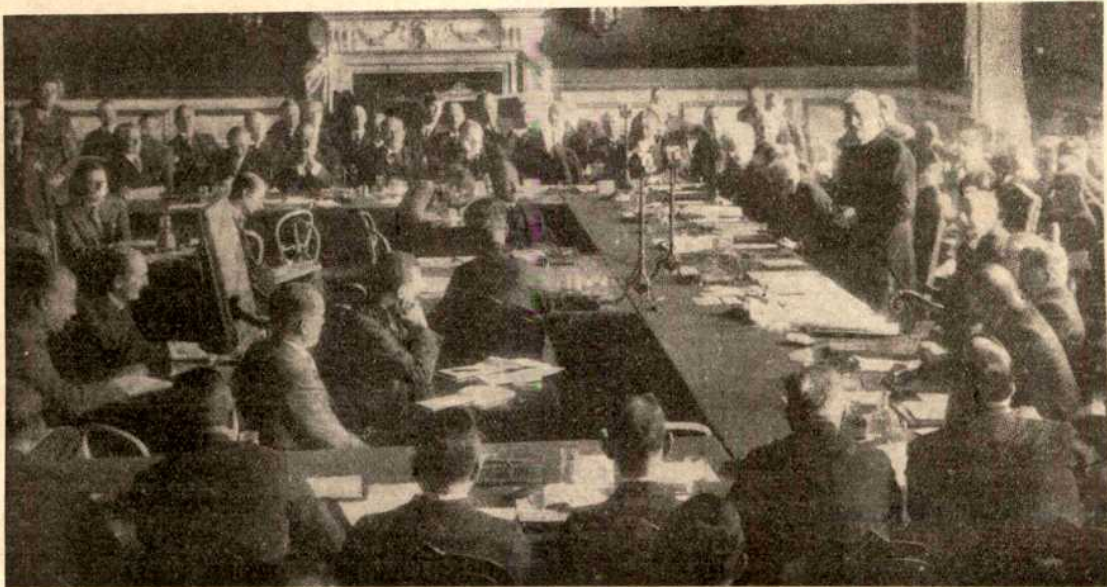
ওয়াশিংটন নৌচুক্তিতে বড় যুদ্ধজাহাজগুলির অনুপাত নির্ধারিত হয় ৫:৫:৩। অর্থাৎ ব্রিটেন ও মার্কিন প্রত্যেকে ৫২৫,০০০ টন ও জাপান ৩১৫,০০০ টন পরিমাণ রণপোত রাখিতে পারিবে। এই রণপোতগুলির প্রত্যেকখানি হইবে ৩৫,০০০ টনের অনধিক ও ইহাদের কামানের ভিতরকার ব্যাস ১৬ ইঞ্চি। ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট রণপোতগুলির অনুপাত ও পরিমাণ এ বৈঠকে নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকখানি ১০,০০০ টনের মধ্যে ও

কামানের মুখ ৮ ইঞ্চির মধ্যে হইবে স্থির হয়। বিমানপোতবাহী জাহাজের অনুপাত বড় রণপোতের মতই হইবে, ইহার প্রত্যেকখানি হইবে ২৭,০০০ টনের মধ্যে। ব্রিটেন ও মার্কিনের মোট পরিমাণ ১৩৫,০০০ টন করিয়া, ও জাপানের ৮১,০০০ টন (অনুপাত ঠিক ৫:৫:৩)।

ওয়াশিংটন বৈঠকের অমীমাংসিত বিষয়গুলি ১৯৩০ সনের প্রথম ভাগে লণ্ডন নৌবৈঠকে স্থির হয়। বহু দিনের আলোচনার ফলে ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও সাবমেরিনের পরিমাণ নিম্নরূপ ধার্য হয়।—

শ্রেণী	মার্কিন	ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	জাপান
ক্রুজার			
(ক) ৬.১ ইঞ্চির			
অধিক মুখের কামান	১৮০,০০০ টন	১৪৬,৮০০ টন	১০৮,৪০০ টন
(খ) ৬.১ ইঞ্চি বা			
তাহার কম মুখের কামান	১৪৩,০০০ "	১১২,২০০ "	১০১,৪২০ "
ডেস্ট্রয়ার	১৫০,০০০ "	১৫০,০০০ "	১০৫,৫০০ "
সাবমেরিন	৫২,৭০০ "	৫২,৭০০ "	৫২,৭০০ "

ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও সাবমেরিন প্রত্যেকখানা কত পরিমাণের হইবে তাহাও এই বৈঠকে নির্ধারিত হইয়াছে: ১৯৩৬, ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চুক্তি বহাল থাকিবার কথা। আর একটি সর্ভে স্থির হয় যে, ১৯৩৫ সনে আবার নৌচুক্তি সম্পূর্ণ বৈঠকের আহ্বান করা হইবে। ওয়াশিংটন নৌচুক্তিও ১৯৩৬ সনের শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে ইহার অদল-বদল করিতে হইলে দুই বৎসর পূর্বে শক্তিবর্গকে জানাইতে হইবে। এই সর্ব অমুসারেই জাপান ওয়াশিংটন নৌচুক্তির অস্বীকৃতি গত ২১এ ডিসেম্বর ঘোষণা করিয়াছে।



লণ্ডন নৌবৈঠক, ১৯৩০। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী রায়মুন্স ম্যাকডোনাল্ড এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এখানে যে নৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহা ১৯৩৫ সনের পরে আর বহাল থাকিবে না।

৩

১৯৩০, ২২এ এপ্রিল লণ্ডন নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাহার পর হইতে এই পাঁচ বৎসর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপে একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা বিগত মহাযুদ্ধের স্মৃতিবিমুক্ত হইয়া ভাবী ভীষণতর যুদ্ধের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন দেশের স্বার্থের মুখে রাষ্ট্রসংঘের মিলন প্রচেষ্টা, নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠক প্রভৃতি সকলই ব্যাহত। ইউরোপীয় দায়িদ্বিশীল রাষ্ট্রনায়কেরা সভাসমিতিতে যুদ্ধের মহিমা ঘোষণা করিয়া জনগণকে আসন্ন মহাসমরের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। ইটালীর সর্বাধ্যক্ষ সিনর মুসোলিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—“War is for man what maternity is for woman.” নারীর পক্ষে মাতৃত্ব, পুরুষের পক্ষে সংগ্রাম দুই-ই সমপর্যায়ভুক্ত—সিনর মুসোলিনীর ইহাই অভিমত। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল নেতা মিঃ বলডুইন আসন্ন সংগ্রামের স্থান নির্দেশও করিয়া দিতেছেন। তিনি পার্লামেন্টে রণসম্ভার বাড়াইবার প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া বলেন—“When you think of the defence of England, you no longer think of the chalk cliffs of Dover but of the Rhine.” অর্থাৎ ‘তোমরা যখন ইংলণ্ড রক্ষার কথা চিন্তা কর তখন আর তোমরা শুভ্রশিখরবিশিষ্ট ডোভার শহরের কথা ভাব না, রাইন নদীর কথাই তোমাদের মনে আসে।’ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের মুখনিঃসৃত এই সকল বাণী লোকের মনে আতঙ্কের উল্বেক করিতেছে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী অন্তঃসন্ত্র-সংগ্রহে ও রণপোতা-নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ, জার্মানীও এবিষয়ে এখন আর কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহে।

ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ জগতের অন্তান্ত রাষ্ট্রকেও সজাগ করিয়া দিতেছে। ইংলণ্ডের সহিত মার্কিন ও জাপান নৌচুক্তিতে আবদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অল্প রাষ্ট্রগুলি নৌবৈঠকে যোগ দিলেও তাহাদের সরকার ইহার চুক্তি স্বীকার করে নাই। কাজেই ইহারা যখন নূতন কিছু করিতে চাহে তখন মার্কিন বা জাপানের কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু ইংলণ্ড যখন এই সম্পর্কে কিছু করিতে অগ্রসর হয় তখনই চুক্তিবদ্ধ অপর দুই রাষ্ট্রের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের নৌবহর-মন্ত্রী এক জনসভায় বলেন, “I believe a strong Navy helps more than anything towards world peace.” ‘বিশ্বের শান্তি স্থাপনে শক্তিশালী নৌবহর সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে।’ প্রকাশ, ইংলণ্ড-সরকার ১৯৩৪ সনে ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নূতন রণপোতা নির্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এবং ঐ বৎসরের শেষে ১৩ খানা ক্রুজার, ২৭ খানা ডেস্ট্রয়ার, ৮ খানা সাবমেরিন, ১৪ খানা গ্লোপ ও একখানা বিমানপোতবাহী জাহাজ নির্মাণ আরম্ভ হইবে জানা গিয়াছিল। ইদানীং নির্মাণকার্য অনেকটা অগ্রসর হইয়া থাকিবে। ১৯৩৫ সনে নৌবৈঠকের অধিবেশনের প্রাক্কালে বিলাতের এইরূপ কার্যের উদ্দেশ্য ও ফলাফল সখ্যে নিম্নের উক্তি যথেষ্ট আলোকপাত করিবে। ‘মাক্সেটার গার্ডিয়ান’ পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা নিউ ইয়র্ক হইতে লেখেন,—

“While it may be argued that the new British programme would discourage the Japanese, making them feel they cannot afford equality on

such an expensive scale, it is feared here that the result may be just the contrary and may embolden the Japanese to demand a tremendous increase in their fleet.”

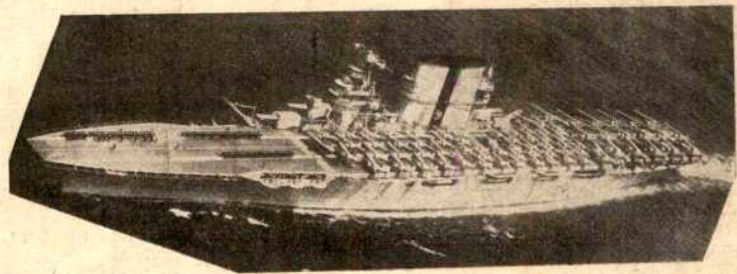
ইহার মর্ম্ম : এই বলা হইতেছে ইংলণ্ডের অনুকরণে জাপান অনুরূপ আয়োজন করিতে নিরস্ত হইবে। কারণ বিপুল অর্থব্যয়ে সমশক্তি লাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু লোকে আশঙ্কা করিতেছে, ইহার ফল বিপরীতই হইবে—জাপানীরা নৌবহর বাড়াইতে অধিকতর বন্ধপরিকর হইবে।

গত কয়েক মাসের ঘটনায় এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের নৌবহর-বৃদ্ধিই জাপানের বর্তমান সঙ্কল্পের একমাত্র কারণ নহে। মার্কিন ও তাহার নৌশক্তি একরূপ বাড়াইয়া চলিয়াছে যে, পূর্বে অনুপাত মানিয়া লওয়া জাপানের পক্ষে এখন অসম্ভব। এখানে যে তালিকাটি দিলাম তাহা হইতে ১৯৩৪ সনের ক্ষেত্রফলি পণ্যস্ত প্রধান রাষ্ট্রগুলির নৌশক্তির সম্বন্ধ মিলিবে। রণপোতের প্রধান প্রধান কয়েকটি শ্রেণীর মাত্র এখানে উল্লেখ করিব।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের রণতরীর হিসাব

শ্রেণী	ব্রিটিশ সাম্রাজ্য	মার্কিন	জাপান	ফ্রান্স	ইটালি	রুশিয়া	জার্মানী
রণপোতা (বড়)	১২	১৫	২	২	৪	৩	৬
ক্রুজার (মোট)	৫৪	২১	৩৬	১০	২৪	৮	৮
বিমানপোতবাহী							
জাহাজ	৮	৩	৫	২	১	—	—
ডেস্ট্রয়ার	১৩৪	২৫১	১০১	৪৮	৭৪	১৭	১৬
সাবমেরিন	৫২	৮২	৫৯	৯৪	৪৩	১৬	—
গ্লোপ	৩০	—	—	১২	২৬	৪	—
মাইন স্থইপার	২৭	৪৩	১২	২৫	৪৮	৬	২০

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। তথাপি ইহা হইতেই বুঝা যাইবে জাপান নৌশক্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংলণ্ডে নবনির্মিত পোতগুলি অবশ্য ইহার বাহিরে।



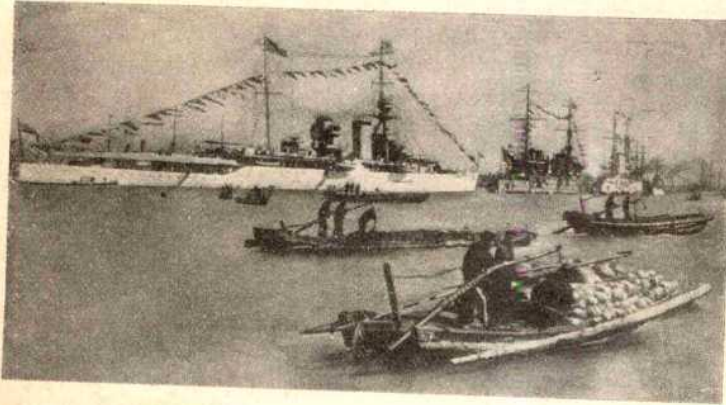
“সারাটোগা”—মার্কিনের একখানা বিমানপোতবাহী জাহাজ। বিমানপোতগুলি এই জাহাজ হইতে উড়িতে পারে ও ইহার উপর নামিতে পারে।

৪

পূর্বে বলিয়াছি, ব্রিটেন, মার্কিন ও জাপানের নৌবহর সম্পূর্ণ অনুপাত ৫:৫:৩। জাপানের বর্তমান দাবি ৫:৫:৫—অর্থাৎ তিনটি রাষ্ট্রই নৌশক্তিতে সমান হওয়া চাই। জাপানের এই দাবির বিরুদ্ধে নানা বুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে। মার্কিনের এ্যাডমিরাল প্রাউ নামক নৌবহরে বিশেষজ্ঞ ও ইহার অল্পতন নায়ক গত জুলাই সংখ্যা Foreign Affairs পত্রে জাপানের এই দাবির অর্থোক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রধানতঃ ইহার উপর নির্ভর করিয়া

এদেশে জাপানী-বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচ্যের মতবাদের জবাব দিয়াছেন নৌবহর-বিশেষজ্ঞ মাসানরী ইতো এক জাপানী পত্রিকায়। তাহার কথাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

জাপানের দাবির বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ব্রিটেন চারিটি সমুদ্রের মালিক, মার্কিনকেও দুইটি সাগরের উপর



সাংঘাইয়ের নিকটবর্তী হোয়াংপু নদীতে স্থিত রণপোতসমূহ। এই চিত্রে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও মার্কিনের রণতরী দেখা যাইতেছে।

কর্তৃত্ব করিতে হয়; অপর পক্ষে জাপান মাত্র একটি সমুদ্রের উপর খবরদারি করিয়া থাকে। এই জন্য ব্রিটেন ও মার্কিনেরই বর্ধিত অধিপত্য আবশ্যক, জাপানের ইহার প্রয়োজন নাই। মাসানরী ইত্যোর মতে এই যুক্তি ভ্রান্ত। ইংরেজেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন, তাহাদের সমুদ্র রক্ষা করিতে হয়, ইহার বস্তুতঃ অর্থ—শত্রুর বিরুদ্ধে সমুদ্র রক্ষা করা। শত্রুর শক্তি বিবেচনা করিয়াই নৌশক্তি বাড়াইতে কমানিতে হয়। চারিটি কি দুইটি কি একটি সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে হয় বলিয়া ইহা প্রয়োজন হয় না। এই দিক দিয়া ব্রিটেন মার্কিন জাপান সকলের প্রয়োজনই অনুরূপ।

বর্তমানে ব্রিটেন ও মার্কিনের জলপথে শত্রুপক্ষ কেহ নাই। তথাপি তাহারা এরূপ বিরাট নৌবহর পোষণ করিতেছে কেন? ভাবী শত্রুর (hypothetical enemy) আক্রমণের বিরুদ্ধেই এই আয়োজন। নৌশক্তিতে ইহারা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে এখন আর কোন রাষ্ট্র ভরসা পায় না। অবশ্য সাবমেরিন বা বিমানপোতের সাহায্যে বড় বড় রণতরী ঘায়েল করা সম্ভব। কিন্তু ইহাও শেষ পর্যন্ত লাভজনক নয়। সেজন্য এগুলির কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নহে।

বর্তমান অধিপত্য সমুদ্রপথে প্রাধান্য লাভ হইতেই নহে, আত্মরক্ষার জন্য যে-শক্তিলাব প্রয়োজন তাহা হইতেও জাপানকে বঞ্চিত করিয়াছে। অর্থ সমুদ্রপথে ব্রিটেন বা মার্কিনের বৈরুপ বিপদের আশঙ্কা আছে বর্তমানে জাপানেরও তাহাই রহিয়াছে। ইহাদের মত জাপানেরও এরূপ শক্তি প্রয়োজন যাহাতে শত্রুপক্ষ কোনরূপে তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস না-পায়। জগতের অন্যান্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ও নৌশক্তি এত দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, বর্তমান অধিপত্যে সে কিছুতেই সমুদ্র থাকিতে পারে না। জাপানের জনসাধারণের আশ্রয়প্রত্যয়

কিরাইয়া আনিতে হইলে উচ্চতর অধিপত্য অবশ্যই নির্ধারিত করিতে হইবে।

বর্তমান অধিপত্যের অস্তিত্ব আর একটি দিক হইতেও বিচার্য। এখন বড় রণপোতের যে অধিপত্য ও সংখ্যা নির্ধারিত আছে, তাহাতে ব্রিটেন ও মার্কিন নিরাপদ। ইহারা প্রত্যেকে ১৫ খানা পর্যন্ত বড় রণপোত রাখিতে পারে, জাপান রাখিতে পারে ৯ খানা। রণপোতসংখ্যা অধিক হইলে জাপানের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা কম হইত। ধরুন, ব্রিটেন ও মার্কিনের রণপোত যদি ১০০ খানা করিয়া থাকিত, তাহা হইলে জাপানের থাকিত ৬০ খানা। সুপরিচালিত হইলে ৬০ খানা রণপোতই যুদ্ধজয়ের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ১৫ খানার বিরুদ্ধে ৯ খানার পারিয়া উঠা অসম্ভব। এ অধিপত্যে জাপান বস্তুতঃই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

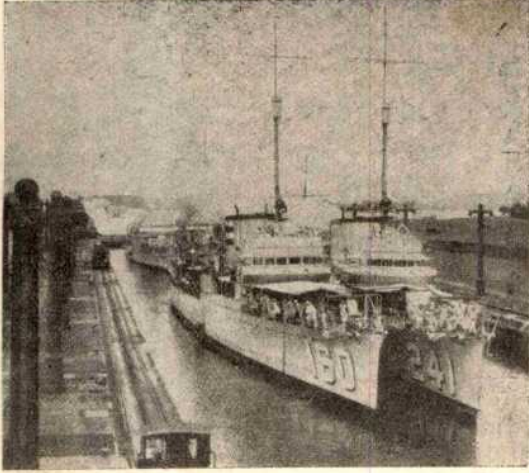
কাহারও কাহারও মতে জাপানের এই দাবির মূলে তাহার সাম্রাজ্য-বুধ। ইহা সত্য হইলে জগতের শান্তি বিনষ্ট হইবে। জাপান কর্তৃক মাল্‌কুরিয়া ও জেহোল প্রদেশ কাৰ্য্যতঃ অধিকারের প্রতি এই উত্তির ইঙ্গিত আছে। ইতো বলেন, সম অবস্থায় পড়িলে সকল

রাষ্ট্রই অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ইটালী কর্তৃক ট্রিপলী, বেলজিয়ম কর্তৃক কঙ্গো, ফ্রান্স কর্তৃক কাশোভিয়া অধিকার একই পর্থাৎভূত। আরও শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তালিকা বাড়ান যায়।

অবশ্য এখানে একথা বলা দরকার যে, বর্তমান সাম্রাজ্যবাদই পররাজ্য-হরণ কি স্বরাজ্য-বর্ধন-স্পৃহার জন্য দায়ী। গত তিন শত বৎসর ধরিয়া বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সকল শক্তিশালী রাষ্ট্রই অনুরূপ অপরোধে অপরোধী। বর্তমান চিন্তাধারা সাম্রাজ্যবাদ আদৌ সমর্থন করে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে ঘায়েল করিতে যে শক্তি প্রয়োজন তাহা মনুষ্যসমাজে এখনও জাগ্রত হয় নাই। সাম্রাজ্য-বাদের উচ্ছেদ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে শক্তিসঙ্কয়ের প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্রবিশেষকে দোষী সাব্যস্ত করিলেই ইহার উচ্ছেদ সাধিত হইবে না।

ইতো মহাদয়ের মতে আর এক কারণে সমান অধিপত্য একান্ত আবশ্যক। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির রণসম্ভার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সকলের শক্তি যদি সমান হয় তাহা হইলে সবল দুর্বলের তারতম্য আর থাকিবে না। পাঁচ লক্ষ টনই বলুন কি দুই লক্ষ টনই বলুন—রণপোতের পরিমাণ সম্মিলিতভাবে যদুচ্চা হাস করা সম্ভব হইবে। ইতো বলেন, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। নিরস্ত্রীকরণ বৈধ তখন মাকলামণ্ডিত হইবে—কেলগ-ব্রিস। চুক্তি ও রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ কিছুই মানিয়া লইতে বাধা থাকিবে না। কারণ সকলের মন হইতে বৈষম্যের ভাব বিদূরিত হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্য নিরাকরণের প্রধান অন্তরায় ব্রিটেন ও মার্কিন। মিঃ ফ্রান্স সিমন্স *Can Europe keep the Peace* (ইউরোপ কি শান্তি রক্ষা করিতে পারে?) নামক পুস্তকে সত্যই লিখিয়াছেন,—
“Anglo-Saxon conceptions are, however, a curious mixture of hypocrisy and blindness. The



মার্কিন নৌবহরের মহড়া। চারখানি ড্রেগয়ার একই সময়ে যাত্রা করিতেছে। সাতচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সর্বসমেত এক শত দশখানা রণপোত পানামা—ক্যানেল দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

hypocrisy is disclosed in the fact that for themselves both Great Britain and the United States claim complete and overwhelming naval supremacy in those waters which are vital to them.....And, although both nations discuss disarmament, neither has any intention of modifying, in the smallest degree, the relative superiority it maintains."

সিমণ্ডস সাহেবের মতে ভগামি ও অন্ধতার আশ্চর্য্য সংমিশ্রণে এ্যাংলো-স্নাকশন ধারণাগুলি গঠিত। ভগামি একটা বিষয়ে বেশ ধরা পড়ে। যে-সব সমুদ্রে নিজেদের স্বার্থ রহিয়াছে সে-সব স্থলে ব্রিটেন ও মার্কিন নৌবহরের প্রাধান্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিবার দাবি করে এবং যদিও উভয় রাষ্ট্রই নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক আলোচনায় যোগ দিয়া থাকে তথাপি তাহারা তাহাদের বর্তমান প্রাধান্ত বিন্দুমাত্রও হ্রাস করিতে ইচ্ছুক নহে।

এই সব কারণে মনে হয়, ব্রিটেন ও মার্কিনের স্থায় প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখে জাপানের সমান অগুপাতমূলক দাবি এতটুকুও অসম্ভব নহে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল •

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

১

ঘড়ির ঘণ্টা সশব্দে বাজিয়া উঠিল। অরুণ বিছানাতে চোখ বুজিয়া নিদ্রাজাগরণের স্বপ্নাবেশময় আবছায়ায় অলস স্থখে শুইয়াছিল; কি এক সুখস্বপ্ন-শেষে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। স্বপ্নটি কি তাহার ঠিক মনে পড়িতেছিল না, স্মৃতির পটে অতি হালকা রঙীন ছোপ, বালুকাতটে সমুদ্রতরঙ্গের ফেনিল লিপির মত ক্ষণিকের মধ্যে মিলাইয়া যায়—এক গানের মধুর সুর, অজানা পুষ্পদলের মৃদু গন্ধাচ্ছাস, এক কিশোরীর স্নিগ্ধ মুখ কখনও হাস্তে, কখনও কৌতুকে ভরা। সুখস্বপ্নস্মৃতিকে সে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল।

ঘড়ির এলার্ম-ধ্বনিতে অরুণ চমকিয়া উঠিল, স্বপ্নস্মৃতিজাল ছিন্ন হইয়া গেল। ঘড়ির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া

তরল অন্ধকারময় বরের দিকে চাহিল। ভোরের বাতাসে বড় খাটের পায়ের দিকে ডানপাশে পূর্বের জানালা খুলিয়া গিয়াছে, পক্ষের কাজ-করা পুরাতন বিবর্ণ দেওয়ালে উষার পাণ্ডুর আলো বড় করুণ দেখাইতেছে, সুরহং গৃহ আলোছায়াময়।

এলার্ম বাজিতে লাগিল। স্থলের অনেক পড়া মুখস্থ করিতে হইবে। আজ আবার ইতিহাসের মাসিক পরীক্ষা, দিল্লীর বাদশাহগণের নাম, ভারতের গবর্ণর-জেনারালগণের নাম ও শাসনকাল, নানা সন তারিখ মুখস্থ করিতে হইবে; তার পর সংস্কৃত-জিয়ার ধাতুরূপ, ম্যালজ্যাত্রার ফরমূলা, কবি শেলির একটি কবিতা। বাক, এখনও পাঁচটা বাজে নাই, আরও পনের মিনিট সে বিছানাতে শুইয়া থাকিতে পারে। কাল রাত সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত

জাগিয়া পড়িয়াছে, স্কুলের বই নয়, ডেভিড কপারফিল্ড নামে এক গল্পের বই, তাহার কাকার লাইব্রেরী হইতে আনিয়াছিল; কাকা কিন্তু রাত বারোটোর মধ্যেও করেন নাই। বড় করুণ ডেভিডের জীবন, কিন্তু সে বড় বোকা, য়াগনেস যে তাহাকে ভালবাসে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না, ডোরাকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইবে? বোকারা জীবনে ত অসুখীই হইবে। আচ্ছা, য়াগনেস কাহাকে বিবাহ করিবে? সে বড় ভাল স্নেহে। চার্লস ডিকেন্স লেখেন ভাল।

বাড়ির শব্দ ধীরে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। বাড়ির পূর্ব দিকের বাগান পাখীর গানে ভরিয়া উঠিল। অন্ধনের আর ঘুম আসিল না। চোখ মেলিয়া সে শুইয়া রহিল। নানা কাকুতর্ক্যময় বৃহৎ খাট, ঘরের এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া তাহার মায়ের বিবাহের খাট, মেহগনী পালিশ প্রায় কালো হইয়া গিয়াছে।

খাটের মাথায় দক্ষিণ দেওয়ালে অন্ধনের মাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিং; মায়ের মৃত্যুর পর তাহার পিতা এক ফরাসী চিত্রকর দিয়া ফটো হইতে এই ছবি আঁকাইয়া-ছিলেন। এ ঘরে পিতার বৃহৎ ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট রাখিবার আর স্থান নাই, আর তাহার ছোটবোন প্রতিমা তাহার ঘরে একটি ফটো রাখিতে চায়; স্বর্গগত জনক-জননীর ছবি আসবাবপত্র জিনিষ দুই ভাইবোনে ভাগ করিয়া লইয়াছে।

ভোরবেলায় ঘুম তাড়িয়া গেলে অন্ধকারময় স্নিগ্ধ স্তব্ধতায় অন্ধনের ছেলেবেলায় কথা ভাবিতে ইচ্ছা করে, —স্বপ্নছবির পর স্বপ্নছবি। সোনালী শস্তভরা অব্যাহত মাঠের মধ্য দিয়া নদীর রক্ততারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া সুনীল প্রান্তরে গিয়া মিশিয়াছে, তাহার তীরে তাহাদের বাঙলা-বাড়ি ছবির মত; সেখানে বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে ও টুলি কি সুখে আনন্দে দিন কাটাইয়াছে,—নদীতে সাঁতার-কাটা, বাগানে ফলপাড়া, বাবার সঙ্গে বজরাতে টুং-বাওয়া, আমগাছে বাঁধা দোলনাতে দোলা, সেই বুড়ো বটগাছের তলায় চড়ুইভাতি, সন্ধ্যায় মায়ের গল্প বলা—তখন তাহার ডেপুটি সাহেবের ছেলেমেয়ে, কত বড়, কত আদর।

মা কি সুন্দরী দেখিতে ছিলেন, তেমনি সুন্দর রাখিতে পারিতেন। ফরাসী চিত্রকর অন্ধনের কর্মন্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—কি হে, ঠিক হয়েছে, তোমার মার ছবি? সে উত্তর দিয়াছিল আমার মা এর চেয়ে অনেক সুন্দরী ছিলেন, সে তুমি আঁকিতে পারবে না। সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য অয়েল-পেন্টিঙে কেমন করিয়া আসিবে! এ-দৃষ্টিতে সে স্নেহ-মমতা কই?

দরজায় করাঘাত হইল। অন্ধ, উঠেছিস—ওঠ, অন্ধ—উঠেছিস অন্ধ। ঠাকুমা গলা। ঠাকুমাকে সে বলিয়াছিল, ভোরে জাগাইয়া দিতে। দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া জল-ছড়া দিয়া ঠাকুমা চলিয়া গেলেন। অন্ধকে এবার উঠিতেই হইল।

সিঁড়ির উত্তরে প্রতিমার ও দক্ষিণে অন্ধনের ঘর, মধ্যে ঘোরান-সিঁড়ি পূজার দালানের পাশ দিয়া দুই মহল বিভাগ করিয়া ছাদ পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে; দুই মহলওয়ালা বৃহৎ বাড়ি প্লান করিয়া তৈরি নয়, গত নব্বই বৎসর ধরিয়া বোম্ব-বংশের নানা কর্তার খুশীমত গড়িয়া উঠিয়াছে—ছোট-বড় ঘর, নানা বারান্দা, আঁকাবাঁকা অন্ধকার করিডর, অন্ধ কুঠরী, বাড়িটি বিচিত্র গোলকর্দার।

হাত-মুখ ধুইয়া অন্ধন সিঁড়ির ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমার ঘরের দরজা বন্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। প্রতিমা ভোরে উঠিয়া গান গায়, গলা সাধে। আজ কোন অস্থখ করিল কি? কাল রাতে সে ভাল করিয়া খায় নাই। মাঝে মাঝে প্রতিমার জন্ত তাহার বড় ভাবনা হয়, বড় রোগা সে।

তেতলার ছাদে সিঁড়ির পাশে এক ছোট ঘর ভাঙা চেয়ার ঝাড়লঠন ছেঁড়া সতরঞ্চি কার্পেট ইত্যাদি সভা সাজাইবার নানা বহুব্যবহৃত দ্রব্যে পূর্ণ ছিল, সেই ঘর সাফ করিয়া অন্ধন তাহার পড়িবার ঘর করিয়াছে। এ-বৎসর তাহার ম্যাট্রিক পরীক্ষা, এখন তাহার সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিবার জন্ত সকলে উদ্যোগী।

অন্ধন পড়ার ঘরে গেল না, এক তলায় নামিল। বড় লাইব্রেরী-ঘরের পাশ দিয়া পূর্ব দিকের বাগানে বাহির হইয়া গেল। ক্লাসের কোন পড়া ভাল করিয়া হয় নাই, তবু পড়িতে বসিতে তাহার মন লাগিতেছিল না। আপন

মনের চঞ্চলতা বিঘ্নতা তাহার নিজের কাছে অনুভূত লাগে। কোন দিন সে নিবিষ্ট মনে সমস্ত সকাল পড়ে, কোন সকাল পড়ায় মন বসে না, বাগানে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতে, পুকুরের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বা প্রতিমার সহিত খুনহুটি করিতে বড় ভাল লাগে।

কলিকাতায় কোন বাড়িতে এত বড় বাগান ও পুকুর নাই বলিলেই হয়। ও বাগানের প্রতি বৃক্ষ রোপণের ইতিহাস অরুণ তাহার ঠাকুমার নিকট শুনিয়াছে। তাহার প্রপিতামহী যে পুকুরিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এখন তাহার অর্ধেক বৃক্ষান হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন পূর্বপুরুষ মালদহ হইতে কোন আমগাছের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, হটহাউস তৈরি করিয়া নানা জাতীয় ফার্ণ, ইংরেজী ফুলের গাছ করিয়াছিলেন, সে-সব গল্প তাহার জানা। এখন সে-হটহাউস ভাঙিয়া গিয়াছে, পরীওয়ালা ফোয়ারাগুলির জলধারা নিঃশেষিত, ইতালীয় মার্বেলের অর্ধভগ্ন নগ্না নারীমূর্তিগুলি ভঙ্গলে লজ্জায় লুকাইয়া।

ফাস্তনের প্রভাত নিম্ন হৃন্দর; তালপুকুরের স্থির ভলে নবীন রৌদ্রালোক কচি শিশুর হাসির মত; নারিকেল গাছগুলির শ্রামমসৃণ পাতা ঝিকমিক করিতেছে; এক মর্ম্মরের পরী-শিশুর ভগ্ন হস্তে মাকড়সার জাল বোনা, তাহার উপর শিশিরবিদ্যু মস্তুর মত; নব বসন্তের তৃণ—পুষ্প-শোভিত পৃথিবীর অপূর্ণ গন্ধোচ্ছ্বাস বর্ণোৎসব অরুণকে যেন অভিভূত করিল। তাহার অন্তর কি অজানা বিবাদে এ-প্রভাতে আরও উদাস হইয়া গেল।

অরুণ যখন তেতলায় পড়িবার ঘরে আসিল, প্রভাত আতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে প্রথর সূর্যালোক। টেবিলের উপর চাকর যত্ন গরম হুধের বাটি, কুটি ও মোহন-ভোগ রাখিয়া গিয়াছে। হুধ ও একখানি বাসি কুটি খাইয়া অরুণ আওরঙ্গজেবের পর দিল্লীর পাতশাহগণের নাম মুখস্থ করিতে বসিল।

স্থলের বই-খাতা লইয়া প্রতিমা তাহার ঘরে আসিল।

—দাদা, অ-দাদা, আমার অঙ্কগুলো কবে দাও, তা না হ'লে হুধাদি আমার আজ খেয়ে ফেলবেন।

—হুধাদির তুই প্রিয়া ছাত্রী, হুধাদি তোমায় খেয়ে ফেলছেন!

—সত্যি।

—হ্যারে টুলি আজ তোর গলা শুনলুম না?

—বা, গলা কি রকম ধরেছে দেখছ না!

—সর্দি করেছ ত, রাতে কেশেছিলে—শোন, আমার ঘরে পাথরের টেবিলে সেই পুরনো ফ্রেঞ্চ ঘড়িটার পাশে এক লাল রঙের শিশি আছে, চল, আমিই বাই।

—বাবা, তোমার ডাক্তারি আর করতে হবে না, আমি ওষুধ খাচ্ছি।

অরুণ মেহদিজন্ত নয়নে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিল। কেন তাহাকে সে এত ভালবাসে, তাহার জন্ত মনে বড় ভয় হয়, বড় রোগা সে।

—আচ্ছা, দাদা, বল ত, থার্ড ক্লাসে কখনও এত শক্ত অঙ্ক দেয়, হুধাদি কেবল হেড-মিস্ট্রিসের কাছে নাম কিনতে চান।

—বেশী জ্যাঠামি করিস না, অঙ্ক পার না, হুধাদির দোষ, ওধুধ খেয়েছিস আজ সকালে?

—খেয়েছি গো, অঙ্কগুলো কবে দাও।

অঙ্ক কথিতে কথিতে অরুণ বলিতে লাগিল—টুলি, অজয়ের বোনেরা তোর স্থলে পড়ে?

—হ্যাঁ, পড়েই ত!

উচ্চ স্বরে প্রতিমা হাসিয়া উঠিল। হাসিলে তাহার গালে হৃন্দর টোল পড়ে।

—উমা কি তোর সঙ্গে পড়ে?

—বা! উমাদি আমার সঙ্গে পড়ে! উমাদি ত সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, আমার সঙ্গে খুব ভাব, জান—হৃন্দর গান গায়।

—তোর চেয়ে ভাল?

—অত জানি না বাপু।

—আর শীলা?

—শীলা, বোধ হয় কিঞ্চিৎ ক্লাস।

—হঁ, দেখ দেখি, রেজাল্ট মিলল কিনা।

—মিলেছে। আর এইটা। জান দাদা, একটা ভাল গান শিখেছি, তোমার রবিবাবুর নতুন টাটকা গান,

সুঁরটা কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগল না, তবে কথা
চমৎকার, তোমার খুব ভাল লাগবে।

—রোস, অঙ্কটা শেষ করি।

—আজ আমি গাইতে পারব না কিন্তু, যা গলাবোথা।

—বাথা! তা ত বলিস নি এতক্ষণ, আজ আর স্কুলে
যায় না, আমি ঠাকুমাকে ব'লে দিচ্ছি।

—না, না, আজ স্কুলে যেতে হবে, আজ বড় মজা
আছে, শোন, দাদা, আস্তে গাই।

প্রতিমা ধীরে গাহিতে লাগিল—

প্রাণ ভরিয়া, তুষা হরিয়া
মোরে আরও আরও দাও প্রাণ

অদ্বৈত গাহিয়া সে থামিয়া গেল। আর তাহার কথা
মনে পড়িতেছে না।

—অদ্ভুত তোমার স্মরণশক্তি!

—আচ্ছা দাদা আজ উমাদির কাছ থেকে লিখে নিয়ে
আসব। থাক, ওই দুটো অঙ্কতেই হবে। মেনি থ্যাঙ্কস,
তোমার পড়ার অনেক ক্ষতি হ'ল।

প্রতিমা চলিয়া গেল। অরুণের আর পড়া বিশেষ
কিছু হইল না। গানের সুর তাহাকে উন্নয়ন করিয়া দিল।
উমা নিশ্চয় এ গান খুব চমৎকার গায়।

২

অরুণ যখন স্কুলের গলির মোড়ে, স্কুলের ঘণ্টা
বাজিতেছে। ছুটিয়া সে স্কুলের দিকে চলিল।

প্রথম ঘণ্টা, ইংরেজী, 'নাকুর' ক্লাস। 'নাকু' একটু
দেরি করিয়াই আসেন, আর দেরি হইলেও অরুণকে
তিনি কিছুই বলিবেন না।

বস্তুতঃ, এই নম্র স্বল্পভাবী সুদর্শন ছাত্রটিকে সকল
মাষ্টারই ভালবাসেন; বোধ হয় তাহার বংশের আভিজাতিক
গৌরবের জন্য একটু সম্মানও করেন। সহপাঠিদিগের
মধ্যেও অরুণ প্রিয়। বন্ধু তাহার খুব বেশী নাই, সে বড়
লাজুক; কিন্তু যে-কয়জন বন্ধু আছে তাহারা তাকে
সত্যি ভালবাসে, আপন সুখ-দুঃখের কথা বলে। কাহারও
সহিত ঝগড়া মারামারি করিতে তাহার কেমন লজ্জা হয়,
অন্ত ছাত্ররাও তাহার সহিত অভদ্রাচরণ করিতে সঙ্কোচ
বোধ করে।

স্কুলের গেটে পৌঁছিতেই জয়ন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে
তাহার সঙ্গ লইল।

অরুণ বলিল—ঘণ্টা বেজে গেছে!

জয়ন্ত গানের সুরে বলিয়া উঠিল—আমার ভাগ্যে ত
বকুনি আছে।

তার পর অরুণের হাত ধরিয়া বলিল—চল অরু, শেষ
বেষ্টিতে আমার পাশে বসবে, তোমার সঙ্গে ভয়ঙ্কর
দরকার।

—কি নতুন কবিতা লেখা হ'ল?

—না, কবিতা নয়, সে ভীষণ ব্যাপার।

জয়ন্ত চৌধুরীকে ক্লাসে সবাই 'কবি' বলিয়া ডাকে।
সে লম্বা চুল রাখিয়া কোঁকড়ায়, চিলে পাঞ্জাবী পরিয়া
শ্রায়ের চাদর লুটাইয়া চলে, পায়ে জরির নাগরা। লম্বা,
শ্রামবর্ণ, চোখে উদাস স্বপ্নভরা দৃষ্টি রচনা করিবার প্রয়াস,
মন বড় কোমল, বেদনাগ্রবণ।

অরুণ ক্লাসে ঢুকিয়া দেখিল, মাষ্টার মহাশয় আসেন
নাই। ভূদো বৃন্দাবনকে লইয়া খুব হৈ হৈ চলিতেছে।
বৃন্দাবন গুপ্ত ছেলেটি যেমন মোটা তেমনই কালো, লম্বা
হইলেও বেঁটে দেখায়, পায়ে কালো বুট, থাকি হাফপ্যান্ট ও
সবুজ রঙের বুক-কাটা কোট পরিয়া সে স্কুলে আসে,
'বাস্কেট বল' খেলার বলের মত দেখায়, ছোটবেলা হইতে
কলিকাতায় থাকিলেও রাগাইয়া দিলে তাহার পৈতৃক
গ্রামের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। স্কুলের
ছেলেদের মধ্যে হাফপ্যান্ট পরার রেওয়াজ তখনও হয়
নাই। নাম, চেহারা, বেশ ও ভাষা, ব্যঙ্গ করিবার এতগুলি
বিষয়। ছেলেরা ছাড়িবে কেন? অরুণ দেখিল, ক্লাসের
মধ্যে বৃন্দাবন পৈতৃক গ্রাম্য ভাষায় তর্জন-গর্জন করিতেছে
আর কেহ সুর করিয়া বলিতেছে, আমি বৃন্দাবনে বনে বনে
ঘেঁহু চরাব। কেহ বলিতেছে, ওহে হাফপ্যান্ট-পরা খেঁহু,
মোদের ক্লাসে চরতে এল কেহ?

সুহাস সেন ক্লাসের আর্টিষ্ট। পিছনের বেঞ্চে বসিয়া
সে মাষ্টার ও ছাত্রদের নানা ব্যঙ্গচিত্র অঁাকে। তাহারই
আঁাকা বৃন্দাবনের একটি সরস চিত্র হাতে হাতে ঘুরিতেছে।

চালিয়াৎ চট্টো জুতা মসমস করিতে করিতে প্রবেশ
করিল। ছেলেটির নাম অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, লম্বা, কদা,

নিখুঁত ভাঁজ-করা হুট পরিয়া হাতে বইখাতা-ভরা চামড়ার ব্যাগ লইয়া আসে, কোটের বুক-পকেটে রঙীন ক্রমালে এসেঙ্গের গন্ধ, পিন্সনে চশমার কালো চওড়া ফিতা কানের পিছনে দোলে। তাহার বাবা ইংরেজী সওদাগর আপিসের বড়বাবু না সেজবাবু, ইহা লইয়া ছেলেদের মধ্যে তর্ক হয়। চালিয়াৎ চট্টো ইংরেজীতে কথা বলে। সে ক্লাসে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিল, হোয়াট ইজ-দি ম্যাটার?

ছেলের দল হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল, চালিয়াৎ চট্টো বড় কতিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে, বস্তু কি? কোথায় হে বাণেশ্বর তর্কচক্রে—

অরবিন্দ আসাতে বৃন্দাবন একটু রেহাই পাইল। সে গজগজ করিয়া দ্বিজেনের পাশে বসিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ক্লাসের 'ভাল ছেলে', প্রায় সব বিষয়ে প্রথম হয়।

অরুণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বন্ধু অজয় আসিয়াছে কি না। অজয় তাহার সীটে বসিয়া কি লিখিতেছে, নিশ্চয় কোন স্থলকে ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করিয়া চিঠি। অরুণ নিশ্চিন্ত হইল। যতীনকে ডাকিয়া তাহার পাশাপাশি বসিল।

যতীনকে তাহার বড় ভাল লাগে। খুব গরিবের ছেলে হইবে, ক্রী পড়ে। পায়ে কাদাভরা চটি, ময়লা কাপড় ও হেঁড়া শার্ট পরা, শীর্ণ দেহ, কিন্তু মুখখানি বুদ্ধিতে ভরা, টানা কালো চোখ ছুটিতে তীক্ষ্ণবী। সেও অরুণের মত স্বল্পভাষী, শান্ত; কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। সে যে দরিদ্র এই হীনতাবোধ তাহার চিন্তকে সর্বদা বেদনা-প্রবণ করিয়াছে।

যতীনের সহিত অরুণের বেশভূষায় অত্যন্ত পার্থক্য। অরুণ ময়লা কাপড় পরিতে পারে না, ময়লা জামা গায়ে দিলে তাহার গা বিন-বিন করে, সহজ সৌন্দর্য্য ও শুচিতার বোধ তাহার জন্মগত। কিন্তু চেহারায় ও মানস প্রকৃতিতে যতীনের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। তাহার দেহ যতীনের মতই ক্লশ, ভঙ্গুরতার ভাবময়; পাণ্ডুর মুখশ্রী কখনও বেদনায় ককণ, কখনও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। যতীন অরুণের সহিতও বেশী কথা কয় না, কিন্তু কয়েকটি কথাতেই তাহাদের চিন্তের কোন গম্ভীর গোপন যোগ স্থাপিত হইয়া যায়।

ইংরেজী মাস্টার-মহাশয়ের চোগাচাপকান-পরা দীর্ঘ মূর্ত্তি বারান্দায় দেখা যাইতেই ক্লাস নিস্তব্ধ হইয়া গেল। লম্বা রোগা কালো চেহারা, লম্বা মুখের উপর খাঁড়ার মত নাক, অজীর্ণতাশীর্ণ জলজ্বলে চোখ; অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক; কেহ কখন তাঁহাকে ক্লাসে হাসিতে দেখে নাই। বেশের কৃষ্ণতায়, দেহের দৈর্ঘ্যে, শীর্ণচক্ষের স্মৃতির দীপ্তিতে সর্বক্ষণ ভয়াবহ স্তব্ধতা সৃষ্টি করিয়া তিনি কিশোর-মনে ভয়ের শাসন স্থাপন করিতে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। ছেলেরা পিছনে তাঁহাকে নাকু বলে, কিন্তু তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করে। আতঙ্কিত কিশোর-চিন্তের কল্পনায় তিনি রুদ্রদেবতার রূপ।

চেয়ারে বসিয়া নাকু ক্লাসের দিকে চাহিলেন। সবাই ভীত মগ্নমুগ্ধ হইয়া পুত্তলিকার মত তাঁহার দিকে চাহিল। তাঁহার দীর্ঘ শীর্ণ তর্জ্জনী বাহার প্রতি নিক্ষেপ করিবেন, তাহাকে সোজা দাঁড়াইয়া আজিকার ইংরেজী-পাঠ রীডিং-পড়িতে হইবে। তিনি কোন কথা বলিবেন না, শুধু তর্জ্জনীর ইঙ্গিত।

নাকুর তর্জ্জনী অরবিন্দের প্রতি পড়িল। চালিয়াৎ চট্টোকে পড়িতে হইবে ক্লাসের সবাই খুশী।

ড্রিল-সার্জেন্ট ঘেরুপ গম্ভীর তীক্ষ্ণস্বরে হুকুম করিয়া শিক্ষানবীশ সৈনিকদের কুচকাওয়াজ শেখায়, সেইরূপ অর্ডারের মত নাকুর এক-একটি ইংরেজী কথা বাহির হয়, ছেলেদের বুক ছরছর করে—সোজা, সোজা দাঁড়াও, সোজা বই।

অরবিন্দ কম্পিত হস্তে চশমার ফিতা ঠিক করিয়া লম্বা টানা সুরে পড়িতে লাগিল; ক্লাসের সকলে চুপ। যখন এক প্যারাগ্রাফ পড়া শেষ হইল, অরবিন্দ নূতন প্যারাগ্রাফ পড়িতে যাইবে, অর্ডার আসিল,—থাম। একি গান? গানের সুর! প্রোজ, প্রোজ!

অরুণ অজ্ঞাত ভাবে হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণ শীর্ণ তর্জ্জনী অরুণের বেঞ্চের দিকে পড়িল। অরুণের বুক কাঁপিয়া উঠিল, রীডিং সে বেশ পড়িতে পারিবে, কিন্তু শব্দ কথার অর্থগুলি দেখিয়া আসে নাই। সহসা তাহার পাশ হইতে যতীন দাঁড়াইয়া উঠিল। বাঁচা গেল। যতীন বেশ ইংরেজী পড়ে।

আরবিন্দ বসিতে যাইতেছিল, অর্ডার হইল, দাঁড়িয়ে শোন। তর্জনী বেঞ্চির পর বেঞ্চি ঘুরিতে লাগিল। ক্লাস যখন শেষ হইল, সকলে ঘামিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় ঘণ্টা সংস্কৃত, হেড্ পণ্ডিতের ক্লাস। সকলে পঞ্চতন্ত্র খুলিল।

যজ্ঞেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত, ভাটপাড়ার এক প্রাচীন পণ্ডিত-বংশের। এ-যুগে টোল করিয়া চলে না, স্কুল-মাষ্টারি লইতে হইয়াছে। তাঁহার প্রতি সমাজের অবিচারের জন্ত তাঁহার চিত্ত সর্বদাই কুপিত; চারিদিকে আধুনিক অনাচার-শ্লেচ্ছাচরের জন্ত তিনি অত্যন্ত বিরক্ত। তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত বিদ্যাতেও আর্থিক উন্নতি খুব বেশী হইল না, সুতরাং ছাত্ররা মন দিয়া সংস্কৃত না-পড়িলে তিনি ক্ষুব্ধ হন না। তবে পাস করিবার ক্ষমতা পড়িলেই হইল।

পায়ে তালতলার চটি, মোটা খান কাপড় পরা, গাল গলাবন্ধ কামার উপর চাদর, মাথায় শিখা, চোখে ষ্টিল-ফ্রেমের চশমা। পণ্ডিত-মহাশয়কে ছাত্ররা পছন্দ করে।

পণ্ডিত-মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করিলে, ছাত্ররা দেখে, পণ্ডিত-মহাশয়ের শিখা উর্দ্ধে বাঁধা না অধোতে। আর পণ্ডিত-মহাশয় দেখেন তাঁহার পুত্র বাণেশ্বর ক্লাসে আসিয়াছে কিনা। পণ্ডিত-মহাশয়ের শিখা যদি উর্দ্ধে থাকে তাহা হইলে তাঁহার মেজাজ ভাল নাই, আর যদি নিম্নে থাকে, তাহা হইলে, হয়ত অর্ধঘণ্টা ছুটিও দিতে পারেন।

ছাত্ররা দেখিল, শিখা উচ্চ করিয়া বাঁধা; সকলে প্রমাদ গণিল। বাণেশ্বরের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। পিতা প্রথমেই তাহাকে পাঠ জিজ্ঞাসা করিবেন। সেজন্ত সে ভীত নয়, কিন্তু তাহাকে যখন তিনি বাড়ির ডাকনাম ধরিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকেন, তাহার ভয়ঙ্কর রাগ হয়। নামটিও হুমধুর নয়—হাঁদা!

পণ্ডিত-মহাশয় পুত্রকে রেহাই দিলেন। আরবিন্দকে ডাকিলেন, ওহে সাহেব!

পণ্ডিত-মহাশয় নিজ পুত্রকে যেমন ডাকনাম ডাকেন, তেমনই ক্লাসের আর সকলকেও একটা নাম তৈরি করিয়া ডাকেন।

সাহেব সমাসটি ঠিক বলিল। তার পর 'মাকাল-ফল'ের

আহ্বান হইল। কালীপ্রসাদ মল্লিকের নাম মাকাল-ফল। পাড়ার মল্লিকদের বাড়ির ছেলে। মোটা, গোলগাল মুখ, ফুটফুটে দেখতে, সব সময়ে হাসিখুশী ভাব; পায়ে পাম্পাস, কৌচান দেশী ঘুতি ও রঙীন সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া আসে। মাকাল-ফল বড় মুস্থিলে পড়িল, সব সময় সুপারি চিবাইয়া সে একটু তোতলা হইয়া গিয়াছে, দীর্ঘ সমাস-যুক্ত সংস্কৃত ভাষা তাহার জিহ্বার উচ্চারণের জন্ত নয়। সে দাঁড়াইলে পণ্ডিত-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়া তৈরি হয়েছে?

কালীপ্রসাদ অল্পানবদনে উত্তর দিল—সুত, ভাল হয় নি। পণ্ডিত-মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা বোস, কেন স্কুলে আসি? বাবার আপিসে বেকতে আরম্ভ কর। বিন্দে!

বন্দাবন বুটের শব্দ করিয়া দাঁড়াইয়া গড়গড় পড়িতে আরম্ভ করিল।

পণ্ডিত-মহাশয় আবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—আন্তে আন্তে, দেবভাষা শ্লেচ্ছের মত পড়িস না।

এ-ঘণ্টাতেও অরুণকে কিছু পড়িতে হইল না।

তৃতীয় ঘণ্টা অঙ্কের। অঙ্কের মাষ্টার গোপালবাবু ক্ষীণকীরী, অতি ভালমানুষ। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়াই বোর্ডে দুইটি অঙ্ক লেখেন, ছেলেদের নিজ নিজ খাতায় অঙ্ক দুইটি কবিত্তে বলিয়া নিজে একটি বই বা খাতা লইয়া চেরারে বসেন। অনেকে অঙ্ক কষে, অনেকে অঙ্কগুলি খাতায় ঢুকিয়া বসিয়া গল্প করে। তবে কেহ গোলমাল করে না। মাষ্টার-মহাশয়ের সঙ্গে ছেলেদের যেন বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি ছাত্রদের জালাবেন না, ছাত্ররাও যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। তাঁহার চাকরি যেন বজায় থাকে। উৎসাহী ভাল ছেলেরা অঙ্ক কবিত্তা তাঁহার কাছে লইয়া যায়। আর ক্লাসে মাকাল-ফলের সুপারির কোটা, সুহাস সেনের নাক বা পণ্ডিত-মহাশয়ের সরস রেখাচিত্র বেঞ্চি হইতে বেঞ্চে চালিত হয়।

কিছু ক্ষণ পর গোপালবাবু নিজে উঠিয়া বোর্ডে অঙ্ক কবেন ও ছেলেদের খাতায় টুকিতে বলেন। এ-বিষয় তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি। বলেন—বাপু, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ ক'রো না। অধিকাংশ ছেলেই টুকিয়া লয়।

অন্ধকথা শেষ হইলে অনেক সময় তিনি ঘণ্টা বাজিবার আগেই চলিয়া যান। ছেলেরা কোন গোলমাল করে না, তবে ভূদো বিন্ধেকে চিমটি-কাটা চলে।

টিকিনের সময় অরুণ অজয়কে খুঁজিতে বাহির হইল।

অজয়ের সহিত তাহার গভীর বন্ধুত্ব। এক বছর হইল অজয় স্কুলে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে তাহাদের কিরূপে একত্ব ভাব হইল, তাবিলে অরুণ অনেক সময় আশ্চর্য্য হয়।

অজয় অরুণের চেয়েও লম্বা, তরুণ শালবৃক্ষের মত সুঠাম দৃঢ় দেহ, বীরাব্যাজক সজীব স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। মুখ তারুণ্যমণ্ডিত বটে, কিন্তু অরুণের মুখত্রীর পাণ্ডুর ভাবপ্রবণতা, স্বপ্নময় উদাসতা নাই। তাহার দেহের মত তাহার মনও সরল, ঋজু। সে হৈ চৈ করিয়া কথা বলে, সারাক্ষণ চোঁচায়, হাসে, কিশোর প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরা। ‘ফ্যাটি’ বিন্ধের পেটে ঘুসি মারিতে, চালিয়াৎ চটোর চশমার কিতা টানিয়া দিতে, ছেলেরদের সহিত ঘুসোঘুসি করিতে, অত্যাচারিত দুর্বল ছেলের জন্ত লড়িতে সর্বদাই প্রস্তুত। ক্লাসের মধ্যে সে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়, স্কুলের ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন। স্কুলে বিদ্যাচর্চা অপেক্ষা খেলার মাঠে দেহচর্চা করিতে বেশী ভালবাসে। তবে পড়াশোনাতেও অমনোযোগী নয়। এক শতের মধ্যে পঞ্চাশ পাইবার মত পড়া পড়ে। তার বেশী পড়া, তার মতে পণ্ডশ্রম। সে কল্পনাপ্রিয় নয়, বলে, আমি রিয়ালিষ্ট। জয়ন্তের কবিতাকে সে বলে, প্যানপ্যাননি ও বাণেশ্বরের তর্ককে বলে জ্যাঠামি, তবে সুহাসের ব্যঙ্গচিত্রগুলিকে প্রশংসা করে।

অজয়কে নিভৃত ডাকিয়া অরুণ বলিল—মামাবাবু কেমন আছেন?

অজয় একটু গভীর হইয়া উত্তর দিল—বাবা, বাবা সেই রকমই আছেন। কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। তাছাড়া অল্প কোন নতুন উপসর্গ নেই। শোন, মা ব’লে দিয়েছেন, আজ বিকেলে তুমি যেও নিশ্চয়। দু-দিন যাও নি কেন, স্কুল থেকেই যেও, ওখানে চা খাবে।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—তুমি থাকবে ত?

অজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমার ফিরতে রাত হবে, আজ স্কুলের ম্যাচ, আমি ক্যাপ্টেন, যাওয়া চাই। আচ্ছা, এখনি টীম তৈরি করতে হবে। যেও, না হ’লে মা ভাববেন।

মামীমা তাহাকে সতাই বড় স্নেহ করেন। এক বৎসরের পরিচয়, কত আপন করিয়া লইয়াছেন, যেন জন্মজন্মান্তরের জ্ঞান।

অজয় চলিয়া গেল। জয়ন্ত আসিয়া তাহার হাত ধবিল, চোখ ছল ছল করিতেছে। জয়ন্ত সামান্য আবেগেই কাঁদিয়া ফেলে।

অরুণ ধীরে বলিল—কি হয়েছে ভাই?

ভগ্নস্বরে জয়ন্ত বলিল—চল ক্লাসে, বলছি।

ক্লাস প্রায় শূন্য। দুই জনে এক কোণে বসিল।

জয়ন্ত কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—বাবা চলে গেছেন।

বিবর্ণ বিম্বিত মুখে অরুণ বলিল—তোমার বাবা, কি হ’ল হঠাৎ!

—তিনি সমাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ ক’রে চ’লে গেছেন।

—ও, তাই বল, আমি ভাবছিলাম—

—কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি হ’ল!

—তোমার ত মা নেই।

—না, কিন্তু ছোট ভাই এক আছে।

—তোমাদের এক দোকান আছে না?

—হ্যাঁ, ঘড়ির দোকান, রাধাবাজারে। বাবার মত ভয়ানক ঘড়ি নাকি কেউ সারতে পারত না, ঘড়ি সেরে সেরে তাঁর চোখ খরাপ হয়ে গেছিল। তিনি আর বড় মেসোমশাই হু-জনে দোকান করেছিলেন, দোকান ত মেসোমশাইকে দিয়ে গেছেন।

—তোমরা ত একসঙ্গে থাক।

—হ্যাঁ, বড় মাসীর সঙ্গে, বাবাই বেশীর ভাগ খরচ দিতেন। আমার জন্তে ভাবি না, কিন্তু মণ্টুর কি হবে, ছ-বছরের ছেলে সে—বাবা একটু ভাবলেন না।

—মাসী দেখবেন।

—হ্যাঁ, মাসীর চার ছেলে চার মেয়ে—মাসী দেখবেন। শোন, তোমার ব্যারিষ্টার-কাকার সঙ্গে আমি পরামর্শ করতে

চাই। দোকানে আমাদের অংশ কি, মণ্টুত নাবালক,
সব ঠিক ক'রে নিতে হবে।

—আচ্ছা, আমি বলব।

—শীগির একটা ব্যবস্থা করা চাই। মেশো কোন্ দিন
বলবেন, চরে খাও গে।

—আচ্ছা, আমি নিশ্চয় বলব।

—বাবা বেশ, সম্যাসী হয়ে চলে গেলেন।

টিফিনের শেষে দুই ঘণ্টা ইতিহাসের মাসিক পরীক্ষা
হইল। প্রশ্নগুলি সহজই ছিল। কলিকাতা-স্থাপনের
ইতিহাস, শেষ পানিপথ যুদ্ধ মারাঠাশক্তি পতনের কারণ,
ইত্যাদি। অরুণ উত্তরগুলির সঙ্গে নিজের নানা মন্তব্য
জুড়িয়া দিল। ইতিহাসের শিক্ষক জগদীশবাবু সে প্রশ্ন
ছাত্র। সে নির্ভয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখে। জগদীশবাবু
নিজেও ছাত্র, এম-এ পাস করিয়া ল' পড়িতেছেন। সেজন্ত
বোধ হয় কিশোর-মনের উচ্ছ্বাস স্নেহের চোখে দেখেন।

অরুণ লিখিল, শেষ পানিপথ-যুদ্ধে যদি আ'মদ শা
হরানীর পরাজয় হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস
কি হইত কে জানে। হয়ত কি হইতে পারিত, এ প্রশ্নের
সে নানা কাল্পনিক উত্তর লিখিল। আর এক প্রশ্নোত্তরে
সে লিখিল, জব চার্লক যদি কলিকাতায় কুঠিস্থাপন না-
করিতেন তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধ হইত কি? ইতিহাস
পড়িতে পড়িতে তাহার মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন জাগে।

স্কুলের শেষে অরুণ অজয়কে খুঁজিয়া পাইল না।
স্কুলের বই লইয়া একা অজয়দের বাড়ি যাইতে তাহার লজ্জা
বোধ হইল। বইগুলি বাড়িতে রাখিয়া ঠাকুমাকে বলিয়া
বাইবে, ঠিক করিল। হয়ত, মামীমা রাতে খাইয়া যাইতে
বলিবেন।

একা পথ দিয়া বাড়ি ফিরিতে প্রতিমার সকালে গাওয়া
গানের সুর তাহার কানে বাজিতে লাগিল। গানের
কথাগুলি প্রতিমাকে দিয়া লিখাইয়া লইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

নিশীথে

শ্রীমুখীরচন্দ্র কর

কী পাখী ডাকে !

গান কার বেধে গেল পথের বাঁকে ॥

অঙ্গন ছায়া ঢাকি

ক্ষীণ কাঁপে ঝাউশাখা,

সহসা খসিয়া বায়ু থমকি থাকে ॥

উৎস্রকে বিকশিত গুল্মা বেলি

শূন্যে দিয়েছে মৃদু গন্ধ মেলি।

দীঘিতে অঁঠে জল

থেকে থেকে টলমল,

উকি খুঁকি মারে চাঁদ মেঘের ফাঁকে ॥

ঝিল্লির ঝিঁঝিঁ-রব চলিছে টানা,

অজ্ঞানার বাঁশি বেন না মানে মানা।

মৌন গভীর করি

মাতায় সে বিভাবরী

কত কী বলিতে চায় কে যে কাহাকে ॥

শিশু কঁদে লেগে রয় মায়ের বুকে,

প্রিয় জেগে চেয়ে রয় প্রিয়ার মুখে।

কেহ বা স্বপনঘোরে

বাঁধে তারে বাহুডোরে,

জল ভ'রে আসে কারো বিনিদ্র আঁখে ॥

কুকুরের ভাঙা গলা মিলায় দূরে,

ঝোপে ঝাড়ে মিটিমিটি জোনাকি উড়ে।

পাতা ঝরে টুপ্ টুপ্

আবার সবাই চুপ,

যেন সবে কান ছুটি পাতিয়া রাখে ॥

স্বরলিপি

গান

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
তব নিশ্বাস পরশনে
এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণ সমীরণে।
কেন বঞ্চনা কর মোরে
কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে
দেখা দাও দেহ-মনভরে
মম নিকুঞ্জবনে ॥

দেখা দাও চম্পকে রঙ্গণে
দেখা দাও কিংসুকে কাঞ্চনে।
কেন গুপ্ত বাশরীর হুরে
ভুলায়ে লয়ে বাও দূরে
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও
দৃষ্টির বন্ধনে ॥

—“শাপমোচন”।

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

ধা না || সী -১ ধা না | সী -১ না নধা | ধা -পা পা পমা | মগা পা মা -১ |
হে স || খা ০ বা র | তা ০ পে য়ে ০ | ছি ০ ম নে ০ | ম ০ নে ০ |

||
-১ -১ -১ -১ | -১ -১ মা গা | মা না না ধা | পা মা গা রা | মা -১ -১ -১ | -১ -১ সা না |
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ত ব | নি ০ খা স | প র শ ০ | নে ০ ০ ০ | ০ ০ এ সে |

সা -মা মা মা | মা -১ মগা পা | মা -১ -১ -১ | মা -১ পা গা | মা ধা -১ না | সী -১ ধা না ||
ছ ০ অ দে | খা ০ ব ন্ | ধু ০ ০ ০ | দ ০ ক্ষি ০ | স মী ০ র | গে ০ হে স ||

১ -১ |
০ ০ |

{ সী মগী গী -গী | গী গী মী প | মপা পর্মী মী মগী | গী -১ -গী -রা | রা -সী সী না | ধা ধা না না |
কে ন ব ন্ | চ না কর | মো ০ ০ রে কে ০ | ন ০ বা ০ | ধ ০ অ ০ | দৃ ০ গু জে |

{ সী -১ -১ -১ | -১ -১ (-১ -১) } | ধা না | সী সী না না | ধা ধা পা পা | মা মা -১ -১ | -১ -১ -১ -১ |
রে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ } | দে খা | দা ও দে খা | দা ও দে খা | দা ও ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

সা মা মা মা | মা মা পা গা | মা ধা ধা ধা | না সা সা সা | “এসেছ অদেখা বহু দক্ষিণ সমীরণে” পূর্বের তায় ||
 দে হ ম ন | ভ রে ম ম | নি কু ন্ জ | ব নে এ সে

সা মা || মা মা -১-১ | -১-১-১-১ | সা-মা মা মা | মা পা মা গা | -১-১ মা ধা | ধা -১ না -১ |
 দে খা || দা ও ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | চ ম প কে | র ঙ্গ গ লে | ০ ০ দে খা | দা ০ ০ ০

সা -১-১-১-১ | সা সা সা সা | সা না ধা ধা | পা-মা-মা-মা | -মা-মা -১-১ | -১-১-১-১ |
 ও ০ ০ ০ ০ | কি ং শু কে | কা ন্ চ নে | ০ ০ দে খা | দা ও ০ ০ | ০ ০ ০ ০

{ সা সা গা গা গা | গা গা মা পা | ম পা -১ মা মা | গ মা -গা গা গা | রা -১ সা না | ধনা ধা ধা-সা |
 কে ন শু ধু | বা শ রী র | হু ০ ০ রে ভু | লা ০ ০ য়ে ল | য়ে ০ যা ও | দু ০ ০ রে ০

{ -১-১-১-১ | -১-১-১-১ } | সা গা গা গা | রা সা সা সা | না ধা ধা ধা | পা পা মা মা |
 ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ } | য়ে ০ ব ন | উ ০ ০ স ০ | বে ০ ধ রা | দা ও ধ রা

মা মা মা মা | মা-পা-গা-১ | মা মা ধা ধা | ধা না না সা | -১-১-১-১ | -১-১ সা সা |
 দা ও ধ রা | দা ০ ও ০ | দৃ ব্ টি র | ব ন্ ধ নে | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ এ সে

“এসেছ অদেখা বহু দক্ষিণ সমীরণে” পূর্বের তায় || ||

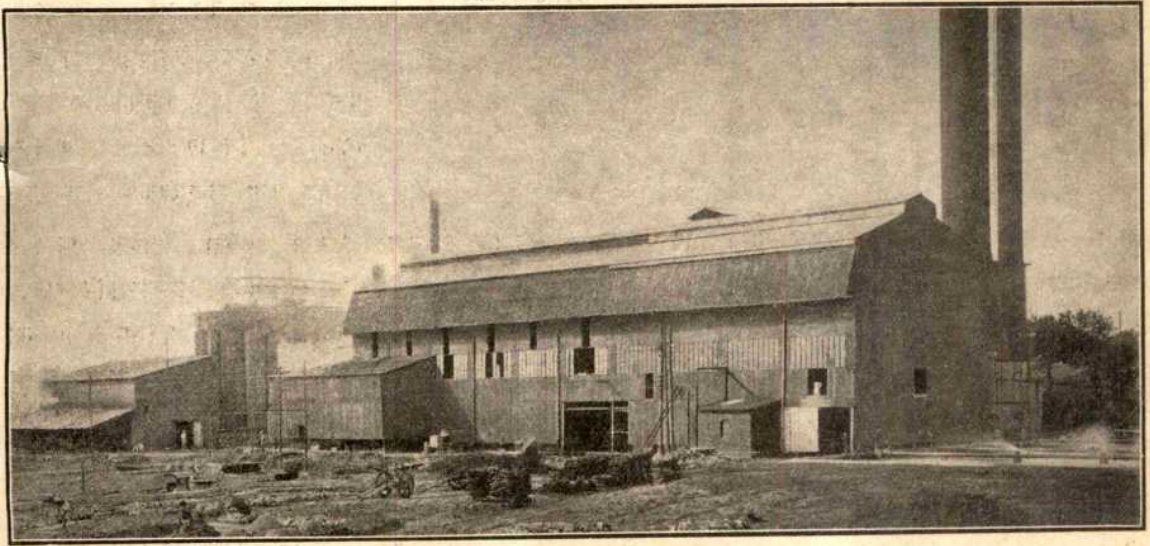


সিংভূমের তাম্রখনি

শ্রীপিণাকীলাল রায়

সুবর্ণরেখা নদীর প্রায় সমান্তরালে লীলায়িত পাহাড়ের শ্রেণী সিংভূম জেলার পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া দিগ্‌মণ্ডলকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল পাহাড় ব্যাপিয়া যে একটি তাম্র-প্রস্তরের স্তর (Singhbhum Copper Belt) বিদ্যমান আছে, কাননকুস্তলা ধরিত্রীর কটি-মেথলার মত, তাহার অস্তিত্ব পাশ্চাত্য খনিতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু এই সেদিন, দুই জন জার্মান বিশেষজ্ঞ (Geo-physicist) তাহাদের

ও কৃষ্টির লীলাভূমি রূপে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময় এই সকল পাহাড় হইতে তাম্র-প্রজনন ক্রিয়া যে যথেষ্টই চলিয়াছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তাম্র-প্রস্তর উত্তোলনের গহ্বর (shaft), ফারনেস্ হইতে তাম্র-নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত ময়লার স্তুপ (slags), এবং গলিত তাম্র ঢালিবার জন্ত তৈরি বড় বড় মুচির (crucibles) ভগ্ন খণ্ড, এখনও পার্কতা অঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা অশোকের নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা ও তাম্রফলক কচিং



মৌভাঙার কারখানার এক পাখের সাধারণ দৃশ্য

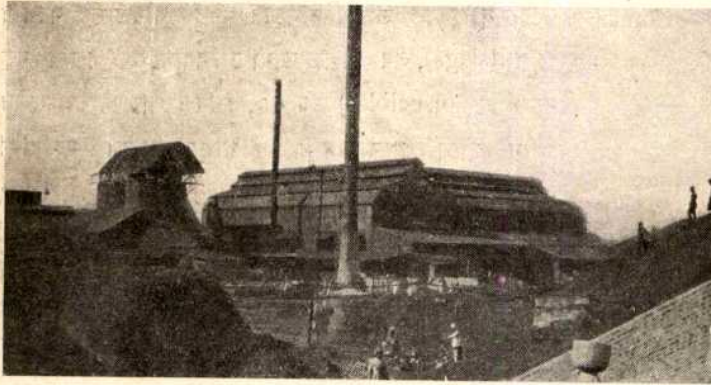
নবাবিকৃত বহুপাতির সাহায্যে এই তাম্র-প্রস্তরের প্রধান স্তর ও তাহার শাখা-উপশাখার সঠিক অবস্থান হাতে-কলমে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, এই ধরিত্রীরই পিঠের উপর বসিয়া—যেমন কোন অভিজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসক দেহভাস্তরস্থ শিরা-উপশিরাগুলির অবস্থান বুঝিতে পারিয়া ছুরি চালাইতে সমর্থ হন।

অতি প্রাচীনকালে, যখন ভারত তৎকালিক সভ্যতা

কোন জংলী সাঁওতাল কিংবা থেরোয়াল দেখিতে পাইলে এখনও কুড়াইয়া আনে, আমাদেরকে দেখাইবার জন্ত।

কালমাহাত্ম্যে ও অনুশীলনের অভাবে এই খনিজ শিল্পের কথা লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল, যদিও এই মূল্যবান সম্পদের বিষয় ভুলিয়া যাওয়ার মত আশ্চর্য্যও জগতে কিছু নাই। তত্রাচ বলিব, এই আশ্চর্য্যবিশ্ময় জাতির পক্ষে এটা বিশেষ রকম আশ্চর্য্য নয়, বরং ইহা স্বাভাবিক

বলিলেও অত্যাক্তি হয় না; নতুবা, ইহার চেয়েও কত শত অমূল্য সম্পদ এই জাতি হেলায় হারাইয়া আজ সর্বহারা হইয়া পড়িয়াছে। তবুও এই জাতি আত্মবিশ্বাসের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া যদিই বা কোন দিন জাগিয়া উঠে—যদিই বা কোন দিন এই মেঘ-ভরা রজনীতে, কোন হাজার বৎসর আগে হারিয়ে-যাওয়া বিদ্যুৎ-আঁকা পথটির সন্ধান সে ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে তাহাকে সেই শুভদিনের জন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।



রোলিং মিল ও ওর-বিনের এক পার্শ্বের দৃশ্য

বহুকাল পরে সিংভূম জেলার সেই নষ্ট শিল্পের আবার পুনরুদ্ধার হইয়াছে, উদ্যমশীল ব্রিটিশ জাতির উদগ্র চেষ্টায় ও তাহাদের কর্মকুশলতায়। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহারা জানিতে পারে যে, এই সকল পাহাড়ে তামার অস্তিত্ব আছে এবং প্রায় শত বৎসর পূর্বে ১৮৩৩ সালে মিঃ জোনস্ (Mr. Jones) নামক জনৈক ইংরেজ খনিতাত্ত্বিক নানা রকম কারণ দর্শাইয়া প্রতিপন্ন করেন যে, এই সকল পার্বত্য অঞ্চলের কোন-না-কোন স্থানে নিশ্চয়ই প্রচুর তাম্র-প্রস্তরের স্তর বিদ্যমান আছে।

পরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের গভর্ণর জেনেরালের এজেন্ট ক্যাপটেন্ জে, সি, হট্‌ন (Captain J. C. Haughton) এই সব পাহাড় বহুপাতিত সাহায্যে খনন করাইয়া তাম্র-প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করেন ও এই স্তরটির সঠিক অবস্থিতির বিষয় জানিতে পারেন। ইহার ফলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম একটি তাম্র-সমবায়ের সৃষ্টি হয় কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ মহাজনের

চেষ্টায়। এই কোম্পানীটি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে “দি হিন্দুস্থান কপার কোম্পানী” নামে আর একটি দ্বিতীয় কোম্পানী এক লক্ষ কুড়ি হাজার পাউণ্ড বা প্রায় ষোল লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া রাজদোহা নামক স্থানে তাহাদের কারখানার পত্তন আরম্ভ করেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইহার পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক জন সুপ্রসিদ্ধ ভূতাত্ত্বিক (Geologist) মিঃ ভ্যালেন্টাইন্ বন্ (Mr. Valentine Ball) সিংভূমের তাম্রখনির বিষয়ে একটি ক্ষুদ্রগ্রাহী প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, প্রাচীন কাল রাজপুতানা অঞ্চল হইতে জৈনধর্মাবলম্বী জাতি বা শরাক্ জাতীয় এক দল লোক প্রতি-বৎসর বাণিজ্যব্যপদেশে এদেশে আসিত এবং তাহাদের অনীত মাল-

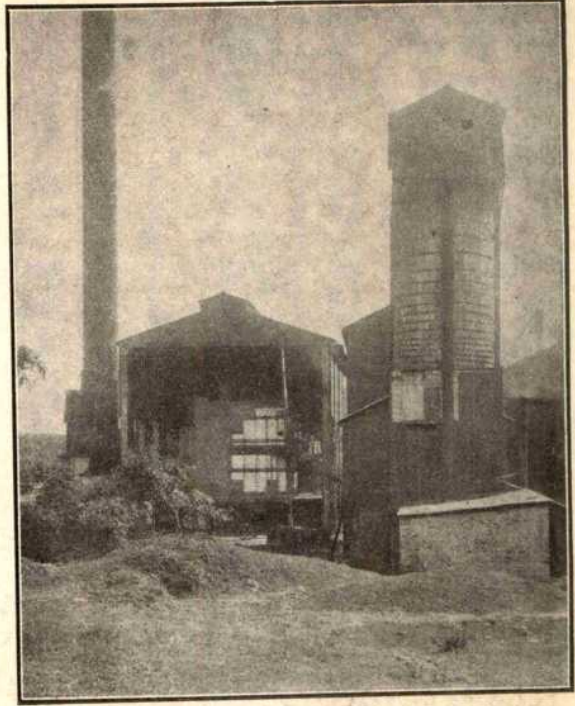
মশলার বিনিময়ে তাহারা লইয়া যাইত এদেশের প্রধান উৎপন্ন পণ্য তাম্র। ফলে তাহারা ই এদেশে বসবাস করিয়া তাম্র তৈরি করিবার প্রণালীটি শিখিয়া লয়, কতকটা কুটীর-শিল্পের আকারে এবং স্থানীয় ভূস্বামী ঘাটশিলার রাজার নিকট এমন একটা পাকাপাকী রকমের বন্দোবস্ত করিয়া লয় যাহাতে এই কার্যটি বহুকাল ধরিয়া তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তার পর কোন কারণে এই ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া রাজার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তাহারা চিরদিনের জন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কোন কোন স্থানে উক্ত শরাক্দের স্থাপিত পুষ্করিণী, বাঁধ, কূপ, রাস্তা প্রভৃতি এখনও তাহাদের এদেশে অবস্থিতির ও কীর্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর এই খনিজ শিল্পটি বাহা কুটীর-শিল্পের আকারে কোনরূপে জীবিত ছিল তাহা একেবারেই লোপ পাইয়া যায়।

পুনরায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে “দি রাজদোহা মাইনিং

কোম্পানী” নামে আর একটি কোম্পানী সংগঠিত হয়। তাহার সরাসরি গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ধলভূম তাম্র-প্রস্তর স্তরের কতকটা অংশ ইজারা লয় এবং রাখা হইতে রাজদোহা পর্য্যন্ত প্রায় ২৪ বর্গ-মাইল পরিমিত স্থানের উপর তাহাদের কর্মস্থলের সীমানা ধাৰ্য্য করে। এই নূতন কোম্পানী রাজদোহা ও রাখা এই উভয় স্থানেই একসঙ্গে তাহাদের কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাহারাও পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হয় তাহাদের মূলধনের অসচ্ছলতার দরুণ।

তার পর ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ সালের মধ্যে স্তর টমাস হল্যান্ড (Sir Thomas Holland) এই সিংভূমের তাম্র-প্রস্তর সম্বন্ধে অনেক গবেষণার পর একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা ভারত-গবর্ণমেন্টের দরবারে পেশ করেন। ইহার ফলে ভারত-গবর্ণমেন্টের জরীপ-বিভাগ (Geological Survey of India) এই তাম্র-প্রস্তর স্তরের উপর যান্ত্রিক পরীক্ষা চালাইয়া তামার অস্তিত্বের সম্ভাবজনক প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হইবার পর দি কেপ্ কপার কোম্পানী (The Cape Copper Co., Ltd.) নামে আর একটি কোম্পানী ইংলণ্ডের জন টেলার এণ্ড সন্সের (John Taylor & Sons) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া “দি রাজদোহা মাইনিং কোম্পানী”র নিকট হইতে পরীক্ষা-স্বরূপ খনির কার্য্যভার গ্রহণ করে এবং খনিটি কার্য্যকরী বিবেচিত হইলে স্থায়িতাবে ইহার ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইবে এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করে।

পরে ১৯০৭-০৮ সালে উক্ত কেপ্ কপার কোম্পানী “রাজদোহা মাইনিং কোম্পানী”র নিকট হইতে ১৪০০০ পাউণ্ড বা প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকায় ইজারাটি স্থায়িতাবে কিনিয়া লয় এবং ১৯১৪ সালে ইহা খনির আকারে পরিণত হইয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইয়া উঠে। এই ১৯১৪ সালেরই এপ্রিল মাসে মিলের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং বহুকাল পরে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্রিটিশ জাতি ভারতে প্রথম তাম্র উৎপাদন করিয়া রাখা পাহাড়ের শীর্ষদেশে তাহাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে প্রোথিত করেন।

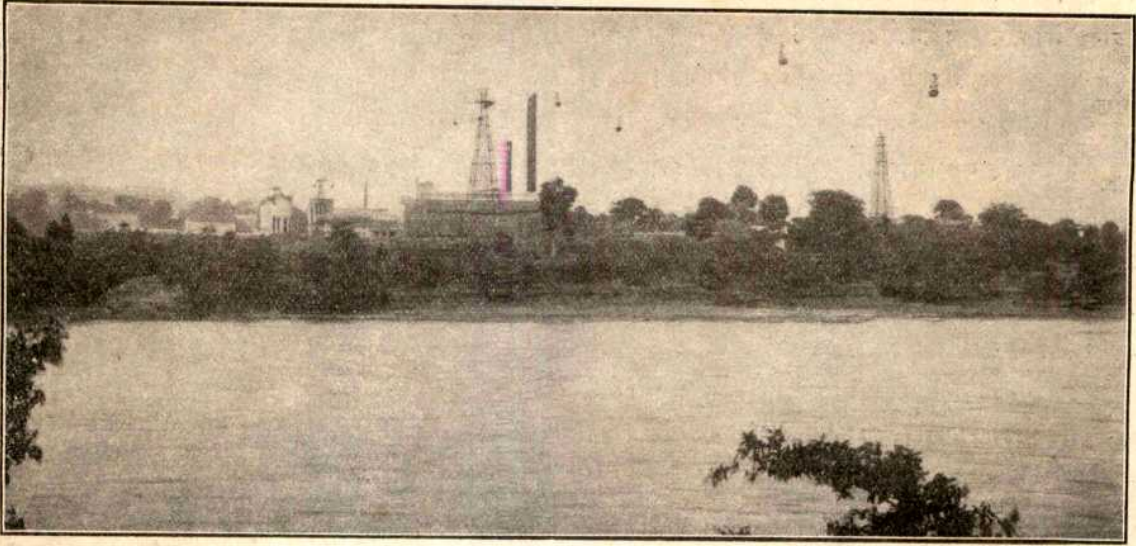


পালভারাইজড্ কোল-প্ল্যাণ্ট ও বরলার-হাউসের এক অংশ

এই কোম্পানীর তাম্র-প্রজনন ক্রিয়া ১৯২১ সালের ২০শে জুন পর্য্যন্ত কোনরকমে চলিয়াছিল; তারপর, ইহার আয় ও ব্যয় সম্বলান সুবিধাজনক না-হওয়ায় রিসিভারেরা এই খনিটির কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইহার পর-বৎসর ১৯২২ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে খনির তাম্র-প্রজনন ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, যদিও খনিটি ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যোপযোগী করিয়াই রাখা হইয়াছিল।

এই শেষোক্ত কয়েক বৎসরের শেষ দিকে ১৯২৯ সালে ইনডিয়ান কপার কর্পোরেশন্ কোম্পানী এই খনিটি পরীক্ষা-স্বরূপ লইয়াছিল মাত্র, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত মোটেই ইহা পরিচালিত করে নাই।

১৯২০ সালে “দি করডোবা কপার কোম্পানী” মোঘাবনীর খনিটি পরীক্ষা-স্বরূপ লইয়াছিল। এই খনিটিও কেপ কপার কোম্পানীরই সম্পত্তি এবং ইহার আংশিক কার্য্য জন টেলার এণ্ড সন্স-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছিল। ১৯২৪ সালে উহাদের পরীক্ষার কাল শেষ হইলে ২০ বর্গ-মাইল



স্বর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীরে হইতে গৃহীত আলোকচিত্রে কারখানার সাধারণ দৃশ্য। এরিয়াল য়োপ্‌ওয়ের
দুইটি টাওয়ার ও বুলবুল বাল্কটগুলি দেখা যাইতেছে।

পরিমিত স্থানের খনি-স্বত্ব কেপ কপার কোম্পানীর নিকট হইতে করডোবা কপার কোম্পানী কিনিয়া লয়। পরে এই বৎসরেরই ২১শে জুলাই তারিখে এই কোম্পানীটির পুনর্গঠন হয় “দি ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন্ লিমিটেড” এই নামে, প্রায় উনত্রিশ লক্ষ বিরাশী হাজার টাকা মূলধন লইয়া। এই নূতন কোম্পানী সেই সঙ্গে সেই একই সময়ে “দি নর্থ অনন্তপুর গোল্ড মাইনিং কোম্পানীর এবং “দি ওরিগাম্‌ গোল্ড মাইনিং কোম্পানী”র নিজস্ব সম্পত্তি সিদ্ধেশ্বর পাহাড় ও খরসোয়ান্‌ নামক স্থান দুইটির খনি-স্বত্বও কিনিয়া লইয়াছিল।

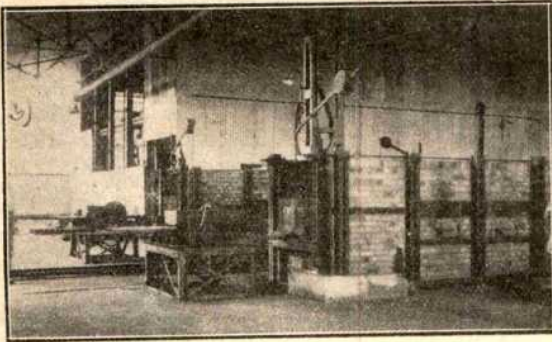
এই নব-গঠিত কোম্পানীর কাজ মোঘাবনী অঞ্চলেই এত দিন নিবন্ধ ছিল এবং খনিটি কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার কার্য্য পূরা দমে চলিয়াছিল ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত। এই সময় ইহার পূর্ণ পরিচালনার ভার “দি এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এণ্ড স্কেনের্যাল ইন্ডেস্ট্রিজেস ট্রাষ্ট লিমিটেড”-এর হস্ত অর্পিত হয়। তার পর উপরি উক্ত মূলধনের উপর পুনরায় প্রায় ছেচলিশ লক্ষ আট ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়, স্বতন্ত্র ভাবে কোম্পানীর নূতন কারখানা

খুলিবার জন্ত। এই কারখানাটি বাটশিলার নিকট স্বর্ণরেখা নদীর উত্তর তীরে স্থাপিত; এখানে যে-সকল যন্ত্রপাতি নির্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পাওয়ার প্লান্ট, কন্সেন্ট্রেশন্ মিল, স্কেল্টার এবং রোলিং মিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাহা হউক, ১৯২৭ সালেই বিশেষ ক্ষিপ্ততার সহিত উক্ত যন্ত্রগুলির পত্তন আরম্ভ হয় এবং পর বৎসর নভেম্বর মাসে ঐ সকল যন্ত্রের নির্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই কোম্পানীর প্রথম তাম্র-প্রস্রবন ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়।

এই এত বড় বৃহৎ ব্যাপার এত অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যকরী করিয়া তোলার জন্ত যদি কেহ বশ-গৌরবের প্রার্থী হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই কোম্পানীর তিনটি প্রতিভাবান লোকের উপর সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। প্রথম এই কোম্পানীর বড়সাহেব, রাসেল বি. ওক্‌স্‌ (R. B. Woakes); ইনি এই কোম্পানীয় জন্মদাতা বলিলেও অতুক্তি হয় না। দ্বিতীয়, কারখানার ম্যানেজার, এইচ. সি. রবসন্‌ (H. C. Robson)। ইনি এক দিন গর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, “যদি

এই কোম্পানীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে না-পারি তাহা হইলে আমার এই মন্তকের টুপি সুবর্ণরেখার জলে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাইব।” তৃতীয়, সম্ভাব্য ভট্টাচার্য্য,—এস্. ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত—এই কোম্পানীর গঠনমূলক কার্যের ছিলেন অক্লান্তকর্মী অগ্রদূত। বাস্তবিকই যত দিন এই কোম্পানীর অস্তিত্ব বজায় থাকিবে তত দিন পর্য্যন্ত এই তিনটি লোকের হাতের ছাপ ইহার প্রত্যেক কার্যের ও কার্যপ্রণালীর উপর অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে।



রোলিং মিলের একটি কারনেস ও তাহার বামপার্শ্বে স্কেপিং মেশিন

যাহা হউক, ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে এই তামার কারখানার পাশেই রোলিং মিল নামে আর একটি সুবৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইল। পিতল ও পিতলের শিট তৈরি করিবার জন্তই এই যন্ত্রটির পরিকল্পনা এবং এই সময়েই ভারতে সর্বপ্রথম পিতলের শিট এই কারখানায় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়।

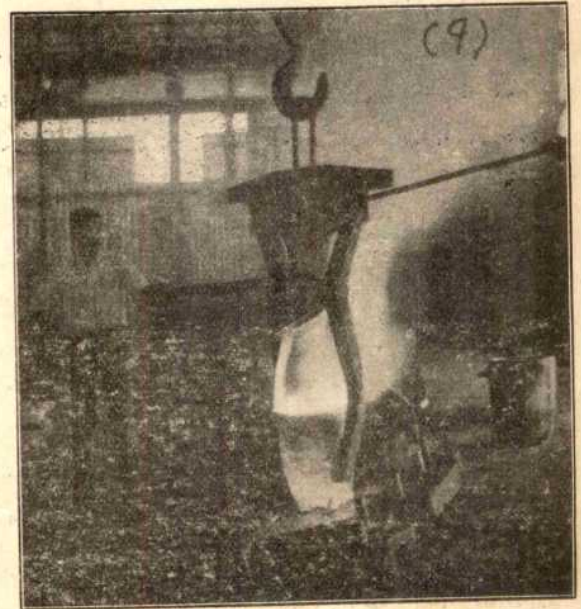
ইহার পর ১৯৩১ সালে কোম্পানীর টেকনিক্যাল-বিভাগের কাজ “দি নিউ কনসোলিডেটেড গোল্ড ফিল্ড, সাউথ আফ্রিকা লিমিটেড” নামীয় একটি কোম্পানীর উপর লুপ্ত হয় এবং অদ্যাবধি উক্ত কোম্পানীরই তত্ত্বাবধানে কর্পোরেশনের কাজ চলিয়া আসিতেছে।

যাহাতে তামা ও পিতলের প্রজনন-ক্রিয়া বর্ধমানের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, এই আশায় কোম্পানী পুনরায় প্রায় ষোল লক্ষ সাতাশটি হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে কারখানার এই ক্রমবর্ধমান অংশের নির্মাণ কার্যের

পরিসমাপ্তি ঘটে। এক্ষণে এই কোম্পানীর সর্বসমেত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা।

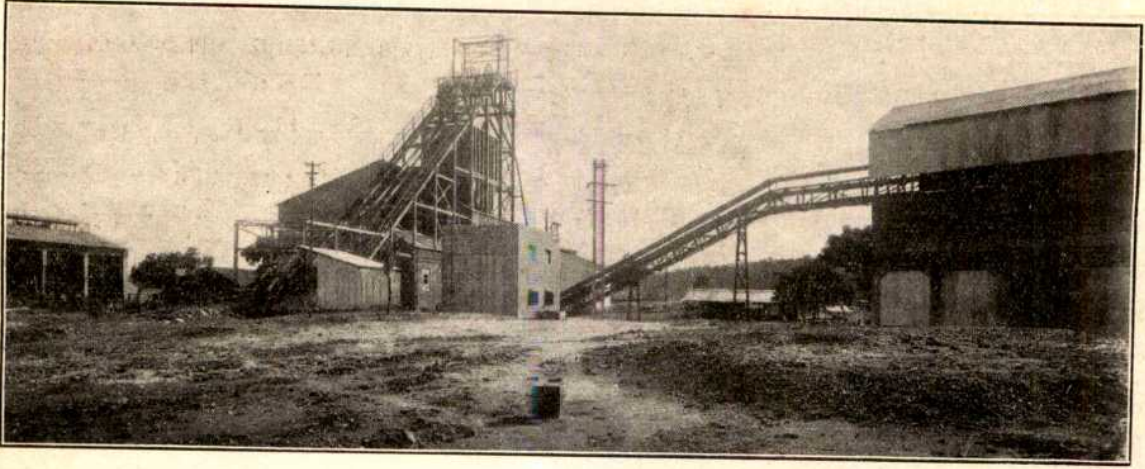
এই কারখানাটি স্থাপিত হইবার পর হইতে উৎপন্ন পণ্যের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সাল	খনি হইতে উত্তোলিত তামা-প্রস্তুত টন	ইনগট্ টন	শিট টন
১৯২৯	৭৩৫১৯	১৬৩৫	০
১৯৩০	১১৯৭৮৭	২৯৭৪	৭৮
১৯৩১	১৪৪২৫০	৪০৬৯	৩৬৩৭
১৯৩২	১৬৫৯৭৭	৪৪৪৩	৫৪৪০
১৯৩৩ } ৯ মাস }	১২৮২৬৩	৩৫৩০	৪৪২০
মোট ৬৩১,৭৯৬		১৬,৬৫১	১৪,২১৫



রোলিং মিল ফাউন্ড্রিতে—‘ব্লুম’ (পিতলের ব্লক) তৈরি করিবার জন্য গালিত ও ফুটন্ত পিতল পরিপূর্ণ একটি মুচি ইলেকট্রিক ক্রেনের দ্বারা চালিত হইতেছে।

এক্ষণে গড়পড়তা হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে, বৎসরে পঁচানব্বই লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাত শত তেইশ



মোঘাবনী খনির প্রধান গাছ-টের উপরের দৃশ্য। হেড গিয়ার, প্রাইমারী, ক্রাশার, কন্সপ্রেসড্‌ এয়ার বেণ্ট-কন্ভেয়ার, ওর-বিন ইত্যাদি

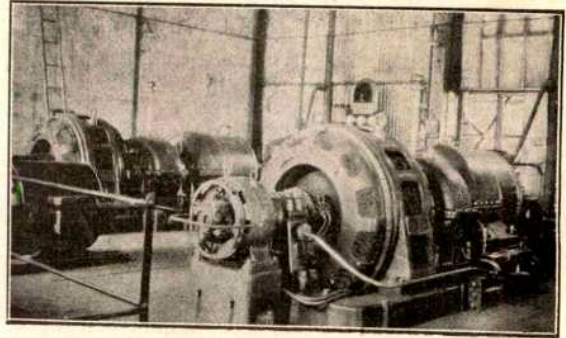
টাকার পিতলের শিট্‌ এবং সাতবাটি লক্ষ পনের হাজার সাত শত বিয়াল্লিশ টাকার তামার ইন্‌গট্‌, উৎপন্ন হইতেছে, অবশ্য ১১৪১ টন তামা বাদে যাহা পিতল তৈরি করিতে খরচ হইয়া থাকে।

এইবার মোঘাবনীর খনি হইতে উত্তোলিত তাম্র-প্রস্তরগুলি কি উপায়ে মোভাওয়ারের কারখানায় আনীত হইতেছে সে-সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ তাম্র-প্রস্তরগুলি প্রাইমারী ক্রাশিং প্ল্যাণ্টে চূর্ণীকৃত হইয়া বেণ্ট-কন্ভেয়ারের দ্বারা এরিয়াল্‌ রোপওয়ের ‘বিনে’ আসিয়া সঞ্চিত হয়। তার পর সেগুলি বড় বড় বুলন্ত বালতিতে বোঝাই হইয়া এরিয়াল্‌ রোপের সাহায্যে ছয় মাইল দূরবর্তী মোভাওয়ারের ওর-বিনে আসিয়া পড়ে। পরে কন্ভেয়ার-বেণ্ট সেগুলিকে কন্সপ্রেস্টেড শন মিলে আনিয়া দেয়। মোঘাবনীর খনির উপরিভাগে ইলেকট্রিক হয়েষ্ট, ক্রাশিং প্ল্যাণ্ট, কন্সপ্রেসড্‌ এয়ার প্ল্যাণ্ট, ড্রিল শার্পেনিং প্ল্যাণ্ট, ওয়ার্কশপ ও কাউণ্ডি এই কয়েকটি বিভাগ আছে। এই যন্ত্রপাতিগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা মোভাওয়ারস্থ কারখানার পাওয়ার হাউস হইতে এগার হাজার ভোল্ট, দুইটি লাইন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া মোঘাবনী খনির যন্ত্রগুলিকে সচল করিয়া রাখে।

এখন মোঘাবনী ও ধবানী প্রায় পাশাপাশি

দুইটি খনিতে কাজ চলিতেছে। এক জন সাহেব মাইন্‌-সুপারিন্টেন্ডেন্ট্‌ নিযুক্ত আছে এতদঞ্চলের খনি-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্ত। তাঁহার অধীনে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিশিয়ান, মাইনার, ডাক্তার প্রভৃতি ২৮ জন দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষিত কর্মচারী ও প্রায় ২৩০০ জন দেশীয় শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ১০০ টন হইতে ১০০০ টন পর্যন্ত তাম্র-প্রস্তর দৈনিক খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে।

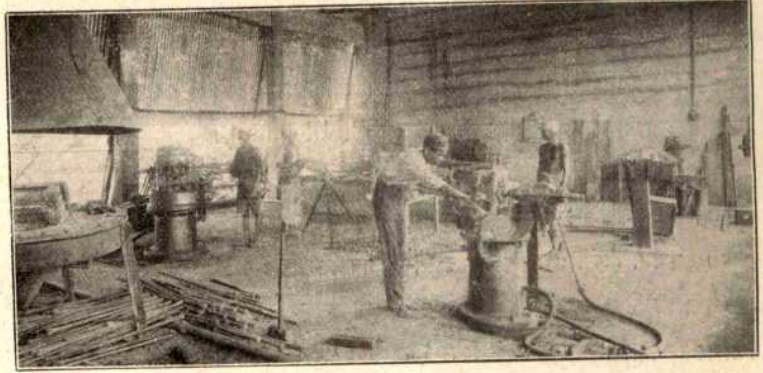


পাওয়ার প্ল্যাণ্টে টারবাইনের দৃশ্য

এই প্রস্তরগুলি এরিয়াল্‌ রোপওয়ের সাহায্যে মোভাওয়ারস্থ কারখানার ওর-বিনে আসিয়া পড়ে। তার পর কন্ভেয়ার-বেণ্টের দ্বারা “হার্ডিঞ্জ-বল্‌ মিলের” মধ্যে আপনা-আপনি উপনীত হয় এবং এই চূর্ণ প্রস্তরগুলি এই

মিলে গুঁড়া হইয়া ঠিক ধুলির আকারে পরিণত হয়। তখন ইহা মিল হইতে বাহির হইয়া উপরিউক্ত প্রণালীতে মিনারেল সেপারেশন বা অয়েল ফ্লোটেশন যন্ত্রে চালিত হয়। তথায় তেল জল ও অত্যন্ত রসায়ন সংযোগে উক্ত ধূলিবৎ প্রস্তর খুব পাতলা কাদার আকারে পরিণত হয় এবং খাঁটি প্রস্তরের অংশ তামা হইতে বিস্মিষ্ট হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। এই ভাসমান ময়লাগুলি তেল ও জলের সঙ্গে অনবরত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বাহির হইয়া গিয়া সুবর্ণরেখা নদীতে পতিত হইতেছে।

ময়লাগুলি বাহির হইয়া গেলে যাহা নীচে থিতাইয়া থাকে তাহা 'ড্রাইং সেকশনে' লইয়া গিয়া শুষ্ক করা হয় এবং এইখানেই মিলের কার্য শেষ হইয়া যায়। এক্ষণে



ড্রিল-শার্পেনিং শপ

চালিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই রকম প্রক্রিয়া দ্বারা এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাই বিশুদ্ধ তামা বলিয়া পরিগণিত এবং এই গালিত অবস্থাতেই তাহা ছোট ছোট লোহার ছাঁচে চালিয়া ইষ্টকাকারে পরিণত করা হয়।

মেল্টার প্লান্টটি পর-পর কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম—মেক্যানিক্যাল রোটার, দ্বিতীয়—পালভারাইজড কোল্ ফায়ারড্, রিভারবারেটোরি ফারনেস, তৃতীয়—বেসিমার কনভারটার্‌স্ এবং চতুর্থ—পালভারাইজড কোল্ফায়ারড্ রিকাইনারী ফারনেস।

এক্ষণে এই যে নানা রকম প্রণালী দ্বারা বিশুদ্ধ তামা উৎপন্ন হইল ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে বি. এস. কিংবা বেট সিলেকটেড্ কপার ইনগট্‌স্ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাতে পাওয়া গিয়াছে শতকরা ৯৯.৫ হইতে ৯৯.৭ ভাগ পর্যন্ত বিশুদ্ধ তামা। আজকাল কলিকাতার বাজারে বি. এস. এবং আই. সি. সি. অক্ষর গুলিদ্বারা চিহ্নিত যে তামার ইষ্টকগুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই কোম্পানীরই তামা। এই সমস্ত তামা ভারতবর্ষের বাজারেই বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ইহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১২০০ টন হইতে ১৫০০ টন পর্যন্ত। ইহা ছাড়া আরও তামা ব্যবহৃত হইয়া থাকে পিতল বা ইয়োলো মেটাল্ শিট তৈরি করিবার জন্ত। শতকরা ৬২ ভাগ তামা এবং ৩৮ ভাগ দস্তার সংযোগে এই পিতল বা ইয়োলো মেটাল শিট প্রস্তুত হইয়া থাকে।



ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন কোম্পানীর জেনেরাল আপিসের এক পার্শ্বের সাধারণ দৃশ্য

তাম্র-প্রস্তরগুলি যে-অবস্থায় উপনীত হইল ইহাই 'কনসেন্ট্রেট ওর' নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ থাকে তামা আর ৭০ ভাগ থাকে অত্যন্ত ধাতু—যেমন লোহা, নিকেল, সাল্ফার ইত্যাদি।

এই শুষ্ক কনসেন্ট্রেট ওর গালাই করিবার জন্ত রিভারবারেটোরি ফারনেসে চালিয়া দেওয়া হয় এবং তথায় গন্ধকের অংশ সাল্ফার ডাইওক্সাইড্ গ্যাসে পরিণত হইয়া চিমনী দ্বারা বাহির হইয়া গেলে, অবশিষ্ট লোহা, নিকেল ও অত্যন্ত পদার্থগুলি দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তারপর সেগুলি ময়লার গাড়িতে

পিতলের কারখানায় তামা ও দস্তার ইষ্টকগুলি ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন্ ফারনেসে গালাই হইয়া ঠাণ্ডা জলসিক্ত ছাঁচে ঢালাই করা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তৈরি পিতলের ইষ্টকগুলির নাম দেওয়া হয় “ব্লুমস্” (Blooms)। যখন এই ব্লুমগুলি ছাঁচ হইতে বাহির করা হয় তখন সেগুলির উপরি ভাগ এন্ডো-থেব্‌ডো ও ময়লায় ভর্তি থাকে। তখন, ক্লেপিং মেশিনের দ্বারা ব্লুমের উপরিভাগের এক পর্দা টাচিয়া ফেলিয়া মশ্‌ন ও ঝক্‌ঝক্‌ করা হয়, সেগুলিকে রোলিং মিলের উপযোগী করিয়া লইবার জন্ত।

ব্লুমগুলি প্রথমে রোলিং মিলের একটি ফারনেসে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া “রাফ রোলের” দ্বারা সেগুলি মোট্র প্লেটের আকারে পরিবর্তন করা হয়। তার পর, তাহা পুনরায় গরম করিয়া ও “স্মুথ্ রোলের” সাহায্যে সেগুলিকে খরিদারদের অর্ডার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ‘গেজে’ পরিবর্তিত করিয়া চারি বর্গফুটের আকারে কাটিয়া লওয়া হয়।

ইহাই এই শিটগুলির চরম অবস্থা নহে। বাজারে বিক্রয়যোগী করিবার পূর্বে আর একটি ফারনেসে শিটগুলি টেম্পার করিয়া লইতে হয় এবং ক্লেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত রাসায়নিক ড্রাবে ধুইয়া লইয়া ইহার সর্বশেষ প্রসাধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

এক্ষণে মাসে মাসে প্রায় ৭০০ টন করিয়া এই পিতলের শিট তৈরি হইতেছে এবং এই বাবতীয় শিট কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

বি. এন্. রেলওয়ের বাটশিলা ষ্টেশন্ হইতে একটি সাইডিং লাইন বাহির হইয়া মোভাঙার কারখানা পর্যন্ত আসিয়াছে এবং যাহা কিছু প্রয়োজনীয় আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের যাতায়াত-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে।

বাটশিলার নিকটবর্তী মোভাঙারে কোম্পানীর প্রধান আপিস স্থাপিত হইয়াছে। এই মোভাঙার কারখানাটি ২৩ জন সাহেব ও ভারতীয় কর্মচারী এবং ১৫০০ জন দেশীয় শ্রমিকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মোভাঙার ও মোম্বাইনী উভয় ক্যাম্পের সর্বসমেত কর্মচারীর সংখ্যা হইতেছে ৪০ জন সাহেব এবং প্রায় ৪০০০ জন ভারতীয়। সহস্রসরে কোম্পানীর উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ৬৫০০ টন বিশুদ্ধ তামা এবং ৮০০০ টন পিতলের শিট।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গিল্যান্ডার্স আরবুথনট এণ্ড কোম্পানী এই সমস্ত পণ্য ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবার জন্ত কোম্পানীর সোল্ সেলিং এজেন্ট রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।*

* ছবিগুলি কোম্পানীর জেনের্যাল ম্যানেজারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।





বাংলা

পরলোকে সঙ্গীতজ্ঞ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতকলাবিদগণের মধ্যে বহরমপুরের হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। ইউরোপীয় সঙ্গীতকে বাংলায় এবং বাংলা সঙ্গীতকে ইংরেজী স্বরলিপির দ্বারা নূতন ভঙ্গীতে রূপান্তরিত করিয়া তিনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ভারতীয় ইংরেজ-গণের সঙ্গীতের আসরে তাঁহার যন্ত্রসঙ্গীত সাধনার নূতন ভঙ্গী ইউরোপীয় সঙ্গীতকলাবিৎ ও দেশীয় রাজপুরুষকে মুগ্ধ করিত। বহরমপুরের অনেক উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ রাজপুরুষকে তিনি তাঁহার নবভাব প্রদর্শিত যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সব ইংরেজ ছাত্রগণের দ্বারা তাঁহার নাম সুদূর ইউরোপেও বিস্তৃত হইয়াছিল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রাজা জগৎকিশোর এবং শ্রীবনবিহারী সেন এই তিন জন তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বহরমপুরের বিখ্যাত “এমচার কনসার্ট পার্টি”র তিনি একমাত্র প্রধান শিক্ষক ও কর্ণধার

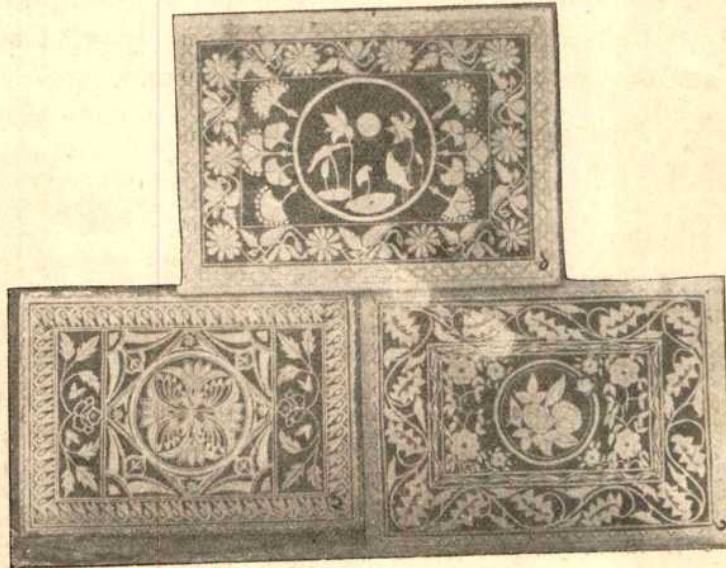
শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীত সাজে (concert party) তিনি অনেকবার ভারতীয় সঙ্গীতকলা শিক্ষা দিবার জন্ত আহৃত হইয়াছিলেন। গত ২১শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সাইকেলে মেয়েদের বর্ধমান যাত্রা—

কলিকাতা ছাত্রীসংঘের উদ্যোগে শ্রীমতী আভা দে, শ্রীমতী বিজলী মিত্র ও শ্রীমতী গীতা পাল ইহার শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি সাইকেলে বর্ধমান যাত্রা করেন। বর্ধমান কলিকাতা হইতে চুয়াবর মাইল। এই দীর্ঘপথ গমনে ছাত্রীদের কোনই কষ্ট হয় নাই। ছাত্রীসংঘের মেয়েরা ছাড়া এপর্যন্ত আর কেহ সাইকেল যোগে এত পথ গমন করেন নাই।

আলপনা-চিত্রে প্রতিযোগিতা—

বগুড়া হইতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাস লিখিতেছেন—



আলপনা-চিত্র

(১) কুমারী ইন্দিরা বসু—প্রথম, (২) কুমারী পারুল খাসুনবিশ—দ্বিতীয়, (৩) কুমারী লীলা বসু—তৃতীয়

ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাকক্ষে তিনি কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে—“অরি ভুবনমোহিনী”র ইংরেজী গৎ ওনাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বিলাত ও ফ্রান্সের কয়েকটি

“অপ্রয়োজনের আনন্দে মাহুয বা গড়ে, সেখানে মেলে-তার শিল্প ও কবি-মনের পরিচয়। আর এই রসকলাক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিভার দান অমূল্য। ছড়ায়, গাঁধায়, বিবাহে, ব্রতকথায়, ব্রতন্তো,

আল্পনায়, কাঁথাচিত্র, মুহুর্শিলে, তকতির ছাচে, জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে আমাদের মেয়েদের হাতের ছাপ মেল।

“চর্চার অভাবে বহু গৃহশিল্পের সঙ্গে সংকলিত আল্পনা-শিল্পেরও অকাল সমাধি হতে বসছে। এই সমস্ত লুপ্ত শিল্প পুনরুদ্ধার চেষ্টায় কিছুদিন পূর্বে বগুড়া শহরে ‘এমেচার আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনে’র উদ্যোগে মেয়েদের মধ্যে একটি আল্পনা-প্রতিযোগিতা হয়। কলিকাতার বাহিরে ও উত্তর বাংলায় এই প্রচেষ্টা প্রথম। স্থানীয় বিষয়, প্রতিযোগিনীদের মধ্যে আজকালকার মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশী।”

তিনি আরও লিখিয়েছেন, এই প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী ইন্দিরা বসু প্রথম এবং শ্রীমতী পারুল খান্নাবিশ ও শ্রীমতী লীলা বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পরলোকে প্রিয়স্বদা দেবী—

পাবনার অন্তর্গত তাড়াশের জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাজুষ্ণ ষায়ে মহাশয়ের পত্নী প্রিয়স্বদা দেবী মহাশয়া দম্পতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাড়াশের জমিদার পরিবার দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ। বহু শিক্ষা



শ্রীমতী অমলা নন্দী

হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সাতখানি স্বর্ণপদক ও তিনখানি রৌপ্যপদক লাভ করেন।

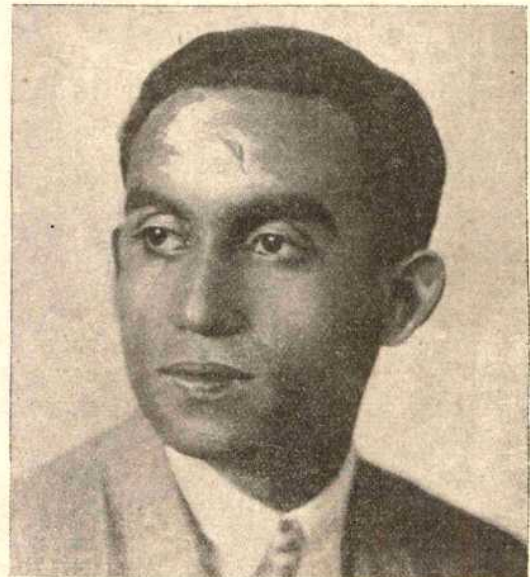


প্রিয়স্বদা দেবী

প্রতিষ্ঠানে এই পরিবারের বিস্তার দান আছে। প্রিয়স্বদা দেবী শুধু দানশীল হইলেন না, তিনি ধর্মপায়ণা বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর দিনেও তাঁহার ধর্মালোচনা শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব—

এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি সঙ্গীত-সম্মেলনের বিষয় গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নৃত্যবিদগণও যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার শ্রীমতী অমলা নন্দীর প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত



শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দে

বিদেশে বাঙালীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুত রাসবিহারী দে গত ইং ১৯১০ সালে যামবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালের পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে জার্মানী গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ কয়েক মাস প্রসিদ্ধ এম-এ-এন্ এর কারখানায় ইঞ্জিন সম্বন্ধ শিক্ষা লাভ করিয়া বিখ্যাত সিমন্স ফার্টার (বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুতকারী) কারখানায় এক বৎসরের উপর কাজ করেন। তাহার পর পশ্চিমার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গত ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে “জার্মান ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সমিতির” ও গত নভেম্বর মাসে “আমেরিকার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সমিতি”র সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ



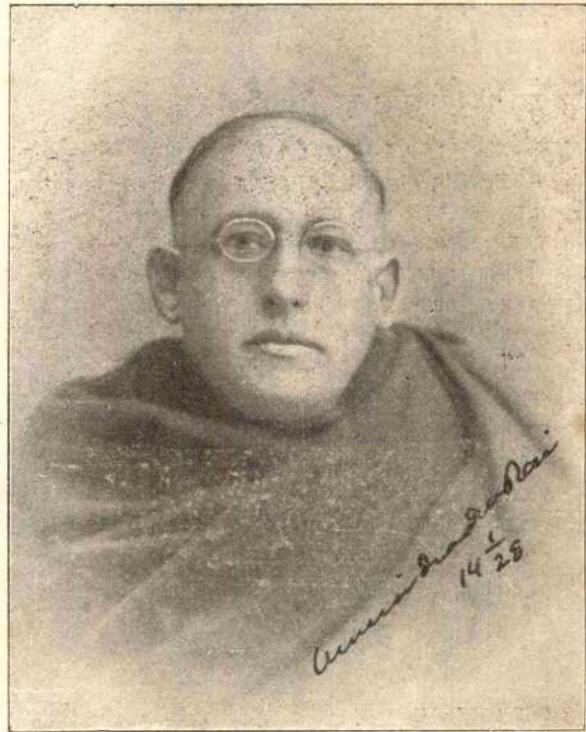
শ্রীযুত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলন—

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, কলিকাতার মহারাজা ইহার উদ্বোধন করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্যজ্ঞ ও ভক্তমোহন

ইহাতে যোগদান করিয়া নিজ নিজ গুণপণ্য প্রদর্শন করেন। স্থানীয় খিওসফিক্যাল স্কুলের বলক-বালিকারা গীত-নৃত্য সহযোগে ‘সঙ্গীতোৎসব’ দৃশ্য দেখাইয়াছিল। এই সম্মেলনে বাংলা দেশ হইতেও প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশ্ব সম্মান লাভ করিয়াছেন। বাংলার সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভৈরব ও আশাবরীর আলাপ ও গান গাহিয়া উপস্থিত সকলকে আপাদ্রিত করেন। তিনি গানের মধ্যে অসামান্য পাণ্ডিত্য ও সাধনার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ‘সঙ্গীত-ভারত’র প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীযুত হরমুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল আজিজ খাঁ, শ্রীযুত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত ভগবানচন্দ্র সেন মহাশয়গণের নামও উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলনের একটি বিশেষত্ব—হারমনিয়মের সাহায্যে উচ্চাঙ্গর সমীহ নিষিদ্ধ ছিল। অধিবেশনের শেষ দিন শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত থাকিয়া সম্মেলনকে গৌরবান্বিত করেন। সম্মেলনের সে তৃতীয় উক্তির মণিচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অক্লান্ত পটিশ্রমে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন, নবম অধিবেশন—



কুমার মুনীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়

বিগত ৮ই ও ৯ই পৌষ মাসে কংগ্রেস ভবনে কুমার মুনীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, এম্. এল্. সির সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের নবম অধিবেশন মহানমাগোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় ভারতের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধি সমাগম হইয়াছিল, সেই সঙ্গে একটি প্রদর্শনও হইয়াছিল। তাহার স্বাধোদ্বটন করেন মাদ্রাজের ভূতপূর্ব

মেয়র মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর জি. নারায়ণ স্বামী, কে. টী. সি. আই. ই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ নরসিংহ রাও সম্বন্ধনাটক রচয়িতা করিলে পর কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান মিঃ আশাহুলা সন্মেলন উদ্বোধন করেন। তাহার পর সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাহার সারগর্ভ অভিভাষণে ভারতবর্ষের লাইব্রেরী আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত এবং এতৎ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাবের অবতারণা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, স্থানীয় কৃষ্টির উন্নতিকল্পে গ্রন্থাগার এবং স্থানীয় অগ্রাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সহিত সহকারিতা ও সাহচর্য আবশ্যক। গ্রন্থাগার ভাঙ্গরূপে পরিচালন করিতে হইলে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পল্লীগ্রামেই ইউক আর নগরেই ইউক, প্রত্যেক গ্রামিয়ান বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির মধ্যে অন্ততঃ একটি ভাল গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পরস্পর পুস্তক লেন-দেন এবং ছোটখাট গ্রন্থালয়ের অভাব পূরণ জন্ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

অর্থ নৈতিক প্রসঙ্গ

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য-চুক্তি—

নূতন শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে, কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্থাপিত হইবে। এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা-বৈঠক নয়া দিল্লীতে বসিয়াছে (১০ই জানুয়ারী ১৯৩৫)। এই বৈঠকে ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের তুলনামূলক আলোচনা হইয়াছে। ১৯৩২—৩৩ সনে ভারতে ব্রহ্মদেশের রপ্তানি এইরূপ—

পণ্য	লক্ষ টাকা
ধান	৫৫
চাল	৬,৩৭
ডাল	১২
কেয়োসিন	৮,৪২
বেঞ্জিনো ও পেট্রোল	৫,৩৪
সেগুন কাঠ	১,৩৬
মেশিন তৈল	৭০
লা	১
অস্ত্র কাঠ	১৬
মোট (অগ্রাঙ্ক সহ)	২,৩৫৯

এ বৎসর ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করে—

পণ্য	লক্ষ টাকা
কয়লা	৫৫
কার্পাস সুতা	৬৫
কার্পাস বস্ত্র কোরা	২৮
খোলাই	১৪
চাপ, রসুন, ছিট	৭৭

পাটের ছালা, ধলি	১,১১
সুপারী	৩৪
তামাক	২৮
ডাল	২০
ময়দা ও আটা	৩০

এতদ্ব্যতীত ১৩ লক্ষ টাকার বিদেশী বস্ত্র ভারতবর্ষ হইয়া ব্রহ্মদেশে যায়। ইহা সর্বসমেত মোট দাঁড়ায় মাত্র ৪৬৮ লক্ষ টাকা।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ—

পাটের চাষ কি পরিমাণ এবং কমানো উচিত এ-সম্পর্কে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট এইবার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কলকাতা ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ইন্সপেক্টর প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৩৪ সনে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল তাহাকে বোল আনা ধরিয়া ১৯৩৫ সালে পাঁচ আনা কম জমিতে পাট উৎপাদন করা উচিত।

ইণ্ডিয়ান জুটমিল এসোসিয়েশন পাট হইতে নানাবিধ পাণ্ডুর উৎপাদন কমানিবার জন্ত গত ১৯৩১ সন হইতে এক চুক্তি করিয়া সমিতির অধীনস্থ যাবতীয় কলগুলিকে শতকরা ৫টি তাঁত বন্ধ রাখিতে এবং সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা মাত্র কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু গত নবেম্বর মাসে এই সমিতি শতকরা ২২টি তাঁত খুলিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এখন শতকরা আরও ২২টি তাঁত খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গ্রেট ব্রিটেন-ভারত চুক্তি—

মানচাষ্টার চেম্বার অব কমার্স এবং কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি ইংলণ্ডের বাণিজ্য-নচিব (প্রেসিডেন্ট, বোর্ড অব ট্রেড) শ্রুর ওয়ালটর রান্‌কিম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, গত বৎসর শ্রুর উইলিয়ম স্ক্রেমার লিজ ও মিঃ এইচ, পি, মোল্লার মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা অনুসরণ পূর্বক কোন সরকারী ব্যবস্থা হয় নাই। লাক্ষাণায়ারের স্বার্থ রক্ষার জন্ত ভারতবর্ষ ও লাক্ষাণায়ারের মধ্যে কোনই বাণিজ্য চুক্তি নাই—প্রতিনিধিগণ ইহাতে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। মিঃ রান্‌কিম্যান প্রতিনিধিগণকে আশ্বাস দেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব একটি বাণিজ্য-চুক্তি বাহাতে স্থাপিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

সম্প্রতি ভারত-সরকারের বাণিজ্য বিভাগ প্রচার করিয়াছেন যে, গত ৯ই জানুয়ারী গ্রেট ব্রিটেন সরকারের পক্ষে শ্রুর ওয়ালটর রান্‌কিম্যান ও ভারত-সরকারের পক্ষে শ্রুর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র লণ্ডন নগরে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। অটরা চুক্তি যতকাল বলবৎ থাকিবে এই নূতন চুক্তি তাহারই অনুপূরকরূপে অব্যাহত থাকিবে। এই চুক্তিপত্রে সাতটি দফা আছে। ভারতের কোন শিল্পকে 'সংরক্ষণনীতি'র আন্দোলন আনিবার প্রশ্ন এখনই আঁলাচিত হইবে, গ্রেট ব্রিটেনের ঐ শিল্পের পরিচালকগণকে তাহাদের বক্তব্য উপস্থিত করিতে সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে ভারত সরকার অস্বীকারবদ্ধ হইলেন। বর্তমানে যে সকল ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণ-নীতির হবিধাভোগ করিতেছে, তাহাদিগের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিলে, সংরক্ষণ কাল অতীত হইবার পূর্বেই গ্রেট ব্রিটেন সরকারের অনুরোধে ঐ শিল্পকে সংরক্ষণের হবিধাভোগ করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কি না এ সম্পর্কে তদন্ত করিতে এবং এরূপ তদন্তকালে গ্রেট ব্রিটেনের ঐ শিল্পে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোকদের বক্তব্য উপস্থিত করিতে সুযোগ দিতে ভারত সরকার চুক্তিবদ্ধ হইলেন।



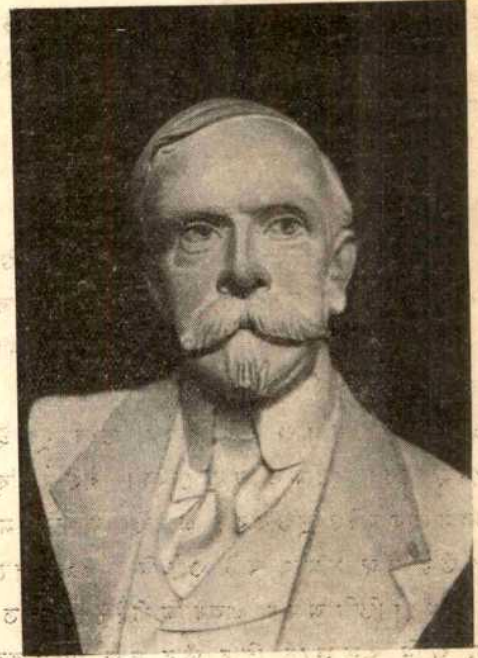
পরলোকগত ঐ বী হাভেল

ঐ বী হাভেল

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে তখনকার কথা যখন এক দিকে বড় বড় নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিকরা (archaeologist) আমাদের প্রাচীন মন্দির মঠাদির বর্ণন ও ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন, আর এক দিকে আর্ট-স্কুলে প্রাচীন গ্রীক রোমান মূর্তির মাটির ছাঁচ এবং প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার মাঝারিগোছের সস্তা নমুনা থেকে নকল নিয়ে নিয়ে আমাদের দেশে শিল্পশিক্ষার্থীদের ক'রে তোলা হচ্ছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে oil-painter, water-colour painter—নকল র্যাফেল, টিশিয়ান হয়ে ওঠবার অভিনয় চলেছে, যেন বাঙালী ছেলে ক্রটাস সেজে মুখস্থ-করা স্পীচ আউড়ে যাচ্ছে আর ভাবছে নিজেকে সতাই সে রোমান সেনেটের এক জন। আমরা যে কেবলই আর্টস্ট হবার অভিনয় ক'রে চলেছি সেটা ভ্রমেও মনে হ'ত না কার। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে আর্টের সৌন্দর্য্য বোঝার পক্ষে একেবারেই কাজে আসে না এটা বুঝলেম আমরা প্রথম হাভেল (Havell) সাহেবের লেখা থেকে—এ যেন এককাল আমাদের ভাস্কর্য্য-শিল্পের বহিরঙ্গীন অংশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বয়েস ইত্যাদির হিসেব ধরা হচ্ছিল আমাদের আগে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের দ্বারা—ঠিক বে-ভাবে ঘোড়ার দালাল ঘোড়ার দাঁত ল্যাজের দৈর্ঘ্য কাঠামোর লম্বাই চওড়াই দিয়ে ঘোড়ার সৌন্দর্য্য বর্ণন করে সেই ভাবে কাজ হচ্ছিল। কিন্তু হাভেল সাহেব তাঁর লেখায় একাধারে প্রত্নতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, ভারতীয় শিল্পের নিগূঢ় রস পরিবেশন করলেন আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতিও তিনি দেশী প্রথায এ-দেশের ছাত্রগণের উপযোগী ক'রে তোলবার চেষ্টায় রইলেন। খাঁচা থেকে পাখীকে টেনে বার ক'রে বনস্পতির ডালে তাকে বসিয়ে দিতে গেলে সে যেমন মানুষটাকেই কামড় দিতে থাকে তেমনি ঘটনা ঘটল এ-দেশীয় শিল্পী ও



কলিকাতা গবর্ণমেন্ট-আর্ট-স্কুলে স্থাপিত হাভেল সাহেবের আবক্ষমূর্তির প্রতিনিধি। এই মূর্তিটির নির্মাতা শ্রীযুক্ত কে. ভেঙ্কটাপ্পা। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত মুকুলদেব সৌজন্তে প্রাপ্ত।

হাভেল সাহেবের মধ্যে—আর্ট-স্কুলের প্রথম শিক্ষাসংস্কার কালে। তখন আমাদের কোন শিক্ষাসদনে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট-শিক্ষার স্থান ছিল না,—আজকাল নৃত্যকলা শিক্ষা নিয়ে বে হৈ চৈ বেবেছে তার চেয়ে অধিক আপত্তি উঠেছিল তখনকার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের মধ্যে শিক্ষাগারগুলোর মধ্যে ডুয়িংশিক্ষার প্রথম প্রচলন ব্যাপার নিয়ে। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সে-বিষয়ে সফলকাম হলেন হাভেল। যে চোখে হাভেল সাহেব আমাদের দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, ইতিহাস প্রভৃতি দেখে গেছেন তা এক জন ঋষির পক্ষেই সম্ভব, সেই কারণেই আমরা না বুঝলেও-তিনি জগতে অন্ধার পাত্র এবং এ-দেশের

শিল্পশিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠাতা বলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করতে হবে আমাদের।

শিল্প-শিক্ষার্থী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ড্রয়িং-শিক্ষার জন্য ড্রয়িংবুক এবং শিল্পসামগ্রী বুঝিয়ে আমাদের এবং বিদেশের রসপিপাহরণের মধ্যে সৃষ্টিস্বিত পুস্তকাদি লেখা হাভেল সাহেবের সারা জীবনের ব্রত ছিল— এমন করে আমাদের শিল্পের আর শিল্পীগণের জন্য নিঃস্বার্থ প্রাণপণ পরিশ্রম অল্প কে করেছে?

হাভেল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শ্রীমুহুরাদ্র দে

তখন আমি ছেলেমানুষ—বোলপুরে পড়ি; ইণ্ডিয়ান আর্টের বই হাভেল সাহেবের সেই প্রথম বেরল। তখন ভাবতও পারি নি যে তাঁর সঙ্গে কোনদিন আমার দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপ-পরিচয় হবে।

১৯২০ সালে ইংল্যান্ড যখন গেলুম, তখন খুব ইচ্ছা হ'ল যে হাভেল সাহেবকে একবার দেখব। লণ্ডনে থাকতে হাভেল সাহেব যদিও ছু-চার বার এসেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ওঠে নি। ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আমার একখানি চিঠি লেখেন, তাতে বলেন, আমি অক্সফোর্ডে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বড় খুশী হবেন। কিন্তু তাও নানা কারণে তখন হয় ওঠেনি।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ স্তর জন উড্রফ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। উড্রফ সাহেব সেই সময় জজের কাজ থেকে অবসর নিয়ে অক্সফোর্ডে বসবাস করছিলেন। সেখানে তখন তিনি ভারতবর্ষীয় আইনের অধ্যাপক। তাঁর বাড়িতে আমাদের দেশের আর্টের নতুন পুরাতন অনেক রকম খুব ভাল ভাল সংগ্রহ আছে দেখলাম। সেই সময়ে একদিন স্তর জন উড্রফ হাভেল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করার জন্য সময় ঠিক করে এলেন। পরের দিন সকালবেলায় আমরা প্রাতর্ভোজন সেরে হেটেই হিডিংটন-হিলের দিকে রওনা হলাম। মাইল-দুই পথ হেটে শহরের বাইরে—উইলীচু খোলা মাঠে—বন-জঙ্গলের ঘোপ-ঝাড়ের ধারে ছোট্ট একটি ফেরোকজ্জীট ও

কাঠের তৈরি আমাদের দেশী ধরণের একতলা বাংলার পৌছলুম। বাড়িটির নাম “Hvide Hus.”

আশপাশে আর কারও বাড়ি নেই বললেই হয়, দূরে দূরে দু-একটি বাড়ি দেখলুম। এই খোলা মাঠে বন-ঝোপের ধারে নিরালো ছোট্ট একটি নতুন ঘর, শীতকাল, বাইরে প্রচণ্ড শীত। বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে বন্ধ দরজায় স্তর জন ঠক ঠক করতেই—বৃদ্ধা মিসেস হাভেল এসে দোর খুলে দিয়ে আমাদের ভিতরে ডাকলেন। ঘরে ঢুকে দেখি ম্যাটেলপিসের সামনে মাথায় হাত দিয়ে খুঁকে পড়ে বৃদ্ধ হাভেল বসে আছেন। বললেন, “এস ব'সো,” কিন্তু ব'লে কিছুক্ষণ ঐরকম ভাব বসেই রইলেন। তাঁর মুখ আমরা দেখতে পেলুম না, হাতের মধ্যে গোঁজা কেশহীন শাদা মাথাটি শুধু দেখতে পাচ্ছিলুম। একটি বেতের চেয়ারে বসেছিলেন—পায়ের গোড়ায় ছোট্ট একটি কাপেট পাতা, ঘরে আসবাবপত্র কিছুই প্রায় ছিল না। ঘরে আশুন নেই—কনকনে ঠাণ্ডা ঘর, ফায়ারপ্লেসের উপর একখানি ঠুঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি—দার্জিলিং থেকে কাক্সন-জঙ্গলের দৃশ্য। ছবিখানি শুকনো অয়েলপেন্টিং ছবির মত দেখতে মনে হ'ল। বরফের মধ্যে কাক্সনজঙ্গলই বিশেষ করে দেখা গেল। পাশে একটি টেবিলের উপরে একখানি প্রকাণ্ড মোটা নিউজ্কাটিং-এর বই (খবরের কাগজ থেকে কাটা প্রবন্ধাদির বই) দেখতে পেলুম। তাতে ভারতবর্ষের ত্রিকলার সম্বন্ধে যত খবর বাদ-প্রতিবাদ বেরিয়েছে সব, এবং তাঁর নিজের লেখা খবরের কাগজে প্রকাশিত আলোচনাদিও রয়েছে। মনে হ'ল বৃদ্ধ ঋষি হিমালয়ের পাদপুল বসে ভারতের বিবরণ নিয়ে তপস্বী করছেন!

আমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, “আমি ভারতের কথাই ভাবছিলাম। তোমার ছেলেবেলায় কাজ আমি কিছু কিছু জানি।” গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রান্ত বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দিল্লীর নতুন রাজধানী গঠন ব্যাপার নিয়ে তিনি মনে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভারতের কত টাকা খরচ করে দিল্লীতে নতুন রাজধানী তৈরি হচ্ছিল, আর সেও লণ্ডনের অফিসে বসে! ভারতের বহু শিল্পী যে কিছু কাজ করতে পাচ্ছিল না, তাই নিয়ে তিনি দুঃখ কষ্টলেন, স্তর এডুইন

লাটিন্স্ যে প্রকাণ্ড ভুল করছিলেন, সে-কথাও তিনি বললেন। তিনি আমায় বার বার বললেন, “তুমি তোমার দেশে গিয়ে দিল্লীতে এবং কলকাতায় শিক্ষাদানের ভার নিয়ে কাজ শিখাও, তাতে খুব বড় কাজ ও উপকার হ'ব।” লগুন যে ইণ্ডিয়া অফিস হবে, তাও তিনি জানতেন, এবং তাতেও দেশী শিল্পীদের কাজ করা এবং দেশী ভাবের স্থাপত্য হওয়া উচিত সে কথাও তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি এই সব বাণী নিয়ে সেই সময়ে কাগজপত্র খুব লেখালেখি করছিলেন; সেই সব কাগজপত্রও আমায় দেখালেন। চল অস্কার সময় হাভেল সাহেব তাঁ'ব লেখা “The Himalayas in Indian Art” (“ভারতীয় ললিত-কলায় হিমালয়”) বইখানি আমায় উপহার দিলেন; বইখানি ম'খায় ছুইয় আমি বিদ'য় নিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর দেখ'স'কাং এই একব'রই হ'বছিল, কিন্তু ভারতের হুংখে হুংখী এবং ভারতের চিত্র'য় নিমগ্ন সেই ঋষিমুর্তি চোখের স'ম'ন অ'মি এখনও দেখতে পাচ্ছি।

ভাবতবর্ষকে নানা দেশের নানা লোকে ন'না ভাবে ভালবেসে এসেছেন, কিন্তু ভারতীয় শিল্পকে হাভেল সাহেবের মত এমন গভীর ও একনিষ্ঠ ভাবে জীবনের সব সময়ে কেউ ভালবেসেছেন কি না অ'মার জ্ঞান নেই। বিদেশীর মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের শিল্পকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তার নিকষ মুর্তিতে প্রকাশ হবার সাহায্য করেন। সেই জন্ত তিনি বর্তমান কালের সমস্ত শিল্পীবই আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র।

আর্নেস্ট বিন্ফিল্ড্ হাভেল

শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতার, কৃষ্টি ও শিল্পসাধনার বিশিষ্ট রস আন্দান করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জগতের নানা স্থানে নানা দেশে, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে আপন আপন বিভিন্ন শক্তি ও চিন্তাধারার আদর্শে, বিভিন্ন প্রকৃতির কৃষ্টি ও শিল্প-সাধনার সৌধ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছে। এই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন প্রকৃতির সাধনার সংস্পর্শ, বিনিময়ে ও প্রভাবে

বিষয়মানবের বিরাট সাধনার কলেবর, বিধাতার বিধানে যুগে যুগে, দেশে দেশে, পরিণতিব পথে অগ্রসব হইতেছে। বাণিজ্যের স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি নানা স্বার্থবাদের বিপাকে পড়িয়া মানবের সম্মিলিত সাধনার জয়যাত্রা পদে পদে বাধা পায়, পদে পদে পথ হারায়। এই জন্ত মধ্যমধ্যে এক জন নেতার আবশ্যক হয়, যিনি এই পথ-হারান সভ্যতার পথ-প্রদর্শক হইয়া, বিভিন্ন পথের বিভিন্ন যাত্রীদের মধ্যে পরিচয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া—যুগভ্রষ্ট যাত্রীদের একত্র কবিতা, সম্মিলিত করিয়া, বিষয়মানবের কৃষ্টির পথে আবার পরিচালনা করেন। যুরোপ ও ভারতের সাধনার সম্মিলনক্ষেত্রে হাভেল সাহেব ছিলেন বিধাতাব প্রেবিত এক জন বিশিষ্ট অগ্রদূত।

ভারতের শাসনতন্ত্রের উপযোগী যে কয়টি ধর্ম ব্রিটিশ-শাসকের কারখানায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ‘ভারতীয় শিক্ষা-তন্ত্র’ তার মধ্যে সর্বোপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার। হাভেল সাহেব এই শিক্ষাতন্ত্রের এক জন যত্নচালক হইয়াও, এই শিক্ষাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা বড় কর্তাদের বির'গভাজন হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, হাভেল সাহেবের প্রদর্শিত শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়া যুবক ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাকে কৃষ্টি ও সাধনাব নূতন কর্মক্ষেত্রে পরিচালিত করিলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সন্ত্রাসবাদের ঘনবটার কাল-ছায়ার আবির্ভাব হইত না। হাভেল সাহেব যে দৃষ্টিশক্তি লইয়া ভারতের সাধনা ও সভ্যতাব গভীরতম অন্তর্দর্শন অনুসন্ধান করিয়া তাহার রহস্য উদ্ঘটন করিয়াছেন, সাধারণ শিক্ষিত ইংরেজের মধ্যে এই শ্রেণীর পর্যালোচকের একান্ত অভাব। জাপানে লক্ষকদিয় হীমরন্ ও কেনেলোসা, পারস্তে বাটন ও নিকলসন্ কৃষ্টির ক্ষেত্রে যে উদার দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনাদিবে ক্ষেত্রে মোক্ষমূলার ও স্তর উলিয়ন্ জোন্স যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনায়, ভারতের শিল্প সাধনাব ক্ষেত্রে হাভেলের গভীরতর অধ্যাত্ম দৃষ্টি সর্বোপেক্ষা মূল্যবান। ভারতের শিল্পের অন্তর্নিহিত বসের অনুসন্ধান দিয়া, ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল জগতে সুপরিচিত করিয়া, হাভেল সাহেব ভারতের সভ্যতাকে নূতন গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই হিসাবে হ্যাভেল সাহেবের প্রচেষ্টা জাতীয় সাধক কোনও ভারতীয়ের চেষ্ঠা হইত কম মূল্যবান নহে। পক্ষান্তরে, ইংবেজী শিক্ষার অতি-প্রভাবে বিজ্ঞাতীয় ভাব-প্রসূত 'শিক্ষিত' ভারতীয়কে আপনার দেশের শিক্ষাসাধনার মর্মস্থান উদ্ঘাটন করিবার পথ দেখাইয়া দিয়া, হ্যাভেল সাহেব ভারতের নূতন দেশাত্মবোধের ইন্ধন যোগাইয়া, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন শিল্পের বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, অগতঃ শিল্পের দরবারে ভারতীয় শিল্পের জন্ত শ্রেষ্ঠ আসন দাবি করিয়া, ভারত এবং যুরোপেব শিক্ষিত সমাজে নানা অপমান ও লাঞ্ছনা হ্যাভেল সাহেবকে বরণ করিতে হইয়াছিল। সর্কাপেক্ষা কোঁতকের বিষয় এই, যে, 'শিক্ষিত' ভারতবাসী তাঁহার ভারতীয় শিল্পের স্তুতিবাদ প্রথমে বিরোধের দৃষ্টিতে এবং চিরকালই কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। আজও শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন, যাহারা হ্যাভেল সাহেবের ভারত-শিল্পের মূল্যের দাবি অকপটে ও সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। ভারতের অকৃত্রিম স্ফূর্ত হ্যাভেল সাহেবের জীবন ও কর্মপদ্ধতি ভারতের সাধনাবিশিষ্ট গুণাবলীর ব্যাখ্যা ও প্রচারে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিল। তাঁহার লিখিত নানা গ্রন্থ ও পুস্তকাদিতে ভারতীয় সাধনার উপর তাঁহার গভীর প্রেম ও ভক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কলিকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ নানা কর্তব্য ও নানা দায়িত্বের পদ। এই পদের নানা কর্তব্যের মধ্যে অবসর খুঁজিয়া লইয়া তিনি বহুপক্ষে ভারতের শিল্প-সাধনার ঐকান্তিক অনুশীলন ও সেবা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিশ্বাসের ব্যাপার। অধ্যক্ষতার অনবসরের অবকাশের মধ্যে তাঁহার ভারতীয় কৃষ্টির নানা বিভাগেব গভীর অনুশীলন ও অনুসন্ধানের চেষ্টার পরিচয় তাঁহার রচিত এক একটি পুস্তকে ভারতের প্রাচীন শিল্প-মন্দিরের ভক্তের অর্থের মত বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'প্রাচীন বাংলার প্রস্তর-শিল্প' (*Stone-Carving in Bengal*)। এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় তিনি প্রথম পরিচয় পান যে, প্রাচীন পদ্ধতির প্রস্তর-শিল্প ও বাস্তববিদ্যা

কুড়ি-শতকেও জীবিত আছে। এই সময়ে পুরীর 'এমার-মঠে,' অপূর্ণ কারুকার্যখচিত একটি নূতন পাছশালা সমগ্র নিম্নিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষিত বাঙালী পুৰীতে তীর্থযাত্রাদি ও স্বাস্থ্যের উদ্দেশে যাত্রায়ত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নূতন পাছশালার অপূর্ণ স্থাপত্যের পরিচয় হ্যাভেল সাহেবের পূর্বে কোনও বাঙালীই দিতে পারেন নাই। ভারতের সাধনার অকৃত্রিম ভক্তের দ্বিতীয় উপহার—“বারাণসীব পরিভ্রমণী: হিন্দু-জীবন ও ধর্মের চিত্র” (*Benares, the Sacred City: Sketches of Hindu Life and Religion*, 1905)। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে, হিন্দুর জীবন ও কর্মপদ্ধতি অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সমষ্টি-মাত্র নহে, পরন্তু হিন্দুর কর্মজীবনে ও আচারের মধ্যে উচ্চ-অঙ্গের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিক দার্শনিকতা সূন্দরের রূপ লইয়া প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। কালীধামের সাধারণ জীবন-যাত্রার নানা খুঁটিনাটির সাহায্যে, তিনি হিন্দুর ধর্মজীবনের গভীর আধ্যাত্মিকতার চিত্র অপূর্ণ কোশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সামান্য উপকরণে, তৈজসমাধারে, স্থান-ঘাটেব আকস্মিক দৃশ্যে, পথের ধারে একটি উপেক্ষিত পাথরের নক্সা, মন্দিরের প্রবেশ-পথের স্তমিত-আলোকের ফাঁকে ফাঁকে যাত্রীদের নানা ভঙ্গীতে, ভজনরাত সাধু-সন্ন্যাসীদের নিবিষ্ট চিত্তাদিতে, হ্যাভেল সাহেব হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্যের যে সমগ্র মুর্তিটি আমাদের চক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আর কোনও শিক্ষিত বিজ্ঞাতীয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার তৃতীয় পুস্তক “আগ্রা ও তাজ” (*Hand Book to Agra and the Taj, 1st ed., 1907, Revised Edition, 1912*)। এটি একখানি ‘বাকী’দের উপযোগী পরিচয় পুস্তিকা মাত্র। কিন্তু এই পুস্তিকায় হ্যাভেল সাহেব নিপুণ বিশ্লেষকের কোশলে সহজে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে, মোগল-বুগের স্থাপত্য-কলা পারশ্বশিল্পের আরজ সন্তান নহে, কিংবা ইতালীর ওস্তাদশিল্পীর বিজ্ঞাতীয় পরিকল্পনা নহে, পরন্তু ভারতের মানস-সরোবরের সহজাত শ্রেষ্ঠ সরসিঙ্গ। মোগল-স্থাপত্যের রসানুসন্ধানের প্রথম-যজ্ঞ এই পুস্তিকায় প্রথম পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রাচীন-পন্থী পুরাতাত্ত্বিকদের অন্ধবিশ্বাসের দ্রুপে প্রচণ্ড আঘাত

করিয়া নূতন দৃষ্টিতে ভারত-শিল্পের বিশ্লেষণ-রীতির প্রথম
সুত্রপাত করিয়াছিল। ইহার ঠিক পরেই ভারত-শিল্পের রস-
বোধক যুগপ্রবর্তক গ্রন্থ “ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য্য”
(*Indian Sculpture and Painting*, January 1908)
প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে হাভেল সাহেব ভারত-
শিল্পের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অলৌকিক স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের
ইতিহাসে নানা শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের প্রতিলিপির সাহায্যে সাহস ও
সত্যানুভূতির শক্তি দিয়া হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া
দিলেন, যে, ভারতের শিল্পের চাবিকাটি তাহার অভিনব
আধ্যাত্মিক ইতিহাসের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।
ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্যের আদর্শ ও প্রকাশ-রীতি তাহার
বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে।
প্রাচীন গ্রীক বা ইতালীর নব যুগের আদর্শের পরকলা
চোখে আঁটিয়া ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্য বিচারের চেষ্টা,
অন্ধের চেষ্টা। অষ্ট শতাব্দীর অনুসন্ধান ভারতের
পুরাতাত্ত্বিক কনিংহাম, ফর্স্টম্যান, বর্জেস ও মার্শাল প্রমুখ
দীর্ঘগজ পণ্ডিতগণের চক্ষে যে সত্য অবগুপ্ত ছিল,
স্বার্থ সৌন্দর্য্যবাসিক ও ভক্তের চক্ষে ভারতের রূপলক্ষ্মী
আত্ম-প্রকাশ করিলেন। ভারতে শিল্পের পক্ষ হইতে
এই স্বাতন্ত্র্য, সম্মান ও গৌরবের দাবি যুরোপের শিক্ষিত
সমাজে যে কোলাহল ও প্রতিবাদের কলরব তুলিয়াছিল
আজও তাহার প্রতিধ্বনি শুদ্ধ হয় নাই। হাভেল সাহেবের
দাবি স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে একাধিক
জার্মান শিল্পবিৎ ভারতের শিল্পের অনুশীলনে যে অক্লান্ত সাধনা
ও গবেষণায় আজ পঁচিশ বৎসর নিযুক্ত আছেন তাহার অনুরূপ
সাধনা ভারতের কোনও শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যাধি প্রবর্তিত
হয় নাই। কারণ, এই নূতন দৃষ্টিশক্তির কেবল যে যুরোপীয়
মনীষীদের অত্যন্ত অভাব ছিল তাহা নহে, ইংরেজী
শিক্ষার মাদকতায় সংস্কারহীন ও দৃষ্টিহীন বিজ্ঞাতীয় ভাবাপন্ন
শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে এই সত্যদৃষ্টির চক্ষুলাভের
একান্ত প্রয়োজন ছিল। হাভেল সাহেবের অঙ্গুলীসঙ্কেতে
‘ভারতবাসী তাহার নিজের দেশের শিল্পকে নূতন করিয়া
দেখিতে, বুঝিতে ও চিনিতে শিখিল। ভারতের জাতীয়তার
ইতিহাসে এই নূতন শিক্ষার দিন, একটি নবজাগরণের
শুভদিন। এই শুভদিনে হাভেল সাহেবের পরিচালনায়

ভারতের নবযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয়
শিল্পের নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করিলেন। ভারতের
প্রাচীন ও সত্য আদর্শ নূতন রূপে যুগের উপযোগী
আকারে ফুটাইয়া তুলিলেন। এই প্রাচীন ভারতকে বর্তমানের
মধ্যে যুক্তিমান ও জীবন্ত করিবার গৌরব অবনীন্দ্রনাথ
বাঙালী শিল্পীদের কপালে উজ্জ্বল করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন।
বাংলার নূতন চিত্রকলাব বিচিত্র ও গৌরবজনক ইতিহাস
“প্রবাসী”র পাঠকদের অবিস্মিত নাই এবং এই নূতন
আন্দোলন ও সাধনার গৌরবের একাংশ যে “প্রবাসী”র
সম্পাদকের প্রাপ্য একথা বকলেই স্বীকার করিবেন।
হাভেলের প্ররোচনায় কয়েকটি রূপরসিক ইংরেজের উৎসাহে
কলিকাতায় “প্রাচ্য-শিল্পের ভারতীয় সংঘ” (Indian
Society of Oriental Art) প্রতিষ্ঠা হয়।
এই পরিষদের নানা চেষ্টায় ভারতের নূতন পদ্ধতির
চিত্রকলা দেশে বিদেশে পরিচিত হইয়া হাভেলের প্রদর্শিত
মস্তক সার্থক ও সফল করিয়া তুলিয়াছে।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত হাভেল সাহেবের “ভারতের
ভাস্কর্য্য ও চিত্র” পুস্তকে যে একটু তর্কবাদের সুর ছিল, যে
একটু প্রতিবাদের গর্জন ছিল, ভারত-শিল্পের প্রতি ভ্রাত্য
বিচারের দাবি ছিল, পক্ষপাতী ও প্রতিবাদীর সেই সুর
সংঘত ও উচ্চ স্বর মধুর করিয়া লইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক
প্রকাশিত হইল—“ভারত-শিল্পের আদর্শ” (*Ideals of
Indian Art*, 1911)। তাঁহার প্রথম পুস্তকে ভারত-
শিল্পের আদর্শের অনুসন্ধান ভারতের প্রাচীন শিল্পের
নিদর্শনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকে
ভারতের দর্শনশাস্ত্র ও প্রাচীন ধর্মসাহিত্য আলোচনা
করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, যে, ভারতের প্রাচীন বৈদিক
যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা প্রভাব ও প্রগতির মধ্য
দিয়া আর্থ্য সভ্যতার মূল ধারাটি কি সাহিত্যে, কি শিল্পে
সমান ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য
ও শ্রেষ্ঠ শিল্পের আদর্শ অভিন্ন। মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্য ও
“পৌরাণিক” শিল্প বৈদিক সাধনার ভাব ও ধারা অক্ষুণ্ণ
রাখিয়াছে। তার পর স্থাপত্য শিল্পেব পালা। ১৯১৩ সালে
মোগল যুগের স্থাপত্য সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত
হইল। ইহার নাম “ভারতের স্থাপত্য: তাহার মনস্তত্ত্ব,

গঠনরীতি ও ইতিহাস" (*Indian Architecture, Its Psychology, Structure and History*, 1913)। এই গ্রন্থে শতাধিক চিত্র সহযোগে হাভেল সাহেব দেখাইয়াছেন যে মোগল-যুগের স্থাপত্যরীতি পারস্য দেশের আমদানী নহে, মোগল-যুগেব নূতন সামাজিক রাস্তানৈতিক ও ধর্ম-উপাসনার উপযোগী আকার ও বীতিতে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য শিল্পেব নূতন বিবর্তন। যুগে যুগে, স্থানে স্থানে, সামাজিক ও ধর্ম উপাসনার নূতন রীতি-পদ্ধতির আবশ্যক অনুসারে কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম, কখনও জৈনধর্ম, কখনও বৌদ্ধধর্ম, কখনও ইসলামধর্মের বিভিন্ন উপাসকগণের ধর্মসাধনার উপযোগী, বিভিন্ন মন্দির, বিহার ও মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়া ভারতের স্থপতিরা তাহাদের অপূর্ণ শৌন্দর্য্যবুদ্ধির ও সৃষ্টি-শক্তির প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে, মোগল বাদশাহরা ভারতের স্থাপত্য শিল্পীদের নূতন ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া ভারতের প্রাচীন শিল্পবিদ্যাকে উন্নতি ও পরিণতির পথে চালিত করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনকালেও সেই প্রাচীন শিল্পের ধারা সম্পূর্ণ শক্তি ও প্রতিভা লইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং এই প্রাচীন শিল্পধারাকে নূতন যুগের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া তাহার নূতন পরিণতির অবসর দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের অবশ্য কর্তব্য। এই সূত্রে হাভেল সাহেব বিলাতে এমন এক বৃহৎ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, যাহার ফলে সেক্রেটারী অফ্ টেট একটি বিশেষ কমিশন বসাইয়া বর্তমান কালে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরিচয় লইতে বাধ্য হইলেন। গর্ডন মাণ্ডার্ন তাঁহার লিখিত রিপোর্টে (*Modern India Building*, 1918) হাভেল সাহেবের দাবি স্বীকার করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, ভারতের স্থপতিরা তাহাদের প্রাচীন শিল্পের ধারা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে এবং অল্পরূপ স্রবোগ পাইলে মোগল-যুগের স্থাপত্য কলা অতিক্রম করিয়া নবযুগের উপযোগী নূতন ধারার স্থাপত্য শিল্পের প্রবর্তন করিবার সামর্থ্য ভারতশিল্পীরা দেখাইতে পারে। এই দাবির সমর্থন করিয়া হাভেল সাহেব তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক লিখিলেন ১৯১৫ সালে। পুস্তক খানির নাম "প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প"

(*The Ancient and Mediaeval Architecture of India*, 1915)। এই পুস্তকে তিনি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মন্দিরাদির রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, যে, ভারতের অলৌকিক শিল্পবুদ্ধি প্রাচীন 'ভাষা' ও ধারা-অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিতানূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার সৃষ্টির প্রতিভা এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত আছে এবং নূতন ক্ষেত্রে নূতন স্রবোগের অপেক্ষা করিতেছে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের সভ্যতার বিকাশ-ও পরিণতির স্রবোগ না দিলে, ভারতবাসীকে তাহার নূতন জীবনের নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের পথ না দিলে, ভারত ও ভারতীয়দের উপর বিশেষ অন্তায় বিচার করা হইবে। হাভেল সাহেব বিশ্বাস করিতেন যে, কেবল চাক্র কলার পুনরুদ্ধানে নহে, পরন্তু নিত্য-ব্যবহার্য্য নানা কারু শিল্পাদির (handicrafts) পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা না হইলে ভারতের অন্ন-সমস্তার সমাধান হওয়া অসম্ভব এবং এই হস্ত-জাত শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রথম চেষ্টা ও উপায় হাতের তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের (hand-loom) উন্নতি সাধন। কিন্তু এই বস্ত্রশিল্পের উন্নতির উপদেশ দিয়াই তিনি ক্লান্ত হন নাই। আপন উদ্যোগে "Havell-Hattersley Loom" নামক উন্নত-পদ্ধতির তাঁতের আমদানী করিয়া তিনি হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিরূপে ভারতের প্রাচীন বয়ন-শিল্প মিলের যন্ত্র-চালিত তাঁতের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রচেষ্টার ফল তাঁহার "Hand-loom Weaving" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। 'বয়নশিল্পের উন্নতিই ভারতের অন্ন-সমস্তার একমাত্র পথ'—এই বাণী হাভেল সাহেব মহাত্মা গান্ধীর অঙ্কতঃ পনর বৎসর পূর্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কেবল শিল্পের ক্ষেত্রে নহে, শিক্ষার ক্ষেত্রে হাভেল সাহেবের আন্দোলন ভারতের শ্রাব্য দাবীর সমর্থন করিয়াছে। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ভারতে প্রচলিত ব্রিটিশ শিক্ষাতন্ত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার বিকাশের উপযোগী নহে, পরন্তু ভারতীয় সাধনার হানিকারক। ভারতের সভ্যতা কেবল ভারতবাসীর সম্পত্তি নহে, পরন্তু, যুরোপের সভ্যতার নানারূপ ব্যাধির আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ এবং এই হিসাবে

ভাবতের সভ্যতাব বিকাশ ও বিস্তৃতি-সাধন ভাবতের
 ৬. স্রাসবক্ষক হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের অবশুকর্তব্য। ব্রিটিশ
 সরকারের ভারতীয় শাসনরীতিব একরূপ নির্ভীক সমালোচক
 সে সময়ে কংগ্রেস দলের মধ্যেও বোধ হয় খুব অল্পসংখ্যক
 লোকই ছিলেন।

শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ
 স্বাভাবিক দাবি হাভেল সাহেবই বোধ হয় প্রথম উপস্থিত
 করেন। শেষ বয়সে ভাবতের শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি দুইটি
 দান দিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি নূতন পদ্ধতিতে লিখিত
 ভারতের ইতিহাস। প্রথমটির নাম :—“আর্য্য শাসনের
 ইতিহাস” (*History of Aryan Rule in India*),
 দ্বিতীয়টি স্থল-পাঠ্য পুস্তক—“ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস”
 (*A Short History of India*, 1924)। একথা
 ‘শিক্ষিত ভারতবাসী সকলেই জানেন, যে, ইংরেজের
 লিখিত ভারতের ইতিহাস নানা ভুলত্রুটি প্রমাণাদির
 পবকলার মধ্য দিয়া অন্ধ বিশ্বাস ও আপনাদের জাতীয়
 অহঙ্কারের লেখনীতে লিখিত এক উদ্ভট রচনা। ভারতের
 সভ্যতার মর্য্যস্থান ধাহাবা খুঁজিয়া পান নাই, ভারতের
 সভ্যতাকে ধারা প্রদ্বার চক্ষে দেখিতে শিখেন নাই, তাঁহাদের
 পক্ষে ভারতের ইতিহাস রচনা যে বিড়ম্বনা মাত্র হাভেল
 সাহেব তাঁহার এই দুইটি পুস্তকে উত্তমরূপে প্রমাণ
 করিয়াছেন। তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর
 মর্য্যস্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,
 ভারতের সামাজিক নীতি, সাম্রাজ্যনীতি, শাসননীতি ও
 ধর্ম্মনীতি কিরূপে যুগে যুগে, প্রদেশে প্রদেশে, নানা
 কল্যাণের মুর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; ভারতের সভ্যতাকে
 সার্থক করিয়াছে, সফল করিয়াছে।

তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, পাঠান ও মোগল-যুগের
 বিদেশী বাদশাহরা তাঁহাদের তথাকথিত যথেষ্টাচারী
 শাসন-তন্ত্র দ্বারা আর্য্য সভ্যতার বিকাশ-লাভের বাধা

প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের সমস্ত শক্তির দ্বারা
 আন্তরিক ভাবে তাহার পবিত্রতা সাহায্য করিয়াছেন এবং
 নূতন নূতন পথে তাহার সফলতার অবকাশ দিয়াছেন।
 তিনি নানা প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ
 করিয়াছেন, যে, টুংলকেব শাসন, সেরসাহের শাসন,
 আকবরের শাসন বিজ্ঞতার শাসন নহে, ভারতীয় নীতিতে,
 ভারতীয়ের সম্পূর্ণ সহযোগিতায়, ভারতের কল্যাণের উদ্দেশে
 ভারতীয় রাজার ধর্ম্ম-শাসন।

ভারতের সভ্যতার মূলমন্ত্র ও আদর্শে তাঁহার যে গভীর
 ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল তাহা কোনও ভারতবাসী অপেক্ষা
 কিছু মাত্র হীন নহে। এই বিশ্বাস ও গর্ব্ব তাঁহাব একটি
 মাত্র বাণীতেই ফুটিয়া রহিয়াছে,—

“ভারতবর্ষ, আজ তাহার ঐষ্ট জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত
 হইয়াই বিশ্বমানবের সভায় জাতীয়তাব আসন হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষ
 আবার উচ্চ আসনে তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখনই ভারত বর্তমান
 যুরোপ যে আদর্শে তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর
 আদর্শের পতাকা তাহার নিজের জন্ত সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্ত
 উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিতে” (“India has sunk in the scale
 of nations, because, she has been false to her
 highest ideals, and India will rise again, when she
 holds up for herself, and for humanity, higher ones
 than modern Europe now brings her.”)

ভারতের সভ্যতাব এইরূপ দরদী প্রেমিক, ভারতীয়
 সাধনার আদর্শেব একরূপ বিশ্বাসী ভক্ত, ভারতীয় শিল্প ও
 কৃষ্টির একপ সঙ্গদয় ও স্ননিপুণ ব্যাখ্যাকার, ভারতের
 সর্বাঙ্গীন কল্যাণের একপ অকৃত্রিম সুহৃদ, নবজাগরণেব
 ও দেশ-পুজার একপ সুযোগ্য পুরোহিত ভারতের
 সমসাময়িক ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা দিয়াছে। কটন,
 ওয়েডারবার্ণ, বেষার্ট, নিবেদিতা প্রমুখ ভারতের অন্তান্ত
 বিদেশী বন্ধুগণের স্মৃতি যে-সম্মানেব আসনে অধিষ্ঠিত,
 তাহারই পার্শ্বে ভারতের এই বরণ্য বন্ধুর স্মৃতি-চিত্র স্থবর্ণেব
 প্রভায় চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে।

চার অধ্যায় •

শ্রীরাজশেখর বসু

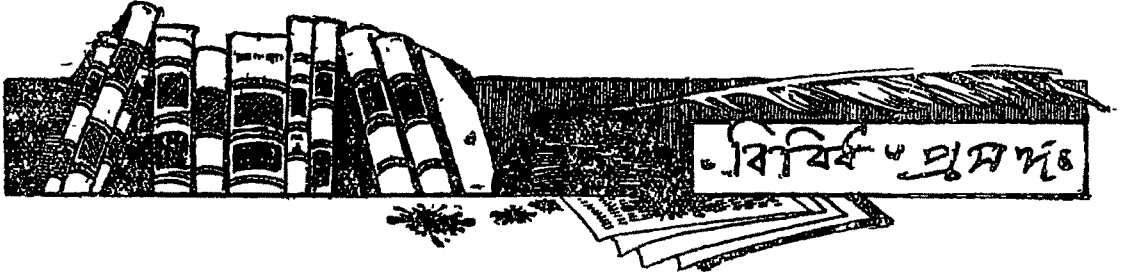
বিখ্যাত লেখকের গল্প পড়বার সময় কেউ কেউ একটা ভুল ক'রে ফেলেন। লেখক তাঁর পাত্র পাত্রীকে দিয়ে যে কথা বলান তার অনেক কথা পাঠক অকারণে লেখকের মতামত ব'লে মনে করেন। গল্পে যদি সেকেলে রীতিতে কেবল আদর্শচরিত নায়ক নায়িকা আর খাঁচী ছরাতা চিত্রিত হয় তবে লেখকের টান কোন দিকে তা বুঝতে বাধা হয় না। কিন্তু লেখক যদি এমন চরিত্র আঁকেন যারা স্বাভাবিক সদস্যসংস্করণী এবং যাদের মনের সূক্ষ্ম বৃন্দ মনোহর ভাষায় প্রকাশ পায়, তবে অসাধারণ পাঠক পাত্র পাত্রীর অনেক উক্তি নির্বিচারে লেখকের উপর আরোপ ক'রে বসেন। যে লেখক অনতিথ্যাত তাঁর রচনা পড়বার সময় এই ভুল বড় একটা হয় না, কারণ পাঠকের কৌতুহল পাত্র পাত্রীর উপরেই নিবদ্ধ থাকে, লেখক অন্তরালে থেকে নিস্তার পান। কিন্তু যেখানে লেখক স্বয়ং পরম কৌতুহলের বিষয়, সেখানে পাত্র পাত্রী সাধারণের কাছে সব সময়ে সুবিচার পায় না। পাঠক ছড়ে ছড়ে লেখককেই সন্ধান করে এবং তার ফলে সৃষ্টিকেই স্রষ্টা ব'লে ভুল করে। রবীন্দ্রনাথের পাত্র পাত্রী এই কারণে একটু বিপন্ন। তাই একদল পাঠক সন্দীপের উক্তি সইতে পারেন না এবং আর এক দল অসুযোগ করেন যে গ্রন্থকার কমলার সহজ নারীধর্ম হঠাৎ ঘুচিয়ে দিয়ে বেচাবীকে সনাতনী সতী বানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ পূর্বে যে সব গল্প লিখেছেন তাতে তিনি

নিরপেক্ষ স্রষ্টা, তাঁর পাত্র পাত্রীর মতিগতির তিনি অহুমত্তাও নন অবমত্তাও নন। কিন্তু 'চার অধ্যায়' গল্প ভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা। তার লক্ষণ—'আভাস' শীর্ষক মুখবন্ধ। তাঁর কোনও আধুনিক গল্পে মুখবন্ধ নেই। 'চার অধ্যায়'এর উদ্দেশ্য কি তার আভাস প্রথমেই পাওয়া যায়। গল্পের প্রধান পাত্র পাত্রীরা ঘোরাচারী বিপ্লবী। রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে আমাদের দেশে যে বিজাতীয় হিংস্রতা দেখা দিয়েছে, গ্রন্থকার তারই ব্যর্থতা চিত্রিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' গল্পেও হিংস্র নরনারীর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু তাতে বিপ্লবীদের যে বিবরণ আছে তা গল্পের সূত্র মাত্র, মুখ্য বিষয় নয়। সেই নিরীহ গল্পটির প্রধান বাপার চরিত্র-চিত্রণ, আর কিকিৎ রোমহর্ষণ। 'চার অধ্যায়' গল্পের ধারা অল্প রকম। নায়ক অতীন্দ্র নায়িকা এলা ও উপনায়ক ইন্দ্রনাথের বিচিত্র আলাপে তাদের চরিত্র ও মানসিক বৃন্দ যেমন আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, সেই সঙ্গে লেখকের মতামতও নিঃশব্দে খবর দিয়েছে। আপদধর্মের রূপ ধরে আমাদের দেশে যে সব অপধর্ম মাথা খাড়া করেছে, গ্রন্থকার তার উপর তাঁর তীব্র বিরাগ গোপন করেন নি।

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ একাধিক মোচাকে কাঠি দিয়েছেন, তার স্বাক্ষর শোনবার জন্ত আমরা অপেক্ষা করছি।

* চার অধ্যায়।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত। ৭২ "x ৪", ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ ও ১।০।



বঙ্গের গবর্নমেন্ট-তপশীলভুক্ত জাতিসমূহ

গত ২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গের গবর্নমেন্ট-“তপশীলভুক্ত জাতিসমূহ”র একটি তালিকা বাংলা-গবর্নমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধীয় নির্ধারণটিতে বলা হইয়াছে—

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখের নং ১২২ এ, আর, নির্ধারণ দ্বারা বঙ্গদেশে গবর্নমেন্ট তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের একটি খসড়া তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অবনত শ্রেণীসমূহের ভোটাধিকার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মীমাংসার প্রথমে যে-সকল প্রস্তাব ছিল ও তৎপরে পূর্ণাঙ্গীকৃত অস্থায়ী উদ্দেশ্যে যে পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করা হইবে তাহার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণার্থে এই তালিকা প্রস্তাবিত হইয়াছিল। এই সকল জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনত অবস্থা ও উদ্দেশ্যের স্বার্থ রক্ষার্থে উহারিগকে বিশেষ ভোটাধিকার দেওয়া আবশ্যিক বোধে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

২। উক্ত তালিকায় কোন একটি বা একাধিক জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা বা না-করা সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য গবর্নমেন্ট সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতিবিশেষের সমিতি বা ব্যক্তিবর্গকে অনু-দ্রোষ করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলায় কর্তৃত্বচা-রীগকে তাঁহাদের বিভাগে বা জেলায় যে-সকল জাতির লোক বেশী সংখ্যায় আছে সেই সকল জাতির বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ও গবর্নমেন্ট নির্দিষ্ট আদর্শের হিসাবে এই সকল জাতি তালিকাভুক্ত করা সম্ভব কি না সে-বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে বলা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে আরও বলা হইয়াছিল যে, বাহার নাম তালিকাভুক্ত করা হয় নাই কিন্তু তাঁহাদের মতে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদের বিভাগে বা জেলায় এরূপ কোন জাতি আছে কি না তাহা জানাইবেন।

৩। গবর্নমেন্টের আহ্বানের উত্তরে সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতি-বিশেষের সমিতি ও ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে গবর্নমেন্ট বহু আবেদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐগুলি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা কর্তৃত্বচা-রীগের মতামত এক্ষণে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইয়াছে, এবং এতৎসংলগ্ন জাতিসমূহের তালিকাটি বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া মহাসভা সম্রাটের গবর্নমেন্টের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করিবেন বলিয়া গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন।

উদ্ধৃত বাংলা বাক্যগুলি সবকারী দপ্তর হইতে প্রাপ্ত।

“তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা” নীচে দিতেছি।

তাহাতে সাতাত্তরটি জাতির নাম আছে। তাহাদের মধ্যে যে-সব জাতির মধ্য হইতে তপশীলভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে

গবর্নমেন্টের কাছে আপত্তি গিয়াছিল, তাহাদের নাম ও লোকসংখ্যা তাহাব পর দিব।

তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা।

আগরীয়া	বাগ্‌দী	বাহেলীয়া	বাইতী
বাউরী	বেদিয়া	বেলদার	বেকরা
ভাতিয়া	ভুঁইমালী	ভুঁইয়া	ভুমিজ
বিন্দ	বিন্দিয়া	চামার	ধেমুয়ার
ধোবা	ঘোড়াই	ডোম	দোসাধ
গারো	মাসী	গোণবী	হাড়ী
হাজং	হালালখোর	হরি	হো
জালিয়া কৈবর্ত	খালোমালো বা মালো	কাহার	কাণ
কাঁধ	কাঁদরা	কেওয়ার	কাপুদিয়া
করেজা	কাছা	কাউর	খবরা
খাতিক	কোট	কোনাই	কোন্ডার
কৌড়া	কোটাল	লালবেগী	লোখা
লোহার	মাহার	মাইলী	মাল
মামা	মাল পাহাড়িয়া	মেচ	মেখর
মুচী	মুণ্ডা	মুসহর	নাগেসিয়া
নমঃশূত্র	নট	মুনিয়া	ওরাও
পলিয়া	পাণ	পাসি	পাটনী
পোদ	রডা	রাজবাংশী	রাজবার
সাঁওতাল	শুঁড়ি	হুজুর	তিয়র
তুরি			

১৯৩৩ সালের ২৯শে আগষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাবের উত্তরে বাংলা-গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে স্ত্রর উইলিয়ম প্রেস্টিস বলেন, যে, নিম্নমুদ্রিত ছাব্বিশটি জাতির মধ্য হইতে তপশীলভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি আসিয়াছিল।

জাতি	লোকসংখ্যা	জাতি	লোকসংখ্যা
বাগ্‌দী	২,৮৭,৫৭০	মুচী	৪,১৪,২২১
ভুঁইমালী	৭২,৮০৪	নাগর	১৬,১৬৪
ধোবা	২,২২,৬৭২	নমঃশূত্র	২০,২৪,২৫৭
হাড়ী	১,৩২,৪০১	নাথ	৩,৮৪,৬৩৪
জালিয়া কৈবর্ত	৩,৫২,০৭২	মুনিয়া	২৮,১০০
খালো মালো	১,২৮,০২২	ওরাও	২,২৮,১৬১
কালোআর	১৩,৫৪০	পোদ	৬,৬৭,৭৩১
কপালী	১,৬১,৫৮৯	পুণ্ডরী	৩১,২৫৫
খতাইত	৩৫,০৮০	রাজবাংশী	১৮,০৬,৩২০

কোঙার	১৩০	রাজু	৫৬,৭৭৮
লোখা	১১,০০১	শাগিদগৈশা	৩৩৩
লোহার	৫০,১৮২	শুল্লি	৩,৮৮০
মাল্লা	১,১১,৪২২	শুড়ী	৭৬,২২০

এই ছাব্বিশটি জাতির লোকদের মোট সংখ্যা ৮১,৬৯,০৬৯। লোকসংখ্যাগুলি আমরা সেন্সস রিপোর্ট হইতে বসাইয়া দিয়াছি। গবর্নেন্ট “অবনত” জাতিদের যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ৮৭টি জাতির নাম ছিল। তাহাদের মোট লোকসংখ্যা এক কোটির কিছু উপর ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহাদের মোটামুটি চারি-পঞ্চমাংশ লোকদের অনেকে অবনত বলিয়া গণিত হইতে আপত্তি করিয়াছিল। যে ছাব্বিশটি জাতির মধ্য হইতে আপত্তি গবর্নেন্টের কাছে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গবর্নেন্ট নিম্নলিখিত জাতিদের সম্বন্ধে আপত্তি না শুনিয় তাহাদের নাম “অবনত” জাতিদের পাকা তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন:—

জাতি	লোকসংখ্যা	জাতি	লোকসংখ্যা
বাগদা	২,৮৭,৫৭০	লোহার	৫০,১৮২
চুইমালী	৭২,৮০৪	মাল্লা	১,১১,৪২২
ঘোবা	২,২২,৬৭২	মুচী	৪,১৪,২২১
হাড়ী	১,৩২,৪০১	নমঃশূদ্র	২০,২৪,২৫৭
জালিয়া কৈবর্ত	৩,৫২,০৭২	হুনিয়া	২৮,১০০
ঝালো মালো	১,২৮,০২৯	ওবাও	২,২৮,১৬১
কোঙার	১৩০	পোদ	৬,৬৭,৭৩১
লোখা	১১,০১১	রাজবংশী	১৮,০৬,৩২০
		শুড়ী	৭৬,২২০

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে-সব জাতির লোকসংখ্যা এক লাখে বৈশী, তাহাদের মধ্যে কেবল কপালী ও নাথদেব সম্বন্ধে সরকার আপত্তি শুনিয়াছেন, আর কাহারও সম্বন্ধে শুনে নাই। সকলের চেয়ে সংখ্যায় বেশী বাহাবা তাহাদের সম্বন্ধে আপত্তি মোটেই শুনে নাই—যথা নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পোদ, বাগদী, জালিয়া কৈবর্ত, মুচী, ঘোবা, ইত্যাদি। তাহাতে মনে হইতেছে, যে-সব সরকারী কর্মচারী তালিকাভুক্ত জাতিসমূহের সামাজিক মর্যাদার বিচার করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকটা এই মানদণ্ড ব্যবহার করিয়াছিলেন, যে, তাহারা সংখ্যায় বেশী তাহারা নিশ্চয়ই অবনত। অবশ্য সকল জাতি সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে তাহারা নিতান্তই ধরা পড়িয়া যাইতেন বলিয়া

বোধ হয় দুই-এক স্থলে ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তাহাদের মনে জাতসারে বা অজাতসারে একটা এই রূপ ঝোঁক থাকার আভাস ইহা হইতে পাওয়া যায়, যে, “অবনত” জাতিদের লোকসংখ্যা কম দেখাইতে দেওয়া চলিবে না।

আমরা আগে আগে অনেক বার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, যে, যিনি আপনাকে “অবনত” বলিয়া স্বীকার করেন না, এরূপ এক জন লোককেও অবনত তালিকাভুক্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই, অথচ গবর্নেন্ট এরূপ বিস্তর লোককে “অবনত” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মাজ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বে-রকমের অস্পৃশ্য জাতি আছে বঙ্গে সে-রকমের অস্পৃশ্য অল্পই আছে। অথচ মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বঙ্গের হিন্দুদিগকে দ্বিখণ্ডিত ও হীনবল করা চাই-ই! সুতরাং বঙ্গের ও অন্ত কোন কোন প্রদেশের পক্ষে ফরমাইস হয়, যে, এখানে সামাজিক ও রাস্তনৈতিক হিসাবে অবনতদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

বাংলা-গবর্নেন্ট যখন ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে খসড়া তালিকা বাহির করেন, তখন লিখিয়াছিলেন, যে, তেলী ও কলুদের মত জাতিদিগকে ঐ তালিকাভুক্ত করা হয় নাই, কারণ তাহাদের নিকট হইতে আপত্তি আসিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রাসদস্ত বিচার ১৭টি জাতি সম্বন্ধে করা হয় নাই, যদিও তাহাদের মধ্য হইতেও আপত্তি আসিয়াছিল। ইহা সরকারী অসঙ্গতির একটি প্রমাণ।

“অবনত” জাতিদের জন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ত্রিশটি আসন রক্ষিত আছে। কিন্তু “অবনত” “তপশীলভুক্ত” জাতির সংখ্যা ৭৭টি। ইহার মধ্যে নমঃশূদ্র ও অন্ত দুই-একটি জাতি নিশ্চয়ই প্রত্যেকে একাধিক আসন দখল করিতে পারিবে। কিন্তু ইহা না ধরিয়া যদি মনে করা যায়, যে, কোন জাতির শোকই একটির বেশী আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা হইলেও কেবল ত্রিশটি জাতির ত্রিশ জন লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবে, বাকী ৪৭টি জাতির এক জনও একটি আসন পাইবে না—তাহাদের “জাত” যাইবে অথচ পেট ভরিবে না।” সোজা বাংলার বলিতে গেলে, তাহারা সরকারী তালিকায় “নীচ জাত” ও “ছোট লোক” বলিয়া গণ্য

হইবে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব রূপ প্রলোভনের জিনিষেব কোন অংশ পাইবে না।

৫ আমরা সম্পাদক রূপে জানি, “প্রবাসী”র কোন লেখকের কোন গল্পে যদি কোন পাত্র বা পাত্রী অপর কোন পাত্র বা পাত্রীকে “ছোট লোক” বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা হইলে এইরূপ অবজ্ঞাব্যঞ্জক কথায় অভিহিত কাল্পনিক ব্যক্তিদেব স্বজাতীয় ব্যক্তির “প্রবাসী”র সম্পাদককে আক্রমণ করেন। কিন্তু সেই সব জাতিরই মধ্যে কোন কোন জাতি এখন সরকারী “তপশীলভুক্ত” হওয়াতে আপত্তি করিতেছেন না, যদিও “তপশীলভুক্ত” মানে সোজা কথায় “নীচ জাত” বা “ছোট লোক”। গল্প আছে, যে, কোন এক ব্যক্তি পাত্রকা দ্বারা প্রজ্ঞত হইয়া আপনাদের মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিল, যে, জুতাটা ডসনের জুতা। ষাহাদের স্বদেশবাসীরা তাঁহাদিগকে “নীচ জাত” বলিলে তাঁহারা জুত্ব হন (এবং তজ্জন্ত জুত্ব হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও ত্রায়সঙ্গত) এবং আপনাদের দ্বিগুণ প্রমাণ করিতে চান, ঠংরেজরা তাঁহাদিগকে পরোক্ষভাবে “নীচ জাত”-সকলের তালিকাভুক্ত কবিলে দেখিতেছি তাঁহারা খুলী হন।

“তপশীলভুক্ত” কতকগুলি জাতির কতকগুলি লোক যে তপশীলভুক্ত হইতে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বহুবৎসরব্যাপী দাবীর অনুবাদী হইয়াছিল। এই প্রকারে সঙ্গতি রক্ষার জন্ত তাঁহারা প্রশংসার্হ।

১৯৩১ সালের বঙ্গব সেলস রিপোর্টে দেখিতে পাই, কতকগুলি জাতি ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের দাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও অবনতত্ব স্বীকার না করিয়া পূর্ব দাবী বজায় রাখিলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হইবে না, বরং তাঁহারা আত্মসম্মান রক্ষা করিতে ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন এবং সঙ্গতি রক্ষার জন্ত অপরেরও সম্মানভাজন হইবেন। কয়েকটি জাতি আপনাদিগকে কি নামে অভিহিত করেন, তাহা নীচে লিখিত হইল।

বাগদী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়; ভুঁইমাণী, বৈশ্যমাণী; ঝালো, বাল্লক্ষত্রিয়; মালো, মল্লক্ষত্রিয়; নমশুদ্র, নমব্রাহ্মণ, নমব্রহ্ম; পোদ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়; পুণ্ডরী, পুণ্ড্রক্ষত্রিয়;

রাজবংশী, রাজবংশী ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় রাজবংশী; শুঁড়ী, শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয়, শৌণ্ডিয়া ক্ষত্রিয়; হাড়ী, হৈহয় ক্ষত্রিয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতত্ব

গবর্নেন্ট সামাজিক অবনতত্ব বোধ হয় এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যে, কতকগুলি জাতির দেওয়া বা হোঁয়া জল অপর জাতির লোকেরা পান করে না, এবং কতকগুলি জাতিব পাক করা বা হোঁওয়া অন্নব্যঞ্জন অন্ত জাতিব লোকেরা খায় না। এই যে অবনতত্ব-বোধ, ইহাব জন্ত হিন্দু সমাজ অবশ্যই দায়ী। কিন্তু সামাজিক অবনতত্ব ত শুধু অন্নজলেই আবদ্ধ নহে। অতিশয় আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা অন্ত কোন জাতির অন্নজল গ্রহণ করেন না; কিন্তু তা বলিয়া অন্ত সব জাতিই অবনত নহেন, গবর্নেন্ট ও তাঁহাদের সকলকে তপশীলভুক্ত কবেন নাই। এই রূপ, ব্রাহ্মণের কোন কোন জাতিও স্বজাতিব ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন জাতির অন্নজল গ্রহণ করেন না। কিন্তু শেষোক্ত এই সকল জাতিই অবনত বলিয়া গণিত বা সরকারী তপশীলভুক্ত হন নাই।

শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্যও সামাজিক অবনতত্বের কারণ। এই শিক্ষাভাব ও দারিদ্র্যের জন্ত দারিদ্র্যের জাত্য অংশ গবর্নেন্টকেও লইতে হইবে, সব দোষ হিন্দুসমাজ এবং অশিক্ষিত ও দরিদ্র জাতিদের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না—তাহা ত্রায়সঙ্গতও হইবে না। শিক্ষা ও আপেক্ষিক ধনশালিতার প্রভাবে অবনতত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, একপ জাতির নাম করা কঠিন নয়। তাঁহারা যেমন সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির দ্বারা অন্তেরাও তেমন সামাজিক উন্নতি লাভ কবিতে পারবেন।

রাজনৈতিক হিসাবে অবনতত্ব আমরা সবাই। আমরা অবনত বলিয়াই নেত্রন হিসাবে বিদেশে কোথাও সম্মানিত নহি—স্বদেশেও নহি, সুতরাং “পলিটিক্যাল ব্যাকওয়ার্ড” “রাজনৈতিক হিসাবে অনগ্রসর” বলিয়া কতকগুলি জাতিকে আলাদা করার ঠিক কোন মানে হয় না। যেন আর সবাই রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন ও অগ্রসর! তবে যদি বলেন, ষাহারা রাজনীতি

কিছু বুঝে, রাজনৈতিক অন্বেষণ করে ও চেষ্টায়, তাহারাই অগ্রসর, তাহা হইলে সেটা ত লেখাপড়া শেখার ব্যাপাব, লেখাপড়া শেখার উপর নির্ভর করে। সরকার “অবনত”দিগকে দশটা বা ত্রিশটা আসন না দিয়া, সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলে সবাই ঐ অর্থে রাজনৈতিক হিসাবে অগ্রসর হইয়া যাইবে। আর এক অর্থে কতকগুলি লোককে রাজনৈতিক হিসাবে অগ্রসর বলা যায়—যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, দুঃখ বরণ করিয়াছেন তাঁহারা অগ্রসর। কিন্তু ইহাদের মধ্যে হয়ত বেশী লোক “উচ্চ” জাতির হইলেও অন্য জাতির লোকও আছেন—এখানে জাতিভেদ নাই।

গবর্নেন্ট হয়ত অন্য একটা মানদণ্ড দ্বারা অবনতত্ব ও উন্নততার নির্ধারণ করিয়া থাকিবেন, মনে করিয়া থাকিবেন, ইহাদের মধ্যে কেহই ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন নাই, তাঁহারা অবনত। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সরকারী তপশীলভুক্ত নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পোদ, চামার, মেথর প্রভৃতি জাতির লোকেরা এই প্রকার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং এই সব জাতিকে উচ্চ অর্থে অবনত বলা চলে না।

কোন জাতি কাহার হিত করেন

এইরূপ একটা যুক্তি শুনিয়াছি, যে, যে-সব জাতি অবনত, তাহারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে ও পরস্পরের হিত করিবে; “উচ্চ” জাতিরা তাহাদের তেমন দরদী ও হিতৈষী নহে। কিন্তু বাস্তবিক কি “উচ্চ” জাতিদের চেয়ে অন্য জাতিরা এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? “নিম্ন” জাতিসমূহ পরস্পরকে যতটা “অস্পৃশ্য” মনে করে, “উচ্চ” জাতির লোকেরা তাহাদিগকে তার চেয়ে বেশী অস্পৃশ্য মনে করে কি? কোন কোন স্থলে বরং কম করিতেই দেখা যায়। অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকদের শিক্ষার ও আর্থিক উন্নতির চেষ্টা “উচ্চ” জাতির লোকেরাও করিয়া থাকে। অন্য জাতির লোকেরা এরূপ চেষ্টা বেশী করিয়া থাকে বলিয়া শুনি নাই। “তপশীলভুক্ত” জাতিদের মধ্যে ষাঁহারা

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, এ-বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব বা চেষ্টা “উচ্চ” জাতির লোকদের চেয়ে বেশী হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। কিন্তু এ-পর্যন্ত যে তাহা বেশী হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ আমরা অবগত নহি।

পরস্পরনির্ভরশীলতা

সমস্ত জাতের লোক যদি পরস্পরনির্ভরশীল হন, তাহা হইলেই সকলের কল্যাণ ও উন্নতি হইতে পারে। ষাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত মনে করেন কেবলমাত্র তাঁহাদের চেষ্টায় দেশের উন্নতি হইতে পারে না—এমন কি তাঁহাদের নিজেরও সম্যক উন্নতি হইতে পারে না। ষাঁহাদিগকে অন্তেরা “অবনত” মনে করে, “অস্পৃশ্য” বা নীচ জাতি মনে করে, এবং হয়ত ষাঁহারা নিজেও আপনাদিগকে হীন মনে করেন, তাঁহারাও কেবল নিজেদের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিতে পারিবেন না, দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন না। বিদেশীদের সম্পূর্ণ সাহায্য পাইলেও তাহা করিতে পারিবেন না, এবং তাহাদের সম্পূর্ণ সাহায্য পাইবেনও না। তাঁহাদের অনেকেরই শিক্ষার ও জ্ঞানের অভাব এত বেশী, যে, তাঁহাদের মনে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উন্নতির চিন্তাই উদ্ভিত হয় না। তাঁহারা যে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তাহার জন্য প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের গঠন দায়ী, হিন্দুসমাজের “উচ্চ” জাতিরা দায়ী। সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে, সব জাতির মধ্যে যে পরস্পরনির্ভরশীলতা নাই, তাহার জন্যও আমাদের সমাজ দায়ী।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের কাজ করিবার জন্য যোগ্যতম ষাঁহারা, তাঁহারা যে-জাতির লোকই হউন, সকল জাতির লোকে সম্মিলিত ভাবে তাহাদিগকে নির্বাচন করিলে তবে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। ভ্রাম্যবুদ্ধি ও কল্যাণ-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিদেশীরা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এরূপ আশা করা মুচুতা। তাঁহাদের নিজের প্রভুত্ব রক্ষা ও স্বার্থ রক্ষা বাহাতে হয়, তাহাই তাঁহারা করিবেন, এইরূপ আশা করাই স্বাভাবিক ও উচিত।

আমাদের দুর্বলতার জন্য আমরা দায়ী

আমরা যে সম্ভবতঃ সংহত অথও জাতি নহি, তাহার জন্য আমরা দায়ী। আমরা আগে কতকগুলি লোককে “নীচ জাতি” ও “ছোট লোক” ভাবিয়াছি, বলিয়াছি ও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছি, তবে বিদেশীরা হিন্দু সমাজকে ছুটা শ্রেণিতে ভাগ করিতে পারিয়াছে। সরকারী যে “তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা” বাহির হইয়াছে, তাহার সমালোচনা আমরা করিয়াছি, অপরেরাও করিবেন। কিন্তু তাহার একমাত্র প্রকৃত ও ফলপ্রসূ উত্তর হিন্দুসমাজ হইতে “অস্পৃশ্যতা” ও অল্পজল সঙ্কে সামাজিক “অনাচরণীয়তা” উঠাইয়া দেওয়া। হিন্দুসমাজে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, প্রাণবন্ততা ও শক্তিমত্তা এবং তদনুযায়ী শ্রায়পরায়ণতা ও সাহস থাকিলে ইহা অচিরে করা যাইত। আমরা অনেকেই জাপানের অভ্যুদয়ের কথা ভাবি ও বলি, কিন্তু সব সময় মনে রাখি না যে, জাপান প্রাণবন্ততা ও শক্তিমত্তা এবং সামাজিক শ্রায়পরায়ণতা ও সাহস দ্বারা স্বীয় অভ্যুদয় আনয়ন করিয়াছে। জাতীয় কল্যাণের জন্য যখন আবশ্যক হইল, যখন মানবতার ও স্বাধীনতার আহ্বান আসিল, তখন সাযুবাই নামক জাপানী অভিজাত সম্প্রদায় অচিরে আপনাদের সমুদয় বিশেষ অবিকার পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের ও জাপানের “এতা” নামক অস্পৃশ্য লোকদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার কোন পার্থক্য রহিল না। আমাদের সমাজে এরূপ শ্রায়পরায়ণতা, সাহস, মহাপ্রাণতা ও বুদ্ধিমত্তা থাকিলে বা কখন জন্মিলে তবে আমরা টিকিয়া থাকিতে ও বড় হইতে পাবিব, নতুবা হিন্দুসমাজের আরও ক্ষয় এবং বর্তমান প্রকারের হিন্দুত্বের লোপ অবশ্যস্বাবী।

সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার বহু প্রতিবাদ হইয়াছে, আরও হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর প্রভৃতি বড় নেতারা তাহা আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু অবনত শ্রেণী সকলকে গবর্নমেন্ট যাহা দিয়াছেন ও দিবেন বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা চাড়িবেন কেন? আমরা বলি, আমরা তাঁহাদের বন্ধু ও হিতৈষী। কিন্তু তাহর কার্যগত প্রমাণ কোথায়? সামান্য প্রমাণ সেইসব অল্পসংখ্যক লোকেরা বহুবৎসর ধরিয়া দিয়া আসিতেছেন যাহারা কোন জাতিবই লোককে হীন মনে করেন না, অবজ্ঞা

করেন না, এবং স্বীয় আচরণ দ্বারা “অস্পৃশ্যতা” ও “অনাচরণীয়তা”র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বিশাল হিন্দুসমাজের তুলনায় তাঁহারা সংখ্যায় কয় জন? সকলের সহিত সামাজিক সাম্য স্থাপন ব্যতিরেকে সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হইবে না।

সমগ্র হিন্দুসমাজ জাগ্রত হউন। বিশেষ করিয়া জাগ্রত হউন যাহারা আপনাদিগকে সনাতনী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকে আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানেন, যে, শাস্ত্র অনুসারে যাহারা মুনি ঋষি বলিয়া পূজনীয় ও পুজিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেইরূপ পিতা বা মাতার সন্তান যাহাদের স্বজাতিদিগকে এখন সনাতনীবা অনাচরণীয় মনে করেন। আধুনিক সনাতনী মত ও আচার বাস্তবিক সনাতনী মত ও আচার নহে।

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ”

অন্ত প্রাতে “গীতাঞ্জলি” খুলিতেই রবীন্দ্রনাথের “হে মোর দুর্ভাগা দেশ” শীর্ষক কবিতাটি চোখে পড়িল। কবিতাটি ভারতীয় মহাকাব্যের বর্তমান প্রধান কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ স্মারক বলিয়া সকলের পড়িবার সুবিধার জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মামুষের আধকারে
বশিত করেছ যাবে,
সম্মুখে দাঁড়াবে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মামুষের পরশের প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূবে
বুণা করিয়াছ তুমি মামুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার কয় রেখে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অপমান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেখান তাদেব দিলে সে
সেখান শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চবণে দলিত হয়ে
ধূলায় সে যায় ব্যয়,
সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

বারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাণিবে যে নীচে ।
পশ্চাতে রেখেছ বারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ।

অজ্ঞানের অঙ্ককারে

আড়ালে ঢাকিছ বারে

তোমার মঙ্গল ঢাকি গুঁড়িছে সে ঘোর ব্যবধান ।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।

‘শতক শতাব্দী ধরে’ নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষেব নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার ।

তবু নত করি আঁখি

দেখিবারে পাও না কি

নেমেছে ধূলাব তলে হীন পত্নিতের-স্তম্ভরান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান ।

দেখিতে পাও না তুমি যুগ্মদূত পাঁড়িয়েছে ঘরে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অঙ্কাবে ।

সবারে না’ যদি ডাক,

এখনো সরিয়া-থাক,

আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
যুগ্মমাথে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান ।

এই কবিতাটি সাড়ে চব্বিশ বৎসর পূর্বে ১৩১৭
সালের ২০শে আষাঢ় রচিত হয় । এখন কতকগুলি
লোক সচেতন হইয়াছেন । তাহাতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ
স্বত্ব কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইতে পারা যায় । এখন ৬
১৩১৭ সালেরই পর দিন, ২১শে আষাঢ়, রচিত কবির
নিয়মুদ্রিত কবিতাটি আশাস-বাণী বিবেচিত হইতে
পারে ।

ছাড়িস নে ধবে থাক এঁটে,

ওরে হবে তোর জয় ।

অন্ধকার যার বুবি কেটে,

ওরে আর নেই ভব ।

ওই দেখ পূর্ণাশাব ভালে

নিবিড় বনের অন্তরালে

শুকতারা হয়েছে উদয় ।

ওরে আর নেই ভয় ।

এরা যে কেবল নিশাচর—

অবিবাস আপনার পদ,

হতাশাস, আলস্ত, সংশয়,

এরা প্রভাতের নব ।

ছুটে আয়, আরে বাহিরে

চেয়ে দেখ, দেখ উদ্দেশ্যের,

আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়,

ওরে আর নেই ভয় ।

অবনতত্বয়ীকারে সূত্রধরদের শ্রাঘ্য ও

স্বাভাবিক আপত্তি

ঢাকার হুজুর সমিতির এক অধিবেশনে সম্প্রতি (৬ই
জানুয়ারী) হুজুর জাতি তাঁহাদিগকে সরকারী অবনত
জাতিদের তপশীলভুক্ত করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন ।
তাঁহারা বলেন—বহুপূর্বে যখন রিজলী সাহেব ভারতীয়
জাতিসমূহেব শ্রেণীবিভাগ করেন, তখন তিনি হুজুরদিগকে
“এক্সক্লুসিভ” অর্থাৎ শুদ্ধাচারবান্ জাতি বলিয়াছেন ;
১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁহাদিগকে অবনত বা অনুন্নত বলা
হয় নাই ; বাংলা-গবর্ণমেন্টেব ১৯৩৩ সালেব জানুয়ারী মাসের
“অবনত”দের খসড়া তালিকায় হুজুরদের নাম ছিল না ;
এই তালিকা প্রকাশের সময় গবর্ণমেন্ট জানিতে চাহিয়া-
ছিলেন, যে, তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত হয় নাই, এমন
কোন জাতি তপশীলভুক্ত হইতে চান কি না, তাহার উত্তরে
হুজুর জাতি তপশীলভুক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে
নাই ; তবে কেন হুজুরদিগকে পাকা তালিকায় ফেলা
হইল ?

তাঁহারা আরও বলেন, শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা দেব-শিল্পী ।

কাঁচড়াপাড়াতেও হুজুরদিগেব এইরূপ প্রতিবাদ-সভা
হইয়া গিয়াছে ।

সম্ভবতঃ নানা জায়গাতেই অনেক জাতিব প্রতিবাদ-সভা
হইবে ।

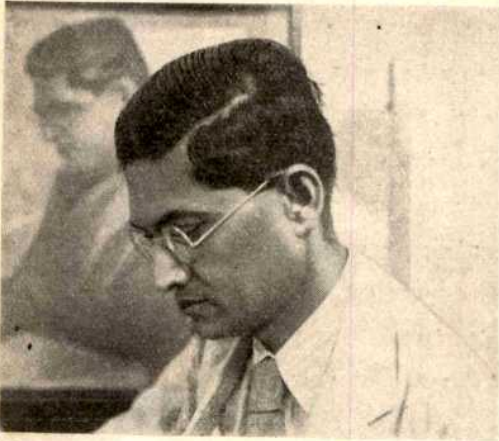
আমরা আগেই বলিয়াছি, যে-কেহ বলিবেন তিনি বা
তাঁহার জাতি অবনত নহেন, তাঁহাকে অবনত বলিয়া
তপশীলভুক্ত করা অস্বচিত ।

হিন্দুসমাজের কর্তব্য

যে-কোন জাতি আপনাদিগকে হিন্দু বলিবেন, তাঁহাদেরই
অঙ্গপ্রাণ গ্রহণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ও তাহা প্রকাশ করা
হিন্দুনেতাদের কর্তব্য । অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য, যে,
নেশাখোর ও কুক্রিয়াক্ত ব্যক্তিরা যে-কোন জাতিরই হউক
তাঁহাদের অঙ্গপ্রাণ গ্রহণীয় বলিয়া তাঁহারা দাবী করিতে
পারিবে না । প্রকৃত শুচিতা সকলেরই আদর্শ হওয়া
উচিত ।

প্রবাসী বাঙালীর সম্মান

বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইয়াছেন অনেক। তাঁহার পরই তাঁহা অপেক্ষা বঙ্গকনিষ্ঠ বাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহার আঁকা উৎকৃষ্ট অনেক ছবি আমরা প্রবাসীতে প্রকাশ



শ্রী অসিতকুমার হালদার

করিয়াছি। ইনি অনেক বৎসর হইতে লক্ষ্মোয়ের সরকারী ললিতকলা ও কারুশিল্প বিদ্যালয়ের (Government School of Arts and Crafts এর) অধ্যক্ষের কাজ বোধ্যতার সহিত করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বিলাতী রয়াল সোসাইটি অব আর্টসের সদস্য (Fellow of the Royal Society of Arts) মনোনীত হইয়াছেন। আমরা গত নবেম্বর মাসে যখন লক্ষ্মো গিয়াছিলাম, তখন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নূতন রীতিতে অসিতবাবুর দ্বারা অঙ্কিত একখানি ছবি দেখিয়াছিলাম।

বাঙালী বৈমানিকদের ভূপ্রদক্ষিণ সঙ্কলন

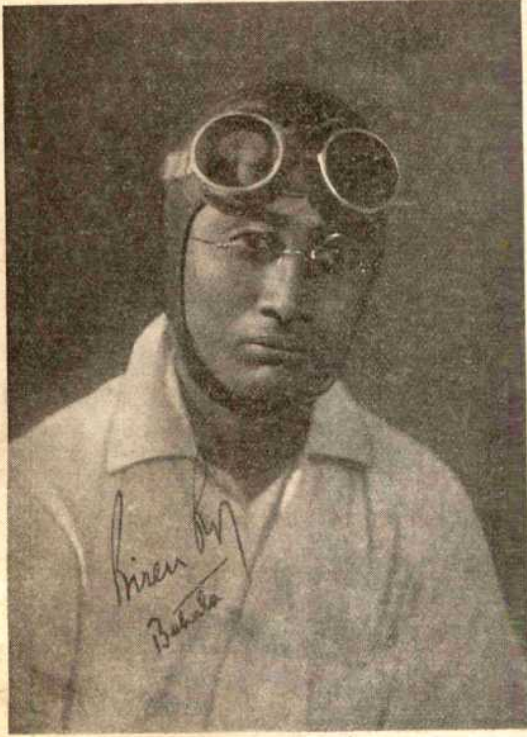
গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে লণ্ডন হইতে মেলবোর্ণ পর্যন্ত বিমান-চালনার প্রতিযোগিতার বৃত্তান্ত দিবার উপলক্ষে আমরা লিখিয়াছিলাম, “দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ।” কাহারও সহিত প্রতিযোগিতায় না হইলেও



শ্রী দেবকুমার রায়

ইহা সুসংবাদ, যে, সম্প্রতি দুই জন বাঙালী যুবক বিমানযোগে ভূপ্রদক্ষিণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতা হইতে লণ্ডন, লণ্ডন হইতে জাপানের রাজধানী তোকিও, এবং তোকিও হইতে কলিকাতা বিমানযোগে ভ্রমণ করিতে চান। ইহাতে মোটামুটি পঁচিশ হাজার মাইল আকাশপথে ভ্রমণ করা হইবে। ইঁহাদের এক জনের নাম শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়। বৈমানিক বলিয়া বঙ্গে ইনি পরিচিত। ইনি বেহালা মিউনিসিপালিটির সভাপতি। অল্প যুবকটির নাম শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়। ইনি বিজ্ঞানে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইবার পর বিলাত যান এবং সেখানে ব্রিটল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করেন। তাহার পর বৈমানিকের সব রকম কাজ শিখিয়া ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বিমান-চালনার “এ” ও “বী” উভয়বিধ লাইসেন্স পাইয়াছেন।

ইনি মিঃ এন্স কম্পার নামক ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিমানচালকের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।



শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

এই দুই যুবকের সম্বন্ধ প্রশংসনীয়। আমরা ইহাদের সাফল্য কামনা করি। এই কাজ কিছু ব্যয়সাধ্য, তবে বেধী ব্যয়সাধ্য নহে। বিমান ক্রয় করিতে ও অত্যন্ত ব্যয় বাবত ইহাদের ত্রিংশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আবশ্যক হইবে। আশা করি সম্ভ্রতিপন্ন লোকেরা ইহাদের সহায় হইবেন।

স্বর্গীয় মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে বাঙালী বালকদের বেঙ্গল একাডেমী নামক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, বি এল, ও বি টি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাদান-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ও অহুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বেঙ্গল একাডেমী ও ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়

সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সংকল্পানুরাগ, চরিত্রবত্তা ও বিদ্যাবত্তার জন্ত তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এই জন্ত, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বেঙ্গল আহত হইয়াছিল, তাহার আহ্বানকারীদের মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় ও ব্রহ্ম-প্রবাসী নানা প্রদেশের ভারতীয়দের নাম ছিল।



স্বর্গীয় মহিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহিত বাবু বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন না; কারণ দূরস্থ ব্রহ্মদেশ তাঁহার কক্ষক্ষেত্র ছিল, বঙ্গে তিনি কচিং আসিতেন। আমরা তাঁহাকে জানিতাম। যখন কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের আয়োজন করা হইতেছিল, তখন উদ্যোক্তারা দূর দূর জায়গার প্রবাসী বাঙালীদিগকে কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায় অনুসারে মহিত বাবুকে সম্মেলনের একটি শাখার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমরা যখন প্রায় ৮ বৎসর পূর্বে রেঙ্গুনে গিয়াছিলাম, তাহার পূর্বে হইতেই তিনি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

পৌষের নানা সভা-সমিতি

আমাদের শাসনকর্তারা খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের প্রধান পর্বে (Christmas কে) বড়দিন বলা হয়, এবং এই বড় দিন উপলক্ষ্যে ও খ্রীষ্টীয় নববর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষ্যে সমুদয় সরকারী আফিস আদালত ও স্কুল কলেজ আদির দিন-দশ ছুটি থাকে। এই সুযোগে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা সভা-সমিতির অধিবেশন হয়। সমুদয় সভা-সমিতির বিস্তারিত বিবরণ দৈনিক কাগজসমূহ ও ছাপিয়া উঠিতে পারেন না—মাসিক কাগজের পক্ষে তাহা অসম্ভব। বাহা ঘটে তাহার বৃত্তান্ত ও সংবাদ দেওয়া দৈনিক কাগজের একটি প্রধান কাজ। বাহা ঘটে এবং সভা-সমিতিতে বাহা বলা হয় এবং যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ ও টিপ্পনী করা মাসিক কাগজের একটা কাজ। কিন্তু এতগুলি সভাসমিতির বক্তৃতা সমূহ ও প্রস্তাবাবলীর উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার জায়গা আমাদের নাই। প্রধান প্রধানগুলির উপরও কিছু বলা আমাদের সাধ্যাতীত। সভাসমিতিগুলির অধিবেশন বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইলে সর্বসাধারণ অনেকগুলিতে কতকটা মন দিতে পারে, আমরাও পারি। কিন্তু সব মাসে তা ভারতবাসী অনুন আট দশ দিন ছুটি পাওয়া যায় না। সুতরাং একই মাসে একই স্থানে বহু সভা-সমিতির অধিবেশন হয়।

কংগ্রেসের জন্ম হইতে বহু বৎসর উহার অধিবেশন হইত পৌষ মাসে। করাচীতে শেষ যে অধিবেশন হয়, তাহা হয় চৈত্র মাসে। তাহার পর রীতিমত অধিবেশন হইয়াছে বোম্বাইয়ে গত কাৰ্ত্তিক মাসে।

এবার পৌষ মাসে খাঁটি সমগ্রভারতীয় রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল পূনায় উদারনৈতিক সংঘের। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জর। ইনি জনহিতকর কাজে সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রতিষ্ঠিত ভারতভূত্যা সমিতির ইনি এক জন প্রধান সভ্য। ইহার বক্তৃতায় জয়েন্ট প্যালেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের বিশ্লেষণ ও তীব্র নিন্দা ছিল। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও খুব কাঁঝাল বক্তৃতা করেন, বলেন, “আমরা জয়েন্ট প্যালেমেণ্টারী কমিটির

রিপোর্ট অনুযায়ী আইন হইলে তদনুযায়ী কাজে গবর্নমেন্টের সহিত বিন্দুমাত্রও সহযোগিতা করিব না।” এলাহাবাদের লীডারের প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তামণি বলেন, “তোমাদের প্রস্তাবিত কমিটিটি উগ্রনটা চাই না, এখন যেটা চলছে বরং তাও ভাল।” অন্য দিকে কিন্তু আর এক উদারনৈতিক নেতা স্তর তেজ বাহাদুর সপ্ত বলিয়াছেন, “নূতন যে শাসনবিধি হইতেছে, সেটা অনুসারে কাজ যে করা যায় না তা নয়। আর, আমরা যদি সেটাকে না চালাই, সেটা আমাদের কাছে চলাইবে।” সুতরাং উদার-নৈতিক কেহই গবর্নমেন্টের সহায় হইবেন না, এমন মনে হয় না।

করাচীতে সমগ্রভারতীয় মহিলা-কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা প্রকার বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। এই কনফারেন্সেও জয়েন্ট প্যালেমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট খুব নিন্দিত হইয়াছে। তা ছাড়া নারীদের শিক্ষা, উত্তরাধিকার, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধের সমর্থক প্রস্তাব অনেক মহিলা-কনফারেন্সে গৃহীত হইয়া গিয়াছে, করাচীতেও হইয়াছে। অনেক নারী কেন ইহার সমর্থন করেন, তাহা বুঝা কঠিন নয়। কিন্তু সমর্থনের যে সব কারণ বলা হয়, তাহা সব প্রদেশে সব পরিবারে সব সখ্যা নারীর পক্ষে খাটে না। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের বসতি ঘন নয়; সব পরিবার দরিদ্র নয়; জন্মনিরোধ দরিদ্রা নারীদের চেয়ে দৌখীন ধনী নারীরাই বেশী করিয়া থাকে; কোন কোন রোগে চিরক্ৰম হুর্কল-দহা মাতাদের পক্ষে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে জন্মনিরোধ আবশ্যিক; কিন্তু অনেক স্থলে সবেল বিবাহিতা নারী ইহা করিয়া থাকে। অবিচারিত জন্মনিরোধের প্রতিকারের জন্য ইটালীতে ও জার্মানীতে নানা উপায়ে বিবাহে ও বহুসন্তানপালনে উৎসাহ দিতে হইতেছে।

পাটনায় যে নিখিলভারতীয় ধনবিজ্ঞান সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে সর্বসাধারণের খুব কোতূহল দেখা গিয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনও পৌষ মাসে কলিকাতায় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে বিজ্ঞানবিদরা আসিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

আরও নানা সভা-সমিতির অধিবেশন নানা স্থানে হইয়াছিল।

ভারতীয়দের পরিচ্ছদ

খবরের কাগজে আজকাল ছবি দেওয়ার রীতি খুব বাড়িয়াছে। এই সব শাদা-কাল ছবি যে-সব মানুষের, তাঁহাদের গায়ের রং তাহা হইতে বুঝিবার যো থাকে না, নাম দেখিয়া ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে হয় তাঁহারা কে। অনেক সভার লোকদের, স্থল-কলেজের ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের ছবিও কাগজে বাহির হয়। তাঁহাদের অধিকাংশের কেবল পরিচ্ছদ দেখিয়া বিচার করিতে হইলে, নাম ছাপা না থাকিলে, মনে হইত তাঁহারা ইউরোপীয়। অনেক সভায় গেলে অবশ্য গায়ের রঙে প্রায়ই বুঝা যায় কে ইউরোপীয় কে নহে; পাগড়ী ও ছাট হইতেও তাহা বুঝা যায়। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের অন্তর্গত ইউরোপীয় কোট, টাই ইত্যাদির সঙ্গে পাগড়ীও দেখা যায়, কিন্তু ছাটও কম দেখা যায় না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, “শিক্ষিত” ভারতীয়েরা পরিচ্ছদে অনেকটা ইউরোপীয় বনিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মহিলারা পরিচ্ছদে ইউরোপীয় বনেন নাই—বদিও অনেকের জ্যাকেট ব্লাউস কতকটা ইউরোপীয় ধরণের বটে। তবে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, কোন কোন মেম-বোঁবা ভারতীয়া শাড়ীটাকেই পরেন আট-সাঁট-খাট স্বাক্টের মত করিয়া।

সম্প্রতি কলিকাতায় যে ছটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে সব উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রতিনিধি এবং প্রায় সব দর্শককে বাঙালী বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে-ছটি জলযোগ-সভায় গিয়াছিলাম, তাহাতে বাঙালী বিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে কয়েক জন এবং পঞ্জাবের বুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রুচিরাম সাহনী ছাড়া (অবশ্য ভারতীয় মহিলাদেরও ছাড়া) আর সকলের পরিচ্ছদ ছিল যোল আনা বা চৌদ্দ আনা ইউরোপীয়।

ইউরোপীয় বলিয়া কোন কিছুর নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বাহা কাজের পক্ষে সুবিধাজনক, বাহা স্বাস্থ্যকর, বাহা অল্পব্যয়সাধ্য, বাহাতে শ্রীলতা রক্ষা হয়, বাহা জটিল ও নানা অঙ্গ বা অঙ্গের সমষ্টি নহে, পরিচ্ছদ এইরূপ হওয়া ভাল। তাহার উপর তাহা সুন্দর এবং জাতীয় হইলে আরও ভাল। জাতীয় বলিতেছি এই জন্ত, যে, তাহা হইলে দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে পার্থক্য কম হয়। অন্তদের সঙ্গে অনাবশ্যক অসাদৃশ্যবৃদ্ধি বাঙালীয় নহে—তাহাতে জাতীয় সংহতি নষ্ট হয়।

খবরের চলন যে কোন সময়েই খুব বেশী হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু আগে যতটুকু হইয়াছিল, এখন তাহাও বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

খবরের কাগজের ছবি এবং নানা প্রাদেশিক সভা-সমিতি দেখিয়া মনে হয়, বাঙালীরা এখনও দলবলে ধুতি ত্যাগ করে নাই।

সুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্র বসু পিতৃশ্রদ্ধের পর ভিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা উদ্বেগজনক সংবাদ। ভিয়েনায় তাঁহার অস্ত্রোপচার হইবে। এখানে তাহা হইবার বোধ হয় উপায় ছিল না। তাঁহার নিজের ব্যয়ে পুলিশ তাঁহাকে ভিয়েনা বাতারাতে টিকিট কিনিয়া দিয়াছে, ইহা মনের ভাল। ইহাতে মনে হয় দেশে ফিরিতে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইবে না। তিনি সুস্থ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসুন এবং দেশের কল্যাণ করুন, ইহাই আমরা চাই।

শরৎ চন্দ্র বসু

শরৎ চন্দ্র বসু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত গবর্নর-জেনারালের সমন পাইয়াছেন। আবার, তিনি গবর্নর-জেনারালেরই হুকুমে রাজবন্দী হইয়া এক জায়গায় (বাসিংগে) আটক আছেন। সুতরাং একই কর্তৃপক্ষ

তাহার উপর পরস্পর-বিরোধী ছুটা হুকুম জারি করিয়াছেন। অবশ্য এই বিরোধভঙ্গনের ক্ষমতাও ঐ কর্তৃপক্ষের আছে। তাঁহাকে পীড়িত পিতাকে দেখিবার ও পরে পিতৃশ্রদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনুমতি ও ছুটি দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবার জন্তও গবর্নেন্ট তাঁহাকে অনুমতি ও ছুটি দিতে পারেন।

বিচারান্তে অপরাধ প্রমাণিত হইবার পর মানুষের যেরূপ শাস্তি হয়, বিনা বিচারে এবং কোন অপরাধ প্রমাণিত না-হইলেও তাহার শাস্তি তার চেয়ে বেশী হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাংলা দেশে—অনেক আছে। শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে ভারত-গবর্নেন্টের স্বরাষ্ট্র-মন্ট্রি বাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই—প্রমাণ থাকিলে ও দিতে পারিলে আদালতে শরৎ বাবুর বিচার হইত। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, তাঁহার বিরুদ্ধে বাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য, তাহা হইলেও নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্ত তাঁহার স্বাধীনতা লোপ এবং কতক অর্থদণ্ড হইত। কিন্তু তাঁহার ব্যারিষ্টারির আয় দীর্ঘ কালের জন্ত নষ্ট হওয়ায় প্রকারান্তরে তাঁহার যে ভরিমানা হইয়াছে সেরূপ প্রভূত অর্থদণ্ড পীতাল কোড অনুসারে কোন অপরাধীরই হয় না, এবং নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্ত স্বাধীনতালোপের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত তাঁহার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। শাসনযন্ত্রের মহিমা।

বলিয়াছেন, উহা বর্তমান জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি বাহির হইবে। তাহাতেও যে বাধা জন্মিতে না-পারে, এমন নয়। সাণ্ডাল্যাণ্ড সাহেবের যে “ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ” পুস্তকের প্রকাশক বলিয়া প্রবাসীর সম্পাদককে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তাহা বিলাতের জর্জ্‌ গ্যালেন এণ্ড্‌ অনউইন নামক প্রকাশকদের ছাপিবার কথা ছিল। সব আয়োজন ঠিক হইয়াছিল, তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হইবে এবং ঐ বাহির বিলাতী সংস্করণও বাহির হইবে। পরে খবর পাওয়া গেল, বিলাতী কর্তৃপক্ষের হুকুমে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিলাতেও মুদ্রাযন্ত্রের ও প্রকাশকদের স্বাধীনতা স্বদেশ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যতটা আছে, ভারতবর্ষীয় ব্যাপারে কার্য্যতঃ ততটা নাই।

কাগজে বাহির হইয়াছে, বিলাতের বার্ণার্ড শ, এইচ জি ওয়েল্‌স্‌, গ্যাল্ডস্‌ হক্‌লী, এবং আল্‌ রাসেল প্রমুখ লেখকগণ এবং ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বাবুর বাহির টাইপ-লিপি বাজেয়াপ্ত করার জোরাল প্রতিবাদ করিয়াছেন বা করিবেন। একরূপ প্রতিবাদ প্রতিবাদকারীদের পক্ষে প্রশংসার বিষয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বার্থ। ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ প্রকাশ সম্পর্কে প্রবাসীর সম্পাদকের দণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রধান প্রধান উদারনৈতিকেরা মিঃ ম্যাকডগ্যাল্ডের কাছে তীব্র প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

সুভাষচন্দ্রের পুস্তক বাজেয়াপ্তী

সুভাষচন্দ্র করাচী পৌছিবার পর তাঁহার জিনিষপত্র হাতড়াইয়া তাহার মধ্য হইতে তাঁহার অচিরে প্রকাশিতব্য ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টা-বিষয়ক রাজনৈতিক পুস্তকের টাইপ-লিপি পুলিশ হস্তগত করে, এবং পরে তাহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। প্রকাশিত হইবার আগেই বাজেয়াপ্ত! শাসন-যন্ত্রের ঘূর্ণনের ফল নানা রকম হইয়া থাকে। বাহা ইউক, সুভাষ বাবুর পুস্তকের উহাই একমাত্র টাইপ-লিপি ছিল না (কোন বুদ্ধিমান ভারতীয় লেখকই স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা-বিষয়ক বাহির একমাত্র পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া বেড়ান না), অল্প একটি তাঁহার বিলাতী প্রকাশকদের কাছে ছিল। তাঁহার

বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা

বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্ত গবর্নেন্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁহারা ১৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে অবৈতনিক আবৃত্তিক শিক্ষা প্রবর্তন না-হওয়া পর্যন্ত মক্তবগুলি এখনকার মতই চালাইতে বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে অমুসলমান ভারতীয়দের মতের মধ্যে মুসলমানরা কুঅভিসন্ধির অস্তিত্ব সন্দেহ করিতে পারেন। সরকারী ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁহাদের বন্ধু; তাঁহাদের মত হয়ত তাঁহারা হুরতিসন্ধিহীন মনে করিবেন। সেই

সব মত প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে তাঁহার সঙ্কলিত দেখিতে পাইবেন।

—

কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিসভা

যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেনকে প্রতি বৎসর স্মরণ করিয়া সমবেত ভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্তব্য বলিয়া বুঝেন। যাঁহারা সমাজ-সংস্কার আবশ্যক মনে করেন কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহারাও এই সাধু পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন কর্তব্য মনে করেন। আধুনিক যুগে রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়া এক দিক দিয়া সমাজ-সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন, বালিকাদের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি, হুঁরাপান-নিবারণ, প্রভৃতির চেষ্টা বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্রই প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিও কেশবচন্দ্রের দ্বারা হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াই সুবিদিত হওয়ায় তিনি যে বাংলার স্থলেখক ছিলেন তাহা যেমন লোকে ভাবে না, তেমনি কেশবচন্দ্রকেও লোকে কেবল ধর্ম্মাচার্য্যই মনে করায় তিনি যে সরল ও প্রাণস্পর্শী বাংলা বলিতেন ও লিখিতেন, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া থাকি। সত্য বাংলা খবরের কাগজের কল প্রচার তিনিই প্রথমে “স্থলভ সমাচার” দ্বারা করেন। উহার দাম ছিল এক পয়সা। আমাদের মনে পড়ে আমরা যখন বাঁকুড়া জেলা-স্কুলে পড়ি তখন উহার অত্যন্ত শিক্ষক ভোলানাথ অধ্বন্যু সপ্তাহে ১৪০খানা পর্য্যন্ত ঐ কাগজ আনাইয়া বিক্রী করিতেন। প্রথম পৃষ্ঠায় উহার নামের নীচে চারি পংক্তি পদ্য ছাপা থাকিত। প্রথম দুই ছত্র—

“সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন

স্থলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।”

অন্ত দুই পংক্তি ঠিক মনে নাই। উহার পূজা-সংখ্যা রঙীন কাগজে ছাপা হইত ও আমাদের বড় প্রিয় ছিল। ইংরেজীতে ইণ্ডিয়ান মিররও কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। সাবেক আলবার্ট-হল তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে অনেকগুলি পরিবার সাম্যবাদী

রীতিতে (communist principle) বাস করিতেন। উহা অবগু কশিয়ার কমুনিজমের মত হিংসার দ্বারা প্রবর্তিত হয় নাই—মানবপ্রীতিরই উহা বাহু প্রকাশ ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও কেশবচন্দ্রের প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। যাঁহারা পরমহংস রামকৃষ্ণের মণ্ডলীভুক্ত বা মণ্ডলীভুক্ত না হইলেও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান, তাঁহারা পরোক্ষভাবে কেশবচন্দ্রেরও নিকট ধনী। কারণ রামকৃষ্ণ ও কেশব উভয়ের আধ্যাত্মিকতা যেমন নিজ নিজ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সাধনায় তেমনি অংশতঃ পরস্পরের প্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

—

শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ

শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ যে সিংহল গবর্নমেন্টের পণ্য-শিল্পবিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়া সিংহল গিয়াছেন,



শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ

তাহা প্রবাদীতে আগে লেখা হইয়াছে। তিনি বঙ্গের সরকারী পণ্যশিল্প-বিভাগে সার্ভেয়ার অব্ ইণ্ডাস্ট্রিজের কাজ করিতেন। তিনি প্রথমে বাদরপুরের এজিনিয়ারিং

স্কুলে শিক্ষালাভ করেন, পরে লিভারপুল গিয়া সেখানে পণ্যশিল্পবিদ্যায় রসায়নবিদ্যায় এম্ এসসী উপাধি লাভ করেন। বাকালোরে গবেষকের কাজও তিনি কিছু দিন করেন। তাঁহার জার্শেনীর অভিজ্ঞতাও আছে।

পাটের চাষ কত কমাইতে হইবে

সরকারী একটি জ্ঞাপন-পত্র হইতে জানা যায়, যে, সরকার পাটচাষীদিগকে পাটচাষের রকম পাঁচ আনা জমিতে এবার “স্বেচ্ছায়” পাটচাষ না-করিতে “পরামর্শ” দিবেন।

পাটচাষ বস্তুতঃ কত কমিবে এবং পাটের দর তাহাতে বাড়িবে কিনা, পরে তাহা বুঝা যাইবে।

“অবনত”দিগের জন্ম আসন সংরক্ষণের কুফল

“অবনত”শ্রেণীসমূহের জন্ম আসন সংরক্ষণের একটা কুফল এই হইয়াছে, যে, তাঁহারা আগে অবনতত্ব অস্বীকার করিয়া আপনাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারা অনেকে এখন সংরক্ষিত আসনগুলির প্রলোভনে সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যৎ কুফল এই হইবে, যে, তাঁহারা সংরক্ষিত আসনের “সুবিধা” হারাইবার ভয়ে অবনতত্ব অস্বীকার করিয়া তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহিবেন না। “উচ্চ” জাতির লোকেরা “অবনত”দের উন্নয়ন চেষ্টায় ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে যোগ দিতেছিলেন। ইহাতে অতঃপর বাধা পড়িতে পারে।

এই সকল আশঙ্কা ও বাধা সত্ত্বেও সমুদয় হিন্দুর মধ্যে সংহতিবুদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

গ্রামশিল্পসভা সম্বন্ধে গুজব

দিল্লী হইতে আগত এই একটা গুজব সব কাগজে স্থান পাইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধী সমগ্রভারতে গ্রামশিল্প পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করায় ভারত-গবর্নেন্ট প্রাদেশিক গবর্নেন্ট-সমূহকে এ-বিষয়ে সচেতন করিয়া

দিরাছেন। তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুজবটা নীরব নহে। অনুমান এই, যে, গবর্নেন্ট চান না, যে, ভারতবর্ষের গ্রামবাসীদের উপর (অর্থাৎ ভারতের অধিকাংশ লোকের উপর) গান্ধীজীর প্রভাব বর্দ্ধিত হয়। গ্রামশিল্প-সকল পুনঃপ্রবর্তিত হইলে গ্রামের লোকেরা উপকৃত হইবে, এবং তাহাদের উপর গান্ধীজীর (মৃতরাং কংগ্রেসের) প্রভাব বাড়িবে। গুজব এই, যে, সরকার তাহা পছন্দ করেন না, এবং এই জন্য সরকার নিজেই সব গ্রামশিল্প সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রবর্তনের ভার লইবেন। বাস্তবিক তাহা লইলে ত ভালই হয়, এবং গান্ধীজীও তাহাই মনে করেন। কিন্তু সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষের অনেক শিল্প যে মৃতপ্রায় তাহা পাশ্চাত্যের (প্রধানতঃ ইংলণ্ডের) বড় বড় কারখানা-সকলের প্রতিযোগিতার ফলে। গ্রামশিল্প পুনঃপ্রবর্তনের মানে ইংলণ্ডীয় অনেক কারখানার জিনিষের কাটুতি কমান। এমন ফল বাহাতে হইতে পারে, বাহাতে ইংরেজ কারখানাওয়ালারা ও ব্যবসাদারদের ক্ষতি হইতে পারে, সেরূপ কাজ ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্নেন্ট করিতে পারেন কি?

গুজবের আর একটা অংশ এই, যে, গবর্নেন্ট সন্দেহ করেন, গান্ধীজীর আসল মতলব গ্রামশিল্পের সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রবর্তনের ব্যপদেশে তিনি গ্রাম্য লোকদের উপর প্রভাব স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে খুব ব্যাপকভাবে আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা চালাইবেন। গবর্নেন্ট বাস্তবিক একরূপ সন্দেহ করিয়া থাকিলে পুলিশের লোকেরা গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত ভারতবাসী সমিতিটির কাজ পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গান্ধীজীর মনে যে একরূপ আশঙ্কা না আসিয়াছে একরূপ বোধ হয় না। তিনি আগে হইতেই সমিতিটিকে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

বোম্বাইয়ে গত অক্টোবর মাসে যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়, তাহাতে বাংলাভাষী সভ্য এক জনও নাই; অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের অঙ্গীভূত কংগ্রেস-প্রদেশসমূহ ভাষা

অন্যসারে গঠিত হইয়া থাকিলেও উহার এক-পঞ্চমাংশ যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে তাহাদের এক জনও ঐ কমিটিতে নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যসংখ্যা ২৫ জন বা অন্ততঃ ২১ জন করিলেই তৎপ্রত্যেক প্রদেশের এক জন করিয়া প্রতিনিধি উহাতে থাকিতে পারেন। তাহা করা হয় না কেন?

বাঙালী এক জনও যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নাই, সেইদোষটি সারিয়া লইবার জন্য কমিটির অধিবেশনে ২১ জন বাঙালী কংগ্রেসওয়ালাকে ডাকা হয়। এবারও ডাকা হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত, যে, এমন কংগ্রেসওয়ালারাই বঙ্গের প্রতিনিধি যাহারা অন্তরে ও বাহিরে স্পষ্টতঃ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরোধী। বঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, সুভাষ বাবুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি-নির্বাচনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, এবং এবার বঙ্গের দুই কংগ্রেসী দলের মধ্যে রফার দ্বারা মিলিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হওয়ার দ্বারাও তাহা অংশতঃ প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বড়নাট

কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গেল বড়নাট তাহার প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। উহা পড়িলে লোকের মনে হইতে পারে, যেন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ভারতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নিজের কর্তব্য করিয়াছেন, এখন অন্তরে বাহ্য করিবার কর্তব্য। আমাদের ধারণা সেরূপ নহে। আমরা মনে করি, গবর্নেন্ট “পিস্তিরক্ষা” মাত্র করিয়াছেন। সব প্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবে দেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বাড়িবে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপিত হইবে। গবর্নেন্টের নিজ ব্যয়ে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দির অল্পই স্থাপিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন ও তাহার কাজ চলা তারকনাথ

পালিত, রাসবিহারী ঘোষ ও খয়রার কুমারের দান ব্যতীত হইতে পারিত না।

বিজ্ঞান কলেজের সকল বিভাগ এক জায়গায় একত্র করিলে তবে উহার কাজ ভাল করিয়া চলে। আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের কাছে জমিও প্রায় আট-নয় বিঘা আছে। দাম আনুমানিক তিন লাখ টাকা পড়িবে। তাহার পর ঘর-বাড়ী নিৰ্মাণের খরচ আছে। ভারত-গবর্নেন্ট অন্ততঃ ঐ তিন লাখ টাকা ত অনায়াসেই দিতে পারেন। তাহা হইলে বুকিব, ভারত-গবর্নেন্ট খুব বিজ্ঞানোৎসাহী।

জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান

শ্রর চন্দ্রশেখর রামন্ বাঙ্গালোরে একটি বৈজ্ঞানিক পরিষদ স্থাপন করিয়া ও তাহার নাম ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (Indian Academy of Science) দিয়া সমগ্র ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষদটি নিজের প্রভুত্বের অধীন রাখিবার চেষ্টা করেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও বাগ-বিতণ্ডার ইহাই সূত্রপাত। সুখের বিষয়, যে, এই ঝগড়া মিটিয়া গিয়াছে, এবং সমগ্র ভারতের জন্য “জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান” (National Institute of Science) কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলাম এই মিটমাট প্রধানতঃ এক জন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক কর্মচারীর মধ্যস্থতায় হইয়াছে। কেবল দেশী লোকদের সুবুদ্ধিতে হইলে আরও সন্তোষের বিষয় হইত।

এই “জাতীয়” প্রতিষ্ঠানটির প্রথম (অবৈতনিক) কর্মচারী ও সদস্যদের তালিকা দ্রষ্টব্য। ইহাদের মোট সংখ্যা ৩৩। তাহাদের মধ্যে ১৩ জন ইংরেজ। সভাপতি ইংরেজ ও সরকারী কর্মচারী, সহকারী সভাপতি ইংরেজ ও সরকারী কর্মচারী। ২০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৬ জন বাঙালী। দু-জন সাধারণ সেক্রেটারীর মধ্যে এক জন সরকারী ইংরেজ কর্মচারী।

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এত বেশী পরিমাণে ইংরেজদের দ্বারা হইয়াছে ও হয়, তাহা সর্বসাধারণের অজ্ঞাত।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

গোরখপুরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন সম্বন্ধে আমরা গত বৎসর ফাল্গুনের প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এ-বৎসর কলিকাতায় যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহার সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিবার আছে। কিন্তু এখনই তাহা লিখিতে পারিতেছি না, পরেও সব কথা পারিব কিনা বলিতে পারি না। তাহার কারণ, এবার প্রবাসীর সম্পাদককে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং দোষ গুণ উদ্ঘাটন, এবারকার অধিবেশন যে-ভাবে হইয়া গেল তাহার জন্ত দায়ী নহেন এমন কোন লোকের দ্বারা হইলেই ভাল হয়।

বাংলা দেশের বাহির হইতে যাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গ বাহারা বিদ্যা ও কৃষ্টির নানা বিভাগে কৃতী তাঁহাদিগকে দেখিবার ও তাঁহাদের কিছু কথা শুনিবার সুযোগ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের কয়েক জন কোন-না-কোন অধিবেশনে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাঙালীদের কলিকাতার কোন কোন প্রতিষ্ঠান দেখাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। এরূপ সব প্রতিষ্ঠান দেখাইবার ও দেখিবার সময় ছিল না। প্রবাসী বাঙালী ও বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে, এই বোধটি উজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ও আমাদের ছিল।

ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের দাবী

জয়েন্ট প্যালেমেন্টারী কমিটির রিপোর্টে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করা হইবে ও পৃথক্ দেশ বলিয়া শাসন করা হইবে। তাহার সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে, যে, ব্রিটিশ সম্রাটের ব্রিটিশ-বংশীয় প্রজারা বা ব্রিটেনের স্থায়ী অধিবাসী অন্ত প্রজারা অবাধে ব্রহ্মদেশে যাইতে, বসবাস করিতে ও তথায় কোন চাকরী ব্যবসায় বা অন্ত কাজ করিতে পারিবে; তাহাতে বাধা হয় এরূপ কোন আইন ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভা প্রণয়ন করিতে পারিবে না। কিন্তু ভারতীয়দের সম্বন্ধে উক্ত রিপোর্টে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত এরূপ কিছু বলা হয় নাই, বরং বলা হইয়াছে, যে, ব্রহ্মের গবর্ণরের সম্মতি

লইয়া ভারতীয়দের ব্রহ্মদেশ-প্রবেশে বাধাজনক আইনের খসড়া ব্রহ্মদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মদেশের গবর্ণর হইবেন জয়েন্ট প্যালেমেন্টারী কমিটির সভ্যদের জাতিভাই ইংরেজ। সুতরাং কমিটি ভারতীয়দের প্রতি-যেক্ষপ ত্রায়পায়ণতা ও মহাহুত্ব দেখাইয়াছেন, গবর্ণর তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ঐ ছটি গুণের পরিচয় দিবেন, আশা করা যায় না—তিনি ওরূপ আইন ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার অনুমতি সহজেই দিবেন।

আমরা এরূপ একটোখো সুপারিশের সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতবর্ষের লোকদের ব্রহ্মদেশে এবং ব্রহ্মদেশের লোকদের ভারতবর্ষে যাতায়াত, বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী প্রভৃতি করার সম্পূর্ণ ও অবাধ অধিকার থাকা উচিত।

ব্রহ্মদেশের আয়তন ২,৩৩,৪৯২ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা মাত্র ১,৩২,১২,১৯২। অর্থাৎ তথায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৫৬ জন করিয়া লোক বাস করে। সুতরাং এরূপ বিরলবসতি বৃহৎ দেশ আরও অনেক লোকের জায়গা হইতে পারে। অব্যবহিত নিকটেই ঘনবসতি ভারতবর্ষ—বঙ্গদেশ ও আসাম। ব্রহ্মের ধর্ম ও কৃষ্টি ভারতবর্ষ হইতে তথায় গিয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক অর্থ ব্রহ্মদেশে ব্যয়িত হইয়াছে ও খাটিতেছে। ব্রহ্মদেশ শীতপ্রধান দেশ নহে, যে, সেখানে কেবল ইউরোপীয়রাই উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে। সুতরাং আইনের জোরে ভারতীয়দিগকে ব্রহ্মে যাইতে না-দেওয়া বা তাহাদিগকে সেখানে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া তাড়ান অত্যন্ত অত্যাচার ও অস্বাভাবিক হইবে।

ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়েরা গত ত্রিষ্টমাসের সময় কন্ফারেন্স করিয়া রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার্থ যে যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহাও বলিয়াছেন। আমরা এই কন্ফারেন্সের প্রস্তাবগুলি ত্রায়সম্মত মনে করি। আশা করি ভারতীয় দৈনিক কাগজ-গুলিতে সেই সকল প্রস্তাবের সমুচিত আলোচনা ও সমর্থন হইবে।

লণ্ডনে ভারতীয় ললিতকলা প্রদর্শনী

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক একটি সমিতি আছে।

এই সমিতিই প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহারা ভারতবর্ষের এবং যে-সব প্রাচ্য দেশ ভারতবর্ষ দ্বারা প্রভাবিত ও ভারতবর্ষ বাহাদের দ্বারা প্রভাবিত, সেই সব দেশের ললিতকলা ও সাহিত্যাদির অনুশীলন করিয়া থাকেন। “ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড লেটাস” নামক ইহাদের একখানি পত্রিকা আছে। তাহা বৎসরে দুই বার বাহির হয়।

এই সমিতি গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতীয় নানা প্রকারের চিত্র, মূর্তি, এবং স্থাপত্যের ফোটোগ্রাফ ও রেখা-চিত্রের প্রদর্শনী খুলেন। প্রদর্শিত জিনিষগুলির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০।

প্রদর্শনীটি খুলিবার তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ১০ই ডিসেম্বর। উহা খোলা হইবার আগে ঐ তারিখের টাইম্‌স্‌ উহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে লিখিত ছিল :—

“It is a much better exhibition than the somewhat scrappy representation of contemporary Indian art that we have had hitherto in London would have led anybody to expect, which is to say that it has completely fulfilled its purpose.”

টাইম্‌স্‌ আরও বলেন :—

“So far as can be judged the representation of the different parts of India is fairly well balanced, and it is unlikely that anything of special significance has been ignored.”

টাইম্‌স্‌ লিখিত হইয়াছে, যে, “A good many of the works are loans,” “প্রদর্শিত সামগ্রীসমূহের অনেকগুলি ঋণ দেওয়া,” অর্থাৎ সেগুলি আর্টিষ্টরা স্বয়ং পাঠান নাই, তৎসমূহদের ক্রেতা বা অন্ত প্রকারের অধিকারীরা পাঠাইয়াছেন। বাহারা বাহারা ঋণ দিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিবার পর টাইম্‌স্‌ লিখিতেছেন :—

“The works are grouped according to States and Provinces. This makes for convenience, though it would be extremely rash for anybody but a person thoroughly acquainted with the whole history of Indian art to attempt a definition of local styles. The broad division is that between the work of the Bombay school and that from other parts of India. It is at Bombay that the application of Western methods of teaching has gone farther. Speaking generally it can be said that the results—in the first gallery—seem to show that such teaching can be digested without serious disturbance to the native tradition. A fair statement of the case would be to say that, having regard to contemporary conditions, the work from Bombay strikes one as being more businesslike,

but that many of the things of the highest artistic interest are to be found elsewhere.”

শেষ উদ্ধৃত বাক্যটিতে বোম্বাইয়ের কাজের সম্বন্ধে মন্তব্যটিকে, আর্টের দিক্ দিয়া, বোম্বাইয়ের শিল্পীরা আপনাদের প্রশংসা মনে করিবেন কিনা জানি না। তাহাতে বাহা বলা হইয়াছে সোজা কথায় তাহার মানে, বোম্বাইওয়ালারা ব্যবসা বুঝে ভাল, কিন্তু উচ্চতম আর্টের নিদর্শন দেখিতে হইলে প্রদর্শনীর অন্তর বাইতে হইবে।

১১ই ডিসেম্বর টাইম্‌স্‌ প্রদর্শনী খুলিবার সভার বৃত্তান্ত দেওয়া হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন বঙ্গের ভূতপূর্ব গবর্নর লর্ড জেটলাণ্ড। পূর্বে তিনি লর্ড রোনাল্ডশে ছিলেন। তিনি বলেন :—

“The art movement noticeable in India during recent years was the outcome of an instinctive impulse towards self-expression. Indian art had certainly been affected by contact with the art of Europe—more so in the West of India perhaps than in the East—and there had been occasions on which it had been in danger of becoming little more than imitative. But when such a tendency had shown itself the movement had always languished, and he had little hesitation in saying that the recent art of India remained true to what, broadly speaking, might be said to have been throughout the centuries the distinguishing characteristic of Hindu art as compared with European art—that the artist had aimed at giving expression to mental concepts than at reproducing the objects of the external world around him.”

“It was the same spirit of revolt against the Westernization of India which had played so large a part in the National Movement that inspired the little circle of men who brought into being the new school of painting in Bengal.”

বিলাতের রয়্যাল একাডেমীর সভাপতি শ্রী উইলিয়াম লিউয়েলিন অতঃপর বলেন :—

“The exhibition was the first complete survey of modern Indian art that had been held in this or any other country, and he thought it would be of great interest to British artists. He quoted a comment made in *The Times* yesterday that the exhibition proved that ‘practically all over India the native talent familiar to us in works of the past survives, and is well worth cultivating.’ This, he thought, was a very important matter. The tendency today was to universalize everything in all matters of life, and art had not escaped. They were glad to see work that indicated that India had developed on its own lines and not on Western lines.”

অতঃপর সহকারী ভারত-সচিব মিঃ বাটলার কিছু বলেন। তাহাতে বোম্বাই বা বাংলা কিংবা বঙ্গে ভারতীয় আর্টের বা তাহার ইউরোপীয় বা বাঙালী প্রবর্তকদের নিন্দা বা প্রশংসা ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেই চলিবে।

"We in this country were apt to hear of India and her doings mainly in connection with politics, and it was a welcome change to politicians as much as to anybody to have an opportunity of assessing the great achievements of modern India in some other field. He was afraid that hitherto only those who had had the chance of visiting India had been able, apart from isolated examples, to realize that India today had an art that was the legitimate successor of all those priceless treasures which dated from the times before the British came to her country."

টাইম্‌সে বাঁহাদের বক্তৃতা বা তাহার সংক্ষিপ্তসার বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে কেবল মাত্র বর্ধমানের মহারাজা, আর কাহারও প্রশংসা বা নিন্দা না করিয়া, বোম্বাইয়ের আর্ট-স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ সলোমনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"He was glad to see the vigorous development of art in Western India under the guidance of Mr. Gladstone Solomon, the Principal of the Bombay School of Art."

অত্যন্ত বিবয়ের মত আর্টের সম্বন্ধেও বর্ধমানের মহারাজার মন্তব্যের মূল্য বাটাই করা অনাবশ্যক।

পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী রীতির প্রশংসা কেহ কেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে তাহা করিলেও হাভেল সাহেব প্রথমে তাহা করিয়া নিন্দাতাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং আধুনিক সময়ে ভারতীয় আর্টের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে হাভেল সাহেবের প্রশংসা কেহ প্রসঙ্গক্রমে করিলে তাহা বেথাপ হইত না। কিন্তু কেহ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন দেখিতেছি না; তবে তাঁহার নিন্দাও চোখে পড়িল না।

অনেকেই মনে করেন, বিলাতী দৈনিক ম্যাক্‌লিষ্টার গার্ডিয়ানের মতের গুরুত্ব আছে। প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে এই কাগজে লিখিত হইয়াছিল :—

"Indian art today is still conscious of its past and its rather muddled present. As a general criticism it may be justly said that those artists who have worked on traditional lines—whether of Buddhist or Hindu or Moslem inspiration—are in a fair way to laying the foundations of modern Indian art, which may well be no less than the great art of her past. Unfortunately, in this renaissance, with few teachers and a sub-conscious feeling that Indian art was Indian rather than universal, many Indian painters turned to Europe or the Far East. Although Indian art in the past has shown that it is capable of assimilating foreign pictorial modes, up to the present the influence of the West and of Japan has been deplorable. This exhibition shows that, if Indian artists are content to work on the basis of the great Buddhist, Hindu, and the Mogul schools, they may succeed in creating an art at least equal to the great art of India's past."

এই মত ঠিক হইলে বাঙালী চিত্রকরেরা ঠিক পথ

ধরিয়াছেন বলিতে হইবে। শুরুর মারে হামিক্‌ এক সময় ভারতবর্ষে কাজ করিতেন। তিনি কোন বাঙালী ভদ্রলোককে যে ব্যক্তিগত চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রদর্শনীটি সম্বন্ধেও কিছু কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"We thoroughly enjoyed our visit to the opening and seeing your work and the pictures from your students. It is a beautiful Exhibition and much appreciated by many visitors. For myself, I think you in Bengal are working on better lines than Bombay—though I dare say for those who have not been to India the Bombay pictures have the greater appeal."

প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে টাইম্‌স্‌ ও ম্যাক্‌লিষ্টার গার্ডিয়ান ছাড়া অত্যন্ত বিলাতী কাগজে মন্তব্য বাহির হইয়া থাকিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। উপরে বাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার ছাড়া প্রদর্শনীর প্রত্যক্ষদর্শী অন্য কোন ইংরেজের মতও আমরা অবগত নহি।

কোথায় কত জন ভোট দিয়াছে

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার যে সভানির্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নির্বাচকদের মোট সংখ্যা, তন্মধ্যে কত জন ভোট দিয়াছিলেন এবং শতকরা কত জন ভোট দিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইতেছে। ইহাতে সব প্রদেশের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।

প্রদেশ	মোট সংখ্যা	ভোট দিয়াছিলেন	শতকরা অনুপাত
আজমীর	৬৫৯৬	৫৮৫৪	৭৬.৬
আসাম	২৮৪৫০	১৩০৩৫	৪৫.৮৯
বাংলা	১৭৮৯৩৫	৫১২২০	২৮.৭
ব্রহ্মদেশ	৫০৫৭৭	১৫১৭১	২০.৯৯
মধ্যপ্রদেশ	৪৫০৫৬	২৬৩৫৭	৫৮.২
দিল্লী	১১৩৭১	৪৩৯২	৩৮.৬২
উ-প. সী. প্র	৭৬১৩	৫৫২৪	৭৩.০০
পঞ্জাব	৬৪০৭৭	৪১৯৮৫	৬৫.৫

দেখা বাইতেছে, যে, বঙ্গে শতকরা কম লোক ভোট দিয়াছে।

নারী নির্বাচকদের তালিকা নীচে দিতেছি।

প্রদেশ	মোট সংখ্যা	ভোট দিয়াছিলেন	শতকরা অনুপাত
আসাম	৬০৪	১১২	১৮.৫৪
বাংলা	৯৩৫৯	৮৯৮	৯.৬
ব্রহ্মদেশ	৬০২৮	১১১১	১৮.৪৩
মধ্যপ্রদেশ	১৩৬৭	২৩৭	১৭.৩
দিল্লী	৯১৩	২৩৭	২৫.৯৫
পঞ্জাব	২৫৪৭	৫৭৮	২২.৭

নারীদের মধ্যেও বঙ্গে শতকরা কম নির্বাচিকা ভোট দিয়াছিলেন।

বাংলা দেশে নানা বিষয়ে অবসাদ ও ওদাসীতা আসিয়াছে। বাঙালী পুরুষ ও নারীর জাগরণ আবশ্যক।

“চার অধ্যায়”

কয়েক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে ছোট উপন্যাসটি পড়িয়াছিলেন, তাহা “চার অধ্যায়” নাম দিয়া সম্প্রতি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রধান নায়ক বিভীষিকাপন্থী অতীন্দ্র, যদিও সে দলের সদ্ধার নয়। দলের সদ্ধার ইন্দ্রনাথ এক জন উপনায়ক। অল্প কয়েক জন উপনায়কেরও দেখা পাওয়া যায়। নায়িকা এলা। এলা দলে থাকিলেও তাহার কৃত কোন বিভীষিকা-গ্রন্থানুসারী বৈপ্লবিক কাজের বর্ণনা বা উল্লেখ পুস্তকে নাই। অতীন্দ্রের নিজের মুখেই তাহার কোন কোন কাজের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যখন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গল্পটি পড়া শেষ করেন, তখন শ্রোতাদের মন এরূপ অভিভূত হইয়াছিল, যে, কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একা আবার পড়িয়া মনের অবস্থা সেইরূপই হইল। একবার শুনিয়াছিলাম, তথাপি কোতূহল হ্রাস পায় নাই। যখন পড়া শেষ করিলাম, তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ করিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

নাগপুরের কংগ্রেস-নেতা অভ্যঙ্কর

নাগপুরের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত অভ্যঙ্করের অকালমৃত্যুতে মধ্যপ্রদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ১৯২১ সালে ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এবারও তিনি উহার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন ডাক্তার মুঞ্জের। তিনি যে ডাক্তার মুঞ্জের অপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার লোকপ্রিয়তা অহমিত হইতে পারে।

আর্নেস্ট বিন্ফীল্ড হাভেল

ভারতীয় ললিতকলার প্রথম ও প্রধান ইউরোপীয় কাথ্যাতা ও সমর্থক, ভারতীয় কাকশিল্পের পুনরুজ্জীবনপ্ররাসী, এবং ভারতীয় আর্থা-ইতিহাসের অন্ততম লেখক কলিকাতা গবন্মেণ্ট আর্ট-স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ আর্নেস্ট বিন্ফীল্ড হাভেল সাহেবের সম্প্রতি ইংলণ্ডে ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে তিনটি লেখা অল্প প্রকাশিত হইল। তাঁহার মূর্তির ফোটোগ্রাফখানি কলিকাতা গবন্মেণ্ট আর্ট-স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে সৌজন্য সহকারে তুলিয়া দিয়াছেন। মূর্তিটি শিল্পী শ্রীযুক্ত কে বেকটাপ্পা নির্মিত। উহা গবন্মেণ্ট আর্ট-স্কুলে আছে।

বঙ্গে ছুঁড়িফ

কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও বা অতিরিক্ত প্লাবনে বঙ্গের অনেক জেলায় ছুঁড়িফ হইয়াছে। অনাবৃষ্টির কুফল দেখা দিয়াছে প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায়। বাঁকুড়া জেলাতেও অল্পাভাব উপস্থিত হইয়াছে। প্লাবন হইয়াছিল মালদহ, রাজসাহী, নদীয়া, বশোহর, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিং জেলার কোন কোন অঞ্চলে।

অল্পস্বল্প সরকারী সাহায্য কোথাও কোথাও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকতর সাহায্য আবশ্যক।

নিখিলবঙ্গ বেকার যুবক সম্মেলন

গত ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় আলবার্ট-হলে নিখিলবঙ্গ বেকার যুবক সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাংলা-গবন্মেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী নবাব কে জি এম ফারোকী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য গবন্মেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন মন্ত্রী-মহাশয় তাহা বলেন। মেয়র মহাশয়, সরকারী ও বেসরকারী কি কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা নির্দেশ করেন।

বেকার সমস্যা দুই প্রকার। “শিক্ষিত” ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উপার্জনের উপায়ের অভাব এক সমস্যা, এবং অশিক্ষিত ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে জীবিকার অভাব আর এক সমস্যা। দুটিরই সমাধান আবশ্যিক। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে যে বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে তথাকার গবর্নেন্ট শ্রম তেজ বাহাদুর সপ্তকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা “শিক্ষিত” শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা।

অবশ্য দুই প্রকার বেকার-সমস্যারই পরস্পরের সহিত সম্পর্ক আছে, এবং রোজগারের কোন্ কোন্ উপায় শিক্ষিতদের ও কোন্ কোন্ উপায় অশিক্ষিতদের অবলম্বনীয়, তাহা ঠিক করিয়া নির্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না। তথাপি বেকার-সমস্যা যে দু-রকমের তাহা মনে রাখা দরকার।

লেখাপড়া জানা লোকদের বেকার অবস্থা নানা কারণে লোকের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাহা দূরীকরণের উপায় অনেকে অনেক রকম বলেন বাহা অহুসারে কাজ বেশী হয় না। তাহার সব দোষ অবশ্য বক্তাদের নয়। আমাদের মাথাতেও নানা বুদ্ধি, খেয়াল বা স্বপ্ন আসিয়া থাকে। তাহার একটা অনেক বার বলিয়াছি, আবার বলি—বদিও তদহুসারে কাজ গবর্নেন্ট করিবেন না। দেশময় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য এত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হউক, যাহাতে পাঁচ বৎসরের উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা সবাই বিনা বেতনে পড়িতে পারে। এইগুলিতে অনেক হাজার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য বাংলা-গবর্নেন্ট আবশ্যিক-মত মূলধন ধার করুন। তাহার সুদ ও আসল সিংহি ফণ্ড স্থাপন দ্বারা শোধ করিবার ব্যবস্থা করুন। জানি, বলা হইবে বাংলা-গবর্নেন্টের টাকা নাই। কিন্তু যে ভারত-গবর্নেন্টের অন্তায় শোষণে বাংলা-গবর্নেন্ট দরিদ্র, সেই ভারত-গবর্নেন্টকে বাংলা-গবর্নেন্ট চাপিয়া ধরুন।

ব্রিটেন-ভারতে বাণিজ্যচুক্তি

ব্রিটেন-ভারতে আবার একটা বাণিজ্যচুক্তি হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় কোন ব্যবস্থাপক সভার, ভারতীয়

লোকদের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন সভার সম্মতি লইয়া এই চুক্তি হয় নাই। ইহা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্নেন্ট এবং ব্রিটেনের ব্রিটিশ গবর্নেন্টের মধ্যে চুক্তি। অথচ ইহার নাম ইণ্ডো-ব্রিটিশ পাক্টি! এটা অটোয়া-চুক্তির ছোট ভাই—সহোদর কিংবা মাসভুতো, বা বল তাই। ইহাতে ব্রিটেনের স্বার্থের দিকে যে খুব দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য, ভারতবর্ষের স্বার্থের কথা না-তোলাই ভাল।

বেলুড়ে লোহার কারখানা

বেলুড়ের কাছে যে বৃহৎ লোহার কারখানা স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে বাঙালীদের মূলধন বোধ হয় বেশী নাই। তাহার জন্য উদ্যোক্তাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। তাহার ডিরেক্টরদের মধ্যে এক জন বাঙালী, এক জন ইংরেজ, দু জন জাপানী ও তিন জন মাড়োয়ারী। কারখানাটি এখন বাংলা দেশে স্থাপিত হইয়াছে, তখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীদিগকে ইহার কাজে নিযুক্ত করিলে তাহা অন্য় ও অস্বাভাবিক হইবে না।

ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষা

করাচীতে সম্প্রতি যে সমগ্রভারতীয় নারী-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষা সমর্থিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীনপন্থীদের মনঃপূত হইবে না। কিন্তু তাহাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে, যখন ছাত্রছাত্রীদের একত্র শিক্ষার উচিত্যাহুচিত্তের কথা কেহ তুলে নাই, তখন হইতে পাঠশালায় ছেলেদের সঙ্গে অনেক মেয়ের লেখাপড়া শেখা চলিয়া আসিতেছে। অতএব, তাহার অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাদের একত্র অধ্যয়নে সম্মতি ও উৎসাহ দান করুন। নতুবা বালিকাদের সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা কবে যে বালিকা-বিদ্যালয়সকলে হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অধ্যায়বিশেষে থাকিতে পারে, না-থাকিতেও পারে।

প্রাচীনপন্থীরা জানেন, কণ্ঠমুনির আশ্রমে পালিতা শকুন্তলার সখী যেমন অননুয়া ও প্রিয়ংবদা ছিলেন, তেমনি সতীর্থ ছিলেন শার্ঙ্গধর ও শারদ্বত। শকুন্তলা কিন্তু ইহাদের কাহারও প্রণয়পাশে বদ্ধ হন নাই—ইহা ছিলেন দুঃসন্ত নামক এক আগন্তকের।

বঙ্গে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব

ভারত-গবর্নমেন্ট বঙ্গদেশে সংগৃহীত রাজস্বের খুব কৌলি অংশ শোষণ করায় বাংলা-গবর্নমেন্ট বরাবরই দরিদ্র। সেই দারিদ্র্য কিঞ্চিৎ দূর করিবার জন্ত গোটা চার পাঁচ নূতন ট্যাক্স বসিবে শুনা যাইতেছে। যথা—(১) বত বৈজ্ঞাতিক শক্তি গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হয়, তাহার একক (unit) প্রতি অতিরিক্ত মূল্য আদায়; (২) থিয়েটার সিনেমা মার্কাস প্রভৃতির এক টাকার কম মূল্যের টিকিটেরও উপর আমোদ-কর; (৩) প্রোবেট-ট্যাক্স বৃদ্ধি; (৪) কোর্ট-ফী বৃদ্ধি; (৫) তামাক ইত্যাদি বিক্রীর জন্ত লাইসেন্স ফী।

বাদবপুর বন্দা-হাসপাতাল

বাদবপুর বন্দা-হাসপাতালে এ-পর্যন্ত ৬১৩ জন রোগী ভর্তি করা হইয়াছে। চিকিৎসার ফলে প্রায় ২০০ অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা ইহার উপকারিতা বুঝা যাইতেছে। ইহাতে মোট ৭৫টি শয্যা আছে, তাহার মধ্যে ২৫টির জন্ত রোগীদের কাছ থেকে টাকা লওয়া হয় না। সঙ্গতিপন্ন লোকেরা সাহায্য করিলে ইহার ছই রকম শয্যারই সংখ্যা বাড়িতে পারে। বাড়ী অবশ্রুত ও উচিত। ডাঃ সুর নীলরতন সরকার মহাশয় ইহার পরিচালক-সমিতির সভাপতি।

সুভাষ বাবুর কয়েকটি মন্তব্য

সুভাষ বাবু ইউরোপ যাইবার জন্ত বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিবার পূর্বে সংবাদিকদিগের প্রশ্নের উত্তরে

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুলিশ তাহাতে বাধা দেয় নাই। তাহাতে বুঝা যায়, তিনি তখন রাজবন্দী ছিলেন না।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণ সুভাষ বাবু কার্যতঃ প্রকৃত অবসরগ্রহণ মনে করেন না। কারণ, কংগ্রেস তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যতালিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই গৌড়া অনুচরেরা এখন উহার কার্যানির্বাহক সমিতির সভ্য, তাহাতে ভিন্নমতাবলম্বী কংগ্রেসওয়ালাদের স্থান হয় নাই, এবং কংগ্রেসের কার্যানির্বাহক সমিতির প্রধান কর্মীরা এখনও গান্ধীজীর পরামর্শ গ্রহণ ও অনুসরণ করেন এবং তিনি পরামর্শ দিয়া থাকেন। সুভাষ বাবুর মন্তব্য ভিত্তিহীন বলা যায় না।

তিনি বলিয়াছেন, জাতীয়তার সার বস্তু বাদ দিয়া ঐক্যস্থাপনের বা ঐক্যের কোন মূল্য নাই। জাতীয়তার উপর দাঁড়াইয়া যদি একতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কার্যতঃ মানিয়া লইয়া ঐক্যস্থাপনের কোনই মূল্য নাই।

সুভাষ বাবুর অতীত কথাও মূল্যহীন নহে।

মডার্ণ রিভিউর উনত্রিংশ বৎসর

আমাদের ইংরেজী মাসিকপত্র মডার্ণ রিভিউকে ভারতবর্ষের বাহিরে, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে, এমন কি বাংলা দেশেও অনেকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র বলেন। আমেরিকার ভারত-বন্ধু সাণ্ডালীও সাহেব ত বলিয়াছেন, এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও আলোচনায় পূর্ণ ইহার মত মাসিক কাগজ আমেরিকায় নাই, ইংলণ্ডেও নাই। এই সব প্রশংসায় আমাদের আনন্দ হয় না বলিলে ঠিক বলা হইবে না। ইহার গ্রাহকসংখ্যাও কম নয়। কিন্তু ইহা যেরূপ বহুবায়সাধ্য ও বহুশ্রমসাধ্য, তাহাতে ইহার গ্রাহকসংখ্যা দ্বিগুণ হইলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। পত্রিকাটি ২৯শ বৎসরে পড়িয়াছে।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা। পুনর্মিলন
শ্রীবিমল দেব

প্রবাসী

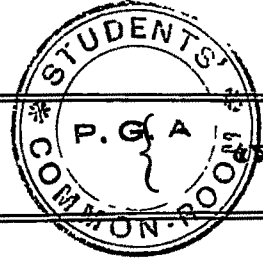
“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নামস্যাং বলাহীনে নভাঃ”

৩৪শ ভাগ

২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪১



৫ম সংখ্যা

ভুল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহসা তুমি করেছ ভুল-গানে

বেধেছে লয় তানে,

অলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা

সরনে তাই মলিন মুখ নত

দাঁড়ালে থতমতো

তাপিত ছুটি কপোল হ'ল রাজা।

নয়নকোণ করিছে ছলোছলো

গুথালে-তবু কথা কিছু না বলো,

অধর থরো থরো

আবেগভরে বুকের 'পরে মালাটি চেপে ধরো ॥

অবমানিতা জানো না তুমি নিজে

মাধুরী এল কী যে

বেদনাভরা ক্রটির মাঝখানে।

নিখুঁৎ শোভা নিরতিশয় তেজে

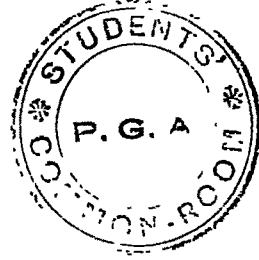
অপরাজেয় সে যে

পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।

একটুখানি দোষের কাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ প্রিয়ে
করণ পরিচয়,
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয় ।

তৃষিত হয়ে ঐটুকুরই লাগি
আছিল মন জাগি
বুঝিতে তাহা পারি নি এতদিন ।
গৌরবের গিরিশিখর 'পরে
ছিলে যে সমাদরে
ভুবর সম শূভ্র স্মৃকঠিন ।
নামিলে নিয়ে অশ্রুজলধারা
ধূসর স্নান আপন মান হারা
আমারো ক্ষমা চাহি'
তখনি জানি আমারি ভূমি নাহি গো দ্বিধা নাহি ।

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায় ।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
সরম ভব পরম করুণায় ।
অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে বোমটা কালো ;
আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে ।



সাহিত্যবিচার

শ্রীরাজশেখর বসু

মানুষের মন একটি আশ্চর্য্য বস্তু। কোন্ আঘাতে এ বস্তু কি রকম সাড়া দেয় তা আমরা অগ্নি জানি। রাম একটি কড়া কথা বললে, অমনি শ্রাম ক্ষেপে উঠল; রাম একটু প্রশংসা করলে, শ্রাম খুশী হয়ে গেল। মনের এই রকম সহজ প্রতিক্রিয়া আমরা মোটামুটি বুঝি এবং তার নিয়মও কিছু কিছু বলতে পারি। কিন্তু রাম যদি ব্যক্তি বা দল-বিশেষকে উদ্দেশ্য না করে কিছু লেখে বা বলে, অর্থাৎ কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে বা বক্তৃতা দেয়, তবে তাতে কোন্ গুণ থাকলে সাধারণ খুশী হবে তা নির্ণয় করা সোজা নয়। পাঠক বা শ্রোতা যদি সাধারণ না হয়ে অসাধারণ হন, যদি তিনি সমঝদার রসজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তাঁর বিচারপদ্ধতি কিরূপ তা বোঝা আরও কঠিন।

একটা সোজা উপমা দিচ্ছি। চা আমরা অনেকেই খাই এবং তার স্বাদ গন্ধ মোটামুটি বিচার করতে পারি। কিন্তু চা-বাগানের কর্তারা চায়ের দাম স্থির করেন কোন্ উপায়ে? এখনও এমন বস্তু তৈয়ারী হয় নি যাতে চায়ের স্বাদ গন্ধ মাপা যায়। অগত্যা বিশেষজ্ঞের শরণ নিতে হয়। এই বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছুই জানেন না। এ'ব সম্বল শুধু জিব আর নাক। ইনি গরম জলে চা ভিজিয়ে সেই জল একটু চেখে বলেন—এই চা দু-টাকা পাউণ্ড, এটা পাঁচ সিকে, এটা এক টাকা তিন আনা। তিনি কোন্ উপায়ে এই রকম বিচার করেন তা নিজেই বলতে পারেন না। তাঁর স্বাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতি অল্প ইতরবিশেষও তাঁর কাছে ধরা পড়ে। এই বিধিসম্মত ক্ষমতার খ্যাতিতে তিনি টি-টেস্টারের পদ লাভ করেন এবং চা-ব্যবসায়ী তাঁর যাচাইকেই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নেয়। তিনি যদি বলেন এই চায়ের চেয়ে এ' চা দ্রব্য ভাল, তবে দু-দশ জন সাধারণ লোকে হয়ত অস্ত মত দিতে পারে। কিন্তু বহু শত বিলাসী লোক যদি এ' দুই চা খেয়ে দেখে তবে অধিকাংশের অভিমত টি-টেস্টারের অনুবর্তী হবে।

যাঁরা সাহিত্যে বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি লাভ করেন তাঁরা টি-টেস্টারের সহিত তুলনীয়। টি-টেস্টারের লক্ষণ—স্বাদ-গন্ধের সূক্ষ্ম বোধ আর অসংখ্য পেয়ালার সঙ্গে পরিচয়। বৈদগ্ধ্য ব্যক্তির লক্ষণ—সূক্ষ্ম রসবোধ আর সাহিত্যে বিপুল অভিজ্ঞতা। স্বাদ গন্ধ কাকে বলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমরা কেবল মনে মনে বুঝি। কিন্তু রসের স্বরূপ সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করাও শক্ত। সাহিত্য-বিচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আপনি কি কি গুণের দ্বারা এই বচনাটিকে ভাল বলছেন—তবে তিনি কিছুই স্পষ্ট করে বলতে পারবেন না। যদি বলতে পারতেন তবে রসবিচারের একটা পদ্ধতি খাড়া হ'তে পারত। তাঁর যদি বিদ্যা জাহির করবার লোভ থাকে (থাকতেও পারে কারণ, বিদ্যা দ্বাতি বিনয়ঃ সব ক্ষেত্রে নয়), তবে তিনি হয়ত আর্টের উপর বক্তৃতা দেবেন, অলঙ্কারশাস্ত্র উদ্ঘাটন করবেন, রসের বিশ্লেষণ করবেন। সেই ব্যাখ্যান শুনে শ্রোতা হয়ত অনেক নূতন জিনিষ শিখবে। কিন্তু রসবিচারের মাপকাঠির সন্ধান পাবে না।

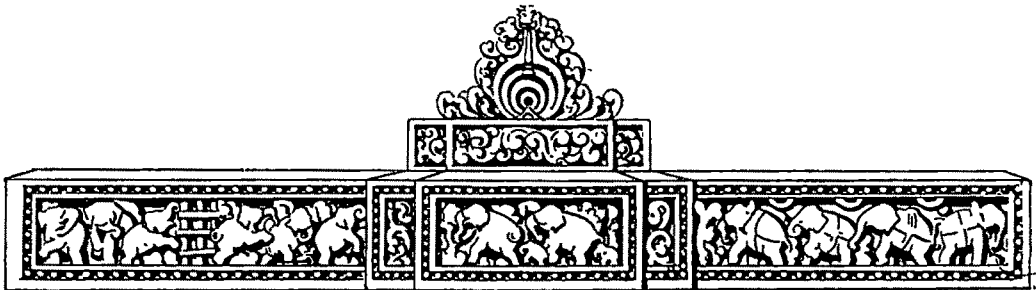
সাহিত্যের যে রস তা বহু উপাদানের জটিল সমন্বয়ে উৎপন্ন। সঙ্গীতের রস অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা লোকপরিম্পরায় জেনে আসছি যে অমুক স্বরের সঙ্গে অমুক স্বর মিষ্ট বা কটু শোনায, কিন্তু কিজন্ত এমন হয় তা ঠিক জানি না। বিজ্ঞানী এইটুকু আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের কানের ভিতরের ঋতিধ্বজে কতকগুলি তন্তু আছে, তাদের কম্পনের রীতি বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট। বিবাদী স্বরের আঘাতে এই তন্তুগুলির অক্ষন্দ স্পন্দনে বাধা হয়, কিন্তু সংবাদী স্বরে হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের রহস্য যদি আবণ্ড জানা যায় তবে হয়ত সঙ্গীতের অনেক তত্ত্ব বোধগম্য হবে। যত দিন তা না হয় তত দিন সঙ্গীতবিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলা চলবে কিন্তু বিজ্ঞান বলা চলবে না।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই

অস্পষ্ট। স্থূললিত বর্ণনার মায়াজালে এই অস্পষ্টতা ঢাকা পড়ে না। কেউ বলেন—art for art's sake, কেউ বলেন—মানুষের কল্যাণই সাহিত্যের কামা, কেউ বলেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসাধন। এই সমস্ত স্বাপ্না কথার রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু বুঝি যে সাহিত্যরসে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু রসের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা ও যোজনায় বিষয় আমরা কিছুই জানি না। যে যে উপাদান সাহিত্যরসের উপজীব্য তাব কয়েকটির সম্বন্ধে আমরা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি, যথা — জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের রুচিকর বিষয় বর্ণন, চিরাগত সংস্কার ও অভ্যাসের আহুকূল্য, মানুষের প্রচ্ছন্ন কামনার তর্পণ, অপ্রিয় বাধার ধ্বংস, অক্ষুণ্ণ অমৃতত্বের পরিস্ফুটন, জ্ঞানের বর্ধন, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এই সকল উপাদানের কতকগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। ওস্তাদ পাচক যেমন কটু অন্ন মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে বিবিধ সুখাদ্য তৈয়ার করে, ওস্তাদ সাহিত্যিকও সেই রকম করেন। খাদ্যে কতটা বি দিলে উপাস্বেয় হবে, কটা লক্ষ্য দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটুকু রহন দিলে বিকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে কতটুকু শাস্তরস বা বীভৎসরস, তৎকথা বা হুর্নাতি ববদাস্ত হবে, এ সবার নির্ধারণ একই পদ্ধতিতে হয়। কয়েক জন ভোক্তার হয়ত বিশেষ বিশেষ রসে অনুরক্তি বা

বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পছন্দই জগতে চরম বলে গণ্য হয় না। যিনি কেবল দলবিশেষের তৃপ্তিবিধান কবেন অথবা কেবল সাধারণ ভোক্তার অভ্যস্ত ভোজ্য প্রস্তুত করেন, তিনি সামান্ত পেশাদার মাত্র। যিনি অসংখ্য খোশখোরাকীর রুচিকে নিজের অভিনব রুচিব অনুরূপ কবতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাহিত্যপ্রজ্ঞা; এবং যিনি অন্তের রচনায় এই প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি করে সাধারণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই সমালোচক হবার যোগ্য।

তামাক একটা বিষ, কিন্তু ধূমপান অসংখ্য লোকে কবে এবং সমাজ তাতে আপত্তি কবে না। কারণ, মোটের উপর তামাকে যতটা স্বাস্থ্যহানি হয় তার ভুলনায় লোকে মজা পায় ঢের বেশী। পাশ্চাত্য দেশে মদ সম্বন্ধেও এই ধারণা, এবং অনেক সমাজে পরিমিত ব্যতিচারও উপভোগ্য বলে গণ্য হয়। মজা পাওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু তাতে যদি বেশী স্বাস্থ্যহানি ঘটে তবে মজা নষ্ট হয় এবং রসের উদ্দেশ্যই বিফল হয়। সাহিত্যরসের উপাদান বিচারকালে সুবীজন এ-বিষয়ে স্বভাবতঃ অবহিত থাকেন। যিনি উত্তম বোদ্ধা বা সমালোচক তিনি মজা ও স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে রসের যাচাই করেন। তাঁর যাচাইয়ের নিক্তি আর কষ্টপাথর কি রকম তা তিনি অপরকে বোঝাতে পারেন না, নিজেও বোঝেন না। তথাপি তাঁর সিদ্ধান্তে বড় একটা ভুল হয় না, অর্থাৎ শিক্ষিত জন সাধারণতঃ তাঁর মতেই মত দেয়।



ধারাবাহী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

এক সময় তোমরা এই বিদ্যালয়ে ছিলে—দূরে গেলে মনের বিচ্ছেদ ঘটতেও পারে, সেই ক্ষণে দু-একটি কথা তোমাদের কাছে বলা প্রয়োজন মনে করি।

আমাদের এই বিদ্যালয় নানারকম যোগাযোগে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সর্বদাই এর মধ্যে একটা মূলতত্ত্ব কান্দ করছে। আমি যদি বলি সে তত্ত্ব আমার, কঠিন হাঁচে ঢালাই ক'রে তাকে বক্ষা করতে হবে—তা হবার নয়; আমি বলব না যে এমন একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে যা চিরকাল থাকবে। এর ভিতরকার সে মূল কথাটি এই যে একটা বৃহত্তর জীবনের ভূমিকায় আমরা অনেকে একসঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছি—নানা বিচিত্রতা বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে একটা প্রাণবান অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে, সে নিজেও জানে না কোন্ পথে যাবে, তার কোনো বাঁধা পথ নেই।

একলা যখন ছিলুম তখন আমার অভিপ্রায়ই এ অস্থানের মধ্যে কাজ করেছে। পথ তখন সহজ ছিল। যখন কথা হ'ল যে সাধারণের হাতে সমর্পণ না করলে এ বেশি দিন স্থায়ী হবে না দেশের যোগ থাকবে না তখন একটা কনস্টিট্যুশন করতে হয়েছিল—তৎপূর্বেই অত্যন্ত দেশের সঙ্গে এর যোগ ঘটেছিল, অনেকে জেনেছিল এর কথা। আমার মতে, এই কলকৌশলের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার প্রয়োজন আছে। তোমরা অনেকে জানো এই বিদ্যালয়ের জন্ত নিজেদের আমি অনেক বঞ্চিত করেছি—সাহিত্য যে আমার পছন্দ তাতেও আমি আবৃত্ত সন্তোষ। আমার অবর্তমানে এ যদি একটা কল মাত্র হয়, তবে কেন এত করেছি। আমার সেই গোপন হৃৎকের ইতিহাস কখনো কেউ জানবে না। আনুকূল্যের চেয়ে অধিক মিথ্যে উক্তি আমি লাভ করেছি—বহু বিজ্ঞপ্তি নিম্না মাধ্যম ক'রে এখন আমার জীবনের শেষভাগ উপস্থিত। এখন যদি এ একটা জীবন্ত পদার্থে পরিণত হয়, এর প্রাণশক্তি না থাকে, তবে ব্যর্থ

হলুম। বতটা দিয়েছি তার কিছুই ফল পাব না তা ইচ্ছে করে না।

তোমরা সবাই অমূলক হবে এমন আমি আশা করি নে, তবে আশা কবি এক দল আছে যাদের এব সম্বন্ধে মমতা থাকা স্বাভাবিক। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এ বিদ্যালয় প্রাণবান, এর মধ্যে অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু এর অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত। তোমরাও যদি তাই মনে করো তবে এর অঙ্গীভূত হয়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা স্থায়ী প্রভাব এর উপরে বিস্তার করতে পারো।

বিরুদ্ধতাকেও আমি স্বীকার করি—তোমাদের কাছে আমি শুধু এইটুকু চাই যে অকৃত্রিম মমতার সঙ্গে একে তোমরা গ্রহণ করো।

কী করে তার অবকাশ হ'তে পারে তা আমি জানি নে—কনস্টিট্যুশন সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি অক্ষম—আমি শুধু আমার ইচ্ছাপ্রকাশ করতে পারি; যখন আমি থাকব না তখন এর মধ্যে প্রাণকে জাগিয়ে রাখতে পারে এমন একটা শক্তি থাকা দরকার—তোমরা যদি অগ্রসর হয়ে একে গড়ে নাও তবে সেই অভাব মোচন হ'তে পারে।*

২

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত—তার ভাবরূপ তখনও অস্পষ্ট, অথচ একদিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিষ্কৃত ছিল কারণ তখন বে-আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অথও আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্ত প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভ-সীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি,

* আশ্রমিক-সংঘের প্রতিনিধিসম্মেলন নিকট কথিত।

যেমনতর স্বর্ঘ্য যখন পশ্চিম অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম বাত্মরস্ত।

অতীতকাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের স্বদয়ের পূর্বরাগ অত্যাঙ্কি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে বা কিছু অবাস্তর তা তখন সত্যই মন থেকে বারে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে বত কিছু আকস্মিক বা কিছু অসঙ্গত সংবৃত্ত থাকে তা তখন স্থলিত হয়ে ধূলিবিহীন; পূর্বে নানা কারণে বাব রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আব পীড়া দেয় না। এই জন্ত গতকালের যে-চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, বাত্মরস্তের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদরূপে অল্প অংশকে বঞ্চিত করতে থাকে। এই জন্তই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিকিড়ভাবে মনে অমুভব ক'রে থাকি। কালের দূরত্বে, যা বার্থসত্য তার বাহুরূপের অসম্পূর্ণতা বুচে যায়, সাধনার কল্পমুষ্টি অক্ষুণ্ণ হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্ত ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার উপকরণ-বিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা অত্যন্ত বেশি ছিল। ক'টি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড় জামগাছতলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা—এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এক কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতার পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্য্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায় কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপে বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তাব পূর্ণ মূল্য ভাবী-কালের প্রত্যাশাব মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোট, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে-সংসাব উপকরণ-বহুলতায়

প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যারা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কষ্টই না তাঁরা এখানে গেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিও না, অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি; এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটবড় জরচাক আছে বা সামান্ত ঘটনাকে শব্দায়িত ক'রে রটনা করে তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিস্তারের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের বার্থ তপস্তা। অর্থের এত অভাব ছিল যে আজ জগদ্ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমেব কোনো সম্পত্তি ছিল না সহায়তা ছিল না—চাইও নি। এই জন্তই, যারা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শ আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয় কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিকিড় হ'তে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল—অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন, পরস্পরের সহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তাব মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার ক'বে তাকে সাধনার আদর্শের অন্তর্গত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রাব পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সঙ্গীতে নানা ক্রটি ঘটতে পারে, একতারায় ভুলচকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন

নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমগ্রন্থাদি সবেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছাও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোট কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড় হয়ে উঠল তখন এক জনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হ'তে পারে না।—অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা—সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে বাদ দিই নে, নানা ভুলত্রুটি ঘটে নানা বিজ্ঞোহ-বিবোধ ঘটে—এ সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে-প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আচ্ছাদিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারাধরে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি বাকে বড় ব'লে জানি, শ্রেষ্ঠ ব'লে বা বরণ করেছি অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নাশিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার বা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিন্তেব সমবেত উদ্যোগে বা উদ্ভাবিত হ'তে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য ক'রে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতৌবিবোধীতাকেও স্বীকার ক'বে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র ক'রে দেখতে পাচ্ছি; দেখছি, আপনি নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তাব ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সম্ভত হ'ল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হ'ল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা চুকেছে তার মধ্যে, সে

সরল গতি আর তাব নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটাই বড়—আশ্রমও স্বতৌধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে। অনেক মানুষের চিন্তাসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে একথা আমি আশা করি—সে-কথা এই যে এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না বার মধ্যে কোনো কলুষ নেই হুংখজনক কিছু নেই—কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে এব মধ্যে বা নিন্দনীয় সেইটাই বড় নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে; কিন্তু পড়াটাই বড় নয়, সেটাকে বড় বললে অস্বতাকে বড় বলতে হয়। যারা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়—নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত ক'রে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকতেই প্রাণের প্রশ্ন। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু—তাকে আলাদা ক'রে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত ক'রে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে—কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়।

আমি এমন কথা কখনও বলি নি আজও বলি নে যে আমি যে-কথা বলব তাই বেদবাক্য—সে রকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তব্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করি নি; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে-কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ঋষি হয়ে থাক। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্তমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি ব্যক্তিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান যেন প্রাণবান হয় কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে, ক্ষয় প্রাণ কল্পনাব সঞ্চরণের পথ

যেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের
আশ্বাদন এক সময়ে যারা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের
সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন—অনেক সময় হয়তো তাঁরা
এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে
গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড় যা সত্য।
আমার বিশ্বাস সেই দৃষ্টিবান অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই
আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হ'ত। এক সময়ে তাঁরা
এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন,
এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ-হ'তেই পারে না।
আমি আশা করি, কেবল নিষ্কিন্ন মমতা দ্বারা নয় এই
অমুষ্ঠানের অন্তর্কর্ত্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন
তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের
কঠিনতা বড় হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে
এখানে যারা ছাত্র ছিলেন, যারা এখানে কিছু পেয়েছেন
কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন
তবেই এ প্রাণবান হবে। এই ক্ষুদ্র আশ্রম আমার এই ইচ্ছা
প্রকাশ করি যে যারা জীবনের অর্থ এখানে দিতে চান যারা

মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান তাঁদের অন্তর্কর্ত্তী ক'বে
নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমবা অবলম্বন
করি। যারা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সন্নিহিত হয়ে
এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ ক'রে রাখুন এই আমবা অমুরোধ।
অন্ত সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কালের জিনিষ না
হয়—তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ
এসে পড়েছে কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেই ক্ষুদ্রই
আহ্বান করি তাঁদের যারা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাদের
মনে এখনও সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি
আমাদের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা
যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত ক'রে রাখেন, নিষ্ঠাধারা
শ্রদ্ধাধারা এর কর্মকে সফল করেন—এই আশ্বাস পেলেই
আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।*

* গত ৮ই পৌষ (১৩৪১ সন) বিবর্ত্তারতী পরিষদের ব্যক্তি
অধিবেশনে আচার্যের অভিভাষণ।

দুই-টি অভিভাষণই শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও
তদনুসারে বিশ্বকবি কর্তৃক সংশোধিত ও অন্তর্মোদিত।

কান্তা

শ্রীমুখীরচন্দ্র কর

বুঝি, তোমার কতই কষ্ট হয় !

সবচেয়ে যে আপন তারেই

পর না করলে নয় !

কোথায় তোমার ক্লম্ব কেশের সযত্ন বিত্বাস

বস্ত্রীন বসন, আখির কোণে বিদ্যা উল্লাস,

কেন যে নাই আয়োজনের একটুকু আভাস

সহজ সমুদ্র,

সব-ই বুঝি :—তোমার কাছে ওসব সজ্জা আভ

প্রেমের লজ্জাময় ॥

সবার কাছে সকল সময় মুক্ত তোমার গতি

পূর্ব হ'তে কথার বেগও বেড়েছে সম্প্রতি,

কেন, কেবল আমার বেলায় ক্রমেই তোমাব মতি

উদাস অতিশয় ;

জানি, তোমার সিদ্ধ করে কোন ডুবুরির তরে

কী রত্ন সঞ্চয় !

ভুলেও তোমার নাম-সে আমার নিন্দা ঘটার পাছে,

সে উদ্বেগের তলায় দবদ সদাই চাপা আছে,

এই ক'রে কি প্রথম প্রেমের কান্তাপরাণ বাঁচে,

মৃত্যু কারে কয় ?

আপনি ম'রে আমার তুমি রাখবে মহীয়ান,

—জয় তোমারই জয় ॥

দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

দাদার মৃত্যুর মাস-তিনেক পরে বাতাসার কাবখানার কুণ্ডুমশায় হঠাৎ মারা গেলেন। এতে আমাদের বিপদে পড়তে হ'ল। কুণ্ডুমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলেরা এসে কারখানা ও বাড়ির দখল করলে। কুণ্ডুমশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিতান্ত ভালমাসুখ পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার হাতের হাজার দুই নগদ টাকা বার ক'রে নিলে। টাকাগুলো হাতে না-আসা পর্যন্ত ছেলের বৌয়েরা সৎ-শান্তভাবে খুব সেবায়ত্ন করেছিল, টাকা হস্তগত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে তাদের মুষ্টি গেল বদলে। যা হুঁশা তার হুকু কবলে ওরা! বাড়ির চাকরাণীর মত খাটাতে লাগল, গালমন্দ দেয়, তুচ্ছতাজিলা করে। আমি একদিন গোপনে বললাম—মাসীমা, পঞ্চকে ডাকঘরের পাস-বই দিও না বা কোন সই চাইলেও দিও না। তুমি অত বোকা কেন তাই ভাবি। আগের টাকাগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে বসলেই বা কি বুঝে?

ডাকঘরের পাস-বইয়ের জন্তে পঞ্চ অনেক পীড়াপীড়ি কবেছিল। শেষ পর্যন্ত হয়ত মাসীমা দিয়েই দিত—আমি সেখান নিজেই কাছে এনে রাখলাম গোপনে। কত টাকা ডাকঘরে আছে না জানতে পেরে পঞ্চ আবও খেপে উঠল। বোকারী হুঁশাব একশেষ ক'বে তুললে। কুণ্ডুমশায়ের স্ত্রী বড় সাধ ছিল সৎছেলেরা তাকে মা বলে ডাকে, সে সাধ তারা ভাল কবেই মেটালে। একদিন আমার চোখের সামনে সৎমাকে বগড়া ক'রে খিড়কীদের দিয়ে বাড়ি বার ক'রে দিলে। আমি মাসীমাকে নিজে বাড়িতে নিয়ে এলাম, চিঠি লিখে তার এক দূরসম্পর্কের ভাইকে আনালাম—সে এসে মাসীমাকে নিয়ে গেল। আমার অসাক্ষাতে মাসীমা আবার বৌদিদিব হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলে গেল যাবার সময়—জিতু মাসীমা বলেছিল,

আমি তিলির মেয়ে, কিন্তু বেঁচে থাক সে, ছেলের কাজ কবেছে। আমার জন্তেই তার কারখানার চাকরিটা গেল, বত দিন অল্প কিছু না-হয়, এতে চালিয়ে নিও, বৌমা। আমি দিচ্ছি এতে কিছু মনে ক'রো না, আমার তিন কুলে কেউ নেই, নিজের বৌয়ের হাতে দিয়ে যদি সুখ পাই, তা থেকে আমার নিরাশ ক'রো না।

পঞ্চ কারখানা থেকে আমার ছাড়িয়ে দিলেও আমি আর একটা দোকানে চাকরি পেলাম সেই মাসেই। সৎমায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করার দক্কন কালীগঞ্জের কেউই ওদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, মাসীমার অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে ভালবাসত। তবে পঞ্চদের টাকার জোর ছিল, সব মানিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন সীতার স্বস্তরবাড়ি গেলাম সীতাকে দেখতে। দাদা মারা যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ এক বেলার জন্তেও ওরা সীতাকে পাঠাতে রাজী হয় নি। সীতা দাদার নাম ক'রে অনেক চোখের জল ফেললে। দাদার সঙ্গে ওর শেষ দেখা মায়ের মৃত্যুর সময়ে। তার পর আমার নিজের কথা অনেক জিগেস করলে। সন্ধ্যাবেলায় ও রান্নাঘরে বসে রাখছিল, আমি কাছে বসে গল্প করছিলাম। ওর স্বস্তরবাড়ির অবস্থা ভাল না, বস্তবাড়িটা বেশ বড়ই বটে, কিন্তু বাস করবাব উপযুক্ত কুঁরী মাত্র চারটি, তাদেরও নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা, চূণবালি-খসা দেওয়াল, কার্নিসের ফাটলে বট অশ্বখের গাছ। রান্নাঘরের এক দিকের ভাঙা দেওয়াল বাঁশের চাঁচ দিয়ে বন্ধ, কার্তিক মাসের হিম তাতে আটকাচ্ছে না। সীতার বড়-জা ওদিকে আর একটা উলুনে মাটির খুলিতে টাটকা খেজুর-রস জাল দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন—মা হবার হয়ে গেল ভাই, এইবার তুমি একটা বিয়ে কর দিকি? এই গাঁয়েই বাঁড়ুঘো-বাড়িতে ভাল মেয়ে আছে, যদি মত দাও কালই মেয়ে দেখিয়ে দিই। সীতা চুপ ক'রে রইল। আমি বললাম—

একটা সংসার ঘাড়ে পড়েছে, তাই অতি কষ্টে চালাই, আবার -
একটা সংসার চালাব কোথা থেকে দিদি? সীতা বললে—
বিয়ে আর কাউকে করতে বলি নে মেজদা, এ অবস্থায়
বড়দারও বিয়ে করা উচিত হয় নি। তোমারও হবে না।
তার চেয়ে তুমি সন্নিহিত হয়ে বেড়াচ্ছিলে, ঢের ভাল
করেছিলে। আচ্ছা মেজদা, তুমি নাকি খুব ধার্মিক হয়ে
উঠেছ সবাই বলে?

আমি হেসে বললাম—অপরের কথা বিশ্বাস করিস্ নাকি
তুই? পাগল! ধার্মিক হলেই হ'ল অমনি—না? আমি
কি ছিলাম না-ছিলাম তুই ত সব জানিস সীতা। আমার
ধাতে ধার্মিক হওয়া নয় না, তবে আমার জীবনেব আর
একটা কথা তুই জানিস নে, তোকে বলি শোন।

ওদের মালতীর কথা বললুম, হু-জনেই একমনে শুনলে।
ওর বড়-জা বললে—এই ত ভাই মনের মত মানুষ ত
পেরেছিলে—ওরকম ছেড়ে এলে কেন?

আমি বললাম—এক তরফা। তাতে দুঃখই বাড়ে,
আনন্দ পাওয়া যায় না। সীতা ত সব শুনলি, তোর কি
মনে হয়?

সীতা মুখ টিপে হেসে বললে—এক তরফা ব'লে মনে
হয় না। তোমার সঙ্গে অত মিশত না তা হ'লে—বা
তোমার সঙ্গে কোথাও যেত না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি আর একবার
সেখানে যাও, মেজদা। আমি ঠিক বলছি তুমি চলে
আসবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে তার আখড়া নিরেখাকা
কাঁকা কাজ। ছেলেমানুষ, নিজের মন বুঝতে দেরি হয়।
এইবার একবার যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এস ত?

সীতা নিজের কথা বিশেষ কিছু রলে না, কিন্তু ওর
ওই শাস্ত্রমোনতার মধ্যে ওর জীবনের ট্র্যাজেডি লেখা
রয়েছে। ওর স্বামী সত্যিই অপদার্থ, সংসারে বখেট দারিদ্র্য,
কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে হু-পরদা আনবার চেষ্টা করবে
না। এক ধরনের নিরুৎসাহী লোকেরা মনের আলস্ত ও
দুর্ভাগতা প্রসূত ভয় থেকে পুজো-আচার প্রতি অনুরক্ত
হয়ে পড়ে, সীতার স্বামীও তাই। সকালে উঠে ফুল তুলে
পুজো করবে, স্নানের সময় তুল সংস্কৃতে স্তবপাঠ কববে,
সব বিষয়ে বিধান দেবে, উপদেশ দেবে। একটু আদা-চা

খেতে চাইলাম—সীতাকে বারণ ক'রে ব'লে দিলে রবিবারে
আদা খেতে নেই। ছপুরে খেতে উঠেই বিছানায় গিয়ে
শোবে, বিকাল চারটে পর্যন্ত ঘুমবে—এত ঘুমুতেও পারে।
এদিকে আবার ন'টা বাজতে না-বাজতে রাত্রে বিছানা
নেবে। সীতা বই পড়ে ব'লে তাকে বখেট অপমান সহ
করতে হয়। বই পড়লে মেয়েরা কুলটা হয়, শাস্ত্রে নাকি
লেখা আছে।

মেথলাম লোকটা অত্যন্ত দুর্ভাগ ও বটে। কথায় কথায়
আমার মুখে একবার বীণুজীঠের নাম শুনে নিতান্ত অসহিষ্ণু
ও অভদ্র ভাবে ব'লে উঠল—ওসব স্লেচ্ছ ঠাকুরমেবতার নাম
ক'রো না এখানে, এটা হিন্দুর বাড়ি, ওসব নাম এখানে
চলবে না।

সীতার মুখেব দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলাম, নইলে
এ-কথার পর আমি এ বাড়িতে আর জলম্পর্শ করতাম না।
সীতা ওবেলা পায়ের পিঠে খাওয়ার আয়োজন করছে
আমি জানি, তার আদরকে প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন
সরল না। আমি রাগ ক'রে চলে গেলে ওর বুকে বড় বিধবে।
ওকে একেবারেই আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি সবাই মিলে।
সীতা একটাও অনুযোগের কথা উচ্চারণ করলে না। কান্নার
বিকল্পেই না। বৌদিদিকে ব'লে ব'লে একখানা লম্বা চিঠি
লিখলে, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললে—আমায়
পাঠাবে না কালীগঞ্জে, তুমি মিছে ব'লে কেন মুখ নষ্ট করবে
মেজদা। দরকার নেই। তার পর জল-ভরা হাসি-হাসি
চোখে বললে—আবার কবে আসবে? ভুলে থেক না
মেজদা, শীগগির আবার এসো।

পথে আসতে আসতে ছপুরের রোদে একটা গাছের
ছায়ায় বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলুম। উম্প্লাউয়ের মিশন-
বাড়ির কথা মনে পড়ল, মেমেরা সীতাকে কত কি ছুঁচের
কাজ, উল-বোনার কাজ শিখিয়েছিল যত্ন ক'রে।
কার্ট রোডের ধারে নদীখাতের মধ্যে বসে আমি আব সীতা
কত ভবিষ্যতের উজ্জল ছবি এঁকেছি ছেলেমানুষী মনে—
কোথায় কি হয়ে গেল সব। মেয়েরাই ধরা পড়ে বেশী,
জগতের দুঃখের বোঝা ওদেরই বইতে হয় বেশী ক'রে।
সীতার দশা যখনই ভাবি, তখনই তাই আমার মনে হয়।
মনটাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে সীতার স্বামীর একটা

কথায়। সে আমার লক্ষ্য ক'রে একটা শ্লোক বললে কাল রাত্রে। তার ভাবার্থ এই—গাছে অনেক লাউ ফলে, কোন লাউয়ের খোলে কুম্ভল্য গাইবার একতারা হয়, কোন লাউ আবার বাবুর্চি রাঁধে গোমাংসের সঙ্গে।

তার বলবার উদ্দেশ্য আমি হচ্ছি শেখোক্ত শ্রেণীর লাউ। কেন-না, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণেব আচার মানি নে। দেবদেবীর পূজো-আচ্ছা করি নে ওর মত। এই সব কারণে ও আমাকে অত্যন্ত কুপার চক্ষে দেখে বুঝলাম এবং বোধ হয় নিজেকে মনে মনে হরিনামের একতারা বলেই ভাবে।

ভাবুক তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার মতের সঙ্গে মিল না হ'লেই সে যদি আমার ঘৃণা করে তবে আমি নিতান্ত নাচার। কোন্ অপরাধে আমি বাবুর্চির হাতে-রাঁধা লাউ? ছেলেবেলায় হিমালয়ের ওক্ পাইন বনে তপস্তান্তরু কাঞ্চনজঙ্ঘার মূর্তিতে ভগবানের অস্তরূপ দেখেছিলাম, তাই? রাঢ়দেশের নির্জন মাঠের মধ্যে সম্ভায় সেবার সেই এক অপরূপ দেবতার ছবি মনে এঁকে গিয়েছে, তাই? সেই অজানা নামহীন দেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলি—বে বা বলে বলুক। আমি আচার মানি নে, অনুষ্ঠান মানি নে, সম্প্রদায় মানি নে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত মানি নে, গোঁড়ামি মানি নে, আমি আপনাকে মানি। আপনাকে ভালবাসি। আপনার এই বননীল দিগন্তের রূপকে ভালবাসি, বিশ্বের এই পথিক রূপকে ভালবাসি। আমার এই চোখ, এই মন জন্মজন্মান্তরেও এই রকমই রেখে দেবেন। কখনও যেন ছোট ক'রে আপনাকে দেখতে শিখি নে। আর আমার উপাসনার মন্দির এই মুক্ত আকাশের তলার বেন চিরযুগ অটুট থাকে। এই ধর্মই আমার ভাল।

২

বাড়ি ফিরে দেখি বৌদিদি অত্যন্ত অস্থির পড়েছে।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কারও সাহায্য পাই নে, ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—দাদাব বড় মেয়েট আট বছরের হ'ল, সে সমস্ত কাজ করে, আমি রাঁধি আবার বৌদিদির সেবাসুশ্রী করি। রোগিণীর ঠিকমত সেবা পুরুষের

দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও আমি আর খুকীতে মিলে যতটা পারি করি।

বৌদিদির অস্থির দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ—বৌদিদি অচৈতন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে, ছেলেমেয়েরা যা খুকী তাই করছে, ঘরের জিনিষপত্র ভাঙছে কেলেছে ছড়াচ্ছে—এখানে নেংরা, ওখানে অপরিষ্কার—কোন্ জিনিষ কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, হঠাৎ অসময়ে আবিষ্কার করি ঘড়ার খাবার জল নেই, কি লণ্ঠন জালাবার তেল নেই। বাজার নিকটে নয়, অন্ততঃ দেড় মাইল দূরে এবং বাজারে যেতে হবে আমাকেই। স্ততরাং বেশ বোঝা যাবে অসময়ে এসব আবিষ্কারের অর্থ কি।

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাটল। এই এক মাসের কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। আমি জানতুম না কখনও যে জগতে এত দুঃখ আছে বা সংসারের দারিদ্র্য এত বেশী। রাত দিন কখন কাটে ভুলে গেলেম, দিন, বার, তারিখের হিসেব হারিয়ে। কেলেছিলাম—কলেব পুতুলেব মত ডাক্তারের কাছে যাই, রোগীব সেবা করি, চাকুরি করি, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করি। এই দুঃসময়ে দাদার আট বছরের মেয়েটা আমাকে অজুত সাহায্য কবলে। সে নিজে রাঁধে, মায়ের পথ্য তৈরি করে, মায়ের কাছে বসে থাকে—আমি যখন কাছে বেরিয়ে যাই ওকে ব'লে যাই ঠিক সময় ওষুধ খাওয়ানোতে কি পথ্য দিতে।

মেজাজ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, একদিন কোথা থেকে এসে দেখি রোগিণীর সামনের ওষুধের মাসে ওষুধ রয়েছে, খুকীকে ব'লে গিয়েছি খাওয়ানোতে কিন্তু সে ওষুধ মাসে চলে মায়ের পাশে রেখে দিয়ে কোথাও চলে গিয়েছে। দেখে হঠাৎ রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আর ঠিক সেই সময় খুকী আঁচলে কি বেঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি রুদ্ধ হুঁরে বললাম—খুকী এদিকে এস—আমার গলার হুব শুনে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে ভয়ে ভয়ে, দু-এক পা এগিয়ে আসতে লাগল, বরাবর আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বললাম—তোর মাকে ওষুধ খাওয়ানো নি কেন? কোথায় বেরিয়েছিলি বাড়ি থেকে?

সে কোন জবাব দিতে পারলে না—ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কি যে রাগ হ'ল চণ্ডালের মত! তাকে পাখার বাট দিয়ে আখালি-পাখালি মারতে লাগলাম—প্রথম ভয়ে মার খেয়েও সে কিছু বললে না, তার পরে আমার মারের বহর দেখে সে ভয়ে কেঁদে উঠে বললে—ও কাকাবাবু আপনার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারবেন না, আমি আর কখন এমন করবো না—

তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে আঁচলের প্রান্ত থেকে ছোটো মুড়ি পড়ে গেল মেজ্ঞেতে। সে মুড়ি কিনতে গিয়েছিল এক পয়সার খিদে পেয়েছিল বলে। ভয়ে তাও যেন তার মনে হচ্ছে কি অপরাধই সে ক'রে ফেলেছে।

আমার জ্ঞান হঠাৎ ফিরে এল। মুড়িকটা মেজ্ঞেতে পড়ে যাওয়ার ঐ দৃশ্যে বোধ হয়। নিজেই সামলে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন ভাবলাম—**ছি** এক কি ক'রে বসলাম! আট বছরের কচি মেয়েটা সারাদিন ধরে খাটছে, এক পয়সার মুড়ি কিনতে গিয়েছে আর তাকে এমন ক'রে নির্মমভাবে প্রহার করলাম কোন্‌ প্রাণে?

জীবনে কত লোকের কত বিচার করেছি তাদের দোষগুণের জন্তে—দেখলাম কাউকে বিচার করা চলে না—কোন্‌ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কে কি করে সে কথা কি কেউ বুঝে দেখে?

বৌদিদির অল্প ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। দিন-দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দেখে ভয়ে আমাব প্রাণ উড়ে যাচ্ছে; এদিকে, এক মহা হুস্কিন্সা এসে জুটল, যদি বৌদিদি নাই বাচে—এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করব? বিশেষ ক'রে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কি করি? ছোট খুকী মোটে এই দশ মাসের—কি হুন্দর গড়ন, মুখ, কি চমৎকার মিষ্টি হাসি! এই দেড় মাস তার অবস্থার এক শেব হচ্ছে—উঠোনের নারকোণতলায় চটের থলে পেতে তাকে রন্ধুরে শুইয়ে রাখা হয়—বড় খুকী সব সময় তাকে দেখতে পারে না—কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্নাত বন্ধ এই দেড় মাস—হালিক খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে। রাতে আমার পাশে তাকে শুইয়ে

রাখি, মাঝরাতে উঠে এমন কান্না শুরু করে মাঝে মাঝে—ঘুমের ঘোরে উঠে তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াই—কড় খুকীকে আর ওঠাই নে। রাতে ত প্রায়ই ঘুম হয় না, রোগীকে দেখা-শুনো করতেই রাত কাটে—মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। পাড়ায় এত বৌ-ঝি আছে—দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বললে না যে খুকীকে নিয়ে গিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই। আমি একা কত দিকে যাব—তা ছাড়া আমার হাতের পয়সাও ফুরিয়েছে। এই দেড় মাসের মধ্যে সংসারের রূপ একেবার বদলে গিয়েছে আমার চোখে—আমি ক্রমেই আবিষ্কার কবলাম মানুষ মানুষকে বিনা স্বার্থে কখনও সাহায্য করে না—আমি দবিত্ত, আমার কাছে কান্নার কোন স্বার্থের প্রত্যাশা নেই, কাজেই আমার বিপদে কেউ উকি মেরেও দেখতে এল না। না আহুক, কিন্তু কোলেব খুকীটাকে নিয়ে যে বড় মুন্সিলে পড়ে গেলাম! ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর অমন কাঁচা সোনার বঙের ননী পুতুলেব মত ক্ষুদ্রে দেহটিতে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কি করবো ভেবে পাই নে, আমি একেবারেই নিরুপায়। স্তম্ভহৃৎ আমি ওকে দিতে ত পারি নে?

কিন্তু এব মধ্যে আবার মুন্সিল এই হ'ল যে স্তম্ভহৃৎ ত দুরের কথা, গরুর দুধও গ্রামে পাওয়া ছুফর হয়ে উঠল। গোয়ালারা ছানা তৈরি ক'রে কল্‌কাতায় চালান দেয়, দুধ কেউ বিক্রী করে না। এক জন গোয়ালাব বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটো-একটার এদিকে দুধ দিত না। খুকী বিদেতে ছট্-ফট্ করত, কিন্তু চুপ ক'রে থাকত—একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো-আঙুলটা তার মুখেব কাছে সে সময় ধরলেই সে কচি অসহ্য হাত ছাটি দিয়ে আমাব আঙুলটা ধরে তার মুখের মধ্যে পূরে দিয়ে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বৃষ্ণতাম মাতৃস্নাত-বঞ্চিত এই হতভাগ্য শিশুর স্তম্ভক্ষুধার পরিমাণ।

ওকে কেউ দেখতে পারে না—হু-একটি পাড়ার মেয়ে যারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করত। ওব অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারা গেল, ওর মা শক্ত অস্থি পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাস যখন-তখন হাসা—কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, সে

আপন মনে ঘরের আড়ার দিকে চেয়ে কি ক'রে একগাল হাসবে। তার সে ক্ষুধাশীর্ণ মুখের পবিত্র, স্নানর হাসি কতবার দেখেছি—কিন্তু সবাই বলত, আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে? উঠানের নারকোশতলায় চটপেতে রৌদ্রে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কত দিন দেখেছি নীল আকাশের দিকে চোখ-ছুটি তুলে সে আপন মনে অবোধ হাসি হাসছে। সে অকারণ, অপার্থিত হাসি কি অপূর্ণ অর্থহীন খুলিতে ভরা। ছোট্ট দেহটি দিন-দিন হাড়সার হয়ে যাচ্ছে, অমন সোনার রং কাশো হয়ে গেল, তবুও ওর মুখে সেই হাসি দেখেছি মাঝে মাঝে—কেন হাসে, কি দেখে হাসে কে বলবে?

এক এক দিন রাতে ঘুম ভেঙে দেখি ও খুব চোঁচিয়ে কাঁদছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। বড় খুকীকে বলতাম, একটু দুধ দে ত গরম ক'রে, হয়ত শিমেয় কাঁদছে। সব দিন আবার রাতে দুধ থাকত না। সেদিন আঙুল চুবিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াতে হ'ত। একদিন সকালে ওর কান্না দেখে আব থাকতে পারলাম না—বোগীর সেবা ফেলে হু-ক্ৰোশ তফাতের একটা গ্রাম থেকে নগদ পয়সা দিয়ে আখ সের দুধ জোগাড় ক'রে নিয়ে এসে ওকে খাওয়ালুম। গোয়ালাকে কত খোসামোদ করেও বেলা বারোটোর আগে কিছুতেই দুধ দেওয়ানো গেল না।

মাহুষ যদি বিবেচনাহীন হয়, নির্বোধ হয় তবে বাইরে থেকে তাকে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর মনে করা দোষের নয়। যখন খুকীর দুধের জন্তে আমি সারা গ্রামখানার প্রত্যেক গোয়ালাবাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছি যদি সকালের দিকে কেউ একটু দুধ দিতে পাবে—বে বলেছে হয়ত ওখানে গেলে পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি, আগাম টাকা দিতে চেয়েছি কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—সে সময় ঠিক আমার বাড়ির পাশেই হুপপতি মুখুন্দের বাড়িতে দেড় সেব ক'রে দুধ হ'ত। হুপপতি সস্ত্রীক বিদেশে থাকেন, বাড়িতে থাকেন তাঁব বিধবা বড় ভাজ নিজের একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে। এঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা কোঠা বাড়ি ছ-সাতটা গরু, জমিজমা, ধানভবা গোলা। সকালে মাঝে-ঝিরের চা খাবার জন্তে দুধ দোয়া

হয়, মেয়েটি নিজেই গাই দুইতে জানে, সকালে আখ সের দুধ হয়, দুপুরে বাকী এক সের। ওরা জানেন যে দুধের জন্তে খুকীর কি কষ্ট যাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথ্য হয়েছে অনেকবার, আমার অনেকবার প্রোচা মহিলাটি ব্রিগেসও করেছেন আমি দুধের কোনো সুবিধে কবতে পারলাম কি না—হুচার দিন সকালে ডেকে আমার চাও খাইয়েছেন কিন্তু কখনও বলেন নি এই দুধটুকু নিয়ে গিয়ে খুকীকে খাওয়াও ততক্ষণ। আমিও কখনও তাঁদের বলি নি এ নিয়ে, প্রথমতঃ আমার বাধ-বাধ ঠেকেছে, দ্বিতীয়তঃ, আমার মনে হয়েছে এঁরা সব জেনেও যখন নিজে থেকে দুধের কথ্য বলেন নি, তখন আমি বললেও এঁরা ছলছলতো তুলে দুধ দেখেন না। তবুও আমি এঁদের নিষ্ঠুর বা স্বার্থপর ভাবতে পারি নে—বিবেচনাহীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব এঁদের অবকম ক'রে তুলেছে।

কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—“ওর কষ্ট আমি আর দেখতে পারি নে, আপনি ওকে একটু দুধ দিন।” ওর মুখের সে অবোধ উজ্জাসের হাসি প্রতিবার ছুরির মত আমার বুকে বিঁধেছে। কতবার মনে মনে ভেবেছি আমি যদি দেশের ডিক্টেটর হতাম, তবে আইন ক'রে দিতাম শিশুদের দুধ না-দিয়ে কেউ আর কোন কাজে দুধকে লাগাতে পারবে না।

কতবার ভেবেছি বৌদিদি যদি না বাচে, এই কচি শিশুকে আমি কি ক'রে মাহুষ করব? স্তম্ভহৃৎ একে কেউ দেবে না এই পাড়ারগারে, বিশিয়ে দিলেও মেয়েসন্তান কেউ নিতে চাইবে না—নিতান্ত নীচু জাত ছাড়া। আটঘরাতে থাকতে ছেলেবেলার এরকম একটা ব্যাপার শুনেছিলুম—গ্রামের শশিপদ ভট্টাচারের স্ত্রী মারা যায় ছুটি শিশুসন্তান রেখে। শশিপদ ভট্টাচারের কেউ ছিল না—এদিকে শিশু দুটিই মেয়ে, অবশেষে যত সুচির বৌ এসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সোনার খুকীকে সেই বকম বিশিয়ে দিতে হবে পরের হাতে? কত বিনিত রজনী কাটিয়েছি ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে এই ভাবনায়। এই বিপদে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে মালতীর কথা। মালতী আমার এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, সে কোন উপায় বার করবেই, যদি

খুকীকে বুকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না। তার ওপর অভিমান ক'রে চলে এসেছিলাম, দেখা পর্যন্ত ক'রে আসি নি আসবার সময়—আর তার পর এতদিন কোনো খোঁজখবর নিই নি—একখানা চিঠি পর্যন্ত দিই নি, আমার বিপদের সময়ে সে আমার শব্দ দোষ ক্ষমা ক'রে নেবে।

কিন্তু খুকী আমার সব চিন্তা থেকে মুক্ত ক'রে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যে এসেছিল কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল। কিছুই সে চায় নি, শুধু একটু মাতৃস্নেহ, কি লোলুপ হয়ে উঠেছিল তার জন্য, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুটি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমার আঙুলটা আঁকড়ে ধরে কি অধীর আগ্রহে সেটা চুম্বত মাতৃস্নেহ ভাবে। আমারও কি কম কষ্ট গিয়েছে অবাধ শিশুকে এই প্রতারণা করতে? জগতে কত লোক কত ক্ষমত অসমত খেলা পরিভূত করবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে, আর একটি ক্ষুদ্র, অক্ষুটবাক শিশুর নিতান্ত ত্যাগ একটা সাধ অপূর্ণ হয়ে গেল কেন তাই ভাবি।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১

বৌদিদি ক্রমে সেরে উঠলেন, কিছুদিন পরে আমার হঠাৎ একদিন একটু জ্বর হ'ল। ক্রমে জ্বর বেকে দাঁড়াল, আমি অজ্ঞান অচেতন হয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন যাব জ্বর ছাড়ে না। একুশ দিন কেটে গেল। দিনের রাতের জ্ঞান হারিয়ে কলেছি যেন, কখন রাত কখন দিন বুঝতে পারি'নে সব সময়। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখি বাইরের রোদ একটু একটু ধরে এসেছে তখন বুঝি এটা দিন। রিছানার ওপাশটা ক্রমশঃ হয়ে গেল বহু দূরের দেশ, আফ্রিকা কি জাপান, ওখানে পৌছানো আমার শরীর ও মনের শক্তির বাইরে। অধিকাংশ সময়ই ঘোর-ঘোর ভাবে কাটে—সে অবস্থায় যেন কত দেশ বেড়াই, কত জায়গায় বাই। যখন বাই তখন যেন আর আমার অস্থখ থাকে না, সম্পূর্ণ সুস্থ আনন্দে মন ভবে ওঠে, রোগশয্যা স্তম্ভ ব'লে মনে হয়। ছেলেবেলাকার সব জায়গাগুলোতে আবার গেলাম যেন,

আটঘরার বাড়িও বাদ গেল না। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, দেখি কুলদা ডাক্তার বুকে নল বসিয়ে পরীক্ষা করছে।

একবার মনে হ'ল ছপুর বাঁ-বাঁ করছে, আমি দ্বার-বাসিনীতে বাচ্ছি ছোট খুকীকে কোলে নিয়ে। দুর্গাপুরের ডাঙা পার হয়ে গেলাম, আবার সেই কাঁদোড় নদী, সেই তালবন, রাজা মাটির পথ। মালতী বড় ঘরের দাওয়ার বসে কি কাজ করছে। উদ্ধবদাস আমার দেখে চিনলে, কাছে এসে বললে—বাবু যে—কি মনে ক'রে এতদিন পবে? আপনার কোলে ও কে? মালতী কাজ কলে মুখ তুলে দেখতে গেল উদ্ধবদাস কার সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। তাব পর আমার চিন্তে পেরে অবাধ ও আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে রইল। আমি এগিয়ে দাওয়ার ধারে গিয়ে বললাম—তুমি কি ভাববে জানি নে মালতী, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েছি এসেছি। এই ছোট খুকী আমার দাদার মেয়ে, এর মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে। একে বাঁচিয়ে রাখবাব কোন ব্যবস্থা আমার মাথায় আসে নি। আর আমার কেউ নেই—একমাত্র তোমার কথাই মনে হ'ল, তাই একে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। একে নাও, এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর। তুমি ছাড়া আর কারও হাতে একে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

মালতী যেন তাড়াতাড়ি খুকীকে আমার কোল থেকে তুলে নিলে। তার পর আমার রক্ত চুল ও উদ্ভ্রান্ত চেহারার দিকে অবাধ হয়ে চেয়ে বইল। পরক্ষণেই সে দাওয়া থেকে নেমে এসে বললে—আপনি আহুন, উঠে এসে বহুন।

আখড়ায় আর যেন কেউ নেই। উদ্ধবদাসকেও আর দেখলাম না। শুধু মালতী আর আমি। ও ঠিক সেই বকমই আছে—সেই হাসি, সেই মুখ, সেই ঘাড় বাকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। হেসে বললে—তার পর?

আমি বললাম—তার পর আর কি? এই এলাম।

—এতদিন কোথাব ছিলেন?

—নানা দেশে। তার পর দাদা মারা গেলেন, আমার ওপরে ওদের সংসারের ভার।

—উঃ কি নিষ্ঠুর আপনি!

তার পর সে বললে—আপনি বহুন খুকীর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। একবার নীরদা-দিদিকে ডাকি।

আমি বললাম—আমি কিন্তু এখনই যাব মালতী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলে রেখে এসেছি পরের বাড়িতে। আমাকে যেতেই হবে।

মালতী আশ্চর্য হয়ে বললে—আজই? আমি বললাম—আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এখন ভূমি যা করবে কর খুসীকে নিয়ে। আমি থেকে কি করব? আমি যাই।

মালতী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—আমার নিয়ে যান তবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি মালতী? তুমি বাবে আমার সঙ্গে? তোমার এই আখড়া?

মালতীর সঙ্গে যেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিনটি যেমন ও চোখ নামিয়ে কথা বলেছিল—ঠিক তেমনই ভঙ্গিতে চোখ মাটির দিকে রেখে স্পষ্ট ও দৃঢ় স্বরে বললে—আপনি আমার নিয়ে চলুন সঙ্গে যেখানে আপনি যাবেন। এবার আপনাকে একলা যেতে দেব না।

* * * *

একচল্লিশ দিনে অর ছেড়ে গেল। সেরে উঠলে বৌদিদি একদিন বললেন—অরের ঘোরে 'মালতী' 'মালতী' ব'লে ডাকতে কাকে? মালতী কে ঠাকুরপো?

আমি বললাম—ও একটি মেয়ে। বাদ দাও ও-কথা। রোজ বলতাম? কত দিন বলেছি?

এই অস্থ-বিস্থে মাসীমার দেওয়া সেই একশো টাকা ত গেলই, বৌদিদির 'গানের সামান্ত বা 'হু-একখানা গহনা ছিল তাও গেল। নতুন চাকুরীটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামালপুর ব'লে একটা গ্রাম আছে। নিতান্ত পাড়ারগাঁ এবং জঙ্গলে ভরা। সেখানকার হু-এক জন জানাশোনা ভদ্রলোকের পরামর্শে সেখানে একটা পাঠশালা খুললাম। বৌদিদিদের আপাততঃ কালীগঞ্জে রেখে আমি চলে গেলাম কামালপুরে। একটা বাড়ির বাইরের ঘরে বাসা নিলাম—বাড়ির মালিক চাকুরীস্থানে থাকেন, বাড়িটাতে অনেক দিন কেউ ছিল না। বাড়ির পিছনে একটা বড় আম-কাঁটালের বাগান।

পাঠশালার অনেক ছেলে জুটল—কতকগুলি ছোট মেয়েও এল। বা আর হয়, সংসার একরকম চলে যায়।

সময় বড় বড় মনের লাগ মুছে দেবাব মন্ত্র জানে। আবার নতুন মন, নতুন উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অধ্যায় কি রকমে শুরু হ'ল তাই এখানে বলব।

পাঠশালা খুলবার পরে প্রায় ছ-বছর কেটে গিয়েছে। তাত্র মাস। বেশ শরতের রোদ ফুটেছে। বর্ষার মেঘ আকাশে আর দেখা যায় না। একদিন আমি পাঠশালার গিয়েছি একটা ছোট মেয়ে বলছে—মাষ্টার মশায়, পেনো হিরণদিদির হাত আঁচড়ে কামড়ে নিয়েছে, ওই দেখুন ওর হাতে রক্ত পড়ছে।

যে মেয়েটির হাতে আঁচড়ে নিয়েছে তার নাম হিরণ্যরী, বয়স হবে বছর চোদ্দ, পাঠশালার কাছেই ওদের বাড়ি—কিন্তু মেয়েটি আমার পাঠশালার ভর্তি হয়েছিল বেশী দিন নয়। ওর বাবার নাম কালীনাথ গাঙ্গুলী, তিনি কোথাকার আবাদের নায়ক, সেইখানেই থাকেন, বাড়িতে খুব ~~কম~~ই আসেন।

আমি লক্ষ্য করেছি এই মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত চঞ্চল। সকলের চেয়ে সে বয়সে যেমন বড়, সকলের চেয়ে সে সভ্য ও সৌধীন। কিন্তু তার একটা দোষ, কেমন একটু উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে।

একদিন কি একটা অঙ্ক ওকে দিলাম, সবাইকে দিলাম। ওর অঙ্কটা ভুল গেল। বললাম—তুমি অঙ্কটা ভুল করলে হিরণ? অঙ্কটা ভুল গিয়েছে শুনে বোধ হয় ওর রাগ হ'ল—আর দেখেছি সব সময়, অপর কারোর সামনে বকুনি খেলে ও খেপে ওঠে। খুব সম্ভব সেই জন্তই ও রাগের স্বরে বললে—কোথায় ভুল? কিসের ভুল? ব'লে দিন না? আমি বললাম—কাছে এস, অতদূর থেকে কি দেখিয়ে দেওয়া যায়? আমি দেখে আসছি যে কুদিন ও এসেছে, আমার কাছ থেকে দূরে বসে।

ও উদ্ধতভাবে বললে—কেন এখান থেকেই বলুন না? আপনার কাছে কেন যাব?

আমার মনে হ'ল ও বড় মেয়ে ব'লে আমাব কাছে আসতে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু তার জন্যে ওরকম উদ্ধত হ'র কেন? বললাম—কাছে এসে আঁক দেখে নিতে দোষ আছে কিছু? ও বললে—সে-সব কথার কি

দরকার আছে? আপনি দিন অঙ্ক ওধান থেকেই বুঝিয়ে।

রাগে ও বিরক্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল। আচ্ছা মেয়ে ত? মাষ্টারের সঙ্গে কথাবার্তার এই কি ধরণ? আর আমার যখন এত অবিধাস তখন আমার জ্বলে না-এলেই ত হয়? সেদিন আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথাই বললাম না। পরদিনও তাই, জ্বলে এল, নিজে ব'সে ব'সে কি লিখলে বই দেখে, একটা কথাও কইলাম না। ছুটির কিছু আগে আমার বললে—আমার ইংরিজিটা একবার ধরুন না? আমি ওর পড়াটা নিয়ে তার পর শান্তভাবে বললাম—হিবণ, তোমার বাড়িতে ব'লো, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। অন্য ব্যবস্থা করতে ব'লো কাল থেকে।

হিরণ্ময়ী মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল—বললে—কেন?

আমি বললাম—না—তুমি বড় মেয়ে, এখানে তোমার সুবিধা হবে না।

ও বললে—রাগ করেছেন নাকি? কি করেছি আমি?

আমি বললাম—কাল তোমার ও-কথাটা কি আমার বলা উচিত হয়েছে হিরণ? কি ব'লে তুমি বললে আপনার কাছে কেন বাব?...এখান থেকেই বলুন না? তুমি আমার কাছে তবে পড়তে এসেছ কেন?...

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—এই! তা কি এমন বলেছি, আমি? তা যখন আপনি বলছেন দোষ হয়েছে বলাতে, তখন দোষ নিশ্চয়ই হয়েছে।

—কেন তুমি বললে ও রকম? তোমার হৃৎখিত হওয়া উচিত ওকথা বলার জন্যে, তা জান?...

হিরণ্ময়ী বললে—হা, হয়েছে! হ'ল ত? এখন নিন।

তার পর যখন ওর অঙ্ক দেখছি, তখন হঠাৎ আমার মুখের দিকে কেমন একটা বৃষ্টিতে না-পারার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উঃ আপনার এত রাগ?...আগে ত কখন রাগ দেখি নি এ রকম?...তখনও সে আমার মুখের দিকে সেই রকম দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। ওর রকম-সকম দেখে আমি হাসি চাপতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে হিরণ্ময়ীকে নতুন চোখে দেখলাম। দেখলুম হিরণ্ময়ী অত্যন্ত লাভণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত ডাগর, টানা-টানা

জোড়া ভুরু দুটি কাল সুরু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা ছোট, অর্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কাল চুল।

ও তখনও আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। এক মিনিটের ব্যাপারও নয় সবটা মিলে।

পরদিন থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হিরণ্ময়ী আমার কাছে থেকে ততদূরে আর বসে না—আর না-ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন আমার বললে—জানেন মাষ্টার-মশায়, আমার সব দল এরা—আমায় এরা ভয় করে।

অবাক হয়ে বললুম—কারা?

হাত দিয়ে পাঠশালার সব ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—এরা। আমার কথা না-শুনে কেউ চলতে পারে না।

—ভয় করে কেন?

—এমনি করে। আমি যা বলব ওদের শুনতেই হবে।

পাঠশালার সকলেরই ওপর সে ছকুম ও প্রভুত্ব চালায়, এটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—সেদিন থেকে সেটা লক্ষ্য করলাম। তবে পেনো, যে সেদিন ওর হাত আঁচড়ে নিরেছিল সে আলাদা কথা। দেশের রাজার বিরুদ্ধেও ত তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়?

রোজ রাতে বাসায় এসে সন্ধ্যাবেলা পরোটা গড়ি। ছ-এক দিন পরে সন্ধ্যাবেলা ময়দা মাখাচি একা রান্নাঘরে বসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী নয়, একটা হারিকেন-লঠন জ্বলছে ঘরে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী। শব্দবাক্তে উঠে বিস্মিত মুখে বললাম—হিরণ! এস এস, কি মনে ক'রে?...

হিরণ্ময়ী একটা স্বভাব গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি, কখনই প্রশ্নের ঠিক জবাবটি দেবে না। আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বললে—ময়দা মাখেন বুঝি নিজে রোজ? ওই বুঝি ময়দা মাখা হচ্ছে?

আমি বিপন্ন হয়ে পড়লুম—চোদ্দ বছরের মেয়েকে পাড়গাঁয়ে বড়ই বলে। আমার কাছে এরকম অবস্থার

আসাটা কি ঠিক হ'ল ওর? এসব জায়গার গতিক আমি জানি ত?

বললাম—তুমি যাও হিরণ, পড়গে।

হিরণ্যী হেসে বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি যাব না—এই বললাম। বেজায় একসুয়ে মেয়ে, আমি ত জানি ওকে। বললে—একটা অঙ্ক কষে দেবেন? না—থাক্, একটা গল্প বলুন না?...ও আপনি বুদ্ধি ময়দা মাখবেন এখন! সন্ধান, সন্ধান দিকি! আমি মেখে বেলে দিচ্ছি। কি হবে রুটি না লুচি?...আপনি এই পিড়িটাতে বসে শুধু গল্প করুন।

সেই থেকে হিরণ্যীব রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাহায্য করতে আসা চাই-ই। মুহু প্রদীপের আলোতে ও হাসি-হাসি মুখে সে তার খাতাখানা খুলে নামে অঙ্ক কষে—কাজে কিছু সে আমার রুটি পরোটা তৈরি ক'রে দেয়। কিছুতেই আমার বারণ শোনে না—ওর সঙ্গে পারব না ব'লে আমিও কিছু আব বলি নে। ওর মায়ের বারণও ও শোনে না, একদিন কথাটা আমার কানে গেল।

শুনলাম একদিন মাকে বলছে ওদের বাড়িব উঠানে ঝাঁড়িয়ে—কেন বাই তাই কি? আমি অঙ্ক কষতে বাই। বেশ করি—যাও।

হিরণ্যীকে বললাম—শোন হিরণ, আমার এখানে সন্ধ্যাবেলা আর এস না—যখন তোমার মা বকেন। আমার কথাটা অন্ততঃ তোমার মামা উচিত। বুঝলে?

পরদিন হিরণ্যী সত্যিই আর এল না। আমার সন্ধ্যাটা কেমন ঘেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ওর না আসাতে, সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম। সাত-আট দিন কেটে গেল—হিরণ্যী পাঠশালাতে রোজই আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করি না অবিশ্তি কেন সে সন্ধ্যাবেলা আসে না।

একদিন সে পাঠশালাতেও এল না। ছ-তিন দিন পরে জিগ্যাস্ ক'রে জানলাম সে মামার বাড়ি গিয়েছে তাব মায়ের সঙ্গে।

দেখে আশ্চর্য হলাম যে আমার পাঠশালা আর সে পাঠশালা নেই—আমার সন্ধ্যাও আর কাটে না। হিরণের বিয়ের সন্ধ্যা হচ্ছে ওর মামার বাড়ি থেকে, মেয়ে দেখাতে

নিয়ে গিয়েছে—বরপক্ষ ওখানেই মেয়েকে আশীর্বাদ করবে।

মামুষেব মন কি অজুত ধবণের বিচিত্র! হঠাৎ কথাটা শুনেই মনে হ'ল এ গাঁয়ের পাঠশালা উঠিয়ে দেব, অন্ততঃ চেষ্টা দেখতে হবে। কেন, যখন প্রথম পাঠশালা খুলেছিলাম এ গাঁয়ে, তখন ত হিরণের অপেক্ষায় এখানে আসি নি, তবে সে থাক্-লা বা গেল—আমার তাতে কি আসে যায়?

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। আমি কলেব মত কাজ করে বাই, একদিন সামান্য একটু বাদলামত হয়েছে—পাঠশালার ছুটি দিয়ে সকাল-সকাল বামা সেরে নেব ব'লে রান্নাঘরে ঢুকেছি, বেশা তখনও আছে। এমন সময় দোরের কাছে দেখি হিরণ্যী এসে হাসিহাসি মুখে ঝাঁড়িয়েছে। আমি বিশ্বয়মিশ্রিত খুশীর হরে ব'লে উঠলাম—এস, এস হিরণ,—কখন এলে তুমি? ব'লো।

হিরণ্যী বললে—কেমন আছেন আপনি? তাব পর সে এগিয়ে এসে সলজ্জ আড়ষ্টতার সঙ্গে ঝপ্ ক'রে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে আবার সোজা হয়ে দোরের কাছে দাঁড়াল।

আমি এত খুশী হয়েছি তখন, ওকে কি বলবো ভেবেই পাই নে ঘেন। বললাম—ব'লো হিবণ, ঝাঁড়িয়ে কেন?

হিরণ্যী বোধ হয় একটু স্কোচের সঙ্গেই এসেছিল, আমি ওর আসাটা কি চোখে দেখি—এ নিয়ে। আমার কথা শুনে—হাস্জাব হোক নিতান্ত ছেলেকামুষ ত?—ও ঘেন ভবসা পেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা পি'ড়ি পেতে বসল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি সেই শিথিরে দিলেন, 'নয় পরিত্যাগ-প্রণালী' না কি? দব ভুলে গিয়েছি—হি-হি—

দেখলাম ওর বিয়ে হয় নি—ওকে আর কোন কথা বলি নি অবিশ্তি তা নিয়ে। দেনা-পাণ্ডনার ব্যাপার নিয়ে সে-সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে—হুচাব দিনে অপরের মুখে শুনলাম। আবার হিরণ্যী আমার পাঠশালাতে নিত্য আসে যায়—সন্ধ্যাবেলাতেও বোজ আসে—ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তার সন্ধ্যায় আসা কামাই যাবে না। কেন তার মা এবার তাকে বকেন না—সে কথা আমি জানি নে—তবে বকেন না যে এটা আমি জানি।

বরং একদিন হিরণ্যী বললে—আজ আলো জেলে...

একটা বই পড়ছি, মা বললে আজ যে তুই তোর মাষ্টারের কাছে গেলি নে বড়? তাই এলুম, মাষ্টার মশায়। আমি বললাম—তা বেশ ত, গল্পের বই পড়লেই পারতে। মা না বলে দিলে ত আজ আসতে না?

কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অলঙ্কিতে একটা অভিমানের সুর বাব হয়ে গেল—হিরণ্যী সেটা বুঝতে পেরেছে অমনি! এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এইটুকু বয়সে!—বললে—নি, আর রাগ করে না। ভেবে দেখুন, আপনিই না আমার এখানে এল তাড়িয়ে দিতেন আগে আগে?

হুঃখিত ভাবে বললাম—ছি: ও-কথা বলে না হিরণ, তাড়িয়ে আবার তোমায় দিয়েছি কবে? ও-কথাতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

হিরণ্যী মুখে কাপড় দিয়ে ধিল্ ধিল্ করে উচ্ছ্বসিত ছেলেমানুষী হাসির বত্মা এনে দিলে। ঝড় হুলিয়ে হুলিয়ে বলতে লাগল—না—না দেন নি? বটে? একদিন—সেই—তাড়ালেন না! আজ আবার বলা হচ্ছে—পরে আমার স্নেহের নকল করতে চেষ্টা করে—ওতে আমাব মনে কষ্ট দেওয়া হয়—কি মানুষ আপনি!—হি-হি-হি-হি—

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত স্বকুমার লাবণ্যভরা মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—চোখ আর কেরাতে পাবি নে—কি অপূর্ণ হাসি! কি অপূর্ণ চোখ মুখের স্ত্রী!

যখন চোখ নামিয়ে নিলাম তখন সে আমার বেলুনটা তুলে নিয়ে ঝুটি বেলতে বসে গিয়েছে। সেদিন ও যখন চলে যায়, ঝোঁকের মাথায় অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই শুকে আবার বললাম—এ রকম আর এস না, হিবণ। না সত্যি বলছি তুমি আর এস না।

মনকে খুব দৃঢ় ক'বে নিয়ে কথাটা বলে ফেলেই ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা ভীক ভীক খচ ক'রে বিধলো। দেখলাম ও বুঝতে পারে নি আমি কেন একথা বলেছি—কি বোধ হয় দোষ ক'রে ফেলেছে ভেবে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে উদ্বেগে ও ভয়ে।

আমার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে রইল—যদি মুখের ভাবে কাবণ কিছু বুঝতে পারে। না-বুঝতে পেরে যাবার সময় দেখলাম শুক বিবর্ণ মুখে বললে—আমায় তাড়িয়ে দিলেন না? এই দেখুন—তাড়ালেন কি না।

হুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। নিমগ্নাচ্ছটাব তলা দিয়ে ও ওই যাচ্ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি, ডেকে ছুটো মিষ্ট কথা বলব, ছেলেমানুষকে একটু সান্ত্বনা দেব?...

ডাকলুম শেষটা না-পেরে।—শোনো ও হিবণ—শোনো—ও দাঁড়াল না—শুনেও শুনলেনা, হুঃহুঃ ক'রে হেঁটে বাড়ি চলে গেল। পরদিন খুব সকালে উঠে বারান্দাতে বসে আউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ছি—হিরণ এসে দাঁড়িয়ে বললে—কি কচ্ছেন?—এস, এস হিরণ। কাল তোমাকে ডাকলাম রাজে, এলে না কেন? তুমি বড় একশুয়ে মেয়ে—একবার শোনা উচিত ছিল না কি বলছি?

মুখরা বালিকা এবাব নিজমূর্তি ধরলে। বললে—আমি কি ফুরুর না শেয়াল, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, আবার তু ক'রে ডাকলেই ছুটে আসব? আপনি বুদ্ধি মনে ভাবেন আমার শরীরে বেরা নেই, অপমান নেই—না? আমি বলতে এলাম সকালবেলা যে আপনার পাঠশালায় আমি পড়তে আসব না—মা অনেক দিন আগেই বারণ করেছিল—তবুও আসতাম, তাদের কথা না-শুনে। কিন্তু যখন আপনি কুকুর-শেয়ালের মত দূর ক'রে তাড়িয়ে—ওর চোখে জল ছাপিয়ে এসেছে—অথচ কি তেজ ও নপের সজ্জ কথাগুলো বললে সে! আমি বাধা দিয়ে বললাম—আমায় ভুল বুঝো না ছি: হিরণ—আচ্ছা, চেষ্টাও না বেশী, কেউ শুনলে কি ভাববে। আমাব কথা শোন—রাগ কবে না ছি:।

হিরণ দাঁড়াল না এক মুহূর্ত। অতটুকু মেয়ের রাগ দেখে যেমন কৌতুক হ'ল, মনে তেমনই অত্যন্ত কষ্টও হ'ল। কেন মিথ্যে ওর মনে কষ্ট দিয়েছি কাল? আহা, বোচরী বড় হুঃখ ও আশ্বাস পেয়েছে। আমাব জ্ঞান আর হবে কবে? ছেলেমানুষকে ও-কথাটা ও-ভাবে বলা আমার আদর্শ উচিত হয় নি।

মন অত্যন্ত ধাবাপ হয়ে গেল—ভাবলাম, এ গ্রামের পাঠশালা তুলে দিয়ে অস্ত্র বাবই। এদিকে হিরণ্যীও আর আমার পাঠশালাতে আসে না। মাসের বাকী আটটা দিন পড়িয়ে নিয়ে পাঠশালা তুলে দেব ঠিক ক'রে ফেললাম। সবাইকে বলেও রাখলাম কথাটা। আগে থেকে যাতে সবাই অস্ত্র ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে। (ক্রমঃ)

যুরোপে জীবননীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

শান্তিনিকেতন

প্রকাশ্যদেয়

আপনার প্রেবিত বইখানি পেলুম।

পৃথিবীতে যুগান্তর এলো। তার লক্ষণ যুরোপে দেখা দিচ্ছে। কারণ যুরোপে মানুষ ভালোয় মন্দায় বেঁচে আছে সম্পূর্ণরূপে।

অতীত ইতিহাস যদি সন্ধান করি তবে দেখতে পাব, কী আর্থিক কী সামাজিক পদ্ধতি মানবসংসারে একটানা চলে আসে নি। এক মহাভারত আলোচনা করলে তার যত পরিচয় পাই তেমন কোনো একখানা বইয়ে পাওয়া যায় না। যে সব রীতি সব শেষে পরিণত হয়েছে তাই যে সব চেয়ে ভালো আমাদের চার দিকে চেয়ে দেখলে সে কথা মানা যায় না।

মানুষ অনেক প্রথা তৈরি করে তুলেছে যা মোটের উপর কাজ-চালানে, অথচ বা নানা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হুঃখকর, এমন কি, মনুষ্যের অপমানজনক। জীবনযাত্রা যখন সংকীর্ণ পরিধিতে স্তব্ধ হয়ে জটাবহুল ছিল না তখনকার প্রত্যেক রীতিনীতি ধর্মের নামে সনাতন চেহারা ধারণ করবার শান্ত অবকাশ পেয়েছিল। যেখানে অবস্থা আজও প্রায় সেই বকমই অচঞ্চল, নব যুগের আবর্ত যেখানে ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে নি সেখানকার স্থাবরতার পুরাতন নীতির ভিত্তি কাঁপে নি— সেখানে অবস্থান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে পুরাতন অনুশাসনপাশ ছিন্ন হয় নি। সেই অবস্থার ভাষায় অল্প অবস্থাকে বিচার করা চলে না।

যুরোপে আর্থিক নীতি অনেক দিন থেকেই বিশেষ পন্থায় চলছিল। সেখানে ধনসৃষ্টি ও ধনভোগে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই ছিল প্রবল। তার প্রথম আঘাত লেগেছে গার্হস্থ্যে। গৃহযাত্রার স্বভাবতই স্ত্রীপুরুষের অধিকারভাগ আছে। পুরুষের কর্তব্য ধন আহরণ, মেয়ের কর্তব্য সংসারের

প্রয়োজনে তার ব্যয়ে ব্যবস্থা। মেয়েকে আর্থিক দিকে পুরুষের অধীন থাকতেই হয়। সেই অধীনতার পুরুষের ইচ্ছা ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে নতভাবে না মেলাতে পাবলে সে বাঁচেই না। কিছুকাল থেকে যুরোপে জীবনযাত্রার আদর্শ বহুব্যয়সাধ্য হওয়াতে পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীর দায়িত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। সেখানে ঘর ভেঙে বাসাব বিস্তার বেড়ে চলেছে। মেয়েরা তাদের চিরকালের আশ্রয়চ্যুত হয়ে স্বয়ং জীবিকা-উপার্জনে বাধ্য হয়েছে। আর্থিক স্বাভাব্য বে লাভ করে সে স্বভাবতই ভীকৃতাবে পরেব মন জোগায় না। পাশ্চাত্য মহাদেশে এই অর্থোপার্জনবীতির বিপর্যয় ঘটতেই জন্মশই স্ত্রীধর্মনীতির পরিবর্তন স্বতই ঘটে আসছে।—এব প্রভাব পুরুষের উপর পড়তেও বাধ্য। তারা অনেকেই গার্হস্থ্যের দায়িত্ববন্ধন থেকে মুক্ত, অপর-পক্ষে বহুসংখ্যক মেয়েও তাই। এরা উভয়েই স্বাভাব্য রক্ষা কবতে চায়; অতএব এদের বিবাহ ঠিক কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে এই নিয়ে সে দেশে আলোচনাব সীমা নেই।

এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিজ্ঞান—বিশেষত মনোবিজ্ঞান। স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি পর্যালোচনায় সমস্ত আত্ম সে ধসিয়ে দিয়েছে। উপভাস নাটক রঙ্গভূমি সব জায়গাতেই মানব-প্রকৃতি আজ অনাবৃত। মানব-ইতিহাসের আদিযুগে দেখ ছিল নম্র। আজ মানুষের মনের রইল না বস্ত্র।

এমন সময় যুরোপে এল সর্বনেশে এক যুদ্ধ। অতিকায় মৃত্যু এসে মানুষের মনকে দিয়েছে নিঃশব্দ নির্মম করে। সেই কয় বৎসর বহুসংখ্যক মানুষ এমন এক অনিত্যতার মধ্যে দিনযাপন করেছে যেখানে সে আজ আছে কাল নেই। মৃত্যু ব্যাপারটা যদিও চিরসত্য তবু মানুষ যখন সংসারযাত্রা করে তখন মৃত্যু যেন নেই এইভাবেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। মৃত্যুকে কাছে দেখা দশেও মৃত্যুকে যদি ভুলে না থাকতে পারে তবে কোনো বিশ্বাস কোনো ব্যবহার উপরেই সে বাসা বাঁধতে পারে না। কিন্তু যুরোপে এত বৎসর ধরে

এত বিরাটরূপেই মৃত্যুকে সামনে রাখতে হয়েছে যে সংসারের সমস্ত স্থিতিপ্রবণ নীতির পরেই তার আস্থা গেছে শিথিল হয়ে। এই সমস্ত কারণ জড়িয়ে মানুষ আজ আপন অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা একেবারে মূলের থেকে পরখ ক'বে দেখতে প্রবৃত্ত। যখন মানুষের ছিল সম্পন্ন অবস্থা, তার ভোগেব অধিকার ছিল ব্যাপক, তখন পুরাতন নিয়মকে নাড়া দিতে তার ভয় ছিল, পাছে কোনো জায়গায় তার আরামে তার ঐশ্বর্য্যে ভাঙন লাগে—আজ সেই ভয়ের দশা গেছে—যার যার পুরোনো আশ্রয়ের জীর্ণ ভিত্তি থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ছে। নতুন ক'রে পরীক্ষা করবার ভয় আর রইল না কারো।

যুরোপে যে তোলাপাড়া চলচে সে স্বভাবের নিয়মে, বহু লোককে নিয়ে—কেবল বইপড়া কয়েক জন চমমাপরা লেখক-পাঠকের সৌখীন বিচার নিয়ে নয়। ভীষণ তাদের আগ্রহ, ক্রিশিয়ার দিকে তাকালেই তা দেখা যায়। এই আকর্ষণ সম্ভবপর হ'ত না যদি নতুন অবস্থায় মানুষের কাছে একান্তভাবে ধরা না পড়ে থাকে যে, যে-সব বাঁধন একদা ছিল স্থিতির অনুকূলে, আজ তাতে স্থিতির সহায়তা

দান করছে না কেবল তা বন্ধনরূপেই আছে। বলা বাহুল্য, সমানেও সনাতনী আছে মানবস্বভাবে। সেও রীতিমাত্রকেই নব্বিজ প্রত্যাদেশ বলে মানে। তাদেরকেও সমাজে প্রয়োজন আছে। পরখ করবাব দিনে তাদের বিরুদ্ধতাও সত্যের পরিচয়ে সহায়তা কবে।

আজ যুগান্তরের দিনে আমরা বইপড়া পণ্ডিতরা অপেক্ষাকৃত দূরে আছি। জিনিষটাকে কেউ বা দেখছি বন্ধমুক্ত প্রবৃত্তির দিক থেকে, কেউবা অন্ধদৃষ্টি সনাতনের মোহের থেকে। আমার মন বলছে, নিশ্চিত জানি নে মানুষ কী ক'রে আপন অপরিহার্য্য সমস্যার সমাধান কবে—শাস্ত্রাত্মক সমূল সমাধানের যে প্রচণ্ড উত্তম চলেছে সেটা শাস্ত্রিক নয়, সাহিত্যিক নয়, সেটা সামাজিক জীবনমৃত্যুর একান্ত প্রয়োজনঘটিত। যদি পবিত্র ধর্মে, তবে পোত্র হয়ে জন্মিয়ে তখন ফলাফল দেখে বিচার করব। ইতি ২১ এপ্রেল ১৯৩৩।

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রবাসী সম্পাদককে লিখিত চিঠি]

মৃত্যু নাহি মম

শ্রীমলিনা হালদার

কবি কহে, মৃত্যু তার আপনার জন,
দ্রাশির কুয়াশায় নিরাশ-স্বপন
নামে যবে তজ্জাহত স্নান আঁখিপাতে
আলো-আঁধারের মাঝে; কঠোর আঘাতে
সচকিত হৃদে দেখে নাহি সূর্য্য তার,
চন্দ্র সেও কালো মেঘে ঢাকে ধার-বার।
আসে যবে ধরণীর বিবাহ-লগন,

কবি কহে, মৃত্যু তার শ্রাম-সম ধন।
মিথ্যা কথা, কেবা কহে নাহি কিছু বড়
মৃত্যু চেয়ে? ভস্ম-স্তুপ হর্ষে করি জড়ো
সর্ব্বাঙ্গে মাথিয়া মোর মহাদেব সম
জানাবো জগতজনে মৃত্যু নাহি মম।
প্রেমিক মরে না কভু, প্রেম সে অমর,
প্রেম যেথা নাহি সেথা মৃত্যু বাঁধে ঘর।

কুটীর-শিল্প ও বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ

শ্রীকরণাদাস গুহ, এম-এসসি (নিভারপুল)

বাংলার নিজস্ব শিল্প বাঙালীর জীবন এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কুটীরেই বেড়ে উঠেছে। বাংলার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলার শিল্পপ্রচেষ্টা একটা বিশিষ্ট আকার নিয়েছিল। তখন বাংলাব প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল স্বাবলম্বী। চাষীরা চাষ ক'রত, কুটীরে কুটীরে তখন চরকা চলত, গ্রামেব তক্তবায় সেই স্বতো নিয়ে কাপড় বুনে দিত। গ্রামের চর্মকার পাছকা তৈরি ক'রত, গ্রামের কুস্তকার প্রয়োজনীয় হাড়িকুড়ি ক'বে দিত। অনেক রকমের কর্মকার থাকত গ্রামে, কেউ ক'রে দিত চাষবাসের জন্ত লাঙ্গলের ফাল গ্রামে, কেউ বা গড়ত মেয়েদের অলঙ্কার—অলঙ্কারের প্রতি মেয়েদের দুর্বলতাটা একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কালের। গ্রামে গ্রামে হস্তধর ছিল, তারা ঘর তৈরি কবত, কৃষকদের লাঙ্গল ইত্যাদি বস্ত্রপাতি ক'রে দিত। কাঠের পাছকা, আসবাবপত্র, নৌকা ইত্যাদিও তৈরি কবত। কনুয়া বানিতে তেল ক'রত, জেলেরা মাছ ধ'রত, গোয়ালারা বি দই ইত্যাদি ক'রত, পটুয়ারা ছবি আঁকত, বাদ্যকররা উৎসবের সময় ঢাক ঢোল সানাই ইত্যাদি বাজাত—তখন বাংলার পল্লীতে ম্যালেরিয়া ঢোকে নাই। তখন বাংলার ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ এবং বাঙালীব বুকভরা প্রাণ ছিল। তখন বাংলার কবি ছিলেন চণ্ডীদাস, বিষ্ণুপতি, জয়দেব।

বাংলার সেদিন অনেক কাল চ'লে গেছে। বিভিন্ন ভাব এবং সভ্যতার সংঘাতে বাঙালীর জীবনপ্রণালীর সেই সহজ ভঙ্গীটি আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন সামাজিক গঠন আজ অনেক দিন হ'ল ভেঙে বাচ্ছে, সেই সঙ্গে আমাদের কুটীর-শিল্পগুলিও। বাঙালী-জীবনের এই নতুন অভাববোধকে পূরণ করতে আমাদের সেই পুরনো কুটীর-শিল্প আজ অক্ষম। অভাবপূরণ

হিসাবে বাংলার গ্রামেব স্বাবলম্বন এখন ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

বাঙালীর জীবন-তরী চলছিল ভাটিয়াল হুরে। চলতে চলতে হঠাৎ ধাক্কা খেল সে পাশ্চাত্য সভ্যতাব বাপ্পীয়পোতের সঙ্গে। সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতা হ'ল বাপ্পীয় বা বৈজ্ঞানিক সভ্যতা—গতির সভ্যতা। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেই সভ্যতার গতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আমরা এস পড়েছি। আজ নিরালা পল্লীর গ্রামলিমার মধ্যে বাংলার তালগাছ-বেরা পুকুরপাড়ে শীতলপাটিকে আশ্রয় ক'বে পুরাতনব সাধনা অসাধ্য হয়ে উঠেছে। জীবনসংগ্রাম চার দিক থেকে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, একটু বসবার অবকাশ নাই, কেবল গতি আর গতি। বিজ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত বিভিন্নতাকে একত্বের দিকে নিয়ে আসছে, কোনও জাতিই আজ এব হাত থেকে নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারবে না,—এটা যুগধর্ম। আমাদেরও চলতে হবে। নইলে বারা আজ চলছে তাদের পায়ের নীচে আমবা ধূলি হয়ে যাব।

পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি মূলমন্ত্র হ'ল অর্থনীতি। ইহাকে প্রধানতঃ বাণিক-সভ্যতাও বলা চলে। ইহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎও আমাদের বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহ শিল্প ও বাণিজ্যে যে বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছে সেটা হ'ল ব্যাপক ভাবে উৎপাদন (mass production) ও কেন্দ্রীকরণ (centralization)। এই পন্থা অবলম্বন ক'রে পাশ্চাত্য দেশসমূহ বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনর্থও বে না এসেছে তা নয়, সমস্ত পৃথিবী আজ ধনিক ও শ্রমিক স্বার্থের টানা-হেঁচড়ায় বীভৎসতার পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সে বাই হোক, পাশ্চাত্য পন্থাব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলার অসংকু কুটীর-শিল্প বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ শিল্প—যেমন ঢাকার মসলিন, বিপুল হয়ে

গেছে। আর যে-সব শিল্প এখনও আছে তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা অতীব শোচনীয়। শিল্পই উন্নত প্রণালী ও শুল্কের সাহায্য না-পেলে পঞ্চত্বলাভ ছাড়া বাজারে তাদের আর কোনও লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বাংলা দেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিদেশী ও দেশী মূলধনে অনেক বড় বড় কল-কারখানাই হয়েছে। কিন্তু এতে বাংলার সর্বসাধারণের সমৃদ্ধির দিক থেকে বিশেষ কল্যাণ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এখন প্রাশ হ'ল কুটীর-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন ক'রে তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা, না অর্ধমৃত কুটীর-শিল্পগুলিকে যথারীতি সংকার ক'রে তার স্থানে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করা। এই সমস্তা মীমাংসার পূর্বে বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থাটা একটু আলোচনা করা যাক।

১৯৩১ সনের সেন্সাস বা আদমশুমারীতে করদ-রাজ্য বাদে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৫০,১১৪,০০০ (পাঁচ কোটি এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার)। তার মধ্যে—

উপার্জক— ১৩,৭৫০,০০০

কর্মী পোষা (Working dependent) ৬৬৩,০০০

মোট কর্মী—১৪,৪১৩,০০০ (এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ তের হাজার)

অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা মাত্র ২৯ জন কাজ করে আর বাকী ৭১ জন পোষা। ১৯২১ সনের আদমশুমারীতে দেখিতে পাই শতকরা ৩৫ জন কর্মী ও বাকী ৬৫ জন পোষা। বাংলার বেকার-সমস্তা যে ক্রমশঃ অতীব গুরুতর আকার ধারণ করছে বা পূর্বেই করেছে সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই।

বর্তমানে বাংলার কর্মক্ষম লোকসংখ্যা ২৩,০০০,০০০ (দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ), তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী অর্থাৎ ৮,০৫০,০০০ (আশী লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লোক সম্পূর্ণ বেকার। বেকারের এই বিরাট বাহিনী দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলা দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক কৃষিকর্মী।

কৃষি উপরেই বাংলার জীবন-মরণ নির্ভর করে। কিন্তু এই কৃষির অবস্থাও অতীব শোচনীয়। জন-প্রতি কৃষকের ভাগে জমীর পরিমাণ অতি কম। যে জমী এক জন লোক চাষ ক'রতে পারে সেখানে আজ পাঁচ জন লোক নিযুক্ত আছে। লাভও সেই পরিমাণে জন-প্রতি এক-পঞ্চমাংশ হয়ে গেছে। তা ছাড়া বাংলার কৃষকদের বৎসরে প্রায় নয় মাস ব'সে থাকতে হয়। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক ছববস্থার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব রকম কমে যাওয়ায় বাংলার আর্থিক জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কৃষকদের ক্রয় করবার ক্ষমতা প্রায় অক্ষমতার সীমায় এসে পৌছেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও অসম্ভব রকম কমে গেছে। কৃষকদের আরের পথ বাড়িয়ে তাদের ক্রয় করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপরেই দেশের শিল্প ও আর্থিক উন্নতি নির্ভর করছে।

এই ত গেল কৃষকদের অবস্থা। এ ছাড়া বর্তমানে আর একটা জটিল সমস্তার উদ্ভব হয়েছে, সেটা হ'ল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্তা। স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত ক'বে বাঙালী যুবক আজ চারি দিক অন্ধকার দেখছে। চাকরির আশা ছরাশা হয়ে উঠেছে। চার দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলা দেশ কৃষিসর্বস্ব দেশ। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই কেবল মাত্র কৃষির সাহায্যে তার অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। কৃষি ও শিল্প এই দুয়ের সামঞ্জস্যের ওপরেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য নির্ভর করে। এই অসামঞ্জস্যতার জন্যই বাংলার আজ এই ছববস্থার দিনে কুটীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এমন ভাবে অনুভূত হচ্ছে।

সামাজিক প্রথা ও লোকের মানসিক গড়নের উপরই জাতীয় শিল্পানুষ্ঠানের প্রকার ও কৃতকার্যতা নির্ভর করে। গত ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় মনে হয় বাঙালী বড় বড় কল-কারখানার চেয়ে কুটীর-শিল্পকেই বেশী ভালবাসে। ১৯২১ সনের আদমশুমারীতে দেখতে পাওয়া যায়, বাংলার বড় বড় কলকারখানাতে প্রায় ১৭০,০০০ (এক লক্ষ সত্তর হাজার) লক্ষ কারিগর কাজ ক'রত, তার মধ্যে বাঙালী ছিল মাত্র ৭১,০০০ (একাত্তর হাজার) জন, অর্থাৎ শতকরা ৪২ জনেরও কম। অবশ্য এমন অনেক শিল্প আছে যা বড় বড়

কলকারখানাতেই কেবল করা সম্ভব, যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। তা ছাড়া আর প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিষই অল্প-বিস্তর কুটীর-শিল্প হিসাবে করা চলে এবং শিল্পে শিক্ষা ও দক্ষতা অহুসারে নানা প্রকারের দ্রব্য তৈরি ক'রে ক্রমিক তার বৎসরের কর্মহীন নয় মাস এবং বেকার তার বৎসরের কর্মহীন বার মাসকে উর্বর ক'রে তুলতে পারে।

আমি প্রথমেই বলেছি বাংলার সভ্যতা, সমাজ ও প্রতিভার সঙ্গে কুটীর-শিল্পের একটা নাড়ীর যোগ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষ বিধগুণ হ'লেও বাংলা দেশ বোধ-পরিবাবের দেশ। বোধ-পরিবাব ভাল কি মন্দ সে বিচারেব স্থান এ নয়। বোধ-পরিবাবে আর যাই থাক আসন্ন এবং দারিদ্রহীনতার প্রশ্রয় সেখানে অনেকটা হয় তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। পরিবারের একটি প্রাণী হয়ত রাত-দিন কুতলাসেব মত খাটছে আর তার উপর কর্মজন্ম আত্মীয়েরা ব'সে ব'সে খাচ্ছে—এ দৃশ্য বাংলার ঘরে ঘরে। নানা প্রকার কুটীর-শিল্পকে সহজসাধ্য ক'রে তুলে বাংলার দুর্গাবাদে দুর্গাবে নিয়ে যেতে হবে—একান্তভুক্ত প্রত্যেক বাঙালীই যাতে নিজস্বভুক্তের মর্যাদা পেতে পারে; ব'সে থাকবার সব যুক্তিই যাতে অচল হয়। এদিক থেকে আজ কুটীর-শিল্পের প্রয়োজন বাঙালীর আর্থিক জীবনে সবচেয়ে বেশী। এই জন্যই আজ বাংলা-সরকার বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের সাহায্যে কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধনে এমন তৎপর হয়ে উঠেছেন।

দেশী ও বিদেশী কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'বেও আজ যে সব কুটীর-শিল্প—বিশেষ ক'বে বয়নশিল্প, বাংলায় বেঁচে আছে তাতেই প্রমাণ হয় বাংলার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে এর একটা বিশেষ সঙ্গতি আছে। আশ্রয় বাংলা দেশে হাতেব তাঁতের কাজে পাঁচ লক্ষেরও বেশী লোক নিযুক্ত আছে এবং সেই সম্পর্কে আবও বহু লোক প্রতিপালিত হচ্ছে।

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস ক'রছি। প্রতি দিনের গবেষণা ও আবিষ্কার মানুষের হাতে নতুন নতুন বস্তু নতুন নতুন কৌশলে তুলে দিচ্ছে। বাংলার কুটীর-শিল্পকেও আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের উপরেই কুটীর-

শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আজ কয়েক বছর হ'ল বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ পাগলাডাঙাতে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। শিল্প-বিভাগেব এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, রাসায়নিক শ্রীযুক্ত বসিক-লাল দত্ত ও চর্ম-পারদর্শী শ্রীযুক্ত বিবাজমোহন দাসের তত্ত্বাবধানে বিশেষ গবেষণা চলছে এবং তাঁদের সাফল্য ইতিমধ্যেই নানা কুটীর-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপর স্থাপন করেছে। এ ছাড়া বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের অন্তর্গত শ্রীযুক্ত ব্রজেনচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয় দেশেব কারিগর ও শিক্ষিত যুবকদের উন্নত প্রণালীর বয়ন ও রং-করা শিক্ষা দিয়ে বাংলা দেশের বয়ন-শিল্পকে উন্নত করার চেষ্টা ক'রছেন। বললে হয়ত অত্যাশঙ্কিত হবে না যে, বাংলার বয়নশিল্প তার বর্তমান সাফল্যেব জন্য শ্রীরামপুরেব শিক্ষার কাছেই সম্পূর্ণভাবে ধনী।

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা কুটীর-শিল্পের প্রচাৰ ও উন্নতিব পথে বিশেষ কয়েকটি বাধা লক্ষ্য করেছি, যথা—

- (১) কুটীর-শিল্পে অভ্যাস ও উৎসাহের অভাব।
- (২) শিল্পকার্যে উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব।
- (৩) বড় বড় কলকারখানায় প্রস্তুত সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।
- (৪) মহাজন ও বেপারীদের হাত থেকে বক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত টাকা-পয়সার অভাব।
- (৫) আধুনিক উন্নত প্রণালীর ছোট ছোট বস্ত্রপাতির অপ্রচলন।
- (৬) উপযুক্ত বিজ্ঞাপন এবং শিল্পজাত জিনিষ সঞ্চয় প্রচারকার্যেব অভাব বা অজ্ঞতা।
- (৭) বাজারের অবস্থা এবং চাহিদা সঞ্চয় অনভিজ্ঞতা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় সুবন্দোবস্তেব অভাব।

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এ. টি. ওয়েষ্টনের অধীনে শিল্প-বিভাগ উক্ত সমস্ত গুণের সমাধানে বিশেষরূপে অগ্রসর হয়েছেন। উন্নত প্রণালীর তাঁতের প্রচলন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রং-করা শিক্ষা দিয়ে শিল্প-বিভাগ বাংলার বয়নশিল্পকে অনেকটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপর স্থাপন-

করেছেন। আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন না যে, পাবনা জেলার সাহজাদপুর, এনায়েতপুর, নদীয়া জেলাব শান্তিপুর, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, ঢাকা জেলাব কুমারভোগ, কাজিরপাংগলা ইত্যাদি স্থানের বয়নশিল্পের আজকেব এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য শিল্প-বিভাগেব একান্ত চেষ্টারই ফল। শিল্প-বিভাগের ভ্রাম্যমাণ (peripetitia) বয়ন-বিদ্যালয়গুলি ঐ সব স্থানে গিয়ে অনেক দিন ধরে কুটীর-কর্মীদের উন্নত প্রণালীর তাঁতে কাজ এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে রং-করা শিক্ষা দিয়েছে। তাই কিছুদিন আগে যেখানে অতি সেকেলে ধরণের কয়েকটা হাতের তাঁত চলত আজ সেখানে শত শত উন্নত প্রণালীর তাঁতে (fly-shuttle এবং Jacquardএ) নানা ধরণেব কাপড় হয়ে বাংলার বাজার ছেয়ে ফেলছে।

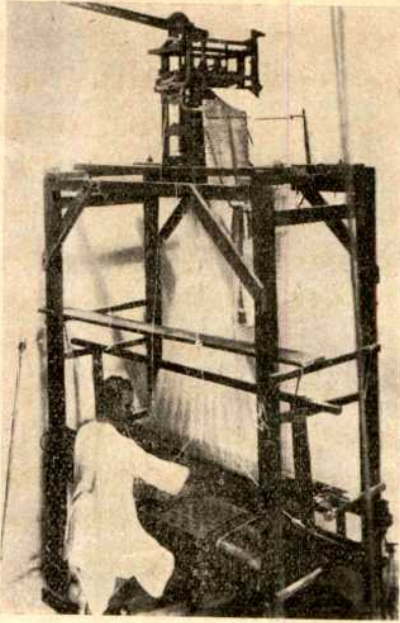
গত দেড় বছরের মধ্যে শিল্প-সংক্রান্ত কাজে আমাকে অনেকবার পাবনা জেলায় বেতে হয়েছিল। পাবনাব শিল্পকেন্দ্রগুলি—বিশেষ করে বয়নশিল্পের কেন্দ্রগুলি, এবং তাদের কর্মপদ্ধতি আমি একাধিকবার পরিদর্শন করেছি। গৃহের আবেষ্টনের মধ্যে নিম্নের পরিবাবের লোক নিয়ে কুটীর-শিল্পের কাজে এবং যন্ত্রপরিবেষ্টিত একঘেয়ে কারখানার কাজে কি পার্থক্য। ইউরোপের অনেক বড় বড় কারখানা দেখবাবও সুযোগ আমার হয়েছিল। জার্মেনীর ক্লুপ, ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কলগুলি, রঙের কারখানা, ফোর্ডের শাখা-কারখানা, পোর্ট সানলাইটেব সাবানের কারখানা, ইত্যাদি অনেক দেখেছি। সে-সব কারখানায় একান্ত বিশেষজ্ঞতা প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হলেও কর্মীকে শিল্পের সমগ্রতার সৌন্দর্য ও আনন্দ দিতে পারে না। ফোর্ডের কারখানায় জিজ্ঞাসা করে জানলাম গত দশ বছর হ'ল একটা লোক মোটর গাড়ীর স্থানবিশেষে কেবল জুই টিপে দিচ্ছে। জু-টেপার ব্যাপাবে সে হয়ত অতিপূর্ণতা লাভ করেছে, কিন্তু কর্মের যে আনন্দ আছে, এ ধরণের কাজে তা পাওয়া যায় ব'লে মনে হয় না। ফোর্ডের কারখানায় মানুষকে একেবারে যন্ত্র করে তোলার সাফল্য দেখে মনটা এত দমে গিয়েছিল তা আর কি বলব। একঘেয়ে কাজের বৈচিত্র্যহীনতার জন্তই মনে হয় কারখানার কর্মীদের মন ও চরিত্রে স্বাস্থ্যের

এত অভাব। পাবনা জেলার কুটীর-কর্মীদের মধ্যে সেই স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য দেখলাম।

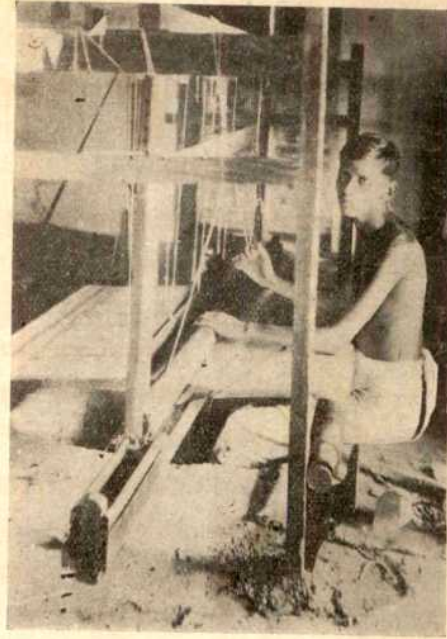
কিছুদিন আগে থেকেই দুইটি ভ্রাম্যমাণ বয়ন-বিদ্যালয় উক্ত জেলায় কাজ করছিল। তাদের সাফল্য অভূতপূর্ব। বর্তমানে সমস্ত জেলায় প্রায় বিশ হাজার তাঁত চলছে। কেউ কৃষিকার্যের অবসরে তাঁত চালায়, কারও বা তাঁতের কাজই একমাত্র অবলম্বন। এই বিশ হাজার তাঁতের মধ্যে উন্নত ধরণের তাঁত (fly-shuttle এবং Jacquard) প্রায় পাঁচ হাজার এবং তার সবগুলিই শিল্প-বিভাগের চেষ্টার প্রবর্তিত হয়েছে। সাহজাদপুরে হোসেন আলী নামে একটি লোক কয়েক বছর আগে শিল্প-বিভাগের ভ্রাম্যমাণ বয়ন-বিদ্যালয় থেকে উন্নত প্রণালীর কাজ শিখে প্রথমে মাত্র দুইখানি তাঁত নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। আজ চার-পাঁচ বছরেব মধ্যে সে প্রায় দুই শত তাঁতের মালিক হয়েছে। বাংলা দেশে এখনও এরূপ বহু হোসেন আলীর স্থান আছে। এই আর্থিক হৃদ্বিনেও পল্লীতে পল্লীতে কারিগরদের মুখের হাসি ও মাথায় তেলের প্রাচুর্য তাদের ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করেছে। এখানে ম্যাঞ্চেষ্ঠার, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কলকাতা, এমন কি জাপানও হাব মেনেছে। কুটীর-কর্মীরা অনেকে এখনও মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায় নাই বটে, কিন্তু বর্তমানে বোম্বাইয়েব মিল-ওয়ার্লামের মত ধর্মঘটের ভয়ও তাদের নাই।

ভ্রাম্যমাণ বয়ন-বিদ্যালয় ছাড়া বাংলা-সরকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের বেকার-সমস্যা বখাসাধ্য সমাধানের ক্ষমতা উন্নত প্রণালীর কুটীর-শিল্প প্রচলনেব যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাতেও আট বকমের ভ্রাম্যমাণ শিল্প-বিদ্যালয় গত দেড় বছর হ'ল বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে কাজ করেছে। ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক এই সব বিদ্যালয়ে ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত বিনা-বেতনে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নানা শিল্প শিক্ষা করে নিজেরা ছোটখাট কারখানা করেছে এবং চারদিক থেকেই তাদের কাজের সাফল্যের কথা শোনা যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আপাততঃ যে আটটি শিল্প শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের নাম :—

(১) সাবান প্রস্তুত করা—রাসায়নিক ডাঃ রসিক লাল দত্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।



উন্নত প্রণালীর জ্যাকার্ড তাঁত



উন্নত প্রণালীর ঠকঠকি তাঁত

(২) জুতা প্রস্তুত করা—চর্ম-পারদর্শী শ্রীযুক্ত বিরাজ-মোহন দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।

(৩) নকশাদার পশমী কাপড় বয়ন করা।

(৪) পাট রং-করা এবং তা থেকে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য বয়ন করা—বয়ন-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।

(৫) ছাতা তৈরি করা।

(৬) ছুরি কাঁচি ইত্যাদি ইম্পাতের জিনিষ তৈরি করা।

(৭) পিতল-কাঁসার জিনিষ তৈরি করা।

(৮) উন্নত চাকে মাটির জিনিষ তৈরি ক'রে উন্নত পোয়ানে বা পাজায় পুড়িয়ে নেওয়া।

এই শেখোক্ত চারটি শিল্প এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। উক্ত

আটটি কুটীর-শিল্পের মধ্যে দুইটি বয়ন-শিল্প এবং জুতা প্রস্তুত করা বাদে বাকী পাঁচটি শিল্প কলিকাতার কেনাল সাউথ রোডে শিল্প-বিভাগের গবেষণাগারেও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ গবেষণা দ্বারা এই সব শিল্প বাংলা দেশে লাভজনক ব'লে বিবেচিত হয়েছে এবং এই আটটি শিল্পের প্রত্যেকটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য চার জন ক'রে শিক্ষক-দল নিয়ে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় গঠন করা হয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিল্প-বিভাগের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর উদ্ভাবিত ছাতার বাটে নানারূপ চিত্র করার কল, মাটির জিনিষ তৈরি করার উন্নত চাক এবং কাঁসার পরিবর্তে সেই গুণেরই অথচ সস্তা একটি নূতন মিশ্র-বাতুর প্রবর্তন কুটীর-শিল্পে বিশেষ দান।

গিরিডির উপনিবেশিক বাঙালী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য

শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের মধ্যে গিরিডি* অত্যন্তম। ইহা হাজারীবাগ জেলার একটি মহকুমা শহর। গিরিডিকে “কুরহর বাড়ী” নামেও অভিহিত হইতে দেখা যায়। পূর্বে ইহা খড়কডিহা জেলার অন্তর্গত ছিল; এখন খড়কডিহা নামে পৃথক কোন জেলার অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইহা খড়কডিহা পরগণার অন্তর্ভুক্ত বটে। কলিকাতা হইতে গিরিডির দূরত্ব দুই শত ছয় মাইল মাত্র। সাগরপৃষ্ঠের (sea-level) হইতে ইহার উচ্চতা এক হাজার ফুট। গিরিডির উত্তরে উকী নামক পার্বত্য নদী, দক্ষিণে কুলডিহা, পূর্বে বারগুয়াড়ী ও জরিয়াগাদী গ্রামদ্বয় ও পশ্চিমে পচষা। ইহাই বর্তমান গিরিডির মিউনিসিপ্যাল সীমানা। ইহার বর্তমান লোকসংখ্যা ২১,২১৬। জরিপ-বিভাগের ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে গিরিডির নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। গিরিডির তৎকালীন টাকাইং (দেশীয় জমিদার) ছিলেন পচষার ৮সিদ্ধনাথ সিংহ। কয়লা-খনির দিগন্তপ্রসারী সুবিজ্ঞা জমিগুলি তিনি গভর্ণমেন্টকে মাত্র নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন। গভর্ণমেন্ট ঐ জমি ষ্টেট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা খাজনায় ইজারা দেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয় ও সেই সঙ্গেই গিরিডিতে রেলপথ স্থাপনার স্বরূপাতি হয়। ষ্টেট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর আবশ্যক সমুদয় কয়লা অদ্যাবধি এই স্থান হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে।

তৎকালে গিরিডি গহন অরণ্যে পরিবৃত্ত ছিল। রেল

কোম্পানীর চাকুরী লইয়া প্রথমে কয়েক ঘর বাঙালী-পরিবার মকতপুরা নামক স্থানে আসিয়া বসবাস করেন। এখন যে-স্থানে মকতপুরার বাজার বসে, সেই স্থান হইতে বর্তমান “পুরাতন কুটীর” (“Oldest Cottage”) নামক বাটী অবধি বিস্তৃত ভূভাগেই বাঙালীরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। বহু স্বাস্থ্যার্থেই অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী ভ্রমলোক এই স্বাস্থ্যকর স্থানটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এখন এই স্থানে মনোরম উদ্যানবেষ্টিত সুদৃশ্য বাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বে সেই জঙ্গলাবৃত্ত স্থানে দিনমানোও লোকচলাচল নিরাপদ ছিল না। এ-বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ সত্যবটনামূলক জনশ্রুতি আছে। সে-সময় গিরিডিতে নারো রায় নামক এক দুর্দান্ত দেশীয় ঘাটোয়ার দস্যুর ভয়ানক অত্যাচারে জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। তৎকালীন নবাগত বাঙালীদের সহিত এই দস্যুর এক রফা হয় যে প্রত্যেকে তাহাকে মাসিক কিছু কিছু অর্থদান করিলে সে বাঙালীদের উপর কোন অত্যাচার করিবে না। ৮ মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন কয়লা-খনিতে নেটিভ ইনস্পেক্টর-রূপে কার্য্য করিতেন। একদিন কার্য্যান্তে গৃহপ্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে মস্তকে সহসা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ধরাশায়ী হন; সগৃহ নীত হইবার পর তাঁহার চেতনা হইলে নারো রায় আসিয়া তাঁহার নিকট তাহার ভ্রম স্বীকার করিয়া অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। দস্যু হইলেও তাহার কর্তব্যজ্ঞান ছিল, সে-বিষয় সন্দেহ নাই। এই নারো রায় অমিতবিক্রমশালী ছিল। একবার নাকি সে গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশ-পাহারায় রেলে করিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতেছিল। হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উত্তীর্ণদীর উপর গাড়ী পৌছিবামাত্র, সে সেই বদ্ধ অবস্থায় প্রহরীদের প্রহার করিয়া চলন্ত গাড়ী হইতে লক্ষ্যপ্রদানে নদীমধ্যে পতিত হয় ও নিমেষমধ্যে প্রস্তরাঘাতে হস্তপদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া

* কেহ কেহ এই স্থানটির নাম গিরিধি লেখেন। তাহা ভুল। ইহার নাম গিরিডি—গিরিডিহি বা গিরিডিহ হইতে উৎপন্ন। ডিহি শব্দ বঙ্গের আরও অনেক স্থানের নামে পাওয়া যায়। ডিহির অর্থ, “গ্রামসমষ্টি; কয়েকটি গুহ, গুহ গ্রামে একটি মৌজা হয়, কয়েকটি মৌজায় একটি ডিহি হয়।”—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’

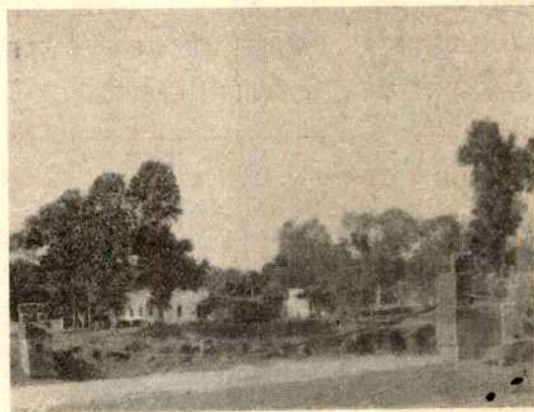
পলায়ন করে। পরে অবশ্য এক ‘বাটোয়ার’ জমিদার তাকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করেন ও সেই সময় হইতে দস্যুর অত্যাচারও দূর হয়। বর্তমান কাছারিবাটীর অনতিদূরে এই দস্যুর গৃহ ছিল।

যাহা হউক, কয়লাখনি ও রেলপথ বিস্তৃতির সহিত ক্রমশঃ এই স্থানে একটি জনপদ গড়িয়া উঠে। বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এইস্থানে আগমন করেন ৩রাখালচন্দ্র কুণ্ড মহাশয়। তখন তিনি রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার ছিলেন। তাঁহার আদিনিবাস খয়েন ষ্টেশনের নিকটবর্তী ইটেচোনা গ্রামে। পরে তিনি গিরিডিতে বাড়িঘর করিয়া স্থায়ী বসবাস করেন। স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহার উদ্যোগ ছিল। তাঁহার পুত্র ৩গোষ্ঠবিহারী কুণ্ড মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ গিরিডির অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বারগড়ার নিকট উক্সী নদীর অপর তীর হইতে খানডুলি পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিসিয়া নামক সুবিশীর্ণ জমিদারী গোষ্ঠিবাবু ক্রয় করেন। সাধারণের সুবিধার জন্য উক্সীর উপর তারের একটি দোলায়মান সেতু তিনি নির্মাণ করাইয়া দেন ও স্থানীয় হাসপাতাল-বাটী নির্মাণকল্পে অর্থসাহায্য করেন। এখন তাঁহার পুত্র শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ কুণ্ড মহাশয় জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গিরিডিতে বাঙালী গৃহস্থবাটীর মধ্যে একমাত্র ইহাদের বাটীতেই জুর্গোৎসব হইয়া থাকে।

বর্তমান গিরিডির ক্রমোন্নতির ইতিহাস লিখিতে হইলে ঐহাদের কথা স্ততঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, সেই লোকহিত-ব্রতী উদ্যমশীল ব্যক্তিদিগের বিষয়ে কিছু লিখিতেছি।

৩তিনকড়ি বহু মহাশয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গিরিডিতে আসিয়া পচদ্বায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার আদিনিবাস হুগলী দশঘরা গ্রামে। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার বখেষ্ঠ উদ্যোগ ছিল। ধর্মবিষয়ে তাঁহার উদারতা ছিল অনন্তসাধারণ। ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা প্রথমে তাঁহারই পচদ্বায়স্থিত গৃহে হয়, যদিও তিনি নিজে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের পাকা বাটী স্থাপিত হয়। রাট্রে দাতব্য

চিকিৎসালয়ের (Rattray Charitable Hospital) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি অগ্রতম ব্যক্তি ছিলেন। স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহার সাহায্য নিতান্ত সামান্য ছিল না। তিনি এই জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ধানওয়ার-রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার রূপেও তিনি কিছুদিন কার্য্য



উক্সী নদীর উপর দোলায়মান তারের পুল

করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তি-বর্গের চেষ্টায় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত সমাজের প্রচারকগণের বাসের জন্য “৩তিনকড়ি বহু প্রচারক আশ্রম” নামে একটি একতলা পাকা বাটী প্রায় পাঁচ ছয়-বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে। তিনি এই স্থানে জমি ক্রয় ও নিজস্ব বাড়ি-ঘর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ বহু মহাশয়ও পিতার ন্যায় ধানওয়ার রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন; এখন অবসর লইয়া গিরিডিতে বাস করিতেছেন।

৩ধরগীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রাম হইতে এই স্থানে উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক রূপে আগমন করেন ও পরে ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া এই স্থানেই ওকালতি করিতে থাকেন। রাট্রে দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির নির্মাণকল্পে তিনি অর্থসাহায্য করেন। স্বয়ং হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও সকল ধর্ম্মেই তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত। পচদ্বা

রোডের উপর বাটী নির্মাণ করাইয়া তিনি গিরিডিতে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। পরে ধরমপুর নামে একখানি মোজাও ক্রয় করেন। একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসর এই স্থানে বাস করিবার পর পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্থানের অত্যন্তম গ্যাডভোকেট ও স্থানীয় ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের অত্যন্তম ডিরেক্টর।

শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ এইস্থানে বাস করিতেছেন। কলিকাতা আহিরী-



উল্লী জলপ্রপাত

টোলায় ইঁহার আদিনিবাস। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইনি অত্রের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু কোন বিপ্লব ব্যক্তি কর্তৃক প্রবঞ্চিত হওয়ায় ও ব্যবসায়ে ইঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ একমাত্র উপযুক্ত পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ইঁহার ব্যবসায়ে লোকসান হয় ও পরে ইনি অত্রের কার্য ছাড়িয়া দেন। ইনি বহুকাল সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে গিরিডিতে ইনিই সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। স্থানীয় বঙ্গশিশুবিদ্যালয় ও উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের সংস্থাপকদিগের মধ্যে ইনি অত্যন্তম। অতি অমায়িক ও বিনয়ী পুরুষ; ইঁহার বয়স এখন ত্রিযান্তর বৎসর।

শ্রীযুক্ত শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে প্রবাসী হন। ইনি এক জন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা প্রধান উকীল। পচম্বা-রোডের উপর শক্তিকণ্ঠ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা ব্যবসায়ে ইঁহার সাফল্যের সাক্ষ্য দেয়। স্বীয় গুণে ইনি প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছেন। লোকহিতকর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সহিতই ইঁহার যোগ আছে। বর্তমান সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির স্থাপনার সময়ে ইনি সাহায্যকারীদিগের মধ্যে অত্যন্তম ব্যক্তি ছিলেন। উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয়ের বাটী-নির্মাণকল্পেও ইনি যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন। উকীল-লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠায় ইঁহার বিশেষ উদ্বোধন ছিল। ইনি গিরিডি মিউনিসিপালিটির প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

৳রাজকৃষ্ণ সাহানী মহাশয় বাঙালী অভাবাবসায়ীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই স্থানে আগমন করেন। ইঁহাদের অভ্রের খনি কোডাম্মায় অবস্থিত। ইঁহার দ্রাতুপুত্র সত্যকিন্দর সাহানী মহাশয় বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য। ৳রাজকৃষ্ণ বাবুর এই স্থানে অনেকগুলি বাড়ির আছে। ইঁহাদের কসতবাটী হাজারিবাগ রোডের উপর অবস্থিত। রাষ্ট্রে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় ইনি সাহায্য করেন। পুরাতন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ইনি অত্যন্তম।

৳রাখালচন্দ্র তা মহাশয় প্রথমে রেলওয়ে কন্ট্রাক্টররূপে এই স্থানে আসেন; পরে কয়লার ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। গিরিডিতে ইনি বাড়িবর করিয়া গিয়াছেন। 'লতাবৈহার' নামে একটি মোজাও ইনি ক্রয় করেন। ইঁহার পুত্রের একটি মুদির দোকান আছে।

৳গদাধরচন্দ্র রায় মহাশয় বাঁকুড়া হইতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার কাঞ্চা ৳প্রসন্ন বাবু প্রথমে গরুর গাড়ী করিয়া বাঁকুড়া হইতে এই স্থানে আসেন। ৳গদাধর বাবুর কয়লার ব্যবসায় ছিল। গিরিডিতে তখন রেল-চলাচল হয় নাই। তিনি এই স্থান হইতে কুলি-মারফৎ ঈষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের মেন-লাইনস্থিত লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনে কয়লা চালান দিতেন। তৎকালে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এত কম ছিল যে, মাল-চালানের এইরূপ অহুবিধা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। মকতপুরায় তিনি বাড়ি করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সুপরিচিত মোক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীপতি সামন্ত মহাশয় শক্তিকণ্ঠ বাবুর সমসাময়িক ব্যক্তি। গত বৎসর ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ইঁহার দ্বিতল বসতবাড়ী পচষা-রোডের উপর অবস্থিত; এতদিন ইনি গিরিডিতে বহু ঘরবাড়ি করিয়াছেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সামন্ত মহাশয় উপর্যুপরি দুইবার স্থানীয় লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

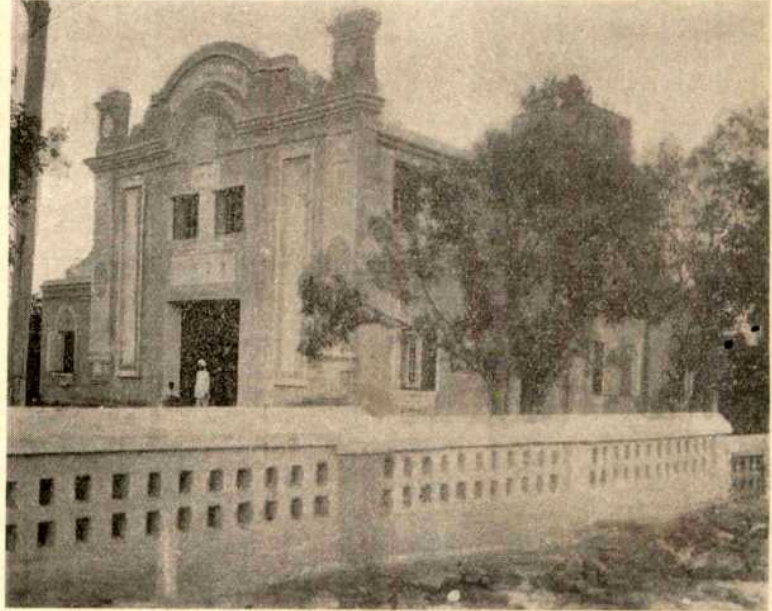
ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর মুখো-পাধ্যায়, এম্-বি, মহাশয় ১৯০১ সালে স্থানীয় হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন রূপে আগমন করেন। এই স্থানে তিনি একাদিক্রমে প্রায় আট বৎসর অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ছিলেন। পরে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই স্থানে নিজস্ব বাড়ী করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যান। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই স্থানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎ

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এই স্থানের পুরাতন বাঙালী অধিবাসীদের মধ্যে অজ্ঞতম। চকের উপর পূর্বে শরৎ বাবুর একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। লক্ষ্মীবাবু স্থানীয় কোন অত্র-ব্যবসায়ীর আপিসে কার্য্য করিতেন; পরে তিনি এই কার্য্য ছাড়িয়া দেন। গাওয়া নামক স্থানে ইঁহাদের অঙ্গের থনি আছে। “হেল্থ হল” (Health Hall) নামক যে সুপরিচিত ঔষধালয়টি ১৯০৫ সালে গিরিডিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইঁহারা তাঁহার স্বত্বাধিকারী। পরে ঔষধালয়টি পচষা-রোডের উপর অবস্থিত ইঁহাদের নিজ বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে ইঁহাদের একাধিক বাড়িঘর আছে। ইঁহারা এ স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় রেলওয়ের ডাক্তার ছিলেন; পরে নিজ বাড়ী করিয়া গিরিডিতে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। ইনি পুরাতন ঔপনিবেশিক বাঙালী-বাসিন্দাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ।

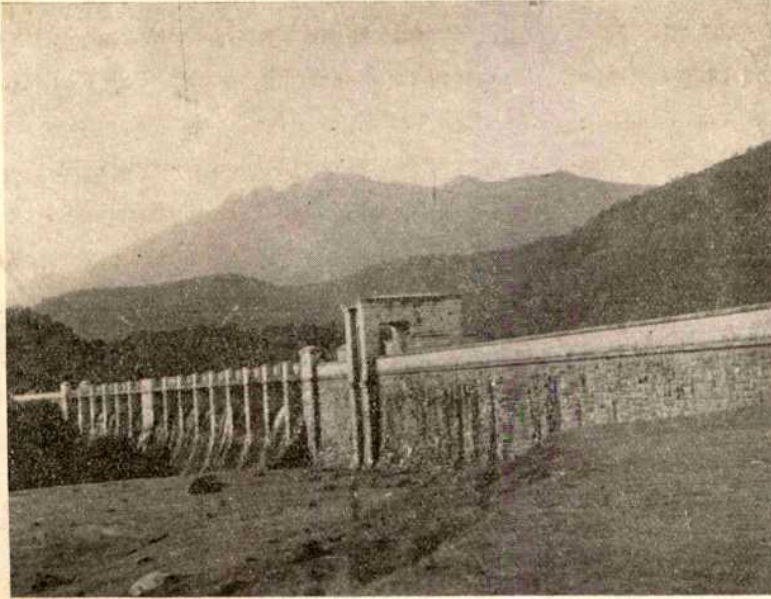
পূর্কাক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়লা-খনির দেশীয় ইন্সপেক্টর রূপে গিরিডিতে আগমন করেন। ইঁহার আদি নিবাস বর্ধমান জেলাস্থ রায়না গ্রামে। ইনি নিজে



গিরিডি ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড

এই স্থানে বাড়িঘর না-করিলেও, ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি পচষা-রোডের উপর নিজস্ব বাড়ী করিয়াছেন। তিনকড়ি বাবু ওকালতি করেন। তিনি কিছুদিন দাতিয়া-ষ্টেটের চীফ জুডিশিয়াল অফিসার ছিলেন। বর্তমানে ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির এক জন কমিশনার। উচ্চ-ইংরেজী বালক-বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে সাত বৎসর বাবৎ রহিয়াছেন। গিরিডির প্রায় সকল জনহিতানুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে ইঁহার উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয়।

গিরিডির তিন মাইল পূর্বে ভুরুস্তিহা নামক স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। ইঁহারা ‘মিশ্র’ উপাধিধারী। ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল চবিশ-পরগণার অন্তর্গত হালিশহর গ্রামে। এখন ইঁহারা



• ঝরিয়া ওয়াটার ওয়ার্কস, তোপচাটি। দূরে পরেশনাথ পাহাড় দেখা যাইতেছে

প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বর গৃহস্থ এইস্থানে বাস করিতেছেন। অনুমান বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সালে এই জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের তদানীন্তন রাজা, রামচন্দ্র মিশ্র নামক এক বাঙালী ব্রাহ্মণকে হালিশহর হইতে তাঁহার পুরোহিত রূপে গিরিডিতে আনয়ন করেন ও তাঁহাকে তাঁহার জীবিকা-নির্বাহের উপায়স্বরূপ বিস্তর ভূমিদান করেন। ভুক্তিহারা বর্তমান প্রবাসী বাঙালী ব্রাহ্মণেরা সকলে তাঁহারই বংশোদ্ভূত। ইঁহারা এই স্থানে পুরোহিত্য করেন। হুঁদের বিষয়, ইঁহারা দীর্ঘকাল প্রবাসী হইয়াও বাঙালীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইঁহাদের বংশের এক ব্যক্তি স্থানীয় কাছারীতে ওকালতি করেন।

গিরিডিতে বারগঙা নামক স্থানেই অধিকাংশ বাঙালীরা বাস করেন। এই বারগঙা নামের উৎপত্তি কিরূপে হইল বলিতেছি। গিরিডি হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে হাজারিবাগ রোডের নিকট বারগঙা নামক স্থানে পূর্বে বার্ড এণ্ড কোং-এর একটি তাম্রের খনি ছিল। গিরিডিস্থ বর্তমান বারগঙা রোড যে-স্থানে উত্তীর্ণ নদীর তীর অবধি আসিয়া শেষ হইয়াছে, ঐস্থানে কপারফীল্ড নামক একটি দ্বিতল অটালিকা আছে। তৎকালে উহাতেই উক্ত

কোম্পানীর কার্যালয় ও আকরিক তাম্র হইতে বিপুল তাম্র নিষ্কাশনের জন্য বস্ত্রপাতি স্থাপিত হয়। আসল খনিটি বারগঙা নামক স্থানে অবস্থিত বলিয়া এবং আপিস ও তাম্র-নিষ্কাশণ সংক্রান্ত কার্যের জন্য এস্থানের সহিত বারগঙা নামক স্থানের যোগ থাকায় কালক্রমে এই স্থানের নামও বারগঙা হইয়া যায়। কপারফীল্ড নামক বাটীটি এখন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের অধিকারে আছে। পরে খনিজ তাম্র নিঃশেষিত হওয়ার জন্যই হউক অথবা ব্যবসায় কোম্পানীর

ক্ষতি হওয়ার কারণেই হউক উক্ত আকর হইতে তাম্র-উত্তোলনকার্য বন্ধ হইয়া যায়। বারগঙা নামক স্থানটি এখন বেঙ্গল ইকুইটেবল কোল কোম্পানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা স্থানীয় ট্রাইইং-এর নিকট হইতে প্রথমে কয়লা-উত্তোলনের উদ্দেশ্যে জমিটি ক্রয় করেন; কিন্তু পরে কয়লা না-পাওয়ায় জমি পড়িয়া থাকে। কথিত আছে, ইকুইটেবল কোল কোম্পানী এককালে মাত্র ছয় শত টাকা বাৎসরিক খাজনায় সমগ্র বারগঙা ইজারা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সেই জঙ্গলাবৃত্ত কঙ্করাকীর্ণ অক্ষুণ্ণ জমিতে কসলোৎপাদনের চেষ্টা হুদূরপর্যন্ত বৃথিয়া তখন কেহই সেই জমি ইজারা লইতে ভরসা করেন নাই। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু মহাশয়ের পরামর্শে উক্ত কোম্পানী এই জমিগুলি বহু অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশ বাৎসরিক দশ টাকা খাজনায় বিলি করিবার বন্দোবস্ত করেন। শশীবাবুই প্রথম এই সব জমিতে ব্রাহ্মদের বসবাস করাইতে আরম্ভ করেন। তদবধি গিরিডি ব্রাহ্ম-উপনিবেশ রূপে পরিগণিত হয়। শশীবাবুর আদি নিবাস ছোট-জাগুলিয়া গ্রামে। তিনি পূর্বে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বারগঙায় তাম্রখনির আপিস প্রতিষ্ঠার সময়ে

বার্ড কোম্পানীর সাহেব-কর্মচারীদের জন্ম আপিস-বাটীর অদূরে তিনখানি বাংলা-বাটী নিশ্চিত হয়। পরে ইহারই একখানি শশীভূষণ বাবু ক্রয় করেন। এখনও ইহা তাঁহারই অধিকারে রহিয়াছে। বাড়িটির বর্তমান নাম “বারগুণ্ডা বাংলা।” অপর দুইটি বাটী ডাক্তার সার নীলরতন সরকার ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বহু ক্রয় করেন। গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে শশীভূষণ বাবু অগ্রতম ব্যক্তি ছিলেন। গিরিডিতে ব্রাহ্ম-উপনিবেশস্থাপনের ইচ্ছা, গুনিয়াছি, প্রথমে ৮ আনন্দমোহন বহু মহাশয়ের মনেই উদ্ভিত হয়। তিনি পচষায় কিছু জমিও সেই উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু যে-কারণেই হউক, শেষ-পর্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। তিনি পচষায় “মজিলপুর ভিলা” নামক বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন।

বারগুণ্ডার পুরাতন অধিবাসীদের মধ্যে ৮ সাতকড়ি দেব মহাশয় অগ্রতম ছিলেন। ইহার আদি নিবাস ছিল কোল্লগর গ্রামে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইনি প্রথম এই স্থানে বাড়িবর নিষ্কাশন করাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় সর্বপ্রথম এই স্থানে দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া ভাড়া খাটাইতে থাকেন। সেই হইতে এ স্থানে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন হয়। সেই জন্ম এ কথাটির উল্লেখ করিলাম। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ বীরেন্দ্র বাবু গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী-আবাস নির্মাণোদ্দেশ্যে দুই সহস্র মুদ্রা দান করেন। স্থানীয় শাসনসংস্থার কার্যে জন্মও তিনি পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। বীরেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বারগুণ্ডায় নিজ বাটী আছে। উল্লী নদীর অপর তীরে পাড়েডিহি নামক মৌজাখানিও ইহার। উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের ইনি অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা।

গিরিডির প্রধান খনিজ পণ্য কয়লা ও অন্ন। কয়লার খনিগুলি রেল-কোম্পানীর অধিকৃত। উপস্থিত বাজার মন্ডা হওয়ায় খনিগুলিতে কয়লার চাহিদা হিসাবে সপ্তাহে কয়েক দিন মাত্র কয়লা উত্তোলিত হয়। গত মহাসময়ের

সময়ে যখন অন্নের মূল্য অত্যধিক ছিল, তখন স্থানীয় বহু লোক ও প্রবাসী বাঙালী অন্ন-ব্যবসায়ীরা অনেকেই বিশেষ বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি সে সময়ে অন্ন-ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সাধারণ দিনমজুররা অবধি প্রত্যহ গড়ে তিন চারি টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিত। কিন্তু পরে অন্নের দর অসম্ভব রকম হ্রাস হওয়ার সঙ্গেই উক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। ঠিক গিরিডিতে কোন অন্নের খনি না-থাকিলেও, কোদাঙ্গী, গাওয়া প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থানসমূহের খনিগুলি হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট অন্ন পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান হইতে অন্নের পুরু শুবক সংগ্রহ করিয়া গিরিডিতে আনীত হয়। এই স্থানে তাহা হইতে অনতিদূর তত্ত্বি প্রস্তুত হয় ও পরে তাহার মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ হইলে ছুরির সাহায্যে স্তর বিচ্ছেদ করিয়া খুব সূক্ষ্ম অন্নপত্র প্রস্তুত হয়। গিরিডির বহু বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অন্নের স্থানীয় কারখানা হইতে অন্নতত্ত্বি আনিয়া নিজ বাটীতে বসিয়া উপরিউক্ত প্রথায় কাটিয়া-ছাঁটিয়া অন্নপত্র প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ঐ কারখানায় দিয়া আসেন। এই কার্যেই বহু পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হয়। ইহার পর কারখানায় এই অন্নপত্রগুলি হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন আকার ও স্থলতা বিশিষ্ট অন্নের তত্ত্বা প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। অন্ন-ব্যবসায়ের সাময়িক অবনাদ হেতু গিরিডিতে উপস্থিত অন্নভাব প্রকট হইয়াছে।

বাঙালী অন্ন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রথমেই শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি এককালে “অন্নের রাজা” (Mica Prince) নামে পরিচিত ছিলেন। গিরিডিতে ইহার বাড়িবর ও অন্নের প্রকাণ্ড কারখানা-বাটী অবস্থিত। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বোবের পচষাষিত বসতবাটী ও কারখানা-বাটী ইহারও ব্যবসায়ে উন্নতির পরিচয় প্রদান করে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে সাক্ষাৎলাভ হেতু অতি দীন অবস্থা হইতে ইনি লক্ষপতি হইয়াছেন এবং এখনও এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দে মহাশয় এক সময়ে অন্ন-ব্যবসায়ে লক্ষপতি হইয়াছিলেন। উল্লী নদীর তীরে ‘কপারকীল্ড’ নামক সূক্ষ্ম দ্বিতল অট্টালিকাখানির ইনিই অধিকারী।

রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের এক সময়ে গিরিডিতে অঙ্গের থনি ছিল। ইনি স্থানীয় পুরাতন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অগ্রতম ছিলেন। গিরিডিতে ইঁহার বাটী বর্তমান। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এক জন স্থানীয় অভ্য-ব্যবসায়ী। ইঁহার এখানে নিজস্ব বাটী ও জমি আছে। ইনি এক জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। ইঁহার পিতা মনোজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর যাবৎ এস্থানের ষ্টেশন-মাস্টার ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বে কলিকাতায় বেচু চাটুজ্জে ষ্ট্রাটে বাস করিতেন। ১৯১৫ সালে গিরিডিতে কপর্দকশূন্য অবস্থায় আসিয়া কিছুকাল স্থানীয় কাছারীতে ওকালতি করিয়াছিলেন; পরে অঙ্গের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বিশেষ লাভবান হন। এখনও ইনি বিলাতে অভ্য রপ্তানী করিয়া থাকেন। স্থানীয় বিহার-মাইকা কোম্পানীর ইনিই স্বত্বাধিকারী। গিরিডিতে ইঁহার একাধিক বাড়ির আছে; ইনি এস্থানের স্থায়ী অধিবাসী। ব্রাহ্মদাস চট্টোপাধ্যায় ও ব্রাহ্মকৃষ্ণ সাহানী মহাশয়দের কোদাম্ভার নিকট অভ্যথনি বর্তমান। গিলোপী রজার্স পিয়েট কোম্পানী এই স্থানের প্রধান অভ্য-ব্যবসায়ী; ইঁহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ এই কোম্পানীতে কার্য্য করিতেছেন। সামান্য কর্মচারী হইতে স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে ইনি উন্নত হইয়াছেন। অঙ্গের শ্রেণী-বিভাগকার্য্যে ইঁহার ভ্রাতৃ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিরল। গিরিডিতে ইঁহার বাড়ি আছে।

বাঙালীদের মুদিখানার দোকান গিরিডিতে পাঁচখানি আছে। তন্মধ্যে মকতপুরার জ্ঞানবাবুর দোকান সমধিক জনপ্রিয় ও প্রাচীন। ইঁহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা অমৃতবাজার গ্রামে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে স্বাস্থ্যোন্নতিকামনায় ইনি গিরিডিতে আগমন করেন। পরে ক্রমে একখানি ছোট মুদির দোকান খুলিয়া বসেন। এখন নিজস্ব বাটী করিয়া ইনি এ-স্থানে স্থায়ী বসবাস করেন। কয়লার ডিপো, মগিহারী দোকান ও চারি-পাঁচখানি মিষ্টানের দোকানও বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

হেলথ হল, ইম্পিরিয়াল মেডিক্যাল হল, বিহার

ড্রাগিস্ট হল, সুলভ ফার্মেসী, কৃষ্ণভাবিনী মেডিক্যাল হল প্রভৃতি স্থানীয় সকল ঔষধালয়গুলিই প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত। ইম্পিরিয়াল মেডিক্যাল হলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সত্যদাস রায় মহাশয় ষ্ট্রট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর স্থানীয় কোলিয়ারী আপিসের হেড ক্লার্ক।



শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গিরিডিতে দর্জিমহল্লা নামক স্থানে 'ঘোষ হাজরা এণ্ড কোং' নামে বাঙালীদের একটি কাপড়-কাটা সাবানের কারখানা আছে। সুথের বিষয়, ইঁহাদের প্রস্তুত সাবান এখানে বেশ আদৃত হওয়ায় কারখানা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

গিরিডি ইলেকট্রিক কোম্পানী ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর ক্রমোন্নতির আর একটি নিদর্শন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বারগুয়ায় তিন বিঘা জমি নিরানব্বই বৎসরের জন্য ইজারা লইয়া ইঁহার বিদ্যুৎ-উৎপাদন গৃহ (power house), বিশ্রাম কুটার নামক কার্যালয় প্রভৃতি নির্মাণ আরম্ভ হয় ও তৎক্ষণ একুশ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। সাতাশী হাজার টাকা মূল্যের বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রপাতি ক্রীত হয় ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের আনুষঙ্গিক অগ্ন্যস্তর বন্দোবস্তের জন্যও একানব্বই হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। ১৯৩১ সালের ২৮এ মার্চ তারিখে ইঁহার দ্বারোদঘাটন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে ও ৩১এ মার্চ হইতে গিরিডিতে তড়িৎ-প্রবাহ সরবরাহ হইতেছে। এই কোম্পানী এখন সমস্ত গিরিডি শহরে তড়িৎপ্রবাহ সরবরাহ করিয়া থাকেন। লালজী এণ্ড কোম্পানী উপস্থিত ত্রিশ বৎসরের জন্য ইঁহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। ৩৪ নং শোভাবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতায় ইঁহার একটি শাখা-

কার্যালয় আছে। ইহার ডিরেক্টরেরা সকলেই বাঙালী ; তন্মধ্যে ত্রিযুক্ত বিষ্ণুভূষণ সিংহ মহাশয় স্থানীয় অত্র-ব্যবসায়ী। মিঃ এন. এল. রায়, এম-ই (কর্ণেল, ইউ. এস. এ) ইহার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ; ইহা ভিন্ন সাত জন বিচক্ষণ বাঙালী ফোরম্যান ও এক জন বাঙালী সহকারী এঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও আপিস-সংক্রান্ত সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করেন। কোম্পানী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

গিরিডি়র অদূরবর্তী দ্রষ্টব্যস্থান-সমূহের কথা উল্লেখ করিতে হইলে বারগঙা হইতে সাত-আট মাইল দূরস্থ উল্লী জলপ্রপাতের কথাই প্রথমে মনে উদ্ভিত হয়। বর্ষার শেষে অথবা শরৎকালের প্রাবল্ধে জলপ্রপাত দেখিতে বাওয়াই প্রশস্ত। উচ্চ পর্বতশীর্ষ হইতে অজস্র ফেনন্তল উচ্ছলিত জলধারার সশব্দ পতন ও শূন্যোৎক্ষিপ্ত ধূমাত বারিকিল্লুর উপর সূর্য্যকিরণপাতে সপ্তবর্ণের বিচিত্র লীলা সত্যই মনোরম।

গিরিডি় হইতে সাতাশ-আটাশ মাইল দূরে ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ পর্বত পরেশনাথ। পূর্বে রেলযোগে গিরিডি় গিয়া পুস্পুস অথবা গোবানে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া পরেশনাথ বাইতে হইত ; ইহা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। এখন অবশ্য পরেশনাথ ষ্টেশনে নামিয়া বাইবার সুবিধা হইয়াছে। গিরিডি় হইতে বাইতে হইলে এখন সকলে মোটরকারে অথবা মোটরবাসে ঐ স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। পরেশনাথ প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থস্থান।

গিরিডি় হইতে প্রায় আটচল্লিশ মাইল দূরে ভোপটাচি নামক স্থানে বরিয়্যা ওয়াটার ওয়ার্কস্ও অনেকে দেখিতে যান। ঐ স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য অতি রমণীয়। বর্ষার সময়ে চারি ধারের হুউচ্চ গিরিগাত্র হইতে যে বারিধারা নামিয়া আসে, স্থাপত্যকৌশলে এক দিকে দীর্ঘ বাধ দিয়া সেই বারি সঞ্চিত করা হয় ও পরে তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া বরিয়্যা প্রত্নুতি স্থানে নলের মধ্য দিয়া সরবরাহ করা হয়। ফলে ঐ স্থানে মনোহর প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের মধ্যে প্রায় সার্ব্ব তিন মাইল দীর্ঘ ও সাতবাটি ফুট গভীর একটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে।

গিরিডি়র শ্মশানের বিষয়ে কিছু না-লিখিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। উল্লী নদীর তীরে ঐ শ্মশান অবস্থিত। শ্মশানঘাট নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন প্রসিদ্ধ অত্র-ব্যবসায়ী ত্রিযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়। শ্মশানঘাট-সংস্কার-সম্ম (Burning Ghat Improvement Trust) বিহারী ও প্রবাসী বাঙালীদের সহযোগিতায় গঠিত হইয়াছে। ঐ সম্ম শবাহুগামী ব্যক্তিদের জন্য ঐ স্থানে একটি বিশ্রামগৃহ নিৰ্ম্মাণকল্পে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এ-পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত পঁচাত্তর টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে প্রদত্ত পাঁচ শত টাকা ও নিউ-বারগঙার অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার ত্রিযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত দুই শত পঞ্চাশ টাকা উল্লেখযোগ্য।



বাঁশীর সুর

শ্রীআশালতা দেবী

১

মেয়েটি আজ ক'দিন হইল ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে উঠিয়াছে। অসুখটা হইয়াছিল শক্ত রকমের। রোগা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা। সমস্ত মুখে রোগ-শীর্ণ একটি করুণ আভা।

সকালবেলা হইতে একটি কমলানেবু হাতে করিয়া শুধু মোজা পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নেবুটি তখনই খাইতে মীরার মায়া হইতেছে। জানে ফুরাইয়া গেলে মায়ের কাছে আর নাই।

মীরার মা তখন ভাণ্ডার-ঘরের রোয়াকে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। সামনেই কল। সেখানে চাকরে বাসন ধুইতেছে। স্থানটা স্বলে এবং কাদায় ভর্তি। মীরা মায়ের কাছে ঘোরাফেরা করিতেছে। মা ডাক দিয়া কহিলেন, “ও মাগিক, শুধু মোজা প'রে ঘুরে বেড়ায় না। জলে এখনই ভিজ্ঞে মোজা নষ্ট হয়ে যাবে আর পায়ে ঠাণ্ডা লাগবে।”

মীরা করুণ ভাবে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, “আমার যে জুতো নেই মা। তুমি তো জান।”

তখন মায়ের স্মরণ হইল তাই বটে। মীরার জুতা-জোড়াটা অন্ততঃ দশবার মুচির কাছে পাঠাইয়া তিনি তালি দিয়া আনিয়াছেন কিন্তু আর সেটা দিয়া কাজ চলে না। এত দিন মীরার অসুখ চলিতেছিল, শুইয়া তাহার দিন কাটিত, জুতার প্রয়োজন তেমন ছিল না।

সময়টা শীতকাল, পশ্চিমের শীত দ্রুত, তাহাব উপর মেঘেটা সদ্য এতবড় অসুখ হইতে উঠিল।

মীরার মা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কাজকর্ম শেষ হইলে বাক্স খুলিয়া তাঁহার তহবিল মিলাইবেন এবং যেমন করিয়া হোক ও-বাড়ির ঠাকুরপোকে দিয়া বিকালে তাহার জন্য একজোড়া জুতা আনিইবেন। এখন মেয়েকে কাছে ডাকিয়া পাশে একখানা আসন পাতিয়া বলিলেন,

“এখানে এসে বোস মা। আজ বিকেলে তোর জুতো দোকান থেকে নতুন জুতো নিশ্চয় আনিবে দেব।”

খবরটা মীরার পক্ষে এমন অভাবনীয় যে আনন্দে তাহার শীর্ণ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কবে যে তার জুতা কেনা হইয়াছে সে আর এখন তার মনেও পড়ে না। বোধ হয় বছর-তিনেক আগে। অত্যন্ত খুশী হইয়া সে আসনে বসিয়া কহিল, “সত্যি মা?”

—হ্যাঁ, মা। কিনে দেবো বইকি।

নেবুটা আলোষ্টারের ছিন্ন পকেটে গুঁজিয়া রাখিয়া সে স্থির হইয়া বসিল। এখন বোধ হয় ঘড়িতে নটা বাজে। আর কিছুক্ষণ পরে দুপুর হইবে, তার পরে বিকাল, আর তার কিছুক্ষণ পরেই তার নতুন জুতা আসিবে। পৃথিবীতে এত সুখও অবশেষে ছিল। মধ্যাহ্ন, অভাবের ঘরের মেয়ে, এই তো মোটে তার ছ-সাত বছর বয়স হইয়াছে ইহারই মধ্যে ঘরকন্নার কাজ অনেক শিখিয়াছে। বলিল, “দাও না মা তোমার শুকনোটা আমি তত ক্ষণ কুটে দিই। নটা বাজে, বাবা খেয়ে-দেয়ে কাছারি যাবেন। তুমি রান্না করবে না?”

মা সম্মেহে একবার তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তোমার রোগা শরীর, থাক না মীরা। ক'টা আনাজ কুটতে আমার কতক্ষণই বা লাগবে।”

তার পরে মীরার বাবা আসিলেন। তিনি চার-পাঁচ বছর হইতে পশ্চিমের এই শহরে ওকালতী করিতেছেন। স্থানীয় বড় উকিল তেজনারায়ণ ধনধনিয়ার কাছে জুনিয়ারি করেন। সকাল সাতটা বাজিতে-না-বাজিতে তাঁর বাড়িতে ছোটেন এবং কাছারি যাইবার আধ ঘণ্টা আগে বড়জোর বাড়ি ফিরিয়া আসেন। শুধু যে তাঁহাব জুনিয়ারি করেন এমন নয়। তাঁহার বোকা ছেলেকে ঘণ্টাভূই করিয়া পড়ান, শহরের একপ্রান্তে গোলাঘাটের এক দোকানে কাশীর

জরী আর লক্ষ্মীরের সুরি এবং কিয়াম পাওয়া যায়, সেখান হইতে ধনধানিয়া-গৃহিণীর জন্ত তাহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। আরও কত টুকি-টাকি কাজ যে করিয়া দেন, প্রত্যহের কত পুঞ্জীভূত হীনতা, কত মিথ্যা চাটুবাক্যের গানি যে তাঁহাকে বহন করিয়া চলিতে হয়। তথাপি তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। কত বেহারী জুনিয়ার উকিল তাঁহার ক্ষুধার্ত লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে প্রতিদিন মোকদ্দমা লইয়া যায়, তিনি পান না। কায়ক্লেশে তাঁর সংসার চলে। জীবনবৃক্ষে অবিরত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং প্রকৃতি রুদ্ধ হইয়া গেছে।

২

বাড়িতে এগারটা বাজিল। মীরার বাবা মন্থবাবু স্নান এবং আহার সারিয়া চাপকানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে একাধা চড়িয়া কাছারির উদ্দেশে বাহির হইয়া গেলেন।

মীরা কয়েকটা সূজির ক্রটি অনেক ক্ষণ ধরিয়া বসিয়া খাইল। তার মায়ের রান্নাবরের সব কাজ মিটল। ক্ষুদ্র অপরিষার বারান্দায় বেখানে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেইখানে একটি মাদুর বিছাইয়া মীরার মা বসিলেন মীরাব ছোট ভাইটিকে লইয়া। এই তো দুপুর কাটিয়া আসিল, এইবারে বিকাল হইবে। তার পরেই মীরার জুতো। আনন্দে মীরা তাহার বহু পুরাতন আলোষ্টারের পকেট হইতে কমলানুবুটি বাহির করিয়া এতক্ষণ পরে তাব খোসা ছাড়াইল।

খোকাকে ডাকিয়া কহিল, “চুনি, নেবু নিয়ে যা। তোকে দু-কোয়া দেবো।”

মীরার মা হুমুনা বড়লোকের মেয়ে। কলিকাতায় বাপের বাড়ি। কিন্তু আজ দশ-বার বছর বিবাহ হইয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া অভাবগ্রস্ত স্বামীর সংসারের ধরনী হইয়া সে-সবই ভুলিয়াছেন। একটু পরে খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া উঠিয়া তিনি ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিলেন। টাকার ব্যাগ খুলিয়া গুলিলেন, আঠারটি টাকা আছে। আজ ইংরেজী মাসের একুশে, এমাসে রোজকার সামান্য, বাজাব-খরচ তিন-চার আনা বাদ দিয়া স্বামীর উপার্জন

এই হইয়াছে। এখনও কত বাকী। মাস দুইতে-না-দুইতেই গোয়ালার দুধের দাম, ঠিকা চাকরটার মাহিনা, বাড়িভাড়া সমস্তই দিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া কল নাই।

পাশের বাড়ির নিতু তখন দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাক দিতেছে, “বৌদি ডেকে পাঠিয়েছিলে, কিছু দরকার আছে নাকি?”

“হ্যাঁ, ভাই। মীরার পায়ের এক জোড়া জুতো এনে দিতে হবে।”

“কেমন জুতো চাই?”

“ওরই মধ্যে একটু শক্ত টেকসই হয়। জানই তো একবার কিনলে আবার যে কিছুদিন পরে কিনে দোব সে সামর্থ্য নাই।”

চোখ-মুখ হুশীতে উজ্জ্বল কনিয়া-মীরা নিতুর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “নিতু কাকা, আমি সেই রকম ফুলওয়াল জুতো নেব। সেই যে তোমার বোন রুম্মর পায়ে দেখেছি।”

তাহার মা ভাড়া দিয়া বলিলেন, “না না পামুন্ড নিতে হবে না। বড় তড়াতাড়ি হিঁড়ে যায়।” নিতু মমতাভরা চোখে একবার মীরার দিকে চাহিল। বেচারী জানে না ভাল-কাজ-করা পামুন্ড, রুম্মর ঘেমন পায়ে দিবেছিল, তার দাম পাঁচ-ছ টাকা। কহিল, “আচ্ছা বৌদি এক কাজ করলে হয় না, মীরাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাই। জুতো কেনা, যার জন্তে কিনব সে সঙ্গে থাকলেই ভাল হয়।”

“বেশ তাহলে ক’টাকা তোমায় দেব?”

“এটুকু বাচ্চার জুতোর দাম আর কত হবে? আচ্ছা আগে আমি নিয়ে আসি তার পরে সে-সব হবে।”

দুটা-দুই পরে লাইমজুন শাইয়া পিপারমেন্ট-দেওয়া পানে ঠোঁট ছুটি লাল টুকটুকে করিয়া খুব সৌখীন এক পামুন্ড পায়ে, জুতার বাক্সটা বগলে চাপিয়া আনন্দে উদ্বেলিত মীরা যখন তাহাদের বাড়িতে ঢুকিল, ঠিক সেই সময়ে মীরার বাবা কাছারি-ক্ষেত্রত গুরুমুখে টমটম হইতে নামিতেছেন।

নিতু মীরাকে তার মায়ের কাছে দিয়া বলিল, “নাও বৌদি তোমার মেয়ে। আহা বেচারী অহুখে ভুগে বড় দুর্বল হয়ে গেছে। এক দোকান থেকে আর এক দোকানে

একটুখানি যেতেই একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষে কোলে ক'রে নিলুম। জুতো কেমন হয়েছে?...কত দাম নিয়েছে?...দাম আর কত, টাকা-দুয়েক।” আসলে জুতোর দাম চার টাকা পনের আনা। কিন্তু নিতু ঠিক করিয়াছিল বৌদির কাছে দু-টাকার বেশী কিছুতেই লইবে না।

“...ও কি, আবার মোজা, গার্ডার। এসব কেন ঠাকুরপো?”

“হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তোমাকে বলতে ভুলেছিলুম, জুতোর দাম এক টাকা ছ-আনা। আর মোজা-টোজা সবছদ্ম ধরে দু-টাকা।...” নিতু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল। সে অনেকবার নিজে হইতে মীরাকে কিছু দিতে গিয়া দেখিয়াছে দারিদ্র্যাভিমানিনী বৌদি তাহা নেন-না। তাই এবারে এই ছলনাটুকু করিল।

হুমনা অপ্রসন্ন মুখে বাক্স হইতে ছুটি টাকা বাহির করিয়া আনিল। মনে মনে ভাবিল, আবার মোজা কেনা কেন। তা না হইলে ত পূর্বা দুইটি টাকা লাগিত না।

নিতু চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে কহিল, “ওগো বাক্সে টাকা আঠার আছে, নয়? কাল যে কাছারি ঘাবার আগে গুণেছিলুম আঠার টাকা এগার আনা ছিল। তা দু-দিনের বাজার-খরচে খুচরো পয়সাটা বাড়ে আঠার টাকাই নিশ্চয় থাকবে। তুমি এক কাজ কর দেখি, খরচের জন্ত একটি টাকা রেখে সতের টাকা আমাকে বার ক'রে দাও। আজ আর কাছারিতে কিছুই পাই নি।”

“একসঙ্গে এত টাকা কি হবে?”

“তোমাকে বলি নি, আর বলেই বা কি হবে! মাসে বা বৎসামাত্র পাই, তাতে খরচ চলে কই। প্রত্যেক মাসেই তাবাপদর কাছে কোন মাসে আট কোন মাসে দশ এমনি ধাব করতে করতে প্রায় একশো টাকা দাঁড়িয়ে গেছে। আজ বার-লাইব্রেরীতে সকলের সামনেই অপমান ক'বে বসলে। আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। বলেছে আজ পনের টাকা কম ক'রে তাকে দিতেই হবে।”

“তবে সতের চাইছ কেন?” হুমনা সাহস সঞ্চয় করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল।

“আর ছোটো টাকা জরদা আর কিমাম বিক্রী ক'রে সেই

মুসলমানটাকে দিতে হবে। ধনধনিয়া-গিন্নীকে নিজের পয়সায় স্তুতি আর জরদা কিনে ভেট দিতে দিতে কতুব হয়ে গেলাম, তবু যদি একটা মজেলের মুখ দেখবার জো রয়েছে। আজ মুসলমান বুড়োটা পথের মাঝে একা দাঁড় করিয়ে বলে, ‘বাবুজি, আমার দোকানে কমসে কম তোমার পনের রুপের বাকী। আজ পাঁচ মাস ছ-মাস হয়ে গেল এক পয়সা দিলে না। আর আমি কেমন ক'রে অপেক্ষা করব।’ তাকেও আজ টাকা-দুয়েক না দিলে অনর্থ করবে।”

“তোমার যে এত জায়গার ধার রয়েছে সে-কথা আগে ত আমাকে ঘণাক্ষরেও বল নি।” হুমনা বিহ্বলের মত তার নিজের নাম লেখা ক্যাশ-বাক্সটার দিকে চাহিল।

“ব'লে কি হবে? বলবার মত কথা হ'লে বলতুম। এখন দাও দিকি টাকাটা চটপট বাক্স থেকে বার ক'রে।”

আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। হুমনা মরীয়া হইয়া কহিল, “অত টাকা নেই বাবো, ষোলটি টাকা রয়েছে।”

মন্মথ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, “এর মধ্যে এত খরচ ক'রে ফেলেছ? কিসে খরচ করলে? এবার থেকে টাকাকড়ি হিসেবপত্র সব আমি নিজে করব। চাৰিও রাখব আমার কাছে। চুপ ক'রে রইলে কেন? জবাব দাও। এত কি নবাবের মেয়ে হয়েছে যে এক জন মুখের রক্ত উঠিয়ে টাকা রোজগার কববে আর তুমি তা জলের মত খরচ ক'রে বাবে-হিসেবটাও দিতে পারবে না।”

“মেয়েটার জুতো ছিল না।...” হুমনার মুচ্ছিতপ্রায় কণ্ঠস্বর হাওয়ায় মিশাইয়া গেল।

“জুতো কিনেচ মীরার?...দু-টাকা খরচ ক'বে! তাই বটে, আজ কাছারি থেকে ফেরাব সময় দেখলুম মেয়ে নতুন সৌখীন জুতো পায়ে আফ্রাদে ডগ্‌মগ হয়ে আসছে। তোমাদের লজ্জা নেই? পেনার দায়ে স্বামীকে পথের লোকে অপমান ক'বে বাচ্ছে আব এদিকে এই সব হচ্ছে।”

মন্মথের গলার আওয়াজ ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে লাগিল। মীরার ভয় পাইয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নতুন জুতোটি পা হইতে খুলিয়া বাক্সে ভরিয়া কাগজের বাক্সটা সে বকের কাছে চাপিয়া ছিল। তাহার দিকে গোধ পড়িতেই মন্মথ যেন ফেপিয়া গেল। বাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে বাক্সটা কাড়িয়া লইয়া উন্মত্তের মত বলিতে লাগিল,

“এই সব হচ্ছে, এই সব হচ্ছে! আচ্ছাদে মেয়ে, অমন জুতোর নিকুচি কর!” বলিযা জুতাঝোড়া সবেগে দেওয়ালের দিকে নিক্ষেপ করিল। একটা জুতার ফুল হিঁড়িয়া খুলিয়া গেল। মীরা কাঁদিবার উপক্রম কবিত্তেই তাহার বাবা গালে সশব্দে এক চড় মারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিলেন।

মা ছুটিয়া অশ্রুতন্তিত চক্ষে মেয়েকে তুলিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, “রোগা মেয়েকে অমন ক’রে মেরো না। হয়ত এখন তোমার মন খুব উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, অল্প জায়গায় যাও। পরসো না-খাকলেও মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে, সেটা যায় না। এটুকু অন্ততঃ তোমার কাছে আশা করতে পারি।”

৩

ঘরের মাঝে একটুকরো জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। হুমনা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। স্বামী এখনও ফেরেন নাই। অদূরে ক্ষুদ্র বিছানার থোকা আর মীরা শুইয়া আছে। হুমনা বসিয়া ভাবিতেছিল আগেকার দিনের কথা। বাবা ছিলেন কলিকাতার বড় ডাক্তার, চাল-চলন ছিল একালের মত। হুমনাকে গান শিখাইয়াছিলেন, মেম রাখিয়া সেলাই শিখাইয়াছিলেন। বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে সে যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ে তখন বিয়ে হয়। স্বামী মন্থ ছিল দেখিতে সুপুরুষ, তাহার চেহারা দেখিলে দু-দু তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়ে। লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল। হরকুমার বাবুর সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল একদিন কি-একটা উপলক্ষ্যে। বুঝি কোন বন্ধুব অস্থানে সে তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিল। দেখিবামাত্র ছেলোটিকে তিনি কি যে স্নেহে দেখিলেন। হুমনার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করিবার পরেও বাড়ির মেয়ের আপত্তি তুলিয়াছিল ছেলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া। কিন্তু হরকুমার সে আপত্তি গ্রাহ্যে আনেন নাই।...সোনারটুকরো ছেলে। ওকালতী পাস করাইয়া কলিকাতায় তাহাকে তিনি বসাইবেন। নিজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী, জামাইকে সাহায্য করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া যাইবেন। কোথায় বা কি হইল, যে বছর মন্থ ওকালতী পাস করিয়া বাহির হইল, সেই বছর হুমনার

বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মারা যাইবার পরে দেখা গেল কিছুই রাখিয়া যান নাই। বাঁশীগঞ্জে এক সুবৃহৎ বাড়ি, মোটর, ছোট পাঁচ-বছর বয়সের একটি মেয়ে এবং বিধবা স্ত্রী। তবে একমাত্র আশার কথা তাঁর বড় ছেলে বছর-দুই আগে বিলেতী ডিগ্রী লইয়া ডাক্তারি শুরু করিয়াছে এবং বাবার পশার আশ্বে আশ্বে তাহার হাতে আসিতেছে। নরেন্দ্র প্রথমটায় খুব ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে এত নাম এত ষ্টাইল কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁহার সিদ্ধক শূন্য। এমন গোলমালের সময়ে হুমনা বা তাঁর স্বামীর কথা কেহ ভাবিল না। পশ্চিমে জীবনযাত্রার ব্যয় অল্প, জিনিষপত্র সস্তা, তাই মন্থ এখানে আসিয়া ওকালতীতে বসিল। হুমনা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল সেই সব দিন কত আশা কত আনন্দেই না কাটিয়াছে। ওকালতি পাসের খবর যেদিন বার হইল সেদিন মন্থ কত হান্ত-পরিহাস কত আমোদের ভিতর দিয়া ভাব কানে কানে এই অতিশয় প্রিয় সংবাদটি দিয়াছিল। তাৎ পরে দুই জনে মিলিয়া ‘ভবিষ্যতে’ কত ছবি আঁকা...কত স্বপ্ন দেখা...হঠাৎ বিনামেবে বজ্রাঘাতের মত হুমনার বাবা সন্ন্যাসরোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। যেখানে অনেক আলো জলিতছিল, সভা বসিয়াছিল, সঙ্গীতপ্রবাহ বহিতেছিল, সেখানে অকস্মাৎ আলো নিবিয়া গেল। গাঢ় তমিস্রায় সকলের নয়ন অন্ধকার হইয়া গেল। বাবা কিছু ছিল সমস্তই অকালে ভাঙিয়া গেল। সেই হইতে হুমনা বিদেশে। অল্প আগে অপরিচিত জায়গায় কোনক্রমে জীবনতরঙ্গী বাহিয়া চলিয়াছে। মনে আর আশা নাই, জীবনে আর জ্যোতি নাই। কালে সবই সহিয়া আসিতেছে।...কেবল আজিকার ব্যাপারটায় মনে বড় লাগিয়াছে। রোগা মেয়েটা অত মার খাইয়া কেমন যেন নিরজীবের মত হইয়া পড়িয়াছে। অত যে সখের জুতা তাও অনাদৃতের মত আলনার তলায় পড়িয়া আছে। হুমনা ভাবিতেছিল সে ছেলেবেলার দাদার সঙ্গে মোটরে করিয়া নিউমার্কেটে গিয়া কত দিন কত দামী জুতা কিনিয়া আনিয়াছে আর নিজের মেয়ের একটা সামান্য সখ... না, সখও নয়, অবশ্যপ্রয়োজনীয় একটা সামান্য জিনিষ, তাও কিনিয়া দিবার অধিকার বা সামর্থ্য তাহার নাই। নানা স্মৃতির আলোড়নে আপন অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া

তাহাব জল পড়িতেছিল অত খেয়াল করে নাই। অফুট চন্দ্রালোকে নিঃশব্দে অপরাধীর মত কে ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া নিদ্রিতা মীরার পাশে আসিয়া বসিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া বড় বড় তাহার নবম রেশমের মত চুলগুলির উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

আখা আলোছায়ামর ঘরে কিছুই স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না।

“সুমনা!”

সুমনা চমকাইয়া উঠিল। তাহার পরে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বামীব পানে চাহিয়া কহিল, “কি বলছ?”

“মেয়েটা কি বড় বেশী কাঁদছিল?...” মন্থ ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত মীরার মুঠিবাঁধা হাতটি খুলিয়া দিল।

“না, তেমন আব কি কাঁদছিল। ছেলেমানুষ অল্প সময়ের মধ্যেই সব ভুলে যায়। কিন্তু কিরতে তোমার এত রাত হ’ল কেন?...সুমনা তখন সাংসারিক জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে। একটুখানি আগেকার ক্রন্দনবিবশা স্মৃতিভারাতুবা নারী তখন আর নাই, তাহার জায়গায় মমতাময়ী স্ত্রী আসিয়া স্থান নিয়াছে। সুমনা মনে মনে স্বামীকে ক্ষমা করিল তখনই। ভাবিল, একে ত লোকটা সংসারের ভার বহিয়া নানা আশার উদ্ভ্রান্ত। তাঁহাকে আর কথা কষ্ট দিই কেন।

“রাত অনেক হয়েছে। এবারে তুমি খেতে বসো। ভাতটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ব’লে গরম জলের কড়াব উপর বসিয়ে বেখে দিয়েছি। চলো দিইগে।”

কিন্তু মন্থ যেন শুনিতেই পায় নাই, সে আপন মনে বলিয়া চলিয়াছিল, “ছুটে পালালুম...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মীরার কান্না শুনতে পাবলুম না। আহা মা আমার কতদিন পরে সবে জুটি ভাত মুখে দিয়েছিল। কি মনে করলে বে! এমনিতেই ত অনেক কষ্ট সুমনা, ছেলেমেয়েকে কখনও না-দিতে পেবেছি একটা সংখের জিনিষ, না একটা খেলনা। বলে, মাখার ঘরে কুকুর পাগল, আমারও হয়েছে তাই। সামনে পিছনে কোনদিকে তাকাবার আর অবসর নাই।”

“নাও, কি যে বকতে শুরু করলে পাগলের মত তার ঠিক নেই। রাগের সময় মানুষের অত ঠিক থাকে না। ছেলে-

মেয়েকে তখন অস্তায় ক’রে দুটো বকে, মারে। তাতে মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় না। আর সত্যিই ত, তোমার মাখা কি ঠিক হয়েছে, এক জনের উপর কত ভার।” সুমনা সান্ত্বনামাখা স্নিগ্ধ স্বরে কহিল। দুই জনেই এবারে দু-জনের মনের কথা বুঝিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। আর কথা হইল না, মন্থ খাইবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছে এমন সময় হঠাৎ রাক্ষির স্তব্ধতাকে চিরিয়া কোন্‌খান হইতে বাঁশীর একটা আওয়াজ আসিল। ক্রমে সিদ্ধ, তার পর বারোয়া, তাব পরে ইমনকল্যাণ এবং তাহারও পরে বেহাগ বাজিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল সুরের সেই তরঙ্গাবেগে জ্যোৎস্নার স্নান উত্তরীয় যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মন্থ অফুট স্বরে কহিল, “খননিয়ার সেই বেকার ভাইপোটা, রামখেলাওন, এ তারই বাঁশী। ছোকরা বাজায় ভাল। বেদিন তার মন খুলে যায় সেদিন প্রাণ দিয়ে বাজায়।” বাঁশী বাজিয়াই চলিল। অনেক ক্ষণ পরে থামিল। কিন্তু সুরের মুর্ছনা যেন থামিতেই চায় না।

সুমনা আর মন্থ চুপ করিয়া আছে। সুমনা ভুলিয়া গিয়াছে আর খাওয়ার তাগিদ দিতে। এখন যে তার অনেক কাজ বাকী। মন্থের খাওয়া হইলে সে খাইবে, তার পর রান্নাঘর ধুইবে, হৈসেল তুলিবে। সে-সব কথা নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়াছে। মন্থ ভুলিয়া গিয়াছে তাহার পাণ্ডনাহারের তাড়া, ভুলিয়া গিয়াছে তাহার নিরীহ রোগা মেয়েটাকে বিনা দোষে মারিয়া ফেলার মর্গজালা। বাঁশীর সুর তাহাকে প্রতিদিনের কাঁটার দ্বা হইতে তুলিয়া আরও অনেক উদ্ভ্রলোকে লইয়া গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্নার আলো-হাওয়ার কম্পন, আকাশের তারা সমস্তই কেন্দ্র করিয়া আছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরী মুখকে। বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া মন্থ মুহূহুরে কানে কানে কথা বলার মত করিয়া কহিল, “মনে পড়ে সু—সেই যে তোমাকে বলতুম, বাড়ি থেকে যখন কলকাতার আসতুম, কলকাতা স্টেশন যত এগিয়ে আসত ততই বুকের মধ্যে কি রকম করত। চোখে জল এসে পড়ত। মনে হ’ত, আর একটু পরে, তার পরেই তোমাকে দেখতে পাব। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে।”

সুমনা কোন কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহাব

সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। খ্রীতিভবা চোখে সে একবার স্বামীর দিকে একবার ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের পানে চাহিল। একটু আগে মেয়েকে অন্তায় করিয়া অমন মারার জন্ত স্বামীর উপর তাহার মনে যত অভিমান যত ক্রেশ-সঞ্চিত হইয়াছিল, যত অশ্রুবাষ্প ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত কাটিয়া গেল। বাঁশীর সুরের মায়ায় তাহার একটানা ক্লাস্তিকর জীবনের উপর হইতে এক নিমেষে যেন সকল আবরণ খসিয়া পড়িল। ছেলে অসুস্থ হইলে, রাগ অভিমান করিলে সব সময়ে ত তাহার মেজাজ ভাল থাকে না, তখন মায়ের উপর অবস্থা পীড়ন করে। মাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া মা কি ছেলের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারেন? মাতার সেই বিশাল ধৈর্য্যপূর্ণ অন্তর লইয়া সুমনা তাহার স্বামীর সমস্ত কঠোর

ব্যবহার ক্ষমা করিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, ‘বাইরের নানা অপমান নানা ধাক্কা ঠুকে সহিতে হয়। তাইতেই আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন ব্যবহার ক’রে ফেলেন। না-হয় মানলুম আমার ছোট সংসারে অনেক দৈন্ত অনেক অভাব-অনটন। কিন্তু আমার মত এমন ক’রে ভালবাসবার সুযোগ পেয়েছিল ক’জনে, আর এত বেশী ক’বে তা ফিবে পেয়েছিলই বা কে।’

কয়েকটা বাড়ির পরে ধনধনিয়াদের মস্ত বড় জিতলের ছায়ে তখন বামখেলাওন বাঁশীতে কানাড়ার সুর ধরিয়াছিল। আকাশের তারা অজস্র হইয়া চাহিয়াছিল, আর নিভৃত জ্যোৎস্না ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছিল।

সংস্কৃত-শিক্ষা ও জীবিকা

ত্রিবৈভূতনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

সংস্কৃত ভাষা একদিন ভাবতের জাতীয় ভাষা ছিল। আজ হিন্দী ভাষাকে যে-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে—ভাব-সম্পদে ও ভাবার চমৎকারিতায় সংস্কৃত ভাষা কোন আদিম যুগে আপনিই সে-স্থান অধিকার করিয়াছিল। জগতের বিভিন্ন জাতি এই ভাবার দর্শন সাহিত্য জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর। এই সংস্কৃত ভাবার অন্তরালে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের যে অমূল্য দান আত্মগোপন করিয়া বহিয়াছে তাহার সন্ধান লওয়া কঠব্য।

আমাদের ক্রিয়াকলাপ ভজন-পূজন প্রায় সমস্ত বিষয়ই সংস্কৃত ভাবার সাহায্যে হইয়া থাকে। আজও আমরা সন্মানে অসন্মানে উৎসবে বাসনে সেই সংস্কৃত ভাবারই সেবা করিয়া আসিতেছি। বিবাহ জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কার। তাহাতেও আমরা সংস্কৃত ভাবার মন্ত্রপাঠ কবিচাই দাম্পত্য-জীবন লাভ করিয়া সংসার-পথে প্রবিষ্ট হইতেছি।

আমাদের চরম সংস্কার শ্রদ্ধ তর্পণ—তাহাও দেবভাবার সাহায্যেই চলে।

জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি জাতীয় সাহিত্য। আজ অবশ্য ববীন্দ্র-শরৎ-সেবিত বঙ্গভাষা বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের দাবি রাখে। ভাবতের কিন্তু নয়। একদিন এই সংস্কৃত ভাষা সে-স্থান পূরণ করিয়াছিল। সংস্কৃত আলোচনা শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা ভারতের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের সাধারণ ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাঈ বাগিচা প্রভৃতি কার্যকলাপেব সংস্কৃত ভাষাই ছিল একমাত্র যোগসূত্র। আজ অবশ্য রাক্তভাষা ইংরেজী সে-স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার গোবব বেদ বেদান্ত তন্ত্র পুরাণ স্মৃতি দর্শন সাহিত্য সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ।

যে-জাতি নিজের বিশেষত্ব বিসর্জন দিয়া অপবের

ভাবধারায় ভাসিয়া চলে জগতের ইতিহাস হইতে সে জাতি শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হিন্দুর ভাবধারা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে সংস্কৃত ভাবাব সহিত পরিচয় রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তথাপি একটি কথা ভয়ে ভয়েই বলিতে হয়—সংস্কৃত ভাবাব সহিত আমবা আর ওতপ্রোত ভাবে মিলিতে পারিতেছি না। যদিও ক্রিয়াকলাপে আজও সংস্কৃত মন্ত্রই চলিতেছে, তথাপি আমাদের অজ্ঞতায় তাহা দিন দিন অসংস্কৃত হইয়া উঠিতেছে। অনেক স্থানেই দেখা যায় পুরোহিত না-বুধিয়া মন্ত্র পড়ান—যজ্ঞমান তোতাপাখীর মত সেই বুলিই কপচাইয়া চলেন। কেহই অর্থ বোঝেন না; ইহারই জন্ত ইজ্ঞশব্দযোগেব মত বিপরীত ফল প্রসব হয়। কি না তা কে বলিবে?

অবশ্য ইহার জন্ত দায়ী আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের সম্মুখে একমাত্র যাজ্ঞনক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোনও পথ খোলা নাই। তাহা ভিক্ষারই নামান্তর। যতই তাহার অঙ্গে নৈতিক পোষাক পরান হউক না কেন, তবু তাহাকে আজ আর কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

একদিন শাস্ত্রকারগণ উদাত্ত হুরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—‘সেবা স্ববৃত্তিমতা’—কাহারও সেবা করিয়া জীবিকানির্বাহকে—কুরুর বৃত্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেই সেবাই আজ অবশ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের বরণীয় পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেবা স্ববৃত্তি—একথা যাহারা বলিয়াছেন, তাহারাই বলিয়াছেন—‘ভিক্ষাঃ নৈব নৈব চ’। ভিক্ষা অপেক্ষা চাকরি অর্থাৎ রাজসেবাও ভাল।

সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের প্রধান বৃত্তিই যাজ্ঞনক্রিয়া। কিন্তু আজ প্রাচীন শিক্ষিত সমাজে ঐ বৃত্তি ভিক্ষারই রূপান্তর। শ্রদ্ধাশীল যজ্ঞমান নাই বলিলেও বেশী বলা হইবে না। ‘শিক্ষিত মর্যাদাসম্পন্ন পুরোহিতের বৃক্কেও আত্মহীন যজ্ঞমান-বাড়িতে কাজ করিতে আঘাত লাগে।

ইহা ভিন্ন জীবিকার আর একটি উপায়—স্থলে পণ্ডিতী করা। কিন্তু তাহাও নির্দিষ্টসংখ্যক। সে কাজের জন্যও প্রত্যেক স্থানই চাহিয়া থাকেন—‘ইংরেজী-জানা কাব্যতীর্থ’। আর আজিকার দিনে গ্রাক্সেট কাব্যতীর্থও বিরল নয়। প্রতিবৎসর যে এতগুলি ‘তীর্থ’-উপাধিদারী পণ্ডিত

বাহির হইতেছেন তাঁহাদের সম্মুখে খোলা আছে কোন পথ? তাহার নিদোষ ভাবে জীবিকাজনের জন্ত কোন উপায় অবলম্বন করিবেন?

এই সকল কারণে দিন দিন সংস্কৃত পরীক্ষায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও কেবল সংস্কৃতাদ্যায়ী ছাত্রসংখ্যা দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, নির্ভাবান পণ্ডিতের পুত্রও আজ স্ববৃত্তির আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার বা তাঁহার পিতার কাহারও আর সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি তেমন আস্থা নাই। গুরু বা পুরোহিত বংশের বহু সন্তান স্ববৃত্তির মোহে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছেন। সেই স্ববৃত্তিও আজ উজ্জ্বলিত আশিয়া পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহারও প্রতিকার-চিন্তার সময়ও আসন্ন।

আজকাল সংস্কৃত-শিক্ষার আর অঙ্গসংস্থান হয় না। অধ্যাপক-বিদ্যায় শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে দুই একটি হইলেও পল্লীর অধ্যাপকদিগেব অদৃষ্টে তাহা জোটে না। তেমন বড়লোক বিরল যিনি অধ্যাপকবৃত্তিকে মাসে মাসে দুবে থাক, বৎসবেও একবার সাহায্য করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন। অথচ শত শত অকার্য্য করিয়াও (অপকার্য্য শতং কৃত্বা) যাহাদেব ভরণপোষণ করিতে হইবে সেই পোষ্য পরিবারবৃন্দেব ভরণপোষণ আর সংস্কৃত-শিক্ষার সাহায্যে চলে না। সংস্কৃত-শিক্ষার্থী যেন অঙ্গ সমাজের বৃক্কে অভিশাপ-স্বরূপ। শত অকার্য্যের স্থানে সহস্র অকার্য্য করিয়াও তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায় করিতে পারিতেছেন না।

সমাজ আজ শত ঝড়বাতো বিপর্য্যস্ত। অভাব-উৎপীড়ন আজ সার্বজনীন হইতে বসিয়াছে। দীনতা-হীনতা-সঙ্কীর্ণতা ইহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে। সম্মুখে পথ নাই—কোনও উপায় নাই।

সত্য কথা—পরের প্রতি চাহিয়া থাকার দিন চলিয়া গিয়াছে, একথা উজ্জ্বল সত্য যে—

সর্বং পরবশং হুংখং

সর্বসাম্রবশং হুংখং।

আজিকার দিনে সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন তাহাদিগকে সমাজের গলগ্রহ হইয়া জীবিকার জন্ত পরের ষারস্থ না-হইতে হয়।

অবশ্য আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জীবিকা অর্জন অনেকে করিতেছেন। ঐরূপ হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি বিদেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যা ভারতীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিয়াও ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণের বৈদ্যবৃত্তিগ্রহণ সমাজের কাছে আব হেয় নহে।

সংস্কৃত শিক্ষা করিলেই অঙ্গের জন্ত ধনীর দ্বারে স্তাবক সাজিয়া দাঁড়াইতে হইবে ইহার কোনও মানে নাই। সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াও বিভিন্ন অর্থকর অশ্রান্ত বৃত্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে। পুর্ন, স্থাপত্য, শিল্পবিদ্যা, বাগিচা প্রভৃতি বে কেবল ইংরেজী-বীশদিগের ক্ষতই খোলা আছে তাহা নয়। সংস্কৃত ছাত্রগণকেও পূর্নবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা কবিত্তে হইবে। এ-দেশে অনেক নিরক্ষর লোকও গৃহাদি নির্মাণ কার্যের কনট্রাক্টারি করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন। পণ্ডিতগণ কি সে কার্যেরও অনুপযুক্ত? ছবি আঁকিতে শেখাও তাঁহাদের উচিত। চিত্রবিদ্যাতেও অর্থ আছে।

আমরা হিন্দু। নিষ্ঠা আমাদের বক্তের সহিত মিশিয়া আছে। শাস্ত্র আমাদের শিখিতেই হইবে। কিন্তু মনে হয় ঐ সঙ্গ আব একটি অর্থকরী বিদ্যাও আমাদের শিক্ষা করা উচিত। তাহা হইলে শাস্ত্র ও সংসার উভয়েরই একসঙ্গে সেবা করিয়া জীবন-আহবে জয়ন্তী মণ্ডিত হওয়া যাইতে পারে।

আমি ভুক্তভোগী। সেই জন্ত সমস্তাস্বরূপ এই প্রবন্ধটি সমাজের দ্বারে পেশ করিলাম। হয়ত, বর্তমান শিক্ষা—সামাজিক আবহাওয়া—আমাদের চালচলন ইহার বিপবীত পথেই উদ্ধাম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তবু মনে হয়—আন্তরিক আগ্রহ, মধুব সহানুভূতি—পরস্পরের প্রীতির আদান-প্রদান হয়ত এ-পথকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারে। এ-সম্বন্ধে পূজনীয় বিদ্বান্‌গণী, সামাজিকবর্গের অভিমত জানিতে ইচ্ছা কবি। কিন্তু কি জানি কাহার যেন উদাস্ত হুবে ধ্বনিত হইতেছে—‘নাশঃ পশাঃ বিত্তন্তেহয়নায়’।

চিরন্তনী

শ্রীপারুল দেবী

এলাহাবাদেই বিয়ে। বরপক্ষীর প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন যে ঢাকা থেকে এলাহাবাদে আসবার সুবিধা হয়ে উঠবে না, বড়জোব কলিকাতা অবধি যাওয়া যোত পারে। বরবাজীর কেউ কেউ রাগ ক’রে বললেন, যদি বেতেই হয় এলাহাবাদে, ত বর একাই বাক্—একবাত্রি নিমন্ত্রণ খাবার জন্ত এতটা কষ্ট স্বীকার ক’রে তাঁরা কেউ যাবেন না। কিন্তু শেষ-অবধি আপত্তি টিকল না। পরষটি জন বরবাজীর রেলভাড়া ইত্যাদির ধরচেব টাকা এবং বিনয়বচনপূর্ণ সাদব নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিবে দিবে কস্তাপক্ষীর সে আপত্তি খণ্ডন কবলেন।

দুই পুরুষ থেকে এলাহাবাদেই বাস—বাংলা দেশ এঁদের কাছে প্রায় বিদেশ হয়ে এসেছে। বাড়ির প্রথম

মেয়েটির বিয়ে—কোথায় অজানা অচেনা কলিকাতায় যাবেন, কারই বা সাহায্য সেখানে নেবেন—কনের বাপ-মা ভেবেই দিশাহারা। যা হোক, পথখরচ ইত্যাদি বাবদে মোটা টাকা হাতে পেয়ে বরপক্ষীর বখন এলাহাবাদেই আসতে রাজী হলেন, কস্তাপক্ষীর সকলে হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন।

বসত-বাড়িতে এত লোক কুলোবে না ব’লে পাশেই আব একটা বাড়ি কিছুদিনেব জন্ত ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতেও এখন আঁটছে না। পরমাস্বীয়, আশ্বীয় এবং অনাস্বীয়ের ভিড়ে বাড়ি গিস্‌গিস্‌ করছে। কোলাহলের বিবাম নেই। “ও ছোট বোঁ, ছেলে যে কেঁদে সাবা হ’ল, তোন্ না ভাই,” “ওরে, হেমাংকে ডাক্ না পুরুত-মশাইকে জলখাবারটা খাওয়াক কাছে বসে,” “ছোটো, এতক্ষণ ছিলে কোথায়?”

বাও না বাইবে জ্যাঠামশাইয়েব কাছে একবার—বকুনি খাবে” ইত্যাদি মেয়েদের কলরবে এবং ছেলেদের “ওরে আন, ওরে ডাক্, ওরে তোলা” ইত্যাদি হাকাহাকি ডাকা-ডাকিতে বাড়ি একেবারে সরগরম। সকলেরই কাজ আলাদা, প্রয়োজন বিভিন্ন এবং সকলেই সব গোলমাল ছাপিয়ে নিজের দরকারী কথাটি অপরকে শুনিয়ে দিতে চায়। একটি ঘরে চারি পাশে বিছানার স্তূপ এবং কাপড়-চোপড়ের স্তূপের মধ্যে একটুখানি স্থান ক’রে নিয়ে বসে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে একটি বক্স-হারমোনিয়ামের সাহায্যে সঙ্গীত-চর্চা করছিল। ওরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বয়সের একটি ছেলে প্রাণপণ টেটিয়ে গান ধরেছিল “বদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল, সখি গো।” বধাসম্ভব মুখ ব্যাধান ক’রে এবং গলার জোরে হুরের ক্রটি ঢেকে নেবার চেষ্টার অভাব ছিল না এবং অল্প ছেলেগুলি নিজেরাও অল্পবিস্তর হাঁ ক’রে গায়কের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, এমন সময়ে করুণা ঘরে ঢুকল।

করুণার চাবি হারিয়েছে। তারই বাস্কে কনের নতুন বাজুবন্ধ আছে, একটু পরেই কনে সাজাতে হবে, গয়নাটা চাই, কিন্তু চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। করুণা ঘরে প্রবেশ করতেই ‘সখি গো’র বিকট টান এক মুহূর্তে থেমে গেল। করুণা বললে, “ওবে, বাপ্ বে, এই গরমে গলা ফাটিয়ে আর ভুল হুরে কীর্তন গাস নে বাবা—থাম্ সব। কান গেল। একেই ত গোলমালে বাড়িতে টেকা দায় হয়েছে।...ওরে ওই ছেলেরা, লক্ষী বাবা সব—আমার চাবিটা খুঁজে দে না! পয়সা পাবে যে আমার চাবি খুঁজে দেবে—চার আনা পয়সা। সেই যে লম্বা চক্চকে চেনে-বাঁধা চাবিব গোছা—একটা মস্ত লম্বা লোহার সিঁদুকের চাবি ঝোলান আছে তাতে—মনে নেই, সেই যে রে, ভামু, তুই যে আমার চাবি কাল নিয়েছিলি আমার বাস্কে খুলতে, মনে নেই আবার কেন? দরকারের সময়ে বুদ্ধি ভুলে গেলি? নে, নে, খোঁজ্ সব, পয়সা পাবি খুঁজে দিলে।”

ছেলেরা লোহার সিঁদুকের লম্বা চাবি ঝোলান বক্সকে চেনে বাঁধা চাবির গোছা এই বিয়েবাড়িতে যে কতগুলো দেখেছে তা গুণে উঠতে পারলে না—ঠিক কোন্ চাবিটা যে তাদের খুঁজে বার করতে হবে তাও বুঝলে না; কিন্তু এ-সব তুচ্ছ কারণে তাদের খোঁজা আটকাল না। কে

প্রথমে খুঁজে পাবে এবং খুঁজতে পারলে চাবি আনা পয়সার অধিপতি হয়ে সে প্রথমে সেই পয়সার কি করবে, তারই বোর গবেষণা করতে করতে কেউ খাটের তলায়, কেউ কাপড়ের আলনায়, কেউ খোলা বাস্কের মধ্যে চাবি খুঁজতে লেগে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপড়-চোপড় জিনিষ-পত্রে ঘরের গোছান জিনিষ সব হারিয়ে গেল, কিন্তু হারান চাবির সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভাঁড়ান-ঘরের সামনেব চণ্ডা বারান্দায় সারি সারি বাঁটি গড়েছে, এবং তারই পাশে পাশে বস্তা বস্তা আলু, বুড়ি বুড়ি বেগুন এবং বাশিকৃত পটল রয়েছে। অল্পবয়সী মেয়েবা এদিকে কেউ বেঁবে নি; এখানে কনের মাসী পিসী খুড়ী জ্যোষ্ঠার দল। কালিয়ার আলু কোটার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে কথারও বিরাম নেই। বিরান্দ-পিসী বলছিলেন, “তুমি আর বোক না মেজ বৌ, রেগুর বয়েস আর আমি জানি নে? তোমার যখন বিয়ে হ’ল, তখন তোমার ঐ ভাইব্বি ত” মেজে থেকে হাত-দেড়েক উচুতে শূন্ত হাত রেখে মেয়েটির উচ্চতার পরিমাপ দেখিয়ে বললেন, “এই এত বড় মেয়েটি। আমার ইন্দু ত তখন মোটে মাস-আষ্টকের মেয়ে। তা হ’লেই হিসেব ক’রে দেখ না রেগুর বয়েস কত হ’ল—ইন্দু চেয়ে অন্ততঃ চার-পাঁচ বছরের বড় হ’ল কি না। তোমার দাদা মেয়ের বিয়ে না-দিয়ে আইবুড় ক’রে রেখেছেন বলেই ত আর মেয়ের বয়েসটিও তাই থেমে থাকবে না। আমার ইন্দু যে হু-ছেলের মা হ’ল।”

মেজবৌ বললে, “না ঠাকুব্বি, রেগু ত আমার বিয়ের সময়ে অতবড় মেয়ে ছিল না। ও ত তখন হাঁটতেই পারত না। ও ইন্দুর চেয়ে মাস-কয়েকেব বড় বড়ি হয়। এই ত মোটে সত্তরোয় পা দিয়েছে।”

সই-মা বললেন, “তোমাদের ভাই কেমন বয়েস ভাঁড়ান স্বভাব। রেগুর সতবেণী যে কোন্ কালে পেরিয়েছে—এখন আবার নতুন ক’বে সে সত্তবেণী পা দেবে কেমন করে লা? এই আমি সেদিনই হিসেব ক’রে দেখছিলাম যে আমার হুরমার চেয়ে, রেগু তবে গিবে ঐ ইন্দু, সকলেই বড়। সেই আমার শাশুড়ী যে বছর মারা গেলেন, সেই বছরেই হুরমা হ’ল কি না—তাই হিসেবে ত ভুল হবার জো নেই। সবাই বললে, আমার শাশুড়ীই আমার মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছেন,

মায়ী কাটাতে পারেন নি। আহা এমন শাওড়ী কিন্তু কান্নব হয় না ভাই, এমন মানুষ আজকালকার দিনে আর পাবে না, তা আমি তোমাদের বলছি। কিন্তু আমি হাজার হোক ছেলেমানুষ ছিলাম ত, ও-সব কথা শুনে ভয়েই মরি।... তা সে বাই হোক, তা হ'লেই হিসেব ক'রে দেখ না যে কার কত ব্যয়। ইন্দু, রেণু, সুরমা সবাই ত ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছে। বয়েসে ছোট ছিল ব'লে সুরমাটা কেবল মার খেয়ে মরত সকলের কাছে, মনে নেই? আমার কাছে সবাই বয়েসের হিসেব পাবে, ভুল হবার জো নেই।”

পাশের বাড়ির বোটি এলাহাবাদেরই মেয়ে, এলাহাবাদেরই বো-ও হয়েছে। উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ রং, দোহারা গড়নটি, পাতলা ঠোঁট দুখানিতে চাপা হাসিটি লেগেই আছে। বোটি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে আনু কুটছিল, এত ক্ষণ কুটনো শেষ ক'রে বালুতির জলে হাত ধুতে ধুতে হাসিমুখে বললে, “কি জানি দিদি, আমি ত নিজের মেয়েদেরই বয়েসের হিসেব রাখতে পারি নে, তা আবার পরের মেয়ের। কি ক'রে তোমরা এত মনে রাখ কি জানি! আমার বড় মেয়েটি এই বছর ম্যাট্রিক দিয়েছে; আমার বতসুর হিসেব তাতে ত

A. তার এই আষাঢ় মাসে বোল ভরল। কিন্তু সেদিন ঐ মুখুজ্জদের বড়বো এসে ব'লে গেলেন যে ওর নাকি একুশ ভরে গেছে। ও-বাড়ির বড় পিসীমাও বলেন যে, আমার মেয়ের ব্যয় না-কি তাঁর কাছে লেখা অবধি আছে—এই তেইশে পড়ল। শুনে শুনে ভাই ঝুলিয়ে যায় সত্যিকারের ব্যয়সটা কি—একুশ, না তেইশ, না বোল। ভাই নিজে আর হিসেব করবার চেষ্টাও তেমন করি নে—ভাবি পাড়ার পাঁচ জনে যখন সে কাজটা করছেন, আমি আব নাই করলাম।”

কথাটাব প্রচ্ছন্ন খোঁটা বিরাজ-পিসী কতটা বুঝলেন তা ঠিক বলা যায় না; তবে এটুকু স্পষ্টই বুঝলেন যে কথাটা ঠিক সোজা ভাবে বলা হয় নি, একটু গোল আছে। কি উত্তর দেবেন ভাবলেন, এমন সময়ে সহীমা খন্-খন্ ক'বে ব'লে উঠলেন, “তা ভাই—নিজের মেয়ের ব্যয়সটি কমিয়ে কমিয়ে বল যে তোমরা—কাজেই পরকে হিসেব রাখতে হয়। না হ'লে কার আর কি মাথাব্যথা বল না?

এই দেখ না লীলা—ঐ যে ঐ হরিনাথবাবুর মেজছেলেব বো গো, জ্বাকে যার নাটিতে পা পড়ে না, অথচ কিসের যে এত জ্বাক তা ত জানি নে—ঐ লীলা আজ তিন বছর থেকে ব'লে আসছে যে ওব মেজমেয়ে সরযু চৌদ্ধ বছর ব্যয়। কাজেই না ব'লে থাকতে পারি নে। তবে তোমরা হ'লে লেখাপড়া-জানা মেয়ে, পাসটাশ করেছে, তোমাদের হিসেবই বোধ করি আলাদা। আমরা মুখ্য মানুষ, অত ত জানি নে, যেটা চোখে দেখি সেইটেই বলি।”

মেজবো হেসে উঠল। বললে, “রাগ করছেন কেন সহী-দি? সব মেয়েরই ত এতদিন চৌদ্ধ বছর ব্যয় হয়, একদিন বোলও হয়, আবার একদিন সে তেইশেও পড়ে—কেউ ত কোনটা ভিত্তিয়েও যায় না, কোনখানে থেমেও থাকে না। আমার ভাইবির রেংর তেইশ হ'লে যদি আপনারা সব খুশী হন ত বেশ ত, তাই না, হয় হ'ল। আমার ত তাতে কিছু আপত্তি নেই।” বলতে বলতে ব'টি ছেড়ে উঠে মেজবো পাশের বাড়ির বোটিকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে, “ও কি ভাই, চলে যাচ্ছ যে? বলছি না খোকার জন্তে মিষ্টি রেখেছি, না নিয়ে যেও না? আজ মিষ্ট না পাঠালে খোকা যে তার মাসীকে খেয়ে ফেলবে। এস, সব সাঞ্জিয়ে ভাড়াবে রেখেছি, দিই গে। যাঁ মাছি এখানে, খাবার জিনিষ কি বার করবার জো আছে?”

মেজবো বোটিকে নিয়ে ভাড়ারের উদ্দেশ্যে চলে গেল। বিরাজ-পিসী কিছু ক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে থেকে তার পর এদিকে মুখখানা ফিরিয়ে বললেন, “মেজবোব কথা শুনে? আমরা বেন সব মিথ্যাবাদী! কেন সহী মন্দ কথাটা কি বলেছে? চৌদ্ধ বছরের মেয়ে কি সত্যি চিরকাল ধ'রে চৌদ্ধই থাকবে নাকি? সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলতে গেলেই আর সে কথা মিষ্টি লাগে না, অমনি রাগ হয়ে ওঠে সব। নিজেরাও সব খুশী সজে আছেন—খাড়ি খাড়ি মেয়েদেরও সব খুশী ক'রে রেখেছেন, লজ্জাও কবে না। ঐ দেখ না মেজবোকে—বাল্ল একেবারে রং-বেবঙের জামা-কাপড়ে ঠাসা—যেন পরবার ব্যয় এখনও আছে আব কি। জিজ্ঞেস কর গে না—বলবে এখন ওবও এই তেইশ ভরেছে।”

সহী-মা বললেন, “ঠিক বলেছি ভাই। ব্যয়স কমান হয়েছে

আজকালকার এক ক্যাশান। ঐ রেণুব বয়েসের কথায় মেজবৌ অমন বাগ ক'রে উঠল বটে, কিন্তু বিহুনী গিঠে ঘুরিয়ে বেড়ালে কি হবে? কম-সম ক'রে ধরলেও ওর বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ হবে। হবে না ভাই প্রভা?"

প্রভা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে এবং নিস্তারিণীর দিকে তাকিয়ে বললে, "তা হবে। হবে না নিস্তার-দিদি?"

নিস্তার-দিদিও ঘাড় নেড়ে জানানলেন যে তাঁরও সেইরকম মনে হয়—যদিও তিনি এই মাত্র তিন মাস হ'ল ছাপরা থেকে বায়ুপরিবর্তনের জন্য এলাহাবাদে ননদিনীর নিকট এসেছেন এবং এই তিন মাসের মধ্যে বার-দুইয়েই বেনী রেণুকে চোখে দেখেন নি।

সর্বসম্মতিক্রমে যখন স্থির হ'ল যে রেণুর সতের বছর বয়স সতের বছর আগে পেরিয়ে গেছে, তখন সকলে হঠাৎ চিন্তে যথাকর্তব্য সম্পাদন ক'রে বঁটি ছেড়ে অস্ত্র কাজে গেলেন।

ক'নে নমিতার ঘরে আরও ভিড়। কুমাবী এবং বিবাহিতা, বালিকা এবং কিশোরীর দল ক'নেকে ঘিরে ব'সে আছে। অত্যন্ত সাধারণ নমিতা যেন আজ অকস্মাৎ এক বিস্ময়কর বস্তু হয়ে উঠেছে, কেউ আর তার মুখ হ'তে একদণ্ড দৃষ্টি নামাতে চায় না। ক'নের মা গৌরাজিনী বাস্তব খুলে কস্তাব বিবাহসজ্জার উপকরণ বার ক'বে কল্পণাব হাতে দিচ্ছিলেন—সেই কনে সাজাবে। শুধু কপালে চন্দন পবাবার নুতন পদ্ধতিটা তাব ভাল জানা নেই—মেজবৌ এসে পবিয়ে দিয়ে বাবে। গহনায়, কাপড়ে কল্পণাব শাড়ীর আঁচল ভরে উঠল—গহনার ছোট-বড় নানা রকম বাস্তবগুলি সে খাটের উপর সাজিয়ে বাথতে রাখতে বললে, "বাবা, বা বোঁগা মেয়ে, এত গহনার বোঁগা বইতে পারলে হয়।"

সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত দেহ—তার ওপর একমাত্র মেয়েটির আসন্ন বিবাহ-বেদনায় মায়ের চিন্তা উদ্ভাস্ত হ'বে গেছে, কোনও কাজে মন লাগছে না। ইচ্ছা হচ্ছে সব সবিয়ে নিভুতে মেয়ের কাছে একটু বসেন—তাকে কোলে বসিয়ে মাতৃকল্লের সমস্ত স্নেহ দিয়ে আলীকর্ষন করেন; তার নবগৃহবাত্রা-পথকে স্নেহ-অভিষিক্ত ক'রে দেন। বে তাঁরই একমাত্র আপনাতর ধন ছিল, সে আজ পরের গৃহে পর হ'তে চলেছে। সেই বিদায়ের আয়োজন করতে করতে

মায়ের ছুই চোখে অশ্রুব আর বিরাম নেই। সকলের নিকট হ'তে আপনাকে তিনি লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন—বার-বার নিজেকে বোঁগাচ্ছেন যে আজ মঙ্গলবে দিনে চোখেব জল ফেলতে নেই—কিন্তু মন মানে না।

যা-কিছু বাস্তব গোছান ছিল, সব বার ক'বে কল্পণাব হাতে দিয়ে মা বললেন, "ওরে, ঘবে যে বড় ভিড় হয়েছে মা। যে যে তোরা ক'নে সাজাবি, তাবাই শুধু ঘরে থাক—আর সকলকে বল যে ক'নে সাজান হয়ে গেলে পবে তখন এসে দেখবে। উপোস ক'রে এই গবমে আর লোকের ভিড়ে মেয়েটার মুখ শুকিয়ে কি হয়ে উঠেছে!"

কল্পণা হেসে বললে, "মাসীমা কেবলই মেয়ের মুখ শুকনো দেখছে—কোথায় বাপু তোমার মেয়ের শুকনো মুখ? এখন তোমাকে দেখে ওব চোখ ছলছলিয়ে এল—না হ'লে এতক্ষণ ত কত হাসি-তামাশা করছিল আমাদের সঙ্গে। তুমি যাও না নিজের কাজে—শুকনো মুখে হাসি ফুটে দেয় লাগবে না। তোমার মুখখানা বা হয়েছে, ও দেখে আমাদেরই কান্না পাচ্ছে, তা ওর ত পাবেই। তুমি যাও এ-ঘর থেকে।"

গৌরাজিনী মেয়েদের ভিড় ঠেলে নমিতার কাছে এসে বসলেন। আঁচল দিয়ে তার মুখটি মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খাবি কিছু?" মায়ের স্নেহস্পর্শে নমিতার চোখে জল ভরে এল, সে কথা বলতে পারলে না, ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে কিছু খেতে চায় না। মায়ের বুকে কান্নার চেউ কণ্ঠ অবধি ঠেলে এল, তিনি তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পালের ঘরে কল্পণাব মা অর্থাৎ গৌরাজিনী ব'সে কনের বাস্তব কাপড় গোছাচ্ছিলেন। গৌরাজিনী সেই ঘরে ঢুকতেই তিনি মুখ তুলে বললেন, "হ্যারে গৌরী, তুই কি বাজারে আব কিছু কাপড় বাথিস নি? করেছিস কি? এত কাপড় এই একটা বাস্তব আমি ধরাই কি ক'রে? এ বাস্তব যে শুধু বেনাবনী আর রেশমের কাপড়েই ভবে—উঠল—এই শান্তিপুৰী, চাকাই, আর তাঁতের শাড়ীর গাদা আমি এখন চোকাই কোথা?"

গৌরাজিনী ক্লান্ত ভাবে আলমারীর গায়ে ঠেস দিয়ে সেইখানে মেজতে বসে পড়লেন। উদাসীন ভাবে

বললেন, “বা ভাল বোঝ কর দিদি, আমি আব অত ভাবতে পারি নে।”

তার দিদি জিজ্ঞাস্যভাবে ভগিনীর দিকে তাকালেন।
প্রশ্ন করলেন, “কেন রে, তোব হ’ল কি?”

গৌরাজিনী বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, “হবে আবাব কি? মেয়েটা চলল আমার ঘর ছেড়ে পরের ঘরে কোথায় কত দুবে তার ঠিক নেই, আমার কি যে হচ্ছে মনের মধ্যে তা ত কেউ বুঝতে পারছে না। ও-সব গল্পনাগাঁটি কাপড়-চোপড় যখন সখ্ ক’রে কিনেছিলুম তখন কিনেছিলুম, এখন আব ও-সব কিছুই ভাল লাগছে না। তুমি আমাব ও-সব কথা কিছু জিজ্ঞেস ক’বো না দিদি।”

দিদি বললেন, “ওমা, ও কি রে? অমন ভাল জামাই হচ্ছে, কত ভাগ্যি তোর—কত আনন্দের দিন আজ, আজকে অমন মনধারণ করতে আছে কি? তোর ঘর ছেড়ে যে ঘবে বাচ্ছে আজ সেই ঘরে চিরকাল থাকে যেন ভাই। তোব ঐ একটি মেয়ে, বড় একলা পড়বি ওকে দূরে পাঠিয়ে, তাই কিছু কষ্ট হবে বইকি প্রথম প্রথম; কিন্তু এব পর মেয়েব হাসিমুখ দেখলে তখন আবাব নিজের কষ্ট ভুলে যাবি, তাও ব’লে দিলাম।... ওমা, দেখেছ, এই কাপড়ের রাশ থেকে আবাব একখানা পুরবী শাড়ী বেরোল! না ভাই, তোমার মেয়ের কাপড় তুমিই গোছাও এসে, আমাকে দিয়ে হবে না। আচ্ছা, এক পুরবী শাড়ীই ক’খানা কিনেছিস কি করতে বল ত?”

গৌরাজিনী শাড়ীর কথায় কান দিলেন না। বললেন, “ই্যা, মেয়ের হাসিমুখ! কেঁদে কেঁদে ত সারা হচ্ছে আজ সাত দিন থেকে! এই এখনই দেখে এলাম চোখের জলে ভাসছে। রোজ বাস্তবে বা ক’রে আমাকে আঁকড়ে শুয়ে থাকে। কখনও একদিন আমাকে ছেড়ে দূরে থাকে নি—কি ক’রে যে সেই অত দূরে চাকায় গিয়ে থাকবে জানি নে।”

মেয়ের বাপ অমরেন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। লম্বা কবসা চেহারা, রগের কাছে চুলে সামান্য পাক ধরেছে—চশমা-পর। স্বামি-স্ত্রী কাউকে দেখেই বোঝা যায় না যে এঁদেরই আজ জামাই আসছে।

অমরেন্দ্র ঘরে ঢুকে বড় জালিকাব দিকে তাকিয়ে

বললেন, “কি দিদি, তুমি যে কাপড়ের রাশির মধ্যে ডুব দিয়েছ একেবারে! করছ কি ওগুলো নিয়ে?”

গৌরাজিনী দিদি হাসিমুখে বললেন, “কি করব ভাই—যা কাপড়ের রাশ কিনেছ তোমরা—না ভুবে করি কি বল? গৌরীকে তাই ত বলছিলুম যে এ কি কাণ্ড তোমাদের? এ কাপড়ে যে পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়, একটাকে এত দিলে সে প’রে উঠবে কত দিনে? আমি ত তাই ভাবছিলুম যে খানকতক এই থেকে বেছে নিয়ে বেথে দিলে হয়—আবার ত এই পূজো আসছে সামনে, তখন তব্ব দিলেই হবে। তা মেয়ের মা ত মেরেকে খণ্ডরবাড়ি পাঠাবার ভাবনাতেই উতলা—ও ত কোনও কথায় কান দেয় না। তুমিই বল না, রাধব নাকি?”

অমরেন্দ্র জিব কেটে বললেন, “সর্বনাশ! মতামত দেব আমি? কোনও দিন ওটা অভ্যেস নেই দিদি, জানই তো। সে কাজটা এই ইনিই সব সময়ে ক’বে থাকেন। ছুই—এক বার মত প্রকাশ করতে গিয়ে দেখেছি যে, ঠিক যে জায়গাটিতে মত দেওয়া আমার উচিত ছিল, সেইখানেই ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে ফেলেছি এবং যেখানে ঘোর আপত্তি জানান উচিত ছিল, সেই জায়গাটিতেই সম্মতি দিয়ে এসেছি। অবিশি আমায় সে-সব ভুল ইনিই আমাকে পরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, না হ’লে আমি বোকা মানুষ, অত বুঝতে পারি নে। কাজেই ও গোল-মালের মধ্যে আমাকে আর কেন?”

গৌরাজিনী দিদি হাসতে লাগলেন। বললেন, “ওমা, ও কি গো? খণ্ডব হ’তে যাচ্ছ, একটা মত অবধি দেবাব ক্ষমতা নেই নিজের বাড়িতে? এমন পুরুষমানুষও ত কখনও দেখি নি। দেখ ত একবার গৌরী কি টাকাটাই নষ্ট করেছে! পাঁচখানা দামী দামী বেনারসী কিনেছে বাক্সে দেবার—একে নষ্ট বন্ধে না? বেনারসী পবে কোথা আজকালকার মেয়েরা? সে সব ছিল আমাদের কালে—তখন ত আর এত রকম-বেরকমের শাড়ী হয় নি—ভাল শাড়ী না-হয় ঐ বেনারসী, কিন্তু এখন এত কেন? ছু-খানা কিনলেই ত চের হ’ত।”

গৌরাজিনী ক্লান্ত দেখে আলমারীতে চেস দিয়ে নিস্পৃহ

চোখে কাপড়ের রাশির দিকে চেয়ে নীরবে বসেছিলেন। এখন বললেন, “কেন আর গোলমাল করছ দিদি? মেয়েটার নাম করেই কিনেছি সব, দাও না বাপু ওকেই সব দিয়ে। ভগ্নীপতিকে এত রাধারাখির কথা ভিজ্জেস করছ কেন? ও রেখে হবে কি ছাই? তোমার ভগ্নীপতি কি আবার একটা বৌ বিয়ে ক’রে আনবে নাকি যে তাকে ছুটো বেনারসী দেবে?”

অমরেন্দ্র বললেন, “কথাব সংযোগটা দেখলে দিদি? তোমার বোন ত লজিক পড়েন নি—কিন্তু ছুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথাকে একটি সূত্র দিয়ে যুক্ত ক’রে দেখাবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলে একবার? আশ্চর্য্য!”

গৌরাজিনীর দিদি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “ওর এখন মন খারাপ হয়ে রয়েছে ভাই—তুমি আর ওকে রাগিও না।...কিন্তু হ্যাঁরে গৌরী, এত মন খারাপই বা কেন বাপু তোর? বিয়ে হ’লেই মেয়ে পরেব বাড়ি যাবে, এ ত যেদিন মেয়ে জন্মেছে সেইদিনই জেনেছিস—আজ কি নতুন জ্ঞানলি? আর কই, নমিতার ত দিবি হাসি-মুখ দেখে এলাম রে—কত মেয়ে কত কান্নাকাটি করে, তোব মেয়ে ত লজ্জী। কুণির বিয়ে হ’ল দেখিস নি? বাপু রে, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না ত, বেন ধ’রে মারছে। এমনি কাণ্ড তাব! ও বাপু আমাব কিন্তু ভাল লাগে না, তা যাই বলিস। কক্কাণ্ড বিয়ের সময়ে সুরু করেছিল অমনি কান্না—তুই ধমক দিয়ে তখন চুপ কবাই।”

গৌরাজিনী অগ্রসর মুখে বললেন, “আমাদের কক্কাণার একটু মায়াই কম দিদি, তা তুমি যা-ই বল। সব মেয়ের কি আর সমান টান হয়? নমিতা যে দিদি ‘মা’ বলতে অজ্ঞান। মা খাওয়াবে, মা শোওয়াবে, মা ওর সব কাজ ক’রে দেবে এখন অবধি, তবে মেয়ের হবে। আমার কেবল ভয় হয় ও খণ্ডববাড়ি গিয়ে কান্নাকাটি ক’রে একটা অন্থখে না পড়ে। ছেলেমেয়েরা কত মাসীর বাড়ি, পিসীর বাড়ি সখ ক’রে বেড়াতে গিয়েও দু-চার দিন মা ছেড়ে থাকে ত? তা ও মেয়ে তা-ও এক দিনের জন্তে কখনও যেতে চাইত না। উনি বরং কতদিন বলেছেন যে ইস্কুলের ছুটির সময়ে যাক না র’টিতে, হয় তোমার কাছে নয় ন’দির কাছে, তা কি কিছুতে বেতে চাইত? এই ত উনি

বলে—ওকেই ভিজ্জেস কর না। আমি কি আর মিছে বলছি?”

দিদি বললেন, “মিছে কেন বলবি? আইবুড় মেয়ে, একটি মোটে মেয়ে—মা-অন্ত-প্রাণ ত হবারই কথা। এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কিন্তু তা ব’লে যাই বলিস গৌরী, মাসী-পিসীর বাড়ি আর খণ্ডববাড়ি আমাদের বাড়ালীর মেয়ের কখনও এক হয় না। মাসী-পিসীর বাড়ি লোকে দু-দিন পাঁচ দিন বেড়াতে যায়—সে কাকুর ইচ্ছে হ’ল ত গেল, না ইচ্ছে হ’ল ত না-ই গেল—কিন্তু খণ্ডবঘর না ক’রে উপায় কার আছে? যা করতেই হবে জানে—বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, লেখা-পড়া শিখেছে, তাতে অবুধের মত কান্নাকাটি করবে কেন? তুই মিছে ভাবিস নে, দেখিস খণ্ডববাড়ি গিয়ে নমিতা দিবি থাকবে। সবাইকেই ত দেখছি।...আমি আর একটা বাব্বর জোগাড় দেখি, এতে ত আঁটল না। অমনি তুইও ওঠ, চল্ একটু সরবৎ-টরবৎ কিছু খাবি। মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।”

অমরেন্দ্র বসে পড়েছিলেন, এখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “সবাই এ পৃথিবীতে নিজের নিজের দেখে। ইনি ভাবছেন এঁর মেয়ের কথা, তুমি ভাবছ তোমার বোনের কথা—আমার ত এখানে মাও নেই, বোনও নেই, আমার কথা আব কে ভাববে বল? আর এ পৃথিবীর এমনই নিয়ম যে, যে-হতভাগ্যব জন্তে ভাববার কেউ নেই, সে নিজেও নিজের জন্তে ভাবতে ভুলে যায়। দেখ না, আমি বাইরে থেকে এসেইছিলুম ঐ সরবৎ-টরবৎ জাতীয় কিছু একটা চেয়ে খাব ব’লে—গরমে, খেটে খেটে, আর সকাল থেকে উপর্যুপরি চারবার শুধু শুকনো সন্দেশ গিলে উপোস ক’রে ভেঁটায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে। তা তোমাদের তুই ভগ্নীকে এখানে একত্র দেখে নিজের কষ্টের কথা ভুলেই ব’সে আছি। তুমিও কেবল তোমার বোনের তৃষ্ণাটাই অনুভব করলে—অথচ খুব সম্ভব তিনি তাঁর কস্তাব খণ্ডব-গৃহযাজ্ঞাপ মহা গোলমালে ঘটনাব উদ্ভাস্ত হয়ে তৃষ্ণা অনুভব কবতে ভুলেই গেছেন। কিন্তু আমার বুক, গলা, মুখ, চোখ সব শুকিয়ে উঠেছে ভেঁটায়, তা তোমাব চোখেও পড়ল না। হা অদৃষ্ট!”

গৌরাজিনীর দিদি হেসে বললেন, “এখনও যে এক ঘণ্টাও হয় নি গো, তোমাকে সন্দেশ ফল জল সব খাইয়ে এসেছি—এর মধ্যেই আবার যে তোমার পা থেকে মাথা অবধি তেঁটায় শুকিয়ে উঠেছে তা কেমন করে জানব বল? বাপ রে, সকাল থেকে মোটে চারবার সন্দেশ খেয়ে নির্জলা উপোস করা—তোমার বড়ই কষ্ট হ’ল বল।”

অমরেন্দ্র বললেন, “অমন একটা তৃষ্ণায় ছাতি-কাটার করুণ কাহিনী শোনালাম তাতেও দয়া নেই? ‘পাষণী রমণী’ কবির কি আর সাধ ক’রে ব’লে গেছেন? সবায়েরই এমনি এক একটি ক্ষয়হীনা প্রাণী ছিল আর কি! যাক, আমারই অভায় হয়েছিল তোমাদের কাছে তৃষ্ণার জল চাইতে আসা। যাই দেখি পিসীমাদের ভাঁড়ারে, যদি কিছু পাই।”

গৌরাজিনীর দিদি বললেন, “চল, চল, আমিই দিছি, পিসীমাদের কাছে আর যেতে হবে না। আর রে গৌরী।”

গৌরাজিনী বললেন, “মেয়েটাকেও ডাক না দিদি—খাওয়াই কিছু। ক’দিন দিনে খাওয়া নেই, রাত্রে ঘুম নেই, সারা হ’ল মেয়েটা।”

“এগো তোরা, আমি নমিতাকে ডেকে আনছি” ব’লে দিদি বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্র ও গৌরাজিনীও তাঁব অনুসরণ করলেন।

* * * *

আশ্বিন মাস। পূজা এল বলে, আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে। নমিতাকে শ্রাবণ মাসে বিয়ের পরেই তাঁরা নিয়ে গেছেন, তার পর ভাদ্র মাস পড়ে যাওয়াতে আর পাঠান হয়ে ওঠে নি। গৌরাজিনী থাকতে না-পেরে ভাদ্র মাসেব মাঝামাঝি স্বামীকে জোর-জবরদস্তি ক’রে ধ’রে সঙ্গে নিয়ে চাকায় গিয়ে চাব দিনের জন্ত মেয়েকে দেখে এসেছেন; তার পর ফিরে এসে দিন গুণছেন মেয়ে কবে তাঁর কাছে আসবে। পূজার সময়ই পাঠাবার কথা। জামাইকে বেয়াইকে বার-বার ব’লে এসেছেন পূজার সময়ে জামাই মেয়ে যেন আসে তাঁর কাছে, কিছুতে যেন অত্যা না-হয়। নুতন কুটম্ব অত্যন্ত ভদ্র। ছেলের পিতা বেহানকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ে-জামাই

তাঁর কাছে বাবে এ আর বড় কথা কি, তিনি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।

গৌরাজিনীর এলাহাবাদের বাড়িতে ঘর অনেকগুলি। স্বামি-স্ত্রী দু-জনের মাত্র সংসার—সব ঘরই খাঁ-খাঁ করে। ছপুয়ে শূন্তগৃহে গৌরাজিনী একবার এঘর, একবার ওঘর কবে বেড়ান; কর্মবিহীন দীর্ঘ অবসর কাটানো দুষ্কর হয়ে ওঠে, কতাহীন অনভ্যস্ত গৃহে কোনও মতে মন বসে না। নমিতার কাপড়ের আলমাবীতে তার পুরান কাপড়জামা ঠাসা—বিয়ের ক’নের সঙ্গে পুরান কাপড় দিতে মায়েব মন সরে নি, তাই সবই রয়ে গেছে। সে এইবার এসে সব আবার পরবে, তাব পর যাবার সময়ে নিয়ে যাবে। সেই আলমারী খুলে, বার-বার ঝেড়ে কাপড়গুলি নুতন ক’বে শুষ্কিয়ে রাখেন। মেয়ের কাপড়গুলি নাড়াচাড়া ক’রে মায়ের মন ভুগে পায়। ১৭৮

সেদিন অমরেন্দ্র আপিস বেকে ফিরে দেখলেন যে, তাঁর শয়নগৃহ-সংস্কারকার্যে বাড়ির চাকরগুলি, মায় মালীটা পর্যন্ত সকলেই মহা ব্যস্ত। ঘরের জিনিষপত্র বারান্দায় বার করা হয়েছে এক চাকবেবা ধরাধরি ক’রে ও-ঘরের বড় আলমাবী এ-ঘরে নিয়ে আসছে, বসবার ঘরের বড় গালিচাটা এ-ঘরে টেনে এনেছে, পাতা হবে মেসেতে, জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে তিনি বললেন, “ক’দিনই বা আছে আব? নমিতা আসছে, প্রথমবার জামাই আসছে, ভাল শোবার ঘরটা না-ছেড়ে দিলে কখনও হয়? আমরা ঐ পশ্চিমবে দিকেব ঘরটার শোব ক’দিন।”

অমরেন্দ্র বললেন, “সে ত এখনও দশ দিন দেরি গো। আর আসে কিনা তাই দেখো আগে। কই, এখন অবধি ত ওরা নিশ্চয় আসছে ব’লে কোনও খবরই পাই নি। ভুমি এতও পার সতি! কোথায় কি তার ঠিক নেই, তার জন্তে এই জিনিষপত্র নাড়ানাড়ি করছ আজ সারাদিন ধরে? ক্রমে ক্রমে করলেই ত হ’ত, এত ভাড়াভাড়ি কি?”

গৌরাজিনী স্বামীর কথায় অগ্রসর হয়ে বললেন, “তাড়া আবার কোথায় করলাম? তোমাদের সেই শেষ মিনিটেতে সব না করলেই অমনি তার নাম হয়ে যায় ভাড়াভাড়ি করা। ঘরদোর গোছাব, ঝাড়াব, জিনিষপত্র ঠিক করা—শেষের দু-দিন ত আমাব ওদিকের খাবার-দাবার করতেই যাবে,

তখন কি আর এসব দিক দেখাবার সময় পাব? আমাকে ত আবার সব দিক একাই দেখতে হয় কি না—তোমাকে দিয়ে ত এতটুকু সাহায্য কোনও দিকে পাবাব জ্ঞো নেই। নমি আবার বার-বার বলে দিয়েছে—মা, যদি যাই ত তুমি নিশ্চয় ষ্টেশনে নিতে এস। মাকে দেখবাব জ্ঞো তার প্রাণ যা করছে তা আমিই জানি। এসেই যদি ষ্টেশনে আমাকে না-দেখতে পায় ত কি অনর্থ কববে দেখো তখন।... এই দেবী সিং, ও আরনাটা কোথায় রাখছিস? ব'লে দিলুম না যে ওটা এই পুখুখো রাখবি? সব সর, আমিই টেনে আনছি। তোবা ত সব সময়ে উণ্টোটি ক'বে আমাব কাজ বাড়াতেই আছিস কিনা।”

অমরেন্দ্র এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, “এ-বর ত তোমার মেয়ের ঘর হয়ে গেল দেখছি—আমাব বোধ হয় প্রবেশ নিবেধ? আচ্ছা, পশ্চিমের ঘরটাই ওদের দিলে দোষ হ'ত কি? সেটা ত আমার মনে হয় এব চেয়ে ভালই ঘর—আব এন্ত নাড়াচাড়া ক'বে হাঙ্গামও করতে হ'ত না। তা বাকু, যা করছ তা কর, কিন্তু আমি এখন স্নান-টান কবি কোথা? স্নানের ঘরটাও আজ থেকে আমার ব্যবহার বন্ধ নাকি?”

গৌরাজিনী বললেন, “এ স্নানের ঘরটা ওদেরই দিলুম। তোমার জ্ঞো ঐ পশ্চিমের গোসলখানাটা ঠিক কবিয়ে দেব—এই যাচ্ছি এখনই। এই আনলায় নমিব সেমিজ-টেমিজগুলো বাব ক'বে রেখেই চল যাচ্ছি ওদিকে তোমার সব ব্যবস্থা করিয়ে দেব।”

ইংরেজী গানের একটা শিষ দিতে দিতে অমরেন্দ্র নিজের নুতন শোবার ঘরের উদ্দেশে চলে গেলেন। কিন্তু একটু পবেই সে ঘর থেকে চোঁচোমেটি শুনতে পাওয়া গেল, “কই

গো, আমাব কাপড় কই, তোয়ালে কই, জল কই, সাবান কই? কিছু বে নেই এখানে। তোমার মেয়ে স্নান কববে আজ দশ দিন পরে এসে, তার কাপড় বার ক'বে সাংলান হয়ে গেল, আর আমি এদিকে কি দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? ওগো—।”

কিন্তু গৌরাজিনীর কাছে থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। অমরেন্দ্র এসে আবার সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। একখানা ডাকের চিঠি হাতে নিয়ে গৌরাজিনী খাটের উপর বসে আছেন। অমরেন্দ্র ভয় পেয়ে কাছে এসে স্ত্রীর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে নিলেন; উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন কবলেন, “কি হয়েছে গৌরী?” বলতে বলতেই চিঠিখানাব দিকে চেয়ে দেখলেন যে নমিতার লেখা। পড়লেন নমিতা লিখেছে, “প্রীচরণেশু মা, এবার পূজাব ছুটিতে আমাদের তোমাব কাছে বাবার কথা ছিল, আমাব খবরেরও ইচ্ছা যে আমবা যাই, কিন্তু উনি বলছেন যে এলাহাবাদ বড় পুরান জায়গা, ওখানে যা দেখবার ছিল অনেক বারই দেখা হয়ে গেছে। পূজার ছুটিটা এবার কোনও নুতন জায়গায় কাটাতে চান। ওঁর খুব ইচ্ছা যে আমি ওঁর সঙ্গে পুরী বেড়াতে বাই। সমুদ্র ত কখনও দেখি নি, তাই তোমবা যদি অমত না কব ত আমিও ভাবছি এবাব না-হয় পুরীর সমুদ্রটা দেখে আসি। শুনেছি নাকি অমন চেউ আর কোথাও হয় না। বড়দিনেব ছুটিতে তোমাদেব কাছে যাব। তোমাব জ্ঞো বড় মন কেমন কবে; বাবার কথাও সব সময়ে মনে হয়। আমার প্রণাম জেনো। ইতি তোমার নমিতা।”

অমরেন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। গৌরাজিনী চোখব জল সামলাইতেছিলেন।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মহামানী ছর্যোধন
শ্রীননী গোপাল দাসস্বপ্ন

ছোটনাগপুরে সাহিত্যসেবার উপাদান

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়

২

ঐতিহাসিক যুগ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া এইবার ঐতিহাসিক যুগের প্রভুত্বের আলোচনা করিব। সর্বপ্রথমে আমরা ছোটনাগপুরের আৰ্য্যবংশসম্বৃত জৈনদের প্রভাবের কিছু নিদর্শন পাই। মানভূম জেলায় তেলকুপী, পাড়া, দল্মা প্রভৃতি গ্রামে অনেকগুলি জৈনমূর্তি পাওয়া যায়; তাহাদের কতক অটুট এবং কতক ভগ্ন। রাঁচি জেলাতে ও মানভূমে যে সরাক নামে জাতি এখনও বর্তমান তাহার জৈন 'শ্রাবক'দেরই বংশধর। রাঁচি জেলার এক গ্রামে একটি নগ্ন জৈনমূর্তি ভগ্নাবস্থায় পাইয়াছি। হাজারি-বাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়ে জৈন-তীর্থঙ্কর পরেশনাথ তপস্বী ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; ইহা বহুকাল হইতে জৈনদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। সিংহভূম জেলায় বেণুগার গ্রামে বেণুগার নামে যে বাঁধ বা দীঘিকা আছে তাহার তীরে প্রভুত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব সুপারি-টপেট কোলার (Beglar) সাহেব একটি জৈনমূর্তি পাইয়াছিলেন; তিনি এখানে একটি প্রস্তরমূর্তিও পাইয়াছিলেন—তাহা জৈন কি বৌদ্ধ ঠিক নির্ণয় করা যায় না।

বৌদ্ধ প্রচারকগণ যে বর্তমান মানভূম জেলায় আগমন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আরও সম্ভোযজনক; সেখানে কয়েকটি গ্রামে কতকগুলি সমগ্র বৌদ্ধমূর্তি ও অনেক বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে একটি গ্রামের নামই বুদ্ধপুর। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন সাঙ যে কিরণসুফ (Kio-lo-na Sufa-la-na) প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকা মানভূম জেলা তাহারই অন্তর্গত ছিল, কানিংহাম এরূপ অনুমান করেন; কিন্তু এ-বিষয়ে তাহার পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ অত্যন্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোটনাগপুরের ওরাও জাতি যে 'ধর্ম্ম' বা ধর্ম্মদেবতার পূজা করে, ভগবানের সেই নাম সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত। তবে ওরাওরা বিহার হইতে রোহটাস পাহাড়ের পথ দিয়া মুণ্ডাদের অনেক পরে পালামৌ হইয়া রাঁচি জেলায় আগমন করে। সম্ভবতঃ বিহার হইতে এই 'ধর্ম্ম' নামটি আদিয়াছিল। পালামৌ শহরের অনতিদূরে চেরো রাজাদের যে পুরাতন কেল্লা দেখা যায়, তাহার পূর্ব-তোরণে একটি বুদ্ধমূর্তি ছিল। ঐ চেরো রাজারাও রোহটাসগড়ের পথে ছোটনাগপুরে আসে।

ছোটনাগপুরের সঙ্গে পুরাকাল হইতে বাহিরের যোগ ছিল, এ-সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তি বন্দর (আধুনিক তমলুক) হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বামনবাটি হইয়া সিংহভূম জেলার পোড়াহাট পর্য্যন্ত বাণিজ্যের রাস্তা ছিল। পোড়াহাট পরগণা রাঁচি জেলার সংলগ্ন। ঐ বামনবাটি গ্রামে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল; তাহার মধ্যে কয়েকটি মুদ্রা কম্বটানটাইন, গড়িয়ান প্রভৃতি রোমান সাম্রাজ্যের সময়ের। চাইবাসার কয়েক মাইল দক্ষিণে গুলফা গ্রামে এক হাড়ি পুরাতন তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়, সেগুলি কুশান-মুদ্রা (Indo-Seythian)—ভারতীয় প্রভুত্ব-বিভাগের কার্যাবিসরণীর ত্রয়োদশ খণ্ডে এরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুশান-সম্রাট হাবিষ্ ও কনিষ্কের সময় ছোটনাগপুরের সঙ্গে উত্তর-ভারতের যে আদান-প্রদান চলিত, তাহার আরও প্রমাণ রাঁচি জেলায় প্রাপ্ত কুশান-রাজাদের মুদ্রা। রাঁচি জেলায় হাবিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলাম, তাহা এখন পাটনার বাহুবরে আছে এবং আরও কয়েকটি ইম্পিরিয়াল কুশান-মুদ্রা গ্রামা বালকবালিকার গলায় কবচস্বরূপ পরিহিত দেখিয়াছি—উদ্ধার করিতে পারি নাই। সবগুলিই মটি



জগন্নাথ-মন্দির, রাঁচি

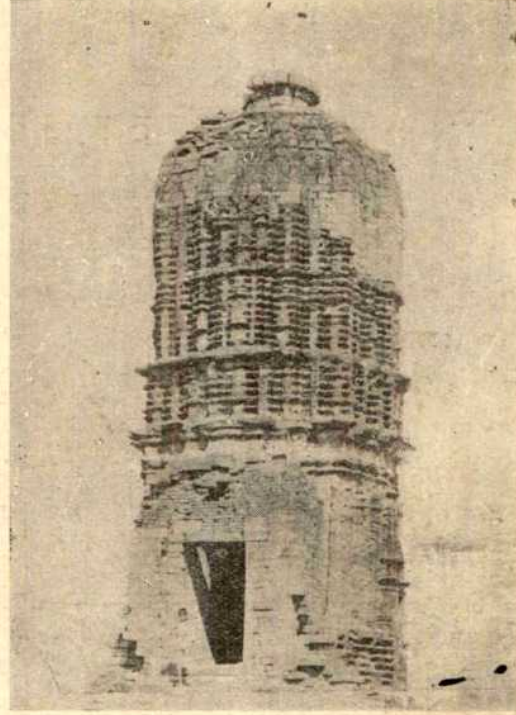
[শ্রীমত বিভূতিভূষণ মিত্রের সৌজন্যে]

খনন করিতে গিয়া পাওয়া যায়। কুশান-সম্রাটদের মুদ্রার অরূপ যে মুদ্রাগুলি “পুরী কুশান মুদ্রা” নামে অভিহিত হয় তাহার অনেকগুলি রাঁচি জেলায় পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর কয়েকটি মুদ্রা প্রথমে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাম জেলায় পাওয়া যায় এবং ঐ সনের *Madras Journal of Literature and Science*-এ সেগুলির বিবরণ আছে। তার পর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুরী জেলায় ৫৪৮টি ঐরূপ মুদ্রা পাওয়া যায়; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হর্ণলী (Dr. Hoernle) *Proceedings of the Asiatic Society*তে সেগুলির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে প্রথমে উহাদের “পুরী কুশান-মুদ্রা” এইরূপ নামকরণ করেন। এই শ্রেণীর মুদ্রা কুশান-রাজাদের সমসাময়িক বা তাঁহাদের অব্যবহিত পরবর্তী—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। অধ্যাপক র্যাপসন (*Indian Coins*, pp. 13-14) এই পুরী কুশান-মুদ্রাগুলির কাল খ্রীষ্টীয় তিন শতাব্দীর মধ্যে, এবং ভিনসেন্ট

এ স্থিত তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর—এরূপ স্থির করিয়াছেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচি জেলায় প্রাপ্ত একটি পুরী কুশান-মুদ্রা-পৃষ্ঠে খোদিত ‘টঙ্কা’ শব্দটি দেখিয়া স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহাকে ষষ্ঠ শতাব্দীর বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের, এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি প্রায় এক শত পুরী কুশান-মুদ্রা রাঁচি জেলায় পাইয়াছিলাম; তাহার কোনটিতে কোনও লেখা নাই; কেবল কুশানদের জায় রাজপরিচ্ছদপরিহিত মূর্তি আছে। পরবর্তী গুপ্ত-সম্রাটদের, কিংবা পাল-বংশ বা সেন-বংশ অথবা অন্ত কোন হিন্দুরাজবংশের মুদ্রা অন্ততঃ রাঁচি জেলায় এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তার পর কোন কোন মুসলমান বাদশাহের মুদ্রা মধ্যে মধ্যে এখানে পাওয়া যায়। আর বিশেষতঃ জৌনপুরের শার্কী (Sharqui) রাজাদের অনেকগুলি মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে ছোটনাগপুরের বিরূপ বোগ ছিল ইতিহাসে ঠিক পাওয়া যায় না।

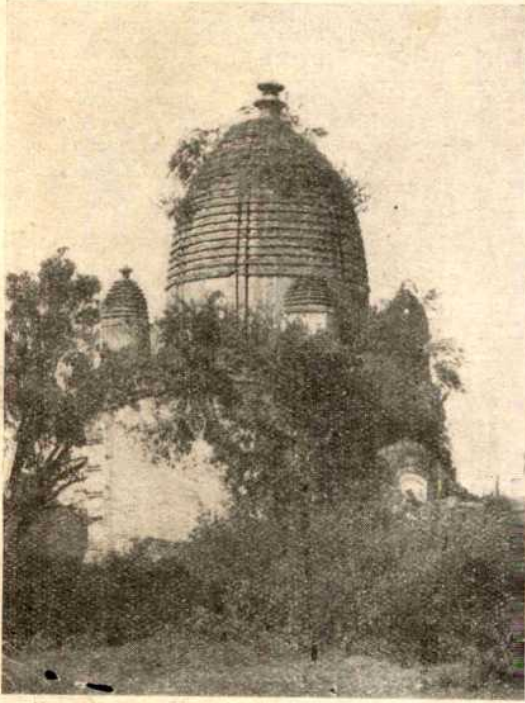
তবে ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, দিল্লী-সম্রাট মুবারক শাহের প্রধান মন্ত্রী মলিক সর্বর ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে “মুলতান-উয়-শার্ক” (পূর্বদেশের রাজা) উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্রাটকে অবজ্ঞা করিয়া জৌনপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং পশ্চিমে অধোধ্য হইতে কোইল পর্য্যন্ত এবং পূর্বে ত্রিহুত ও মগধ পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করেন। ঐ বংশের তৃতীয় রাজা শামসুদ্দীন ইব্রাহিম বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং বঙ্গভূপতির প্রধান সামন্ত রাজা গণেশের পুত্র জয়মল্লকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সৈন্যদল জৌনপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ইব্রাহিমের পৌত্র হুসেন উড়িয়া আক্রমণ করেন ও উড়িয়ার রাজার নিকট হইতে বহু অর্থ আদায় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পরে সম্রাট বুলুল লোদী কর্তৃক স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করেন ও শামসুদ্দীন ইউফ শাহের আশ্রয়ে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করেন। যদিও শার্কী-রাজাদের ছোটনাগপুর-অধিকারের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি মনে হয় বঙ্গদেশে এবং উড়িয়া-অভিযান উপলক্ষে ছোটনাগপুরে শার্কী-রাজাদের প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। তৎপূর্বে ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কিরোজ শাহ উড়িয়া-অভিযান হইতে প্রত্যাগমনকালীন ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুরের পথে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল পথ হারাইয়া ছয় মাস কাল ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

শের শাহের সময় হইতে ছোটনাগপুরের জঙ্গলের হাতী ও শজা নদীর হীরা মুসলমান রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর শাহের প্রেরিত সৈন্যদল ছোটনাগপুরের তৎকালীন নাগবংশী রাজাকে পরাস্ত করে। আর ঐ রাজা মোগল সম্রাটকে বাৎসরিক কর দিতে স্বীকৃত হন। তখন রাজাদের রাজধানী ছিল বর্তমান খুথরা পরগণাস্থ খুথরা গ্রামে। সেই জন্ত ঐ প্রদেশ মোগল সম্রাটের সরকারে ‘খোথরা’ নামে অভিহিত হয়। ‘আইন-ই-আকবরী’তে দেখিতে পাই, ‘খোথরা’ প্রদেশ মোগল-সাম্রাজ্যে “মোথেরাজি” তালুক রূপে সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গ্লাউউইন সাহেব তাঁহার ‘আইন-ই-আকবরী’র



পাড়াগ্রামে পাথরে নির্মিত দেউল

অনুবাদে এবং Grant's Fifth Report of the Revenues of the East India Companyতে ‘মোথেরাজি’ শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে ‘unattached’ অর্থাৎ অসংলগ্ন। খোথরার রাজা স্বেচ্ছায় বোধ হয় এই কর কখনও দেন নাই; মধ্যে মধ্যে ফৌজ প্রেরণ করিয়া এই কর আদায় করা হইত এবং ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ছোটনাগপুর বা খোথরার রাজা দুর্জন শাল বন্দী হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে কারাবদ্ধ হন ও বাৎসরিক ছয় সহস্র টাকা কর দিবার কড়ারে কারামুক্ত হন। তিনি স্বরাজ্যে ফিরিয়া কিছু দিন পরে খোথরা হইতে ডোএসা নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে, গোয়ালিয়র-দুর্গে অবস্থানকালে খোথরার রাজা বুটা হীরা ও আসল হীরার প্রভেদ দেখাইয়া দিয়া বাদশাহকে খুশী করেন এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার কয়েকটি সহ-বন্দী হিন্দুরাজাও কারামুক্ত হন। পরে ঐ হিন্দুরাজগণ রাজা দুর্জন শালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারমানসে নাগবংশী-রাজার রাজধানীতে রাজার অনুপযোগী সামান্য

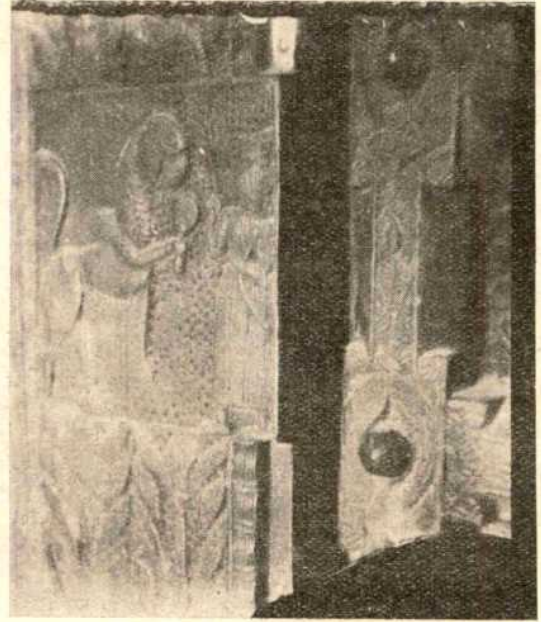


রামগড়ে বিষ্ণুপুরী চণ্ডের পঞ্চরত্ন-মন্দির

রাজবংশী দেখিয়া বিস্মিত হন ও স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া নিপুণ রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগর প্রেরণ করেন এবং তাহারাই ডোএসা নগরের 'নৌরতন' (নব-রত্ন) নামক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে। আর ঐ সময় হইতে সভ্য প্রদেশের হিন্দু রাজাদের সংস্পর্শে আসিয়া ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজারাও রাজোচিত আড়ম্বর ও পদমর্যাদা রক্ষার জন্য বিহার ও মধ্যপ্রদেশ হইতে হিন্দু আমলা সিপাহী প্রভৃতি আমদানী করেন। সেই অবধি বর্তমান রাঁচি জেলায় হিন্দু সভ্যতার প্রচলন দৃষ্টরমত আরম্ভ হয়। অবশ্য ছোটনাগপুরের সীমান্ত-স্থানগুলিতে—যেমন ঝাড়ভাভাভাষী মানভূম জেলা এবং মিশ্রিত বঙ্গ ও উড়িয়াভাষী ধলভূম পরগণায়—হিন্দু সভ্যতার প্রচলন বহু পূর্বে হইতেই ছিল।

ছোটনাগপুরের মালভূমিতে হিন্দুধর্মের বিস্তার সম্বন্ধে জানা যায় যে, বৌদ্ধ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈতন্যদেব পুরীধাম হইতে মথুরা যাইবার পথে ঝাড়খণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন ও সেখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। ছোটনাগপুর ঝাড়খণ্ডের

অন্তর্ভুক্ত ছিল একপ অন্মুদিত হয়। পুরীধাম হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইবার পুরাতন রাস্তা রাঁচি জেলার বুড়ু ও তামাড়া পরগণার মধ্য দিয়া বিস্তৃত ছিল; এখনও স্থানে স্থানে সে-রাস্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রবাদ এই যে বুড়ু গ্রামের



বোড়ায়ার মন্দিরে "নবগুজর"

নিকট চৈতন্যদেব বিশ্রাম করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ বুড়ু ও তামাড়া পরগণায়, এমন কি অসভ্য মুণ্ডাদের মধ্যেও, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এখনও দেখা যায়। নিকটবর্তী সিরি, শোণপুর প্রভৃতি অত্যন্ত পরগণায় মুণ্ডাদের মধ্যেও মুণ্ডা ভাষায় রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীতের প্রচলন আছে। এমন কি বিবাহের "সিন্দূরদান" শেষ হইলে মুণ্ডারা 'রাধে' 'রাধে' ধ্বনি করে, কিন্তু অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলে ইহার অর্থ 'আড়ান্দিটু-জানি' অর্থাৎ 'বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হইল'। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় যে চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রদেশের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে—

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝাড়খণ্ডে,
[ভিন্ন প্রায় লোক তাহে পরম পাষণ্ড],
নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার
চৈতন্যের গুঢ় লীলা বুঝে সাধ্য কার ?

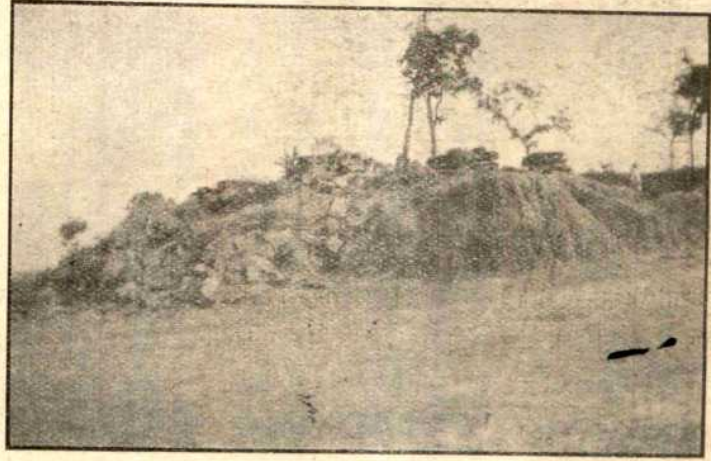
ঝারিখণ্ডে স্বাবর জন্ম ছিল যত
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমতে উদ্ভূত,
যেই গ্রাম দিয়া যান বাঁহা করেন স্থিতি
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি।

মুণ্ডাদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের যে-সব গান প্রচলিত আছে এবং বুড়, সিলি প্রভৃতি “পাঁচ পরগণা”র কুড়মী প্রভৃতি জাতির মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক যে বাংলা কুমুর গীত শোনা যায়, সেগুলি এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফল। এখানকার অসংখ্য জাতিদের মধ্যে যে ‘ভক্ত’ বা ‘ভকত’ সম্প্রদায় আছে, তাহাও অজ্ঞাত বৈষ্ণব-গুরুদের প্রভাবে গঠিত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের পূর্বভাগে যেমন বাংলা দেশের গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত প্রচলিত, তেমনি মধ্য ও পশ্চিম ভাগে রামানন্দী সম্প্রদায়ের মতের প্রভাব দেখা যায়। ডোরাগুর নদীর মধ্যে যে মঠ আছে উহা রামানন্দী সম্প্রদায়ের। গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার মনে করেন; কিন্তু রামানন্দীরা শাস্ত্রের দশ অবতার ভিন্ন অন্য

কাহাকেও অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না; চৈতন্যদেব প্রভৃতিকে কেবল পরমভক্ত ও আচার্য্য বলিয়াই মানেন। গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম স্থান দেন; রামানন্দীরা রামচন্দ্রকে প্রথম স্থান দেন। ছোটনাগপুরের দক্ষিণ ভাগে ধলভূম পরগণায় যে বৈষ্ণব মত প্রচলিত তাহাও গোড়ীয় বৈষ্ণব মত। কিন্তু উড়িয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে দুই দল হইয়াছে। অধিকসংখ্যক বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম স্থান দেন আর প্রথমে বলেন, “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,” আর এক দল রামানন্দীদের মত রামনামকেই প্রথম স্থান দেন এবং প্রথমে বলেন, “হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।” এই শেষ শ্রেণীর বৈষ্ণবদের নাম হইয়াছে ‘অতিবড়ি’ বা ‘অতি-বড়’ সম্প্রদায়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জোলাবংশসম্বৃত কবীর যে ভক্তিযোগ ধর্ম প্রচার করেন, মধ্যপ্রদেশ হইতে তাহা গত

শতাব্দীর প্রথম ভাগে ছোটনাগপুরের ওরাওদের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং কতকগুলি ওরাও-পরিবার এই ধর্মে দীক্ষিত হয়; এমন কি কয়েকটি ওরাও-ভক্ত এখন কবীরপন্থী-গুরুর কাজও করেন। গত শতাব্দী হইতে ছোটনাগপুরের আদিম নিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান পাদ্রীরা আসেন, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ র্যাংলিকান পাদ্রীরা আসেন, এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে



বুড়িডিহি গ্রামের একটি প্রাচীন চিবি

রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা চাইবাসায় প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। ধর্মবিশ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মমন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ ও ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও আলোচনার প্রবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

ছোটনাগপুর ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নামমাত্র মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিলেও এখানে মুসলমান সভ্যতার বা ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। কেবল মুসলমান সৈন্যদের ও তাহাদের অনুচরদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ছোটনাগপুর হইতে গিয়াছিল ও সম্ভবতঃ নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় লোকদের মধ্যে কোন কোন পরিবারকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। ইহাদেরই সংমিশ্রণে রাঁচি জেলায় বর্তমান নিম্নশ্রেণীর জোলা প্রভৃতি মুসলমানের উদ্ভব হইয়াছে। নাগ-বংশীয় রাজা দুর্জয় শাল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি দ্বারা ডোএসা নগরে রাজপ্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করান তাহারাও



বুড়াডিহি গ্রামে অবস্থিত পুরাতন প্রস্তর-মন্দির

সম্ভবতঃ পরে এই প্রদেশেই অবস্থান করে। ডোএসার 'নওরতন' প্রাসাদ যদিও খানিকটা মুসলমানী প্রথা নিশ্চিত হইয়াছিল, সেখানকার পরবর্তী মন্দিরাদি হিন্দু প্রথা নিশ্চিত। ডোএসা নগরে জগন্নাথ-মন্দিরের যে ভগ্নাবশেষ আছে তাহার খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৭৩৯ সন্থতে অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজগুরু হরিনাথ ব্রহ্মচারী উহা নির্মাণ করান। আর সেখানকার কপিলনাথ দেবের মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, সে মন্দির ১৭৬৮ সন্থতে অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চিত হয়। তথাকার বোধীমঠ, পঞ্চমঠ ও মহাদেবের মন্দিরে কোন লিপি পাওয়া যায় না। রাঁচির ছয় মাইল উত্তরে বোড়ের গ্রামে যে মদনমোহনের মন্দির আছে তাহাতে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৭২২ সন্থতে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় এবং ১৭৩৯ সন্থতে অর্থাৎ ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। হিন্দু রাজমিস্ত্রী অনিরুদ্ধ ইহার নির্মাতা এবং নির্মাণ-ব্যয় চৌদ্দ হাজার এক টাকা। ঐ মন্দিরের একটি কপাটের খাপে (panel) কাঠের উপর একটি "নব-গুজর" মূর্তি খোদিত আছে।* উড়িষ্যার বাহিরে আর কোথাও এই মূর্তি দেখা যায় না।

হিন্দুর নিকটস্থ জগন্নাথপুর পাহাড়ের উপরে জগন্নাথ

দেবের মন্দির ১৭৪৮ সন্থতে অর্থাৎ ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে "ঠাকুর"-উপাধিধারী জমিদার আইনিসাহি নির্মাণ করান। এই মন্দির অনেকটা পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের অঙ্করণে নিশ্চিত।

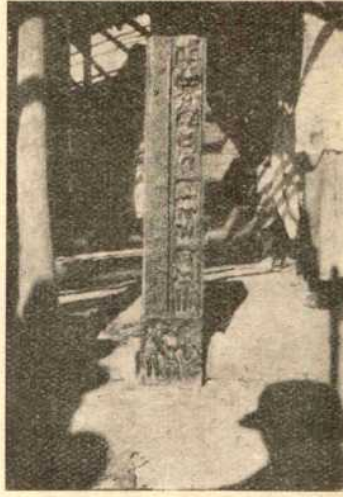
এই খোদিত লিপিগুলি ছাড়া দুই-একটি দীর্ঘিকা, ইদারা ও কূপের খননকাল ও খনন-কর্তার নামের স্মারক-চিহ্নস্বরূপ শিলালিপি দেখা যায়; উদাহরণ-স্বরূপ তিলুসি গ্রামের অকবর নামক নাগবংশী 'ঠাকুর' উপাধিধারী জমিদারের দ্বারা ১৭৯৪ সন্থতে (অর্থাৎ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে)

প্রতিষ্ঠিত কূপ বা ইদারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। হাজারীবাগ জেলায় রামগড় থানায় কতকগুলি হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার কোনটিই সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেরকার বলিয়া মনে হয় না। উহাদের মধ্যে রাজরোপায় ছিন্নমস্তার মন্দির প্রসিদ্ধ।

পূর্বকালে হিন্দু রাজারা যেক্রপ তাম্রশাসন দ্বারা গ্রাম ও ভূমি দান করিতেন, ছোটনাগপুরে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঐক্রপ পিতলের পাট্টা দেওয়ার প্রচলন ছিল। আমি ঐক্রপ একটি পিতলের পাট্টা সংগ্রহ করিয়াছি; তাহার উপর সন্থ ১৯.. (১৮.. খ্রীষ্টাব্দ) এই তারিখ আছে।

রাঁচি জেলায় পুরাতন মন্দিরাদি যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহার একটিও খ্রীষ্টীয় বোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেরকার বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দুইটি বট-পর্যায় মূর্তি পাইয়াছি, তাহা হয়ত অপেক্ষাকৃত পুরাতন। উহাদের মধ্যে বড়টি পাটনার সরকারী বাধ্যবরে রক্ষিত আছে। মানভূম জেলায় আরও অনেক আগেকার পুরাতন মন্দিরাদি আছে। কয়েক বৎসর হইল রাঁচি-পুকলিয়া রেল-লাইনের গড়জয়পুর স্টেশনের এক মাইল দূরে বোড়াম গ্রামে যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটি সুন্দর মূর্তি দেখা যায়। সেগুলি মধ্যযুগের। রাঁচি জেলার বুড়াডিহি গ্রামের নিম্নস্থ নদীর অপর তীরে কয়েকটি পুরাতন দেউলের ধ্বংসাবশেষ ও

* শ্রীমান্ নির্মলকুমার বহু এই মূর্তিটি প্রথম লক্ষ্য করেন।



১। বুড়াডিহি গ্রামে প্রাপ্ত দেবী-মূর্তি

২। বুড়াডিহিতে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তরের চৌকাট

৩। বুড়াডিহি গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিঙ্গ-মূর্তি

পুরাতন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সম্ভবতঃ বোড়ামের মূর্তিগুলির সমসাময়িক। ইহার প্রধান মন্দিরটি পুর্বীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে নিৰ্মিত।

পালামৌ জেলায় ডালটনগঞ্জ শহরের অদূরবর্তী জঙ্গলে ‘চেরো’ রাজাদের যে কেল্লা আছে তাহার গঠনপ্রণালী রোহটাস্‌গড় ও শেরগড়ের অনুরূপ; মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের বলিয়া মনে হয়। সিংহভূম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বেণুদাগরের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি, সেখানকার পুরাকালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে পুরাতন প্রস্তর-মূর্তিগুলি—শিবকালী, মহিষাসূরী দেবী, গণেশ প্রভৃতি—একটি প্রস্তরের হস্তিমূর্তি বেগলার সাহেব পাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল বেণুদাগর হইতে আরও কতকগুলি সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি পাটনার বাজারে রক্ষিত আছে।

মন্দির-নিৰ্মাণ ও দেবমন্দির-গঠন ছাড়া ধর্মের অভ্যুত্থান ও সমৃদ্ধির আর একটি নিদর্শন ধর্মগ্রন্থের প্রচার। রাঁচি জেলার বুড়ু পরগণা পাঁচপরগণার বৈষ্ণবদের কেন্দ্রস্থল। গোড়ীয় বৈষ্ণবদের সংখ্যা অধিক; তবে রামানন্দী বৈষ্ণবও আছে। বুড়ু পরগণায় নৃত্য গবেষণা উপলক্ষ্যে অবস্থান-কালে আমি কয়েকখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এগুলি প্রায় সবই ধর্মগ্রন্থ; সবই বাংলা

অক্ষরে লেখা। ইহার মধ্যে চারিখানির ভাষা বাংলা, বোলখানির ভাষা সংস্কৃত এবং পাঁচখানি উড়িয়া অক্ষরে লেখা। এই পাঁচখানি উড়িয়া পুস্তকের মধ্যে দুইখানির ভাষা সংস্কৃত ও তিনখানি উড়িয়া।

প্রথম বাংলা পুঁথিখানির নাম ‘তত্ত্ববিলাস’। ইহাতে পদ্যে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে। গ্রন্থকর্তার নাম বৃন্দাবনদাস। তারিখ দেওয়া নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে গৌরানন্দদেব ও তাঁহার ভক্তদের বন্দনা আছে; বিশেষ করিয়া গৌরান্দ-পার্বদ গদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করা হইয়াছে; তাহাতে মনে হয় গ্রন্থকার গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য-পরিবার ছিলেন। গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন:—

“বৃন্দাবন দাস কহে তত্ত্ববিলাস।

শুনিলে যমের দূত নাহি আশে পাশ ॥”

দ্বিতীয় বাংলা পুঁথি কবিচন্দ্রের ‘অঙ্গদরায়বার’। নকলের তারিখ ৭ই আষাঢ় সন ১২০৬ সাল; অর্থাৎ এ পুঁথি ১৩৫ বৎসর আগের লেখা। তৃতীয় বাংলা পুঁথি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড। কৃষ্ণবাসের রামায়ণের সঙ্গে ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে। শেষে লেখক ও তারিখের বিবরণ এইরূপ:—

“ইতি সন ১২০৫ সাল প: নাগপুর, ত: বারন্দা, মৌ পাণ্ডাজি, ২০শে ভাদ্র, কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী, লিখিতং শ্রীবিজ্ঞানমণ্ডল।”

চতুর্থ বাংলা পুঁথি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব। কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে মেলে; লেখক শ্রীকমলনাথ দাস,



ছিন্নমস্তার মন্দির, রাজশাহী

[শ্রীযুত বিজুভূষণ মিত্রের সৌজন্যে]

সাংখ্যসূত্র ১৮৯৮ সধ্যং (= ১৮৪১ খ্রীঃ), অর্থাৎ ৯৩ বৎসর আগেকার।

বাংলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুঁথিগুলির নাম—

(১) বিষ্ণুসংস্কৃত ‘গোবিন্দনামোদর স্তোত্র’;

(২) শ্রীবিষ্ণুপুরী সংগৃহীত ‘শ্রীভগবদ্ভক্তিরত্নাবলী’ (লিখিতঃ কুতুবপুর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সমীপে; সংঃ ১৯৬৩)

(৩) সনৎকুমার-সংহিতায় নারদোক্ত “শ্রীরামচন্দ্র-স্তবরাজ্যস্তোত্র”

(৪) শ্রীরামকর্ণামৃত, (৫) রামমন্ত্রবিধিপদ্ধতিপটল,

(৬) গৌর অষ্টক, (৭) গীতা, দশম অধ্যায়,

(৮) শ্রীরামানুজকৃতং “শ্রীরামপদ্ধতি” (বেদোক্ত)

(৯) শ্রীব্রহ্মবামলে সৃষ্টিপ্রশংসায়ঃ উমামহেশ্বরসংবাদে রকারাদি শ্রীরামসহস্র স্তোত্র। ১৯৬৩ সাল।

(১০) কামরত্ন (বশীকরণ-বিদ্যার বই)---(নাগরী অক্ষরে)

(১১) রকারাদি রামসহস্র নামস্তোত্র (ব্রহ্মবামলে সৃষ্টিপ্রশংসায়ঃ উমামহেশ্বরসংবাদে)

(১২) পঞ্চরাত্রোক্ত আর্যধনাক্রম (ভগবান্দাসকৃত)

(১৩) পদ্মপুরাণে ভৃগুসংবাদে নারায়ণস্ততি।

(১৪) পঞ্চামৃতঃ, (১৫) হনুমান-পূজাপদ্ধতি।

রাঁচি জেলার দক্ষিণ ভাগে তালপত্রে উড়িয়া অক্ষরে লেখা কয়েকখানি পুঁথি ও একটি লোহের লেখনী পাই। প্রথমখানি উড়িয়া ভাষায় ‘করম কথা’ (অর্থাৎ করম একাদশীতে আবৃত্তি করিবার জ্ঞত করম-ধরমের কাহিনী), দ্বিতীয়খানি উড়িয়া অক্ষরে লেখা শিবদাস-বিরচিত ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’। তৃতীয়খানি উড়িয়া অক্ষরে লেখা সংস্কৃত ‘দশকর্ম্মাণি’ (গর্ভাধান প্রভৃতি); চতুর্থখানি উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় ‘নবগ্রহ স্তব ও মন্ত্র ও গ্রহশান্তির পদ্ধতি ও মন্ত্র’

প্রভৃতি। পঞ্চমখানি উড়িয়া অক্ষরে ও উড়িয়া ভাষায় লেখা পঞ্চতন্ত্রের ও মহাভারতের কয়েকটি উপাখ্যান ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে কবিতা।

ঐতিহাসিক কালের প্রত্নতত্ত্ব, মূর্ত্তিতত্ত্ব, খোদিত লিপিতত্ত্ব ও প্রাচীনমুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার প্রচুর উপাদান না থাকিলেও, ভাষাতত্ত্ব—বিশেষতঃ নৃতত্ত্ব—সম্বন্ধে গবেষণার জ্ঞত ছোটনাগপুর একটি সুবিস্তৃত ও উর্ব্বর ক্ষেত্র। ছোটনাগপুরের উত্তরে মগধ বা বিহার, দক্ষিণ-পূর্বে উড়িয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরে এবং পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশ এবং পূর্বে বাংলা দেশ। এইরূপ সীমান্ত প্রদেশের ভাষা যেকোন সঙ্কর বা দোআঁসলা হইয়া থাকে এ প্রদেশের প্রচলিত সংস্কৃতজ তিনটি ভাষাই—বাংলা হিন্দী ও উড়িয়া—সেই সাক্ষ্য দোষে ছুট। এই দোষে সীমান্ত দেশের ভাষা কতদূর ছুট হইতে পারে তাহার একটি চরম দৃষ্টান্ত ‘করমালি’ বুলি, আর একটি ‘হেটগোলা’ বা খেটাই বাংলা।

রাঁচি জেলার পাঁচপরগণার এবং মানভূম জেলার কুর্দি জাতি যে বিকৃত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে তাহা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারির রিপোর্টে ও তৎপূর্বে বাংলা ভাষার একটি বুলি (কুরমালি বাংলা) বলিয়া পরিগণিত

হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারির রিপোর্টে এই ‘কুরমালি’ বুলিকে হিন্দী ভাষার মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। বাহা হউক, এই রিপোর্টের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই বুলিকে স্থানীয় লোকে ‘খোটা বাংলা’ বলে এবং ইহা বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়।

“This patois is known as *Khotta Bengali* and is written in the Bengali character. Locally it is regarded as a corrupt form of Bengali.”

স্তর লক্ষ্য গ্রীয়ার্সনও এই কুরমালি ঠার বা বুলিকে Eastern Magahi dialect বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাব যে নমুনা দিয়াছেন তাহা হইতে বাঙালী পাঠক ইহাকে বাংলা ভাষারই অপভ্রংশ বলিয়া চিনিবেন। মানভূম জেলার কুরমালি ঠারের নমুনা এইরূপ :—

“এক লোকের দুটা বেটা ছালায়া রেহেক। তারাদের মইষে ছুটু বেটাটার অকর বাপকে কেহলাক যে বাপ-হে হামরাকর দৌলতকর যে ময় হিসা পায়ম সে মকে সে। তখন তাকর বাপ আপন দৌলত বাটিকে অকর হিসা দেই দেলাক। ষড়েক দিন বাসে ছুটু বেটা ছাওয়াটা আপন ধন দরিব লেইকে বিদেশ গেজ।” (*Linguistic Survey of India*, Vol. v, part II. p. 152.)

রাঁচি জেলার পাঁচপরগণায় কুরমালি ঠারের বা পাঁচ-পরগণিয়া বুলির নমুনা এইরূপ :—

“কোনো এক আদমিকের দুইটা ছুয়া রোহে। তেকর মাঁহনে ছোট ছুয়াটা আপন বাপকে কোহলাক ‘বাপ, মোএ’ ধনকের যে হিসা পায় সে মোকে দেউ।” (*Ibid*, p. 170)

আবার হাজরাবিবাগ জেলার গোলা, কাসনার ও রামগড় থানায় যে বাংলা বুলি প্রচলিত আছে তাহা বরাবর বাংলা বুলি বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু তাহাও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে বিকৃত মগাহি হিন্দী (“a corrupt form of Magahi Hindi”) বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধেও ঐ রিপোর্টে স্বীকার করিতে হইয়াছে

“This patois which is called *Het Gola* contains Bengali words and phrases and locally is considered to be Bengali.”

তবে তৎপূর্বে গ্রীয়ার্সনও ইহাকে “So-called Bengali of Hazaribagh” এই আখ্যা দিয়া মগাহি হিন্দীর মধ্যে স্থান দেন।

এই ভাষায় যে বাংলা ও মগাহি হিন্দীর মিশ্রণ হইয়াছে তাহা গ্রীয়ার্সন প্রদত্ত নিম্নলিখিত উদাহরণে বুঝা যাইবে—

“এক লোকের দু বেটা ছিল। তকরমে ছোট বেটা আপন বাপ সে কহলই, এ বাপ চিক্রকে যে বখরা হাম পায়ব সে হামরা দেই সে।..... তব সে ধায়কে সে দেশেব এক লোকের আশ্রয় লেলক।” (*Ibid*, p. 163.)

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারির রিপোর্টে ১৯১১ সনের রিপোর্ট অনুসরণ করিয়া ‘কুরমালি’ বাংলা ও খোটা বাংলাকে হিন্দী ভাষার মধ্যে পরিগণিত করা হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের বৌদ্ধিকতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ট্যালেন্টস (Mr. Talents) ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, “এই খোটা বুলি হিন্দী কি বাংলা বলা কঠিন; তবে যখন ১৯১১ সনের সেন্সাসে হিন্দীব মধ্যে ধরা হইয়াছে তখন মোটের উপর এবারেও তাই করাই ভাল।”^{*} ভাষার এইরূপ নাম-পরিবর্তনের ফলস্বরূপ এই সব স্থানের স্থলে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে হিন্দী পড়ান হইতেছে। আবার, সিংহভূম জেলার আদালতের ভাষা হিন্দী, কিন্তু দরখাস্ত ও দলিলাদি যদিও হিন্দী অক্ষরে লেখা হয় তাহার মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটি উড়িয়া অক্ষর এবং বাংলা কথা ও বাক্যসমষ্টি পাওয়া যায়।

মুণ্ডাভাষাগুলিতে বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কতক শব্দ মুণ্ডারা কোনও প্রাকৃত বা বাংলা বা হিন্দী ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, তাবার কতক শব্দ মুণ্ডাদের নিকট হইতে সংস্কৃতে বা বাংলাতে কিংবা যে প্রাকৃত হইতে বাংলা ভাষা হইয়াছে তাহাতে পুরাকালে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এ-সম্বন্ধে সম্যক গবেষণার প্রয়োজন।

এই সব সংস্কৃত ভাষা ছাড়া ছোটনাগপুরে আদিম জাতিদের অনেকগুলি ভাষা আছে। সেগুলি agglutinative, এবং সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ inflexional ভাষাগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর। এখানে প্রায় ২০টি বিভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে জঁরাও জাতির ভাষা দ্রাবিড়ী শ্রেণীর অন্তর্গত এবং মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, অনুর, সাজাল, বিরহোড়, খাড়িয়া, কোড়োয়া, তুরি প্রভৃতি জাতি মুণ্ডাশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন বুলি ব্যবহার করে। অবশিষ্ট জাতি-

* “It is impossible to say that Khotta is either Hindi or Bengali. As it was treated as Hindi in 1911 it was thought better on the whole to treat it as such again on the present occasion.”

গুলি—যথা, হুইয়া, চেবো, খারোয়ার, পহিড়া, নাগেসিয়া, বেদেয়া প্রভৃতি—আপন আপন পূর্বপুরুষদের মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষা বিস্তৃত হইয়া স্থানীয় গাওয়ারী হিন্দী বা বিকৃত বাংলা বুলি ব্যবহার করে। মানভূমের অসভ্য খাড়িয়াদের মুখে বাংলা ভাষা বিকৃত হইয়া কিরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত মানভূম জেলার খাড়িয়াদের বুলি হইতে দিতেছি।

“তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?” ইহার খাড়িয়া বাংলা—“তুই কুখী?”

“কি এনেছ?” ইহার খাড়িয়া বাংলা—“কিস্ আইনে?”

“বন্ধনা পূজা রবিবারে হইবে নাকি?” ইহার খাড়িয়া বাংলা—“বন্ধনা রব বারে হিথ না কই?”

“আমি দোকানে বসিয়া নাড়ু কিনিতেছিলাম; আমি কিছু জানি না; আমার দোষ নাই।” ইহার খাড়িয়া বাংলা এই:—“মুই দোকানে বসি নাড়ু কিনিৎগে না। মুই কিস্ জান্ন নাই। মহর লব নাই।”

সম্ভবতঃ এক সময়ে মুণ্ডাগোষ্ঠীর ভাষা ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্রই, অন্ততঃ উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ ভাগে প্রচলিত ছিল, এবং অত্যন্ত ভাবার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাংলা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অশিক্ষিত লোকে যে কুড়ি হিসাবে গণনা করে সম্ভবতঃ সেটা মুণ্ডাদের ভাষা হইতে লওয়া। এইরূপ আরও কত রকমে আৰ্য্য ও দ্রাবিড়ী ভাষাগুলি মুণ্ডা ভাষার নিকট ঋণী, সে-সম্বন্ধে এখনও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

এইবার নৃতত্ত্বের কথা। নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এক কথায় বলিতে গেলে—মাছুষ প্রথমে কি ছিল, এখন কি হইয়াছে, কেন ও কি রীতিতে এমন পরিবর্তন হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনের গতি মোটের উপর কোন্ দিকে চলিয়াছে?

আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ভিন্ন ভিন্ন শাদা, কালো, তামাটে ও পীত রঙের লম্বা, বেঁটে ও মাঝারী ধরণের বিভিন্ন জাতির মানুষ আছে, তাহাদের শারীরিক গঠনের যেরূপ পার্থক্য তেমনই জীবিকা ও পরিচ্ছদ, গৃহনিৰ্মাণ-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মমত ও পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতির সেইরূপ পার্থক্য বর্তমান। বিভিন্ন জাতির শারীরিক গঠনের পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা যে-কারণ নির্দেশ করেন, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে সেটা

অস্বীকার করিয়া লইতে পারি। সহজ বুদ্ধিতে আমরাও বুঝি যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আবহাওয়া ও খাদ্যাদির প্রভাবে এরূপ পার্থক্য উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে যে আমরা সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত দেখি, ইহাও কারণ নির্ণয় করিতে হইলে সব চেয়ে নিম্ন স্তরের জাতিদের লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর জাতির সভ্যতার সহিত তুলনা করা প্রয়োজন এবং তাহাদের মধ্যে প্রভেদের প্রকার ও পরিমাণ এবং তাহাদের প্রত্যেকের ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া প্রভেদের কারণ অন্বেষণ করিতে হয়। ছোটনাগপুরের পার্শ্বত্যা মালভূমিতে বিভিন্ন স্তরের, বিশেষতঃ নিম্নতর স্তর-গুলির, যেরূপ বহুসংখ্যক জাতি আছে, তাহা ভারতে খুব অল্প প্রদেশেই বর্তমান। এই জন্ত নৃতত্ত্বের গবেষণার ইহা একটি প্রধান ক্ষেত্র।

সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের জাতিদের এইরূপে তুলনা করিলে ও তাহাদের সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সভ্যতার জাতির সংস্পর্শ সভ্যতার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। তৃতীয়তঃ, অল্প জাতির সঙ্গে সংস্পর্শে সকল জাতি সমান ফললাভ করিতে পারে না। বহুমূল পূর্ব সংস্কারের প্রভাবে ও শিক্ষার অভাবে কোন কোন জাতি সম্যক ভাবে নূতন ভাব, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গ্রহণ করিতে অসমর্থ; আবার কোন কোন সৌভাগ্যবান জাতি অধিকতর উন্নত জাতির সংস্পর্শে ও সাহায্যে একেবারে হুই চারি ধাপ উপরে উঠিয়া যায়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সভ্য জাতিদের সঙ্গে অসভ্য জাতিদের প্রভেদ প্রকৃতিগত নয়—কেবল শিক্ষাগত মাত্র। যে-সব জাতিকে আমরা অসভ্য বলিয়া অবহেলা করি তাহারা সাধারণতঃ সভ্যতাভিমানী জাতিদের অপেক্ষা স্বাভাবিক বুদ্ধি বা অপরাপব মনোবৃত্তিতে নিকৃষ্ট নয়; কেবল প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বা উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে সেগুলির যথাযথ স্ফূরণ বা পরিমার্জন হইতে পারে নাই। এই জন্ত প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকাবেরা বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ শবর কোস ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা প্রকৃতিগত ক্ষত্রিয় জাতি; কেবল

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আচার্যের দর্শনভাষে বুঝলক্ষ বা পাতিত্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই ইহারাও প্রকৃতিব সহিত সাধ্যমত সংগ্রাম করিয়া যতটা সম্ভব নিজেদের ধাপ খাওয়াইয়া আবাসস্থান ও খাদ্যসমস্তা প্রভৃতির মোটামুটি একটা সমাধান করিয়া লইয়াছে। পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধান, আইনকানুন, নীতিধর্ম প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয়াছে, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, সাজশয্যা, অলঙ্কারাদি ও অত্যন্ত গৃহসামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয়াছে। বস্তুতঃ সভ্য জাতিদের অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্য-যন্ত্রাদি, অলঙ্কার ও সাজসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতির মধ্যে অনেকগুলিই আদিম নিবাসীদের উদ্ভাবিত জিনিষের উন্নত ও সংস্কৃত সংস্করণ মাত্র। যে ‘অসভ্য’ জাতিরা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা জীবিকা-অর্জনের ও শরীর-রক্ষার চেষ্টা ছাড়াও মনোবল অল্পবিস্তর উৎকর্ষ সাধন করিবার অবকাশ পাইয়াছে। সুতরাং অবসর-বিনোদনের ও জীবনের সৌকুমার্য্য সম্পাদনের জন্য নৃত্যগীত ও শিল্পকলার সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনের সমস্তা ও মৃত্যুর পরপারের প্রােহলিকা তাহাদের মনকেও আলোড়িত করিয়াছে, ভূতপুঞ্জার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের ও ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছে। এই চেষ্টাতেই মুণ্ডাদের মধ্যে ‘বীরসা’ ধর্ম্মের, গুঁরাওদের মধ্যে ‘চানা ভকত’ ধর্ম্মের, সাঁওতালদের মধ্যে ‘সাকাহোড়’ ধর্ম্মের এবং সম্প্রতি ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় ‘হরিবাবা’ ও ‘হরিরাজ’ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, কিন্তু শিক্ষার ও পরিচালনার অভাবে অবাস্তর পথে চলিয়া গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ে সভ্য জাতিদের সঙ্গে অসভ্য আদিম অধিবাসীদের প্রভেদ কেবল উৎকর্ষের পবিমাণে, প্রকারে নয়।

প্রমাণস্বরূপ ছোটনাগপুরের অসভ্য মুণ্ডাদের গীতি-সাহিত্যের সামান্য পরিচয় দিব। মুণ্ডাজাতি নিরক্ষর। তাহারা গদ্য পদ্য কিছুই লেখে না। তাহাদের মধ্যে কতিপয় ভাবুক ব্যক্তি কখনও কখনও মনের আবেগে মুখে-মুখে গান বাঁধে ও গায় এবং তাহাদের ভাবার দৈন্ত, সুর-তালের অসম্পূর্ণতা ও অলঙ্কারের অভাব তাহারা পূরণ করে গভীর ভাবের আবেগে তালে তালে নৃত্য

করিয়া। জনসাধারণ সেই গীতগুলিতে আপন আপন মনোভাবের প্রকাশ দেখিয়া পুলকিত হয় ও সাগ্রহে গীতগুলি আরম্ভ করে।

স্বভাবের সৌন্দর্য্য, যুবক-যুবতীর প্রেম, মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ; পার্থিব সুখের, সৌন্দর্য্যের ও মানবজীবনের নশ্বরতা প্রভৃতি বাহা চিরকাল সর্বদেশে কবি-হৃদয়কে ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে তাহা অসভ্য মুণ্ডা-কবিদের হৃদয়কেও উদ্বেলিত করে। সভ্য জাতিরা কবির উচ্ছ্বাসের কবিতায় যে উচ্ছ্বাস মুখরিত হয়, সেই সব সুখ-দুঃখ, প্রেম ও মৃত্যু, আশা ও ভয় নিরক্ষর মুণ্ডার হৃদয়কেও আলোড়িত করে এবং সেই ভাবের উচ্ছ্বাস তাহারাও গানের দ্বারা ধ্বনিত করে। কিন্তু তাহাদের ভাষা ভাবের গভীরতার তলস্পর্শ করিতে না-পারিয়া হস্তপদের বিভিন্ন ভঙ্গী বা নৃত্যের সাহায্য লইয়া থাকে। মুণ্ডাকবি ভাবের গভীরতা প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় একই ভাব নানা ছন্দে পুনরাবৃত্তি করে, একই শব্দ বার-বার আবৃত্তি কবে, আর প্রতিশব্দের উপর প্রতিশব্দ চাপায়। আব শ্রুতিমধুর করিবার জন্য গানে শব্দের প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ বা ‘হ’ থাকিলে তাহার আগে ‘ন’ জুড়িয়া দেয়, যেমন ‘হাতু’র স্থানে ‘নাতু’, ‘হুণ্ডি’র স্থলে ‘নুণ্ডি’, ‘ওড়া’র পরবর্ত্তে ‘নোড়া’ ও আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করে।

প্রথমে একটি প্রেমগীতি বলিতেছি। একটি মুণ্ডা যুবক তাহার প্রীণিত যুবতীকে বলিতেছে—

কুচা মুচা কুনুকু কুচা কোটাং তাদিকী কুনুকু,
কুচা কোটাং তাদিকী নাইরি।
নাড়ি নাড়িন গলাগুম নাড়িন। কোটাং তাদিকী গলাগুনাড়িন,
কোটাং তাদিকী নাইরি।
জিউরে হুকুয়ানয়ে দো দোলাং সেনোয়া
কুনুকু দো দোলাং সেনোয়া নাইরি।
কুড়ামবারে রেড়াখানরে, মার দেলাং বিরিলা, গলাগু,
মারে দেলাং বিরিলা নাইরি ॥

তনুবাদ

কুনুকু লতা যেমন বৃক্ষকে জড়িয়ে রাখে,
তুমিও তেমনি তোমার [প্রেম] ডোরের আমাকে বেঁধে ধরেবে;
গলাগুলতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আঁকড়ে রাখে
তুমিও তেমনি আমার হৃদয়কে জড়িয়ে বেঁধেবে ॥
যখন হৃদয় [এমন] আনন্দে উঠবে উঠবে, হে আমার কুনুকুলতিকে,
চল আমরা একত্র জীবনপথে পাড়ি দিই।

প্রাণ বধন প্রেমাম্পদে ভ'রে গেছে চল, গলাগুলতিকে,
চল আমরা একত্রে জীবনপথের পশ্চিম হই।

তার পর যুবতী তার প্রেমাম্পদের অস্ত্র ফুলের মালা
লইয়া সারা দিন মাঠে মাঠে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, মালার ফুল
শুকাইয়া বাইতেছে, তবু প্রেমাম্পদের সাক্ষাৎ মিলিতেছে না;
তখন এইরূপে বিলাপ করিতেছে—

মোদে শিড়ি লেলেমুয়ে গাতি কাম্ লেলো লেলোরা গাতিং,
বারে শিড়ি লেলেমুয়ে গাতিং কাম্ চিনাও চিনাও।
হুন্দিবাইং শুভুলোরা গাতিং কাম্ লেলো লেলোরা গাতিং,
বাগড়ি বা-ইং পালাললোরা সাক্ষাইং কাম্ চিনাও চিনাও।
হুন্দি বা-ইং শুভুলোরা গাতিং চারিগে গোসোয়ানা,
বাগড়ি বা-ইং পালাং লোরা সাক্ষাইং হুতাম্ রেগে সরলাশানা।

অনুবাদ

হে সখা, তোমার সন্ধানে প্রথম এক ক্ষেতে গেলাম, কিন্তু পেলাম না
তোমার দেখা পেলাম না,
দ্বিতীয় ক্ষেতে গেলাম, সখা, তবু তোমার সন্ধান মিললো না সখা,
মিললো না।
আমি (তোমারই অস্ত্র) হুন্দি ফুলের মালা গাঁবেছিলাম, তোমার
দেখা পেলাম না, সখা, পেলাম না।
বাগড়ি ফুলের মালা গাঁবেছিলাম, সখা, কিন্তু তোমার সাক্ষাৎ
মিললো না, সখা, মিললো না।
(খড়িকার উপর) হুন্দি ফুলের মালা গাঁবেছিলাম, সখা, (হার)
সে মালা খড়িকার উপরেই শুকিয়ে গেল।
বাগড়ি ফুলের মালা গাঁবেছিলাম, সখা, (হার) সে মালা হুতোর
উপরেই যান হ'রে গেল।

তার পর যৌবনের নখরতা সন্ধ্যাে অনেক গীত আছে।
একটি গীত এইরূপ :—

[গেনা]

সিরিঞ্জাটি নোড়ারে মা গাতিম্, পাটাংগোড়া রোসোম রে।
বালেকাম্ হুড়ুললেনা, গাতিম্; ডালিলেকাম্ পায়ারলেন।
বালেকাম্ হুড়ুললেনা, গাতিম্, বালেকাম্ গোসোয়ান্
ডালিলেকাম্ পায়ারলেনা, সাক্ষাইং ডালিলেকাম্ মইলারান।
ওতে লোলোতেচি, গাতিম্, সিরিমা জেটেতে?
বালেকাম্ গোসোয়ানা গাতিম্, ডালিলেকাম্ ময়লারান্।
ওতে লোলোতেও কা'গে; সিরিমা-জেটেতেও কা'গে;
সোমার সেনোতানা, গাতিম্, নোসাডু বিরিয়তান্।

অনুবাদ

ছিটে বেড়ার বর থেকে, সখি, ছিটে বেড়ার বর থেকে;
তুমি ফুলের মত দীপ্তিতে বেরিয়ে আসতে, সখি,
বেকুতে মধুর-হুটির মত শোভাতে।

তখন [প্রকৃতি] ফুলের মত শোভার বেকুতে, সখি,
এখন (স্বয়ং) ফুলের মত গেছ শুকিয়ে।
তখন তুমি মধুর-হুটির মত দীপ্তিতে শোভা পেতে, সখি,

এখন শুকনো মধুর-হুটির মত গেছো মলিন হ'রে।
তোমার ছিটে বেড়ার বর কি এত উজ্জ্বল হয়েছে, সখি,

যে তোমার সে সৌন্দর্য্য আজ শুকনো ফুলের মত শুকিয়ে কেলেছে?
শুকনো মধুর-হুটির মত মলিন হ'রে কেলেছে?

(উত্তর)

মাটির উত্তাপেও এমন হয় নি, সখা, সূর্যের উত্তাপেও এমন হয় নি,
সময় চ'লে গেছে, সখা, তাই এমন হয়েছে,
যৌবন ফুরিয়ে গেছে,—তাই এমন হয়েছে।

মিলন বিরহ এবং জীবন ও যৌবনের নখরতা ছাড়া,
মুণ্ডদের সঙ্গীতের প্রধান বিষয়,—রাধাকৃষ্ণপ্রেম, বিবাহ,
মুগ্ধা, যুদ্ধ, বর্ধায় চাষীর আনন্দ, বাদ্যের মধুর স্বরে
মুণ্ড-জন্মের আনন্দ, ধাত্তলক্ষ্মীর সম্বন্ধনা, প্রথর রৌদ্রে
কিংবা অনাবৃষ্টিতে কৃষকের আশঙ্কা, অত্যাচারীর উপর
স্বণা বা রোষ। একটি গানে মুণ্ডকবি ধানকে 'লক্ষ্মীরাজা'
বলিয়া আহ্বান করিয়াছে ও নদী-তীরের ঠাণ্ডা হাওয়ায়
শীতে 'লক্ষ্মীরাজা' কাঁপিতেছেন মনে করিয়া সমবেদনা
প্রকাশ করিতেছে। অনেক গানেই ফুলের সৌন্দর্য্যে কবি-
জন্মের আনন্দ নানা রূপে বর্ণনা করিয়াছে। কোন ফুলকে
উদীয়মান প্রভাতসূর্যের সঙ্গে, কোন ফুলকে উদীয়মান
চন্দ্রের সঙ্গে, এইরূপ নানা ভাবে ফুলের শোভা ও হৃগন্ধের
বর্ণনা আছে। ফুলের ভিতর মুণ্ডকবি ফুলের প্রাণ
অনুভব করে ও তাহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করে।
শিকারীদের বস্ত্রের আঘাতে হস্তি ফুল ও শিয়াদী ফুল
ভাঙিয়া গিয়াছে আর বাজুর ও বকাই ফুলের পাতা ছিঁড়িয়া
গিয়াছে কিংবা অস্ত্র কোন ফুল বা পাতার ছন্দা ঘটিয়াছে,
এই অস্ত্র সেই ছিন্ন ফুল ও পাতার সঙ্গে সমবেদনাজ্ঞাপক
অনেকগুলি গান আছে। সেগুলি শুনিলে স্বর্গলোকের
কৃষক-কবি বর্ধসু-এর কবিতা মনে পড়ে। মুণ্ডগীতির আর
একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—ছোট ছোট পাখীদের হৃৎ-হৃৎ
কবির সহানুভূতি। মুণ্ডগীতি-রচয়িতা যেমন আপন
ছোট ছেলে-মেয়ের হৃৎ-হৃৎ সহানুভূতি ও সমবেদনা
গানে প্রকাশ করেন, ঠিক সেইরূপে পাখীদের হৃৎ-হৃৎ,
হৃৎ-হৃৎ, আশঙ্কার আশঙ্কা, গানে প্রকাশ করেন।

অসত্য আদিম অধিবাসীদের ক্ষরেও যে সর্বভূতের
সঙ্গে নিজের প্রাণের যোগ এবং ভগবানের যোগের উপলব্ধি
হইতে পারে, ইহার প্রমাণ-স্বরূপ ওঁরাও ভক্তদের
একটি গীতের নমুনা দিতেছি। গীতটির প্রারম্ভ
এইরূপ :—

মহুখার গাহি জিয়া, বাবা, মহুখার গাহি,
ভৈস গাহি জিয়া, বাবা, ভৈস গাহি।
মহুখার গাহি জিয়াকা, মহুখার গাহি জিয়া,
গাই গাহি জিয়া বাবা, গাই গাহি জিয়া
মহুখার গাহি জিয়াকা, মহুখার গাহি জিয়া ; ইত্যাদি

অনুবাদ

মহিষের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন। মহিষ-
শাবকের জীবন আর মানুষের জীবন একই জীবন। এইরূপ গক
বাছুর—ইত্যাদি।

সকল জীবজন্তুবই জীবন মনুষ্য-জীবনের অনুরূপ এই মর্মে
ওঁরাও ভক্ত প্রত্যেক প্রাণীর সম্বন্ধে গীত গায়।

তার পর ওঁরাও ভক্তের গানের চরম এই :—

বাবা বাবা বাদর হারো ভৈসো, বাবাস নামহাই
জিয়ামুন্ রাদস হারো, ভৈসো,
বাবাস নামহাই কারামুন্ রাদস
‘বাবা বাবা’ বাদর হারো, নর্গে বাবাস জিয়ামুন্ রাদস

অনুবাদ

হে ভাই, তুমি মুখে ভগ্নবাক্যে ‘বাবা’ ‘বাবা’ বলিয়া
ডেকে থাকো ; কিন্তু সেই বাবা তোমার প্রাণের ভিতরেই আছেন,
বাবা তোমার শরীরের ভিতরেই আছেন।

রাশিয়ার আইন-আদালত

ত্রিনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মস্কোর একটি আদালতে ঢুকলাম। প্রথমেই বিস্মিত
হ’লাম এর অনাড়ম্বরতা দেখে। পোষাক-পরা আদালতীর
দল হৈ হৈ করে লোক থামাচ্ছে না, জমী দলের পেছন
পেছন বকশিসের দাবি নিয়ে বিরক্ত করছে না ;
সামলাকারী লোকজনও খুব বেশী নেই। আমি ও আমার
তরুণী গাইডটি গিয়ে একটি বিচারগৃহে বসলাম। একটি
কাঠের নীচু তক্তার ওপর একটি টেবিল ও তিনটি চেয়ার ;
জুজুন পুরুষ-বিচারক ও এক জন নারী। মহিলা বিচারকটির
মাথায় একটি বড় রুমাল বাঁধা ছিল ; পুরুষ-বিচারকদেব
মাথাব চুলগুলি ছোট ছোট করে ছাঁটা, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ-
অণ্ডল, শিরা ও পেশীবহুল হাতগুলি, দেখেই মনে হয় বিলাসে
এই সব বিচারকের দল লালিত নয়, জীবনে কঠোর সংগ্রাম
করেছে এরা, সে সংগ্রামের সমস্ত চিহ্ন আজও সুস্পষ্ট
ওঁদের সর্গশরীরে। বিচারকদের টেবিলের সামনে একটি
কাঠের লম্বা দণ্ড আড়াআড়ি ভাবে রক্ষিত, তার এ-পাশে
বিচারার্থী ও প্রোতাদের জন্ত বেঞ্চ। আমরা এই বেঞ্চে
বসলাম। আমরা যখন বিচারগৃহে ঢুকলাম তখন একটি
স্ত্রীলোক কাঠের দণ্ডটির ওপর চেস দিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে
ফুঁপিয়ে কি সব বলছিল, আবার পরক্ষণেই চোঁটেরে কেঁদে

উঠছিল। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, “ব্যাপারটা কি ?”
সে কিছুক্ষণ শুনে বললে, “মেয়েটি তার ছেলের খোরপোষের
জন্ত এক জনের ওপর নালিশ করেছে, কিন্তু সেই লোকটি
বোধ হয় ছেলের পিতৃস্ব অস্বীকার করেছে।”

বড় কোতুক বোধ হ’ল ; রাশিয়ার নবপ্রবর্তিত সমাজ-
ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত এই সব নতুন রকমের মোকদ্দমা। এখন
রাশিয়ার নরনারীকে একত্রে থাকতে হলেই লৌকিক
বিবাহের প্রয়োজন হয় না, বিবাহ না-করেও একত্রে
থাকলে সমাজ বা বাইরে তাতে বাধা দেয় না, এর ফলে
ব্যভিচার বাড়বে বলেই আশঙ্কায় ধারণা। এই বকম
মোকদ্দমার কি বিচার হয় জানতে বড় কোতুক হ’ল।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে ডাকা হ’ল—সে স্পষ্টই
বললে সে ছাড়া আরও অনেকে ঐ নারীর সঙ্গে বাস
করেছে, কতকই সম্ভব যে তারই ওঁর সমাজে সে-বিস্ময়ে
নিশ্চয় কি ? অতঃপর যারা যারা বাস করেছিল বা আসা-
যাওয়া করত তাদের ও যারা তাদের আসা-যাওয়া দেখেছে
তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া হ’ল। এর পর এই মোকদ্দমার
কোনও রায় না দিয়েই আর একটি মোকদ্দমা ধরলে। এরও
বাদী একটি স্ত্রীলোক ; এর নালিশের বিবরণ এই যে,

কিছু দিন পূর্বে ত্রীলোকটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে স্বামীর বেতনের এক-তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের জন্য ডিক্রী পেয়েছিল। এখন সেই স্বামীর বেতন অনেক বেড়েছে কিন্তু সে পূর্ব বেতনেরই এক-তৃতীয়াংশ এখনও দেয়, তার দাবি বর্তমান বেতনের এক-তৃতীয়াংশ তাকে দেওয়া হোক। এই মোকদ্দমটির দুই পক্ষের সুনানী হ'তে প্রায় পনের মিনিট লাগলো। এর পর বিচারকেরা পাশের ঘরে পরামর্শের জন্য উঠে গেলেন। যাবার সময় এক জন বিচারক আমার গাইডকে ডেকে আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবার জন্তে বললে।

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট; একধারে একটি টেবিল, তাতে কতকগুলো বই ও খাতাপত্র ছড়ান, তার পাশে একটি চেয়ারে এক জন নারী সেক্রেটারী, আর খান-দুই চেয়ার ও একটি টুল ঘরটিতে ছিল। ঘরে কোন ছবি, ফুল বা সাজাবার আসবাব একটিও ছিল না। প্রথমে আমি কোথাকার লোক, কি জন্ত রাশিয়ায় এসেছি, বিচার কেনন দেখলাম ইত্যাদি তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে আমি রাশিয়ার বিচার-বিভাগের গঠনপ্রণালী, আপীলের ব্যবস্থা, বিচারক-নিয়োগের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে একে একে প্রশ্ন করতে লাগলাম; তাঁরাও সানন্দে গাইড-মারফত তার জবাব দিতে লাগলেন।

রাশিয়ার সর্বনিম্ন আদালতের নাম পিপলস কোর্ট (People's Court), এর এলাকা ছোট হলেও ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। এই বিচারালয়ের বিচারের বিরুদ্ধে প্রভিজিয়াল বা রিজিয়াল আদালতে আপীল চলে। এইখানে রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিভাগগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা ভাল, নচেৎ এই আদালতগুলির এলাকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে কষ্ট হবে।

সমস্ত রাশিয়াটি (U. S. S. R.) সাতটি রিপাব্লিকে বিভক্ত। এই রিপাব্লিকগুলি প্রভিজ বা রিজিয়ন অর্থাৎ নানা প্রদেশে বিভক্ত; এই প্রদেশগুলি আবার জেলা ও গ্রামে বিভক্ত। কাজেই সাধারণ বিচারালয়ের আপীল প্রভিজিয়াল বিচারালয়ে হয়। তবে এই বিচারালয়গুলি শুধু আপীল-শোনা ছাড়াও প্রদেশের সমস্ত বিচারানুষ্ঠানের কার্যকলাপের ওপর নজর

রাখে এবং যে-সব দুর্ভাগ্য প্রাপ্তরা আইনগত সমস্তা নীচের আদালতগুলি ক'রে উঠতে পারে না, সেগুলি এই আদালতের বিচারকেবা তাঁদের সাধারণ সভায় মীমাংসা করেন। এই সঙ্গে একটা জিনিষ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাশিয়ায় আমাদের মত 'কেস-ল' (Case law) নাই অর্থাৎ কবে কোন বিচারক একটা মোকদ্দমার কি বিচার ক'রে গেছেন সেই নজীরে পরবর্তী বিচারকদের বিচার করতে হবে এ ব্যবস্থা সেখানে নাই। তারা বলে এতে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ব্যাহত হয়। এটা যে বাস্তবিকই একটা ভুল ও অনিষ্টকর প্রথা তা আমরাও আমাদের দেশে দেখতে পাই। একই রকম মোকদ্দমার বিচার কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গার হাইকোর্ট ভিন্নরূপে ক'রে থাকে; বে-বিচারক যেমন বোম্বেন তেমনি বিচার ক'রে থাকেন, কিন্তু যদি নিম্নআদালতগুলিকে অক্ষতাবে সেই সব নজীর মানতে হয় তা হ'লে সভ্যই বিবেকবুদ্ধি ব্যাহত হয়। ওদেশে আইন শেখাবার জন্তে 'ইনস্টিটিউট অব সোভিয়েট ল' আছে, সেখানে আইন ছাড়াও রাজনৈতিক অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শেখান হয়। বিচারক বিবেকবুদ্ধি নিয়ে বিচার করে আর আইন-মত তার, দণ্ড দেয়।

প্রভিজিয়াল বা প্রাদেশিক আদালতগুলির ওপরওয়াল রিপাব্লিকগুলির সুপ্রীম-কোর্ট। প্রত্যেক রিপাব্লিকের সুপ্রীম-কোর্ট স্বাধীন। সব রিপাব্লিকের সুপ্রীম-কোর্ট একমাত্র ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোভিয়েট রাশিয়ার (U. S. S. R.) সুপ্রীম-কোর্টের এবং সামরিক আদালতের অধীন। এই দুটি আদালত ছাড়া আরও একটি প্রতিষ্ঠান সমস্ত রাশিয়ার সর্বময়কর্তা। তাব নাম 'গেপেয়' বার ইংরেজী প্রতিশব্দ আমরা জানি G. P. U.। এটা দেশের রাজনৈতিক গোয়েন্দা-বিভাগ। কাজেই সব রিপাব্লিকের ওপরই এর অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং এর শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের (U. S. S. R.) অধীন। রিপাব্লিকগুলির সুপ্রীম-কোর্টে মোটামুটি তিনটি কাজ—(১) আপীল-শোনা, (২) বিচার-বিভাগ (original) ও (৩) কঠিন আইন-সমস্তাগুলির সমাধান করা। প্রভিজিয়াল বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে এখানে আপীল শোনা হয় এবং এই

বিচারালয়ের আদেশই চূড়ান্ত, যদি-না এখানকার প্রেসিডেন্ট অন্তমত হন। যদি প্রেসিডেন্ট ভিন্ন মত পোষণ করেন তা হ'লে সে বিষয়টি 'প্লেনাম' বা আদালতের সাধারণ সভায় উপস্থিত ক'রে মীমাংসা করা হয়। তবে সাধারণতঃ বাদী বা প্রতিবাদী পক্ষ এই আদালতে আপীল করতে পারে না। যদি এই আদালত ইচ্ছা ক'রে কোন মোকদ্দমা পুনর্বিচার করতে চায় বা রিপাব্লিকের প্রোকিউরেটর কোনটি এখানে পাঠাতে চান তা হ'লে নিম্ন-আদালতের রায় উল্টে দেবার ক্ষমতা এই আদালতের আছে। এর বিচার-বিভাগে কেবল দেশের অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোকদের (যথা, প্রোকিউরেটর, সুপ্রীম-কোর্টের বিচারক ইত্যাদি) বিচার হয়। রিপাব্লিকের সব আইন-কানুন বা বিচার-পদ্ধতির (procedure) সমস্ত এই আদালত সমাধান ক'রে দেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের (U. S. S. R.) সুপ্রীম-কোর্টেরও উল্লিখিত সমস্ত ক্ষমতা আছে। এই আদালত সাতটি রিপাব্লিকের সুপ্রীম-কোর্টের বিচার পুনরায় তদন্ত করতে পারে ও অল্প রায় দিতে পারে। রিপাব্লিকগুলির মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হ'লে এই আদালত তার বিচার ক'রে এবং এর বিচারকেই চূড়ান্ত ব'লে শিরোধার্য ক'রতে হয়। খুব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিচার এই আদালত করে। এর 'প্লেনাম' বা সভার রিপাব্লিকগুলির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সিদ্ধান্ত বা বিচারের কিছু কিছু ওলট-পালট ক'রে দেবার ক্ষমতা আছে। এই সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিগুলিই রিপাব্লিকগুলির কর্তৃপক্ষ। এই সব বিচারালয় ছাড়াও রেড আর্মি বা সৈন্যদলের বিচারার্থ মিলিটারী কোর্ট আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “বিচারকদের মাইনে কত? তাদের শিক্ষা-দীক্ষাই বা কতদূর? ওদের মাইনে নিশ্চয়ই বেশী?”

গাইড উত্তর দিল, “ফ্যাক্টরীতে কুশলী কর্মীরা (skilled labourer) যে বেতন পায় বিচারকবাও তাই পেয়ে থাকে। ও এক সময় শ্রমিকই ছিল, পরে ওর বিচার-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা দেখে ওকে বিচারক করা হয়েছে।” পরে মহিলা-বিচারক ও অল্প বিচারককে

দেখিয়ে গাইড বলতে লাগল “ওরা এখনও কারখানাতেই কাজ করে। বছরে ছ-দিন বাড়ি ওদের বিচার করতে দেওয়া হয়েছে—এর পর ওরা আবার কারখানায় ফিরে যাবে। যদি ওরা বিচারে নৈপুণ্য ও বুদ্ধি দেখাতে পারে হয়ত একদিন ওরাও এমনি পাশাপাশি বিচারক হবে।”

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “এই সব আনাড়ী লোক দিয়ে বিচার হয়? ওরা নিশ্চয়ই আইন পড়ে।”

গাইড হেসে উত্তর দিলে, “না, কিন্তু ওদের বিবেক-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান আছে, তা ছাড়া মাঝে মাঝে কারখানায় আইন-বিষয়ে ওদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানেও ঐ বিচারক ওদের আইনের ধারা বুঝিয়ে দেন।” জিজ্ঞাসা করলাম, “তা হ'লে যদি স্থায়ী বিচারক ও এই দুই জন ছ-দিনের বিচারকের মধ্যে মতবৈধ ঘটে তা হ'লে কার মত বাহাল থাকবে? ঐ আনাড়ীদের, না শিক্ষিত বিচারকের?”

“যদি ওরা দু-জনেই একমত হয় তবে শিক্ষিত বিচারকের মত বাতিল হবে, কারণ মতাদ্বিক্য এদিকেই বেশী।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, মহিলা-বিচারকদের কি পুরুষদের মতই বিচক্ষণ মনে কর; ওদের বিচার-বুদ্ধি কি সমান তীক্ষ্ণ?” আমার মহিলা গাইড এ-প্রশ্নে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি সম্মিত মুখে বললেন, “কেন তারা সমান হবে না? তারা কি পুরুষদের চেয়ে বোকা? মেয়েরা যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের চেয়ে চালাক হয় এ-কথা স্বীকার কর না?” তাব হাসির মধ্যেও অন্তরের উয়ার আঁচ পেলাম। বললাম, “তারা বুদ্ধিমান হ'তে পারে কিন্তু তারা ভাবপ্রবণ, যেটা বিচারের সময় নিরপেক্ষতার একটা প্রধান অন্তরায়।” হেসে গাইড উত্তর দিলে, “ওটা সেকেন্দ্রে যুক্তি। একই শিক্ষা ও আবহাওয়ায় মানুষ হ'লে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে ভাবপ্রবণ হবে কেন? আর যদিই বা হয় তাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? বিচারার্থীদের সব বিষয় দরদ দিয়ে দেখতে পারলে তবেই ভালবিচার হয়।”

বললাম, “আচ্ছা, ও তর্ক পূর্ণ হবে। এখন বিচারকদের

সময় নষ্ট করা হবে না। আচ্ছা, এই বিচারকদের কে নিযুক্ত করে এবং কত দিনের জন্যে কার্য্যমী বিচারকেরা নিযুক্ত হয়?”

“এই আদালতের বিচারক প্রভিশিয়াল এক্সিকিউটিভ কমিটি নিযুক্ত করে সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য, কিন্তু এরাই আবার পুনর্নির্বাচিত হয়।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, তোমাদের আদালতে কি উকীল স্যাডভোকেট নাই? তাদের বড় বড় পকেট নিয়ে ত কাউকে ঘুরতে দেখলাম না।”

গাইড উত্তর দিলে, “আমাদের এখানে উকিল আছে, তবে উকিল দিতেই হবে এমন কোন আইন নাই। বিচারার্থীরাই নিজেরা সমস্ত খাতাপত্র দেখতে পায়, দাবকার হ'লে নকল করতে পাবে, বিচারের সময় বা-খুশী বলতে পায়, কাজেই উকিল দিয়ে পরসা নষ্ট করবে কেন? বিস্মিত হয়ে বললাম, “পরসা নষ্ট কেন? উকিলেরা কি পরসা নেয়?”

“নিশ্চয়ই, এখনও ত আমরা কম্যুনিষ্ট নই, আমরা যে সোশ্যালিষ্ট, কাজেই সবকিছুই বিনিময়েই ত অর্থ এখনও চলছে। শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে অর্থ নেয়, শ্রমের তারতম্য অনুসারে পারিশ্রমিকের তারতম্য আছে। স্টেট এখন তার বাড়ির বদলে ভাড়া নেয়, খাবারের মূল্য নেয়, বানের ভাড়া নেয়, কাজেই পরসা না-নেবার কথা উঠছে কোথায়। যখন আমরা কম্যুনিষ্ট হব তখনই কেবল পরসার বিনিময় উঠে যাবে, তখন প্রত্যেকে দেবে তার যথাসাধ্য শ্রম আর পাবে তার বা যা প্রয়োজন, মুক্তার মধ্যস্থতা তখন লোপ পাবে। এখন উকিল পরসা নেবে না কেন? শুধু পরসা নেওয়া নয়, প্রত্যেক উকিল তার যোগ্যতা হিসেবে মজলদের কাছ থেকে ফি আদায় করে। তবে এই ফি সবার কাছ থেকেই সব উকিল সমান পায় না। অত্যন্ত সব জিনিষের মতই যার বেশন বেশন অর্থাৎ আর তাকে সেই হারে উকিল ফি-ও দিতে হয়; তবে উকিলরা এই ফি সোজা-সুজি পায় না। এই সব ফি “কন্সলিয়াম” বা উকিল সমিতিতে জমা হয়, পরে প্রত্যেক উকিলকে তার যোগ্যতা অনুসারে মাসে মাসে ঐ টাকা ভাগ ক'রে দেওয়া হয়।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “তাহ'লে যারা অতি দরিদ্র, তাদের রোজগার থেকে কেবল খাওয়া-পরা চলতে পারে মাত্র, তারা উকিল দিতে পারে না তোমাদের দেশে?”

গাইড বেশ জোর দিয়ে বললে, “নিশ্চয়ই পারে। কনসালটেশন ব্যুরোতে তাকে খালি দরখাস্ত করতে হয়; যদি ঐ প্রতিষ্ঠান বোঝে যে, সে সত্যি ফি দিতে অপারগ তখন তাকে বিনিপরসায় ঐ সমিতি থেকে সাহায্য করা হয়।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, তোমাদের কোর্ট-ফির হাব কি রকম?”

“কোর্ট-ফি-ই আমাদের লাগে না। বিচারের জন্য রাষ্ট্র আদালত রেখেছে, তার সমস্ত খরচ রাষ্ট্র বইবে; তার ওপর আবার কোর্ট-ফি চাপিয়ে দরিদ্র লোককে সুবিচার থেকে বঞ্চিত ক'রে লাভ কি? কোর্ট-ফি সৃষ্টি করা মানেই দরিদ্রদের আদালতের বাইরে রাখা বা তাদের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপান; জা'রের রাজ্যে এটা আমবা মর্শে মর্শে বুঝেছি, কাজেই কোর্ট-ফি ব'লে কোন জিনিষ এখন নাই।”

বললাম, “কিন্তু এর ফলে অযথা মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক বাড়বে।”

“যদি কারও কোন অভিযোগ থাকে সে আদালতে এসে বলুক না; সত্যমিথ্যা আদালত দেখবে। কতকগুলো হালকা মামলা এসে কোর্টের কাজ বাড়াবে ব'লে দরিদ্রকে ভ্রাসবিচার থেকে বঞ্চিত করলে সে আবার ধনীর হাতে পিষ্ট হবে।”

হেসে বললাম, “তোমাদের দেশে ত ধনী আর নেই; কি বল?” অপেক্ষাকৃত ধনী ও নির্ধন শ্রেণী যে এখনও রাশিয়ার আছে এ-বিষয়ে পূর্বে তার সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে আমার যুক্তি মানতে হয়েছিল, তাই সে একটু লজ্জিত হয়ে বললে, “বলেছি ত, এখনও আমরা সোশ্যালিষ্ট।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত একই ব'লে মনে হয়; তাই কি?”

—হ্যাঁ।

অতঃপর বিচারকদের আমার সব প্রশ্নের উত্তর

দেওয়ার ও আমার জন্ত তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্ত ধন্যবাদ দিয়ে করমর্দন ক'রে উঠে বাইরে এলাম।

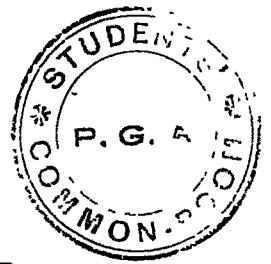
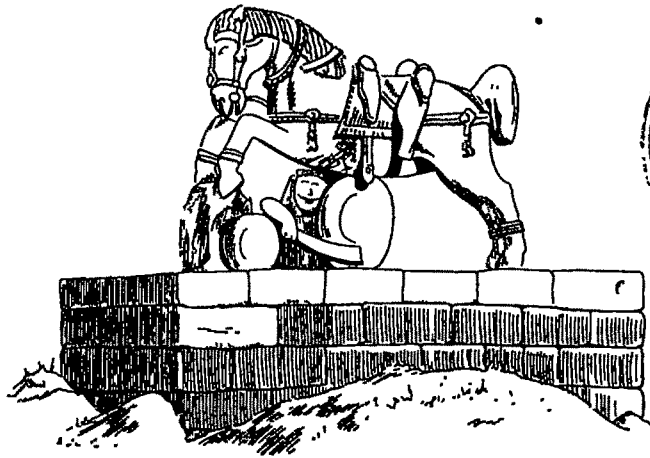
অল্পক্ষণের মধ্যেই বিচারকরা বাইরে এলেন। প্রথম মামলার রায় হ'ল, যে-যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সহবাস করেছিল সকলকেই ছেলোটর ভরণপোষণের দায়ী হ'তে হবে।

এই রকম বিচারের ফলেই রাশিয়ার বিবাহ-বন্ধন শিথিল হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার বাড়িতে পারে নাই, একদিন ব্যভিচারের ফলে হয়ত বেতনের এক-তৃতীয়াংশ নিয়মিত কেটে দিতে হবে—এই আর্থিক শাসনের ফলে ব্যভিচার বাড়তে পারে না। দ্বিতীয় মামলার বাদিনী তার স্বামীর বর্তমান বেতনের এক-তৃতীয়াংশই ডিক্রী পেল।

রাশিয়ার আদালতের বিচারে, বাদী-প্রতিবাদীর নিজেদের কথা বলবার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে, সব-কিছুর মধ্যে অর্থলিপ্সু দালাল ও শোভী কর্মচারীদের বিবাক্ত আবহাওয়ার অভাব এবং সর্বোপরি বিচারকমণ্ডলী আমার মুগ্ধ করেছিল। এখানে বিচার করে তারা যারা বিচারপ্রার্থীদের অন্তরের ও বাইরের সব কথা, আচার-ব্যবহার, মনস্তত্ত্ব সবই জানে। অত্যন্ত দেশে সাধারণতঃ ধনী সম্প্রদায় থেকে

বিচারকদল নির্বাচিত হয়, ফলে তারা অধিকাংশই সাধারণ লোকের হৃৎকুণ্ডলের সঙ্গে প্রাণের যোগের অভাবে অনেক সময় অজ্ঞত, সাধারণ লোকের ওপর অবগতি কঠোর ব্যবহার ক'রে বসে। অত্যন্ত দেশে বিচারার্থীর দল বিচারকদিগকে একটা ভয়ের চোখে দেখে, ফলে তাদের সব কথা সরলভাবে বলতে ভয় পায়। বিচারকও নিজের আসন থেকে নেমে সাধারণের সঙ্গে মিলতে বিধা বোধ করেন—তাতে সম্মান-হানির আশঙ্কা আছে। রাশিয়ার যদি কোন বিচারকের মনে এই ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাস্ত্র উকি মারে, তা ধরা পড়বা-মাত্র তাকে বিচারকের আসন থেকে নামিয়ে শ্রমিকের দলে ঠেলে দেওয়া হয়। যত ক্ষণ বিচারের আসনে সে আসীন তত ক্ষণ তার সম্মান, কিন্তু সেই সম্মানবোধ বিচারককে বিচারের পর সাধারণের সঙ্গে মিশতে বাধা দেয় না। এই জন্তই বিচার করা এক বৎসরের জন্ত মনোনীত হয়।

রাশিয়ার বিচার-বিভাগের অনাড়ম্বরতা, দরিদ্রতম ব্যক্তির ছায়বিচার পাবার সুবিধা, ~~অর্থহীন~~ ঘুষখোর কর্মচারীদের অভাব এবং দিনকে রাত তৈরি করতে হুপটু উকিলমহলের স্বল্পতা পৃথিবীর যে-কোন সভ্য দেশেই বিচার-বিভাগের অনুকরণীয়।



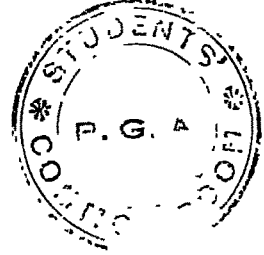
শ্রীমুশীলকুমার ঘোষ

এখনও লোকেরা ভুলে কবিতারে ধোঁজে—
চাঁদিনীর মধুরাতে, আধকোটা হানুনোহানায়,
সেতারের মধুর গুঞ্জে, আর প্রেমসীর শরীর-সীমায়,
নির্ব্বরের কলগীতে, মর্ষরিত বনবীথিকায়,
প্রভাতের সায়াক্ষের পাখীর কুঞ্জে—।
ভুল, ভুল—সেথা হ'তে আসন টলেছে তার—
নামিয়াছে প্রভাতের জীবন-সংগ্রামে,
অন্নকষ্টজর্জরিত আমাদের দরিদ্র এ দেশে ।
যেথায় সমষ্টি এই—ব্যষ্টির তুষ্টিতে সেথা
কবিতা থাকিতে পারে, বিলাস-ব্যসনে
গর্জিত হ্রস্বভিত বেশমী-আঁচলে ।
তাহারা শোনে নি—কি ছন্দ গাঁথিছে গানে
কোলাহলে মুখর বাজার,
গম্যমান ষ্টীমারের চাকার আওয়াজ ।
কলরবে যে সঙ্গীত উঠিতেছে রেলের ষ্টেশনে
পাথর-বাঁধানো পথে লোহা-বাঁধা চক্রের ঘর্ষরে
নিরন্তর যে ছন্দেব প্রতিধ্বনি বাজে, সেই সুরে—
এস নেমে কবিতা আমার ।
বিশ্বের আতপ হ'তে সারাদিন রহিয়া বঞ্চিত
কারখানা-ছাদতলে কোটি কোটি লোক,
মুহুর্তে মুহুর্তে বরে মৃত্যু-হিম কোল—
কান পেতে শোনো গান, মেশিনের লোহ-নিষ্কাশন ।
যেথা, লোহারে গলায়ে জলে প্রদীপ্ত 'কারনেস'
প্রকাণ্ড চিমনী-নীচে উড়িতেছে ছাই—
যে-ভালে ঝুকিছে মাথা নেহারে হাতুড়ি
কিছা গ্রাম্য কামারের ফাঁপর হাপরে

বাঞ্ছিয়া ওঠে না গান, নাহিক কবিতা ?
আকাশের রৌদ্রদগ্ধ চক্রাতপ-তলে
গীতিতে রাখিয়া মাথা মজুর ক্রিয়ায়—
পাশে গান গাহে তার, 'সীমের' 'রোলার' ।
ফেনায় ভরেছে মুখ—ঘোড়া ও সহিস,
সারাদিন যাত্রী খুজি পায় নি হৃদিস ;
শকটের একটানা ক্লান্ত রথ—কবিতা গাঁথে না ?
গল্প ও মোষের মত টানে গাড়ী রিক্শওয়াল
পীচ গলে পদতলে তার, তবু টানে—
ছপুর-স্কন্ধতা হরে হাতের নূপুর ।
[পশুক্ষেপ-নিবারণী রয়েছে সমিতি,
মাংস-পত্তর তরে নাই কেহ, রয়েছে শ্মশান ।]
কারাগারে নির্বাসিত নির্বাসিত নব.
শৃঙ্খলের বিশৃঙ্খলে হতেছে বানব—
তাদের পায়ের সেট ভারী শিকলের।
গাহিয়া ওঠে না গান, হবে তারা চলে
আপনার 'সেলে' ফিরে বানিটানা-শেষে ?
এঞ্জিনের চক্রতলে বাঞ্ছিতেছে অধুনা কবিতা ।
হাটুবে নোকার সেই তালে তালে বৈঠার বিক্ষেপ,
চারিতলে মজুরেরা ছাদ পেটে হবে—
হর নাই ভাল নাই সেও কি বেহুবা !
সে ছন্দে গুল্লরি ওঠ কবিতা আমার ।
জীবন-সংগ্রামে শোন আজের কবিতা ।
কবির লেখনী যদি, বেদনাব নাহি গাঁথে গান
বেদনারে আনন্দেতে রূপায়িত না করিতে পারে
বুধা সে কবিতা তবে বুধা সে লেখনী ।

বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র

শ্রীসনৎকুমার সিংহ



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাতৃভাষাকে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন। সুধীযুগ বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্ত চেষ্টাও করিতেছেন। বঙ্গভাষা এখন কিয়ৎ পরিমাণে সমৃদ্ধিশালিনী। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ, এবং এম-এ পরীক্ষার বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র ইংরেজী ভাষায় করা হয়। বহুদিন হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার কোনরূপ সঙ্গত কারণ নাই। যাহারা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা দিতে বাইতেছে, তাহাদের ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় কেন? বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্ন করিতে হইলে কি ইংরেজী ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা হয় না? ইহা কি লজ্জার কথা নহে যে, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ভারতবর্ষের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষারই বাংলা প্রশ্নপত্রে আগাগোড়াই ইংরেজী হরফ, কেবলমাত্র যে-অংশ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—যাহা ইংরেজীতে দেওয়া অসম্ভব—তাহাই গুগু বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়?

এমন বহু ছাত্র আছেন যাহারা ইংরেজীতে দেওয়া প্রশ্ন অপেক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া প্রশ্নকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সূচিক্রিত উত্তর প্রদান করিতে পারেন। ইংরেজী ভাষার পাঁচ-দেওয়া কঠিন শব্দে বাংলা ভাষার প্রশ্ন করিয়া এই সকল ছাত্রদের উপর কিরূপ অবিচার করা হয়, প্রশ্নকর্তারা বোধ হয় তাহা খেয়াল করেন না। অনেক সময়ে বি-এ, এম-এ পরীক্ষার বাংলা প্রশ্ন বেশ কঠিন হয়, এবং সেগুলি ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত থাকায় তাহাদের মাতৃভাষার অর্থ

করিয়া প্রাঞ্জল ও সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেই ছাত্রদের অনেকটা সময় অবশ্য নষ্ট হয়। ইহার স্রষ্টা কাহার দায়ী?

ইংরেজী ভাষার অনাদর বা অবহেলা করিতেছি না, কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্নপত্র বঙ্গভাষাতেই হওয়া শোভন ও সঙ্গত নহে কি? ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রকে পরীক্ষার সময়ে জ্ঞান্যান বা ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত প্রশ্নপত্র দিলে সে কি করে? অবশ্য কথা উঠিতে পারে যে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা। কিন্তু তাই বলিয়া যে বাংলা প্রশ্নপত্র ইংরেজী ভাষাতেই করিতে হইবে, ইহার কি যুক্তি আছে? একথা মানিতেই হইবে যে, যাহারা বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের প্রশ্নকর্তা তাহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্য ও ভাষাটিকে সম্যকরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াই তাহাদের প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। তবে কেন তাহারা প্রশ্নগুলি করিবার সময়ে ইংরেজী ভাষার কাছে ভিক্ষা করিতে যান? ইহা কি হস্তাকর ব্যাপার নহে যে, যে-ভাষার উত্তর লিখিতে হইবে সে-ভাষায় সেই উত্তরের প্রশ্ন কবা চলে না? একথাও নিশ্চিত যে, বঙ্গভাষার এতবড় দৈন্ত বটে নাই যাহাতে প্রশ্নপত্র করিবার সময় শব্দের বা ভাবের অনটন পড়ে। বাংলা প্রশ্নপত্র ব্যাপারে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষার উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। দিণ্ডিকিটের সভ্যবৃন্দ এবং বঙ্গভাষার সন্ততম সেবক আওতাধার স্ববোধ্য পুত্র বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলারের দৃষ্টি এই বিষয়ের উপর আকর্ষণ করিতেছি।



শান্তিনিকেতন, প্রথম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-ভারতী প্রকাশ, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৫০ টাকা, বাধান ২৮ টাকা। ডবল ক্রাউন বোডশাংশিত ৩০০ পৃষ্ঠা। হুমুজিত।

রবীন্দ্রনাথের “শান্তিনিকেতন,” “ধর্ম,” ও ধর্মবিবরণ অপ্রকাশিত সমস্ত অবশ্য সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশ করিবার যে আয়োজন ও চেষ্টা হইয়াছে, এই পুস্তকটি তাহার প্রথম ফল। ইহা দেখিরা প্রীত হইবাছি। ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির ইহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, তাহাদের অনেক সন্দেহ দূর হইবে; আবার অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহও তাহাদের মনে উদ্ভূত হইবে। তাহাও সমুদয় প্রকৃত ধর্মোপদেশের অভ্যুৎপত্তি।

ধর্মোপদেশী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

মৃত্যুর ও প্রকাশক প্রত্যেক উপদেশের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে বৎসর, মাস ও দিন মুদ্রিত করিয়া মিলে ভাল হইত। অনেকগুলিতে শুধু মাস ও দিন আছে, বৎসর গুলিয়া বাহির করিতে হয়। ইহা বৃহৎ কোন বোঝ নব; কিন্তু বাহা করা হয় তাহা নির্বৃত্ত ভাবেই করা ভাল।

বঙ্গীয় মহাকোষ—নমুনা সংখ্যা ও প্রথম সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক জীঅমৃত্যচরণ বিদ্যাত্মক। ‘বঙ্গীয় মহাকোষ’-কার্যালয়, ৩-এ, রাসবর্তন বোসের পেন, শ্রীমৎস্বামী ডাকঘর, কলিকাতা।

ইংরেজীতে এবং অন্তর কোন কোন প্রধান ভাবের প্রত্যেকটিতে একাধিক এন্ট্রীকোপীডিয়া আছে। কোনটিই অনাবশ্যক নহে, এবং কোনটিতেই সব প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলার এক “বিষাকোষ” প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে বলিয়া আর একটি এন্ট্রীকোপীডিয়া অনাবশ্যক, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। বঙ্গ বিদ্যাত্মক মহাশয়ের সত পরিশ্রমী, বহু বিদ্যাবিৎ, উন্মোচনী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সম্পাদকতার আর একটি এই জাতীয় মহাগ্রন্থের প্রকাশে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অমর্যাদা সাক্ষ্যই আনন্দিত হইবার কথা। তাহার মহাকোষের নমুনা সংখ্যা ও প্রথম সংখ্যা আমাদের মনে বৃগুপৎ আনন্দ, উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করিয়াছে। তিনি ভাল কাগজে, নুতন অক্ষরে, ভাল ভাল ছবি দিয়া গ্রন্থখানি ছাপাইতেছেন। সমুদয় তথ্য সাবধানতার সহিত বহু বয়ে সংগৃহীত হইতেছে। প্রত্যেক সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠা পরিমিত। মূল্য আট আনা। আট বৎসরে ২১২০ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে। বিদ্যার নানা বিভাগে বিশেষজ্ঞ ও বিদ্বান বহু সংখ্যক লেখক নিয়মিত রূপে অমূল্য বাবুর সহায়তা করিতেছেন। তিনি নিজেও অনেক বৎসর ধরিয়া মহা সঙ্কল্পটি হৃদয়ে পোষণ করিয়া পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন, এবং এখনও ষাটিতেছেন। তাহার ব্রতের যে-দিন উদ্ঘোষন হইবে, সেদিন তিনি ও তাহার সহকর্মীরা ইহা ভাবিয়া আনন্দপ্রসার অসম্ভব করিতে পারিবেন, যে, বাঙালীদিগকে তাহারা এমন একটি মহাগ্রন্থ দিলেন বাহা অধ্যয়ন করিয়া তাহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন।

র. চ.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী—শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী কর্তৃক সঙ্কলিত। পরিবর্ধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—ইউডেটস্ লাইব্রেরী, ৭৭১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০০+৩০৮+ ১/২, মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কতকগুলি উপদেশ ও বাণী সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলা ভাষার এরূপ একটি সংগ্রহের বিশেষ অভাব ছিল; এই গ্রন্থ সেই অভাব দূর করিবে। বর্তমান সংস্করণে পরমহংসদেবের কয়েকটি উপদেশ নুতন করিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে পরমহংসদেবের সহধর্মিণী শ্রীমতী সারদেবী দেবীর (শ্রীশ্রীমায়ের) ও স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই সংস্করণে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্কলিত বিদ্যর ভাগ করিয়া উপদেশগুলি সাজাইয়াছেন এবং গ্রন্থখানিকে সর্বদ্বন্দ্বহীন করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ভক্ত-পাঠকগণের নিকট এই গ্রন্থ যে সমাদর লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপুরুষগণের বাণী বতই প্রচার লাভ করে ততই মঙ্গল। ছাপা, বাঁধাই ও আকার হিসাবে গ্রন্থের মূল্য খুবই কম।

প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ—বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। প্রকাশক প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪২। মূল্য পাঁচ সিকা।

বঙ্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল ‘প্রবর্তক’ মাসিক পত্রে পূজ্যপার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একটি জীবনকাহিনী ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার মৃত্যুতে সে রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। প্রবর্তক-সম্পাদক কর্তৃপক্ষ সেই অসম্পূর্ণ জীবনকাহিনী বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বিপিনবাবু গোস্বামী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন ও তাহাকে খনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। গ্রন্থের বিবরণ-সূচনায় তিনি কি ভাবে গোস্বামী মহাশয়ের এই জীবনকাহিনী লিখিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহার একটি পরিকল্পনা পাওয়া যায়। তাহা পড়িলে মনে হয় যে, লেখা শেষ হইলে গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার জীবনচরিত-সাহিত্যে সম্পদ বৃদ্ধি করিত। মৃত্যুর পূর্বে বিপিনবাবু বেটুর লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার, তবে আকার হিসাবে ইহার মূল্য কিছু বেশী বলিয়া মনে হইল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

রাতের অতিথি—শ্রীশ্রীদিল্লী বন্দোপাধ্যায়। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং। ২ ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দশ তানা। ১৩৪১

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত ছয়টি কাহিনীর সমষ্টি। ঐতিহাসিক, ভূতুড়ে, জীবজন্তু—সব রকমের গল্পই আছে। গল্পগুলি ছলিত এবং উপভোগ্য, বয়স পাঠকেরাও ইহাতে আনন্দ পাইবেন।

হাসে হাসে যে সকল ইচ্ছিত আছে, শিশু-চিত্ত হস্ত সেউলির অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু কোথাও সরসতার অভাব নাই।

ঐপ্রিয়রঞ্জন সেন

বড়—শ্রীবাহুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। পি. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ২ শ্রামাচরণ থে স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ২৮

একখানি সুবহু উপজ্ঞাস। সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন হইলেও কয়েকটি বিশিষ্ট শক্তির জোরে লেখক দ্রুত নিজের স্থান করিয়া লইতেছেন। তাঁহার বইয়ের আখ্যানভাগ বেশ গতিশীল—সরাসী নবতর ঘটনার মধ্য দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, অতিরিক্ত বিস্তারিত বা মন্তব্যের চাপে কোথাও কলঙ্কপতি হইয়া পড়ে না। ইহাতে উপজ্ঞাসের মোহটুকু বরাবর বজায় থাকিয়া যায়। ভাষাও বেশ সযত্ন অঞ্চল জটিলতাবজিত।

আলোচ্য বইখানিতে এক দিকে প্রধান পুস্তকচরিত্রগুলি ও অপর দিকে প্রধান নায়কচরিত্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য আছে। লেখক শক্তিশালী, ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট আরও বৈচিত্র্যের আশা রাখিলাম। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ প্রকাশকের ব্যাতি অসুস্থ রাখিয়াছে।

ঐবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার ব্যবসা-জীবন—রায়-সাহেব বিনোদবিহারী সান্থা। ২য় সংস্করণ, ১৩৪১। প্রকাশক—ঐবিজয়চন্দ্র দাশ, বি-এল, সাহিত্য-ভূষণ, ২০ উন্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা, মূল্য ১০ টাকা। পৃষ্ঠা ১/০+১০+২১১+৮

এক বসন্তের মধ্যে যে উন্মিষিত গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে হইল, ইহা হইতেই ইহার উপবেশিতা বুঝা যাইবে। আমরা আপা করি পুস্তকখানি পড়িয়া বাংলার উন্নয়মান ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইবেন।

জহরলালের চিঠি বা পৃথিবীর ইতিহাস—

ঐপ্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক ঐহরীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৬৪ লেক রোড, কলিকাতা। মূল্য ১০ পুঃ ১৩৫।

জহরলাল তাঁহার কন্যাকে “Letters from a Father to his Daughter—নামে যে সকল চিঠি লেখেন বর্তমান গ্রন্থখানি তাহারই অন্তর্ভুক্ত। ছোটদের জন্য পৃথিবীর ইতিহাস গল্পাকারে ভাগেও বাংলায় বাহির হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি অপেক্ষা এ বইখানি অনেক ভাল হইয়াছে। প্রথমতঃ জহরলালদ্বারা যুব সরস করিয়া বিবরণ লিখিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ, অনুবাদের ভাষাও স্বচ্ছ ও সরস হইয়াছে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ঐনির্মালকুমার বসু

চুখক-রহস্য—ঐরাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্-এসসি প্রণীত; ২০৩২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে এস্. গুপ্ত এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানি বালক-বালিকাদিগের জন্য লিখিত। চরিত্রে ও চিত্রে চুখক সম্বন্ধে সাধারণ তথ্যগুলি সরস ও সরলভাবে উন্মিষিত হইয়াছে। ইহাতে চুখকের উপাদান, তাঁহার উদ্ভবমেক ও দক্ষিণসেতুর বিশেষত্ব, চুখকের লৌহাকর্ষণ, লৌহের চুখক প্রাপ্তি, লৌহ ও ইস্পাতের প্রভেদ, চুইটি চুখকের দুইটি বিশদ মেরুর পরস্পর আকর্ষণ ও দুইটি সযত্ন

মেরুর বিকর্ষণ, চুখকের প্রতি অংশের চুখক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তথ্য-গুলি গল্পরূপে এমন সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিত হইয়াছে যে পুস্তকখানি প্রধানতঃ বালক-বালিকাদিগের জন্য রচিত হইলেও, ইহা ছোট-বড় সকলকে সমান ভাবে তৃপ্তি দান করিবে। বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি নিশ্চিন্তা ও বালকগণ করিয়া প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই জন্যই গ্রন্থকারের এই উদ্যম প্রশংসার। গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল ও মনোহর। দুই এক স্থলে আর একটু সহজ করিয়া লিখিলে ভাল হইত। বাহ্যিক, পুস্তকখানি সুগঠিত ও সুলিখিত হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ প্রশংসনীয়।

ঐশুকুমাররঞ্জন দাশ

লেনিন—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণবাণী পাবলিশিং হাউস, ২৬ মিরজাপুর স্ট্রিট, মূল্য আট আনা, ১১৬ পৃষ্ঠা।

বইখানিতে মোটামুটি ১৮৮৭ সালে থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত লেনিনের কার্যাবলী ও বক্তৃতাগুলি অংশবিশেষ উল্লেখ ক’রে লেখক রাশিয়ার ইতিহাস আলোচনা কয়েছেন। এটিকে লেনিনের জীবনী বলা যায় না, কারণ জীবনের ব উপাদান, বইটিতে তার অভাব। লেনিনকে কেন্দ্র ক’রে বইখানিতে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্যও যে তাই একথা তাঁর ভূমিকাতেই বোঝা যায়। লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে; ভাষা জোরাল, সহজ। তবে অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা ভাষার মধ্যে বাংলা হয় কেন না থাকলেই ভাল হ’ত। অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা অপরিহার্য কিন্তু এমন বহু শব্দ বার-বার ব্যবহৃত হয়েছে যার ভাল-বাংলা প্রতিপদ আছে। লেখক স্বাধীনমুখ্য; তাঁর রাজনৈতিক মতামতও প্রখ্যাত। কাজেই এর মধ্যে আমরা সমাজতন্ত্র মতবাদের নিরপেক্ষ সমালোচনা পেতে পারি না। তবে তিনি লেনিনের যে-সব মত ও পথ লেনিনের লেখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো বাংলার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে। যে-সব না-পড়ে-পড়িত লেনিন সম্বন্ধে খালি শুনে শুনে রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে ও জোরালো বক্তৃতা দিয়ে শ্রমিকবৃদ্ধ সেন্সে সত্যের নাম কিনবার চেষ্টা করে, তাদের এই সব বই প্রতীত কলাপ করবে। সমাজতন্ত্র কি, কখন এর বিকাশ সম্ভব, প্রভৃতি সম্বন্ধে সেনিনের মতবাদের সত্যপরিচয় বইটিতে পাওয়া যাবে।

ঐনিভানন্দারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তৃতা ও উপদেশ—আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ। প্রকাশক—ঐজিতেন্দ্রনাথ রায়। গুরুসঙ্গ লাইব্রেরী, ২০৩৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা ১৬১, মূল্য ৮০।

ঐমদ্যচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুত উপদেশ ও বক্তৃতার সমষ্টি। সাহুজনের বক্তৃতা সর্বদাই সুগঠিত। মুদ্রণ ও ছাপা চলনসই।

ঐবিমলেন্দু কল্যাণ

সোজন বাদিয়ার ঘাট—ক্রসীম-উদয়ন প্রণীত কাব্য। শুক্লাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

শহরের কোলাহল, মোটর-ট্রামের বিকট আওয়াজ আর শত কর্তব্যের টানটানিতে কলিকাতার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। মাঝে মাঝে গম্ভীর পথ ঘাট পাছ লতা পুতুর নদী কিংবা বুলবুলি আর

তাহাদেরই সঙ্গে পল্লীর গাছের ছায়া ও নদীর জলের আদরে-সোহাগ-গড়া মানুষগুলিকে বঁধন মনে পড়ে তখন আরামে আশাসে মন জুড়াইয়া যায়।

কবি জসীম-উদ্দীনের এই কাব্যগ্রন্থখানি পল্লীর সকল ছবি, সকল রীতি, সকল বিবাদ-মিলন, সকল শান্তি-বিবাদ এবং সকল সোহাগ-আদর লইয়া শহরবাসীদের হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাব্যের কাহিনীটি অতি সরল, অত্যন্ত গ্রাম্য এবং সেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্মল ও ষাটি।

এক মুসলমান যুবক ও এক নমঃশূত্র যুবতীর প্রণয়-কাহিনী নানাবিধ সামাজিক বাধাবিধ এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়া আসিয়া অবশেষে অপরাধ করণ মর্গশ্রী সার্থকতার পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। এই প্রেম-কাহিনীটি বিবৃত করিতে সিঁচা বর্তমান কালের হিন্দু-মুসলমানের বহু বিরোধ-মিলনের কথা, সামাজিক অসাম্যের কথা, চক্রীর চক্রান্তজাত সাম্প্রদায়িক কলহের কথা এবং অত্যাচারী গ্রাম্য জমীদার ও তাহার অত্যাচারী স্বার্থাঘেবী নায়েবের কুটিলতা হিন্দু-মুসলমানের সর্বদমনের কথা কবিকে বলিতে হইয়াছে। কিন্তু এই গুরুতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার উল্লেখ সত্ত্বেও সমস্ত কাব্যখানির মধ্যে কবির উদারচিত্ততার কল্পশ্রোত বহিরা গিয়াছে, এবং তাহাই কাব্যখানিকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বহু স্থান কবির সরল ভাষা ও সরল গ্রাম্য উপমা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

এমন গ্রাম্য প্রেম, এমন গ্রাম্য সমাজ ও এমন গ্রাম্য প্রকৃতির কথা অনেক দিন ~~এই~~ নাই; সেইজন্য কাব্যখানি আমাদের কাছে যথার্থই আনন্দ দান করিয়াছে।

কাব্যখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালই; কিন্তু ছাপার ভুল অনেক আছে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শ্রীবামলীলা—(বামাক্যাপাবার জীবনী ও সাধাসাধন-তত্ত্বকথা)। আদি লহরী। শাস্ত্রী শ্রীহরিশ্রম গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীগুপ্তমতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, সম্পাদক, শ্রীবাসুদেব সম্প্রদায়। ৪৮১২, বেনেটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

বায়তুম তারাগীঠের বাহাদুরহীন আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ সাধক বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্যাপার জীবনের আংশিক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্য ও অন্ত্যলহরী নামে আর দুই খণ্ডে তাহার জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গালা দেশের এই অনতিপবিত্রিত সাধকপ্রবরের ধর্মজীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ এই গ্রন্থে এতদ্বিবয়ক অজ্ঞান গ্রন্থ অপেক্ষা বিধর ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের সিঁদ্বাজনোচিত আবেগ ও আন্তরিকতা হবান্ত। যে প্রকরণে সাধক সঙ্কল্পে যে কথা বলা হইয়াছে, প্রকরণের প্রায়স্তে এক একটি সংকল্পিত স্নোকে তাহা বইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিবরণ, এই গ্রন্থের আদর সত্ত্বেও গ্রন্থকার সম্পূর্ণ নির্বাক। সাধকের জীবনবৃত্তান্ত ছাড়া, ধর্মকৃত্যের অন্তর্ধানি সত্ত্বেও বিবিধ মতবাদ ও সাধারণ ধর্মভঙ্গ বিবরণ বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থমধ্যে করা হইয়াছে। এই আলোচনা গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে সত্য তবে ইহা একটু সঙ্কীর্ণ হইলেও গ্রন্থের গৌরব হানি হইত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, আশঙ্কা হয়, সর্বথা আডম্বরসম্পর্কশূন্য সাধকের এই জীবনী সাধারণ পাঠক ও ঐতিহাসিকের নিকট একটু আডম্বরবহুল বলিয়া মনে হইতে পারে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

যুগের বাংলা—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রবর্তক পারিশিঃ হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। ৬১ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। ৬০ পৃঃ মূল্য ১০ আনা।

এই ক্ষুদ্র স্মৃতিকাখানিতে গ্রন্থকার বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুর সংখ্যা-হাস, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর স্থানভাব, বাংলার শিল্পের অবনতি, নারী-প্রগতির নুতন ধারা ও তাহার বিপদ—এই সমস্ত বিষয়েই আলোচনা ইহাতে রহিয়াছে। নারী-আগরণ সত্ত্বেও গ্রন্থকার মনে করেন যে, যে-আগরণে নারী “বিশ্বায়ী সভ্যতার অনুকরণে ডাইভোর্স চায়, পরাক্রান্ত বিবাহের অভিনয় চায়, ... কুমারী, যুবতী, বিধবা নির্বিশেষে গর্ভনিরোধ-বটিকার অনিবার্যতায় যৌবনের মুষ্টিলাস আসান বুজে”—সে আগরণ জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষা করিতে পারিবে না। (৬০ পৃঃ)। কিন্তু এই সেদিন করাচীতে নিখিল ভারতীয় নারী-সম্মেলনের ২ম অধিবেশনে ২৪ : ৩৫ ভোট দ্বিবাঙ্কিত হইয়াছে যে, জঘনিরোধ সত্ত্বেও উপদেশ লইবার অধিকার মেয়েদের আছে এবং উহা বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর পরবর্তী সংস্করণে আমাদের গ্রন্থকার এ সত্ত্বেও তাঁর মত পরিবর্তন করেন কিনা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। যে-সব বিপদের ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন তাহা আমরাও সম্পূর্ণ স্বীকার করি; কিন্তু উদ্ধারের পথ কোন্ দিকে?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আকাশ ও মৃত্তিকা—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ২০৩১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ২২২।

এই উপন্যাসখানি গতানুগতিক নয়। প্রধান চরিত্র জয়ন্তীকে অতি বিচিত্ররূপে ফুটিয়া তোলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, চবিত্র বলিতে এই একটাই; অপরগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইহার বিকাশে সাহায্য করিয়াছে মাত্র। লেখকের সকল সৃষ্টিচাতুর্য্য তাই ইহারই উপর পড়িয়াছে। ইহাকে লইয়াই হৃদয় আকাশ ও আবিলভামব পৃথিবীর যত্ন-সংযত। এ যেন এক দড়ির শেলের উপর দিয়া চলিয়াছে। পড়িতে পড়িতে তাই চমকিয়া উঠিতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হইলেই হয় দ্ব্যভাবিকত্বের কোঠার পৌঁছিত, নয়ত শিব গড়িতে বানর হইয়া বাইত। কিন্তু বিনয়কর লেখনী-সংযমে সকল দিক সামলাইয়া গিয়াছে; চরিত্রটি হৃদয়ঙ্গম পরিণতি লাভ করিয়াছে। স্থলবক বলিয়া সরোজ-কুমারের খ্যাতি আছে; বর্তমান উপন্যাসে সে যশ বাড়িবে। ছাপা বাঁধাই যত্নব

শ্রীমনোজ বসু

কলিকাতা-পরিচয়—মূল্য এক টাকা, প্রাপ্তিস্থান—অজন্তা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৬ নং মুল্লাধর সেন লেন, কলিকাতা।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে অধ্যয়না-সমিতি আয়ত প্রবাসী বাঙালীদিগকে কলিকাতা সত্ত্বেও সম্যক পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে কলিকাতার ইতিহাস, প্রাচীন বাঙালী মনীষিগণের জীবনী ও তাহাদের কীর্তিকলাপ আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতার ঐতিহাসিকসমূহ ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সচিব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রাচীন ও আধুনিক জাতব্য তথ্যাদি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণভাবে কলিকাতা সত্ত্বেও বাহা জানা দরকার, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা জানা যাইবে।

বাঁড়ার পুরাক্রতি-রক্ষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাঁড়ার জেলা কয়েকটি ভূমে বিভক্ত। ভূম, ভূমি, দেশ। উত্তরে সামন্তভূম, দক্ষিণে মল্লভূম, পূর্বে শূরভূম, পশ্চিমে বরাহভূম, ধবলভূম, তুঙ্গভূম। এক এক ভূমের এক এক রাজা ছিলেন; সে সে রাজার বংশের নামে ভূমের নাম। এই সকল ভূমের মধ্যে মল্লভূম বিস্তীর্ণ। এককালে শূরবংশ হীনবল হইলে শূরভূম মল্লরাজার শাসনে আসিয়াছিল। মল্লভূম দ্বৈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমল পর্যন্ত আট-নয় শত বৎসর প্রায় স্বাধীন ছিল। বর্গী-দহা ভাস্করপণ্ডিত মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর আক্রমণ ও অবরোধ করিয়াছিল, কিন্তু দলমর্দন (দলমাদল) কামান্বেব অম্মদগার সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিল। মল্লরাজ বীরহাছীর মোগল বাদশাহকে কিঞ্চিৎ কর স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বৎসর দিতেন, কোন বৎসর দিতেন না। বঙ্গের পাঠান মুলতানেরা মল্লভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন কিছদস্তীও নাই। লোকে শুনিয়াছে, শ্রীনিবাস আচার্যেব দুই গাড়ী গ্রন্থ মল্লভূমে লুপ্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাবে নাই, মল্লভূম স্বাধীন রাজ্য ছিল, সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বিদেশীকে রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইত। শ্রীনিবাস আচার্য একা শূন্যহস্তে গমন করিলেও ঘাটিতে (পুলিস আউটপোস্ট) জানাইয়া বাইতে হইত। কোন্ বিদেশী কোন্ রাজ্যে স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে পারে? আচার্য-ঠাকুরের সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল, প্রত্যাগীতও হইয়াছিল। দেশশাসনের এই সনাতন বিধি লঙ্ঘিত হয় নাই। রাজা অপহৃত গ্রন্থের মূল্য বুঝেন নাই, এমন নহে। তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতেছিলেন, আচার্যঠাকুর-কৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে এক বিদেশী পর্যটক লিখিয়া গিয়াছেন, প্রজা রাজ্যিকালে গৃহস্থার রুদ্ধ না করিয়া নিদ্রা যায়, সে রাজ্যে বিদেশী প্রবেশ করিলে ঘাটিআলেরা ঘাটিতে ঘাটিতে পঁছাইয়া দেয়।

কিন্তু কবে বিষ্ণুপুর রাজধানী হইয়াছিল, কবে হইতে ও কেন মল্লাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানি না। কে সে কোটেস্বর, যাহাঁব কোট (দুর্গ) লোকমুখে কোড়াস্বর-গড় হইয়াছে; কে সে ভৈরব, ভূমিনাথ, যাহাঁর নামে (বি এন রেলের পিয়ারডোবা স্টেশনেব কাছে) অম্বরগড় প্রসিদ্ধ হইয়াছে? কে সাবংগড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন? তিনি কোন্ দেশ শাসন করিতেন? দক্ষিণে কেদ্রগড়, হোমগড়, রামগড়, লালগড়, মন্দাবগড়, ইত্যাদি এক এক গড়ে এক এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু কে সে অতীত কাহিনী শুনাইবে? শূরভূম নিশ্চয় শুববংশীয় রাজাদিগের রাজ্য ছিল। দামোদরের পশ্চিম পার্শ্বে রাজ্য। ভূমি উর্বরা, রাজ্যস্থাপনের যোগ্য। শূরবংশের যিনি আদি, যিনি পশ্চিমদেশ হইতে পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তিনি কি এই শুবভূমের রাজা ছিলেন? ধবলভূমের প্রতিষ্ঠাতা কি শুর্জর-প্রভীহার, ও তুঙ্গভূমের কর্ণাটদেশীয় ছিলেন? লাউসেন কি এই দুই বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন?

শিশুনিয়া পাহাড়টি শিশুনাগ (শিশুহস্তী)। তুলা শুইয়া আছে। কে তাহার গায়ে বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? তিনি পুষ্করণার অধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মণ। আমবা উৎকীর্ণ লিপি হইতে এইটুকু জানিতেছি। লিপিপ্রাঞ্জেরা চতুর্থ খ্রিষ্টশতাব্দের বলিয়াছেন। প্রথমে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বহু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অঙ্কমের দেশের পুষ্করভীর্ষের চন্দ্রবর্মণ মনে করিয়াছিলেন। পবে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালবদেশাধিপতি সিংহবর্মার পুত্র অনুমান করেন। হই জনেরই যুক্তি খণ্ডিত। এক জনও জানিভেন না, শিশুনিয়া হইতে ২৪ মাইল পূর্বে পোথর্না নামে গ্রাম আছে। দামোদরের দক্ষিণ তীরে গ্রাম। এখানে গড়ের চিহ্ন আছে। ইহার প্রাচীনতার বহু নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, দ্বিতীয় খ্রিষ্টশতাব্দের আছে, বহু চিহ্ন দামোদরের

বস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রবর্মা এই প্রাচীন পুষ্কণার অধিপতি ছিলেন কি? কে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করিবে? ছাতনায় ও কেজাকুড়ায় যুদ্ধে নিহত আয়ুধিক সৈনিকের পাষণ-মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কত কালের মৃত সাক্ষী, কোন্ যুদ্ধের, কোন্ প্রতিপক্ষের সাক্ষী, কে সে বিজয়বাহিনী-ঘোষণার কাহিনী তুলিবে? সে পক্ষ পরাজিত হইয়াছিল। সে নিমিত্ত মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ মূর্তি অত্র স্থানেও আছে।

দেশটি অনাথের অধিকৃত ছিল। নিরুপমা রাঢ়ভূমিও এককালে তাহাদের ভোগে ছিল, পবিত্র ব্রহ্মাবর্তও ছিল। তাহাতে দেশের গৌরবহানি হয় না। নিবিড় অরণ্যানী রাঢ়ের পশ্চিমের দেশটিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। দেশটি নূতনও নয়। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, যাহার সংখ্যা করিতে ভূবিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে। বাঁকুড়া নগরের ঘেষানে সবকারী কৃষি আগিল, দেখিতেছি স্তর-বিকৃত প্রস্তরের বৃষ্টিবাত্যা-শীতাতপহত পর্বতের উপরে রহিয়াছে। তখন গন্ধেশ্বরী নদীর জন্ম হয় নাই, বর্ষার বস্ত্র দ্বারকেশ্বরে পড়িত। বস্ত্রার কর্ণমে সে ভগ্ন ক্ষয়িত বিল্লিষ্ট পর্বতের শিরোদেশে এখনও আধহাত-পুরু মুক্তিকা রহিয়াছে। সে বস্ত্রার পলিতে কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে। সে স্বাপদসঙ্কুল বনভূমি কতকাল জনহীন ছিল, কে জানে? তাব পর মানুষের কুঠারে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ আরম্ভ হইয়াছিল। সে কুঠাব কেহ খুঁজে নাই, কে খুঁজিবে? হয়ত দৈবাৎ চোখে পড়িয়াছে, সামান্য পাথর মনে হইয়াছে, দূরে নিষ্কিন্ত হইয়াছে। কোথাও কোথাও এখনও শিলাশস্ত্র আছে। কিন্তু কে অন্বেষণ করে, বক্ষা কবে?

বাঁকুড়ার উত্তরসীমা হইতে পার্শ্বনাথ পর্বত অধিক দূরে নয়। এটি শেখর ভূম। বাঁকুড়া ও শেখবড়মুশিগিয়া গিয়াছে, উভয়ের অবচ্ছেদক রেখা আধুনিক ও কৃত্রিম। দেশটি গয়া হইতে দক্ষিণগামী পথেও পড়ে। জৈন ও বৌদ্ধ পরিব্রাজক এদেশে বাস করিয়াছিলেন। তাহাদের নির্মিত শিলামূর্তি নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের পূর্বভাগে দ্বারকেশ্বর নদের কূলে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখনও লোকে সে গ্রামকে বিহার বলে। সেখানে মকরাক্ষ নামে নরপতি চাঁপাইর ঘাট বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কে সে রাজা? তিনি

কবে ছিলেন? একতেশ্বর শিবমন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের মধ্যে 'ধাঁদারানী' নামে যে শিলামূর্তি পুজিত হইতেছে, সেটি জৈন কি বৌদ্ধ তাহাও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কোন্ শাস্ত্র মহানুভব রাজা অধিকানগর নামে রাজধানী করিয়াছিলেন? কোন্ বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শী জৈন-বৌদ্ধ-শাস্ত্র-শৈব-বৈষ্ণব-গাণপত্য-সৌর প্রতিমা কুমারী নদীতটে বর্তমান কালের চিত্রশালা করিয়াছেন? কত প্রতিমা নদীগর্ভে বিনষ্ট হইয়াছে, কত অপসৃত হইয়াছে, কত সাগরাস্তরিত হইয়াছে! এখনও এখানে ওখানে মুক্তিকা হইতে নূতন নূতন শিলামূর্তি পাওয়া যাইতেছে। কে সে সব সংগ্রহ ও রক্ষা করিবে? কে বাহলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিবের, কে ইক্ষুপুরের চণ্ডীর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন? কে কবে একতেশ্বরের মন্দির, কে যুটগড়িয়ার মন্দির, সোনাতাপলের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন?

পূর্বকালে দেশটি দরিদ্র ছিল, এখনও দরিদ্র। তথাপি ক্রমিক বস্ত্র, উত্তম কাংসপাত্র নির্মিত হইত। সেকালের বস্ত্র, লৌহতাত্রাপত্তলকাংসপাত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ অলঙ্কার, মুদ্রয় পুত্তলিকা দেশের কলানৈপুণ্যের ও রূপকল্পনার সাক্ষী। সে পট-কার কই যে রামলীলা ও কৃষ্ণের ব্রজলীলার চিত্র, লিখিত, দশাবতার তাস লিখিত? কোন্ সে লৌহকার যে আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশিত করিত? কোন্ সে কর্মকার যে বুদ্ধাত্ম নির্মাণ করিত? সে যুদ্ধাত্মের কি রূপ ছিল? কোন দক্ষ কর্মকাব ১ ফুট হুঘিরের ১২ ফুট দীর্ঘ দলদল কামান গাড়িয়াছিল? কত কর্মকার দুই শত মণ লৌহ জুড়িয়াছিল? লৌহের নিমিত্ত কর্মকারকে দূরে বাইতে হয় নাই। বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাইপুরের নিকটে এক ছোট পাহাড় হইতে এখনও লৌহ নিষ্কাশিত হইতেছে। হাজারিবাগ হইতেও আকর আসিত, কেজাকুড়ার নিকটে লৌহ পৃথক হইত, লৌহমল তাহার সাক্ষী।

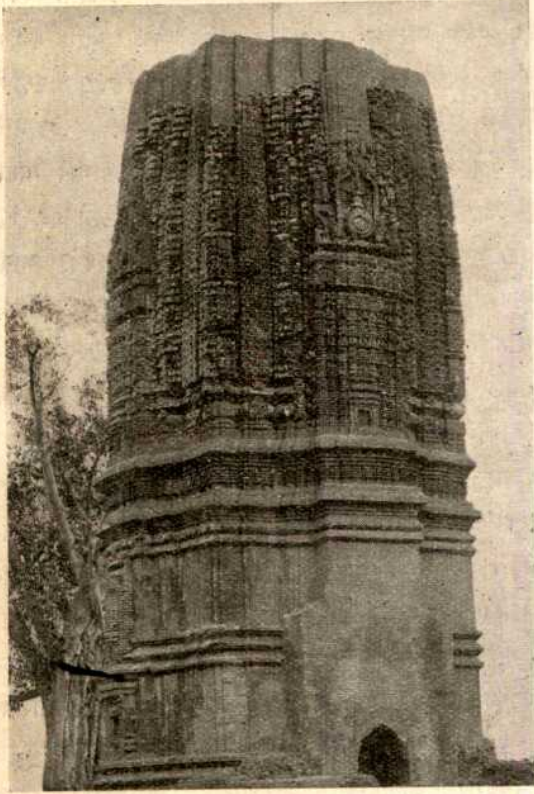
সমস্তাল, ভূমিজ, মুন্ডিজ ও বর্বর জাতির বাসভূমিতে কাক্সিলাল গাঞির ব্রাহ্মণের আদিগ্রাম কেজাকুড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। কোনোজ হইতে কত পাঠক, ত্রিবেদী, অধ্বর্যু, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী আসিয়া বাস করিয়াছেন। উত্তব-বজ হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। উৎকল হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য আসিয়া নিবাসী হইয়াছেন। বর্তমান হইতে

অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণ আসিয়া চিরবাসী হইয়াছেন। এই রূপ নানা দেশাগতেরা নূতন দেশ বর্জন করেন নাই, স্ব স্ব দেশের বিদ্যালয়লীন ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই। ইহারা ও অপরে অসংখ্য পুথী লিখিয়াছিলেন। গহন বনের ভিতর দিয়া বাহিরের লোকের গমনাগমন ছিল না। বাহিরের পুথী বাহিরের লোকের সহিত আসিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে যায় নাই। এইরূপে দীর্ঘকালে বহু পুথী সঞ্চিত হইয়াছিল। কত পুথী ইঁদুর কাটিয়াছে, উই মাটি করিয়াছে, বর্ষার জল পচাইয়াছে, আগুন ভস্ম করিয়াছে; নষ্ট পুথী ডোবার জলে ও সারকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাপি গাড়ী গাড়ী পুথী স্থানান্তরিত হইয়াছে। “এশিয়াটিক সোসাইটি”র পুথীশালায়, “বিষকোষ” কার্যালয়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীশালায়, কিছু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। সে সকল পুথী সম্বন্ধে রক্ষিত হইতেছে, সত্য; কিন্তু বাঁকুড়া নিঃস্বত্ব হইয়াছে। আর যে কত পুথী, কত পুথীর পাতা গ্রন্থগৃহে ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া অজ্ঞাত দেশে লইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কালীরামদাসের মহাভারতের তিনখানা পুথী পাত্রসায়র হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীশালায় গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি কালীরামদাসের নিজের পুথীর মাত্র পনের বৎসর পরে পাত্রসায়রে অনুলিখিত হইয়াছিল। “ধর্মপূজাবিধানের” ও রামাই পণ্ডিতের “শ্রুতপুরাণের” পুথী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। এত পুথী নষ্ট ও স্থানান্তরিত হইবার পরেও যে বিষ্ণুপুরে আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর পুথী পাওয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্য বটে। এই আবিকারে সাহিত্যিক-সমাজ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই চণ্ডীদাসই কি ছাতনার বাসলী দেবীর বড়ু ছিলেন? আঠার বৎসর হইল সে পুথী মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইহাদের বিষয় কাটে নাই। স্বাধীন দেশে গতানুগতিকতা থাকে, থাকেও না। বড়ু রাধাকৃষ্ণলীলা-গীতে কোথাও পুরাণ মানিয়াছেন, কোথাও নূতন গড়িয়াছেন। গীতবাদ্যের দেশেই উত্তম উত্তম গীতের উদ্ভব হইয়া থাকে। শত বৎসর পূর্বেও বিষ্ণুপুরে বড়ুর গীত ধরিয়া নারদমতে ভাল শিক্ষা দেওয়া হইত। সে গীতের ও তালের পুথী পাওয়া

গিয়াছে। আর, কে না বহু-ভট্টের খেয়াল, কীর্তি-গোস্বামীর পাখোয়াজের খ্যাতি শুনিয়াছে? আর কোথায় জগৎ-গোস্বামীর টোলে শিবোরা প্রতিপালিত ও গন্ধবিন্দ্যা আয়ত্ত করিয়া গিয়াছে? সে ক্রন্দ এখনও নিঃশব্দ হয় নাই।

যে শুভঙ্করী আখ্যা বঙ্গদেশের তাবৎ পাঠশালায় অধীত হইতেছে, আদি শুভঙ্কর বিনিই হউন, তিনি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোন্ শুভঙ্করী আখ্যায় ভূমিপরিমাণের প্রাচীন পদ্ধতি আছে? শুভঙ্করী ‘দাঁড়া’ নামে যে আট ক্রোশ দীর্ঘ খাল আছে, কৃষকের হিতার্থে খনিত হইয়াছিল, সে দাঁড়ার নামেই প্রকাশ সূত্রধর (ইঞ্জিনিয়ার) স্মৃতি ধরিতে জানিতেন, দাঁড়ার শিরায় শিরায় ফলনালা করিয়াছিলেন। কত গ্রামে কত ‘বাঁহ’ নির্মিত হইয়াছিল, কত পোখরী খনিত হইয়াছিল। এখনও বামন দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলিত হয়, এখনও আখ্যান দিনে (১লা মাঘ) গ্রামবাসীরা মুগয়া করে। দেশ স্বাধীন ছিল, দেশবাদী স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্যাহ করিত। দেশের গ্রহচাৰ্ঘ্যেরা স্বরচিত গ্রহগণিতযোগে পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতেন। তাহার চিহ্ন এখনও বগডি-তে (বকদ্বীপ) আচার্য-বংশে রহিয়াছে। সর্বাঙ্গেক্ষা বিশ্বয়ের বিষয়, ভরণী নক্ষত্রে রবি প্রবেশ করিলে (১৩ই বৈশাখ) নববর্ষ গণনা অজ্ঞাপি প্রচলিত আছে। অশ্বিনীর উদয়ের পরেই সূর্যের প্রকাশ দেখিয়া এই বিধি হইয়া থাকিবে। কিন্তু উৎপত্তি অজ্ঞাত।

প্রত্যেক জেলাতেই পুরাবৃত্তের উপকরণ আছে। প্রত্যেক জেলাতেই উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষা, নূতন উপকরণ অন্বেষণ ও বিনিয়োগ নিমিত্ত যে নামেই হউক এক সমিতি স্থাপন কর্তব্য। কয়েক বৎসর পূর্বে কে জানিত দামোদরের দক্ষিণে মহানাদ নামক স্থানে পুরাক্রতি পাওয়া যাইবে? এক এক দিন বাইতেছে, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু নষ্ট হইতেছে। পুরাক্রতির মূল্য নাই। আর, যে মানুষ তাহার বাসভূমির বর্তমান ও অতীত দশা স্মরণ না করে, সে অন্ধ থাকিয়া কাল কাটায়। স্বদেশের জ্ঞান নিমিত্ত আর কত কাল বিদেশীর কোতূহলের প্রতীক্ষায় থাকিবেন? যে দেশ নূতন নূতন ধন উপার্জন করে, সে দেশ ধনী। আর, যে দেশ পৈতৃক ধন রক্ষা করিতে উদাসীন, সে



বাকুড়া জেলার বাহলাড়ার মন্দির

[ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্মে]

কিসের গৌরব করিবে? বাকুড়ায় যত প্রকারের যত উপকরণ আছে, রাঢ়ের অল্প কোন জেলাতে তত নাই।

১৩২৯ বঙ্গাব্দে বাকুড়ায় 'সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অনুষ্ঠান-পত্রের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে। "সারস্বত-সমাজ জনগণের চিত্তে কর্ণ ও বর্ষণ প্রয়াসী। অন্ন-পানে দেহ রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনের ভোজ্য না পাইলে সে দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়।... কেহ কেহ অলীক আশঙ্কা করেন; মনে করেন তিনি লেখাপড়া করেন না, সারস্বত-সমাজ সরস্বতীর বরপুত্রের সমাজ। কিন্তু সরস্বতীর পূজা কে না করেন? কেমন বাতীত দেহ লইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন? আমরা জনে জনে শস্ত উৎপাদন করি না, কিন্তু আমরা সকলেই ভোজ্য। কেহ ভোজ্য আহরণ করেন, কেহ পরিবেষণ করেন।... সম্প্রতি সারস্বত-সমাজের কতৃৎ টোলের ছাত্রদিগের সংস্কৃত

পরীক্ষা হইতেছে।* কিন্তু ইহা বিপুল কার্যক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র কোণ মাত্র।"

নানা কারণে সারস্বত-সমাজ দেশজ্ঞানসঙ্কয়ে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। কিন্তু কোথায় কি আছে, কোথায় কি পাওয়া যাইবে, সে অনুসন্ধানে বিরত হয়েন নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রত্নভবন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সারস্বত-সমাজে দুই দিন বিমূঢ় হইয়াছে। আনুমানিক ব্যয় ২৫০০০/- পঁচিশ হাজার টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। ঢাকা চিত্রশালার অবৈক্ষক ('কিউরেটর') শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সহিত পত্রব্যবহার হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, বাহলা দবীর মন্দিরের আদর্শে বাকুড়া প্রত্নভবন নির্মিত হইবে। ভবনে পাঁচটি কক্ষ থাকিবে। এক দীর্ঘ কক্ষে গ্রন্থাগার, দুই সৰু কক্ষে শিলা ধাতু ও মূর্তিকার মূর্তি, এক কক্ষে পুথী থাকিবে। অপর কক্ষে নিয়োগী বসিবেন। ব্যয় এইরূপ হইবে,

ভূমি ও ভবন	...	১৩০০০/-
দ্রব্য আহরণ	...	৫০০০/-
গ্রন্থাগার	...	৪০০০/-
সজ্জা	...	৩০০০/-
		২৫০০০/-

বার্ষিক ব্যয় সম্প্রতি

অবৈক্ষক (৫০/-৫/-১০০/-)	...	৬০০/-
প্রতীহারী (১২/-)	...	১৪৪/-
অনিশ্চিত ব্যয়	...	১০০/-
		৮৪৪/-

পরে অবৈক্ষকের বেতন বৃদ্ধি হইবে, আহরণের নিমিত্ত ৫০০০/- ও গ্রন্থাগারের নিমিত্ত ৪০০০/- টাকা ক্ষয় হইলে বার্ষিক ১৫০/- এবং ৩০০/- টাকা লাগিবে। বাকুড়ায় একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ, তিনটি ইংরেজী ইকুল, একটি মেডিকাল ইকুল আছে। কিন্তু গ্রন্থাগার নাই। প্রত্নভবনের গ্রন্থাগারে দেশজ্ঞানবৃদ্ধির অমূল্য সারবান্ গ্রন্থ থাকিবে। সে কক্ষের ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরের চিত্র থাকিবে।

সমাজের আশা আছে, বাকুড়া মুন্সিপালটি ও ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড বার্ষিক ব্যয় ৮৫০ হইতে ১২০০/- টাকা দিবেন। প্রথম

* গ্রন্থের বিষয় এখন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া আড়াই শত হইয়াছে।

বায় ২৫০০০ টাকা দানশীল স্বদেশহিতেছু দান করিবেন। যিনি এই টাকা দান করিবেন প্রভুভবন তাহার নামে আখ্যাত হইবে। যিনি ৫০০০ টাকা দান করিবেন, তিনি 'গোপ্তা' নাম পাইবেন, এবং ভবনের এক কক্ষ তাহার নামে আখ্যাত হইবে। যিনি ১০০০ টাকা দিবেন, তিনি ভবনের 'পোষ্টা'; এবং যিনি ৫০০ টাকা দিবেন, তিনি 'মিত্র' নামে পরিচিত হইবেন।

ইতিমধ্যে প্রভুভবন নিমিত্ত কিছু কিছু দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কেহ কেহ এই দান লইয়া পুখী সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু পুখীকে অমূল্যনিধি মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হইবে। সমাজের নিজের

গৃহ না হইলে ধর্মরক্ষা হইবে না। পুখীর স্বামী কি দেখিয়া কাহাকে দেখিয়া তাহার বংশের ক্রমায়ত্তরিকণ কোথায় তন্ত করিবেন? কে লয়ক হইবেন? এদিকে যত দিন যাইতেছে, শিলাপ্রতিমা ও পুখীও তত নষ্ট ও স্থানান্তরিত হইতেছে। এই সন্দেহে পড়িয়া বাকুড়া শারস্বত-সমাজ বাকুড়াবাসী ও স্বদেশবাসী বদান্ত ও বিদ্যোৎসাহীর নিকটে ২৫০০০ টাকা প্রার্থনা করিতেছেন। আপনাদের শিববুদ্ধি হউক, দেশের মুখ উজ্জল হউক।

বাকুড়া
শারস্বত-সমাজ
১৩৪১ সাল, মাঘ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়,

প্রভুভবন জগন্নাথের অনুযোজক

বঙ্গের পট-চিত্র

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

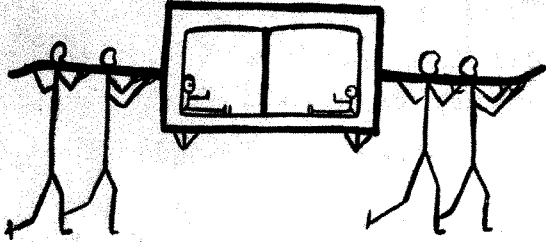
ভারতে বৌদ্ধযুগকে জাগরণের যুগ বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হইবে না, কেননা, বৌদ্ধযুগে ভারত সর্ববিধে— চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থপতি-কলায় যেরূপ উন্নত হইয়াছিল সেরূপ বিকাশ আর কোনও যুগে দেখা যায় না। এই কারণে বাংলার চিত্র-পরিচয় দেওয়ার পূর্বে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর ভারতের অন্তান্ত অংশের তুলনায় পূর্ব-ভারতেই প্রথম অধিকাংশ লোক বৌদ্ধমত গ্রহণ করিতে থাকে। এমন কি আফগানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করে তখন পূর্ব-ভারতের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ছিল। তাহারও পূর্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনেরা ইহার মধ্যে এক শত বৎসর ধরিয়া বাংলার একাংশে রাজা ছিলেন মাত্র এবং বঙ্গাল সেন যখন তাহাদের সংখ্যা

গণনা করেন তখন বাংলায় দুই হাজার বর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলা ও বিহারে রাজত্ব ব্যতীতও অন্ত অনেক দেশ তাঁহাদের অধিকারে আসে। এক শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম দীর্ঘাত্ত-প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারত যখন বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে আসে নাই তখন বাংলায় রীতিমত বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে ভিত্তি করিয়াই বৌদ্ধ সম্রাসীরা পৃথিবীর নানাস্থানে বৌদ্ধমত প্রচার করিতে থাকেন। বাংলার ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, এবং বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। (৮হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ, 'ভারতবর্ষ')।

এই সময় বৌদ্ধ শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্থপতি-কলা বৌদ্ধ ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া দৃষ্টিজয় করিতে ছুটিয়াছিল এবং ইহার

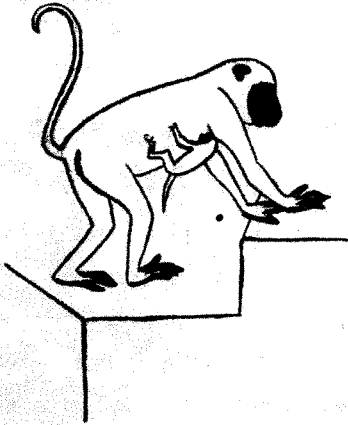
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন খ্রীঃপূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্বে হইতে খ্রীষ্টীয়
সপ্তম শতাব্দীর পর পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই সাত শত
বৎসর অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের
পুনরুত্থান পর্যন্ত বাংলা দেশ বৌদ্ধদের লীলাক্ষেত্রে



ক'নে-বউ

ছিল এবং এই বাংলা দেশের শিল্পকুশলীরা ভারতীয়
প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিল্প-বিভাগে প্রতিভার কি
পরিচয় দিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা
করিব।

খ্রীঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাল-রাজাদের



হুমান ও সম্ভান (অজন্তা)

শেষ-সময় পর্যন্ত মগধে শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয়
এবং বঙ্গদেশেই মগধের চিত্রাঙ্গার ছিল ইহা ক্রমশই
প্রমাণিত হইতেছে। পাল-রাজত্বের পূর্বে হইতেই গোড়
উত্তর-ভারতের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও বুদ্ধিষ্ণু নগর বলিয়া
বিদেশীয়গণের আকর্ষণ-ভূমি ছিল। এই সময় হইতেই
বঙ্গদেশ চারু-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে।
দেবপালের রাজত্বকালে আমরা দুই জন প্রতিভাশালী



মাতৃমূর্তি—কালীঘাট

শিল্পী ধীমান ও তৎপুত্র বীতপালের পরিচয় পাই।
ভিক্ষু তারনাথ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের
রাজত্বের সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে নিপুণ দক্ষশিল্পী ধীমান
ও তৎপুত্র বীতপাল ধাতুশিল্পে, ভাস্কর্য্যে, চারুকলায়
বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বীতপালের শিষ্য
স্বগধেই বেশী ছিল এবং ধীমানের শিল্পপদ্ধতিকে 'পূর্ব
বিভাগ' এবং বীতপালের পদ্ধতিকে 'মধ্যদেশ শিল্পবিভাগ'
বলা হইত।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় গোপাল সিংহাসন
অধিকার করেন। সেই সময়ের একখানি সচিত্র পুঁথি
পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে
রক্ষিত আছে। এই সময় তিব্বতীয়েরা উত্তর-বঙ্গ আক্রমণ
করিতে বঙ্গশিল্পের অধঃপতন শুরু হইয়াছিল। ইহার
পর একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহীপাল দেবের সময়
বঙ্গশিল্পের পুনর্জাগরণের মহতী চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই
সময়েই 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথি লিখিত হয়।
এই পুঁথিখানির চিত্রগুলি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত এবং ইহা 'এশিয়াটিক
সোসাইটি'র গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই তিব্বতীয়েরা বাংলায়

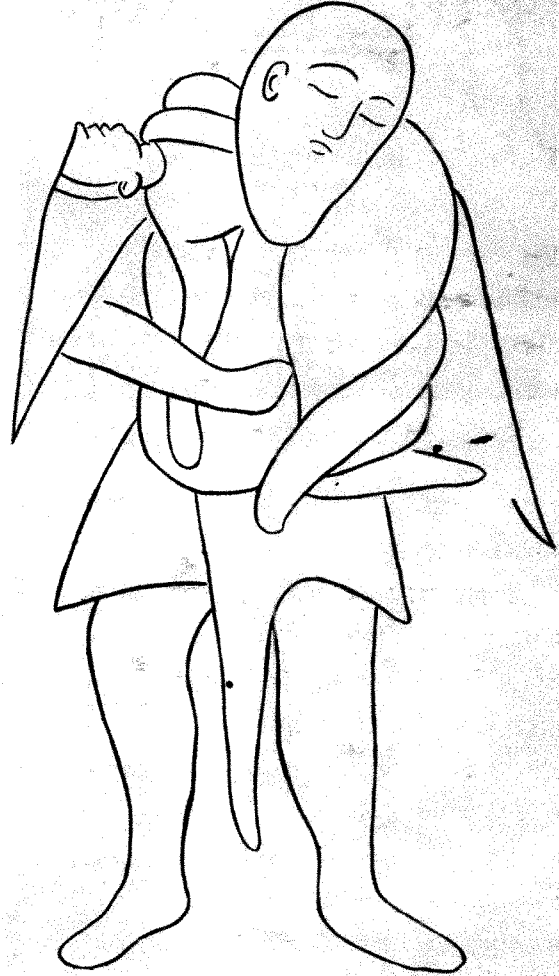


অন্নপূর্ণা—কালীঘাট

প্রবেশ করিতে থাকে এবং মহীপালদেবের রাজত্বের সময় বিক্রমশিলার প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু অতীশ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য নেপাল ও তিব্বত গমন করেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় বঙ্গশিল্প নেপাল ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এলিস গেটি লিখিয়াছেন, “বাংলায় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তৈজসপত্রে মগধরীতি অনুযায়ী যে চিত্রাঙ্কন হইত সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি তিব্বত এবং নেপালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।” * নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের গ্রন্থের† ভূমিকায় ষ্টেপলটন লিখিয়াছেন যে একাদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় ‘Pog-Sam-Zom-Zam’ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রে বঙ্গশিল্পীরা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পরে নেওয়ার ও তিব্বতীয় শিল্পীগণ এবং সর্বশেষে চীনাশিল্পী।

কেবলমাত্র স্থলপথে নয় জলপথেও বঙ্গদেশের সহিত সুদূর পূর্বখণ্ডের বহু পূর্ব হইতেই বোঁগাযোগ ছিল। বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত, চট্টগ্রাম, সাতগাঁ প্রভৃতি হইতে বহু প্রকার বঙ্গপোত সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান,

মালয় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিত।* চতুর্থ শতাব্দীতে ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্ত বন্দরের ত্রীবৃদ্ধি দেখিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর এখানে থাকিয়া তিনি তাম্রলিপ্তের একখানি পোতে চৌদ্দ দিনে সিংহলে পৌঁছেন। ইহার আড়াই শত বৎসর পরে হুয়েন-সাং আসিয়াও তাম্রলিপ্তকে একটি সমৃদ্ধ নগর বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। হুয়েন-সাঙের পরবর্তী



সতীর দেহত্যাগ—কালীঘাট

ইং-সিংও তাম্রলিপ্ত বন্দরে নিশ্চিত পোতে চীনে প্রত্যাগমন করেন। এই ভাবে বঙ্গ-প্রভাব চারি দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। রাধাকুমুদ বাবুর *Indian Shipping* গ্রন্থে লিখিত আছে যে জাপানের হরিউজি মন্দিরে রক্ষিত কয়েকখানা

* *The Gods of Northern Buddhism.*

† *Iconography of Buddhist and Brahminical Sculptures in the Dacca Museum.*

* রাধাকুমুদ যুগোপাধ্যায়ের *Indian Shipping and Maritime Activities from the Earliest Time* দ্রষ্টব্য।



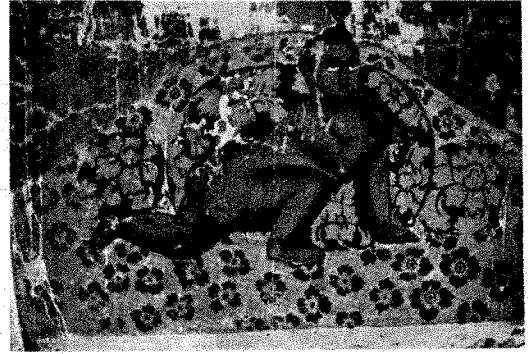
দ্বিতীয় সৌপাল্যের রাজত্বকালীন রঞ্জিত পুঁথি (ব্রিটিশ মিউজিয়াম)

জাপানী ধর্মগ্রন্থের বর্ণমালা একাদশ শতাব্দীর বাংলা অক্ষরের অনুরূপ।

ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত পোগান মন্দিরের গাত্রে অঙ্কিত ফ্রেস্কো চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, “এই ফ্রেস্কো চিত্রাঙ্কন-রীতির সহিত বাংলা ও নেপালের একই প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের রঞ্জিত পুঁথি (নেপাল ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ), এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি (নেপাল ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৪৬৪ এবং ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কেম্ব্রিজের রক্ষিত পুঁথি (বাংলা একাদশ শতাব্দীর, বোষ্টনে রক্ষিত পুঁথি) প্রভৃতি বিচার করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।”† আবার ভিক্ষু তারনাথও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের সময় হইতেই নেপালের শিল্প বঙ্গশিল্পের দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের বর্তমান রূপ অতীতই প্রথম প্রবর্তন করেন। তখন তিব্বতের শিল্পও পালশিল্পদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। আমরা

নেপাল ও তিব্বতের মন্দির-গাত্রে লঙ্ঘন চিত্র ও সমসাময়িক বঙ্গচিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পর পালেরা মাত্র কয়েক পুরুষ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পালরাজা মদন পালের সময় হইতেই বঙ্গদশ বার-বার বিদেশীগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে থাকে। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেনেরা বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এত দিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেরা শান্তিতেই পরস্পর বাস করিতেছিলেন, কিন্তু সেন রাজাদের সময় হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই সব কারণে বোধ হয় বঙ্গশিল্পীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া



গোপাল

সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। আমাদের মনে হয় কাংড়া-উপত্যকার শিল্পীরা ইহাদেরই বংশধর। কাংড়া-শিল্প বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহার বিধ-বস্তু, বর্ণবিভাস ও মুষ্টি-রচনা বঙ্গশিল্পের একই ধাঁচে গঠিত। যদিও ইহাতে রাজপুত শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা সম্ভবপর, কেন-না, তদ্বদেশে বসবাস করিয়া রাজপুত শিল্পীর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন ছিল, তথাপি তাহাদের চিত্রাঙ্কনে বঙ্গশিল্পের ধারা যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুর আছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, দেবপালের রাজত্ব উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং ত্রিযুক্ত জে. সি. ফ্রেঙ্ক মহাশয়ের গ্রন্থে ইহার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

“লেখক যখন পাঞ্জাব ‘হিল’ স্টেটে ছিলেন তখন তিনি পালবংশ-সম্পর্কীয় একটি কোতুলোদীপক ও অপ্রত্যাশিত প্রবল প্রবাদ শুনিতে পান যে হুকেত, কাওনখল, কাছওয়ার, মুণ্ডি প্রভৃতি স্টেটের মূপতিগণ বাংলার গৌড়-রাজবংশোদ্ভূত। এই সব প্রাচীন রাজপুত রাজবংশের

† History of India and Indonesian Art, p. 172.

প্রবাদগুলি শক্তিশালী ও নিভুল বলিয়া পরিগণিত। কথিত আছে যে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'কাহন পাল' একদল ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া রাজ্যস্থাপনার্থ ঐ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতে আসিয়াছিলেন এবং তখাকার রাজবংশের কুমার ছিলেন।”*

ইহা ছাড়া গভর্ণমেন্টের গেজেটিয়ারেও লিখিত আছে—তদ্বংশীয় অনেক নৃপতি পালবংশোদ্ভূত এবং তাঁহারা এখনও উহা বলিয়াই পরিচয় দেন।†

পূর্বেই বলিয়াছি পাল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয়েরা বঙ্গদেশ বার-বার আক্রমণ করিতেছিল এবং সেন-রাজত্বের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানে বাংলার শিল্পে এক নূতন প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করেন এবং প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈনধর্ম হুদূর পশ্চিম-বাংলার প্রধান ধর্ম ছিল, এই সুযোগে মানসিংহের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জয়পুর-পদ্ধতি বাংলার শিল্পে অতি সহজেই স্থান করিয়া লইল। বোধ হয় বাংলার শিল্পে মুসলমান পদ্ধতি নাই বলিলেও অতুক্তি হইবে না, তবে পরবর্তী সময়ে বাংলা দেশ ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই।

তাহা হইলে আমরা চিত্রকলা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে বাংলার সমগ্র শিল্পকে বিশেষভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের ধারা, এবং দ্বিতীয় ধারাটি জয়পুর শিল্পের সংমিশ্রণ। ইহার মধ্যে আবার বাংলার শিল্প-পদ্ধতি, দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হুদূর পশ্চিম-বাংলার শিল্প-পদ্ধতি আর একটি খাস বাংলার

শিল্প-পদ্ধতি এবং বাংলার সমগ্র শিল্প-বিভাগকে আমরা এক কথায় পট-চিত্র বা চিত্র-পট বলিতে পারি। কেন-না, বাংলায় পাহাড়-পর্বতের অভাবে কোন শিল্পীই স্থায়িতাবে কোন চিত্রাঙ্কন করিয়া বাইতে পারেন নাই।



বঙ্গহরণ

তার পর বাংলার মন্দিরগুলি অধিকাংশই মুসলমান এবং এই সব মন্দিরেরও অস্তিত্ব বেশী দিন থাকে না, এইরূপ বহু অসুবিধার জন্য বাংলার চাক্রচিত্র জনসাধারণের শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

খাস বাংলায় সাধারণতঃ আচার্য্য এবং পাল, এই

* Art of the Pala Empire, p. 91.

† দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' দ্রষ্টব্য।



অষ্টমাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা
(ফুশের পুস্তক হইতে গৃহীত)

দুই শ্রেণীর শিল্পীরাই চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন। আচার্য্যেরা সাধারণতঃ জড়ানো পট, চালচিত্র, কুল, পিড়ি ইত্যাদি এবং পালেরা লক্ষ্মীসরা, পুতুল ও দেবদেবীর প্রতিমাগুলি চিত্রিত করিয়া থাকেন। পাল-শিল্পীরা মূর্তি ভিন্ন অল্প কোন বস্তুর উপর স্বপ্রণোদিত হইয়া অঙ্কন করিতে প্রায়ই অক্ষম। ইহার কারণ বোধ হয় তাঁহারা বহু দিন হইতেই উৎসাহের অভাবে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তী কালে পূজা-পার্বণে শুধু মনায়-মূর্তি গড়িতে গড়িতে বর্ণবিভাস একেবারে ভুলিয়া যান। তাঁহাদের হস্তাঙ্কিত চিত্র মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা বার্থ অনুকরণের চেষ্টা মাত্র এবং এই রচনার মধ্যে নিম্নশ্রেণীর কৃত্রিমতা ভিন্ন অল্প কোন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না।

আচার্য্যদের চিত্রগুলি অনেক উচ্চ স্তরের এবং ইহাদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে অনাবিল সৌন্দর্য্য রক্ষিত আছে। চাহিদা এবং উৎসাহের অভাবে তাঁহারা বর্তমানে জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিলেও বংশানুক্রমিক চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি-গুলি এখনও শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং নিজেদের অল্প কোন উপাধি থাকিলেও অমুকচন্দ্র আচার্য্য বলিয়াই পরিচয় দেন। আচার্য্যদের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কালীঘাটের পটুয়ারা প্রাচীনকালে চিত্রাঙ্কন করিতেন এবং তাঁহারা বর্ণবিভাস অপেক্ষা রেখা-সমন্বয়-চিত্রে অতি চমৎকার মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর

প্রথম ভাগে কালীঘাটের প্রতিভা জীবন্ত সৃষ্টিতে আনন্দ ও স্ফূর্তি পাইয়াছিল, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাশ্চাত্য প্রভাবে কালীঘাটের শিল্পীরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠেন। তাঁহারা সত্য জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ দৈনন্দিন জীবনের ব্যঙ্গচিত্রগুলি আঁকিতে আরম্ভ করেন। যদিও চিত্রের দিক হইতে বিচার করিলে এই সব ব্যঙ্গচিত্রে বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় পাই না, তথাপি সেই সময়ে শিল্পীদের এই চিত্রগুলি মুক ও বধির জনসাধারণকে কথা বলাইতে শিক্ষা দিয়াছিল এবং এই সব চিত্রাঙ্কনে স্পষ্ট নির্দিষ্ট ভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও তাহাদের প্রকাশে একটি কোমল পেলবতা ও শ্রী মণ্ডিত আছে।



কেথি জ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি
(ফুশের পুস্তক হইতে গৃহীত)

ওদিকে হুদুর পশ্চিম-বাংলায় পটুয়ারাই প্রধান শিল্পী। এই শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে খাস বাংলার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির একটি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখানকার চিত্রাঙ্কনের প্রধান উপাদান ছিল পুঁথির পাটা। এই সময়েই পুঁথির পাটার উপর রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পৌরাণিক ও বৈষ্ণবীয় ঘটনাবলী চিত্রিত হইতে থাকে। পুঁথির ভিতরকার বিষয়বস্তুগুলি তাঁহারা এই পাটার উপর প্রতিকলিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ তেরেট বৃক্ষের পত্র কিংবা পুঁথির পাটাতে ময়দা, খোল, বেল, বাবলার আঠার লেপন দিয়া চিত্রাঙ্কন করা হইয়া থাকে। এই পাটার চিত্রাঙ্কন-

পদ্ধতি আবার দুইটি শ্রেণীভুক্ত। একটি জয়পুর-শিল্পের সংমিশ্রণ এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অত্রটি উড়িয়া-পদ্ধতি। বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন গঙ্গা-বংশীয় হিন্দু রাজারা এই সব অঞ্চল জয় করেন তখন হইতেই উড়িয়া-পদ্ধতি এখানে স্থানলাভ করে এবং ঐ সময়েই ত্রিচৈতন্যদেবের নীলাচল-ভ্রমণে বঙ্গ ও উড়িয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

অবশ্য সর্বত্রই বে এ-কথা সত্য তাহা বলা চলে না। অথুনা আবিষ্কৃত বীরভূমের পটগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহাতে খাস বাংলার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ হয়ত এই পট-শিল্পীরা খাস বাংলার প্রভাবে পরবর্তী কালে আসিয়াছিলেন, নতুবা খাস বাংলা হইতে যে-কোন কারণে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম-বাংলায় গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। যদিও বর্তমানে ইহাদের অনেকে মুসলমান, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের নাম বাদব, কান্তিক, গণেশ প্রভৃতি এবং ইহারা যে দুই এক পুরুষ পূর্বেও হিন্দু ছিলেন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। (ত্রিযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রণীত 'পটুয়া')

এই অঞ্চলের পটুয়াগণ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত লম্বা কাপড়ে পাতলা মৃত্তিকা লেপনের উপর কাগজ আঁটিয়া রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি চিত্রিত করিয়া থাকেন এবং রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার পট পরিবর্তন সময়ে স্বরচিত গান করিয়া চিত্রিত বিষয় জনসাধারণের সম্মুখে ফুটাইয়া তোলেন।

সুদূর বাংলায় এখনও এইরূপ ধরনের চিত্রিত পটের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু খাস বাংলায় এইরূপ জড়ানো পটের দুই-এক জায়গায় সামান্য প্রচলন থাকিলেও ইহার চলন বহু পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় খাস বাংলার মুসলমানাধিক্য। তাহাদের সম্মুখে রামায়ণ মহাভারতের গান গাহিয়া চিত্রপট দেখাইয়া রোজগার করার বিপদ আসিতে পারে বলিয়াই ধীরে ধীরে জড়ানো পটের প্রচলন খাস বাংলায় থামিয়া যায়। এই জড়ানো পটের অনুরূপ গাজির পটের প্রচলন আজকাল খাস বাংলায় দেখিতে পাই। পশ্চিম-বাংলার পটশিল্পে অনেক পটুয়া আবার আজকাল পটের শেষভাগে সামাজিক

রহস্যমূলক চিত্র এবং যমালয়ের দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

পুঁথির পাটার উপর চিত্রাঙ্কনের সময় হইতেই আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশে প্রতিকৃতি-অঙ্কনের প্রবর্তন হয়। এই সময় শুধু রাধাকৃষ্ণের নয় নিমাই ও তাহার শিষ্যমণ্ডলী প্রভৃতিরও প্রতিকৃতি পাটার উপর অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ত্রিযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:—

হরিবংশের চিত্রলেখা আদি যুগের চিত্রকরী। আগ-জ্যোতিষ-পুরের বাণ-রাজার কন্যা উষা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র কামদেবের পুত্র অনুরুদ্ধকে দেখিয়া প্রেমে পতিত হন। এই স্বপ্ন-দৃষ্ট তরুণ হৃদয় রাজকুমার কে তাহা তিনি কিছুতেই জানিতে না পারিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন। তাহার সখি চিত্রলেখা তখন ভারতীয় তৎকাল প্রসিদ্ধ যাবতীয় তরুণ রাজকুমারের চিত্র অঙ্কন করিয়া কুমারী উষার নিকটে উপস্থিত করেন। তদ্ব্যভায়েই উষা সহজেই অনুরুদ্ধকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। হরিবংশের পূর্বে মহাযজুর্ভিত্তিক অবিবর্তিত প্রতিকৃতি অঙ্কনের কথা বোধ হয় আর কেহ বলেন নাই। চিত্রলেখার সময়ে এবং তাহার পূর্বে হইতে যে একশ্রেণী চিত্র-বিদ্যায় বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এই বিবরণ হইতে তাহা অনুমিত হয়।

এইরূপ বঙ্গ-কনের চিত্র আঁকিয়া দেশ-বিদেশে ষটক বিবাহ স্থির করিতেন। এতৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালার বহু দিনের কিংবদন্তী আছে। প্রাচীন পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় বহু পল্লী-হস্তার চিত্র লইয়া ষটকেরা দেশ-বিদেশে আনাগোনা করিতেন। কথিত আছে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমও এই নিদর্শন হইতেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় এই কথা পাওয়া যায়। পূর্বরাগের প্রথমাংশের নামই 'চিত্রদর্শন'।

কি চিত্র বিচিত্র মরি দেখাইল চিত্রকরী, প্রাণ মম নিল যে হরি।
বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট, মোরা বলেছিলাম সে বড় লম্পট।
প্রভৃতি বহুবিধ গান বৈষ্ণব কবিগণ রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগেও এরূপ চিত্রাঙ্কনের দ্বারা পাত্র-পাত্রীর মন আকর্ষণ করার রীতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান কিরোজ ধাঁ বানিয়াচলের দেওয়ান-কুমারী সখিনার চিত্র দেখিয়া যুগ্ম হইয়া কুমারব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'কিরোজ ধাঁ' নামক পল্লী-গীতিতে তাহা দৃষ্ট হয়।

চণ্ডীদাসের,

হাম সে অবলা, সরলা অথলা, ভালমন্দ নাহি জানি।

বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাও আনি।

(বৃহৎ বঙ্গ পৃ. ২৩৮)

ইহা ছাড়া বাংলা দেশে আর একটি শিল্পধারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ ঘরে ঘরে সময়-অসময়ে আঁকা হইয়া থাকে, ইহার কোন একটি সুনির্দিষ্ট বস্তু নাই। চাউলের গুঁড়া অথবা সিন্দূর দিয়া আঙুলের ডগায় অথবা নেকড়া দিয়া এই সব চিত্রাঙ্কন করা হইয়া থাকে। পাকীতে ক'নে-বউ স্বামীর সহিত ঋগুরবাড়ি যাইতেছে, এই ছা-

খানিতে দুই-একটি রেখার টানে বেহারাদের পায়ের গতি দেখান হইয়াছে। এই ধারার শিল্প যে এখনও জীবিত আছে তাহার কারণ বোধ হয় ঘরে ঘরে ইহার প্রচলন এবং দৈনন্দিন জীবনের দেখাশুনা লইয়া চিত্রগুলি আঁকা হইত। কোন স্থপতি শিল্পীর হাতে এই এক চিরন্তন গড্ডলিকা প্রথার আঁকা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আজকাল এই শিল্পের ধারা বাংলা হইতে এক রকম উঠিয়া যাইতেছে, তবে শিবহুগাঁ প্রভৃতি চিত্র পূজানুষ্ঠানে আঁকিতে হয় বলিয়াই ইহার প্রচলন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গেল বাংলার মোটা-মুটি শিল্পের ইতিহাস। এখন আমরা চিত্রগুলি বিচার করিয়া দেখিব এই ইতিহাসের সঙ্গে ইহাদের সামঞ্জস্য কতটুকু আছে।

আমরা কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত ‘অন্নপূর্ণা’ চিত্রখানিতে দেখিতে পাই—পট-ভূমিকাশূন্য শুধু রেখা-চিত্রে বিরাট কল্পনাকে রূপ দিবার অজুত পরিচয় শিল্পী এখানে দিয়াছেন। চিত্রখানিতে শিল্পী রেখাটানের নৈপুণ্যে এক অমিষ্টময়ী ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলার শিল্পীদের বরাবর এই দিবাচন্দ ও জীবনগতির উপর লক্ষ্য ছিল। ‘অন্নপূর্ণা’ চিত্রখানিতে শিব ভিখারীর বেশে ছয়ারে ছয়ারে ভিক্ষা করিয়া রিক্ত হস্তে সতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সতীও তাঁহার সর্বভাগী উমানাথকে দেখিয়া ভিক্ষা দিতে তুলিয়া গেলেন, দুই জনেই আজ একে অন্তের মধ্যে আত্মহারা। শিবের ব্যাঘ্র-চর্শ্ব খসিয়া পড়িয়াছে, চোখের পলক নাই, তিনি আজ সর্বভাগী আত্মভোলা মহেশ্বর।

কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত ‘মাতৃমূর্তি’ এবং আচার্য্যদের অঙ্কিত ‘বস্ত্রহরণ’ চিত্র দুইখানিতেও বাংলার শিল্পীদের মৌলিক কল্পনার প্রসার কতদূর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি। গো-দেহীনের সময় সন্তান হুধ খাইতে আসিয়াছে। উহা দেখিয়া হেলে মায়ের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হুধ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েকটি রেখায় এইরূপ অসাধারণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে বাঙালী শিল্পীরাই পারিত। অজন্তার আমরা এইরূপ কয়েকটি মাতৃমূর্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই এবং অজন্তার শিল্পীরা “হনুমান ও তাহার সন্তান”—এই মাতৃমূর্তি চিত্রখানিতে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলায় অন্তান্ত পশুপক্ষী হইতে গোমাতার

চিত্রই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এখন গল্প তাহার সন্তানকে হুধ দিতে দিতে আদর করিতেছে, শিল্পী এই ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

“বস্ত্রহরণ” চিত্রে (এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত একখানি বস্ত্রহরণ চিত্র ত্রিযুক্ত গুরুসদয় দত্ত *Journal of the Oriental Society of Art* পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন, উহার বিষয়বস্তু এই চিত্রখানি হইতে আরও উৎকৃষ্ট) জলটা বড় কথা নয়, গোপিনীদের স্নান করাটাও সর্বস্ব নয়; বস্ত্র তাহাদের চুরি গিয়াছে, এখন তাহারা নিরাভরণ এই সমস্তাই প্রবল। এখানে শিল্পী তাহাদের এই অসহায় ক্ষুদ্র অভিমান খুব সামঞ্জস্য রাখিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলার সূত্রধর, মালাকরেরাও কিছু কিছু চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন, তবে উহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলার চিত্রশিল্প ধীরে ধীরে এইরূপ একটি বিশেষ ভাবে মূর্তি লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য-বহুলতা ও কমনীয়তাই এই শিল্পের বিশেষত্ব। বঙ্গশিল্পের একটি চিত্রাঙ্কন-রীতিতে মূর্তিগুলির মুখ, হাত, পা দুইটি দীর্ঘ রেখার দুই পার্শ্বে তুলি দিয়া রঙের নিটোল টানে অঙ্কিত এবং ইহাতে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কমনীয়তা ফুটয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ মূর্তিগুলির বক্ষ উন্মুক্ত, শুধু কটিদেশ বস্ত্রাবৃত এবং উহাও আবার মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে পূর্ণ। এই পদ্ধতির সঙ্গে অজন্তার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির একটি পরস্পর একা ভাব লক্ষিত হয়। প্রিক্লিথ সাহেব তাঁহার অজন্তা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে, ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, “অজন্তা-গুহার কতকগুলি চিত্রে মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতি ঠিক বাঙালীর মত।” যদিও অজন্তার চিত্রগুলিতে মুকুট, সিংহী, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তাজাল, মেথলা, কাঞ্চী, রাক্ষুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য অলঙ্কার চিত্রিত দেখিতে পাই এবং বাংলার পটচিত্রে ইহার অঙ্কন যদিও কম, তথাপি বাংলার মূর্তি-মূর্তিতে এইরূপ বহুপ্রকার বেশ ও অলঙ্কারের প্রচলন আছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ মূর্তি-মূর্তিতে এই পদ্ধতিগুলি এখনও সুস্পষ্ট আছে। এই বিষয়ে ত্রিযুক্ত অসিতকুমার হালদার অজন্তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

“আশ্চর্য্য বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাংলা দেশের প্রচুর

আভাস পাই। প্রথমতঃ আমরা গুহার নিকটবর্তী দূরবর্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিই মাটির ছাদ, অজস্তার ছবিতে অবিকল বাংলার খড়ে-ছাওয়া আঁচালা। সে দেশের লোক নারিকেল গাছ চোখে দেখে নি, কিন্তু ছবিতে নারকেল যথেষ্ট। বঙ্গদেশে বাঁড়ের দেহের তুলনায় তাহার স্বকৃষ্টি যতটা বেশী উঁচু দেখা যায় অল্প কোন দেশে সে রকম দেখা যায় না। অজস্তার ১নং গুহার বাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের বাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যে সকল চিত্র দেখা যায়, অজস্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কন-পদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজস্তার মত অল্প উৎকৃষ্ট না হলেও) একটা অভূত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের দুর্গা-প্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজস্তার নিয়মেই গোবর-মাটির জমির উপর সাদা রং দিয়া তার উপর আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজস্তার রেখাকোশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখলেই অজস্তার শিল্পীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।*

বাংলার পট-শিল্প ও অজস্তার চিত্রাঙ্কন-রীতিতে রেখার সুস্পষ্টতা ও অঙ্কন-নিপুণতা একই সাদৃশ্যে পূর্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় বাংলার নায়ক-নায়িকার সুলভ ও কমনীয় ভঙ্গীর প্রকাশ অজস্তার চিত্রকেও ছাপাইয়া যায়। বাংলার এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত সমস্ত চিত্রই বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা ক্রেস্কো-ধরণে অঙ্কিত। এমন কি ‘অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’ প্রভৃতি পুঁথির ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকেও বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। ভার্ডেনবার্গ ‘রূপম’ পত্রিকার ১৯২০ সনের জানুয়ারীর প্রথম সংখ্যায় এই পুঁথির চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

“মূর্তিগুলির সহজ ও মাধুর্যমণ্ডিত ভঙ্গী ও তাহাদের দেহের অলঙ্কার-সজ্জা এবং বেশ-ভূষার অঙ্কন রীতি, অজস্তার যে পদ্ধতির সহিত আমরা পরিচিত উহার সহিত মিলিয়া যায় এবং স্থাপত্য-শিল্প ও বুদ্ধাদি অঙ্কনের পদ্ধতিও অনুরূপ।

‘রূপম’ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমাদের লক্ষ্য করাইয়া দেন যে ঐসব ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র পুস্তক-প্রসাধনের কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি নয়, উহা বৃহৎ চিত্রাঙ্কনের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র।” (১০ পৃষ্ঠা)

ওদিকে আর একটি বিভিন্ন পদ্ধতির চিত্রগুলিতে, বিশেষতঃ পুঁথির রঞ্জিত চিত্রে, এইরূপ নিটোল ভাবের অভাব আছে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা পূর্বেই উল্লেখ

করিয়াছি। এইরূপ পদ্ধতিতে অঙ্কিত মূর্তিগুলির বস্ত্রগুলি সাধারণতঃ মূর্তির পাদদেশ স্পর্শ করে এবং ইহার বিস্তারিত হইয়া মূর্তিতত্ত্বস্থ খুঁটিনাটি প্রকাশিত হইত। স্ত্রীমূর্তিগুলির বক্ষে আভরণ, দেহ কিংবা মস্তক চাদরাবৃত এবং এই শিল্প-পদ্ধতির বাহিরের রেখা কঠোর, রং প্রখর ও পার্শ্বিক দৃশ্যের মধ্যে কেমন একটা ভাবের দীনতা সুস্পষ্ট আছে। এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে শিল্পীরা রাজপুত ও জয়পুরী অতুল্য রং ফলানোর অনুকরণে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেন। বাংলার খাঁটি চিত্রের পট-ভূমিকার সাধারণতঃ প্রধানতম রং হিঙ্গুল ছিল। বোধ হয় ইহা সূর্য্যের রক্তাভ বর্ণকেই চিহ্নিত করে এবং বঙ্গ-শিল্পীর চিত্র-পটের এই বর্ণবিস্তার অতীব নয়নমগ্নকর। এই সব ওস্তাদ শিল্পীর হাতের রং এমন আশ্চর্য্য গভীর ও পাকা যে প্রায় তিন-চারি শত বৎসরের অবস্থ ও অনাবধান নাড়া-চাড়া সত্ত্বেও এখনও নূতনের মত উজ্জ্বল ও অটুট আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার চাক্ষুশিল্পের অধঃপতন শুরু হয় এবং চিত্রকরেরা সাহাব্যের অভাবে নান্য হইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপার্জনের উপায় অবলম্বন করিতে থাকে। এইরূপে চর্চ্চা ও উৎসাহের অভাবে বাংলায় চিত্র-শৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। বর্তমানে বাংলা দেশে ইহাদেরই এক-আধ জন বংশধর পূর্ব-পুরুষের শিল্পকলা নকল করিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে স্বকীয় কোন বিশেষত্ব বা আত্মশক্তির কোন পরিচয় পাই না, শুধু তাহার পূর্বপুরুষের চিত্রাঙ্কন-রীতির ধারাটাই চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।*

* বঙ্গশিল্প-সংগ্রহ নিম্নলিখিত সংগ্রহে আছে :—

শ্রীগুরুসদয় দত্তের সংগ্রহ—১৯১৩ সনের সংগ্রহ—বর্তমানে ইহা ত্রিপুরাধিপতির সংগ্রহে আছে। অঙ্কিত ঘোষের চিত্রশালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৪ সনের সংগ্রহ—বর্তমানে ইহার কয়েকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। বঙ্গীচরণ আচার্য্য, বাংলার এই লুপ্ত শিল্পের বঙ্গীচরণ আচার্য্য, বামাচরণ আচার্য্য এবং ইহা চিত্রাঙ্কন-রীতি আছেন।

বৈরী

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

১

“শিকল-দেবার ঐ যে পূজা-বেদী

চিরকাল কি স্থাইবে থাড়া?”

এই ত সেদিন মহাযুদ্ধের অবসান হ’ল, এখনও তার বিভীষিকা ইউরোপের ঘরে ঘরে ত্রাস সঞ্চার করে, আবার রণ-ভেরীর গভীর নিনাদ মহাদেশ কম্পিত ক’রে তুলল—প্রবল ফরাসীবাহিনী চলেছে জার্মানীর শিল্পক্ষেত্র রুসু অধিকার করতে। নিরস্ত্র জার্মানী শঙ্কিত হ’য়ে উঠল।

১৯২৩ সাল জাহ্নবারীর দ্রুত শীতে রাইন নদের বিপুল জলপ্রবাহ জমে বরফ হয়ে গেছে, হয়ত নিরস্ত্র জার্মান জাতির রঙীন জীবন-প্রবাহের একই দুর্দশা হ’তে চলেছে,—তার জংঘন রুসু-ই যে ফরাসীর অধীন হ’তে চলল!

রুসু-অভিযাত্রী ফরাসীবাহিনীর পথে পড়ে বিখ্যাত শিল্প-নগর ডুসেল্ডর্ফ। রাইনের পশ্চিম তীরে তিন নম্বর রেজিমেন্ট লুকুম পেল ডুসেল্ডর্ফ দখল করতে হবে, তারা রওনা হোক! অমনি আরম্ভ হ’ল রেজিমেন্টের রওনা হবার তোড়জোড়,—বিগেল বাজে, ডেপাডাণ্ডা ওঠে, সারি সারি মোটর লরি ও ভারি ভারি কামানের গাড়ী ঘর-বাড়ি কাঁপিয়ে বরফ কেটে কেটে চলে, চারিদিক ধ্বনিত হয় সৈনিকদের পদচারণ-ধ্বনি ও কুচ-কাণ্ডের সামরিক নির্দেশ এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রণবাদ্যের “ইএস্”-এর উদ্ভাস্ত স্বর উচ্ছল হ’য়ে অতুল কলরব তুব্বারমণ্ডিত দুই কুল ভাসিয়ে দেয়।

কিন্তু সৈনিকদের হাতের তালুতে হাতের প্রাচুর্য বশ্-ভীতি—স্প্যানীরা সার্জেন্ট-মেজর লাক্-এর হাতে ছুটে এসে টেবিলের মধ্যে চেপে

ধ’রে চীৎকার ক’রে উঠল, “কেতে!—কেতে!!” তার পরই একবার ছুটে যায় একটা ব্যাগে জিনিষপত্রের ভরতে, সেটা ফেলে আবার ছোটে তার জামাকাপড় ঝাড়তে, সেগুলো ফেলে আবার অস্থির হ’য়ে হুক করে তার জুতোজোড়া ঝাড়তে, আর মাঝে মাঝে টেবিলের কাছে ছুটে এসে সেই ছবিটাকে পাগলের মত চুমু খায়।

এই দেখে সেই ঘরেরই বাসিন্দে হুলকায সার্জেন্ট-দ্রাপ্ অবাক হ’য়ে জিজ্ঞাসা করল, “ব্যাপার কি হে?” লাক্ উল্লসিত হ’য়ে বলল, “আরে জান না?—লুকুম হ’য়েছে ডুসেল্ডর্ফে রওনা হবার!” এবং হঠাৎ দ্রাপ্-র সেই বিশাল দেহ আঁকড়ে ধ’রে অবলীলাক্রমে নাচতে আরম্ভ করল। দ্রাপ্ রেচারী যত বলে, “ছাড়ো!—আরে ছাড়ো!” লাক্-ও তত তাকে চেপে ধ’রে নাচে আর চোঁচায়, “ডুসেল্ডর্ফ—ডুসেল্ডর্ফ!” দ্রাপ্ প্রাণপণ চেষ্টায় তার হুল দেহ মুক্ত ক’রে হাপাতে হাপাতে বলল, “এ কি?—পাগল হ’লে না কি?” লাক্-এর ক্রক্ষেপ নেই, সে নাচে আর সমানে চোঁচায়! একক্ষণে সেখানে একটা ভিড় জমে গেল, সকলে হাঁ ক’রে এই ব্যাপার দেখতে লাগল। শেষে দ্রাপ্-র ইঙ্গিতে সকলে মিলে লাক্কে জাপটে ধ’রে থামাল! দ্রাপ্ জিজ্ঞাসা করল, “কি হ’ল তোমার?”

“জান না?—আমরা যে চলেছি ডুসেল্ডর্ফে!”

মুখ ভেঙছে দ্রাপ্ বলল, “ডুসেল্ডর্ফে!—তাতে কি হবে বে অমন করছ?—হবে ত শুধু বশ্-এর হাতে অজ্ঞা পাওয়া, তার জন্তে আমাকে হুজু টেনে নাচা?”—অপর সকলে হেসে ফেলল।

লাক্ চীৎকার ক’রে উঠল, “তোমরা কি বুঝবে?” সজোরে তাদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে সেই ছবিটা নিয়ে বলল, “বিশ বছর পরে পাব আমার এই কেতেকে—” দ্রাপ্ বাধা দিয়ে বলল, “এই ব্যাপার!—তা ভেবে রেখেছ, এই বশ্-এর দেশে ঐ হুন্দরী বিশ বছর অমনিটি রয়েছে?”

সময়ে ফরাসীগণ করতেন।

এত দিনে অন্ততঃ উজনথানেক হজম ক'রে একটা বোকা বশ-এর কাঁধে জেঁকে বসে নি?—”

সঙ্গে সঙ্গে লাক্-এর কানে গেল সকলের একটা চাপা হাসির শব্দ। “খামো শূয়ার!” চীৎকার ক'রে হঠাৎ সে বা-হাত দিয়ে ছাপ্পের মুখ চেপে ধরল, “এই রিভলভারের বাঁট দিয়ে তোমার মুখ খেঁতলে দেব—তোমাকে—” তার ডান হাত খাপ থেকে রিভলভার টেনে বার করল, তৎক্ষণাৎ সকলে তার ছই হাত চেপে ধরল। “ছেড়ে দাও—ওকে খুন করব—” কয়েক জন তার রিভলভার ছিনিয়ে নিল। এখন লাক্-এর উত্তেজনা সীমা অতিক্রম করেছে, তার সর্বশরীর খর খর ক'রে কাঁপছে, সকলে ভয়ে তার হাত ছেড়ে দিল, সে তার বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে গুরে প'ড়ে ডুকের কঁদে উঠল।

সকলে হতভম্ব! এর চেয়ে কত মজার কথা তাদের মধ্যে রাতদিন চলে, সবাই তাতে প্রাণ খুলে হাসে—এ কি? আর লাক্-এর এত উত্তেজনা? সেই লাক্, যাকে সকলে জানত দূঢ়চেতা, স্বল্পভাবী! অনেকে অবশ্য সন্দেহ করত তার জীবনে কোন রহস্য আছে, সে হয়ত একটা দারুণ ব্যাথা চেপে রাখে, কারণ তার মুখে নিরন্তর লেগে থাকত বিবাদের গভীর রেখা! এমন কি রণক্ষেত্রের চরম উত্তেজনায় তার মুখে এই বিবর্ততার সুস্পষ্ট ছায়া হানচুত হ'ত না। হেতু জিজ্ঞাসার খোঁচা দিয়ে তার হৃদয়ে এই গভীর ব্যথার কঠিন আবরণ উন্মোচন করতে কারও কোন দিন সাহস হয় নি। কিন্তু আজ এ কি হ'ল?

ফরাসী-সৈন্য ড্রাসেল্ডর্ফ দখল করেছে। সদাহাস্তময়ী নগরী আজ বিবাদের কুজাটিকায় আচ্ছন্ন। ফরাসী কর্তৃক পাশবিক শক্তির এমন অসঙ্কোচ অপপ্রয়োগ জার্মান জাতির বক্ষে শেল বিদ্ধ করেছে। নিরুপায় জার্মান সরকার এই জুগুমের একমাত্র প্রতিকার-স্বরূপ অসহযোগ ঘোষণা করেছে। তাই কল-কারখানা কমিশ্রুত, রাস্তাঘাট জনশূন্য, আনন্দভবন সব নিরানন্দ—শহর যেন শোকাভূর! এমন কি যে-সব শসস্ত্র ফরাসী-সৈন্য চমকদার পোষাক প'রে বুক ফুলিয়ে চলা-ফেরা করছিল, তাদেরও মুখে কিসের একটা শব্দ!

এই ভীষণ পুরীর মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি পরম উৎসাহে

চলেছে রাস্তার ওপর সুপীকৃত বরফ ভেঙে—সে আমাদের মার্জেন্ট-মেজর লাক্। এতক্ষণে ছুটি পেয়ে, সে তার উৎকৃষ্ট পোষাক আর চকচকে সখের জুতা-জোড়াটি প'রে, কাঁচাপাকা চুলের বাহারে টেরির ওপর কায়দা ক'রে টুপিটি চড়িয়ে, হাতে একটা সোঁখীন ছড়ি নিয়ে বার হয়েছে। ছুটে গিয়ে হাজির হ'ল তার সেই চিরপরিচিত রাস্তায়, কিন্তু অবাধ হয়ে দেখল তার হু-ধারে নতুন নতুন অটালিকার সারি উঠেছে আর তার চালু ছাদের ওপর জমাটবঁধা বরফের টাই ভেঙে ভেঙে ফুটপাতে পড়ছে—রাস্তা জনশূন্য! তার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠল। কিন্তু বিশ বছর একটি মুখ ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-বাড়ির ছবিটাও তার মনের পটে খোদা হ'য়ে গেছে তার কি কখনও ভুল হয়? অল্প সন্ধানের পরই তার সামনে এল সেই বাড়ি।

হ্যাঁ, এই ত সেই! শুধু একটু পুরনো হয়েছে। সেই একতালার কেক আর চকোলেটের দোকান, তার সকল দেওয়াল কাঁচের, তার পাশ দিয়ে উঠেছে সেই সিঁড়ি তেতলায়! তেতলায় রাস্তার দিকে সেই জানালা এখনও ঠিক তেমনই রয়েছে, সেই রঙ, সেই কাজ, সেই পর্দা। এমন কি তার ওপর বরফও জমেছে ঠিক পূর্বের মত! ফটকের ফ্রেমে তেতলার রীড়বেলের বোতামটা সে তাড়াতাড়ি টিপল—একবার হু-বার আড়াইবার—ঠিক পূর্বের সংক্ৰমণ। আশা এখনি ঐ রঙীন পর্দা সরে যাবে, ঐ জানালার কাঁচ ধীরে ধীরে খুলে যাবে, ঐ বাতায়নে এখনি ফুটে উঠবে সেই স্মিত সুচারু আনন, সেই ভীত কুরঙ্গনয়নের চকিত বিলোল চাহনি—তার কানে সুধা ঢালবে সেই মিষ্ট মন্দির সন্বেদন—তার শিরায় শিরায় উদ্বেলিত হবে সেই উন্মত্ত জাগরণ। তার সারা সন্তায় লীলায়িত হবে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-প্রাণের সেই উদ্যম আলোড়ন।

কিন্তু এ কি? কি হ'ল? সাড়া নেই কেন? ঐ পর্দা ত কই সরছে না, ঐ জানালা ত কই খুলছে না—অনেক ক্ষণ যে কেটে গেল! আবার ঠিক সেই রকম ক'রে বোতাম টিপল—অনেক ক্ষণ জানালার দিকে চেয়ে রইল—তবু কোন সাড়া নেই?

তবে? হয়ত তার জানালার কাছে আসতে ভয় হ'চ্ছে।—বদি সে ভুল শুনে থাকে? আগেও হয়ত কতবার অমন হয়েছে?

আবার সেই বোতাম টিপল, কন্স রীং, কন্স রীং—ক্রিং! সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত কণ্ঠ সর্বোচ্চ স্বরে জানাতে চাইল, “আমি—আমি—আমি!”

তবু কেউ এল না? তবে? তবে সে নিশ্চয় মুর্ছা গেছে। তিন-তিন বার এ সম্বন্ধে শুনে তার সন্দেহ গেছে যুগে, অমনি এক আনন্দ-সমুদ্র উথলে উঠে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণিত ক'রে দিয়েছে—সে মুর্ছা গেছে। ছি, ছি, ছি-ই! সে কি অত্যাশঙ্কিত করেছে! আগে ওকে খবর দিয়ে প্রস্তুত ক'রে তবে তার আসা উচিত ছিল!

আর রীঙ্বেলু টিপে কি হবে ছাই! সে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা মারতে আরম্ভ করল। তবু সাড়া নেই? হঠাৎ তার হ'ল সে যে করাসী সৈনিক, তার প্রেয়সী মুর্ছিতা, ঐ জার্মান-বাড়িতে কে তাকে দরজা খুলে দেবে? সে চীৎকার ক'রে উঠল, “দরজা খোল, কোন ভয় নেই, ওগো তোমরা দরজা খোল!” আর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা-ভাঙার জোগাড় করল—তাকে তার মুর্ছিতা কেতের কাছে যে যেতেই হবে! হঠাৎ দরজা খুলে গেল, এক বৃদ্ধা ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, “সেনাপতি-মশায়, কী চান?”

“সে কেমন আছে?”

“কে?”

“কেতে—আবার কে?”

“কেতে?”

“হ্যা গো হ্যা, যে মুর্ছা গেছে!”

“কি বলছেন? ও নামেরই ত কেউ এখানে নেই!”

“তুমি জাহ্নুম যাও!” এই ব'লে লাকক্ দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল। বৃদ্ধা তার পিছু পিছু ছোট্ট আর মিনতি করে, “থামুন—কথা শুনুন—ও নামের কেউ যে এখানে নেই—তেতলায় যে রুগী থাকে—ওখানে অমন চোঁচোমোঁচ করবেন না—” লাকক্ তাঁর মত তেতলায় উঠে দরজায় ভীষণ ধাক্কা মারতে লাগল।

২

নিবিড় নিশীথ। ভূবারাচ্ছন্ন নগর নীরব—তমসাবৃত। মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসে গ্রহরীর পদচারণ-ধ্বনি—মচ্-মচ্! তাঁবুর মধ্যে ব'সে লাকক্ কত কি ভাবে! এই দশ দিন সে সর্বত্র খুঁজছে—কোথাও পায় নি তার কেতের সন্ধান। সে নিয়েছে জার্মান পুলিশের সাহায্য, তারাও কোন সংবাদ দিল না—কেনই বা দেবে, সমস্ত জার্মান জাতি যে অসহযোগী? তার বক্ষে জমেছে আঁধার নিরাশা, তার মস্তিষ্কে বিধেছে নিশ্চয় ব্যথা—সে হ'ল নিশ্চিহ্ন?

হঠাৎ যেন একটা শব্দ হ'ল—কট, কট, কট! কাঁটা-তার কাটার আওয়াজ? তার চিন্তাশ্রাব গেল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে। আবার সেই?—অতি ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট! সে মনোযোগী হ'ল। গত মহাযুদ্ধে সে চার বৎসর ট্রেঞ্চ কাটিয়েছে—এ শব্দ সে চেনে! কতবার হসিয়ার জার্মান স্নাইপার সৈন্যকে সে কাঁটা-তার কাটার অবস্থায় হঠাৎ প্রেরণ ক'রে এনেছে—তার কলে, করাসী-সৈন্তের অনেক উপকার হয়েছে—কারণ এদের কাছে শত্রু-সৈন্তের দামী খবর পাওয়া যায়—এই কারণে তার যথেষ্ট খুশি হয়েছে। তাই আজ তার এত বড় খাতির, সে রক্ত-দখলকারী করাসী-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির বাসায় গ্রহর-নায়ক সে প্রাসাদ যেন একটা দুর্গ। তার চারি ধারে দশ কাঁটা-তারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর—প্রাচীরের স্থানে স্থানে মেশিনগান—প্রধান দেউড়ির সামনে মেশিনগান—এর সারি! প্রত্যেকটির পেছনে সর্বদা-সতর্ক সশস্ত্র সৈনিক। এ ছাড়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে, ও প্রাচীরের সর্বত্র সজীন্দ্র-চড়ানো রাইফেল-কাঁধে সজাগ সৈনিক সর্বদা পাহারা দিচ্ছে। লাকক্ এই দুর্গদ প্রহরীদের চালক।

আবার হ'ল সেই আওয়াজ?—হ্যা, এ তাই! এখন দু-জায়গা থেকে শব্দ আসছে! তবে কি একটা দল এসেছে ঐ কাঁটা-তারের বেড়া কাটতে?—হ্যা, তাই! ওদের সজলকে জ্যান্ত ধরতে হবে! মেজের খড়ের বিছানায় জনকয়েক সৈন্য ঘুমিয়ে ছিল, তাদের চুপি চুপি তুলে, চুপি চুপি নানা রকমের নির্দেশ দিয়ে তাঁবুর কোণে শুপীকৃত অস্ত্রশস্ত্র নিঃশব্দে নিয়ে, আস্তে আস্তে সকলে বেরিয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিট পরে হ'ল কয়েক বার রিভল্ভারের আওয়াজ, বাইরে হ'ল তুমুল সোরগোল, কয়েক বার হ'ল রাইফেলের শব্দ, কিছুক্ষণ ধ'রে হ'ল বহু মেশিনগান্ ছোঁড়ার তীক্ষ্ণ ধ্বনি—টা-টা-টা-টা-টা—। তার পরই সব স্তব্ধ—একেবারে নিবুস।

কিছুক্ষণ পরে তাঁবুর বাইরে সৈন্তদের ফেরার শব্দ আর ল্যাক্-এর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ল্যাক্ বকতে বকতে ঢুকল, “সব মাটি হ'ল—সমস্ত মাটি হ'ল—” আর তার পেছনে পেছনে এক আষ্টেপিটে দড়ি-বাঁধা যুবককে নিয়ে সৈন্তরা ঢুকল। চীৎকার ক'রে ল্যাক্ এক কর্পোরালকে ধমকাল, “এখন লিয়াংন'কে মুখ দেখাই কি ক'রে? ওদের গেল হু-হুটো লোক পালিয়ে, তারা আমাদের তিনটেকে মারলে গুলি ক'রে, আর তোমরা না-পারলে তাদের একটাকেও ধরতে, না-পারলে মারতে? ছি, ছি, ছি-ই!

“আজ্ঞে স্যোজ'! তাতে কি হয়েছে? আপনার ধরা ছোকরার কাছেই সব খবর পাওয়া বাবে।

“তাতে তোমার কি বাহাদুরী? আমি ঐ দিকটায় গিয়ে একে নিজে হাতে না-ধরলে এও ত যেত পালিয়ে! যেখানে শুয়ে পড়ে বুকে হাঁটতে বলেছিলাম সেখানে না ক'রে বিশ হাত দূরে স্ক্রু করলে কেন? আমার হুকুম শুনলে না কেন? জান, আমার হুকুম না শুনে এই যে ভয়ানক লোকসান করালে, এর জন্তে তোমার কি শাস্তি হবে?”

“স্যোজ'! জানি! দোহাই স্যোজ'! মাপ করুন—আমাকে বাঁচান—না হ'লে আমার প্রাণ বাবে—আপনিই আমাদের মালিক—”

“থামো!—এই ছোকরা, কে তুমি?”

যুবক বুক ফুলিয়ে বলল, “জাম্বান!”

“তা আর শেখাতে হবে না, ফাজিল! নাম কি? বাড়ি কোথায়? এখানে এসে কাঁটা-তার কাটছিল কেন?”

“বদি না বলি?”

“বলবে না?—আলবৎ বলতে হবে!—বল!—বল!!”

“সত্যিই ঠিক করেছি এ-সব কিছুই বলব না।”

ল্যাক্ ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে যুবকের গালে চড় মারল।

“এই কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতির রীতি? অসহায় বন্দীর ওপর পান্থিক অভ্যাস!”

“বন্দী?—এসেছ চুরি করতে, আশা করো বন্দীর খাতির পাবে?”

“আর তোমরা বুঝি আমাদের দেশে সাধুতা করতে এসেছ?”

“তুমি বলা?—পাজি বশ্! মুখ সামলে কথা বল, না হ'লে—”

হয়ত আর একটা চড় যুবকের গালে পড়ত, কিন্তু হঠাৎ বাইরে গ্রহরীর গোড়ালী ঝুকে ও রাইফেল হাত ঝুকে সেলাম করার শব্দ হ'ল, সকলে চমকে উঠে সতর্ক হ'ল—সম্ভবতঃ কোন অফিসার আসছেন! সি-কোম্পানীর প্রথম লেফটেনেন্ট প্রবেশ করলেন, যুবক ভিন্ন সকলে ম্যাটেনশনে দাঁড়াল। লেফটেনেন্ট নাকি চশমাটা লাগিয়ে বন্দীকে কিছুক্ষণ সহাস্যে নিরীক্ষণ ক'রে বললেন, “আ!—তরুণ জাম্বান, আঁ? দারুণ স্বদেশ-হিতৈষী, আঁ?”

“তারুণ্য, স্বদেশ-প্ৰীতি এ-সব কি আপনাদের ‘লা গ্রান্দে নাসিয়ঁর’* কাছে পরিহাসের বিষয়?”

“বা!—প্রাণে বেজায় আঘাত লাগল, আঁ? দেশভক্তির মাত্রাটা তা'হলে অতি ভীষণ, আঁ? তাই দেশের জন্তে প্রাণ বিসর্জন করতে আসা হয়েছে, রূর-দখলের প্রতিহিংসা, আঁ?”

“হ্যাঁ!”

“হ্যাঁ-আঁ! সাবাশ!” [পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করে খুলে যুবকের সামনে ধরে,] “সিগারেট?”

“না।”

“আ!—তীব্র করাসী-বিদ্বেষ আঁ? স্যোজ'! ল্যাক্, খুশী হলাম, বেশ হ'য়েছে!”

“ধন্যবাদ, লিয়াংন'!”

যুবকের আশ্চর্য্য ভাবান্তর হ'ল! সে বিস্মিত হ'য়ে ল্যাক্কে নিরীক্ষণ করতে থাকল। লেফটেনেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যাঁ, হেরু পেট্রিটের নাম?”

যুবক হ'ল অধিক বিচলিত, সে শুধু ইতস্ততঃ চাইতে

* লা গ্রান্দে নাসিয়ঁ [La grande Nation] :—
The grand nation বা শ্রেষ্ঠ জাতি।

লাগল, ল্যাককে বার-বার দেখতে লাগল, কিন্তু তার বাক্যসূরণ হ'ল না।

“সে কি হের্ পেটিয়ট, ভয় হ'চ্ছে? চারি দিকে এই সব সতর্ক সেপাইদের নজর এড়িয়ে, ঐ কামান বন্দুকের জঙ্ঘল ভেদ ক'রে, অমন চর্ভেদ্য কাঁটা-তারের বেড়ায় দরজা ফুটিয়ে এই গভীর রাত্রে, এই দারুণ শীতে একা এসেছিলেন ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, আর—”

হঠাৎ ল্যাক ব'লে ফেলল, “একা নয় লিয়াৎন'ী, ওর সঙ্গে আরও দু-জন ছিল।”

“তারা কোথায়?”

“আমারই বোকামিতে তারা পালিয়ে গেছে লিয়াৎন'ী।”

“পালিয়ে গেছে?” রোবকবারিত নেত্রে লেফটেনেন্ট ল্যাক-এর দিকে তাকালেন, “পালিয়ে গেল?” ক্রোধে তাঁর মুখ আরক্ত হ'ল।

কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে বললেন, “হ্যাঁ!—মহাশয়ের এতখানি বুকের পাটা হয়েছিল, আর নাম বলতে গিয়ে সেই বুক কেঁপে উঠল!”

“আমার নাম—সীগ্‌ফ্রীড।”

“সীগ্‌ফ্রীড, হ্যাঁ? মহাবীর সীগ্‌ফ্রীড?—বা! সেই ড্রাগন-বিজয়ী জার্মান বীর পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছেন, হ্যাঁ?—চমৎকার! কিন্তু, সীগ্‌ফ্রীড কী?”

“এটি জিজ্ঞাসা করবেন না।”

“এটি জিজ্ঞাসা করব না?—কন?”

“অনুরোধ করি এটি জিজ্ঞাসা করবেন না।”

“আ!—এটি সম্পূর্ণ নিশ্চয়োজন, যদি অবশ্য হের্ পেটিয়ট ব'লে দেন, মহাশয় কোন দলের লোক, কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধান সেনাপতির সন্ধান করছিলেন, আর যে-সব মহাশক্তি পেটিয়টদের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের কি নাম—”

“আমি বিশ্বাসঘাতক নই।”

“এই খবরটুকু দিলে মহাশয়কে নাম জিজ্ঞাসা ক'রে আর বিরক্ত ত করবই না, বরং প্রচুর পুরস্কার দিয়ে এখুনি খালাস ক'রে দিব।”

“আমি বিশ্বাসঘাতক নই।”

“আ!—হের্ পেটিয়ট অকারণ ভয় পাচ্ছেন! কেউ জানবে না এ-সব খবর আমরা কোথায় পেলাম।”

“সেটা বড় কথা নয়।”

“সেইটাই আসল কথা! লোকে জানলে সব মাটি, না-জানলে আপনি ত নিষ্কলুষ স্বদেশহিতৈষী থেকেই যাবেন! চাই কি রটিয়ে দেবেন, এখান থেকে বহু ফরাসী-সৈন্য খুন ক'রে পালিয়েছেন, আমরাও তার কোন প্রতিবাদ করব না, ফলে হবে আপনার স্বদেশে অশেষ খ্যাতি, আর আমাদের প্রচুর অর্থ নিয়ে আদর্শ স্বদেশ-সেবক হিসাবে—”

“বুখা বাক্যব্যয় করবেন না!”

“হ্যাঁ!—আ! হের্ পেটিয়ট নন, ভীষণ আদর্শবাদী, হ্যাঁ? কিন্তু দুঃখের সহিত জানাতে হ'চ্ছে, এ খবর না দিলে মহাশয়ের কিছু বিপদ হবে। হয়ত বা প্রাণদণ্ড দেওয়া আমাদের অগ্রিয় কর্তব্য হবে।”

“জানি।”

“তবু কিছু বলবেন না?”

“না?—আ! আদর্শবাদের পরিমাণটা কিছু বেশী। ভাল!—শ্রেষ্ঠ! ল্যাক, এই তত্ত্বলোকের জন্তে উত্তম বিশ্রামের ব্যবস্থা হোক!”

“যে আজ্ঞে, লিয়াৎন'ী, কোথায়?”

“জেলে, আবার কোথায়! কিন্তু সাবধান, কেউ যেন ওঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে।”

“যে আজ্ঞে লিয়াৎন'ী।”

“হ্যাঁ, কাল সকালে আবার দেখা যাবে। আউফ্‌ভি-দারসেন্* হের্ পেটিয়ট। আশা করি রাত্রে ভাল ঘুম হবে, তার পর মাথা ঠাণ্ডা হ'লে এই অনাবশ্যক আদর্শবাদের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।” লেফটেনেন্ট প্রস্থান করলেন।

এর পর আরও এক সপ্তাহ অতীত হ'ল, সে যুবক কিছুই প্রকাশ করল না। সুসভ্য বৈজ্ঞানিক যুগে স্বীকার করানোর যত উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে তার সব কিছু ঐ তরুণের ওপর প্রয়োগ করা হ'ল, কোন

* আউফ্‌ভি-দারসেন্ [Aufwiedersehen] :—জার্মানীতে বহু প্রচলিত শব্দ, অর্থ পুনর্দর্শনায়।



অবাসী গ্রেস, কলিকাতা

রাধাকৃষ্ণ

[ক্রীত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতে]



ফল হ'ল না। শেষে সামরিক বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল।

কিন্তু সি-কোম্পানীর সেই প্রথম লেফটেনেন্ট তখনও হাল ছাড়লেন না। ঐ ছোকরা বশ্-এর কাছে হার মানতে হবে তার মত চতুর ফরাসী অফিসারকে? তাঁর ভীষণ স্নেহ-শক্তি বাকী মুরিশ তলোয়ারের মত ক্ষুধিত হ'য়ে উঠল, কিন্তু তার নির্মম আঘাত যুবকের জিদ বাড়াল বই কমাল না। তিনি বুঝলেন তাঁকে অস্ত্র অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। তাঁর স্ত্রেন-দৃষ্টি মাত্র যুবকের মনে একটি ছিদ্র লক্ষ্য করেছিল। মধ্যে মধ্যে যখন ল্যাক্কে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যেতেন, ল্যাক্কে দেখা মাত্র যুবকের অদ্ভুত ভাবান্তর হ'ত, যেন তাকে কষ্টে মন শস্ত করতে হ'ত, তার অপূর্ণ মানসিক গঠনের সৌষ্টব নষ্ট হ'য়ে যেত। কিন্তু তখন যুবকের ঐ কেবলমাত্র মনকে আয়ত্তে আনবার জন্যে যেই তিনি মুখ খুলতেন, অমনি শামুকের মত সেটা যেত এক কঠিন আবরণের মধ্যে লুকিয়ে, আবার তাঁর ভীষণধার স্নেহেব আঘাত পড়ত শুধু একখণ্ড ইম্পাতের ওপর।

অবশেষে লেফটেনেন্ট মনস্থ করলেন সেই চরম মুহূর্তের কিছু পূর্বে ল্যাক্কে তার কাছে একা পাঠাতে হবে। ল্যাক্কে অতি পাকা লোক, সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য। এমন ভীষণ মুহূর্তে তার কাছে যুবকের মন অধিক বিকল হবে এবং সুদক্ষ ল্যাক্কে সফল হবে।

সেদিন ভোর ছটায় সি-কোম্পানীর বিশটা রাইফেলের অলঙ্কৃত গুলি বালকের বুক ঝাঁঝরা ক'রে দেবে। তার ঠিক এক ঘণ্টা পূর্বে ল্যাক্কে এল তার ঘরের সামনে। লোহার দরজা খোলার শব্দে বালকের ঘুম ভাঙল। উঠে ব'সে, হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে সে বলল, “বুঝেছি, এখুনি প্রস্তুত হচ্ছি।” বিছানা থেকে লাফ দিচ্ছে নেমে, পাশেই স্নানের ঘরে গেল। ল্যাক্কে ঘরে ঢুকে আলো জালল। বালক ফিরে এল স্নান ক'রে, উত্তম পোষাকে ভূষিত হ'য়ে, প্রফুল্ল মনে। ল্যাক্কে দেখেই চমকে উঠে বলল, “আপনি? এ কাজও কববেন আপনি?” আশ্চর্যস্বরূপ ক'রে বলল, “ভাল! কেনই বা তা না হবে? চলুন, আমি প্রস্তুত।”

“আমি এসেছি তোমাকে বাঁচাতে।”

“বাঁচাতে? ও বুঝেছি! আপনি চান, শেষ মুহূর্তেও

আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে, অর্থ-পুরস্কার দেওয়া হবে, যদি ঐ হীন কান্ন কবি।—না, এমন কুৎসিত প্রস্তাব আপনি মুখে আনবেন না!”

“কিন্তু কেন?—”

“ও প্রসঙ্গ আর তুলবেন না। আমার প্রতি আপনার শেষ কর্তব্য পালন ক'রে আমাকে শাস্ত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে দিন—কোন দোষ হবে না। কিন্তু এমন কুৎসিত প্রস্তাব আপনি ক'রে আমার মন ক্ষোভে ভ'রে দেবেন না—বিশেষ ক'রে আপনি!”

“বিশেষ ক'রে আমি?—এ-কথা কেন বলছ?”

* * * *

ল্যাক্কে বুঝল, তারা পিতা ও পুত্র।

৩

বসন্ত তখনও অনাগত, ধরণী তখনও তুষারমণ্ডিত, শীতের সে জমাট জড়তা পরাজয় করতে যৌবন হয়ে ওঠে সহসা উচ্ছ্বসিত। “ফাশিং”এর রাজ্যে সারা জার্মেনী উন্মত্ত হয় মদনোৎসবে। দলে দলে নরনারী আসে ঘর ছেড়ে, বিচিত্র সাজে সজ্জিত হ'য়ে, ধনী-গৃহের স্তম্ভরীরা আসেন অবগুষ্ঠিত হ'য়ে। সেদিন তরুণ-তরুণীর মিলনে প্রয়োজন হয় শুধু নিয়মহীন খেয়াল, অথবা হয়ত সেই হুর্নিবার আকর্ষণ! ধনী-নির্ধনের পার্থক্য বায় ঘুচে, আভিজাত্যের গৌরব হয় ধূলিসাৎ, সমাজের বন্ধন হয় শিথিল, যৌবন হ'য়ে ওঠে উচ্ছল উদ্ভাস, নির্বোধ, বুদ্ধেরও ফিরে পায় যৌবন—সকলে করে সারারাজ বাধাহীন নৃত্য।

ঠিক বিশ বৎসর পূর্বে এমনি এক রাজ্যে এই উৎসবের মধ্যে ল্যাক্কে-এর সঙ্গে হয়েছিল কেতের মিলন, আর সেই রাজ্যেই উভয়ে করেছিল উভয়কে দয়-দান।

কেতের পিতা হেড্ গেহাইম্‌স্টাট লিঙ্ক, কাইসারের উচ্চ রাজকর্মচারী, ল্যাক্কে-এর মত পাত্রের হাতে একমাত্র সন্তান ঐ কেতেকে সমর্পণ করা যে তাঁর পক্ষে চিন্তাতীত তা ঐ প্রণয়ীযুগল বুঝল। কিন্তু তাদের প্রণয় এতই গভীর হ'য়ে উঠল যে তারা গোপনে বিবাহ না ক'রে থাকতে পারল না।

* গেহাইম্‌স্টাট [Geheimrat]—জাঙ্গান কাইসারের উচ্চ উপাধি বিশেষ, অনেকটা ইংরেজী Sir-এর মত।

হেয় গেহাইম্বাটের কাছে এ সংবাদ গোপন থাকল না। তিনি তৎক্ষণাৎ জার্মান-সরকারের সাহায্যে জামাতাকে জার্মেনী পরিত্যাগ করতে বাধ্য ত করলেনই, এমন কি নবদম্পতীর মধ্যে পুত্র-বিনিময়টাও বাতে অসম্ভব হয় তার নিপুণ ব্যবস্থা করলেন এবং এই দুর্ঘটনার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার জন্তে রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে কতাসহ প্রস্থান করলেন দূরে, ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিক শহরে। কিন্তু তাঁর নিষ্কটক মিউনিক-ভবনেও যথাসময়ে ভূমির্ভূ হ'ল ঐ যুবক, এবং তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বামীর প্রিয় নাম ডাকতে ডাকতে তাঁর অতি আদরের কন্যা কেতে ইহধাম ত্যাগ করল।

নবজাত হ'ল মাতামহের গৃহে লালিতপালিত। তাকে দেওয়া হ'ল জার্মেনীতে অতি বিরল, অপ্রীতীয় নাম, সীগ্‌ফ্রীড। হেয় গেহাইম্বাট হস্ত আশা করেছিলেন অতীত জার্মেনীর বীবহের প্রতীক এই নাম, এর দাঁপটে বালকের জন্ম-খণ্ড লুপ্ত হবে!

কিন্তু যথাকালে বালকের পিতৃ-পরিচয়ের ক্ষুধা তীব্র হ'য়ে উঠল। হেয় গেহাইম্বাট তাকে বোঝালেন, তার পিতার নাম ল্যাক্‌ক হ'লেও তিনি ছিলেন এক দেশগতপ্রাণ জার্মান। ফরাসীরা তাঁকে কোশলে বন্দী ক'রে তাদের আফ্রিকার অবস্থিত ভীষণ “বিদেশী বাহিনী”তে জোর ক'রে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত করেছে!—বালকের মনে পুষ্ট হ'ল উগ্র ফরাসী-বিষেব। সে তার জনক-জননীকে একত্রে-তোলা ফটোটা যত্ন ক'বে তার ঘরের টেবিলে রাখত, তাকে নিত্য স্মৃতি দিত, আর প্রতিজ্ঞা করত, একদিন সে এর প্রতিশোধ নেবে, তার পিতাকে উদ্ধার করবে, তার নামের উপযুক্ত কাজ সে করবে।

নির্ভীকতার বজ্রবাত পেয়ে, ততোধিক কষ্টকর বিরহকে অতিক্রম করবার জন্তে ল্যাক্‌ক-দম্পতী মনে করেছিল একত্রে ফরাসী দেশে পলায়ন করবে। কিন্তু হেয় গেহাইম্বাটের নিপুণ ব্যবস্থা তাও হ'ল অসম্ভব! ল্যাক্‌কে একাই দেশে ফিরতে হ'ল।

ল্যাক্‌ক-এর পিতা, প্যারিসের এক ক্ষুদ্র মুনী, এই ঘটনাকে এক সীমিতাগের ব্যাপার মনে করলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ঐ ভাবপ্রবণ অপদার্থ পুত্রকে ব্যবসায় নিযুক্ত ক'রে

মাহুষ ক'বে তুলতে, তাব জন্তে তিনি অর্থব্যয় করতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মূর্থ পুত্র পালিয়ে গিয়েছিল ডুসেলডর্ফে। এখন বহু চেষ্টা ক'রে কেতের একটা সংবাদ পর্যাস্ত না-পেয়ে তাঁর পুত্রের মন যখন সেই ব্যবসার দিকেই গেল, তিনি হলেন অতিশয় সন্তুষ্ট।

কিন্তু ল্যাক্‌ক-এর পক্ষে, ইউরোপবাস অসম্ভব হ'য়ে উঠল। সে আবার পালাল—এবার সুদূর ইন্দো-চীনে। সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম ও ক্লান্ত সাধন ক'রে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় ক'রে আবার যখন দেশে ফিরল, তখনই আবস্ত হ'ল বিশ্ব-সমর, সে বাধ্য হ'ল ফরাসী সৈনিক হ'তে। সে ধনী হ'লে তার গেহাইম্বাট স্বপ্নবৎ সন্তুষ্ট হবেন, তার কেতকে ফিরে পাবে, এ সব দীর্ঘ-সঞ্চিত আশা নিবে গেল।

তার পর এই দশ বৎসর সে করেছে নির্ভর সহিত সৈনিকের কাজ—উৎকর্ষ স্বদেশ-সেবা। তার পুরস্কার?—আর আশ্চর্যের মধ্যেই তার কেতের একমাত্র চিহ্ন ঐ বালককে হত্যা করবে!—কারা? সেই সব তরুণ সৈন্ত যাদের সে আপন হাতে রাইফেল ছুঁড়তে শিখিয়েছে!

সে চাইল তার প্রাণ-পুস্তলীকে বুকের মধ্যে নিয়ে পলায়ন করতে। কারাগারের সকল প্রহরী তারই অধীন, তাকে বাঁচা দেবার কেউ ছিল না। কিন্তু যুবক হ'ল অস্বীকৃত—অমন পলায়ন সে চায় না।

ল্যাক্‌ক বুঝল, এ তাব মাতৃহীন পুত্রের কত বড় অভিমান। সে তখন সব বলল—তার দুই গুণ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল। যুবক বিচলিত হ'য়ে বলল, “বুঝেছি, এ শুধু অদৃষ্টের নির্ভর পরিহাস!”

“চল সীগ্‌ফ্রীড, পালাই, এ থেকে বেহাই পাই—”

“ছি! সে কাজ তোমার জীবনে কী এনে দেবে? তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।”

ল্যাক্‌ক এ-কথার মর্ম অল্পভব করল। কিন্তু, তাই ব'লে সে হবে পুত্রহস্তা? কোন্‌টা ভীষণতব? যুবক হস্ত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ—ল্যাক্‌ক? ঐ পুত্র যে তার কেতের একমাত্র চিহ্ন! ও বালক তার কী বুঝবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শুধু বলল, “হা, ভগবান!”

“হুঁসল হ'লে চলবে না পিতা, তা হ'লে আসবে হীনতা। এ ত শুধু অদৃষ্টের পরিহাস নয়, এ যে এক নির্ভর বিধানের

নির্মম আধাত! কিন্তু, সে বিধান দুর্বোধ্য অলম্ব্য, তার আধাত বীরের মত গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই—”

“উপায় আছে, আমি যে তোমার বাবা!” এই বলে ল্যাক্ আপন বক্ষে বেওনেট বিদ্ধ করতে উদ্যত হ’ল, যুবক ক্ষিপ্ৰবেগে তার হাত ধরে ফেলল, তার বেওনেট জোর ক’রে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ ক’রে পিতাকে আলিঙ্গন করল। ল্যাক্ পুত্রকে স্বস্তি ভুলে নিয়ে ক্রান্ত দরজার দিকে অগ্রসর হ’ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সি-কোম্পানীর প্রথম লেফ্টেনেন্ট কারাক্ষ প্রবেশ করল। ল্যাক্ পুত্রকে স্বস্তি হ’তে নামিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। নাকি চশমাটা লাগিয়ে পরম বিষয়ে লেফ্টেনেন্ট এ দৃষ্ট দেখতে থাকলেন। বাইরে সৈন্ত-বাহিনীর পদস্বৰ মশ, মশ, মশ, মশ, স্পষ্ট হ’তে স্পষ্ট-তর হ’র উঠল, তারা এল যুবককে বধ করতে। লেফ্টেনেন্ট হাঁক দিলেন, “সোজ্!” ল্যাক্! ল্যাক্ বস্ত্রবৎ পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে র্যাটেনশনে দাঁড়াল, “হাঁ, লিয়ত্ন!”

“এর অর্থ?”

সব শুনে, লেফ্টেনেন্ট যুবককে বললেন, “বা! মিসিয়া ল্যাক্—আ? ভুল ক’রে মিসিয়া এতদিন জার্মান ভেবে এসেছেন—আজ মিসিয়ার বশ-জীবন থেকে মুক্তি হ’ল—আ? ফেলিসিতাসি* মিসিয়া, হাঁ! সোজ্!” ল্যাক্, এমন বীর পুত্র করাসী জাতিকে দেওয়া মন্ত গৌরব—হাঁ—আ?!

“লিয়ত্ন!” প্রাণের ধন্যবাদ নিন। সীগ্জীড্ এখন তুই এই দেবতার দয়ার খালাস পেলে, আর কোন ভয় নেই! প্রাণের ধন্যবাদ নিন, লিয়ত্ন!”

“এ! বেশ, বেশ! হাঁ, আশা করি মিসিয়া তাঁর পিতাকে সব খবর ঠিক ঠিক দিয়েছেন।”

“কিসের খবর লিয়ত্ন?” আমার ছেলে কি খবর দেবে?—ও হাঁ, খবর!”

“হু! সোজ্!” দেখছি বড়ই আশ্চর্য্য হ’য়েছেন—হ্যাঁ, তার কারণও কিছু হয়েছে! [ঘড়ি দেখে] কিন্তু, কিন্তু অমূল্য সময় নষ্ট হ’রে গেছে সোজ্!” জানেন, সামরিক আইনে এই কর্তব্যের অবহেলা কত বড় অপরাধ?”

* ফেলিসিতাসি [Felicitatation] :—অভিনন্দন-জ্ঞাপন। [Congratulation]

যুবক চীৎকার ক’রে উঠল, “পিতা!”

“স্থির হও সীগ্জীড্!—জানি লিয়ত্ন!” এর শাস্তি কি তাও জানি! কিন্তু যে করাসী রিপাব্লিকে এত বছর প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে, তার কাছে শুধু এই ভিক্ষে চাই, আমার একমাত্র ছেলের প্রাণটুকু যেন বাঁচে!”

“এ আপনার অন্তর দাবি নয়! এর জন্তে দরখাস্ত করুন, আমি তা ভাল ক’রে সুপারিশ করব।”

“যে আশ্রয় লিয়ত্ন!” ধন্যবাদ!”

“হ্যাঁ সোজ্!” ল্যাক্, এখন একটু বাইরে যান।”

ল্যাক্ সে কক্ষ ত্যাগ করল। তার অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত লেফ্টেনেন্ট তাকে অবজ্ঞা ভরে দেখলেন—“স্নেহহর্মিল ক্ষুদ্র কীট!” তার পরই যুবকের দিকে ফিরে বললেন, “হ্যাঁ, এইবার আশা করি, মিসিয়া তাঁর ক্ষুদ্র কর্তব্যটুকু শিগ্গির সেরে ফেলবেন, আ? বিশেষ ক’রে এখন যখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির সভ্য হ’লেন—”

“পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি জার্মান!”

“আ!—বুঝেছি! [ঘড়ি দেখে] তা হোক তবু খবরটা শিগ্গির দিয়ে ফেলুন।”

“না!”

“না?—আ! কিন্তু মিসিয়া ভুলে যাচ্ছেন, এক জন করাসী হিসাবে—”

“আমি জার্মান!”

“আ?—এখনও বশ?”

“আমি জার্মান! জানে আমার জন্ম, যার আগে আমি পুষ্ট, যার শিক্ষায় আমার মনুষ্যত্ব, আমি সেই পুণ্যভূমির সন্তান—আমি জার্মান!”

“আ, বুঝেছি! মিসিয়া এখন যারানো জিনিষ আঁকড়ে ধরতে চান—আ?!”

“আমি জার্মান!”

“বেশ ত!—কিন্তু, যে পিতৃভূমি* জয়গান করতে বাল্যকাল থেকে অভ্যস্ত, এখন সেই পিতৃভূমিকেও একটু দয়া করুন।—কি? চুপ ক’বে রইলেন যে? সন্দেহ হ’চ্ছে কোনটা বড়? পিতৃভূমি না মাতৃভূমি,

* পিতৃভূমি :—জার্মানির স্বদেশকে বলে Das Vaterland, অর্থাৎ পিতৃভূমি।

আ? আশা করি, মুসিয়া এমন নির্বোধ নন যে এমন সম্বন্ধস্থলে সঠিক কর্তব্য নির্ধারণ করতে ভুল করবেন।”

“আমার কর্তব্য আমি জানি।”

“নিশ্চয়!—এই ত চাই! [ঘড়ি দেখে] এখন পিতৃভূমির খাতিরে—”

“আমি বিশ্বাসঘাতক নই।”

“আ! মুসিয়া এখন বাড়াবাড়ি করছেন। এ-সংবাদ না দিলেও যে আপন পিতৃভূমির বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, আর তার ফলে আপনার নিজের জীবন ত নষ্ট হবেই—আপনার পিতারও সর্বনাশ হবে—”

“কেন? তিনি কি অপরাধ করেছেন?”

“এটা বুঝছেন না, পুত্র দেশদ্রোহী হ’লে, পিতার কখনও সেই দেশের সৈন্তে স্থান থাকে, না থাকে উচিত?”

“ও!”

“তাই বলি মুসিয়া, এই খবরটুকু দিয়ে ফেলে নিজের পিতাকে বাঁচান, তাহ’লে সব দিক রক্ষা পাবে, আপনিও আমাদের প্রচুর অর্থ নিয়ে ক্রান্তির কোন মনোরম নগরে সুখে বাস ক’বে জীবন সার্থক করতে পারবেন।—আ! ভয় নেই মুসিয়া। পিতৃভূমির এত বড় উপকার করলে লোকে আপনাকে দেবতার মত পূজা করবে—”

“অমন পূজা চাই নে, জীবাকে অমন ভাবে সার্থক করাও চাই নে।”

“কিন্তু, জীবনদাতা পিতাকে রক্ষা করা কি আদর্শ-বাদীর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়?”

“বুঝা চেষ্টা, কিছুই বলব না।”

“না বললে, আপনার পিতার সর্বনাশ হবে, তাকে কোর্টমার্শাল করা হবে, তাকে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হবে, তাকে—”

“তার কি ঘোষ? তিনি ত ইতিপূর্বে আমার জন্ম-সংবাদও জানতেন না—”

“আপনাব এই জিদ—এই সর্বনেশে জিদ—”

“আপনাবা না তাঁর কাছে অশেষ স্বপ্ন? আমার স্বপ্নের মতোমত ছিলেন গোঁড়া-জাফান, তিনি তাঁর জীবন হুখে ভ’রে দিয়েছেন, আপনাবা তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর হ’বেন?”

“আ! মুসিয়া সাবধান! সেই বুদ্ধের আশ্রয়টি কিছ আপনাব কাঁধে চেপেছেন—হ্যাঁ আ!—কী? ঘাবড়ে গেলেন যে? ভয় নেই মুসিয়া, শুধু এই কুইক্সটিক্ জিদ ছেড়ে দ্বিন, তাহ’লেই সব রক্ষা পাবে।—এ কাজ ত অতি সহজ, চিন্তা কিসের?”

“সহজ নয়, অসম্ভব। আমার পিতাকে রক্ষা করা ব জন্তে আমার সহচরদেব মৃত্যুমুখে তুলে দিতে আমি পারি নে—কিছুতেই নয়। আমার জন্ম যদি ফরাসী দেশে হ’ত, আমার মাতা যদি ফরাসী নারী হ’তেন, এ সব অস্তায় করেছি এমন ধারণা যদি বদ্ধমূল হ’ত, তাহ’লেও এমন হীন কাজ করতে আমি পারি নে—কিছুতেই নয়! কিছুতেই নয়!!”

লেফটেনেন্ট, স্তম্ভিত হলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখেও বাক্যস্ফূরণ হ’ল না—এও সম্ভব? হঠাৎ তাঁর মনে জাগল, বহু বৎসর পূর্বের স্মৃতি, যখন তিনি এই বয়সে নতুন ইউনিফর্ম প’বে ‘ক্যাডেট’ হয়েছিলেন—হয়ত তিনিও তখন এমনিটি ছিলেন! আর যুগপৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যারনের তরুণী স্ত্রী হুন্দরী ব্যারনেস্ আদ্রে দ্য লা-র সেই আবেশ-জড়িত আয়ত লোচনের উন্মাদক কটাক্ষ, যা সেই সময়ে তাঁর কৈশোব ঘূটন ঘোবনের উন্মেষ করেছিল,—কী তার মাদকতা! মনে পড়ল পরবর্তী কত বোমাধ্বজের ঘটনা, যা অস্ত্রাতে তাঁব পূর্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিকৃত ক’রে দিয়েছে, যাব তীব্র স্মৃতি তাঁর এতক্ষণ অর্দ্ধচেতন রক্ত-পিপাসা জাগ্রত ক’রে দিল।

তাঁর ক্ষুধিত দৃষ্টি পড়ল হুকুমার কিশোরের নবীন কান্তির ওপর। সে দৃষ্টি যুবকেব মনে কেমন একটা অস্বস্তি সৃষ্টি করল।

তিনি হাঁক দিলেন “সোর্জ”! হুপ! হুপ! ও ল্যাক্ প্রবেশ করল।

“আ!—সোর্জ”! ল্যাক্, আমি নিরুপায়! আপনাব তরুণ পুত্র নিজের নবীন জীবন বিসর্জন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি কি করব? অমন তাজা দেহ ধ্বংস করার প্রথম আনন্দের কাছে তাঁর পিতা, তাঁর পিতৃভূমি এসব তুচ্ছ।”

যুবক বলল, “আমার পিতৃভূমি জার্মেনী, আমার মাতৃভূমি জার্মেনী, আমার স্বর্গ—জার্মেনী!”

“লিয়ৎন”! ও পাগল, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি সব ঠিক ক’রে নেব—”

“তার আর সময় নেই!—স্যের্জ”! ছাপ, বন্দীকে নিয়ে চল।”

“লিয়ৎন”! ও শিশু, ওকে মাপ করুন—”

“অসম্ভব—”

“তবে আর এক ঘণ্টা সময় দিন, প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে এখুনি ওর প্রাণ ভিক্ষে ক’রে আনছি। আমি তাঁর জীবন বাচিয়েছি, তিনি আমাকে এটুকু দয়া করবেন, লিয়ৎন”! মাস্তর এক ঘণ্টা—”

“এক মুহূর্তও নয়! এ সামরিক নির্দেশ—অলম্ব্য!”

রপ-দামামা বেঙ্গে উঠল। যুবক বধ্যভূমিতে টাঁড়াল—মাথা খাড়া ক’রে, বিংশতি রাইফেলের দিকে বুক পেতে দিয়ে।

ঠিক ছ’টায় লেফটেনেন্টের মুখ-নিঃসৃত হ’ল আদেশ। যুবক শতচ্ছিন্ন বক্ষ নিয়ে তার প্রাণাধিক পিতৃভূমিকে চুম্বন ক’রে চিরনিদ্রায় শায়িত হ’ল।

সহসা সকলে দেখে, তাদের সার্জেন্ট-মেজর ল্যাক্‌ছিম-মূল তরুর ত্রায় ভূপতিত হ’ল। প্রথম লেফটেনেন্ট ছুটে গিয়ে দেখেন, তাঁর বিশেষ আদেশ সত্ত্বেও ল্যাক্‌-এর অঙ্গুলী রাইফেলের ঘোড়া টানতে অসমর্থ হয়েছে, তার হৃৎস্পন্দও বিকল হয়েছে,—তার দেহ প্রাণহীন।

লাভস্ট্রোক

আবুল হাছানা

চাকুরীটি আমার বিশেষ বড় নয়, তবে অসাধ্যসাধন আমাদের নিত্যকর্ম। নাটক-নভেল লেখকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করি যা থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের তাতে পাকা হাত। দিনগুলো বেশ কাটিয়া যাইতেছে; ছোটখাটো বিপদ ঘুরে থাকুক, বড় বড় কঠিন সমস্যাও এখন হেলায় কাটাইয়া দিই। কিন্তু প্রথম চাকুরী-জীবন সামান্য একটি ব্যাপারেই বড় মুবড়াইয়া গিয়াছিল। দয়াময়ের উদ্দেশে কত কাতর মিনতি, নির্জনে কত অশ্রুপাত! মনেব সেই অস্তিত্বভাৱ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি বড়ই আত্মহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন শুধু হাসি আসে সে কথা মনে পড়িলে।

সে বৎসর ট্রেনিং কলেজ হইতে পাস করিয়া আসিয়া আবাব জেলায় কাজ শিখিতে হইল। প্রবেশনারী অবস্থার লাজ্জনা মনে পড়িলে স্থগার উদ্বেগ হয়। কত লোকের ধমকানি, চোখরাঙানি যে সহ্য করিতে হইল! একদিন মনের হ্রংশ খুলিয়া এক চার্জ-অফিসার অর্থাৎ পাকা দারোগাজীব কাছে বলিলাম। বলিলেন,—“ওহে, আর একটু সবুরই কর না! দেখবে কত লোকের জানমালের মালিক হ’য়ে পড়বে। তখন তোমাকে খোসামুদ না কবে এমন লোকই এলাকার থাকবে না। ক্ষমতা হবে তোমার অসীম, দাপট হবে বিষম!”—আপাততঃ আশ্বস্ত হইলাম।

শিক্ষাদীক্ষার চোটে এক রকম মনমরা হইয়াই গিয়াছিল। তাই কবে কখন এমন সুযোগ আসিবে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আসিলও খুব তাড়াতাড়ি। গোয়ালদিঘী ধানার বাসা-গুলি সেবার ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গেল। চার্জ-অফিসার অনুস্থ ছেলেমেয়ের অজুহাতে ছুটি লইয়া পলাইয়া গেলে, সাহেব আমাকেই ডাকিয়া হাসিয়া বলিলেন,—“যাও, তোমাকে গোয়ালদিঘীর চার্জে পোষ্ট কবা গেল! ভালমতে কাজ করিও।”

লাইনে থবর লইয়া জানিলাম বিবাহিত অনেকেই এই অজুহাতে সাহেবের নিকট হইতে এই ধানার পালা এড়াইয়া ফেলিয়াছে। আর আমি? আমি যে সদ্যবিবাহিত! একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলাম। লাইন বাবু বলিলেন,—“সাহেবকে বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি ছেলপিলেওয়ালাদের আপত্তি আরও বেশী গ্রাহ্য বলিয়া! উহাকে উড়াইয়া দিয়াছেন।

মনে মনে সকলের চৌদ্দপুরুষের জগদগান করিলাম, আর নব-দম্পতির অতি লজ্জা অধিকারটুকুর দিকেও বাহারা চাহিল না তাহাদের পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দ্য ও হিতকামনা করিয়া রওনা হইলাম। স্বামীসুখবঞ্চিতা তরবার কর-কমলে স্বপ্নের গভীরতম ব্যাথাটুকু জানাইয়া শুধু এই বলিয়া

অশ্লিপি পাঠাইলাম,—দারোগাদের নৈতিক উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী তাহাদের কর্মপদ্ধতি।

পথ নৌকাযোগে। সময়টা আর কাটিতে চাহে না। মনের সেই বিরাগ, বিরক্তি মেজাজটাকে গরম করিয়াই রাখিল। থানাঘাটে যখন পৌঁছিলাম, তখন সংবাদ শুনিয়া সবাই ছুটিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিল। মাঝিদের সঙ্গে ভাড়া লইয়া একটু তর্কবিতর্ক হইতেই একেবারে জলিয়া উঠিলাম। বেদম গ্রহাবে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল তাহার আর খোঁজ মিলিল না।

বেতখানিব সেই প্রথম সম্ব্যবহার, কিন্তু শাসনকার্যে আমার বড়ই সহায়তা করিয়া বসিল। “বাবু বড় কড়া,” “ভারী তাঁব মেজাজ,” ইত্যাদি কথা দুই-তিন দিনেই থানায় ও এলাকায় রাত্রি হইয়া পড়িল।

২

ট্রেনিং কলেজে বড় বড় ওজাদের নিকট ‘ল’ পড়া হইয়াছিল। তাই আইনের ব্যবহারিক দিকটা বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। শিক্ষকেরা সবাই ছিলেন অভিজ্ঞ—জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটা কাটাইয়াছিলেন দাবোগাগিবি করিয়া; চাকুরী-জীবনে আমাদিগকে দুইটি প্রধান তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। একটি ছিল, Discarding of the corroborated statement—অর্থাৎ যে-কথাব কোন উপযুক্ত সমর্থক না থাকে তাহার উপর ভরসা করিতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, Careful cross-examination of persons—অর্থাৎ কাহাকেও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহাকে ভালমতে জেরা করিয়া লইতে হইবে।

তাই নিয়ন্তন কর্মচারীরা যখন বলিয়া বসিত আমার সবাই এক একটি সেবা অফিসার, তখন তাহাদিগকে শুধু জেবা করিয়াই বাতিব্যস্ত করিতাম না, কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ তলব করিয়া রীতিমত বিচারে বসিয়া বাইতাম। কয়েক দিনেব মধ্যেই আদারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বাচিলাম। সবই বলিত, দারোগা বাবু ভাবী নিটখুটে লোক বটেন, তাঁব কাছে ধাপ্পাধ কাছ চলবে না।

সাক্ষী দিতে আসিয়া প্রায় সকলেই মুবড়িয়া বাইত। আমার সন্দেহচক/বিস্ময়োক্তি শুনিয়া ও মুখের হাবভাব দেখিয়া তাহাবা ধামিয়া ধামিয়া তলাইয়া দেখিয়া অতিশয় সঙ্কোচের সহিত জবাববন্দী করিত। জেরার চোটে ও মেজাজেব দাপটে তাহাদের মুখ এতটুকু না-হইয়া বাইত না। সবাই বলিত,—হুজুরের অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

কাজকর্ম চলিল বেশ। তাবিলাম যে-রকম নাম করিয়া ফেলিলাম, তাহাতে আব কোন কাজে বিশেষ আটকাইতে হইবে না। মনটি মাঝে মাঝে ভক্তিবসে আধুত হইয়া

উঠিত আব ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রায়ই হাতছোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া গোপনে প্রশংসা করিয়া ফেলিতাম।

৩

একদিন বৈকালবেলায় আনমনে নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলাম। সকলের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার প্রস্তর কখনই দিতাম না, তাই থানার অন্ত কাহারও আমার সঙ্গে আসার মত দুঃসাহস হইত না। তবে অন্ততম সহায় “বেত্রবর” অর্থাৎ শাসনদণ্ডখানি সর্বদাই হাতে থাকিত।

খুলনা হইতে ঈমারখানি আঁকাবঁকা কাটা খালটি বাহিয়া আসিয়া ঘাটে লাগিল। হঠাৎ স্বামীস্বথবক্তিতা তরুণী স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল। এই খুলনায়ই তিনি বর্তমান। শুধু কয়েক ঘণ্টার রাস্তার ব্যবধান; অথচ বহুদিন মিলন ঘটে নাই। মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল, রাগ করিবার মত কেহ সঙ্গেও ছিল না, তাই আত্মসংবরণ করিলাম।

ছাতা, লাঠি, বাজ, পুঁটলী লইয়া যাত্রীবা দ্বিধিধিকে ছুটিল। তাহাদের মধ্যে ও কে? কঠিন হুবে ডাকিলাম,—রজনী! ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? আমি যে এখানে!

নমস্কার বাবু মশাই। তাই ত! জরুরী থবর। বাবা আমার পাঠিয় দিলেন, বললেন জামাইবাবুকে তাড়া ক’রে নিয়ে আর গে।

নিমেষের মধ্যে বুকের রক্ত জমাট হইবার উপক্রম হইল। ব্যাপারটা তবে কি? বলিলাম,—হ্যাঁ, চল বেটা আগে থানায় যাই, তার পবে সব শুনব।

রজনী রজনীর মতই অন্ধকার-মুখে মাথা হেঁট করিয়া পিছু পিছু চলিল। থানায় পৌঁছিয়াই হাকিলাম,—জমাদার বাবু! একখানা টেলিগ্রাফের ফর্ম নিয়ে আস্থন ত! থবব বিশেষ ভাল বোধ হচ্ছে না, তবে বেটাকে ‘জেরা’ করা যা বাকী।

ফর্ম একখানার জায়গায় দশখানা আসিল ও ভক্ত প্রজাবৃন্দের মত থানার সবাই আসিয়া জড়ো হইল। আমি ‘জেরা’ ধরিলাম,—

—আচ্ছা, বল ত, তোকে কে পাঠালেন? তোব বাবা, মা, না তোব ঐ দিদিমণি, বুঝি কি না ঐ আমার স্ত্রী।

—পাঠালেন ত বাবা, মাও নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দিদিমণির সঙ্গে আনবার আগে আর দেখাই হয় নি।

—তবেই মরেছে বে বাটা! তিনি তবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন শিগগীব ক’রে ব’লে ফেল।

জমাদার বাবু—শিগগীব ক’রে বল ত বাপু!

—তা আমি মোটেই জানি নে। তবে বাবা, মা কি অবস্থায় কোথা থেকে হুকুম দিলেন তা বলতে পারি বটে।

—বেশ, তাই বল দিকিন! শিগীর!

জমাদার বাবু—তাই ব'লে ফেল।

—আজ সকালবেলায় ঘুম ভাঙতে-না-ভাঙতেই ডাক পড়ল—রজনী, রজনী! হাত-মুখ তখনও বুতে পারি নি। দৌড়ে গেলাম মাঝেব কোঠায়। বাবু আমাকে দেখে নড়ে-চড়ে পাশ ফিরে শুলেন, মা পাশ থেকে ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাবু জোবে হাই তুললেন, হাতের দশ-দশটি আঙুল মটকালেন, তাব পরে আস্তে আস্তে ভারী গলায় বললেন,—রজনী, বা একটু গোয়ালদিবা,—এখনকার ঈমারেই বা, জমাই বাবুকে নিয়ে আর। বলবি—বাবা আপনাকে অবশ্যই যেতে বলেছেন।

“শুভ ভারী অমুখ, এক মাসের বিদায় চাই”—বলিয়া ‘তার’ লেখা হইল। জমাদার বাবু ছই জন, সিপাই গণ্ডা-তিনেক—সবাই “আমি ‘তার’ করে আসি,” “নেই হাম যাতে হায় দৌড়কে” বলিয়া যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল তাহাতে আমার প্রতি তাহাদের অটল শ্রদ্ধা না হউক তাহাদের উপর আমার যে অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। রজনী আমাব বিরক্তিপূর্ণ বক্ত্রিম চাহনি দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা লইয়াও খুব কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়িয়া গেল।

বিছানা, ট্রাঙ্ক, বাক্স মলপসব ইত্যাদি কম ত নয়? সাজাইয়া-গুছাইয়া ষ্টেশনে আসিতে প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। ঈমার তখনও দেখা দেয় নাই। মাস্টার বাবু ‘চেয়ার’ ‘চেয়ার’ কবিয়া অস্থির, লীঘ্র জোগাড় করিতে না পারিয়া নিজের আসনই ছাড়িয়া দিলেন।

বসিয়া সিগারেটের উল্টোদিকটা ধরইয়া ফুঁকিতে ফুঁকিতে হাঁকিয়া ডাকিলাম, “রজনী, বাটা এদিকে আর ত ছুটে।”

বেচারি পিছনে মাথা গুঁজিয়া ছিল, ভয়ে ভয়ে আসিয়া বলিল, “বাবু!”

—তোর মণিমালা দিদি কিছুই ব'লে দেন নি?

—বাবু না, তাঁর সঙ্গে ত দেখাই হয় নি?

—বলিস্ কি? কালও হয় নি।

—কাল বিকেলে, কি একটা কাজের জন্ত ডেকেছিলেন, মুখচোখ তাঁব একটু ভারী বোধ হচ্ছিল।

—বাটা গল্প! আসবাব সময়ে আবার একটু দেখাও ক’রে এলি নে?

—বাবু, না,—বাবা আমার যে তাড়া ক’রে পাঠিয়ে দিলেন, তাতে ত আমি ছটো মুখেও দিই আসতে পারি নি।

শুভর-মহাশয়ের এই অবস্থা তাড়াহড়ার জন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ দিতে পারিলাম না। অমুখ মন লইয়াই ঈমারে উঠিয়া পড়িলাম।

ইন্টার ক্লাসেব টিকিট হইলেও কাষ্ট ক্লাসটা দখল কবিয়া লইতে আর বেগ পাইতে হইল না। রজনীকে মালপত্রের পাহারায় রাখিয়া গিয়া কেবিনে শুইয়া পড়িলাম।

‘জেবা’ বরিয়া অল্প সব ক্ষেত্রে সুফল পাইয়া থাকিলেও এক্ষেত্রে কেমন বেন উল্টো ফলই ফলিল। শুভর-মহাশয়ের হাইতোলা—দশ-দশটি আঙুল মটকানো—মণিমালা চোখ মুখ ভারী—উঃ—কিছুই ত হৃদিস্ মিলে না! ইহার উপর ছারপোকর কামড়ে একেবারে ছটফট করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম এ ক্লাসের বাক্সীরা নেহাৎ ‘ভালমানুষ’ হিসাবে বোকা, তাহা না হইলে তাহাবা ঈমার কোম্পানীকে ভাড়া এবং ছাবপোকা মাকড় ও ঘোঁককে গায়ের রক্ত দিতে কিছুতেই সম্মত হইত না।

৪

পরদিন সকালবেলায় থুলনা ষ্টেশনে পৌছিয়া জেটি পার হইতে-না-হইতেই “বাবা অনিল, এই বে তুমি এসেছ?—এই বোড়াগাড়ী—রজনী গাড়ীটা ডাক্ত”—ইত্যাদি চীৎকার করিতে করিতে শ্রয় শুভর-মহাশয় দর্শন দিলেন। তাই ত—লোক না-পারিলেন কি আব তোমার আসা হত?—আচ্ছা, আচ্ছা, ধায়, পদধুলিটুলি নেওয়াটা, ও পূর্বকালের অমার্জিত প্রথা—বলি শরীর ভাল ত?

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলাম,—আজ্ঞে হ্যা, এক রকম ভালই—তবে মনে অশান্তি—এই বা! বাড়িতে কান্নব অমুখ-বিমুখ নেই ত?

দোলা খাইতে খাইতে—না; বালাই, সবাই বেশ আছে।

আমি—হঠাৎ মুখস্থপ্রে অচেতন হইয়া পড়িলাম। তাহা হ’লে ত তরুণী আখ্যাব সহিত একমাস কালের অবিচ্ছিন্ন মিশন। সে বেন মূর্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল গাড়ী মোটেই চলে না, হাঁকিলাম,—এই বেটা—চা—লা!

কিছু ক্ষণের জন্ত অপ্রমত্ত হইয়া পড়ায় গুরুজনের বক্তৃতা অবনত ধরিতেই পারি নাই। কেবল শিষ্টতার খাতিরে হা বা না করিয়া যাইতেছিলাম। উত্তর ঠিক না হওয়ায়ই বোধ করি ক্ষেপিয়া গিয়া আমার হাতখানা ধরিয়া বেশ নাড়া দিয়া তিনি বলিলেন—বলি, শুনছ ত? কাল রবিবার ও পরশু বন্ধ—এ দু-দিনেরই ছুটি নিয়ে এসেছ ত? হঠাৎ মুখ শুকাইয়া গেল, সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—ছুটি ত এক মাসেরই নিয়ে এসেছি। ব্যাপার গুরুতর বলেই মনে হয়েছিল। বাক্ কিছুমি—

—কতি আর কিই বা হয়েছে? ছুটি ক্যান্সেল ক’রে জয়েন্ ত করাই যেতে পারে। বিষয়টা একটু খুলেই

ব'লে ফেলি। কাল রাতে তোমার শান্ত্ৰী-ঠাকুরগ
হঠাৎ বললেন,—অনেক দিন জামাই বেড়াতে আসে নি।
তাকে একবার আনাও না। আমি বললাম, সে কি করে
হ'তে পারে? সে এখন নুতন চাক্ষু পেয়েছে। কাজের
যে ক্ষতি হবে। দেখ আমার মতে ছুটি-ছুটি ও-সব ঐ
গোরাাদের জন্তে। সাত সমুদ্রে তের নদী পার হয়ে ওরা আসে
আর আমরা ত ধর না এই বাড়ি বসেই চাকরি করি।
এই কত বছর জজের সেরেজদারী করছি। ছুটি নিয়ে
ব'সে থাকলে ত ওরা সবাই যা পারে লুটে নেবে। অসমর্থ
হ'লে ত ওরাই আমাকে একেবারে ছুটি দিয়ে দেবেন। যত
দিন শক্তি আছে—এই এসে পড়ল যে—রজনী তোর
মাকে খবর দে—আমরা এসে পড়েছি।

খণ্ডর-মহাশয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে ক্লান্ত দেহখানি ও
বিরক্ততাবা মুখখানি লইয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম।
শান্ত্ৰী-ঠাকুরাণীকে আব প্রণাম করাও হইয়া উঠিল না।
নিতান্ত অশোভন না হইলে হয়ত বেতখানি অনর্থক
রজনী কোঁটার পিঠের উপর দিয়া ঢালাইয়া দিতাম।
শান্ত্ৰী বলিলেন,—কি বাবা অস্থ-বিস্থ হয় নি ত?
চেহারা ত একেবারে হাই হয়ে গেছে—

—হ্যা—একটু খারাপই লাগছে—বলিয়া যেন কঁদিয়াই
ফেলিলাম।

বাধা দিয়া,—ও কিছু নয়, ঈমারের বাকানিতে
একটু খারাপ লাগেই—একুনি সেরে যাবে—তুমি না-হয়
একটু চা খেয়ে আরাম কর গে, আমার আফিসের সময় হয়ে
এল—বলিয়া খণ্ডর মহাশয় সরিয়া পড়িলেন।

ভিন্ন একখানি হুসজ্জিত কামরায় শুইয়া পড়িয়া আকাশ-
পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। মণিমালার আসিতে মেরি
হইতেছিল। ভাবিলাম—কপাল! এরা বুঝি সবদিকেই
সমান। মেয়েটিকে আফিসে নিয়ে যান নি ত?

হঠাৎ অলঙ্কারের কলহবুহু শব্দে চারিদিক মুখরিত হইল।
বুঝিলাম—প্রিয়তমার আগমন। অভ্যর্থনা করিবার মত
উৎসাহ আর হইল না, রাগ তখনও পড়ে নাই।

নিজেকে নিজেই ইন্টোডিউস করিতে বা বোধ করি
বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল,
বলিল,—উঃ তাই ত মা বললেন তোমার শরীর খারাপ!
মাথা ধরেছে কি? জলপটি বেঁধে দেব? ম্যাসপিরাইন আনব?
স্নান ক'রে নেবে?—না বাই, পাখাটা নিয়ে আসি গে।

ফিরিয়া আসিয়া হাওয়ার চোটে চাদের ও ক্রমাল উড়াইয়া
দিয়া অভিমানের সুরে কহিল,—কে বলেছিল তোমায়
অস্থ-মিমে আস্তে? আমার পোড়া কপাল! নইলে
এমন হবে কেন?

অভিमानে অভিমান আনে, তাই এত ক্ষণে উত্তর দিলাম,
না গো না, তোমাদের কড়া তলবে আস্তে হ'ল। শরীর

ভালই ছিল, মনে করেছিলাম এখানে কারুর অস্থ-বিস্থ
হয়েছে। কিন্তু তোমরা ত দেখছি দিবা চলাফেরা করছ।
অস্থের অজুহাতে এক মাসের ছুটি নিয়ে এলুম, তা কারুর
অস্থ-বিস্থ না থাকলে আমাকেই অস্থ হ'য়ে পড়তে হবে।
না-হয় শিপ্পীর ফিরে যেতে হ'বে।—তোমার বাবা হুকুম
করেছেন।

—কেন, লোকে কি শুধু গাধার মত খাটবেই বার মাস?
বেড়াতে নেই, আমোদ-প্রমোদ নেই? এ কি রকম?
নাঃ, তোমাকে একটি মাস থেকে যেতেই হবে। তুমি তার
জন্তে ভেব না।

ক্ষণিকের জন্ত আশ্বস্ত হইয়া প্রিয়তমার অনভ্যর্থনার
ক্ষতিপূরণ করিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে ছপুট্টা এক
রকম ভালই কাটিল।

খণ্ডর-মহাশয়ের প্রত্যাবর্তনের সময় হইয়াছে বোধনা
করার অপরাধে রজনীকে তিরস্কার করিয়া উঠিলাম।
আবার দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিল। তাঁহার সহিত পূর্বে এত
আলাপের সুযোগ হয় নাই, এবার তাঁর বৈয়্যিক বুদ্ধির যে
বহর দেখিলাম তাহাতে সমস্তা জটিল বলিয়াই মনে হইল।
তবে মণিমালার আশ্বাস?—সে ত নিতান্ত মেয়েমানুষ!
জন্ম-সাহেবের সেরেজদার ও থানার বড় দারোগার মধ্যকার
ব্যাপারে তার হাত আর কত দূর থাকিতে পারে?

খণ্ডর-মহাশয় পাশের ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িতে
ছাড়িতে শান্ত্ৰী-মাতাকে বলিলেন,—দেখ, জামাই মাত্র
দু-দিনই এখানে আছে—খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত যেন
একটু ভালই হয়।

আমি মনে মনে বলিলাম,—তার বদলে একটু
বিষ খাইয়ে দিন না কেন?

চটীকৃত্য পায়ের দিয়া চট-চট করিয়া এ ধারে আসিয়া
বলিলেন,—হ্যা, এখন ত বেশ লাগছে? চেহারা দেখেই ত
বুঝতে পাচ্ছি। বেশ, চল একটু চা খেয়ে নিই গে।

সমস্ত শরীর তখন রাগে পুড়িয়া যাইতেছিল। দম বন্ধ
করিয়া চক্ষু মুদিয়া সমস্ত মুখখানি জ্বোরে বিকৃত করিয়া
বলিলাম,—মোটাই নয়, মাফ করবেন। চা খাবার প্রবৃত্তি
হচ্ছে না। খাবই না।

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও হারিয়া গিয়া শেষে
চায়ের দোষকীর্জন করিয়া বলিলেন,—চা খাই বলিই যে
ওটার প্রশংসা করব তা নয়। ওটার দোষ রয়েছে অনেক।
বেশ, নাই খেলে এবেলা। রাগে একটু দুখ-কষ্টের বন্দোবস্ত
দেখা যাবে। কাল সকালে নিশ্চয় দেখবে দিবা সেরে গেছে।
বদি না-বায় তবে—ও মণিমা, ও মণিমা আমার—বক্তৃতা আর
ভাল লাগিল না, তাই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যাব পরে খাওয়া-দাওয়ায় একটু বিরক্তিই দেখাইলাম। মণিমালায় আদরবৃত্তে রাজিটা কোন মতে ভালই কাটিল।

পরদিন সকালে বাহিরে আসিয়া হাত-মুখ ধুইতেছি এমন সময়ে রজনী ছুটিয়া আসিয়া,—বাবু, বা—বু, দিদি, দি—দি যেন কেমন কেমন কচ্ছে গো—বলিয়া কাদিয়া ফেলিল।

ধমক দিয়া বলিলাম,—হারামজাদা, তাকামী করছিসু—বল না কি হয়েছে।

—দিদি, ও গো আমাব মণি দি—দি, চোখ মুখ বুজে কেবল মেজ্ঞেতে গড়াচ্ছেন। কথাও কন না, জবাবও মেন না, বাবা মা ত এখনও শুয়েই রয়েছেন।

সময় অতি সঙ্গীর্ণ, তাই আব জেরা করিলাম না। মনে করিলাম, শেবে অতি প্রিয়জনকেই অস্থখে ধরিল বাড়িতে এত লোক থাকিতে? বলিলাম, আমি যাচ্ছি, তোর বাবা মাকে চট্ ক'রে খবর দে।

বিছানার পাশে সকলের জড়ো হইতে আর বেশী দেবি হইল না। কেহ বলিল মুর্ছা গেছে, কেহ বলিল মুগী, কেহ সোনার চাঁদকে রাহতে ধরেছে বলিয়া কতকটা কাদিয়াই ফেলিল।

আমার শুধু ছঃখ হইল, এ বাড়িতে এত লোক থাকিতে আমার কেবল আর এক দিনেবই সঙ্গিনীকে ভুতে ধরিল।

—ভাল শবীরে হঠাৎ মুর্ছা গেলে তাকে ভুতে-খরা ছাড়া আর কিই বলিব—বলিয়া আক্ষেপের সহিত মুন্ডরা প্রকাশ করিলাম।

খণ্ডব-মহাশয় তখন আসিয়া পড়িয়াছেন। সকলেব মুখের দিকে তাকাইয়া আমাকেই উদ্দেশ করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—ভুতে যদি ধরেই থাকে, তা হ'লে বাবা, তুমিই গোয়ালদিবী থেকে ভুত সঙ্গে ক'বে নিয়ে এসেছ। কি বল তুমি, মণির মা! এ বাড়িতে ত আর কখনও এ বালাই এসে ছোটো নি। এখন ওঝা ডাকাই, না ডাক্তার?

বিরক্তি চাপিয়া গন্তীর গলায় বলিলাম, ভাল ডাক্তার—আর যদি পাওয়া যায় তবে লেডী ডাক্তার ডাকাইয়া বোগ নির্ণয় করাই ভাল।

—আ-রে বলেছ ভাল। ঐ প্রিয় ডাক্তার আর তার ঐ মোটা বোঁটি—দু-জনেই একসঙ্গে রোগী দেখে বেড়ায়। যাও না বাবা রজনীকে সঙ্গে ক'রে—একবার তাদের নিয়ে এস দোড়ে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তারা রোগীর সম্বন্ধে আগেই বত খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন 'জেরা' করেন তার উত্তর তুমিই দিতে পারবে বেশী।

প্রিয় ডাক্তার বারান্দায় বসিয়া আনমনে কি একটা কাগজ পড়িতেছিলেন। আমি সিঁড়ির তলায় পৌছিতেই

ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া চাপা গলায় বলিলেন,—ও গো কপড় ছেড় না। দেখি কল্ এসেছে বলেই মনে হচ্ছে।

আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে শুধাইলেন,—কি ব্যাপার বলুন। আমি ঠিক ধরেছি,—ডেলিভারী কেস; বটে ত? তা হাতে অনেক কাজ, অবসর বড় কম। চট্ ক'রে ব'লে ফেলুন ত কি রকম অবস্থা।

—এসেছি যখন, তখন বলব বইকি? শুনেছি আপনারা ত অল্পে ছাড়েন না, 'জেরা' ক'রে দস্তুরমত নাড়ীর খবর নিয়ে নেন। তা আপনার স্ত্রীকে একটু ব'লে রাখুন তাঁকেও যেতে হবে।

—ও আমার বলাই আছে। এই দেখুন—আমাকে কেউ একলা ডাকে না, মনে হয় যেন আমাব স্ত্রীর উপবেই লোকের চোখ বেশী—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

আমি হতটা জানি বলিলাম।

ডাক্তার ও ডাক্তারণী উভয়কে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। বলিলাম,—উনিই অনুগ্রহ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখে আনুন। আপনাকে বললেই হবে, আপনি এখানে বসুন।

প্রিয়বাবু হাসিয়াই সারা। বলিলেন—তা বেশ, তবে আমার যে বয়স তাতে ক'রে আপনার স্ত্রীকে আমার মা ব'লে ডাকবার অধিকারই ত রয়েছে। 'অচ্ছা', দেখা-শুনাটা উনিই না-হয় করুন।

প্রায় আধঘণ্টাকাল দেখিয়া-শুনিয়া আসিয়া ডাক্তারণী হিসাব দিলেন। নাড়ীর গতি দ্রুত, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়; হৃদস্পন্দ নির্দোষ। রোগিণীর কথাবার্তা ফিরিয়া আসিয়াছে, তবে কথা বড় কম কহিতেছেন। তালিকা দিয়া বলিলেন—আমি ত বহুতঃ কোন ব্যারামই ধরতে পারছি না।

খণ্ডব-মহাশয় এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, লাফাইয়া বলিলেন,—তা হ'লে বুঝেছি—ওঝারই দরকার হবে! তবে রজনী—

প্রিয়বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—খামুন, ওঝা-ফোঝার দিন চ'লে গিয়েছে। নিজের স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, কি ক'রে ধরতে পাববে বল? তুমি ত আর রোগের পূর্বসূর ইতিহাসটা শোন নি। আমি ঠিক ধরেছি। ঐ যে সেদিন তোমাকে বললুম না, আশ্চর্য্য আবার একটা নূতন রোগ দেখা দিয়েছে,—যাকে বলে, 'নাভট্টোকা'। এক্ষুনি প্রেক্ষিপূশন ক'রে দিচ্ছি। দিন ত এক টুকরো কাগজ।

কাগজ লইয়া ইংরেজীতে লিখিলেন,—“উক্সা পিউরা ইন্ বোটল্ ডি লিউক্”—“সেও ওয়ান্‌ য়াট্‌ ওয়ান্‌”—বলিলেন, শীর্ণরূপী একটি লোক পাঠিয়ে দিন ত ওষুধটা নিয়ে আসতে। আমার ডিপেন্ডেন্সারী ছাড়া অন্য কোথাও মিলবে না।

ঔষধ আনিতে দিয়া প্রিয়বাবু সবাইকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বকৃত্য স্বাভিলেন,—ব্যারাম এটা নতুন হ'লেও—আসলে কিন্তু নতুন নয়। তবে এর প্রগতি ও প্রতিধানের ব্যবস্থা এত দিন জ্ঞান ছিল না। পূর্বে ভূতে ধরেছে বলেই লোকের বিশ্বাস ছিল। “ভূত কিন্তু মনের বাধা”—এর মত একটি ভিত্তিহীন কুসংস্কার মাত্র। এটাকে বহু গবেষণা ও রিসার্চ করে আমি ধবতে পেরেছি। এটার নতুন নাম ‘লাভট্রোক’। যুবক-যুবতীদের মধ্যেই এর প্রকোপ বেশী। এর মেডিক্যাল কন্সল্ট বা বৈজ্ঞানিক কারণ বিশেষ কিছু নয়। আশা ও নিরাশার ওদের Nervous system বা স্নায়ুমণ্ডলে এক রকম gaseous vapour বা ধূঁয়ার মত বাষ্প তৈরি করে দেয়। পরস্পরের আশু অমঙ্গল সংবাদ, হঠাৎ বিরহ-ভয় বা ব্যবহাবজনিত পীড়া—এই সব কারণের কোন একটিই হঠাৎ এই গ্যাসে আশ্রয় ধরিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেমে ভীষণ firing আরম্ভ হয়ে যায়। তখনই সংজ্ঞালোপ, পাক খাওয়া ইত্যাদি সিম্‌টম্ দেখা দেয়। কেস প্রায়ই কেটালু হয় না, তবে ব্রেন ও হার্ট স্যাক্টে করে বলে সাবধান হ'তে হয়।

শুভর-মহাশয় মনোবোগ দিয়া শুনিয়া বাইতছিলেন, এবারে বাধা দিয়া তর্কের অবতারণা করিলেন। বলিলেন,—ব্যারাম ত নতুন কতই দেখা দিয়েছে।—এই ধরন না, কালাজর, ডেঙ্গু, ওয়ারফিভার, ইত্যাদি। এটা না হয় বিশ্বাস করেই নিলুম, ‘লাভট্রোক’ও সেরকম একটা। কিন্তু ডাক্তার-মশাই, কারণগুলি যা দিলেন তাতে ত ঠিক একমত হ'তে পারছি নে—আপনার স্ত্রীকেই জিঞ্জিগ করছি,—ধরুন না ও সব কারণ ত আমাদের জীবনে কতই ঘটেছে।—“স্ত্রীর ভয়ানক অমূল্য” বলে ‘তার’ পেয়েছি, দ্রুপ হ'য়েছে, ছুটে গিয়েছি;—বিরহ ত সামান্য কথা, কত বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটেছে, সব সামলে গিয়েছি। আর কলহ-বিবাদ ত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অহরহ হ'বেই, হওয়াই উচিত—তাতে করে আমার ত দুরের কথা, আমার স্ত্রীরও ত কখনও সংজ্ঞালোপ বা রোগ-টোগ হয় নি। বাক্য—আপনার হাতে বধন কেন গিয়েছে তখন নিশ্চিতই হওয়া গেল। জামাই বাবু তাহ'লে কালই বাসায় ফিরতে পাবেন—ঔর নতুন চার্জ। সেবা-শুশ্রূষা ত মা-বাপ হিসেবে আমাদের করতেই হবে।—কি বলুন?

আমার গায়ের রক্ত অব্যবহার ফুটিয়া উঠিল, মনে হইল তখনই ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীমার ধরিয়া ফেলি!

প্রিয়বাবু বৃদ্ধের দিকে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া স্বকার দিয়া বলিলেন,—আপনার মতামতে আসবই কি আর বাক্যই বা কি? চিকিৎসাশাস্ত্রের আপনি জানেনই বা কি? এ রোগের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাই বেশী দরকার। ঔকে ছ-চার দিন এখানে থাকতেই হবে এবং এই যে ওষুট্টা এসে পড়ল এটি আমার নিজের তৈরি, মনে করছি

পেটেন্ট করে ফেলব। নতুন আবিষ্কার হিসেবে দাম খুব কমই রেখেছি—মাত্র ৩০ টাকা। ভাবলাম গবির বাঙালীদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না। দাম কম না রাখলে তারা যে মারা যাবে। আহা বেচারারা ত কুইনাইনের পয়সাই বোগাতে পারে না।—তা নিন এক ডোজ একুনি খাইয়ে দিন, তার পর তিন-তিন ঘণ্টা পর এক ডোজ!—চার-পাঁচ শিশি খাওয়াতে হবে—ভয় কিছুই নেই—তব এখন উঠি।

শুভর-মহাশয় প্রচণ্ড বাধা পাইয়াই হটক বা ঔষধের দাম শুনিয়াই হটক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রিয়বাবু সঙ্গীক উঠিয়া পড়িলেন, অথচ ভিটেব কোনই ব্যবস্থা হইল না দেখিয়া অগত্যা আমিই পকেট হইতে ৩০ আঁব ৫ মোট ৮০ টাকা বাহির করিয়া দিলাম।

তাঁহারা বিদায় হইলে শুভর-মহাশয় কৃত্রিম হাসিভান করিয়া বলিলেন—দিয়ে দিয়েছ? বেশ কবেছ? তা হিসেব রেখ এখন। সবটা তোমার দিতে হবে না, অর্ধেকটা আমরাই দিয়ে দেব। স্বামী ও বাবা হিসেবে আমার ও তোমার উপর মণিমালার সমান দাবি। যাও, এখন ভাববার কিছু নেই, ওষুট্টা একটু খাইয়ে দাও গে।

ঔষধ খাওয়ার আমার একটি প্রধান কর্তব্য হইল। তিন-চার দিন অন্তর ডাক্তারেরা আসিয়া দেখিয়া বাইতে লাগিলেন এবং একই ঔষধের পুনর্ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মণিমালার মনস্তত্ত্বসাধন—অনুপান বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাস্বরূপ—আমাকেই করিতে হইবে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়া বাইতেন।

মণিমলা বলিল—শরীর ত আমাব একটু অমূল্য হ'য়েই ছিল, কিন্তু তা বলে তুমি চিকিৎসার ঘট করে এত টাকা উড়োবে নাকি? যাও, আমি ভাল হ'য়ে গিয়েছি।

আমি বলিলাম,—তুমি বললে ত হবে না! তোমাকে ডাক্তারী আইনের চকে সেরে উঠতে হবে। টাকা ত ভারী জিনিষ, তোমার নিকটে থাকতে পারছি, এর মুলা কি কম?

সময়টা বেশ কাটিয়া বাইতছিল। তেইশ-চব্বিশ দিন পরে ডাক্তারবাবু লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাদের আর আসিতে হইবে না। ঔষধটি মাঝে মাঝে এক ডোজ দিলেই হইবে।

এবার নিজেই শুভর-মহাশয়ের সমীপে প্রস্তাব করিলাম,—ভগবানের ইচ্ছায় মণিমালার শরীর ত বেশ ভালই হ'য়ে গেছে। এবার বাজার উদ্যোগ কবি?

—হ্যাঁ বাবে বইকি? মণির মা, মণির মা, দেখ ত এদিক,—হ্যাঁ বাবা, তুমি মোট কত টাকা ব্যয় করেছ? ৫২ টাকা?—হ্যাঁ, মণির মা, দেখ ত অনিলের ছাকিলাটি টাকা দেওয়া যায় কি না? না হয়ত আসছে মাসের মাইনে পেলেই

পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। ওর হাতে টাকাও যা আমার হাতেও তা।

—কেন দেওয়া যাবে না? এই আমি এখনই দিবে দিচ্ছি,—বলিয়া শ্রম'তা উদ'রতার পরকাঠা দেখাইলেন।

মা সব শেষে বিদায় লইতে গিয়া মণিমালার ছল ছল চোখ ছুটি দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। হাতখানি বুকে টানিয়া লইয়া বলিল'ম,—প্রিয়তমে, কেন? তুমি ত তোমার কথা রেখেছট,—একটি মাস বেশ কেটে গেল। এখন আসি! তোমার শিক্ষাতেই ত এমন অভিনয় করতে পারল'ম।"

—হ্যা, আসবে বইকি? একটি মাস বইত নয়?—আচ্ছা, কথা দাও,—৩০ দিন তোম'র ওখানে বাসা তৈরি না হয়, তার মধ্যে আর অন্ততঃ একবার এসে বেড়িয়ে যাবে। বল, কথা দাও।

হঠাৎ শব্দ-মহাশয়ের অভিমত ও হাবভাব মনে পড়িয়া গেল, রাগিয়া উঠিয়া বলিলাম,—কথা দি'তুম বইকি? কিন্তু তোমার ব'ব ত ভুলেও আব খরচ পাঠাবেন না, আর এমন এলে অভিযর্থনা যে কেমন করবেন তা'ত দেখলেই।—

ব্যথিত হুঁরে মণিমালার কানের কাছে মুখটি আনিয়া বলিল—তবে সে সময়ও আসবে না?

শ্রম'তার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়া এবার শব্দ-মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি খড়ম পায়ে দিয়া তাঁহ'র ঘবেব মধ্যে পাইচারি করিতেছিলেন, বোধ করি আমি অবশেষে বিদায় লই'তাহি সেই মুখে! আমি প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—বেঁচে থাক বাবা,

মুখে থাক,—খন, গৌরব দুই-ই তোমার হউক,—হ্যা, বাবা বুড়ো মানুষ'র কথাটা মনে রেখ—এ'ব'স খাটবার আর উপার্জনের। একনিষ্ঠ হ'য়ে এব'র কাজে লাগবে।—আর তোমার আমবাও বিরক্ত করছি না—

—আজ্ঞে, হ্যা, আর শীগগীর ছুটিও মিলবে না। তবে—

—ও চিঠিপত্রে বোঝাব'র নেবে ও দেবে। এখান থেকে বেশী দূরও ত নয়?

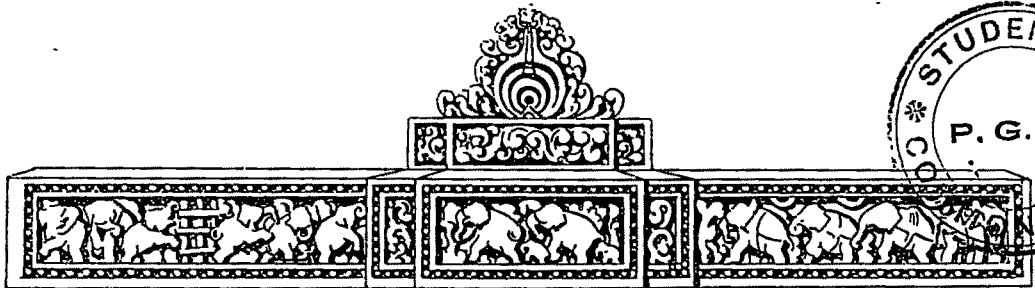
—না ভাবছি কি—তবে, মণিমালার ডেলীভারির সময়টায় একটু বিশেষ যত্ন নেবেন। ঐ ডাক্তারই ওর স্ত্রীকে নিয়ে এসে দেখে যাবেন। আমি ওখান থেকে ধোঁজ নেব।

চমকিয়া—না, না, র'সো, একটু জেবে দেখছি—বলিয়া খানিকক্ষণ চোখ মুদ্রিয়া রহিলেন, বলিলেন—না, তবে বাবা, তুমিই এসে প'ড়ে। ব্যাপারটা ত কিছুই নয়। তবে কি জান? ভয় করি ঐ রোগ-টোগের। আবার দেখলে ত? প্রিয়বাবুর পেটেন্ট ওষুধগুলির দাম ১০ তা বাবা, তুমিই হি'সব রাখবে ভাল! ভেব না, অর্ধেক খরচ ত আমিই দেব। বোঝাপড়াটা কেবল ঐ ডাক্তারের সঙ্গে, তুমিই না-হয় সবটা কর। মনে থাকে যেন আবার এসো।

—আজ্ঞে, তবে আসাই যাবে। এখন আসি।

—আচ্ছা বাবা, এস, রজনী ও রজনী, আমার জামাটা দে ত। ষ্টেশনে ওকে দিয়ে আসি।

স্ট্রিমার বাশি দিয়া ছাড়িয়া দিল। শব্দ-মহাশয় তখনও পাড়ে দাঁড়াইয়া ক্রমশ ঘুর'ইয়া বলিতে লাগিলেন—মনে থাকে যেন। আবার ছুটি নিয়ে এস গো—এসে ...





আলোচনা



“ভারতে লিপি-সমস্যা”

পৌৰ সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের “ভারতে লিপি-সমস্যা” পড়ে যে দুই-একটি কথা জানাবার ব’লে মনে করি, তাই জানাচ্ছি। ভারতীয় ‘অক্ষর’গুলির জটিলতা স্বীকার্য—অতএব তার সংস্কারও কামা। কিন্তু রোমান লিপি গ্রহণে আমাদের কি কি বাধা আসতে পারে তাই এখানে জানাতে চাই।

১। প্রথম কথা হচ্ছে দুইটি পৃথক পৃথক বর্ণ নিয়ে যে একটি বর্ণ বুঝাবে—য=gh; ঠ=th. য=th প্রভৃতি, তাহাকে সরলতর করা উচিত। অর্থাৎ য ঠ থ প্রভৃতি বর্ণগুলিকে এক একটি পৃথক পৃথক বর্ণ বিশেষ দ্বারা স্থিতি করা উচিত। দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণ মিলে যে কি ক’রে একটি বর্ণ সৃষ্টি কবল তা মনে আসতে পারে। যেমন, গ (g) আর হ (h) মিলে ‘ঘ’ ইত্যাদি।

আমাদের ভাষা যে এই রূপকে সহ্য করতে পারে নি তার প্রমাণ হচ্ছে, ক+ব=ক; ম+হ=ম; জ+ঞ=জ প্রভৃতি দুইটি পৃথক বর্ণ মিলে যখনই একটি বিশেষ ধ্বনি সৃষ্টি করেছে, তখনই তারা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের মত এক বিশেষ পৃথক রূপ পেয়েছে। তাই এই সব যমজ বর্ণ মিশে গিয়ে একটি বিশেষ রূপ পাবে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

২। আমাদের বর্ণমালার যে যে উচ্চারণ সেই সেই বর্ণমালার থাকিল, কেবলমাত্র নূন সংস্করণে ঐগুলিকে অল্প ভাবে নিবব—এই ত হচ্ছে নূতন সংস্কারের মূল কথা? অর্থাৎ আমরা ‘কাকা’কে Kaka লিখব। এখানে একটি কথা আসছে, যে, আমাদের ছেলে-মেয়ের এই নূতন কাকাকে (Kaka) বানান করবে কি ক’রে। এত দিন যে ‘ক’র আকারে কা, ‘ক’র আকারে কা=কাকা ছিল, ‘কাকা’র সেই ‘কাক’গুলি বুঝি আর থাকে না। অবশ্য না-ই যদি থাকে তার জন্ম আমার আশ্চর্য্য নেই। কিন্তু এই নূতন Kaka-র যে বিপদটুকু তাই বললাম।

৩। আমাদের প্রতিলিখনের অনুযায়ী লিখতে হবে ‘বই’ লও ‘ব’ জায়গায় ‘bui lo’, এইখান আরও একটু মুঞ্চিল আছে। আর সে মুঞ্চিলই একটু বিশেষ। তা হচ্ছে এই যে, আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সবই ‘অ’কারান্ত। অল্প অনেক ভাবার ব্যঞ্জনগুলি হ’তে আমাদের ব্যঞ্জনগুলির এই বিশেষ। হতরাং আমাদের ‘প্রতিলিখনে’ এই সব ‘অ’কারান্ত ব্যঞ্জনগুলির ‘অ’ লোপ পাবে। কেননা, যখনই ‘ব’র পরে ‘অ’ হবে, তখনই তা দেখিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ‘bu’ দিয়ে ‘ব’ লিখতে হবে। পূর্বে যে আমাদের ‘ব’র ভিতরেই ব+অ ছিল এখন আর তা রাখা যাবে না; আর তা-ই যদি না যায়, তবে আমাদের ব্যঞ্জনগুলির নামও বদলাতে হবে। অর্থাৎ সব ব্যঞ্জনগুলির ‘অ’কারান্ত নাম না হয়ে হসন্ত বা ঐ রকমই কিছু হবে।

তখন আমাদের প্রতিলিখনের ক ph, ল l, ক k, ন n, ট t, প্রভৃতিকে এক, এল, কে, এন্, টি প্রভৃতি ব’লে ডাকতে হবে। এতটা

স্বীকার করবার স্পর্ধা রাখলেও নিস্তার নেই—আবার সম্ভব জীতি আছে। বর্ণমালার এই নূতন নামকরণে সম্মিলিত ভাষা থেকে বিসর্জন দিতে হবে। তাই এই সব দেখে মনে হয়, আমাদের বোম্যান লিপি নেওয়ার পথে বাধা কম নয়। তুরস্কের কেমাল পাশা যে নিজের দেশে সংস্কার করেছেন তাতে বেগ পেতে হয় নি তাঁকে, কেননা, রোমান বর্ণমালার মতই বোধ হয় আরবী বর্ণমালা ‘অ’কারান্ত ধ্বনি পায় না। হতরাং ‘বে’র স্থলে ‘বি’ b নেওয়া সহজ হয়েছে। জার্মান দেশের গথিক বর্ণমালার সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলিও রোমান বর্ণমালার মত ‘অ’ ধ্বনি পায় না; হতবাং জার্মানরা গথিক ছেড়ে রোমান সহজেই নিতে পারছে।

কিন্তু আমাদের বেলা এই বিপদকে পেরিয়ে বাওয়া অসম্ভবও হ’তে পারে। তাই বাংলা লিপির যুক্তবর্ণ দূর ক’রে অক্ষর কমিয়ে আমাদের সংস্কার চল কিনা দেখা উচিত।

শ্রীমধীরচন্দ্র আচার্য্য

১। মুরায়ত, টাইপরাইটার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধার জন্ম ভারতীয় বর্ণমালার যে পরিবর্তন আবশ্যিক ইহা স্বীকার করি।

২। ভারতীয় বর্ণমালাসমূহের আদি সংস্কৃত বর্ণমালা যে রোমক বর্ণমালা অপেক্ষা অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত ইহা সুবিদিত। এরূপ অবস্থায় রোমক বর্ণমালা গ্রহণ করিতে বাওয়া পশ্চাদ্ভর্তন হইবে মাত্র।

৩। হতরাং বোঝা বাইতেছে যে, সংস্কৃত বর্ণমালার ক্রটিগুলি অপসারণ করিয়া পরিবর্তিত আকারে আধুনিককে গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। ইহা অতিশয় সহজসাধ্য। কতিপয় সহজ চিহ্নের সাহায্য লইবা মাত্র একাংশ বর্ণমালা সমুদায় সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং মাত্র পাঁচটি বর্ণমালা সমুদায় স্বরবর্ণ প্রকাশ করা বাইতে পারে।

৫। দৃষ্টান্তরূপে বলা বাইতে পারে, যে, অন্ত্যবর্ণ বাদ দিলে, ক, চ, ট, ত, প এই পাঁচটি বর্ণগণ প্রত্যেক বর্ণ একটি মূল শব্দের উচ্চারণের প্রাচুর্য জন্ম মাত্র। কেবল মাত্র পাঁচটি মূল বর্ণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া চিহ্নের সাহায্যে অপর সমুদয় বর্ণগুলি প্রকাশ করা বাইতে পাবে। বর্ণগণ সমুদয় অন্ত্যবর্ণগুলি চিহ্নের সাহায্যে কেবলমাত্র একটি বর্ণমালা প্রকাশ করা বাইতে পারে। আবার ‘ট’ ও ‘ত’কে মূলতঃ একই শব্দের উচ্চারণের প্রাচুর্য জন্ম ধরিয়া, চিহ্নের সাহায্যে সমুদয় বর্ণ কেবল মাত্র একটি বর্ণ সাহায্যে প্রকাশ করা বাইতে পারে। অল্প সকল বর্ণ সম্বন্ধেও উপযুক্ত উপায় পাট।

৬। অধ্যাপক মহাশয় ঐতিহ্য ও “সেন্সিটিভিটি”র কথা একেবারে ভুলিয়াছেন। এগুলি এত তাচ্ছিল্যের বিষয় মনে করি না।

শ্রীউদাস গুপ্ত

শ্রীমধীরচন্দ্র আচার্য্য যে-কয়টি বাধার কথা উল্লেখ করেছেন সে-বিষয়ে এই বলা যেতে পারে :—

১। খ, ঘ, ছ, ঞ ইত্যাদির জন্ম পৃথক বর্ণ উদ্ভাবন করার প্রয়োজন

কিছু নেই; কেন-না, প্রতি বর্ণের ২য় ও ৪র্থ বর্ণের ধ্বনি ১ম ও ৩য় বর্ণের সঙ্গে 'h' অর্থাৎ 'হ' ধ্বনি, যোগ ক'রে সহজেই প্রকাশ করা যায় এবং এখনও করা হয়, যেমন, কামাখ্যা Kamakhya। ধ্বনিত্বের দিক দিয়েও 'ক' ও 'হ' ধ্বনি মিলিত হয়ে 'খ' ধ্বনিই হয়, উচ্চারণ ক'রে দেখলে সহজেই সেটা বুঝা যাবে। এই 'h' ধ্বনিকে aspirate বলা হয় এবং এই অনুসারে 'ধ'কে aspirated 'ক', 'ঘ'কে aspirated 'গ', ইত্যাদি বলা যেতে পারে। পুনশ্চ, বর্ণগুলির ২য় ও ৪র্থ বর্ণের মাত্র নতুন বর্ণ উদ্ভাবন করতে গেলে আমাদের বর্ণমালার এখন যে জটিল অবস্থা তাই থাকবে, কোন লাভ হবে না; তাছাড়া রোমান অক্ষরের যে সরলতার কথা আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি সেটা রক্ষা করা যাবে না।

২। বানান করার অল্পবিধা অসংখ্য বর্ণের সময়ে বিশেষ কিছু হবে না, এখন যেভাবে হয় তাই হবে এবং 'কার' ও 'কলা'ও থাকবে, কেবল অ-কারান্ত ব্যঞ্জন ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জনের পরের স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ এখনকার মতই 'কার' ও 'কলা' ক'রে বানান করতে হবে। যুক্তবর্ণের বানানেও তাই, যদিও প্রথম প্রথম এক এক স্থানে কিছু অল্পবিধা হওয়া সম্ভব; ক্রমে ক্রমে এ-সব অল্পবিধা দূর করার ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে পারে।

৩। কোন অক্ষরের নাম বা উচ্চারণ পরিবর্তন করার আমি পক্ষপাতী নই এবং প্রয়োজন মনে করি না। অক্ষর-পরিচয়ের সময় এখন আমরা যেভাবে পড়ি সেই ভাবেই k, kh, ইত্যাদিকে ক, খ, পড়া হবে, কেবল লিখার সময় অ-কারান্ত ব্যঞ্জনগুলির পরে 'a' অর্থাৎ অ-কার, প্রকাশ করতে হবে; যেমন, কখন=kukhna। 'হসন্ত' অক্ষরের সম্বন্ধ হসন্তের চিহ্ন () বর্তমান আকারে ব্যবহার করা শ্রেয় মনে হয়; ছাপার সময়ে 'হসন্ত' একটি পৃথক type হবে, লেখার সময়ে 'হসন্ত'-অক্ষরে 'a' অর্থাৎ অ-কার না দিয়ে নীচের দিকে হসন্তের টান দিলেই হবে। এরাপ হ'লে 'সন্ধি' নিয়ে কোন অজবাব্দ্য থাকবে না।

ঐউমাধাস শুণ্ড যে কয়েকটি বিবরণ উল্লেখ করেছেন সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য :—

১। মনে হয় শুণ্ড মহাশয় 'বর্ণ' ও 'ধ্বনি', এই দুটিকে মিলিয়ে কেলেছেন; এই ভয়েই আমার প্রবন্ধে পাঠকদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ কবেছিল। 'সংস্কৃত (?) বর্ণমালা'কে সকলে বিজ্ঞান-সম্মত ব'লে স্বীকার কবেন এই মত্রে যে পৃথিবীর অস্ত্র কোনও ভাষার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে এরূপ হৃদয়লব্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজান দেখা যায় না। এই ধ্বনিক্রমেব মাত্র এয় এত প্রশংসা, কিন্তু বর্ণ বা অক্ষরের আকারের মাত্র নয়। আমার প্রবন্ধে এই ধ্বনিক্রমের কোন ব্যতিক্রম আমি প্রস্তাব করি নি, বরং রোমান লিপিতেও এই ক্রমধারার কথাই বলেছি, হৃতবাং প্রস্তাবিত পরিবর্তন 'পঞ্চাবর্তন' নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সংস্কৃতের স্বর-ধ্বনিক্রম-সম্পর্কে এ প্রশংসা চলে না, কারণ ইহা কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রশংসা সাজান নয়।

২। 'সংস্কৃত বর্ণমালা'র যে ক্রটিগুলির উল্লেখ আমার প্রবন্ধে করেছি সেগুলির অপসারণ সম্ভব নয়।

৩। একাদশটি বর্ণমালা কতকগুলি 'সহজ চিহ্ন'র সাহায্যে তিনি যে বর্ণমালা উদ্ভাবন করতে চান, সেটা না দেখলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না। তিনি যদি ঐ বর্ণমালা প্রস্তুত ক'রে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন তবেই সকলে বিচার ক'রে দেখবার হযোগ পাবেন যে সেটা চলতে পারে কিনা। এই বর্ণমালা উদ্ভাবনের সময় প্রবন্ধে আদর্শ

লিপির যে বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৪। ঐতিহ্য ও সেটিমেটিকে আমি ত্যাগ করি না। কিন্তু কখনও কখনও এমন অবস্থা উপস্থিত হ'তে পারে যখন এগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। লিপিসংস্কার সেই প্রকার একটি বিষয় ব'লে মনে হয়। তাছাড়া, শুণ্ড-মহাশয় চিহ্নাধি সাহায্যে যে নতুন অক্ষর প্রচলিত করতে চান তাতেও কি ঐতিহ্য ও সেটিমেটের আপত্তি আসতে পারে না?

ত্রিনিবন্ধন নিয়োগী

বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন

বাণীবন তথাটা উল্লেখ করিবার হাঁহার নাম লোকের মনে পড়ে, তিনি কর্ণবীর পরলোকগত এককড়ি সিংহরায় মহাশয়। হাঁহার জ্ঞানেন তাঁহার বলে, "বাণীবন বললে এককড়ি বাবু এবং এককড়ি বাবু বললে বাণীবন বুঝায়।" একথা কত লোকের মুখে যে শুনিয়াছি তাহা বলিবার শেষ করিতে পারি না। এই বিদ্যালয়টি তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় প্রথম তাঁহার বাড়ির বারান্দায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বহু মহাশয়ের শিক্ষকতায় ১৯০০ সালে আরম্ভ করা হয় এবং বর্তমান হুন্সর পাকা বাড়িটিও তাঁহার ও স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র সিংহরায়ের প্রদত্ত জমির উপরই প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং এজন্য অর্থসংগ্রহ করিতে হাঁহার খাটরাছেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, স্বর্গীয় এককড়ি বাবু ও বর্তমান লেখক অগ্রণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য নিজেও অনেক টাকা এজন্য দান করিয়াছেন। পাকাবাড়ি তৈরি করিবার সময় স্বর্গীয় এককড়ি সিংহরায় মহাশয় ঐ স্থানের সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিবারই বালিকাদের জন্য বাড়ি স্থাপন করা হয়। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাঁহার মত অল্পান্ত্র-কর্ম্মীর আবশ্যক। ভগবান সেরূপ কর্ম্মী আনিয়া দিন।

বাণীবন স্থলটিব কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নামের মধ্যে ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়ের ট্রেনিং-বিভাগের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বালিকা-বিদ্যালয়ের যখন Standard Examination প্রবর্তিত হয়, তখন বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয় হইতে প্রথম স্বর্গীয় এককড়ি বাবুর জ্যেষ্ঠাকৃত্য হুম্মা দাস ও স্বর্গীয় হারাণ বাবুর কৃত্য পরলোকগতা অমিয়া সিংহরায়কে পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়। তখন এই প্রবন্ধ-লেখক স্থানের সম্পাদক ছিলেন। ইহার পরই Miss L. Brock যিনি সেই সময় স্থানের Inspotress ছিলেন—স্থল পবিত্র করিতে সেই সময়ে ইহার কার্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। ফলে সেই সময় হইতে Grant-in-aid পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-লেখক ও স্বর্গীয় এককড়ি সিংহরায়ের পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন, এম-এ, ইহার সম্পাদক হন এবং ২ বছরকাল সম্পাদকের কার্য করেন। এই স্থলে হাঁহার প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে স্বর্গীয় কিরোদচন্দ্র দাস মহাশয়ের কথা। স্বর্গীয় মণিলাল মলিক, স্বর্গীয় অনাথবন্ধু সরকার, স্বর্গীয় হরিশোহন ঘোষাল, স্বর্গীয় কিশোরীমোহন দাস বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত বনমালী গ্রামাণিকও ইহার প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন।

ভারতে মনঃসমীক্ষা

শ্রীহিরণ্যর মুদ্রা

পূত পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে শ্রীব্রজনাথ ঘোষ মহাশয় 'ভারতে মনঃসমীক্ষা' বিজ্ঞানের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে লেখক মনঃসমীক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ে আর একখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই। সে বইখানি অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের 'মনের পথে,' ১৩৩০ সালে পাবনা সংস্কৃত হইতে প্রকাশিত হয়।

“পাটের বদলে অল্প ফসল”

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গ “পাটের বদলে অল্প ফসল” শীর্ষক অঙ্কুর বাছা লেখা হইয়াছে সে-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

চীনাবাদাম বেলে, বেলে দোরাঁশ ও দোরাঁশ জমিতে উৎপন্ন হয়; বেলে দোরাঁশ ও দোরাঁশ জমিতে পাটও জন্মে; এইরূপ উঁচু জমিতে

বগী পাট জন্মে; হুতরাং বগী পাট চাষ কম কবিবার জন্ত যে-সকল উঁচু বেলে দোরাঁশ ও দোরাঁশ জমি (অর্থাৎ বাহাব উপর জল পান্ডার না) উৎকৃষ্ট থাকিবে সেই সকল জমিতে চীনাবাদামের চাষ করা বাইতে পারে। চীনাবাদাম বৎসরে দুইবার অর্থাৎ শীতকালে ও বর্ষাকালে রোপণ করা বাইতে পারে।

তামাক শীতকালের অর্থাৎ রবি-ফসল; পাট বর্ষাকালের অর্থাৎ খরিস-ফসল; শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে পাট উঠাইয়া পাটের জমিতে তামাকের ফসল করা যাইতে পারে।

পাটের বদলে রবিশস্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে বলিলে ভুল বলা হইবে; রবি-ফসল সম্বন্ধে যে পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে পাটের বদলে রবিশস্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। পাটের দাম কম হওয়াব জন্ত কৃষকদিগের যে আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহা তাহারাই রবিশস্ত্রের আবাদ বাড়াইয়া ও নতুন নতুন লাভজনক রবিশস্ত্রের চাষ করিয়া কতক পরিমাণে পূরণ করিতে পারেন; এই উদ্দেশ্যেই রবি-ফসলের চাষ সম্বন্ধে কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

বিক্রমপুর—একালে ও সেকালে*

শ্রীরাপ্রসাদ চন্দ্র

[যখন আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি-পদ গ্রহণ করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, ব্যাপার বুঝি সাহিত্য-সম্মিলন বা একক পিছু, তাই সহস্ৰ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সাহস করিয়াছিলাম। তার পর আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের প্রথম দশ বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম, এই মণ্ডলের সাঙলিকগণ কেবল প্রজাগার, মুষ্টি সংগ্রহ, পুঁথি সংগ্রহ, বিজ্ঞানগণ পরিচালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, বুদ্ধিমান লোকেরা যাহাকে বাল কাঙ্ক্ষণ কাজ এমন অনেক কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহঁরা সফলতা লাভ করিয়াছেন। বান্ধাপন, চোর-ডাকাতের হস্ত হইতে গ্রাম-রক্ষণ, ব্রতদল ও সেবা-সমিতি গঠন, এমন কি পদব্রজে ভূপর্দাটনের ব্যবস্থাও আপনারা করিয়াছেন। মণ্ডলাচার্য্য বা মহামাণ্ডলিক শ্রীমুখ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় চিনি ও তৈল প্রস্তুত কবিবার জন্ত গ্রামের মধ্যে কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনারা আপনাদের পল্লীর সকল প্রকার উন্নতসাধনে রত; আব আমি আমার পল্লী হইতে পলায়িত; হুতরাং আপনাদের সমাজে অপরাজেব। এইরূপ অপরাজেব ব্যক্তিকে আপনারা কেবল পংক্তিতে নহে, আপনাদের পংক্তির প্রথম আসনে বসাইয়াছেন। এই জন্ত যে আপনাদিগকে কি বলিব তাহা আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু দু-দিনের জন্ত এই পলাতককে যে আপনাদের সং

সঙ্গ লাভের সুযোগ দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।]

বর্তমান যুগে নগর পল্লীর গৌরব অপহরণ কবিয়াছে। কিন্তু এক সময় পল্লীই ছিল দেশের সর্বস্ব। আমাদের সভ্যতা পল্লীর সভ্যতা, নগরের অমুপযোগী। নগরের আশ্রয় লইয়া এই সভ্যতা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। পল্লীর অনেক দোষ ছিল, কিন্তু অনেক গুণও ছিল। এখনকার হিসাবে, পল্লীসমাজের প্রধান দোষ, জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা। কিন্তু পল্লীতে যেমন জাতিভেদ আছে, তেমন জাতিভেদ নাই বা ছিল নাও বলা যাইতে পারে। কারণ, পল্লীতে জাতিভেদের সঙ্গে তাহার প্রতিবেশকও ছিল। নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন প্রকাশ্য ভাবে নবদ্বীপে সংকীর্ণতার আরম্ভ করিলেন, তখন নবদ্বীপের কাজী তাহা নিবেদন করিয়াছিলেন। এই নিবেদনার উত্তরে বিবাত এক দল কীর্তিনিয়া লইয়া গিয়া নিমাই কাজীর বাড়ি চড়াও

* আড়িয়ল পল্লীমণ্ডলের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিজ্ঞাণ।

করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ (আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ, ১৪৮-১৫০) লিখিয়াছেন, কাজীসাহেব তখন বাড়ির বাহির হইয়া নিমাইকে বলিয়া-

—ছিলেন—

গ্রাম সন্ধ্যা চক্রবর্তী হয় মোর চাচা ।
নেহ সন্ধ্যা হৈতে গ্রাম সন্ধ্যা সাঁচা ।
নীলাধর চক্রবর্তী হব তোমার নানা ।
সেই সন্ধ্যা হও তুমি আমার ভাগিনা ।
ভাগিনার জ্যেষ্ঠ নামা অবস্ত্র সহয় ।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ।

এখনও আমাদের গ্রাম হইতে গ্রাম সন্ধ্যা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও গ্রামের আচরণীয় হিন্দু, অনাচরণীয় হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পরকে চাচা, খুড়া, মামু, ভাই, ভগিনী, পিসী, মাসী বলিয়াই সম্বোধন করে, এবং ঋণভার সময় পর্যায় লঙ্ঘন করিয়া গালি দেওয়া বিশেষ অপরাধজনক মনে করে। এই গ্রাম-সন্ধ্যা গ্রামের বিভিন্ন জাতির লোককে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের সকল অধিবাসী আদৌ একই বংশোদ্ভব এইরূপ সংস্কারও বোধ হয় গ্রাম-সন্ধ্যার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাতিভেদ, লম্বু-শুক্র-ভেদ, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভেদ, এইরূপ বিবিধ বৈষম্যের অন্তর্গলে একপ্রকার সাম্যও এক সময় ছিল। প্রভুর পুত্র বয়োজ্যেষ্ঠ ভৃত্যকে রীতিমত সম্মান করিত; ~~এক-কয়োজ্যেষ্ঠ~~ ভৃত্য কনিষ্ঠ প্রভুপুত্রকে অতিভাবকের মত শাসন করিত। রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন স্মৃতি’তে দ্বোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির ভৃত্যতন্ত্র-শাসনের চিত্র আছে। এই চিত্র প্রীতিকর নয়। কিন্তু অল্পপ্রকার ভৃত্যতন্ত্র-শাসনের সহিতও আমাদের পরিচয় আছে। এইরূপ শাসনের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে, প্রভু-ভৃত্য, ধনী-নিধনে এখন বত ভেদ তখন তত ভেদ ছিল না। প্রকৃত জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে এখনকার শহরে। শহরে গ্রাম-সন্ধ্যার বন্ধনযুক্ত জাতিভেদ ধনী-নিধন, শিকিত-অশিকিত, সভ্য-অসভ্য ভেদের সহিত মিলিত হইয়া বিকট আকাব ধারণ করিয়াছে। পল্লীগ্রামে অপরিচিত দীন ব্যক্তি কও “ভাই” বলিয়া সম্বোধন করা হয়। শহরে আসিয়া পাশ্চাত্য ফ্রেটারনিটি বা ব্রাহ্ম-মত্রে দীক্ষিত আমরা এইরূপ “ভাই” ডাক ভুলিয়া গিয়াছি। দেশের লোকের প্রকৃতি এবং দেশাচারের মর্শ্ব-অনভিজ্ঞ-সমাজ-সংস্কারকগণ শহরের সমাজের কাটা ঘায়ে মূনের ছিটা

দিতেছেন। শহরের সামাজিক ব্যাধি বিধি ক্রমশঃ পল্লীতে সংক্রামিত হইতেছে। এমন সময় ভোট-বাটোয়ারার এবং শাসন-পরিষদের আসন-বাটোয়ারাব বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়ার আমাদের এক সময়ে গ্রাম-সন্ধ্যার একতাসূত্রে সন্ধ্যা সমাজ ত্রিধণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্ত প্রস্তুত। এই দুর্যোগে দেশনায়কগণ এদেশের জনগণের মধ্যে অনৈক্য স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া ঐক্যস্থাপনের জন্ত নানা প্রকার বিদগ্ধ ও বধ প্রয়োগ করিতেছেন। ইহারা আপনাকে পর করিয়া লইয়া পরহিতের তৃপ্তি ও খ্যাতি লাভ করিতেছেন; স্বজনকে হরিজনে পরিণত করিয়া হরিভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। আমাদের পল্লীসমাজে এই যে অনৈক্যের এবং অন্তর্দ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে, ইহাব পরিণাম তিস্তা করিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

পল্লীসমাজের অন্তরে এখন এই অন্তর্দ্রোহের সূচনা হইতেছে, তখন আবার বাহিব হইতে বাজ্রদ্রোহেব তাপ আসিয়া সমাজকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠান নিরস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় যুবক সশস্ত্র বিদ্রোহ—অলঙ্কিতভাবে রাজপুরুষ হত্যা আবস্ত করিয়াছিল। নিরস্ত্র বিদ্রোহ আপাতত স্থগিত আছে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহেরও বিরাম দেখা যায়। শুণ্ড সশস্ত্র বিদ্রোহের অপকারিতা এবং নিষ্ফলতা সন্ধ্যা অনেক বহুদর্শী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু এদেশে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন-ক্ষেত্রে সকল প্রকার চরম পন্থার অল্পবোগিতা সন্ধ্যা আমার একটি কথা বক্তব্য আছে।

দেশের মুক্তি সকলেরই প্রার্থনীয় এবং এই মুক্তির জন্ত দেশবাসী মজেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য। আমাদের মুক্তির দাবি যে অসঙ্গত নহে এ-কথা সরকারও স্বীকার করিয়াছেন; কালে আমাদেরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মালোকা মুক্তি (Dominion Status) দান করিবেন এরূপ আশাও দিয়াছেন। সুতরাং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দোষের কথা নহে এবং মুক্তির বিলম্ব ঘটিলে অর্ধৈর্ধ্য হওয়া অসম্ভাবিক নহে। কিন্তু অর্ধৈর্ধ্য হইয়া চরম পন্থা অবলম্বন করিলে এদেশে লাভের অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক মনে হয়। রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনের

শুক্র যুরোপীয়গণ আবিষ্কৃত টেলের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষকে মনে করেন রাষ্ট্রীয় জীব (political animal), অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্বাস করেন, মানুষের সুখ-দুঃখ অনেকটা রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবহার উপর নির্ভর করে। কিন্তু হিন্দু-সাধারণ তাহা মনে কবে না। হিন্দু-সাধারণ মনে করে, মানুষ কর্মফলের হাতের ক্রীড়াপুতুল; এই কর্মফল ভোগ করিবার জন্ত সে পুনঃ পুনঃ জন্মে এবং পুনঃ পুনঃ মবে। এই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের হাত হইতে মুক্তি বা মোক্ষলাভ করা মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। মোক্ষ অবশ্য সহজলভ্য নহে এবং প্রকৃত মুমুকুর সংখ্যা কখনও খুব বেশী হইতে পারে না। গীতাকার বলিয়াছেন—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

হাজার হাজার লোকের মধ্যে এক-আধজন সিদ্ধির (মোক্ষের) চেষ্টা করে। কিন্তু হিন্দু-সাধারণের মধ্যে বাহারা মোক্ষের জন্ত চেষ্টা করিতে অসমর্থ, তাহারাও ঐহিক ব্যাপারে অনেক সময় অধিবিরাগী; নৃষ্ট বিষয় অপেক্ষা অদৃষ্ট তাহাদের মনকে অধিক আকর্ষণ করে। এইরূপ সংস্কারসম্পন্ন জনগণকে ঐহিক যুক্তির জন্ত চরম পন্থায় পরিচালিত করা অসাধ্য মনে হয়। কথায় বলে, “শুক্র মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক।” পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এদেশে কতক জন চরম পন্থার নায়ক অভ্যাসিত হইতেছেন এবং হইবেন। কিন্তু কর্ম-জন্মান্বরে বিশ্বাসী জনসাধারণের পক্ষে দীর্ঘকাল তাঁহাদের অনুসরণ কবা অসম্ভব। যত দিন না হিন্দু-সাধারণের মনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়, তত দিন তাহারা যুরোপীয় জনসাধারণের মত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সম্পূর্ণ মাতিতে পারিবে না। কিন্তু সেদিন বোধ হয় অনেক দূরে। এইরূপ অনধিকারী শিষ্য-সম্প্রদায় লইয়া চরম পন্থা অবলম্বন করিতে গেলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং আমাদের দেশের যে-সকল যুবক-যুবদের মনে রাষ্ট্রীয় ভাব জাগরিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে সংযত হইয়া, জনসাধারণ যতটা বেগে তাঁহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে ততটা বেগে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁহারা যদি ধীর পদে অগ্রসর হইতে সম্মত হন তবে পূর্ণ স্বরাজ্য না হউক স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সহায়তা কবিতে পারেন।

কিন্তু ধীর পদে চলিতে হইবে বলিয়া এক মুহূর্তের জন্তও

লক্ষ্য বিষ্মত হওয়া কর্তব্য নহে। লক্ষ্য অবশ্য আমাদের মাতৃভূমির উপর মুক্তিযুগপ-গঠন। মুক্তিযুগপ-গঠনের বিলম্ব হয় হউক; কিন্তু যে-ভূমির উপর মুক্তিযুগপ গঠিত হইবে সেই ভিত্তিভূমির বাটোয়ারা হইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। সম্প্রদায়ভেদ বা জাতিভেদ অনুসারে শাসন-পরিষদের আসন বাটোয়ারা করিলে মুক্তিযুগপের ভিত্তিভূমি খণ্ড খণ্ড হইয়া বাইবে। যদি আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ এবং ‘অনাচারণীয়’ হিন্দু ভ্রাতৃগণ হিন্দু ভ্রাতৃলোককে বিশ্বাস করিতে না পাবেন, সকল আসনই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; রাগ করিয়া নয়, অভিমান করিয়া নয়, কাহারও অহুবিধা জন্মাইয়া নয়, সানন্দে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তথাপি বাটোয়ারায় সম্মত হওয়া উচিত নহে।

বাক্সালার যে-সকল ভদ্রসম্ভান দেশগতপ্রাণ তাঁহাদের কাজের অন্ত নাই। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান কাজ, বাঙালীর জন্ত বাক্সালার সম্পদ (natural wealth) বা আর্থিক স্বরাজ রক্ষা। শৈশবে আমরা একটি হেয়ালি শুনিতাম—

“বল ত পৃথিবীটা কার বশ।”

হেয়ালির উত্তর ছিল—“পৃথিবী টাকার বশ।”

জনসমাজে সম্পদের সাম্যবাদী কার্ল মার্কস দেখাইয়া গিয়াছেন, মনুষ্যের ভাগ্যচক্র অর্থের দ্বারা পরিচালিত। মার্কসের ব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের নাম ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (economic interpretation of history)। টাকা শুধু টাকশালে মুদ্রিত টাকা নহে; যে-সকল বস্তুর দ্বারা বা যে-সকল উপায়ে টাকা উপার্জন করা যায় তাহাও টাকা। যে-দেশের টাকা-উপায়ের সকল পথ বিদেশীর হাতে, সে দেশের মুক্তি অসম্ভব। বাক্সালার টাকা-উপায়ের অধিকাংশ পথই এখন বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীর হস্তগত। উচ্চজাতীয় হিন্দু বা ইংরেজের আমলে চাকুরী, ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশার মোহে চাববাস, শিল্প-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সঞ্চিত অর্থের দ্বারা জমিদারী, খরিদ করিতেছিলেন। ফলে বাক্সালার সম্পদ—কয়লার খনি, পাটের বাজার, চা-বাগান, কল-কারখানা, দোকান-পসার পরহস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে এখনও বাহা অবশিষ্ট আছে তাহা দেশবাসীর জন্ত রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের কোন প্রকার মুক্তিই সম্ভব হইবে না।

ভদ্রলোকের হস্তগত চাকুদী এখন করিবেন মুসলমান এবং অনাচবণীর হিন্দুগণ। তাঁহারা যে শীঘ্র চাকুদী এবং শাসন-পরিষদে আসনের মোহ কাটাইয়া দেশেব সম্পদরক্ষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিবার অবসর পাইবেন একপ আশা করা যায় না। সুতরাং বাক্সালার অবশিষ্ট সম্পদ রক্ষার ভার এখন অপব হিন্দুদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাঁহারা এ ভার বহন অসমর্থ হইয়ন তবে শাসন বিবরে অন্তরাজ্ঞ অপেক্ষা গুরুতব বিপদ, ধনসম্পদের ক্ষেত্রেও আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অতরাজ্ঞ হইতে হইবে। শাসনবিধিসংস্কার হঠাৎ আমাদের জন্ত নূতন অবস্থার (environmentএর) সৃষ্টি করিয়াছে। একপ নূতন অবস্থার সহিত নিম্নে ক খাপ খাওয়াইতে হইলে (adaptation to environment) অবশ্যেব দরকার। সে অবকাশ আর পাওয়া বাইবে না। সুতরাং আর সকল কর্ম, আর সকল আন্দোলন, ত্যাগ করিয়া অর্থিক পবাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্ত আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। নতুবা যে ভদ্রলোকই ধনসম্প্রাপ্ত হইবে তাহা নয়; তাঁহাদের প্রতিবেদী মুসলমান এবং অত জাতীয় হিন্দুগণও কালে অধঃপাতে যাইবে। আড়িয়ল পল্লী-মণ্ডলার মণ্ডলিগণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ~~এবং~~ শ্রীধব মিল প্রতিষ্ঠিত কবিয়া বিক্রমপুরে আর্থিক মুক্তির প্রকৃত পথ প্রদর্শন কবিয়াছেন। সমস্ত বিক্রমপুরবাদী, বিশেষতঃ স্বদেশগুপ্রাণ যুবকগণের, অনন্তকর্ম্য হইয়া এই আদর্শের অনুকরণ করা কর্তব্য।

বড়ই আনন্দের বিষয়, আপনারা ব্যাঙ্ক এবং মিল করিয়া ক্ষান্ত হইয়ন নাই, দেশবাসীর বৈহিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের মুক্তিব (intellectual emancipationএর) জন্ত পুস্তক লয়, প্রাচীন পুঁথিশালা, এবং চিত্রশালাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বন্ধুবব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরের প্রভুগঙ্গাদব দিকে প্রথমতঃ আমাদের মনোবোগ আকর্ষণ কবিয়াছিলেন। তার পর ঢাকা মিউজিয়মের সুবোগা অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য অনেক রত্ন উদ্ধার করিয়া ঢাকার চিত্রশালায় সঞ্চিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকে আরও অনেক রত্নের পরিচয় দিয়াছেন

ইতিহাস বিক্রমপুরেব এই দুই জন যুগান্তনকে বিশ্বিত হইবে না। আড়িয়ল চিত্রশালায় সংগৃহীত মুর্তিসমূহকে শ্রীযুক্ত রামণ বসু মহাশয় ষোড়শ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য নিদর্শন বলিয়া মনে কবেন। একপ অসম্মানের কাবণ, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এই ধরণেব কোন কোন মুর্তিত ষোড়শ শতাব্দীর অক্ষবর লিপি পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরের চৈতন্যময় স্মার্য্যমূর্তি পাওয়া যায়, ঠিক এই বকসব একখানি স্মার্য্যমূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। এই মুর্তিই পাদপীঠের লিপির অক্ষবেব উপর সরল মাত্রা নাই; প্রত্যেক লক্ষ্যমান রেখাব অগ্রভাগ একটু চোপুটা পেবেকের মণির মত। এইরূপ লিখিত মুর্তিকে দশম শতাব্দীর পর ফেলা যায় না। সুতরাং আড়িয়ল চিত্রশালাব এই সকল মুর্তিকে গোড়ব পাংশিলেব নিবর্ধন ভিন্ন বড় বেদী কিছু বলা কঠিন। আড়িয়ল হইতে সংগৃহীত এবং ঢাকা জীবনবাচর বাড়ি রক্ষিত লক্ষ্য সেনার তৃতীয় বর্ষেব লিখিত চণ্ডীমূর্তি দেখিলে বুদ্ধিতে প'বা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ পর্যন্ত এই মুর্তি শিল্প সজীব ছিল।

এদেশেব সকল পদার্থই শুভাস্য বিচারেব বিচারালয় এখন যুরোপে স্থানান্তরিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীে আমাদের প্রাচীন মুর্তি শিল্প বর্ধরতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত। বর্ধবন শতাব্দীে সেই মত পরিবর্তিত হইয়াছে।

এই মত পরিবর্তনেব মূল পরলোকগত হেবল সাহেবেব ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ভাবতীয় ভাস্কর্য্য এবং চিত্র বিষয়ক পুস্তক। হেবলের দৃষ্টান্ত প্রথম অনুসরণ করেন ডাক্তার কুমারস্বামী। তাব পরের ঘটনা সম্বন্ধে সার উইলিয়ম রোটেনষ্টাইন তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

"Later, when Havell returned to England, he, Coomaraswamy and I went to hear a lecture by Sir George Birdwood, who, while praising her crafts denied fine art to India; the noble figure of Buddha he likened to a noble suet pudding! This so disgusted me that, there and then, I proposed we should found an India Society. A meeting was held at Havell's house, and with the support of Dr. and Mrs. Hearnham, Thomas Arnold, W. R. Lethaby, Roger Fry, Dr Thomas, T. W. R. Heaton and others the new society was formed." (*Men and Memoirs*, 1903—1922. Vol. 2, p. 231.)

১৯১০ সালে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং অনেকে সার জর্জ বার্ডউডের প্রকাশিত প্রতিবাদের করিয়াছিলেন। তদবধি পাশ্চাত্য রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভাবতেন প্রাচীন মূর্ত্তি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

খান-খারনা-সমাধিতে আধ্যাত্মিক ভাবের চরম বিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের ভাস্কর দেবদেবীর এবং বুদ্ধ ও জিনের মূর্ত্তিতে খান-খারনা-সমাধিকে মূর্ত্তিসমত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সার উইলিয়ম বোটেনষ্টাইন বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পী তিনটি মহাভাবকে রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(১) The plastic interpretation of samadhi সমাধির রূপের সৃষ্টি।

(২) জগৎসৃষ্টিকাবিনী মহাশক্তির প্রচণ্ড লীলা যে ঐক্যতান বায়োর তালে তালে চলিতেছে তাহাব প্রকাশ। নটরাসের মূর্ত্তি।

(৩) The interpretation in material form of a moment between movement and tranquillity গতিশীলতার এবং শান্ত অবস্থার সন্ধিক্ষণের রূপ। ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় দাক্ষিণাত্যের শিল্পে।

প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তিশিল্পের কি ইহা ছাড়া আর কোন গুণ নাই? রোটেনষ্টাইন ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের যে-সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা symbolic meaning বা সাংকেতিক অর্থের সামিল। ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প কি কেবল সঙ্কেত মাত্র? ইহাব রূপের কি কোন স্বতন্ত্র মহিমা বা সার্থকতা (formal meaning) নাই? মূর্ত্তিশিল্পের এই সকল গুণ রূপকে সার্থকতা দান করে—সজীবতা, নিরেট বস্তুর দর্শন এবং স্পর্শ স্পর্শের অনুভূতি, এবং গুরুত্বের অনুভূতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আড়িয়ল চিত্রশালাব কঙ্কিমূর্ত্তির উল্লেখ করিব। মূর্ত্তির মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট মূর্ত্তিব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, পায়ণ যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া অশ্ব এবং অশ্বারোহীতে পরিণত হইয়াছে। অশ্বের হুগোল পূর্ণ এবং গ্রীবা দর্শকের স্পর্শ-স্বথ জাগাইয়া দেয়। আরোহীর এবং অশ্বের গুরুত্ব সহজেই অনুভূত হয়। আরোহীর বক্ষস্থল, বাহু এবং জাহ্নুর গড়ন নয়নমনেব

তৃপ্তিকর। চাবিটি বাহুব বিভ্রাসে হৃদয়ঙ্গমিত রহিয়াছে। আড়িয়ল চিত্রশালায় যে কঙ্কিখানি মূর্ত্তি আছে তাহার কোন খানিই নির্জীব নহে, এবং কোনখানিরই আকার একেবারে অর্থহীন নহে। এই সকল মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বিক্রমপুরবাসী সেকালে আধ্যাত্মিক হিসাবে কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাদেব রুচি কত মার্জিত ছিল, এবং তাহাদের অনুভূতি কত সুস্পষ্ট ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত গোড়মণ্ডলের সার্ক্সভৌম পালনরপালগণের কোন লিপি এ-পর্যন্ত বিক্রমপুরে পাওয়া যায় নাই; পক্ষান্তরে চন্দ্র, বর্ম্মা এবং সেন বাদ্রগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর স্বন্দাবারে বাসের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, পালযুগে বিক্রমপুর একটি খণ্ডরাজ্য ছিল। এই খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণ গোড়াধিপের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন। আমার অনুমান হয়, বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই খণ্ডরাজ্য কখনও করদ, কখনও স্বাধীনরূপে বর্তমান ছিল, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক কেদার রায়ের পবাস্রয়ে এবং নিধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাব অবসান হয়। কেদার রায়ের পরাজয়ে—দিন বিক্রমপুরের জীবনসন্ধ্যা। তার পর হইতে ধ্বংসলীলা চলিতেছে। কীর্তিনাশা পদ্মার দক্ষিণ তীরে বিক্রমপুরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে; এখনও প্রবাদ আছে, এই কীর্তিনাশা এক সময় একটি সন্ন্যাস মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের জীবনসন্ধ্যায় বিক্রমপুর যে কত বড় ছিল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের অস্তিত্ব বাঙ্গালার দুইখানি মানচিত্রে তাহাব পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) মেথুজ ভেন ডার ব্রুকের ম্যাপ। ভেন্ডার ব্রুক (Matheus van der Broucke) ১৬৫৮ হইতে ১৬৭৪ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালার ওলন্দাজ (Dutch) বণিক-গণের অধিনায়ক ছিলেন। ভেন্ডার ব্রুকের ম্যাপের প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায় নাই। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বেলেটিনের (Valentyn's) ইস্ট ইণ্ডিয়া (East India) নামক পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ব্রুকের ম্যাপের যে সংস্করণ আছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনীত তাহাব ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইল। ভেন ডার ব্রুকের সময় কলিকাতা একটি

নগণ্য গ্রাম ছিল। বেলেটিনের প্রকাশিত ম্যাপের এই সংস্করণে কলিকাতার স্থানে সূতানুটি কলিকাতা (Collecatta) এবং কলকুল (Calcula) নামক তিনটি গ্রাম দেখা যায়। কলকুল গোবিন্দপুরের স্থলবর্তী। এই তিনটি গ্রাম এবং নিকটবর্তী অত্যন্ত গ্রাম বোধ হয় ভেন্ডার ক্রকের পরে চিহ্নিত হইয়াছে।

(২) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে বঙ্গালা মৌগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ বণিকগণ তখন প্রকারে হিসাবে বঙ্গালায় বাণিজ্য করিত, সূতরাং জরীপ করিয়া মাপ তৈরি করিবার তাঁহাদের অধিকার বা প্রয়োজন ছিল না। নদীপথে নৌকার মাল চালান করিয়া তাঁহারা বাবসা করিতেন। মালের নৌকার মালিকমাল্লার সুবিধার জন্য তাঁহাদের নদ-নদীর এবং আড়ঙ্গের মাপ আবশ্যক ছিল। এই জন্য ভেন্ডার ক্রক মাপ তৈরি করিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদেরও মালের নৌকার মালিকের সহায়তার জন্য মাপসহ নদ-নদীর বিবরণ প্রকাশিত করা আবশ্যক ছিল। এই শ্রেণীর বিবরণীর নাম English Pilot, ইংরাজী নদীপথপ্রদর্শক। এইরূপ একখানি পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে।* এই পুস্তকে একখানি ম্যাপ আছে। তাহাতে লেখা আছে যে দ্বিষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ইহা প্রস্তুত করিয়াছে, এবং জন থর্নটন কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের এক খণ্ড মাত্র লণ্ডনের নৌসেনা-বিভাগের বড় আফিসে (Admiraltyতে) আছে। সেখান হইতে ম্যাপের ফটোগ্রাফ আনা হইয়াছে।

এই দুইখানি ম্যাপে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ভেন্ডার ক্রকের ম্যাপে নাম বেশী আছে; সূতরাং এই ম্যাপ হইতে বিক্রমপুর অংশের বিবরণ সংগৃহীত হইল।

বর্তমানে শুদ্ধপ্রায় করতোয়া নদীর খাতের পূর্বতীরে ঘোড়াঘাট অবস্থিত। এই মানচিত্রে একটি নদীর পশ্চিমে ঘোড়াঘাট (Gerregaat) চিহ্নিত হইয়াছে। এই নদী



কক্ষিমূর্তি

অইগু করতোয়া, এবং ভ্রমক্রমে পশ্চিম পারে ঘোড়াঘাট চিহ্নিত হইয়াছে। এই ম্যাপে করতোয়া প্রবাহমান। এখন আর করতোয়ার সেদিন নাই। সেকালে যে জলরাশি করতোয়ার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত, এখন তাহা তিস্তার খাতে চলিতেছে।

পশ্চিমে করতোয়া এবং পূর্বে শীতললক্ষ্যা (Lecki) এই দুই নদীর মধ্যভাগে আর কোন নদী চিহ্নিত হয় নাই; অর্থাৎ তখন তিস্তা আত্মপ্রকাশ করে নাই, এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জলরাশি তখন যমুনার খাত দিয়া বহিতে আরম্ভ করে নাই। ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি তখন কতক লক্ষ্যা দিয়া, এবং কতক লক্ষ্যার পূর্বদিকে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত দিয়া গিয়া মেঘনায় পতিত হইত। শীতললক্ষ্যার এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমের উত্তরে কাঠারব (Catterabo), এবং কাঠারবর রাজধানী সোণারগাঁও (Sonnergam)। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঈশাখাঁ কাঠারবর অধিপতি ছিলেন। লক্ষ্যার পশ্চিম দিকে, একটি অল্পপরিসর নদীর তীরে বৃহৎ ঢাকা নগরী। এই নদী বোধ হয় বুড়িগঙ্গা। এই নদীর দক্ষিণে যে আর একটি অল্পপরিসর নদী আছে এই ক্ষুদ্র নদী কীর্তিনাশার প্রাচীন খাত। এই নদীর অনেক দক্ষিণ দিয়া পদ্মার বিপুল জলধারা প্রবাহিত হইত। এই নদীর তীর হইতে লক্ষ্যার তীর পর্যন্ত কৈদার-রায়ের রাজ্য

* The English Pilot: The Third Book, Describing, sea.....Original Navigation, collected for the general benefit of our own countrymen. By John Seller, Hydrographer to the King.

বিস্তৃত ছিল। আমার অস্থান হয় এক সময় এই সমস্ত ভূভাগই বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল।

ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান যমুনা পথে প্রবাহিত হইয়া বিক্রমপুরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে এবং কেদার-রায়ের কীর্তিনাশ করিয়া কীর্তিনাশ নামধারণ করিয়াছে। কীর্তিনাশ কত যে সমৃদ্ধ গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে তাহা গণনা করা অসম্ভব। কীর্তিনাশার কীর্তিনাশের এখনও বিরাম নাই। কালে বিক্রমপুরের উত্তর পারের চিহ্ন থাকিবে কিনা সন্দেহ।

সুতরাং বিক্রমপুরবাসী আমাদের সকল দিকেই বিপদ। এই বিপদ হইতে মুক্তির পথও সুপরিচিত। এই পথে চণ্ডিবার শক্তির একটি উপদান ভক্তি বা ভাবের টানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের এই ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি নহে। এই ভক্তির বিপজ্জাল অতিক্রম করিতে হইলে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি বা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানের আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? এইরূপ জ্ঞান লাভের উপায় জানিতে হইল আড়িয়লের চিত্রশালার বা অন্তান্ত চিত্রশালার যে-সকল উৎকৃষ্ট প্রাচীন দেব-দেবীর এবং বুদ্ধ জিনের প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছে এই সকল প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সকল প্রতিমা কেবল সজীব নহে, সবাণ; প্রাণ পাতিয়া, অনুভূতির দ্বারা, ইহাদিগের বাকী শুনিতে পাওয়া যাইবে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। নারায়ণ অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখমণ্ডলে—

কিঞ্চিৎ প্রকাশ স্তিমিতোগ্রহায়ৈ
জ্ঞানবিক্রিয়ায়ঃ বিরত প্রসঙ্গঃ ॥
নৈবৈত্রৈ বিশ্বপলিত পদ্মমালৈ
লক্ষ্মীকৃতভ্রাণমধো মমুখৈঃ ॥

কুমারসম্ভব কাব্যে (৩৪৭) কালিদাস ধ্যানমগ্ন শিবের চক্ষুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধ ও জিনের মূর্তির স্তায় বিষ্ণুমূর্তিতেও দেখা যাইবে, দ্বৈত-উন্নীলিত চক্ষুর তারার অধঃমুখী রশ্মি নাসাগ্র লক্ষ্য করিতেছে। এইরূপ নয়নভঙ্গী ধ্যানমগ্ন মনের পরিচয় দেয়। সুতরাং পাবাণের বিষ্ণু দর্শককে নীরবে উপদেশ দিতেছেন, অমি ধেমন ধ্যান করি, তুমিও তেমন ধ্যান কর।

হরগোরীর যুগল মূর্তিও সেই কথাই বলিতেছেন। গোরীকে ক্রোড়ে করিয়া হর ধ্যানমগ্ন; হরের ক্রোড়ে বসিয়া গোরী ধ্যানমগ্ন। আর্যাবর্তের প্রাচীন দেব-দেবীর মূর্তিতে দেখা যায়, ধ্যান কেবল বুদ্ধের বোঝার, এবং জিনের কেবল জ্ঞানের নিদর্শন নহে; দেবতার দেবত্বের নিদর্শন ধ্যান; মানুষের মোক্ষলাভের উপায়ও ধ্যান। উপনিষদে, বেদান্তে, ভগবদ্গীতায়, সকল শাস্ত্রে মুখুর জন্ত ধ্যানই বিহিত হইয়াছে। এখন আমাদের মনে ঐহিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে। এই মুক্তির মন্ত্র আসিয়াছে যুরোপ হইতে। কিন্তু এই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও ধ্যান করিতে হইবে; একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে, মুক্তিলাভের উপায় কি। মুক্তির বাহ্য-আভ্যন্তর দুই প্রকার বাধাই আছে। আভ্যন্তরীণ বাধাগুলি অতিক্রম না-করিয়া বাহ্য বাধার সম্মুখীন হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আভ্যন্তরীণ বাধা যে কি তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; ধ্যান করিলেই ধরা পড়িবে, এবং ধ্যান করিলেই তাহা অতিক্রম করিবার উপায় দেখা যাইবে। আমার বিশ্বাস, ধ্যানের পথ পরিত্যাগ করার ফলে হিন্দুদের অধঃপতন ঘটিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মানুষের ইতিহাসকে কৃত (মত), ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং যুগ যুগে মানুষের শারীরিক মানসিক সকল প্রকার শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং মানুষের শক্তির ক্রমিক হ্রাস হিসাব করিয়া যুগ যুগে বিভিন্ন আচার বিহিত হইয়াছে। যথা বিষ্ণুপুরাণ (৬:২:১৫-১৮) —

যৎকৃতে দশভিবর্ষে ত্রেতাস্যঃ হায়নেন যৎ ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অ দ্বাপরাং তৎকলৌ ॥
তপসো ব্রহ্মচর্যাস্ত জপা দশচ ফলং ত্রিভুঃ ।
প্রাপ্নোতি পুরুষ স্তেন কলিঃ সাক্ষিতি ভাষিতম্ ॥
ধ্যায়ন কৃতে, যজ্ঞন যজ্ঞে স্তোতায়াং দ্বাপর ইর্তয়ন ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ণ কেশবম্ ॥

কৃতযুগে দশ বৎসরকাল তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জপ করিলে যে-ফল পাওয়া যায়, ত্রেতযুগে এক বৎসরকাল অশুষ্ঠান করিলে, দ্বাপরযুগে এক মাস অশুষ্ঠান করিলে, এবং কলিযুগে মাত্র এক দিবসাত্র অশুষ্ঠান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

এই নিমিত্ত কলিযুগকে সাধু বলা হয়। কৃতযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া, দ্বাপরে দেবতার অর্চনা করিয়া বে-ফল পাওয়া যাইত, কলিযুগে কেশবের সংকীৰ্তন করিয়া সেই ফল পাওয়া যায়।

পারিত্রিক মুক্তির ক্ষেত্রে কলিধর্ম-পালন কতটা কার্যকরী তাহা বলা আমাদের অসম্ভব। আমাদের চিত্রশালায় রক্ষিত এবং প্রদর্শনীতে সজ্জিত ধ্যানমগ্ন প্রাচীন প্রতিমা দেখিলে মনে হয়, পালযুগে এবং সেন-যুগেও এদেশে কৃতযুগের পালনীয় ধ্যানই মুক্তির সোপান বলিয়া গণ্য হইত। বঙ্গালা দেশে ধ্যানমগ্ন চতুভূজ বিষ্ণুর স্থানে বংশীবাদনরত গোপীনাথের পূজা এবং সংকীৰ্তন বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে ষোড়শ শতাব্দে চৈতন্যের সময় হইতে। পারিত্রিক ব্যাপারে যাহাই হউক, ঐহিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যগণের সংঘম এবং সংগঠন শক্তি কলি উন্টাইয়া দিয়াছে। এখন আর্থিক ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সত্যযুগের ধর্ম ধ্যানে ফিরিয়া যাইতে হইবে; শুধু সংকীৰ্তনে চলিবে না। ধ্যান করিলে জ্ঞানলাভ হইবে, এবং সেই জ্ঞানের আলো আমাদিগকে মুক্তির প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মোহে আমরা আমাদের দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া, পাশ্চাত্য মস্ত্রে মাতিয়া, উদ্ভট

সংকীৰ্তন আরম্ভ করিয়াছি, এবং পদে পদে ছোট খাইয়া আহত হইতেছি। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ধ্যান করা আবশ্যক।

পারিশিষ্ট

বলা বাহুল্য কলিকাতায় বসিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। তার পর আড়িম্বেল গিয়া যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহা জন্ম-বিদারক। যাহাদের শহরে গিয়া বাস করিবার সাধা আছে তাহারা এখন আর গ্রামে বাস করেন না। ভদ্রলোকের মধ্যে যাহারা এখন গ্রামে বাস করে তাহাদের মুখে হাসি নাই, মনে আনন্দ নাই। ভীতির ছায়া অনেকের মুখের মলিনতাকে গাঢ়তর করিয়াছে। গ্রামের উপকাঠ গোরা-সৈন্তের শিবির। গ্রামের অনেক যুবকই গৃহে আবদ্ধ। পুলিশ এবং গোরা-সৈন্ত হাতিতে গিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া আসে। গোরা-সৈন্তরা কোন অত্যাচার করে না। পথ না চিনায় এবং ভাষা না জানায় সময় সময় ইহারা গ্রামবাসীদের অহবিষার সৃষ্টি করে এবং নিজেরাও অহবিষা ভোগ করে। আড়িম্বেলের গোরা-সেনার অধিনায়ক খুব ভদ্র এবং অমায়িক। বিক্রমপুরে এইরূপ আটটি গোরা-সেনার শিবির আছে। প্রত্যেক শিবিরের অধিনায়ক এক জন লেফটেন্যান্ট, চারিটি শিবিরের অধ্যক্ষ এক জন কান্টন। আশ করিয়াছিলাম গত ১৫ বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঢেউ যে-ভাবে পরীসমাজ আন্দোলিত করিয়াছে, তাহার ফল পরীরা ভদ্রলোকেরা অন্ততঃ দলাদলি ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, লোকশিক্ষার হিঁসাব বিক্রমপুরের এই অংশে আন্দোলন নিখল হইয়াছে। গ্রাম্য দলাদলির কলেও বোধ হয় অনেক হস্তগাত্য যুবকের পরকাল নষ্ট হইতেছে। গ্রামবাসীর মধ্যে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; কে যে বন্ধু, কে যে স্তম্ভচর (spy), তাহা চেনা যাইতেছে না। কথায় বলে, “আধার ঘর সাপ, হুতরাং সকল ঝরেই সাপ।” এইরূপ সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া বিক্রমপুরের পরীবাসী দ্বিতীয় ভদ্রলোকগণ অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন।]

কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

প্রবাসী শব্দটি নূতন নয়, পুরাতন। কিন্তু বাংলা দেশের বাহিরে যে-সব বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের প্রতি বিশেষণরূপে ইহার প্রয়োগ পুরাতন নয়। বোধ হয় চৌত্রিশ বৎসর আগে প্রয়াগে আমরাই এই মাদিকপত্র-ধানিতে এই প্রয়োগ চালাইতে আরম্ভ করি। তখন তর্ক উঠিয়াছিল এবং এখনও তা চলে, পরেও চলিতে পারিবে, যে, ভারতবর্ষ যখন আমাদের ভারতীয় মহাজাতির দেশ, তখন বাংলার বাহিরে অল্প সব প্রদেশকে প্রবাস বলা ঠিক নয়। ইহাও বলা যাইতে পারে, যে, যেহেতু “উদারচরি-

তানান্ত বহুধৈব কুটুমকম্,” সেই জন্ত পৃথিবীর কোন জায়গাই প্রবাস নয়, সব মাতৃভূমি আত্মীয়। অত দিকে চিরঞ্জীব শর্মা গাহিয়াছেন—

হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।
ফুরাল খেলা ভাঙ্গল মেল, আর কেন বিলম্ব বল?
বিদেশে প্রবাসে ভব পাশ্ববাস, কিছুই আর লাগে না ভাল,
বাড়ীপানে মন ছুটছে এখন, মা মা বলে ঘরে চল।

অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটাই প্রবাস।

বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা প্রবাসী কিনা তাহার বিচার না-করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে, যে, তাঁহাদের ও বঙ্গের



কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়

অধিবাসী বাঙালীদের পরস্পর আত্মীয়তা-বোধ জাগাইয়া তোলা ও বাড়ান আবশ্যক। এই চেষ্টা প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন করিতেছেন। তা ছাড়া, অত্র কর্তব্যও অবশ্য সম্মেলনের আছে—সম্মেলন তাহাও করিতেছেন। সম্মেলনের সহিত ‘প্রবাসী’ মাসিকপত্রের কোন বিশেষ, একচেটিয়া, স্বত্ব না থাকিলেও, একটি দাবি ‘প্রবাসী’ করিতে পারে, যে, ইহাই বিশেষ করিয়া প্রবাসী বাঙালীদের কথা বাঙালী সমাজের নিকট বার-বার বলিতে আরম্ভ করে এবং চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাহা তাহার নিকট মধ্যে মধ্যে উপস্থিত করিয়াছে। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন যে কাজ বার বৎসর করিতেছেন, ‘প্রবাসী’ মাসিকপত্রও ৩৪ বৎসর সেই কাজ কিছু কিছু করিয়াছে।

সেই জন্ত ‘প্রবাসী’ বঙ্গের বাহিরের ও বঙ্গের বাঙালীদের আত্মীয়তার কথা পুনঃপুনঃ বলিতে চায়। কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ

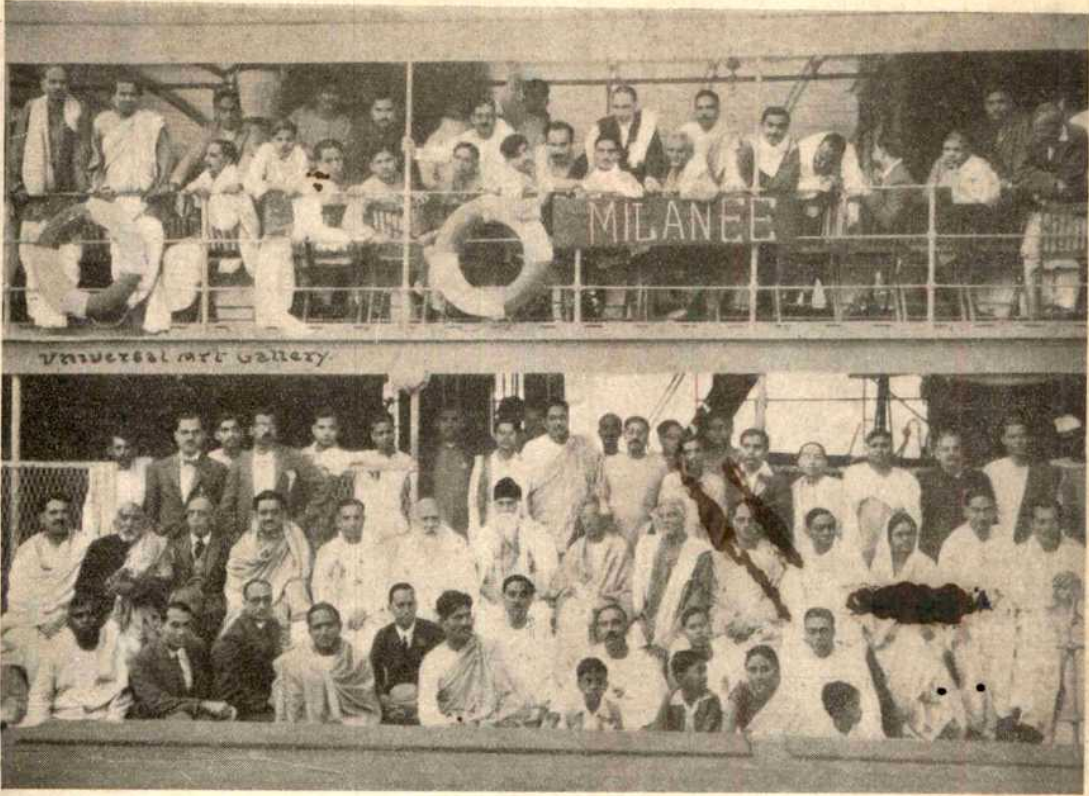


শ্রীযুক্ত ডক্টর সত্যচরণ লাহা

অধিবেশনের উদ্বোধিনী বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ এই আত্মীয়তার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গের প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না, সে তর্ক ছেড়ে নিয়েও, সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অল্প প্রদেশ বাঙালীর পক্ষে প্রবাস, সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশি যে, অন্য প্রদেশের বর্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির সামঞ্জস্য অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা, সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্য প্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয়, অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলা ভাষা নানা প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাহায্যে যে রূপ ও শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তাহার অভিমুখিতা অন্য দিকে; অথচ সে সবল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে বাঙালীর হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয়। আমরা তার অতি মন্দ দৃষ্টান্ত দেখছি, যেমন পরলোকগত অভুলপ্রসাদ সেন। উত্তর পশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল; কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাই বলছি, আজ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বাঙালীর অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করবে। নদী যেমন শ্রোতের পাথে নানা বাঁকে



প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে স্টীমারে প্রতীতিসম্মিলনী। মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথ উপবিষ্ট

বাকি আপন নানারিক্‌গামী তটকে এক করে নেয়, আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশপ্রদেশের বাঙালীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে।

কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে বাঁহারা বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদিগকে ভোজনে ও কথোপকথনে সম্মিলিত হইয়া “নানা দেশ প্রদেশের বাঙালীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত” “এক প্রাণধারা” অনুভব করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সমগ্র বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

কলিকাতায় “মিলনী” নামে একটি ক্লাব আছে। ইহার পক্ষ হইতে লালগোলায় কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথরায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ প্রভৃতির একত্র সম্মিলিত হইবার আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রায় তিন দণ্ডা স্টীমারযোগে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করেন। প্রচুর জলযোগের ও কথোপকথনের ব্যবস্থা ছিল। ঘাট হইতে স্টীমার রওনা

হইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আগমন করেন এবং তাঁহাকে লইয়া একটি ফটোগ্রাফ তোলা হয়। তাঁহার পর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

১২ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার টাউন-হলে প্রতিনিধিবর্গ ও অত্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের একটি প্রীতি-সম্মেলনের বন্দোবস্ত করেন। সকলে প্রচুর জলযোগ ও কথোপকথনে আপ্যায়িত হন।

তাঁহার পরদিন মহিলা প্রতিনিধিগণ ও অপর নিমন্ত্রিত মহিলাবৃন্দ ডাঃ সুর নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লেডী নির্মলা সরকার মহোদয়ার বাটীতে উজ্জান-সম্মেলনে একত্র সমবেত হন। সেখানেও জলযোগ আদির ব্যবস্থা ছিল।

ঐ দিন ঐ সময় ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা আগড়পাড়ায় তাঁহার সুরম্য বাগান-বাড়ি ও পক্ষিনিবাসে



• শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

উদ্যান-সম্মেলনের আয়োজন করেন। উন্মুক্ত প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমিতে নীল আকাশের নীচে তিনি যে শুধু রমনার তৃপ্তির বন্দেবস্ত করিয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার নানাজাতীয় স্থলচর জলচর পক্ষী সকলের নামধাম আহার জীবনবৃত্তা-প্রণালী প্রভৃতি এক এক দল নিমগ্নিত ব্যক্তিদিগকে পরে পরে অবগত করাইবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রবাদী-বঙ্গবাহিতা-সম্মেলনের উদ্বোধনারা মহিলা-দিগকেও পক্ষিনিবাসটি দেখিবার সুযোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নানা শাখা-সভার অধিবেশন, অনেক প্রীতি-সম্মেলন এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান-দর্শনের বন্দাবস্ত করিতে হওয়ায় মহিলাদের জন্ত পক্ষিনিবাস-দর্শন এবং উদ্যান-সম্মেলন একই দিনে একই সময়ে পড়িয়া গিয়াছিল।

১০ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে প্রদর্শনীতে উদ্বোধন করেন। তখন যত প্রতিনিধি আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, তাঁহারা



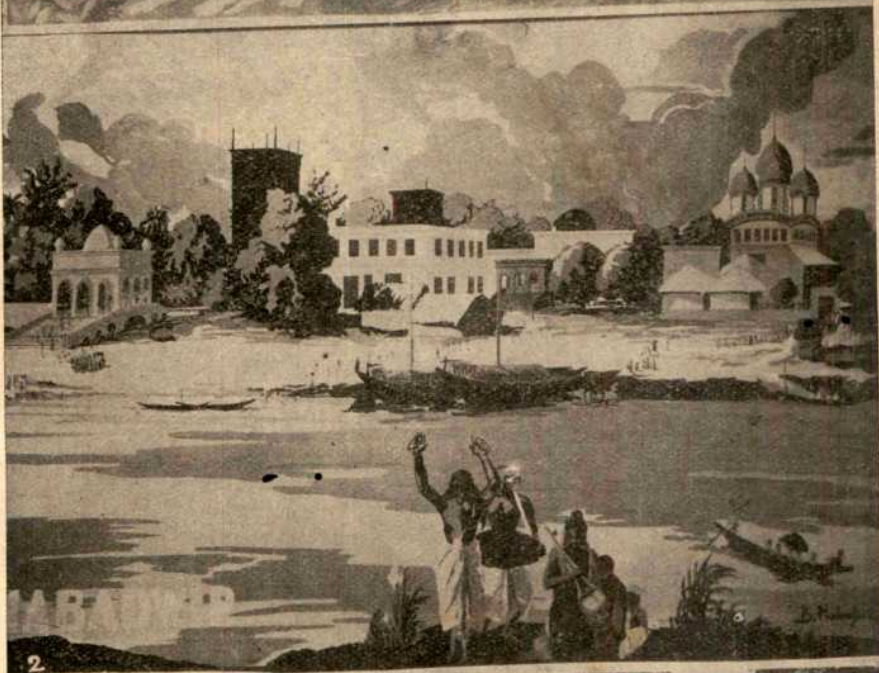
শ্রীযুক্তা লেডা নির্ঘলা সরকার

উপস্থিত ছিলেন। পরে আবার ১৪ই পৌষ পরিষদ সকল প্রতিনিধি ও অশ্রী বহু বিজ্ঞানসাহী ব্যক্তিকে পরিষদ-মন্দির ও রমেশ ভবনের মূর্তি সংগ্রহাদি দর্শন করিতে আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের সকলের জলবোগের ব্যবস্থা করেন।

ঐ দিন রাত্রে কলিকাতা হু ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি (Indian Journalists' Association) সমুদয় প্রতিনিধি ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে টাউন-হলে বিদায়ভোজ দেন। বর্তমানে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এই সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক।

এই সকল প্রীতি-সম্মেলন ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ বৈরাগ্যস্রপীঠে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু “বিশ্বকোষ” কার্যালয়ে, শ্রীযুক্ত বামিনীরঞ্জন রায় তাঁহার চিত্রশালায়, এবং আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রেসে প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা গবর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে চিত্র-প্রদর্শনী, ১৯০৪



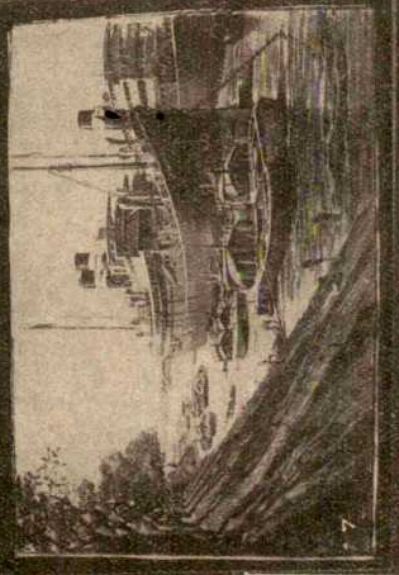
- ১। অরণ্যে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ—শ্রীতারক বসু। ২। বিজ্ঞাপনী চিত্র—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।
৩। কালীপূজা—শ্রীরাধা বাগ্‌চী।



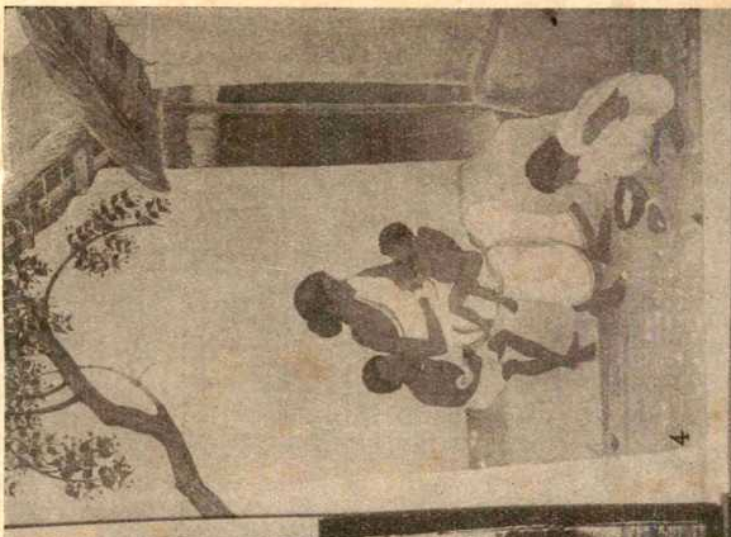
9



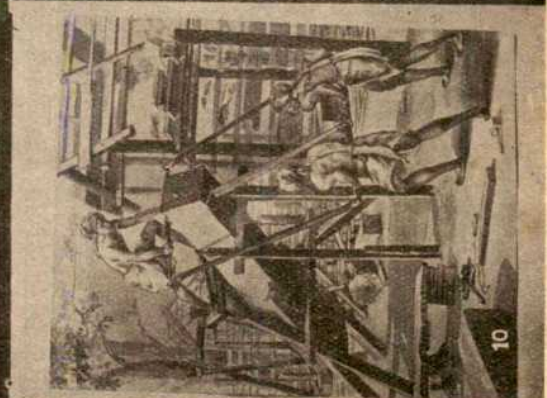
6



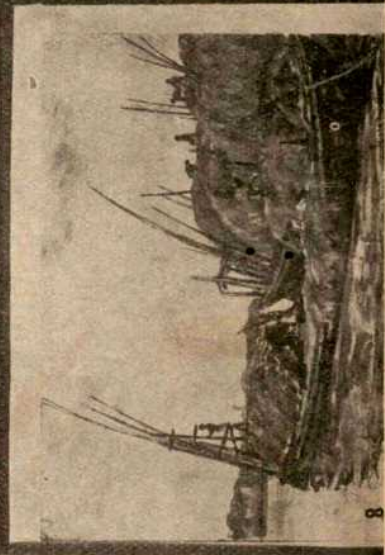
7



4



10



8



5

- ৪। মাতা ও পুত্র—শ্রীমহীল সেন। ৫। বিবাহ-দুগ্ধ—শ্রীঅবহুল সেন। ৬। পল্লীদৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণব্রজ মুখোপাধ্যায়। ৭। গঙ্গা-দৃশ্য—শ্রীচন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম।
৮। ধানের নৌকা—শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল। ৯। বিজাপুর চিত্র। ১০। কুরাতী।



- ১। ভাবুক—সৈয়দ আহমেদ। ২। সে কি আসিবে না?—শিরাম রাও। ৩। অয়্যাস—হীকালীকির শেষ দণ্ডিদার। ৪। ধানী বুরু—হীবেকট নারায়ণ রাও।





୫ । ନଟୀ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ । ୬ । ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ—ଶ୍ରୀଲୋକିୟା । ୭ । ହୋଲି ଉତ୍ସବ—ଶ୍ରୀବେକଟରତ୍ନ ।
୮ । ଜଳଭରନେ—ଶ୍ରୀବେକଟ ନାୟାୟ ରାଓ ।

গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলসমূহে চিত্রকলা-প্রদর্শনী

কলিকাতা গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে চিত্রকলা-প্রদর্শনী—

কলিকাতা গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে চিত্রকলা-প্রদর্শনী প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। আর্ট স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের অঙ্কিত চিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়। এবারেও গত ডিসেম্বর মাসে এই প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

এবারকার প্রদর্শনী একটি বিষয়ে বিশেষ স্মরণীয়। স্কুলের তিন শত ছাত্রের দ্বারা দুই হাজারের অধিক চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। এই স্কুলের ছাত্রদের ভারতীয় রীতিতে আঁকা প্রায় পঞ্চাশখানি চিত্র লণ্ডনের বেলিংটন হাউসে প্রদর্শিত হইয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এ-বৎসরের স্থানীয় প্রদর্শনীটিও বিভিন্ন ধরনের চিত্র-সমাবেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।



কলিকাতা প্রদর্শনী

চিড়িয়াখানার একটি দৃশ্য (মাটির কাজ)—শ্রীহরিকেশ ঘোষ

আর্ট স্কুলের শিক্ষকগণের চিত্রাবলী একটি বিশেষ স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এগুলি প্রদর্শনীর সৌষ্টব্য যথেষ্ট বাড়াইয়াছে। ছাত্রগণের চিত্রগুলি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকারে রাখা হইয়াছিল। ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। শ্রীযুত ইন্দু রক্ষিতের প্রাচীর-চিত্র চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

এই বিভাগে শ্রীযুত হুম্মীল সেন, শ্রীযুত পূর্ণেন্দু বহু, শ্রীযুত তারক বহু, শ্রীযুত নির্মল মুখোজ্য, শ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মুখোজ্য, শ্রীযুত সত্য মজুমদার,



মাদ্রাজ প্রদর্শনী

উপরে : রাস্তা—শ্রীপ্রবোধ দাশগুপ্ত, নিম্নে : মুখোস—শ্রীকার্ত্তিকেশ শ্রীযুত মণিকলাল বাঁড়ুজ্য ও মৌলবী আব্দুল মৈনের চিত্রাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কমার্শিয়াল আর্ট ও কার্ট-বোদাই চিত্র বিভাগও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন-কলারও চর্চা আরম্ভ হইয়াছে। কোন জিনিষের কিরূপ বিজ্ঞাপন দিলে সহজে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায় তাহা কলা-বিভাগের একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। ইংরেজীতে ইহাকে কমার্শিয়াল আর্ট বলে। আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ এবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ছাত্রগণ কার্ট-বোদাই বিভাগেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষক মৌলবী আব্দুল মৈন এবিষয়ে সকলেরই দৃষ্টবান্দার। কারণ তাঁহারই একান্তিক চেষ্টা-বলে ছাত্রগণ এ-বিভাগে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।



কলিকাতা গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে শ্রীযুত ইন্দু রক্ষিত
প্রাচীর চিত্র আঁকিতেছেন

এবারকার চিত্র-প্রদর্শনী হইতে একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সম্ভবপর হইয়াছে। শুধু সৌন্দর্যের অনুভূতির জন্মই নহে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা আর্থিক উন্নতির জন্মও কলা-বিদ্যার চর্চা একান্ত প্রয়োজন।

মাদ্রাজে চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শনী—

কলিকাতার শ্রীযুত মাদ্রাজের সরকারী আর্ট স্কুলেও গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ-বৎসর গত জানুয়ারী মাসে এই স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা-যত্নে প্রতি-বৎসর যত্নে এই প্রদর্শনী হইয়া আসিতেছে। মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড এরস্কিন মহোদয় এবারে প্রদর্শনীর দ্বারা উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য-চিত্রের সমাবেশ এই প্রদর্শনীর চারুশিল্প বিভাগ বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। ভাস্কর শ্রীযুত কালিকিঙ্কর ঘোষ দণ্ডিন্দার, শ্রীযুত প্রদোষ দাশগুপ্ত শ্রীযুত বেকট নারায়ণ রাও, শ্রীমতী মুখুন্ডেল ও শ্রীযুত কার্তিকেশ্বর ভাস্কর্য-চিত্র সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পরিকল্পনা ও নির্মাণ-কৌশলে মৌলিকতা যথেষ্ট। কালিকিঙ্করের “প্রয়াস”, নারায়ণ রাওর “ধানী বৃদ্ধ” প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। শ্রীমতী মুখুন্ডেলের স্থায়ী ছাত্রী শ্রীমতী কমলার চিত্রও উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কিত বহু চিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুত রাম রাও, শ্রীযুত পল্লব রাজ ও শ্রীযুত খগেন্দ্র রায়ের চিত্রগুলি এই বিভাগের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

দেব-সব চিত্রে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল সেগুলি এক স্থলে প্রদর্শিত হয়। সৈয়দ আহমেদ, কালিকিঙ্কর, লোকিয়া, খগেন্দ্র রায়, ডোরাইস্বামী বেকটনায়ণ রাও, রাম রাও, বেকটরড্রম, পি. সি. রাজু প্রভৃতির চিত্রাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর চিত্রাবলী যে মনোহর হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু

৩

অরুণ যখন অজয়দের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছাইল, কলিকাতার দৌধাবলীর উপর অপরাহ্নের আলো রান হইয়া আসিয়াছে, নগরের গলিতে প্রাসাদগুলির দীর্ঘতর ছায়া।

ছাদ হইতে অরুণকে দেখিতে পাইয়া চন্দ্ৰা সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিল, অরুণের হাত ধরিয়া হাপাইতে হাপাইতে বলিল,—বেশ, কাল আস নি কেন? কাল বড়দির জন্মদিন গেল।

অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল—আমি কি জানতুম?

হাত নাড়িয়া চুল দোলাইয়া চন্দ্ৰা বলিল—তোমার কিছু মনে থাকে না। আমার লাড়ু এনেছ?

—ওই, আনতে ভুলে গেছি।

—বড় ভোলা মন বাপু তোমার।

—লাড়ু ত ছেলেরা খেলে, আচ্ছা, থুঁকু তোর জন্তে বড় পুতুল এনে দেব, কেমন?

—না আমার পুতুল চাই না, আমার লাড়ু চাই, বা, ছেলেরা স্কিপ্ করে কেন?

চন্দ্ৰা অজয়ের ছোট বোন। ছয় বৎসর বয়স হইবে। খয়ের-রঙের ফ্রকের ওপর ফুল-কাটা সাদা এ্যাপ্রন; কচি আমপাতার মত শ্রামস্ত্রী; মুখখানি মঞ্জোলীয়, চাঁদের সহিত তুলনা দেওয়া বাইতে পারে, স্কুলের মেয়েরা তাহাকে চাঁদামাছ বলিয়া ডাকে। তাহার দুই চোখে ছুটিমি, দেহে মনে চঞ্চল কৌতুক, গিরিকর্ণার মত ছুটিয়া

সিঁড়ি নামে, কলহান্ত্রে উচ্চ স্বরে কথা বলে, নৃত্যের ভঙ্গীতে চলে।

চন্দ্রার সহিত দ্রুতপদে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে অরুণ বলিল—মামীমা কোথায়?

জুষ্টামিভরা চোখ নাচাইয়া চন্দ্রা উত্তর দিল—মা তোমার সঙ্গে আজ দেখাই করবেন না, খুঁজেই পাবে না মাকে।

—তুই বুঝি লুকিয়ে রেখেছিস, আচ্ছা, কোন্ রঙের লাটু তোর পছন্দ? অরুণ পকেট হইতে তিনটি লাটু বাহির করিল।

চন্দ্রা লাফাইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—ও, কি ছষ্টু ভুমি! থ্যাক্স থ্যাক্স, আমি তিনটিই নিচ্ছি।

বিজ্ঞাষেগে চন্দ্রা অন্তর্হিত হইল। অরুণ রান্নাঘরের দিকে চলিল। মামী এখন নিশ্চয় রান্নার তদারক করিতে গিয়াছেন। ভাঁড়ার-ঘরের সম্মুখে থোলা বারান্দায় আসিতে চলার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। আলোছায়াময় ঘরের পটে এক কিশোরীমূর্তি সন্ধ্যাকাশে তারার মত ফুটিয়া উঠিল। পদশব্দে উমা প্রবেশ-দ্বারের চৌকাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতীর দাঁতের মত গৌরবর্ণ দেহে লাল-পাড় তসরের শাড়ী অপরাহ্নের আলোয় যেন আগুনের আভা।

অরুণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সৌন্দর্য্য তাহাকে এমন করিয়া অভিভূত করে কেন!

উমা ধীরে বলিল—মা বাড়ি নেই। উমা বড় শাস্ত স্বরে কথা বলে, কণ্ঠে একটু আবেগ আনে না কেন!

লজ্জিত ভাবে অরুণ বলিল—ও, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।

—তাতে কি, এক ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন, মাসীমার ওখানে গেছেন। বাবা তোমায় খুঁজছিলেন।

—আচ্ছা।

—শোন, কি খাবে!

—আমি খেয়ে এসেছি, কিছু খাব না।

—তা হবে না, মা এসে আমায় বকবেন, তিনি নেই বলে—

গজদন্তশুল্ল আননে মুহূ হাস্য খেলিয়া গেল। উমার হাসি বড় সংযত, উচ্ছ্বসিত হইয়া একটু হাসে না কেন!

—সত্যি, আমার এখন ক্ষিদে নেই।

—বেশ, রাতে খেয়ে বেও।

—অজয় এসেছে?

—না, দাদা আসেন নি—বাবা ওদিকে ছাদে আছেন।

অরুণ একটু অগ্রসর হইয়া আবার নীরবে দাঁড়াইল। স্বর্যাস্তের স্বর্ণাভামণ্ডিত ঐ অলৌকিক সৌন্দর্য্যরূপ যেন সে দৃষ্টিচ্যুত করিতে চায় না। একটু বাধিত স্বরে সে বলিল—কাল তোমার জন্মদিন আমি জানতুম না।

—দাদা বুঝি বলতে ভুলে গেছেন। কিন্তু সেদিন বে মার সঙ্গে তোমার অত হিসেব হচ্ছিল,—তোমার জন্মদিনের দশ দিন পরেই আমার জন্মদিন, সব ভুলে গেছেন—

—হা, আজকাল কিছু মনে থাকে না।

—খুব পড়ছ বুঝি, দেখ অরুণ—

—এই বললে, আমি তোমার চেয়ে বড়, আমায় দাদা বলা উচিত।

—ভারি দশ দিনের বড়, তবু যদি এক মাস হ'ত।

উমা অরুণকে দাদা বলিতে কেনন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার অন্ত বোনেরা, এমন কি মাসতুতো বোনেরাও, অরুণকে স্বচ্ছন্দে দাদা বলে, কিন্তু সে তেমন পারেনা।

—আচ্ছা, আমি তোমাকে আমার নাম ধরে ডাকবার অহুমতি দিলুম, এটা তোমার পঞ্চদশ জন্মদিনে আমার উপহার কেনো।

—খুব কথার ভটচাখি হয়েছ, না দিলেও আমি তোমায় ডাকতুম। কিন্তু অত গম্ভীর কেন!

—কি জান, উমা, মনটা তেমন ভাল নেই।

—মন খারাপ কি জন্তে? যত চং, অত রাজ্যের বই পড়লে মন কেন, মাখাই খারাপ হয়ে যায়। আমি মাকে বলে দেব, তোমার আর বই দেবেন না।

—তুমিও কিছু কম বই পড় না।

—আমার তাতে মন খারাপ হয় না, যাও বাবা একা ছাদে আছেন, আমি যাচ্ছি।

অজয়ের পিতা শ্রীহেমচন্দ্র রায় মহাশয় ভারত-গভর্নমেন্টের দপ্তরখানার এক উচ্চপদস্থ কন্সটারী। অসুস্থতার জন্ত প্রায় দুই বৎসর হইল চিকিৎসা করাইতে

কলিকাতায় ছুটি লইয়া আছেন। অরুণের মাতা তাঁহার জন্মগ্রামের মেয়ে, তাঁহাকে দাদা বলিতেন, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে অরুণ তাঁহাকে মামাবাবু বলে।

হেমবাবু যুবাবয়সে কলেজে পাঠের সময় ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে ও প্রভাবে আসেন। একবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। পরে হিন্দুসমাজে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক সংস্কার আধুনিক আদর্শ নিজপরিবারে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ী তাঁহার সাহায্যকারিণী। বিবাহের পর তিনি স্ত্রীকে মেম রাখিয়া ইংরেজী শিখাইয়াছিলেন, তাহা বৃথা হয় নাই। দিল্লী সিমলার উচ্চতম অফিসার-সমাজে তিনি নিঃসঙ্কোচে সদস্যমানে মিলিতে পারিয়াছেন।

দুই বৎসর পূর্বে সিমলাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া হেমবাবুর জ্বর ও পেটের অসুখ হয়। দিল্লীতে নামিয়া পেটের অসুখ কমিল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কিছু সুস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু জ্বর একেবারে ছাড়িতেছে না। ডাক্তারেরা আশ্বাস দেন, শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন, আর একটু বল পাইলেই চেঞ্জ গেলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন। বস্তুতঃ, রোগ যে কি, তাহা ঠিকরূপ নির্ধারিত হয় নাই।

শয়নগৃহের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় এক লম্বা চেয়ারে পিঠে বালিশ ঠেসান দিয়া হেমবাবু শুইয়াছিলেন। ফাস্তনের শেষে বেশ গরম পড়িয়াছে, সন্ধ্যায় ঘরে থাকিতে আর ইচ্ছা করে না।

বারান্দার সামনে বড় খোলা ছাদ জুড়িয়া নানা ফুলের গাছ—জুই, বেল, গোলাপ, এন্টর, ডালিয়া, জিসেনথিমাম্। কল্লাদের সহায়তা ও উৎসাহে বিছানাতে শুইয়া হেমবাবু এই সুন্দর রুক-গার্ডেন তৈরি করিয়াছেন।

অরুণ বারান্দার প্রবেশ করিতেই চন্দ্রা চোঁচাইয়া উঠিল—
বাবা, অরুণদা এসেছেন।

হেমবাবু একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—এস, অরুণ এস, ওরে শীলা, তোর অরুণদার জন্তে একটা চেয়ার দে।

অরুণ ধীরে বলিল—আমি এই মোড়াতে বসছি, কেমন আছেন মামাবাবু?

শীলা ফুলের টবে জল দিতেছিল। বাঁঝারি নামাইয়া পিতার নিকট ছুটিয়া আসিল। হাতে একটি ফুল।

—বাবা, দেখ, কি সুন্দর নীলফুল, দেখ অরুণদা—কি নাম বল ত?

—কোন বিলিতি ফুল হবে।

শীলা একটি লম্বা নাম বলিল। সব ফুলের নাম তাহার মুখস্থ।

—অরুণদা, তোমার ত বাটন-হোল নেই।

—তোমার মাথায় গৌঁজ, বেশ দেখাবে।

খোঁপাতে গুঁজিবার ইচ্ছা হইলেও, ফুলটি শীলা পিতার চেয়ারের পার্শ্বে ছোট মার্বেল টেবিলের উপর ফুলদানির শুষ্পগুচ্ছে গুঁজিয়া দিল।

হেমবাবু অতি সৌখীন প্রকৃতির মানুষ। অসুস্থতায় তাঁহার শুচিতা ও সৌন্দর্য্যবোধ আরও স্বল্প প্রবল হইয়াছে। তাঁহার শয্যা, আসবাব, গৃহ সব সময়ে পরিষ্কার থাকা চাই। জানালায় রঙীন সিক্কের পর্দা, নীল দেওয়ালে রাফায়লের ‘মাতৃমূর্তি’, মাইকেল এঞ্জিলের ‘আদামের জন্ম’ কোরো-র ‘ল্যাওস্কেপ’ ইত্যাদি কয়েকখানি ছবি যথাযথ টাঙানো; চেয়ারে রঙীন রেশমের ঝালরওয়ালা বালিশ, টেবিলে সূচের সূক্ষ্ম কাজ-করা সাদা আচ্ছাদন, চারি দিকে শোভন পরিচ্ছন্নতা। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে তাঁহার নিকট পরিষ্কার পরিচ্ছদে থাকিতে হয়, সকলে সুবেশে থাকে, সুচক্র জীবন যাপন করে, ইহাই তাঁহার বাসনা। তাঁহার সম্মুখে ভৃত্যরাও ময়লা কাপড়ে আসিতে পারে না।

হেমবাবু স্নেহকণ্ঠে বলিলেন—ওরে অরুণকে কিছু খেতে দে।

—না, আমি এই খেয়ে আসছি।

—তা হোক, কিছু ফল খাও, উমা!

—না, মামাবাবু!

শীলা হাসিয়া বলিল—বাবা, অরুণদা কি লাজুক।

চন্দ্রা বড়দিদির নিকট ছুটিল, খাবার আনিতে।

উমা মিষ্টি ও ফল লইয়া আসিলে অরুণ আর আপত্তি করিল না।

হেমবাবু বলিলেন—তুমি খাও অরুণ।

রোগে ভুগিয়া তাঁহার অন্তর যেমন সকলের হৃদয়ের প্রেম

পাইবার পিয়ানী হইয়াছে, তেমনি স্নেহে প্রেমে আপনাকে বিলাইয়া দিবার জ্ঞত তিনি ত্বিত।

খাওয়া শেষ করিয়া অরুণ বলিল—খুক্ কি নতুন গান শিখেছ? এবার অরুণের প্রতিশোধের পালা।

চন্দ্রা ছুটিয়া ঘর হইতে শীলার এসাজ লইয়া আসিল।

—ছোটদির এসাজ সেরে এসেছে বাবা।

—আচ্ছা, তোমার বড়দি'কে ডাক।

হেমবাবু নিজে সুরকণ্ঠ গায়ক না হইলেও, অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয়। রোগশয্যা় সঙ্গীতানুরাগ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। দিল্লীতে তিনি মেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষার জ্ঞত ওস্তাদ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সুস্থ বোধ করিলে কলিকাতাতেও মধ্যে মধ্যে ভাল গায়ক আহ্বান করিয়া জলসা হয়। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই কতাদের লইয়া পারিবারিক সঙ্গীতসভা বসে।

উমার গলা ভাল, কিন্তু কলিকাতাতে আসার পর প্রায়ই তাহার সর্দি-কাশি হয়, নিয়মিত ভাবে গান শিখিতে পারে না। শীলা গান ভাল গায় না, তবে সেতার এসাজ সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে সুনিপুণ। চন্দ্রা যে কোন দিন গায়িকা হইবে এ আশা তাঁহার পিতাও করেন না; তবে রুগ্ন পিতাকে সাধামত গান গাহিয়া আনন্দ দিতে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ। সে উৎসাহ কেহ দমন করিতে চায় না।

চন্দ্রার গান দিয়াই সে সন্ধ্যার জলসা আরম্ভ হইল। বড়দিদির সাহায্যে সে সুর-সমুদ্রে অকুতোভয়ে পাড়ি দিল।

শীলার এসাজ বাজান শেষ হইলে উমা বলিল—কোন গান করব, বাবা?

—আজ সকালে কি গানটা গুন-গুন করছিলে?

—ও, তিমির-ছয়ার খোল এস, এস নীরব চরণে—

—হাঁ।

—সে ত ভোরবেলার গান বাবা।

—ওই গানই ত রাতে বসে গাইবার গান মা, যখন আলো শেষ হ'ল, অন্ধকার বনিয়ে আসছে, 'তিমির-ছয়ার খোল'—এ যে অন্ধকারে আলোর জ্ঞত প্রার্থনা।

উমা ধীরে গান ধরিল,

'তিমির-ছয়ার খোল এস, এস নীরব চরণে

জননি আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ কিরণে।'

ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে; চারি দিকে মায়াময় আবছায়া; পশ্চিমাকাশে নারিকেল বৃক্ষগুলির অন্তরালে সূর্য্যাস্তের সূর্য্যহ্রাস্তি প্রকৃতি-লক্ষ্মীর ললাটে রক্তচন্দনের মত। হান্সাহানার গন্ধভরা বাতাস মুহূ বহিতেছে।

অরুণ গান গুনিতে লাগিল।

উমা প্রতিমার মত অত চমৎকার গায় না। ছ-জনের গান গাইবার ভঙ্গীর কত প্রভেদ। প্রতিমা যদি এ গানটি গাহিত, মনে হইত, নীড়ে-জাগা ভোরের পাখী সহজ উচ্ছ্বসিত আনন্দ সুরে অরুণোদয়ের অভ্যর্থনা করিতেছে। উমা গাহিতেছে, যেন শ্রান্ত পথিক ক্লান্ত চরণে অন্ধকার রাত্রে পথহারা হইয়া আলোর জ্ঞত বাকুল প্রার্থনা করিতেছে। উমার কণ্ঠ এমন করুণ উদাস কেন?

উমা তাহার মাতার সুন্দর রং পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুগঠিত রূপ পায় নাই। মুখখানি লম্বা, অনতিপক্ক পেয়ার-ফলের মত; প্রশস্ত উন্নত ললাটে একটি টিপ জলজ্বল করিতেছে, যেন উষার গগুনে শুকতারা; টানার ক্রর নীচে আয়ত নয়ন নীচু করিয়া বসান, সে নয়নে কখনও নিষ্কাশিত অসি-লতার দীপ্তি, কখনও আবাড়ের নবীন মেঘের ছায়ামিথতা; অপরিপুষ্ট অধর একটু শীর্ণ, সে শীর্ণতা রোগশয্যার সেবাক্লিষ্টতা, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি; গণ্ড দুইটিতে কখনও উষার পাণ্ডুরতা, কখনও সন্ধ্যার রক্তিমতা; প্রশস্ত চোয়াল হইতে কমনীয় চিবুকের রেখার ছন্দ ওঁদায়ে ভরা; যেন সমুদ্রের একটি তরঙ্গরেখা ললাটে উচ্ছ্বসিত, নয়নে আনত, কপোলে প্রবাহিত হইয়া চিবুকের দিগন্তে কোন্ অসীমে মিশিয়া গিয়াছে। স্বর্ণাভ প্রদোষাঙ্ককারে পটভূমিকায় গায়িকা কিশোরীর মুষ্টি।

তিন বোনের মধ্যে দেহরূপে কত প্রভেদ। শীলার মুখ উমার মত লম্বা নয়, গোল হইয়া আসিয়াছে, তার পর চন্দ্রার মুখ ত চাঁদামাছ। শীলার রং উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ, বয়সের তুলনায় স্থলকায়, সহজেই আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, যেন এক সতেজ বনলতা নিজের চারি দিকে ভাবের কুঞ্জ রচনা করিতে চায়।

উমার দেহের গঠন পরিমিত, মুখে পরিণত বুদ্ধির গাভীর্য্য, ঠোঁটের টানে স্থিরসঙ্কল্প, কণ্ঠের সুরে শান্তি ভাব, ব্রী ও ধীশক্তি অন্তরাবেগকে সংযত করিয়া তাহাকে ত্রীমণ্ডিত

করিয়েছে; কিন্তু তাহার একটু ভাবোচ্ছ্বাস থাকিলে বুঝি ভাল হইত, মনে হয় তার জন্মে কোথাও নিষ্ঠুরতা, শূন্যতা আছে।

উমার গান শুনিতে অরুণের বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু উমা যখন গান গায় সে আনন্দ পায় না। প্রতিমার গান গাওয়ায় যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দহর আছে, উমার কণ্ঠে সে সুর খুঁজিয়া পায় না।

হেমবাবুর রোগাতুর মুখের দিকে চাহিয়া, উমার শীর্ণকায় নয়নপল্লবের দিকে তাকাইয়া সে অন্তরে কি বেদনা অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল এই সুখ, এই সঙ্গীতের আনন্দ যেন কোন বিস্কৃত মহানন্দের ছায়ামাত্র, যে বেদনাহীন মহানন্দের একটুকু আভাস সে পাইতেছে, কল্পলোকের দিগন্তে সে পূর্ণ আনন্দচ্ছটা ক্ষণিকের জন্ত দেখা দিয়া আবার মিলাইয়া যায় কেন, ব্যথাভরা তৃষ্ণা রাখিয়া যায়।

সেই অলৌকিক সন্ধ্যায় অরুণের জীবনে প্রেম, বেদনা ও অশ্রুত্বা এক সূত্রে তিনটি মুক্তার মত গাঁথা হইয়া গেল।

৪

রাত প্রায় নয়টার সময় অরুণ বাড়ি ফিরিল। ঘরের সম্মুখে বারান্দায় ঠাকুমা তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যারে খেয়ে এসেছিস?

অরুণ উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠাকুমা, আমি ত তোমায় বলেই গেলুম।

ঠাকুমার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন, মামী কি খাওয়ালেন। কিন্তু অরুণ খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ তালিকা দেবে না, আর অত খাবারের নাম শুনিতে পরদিন তাঁহাকে কিছু বেশী রাঁধিতে হইবে।

—আজ আর বেশী রাত জেগে পড়িস নে, শুয়ে পড়।

—আমি শুঁচ্ছি, তুমিও শুতে বাও ঠাকুমা।

অরুণ যে অজয়দের বাড়ি অত বেশী যায়, খায়, গল্প করে, ঠাকুমা তাহা মনে মনে পছন্দ করেন না। কোন বাধাও দিতে ইচ্ছা হয় না। এই মাতৃহীন বালকের অন্তরের মেহক্ষুণা তিনি ত মিটাইতে পারেন না। অরুণ যদি

কোথাও গিয়া আনন্দ পায়, তাহাতে তিনি বারণ করিবেন কেমন করিয়া। প্রতিমার কিন্তু এসব হাঙ্গাম নাই। সে বাড়িতে বেশ থাকে। স্কুলের পড়া পড়ে, গান গায়, পাখীদের পালন করে, হেলা-ফেলা করিয়া কাটাইয়া দেয়; মাঝে মাঝে তাহার কোন সহপাঠিনীকে নিমন্ত্রণ করিয়া সখ করিয়া রাঁধিয়া খাওয়ায়। কাহারও বাড়ি বাইতে সে রাজী হয় না। পুরুষেরা চিরকালই বাহিরমুখো।

প্রতিমার ঘরে উকি মারিয়া ঠাকুমা নিজের ঘরে গেলেন। প্রদীপ নিবাইয়া বারান্দায় মাহুর পাতিয়া শুইলেন। সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে।

কৃশাদ্রী, থকাঁকতি, কাঁচাপাকা চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া বারিকারেখাক্তি মুখ শীর্ণ দেখায়। দেহের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, আঁটসাঁট গড়ন, মুখের স্নেহপ্রসন্নতা দেখিলে বোকা যায়, ঠাকুমা এক সময়ে সুন্দরী ছিলেন। বস্তুতঃ, অতি গরিব ঘরের মেয়ে হইলেও, অতুলনীয় সুন্দরী ছিলেন বলিয়াই এই ধনী বনিয়াদী বংশে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ছোটবেলায় সবাই তাঁহাকে পুতুল বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সমস্ত জীবন নিষ্ঠুর বিধাতার হস্তে পুতুলের খেলাই হইয়াছে। ছোট মেয়ে আপন পুতুলকে আদর করিয়া নানা রঙীন কাপড়ের টুকরায় খুশীমত সাজায়, হৈ চৈ করিয়া তাহার বিবাহ দেয়, আবার রাগ হইলে সমস্ত সজ্জা ছিঁড়িয়া সেই মাটিতে আছড়ায়। বিধাতাও একদিন তাঁহাকে বালিকাবয়সে বধূবেশে সাজাইয়া কোন সোনার সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সে-কথা ঠাকুমার স্বপ্নের মত মনে হয়। সোনার স্বপ্ন মিলাইয়া গেল, যৌবনেই তাঁহাকে যোগিনী হইতে হইল। যে শ্রাবণ-রাত্রে ছই শিশুপুত্রকে বক্ষে চাপিয়া তিনি বিধবা হইয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল সে অন্ধকার নিশীথের বুঝি অবসান হইবে না। সে রাত্রিও প্রভাত হইল। বড় সাধ করিয়া প্রথম পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। সে পুত্র, সে লক্ষ্মীস্বরূপিনী পুত্রবধূ আজ কোথায়! সব ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভাড়িয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তার পর দুঃখ তাঁহার ললাটে যতই আঘাত করিয়াছে, তিনি মনের বল হারান নাই, কোথা হইতে নবশক্তি পাইয়াছেন। নিষ্ঠুর বিধাতা সংসারঙ্গনে এ পুতুলটিকে বার-বার আছড়াইয়াছেন,

ভাঙিতে নয়, আরও মজবুত করিতে। কোন অথাত জন্মগ্রাম হইতে এক সরলা শক্তিতা বালিকা যেদিন সালঙ্কতা গৃহবধূরূপে এই গৌরবময় বনিয়াদী পরিবারে আসিয়াছিল, ওই পূজার অঙ্গনে বরণডালার প্রদীপশিখায় সেদিন এই বংশের মহিমা মর্যাদা রক্ষার ভার যে তাহারই হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল। অরুণ ও প্রতিমার জীবনে সেই মহিমার অক্ষুণ্ণ রূপ দেখিয়া না-যাইতে পারিলে ঠাকুমা শান্তিতে মরিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় পুত্রের উপর তিনি কিছু আশা করেন না। বিলাত হইতে সে মদ্যপ, অনাচারী, হিন্দুধর্মদ্রোহী হইয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বলে, সে বিলাতে বিবাহ করিয়াও আসিয়াছে। ঠাকুমা তাহা বিশ্বাস করেন না, তবে তাহার বিবাহেরও কোন চেষ্টা করেন নাই। সে শুধু তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকুক।

অরুণ ও প্রতিমাকে তিনি জীবনের সমস্ত আশা ও স্নেহ দিয়া জড়াইয়াছেন। এ-বংশের আদর্শানুসারে তাহাদের মানুষ করিতে হইবে। তাহারা যখন পিতার মৃত্যুর পর ঠাকুমার সহিত বাস করিতে আসিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা লইয়া মাতা ও পুত্রে বিবাদ বাধিল। প্রতিমার বিলাত-ফেরৎ বাবা তাহাকে কোন মেমসাহেবের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিতে চাহিলেন, আর ঠাকুমার ইচ্ছা, প্রতিমা সংসারের কাজকর্ম করে, খুব-জোর কোন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা করে। এ-বংশের কোন মেয়ে কখনও গাড়ী করিয়া স্কুলে যায় নাই। শেষে রফা হইল প্রতিমা কলিকাতার কোন বাঙালী মেয়েদের স্কুলে পড়িবে, বাড়ির গাড়ী তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিবে। স্কুলে গিয়া প্রতিমা কোন হরস্তপনা, বেহায়াপনা শিখে নাই, বেশ শাস্ত, বাধ্য মেয়ে, তবে মাঝে মাঝে বড় একগুঁয়েমি করে।

অরুণের জন্ত ঠাকুমার বড় ভাবনা। ঘরে তাহার মন নাই, তাহার বহু বন্ধু, তাহারা বনিয়াদী বংশের ছেলে বলিয়া মনে হয় না। তাহার শরীরও রোগা, টো-টো করিয়া ঘোরে, বাগানে একা বসিয়া থাকে, প্রতিমার মত আব্দার করে না, মন খুলিয়া কথা বলে না, তাহার মনে কিসের ছুখ? তাহাকে তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

অরুণ বি-এ ক্লাসে উঠিলেই, হুন্দরী মেয়ে দেখিয়া ঠাকুমা তাহার বিবাহ দিবেন, গরিব বনিয়াদী ঘরের মেয়ে আনিবেন। তাহাকে বিলাত যাইতে দিবেন না।

ঠাকুমার চোখে জল আসিল। রেখাঙ্কিত কপোল অশ্রুতে ভিজিয়া গেল। মাদুর হইতে উঠিয়া তিনি ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুমা চলিয়া গেলে অরুণ হাতমুখ ধুইয়া জামা বদলাইয়া খোলা জানালার কাছে এক চেয়ার টানিয়া বসিল। স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রি স্বপ্নের কুহেলিকাজড়ান।

স্কুলের বই পড়িতে ইচ্ছা করিল না। মন যেদিন বিষম বা আনন্দপূর্ণ থাকে, সে ডায়েরি লেখা বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া পড়ে। মামীমার নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পুস্তিকাগুলি লইয়া আসিয়াছে। উপদেশ-গুলি একটু হর করিয়া মৃদুস্বরে পড়িতে বসিল, যেন মহান কবিতা। সব বুঝিতে পারিল না, গভীর ভাবগর্ভ কথাগুলির তরঙ্গাঘাতে তাহার অন্তরের কোন গোপনগুহার হুপ্ত জলে চঞ্চলতা জাগিল। উপদেশের শেষে প্রার্থনা সে ভক্তির সহিত পাঠ করিল, এ যেন তাহার অব্যক্ত আত্মার ভাবাহীন বেদনার বাণী।

ডায়েরি লেখা হইল না। শান্তিনিকেতন হইতে কয়েকটি অংশ ডায়েরিতে ঢুকিল।

“জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সম্মত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কন্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ।”

তাহার নীচে অরুণ লিখিল—জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে সত্য কি জানিবার জন্ত, শক্তির সাধনা করিতে হইবে মানবকল্যাণের জন্ত, কিন্তু প্রেমের সাধনা কিসের জন্ত? মৌনর্ষ্যের জন্ত? বেদনার জন্ত? কবি বলিতেছেন, জ্ঞান প্রেম ও শক্তির সমন্বয় করিতে হইবে তবে আনন্দতীর্থে পৌছান যায়।

এ বিষয় জয়ন্তর সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

ডায়েরি বন্ধ করিয়া অরুণ প্রতিমার ঘরের দিকে চলিল।

প্রতিমা নিশ্চয় তখন ঘুমায় নাই। তাহার এত রাতজাগা উচিত নয়।

গৃহদ্বারের নিকট আসিয়া অরুণ শুনিতে পাইল, প্রতিমা একা ঘরে বসিয়া আপন মনে উচ্চ স্বরে হাসিতেছে। মাথা খারাপ হইল না কি!

ঘরে ঢুকিয়া অরুণ দেখিল, প্রতিমা নিবিষ্ট মনে কি বই পড়িতেছে : ও ডনকুইক্সোট।

—দাদা, কি মজার বই, তুমি আমায় এত দিন দাও নি!

—টুলি, কি মজা? খুব চোঁচিয়ে হাসছিস ত!

—এই তোমার ডনকুইক্সোট গো।

—ওতে হাসবার কি আছে?

—বা, হাসবার নেই? আচ্ছা, উইণ্ডমিলগুলোর সঙ্গে কি ব'লে যুদ্ধ করতে যায়? শোন, আমি একটা কবিতা লিখেছি, তোমার কবিবন্ধু এমন লিখতে পারবে না, ছন্দ মিলেছে—

ডনকুইক্সোটের লাগল চোট

রক্ত বারিল বক্ষে

অমন কাণ্ড হতেই হবে

দেখে না যারা চক্ষে

ছ-চার লাইনে বাঙ্গ-কবিতা রচনা করিতে প্রতিমা হুনিপুণ।

অরুণ হাসিয়া বলিল—তুই গল্পটা কিছুই বুঝিস নি, ও কত বড় আইডিয়াল নিয়ে বাহির হয়েছে।

—মাথায় থাক অমন আইডিয়াল, ওর ত বই পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, তোমার বন্ধু কি সব বাজে কবিতা লেখেন, এই গল্পটা কবিতায় অনুবাদ করতে ব'লো।

—টুলি, যা বুঝিস না তাই নিয়ে ঠাট্টা করিস না।

—বা আমি ত মিররসলি বলছি।

অরুণ ভাবিল, পৃথিবীর ডনকুইক্সোটদের মেয়েরা কি চিরকাল পরিহাস করিবে, তাহাদের আদর্শ বুঝিয়া ভাল বাসিবে না?

—দাদা, তুমি বড় গম্ভীর হয়ে যাও। কিন্তু তোমার

কবিবন্ধুটিকে সাবধান ক'রে দিও। আমাদের স্কুলের গাড়ীর বোড়াটি ওই উইণ্ডমিলের চেয়েও বেগবান ও সজীব।

—কেন কি হয়েছে?

—কবিটি আর একটু হ'লে বোড়া-চাপা পড়তেন, একেবারে আকাশের দিকে চেয়ে হাটেন।

—বা, বাজে বকিস না, এখন বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়।

বেশী পড়লে কি অবস্থা হয়, দেখছিস, ত ডনকুইক্সোট—

—সেটি তুমিও মনে রেখো। আমি বাপু গল্পটি শেষ না ক'রে শুচ্ছি নে।

—আচ্ছা, আর আধ ঘণ্টা।

—ও, ভুলেই গেছলুম, এই নাও দাদা সেই গানটা।

গানের কাগজখানি লইয়া অরুণ নিজের ঘরে গেল না। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাগানে বাহির হইয়া গেল। মুঞ্জরিত রক্তকরবীকুঞ্জের ছায়ায় ভগ্ন মন্দির বেদিকায় ধীরে বসিল।

জ্যোৎস্না-নিশীথের নৈশশব্দ দক্ষিণ সমীরণে ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে। সুপ্তসৌধ মহানগরী যেন কোন সুদূরে। এই প্রাচীন পরিত্যক্ত উদ্যানে ঝরা-পাতার গন্ধময় রহস্যাক্ষকারে, বুরিনামা বটগাছের পুঞ্জীভূত শুক্লতায় অরুণ তাহার জীবন-কল্লোলময় বেদনাপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে একটি শান্তির আশ্রয় লাভ করে; এই নিভৃত নির্জনতায় তরুরথাবেষ্টিত যে ধণ্ডিত আকাশ দেখা যায়, সেই নীলকান্তপ্রভ হুনির্ম্মল আকাশটুকু তাহার নিজস্ব; এই আকাশের সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্তে চুনি-পান্না-গলানো আলো, চন্দ্রমার স্বপ্নময় শুভ্রতা, তারালোকের অসীমতা, নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বস্ত্রাধারা, এ আলোক অন্ধকার কেবল মাত্র তাহারই। এ শ্রামল বিজনতার আকাশটুকু তাহার একমাত্র সঙ্গী।

আজ কিন্তু সেই পরিচিত নীল যবনিকার নিঃসঙ্গতা রহিল না, নিভৃত আশ্রয়ে নানা গানের সুর ভিড় করিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী

শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গত এম্-এ পরীক্ষায় বাংলার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী মিথোবাঈ এম্ চিন্নয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় আঠার হাজার ছাত্র-ছাত্রী দ্বন্ মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ডক্টর দাদাভাই নওরোজী বৃত্তি পাইয়াছেন।

শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে অক্সফোর্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গত বৎসর তিনি অক্সফোর্ড হইতে শিক্ষা বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী অমিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও একজন কৃতী ছাত্রী, তিনি এখান হইতে ইংরেজীতে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া অক্সফোর্ডে গমন করিয়াছিলেন।



শ্রীমতী মিথোবাঈ এম্ চিন্নয়



শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়



দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে চিত্র-প্রতিষ্ঠা—

সুপ্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে দুই জন বাঙালী স্নানীয় চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-ই, বিজ্ঞানরত্ন, এন্-আর-এ-এস, এবং রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর। স্ত্রীর যত্ননাথ সরকার মহাশয় চিত্র দুইখানি উন্মোচন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকায় বক্তৃতার এই অংশটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মুকুন্দবাবুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

‘মুকুন্দদেব যেমন তাঁহার আকৃতির সৌন্দর্যে তেমনি তাঁহার চরিত্রগুণে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি অতি উজ্জলভাবে আনিয়া দিতেন। তিনি পিতার সেই বুড়োরঙ্গ শালগ্রাম দেখে, সেই প্রশস্ত নির্মল ললাট, সেই সৌম্য মহাস বদন পাইয়াছিলেন। আর ভূদেববাবুর মতই ছিল তাঁহার স্থির বুদ্ধি, আয়তনময়, গভীর সংসারজ্ঞান, নিজস্ব নিষ্পত্তা, লোকহিতপরায়ণতা। আমাদের মহাকবি ভারতের আদর্শ মুপতির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

স্বপ্ন-নিরভিলাসঃ শিথিলো লোকহিতো প্রতিদিনম।

এই দুটি ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবনেও ঠিক সেই কথা সত্য প্রমাণ হইয়াছিল।

পিতাপুত্র দু-জনের চরিত্রেই একাধারে নৈতিক দৃঢ়তা ও জীবনের প্রতি আগ্রহ দৃষ্টি মিলিত ছিল। তাঁহাদের হৃদয়ে করুণা আর চোখের কোণে বিগল রসজ্ঞান উঁকি মারিত। তাঁহার সরকারী কর্ম উপলক্ষে বঙ্গ ও বিহারের অনেক শহরে বাস করিয়াছিলেন, সর্বত্রই তাঁহাদের অদম্য জ্ঞানপরায়ণতা ও বিশ্বমানবপ্রীতির কথা লোকের মনে আছে।

মুকুন্দবাবুর সহিত আমার তিন পুরুষের পরিচয়। ভূদেববাবু আমার পিতার গুরুস্থানীয় ছিলেন, বন্ধু বলিলে অসঙ্গত হইবে, কারণ বাবা তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। ভূদেববাবু রেল-স্বিখা হইবার পূর্বে আমাদের রাজশাহীস্থ পৈত্রিক গ্রামে একবার গিয়াছিলেন। আর, মুকুন্দবাবুর সঙ্গে আমি অনেক বৎসর পাটনায় ছিলাম, সর্বদাই সাক্ষাৎ হইত। তিনি অবশর লইয়া কাশী যাইবার পরও আমি সেখানে অনেক বার তাঁহার অসিধামে গিয়া দেখা করি। এই সব সুযোগে তাঁহার নিকট ভূদেববাবু মাইকেল প্রভৃতির অনেক গল্প এবং মুকুন্দবাবুর নিজ জীবনের অনেক কাহিনী শুনি; এগুলি যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি মনোরম। ইহার কয়টি মাত্র ‘সদালাপ’ ও ‘ভূদেব-চরিত’ গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও স্থানে স্থানে নাম বদলাইয়া।

সেবার বন্ধন তাঁহার নিকট যাই, তখন দেখি যে তিনি শয্যাশায়ী, বাতে আক্লান্ত, হাত-পা ফ্রানেলের মোজা ও দাঁতানা দিয়া জড়িয়া কট

লাষবের চেষ্টায় আছেন। রোগটি অত্যন্ত ক্লেশকর, তাঁহার তখন বয়সও খুব অধিক, কিন্তু বাধি তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই, শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার সেই পূর্বপরিচিত শান্ত সরস বাণী ভিন্ন আর কিছুই শুনিলাম না; হাসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।



মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

তিনি জীবনে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক ভূদেব-বাবুর মতই, তাহা নিজ ভোগে ব্যয় না করিয়া নানাধি লোকহিতকর কার্যে দান করিতেন। একটি দৃষ্টান্তে তাঁহার চরিত্রের অসাধারণতা দেখাইতেছি—

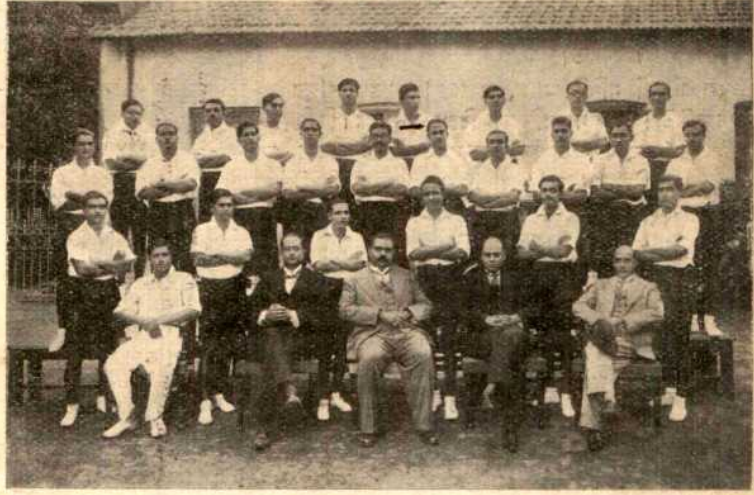
সেবার পাটনায় বিহার জ্ঞানশালা কলেজ অর্থাভাবে ডুব ডুব হইয়াছে, উহার রক্ষার জন্য সভা হইল, সব জ্ঞানশালা নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু পয়সা দিলেন না। একমাত্র মুকুন্দবাবু কোম্পানীর কাগজ দান করিলেন, বলিলেন যে ইহা হইতে অন্ততঃ কিছু স্থায়ী আয় হইবে।

মুকুন্দবাবু জীবনে অনেক হুঃখ পাইয়াছিলেন। পুত্র সৌমদেব খার্ড ইয়ারে উঠিয়া অকালে মারা গেল। পুত্র প্রতিমরাম দেব আমার কলেজে প্রথম হইত, সেও ডেপুটী পদ পাইয়া, অসামান্য নাম ও উন্নতি অর্জন করিয়া, মহাবুদ্ধির পরবর্তী সেই ভাষণ ইনফলুএঞ্জা বোণে

হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মুকুন্দবাবুও শেষবয়সে ব্যাধিতে পড়িলেন। কিন্তু এই মহাপুরুষের ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান তাঁহাকে এ-সব রোগশোক নীরবে সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল। এমন হৃদয়বল ভূদেব-পুত্রেরই সম্ভবে।

বঙ্গসাহিত্যে মুকুন্দদেবের অনেক দান আছে, তাহা চিরদিনই আবৃত্ত হইবে, কারণ তাহার মধ্যে অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত। “নেপালে ছত্রী,” “সদালাপ” ও “ভূদেবচরিত” অনেকেই পড়িয়াছেন। তাহা ভিন্ন অনেক সত্য নদগল্প তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৩২৭-১৩৩১ সাল পর্যন্ত তিনি ইহার চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন। পরিষদ-মন্দিরের



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্মীগণ। ইহার শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন।



মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বে-অংশে চিত্রশালা আছে তাহা রমেশ-ভবন নামে পরিচিত। এই রমেশ-ভবনের পরিকল্পনা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি একাধারে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। ভারতীয়া বিবয়েও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার পুস্তকাবলীই ইহার প্রমাণ। “Orissa and Her Remains,” “Vivekananda—a study,” “Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad” প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক

তিনি লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩৩২ সালে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২৪এ জানুয়ারী ইহার প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কলিকাতার কলেজগুলির বহু ছাত্র-ছাত্রী এই উৎসবে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকী—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকীও সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ইহা লর্ড উইলিয়াম বেটিন্কে'র আমলে ১৮৩৫, ২৮এ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। শতবার্ষিকীর স্মৃতিরক্ষার জন্ত মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের একটি নতুন ওয়ার্ড নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র প্রভৃতিরও একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল।

শিক্ষাকার্যে দান—

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ কয়াল গোবিন্দপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাট হাজার টাকা মূল্যের প্রায় তিন শত পচিশ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। তিনি আরও দশ হাজার টাকায় বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত জমি হইতে বার্ষিক আয় হইবে আনুমানিক আড়াই হাজার টাকা। কালীচরণবাবুর দান সকল অর্ধশালী ব্যক্তির অনুকরণীয়।

অর্থনৈতিক-প্রসঙ্গ

লাক্ষাশায়র ও ভারতীয় কার্পাস—

ইংলণ্ডে একটি সমিতি আছে, তাহার নাম “লাক্ষাশায়র ভারতীয় কার্পাস কমিটি”। ইহার সভাপতি সার রিচার্ড জ্যাকসন। তিনি গত বৎসর ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্ত এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটির প্রথম বার্ষিক বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ যে এই কমিটি স্থাপিত হইবার পর ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতীয় কার্পাসের দ্বিগুণ মাত্রা বাড়িয়াছে। সমগ্র লাক্ষাশায়রের কলসমূহ ভারতীয় কার্পাসের প্রচলন করাই এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল কল পূর্বে কখনও ভারতীয় কার্পাস ক্রয় করে নাই, এখন তাহারা ভারতীয় কার্পাস ব্যবহার করিয়া ভাল কল পাইতেছে। চাহিদামত উপযুক্ত পরিমাণে ভাল কার্পাস বাহাতে সরবরাহ হয় ভারতে সে চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্বে জাপানই ভারতের বড় খরিদদার ছিল কিন্তু এখন জাপান ভারতীয় অপেক্ষা মিশরীয় ও আমেরিকার কার্পাসই বেশী ক্রয় করে। ওদিকে লাক্ষাশায়র প্রধানতঃ আমেরিকার কার্পাসের উপরই বশশির গড়িয়া তুলিয়াছিল কিন্তু অটোয় চুক্তির ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। লাক্ষাশায়রে ভারতীয় কার্পাসের চাহিদা বাড়িয়াছে। ভারতেও স্বদেশীয় শিল্পের গরই লাক্ষাশায়রের শিল্পের চাহিদা হওয়া উচিত।

লাক্ষাশায়রে ভারতীয় কার্পাসের চাহিদা বাহাতে বাড়ে এই জন্ত তিনটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম লাক্ষাশায়র-ভারতীয় বাণিজ্য বাহাতে অব্যাহত থাকে এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় কার্পাসের নিয়মিত সরবরাহ ও তৃতীয়তঃ ভারতীয় বাজারে লাক্ষাশায়রের বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি। ভারতীয় তুলা যে সকল কল বস্ত্র প্রস্তুত করে তাহার তালিকা প্রস্তুত আছে।

ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কে টেকনিকাল অনুসন্ধান জন্ত কমিটি উপদেষ্টা-সভা গঠন করিয়াছেন, সিলে ইনস্টিটিউটের সহায়তায় এরূপ অনুসন্ধান হইয়াছে। এই সভার অনুরোধে গত ১৯৩৪ জানুয়ারী মাসে একটি প্রদর্শনী হইয়াছে। ইহার ফল অতীব সন্তোষজনক।

কমিটি আরও বলেন যে কেবল কার্পাসের উৎকর্ষ সাধিত হইলেই চলিবে না, নিয়মিতভাবে সরবরাহ আবশ্যক। ইতিপূর্বে প্রধানতঃ মূল্য সম্পর্কেই প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। কম মূল্য ছিল সকলেরই লক্ষ্য সুতরাং নানা বিভিন্ন শ্রেণীর কার্পাসে মিশ্রিত হইত। ফলে তুলার উৎকর্ষ সম্পর্কে কেহই নিঃসন্দেহান হইতে পারিতেন না।

সাম্রাজ্যের ভিতর যে বাণিজ্য আশুপ্তা নীতি বর্তমান সময়ে চলিতেছে সে সম্পর্কে কমিটি বলেন যে বিশ্বব্যাপী অর্থ সঙ্কটে এরূপ ব্যবস্থা সমীচীন। রাজনীতিক বা সাম্রাজ্য-প্রীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই ব্যবস্থাই যে ভারত ও ইংলণ্ডের পক্ষে নিরাপদ। সৌভাগ্যবশতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ও এরূপ প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ যে বাহিরের সহায়তা ভিন্নও ইহা স্বয়ং নিজকে অপ্রতিষ্ঠ করিতে পারে। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ আদান প্রদানের চুলচেরা ভাগ করিতে বসিলে ব্যাপার কঠিন হইবে। বতরু কুঁচি দিব ঠিক ততরু চাই—সর্বত্র এই দাবি হইলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাইবে না! অংশীদার-গণের পরস্পরের প্রতি আস্থা ও স্বার্থত্যাগের আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন। কেহ কেহ এরূপ কথাও বলেন যে লাক্ষাশায়র ভারতে যে বাজার হারাইয়াছে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে ফিরিয়া না পাইলে ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কে সহযোগিতা করা লাক্ষাশায়রের পক্ষে উচিত নহে।

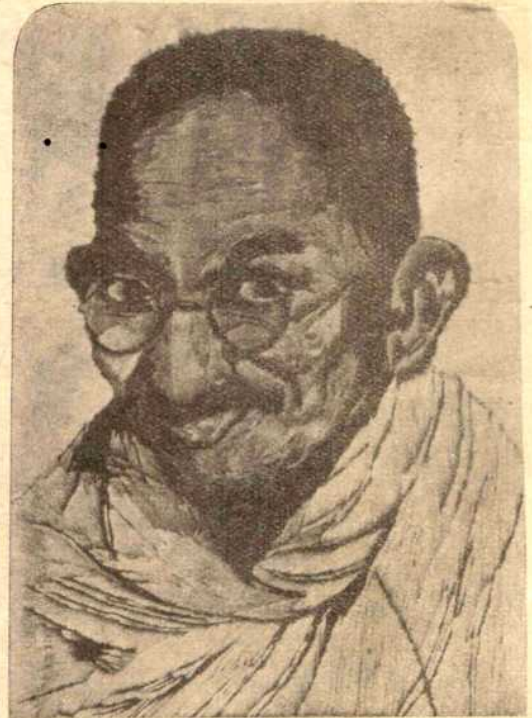
কিন্তু কমিটি মনে করেন যে অপর পক্ষও অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন এই বিশ্বাসেই পারস্পরিক বাণিজ্য পরিচালিত হওয়া কর্তব্য। ভারতবর্ষ হইতে তাহারা উৎসাহ পাইবেন এ বিশ্বাস কমিটির আছে।

ইঙ্গ-ভারত চুক্তি—

এই বিবৃতি ভারতে প্রচারিত হইবার অল্পদিন পরেই রাষ্ট্রীয় পরিষদে “ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি” সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। মতামতের পরিষদ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন; পরিষদের এই মত প্রকাশের ফলে ইঙ্গ-ভারত চুক্তি যে বাতিল হইল তাহা নহে।

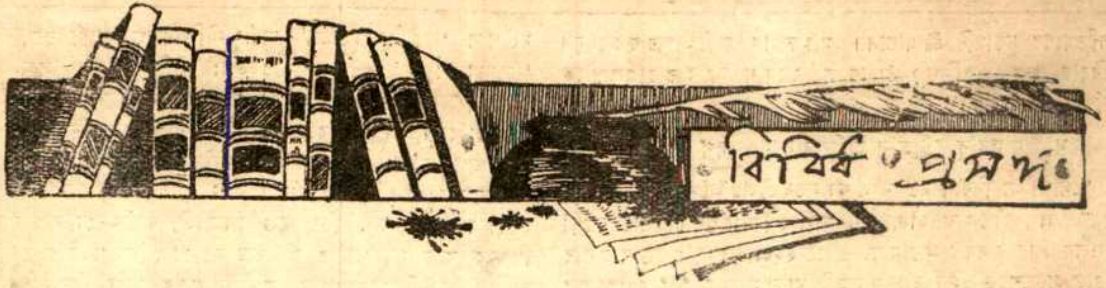
এদিকে ইংলণ্ডে কমন্স সভায় ভারতীয় সংস্কার সম্পর্কে বিতর্কে মিঃ এস এস হামাস লে বলেন যে রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ভারতীয়গণ লাক্ষাশায়রকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভারতীয় শাসনযন্ত্রের চাকা লাক্ষাশায়রে স্বার্থের জন্তই ঘুরে এ ধারণা ভুল! পরিষদের সিদ্ধান্ত নৈরাশ্রজনক কিন্তু লাক্ষাশায়র মনে করে যে চুক্তির মুক্তিযুক্ততার উপর পরিষদের এই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ হয় নাই, ভারত-সরকার ভারতীয় বর্ষিকমতবাদকে উপেক্ষা করিয়াছেন এই ধারণায়ই এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বাহাই হউক লাক্ষাশায়র বর্তমান নীতি ত্যাগ করিবেন না।

মিঃ এস এস হামাস লের প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব স্তর সামুয়েল হোর কমন্স-সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে পরিষদের সিদ্ধান্ত ভারত-সরকার গ্রহণ করিবেন না। এই সিদ্ধান্তে চুক্তির বৈধতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, নীতিরও পরিবর্তন হইবে না।



মহাত্মা গান্ধী (?)

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রী শ্রীমতী মলিনীবালা রায় কর্তৃক দৃষ্টাশিল্প হইতে।

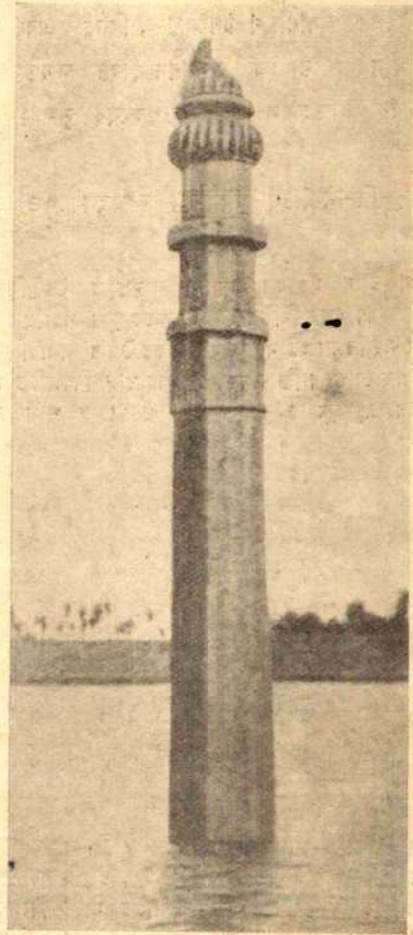


বঙ্গে অষ্টম শতাব্দীতে নৃপতি-নির্বাচন

দিনাজপুর জেলার দিবর গ্রামের “দিব্য” দীঘির গর্ভে প্রতিষ্ঠিত একটি স্তম্ভ আছে। উহা মহারাজ দিব্য বা দিব্যক কর্তৃক নিশ্চিত জয়ন্তস্ত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। উহার একটি চিত্র ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় “গোড় রাজমালা” গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে উহা দিব্যের জয়ন্তস্ত। এই সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত না হইলেও অনেকেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ২৬শে মার্চ এই দীঘির নিকট মহারাজ দিব্যের সিংহাসন-আরোহণ দিবসের স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, প্রভুতত্ত্ববিৎ রায় বাহাদুর রমাশ্রম চন্দ্র। তাঁহার অভিভাষণে তিনি দিব্যের বিষয় বিবৃত করিবার পূর্বে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে গোপাল দেব প্রজাদের দ্বারা নৃপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন :—

আমাদের দেশে মহাশ্মা, মহাজন, মহাপুরুষ বলিতে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষই বুঝায়। কিন্তু ঐহিক জগতে বাধাবিহীন অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মহৎকার্য সাধন করিতে হইলেও সংঘের সহিত সাধনার আবশ্যক। এইরূপ ঐহিক সাধনায় সিদ্ধপুরুষও মহাপুরুষরূপে গণনীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা এইরূপ মহাপুরুষদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রাজার এবং রাজপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র। এই সকল রাজা এবং রাজপুরুষের মধ্যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সাধনরত, এবং সাধনায় যথা-সম্ভব সিদ্ধ, মহাপুরুষের অভাব নাই। কিন্তু আদৌ স্বেচ্ছায় নহে, জনসাধারণের দ্বারা আহূত বা নির্বাচিত হইয়া, রাষ্ট্রীয়সাধন-সময়ে অবতীর্ণ হইয়া স্বাধীন সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ফলভ নহে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ দুই জন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই দুই জনের মধ্যে এক জন, পাল-রাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব, যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জনসাধারণ কর্তৃক অরাজকতা নিবারণের জন্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; দ্বিতীয়,



মহারাজ দিব্যের জয়ন্তস্ত

পাল-রাজবংশের প্রথম রাজা গোপাল দেবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্মপাল দেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে আছে :—

“মাংস্ত্রায়মপোহিতং প্রকৃতিভিলপ্যাঃ কং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল-
ইতি কিতীশশিরসাংচুড়ামণিস্তংস্থতঃ।” “তাঁহার (বপাটের) পুত্র

নৃপতিগণের চূড়ামণি শ্রীগোপাল। সামন্তজ্ঞার অর্থাৎ অরাজকতা দূর করিবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অর্থাৎ গোপালের করে রাজলক্ষ্মীকে অর্পণ করিয়াছিলেন।”

রমাশ্রমাদবাবু তাঁহার অভিভাষণে দেখাইয়াছেন, যে,

“গোপালের নির্বাচনের কাল খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষ-ভাগ” এবং নির্বাচন আদৌ বর্তমান মালদহ দিনাজপুর রাজশাহী বগুড়া ও পাবনা জিলার সমষ্টি প্রাচীন বরেন্দ্রীতে হইয়াছিল। “কিন্তু বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশেরও এই নির্বাচনে সম্মতি থাকা সম্ভব * * * গোপালের নির্বাচনের সময়ে বাঙ্গলার অপরাপর অংশের, বিশেষতঃ রাঢ়ের, অধিবাসিগণ বারেন্দ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া এই মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিল এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।”

গোপালের অসাধারণ রণনৈপুণ্য, বিনয় এবং রাষ্ট্রকে শান্তিস্থপদান ও রাষ্ট্রের কল্যাণসাধনের ক্ষমতা ছিল।

“ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মহাপুরুষের তুলনা পাওয়া যায় না।”

বঙ্গ নৃপতি-নির্বাচন মুসলমান রাজত্বকালেও একবার হইয়াছিল।

“খোজা রাজা মজঃফর সাহের অত্যাচারে উৎপীড়িত হিন্দু মুসলমান নায়কগণ একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং এই বিদ্রোহের নায়ক মজঃফরের উজীর আলউদ্দিন হোসেন সাহেব নামক এক যোগ্য ব্যক্তিকে সকলে মিলিয়া রাজা নির্বাচিত করেন।” (ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ‘সে। ৩ষ্ঠ মানের পাঠ্য ভারতের ইতিহাস, ৮৭ পৃষ্ঠা ও ম্যাট্রিক পাঠ্য ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৩৭ পৃষ্ঠা : ১৯৩৩ অব্দে প্রকাশিত)।

মহারাজ দিব্য

রমাশ্রমাদ বাবু তাঁহার অভিভাষণে সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত “রামচরিত” এবং কোন কোন তাম্রশাসনের বিচার করিয়া মহারাজ দিব্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন।

“প্রকৃতিপুঞ্জকর্তৃক গোপালের রাজপদে প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন শত বৎসর পরে বাঙ্গলায় আর একটি আশ্চর্য ঘটনা, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঘটয়াছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের অনন্তসামন্তচক্রের নির্বাচিত নায়ক ছিলেন দিব্য বা দিব্যোৎসব।”

বিদ্রোহ হইয়াছিল মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে—যেহেতু তিনি অত্যাচারী ও হীনীতিপরায়ণ ছিলেন।

“গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপাল সন্দেহের বশে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব, সুরপাল এবং রামপালকে, লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের অপর কারণ স্বরূপ কবি বলিয়াছিলেন,

মহীপাল ‘অনীতিকারম্ভরত,’ অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কার্যে রত, এবং ‘ভূতনয়াদ্রাণযুক্ত,’ অর্থাৎ সত্যের এবং নীতির মর্যাদা লঙ্ঘনকারী ছিলেন। দিব্যের বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না; ঘটনাচক্রে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তিনি রাজদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন নাই, উপায়ান্তর নীতাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভণ্ড তপস্বী হওয়া দোষের কথা, কিন্তু ভণ্ড বিদ্রোহী, অর্থাৎ যে সাধু করিয়া বিদ্রোহ করে না, কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে বিদ্রোহ করে, সে মহৎ ব্যক্তি। এই বিদ্রোহ কোন জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। ইহা সার্বজনীন বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লব।”

রমাশ্রমাদ বাবু প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক। রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব ও আন্দোলন তিনি করেন না, তাহা তাঁহার কাজ নয়। এই কারণেই তাঁহার অভিভাষণের শেষে তিনি বাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রণিধানযোগ্যতা বাড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :—

“মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র নির্বাচিত গোপাল দেব এবং দিব্য জাতিবর্গের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন। সেকালের সামন্তচক্রের স্থলবর্তী বর্তমান জননায়কগণ। গোপাল দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সাদি একাদশ শত বৎসর পূর্বে এবং দিব্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন সাদি আট শত বৎসর পূর্বে। এই দ্ব্যধী কালের মধ্যে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। সর্বাপেক্ষা প্রধান পরিবর্তন আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি পল্লীসমাজ, বাহা মুসলমানগণকেও আপনাদের করিয়া ভাই চাচা, নানায় পরিণত করিয়াছিল, তাহা প্রায় হারাইয়াছে, এবং পল্লীসমাজের প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতির বর্তমান লক্ষ্য স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য (end) নহে চরম লক্ষ্যে পহঁছিবার পথ (means) মাত্র। রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য, সার্বজনীন কল্যাণ, সার্বজনীন সুখসম্পদ।

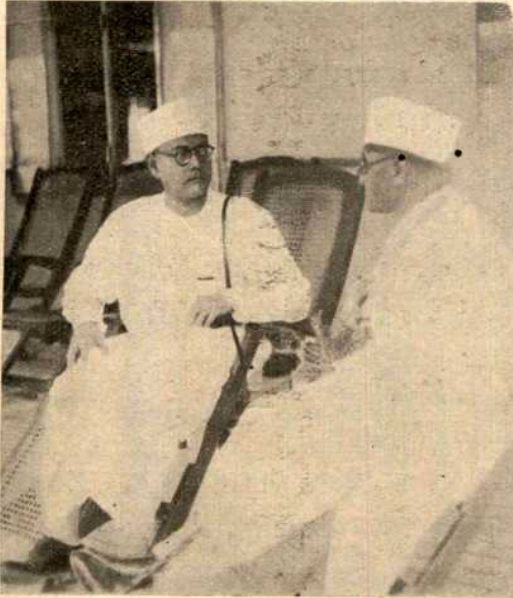
“এই লক্ষ্যে পহঁছিতে হইলে সেকালেও যে উপায় অবলম্বন করিতে হইত, এখনও তদ্বিধ উপায়ান্তর নাই। সেই উপায় অনন্তসামন্তচক্রের মিলন; সকল জনসেবকের একতা। এরূপ একতা বর্তমানে অসাধ্য মনে হয়। যে দুই জন মহাপুরুষ বিশেষ বিপদকালে এদেশে অনন্ত-সামন্তচক্রের মঙ্গলময় একত্বের সম্মতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্রকথা আমাদের স্মরণীয়, মাননীয় এবং কর্তনীয়। এইরূপ স্মরণ, মনন, কর্তন আমাদের মনে একত্বের সম্মতি উদ্বোধনের সহায়তা করিতে পারে। ইহাই দিব্যস্মৃতি-উৎসবের সার্থকতা। আর এক কারণেও এই উৎসব বড় সমাগোপযোগী হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ আত্মনির্ভর এবং আত্মমর্যাদা হারাইয়াছে। তাহাকে আবার দেশের দিকে ফিরাইয়া আনার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় দেখা যায় না।”

সুভাষ বাবুর পুস্তক ভারতে নিষিদ্ধ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপে থাকিবার সময়ে ভারতবর্ষের আধুনিক স্বাধীনতালাভ-প্রয়াস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। তাহারই একটি টাইপলিপি

করাচীতে পুলিশ অধিকার করে ও তাহা গবর্নেন্ট কর্তৃক পরে বাজেয়াপ্ত হয়। অত্র প্রতিলিপি তাঁহার বিলাতী প্রকাশকদের নিকট ছিল। তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। অবিলম্বে ভারত-সরকার তাহার বা তাহার কোন অংশের বা কোন অনুবাদের ভারতে আনয়ন বা প্রকাশ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সাণ্ডার্সাণ্ড সাহেবের “ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ”র ভারতীয় মুদ্রক ও প্রকাশককে ফৌজদারী সোপর্দ করিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। তখন শুনিয়াছিলাম, এবং আগে ও

পরেও অনেক বার শুনিয়াছি, যে, রাজদ্রোহবিষয়ক আইন না কি ইংলণ্ডে ও ভারতে একই। হইতে পারে। তবে,



শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা

বস্তুতঃ দেখিতেছি, সুভাষ বাবুর পুস্তকের বিলাতী মুদ্রক ও প্রকাশক ফৌজদারী সোপর্দ ও দণ্ডিত হন নাই; কেন-না, মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। আমরা তাঁহাদের শাস্তি চাহিতেছিও না। বরং ইহা ভাল মনে করি, যে, অন্ততঃ



শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও বোম্বাইয়ের বঙ্কু বর্গ

ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা ভালই। সুভাষ বাবুর পুস্তকটি ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় এক হিসাবে উহার প্রচারের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে; ইংলণ্ডে, ইউরোপে ও আমেরিকায় উহার সম্বন্ধে কৌতুহল বাড়িয়াছে। তাহাতে উহার কাটতি বাড়িয়াছে এবং বেশী লোকে উহা পড়িতেছে।

সুভাষ বাবুর পুনর্ব্বার ইউরোপ যাত্রা

সুভাষ বাবু চিকিৎসার্থ আবার ইউরোপ গিয়াছেন। তিনি সুস্থ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক দেশহিতকর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিলে তাহা শুভফলদায়ক হইবে।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গের বাহিরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের এক জন প্রধান প্রযত্নকর্তার তিরোভাব ঘটিল। তিনি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের এক জন প্রধান সহায়ক ছিলেন। কলিকাতায় থাকিতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অগ্রতম অধ্যাপক রূপে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রতম শিক্ষক রূপে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্মজীবন পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে

পেন্সান লইয়া কাশীবাসী হইয়াও তিনি অলস হন নাই। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ লইয়া তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পণ্ডিতও ছিলেন। কিন্তু “ব্রাহ্মণপণ্ডিত” বলিলে ঘেঁরুপ যুক্তিবিমুখ অন্ধ গোঁড়ামির সমর্থক অনেক ক্ষেত্রে বুঝায়, তিনি সেরূপ ছিলেন না। তিনি বিধবা-বিবাহের



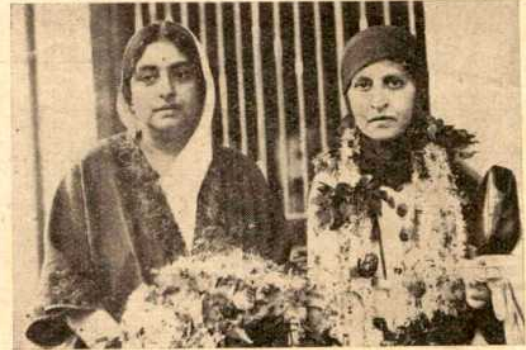
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ

সমর্থন করিতেন, পণপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাল্যবিবাহনিষেধক শরিদা-আইনের সমর্থনকল্পে সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি পূজনীয় নারীগণের বিবাহের বয়স দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক

জুর্নীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতবাগিতা সুবিদিত ছিল। সদালাপে ও আপ্যায়নে তাঁহার দক্ষতার জ্ঞাত তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলা বহি লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী হালিদে এদীব হানুম

তুরস্কের প্রসিদ্ধ লেখিকা ও স্বজাতির স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার অগ্রতম নেত্রী ভারতবর্ষে আসিয়া নানা স্থানে



শ্রীমতী হালিদে এদীব হানুম ও শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়

বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার জীবন আত্মোৎসর্গ ও দুঃখবরণের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার বক্তৃতা হইবে। সম্ভবতঃ এখানকার ভারতীয় মহিলারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধনা করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভায় জয়পরাজয়

ইংলণ্ডে ও অন্ত অনেক পাশ্চাত্য দেশে এবং অন্তর্ভুক্ত কোথাও কোথাও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মত অনুসারে দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহিত হয়। জনসাধারণের মত কোন সময়েই ঠিক একই রকম হয় না। এই জ্ঞাত একাধিক দলের সৃষ্টি হয়। ব্যবস্থাপক সভায় যখন যে দলের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হয়, তখন তাহা হইতে প্রধান মন্ত্রী ও অন্তান্ত সব মন্ত্রী মনোনীত হয়। ইহারা হন “গবর্নেন্ট” এবং রাষ্ট্রীয় কাজ ইহারা চালান—প্রয়োজন

মত নূতন আইন ইহার। করেন,
পুরাতন আইনের সংশোধন করেন,
এবধি কাজ। ইত্যাকার কাজ করিতে
গিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ইহাদের পরাজয়
হইলে, অর্থাৎ যত প্রতিনিধি ইহাদের
দিকে ভোট দেয় ইহাদের বিরুদ্ধে
তার চেয়ে বেশী লোক ভোট দিলে,
ইহার। পদত্যাগ করেন। তখন নূতন
প্রতিনিধিনির্বাচন দ্বারা বা অল্প
প্রকারে নূতন মন্ত্রীমণ্ডল ও “গবন্মেণ্ট”
গঠিত হয়।

এই প্রকারে প্রজাদের প্রতিনিধি-
দিগের দ্বারা যে সব দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য
নির্বাহিত হয় তথাকার ব্যবস্থাপক
সভায় জয়পরাজয়ের সদ্য সদ্য একটা
ফল ফলে। আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক
সভায় জয়পরাজয়ে এরূপ কিছু ঘটে
না, ঘটিতে পারে না। ইংরেজ জাতি
ভারতের প্রভু। তাহার। ইংলণ্ড হইতে
শাসনকর্তা পাঠায়। সেই কর্তারা
“গবন্মেণ্ট”। ব্যবস্থাপক সভার ভোটে
এই “গবন্মেণ্টকে” যতবারই পরাজিত
কর না, ইহার।ই গবন্মেণ্ট থাকিবে,
জয়ী ভারতীয় প্রতিনিধিরা মন্ত্রীমণ্ডল
গঠন করিয়া “গবন্মেণ্ট” নামধেয়
হইতে পারিবে না। সুতরাং
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জয়পরাজয়ে

ইংরেজদের কিছু আসে যায় না। গবন্মেণ্ট পক্ষ
পরাজিত হইয়াছে বলিয়া যে শরৎ চন্দ্র বসুর মুক্তি হইবে,
কিংবা তথাকথিত ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য-চুক্তি নাকচ
হইবে, তাহার বিন্দুমাত্রও আশা নাই। মিঃ মোহম্মদ আলী
জিন্নার সংশোধক প্রস্তাবের শেষ ছই অংশ অধিকাংশ
ভোটদাতার ভোট অনুসারে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যে
বিলাতী গবন্মেণ্ট দেশী রাজ্যগুলির সহিত ফেডারেশন ত্যাগ
করিয়া কেবল ব্রিটিশ ভারতের জগ্গই নূতন শাসনবিধি



শ্রী আবদুর রহিম

প্রণয়ন করিবেন বা ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির লোক-
দিগকে সত্যকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিছু দিবেন, এরূপ মনে করা
ছরাশা মাত্র।

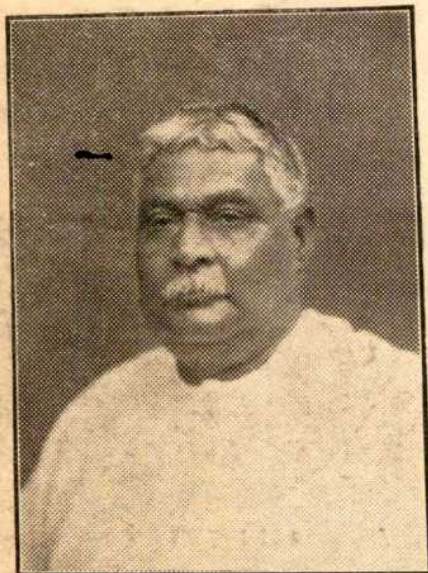
তবে, মিঃ জিন্নার সংশোধক প্রস্তাবের প্রথম অংশ
গৃহীত হওয়ায় কুফল ফলিবে। তাহা গৃহীত না হইলেও
প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার কোন পরিবর্তন
হইত না, এখনও ভালর দিকে পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু
এখন এই কুফল হইল, যে, ইংরেজরা ইহা বলিবার সুযোগ

ডেপুটি সভাপতি

શ્રીવૃદ્ધ શ્રે ગી પિલેઈ

শ্রীযুক্ত ডক্টর লক্ষ্মীসুন্দরম্

পিলেই ও শ্রীযুক্ত ডক্টর লক্ষ্মানন্দম্ । ইহাদের চেষ্ঠায়
ব্রহ্মদেশের 'ও তথাকার ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণ হইলে
স্বার্থের বিষয় হইবে ।



শ্রীযুগ্ম অখিলচন্দ্র দত্ত

নির্দোষিত হইরাছেন। উভয়েই যোগ্য ব্যক্তি। গ্রাম
আবজুর রহিম মেদিনীপুরের ও শ্রীবক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত
কুমিল্লার অধিবাসী।

নিখিলব্রহ্ম ভারতীয়-শ্রমিক কন্ফারেন্স

প্রথম নিখিলব্রহ্ম ভারতীয়-শ্রমিক কন্ফারেন্স ভারত-
গ্রন্থোৎসবের নিকট নিম্ন মতামত জানাইবার জন্য দুই জন
প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। ইহাদের নাম শ্রীযুক্ত জে পি

কংগ্রেস পালেমেন্টারী দলের কার্যতঃ

দেশদ্রোহিতা

কংগ্রেস এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছে, যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোরারাটা ঠিক নয়, কিন্তু যে-হেতু সকল সম্প্রদায় উহার বিরোধী নহে, অতএব কংগ্রেস উহা গ্রহণও করে না, বর্জনও করে না। কংগ্রেসের এই প্রকার মতের সমালোচনা আমরা ‘প্রবাসী’তে এবং বিশেষ করিয়া আমাদের ইংরেজী মাসিক পত্রে করিয়াছি। এখন পুনর্ব্বার তাহা করিব না। এখন আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, কংগ্রেস পালেমেণ্টারী দলের নিজের মতে স্থির থাকা উচিত। মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের প্রথম অংশের বিরুদ্ধে তাঁহারা ভোট না দেওয়ায়, তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকায়, তাঁহাদের সম্মতি রক্ষা হয় নাই—তাঁহারা কার্যতঃ দেশদ্রোহী হইয়াছেন। অবশ্য দেশদ্রোহিতা করা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের মত এই, যে, তাঁহারা
ব'টোয়াব'টা গ্রহণও করেন না, বর্জনও করেন না।
সুতরাং ইহার সোজা মানে এই, যে, কেহ যদি উহা
গ্রহণ করেন, তাঁহার বিরোধী তাঁহারা, এবং কেহ যদি

উহা বর্জন করেন, তাঁহারও বিরোধী তাঁহারা;— কেবল মাত্র যিনি উহা “গ্রহণ করেন না বর্জনও করেন না” তিনিই তাঁহাদের দলভুক্ত।

মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের প্রথম অংশ বলিতেছে, “এই ব্যবস্থাপক সভা, বাটোয়ারাটা যত দূর গিয়াছে তত দূর, উহা গ্রহণ করিতেছে।” ব্যবস্থাপক সভার যে সব সভা উহা গ্রহণ করেন না (এবং বর্জনও করেন না) তাঁহাদের নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল, “না, আমরা উহা গ্রহণ করি না।” তাহার পর যদি আর কেহ প্রস্তাব করিতেন, “এই ব্যবস্থাপক সভা বাটোয়ারাটা বর্জন করিতেছে,” তখনও তাঁহাদের বলা উচিত ছিল, “না, আমরা উহা বর্জন করি না।” অবশ্য, দুইবার এই দুই রকমে ভোট দিলে তাহা একটা হাস্যকর ব্যাপার হইত। কিন্তু উপায় কি? তাঁহাদের “না-গ্রহণ না-বর্জন” ব্যাপারটাই যে হাস্যকর। উহার সোজা মানে দাঁড়াইয়াছে “গ্রহণ,” এবং জিনিষটা ভাল বলিয়া গ্রহণ নহে—সাহস ও দৃঢ়তার অভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কূট চা’ল ভেদ করিবার শক্তির অভাবে গ্রহণ, কয়েক জন স্বাধীনতার ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম-ধারী চতুর লোকের ছলনায় প্রতারণিত হইয়া গ্রহণ।

ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় সম্মতির মূল্য

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কি পরিমাণে দেশের লোকদের প্রতিনিধিত্বান্বিত তাহার আলোচনা না করিয়া, ইহা ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, উহার নির্বাচিত সদস্যেরা দেশের লোকদের প্রতিনিধি। তাহা হইলে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের লোকে অনুমোদন করে কি না তাহা ব্যবস্থাপক সভার ভোট দ্বারা স্থির করিতে হইলে, কেবল নির্বাচিত সদস্যদেরই ভোট লওয়া উচিত ছিল। তাহা না করিয়া গবর্নেন্ট সরকারী সদস্য এবং সরকারের মনোনীত সদস্যদিগকেও ভোট দেওয়াইয়াছেন। ইহাদের ভোটের সাহায্যে, এবং তত্‌পরি কংগ্রেস প্যারলিমেন্টারী সদস্যদের নিরপেক্ষতায়, যে প্রস্তাবটি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত

হইয়াছে, তাহা দেশের লোকদের অনুমোদিত বলিলে নিতান্ত মিথ্যা কথা বলা হইবে।

মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের সমর্থক ৬৮ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন গবর্নেন্ট সদস্য, ৯ জন গবর্নেন্ট-মনোনীত সদস্য, এবং বাকী ৩৪ জন মুসলমান সদস্য। সুতরাং অ-মুসলমান নির্বাচিত সদস্য এক জনও উহার পক্ষে ভোট দেন নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, কংগ্রেসের “না-গ্রহণ না-বর্জন” নীতি মুসলমানদিগকে খুশী করিবার জন্য অভিপ্রেত হইলেও, এক জন অকংগ্রেসী মুসলমান সদস্যও একারণে নতুন করিয়া কংগ্রেসী দলে গিয়া ভোটের সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন নাই।

ঢাকায় সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্কের শাখায় বাঙালী এজেন্ট

সেন্ট্র্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের একটি প্রধান ব্যাঙ্ক। ঢাকায় সম্প্রতি ইহার একটি শাখা খোলা হইয়াছে।



শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে দাড়া

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে দাড়া ইহার এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যাঙ্কের কার্যে তাঁহার অনেক বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি না হইলে বোম্বাই-ওয়ালদের ব্যাঙ্ক ইহার একটি শাখায় এক জন বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিত না। আশা করি, তাঁহার ও তাঁহার মত অল্প বাঙ্গালীদের দ্বারা বঙ্কে বাঙ্গালীদের ব্যাঙ্কিং ব্যবসাতে প্রতিষ্ঠা হইবে।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের অত্যন্ত ভূতপূর্ব প্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং স্বয়ং তথাকার এক জন প্রধান অমাত্য ও জায়গীরদার



ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের আনন্দ আমরা পাইয়াছিলাম। বঙ্গদেশে জলপ্লাবনাদিতে মাছুষ বিপন্ন হইলে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সাহায্য পাঠাইতেন। ইহা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি। পাঠকবর্গ তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় জয়পুর-প্রবাসী ডাক্তার পান্নালাল দাস কর্তৃক 'প্রবাসী'র জন্ম লিখিত নিম্নমুদ্রিত প্রবন্ধটি হইতে পাইবেন :—

কালের পরবর্ত্তনে যদিও বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃই বিরল হইতেছে; যদিও পূর্বের মত রাজস্থানের বিবিধ রাজ্যে, মন্ত্রী-পদাধিষ্ঠিত বিজ্ঞাধর ভট্টাচার্য্য, হরিমোহন সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংসারচন্দ্র সেন, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ বিশ্বাস ও

মতিলাল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষী প্রবাসী বাঙ্গালীর আর আবির্ভাব নাই; তথাপিও যাহারা সেই স্বনামধন্য পুরুষপ্রবরদের কীর্ত্তিরশ্মির অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্ততম এক জন ছিলেন রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এত দিন প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়া তিনি আজ বিধাতার আহ্বানে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

গত ১৯শে জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যার সময় চন্দ্রগ্রহণের কিছু পূর্বে তিনি স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। কোম্বিলের সদস্ত-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলে পীড়িত হইয়া তাহার পরিণামেই একদিন মাত্র অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভূতপূর্ব জয়পুর নরেশের প্রধান অমাত্য রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই, মহোদয়ের তৃতীয় পুত্র। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জয়পুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা জয়পুরেই হয়। এখানে মহারাজার কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার পিতার নিকট হইতে নৈতিক ও রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করেন। পরে উপবৃত্ত হইলে জয়পুরাধিপতি মহারাজা সওয়াই মাধো সিংজী সাহেব বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার পিতা কান্তিবাবু তাঁহাকে আপীল কোর্টের জজ রূপে নিযুক্ত করেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কান্তিবাবু গবর্ণমেন্ট দ্বারা ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কমিশনে সদস্য মনোনীত হইলে, মহারাজ ভারতের হিতকর ঐ কার্যে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তখন কান্তিবাবুর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, বড়লাট লর্ড কর্জন স্বয়ং তাঁহার পুত্র ঈশান বাবুকে পিতার সহচর্য্যে থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন। এই বিশেষ কার্যে থাকতে এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করাতে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। কমিশন-স্থল নাগপুরে আসেন, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ কান্তিবাবুর পাড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

এই অভাবনীয় ঘটনাতে গভর্ণমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ঈশান বাবুকে যথারীতি সাহুনা প্রদান করিতে বিলম্ব করেন নাই। নাগপুর শহর কান্তিবাবুর স্মারক-মন্দির নির্মাণ জন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করেন, বাহাতে ঈশানবাবু তাঁহার পিতার স্মরণার্থে এক স্মারক-মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর নাম অঙ্গুর করিয়া রাখিয়াছেন। মহারাজা মাধো সিংজী তাঁহার বিখ্যাত প্রধান অমাত্যের অকালমৃত্যুতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং অনন্তোপায় হইয়া কোম্বিলের সদস্ত পদে উন্নীত করিয়া, আপনার “গুরুভাই” ঈশানবাবুকে রাজাশাসনের গুরুভাব অর্পণ করেন; এবং গুরুভাইকে গুরুপদে বরণ করেন। কান্তিবাবু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেহত্যাগ করেন। মহারাজা এপ্রিল মাসেই ঈশানচন্দ্রকে কোম্বিলের সদস্তপদ দেন, এবং কান্তিবাবুর মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই তাঁহাকে তাজিমী সরদার পদে জায়গীরদার স্বীকার করিয়া “মহাশ্রী” অর্থাৎ সনদ দিবার জন্ত তাঁহার বাটীতে স্বয়ং আসেন। এত অল্প সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ কোন জায়গীরদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের মহাশ্রী, এক মাসের মধ্যে হয় না! কিন্তু অপরাজ মহারাজ মাধো সিংজী তাঁহার “গুরুভাই”এর জন্মই একুশ অঙ্গুহ দেখাইয়া শ্রীযু মহাশ্রী করেন।

কান্তিবাবুর জীবদ্দশায় ঈশানচন্দ্র বিবিধ রাজকার্যে পিতার সহকারী রূপে থাকায় হাতেকলমে সর্বাদ্বৈত শিক্ষার তাঁহার সুযোগ হয়। সে

শিক্ষা ভবিষ্যতে কর্তৃক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসে। কোঙ্গিলের সকল বিভাগেই রাজস্ব কোঙ্গিলারী দেওয়ানী প্রভৃতিতে এরূপ যোগ্যতা ও জ্ঞানপরাবর্ণতার সহিত তিনি কার্য করেন যে, রাজা প্রজা সকলেরই অল্পসময়ের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহার সহকারী—অভ্যন্তরীণ সমস্তবর্ণ পলিটিক্যাল অফিসার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা সকলেই তাঁহার বিচারে নির্ভীকতা ও সততার জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যে রাজ্যাশাসন কার্যে এক স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন তাহা তাঁহারাই মনে করেন।

মহারাজ সওয়াই মাধো সিংহ সাহেব বাহাদুর স্বর্ণলাভ করিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে অসুস্থ হইয়া থাকেন; তাহার জন্য তিনি রাজকাৰ্য্য মুচাক্কপে পরিদর্শন করিতে না পারায় কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর সওয়াই মহোদয় মানসিং বাহাদুরের নাবালকতায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়া এই বিশৃঙ্খলতা দূর করিতে সন্থ করেন, এবং ঈশানবাবকে একমাত্র উপযুক্ত সমস্ত নির্দ্ধারিত করিবার তাহাকে এই কমিটিতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে রাজ্যবৎ এই বিশৃঙ্খলতা দূর হয় এবং অপরাধীরা দণ্ডিত হয়। এই জটিল কর্মের সমাধানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে জাহাঙ্গীরী ১২২৫ খ্রীঃ অঙ্গে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন।

কোঙ্গিলের সমস্ত পদের নির্দ্ধারিত বেতন আছে, কিন্তু ঈশান বাবু তাঁহার পৈতৃক লাভগীরের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া, অনেক দিন অবৈতনিক ভাবেই কর্ম করেন। পরে মহারাজার আদেশানুসারে এই নির্দ্ধারিত বেতন গ্রহণ করেন।

গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে চালিত কোঙ্গিল অব রিজেন্সীতেও বিশেষ যোগ্যতা সহিত কার্য করিয়া তিনি ইংরেজ রাজপুরুষদের বিশ্বাসভাজন ও প্রকার পাঠ হন। তিনি এমন আদর্শচোতা ও উচিতবস্তা ছিলেন যে নিজের হৃদয়েচিত্রিত মত পবিত্র করিতে চাহিতেন না, তৎক্ষণাৎ কতিয়কীর করিতেও প্রস্তুত হইতেন।

ঈশানচন্দ্রের পিতামাতা তাঁহাকে আদব করিয়া “হাতি” বলিয়া ডাকিতেন। তাই সাধারণ্যে “হাতি বাবু” নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

১২২৫ অঙ্গে পার্বারিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি রাজকাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রাজকাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও কখনই তিনি আলস্তে কালক্ষেপ করিতেন না। স্বর্ণলাভের এক দিন পূর্বে পর্য্যন্তও দৈনিক বিষয়কর্ম, পুস্তকপাঠ, উদ্ভান-পরিদর্শন প্রভৃতি কোন কার্যই অসমাপ্ত রাখেন নাই।

উদ্ভানের উন্নতি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা তাঁহার এক প্রধান দৈনিক কর্ম ছিল। প্রাতে, সাথাকে, নিয়মিত ভাবে উদ্ভান পরিদর্শন ও উদ্ভানপালদের কার্য দেখান, তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিত। দূর দেশ হইতে আনীত বহুমূল্য নানাবিধ বৃক্ষলতাগিতে তাঁহার মনোবশ উদ্ভানটি সুশোভিত করিয়া রাখিরাছেন। তাঁহার বাগানের আশ্রয় এই সুবাসিত ও উত্তম, যে, মহাবাজা তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি বৃক্ষ নির্দ্ধিত করিয়া দিরাছিলেন, এবং দূর প্রবাসে বা ভীর্ণস্থলে থাকিলেও তথায় বিশ্বস্ত লোকের হস্তে এই আশ্রয় তাঁহাকে অতি যত্ন সহিত পাঠাইতে হইত। এরূপ হৃদয় উদ্ভান যে-কোন নগরেরই গৌরবকর। বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ব্যতিরেকে তাঁহার প্রাসাদভূম্য সৌন্দর্য্যলাভেও সর্বদা সংকল্প ও শোভিত করিতে উচ্চপদের শিক্ষা নিযুক্ত করিবার প্রত্যয় তাহাদের কার্য পরিদর্শন করিতেন। ইহা অপেক্ষাও তাঁহার সংস্কৃতির অধিক পরিচায়ক তাঁহার বহুমূল্য ও হৃদয় পুস্তকাগার। এই পুস্তকাগারে শিক্ষাশ্রমীরা সকলেই অব্যাহতধার ছিল। তাঁহার

পছন্দসই কোন পুস্তক, কিং ইংরেজী, কি বাংলা, কি হিন্দী, কি সংস্কৃত, কি উর্দু, যখনই বাহা প্রকাশিত হইত, তখনই তিনি তাহা আনাইয়া নিজে পাঠ করিয়া বা পাঠ করাইয়া আলমারী শোভিত করিতেন। যখন কোন কার্যাব্যপদেশে কলিকাতা বা অন্য নগরীতে বাইতেন, তখন পুরাতন দুপ্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করা তাঁহার এক বিশেষ কার্যের মধ্যে ছিল। তিনি পুরাতন পুস্তকালয়গুলি অগ্রদক্ষান করিয়া তথায় নিজে গিয়া পুস্তক-বিক্রেতাগণকে অতিরিক্ত মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিয়া উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার পুস্তকাগার সংরক্ষণের জন্য মূল্য ও দপ্তরী প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

ধর্মবিষয়ে তিনি সনাতনপন্থা হইলেও, তাঁহার ধর্মমত উদার ছিল। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহারও তাঁহাদের প্রজ্ঞা-ভক্তির চক্ষু দেখিত।

৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্বর্ণলাভ হয়। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের নির্দ্ধাতিশযে ও মহারাজার আদেশে তিনি পুনর্বার দারপরিগ্রহ করেন।

জয়পুর-প্রবাসী হইলেও তিনি তাঁহাদের পৈত্রিক বাসভূমিকে তুলেন নাই। শ্রামনগরব নিকট রাহতা তাঁহাদের আদ্রিম গ্রাম। সে গ্রামের সর্বাঙ্গান উন্নতি করিতে তিনি উদ্যোগ ছিলেন না। তাহার রাস্তাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি সমস্ত সংকার্য্যেই তাঁহার আগ্রহ ছিল এবং সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রযোজনীয় যে শিক্ষাবিভাগ, তাহাতে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া “কাস্তিচন্দ্র হাই স্কুল” নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহার সমস্ত খরচ বহন করিবার দেশের সকলেরই কৃতজ্ঞার পাত্র হইয়াছেন।

বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতিতে তিনি সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য ও আভিজাত্য-পর্য্যবসিত ছিলেন। আভিজাত্যমণ্ডিত এ রাজধানের কার্য-কাহনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। সাধারণ কর্মচারী প্রভৃতির সহিত একাসনে বসিতে বিধিবোধ করিতেন না! তাঁহার এই অমায়িক ব্যবহার এদেশে আদব-কায়দার খোলাপ-অসে, লোকে প্রথমে তাহা তত প্রকার চক্ষু দেখিত না। কিন্তু পরে তাঁহার শুণগ্রামের ও সর্বাঙ্গবাহারের পরিচয় পাইলে, স্বভাবই তাহাদের আদব-কায়দাজড়িত মস্তক প্রকার ও সন্ময়ে অবনত হইত।

অভ্যাগত বাঙ্গালীরা তাঁহার ধর্মশালাব আদরের সহিত স্থান পাইতেন এবং যাহাতে বাঙ্গালীর কোন উপকার হয় তিনি তাহা করিতে কখনও পরাধুণ হইতেন না। জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালীদের নেতাধরূপ হইয়া তিনি অনেকের দুঃখকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। গত পাঁচ বৎসর তাঁহার নেতৃত্বে সকল বাঙ্গালী একনিষ্ঠ হইয়া শরণার্থী বাসোয়ায়ী পুজা উপলক্ষ্যে বিশেষ আদর উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহার মহিমাময়ী ভাব্যার বার-ব্রত উপলক্ষ্যে রাস লোল প্রভৃতি উৎসবে মদুর এই মঞ্চভূমিতেও ভক্তি-উৎস প্রবাহিত হইত। শিল্প, নাট্যকলা ও নট্যভেদে তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। সে-সব আজ প্রবাসী বাঙ্গালীদের মনসপটে মর্য্যাদিকামাত্র প্রভীত হইতেছে।

বালাকাসে তাঁহার দুই অগ্রজের অকালমৃত্যুতে ঈশানচন্দ্র পৈত্রিক বিস্তীর্ণ জায়গাঁও, স্বর্ণপদালভ্যভূষিত তামিরা স্রদারী ও গুরুপদের অধিকারী হন।

তাঁহার প্রথম পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বৃহৎ পথিব্যাবরণ বন্ধুবান্ধব সহ তাঁহার মৃত্যুতে শোকাভূত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই শিক্ষিত, এবং আশা করা যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র

জীমানসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, বি-এ, মহাশয় তাঁহার পৈত্রিক বিষয় ও মর্যাদার অধিকারীরাপে তাঁহাদের বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রবাসী বাঙালীর মুখোজ্জলকারী হইবেন।

মিঃ জিন্না কি চান

জয়েন্ট প্যালেমেন্টারী কমিটির রিপোর্ট এবং তদনুসারে প্রণীত ভারতশাসন বিল ভারতীয়দিগকে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেয় নাই, ইহা মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না বেশ জানেন। তাহা হইলে লোকের কৌতূহল হইতে পারে, যে, এই যে সারশুল্ক ভারতীয় বঙ্গটিটিউশন বা শাসনবিধি হইতেছে, তাহার ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে মিঃ জিন্না নিজের সম্প্রদায়ের জন্ত একটা বড় বধবা (যাহা তাঁহাদের ভাষা পাওনা নহে) লইয়া কি করিবেন। শুল্কের বরকম পাঁচ আনা চার পাই বা আট আনা বা বার আনা বা বোল আনা—কিছুরই কোন মূল্য নাই। সেই জন্ত মিঃ জিন্না গবন্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া বিলটাকে তাঁহার প্রস্তাবের একটি অংশ দ্বারা এরূপ ভাবে সংশোধিত কবাইতে চান যাহাতে কতকটা ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে আসে। সেরূপ সংশোধন হইলে সেই ক্ষমতার বরকম পাঁচ আনা চার পাই মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অনুসারে পাইবে—রক্ষিও তাহা বা শিক্ষা, সার্বজনিক কার্যে উৎসাহ, আয়োৎসর্গ ও ত্যাগ, ধন-শালিতা, এমন কি লোকসংখ্যা অনুসারেও সমুদয় ক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারী জারতঃ নহে।

মিঃ জিন্না ইহাও জানেন, যে, প্রধানতঃ হিন্দুদের চেষ্টায় এবং আয়োৎসর্গ ও ছুঃখবরণের জোরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কালক্রমে দেশের লোকদের হাতে আসিবেই। তখন, এখন যাহা শুল্ক (°), তাহা কিছু-একটাতে পরিণত হইবে, এবং তখন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা কার্যে থাকিলে সেই কিছু-একটার এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানেরা পাইবে। এই জন্ত, তিনি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটাকে জীয়াইয়া রাখিতেছেন, এবং সেই অভিসন্ধিতে ডাঃ আব্দারী, মোলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি তথাকথিত শ্রান্তলিষ্টদের ববাবব যোগ আছে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

কংগ্রেস জয়েন্ট প্যালেমেন্টারী কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শাসনবিধি মোটেই চান না—মহাত্মা গান্ধীরও মত তাই, কংগ্রেস ওরূপ শাসনবিধি সম্পূর্ণ বর্জনীয় মনে করেন।

উদাবৈনতিক সংঘও উহা সম্পূর্ণ বর্জনীয় মনে করেন। হিন্দু মহাসভাও তাই মনে করেন।

কিন্তু মিঃ জিন্না তাহা বলেন নাই। তিনি চতুর লোক। তিনি জানেন, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা গ্রহণীয় নয়, বর্জনীয়ও নয় বলিলেও, জয়েন্ট প্যালেমেন্টারী রিপোর্টটা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যক্ত হইলে তাহার অঙ্গীভূত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটাও পরিত্যক্ত হইবে। সেই জন্ত, তিনি প্রস্তাবিত শাসনবিধিটার সংশোধন চান, সম্পূর্ণ বর্জন চান না, এবং সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটাকে ত. আগে হইতেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

তার পর, মিঃ জিন্না দেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সংযোগে একটি সমগ্রভারতীয় ফেডারেশন চান না। ধেরূপ ফেডারেশনের প্রস্তাব হইয়াছে, আমরাও তাহা চাই না। আমরা চাই না, যে, দেশী রাজ্যের ওজারা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়ক্ষমতাহীন থাকে, এবং তাহাদের উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বশালী রাজারা নিজেদের মনোনীত কতকগুলি লোককে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিকপে পাঠায়; আমরা চাই না, যে, ঐ সভায় ৩৭৫ জন সভ্যের এক-তৃতীয়াংশ ১২৫ জন দেশী রাজাদের দ্বারা মনোনীত হয়। কারণ, প্রথমতঃ আলাহুদেউ শত রাজ্যের দেড় শত রাজা (বাকী রাজ্যদিগকে বিলের তপশীলে কোন প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই) ১২৫ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবে ও ব্রিটিশ-ভারতের ২৫ কোটির উপর মানুষ ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার, এবং যদি ইহা শোচনীয় না হইত তাহা হইলে ইহাকে সাতিশর হাস্যকর ব্যাপার বলা চলিত। দ্বিতীয়তঃ, যদি দেশী রাজ্যের প্রজারাও ব্রিটিশ-ভারতের প্রজাদেরই মত নির্বাচনাধিকার পায়, তাহা হইলেও দেশী রাজ্যের ৮ কোটি প্রজা পাইবে ১২৫ জন প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ-ভারতের ২৫ কোটির উপর অধিবাসী পাইবে ২৫০ জন প্রতিনিধি, ইহা ভাষ্য ব্যবস্থা নহে।

প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আরও নানা আপত্তি আমাদের আছে। মিঃ জিন্নারও সেই সমস্ত আপত্তি থাকিতে পারে। তা ছাড়া মুসলমানদের আর একটা আপত্তির

অস্তিত্ব তাঁহাদের একটি দাবী হইতে বুঝা যায়। তাঁহারা ফেডারাল অ্যাসেমব্লীতে (Federal Assemblyতে) ২৫০টি আসনের মধ্যে ৮২টি অর্থাৎ মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ পাইবেন, প্রস্তাবিত গবর্নেন্ট অব ইণ্ডিয়া বিলে এইরূপ আছে। মুসলমানেরা চাহিয়াছেন, যে, দেশী রাজ্যগুলির ১২৫টি আসনেরও এইরূপ একটি ভাগ আইন দ্বারা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়; কিন্তু তাহা দেওয়া হয় নাই। অবশ্য ১২৫টিরও কতক অংশ তাঁহারা পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা চান নিশ্চিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ, কিন্তু দেশী রাজ্যের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশও মুসলমান নহেন। দেশী নৃপতিদের মধ্যেও মুসলমান নৃপতির সংখ্যা কম—হিন্দু ও শিখই বেশী। সুতরাং দেশী নৃপতিদের মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্যে মুসলমান থাকিবে কম, এক তাহা সন্দায় নহে। সেই জন্য অ্যাসেমব্লীর ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে মুসলমান সদস্যদের প্রভাব ততটা হইবে না, যতটা হইবে ব্রিটিশ-ভারতের ২৫০ জনের মধ্যে ৮২ জন মুসলমান সদস্যের। এই কারণে মুসলমানবা দেশী রাজ্যগুলির সহিত ফেডারেশন চান না, তাঁহারা কেবল ব্রিটিশ-ভারতের জন্যই এমন একটা শাসনতন্ত্র চান যাহাতে তাঁহাদের পাওনার অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকে। মিঃ জিন্নার ফেডারেশন-বিরোধিতা বহুস্থ ইহা হইতে বুঝা যায়।

আইন-সচিবের নিরপেক্ষ থাকা

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবে আইন-সচিব স্তাব নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত কার্য হইয়াছে। তিনি আইন-সচিব হইবার পূর্বে বিলাতে ও ভারতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরোধিতা উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত করিয়াছিলেন। এখন সরকারী কথ্যচারী হইয়া উল্টা সুর ধরিলে তাহা অসঙ্গত ও নিতান্ত অশোভন হইত। অবশ্য তিনি স্বাধীন সদস্য নহেন বলিয়াই বাটোয়ারাটার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন নাই।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর আত্মরক্ষা

ইংলণ্ডের লোকেরা স্বদেশে “বাই ব্রিটিশ” (“Buy British”) নীতিব অনুসরণ করে, ইংরেজের তৈরি জিনিষ পাইলে বিদেশী জিনিষ কেনে না। তথাকার যুববাজ এই নীতির প্রধান পাণ্ডাগিরি করিয়াছেন। এদেশে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, “আমার গ্রামে যে জিনিষটি তৈরি হয়, তাহাই আমার স্বদেশী জিনিষ,” অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রায়ে সেই জিনিষ কিনিবেন, তাহা না-পাইলে বা তাহা না-থাকিলে অন্য ভারতীয় জিনিষ কিনিবেন। অথচ আমবা দেখিতে পাই ও শুনিতে পাই, যে, বাংলা দেশে যদি কেহ বলে, “আমি আগে বঙ্গে বাঙালীর তৈরি জিনিষ কিনিব, তাহা না-থাকিলে বা না-পাইলে তবে অন্য প্রদেশের ভারতীয় জিনিষ কিনিব,” তাহা হইলে তাহাকে সংকীর্ণমনা বলা হয়। যদিও দেখিতে পাই, এই কলিকাতা শহরে শিখরা বাঙালীদিগকে বয়কট কবে, নিজেদের হোটেল, মুদিখানা, চিকিৎসা-পর্যন্ত পঞ্জাব হইতে আমদানী শোকদের দ্বারা চালায়; গুজরাটী ব্যবসাদাররা নিজেদের দোকান ও ব্যাঙ্কের কেরানীটি পর্যন্ত অনেকটা গুজরাট হইতে আমদানী করে; কিন্তু বাঙালী নিজের শহবে ও গ্রামে বসিয়া যদি বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধার ও বেকার বাঙালীদের ভ্রমের উপায়ের কথা ভাবে, তাহা হইলে সে হয় সংকীর্ণমনা! সংপ্রতি হাবড়া মিউনিসিপালিটিতে এইরূপ একটি প্রস্তাব ধার্য হইয়াছে, যে, যোগ্য বাঙালী থাকিলে চাকরি তাহাকেই দিতে হইবে। যোগ্য বাঙালী কণ্ট্রাক্টর থাকিলে তাহাকেই কণ্ট্রাক্ট দিতে হইবে, মিউনিসিপালিটির জিনিষপত্র খরিদ করিবার সময় বাঙালীর তৈরি জিনিষই কিনিবার চেষ্টা আগে করিতে হইবে। এরূপ প্রস্তাব আমরা স্তাব্য মনে করি। বঙ্গপ্রবাসী অবাঙালীদের ইহাব বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত নয়। বরং তাঁহাদের পক্ষে বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যাওয়াই ভাল, যেমন অর্গ্য রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেবীর পূর্বপুরুষেরা হইয়াছিলেন, পণ্ডিত সবারাম গণেশ দেউস্করের পূর্বপুরুষেরা হইয়াছিলেন। বাঙালীরা এমন কথা বলেন না, যে, তাহারা অন্য প্রদেশের বা অন্য প্রদেশীয়দের জিনিষ কিনিবেন না। এ বঙ্গের ও বাঙালীর তৈরি জিনিষ বা নাই, অন্য প্রদেশের ও

প্রদেশীর সেরূপ জিনিষ বাঙালী নিশ্চয় কিনিবে ও কেনে।

বাংলা দেশের ও বিহারের কয়লা না কিনিয়া বোঝাই ও আহমেদাবাদের মিলওয়লারা যে দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা কেনে, তাহাতে ত আমাদের সমগ্রভারতীয় স্বদেশপ্রেমের শিক্ষাদাতারা কোন উচবাচ্য করেন না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মোৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার ৭৭ বৎসর পরেও যে ইহার জন্মোৎসবের কথা কর্ণপক্ষের মনে পড়িয়াছে, তাহার জন্ত তাঁহারা প্রশংসার পাত্র। এই উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা ব্যায়ামাদি হইয়াছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ভবিষ্যতে কলিকাতার বাহিরের ছাত্র-ছাত্রীদিগকে একরূপ উৎসবে যোগ দিবার—অন্ততঃ তাহাদের প্রতিনিধিদের যোগ দিবার—সুযোগ দিতে হইবে, যাহারা পঠদক্ষ অতিক্রম করিয়াছে সেই সব প্রাক্তন ছাত্রদিগকেও সুযোগ দিতে হইবে, দৈহিক ক্রিয়াশীলতার পরিচয় ছাড়া মানসিক কন্ঠিততার প্রমাণ দিবার সুযোগ দিতে হইবে, এবং কোন-না-কোন প্রকারে ও কোন-না-কোন দিকে শিক্ষালাভের সুবিধা প্রতি বৎসরই কিছু বাড়াইতে হইবে।

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব

১৮৩৫ সালে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। এই বৎসর তাহার শতবার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি ও আরোগ্যবিধান বাহাব উদ্দেশ্য, একরূপ প্রতিষ্ঠানের উৎসব বৈরূপ হওয়া উচিত, মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব সেইরূপই হইয়াছিল। বক্তৃতাাদি ছিল, অন্ত-চিকিৎসা ও অন্তরূপ চিকিৎসার জন্ত আবশ্যক জন্ত যন্ত্র ওষধ পথ্যাদির প্রদর্শনী হইয়াছিল, এবং তাহার উপর আকস্মিক দৃষ্টিয়ার আহত লোকদের জন্ত একটি হাসপাতালের ভিত্তিও স্থাপিত হইয়াছে।

অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান

অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে গঙ্গার স্নান করিবার জন্ত

বাহির হইতে পাঁচ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসিয়াছিল অনুমিত হইয়াছে। তন্মিত্ত কলিকাতারও চার-পাঁচ লক্ষ লোক স্নান করিয়া থাকিবে। এতগুলি লোকের স্নানে যে অতি অল্পসংখ্যক দূষণটা ঘটিয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক লোকের যে ওলাউঠা আদি সংক্রামক বোগ হইয়াছিল এবং অতি অল্পসংখ্যক লোক যে নিক্রমশ হইয়াছে, ইহা স্নানার্থীদিগের সাহায্যকারী সকল কর্তৃপক্ষের ও স্বৈচ্ছাসেবকদের বিশেষ প্রশংসার বিষয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সকল রকমের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পুলিশ কমিটারী ও কনষ্টেবলেরা সকলের সাহায্য করিয়াছিলেন। ধাকড় মেথর প্রভৃতি তাঁহাদের নির্দিষ্ট কাজ সানন্দে ও সোৎসাহে করিয়াছিলেন। বিশ হাজার পুরুষ ও মহিলা স্বৈচ্ছাসেবক দিন-রাত রেলওয়ে ষ্টেশনে, স্নানের ঘাটসমূহে, নদীবক্ষে নৌকায়, এবং নানা পান্থশালায় ও স্থায়ী ও অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রে আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দ্যের দিকে দৃকপাত না করিয়া সেবার কাজ করিয়াছিলেন। শিক্ষালয়, ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান ও অন্তবিধ নানা প্রতিষ্ঠান হইতে স্বৈচ্ছাসেবকগণ আসিয়াছিলেন।

কংগ্রেস অর্দ্ধোদয়যোগ কেন্দ্রীয় বোর্ড এই উপলক্ষ্যে কৃত সেবাকার্যের বে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন,

স্বৈচ্ছাসেবকগণকে ড্রিল বা কৃচকাওয়াজ কিছুই জ্ঞান্য করান হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছাত্রগণ প্রমুখ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী হইতে সংগৃহীত ২০ হাজারেরও অধিক স্বৈচ্ছাসেবক কর্তব্যসম্পাদনে অতি আশ্চর্য্যকর কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে। এই সাফল্যের জন্ত প্রশংসা করিতে হইলে সর্বপ্রথম স্বৈচ্ছাসেবকগণেরই উচ্চ প্রাপ্য। স্বৈচ্ছাসেবকগণ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থবর্তিতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করে ও সম্মিলিতভাবে কার্য করে। আমরা যুব-বাল্যকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হুই-এক দিন, হুই-এক সপ্তাহ বা তদপেক্ষা কিছু দীর্ঘ কালের জন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত কঠিন কাজ করিতে বাঙালী ছেলেমেয়েরা আপনাদের সামর্থ্য অনেক বার দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহারা যে প্রশংসা পাইবার জন্তই সকল স্থলে এইরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহাও নহে। যেখানে বহু জনসমাগমজনিত উত্তেজনা ও উৎসাহের আকর্ষণ নাই, সেরূপ কার্যক্ষেত্রেও লোকচক্ষু হইতে দূরে তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ

করিতে পারিবেন; তাঁহাদের কৃতিত্ব হইতে এই আশা পোষণ করিতেছি।

কংগ্রেস বোর্ড বলিয়াছেন :—

অস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানও আশানুরূপভাবে কর্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যের ও সম্বোধনের বিষয় এই যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান তাহাদের শক্তি ও উপাদান সমবেতভাবে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সম্মিলিতভাবে একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য করিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হন।

কংগ্রেস বোর্ড কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ বিশেষ ভাবে করিয়াছেন।

যে স্থানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই অপরের কৃতিত্ব ছাপাইয়া উঠিতে চেষ্টা করে, সে স্থলে কোনও বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যমূলকভাবে নামোল্লেখ করা নিতান্ত অস্বাস্থ্যরূপে প্রয়োজন বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ত্রিপুরা হিতসামিতি সভা শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে স্থল কার্য করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, চারিদিকে তাহা শতমুখে প্রশংসিত হইতেছে। সেই প্রশংসায় যদি আমরা যোগদান না করি, তবে আমাদের কর্তব্যোক্ত হইবে। শিয়ালদহে এবং শ্রমবাজারে মার্টিন কোম্পানীর রেল ষ্টেশনে অস্বাস্থ্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ এখনও কার্য করিতেছেন, তাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য সম্বন্ধে বোর্ড বলেন :—

কলিকাতা কর্পোরেশনও তীর্থযাত্রীগণের প্রতি তাহাদের কর্তব্য দৃঢ়চরিত্রপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। মনে হয়, উত্তমতর রূপে উহা আর করা সম্ভব নহে। যাত্রীদের স্বখস্বচ্ছন্দ্যের জন্য কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধ সকলের মতামত তাহারা চাহিয়া পাঠান এবং যে সকল প্রস্তাব যাত্রীদের নিয়োগ ও স্বচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, তাহার ব্যবস্থাও তাহারা করিয়াছিলেন। প্রধান কর্তব্য হইতে সামান্য ভ্রাতৃ পর্যন্ত কর্পোরেশনের ব্যবসায় কর্তব্যগণকে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও অন্তরায়মানগণ, তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ রেম্ফার্ড, অতি সুন্দর রূপে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

অন্ত সকলকেও কংগ্রেস বোর্ড ধন্যবাদ দিয়াছেন।

স্থানীয় বিভিন্ন রেল কর্তৃপক্ষ এবং তাহাদের অবদান কর্তব্যগণ ও বিশেষ করিয়া, শিয়ালদহ ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের অধীন রেল-কর্তব্যগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা অনুভূতি ভাবে তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাহারা যাত্রীগণের ও কর্তব্যগণের প্রতি ধীর হিতভাবে, ‘হসন্তরূপে’ সহায়ত জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অতি সম্যক ব্যবহার করেন। ট্রাম কোম্পানী ও বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আহত ও গীড়িতদের চিকিৎসায় যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পত্রিকাসমূহও আমাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদিগকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের সর্বত্র জয়েন্ট পাল্‌মেটোরী রিপোর্টের প্রতিবাদ করিবার দিবস কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত হয়। তদনুযায়ী প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে। ঐদিন কলিকাতার আলবার্ট-হলে ঐ উদ্দেশ্যে জনসভা আহূত হয়। কংগ্রেস ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন ঐ সকল সভায় জয়েন্ট পাল্‌মেটোরী কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদ-স্বচক প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার উল্লেখ আদৌ তাহাতে ছিল না। কিন্তু কলিকাতার এই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, এবং সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসী চন্দ্র গোস্বামী বলিয়াছিলেন, যে, কলিকাতার জনগণের এরূপ পরিবর্তিত প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিবার ও গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বহুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সমগ্র হিন্দুসমাজের যে ‘কন্ফারেন্স’ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ হইয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষে সকল প্রদেশে এই বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ প্রকাশ্য সভায় হইয়া গিয়াছে। কলিকাতাতেও শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বহুর সভাপতিত্বে এক সভায় হইয়াছিল।

তথাপি এই বাঁটোয়ারার ভেদনীতির ভিত্তির উপর নির্মিত ভারতশাসন-বিল পাল্‌মেটে আইনে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহা যেন ভারতীয় মহাঅভিধ্বংসকারী এই বাঁটোয়ারার উচ্ছেদ-চেষ্টা হইতে আমাদেরগকে নিবৃত্ত না করে।

ভারত-সচিব ও ডোমিনিয়ন স্ট্রেটস

জয়েন্ট পাল্‌মেটোরী কমিটির রিপোর্টে (ও তাহার পর ভারতশাসন-বিল) ব্রিটিশ জাতির ভারতশাসনের লক্ষ্য যে ভারতবর্ষকে স্বশাসক ডোমিনিয়নে পরিণত করা, এ-কথার উল্লেখ না থাকায় ডোমিনিয়ন-প্রার্থীদের পক্ষ হইতে নানা সমালোচনা ও প্রতিবাদ হইয়াছে। সেই জন্য, পাল্‌মেটে

ভারতশাসন-বিল দ্বিতীয় বার পঠিত হইবার সময় তর্কবিতর্ক উপলক্ষ্যে ভারত-সচিব স্তার সামুয়েল হোব বলিয়াছেন, ব্রিটিশ-সরকার ও জাতির পক্ষ হইতে ডোমিনিয়নকে লক্ষ্য বলিয়া যখন বাহার দ্বারা বাহা বলা হইয়াছে, সেরূপ কোন অঙ্গীকাব হইতেই আমরা সরিয়া যাই নাই, লক্ষ্য স্থির আছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের লাভটা কি হইল? আগে ব্রিটিশ নৃপতি এবং বাহুনিৈতিক কার্য্যেব ভারপ্রাপ্ত অভিজাত ও সাধারণ ব্রিটিশ মনুষ্য কেহ কেহ বাহা বলিয়াছিলেন, স্তার সামুয়েলের কথা সেই রূপ আর একটা কথা মাত্র। কোন্ বৎসব কি উপায়ে ভারত ডোমিনিয়ন হইবে, তাহা যেমন আগে কেহ বলেন নাই, ভারত-সচিবও তেমনি তাহা বলেন নাই। কেহ যদি কাহাকেও বলে, তোমাকে এক শত টাকা দিব, কিন্তু যদি দিবার তারিখ ও স্থান নির্দিষ্ট না থাকে এবং অঙ্গীকারের কোন দলিল না থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রতিশ্রুতির কোনই মূল্য নাই। অঙ্গীকার-কারী প্রত্যহই বলিতে পারে, “হা হা, দিব।” কোন্ অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে কত বৎসর, যুগ, বা শতাব্দী পরে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন হইবে? ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্য তত দিন থাকিবে কি? তাহাব পর দলিলের কথা। ভারতশাসন-বিলের মধ্যে যদি থাকে, যে, ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করা এই আইনের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহার কিছু মূল্য থাকিবে স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নয়। দেখাইতে হইবে যে, বিলটার অর্থাৎ প্রস্তাবিত আইনটার অভিমুখিতা ও গতি ডোমিনিয়নকে দিকে—দেখাইতে হইবে যে, উহা বর্তমান ভাবতশাসন-আইন অপেক্ষা বেশী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভারতবাসীদিগকে দিতেছে, এবং সর্বোপরি দেখাইতে হইবে, যে, প্রস্তাবিত ভারতশাসন-আইনে ভারতীয়দিগকে প্রদত্ত ক্ষমতাব ব্যবহার দ্বারা তাহার স্বয়ং ডোমিনিয়নকে পৌছিতে পারিবে, তাহাদিগকে তাহার জন্ত ব্রিটিশ জাতির ও পার্লামেন্টের দ্বারস্থ হইতে হইবে না, এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও জাতি পদে পদে তাহাদের শাসন-অধিকার-শাভচেষ্টার বাধা দিতে পারিবে না।

কিন্তু ভারতশাসন-বিলে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই—ডোমিনিয়ন-বিলের নাম পর্যন্ত নাই। বিপরীত দিকে আছে

এরূপ সব ব্যবস্থা বাহাতে প্রস্তাবিত শাসনবিধি বর্তমান শাসনবিধির চেয়েও অপকৃষ্ট, বাহাতে উহা ভাবতীয়-দিগকে এখনকার চেয়েও বেশী ক্ষমতাহীন এবং তাহাদের বিদেশী শাসকদিগকে এখনকার চেয়েও অধিক নিরঙ্কুশ প্রভুত্বশক্তিশালী করিয়া ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন-বিলের বিপরীত দিকে লইয়া বাইতে চায় ও লইয়া বাইবে।

অতএব স্তার সামুয়েল হোবের কথা কোনই মূল্য নাই। ভারতীয়রা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাহাতে পায় ভারতশাসন-বিলে এরূপ কোন পরিবর্তন না-করিয়া যদি কেবল ডোমিনিয়ন-বিলের একটা তারিখহীন অঙ্গীকারভাস উহাতে কোথাও বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহারও বিশেষ কোন মূল্য থাকিবে না—বরং বিলটার অভিমুখিতা বিপরীত দিকে হওয়ার তাহাতে ঐ আভাসের সমাবেশ বিলটাকে স্ববিয়োধ্যী ও প্রহসনবৎ করিয়া তুলিবে।

ইংরেজ জাতির শাসক-শ্রেণী বুদ্ধিমান, কিন্তু তাহারা মধ্যে মধ্যে বড় রকমের ভুল করে, এবং তাহাতে তাহাদের দেশের ক্ষতি হয়। বাহা কালক্রমে মানিয়া লইতেই হইবে, তাহা তাহারা কখন কখন যথাসময়ে মানিয়া লয় না, অতএব পরে বাহা অপেক্ষা বেশী অধিকার দিতে বাধ্য হয়, কাহাকেও কাহাকেও যথাসময়ে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে দিতে চায় না। আমেরিকাব হুবহুৎ কানাডা দেশ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যেব অন্তর্গত নামে মাত্র, কার্য্যতঃ স্বাধীন। কানাডার ক্ষমতা যত তাহার অধিক ক্ষমতাও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার অন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে দিলে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইত না। বর্তমানে বাহা আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস বা যুক্তরাষ্ট্র তাহা হইলে তাহা এখনও কানাডার মত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিয়া ব্রিটিশ মহাজাতিতে আরও ক্ষমতাপালী করিত।

ডোমিনিয়ন-বিল যখন দিলে ভারতীয়েরা নুফিয়া লইত, ইংরেজ তখন তাহাতে কর্ণপাত করে নাই; এখনও কেবল ডোমিনিয়ন স্টেটস কথা দুটা মাত্র উচ্চারণ করিতে রাজী, উহার ভিতরকার প্রকৃত বস্তুটা দিতে নারাজ। এমিকে কিন্তু ভারতে বাহারা সকলের চেয়ে সাহসী, উৎসাহী, ত্যাগী, ও হৃৎধববর্ণে সমর্থ, ডোমিনিয়ন-বিলের নামে তাহারা হাসে—তাহারা চায় পূর্ণস্বরাজ। নিয়তি: কেন বাধাতে?

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী সাধারণতন্ত্র হইবে না, কে বলিতে পারে ?

বঙ্গে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব

বঙ্গে বিদ্যুৎ-শুদ্ধ বিল ও তামাক বিক্রীর লাইসেন্স বিল দ্বারা ছুটি নূতন ট্যাক্স বসিবে, এবং ভারতীয় ষ্ট্যাম্প বিল, কোর্ট ফী বিল ও বঙ্গীয় আমোদ-কর বিলের সংশোধন দ্বারা অধিকতর ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা হইবে। এই পাঁচ প্রকারে বাংলার অধিবাসীদের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় করিবার চেষ্টা ত্রায়সঙ্গত নহে। বঙ্গে বত ট্যাক্স সংগৃহীত হয়, তাহার অত্যন্ত অধিক ভাগ ভারত-গবর্নমেন্ট দখল করেন, অল্প কোন প্রদেশ হইতে এত অধিক ভাগ গ্রহণ করেন না। বাংলা-গবর্নমেন্টের হাতে অত্যন্ত কম টাকা থাকিবার ইহাই প্রধান কারণ। সুতরাং বাংলা-সরকারের অধিক টাকা পাইবার জন্য বঙ্গীয় জনগণের ট্যাকে হাত দিবার আগে ভারত-গবর্নমেন্টের সহিত সংগ্রাম (অবশ্য অহিংস সংগ্রাম!) করাই উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সরকার যে ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি বসাইয়াছিলেন, সেই কমিটির প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিলে, নূতন ট্যাক্স দ্বারা যে ২৪৬ লক্ষ টাকা পাইবার আশা করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা বাঁচিত। “জাতিগঠনমূলক” বিভাগগুলিতেও ঐ কমিটি ব্যয় ছাঁটয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমরা তাহার সমর্থন করি না। কিন্তু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অল্প সব বিভাগের ব্যয় কমাইলে নূতন ট্যাক্স বসাইবাব প্রয়োজন হইত না।

তৃতীয়তঃ, বাংলা-গবর্নমেন্ট সরকারী চাকরীদের যে বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন, এখন তাহা রহিত করিয়া, তাঁহাদিগকে পূর্ব হারে বেতন দিবেন, স্থির করিয়াছেন। কাহারও ক্ষয় বৃদ্ধিতে আমরা ছাড়াই হইব না। কিন্তু সরকারী চাকরোরাই দরিদ্রতম ও কেবল তাঁহাদেরই আয় সর্বাপেক্ষে বাড়ানোর, এক সেই আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (ও কতকটা সেই আয়বৃদ্ধির জন্যই) জনগণের স্বল্প নূতন ট্যাক্সের বোঝা চাপান উচিত মনে করি না।

চতুর্থতঃ, বঙ্গের অনেক জায়গায় কেবল মাত্র হিন্দুদিগকেই

নিগ্রহ-ট্যাক্স বাবতে হান্দার হাজার টাকা দিতে হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার উপর আরও ট্যাক্স বসান পীড়াদায়ক হইবে।

পঞ্চমতঃ, বৈজ্ঞানিক শক্তির ব্যবহার সবে মাত্র বঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে, বিশেষতঃ মফঃসলে। মফঃসলে বৈজ্ঞানিক শক্তির মূল্য অত্যন্ত অধিক, কলিকাতাতেও যে বিশেষ কম, তাহা নহে। তাহার উপর ট্যাক্স বসাইলে বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধিতে বাধা পড়িবে। এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ উহা ব্যবহার আলোকের জন্যই বঙ্গে হইতেছে। শিক্ষার্থীদের ও রক্তনের জন্য উহা এখনও বেশী ব্যবহৃত হয় না। কৃষিকার্যের জন্য ত, আমরা বত দূর জানি, হয়ই না। এমনত অবস্থায়, ট্যাক্স বসান সমীচীন মনে হয় না।

আরও অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অবস্থা ভাবিলে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

নিখিলবঙ্গ প্রজাসম্মেলন

ময়মনসিংহে যে নিখিলবঙ্গ প্রজাসম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের অভিভাষণ, সভাপতি মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের অভিভাষণ এবং নবাব ফরোজ সাহেবের উদ্বোধনীয় বক্তৃতা ২৭শে মাদেব দৈনিক কাগজে প্রথম দেখিলাম। এই সম্মেলন বঙ্গের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাবহুল শ্রেণীর অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে স্বাধীনবীরদের হিতার্থে কল্পিত। অতএব ইহার অভিভাষণসমূহ ও প্রস্তাবাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মিলনীর অধিবেশন

এবার যশোর জেলার বনগ্রামে প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মহীতোষ বার চৌধুরী ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে (এবং অল্প শিক্ষা সম্বন্ধেও) গবর্নমেন্ট ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি যে নিষ্ক নিষ্ক কর্তব্য করিতেছেন না, মহীতোষ বাবু তাঁহাব অভিভাষণে তাহা দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে, তিনি সত্যই বলিয়াছেন :—

প্রাথমিক শিক্ষকগণের দুরবস্থা কেবল মাত্র বৃষ্টি সাপ্তাহিক নহে,

আমাদের দেশবাসীরাও ইহা নিরতিশয় কলঙ্ক ও লজ্জার কথা। আমরা শিক্ষিত, সুশাস্ত্র ও দেশভক্ত বলিবা বাহারা গুরুত্বপূর্ণ করি, আমাদের মধ্যে বাহারা ভগবানের ইচ্ছার ঐশ্বর্য, অর্থ ও সম্পদশালী, তাহারা মুখে বাহা বলুন না কেন, অন্তরে অন্তরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। বিশেষতঃ, আমাদের এই বাংলা দেশে নেতৃগণের দৃষ্টি উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার প্রতি যে পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তাহা হয় নাই।

তাঁহার মতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি কবা উচিত।

১। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অনতিবিলম্বে প্রবর্তনের দাবী।

২। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষমতা সরকারী ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির তহবিল হইতে অধিকতর অর্থব্যয়ের দাবী।

৩। অধিকসংখ্যক ট্রেনিংস্কুল স্থাপন এবং তাহাতে গুরুগণের শিক্ষা লাভ করিবার অধিকতর সুযোগের দাবী।

৪। নিয়মিত ভাবে এবং বিনাক্ষেপে সরকারী ও বেসরকারী নির্দিষ্ট সাহায্য প্রাপ্তির দাবী।

দাবী যে করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষার ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়াইবাব পরিবর্তে গবন্মেণ্ট তাহা ক্রমাগত কমাইয়াই চলিতেছেন।

শ্রীর আবদুল্লাহ হুজাওয়ার্দী

শ্রাব আবদুল্লাহ হুজাওয়ার্দীর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ হইতে এক জন বহুভাষা বিদ্বান ব্যক্তির অন্তর্ধান হইয়াছে, এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশে, ইংলণ্ডে ও মিশর দেশে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে তিনি অধ্যাপকের কাজ বহু বৎসর করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য তিনি বহু বৎসর ছিলেন।

যৌবন কালে তিনি যেমন বিলাতে বিশ্ব-ইসলামিক সমিতি (Pan-Islam Society) স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনই উৎসাহী স্বাধীনতা (Nationalist) ছিলেন। আমরা ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম :—

“সৈয়দ আবদুল্লাহ আল্ হাম্মুদ হুজাওয়ার্দী বরসে নবীন হইলেও প্রাণে প্রবীণ, নানা বিদ্যার পারদর্শী। তিনি লন্ডনের বিখ্যাত বিশ্ব-মুসলমান-সমিতির স্থাপনকর্তা। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রায় এক মাস হইল পূর্ণিবার চতুর্থ মুসলমান শিক্ষাসম্মেলন আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হন। তাহার অভিভাষণ উৎসাহপূর্ণ, এবং ধর্মভাব, স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রেম, ধর্মবিষয়ক উদ্বোধন, ও বিদ্যাসুহৃদের একত্র সম্মিলনে উপাসনের হইয়াছিল।

ঐ অভিভাষণ উহা হইতে আমরা প্রবাসীর প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী ছুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত কবিয়াছিলাম। তাহার কয়েকটি বাক্য নীচে মুদ্রিত হইল।

“I for one am proud to declare that the blood of the Aryans flows in my veins with that of the Semites. A greater and a wider heritage becomes mine when I feel that I owe allegiance not only to Moses, Christ and Muhammad, but also that Zarathustra, Srikrishna and Gautama claim my homage. The Gita as well as the Gospel of Islam belongs not to this race or that, but to whole humanity.”

“The Muslim is often reproached for lack of patriotism. Yet it was the prophet of Islam who declared patriotism to be a part of religion.”

অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জেনিভাতে যে লীগ অব নেশন্স বা রাষ্ট্রসংঘ আছে, তাহার সভ্য সমুদয় রাষ্ট্রকে চান্দা দিয়া তাহার ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। ভারতবর্ষকেও চান্দা দিতে হয়, যদিও লীগে ভারতবর্ষের ক্ষমতা কিছুই নাই। ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের অধীন গবন্মেণ্টকে ভারত-গবন্মেণ্টের স্থান লীগে আছে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া ধাহারা লীগে প্রেরিত হন, তাহারা বস্তুতঃ ভারত-গবন্মেণ্টের আত্মাধীন মনোনীত লোক।

লীগের সভ্য স্বাধীন দেশসকল লীগ হইতে কোন কোন বকম সুবিধা পাইয়া থাকে, ভারতবর্ষ না-পাওয়ারই মধ্যে।

ইউরোপের স্বাধীন দেশসমূহের অনেক লোক লীগের বড় বড় কর্মচারী। জাপান যত দিন সভ্য ছিল, তত দিন জাপানেরও এই সুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। ভারতবর্ষ লীগে টাকা নিতান্ত কম দেয় না, কিন্তু ভারতীয় অতি অল্পসংখ্যক লোক লীগের কর্মে নিযুক্ত আছে। খুব বড় কাজে কোন ভারতীয় নাই। মাঝারী-গোছ কাজে জন চার-পাঁচ ছিটেন। তাহার মধ্যে শ্রীর অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক জন। তিনি আগে লীগের সংবাদ-বিতরণ বিভাগে (Information Section) কাজ করিতেন, পরে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে কাজ পান। সম্প্রতি তিনি ছুটিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ কলিকাতায় তিনি যে মোটর গাড়ীতে যাইতেছিলেন তাহার সহিত ট্রামগাড়ীর ধাক্কা লাগায় তিনি পড়িয়া গিয়া সাংবাদিক আঘাত পান। তাহাতেই অরিলদে হাসপাতালে

তাঁহার মৃত্যু হয়। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে লীগে ভারতের মুষ্টিমেয় কর্মীদের সংখ্যাও কমিয়া গেল। অমূল্যবান ভারতবর্ষে থাকিতে বোম্বাইয়ে, রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। জেনিভায় লীগের কাজে তিন জন বাঙালী ছিলেন। এখন দুই জন রহিলেন। তাঁহার মধ্যে ডক্টর শ্রীবৃক্ষ রজনীকান্ত দাস কতকটা বড় কাজ করেন, আর বিপিনবিহারী বোম্বের পুত্র ডক্টর শ্রীবৃক্ষ সুধীন্দ্রনাথ বোম্ব অগণ্যাকৃত অল্প বেতনের কাজ করেন।

বাণিজ্য-চুক্তি

ব্রিটেনে ও ভারতবর্ষে এক বাণিজ্য-চুক্তি হইয়া গিয়াছে, জগতের লোক ইহা শুনিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ এই, প্রভু ব্রিটিশ গবর্নেন্ট তদধীন ভারত-গবর্নেন্টের কর্মচারীর দ্বারা ব্রিটেনের পক্ষে সুবিধাজনক কতকগুলি সর্বোত্তম দ্রব্য ক্রয় করাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার আগে সর্বগুলি ভারতবর্ষীয় ব্যতীত সত্যকে জানানও হয় নাই।

এইরূপ আর একটা বাণিজ্য-চুক্তির নাম ইণ্ডো-বর্মী (ভারত-ব্রহ্ম) চুক্তি। ইহাও ভারতীয় লোকদের ভারতীয় প্রতিনিধি এবং ব্রহ্মদেশীয় লোকদের ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার পর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষরিত চুক্তি নহে। ইহাও ভারত-গবর্নেন্ট ও তদধীন বর্মী-গবর্নেন্টের মধ্যে চুক্তি। অর্থাৎ কোন মানুষের ভান হাত বা হাতের মধ্যে চুক্তি হইলে যেমন হয়, কতকটা সেই প্রকার! সভ্যতার যত রকমের ভান আছে, এগুলো তাঁহাবই অঙ্গতম।

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রাদির প্রদর্শনী

গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতীয় চিত্র প্রভৃতি ললিতকলার যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে বিলাতী কাগজে প্রকাশিত কতকগুলি মত আগে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে আরও কিছু এইরূপ মত হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার কিছু কিছু নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

বলিংটন ম্যাগাজিনের সম্পাদক মিঃ ট্যাটলক্ ডেলী টেলিগ্রাফে লিখিয়াছেন:—

What astonishes the English visitor is not any discernible differences between one part of India and another, but an essential unity of aesthetic feeling.

The most surprising impression is that the inhabitants of a country so vast as India have contrived so splendidly to 'pull together.'

The population of India is roughly equivalent to that of extra-Russian Europe. But if we were to envisage an exhibition of European art we should take it for granted that there would be many "clashes" This exhibition gives the impression very distinctly, that, so far as art is concerned, India is much more closely knit than Europe. It is true that Bombay, best seen in Gallery I, attracts the occidental eye most insistently, but that may be due to Mr. W. E. Gladstone Solomon's power of organization.

মিঃ ট্যাটলক্ বলিতেছেন, যে, যদিও ভারতবর্ষ কশিয়া বাদে সমস্ত ইউরোপের সমান, তথাপি এত বড় দেশে ইহার ললিতকলায় রসে একটি সামঞ্জস্য ও ঐক্য দৃষ্ট হয়। তিনি আবও বলিয়াছেন, যে, প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি নিঃসন্দেহ সর্বাধিক তাবতীয় ("The best pictures are undoubtedly the most Indian")।

মর্নিং পোস্টের আর্ট-সমালোচক বলেন, এখন ভারতবর্ষে আর্টের মোটামুটি দুটি স্রোত প্রবাহিত। একটিকে বাংলা ও অন্যটিকে বোম্বাইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলা বাইতে পারে। বাংলা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত রীতিসমূহের প্রতিনিধি, বোম্বাই পাশ্চাত্য স্যানাটমি অফিসালদের মূল্যের পরিচয় দেয়। তাঁহার পর এই সমালোচক লিখিতেছেন, বাংলা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতীয় ললিতকলার পুনরুজ্জীবনে ব্যাপৃত আছে। যথা—

"Bengal also is active in the renaissance of Indian art throughout the Peninsula. The thirty odd years' revival in Calcutta, based upon a continuity of India's artistic tradition, has been inspired by the lead of the Tagore family, and spread by Bengalee artists who removed to other parts of the country. Moreover, young students came from distant places to the School of Oriental Art at Calcutta, and the Institute founded by the Poet Rabindranath Tagore at Shantiniketan."

তাঁহার পর এই সমালোচক বলিতেছেন—

"Poetry, vigorous romance, and somewhat timid Western realism characterize Bengalee art..."

ললিতকলা-সমালোচক মিঃ ফ্রাঙ্ক বটব (Mr. Frank Rutter) সপ্ত টাইম্‌সে লিখিয়াছেন:—

"The great lesson taught by the current exhibition at the New Burlington Galleries is that Indian Artists are far more fruitfully inspired when following the noble traditions of their own country, than when they seek to imitate the superficial realism of Western academic art... While much from elsewhere also commands our admiration, it is most instructive to compare the work of the two principal schools, that of

Calcutta and of Bombay. For of these two the latter has been far more influenced by European art; and its products have far less charm and distinction than those of the former, which has remained loyal to the Hindu and Moghul masters of the past.

"The renaissance of Indian art dates from rather more than a generation ago, when, under the sympathetic guidance of Mr. E. B. Havell, the students of the Calcutta School of Art were persuaded to base their practice on the style of India's indigenous masterpieces rather than on that of imports from the West. London became aware of the rise of a new Calcutta School when the work of those two fine artists, Abanindranath Tagore and J. P. Gangooly, was seen in the first London Salon of the Allied Artists in 1908; and it is a pleasure to see the first so well represented in the present exhibition. There are many of his name among the exhibitors, and there is a very beautiful wash drawing, "Devatatma Himalaya" (384), by the poet Rabindranath Tagore; but just as he was one of the earliest leaders of the revival, so Abanindranath Tagore remains the outstanding modern master of Bengal.

"Whether on the smaller scale of miniature painting or on the larger scale of such a decoration as Sarada Ukil's "Shiva's Grief" (115), the superiority of the traditional linear style is incontestable in this exhibition."

বাঁকুড়ায় মিউজিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব

অধ্যাপক বেগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়া জেলার পুরাকৃত্তি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, ধাতু-মূর্ত্তি, শিলা বা ধাতুর তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁকুড়া শহরে একটি মিউজিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'র বর্তমান সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত মুদ্রিত হইল। আমরা তাঁহার প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি যে-সকল প্রাচীন জিনিষ রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একবার নষ্ট হইলে বা বাঁকুড়া হইতে অন্তর্ভুক্ত অপসৃত হইলে আর পাওয়া যাইবে না, অথচ সেগুলি বাঁকুড়া জেলার অমূল্য সম্পদ। প্রবাসীর পাঠকগণ বিক্রমপুরের একটি গ্রাম আড়িয়লের মিউজিয়মটি সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও করিতে পারেন। একটি গ্রামে বাহা হওয়া আবশ্যিক বিবেচিত হইয়াছে এবং বাহা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহা একটি শহরে নিশ্চয়ই হওয়া উচিত ও হওয়া সম্ভবপর। ২৫,০০০ টাকা কিছু বেশী নয়। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী এক বাঁকুড়ায় বাহাদের জন্য কিছু এখন অন্তর্ভুক্ত বাস করিতেছেন, এরূপ অনেক লোক আছেন বাহারা এই টাকা দিতে পারেন।

বাহারা বিশেষ সজ্জতিপন্ন নহেন, তাহারাও যথাসাধ্য দান করিলে—ন্যূনকল্পে দান সংগ্রহ করিয়া দিলে, এই কাজটি হইতে পারে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক

আসনবন্টনে ত্রায় ও নিয়মের অভাব

বর্তমান ভারতশাসন-আইন অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিকে বতগুলি কবিয়া সদস্যের আদান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন ত্রায় নিয়মের অনুবর্ত্তিতা নাই। ইহা আমরা অনেক বার দেখাইয়াছি। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক সাংবাদিকগণ, এমন কি ততোধিক স্বদেশপ্রেমিক কংগ্রেসওয়ালাবাও, এ-বিষয়ে দৃকপাত করেন নাই। গবর্ণমেন্ট ত দৃকপাত করিবেনই না। নূতন যে ভারতশাসন-আইন হইতে বাইতেছে, তাহাতেও প্রদেশগুলির মধ্যে আসনবন্টনে কোন নিয়ম ও ত্রায়বিচার দেখা যাইতেছে না। যখন প্রতিনিধি-নির্বাচনে খুব জ্ঞানী, খুব বেগা, খুব ধনীরা এক ভোট, এবং নিরক্ষর কম যোগা, অল্প-বিত্ত লোকেরও এক ভোট, এবং যখন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাঝেবই এক ভোট (অর্থাৎ adult suffrage) এই আদর্শের দিকে সব দৃশ চলিতেছে (এবং কোথাও কোথাও এখনও তাহাই নিয়ম), তখন প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যা অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার জন্ত আসনের সংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। ইহা আমাদের উদ্ভাবিত একটা আদর্শ নহে। ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত ও নজীর দিতেছি।

আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসে ৪৮টি স্টেট বা রাষ্ট্র আছে। উহার প্রতিনিধি-সভায় (House of Representatives) প্রতিনিধি সংখ্যা ৪৩৫। প্রত্যেক স্টেট প্রতিনিধি ২১০৪১৫ জন অধিবাসীর জন্য এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাতে পাঠাইতে পারে। তদনুসারে নিউ ইয়র্ক স্টেট সর্বাপেক্ষা অধিক, ৪৫ জন, প্রতিনিধি পাঠায় এবং ছোট স্টেট ১ জন করিয়া পাঠায়।

নূতন ভারতশাসন-বিলে ব্রিটিশ-ভারতের প্রদেশগুলিকে ফেডারাল স্যাসেমব্লীতে ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, এবং কোন

প্রদেশ কত আসন পাইবে, বিলের তপশীলে তাহা লেখা আছে। প্রদেশগুলির অধিবাসীর সংখ্যা অনুসারে এই আসন ভাগ করা উচিত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। যাহা করা হইয়াছে এবং যাহা কবা উচিত তাহা আমরা দেখাইতেছি।

ব্রহ্মদেশকে ভারতসাম্রাজ্য হইতে পৃথক করা হইবে স্থিৰ হইয়াছে। তাহাকে বাদ দিয়া ব্রিটিশ-ভারতের মোট লোকসংখ্যা ২৫,৬৮,৫৯,৭৮৭। ইহাদিগকে ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে বলিলে, ১০,২৭,৪৩৯ জন লোকের সমষ্টিকে এক এক জন প্রতিনিধি নির্বাচন কবিত্তে দেওয়া উচিত। এই নিয়ম অনুসারে কোন্ প্রদেশের কত প্রতিনিধি পাওনা হয়, এবং বাস্তবিক কোন্ প্রদেশকে কত প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি। গোটা গোটা অঙ্কগুলিই ধরা হইয়াছে, ভাঙ্গাংশ ধরা হয় নাই।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	প্রাপ্য আসন।	প্রাপ্ত আসন।
মাদ্রাজ	৪৬৭৪০১০৭	৪২	৩৭
বোম্বাই	১৭৯৯২০৫৩	১৫	৩০
বাংলা	৫০১১৪০০২	৪৮	৩৭
আন্ধ্র-অযোধ্য	৪৮৪০৮৭৬৩	৪৭	৩৭
গুজরাট	১০৫৮০৮৫২	২২	৩০
বিহার	৩২৪০০০০০	৩১	৩০
মধ্যপ্রদেশ-বেঙ্গাল	১৫৫০৭৭২৩	১৫	১৫
আসাম	৮৬২২০৫১	৮	১০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২৪২৫০৭৬	২	৫
উড়িষ্যা	৬৭০০০০০	৬	৫
সিন্ধুদেশ	৩৮৮৭০৭০	৩	৫
ব্রিটিশ বালুচিস্তান	৪৬৩৫০৮	০	১
দিল্লী	৫৩৮২৪৬	০	২
আজমীর-মেরোয়াড়া	৫৬০২৯২	০	১
কুর্গ	১৬৩৩২৭	০	১

প্রশ্ন হইতে পারে, যে, ছোট ছোট চারিটি প্রদেশেব প্রাপ্য আসন যে শূন্য (০) ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার কি প্রতিনিধিস্থত থাকিবে? উত্তর এই, যে, এত অল্প অল্প লোককে লইয়া এক-একটা প্রদেশ করিয়া খরচ বাড়ানই ভুল। কোন-কোনটাকে সন্নিহিত বড় কোন কোন প্রদেশের সামিল করা উচিত। যদি তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিতেই হয়, তাহা হইলে তাহাদের কয়েকটাব সমষ্টিকে ১টা বা ২টা আসন দেওয়া যাইতে পারে। এ প্রস্তাবের নজীরও আছে। দেশী রাজ্যসমূহের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যসমষ্টিকে একটি করিয়া আসন দেওয়া হইয়াছে।

কতকগুলি ছোট ছোট প্রদেশ নিজেদের রাজস্ব হইতে নিজেদের ব্যয়নির্বাহে অসমর্থ। ভারত-গবর্নমেন্ট তাহাদের ঘাটতি পূরণ করিয়া কাজ চালাইয়া দেন। অর্থাৎ বড়

প্রদেশগুলি হইতে—বিশেষতঃ বাংলা দেশ হইতে—রাজস্ব শোষণ করিয়া ভারত-সরকার তাহা এই সব চির-দেউলিয়া ছোট ছোট প্রদেশে অপব্যয় করেন। বড় প্রদেশগুলির উপর—বিশেষ করিয়া বঙ্গের উপর—এই এক অবিচার। আর এক অবিচার, বড় কোন কোন প্রদেশকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাপ্য আসন হইতে কতকটা বঞ্চিত করিয়া ছোট ছোট কোন প্রদেশকে আসন দেওয়া ও বেশী আসন দেওয়া। ইহাতে বড় প্রদেশগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বঞ্চিত হইয়াছে বাংলা দেশ—ইহার প্রাপ্য অন্ততঃ ১১টি আসন ইহা পায় নাই। অন্ততঃ বলিতেছি এই জন্ত, যে, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত কতকগুলি জেলাকে বিহার ও আসামের মধ্যে ফেলিয়া বাংলাব আয়তন ও বঙ্গের অধিবাসী-সংখ্যা কম করা হইয়াছে। বাস্তবিক বাংলা দেশ যত বড় তাহাকে তত বড় থাকিতে দিয়া তাহার অধিবাসীসমষ্টিকে জাতিসংখ্যক প্রতিনিধি দিলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালীদের যে প্রভাব হইতে পারিত, বাঙালীদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইল, বঙ্গের নেতৃবর্গ বা বঙ্গের সাংবাদিকগণ তাহার আলোচনা করিবেন, এল্প আশা কম। অবাকালীবা—বিশেষতঃ বোম্বাইওয়ালারি—ইহাতে মন দিবেন না। বোম্বাইয়ের যত আসন পাওনা, বর্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে তদপেক্ষা বেশী আসন বোম্বাইয়ের আছে। নূতন ভারতশাসন-বিধে বোম্বাইয়ের জাতি প্রাপ্য অপেক্ষা তাহাকে ১৩টি আসন বেশী দেওয়া হইয়াছে।

অবিচারহুট ও গুরুপাতহুট এই প্রকাব আসন-বণ্টনের কাণ কি? অভিপ্রায়ই বা কি? যে-সব প্রদেশকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তথাকার অধিবাসীদের মূল্য কি কারণে কম বিবেচিত হইল?

উড়িষ্যার বাঙালী, এবং বঙ্গের বাঙালী ও প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

নিম্নমুক্তিত মন্তব্যটি 'সঞ্জীবনী' হইতে উদ্ধৃত।

উড়িষ্যার বাঙালীর দ্বয়বস্থা—কলিকাতায় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় বহু বাঙালীর বাস কিন্তু উড়িষ্যা-বাসী বাঙালীদের মধ্যে এই সম্মেলনে যোগ দিবার ক্ষমতা তেমন উৎসাহ দেখা যায় নাই। সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি হইতে হইতে বাঙালী আসিয়া এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছে, কিন্তু বাঙালীর পার্শ্বে অবস্থিত ও এককালে বাঙালী দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এই সম্মেলনে যোগ দিবার উৎসাহ নাই কেন? উড়িষ্যার পক্ষীতে পর্যন্ত বহু বাঙালী বাস করে। এমন সকল পক্ষী আছে যথায় বাঙালীর সংখ্যা উড়িষ্যাদিগের অপেক্ষা অধিক। তাহাদের প্রাণ সকলেই বাঙালী ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে। কিন্তু

আশ্চর্যের কথা, তাহাদিগকে উড়িয়া সমাজে গ্রহণ করা হয় নাই। তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাহারা এক পরিবারের মধ্যেই বিবাহাদি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই সকল বাঙালীদিগকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। বাহাতে তাহারা বাঙালীর কুটি পুনরায় অধিগত করিতে পারে, পুনরায় জ্ঞান, সম্ভার ও শিক্ষার আলোক পায়, তাহার জন্য বাঙালীরই চেষ্টা করা উচিত। এই জন্য তাহাদিগকে বাঙালী লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তাহাদের চতুর্পার্শ্ব অবস্থার জন্য তাহারা ভীত ও নিরাস্রম হইয়াছে, তজ্জন্য তাহারা নিজেই যে উন্নতির চেষ্টা করিবে তাহা সম্ভব নহে। বাঙালী দেশ ও অপর স্থানের বাঙালীর এই জন্য চেষ্টা করা উচিত। ইহা বিশাল কার্য এবং তজ্জন্য বহু ব্যয়ের ক্রমাগত চেষ্টায় প্রয়োজন। এই কার্যের জন্য ঐ সকল স্থানে বাঙালীকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। বাহাতে তাহারা পুনরায় বাঙালী সমাজে গৃহীত হয়, তজ্জন্য বাঙালীর আশ্রয় চেষ্টা করিতে হইবে। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন কেবল প্রবন্ধ পাঠ না করিয়া এই কার্যকরী বিষয়ে নাসিবেন কি?

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কিছু কিছু সমালোচনা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি। সবগুলির আলোচনা করা আবশ্যক নহে, সম্ভবপরও নহে। 'সতীবনী'র মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আগেই বলিয়া রাখি, ইহাব সম্পাদক মহাশয় প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতিতে কোন কারণে যোগ দেন নাই বলিয়াই যে সম্মেলনের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতেছি না; তিনি হিতৈষণা হইতে সম্মেলনকে উপদেশ দিয়াছেন, এইরূপ মনে করাই উচিত।

উড়িয়ার বাঙালীদের সম্বন্ধে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া হৃৎক বোধ করিতেছি। ইহাদের প্রতি কর্তব্য করা সমগ্র বাঙালী সমাজের উচিত। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের চেয়ে বঙ্গের অধিবাসী বাঙালীদের সংখ্যা, ধনসমষ্টি, জ্ঞানসম্ভার, সংহতি ও প্রভাব অনেক বেশী। সুতরাং এই কর্তব্য বঙ্গের অধিবাসী বাঙালীদেরই বেশী করিয়া করা উচিত। বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদেরও এই শুভচেষ্টায় যোগ দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন একটি ক্ষুদ্র সমিতি। ইহার লোকবল অর্থবল অত্যন্ত কম। বৎসরে একবার যখন ইহার অধিবেশন কোথাও হয়, তখন ইহার প্রতি বাঙালীর কিছু দৃষ্টি পড়ে মাত্র। ইহার সভ্য-সংখ্যা ও অর্থাগম বেশী হইলে ইহার দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। এবার কলিকাতায় অধিবেশন হওয়ার কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের দ্বারা ইহার কার্যবিবরণ অনেকের গোচর হইয়াছে। এমন কি, যে-উড়িয়া সম্বন্ধে ত্রাণ হৃৎক করা হইয়াছে, সেখান হইতেও বাঙালী আসিয়াছিলেন।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সমালোচক বত, ইহা যে পরিমাণে সহায়ক পাইলে ইহার কার্যসৌকর্য বাড়িত। কলিকাতায় ধনজনের অভাব নাই। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির কয়েকটি লোক অর্থসংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেও

আবশ্যকমত সামান্য টাকা উঠে নাই, কয়েক শত টাকা বাটতি পড়ে; আবার চেষ্টা করায় তাহা প্রায় শোধ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইত না, যদি কোন কোন মহলে সম্মেলনের প্রতি ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধভাব এবং ইহা পণ্ড হইবার আশা না থাকিত। তবে অবশ্য যখন ইহা পণ্ড হইলই না, তখন ঐ ঐ মহলের কেহ কেহ সহজ উপায়ে বাহবা লইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি কর্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙালীদের নিজের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহার সমতুল্য এরূপ আর একটি বঙ্গের আর কোথাও নাই। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও অন্য কোন ভাবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান নাই। মুদ্রিত বাংলা পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি এবং পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি ইহাতে যত আছে এমন অন্য কোথাও নাই। তাহার উপর ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি আদরের অমূল্য লাইব্রেরী স্থান পাইয়াছে, রমেশচন্দ্র দত্তের লাইব্রেরী এখানে আছে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইব্রেরীও এখানে রক্ষিত হইয়াছে। এখানে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হইয়া থাকে। ইহা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থসমূহ আদরীয়। বহুসংখ্যক পাঠক পরিষদ-মন্দিরে আসিয়া প্রত্যহ পাঠ করেন। ইহাতে এখন অত্যন্ত স্থানান্তর ঘটাইয়াছে। পুস্তকের আলমারীগুলি স্থানান্তরে ঠিক যেন গুদামের মত কবিতা রাখা হইয়াছে। বহুমূল্য বহু পুঁথি স্থানান্তরে মেঝেতে লুটায়। স্থানান্তর দূর করিবার জন্য ইহারই অঙ্গীভূত রমেশ-ভবনের উপর দ্বিতল বহু হল নির্মাণ করা আবশ্যক। রমেশ-ভবনে প্রাচীন মুষ্টি আদি রক্ষিত আছে। উহারও মেঝে সিমেন্ট করা দরকার। উহার মুষ্টিসংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে। তদ্বিষয়, পরিষদ-মন্দির পুরাতন হওয়ায় এবং উহার সমুদ্র দিয়া প্রত্যহ আবর্জনার ট্রেন যাতায়াত করার উহার সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক। অনেক হাজার টাকা শীঘ্র চাই। বাঙালীর এই গৌরবের প্রতিষ্ঠানটিকে বাঙালী রক্ষা করুন।

স্কটিশ চার্চ কলেজ অটোবনিক নৈশ বিদ্যালয়

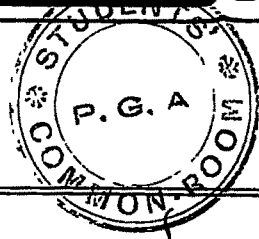
এই নৈশ বিদ্যালয় ২৪ বৎসর চলিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কলেজের ছাত্রেরা রাতে যেচ্ছায় জনশিক্ষাকল্পে স্থানীয় শ্রমিক ও তাহাদের সন্তানদিগকে জাতিধর্মনির্বিশেষে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সমাজ-সেবকদের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত সকল কলেজের ছাত্রদের অনুকরণীয়। সম্ভ্রুতি এই বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণ ডাঃ স্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। ৬৫ জন ছাত্র পুরস্কার পাইয়াছে।



পরমহংস রামকৃষ্ণ
প্রসিদ্ধ চিত্রকর ফ্রান্স ভোরাক কর্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্রের ফোটোগ্রাফ হইতে।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”
“নামমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”



৩৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪১

৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাঁওতাল মেয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে,

শিমুল গাছের তলে কঁকর-বিছানো পথ বেয়ে।

মোটী শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তুমু কালো দেহ।

বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ

কোন কালো পাখীটিরে গড়িতে গড়িতে

আবণের মেঘে ও তড়িতে

উপাদান খুঁজি

ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।

ওর হুটি পাখা

ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,

লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর গুড়া।

নিটোল হু-হাতে তার শাদা-রাঙা কয় জোড়া

গালা-ঢালা চুড়ি ;

মাথায় মাটিতে ভরা কুড়ি

যাওয়া আসা করে বার-বার।

আঁচলের প্রান্ত তার

লাল রেখা ছলাইয়া

পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।

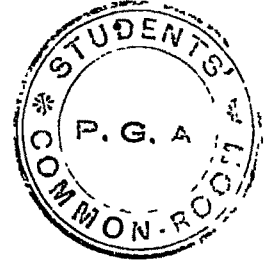
পউষের পাশা হ'ল শেষ,
 উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের কচিং আবেশ ।
 হিম-ঝুরি শাখা 'পরে
 চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
 শীতের রোদ্দুহে ।
 পাখুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে ।
 আমলকী-তলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
 জোটে সেখা ছেলেদের দল ।
 আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া গাঁথা,
 অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
 সচকিত হাওয়ার খেয়ালে ।
 ঝোপের আড়ালে
 গলা-ফালা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে ।
 বুড়ি নিয়ে বার-বার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে ।

আমার মাটির ঘরখানা
 আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা ।
 ধীরে ধীরে ভিৎ তেলে গুঁথে
 রৌদ্রে পিঠ পেতে ।

মাঝে মাঝে
 সূদূরে রেলের বাঁশি বাজে ;
 প্রহর চলিয়া যায় বেলা পড়ে আসে,
 ঢং-ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত আকাশে ।
 আমি দেখি চেয়ে,
 ঈষৎ সঙ্কোচে ভাবি এ কিশোরী মেয়ে
 পল্লীকোণে যে বরের তরে
 করিয়াছে প্রস্তুতিত দেহে ও অন্তরে
 নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
 গুঞ্জার স্নগ্ধমুখাভরা,
 আমি তারে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরী,
 মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
 পয়সার দিয়ে সিঁদকাটি ।
 সাঁওতাল মেয়ে ওই বুড়ি ভ'রে নিয়ে আসে মাটি ।



সাঁওতাল মেয়ে
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত



রবীন্দ্রনাথের পত্র

৩

কল্যাণীয়েষু

অজিত, তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তর আমি পূর্বেই দিয়েছি। একথা আমি ক্রমশই স্পষ্টতর ক'রে বুঝতে পারছি, ভালো নামক জিনিষটা আমাদের পক্ষে একটা কথার কথা যতক্ষণ তা আমাদের পক্ষে সত্য না হয়। অতএব আমরা ভালোকে চাই বললে কিছুই বলা হয় না, আমরা সত্যকে চাই এইটেই ঠাঁটি কথা। ভালোর প্রতি লোভ ক'রে সত্যকে হারানো মানুষের পক্ষে বড় দুর্গতি। বস্তুত পৃথিবীতে যথার্থ সংলোকের এই একটা মন্ত বিপদ আছে। তাঁরা ভালোর প্রতি অত্যন্ত লুপ্ত হয়ে নিজের সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরা বাইরের দিকের ভালোটাকেই সমুচ্ছল ক'রে দেখেন, নিজের ভিতরের দিকের ভালোটা দেখতে পান না। যারা bull's-eye লঠন নিয়ে দেখে তারা নিজের চারি দিকটাকে অন্ধকার ক'রে দেখে—সেটা বিশেষ কোনো একটা প্রয়োজনের দেখা হ'তে পারে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক দেখা নয়। আমরা কোনো উপায়েই অন্ধকে পেতে পারি নে;—অন্ধকে দেখতে পাবি, ভালবাসতে পারি, নিজেকেই পেতে পারি। ভালোকে বাটের দেখতে পাওয়ার একমাত্র সার্থকতা এই যে, নিজের ভালোর সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। নইলে তাকে আত্মসাৎ করতে যাওয়া চুরি করতে যাওয়ার মত। চোরাই মাল আপনার নয় এবং দণ্ডস্বরূপে আপনারটাকে খোয়াতে হয়। নিজের সত্যের সঙ্গে সকল সত্যের যোগ আছে, নিজের ভালোর সঙ্গে সকল ভালোর আত্মীয়তা আছে এইটেকে ঠিকমত অনুভব করতে পারলেই আত্মবিশ্বাসের হাত থেকে ছুটি পাওয়া যায়। অবশ্য নিজের সত্যকে জানা অলস নিশ্চেষ্ট লোকের কর্ম নয় কিন্তু বস্তুত সেইটেই সবচেয়ে কঠিন সাধনার কর্ম। যা আপনার ছেলেকে যেমন আপনার প্রাণ দিয়ে তবো পায় কিন্তু নিজের ছেলেকে কোলে তুলে নিলেই হ'ল এও তেমনি—

নিজের সত্যের দায়ই সবচেয়ে বেশী। তেমনি নিজের সত্যের আনন্দেরও তুলনা নেই। কৃত্রিম কর্তব্যের দোহাই দিয়ে মানুষের নিজের ভিতরকার সত্যকে অহরোধ করতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করি। নিজের জোরকে অস্ত্রের প্রতি প্রয়োগ করাই দৌরাখ্য, অস্ত্রের জোরকে জাগিয়ে তোলাই যথার্থ হিতৈষিতা। তোমার যেখানে কাজেব ক্ষেত্র সেখানে তুমি যেটা সবচেয়ে ঠিকমত করতে পার সেই দিকেই প্রাণপণে ঝোক দিও, অস্ত্র কিছু যতই ভালো এবং যতই আবশ্যক হোক না তোমার তাতে কিছুমাত্র দায়িত্ব নেই। এইটেই যথার্থ নিলোভ এবং নিরাসক্ত ভাবে কর্ম করা; এই ভাবটি ঠিকমত রক্ষা করতে পারলেই কর্মের দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যের কাছেই আমি ধরা দিতে পারি, তাতেই আমার আনন্দ কিন্তু কর্মের কাছে নয়;—সত্যেরই প্রকাশক্ষেত্র বলেই কর্মের গৌরব, নইলে তার মত হরিণবাড়ি জগতে কোথাও আছে?

আমি সম্প্রতি গুসটারশায়ারে এক গুপ্তগ্রামের কৃষকের ঘরে বাস করছি। নিকটে আর এক বাড়িতে রটেনটাইন থাকেন। বেশ আনন্দে আছি। শিশু থেকে একটা আধটা কবিতা তাঁকে তর্জমা ক'রে দিই—তাঁর ভালো লাগে। ইতি ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

C/o Prof. Seymour
Urbana
Illinois
U. S. A.

কল্যাণীয়েষু

অজিত, আমরা আগামী শনিবারে আমেরিকার যাত্রা করব। কথা ছিল, আমার বই বের হয়ে গেলে পর তার পরে রওনা হব—এখানকার সকলে সেই পরামর্শ দিচ্ছিলেন—

কিন্তু আমার মন শান্তি চাচ্ছে। আমি নিজের লেখা নিজের আলোচনা নিয়ে আর থাকতে পারছি নে—এখানকার বন্ধনজাল কাটিয়ে আবার একবার মুক্তিলাভ করবার জন্তে সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি শিলাইদহেব নির্জন ঘরে বসে গীতাঞ্জলি তর্জমা কবছিলুম সে আমার আপন মনের আনন্দে করছিলুম। সেই বিজনতা থেকে একেবারে মাহুঘের ভিড়েব মাঝখানে এসে পড়েছি—এখন যা কিছু কবছি সে তো আনন্দের কাজ নয় সে তাগিদের কাজ। সে আমার বেশি দিন পোষাবে না। যতই বেতন খোরাক পাই না কেন আমি জবাব দিলুম। বরাবর নির্জন অবকাশেব সমুদ্রে জাল ফেলাই আমাব ব্যবসা—জাল যদি গুটিয়েও বসে থাকি তবু সমুদ্রে আছে—সেই আমাব সবচেয়ে বড় লাভ। এখানে আমাব বন্ধুরা আমাকে টেনে রাখতে চান—কিন্তু কিছুতে আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

তুমি ছাড়া এবার আর কারো কাছ থেকে চিঠি পাই নি। বোধ হয় আমাদের জর্জনি যাবার শুজবে তোমরা ছুটি নিয়েছ। কিন্তু শরীরটা কিছু বিগড়েছে। ক্ষিতীশ সেন নামক এখানকার এক জন ছাত্র “রাজা” তর্জমা করছেন। তর্জমাটা বোধ হচ্ছে ভালই হবে। বিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমার লেখাটা আমেরিকায় গিয়ে ছাপাবার ব্যবস্থা করব ঠিক করেছি। ইতি ৩০ আশ্বিন ১৩১১

তোমাদের
শ্রীবীজনাথ ঠাকুর

ও

সবিনয় নমস্কার

আমরা সূর্যাস্তের পথ অনুসরণ করতে চললুম। এবার অন্তঃস্রাবের ওপারের ঘাটে পাড়ি দেওয়া যাচ্ছে। ভেবেছিলুম সূর্যের বধেরবার অনুবর্তন করতে করতেই ভারতবর্ষ গিয়ে পৌঁছব—কিন্তু বোধ হচ্ছে ঠিক সে রকমটি হবে না। এখানে এঁরা ধরেছেন আবার আমার গ্রীষ্মের সময় আসা চাই। তত দিনে আমার অন্ত বই ছাপাবার সময় হয়ে আসবে। কাল রাতে ইয়েটসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। “ডাকবরের” তর্জমাটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ওটা

তিনি তাঁদের আইরিশ থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্তে উৎসুক হয়েছেন। এখানকার এক জন ছাত্র “রাজা” তর্জমা ক’রে দিয়েছেন, সেটাও কালরাতে ইয়েটসকে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস এইটেই আমার সকল লেখার চেয়ে এঁদের ভালো লাগবে। কাল সকালে এক জন ফরাসী গ্রন্থকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি প্রক্ষে আমার তর্জমাগুলো পড়ে উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। তিনি বললেন, তোমার মতো কবির জন্তে আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের লিরিক্সে আমবা কেবল accidental-কে নিয়ে বুদ্ধ হয়ে আছি—তোমার লেখা দেশকালের অতীত, চলো তুমি আমাদের ক্লাসে চলো, সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। ইত্যাদি। ইনি আমার এই তর্জমাগুলি ফরাসীতে অনুবাদ কববার অনুমতি নিয়ে গেলেন। এঁদের এই উৎসাহ দেখে আমি অত্যন্ত বিস্ময় বোধ কবি—এ আমি কখনো কল্পনা করতেও পারতুম না। ব্রজেন্স বাবুকে কেবলিজে কিম্বা লগুনে কোনো কাজ নিয়ে এখানে আবদ্ধ কববার জন্তে আমরা খুব চেষ্টা করছি। একটা কিছু জুটবে ব’লে মনে করছি। এদেশে উনি থাকলে আমাদের ভারি উপকার হবে।

বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি এত দিনে নিশ্চয় তোমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। সেটা খুব একটা ভাবি পার্কেল হয়েছে—সেই জন্তে পেতে দেরি হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পেনে যেন তোমাদের বিদ্যালয়ের কাজে লাগাতে পারো। ইতি ২রা কার্তিক ১৩১১

তোমাদের
শ্রীবীজনাথ ঠাকুর

New York

২৮ অক্টোবর ১৯১২

১২ কার্তিক ১৩১১

ও

কল্যাণীয়েষু

অজিত, আটলান্টিক পার হয়ে এ-পারে এসে কাল পৌঁছেছি। সমুদ্রে প্রথম কয়দিন যে-রকম অশান্ত ছিল এমন আর কখনো আমি দেখি নি। এই দেহপাত্রে

মধ্যে বেটুকু জীবন ছিল তাকে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে তার অর্ধেকটা প্রায় বেরু ক'রে ফেললে—বেটুকু বাকি ছিল তাতে কেবলমাত্র বেঁচে থাকা চলে, তার অতিরিক্ত আর কোনো কাজই চলে না। অঙ্ককারে ছোট্ট ক্যাবিনের খাঁচার মধ্যে অনাহারে পড়ে পড়ে কেবল ভাবছিলুম বরুণদেব করুণ হবেন কবে। মনে মনে মহাসমুদ্রকে একটা চতুর্দশপদী মানৎ করেছিলুম। কিন্তু মহাসমুদ্র মানবচরিত্রের দুর্বলতা বোধ হয় অবগত আছেন। তিনি জানেন যদি নিতান্ত সহজে তিনি আমাদের পার করেন তা হ'লে পারে এসেই তাঁকে ভুলতে আর বিলম্ব হবে না কিন্তু খুব কসে একবার দোলা দিয়ে দিলেই অস্তঃকরণে সেটা একেবারে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। কথাটা মিথ্যা নয়—এবার আমাদের আটলান্টিকের এই কুলনদী আমরা ইহ-জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্য জিনিষ এবার দেখলুম—শরীরে যখন কোথাও কিছুমাত্র আরাম নেই এবং চারিদিক যখন সঙ্কীর্ণরূপে বদ্ধ—তখন নিজের অন্তরতম শক্তি সেই সঙ্কীর্ণতার কোণে একটুখানি ছিদ্রপথ দিয়ে অমৃত উৎস উৎসারিত ক'রে দিয়েছিল। কতদিন এবং কতরাত্রি আমার রোগশয্যা যেন জননী'র কোল হয়ে আমাকে গ্রহণ করেছিল—সমস্ত মুক্তি জগতের আনন্দ ক্যাবিনের ভিতরটিতে এসে আমার থবর নিয়ে গেছে। কী স্বগতীব শান্তি, সাধনা এবং আরামের দ্বারা আমার শরীরের সমস্ত হুংরু গ্লানি একেবারে সমাবৃত হয়ে গিয়েছিল সে আমি বলতে পারি নে। আমাব চতুর্দিক অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল বলেই আমি এমন একটা বৃহৎক এমন সত্য-ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। কেননা যে বৃহৎটি সত্য, কোনো বাহ্য সঙ্কীর্ণতায় তাকে ছোট করতে পারে না—ভূমিতে আয়তনের দ্বারা ছোটও হ'ল না বড়ও হ'ল না। আমাব সেই অবরুদ্ধ ক্যাবিনটার মধ্যে সমস্ত জগৎকে ধরেছিল—আমার কোনো অভাব হয় নি।—আমি বেশ দেখতে পেলুম বঞ্চিত হলেই স্বার্থ রূপে পাওয়া যায়—হারানো'র ভিতর দিয়ে পাওয়ার মতো নিবিড় পাওয়া আর কিছুই নেই। সত্য মাঝে মাঝে চল ক'রে মুখ ঢাকা দেন, তখন ব্যাকুল হয় তাঁকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখা যায় তাঁকে হারাবার জো নেই। সেদিন ভোররাত্রে

যখন বাইরে ঘন মেঘ ঝুটি ও অশান্ত বাতাস তখন আমি গাচ্ছিলুম “জননী আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ কিরণে।” তেমন নবীন অরুণ কিরণ তো আমি বোলপুর মাঠের ধারে বসেও এমন ক'রে পাই নি। অরুণ কিরণকে পাবাব জন্তে যখন সামনে অরুণ কিরণকে সাজিয়ে রাখবাব কোনো দরকাব হয় না তখনই ভীবন ধৃত। ছবির গায়ের উপরে ছবির নাম লিখে দিতে হয় নিতান্ত ছেলেমানুষদের জন্ত—বাইবের এই উপকবণগুলো তেমনি নাম লেখা মাত্র—ওগুলো না দেখলে আমরা যুটরা কিছু বলতে পারি নে—কিন্তু অক্ষর তো জিনিষ নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

New York

২১ অক্টোবর ১৯১২

ও

বিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন

দেবানুবে মিলে যখন সমুদ্রমহানে লেগেছিলেন তখন মহাসমুদ্রের পেটে যা-কিছু ছিল সমস্ত তাঁকে নিঃশেষে উদগার করতে হয়েছিল। সে সময়ে তাঁর যে কী রকম পীড়া উপস্থিত হয়েছিল সেটা তিনি মহাভারতের বেধব্যাসকে কোনোদিন বোঝাবার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা জানি নে কিন্তু এই বর্তমান কথিতিকে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার জঠর তাঁর জঠরের মতো এমন বিরাট নয় এক তার মধ্যে বহুমূল্য জিনিষ কিছুই ছিল না কিন্তু বেদনার পরিমাণ আয়তনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; সেই জন্তে অতলান্তিক পার হবার সময় তাঁর অপাব হুংরু অল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি ক'রে নিয়েছিলুম। আমবা যে নিতান্তই মাটির মানুষ সেটা বুঝতে বাকি ছিল না। এখন কেবলই মনে হচ্ছে, কালো জল আর হেরব না গো দূতী, সমুদ্র আব পাব হব না—ঈমারের বংশীধ্বনি যত তোরোই বাজুক আব কুল ছাড়তে মন যাচ্ছে না। ডাঙায় নেমে এখনও শবী'টা ক্লান্ত হয়ে আছে। দিনবাজি নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যেন শবীরের থেকে আলাগা হয়ে নড়নড় কবছে। সমুদ্র আমাকে যেন তার কুমুদুমি পেয়েছিল—হু-হাতে ক'রে ডাইনে বাঁয়ে

নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুর্পদী বা-কিছু আছে সমস্ত মিলে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুলবে—কিন্তু উল্টে পাল্টে খানাতল্লাসী করে জঠরের মধ্য থেকে ছন্দোবন্ধের কোনো সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিম্বুতি দিলেন।

সুফলের বাড়িটা পাওয়া গেছে। পূর্বেই লিখেছি আপাতত সেটা ইঙ্কলের কাজে লাগিয়ে দিও। সিংহ লিখেছেন তাব আসবাবগুলো আপাতত ঐখানেই রেখে ব্যবহার করতে। কিন্তু পাছে লোকসান হ'লে তার দাম ধরে বসেন এই আমার আশঙ্কা হয়। দ্বিপুকে ছানিয়ে

তিনি যেটা ভালো বোঝেন তাই করবেন। আসবাবের একটা ফর্দ ক'রে বুধে নিয়ো এবং তার একটা কাপি আমাকে পাঠিয়ে দিও। সুফলের বাগানে বিদ্যালয়ের অন্য তরীতরকারী উৎপন্ন করানো যেতে পারে কিনা ভেবে দেখো—অবশ্য ফসলের দামের চেয়ে চাষের দাম বেশি না পড়ে। অন্তত ফলের গাছের গোড়া খুঁড়ে এহবেলা সার দিয়ে রাখলে নিশ্চয়ই ফল পেতে পারবে। ইলিনয়ের টিকানায় পত্র লিখো। ইতি

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৈথিল কবি গোবিন্দদাস ঝা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বলন ও সম্পাদন করিবার জন্য ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাকে মিথিলার বাইতে হয়। মৈথিল কবিতাসমূহ অহুসন্ধান করিবার সময় জ্ঞানিতে পাই যে, বাংলা দেশে প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যেগুলি মৈথিল ভাষায় রচিত এবং গোবিন্দদাসের ভণিতা সম্বলিত সেগুলি মিথিলাবাসী গোবিন্দদাস ঝার রচনা। আমাদের দেশে লোকে মৈথিল ভাষা বিস্তৃত হওয়াতে ঐ সকল পদ অত্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে, এমন কি স্থানে স্থানে অর্থবোধ হয় না। এই সকল পদই বিস্তৃত আকারে মিথিলায় দেখিতে পাই।

কলিকাতার ফিরিয়া গিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ পাঠ করি। উহার মর্ম পরিষদের কার্যবিবরণীতে সন্নিবেশিত আছে। সে সময় আমাব সিদ্ধান্ত লইয়া কোনরূপ আন্দোলন হয় নাই, কোন সামগ্রিক অথবা সংবাদ পত্রে কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি মৈথিল কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠ

করি এবং উহা পরিবৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পব কলিকাতা পোয়েট্রি সোসাইটিতে ইংরেজীতে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, এবং সেই প্রবন্ধ পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রে উহা প্রকাশিত হয়।

এবার আমার মতের বিস্তার প্রতিবাদ হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রে আমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত এই অভিযোগ প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদীরা বলেন, ব্রজবুলিতে রচিত পদসমূহ শ্রীখণ্ড বুধরী নিবাসী গোবিন্দদাসের লেখা। অপভ্রংশ মৈথিল ভাষার কল্পিত নাম ব্রজবুলি। এই গোবিন্দদাস জ্ঞাতিতে বৈদ্য ছিলেন ও তাঁহার উপাধি ছিল কবিবাড়—চিকিৎসক অর্থে নয়, শ্রেষ্ঠ কবি অর্থে। এই মতও কল্পিত ও আনুমানিক। বাহারী একথা লিখিয়াছিলেন তাঁহার বৃহৎকার 'পদকল্পতরু' আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। গোবিন্দদাস নামে কয় জন বৈষ্ণব কবি ছিলেন তাহাও বোধ হয় জানেন না। কোন্ পদ কোন্ গোবিন্দদাসের বচিত তাহা কোন-মতে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব কাব্যের দুইটি

প্রধান সঙ্কলন, 'পদকল্পতরু' বৈষ্ণবদাস কৃত সঙ্কলিত ও 'পদসমুদ্র' রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে টীকা নাই, পদসমুদ্রে সংস্কৃত ভাষায় টীকা আছে, কোন কবির কোন পরিচয় নাই। গোবিন্দদাস নামে পাঁচ জন কবি ছিলেন, কোন কোন পদের ভণিতার কবির উপাধি আছে, যেমন গোবিন্দ বোষ। অক্ষরচন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে গোবিন্দদাস নামধারী সকল কবির পদ একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কেবল একাধ পদ নামে স্বতন্ত্র সঙ্কলন আছে। এগুলি এক জন কবির রচনা, ভাষা বাংলা, খ্রীষ্ণের গোবিন্দদাসের হইতে পারে। কিন্তু একথাও অসম্ভব মাত্র, প্রামাণিক নয়। গোবিন্দ বোষ, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, কে কোন পদ রচনা করেন, নিঃসংশয়ে তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই। কয়েকটি পদের ভণিতার কবির পদবী আছে, নচেৎ সর্বত্রই কেবল গোবিন্দদাস নাম পাওয়া যায়।

যে-সকল প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় আমি তাহার কোন উত্তর দিই নাই। দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ষাঁহার প্রধান কবি গোবিন্দদাসকে মৈথিল স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য বাঙালী জাতির গৌরব রক্ষা করা, কিন্তু সত্যের অপেক্ষা মহত্তর কিছুই নাই এবং সত্যের অস্বাক্ষানে বাহা জানিতে পারা যায় তাহা গোপন করা অসম্ভব। আমি বৈষ্ণব কবিতা অল্পস্বল্প দেখিয়াছি, কবিরাজ গোবিন্দদাসকে সাধ করিয়া মিথিলাকে প্রত্যর্পণ করি নাই। বিদ্যাপতি-সম্পাদনকালে আমাকে অনেক পরিশ্রম করিয়া মৈথিল ভাষা শিখিতে হয়। মৈথিল গোবিন্দদাসের ভাষা, তাঁহার শব্দ-কৌশল উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে কোন মতেই বাঙালী বলিতে পারা যায় না। বিশেষ যখন তাঁহার রচনা আমি 'মিথিলার দেখিয়া আসিয়াছি এমন অবস্থায় বিধার আর স্থান নাই।

এ-কথা কি সকলের জানা আছে যে কিছুকাল পূর্বে বিদ্যাপতিকে সকলে বাঙালী বলিত? বলিবারই কথা।

তাঁহার অপূর্ণ পদাবলী বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। ১২৮০ সালে জগদ্বন্ধু ভদ্র 'মহাজন-পদাবলী' নামে বৈষ্ণব কাব্য প্রকাশ করেন। তাঁহাতে তিনি লেখেন বিদ্যাপতির নাম ছিল বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য এবং তিনি যশোহরনিবাসী। ১২৮২ সালে দ্বৈপ্য ঠাকুর 'বঙ্গ-দর্শনে' রাজকৃষ্ণ সুখোপাধ্যায় অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতিকে মিথিলাবাসী নির্দেশ করেন। স্যর জর্জ-গ্রিয়রসন মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মিথিলাবাসীরা নিজের কর্তব্যে উদাসীন। বাঙালীর বড় গৌরবের কথা যে, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ঠাকে এত উচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে।

মিথিলার মৈথিল সাহিত্যে এখন অনুরাগ হইয়াছে। লহরিয়াসরার দরভঙ্গার মৈথিল সাহিত্য-পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি যজ্ঞ নামক যুদ্বাযজ্ঞ এবং প্রাচীন মৈথিল লিপির অক্ষর চালা হইয়াছে, কয়েকখানি গ্রন্থও ছাপা হইয়াছে। গত বৎসর বিদ্যাপতির জয়ন্তী-উৎসব হইয়াছিল, সভাপতি হইয়াছিলেন দরভঙ্গার মহারাজা। পাটনার বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিল ভাষার শিক্ষক মহারাজার ব্যয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষা পাঠিত হইতেছে।

গোবিন্দদাস বার সম্বন্ধেও বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি যজ্ঞ হইতে 'গোবিন্দগীতাবলী' পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সঙ্কলয়িতা দরভঙ্গা রাজকীয় পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ-শ্রীমথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত। যে-সকল পদ এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশেও পাওয়া যায়। সঙ্কলনকার আমার প্রবন্ধাদির উল্লেখ করিয়া কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম যে গোবিন্দদাস কবিরাজ মিথিলাবাসী।

'গোবিন্দগীতাবলী' সম্পূর্ণ গ্রন্থ নয়। বিদ্যাপতির সম্পূর্ণ পদাবলী আমি সম্পাদন করি, গোবিন্দদাস বারও করিব।

বাংলা দেশের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের দেশে শিক্ষাসংস্কারের কথা তুলিলেই এক দল লোক বলেন বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন না করিলে কোন ভাল কাজই আমাদের বিদ্যালয়ে করা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের মতে পরীক্ষাবিধি, পবিদর্শন-পদ্ধতি ইত্যাদি বাহিরের শাসন আমাদের শিক্ষা-প্রণালীকে এমন কঠিন নাগপাশে বাধিয়া রাখিয়াছে যে সেখানে উন্নতির যে-কোন চেষ্টা করিলেই ব্যর্থ হইতে হইবে। কথাটা আংশিক হিসাবে ঠিকই বটে, কিন্তু অনেক দিন হইতেই আমার মনে সন্দেহ ছিল যে সেটা হয়ত পুরাপুরিভাবে সত্য না-হইতেও পারে। এই জন্তই অনেক কাল ধরিয়া সন্ধান করিতেছিলাম এমন কোন শিক্ষারতন মেলে কিনা যেখানে দেশের সর্বত্র প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী অহসবণ করিয়াও তাহারই মধ্যে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, যেখানে বাহিরের সমস্ত শাসন স্বীকার করিয়াই শত বাধাসম্মেও বিদ্যালয় নূতন প্রাণসঞ্চার করার প্রয়াস চলিতেছে এবং সেই প্রাণবোধন-তপস্যা কিছু পরিমাণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পুরাতন প্রণালীকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া নূতন শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে হইয়াছে এবং সে চেষ্টা কোথাও কোথাও হয়ত আংশিকভাবে সফল হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে চেষ্টা নানা কারণে স্বভাবতই দেশব্যাপী হইতে পারে না এবং এই নূতন ধরণের বিদ্যালয়গুলি দেশের অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই অভাব মিটাইতে পারে। এই জন্ত এমন বিদ্যালয় প্রয়োজন বাহা সাধারণ হইয়াও অসাধারণ, বাহা চারি দিকে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী স্বীকার করিয়াই তাহার সংস্কারের অনুর্ত্তান করিতেছে এবং সেই সংস্কৃত প্রণালীর সাহায্যে ধীরে ধীরে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। বিদ্রোহ করিবার শক্তি সকলেরই নাই, সকলেই আবার বিদ্রোহ

করিয়া সফল হয় না; সে শক্তি যাহার আছে তিনি সে পথ অবলম্বন করিবেন, কিন্তু সে পথ প্রভুততমের পথ নহে। দেশের অধিকাংশকেই বিপ্লবের পরিবর্তে ক্রমবিকাশের পথ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। পুরাতনকে একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে এক প্রকারের শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে উদ্ভাটনা আছে, সেই উদ্ভাটনাই আনন্দের খোরাক জোগায়। কিন্তু অসীম ধৈর্যের সহিত একটির পর একটি করিয়া ইট বদল করিয়া সংস্কারের যে প্রয়াস তাহার জন্ত চাই আর এক প্রকারের শক্তি; তাহার মধ্যে উদ্ভাটনা নাই, আছে শাস্ত-ধৈর্য। হয়ত প্রথম শক্তির তুলনায় তাহার মধ্যে বাহ্য বৈভবের, ঐশ্বর্যের অভাব আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ছোট কবিলে চলিবে না। আমাদের দেশে আজ সে শক্তির, সে রূপ চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

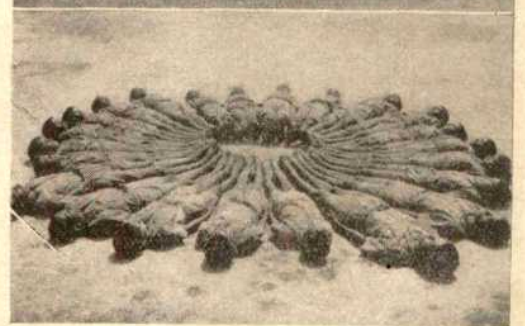
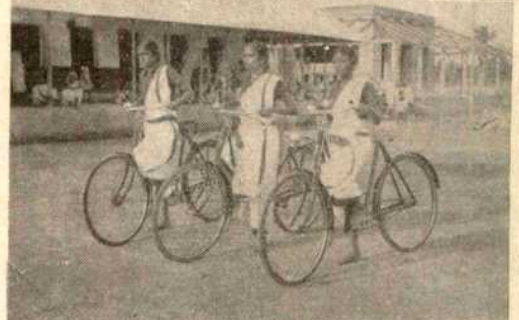
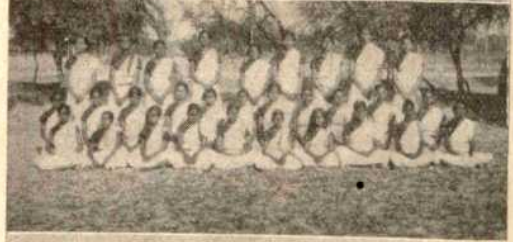
সেদিন শিক্ষাসংস্কারের এইরূপ একটি প্রচেষ্টার সহিত আমাব পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহার কথা বলি।

কলিকাতার দক্ষিণে যে প্রশস্ত সুদীর্ঘরাজপথ কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহারই পার্শ্বে ডায়মণ্ড হারবার হইতে চার মাইল উত্তরে সরিষা নামে একটি নাতিবৃহৎ গ্রাম আছে। রাজপথ হইতে গ্রামের উপাঙ্গে স্থিত প্রকাণ্ড একটি দীঘি চোখে পড়ে; তাহাবই পূর্বে অম কাঁঠাল নারিকেল গাছের ছায়ার গ্রামটি অবস্থিত। রাজপথের পশ্চিমে এক কালে যেখানে শুধু ধানের ক্ষেত ছিল সেখানে আজকাল কয়েকটি ক্ষুদ্রবৃহৎ কুটীর সমষ্টি দেখা যায়। এইগুলিই সরিষার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। প্রায় বাবো বৎসর পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি সেবাত্রস্ত সন্ন্যাসী মাঠের মাঝে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার ভিত্তি দিয়া নূতন করিয়া গল্পাসমাজ-গঠন। সেই জন্ত তাঁহারা বিশেষ করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থারই উপর স্বেচ্ছা দিয়াছিলেন।

একদিন আমাদের দেশে যখন সমাজ সংহত এবং সমাজবোধ প্রবল ছিল তখন সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন-অনুযায়ী সমাজের নিকট সেবাগ্রহণ করিত এবং আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিত। সেদিন সেবাগ্রহণেও লজ্জা ছিল না, সেবা করিতেও গৌরব ছিল না। তাই তখন সমাজসেবার জন্ত কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আজ সমাজ সংহতি হারাইয়াছে এবং আমাদের সমাজবোধ ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই নানা ভাবেই আজ সমাজসেবার কেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে সেবার ভার লইবে কে? একদিন যে সন্ন্যাসী সমাজের নিকট হইতে জীবনধারণের অধিকারের বিনিময়ে অধ্যায়সম্পদ দানের ও সেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ নিতান্তই ভিক্ষাত্রতী, সমাজের প্রতি তাঁহার কর্তব্যসাধনে বিমুখ। তাই দেশের ভিখারীর সংখ্যাই বাড়িয়া চলিয়াছে, সেবকের সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, তাই অধিকাংশ স্থলেই তথাকথিত আশ্রম-গুলি সেবাকেন্দ্র না-হইয়া ভিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইতেছে। অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণের তপোবনগুলি শিক্ষা, দীক্ষা, অধ্যায়সাধনা ও জ্ঞানচর্চা সকল দিক্ দিয়াই প্রাণের কেন্দ্র ছিল। একথা মনে করিলে ভুল করা হয় যে সেই আশ্রমগুলি শুধু অধ্যায়-সাধনা লইয়া ব্যাপ্ত ছিল। এদেশের আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি নামেই প্রোক্ত; বাৎস্তায়নও ঋষি ছিলেন।

আমী বিবেকানন্দ আমাদের কালে সন্ন্যাসের সেই প্রাচীন আদর্শ নূতন করিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী-সেবকগণ আজ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত সেবাপ্রতিষ্ঠান-গুলি সাধারণতঃ বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু আমি জানি না যে, আমি যে-প্রতিষ্ঠানটির কথা বলিতেছি তাহার সহিত কয় জনের পরিচয় আছে। বাংলার একটি নিভৃত অথাতনামা পল্লীতে এই যে কয়েক জন সন্ন্যাসী মিলিয়া তাঁহাদের বাহ্যঐর্ধ্যহীন, অনাড়ম্বর চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা ভাবী কালের সূচনা করিয়াছেন, ভাবী

সমাজগঠন করিতেছেন তাহা সত্যই বিশ্বয়ের ব্যাপার; তাহার সন্ধান লওয়া আমাদের প্রয়োজন।

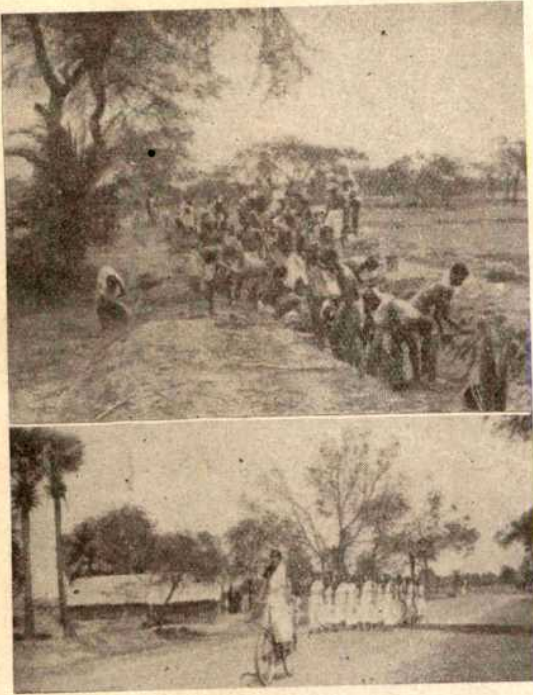


(১) মেয়েদের খেলা। (২) বিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্রী।
(৩) মেয়েদের খেলা। (৪) ডিলের দৃশ্য।

এই আশ্রমের বাহিরের সৌষ্ঠব কিছু নাই। জুই

টুকরা জমির উপর ইতস্ততবিম্বিত কয়েকটি কুটির, একটি ইষ্টকনির্মিত ক্ষুদ্রায়তন গৃহ, দেখিলেই বিদ্যালয় বলিয়া চেনা যায়, এই লইয়াই সরিষার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

ধানক্ষেতের জমি উচু করিয়া তাহার উপর আশ্রমগৃহ ও কুটিরগুলি নির্মিত হইয়াছে চারি দিকে নয়নাভিরাম পল্লীদৃশ্য দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আশ্রমের সম্মুখে রাজপথের অপর পারে সরিষাগ্রাম; দূরে বৃক্ষপল্লবের অন্তরালে আরও দু-একটা গ্রাম দেখা যায়। এই কয়েকটা গ্রামকে অবলম্বন করিয়াই আশ্রমের কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত। বাংলার অত্রাশ্রম শত শত পল্লীগামেরই মতই এই কয়েকটি গ্রাম, কোন বিষয়ে



(১) ছেলেদের সমাজ-সেবা।

(২) মেয়েরা মাচা করিয়া যাইতেছে।

বিশেষত্বপূর্ণ বা উন্নতিশীল নহে। সেই অম-কাঁঠাল-নারিকেলের বন, বাশের ঝাড়, সেই শৈবালচ্ছন্ন ছোট ছোট পুষ্করিণী, সেই প্রাচীন গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ভগ্নমন্দির, কয়েকটি কোঠাবাড়ি ও পূর্ণপ্রায় দীর্ঘিকা এবং এই

অবহাওয়ার মধ্যে মানুষ ম্যালেরিয়া-প্রসিদ্ধিত দারিদ্র্য-ভরক্লিষ্ট জরাজীর্ণ গুটিকতক বাড়ানী সন্তান। তাহাদের মধ্যে তথাকথিত ভদ্র ও অভদ্র দুই শ্রেণী বাস করে। বাহারা ভদ্র বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের মধ্যে বাহারা ভাগ্যবান তাহারা শহরে চাকরি করে এবং ধীরে ধীরে পল্লীজননীর হোঁচল ত্যাগ করিয়া নগরেই আশ্রয় খোঁজে; আর বাহাদের অদৃষ্টে সে-সৌভাগ্য জোটে নাই তাহারা গ্রামে থাকিয়া দলাদলি করে, মামলামোকদমা করে, পরনিন্দা করিয়া তাম্রকূটের ধোঁয়ায় পল্লী-চণ্ডীমণ্ডপ ধুমায়িত করে আর প্রতিদিন তাহাদের অদৃষ্টকে দ্বিজার দেয়। আর বাহারা অভদ্র বলিয়া পরিচিত তাহাদের মধ্যে বাহাদের অল্পবিস্তর জমি আছে তাহারা চাষ করিয়া কোনমতে দিনাতিপাত করে; বাহাদের জমি নাই তাহারা হয় দিনমজুরী করে, না-হয় নিকটবর্তী পাটের কলে কুলির কাজ করে। গ্রামের মেয়েরা গৃহকর্ম করে এবং তাহার অবসরে কলহ ও পরচর্চা করে। এখানকার পল্লীজীবনে আজ আর কোন স্ত্রী, কোন সৌন্দর্য বা মাধুর্য্য নাই; মানুষের মনকে মুক্তি দিবার, তাহাকে সার্থকভাবে ব্যাপৃত করিয়া রাখিবার কোন আয়োজনই আজ দেখানো নাই।

এরূপ আবেষ্টনের মধ্যেই ১৯২১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সরিষা আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ইহার বাহিরের ঐশ্বর্য্য বিশেষ কিছু নাই। যে দুই টুকরা জমির উপর আশ্রমটি অবস্থিত তাহাদের একটির আয়তন প্রায় তিন বিঘা। তাহার উপরে বিদ্যালয়গৃহ ছাড়া আরও পাঁচ-ছয়টি কুটির আছে; সেগুলি যথাক্রমে বায়ামাগার, ডাক্তারখানা, রন্ধনগৃহ, ঠাকুরপূজার মন্দির এবং আশ্রমের সাধু ও অতিথিদের থাকিবার স্থান। যদি ইহাদের কোন বিশেষত্ব থাকে, তবে সে তাহাদের আড়ম্বরহীন পরিপাটি পরিচ্ছন্নতা; বিদ্যালয়ের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বা অত্র কোথাও একটুও আবর্জনা নাই দেখিয়া সত্যিই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

অদূরে রাস্তার ওপারে সারদামন্দির বা মেয়েদের শিক্ষালয়। একটা নালায় উপর বাশের সেতু, সেই সেতু অতিক্রম করিয়া সারদামন্দিরে যাইতে হয়। প্রকাণ্ড একটি চারচালা মাটির কোঠা, পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছন্দভাবে সাজান;

কোথাও আয়োজন-বাছল্য নাই। আশ্রমের সর্বত্রই একটা সংঘত শুচিতার ভাব রহিয়াছে।

১৯২৩ সালে ছেলেদের বিদ্যালয়টি, শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এখানে ছেলেরা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়ে। ইহার ছাত্রসংখ্যা অনুমান দুই শত। এখানকার ছাত্রগণ প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্টের বৃত্তি পাইতেছে।

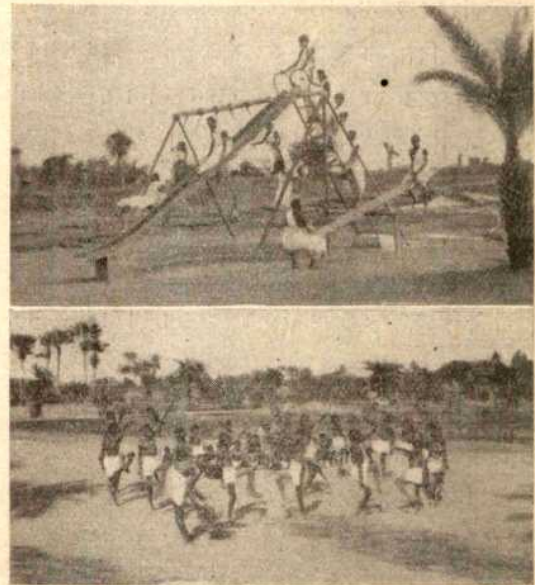
সারদামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯২৭ সালে; প্রথমে ইহা সামান্য একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং সম্প্রতি ইহার সঙ্গে উচ্চ-বিদ্যালয়েরও একটি শ্রেণী খোলা হইয়াছে। দুইটি বিদ্যালয়েই একদিন শিক্ষার্থী জুটত না; শিক্ষামন্দির আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র পাঁচটি ছাত্রকে লইয়া। সারদামন্দিরের আরম্ভ কয়টি ছাত্রীকে লইয়া তাহার সংখ্যা ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু আজ উভয় বিদ্যালয়েই স্থানাভাব ঘটিতেছে। শিক্ষামন্দিরের ছাত্রের সংখ্যা পূর্বেই বলিয়াছি, সারদামন্দিরের বর্তমান ছাত্রী-সংখ্যা এক শতের অধিক। এমন কি পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছাত্রীদের জন্ত আশ্রমের কর্ম্মীগণকে মানখণ্ডা ও কলাগাছি গ্রামে আরও দুইটি সারদামন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। সেই দুইটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যাও মোট প্রায় এক শত হইবে। সারদামন্দিরের ছাত্রীগণও প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিতেছে।

ছেলেমেয়েদের বৃত্তিলাভের কথা এই জন্তই উল্লেখ করিয়াছি যে, সাধারণ হিসাবেও ইহারা বাংলা দেশের অন্ত্যন্ত শত শত বিদ্যালয়ের চেয়ে কম নহে। বরং যদি বৃত্তিলাভ বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ও মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে হয়ত ইহারা অল্প বহু বিদ্যালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

কিন্তু শিক্ষামন্দির ও সারদামন্দিরের বিশেষত্ব সেখানে নহে। সে বিশেষত্ব চোখে পড়ে যখন এই বিদ্যালয় দুইটির ছাত্রছাত্রীগণকে দেখি।

অল্পবয়স্ক গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা স্কেয়াড ড্রিল করিতেছে, লেফট রাইট করিয়া বাঁশী বাজাইয়া রাজপথ দিয়া মার্চ করিয়া যাইতেছে, মেয়েরা সাইকেল চড়িতেছে, জুজুংসু করিতেছে;

ছেলেরা কুস্তী করিতেছে, সকলেই দেহ-মন দিয়া কাজ করিতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, খেলা করিতেছে। সকলের দেহ বলিষ্ঠ, গতি ক্ষিপ্র, মন চলিষু সবল, মুখশ্রী উৎসাহে উজ্জ্বল, দীপ্ত; সকলেরই মনে আশা, আনন্দ ও স্বাধীনতা। তাহারা আপন কর্ম্মের ভার আপনারাই লইয়াছে; ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ সম্মান আছে। সেই সম্মানের উপর ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের ভারও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সম্মানের বিভিন্ন বিভিন্ন শাখা আছে, কোনটির উপর বিচারের ভার, কোনটির উপর নৈশবিদ্যালয়-চালনার ভার, কোনটি ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে, কোনটি বা সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নূতন নূতন আদর্শ ও চিন্তা আহরণ করিবার ও ছড়াইবার ভার লইয়াছে।



(১) মেয়েদের খেলা। (২) ছেলেদের নৃত্য।

বিদ্যালয়গৃহ পরিষ্কার রাখিবার ভারও ছেলেমেয়েদেরই উপর; এমন কি তাহারা পাঠখানাও পরিষ্কার করে।

এখানকার ছেলেমেয়েরা গ্রাম্যজীবনের গতানুগতিক লোকাচার, অন্ধ সংস্কার ও পুরুষানুক্রমিক অজ্ঞতা, পল্লীমূলভ সকল জড়তাই ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়াছে। ভোরের স্তিমিত আলোকে এখানকার ছাত্রীরা একা বা দলে দলে

সারদামন্দিরে ছুটিয়া আসে ; রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শিক্ষা দিয়া ফেরে ; পিঙ্গল জ্যাকেট পরিয়া নেত্রীর আদেশের সঙ্গে তাল রাখিয়া ডুল করে । এখানকার ছেলেরা গ্রামের পথ তৈরি করে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে, নৈশবিদ্যালয় চালায়, আনন্দ-উৎসব করে ।

এই নির্ভর নিরলস, কর্মনিপুণ, আনন্দমন্দের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখিয়া সত্যিই তৃপ্ত হইতে হয় । বাংলার অতি অল্প বিদ্যালয়েই এইরূপ দৃশ্য দেখা যায় ।

এখানে একটি পরিপূর্ণ সমাজের ছবি চোখে পড়িল । ছেলেমেয়েরা সকলেই আশ্রমকে ভালবাসে, ইহার সকল কাজেই তাহারা ছুটিয়া আসে, উৎসাহের সহিত বোগ দেয়, অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম সার্থক করে ও আপনার আনন্দদ্বারা তাহাকে সুন্দর করিয়া তোলে । এখানে তাহারা শুধু বিদ্যাই লাভ করিতেছে না, নবজীবনের দীক্ষালাভ করিতেছে । এখানকার বিদ্যালয় দুইটির কর্ম মাত্র বিদ্যাদানেই পর্যাবসিত নহে ; বাহিরের বৃহত্তর সমাজ যেমন নানা চেষ্টার ভিতর দিয়া নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া পূর্ণ, এখানকার এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়সমাজও তেমনই বিদ্যাল্যভের ব্যবস্থা, সমাজসেবা, আনন্দ-উৎসব ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আপনার প্রাণশক্তির বিকাশ করিয়াছে ।

বিদ্যালয়ের এই সমাজ-রূপ সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে না ; আমরা বিদ্যার একটি খণ্ড রূপ দেখি, ইহার উদার ও মহত্তর রূপ দেখিতে পাই না । এই জন্তই আমাদের বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশ স্থলেই নিছক বিদ্যাল্যভেরই কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়, সেগুলির কোন অধ্যাপকজীবন বা সত্তা থাকে না । তাহার ফলে সেখানে বিদ্যাল্যভ করা যায় বটে কিন্তু জ্ঞানলাভ করা যায় না, সেখানে চরিত্রগঠনের বা জীবনবিকাশের কোন সহায়তা পাওয়া যায় না । যেমন খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিতে হইলে খাদ্য ছাড়াও অন্তান্ত বস্তুর প্রয়োজন হয়, তেমনই বিদ্যাকেও

সার্থক করিতে হইলে বিদ্যালয়ে অন্তান্ত নানা আয়োজন করিতে হয়, বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র অথচ সর্বাত্মপূর্ণ সমাজে পরিণত করিতে হয় ।

এই আশ্রমে সেই বিদ্যালয়-সমাজকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম । তাহার জন্তই ইহার শিক্ষা সার্থক হইতেছে । আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন অবকাশ ; বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজ বন্ধ ; কিন্তু ছেলেমেয়েদের কাজের অবকাশ ছিল না । সেখানে তখন শিক্ষাশিবির বসিয়াছিল । দ্বিপ্রহরে দেখি এক দল ছেলে ধূলাকাশ মাথিয়া ঘনাক্ত দেহে গান করিতে করিতে ফিরিল ; দ্বিজ্ঞান করিয়া জানিলাম ছেলেরা এবার গ্রামের একটি জীর্ণ পয়ঃপ্রণালী সংস্কার করিবার ভার লইয়াছে । তাহাদের দলে কয়েক জন যুবকেও দেখিলাম । শুনিলাম আশ্রমের মহৎ আদর্শ ধীরে ধীরে আর সকলের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছে এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক দল অনুরাগী-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে । মনে হইল ইহাই ত ভাবী কালের বিদ্যালয়ের মূর্ত প্রতীক । একদিন যখন ধর্মবোধ প্রবল ছিল, তখন দেবায়তনগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লীসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল ; তাহার পর নানা কারণে আজ দেবায়তনগুলি তাহাদের আবর্ষণ হারাইয়াছে, ফলে পল্লীসমাজ কোন প্রাণকেন্দ্র খুঁজিয়া পাইতেছে না । অথচ পল্লীসমাজের সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সেই প্রাণকেন্দ্র সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে । সত্যকার বিদ্যালয়ের চেয়ে ভাল কেন্দ্র আর কি হইতে পারে ? দেশের বিদ্যালয়গুলি যেদিন প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান না-হইয়া নবজীবনের তীর্থস্থল পূজামন্দির হইয়া উঠিবে, সেদিন দেশ আপনার প্রাণের সন্ধান পাইবে ।

এইখানে বাংলার এই অধ্যাতনামা নিভৃত পল্লীটিতে দুইটি বিদ্যায়তন দেখিলাম যাহা সত্যসত্যি নবজীবনের তীর্থস্থল পূজামন্দির হইয়া উঠিতেছে ।

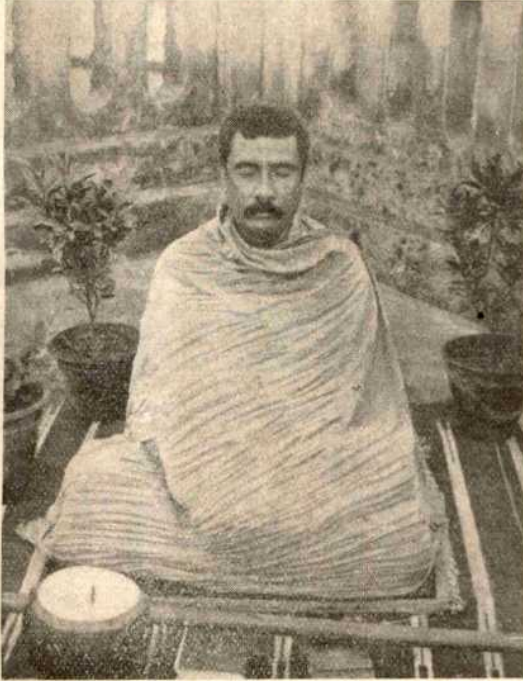
গিরিডির বিবিধ প্রতিষ্ঠান

শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

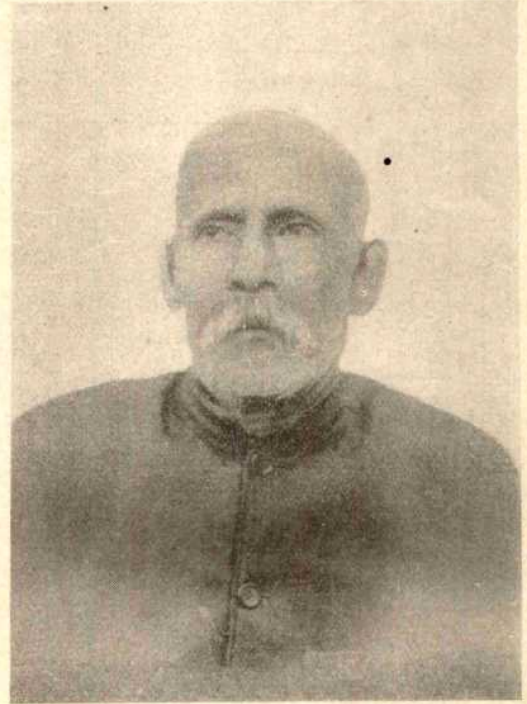
লোকবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা ক্রমে ক্রমে কিরূপে গিরিডিতে লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিলেন, তাহার বিশদ ইতিহাস দিতেছি।

গিরিডি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ ৬তিনকড়ি বহু মহাশয়ের চেষ্টা ও উদ্যোগে তাঁহারই পটভাষিত বাটীতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ইহা পটভা-

সময়ে গিরিডিতে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এক জনও ছিলেন না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মকতপুরা নামক স্থানে পটভার তৎকালীন টীকাইং ৬সিদ্ধনাথ সিংহ মহাশয় প্রদত্ত নিষ্কর জমির উপর একটি ক্ষুদ্র কাঁচা মন্দিরগৃহ নির্মিত হয়। সমাজের স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬আনন্দমোহন বহু, ৬পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৬তিনকড়ি



গিরিডি নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের
প্রতিষ্ঠাতা ৬অমৃতলাল ঘোষ



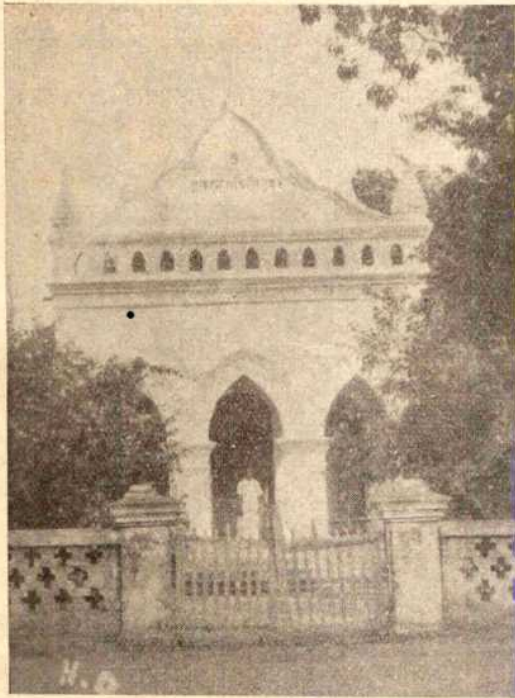
৬তিনকড়ি বহু

ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইত। তিনকড়ি বাবু যদিও হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মধর্মের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহারই উপর সম্পূর্ণভাবে স্তৃত ছিল। সমাজ-প্রতিষ্ঠার

বহু, ৬উমেশচন্দ্র দত্ত ও ত্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এই পাঁচ জনকে লইয়া একটি অছিমগুলী (Board of Trustees) গঠিত হয়। আনন্দমোহন বহু ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরে স্বর্গগত হইলে ৬ভি. রায়, ডি-এল ও ত্রীযুত শশীভূষণ বহু, এম্-এ মহাশয়েরা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

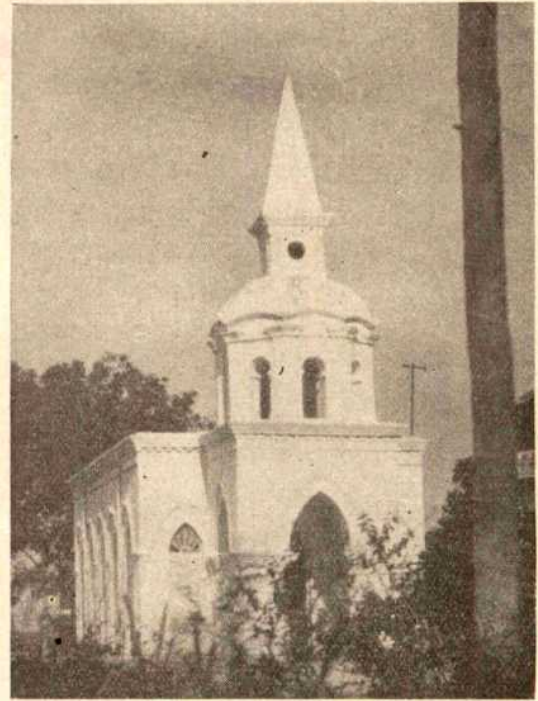
এভাবে ৬তিনকড়ি বার্ষিক হস্তে সমাজ-সংক্রান্ত সকল কার্যের ক্ষমতাই অর্পিত ছিল। তাঁহার এই গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৬ভি. রায়, মিঃ পি. এন. দত্ত (পার্বতীচরণ দত্ত), ৬তিনকড়ি বহু, ৬ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৬রজনীকান্ত নিয়োগী, শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬উমেশচন্দ্র নাগ, এই সাত জনকে লইয়া প্রথম একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত করা হয় ও শেযোক্ত দুই জন যথাক্রমে উহার সম্পাদক ও

মন্দিরের সুপ্রশস্ত উপাসনাগৃহে প্রায় দুই শত ব্যক্তি সমবেত ভাবে উপাসনা করিতে পারেন। প্রতি রবিবারে সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে উপাসনা হইয়া থাকে। উনিশ-কুড়ি বৎসর পূর্বে গিরিডিতে দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল প্রায়



গিরিডি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির

সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। উক্ত সভাগণের মধ্যে মিঃ পি. এন. দত্ত ও শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত আছেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন কাঁচা মন্দিরগৃহ ভূমিসাৎ করিয়া প্রায় চারি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বর্তমান মন্দিরগৃহ নির্মিত হয়। অর্থসাহায্য প্রধানতঃ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইলেও কিয়দংশ ৬তিনকড়ি বহু, ৬ধরগীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শক্তিকর্ষ ভট্টাচার্য্য ও ৬মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতেও পাওয়া গিয়াছিল। এই



গিরিডি নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির

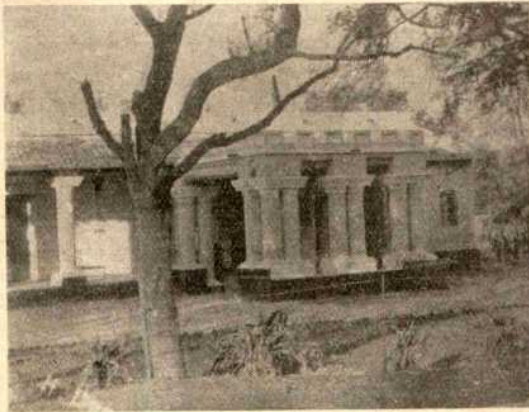
সাতচল্লিশ জন; বর্তমান সংখ্যা প্রায় সত্তর জন। উপাসনাগৃহে বিজলী আলোকের বন্দোবস্ত হইলে মন্দিরের ত্রীভুজি হইতে পারে। এ-বিষয়ে গিরিডিস্থিত প্রবাসী বাঙালীরা চেষ্টিত হইলে স্থখের বিষয় হইবে।

সমাজের বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস মহাশয় পূর্বে লব্ধজ্ঞ ছিলেন। পরে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সাত-আট বৎসর হইল গিরিডিতে নিজস্ব বাটী করিয়া বাস করিতেছেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের অদূরে বারগঙা রোডের উপর সুদৃশ্য 'নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির' অবস্থিত। এক বিধা বার কাঠা হাতার মধ্যে প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইহা নির্মিত হয়। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন কলিকাতার হারিসন রোডের সুপরিচিত জুয়েলার্স মেসার্স

ঘোষ এও সঙ্গের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে সমাজের গৃহ-প্রবেশ-উৎসব কুচবিহারের মহারাণী অমুনীতি দেবী কর্তৃক সম্পন্ন হয়। সমাজের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্ম অমৃত বাবু পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইহার নিজেরও

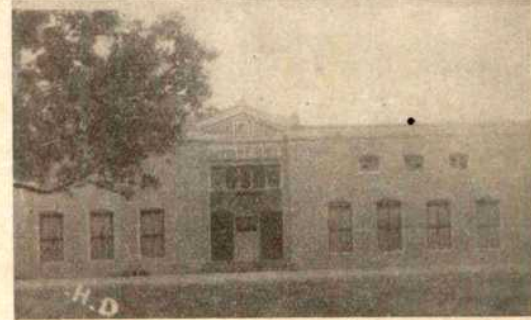
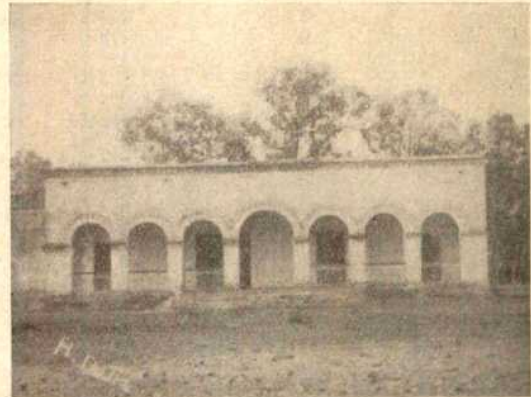
হয়। সংস্থাপকবর্গের মধ্যে শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুত বামনদাস মজুমদার, ঔরজনীকান্ত নিয়োগী, শ্রীযুত শশীভূষণ বসু, শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় ও তাঁহার



ব্যাটুরে দাতব্য চিকিৎসালয়

গিরিডিতে অনেকগুলি বাড়ির আছে। কুচবিহারের মহারাণী প্রদত্ত এক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে সমাজের প্রচারক আশ্রম উক্ত হাতার মধ্যে নির্মিত হয়। গিরিডিতে নববিধান-সমাজ-অন্তর্গত ব্রাহ্মের সংখ্যা নিতান্ত অল্প;—মাত্র তিন ঘর। এ-স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা ও অন্ততম প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার যোগানন্দ রায় মহাশয় উপস্থিত এই সমাজের সম্পাদক ও শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয় ইহার সহকারী সম্পাদক। জীবনকৃষ্ণ বাবুর গিরিডিতে নিজস্ব বাড়ী আছে; তিনি এ স্থানের স্থায়ী অধিবাসী।

গিরিডিতে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে, গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় তন্মধ্যে অন্যতম। বহু বৎসর পূর্বে যখন স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে বাঙালী জনসাধারণ উদাসীন ছিলেন, সেই সময়ে প্রধানতঃ কতিপয় ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বাঙালী ভদ্রলোকের উদ্যোগে এই বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে ইহার নাম ছিল ছোটনাগপুর বালিকা-উচ্চবিদ্যালয় (Choto Nagpur Girls' High School)। পরে ইহা গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় নামে অভিহিত



(১) গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাড়ী।

(২) গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়

সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলা রায়, ডাক্তার শ্রুর নীলরতন সরকারের ভগ্নী শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র, মিস ঔরধারাণী লাহিড়ী (যিনি এক সময়ে কলিকাতা বেথুন কলেজ হোস্টেলের লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন), শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঔতিনকড়ি বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা বাইতে পারে। প্রথমে মাত্র আট জন ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই এই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সর্বসমেত ঊনপঞ্চাশটি ছাত্রী হইলে বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী-আবাস স্থাপিত হয়। সেই সময়ে দুই জন পঞ্জাবী ও কয়েক জন আসামী ছাত্রী ভিন্ন অপর সকল ছাত্রীই বাঙালী ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ

বসাক মহাশয়। উত্তরকালে পুরুষ-শিক্ষকের অপেক্ষা মহিলা-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ অধিকতর সমীচীন বিবেচিত হওয়ার কলিকাতা বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের বর্তমান প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হন। বর্তমান বিদ্যালয়-বাটী পূর্বে কবি কামিনী রায়ের অধিকৃত ছিল; সেই সময়ে তিনি ঐ বাটী এক বৎসর বিনা-ভাড়া বিদ্যালয়ের জন্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শ্রী নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার বাটীতে ছাত্রী-আবাস-স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন ও ভাড়া-বাবদ তাঁহার প্রাপ্য প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা তিনি

মহাশয়কে বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা করেন। ইহার উদ্যোগে ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের তৎকালীন মন্ত্রী ফকরুদ্দিন সাহেবের চেষ্টায় গভবর্ণমেন্ট পুনরায় পূর্বমত—



গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা
চরকা কাটিতেছে



ছাত্রীরা রন্ধন করিতেছে

অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন নাই। মিঃ পি. এন. দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতিতে তের শত টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন; তিনিও ঐ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। এম্. এন. দত্ত মহাশয় বহুদিবসাবধি বিদ্যালয়কে মাসিক এক শত টাকা অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ত্রীযুত গৌরীকান্ত রায়, ত্রীযুত সত্যানন্দ বসু প্রভৃতির নিকট হইতেও অর্থসাহায্য লাভ করিয়া স্কুল-কমিটি উপকৃত হইয়াছিল। বিহার-গবর্ণমেন্টের নিকট হইতেও বিভিন্ন সময়ে মাসিক তিন শত পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সালে নানা কারণে বিদ্যালয়টি অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় নীত হয়। তৎকালে ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে মাত্র আটত্রিশ জন হয় ও গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্য পাঁচ শত টাকা অর্থসাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্কুল-কমিটি ত্রীযুক্তা লাবণ্যবালা ঘোষ, এম-এ, বি-টি

মাসিক পাঁচ শত টাকা অর্থসাহায্যদান আরম্ভ করেন। উপস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা সর্বসমেত চুরানব্বই জন। তন্মধ্যে পাঁচ জন বিহারী, এক জন ওঁরাও ও এক জন ছোটনাগপুরের অধিবাসিনী ভিন্ন অপর সকল ছাত্রীই বাঙালী। বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সর্বসমেত দশ জনের মধ্যে নয় জন বাঙালী; তন্মধ্যে তিন জন গ্রাজুয়েট, এক জন শিক্ষয়িত্রী ছোটনাগপুরের অধিবাসিনী ও বিদ্যালয়েরই ভূতপূর্বা ছাত্রী। ইহা ভিন্ন এক জন বিহারী পণ্ডিত মহাশয়ও আছেন। বিদ্যালয়ের ও ছাত্রী-আবাসের নিজস্ব গৃহ না থাকায় মাসিক বহু অর্থ বাড়িভাড়া-বাবদ ব্যয়িত হইতেছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ক্রয়ের জন্ত কার্যনির্বাহক সমিতি অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সংগৃহীতও হইয়াছে। ত্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত পিতা সাতকড়ি দেব মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ছাত্রী-আবাস-নির্মাণের জন্ত দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। রামগড় ওয়ার্ড এষ্টেট দুই সহস্র মুদ্রা ও রায় অনন্তনাথ মিত্র বাহাদুর পাঁচ শত মুদ্রা বিদ্যালয়-বাটী-নির্মাণের জন্ত দান করিয়াছেন। মিঃ ডি. পি. শর্মা, আই-সি-এস, মিঃ এস. সলোমন, আই-সি-এস, রায়-বাহাদুর ভবদেব সরকার, মিঃ এইচ. হুইটেকার, আই-সি-এস (ছোটনাগপুরের বর্তমান জুডিশিয়াল কমিশনার) প্রভৃতি স্থানীয় ভূতপূর্ব সাবডিভিসনাল অফিসারেরা গৃহনির্মাণের জন্ত

ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্থানের ভূতপূর্ব প্রসিদ্ধ জার্মান অভ্য-ব্যবসায়ী ম্যুব সাহেবের বাসাবাটীটি (যাহা উপস্থিত রাণাবাটী নটুদেহের জমিদার জনকরচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্রগণের অধিকারে আছে) বিদ্যালয়ের-গৃহের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ঐ বাটীতে বর্তমান বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইবার আশা আছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও সম্পাদিকা শ্রীমতী লাবণ্যবালা ঘোষ মহাশয়া ইতিপূর্বে পাঁচ বৎসর বাৎ কটক রায়ভেনশ বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ও লক্ষ্মী ধবর্ষ কলেজের প্রফেসর ও রীডার রূপে তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি স্নানমধ্যাত রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী ও খ্রীষ্টান-সমাজভুক্ত। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ইনি গবর্ণমেন্ট মনোনীত একমাত্র ও প্রথম মহিলা সদস্য। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ ক্রীত হইলে বাড়িভাড়া-বাবদ মাসিক ব্যয়ের কিছু সঙ্কোচ হইবে। বিদ্যালয়-পরিচালনের বর্তমান মাসিক ব্যয় প্রায় আট শত টাকার মধ্যে পাঁচ শত টাকা গবর্ণমেন্ট-সাহায্য দ্বারা সাধারণের অর্ধসাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু উপস্থিত পৃথিবীব্যাপী অর্থকষ্টতা ও অন্ত্য নানা কারণে সাধারণের সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় বিদ্যালয়-পরিচালন বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্ত সম্পাদিকা মহাশয়াব আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের আন্তরিক প্রয়াস বিশেষ প্রাণবন্ত। এতদ্ব্যতীত তিনি হাজারিবাগ ও অন্ত্য দূরবর্তী স্থানস্থ অধিবাসীদের নিকট স্বয়ং সাহায্য শিক্ষা করিতে যাইতেও কুণ্ঠিতা হন না। তাঁহার নিরলস চেষ্টা ব্যতিরেকে বিদ্যালয়-পরিচালন যে বিশেষ কষ্টকর হইত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত এই বিদ্যালয়ে সেবাসুশ্রুতা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, গৃহস্থালী, রন্ধন ও নীতি শিক্ষা দিবারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কাপড় কাটা ও সেলাই, নানা প্রকার কারুকার্য্য, উল-বোনা, চিত্রাঙ্কণ ও মুদ্রিকা সাহায্যে খেলনা প্রস্তুত করিতেও নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। চরকা ও কুটীর-শিল্প-শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। বালিকাদের এই সকল বিষয়ে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পুরস্কার পদক

প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রত্যহ সমবেত অসাম্প্রদায়িক উপাসনার বিধান আছে। সাধারণ কেতাবী বিদ্যানান ভিন্ন ছাত্রীদের শরীর, মন ও হৃদয় উন্নত করিয়া, তাহাদের শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মবোধকে জাগ্রত করাই এই শিক্ষায়তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গিরিডির স্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর গুণে ও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে চলাফেরা খেলাধুলা করিতে পারায় ছাত্রীদেব প্রায় সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবতী। তাঁহাদের শৃঙ্খলাগ্ৰন ও নিয়মানুবর্তিতাও প্রশংসনীয়। বাঙালী ধনী ব্যক্তিগণ যদি এই বিদ্যালয়ের স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের জন্ত সকলে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেন, অথবা অন্ততঃ যদি সকলে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যাবৃদ্ধির জন্ত সচেষ্ট হন, তাহা হইলে প্রবাসী বাঙালীদের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ স্থায়ী হইতে পারে।

গিরিডির বর্তমান উচ্চ-ইংরেজী (বালক) বিদ্যালয় স্থাপনার মূল্যেও প্রধানতঃ বাঙালীরাই ছিলেন। প্রথমে পচষা বাঙালীদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গিরিডিতে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। শেবোক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন পূর্ণানন্দ মিত্র মহাশয়। এই দুইটি বিদ্যালয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এক হইয়া যায়। পচষা বোডের উপর ভাগুরডিহি নামক স্থানে তিনকড়ি বহু, পূর্ণানন্দ মিত্র, ব্রাহ্মদাস কুণ্ডু প্রমুখ ভ্রাতৃলোকদের চেষ্টায় বিদ্যালয়ের বর্তমান নিজস্ব বাটী নির্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত পচষার তৎকালীন টীকাইং অগ্রগ্রহ করিয়া জমিদান করেন। পরে শক্তিকর্ষ বাবুর চেষ্টায় বিদ্যালয়-বাটী বহু উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যালয়ে প্রথম প্রধান শিক্ষক হইয়া আসেন পঞ্চরথীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; পরে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া গিরিডিতেই ওকালতি করিতে থাকেন। তাঁহার বিষয়ে পূর্বে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা উপস্থিত সর্বসমেত চার শত উন্নতবয়স্ক জন; তন্মধ্যে বাঙালী ছাত্রের সংখ্যা এক-শ চল্লিশ জন মাত্র। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত মণিলাল সান্যাল, এম-এ মহাশয় ১৯১৮ সাল হইতে কার্য্য করিতেছেন। অন্ত্য শিক্ষক সর্বসমেত চব্বিশ জনের মধ্যে বাঙালী বারো জন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়

এম-এ, বি-এল মহাশয় প্রায় সাত বৎসর বাবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক রহিয়াছেন।

স্থানীয় উচ্চপ্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় আর একটি বিশেষ কার্যকর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইহা শ্রী. রায়, ডি-এল, ষ্ঠরগীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊমেশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় মকতপুরায় বারগাঙা রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়-বাটী বিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পত্তি। গৃহনির্মাণে দেশীয় এক ভদ্রলোক কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার ছাত্রী-সংখ্যা উপস্থিত চল্লিশ জন। দুই জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী ও এক জন পণ্ডিত মহাশয় বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা সকলেই বাঙালী। গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এই বিদ্যালয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার বর্তমান সম্পাদক।

গিরিডি 'বৃদ্ধশিশু-বিদ্যালয়' প্রায় কুড়ি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রবাসী বঙ্গসন্তানেরা বাহাতে শৈশব হইতে মাতৃভাষার মধ্যবর্তিতায় শিক্ষালাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া প্রধানতঃ তিনকড়ি বহু ও শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগী হইয়া ইহা স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের বর্ষ শ্রেণীর পাঠের সমান শিক্ষা প্রদত্ত হয়। ছাত্রের সংখ্যা সর্বসমেত ছেতল্লিশ জন; ইহারা সকলেই বাঙালী। ছাত্রদের বেতন ও স্থানীয় বাঙালীদের অর্থ-সাহায্য সম্বল করিয়া বিদ্যালয়টি চালিত হইতেছে। ইহার নিজস্ব কোন বাটী নাই। গিরিডিস্থিত প্রবাসী বাঙালীদের ইহার নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায়-সাহেব শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার বর্তমান সম্পাদক। ইনি উপস্থিত রেল-কোম্পানীর কয়লা-বাগে লেবার ইন্সপেক্টর রূপে কার্য করিতেছেন। নিউ বারগাঙায় নিজস্ব বাটী করিয়া ইনি স্থানিভাবে বাস করিতেছেন। ইনি এই স্থানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও অবৈতনিক :

গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনার সহিতও স্থানীয়

প্রবাসী বাঙালীরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তন্মধ্যে ষ্ঠরগীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ষ্ঠগোষ্ঠবিহারী কুণ্ড ও শ্রীযুত শক্তিকর্ষ ভট্টাচার্য মহাশয়েরাই বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তৎকালে সাবডিভিসনাল অফিসারই মিউনিসিপ্যালিটির পদহেতুক (Ex-officio) চেয়ারম্যান হইতেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান কমিশনারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন শ্রীযুত শক্তিকর্ষ ভট্টাচার্য মহাশয়। উত্তরকালে চেয়ারম্যানও কমিশনারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে থাকেন। উপস্থিত সর্বসমেত কুড়ি জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের মধ্যে সাধারণ কর্তৃক বোল জন ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত বাকী চার জন। ইহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সর্বসমেত নয় জন; তন্মধ্যে সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত আট জন। গিরিডি উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা লাক্ষ্যাবালা বোব, এম-এ, বি-টি মহাশয়া গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীতা সমস্ত। এ-পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান পদ দুইটিতে স্থানীয় বাঙালীরাই নির্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। গত বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন রায় অনন্তনাথ মিত্র বাহাদুর ও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীপতি সামন্ত মহাশয়। এ-বৎসর কোন বাঙালী চেয়ারম্যান অথবা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন নাই। শ্রীলোকমুখে শুনিলাম, বাঙালী কমিশনারদের মধ্যে দুই-এক জন তাঁহাদের বক্তৃগত স্বার্থোদ্দেশ্যে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত বাঙালী প্রার্থীদের সমর্থন না করিয়া স্বাভাবিকতার পরাকর্ষী দেখাইয়াছিলেন; তাহাতেই বাঙালীদের এই শাচনীয় পরাজয় ঘটে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিশেষ দুঃখ ও লজ্জার কথা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাহা হউক, গিরিডির প্রবাসী বাঙালীগণ পরবর্তী কমিশনার নির্বাচনকালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এমন প্রার্থীদের যেন সমর্থন করেন যাহাদের দ্বারা অত্যন্ত ভাবে বাঙালীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার কোন আশঙ্কা না থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটির হেড্‌ক্লার্ক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বোব মহাশয় বক্তৃগত বৎসর বাবং উক্ত পদে কার্য করিতেছেন। ইনি অতি কর্মকুশল ব্যক্তি এবং গিরিডির স্থায়ী বাসিন্দা; এ-স্থানে তাঁহার নিজস্ব বাটী আছে। শ্রীযুত সত্যীশচন্দ্র

বোম্ব কুড়ি বৎসর একাদিক্রমে মিউনিসিপ্যাল ওয়ারসিয়ার রূপে কার্য্য কবিতেন।

হাজারিবাগ ব্যাঙ্কের একটি শাখা পচরা রোডের উপর অবস্থিত। বাটীটি ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের নিকট ব্যাঙ্ক বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে। ইহা প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ব্যাঙ্ক-পরিচালনে বর্তমান ম্যানেজার শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গিরিডিতে নিজস্ব বাটী করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

স্থানীয় ব্যাটরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল প্রধানতঃ ৮তিনকড়ি বহু, ৮ধরদীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮রাজকৃষ্ণ সাহানা, ৮গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু, শ্রীযুত শক্তিকর্ষ ভট্টাচার্য্য, ৮ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার প্রভৃতির উত্তোগে ও অর্থ-সাহায্যে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য সমুদয় ইষ্টক ক্রয়ের ব্যয় বহন ও চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বহু বৎসরব্যধি এক শত টাকা করিয়া মাসিক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ৮অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় একাদিক্রমে বহু বৎসর যাবৎ এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই একখানি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ের একটি কক্ষে এখনও শোভা পাইতেছে। ইহাব গ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জেন ভিন্নও গিরিডিতে অনেকগুলি বাঙালী চিকিৎসক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ যোগানন্দ রায় মহাশয়ের পসার সর্বাধিক। ডাঃ জয়সুন্দর রায় মহাশয়ও গিরিডির এক জন লক্ষ্যপ্রার্থী চিকিৎসক ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। তন্নিম্ন ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ডাঃ শিরীষচন্দ্র বহু, ডাঃ গোপীবল্লভ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এ. বি. দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই স্থানে চিকিৎসা-ব্যবসারে লিপ্ত আছেন। ইহাদের মধ্যে যোগানন্দ বাবু, গোপীবল্লভ বাবু ও হরেন্দ্র বাবু বাড়িঘর করিয়া এই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস কবিতেন। ইহা ভিন্ন গিরিডিতে কয়েক জন বাঙালী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কয়েক জন কবিরাজও আছেন।

স্থানীয় উকীলের সংখ্যা সর্বসমেত আটগ্রন্থ জন; তন্মধ্যে বাইশ জন বাঙালী। স্যাডভোকেট চারি জনই

বাঙালী;—তাঁহাদের নাম, ত্রীসতীশচন্দ্র রয়, ত্রীশক্তিকর্ষ ভট্টাচার্য্য, ত্রীপ্রাণকৃষ্ণ সামন্ত ও ত্রীবৈজ্ঞান্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় উকীল-লাইব্রেরীটি শক্তিবাবু, ৮ধরদীধর বাবু প্রমুখ বাঙালীদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ইহার সংলগ্ন একটি টেনিস-কোর্টও আছে। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় ইহার বর্তমান সম্পাদক।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিতে চাই। গিরিডির সাধারণ জনহিতকর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই মুখ্যতঃ প্রবাসী বাঙালীদের চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। এ-যাবৎ স্থানীয় জনসাধারণের সহিত প্রবাসী বাঙালীদের পারস্পরিক মধুর সৌহার্দ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি উগ্র প্রাদেশিকতা প্রকট হওয়ার বিহারী ভ্রাতাবা বাঙালীদের অন্ত চক্ষে দেখিতে আবিস্ত করিয়াছেন ও এ-বিষয়ে আন্দোলনও শুরু হইয়াছে। বাঁহারা গিরিডিকে নিজেব দেশ বলিয়াই জ্ঞান করেন, গিরিডির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কামনোবাক্যে চেষ্টা করেন ও স্বোপার্জিত অর্থ মুক্তহস্তে দান করেন,—বস্তুতঃ গিরিডির বর্তমান সমৃদ্ধির মূলে বাঁহারা, তাঁহাদের বিপক্ষে এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা নীতির দিক দিয়া যে কত বড় অন্ত্রায় ও কিরূপ অশোভন, তাহা আব কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

উপসংহাবে আর একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। স্থানীয় বাঙালী যুবকদের সামাজিক জীবনে আশাহীন প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য না করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। পরস্পরের মধ্যে মিলন ও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য মিলনক্ষেত্র আছে বলিয়া শুনি নাই; যদিও “মিলনী” নামে একটি নামমাত্র সমিতি আছে। সেদিন পর্যন্ত লাইব্রেরী বলিতে গিরিডিতে কিছু ছিল না। সম্প্রতি একটি ছোট লাইব্রেরী হইয়াছে। গিরিডিতে স্থায়ী বাঙালী যুবকের সংখ্যা নিত্যান্ত অল্প নহে। কিন্তু তৎসঙ্গেও সেখানে একটি উপযুক্ত লাইব্রেরী না থাকায়, তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা অথবা মানসিক উৎকর্ষের বিষয়ে যদি কেহ কটাক্ষ করে, তাহা হইলে সপক্ষে বলিবার তাঁহাদের হয়ত বিশেষ কিছু থাকিবে না। সুখের বিষয়, সাহিত্য-আলোচনা, আবৃত্তি, গীতবাদ্য প্রভৃতির জন্য

সময়ে সময়ে 'বাগী বৈঠকে'র অধিবেশন হয়। বৈঠকের পৃষ্ঠপোষক ষাঁহারা, তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে বর্তমান লাইব্রেরীটির উন্নতির অথবা একটি উপযুক্ত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ধড়বান হইতে পারেন। উন্মুক্ত বাতাসে যুবকদের ক্রীড়া ও শরীরচর্চার জন্য কাছারীর নিকট সাধারণের অর্থসাহায্যে একটি সুপারিসব ক্রীড়াক্ষেত্র বহু দিন হইল ক্রীত হইয়া পড়িয়া আছে শুনিয়াছি; তাহার এক পার্শ্বে একটি ক্লাব হইবারও কথা আছে। কথা অবিলম্বে কার্যে পরিণত হইলে, বিশেষ যুথের বিষয় হইবে। ক্রীড়া-কোতুক, গীতবাদ্য, বিদ্যানুশীলন, সাহিত্যচর্চা,

সামাজিক মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রবাসী বঙ্গ-যুবকদের অগ্রণী দেখিতে আশা করি, সেই জন্য এই মন্তব্যটি করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।*

* শ্রীযুত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত আশুতোষ বহু প্রভৃতির নিবট হইতে প্রবন্ধ-রচনার যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি। শ্রীযুক্তা লাবণ্যবালা খোষ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রিন্টিং উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কিত ছবিগুলি ও মেসার্স লালমুখী এণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে প্রিন্টিং ইলেকট্রিক কোম্পানীর বাটার ছবিখানি পাইয়াছি। বাক্য কটোগুলি প্রায় সমস্তই গিডিডির কটোগ্রাফার মি: এইচ. সি. দত্ত অল্পমূল্যে তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মহোৎসব

শ্রীযুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবদ্বীপের বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ঠাকুর হরিদাস গোস্বামী এসেছেন মহোৎসবে আমাদের গ্রামে। দ্বৈত মাস, গঙ্গার উপকূল বিশাল বুড়ো বটেব তলে মহাসংকীর্ণনে জেগে উঠেছে মুহূর্ত্তমান গ্রাম। নবোদিত রবির রাঙা কিরণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে উকি মেরে দীপ্ত করেছে উৎসব। সভার অনতিদূরে মাধবজীব মন্দির থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে নহবতের করুণ সুর। গ্রামের জমিদার-পরিবারের জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থা হয়েছে। জাতে 'বাবু' গন্ধবশিক। তাঁরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক। বাব মাস থাকেন কলকাতায়। কেবল প্রতি-বছর এমন সময়ে গ্রামে আসেন তাঁদের গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রী মাধবজীউর মহোৎসব উপলক্ষে। শহর থেকে তাঁদের সম্প্রদায়ের আরও অনেক নবনারী এসেছেন উৎসবে। গ্রামের দশজনও জড়ো হয়েছেন। মহিলারা ভক্তীগদগদচিতে গলায় আঁচল দিয়ে মধুব হবিনাম সুনছেন ঠাকুরেব মুখ থেকে। জাঁকাল রকমের হাটবাজার বসেছে মাধবজীর ঘাটের চার ধারে। গোবরার মা প্রতি-বছরই মেলায় আসে

তাদের গাঁ থেকে। এ-বছরও সে আর গোবরা এসেছে। গোববা মা'র মাথায় এক মন্ত ঝুড়ি। তাতে আছে মাটির পুতুল, মেয়েদের মাথাব কাঁটা আব বেলেয়ারি চুড়ি। ভাল রকম একটা জায়গা দখল ক'বে সে সরসাম সাজিয়ে বসল। মাঝে মাঝে গলা হাঁকে আর ধন্দের বুঝে চোপ্ মারে। গোবরা ছোট্ট ছেলে। সে ছটসট করেছে হরিনাম সুনতে বাবে ব'লে। তার মা তাকে সাবধান ক'রে দিল সে যেন না কিছু হোঁয়, কিছুতে যেন তার গা না লাগে। সে যে বাগদীর ছোল। গোববার বাপের মতন সে একটু ডানপিটে। সে ভাল আসন দেখে বাবুদের ওধারে এগোয়। তার মা'র বুক ছুঁ ছুঁ ক'রে উঠে দেখতে পেয়ে। 'বড়বাবু বা রাগী লোক। তেনা দেখতে পেলে কি গোববাকে আন্ত রাখবেন।' সে চট্ ক'রে উঠে গোববাকে ধরে গালে একটা থাবড়া মেরে সরিয়ে নিয়ে গেল। গোবরা কিছুতে তার মা'র কাছে থাকবে না। তাব মা অনেক ক'রে তাকে বুঝিয়ে দিলে যদি সে বাড়াবাড়ি করে তা হ'লে 'বাবুদের' বাড়ির ভজুয়া লাঠি মেরে তার

মাথার খুলিটা ভেঙে দেবে। সে হুপ করলে সে আর ওধারে বাবে না। এক পরশা দিয়ে একখানা তেল-ভাজা বড় পাপর কিনে মাধবজীর শানু-বাধানো ঘাটের বাঁ-পাশে একটা ভাঙা পৈঠের উপর বসে, খেতে খেতে পার-বাটের নৌকাযাত্রীদের দেখতে লাগল। বেলা বাড়লো। ঠাকুর হরিদাস গোস্বামী সকালকার মত সভাভঙ্গ ক'রে উঠলেন। তিনি জমিদার-বাড়ির পৈতৃক গুরুদেব। গোঁড়া গোসাই ব্রাহ্মণ। গৌর রং, মোহারা চেহারা, মাথা মুড়ানো, নাকে তিলক, গলায় কঙ্কী এবং একগোছা পৈতা, পরনে গরদের কঁচান ধুতি, খালি পা; দেখলে মনে হয় যেন আভিজাত্যের গৌরবে গৌরবাসিত। মাধবজীর ভোগের সময় হ'ল। ভেঁপু বেজে উঠল।

গোসাইজী যাবেন স্নানে। পথে শত শত লোক তাঁর পায়েব ধুলা ভক্তিসহকারে মাথায় ঠেকালে। তারা ভাবলে তাদের জীবন আগ্র ধস্ত হ'ল ঠাকুরের স্রীচরণের ধুলিতে। শুধু বারা জীবনের এই পরম সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হ'ল তারা গ্রামের ছোট জাত। ভয়ে ভয়ে দূর থেকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ ক'রে তারা মনের ক্ষোভ মেটালে। বড়বাবু কড়া হুকুম কোন ছোটলোক যেন ঢুকতে না পার ঘাটে। ভজুরা সদলবলে বাড়ে লাঠি নিয়ে ঘিরে টাঁড়াল মাধবজীর ঘাট। গোব্বার মা রুদ্র নিঃশ্বাসে ছুটে এল গোব্বা বুঝি কি সর্জনশ করে দেখতে। “ওরে গোব্বা দূর থাক। ছুয়ে ফেলিস নি যেন ঠাকুরকে...। এখানে চৌধুরীপাড়ার খেঁদী কাঁটা কিনতে এসে দোকান-ওয়ালীকে দেখতে না পেয়ে হাঁকলে, “গোব্বার মা কোথায় গেলে গো—ও—ও—ও।” “এই যে হেথা, কি

নিবে গা মাসি?” গোব্বার মাথায় কিন্তু ভূত চাপলো। তার মা গেল চ'লে। সে বুপ ক'রে জলে নেমে এক ডুবে স্নাত্তরে গেল ঘাটে ব্যাপারখানা দেখতে। ঠাকুর স্নান শেষে ঘাট উঠলেন। গোব্বা তাড়াতাড়ি তাঁর পা-দুটো জড়িয়ে মিনতি করলে, “ঠাকুর, আমি যাব মাধবজীর মন্দিরে আপনার সাথে।” বড়বাবু চোখ রাঙিয়ে ধমকালেন, “কে তুই?” ভীড়ের ভিতর থেকে কে এক জন ক্ষীণকণ্ঠে বললে, “তালপুকুরের চুড়িওয়ালীর ছেলে। ঠাকুর ওক হোঁবেন না; হোঁবেন না। ও ছোট জাত।”

মাধবজীর ত কোন জাত নেই বড়বাবু, উনি সকল জাতের মধ্যে যে.....”

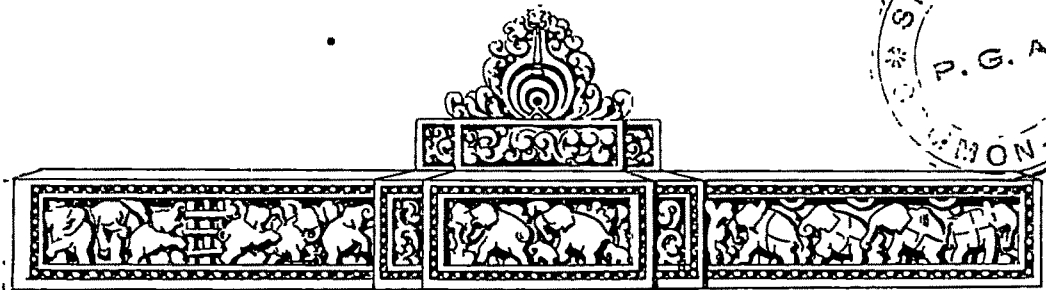
“চোপুরুও উল্লুক, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?”

“কিন্তু আজ আমি ঠাকুর তোমায় হাড়ব না।” অতটুকু ছেলে গোব্বা। তার বুকের পাটা দেখে বড়বাবু রাগে ধর ধর ক'রে উঠলেন। হুকুম কবলেন, “ভজুরা?”

“হজুর।”

সকলে এক অপ্রত্যাশিত আশঙ্কায় শিউরে উঠলো। এক মুহূর্ত্ত এবং ভজুরার সঞ্চালিত লাঠি যমক সজোরে আঘাত করল ঠাকুরের মাথায়। কপালের দিকে খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। সবাই নির্বাক। সব চূপচাপ। বিনামেবে বজ্রপাতের মত ভজুরার লাঠির আঘাতে ঠাকুরের রক্তপ্লাবিত অচেতন দেহ ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়লো ঘাটের উপর। বাবুরা পাগলের মত ছুটছুটি করতে লাগলেন চার দিকে।

* * * * *
মাধবজী সেদিন ভোগ পেলেন না।



দৃষ্টি-প্রদীপ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

২

যাবার দু-দিন আগে জিনিষপত্র গোছাচ্ছি—হঠাৎ হিবথ্রী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে কখন ঝাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে ওর দিকে চাইতেই হেসে ফেললে। বললে—আপনি নাকি চলে যাবেন এখান থেকে?

অমি বললাম—যাবই ত। তার পব এত দিন পরে কি মনে করে? হিবথ্রী তার অভ্যাসমত আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললে—কবে যাবেন?

—বুধবারে বিকেলে, গাড়ী ঠিক করা আছে, চাকদাতে গিয়ে উঠব।

হিবথ্রী একবার ঘরের চারি ধারে চেয়ে দেখলে। বললে—আপনার সে বড় বাস্তবতা কই?

—সেটা কানুর বাবার কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিয়েছি। অত বড় বাস্তব কি হবে, তা ছাড়া সঙ্গে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ানোও মুশ্কিল।

হঠাৎ হিবথ্রী ঝপ্ ক'বে মেঝেতে ব'লে পড়ল—কর্জ্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললে—না আপনি যেতে পারবেন না। দেখি দিকি কেমন যান?

আমার হাসি পেল ওর রকম দেখে। খুব আনন্দও হ'ল—একটা অজুত ধরণের আনন্দ হ'ল। বললাম—তোমার তাতে কি, আমি যাই আর না-যাই? তুমি ত আর এত দিন উকি মেরেও দেখতে আস নি হিবথ্রী, তুমি আমার পাঠশালা পর্যন্ত যাওয়া ছেড়েছ।

—ইস্! তাই বইকি!

—তুমি ভেবে দেখ তাই কি না। উড়িয়ে দিলে চলবে না, হিবথ্রী। আমি যাবই ঠিক করেছি, তুমি আমার আটকাতে পারবে না। কানুর জন্তে কানুর আটকায় না—এ তুমি নিজেই আমার একদিন বলেছিলে।

হিবথ্রী বালিকাহুলভ হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলে

বললে—ওই! কথা যদি একবার শুরু ক'রে দিলেন, ত কি আর আপনার মুখের বিরাম আছে? কানুর জন্তে কানুর আটকায় না, হেন না তেন না—মাগো—কথার খুঁড় একেবারে!

—সে যাই হোক, আমি যাবই।

—কখনো না। ইং, বললেই হ'ল যাব।

আমি চুপ ক'রে রইলাম—ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক ক'রে আর লাভ কি।

দেখি যে বিকেলে পাঠশালায় হিবথ্রী বইখাতা নিয়ে হাজির হয়েছে। সে এসে সব ছেলেমেয়েকে ব'লে দিলে আমার পাঠশালা উঠবে না, আমি কোথাও যাব না, সবাই যেন ঠিকমত আসে। এমন সুরে বললে যে সে যেন আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বললে—এই হাঁড়, মাষ্টার-মশায় তোমায় বলেছিলেন না ধারাপাত আনতে—কেন নি কেন ধারাপাত? এই সোমবারের হাট থেকে আনতে ব'লে দেবে। বুঝলে?

হাঁড় বোকাব মত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—মাষ্টার-মশাই যে সোমবারে চলে যাবেন এখান থেকে?

হিবথ্রী তাকে এক তাড়া দিয়ে বললে—কে বলেছে চলে যাবেন? মেরে হাড় ভেঙে দেব ছোঁড়ার! যা বলছি তা শোন। বাদর কোথাকার—

আমি বললাম—কেন ওকে মিথ্যে বকছে হিবথ্রী, ছেলে-মানুষকে—ওর দোষ কি, আমি যাবই, কেউ আমার আটকাতে পারবে না।

হিবথ্রী স্বভাব দিয়ে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। যাবেন ত যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে ও রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বললে—গুড়ের ভাড়াটা কই!

—সেটা তিনকড়িদের দিয়ে দিইছি। দু-দিনের মত

খানিকটা শুষ্ক ওই বাতীতে রেখেছি—হুটো দিন ওতেই চলে যাবে।

হিরণ্ময়ী অন্ত দিনের মত বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। একবার বাইরে যাবার সময় ও সরে দরজার কপাটের আর দেওয়ালের মধ্যের যে জায়গাটুকু, সেখানটাতে দেখি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলাম—ওখানে না, ওখানে না—কাপড়ে কাগিটালি লেগে যাবে কি না—বার হয়ে এস—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি ওব ডাগর চোখটুকু জলে ভ'রে টল টল করছে। হিরণ্ময়ীর চোখে জল! অবাক, এ দৃশ্য ত কখন দেখি নি! ও 'জল-ভরা ধরা-গলায় বললে—আপনি বলুন, যাবেন না, মাঠার মশায়। আমি তখন পাঠশালায় বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তাহ'লে। আর কেউ নয়—আর সবাই আমার ভয় করে, কেবল ওই মণ্টুটা বড় ছুটু!

তার পর আমার দিকে চোখের জল আর হাসি-মিশানো এক অপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—যাবেন না, কেমন?

হিরণ্ময়ী এই প্রথম দুর্বলতা প্রকাশ করলে—এর আগে কখন দেখি নি। ছেলেমানুষ, ও কথা ত তেমন জানে না, কিন্তু ওর ডাগর সজল চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ওর ভাবার দৈন্ত যুটিয়ে দিয়ে এমন কিছু প্রকাশ করলে—এক জাহাজ কথাতো তা প্রকাশ করা যেত না।

আমার মনে অতুতাপ হ'ল—কেন ওকে মিথ্যে কাঁদালাম সন্ধ্যাবেলাটিতে?

জীবনের এই সব মুহূর্তই না মানুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে? ব্রাউনিঙের 'পলিন' কবিতার সেই সর্বস্বার্থ লোকটির মত আমার মনও ব'লে উঠল :—I believe in God and Truth and Love !...

ওর হাতটি ধ'রে দরজার কপাটের ফাঁক থেকে বাব ক'রে এনে আস্তে আস্তে সিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম—ওখানে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াতে নেই। বিছেটিছে বেরুতে পারে—এখানে বোস। রুটিগুলো বেলে দাও দিকি, লক্ষ্মীমেয়ে। আমি যাব না—বলছ তুমি যখন, তখন আর যাব না। চোখের জল ফেলতে আছে অবেলায়? ছিঃ—

তার পরই রুটি তৈরি করতে ব'সে যে হিরণ্ময়ী,

সেই হিরণ্ময়ী—সেই মুখরা বালিকা, যে সকল কথা এমন কর্তৃত্বের স্বে বলে যেন ওর কথা না মেনে চললে ও ভয়ঙ্কর একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবে, সেটা আবার খুব কৌতুকপ্রদ এবং ভেবে দেখলে করুণ বলেই মনে হয়, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মুখের বলিটুকু ছাড়া ওর হুকুমের পেছনে ওর কোন জোর খাটাবার নেই—নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায়।

প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি স্ত্রী ধ'রে। বড় বড় ঘটনাকে এড়ান সহজ, কিন্তু এই সব ছোট জিনিষ প্রাণে গেঁথে থাকে—ফলুই মাছের সর চুল-চুল কাঁটার মত। গায়ের জোরে সে কাঁটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বই কমে না।

পুরুষমানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না। যেটা অনেক সময়ে মেয়েরা পারে। যেখানে যা হবার নয়, পাবাব নয়, সেখানেও তাবা বোকার মত ধরা দিয়ে বসে থাকে—এবং নাকালও তার জন্তে যথেষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষমানুষই আবার বেগতিক বুঝলে যত সম্ভব হাবুডুব খেতে খেতেও সাঁত্রে তীরের কাছে আসতে পারে—মেয়েবা গভীর জলে একবার গিয়ে পড়লে অত সহজে নিজেদের সামলে নিতে পারে না।

তবুও আমি হিরণ্ময়ীকে দূরে রাখবার চেষ্টাই করলাম।

একদিন চপ্পরের পবে হিরণ্ময়ীদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে গুনলুম। পুলিশ কিসের? একে ওকে স্টিগ্যেন্স করি, কেউ সঠিক উত্তর দেয় না অথচ মনে হ'ল ব্যাপারটা সবাই জানে। এগিয়ে গেলুম—ওদের বাড়ির সামনের তেঁতুলতলায় বড় দারোগা চেয়ার পেতে ব'সে—পাড়ার লোকদের সাক্ষ্য নেওয়া চলছে। দেখলাম গ্রামে ওদের মিজ বড় কেউ নেই। আমি আগেও যে একথা একেবারে না-জানতাম এমন নয়—তবে পাড়াগাঁয়ের কাণাঘুঘোতে কান দিই নি।

বিকেলের দিকে হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিকে খানার ধ'রে নিয়ে গেল। কাছারির মুহূর্তী সাতকড়ি মুখুয্যে আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—ও মেয়েটার তত দোষ দিই নে—মা-ই যত নষ্টের গুফমশাই। ওই ত ওকে শিখিয়েছে? নইলে মেয়েটার মাথি কি—কিন্তু

মাগী কি ডাকাত! মেয়েটার প্রাণেব আশঙ্কা করলি নে একবাবও?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেবি হ'ল না। সাতকড়ি আবও বলল—কালীনাথ গাঙ্গুলী কি গ্রাম ত্যাগ করেছে সাথে? এই জন্তেই সে বাড়িমুখো হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

এত কথা আমি কিছু জানতাম না—এই নতুন গুনলাম। আমি মুস্তিলে পড়ে গেলাম—আমি এখন কি করি? হিরণ্ময়ী মা আর দিদি দোষী কি দোষী নয়—সে বিচারের ভার আছে অত বিচারকের ওপর—সাতকড়ি মুখুযেব ওপব নয়। কিন্তু এদের মোকদ্দমা উঠলে উকীল নিযুক্ত কে করে, এদের স্বার্থ বা কে দেখে, এদের জন্তে পরসা-খরচই বা কে করে?

এদিকে আর এক মুস্তিল। ওব মা আর দিদিকে বখন ধ'রে নিয়ে গেল, হিরণ্ময়ী তখন ওদের বাড়ির সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে অন্ধকার রাত, সে রাতে সে একাই বা বাড়িতে থাকে কেমন ক'রে, বাড়িতে আব বখন কেউই নেই—অথচ সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ তাকে নিজের বাড়িতে ডাকলে না। সন্ধ্যার সময় ও-পাড়ার কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী এসে ওকে ও-অবস্থায় দেখে বললেন—ওমা, এ মেয়েটা এখানে একা দাঁড়িয়ে আছে যে! ছেলেমানুষ, বাড়িতে একা থাকবেই বা কি ক'রে? ওর মা দিদি কি করেছে জানি নে—কিন্তু ওকে আমি চিনি। ও পাগলী, আনন্দময়ী। এস ত মা হিরণ, তোমাদের হারিকেনটা বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে ঘরে ঢাবি দিয়ে এস। ওকে জায়গা দিলে যদি জ্বাত না থাকে—তবে না থাকল ভেমন জ্বাত?

মজুমদার-গিন্নী যদি কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে হিরণ্ময়ীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তবে হয়ত কোনই গোলযোগ বাধতো না—কিন্তু শেষের কথাটি ব'লে ফেলে তিনি নিতান্ত নির্কোষের মত কাজ ক'রে বসলেন। কাছেই গ্রামেব সমাজপতি আচার্য্য-মশায়ের বাড়ি। তাদের সঙ্গে বাধলো তুমুল ঝগড়া। শশধর আচার্য্যের স্ত্রী অনেক ক্ষণ নিজের মনে একতরফা গেয়ে যাবার পর উপসংহারে বললেন—ও বড় ভাল মেয়ে—না?

মুখ খুলেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। সব জানি, সব বুঝি। চুপ ক'বে থাকি মুখ বুজে—বলি মাথার ওপর এক জন আছেন, তিনিই দেখবেন সব—আমি কেন বলতে যাই?

মজুমদার-গিন্নী বললেন—বা কর ন-বো, আবার এ মেয়েটার নামে কেন বা তা বলছ? সেটাই কি ভগবান সইবেন?

আচার্য্য-মশায়ের স্ত্রী বাকুদের মত জলে উঠলেন—আরও ঝগড়া চেঁচিয়ে বললেন—ধন্য দেখো না ব'লে দিচ্ছি, ভাল হবে না। ওই রয়েছে মুখুযেরা, ভট্টাচার্য্যরা জিগোস কর গিয়ে। ওই মেয়ে ওই পাঠশালায় মাষ্টার-ছোকরার কাছে রাত বারটা অব্ধি কাটিয়ে আসে—রোজ তিন-শ তিরিশ দিন। সারা রাত্তিরও থাকে এক-এক দিন। বলুক ও মেয়েই বলুক, সত্যি না মিথ্যে। ভেবেছিলুম কিছু বলব না—মরুক গে, যার আন্তাকুড়, সেই গিয়ে ঘ'টুক, না ব'লে পারলাম না। কে ও মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়ে কালকে আবার একটা হাজিমা বাধাতে বাবে?

আমি এত ক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, কথা বলি নি—কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত ছিল না ব'লে। চেঁচামেচি শুনে আচার্য্য-মশায়, সাতকড়ি ও সনাতন রায় ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম—আপনারা আমার মায়ের মত—আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, হিরণকে এ ঝগড়ার মধ্যে মিথ্যে আনবেন না। ও আমার ছাত্রী, ছেলেমানুষ, আমার কাছে যার সন্ধ্যাবেলা গল্প শুনতে—কোনদিন পড়েও। রাত নটা বাজতেই চলে আসে। একটা নিষ্পাপ নিবপরাধ মেয়ের নাম এ-সবের সঙ্গে না-জড়ানই ভাল। মা, আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যান।

এতে ফল হ'ল উলটো। ঝগড়া না থেমে বরং বেড়ে উঠল। মজুমদার-মশায়ের দুই ছেলে ও ছোট ভাই এসে মজুমদার-গিন্নীকে বকাবকি করতে লাগল—তিনি কেন ওপাড়া থেকে এসে এই-সব ছেঁড়া ল্যাটার মধ্যে নিজেকে জড়াতে যান? এ বয়েসেও তাঁর জ্ঞান যদি না-হয় তবে আর কবে হবে?...তিনি চলে আহুন বাড়ি। এ-পাড়ার ব্যবস্থা এ-পাড়ার লোকে বুঝবে, তিনি কেন মাথাব্যথা

করতে যান—ইত্যাদি। যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সে ভয়ে ও লজ্জায় কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে ওদের বাড়ির সদব দবজায়। ওর চোখে একটা দিশেহারা ভাব, লজ্জার চেয়ে চোখেব চাউনিতে ভয়ের চিহ্নই বেশী। ওর সেই কথাটা মনে পড়ল—জানেন, মাষ্টার-মশায়, আমার সবাই ভয় করে, সবাই মানে এ পাড়ায়—আমাব সঙ্গে লাগতে এলে দেখিয়ে দেব না মজা? বেচারী মুখরা হিরণ্যী!

শেষ পর্যন্ত কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী ওকে না নিয়েই চলে গেলেন। তাঁব দেওর ও ছেলেরা একরকম জোর করেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললুম—হিরণ, তুমি কিছু ভেব না। আমি এত ক্ষণ দেখছিলাম এরা কি করে। যে ভয়ে তোমাকে ডাকতে পারি নি, সে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। তুমি একটু একলা থাক—আমি কাণ্ডাপাড়া থেকে মোহিনী কাওরাণীকে ডেকে আনছি। সে তোমার ঘরের বারান্দাতে শোবে রাত্রে। তা'হলে তোমার রাত্রে একা থাকার সমস্যা মিটে গেল। আর এক কথা—তুমি রান্না চড়িয়ে দাও। চাল-ডাল সব আছে ত?

কাণ্ডাপাড়া থেকে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল। মোহিনী-বুড়ীকে চার আনা পরসা দিয়ে রাত্রে হিরণদের বাড়িতে শোবাব জন্তে রাজী করিয়ে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানের চৌকাঠে বসে হিরণ্যী হাপসু নয়নে কাঁদছে। অনেক ক'রে বোঝালুম। বড় কষ্ট হ'ল ওকে এ অবস্থায় দেখে। বললে—মার আর দিদির কি হবে মাষ্টার-মশায়? আপনি কালই বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের ফাঁসি হবে না ত?

হেসে সাঙ্খনা দিলাম। বললাম—রাঁধ হিরণ। খাওয়া-দাওয়া কর। কিছু ভেব না—আমি কাল রাণাঘাট যাব। ভাল উকীল দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব। ভয় কি?

হিরণ কিছুতেই রাঁধতে চায় না—শেষে বললে—আপনিও—এখানে থাকেন কিন্তু। ঠিক ত?

ও রাঁধছে ব'লে, আমাকে রান্নাঘরেই বসে থাকতে হ'ল—ও যেতে দেয় না, ছেলেমানুষ, ভয় করে। কেবল জিগ্যাস করে মা আর দিদির কি হবে।

রান্না হয়ে গেল, ঠাই ক'রে আমার ভাত বেড়ে দিলে। এমিকে হিরণ বড় অগোছালো, কুটনো-বাটনা, এঁটো-কাঁটা, ভাতের ফেন, ডালের খোসাতে রান্নাঘর এমন নোংরা ক'রে তুলেছে। ভাত বাড়তে গিয়ে উহুনের পাড়ে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—নিতান্ত আনাড়ি।

বললাম—দিনমানে কোন রকমে একা থেক। আমি সম্ভাব আগেই রাণাঘাট থেকে ফিরবো। রে'খে থেও কিন্তু। না হ'লে বড় রাগ করব। মোহিনী কাওরাণী এল রাত ন'টার পরে। তার পরে আমি আমার বাসায় চলে এলুম।

পরদিন রাণাঘাটে গিয়ে দেখি কেস্ ওঠে নি আদালতে। উকীল ঠিক ক'রে তার সঙ্গে জামিনের কথাবার্তা ব'লে এলুম। ফিরবার সময় হিরণ্যীব জন্তে দু-একটা জিনিষ কিনে নিলুম ওকে একটু আনন্দ দেবার জন্তে। ফিবে দেখি ও ব'সে ব'সে আবার কাঁদছে কালকার মত। সারাদিন বোধ হয় র'াধে নি, কিছু খায় নি। স্নানও করে নি, দু-এক গাছা রুক্ষ চুল মুখের আশেপাশে উড়ছে। মহা বিপদে প'ড়ে গেলুম ওকে নিয়ে। কি করি এখন? ওর বাবাকে আজ রাণাঘাটে পৌঁছেই টেলিগ্রাম করেছি, যদি আজ তা পেয়ে থাকেন, তবে কাল তিনি এসে পৌঁছলেও ত বাচি। নইলে হিরণ্যীকে ভাবছি কালীগঞ্জে বৌদিদির কাছে কি বেধে আসব? কারণ এসে শুনলুম মোহিনী-বুড়ী ব'লে গিয়েছে সে রাত্রে এখানে আর শুতে আসতে পারবে না।

ও আমার দেখেই ছুটে এসে বললে—মাকে দ্বিমিকে দেখে এলেন, মাষ্টার-মশাই? তারা কেমন আছে? খালাস পেলেন না?

আমি ওদের নিজে দেখতে বাই নি, উকীলের মুখে হিরণ্যীর সংবাদ পাঠিয়ে বলেছিলাম হিরণ্যীর জন্ত বেন তারা কিছু না ভাবে। বললাম সে কথা।

তার পর হিরণ্যী আমাকে বালতী ক'রে জল তুলে দিলে স্নানের জন্তে—ঘরে প্রদীপ জ্বলে উহুনে বসিয়ে চায়ের জল চড়ালে। রাণাঘাট থেকে ওর জন্তে কিছু খাবাব এনেছিলাম, তার বেশী অর্ধেক আমার রেকাবী ক'রে চায়ের সঙ্গে জোর ক'রে খাওয়ালে—তার পব রান্না চাপিয়ে দিলে। ওর মনে স্থখ নেই, কেমন বেন মুসড়ে পড়েছে ছেলেমানুষ, নইলে

ওর মত হাস্যময়ী আনন্দময়ী চঞ্চলা মেয়ে এত ক্ষণ কত কথা বলত, হাসি-খুশীতে ঘর ভরিয়ে তুলত।

একবার জিগ্যোস করলে—রাণাঘাটে নাকি সার্কাস এসেছে সবাই বলে? দেখেছেন আপনি? এত ছুঃখের মধ্যেও ওর ছেলেমানুষী মন সার্কাসের সম্বন্ধে কৌতূহলী না হয়ে পারে নি ভেবে আমার হাসি পেল।

এ-রাড্ডে মোহিনী-বুড়ী এল না—আমি ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরের বারান্দাতে শুয়ে রইলুম। বারান্দার বিছানা পাতছি, ও আবার এত সরলা, নিষ্কলুষ—আমার অবাঁক হয়ে জিগ্যোস করলে আপনি বাইরে শোবেন কেন? কোন নীতিবাদের সঙ্কোচ এনে ফেলে ওর নিষ্পাপ মনে দাগ দিতে আমার বাধল। বললুম—দেখছ না কি রকম গরম আজ? বাইরে শোয়াই আমার অভ্যাস তা ছাড়া। সারারাত ছুঃসনে গল্প ক’রে কাটালুম। ও ঘর থেকে কথা বলে, আমি বারান্দা থেকে তার উত্তর দিই। বাবা বোধ হয় কাল আসবেন, না? মা দিদি কবে আসবে? সার্কাসওয়াল কোথায় তাঁর ফেলেছে? কলকাতায় কখনও যায় নি—একবার যাবার ইচ্ছে আছে। কলকাতার থিয়েটার দেখতে কেমন? চৌধুরীরা বোধ হয় মোহিনী-বুড়ীকে বারণ ক’রে দিয়েছে এখানে আসতে। আমার শীত করছে কিনা। রাত বেশী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে দেবার একটা মোটা চাদর দেবে? আরব্য-উপভাসের মত গল্প আর নেই। আচ্ছা, অঙ্ক কত দূর শেখা যায়? বিজ্ঞান শেষ নেই—না? এম-এ পাস করে আরও পড়া যায়, পড়বার আছে?

ওর বাবা এলেন পরদিন সকাল দশটার সময়। তাঁর মুখে শুনলুম পুলিশ থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শীঘ্র বাড়ি এসে মেয়ের ভার নিতে। তিনি অত্যন্ত বদ্মেজাজী লোক, দু-একটা কথা শুনেই বুঝতে দেরি হ’ল না। আমার ওপর আদৌ তিনি প্রসন্ন হ’তে পারলেন না—তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্তে একটা ধনবান দেওয়া ত দুরের কথা, সেটাকেই তিনি আমার একটা অপরাধ ব’লে গণ্য ক’রে নিলেন এবং যে মুখ্যে ও চৌধুরীরা পরশু সম্বোধন হিরণ্যরীকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায় নি তাদেরই বাড়িতে খোঁষামোদ ক’রে তাদের সঙ্গে এ-বিপদে পরামর্শ চাইতে গেলেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখলুম তিনি হিরণ্যরীকে আদৌ দেখতে পারেন না। আমার সামনেই ত তাকে তাড়না, তর্জন-গর্জন যথেষ্ট করলেন এ নিয়ে, যে সে-রাড্ডে চৌধুরী-গিন্নীর পায়ে পড়ে কেন অহরোধ করে নি তাকে জায়গা দেবার জন্তে। কারণ তারা দেখলুম লাগিয়েছে যে তাদের কি আর ইচ্ছে ছিল না ওকে জায়গা দেবার? ও মেয়ের তা ইচ্ছে নয়। হিরণ্যের অপরাধ সে মুখ ফুটে কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। এ ওরা কেউ বুঝল না যে, হিরণ্যের বয়সের মেয়েরা মুখে কোন নাট্যিক-ধরণের কথা ব’লে আশ্রয় চাইতে পারে না পরের কাছে—বিশেষ ক’রে হিরণ্যরী মত একটু তেজী মেয়েরা।

আমি হিরণ্যরীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে কালীগঞ্জে চলে এলুম পরদিন সকালেই। শুনেছিলুম হিরণ্যরীর মা ও দিদি রাণাঘাট থেকে প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে এসেছেন।

কালীগঞ্জে এসে বসলুম বাট, কিন্তু বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, মনের কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। হিবণ্যরীর সেই শুকনো মুখখানা কেবলই মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় ওর যে মুখ দেখেছিলাম, সেদিন ওর মাকে আর দিদিকে থানায় নিয়ে গেল। হিরণ্যরীর ব্যথা,—হিরণ্যরীর ছুঃখ,—ওই রকম বাড়িতে, ওই গাঁয়ের আবহাওয়ায় হিরণ্যরীর মত মেয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়বে। কেই বা দেখবে, বুঝবে ওকে? একদিন মালতীর সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই ভাবতুম। কত ভেবেছি। এখন বুঝি কি দুর্জয় অভিমান কবেই চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে! কিছুতেই সে অভিমান ভাঙলো না। তার পব দাদা মারা গেলেন, দাদার সংসার পড়ল ঘাড়ে, নইলে হয়ত আবার এত দিন ফিরে যেতাম। কিন্তু বৌদিদিদেব নিয়ে ত দ্বারবাসিনীর আখড়াতে গিয়ে উঠতে পারি নে? এক সময় বার ভাবনায় কত বিনীত রাতি কাটিয়েছি বটেম্বরনাথ পাহাড়ে, সেই মালতী এখন আমার মনে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ’য়ে আসছে—হয়ে এসেছে। আর ত তাকে চোখে দেখলুম না? ক্রমে তাই সে দূরে গিয়ে পড়ল। কি করব, মনের ওপর জোর নেই—নইলে আমি কি বুঝতে পারি নে কতবড় ছাত্রেরি এটা মানুষের জীবনের? শ্রীরামপুরের ছোট বৌঠাকরুণ আজ কোথায়? কে বলবে কেন এমন হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১

একদিন আবার হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তখন মাস দুই কেটে গিয়েছে, কামালপুরে আর বাই নি, সেখানে আমার বাগায় ঠি নিষপত্র এখনও রয়েছে—সেগুলো আনবার ছুতো করেই গেলুম সেখানে। মাস দুই পবে, গ্রাম ঠাণ্ডা হয়েছে, কেবল শুনলুম হিরণ্ময়ীরা একঘরে হয়ে আছে। হিরণ্ময়ী আগেকার মতই ছুটে এল আমি এসেছি শুনে। এখানে ওর চরিত্রের একটা দিক আমার চোখে পড়ল—লোকে কি বলবে এ-তর ও করে না—এখানে মালতীর সঙ্গে ওর মিল আছে। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ওর তফাৎও আমি বুঝতে পারি। হিরণ্ময়ী যেখানে দেবে, সেখানে পেছন ফিরে আর চায় না—মালতীর নানা পিছুটান। সবাই সমান ভালবাসতেও পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন আছে। খুব বড় শিল্পী, কি খুব বড় গায়ক যেমন পথেঘাটে মেলে না—খুব বড় প্রেমিক বা প্রেমিকাও যেমন পথেঘাটে মেলে না। ও প্রতিভা যে কোন বড় সৃজনী প্রতিভার মতই দুর্লভ। এ-কথা সবাই জানে না, তাই বাব কাছে যা পাবার নয়, তার কাছে তাই আশা করতে গিয়ে পদে পদে যা খায় আর ভাবে অল্প সবাইই ভাগ্যে ঠিকমত জুটেছে, সে-ই কেবল বঞ্চিত হয়ে রইল জীবনে। নয়ত ভাবে তাব রূপগুণ কম, তাই তেমন ক'বে বাঁধতে পারে নি।

হিরণ্ময়ী তনুলতায় প্রথম যৌবনের মজরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই ছ-মাসের মধ্যে। আমার বললে—কখন এলেন? আনুন আমাদের বাড়িতে। মা বলেছিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। কত দিনের ছুটি দিয়েছিলেন পাঠশালাতে, দেড় মাস পরে খুলো?

—ভাল আছ হিরণ? উঃ মাথায় কত বেড়ে গিয়েছে?

—এত দিন কোথায় ছিলেন? বেশ ত লোক? সেই গেলেন আর আসবার নামটি নেই।

হরত ছ-বছর আগেও এ-কথা কেউ বললে বেদনাভূব হয়ে ভাবতাম—অ'হা, বাববাসিনীতে ফিরলে মালতীও আমার এককম বলত। কিন্তু সময়ের বিচিত্র লীলা। এ সম্পর্কে মালতীর কথা আমার মনেই এল না।

ছ-দিন কামালপুরে রইলাম, হিরণ্ময়ী এ-কথা ভাবে নি যে, আমি আমার স্নিগ্ধপত্র আনতে গিয়েছি ওখানে, সে ভেবেছিল আমি আবার পাঠশালা খুলব। ওখানেই থাকব। এবার কিন্তু সে আসবার সময় তর্ক, ঝগড়া করলে না, যেমন ক'রে থাকে। ও শুধু শুকনো মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমার যাওয়া। ওর সে আগেকার ছেলে-মানুষী যেন চলে গিয়ে একটু অন্তরকম হয়েছে। তবুও কত অনুরোধ করলে ওখানে থাকবার ক্ষেত্রে—গাঁ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, কেন আমি বাচ্ছি, গাঁয়ের ছেলেরা তবে পড়বে কোথায়? তা কি ক'রে বলব কোথায় পড়বে, আমাব পোষাবে না এখানে থাকা।

কামালপুর গাঁ পিছু ফেলেছি, মাঠের রাস্তা, গঙ্গার গাড়ী আস্তে আস্তে চলছে। কি মন খারাপ যে হয়ে গেল! মাঠের মধ্যে কচি মটর-শাক, ঘেঁদারি-শাকের স্ত্রামল সৌন্দর্য্য, শিরিষগাছে কাঁচা হুঁটি বুলছে, বাহুদেবপুন্দের মরগাঙের আগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল 'চ'রে বেড়াচ্ছে। হিরণ্ময়ীর নিরাশার দৃষ্টি বুকে যেন কোথায় বিঁধে রয়েছে, খচ্ খচ্ ক'রে বাজছে। বেলা যায়-যায়, চাকদার বাজার থেকে ওড়েব গাড়ীর সারি ফিরছে, বোধ হয় বেলে কি চুয়াডাঙ্গার বাজারে রাত কাটাবে। জীবনটা কি যেন হয়ে গেল, এক ভাবি আর হয়, কোথায় চলেছি আমিই জানি নে। কেনই বা অপরের মনে এত কষ্ট দিই? এই রাঙা রোদ-মাখান মটর মুহুরিব মাঠ যেন বটেখরনাথের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকোর সারি মুজেরের দিকে যেত, আমি মালতীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাষাণ-বাথানে বাটের ওপর বসে বসে অত্মমনস্ক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ মরগাঙের ওপায়ে জমা সন্ধ্যার কুয়াশার মত—কাঁকা, ছ-দিনেব স্নিগ্ধ। এখানে ফল পার্কে না। স্ক্রেকসালেম পাথরের দেশ।

২

এব কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা আমার কাছে এলেন কালীগঞ্জে। আমার একবার তাঁদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে। আব একটা কথা,

মেয়েব বিয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি গরিব, অবস্থা আমি সবই জানি, গ্রামের সমাজে একঘবেও বটে। দু-তিন জাষগা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল, নানা কানাদুযো শুনে তারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একশুয়ে, তাকে দেখতে আসছে জনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। অত বড় মেয়ে, এখনও জ্ঞানকাণ্ড হ'ল না, চিরকাল কি ছেলেমানুষী করলে মানার? হুতরাং তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণের এ দায় উদ্ধার না-করি তবে তিনি, কালীকান্ত গাঙ্গুলী, সম্পূর্ণ নিকপায়। আমার কি মত?

আমি আর কিছুই ভাবলাম না, ভাবলাম কেবল হিবগরীর আশা-ভাঙা চোখের চাউনি আর তাব শুকনো মুখ, সেদিন যখন জিনিষপত্র বাঁধছি সেই সময়কারের।

বৈশাখ মাসের প্রথমেই বিধে হয়ে গেল। বিয়ে পর ওকে নিয়ে প্রথম গেলাম আটঘরার বাড়িতে, বরণ করে নেবার সময় ছোট কাকীমা, (পানীর মা, এখন বিধবা) দূরে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বললুম—সীতা, ছোট কাকীমাকে আসতে বল বরণের সময়। উনি দূরে থাকলে সে-কাজে মজল হবে না, সংস্কার থাকুক। আজ মা নেই, উনি আছেন, ওঁকে কি দূরে থাকলে চলে?

একদিন হিবগরী বললে—একটা কথা শোন। যেদিন তুমি প্রথম পাঠশালাতে পড়াতে এলে, আমি তোমার কাছে গেলাম, সেদিন থেকে তোমায় দেখে আমার কেমন লজ্জা করত। সেই জন্তে কাছে বসতে চাইতাম না। তার পর তুমি একদিন রাগ করলে, তাতে আমাবও খুব রাগ হ'ল। তুমি তার পর বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনের সজ্জনেতলায় চলে গেলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনের মধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে।

হিবগরী শুঁড়িয়ে কথা বলতে শেষে নি এখনও।

* * * *

ভগবান জ্ঞানেন বিয়ের সময় কেমন যেন অন্তমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সপ্ত-সমুদ্র পারের কোন দেশে অনেক দূরে

এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাঙ্গরুখী তরী কিণোরী প্রদীপ-হাতে ভাঙা বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে...পুকুর-পাড়ের তমাল-বনের আড়ালে তার সঙ্গে সেই যে সব কত স্থখ-দুঃখের কাহিনী, কত ঠাকুর-দেবতার কথা, সে-সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন? কোথায় গেল সে মেয়েটি? আর তাকে তেমন ক'বে ত চাই না? যেন কত দূরদূর তর সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—তাকে বেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তার স্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না? কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব প্রদীপ-দেখানো সন্ধ্যা?

৩

বছরখানেক পরে একদিন রাণাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। মূর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে অনেকগুলি বৈষ্ণব নামলো। তারা যাবে খুলনার গাড়ীতে। তাদের মধ্যে এক জনকে পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। কাছে গিয়ে দেখি দ্বারবাসিনীর আখড়ার সেই নরহরি বৈরাগী—যে একবার জীব-গোস্বামীব পদাবলী গেয়েছিল। সে পরলা নম্রবে ভবঘুরে, মাঝে মাঝে আখড়ায় আসত, আবার কোথাও চলে যেত। নরহরিও আমায় চিনলে, প্রণাম ক'রে বললে—এখানে কোথায় বাবু? এটা কি দেশ নাকি? আপনি ত অনেক দিন দ্বারবাসিনী যান নি। আর যাবেনই বা কি, সব শু'নছেন বোধ হয়, আখড়া আব সে আখড়া নেই। দিদি-ঠাকুরমা মাঝে মাঝে যাওয়ার পরে—

—কে?

—কেন আপনি জ্ঞানেন না? মালতী দিদি-ঠাকুরমা ত আজ বছর-চারেক নারা গিয়েছেন।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। নরহরি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখন উদ্ধবদাসের এক ভাইপো তার সেবাদাসী নিয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সেই এখন কর্তা। উদ্ধবদাস তো বড়ো হয়েছে, সে কিছু দেখে-শোনে না। এখন অতিথি-বোষ্টম গেলে আব জায়গা হয় না। মালতী দিদি-ঠাকুরমা ত মানুষ ছিলেন না, স্বর্গের দেবী ছিলেন, কি বাপের মেয়ে! তিনি স্বর্গে চ'লে

গিয়েছেন, এখন তাঁর অত সাধের আখড়ার কি দশা হয়েছে এই চার বছরে, দেখে চোখে জল আসে বাবু। তাই বড়-একটা সেখানে বাই নে।

ওবা চলে গেল। আমি ষ্টেশনের বাইরের সেগুন-বাগানে গিয়ে কত ক্ষণ বসে রইলাম। কত ক্ষণ...কত ক্ষণ। হিসেব করে দেখলাম আমি যখন বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে তখনই সে মাঝা গিয়েছে। অর্থাৎ আমি আখড়া ছেড়ে আসবাব এক বছর পরেই। আশ্রয় হঠাৎ মনে হ'ল তার ওপর কি সুবিচার করেছিলুম? অভিমান ভাঙাবার সুযোগও তাকে আব একবার দিই নি। আমার জীবনে সে মবে গিয়েছে অনেক দিন, যদিও খবরটা আজ পেলাম। আমার মন অলক্ষিতে আত্মরক্ষা করেছে, বেদনার স্থানে শক্ত আবরণ গড়ে তুলেছে—শায়ুক্বেণন আত্মরক্ষার জন্তে খোলা তৈরি কবে। আজ সে খোলা হয়ে পড়েছে শক্ত, অলভুতিহীন—অন্ততঃ এত দিন তাই ভাবতাম। কিন্তু খোলার আবরণেব তলায় ব্যথাব জায়গাটা আজ মনে হচ্ছে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সারে নি।

কে আজ উত্তর দেবে আমি চলে এলে গোপনে একটুখানি চোখের জলও কি ফেলে নি সে কোনদিন? বিষ্ণু-মন্দিবে প্রদীপ দিতে গিয়ে একদিনও কি অন্তমনস্ক হয় নি? দিনের কাজ মিটে গেলে সে যখন 'পায়ুগলনের অম্বকরণে' বই লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার সেই খাতাখানা খুলে বসত, একদিনও কি আমার কথা মনে পড়ে নি?... কত ঠাট্টা যে করতুম তাব সেই বইলেখা নিয়ে! আমাব যদি আজ দশ হাজার টাকা থাকত, আমি চাইলে সব টাকাই দিয়ে দিতে পারতাম, যদি এই খবরগুলো আমায় কেউ দিতে পারতো। টাকার মায়া করতুম না, করি নি কোনদিনই। ওই খবরবেব বদলে আমি কি না দিতে পাবি!

পাগলের মত কি ভাবছি যা তা বসে! লাভ কি আজ এসব ভাবনার? ভালই হয়েছে মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। সুখ জ্যোৎস্না রাতে পল্লী-প্রান্তেব বনে মন্ডে-লতায় ফুল ফোটে, সুবাসে পথচারীদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে, কিন্তু কত দিন তার আবু? জ্যোৎস্না লুকিয়ে আঁধাব পক্ষ নামে, বনফুল ঝরে যায়, পুষ্প-

সুৰভি হিমের রাত্রির বন কুয়াশায় ঢাশা পড়ে, নয়ত অকাল বর্ষার বারি-ধাবার ধুয়ে মুছে যায়। মানুষের অনেক সেবা ভুগি করেছিলে, মানুষের মনে তোমার রূপ ভগবান ম্লান হ'তে দিলেন না। ফুলের সুবাস চলে গেলে বনলতা পাছে অনাদৃত হয়? তোমার বেলা ভগবান তা স্মৃ করবেন না।

সেগুন-বাগান থেকে উঠে এলুম তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একবার মালতীকে বলেছিলুম—আমাদেব গাঁয়ে একটা হাত-ভাঙা বিষ্ণুমূর্তি আছে। ছেলেবেলায় তাঁকে বড় ভালবাসতুম। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁকে নিয়ে এসে তোমার বাবার মন্দিবে প্রতিষ্ঠা করব।

8

দেখতে দেখতে কত দিন হয়ে গেল।

তার পর সাত-আট বছর কেটে গিয়েছে।...

আমাব সে অল্প বয়সেব ভবঘুরে জীবনেব পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে অনেক দিন। তবু সে-সব দিনের ছরছাড়া মুহূর্তগুলোর ভ্রান্তে এখনও মঝে মাঝে মন কেমন ক'বে ওঠে, যদিও এখন বুধেছি হারান-বসন্তেব ভ্রান্তে আক্ষেপ ক'বে কোন লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনেব শত বসন্তেব পাখীক কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুটিয়ে যাবে...তার চলমান রূপেব মধ্যেই তার সার্থকতা।

মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হ'ল, পৃথিবী ছেড়ে কোন প্রেমেব লোকে, নক্ষত্রদেব দেশে, নক্ষত্রদেব মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।

কেবল মাঝে মাঝে গভীর ঘুমের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে যেন মাথার শিয়রে বসে থাকে। ঘুমের মধ্যেই শুনি সে গাইছে :—

সুখ আমার প্রাণের মাঠে
শেখ চরাব রাখাল কিশোর
প্রিয়জনে লয় সে হরি
ননী ধায় সে ননীচোর

সেই আমার প্রিয় গানটা... যা ওর মুখে শুনে
ভালবাসতুম।

চোখোচোখি হ'লেই হাসি হাসি মুখে পুরনো দিনের
মত তার সেই ভেলমানুখী ভঙ্গিতে বাড় ছলিয়ে বেলেছে—
পালিয়ে এসে যে বড় লুকিয়ে আছ? আশ্চর্য কত কাজ
বাকী আছে মনে নেই?

তখন আমার মনে হয় ওকে আমি খুব কাঁছে পেয়েছি।
দ্বারবাসিনী'ব পুকুর-পাড়ের কাঞ্চনফুল-তলার দিনগুলোতে
তাকে যেমনই পেতুম, তার চেয়েও কাছে। গভীর স্নেহের
মধ্যেই তজ্রাবোরে বলি—সব মনে আছে, ভুলি নি মালতী।
তোমার ব্যথা দিয়ে ব্যর্থতা দিয়ে তুমি আমাকে জয় কবেছ।
সে কি ভোলবার?

সমাপ্ত

শীতের রোম

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, এম-এ, ডি-লিট

এ বৎসর রোমে প্রবল শীত পড়িয়াছে। প্রবল শীত
রোমে বড়-একটা পুড়ে না, কিন্তু এবার অনেক দিন তাপ
শূন্য—এমন কি শূন্যেরও কয়েক ডিগ্রি নীচে নামিয়াছে।
কয়েক দিন শহরের গায় ও তার আশপাশে পাতলা বরফের
জামা দেখা গিয়াছে। হুই দিন খুব বৃষ্টি হইয়াছে।
টাইবার সাধারণতঃ শাস্ত-প্রকৃতির নদী, কিন্তু বৃষ্টির ফলে
সেও বেশ ছন্দস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক স্থানে স্রোত
ছুলিয়া নিকটবর্তী রাস্তা ও জমি ডুবাইয়া দিয়াছিল।
একপ দৃশ্য কলিকাতায় আমবা প্রায়ই দেখি। একটু বৃষ্টি
হইলেই সেখানে রাস্তাবাট জলে ডুবিয়া যায়। বসন্তে,
সেদিন এধানকার জলে-ডোবা রাস্তায় বাস ও লোক
চলাচলের দৃশ্য দেখিয়া কলিকাতার কথা খুব বেগী করিয়া
মনে পড়িতেছিল।

জানুয়ারি'ব প্রথম হইতেই শীতটা বেশী হইয়াছে।
অক্টোবর মাসের শেষাংশে ও নবেম্বরের প্রথম দিকে কয়েক
দিন বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। তার পর বাতাস আবার
কবোক্ষ হয়। মনে হইত যেন বসন্তেব বাতাস। নবেম্বর
মাসের এই বাসন্তী কবোক্ষতাকে রোমের বাসিন্দারা বলে
সেন্ট মার্টিনের বসন্ত। এমন কি বড়দিনের কয়েক
দিন অর্গে পর্যন্ত অনেক সন্ধ্যা এই অকাল বসন্তের
বাতাসে মনোহর লাগিয়াছে ও তার ছোঁয়া লাগিয়া মনের

ভিতব সেই “মিষ্ট কিছু না করার” (dolce far niente)
ভাব জাগিয়াছে যা শুধু ইটালীয় লোকেরাই জানে। তার
পরেই শিশিরের ঋতু প্রবল প্রতাপে দেখা দিয়াছে ও এখন
পর্যন্ত সকলকে অত্যাচার করিয়া মারিতেছে।

কিন্তু রোমে এ-বৎসর শীত খুব প্রবল হইলেও
ইউবোপেব' অস্ত্রান্ত রাজধানীতে শীতকাল যত ধারাপ
এখানে তার অর্ধেকও নয়। সাধারণ লোকের কল্পনায়
শীতকালকে পলিতকেশ বিরস-বদন বৃদ্ধের সহিত তুলনা
করা হয়। কিন্তু রোমে শীতের পলিতকেশ দেখা যায়
না, তার বদনও বিরস নয়। রোমের শীত প্রায় সর্বদাই
হাসিমুখ। রোম শহরের উপর সতত সূর্যের আশীর্বাদ
করিয়া পড়ে। শীতকালে এই আশীর্বাদ আপনি প্রাণ
ভরিয়া উপভোগ করিতে পারেন। দেব বিভাবনুব এই
উদারতা প্রতিবৎসর শীতকালে উত্তর-ইউরোপের হাজার
হাজার অধিবাসীকে রোমে আকর্ষণ করে। রোমের
হোটেলওয়ালাদের তখন সুসময়, পয়সা-উপার্জনের আনন্দে
তখন তাহাদের মুখে হাসি আর ধরে না। রোমের
বাসিন্দারাও এই সূর্যালোকে আকৃষ্ট হইয়া ছুটির দিনে
দলে দলে ঘরের বাহির হয় ও পিন্‌চো পাহাড়েব বাগানে
জড়ো হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া বসিয়া মোমোঁছির মত
রোদ পোহায়।

ইতিহাস বলে পিন্চো পাহাড়ের বাগানের নির্মাতা রোমের সম্রাট লুকুলাস (Lucullus)। এই পরম বিলাসী — সম্রাট এই পাহাড়ের উপর বাগান রচনা করিয়া তার মধ্যে নিজের ডাইনিং-হল তৈয়ার করেন। পিন্চো পাহাড়ের অবস্থিতি এমন চমৎকার যে, এর উপরে দাঁড়াইয়া প্রায় অন্ধ্রিক শহর দেখা যায়। তা ছাড়া এখান হইতে সূর্যাস্ত যেমন সুন্দর ভাবে দেখা যায়, শহরের আর কোথাও হইতে সেরূপ দেখা যায় না। সম্রাট নাকি শুধু সূর্যাস্ত দেখিবার জন্তই এখানে তাঁর ডাইনিং-হল তৈয়ার করিয়াছিলেন। তাঁর ধর্মনীতি যে খানিকটা কাব্য-ধারা প্রবাহিত ছিল, সন্দেহ নাই।

সম্রাটও নাই, তাঁর ডাইনিং-হলও আর নাই। এখন সেখানে একটি প্রকাণ্ড ব্যালকনি বানানো হইয়াছে। এই ব্যালকনি একটা পাথরের বেড়া দিয়া বেরা। এখানে দাঁড়াইলে আপনার দৃষ্টি শহরের বৃহদায়তন বাড়িগুলির উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে সেন্ট পিটারের গির্জার আকাশভেদী চূড়ার আদিয়া আবদ্ধ হয়। এর একটু দক্ষিণে মস্তেমারিয়ো নামে পাহাড়—রোমের একটি সৌন্দর্যানিলয়। একটু বামে জানিকোলো নামে পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর গারিবাল্দি ও তাঁর স্ত্রী আনিতার মন্মথ ও সেন্ট ওনোফ্রিও নামক গির্জার কবি তাসোর সমাধি।

পিন্চো পাহাড়ের এই ব্যালকনির উপর দাঁড়াইয়া শহরের রূপ পান করা ও সূর্যালোক উপভোগ করা বিশেষ আনন্দদায়ক। সম্ভাব্যেবাব মিনিটগুলি বিশেষ করিয়া আনন্দদায়ক। পারের নীচে বিস্তৃত পিয়াৎসা দেল পপোলো, সম্মুখে সেন্ট পিটারের গির্জা ও মস্তেমারিয়ো, সূর্যাস্তকালে শহরের এই রূপ দেখিয়া মনে হয় যেন “একটি প্রকাণ্ড নৌকা জগতের সাম্রাজ্যের অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে” (an immense ship launched towards the empire of the world.)

যেমন রোমের সূর্য তেমন রোমের চাঁদ। রোমের আকাশ সর্বদাই পরিষ্কার আর নীল। কিন্তু শীতের রাতে এর এক বিশেষ রকমের দীপ্তি চোখে পড়ে। তখন চাঁদের আলোকেও যেন এক বিশেষ কুহক জন্মে। বড়দিনের সম্ভা হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্টার পর্যন্ত শীতের এই

কয় মাসই এই অপূর্ব সূর্যালোক ও চ্যোৎস্নার মায়াজালের মধ্যে রোমের স্বরূপ অনুভব করিতে পারা যায়। অনেক পার্থিব আনন্দ উপভোগ করিবার পক্ষে এই সময়ই সুপ্রশস্ত। কিন্তু যারা রোমকে বৃত্তিতে চেঁচা করে এই কয় মাসই সে তার স্বপ্নের রহস্য একটু খুলিয়া দেখায়।

ঈষ্টমাসের দিন মধ্যরাতে সিঁড়ি ভাঙিয়া ক্যাপিটল পাহাড়ে আরোহণ করুন ও আরা চেলি (Ara Coeli) গির্জায় প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে যোগ দিন। গির্জার ঘণ্টার চং চং ধ্বনি গভীর রাতের নিস্তব্ধতার দূরে ছড়াইয়া যায়। পুরোহিতের কণ্ঠ হইতে আগমনীর স্বর ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া খানিক ক্ষণ গির্জার অভ্যন্তরে খিলানে-খিলানে ঘুরিতে-ঘুরিতে অবশেষে জানালার ফাঁক দিয়া বাহর হইয়া আসে ও ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অসংখ্য নক্ষত্রের মৌন বাগ্মিতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তার পর বেদীৰ উপরে মোমের মুহ আলোকে খ্রীষ্টের নকল জন্মগ্রহণ। এই দৃশ্য দেখিয়া আপনি গির্জার বাহিবে আশ্রন ও ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া রোমান ফোরামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তার ভেস্তার মন্দির, ক্যাস্টর ও পলাক্সের মন্দির, তার জয়ন্তন্তগুলিব ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তম্ভের কাহিনী শুনুন। তার পর গিছন ফিরিয়া খেত-পাথরের তৈরি ভিত্তির ইমানুয়েল মন্মথ ও পিয়াৎসা-ভেনেৎসিয়ার দিকে চাহিয়া নূতন রোমের কণ্ঠ শুনুন। ক্রমশঃ এই তিন কণ্ঠ মিলিয়া আপনার ভিতর এক গভীর নামের সৃষ্টি করিবে। আনোন্ডিত মনে আপনি তখন পাহাড় হইতে নামিয়া আসেন ও নব-নির্মিত “সাম্রাজ্যের রাজপথ” (via del impero) ধরিয়া পথ চলিতে থাকেন। এই রাজপথ প্রাচীন রোমকে নূতন রোমের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে। চলিতে চলিতে আপনার মনে এই অবিভীত নগরীর ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হয়। এব অতীতের কথা, এর বর্তমান নিয়তি ও ভবিষ্যৎ নিয়তিব রহস্য চিন্তা অভিভূত করিয়া ফেলে।

ঈষ্টমাসের দিন মধ্যরাতে ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া রোমকে যেমন বুঝা যায়, আর কোন সময় আর কোন স্থান হইতে তেমন বুঝা যায় না। অন্তর ও অন্ত সময় এই ফিংক্স-সদৃশ নগরীর রহস্যের একটু আভাস পাওয়া

যায় মাত্র। কিন্তু ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে এই মায়ামিনী আপনার সঙ্গে একটু মন খুলিয়া কথা বলে ও তার রহস্যময় অন্তরে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ দেয়। আপনাব কাছে তখন এই অন্তরের সৌন্দর্য্য তার বিভিন্ন অবস্থায় প্রফুট হয়—তার গর্ভের ভঙ্গিমায়, তার বিলাস-লাগলার উভেজনায়, তার বিনয়ের মূর্তিতে, তার কক্কাণ কমনীয়তায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি বাস্তবিক বৃত্তিতে পাবেন না এই সুন্দরী কা'কে তার হৃদয় দিয়াছে—রোমোলাস ও তার বংশধরদের, না গ্যালিলিয়ান ও তার শিষ্যদের। যদি প্রশ্ন করেন, সে সমান স্নেহে তার ভগ্নস্থূপের ও তার গির্জাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে।

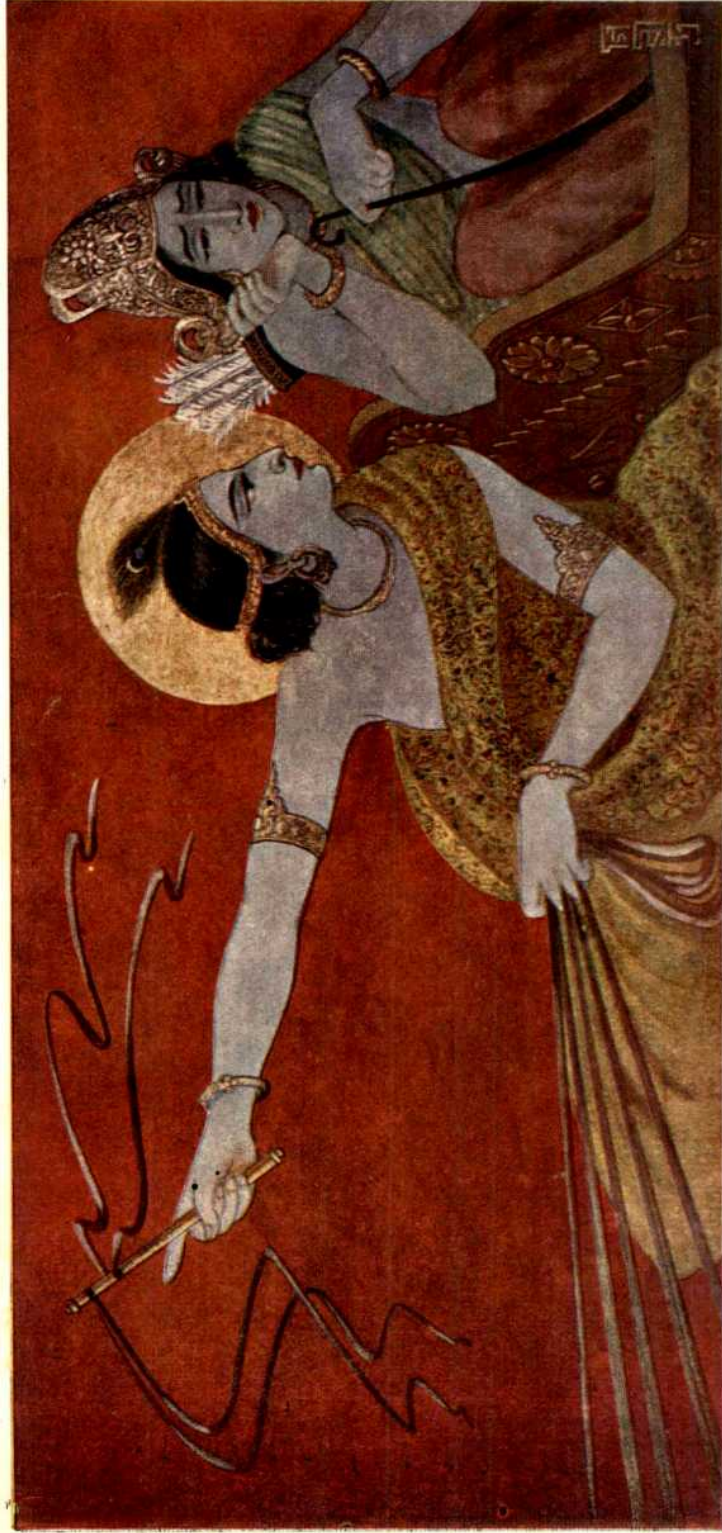
ক্রীষ্টমাসের পরে রোমে বেকানার উৎসব। বেকানা এক রূপকথাব বুড়ী। ৬ই জানুয়ারির রাত্রে এই বুড়ী বাড়িতে বাড়িতে ভাল ছেলেদের উপহার বিতরণ করিয়া বেড়ায়। ছেলেবা যখন ঘুমায় সে তখন গোপনে বাড়িতে ঢুকিয়া তাদের মোজার ভিতর উপহার রাখিয়া চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে জাগিয়াই ছেলের। ছোট্টে নিজ নিজ মোজার খোঁজে তার ভিতর বেকানা কি উপহার রাখিয়া গিয়াছে দেখিবার জ্ঞাত। রূপকথায় জিনিষটা এই ভাবে বলা হয়: প্রকৃতপক্ষে ছেলেদের মায়েরাই বেকানার কাজ করেন। তারাই রাত্রিকালে ছেলেবা ঘুমাইলে মোজার ভিতর ঘর বা সাধ্যমত উপহার সাজিয়া সেটাকে ঘরের এক জায়গায়, সাধারণতঃ রান্নাঘরে, ঝুলাইয়া রাখেন। এই উপহার দেওয়া উপলক্ষে ৬ই জানুয়ারি রোমের পিয়াৎসা নাভোনার এক মেলা বসে। পিয়াৎসা নাভোনা রোমের একটি নামকরা জায়গা। এখানে সুবিখ্যাত বেগিনির অন্ত্যস্ত ভাস্কর্যের কাজের মধ্যে নীল, গঙ্গা, রিও দেল্লা প্রাতা ও দানিউব এই চারিটি নদীর মূর্তি আছে। এই মেলা রোমের একটি বিশেষত্ব। রোমের জনসাধারণ সেদিন স্নানতার বন্ধন ভুলিয়া যায়। সেই জ্ঞাত সেদিন স্ত্রী-পুরুষ বারা মেলার আনন্দে যোগ দিতে চায় তাহাদিগকে স্নানতাবিরুদ্ধ আচরণের জ্ঞাত প্রস্তুত হইয়া বাহিতে হয়।

বেকানার পরে কার্ণেভাল উৎসব আরম্ভ হয় ও ঈষ্টারের চল্লিশ দিন আগে শেষ হয়। এক সময় রোমের কার্ণেভাল জগদ্বিখ্যাত ছিল। তখন রোমের রাজপথগুলি সারা

শীতকাল উদ্দাম আনন্দে মত্ত জনতার গমগম করিত। কিন্তু আগেকার রাত্তাব ক্ষুণ্ণ এখন 'বলকমে' আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনও দোকানে দোকানে নানা রকমে মুখোস ও রকমারি পোষাক বিক্রয়ার্থ সাজান দেখা যায়, কিন্তু ক্রেতার দল এখন শুধু শিশুরাই। পরিণত-বয়স্কেরা শুধু ঘরের ভিতর নাচিয়াই ক্ষান্ত। আগেকার দিনেব চটকদার শোভাবাত্রা, পুষ্পযুক্ত ও মুখোস পবিয়া নাচ আব নাই। এখনকার রোমানরা শুধু খোলা মুখে নাচিয়া, কনসার্ট শুনিয়া, অপেরা দেখিয়া ও খেলাধুলা করিয়া কার্ণেভালের সময় কাটায়। মুসোলিনির আমল হইতে খেলাধুলার প্রতি যৌক খুব বাড়িয়াছে। শীতের কয় মাস দলে দলে হাজাব হাজার যুবক-যুবতী বোম হইতে অনতিদূরে রক্তাবাসো ও টেরমিনিজো নামক স্থানে স্কি খেলিতে যায়। আজকাল রোমান যুবকদের মধ্যে ইংরেজদের অনুকরণে শিয়াল-শিকার, পোলো ও ফুটবল খেলিবার আগ্রহও খুব বাড়িতেছে।

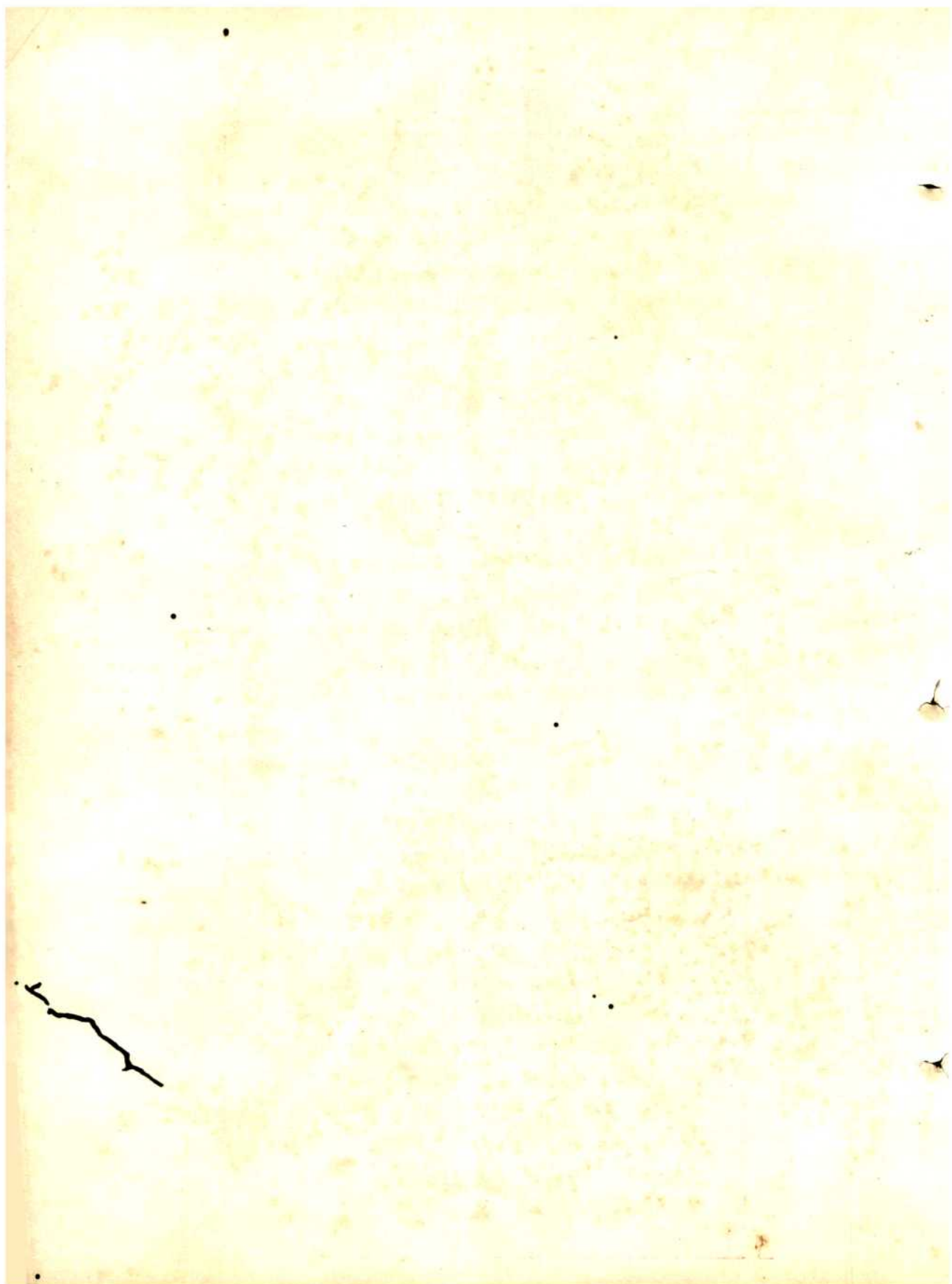
ঈষ্টারের সময় রোম আবার তার চাবিশত গির্জার ভিতর দিয়া জগতের কাছে নিজের মহিমা ঘোষণা করে। ক্রীষ্টের জীবনের যে ট্রাজেডি জেরুজালেমে সংঘটিত হয় তাহা লোকোত্তর মহিমার মহিমাম্বিত হইয়াছে রোমের মাটিতে, কারণ রোম সেন্ট পল ও সেন্ট পিটারকে নিজের বৃক স্থান দিয়াছে ও ক্রীষ্টধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিণত করিয়াছে। প্রতি-বৎসর ঈষ্টারের দিনে রোমানরা দীর্ঘকালব্যাপী আচাবেব ভিতর দিয়া ক্রীষ্টের জীবনের ট্রাজেডির পুনরুত্থান করিয়া নিজেদের এই কীর্তির কথা স্মরণ করে। রোমে আভেস্তিনো পাহাড়ের উপর বেনেডিক্টিন সন্ন্যাসীদের একটি বিহাব আছে। নাম সেন্ট আনসেলম। কি নিষ্ঠা ও সংযমের সহিত এই অস্থান সম্পন্ন করা হয়, গত বৎসব ঈষ্টারের দিনে এই বিহারে আমি তাহা দেখিয়াছিলাম। ক্যাথলিক ধর্মের ভিতর যে কতটা কাব্য আছে তাহাও আমি সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলাম। পূজার্তনার অস্থান-বিধির জটিলতা ও আড়ম্বরের কথা ভাবিলে ক্যাথলিকদিগকে ব্রাহ্মণদের নিকট-জ্ঞাপ্তি বলিয়া মনে হয়।

ঈষ্টারের পরে ২১শে এপ্রিল রোমেব-অস্ট্রোৎসবের দিন। শীত শেষ হইয়াছে। প্রকৃতির চেহারা বদলাইয়াছে।



কৃষ্ণপেত্র
শ্রীগিরীজবৃক্ষদয়

অবাসী প্রেস, কলিকাতা



এদিন আপনি আবাব ক্যাপিটল পাহাড়ের উপরে উঠিয়া
সেখান হইতে রোমের জন্মোৎসব লক্ষ্য করুন। আপনার
দৃষ্টি আবার কোবামে ও পাল্যাটিন পাহাড়ের ভয়ঙ্কর ও
আরা চেলি গির্জার উপর পতিত হয়। আবার আপনার মনে
প্রশ্ন জাগে—রোম কাকে তার ক্ষয় দিয়াছে, রোমোলাস

ও তার বংশধরদের, না গ্যালিলিয়ান ও তার শিষ্যদের?
কিন্তু রোম কোন জবাব দেয় না। সে শুধু বসন্তের মুহূর্ত
স্বর্ধাকিরণে আপনার দিকে চাহিয়া হাসে। সে-হাসি
মোনালিসার হাসিব মত তুর্কোখ্য ও মন্দর।

রোম (২০১.৩০)

কুলীনের মেয়ে

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খনদা মুখের কল্পা তরু শেষে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা
করিল। এই মেয়েটাই অতি দৃষ্ণ পরিবারটির কর্ণধাবহীন
সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। পরিবারের মধ্যে
বিধবা ভ্রাতৃজায়া, একটি বালক ভাইপো, আর নিতান্ত না-
বালিকা একটি ভাইব্বি। পাড়াগাঁয়ে যাহাকে বলে—সাপের
গর্ত, ইহুরের গর্ত হইতে আহাির সংগ্রহ করা—তাই। করিয়া
তরু বাপের বংশটির ভরণপোষণ করিয়া চলিতেছিল।
অতিদৃষ্ণও তাহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকিত—লোকে
বলিত ধৈর্যের প্রতিমূর্ত্তি তরু। সেই তরু কেন যে অকস্মাৎ
ধৈর্য হারাইয়া বসিল তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিল
না। তরুও যুগাঙ্করে তাহার কোন আভাস দিয়া গেল না।

রাত্রি এগারটার সময়েই, তরুর যন্ত্রণাকাতর ধ্বনিতে
তাহার ভ্রাতৃজায়ার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে পাড়া-
প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনিল।

তরুর মুখ দিয়া তখন ফেনা ভাঙিতেছে—মৃত্যু বুক
আসিয়া নির্মমভাবে চাপিয়া বসিয়াছে। তরুর দেহখানাকে
সে যেন হুমড়াইয়া ভাঙিয়া জীবনটুকু টানিয়া বাহির করিয়া
লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তরুর সই—প্রতিবেশিনী
জমিদার-গিন্নী ডাকিলেন—সই—সই।

অতিকষ্টে চোখ মেলিয়া তরু উত্তর দিল—জ্যা।

সেহভবেই জমিদার-গিন্নী প্রশ্ন কবিলেন—এ কাজ
কেন করলে সই?

তরু অবশপ্রায় হাতখানি কপালের উপর রাখিয়া বোধ
করি ইঙ্গিত করিল—কপাল, অদৃষ্ট।

আচ্ছন্নতা প্রগাঢ় হইয়া আসিতেছিল—জমিদার-গিন্নী
তাহাকে নাড়া দিয়া আবার ডাকিলেন—সই—সই! তরু!

তরু চোখ মেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখ খুলিল
না—জ-হুইট খানিকটা উপরে উঠিল মাত্র। মুখে সে
জড়িতস্বরে বলিয়া উঠিল—ছি—বড় ঘেন্না!

আবার মূহুর্ত্তরে বলিল—আর সহ হ'ল না। আর—

আবার সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ডাক্তার আসিয়াছিলেন। ইন্জেকশন—ষ্টম্যাক পাম্প
দিয়া বিয়ের সহিত যুদ্ধও বধেষ্ট চলিতেছিল। কিন্তু বিষ
তখন বিষম হইয়া উঠিয়াছে—উপায় ছিল না। ডাক্তার
হতাশ হইয়া উঠিতেছিল। সে আর একটা ইন্জেকশন দিল।
বিষ-বোরের আচ্ছন্নতার মধ্যে তরু একটু মুখ বিকৃত করিল
মাত্র। জমিদার-গিন্নী আবার তাহাকে সজোরে নাড়া দিয়া
ডাকিলেন—তরু—তরু!

ইন্জেকশনের শক্তি-ফলেই বোধ করি তরু এবার একবার
চোখ মেলিয়া কয়েকটি কথাই বলিল—আঃ—আর ডেক
না গো!

জমিদার-গিন্নী বলিলেন—একবার দেখবি?

তরু স্থবদৃষ্টিতে সইয়েব মুখের দিকে চাহিয়া
রহিল।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন—তারণকে একবার দেখবি ?
ডাকব ?

তরু বলিল—ছি !

তরু সখা—তাহার স্বামীও এই গ্রামেরই অধিবাসী—
নাম বিপদতারণ। পেশাদার কুলীন বিপদতারণ—সর্বমুদ্র
তাহার ছয়টি বিবাহ। জমিদার-গিন্নীর চোখ দিয়া কয়
ফোটা জল ঝরিয়া পড়িল। দারুণ যন্ত্রণার আক্ষেপে তরু
আঁকিয়া-বাঁকিয়া গোড়াইতে-গোড়াইতে ক্ষতিত স্বরে বলিল—
মুক্তি দাও—হে ঠাকুর।

মুক্তি সে পাইল ভোররাজে—প্রায়-অবসান রাজির
অন্ধকার তখন শুকতারার আলোকে ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া
উঠিয়াছে—সে অক্ষুণ্ণ আলোকে তরু মানুষ্যের অজানা পথে
যাত্রা করিল।

কাঁদিবার বড় কেহ ছিল না—ভ্রাতৃজ্ঞায়া একবার কাঁদিয়া
নীরব হইল—কিন্তু ছেলমানুষ ভাইপোটির-কাছার নৈশ
প্রকৃতির খানিকটা অংশ সক্রমণ ভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।
ঐটুকুতেই বোধ করি তরুর অনির্দিষ্ট যাত্রা সার্থক হইয়া
উঠিল।

এদিকে কিন্তু বাস্তব সংসারে ইহার পরেও অনেক-কিছু
অপেক্ষা করিয়াছিল। প্রভাত হইতে-না-হইতে পুলিশ
আসিয়া দরজায় বসিল। সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, ছেলেটা
এক মুহূর্তে সভয়ে কান্না খামাইয়া যেন মুক হইয়া গেল।

ভদ্রলোক কয়েক জন আসিয়াছিলেন। পুলিশের সব-
ইনস্পেক্টর তাঁহাদের সমক্ষে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। তরুর
বিছানার মধ্যে ছইখানা পত্র পাওয়া গেল। একখানা
শিরোনামাহীন—সেখানায় সে আঁকা-বাঁকা অক্ষবে লিখিয়া
গিয়াছে—আমি আপন ইচ্ছায় বিষ খাইয়া আত্মহত্যা
করিতেছি। বড় লজ্জা—বড় যুগাব জীবন—এ যাওয়াই
ভাল। আর সহ্য করিতে পারিলাম না।

অপরখানিতে দক্ষিণপাড়ার জমিদার গাঙ্গুলীবাবুর নাম
লেখা ছিল—যোগীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলীবাবুকে আহ্বান
করিয়া তাঁহাকে দিয়াই পত্রখানি খোলা হইল। পত্রখানি
পড়িতে পড়িতে তাঁহাব হাত কাঁপিতেছিল—মুখ বিবর্ণ হইয়া
উঠিল।

পর্যতাল্লিশ বৎসর পূর্বে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে একটা
সদ্যজাত শিশুর ভূমিকা লইয়া তরু প্রবেশ করিয়াছিল।
একটি সচ্ছল গৃহস্থ—বাপ, মা, দুই বড় ভাই, তরুব আদরেই
আর সীমা ছিল না। বাপ ধনদা মুখুজের পৈতৃক
অবস্থাই শুধু সচ্ছল ছিল না—তাঁহার নিজের উপার্জনও
ছিল পর্যাপ্ত। স্থানীয় রেজেন্টারী আপিসে কাজ
কবিতেন—বেতুন পনেব টাকা—কিন্তু উপরি-পাওনা দৈনিক
দুই-তিন টাকার কম ছিল না। তাহাব উপর তিনি ছিলেন
একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির। তাঁহাদের বংশকেই লোকে
বলিত মাথাখাবাপের বংশ। ধনদা বাবুর পিতা এক দিন
প্রয়োজনেব সময় একটা সূচ না পাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া পাঁচ
টাকার সূচ কিনিয়া সমস্ত বাড়ি-বরের দেওয়াল সূচী-
কণ্টকিত করিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—সূচের অভাব
আমার বাড়িতে !

আরও একটা খেলার কথা বলি—তিনি ছিলেন
কুলীনের ঘরের ভাগিনের—মাতুলদের আশ্রয়েই বাস ছিল।
মাতুল ছিলেন সে আমলের লক্ষপ্রতিষ্ঠ উকীল। পুঙ্খার
সময় সপরিবারে দেশে আসিতেন। তখন রেল মোটর ছিল
না—পাকীই ছিল সম্ভ্রান্ত যান। সেকালে তাঁহার
মাতুলের বৃহৎ সংসার আট-দশখানি পাকীতে সদর হইতে
ষেদিন গ্রামে ফিরিত, সেদিন দশখানা পাকীব বোহারার
হাঁকে গ্রামখানা সরগরম হইয়া উঠিত। ইতর ভদ্র সকলে
দলে দলে দেখিতে ছুটিত। ভদ্রলোকেরা সাগ্রহে কুশল
জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগে কথা কহিয়া ধন্ত হইত। ধনদা
বাবুর পিতার সে সহ্য হইত না। বলিতেন—আঁঃ—সবাই
গিয়ে মামাকেই বলবে—কখন এলেন—কেমন ছিলেন ? যুবক
ত একখানা পাকীব। সে আও পাকী। তিনি নিজে এক
পাকী চাপিয়া গ্রাম হইতে মাইল-দুই দূরে গিয়া অপেক্ষা
করিয়া থাকিতেন। মাতুল-পরিবারের পাকীবাহিনীর
সাদা পাইবা মাত্র তিনি হুকুম দিতেন—উঠাও পাকীব
হামবা পাকীব আগে যারে গা। মাতুলের আগেই তাঁহার
পাকীব গ্রামে আসিয়া পৌঁছিত। পাকীব হইতে নামিয়া তিনি
প্রতীক্ষমান ভদ্রজনদের সহিত নিজেই আলাপ কবিতেন—
কি চাটুক্ষে মশার ধো—নমস্কাব, নমস্কার। বাড়ির সব ভাল—
আপনি ভাল আছেন ? আমি ভালই আছি। এই আসছি।

তাঁহার পিতা—ধনদাবাবুর পিতামহ, আহাির করিতে বসিয়া সম্মুখে বাহাকে পাইতেন প্রশ্ন কবিতেন—বলি—
—হ্যা—হে আর খেতে পারব—পেট ভরেছে কি না বল দেখি ?

ধনদাবাবুও পিতা-পিতামহেরই মত ছিলেন। আর-
ব্যয়ের হিসাব তাঁহার ছিল না। কেহ বলিলে বলিতেন—
হিসেব কিসেব রে—হিসেব? একের পরে শূত্র দিলে হয়
দশ—আর এক শূত্র দিলে শ—আবাব শূত্র দাও হাজার
—দশ দিয়ে অঙ্ক বাড়ানোব নাম হিসেব? তাঁহার তিন
পুত্রও বংশের ধারা হইতে বাদ যায় নাই—বড়টি মাতাল,
মেজটি বন্ধ গোঁয়াব, ছোটটি ছিল তানসেন। ফুলে কোথ রাস
হইতে প্রমোশন না পাইয়া বেদিন সে কাঁদিত কাঁদিত বাড়ি
ফিরিয়া আসিল, সেদিন ধনদাবাবু বলিলেন—কাঁটা মার
ইকুলের মুখে—কিছুই জানে না বেটার। লেখাপড়াব
জন্তে কান্না কিসের—কাঁদুছিস কেন তুই—একরাতে তোকে
বিদ্যেন ক’রে দেব আমি। তাহার পর দিনই তিনি ছেলেকে
তবলা কিনিয়া দিলেন। বাকু, তের বৎসর পর্যন্ত তরুর
জীবনের ভূমিকায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সংস্থান
নাট্যকার করেন নাই। ছোট মেয়েটি আনন্দময়ী প্রতিমাব
মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত—দাদার মাষ্টাবের নিকট
নিজে হইতেই গিয়া গভীর মনোযোগের সহিত একখানা
ইংরেজী বই খুলিয়া মনে বাহা আসিত তাহাই পড়িয়া বাইত।
ছাত্রীটির অনুরাগ দেখিয়া মাষ্টার তাহাকে লিখিতে পড়িতে
শিখাইলেন। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলিতে গিয়া কান্দল
বাধাইয়া ফিরিয়া আসিত—ভূমি শালপাতা ছেঁটে ছুয়ে দিলে
কেন আমাকে? বলব না—গাল দেব না আমি? হ্যা তাই
গঙ্গাজল।

সন্ধ্যায় সে মায়ের আঁচল ধরিয়া আবার ধরিত—গল্প বল
ভূমি—বিয়ের গল্প।

এই বিবাহের গল্পের উপর তরুর বিশেষ একটি প্রীতি
ছিল। নিত্য সন্ধ্যায় বিবাহের গল্প না শুনিলে তাহার হইত
না। তাহার তেব বৎসরের সন্ধ্যায় মধ্যে শৈশব ও শৈবের দুই
বৎসর ছাড়িয়া দিয়া এই গল্প শোনার ব্যক্তিক্রম যে কয় দিন
ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা বোধ করি হিসাব কবিয়া বলা যায়।
মা গল্প বলিতেন—এই রত্নচৌকী বাজবে—চোলের
বাজনা হবে। মশালের আলো জালিয়ে হুমহাম্ ক’রে ববের

পাকী আসবে। রাঙা টুকটুকে বর। ইদিকে লুচি ভাজা
হবে, সন্দেশ হবে, মুড়কী হবে, মুড়ী হবে। ঘরের মধ্যে
তরুর পাচী পেড়ে চুল বেঁধে দেব। তরু গয়না পরবে—হাতে
দেব কাঁকনি, ওপর হাতে বাজুবন্ধ, গলায় মুড়কী-মাছলী,
কোমরে গোট।

তরু নীরব নিস্তরু—তাঁহার ‘ছ’ দেওয়া কখন বন্ধ হইয়া
গেছে। মা নাড়া দিয়া ডাকেন—তরু, তরু ঘুমুস না—খেয়ে
ঘুমুবি। অ—তরু।

তরু আগিয়া উঠিয়া বলে—তাব পরে ?

তরুব ছোটদাদা বুক বাজাইয়া তবলার একটা বোল
মাখিতে মাখিতে পান লইতে আসিয়াছিল। সে তরুর
মাথাব উপরে একটা চাটি মাঝিয়া দিয়া বলিল—কন্তে-
ধাগিনাক্—

* * *

তরুর এই ‘তার পর’ প্রশ্নের উত্তর নাট্যকার তাহার
জীবনভূমিকার মধ্যেই রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।
তের বৎসর বয়সেই সে উত্তর সে পাইল। ত্রিশ-বত্রিশ
বৎসর পূর্বে তখন বাংলা দেশে বঙ্গাল সেনেরই রাজত্ব
চলিতেছে। গঙ্গাযাত্রার পথেও কুলীকে তখন লোকের
কতাদায় উদ্ধার করিতে হইত। ধনদাবাবু সেদিন তাঁহার
পিতাব মাতুলপুত্র—স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণবাবুর বৈঠকখানার
দরজা হইতেই লাফ দিতে এবং চীৎকার করিতে আবস্ত
কবিলেন—বাপ রে, বাপ রে, খেলে রে—।

কৃষ্ণবাবু শব্দবাস্তে বাহিব হইয়া আসিলেন—কি হ’ল,
কি হ’ল—ধনদা—তাইপো ?

ধনদাবাবু বলিলেন—প্রকাণ্ড এক সাপ ! বাপ বে, বাপ,
হাত-চারেক লম্বা, ইয়া ফণা ! খেবে ফেলেছিল আর একটু
হ’লেই।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—কোথায় ?

ধনদাবাবু বলিলেন—তোমাব সিঁড়ির মুখেই—বাপ বে
বাপ !

আস্তিক—গরুড়—আস্তিকস্যা মূনেমাতা—। সাপের
কথা শুনিয়াই কৃষ্ণবাবুর লোকজন লাঠিসেঁটা লইয়া প্রস্তুত
হইয়াছিল। তাহার আগাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবাবুও
গেলেন, পিছনে ধনদাবাবু।

সাপ দেখা গেল না। কৃষ্ণবাবু বলিলেন—দেখ, সব ভাল করে খুঁজো—

তাহার কথা শেষ হইল না, ধনদাবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ঐ—সাপ!

—কই—কই?

ধনদাবাবু কৃষ্ণবাবুর কাপড় টানিতেছিলেন, বলিলেন—পালিয়ে এস—পালিয়ে এস বাবা।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—সাপ কই?

—ঐ যে, ঐ যে ঘাসের মধ্যে। ঘাস নড়ছে। নড়ন্ত ঘাসের উপরে লাঠিরূপী হইয়া গেল। তাহার পর তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল হাতখানেক লম্বা একটি হেলে-সাপ।

কৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন—মধুসূদনের ঝাড়ের দোষ, তোমার দোষ কি বল!

ধনদাবাবুরা মধুসূদন তর্কালঙ্কারের বংশ। ধনদাবাবু বলিলেন—সাপ ত বটে হে বাপু। ওটাই কি কম? ওর আবার বিষ বেশী, নামই হ'ল হলাহল। ওটা খেলেই যে—বাস, ধনদা-ভাইপো অজ্ঞ। নাও, চা করতে বল।

চা তখন সবে দেশে ঢুকিতেছে। কৃষ্ণবাবুর বৈঠকখানা সে আমলে ছিল সমস্ত গ্রামের চায়ের আসর। সর্দি হইলে কেহ কেহ এক-একটা পাঁচ সেরি ধোঁরাবাগী-হাতে চা লইতে আসিত।

তামাক টানিতে টানিতে ধনদাবাবু হাত-পা নাড়িয়া বলিলেন—বাপজান, ফেসাদ ত চুকিয়ে ফেললাম।

কৃষ্ণবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন—ফেসাদ আবার কি হ'ল, কই কিছু ত শুনি নাই, তুমিও বল নাই।

ধনদাবাবু বলিয়া উঠিলেন—ফেসাদ নয়? মহা ফেসাদ। মেয়ের বিয়ে দাও, বিয়ে দাও! আবে বিয়ে দাও বললেই

কৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন ও তরুর বিয়ের কথা বলছ? —দেখ দেখি বাপু, ছেলে হয় মেয়ে হয় খেয়ে খেলে বেড়ায়—সেই ত ভাল। তার আবার বিয়ে কেনে রে বাপু!

কৃষ্ণবাবু হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ধনদাবাবু কয়েক বার ঘন ঘন নলে টান দিয়া বলিলেন—তা

আমি ত ফেসাদ চুকিয়ে ফেললাম, বাপজান। সব ঠিক হয়ে গেল।

কৃষ্ণবাবু প্রশ্ন করিলেন—কোথা?

বার-দুই মাথা নাড়িয়া ধনদাবাবু বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। বাপজান, এ কি তোমাদের চোখ, এ আমাদের শিকেরী-চোখ। আমাদের ঘরের ছোঁড়েরেই পাঁজ-হরিচরণের ছেলে তারণ—ওই বাক বলি আঁটি-চোখো তারণ।

কৃষ্ণবাবু সবিস্ময়ে ধনদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—সে কি!

কৃষ্ণবাবুর বিস্ময় ধনদাবাবুর গোচরেই আসিল না। তিনি মহা উৎসাহভরেই বলিতেছিলেন—কুলীনের সেরা কুলীন—কেশব চক্রবর্তীর সন্তান—

কৃষ্ণবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—কুল ত ভাল, কিন্তু ছেলে যে কুলদ্বার।

ধনদাবাবু প্রবল প্রতিবাদ তুলিয়া বলিলেন—খুব ভাল ছেলে। পাঁচ-হিংস্রকে বলে মন্দ। অতি উত্তম ছেলে।

কৃষ্ণবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি শুধু ধনদাবাবুর মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

ধনদাবাবু ধামেন নাই। তিনি বলিলেন—সে দিন এক-নজরে আমি চিনে নিয়েছি। যে খাতিরটা আমাকে করলে সেদিন—ওঃ সে আর তোমাকে কি বলব! জলের সময় আসছি—ছাতা নাই—দেখেই আমাকে ডেকে বসালে, নিজে হাতে তামাক স্নেহে খাওয়ালে। বুঝলে কি না, সেইখানেই ওর মা নিজে সেধে কথা পাড়লে।

কৃষ্ণবাবু এতক্ষণে বলিলেন—এবই মধ্যে পাঁচটা বিয়ে ওব. হয়ে গিয়েছে—তা জান!

ধনদাবাবু উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলেন—বাঃ কুলীনেব ছেলে বিয়ে করবে না? আরও দশটা করে নাই এই আশ্চর্য্য।

কৃষ্ণবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—কাজটা ভাল হবে না ধনদা-ভাইপো, পেশাদার কুলীনের ছেলে—ও কখনও বশ মানেনা।

ধনদাবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—রূপোর শেকল দিয়ে বেটাকে বেঁধে রাখব। ঘর ক'বে দেব, জমি দেব, আব সববেজেটারী আপিসে একটা কাজে ঢুকিয়ে

দেব, বুঝলে, বাস—আর যাবে কোথা, ঘুরে ঘুরে নড়েই ব'স তাঁবেদার হয়ে থাকবে। বজ্জাতি করলেই যাতে-তাতে কাঁইন ক'রে দেব।

কৃষ্ণবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার অসন্তুষ্টি অনুমান করিয়া ধনদাবাবু বলিলেন—তারণের মা খোশামোদ করছে। পাত্রপক্ষ খোশামোদ করছে এ কখনও ছাড়তে আছে? কোথা এখান-ওখান ক'রে লোকের খোশামোদ ক'বে বেড়াব বল ত?

কৃষ্ণবাবু এ-কথারও কোন জবাব দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ধনদাবাবু আবার বলিলেন—গাঁজা নদ একটু খায়, রংটা কাল, তার আর কি হবে? কুলাঙ্গার বলছ—ও আঙ্গারে আঙুন ঠেকালেই আঙ্গার আঙুন, বুঝলে। ঘরসংসার হলোই সব ঠিক হয়ে যাবে।—বলিয়া নিজের বসিকতায় নিজেই তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া সারা হইলেন। কৃষ্ণবাবু নীরব হইয়াই রহিলেন।

* * *

তরুর জীবন-ভূমিকার একটি পট পরিবর্তিত হইল। অদৃষ্ট নাট্যকারকে মানিতে গেলে বলিতে হয় তাহারই নির্দেশ-অনুযায়ী তরু একদিন রাঙা ঢেলী পরিল, চোখে কাজল পবিল, আভরণ পরিল, বসনে সুষণে রাজকন্যা সাজিয়া রাঙা টুকটুকে বরের প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া রহিল।

তার পর শুভক্ষণে বিপদতারণের জীবনের সহিত নিজের জীবনের গ্রন্থি বাঁধিয়া লইল। ধনদাবাবু কন্যার বিবাহে খরচের ক্রটি করেন নাই। বরান্দরণে, দানে তিনি তার বোঝাই করিয়া দিয়া কন্যাকে জামাতাব সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

ফুলশয্যার রাত্রে তরু বিছানার শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তারণের খোঁজ ছিল না—সে কোথায় গিয়াছে। অস্বাভাবিক হইলেও বরের বাড়িতে এ লইয়া কোন ব্যস্ততা বা আন্দোলন ছিল না। অকস্মাৎ কাহার আফালন-আহ্বানে বহির্দ্বারে উচ্চ আঘাত-শব্দে তরুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাত্রি বোধ হয় গভীর, বাহিরে কোথাও আর কোন শব্দ নাই। সদ্য ঘুম ভাঙিয়া অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে আপনাকে দেখিয়া তরু ভয় পাইয়া গেল—তার পর তাহার মনে পড়িল এ স্বামীর ঘর। ওদিকে দরজা-খোলার শব্দ হইল, সঙ্গে

সঙ্গে কাহার কণ্ঠস্বরও সে শুনিতে পাইল—আজকের দিনেও কি এই কাণ্ড করে—? জড়িত উচ্চ স্বরে কে বলিয়া উঠিল—কেয়া হ্যায়—কোন শালার পরোয়া করি আমি!

কে বলিল—ওরে শোন—শোন—

সেই মুহূর্তেই তরুর শয়নঘরের দরজা প্রচণ্ড আঘাতে আছাড় খাইয়া খুলিয়া গেল—টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল তারণ, তাহার এক হাতে একতাল কি রহিয়াছে।

তারণ আসিয়াই বলিল—ইধার আও—এই—ইধার আও।

সে মুষ্টি ও আফালন দেখিয়া তরু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

তারণ বলিল—তোর মুখেব হাঁচ তুলব আমি—এই কাদা দিয়ে, এই কাদা দিয়ে—।

হাতটা নাড়িয়া কাদার তালটা দেখাইতে গিয়া হাত হইতে কাদার তালটা থপ কবিয়া পড়িয়া গেল। তরু সময়ে ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তারণ কাদার তালটা মাটি হইতে চাচিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল—পরী দেখতে চেয়েছে তোঁর মুখের হাঁচ—তোব মুখের হাঁচ তুলব আমি।

পরী একটা নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক—পরীর কথা তরু জানে, বিবাহের পূর্বেই শুনিয়াছে। তরুর চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল—গলা দিয়া স্বব তাহার বাহির হইল না।

তারণ বলিল—পরীকে বালা দিতে হবে—খুলে দে তোঁর বালা।

তরু বালা দুইগাছা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। তারণ খুলী হইয়া বলিল—আব্ব ইধার আও, মুখের হাঁচ লেঙ্গে—আও, আও—।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া তারণ অগ্রসর হইল। তরু এবার প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিয়া দরজার দিকে ছুটিল। তারণও ছুটিল, দরজার মুখেই সবল তরুকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার মুখের উপর কাদার তালটা চাপাইয়া দিল। কাদার তালটা তুলিয়া লইয়া দেখিয়া বলিল—ওঠে নাই ভাল।—বলিয়া আবার সেটা তরুর মুখের উপর চাপাইয়া দিল। তরুর খাসকান্ন হইয়া আসিতেছিল। সে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া মত্ত তারণকে

একটা খাঞ্চা দিল। নেশার উত্তেজনার জ্বলন্ত তারণ পড়িয়া গেল—সেই অবসরে দরজা খুলিয়া ছুটিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বাহিরেও নিষ্কৃতি ছিল না—সেখানে শান্তুড়ী প্রহরা দিতেছিল বাঘিনীর মত। তারণের ধরের দরজায় অতি ক্ষিপ্ৰভাবে শিকল দিয়া বন্ধ কবিয়া দিয়া বধূকে আটক করিয়া কহিল—পালাবি কোথায় শুনি? হারামজাদী, স্বামীকে ফেলে দিয়ে তুমি পালাবে? কেলেঙ্কারী কবে আমার?

তরু সত্তরে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শান্তুড়ী তাহাকে সেই অবস্থাতেই আপনার ঘরে বন্ধ করিলেন। তরুর কান্দিবার সাহস ছিল না, কিন্তু কান্নার আবেগে বুক বেন তাহার কাটিয়া যাইতেছিল। সে নিদ্রাহীন চক্ষে আবেগের সহিত যুদ্ধ কবিয়া বিক্ষারিত চক্ষে ঘরভরা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া পড়িয়া রহিল।

ভোরের দিকে শান্তুড়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—ও ঘরে তারণেব নাসিকা-গর্জনেব ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। তরু উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভয়ে বেন সে পঙ্গু হইয়া গেছে। কিছুক্ষণ পব আবার সে উঠিল। দরজার কাছে আসিয়া অর্গলে হাত দিল।

ধনদাবাবু গ্রামের মধ্যে প্রত্যুষে উঠিয়া থাকেন—অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই তিনি বাহিরে আসেন। সেদিন প্রত্যুষে বহির্দ্বার মুক্ত করিয়া মাত্র প্রথম দর্শন করিলেন নববিবাহিতা কস্তাব কর্দ্ধমলিপ্ত মুখ। তিনি শিহবিয়া প্রশ্ন কবিলেন—তরু—মা!

তরু উত্তব দিতে গেল, কিন্তু পারিল না—সে এতক্ষণে মুচ্ছিত হইয়া পিতার কোলে চলিয়া পড়িল।

তরুব জীবনের এইখানেই বোধ হয় প্রথম অন্ধ শেষ হইল।

পরদিন প্রভাতেই তরুর শান্তুড়ী বউ লইতে আসিয়া বলিল—আরও পঞ্চাশ টাকা তোমাকে লাগবে বেয়-ই। তারণ ত আমার রেগে খুন—বলে ও পরিবার আমি নোব না। আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

অসহিষ্ণু ভাবে ধনদাবাবু বলিলেন—না।

সবিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া তরুর শান্তুড়ী বলিল—না কি? এক কথায় ধনদাবাবু বলিয়া দিলেন—মেয়ে আমি পাঠাব না।

তরুর শান্তুড়ী বলিল—অ—তা বেশ। কিন্তু গয়নাগুলি আমার দাও। গয়না ত আমার তারণের।

ধনদাবাবু বলিলেন—গয়না আমার মেয়ের।

ইহার উত্তরে তরুর শান্তুড়ী চীৎকার কবিয়া পথে পথে তরুর গতরাত্রির নৈশ অভিসারের একটা রচিত কাহিনী রচনা কবিয়া বাড়ি ফিরিল।

ধনদাবাবু প্রতিজ্ঞা কবিলেন—ও জামায়ের আমি মুখ দেখব না। আমার মেয়ের ভাবনা! এক লাখ টাকা দেব আমি তরুকে—বেটা নিজে এসে গড়িয়ে পড়বে—তবে আমার নাম।

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা তাহার থাকিল না।

চার বৎসর পবের কথা। তরুর বয়স তখন সত্তের বৎসর।

তরুর মা সেদিন ধনদাবাবুকে বলিলেন—হ্যা গো—মেঘেটার একটা ব্যবস্থা কর।

ধনদাবাবু বলিলেন—পাঁচ হাজার টাকা দেব আমি তরুকে—ভাবনা কি?

গৃহিণী বলিলেন—টাকা নিয়ে কি করবে তরু? কে ভোগ করবে?

ধনদাবাবু সচকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—হুঁ।

গৃহিণী বলিলেন—জামায়ের সঙ্গে কি মাথা তুলে চলা চলে, যার পারে ধরে মেয়ে দিয়েছে! তরুর দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

ধনদাবাবু কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় নিজেই গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন—তরু ত বেশ রয়েছে—কেবল দেখলাম আজকাল বৌদেব সঙ্গে ঝগড়া করে বেশী।

গৃহিণী বলিলেন—ঝগড়া করাটা বুঝি ভাল মনের লক্ষণ?

ধনদাবাবু ডাকিলেন—তরু—তরু!

তরু তখন নীচে ঝগড়াই করিতেছিল—সে ভীষ্মকণ্ঠে অন্ধকার বাড়িটার প্রাঙ্গণে একা দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—

গোপালের মা সব—গোপাল কোলে ক'বে শুয়েছেন।
আব আমি—দাসী-বান্দী আমার ত না খাটলে উপায়
নেই। আমি ত গোপালের মা নই।

ধনদাবাবু গৃহিণীকে বলিলেন—হুঁ।

তরু তখনও আপন মনেই বকিতেছিল—কাল যে
যজ্ঞী—তা সে-উষ্মগও আমাকে করতে হবে? কেন—
কুনি? ঝাটা মারি আমি যজ্ঞীর মুখে।

* * *

পবদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই ধনদাবাবু গৃহিণীকে
বলিলেন—কুমুঠাকরুণকে একবার ডাক দেখি।

গৃহিণী বলিলেন—কেন?

—তারণের মায়ের কাছে একবার পাঠাব।

কুমুঠাকরুণ দৌত্য লইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া
বলিল—তারণ আসতে-যেতে রাজী আছে। কিন্তু ৬-দিন
আসবে সম্মানী দিতে হবে পাঁচ টাকা ক'রে। প্রথম দিন
কিন্তু দশ টাকা লাগবে।

ধনদাবাবু বলিলেন—দশ টাকা, মোটে দশ টাকা: হুশ-
পাঁচ-শ দেব আমি। চাঁদীর জুতো মারব আর নিরে
আসব বেটাকে—যাও তুমি কুমুদিদি, নেমন্তন্ন ক'রে এস—
বাজে সে এখানে থাকবে।

কুমু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—টাকা কিন্তু আগাম
দিতে হবে।

দশ টাকার ছইধানি নোট বাহির করিয়া তিনি
কুমুর হাতে তুলিয়া দিলেন, বিশ টাকা দিলাম—আবার
দেব। ভাবনা কি! বাড়িতে নানা আয়োজন হইল।
তরু নিজে হাতে শয্যা রচনা করিল।

ছোট ভাজ রসিকতা করিয়া বলিল—ঠাকুরঝিকে আজ
ভাই বড় খুশী খুশী দেখছি।

ফিফ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া তরু বলিল—মরণ আর
কি!

বড় ভাজ বড় করিয়া কেশবিত্তাস করিয়া দিল।

বাজে শুইতে বাইবার সময় সে আঁচলের খুঁট খুলিয়া
কয়টা বেগফুল খোঁপায় পরিয়া লইল। কখন গোপনে
সে কুমুদাবুর বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

প্রভাতে উঠিয়া তরু দেখিল শয্যাশূন্য—তারণ কখন

উঠিয়া চলিয়া গেছে। দেওয়ালে ঝুলানো আরনার সে
বিশৃঙ্খল মাথাটা ঠিক কবিয়া লইতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল—
তাহার কানের একটা মাকড়ী নাই। বিছানা খুঁজিতে
তাহার প্রবৃত্তি ছিল না—কিন্তু তবুও একবার খুঁজিয়া
দেখিল।

সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত মাকড়ী পাওয়া
যাইবে না—পাওয়া গেলও না।

কয় দিন পর আবার সেদিন সকালে কুমুঠাকরুণকে
দেখিয়া তরু মাকে বলিল—কুমুঠাকরুণ কেন এসেছিল মা?

মা বলিলেন—তারণকে নেমন্তন্ন করতে পাঠিলাম।

তরু বলিল—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব মা।

সবিস্ময়ে মা প্রশ্ন করিলেন—কেন?

তরু বলিল—হ্যাঁ।

কিন্তু কয় দিন পর কুমু আসিয়া বলিল—কই গো তরুব
মা—টাকা-পাঁচটা দাও বাপু—আগাম না হ'লে তোমাব
জামায়ের চলবে না।

তরুর মা বাস্তব খুলিতেছিলেন—তরু আসিয়া তাঁহার
পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমাকে আর আত্মহত্যা কবিও
না মা—তোমার পায়ে ধবছি আমি।

মা সম্মুখে তরুকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া
বলিলেন—কেন সে-কথা আমার বলবি না তরু?

মায়ের আকর্ষণেও তরু উঠিল না, সে ঝবঝব করিয়া
কাঁদিয়া মায়ের পায়ে মুখ লুকাইয়া বলিল—চোর—চোর, মা,
সেদিন আমার মাকড়ী চুরি ক'রে নিরে পাগিয়েছে।

* * *

আট বৎসর পরের কথা—

পশ্চাত্তের পটভূমির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গেছে।
জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ধনদাবাবুর বড়
বাড়িটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ হইয়াছে। ধনদাবাবুও
নাই—তাঁহার স্ত্রীও নাই। বাড়িটা চারি অংশে বিভক্ত
হইয়াছে—তিন ভাইয়ের তিন অংশ, তরুব এক অংশ।
তরুকে তিনি দিয়া গিয়াছেন নগদ পাঁচ শত টাকা ও
হাজার-দেড়েক টাকা মূল্যের জমি। লাখ-পঞ্চাশ হাজার-
দশ হাজার-পাঁচ হাজার ওটা ছিল ধনদাবাবুর স্বভাবসিদ্ধ
আঞ্চালনের অঙ্গ। বড় ভাইয়ের বাড়ি বন্ধ, বড়ভাইও

নাই—হেলেটিকে লইয়া বড়ভাঙ্গ ভাইপোর কাছে গিয়া
আছেন। মেজমাই এখানকার বাসই তুলিয়া দিয়াছে
—সমস্ত কিছুর করিয়া সে খণ্ডরবাড়িতে গিয়া বাস
করিতেছে। থাকিবার মধ্যে আছে তরু ও তরুর ছোটদাদা।
তরুও স্বতন্ত্র ভাবে সংসার পাতিয়াছে। ধনদাবাবুর
শ্রদ্ধাশ্রী চুকিয়া যাওয়ার কিছুদিন পর সেদিন তরুর দূর-
সম্পর্কীয়া এক নন্দ আসিয়া ডাকিল—বৌ রয়েছে না কি?

তরু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে?

নন্দ রসিকতা করিল—কুটুম হে কুটুম—সন্দেশ বার
কর।

তরু বলিল—এস—ব'স।

নন্দ বলিল—পাকী এনেছি—নিতে এলাম তোমাকে।

একখানা আসন পাতিয়া দিয়া তরু বলিল—ব'স।

বসিয়া নন্দ চারি দিক দেখিয়া বলিল—বেশ বাড়ি
হয়েছে। কার সঙ্গে কোন লেপ্চ নাই।

তরু শুকনুরে বলিল—হঁ।

নন্দ বলিল—আর কি দিয়ে গেল বাবা? কেউ
বলছে পাঁচ হাজার, কেউ বলছে দশ হাজার—তা অবিশেষের
কথা নয়—বাপ ত তোমার বড় বাপই ছিল।

তরু গম্ভীর ভাবে বলিল—পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে
গিয়েছেন।

নন্দ বলিল—তা আমাকে কিছু শিরোপা দিও ভাই,
আমি হুখবর এনেছি।

তরু কোন উত্তর দিল না—সে হুখবরটার জন্ত তাহার
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কেহ কোথাও ছিল না—তবুও অনাবগুক ভাবে মুহুরেরে
নন্দ গোপন সংবাদটি প্রকাশ করিল—দাদার মন টলেছে
হে—তোমার কপাল খুলেছে।

বিচিহ্ন হাসি হাসিয়া তরু বলিল—তাই না কি?

—হ্যাঁ, তাই ত বললাম—তোমাকে নিতে এসেছি।

—ও—।

—তা হ'লে কবে যাবে বল—এ মাসের ২০শ, ২৫শ,
২৭শ এই তিনটি দিন আছে।

তরু কঠিন স্বরে অপ্রত্যাশিত রুচভাবে এবার জবাব
দিল—বলতে তোমার লজ্জা লাগল না ঠাকুরখি—ছি—ছি।

একসঙ্গে তোমার দাদাকে তপস্শা করতে বল গে—আসছে
জন্মে যাব। আমার টাকার লোভে নিতে এসেছে—আবার
ছ-দিন পরে টাকা ক'টা কেড়ে নিয়ে আর একটা কলঙ্ক দিয়ে
বিদেয় ক'রে দেবে, কেমন?

নন্দ মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল। তরু পূজার জন্ত
ফুল বাছিতে বসিল। সে এখন নিত্য নিয়মিত পূজা
করে—ব্রত-নিয়মের কোনটি সে বাদ দেয় না।

ছোট ভাঙ্গ আসিয়া দাঁড়াইল।

অকুণ্ঠিত করিয়া তরু বলিল—কি?

বোটি ভয়ে ভয়ে বলিল—তোমার দাদা একবার
ডাকছে।

কর্কশভাবেই তরু উত্তর দিল—কেনে?

—সে ত আমি জানি না ভাই।

—তুমি জান না—আমি জানি—বল গে টাকা আমি
দিতে পারব না।

বোটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই ইমনকল্যাণ
ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ছোটদাদা আসিয়া বিনা-ভূমিকায়
বলিল—পাঁচটা টাকা দে ত তরু।

তরু ভাইকে দেখিয়া একটু কোমল হইয়া উঠিল—
এই ছোটদাদাটিকে সে বালাকাল হইতেই বড় ভালবাসে।
তরু একটু কোমল কণ্ঠেই বলিল—টাকা আমার নাই
ছোটদা।

ছোটদাদা বসিয়া পড়িয়া থামেব গারে টাকা দিয়া
বোল বাজাইতে বাজাইতে বলিল—আঃ আজ একটা গানের
মজলিস বসবে—এক জন সেতারী ওস্তাদ এসেছে।

তরু বলিল—এই ক'বেই তুমি সব নাশাবে ছোটদা।

ছোটদাদা আংটিটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—
এইবার দিবি ত! •

আংটিটা কুড়াইয়া লইয়া তরু পাঁচটা টাকা বাহিব
করিয়া দিল। খুলী হইয়া ছোটদাদা টাকা লইয়া যাইতেছিল,
কিন্তু তরু আবার ডাকিল—ছোটদা—নিংয়ে যাও তোমাব
আংটি। আংটিটা সে ভাইয়ের দিকে ফেলিয়া
দিল।

দিনকয়েক পর—সেদিন তখন সে রান্না করিতেছিল।
কাহার গলার সাড়া পাইয়া সে বুঝিল ছোটদাদা আজও

আবার টাকার জন্ত আসিয়াছে। সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।
মনে মনে শত্রু কথার সাবি সাজাইয়া তুলিতেছিল সে।

—একটু আশ্বন দাও দেখি।

তরু চমকিয়া উঠিল—মুখ ফিরাইয়া দেখিল—বিপদতারণ
নিলক্ষ্য ভাবে দাঁত মেলিয়া হাসিতেছে।

হি-হি করিয়া হাসিয়া বিপদতারণ বলিল—চমকে
উঠলে যে—ভূত নাকি আমি?

দেওয়ালে ঠেস দিয়া তরু কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তারণ বলিল—বেশ ঘরদোর হয়েছে। তা আমাকে
একদিন নেমস্তন্ন-টেমস্তন্ন কর।

তরু এবার বলিল—না।

তারণ কৃত্রিম ভয়ে একটু পিছাইয়া আসিয়া বলিল—
ও রে বাপ রে! সাপিনী রে—নাগিনী রে কোঁস!

তরু কিন্তু এ রসিকতায় হাসিল না।

তারণ বলিল—তা হ'লে কবে নেমস্তন্ন করছ বল?

তরু বলিল—বললাম ত—না।

—না! কেন শুনি?

তরু অস্থির কণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত বলিল—চোরকে আমি

বড় ঘোরা করি।

এক মুহূর্তে তারণের কাল মুখও কেমন অস্বাভাবিক
বর্ণ ধারণ করিল। মাথাও নত করিতে হইল।

তরু বলিল—মাকড়ী তুমি আমার চাইলে না কেন?

তারণ বলিল—চাইলে তুমি দিতে?

—চেয়ে দেখলে না কেন তুমি? মুখে মাটির ছাঁচ
তুলছিলে, তবু ত আমি রাগ করি নি।

তাহার ছুটি চোখ জলে টল্ টল্ করিতেছিল।

তারণ আসিয়া তাহার ছুটি হাত ধরিয়া অকৃত্রিম
স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল—আমাকে মাক্ কর তরু।

তরু বরষার করিয়া কাঁদিল শুধু। তারণ তাহাকে

বুকে টানিয়া লইয়া বার-বার তাহাকে চুম্বন করিল।

তার পর বাইবার সময় বলিল—রাজে আমার নেমস্তন্ন
রইল এখানে।

জীবনের এই তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার সুখের চিত্র
আঁকিয়াছিলেন। বিপদতারণ তাহাকে ধরা দিল, সত্য সত্য

ধার্মীর মতই ধরা দিল। অর্থ চাহিল না—সম্পদ চাহিল না—
আপনার মত করিয়াই সমস্ত জোভজমার তদারক করিল,
তরুর সেবাও লইল—শাসনও মানিল। মাস-চারেক পর
সেদিন তারণ মাঠ হইতে ফিরিয়া দেখিল তরু শুইয়া আছে।
প্রশ্ন করিয়া জানিল তাহার অর হইয়াছে। তারণ নিজেই
রাগা করিতে বসিল।

তরু বলিল—ছোটবোঁ যে নেমস্তন্ন ক'রে গিয়েছে
সকালেই। অর দেখে বললে—ঠাকুরজামাই তা হ'লে আমার
বাড়িতেই থাকেন।

হুম্ করিয়া কড়াটা নামাইয়া দিয়া তারণ বলিল—
বাচলাম বাবা। একটান তামাক খাই বরং—কাজ দেখবে।
আজ কিন্তু একটা টাকা দিতে হবে—অনেক দিন মদটন
খাই নাই। কে—কে গো?

তরুর ননদ প্রবেশ করিয়া বলিল—তোমাকে একবার
ডাকছে দাদা। কাঁট লোক এসেছে বাড়িতে। দাদা আজ
বাড়িতেই থাকে বউ।

তারণ বলিল—লোক—কে রে বাপু? কার ধার ধারি
আমি।

তরু বলিল—দেখেই এস না বাপু!

তারণ গেল, কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যেও আর ফিরিল
না। অপরাহ্নে ছোটবধু আসিয়া বলিল—ঠাকুরজামাই
ফেরেন নি ঠাকুরঝি?

তরুর অর ছাড়িয়া আসিতেছিল—সে বলিল—সেই
জলখাবার বেলাতেই গিয়েছে বাড়ি—কে লোক এসেছে।
এখনও ত ফিরল না। কাউকে যে পাঠাব এমন লোক
নাই।

কিছুক্ষণ নিস্তরু থাকিয়া বউ বলিল—তোমার স্বলকার
সতীন এসেছে।

তরু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে বললে?

অপরাধিনীর মত বউটি বলিল—পাড়াত্তেই শুনলাম—
খবর সত্যি।

তরু কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া বলিল—দেখি কিছুক্ষণ।
তুমি ছোটদাকে একবার ডেকে দিও ভাই।

ডাকিতে কিন্তু পাঠাইতে হইল না—তারণ নিজেই
সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিল।

তরু প্রস্থ করিল—কলকার বৌ এসেছে ?

তারণ বলিল—হ্যাঁ। দেখ কেনে, বলা নাই, কণ্ডা নাই—ড্যাং ড্যাং এক-কাপড়ে এসে হাজির। শালারা মদ খাইয়ে বিনা পয়সায় বিয়ে দিয়েছে—এখন বলে ভাতকাপড় দাও—নিয়ে ঘর কর।

তরু চুপ করিয়া রহিল। তারণ বলিল—দিলাম বিদেয় করে। বলে ভেসে যাবে—আমি ব'লে দিলাম—গলায় কলসী বেঁধে দিও ডুব যাবে—ভেসে যাবার ভয় থাকবে না।

তরু বলিল—ছি—ওই কি বলে গো।

আবার কিছুক্ষণ পর তরুই বলিল—আজই কেন বিদেয় ক'বে দিলে বল ত? না—হয় একটা রাত থাকত। না—হয় সম্মানীটা আমি দিতাম।

তারণ বলিল—একটা টাকা দাও দেখি—একটা বোতল আনব আজ।

তরু বলিল—বাল্লটা আন না, লক্ষী!

তারণ বাল্ল আনিতে তরু একটা টাকা বাহিব করিয়া দিল। বলিল—বেখে এস এটা—আমি পারছি না। তারণ তখন বহির্দ্বারের কাছাকাছি পেঁছিয়াছে—ফিরিয়া চাহিবার তাহার সময় ছিল না। তরু শুধু হাসিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তরু ডাকিল—ছোটবো! ছোটবো আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—কেমন আছ ঠাকুরবি? ঠাকুরভামাই কই?

তরু বলিল—মাঠ গিয়েছে। আমি ভালই আছি। আজ আমবা ছ-জন এবেলা তোমাব কাছেই খাব। আর ওবেলার জন্তে কিছু মাছ আনিয়ে ভেজে রেখ ত ভাই। বাল্লটা বের ক'রে আন, পয়সাটা দি—নিয়ে যাও।

ঘরে ঢুকিয়া ছোটবো বলিল—বাল্ল কই ঠাকুরবি? এ কি—তোমার সিদ্ধকের তালা খোলা কেন?

তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া তরু দেখিল—কাঠের হাত-বাল্লটা নাই—সিদ্ধকের তালাটা খোলা ঝুলিতেছে।

কাঁপ দিয়া পড়িয়া তরু সিদ্ধকের তালা খুলিয়া দেখিল—শূন্য—গহনার বাল্ল—টাকার বাল্ল কিছুই নাই।

তরু থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

বো ডাকিল—ঠাকুরবি—ঠাকুরবি!

তরু বলিল—গোল ক'রো না—গোল ক'রো না বো।

গেছে থাক।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা বোধ করি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

তরু আবার পূর্বের মত জীবন আবস্ত করিল। তিল তিল করিয়া সঞ্চয়ে আপনার ভাগ্য আবার সে গড়িয়া তুলিতেছিল—আর আবার সেই পূজা-অর্চনা—বারব্রতের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

কিন্তু কঠোরতা তাহার পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সংসারে করুণা সে কাহাকেও কবে না। ছোটদাদার এখন বৃদ্ধ অতাব—একে একে সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছে—তবু একটি পয়সা সাহায্য সে কবে না। ছদ্মশ টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায়ে হুম সে একটি পয়সা ছাড়ে না। তাহার ক্ষয়ের সমস্ত আবেগ সে ঐ শূন্য সিদ্ধকটি পূর্ণ করিবার জন্ত কঠোর ভাবে নিয়োজিত করিয়া বসিল।

তারণ ঝগকার বোকে লইয়া সংসার পাতিয়াছে। কয়টি ছেলেকেও হইয়াছে। তরু পাড়ার সে-দিকটা মাড়ায় না পর্য্যন্ত। কিন্তু মুখে সে কোনদিন একটা কথা বলিল না।

দশ বৎসর পর।

সেদিন ছোটদাদা আসিয়া বলিল—তরু একটা কথা বলছিলাম তোকে—

বাধা দিয়া তরু বলিল—নিজে খেতে পাই না আমি, আমি কোথা সাহায্য করতে পাব বল।

ছোটদাদা নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। বলিল—সে কথা ঠিক তোকে বলতে আসি নাই আমি। তরু—অন্ত কথা বলছিলাম—তা থাক—

সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার কথাগুলির মধ্যে কণ্ঠস্বরের দীনতায় তরু আজ একটু বেদনা বোধ না-করিয়া পারিল না। ছোটদাদা চলিয়া গেল—তরুর আজ মনে হইল ছোটদাদা যেন বড় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ বয়স ত তাহার বেশী নয়। চল্লিশ এখনও পূর্ণ হয় নাই। সে দরজাটার কুলুপ বন্ধ করিয়া ছোটদাদার বাড়িতে চলিল।

ক র্তিক মাস, রাস-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাবুদের গোবিন্দ-মন্দিরে রোসনচৌকী বাজিতেছে। তরু শুনিয়া ছোটদাদা:

বলি, তখন—কি রাগিনী আলাপ করছে জান?—বাগেত্রী।—
বলিয়া নিজেই গুণ-গুণ করিয়া রাগিনী ভাঙিতে আরম্ভ
করিল। তরু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

ছোটদাদা বলিল—তরু? আয়—ব'স!

তরু ছোটদাদাকে দেখিতেছিল—সত্যি ছোটদাদার
চেউ-খেলানো চুলে আজ সাদা বং ধরিয়াছে—তাহাতে আর
সে বিস্তাসও নাই।

কাঁচা সোনার মত রং তামাটে হইয়া আসিয়াছে—
ব্যালোর ব্যায়ামপুষ্ট সবল দেহ যেন জীর্ণ শিথিল—গারের
চামড়ায় কুঞ্জন ধরিয়াছে।

ছোটদাদা বলিল—কেটেছে তাল বেটাচ্ছেলে।

তরু বলিল—রাগ করেছে ছোটদাদা?

হাসিয়া ছোটদাদা বলিল—না রে—রাগ করব কেন?

—তবে কি বলছিলে না ব'লে চলে এলে যে?

—তুই শুনলি কই—আঃ, আবার তাল কেটেছে—
দাঁড়া ত ব'লে আসি বেটাকে!

তরু বলিল—কি কথা ছিল ব'লে তবে যেতে পাবে।

চিরকালই কি মানুষের একভাবে যায়? ছি—ছি—ছি।

ছোটদাদা বলিল—বলছিলাম কি—ছোটবৌ বড় কাতর
হয়ে পড়েছে—মানে ওর ছেলে হবে তা জানিস ত?

হাসিয়া ফেলিয়া তরু বলিল—হ্যাঁ তা জানি।

ছোটদাদাও একটু বোকাব মত হাসিয়া বলিল—মানে
বেশী বয়সে ছেলে হবে—আর আজকাল হয়েই আছে।
মানে—কাল থেকেই শরীর যেন—আঃ বল না গো
তুমি!

তরু আবার হাসিয়া বলিল—তুমিই বল।

ছোটদাদা বলিল—তাই বলছিলাম—রাগাটা যদি এক
দ্বায়গায় একদিন তুই চালিয়ে দিস, তবে বড় ভাল হয়।

তরু ছোটবোয়ের নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিল—শরীর
কি ভেঙেছে ছোটবৌ?

ছোটবৌ বলিল—হ্যাঁ ভাই কেমন যেন—।

তরু ভাইকে প্রশ্ন করিল—দাই এখনি ব'লে রেখেছ ত
ছোটদাদা?

* * * *

সেইদিনই রাতে ছোটবৌ একটি পুত্র প্রসব করিয়া

অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ছোটদাদা ছল-ছল নেত্রে তরুর
দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে তরু?

তরু কোন কথা বলিল না—সে আপনাব বাড়ি
চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পবেই আবার ফিরিয়া দুইটি টাকা
ভাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—বাও ডাক্তার ডেকে নিয়ে
এস।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ভরসা দিয়া বলিলেন—বিশেষ
কিছু ভয় নেই

নবজাত মানবকটি শব্দে চীৎকার করিতেছিল।
ডাক্তার তাহাকে কোলে লইয়া বলিলেন—বাঃ বড়
সুন্দর থোকা হয়েছে। এর যে একটা ব্যবস্থা করা
দরকার—এক-আধ দিন ত নয়, এখন মাসখানেকই ধরে
রাখুন।

তরু অসঙ্কোচে আঁতুবধবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া
থোকাকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই বোধ হয় চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি।

* * * *

ছোটবৌ ভাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মা হওয়া তাহার
হইল না। সে-ই হইল ধাত্রী—আর তরু হইল মা।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন
ঘটিয়া গেল। যে-কয়দিন সে তারণকে জীবনে নিবিড়
ভাবে পাইয়াছিল, সে-কয়দিনের মধ্যেও তাহার এত মিষ্ট
কথা কেহ কোন দিন শুনে নাই। জীবনের স্নেহের সুখার
ভাণ্ডার সে যেন উজাড় করিয়া দিল। শুধু স্নেহই নয়—
তাহার জীবনের সঞ্চয় সামর্থ্য সমস্ত দিয়া ছোটদাদার সংসারটি
প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিল। সঙ্গীতবিৎ ছোটদাদাও
ইাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল—আঃ, বাঁচলাম আমি তরু—
তরুর ছায়ায় এবার জুড়োব আমি। তরু এখন আবার রাগ
করিল না—হাসিয়াই বলিল—ওই শিখেছিলে শুধু—কথার
ঝুড়ি—আর কস্তে ধাগিনাক্।

ছোটদাদাও হাসিয়া বলিলেন—আয় আজ একবার
তোমার মাখায় কস্তে ধাগিনাক বাজিয়ে দি।

—তবরদার ছোটদাদা—ভাল হবে না বলছি। থোকার
জুধ গরম করব, সরো।

ছোটদাদা একবিদ্রুত অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলে নাই। তাহার সম্পত্তি বাহা কিছু সবই প্রায় গিয়াছে— এখনও ঋণ পর্ত্তপ্রমাণ। তরুর সঞ্চয় ও সম্পত্তি হইতে বহুদিন পরে পরিবারটির অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিল। কিছু দিনের মধ্যেই অকালবৃদ্ধ ছোটদাদার শরীরে চিক্ণতা দেখা দিল। তরুর ভাড়ার মাঝে মাঝে জ্যোতস্মার তদারক করিতে বাইতে হয়—অল্প সময়ে আপনার দাওয়াটির উপর বসিয়া কস্তে ধাগিনাক করেন—কখনও বা ইমন-কল্যাণের রাগিণী একটু হেরফের করিয়া একটা নুতন সুর সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। মধ্যে মধ্যে বলেন—তরু তুই আপত্তি করিস নে—আমি ওস্তাদি করতে আবস্ত করি। দশ টাকা আসবে—আমার পেটটাও বাইরে-বাইরে—

তরু বলে—হ্যা—নেশাভাটা চলবে—সেইটাই হ'ল আসল কথা তোমার ছোটদাদা।

ছোটদাদা অপ্রতিভের মত হাসে।

তরু বলে—না—চুল রেখে, গাঁজা খেয়ে বেড়াতে হবে না ছোটদাদা। বড় হ'লে ছেলেটা যাতে বাপ ব'লে পরিচয় দিতে পারে তার মুখ রেখে বাও।

ছোটদাদা আরও কি বলিতে যায়—কিন্তু তরু শোনে না—খোকাব কোন পরিচর্য্যার সময় অতিবাহিত হইয়া বাইতেছে অজুহাতে সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

বৎসর-তিনেক পর ছোটবোঁ আর একটি কন্তা প্রসব করিল।

তরু হাসিয়া বলিল—নাও ছোটদাদা—মহাজন হ'ল তোমার।

ছোটদাদা হাসিয়াই উত্তর দিলেন—মহাজন নয় বোন—পাথর। সংসারসমুদ্রে কোন রকমে ভাসছিলাম—এইবার বুকে চাপল পাথর।

তরু সজল চক্ষে বলিল—ছি ছোটদাদা! জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। তোমার ভাবনা ত মিছে।

ছোটদাদা শুধু হাসিল।

তরু বলিল—ওর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না ছোটদাদা—আমাকে ভার দিও—কুলেব মাথা খেয়ে আমি ওকে হুখী করব।

ছোটদাদা হাসিয়াই উত্তর দিল—আমার ভারই তোঁর হাতে তরু। সংসারের হাটে ভারী ত দুরের কথা ঝাঁক-

মুটে হবার সামর্থ্যও আমার নাই। এ সংসারের সব ভারই তোঁর।

ইহার কিছুদিন পরই একদিন ছোটদাদা সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া সেগুলি ব্যবহারের যোগ্য করিতে বলিল। তরু বলিল—বত বাজে কাজ কি তোমার ছোটদাদা!

ছোটদাদা বলিলেন—এবার এগুলোকে কাজেই লাগাব তরু। আর তোঁর কথা শুনব না। মান যাক—তানে যদি পেট ভরে তাতে দোষ কি?

তরু এবার আর আপত্তি করিল না। তাহার সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাপকে মনে পড়িয়া গেল—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। ছোটদাদা তানপূবা বাড়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাসখানের পরে ছোটদাদা কিবির-ডাকিলেন—তরু।

খোকাকে কোলে লইয়া তরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ছোটদাদা!

দশটি টাকা তরুর হাতে দিয়া ছোটদাদা বলিলেন—রাখ।

তরু বলিল—খোকার জন্তে কি এনেছ, দাও।

অপ্রতিভ হইয়া ছোটদাদা বলিলেন—কিছু ত আনি নাই তরু—ও কথা আমার মনেই হয় নাই।

তরু ছেলেমানুষের মত অভিমান করিয়া বলিল—তোমার টাকা তুমি রাখ দাদা—আমার দরকার নাই। বেশ ত তোমার সংসার তুমি চালাও—খোকার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

বহু কষ্টে ছোটদাদা তরুকে শাস্ত করিলেন। মাসখানেক পর আবার ছোটদাদা বাহির হইয়া গেলেন।

মাস-ছরেক পর।

সন্ধ্যার সময় ননদ ও ভ্রাতৃজ্ঞার স্নেহভাষের কথা হইতেছিল। তরুর কোলে খোকা, বৌর কোলে ছিল থুখী। ছোটদাদা বাড়িতে নাই—বাহির হইয়া গিয়াছেন। খোকা বায়না ধরিয়াছিল সে মাতৃস্তন পান করিবে।

বৌ বলিল—না ঠাকুরঝি, মেয়েটা ত এক ফোঁটা দুধ পায় না—তার ওপর মাইদুখে ভাগ বসালে ও বাচে কি ক'রে বল!

তরু বলিল—ও হে—কুলীনের ঘরের মেয়ে অক্ষয়
অমর—দেখছ না আমাকে! দাও ভাই দাও খোকাকে
আমার—একবার দুধ দাও। তাতে তোমার রাজকন্তেব
কম পড়বে না।

বাহিব হইতে কে ডাকিল—কে রৈছেন গো ঘরে!

তরু সাড়া দিল—কে? কোথা বাড়ি?

উত্তর হইল—আমরাই গো—ওস্তাদকীকে নিয়ে এসেছি
—অমুখ তেনার।

তরু ছুটিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল—ছোটদাদা গাড়ীর
ছইয়ের মধ্যে অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। সে ব্যাকুল ভাবে
ডাকিল—ছোটদা—ছোটদা গো!

গোড়াইয়া গোড়াইয়া ছোটদাদা যে কি উত্তর দিল তরু
বুঝিতে পারিল না। সে গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল—কি
হয়েছে গো?

গাড়োয়ান বলিল—আজ্ঞে কবরেজ দেখাচ্ছিলাম
আমবা—ডাক্তারও দেখেছে—এক অঙ্গ পড়ে গিয়েছে
ঠাকুরর।

তরু বুঝিল পক্ষাবাত।

পক্ষাবাত ভাল হইবার ব্যাধি নয়—ভাল হইল না।
পক্ষ অক্ষয় হইয়া ছোটদাদা তরুর সঙ্গেই বোঝা হইয়া চাপিয়া
রহিলেন। তরু চিকিৎসায় কিছু অর্থব্যয় করিল, কোন
ফল হইল না।

কিন্তু এততও তরু দমিল না। তাহার জ্যোতস্মা
হইতেই নিপুণ বন্দোবস্তে সে সংসারটির অনবস্ত্রের সংস্থান
করিয়া চলিল। ছোটদাদা আবও বৎসরখানেক বাচিয়া রোগ-
ভোগ করিয়া তবে গেলেন। তিনি বোধ করি ছিলেন তরুর
জীবনের প্রবলতম মন্ত্রগ্রহ। তাহার পিতা তাহার এত ক্ষতি
করেন নাই—তাবণও করে নাই—কিন্তু ছোটদাদা তাকে
পথে বসাইয়া দিয়া গেলেন। জীবনে অমিতব্যয় ছাড়া তিনি
আর কিছু কবেন নাই—দেহে তাহার জন্ত শেষপর্যন্ত হইল
পক্ষাবাত—আর যে ঋণ তাহার অবশিষ্ট ছিল তাহাই
একদিন হুসে আসলে আদালত-থরচারি বোল শত টাকার
বডিগুয়াবেণ্টরূপে আসিয়া হাজির হইল। মহাজন গ্রামের
লোক—তিনি তরুর সম্পত্তিটুকুর দিকে লক্ষ্য করিয়া জাল
নিষ্কোপ করিলেন।

উঠানে আদালতের, পেয়াদা—মহাজন ওয়ারেন্ট-হাতে
অপেক্ষা কবিতেনি। চিন্তা কবিবার অবসর ছিল না—
তরু হল-হল চোখে আসিয়া জোড়হাত করিয়া মহাজনকে
বলিল—আমার সম্পত্তিটুকু নিয়েও আপনি দাদাকে রেহাই
দেন।

সেই দিনই দলিল লেখাপড়া বেজেদ্বারী হইয়া গেল।
তরু মহাজনকে আশীর্বাদ কবিতেনি করিতে ফিরিয়া আসিল।

ইহাব ঠিক দিন দুই পর। ছোটবৌ বলিল—চাল ভ
আজ নাই ঠাকুরঝি!

তরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বাহির হইয়া গেল।
কত বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত গিয়াও সে ফিরিয়া আসিল। সে
খার চাহিবার জন্ত বাহির হইয়াছিল। পথে সহসা তাহার
মনে হইল—শোধ করিবে কি কবিয়া?

এই লজ্জাতেই সে ফিরিল—অনেক ক্ষণ অর্থহীনভাবে
এদিক-ওদিক ঘুরিয়া সে বাড়িই ফিরিয়া আসিল। কিন্তু
বাড়ির দুয়ারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জড়িত স্বরে রুম ছোটদাদা চীৎকার করিতেছেন—খিদে
—খিদে।

খোকা কাদিতেছে—ভাত—খা—বো!

তরু আবার ফিরিল—খিদা তাহার কাটিয়া গিয়াছে।
সে সহস্র বাড়িতে গিয়া সহস্রকে বিনা-ভূমিকায় বলিয়া
কেলিল—পাঁচ সের চাল দিতে পারবে সই?—ভিক্ষে—
শোধ দেবার ত উপায় নাই।

সই কোন কথা বলিল না—একটি ধামাতে সের-সাতেক
চাল ভরিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। এতক্ষণে তরু
স্বপ্ন-স্বর কবিয়া কাদিয়া কেলিয়া বলিল—কি হবে সই?

* * *

আরও বৎসর-দুয়েক পরে তরুকে দেখা যায়—কিন্তু
চেনা যায় না। ছোটদাদা আর নাই—ভিক্ষা এখন তরুর
উপজীবিকা। ভিক্ষা করিয়াই সে খোকাকে পড়াইতে
শুরু করিয়াছে। বাড়ীজন্মের পুকুরে সেদিন মাছ-ধবানো
হইতেছিল—খুচরা চুনা মাছ। চারিদিকে ছোটলোকের
ছেলেমেয়ের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে।

পাড়ের উপর একটা পরিষ্কার স্থানে মাছ চালিয়া
ভাগ হইতেছে।

ছোটলোকের ছেলেগুলোকে ধমক দিয়া কে বলিল—সব
সব এই ছেলেগুলো—পথ দে।

একটা ছেলে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—যেখানে
মাছ ধরবে—আমি পাড়বে—সেইখানেই ঠাকুরের
ভাগ আছে।

তরু একটি কচুপাতা হাতে পথ খুঁজিতেছিল। ভিড়ের
ভিতরে আসিয়া সে বলিল—ছেটাবাবু—মাছ ছোটো দাও
বাপু—ছেলে কাঁদছে—যবে।

বারংরে সে সধবা খাইয়া ব্রতদান গ্রহণ করিয়া
ফেরে। সেদিন যোগেন গাঙ্গুলীর স্ত্রীর এয়ো-সংক্রান্তির
ব্রত। তরু আগে হইতেই গাঙ্গুলী-গিন্নীকে ধরিয়াছিল—সধবা
তুমি আমাকেই কর দিদিমা।

গাঙ্গুলী-গিন্নী মুখ এড়াইতে পারিলেন না—দয়াও হইল।
গাঙ্গুলীর ভাইপো শুধু বলিল—না—না—ও হ্যাঁচড়
মেয়েটাকে আবার পুজো কেন? ভিক্ষে বরং দাও ত
কিছু দাও।

গাঙ্গুলী-গিন্নী কিছু বলিলেন—আহা বাবা—দুঃখী ব'লে
যা তা বলতে নাই—ছি।

ব্রতের দিন তরুকে আপনার শয়ন-বরে বসাইয়া,
জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নূতন শাড়ী পরাইয়া দিলেন—
সীথিতে সিঁদূর দিয়া মুগন্ধ তেলে চুল আঁড়াইয়া দিলেন,
পায়ে আলতা পরাইয়া দিয়া নানাবিধ মিষ্টান্নভরা পাত্র
সমুখে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—খাও।

তরু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বাড়ি নিয়ে বাই
দিদিমা—ছেলেগুলো আছে—বিধবা বোটা আছে।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—না—না—তুমি ওগুলো খাও
তরু, আমি ছেলেদের জন্তে আলাদা এনে দিচ্ছি।

তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নির্জন যবে তরু পরমতৃপ্তিভরে খাইতে খাইতে
চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। ঘরের চারিদিকে সুশোভন
প্রাচুর্য! কিছুই তরুব অপরিচিত নয়—একদিন এ সবই
তাহাদের ছিল। দেওয়ালের ছবি, আলমারী, পুতুল,
খাট, বিছানা—সবই সে ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আজ
তাহার পক্ষে সবই অপরিচিত। পূর্বদিকের খোলা জানালা
দিয়া রৌদ্র আসিয়া সমস্ত বস্তুকে করিতেছে।

বালিসের নীচে ওটা কি? রৌদ্রাতার আগুনের মত
রাঙা—ধক ধক করিতেছে। এক মুহূর্তে তরুর সমস্ত
গোলমাল হইয়া গেল—সে চিলের মত ছোঁ মারিয়া
সেটাকে টানিয়া লইল। সোনার চেন তাগা এক
ছড়া।

তাহার বুকের মধ্যে যেন রেলগাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে!
ধর ধর করিয়া সমস্ত অঙ্গ তাহার কাঁপিতেছিল। ঘরখানা
যেন ঘুরিতেছে! তরু দ্রুতপদে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া
আসিল।

গাঙ্গুলী-গিন্নী একটি চৌকি হাতে উপবে বাইতে-
ছিলেন—পিছনে পিছনে তাহার ভায়রপো।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—খাওয়া হয়ে গেল তোমার?
ভায়রপো অসহিষ্ণু ভাবে বলিল—কোথা রেখেছ আমাকে
বল না—আমি বার ক'রে নোব।

গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—তোমার বাবা, বোড়ায় চড়ে
কাজ করা স্বভাব—মাথার বালিসের নীচেই আছে তোমার
তাগা নাও গে।

সে চলিয়া গেল; গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—কোথায়
জ্যেটিমা—পাচ্ছি নে যে।

বিরক্তভাবে গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—বালিসের নীচে—
ভাল ক'রে চোখ মেলে চেয়ে দেখ। আচ্ছা আমি বাই।

তরুর হাতে চৌকিটা দিয়া তিনি বলিলেন—এস ভাই।
তরু দ্রুতপদে চলিবার চেষ্টা কবিত্তেছিল, কিন্তু কম্পিত
পদে তাহার গতি ব্যাহত হইয়া ঘাটতেছিল। উপরে
তাহারা খুঁজিতেছে। হয় ত—সেই মুহূর্তে বাড়ির ভিতর
হইতে ডাক আসিল—তরু—তরু—এই মাগী। তরু তখন
গাঙ্গুলীদের বাড়ির ঠিক বাহিরে। তরু এদিক-ওদিক
চাহিয়া তাগাটা বাহির করিয়া গাঙ্গুলীদের নরনার তরল
পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তখনও সে ঠক ঠক
করিয়া কাঁপিতেছিল।

দ্রুত পদধ্বনির সঙ্গে গাঙ্গুলীবাবুর ভাইপো আসিয়া
বলিল—বের কর তাগা—বের কর বলছি।

পিছন হইতে গাঙ্গুলী-গিন্নী বলিলেন—তরু!

তরু কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখে কথা
ফুটিল না।

গাঙ্গুলী-গিঙ্গী বলিলেন—নিরে থাক ত দাঁও তরু—
পাঁচটা টাকা আমি দেব।

তরু তবুও নির্ঝাঁক।

গাঙ্গুলীবাবু ভাইপো চীৎকার করিয়া ডাকিল—
মোক্ষদা—মোক্ষদা। মোক্ষদা বাড়ির ঝি। সে আসিতেই
তাহাকে ছকুম হইল—দেখত মাগীর কাপড়চোপড়
খানাতলাস ক'রে।

তরু শিহরিয়া উঠিল—তাহার হাত হইত খাবারের
ঠোঙাটা পড়িয়া গিয়া সন্দেশগুলো ছড়াইয়া পড়িল।

মোক্ষদা তাহার দিকে সত্যি অগ্ৰসর হইল।

* * * *

বোগেন গাঙ্গুলীকে তরু যে পত্র দিয়াছিল—তাহাজে
ওই তাগার কথাই লেখা ছিল। লেখা ছিল—আপনাদের
তাগা—আপনাদের নর্দমার মধ্যে পড়িয়া আছে।

মধুগন্ধি বনে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

প্রিয়তমে, ছিল সাধ যাবে দিন মধুগন্ধি বনে,
সজিনার মুহূর্তে বাসে স্নগন্ধি দক্ষিণ সমীরণে
যাবে দিন,—ভেবেছিহু, এ বঙ্গের নিভৃত পল্লীতে
আত্ম-পনদের কুঞ্জে কাশো জলে হংসের সঙ্গীতে
বাধিব আমার বীণা—ভেবেছিহু তারি সুরে সুরে
দরিদ্রা এ বঙ্গভূমি দেখা দিবে অশ্রুর মুকুরে,
দরিদ্র কবির স্বপ্নে দেখা দিবে জীর্ণ ভিখারিণী
সুকর্ণ অধঃ-হায়াতে। অনাহত সে রাগিণী
জাগারে তুলিবে মনে কত দূর বিশ্বস্ত বেদনা,
কত স্বপ্ন, কত গান, কত চিত্র, কত আরাধনা—
সে শুধু বহিল স্বপ্ন, প্রিয়তমে, রহিল তা মনে—
ভেবেছিহু যাবে দিন নদীতীরে মধুগন্ধি বনে।

আজ দাঁড়ায়েছি আসি নগরীর উচ্চ কোলাহলে
জীবিকার জয়-বাতা-পথে, শ্রান কেরানীব দলে
লিখেছি আপন নাম, ললাটে রথেন্দ্র-বেথা
স্মিতহাস্তে মুছিয়াছি, চলিয়াছি ধীর পদে একা
এ পুর্বীর শ্রান্ত সরণীতে! প্রিয়তমে, চাহো মোর পানে—
দেখো আমি সেই কবি, আজো আছি মগ্ন অভিমানে,

ললাটে রয়েছে লেখা জন্ম-হ'তে অগ্নির অক্ষরে—
অসহন ছুঃখের তিলক, ডাকো আজ স্নেহস্বরে
পরায়দা দাঁও মাশা, তব প্রেম—এই অহংকার
ভুলায়েছে জীবনের তুচ্ছতম অজস্র ধিকার—
দেখো চলিয়াছে কবি ছুঃখ হ'তে কা'র অঘেষণে!
প্রিয়তমে, ছিল সাধ যাবে দিন মধুগন্ধি বনে।

তবু ডাকে সেই বন, তারা যেথা হয়েছে কুহুম,
বনচ্ছায়াতলে যেথা বর্ণাক্রণ আলোর কুহুম
পড়েছে কপোলে তব, নতনেত্রে, স্নিগ্ধ কেশপাশে—
ছিল সাধ যাবে দিন তাহারি মধুব অবকাশে!
সেই ছান্না-অস্তুরালে নব শিল্প করিব রচনা,
রূপায়ন জীবনের,—হেরি কা'র মুর্ত্তি অসহনা
নামিয়া আসিমু পথে, দেখিলাম তাহারি ইঙ্গিতে
ছুটেছে নিখিল পৃথ্বী অবিশ্রাম উদাত্ত সঙ্গীতে
মুখরিয়া মহাকাশ, কহিল 'ম, কব সঙ্গী মোরে
তোমাদের বাতাপথে, বাধিও না মুগ্ধ মাসা-ডোরে—
আজ তবু মনে হয়, বেদনার নিগূঢ় বন্ধনে,
ভেবেছিহু যাবে দিন তব সাথে মধুগন্ধি বনে।



পুরাণ প্রবেশ—ঐগিরীলেশ্বর বহু। প্রকাশক—এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স, লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪/।

অনেক দিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় পুরাণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক বাহির হইল। এ বই বই বাঙ্গালার এই নূতন। এখানি বইয়ের মত বই। প্রাণ বলিয়া বুঝাতি করিবার মত বই। পুরাণপ্রবেশ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার নিষ্ঠার সহিত খাটিয়া খুঁটিয়া বইখানি লিখিয়াছেন। নিষ্ঠার ফলে পুরাণে তাঁহার কটি ক্ষতিগ্রহে। পুরাণের প্রকৃত ভাব ও অর্থ কি তাহা তিনি নিজে খুঁটিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস ও প্রবৃত্তি অনেকটা সফলও হইয়াছে।

পুরাণপ্রবেশ ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিতে পুরাণ সম্বন্ধে অবজ্ঞাতব্য বিষয়গুলির বিচার ও আলোচনা আছে। এই ২৭টি অধ্যায়ে গ্রন্থকার ১২০টি গুরুতব সমস্তার সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অতুলসম্মান যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। পুরাণকে তিনি পুরাপুরি History বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থনকল্পে নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া নানা দিক্ দিয়া তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণ নিষিদ্ধ কবিয়াছেন। পক্ষান্তরে 'ঐতিহাস' যে History নয় তাহাও দেখাইতে তিনি ক্রটি করেন নাই। বস্তুতঃ ঐতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য কি তাহাও তিনি পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তিনি পুরাণের স্বরূপ কি তাহা বুঝাইয়াছেন। ইহা যে কণকহার স্তায় নানাপ্রকার অসম্ভব, অসম্ভব ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা-সম্ভার গ্রন্থ নয় তাহা তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণের সকল কথা এ-পর্যন্ত কেহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পুরাণে রাজাদের বংশতালিকা' ঘেরকম হনিবদ্ধ হইয়া প্রাণীতে প্রদত্ত হইয়াছে এ-রকম আর কোথাও দেখা যায় না। ভিল্টট শিখ এ-বিষয়ে পরম্পরাগত রীতি যে পুরাণে অশ্রু আছে তাহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন খ্রীষ্ট বংশতালিকা বাবু, মন্তব্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মাও ও ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায়। তিনি এ-কথাও বলেন যে বর্তমান ইউরোপীয় লেখকগণ পৌরাণিক বংশতালিকা মানিতে চাহেন না; কিন্তু যতই পুরাণের অধ্যয়ন হইতেছে ততই পুরাণে খ্রীষ্ট ঐতিহাসিক তত্ত্বের সম্মান পাওয়া যাইতেছে।

গিরীশ বাবু তাঁহার গ্রন্থে বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা এই অল্প পৃষ্ঠায় সম্ভবপর নয়। তিনি যে পৌরাণিক সাবধী ও কালানিলেখ দিয়াছেন তৎসমস্ত ঐতিহাসপাঠক মাত্রই গিরীশ বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তিনি মনস্তত্ত্বাদি, ইন্দ্রজ্ঞ, পুরু প্রভৃতি বংশবিচারে যে স্বপ্ন বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। প্রত্যোত, শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত, কণ্ঠ, প্রভৃতি বংশপরম্পরা বিচারে বিভিন্ন পৌরাণিক মতের তিনি পরিচয় দিয়াছেন। এ-সমস্ত বিষয়ে তাঁহার প্রদত্ত সারগীগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিবে। সমগ্রধায় বিভিন্ন বংশীয় প্রাচীন রাজগণের সারগীর বিচারকোশল অতি স্পষ্ট হইয়াছে। পুরাণ বিষয়ে বিদ্বাদ্বর্গের পক্ষপাত সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে লেখক যে-পরিমাণ

পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অমূল্য। কেবল পুরাণের অতীতিবিচার অধ্যায়ে লেখকের অনেক সিদ্ধান্তই আমরা মানিতে পারিলাম না। কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিতান্তই বিসদৃশ হইয়াছে। এ অধ্যায়টি কাটিয়া-ছাটিয়া নুতন করিয়া লেখা আবশ্যক।

গ্রন্থের সকল মতের সহিত সকলের মতের ঐক্য না থাকিতে পারে; ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিম্নেরও কতকগুলি বিষয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও গ্রন্থকারি যে স্পষ্ট পদ্ধতিতে লিখিত তাহাতে সকলেই আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। লেখকের বলিবার প্রাণালী যেমন সরল ও বিশদ, বিচারপদ্ধতিও তেমনই বিশুদ্ধমূলক। পুরাণ তথা ইতিহাস (History) সম্বন্ধে এরূপ সারবান্ অথচ প্রসঙ্গ-বিশিষ্ট গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। ইহা যুগপৎ বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ পাঠকের উপকৃত্য হইবে। সকল গ্রন্থাগারে ইহা রাখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাহরণ

জীবনযাত্রায় মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ—দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১০ চারি আনা। ৯২ নং আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞানাগার হইতে শ্রীযুত হৃদয়কুমার বহু কর্তৃক প্রকাশিত। ১১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান-প্রয়োগশালায় অধ্যাপকগণ কর্তৃক এই পুস্তিকাখানি লিখিত হইয়াছে। কি করিয়া শিশুর মন বিকশিত হয়, কি ভাবে পালন কবি ল শিশুর মন পূর্ণতা লাভ কবিত্তে পারে, কি করিয়া বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইতে হয়, মানসিক স্বাস্থ্য কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, ছুটি বা দুইকোথা শিশুকে কি কবিলে ভাল করা যায়, মানসিক বিকাবের প্রাথমিক লক্ষণগুলি কি কি ও কোন্ উপায়ে তাহা নিবারণিত হইতে পারে, কিশোর-কিশোরীর নানা মানসিক সমস্যা কি করিয়া নিবাকৃত হইতে পারে, কোন্ বালকের পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ বৃত্তি উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি বহুবিধ অত্যাশঙ্কক বিষয়ের উপদেশ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক এই পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে। আমায় মত প্রত্যেক পিতামাতার এই পুস্তিকাখানি অশঙ্কপাঠ্য। বাংলা ভাষায় এইরূপ পুস্তিকা একেবারে নূতন। কলিকাতা মনোবিজ্ঞান-প্রয়োগশালায় অধ্যাপকগণ যে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও চেষ্টালাভ জ্ঞান সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিতেছেন ইহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শরীরের দিকে এখন অনেকেরই নজর পড়িয়াছে, কিন্তু শব্দের দ্বারা মনের স্বাস্থ্যও যে অত্যাশঙ্কক সম্পদ, একথা আমরা সকলে সমাক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। এই পুস্তিকা পাঠ্য আমাদের অনেকেরই চক্ষু ফুটিবে। সাধারণ ইহাতে বহু নূতন ও বাস্তব জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্মান পাইবেন। শিক্ষকগণও অনেক নূতন জিনিষ শিখিবেন। পুস্তিকাধৃত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন-কোনটি পূর্বে মানসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রত্যেক

প্রবন্ধেরই লেখক আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। এইরূপ পুস্তিকা প্রকাশে বাংলা-সাহিত্যের মৌরব বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তিকা প্রথম সংস্করণ সাধারণের হিতকল্পে কলিকাতা স্বাধ্যাত্রদর্শনীতে বিনামূল্যে বিতরণিত হইয়াছিল। এই অমূল্য পুস্তিকাখানির দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য নামমাত্র চারি আনা করা হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচারই সম্প্রদায়কমণ্ডলীর উদ্দেশ্য। পুস্তিকাখানিতে অনেক মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধিত হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৭ম সংস্করণ। কলিকাতা, ৮৪ ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা।

ঐহকার এক জন স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তিনি নিজে হাতে-কলমে কাজ করিয়া ব্যবসায়-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে ঐহকারের আত্ম-কথায়, কিরূপে অতি সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায়, সততা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা আছে। ব্যবসায়িকায় ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠে ব্যবসায়-সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিবেন।

দানবিধি—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ৮৪ ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা।

ঐহকার নিজে এক জন দানবীর। দেশ কাল ও পাত্র-ভেদে কিরূপে দান করিলে দান সফল হয়, তাহাই এই পুস্তিকায় আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

তৃষা। শ্রীতারাপদ রাহা। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, ২২ নং জামাচরণ সে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা, পৃ. ১১০।

ছোটগল্পের বই। গল্পগুলি স্বপ্নাট, এর বেশী আর কিছু বলা যায় না। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

মায়াযুক্তি। শ্রীব্যাকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস। ২৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য ঐহখানি উপভাস। বেশী বয়সের ভাবায় লেখা একটি সুশিষ্ট গল্প। রসজ্ঞতার চরিত্র আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

এগারোই ফাল্গুন—শ্রীহরেন্দ্রনাথায় মুখোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস। ২৭, কলেজ স্ট্রীট। দাম পাঁচ সিকা। পৃ. ১৪৮। বইখানি পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে। লেখক চরিত্রাঙ্কনে কল্পিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রমলা তে একেবারে জবজ্বল। টেকনিকের দিক হইতেও বইখানি নতুন ধাঁচের।

শ্রীবিহুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেয়াল—শ্রীহরিনরায় চৌধুরী। ২ নং কলেজ কোয়ার্টার কলিকাতা হইতে আন্ততঃ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক। ইহাতে সর্বস্বত্ব নরটি গল্প আছে,—পাগলের খেয়াল, নান-না-জানা কল, পিত্তলের গুলি, কুঁড়ের কীর্তি, বারবেলা, অমাবস্তার অন্ধকাবে, গুপ্তধনের নেশা, নিকলেশ ও নামচুরি। শেষের গল্পটি একটি জাপানী গল্পের ভাবানু-সরণে লিখিত। গল্পগুলি যেমন সুপাঠ্য, তেমনই ছেলের মনোবঙ্গনের উপযোগী রসযারার ভরপুর। পুস্তকখানি সর্বোপায়ে শিশুদিগের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া মনে হয়। গল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলিও স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগী হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ বেশ সুন্দর। কয়েকখানি স্থলর চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রবাসী বাঙালী—শ্রীঅবিনাশ রায়। ২ নং জামাচরণ সে স্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে পি. সি. সরকার এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানি লেখকের চৌদ্দ-পনের বৎসর প্রবাসের স্মৃতি লইয়া রচিত। মিল্লার কথা, মীরাতের কথা, আশ্রায় কথা, পুণ্যের কথা, দেওঘরের কথা, শিলঙের কথা—এই কয়টি নিবন্ধ লইয়া এই গ্রন্থ রচিত। পরিশিষ্ট ভাগে কয়েকটি মৃত প্রবাসী বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে যে-সকল উদ্ভব্য বস্তু বা প্রবাসী বাঙালী লেখকের মনের উপর একটা রেখাপাত করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এই পুস্তকে কেবল তথ্য নাই, আবার কেবল কল্পনাও নাই, দুইটির সংমিশ্রণে কোন কোন বর্ণনা লেখকের দেখার ভঙ্গীর ভিত্তির দিয়া বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনাগুলির মধ্যে মিল্লার কথা, মীরাতের কথা ও আশ্রায় কথা—এই তিনটি সর্বোৎকর্ষ আধক মনোজ্ঞ হইয়াছে। লেখকের ভাষা এমন সরস ও সরল এবং বর্ণনাত্মক। এমন চিত্তাকর্ষক যে স্থানে স্থানে উহা উচ্চাঙ্গের উপভাসের মত হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। স্থানে স্থানে লেখক মহাশয় কিছু কিছু অবাস্তব উচ্ছ্বাস আনিয়া ফেলিয়াছেন, উহা তাঁহার এমন মনোমগ্ন বর্ণনার মধ্যে না থাকিলেই ভাল হইত। লেখকের বর্ণিত স্থানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দেখিবার সুযোগ অনেকেরই হইয়াছে, কিন্তু লেখকের মত এমন অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতিপূর্ণ মন লইয়া দেখিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। সুতরাং এই রচনাগুলি সকলের নিকটই বিশেষ উপাদেয় হইবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের মন ও অন্তরের যে পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয় এবং আমাদের সেই একান্ত আপনায় লোক-দগের উদ্দেশে সম্রাট্রীতিনিবেদন জানাইতে হৃদয় উৎসুক হইয়া উঠে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ পুস্তকের রচনার মতই সুন্দর।

ভেক রাজকুমার—শ্রীবিনয় সিংহ। ২৭/১ কড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা, বিচিত্রা-নিকেতন হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা।

ইংরেজী শিশুপাঠ্য উপকথার Frog Prince নামক গল্প অবলম্বনে ইহা রচিত। যে-সকল শিশু সম্বোধ্য অল্প বাংলা পড়িতে শিবিয়াছে, তাহাদের জন্য ইহা লিখিত। এই পুস্তকের বড় গুণ যে ইহা খুব সরল ভাষায় লিখিত, একেবারে একটিও মুতাক্কর নাই। ছেলের রং দিবার জন্য দুইখানি চিত্রের যোগদানও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ বেশ ভাল।

গায়ে কাঁটা—শ্রীজীবকেশ মৌলিক প্রণীত। ২০/৩ মেছুরা-বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। কুলজা সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণদীপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য উপগ্রন্থ। একটি বালক কণিকাঠা হইতে মাদারীপুরে তাহার শিসিমার বাটীতে গিয়া, সেগান হইতে নিকটবর্তী গ্রামে তাহার পিসুহুত বোনের স্বত্ব-বাটীতে নিমন্তন রক্ষা করিতে বাটবার পথ তাহার হোটি পিসুহুত বোনের সহিত রাত্রিকালে যে ভাষণ বিপদে পড়িয়াছিল তাহারই বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। বালকটি বিপদে পড়িয়া যে অল্পত সাহস, উপস্থিত-বুদ্ধি ও সতর্কতার সাহায্যে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে বেশ ভাল রকম ফুটিয়া তোলা হইয়াছে। গল্পটি আগাগোড়া বেশ জমিয়াছে, দুই-একটি চিত্রের সমাবেশে আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভাবা সরল ও লিখিবার সজ্ঞাও সরস; শিশুরা এই পুস্তক পাঠে বেশ আনন্দ পাইবে। বাঁধাই, ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

তথ্যিত—খ্রীষ্টোশপ্রদাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বরেন্দ্র লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা।

ইহা একখানি গল্পসংগ্রহ পুস্তক; ইহাতে সর্বস্বত্র এগারটি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় উহাদের রচনার সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যাখ্যান আছে, উহাদের ভাব ও ভাবার ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলেই একথা বেশ বোধগম্য হয়। কয়েকটি গল্পের রচনাস্তর চমৎকার। ছোটগল্পের রচনা যে একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, তাহা লেখকের কয়েকটি রচনার সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিদর্শন-স্বরূপ “আতঙ্ক”, “রায়বাড়ী” ও “নায়ের মূল্য” কহটির উল্লেখ করা যাইতে পারে; “পথ-ভোলা” গল্পটিতেও বেশ একটু সরলতা ও কল্পিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের সর্বোপেক্ষ বৃহৎ গল্প “অপরায়ণ” সমাজের একটি জটিল সমস্যা কথায় ভূগিয়া নির্ভীকভাবে তাহার সমাধান করিয়াছে, এই গল্পটির রচনা ও বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। মোটের উপর ছোটগল্পের আট জিনিষটি লেখকের আরও আছে বলিয়া বোধ হয়। আশা করি যিনি ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে আরও কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

শ্রীশুকুমাররঞ্জন দাশ

জাতীয় সাহিত্য—স্তর আন্তোভ মুখাপাধ্যায় প্রণীত এবং ৭৭, আন্তোভ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, হইতে শ্রীমতীপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ভৌগোলিক সীমার বন্ধনব মধ্যেই দেশ এক নয়, ভাবনাত একই ভারতবর্ষকে সমগ্রতা দান করিয়াছে। সেই একাধোখের উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা। এই বোধের দ্বারা নিবন্ধিত হইয়া যে-সাহিত্য সমগ্র-ভারতের জনগণের মন উত্তর করিতে পারিবে, তাহাই জাতীয় সাহিত্য। গ্রন্থের সকল মালোচনার মূলে এই প্রধান কথাটি রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় বইখানি নাম ‘জাতীয় সাহিত্য’ দেওয়া হইয়াছে। কর্ণে কবির অথবা ভাবপ্রকাশে কল্পার শক্তি-প্রয়োগের প্রণালী ও নৈপুণ্য আশার কৌতুহলী মনকে চিরদিন উত্তীর্ণ করে। প্রতিভা আপন প্রকৃতি অনুসারে আপনার ক্ষেত্র বাহিয়া নয়। কর্ণের মধ্য দিয়া আন্তোভের প্রতিভা ক্ষুরিত হইয়াছে। এখানে সাহিত্যে তাহার আত্মপ্রকাশ। যে ভাব ও কল্পনা তাহার সৃষ্টিকলী শক্তিকে কর্ণে প্রেরিত করিয়াছে তাহারই সাহিত্যিক পরিচয় এই পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়। ভূমকায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ‘আন্তোভ ভারত-ক্যাপি বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে

চিত্র এঁকেছেন, তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের সহস্র আয়িম্পটরূপে অমুভব করছি।’ পূর্বাভাবে শ্রীমুখোপাধ্যায় মিত্র গ্রন্থ ও জীবন-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‘ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘মহাকবি মধুসূদন’, ‘জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি’, ‘বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ’—এই প্রবন্ধপত্রকে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষটি বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের এবং চতুর্থটি উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ। ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি একাধে সাহিত্যের সার্বকতা। উৎসাহ, সাহস, নবনবোন্মেষণালিনা বুদ্ধি এবং প্রাণশক্তির প্রবলতায় যে ব্যক্তিত্ব আবেগশীল তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধগুলির রচনাস্তরতে পরিষ্কৃত। আন্তোভ বলিতেছেন, ‘বঙ্গ বঙ্গসাহিত্যকে সমগ্র-ভারতের আত্মসাহিত্য করিতে হইবে।’ তিনি জানিতেন, ‘অল্প কয়েক জন মাত্র ইংরেজী ভাষার অমুশীলন করে।...জাতীয় ভাব বজার রাখিতে হইলে ভারতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক।’ ভাব ও চিন্তার পারস্পরিক আদান-মদান সহজ করিবার অভিপ্রায়ে ভারত প্রত্যেক প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় যদি অল্প প্রদেশগুলির ভাষার অমুশীলনের ব্যবস্থা বিধান করে তাহা হইলে ‘স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া.....সমগ্র-ভারতে জাতীয় সাহিত্যগত একতার সমাধান করা যাইতে পারে।’ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সঙ্কল্পে কার্যে পরিণতি দিয়া গিয়াছেন। শেষ প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, ‘যদি এমন ভাবে বঙ্গ-ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলে অপরাপর ভাষার দ্বারা বঙ্গ-ভাষাও শিথিতে হয়, এবং না-শিথিলে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায় ও অল্প পত ভাষা শিক্ষা করিয়াও পূরা মানুষ হওয়া না যায়, তবেই বঙ্গ-ভাষা চিরস্থায়ী হইবে।’

সুন্দরের সীমানা—শ্রীঅরবিন্দ, সুরেশ, দিলীপ, নলিনী লিখিত এবং কালিকাতা, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, আর্ধ্য-পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। দাম বার আনা।

চার জনের লেখা পাচটি প্রবন্ধের সমষ্টি। আলোচনাগুলি পঞ্চলো লেখা। বইখানিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় চন্দ্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত আটের এবং আর্টসম্পর্কিত মতের বিচার করিয়াছেন। তর্কের নিষ্পত্তি-স্বরূপ এ সম্বন্ধে অরবিন্দ-সহ শ্রীঅরবিন্দ একখানি ইংরেজী পত্র প্রকাশিত। তর্কের বিষয়, আর্ট কি আর্টস-সেক সৃষ্টি সত্য কি না এবং সত্য হইলে কতদূর সত্য এবং কত খানি প্রাচ্য। আর্ট লইয়া তর্ক করিতে গেলে সৌন্দর্যের কথা আপনাই আদিয়া পড়ে। এই হিসাবে ‘সুন্দরের সীমানা’ নাম দেওয়া হইলেও, নাম হইতে বিষয়ের স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে না। শ্রীমুখোপাধ্যায় সৃষ্টির নীতি সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, ‘বস্তু-জগতের ধর্ম সামান্য ধর্ম... প্রত্যেক আর্টিষ্টের মাঝে একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল আত্মা আছে যা সব কিছুই উর্ধ্বে.....তাই সে হাতের একই তুলি দিয়ে রাজপ্রদাদ ও কুঁড়েঘর আঁকে, ডেস্‌জেয়োনা ও ইংগোকে রচনা করে’ ইত্যাদি। উত্তরে শ্রীদিলীপকুমার বলেন, ‘জীবনের মত আর্টে ও চুটকি ও গভীর, চক্চকে ও হালকা, মেকি ও সঁচো, মুড়ি ও মিছরি এক দর হতেই পারে না।...হোট ও বড় সর্বাসুন্দর অভিব্যক্তি উল্লেখ্য নয়।’ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলেন, ‘উভো তৌ’—দুই-ই সত্য। ‘যে নৈপুণ্য দিয়ে কালিদাস তাঁর মহাদেবকে এঁকেছেন, সেই নৈপুণ্য দিয়েই এঁকেছেন মহাদেবের সৃষ্টিকে। দু-জনার মধ্যকার এক নয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হিসাবে দুটিই সমান নয় কি? শ্রীঅরবিন্দ মত, ‘তিনটি জিনিষ নিয়ে আর্টের সমগ্রতা। প্রথম, প্রকাশক রূপের অনবচ্ছিন্নতা,

সৌন্দর্যের আবিষ্কার; দ্বিতীয়, বস্তুর যে মূল সত্তা বা অন্তঃস্বারা তার অভিব্যক্তি; তৃতীয়, এই দুই অঙ্গ বার বারন সেই সৃষ্টিগত চৈতন্যেব ও আনন্দেব শক্তিস্থাঙ্গি। এই তিনটি বস্তু আমরা এক সাথে গ্রহণ করি তাৎ.....মামাংসায় হরত আমরা পৌছতে পারি।' হাঁহারা ইংরেজী জানেন তাহাদের পক্ষে শ্রীমদবিষ্ণুর ইংবেজী লেখাটি অসুবিধের অপেক্ষা হ্রস্বোক্ত হইবে। পূর্বোক্ত সূত্রটির প্রচলন অবশিষ্ট আট সঙ্কেতের এই ত্রিণারা চলিয়া আসিতেছে। এক দল আটকে বিষয়-নিয়োগক প্রকাশ সৌষ্টবে দিক দিয়া, আর এক দল রচনার অন্তর্গত বিষয়বস্তুর দিক দিয়া, এবং তৃতীয় দল রূপ ও বিষয়ের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বাক্ষর করিয়া আটকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পরিচয়—শ্রীনিশিকান্ত বল্লোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃ. ২০২।

প্রথম দিব্যতার কতকগুলি চিহ্ন; তার পর এক উপস্তাস কাঁদা হইয়াছে। চিহ্নগুলি মোটর উপর ভালই; কিন্তু উপস্তাসে কাঁচা হাতের ছাপ সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার অসংখ্য ছাপার ভুলের অন্ত তাহাও শেষ পর্গাণ্ড পড়িয়া ওঠা দুঃসাধ্য।

শ্রীমনোজ বসু

ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ভামতী, কল্পতরু ও নবীন টীকা ভামতীপ্রভা ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য বিবরণ সহিত। টীকাকার ও অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীমুক্ত চাকরুক তর্কতর্ক। পণ্ডিত শ্রীমুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ সম্পাদিত। দ্বিতীয় অধ্যায় স্মৃতিপাদ নামক প্রথমপাদ। আমরা এই নবীন টীকা ও বঙ্গানুবাদ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। ব্রহ্মসূত্রের স্মৃতিপাদ ও তর্কপাদ অতি জটিল ও সমস্তাঙ্গ। যে-সমস্ত মতবাদই আলোচনা ও বণন এই পাদদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎপরিচয় বৃদ্ধি হইতেই পণ্ডিতসমাজের সংগঠিত হয় নাই। এমন কি তাহা বলিল অতিরঞ্জন করা হইত না যে এত প্রস্থালোচনাকালেই এই সমস্ত মতবাদের অস্তিত্ব সন্দেহ প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মে। ভামতী গ্রন্থে এই সমস্ত মতবাদের সংক্ষিপ্ত ও স্থলবদ্ধ বিবরণ আমরা পাই বটে, কিন্তু তাহাতে জানিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায় অথচ সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা সম্ভবপূর্ব হয় না। বর্তমান কালে বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সে-সমস্ত দর্শন ও মতবান আলোচনা করিবার সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং হৃদয়সম্প্রদায় সে-সমস্ত মতের অনুশীলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিতসমাজ এ দ্বিতীয় আলোচনা হইতে এতকাল উদাসীন ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে আমরা দেখিয়া বিশ্ব আনন্দ লাভ করিলাম যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমুক্ত চাকরুক তর্ক-বেদান্ততীর্থ মহাশয় সে-সমস্ত আকর গ্রন্থের আলোচনা করিয়া নিজ টীকা মধ্যে সে-সমস্ত মতের বিনিবেশ করিয়াছেন। এ-টীকার অনুশীলন বৃদ্ধি পাইলে বিস্তার প্রসার বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

এ-সংস্করণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—তদ্রূপে সম্পাদক শ্রীমুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের অবলম্বিত সূত্রাকর সাহায্যে অধিকরণনির্ণয়-প্রণালী আমাদের নিকট একেবারে নবীন বলিয়া মনে হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় তুর্কাক্ষাধে বলিয়াছেন যে, এ শৈলী তিনি সম্প্রদায়ক্রমে পূজাপাদ স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিবন্ট অধারনকালে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে যদি বর্তমান কোন গবেষণাকারী এ শৈলী অবলম্বন সূত্রার্থ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে ইহাও অনেক সাম্প্রদায়িক বিবাদের মামাংসা হ্রাস হইবে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে—ভাষ্য ও ভামতী মধ্যে যে-সমস্ত প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বধ্যসম্বন্ধ আকর নির্দেশ হইয়াছে।

এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রচার বঙ্গদেশে অনতি-পূর্বকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রার্থনা করি ‘অযমায়ন্তঃ শুভাষ ভবতু’। বঙ্গদেশবাসী পণ্ডিতগণ যখন বেদান্ত-অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন ইহা আশা করিতে পারা যায় যে বেদান্ত চিন্তার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন অসম্ভব হইবে না। বাঙালী যে-সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাবই মধ্যে স্বতন্ত্র প্রকৃতির পবিত্র বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তরূপে নব্য জ্ঞান ও নব্য স্মৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মামাংসাধর্শন-মধ্যে শুক্রমতের প্রকৃতি ও বাচল্য বঙ্গদেশেই সঞ্চিত হইয়াছিল। বেদান্তের মধ্যেও এ অভিনব ধারা প্রবর্তিত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

প্রসূতি ও সন্তান—শ্রীনিরঞ্জনকৃষ্ণ মিত্র, এম-বি, এল-এম (ডাবলিন) প্রণীত ও বেঙ্গল পাবলিশিং হোম হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

ধাত্রাবিদ্যা ও প্রসূতি পরিচর্যা সম্বন্ধে আমাদের বাংলা ভাষায় মাত্র দুই-তিনখানি ভাল বই আছে। সে হলে গিরীন্দ্রবাবু আর একখানি বই লিখিয়া বাঙালী গৃহস্থ সমাজের অনেক কল্যাণসাধন ও উপকার করিয়াছেন। যে-দেশে শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর এত অধিক, যে-দেশে অস্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা ও অলসতা এত ভীষণ, সে-দেশের প্রসূতি ও সন্তান পালনের জন্ত এরকম পুস্তকের নিত্য প্রয়োজন—একথা বলা বাহুল্য। আলোচ্য বইখানি বিশেষজ্ঞদের জন্ত নহে—সধারণ নর-নারীদের পাঠোপযোগী করিয়াই লেখক লিখিয়াছেন। প্রসূতির প্রসবের পূর্বাভাস হইতে প্রসবের পর পর্যন্ত সমস্ত অবস্থাই লেখক বুটিনাটি ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। প্রসবের সময়কার কথা আরও ‘বন্দনভাবে বর্ণন’ করা উচিত ছিল; বইখানি ডাক্তারি-শাস্ত্রে অনতিজ্ঞ লোকের জন্তই লিখিত, সে স্থানে ডাক্তারি উপকরণের কথা না বলিয়া বাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর, তাহাই লেখা উচিত ছিল। মোটর উপর বইখানি প্রলিখিত হইয়াছে ও গৃহস্থ-সংসারের অনেক উপকার সাধন করিবে। বইয়ের দামও খুব অল্প।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

প্রোত

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

বনমালীবাবু প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু না বলিলে চলিবেই না। নিজের জামাই হইলেই বা কি? দরদ দেখাইতে গিয়া শেষে গোষ্ঠীসম্মত মরিবে নাকি? কবিরাজ বাহা বলিলেন, সে অতি ভয়ানক কথা। এ-সব ব্যাধি লইয়া ছেলেখেলা নয়।

দিবাকব ঘরের ভিতরে বসিয়া কাশিতেছিল। একবার থুঁক কবিরাজ খানিকটা গয়েব জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিল।

শব্দটা শুনিয়া বনমালীবাবু পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন।

দিবাকর থাকিয়া থাকিয়া কাশিতেছেই। বনমালী আস্তে আস্তে ঘরেব সামনে আসিয়া দিবাকরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, বুঝলে দিবাকব, তুমি যে আর এখানে থাক এটা আমার মত নয়। এ-সব ব্যাধির পক্ষে শহর জিনিষটাই খারাপ। আমার মতে তোমার এখন দেশে যাওয়াই উচিত। হাজার হ'লেও গ্রামে খাবার জিনিষপত্র প্রচুর মেলে, জিনিষও সব টাটকা। আর কি বলে, হ্যাঁ, ইহুসের ছুটির জন্তে একখানা দরখাস্ত ক'রে কি দিয়েছিলে?

দিবাকর বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ দরখাস্ত ক'রেছিলুম, তিন মাসের ছুটি মঞ্জুব কবেছে।

—বেশ বেশ। তিন মাস বাড়িতে গিয়ে থাক, ভগবানের কৃপায় এর ভিতরেই সুস্থ হ'য়ে যাবে। মাইনেটা পুরোই দেবে ত?

—ইহুসের অবস্থা ত তেমন ভাল নয়, প্রথমটা আপত্তি করেছিল। শেষে হেড্‌ মাষ্টারকে ব'লে-ক'রে পুরো মাইনেতেই গ্রাণ্ট করিয়ে নিয়েছি।

দিবাকর আবার কাশিতে লাগিল।

বনমালীবাবু বলিলেন—তা'হলে আর দেরি ক'রে দরকার নেই, কালকেই তুমি চলে যাও।

দিবাকর যেন একটু বিপন্ন বোধ করিল। বলিল—যাব তো, কিন্তু বাড়ি গিয়ে কি অবস্থার ভেতরে পড়ব ঠিক বুঝতে পারছি নে। আর মাধুরীকেও নিয়ে যাব ভাবছি—

বাধা দিয়া বনমালীবাবু বলিলেন,—না না, মাধুরীকে নিয়ে আর কাজ নেই, ওরা সবাই এখানেই থাক। শুধু যে ঝগড়াট বাড়বে তাই নয়; মাধুরীর এখন যাওয়াও ত অসম্ভব। কোলে ওই কচি ছেলে—

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—তোমাদের ভিটের এখন যে ঠাকুরশ্রী বাস করছেন, তোমার একলা মানুষের সামান্য স্নোগাড়, তিনিই করতে পারবেন। আর এই ত ক'টা দিন মোটে...

ঋগুর-মহাশয়ের কথার উত্তরে দিবাকর আর কিছু বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। আবার কাশির বেগ আসিল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়া গেলে নিজের ঘরে বসিয়া দিবাকর কতাকে বলিল—মীরা, তোমার মাকে একবার ডেকে নিয়ে এস ত একটু।

আজ দু-তিন রাত্রি মাধুরী পুত্রকন্ডা লইয়া পৃথক ঘরে শোয়, স্বামীর ঘরে থাকে না। কবিরাজ কড়া ভাবে এই রকম থাকিতেই বলিয়া দিয়াছেন। কবিরাজ যেটুকু বারণ করিয়া দিয়াছেন, মাধুরী তাহাও ছাড়াইয়া আরও অধিক দূর যায়—সে পারতপক্ষে স্বামীর কাছে যে'বেই না। এমন ব্যাধির কথা শুনিবার পরমুহূর্ত্ত হইতে স্বামীর প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণার তাহার মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্দেহ একটু একটু তাহারও পূর্বে হইতেই হইয়াছিল, এখন স্বামীর ওই শীর্ণ দেহের প্রতি তাকাইয়া মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কাশির কুৎসিত শব্দ কানে গেলে গায়ের ভিতরে কাঁটা দিয়া উঠে। তিন দিন পূর্বেও স্বামীর পার্শ্বে এক বিছানায় শুইয়া সে রাত্রি কাটাইয়াছিল, কিন্তু এখন সেই কথা স্মরণ করিতেই যেন মাধুরী ভয় পায়।

মীরা মাকে গিয়া বলিল—মা তোমার বাবা ডাকছে।

মাধুরী কোলের ছেলেটির জন্তে দুখ গরম করিতেছিল। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—তা জানি না, একুনি যেতে ব'লল।

—একুনি যেতে পারব না, ব'লগে যা। ওকে দুখ খাইয়ে শুইয়ে রেখে আরও দুটো-একটা কাজ আছে সব সেরে তবে যাবো'ধন। আর তুই ও-বরে অত ঘাসু নি, বুধলি? বা, শুধু এই কথাটা ব'লে এসে শুয়ে পড়গে।

মীরা আসিয়া বাবাকে বলিল। শুনিয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিবাকর মাথুবীর অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা খানেক পরে মাথুবী দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে না-চুকিয়া ওখান হইতেই জিজ্ঞাসা করিল—ডাকছিলে কেন?

মাথুবীর দিকে তাকাইয়া দিবাকর কহিল—ভিতরে এস।

—বল। এখান থেকেই শুনিছি।

দিবাকরের চোখ দুইটি একটু নত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে বলিল—ম্যাথ, ইস্কুল থেকে তিন মাসের ছুটি পেয়েছি। তোমার বাবা ব'লছেন এই তিন মাস বাড়িতে গিয়ে কাটাতে। তা জানই ত, আমার আর কেউই নেই। বাড়িতে শুধু একটা ভিটে প'ড়ে আছে। এত দিন বন-জঙ্গলেই ছেয়ে যেত, তা বায় নি শুধু গ্রামের এক বিধবা ঠাকুরপা আমাদের ভিটের ওপরে ছুখানা ঘর তুলে বাস ক'রছেন সেই জন্তে। আমি ভেবেছিলাম যে তোমাদের নিয়েই বাই, সেই স্বর্ণ-দিদির ঘরেই এই তিনটে মাস গিয়ে থাকব। তিনি বুড়ো মানুষ, অতি ভাল মানুষও। ছোটবেলা থেকেই আমাকে বড় স্নেহ ক'রতেন।...তা তোমার বাবার এতে অমত। তুমি কি বল?

—তা বাবার অমত হ'লে আমি কেমন ক'রে কোন কথা বলি? আমার যাওয়া হয় না।

—অবিশ্রুতি তুমি যা ভাবছ, তোমাদের তেমন কোন অসুবিধা হবে না। আমরা স্বতন্ত্র ভাবেই থাকব, স্বর্ণ-দিদির সাহায্যও খানিকটা পাওয়া যাবে। তা'ছাড়া সেদিন মীরা বলছিল, বাড়ি কেমন তার দেখতে ইচ্ছে করে। কোনো দিন দেখে নি ত!

একটু অসহিষ্ণু হইয়া মাথুবী বলিল—আচ্ছা, সে বাড়ি দেখা হবে'ধন।...তা তুমি তোমার সেই স্বর্ণ-দিদির কাছেই

এই তিনটে মাস থেকে এসগে না? মিথ্যা আমাদের নিয়ে আর টানাটানি করছ কেন? হাজারি নিশ্চয়ই হবে। নিঃস্বের বাড়ি নেই, ঘর নেই—তার পরে আবার গ্রাম চিরদিনই দেশ ছাড়া!

—না, না তুমি যা ভাবছ—

—ঠিকই ভাবছি আমি। বাবার পরামর্শই ভাল। কব্বেরের কাজ থেকে ওষুধপত্র নিয়ে চলে যাও—

কাপড়ের আঁচল দিয়া মাথুবী মুখটা একবার মুছিয়া ফেলিল।

দিবাকর ঘরের মেঝের দিকে মুখ নীচু করিয়া তাকাইয়া মাঝে মাঝে দু-একবার কাশিতেছিল। ধীরে ধীরে বলিল—এই জন্তেই তোমায় ডেকেছিলুম, আর কোন কিছু নয়। আচ্ছা, তাই-ই করব।

ও-বরে ছেলেটা আবার কাঁদিয়া উঠিয়াছে, মাথুবী এক-পা দু-পা করিয়া করিয়া চলিয়া গেল।

বহুকাল পরে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে একটি নূতন অলঙ্কারিত দিবাকরের মন ভরিয়া উঠিল। তাহারও পরিবর্তন হইয়াছে, গ্রামেরও পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু এত দিন পরেও যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছে। এই গ্রামে সে অনধিকারপ্রবেশ করিতেছে, এমন কথা তাহার মনে হইল না, বরং কত যুগ আগেকার শৈশব-স্মৃতিগুলিই অন্তরে এক-এক করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকিল।

দিবাকর হালদার-বাড়ি ছাড়াইয়া গেল; নবীন দাসের পানাপুকুর পার হইয়া মা ভবতারিণীর মন্দির। বহুদিন পূর্বেই মন্দির হইতে ইট খুলিয়া খুলিয়া পড়িতেছিল, এখন তাহার আরও জরাজীর্ণ অবস্থা। মন্দিরের মাথার উপর দিয়া একটি বিশাল বটগাছ ছুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। দিবাকর মা-ভবতারিণীর উদ্দেশে দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল।

এখনই কাহাবও সঙ্গে দেখা হয়, ইহা দিবাকর চাহিতেছিল না। চুপে চুপে যথাসম্ভব এক-একটি বাড়ি পিছন দিয়া, যে-সব পথে বেগী লোকজন সর্বদা চলা চ করে না এমন পথ ধরিয়া নিজের বাড়ির দিকে চলিতেছিল।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও নরেশ-কাকার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

দিবাকর নরেশ-কাকাকে দেখিয়াই চিনিয়াছে, কিন্তু নবিশ প্রথমটা বুঝিতেই পারেন নাই। প্রশ্ন করিয়া দিবাকর পরিচয় দিতেই নরেশ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—আরে! এত কাল পরে বাড়ি এলি দেবা? তা তোরা একি ছিরি হয়েছে বে? অস্থ-টস্থ না কি? তোকে যে মোটে চেনাই নেই!

নরেশ-কাকার কথাব দুই-চারিটা উত্তর দিয়া তাঁহার কৌতূহল যথাসম্ভব প্রশমিত করিয়া দিবাকর পুনরায় চলিতে থাকিল। আর বেশী দূর নয়!

নিজের বাড়ির উপরে আসিয়া যখন দিবাকর দাঁড়াইল, তখন স্বর্ণ-চাকুবাণী ঘরের বারান্দার উপরে বসিয়া বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। সহসা দিবাকরকে দেখিয়া কাঁথা, ছুঁচ, মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—ওমা, দেবা যে! ওমা—কতকাল পরে তোকে দেখলুম! আর বাছা আর, সঙ্গে আর কে?

দিবাকর বাবান্দার উঠিতে উঠিতে উত্তর দিল—আর কেউ নয় সন্ন দিদি, আমি একলাই।

ঘরের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি একটা মাত্র আনিয়া বাবান্দার বিছাইয়া দিয়া স্বর্ণময়ী বলিলেন—ব'স বাছা, ব'স। পাখা এনে দি...

স্বর্ণদিদি পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া একখানা পাখা আনিয়া দিবাকরের হাতে দিলেন,—শার্টের বোতাম খুলিতে খুলিতে দিবাকর নিজেই হাওয়া করিতে লাগিল।

দিবাকরের মুখের দিকে তাকাইয়া স্বর্ণদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই কি কোন ব্যাংমাতে ভুগছিস দেবা? তোরা সেই অমন মোটা-সোটা নাহু-নাহু শরীর তা কোথায় গেল?

দিবাকর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা সে-সব পরে হবে সন্নাদিদি, এখন তুমি আমায় এক গ্রান খাবার জল এনে দাও দেখি!...

রাত্রে দিবাকর সকল কথাই খুলিয়া বলিল।

তিনি স্বর্ণদিদি বলিলেন—তা বেশ ক'রেছিস বাপু।

তিনটে মাস থাক, কবরেজ যে ঔষধ দিয়েছে নিয়ম-মতন বা, মা-ভবতারিণী তোকে অবিব্রিই ভাল করবেন।... বোমাও যদি আস্ত, তা হ'লে বেশ হ'ত, বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। অস্থিধে আর কিই-বা হ'ত, তোরা সবাই মিলে এই ঘরে থাকতিস, আমি না-হয় ওই ঘরে গিয়ে থাকতাম।

দিবাকর নিয়ম-মত কবিরাজী ঔষধ খাওয়া শুরু করে। দুপুরের ঔষধটা কেবল মাত্র মধু দিয়া খাইতে হয়, তেমন কিছু হাল্কা নাহি। দিবাকর নিজেই সেটা পারে; কিন্তু সকালে, বিকালে এবং রাত্রে স্বর্ণদিদির সাহায্য লইতে হয়।

সকালবেলাকার পাঁচনের উপকরণগুলি সে কিনিয়াই লইয়া আসিয়াছিল। সেগুলি বাছিয়া ওজন করিয়া পৃথক পৃথক মোড়কে এক-এক দিনেই মত দিবাকর বাধিয়া রাখে। স্বর্ণদিদিকে বলিল—তোমাকে কিন্তু এই ক'টা দিন একটু বিরক্ত করব সন্নাদিদি। আমার ঔষধ-পত্রগুলি তোমার একটু শুছিয়ে-টুছিয়ে দিতে হবে।

স্বর্ণদিদি উত্তর করিলেন—ওম, বিরক্ত হব সে আবার কি কথা? তোরা যখন যা ক'বে দেবার দরকার হবে সবই আমায় বলবি। মুড়িতে শুদ্ধ মাথিয়ে, শশা কেটে, নারকেল কুরিয়ে কত খেতে দিয়েছি, মনে নেই? পুণীপিঠে তৈবি ক'রে দেবার স্ত্রে দিন-রাত আমায় কত জালতন করতিস, সব ভুলে গেছিস বুঝি? সেই দেবা আমার এখন ভদ্র-কাক হয়েছে!...

দেড় সের জল এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া পবিত্র একখণ্ড চাকড়া দিয়া ছাঁকিয়া স্বর্ণদিদি পাঁচনটা আনিয়া দিবাকরের হাতে দিলেন। খাইতে বিশ্রী তেতো এবং কটু, কিন্তু দিবাকর সত্ত্বে পাঁচনের বাটটা তুলিয়া ধরিয়া তলানিটুকু পর্যন্ত গলাব ভিতরে ঢালিয়া দিল।

বিকালের ঔষধটা খাইতে হয়, চালকুমড়ার রস দিয়া। দিবাকর গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু কষ্টে চালকুমড়া জোগাড় করিয়া লইয়া আসিল। স্বর্ণময়ীই ছেঁচিয়া রস বানাইয়া দিলেন।

রাত্রেই জন্ত কবিরাজ বুকে একটি মালিশের ঔষধ দিয়াছেন। ঔষধ মালিশ করিয়া আকন্দ-পাতা আঙনের উপর অল্প গরম করিয়া তার পরে বুকে সেক দিতে হইবে। ইহাতে ত স্বর্ণদিদির সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায়ই নাই!

দিবাকরের বুকে মালিশটা লাগাইয়া দিতে দিতে স্বর্ণদিদি বলিলেন—বুকের পাজরাগুলো একেবারে বেরিয়ে পড়েছে—আহা! বাবে, ভাল হ'য়ে বাবে, কিছু তুই ভয় করিস্ নে দেবা! মা-ভবতারিণী, তুমি আমার দেবাকে ভাল ক'রে দাও—।

এই মুহূর্তে সহসা মাখুরীর কথা দিবাকরের মনে পড়িল, অকারণে বুকের ভিতরটায় একটা মোচড় দিয়া উঠিল।

ঔষধ খাওয়া প্রত্যাহ চলিতে থাকিল।

কিন্তু একদিন দিবাকরের দিকে তাকাইয়া স্বর্ণদিদি বলিলেন—আজ প্রায় ছুটি মাস কেটে গেল দেবা, কিন্তু কই, চেহারা ত তোরা মোটে ফেরে না! আরও যেন বেজার কাবু হ'য়ে যাচ্ছিস, আর কাশিটাও ত কিছুতেই কমছে না।

দিবাকরও নিজের শরীরের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারে। বলিল—তাই ত সন্মোদিদি, কি যে করি তাও ত বুঝি না।...

হঠাৎ কাশি আসিল। কাশিতে কাশিতে দিবাকরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বলিল—সন্মোদিদি, একটা শিশিতে কালো মতন কতকগুলি বড়ি আছে। ওরই একটা বড়ি আমার লীগুগীর এনে দাও ত—

স্বর্ণদিদি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যান; কিন্তু দিবাকর যেটা চায়, সেটা তিনি ঠাহর করিতে পারেন না। দু-তিনটা শিশি আনিয়া দিবাকরের হাতে দিলেন, দিবাকর বাছিয়া একটি শিশি হইতে একটি বড়ি বাহির করিয়া মুখ পুরিয়া চুষিতে থাকিল। কিন্তু তবুও কাশি দমন হইল না।

স্বর্ণদিদি বলিলেন, কবরজকে বরং একখানা চিঠি লিখে দে, দেবা, শরীরের সব কথা জানিয়ে। তিনি যদি নতুন ব্যবস্থা কিছু করেন—

—নতুন ব্যবস্থা আর কি-ইবা ক'রবেন, ঘে-ওষুধপত্র দিয়েছেন এ সবই অন্ততঃ মাসচারেক খেতে বলেছেন। এখন ত সবে ছুটি মাস হ'ল। আর আছিই বা কত দিন। দিন-পনর-বিশের ভেতরেই তো চলে যেতে হবে, সামনে গিয়েই দেখানো যাবে!

—চ'লে ত যাবি বাছা, কিন্তু—

কিন্তু বলিয়া স্বর্ণদিদি থামিয়া আছেন দেখিয়া দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু কি?

—না বলছিলাম যে তোর শরীরের দিকে তাকিয়েই যে মনে শাস্তি পাচ্ছি নে। আমি বলি কি, চাকরি-বাকরি ক'রে এখন আর তোর কাজ নেই। প্রাণ বাঁচলে সব হবে। অস্থির জন্তে একটু ভাল রকম চেষ্টা-চরিত্তির কর।

—ভাল রকম চেষ্টা-চরিত্তি আব কি করব তাই বল।

—আমি আর সে-কথা কি বা বলি, কবরজকে আবার দেখিয়ে তিনি কি ব্যবস্থা করেন সেই-টাই ত জানবার দরকাব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বর্ণদিদি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ রে দেবা, বোমার চিঠি-টিঠি পাস্? কেমন আছে ওরা সবাই?

দিবাকর চুপ করিয়া থাকিল।

—কিরে, কথা বলছিস্ না যে?

ধীরে ধীরে দিবাকর উত্তর দিল—না সন্মোদিদি, ওদের কোনো চিঠিপত্রই আমি পাই নে।

স্বর্ণদিদি বিষয় বোধ করিয়া বলিলেন—ওমা এত দিনের ভেতরে চিঠি পাস্ নি, সে কেমন কথা? তুই লিখেছিস্ ত?

—হ্যাঁ সন্মোদিদি, একখানা নয় পব-পব কয়েকখানা লিখেছি।

মুখ নীচু করিয়া পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া দিবাকর উঠানের মাটি খুঁড়িতে থাকিল।

দিবাকর ছুটি ফুরাইয়া আসিল।

রওনা হইবার সময়ে স্বর্ণদিদি দিবাকরের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন—মা-ভবতারিণীকে আমি সর্বদা ডাকছি, তিনি তোকে নিশ্চয়ই সুস্থ ক'রে দেবেন। আর ভাল হ'য়ে মাঝে মাঝে আসিস্ বাছা। তোর মুখখানা দেখে যে কত শাস্তি পেয়েছি, তা বলতে পারি নে। এবারে যখন কোনোদিন আসবি—বোমাকে, ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে আসবি—

দিবাকর একটু হাসিল।

বাসায় ঢুকিবার পূর্বেই রাস্তাব উপব বনমালী বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। বনমালী বাবু বলিলেন—এই যে দিবাকর, কেমন আছে?

—আজ্ঞে তত সুবিধার নয়।

—তা চোহারা দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার এখন বাড়ি থেকে চলে আসাটা মোটেই ঠিক হয় নি।

দিবাকরের শরীরের অবস্থা দেখিয়া বনমালী বাবু অত্যন্ত সন্তোষিত হইয়া উঠিতেছিলেন। গাল একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি যে কোথায় গিয়া চুকিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আব থাকিয়া থাকিয়া ঐ কুৎসিত কাশি!

দিবাকর বলিল—না এসেই বা কি করি। ছুটিও ফুরিয়ে গেল, কবরেজকেও আবার দেখানো দরকার—

এবারে মাথা চুলকাইয়া বনমালী বাবু বলিলেন—
এলে ত, বাসায়ই যে কেউ নেই! আমি একলা শুধু ঠাকুর আর ঝিটাকে নিয়ে আছি। সেদিন আমার শালা এসেছিল, ওদের সবাইকে সে মাস-দেড়েকের জন্তে তার কাছে নিয়ে গেল। আমি আছি সে এক মহা বিব্রাটের ভেতরে। তোমার ত অনুবিধার একেবারে চরম হবে। ওরা থাকলে বরঞ্চ এক রকম হ'ত। না হে বাপু, তুমি রোগা মানুষ, সন্তান সময়ে তোমার ঠিক-মতন তদারক হওয়া চাই, বাসায় গিয়ে আর কাজ নেই।...বনমালী বাবু পুনরায় মাথা চুলকাইলেন—তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও আবার। কবরেজ যা বলে শোন গে, আর—

বনমালী বাবু পকেটে হাত দিলেন, একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিবাকরের সন্মুখে ধরিয়া বলিলেন—
এই টাকাটা রাখ। দরকার মতন—

দিবাকর একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিল, বুঝিতে পারিল, তাহার বাসায় যাওয়াটাকেই বনমালী বাবু পছন্দ করিতেছেন না। নতুবা উহারা কেহ না থাকিলেই বা কি? বাড়ি হইতে এতদিন পরে আসিয়াছে, অন্ততঃ বিশ্রামের জন্তেও ত তাহাকে একটি কি দুটি দিন থাকিয়া ঘাইতে বলা উচিত।

মাধুরী কেন তাহার চিঠির উত্তর দেয় নাই, মামার নিকট যাওয়ার উপরে কারণট আবেগ করিতে দিবাকর চেষ্টা করিল। কিন্তু মামার কাছে গিয়াছে ত সেদিন, এত দিন কেন মাধুরী চিঠি দেয় নাই? আর মামার কাছে গেলেই বা কি, তাহাতে চিঠি লিখিবার বাধা কোথায়? তাহার এমন অসুস্থতা, একটু খোঁজ লইবারও কি ইচ্ছা হয় না?

বুদ্ধিমান দিবাকর মাধুরীর মনের গতি বুঝিতে পারিল।

মুহুর্তের জন্ত মাধুরীর, মীরার, খোকনের মুখগুলি স্মরণ করিয়া তাহার অন্তর বেদনাতুর হইয়া উঠিল।

বনমালী বাবু বলিলেন—এখন তা'হলে কবরেজ-বাড়িই যাও দিবাকর—

তাহাকে এড়াইবার জন্ত খণ্ডর-মহাশয়ের এত বেশী গরজ দেখিয়া দিবাকর সত্যিই হুঃখিত না-হইয়া পারিল না। কিন্তু আর বেশী কোন কথা বলিতে তাহার প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। ওই অবস্থায়ই সে তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

রাস্তার মোড় ঘুরিতেই হঠাৎ বাসার ঝি কাছুর সঙ্গে দেখা। কাছু বাজার হইতে ফিরিতেছে, হাতে বুড়িতে বাজারের সওদা।

—ওমা দাদাবাবু যে! কখন এলে?

দিবাকর উত্তর দিল—এই ত একটু আগে। ভাল আছিস্ ত?

—এই চলে যাচ্ছে, এক রকম আমাদের আবার ভাল থাকা আর মন্দ থাকা। তা এখনই চলেছ কোথায়? তোমার চেহারা ত বেজায় খারাপ হয়ে গেছে দাদাবাবু! কবরেজ এখন কি বণছে?

—কবরেজের কাছেই ত বাছি।

হাসিয়া কাছু বলিল—খোকনমণিকে কেমন দেখলে দাদাবাবু? তোমার কোলে এল না? উঃ, বা ছরস্ব হয়েছে! হামাগুড়ি দিতে শিখেছে—চার হাত পারে এমন ছুটবে, ওর সঙ্গে পারে কার সাধ্য? গায়ে আবার জোরও হয়েছে বাবুর! কালকে রাস্তিরে খাটের ওপর থেকে মীরাকে মাটিতে ফেলে দেবার জন্তে কি চেষ্টা! আমরা ত হেসে বাঁচি নে!

দিবাকর তরু হুইয়া কাছুর কথা শুনিতেছিল। এক মুহুর্তের ভিতরে সে সমস্ত বুঝিল।

খণ্ডর-মহাশয়ের উপরে এতটুকু আক্রোশের ভাব তাহার মনে জাগিল না, কিন্তু তার মাধুরী—?

কাছুকে কোনো কথাই সে জিজ্ঞাসা করিল না, এমন কি তাহার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া কাছু পাছে কিছু সন্দেহ করে এই ভয়ে দিবাকর নিজেই সম্পূর্ণ সংযত করিয়া অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বলিল—দেখ কাছু, তুমি একটা

কাজ কর ত, বাসায় গিয়েই মীরাকে পাঠিয়ে দিও।
খোকনকে যেন কোলে ক'রে নিয়ে আসে। বাসায়
পৌছতেই মীরা বলেছে তার ছোটো পুতুল ভেঙে গেছে,
খোকনমণিব ঝুমুঝুমি নাই, আর কত ফরমাসেস!
বাজারেব পাশেই ত কবরের জের বাসা, বাজার থেকে
মীরাকে সব ক্রিনে দেব'খন, আর ওদের সঙ্গে করেই
কবরের জের বাড়ি থেকে ঘুরে আসব'খন।

কাছ পা বাড়াইল। দিবাকর বলিল—হ্যাঁ, ওর মা যদি
আবার বারণ করে, তুমি শুধু চুপি চুপি মীরাকে ডেকে
খোকনকে কোলে দিয়ে আমার কথা ব'লে পাঠিয়ে দিও,
বুঝেছ?

কাছ একবার পা বাড়াইয়া আবার ফিবিয়া হাসিতে
হাসিতে বলিল,—মাঘ মাসের একুশে তারিখে খোকন-
মণির মুখ ভাত, শুনেছ ত? আমার কিন্তু বংশিশ্ দিতে
হবে দাদাবাবু। একজোড়া কাপড়ের কমে ছাড়ছি না।

দিবাকরও হাসিতে চেষ্টা করিল। বলিল—দেব বইকি
কাছ, নিশ্চয় দেব।

—হ্যাঁ, মনে থাকে যেন...

কাছ চলিয়া গেল। দিবাকর রাত্তার দিকে তাকাইয়া
চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

পাঁচ-সাত মিনিট কাটিয়া যায়, কিন্তু কেহই আসিল না।
দিবাকর তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা খানেকের ভিতরেও যখন কেহ আসিল না,
দিবাকর এক পা ছই পা করিয়া রাস্তা দিয়া একটু আগাইয়া
আসিল। বাসা দেখা যায়, কিন্তু আর কাহাকেও দেখা
যায় না।

দিবাকর আরও কিছু ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। কপালে
বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু বহু ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন মীরা আসিল না,
দিবাকর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আশ্বে আশ্বে সেখান
হইতে সরিয়া গেল; হয়ত বা, চক্ষু ছইটি একটু সিক্ত
হইয়া উঠিল।

কবিবাজের বাড়িতে আর দিবাকর গেল না। দশ টাকা
করিয়া সপ্তাহ, চালাইবারও উপায় নই—আর এই
কবিবাজের উপর বিশ্বাসও তাহার কিছু কমিয়া গিয়াছে।

আশুবাবু নামজাড়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। শহরের
কোনো স্ন্য'লোপ্যাথও তাঁহাব মত বশ অর্জন করিতে
পারেন নাই দিবাকর আশুবাবুর বাড়িব দিক ঘাইতে
লাগিল। ডাক্তারও ভাল, আর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়
খরচও কম।

সমস্ত শুনিয়া আশুবাবু ঔষধেব ব্যবস্থা কবিলেন।
আশুবাবুর ডিস'পেন্সারী হইতেই দিবাকর ঔষধ কিনিয়া
লইল। বাহির হইয়া আসিবার আগে অল্প একটু হাসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? ভাল
হব ত?

আশুবাবু ঘাড় কাৎ করিয়া বলিলেন—অবিত্তি।
ভয় কিছু নেই, তবে হ্যাঁ, একটু সাবধান।

আশুবাবুর বাড়ি হইতে দিবাকর সোজা ইক্সলে
আসিল। হেড'মাষ্টার মহাশয় একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—
কিছু মনে কর'বন না দিবাকর বাবু, কাজ থেকে আপনার
জবাব দিতে হবে। আপনার যে ব্যাধির কথা শুনলাম,
এতে আপনাকে আব বাধতে পারি নে এবং এই কথা
জানাবার জন্তে সেক্রেটারীও আমার সেদিন খবর পাঠিয়ে-
ছিলেন।

দিবাকরের মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—যদি আম'কে
আব কিছু দিনের ছুটি দিতেন স্তর, অন্ততঃ চেষ্টা ক'বে
দেখ'গাম। এই অবস্থায় এখন যদি আমার—

—তা আমি আব কি কর'ত পারি দিবাকর বাবু?
আমার কোনো হাত নেই। আপনাকে তিন মাসের ছুটি
পুরো মাইনেয় দিয়েছি। আর ছুটি দেওয়া অসম্ভব।
এতে ইক্সলের কাজে বিশৃঙ্খলাও হয়, আব ইক্সলের আর্থিক
অবস্থাও—

কাতর ভাবে দিবাকর কহিল—পুরো মাইনে আমি
চাই নে, দয়া ক'রে যদি অর্ধেক মাইনেতেও—

হেড'মাষ্টার একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—আপনি
বুঝতে পারছেন না দিবাকর বাবু। আপনার ওই ব্যাধিটাই
যে সব গোলমাল কর'ছে। আপনার বা শরীরের অবস্থা
দেখ'ছি, এতে, আপনি নিজেই যে কাজ করতে পাববেন
না। আর আপনাকে আমরা স্যাল'উই বা করি কি
ক'রে? দশ বিশ দিন বা এক মাসের ছুটিতে আপনাব

কিছুই হবে না। আপনার ক্ষেত্রে আমি বড়ই দুঃখিত হচ্ছি দিবাকর বাবু, কিন্তু কোন উপায় নেই। আমি আপনাকে বলি, এখানকার প্রিভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা আপনি তুলে নিয়ে যান—তা সে যা-ই হোক না কোন, নিয়ে গিয়ে ওরই ভেতর নিজেব বখাসস্তব চিকিৎসার বন্দ বস্ত করুন।

দিবাকর আর কোনো কথাই বলিতে পারিল না। চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার বনাইয়া আসিল।

* * *

স্বর্ণময়ী বলিতেছেন, তা ভালই করেছিল দেবা, কিরে এস। একবারে মড়ার হাল হয়েছে, এই শবীর নিয়ে কেউ খাটুনীর কাজ ক'রতে পারে? চাকরিতে জবাব দিয়ে এসেছি, তাতে কি হ'য়েছে? মা-ভবতাবিণীর দয়্যার সেরে উঠল, অমন চাকরি আবার পাবি। তুই মন খারাপ করিস্ নি বাছা।

দিবাকর বলিল—না সন্নোদিদি, মন আর কি খারাপ ক'রব, তবে আবার চলাও তো চাই! তবুও যাহোক কটা টাকা পাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন যে আর উপায় নেই। কে আমার সাহায্য ক'রবে?

—তা বাবা এই অবস্থায় খন্তর কি আর কিছু না-ই ক'রবেন? অবিশ্রিই ক'রবেন। এত দিন তাঁর কাছেই ত থাকলি!

স্বর্ণদিদি অবশ্য সরল মনেই বলিলেন, কিন্তু সেখান হইতে কোন সাহায্য প্রার্থনা কবিণাব কথা ভাবিতেও দিবাকর মনের ভিতরে কেমন একটা গ্লানি অনুভব করে। কিন্তু তাই বলিয়া সে মাথাটাকে প্রথমই খাবাপ কবিয়া বসে না।

আশুবাবুর দেওয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিশ্বাসের সহিত খাইতে থাকে। কখনও কখনও কলিকাতায় গিয়া এক জন বড় ডাক্তার বা কবিবাজকে দিয়া দেখাইবার ইচ্ছা মনে জাগে; কিন্তু পরক্ষণেই সে-চিন্তা সে মন হইতে মুছিয়া কেলিয়া দেয়। কলিকাতা যাওয়া এবং থাকার খবর, ডাক্তারের কি, ঔষধপত্র, বড় ডাক্তারের বড় ফরম্যাশ... অসম্ভব!

তা আশু ডাক্তারই বা কম কিসে? বন্ধিম মোস্তারের অতবড় অমুখ, তা শেষে আশুবাবুর হাতেই ত সারিল! সে ত কলিকাতাও গিয়াছিল, পরসাত চালিয়াছিল দুই হাতে;

কিন্তু কই, কলিকাতার ডাক্তাররা ত কিছুই করিতে পারিলেন না, শেষকালটায় ত এক রকম জবাবই দিয়া দিলেন।

আশুবাবুর দেওয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শুঁড়া শিশি হইতে কাগজের উপর মাত্রা তিক করিয়া দিবাকর চালিয়া লইল; যুঃখব ভিতর ফেলিয়া জিহ্বা দ্বারা চাটিতে চাটিতে মনকে প্রবোধ দিতে থাকিল।

কিন্তু কিছুই হইল না!

দিবাকরবেব শরীর যেন ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতে চায়। কাশিতে কাশিতে বুক পিঠ বাকা হইয়া আসে, পেটের নাড়িগুলি ছিড়িয়া আসিবার উপক্রম করে। গায়ে জ্বর সর্বক্ষণ লাগিয়া আছে। সন্ধ্যার দিকে দিবাকর বেছ'সের মত বিছানার উপর পড়িয়া থাকে।

পাড়ার ভিতরে নরেশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লোক, তাঁহার বিজ্ঞতাব উপরেও সকলের আস্থা।

স্বর্ণ-ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ নবেশ, দেবা যে বড় ভাবনার ভিতরে ফেলল। কি করা যায় বল দেখি।

নরেশ প্রথমটা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পরে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন—আসল কথা বলতে কি সন্নো? এ-সব শিবের অসাধ্য ব্যাধি। তবে ভাগ্যের জোর থাকলে সেরেও যায়, একেবারে যে না-সারে এমন না। এই ত ধব না কেন, আমার খুড়ো-মশায়েরই ত এই ব্যাধি ছিল। তা তিনি সম্পূর্ণ সারেন নি বটে কোনোদিন, তবে একেবারে ভেঙেও পড়েন নি। একটু-আটটু উপসর্গ থাকতই, মাঝে মাঝে আবার ভালও থাকতেন! ওই নিয়েই ত পঁচাশী বছর তিনি বেচেও গেলেন—ছেলে, মেয়ে, বউ নিয়ে ঘর-গেরস্তালী ক'রেই!

—কিন্তু দেবা যে ক্রমেই শয্যে-ধরা হ'তে চ'লল।

—তাই ত সন্নো, কি করা যায়।

—তুমি না-হয় যেয়ো বাবা একবার বাড়ির ওদিকে। দেবাকে একটু দেখে এস।

—যাব'খন; তবে আজকে ত আর পারব না। নারেন-কাছারীতে একটু বেতে হবে, লাটেব কিস্তির তারিখ আবার। কাল সকালের দিকে যাব।...

একদিন কাহার নিকট হইতে নরেশ যশোরের কোন

এক ভদ্রলোকের খবর স্বর্ণর নিকটে আনিয়া হাজির করিলেন। বলিলেন—আমার মনে হয় এটা একবার

দেখলে মঙ্গ হয় না।

স্বর্ণময়ী বলিলেন—আমার তো কোনই আপত্তি নেই, দেবা মত ক'রলে হয়।

—এতে আব অমত করবার কি আছে? সে ভদ্রলোক নাকি অনেককেই সারাচ্ছেন শুনলাম। তিনি কতকগুলো শেকড় দেবেন, পনের দিন তাই রোজ খেতে খেতে হবে। এটায় এমন খবচ কিছু নয়, হাঙ্গামাও নেই। কার কিংস যে কি হয়, বলা ত যায় না! ব'ল তুমি দিবাকরকে।

রাত্রে দিগবর বসিয়া ঝুটি খাইতেছে। স্বর্ণময়ী আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া বসিলেন।

—একটা কথা, দেবা।

দিবাকর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা সন্নোদিদি?

—নরেশ বলছিল, সে কা'র কাছে শুনেছে যশোরের এক জন ভদ্রলোক নাকি এই ব্যামোর ভাল চিকিৎসা ক'রছেন, অনেককে সারিয়েছেন। তাঁর ওষুধ হচ্ছে কতকগুলি শেকড়, মাস্তব পনের দিন খেতে হবে। আমি বলি কি, এটা একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়। তুই কি মত করিস?

একখানা ঝুটি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে দিবাকর বলিল—আমার ত অমত কিছু নেই, তবে কেমন ক'রে বা সেই ওষুধ আনান যাবে, আর খরচ-টবচ—

—সে সবের জন্ত তোর বেশী ভাবনা ক'রতে হবে না। সে ভদ্রলোক মোটে নাকি পাঁচটি টাকা নিয়ে থাকেন। আর তাঁর কাছে নাকি কারও নিজের গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে হবে, ডাকে তিনি পাঠান না। কিন্তু তাও আমি ভেবে বেখেছি। হালদার-বাড়ির বিনোদ ত নিষ্করী হয়েই বাড়িতে ব'সে থাকে, আমি ভাবছি ওকেই ব'লে-ক'রে পাঠাব। তুই বাবা এই কটা টাকা খরচের জন্তে ভাবিসনি। এমন সাংঘাতিক ব্যামো যদি ভাল হ'য়ে যায়—

দিবাকর মত করিল। স্বর্ণদিদি দিবাকরের পিঠে সম্মেহে হাত বুলাইয়া মানৎ করিলেন, আমার দেবাকে

তুমি ভাল ক'রে দাও মা-ভবতারিণী, আমি তোমার পুজো সেব।

একটু পবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে দেবা, বৌমার চিঠি-পত্ৰর পাস্‌নে?

দিবাকর মুহুর্তের জন্ত স্বর্ণদিদির মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ নামাইয়া লইল। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাটির ভিতরে গরম দুধটা আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে বলিল—তারা ত ওখানে নেই সন্নোদিদি, আমার কাছে গেছে। এক স্বস্তবমশায় ছাড়া বাসায় আর কেউই নেই। আর বোয়েবও চিঠি-পত্ৰর লিখবার অভ্যাস আবার একটু কম কিনা! তা পেয়েছি, একখানা চিঠি এই ত কিছু দিন আগ পেলাম। ভালই আছে ওরা।

কথাটা বলিতে গিয়া দিবাকরের বুকেব ভিতরটা টাটাইয়া উঠিল। তবু ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলিল। স্বর্ণদিদির মনে কোন বিষয় জাগিয়া উঠিবার আগে, কোনো হা-হুতাশের কথা শুনাইবার আগে, আজ সে কোনগতিকে কপাটা এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল।

বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইয়া স্নানের খিটটাকে হাতে করিয়া ই দিবাকর কিছু ক্ষণের জন্ত সম্মুখের অন্ধকারের দিকে স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিল। একুশে মাঘ, তার খোকনের অন্নপ্রাশন!...

তিন-চারি দিন পবে বিনোদ যশোর হইতে ফিরিয়া আসিল। ওষুধ স্বর্ণময়ীর হাতে দিতে দিতে বলিল—যত্ন ক'রে তুলে রেখে দাও সন্নো-মাসি। সন্ধ্যা-বলা উঠে কাপড় ছেঁড় তুলসীজল মাখায় ছিটিয়ে তুমি খেতে রেখে দেবে, দিবাকর চান্‌ ক'রে ভিজ্জে কাপড়েই পুবের দিকে মুখ ক'বে দাঁড়িয়ে ওষুধটা খেয়ে ফেলবে। পনের দিন। এই নাও, ধব—

ওষুধ হা ত লই ত লইতে স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর বাছা কষ্ট হয় নি ত কোন?

—সে কথা আর কেন বল মাসি, জ্বরভোগ কিছু গেছে বইকি,...

বিনোদ হাত-মুখ ধুয়াইয়া বলিতে লাগিল, যাওয়াব দিন অবিগ্রহিত মনে কিছু অসুবিধে হয় নি; কিন্তু কেবাব সময়ই সব চিন্তার ক'রে ফেললাম। ওই গাঁ থেকে বেরিয়ে

মাইলখানেক দূরে বাজারের ওপর এসে চড়তে হয় মটোরে। মটোরে আট মাইল এসে তবে ইস্টিসান। শালার মটোরই দিলাম কেল মেরে। কিন্তু বিনোদ হালদার মোটে সেই বান্দাই নয় যে আবার ফিরে গিয়ে ভদ্রর লোককে উৎপাত করবে। পা তো নয় মাসি, যেন বজ্রা নৌকো! দিলাম চালিয়ে। সে ট্রেন আর ধরতে পারলাম না। মাঝ রাস্তারের আগে আর ট্রেনও নাই। কিন্তু এরাবা বিনোদ হালদার, ইস্টিসানে সিটকে পড়ে থাকবার পাক্তর নয়! খানিক পবেই এল এক মাল গাড়ী। তা পরে বুঝলে মাসি,—

হাসিয়া বিনোদ বলিতে থাকে, দিলাম হাতে শুজে আট গণ্ডা মুদ্রা। এর নাম বাবা! রূপচাঁদ, পেছন দিক দিয়ে হুড়ু হুড়ু করে নিলে গার্ড বেটা আমার তুলে। তা পরে রাণাঘাটে এসে আব ট্রেনের অভাব কি? যে একটা টাকা বাচ্চলো, রাণাঘাটে এসে এক মেঠারের দোকানে চুকে,—

হাসিয়া বিনোদ বলে,—বুঝলে ত মাসি?

তা বা করেছিল বাপু করেছিল, এখন এই কষ্ট আর পরসাবার সার্থক হয় যদি দেবা আমার এই ঔষধে উপকার পায়—

—কিছু ভয় নেই সন্মোমাসি, হুড়ু করে দাও ভরসা করে। সেয়ে যাবে।

—এই কথাই বল তোরা সকলে বাছা।

নরেশ পণ্ডিকা মেথিয়া একটি শুভদিন ঠিক করিয়া দিলেন, স্বর্ণ সেইদিন হইতে দিবাকরকে ঔষধ খাওয়াইতে হুড়ু করিলেন।

স্নান করিয়া আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দিবাকর পূবমুখী হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কপালে ঔষধের বাটিটা একবার হোঁয়াইয়া স্বর্ণময়ী বলিলেন—ভক্তি করে খেয়ে কলে দে বাবা।

দিবাকর ঔষধটা গিলিয়া ফেলিবার সময়ে অনুভব করে যেন গলা হইতে পেট পর্যন্ত একেবারে জ্বিয়া উঠিল।

কয়েক দিন ঔষধ খাইবার পরেই হঠাৎ একদিন এমন জ্বোরে অর চড়িল আর সারা শরীরে এমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হইল যে দিবাকর একেবারে পাগলের মত বকিতে হুড়ু

করিয়া দিল। কাটা-ছাগলের মত ছটফট করিতে থাকিল। পর-পর তিন চারি দিম কাটিয়া গেল, তবুও উপশম হইল না।

স্বর্ণময়ী শুক্রমুখে বিনোদের কাছে গিয়া ঔষধ খাওয়ানোর পরে দিবাকরের যে অবস্থা হইয়াছে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়াই, বিনোদ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল—ওঃ, বলতে ডাহা ভুল হ'রে গিয়েছিল মাসি, এই ঔষধ খাবার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ঠাণ্ডা জিনিষ খেতে হবে, ভদ্রলোক ত বলে দিয়েছিলেন! ঠাণ্ডা জিনিষ মানে ধর এই যেমন—ঘোল, ডাবের জল, মিছরীর পানি...এই সব। আর খালি ঔষধ-খাওয়ার সময়ে নয়, সন্ধ্যাবেলায়ও আর একবার চানু করিতে হবে। ঔষধটা নিশ্চয়ই বড় বদরাগী...

তা একথা আগে বলতে হয়। মাহুকের জীবন নিয়ে খেলা ত নয়! তোর খেয়ালটাই একটু কম বাপু...

বিরক্তির সঙ্গে বিনোদকে তিরস্কার করিয়া আসিয়া স্বর্ণময়ী যথোপযুক্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

দিবাকরের মনের ভিতরে বার-বার জাগিয়া উঠে, একুশে মাখ তার খোকনের অন্নপ্রাশন! ছোট্ট ফুটফুটে সেই কচি মুখখানি দিবাকরের মনের প্রত্যেকটি অঙ্গ-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহ্ন বলিল, খোকন বড়ই ছুটু হইয়াছে। দিবাকরের চোখের সামনে পেন ভাসিয়া উঠে মাধুরী বসিয়া হয়ত চুল বাঁধিতেছে। খোকন কিছুতেই যেন মীরার কোলে থাকিবে না—মায়ের কাছে আসিবেই! মীরা ওর মতলব বুঝিয়া ছপু করিয়া মাটিতে নামাইয়া দিল। হামাঙড়ি দিয়া আগাইয়া আসিয়া পিঠ বাহিয়া বাহিয়া মায়ের কাঁধের উপর হাত দিয়া খোকন দাঁড়াইল। তাহার পরে কতকগুলি চুল মুঠির ভিতরে লইয়া এমনভাবে টানিতেছে যে, ম'ধুরী চীৎকার করিয়া উঠিল—উঃ, কি দস্তি ছেলে মাগো, চুলটাও বাঁধতে দেবেনা! তার পরে যেন মীরাকে অনুন্নয় করিয়া বলিল—লক্ষীটি ওকে একটু নাও—

মীরা বলিল—নিয়েছিলামই ত, তা বাপু কিছুতেই কোলে থাকে বন না—তার পরেই গাল ফুলাইয়া চোখমুখ পাকাইয়া এক ধমক—ও ছুটু খোকন, ফেলবো একেবারে মেয়ে, চল, লীগগীর.....

খোকন হয়ত দিদির গ্রাহও না করিয়া মায়ের কতগুলি চুল নিজের মুখের মধ্যে নির্ঝিকারভাবে পুরিয়া দিল।

পরের দিনকার ডাকে দিবাকর মাধুরীকে একখানা চিঠি লিখিল—

পরম কল্যাণীয়াহু

মাধু, অনেক দিন তোমাদের কোনই খবর জানি না। কত চিঠি লিখি, কিন্তু একখানারও ত উত্তর দিবে না।

কাল রাতে তোমাদের অনেক স্বপ্নে দেখিয়াছি। খোকনের জন্তে মনটা এক সময়ে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। সে কেমন আছে, তাহার সমস্ত কথা আমার জানাইবে কি?

মীরাও কি আমার ভুলিয়া গিয়াছে? আমার কথা সে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে না? তোমার শরীর ভাল আছে ত? সর্বদা সাবধানে থাকিও। লক্ষ্মীটি, চিঠির উত্তর দিতে ভুলিও না। আমার স্নেহাশীষ লও। ইতি দিবাকর।

পনের দিন কাটিয়া গেল। দিবাকর যশোহর হইতে আনা ঔষধের কোন গুণই ফলিতে পারিল না। কিন্তু স্বর্ণময়ী বলিলেন, আগের চাইতে একটু ভালই দেখা যায় যেন রে দেবা। তোর কেমন ঠেকছে?

—কি জানি সন্মোদিত, কিছুই ত বুঝি-চুঝি নে।

—আরও দুটো দিন যেতে দে, দেখাই যাক।...

সহসা স্বর্ণদিদির আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, বলিলেন—হ্যাঁ—পূর্ণ-ঠাকুরকে বলে এলাম একটা সত্যনারায়ণ পূজা করে দিয়ে যাবার জন্তে। অনেক দিন সত্যনারায়ণের পূজা বাড়িতে হয় না, তোরও এই রকম ব্যামো। দেবতার পূজা একটা করে ফেলাই দরকার।

দিবাকর স্বর্ণদিদির কোনো কাজেই বাধা দেয় না।

পূর্ণ-ঠাকুরের নির্দিষ্ট দিনে স্বর্ণ-ঠাকুরাণী পূজার আয়োজন করিয়া কেলিলেন।

পূজা দুই মিনিটেই হইয়া গেল। পূর্ণ-ঠাকুর পাঁচালী পাঠ করিতে শুরু করিলেন।

গণেশ-বন্দনার আরম্ভটা সামান্য একটু বোঝা গেল, তা'র পরে সত্যনারায়ণ-দেবের প্রসাদ অবহেলা কবিবার ফলে সগদাগরের ভিক্ষা নিমজ্জন, কারাবাস, ইত্যাদি অশেষ

দুর্গতির শেষে পুনরায় গভীর বিশ্বাসের সহিত স্তব-স্ততি করিয়া তাহার কৃপায় সমস্ত পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত—এক নিঃশ্বাসেই সমাপ্ত হইয়া গেল। জল-ভরা হাঁকায় তামাক খাইবার সময়ে যেরূপ একটা শব্দ হয়, সেইরূপ একটি শব্দ পূর্ণ-ঠাকুর কিছু ক্ষণ করিয়া গেলেন মাত্র। -এক বাড়িতেই বেশী সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, আরও পাঁচখানা সত্যনারায়ণ পূজা তাঁহাব সেই রাতেই করিতে হইবে।

ভক্তিরে একটি ফুল পূজার স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া স্বর্ণদিদি দিবাকরের কপালে ছোঁয়াইয়া কানে গুঁজিয়া দিলেন। অতঃপর সিন্নি-চটকানো চলিতে থাকিল।

এতকাল পরে এই সত্যনারায়ণ পূজা দেখিয়া দিবাকরের শৈশবের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল।

দিবাকরের পিতা ঠিক পুরোহিত না হইলেও সর্বপ্রকার পূজা-পদ্ধতিই জানিতেন এবং সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা ইত্যাদি অনেক সময়ে তিনি অনেক বাড়িতে করিতেন। তিনি যখন মরিয়া গেলেন, তখন দিবাকরকে মাঝে মাঝে এক-এক বাড়িতে ধরিয়া বসিত, তাহাদের পূজা করিয়া দিতে হইবে। দিবাকর পূজার কিছুই জানিত না, কাজে কাজেই এড়াইয়া বাইত।

কিন্তু কাম্বোজ-পাড়ার হরিদাসই দিত মুন্সিল করিয়া। দাদাঠাকুরের প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস, অসীম শ্রদ্ধা। তিনি মরিয়া গেলে কি হইবে, তাহার পুত্র—সে ছেলোমানুষই হউক আর বাহাই হউক—তাহাকে মিয়া পূজা কবাইয়াই তাহার তৃপ্তি! জোর করিয়া সে দিবাকরকে একবার তাহার ঘরে লক্ষ্মীপূজা কবিয়া দিবার জন্ত লইয়া গেল; আদর করিয়া, যত্ন করিয়া তাহাকে পূজার আসনে বসাইয়া বলিল—তুমি যেমন করে পূজা করবে তাই-তেই আমার পুণ্য হবে ছোটদাদা!

দিবাকর আসনে বসিয়া ঘামিয়া উঠিল। হরিদাসের বড়মেরে কাছে বসিয়া দিবাকরকে সব দেখাইয়া দিল। না-জানা আছে মস্ত, না-জানা আছে কিছু—তবুও তাহাকে ধরিয়া টানাটানি! দিবাকর মনে মনে অত্যন্ত চট্টয়া ফাট-বক অব রিডিং-এব বোড়ার গল্পটা বিড়-বিড় করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুখস্থ বলিয়া লক্ষ্মীর ঘটের উপর ফুল এবং আলোচাল ছিটাইয়া দিল।

পূর্ণ-ঠাকুরকে তাহার নিজের চাটতে বড় বেশী কিছু তফাৎ বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু পূর্ণ-ঠাকুর বাহাই হউক না কেন, সত্যানুসারে দেবকে সে অশ্রদ্ধা করে না; পাঁচালী-পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেলে দিবাকর মাটিতে মাথা রাখিয়া দেবতাব কাছে অন্তরেব একান্ত প্রার্থনা জানাইল—
আমায় হুহু ক'বে দাও ঠাকুর।

কিন্তু দেবতার কানে সে-প্রার্থনা পৌছাইল না। দিবাকরের স্বাস্থ্য ক্রমেই আরও বেশী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নরেশ আর একটি খবর পুনরায় স্বর্ণময়ীর নিকটে লইয়া আসিলেন। খবরটি আর কিছু নয়, কোন একখানি পুস্তকে নাকি এই কাল ব্যাধির সম্বাসী-উক্ত একটি ঔষধের বিবরণ হঠাৎ তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত শুনিয়া স্বর্ণময়ী দিবাকরকে আসিয়া বলিলেন। দিবাকর মনোযোগ দিয়া শুনিল।

স্বর্ণময়ী মন্তব্য করিলেন, বশোরের এই ঔষুধে কিছুই হ'ল না। যখন, তখন নিশ্চিন্তি হয়ে ত আর বস থাকা যায় না, বা হোক আর কিছু দেখতেই হবে। আর এ-ঔষুধটা ত খালি বাসকের পাতার রসেরই ব্যাপার, উপকার না হোক, অপকার কিছুতেই হবে না।

দিবাকরও জুড়িয়া দিল—সব রকম কাশির পক্ষেই ত বাসকের বস ভাল ব'লে শুনেছি। কিন্তু বড় নটখট—

—তা ব'লে এখন আব কি করা যাবে? প্রাণের চাইতে আর কছুই বড় নয়। বিনোদটাকেই লাগিয়ে দেব ভাবছি।

বিনোদ বাড়ির কান্নকন্ঠ কিছু ককক-না-ককক, অপবের বাড়িব এই সব জুজুগে কাছে বড় পটু।

নরেশ বেতপ বলিয়া দিয়াছিলেন, স্বর্ণময়ী বিনোদকে সেইভাবে বুঝাইয়া দেন। বাসকের পাতা লাগিবে এক মণ। সেই পাতা একট মাটির হাড়িতে বোঝাই করিয়া মাটির ভিতরে গর্ত করিয়া বাধিতে হইবে। হাড়ির তলায় থাকিবে একটা ছাঁদা, তার নীচে বসানো থাকিবে একটা পাথুরে বাটি। শেষে হাড়ির মুখ বন্ধ করিয়া গর্তের ভিতরেই হাড়ির চারি পাশে করিতে হইবে আশুন। আশুন নর তাপে পাতা হইতে রস বাহির হইয়া ধেটুকু

বাটিতে পড়িবে, তাহাই হইবে ঔষধ। আশুনও যার তার নয়; করিতে হইবে গোবরের খুঁটের।

স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—পাথুরে ত বিনোদ? একটু কষ্ট ক'বেও তোকে বাবা ক'রতেই হবে, তা না হ'লে আমি যে আর কাউকে ব'লব এমন মানুষও তো দেখছি নে—

বিনোদ উৎসাহের সহিত বলিল—আরে সে-সব কিছু ভেব না মাসি, দ্যাখ না সবই জোগাড় ক'রে নিচ্ছি। এ বাবা বিনোদ হালদার।

একটু পবে মাথা চুলকাইয়া বলিল—কিন্তু—

—কিন্তু কি, ব'লে ফ্যাল বাপু।

—কিন্তু কথা হচ্ছে, এক মণ বাসকের পাতা জোগাড় করাই যে অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে। কোথায় পাব অত বাসকের পাতা? আর অতবড় হাড়িই বা মিলবে কোথেকে?

ভাবিবার বিষয় বটে। এ গ্রামে ত বাসকের গাছ নাইই, এক পাশের গ্রামে ছ-এক বাড়িতে আছে; কিন্তু সমস্ত গাছ মুড়া করিয়া আনিলেও এক মণ হইবে না। আর বাহাদের বাগানে গাছগুলি আছে, তাহারাই বা তা করিতে দিবে কেন? কত সময়ে কত দরকার হইয়া পড়ে!

অগত্যা স্বর্ণময়ী পুনরায় বিনোদকে সঙ্গে করিয়াই নরেশের নিকট উপদেশ লইতে গেলেন। তিন জনে পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির হয়, এক মণ-টন দিয়া আর কাজ নাই, যে-পরিমাণ পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তাহা দিয়াই ঔষধ বানাইতে হইবে।

সমস্তই হইল।

কিন্তু আসল জিনিষ লইয়াই শেষ-পর্যন্ত গোলমাল বাধিল। পাথুরে বাটিটার বাসকের রসের মত কিছুই পড়ে নাই, একটু সাদা জলের মত জমা হইয়াছে।

নরেশ বলিলেন—সাবধান, ওর ভেতর মাটি না পড়ে। শিশিতে পুরে রেখে দাও।

কিন্তু বিনোদ বলিল—এই নাকি তোমার বাসকের রস? আমার বিশ্বাস গরমে পাথর যেমে, বা দেখছো—জমা, হেবেছে।

সঙ্গে-হই ব্যাপার।

খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলিল বিনোদ আর নরেশের

মধ্যে। নরেশ বলিবেই যে ওই তরল পদার্থটা হাড়ির ভিতর হইতেই চুয়াইয়া পড়িয়াছে; বিনোবও বলিতে থাকিবে পাথরের বাট-দামা জল।

দিবাকর খানিক ক্ষণ পরে বলিল—থাক্ গে নরেশ-কাকা, এক কাজ করুন, মিটে যাক্। হাড়ি থেকে পাতাগুলি বেব ক'রে নিংড়ে রস বানিয়ে পাথুরে বাটির এই জিনিষটুকু তাতে ঢেলে মিশিয়ে বোতল ভ'রে বেখে দেওয়া যাক্, রোজ একটু একটু ক'রে খাই। বাস-কের পাতার রসও তো উপকাবীই, তা ছাড়া ওটা নিয়ে যখন একটু সন্দেহই হচ্ছে—এ ব্যবস্থা মন্দ নয়।

অতঃপর তাহাই করা হইল।

দিবাকর সকালে বিকালে দু-বাব করিয়া তিন-চারি দিন খায়, কিছু তার পরই সে রস বোতলের ভিতরে বিশ্রী রকম পচিয়া উঠিল।

একদিন মুখের কাছে লইয়া গন্ধে বসি আসিল। দিবাকর বোতলহুক সব রস চাশিয়া ফেলিয়া দিল।

কিছুই আর ভাল লাগে না, দিবাকর সমস্ত আশাই ছাড়িয়া দিল। হাতের টাকা কয়টিও প্রায় ফুরাইয়া আসিল। দিবাকর আর কুল-কিনারা কবিত্তে পারে না।

প্রত্যহ ডাকের আশায় তাকাইয়া থাকে, মাধুবীর চিঠি আসে না। বে-মাধুবী ছাড়া এই পৃথিবীতে তাহার আর কেহই নাই, সেই মাধুবী তাহাকে এত স্বপ্ন করে! শোকনের অগ্রপ্রাণন—একখানা চিঠি, শুধু একখানা চিঠি ইহাও সে তাহাকে লিখিবে না? মীরও কি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, সেও কি মায়েব কাছে গিয়া তাহাব কথা কখনও জিজ্ঞাসা করে না? করিলে, সে তার কি উত্তর দেয়? তাহার কথা মনে কবিয়া মাধুরীর মনটা কি একবারও একটু কাঁদিয়া ওঠে না।

শীর্ণ হাঁটু দুইটি জোড়া করিয়া তাহার উপরে জরাতুর মাথাটা রাখিয়া দিবাকর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একদিন দ্বোগান্ দুধ দিতে আসিয়া আব্‌তল বলিল—হ্যাঁ দা-ঠাকুর, আমার একটা কথা রাখ না কেনে, এতই ত ক'রলে!

দিবাকর কাশিতে কাশিতে জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা আব্‌তল?

—তোমার ওই কাশির লেগেই বল-বাব চাই।

—কি বল দিকিন্?

—নওপাড়া গেছ কোনোদিন? মধুখালীর বাজার ছাই-ডুই ওই পাশে বে গাঁও?

—ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম, মন প'ড়ছে। কেন বল দেখি?

—নওপাড়ায় এক ভৈরবী মা-ঠাকুবেণ আসেছে। বড় ভারি সাধু। শনি-মঙ্গলবাবে কালীমূর্ত্তি পূজা করেন, পূজার শ্রাঘে তেনাব আদেশ হয়। তখন তিনি তেনার কাছে যাবা গেছে—কি মনে ক'বে গেছে, কার কেরাবাম থাকলে সারবে কিনা—সকল কথাই ব'লে দেন, ওষুধও দেন। কত লোকে নিতাই যাচ্ছে। তা দা-ঠাকুর, এনার কাছে তুমি একবাব গিয়ে ঘুরে আসো না! দৈব ওষুধ তুলিয়া ওষুধ আর কিছু নাই।

দিবাকর দ্বিজ্ঞাসা করিল—অচ্ছা, সেই ভৈরবী মায়েব কাছে গিয়ে কেউ কোনো শস্ত অমুখ থেকে ভাল হ'রে সেরে গেছে এমন তুমি নিজে জান?

দুখেব শূন্ত ভাঁড়টাকে মটিতে উপড় কবিয়া রাখিয়া আবহল বলিল—জানি নে দা-ঠাকুর? সাধে কি অব বলছি? আমারই এক ফুফার সে বা বিপবীত হ'ফানি হয়েছিল, বাচবার ত কথাই না মোট! এক দুই দিনেরও নয়—বিপ বহরের বেগারাম। সেই বেয়াবাম তাব নিদোষ হয়ে সেরে গেল ভৈরবী মায়েব ঠেঁয়ে ওষুধ পেয়ে!

দিবাকর আব্‌তলের কাছে সমস্ত খোঁজখবর জানিয়া রাখে।

স্বর্ণময়ী পাড়ায় কি কান্দে বাহিব হইয়াছিলেন, ফিবিয়া আসিতেই আব্‌তল যাতা ব'লিচ্‌ছে, দিবাকর সমস্ত বলিল। শুনিয়া স্বর্ণময়ী আগ্রহের সহিত বলিলেন—তা'হলে দেবা, তুই আর গিয়ে নওপাড়া থেকে একবার ঘুরে। আব্‌তল ঠিক্‌ কথাই ব'লেছে, দৈব ওষুধেব মত ওষুধ সত্যিই আব্‌তল কিছু নেই।

তার পরে স্বর্ণ-দিদি তাঁহাবও জানা এবং শোনার ভিতরে কয়েকটি কঠিন রোগী দৈব ওষুধ লাভ কবিয়া কেমন করিয়া ভীষণ কঠিন ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি

পাইয়াছিল, তাহার অত্যশ্চর্য্য বিবরণী দিতে আরম্ভ করিলেন। যে লোক ডুবিয়া বাইতেছে, একটি তৃণ পাইলে সে চাপিয়া ধরে, দিবাকর কিছুই অবিশ্বাস কবিল না; কিছুই অস্বীকার করিল না। বলিল—সবই ত বুঝলাম সন্নোদিদি, কিন্তু আসল কথা, সেখানে যাই কেমন করে। পথ তো আট-নয় মাইলের কম হবে না।

কিছু ক্ষণ ভাবিয়া স্বর্ণদিদি বলিলেন—তাতেও আটকাবে না, ডুলীতে করে বাবি।...

নরেশও শুনিয়া বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও সেদিন শুন্লাম বটে—নওপাড়াব সেই ভৈরবীর কথা। যে-সব আশ্চর্য্য কথা তাঁর সম্বন্ধে শুন্লাম, উড়িয়ে দেওয়া যায় না! দিবাকর ওর কাছে গিয়ে ঘুরে আসে, এতে আমরাও মত আছে।

স্বর্ণময়ী দিবাকরের নওপাড়া যাওয়া স্থির করিয়াই ফেলিলেন। রওরা হইবার আগে দিবাকর স্বর্ণদিদির পানের ধূলা গ্রহণ কবিলেন, তাহার মাথার উপরে হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্বাদ কবিতা স্বর্ণময়ী চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

মাঠের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে প্রাচণ্ড রোজ আর ডুলীর অনবরত ঝাঁকানি। নওপাড়া আসিয়া যখন দিবাকর পৌছায়, শরীরের আর তাহাব কিছু অবশিষ্ট নাই। লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা কবিত্তে করিতে আগাইয়া ভৈরবীর ঘরের পার্শ্বে আনিয়া বেহাবারা ডুলী রাখিল।

অন্ত কোন্ এক গ্রাম হইতে আরও একখানা ডুলী আসিয়াছে। ডুলীখানা কাপড় দিয়া ঘেরা, ভিতরে কে আছে দিবাকর বুঝিতে পারিল না। সেই ডুলীখানা ছাড়াও স্ত্রী-পুরুষে আরও দশ-বারো জন লোককে তথায় দেখা গেল। সকলেই হরত ভৈরবীর নিকটে কোনো-না-কোনো প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছে!

কালীর ঘরের দরজা বন্ধ। দিবাকর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ভৈরবী ভিতরে আছেন, সন্ধ্যাব আগে তিনি দরজা খোলেন না।

যাহার সহিত দিবাকরের কথা হইল, সেই লোকটিই অপর ডুলীর সহিত আসিয়াছে। ডুলীর ভিতরে তাহার

ভগ্নী, কোনো একটি শক্ত ব্যাধিতে ভুগিতেছে। ভৈরবী মায়ের যদি কৃপা হয়।

সন্ধ্যার পরে ভৈরবী ঘরের দরজা খুলিলেন। একে একে সমস্ত লোক গিয়া বারান্দার উপরে সারি সারি বসিল। দিবাকরও ধীরে ধীরে গিয়া সকলের সহিত বসিল।

একটি আধা-বয়সী কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোক। পরনে লাল-রঙের ছোপানো কাঁপড়। কপালে একটি প্রকাণ্ড সিন্দূরের ফোঁটা। স্থূলশরীর।

সম্মুখেই মুরগী কালীমূর্ত্তি। মুক্তকেশী, গলায় মুণ্ডমালা, হাতে ধনু, বৃকের উপর দিয়া রুধির বহিয়া বাইতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি ভীষণ। শিবের বৃকের উপর পা রাখিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া ঝাঁড়াইয়া আছেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ভৈরবী কালীমায়ের পূজা করিলেন।

সহসা কিরূপ একটি গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই ভৈরবীর হাত-পা কি রকম কাঁপিতে থাকিল, ক্রমে মাথাটা প্রবল বেগে ঝাঁকাইয়া উঠিল। সকলে তটস্থ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভৈরবী উচ্চারণ করিলেন—বহুদেব মাইতী।

—এই যে মা.....একটি লোক সম্মুখের দিকে আগাইয়া গেল।

দিবাকর লক্ষ্য করিয়া বৃষ্ণিল যে-লোকটির সঙ্গে তাহার কথা হইয়াছিল, সেই।

—বোনের কামো?

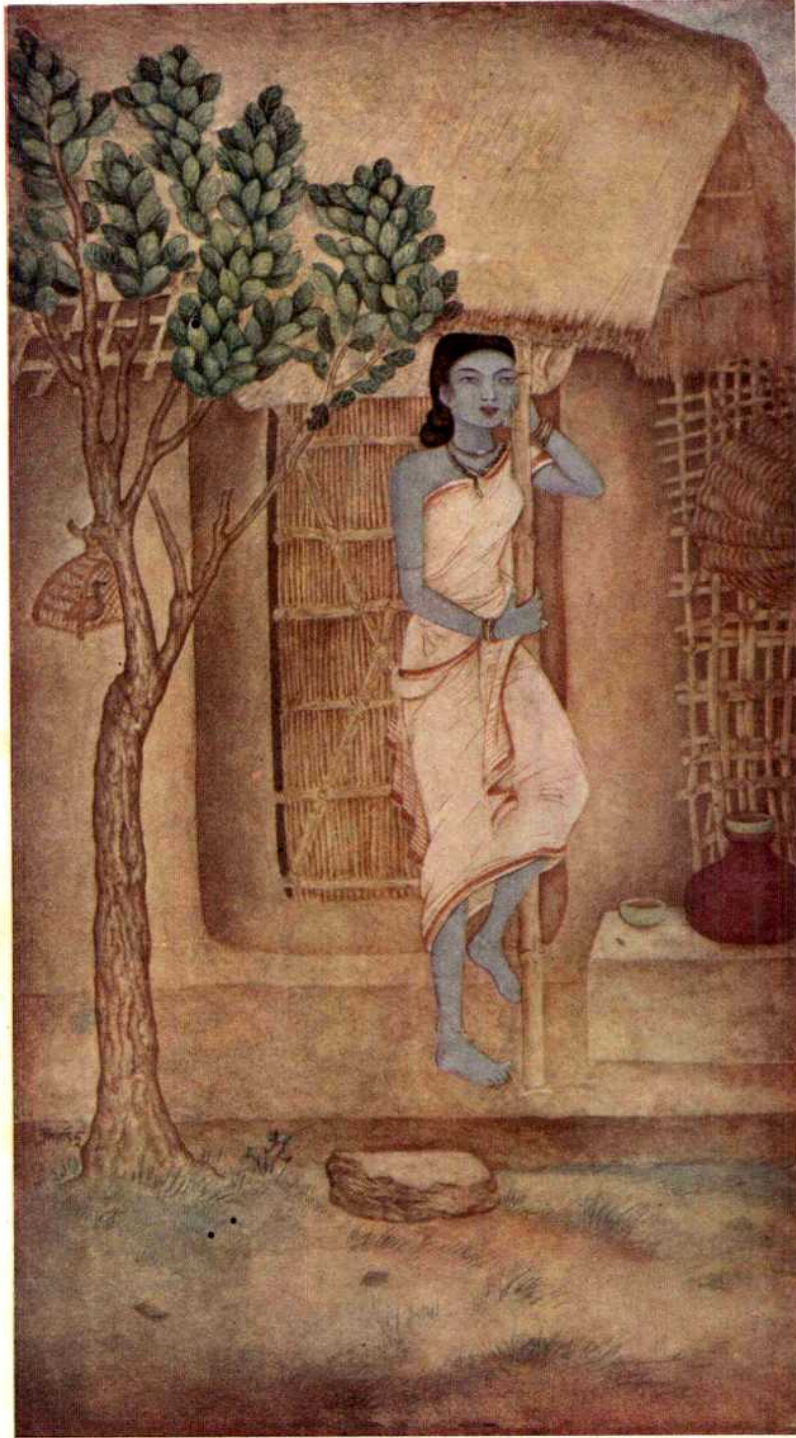
হুই হাত জোড় করিয়া বহুদেব কহিল—হ্যাঁ মা।.....

—হঁ।

ভৈরবী একটু ক্ষণ চুপ কবিতা বসিয়া থাকিলেন। হঠাৎ মাটি হইতে কি একটু কুড়াইয়া বহুদেব হাতে দিয়া বলিলেন, যাঃ—

বহুদেব পরম ভক্তিতরে হাতের মুঠাটি কপালে ঠেকাইল।

এই লোকটির নাম বহুদেব এবং ইহার ভগ্নীর অস্থ, ভৈরবী কেমন করিয়া টের পাইল? দিবাকর একটু বিস্মিত হইয়াই বসিয়া রহিল। পূর্ব হইতেই জানিত-



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নীল বালিকা
শ্রীশরদ্দিং সিংহ

টানিত না কি? সন্দের দোলায় দিবাকর হুলিতে থাকে।

— আরও দু-চারি জনের নাম ভৈরবী উচ্চারণ করিলেন। ব্যাধি-মুক্তির জন্তেই প্রায় সকলেই আসিয়াছে। কেহ বা নিজের জন্ত, কেহ বা পুত্র, কন্তা, স্বামী, স্ত্রী অথবা অথ কোনো আত্মীয়স্বজনের জন্ত। আরও দু-চারি জনকে ভৈরবী ঔষধ দিলেন, কাহাকেও একটি ফুল, কাহাকেও বা একটি বিবপত্র, কাহাকেও বা কালীর বেদীর নীচে হইতে একটু মাটি। কবচ করিয়া ইহাই ধারণ করিতে হইবে, পূর্ন হইতেই সকলে জান।

সহসা গন্তীর কর্তে ভৈরবী ডাকিলেন—দিবাকর চকোবস্তী!

দিবাকরের বকের ভিতরে ধড়াস করিয়া উঠিল, সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটি তীব্র বিদ্রোহ-প্রবাহ চলিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে আড়ষ্ট স্বরে বলিল—মা!

—মিথ্যে এসেছিল, সারবে না। এই মাঘ মাসখান টেনেটেনে.....

* * *

বনমালী বাবু বাসার সম্মুখে এক দল কাঙালী জটলা করিতেছে।

আশপাশে এখানে-ওখানে ছেঁড়া কলার পাতা, ভাঙা মেটে গেলাস, ভাত, ডাল, তরকা-বি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। কয়েকটি কুকুর আসিয়া পাতাগুলি চাটিতেছে।

বনমালী বাবুর নিজের পুত্রসন্তান নাই, একমাত্র কন্তার শিশুপুত্রের অল্পপ্রাশন তিনি ঘটা করিয়াই করিয়াছেন; থরচ মন্দঃ করিলেন না।

ছপুরবেলা শহরের বাবুরা থাইয়া গিয়াছেন, নিমগ্নিতা মহিলার সংখ্যাও নিতান্ত কম হয় নাই। এখন ছঃবী, ভিখারীদিগকে খাওয়ানো চলিতেছে।

সন্ধ্যার আবছা আঁধারে একটি শীর্ণ, কঙ্কালসার লোককে বাসার সম্মুখে কয়েক বার ঘুরিতে দেখা গেল। একবার একপাশে সরিয়া আসিয়া বাসার ভিতরকার একখানি ঘরের দিকে লোকটি কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে, নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

একটি ভিখারী তাহার ছিন্ন বস্ত্র কতকগুলি ভাঁত আর তবকারী বাধিতে বাধিতে আগাইয়া আসিয়া লোকটির কবলিল—বাপু হে, এখানে দেইড়ে থেকে কি হবে, পেটেব গরজ থাকে ত স্নম্কে ঠোঙা হাতে ক'রে দাঁড়াও গে যাও।

কোনো উত্তর না দিয়া লোকটি ভিখারীর মুখের দিকে একবার অর্থশূন্য একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

একঘুম রাত্রে পরে মীরা সহসা বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাধুবী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল রে মীরা, কি হ'ল তোরা...?

মীরা প্রাণপণে মাকে জড়াইয়া ধরির ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে লাগিল।

ওই ঘরে বনমালী বাবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল, তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ধাক্কা মারিতে মারিতে বলিলেন—দোর খোল ত মাধু—

মাধুবী দবজা খুলিয়া দিলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি?... কি হ'ল মীরার—অমন করছে কেন?...?

কোলের ছেলেটাও ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কান্না শুরু করিয়া দিল।

মাধুবী বলিল—কি জানি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এক চীৎকার দিয়ে কেঁদে উঠেছে—

বনমালী বাবু মীরাকে কোলের কাছে টানিয়া অনেক করিয়া অনেক রকম ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মীরার কান্না থামিল বটে, কিন্তু কাঁপুনি আর তাহার যায় না। কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে পাবে না।

অবশেষে কোনো গতিকে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বাহা বলিল : ছারপোকার কামড়ে তাহার ভাল ঘুম আসিতেছিল না। একবার আসে, আবার ভাঙিয়া যাইতে থাকে। হঠাৎ জানালাব দিকে চোখ পড়িতেই দেখে একটা মাহুঘ জানালার ভিতর দিয়া তাহাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে।

মীরার অর্ধেক কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছে, অর্ধেক মুখের ভিতরেই থাকিয়া বাইতেছে। জড়াইয়া জড়াইয়া বাহা বলিতেছে, কাপুনির চোটে তাহাও স্পষ্ট হইতেছে না। বনমালী বাবু বুঝিলেন, মীরা বাই হোক একটা-কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।

লঠন হাতে করিয়া বাহির হইয়া তিনি জানালার ধার, ঘরের আনাচ-কানাচ ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন, কোথাও কিছু নাই।

বলিলেন—হুঃ, মানুষ না হাতী। চল, আমার সঙ্গে, নিজেই দেখি।

কিন্তু মীরা কিছুতেই বাহিরে বাইতে বাস্খী হইল না।

মাধুরী বলিল—স্বপন-টপন দেখেছে নাকি তার ঠিক কি। বনমালী বাবু বলিলেন—তা ত নয়, আমার বিশ্বাস ওই যে আমগাছের পাতাশুদ্ধ ডালটা জানালার সামনে এসে পড়েছে, ঘুমের চোখে ওই দেখেই হয়ত মানুষ ভেবে চোঁচিয়ে উঠেছে।

মীরা তথাপি কাঠের মতন শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী বাবু হাসিয়া বলিলেন—দিদিব আমার কি সাহস! যা যা শুয়ে পড় গে যা!...

পিতা ঘর হইতে চলিয়া গেলে কি ভাবিয়া মাধুরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দুই কোঁটা চোখের জল মুছিল।

কতাকে জিজ্ঞাসা কবিল—কার মত দেখতে রে সে?

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীললিতমোহন কর, কাব্যতীর্থ, এম্-এ, বি-এল

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন বঙ্গ-সাহিত্যের কেন্দ্রস্থানে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নিকট ও দূর হইতে দুই শতাধিক প্রবাসী মাতৃভূমিতে আসিয়া মাতৃভাষার সেবার সুযোগ পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। ষাটাদের প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে এইরূপ বিরাট ব্যাপার সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাদের সময়, সাহায্য ও অর্থব্যয়—উচ্চ মন্দিরের অলঙ্কৃত ভিত্তির মত—সাধারণের অজ্ঞাত হইলেও, প্রগিধান ও সাধুবাদের যোগ্য।

ইহার পূর্ব অধিবেশনে, গোরক্ষপুরে, যখন এই মহা-সম্মেলনের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাকবি অতুলপ্রসাদ তাঁহার শেষ সাহিত্যিক অতুল প্রসাদ বিতরণ করিতে আসিয়া বলিতেছিলেন, “প্রবাসী! চল রে দেশে চল,” তখন ডাঃ হুরেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনকে দেশে লইয়া যাইবাব কল্পনা করিতেছিলেন। এই কল্পনা সত্যো পরিণতও হইল; কিন্তু হায়! সেই মহাপ্রবাসী তখন তাঁহার আকাজিক দেশ হইতে বহুদূরে।

প্রথমে প্রবাসীগণের মধ্যে একটা আশঙ্কা উঠিয়াছিল—প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বঙ্গে গিয়া নিজের নিজস্ব হারাইয়া না ফেলেন। হয়ত একাদশ বর্ষের বালক মাতৃ-ক্রোড় হইতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না; কিংবা হয়ত সম্মেলনের নাম ও রূপ বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু এরূপ কিছুই ঘটে নাই। বরং, সম্মেলনের মূল সভাপতি, শাখা সভাপতি প্রবাস হইতেই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রবাসী সভাপতির অভাবে সাংবাদিকী শাখার অধিবেশন হয় নাই। প্রবন্ধ-পাঠকগণও সকলেই প্রবাসী ছিলেন।

সম্মেলনের এবার মহাসৌভাগ্য যে, যেসকল মনীষীকে ব্যাপ্তিরূপে সভাপতি-পদ পাইলেই ধন্ত মনে করিতেন, তাঁহারা সমষ্টিরূপে ইহার মূলের ও শাখার উদ্বোধনকর্তা রূপে কার্য করিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষিকল্প কবিকে ও বিজ্ঞানতাপস আচার্য্য বহুকে সভায় লাভ করিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখা ফুলে ফলে পূর্ণ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ-গৃহে কর্ণদেব আচার্য্য রায় মূলের উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রবাসে যেখানই

বঙ্গসাহিত্য-সমিতি হউক না কেন, উহা যদি কেন্দ্রস্থানীয় বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষদের অঙ্গীভূত হয়, তাহাতে উভয়েরই সাফল্য ও সার্থকতা। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষদের নিকট এই সম্মান পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। এই অঙ্গাঙ্গিভাবে চিরস্থায়ী হইয়া অশেষ কল্যাণকর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সভার সমারোহ বঙ্গদেশের রাজনগরীর মতই হইয়াছে। কিন্তু তাহাব মধ্যে যে আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই প্রবাসীদিগের বিশিষ্ট সম্পদ। শুনিয়াছি, অভ্যর্থনা-সমিতি যে-সকল প্রাক্তনের নিকট মূল ও শাখার উদ্বোধনের প্রস্তাব লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রবাসিগণের নামে সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলেন। বহুধাকুটুম্বগণের এই স্বজনবাৎসল্য দ্রবণীয় ও অনুকরণীয়। সাহিত্যের আসরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রের অক্ষণালোকে জাগৃতি দিয়া গমনের পর, সভায় শরচ্চন্দ্রের উদয় ও আ-বিদায় আলোকদানে, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ, বঙ্গসাহিত্যের ‘সোনার কাঠি—রূপার কাঠি’র স্পর্শ পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লেডী সবকার ও শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, কুমার ধীবেঙ্গুনারায়ণ রায়, সভ্যচরণ লাহা, নগেন্দ্রনাথ বসু, যামিনীকান্ত রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং আনন্দবাজার সম্প্রদায়, সাংবাদিক-সভ্য প্রভৃতি সহায় ব্যক্তিগণ, প্রবাসী-দিগকে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ও জলে স্থলে জলযোগ দান করিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর ও তাঁহার ছাত্রীগণের গান এবং অপর্ণা দেবীর কীর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজও বাঙালীর নিজস্ব সঙ্গীত বাঙালীর ভাবে গীত হইলে সামাজিকগণের কিরূপ প্রীতির উদ্বেক করে, তাহা শুনি দেখাইয়াছেন।

যে-সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিক সভা উজ্জ্বল করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন প্রবাসী বাঙালীগণ তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। হয়ত তাঁহারা প্রবাস হইতে দেশে উপস্থিত হইয়া আরও অধিকসংখ্যক শ্রুতনামা সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি দেখিলে ও তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার শুভ অবসর পাইলে অধিক আনন্দলাভ করিতেন। অবশ্য কোন সাহিত্যিকেরই পক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য

হইবার বাধা ছিল না—যার অবাবিত ছিল; সদস্য না-হইয়াও সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সহজ ছিল। তবে, “আশার অন্ত নাহিক ঘটে,” এই নীতিবাক্য সর্বদাই স্মর্তব্য।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন যে-কোন প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর বাঁচিয়াছে। এখন ইহাকে কিরূপে দীর্ঘজীবী ও কার্যকরী করা যায় তাহা চিন্তা কবিবাব সময় আসিয়াছে। একপ প্রতিষ্ঠান এই নূতন। বঙ্গদেশে যে কত মহীয়ান—বাংলা ভাষার স্থান যে কত উচ্চ—তাহাব সাধকগণ একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙালীর ও অবাঙালীর বুঝিবার ও বোঝাইবার সময় আসিয়াছে। ভাবতচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, বিজ্ঞেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে বাংলাব জয়গানে দেশকে মুগ্ধ করিয়াছেন—রামেন্দ্রসুন্দর, দীনেশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, হুনীতিকুমার প্রমুখ যে ভাষার প্রতিষ্ঠা স্থাপন ও খ্যাপন করিয়াছেন, তাহা বাঙালীর গৌরবেব ও গর্বেব ও অবাঙালীর প্রশংসা ও অনুকরণের বিষয় হইয়াছে। অনেক অবাঙালী অনুভব করেন যে বাংলা ভাষার মর্যাদা অল্প প্রচলিত ভাষার এখনও আসে নাই। বহুস্থানে এম-এ পবীক্ষায় অল্প ভাষাব অবাস্তব ভাষারূপে পঠনীয় হওয়ায় বাংলা ভাষার ব্যাপকতা অনেক বাড়িয়াছে। বিহাবে ও কাশী-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাব অধ্যাপনা হয়। সংযুক্ত-প্রদেশে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে ইহাকে বি-এ পবীক্ষার পাঠ্য করা হয়। ম্যাট্রিক, আই-এ ও এম-এ পরীক্ষায় ইহা পবিগণিত হইয়াছে। প্রবাসে বঙ্গভাষার জয়যাত্রায় দেশবাসিগণের সহকাবিতা, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

নিরভিমাণে বাংলার সকল সাহিত্যিকই, রাহিত্য না দিয়া, সাহিত্য দান করুন, ইহাই প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আকাঙ্ক্ষিত। এ বৎসরের অভ্যর্থনা-সমিতি যে “বিবরণ-পঞ্জী” সভাস্থলে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিগত একাদশ বর্ষের অধিবেশনের উল্লেখ আছে। ইহাতে দেখা যায় যে প্রবাসে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ বাঙালীগণ সাগ্রহে এই সম্মেলনকে আহ্বান করিয়া নিজ নিজ কর্মভূমিতে হু-তিন দিনের অল্পও মাতৃভাষার সার্বজনীন সেবায় আত্মনিয়োগ

কবিরাছেন। তাঁহাদের কৃত কার্যের কৃতকার্যতা নির্ভর কবিতোক্ত প্রত্যেক ভবিষ্যৎ অধিবেশনের উপর। এই ষাটশ অধিবেশনটি পূর্ববর্তী একাদশ অধিবেশনের সার্থকতা দান করিয়াছে। আগামী ত্রয়োদশ অধিবেশন এই ষাটশটির সার্থকতা দিবে। বিগত বারোটি অধিবেশন প্রমাণ করিয়াছে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন বাংলার বাহিরের ও অন্তরব। কাণ্ড শক্তিমান থাকিলেই শাখা-প্রশাখাও শক্তিমান হয়। মাতৃভূমির সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন মূলস্বরূপ থাকিয়া প্রকৃতির যে বস ও প্রাণশক্তি আহরণ করিয়া কাণ্ডের ভিতর দিয়া শাখা-প্রশাখায় প্রেরণ করিবেন তাহাতেই নিকট ও দূরের প্রশাখা পল্লবে, ফুলে, ফলে শোভিত হইবে।

প্রবাসে বিশেষরূপে অল্পকৃত একটি বাস্তবিক অল্পবিধার কথা উল্লেখ কবিয়া তাহার নিরাকরণের উপায় জিজ্ঞাসা কবিতোক্ত। প্রবাস হইতে সাহিত্যিকগণের আমন্ত্রণকালে, তাঁহাদের সকলের নাম ও ধাম সংগ্রহ করা অতি কঠিন হইয়া উঠে। তাহার ফলে অনিচ্ছাকৃত আংশিকমাত্র ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ ঘটিয়া থাকে। ইহার সংশোধনে কিরূপ সূত্রপাত হইতে পারে? যদি বঙ্গদেশে একটি সাধারণ সাহিত্যিক কেন্দ্র পরিগণিত হয় এবং তাহাতে সকল সাহিত্যিক অন্তর্ভুক্ত হন—যথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—তাহা হইলে এক স্থান হইতেই এই সমস্ত পাওয়া যায়, অথবা উদ্ভ্রমাদে জল ঢালিলে তাহা যেমন সর্বাঙ্গে পড়ে সেইরূপ কেন্দ্রে আমন্ত্রণ পাঠাইলে উহা সর্বত্র পৌঁছিতে পারে। তাহা বর্তমান দিন না-হইবে তত দিন সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় সাধারণ ভাবে আমন্ত্রণ পাঠানই সকলের নিকট নিবেদন জানাইবার একমাত্র উপায়রূপে অবলম্বিত হওয়া ছাড়া গতাস্বব নাই।

প্রবাসিগণের ভাবাসেবার একটা দিক এবারকার সম্মেলনে প্রস্ফুট হইয়াছিল। মূল সভাপতি ও বৃহত্তর-বঙ্গ-প্রাধিকার সভাপতি বাংলার বাহিরে ব্যবহৃত শব্দ হইতে কয়েকটি বাংলা শব্দের আগতি, বাংলা প্রথা সহিত অত্র প্রদেশের প্রথার তুলনা ও পরস্পরের ভাষাগত আদান-প্রদানের সংবাদ দিয়া দেখাইয়াছেন যে বাংলা ভাষা, অত্র প্রদেশে প্রচলিত—শুধু পুস্তকগত নয়—জীবিত ভাষার সহিত কিরূপ সম্পৃক্ত তাহা অল্পসঙ্কানের যোগ্য। যে-সকল নিকট বা দূর প্রদেশে প্রবাসী বাঙালী আছেন, তাঁহারা যদি সেই

সেই প্রদেশের ভাষার সহিত বাংলা ভাষার, ভাবে বা প্রথার তুলনামূলক আলোচনার সামগ্রী পান, তাহা সংগৃহীত হইলে বাংলা ভাষার শব্দও সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া প্রচুর পুষ্টি হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কল্পিত বাংলার প্রতি দ্বৈতার ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়নের মত, ভাবতবর্ষের প্রতি প্রদেশের সহিত বাংলার সাদৃশ্যমূলক গবেষণা সমভাবে উপকারী হইবে।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের একটি স্থায়ী পরিচালক সমিতি আছে। নিত্যকার্যের ভার এই সমিতির উপর স্তব্ধ আছে। বার্ষিক অধিবেশন নৈমিত্তিক ব্যাপার। নীরব কর্মী ডাঃ স্বরেন্দ্রনাথ সেন ঐ পরিচালক-সমিতির সভাপতি। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রবাসের বিভিন্ন স্থানের বাঙালীগণের সংখ্যা ও পরিচয় সংগৃহীত হইতেছে।

ষাটশ বর্ষের মধ্যে প্রবাসীকে জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়, নহিলে না কি তাহার দেশের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছাদিত ঘটে। প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন সে কর্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন। যুগে যুগে সম্মেলন গৃহে ঘাইবেন, এবং একাদশ বৎসর দেশবাসিগণ প্রবাসে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন এরূপ হইলে বঙ্গ ও প্রবাসের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। যে সম্মেলনে প্রবাসী বাঙালীর ও বঙ্গের বাঙালীর সাহিত্য বা একযোগে ঘটে তাহাতেই “প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন”ের সার্থকতা।

বাঁহারা প্রয়োজনান্বিত আয়োজনে, আমন্ত্রণে ও আতিথেয়, তত্ত্বাবধানে ও সাহিত্যদানে, উৎসাহনে ও সঞ্চোধনে, অভিভাষণে ও ভাষণে, ছন্দে ও প্রবন্ধে, গানে ও কীর্তনে প্রবাসীদিগকে ধন্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধুর স্মৃতি প্রবাসী বাঙালীগণের চিত্তে চিরজাগরুত্ব থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রণমুন্দর চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধিগণের স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনলস কর্মী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় কখনও সম্মুখে ও কখনও অন্তরালে থাকিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় পুত্রের ঘোর অসুস্থতা সত্ত্বেও আহাতিদির সুব্যবস্থার ক্রটি করেন নাই। ভয়স্বাহ্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বতর্কণ পারিয়াছেন প্রতিনিধিনিবাসে আসিয়া দেখাওনা করিয়াছেন। প্রবীণ

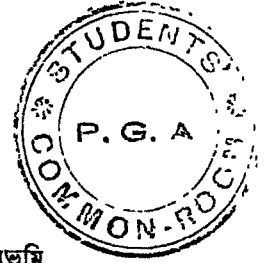
জলধব সেন মহাশয় প্রতিকক্ষে নিত্য আসিয়া এবং সভার প্রতি কার্যে ও সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিনিধিগণকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। শুভ যহ্নাথ সরকার পুরস্কার থাকিয়া তাঁহাদিগকে বিভিন্ন আমন্ত্রণস্থলে যাতায়াতের সতর্ক সঙ্গী ছিলেন। এইরূপে রায় ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বল্পনেব স্বাচ্ছন্দ্যে আশ্রয়নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্থ।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টের অধিনায়কত্বে সুকুমার বালক হইতে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতিনিধিগণের অক্লান্ত ও পর্যাংস্ত

সেবা করিয়াছেন। অভিজ্ঞ কর্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের কন্যা কুমারী উমা ঘোষ মহিলা-প্রতিনিধিগণের জন্ত সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন। প্রতিনিধি-নিবাসের বৃহৎ প্রাসাদে চাবি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল না, অথচ পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিবর্গ নিঃশঙ্ক চিত্তে জিনিষপত্র ফেলিয়া রাখিয়া যাইতেন ও ফিরিয়া আসিয়া সকল বস্তুই স্থানে পাইতেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের একুপ সতর্কতা ও সকল আমোদ-প্রমোদে যোগদানে প্রলোভনভাগ প্রশংসাই ও স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের কর্মকুশলতার নিদর্শন।

সাবিত্রী

শ্রীঅমরেশ রায়



অক্ষম নিষ্ফল মৃত্যু হ'তে মোরে রক্ষা কর
হে সাবিত্রি,—তব পুণ্য প্রেম-শিখা ধর,
দুঃখ মোব জীবনের লক্ষ্যহারা শূন্য অন্ধকারে
বেধা পলে পলে কোন তৃপ্তিহীন বেদনার ভারে
বিলুপ্তির ভয়তলে মিশে যাই চিররাজিদিন
পরম ব্যর্থতা ল'য়ে অগোরবে—পরিচয়হীন!
এস সেখা,—আনো তব দৃষ্ট শুভব্রত,
মৃত্যু মোর কর প্রাতিহত;
নূতন জীবন কর দান
মোরে কর উজ্জীবিত পূর্ণ সত্যবান।

যেখায় গহন বনতলে
নামহারা, রাক্ষসহারা, একাকী বিফলে
ভ্রমিত হেলায়,
স্পন্দিত পল্লব আলো-ছায়ার খেলায়;
আত্মবিস্তৃতির মাঝে
ফিবিহু মলিন দীন সাজে।
একদিন সেখায় সহসা
পড়ুক তোমার জ্যোতি, যেন কোন স্বর্ণ হ'তে ধরা;

জাগারে আঁধার বনভূমি
দাঁড়াইবে তুমি,
জানিবে আমার নাম, কহিবে আমার পরিচয়,
ঘুচিবে সকল গ্লানি জীবনের সর্ব-পরাজয়!
সে দিন জাগিবে মোর হিয়া।
তার পর, হে সাবিত্রি,—যাবে কি ফিরিয়া
আপন প্রাসাদ মাঝে;—হর্ম্যা-বাতায়নে
বিচিত্র খচিত রত্নাসনে
বসিবে নীরবে
বাজিবে পূরবী তান সন্ধ্যার উৎসবে!
হেথা বনতলে
চিত্ত মোর ব্যথা-দীর্ণ ব্যাকুল উছলে,
উৎকর্ষ অধীর,
ব্যগ্র আঁধি বিদ্ধ করে গহন তিমির;—
সর্ব দেহে-মনে কোন থর-অগ্নি করেছি বরণ,
মুহুর্তে মুহুর্তে সহি জাগ্রত মরণ!
তবে এস স্বরা,
হে সাবিত্রি, হও স্নেহধরা।
তার পর দিনে দিনে তিলে তিলে মোরে করহ উদ্ধার;
বিশ্বের গোরব মাঝে ফিরে দাও মোর অধিকার।



আলোচনা



“কোনটি চান?”

শ্রীশচীন সেন রায়

শ্রীযুক্ত বোম্বেশচন্দ্র রায় বিদ্যালয়বিধি মহাশয়ের “কোনটি চান?” নামক হৃৎকপির্পূর্ণ প্রবন্ধের প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ মহোদয় “কলিকাতা ও মক্কেলের কলেজসমূহের তুলনা” শীর্ষক প্রবন্ধে যে-সমস্ত তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাবই সমালোচনা প্রসঙ্গে হই-একটি কথা বলা আবশ্যিক মনে করি।

প্রথমতঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় নব্বিরধরপ জুতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলর হরাওয়ার্ড সাহেবের বক্তৃতা হইতে একটি অংশ তুলিয়া লিখিয়াছেন যে মক্কেল কলেজে গুণী শিক্ষক নাই যত আছেন কলিকাতায়। কথাটির সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও না-হয় তাহার পাণ্ডিত্যে আস্থা হ্রাসন করা গেল। তাই বলিয়া একথা মোটেই স্বীকার্য নয় যে কলিকাতার গুণী অধ্যাপকগণ ছাত্রদের নিকট আপনাদের বিদ্যাবস্তার সম্পূর্ণ সম্ব্যবহার করেন—কারণ বাহিরে ছেলে পড়ান এবং অন্তর্ভুক্ত কার্যে তাহাদের অনেকেই বেশীর ভাগ সময় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজেদের অধ্যাপনা করিবার শক্তির ব্যত্যয় ঘটান—কলে হুহুমনে বক্তৃতা দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে মক্কেল শহরের আবহাওয়া সাধারণতঃ জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি ও তাহার তৃপ্তির পক্ষে অসুবিধাজনক এবং কলিকাতার গ্রন্থালা, পাঠশালা, সভা-সম্মেলনে ছাত্রগণ প্রতিদিন নিত্যান্ত হবোধ বালকের মত যোগদান করিয়া নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু ইম্পারিয়্যাল লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ইত্যাদিতে যত ছাত্র যায় তাহার সহিত সিনেমা হাউস, খেলার মাঠ, ও থিয়েটার দর্শক ছাত্রদের সংখ্যা তুলনা করিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় আপনাদের যুক্তির সারবস্তা বুঝিতে পারিবেন। ইম্পারিয়্যাল লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম ইত্যাদি সং-প্রতিষ্ঠানে যে নিত্যন্ত নগণ্য-সংখ্যক ছাত্র যোগদান করে ইহা আমরা খুব ভালভাবেই জানি, আর আমাদের সত্য ঘটনার সহিতই কারবার করিতে হইবে। এক্ষেত্রে একটি উপমা দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাহাকেও যদি প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করা যায় যে সে কত বই পড়িয়াছে আর সে যদি উত্তর দেয় যে তাহার বাড়িতে এক লক্ষ বই আছে, তবে যে তাহাকে হস্তান্তর হইতে হয় ইহা সকলেই জানেন। শ্রীযুক্ত অনিল বাবু তাহার প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন যে মক্কেলে অধ্যাপকচক্রের বাহিরে এমন লোক খুব কমই থাকেন বাহাদের সংস্পর্শে, উপদেশে ও সাহায্যে মানসিক উন্নতি লাভ সম্ভবপর হয়। এ স্থলে তাহার নিকট আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে কলিকাতার ছাত্রগণের মধ্যে কয় জন অধ্যাপকচক্রের সহিতই ব-জ্ঞানালোচনা করে?

তৃতীয়তঃ, বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে মক্কেল কলেজে অনেক স্থলে অনাসের ব্যবহার এবং ভালরকম বস্ত্রাধিনা থাকার অনেক ছেলে কলিকাতায় যায়। আমরা জানি ভাল ছেলেরাই অনাস লয়। কাজেই মক্কেলে ভাল ছাত্র কদাচিৎ থাকে। সুতরাং অল্পবিদ্যান ছাত্র লইয়া কারবার করিয়াও যে মক্কেল কলেজ কলিকাতার অনেক কলেজ হইতে ভাল ফল করে ইহাতে কি তথাকার অধ্যাপকগণের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না?

বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় হেতমপুৰ প্রভৃতি কয়েকটি কলেজকে অপরূপ কলেজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে অধিবেশনার কার্য করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকল্পে বাঙ্গালা-সরকারের “Fifth quinquennial Report on the Progress of Education” হইতে কলিকাতার ও তথাকথিত উৎকৃষ্ট মক্কেল কলেজ ও হেতমপুৰ কলেজ হইতে শতকরা কত ছাত্র আই-এ ও বি-এ পরীক্ষায় ১৯৩২ সনে উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

আই-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ

বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ

কলেজ	শতকরা	শতকরা
হেতমপুৰ	৫৭.১	৬৮.৭
হুগলী	৫০.৫	৬৭.৫
রাজশাহী	৪৮.৫	৫১.৬
মহম্মদসিংহ	৩৪.৬	৬১.৬
বরিশাল	৪৮.৭	৬৮.৩
ফেরী	৪৫.৫	
মেদিনীপুর	৫৫	
কলিকাতা	৫৫.৫	
শ্রীহরীপুর	৫০	
সেন্টপলস	৪৭.১	
কুমিল্লা	৫৩.২	
বঙ্গবাসী	৪৪.৮	৪৭.১
সিটি	৪৩.৬	৪২.২
রিপন	৫৫.৫	৪৫.৬
আন্তর্য্যাপ	৫২.৪	৬১.৫
বিদ্যাসাগর	৪৭.৭	৪৫.৩
সংস্কৃত		৬২.৫

এ বিষয়ে আর কোন চিহ্ন ছাপা হইবে না। প্রবাসীর সম্পাদক।

“বিক্রমপুর—একালে ও সেকালে”

শ্রীকুমুদলাল গাঙ্গোপাধ্যায়

গত কালক্রমে সালের ‘প্রবাসী’তে আড়িল গল্পীমণ্ডলের দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত রমাশ্রদ্ধ চন্দ্র মহাশয়ের অভিভাষণ বাহির হইয়াছে। তাহার পরিশিষ্টের একাংশে চন্দ্র-মহাশয় লিখিয়াছেন—“আমি করিয়াছিলাম গত ১৫ বৎসর বাবৎ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের টেউ যে-ভাবে পরীক্ষামাত্র আন্দোলিত করিয়াছে, তাহার কলে পরীক্ষার ভুলোকেদের অন্ততঃ দলদলি তুলিয়া একবোলে কাজ করিতে অন্ততঃ হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, লোকশিক্ষার হিসাবে বিক্রমপুরের এই অংশে আন্দোলন নিষ্ফল হইয়াছে। গ্রাম্য দলদলির কলেও বোধ হয় অনেক হতভাগ্য যুবকের পরকাল নষ্ট হইতেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কাহাকে বিবাস করিতে পারিতেছে না; কে যে বক্তৃতা কে যে গুপ্তচর (spy) তাহা চেনা বাইতেছে না। কথার বলে

‘আঁধার ঘরে সাপ, হুতরাং সকল ঘরেই সাপ’। এইরূপ সংশয়াস্ক্রম হইয়া বিক্রমপুরের পল্লীবাসী দ্বিগুণ ভয়লোকগণ অতিকষ্টে দিনবাপন করিতেছেন।” চন্দ্র মহাশয় গত ১৫ বৎসরের রাষ্ট্রীয় আলোচনের

কালে পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা দলাদলি জুলিয়া একযোগে কাজ করিতে অসম্মত হইয়া বহু প্রকাশ করিয়াছেন। একজন্ত আসিয়াও দুঃখিত। কিন্তু এই দোষটা কি কেবল পল্লীগ্রামেই দৃষ্ট হয়? (রমাগ্রাম বাবু বলেন নাই বা ইঙ্গিতও করেন নাই, যে, ইহা কেবল পল্লীগ্রামেই দৃষ্ট হয়।—প্রবাসীর সম্পাদক।) শহরে—যেখানে পল্লীবাসীদের চেয়ে শিক্ষাদাক্ষ্য অধিক অগ্রসর লোকের বাস, সেখানেও কি এই দলাদলি আদৌ নাই? কংগ্রেস, কনকরেস, কর্পোরেশন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সভাসমিতি পর্য্যন্ত এই মতানৈক্য এবং দলাদলির চিহ্ন হৃদয়স্থিত বিস্তারিত। চন্দ্র-মহাশয় নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না এবং গত ১৫ বৎসরের রাষ্ট্রীয় আলোচনের কালে শহরের লোকেরা যদি একযোগে কাজ করিতে অসম্মত না হইয়া থাকে, তবে শুধু পল্লীবাসীদের বাড়ি এ ঘোষ চাপাইলে চলিবে কেন? পল্লী যে শহরের আশ্রয়ই অনুকরণ করে। আর এই জন্তই যদি লোকশিক্ষা হিসাবে বিক্রমপুরের এই অংশে আলোচন নিষ্ফল হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, তবে এই কারণেই কি শহরে তাহা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে? (রমাগ্রাম বাবু ইহাও বলেন নাই বা ইঙ্গিত করেন নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।) বর্তমান আলোচনের কালে দেশের অল্পসংখ্য লোকের চেয়ে একালের লোকের মধ্যে যদি সংসাহস, কর্তব্যব্রতা, নির্ভীকতা এবং স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায় তবে বিক্রমপুরের এই অংশের লোকের মধ্যেও যে এই সব গুণের অসম্ভাব্য নাই তাহা লেখক মহাশয় যদি তাঁহার বিবরণ অবসরের মধ্যেও কষ্ট করিয়া একটু অনুসন্ধান করিতেন, তবে আশা করা যায় তিনি এতটা দুঃখিত হইতেন না। প্রায় দলাদলির ফলে তিনি বহু যুবকের পরকাল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তিনি নিশ্চয়ই “অন্তর্যামে” আবদ্ধ যুবকদিগের এবং বাহ্যিকের উপর পুলিশের নজর আছে, তাহাদিগকে উদ্বেগ করিয়া এই কথা লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত শহরে এবং পল্লীগ্রামে উক্ত প্রকার যুবকের সংখ্যা যে প্রচুর তাহা অবশ্যই প্রবীণ লেখক মহাশয় অবগত আছেন। সর্ব্বত্রই কি এই দলাদলির অনিবার্য কারণে এই সকল যুবকের এই অবস্থা ঘটয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন? যদি তাহা না-হয়, তবে এখানেই বা তাহা হইবে কেন? গম্ভীরমেন্ট কি একারে গোয়েন্দা দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সকল যুবককে অন্তর্যামে আবদ্ধ অথবা পুলিশের নজরবন্দী করেন, তাহা সাধারণ পল্লীবাসীদের ধারণারও অতীত।

বাহাদুরের সারসংক্ষেপে লেখক মহাশয় যত্নপূর্ণ পল্লীগ্রামে গুণাগুণন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রশংসায় তাহার অক্ষয় লেখনী সার্থক হউক, ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি যদি এই প্রসঙ্গে অবাস্তব কথা অবতারণা করেন, তবে তাহা একান্তই দুঃখের বিষয় হয়।

“বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র”

শ্রীবিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কালিদাসের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত বাবু সনৎকুমার সিংহ বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্রে প্রশ্নগুলি ইংরেজীতে করা হয় বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। আপত্তির প্রধান কারণ ‘বঙ্গভাষা এখন কিয়ৎ পরিমাণে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প ভাষারও পরীক্ষা হয়, ‘সে-সব ভাষার মধ্যে সবগুলি না হউক অনেকগুলিই “তিরং পরিমাণে সমৃদ্ধিশালিনী” সে-সব ভাষার প্রশ্নপত্রও সেই সেই ভাষায় লেখা হউক বলেন নাই। বিশেষ সংস্কৃতিতে প্রশ্নগুলি সংস্কৃতিতে করা হউক ও উত্তরগুলি দেখানারীতে লেখা হউক, তাহাও বলেন নাই।

ইংলও, ফ্রান্স ও জার্মানিতে সেই সেই দেশের ভাষা ছাড়া অল্প ভাষার প্রশ্নপত্র সেই সেই দেশের ভাষাতেই হইবার সম্ভাবনা।

ইংরেজী রাজভাষা, বর্তমান কালে ভারতবর্ষের lingua franca, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব লেখা-পড়া, কাজকর্ম ইংরেজীতে হয়। ইংরেজীর সঙ্গে কন্নাসা বা জার্মান ভাষার তুলনার অর্থ বুঝা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব প্রশ্নই ইংরেজীতে হওয়া ঠিক বলিয়া মনে হয়।

“বাকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা”

শ্রীযুক্ত লকিশোর চট্টোপাধ্যায়

কালিদাসের ‘প্রবাসী’তে মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ‘বাকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা’ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বাকুড়াবাসীর মধ্যে কাহার মনে না আনন্দ হয়? বাস্তবিকই বাকুড়া প্রত্নতত্ত্বভবন-অনুষ্ঠানের একটি কেন্দ্র হওয়া বিনেব আবশ্যক। কত শত অমূল্য গ্রন্থ ও পুঁথি যে বাকুড়া হইতে শিল্প দেখে স্থানান্তরিত হইয়াছে, বাকুড়ার কত পুরাতন শিলামূর্তি যে বিভিন্ন জেলার সম্পদ বুদ্ধি করিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া বিশ্বচাঞ্চল্য হইতে হয়। এতদিন যে বাকুড়াবাসী উপেক্ষা করিয়া কাল কাটাইয়াছেন সেজন্ত তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এখনও সময় আছে। এখনও বাকুড়া জেলার অধিবাসী ও প্রবাসী সকলকেই বাকুড়ার সারস্বত-সমাজকে কেন্দ্র করিয়া পুরাকৃতি-রক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় যে প্রত্নতত্ত্বভবন-অনুষ্ঠানে অনুবোধক হইয়া এ অমূল্য প্রস্তাব দিয়াছেন তাহার জন্ত বাকুড়াবাসী সকলেই কৃতজ্ঞ। বাকুড়াই স্বদেশহিতৈষী দানশীল এমন অনেক ধনী অধিবাসী আছেন যাহারা উক্ত প্রস্তাব সত ২৫০০০০ অনুরোধেই দান করিয়া অক্ষয় কাঁটি স্থাপন করিতে পারেন।

ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই বাকুড়ার অধিবাসী ধনী প্রবাসী হইয়া বাস করিতেছেন। তাহাদেরও এ শুভচেষ্টায় বোগদান করা অবশ্যকর্তব্য।

নিশীথে ডাকিল কে !

শ্রীমমিয়কুমার ঘোষ

কথাটা বীণাও শুনিল।

দয়াল রান্নাঘরের পৈঠার উপর পা তুলিয়া বলিতেছিল—
জানলে খুড়ী আজ রাইগড়ের হারান কববেজের ওখানে
গেছলুম। ওষুধ আনলুম। ওষুধ ত খাওয়ানো হচ্ছে
কিন্তু মেয়েটা সারুছে না কেন কে জানে! মেয়েটার চেহারা
যা হয়েছে খুড়ী জানলে? ঠিক এমনি, পাট-কাঠি মত—

দয়াল তাহার হাতের একটি আঙুল উঁচু করিয়া
দেখাইল। তাহার পর বলিতে আরম্ভ করিল—সেই যে
গো সেবার আশ্বিন মাসে বিষ্টি আরম্ভ হ'ল! মেয়েটা
কিছুতেই শুন্নে না—জলে ভিজ্জে ভিজ্জে ঘাটে গা ধুতে
যেত রোজ দুটি বেলা। তার পর সেই যে জবে ধরলো
আর ছাড়ছে না।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে মোক্ষদা দেবী দয়ালকে কি
যেন বলিলেন। কিন্তু বীণা তাহাতে কান দিল না। সে
আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। ঘরে
আসিয়া শুকুনো কাপড়গুলি আঙুলে কবিয়া কোঁচাইতে
কোঁচাইতে বাহিরের দিকে তাকাইল।

...জানালাটি খোলা। জানালার গভীর পারেই বিষ্টদের
উঠান। উঠানে প্রথমেই ধানব মরাইটা তাহাদের দৃষ্টি
আকর্ষণ করে। তাহাব পব একটু দূরে একটি নারিকেল
গাছ দেখা যায়। বাতাসে তাহার পাতা দুটা একটু কাঁক
হইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায়,—হা বেশ স্পষ্টই দেখিতে
পাওয়া যায়, বিমলাদের চিলের-ছাদ। এখান হইতে
বিমলা তাহাকে রোজ ছপরে ইসারা করিত না? ঠিক!
বীণার ঠিক মনে পড়িল—ছপুববেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ
হইয়া গেলে পর শাওড়ী বলিতেন—‘যাও বউমা যাও
এইবেলা একটু গড়িয়ে নাও গে যাও। যাগো যে
রোদ র! মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে!’...বীণা ঘরে ঢুকিয়া
চুপি চুপি দরজা বন্ধ করিয়া দিত। তাহার পর ছাদের
উপর হইতে বিমলা ইসারা করিলে বীণা প্রস্তুত হইয়া

থাকিত। কিছু ক্ষণ পরে বিমলা আসিয়া আস্তে আস্তে
ঘরেব শিকল নাড়িত। সে চুপি চুপি দরজা খুলিয়া তাহার
সহিত বাহির হইয়া যাইত।—ছপুববেলা পাড়ার পথ
নির্জন। তাহারা দুই বন্ধুত্ব খিড়কী পার হইয়া ‘কচে’
পুকুরের পাড়ে যেখানে একটা সন্নিহা গাছ ঝড়ে নুইয়া
পড়িয়াছে সেইখানে গিয়া বসিত। তার পর ছ-জনা কত
কথা—

বীণার এখনও মনে পড়ে...

হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোত্রে বাধা পড়িল। বিনয় স্নান
করিয়া আসিয়া বলিল—ওগো একখানা কাপড় দাও ত!

বীণা স্বামীকে কাপড় দিয়া ঘর হইতে বাহির
হইয়া গেল।

বেলা হইয়া গিয়াছিল। কিছু ক্ষণ পরে বিনয়
আসিয়া ধাইয়া গেল। তাহার পর সরকারদের অনেকে।
তাহার পর মেয়েরা ধাইয়া লইল। ছপুববেলা বীণার
নিরবচ্ছিন্ন অবকাশটুকু যেন ফুরাইতে চাহে না। সে
আস্তে আস্তে ছাদে চলিয়া গেল। ছাদের আলিসার পাশ
হইতে দূবে অনেক দূব দেখা যায়। রোজে চুল মেলিয়া
দিয়া সে দেখিতে লাগিল চাষারা বিলের ধারে পাট
কাটিতেছে। এখান হইতে শব্দ শোনা যাইতেছে ধপ্...
ধপ্...ধপ্... ভাজের রোজে একটুতেই মাথা ঘুরিয়া যায়।
বীণা একটু ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ছপুববেলা সমস্ত
বাড়িটা নির্জন, নিস্তব্ধ। তাহার মনটা কেমন শূন্য
হইয়া পড়ে। বিমলার কথা মনে পড়িত। কিন্তু রাণু
আসিয়া অল্প কথা পাড়িল।

রাণু বীণার ছোট ননদিনী। বীণা তাহাকে একটা
কাজে পাঠাইয়াছিল।

রাণু বলিল—দিয়ে এসেছি বৌদিদি। দাদা বললে—
আচ্ছা আচ্ছা আমার মনে আছে, তুই এখন যা!

কথাটা শুনিয়া বীণার মনে হইল তাহার এইরূপ

করা উচিত হয় নাই। হয়ত বৈঠকখানা-ঘরে নবুদেব বলিতেছে—গত সনের একটা মাস মাপ ক'বে দাও দাদামণি! খামাবেব যা হ'ল! এবাব থেকে আদু খেয়ে থাকব। আর তোমার ধানের চাষ নয়!

বিনয় হাসিয়া বলিতেছে—সে সব জ্ঞানি না। বড়ের দামটা ও'তই কটান গেল।

সরকার-মশাই কানকোঁড় খতিয়ানে কলমের ধোঁচায় কসি টানিতেছেন। থস্ থস্ শব্দ হইতেছে। এমন সময় রাগু গিয়া চিঠিখানি দিল। চিঠিখানি দেখিয়া বিনয়ের কান লাল হইয়া উঠিল। সরকার-মশাই একবার চশমা বাক্সে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া লইলেন। ছিঃ! ছিঃ! বীণার লজ্জা করিতে লাগিল। সরকার-মশাই বুড়ো মানুষ, বিনয়কে এ বাড়িতে হইতে দেখিয়াছে, আর তাহারই কাছে...

রোজ্ঞ এবার বেজায় চড়া হইয়া পড়িয়াছে। ছাদে আর বসিয়া থাকা যায় না। রাগু চলিয়া গিয়াছে।... বীণা ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। আপনার ঘবে আসিয়া আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি লইয়া আলমারী খুলিল। আলমারীর ভিতর তাহার কাপড়-চোপড়গুলি গোছানই ছিল তবুও তাহার মন উঠে না। সেগুলি আবার নামাইয়া গোছাইতে লাগিল। হঠাৎ একখানি কাপড়ের ভাঁজের ভিতর তাকাইয়া—‘বঃ, কাপড়খানা বং লেগে একদম গেছে...কি ক'রে ল'গল?’—বীণা ত'ড়াতাড়ি কাপড়ের ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল। ভাঁজ খুলিয়া ফেলিতেই তাহার ভিতর হইতে ফস্ করিয়া একটি সিন্দূর কোটা বাহির হইয়া পড়িল। কাপড়ের ভিতর সিন্দূর পড়িয়া গিয়া লাল হইয়া গিয়াছে! বীণা দুহাতে কোটাটি তুলিয়া লইল। বিস্ময় ওকি? স্পষ্ট বাহিরে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। হাঁ, ঠিক তাহারই কণ্ঠস্বর বটে। বীণা চোখ বুজিয়া ফেলিল। সে এমনি করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবে। ঐ যে সে ঠিক শুনিতে পাইল—

‘রাঙাদিদি খোকার মা,

আমি না এলে যেয়ো না!’

বীণা বেশ চাপিয়া চোখ বুজিয়া ফেলিল। বিমলা আসিয়া না তাহার চোখ টিপিয়া ধরিলে সে খুলিবে না।

একদিনের কথা তাহার মনে পড়িল। উঃ, সেদিন বা বীণা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। তাহার এখনও মনে আছে। দুপূর্ববেলা দালানে কেহ নাই। রান্নাঘরে বড় পিসিমা নারিকেল পাতা আর পাকাটি পোড়াইয়া রান্না করিতেছেন। তাহার একটা তীব্র গন্ধ আসিতেছে। একলা দালানে বসিয়া থাকিয়া বীণার কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। দালানের একদিকে বহু চাল-বোঝাই বস্তা পর্কত-আকাব সাজান ছিল। হঠাৎ তাহার মন হইল কে যেন তাহার ভিতর হইতে নড়িয়া উঠিল। ভয় তাহার আকর্ষণ শুকাইয়া গেল। একবার ভাবিল দৌড়াইয়া রান্নাঘরে পলাইবে। কিন্তু সে অনেকখানি পথ। দরদালান পাব হইয়া রান্নাঘরে দৌড়াইয়া পলাইবার সাহস তাহার ছিল না। তবে আড়ষ্ট হইয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া ছিল এমন সময় আবার—

রাঙাদিদি খোকার মা,

আমি না এলে যেয়ো না!

তখন বীণা বুঝিতে পাবিল। ‘উঃ, বিমলা এমনি ক'রে ভয় দেখাতে হয়!’ আজও ভাবিল সে আসিয়াছে। কিন্তু আজ সে চোখ বুজিয়া থাকিবে। সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। সে স্পষ্ট বিমলার আঙুলের স্পর্শ পাইল। সে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। বীণা দুই হাতে তাহার হাত দুখানি ধরিল। হাত ধরিয়া সে বিস্মিত হইল—একি বিমলা, তোর নবম হাত দুখানা একি হয়েছে! ইস্!

বিমলা বলিল—জানিস্ না বুঝি সেই যে তোর বাবার অমুখ করতে কলমি ডঙা গেলি। তাব পব যে জর ধরুল আর কিছুতেই সারল না। কত সালসা, কত পাঁচন খেলা'ম, সব বুথা গেল। তুই বুঝি আর কোন খবর রাখিস নে?

বীণা উত্তরে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। সত্যি বিমলাকে চিনিবার জো নাই! কি চেহ'রা ছিল তাহার—কি হইয়াছে! চুলগুলি উজ্জ্বল, মুখখানি মলিন। রোগে মানুষকে দু-দিনেই এতখানি বদলাইয়া ফেলে! বীণার মনে ভাবী দুঃখ হইল। বিমলা তাহার কত আপন ছিল। শুগুরবাড়ি আসিয়া সে এক জন সমবাধী বন্ধু পাইয়াছিল বটে, কিন্তু অমুখ করিয়া সে যেন কত দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে আব দেখিতে পায় না। তাহার

বড় একলা-একলা ঠেকে। মিশিবার মত বীণার এখানে আর কেহ নাই।...

...শান্তী ডাকিতেছিলেন—বউমা! ওমা এ কি মেয়ে তুমি! এই অবৈলায় ভুঁয়ে শুয়ে থাকে বাছা? উঠে পড়, উঠে পড়!

ধড়মড় করিয়া বীণা উঠিয়া বসিল। কিন্তু কোথায় বিমলা, কোথায় কে! বীণা আলমারীরুদ্ধ কাপড় বিছাইয়া মেঝের আঁচল বিছাইয়া কখন শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অলক্ষ্যে কখন বেলা বহিয়া গিয়াছে। দূরে নাবিকেল-বনের মাথার উপর বেলাশেষের বৌদ্ধ কাঁপিতেছে। বীণা লজ্জায় পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সে কাপড় গুছাইতে লাগিল। শান্তী বলিয়া গেলেন—দেখ মা, অমন অবৈলায় আব ঘুমিও নি। অবৈলায় ঘুমলে গা ভারী করে!

* * * *

হাঙ্ক সে দিন আসিয়াছিল।

উঠানে দাঁড়াইয়া সে বলিতেছিল—আমি আবার তেমনি সেহ্না ছেলে খুঁজি! আমি আব সেদিন সারারাত ঘুমুলাম না। ভেগে বসে রইলুম। তোমার বউমা আমাকে শোনালে। জানলার কাছকে এসে তিনবার কুকুলে ‘হাঙ্ক! হাঙ্ক! হাঙ্ক!!’ আমি কোন জবাব দিই না। তার পর আব এক পোয়র বাদে একবার, তার পর আবার, এটা কি ভাল কাজ হচ্ছে খুঁজি। দয়ালদাব এটা করা সম্ভব হইল? তুমি বল খুঁজি।

মোক্ষদা বলিলেন—সত্যি হাঙ্ক, দয়ালের এ কাজ ভাল হচ্ছে না। মেয়েব অস্থখ, ডাক্তার বন্দি দেখাও। তা নয় এ সব আবার কি! তুকফুক আমি দেখতে পারি নে বাপু।

হাঙ্ক আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল—তা জান না বুঝি খুঁজি, হারান কবরেজ যে এলে দিয়েছে? বলেছে বাঁচবে না। তাই কোথা থেকে এক সাধু বাবাকে এনেছে। খুব তুকফুক হচ্ছে। হুম বাগ হচ্ছে।

তাহার পর কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস-ফিস করিয়া বাছা বলিল তাহার মর্মার্থ এই :—

রাত্রি দশটার পর সাধুবাবা হোমে বসেন। হোম শেষ করিয়া তিন প্রহরের সময় একটি ডাবেব মুখ কাটিয়া জল

বাহির করিয়া শুকনো ডাবটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া যান। তাহার পর নিজের সুবিধামাফিক কাহারও বাড়ির সম্মুখে গিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন। যদি সে সাড়া দিয়া ফেলে ত, তখনই শুকনো ডাবের ভিতর জলের তরঙ্গ ফুটিয়া উঠিবে। সেই জল রোগীকে খাওয়াইবে। কিন্তু বাহার নাম ডাকা হইল সে সেই বোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিয়া মরিবে।

কথাটা শুনিয়া মোক্ষদা দেবী অবাক হইয়া গেলেন। তাহারই বাড়ির পাশে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক জন হইয়া দয়াল এ কি আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। ধবে বসিয়া মুহু শরীবে সবাইকে প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে হইবে, এ কি অস্তায় কথা।

কথাটা ক্রমশঃ অনেকের নিকট বাই হইয়া পড়িল। মোক্ষদা সেদিন বীণাকে ডাকিয়া বলিলেন—বৌমা, আজ থেকে আর তোমার ঘাটে গিয়ে কাজ নেই; নব্বে বালুতি ক’রে জল তুলে এনে দেবে, তাতেই চান ক’রো—

বীণা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কেন মা, কি হয়েছে?

তিনি বলিলেন—না মা দিন-কাল ভাল নয়। ডামা-ডোলের দিন—বাতাস খারাপ। হাঙ্কর বউকে বাতাস লেগেছে, আজ দু-দিন সে হাত-পা ঝিঁচে পড়ে আছে। মুখে জল দিচ্ছে না—দাঁতে কুটো কাটছে না, সে এক কাণ্ড!

বীণা অবাক হইয়া গেল। ‘বাতাস লেগেছে!’ যে বাতাস পাতায় পাতায় করুণ মর্ম্মর তোলে, হেনার শাখে দোলন দেয়, যে বাতাস ভুবন ভরিয়া ছড়াইয়া আছে, সেই বাতাস মানুষের মনের ভিতর অলক্ষ্যে আবাব কি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে!

বীণার উপর মোক্ষদা দেবীর নজর আছে।

তিনি বধূর সম্বন্ধে বিশেষ কারণে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বীণার ছেলেবেলা হইতে কি এক বদ স্বভাব সে ঘুমাইতে ঘুমাইতে অনেক সময় চলিয়া বেড়ায়। কখন কখন আবার ঘুমাইতে ঘুমাইতে ‘উঃ’ করিয়া সাড়া দিয়া উঠিয়া বসে। যেন কে তাহাকে ডাকিয়াছে। বিনয় তাহাকে হু-একবার ধরিয়া কেলিয়াছিল। একদিন বেশ মনে পড়ে রাত্রিবেলা কে যেন ধড়াস করিয়া দবজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে উঠিয়া দেখিল তাহার পাশে বধু নাই! তাহাব ঘোব সম্মুখে হইল। তখন বাহিরে গিয়া দেখে ছাদের সিঁড়িটির দরজা খোলা। তাহার ভিতর হইতে শুভ্র জ্যোৎস্নাবানিকটা আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি সে ছাদে উঠিয়া পড়িয়া দেখিল বীণা চোখ বুজিয়া ছাদে আলিসার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে।...আব একদিনের ঘটনা মোক্ষদা দেবী বিনয়কে শুনাইয়াছিলেন—গভীর রাত্রে তিনি দরজা খুলিয়া বাহিরে বাইতেছিলেন, হঠাৎ দেখেন দরজার পাশে বধু এক গ্রাস জল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

—ওমা, বউমা তুমি এত রাত্তিরে দাঁড়িয়ে?

বীণাব স্বপনের আমেজ ভাঙিয়া গেল। সে বলিল—
তুমি বে-জল চাইলে মা খানিক আগে, তাই জল নিয়ে এলাম।

তিনি অবাক হইয়া গেলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপনের মধ্যে হয়ত তাহাব মনে হইয়াছে শান্ততী জল চাহিয়াছেন, তাই জল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশ্চর্য!

এই সমস্ত কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া একদিন মোক্ষদা-দেবী পুত্র বিনয়কে বলিলেন—ওরে সজাগ হও শুস; বউ যেন রাত্তিরে কান্নকে সাড়া দিয়ে ফেলে না।

বিনয় বলিল—কই মা, আজকাল ত আর সে রকম কবে না। সে অস্থখ সেরে গেছে।

তিনি বলিলেন—সেরে বাক আবার ধরতে কতক্ষণ! গুনিস নি বুঝি আবার কি হয়েছে। তোকে বলতে ভুলে গেছি। দয়ালদের বাড়ির পূর্ব দিকের ঐ তেমাতাটা দিয়ে আর হাটস নে। আজ সকালে গয়লা আসে নি, হারুকে ডাকতে বাচ্ছিলুম গাই ছুয়ে দেবার জন্যে—দেখি তেমাতার ওপব খেজুর-গাছটার গায়ে কে একটা ঘট বেধে রেখে গেছে।

বিনয় শুনিয়া বলিল—তাই না কি! আমারও সেদিন নজর পড়েছিল। দয়ালদার বাড়ির পাশ দিয়ে বাচ্ছিলুম, দেখি রাত্তার মাঝখানে কে খানিকটা চুল খুতখুড়ি দিয়ে ফেলে রেখে গেছে। তখন আমি গিয়ে দয়ালদাকে ডাকলুম। সাড়া পেলুম না তাই, তা না হ'লে সেদিনই একচোট হ'য়ে যেত। মেয়ের অস্থখ, ডাক্তার-বদ্যি দেখাও, তা নয়। তুচ্ছক আবার কি!

মোক্ষদা ইসারা করিলেন—বীণা আসিতেছে, গুনিতে পাইবে। কাজেই বিনয় অন্ত কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

আশ্বিন মাস পড়িয়া গেল। পূজা এবার মাসের মাঝেই। বোধন বসিয়াছে। পটুয়ারা বোজ ছপুববেলা উৎসাহের সহিত ঠাকুর গাড়িতেছে। নিস্তরু ঠাকুর-দালানটি প্রাণ-প্রাচুর্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট বহু ছেলে-মেয়ে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। দালানের এক পাশে বহু কাদা ভিজান হইয়াছে। এক জন কাদা ঠেসিয়া মাখিতেছে। আজ হইতে কাঠামোর গায়ে কাদা দেওয়া হইবে।

বীণার আজকাল অবকাশ কম। ছপুববেলা পটুয়াদের থাইবাব সময় তাহাকে দাঁড়াইয়া তদ্বির করিতে হয়। সকাল-বেলা জনেরা মাঠে থাইবাব পূর্বে উঠানে আসিয়া বসে। তাহাদের সবাইকাব কৌচড়ে মুড়ি ঢালিয়া দিতে হইবে। মাঠে বসিয়া বিশ্রামের সময় তাহারা থাইবে—সে কাজেব ভারও বীণার উপর। কাজেই সাবা নিবসেব মধ্যে বীণার অবকাশ অত্যন্ত অল্পই।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর হইতেই হঠাৎ সেদিন বৃষ্টি আসিল। বীণার কাজ সারিয়া আসিয়া শুইতে, যে রাত্রি হইল, পাড়ার পক্ষে তাহাকে ভারী রাত্রিই বলিতে হইবে। ঘরে আসিয়া বীণা দেখিল বিনয় পরিশ্রান্ত হইয়া বেঘোবে ঘুমাইতেছে। চারি দিক নিস্তরু। শুধু বা জলপড়াব ছড় ছড় শব্দ হইতেছে। এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। জানালাগুলো তাহার ধাক্কার মাঝে মাঝে হুমহুম করিয়া উঠিতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার গোয়াল হইতে গরুগুলো ডাকিয়া উঠিতেছে। বীণা বেশ গুনিতে পাইল। তাহাব পর সে কুলঙ্গীতে প্রদীপটির সলিতা টানিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে তাহার মনে হইল কে বেন তাহার দরজা ঠেলিয়া ডাকিতেছে। আন্তে আন্তে উঠিয়া সে দরজা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু কাহাকেও ত দেখিতে পাইল না। দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছিল এমন সময় আবার সেই

‘বাঙাদিদি খোকার মা

আমি না এলে যেয়ো না—’

বীণা অবাক হইয়া গেল। আবার সেই হান্তময়ী বিমলা আসিল কি করিয়া! তার ত আর সে রূপ নাই।

আবার পূর্বের শ্রী কিরিয়া পাইয়াছে; বীণা তাহাকে চিনিতেই পারে নাই। না চিনিবারই কথা।

বিমলা হাসিয়া বলিল—এত রাতে দেখে অবাক হয়ে গেছিস না বীণা? কিন্তু কি ক'বে দিনের বেলা আসবো বল? জানিস না বুঝি আমার আজকাল ভোদের বাড়ি আসা বন্ধ—রাতিরে মুকিয়ে—

বিমলার অস্থখ সারিয়া গিয়াছে অথচ তাহাকে আসিতে দেওয়া হয় না! এইবার বীণা সমস্ত বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল এই কারণেই সে বধন শান্তীকে বিমলার কথা জিজ্ঞাসা করিত তখনই তিনি নয় সে-কথা উল্টাইয়া দিতেন আর নয় বলিতেন—যাক্ গে মা ওসব কথা! তুমি ঘরের বউ—ঘরের কথা বল! পরের কথা কান্না কি আমাদের।...শান্তী উপর দারুণ বিতৃষ্ণায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। বিমলা বলিল—চল্ বউ, এক জায়গায় যাবি?...বীণা বলিল—যাব? এত রাত্রে আবার কোথায় যাব?...বিমলা বলিল—চল্ চিলমারীর জলার ধারে বর্ষায় রাশি রাশি কেয়াফুল ফুটে আছে। নিয়ে আসি গে যাই।

‘কেয়াফুল’! পৃথিবীর মধ্যে বীণার নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রিয় বস্তু এই কেয়াফুল। বিমলা পূর্বে তাহাকে কত এই কেয়াফুল আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু চিলমারীর জলা যে এখান হইতে বহুদূর। সেখানে কি এই দারুণ বর্ষায় নিশীথ রাত্রে যাওয়া যায়? কিন্তু দমিয়া বিমলা ছাড়িল না। সে তাহাকে জোর করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। ঘর ছাড়াইয়া, গম্বী পার হইয়া তাহাবা পথে আসিয়া নামিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। দারুণ বৃষ্টির মুখ কুলবধু আর সে বেশবাস রহিল না; বোমটা তাহার খসিয়া পড়িল—অঙ্গের বসন লুটাইতে লাগিল। ভীষের ফলার মত ভীষণ বৃষ্টির বিন্দুগুলি তাহার সুকোমল অঙ্গটি বিন্দু করিতে লাগিল। কিন্তু কি এক অজানা নেশার ঘোরে সে ছুটিতে লাগিল। বিমলা বলিল—‘বউ পাচ্ছিস না গন্ধ! ঐ যে কেমন জন্মের কেয়ার গন্ধ আসছে!’ সত্যি বীণার মনে হইতে লাগিল দূর-দূরান্ত হইতে মাঠ পার হইয়া যাতাল কেয়াগন্ধের বস্তা আসিতেছে। কি সুন্দর সে গন্ধ। বীণার প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। কিন্তু অনভ্যস্ত পদক্ষেপে

আর কত ক্ষণ সে ছুটিতে পাবিবে? বার-বার সে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কোথায় রে! আর কত দূর? বিমলা বলিল—‘ঐ বে জল দেখা যাচ্ছে, ঐ ত জলা!’ কিন্তু বীণা কিছুতেই দেখিতে পাইল না। বিমলা তাহাকে ভীম-বলে টানিয়া লইয়া চলিল। সে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল।... শেষে সত্য সত্যি তাহাব সম্মুখে কেয়াবন আসিয়া দাঁড়াইল। হাজার হাজার কেয়াফুল ফুটিয়া আছে। সস্ত বর্ষায় স্নাত হইয়া তাহার আকুল গন্ধ বিকীর্ণ করিতে ছ। পাগলের স্তায় বীণা বনের ভিতর নামিয়া পড়িল। কাদায় তাহাব পা ডুবিয়া গেল। কাঁটায় তাহার অঙ্গ কাটিয়া ছড়িয়া রক্ত-রক্ত হইয়া উঠিল। তবুও সে আরও ঘন বনের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। কিসের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে যেন! হঠাৎ তাহাব পায়ে কট্ করিয়া কি যেন কামড়াইয়া দিল। ভীত যাতনায় কাতর হইয়া সে ডাকিয়া উঠিল—‘বিমলা, ও বিমলা! দেখ্ ত কি কামড়াল’ কিন্তু কোথায় বিমলা! সে চারি দিকে কোথাও বিমলাকে দেখিতে পাইল না। সে বহুক্ষণ মিলাইয়া গিয়াছে। এমনিতর অসহায় অবস্থায় পড়িয়া সে ভয়ানক ভয় খাইয়া গেল। কেয়াবনের পাশেই জলার কালো জল। বর্ষার আকাশের তলায় যেন তাহা আরও কালো মনে হইতেছিল। সেই দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল বুঝি বর্ষায় জলার জল লক্ষ জিহবা বাড়াইয়া, প্রবল বস্তায় তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! ভয়ে, দংশনের অসহ বস্তায় সে কাতর হইতে লাগিল। নিস্তব্ধ রাত্রে, বিদ্রন জলার তটটিতে তাহার আকুল কান্না ক্রমশঃ নীবব হইয়া আসিতে লাগিল।

* * * *

সেই বাত্রেব শেষে...

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। কাহাবা হারিকেন হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি বাইতেছিল। একটা ঝোপের কাছে আসিয়া তাহার দাঁড়াইল। ঝোপের ভিতর হইতে ঠক্ ঠক্ শব্দ আসিতেছে। এক জন বালুতেছে—‘সরল দেখে কাট হে, নইল ক'খে লাগবে—’ আর এক জন কি বলিল ঠিক বোঝা গেল না।

গঠন-হাতে লোকগুলিকে দেখিয়া তাহাদেব মধ্যে

এক জন বলিল—‘কেও—কে যায়?’ ‘আমবা—’ ‘ও বীণু দা, এত রাতে?’ ‘দরকার আছে—তোমবা এখানে কেন?’ ‘আজ দয়ালদার মেয়েটি মারা গেল কি না—বিমলা গো—!’

কথাটা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। দূরে মার্চের দিক হইতে কে তাহাকে আলো নাড়িয়া সঙ্কেত করিতেছিল। সে সেইদিকে গিয়া পড়িলেন নব্নে তাহাকে বলিল—‘পাওয়া’ গেছে দাদাবাবু জ্বলার ধারে—’

বিনয় তাড়াতাড়ি জ্বলার দিকে চলিল—সেখানে পৌছিয়া সে দেখিল হারু কেরাবনের ধারে জ্বলের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। বিনয় আসিয়াই জ্বলের ভিতর

ন.মিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু ঝপ্ করিয়া হারু তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, নেম না! এবার দশহারায় মা’র পূজো দাও নি। দেখতে পাচ্ছ না, জ্বলের ভেতর কি?

বিনয় একবার জ্বলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর হাতে তুড়ি দিতেই সেটি মিলাইয়া গেল। সে ঝপ্ করিয়া জ্বলে নামিয়া বীণাকে টানিয়া তুলিয়া আনিল।

সে সঙ্গে আর লাভণ্য নাই। বিষের ক্রিয়ায় অঙ্গ নীল-বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিকে তাকাইয়া বিনয় বলিল—বা হারু, শিগ্গীর রতন-ওঝার বাড়ি যা। বাড়ি চিনিস ত? তাড়াতাড়ি আসবি। দেবি করিস নি যেন!

হারু ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

ভারতে নিম্নজাতি-সমস্যা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ-ডি

ষট্টিবর্ষ পূর্বে বড় দুঃখে কবি লিখিয়াছিলেন :—

হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সমুখে ঠাঁড়াবে রেখে তবু কোলে দাঁও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

তখন প্রায় কেহ কবির এই খেদোক্তিতে সাড়া দেয় নাই। তার পর যখন ভারত বহু বড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া আসিয়া আপনার অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিল, তখন কেহ কেহ এই নিম্নজাতি-সমস্যা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে-চেতনাও ক্ষীণ, একান্ত বিদ্যনা হইলে সে-চেতনা জাগে না। অথচ এই সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের মুক্তি সুদূরপরাহত।

ভাবতবর্ষ সমাজে উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, আচরণীয়-অনাচরণীয় লইয়া বিচার যে অহুদারতার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, তাহা একান্ত শোচনীয় বিষয়। এই বিচারের

ভিত্তিতে বে-সামাজিক কুপ্রথাখর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা ত নহেই, হিন্দুশাস্ত্রের নিত্যসিদ্ধ বিধিও নহে। অথচ এই নিম্নজাতি তথা পাতিত্য আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে, উহার প্রাণবাতী পীড়নে সামাজিক জীবন পঙ্গু ও ক্লিষ্ট হইয়াছেই, উহার সহজ গতিবেগ একেবারে শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; তাই পাশ্চাত্য দেশের এক জন মনীষী ভাবতবর্ষের মানুষকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জীব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন—homo dissidens, সে শুধু আপনাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতেই ব্যস্ত—বর্তমান হিন্দুসমাজে বিভেদনীতি এতই প্রবল। সমস্যাটি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই একটি কথা বলিলেই বুঝা যাইবে যে, ভারতের অধাধিক সংখ্যার হিন্দু অস্পৃশ্য বলিয়া তথাকথিত উচ্চজাতি হিন্দু নিকট গণ্য হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে, সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারায় স্তরবিভাগ অবশ্যজ্ঞাবী। রাষ্ট্র ও সভ্যতা গঠনের একটা প্রধান উপকরণ জেতা ও বিজিত জাতির

বৈষম্য। আর এই বৈষম্য যে ভারতবর্ষের অতীত যুগের ইতিহাসের জাতি-বিভাগের মূল তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবাগত শুক্রবর্ণ আৰ্য্য ও আদিম কৃষ্ণবর্ণ অনাৰ্য্যের বিরোধই আহাৰ বিহার ও বোন সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইউরোপীয় জগতে রাষ্ট্রকণ বুদ্ধ-বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে বলিয়া সেখানে জেতা জাতি বিজিত সমাজ হইতে চিরকালই আপনাকে বিচ্ছিন্ন বাধিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগেব 'শিভালারি'র (chivalry) উৎপত্তি এইখানে। আমেরিকাব প্রজাতন্ত্রেও আজ পর্য্যন্ত অভিজাতবর্গ ও জনসাধারণের বৈষম্য সমান অক্ষুর রহিয়াছে। সেখানে নিগ্রোদিগের প্রতি নির্ধম সামাজিক নিগ্রহ প্রজা-তন্ত্রের একটি ছুরপনের কলঙ্ক। জার্মেনীতে মধ্যযুগে সামরিক শ্রেণী, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কৃষকের বে ভেদবিভাগ ছিল, তাহা এমন একটা অসামঞ্জস্য সমাজে জাগাইয়া বাধিয়াছে, যাহার ফলে শ্রমিক-বিপ্লবের ইতিহাসে জার্মেনীতে কাল'মার্কসেব এত প্রভাব হইয়াছিল। শ্রেণীচৈতন্য সেখানে ইউরোপের অন্য দেশের বহু পূর্বে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং আজও তাহা পাশ্চাত্য দেশের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত বাধিয়াছে। আর রুশিয়া দেশে এই অসামঞ্জস্য এমনই অদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহার ফলে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হইল। রুশিয়ার এই বিপ্লব এখনও শান্ত হয় নাই, সামাজিক অসামঞ্জস্য দূর হইয়া তির্যকে আবার নূতন সমাজ-বিত্যাস দেখা দিবে তাহার নিরূপণ করিবার এখনও উপায় নাই। সমগ্র ইউরোপখণ্ডেই এখন ভাঙাগড়াব পালা চলিয়াছে, ব্যবসায়ী ও ধনী প্রভৃতির পরিবর্তে শ্রমজীবী প্রভৃতি ইউরোপের সমাজভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছে।

ভারতবর্ষ ও চীনদেশেব অতীত ইতিহাসে সামাজিক স্তরবিভাগ বুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা তত অধিক নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাই বুদ্ধের জীতদাস গ্রীস ও রোমের ত্রায় ভারতের সমাজে তত পরিচিত নহে। পরিবার, কুল, জাতি ও শ্রেণীর প্রসার ও সমবায়ে প্রাচ্য সভ্যতার রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ বলিয়া ভারতে আব এক প্রকাব শ্রেণী-বিভাগ জন্মলাভ করিয়াছে। কৰ্ম্ম, ক্রিয়া ও ব্যবসায় হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ সেই কারণেই ভারতের আদিম বর্ণবিভাগের সহিত

মিশ্রিত হইয়াছে এবং চিরাচরিত শান্তিপূর্ণ কৃষিবৃত্তির অন-
গীলনের ফলে এক দিকে যেমন শাস্ত্রবক্তা ব্রাহ্মণ জাতিব
অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুর রহিয়াছিল, অপর দিকে তেমন
অগণ্য অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতিব সৃষ্টি হইয়াছিল;
ইহারাই কৃষিকর্ম্মের নিম্নস্তরের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে,
যথা চামার, নগঃশূদ্র, জালিক, ভূঁইয়ালী, ঝেঁড়, পুলিয়া,
নাহার প্রভৃতি। চীনদেশে আমাদের ব্রাহ্মণ জাতির ত্রায়
নাগরীণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতবর্ষেব মত
সেখানে সমাজ এত শতধাবিশিষ্ট নহে, সেখানে বিবাহ-বিচার
নাই, অন্ন-বিচার নাই, সামাজিক নির্ধাতন নাই। চীনদেশে
যে-কেহ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া মাণ্ডারীনের পর্যায়ে উন্নীত
হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণত্বলাভেব অনুকূপ
অধিকার বহুকাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান কালে অন্ন-
বিচার ও স্পর্শ-বিচারের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনেক সময়ে বে কল্প
অযৌক্তিকতার প্রশ্রয় দিতেছে, যদি এখন তাহা ভাবিয়া না
দেখা যায়, তাহা হইলে এদেশে সভ্য, ত্রায় ও প্রেম আর
অক্ষুর থাকিবে কিনা সন্দেহ।

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও লজ্জাজনক বিষয় ভারতের
পাতিত্যা-প্রথা। নিম্নশ্রেণীর যে অন্তঃটি ও অসভ্যতা,
ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে নিন্দা ও ঘৃণাব মূল কাবণ,
তাহা অপরিহার্য্যভাবে এদেশে থাকিয়া গিয়াছে। বাংলা
দেশে এই পাতিত্যা-প্রথার বন্ধন নানা কারণে কতকটা শিথিল
হইলেও মাস্তাজ ও রাজপুতানা প্রদেশে সে-বন্ধন বিশেষ-
রপেই কঠোর বহিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে, বিশেষতঃ মালা-
বারে, ইহা কি নিদারুণ সামাজিক নিগ্রহের কারণ হইয়াছে-
তাহা বহু লেখক অতি কল্পণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—সে
কর্না পাঠ করিয়া কোন্ হিন্দু লজ্জায় ও বেদনার মন্তক
অবনত না করিবেন?

অথচ এই তথাকথিত নিম্ন ও পতিত জাতিব মধ্যে
ভারতবর্ষেব অধিকাংশ লোকই অন্তর্ভুক্ত; তাহাবাই
সমাজের মূলভিত্তি। জাতির এত বড় একটা অংশকে
চিরকাল পঙ্গু করিয়া রাখা সমাজের পক্ষে কিরূপ আত্মঘাতী
বাণাব তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার কিরূপ নিদারুণ
নিষমর ফল হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই
সকল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকই সামাজিক নির্ধাতনে

পীড়িত ও অতিষ্ঠ হইয়া ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজকে হীনবীৰ্য্য করিয়া দিতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের নিম্ন-শ্রেণীর লোকের প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহারের ইহা অপেক্ষা ভীত নিন্দাবাদ আব কি হইতে পারে।

ভারতের তথাকথিত নিম্নজাতিরা নানা প্রকার অসুবিধা ও সামাজিক বাধার মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে; তাহারা শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ পায় না, তাহাদের নৈতিক উন্নতিবিধানের সুবিধা অল্প, তাহাদের রাজনীতিক ক্ষমতা সঙ্গীর্ণ, তাহারা সামাজিক বিধানে পঙ্গু এবং তাহাদের ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ বাধাপ্রাপ্ত। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই অশিক্ষিত, অথচ উচ্চজাতির অবহেলায় তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই বলিয়া, তাহারা নৈতিক বিষয়েও তেমন উন্নতি কবিতে সমর্থ নহে। সুতরাং যে-সুগে রাজনীতিক যোগ্যতা, অধিকার ও ক্ষমতা সকলই বহুল-পরিমাণে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে, সে-সুযোগে শিক্ষার অভাবে তাহারা যে বাজনীতিকক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ কবিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? তাহারা সমাজের কঠোর বিধি-নিবেধেব শৃঙ্খলে এমনই আবদ্ধ যে কোন দিক দিয়াই তাহারা মুক্তির আশ্বাস পায় না। ধর্মাস্তরানেও তাহারা তেমনই বাধাপ্রাপ্ত, জগৎপিতাব সান্নিধ্য হইতে তাহারা বলপূর্ব্বক অন্তরভাবে বিতাড়িত। এই সমস্ত বাধা ও নির্যাতনের ফলে তাহারা তাহাদের সমস্ত উচ্চশ্রেণীস্থ ভ্রাতৃবর্গের প্রতি বিমুখ ও মমতাপূর্ণ, এবং এই বৈরিতাব একান্ত স্বাভাবিক। একই ধর্মের উচ্চ ও নিম্ন দুই শ্রেণীর মধ্যে এমন বিরোধেব ভাব সমাজের পক্ষে কত দূর অকল্যাণকর, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। বর্তমান সময়ের অস্পৃশ্য জাতিব মন্দিরপ্রবেশ-আন্দোলন কেবল ঐক দিক দিয়া সমাজের এই অকল্যাণ দূর করিবার একটি সামান্ত উপায়। কিন্তু এই ব্যাধি এত সবল নহে, ইহা আরও অনেক জটিল এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায়ও বহুযুগী।

তথাকথিত নিম্নজাতিব সমুন্নয়ন ব্যতিরেকে ভারতের জাতীয় উন্নতি সুদূরপর্যন্ত। যেমন, কোনও একটি অঙ্গের পুষ্টির অবহেলায় সমগ্র দেহেব পুষ্টি অসম্ভব, সেইরূপ এক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট উন্নতি না হইলে সমগ্র জাতির উন্নতি

চেষ্টা নিষ্ফল; এবং ভারতের হিন্দুজাতির সামাজিক ভিত্তি এমনভাবে গঠিত যে এক সম্প্রদায় অল্প সম্প্রদায়েব সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ এবং এক অস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং হিন্দু এইরূপ সামাজিক গঠনে অনুন্নত শ্রেণীর সম্যক উন্নয়ন ব্যতীত সমগ্র জাতির উন্নতিসাধন অলৌক কল্পনা মাত্র।

অতীত কালে হিন্দুসমাজ নিম্ন ও পতিত জাতির উন্নয়নেব ব্যবস্থা করিয়াছিল—বর্ণব্রাহ্মণ ও পুরোহিত-সম্প্রদায় উহাদের শিক্ষা-দীক্ষাব ভার গ্রহণ করিয়াছিল, শিব ও শক্তি পূজা তাহাদের আদিম গাছ, পাথর ও সূর্য্যপূজাকে রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অপর মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, নিম্নজাতির নেতাকে রাজবংশী, উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যাগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, পুৰাতন 'টোটেম' (totem)-এর পরিবর্তে গোত্রের প্রভাব ও বিবাহ-বিচার দেখা দিয়াছিল। এইরূপে নানা উপায়ে নতুন বিধিনিষেধেব বলে যে কত নিম্নজাতি শৌচাচাব লাভ করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে সহজে অর্জিত জাবে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল তাহাব ইয়ত্তা নাই। অতীত যুগে হিন্দুধর্ম ডকা না বাজাইয়া এইরূপে আপনার সংস্কারসাধন কবিয়াছিল। সেই জন্তই ইহা আবও হৃৎকের বিষয় যে, হিন্দুসমাজের এই কল্যাণকর অনাড়ম্বর প্রচার ও প্রসার কার্য আর সেইরূপ কল্যাণের পথে চলিতেছে না। বাহা অশ্মুট, বাহা প্রতিক্রিয়া, তাহাকে জাতীয়তার নতুন আদর্শেব প্রবেণার প্রস্মুট ও প্রবর করিয়া তোলা আমাদের সমাজেব প্রধান কর্তব্য। উচ্চজাতিব মনোভাবের পরিবর্তনেব উপর নিম্নজাতির উন্নয়ন নির্ভর করিতেছে। উচ্চজাতির লোকেরা আপনাদিগকে পতিত জাতির অবস্থাপন্ন মনে করিয়া লইয়া যদি কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তবেই আস্তবিক সহানুভূতি দিয়া তাহারা নিম্নজাতির প্রকৃত উন্নতিসাধন কবিতে পারিবে, নতুবা কৃত্রিম চেষ্টায় কোনও ফলের আশা নাই। কেবল বৈকৃত্য বা সভাসমিতিতে মন্তব্যগ্রহণ ও সমস্তাব বিন্দুমাত্র সমাধান কবিবে না। কথ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হটবাব মহান সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী প্রাণের আবেগে আস্তবিকভাবে হিন্দুসমাজের নেতৃগণকে এই কর্তব্যের দিকে আহ্বান করিয়াছেন। সেদিন ত তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন, নিম্ন ও পতিত জাতির

উন্নয়ন না করিলে স্বরাষ্ট্রলাভ অসম্ভব ও অলীক। নিম্ন ও পতিত জাতিরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; কেবল পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, অনেক স্থলে তাহাদের আত্মনির্ভরশীল হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব-প্রথমে তাহাদিগের মধ্যে যে কতকগুলি কুপ্রথা ও কু-অভ্যাস আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, উহাদের প্রভাব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে, তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে বাস্তবিক যোগ্য না হইলে কেহ কোনও বিষয়ের অধিকারী হয় না। হিংসা বা ঘেঁষে কোনও উচ্চ কার্য সাধিত হয় না, প্রেম ও বোধ্যতার মানস উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

এখনও ভারতের স্থানে স্থানে সমাজের সেই প্রাচীন সজীবতা বর্তমান রহিয়াছে, এখনও প্রেম ও সহানুভূতির দ্বারা অন্তঃনগলি ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইতেছে। উৎকট ভেদনীতির প্রভাব সত্ত্বেও এখনও সাম্রাজ্যের অনেক গ্রামে গ্রাম্য পঞ্চায়তে নিম্নশ্রেণীর লোকেরও বিচার করিবার অধিকার আছে; গ্রাম্য উন্নতির জন্য যে-সকল কার্যের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও চাঁদা দিয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীর ভগবতী-পূজার মহিবেব মূল্যের জন্য ব্রাহ্মণগণও অর্থ দিয়া থাকে। জাতিপঞ্চায়েৎ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ-নীচ জাতির আয়রক্ষার সহায়ক, তেমনই গ্রাম-পঞ্চায়তে বিভিন্ন জাতির ক্রিয়া ও স্বার্থের সমবায় সাধিত হয়। যদিও আধুনিক কুপ্রথা ও কুরীতি এই সমবায়কে যথেষ্ট লঙ্ঘিত করিয়াছে, তথাপি এই সমবায়ই ভারতের সনাতন প্রথা, নিত্যসিদ্ধ রীতি। নিম্ন ও উচ্চ জাতির মিলন ঘটাইতে হইলে এই সমবায়কে পুনরায় জাগাইয়া তুলিতে হইবে। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে এই সমবায় বাহাতে শুধু বারোমাসী পূজার নহে, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাপ্রবোগী নৈশবিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, কৃষি ও শিল্প সমবায়ের অনুষ্ঠানে নূতন মুক্তি লাভ করে, তাহার জন্য নূতন করিয়া সেবা ও সাহায্যের বার্তা প্রচার করিতে হইবে।

এই ভাবেই কবে কোন অতীত যুগে প্রথম রবির কিরণ-সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে তপোবনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে সাম্যমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার অনুরণন এখনও ধামিয়া যায় নাই। সেই সাম্যমন্ত্রের দ্বারাই বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয় ফিরিয়া আসিবে। যুগে

যুগে ইতিহাস পে ময়কে হীনবীৰ্য্য করিয়া দিয়াছে; বিদেশীর সংস্পর্শে হৃতগৌরব ভাবতবর্ষে আত্মরক্ষাকল্পে কঠোর বিধানে বিধিনিষেধেব লৌহশৃঙ্খলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন জাতীয় বিভীষণ-নিবন্ধন ক্রিয়া ও কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক জন্মবিচার জাতি-বিভাগের ভিত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছিল, তখন বীরাচারেব বস্ত্র প্রাবৃত ও নানা বিদেশীর আচার-ব্যবহার ও মহাবান বৌদ্ধ ধর্মের হ্রাসিতর প্রকোপে জর্জরিত দেশকে বাঁচাইবার জন্য বিবাহ-বিচারের দ্বারা সমাজস্থিতি রক্ষার আবশ্যকতা হইয়াছিল, তখন স্নেহ-সংস্পর্শ হইতে রক্ষাকল্পে ধর্মমন্দিরে কঠোর রক্ষা ও পর্যবেক্ষকের কার্য প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহাব পব কত যুগ অতীত হইয়াছে, কখনও কৃষক, কখনও বুদ্ধ, কখনও রামানুজ, কখনও কবীর, কখনও চৈতন্য ভারতে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের দ্বারা এই অধিকার-ভেদকে ধ্বংস করিয়াছেন, জাতি-বৈষম্যের মূলে কুঠারাবাত করিয়াছেন, শ্রীতির দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙিতে চাহিয়াছেন এবং সমবেদনা ও সহানুভূতির দ্বারা উচ্চ ও নীচের প্রভেদ খুচাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার এখন নূতন শিক্ষার আলোকে বৈষম্যের অন্ধকার দূর করিয়া সাম্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আসিয়াছে, পাঞ্চজন্ত-নির্বোধে ভারতবাসীকে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইবার আহ্বান আসিয়াছে। সে-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলে হিন্দু বাঁচিবার আর উপায় থাকিবে না, তাহার শক্তি পঙ্গু হইবে, তাহার সুখ-সৌভাগ্য চিরতরে অন্তর্হিত হইবে।* বহু বর্ষ পূর্বে কবির সাবধান-বাণী বজ্রনির্বোধে বাজিয়া উঠিয়াছিল :—

শতক শতাব্দী ধরে' নামে শিরে অসম্মানভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কল্প না নমস্কার !

তবু নত করি আঁখি

• দেখিবারে পাও নাকি

সেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান;

অপমানে হতে হবে সেখা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়িয়েছে দ্বারে,

অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহকারে !

সবারে না যদি ডাক,

এখনো সবিদ্যা থাক,

আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়াবে অভিমানে—

মৃত্যুমুখে হাব তব চিত্তাঙ্গ নয় সবার সমান।

* এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক উপকরণ অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত “বিষভায়ত” গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সে-কালিনী ও আধুনিক।

ঐ অপরাজিতা দেবী

শুনেছি, নারী প্রাচীন ভারতে
অশ্ববল্গা ধরেছিল রথে—
ক্ষত পলাইতে প্রিয়তমসহ।
কাব্যে কেবা তা রচে নাই কহ?
পদগতি নয় রথগতিশীল!—
আজো বহু কবি গাহে সেই লীলা!
মণিপুর-সুতা—হুহিতা রাধার,—
করে লয়ে ধনু পিঠে তুণভার,
পুরুষের বেশে ছুটেছে যখন,—
গজগামিনী কি ছিল সে তখন?
পদগতিবেগ কে মেপেছে তার
ঘন বনে যবে খুঁজেছে শিকার?—

অতীতে একদা ধনু তরবারি
ধরেছে শুনেছি একাধিক নারী!
অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিরাছে বেগে,—
গেয়েছে নেচেছে নিশি নিশি জেগে।
দেবেছি তাদের কুঞ্জগলিতে
ক্ষিপ্তচরণে একাকী চলিতে।
ছুযোগ-রাতে গভীর আঁধারে
কত সাহসিকা গেছে অভিসারে।
মরালগামিনী,—হ'লে প্রয়োজন
মৃগগামিনী কি হন নি তখন?—
গোড়ে না হোক আঘাতবর্জ
হেন বীরনারী ছিল এ মর্ত্যে।

সেই গজ-বাকী-রথ-পথ যুগে
কবি কালিদাসও গিয়েছেন ভুগে।
নৃপবহীনার চপল চরণ
করেছে সমানই সন্দরহরণ!
অপ্সরী চেয়ে তাপসীরা তাই
তঁহার কাব্যে ছোট হন নাই।
নারী-প্রগতির প্রার্থিত দিনে
ধরে যদি গাড়ী, ছুটে পথ চিনে
কোনো আধুনিক নবীনা তরুণী
কেন বিশ্বয় সে ঘটনা শুনি?
পাছুকা-মুগুর চরণ-শব্দ
করে নি ত কোনো কবিকে জ্ব্ব?—

চুপি চুপি, শোন, বালি কানে কানে,—
জাগায় কাব্য-অনুভূতি প্রাণে
রমা অধুর বা দর সজ,—
তাদের কে মল চরণভঙ্গ
নুপু বত্মিহা হ'ল সম্প্রতি
পাছুকা-মুগুর,—তা হ'ল বা ক্ষতি?
জিহ্বা দা সে অতীত দিবা,
ছিল না রবির খর-কর বিয়া!
মেঘদূত তাই রচিত অতীতে!—
বিজ্ঞান-দূত রচিবেন গীত—
আধুনিকাদের আধুনিক কবি,
আলোকদীপ্ত উজ্জল ববি।

এই কবিতাটির নামটির অন্ত লেখিকা দায়ী ন.হেন। প্রবাসীর সম্পাদক।

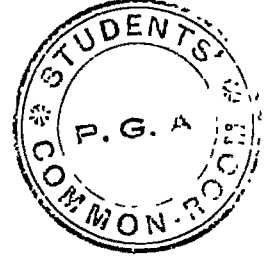
আধুনিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সম্ভাপ তাই মোর ।
কবি-গিরি ফস্ফার উৎসাহ অগ্নায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অগ্নায়
যদি সন্দেহ করো এত বড়ো অবিনয়
চুপ করে যে সহিবে সে কখনো কবি নয় ।
বলিব হু-চার কথা, ভাল মনে শুনো তা ;
পুরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা ।

পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্র
আমি তো তদনুসারে পেরিবেছি সত্তর ।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূণ্যেতে নিশাবে ।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হৃদম
বুকে লাগে যম-রথ-চক্রের কর্দম ।
তবু মোর নাম আজো পারিব না ওঠাতে
প্রান্তিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে ।
জীর্ণ জীবনে আজ রং নাই বধু নাই
মনে রেখো তবু আমি জন্মেছি অধুনাই ।
সাড়ে আঠারো শতক A.D. সে যে B.C. নয়
মোর যারা মেয়ে বোন, নারীদের পিসি নয় ।
আধুনিক ধারে বলো তারে আমি চিনি যে,
কবি-যশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে ।
তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছি শাস্তি ।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কলিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ রমণীর ।

কাছে পাই হারাই-বা তবু ভারি স্মৃতিতে
 স্মর-সৌরভ জাগে আঁখো মোর গীতিতে ।
 মনোলোকে দূতী যারা মাধুরী-নিকুঞ্জে
 গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ-যে ।
 সেকালেও কালিদাস বরকচি আদিরা,
 পুরস্কৃতরীদের প্রশস্তিবাদীরা,
 যাদের অহিমাগানে জাগালেন বীণারে,
 তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে ।
 আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
 তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা ।
 পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো স্মৃতি
 চিরকাল তাই তারে এত মহামুগ্ধ ।
 জুতা পায়ে খালি পায়ে সিঁপারে বা নূপুরে
 নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে ছপুয়ে,
 যেথা স্বপনের পাড়া, সেথা যায় আগিয়ে,
 প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে ।
 তবু কবি রচনায় যদি কোনো ললনা
 দেখো অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা ।
 মিঠে আর কটু মিলে মিছে আর সত্যি
 ঠোকাঠুকি করে হয় রস-উৎপত্তি ।
 মিষ্ট কটুর মাঝে কোন্টো যে মিথ্যে
 সে কথাটা চাপা থাকে কবির সাহিত্যে ।
 ঐ দেখো, ওটা বুঝি হ'ল শ্লেষবাক্য ।
 এ রকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য ।
 প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
 সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা ।
 বারে বারে এই মতো করি অভ্যক্তি,
 ক্ষমা করে কোরো সেই অপরাধমুক্তি ॥



আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই
 তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই ।

অন্ন ভরিয়া দাও সুখা তাহে লুকিয়ে,
 মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে ।
 অনেক গেয়েছি গান মুখ এ-প্রাণ দিয়ে,
 তোমরা তো শুনেছ তা, অন্ততঃ কান দিয়ে ।
 পুরুষ পরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
 সে অকালে তোমাদের বাণী হয় রোচনা ।
 করুণায় ব'লে থাকো, “আহা, মন্দ বা কী !”
 খুঁটে বের করো না তো কোনো ছন্দ-কাঁকি ।
 এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় ক'জনা,
 এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা ।
 এর পরে বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
 তখন আমারে ভুলো পারো যদি ভুলিতে ।
 সেদিন নতুন কবি দক্ষিণ পবনে
 মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে,
 তখন আমার কোনো কীটে কাটা পাতাতে
 একটা লাইনো যদি পারে মন মাতাতে
 তা হ'লে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
 বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া ।
 এ কী গেরো ! কাজ কী এ কল্পনা-বিহারে,
 সেন্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে ।
 ম'রে তবু বাঁচিবার আব্দার খোকামি,
 সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি ।
 এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই
 এস্টিমেশনে তার পড়ে যাব নীচুতেই ।
 অতএব মন, তোর কলসী ও দড়ি আন • •
 অতলে মারিস্ ডুব, Mid-Victorian ।
 কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে,
 শুকুনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে ।
 গদগদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
 শেষ বেলা কেটে যাক্ ঠাট্টায় ঠাট্টায় ॥

তোমাদের মুখে থাক্ হাতের রোস্নাই,
 কিছু সৌরিয়াস্ কথা বলি তবু, দোষ নাই।
 কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রাভাশালিনী
 শুধু এ কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।
 এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্ফেশানেই
 তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
 জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে,
 শেষ রবি-রেখা র'বে সোনা-আঁকা স্মরণে।
 সুর-সুরধুনীধরে যে অমৃত উথলে
 মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
 এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
 কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
 আমাদের কত ক্রটি আসনে ও শয়নে,
 ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
 প্রেম-দীপ জ্বলিছিল পুণ্যের আলোকে,
 মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
 নানারূপে ভোগসুখা বা করেছে বরষণ
 তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
 দামী বাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
 মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
 তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
 তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথের।
 আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
 যে কালে এসেছি আজ সে কালটা Cynical।
 কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
 জেগে ওঠে, ঢাকা থাক্ তার প্রতি বিশ্বাস।

একটু সবুর করো, আরো কিছু ব'লে যাই,
 কথার চরম পারে তার পরে চলে যাই।
 যে গিয়েছে তার লাগি খুঁচিয়ো না চেতনা,
 ছায়ায় অতিথি ক'রে আসনটা পেত না।

বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
 মিথ্যার ধাক্কায় ভিৎ ভাঙে স্মৃতিটার।
 ভিড় ক'রে ঘটা ক'রো ধরা-বাঁধা বিলাপে
 পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
 ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের,
 কবি 'পরে ভার ছিল নিজ মেরোরিয়ালের।
 "ভুলিব না ভুলিব না" এই ব'লে চীৎকার •
 বিধি না শোনে কভু, বলো তাহে হিত কার।
 যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
 সেই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
 শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
 তেলহীন দীপ লাগি দেশলাই পোড়াটা
 যে-মোষ কোথাও নেই সেই মোষ তাড়ানো,
 কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো,
 শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
 উৎসাহ দেখাবার সজ্জায় এ নহে।
 মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ,
 স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য
 সকলি আছতি রূপে পড়ে তারি শিখাতে,
 টিঁকে না যা, কথা দিয়ে কে পারিবে টিঁকাতে।
 ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
 আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে॥

লাহোর

১৫ ফেব্রুয়ারী

১২৬৫

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ট্রাম-চলা বড় রাস্তা হইতে সরু-ফুটপাথওয়ালা পথ সোজা পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে ; তাহার এক প্রাশাখার মত গলিটি দক্ষিণ দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আবার পূর্বদিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া বৃহৎ বাড়িগুলির সীমান্তে হারাইয়া গিয়াছে। অরুণদের বাড়ির সম্মুখে গলিটি সরু, সোজা, নিখুম। উত্তরে ঘোষ বংশের প্রাচীন প্রাসাদভূমির জীর্ণ হলদে দেওয়াল, দক্ষিণে মল্লিকদের বাগানের উচ্চ গুল প্রাচীর ও কয়েকটি ক্ষুদ্র পুরাতন বাড়ি। আম, নিম, কদম্ব নানা বৃক্ষের শাখা গলির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের রৌদ্র তির্য্যকভাবে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য গলিটিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, মধ্যাহ্নে বৃক্ষশাখাগুলির সুস্থিৎ ছায়াপাত হয়, রাত্রে জ্যোৎস্না মায়াঝাল বোনে। এখানে কলিকাতার জনশ্রোত অতি মন্থ ; সকালে ছেলেরা হলা করিয়া জ্বলে যায় ; ছপুরে কোন পথভ্রান্ত ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া চলে, 'চুড়ি চাই' 'ছাতা সারাবে গো', তাহাদের উদাস কণ্ঠের স্বর করুণ প্রতিধ্বনির মত গলিটিতে ঘুরিয়া বেড়ায় ; সম্ভ্রান্ত পর সব নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত। কোন ভাড়াটে গাড়ী যখন বন্ বন্ শব্দে চলিয়া যায়, ঘোড়ার খুরের শব্দে সমস্ত পথ কাঁপিয়া উঠে। গভীর রাত্রে যখন ব্যারিষ্টার ঘোষের লম্বা বড় মোটরকার হেড লাইট জ্বলাইয়া প্রবেশ করে, মনে হয় কোন অতিকায় সরীসৃপ মাথায় মণি জ্বলাইয়া অন্ধ বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এ গলিতে মোটরকার মানীয় না। পূর্বে যখন ঘোষদের, মল্লিকদের বাবুবা জুড়ি গাড়ী হাঁকাইয়া বাহির হইতেন, পাড়ার গৃহিণীগণ পাখী চড়িয়া গল্পাঙ্গান করিতে বাইতেন, তখন গলিটি সজীব ছিল।

গলিতে ছয়-ষড়্‌শ লীলা করুণ সুন্দর। ফাঙ্কনে ঝরা-পাতার পীত আবর্জনার বসন্ত-বাতাস হতাশাসেব মত বহিয়া যায়। গ্রীষ্মে অস্ত্রমুকুল বকুল ফুল ঝরিয়া পড়ে, রৌদ্রে পাথরগুলি বিকিমিকি করে। বর্ষায় সঘন অন্ধকারে গৈরিক

শ্রোত বজ্রাঙ্গলের মত বেগে প্রবাহিত হয়, ছোট ছেলেমেয়েদের কাগজের নৌকা ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। কত বিগত আঁরনে এখানে পুঙ্কার বাজনা বাজিয়াছে, লোকে লোকাবণ্য, কোন বাড়ির প্রতিমা আগে বাইবে, বলিয়া লাঠালাঠি হইয়াছে, এখন কেবল দুই পার্শ্বের বাগান হইতে উদাস স্মৃতিব মত শেকালীর মুহু গন্ধ আসে, অপরাঙ্কিতা লতার নীল ফুলগুলি হলদে দেওয়াল ভরিয়া গলির উপর ঝুলিয়া পড়ে।

খিলানওয়ালা বড় গেট পার হইয়া অরুণদের বাড়িতে প্রবেশ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে বৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতল অংশের আইরোনিক থামগুলির স্মৃতি। ছাদওয়ালা বিলিমিলি-ঢাকা প্রশস্ত বাবান্দার সম্মুখে আইরোনিক থামগুলি যেমন মোটা তেমনি উঁচু, দুই কোণ ও মধ্যে এক জোড়া করিয়া।

দক্ষিণমুখী প্রাসাদের সম্মুখে ডিম্বাকৃতি ফোয়ারা ও বড় বড় কালো পাথর-গাড়া কৃত্রিম পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বিশেষ কিছু নাই ; ফোয়ারার স্বচ্ছ জলে লাল নীল মাছ খেলা করে, এই মাছগুলি প্রতিমার শ্রিষ ; তাহাদের পরিচর্যার ভার সে লইয়াছে।

দুই মহলওয়ালা চক-মিলান বাড়ি। চুকিয়াই চকবন্দী বৃহৎ অঙ্গন। প্রাচীন কালে এখানে কত বাজা, কথকতা, পাঁচালী, কবি লড়াই হইয়াছে, এখন শূন্য অঙ্গন দেখিলে বুকটা খচ খচ কবে। সম্মুখে পুঙ্কার দালান, মেঝের মার্বেল পাথর অধিকাংশ ফাটিয়া ভাঙিয়া গিয়াছে, এক কোণে কয়েকটি ভাঙা চেয়ার ও বাক্স জড়ো করা, যেন গুণামবর ; শূন্য ঠাকুর-দালান দেখিলে মনে বেদনা হয়।

অঙ্গনের পূর্বদিকে লাইব্রেরী-ঘর। সাহেবী দোকানে তৈরি নানা আসবাবে ভরা ; আলমারীগুলিতে নানা পুরাতন গ্রন্থ—শেক্সপীয়ারের অষ্টাদশ শতাব্দীর এক সংস্করণ, স্কটের ওয়েভারলি উপন্যাসাবলী, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ছাপা ;

ডিকেন্স, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি; কার্দুসী, হাফেজ, নানা ফারসী কবির গ্রন্থ। দেওয়াল ছুঁড়িয়া অন্ধের প্রপিতামহের অয়েল পেন্টিং—মাথায় কাজ-করা শামলা, গায়ে শালের চোগাচাপকান, বীর্ষব্যঞ্জন মুখ, ওষ্ঠাধর পাতলা ও চাপা, টানা চোখ দুটি জল জল করিতেছে।

অন্ধের পশ্চিমে দপ্তরখানা। ময়লা ফরাসের ওপর সরকার-মহাশয় সকালে হিসাব লেখেন, ছপরে গড়গড়া টানিতে টানিতে নিদ্রা যান। অন্ধের দক্ষিণে দুইটি বৈঠকখানা-বর। একটিতে তক্তার ওপর ফরাসপাতা, মোটা মোটা তাকিয়া সাজান। সে ঘরে কেহ বসে না। সরকার-মহাশয় রাত্রে নিদ্রা যান।

অপর বৈঠকখানায় চেয়ার-টেবিল সাজান। বোড়শ লুই চেয়ারগুলির বাঁকা পায়ী নড়বড় করে, কার্পেটগুলির চিত্র মলিন। ইহাদের মধ্যে নুতন হালফাসানের চেয়ার-গুলি বড় বেমানান দেখায়। প্রয়োজন হইলে অন্ধের সাহেব-কাঁকা এই ঘবে মাঝে মাঝে বসেন। তাঁহার ঘর বৈঠকখানা-বরগুলির উপর দোতলায়।

শিবপ্রসাদ দিনের বেলায় বাড়িতে অল্প সময়ই থাকেন। আইরোনিক ধামওয়াল প্রাপ্ত বারান্দায় বধন প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া পড়ে, তাঁহার শোবার ঘরের জানালা বন্ধ থাকে। সকাল আটটার সময় ছকু খানসামা চায়ের পেয়ালা ও দাড়ি-কামাইবার গরম জল লইয়া শিবপ্রসাদের শয়নগৃহে প্রবেশ করে। নয়টার সময় স্নান করিয়া তিনি ব্রেকফাস্ট খান। দপ্তরখানার উপর দোতলায় তাঁহার খাবার ঘর। মেহগুনী কাঠের লম্বা বড় সাইডবোর্ড, দেওয়ালে অনেকগুলি বাঁধানো ছবি, ঘরটি সুসজ্জিত। ছবিগুলি তাঁহার ইউরোপের যৌবনেব আনন্দস্মৃতি, অধিকাংশই উপহার—বেনারস “স্নানরতা তরুণী,” রসেটির “দাস্তের স্বপ্ন,” দেগাব “নর্তকী,” নানা ছবি; ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের খেলাধুলা, পিকনিক, নিশীথোৎসবের চিত্র, প্রাণোন্মাদপূর্ণ বিচিত্র বেশসজ্জিত নর-নারীদের ফটো।

সকাল সাড়ে দশটার সময় শিবপ্রসাদ বাহির হইয়া যান। ক্লাব হইতে ফিরিতে রাত এগারটা হয়। তার পর সাপার। ঠাণ্ডা মাংস ও সবজী খাওয়া উপলক্ষ্য মাত্র, মদ

খাওয়াই উদ্দেশ্য। গভীর রাত্রে তাঁহার গ্রন্থপাঠের সময়। তিনি বহুভাষাবিশ্ব। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় জার্মান, ইতালীয়ান, রুশ ও সুইডিস্ ভাষা আয়ত্ত করেন। দেশে আসিয়া শিক্ষক রাখিয়া সংস্কৃত ও ফারসী শিখিয়াছেন। এখন তত্ত্বশাস্ত্র ও ইতালীয় কবি কারুটি পাঠে নিমগ্ন। বারান্দায় লম্বা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া মদ ও বই লইয়া রাত একটা কাটিয়া যায়।

কিন্তু কোন কোন রাত্রে কালিদাস বা কারুটি, হাফেজ বা পুস্কিন, কোন দেশের কোন কবিই তাঁহার চিন্তকে শান্ত করিতে পারে না।

তাঁহার শয়নগৃহে টেবিলের উপর রূপার স্ক্রমে বাঁধ'নো দুইখানি ফটো পুর্বে ছিল। একটি, এক সমুদ্রনীলনয়না সুরূপা ইংরেজ ললনার, মাথায় কৃত্রিম ফুলভরা টুপি, কলকাওয়াল কাম্মীরী শাল হইতে তৈরি জামা ও স্কার্ট, মুখখানি কৃত্রিম ফুলের মত, শোভনতা আছে, প্রাণের দীপ্তি নাই। আর একটি ফটো একটি ছোট মেয়ের, তাহার নীলনয়ন স্নিগ্ধ, চুলগুলি একটু কালো, ফুটন্ত গোলাপের মত মুখখানি, হাসিটি চমৎকার।

এখন সে নীলনয়না ইংরেজ-হুহিতার ফটো নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আর বেবীর ফটো খাটের মাথায় দেওয়ালে ঝুলান। নিদ্রাহীন অশান্ত রাত্রে কখনও কখনও শিবপ্রসাদ খুকীর ফটোটি হুক হইতে খুলিয়া হাতে ধরিয়া বারান্দায় পদচারণা করেন। তার পর ফটোটি বখাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া অন্ধকার গলির দিকে চাহিয়া থাকেন।

চৈত্রের জ্যোৎস্না। পলাশ বৃক্ষেব শাখায় শাখায় রক্তিম পুষ্পগুচ্ছ পুঞ্জিত; নারিকেল বৃক্ষগুলির আড়ালে গুল মেঘ-স্তূপে চন্দ্ৰমা ঘেন স্বপ্নতবী। শিবপ্রসাদের রক্তে বসন্ত-রাত্রির মত্ততা লাগে। অন্তে পড়ে ইংলণ্ডের বসন্তাগমন। আপেল পিয়ার চেরীগাছে নবপুষ্পস্তবকের কি অপকল্প মৌন-খোচ্ছাস! শিশুমুখের মত কচি পাতাগুলি এলম বৃক্ষের ডালে।

শিবপ্রসাদ ভাবেন সেই বেবী এখন কত বড় হইয়াছে। তাঁহার বয়স এখন প্রতিমার সমান হইবে।

গলির অন্ধকারেব দিকে শিবপ্রসাদ চাহিয়া থাকেন কোথায় কোন্ নিশাচর পাখী ডাকিয়া ওঠে।

ছুটিব দিন। চৈত্রেব নিরুদয় দুপুর। স্বচ্ছ রৌদ্র যেন কোন নিস্তরঙ্গ রক্তত সমুদ্রের স্রোত; এই শুভ্র জ্যোতির্ময় শব্দহীন ধারায় বববাড়ি গাছ পথ সব পরিপ্লুত। বিরি বিরি ঈষদোষ্ণ বাতাসে বসন্ত-স্পন্দিত মৃত্তিকার সুবাসি। এইরূপ রৌদ্রের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন বোনা যায়। মনে হয় এই দীপ্ত স্তব্ধতা কোন গভীর প্রাণস্রোতে পূর্ণ।

এইরূপ আলোভরা দিনে অরুণ জ্বাড়া থাকিতে চায় না, বথবর্ষরপূর্ণ জনস্রোতময় কলিকাতার পথের জীবনকল্লোল-মধ্যে তাহার ঘুরিতে ইচ্ছা করে। রাজির স্তব্ধতায় মনে শান্তি আনে, কিন্তু এই সূর্যালোকপূর্ণ নিশ্চলতায় প্রাণে চঞ্চলতা জাগে।

বাওয়ার পব অরুণ একেবারে প্রতিমার বরের দিকে চলিল। প্রতিমা নিশ্চের ঘবে নাই, ঠাকুরমার ঘরে; তাঁহাকে রামায়ণ পড়াইয়া শোনাইতেছে। বারান্দার ময়না ও কেনারী পাখীগুলি খাঁচায় ঝিমাইতেছে। সাদা কাকাতুরাটি হোলা ও ছাতু খাইতেছিল, অরুণকে দেখিয়া লাল ঠোঁট নাড়িয়া চেঁচাইল—শুড্ মনিং। সমস্ত বাড়ি সচকিত হইয়া উঠিল। অরুণ তাহার জলপাত্রে জল ভরিয়া দিয়া বলিল, চুপ কুস্তকর্ণ। এই পাখীগুলি প্রতিমাব পোষা জীব। কাকাতুরার নামকরণ তাহারই।

অরুণ বাড়ি হইতে বাহির হইল। জয়ন্তের বাড়ি বাইবে ঠিক করিল। জয়ন্ত গতকল্য স্কুলে আসে নাই। অসুখ হইল কিনা খোঁজ লওয়া দরকার।

জয়ন্তের বাড়িতে তাহার বাইতে ইচ্ছা করে না। সে-বাড়ির আবহাওয়া, জীবন-প্রণালী হৃদয় স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

জয়ন্তের মেসো-মহাশয় তাহার পুজনীয়। কিন্তু তিনি অরুণের সহিত এত বিনীত ব্যবহার করেন, তাহার বংশ-গরিমার এত উচ্চ প্রশংসা করেন যে অরুণের লজ্জা হয়। পীতাম্বরের কপালে চন্দনের তিলক, গলায় কপ্তি, গায়ে ময়লা ফতুয়া, নয় হাত ছোট মোটা কাপড় পরা, সব সময় জোড়হাতে নম্র হুয়ে কথা বলেন, যেন সবাব দাসদাস। সরল কৈশোর বুদ্ধি দিয়া অরুণ এই লোকটিকে ঠিক বিচার করিতে পাবে না, সে কিন্তু বুঝিতে পাবে লোকটি খাঁটি নয়। বস্তুতঃ, অতি পরমবৈষ্ণব বলিয়া নিজেকে পরিচিত

করিতে চাহিলেও পীতাম্বর ভণ্ড ও অত্যাচারী। তাঁহার গৃহিণী মুন্সরীকে দিনরাত খাটিতে হয়; কাজ বড় কম নয়, নিজের চার ছেলে, চার মেয়ে, তাছাড়া জয়ন্ত ও মণ্টু আছে; বাড়িতে পীতাম্বর ঝি রাখিতে দেন নাই, কারণ সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ছেলেমেয়েরা ভাল খাইতে ও পরিতে পায় না, কারণ দারিদ্র্য-দীনতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। কাহারও অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা হয় না, হরিনাম গান হয়। পীতাম্বর কিন্তু হৃদয়ের নাম-সংকীর্তন করিতে পারেন। আসলে লোকটি অতি রূপণ ও স্বার্থপর।

জয়ন্তের মাসতুতো ভাইবোনগুলির ব্যবহারও অতি অদ্ভুত অস্বাভাবিক লাগে। তাহাদের শীর্ণ বৃত্তু চেহারা ময়লা ছোট কাপড় জামা দেখিলেও হৃৎক হয়। বড় বোন দুর্গা প্রতিমার বয়সী হইবে, কিন্তু অরুণকে দেখিলে কেবল মাত্র সে নয় তাহার তিন-পাঁচ-সাত-নয়-দশ-এগাব বৎসরের ভাইবোনগুলি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, জগন্নাথ, বলবাম, হুভদ্রা সকলে ছুটিয়া পলায়—পীতাম্বর তাঁহার সকল পুত্রকন্তার নাম বেবদেবীর নামে রাখিয়াছেন, হ্যাল-ফ্যানানেব নাম মোটেই পছন্দ করেন না—তার পর সকলে দরজার আড়াল হইতে কৌতুকপূর্ণ নেত্রে অরুণকে দেখে, যেন সে কোন অপরাধ জীব। একদিন ঘটনাক্রমে দুর্গা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়াতে লজ্জায় পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল, তার পব লম্বা ঘোমটা টানিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল। ইহাতে অরুণের যেমন হাসি পাইয়াছিল তেমনি রাগও হইয়াছিল।

কিন্তু কি কারণে দুর্গা ঘোমটা টানিয়া পলাইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে, অরুণ আর জয়ন্তের বাড়ি বাইত না।

একদিন খাবারের পর পান চিবাইতে চিবাইতে পীতাম্বর তাঁহার গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন—দেখ, আমাদের দুর্গার সঙ্গে অরুণের বেশ মনায়। কি বল? চেষ্টি করব?

স্বামী সবল মতে সমর্থন করা মুন্সরীর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কোন আপত্তি বা তর্ক করা সেবিকার ধর্ম নয়। কিন্তু মুন্সরী স্বামীর এই কথায় সায় দিতে পারিলেন না। নিজ পুত্রকন্তা সম্বন্ধে পিতামাতার এক বিচারহীন শ্রেষ্ঠত্ববোধ আছে। পীতাম্বর দুর্গাকে অরুণের বিবাহযোগ্য ভাবিলেও মুন্সরী তাহা পারিলেন না। এই হৃদয়-নম্র বাসকটির

প্রতি তাঁহার কেমন গভীর স্নেহ জন্মিয়াছে। তিনি ধীরে বলিলেন—কি বে বল, অরুণ কত বড় ঘরের ছেলে, আর আমার স্নেহে ত পেছোঁ।

পীতাম্বর রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অতি মিহি সুরে তিনি নিজ বংশের খ্যাতি ও গুণগরিমা এবং তালপুত্রের বোধ-বংশের অসচ্চরিত্রতার ইতিহাস সম্বন্ধে তুলনামূলক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। নানা কাজ বাকী থাকিলেও মুন্সরীকে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। সমস্ত বাসন মাজা বাকী। অবশেষে মুন্সরীকে স্বীকার করিতে হইল, এমন বংশে বিবাহ-করা অরুণের মহাসৌভাগ্য। স্বামী যদি এ-বিষয়ে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি বখেট সাহায্য করিবেন। ঠিক হইল, অরুণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন দুর্গার হাতের রান্না খাওয়াইতে হইবে, অবশ্য মুন্সরীই সমস্ত রীতিবেন।

জয়ন্তের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া অরুণ দেখিল বাড়ির দরজা বন্ধ। পীতাম্বর অতি ভীত প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার বিশ্বাস কলিকাতার সকল গুণ্ডা ও চোরের দৃষ্টি তাঁহার বাড়ির ওপর।

দরজায় কড়াও নাই। অরুণ মুহূ আঘাত করিল, কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জয়ন্তের ছোট ভাই মণ্টু এক হাতে কয়েকখানি ঘুড়ি ও অপর হাতে লাটাই লইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে আশাব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল।

মণ্টু চোঁচাইতে চোঁচাইতে ছুটিয়া আসিল—অরুণদা, যাবেন না, দাদা বাড়িবে ভেতর আছেন। দাদা! দাদা!

বন্ধ দরজায় মণ্টু দমদম লাথি মারিতে লাগিল। বলিল—দাঁড়ান অরুণদা, বাড়ির সবাই একদম কাশা, দরজা দেব এক দিন ভেঙে!

বাড়ির মধ্যে এই ছোট ছেলোট উন্মত্ত প্রাণে-ভরা; সে বিজ্রোহী, কাহারও কথা শোনে না, শাসন মানে না, আপন খুশী-মত হাসিয়া-খেলিয়া বেড়ায়; পাড়ার সকল ছুট ছেলের সঙ্গী। এই অশান্ত ভ্রাতাটিকে জয়ন্ত অত্যন্ত ভালবাসে। নিজের মধ্যে প্রাণেব যে তেজ নাই, নিজ বালক-ভ্রাতার মধ্যে তাহা দেখিতে পাইয়া সে গৌরবময় আনন্দ উপভোগ কবে; তাহার সকল অনিয়ম অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেয়। বালকের স্বাভাবিক ব্যবহার নিবোধ করিলে অমঙ্গল হয়, ইউরোপের এই আধুনিক শিশুশিক্ষানীতি

তাহার জানা না-থাকিলেও সে বুঝিয়াছে প্রাণের সহজ প্রকাশকে বাধা দিলে মানুষ সজীব স্বাধীন হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না, এই শাসন-অনুশাসনের পীড়নে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছে।

জয়ন্ত দরজা খুলিয়া অরুণকে দেখিয়া উদ্ভসিত হইয়া উঠিল।

—আরে ভাই, তোর কথাই ভাবছিলুম, জানি তুই আসবি। একে বলে টেলিপ্যাথি।

—কাল জুলে যাও নি কেন?

—ও যে ভীষণ কাণ্ড কাল, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ঘরে আন্ধ বলাছি।

জয়ন্তের ‘ভীষণ’ ‘ভয়ঙ্কর’কে কেহ সত্যি ভীতিপ্রদ বলিয়া ভাবে না। সবাই জানে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা তাহার অভ্যাস। সে আবেগের সহিত কথা বলে, নিজেকে কোন কল্পনাজীবন-নাট্যের ট্রাজিক অভিনেতা রূপে সকলের সম্মুখে পরচিত্রিত করিতে মুখ পায়, সমবেদনার জন্ত তুষিত।

অরুণ ইচ্ছাপূর্বক অতি গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল,—কি ব্যাপার, আবার কোন নতুন দুর্ঘটনা? আমি কাল থেকে তোমার কথা ভাবছি।

উজ্জ্বলের সহিত জয়ন্ত বলিল—অরুণ, তুই সত্যি আমার বন্ধু। নিজের ঘরে লইয়া কোঁকড়া চুল ঢুলাইয়া হাত-নড়িয়া জয়ন্ত যে দীর্ঘ কাহিনী বলিল তাহার মর্ম্মাংশ এইরূপ—

দুই দিন হইল জয়ন্তের পিতা কামাখ্যাচরণের একখানি পত্র আদিয়াছে হরিদ্বার হইতে। তিনি জয়ন্তকে লেখেন—নাই পীতাম্বরকে লিখিয়াছেন, এজন্য জয়ন্ত বড় ব্যথিত। কামাখ্যাচরণ লিখিয়াছেন, তিনি এক সম্যাসী-দলের সহিত শীঘ্রই বদরিকাশ্রম বাইবেন, সেখানে হইতে মানস-সরোবরে বাইবারও ইচ্ছা আছে। শেষে তিনি লিখিয়াছেন রাধাবাজারের দোকানের তাঁহার অংশের সমস্ত উপস্থিত তিনি ত্যাগ করিয়া পীতাম্বরকে দিতেছেন, দোকানের একমাত্র মালিক পীতাম্বর এ-বিষয়ে বখোঁচিতি দলিল বরিয়া পাঠাইলে তিনি সই করিয়া দিবেন। ইহা লইয়া পারিবারিক কলহ চলিতেছে। পীতাম্বরের ইচ্ছা ছিল, চিঠি সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিবেন না, দলিলটি

নুকাইয়া পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু কোনরূপ চিঠিখানি মৃগ্মরীর হস্তগত হয়, তিনি সকল কথা জয়ন্তকে বলেন। কাল সে মেসোমহাশয়ের সহিত রীতিমত ঝগড়া করে, গালাগালাি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া অতুলবাহার বাড়ি ছাড়িয়া সে চলিয়া যায়। সেজন্য কাল সমস্ত পরিবার উপবাসী ছিল; মাসীমা, ছোট ভাই-বোনরা কেহই খাইতে চায় নাই। মণ্টু পর্য্যন্ত সারাদিন কিছু খায় নাই জানিয়া সন্ধ্যায় ক্ষয় বাড়ি ফিরিয়া আসে। মাসীমা, ভগ্নী, লক্ষ্মী সকলে তাহাকে ঘিরিয়া উচ্চৈশ্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করে। অগত্যা তাহাকে রাতে এ-বাড়িতেই অন্নগ্রহণ করিতে হইয়াছে ও আপাততঃ বাড়ি-ছাড়ার সম্বন্ধও ত্যাগ কবিত্তে হইয়াছে। মেসো-মহাশয়ের সহিতও তাহার একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। তাহার মাসীমা ও ভাইবোনদের ছাড়িয়া সেও থাকিতে পারিবে না। মেসো-মহাশয় বলিয়াছেন বটে তিনি এখন কোন দলিল পাঠাইবেন না, তবে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

দীর্ঘ বৃত্তান্ত শুনিয়া অরুণ বলিল—তা হাজাম চুকে গেছে ত। অলু ও এলু জুটি এলু ও এলু (সব ভাল যার শেষ ভাল)। এখন চল কোথাও বেড়িয়ে আসা হাক, আমি আজ ঘুরে বেড়াবার mood-এতে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে করছে, মনটা ভাল নেই। আজ আমরা দুজনে যাই চল।

অরুণ ভাবিল, দুই-জনে বেড়াইতে গেলে ভ্রমস্ত সমস্ত পথ তাহার ভ্রমের কথাই বলিবে; বাণেশ্বরকে ডাকিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই কিশোরদের নিকট বিপুল কলিকাতা নগর এক রহস্যপূরী। নানা অজানা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহাদের অকুরন্ত উৎসাহ। তাহাদের মন উৎসুক, দৃষ্টি নবীন, অপরিচিতকে জানিবার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় ক্ষয় পূর্ণ।

চার-পাঁচ জন সহপাঠী লইয়া অরুণ প্রায়ই ছুটির অপরাহ্নে কলিকাতার রহস্যোদ্ঘাটন কবিত্তে বাহির হয়। মণিকতলা খালের ধার; খাল-পারে কদম্ব পল্লী, বৃহৎ বাগানবাড়ি, বিপুল গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার, খিদিরপুরের ডক; অজানা বস্তি, সংকীর্ণ বক্রগলিময় অপরিচিত পাড়া, পুতাতন গোরস্থান, কলিকাতার নানা অংশে তাহারা দল বাঁধিয়া

বেড়ায়। জয়ন্ত হাত দোলাইয়া মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে; বাণেশ্বর তর্ক করে, ব্যঙ্গ করে, আদিবসাত্ত্বক সংস্কৃত শ্লোক বলে; অরুণ তর্কে ফোড়ন দেয়, খাবার কিনিয়া খাওয়ার; যতীন চুপ করিয়া চলে, মাঝে মাঝে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে; হবিসাধন কুলীমজুরদের জীবন, বস্তির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কবে। কোন পথিক, পথদৃশ্য, সামান্ত কথা, তুচ্ছ ঘটনা লইয়া কত তর্ক, কোতুক, হাস্য। এই কিশোরদেব নিকট নগরের পথ, জনশ্রোত, ট্রাম-মোটর-বনি, তাহার কদম্বতা, বীভৎসতা সমস্তই নবীন স্নন্দর কোতুককর লাগে, এ যেন কোন নবদেশ-আবিষ্কারের আনন্দময় অভিযান।

বাণেশ্বরকে ডাকিয়া লইয়া অরুণ ও জয়ন্ত যখন ট্রাম-রাস্তার মোড়ে আসিয়াছে, দেখিল মোটা বৃন্দাবন এক বড় ঠোঙা হাতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। অরুণের দলটিকে বৃন্দাবন ভয় করে না, সে জানে ইহারা পেটে খুঁবি মারিবে না। সে হাসিয়া বলিল—হ্যালো বয়েজ, এত নয়েজ করে কোথায় চলেছিস?

বাণেশ্বর উত্তর দিল—হ্যালো ফ্যাটি, মারবো টাটি, এত গপ্‌গপ্‌ করে কি থাকিস?

বৃন্দাবনের উত্তর দিতে হইল না। জয়ন্ত তাহার হাতের ঠোঙা ছিনাইয়া লইল, তার পর সকলে মিলিয়া টেপারি ও অবাক-জলপান খাইতে লাগিল। বৃন্দাবন তাহাতে বাধা দিল না। তাহার ইচ্ছা, অরুণ তাহাকে বেড়াইবার দলে লয়।

সহসা বৃন্দাবন চোঁচাইয়া উঠিল—ওরে।

পথের মোড়ে হেডপণ্ডিত মহাশয়ের ছাতা দেখা গেল, উদ্যত শিখা।

অরুণ বলিল—চুপ্। বৃন্দাবন, সামনে দাঁড়া আর বাণেশ্বর আমাদের পেছনে লুকিয়ে বস্।

বিপদ কাটিয়া গেল। পণ্ডিত-মহাশয় এক ট্রামে উঠিলেন। বাণেশ্বর হাসিয়া বলিল—এ জগতে কিছুই বুধা নয়, ভোঁদাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

অরুণ বলিল—এখন ঠিক কর কোন দিকে যাওয়া যায়। বিন্দে যাবি নাকি?

—নিশ্চয়। আমি বলি, চল ট্রামে।

—ও, তাহ'লেই হয়েছে। না বাপু, তোমার গিচে কাজ নেই, কিছুদূর গিয়ে বলবে কোলে কর। আমরা এখন সাত-আট মাইল হাঁটব।

—সে আমি খুব পারি। একবার আমি দেওঘরে দশ মাইল হেঁটেছিলুম।

—আরে, এ দেওঘর নয়। এখন কোথায় যাওয়া যায়?

—যে পথে যায় চোখ চল সেই পথে।

—রাখ তোমার কবিশ্ব পড়বে চাপা রখে, ওরে সরে দাঁড়া।

—আমি বলি, যে নতুন যুদ্ধজাহাজ এসেছে সেটা দেখে আসা যাক।

—জাহাজে উঠতে দেবে? ভেতরে যেতে দেবে?

—তা দেবে না।

—জাহাজ দেখে কিন্তু চৌরঙ্গী হুগ্ সাহেবের বাজাব হয়ে আসব।

—না ভাই, আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেন বাবার কথা ছিল।

—বেশ, জাহাজ দেখে চাঁদপাল-বাট থেকে যাওয়া যাবে।

—আমি দেখি নি বোটানিক্যাল গার্ডেন।

—কি বা তুমি দেখেছ।

—কিন্তু আমার সঙ্গে ত বেশী পরসাদ নেই।

—আমার আছে, এক টাকা—

হাপ্‌প্যান্টের পকেট হইতে বৃন্দাবন এক চক্চকে টাকা ও কতকগুলি খুচরা পরসাদ বাহির করিল।

বাণেশ্বর বলিল—অচল টাকা নয় ত!

অরুণ কহিল—আমার ব্যাগেও কিছু আছে।

হিসাব করিয়া দেখা গেল ষ্টীমাবে যাতায়াতের ভাড়া বখেটে হইবে। চারি জন হাজ্জে গল্পে পথ মুখর করিয়া চলিল।

কিছু দূর গিয়া বৃন্দাবন এক দেশী হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল—ভাই, কিছু চপ্-কাটলেট কিনে নেওয়া যাক। কিরন্তে ত সন্ধ্যা, খিদে পাবে।

—কি পেটুক বাবা! চপ্-কাটলেট কিনলে ষ্টীমারের ভাড়াটা কোথা থেকে আসবে শুনি?

—ও তাই ত। আচ্ছা, চার পরসাদ চিনেবাদাম কেনা যেতে পারে। আবার কিছু দূর গিয়া মুসলমানদের এক খাবারের দোকানের সামনে বাণেশ্বর থামিল। জয়ন্ত তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছে—সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া—

বাণেশ্বর গম্ভীর ভাবে বলিল—অরুণ তুমি সেদিন বলেছিলে, একদিন শিক-কাবাব খাওয়াবে।

জয়ন্ত ও বৃন্দাবন চমকিয়া উঠিল—শিক-কাবাব! মুসলমানের দোকানের।

—হ্যাঁ।

—কি মাংসের জ্ঞান?

—জানি।

—তুমি খাবে?

—কেন খাব না?

অরুণ বলিল—না, না, পাগল নাকি!

বাণেশ্বর উত্তর দিল—আচ্ছা, আজ আমাব সঙ্গে পরসাদ নেই; দেখো, এক দিন খাব তোমাদের দেখিয়ে।

—তোমার বাবা জানতে পারলে যে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেখেন।

—আমি কেন্দ্র করি না। আচ্ছা, আর চার বছর যাক, তার পর সবার সামনে খাব।

—ছি।

—তুমি খাও নি ও মাংস?

—না।

—আচ্ছা, সেদিন যে ছকু খানসামা আমাদের স্যাণ্ড-উইচগুলি খাওয়ালে, সে কিসের মাংস বাবা?

—সে ছাস।

—ও, একদিন তুমিও খাবে দেখো। তোমার কাকা খান না?

—না, বাড়িতে খান না। ঠাকুমা তা হ'লে মনে কষ্ট পাবেন।

—আর আমাদের কষ্ট কে দেখে শুনি। বাবা হলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, হুতরাং রোজ কেবল শাক-চচ্চড়ি ভাত খাও গব্য স্তুত দিয়ে।

—আমরাও ত বাড়িতে মাছমাংস খাই না।

—চল চল, কি পাগলামি করিস।

বাণেশ্বর সত্যই শিক-কাবাব বাইতে চায় না, কিন্তু পিতার অর্থহীন নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে তাহাব অন্তরে যে বিদ্রোহের কালো মেঘ ঘনাইয়া ওঠে, এ তাহারই বহুগর্জন। ঘরে মমতাহীন শাসন-বিক্রম, অপমানিত আত্মা মুক ধাকে ; বাহিরে সে সারাক্ষণ ব্যঙ্গোক্তি কথা-কাটাকাটি করে। শিশু গাছ যেমন সোজা চলিয়া আলোক না-পাইলে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, শিশুমনও তেমনই স্নেহ আনন্দের অভাবে অস্বাভাবিক বক্র হইয়া যায়।

বিশ্বস্থিতির মধ্যে কোন গুঢ় শক্তি এক আনন্দময় সামঞ্জস্যের সন্ধানে একবার কেন্দ্রাভিগ, একবার কেন্দ্রাভিগ। নটরাজের নৃত্যছন্দে নদীর এক পাড় ভাঙে, নুতন তীর জাগে ; প্রাচীন বংশ বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়, নব বংশ নব সভ্যতার জন্ম হয়। নটরাজের এক চরণে প্রলয়ের অগ্নি, অপর চরণে নবস্থিতির শতদল।

যুদ্ধ-জাহাজ দূর হইতে দেখিতে হইল। পুলিশ ঘাটের নিকট পাহারা দিতেছে। বৃন্দাবন কাহাকেও নিকটে বাইতে দিল না।

চাঁদপালবাটে আসিয়া জানা গেল, পরবর্তী ঈমার আসিতে আধ ঘণ্টা দেরি। এক নৌকার মাঝি আসিয়া বলিল—আধ ঘণ্টার মধ্যে সে বোটানিক্যাল গার্ডেন পৌঁছাইয়া দিবে, ভাড়াও খুব সস্তা।

জয়ন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন ভয় পাইল, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস করিল না। অরুণ ভাবিল, সকলেই সঁতার জানে, ভয়ের কিছুই নাই। অরুণদের বাড়ির পুকুরিণীতে ছুটির সকালে প্রায়ই সস্তরণ-লীলা হয়। অজয়ই এ-সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী। বৃন্দাবনকেও ধরিয়। নাকে মুখে জল খাওয়াইয়া সঁতার শিখাইয়াছে।

হজা করিয়া সকলে নৌকার উঠিল। মাঝি পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমুদ্রগামী জাহাজগুলির পাশ দিয়া নৌকা তরতর করিয়া চলিল। সকলের বড় ক্ষুধা। শুধু বৃন্দাবনের বড় অসোয়াস্তি, মাঝি তাহাকে বার-বার সাবধান করিতেছে, সে যেন ধারে হেলিয়া না বসে, তাহা হইলে নৌকা উল্টাইয়া বাইতে পারে।

জয়ন্ত গান ধরিল,—

আরে মন-মাঝি, তোব বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পাবলাম না।

কলের চিম্নী, ঈমারের ধোঁয়া, ফ্রেনে গাঁটতোলা, মাল-ভবা গাধাবোট, বণিক-সভ্যতা-কলুষিত কলিকাতাব গঙ্গার ওপর অপরাহ্নের আলোকে কিশোরকণ্ঠে ভাটিয়ালাগী সুর যেমন বিসদৃশ তেমনই করুণ মনে হইল।

বোটানিক্যাল বাগানে সকলে খুব হজা করিয়া ঘুরিল ; ডাব খাইল ; ছুটোছুটি করিল ; বড় বটগাছের উচ্চতা কত, তর্ক বাধিল। সকলে চপ-কাটিলেটের অভাব অনুভব করিল। কিরিবার সময় ঈমারে আসা ঠিক হইল। ঈমার-ঘাটে আসিয়া বৃন্দাবন কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—
ভাই, আমার টাকা ?

—টাকা ! কি হয়েছে ?

—আমার টাকা হাবিয়ে গেছে, কোথায় পড়ে গেছে।
দে কাদিয়া ফেলিল।

—যেমন চাল ক'রে হাফপ্যান্টের পকেটে রেখেছিল।

—কাদিস না, তোর নিজের টাকা ত ?

—হ্যাঁ, মা দিয়েছিলেন। চল খুঁজি গে।

—কোথায় খুঁজবি এখন, এ ঈমারে না বেতে পাবলে রাত হয়ে বাবে ফিবতে।

অরুণ বলিল—আচ্ছা, আমি তোকে একটা টাকা দেব'খন।

—দেবে ভাই ?

—বা, তুমি কেন দেবে ? ভাব না, চপ কিনে খেয়েছিস।

—আমার এত কল্পনা নেই, আমি ত কবি নই।

ঈমার আসিয়া পড়াতে আর টাকার সন্ধান হইল না।

চাঁদপাল-বাটে সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া নামিল। সঙ্গে-
ট্রামে ফিবিয়া বাইবারও পরশা নাই।

অরুণ বলিল—চল হেটেই বেতে হবে।

বৃন্দাবন অতি শ্রান্ত, তার পর টাকা হারাইয়া বিমর্ষ।
সে ভগ্নস্বরে বলিল—আমি আর হাটতে পারছি না।

—খুব বে দেওঘরে দশ মাইল বেড়িয়েছিলে।

—না ভাই, আমার নতুন জুতো, পায়ে কোঁড়া পড়েছে।

অরুণের মনে পড়িল মামীমা রাতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,

সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি ফেরা দরকার। সে এক ফিটন-গাড়ীর গাড়োয়ানকে ডাকিল।

গাড়োয়ানটি সন্ধ্যার বেলি—বাবু পরমা আছে ত ? অরুণ গম্ভীরভাবে দরাদরি শুরু করিল।

পিছন হইতে কে ডাকিল—হ্যালো, অরুণ নাকি ?

অরুণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, নূতন হুন্ডার মোটরকারের স্টারিং-হুইল ধরিয়া বসিয়া কোটপ্যান্ট-পরিহিত এক যুবক তাহাকে ডাকিতেছে। সে মোটরকার চালাইয়া যাইতেছিল, অরুণকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়াছে।

যুবকটি বলিল—কোথায় যাবে—এস—joy ride—

অরুণ তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিল না, ধীরে বলিল, —না, থাকুন, আমাদের বাড়ি ফিরিতে হবে, আমরা গাড়ী ঠিক করে ফেলেছি।

—অল রাইট (আচ্ছা)।

খুলি উড়াইয়া সশব্দে মোটরকার চলিয়া গেল।

গাড়োয়ান আর ভাড়ার টাকার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করিল না। সকলে ফিটন-গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—কে রে ছোকরা ? খুব চালু।

অরুণের তখন মনে পড়িল, যুবকটিকে সে মামাবাবুর বাড়িতে কোন সন্ধ্যায় দেখিয়াছে।

গাড়ী ধীরে চলিল।

আহাঙ্কের মাঙ্গল, কলের চিমনীগুলির আড়ালে গঙ্গার পশ্চিম তীরে সূর্য অস্ত গেল। অরুণের মনে হইল সূর্য্যের এরূপ রক্তিম বর্ণ সে কখনও দেখে নাই।

সমস্ত পথ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পথ, মাঠ, জনশ্রোত, প্রাসাদশ্রেণী সব যেন অবাস্তব, রঙীন স্বপ্ন।

গাড়ী যখন অরুণদের বাড়ির সড়ক গলির মধ্যে আসিয়া ঢুকিল, অন্ধকার আকাশ তাবায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

সিন্ধু-তটে

শ্রীগোপাললাল দে

আমি এরে বাসিয়াছি ভালো।

মুক্ত নীলাকাশ এই সিন্ধু স্বর্ণ শরতের আলো,
আজ শান্ত শীত বায়ু, তারই মাঝে অসীম সাগর
হুণীল সফেন-পুঞ্জ সচঞ্চল আদিম জাগর !
দূর দিগন্তের হ'তে বহে আসে তরঙ্গ উত্তাল
উচ্ছসিয়া, উদ্বেলিয়া, আলোড়িয়া পড়ে চিরকাল,
উন্মত্ত আপন রঙ্গে, নাহি থাম, নাহি শোনে বাণী,
ক্ষণতরে দ্বিধা নাই, এতটুকু নাহি কানাকানি,
শাসন মানে না কোন কারো পানে ফিরিয়া না চায়,
লক্ষ বাহু পসারিয়া ধরণীরে আলিঙ্গিতে ধায়।

গগনেতে নাহিক বাদল,

তবু দূরে দূরে বাজে গুরু গুরু শতক মাদল,
উর্ধ্ব আসে মহোজ্জ্বলে অতি দীর্ঘ তুঙ্গ চলচল,
ভাঙি ভাঙি ফেনপুঞ্জ উচ্ছসিয়া উঠে ছলছল ;
এবল তরঙ্গবাত্তে তটপ্রান্তে পড়ে আছাড়িয়া,
ধ্বনি উঠে প্রতিধ্বনি' অকস্মাৎ কাঁপি উঠে হিয়া !
তীব্রবেগে ফিরে যায় জলতলে বিপবীত শ্রোতে,
বাহা পায় টানি লয়, বোধে নাক কত কোন মতে ;
কখনও বা ছই দিকে তীব্রবেগে সংবর্ধি ভীষণ,
আকাশের পানে উঠি বিধারিছে অশনি-নিশ্বন।

সত্যই কি আদিম জাগব !

দ্বিরাত্রি চিরদিন এই মত আছিল সাগর ?
নামে যবে নিশীথিনী অন্তরীক্ষে হুলে কেশভার
আঁচলে আনন ঢাকি, বাম কক্ষে শাস্তিঘট তার ;
হৃৎস্তির মায়াদণ্ড পরশনে লুপ্ত চরাচর,
আঁখি ঢুলে ঢুলে পড়ে সপ্তর্ষি ও স্বর্গের উপর ;
কেহ নাহি চেয়ে দেখে নববধূ লজ্জা-বিকৃষণ,
শ্রুত বাস সংববিত্তে ত্রস্তা নহে স্বপ্ন-নিমগনা,
তখনও কি জেগে থাক ? মহোদধি ! এই জলোচ্ছ্বাস
অনন্ত অক্ষুট নাদে কি কহিছে চির বর্ষমাস ?

আমি বড় ভালবাসিয়াছি,

নীলাকাশ নীল সিন্ধু চুমি আছে তারই কাছাকাছি,
মেঘ ভেলা ভেসে যায়, অন্তরাগে উঁকি মারে চাঁদ,
উবার অঞ্চলতলে স্বর্ণরবি রচে মারামারি।
মধ্যাহ্নের ধর দীপ্তি, গোখুলির পূলকিত বেলা,
আনন্দিত নরনারী সিন্ধুতীরে করে ছেলেখেলা।
বালুক'মন্দির রচি, শুভ্রি দিয়া নয়নাভিরাম,
'কমল' 'চপল' দৌঁছে লিখে গেছে আপনার নাম।
যে বাহারে ভালবাসে, মাতা, পিতা, সখা, প্রিয়তমা,
সাথে তারে আনিয়াছে ! জীবনের সার্থক সাধনা !

কথাকলি

শ্রীশরদিন্দু সিংহ

দক্ষিণ-ভারতে মালাবার অঞ্চলে প্রচলিত কথাকলি নৃত্য-সম্প্রদায় আজিও প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রানুসারী নৃত্যাত্মিক অভ্যাসের ভিতর বাঁচিয়ে রেখেছে। এদের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে কেরল-কথামণ্ডল নাম দিয়ে ও-দেশের কবি ভাল্লাথোল আজ চার বৎসব 'হ'ল বে নৃত্য-বিদ্যালয় খুলেছেন, আমি গত জুন মাসে তারই ছাত্রলব্ধ হই।

স্বদেশ থেকে দেড় হাজার মাইলের দূরত্ব বেলপথে অতিক্রম করে যখন ও-দেশে গিয়ে পৌঁছেছিলাম তখন শেষ রাত্রি। রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় ছ-সাত মাইল মোটর-বাসে করে গিয়ে কেরল-কথামণ্ডলে পৌঁছতে হয়। মোটর-বাসের অপেক্ষায় প্রায় ঘণ্টা-তিনেক স্টেশনে বসে কাটাতে হয়েছিল। সেই সময়ে পথশ্রম ও ঘূমের ব্যাঘাত খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন ও-দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য চোখের সামনে ছুটে উঠেছিল তখন সেই অভাবিতের রূপে মোহিত হয়েছিলাম ও নিজের ক্লান্তি ভুলে যেতে দেরি লাগে নি। জায়গায় জায়গায় আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে হুবহু মিল দেখতে গেবে একটা নিগূঢ় আনন্দ উপভোগ করে-ছিলাম। ও-দেশবাসীদের অনেকের মুখে শুনেছি যে যখন মহাত্মা গান্ধী ও-দেশে গিয়েছিলেন, তখন ওদের স্তম্ভাক্রম, অর্থাৎ প্রাচীন শাসনকর্তা, মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করায় উনি বলেছিলেন এ ত স্বর্গ। সত্যি ও-দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মর্যাদা বক্ষা করতে এক কবির লেখনীই সমর্থ। ও-দেশের ছোট-বড় বৃক্ষবহুল পাহাড় বর্ষাঋতুর সুতা দিয়ে গাঁথা আঁকাবাকা সবুজ ধানের ক্ষেতের মালা গলার ছলিয়ে এবং কোথাও বৃক্ষশূন্য তৃণচ্ছাদিত যেন সবুজ গালিচা বিছান সুপ্রশস্ত উন্নত ভূমি কোলে কোলে আম কঁটাল ও সুপারি গাছের বাগান-বেরা টালির বাড়িকে নিয়ে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ করেছে, সেটা কবি এবং শিল্পীর লেখনী ও তুলিকাকে অকুরন্ত খোবাক দিতে সমর্থ। ও-দেশের

ধানের ক্ষেতে কৃষক-বমণীরা তাদের নিরাবরণ সুপুষ্ট বক্ষ নিয়ে শস্তভারনত ধানগাছের বক্ষিম ভঙ্গীর ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে খুঁকে পড়ে সারাদিন কাজ করেছে যেন রূপদক্ষের তুলিকার অপেক্ষা করেই আনন্দের চিরস্থায়ী প্রতীকে রূপান্তরিত হবার জন্তে।

আমাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয় যখন দেখি ও-দেশের লোকেরা প্রাচীন ভারতের আদর্শ জীবনযাত্রা আজিও মেনে চলেছে। আমার এক মাসীমা বলেছিলেন, যে, বাঙালীর জিভ, স্বদেশ ছাড়া অন্য কোথাও থেয়ে তৃপ্তি পায় না, এ-কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম।

ও-দেশে কথাকলি ছাড়াও আবও কতকগুলি জনপ্রিয় নৃত্য প্রচলিত আছে, যেমন, “কুমি” “কাইকটুটেলি” “আটম্, তুলাল,” “মোহিনী আটম্” ইত্যাদি। প্রথমোক্ত দুইটি ওখানকার বালিকা-বিদ্যালয়েও শেখান হয়। অবশ্য শ্রেষ্ঠতায় কথাকলি এদের সকলের অগ্রণী। কথা অর্থাৎ গল্প এবং কলি অর্থাৎ নৃত্যাত্মিক। কথাকলি অর্থে আখ্যানের নৃত্যাত্মিক কবা। এদের সমস্ত অভিনয়ের আখ্যান-বস্ত্র হচ্ছে পুবাং, এবং নৃত্যরত অবস্থায় কোন রকম কথা না-বলে হাতেব মুদ্রাব দ্বারা কথোপকথন ও চোখ, জ, মুখের ভাবভঙ্গী সাহায্যে অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঠিক কবে থেকে এই সম্প্রদায়ের অভিনয় চলে এসেছে, সে-কথা কেউ স্মরণ কবতে পারছেন না। কেউ কেউ বলেন, “কুড়ী-আটম্” বলে এক সম্প্রদায়ের অভিনয় মন্দিরে শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তারই একটি পরিবর্তিত ও পবিত্রীকৃত সংস্করণ এই কথাকলি। কুড়ী-আটম্ আজকাল খুবই বিবল, নেই বললেই চলে।

কোন স্থানগত ও জাতিগত বাধা না-থাকায় কথাকলি জনপ্রিয় ও দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে। কথাকলি মন্দির থেকে যে জনস্বভাষ করেছে তাব পক্ষে সাক্ষ্য-দেয় এদের ঐকতান বাণ্য এদের ঐকতান বাণ্য থাকে দুই

জন গায়ক, একটি মাদল, একটি চণ্ডা (ঢাক), এক জন গায়কের হাতে একটি কাঁসর ঘণ্টা ও আর এক জনের হাতে এক জোড়া করতাল। অভিনয়কালে এই সঙ্গীত ও বাদ্য সঙ্গিরে আরতির ভাব প্রকাশ করে।

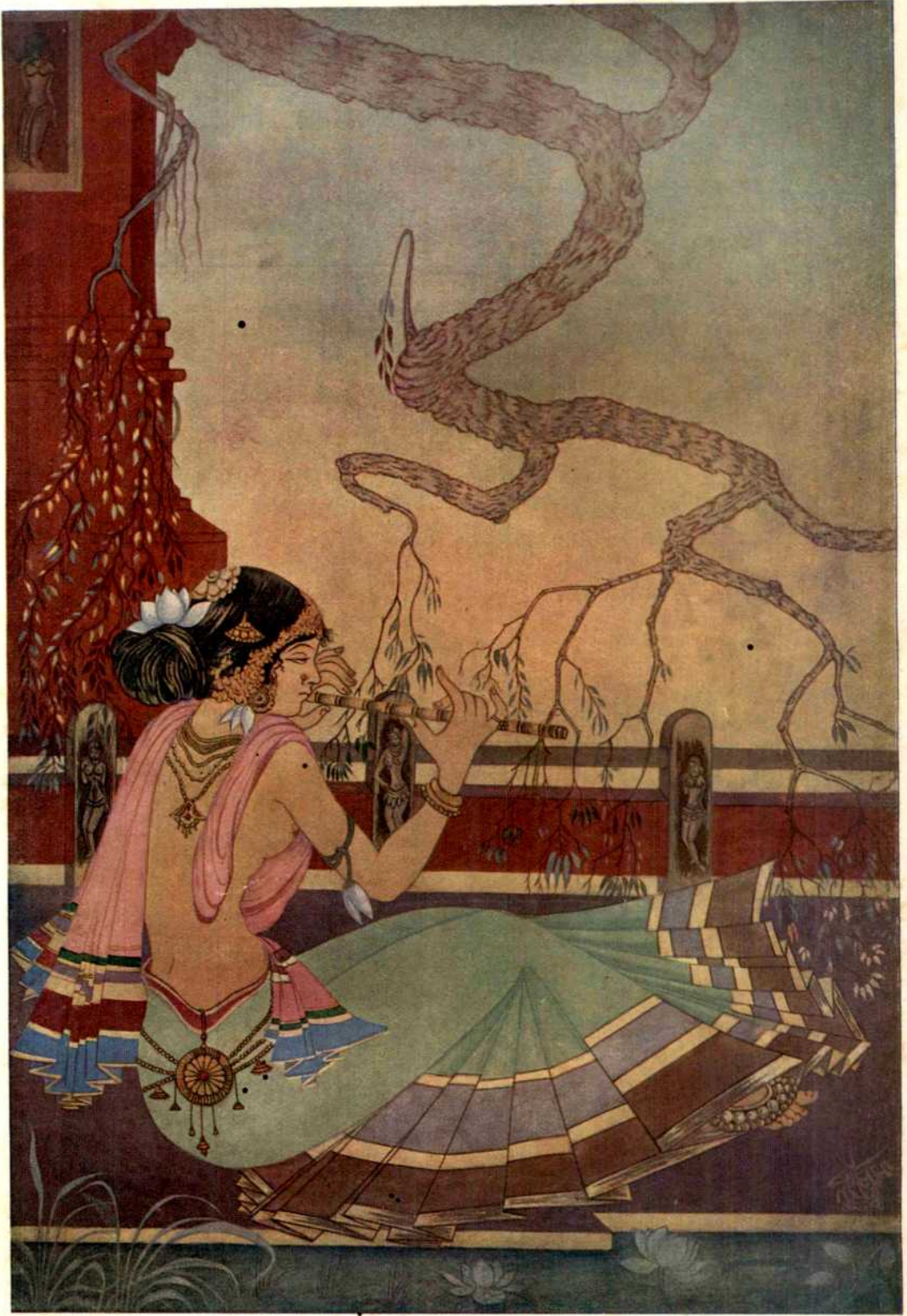
বাজার মত খোলা জায়গায় সামিয়ানার নীচে অভিনয় হয়। গায়কেরা থাকে অভিনেতাদের পেছনে; সামনের দিকে দু-ধাবে ছটা, সময়ে সময়ে একটি প্রায় চাব ফুট উঁচু পিতলের প্রদীপে নারকেল-তেল ও তুলোর পলতে জলতে থাকে। এই আলোর হলদে আভা ও কম্পন গিল্টি-কবা গহনা ও বিচিত্র বর্ণের পোষাককে জমকালো করে তুলতে ও বহুবর্ণ-রঞ্জিত মুখের সজ্জা-রচনাকে দীপ্তিমান করে তুলতে সহায়ক রূপে বিশেষ উপযোগী বলে ব্যবহাব করা হয়। আলোর ঠিক পরেই দু-জন সুবেশধারী ব্যক্তি একখানি বিচিত্র বর্ণের পর্দা ধরে থাকে। একে যবনিকা-রূপে ব্যবহাব করা হয়। নারীরা ত্রিধারে অভিনয় হয়ে থাকে। আজকাল এ-প্রথা শিথিল হয়ে এসেছে। স্থানীয় জমিদার কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা আহুত হয়ে গিয়ে এঁরা অভিনয় কবে থাকেন, সমবে সময়ে নিজেদের উদ্যাগেও কবে থাকেন।

অভিনয়ের দিন সম্ভাব সমবে ঢাক পেটান হয়। এই ঢাকের শব্দ শুনলে লোকেবা বুঝতে পারে, যে, সেদিন রাত্রে কথাকলির অভিনয় হচ্ছে এবং লোকের মুখে মুখে বহু দূর দূর গ্রামেও খবর ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢাক-পেটানকে “কেলীকটু” বলে। এই হ’ল এদের বিজ্ঞাপনের প্রথা। তার পর বাজি প্রায় নটা-সাত-নটার সময় প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে পর্দার পেছনে বন্দনার প্লোক-আবৃত্তি, ও মাদল, চণ্ডা, কাঁসর ঘণ্টা ও করতালের বাদ্য সহকাবে এক নৃত্য কবা হয়। একে “তচেম” বলে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নটরাজকে বন্দনা কবা। তার পর পর্দা সরিয়ে “পুড় পাড়” নামক আব একটি নৃত্য করা হয়, পুড়পাড় অর্থে সমগ্র কাজের সূচনা। এর পর করতাল ঘণ্টা মাদল ও চণ্ডা সহকারে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে একটা গান গাওয়া হয়। একে “মেলাপদ” বলে। “মেলা” অর্থাৎ চাকবজান ও “পদ” অর্থাৎ গান। “মেলাপদ” অর্থে ঢাকের সঙ্গে গান গাওয়া। এই সময়ে শুধু গায়ক

এবং বাদ্যকরদের স্বীয় কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ দেওয়া হয় বলে মনে হয়। এই “তচেম” থেকে “মেলাপদ” পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। আজকাল সব সময়ে এসব না করে একেবারে অভিনয় আরম্ভ করা হয়ে থাকে।

রামায়ণ ও মহাভারতের সমস্ত উপাখ্যান গীতের উপযোগী ভাষায় রূপান্তরিত করা আছে। এই কার্যে ত্রিবাঙ্কুর-রাজকুমারদের মধ্যে কেউ কেউ উদ্যোগী হয়ে স্বীয় রচনার দ্বারা সাহায্য করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। গায়কেরা অভিনয়ের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত গান গেয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন এবং এই গানের কথা অমুসরণ করে অভিনেতারা হাতের মুদ্রার দ্বারা কথোপকথন করেন। সঙ্গীতের ধরণ কতকটা বাংলার কীর্তনের মত। একই পদকে অনেক ক্ষণ ধরে বিভিন্ন সুরে গাইতে হয়। কারণ, মুদ্রার সাহায্যে শোঁটকে বলতে যতটা সময়ের দরকাব তার দিকে নজর রাখতে হয়েছে। এদের এক-একটা দৃশ্য প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট ধরে থাকে। প্রত্যেক দৃশ্যের শেষের দিকে দশ-পনের মিনিট গান বন্ধ থাকে, শুধু বাজনা বাজতে থাকে। সেই সময়ে অভিনেতাকে স্বীয় ভূমিকা, মূল আখ্যানকে অক্ষুণ্ন রেখে, স্বাধীন ভাবে অভিনয় করতে দেওয়া হয়। এই সময়ে অভিনেতারা প্রায়ই কোন যুদ্ধ অথবা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকেন। সুখ দুঃখ কিংবা বীরত্ব প্রভৃতি ভাব প্রকাশের সময়ে সুর যাতে অভিনেতাকে সাহায্য কবতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য আছে। এদের সঙ্গীতে সুরের গমক, হুকার ও স্বব-বিত্তাস বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

অভিনয় ও নৃত্য ছটাকে আলাদা ভাবে দেখলে বুঝবার সুবিধা হবে। অভিনয়ের ভেতর প্রথমতঃ হচ্ছে চোখ জ ও ঠোঁটের সাহায্যে নব রস, যথা—আদি, বীর, কল্প, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়, বীভৎস, রোদ্ভ ও শাস্ত, এদের অভিনয়। শেষোক্ত রসের অভিনয় খুবই বিরল। এই রসের অভিনয়ের পেছনে গভীর রসানুভূতি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও দীর্ঘ অভ্যাস বর্তমান, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর অভিনয় না দেখলে বোধান শূন্য। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে হাতের মুদ্রার দ্বারা কথোপকথন। নৃত্যের সময় অভিনেতার পক্ষে কথাবলা সম্ভব নয় বলে এই



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

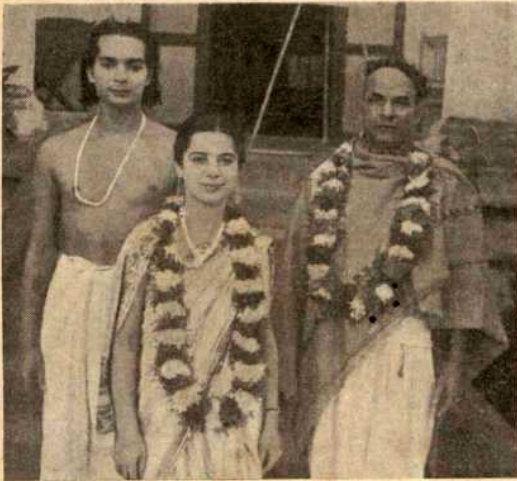
প্রথম প্রয়াস
শ্রীনীলমা বিশ্বাস



কথাকলির অভিনেতাগণ

প্রথার উদ্ভব। হাতের আঙুলকে নানান রকমে সাজিয়ে নিয়ে হাত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা হয়।

এই রকম প্রায় চারি শত মুদ্রা কথাকলি অভিনয় কালে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মুদ্রার সাহায্যে সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত অভিনীত হচ্ছে, এই বললেই বুঝতে পারা যাবে একতথানি সফলতা লাভ করেছে। এর দ্বারা এমন কি



উদয়শঙ্কর, সিম্কা ও কথাকলির আচার্য্য নাগুজি

সাহিত্যিক রসও যে কতখানি ব্যক্ত করা যেতে পারে তার একটা উদাহরণ না-দিয়ে থাকতে পারলাম না। যেমন, নাগক অভিনয়-প্রসঙ্গে নাগিকাকে জিজ্ঞাসা করছেন,

“তোমার মুখের সৌন্দর্য্য দেখে চন্দ্র লজ্জিত, তোমার সুসজ্জিত অলকগুচ্ছ মুখের ওপর এসে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন মধুলোভী ভ্রমর পদ্মের ওপর শোভা পাচ্ছে, মত্ত গজের গমনভঙ্গীর মত তোমার গতি, এইরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নারী তুমি বনে বিচরণ করছ, তুমি কে?”

আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনেতার মুদ্রার দ্বারা এই রকম কথা বলার সময়ে যে কথা যে রসাত্মক তার সঙ্গে সেই রসের অভিনয় করে সেটাকে সপ্রাণ করে তোলেন।

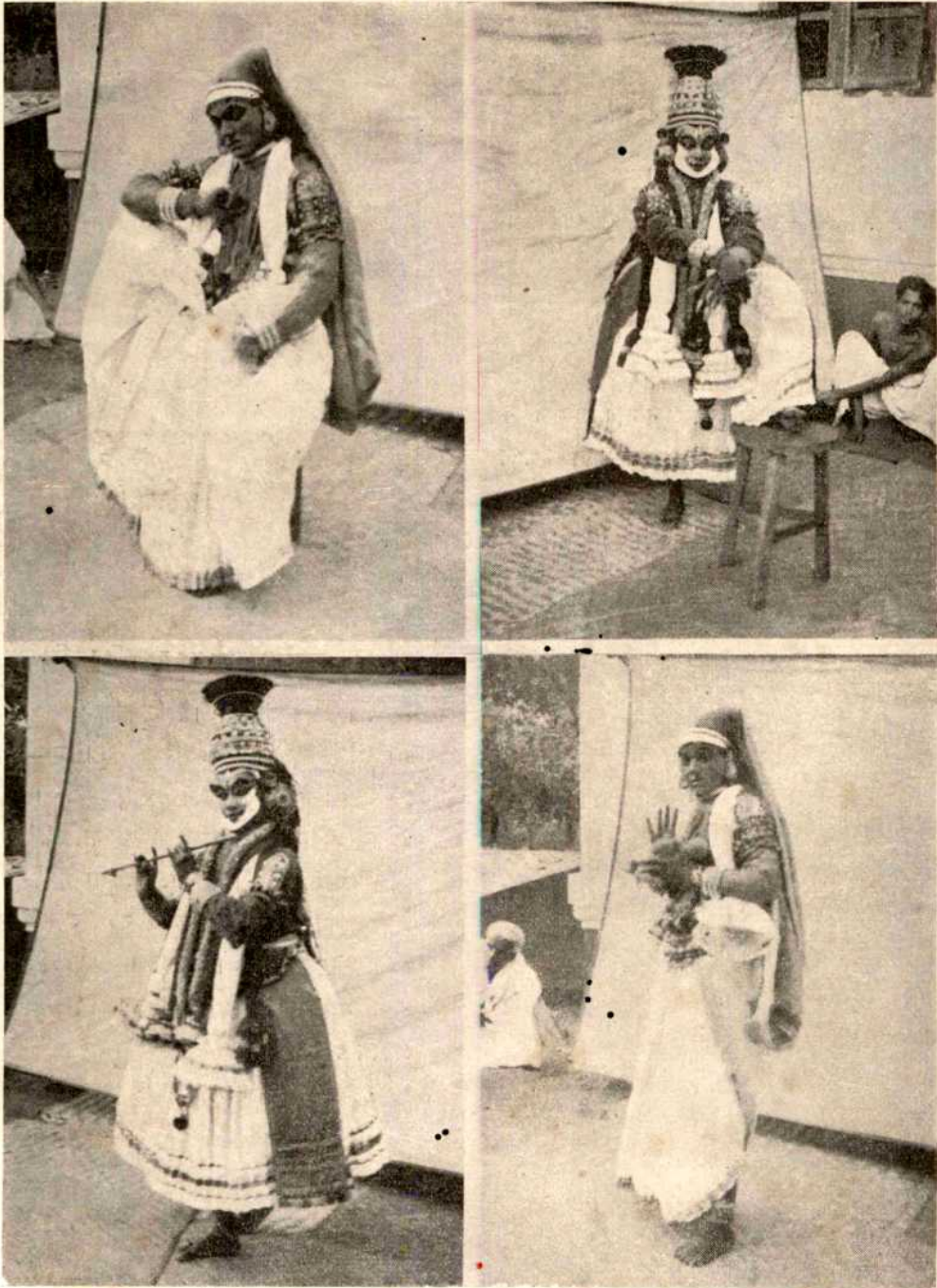


দ্রীলোকের বেশে কথাকলির অভিনেতা

১। পতাকা, ২। ত্রিপতাকা, ৩। কর্তরিমুখম, ৪। অর্দ্ধচন্দ্র, ৫। এলারম, ৬। মুকুতু, ৭। মুষ্টি, ৮। শিখরম, ৯। কপিখম, ১০। কটাকামুখম, ১১। স্থচিমুখম, ১২। মুদ্রা, ১৩। সর্পশীর্ষ, ১৪। মৃগশীর্ষ, ১৫। অঙ্কলি, ১৬। পল্লবম, ১৭। মুকুরম, ১৮। ভ্রমর, ১৯। হংসম, ২০। হংসপক্ষম, ২১। বর্দনম, ২২। মুকুলম, ২৩। উর্গভম, ২৪। কটক। এই চব্বিশটি মূল মুদ্রা। এদের সংমিশ্রণে এবং ব্যবহারের প্রকারভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা হয়।

নৃত্যের ভিতর প্রথমতঃ লালিত্যপূর্ণ দৈহিক ভঙ্গীর বাহুলা আধুনিক যে-কোন ভারতীয় নৃত্যসম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গেছে এবং এদের তালের হিসাবের জটিলতার সমকক্ষ লক্ষ্যের কথক-সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত তাল ছাড়া আর কোথাও নাই। কিন্তু কথক-সম্প্রদায়ের নৃত্যে কমনীয় দৈহিক ভঙ্গীর যথেষ্ট অভাব আছে। এদের ভঙ্গিমার ভেতর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা সুসংযত ও দৃঢ় ভাব। এই ভাবের ব্যঞ্জনার

କଥାକଳି-ଅଭିନୟର ଛିତ୍ର





আটম তুলাল পদ্ধতিতে অভিনয় ও নৃত্য

দ্বারা সমস্ত ভঙ্গিমা যুগ্মিত এবং দক্ষিণ-ভারতের নৃত্য-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ভাস্কর্যের রচয়িতা যে এদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, সেটা অস্পষ্ট নয়। এঁদের নৃত্য-রচয়িতারা হুকৌশলে লাকান, বুঁকে পড়া প্রভৃতির সাহায্যে দৈহিক ভঙ্গিমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে ক্ষান্ত হন নি। ফণায়ুক্ত সাপের ডাইনে বাঁয়ে দোল খাবার ভঙ্গীর অনুকরণে একটি নৃত্যভঙ্গীর রচনা, ও অভিনয়-প্রসঙ্গে ময়ূরের বর্ণনা দেবার জন্য উক্ত পক্ষীর চোখ-মুখের হাবভাব ও নৃত্যভঙ্গীর অনুকরণে নৃত্যের সৃষ্টি—এঁদের সৃষ্টি শক্তির পরিণত অবস্থার রসানুভূতি ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা কোথায় পৌছেছে, এইগুলি তার প্রমাণ দেয়। মুদ্রাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত মন্ত গজের গমনভঙ্গীর যে অভিনয় সেটাও উল্লেখযোগ্য। না দেখলে এ-সবের সম্পূর্ণ রস উপভোগ করবার অল্প কোন চেষ্টা নিফল। এদের নৃত্যে ব্যবহৃত তালের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ, যথা—চম্পরা, চম্পা, পাঞ্চাহারি,

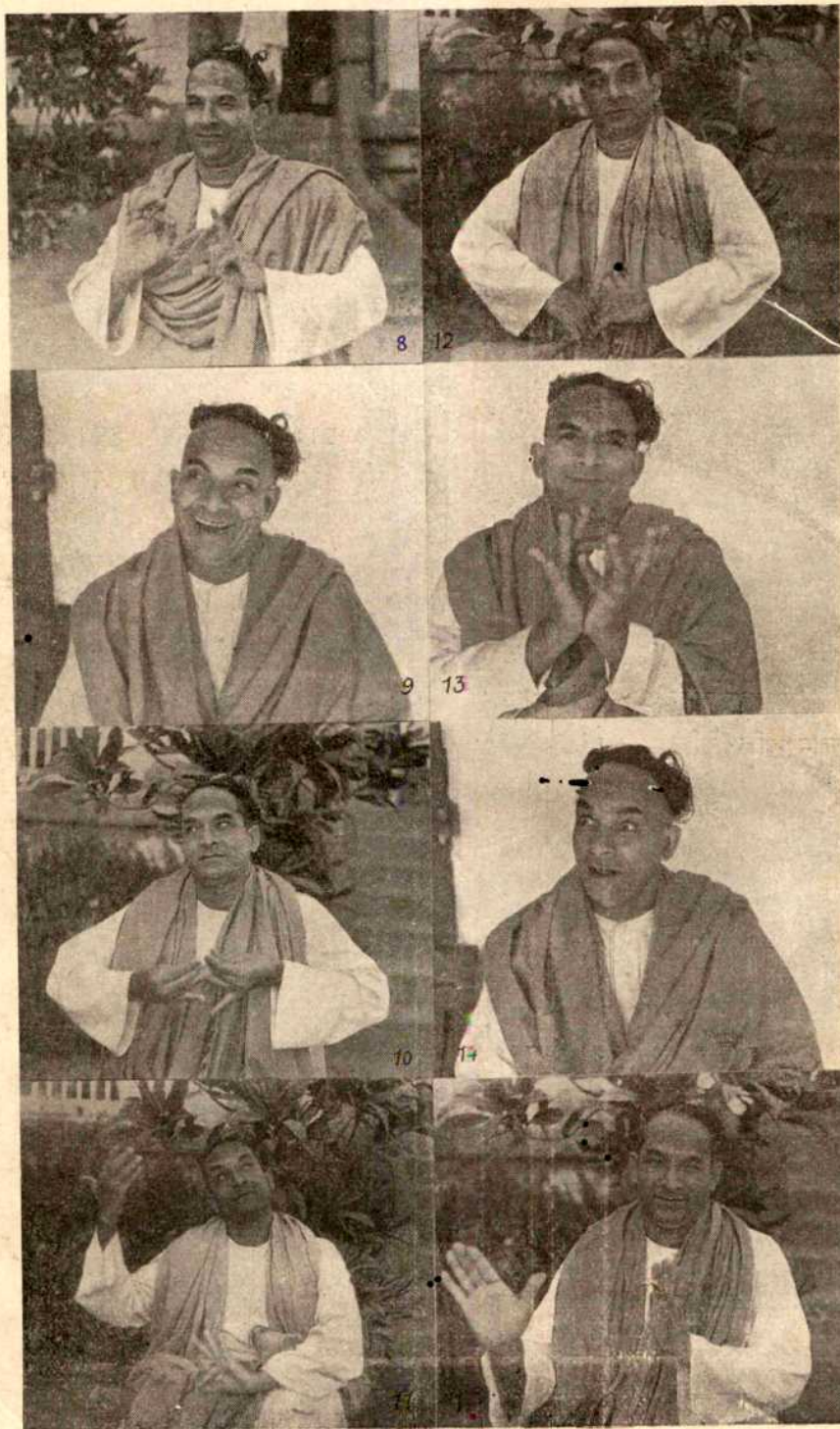
তৃপটা ও আরন্দা। প্রত্যেক তালের তিন-চার রকম পরনের উপর গৎ-বাঁধা নৃত্য আছে। এগুলোকে এঁরা “কালাসম্” বলেন। অভিনয়কালে আগাগোড়া মাদল, ঢোঁ ও করতালের সাহায্যে তাল বাজতে থাকে। তারই কোঁকে কোঁকে মুদ্রার দ্বারা এক-একটি পদকে অভিনয় করে এই রকম একটি “কালাসম্” দিয়ে সেটাকে শেষ করা হয়, একে “খণ্ড” বলে। নর্তকরা যখন সংবত ও দৃঢ়পদক্ষেপে তালের নানান ছন্দে কখনও দ্রুত ও কখনও চিমা লয়ের ওপর নাচতে থাকেন, তখন তাঁদের তালজ্ঞান ও অঙ্গসঞ্চালনের দক্ষতা যে কতখানি সাধনাসাপেক্ষ, তার আভাস সহজে সৃষ্টি হয়। পুরুষের নৃত্যে ও স্ত্রীর নৃত্যে পার্থক্য আছে। পুরুষরাই স্ত্রী-বেশ নিয়ে নৃত্য করছেন। স্ত্রী এবং পুরুষের একসঙ্গে অভিনয়ের



রাক্ষস-বেশে কথাকলির অভিনেতা

প্রথা প্রচলিত নাই। পূর্বে ছিল, এবং সেটাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হচ্ছে।

କଥାକଳିତେ ବିଭିନ୍ନ 'ରସେ'ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି





। কথাকলির যোদ্ধা

এদের ব্যবহৃত পোষাক ও চূণ এবং চালের গুঁড়ার সাহায্যে মুখের রচনা একটি প্রধান অঙ্গ ও খুবই সময়-সাপেক্ষ। পূর্বেই বলা হয়েছে এঁদের আখ্যানবস্তু হচ্ছে পুৰাণ, অর্থাৎ দেবতা ও রাক্ষসদের কাহিনী। এঁদের নায়ক-নারিকাকে সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতি গুণের বিচারী হিসাবে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা। প্রথম হচ্ছে দেবতা, মুখের রং লালচে হলদে, ঠোঁটে সিঁহুর, চোখ ও জুঁজ দিয়ে ফোটান এবং কানের কাছ থেকে আরম্ভ করে দুই গালের ওপর দিয়ে এসে চিবুক ও ঠোঁটের মাঝামাঝি জায়গায় মেশা, চূণ ও চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি এক দেয়াল তুল দেওয়া থাকে। ওঁদের কাছ থেকে জেনেছি, রসাতলিনয়কালে মুখের অনাবশ্যক

অংশকে আবৃত রেখে মুখকে কাস্তিমান ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং আধুনিক রঙ্গমঞ্চের “স্পট” লাইটের ব্যবহারের অর্থও এতে আছে। এই রকম চূণ ও চালের গুঁড়ার সাহায্যে মুখের ওপর নানান রকম নক্সায় ভাগ ক'রে রাক্ষস প্রভৃতি তমোগুণ-বিশিষ্ট ভাবকে রূপ দিয়েছে। বিশেষ ক'রে রাক্ষসের এই রকম মুখ-রচনা খুবই সফল হয়েছে। দ্বিতীয় “পাচো,” সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। মুখের রং সবুজ, ঠোঁটে সিন্দূর, চোখ ও জুঁজ দিয়ে ফোটান এবং ঐ রকম দেয়াল। তৃতীয় “কাতি” রজোমিশ্রিত তমোগুণবিশিষ্ট, যেমন রাবণ, কীচক



রাবণ-বেশে কথাকলির অভিনয়

প্রভৃতি। চতুর্থ “তাচি” ঘোর তম। তিন শ্রেণীতে একে ভাগ করা হয়, যেমন, বীভৎস, রোদ্র, শাস্ত। বীভৎস হচ্ছে কীরাত ও রাক্ষসী। রোদ্র,—দুর্যোধন, দুঃশাসন ও বকাসুর প্রভৃতি। শাস্ত হচ্ছে হনুমান। পঞ্চম, “মিহু

কিয়াও" স্ত্রী-বেশ ও মহর্ষি। এদের মুখের রং লালচে হলদে, ঠোঁটে সিন্দূর, চোখ ও ক্র কাজল দিয়ে ফোটান এবং স্বাভাবিক। বস "নিমান"। এ হচ্ছে যারা ক্ষতবিক্ষত শরীরে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়, যেমন—শূর্ণনখা প্রভৃতি। এই মুখোস জাপান কিংবা জাভার মুখোসের মত স্থায়ী নয়। প্রত্যেক বার অভিনয়ের সময়ে নূতন করে

তৈরি করতে হয়। এতে খুবই সময় লাগে। তবুও মুখ থেকে পৃথক কোন স্থায়ী মুখোসে ইহা রূপান্তরিত হয় নাই। কারণ, রসাতিনয়ের জন্ত মুখের পেশীর সঞ্চালনের কোন বাধা না দিয়ে এই রকম মুখাবরণ তৈরি করতে হয়েছে। এদের ব্যবহৃত পোষাক ও গহনা ছবিতে বেশী স্পষ্ট হবে।

মহিলা-সংবাদ

রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজবাড়ে এক জন বিখ্যাত কর্ম্মী ও সমাজসেবিকা। তিনি গোয়ালিয়রের কাউন্সিল অব রিজেন্সীর সৈন্ত-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সহধর্ম্মিণী। নারীজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। তিনি এই জন্ত গোয়ালিয়র ও বাহিরের অনেকেরই আদর্শস্থানীয়। সামাজিক কুসংস্কার ও দুর্নীতি-নিবারণেও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব আছে।



রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজবাড়ে



ডক্টর শ্রীমতী শান্তা সপ্তর্ষি

ডক্টর শ্রীমতী শান্তা সপ্তর্ষি তৃতীয় এম্-বি, বি-এস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সর্বপদক লাভ করিয়াছেন।

২৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাক্ষ্যের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এপনি মুখের হোলো অধীর মর্ম্মর কলরবে ।
বৎসে, তুমি বৎসরে বৎসরে
সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে,
আমাদের দূত হয়ে তোমার কণ্ঠের কলগান
উৎসবের পুষ্পাসনে বসন্তেরে করেছে আহ্বান ॥

নিষ্ঠুর শীতের দিনে গেলে তুমি কণ্ঠতনু ব'য়ে
আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত আশীর্বাদ ল'য়ে ।
আশা করেছি মনে মনে
নব বসন্তের আগমনে
ফিরিয়া আসিবে যবে লবে আপনার চিরস্থান,
কানন-লক্ষ্মীরে তুমি করিবে অনিন্দ-অযাদান ॥

এবার দক্ষিণবায়ু ছুঁথের নিঃশ্বাস এল ব'হে ;
তুমি তো এলে না ফিরে ; এ আশ্রম তোমার বিরহে
বীথিকায় ছায়ার আলোকে
সুগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে
কহিছে নির্ঝকবাণী বৈরাগ্য-কঙ্কণ ক্রান্ত হয়ে,
তাহারি রণন-ধ্বনি প্রান্তরে বাজিছে দূরে দূরে ॥

শিশুকাল হ'তে হেথা স্মৃতে ছুঁথে ভরা দিনরাত
করেছে তোমার প্রাণে বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত ।
কাশের মঞ্জরী-শুভ্র দিশা ;
নিস্তরু মালতীঝরা নিশা ;
প্রশান্ত শিউলি-ফোটা প্রভাত, শিশিরে ছলোছলো ;
দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্যাস্তের রশ্মি জলোজলো ॥

এখনো তেমনি হেথা আসিবে দিনের পরে দিন,—
তবুও সে আজ হ'তে চিরকাল র'বে তুমিহীন ।
ব'সে আমাদের মাঝখানে
কভু যে তোমার গানে গানে
ভরিবে না স্মৃথ-সন্ধ্যা, মনে হয় অসম্ভব অতি,
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে প্রমাণ করিবে সেই ক্ষতি ॥



শ্রীমতী রমা কর

বারে বারে নিতে তুমি গীতিশ্রোতে কবি-আশীর্বাদী,
তাহারে আপন পায়ে প্রণামে ফিরায়ে দিতে আনি' ।
জীবনের দেওয়া নেওয়া সেই
ঘুচিল অস্তিম-নিমেয়েই ;
মেহোজ্জ্বল কল্যাণের সে সম্বন্ধ তোমার আমার
গানের নিশ্চিন্তা সাথে নিয়ে গেলে মরণের পার ॥

হায় হায় এত প্রিয় এতই দুর্লভ যে-সঞ্চয়
একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয়।
হে অসীম, তব বক্ষোমাঝে
তার বাখা কিছুই না বাজে,
সৃষ্টির নেপথ্য সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায় ;—
শুধু-বীণা রঙ্গগৃহে মোরা বৃথা করি হায় হায় ॥

হে বৎসে, যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দভাণ্ডারে
তারি স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে চারিধারে।
আমাদের আশ্রম-উৎসব
যখনি জাগাবে গীতরব
তখনি তাহার মাঝে অশ্রুত তোমার কণ্ঠস্বর
অশ্রুত আভাস দিয়ে অভিব্যক্ত করিবে অন্তর ॥*

১৮ মাঘ, ১৩৪১

* শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতশিক্ষয়িত্রী পরলোকগতা শ্রীমতী রমা করের উদ্দেশে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি “বিখ্যাতরতী নিউন” পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। রমা তাহার বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অন্ততমা কন্যা ও তাহার মেহতাজন ছিলেন, ডাক-নাম ছিল ‘মুটু’।

দিবাস্বপ্ন

শ্রীসীতা দেবী

দূরের গির্জার বড়িতে চং চং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল।
মিনি আর সন্ত এত ক্ষণ ছটফট করিয়া সবে ঘুমাইয়া
পড়িয়াছে। সন্ধ্যা হইতে এমন ভীষণ গুমোট হইয়াছিল
যে মানুষ সিদ্ধ হইয়া বাইবার জোগাড়। কোথাও
হাওয়ার লেশমাত্র নাই। বাতাস থাকিলে, সামনের এক
ফালি বারান্দাতে বসিলে, গা বেশ জুড়াইয়া যায়। বাড়ির
ভিতর ঐটুকু জায়গা খালি ফাঁকা। আর বাড়ি বলিতে ত
মস্ত বাড়ি, ১০০ টাকা মাহিনা বার, সে কেবলীবাবুর
আর কত বড় বাড়ি ভাড়া করিবার ক্ষমতা হইবে? দুই
খানি থাকিবার ঘর, ঐ ছোট বারান্দাটুকু, ইহাই
বিনোদিনীর বাড়ি। কলের ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি এমন
ছোট ছোট যে পুতুলের ঘর বলিয়া বোধ হয়। বাহা হোক,
তাহারা চারিটি প্রাণী, কোনোমতে ঠাসাঠাসি করিয়া
ইহারই ভিতর কুলিয়া যায়। প্রকাশ বাহির হয় না।
নটায়, আর বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার পর, কাজেই বাড়ির
সঙ্গে সম্পর্ক তাহার আটন ঘণ্টার বেশী নয়। সন্ধ্যা
ছ-সাত বৎসরের হইয়াছে, সামনের জানুয়ারিতে তাহাকে
স্কুলে ভর্তি করিবার কথা। সেও চলিয়া গেলে বাকি
থাকিবে বিনোদিনী আর মিনি। সুতরাং ইহার চেয়ে

বেশী জায়গায় তাহাদের প্রয়োজনই বা কি? আর প্রয়োজন
থাকিলেই বা হইতেছে কি? কোনো কালে অবস্থার উন্নতি
হইবার আশা বিনোদিনী ছাড়িয়াই দিয়াছে।

তাহার বিবাহ হইয়াছে ন-দশ বৎসর আগে। তখন
প্রকাশ মাহিনা পাইত মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এত দিন
ধরিয়া দুই-চার টাকা করিয়া বাড়িয়া এখন ১০০
টাকা হইয়াছে। তেমনি প্রকাশের বয়স ত বসিয়া নাই,
তাহাও বাড়িয়াছে। বিনোদিনী বড়ী হইতে চলিল,
তাহারই গেল মাসে পচিশ পুরিয়া গিয়াছে। প্রকাশ
তাহার চেয়ে বছর-দশের বড়। বাঙালীর স্বাস্থ্য ত?
কত দিনই আর পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে পারিবে?
চল্লিশ বৎসরে পা দিতে না-দিতেই ত তাহাদের চোখের
দৃষ্টি কমিয়া যায়, পিঠ কুঁজা হইয়া পড়ে, হাজার ব্যাধি
আসিয়া জোটে! যা উন্নতি করিবার তাহা এই ত্রিশ
হইতে চল্লিশের মধ্যে।

এমন সময় গির্জার বড়ির শব্দে তাহার চিন্তাসূত্র
ছিন্ন হইয়া গেল। ওমা, আটটা বাজিয়া গেল,
এখনও মানুষের ফিরিবার নাম নাই। কি আক্কেল
বলিহারি বাই। স্বীলোক বলিয়া তাহারা কি

জানোয়ারেরও অধম? তাহাদের সময়মত খাওয়া-শোওয়া কিছুই প্রয়োজন নাই। যখন কর্তার মজ্জা হইবে, তখন তিনি ফিরিবেন এবং খাইয়া-দাইয়া স্ত্রীকে কৃতার্থ করিবেন। তাহার পর সে নিজে খাইবে, হেঁসেল তুলিবে, তাহার পর শুইতে যাইবে।

কিন্তু স্বামী বাড়ি না ফিরিলে বেশ প্রাণ খুলিয়া তাহার উপর রাগও করা যায় না যে? ফুর্টি করিয়া ঘেরি করিতেছে কি? আহা তাহাই যেন হয়। যে স্থানে তাহাদের বাস, শহর না ত মাল্লখেকো রাক্সন। ব্যাধি ত হাজার রকমের বৎসর-ভোর লাগিয়াই আছে, তাহার উপর যমের আর এক নূতন দূত হইয়াছে এই মোটরকার আর বাস্‌গুলি। খবরের কাগজ খুলিলেই হইল, দুইটা কি একটা এই খবর চোখে পড়িবেই পড়িবে। হাজার সাবধান মাল্লখ হোক, কখন কি ঘটে, বলা যায় কি? ভগবান না-করুন, চের কষ্ট সে সহিবাছে, স্বামী পুত্রের মুখ চাহিয়া আরও সহিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াই আছে, কিন্তু ঐগুলি বাদে।

পুরুষমানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, মাঝে মাঝে একটু ফুর্টি করিবার তাহাদের প্রয়োজন হয় বইকি? বিনোদিনীর অত্যাচার হয় ঘটে, কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা এমন কিছু দোষের নয়। সেও সারাদিন খাটে, ঘর ছাড়িয়া কোথাও নড়িতে পার না, লীলনে তাহার কোনোই বৈচিত্র্য নাই, দুশ্চিন্তার ভারে জীবন হইতে সব সৌন্দর্য, সব আনন্দ তাহার মুছিয়া বাইতে বসিয়াছে। প্রকাশ সে-কথা একবার ভাবিলেও পারে—কিন্তু বাংলা দেশে মেয়েমানুষ সম্বন্ধে কে আবার কবে এত ভাবনা ভাবিতে যায় বল? একটা আচ্ছ, সেটা না থাকিলে আর একটা আসিবে, এই ত? বিনোদিনীই মেজাজটা অনেকখানি কোমল হইয়া আসিয়াছিল, দুর্ঘটনার ভাবনার, উহা আবার ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

ঘরের ভিতর নিদ্রিত সন্ত সঙ্কোরে পা ছুঁড়িয়া মিনিকে লাগাইয়া দিল। মিনি অ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বাবান্দা হইতে উঠিয়া আসিয়া চাপ্‌ড়াইয়া চাপ্‌ড়াইয়া মেয়েকে আবার ঘুম পাড়াইয়া দিল। ঠাক্কুণ এখন আগিয়া উঠিয়া বসিলেই হইয়াছিল আর কি?

প্রকাশের সঙ্গে দুইটা কথাও বলিতে দিবে না, ঘ্যান-ঘ্যান করিয়া জ্বালাইয়া মারিবে।

সাদে আটটা হইয়া থাকিবে, বোধ হয়। ঐ ত পাশের বাড়ির মণ্টুর মাঠার পড়াইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। মাগো মা, এত ঘেরি কেন? আপিস হইতে বাহির হইয়া কোথায় গেল এ মাল্লখ? কোথাও যাইবার কথা আছে, তাহাও ত বলে নাই সকালে? আজ আবার মাহিনা পাইবার দিন, সঙ্গে টাকাকড়ি থাকিবে। মাঃ, আর দুর্ভাবনার বোঝা সে বহিতে পারে না, কবে যে তাহার মুক্তি হইবে। ইহার চেয়ে তাহার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়া থাকা ভাল। খাইবার-পরিবার কষ্ট সেখানে হয়ত আরও বেশী হইতে পারে, কিন্তু এত ভাবনা ভাবিতে হইবে না। স্বামী ত সারাক্ষণ চোখের উপর থাকিবে? বিনোদিনীর চোখ দুইটা ছল ছল করিয়া উঠিল, গলাটাও যেন ব্যথায় টন-টন করিতে লাগিল।

সারাটা মাস কি টানাটানির ভিত্তর দিয়াই চলে। মাহিনার টাকাটা হাতে পাইতে-না-পাইতেই ত আগের মাসের বাকী শোধ করিতে অর্ধেকটা ফুরাইয়া যায়। একটা দিনও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, একটা দিনও প্রাণ খুলিয়া আট গুণা পরসা নিজেব ইচ্ছামত খরচ করিবার উপায় নাই। খালি ভাবনা, খালি অনটন, খালি পাই-পরসার দি তাও এত হিসাব করিয়াও যদি কিছু হইত। কোনো দিন যে ইহার শেষ হইবে তাহা ত আর মনে হয় না।

বিনোদিনী বড়লোকের মেয়ে নয়, গৃহস্থ ঘরেরই মেয়ে। তবু তাহার বাপের বাড়ির অবস্থা ইহার চেয়ে খানিকটা সচ্ছল ছিল বইকি? এত কষাকষি করিতে মাকে সে কোনো দিন দেখে নাই। তাহার ত সন্তান মাত্র দুইটা, ভাই-বোনে কিন্তু তাহা বাপের বাড়িতে পাঁচ জন ছিল। দুই বোন তিন ভাই। তা ভালমন্দ সর্বদাই তাহার খাইয়াছে, হেঁড়া ত্রাকড়া পরিয়াও বেড়ায় নাই। ফলপাকুড় যে-সময়কার যা সবই তাহাদের মুখে উঠিয়াছে। পুজার সময় নূতন কাপড় পরিয়াছে, পৌষ-পার্বণে পেট ভরিয়া পিঠাও খাইয়াছে। মা অবশ্য পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকেন নাই কোনো দিন, সংসারের কাজকর্ম সবই করিতেন

একটা ঠিকা-ঝি সম্বল করিয়া। মেয়েরাও তাঁহার বধেই সাহায্য করিত।

তা বিনোদিনীই কি খাটিতে কিছু কল্প করবে? ঠিকা-ঝিও ত তাহার সব সময় জোটে না? কিন্তু দিনের ধরা-বাঁধা চার আনার বেশী বাজার খরচ করিতে কোনো দিন ত পাইল না। ভাল ফল, বা সন্দেশ রসগোল্লা কাহাকে বলে তাহা ছেলেপিলে জানেও না। কালেভদ্রে কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে এ-সব জিনিষ তাহাদের পেটে পড়ে। খেলনা, দু-এক পয়সা দামেরও কখনও সে সখ করিয়া তাহাদের কিনিয়া দেয় না। কাজ কি বাপু? ইহা লইয়া কে আবার কথা শুনিতে যাইবে? পূজার সময় সস্তা ছিটের জামা কিনিয়া দিয়া সে বেচারীদের ভুলায়। বৎসর-কার দিন কি করিয়া আর পুরান স্নাকডা পরাইয়া তাহাদের লোকসমাজে পাঠাইবে? কিন্তু নিজেও নূতন কাপড় এ-পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার অঙ্গে উঠে নাই। পাঁচ বৎসর হইল মা স্বর্গে গিয়াছেন, বিনোদিনীকে নূতন কাপড় পরাইবার কথা কে আর ভাবিতেছে বল? প্রকাশ অবশ্য নিজের জন্তও পূজার সময় কাপড় কেনে না। কিন্তু পুরুষ-মানুষ তাহাকে আপিসে যাইতে হয়, কাজেই মাঝে মাঝে নূতন কাপড়-জামা করাইতে হয় বইকি। সব ক'খানাই তাহার ছেঁড়া নয়। বিনোদিনীর বা দশা তাহা আর বলিয়া কাজ নাই।

গলির দরজার মুহূর্ত্ত শব্দ হইল, ঠুক ঠুক ঠুক। বিশেষ তেজ নাই আজকার আছবানে। বিনোদিনী মনে মনে বকুনিটা মুখস্থ করিয়া নামিয়া গিয়া, হুড়াৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। প্রকাশ বেন না-দেখিয়াই আবার তড় তড় করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

প্রকাশের জানাই ছিল, আজ অভ্যর্থনাটা ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর হইবে না। দশ বৎসর ঘর করিতেছে ত, বিনোদিনীকে তাহার দশবার-পড়া বইয়ের মত জানা হইয়া গিয়াছে। কখন সে কি বলিবে, কোন্ অবস্থায় কেমন ব্যবহার করিবে, সব তার জানা। কিছু লইয়াই তাহার আর কল্পনা খরচ করিতে হয় না। ঋষিরা বুখাই বলিয়া গিয়াছেন স্ত্রী-চরিত্র দুর্জের। বাংলা দেশে অন্ততঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাটা ঠিক নয়।

সে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করিয়া বিনোদিনীর পিছন পিছন উপরে উঠিয়া আসিল। বিনোদিনী চুপ করিয়া বরান্দার দাঁড়াইয়া আছে, প্রকাশ বে একটা মানুষ কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা যেন দেখিতে পাইতেছে না। গভীর মনোযোগ দিয়া সে রাস্তার গাড়ী ও লোক-চলাচল দেখিতেছে।

প্রকাশ আবণ্ড কাছে আসিয়া স্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়া বলিল, “কি গো খেতে-টেতে দেবে? খিদের ত পেট চোঁ-চোঁ করছে।”

বিনোদিনী অসহিষ্ণু ভাবে তাহার হাতখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, “তাই নাকি? এত ক্ষণ বেখানে ছিলে তারো খেতে দেয় নি?”

প্রকাশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “সেটা আমার মশা-বাড়ি নয়?” মুখে হাসি আছে বটে, কিন্তু মনে যে একটু রাগও না-হইতেছে তাহা নয়। এই এক ব্যাপার লইয়া চিরকালই কি রাগারাগি কবিতো হইবে? নব-ত্বাহিত অবস্থায় যে-মান-অভিমানগুলি মধুর লাগে, বেশী-ক্ষিনের পব তাহাই মনে হয় অনাবশ্যক উৎপাত বা স্নাকামী। এত দিনে ~~বিনোদিনী~~ একটু বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়া উচিত, স-সারকে একটু চিনিতে শেখা উচিত। অর্থাৎ সোজা ভাষায় কর্তার খেয়াল-খুশীগুলি নির্দিষ্টবাবে সহিয়া যাওয়া উচিত।

বিনোদিনী ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, “মামার বাড়ি নয় তা ত জানিই। সে কি আর জানতে বাকী আছে? তবু কোথায় যাওয়া হয়েছিল সেটা শুনিই না-হয়?”

প্রকাশ মোড়ায় বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বলিল, “বুঝতেই ত পারছ যে বায়োঙ্কোপে গিয়েছিলাম। সেটা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলে বেশী কি মিষ্টি লাগে?”

“হাঁ কত চমৎকার খবর, মিষ্টি আর লাগবে না?” বলিয়া বিনোদিনী হন-হন করিয়া রাস্তাঘরের দিকে চলিয়া গেল। ঝনাৎ করিয়া শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া স্বামীর জন্ত ভাত বাড়িতে বসিয়া গেল।

‘হুইখানি ঘরের ভিতর একটিতে ছেলেমেয়ে লইয়া বিনোদিনী শোয়, অন্তটাতে প্রকাশ শোয়। ছেলেপিলের

উৎপাতে তাহার যুগ্ম হয় না। সারা দিন ভূতের মত খাটিবে, আবার বাজে উহাদের চীৎকার উপভোগ করিবে, অত সখে আব কাজ নাই। বিনোদিনী অবশু খাটে তাহার চেয়ে বেশী, কিন্তু সে একে মেয়েমানুষ তাহার উপর তাহার খাটুনিতে পরসী আসে না, স্ততরাং তাহাব পরিশ্রমকে কেহ খাতির কবে না।

ভাত বাড়িয়া আনিয়া, প্রকাশের ধবেই আসন পাতিয়া বিনোদিনী জায়গা করিয়া দিল। জ্বালা-জুতা ছাড়িয়া, আপিসের ধুতিখানিও বদলাইয়া প্রকাশ আসিয়া খাইতে বসিল। বিনোদিনী সামনে মাটিতে বসিয়া খাওয়া দেখিতে লাগিল। স্বামীর খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিতে হয়, মাছি থাকিলে মাছি তাড়াইতে হয় এবং হাজার রাগিয়া থাকিলেও তখন রাগের কথা কহিতে হয় না, ইহা বিনোদিনী বাপের বাড়ি হইতেই শিখিয়া আসিয়াছে। মাকে চিরকালই সে এমন ভাবে চলিতে দেখিত।

প্রকাশ যেন ইচ্ছা কবিরাই খাওয়া শেষ করিতে দেয় করিতে লাগিল। এইটুকু সময়ই সন্নিহিত সময়, ইহার পবই বিনোদিনীর মূর্ত্তি বদলাইয়া বাইবে। তবে আজ একটা ব্রহ্মস্ব হাতে আছে, আজ মাহিনাব টাকা তাহার সঙ্গে আছে। বিনোদিনীর টাকা-কটা হাতে করিয়া নাড়িয়াই বা সুখ। ইহার একটা পরসী পর্য্যন্ত সে নিজেব জন্ত, বা নিজের ইচ্ছামত কোনো দিন খরচ করিতে পারে না।

প্রকাশ অবশেষে খাওয়া সারিতে বাধ্য হইল। মুখ-হাত ধুইয়া, বিনোদিনীর হাত হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বিছানায় গিয়া বসিল। এখন তাহার মেজাজটা বেশ আছে। বিনোদিনীর মেজাজটাও যদি ভাল থাকিত ত খানিক মিষ্টালাপ এই সময় করা বাইত। ছেলেমেয়ে দুটাও পাশের ঘরে ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মুক্খিল ত এইখানেই! ছ-জনের মেজাজ এক সময় ভাল থাকটা অতি কালেভাঙে ঘটয়া থাকে। বিনোদিনী মুখ বুজিয়া সারা দিন খাটে বটে, কিন্তু নিজের ক্ষেদ কখনও ছাড়ে না। প্রকাশ স্বাকার না-করুক, সে নিজে জানে যে সে কাহারও বসিয়া খাইতেছে না। অতএব কাহারও অঙ্গুলি-হেলনে হাসিতে বা কাঁদিতে সে বাধ্য নয়। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি করিয়া এঁটো বাসন-কোসন তুলিতে আরম্ভ

করিল। প্রকাশ গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব মোলারেম করিয়া বলিল, “তোমার এখনও খাওয়া হয় নি বুঝি?”

বিনোদিনী কোঁস কবির উঠিল, “তোমার আগে কবে আমি গিলে বসে থাকি শুনি?”

প্রকাশ এখন স্বগড়া বাধাইতে চায় না, বলিল, “তা যদি থাকতেও ত কিছু চণ্ডী অণ্ডক হয়ে যেত না। তোমার ভাত এইখানেই নিয়ে এস না?”

“থাক, অত আদরে আব কাজ নেই, আবার এখানে আর এক পালা এঁটো পাড়তে বসি। তার চেয়ে আমার বাসায়রই ভাল।”—বলিয়া বাসন হাতে করিয়া বিনোদিনী চলিয়া গেল।

প্রকাশ হতাশ ভাবে শুইয়া পড়িল। নাঃ, এদের সঙ্গে আর পারা যায় না। বিনোদিনীকে সুখে বাধিতে তাহাব কি অসাধ? সাধে কুলাইয়া উঠে না তা সে কি করিবে? সেই জন্ত কি চিবদিন ধরিয়া খালি মুখ-ঝামটা খাইতে হইবে? পান থেকে একটু চুণ খসুক দেখি, অমনি গৃহিণীর মুখ তোলা-ছাড়ির মত হইয়া উঠিবে। বাহিরে পরের দাসস্বের জালা, আব বরে খালি খিচিমিচি, কাঁহাতক আর মানুষ পারিয়া ওঠে?

বিনোদিনীর খাইতে সময় বেশী লাগে না। সারাদিন ভূতের মত খাটিয়া সে এত শ্রান্ত হইয়া পড়ে যে খাওয়া-দাওয়া কিছু তাহাব ভালও লাগে না। এই ক্ষুদ্র ধোঁপের মত ঘরে বসিয়া বসিয়া প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া ওঠে, দম যেন বন্ধ হইয়া আসে। চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে একটি বার পাঁচ মিনিটের জন্তও যদি সে বাহিরে বাইতে পারিত, তাহা হইলে খানিকটা বজ্রপা তাহার হয়ত কমিয়া যাইত। কিন্তু কেইবা তাহাকে লইয়া বাইবে? বিকালে তাহার সময় হয় না এবং প্রকাশও বাড়ি ফেবে না। ভোর-বেলা হইলে সে বাইতে পারে। কিন্তু ভোরে প্রকাশকে উঠান একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

খাওয়া শেষ করিয়া এঁটো বাসনের রাশ সে কলতলায় ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। এখন আর মাজিতে বসিতে পারে না, সকালে দেখা যাইবে এখন। রান্নাঘরটা চট করিয়া ধুইয়া দিয়া সে দরজার শিকল তুলিয়া দিল। তাহার পর একটা পান মুখে দিয়া, শুইবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে ঝির-ঝির করিয়া একটু হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিনোদিনী ঘরের সব-ক'টা জানলা-দরজা খুলিয়া দিল, একটু ঠাণ্ডা হোক ঘরখানা। ছেলেমেয়ে দুইটা ঘামে ঘেন্না করিয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত শিশু তাই, বয়স্ক লোক হইলে আর এত গরমে ঘুমাইতে হত না।

পাশের ঘর হইতে প্রকাশ ডাকিয়া বলিল, “ও গো, শুনে যাও।”

বিনোদিনী মুখখানার উপর আবার গাঙ্গীঘোর আবরণ টানিয়া দিয়া, পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। প্রকাশ তখন লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বলিল, “আমার পাজাবীটা নিয়ে এস ত, ওবরে আল্‌নায় রেখে এসেছি।”

বিনোদিনী আবার বিনা-বাক্যব্যয়ে পাশের ঘরে গিয়া পাজাবীটা লইয়া আসিল। প্রকাশ তাহার হাত হইতে জামাটা লইয়া বলিল, “ব'স না বাপু, এখানে বসলে ত আর তোমার জাত বাবে না?”

বিনোদিনী ভুরুটি করিয়া সেইখানে, বিছানার এক পাশে বসিয়া পড়িল। প্রকাশ জামার পকেট হইতে খান-কয়েক নোট্‌ আর খুচরা কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিল, “এই নাও।”

নোট এবং টাকা এক নিমেষে গণিয়া লইয়া বিনোদিনী বিরক্ত কর্তে বলিল, “আর ছোটো টাকা কম কেন? বা-খুশী তাই নিয়ে আসবে, আর তাই দিয়েই আমাকে সব চালাতে হবে। কেন, আমি কি ভেলুকি জানি?”

প্রকাশ বলিল, “ছোটো টাকা বেশী আর কবে কিই বা এসে যায়? থাকলেও যা, না থাকলেও তা। একই অভাবের পালা চলেতে থাকবে।”

বিনোদিনী বলিল, “আহা তা আর নয়। হাতে ক'রে কিছু ত খরচ করতে হয় না, কাজেই লম্বা লম্বা কথা বল। ছোটো টাকায় এক হস্তার বাজার-খরচ চলে, তার খেয়াল আছে?”

প্রকাশ চট্টয়া বলিল, “নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কি এমন মহাপাপ ক'রে এসেছি যে, তখন থেকে খালি খাঁক-খাঁক করছ? সত্যি এক-একবার ইচ্ছে হয় ঘরবাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়ে চলে যাই।”

বিনোদিনী টাকা নোট সব বিছানায় ফেলিয়া দিয়া

উঠিয়া ঝাঁড়াইল, তাহার তখন ছই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা গলায় বলিল, “এই রইল তোমার টাকা-কড়ি, আমার খাঁক খাঁক করেও কাজ নেই, তোমার টাকা নিয়েও কাজ নেই। তুমি কিনে-কেটে এনে দিও, আমি রেঁধে-বেড়ে দেব এখন। তা হলেই আমার কথা আর সইতে হবে না।” সে নিজের ঘরে চলিয়া বাইবার উপক্রম করিল

বিনোদিনী পুখুখামটাটা প্রকাশের অসহ লাগিত বটে, কিন্তু তাহার চেয়েও অসহ লাগিত বিনোদিনীর চোখের জল। এই অন্তরটির সাহায্যে চিবদিনই প্রকাশকে বেশ চট করিয়া হার মানাইয়া দেওয়া যায়।

প্রকাশ উঠিয়া বসিয়া স্ত্রীর ছই হাত ধরিয়া টানিয়া একেবারে নিজের বুকের উপর আনিয়া ফেলিল। বিনোদিনী আর তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল না, প্রকাশের বুকে মুখ শুঁড়িয়াই কাঁদিতে লাগিল।

প্রকাশ তাহার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “এই সামান্ত কথাতেই কেঁদে ফেললে? ছি, ছি, তুমি আবার বয়স-বাড়ার গর্ব কর। আগলে তোমার বয়স দশ বছর, ঐ ও-বাড়ির পুঁটির মত। সেও যেমন সব কথায় ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ওঠে, তুমিও তাই।”

বিনোদিনী মাথা তুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, “হ্যাঁ, তা আর না। যা ক'রে আমার দিন কাটে, অমন বেশ শত্রুও না হয়।”

প্রকাশ বলিল, “ছনিয়াসুন্দরই এমনি ক'রে দিন কাটছে, কেই বা সুখে আছে বল? আমরা তবু খেটে-খুটে ছ-বেলা ছ-মুঠো খেতে পাচ্ছি, অনেকে ত তাও পাচ্ছে না?”

বিনোদিনী বলিল, “সবাই কেন আমাদের মত হ'তে বাবে? তোমার মেজভাইরাই ত বেশ রয়েছে। যাক্‌ গে, পনের হিংসে ক'রে লাভই বা কি? যে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছে।”

প্রকাশ বলিল, “তাই বোঝাও নিজের মনকে।” খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “ঐ টাকা-ছোটো দিয়ে কি করেছি জান? একটা গটারীর টিকিট কিনেছি, যদি কম্পল ফেরে।”

বিনোদিনী বলিল, “তুমিও যেমন। আমাদের কপালে

ও-সব নেই। ভগবান জানেন ঝালি তেল মাখায় তেল ঢালত। দেখ, গরিবরা কেউ কিছু পাবে না, বার বারকার নেই কিছু, এমন কোনো মানুষ পাবে।”

প্রকাশ বলিল, “সে এক রকম জানা কথাই। তবু একবার কপাল হুঁকে দেখি। মাঝে মাঝে পানবিড়িওয়ালা, গাড়োয়ান এরাও পেয়ে যায় কি না।”

বিনোদিনী বলিল, “তা দেখ, কত টাকাই ত কত রকমে যাচ্ছে, এ-ও না হয় যাবে। বাবা, কি গরম আজ। এ বছর দেখি বেশ সকাল-সকালই গরম পড়ে গেল।”

প্রকাশ বলিল, “সত্যি, একেবারে সেদক করে দেবার জো। পাখা একখানা নিয়ে এস ত।”

বিনোদিনী উঠিয়া পাশে ঘর হইতে পাখা লইয়া আসিল। সেইখানেই আধশোয়া অবস্থায় নিজেও হাওয়া খাইতে লাগিল, প্রকাশকেও হাওয়া করিতে লাগিল। তন্ময় কখন তাহার অলক্ষ্যে হাত হইতে পাখাখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। মাঝবাত্রে মিনির চীৎকারে জগিয়া উঠিয়া আবার তাহাদের কাছে গিয়া শুইল। মাহিনার টাকা ঝালিসের তলাতেই গোঁজা বহিল, ঘুমের ঘোঁকে আর বাস্তব ভুলিয়া রাখা হইল না।

পর দিন ভোর হইতেই উঠিয়া আবার দিনের খাটুনির পালা। আজ তবু তাহার মনটা একটু ভাল আছে। সকাল হইতে বত ছোট ছোট পাওনাদার আসিয়া ফ্রোটে, চিনে-ফ্রোঁকের মত পিছন ছাড়িতে চায় না। অল্প দিন কেবলই তাহাদের কিরাইয়া দিতে হয়। তাহার কেহবা নীরবে যায়, কেহবা দুইটা কথা শুনাইয়াও দিয়া যায়। ছোটলোকের মুখে যখন কথা শুনিতে হয়, তখন বিনোদিনীর ইচ্ছা করে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে। কিন্তু ছেলেমেয়ে দুইটার মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকে। ইচ্ছাদের যে সে ভিন্ন গতি নাই। বাপ রোজগার করিয়া আনে বটে, কিন্তু মা না থাকিলে বাপ পর হইয়া যাইতে কত ক্ষণ?

আজ তবু সকলকে দু-এক টাকা করিয়া দিতে পারিলে কথা শোনার পরিবর্তে, সেই কথা শুনাইতে পারিলে, লাগিয়া সকাল হইতেই বিনোদিনীর চিন্তা প্রসন্ন ছিল। চা খাইবার জন্ত প্রকাশ যখন রান্নাবরে স্ত্রীর খোঁজ করিতে গেল, বিনোদিনীর হাসিমুখ দেখিয়া তাহারও মনটা একটা অকারণ

আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ভাবিল “মাসের সব-ক’টা দিন ‘পে ডে’ (মাহিনার দিন) হ’লে তবু কিছু মুখে থাকা যেত।”

চা খাইয়া সে বাজার করিতে বাহির হইল। আগে একাজটা ঠিকা-বিয়ের দ্বারাই হইত। এখন কিন্তু তাহাকে বিনোদিনী বিদায় করিয়া দিয়াছে। মাস সাত-আট আগে মিনির টায়ফয়েড্ ফিভার হয়, তখন চিকিৎসার জন্য বেশ খানিক দেনা হইয়া গিয়াছে। গরিবের এক পয়সা সঙ্কয়ের উণায় নাই। বিপদ-আপদ ঘটিলে তখন হয় ধার কর, না-হয় স্ত্রীর গায়ের গহনা থাকিলে তাহা বাঁধা দাও। বিনোদিনী কিন্তু এক্ষেত্রে খুব শক্ত। গহনা বিশেষ বেতাহার বেশী আছে তাহা নয়, কিন্তু সেগুলিতে সে হাত দিতে দেয় না। মেয়েব বিবাহ ত দিতে হইবে? তখন কোথা হইতে কি জুটিবে? এই কয় টুকরাই ত সম্বল? তাহার চেয়ে ধার করা ভাল, সে যেমন করিয়া পারে শোধ করিবে। করিতেছেও তাহাই, ঠিকা-ঝিটাকে পর্যন্ত বিদায় করিয়া দিয়াছে।

প্রকাশ বাজার করিয়া আনিল। ইহার পর সব রান্না করিতে গেলে সময় থাকে না, কাজেই নিরামিষ রান্না বিনোদিনী আগে সারিয়া বাখে, মাছের ঝোলটা শুধু তাড়াতাড়ি নামাইয়া দেয়। তবকারি আগেকার দিনের বাজার হইতে রাখিয়া দেয়।

স্নান করিয়া খাইয়া প্রকাশ আপিসে চলিয়া গেল। বিনোদিনী তখন মিনিকে, সন্তকে খাওয়াইতে বসিল। প্রকাশ একটা কাজ তাহার করিয়া দেয়, ছেলেমেয়ে দুইটাকে স্নান করাইয়া দিয়া যায়। নীচের তলার বাধান উঠানে বেশ বড় চৌবাচ্চা আছে, সেইখানে প্রকাশ যায় স্নান করিতে। সন্ত ও মিনিও তাহার পিছন পিছন ছোট্টে, তাহারও বাবার সঙ্গে স্নান করিবে। উপরে মা মাত্র এক বালুতি তোলা জলে দু-জনের স্নান সারিয়া দেয়, সে উহাদের ভাল লাগে না। টিনের মগে করিয়া ঝপাঝপ, জল মাখায় চালিতে চালিতে সন্ত চীৎকার করিতে থাকে, “মা, আমাদের তোয়ালে আর সাবান ফেলে দাও, আমরা এইখানে স্নান করছি।” একটা দায় হইতে মুক্ত হইল মনে করিয়া আনন্দিত চিন্তে বিনোদিনী হাত বাড়াইয়া তোয়ালে সাবান নীচে ফেলিয়া দেয়।

খাইতে বসিয়াও ছেলেমেয়ের হাতার হাতামা। সহজে কি ভাত তাহাদের মুখে ওঠে? এ মাছ ভাল নয়, ও তরকাবিত্তে ঝাল। সন্তকে মা বড় মাছখানা দিয়াছে, মিনিকে দেয় নাই। নয় ত মা নিজে খাইবে বলিয়া বড় মাছেব মুড়াটা লুকাইয়া বাখিয়াছে। আবার কোনো দিন বা বায়না ধরে যে তাহারা মাছ খাইবে না। রোজ কেন মাছ খাইবে? মণ্টদের বাড়ি কেমন মাংস হয়, ডিম হয়, মা বুঝি তাহাদের একদিনও কিছু ভাল জিনিষ দিতে পারে না? ছুইটি ছোট মানুষকে খাওয়ান শেষ করিতে প্রায় বিনোদিনীর এক ঘণ্টা কাটিয়া যায়।

তাহার পর ধীরেস্থে স্নান সাবরিয়া, ঘরে আসিয়া বসে। ছেলেমেয়ের এখন ঘুমাইবার কথা, কিন্তু ছুই বৎসরের ভিতর কখনও তাহাদের দিনের বেলা ঘুমাইতে দেখা যায় নাই। মাহুব পাতিয়া শুইয়া তাহারা কেবল পবম্পরের সঙ্গে খুনহুটি করে, এ উহাকে চিম্টি কাটে, নয় ত পা দিয়া ঠেলা দেয়, আবার থাকিয়া থাকিয়া বালিশ ছোঁড়াছুঁড়িও হয়। বিনোদিনী আসিয়া ছুইজনের মাঝখানে শুইয়া পড়ে, কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাদের খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু চুপ করিয়া থাকাটা যে একেবারেই অসম্ভব? অথচ এখন মারামারি করিতে গেলে মা বিরক্ত হইয়া ছুই-একটা চড় বে লাগাইবেন না, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং খানিক অপেক্ষা করিয়া তাহারা আন্তে আন্তে উঠিয়া নীচে মণ্টদের ঘবে পলায়ন করে। বিনোদিনী তত ক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বেশী ক্ষণ অবশ্য ঘুম তাহার হয় না। পাড়ার মেয়ে-ইহুলে চং চং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেই সে উঠিয়া পড়ে। উলুনে আঁচ দিয়া ছেলেমেয়েকে ডাকিয়া উপরে লইয়া আসে। ছুইটুকু কোনোমতে গিলিয়া আবার তাহারা যে বার খেলার সাধীর সন্ধানে প্রস্থান করে। তাহার পব রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, শুকনো কাপড় তোলা, বিছানা পাতা, একটানা কাজের স্রোত বহিতে থাকে, রাত্তার আলো জলিবার আগে তাহার আর নিঃশ্বাস লইবার অবসর থাকে না।

আজ কেবলই কাম্বের ফাঁকে ফাঁকে তাহার মনে হইতে লাগিল, লটারীর টিকিটটার কথা। আচ্ছা, ধর যদি সত্যি কিছু পাওয়া যায়? এমনও ত হয়? কেহ-না-কেহ ত

প্রাইজ্‌গুলি পাইবেই? প্রকাশ পাইলেই বা? আঃ, তাহা হইলে চিরদিনের মত হাড়-ক'থানা বিনোদিনীর জুড়ায়। পাঁচ লাখ, দশ লাখ কিছু সে চায় না, অতি লোভ তাহার নাই। শুধু এই নিত্য চিন্তিতা, নিত্য অপমানের হাত হইতে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তাহা হইলেই যথেষ্ট। মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর মাথা শুঁজিবার মত নিজের একটু ঘর, ইহা হইলেই হয়। কতই বা তাহাতে লাগে? কে জানে, অত হিসাব করিয়াই বা কি হইবে? সত্যিই ত আর সে টাকা পাইবে না?

কিন্তু এই অতিলোভনীয় চিন্তাটিকে কিছুতেই সে মন হইতে দূর করিতে পারে না। লটারীর টিকিট কেনা এই তাহাদের প্রথম, তাই আশা বেশী, উৎকর্ষাও বেশী। যদিই হয়, হওয়া এমনিই কি অসম্ভব?

সেদিন প্রকাশ একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিল। আন্ত আর স্ত্রীকে রার্গাইবার তাহাব ইচ্ছা ছিল না। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চা করিয়া আনিল, ছুটি খানি চিড়িও ভাজিয়া দিল। পাখা হাতে করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ গা, লটারীর ফল বেববে কবে?”

প্রকাশ চিড়িভাজি খাইতে খাইতে বলিল, “বেশ আচ্ছা ঐ ভাবছ বুঝি সারাক্ষণ? সে এখনও চেব দেরি, মাসপানেক ত হবেই।”

বিনোদিনী ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, “তা একটু ভাবছি বইকি? নগদ হু-হু-টাকা থরচ ক’রে টিকিট কেনা হ’ল। আচ্ছা, টাকা পেলে তুমি কি কর?”

প্রকাশের বে একটু লটারীর নেশা লাগে নাই তাহা নয়। সে বলিল, “কতটা পাব, তার উপর নির্ভর করে। লাখ টাকার প্রাইজও হয়, আবার পাঁচ-শ’ও হয়। পাঁচ-শ’ পেলে কিছুই কবি না, তোমায় দিয়ে দিই বোধ হয় গহনা গড়ানার জন্তে।”

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল “ইস, তা আর না? কতই গহনা দিয়েছ এই দশ বছরে, তার আবার কথা।”

স্নায়ব পেয়ালা খালি করিয়া প্রকাশ বলিল, “কি দিয়ে দেব তুমি? টাকা যে-কটা আনি তাতে দেখতেই পাও? সত্যি এবার টাকা পেলে একখানা গহনা তোমায় ভাল-

দেখে ক'রে দেবই, যা তুমি চাও। সব চেয়ে ভাল হয় কাষ্ট' প্রাইজ্‌টা পেলে। তোমার গহনাও হয়, আমার সখও মেটে।”

বিনোদিনী বলিল, “কি তোমার সখ শুনিই না একটু?”

প্রকাশ বলিল, “তাহ'লে হাজার পঞ্চাশ তোমার নামে লিখে দিই, যাতে তোমাদের কোনোদিকে কোন কষ্ট না হয়। বাকীটা নিয়ে একবার কেটে পড়ি পৃথিবীটা ভাল ক'রে দেখবার জন্তে। বারম্বারের কল্যাণে ছবিতে চের দেখই দেখলাম, একবার সত্যিটা কেমন দেখতে চাই। ওদের জীবনটাও একবার উপভোগ ক'রে দেখতে ইচ্ছে করে।”

বিনোদিনী ঠোঁট উন্টাইয়া বলিল, “মাগো মা, কি হিরির সখ। ভগবান তোমায় কখনও প্রাইজ দেবেন না। স্ত্রী-পুত্র ফেলে পালাতে চাও এমনি অমানুষ তুমি। লোকে কোথায় টাকা চায় এদেরই স্থখী করবার জন্তে, না তোমার মতলব কি ক'রে তাদের ফাঁকি দেবে।”

প্রকাশ বলিল, “বেশ, এমন না হ'লে আর স্ত্রী-বুদ্ধি। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বাব, তালনা হ'ল ফাঁকি দেওয়া? একসঙ্গে লেপ্টে পড়ে থেকে, সবাই মিলে না-থেরে মরলে, সেইটেই বুঝি সবচেয়ে চমৎকার হয়? আর ভগবান যাদের প্রাইজ্‌গুলি দেন, তারা বুঝি সবাই তখনই তা দিয়ে দেবালয় ফেঁদে বসে? আমোদ-প্রমোদ কবেই লোকে এ-সব টাকা উড়িয়ে দেয়।”

বিনোদিনী বলিল, “তোমার টাকার আমার কাজ নেই বাপু। পঞ্চাশ হাজার তোমারই থাক। ছেলেমেয়ে নিয়ে বিলেত হয়, আমেরিকা হয় যেদিকে খুশী বেরো, আমি তাদের মানুষ করতে পারব না। আশি গরিবের মেয়ে, দু-মুঠো আমার খেতে পেলোই হ'ল।”—বলিয়া পাখা ফেলিয়া উঠিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

প্রকাশ বলিল, “ভাল বা হোক, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। প্রাইজ্‌ ত পাচ্ছি নগদ, তার ভাগ-বাটোয়ারা ঝগড়া-কাঁটি সব আগে ভাগে হয়ে গেল।” সে উঠিয়া পড়িয়া ছেলেমেয়েদের সন্ধানে চলিয়া গেল। বলিতে গলে ইহাদের সঙ্গে প্রকাশের দেখাই হয় না রবিবাব ছাড়া।

রান্নাঘরে বসিয়া বসিয়া বিনোদিনীর রাগও হইতে লাগিল, হাসিও পাইতে লাগিল। কোথায় কি তার ঠিক নাই, ইহাবই মধ্যে চটাচটি। কিন্তু ধন পুরুষ-মানুষের মন, কি করিয়া সবাইকে কেলিয়া চলিয়া বাইবার কথা ভাবিতে পারিল? বিধাতা স্ত্রী-পুরুষকে সত্যই আলাদা খাতুতে গড়িয়াছেন। বিনোদিনী ত লক্ষ টাকা পাইলেও স্বামী বা সন্তানদের কেলিয়া গিয়া আমোদ কবাব কথা ভাবিতেও পারে না। বাহা হউক, এলইয়া আর বেশী বাড়াইয়া কাজ নাই, ব্যাপারটা সত্যই কল্পনা ছাড়া ত কিছু নয়?

তবু রাগে শুইবার সময় আবার এই কথা না-পাড়িয়াই সে পাবে না। প্রকাশ যদিও তাহাকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেয় না, বলে, “কাজ কি বাপু, অত আলনস্করের স্বপ্নে? মাঝ খেতে লাগি লেগে বাসন-কোসন ভাঙবে।”

বিনোদিনী বলিল, “ওগো, মেয়েমানুষ অত ক'রে স্বপ্ন দেখে না। তাদের বাস্তব নিয়ে নাড়াচাড়া সারাদিন, দুটোর তকাৎ তারা রাখতে জানে। তুমি কথাটা তখন বললে কি না তাই ভাবছিলাম টাকা পেলে একটা মুক্কাব' সরস্বতী-হার করতাম, যেমন আমাদের বড়বোয়ের আছে। তারি হুন্দর জিনিষটা, তুমিও ত দেখেছিলে?”

প্রকাশ বলিল, “কে জানে অত শত আমার মনে নেই। তোমাদের বড়বো বেশ হুন্দর, সেইটে মনে আছে, অত লক্ষ্মী-হার সরস্বতী-হার মনে নেই বাপু।”

বিনোদিনী ঠোঁট উন্টাইয়া বলিল, “তা ত থাকবেই, বলিহারি তোমাদের জাতকে।”

প্রকাশ বলিল, “তা কি করব বল, যেমন বাকে বিধাতা করেছেন। তোমরা গহনা কাপড় দেখ, আমরা দেখি মানুষকে।”

বিনোদিনী জানিত এ সবই তাহাকে ক্ষাপাইবার চেষ্টা, তবু না ফেপিয়াও পারিত না। রাগে আর ঝগড়া বাধাইতে ইচ্ছা করে না, চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ঐটুকুই বা গল্পগাছা করিবার সময়। বলিল, “তা বেশ। আর কি কিনি জান? দুখানা ভাল শাড়ী আর দুটো ভাল ব্লাউজ। বাক্সে একখানাও আমার ভাল শাড়ী কি জামা নেই। কোথাও বাই না তাই, না হ'লে মান থাকত না।”

প্রকাশ তত্ক্ষণাৎ বোঁকে বলিল, “বেশ ত তাই কিনো।”

সকালে উঠিয়া কাজের ভীড়ে লটারীর ভাবনা চাপা পড়িয়া যায়, কিন্তু বিশ্রামের নিশ্চিন্ত অবসরে আবার তাহা বিনোদিনীকে পাইয়া বসে। কত কল্পনাই করে, কত ভাগ্যগড়াই যে তাহার মনে চলিতে থাকে। স্বামীর কাছে বেশী কিছু বলিতে সাহস হয় না, সে যা ঠাট্টা করে। প্রকাশও যে কথাটা মন হইতে বাড়িয়া ফেলিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সেও বিনোদিনীর সঙ্গে এ-সব কথা আলোচনা করে না, আবার পাছে ঝগড়া-বাঁটা বাধিয়া যায়।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, লটারীর ফলাফল জানিবার দিন ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে। উভয়েই উৎসাহ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু পরস্পরের কাছে ধরা পড়িতে চায় না।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রকাশ ম্লানমুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বলে, “না গো, ও সব আমাদের জুটবে কেন?”

বিনোদিনী নিজের আশাভঙ্গের হৃৎকলিয়া প্রকাশকে সাস্থনা দিতে বসে, বলে, “হ্যাঁ, ও কি আর কেউ পায়? কই কখনও ত চেনাশুনোর মধ্যে কাউকে পেতে দেখি নি?” তাড়াতাড়ি করিয়া কড়াইয়ের কচুরি ভাজে, স্বামীকে বহু করিয়া খাওয়ায়। বিকালে কাজের অজুহাতে কখনও সে বাহির হইতে চায় না, আজ নিজের থেকে কাজ সারিয়া

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া ছেলেমেয়ে দুটিকেও পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া, স্বামীর সঙ্গে বাহির হয়। ট্রামে চড়িয়া গড়ের মাঠে গিয়া খুব খানিক বেড়াইয়া আসে।

বিধাতার একটু বেন ইহাদের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। পরদিন আপিস হইতে আসিয়া প্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, “ও গো জান, আগরা একটা কাঁহুনে প্রাইজ, পোয়ছি, ৫০০ টাকা।”

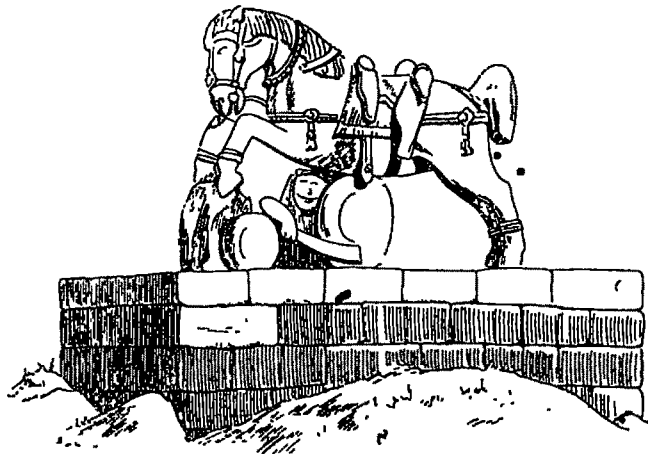
বিনোদিনীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, “কাঁহুনে প্রাইজ কেন?”

প্রকাশ বলিল, “এই ফুলের প্রাইজে ছোট ছেলেগুলোকে কাছার ভয়ে প্রাইজ দেয় দেখ নি? সেই রকম আর কি? তা সরস্বতী-হারের আর বেনারসীর ফরমাস দেব ত?”

বিনোদিনী বিজ্ঞভাবে মুখ নাড়িয়া বলিল, “যা বলেছ, টাকা ক’টা অমনি ক’রে জলে দিই আর কি? ও থাক, ওর একটা টাকাও তুমি হুঁতে পারবে না।”

প্রকাশ বলিল, “কি হবে একটু শোনাই যাক না?”

বিনোদিনী বলিল, “ডাক্তারের দেনাটা দিয়ে দিই, তান পর খণ্ডরের ভিটের একখানা ঘর ভুলব। মাঝে মাঝে এই বিজ্ঞি থেকে বেরুলে ছেলেমেয়েগুলো বাঁচে, আমিও বাঁচি।”



অর্থোদয়-যোগ

ক্রীয়োগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি

হিন্দুর বৃত্ত ধর্মকৃত্য আছে, এত আর কারও নাই। দৈনিক কর্মে, সংসার-চিন্তায়, সুখে ও দুঃখে দিন যায়, কৃত্য এলে সে একটানা শ্রোত ধর্মকো থেকে অন্ত পীথে বয়। এক দিনের জন্ত হ'ক, এক বেলার জন্ত হ'ক, ইষ্টপথ দেখতে হয়। হিন্দু ভাগ্যবান। আর, যিনি, যে ব্রাহ্মণ, সে পথ বেধে দিয়েছেন, তাঁর চরণে কোটি নমস্কার।

শৈশবে পাঠশালায় পড়তাম। মাসে মাসে শুক্ল-পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা ক'রতে হ'ত। পৌষ মাঘ মাসেও প্রাতঃকালে পুরুরে ডুব দিতে হ'ত, শীতে ও বাতাসে থরথর করি, স্নান ক'রতেই হ'ত। অন্ত দিন সকালবেলা কিছু খেয়ে পাঠশালায় বসতাম। এ দিন পূজা না হ'লে খাবার জো ছিল না। গীড়ি কিম্বা জল-চৌকিতে তালপাতার তাড়ি, দেশী কালির দোয়াত, দেশী কলম। এই, সরস্বতী। কিন্তু রূপে কিছুই আসে যায় না, ভাবগ্রাহী ভগবান। পূজার পর কি আনন্দ! মনে হ'ত, যেন নূতন জন্ম হয়েছে। ইংরেজী ইকুলে ঢুকলাম, সরস্বতী-পূজাও হারালাম। রবিবারে ইকুলের ছুটি, সেটা খেলবার ছুটি ছিল।

ধর্মকৃত্য অনেক। পঞ্জিকিতে গ'ণলে ১৬০।১৭০টি হবে। কেহ এতগুলি ক'রতে পারেন না, করবার কথাও নয়। ধর্ম, আচার। যিনি বৈষ্ণবের আচার পালন করেন, তিনি বৈষ্ণব। যিনি শাক্তের আচার পালন করেন, তিনি শাক্ত। এইরূপ, শৈব, সৌর, গাণপত্য। এক এক ধর্মের এক এক কৃত্য ছিল। পরে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত হয়েছে। তাতেই কৃত্য বেড়ে গেছে। বঙ্গদেশে সৌরধর্ম যদি বা ছিল, গাণপত্য প্রায় ছিল না।

যে-সে দিনে যে-সে কৃত্য হয় না। বৈষ্ণব শুক্ল-একাদশী বেছে নিলেন, শাক্ত শুক্ল-অষ্টমী, শৈব কৃষ্ণ-চতুর্দশী, গাণপত্য শুক্ল-চতুর্থী নিলেন। সৌর, তিথি ছেড়ে সৌর দিন বাছলেন। পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত হ'লেও অক্ষমের পক্ষে—

শোখা ওঠা পাশমোড়া।
তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া।
কেপায় চোন্দ, ক্ষেপীয় আট।
এই নিয়ে কাল কাট।

অর্থাৎ হরির জন্ত শয়ন, উখান, পার্শ্বপরিবর্তন, ও ভীম-একাদশী। শিবের জন্ত শিব-চতুর্দশী, এবং অশ্বিকার জন্ত মহাষ্টমী। এই ছয়টি।

ধর্মকৃত্য ব্যতীত নিমিত্ত-কৃত্য আছে। কারও বিবাহ, কারও অন্নপ্রাশন হবে, কেহ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ক'রবে, ইত্যাদি।

যে-কোন কৃত্য হ'ক, প্রথমে সংকল্প, ও তপস্তা, তাব পর কৃত্যকর্ম। বিনা সংকল্পে ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। তপস্তা ত্রিবিধ, শারীর বাচিক মানস। তপস্তা ক্লেশকর। কিন্তু বিনা ক্লেশে ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। কেহ একাদশী-ব্রত ধারণ ক'রবে। কেন ক'বে, তা সংকল্পেব সময় স্পষ্ট স্বদয়জন্ম করা চাই। একাদশীর উপবাস ক্লেশকর হ'লেও সেটা বড় নয়। যে জন্ত উপবাস, সে জন্তটা ব্যর্থ হ'লে ক্লেশভোগ ব্যর্থ। বিষ্ণু-উপাসক হরিশ্রবণ নিমিত্ত একাদশী কেন বেছেছিলেন, সে কেন-ব উত্তর এখন নাই। কোন বৎসর কোন শুক্ল-একাদশীতে জ্যোতিষিক কিছু একটা ঘটেছিল, সে ঘটনা স্মরণীয় হয়েছিল, বিষ্ণু-উপাসক সেদিনের সঙ্গে কৃত্য জুড়ে দিয়েছেন। তার পর মাসে মাসে সে দিন, তার পর মাসে মাসে দুই দিন একাদশী-ব্রত-পালন বিহিত হয়েছে। এ সব কি অল্পকালের কথা? শত শত বৎসর গেছে, একটি একটি বিধি ব্যবস্থিত হয়েছে। কয়েকটার তিথি নক্ষত্র দিন স্মরণ করো ব'লেতে পারা যায়, এই জ্যোতিষিক যোগ এই সময়ে হয়েছিল, অতএব সে যোগ ধরো যে কৃত্য, সে কৃত্য সে সময়ের পরে প্রবর্তিত হয়েছে। পূর্বকালে ব্রাহ্মণ পঞ্জি গ'ণতেন, স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মব্যবস্থা তাঁর হাতে ছিল।

২

গঙ্গার অশেষ মহিমা। গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল পান,—এ সকলের মহিমা আমরা বুঝতে পারব না। ষাঁরা প্রথমে গঙ্গাতীরে বাস ক'রতেন, তাঁরা বুঝতেন। ষাঁদের সে ভাগ্য ছিল না, ষাঁরা গঙ্গা হ'তে দূরে বাস ক'রতেন, তাঁরা গঙ্গাকে তীর্থজ্ঞান ক'রতেন। তীর্থ-দর্শনের বহু ফল। গঙ্গা-স্নানেরও বহু ফল। কিন্তু টো-টো করে; ঘুরতে ঘুরতে তীর্থদর্শনে ফল নাই। রেল মোটরে আরাম ক'রতে ক'রতে গেলে তীর্থ অদৃশ্য হন। বিনা সংকল্পে গঙ্গাস্নানেও ফল নাই। সহজে মনঃ স্থির করবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা জ্যোতিষিক যোগে গঙ্গাস্নান প্রশস্ত করা হয়েছে। যেমন, জ্যৈষ্ঠ-শুক্র-দশমীতে দশহরা-স্নান। দশহরা, গঙ্গা। লোকে দশবিধ পাপ ক'রবে থাকে, সেদিন গঙ্গাস্নানের পূর্বে সে সব পাপ স্রবণ ক'রতে হয়, তার পর শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হয়ে ব'লতে হয়, “জাহ্নবি, আমার পাপ হরণ কর।” পাশ-খ্যাপন দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। মনুষ্যজাতিতেও আছে। কিন্তু পাপ-খ্যাপন কি সোজা কথা? গঙ্গা মাতৃস্বরূপা; মায়ের কাছে ছেলের গুণাংশ অজ্ঞান থাকে না। মাকে ব'লতেও তেমন সঙ্কোচ হয় না। আর, যে ব'লতে পারে সে এই কৃষ্ণ ক'রোছে, সে সে পাপ হ'তে মুক্ত হবার পথে এসেছে।

গঙ্গাস্নানের আর একটি বিশেষ দিন বারুণী। শতভিষা-নক্ষত্রযুক্ত মুখ্য ফাল্গুন কৃষ্ণ-জ্যৈষ্ঠাদিনী। সেদিন শনিবার হ'লে মহাবারুণী। বারুণীতে গঙ্গাস্নান ক'রলে বহু ফল, মহাবারুণীতে ক'রলে বহু বহু ফল। স্মৃতিতে লিখিত আছে, বহু শত সূর্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্ত ফলের সমান ফল। মহাবারুণীতে স্নান ক'রলে কোটি সূর্যগ্রহণকালীন স্নান-ফলের সমান ফল। চন্দ্রসূর্যগ্রহণ এক একটা উপলক্ষ, এক একটা নৈসর্গিক নিমিত্ত। ভক্তিশ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে স্নান ক'রলে দেহ-মন শুদ্ধ হয়। যে কর্মের দিন স্থির নাট, সে কর্ম হয় না। স্নানের পর দান, এটি মুখ্য উদ্দেশ্য। যে যোগ যত হুল্লভ, মানুষ সেটি তত আদর করে। বারুণী হুল্লভ নয়, মহাবারুণী হুল্লভ। বার-যোগ এর কারণ। শতভিষা নক্ষত্রের অধিপতি বরুণ। বরুণ বৈদিক দেবতা। অগস্ত্য, বেদের এক ঋষি। তাঁর নামে এক তারার নাম

অগস্ত্য হয়েছে। অগস্ত্য তারা, বরুণের সন্তান, বারুণি। এই কয়েকটি হুজু ধর্যে বারুণী-যোগের ইতিবৃত্ত অসম্ভব। সপ্তবার গণনা-প্রচলনের পরে, কোনও জ্যোতিষী বারটি পেয়েছিলেন, শনিবার জুড়ে দিয়েছেন। পরে দেখা বাবে, বারুণী-স্নানে বহু পুরাকালের নিদর্শন আছে।

অর্ধোদয়-যোগও হুল্লভ। পৌষ মাঘ মাসে রবিবারে অমাবস্তা হবে, শ্রবণা-নক্ষত্র-যুক্ত হবে, ব্যতীপাত ‘যোগ’ হবে, অর্ধোদয়ের এই লক্ষণ। কিন্তু এই বর্ণনা পরবর্তী কালের। কারণ, ‘অর্ধোদয়’ এই নামের সার্থকতা নাই। অর্ধোদয়, রবিবিষের অর্ধোদয়, অক্ষণোদয়, ঠিক যে ক্ষণে দিবা আরম্ভ হয়। সেই ক্ষণে অমাবস্তা ও শ্রবণা চাই। পৌষ মাঘ মাসে, অবশ্য চান্দ্র, মুখ্য চান্দ্র পৌষ, ‘গৌণ চান্দ্র মাঘ। হুই এক তিথি। কেহ কেহ সৌর পৌষ কিম্বা সৌর মাঘ বুঝেছেন। সেটা ভুল। কারণ, অমাবস্তা একটা তিথি, চান্দ্রমাসের একটা দিন। চান্দ্রমাসের নাম না ক'রলে কোন মাসের তিথি, তা বুঝতে পারা যায় না। আজ মাসের ১৫ই ব'ললে দিনটি নির্দিষ্ট হয় না। তিথি দ্বারা বুঝি সূর্য হ'তে চন্দ্র কত দূরে। নক্ষত্র দ্বারা বুঝি, চন্দ্র নক্ষত্রচক্রের আদি হ'তে কত দূরে। আর, ‘যোগ’ দ্বারা বুঝি সে আদি হ'তে চন্দ্রের দূরত্ব ও সূর্যের দূরত্বের যোগ-ফল কত। অতএব চান্দ্রমাসের নাম না ক'রলে তিথি ও নক্ষত্র দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের স্থিতি জ্ঞানতে পাবা যায় না। আরও দেখা যাচ্ছে, তিথি ও নক্ষত্র পেলে চন্দ্র ও সূর্যের স্থিতি পাই। ‘যোগ’টা একটা অক্ষমাত্র, এর নৈসর্গিক অর্থ নাই, দিনজ্ঞাপনে একেবারে অনাবশ্যক। জ্যোতীরা (ফল-জ্যোতিষীরা)। ‘যোগ’টি জুড়ে দিয়েছিলেন। অর্ধোদয়, মুখ্য চান্দ্র পৌষ-অমাবস্তার। আমরা বঙ্গদেশে মুখ্য চান্দ্রমাস গনি। এই প্রবন্ধে সে রীতি ধরেছি। অমাবস্তা, অতএব চন্দ্র সূর্য এক স্থানে আছে। চন্দ্রের নক্ষত্র শ্রবণা, অতএব সূর্যের নক্ষত্রও শ্রবণা। এই হেতু ব্যতীপাত ‘যোগ’ হবেই হবে। কিন্তু তিথি ৩০, নক্ষত্র ২৭, ‘যোগ’ ২৭টি বর্ষে বর্ষে অগ্রপশ্চাৎ হয়ে পড়ে। ভোগও সমান থাকে না। চান্দ্রমাসেরও অগ্র-পশ্চাৎ হয়। কোন বৎসরে ১২টা, কোন বৎসরে ১৩টা চান্দ্রমাস। সবের

উপরে বার অলঙ্কার পেতেছে। বৎসরে ১২৬ বার বাড়ে। কিন্তু বারের উনাধিক হয় না, নিয়ত ৬০ দণ্ড। এই ৬০ দণ্ডের মধ্যে যে-কোন সময়ে অমাবস্তা শ্রবণা ও ব্যতীপাত শেষ হ'তে পারে। এই সব কারণে অর্ধোদয়ের চক্রনির্ণয় কঠিন হয়েছে। ন্যূনপক্ষে ১৭ বৎসব পবে অর্ধোদয় হ'তে পারে। ২৭ বৎসর পরে আরও বেশী সম্ভাবনা।

গত ২০ মাঘ অর্ধোদয় যোগ গেছে। দেখি, কি হয়েছিল। সেদিন রবিবার মুখ্য চান্দ্র পৌষ-অমাবস্তা ৪০ দণ্ড, শ্রবণা ৫০ দণ্ড। অতএব অর্ধোদয়কালে পৌষ-অমাবস্তা ও শ্রবণা ছিল, যোগও হয়েছিল। কিন্তু অর্ধোদয়ে ব্যতীপাত হয় নি, ৬০ দণ্ড পরে, প্রায় বেলা ৯টার পরে হয়েছিল। অতএব প্রকৃত অর্ধোদয় হয় নি, ব্যতীপাত 'যোগ' অগ্রাহ্য ক'রতে হয়েছিল। বেলা ৯টা হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত যোগ ধরাও চলে না। তাতে অর্ধোদয় নামটি ব্যর্থ হয়। যে ভুলভ কালে যে-কোন জলে স্নান ক'রলে কোটি সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্তু কলের সমান ফল হয়, সে কাল দীর্ঘ হ'তে পারে না। ফলে বলা হয়েছে, ২০ মাঘ বেলা ৯টার পর যে-কোন সময় স্নান ক'রবে। এটা আর নূতন কিছু নয়, সকলেই স্নান করে। অর্ধোদয়ের মাহাত্ম্যের উৎপত্তি চিন্তা ক'রলে মনে হয়, ব্যতীপাত 'যোগ'টি উৎপত্তির বহুকাল পরে যোজিত। বারুণী ও মহাবারুণী স্নানে 'যোগ' দেখা হয় না। এ বৎসব ১৮ চৈত্র ১ এপ্রেল সোমবার মুখ্য কান্ডন কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী ৪১ দণ্ড, শতভিষা নক্ষত্র ২৪ দণ্ড। অতএব বারুণী-যোগ। কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী ও শতভিষা নক্ষত্র হ'লে শুভ নামক 'যোগ' হয়। এদিন শুভযোগ ১৯ দণ্ড থাকবে। সোমবার না হয়ে শনিবার হ'লে মহাবারুণী যোগ হ'ত।

অর্ধোদয়-যোগে লোকসমাগমহেতু কলিকাতা মুন্সিপালটিব খরচ হয়। খরচ লিখতে হ'লে যোগের সাল ও তারিখও লিখতে হয়। মুন্সিপালটির "গেজেটে" পূর্ব তিনটি যোগের সাল ও তারিখ দেওয়া হয়েছিল।

(১) সন ১২৭০। ২৬ মাঘ, ইং ১৮৬৪। ৭ ফেব.

(২) সন ১২৯৭। ২০ মাঘ, ইং ১৮৯১। ৮ ফেব.

(৩) সন ১৩১৪। ১৯ মাঘ, ইং ১৯০৮। ২ ফেব.

আর. এমার

(৪) সন ১৩৪১। ২০ মাঘ, ইং ১৯৩৫। ৩ ফেব
দেখা যাচ্ছে, প্রথমটির ২৭ বৎসর পরে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টির ১৭ বৎসর পরে তৃতীয়টি, এবং তৃতীয়টির ২৭ বৎসর পরে চতুর্থটি হয়েছে। এই ক্রম ধর্যে দেখছি, ১৭ বৎসব পরে, ১৩৫৬ সালে যোগটি হ'তে হ'তে হবে না। কলিকাতায় সূর্যোদয়ের সময় অমাবস্তা থাকবে না। ২৭ বৎসর পরে সন ১৩৬৮। ২১ মাঘ, ইং ১৯৬২। ৪ ফেব সূর্যোদয়কালে পঞ্চলক্ষণ যোগটি পাওয়া যাবে।

৩

গত অর্ধোদয়-যোগে কলিকাতায় নাকি চারি-পাঁচ লক্ষ নবনারী এসেছিল। শিয়ালদহ রেল-স্টেশন কলিকাতায়। কলিকাতার প্রতি আরও টান ছিল। সেখানে এলে কালীঘাট-দর্শনও হয়। রাজধানী-দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও কম নয়। হাওড়ার দিকে তিন-চারি লক্ষ নবনারী এসে থাকবে। গঙ্গা এই খানেই নয়, হাওড়ার উত্তরে হবিঘার পর্যন্ত গঙ্গা। সর্বত্র লোকে যোগটি মেনে গঙ্গাস্নান করোছিল কি না, জানি না। আচ্ছ, গোদাবরীকে গঙ্গা বলেন।

স্বাৰ্থাচার্য বধুনন্দন ভট্টাচার্য এক পাশ্চাত্য "নির্ণয়ামৃত" হ'তে অর্ধোদয়কাল বুঝিয়েছেন। তিনি ববাহকৃত "কৃত্যচিন্তামণি" ও স্বন্দপুরাণ হ'তেও বচন তুলেছেন। আমি "নির্ণয়ামৃত" দেখি নি। "কৃত্যচিন্তামণি" পাওয়া যায় কি না, জানি না। স্বন্দপুরাণ বৃহৎ গ্রন্থ, প'ড়তে পারি নি। বুরছি, যোগকালে স্নান ও দান কর্তব্য। গঙ্গায় স্নান চাই, এমনও নয়। যে-কোন নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে স্নান ক'রলেও চলে। দিনটা অশুভ। ব্যতীপাত যোগ নামের অর্থ দারুণ দুর্নিমিত্ত। অমাবস্তা তিথিটাও অশুভ।

যোগকালটা অশুভই বটে, বৎসবের অস্তিমকাল। তখন পৌষ শ্রবণায় রবিব উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি হ'ত। অর্ধোদয়ের পরে নববর্ষ আরম্ভ হ'ত। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০১ অব্দের, শকপূর্ব ৪৭৯ অব্দের কথা। কেবল নববর্ষপ্রবেশ নয়, সে বৎসর হ'তে এক নূতন অঙ্গ-গণনা প্রচলিত হ'বেছিল। অশ্বিনীর আদি বিম্বু খুজতে যেয়ে খ্রি-পূ ৪০১ অব্দি পেয়েছি * (খুজ অভিগ্রাম্যভাষা)

* যারা ইংরেজী জানেন, তাঁরা The First Point of Asvini নামক পুস্তিকা প'ড়তে পারেন। পুস্তিকা "প্রবাসী প্রেসে" প্রকাশিত।

পৌষ-শ্রবণা হ'তে বর্ষগণনা তৎকালের পক্ষে এক নূতন কাণ্ড। কিন্তু শ্রবণা অস্বীকারের উপায় ছিল না। সেটা প্রত্যক্ষ। রামায়ণ ও মহাভারত বিখ্যামিত্রকে এনেছেন। রামায়ণে (আদি কাণ্ডে) আছে, তপোধন বিখ্যামিত্র গুরুশাপে চণ্ডালত-প্রাপ্ত নরপতি ত্রিশঙ্ককে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ইহা স্বর্গে স্থান দিলেন না। বিখ্যামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে আকাশের দক্ষিণ দিকে নূতন "নক্ষত্র-বংশ" সৃষ্টি করলেন।* নূতন সৃষ্টি হেতু তিনি অপর প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা হ'লেন। পূর্বকালে ব্রহ্মা সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সৃষ্টি কর্যে যে নক্ষত্রকে আদি কর্যেছিলেন, সেটা রহিত করলেন। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, এই ক্রম। ব্রহ্মা ধনিষ্ঠাকে প্রথম কর্যেছিলেন, বিখ্যামিত্র ধনিষ্ঠার পূর্ববর্তী শ্রবণাকে করলেন। একথা মহাভাবতে (আদি পর্বে ৭১ অধ্যায়ে, অশ্বমেধ-পর্বে ৪৪ শ্লোকে) আছে। সেখানে ধনিষ্ঠার নাম নাই বটে, কিন্তু এই নক্ষত্র লক্ষ্য ছিল।

বৈদিক যজ্ঞকর্ম যে-সেদিন করা হ'ত না। সে কর্মের নিমিত্ত অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দুই বিবুৎ, দুই অয়ন দিন গণতে হ'ত। একদা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র-ভাগের আদিত্যে উত্তরায়ণ হ'ত। তখন সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে মৃদলাকার ধনিষ্ঠা-তাবা-চতুর্ভুজ দেখা যেত। লোকে অক্লেশে উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি কাল বুঝতে পারত।† ষাঁরা ধনিষ্ঠায় উত্তরায়ণ দেখতেন, তাঁরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, তাঁদের তিথি নক্ষত্রের পরিপুষ্ট জ্ঞান ছিল। অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় বৈদিক কৃত্য ছিল। যাজ্ঞিকেরা যেদিন পৌষ-অমাবস্তার অন্ত ও ধনিষ্ঠার আরম্ভ সেদিন স্থির করলেন। পরদিন মাঘ-শুক্র-প্রতিপদে নববর্ষ আরম্ভ। এ-সব কথা বড়জ-বেদের জ্যোতিষ-অঙ্গে ও পুরাণে বিস্তারিত

* ত্রিশঙ্ক দক্ষিণ আকাশে এক নক্ষত্র হয়েছিলেন। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" দেখুন।

† এর অনুরূপ বাক্যেও আছে। কুবজ মাজেই বর্ষা-আরম্ভ প্রতীক্ষা করে, বলে 'সিপের বাত' হ'লেই বর্ষা আরম্ভ হবে। 'সিপের বাত' মৃগশিরা নক্ষত্রের বায়ু, আবহের প্রকৃতি। রবি মৃগশিরায় এলে প্রথম বর্ষা হয়। কিন্তু রবির উদয়ে সকল তারাই অদৃশ্য হয়। রোহিণীর পর মৃগশিরা। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে পূর্বকালে রোহিণীর উদয় হ'লে বুঝতে পারা যায়, প্রথম বর্ষা আসন্ন, দিন তের চৌদ্দ পরে 'সিপের বাত' প'ড়বে। রোহিণী শকটাকার, সহজে চিনতে পারা যায়। বাকুড়ায় ও মানভূমে অশিক্ষিত গ্রাম্যজনও রোহিণীর উদয় লক্ষ্য করিতে থাকে। কথাটা সত্য।

আছে। পিতামহ ব্রহ্মা বাবতীর সৃষ্টির কর্তা। ধনিষ্ঠাদি-গণনাও তাঁর কৃত। ক'ব এই ঘটনা হয়েছিল? অশ্বিনীর আদি নির্ণয় করতে যেয়ে অশ্বটি পেয়েছি। সেটি খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দ। তাবিখ ২ জাহুআরি।

কিন্তু উত্তরায়ণ-বিন্দু স্থির থাকে না, পিছাতে থাকে। ধনিষ্ঠার আদি হ'তে শ্রবণার আদিত্যে এসে প'ড়ল। এ সময়ে নিশ্চয় জুড়ল হয়েছিল। এক দল বল্যেছিল, "যেমন আছে তেমন থাক, ধনিষ্ঠাই নক্ষত্রের প্রথম ধরা হ'ক। এই বিধি ব্রহ্মার কৃত। এর জায়গায় শ্রবণাকে বসালে ধর্মকর্ম সব ঠাও হবে।" অন্য দল বল্যেছিল, "তোমরা রাখতে চাও, রাখ। আমরা যেটা প্রত্যক্ষ করছি, সেটা ধ'রব। উত্তরায়ণ-কালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শ্রবণা দেখতে পাচ্ছি, কেমনে বলি ধনিষ্ঠা।" বাস্তবিক উত্তরায়ণকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে ত্রিণাকার জিতারকা শ্রবণা দেখা যেত। রাজর্ষি বিখ্যামিত্র তেজস্বী ও ক্রোধনস্বভাব ছিলেন, তাঁকে দিয়ে নূতন সৃষ্টি করালেন। অবশ্য নামটি কাল্পনিক। গাধি-পুত্র বিখ্যামিত্র, বহুকাল পূর্বে ছিলেন। এত দিন এই বিধি-প্রচলনেব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই নি। অর্ধোদয়-বোগের উৎপত্তি-চিন্তা করতে ~~যেই দেখছি~~, অত্যাগি আমরা সে নূতন সৃষ্টি স্মরণ করছি। খ্রি-পূ ৪০১ অব্দে ৫ জাহুআরি অর্ধোদয়-বোগ প্রথম হয়েছিল। সূর্যের অর্ধোদয় কালে অর্থাৎ দিবরস্ত্রে পৌষ-অমাবস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রের বোগ হয়েছিল।

তৎকালে রব্যাদি সপ্তবার, আর বিকুণ্ডাদি সপ্তবিংশ 'বোগ' গণনা ছিল না। বহুকাল পরে যখন এই দুই গণনা পঞ্জির অঙ্গীভূত হয়েছিল, তখন কোন জ্যোতিষী প্রথম অর্ধোদয়ের বার ও 'বোগ' গণ্যেছিলেন। দেখেছিলেন সেদিন রবিবার, ব্যতীপাত্ত 'বোগ'। গণ্যেও দেখছি, ঠিক। বারের ঐক্যে অব-নির্ণয় সমর্থিত হ'চ্ছে।

শ্রবণাদি-গণনা কতকাল চল্যেছিল, ভারতের কোন প্রদেশে চল্যেছিল, কিছুই জানি না। কিন্তু যে-টা একবার চল্যে সে-টার চিহ্ন থেকে যায়। আমাদের পঞ্জিতে এমন স্মৃতি অসংখ্য আছে। বহু বহু পুরাকালের স্মৃতি আছে। পৌষ অমাবস্তার অর্ধোদয়, মাঘ কৃষ্ণ-চতুর্দশীতে শিবরাত্রি, ফাল্গুন কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে বারুণী। বারুণী দেখি। খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দে ধনিষ্ঠার আদ্যে উত্তরায়ণ হ'ত। বোধ হয় অমাবস্তার

অকণোদয় বেলায় স্নান বিহিত ছিল। সেটি প্রথম অর্ধোদয়ে স্নান। তৎপূর্বে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে, শতভিষা নক্ষত্রের আদ্যে হ'ত। ইহা গণিত দ্বারা জানছি। স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম-ব্যবস্থা হ'তে প্রমাণ পাচ্ছি, বৈদিক ঋষিরা শতভিষায় উত্তরাংশ দেখেছিলেন। না দেখলে স্মৃতি থাকত না। তাঁরা এটা গণিত দ্বারা পেয়েছিলেন, শতভিষা-তারাপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হ'ত না। বোধ হয়, অগস্ত্য-তারার উদয় দেখা হ'ত। অগস্ত্যোদয় প্রসিদ্ধ ছিল। তখন শতভিষার বিপরীত দিকে মধ্য নক্ষত্রে দক্ষিণাংশ হ'ত। বৈদিক গ্রন্থে এর অনেক প্রমাণ আছে। এরও পূর্বে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে, ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণাংশ, এবং ভাদ্রপদা নক্ষত্রে উত্তরাংশ হ'ত। এই দক্ষিণাংশের প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থে আছে। অন্যাপি আমরা দোলযাত্রার ও ঝুলন-যাত্রায় সে কাল স্মরণ ক'রছি। বাতে চন্দ্র সূর্য সাক্ষী তাতে অবিশ্বাস ক'রতে পারি না। স্মৃতিশাস্ত্র, স্মৃতিরক্ষার শাস্ত্র। ভারতের অতীত, স্মৃতিমুখে কথা কইছে, আকাশের তারা অনিমেষ চোখে আছে।

প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা দ্বারা হিন্দুজাতি বেঁচে আছে। সে স্মৃতি লোপ ক'রলে আশ্রয়হীন হবে, নতুন জাতি হয়ে পড়বে। স্মৃতির উৎপত্তি না হেনে উদ্বেগ না বুঝে কেহ কেহ মনে করেন, স্মৃতির ব্যবস্থা কুসংস্কার। তাঁরা জিজ্ঞাসেন, স্নান ক'রলে কি হবে? আমিও জিজ্ঞাসি, জন্ম-তিথি পালন ক'রলে কি হবে? এই যে, সে বৎসর জয়ন্তীর ঘুম পড়োছিল, জয়ন্তী-পত্রও দেওয়া হয়েছিল; কার কি ফল হয়েছিল? এই যে অমুকের পঞ্চবিংশ বার্ষিকী, অমুকের শতবার্ষিকী হ'চ্ছে, কার কি ফল হ'চ্ছে? মাহুষের পূজা অহরহ হ'চ্ছে। পট্টে উপরে ফুলের মালা দেওয়া হ'চ্ছে। এসব হ'চ্ছে, মিটিং করো, নাম স্মৃতি-সভা, স্মৃতি-তর্পণ। প্রাচীনেরা মিটিং ক'রতেন না, হাঁকা-হাঁকি ডাকা-ডাকি ক'রতেন না, বথা তিথিতে প্রাতঃস্নান দ্বারা দেহ নির্মল ক'রতেন, দান দ্বারা পুণ্য ক'রতেন, তপস্বী দ্বারা মনঃসংযম ক'রতেন, ইষ্টের পূজা দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা ক'রতেন। সে ইষ্ট, মাহুষের অনুগ্রহ নয়, কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন নয়।

রাজা রামমোহন রায়

শ্রীদীননাথ সাহা

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২৭শে তারিখে বাজা রামমোহন রায় বিলাতে দেহত্যাগ করেন এবং সেই দেশেই ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার সমাধি হয়। এই উপলক্ষে ইহা ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার এক স্মরণীয় দিন।

কিছুকাল পূর্বে ভারত ব্যাপিয়া তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির শত-বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। নিরপেক্ষ ও ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা হইতে এই সত্যটুকু নিষ্কাশিত হয় যে, রামমোহনের জীবন-চরিত বাহা প্রচলিত, তাহা ভ্রম-প্লামদ-বর্জিতও নয় এবং সম্পূর্ণও নয়। পক্ষান্তরে, যিনি বৃগ-

মানব বলিয়া গণ্য, তাঁহার জীবনী অতি নিরপেক্ষভাবে ও সত্যানুসন্ধিৎসু মনে, কেবলমাত্র সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, হুস্ত্রাণ্য ঘটনাগুলির সন্ধান সম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়া, লিখিত হইয়া একান্ত আবশ্যক।

ইহা একটি চিরন্তন সত্য যে, অলোকসামান্য ব্যক্তি-গণকে সাধারণ মানব হইতে পৃথক করা বড় সহজ, তাঁহা-দিগের মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করা তত সহজ নয়, বাস্তবিকই বৃগ-মানবদিগের মনস্তত্ত্ব হ্রস্বগাহ—বিশেষতঃ সমসাময়িক কালে। উপস্থিত প্রসঙ্গে জীবদশায় যে-কলিকাতায় বঙ্গদের পরামর্শে রামমোহনকে প্রাণভয়ে সাবধান থাকিতে হইত, শত বর্ষ পরে সেই কলিকাতায় তাঁহার শত-বার্ষিক

উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। যুগ-মানব বা অতি-মানবদিগের মনস্তত্ত্ব বাস্তবিকই দুর্বলগাছ—সকল দেশে এবং সকল কালে। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশেও ইহার উদাহরণ একান্ত দুলভ নয়।

যাহা হউক, শত বৎসর পরে আমরা এই যুগ-মানবের মনস্তত্ত্ব ব্লেস্পে বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়,—রামমোহনের স্বভাব-গত দুইটি মনোবৃত্তি তাঁহাকে জীবন-পথে চালিত করিয়াছিল—অসাধারণ ধর্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ প্রচলিত বিবিধ ধর্মগুলির তত্ত্বানুসন্ধান করিবার ইচ্ছা এবং প্রবল কর্মপ্রচেষ্টা। ধর্ম-জিজ্ঞাসাই তাঁহাকে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রণোদিত করিয়াছিল,—বাহার ফলে তিনি তন্ত্র-পুবাণাদি শাস্ত্র-সকল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপ-নিষদাদি গভীর ভাবে অনুশীলন করিতে এবং তাৎকালিক পণ্ডিতগণের সহিত সমকক্ষভাবে তর্কযুদ্ধ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম-জিজ্ঞাসার মনোবৃত্তিই তাঁহাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল;—বাহার ফলে, ধর্মোন্মোহনকালে তিনি মুসলমান মৌলবীদিগের সহিত সতেজে তর্ক করিয়া তাঁহাদের কাছে “জবরদস্ত মৌলবী” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ধর্ম-জিজ্ঞাসার প্রবল তাড়নাতেই তিনি ইংরেজী বাইবেলে পরিচুষ্ট থাকিতে না-পারিয়া মূল বাইবেল পড়িবার উদ্দেশ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন এবং সেই বলে বলীয়ান হইয়া তর্কযুদ্ধে খ্রীষ্টান পাদরীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেন। কথিত আছে, র্যাডাম নামক এক ইংরেজ পাদরী রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্মে ভঙ্গাইতে আসিয়া নিজেই রামমোহনের কাছে সার্বজনীন ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় ইউনিটেরিয়ান চার্চ স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার তাৎকালিক সাহেবেরা ঐ র্যাডাম সাহেবকে “Second Fallen Adam” বলিয়া বিদ্রোপ করিতেন। ফলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে রামমোহন বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং নিজ পক্ষে এমন ধীরতার সহিত যুক্তি প্রয়োগ কবিতেন, যাহাতে অপর পক্ষ চমকিত না-হইয়া থাকিতে পারিত না। এ-সকলই তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্ম-জিজ্ঞাসা-মনোবৃত্তির গুণে।

তাহাব পর, তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা। সেই যুগ-সন্ধির কালে কি ধর্ম, কি সমাজ, কি শিক্ষা, এমন কি, তর্ক করিবার ও গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য বাংলা ভাষায় গদ্যে কয়েকখানি উপনিষদের অন্তর্বাদ, এমন কি ব্যাকরণ, ভূগোল ইত্যাদিও তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টার অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তাঁহার কার্য সবিস্তারে বলা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ-স্থলে আমি কেবল তাঁহার তিনটি কার্যের প্রেরণা সম্বন্ধে বলিতে চাই :—

(১) মহানির্কীর্ণ তন্ত্র, (যাহা রামমোহনের কলামলক-স্বরূপ ছিল), দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনার প্রেরণা ঐ তন্ত্র হইতে। মহানির্কীর্ণ তন্ত্রেব প্রথম তিনটি উল্লাস ব্রহ্মোপাসনা-বিষয়ক এবং সে উপাসনার পদ্ধতি সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী নয়। মহানির্কীর্ণের ব্রহ্মোপাসনায়—

“নারায়ণো নোপবাসন্ত কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।

নৈবাচারাদি নিয়মো নোপচার্য্যস্ত ভূরিশঃ।”

“ন দিক্কালা-বিচারোহস্তি ন মুক্তা-স্ত্যাস-সংহতিঃ।

যৎ সাধনে কুলেশানি তৎ বিনা কোহস্তমাজয়েৎ।”

(২য় উল্লাস—৫০ ও ৫৪ শ্লোক)

“অনাতো বা কৃতমানো ভুক্তোহ্যপি বৃত্তুক্তিতঃ।

পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মল-মানসঃ।”

(৩য় উল্লাস—৭৮ শ্লোক)

“পূজনে পরমেশন্ত নাবাহন-বিসর্জনে।

সর্বত্র সর্বকালেসু সাধয়েৎ ব্রহ্মসাধনম্।”

(ঐ—৭৭)

“ভক্ষ্যাত্মক-বিচারোহত্র ভাষ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে।

ন কালগুহি নিয়মো ন বা স্থান-নিরূপণম্।”

“অভুক্তো বাপিভুক্তো বা নাতো ব্যতিতি এব বা।

সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং যেচ্ছাচারেণ সাধকঃ।”

(ঐ—১১৬, ১১৭)

রামমোহন উপনিষদে যে নিরাকার ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন, মহানির্কীর্ণোক্ত ব্রহ্মোপাসনার ব্রহ্মও তাহাই :—

“যতো বিবং সমুদ্ভূতং যেন জাতক্ তিষ্ঠতি।

যস্মিন সর্বাণি লীয়ন্তে জেয়ং তৎ ব্রহ্মলক্ষণম্।”

(ঐ—১)

মহানির্কীর্ণোপদিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার বিধি ও পদ্ধতি এবং রামমোহনের ভাস্করিক মনোভাব একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, তাঁহার প্রবর্তিত ব্রহ্মসভার বীজ ঐ তন্ত্র হইতে সংগৃহীত।

(২) সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ-কল্পে রামমোহনের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার বীজও এই তন্ত্র হইতে সংগৃহীত, একথা অকুণ্ঠিত-ভাবে বলা যাইতে পারে। কারণ, দশম উল্লাসে উল্লিখিত ;—

“ভদ্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্।

তব স্বরূপা রমণী ভগত্যাচ্ছয় বিপ্রহা।”

মোহাদ্ ভৰ্জু শিতানোহাং ভবেন্দ্রক-গামিনী ॥*

(১০ম উল্লাস—৭২, ৮০)

এ-বিষয়ে মহানির্বাণের নির্দেশটি যেমন সুস্পষ্ট, অভিপ্ৰাণটি তেমনই তীব্র ও বোধ-কব্যায়িত। ইহা হইতে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, এই তন্ত্ররচনার পূর্ব হইতেই সতীদাহ-প্রথার অমানুষিক নিষ্ঠুরতা লোক-সমাজের হৃদয়-তন্ত্রীকে আলোড়িত করিতেছিল এবং মহানির্বাণে সেই প্রতিজ্ঞাই শাস্ত্রোচিত শাসন-বাক্যে প্রতিকলিত হইয়াছে। আরও বোধ হয়, তান্ত্রিকতা-প্লাবিত তাৎকালিক বাংলা দেশে মহানির্বাণের আদেশ একেবারে নিষ্ফল যায় নাই ;—সতীদাহ সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। পরে, বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা রামমোহনের চেষ্টায় রাজ-আজ্ঞা দ্বারা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এ-কার্যে রামমোহনের কৃতিত্ব যথেষ্ট থাকিলেও প্রেরণা, মহানির্বাণ

হইতে, এ-কথা না-বলিয়া থাকা যায় না। তবু কিছ এ-কথা, মহানির্বাণের অনুবাদ ও চীপনীকার জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ ভিন্ন আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

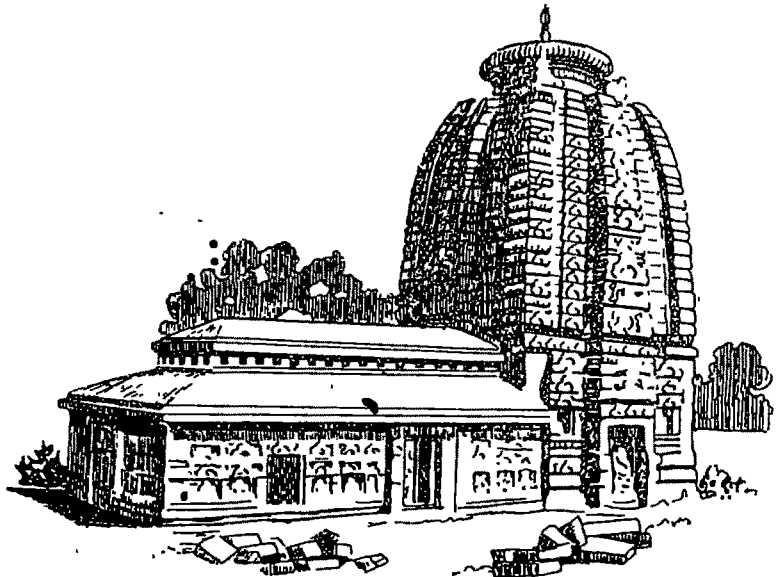
(৩) এদেশে বীতিন্ত প্রথায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধেও রামমোহনের প্রেরণা এই তন্ত্র হইতে। উহার অষ্টম উল্লাসের ৪৭ সংখ্যক শ্লোকটি এখন সর্বজনবিদিত হইয়া পড়িয়াছে ;—

“কস্তাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

সেথা বরায় বিদ্ববে ধনত্বসমমিতা ॥

আমি রামমোহনের মনস্তত্ত্বের সন্ধানে তাঁহার কয়েকটি প্রধান কার্যের প্রেবণা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। প্রেরণায় মানুষকে ধরু করে না ; বরং প্রেবণা গ্রহণ এবং তদনুসারে অক্লান্ত-ভাবে কার্যসাধনই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। সে পক্ষে, তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ, অদম্য চেষ্টা, ও অসীম সহিষ্ণুতা তাঁহার অ-লোকসামান্য ও সমুন্নত ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় প্রদান করে।*

* গত ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কুকনগরে রামমোহন স্মৃতিসভার অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।



পরমহংস রামকৃষ্ণ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

[১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উহার সমগ্র বাংলা অনুবাদ করিলে তাহা ছাপিতে প্রবাসীর মনকল্পে দশ পৃষ্ঠা লাগিবে। এখন সমগ্র অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারা গেল না। পরমহংসদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের কেবল কয়েকটি অংশের তাৎপর্য নীচে দেওয়া হইল।]

“পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে আমাকে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথা আমার মনে আছে। ...দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এক হাতে কিছু ধূলা ও অত্র হাতে কয়েকটি মুদ্রা লইয়া তিনি নদীর ধারে বসিয়া ধ্যানস্থ হইতেন, এবং উভয়েবই সমান অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার পর তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, ‘টাকা ধূলা, ধূলা টাকা, টাকা ধূলা, ধূলা টাকা,’ এবং এই সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবার পূর্ব ধূলা ও টাকা দুই-ই নদীতে ফেলিয়া দিতেন।”

“এক জন সাধু তাঁহাকে দীনতা সাধন করিতে, আপনাকে হীনতম মেথরের সমান মনে করিতে, বলেন। রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ মেথরের কাজ করিতে প্রতিজ্ঞা কবিলেন। তিনি গোপনে এক প্রতিবেশীর পাশখানার নীচের দরজা দিয়া চুকিয়া ময়লার গামলা হইতে ময়লা কেলিয়া দিয়া তাহা নদীতে ধুইরা ঘাটস্থানে রাখিয়া দিতেন। কিছু দিন তিনি এইরূপ করিবার পূর্ব ব্যাপারটি জানা পড়িল, এবং তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও অসুযোগ হইল। তখন তাঁহাকে মেথরের কাজ ছাড়িয়া দিতে হইল।”

“বস্তুতঃ তাঁহার সহিত মিলামিশায় আমার মনে এই ধারণা জন্মে, যে, আমি কচিং এমন আর একটি মানুষকে দেখিয়াছি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য বাহ্যিক আকাজক্ষা এত অধিক এবং বিনি ধর্ম সাধনের জন্য এত দুঃখ ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, যে, তিনি এখন আর সাধক নহেন কিন্তু সিদ্ধ হইয়াছেন। যে সত্যটির তিনি আত্মিক সাক্ষাৎ-

দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং বাহ্য হইতে তিনি স্বীয় আত্মায় মহৎ প্রেরণা লাভ করিতেন, তাহা পরমাশ্চর্য মাতৃ। তিনি পরমদেবতাকে মা বলিয়া উল্লেখ করিতে ভালবাসিতেন, শ্রীশ্রী মাতৃদেবের চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ভাবাবেশ হইত, এবং বিশ্বজননীর বাৎসল্যের গান গাহিতে গাহিতে উদ্ভেকজনীর আধিক্য তিনি সংজ্ঞাহারা হইতেন। তাঁহার এই বিশ্বমাতৃদেবের ধারণা কোন বিগ্রহ বা মূর্তিকে অতিক্রম করিয়া অনন্তের ধারণায় পবিণত হইত।”

“ভবানীপুরের এক জন খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচারক আমাব বন্ধু ছিলেন। তিনি একবার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারে আমার সঙ্গী ছিলেন। এই বন্ধুকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি বলিলাম, ‘আজ এক জন খ্রীষ্টীয় প্রচারককে আপনার নিকট এনেছি। তিনি আমার কাছ থেকে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে খুব ব্যগ্র ছিলেন।’ রামকৃষ্ণ শুধন মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বলিলেন, ‘আমি বীশ্বর পায়ে বর বার প্রণাম করছি।’ তাহার পর এইরূপ কথোপকথন হইল :—

আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি বীশ্বর পায়ে প্রণত হচ্ছেন এ কেমন কথা? আপনি তাঁকে কি মনে করেন?

রামকৃষ্ণ—কেন আমি তাঁকে ঈশ্বরের এক জন অবতার মনে কবি।

আমার বন্ধু—ঈশ্বরের অবতার! আপনি কি দয়া ক’রে বলবেন তাঁপনার কথার অর্থ কি?

রামকৃষ্ণ—আমাদের রাম বা কৃষ্ণের মত এক জন অবতার। আপনি কি জানেন না, যে, ভাগবতে একটি উক্তি আছে, যে, বিষ্ণু বা পরব্রহ্মের অবতার অসংখ্য?

আমার বন্ধু—আপনি দয়া ক’রে আরও ব্যাখ্যা করুন; আপনার কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি না।

রামকৃষ্ণ—সমুদ্রের কথা ধর না। মহাসাগর বিশাল ও প্রায় অপার জলরাশি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে,



স্বামী বিবেকানন্দ

মহাসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ অংশে, জল জমে বরফ হয়ে যায়। যখন তা জমে বরফ হয়, তখন তা সহজে নাড়া-চাড়া করা এবং বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যবহার করা যায়। অবতার কতকটা তার মত। যেমন মহাসমুদ্র, তেমনি আছেন জড়ের ও চেতনের মধ্যে অনন্ত শক্তি; কিন্তু কোন কোন উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে ঐ অনন্ত শক্তির এক একটি অংশ যেন ইতিহাসে মুর্ত্তিমান হন। তাঁকে তোমরা বল মহাপুরুষ, মহামানব। কিন্তু তিনি ঠিক বলিত গেলে সর্ববাপী ঐশীশক্তির স্থানীয় প্রকাশ, অর্থাৎ কিনা ভগবানের এক অবতার। মহাপুরুষের মহত্ব সারতঃ ঐশীশক্তির প্রকাশ।

আমার বন্ধু—আপনার মত বুঝলাম, যদিও আমরা তাতে সম্পূর্ণ সায় দি না। (তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধু বলিলেন) আমার ব্রাহ্ম বন্ধুরা এ-বিষয়ে কি বলেন জানতে চাই।

রামকৃষ্ণ—(ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া) ও আহাম্রিকদের কথা বলবেন না, এ-নব জিনিষ দেখবার চোখ তাদের নাই।

আমি—(রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া) আপনাকে কে বলেছে, মশায়, যে, মানবসমাজের বড় বড় উপদেষ্টাদের মহত্ব ঐশীশক্তির প্রকাশ বলে আমরা বিশ্বাস করি না, এবং সেই অর্থে তাহাদিগকে ঐশ কোন ভাবের (“idea”) অবতার মনে করি না?*

রামকৃষ্ণ—তোমরা কি সত্যি তাই বলে বিশ্বাস কর? আমি তা জানতাম না।

“একবার এক জন দর্শক তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? রামকৃষ্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী লিঙ্গ অনুসারে জ্ঞান ও ভক্তি শব্দ-দ্বটির মধ্যে জ্ঞানকে পুরুষ ও ভক্তিকে নারী বলিয়া উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি

জানিতেন না, যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে জ্ঞান ক্রী-বলিঙ্গ। যাহা হউক, এক্ষেত্রে তাহার জ্ঞানানুযায়ী লিঙ্গভেদের চমৎকার প্রয়োগ তিনি করিলেন। একটিকে পুরুষ ও অত্রটিকে নারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া এবং নারীদিগের অন্তঃপুরে থাকিবার ভারতীয় প্রথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন:—‘জ্ঞান পুরুষ বলে মা’র বাড়ির বাইরের মহলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়; কিন্তু ভক্তি নারী বলে একেবারে দোঙ্গা মা’র অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়।’

“আর একদিন এক জন দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমরা সংসারে নিত্য নানা উদ্বেগ ও কর্তব্য নিয়ে থাকি; এ অবস্থায় পারমার্থিক বিায়ে মনঃসংযোগ করতে হ’লে কি করতে হবে?’ রামকৃষ্ণ বলিলেন, ‘চৈকিতে মেয়েদের চিঁড়া তৈরি করতে দেখেছ? চৈকির মুশল যে গর্তটিতে ক্রমাগত পড়ে ও তার থেকে ওঠে, তার কাছে একটি স্ত্রীলোক ব’সে থেকে তাতে ধান দেয় আর কুটা ধানগুলি সরিয়ে নেয়। তাকে গর্তটি থেকে কুটা ধান খুব সাবধানে সরাতে হয়, নইলে তার আঙ্গুলগুলি খেঁতলে যেতে পারে। এই স্ত্রীলোকটির কথা ভাব। আর এও বিবেচনা কর, যে, সে তখন অল্প কাজেও ব্যাপৃত থাকে। তার কোলে একটি শিশু আছে, তাকে সে মাই দিচ্ছে, বাঁ হাত দিয়ে কুটা ধান রোদে দিবার জন্তে ছড়াচ্ছে, আবার এক জন প্রতিবেশীকে কিছুক্ষণ আগে যে চিঁড়া দিচ্ছিল তার সঙ্গে তার দামের কথাও বলছে। ঐ স্ত্রীলোকটির মন সকলের আগে সকলের চেয়ে বেশী কিসে আছে মনে কর? নিশ্চয়ই সেই চৈকির গর্তে ঢুকান হাতটিতে, যাতে ক’রে মুশলে হাতটা খেঁতলে না যায়। সেই রকম তোমরা এই সংসারে নানা ব্যাপারে লিপ্ত থেকে, নানা কর্তব্যে ব্যস্ত থেকে, কিন্তু সকলের আগে সকলের চেয়ে মন দিও তোমাদের পারমার্থিক কল্যাণের বিষয়ে, যাতে তা নষ্ট না হয়।’”

* শাস্ত্রী-মহাশয়ের ব্যবহৃত ইংরেজী কথাগুলির অবিকল অনুবাদ করা গেল না বলিয়া মূল ইংরেজী দিতেছি :—

“Myself—(addressing Ramakrishna) Who told you, Sir, that we do not believe that the greatness of the great teachers of humanity was a Divine communication, and in that sense they were incarnations of a Divine Idea?”

“আর একবার কথা উঠে, মালা জপ করা বা ঠাকুর দেবতার নাম বার বার উচ্চারণ করার বিষয়ে। সিদ্ধ সাধুপুরুষ বলিলেন, ‘একটি নাম বার-বার আওড়ান কিছুই নয় যদি তার সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ ভাবের উদ্বেক না হয়। একটা টিয়া পাখীর দৃষ্টান্ত নাও। তার মালিক তাকে নিজের

দেবতাদের নাম শিখিয়েছে। তাই সে দিন নাই ক্ষণ নাই সকাল-সন্ধ্যা কেবলই রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বলে চলেছে—যেন সে তাঁদের প্রেমে আত্মহারা। কিন্তু একদিন একটা ধূর্ত বেরাল পেছন থেকে এসে তাকে ধরল ও মেরে ফেলবার চেষ্টা করল। তখন কি স্তূতে পেলো? তখন তার কণ্ঠ থেকে আর রাধাকৃষ্ণ বেরয় না; তার জায়গায় তার যন্ত্রণার স্বাভাবিক কঁা কঁা শব্দ বেরতে থাকে। এই রকম, তোমাদের জগৎগালা মানুষ প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় হয়ত আওড়ান নামটি ভুলে যায়; তোমাদের ভগবৎপ্রেমিক তার ভগবানের নাম ভুলে যায়; তার মামুলি অবিবাস এসে পড়ে, ভগবানের চরণে তার যে আত্মসমর্পণ নাই তা ধরা পড়ে। যে ভগবদ্বিধাস জীবনের নানা পরীক্ষায় টিকে থাকতে না পারে, তা বিবাসই নয়।”

“একদিন তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় কতকগুলি লোক আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন অন্তান্ত প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্ন করিলেন, যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত মানুষের গুরু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতার পরিচালন ও উপদেশের আবশ্যক কিনা। রামকৃষ্ণ বলিলেন, ‘বদি কেউ তার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্য পরিচালক পায়, তা হ’লে তা নিশ্চয়ই সুবিধাজনক ও মহা সৌভাগ্য; এরূপ লোক তাকে বিশেষ সাহায্য করবেন। সে যে স্বচেষ্টায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে না এমন নয়, কিন্তু এরূপ লোকের সংসর্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিকতর সহজে হয়।’ তাহার পর নদীবক্ষে তখন যে ঈমারটি যাইতেছিল তাহা দেখাইয়া সুধাইলেন, ‘ঐ ঈমারটা কখন চুঁচুড়া পৌছবে মনে কর?’ প্রশ্নকর্তা বলিলেন, ‘সন্ধ্যার আগে ষ্টো ৬টার সময়।’ রামকৃষ্ণ বলিলেন, ‘ঈমারের পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা নৌকা দেখছ। ঈমারটার সাহায্যে নৌকাটাও ঐ সময়ে চুঁচুড়া পৌছবে। কিন্তু ধর, নৌকাটাকে ঈমার থেকে খুলে নেওয়া হ’ল এবং তাকে ঈমারটার সাহায্য না নিয়ে যেতে হবে; তা হ’লে সেটা কখন চুঁচুড়া পৌছবে?’ লোকটি বলিলেন, ‘সম্ভবতঃ কাল প্রাতঃকালের আগে নয়।’ তখন রামকৃষ্ণ বলিলেন, ‘ঠিক সেই রকম, মানুষ নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে তার দুর্বলতা ও ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে বিনা সাহায্যে অগ্রসর হ’তে পারে—এতে কেবল বেশী সময়

লাগে মাত্র; অল্প দিকে, বদি সে কোন অগ্রসর আত্মার সঙ্গে ও সাহায্যের সুবিধা পায়, তা হ’লে সে দশ-বার বণ্টার পথ চার বণ্টায় অতিক্রম করতে পারে।’

“থাক, তাঁহার উপদেশের কথা অনেক বলিলাম। এখন তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহ আমার প্রতি কিরূপ ছিল, তাহা কিছু বলি। এক সময় তিনি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্ত আমাকে বার-বার অনুরোধ পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজে ব্যস্ত থাকায় বাইতে পারিতেছিলাম না; তখন তিনি একদিন স্বয়ং আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হয়ত অল্প কোথাও কোন কাজে বাইবার পথে। তখন আমাদের মধ্যে এই কথাবার্তা হইল—

“রামকৃষ্ণ—আমি বার-বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এবং তুমিও বার-বার আসবে বলা সত্ত্বেও তুমি অনেক দিন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই, একেমন কথা?

“আমি—ব্রাহ্মসমাজের কাজে আটক পড়ে গিয়েছিলাম। আজকাল আমি বড় ব্যস্ত।

“রামকৃষ্ণ—চুলোয় যাক তোমার ব্রাহ্মসমাজ যদি তা তোমাকে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে!

“তার পর আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি হাসিলেন ও বলিলেন—‘আমি যখন তোমার কাছে আসছিলাম তখন লোকগুলা (অর্থাৎ তাঁহার নুতন শিষ্যেরা) বললে, ‘আপনি একটা ব্রাহ্মের কাছে কেন যাবেন, সে আপনার দর্শন পাবার যোগ্য নয়।’ তাতে আমি তাদের কি বলেছিলাম জান?’

“আমি—আপনি তাদের কি বলেছিলেন?

“রামকৃষ্ণ—আমি তাদের বলিলাম, দাখ, আমি সবাইকার জন্তে।”

“আর একবার তিনি দম্ভদম্ভ [এক বাগান-বাড়িতে একটি ব্রাহ্ম উৎসবে যোগ দিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমার সেখানে বাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। পৌছিয়া দেখি, তিনি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন, ‘আঃ এখন আমার বুকে

জুড়াল! তাহার পর তাঁহার সঙ্গীতাদি অসাধারণ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।”

“একদিন আমি দীর্ঘকাল পরে যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী হইতেছি, তখন দেখি এই সাধুপুরুষ তাঁহার সরল বালকোপম ভাবে তীর-ধনুক হাতে নিকটের গাছগুলার থেকে কতকগুলো কাক তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। বলিলাম, ‘কি হচ্ছে? তীরন্দাজ হয়েছেন?’ তাহাতে তিনিও আমাকে এত দিন পরে আসিতে দেখিয়া সমান বিস্মিত হইলেন ও তীর-ধনুক ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছিল, যে, তিনি ভাবাবেগের আতিশয্যে সংজাহীন হইয়া পড়েন। আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে তাঁহার কক্ষের মধ্যে লইয়া গেলাম, বিছানায় শুয়াইলাম, এবং যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার জ্ঞান হইল তত ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যখন তিনি আবার কথা কহিতে পারিলেন তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে আলিপুরের “চিড়িয়াখানায়” বাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার কয়েক জন শিষ্য তাঁহাকে সিংহ দেখাইতে লইয়া বাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি সিংহগুলো দেখিতে পাইবার চিন্তায় আনন্দ যে-ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সরলতা অতি মধুর। তিনি বার-বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ‘তুমি কি সিংহগুলিকে দেখতে ভালবাস না? মা-দুর্গার বাহন সিংহগুলিকে?’ আমি হাসিয়া বলিলাম, ‘আমি অনেক বার তাদেরকে দেখেছি।’ তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, তাদেরকে আর একবার দেখতে আমার সঙ্গে যাওয়া খুব মজা নয় কি?’ আমি বলিলাম, ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব মজা; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাকে আর একটা কাজে যেতে হবে। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে সুকিয়াস্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত যাব; তার পর নরেনকে তার ইস্কুল থেকে ডেকে পাঠাব, সে আপনাকে সঙ্গে করে জু’তে নিয়ে যাবে।’ পরে আমি বিবেকানন্দ নামে পরিচিত নরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রপলিটান ইন্সটিটিউশনে কাজ করিতেন।

“শেষে সেইরূপ ব্যবস্থাই হইল, এবং এক জন যুবা শিষ্য একখানা ছেকড়া গাড়ী ডাকিয়া আনিলেন। আমার যত দূর মনে পড়িতেছে, তিনিও গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে উঠিলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া রামকৃষ্ণ আমার বামদিকে বসিবার জিদ ধরিলেন। আমি প্রথম প্রথম তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যখন গাড়ীটা চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি চান্দর দিয়া বাঙালী নবযুগের মত মাথায ঘোঁটা দিলেন। আমি তাঁহাকে সেরূপ করিবার কারণ

জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ‘দেখছ না, আমি এখন বোঁ হয়েছি; আমার বরের সঙ্গে যাচ্ছি।’ এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাত দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিলেন, এবং উপবিষ্ট অবস্থাতেই আনন্দে নৃত্যের ভঙ্গী করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার ভাবাবেগ হইল। তখন বাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল অসামান্য আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল, এবং সম্পূর্ণ সংজাহারা হইবার পূর্বে তিনি আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, ‘মা, ওমা, আমাকে সংজাহীন করো না মা। ওমা, আমি চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখতে যাচ্ছি। ওমা, আমি গাড়ী থেকে পড়ে যেতে পারি। এই যাওয়া-আসাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে বেশ ভাল থাকতে দাও।’ অতঃপর তিনি আমার বাহুতে ভর দিয়া বাহুজ্ঞানশূন্য হইলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি আবার তাঁহার বালকোপম সরল ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন। সুকিয়াস্ট্রীটের মোড় পৌছিবার পর নরেনকে ডাকা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং তাঁহার গুরুদেবকে জু’তে লইয়া গেলেন। এখানে বলা দরকার, যে, মেট্রপলিটান ইন্সটিটিউশন তখন সুকিয়াস্ট্রীটে অবস্থিত ছিল।”

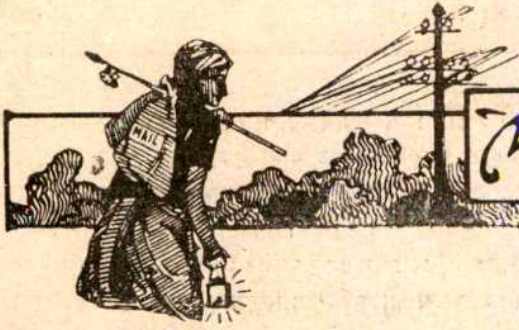
[শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের শেষ তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।]

“My acquaintance with him, though short, was fruitful by strengthening many a spiritual thought in me. I owe him a debt of gratitude for the sincere affection he bore towards me. He was certainly one of the most remarkable personalities I have come across in life.”

তাৎপর্য্য। “তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অল্পকাল-স্থায়ী হইলেও, তাহা এই ফল দান করিয়াছিল, যে, তাহা আমার অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তাকে পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি আমার প্রতি যে অকপট মেহ হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাহার জগ্ন আমি কৃতজ্ঞতাধ্বনে ধনী। আমি জীবনে যে-সকল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে আসিয়াছি, তিনি নিঃসন্দেহ তাঁহাদের মধ্যে এক জন।”

[এই প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রী-মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের কোন কোন অংশের তাৎপর্য্যাক্রম অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পরমহংসদেবের নিজস্ব বচনভঙ্গীর আভাস পাওয়া যাইবে না। শাস্ত্রী-মহাশয়েরও বাংলা ইহা নহে।

চেকোব্রোভাকিয়ায় রাজধানী প্রাগ শহরের প্রসিদ্ধ চিত্রকর জোরাকের অঙ্কিত তৈলচিত্রের কোটোগ্রাফ হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণের ছবি দিলাম। কোটোগ্রাফটি ব্রজনারী গণেশনার্থের সৌজ্ঞেয় প্রাপ্ত।]



দেশ-বিশ্বের কথা

ভারতবর্ষ

অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গ ভিখারী ও স্বাবলম্বী মানুষ—

গত অক্টোবর যোগের সময় প্রয়াগের বেণীবাটে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, ভিখারী ও স্থানীয় মানাখাঁর সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুটি অঙ্গহীন মানুষের ফোটোগ্রাফ প্রয়াগের ডাক্তার ললিতমোহন বহু তুলিয়া পাঠাইয়াছেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক।



প্রয়াগের বেণীবাটে বিকলাঙ্গ ভিখারী



প্রয়াগের বেণীবাটে বিকলাঙ্গ ভিখারী

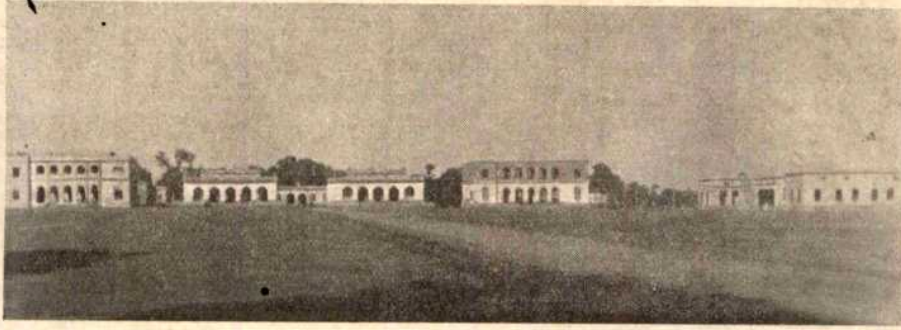
তাহার হাত গজায় নাই। দুটা হাতের জায়গায় দুটা মাংসপিণ্ড আছে। জন্মাবধি এইরূপ। মাংসপিণ্ড দুটা সরু, ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা। ইহার একটা দিয়ে লোকট মালা জপে, পয়সা কড়ি দিলে অল্পটা দিয়ে নমস্কার করে। অল্প ব্যক্তি বালক, বয়স বছর আঠার হইবে। জন্মাবধি ইহার বাম হাত নাই, গজায় নাই। ডান হাতের গড়ন ভাল ও স্বাভাবিক। ইহার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত গড়ন স্বাভাবিক; কিন্তু কোমরের নীচের অংশে ডান পা মাত্র ৮ ইঞ্চি লম্বা ও তাহাতে হাঁটু নাই, বাম পা ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং তাহাতে উরু ও হাঁটু দুই আছে। ইহার মা ইহাকে একটা চার চাকার কাঠের গাড়ীতে বসাইয়া ভিক্ষার জঞ্জ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। এইরূপ অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গ মানুষ নিত্যন্ত বিরল নহে তাহাদের উন্নয়ন করিবার কারণ এই, যে, আমাদের দেশে তাহারা স্বয়ং ভিখারী হয় বা অন্যের দ্বারা ভিক্ষাসংগ্রহের জঞ্জ ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে কিন্তু

এরূপ মানুষকেও শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী ও আত্মসম্মানবান্ করা হয়। ১৯২৬ সালে আমি যখন চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে একটা অনাথ বালকবালিকাদের বিদ্যালয় দেখিতে যাই, তখন দেখি, জন্মাবধি উভয় হস্তহীন কিশোরী কুন্ড একটি ১৮। ১৯ বৎসরর ছেলে, কেবল দুটি পা ও পায়ের আঙ্গুলগুলির সাহায্যে কাঠের হুল্লর হু দর আসবাব প্রস্তুত করিয়াছে ও করিতেছে। সে যে পায়ের দ্বারাই সব কাজ করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্ত, কাঠের আদমাবের

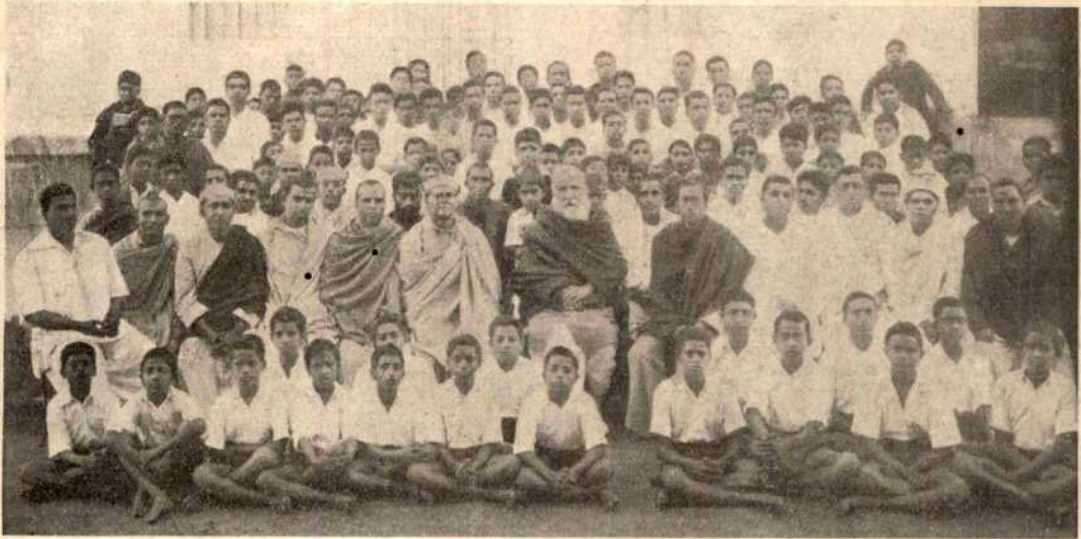
উপর হুল্লর রেখাচিত্র আঁকিল এবং নিরাশলাইয়ের বাস্তব গুলিল, একটা কাঠি লইল, সেটা জ্বালাইল, মুখে চুকুট লইল এবং চুকুট ধরাইল। আমার ইউরোপ দর্শন বিষয়ক একটা সম্পাদকীয় চিঠিতে আমি ইহার বিষয় লিখিয়াছিলাম। সে প্রায় ৯ বৎসরের কথা।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বিষয় আগে কাগজে ও রিপোর্টে পড়িয়াছিলাম। এবার তাহার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিলাম। বিদ্যাপীঠটি বেশ উচ্চ খোলা বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর নিশ্চিত, জায়গাটি স্বাস্থ্যকর,



বিজ্ঞাপীঠের একটি অংশ



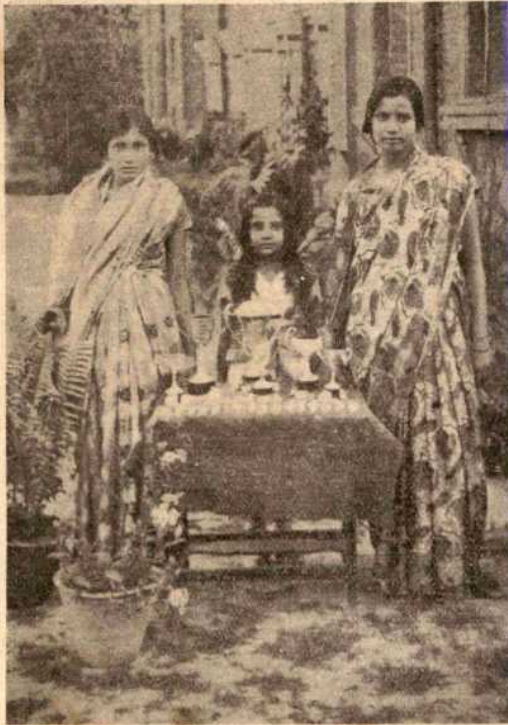
দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিজ্ঞাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা। বিজ্ঞাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং প্রবাসী-সম্পাদক।

ঘরবাড়িগুলিও পাকা ও স্বাস্থ্যকর। ছাত্রেরা যাহাতে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং যাহাতে তাহাদের নৈতিক ও দৈহিক উন্নতি হয় তাহা নিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্রাসী ও ব্রহ্মচারীরা শিক্ষাদান ও তত্ত্বাবধান করেন। ছেলের ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। তাহারা ফুলের বাগানে নানাবিধ ফুলের ও তরকারীর ক্ষেতে নানা প্রকার তরকারীর চাষ করে। দেওঘর গোলাপ ফুলের জন্ম বিখ্যাত। বিজ্ঞাপীঠে বেশ বড় বড় গোলাপ হয়। এখানকার একটি অহুবিধা এই, যে, গরমের সময় কুমার জল কমিয়া যায় বা থাকে না। একটি খুব গভীর নলকূপ হইলেই এই অহুবিধা দূর হইতে পারে। তাহাতে অধ্যাপক ও ছাত্রদের

শ্রান, রন্ধন, পান ত হইতেই পারে, নানা প্রকার কৃষিকার্য্যও যথেষ্ট বাড়াইতে পারা যায়। কতিপয় ধনী লোক বিজ্ঞাপীঠের সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরই কেহ বা অল্প কোন সদাশয় সম্রতিপন্ন ব্যক্তি নলকূপের ব্যয় অনায়াসে দিতে পারেন। ছাত্রেরা ডিল ও ব্যায়াম ভালই করিল, আবৃত্তিও মন্দ নহে। তাহারা সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কণও করে। দেশী বাজ্যন্তের একতান বাজ্য ভাল লাগিয়াছিল। কঠিনসঙ্গীতের একজন শিক্ষকের ব্যয় কোন ধনী লোক দিলে ভাল হয়। কোন এক জন ধনী লোকের সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ শিক্ষকও নিযুক্ত হইতে পারেন।



দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে
প্রবাসী-সম্পাদককে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে



শ্রীমতী মায়ী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সাব্বনা ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী শোভা
ভট্টাচার্য। ইষ্টারা মিঃ ডি, আর, ভট্টাচার্যের কন্যা

সাজাহানপুরে সঙ্গীত সম্মেলন—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাজাহানপুরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ডি, আর, ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি সঙ্গীত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অন্ত অঞ্চল হইতেও বহু সঙ্গীতবিৎ ইহাতে যোগদান করেন। কলিকাতা হইতে আগত শ্রীমতী বাণাপাণি মুখোজ্যে ও শ্রীমতী সুবমা দে সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বহুসংখ্যক পদক লাভ করিয়াছেন। সভাপতি-মহাশয়ের কন্যার মৃত্যুকৌশলের জ্ঞাত ও কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। মিঃ এন, আর ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী চন্দ্রশেখর পাণ্ডুর খেলা ও শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর হারমোনিয়ম সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করে। সাজাহানপুরবাসীদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় প্রবাসী বাঙালী বালকের কৃতিত্ব—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশে বেসিন শহরে একটি ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। দুইজন বন্দী ও দুইজন প্রবাসী বাঙালী বালকের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়। বেসিন



শ্রী স আং ডোয়ে, শ্রী স বা গিন, এবং শ্রী বিপুল সিংহ, শ্রীরমেন দাস

শহরস্থ সন্ন্যাস বন্দীগণ ও মিঃ এস, বি, সেন, মিঃ এ, কে, বহু ও শ্রীমতী হরভি সিংহ, বি-এল প্রমুখ বহু মান্যগণ্য বাঙালীর সম্মুখে এই ক্রীড়া অহুতঃ হয়। বাঙালী বালক দুইটি বন্দীদ্বয়কে হারাইয়া দিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ইহাদের চিত্র এখানে দেওয়া হইল।

হরহুন্দরী ধর্মশালা কাশী—

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও দানবীর ত্রিপুরানিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কাশী গোখুলিয়া অঞ্চলে একটি ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুর সর্ববিধ পূজা রীতি এখানে বিনা ভাড়ায় অহুতঃ হইতে পারিবে।

বাংলা

বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়—

এই বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানের জন্ত ১৭ বৎসর পূর্বে একটি বোর্ডিং খোলা হয়। এই বোর্ডিং বর্তমানে ৫টি বালিকা আছে। ইহাদের মধ্যে একটি বালিকা অদূর মাস্তাজের অন্তর্গত গীঠপুর হইতে আসিয়াছে। অবশিষ্ট ঢাকা, করিদপুর, বরিশাল, যশোর, গুলনা, পাবনা, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, বর্দমান, মুর্শাদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পনেরটি জেলা হইতে আসিয়াছে। এই বালিকাদের মধ্যে তিনটি বিবাহিতা ও তিনটি বিধবা অন্তর্গত শ্রেণীর বালিকার সংখ্যা পাঁচটি। এই ছাত্রী-নিবাসটি এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব, বাংলা দেশের আর কোনও মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী-নিবাস নাই।

শ্রী-শিক্ষা সহজলভ্য করিবার জন্ত বোর্ডিং ফি স্কুল ফি সহ মাত্র ৭ টাকা করা হইয়াছে। বোর্ডারগণকে স্বতন্ত্র বেতন দিতে হয় না।

ব্রাহ্ম বাতীত স্থানীয় বালিকাগণ সকলেই এ পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়িয়া আসিয়াছে।

বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৮২টি, তার মধ্যে ২টি মুসলমান। এই বিদ্যালয় গত দুই বৎসর মধ্য ইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষায় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল এই বিদ্যালয়ে একটি চরকা ও বয়ন বিভাগ খোলা হইয়াছে। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ইহাতে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। এখানে গাম্ছা, তোয়ালে, চাদর, শাড়ী, ধুতী, টেবিল-ঢাকনা, ঝাড়ন ও জামার কাপড় বোনা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয় বাংলা দেশের একটি বড় অভাব পূরণ করিয়া আসিতেছে। ইহা গভর্নমেন্টের ও জনসম্প্রদায়ের সাহায্য পাইবার সম্পূর্ণ উপবৃত্ত। ইহা অনেক গরিব বিধবা ও অন্তর্গত শ্রেণীর বালিকা-দিগের স্বাধীনভাবে উন্নত জীবন যাপনের পথ শুধু উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই, এখানে আসিয়া না পড়িতে পারিলে অনেক বালিকার কোনরূপ শিক্ষাভ্যাসের সুযোগই মিলিত না। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে, ইহারা আসিতে চায় তাহাদের সকলকেও কর্তৃপক্ষ স্থান দিতে পারেন না। এই জন্ত অবিলম্বেই একটি পৃথক স্কুল বাড়ি অত্যাৱণ্যক হইয়াছে। তাহা হইলে এই সমগ্র বাড়িটাই বোর্ডিংয়ের জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। স্থানভাব ছাড়াও একই বাড়িতে স্কুল ও বোর্ডিং থাকিতে বোর্ডারদিগের অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। এই সকল অভাব ও অসুবিধা দূরীকরণ-উদ্দেশ্যে স্কুল কমিটি বিদ্যালয়সংলগ্ন উত্তরদিকের জমির উপর বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্ত আট বৎসর পূর্বে গভর্নমেন্টের নিকট আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ সহ একটি নয়া পেশ করিয়াছেন। কিন্তু টাকার অভাবের জন্ত গভর্নমেন্ট কিছুই করিতে পারেন নাই। এই গৃহ নির্মাণের জন্ত স্কুল কমিটি গত বৎসর ৫২০০০ ইট প্রস্তুত করিয়াছেন, এখন গভর্নমেন্টের আশ্বাস পাইলেই কার্য আরম্ভ করিতে পারা যাইবে।

বাইসিক্লে দিল্লী গমন—

চারিটি বালক বাইসিক্লে দিল্লী গিয়াছিলেন। তাহাদের নাম নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোককুমার রায় চৌধুরী, অরবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাহাদের ছবি দেওয়া হইল।



দণ্ডারমান—শ্রীঅলোককুমার রায় চৌধুরী, শ্রীঅরবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়



শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকে প্রেমলতা দেবী—

স্বগায়িকা প্রেমলতা দেবী মহোদয়া গত ২৩ এপ্রিল ইহদ্যম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



প্রেমলতা দেবী

মহোদয়ের তৃতীয় কন্যা ও শ্রীযুক্ত স্বপ্নকল্পনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী। তিনি সঙ্গীতনায়কী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন গুণী ছাত্রী ছিলেন। গোপেশ্বর বাবুর নিকট ১৫ বৎসর ব্যবৎ খেয়াল, ঝংগা, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন সঙ্গীত সাধনা তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু ছিল। তাঁহার রচিত 'সঙ্গীত সুখা' খেয়াল, টপ্পা, ঝংগা ও বাংলা গানের একখানি উৎকৃষ্ট স্বরলিপি পুস্তক। তিনি প্রত্যেক গানটির অলঙ্কার বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন। এলাহাবাদে 'সঙ্গীত সুখা'র হিন্দী সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানী ও স্তরগণ এই পুস্তকটির বিশেষ সমাদর করেন।

ডক্টর শ্রীনিবাসচন্দ্র রায় মহাপাত্র—

মেদিনীপুর জেলার পালপাড়া গ্রামে একটি অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত বংশে শ্রীমান শ্রীনিবাসচন্দ্র রায় মহাপাত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার



ডক্টর শ্রীনিবাস রায় মহাপাত্র

পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ রায় মহাপাত্র। কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাধারণ ইতিহাসের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের সহায়তায় স্বর্ণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম ছাত্ররূপে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গবেষণা আরম্ভ করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া অতিকষ্টে দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া ডি, লিট, উপাধির লব্ধ তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করেন। পরীক্ষায় তাঁহার প্রবন্ধের যোগ্যতা বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হওয়ায় কালীহিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৪ সালের সমাবর্তন উৎসবে তাঁহাকে ডি, লিট, উপাধি ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীমান রায় মহাপাত্র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি ভিন্ন সাধারণ ইতিহাস, পৌরশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, শাসনতন্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

বিদেশ

জাপানে ভারতীয় নারীদিগের দ্বন্দ্ব পর্ক—

কোবে জাপানের একটি প্রধান শহর। সেখানে ভারতীয় নারীদের একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাবের উদ্যোগে কোবেতে দ্বন্দ্ব পর্কের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান পার্সী ও খ্রীষ্টান মহিলারা এবং শিশুরা যোগ দিয়াছিলেন। তাহাদের ফোটোগ্রাফ এখানে মুদ্রিত হইল। ইহা দিল্লীর হিন্দুস্তান টাইমসের শ্রীযুক্ত চমনলালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



জাপানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয় নারীগণ ঈদপল্লি উদ্‌যাপন করি তেছেন।



ডাঃ সতীশচন্দ্র বোষ

ডাঃ সতীশচন্দ্র বোষ—

ডাঃ সতীশচন্দ্র বোষ প্রথম জীবনে একজন পণ্ডিতকিৎসক ছিলেন। পণ্ডিতকিৎসায় অধিকতর জ্ঞান আহরণের জন্ত তিনি আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে যান ও ১৯০০ সনে এই বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ সন পর্যন্ত বোষ-মহাশয় শিকাগো ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বিষয় আরও অধ্যয়ন করেন।

তিনি অতঃপর দেশে না ফিরিয়া শিকাগো শহরে বাবসায়ে লিপ্ত হন। সেই বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বোষ-মহাশয় সেখানে ধূপের ব্যবসায় আগ্রহ করেন। তাঁহার অনুবর্তী হইয়া অনেকে এখন ধূপ উৎপাদন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোষ-মহাশয়ের কোম্পানীর নাম ইণ্ডিয়া ইনসেন্স কোম্পানী। ধূপের উপাদানের অনেকগুলি তিনি ভারতবর্ষ হইতে লইয়া থাকেন। তিনি সন্তোষিত ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, ধূপ ছাড়া মার্কিনীদের উপযোগী অস্ত্রান্ত কি কি জিনিষ আমেরিকায় চালান দেওয়া যাইতে পারে তাহা অগ্রসন্ধান করাই তাঁহার ভারত আগমনের অন্ততম উদ্দেশ্য।

স্বরলিপি

গান

কোন গহন অরণ্যে তারে এলেন হারিয়ে—

কোন দূর জনমের কোন স্মৃতি বিস্মৃতি ছায়ে।

আজ আলো আঁধারে

কখন বৃষ্টি দেখি কখন দেখি না তারে •

কোন মিলন স্বপ্নের স্বপন সাগর এলো পারায়ে ॥

ধরা অধরার মাঝে

ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।

বকুলতলার ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে

জানি নে মন পাগল করে কিসে

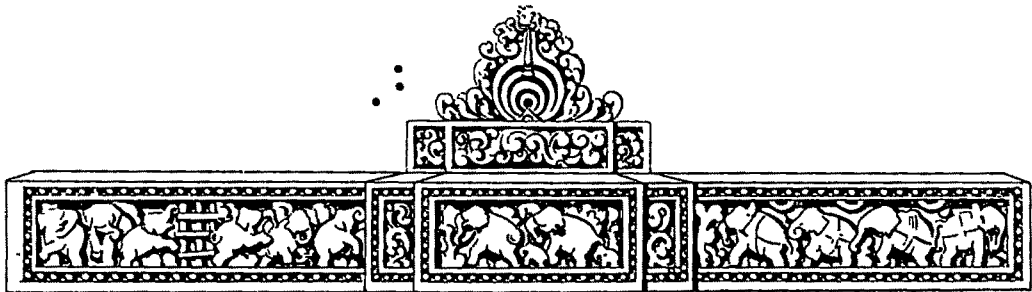
কোন নটিনীর ঘণ্টা আঁচল লাগে আমার গায়ে ॥

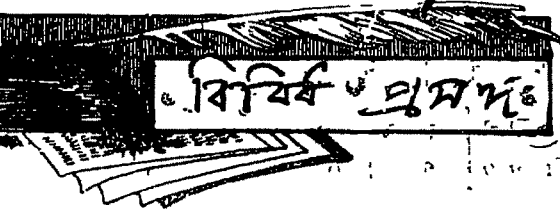
কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

সা	সা	রা	রা	না	ধা	ধা	-গা	পা	পা	-গা	ধা	পা	-না	রা	-না	-গা
কো	ন	গ	হ	ন	অ	র	০	গো	০	০	তা	রে	০	এ	০	০
গা	-মা	মা	-না	-না	-না	-না	-না	-গা	রা	রা	-পা	পা	পা	-না	পা	পা
লে	০	ম	০	০	০	০	০	০	এ	লে	ম	হা	রা	০	য়ে	০
না	সী	রী	সী	সী	না	ধা	ধা	পা	পা	পা	না	ধা	পা	-না		
০	০	০	গ	হ	ন	অ	র	গো	০	০	তা	রে	০			
সা	সা	সা	-মা	মা	মা	গমপ	-পা	পা	-পা	-না	ধা	ধা	না	সী	-না	গী
কো	ন	দু	র	জ	ন	মে	০	ব	কো	ন	০	স্ব	তি	০	বি	০
রী	সী	-না	সা	রা	গা	মা	পা	ধা	ধা	ধা	-গা	ধা	ধা	-গা	পা	পা
তি	ছা	০	য়ে	০	০	০	০	০	গ	হ	ন	অ	র	০	গো	০
ধা	পা	-না														
তা	রে	০														
পা	পা	পা	পা	পা	-না	না	না	না	সী	-না	-না	-না	-না	সী	গী	গী
আ	জ	আ	লো	০	আ	০	ধা	রে	০	০	০	০	০	ক	ধ	ন
গী	গী	-না	সী	গী	-না	রী	সী	-সী	না	না	-না	না	-না	সী	-না	-না
বু	বি	০	দে	খি	০	ক	থ	ন	দে	খি	০	না	০	তা	রে	০

-১ না -না | সী সী গী | রী সী -সী | সী না সী | ধা পা পা | বা রা গা |
 ০ কো ন | মি ল ন | হু খে বু | স্ব প ন | সা গ র | এ ০ ০ |
 গা -মা -১ | রা রা -পা | ক্রা পা -১ | ক্রা পা ধা | না সী রী | সী সী সীনা | ধা ধা গা-
 লো ০ ০ | এ লো ০ | পা রা ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | গ হ ন | অ র ০ |
 -১ -১ | স মা মা | মা মগা -পা | প্ৰা ধা -১ | -১ -১ -১ | ধা ধা -সী | ধা পা -পা |
 ০ ০ | ধ রা অ | ধ রা ০ বু | মা কো ০ | ০ ০ ০ | ছা রা ০ | ন টে বু |
 ক্রা পক্রা ক্রা | ধা পা -মা | মা মা -মা | মা মগা পা | পক্রা পা -১ | -১ -১ -১ |
 বা গি ০ | ক্রি তে ০ | আ মা বু | বা শি ০ | বা ০ ০ | ০ ০ ০ |
 ধা ধা -সী | ধা পা -১ | রা গা মা | পা মা রা | সী -১ -১ | -১ -১ -১ |
 আ মা বু | বা শি ০ | বা ০ ০ | ০ ০ ০ | জে ০ ০ | ০ ০ ০ |
 সগ' গী -গা | গী গী গী | মী গী গী | রী সী সী | না না ধা | না -না সী |
 ব কু ল | ত লা র | ছা রা বু | না চ ন | হু লে র | গ নু ধে |
 না সী -১ | -১ -১ -১ | সী সী গী | রা সী -সী | না না ধা | না সী রী | না সী -১ |
 মি শে ০ | ০ ০ ০ | জা নি ০ | নে ম নু | পা গ ল | ক রে ০ | কিসে ০ |
 -১ -১ -১ | সী -গী গী | রী সী সী | না -না সী | ধা পা -পা | রা বা গা | গা -মা -১ |
 ০ ০ ০ | কো ন | টি নী . র | বু র গী | আ চ ল | লা ০ ০ | গে ০ ০ |
 -১ -১ -১ | -১ -১ গা | রা বা -পা | ক্রা পা -পা | ক্রা পা ধা | না সী বী | না -১ সী |
 ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | লা গে ০ | আ মা বু | গা ০ ০ | ০ ০ ০ | মে ০ ০ |
 ধা পা পা | রা ধা পা | ধা ধা -গা | পা ক্রা -গা | ধা পা -১ |
 ও কো ন | গ হ ন | অ র ০ | গো ০ ০ | তা রে ০ |





ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন-বণ্টনে অবিচার

ভবিষ্যতে যে আইন অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইবে, তাহার খসড়ার এক একটি ধারা বিলাতী পালেমেন্টের হাউস অব কমন্সে বিচারবিস্তারের পব গৃহীত হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকেরা সমগ্র খসড়াটাই ও ধারাসমূহাব যত সমালোচনাই করুক না, তাহার পরিবর্তন হইবে না। ইংরেজদের মধ্যেও যে-সব পালেমেন্ট-সদস্য সংখ্যাভূমিষ্ট দলের নহেন, তাঁহাদেরও উপস্থাপিত কোনও ধারার বিশিষ্ট বকমেব সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে না। তথাপি সমগ্র বিলটির এবং ধারাসমূহাব সমালোচনা আবশ্যক, সর্বসাধারণের জানা আবশ্যক ভারতবর্ষের পক্ষে অনিষ্টকর কিরূপ আইন হইতে বাইতেছে। দৈনিক কাগজে ইহা দেখান যতটা সম্ভবপব, মাসিক কাগজে ততটা নহে। তথাপি, আমরা কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি ও অবিচার দেখাইয়া থাকি।

গত মাসের 'প্রবাসী'তে আমরা সমগ্রভাবতের জ্ঞাত অভিপ্রেত ভবিষ্যতের ব্যবস্থাপক সভার ঘাসেমন্ত্রীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিকে যেভাবে আসনগুলি বাঁটরা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাব দোষ দেখাইয়াছিলাম। এবাবে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভার কোঞ্জিল অব্ স্টেট্ এবং ঘাসেমন্ত্রী উভয়ই আসন বণ্টনের কোন কোন দোষ দেখাইব।

ঘাসেমন্ত্রীর আসন বণ্টন

নূতন ভারতশাসন বিল অনুসারে ঘাসেমন্ত্রীতে ৩৭৫ জন সদস্য থাকিবেন। এই ৩৭৫ জনের ৩৭৫টি আসন কি প্রকারে বণ্টিত হইয়াছে বলিতেছি।

ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হইবে ঠিক হইয়াছে। শুধু ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির ও দেশী রাজ্যগুলির মোট লোকসংখ্যা ৩৩,৫২,০১,৯১২। এই

তেজিশ কোটির অধিক লোকদের প্রতিনিধি হইবেন ৩৭৫ জন। তাহা হইলে প্রতি ৮,৯৫,৭৩৮ জনেব সমষ্টির প্রতিনিধি হইবেন এক জন কবিয়া। (কেন না, ৩৩,৫২,০১,৯১২কে ৩৭৫ দিয়া ভাগ করিলে ৮,৯৫,৭৩৮ হয়।) অতএব যে-সব দেশী বাজ্যেব ক্ষেডাবেশ্বনভুক্ত হইবার কথা, তাহাদের অধিবাসী ৭,৮৮,০১,৯১২ জনেব প্রাপ্য হয় ৮৭ এবং ভগ্নাংশ, ধরুন ৮৮ জন, প্রতিনিধি। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিব অধিবাসী ২৫,৭১,০০,০০০ জন অধিবাসী প্রাপ্য হয় ২৮৭ জন প্রতিনিধি। কিন্তু দেশী বাজ্যগুলিকে দেওয়া হইয়াছে ১২৫টি প্রতিনিধি ও আসন, অর্থাৎ তাহাদের ত্রাঘ্য প্রাপ্য অপেক্ষা ৩৭টি বেশী, এবং প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইয়াছে ২৫০টি অর্থাৎ ত্রাঘ্য প্রাপ্য অপেক্ষা ৩৭টি কম। বলা হইয়াছে বটে, যে, প্রদেশগুলিকে ২৫০টি আসন দেওয়া হইবে, কিন্তু বাস্তবিক দেওয়া হইবে ২৪৬টি। কারণ ৪টি আসন বিশেষ কোন প্রদেশকে দেওয়া হইবে না। সেগুলির সদস্য গবর্ণর-জেনারাল মনোনীত কবিয়া দিবেন। অতএব বাস্তবিক প্রদেশগুলিকে তাহাদের ত্রাঘ্য প্রাপ্য অপেক্ষা ৪১ জন কম প্রতিনিধি দেওয়া হইবে।

প্রদেশগুলির মধ্যে আসন বণ্টন

২৫,৭১,০০,০০০ ব্রিটিশভারতীয়দের প্রতিনিধি হইবেন ২৪৬ জন। ২৫,৭১,০০,০০০কে ২৪৬ দিয়া ভাগ কবিলে পাওয়া যায় ১০,৪৫,১২১। তাহা হইলে প্রত্যেক ১০,৪৫,১২১ জনেব সমষ্টি এক জন কবিয়া প্রতিনিধি পাইবেন। এই সংখ্যা অনুসারে হিসাব করিয়া আমরা নীচের তালিকায় দেখাইব, কোন প্রদেশের কত জন প্রতিনিধি ও আসন প্রাপ্য হয় এবং ভারতশাসন বিলে তাহাকে কত দেওয়া হইয়াছে। প্রদেশগুলির যে লোকসংখ্যা তালিকায় দিলাম, তাহা ভারতশাসন বিলের ভিত্তীভূত স্মরণে

পালমেটাঘী-কমিটির-রিপোর্ট অনুযায়ী। পেন্সল-বিপোর্টে যে লোকসংখ্যা আছে, তালিকায় মাস্তাজ, বোম্বাই-বিহার, ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা তাহা হইতে কিছু ভিন্ন দেখা যাইবে। কাবণ, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর অল্প অংশ উড়িষ্যা প্রদেশে বাইবে, সিদ্ধ ও এডেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক্ কবা হইবে, এবং বিহার ও উড়িষ্যা দুটি আলাদা প্রদেশ হইবে।

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	প্রাপ্য আসন	প্রদত্ত আসন
মাস্তাজ	৪৪০০০০০	৪৩৬	৩৭
বোম্বাই	১৭২৪০০০০	১৭১	৩০
বাংলা	৫০১৪০০০	৪৭২	৩৭
আন্দ্র-অযোধ্যা	৪৮৪০৮৭৩	৪৬৩	৩৭
বিহার	৩২৪০০০০	৩১০	৩০
গুজরাট	২৩৫৮৮৫২	২৩৫	৩০
মধ্যপ্রদেশ-বেহার	১৫৫০৭৭২৩	১৪৮	১৫
আসাম	৮৬২২৫১	৮২	১০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২৪২৫০৭৬	২৩	৫
উড়িষ্যা	৬৭০০০০০	৬৪	৫
সিদ্ধ	৬৮৮৭০৭০	৬৭	৫
ব্রিটিশ বাগচীহান	৪৬৩৫৮০	৪৬	১
মিল্লা	৬৩৬০৪৫	৬৩	২
আজমীর-সেরোআড়া	৫৬০২২২	৫৬	১
কর্ণাটক	১৬৩০২৭	১৬	১

এই তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, যে, কতকগুলি প্রদেশ অনুগ্রহভাজন ও কতকগুলি প্রদেশ ভ্রাতৃ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অনুগ্রহ করিবার কাবণ যেমন বলা হয় নাই, বঞ্চিত করিবার কারণও তেমনই বলা হয় নাই।

দেশীরাজ্যসমূহের নরেশদের ও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতীয়দের মূল্য:

দেশীরাজ্যসমূহের অধিবাসীরা তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে, ইহা ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে, যে, ৭,৮৮,০১,৯১২ জন মানুষের প্রতিনিধি হইবেন ১২৫ জন। তাহা হইলে প্রত্যেক ৬,৩০,৪১৫ জনের সমষ্টি এক জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতীয় প্রদেশগুলিতে প্রত্যেক ১০,৪৫,১২১ জনের সমষ্টি এক জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। যদি দেশীরাজ্যগুলির অধিবাসীরাই বাস্তবিক প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকার

পাইত, তাহা হইলে না-হয় এই বৈষম্য অস্তায় হইলেও সহ কবা চলিত। কিন্তু দেশীরাজ্যের প্রকার-ত প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকার পাইবে না, তথাকার প্রতিনিধি-তথাকার নৃপতিদের দ্বারা মনোনীত হইবে। ভাবত-শাসন বিশেষ তপশীলে দেখিতেছি ১৫০ জন রাজা মহারাজা বাণা মহারাণা নবাব নিজাম জাম ১২৫ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে এক এক জন প্রতিনিধি পাইবে মোটামুটি দশ লক্ষাধিক লোকের সমষ্টি, কিন্তু এই নরেশগণ প্রায় গড়ে এক এক জন এক এক প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। অর্থাৎ তাহাদের এক এক জনের মতের দাম আমাদের মত দশ লাখ অনরেশদের মতের সমান! কি বিষম! অসাধারণ, অতি-মানব উদ্বিগ্ন!

ইহা হইতেও কিছু অনেক জন নরেশের অতিমানবতার ঠিক পরিচয় পঠিকো পাইবেন না। আরও কিছু জানা দরকার।

কোন কোন দেশীরাজ্যের নরেশ একাই কয়েক জন করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। হায়দরাবাদের নিজাম মোল জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের এক কোটি ষাট লক্ষ লোকের প্রতিনিধি হইবে ১৬ জন! কিন্তু একা নিজামেরই প্রতিনিধি হইবে ১৬ জন! মহীশূরের মহারাজা, কাম্বীবেব: মহারাজা, গোয়ালিয়রের মহারাজা শিন্দে, বড়োদার মহারাজা গায়েকোআড়, যথাক্রমে ৭, ৪, ৪, ১৩ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তাহাদের এক এক জনের মতের মূল্য যথাক্রমে ব্রিটিশ ভারতের ৭০ লক্ষ, ৪৫ লক্ষ, ৪০ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ লোকের মতের মূল্যের সমান। জিবাজুড়ের মহারাজা ৫ জন, উদয়পুরের মহারাজা ২ জন, জয়পুরের মহারাজা ৩ জন, বোধপুরের মহারাজা ১ জন, ইন্দোরের মহারাজা হোকার ২ জন, রেওয়ারের মহারাজা ২ জন ও পাটনালার মহারাজা ২ জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। ১ জন করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন অনেক নরেশ। সর্বশেষে আছেন তাহারাই হইবে ৮ জনে মিলিয়া এক একটা বা ২১৩টি প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন।

দেশীরাজ্যের প্রজাদের মতের মূল্য

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকদের অন্ততঃ কতকগুলি লোক প্রতিনিধি-নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবে। কিন্তু দেশীরাজ্যসমূহেব নবশরাই সর্কেসর্কা, প্রজাদের এক জনেরও নির্বাচনাধিকার নাই। ব্রিটিশ গবর্নেন্ট তাহাদের অস্তিত্ব বরাবর কার্যতঃ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অথচ তাহাবা সবাই আমাদেরই মত মানুষ। খুব বড় বড় জননাথক দেশীরাজ্যসকলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে জন্মতঃ কোঙ্কানুপুর্ব রাজ্যেব প্রজা ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী জন্মতঃ পোরবন্দর রাজ্যেব প্রজা। ব্যবসাবাণিজ্যেও দেশীরাজ্যসকলের অনেক প্রজা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মাড়োয়ারীবা ও কচ্ছীরী সবাই দেশী রাজ্যের প্রজা। ঘনশ্যামদাস বিড়লা জয়পুরের এবং অমৃতলাল ওঝা কচ্ছের প্রজা। অথচ দেশী রাজ্যের কোন প্রজারই মতের মূল্য নাই, তাহাদের কাহারও নির্বাচনাধিকার নাই।

কৌন্সিল অব্ স্টেটের আসন বণ্টন

ভবিষ্যৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যাসেমন্টর আসন-বণ্টন সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। ভবিষ্যৎ কৌন্সিল অব্ স্টেট সম্বন্ধে তত না হইলেও কিছু লিখিতেছি।

কৌন্সিল অব্ স্টেটে মোট ২৬০ জন প্রতিনিধি ও তাহাদের ২৬০টি আসন থাকিবে। ব্রিটিশশাসিত প্রদেশগুলি পাইবে ১৫০টি আসন, দেশীরাজ্যগুলি ১০৪টির অনধিক, এবং ফিরিঙ্গীরা ১, ইউরোপীয়েরা ৭, ও দেশী খ্রীষ্টিয়ানেরা ২টি আসন পাইবে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারত-বর্ষেব লোকসংখ্যা প্রায় ২৬ কোটি এবং দেশীরাজ্যগুলির প্রায় আট কোটি। সুতবাং হিসাব-মত দেশীরাজ্যগুলির প্রতিনিধি মোটামুটি ৬০।৬২ জনের অধিক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাহাদিগকে তদপেক্ষা ৪০এব অধিক প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, দেশীরাজ্যগুলির প্রজাদিগকে

কৌন্সিল অব্ স্টেটের প্রতিনিধি নির্বাচনেরও অধিকার দেওয়া হয় নাই।

দেশী খ্রীষ্টিয়ানদের সংখ্যা ফিরিঙ্গী ও ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক বেশী। তাহাদিগকে ২টি আসন দিয়া ইউরোপীয়দিগকে ৭টি দেওয়া তাহাদের অপমান কবা হইয়াছে।

কৌন্সিল অব্ স্টেটে প্রদেশ অনুসারে আসন বণ্টন

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি মোট ১৫০টি আসন পাইবে। তাহাদের ২৫,৭১,০০,০০০ জন অধিবাসীর প্রতিনিধি ১৫০ জন হইবে, অর্থাৎ প্রতি ১৭,১৪,০০০ মানুষেব সমষ্টি এক জন কবিয়া প্রতিনিধি পাইবে। এই হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশের বত প্রতিনিধি পাওনা হয়, সকলকে সেরূপ দেওয়া হয় নাই—কোথাও কম কোথাও বেশী দেওয়া হইয়াছে। তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। প্রত্যেক প্রদেশেব প্রাপ্য আসন কয়টি হয়, তাহা উহার লোকসংখ্যাকে ১৭,১৪,০০০ দিয়া ভাগ কবিলেই পাওয়া যাইবে বজ্জেব প্রাপ্য হয় প্রায় ৩০টি আসন, কিন্তু তাহাকে দেওয়া হইয়াছে ২০টি। বেংগাইয়ের প্রাপ্য হয় ১০টি, দেওয়া হইয়াছে ১৬টি। পঞ্জাবেব প্রাপ্য হয় ১৩টি, দেওয়া হইয়াছে ১৬টি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দেড়টিও পাওনা হয় না, দেওয়া হইয়াছে ৫টি, সিন্ধুর ২টি পাওনা হয়, দেওয়া হইয়াছে ৫টি।

প্রদেশ বা নাজ্জার	লোকসংখ্যা (লক্ষে)	প্রাপ্য আসন
মাল্লাজ	৪৫৬	২০
বোম্বাই	১৮০	১৬
বাংলা	৫০১	২০
আন্ধ্র-অযোধ্য	৪৮৪	২০
পঞ্জাব	২৩৬	১৬
বিহার	৩২৪	১৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১৫৫	৮
আসাম	৮৬	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২৪	৫
সিন্ধু	৩৯	৫
উড়িষ্যা	৬৭	৫
দিল্লী	৬	১

প্রদেশ বা সম্প্রদায়	লোকসংখ্যা (লক্ষে)	প্রদত্ত আসন
আঞ্জমীব-মেরোয়াডা	৬	১
ব্রিটিশ বাঙ্গালীস্থান	৫	১
কুর্গ	২	১
কিরিঙ্গী	—	১
ইউরোপীয়	—	৭
দেশী ব্রিটিশান	—	২

আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসৃত

ভাবতবর্ষকে ভবিষ্যতে ফেডারেশন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রমণ্ডল করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। পৃথিবীতে বর্তমানে সকলের চেয়ে বড় ফেডারেশন আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস বা যুক্তরাষ্ট্রমণ্ডল। ভাবতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় যেমন হইবে কোন্সিল অব স্টেট ও স্যাসেম্বরী, আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভা কংগ্রেসে তেমনি আছে সেনেট ও প্রতিনিধি-ভবন (House of Representatives)। আমেরিকাব প্রতিনিধি-ভবনে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার লোকসংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক ২১০৪১৫ জনেব সমষ্টি প্রতি ১ জন কবিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ইহাতে পাছে বড় বড় রাষ্ট্রগুলি অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপিত হয়, সেই জন্ত তাহা নিবারণার্থ সেনেটে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রই ২ জন কবিয়া সদস্য নির্বাচন করে। ভারতবর্ষে স্যাসেম্বরীতে লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি-নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় নাই; কোন্সিল অব স্টেটেও লোকসংখ্যা অনুসারে প্রদেশগুলিকে আসন দেওয়া হয় নাই, অথচ আমেরিকার রীতি অনুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রকে সমান সমান সদস্যও দেওয়া হয় নাই। কোন শ্রাব্য বা বোধগম্য নিয়মই অনুসৃত হয় নাই।

লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দেশ বিলাতেও আছে। শুধাকার পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সে জেলা ও শহরগুলি প্রত্যেক ৭০,০০০ লোকের সমষ্টি একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী।

আসনবন্টন বৃহত্তর অনুসারেও নহে

প্রতিনিধি দেওয়া হয় সব দেশেই মনুষ্যদিগকে; ভূখণ্ডকে নহে, তাহাব উপরিস্থিত বৃক্ষলতাভূগর্ভিকেনহে, বালুকাদাশি বা ধূলিপুঞ্জকে নহে, এবং বস্ত্র ও গৃহপালিত

পশুপক্ষীদিগকেও নহে। সুতরাং ইহা বলিলে চলিবে না যে, দেশীরাজ্যসমূহের ও ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তর অনুসারে এবং প্রদেশগুলির বৃহত্তর অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা হইলে সাতিশর অযৌক্তিক ব্যবস্থা হইত। কিন্তু ব্যবস্থাসে-প্রকারও হয় নাই। ব্রিটিশ ভারতের আয়তন ৮,৬২,৬৭৯ বর্গ-মাইল, এবং দেশীরাজ্যসমূহের মোট আয়তন ৭,১০,৫০৮ বর্গ-মাইল। ইহাযেব মধ্যে আসন-বন্টন আয়তন অনুসারে হয় নাই। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যেও আসন-বন্টন আয়তন অনুসারে হয় নাই। নীচেব তালিকা দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

প্রদেশ। বর্গমাইলে আয়তন। স্যাসেম্বরীতে আসন। কোন্সিল অব স্টেটে আসন।

মাজাজ	১,৪২,২৭৭	৩৭	২০
বোম্বাই	৭৭,২০১	৩০	১৬
বাংলা	৭৭,৫২১	৩৭	২০
আন্ধ্র-অধোধ্য	১,০৬,২৪৮	৩৭	২০
পঞ্জাব	২২,২০০	৩০	১৬
বিহার	৬২,৩৪৮	৩০	১৬
মধ্যপ্রদেশ-বেয়ার	২২,২২০	১৫	৮
উড়িষ্যা	১৩,৭১৬	৫	৫
আসাম	৫৫,০১৪	১০	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৩,৫১৮	৫	৫
ব্রিটিশ বাঙ্গালীস্থান	৫৪,২২৮	১	১
আজমের-মেরোয়াডা	২,৭১১	১	১
কুর্গ	১,৫২০	১	১
মিরী	২৭০	২	১
সিন্ধু	৪৬,৩৭৮	৫	৫

লোকসংখ্যা ও আয়তন দুই-ই একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া প্রতিনিধির সংখ্যা নিরূপণ করিবার এমন কোন নিয়ম জানি না যাহা গণিতশাস্ত্রের ও ত্রায়শাস্ত্রের অনুমোদিত। বস্তুতঃ একপ কোন নিয়মও অনুসৃত হয় নাই।

আসনবন্টন শিক্ষানুযায়ীও নহে

একটা কথা মনে হইতে পারে, যে, লিখনপঠনক্ষম লোকদের সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। বাস্তবিক তাহাও হয় নাই। দেশী রাজ্য-সমূহের ও ব্রিটিশ ভারতের লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা নীচে দিতেছি।

ভারতবর্ষের অংশ	লিখনপঠনক্ষম পুরুষ	লিখনপঠনক্ষম নারী
ব্রিটিশ ভারতবর্ষ	১,৫৮,৪৫,২৮৭	২২,৩২,০৪৬
দেশী রাজ্যসমূহ	৪৪,৪৮,৬৭৪	২,১২,৭০১

আসনবন্টন এই সংখ্যাগুলি অনুসারেও হয় নাই।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতেও লিখনপঠনক্ষমদের সংখ্যা অনুসারে আসন বন্টিত হয় নাই। ইতিপূর্বে প্রদেশ-গুলিকে প্রদত্ত আসনের বে-বে তালিকা দিয়াছি, তাহার সহিত নীচের তালিকা বিবেচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	লিখনপঠনক্ষম পুরুষ	লিখনপঠনক্ষম নারী
মাদ্রাজ	৩০,০৬,২৭৫	২,৬১,১২৫
(সিন্ধুসহ) বোম্বাই	১৭,২১,০১০	২,১১,৩৭৫
বাংলা	৪০,৩০,২৬২	৬,৬০,৪৫১
আন্ধ্র-অযোধ্যা	২০,৭৩,৪১০	১,৩৮,২২৮
পঞ্জাব	১০,২১,০৪৪	১,৫০,৭১৩
বিহার-উড়িষ্যা	১৫,৭৪,০০৬	১,২২,৭৬০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৭,২০,২১৮	৭৬,৭৮৪
আসাম	৫,২১,৬২০	৭৪,৬২৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৮২,০৫৮	১১,৩০৮
ব্রিটিশ বালুচিস্তান	৩১,২৮৬	৩,৮৫৮
আজমীর-মেরোজাডা	৫১,৪৭৮	৭,৭৭৩
কুর্গ	১২,৮২২	৫,৪৪৪
দিল্লী	৭৩,৩৭৭	১৬,০২৫

আসনবন্টনে অত্যাচারের প্রতিবাদ

আমরা দেশাধিপতি, যে, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক

সভার আসনবন্টনে কোন নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাতেও এইরূপ নিয়মভাব, অব্যবস্থিকতা ও অবিচার আছে। তাহাতে সর্বপ্রকার অধিক অবিচার হইয়াছে বলের উপর। ইহা আমরা এই প্রথম বলিতেছিলাম। আগেও বলিয়াছি ও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। দুইবার স্বরূপ, পাঠকদিগকে জানাইতেছি, আমরা প্রায় আট বৎসর পূর্বে ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ মর্ডার ব্রিটিশ পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম (পরেও লিখিয়াছি) এবং তাহা নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটির, নিখিল-ভারতীয় মুসলিম লীগের, ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক ফেডারেশনের, হিন্দু মহাসভার, ও (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর) অ-ব্রাহ্মণ ফেডারেশনের সম্পাদকদিগকে পত্রসহ পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু এক জনও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করেন নাই। অত্যাচার প্রদেশের কথা দূরে থাক, বাংলা দেশেও এই

অবিচারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয় নাই। তাহাতে বাংলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।

কৌন্সিল অব্ ফেটেট দেশী রাজ্যের নরেশদের মতের মূল্য

আগে বলিয়াছি, ব্রিটিশ-ভারতের ১৭,১৪,০০০ মানুষের সমষ্টি কৌন্সিল অব্ ফেটেট একটি কবিতা প্রতিনিধি পাইবে। কিন্তু দেশী রাজ্যের নরেশবা অনেকে একটি একাধিক প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। যথা—

হায়দাবাদের নিজাম ৫ জন। তাহার মতের মূল্য ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের $১৭,১৪,০০০ \times ৫ = ৮৫,৭০,০০০$ জন মানুষের মতের মূল্যের সমান।

মহীশূবের মহারাজা তিন জন; এবং কান্দীব, গোয়ালিয়ার, ও বড়োদার মহারাজাবাও তিন জন করিয়া।

প্রত্যেকে দু-জন করিয়া প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন কালত, জিবাছুড়, কোচিন, উদয়পুর, জয়পুর, বোধপুর, বিকানার, ইন্দোর, ভোপাল, বেওয়া, কোলহাপুর, পাটিচালা, ও বাহাওলপুরের নরেশগণ।

এক জন কবিতা করিবেন অনেকে, এবং কয়েক জনে মিলিয়া এক এক জন প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন এবং কতকগুলি নরেশ।

এই সমুদয় ব্যক্তির মতের মূল্য ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের কত জন করিয়া মানুষের মতের মূল্যের সমান, তাহা পাঠকদিগকে ছাড়াছাড়ীরাও শুধু কবিতা সহজে বাহির করিতে পারিব।

দেশী নরেশদের গুরুত্ব কেন এত

এটা খুব জ্ঞানী কথা, যে, অনেক বিষয়ে দেশী নরেশদের স্বাধীনতা ব্রিটিশ-ভারতের সাধারণ প্রজাদের চেয়েও কম। তাহাদিগকে বেসিডেন্ট ও পলিটিক্যাল এজেন্টদের ভাবে স্বরূপ থাকিতে হয় এবং হুকুম ও ধমক সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে শুনিতে হয়, আমাদিগকে কোন রাজকর্মচারীর ভাবে স্বরূপ থাকিতে হয় না এবং হুকুম ও ধমক শুনিতে হয় না। তথাপি এই মানুষগুলির মতের দাম-ম্যাসেমূল্যে ও কৌন্সিল অব্ ফেটেট লক্ষ লক্ষ সাধারণ ব্রিটিশ প্রজার

সমান ধরা হইতেছে। তাহাদিগকে ভারতীয় ফেডারেশন বা রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে আনিবার জন্য বিলাতী গবর্নেন্ট এত বেশী ব্যগ্র, যে, ব্রিটিশ-ভারতের সব প্রশাসনিক কাগজ, সব রাজনৈতিক নেতা, সব রাজনৈতিক দল ভবিষ্যৎ ভারত-শাসন বিল সম্বন্ধে কত সমালোচনা করিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল, কিন্তু বিলাতী গবর্নেন্ট বিলাতী ভারত-সচিব ক্রম্বেপও করিলেন না—অটল অটল রহিলেন; কিন্তু যাই দেশী নরেশবা পবামর্শ করিয়া একটা প্রস্তাব ধার্য্য করিলেন, অমনি ভারত-সচিব স্যার সামুয়েল হোর লম্বা কৈফিয়ৎ দিলেন, বিলাতী সম্পাদক ও রাজনীতিজ্ঞদের মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল, ভারত-সচিব নরেশদিগকে খুশী করিবার জন্য তাঁহাদের মতামতবাহী পরিবর্তন বিলের কোন কোন ধারায় করা হইবে বলিলেন।

নরেশদিগকে এত তোয়াজ কেন করা হইতেছে? এর উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। ব্রিটেন জগৎকে দেখাইতে চায়, যে, ভারতবর্ষকে স্বশাসন-অধিকার দেওয়া হইতেছে, অথচ ভবিষ্যৎ শাসনবিধি গ্রহণ করা হইতেছে, যে, তাহা বর্তমান ভারতশাসনবিধি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষের লোকদিগকে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না, গবর্নর-জেনার্যাল ও গবর্নরদিগকে এক্স প্রভু দেওয়া হইতেছে, যাহা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্বাধীন হিন্দুবাহাদুরের ছিল না ও নাই, মুসলমান-শাস্ত্র অনুসারে স্বাধীন মুসলমান রাজাদের নাই, ইংলণ্ডের খ্রীষ্টান রাজার নাই। ভারত-গবর্নেন্টের রাজত্বের শতকরা ৮০ টাকার উপর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাব কোন অধিকার থাকিবে না। বাকী শতকরা ২০ টাকার উপর তর্কবিতর্ক করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে, এবং অন্তান্ত ক্ষমতা যাহা দেওয়া হইবে, তাহার ব্যবহার দ্বারা যাহাতে ব্রিটিশ-ভারতীয় লোকেরা স্বরাজ একটুও না পাইতে পারে, তাহার প্রধান উপায়-স্বরূপ র‍্যাসেমন্ট্রীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি ও কোমন্স অন্ টেটের এক-তৃতীয়াংশের অধিক প্রতিনিধি নরেশদিগকে মনোনীত করিতে দেওয়া হইবে; কারণ, নরেশরা স্বেচ্ছাকারী, গণতান্ত্রিক শাসক নহে, সুতরাং তাঁহাদের মনোনীত সমস্তেরা গণতান্ত্রিকতার অগ্রগতিতে বাধা দিবে

এবং ইংরেজদের প্রভুত্ব আপত্তি করিবে না (কেন না, ইংরেজ গবর্নেন্টও দেশীরাজ্যগুলিতে নরেশদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছে)। সংক্ষেপে, নরেশদের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইংবেজবা তাঁহাদের ওজন বাড়াইতেছে।

গণতান্ত্রিকতার অগ্রগতি বোধ করিবার অত্যন্ত উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে। যেমন, ব্রিটিশ-ভারতে মুসলমানেরা শতকরা ২৪.৬৯, কিন্তু তাহাদিগকে ব্রিটিশ-ভারতের আসনগুলির শতকরা ৩৩৬টি দেওয়া হইয়াছে; হিন্দু এবং অন্তান্ত অখ্রীষ্টীয়ান, অমুসলমান ও অশিখ বাজে লোকেরা ব্রিটিশ-ভারতের শতকরা ৭২.৭১ জন হইলেও তাহাদিগকে র‍্যাসেমন্ট্রীর ব্রিটিশ-ভারতীয় ২৫০টি আসনের মধ্যে ১২৪টি অর্থাৎ শতকরা ৪৯.৬টি আসন দেওয়া হইয়াছে। সংখ্যাভূমিগণকে এই প্রকারে সংখ্যালঘু কবা হইয়াছে। কারণ, হিন্দু বাই গণতান্ত্রিক স্বরাজ সকলের চেয়ে আগে সকলের চেয়ে বেশী চাহিয়াছিল। ভারতশাসন বিল তাহাদিগকে বলিতেছে, “তোমরা স্বরাজ চেয়েছিলে, এই নাও স্বরাজ।”

—

আসনবন্টনের দোষোদ্ঘাটন করি কেন

কংগ্রেস প্রস্তাবিত ভাবতশাসনবিধি অগ্রাহ্য বলিয়াছেন ও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিলেও তাহা যে মন্দ তাহা বলিয়াছেন, ভাবতীয় জাতীয় উদাবনৈতিক সংঘ ভারতশাসন বিলের বিবোধী, এবং কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণী উহাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নহেন। সেই জন্য কেহ খুশিয়া প্রকাশ না করিলেও মনে মনে ভাবিতে পারেন, সমস্ত জিনিষটাই যখন অধিকাংশ ভারতীয়ের চক্ষে নামঞ্জুর, তখন আসনবন্টন লইয়া এত লিখিবার কি প্রয়োজন?

জয়েন্ট পার্লেমেন্টারী রিপোর্টের এবং ভারতশাসন বিলের অন্ত সমালোচনাবৎ যেরূপ প্রয়োজন, আসনবন্টনের সমালোচনারও প্রয়োজন সেইরূপ। ব্রিটিশ-ভারতীয়দের কোন সমালোচনাতেই কোন ফল হইবে না। আমবা সমালোচকেরা গীতার উপদেশ অনুসারে নিষ্কামভাবে সমালোচনা-কর্ম করিতেছি, ফল পাইব না জানিয়াও কর্ম করিয়া বাইতেছি।

ভবিষ্যৎ শাসনবিধি অগ্রাহ্য বাহারাই বলুন, উহা আইনে পরিণত হইবে, এক কংগ্রেসওয়ালারাও ব্যবস্থাপক সভায় ভদ্ররূপে চুকিবেন। সুতরাং উহার গঠনের দোষগুলো বুঝিয়া লওয়া আবশ্যিক।

কেহ কেহ যেমন বলেন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটার প্রতিকূল সমালোচনার সাম্প্রদায়িক রেবারেখা বাড়ান হয়, তেমনি কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আসনবন্টনের দোষাদোষটন করিলে প্রাদেশিক ঈর্ষ্যাধ্বষ বাড়িবে। কোন জায়গায় খুব মশা বাড়িলে যদি কেহ তাহার অনিষ্ট-কারিতা দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে কেহ কি বলে, “ঐ লোকটা ম্যালেরিয়াবৃদ্ধির জন্ত দায়ী?” সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা যে বিদেশীরা করিয়াছে, তাহারা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাধ্বষ উদ্ধাইবার জন্ত দায়ী নহে, দায়ী উহার প্রতিবাদ-কারীরা, ইহা যেমন চমৎকার যুক্তি, আসনবন্টন বাহারা করিয়াছে তাহারা প্রাদেশিক ঈর্ষ্যাধ্বষ বৃদ্ধির জন্ত দায়ী নহে, দায়ী আসনবন্টনের মর্শ্বোদ্ভেদকারী, ইহাও সেইরূপ চমৎকার যুক্তি।

বস্তুতঃ, আমরা দেশে শ্রায়সঙ্গত সাম্যের ভিত্তির উপর গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি বা না-পারি, ভবিষ্যতে তাহাব প্রতিষ্ঠার কত প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যিক। বিঘ্নবাদের সম্যক জ্ঞান না জন্মিলে তাহা দূর করিবার ইচ্ছা জন্মে না, এবং দূর করিবার উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হয় না।

বাঙালীর প্রভাব হ্রাস

আমরা বাঙালীরা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিব, এরূপ কোন হুরভিসিদ্ধি ও হুরাশা আমাদের নাই, কিন্তু স্বভাবতঃ আমাদের শ্রায্য যতটুকু প্রভাব হইয়াছিল ও থাকিতে পারে, তাহার হ্রাসে নিশ্চয়ই আমাদের শ্রায়সঙ্গত অসন্তোষ হইতে পারে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণ ব্যাপসেশে যখন ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল, তখন সেই পরিবর্তনে বাঙালীর প্রভাব কমিল। ভারতীয় লোকমতের যতটুকু প্রভাব ভারত-গবর্নেন্টের উপর হইতে

পারে, বাঙালী কাগজপত্রের মত ও জনমত এরূপ প্রভাব অনেকটা ভারত-গবর্নেন্টের উপর বিস্তার করিত। ভারত-গবর্নেন্টকে সেই প্রভাব হইতে দূরে লইয়া যাওয়া হইল, অথচ দিল্লীতে এমন কোন জনমত ছিল না এবং এখনও নাই যাহা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল বা হইতে পারে। বাহারা বাঙালীর ঈর্ষ্যা করে, বাঙালীকে দেখিতে পারে না, তাহারাই এই পরিবর্তনে খুণী হইলেও ইহা প্রজ্ঞাশক্তিবৃদ্ধিব অনুরূপ হয় নাই। মনস্বী গোথলে যখন বলিয়াছিলেন, “আজ বাংলা যাহা ভাবে, কাল ভারতের অবশিষ্ট অংশ তাহা ভাবিবে,” তখন রাজধানী কলিকাতায় ছিল।

এ প্রশ্ন হইতে পারে, স্থায়ী রাজধানী হইবার কোন বিধিগত অধিকার ত কলিকাতার ছিল না, সুতরাং রাজধানী অন্তঃ হওয়াতে যদি বাঙালীর প্রভাব হ্রাস ও অল্প অল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে পরিবর্তনের প্রতিবাদ করিবার কি অধিকার তোমাদের আছে? বাঙালী বলিয়া প্রতিবাদ করিবার, বঙ্গের প্রভাব হ্রাস হেতু প্রতিবাদ করিবার অধিকার আমাদের না থাকিতে পারে; কিন্তু আমরাও ভারতীয় বলিয়া এক রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার গবর্নেন্টের অপকর্ষ ঘটায় (অন্ততঃ উৎকর্ষলাভের ব্যাঘাত হওয়ার), সে দিক দিয়া সমালোচনা করিবার অধিকার আমাদের আছে।

রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার অধিকার গবর্নেন্টের থাকিতে পারে, কিন্তু ধে-সব জেলার বা মহকুমার অধিকাংশ লোক বাঙালী, বঙ্গসংলগ্ন সেই সব স্থানকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তঃপ্রদেশভুক্ত করিয়া বাঙালীর সমষ্টি-সমুদ্ভূত শক্তি ও প্রভাব কমাইবার শ্রায্য অধিকার কাহারও ছিল না। বাঙালীর অধুষিত ঐ সব জেলা ও মহকুমা বঙ্গের সামিল থাকিলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আরও আসন পাইবার বাঙালীর শ্রায্য অধিকার থাকিত। বাংলা দেশটাকে ছোট করিয়া বাঙালীকে সেই আসনগুলি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

আমরা অনেক বৎসর আগে হইতে দেখাইয়া আসিতেছি, যে, বর্তমানে বলবৎ ভারতশাসনবিধি অনুসারেও বাংলা দেশকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কম আসন দিয়া তাহার শ্রায্য প্রভাব হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

যোগ্যতা আদির লিখিত বা অলিখিত কাহাকেও নিগ্রহ, কাহাকেও অনুগ্রহ কবা করিলে, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার জাতীয় রূপে বাধ্যজনকতারূপে অনিষ্টকারিতার আংশিক প্রতিকারও না-হইয়া বরং নূতন ভেদ-নিষম প্রয়োগহেতু ঐ অনিষ্টকারিতা বাড়িবে।

অতএব মিঃ জিন্নার প্রথম সর্বটি গ্রহণযোগ্য নহে।

প্রথম সর্বটির সম্বন্ধে আরও আপত্তি আছে। তাহার একটি বলিতেছি। সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা সম্মিলিত নির্বাচনের উদ্দেশ্য এই নিবন্ধিকার তৃতীয় অনুচ্ছেদে কিছু বলিয়াছি। অপর উদ্দেশ্য, সদস্যপদপ্রার্থীদের ধর্ম কি তাহা বিবেচিত না-হইয়া সদস্যের কাজ করিবার যোগ্যতা তাহাদের কিরূপ আছে, তাহাই যেন বিবেচিত হয়। কিন্তু মিঃ জিন্নার প্রথম সর্বটির মধ্যে এই ক্ষেত্র রহিয়াছে, যে, মুসলমান নির্বাচকদের সংখ্যা বাড়াইতেই হইবে। উদ্দেশ্য এই, যে, যে-হিন্দু সদস্যপদপ্রার্থী ও যে-মুসলমান সদস্যপদপ্রার্থী অধিকাংশ মুসলমান নির্বাচকের ভোট পাইবেন, তিনিই যেন নির্বাচিত হন এবং হিন্দু নির্বাচকদের ভোটের প্রভাব যেন অনুভূত না হয় বা খুব কম অনুভূত হয়। সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা সম্মিলিত নির্বাচনের যে যে উদ্দেশ্য পূর্বে লিখিত হইয়াছে, মিঃ জিন্নার সর্বটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাহার ঠিক বিপরীত এবং তাহাকে অসিদ্ধ করিবার উপায় মাত্র।

অতএব এই সব কারণেও মিঃ জিন্নার প্রথম সর্বটি গ্রহণযোগ্য নহে।

চতুর্থ সর্বটিতে আছে, যে, বঙ্গ ইউরোপীয়দিগকে (তাহাদের সংখ্যা হিসাবে প্রাপ্য নহে এরূপ) অত্যন্ত বেশী যে আসনগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের হাত হইতে তাহার কয়েকটা পাওয়া গেলে মুসলমানেরা তাহার শতকরা মোটামুটি ৫৫টি ও হিন্দুরা মোটামুটি শতকরা ৪৪টি পাইবে।—ইহা কালনেত্রির লঙ্ঘ্যভাগের মত; ইউরোপীয়েরা কোন আসন ছাড়িয়া দিবে না, হিন্দু মুসলমানে বখরাও হইবে না। বাহা হউক, ইহা অপ্রাসঙ্গিক।—সকলেই জানেন, অন্ততঃ সকলেরই জানা উচিত, যে, শুধু লোকসংখ্যা হিসাবেও বঙ্গ হিন্দুদের যতগুলি আসন পাওনা হয়, তাহা তাহাদিগকে

দেওয়া হয় নাই। লোকসংখ্যা হিসাবে মুসলমানদের যত পাওনা হয়, তাহাদিগকেও তাহা দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু হিন্দুদিগকে যতগুলি আসন হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, মুসলমানদিগকে ততগুলি হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই। সুতরাং ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে, কিংবা সাধারণতঃ সকল খ্রীষ্টিয়ানদিগের নিকট হইতে কতকগুলি আসন পাইলে তাহার বেশীর ভাগ গ্রাহ্যসারে হিন্দুদেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু মিঃ জিন্নার চতুর্থ সর্ব বেশীর ভাগ মুসলমানদিগকেই দিতে বলিতেছে। এই কারণে এই সর্ব গ্রহণযোগ্য নহে।

খসড়া চুক্তিপত্রটি সম্বন্ধে আরও একটি বক্তব্য আছে। উহার কোথাও একথা লেখা নাই, যে, হিন্দু মুসলমান শিখ কেবল নির্বাচনের জন্ত নহে, পরন্তু স্বরাজ-সংগ্রাম চালাইবার জন্ত মিলিত হইবে। যে-কেহ স্বরাজ-সংগ্রাম চালাইবে, সে-ই ইংরেজের বিবাগভাজন এবং অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে। খসড়া চুক্তিপত্রটিতে এই প্রকারে ইংরেজের বিবাগভাজন হইতে প্রস্তুতির কোন লক্ষণ নাই। তাহাতে কেবল ইহাই দেখা যাইতেছে, যে, ইংরেজের অনুগ্রহে মুসলমানেরা বাহা পাইয়াছেন, মিঃ জিন্না তাহা সমস্তই রাখিতে চান এবং মুসলমানদের জন্ত আবও কিছু লাভ চান।

মাস্ত্রাজের কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত বাজগোপালাচারী বঙ্গের হিন্দুদিগকে স্বার্থত্যাগ কবিত্তে উপদেশ দিয়াছেন, মুসলমানদিগকে কিছু ত্যাগ করিতে বলেন নাই।

খবরের কাগজে ইহাও বাহিব হইয়াছে, যে, তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, যে, সব প্রায় ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছিল, কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ তাহাতে রাজী হইতেন, কেবল বাহিবের লোকদিগের সহিত (“outsiders”দের সহিত) আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে রাজী করিতে যাওয়ায় চেষ্টাটা পণ্ড হইয়াছে। পঞ্জাবের কথা আমাদের বলা উচিত নয়, তাহা খুব ভাল করিয়া আমাদের জানাও নাই। বাংলা দেশের হিন্দুরা প্রায়ই শ্রীযুক্ত বাজগোপালাচারীর দলের বাহিরের লোক বটে, কিন্তু হৃৎকের বিষয় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে তাহাদেরই অভিযোগ একটা বড় অভিযোগ। শ্রীযুক্ত বাজগোপালাচারীর আদালতে যদি ফরিদাদীকে বাদ দিয়া বিচার চলে, ত চলুক। কিন্তু

ফরিদাদীকে সেই আদালতের রায় শিরোধার্য্য করিতে বলিলে তাহা কিঞ্চিৎ অবরদস্তী হইবে না কি ?

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন

জলসেচনের ব্যবস্থা দ্বারা, এবং পয়ঃপ্রণালী ধন ও নিষ্কাশন দ্বারা অনাবশ্যক জল নিঃসারণের ব্যবস্থা করিয়া, বাংলা-গবর্নমেন্ট বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন করিতে চান, এই রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত একটি আইন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে। গবর্নমেন্ট এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা কয়েকটি মানচিত্র সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গের বহু জেলায় এইরূপ চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গবর্নমেন্ট এরূপ চেষ্টা যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে করেন ও তাহাতে সফল হয়, তাহা সমস্তের বিষয় হইবে। তবে, পুস্তিকাটির মুখবন্ধ-স্বরূপ জলসেচ-বিভাগের কমিটির বিপোর্ট হইতে ও বঙ্গীয় প্রজাসভা আইন হইতে যে-সব বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সামান্য কিছু বলিতেছি।

জলসেচন সম্বন্ধে ঘূমন্ত কে ?

জলসেচ-বিভাগের কমিটি বলিয়াছেন, বাঙালীদিগের মনে এই মিথ্যা বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে ঘূমন্ত রাখা উচিত নয়, যে, ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন কঠিন ও দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ব্যতীত অস্ত্র কিছু। কমিটি এবং গবর্নমেন্ট কি জানেন না, যে, ওয়াকিফ-হাল বাঙালীরাও তাহাদের নেতা ও সাংবাদিকরা এই বিশ্বাসে কখনও ঘুমায় নাই; অস্ত্র কারণে যদি ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের ঘুম ভাঙিয়াছে অনেক বৎসর আগে, এবং ঘূমন্ত বা নিদ্রিতমস্ত্র আছেন সরকারী বড় ও ছোট কর্তারা ?

বঙ্গে জলসেচন অনাবশ্যক, এ ভ্রম কাহার ?

বঙ্গে জলসেচনের বেশী প্রয়োজন বা মূল্য নাই, জলসেচ-বিভাগের কমিটি এই ভ্রম ভাঙিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই ভ্রমটা দেশের লোকের চেয়ে গবর্নমেন্টই

বেশী করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ কয়েকটি পুনঃ পুনঃ সাংখ্যিক তথ্যবিষয়ক সরকারী পুস্তক (Statistical Abstract for British India) হইতে। এই পুস্তক (Eleventh Statistical Abstract for British India) সালের ১১ই ডিসেম্বর মুদ্রিত ও বর্তমান প্রথম বা দ্বিতীয় মাসে প্রকাশিত) হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

কোন প্রদেশে গবর্নমেন্ট ধনোৎপাদক (productive) জলসেচনের খাল কত মাইল খুলিয়াছেন, তাহার হিসাব নীচের তালিকাব দিতেছি। ইহা যে-বৎসরের (১৯০৩-০৪) শেষ পর্যন্ত তাহার পব আর সব প্রদেশের তুলনামূলক সংখ্যাগুলি একসঙ্গে ছাপা হয় নাই। কিন্তু এই তালিকা হইতেই বঙ্গের প্রতি অবহেলা বুঝা যাইবে। এই সালের পর বঙ্গে এমন কিছু করা হয় নাই, বাহাতে বঙ্গের প্রতি বহু অল্প সব প্রদেশের সমান বলিয়া বুঝা যায়।

প্রদেশ।	খালগুলির দৈর্ঘ্য।	উপখালগুলির দৈর্ঘ্য।	ব্যয়িত মূলধন।
মাদ্রাজ	৩,৫৫৪	২,৫০০	১৩,৪২,৭০,৭০০
বোম্বাই	৫,০৮০	১৫৮	২২,৯৬,৪৪,৪০০
বাংলা	১১	৭	৮৭,৮৭,৩৯৫
আঞ্জী-অযোধ্যা	২,৩৭১	১১,৬২৮	২২,২৭,৩১,৫০০
পঞ্জাব	৩,২৫২	১৬,৬৩২	৩০,১৭,৭০,৭২০

অ-ধনোৎপাদক (unproductive) খাল কোথায় কত মাইল কত ব্যয়ে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

প্রদেশ।	খালগুলির দৈর্ঘ্য।	উপখালগুলির দৈর্ঘ্য।	ব্যয়িত মূলধন।
মাদ্রাজ	৯১১	৮২৮	৪,৩৬,৫০,১১০
বোম্বাই	২,২০৪	১,৮১৩	১২,৯৫,৫৭,৯৫৮
বাংলা	৬৫	০	৮৪,৯২,০৫০
আঞ্জী-অযোধ্যা	৪২৮	১,৭৪১	০,৩৫,৫০,২১৬
পঞ্জাব	১,০৫০	২৬২	৫৯,৬১,২৮০

এই ছুটি তালিকা হইতে বুঝা যাইবে, যে, গবর্নমেন্ট বঙ্গে জলসেচন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। বরাবরই মোট রাজস্ব আদায় অল্প সব প্রদেশের চেয়ে বেশী বই কম হয় নাই। সুতরাং টাকার অভাবে গবর্নমেন্ট বঙ্গে কিছু করিতে পারেন নাই, অল্প সব প্রদেশ খুব রাজস্ব দেয় বলিয়া তথ্য প্রচুর জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা স.

সত্য, যে, ব্রিটিশ রাজত্বকালের অতীত
অতীত তথাকার ঘাটতিপূরণের জন্য এবং
বিস্তারের জন্য, ও অল্প নানাবিধ ব্যয়ের জন্য,
বাহিবে লইয়া যাওয়া হইত, এবং এখনও হয়।

গবন্মেণ্টের বণিকবুদ্ধি

নানি দ্বারা বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু জেলাসমূহেব উন্নতির
পুস্তিকায় গবন্মেণ্ট বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন
৩৪ ধারা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন, যে,
জমির উৎপাদিকা শক্তি জমিদারের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে অথবা নদীর ক্রিয়াতে বাড়িয়া থাকিলে
খাজনা বাড়াইবার মোকদ্দমা করিতে পারিবেন,
ত উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকের দাম অপেক্ষা
দ্বি আদালত মঞ্জুর করিবেন না।

এরাগুলি উদ্ধৃত কবিবার উদ্দেশ্য এই, যে, গবন্মেণ্ট
ক বাহা করিতে বাইতেছেন, তদ্বারা জমির
শক্তি বাড়িলে জমির কৃষকেরা এখনকার চেয়ে
শস্ত্র পাইবে, তাহার অর্ধেকের দামটা বৎসর বৎসর
বাহ্যের লইবেন। বর্তমান সময়ে বঙ্গের যে-সব
বক্ষু হইয়াছে, তাহা যদি বরাবর ক্ষয়িষ্ণু ছিল, কিংবা
গবন্মেণ্টের দোষক্রটি ও অবহেলা ব্যতিরেকে পূর্ব উন্নত
হইলে ক্ষয়িষ্ণু হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবন্মেণ্ট
করিয়া ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলিকে বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া
লাভের কতক অংশ পাইবার অধিকারী হইতে

কিন্তু তাহা পাইতে হইলে জমিদারের মত
ক দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিয়া তাহা
ইবে, এইরূপ নিয়ম হওয়াই সম্ভব। কলেট্টররূপী
নিজের হুকুম দ্বারা রায়তের নিকট হইতে
এক অংশের বর্দ্ধিত উৎপাদিত-শস্যের অর্ধেক
বৎসর আদায় কবিবেন, এরূপ নিয়ম হওয়া

মেদিনীপুর; মুর্শিদাবাদ; করিমপুরের গোয়ালন্দ মহকুমা;
নদীয়া ও বশোব; চব্বিশ-পরগণা; পাবনা; মালদহ;
এবং দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, রাজশাহী ও রঙ্গপুর;
—এই সকল অঞ্চল সম্বন্ধে গবন্মেণ্ট কাজ করিবেন।

বাংলা দেশে ভূ-করের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত।
এই বন্দোবস্ত বন্ধন করা হয়, তখন বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু স্থানগুলি
সাধারণতঃ ক্ষয়িষ্ণু ছিল না। এই জন্য সেই সব অঞ্চলের
খাজনার দাবি বেশী, দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব-বঙ্গের
অনেক জেলার খাজনার দাবি তদপেক্ষা কম। তাহার
একটা কাবণ অবশ্য এই, যে, হয়ত তখন পূর্ব-বঙ্গে চাষের
জমি এখনকার চেয়ে কম ও অরণ্য বেশী ছিল। আমবা
পূর্ব-বঙ্গের কোন জায়গারই খাজনা বাড়াইতে বলিতেছি
না। আমরা পূর্ব-বঙ্গেব জেলাসমূহেব তুলনার মধ্যে
আনিতেছি এই জন্য, যে, বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু অনেক অঞ্চলে
যে খাজনার দাবি বেশী, তাহা হইতেই বুঝা বাইতেছে, যে,
সেগুলি দশশালা বন্দোবস্ত ও চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রারম্ভ-
কালে ক্ষয়িষ্ণু না থাকিয়া বর্দ্ধিষ্ণু থাকায় তথাকার খাজনার
হাব বেশী করা হইয়াছিল। বঙ্গের বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু অনেক
জেলায় যে খাজনা দাবি বেশী, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা
গত (১৯৩৪) ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্ত বঙ্গের ভূমির বাজস্ব
সম্বন্ধীয় রিপোর্ট (Report on the Land Revenue
Administration of the Presidency of Bengal for
the year 1933-34) হইতে কতকগুলি জেলার আয়তন
এবং ভূমির রাজস্বের দাবিব পরিমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

জেলা।	বর্গমাইলে আয়তন।	খাজনার দাবির পরিমাণ
বর্দ্ধমান	৩,২৬৬	৩০,৪৩,৬১৫
বীরভূম	১,৭০৯	১০,৪১,৮০৭
বাকুড়া	২,৬৯১	৫,০০,৩৪৪
মেদিনীপুর	৪,৬৫৭	২৬,৪৯,৩৯৬
হুগলী	১,৩০৭	৯,২৫,৮৭৫
হাবড়া	৩৪১	৪,৪৭,৭৬৪
চব্বিশ-পরগণা	৪,৬৪১	২২,৫০,৩৪৪
নদীয়া	২,৭০৯	৯,৮৭,৭১৮
মুর্শিদাবাদ	২,০৮২	১০,৮৪,৩২৫
বশোব	২,০০৬	৮,৯৪,২৭৮
পুলনা	২,৪৬৩	২,১৭,৪২১
ঢাকা	৩,২২৮	৬,৪১,১৮৯
মৈমনসিং	৬,৩০৩	৯,২৬,০১০
করিমপুর	২,৩০০	৭,৩৪,৪২৯

ক্ষয়িস্থিতার জন্য গবন্মেণ্টের দায়িত্ব

বঙ্গের জেলা; দক্ষিণ-পশ্চিম বর্দ্ধমান ও হুগলী;
বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া; বীরভূম; বাকুড়া;

বাথরগঞ্জ	৩,৬৪৮	২২,৪৩,৬৫৪
চট্টগ্রাম	১,২৮০	১৬,৫৭,৫২৫
জিপুরা	২,৩২৪	১২,০১,৩২৮
নোয়াখালী	১,২১৫	১২,১০,০৫৪
রাজশাহী	২,৬০৬	১০,৩৮,২৫৬
দিনাজপুর	৪,১৩১	১৫,২৫,৬৩৪
জলপাইগুড়ি	২,৩৭৪	১২,৭৫,২৭২
রঙ্গপুর	৪,২০৪	১০,১৬,৩৬৪
বগুড়া	১,৩২২	৫,০৮,১২২
পাবনা	১,৭০১	৫,০৫,১৫০
মালদহ	১,২৩৭	৪,৭০,৫৪৬

কোন জেলার আয়তন বড় হইলেই যে সেখানে চাষের জমি বেশী থাকিবেই, এমন নয়। কোন কোন জেলার পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, জলা, বিল, কঙ্কর ও বালুকাকীর্ণ ভূমি বেশী থাকিতে পারে, এবং চাষের যোগ্য জমি কম থাকিতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশে মোটের উপর জেলার আয়তন তাহার চাষের জমির পরিমাণের পরিচায়ক মনে করা যাইতে পারে।

ক্ষয়িকু জেলা সঞ্চায়ী সরকারী পুস্তিকাটিতে সকলের আগে বর্ধমানের কথা বলা হইয়াছে। ইহার সহিত অত্র কয়েকটি জেলার তুলনা করা যাক। বর্ধমানের আয়তন ৩২৬৬ বর্গমাইল, খাজনার দাবি ৩০,৪৩,৬১৫ টাকা। আর কোন জেলার খাজনার দাবি এত নয়। ইহার সমান বা ইহা অপেক্ষা বড় জেলারও খাজনার দাবি ইহার চেয়ে কম। এই বৈষম্য পূর্ব-বঙ্গের কোন কোন জেলায় স্থাপ্য। চাকার আয়তন ৩২২৮ বর্গমাইল, খাজনার দাবি মাত্র ৬,৪১,১৮২। মৈমনসিংহের আয়তন ৬৩০৩ বর্গমাইল, খাজনার দাবি মাত্র ৯,২৬,০১০।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বর্ধমান প্রভৃতি কোন কোন জেলার খাজনার পরিমাণ বেশী নির্ধারিত হওয়াই তাহাদের পূর্ববর্তীকৃত্যাব একমাত্র প্রমাণ নহে। অত্র প্রমাণও আছে। সরকারী কোন কোন ব্যবস্থার ফলে যে তাহারা ক্ষয়িকু হইয়াছে, তাহারও প্রমাণও আছে।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নহেন। তিনি অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানজগতে বৈজ্ঞানিক বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে "Need for a Hydraulic Research Laboratory in Bengal"

শীর্ষক বে-প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে বড় বড় স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন

Central Bengal which enjoyed a salubrious during the whole of the Moghul age and even the British rule is now fast becoming a owing to the blocking of the head-waters of systems (the Bhagirathi, Jelanghee, etc.) by sand and blocking of the inland waterways by bunds and bridges. West Bengal, which was and prosperous as Central Bengal up to 1850, converted into a malaria-stricken wilderness construction of railway bunds, and blocking headwaters of the Damodar and her tributaries.

বাঙ্গা জমিয়া নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া বাওয়া অনবধানতা ও অবহেলার ফল। রেলওয়ের বাঁধ নির্মাণ কোথাও বা গবর্নমেন্টের অমুমতি অনুসারে, বা গবর্নমেন্টের দ্বারা—সকল ক্ষেত্রেই গবর্নমেন্টের —হইয়াছে।

বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল যে আগে ভারতবর্ষে উর্বরতম ভূখণ্ড ছিল এবং মাস্তাজের তাজোর জে এখনও সেইরূপ থাকিতে পারিত, ডক্টর সাহা প্রমাণ দিয়াছেন।

The problems of Western Bengal stand selves. As Sir William Wilcocks and Dr. Be very convincingly showed, the decline of this health and prosperity is due to the blockir Damodar and her branches by the bunds a erected to safeguard the E. I. Ry. Wilcock surprising parallel between the fanshape allg the old Damodar branches and the alignme Cauvery system in the Tanjore district of India. . . . At any rate, both Burdwan and formed the richest districts of India in 1815, paring the two, Hamilton wrote in 1815, "In agriculture Burdwan stands first and Tanjore

তাহার পব গত এক শত বৎসরের ইতিহাস করিয়া ডাঃ সাহা দেখাইয়াছেন, যে, তাজোবে নদীর বাঁধ ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার এ. কটন প্রাচীন হিন্দু রাজাদের এই বাঁধটি আবার করিয়া নদীর জল কাবেবী ব-দ্বীপে সমভাবে করিবার ব্যবস্থা করেন। সেই জন্ত কাবেবী ব-দ্বীপের অক্ষুর আছে। উহা বর্ধমান অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ও ম্যালেরিয়ামুক্ত। বর্ধমান সম্বন্ধে এঞ্জিনিয়াররা উপায় অবলম্বন করার বর্ধমানের ভগতি হইয়াছে।

The opposite process was undertaken by in Burdwan. This was due to their drea

devastating flood of the Damodar which
vals of 30 or 40 years was a thing of
was afraid. But apart from the havoc
astrophic floods caused after great lengths
rate floods as took place regularly were
beneficial. They fertilised the soil, and
malarial larvae. But when about 1850,
nt wanted to open the E. I. Ry., they
o tame the Damodar in order that the
be safe. They shut up the river within
mpartments, closed the headwaters of the
ches, and made breaches by men in the
which were needed for irrigating their
inal act.

লে কলিকাতার [অবশ্য প্রধানতঃ বিদেশীদের
গিজা খুব বাড়িল এবং তথায় অবাঙালীদের
বটল, কিন্তু বর্ধমান ডিবিজনের সতিশ্বর

sult was that though a safe highway for
on with upper India was opened and the
lcutta increased enormously and people from
try began to flood Calcutta in search of
or adventure, it was done at a terrible cost
e of the Burdwan Division. Two years after
of the railway in 1859, a terrible malarial
oke out, and in Hughli alone half the popula-
ne million out of two died within ten years.
y of population fell from 750 per square
00, and according to Bentley, and other
authorities who ascribed the outbreak of these
idemies to the faulty system of railway
ts, the country has never been free from
to the present time. The fertility of the
about 50 per cent, as the land was deprived
borne silt.

য়-বাধজনিত ম্যালেরিয়ার বর্ধমান ডিবিজনের
ভীষণ লোকক্ষয়, এবং নদীর পলি হইতে
ক্ষেতগুলি বঞ্চিত হওয়ার উর্বরা শক্তির
ইহার জন্ত, ডাঃ সাহা বলেন, ত্রায়তঃ এই
দায়ী পক্ষদিগের নিকট হইতে, ক্ষতিপূরণ
অধিকার আছে। তাহা কিরূপে দেওয়া যায়
নি নির্দেশ করিয়াছেন।

be anything like justice in the world, the
Burdwan are entitled to compensation from
concerned for all these terrible inflictions
It may be given to them by imposing a
or thoroughfare tax on the railway passengers
ing the sum so collected for resuscitation
d prosperity of the country by undertaking
ructive works according to well-laid-out and
d plans.

পর লেখক বলিতেছেন, যে, তিনি বর্ধমান
লোকদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার কথা পরিহাস-
লেন নাই। অনেক এঞ্জিনিয়ার এরূপ স্থলে
র কথা বলিয়াছেন :—

body think that when I am proposing that
of Burdwan are entitled to compensation,
oking. Such a claim is supported by many
John Benton (in the course of the dis-

cussion on the Sara Bridge) says about a proposal to
build railway bunds in North Bengal for the safety of
the Sara Bridge:—

“Any blocking of flood waters by these proposed
new railway lines would increase the damage to crops,
and in the light of experience of similar works else-
where, this would lead to demand on the part of culti-
vators for compensation, or for increased waterway to
pass the flood waters. The best efforts of the Railway
Department would be devoted to show that the flood
spills were not held up, and if these efforts failed, the
railway authorities would have to provide increased
waterway.”

আমাদের বিবেচনায়, প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ
বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলসমূহের স্বাস্থ্যের ও উৎপাদিকা শক্তির
উন্নতিসাধন ভারত-গবন্মেণ্টের নিজ বায়ে করিয়া
দেওয়া উচিত, এবং তজ্জন্ত অধিবাসীদের নিকট হইতে
ভবিষ্যতেও মূল্য আদায় করা উচিত নয়। গবন্মেণ্টকে ইহা
করাইবার ক্ষমতা অবশ্য আমাদের নাই। কিন্তু বাহা
ত্রায়সঙ্গত তাহা বলিলাম।

গবন্মেণ্ট মূল্য আদায় করিয়াও যদি বঙ্গের স্বাস্থ্য ও
উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে দেশের
কল্যাণ হইবে।

সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-বিরোধী কনফারেন্স

গত ১১ই ১২ই ফাল্গুন দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-
বিরোধী কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদের বিখ্যাত
লীডার দৈনিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্রভট্টরী বজ্জের
চিন্তামণি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার
বক্তৃতা যুক্তিপূর্ণ ও সরস হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির
সভাপতি হইয়াছিলেন দিল্লীর সুপ্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় ডাক্তার
অপ্রকাশ চন্দ্র সেন। তিনি “রামবাবু” নামে পরিচিত।
তিনিও সংক্ষেপে বেশ সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন।
ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে চারি শত প্রতিনিধি
আসিয়াছিলেন, এবং শ্রোতার সংখ্যা হাজার দুই হইয়াছিল।
ডাঃ সেনের বক্তৃতার পর সভাপতি-নির্বাচন হয়। পণ্ডিত
মদনমোহন মালবীয়া নির্বাচনের প্রস্তাব করেন, প্রবাসীর
সম্পাদক প্রভৃতি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাহার পর
সভাপতি তাঁহার মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তদনন্তর
বিষয়নির্বাচন-সমিতি গঠন করিবার ব্যবস্থা হয়, ও সেই
দিনই প্রস্তাবগুলির মুদ্রাবিদ্যা করা হয়। তাহার পর দিন
তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধান প্রস্তাবটি পণ্ডিত
মদনমোহন মালবীয়া সভার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া হিন্দীতে
তদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ভাবাবেগ বশতঃ বক্তৃতার
শেষের দিকে তিনি প্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর
প্রবাসীর সম্পাদক এবং মুসলমান হিন্দু ও শিখ অনেক
বক্তা প্রস্তাবটির সমর্থন ও পোষকতা করেন। মুর্শিদাবাদের

উকিল ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মোলবী আবদুস সমদ বলেন, “বাটোয়ারাটার দ্বারা ব্রিটিশ-গবন্মেণ্ট এখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভেদ জন্মাইতে পারিয়াছেন। সেদিন বহুদূরবর্তী নহে যখন মুসলমান সম্প্রদায়ও এই প্রকারে কয়েক ভাগে বিভক্ত হইবে।” লাহোরের অধ্যাপক আবদুল মজিদ খাঁ বলেন, “সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীগুলি মুসলমান সম্প্রদায়কে আর্থিক উন্নতি করিতে

মহাকাতিগঠনের বিরূপ প্রতিবন্ধক গবন্মেণ্ট স্থাপনকে বিরূপ সম্পূর্ণ অসমর্থ রফাপ্রয়ানী নেতাদিগকে ও সর্বসাধারণের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এরূপ, একটা কনফারেন্স আবশ্যক। অত্যায়ে সঙ্গে কো পারে না।



ডাক্তার অশ্রুচন্দ্র সেন
(“রামবাবু”)

বিন্দুযাত্রও সাহায্য করিবে না। তাহারা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা দলের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্প্রদায়ের নাম ব্যবহার করিতেছে, এবং আমলাতন্ত্রের ও নিজেদের সাহায্য করিতেছে।”

প্রতিনিধি ও শ্রোতাদের মধ্যে অবশ্য হিন্দু ও শিখই বেশী ছিলেন। কিন্তু মুসলমানের সম্পূর্ণ অভাব ছিল না।

জয়েন্ট প্যালেমেন্টারী কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, হিন্দুরাও খুব বেশী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাটা মানিয়া লইয়াছে। ইহা যে সত্য নহে, দিল্লীর কনফারেন্সটি তাহার অত্যন্ত প্রমাণ। কংগ্রেসপক্ষীয় কোন কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন, যখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে বাটোয়ারা সম্বন্ধে রফার কথাবার্তা চলিতেছিল, তখন কনফারেন্সটি করা ঠিক হয় নাই। আমরা তাহা মনে করি না। তাহারা কথাবার্তা চালান, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বাটোয়ারাটা যে কত খারাপ, তাহা

সমগ্রভারতীয় বজেট

প্রতিবৎসর এই সময় সমগ্রভারতীয় আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও প্রাদেশিক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপ উপস্থাপিত হয়। যত দিন পর্যন্ত ভারতীয় সভাগুলির ব্যয় মঞ্জুর না-মঞ্জুর করিবার চূড়ান্ত জন্মিবে, তত দিন নামে মাত্র মধ্যে মধ্যে নির্বাণ গবন্মেণ্টকে পরাজিত করিতে পারিবেন অনাবশ্যক ব্যয় ও অপব্যয় কমিবে না, এবং সং ব্যয় বাড়িবে না।

এবার ভারতীয় বজেটে উদ্ভূত দেখান তাহার জন্য ভারত-গবন্মেণ্টের কর্মচারীদের ৫ টাকা বেতন ছাঁটাই হইয়াছিল, তাহা আর অল্প বেতনের চাকরদের বেতন পূর্ববৎ করি আপত্তিজনক না হইলেও, উচ্চপদস্থদের মো ছাঁটাই স্থায়ী করিয়া দেওয়াই উচিত ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যত বেশী বেতন পান দেশের ততুল্য কর্মচারীরা তত মোটা বে ১৯৩৫-৩৬ সালে যে ৯৬ লক্ষ টাকা বেশী ব্য প্রায় সমস্তই সরকারী কর্মচারীদিগকে পূর্বব দিতে খরচ হইবে।

ব্রিটিশ-ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গ্রামাঞ্চ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতির জন্য ভারত-গবন্মেণ্ট টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক প্রে কয়েক লক্ষ টাকা করিয়া পড়িবে। সমগ্র ভি ভারতবর্ষে ৪,৯৯,৩৫০টি, অর্থাৎ মোটামুটি পাঁচ আছে। পাঁচ লক্ষ গ্রামের উন্নতির জন্য এক কো এক শত লক্ষ) টাকা ব্যয়ের মানে, গড়ে প্রা উন্নতির জন্য কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করা। টা গ্রামে ছড়াইয়া খরচ করিলে কোনই ফল হ বিশেষতঃ যখন এক কোটি টাকার একটা বড় অংশ নূতন নূতন চাকরদের বেতন দিতে ব্যয় হইবে প্রদেশগুলির ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলসমূহের ক্ষয়িষ্ণু গ্রামাঞ্চি জন্তই প্রথমে চেষ্টা করিলে কিছু ফল পাওয়া যাইবে ভারত-গবন্মেণ্টের বজেটে কিছু টাকা উদ্

মটাক্সদাতা ধনী লোকদিগের টাকাকার ও কার কম আয়ের টাকাকারদের টাকাকার বাবস্থা করিয়াছেন। ইহা সত্য নহে। অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, “দরিদ্রান্ ভর, রিদ্ভদের ভরণ কর।” ধনিকপ্রভাবাধীন নীতি “ধনীদের সুবিধা আগে দেখ।” ল, ২০০০ টাকার কম আয়ের লোকদের পূর্ণ রহিত করা হইত। এবং গরীব লোকের মাগল, অনেক আগের এক পরমা না হউক, আগের দু-পরমা করা হইত।

নির্মাণ ফণ্ডে ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য, বে-চালনার সাহায্য ৩৩ লক্ষ, ঋণ হ্রাসের জন্য ৭৫ লক্ষ—এই বরাদ্গুলি সমর্থনযোগ্য। পূর্বা-প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বরাদ্দ একটি অনাবশ্যক ব্যয় ও অপব্যয়। চানটির ডুমিকম্পে যে ক্ষতি হইয়াছে, ইহা অনেক কম ব্যয়ে তাহার সম্পূর্ণ মেরামত হইতে

সামরিক ব্যয়

ব্যয় কমিষার পরিবর্তে বাড়িয়াছে। ব্রিটিশ কমান্ডার দেশী সিপাহী বাড়িয়া ও অন্ত্যাত্মিক ব্যয় অনেক কমান ব্যয়। কিন্তু তাহা

যে ব্যয়কে সব সভ্যদেশের বজেটে সংক্ষেপে (ence এর) অর্থাৎ রক্ষার ব্যয় বলা হয়। স্বাধীন হইলে “রক্ষা”র অর্থ, দেশের “স্বাধীন অবস্থা”র তবর্বে “রক্ষা”র অর্থ, দেশের “ইংরেজাধীন”। সুতরাং এই “রক্ষা”র জন্য ইংরেজ গোরো প্রয়োজনীয়।

তীয়করণ এরূপে কখনও হইবে না”

৩ সামরিক বা অন্য কোন বিভাগে এংলিসাইজে-মেরিকার কোন বিভাগে আমেরিকানাইজেশন, কোন বিভাগে জাপানাইজেশন, ফ্রান্সের কোন গ্যালিসাইজেশন, এবং প্রকৃষ্ণ ও তদ্ব্যচক নাম কেন না, ইংলণ্ডে ইংলণ্ডীয়করণ, আমেরিকায় কীকরণ, জাপানে জাপানীকরণ, ফ্রান্সে ফরাসী-অনাবশ্যক বলিয়া হস্তকর ব্যাপার বিবেচিত। কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয়করণটা ভারতীয় এবং হস্ত ব্রিটিশ কর্ণে, অস্বাভাবিক ও আকৃষ্টী না। কারণ, আমরা শাস্ত নাবালক; সুতরাং সব

রাজকীয় বিভাগ, বিশেষতঃ সামরিক বিভাগ, যে বৈদেশিক কর্তৃক অধীন থাকিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক।

অসামরিক বিভাগসমূহে এক আধ জন বড় সাহেবের জায়গায় সাহেবের পোষাকপরিহিত এক আধ জন বড় বাবু নিযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে। সামরিক-বিভাগে তাহা এখনও হয় নাই, নীচের দিকে কিছু অফিসারের পদ দেশী লোকে পাইয়াছে বটে। প্রভু ইংরেজরা, সামরিক-বিভাগে ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া চালান যায় কি না পরীক্ষা করিবার জন্য বহু কমিটি এপর্যন্ত বসাইয়াছেন। কিন্তু নিদ্রিষ্ট কোন একটা সময়ের মধ্যে সব সামরিক অফিসার ভারতীয় হইবে, এরূপ কোন ব্যবস্থা এপর্যন্ত হয় নাই। এই বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সমর-সচিব মিঃ টটেনহামকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া উদ্ভাস্ত করায় তিনি উত্তর দিয়াছেন, যে, “জন্মাবধি জড়বুদ্ধি (congenital idiot) ছাড়া আর সবাই বুঝে, যে, এখন যে-ভাবে ভারতীয়করণ চলছে, তাতে কোন কালেই সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ হবে না,” অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম অফিসার পর্যন্ত সবাই ভারতীয় হইবে না।

ইহা আমরা বরাবরই জানি। সুতরাং মিঃ টটেনহামের পরোক্ষ সংজ্ঞা অনুসারে আমরা যে জন্মাবধি জড়বুদ্ধি নহি, তাহা জানিয়া পরম ও চরম সাধুনা ও সন্তোষ লাভ করিলাম।

আগেই বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষে ডিকেম্বের অর্থাৎ রক্ষার মানে “ইংরেজাধীন অবস্থা”র রক্ষা। সুতরাং বর্তমান দিন ভারতবর্ষে ইংরেজপ্রভু থাকিবে, তত দিন তাহার ইংরেজাধীনতা রক্ষার জন্য প্রধানতম সেনাপতি ও প্রধান প্রধান সেনাপতিরা ইংরেজ থাকিবেন, গোরাসৈন্তও থাকিবে।

প্রাদেশিক বজেটসমূহ

বোম্বাইয়ের বজেটে ঘাটতি আছে, কিন্তু তাহা দুই লক্ষ টাকা মাত্র। বঙ্গের বজেটে ঘাটতি সওয়া দুই কোটি টাকা। ভারত-গবর্নমেন্ট পাটরপ্তানী শুল্কের অর্ধেক বাংলাকে দিলে ঘাটতি দেড় কোটি কমিবে। কিন্তু তাহাতেও ৬৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিবে। গত পাঁচ বৎসরের মোট ঘাটতি হইয়াছে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব বেশী পরিমাণে ভারত-গবর্নমেন্টের হস্তগত হওয়ায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে। মাদ্রাজের বজেটে পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত আছে। আগ্রা-অবোধা প্রদেশের বজেটে ৩২ লক্ষ ঘাটতি পড়িবে। বিহার-উড়িষ্যা বজেটে আর ব্যয় সমান সমান দেখান হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের বজেটে

সওয়া লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। পঞ্জাবে ৫৬০০০ টাকা উদ্ধৃত হইবে।

যে-সব প্রদেশের বজেটে ঘাটতি হইবে, সেখানেও সরকারী কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ৫ টাকা ছাঁটাই আর রাখা হইবে না, অতঃপর পূরা বেতন দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক প্রদেশে যত রকমের রাজস্ব আদায় হয়, তাহার কোন কোন রকম গ্রহণ করেন ভারত-গবর্নমেন্ট, এই বাকী রকমগুলি থাকে প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের। রকমভাগ মেস্টন করিয়াছিলেন, বলিয়া ইহার নাম মেস্টনী নিষ্পত্তি। এই রূপ ভাগে বাংলা-গবর্নমেন্টের প্রায় চির-দেউলিয়া অবস্থা ঘটিয়াছে, অথচ সব রকমের রাজস্ব ধরিলে বাঙ্গা কোন প্রদেশের চেয়ে কম রাজস্ব আদায় হয় না। কিন্তু মেস্টনী নিষ্পত্তি অনুসারে বাঙ্গার প্রাদেশিক রাজস্ব থাকে খুব কম। তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত লউন। মাদ্রাজের লোকসংখ্যা ৪,৬৭,৪০,১০৭, বঙ্গের লোকসংখ্যা ৫,০১,১৪,০০২। কিন্তু মাদ্রাজকে প্রাদেশিক রাজস্ব রাখিতে দেওয়া হয় (১৯৩৫-৩৬ সালের বজেট অনুসারে) ১৬ কোটি টনপঞ্চাশ লক্ষ, বঙ্গকে (১৯৩৫-৩৬ সালের বজেট অনুসারে) ৯ কোটি ৪৪ লক্ষ।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা

ও ইংরেজী ভাষা

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ১৯৩৯ সন হইতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া অন্ত্যত বিবয়ের পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদেরকে মাতৃভাষা বাংলা হিন্দী উর্দু বা আসামীতে দিতে হইবে, আমরা এই পরিবর্তন সমর্থন করি। বিদেশের সহিত ও ভারতবর্ষের অন্ত্যত প্রদেশের সহিত যোগ রক্ষার জন্ত, জ্ঞান অর্জনের জন্ত, রাষ্ট্রকার্য্য পাইবার জন্ত, সরকারী আফিস আদালত সম্পর্কে ওকালতী আদি করিবার জন্ত, ও ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার জন্ত এদেশে ইংরেজী জানা দরকার। সেই নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে যে-যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট হইবে কি না, এবং তাহার ফলে বঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজীর জ্ঞান ও ব্যবহারে অন্ত্যত প্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের সমকক্ষ হইবে কি না, তাহা আগে হইতে বলা যায় না; তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। আমাদের বোধ হয়, ইংরেজী শিখাইবার শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রণালী ভাল হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইবে।

ডোমিনিয়নভের প্রতিভা

ভারত-সচিব শ্রী সামুয়েল হোর পালের যে, কালক্রমে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করা আগে স্বয়ং ইংলণ্ডের ও অনেক ইংরেজ বড় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার প্রতিশ্রুতিটা প্রতিশ্রুতিই রহিল, তার চেয়ে হইল না। যে ভারতশাসন বিলের আলোচনা পালের মনে হইতেছে তাহার হেতুবাদে (Precedent) কিংবা কোন ধার্মীয় এই প্রতিশ্রুতিকে যথার্থ বসাইয়া আইনের অঙ্গীভূত করা চাই এবং আইন বিশেষ কতকগুলি ধারা এরূপ করা চাই, যে, প্রয়োগবলে ভারতবর্ষ স্বয়ং কোন একটি নির্দিষ্ট মধ্যোপশাসক ডোমিনিয়ন হইতে পারিবে। করিলে প্রতিশ্রুতিগুলির ও ভারত-সচিবের উদ্দেশ্য মূল্য নাই।

শ্রামদেশ ও গ্রাম

বিনা রক্তপাতে শ্রামদেশে আবার একটি ফি গেল। শ্রামের রাজা প্রজাধিপক প্রজাদের অনু কোন নিয়ম চাহিয়াছিলেন; রাজশক্তির বর্তমান দল তাহাতে রাজী না হওয়ায় তিনি সিংহ করিয়াছেন এবং বিদেশেই থাকিবেন। রাজবাং বালক রাজা হইবে। শ্রামের বিপ্লব দেশের পথে হইবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু রক্তপাত বোদ্ধদেশের যোগ্য হইয়াছে বলিতে হইবে।

গত মহাবুদ্ধের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আমেরিকার নানা দেশে বিদ্রোহ ও বিপ্লব কোনটাই রক্তপাতহীন হয় নাই। সম্প্রতিও হইয়াছিল। অদ্য ২৯শে ফাল্গুনের কাগজে থক যে, বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে বিদ্রোহের অবসান হইল কি না, কিছুকা বাইবে।

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নে জলযোগ

কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয়ের মত একটি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যাহ্নে জলযোগ হইয়াছে। ইহার জন্ত তাহাদিগকে মাংস দিতে হয়। যে-সব বিদ্যালয় সকাল ১০টা বিকালে ৩টা ৪টা পর্য্যন্ত চলে, এরূপ মধ্যাহ্নে জলযোগের ব্যবস্থা হওয়া ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও বলবৃদ্ধি

হর আগে ও পরে পড়াশুনার সমান মনোযোগী
ব।

শীলভুক্ত কোন কোন জাতির প্রতিবাদ

গে খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল, যে, স্বত্বধর
তপশীলভুক্ত হইতে আপত্তি করিয়াছেন, কারণ
অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় বা অবনত জাতি নহেন।
আমরা আমাদের বক্তব্য যথাসময়ে বলিয়াছিলাম।
বন্ধুগণ যখন অবনত জাতিদের খসড়া তালিকা
বাহির করেন, তখন এই বলিয়া তেলী, তিনী ও
কে বাদ দিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা তালিকাভুক্ত
আপত্তি করিয়াছেন। এই নিয়ম আপত্তিকারী
তিদেরও বেলায় অনুসৃত হওয়া উচিত।

ক নমঃশূদ্রেরও আপত্তি খবরের কাগজে প্রকাশিত
দেখিয়াছি। সম্প্রতি, সচরাচর পোদ নামে
ও পৌণ্ড্রজাতির পক্ষ হইতে আপত্তিসূচক
একটি আবেদন আমরা দেখিলাম। ইহাদেরও
নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

ভারতে বিদেশী চাউলের আমদানী

তবর্ষে বিদেশী চাউলের আমদানী বন্ধ করিবার
দশে চালের দর বাড়িয়া কৃষকদের অবস্থা উন্নত
নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণস্বামী চেষ্টা কৌশল অব
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

চাল অপেক্ষাকৃত সস্তায় আসায় মাড়োয়ারীদের
চালের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মাড়োয়া-
বন্ধুগণের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন, যে, বিদেশ
আমদানী চালের উপর শুল্ক বসান হউক। তাহা
পারে। কিন্তু চালের কলওয়ালারাও তাঁহাদের
র বায় ও লাভের পরিমাণ কমাইয়া বিদেশী কৃষক ও
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছেন না কেন? শুধু
কোন বিদেশী জিনিষেরই আমদানী চিরকাল
রাখা যায় না। নিজেদের প্রতিযোগিতার
দিক্ দিয়া বাড়ান আবশ্যক।

ও মনে রাখিতে হইবে, যে, দেশের স্বাস্থ্যের জন্ত
দ্রুপোষণ ও গ্রামোন্নতির জন্ত চালের কল অপেক্ষা
মধিকতর প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীর সুবিধা

যের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে অত্যধিক ভিড়
হওয়া উচিত, পায়খানাগুলিতে যথেষ্ট দূলা

ও জলের ব্যবস্থা হওয়া উচিত, গরমের সময় বৈজ্ঞানিক
পাখার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, এবং কিছু বেশী ভাড়া দিয়াও
(তৃতীয় ও ইন্টারমীডিয়েট শ্রেণীর) দীর্ঘপথযাত্রীরা
যাহাতে রাত্রে ঘুমাইতে পারেন, তাহার আয়োজন করা
কর্তব্য। এই সব বিষয়ে দৃষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পরামর্শ-
সমিতি আলোচনা করিয়াছেন। সভাপতিও বিবেচনা
করিবেন বলিয়াছেন।

কলিকাতা স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে আবার এবৎসর
স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। তাহার প্রারম্ভিক
বক্তৃতায় বঙ্গের স্বাস্থ্যশাসন-বিভাগের মন্ত্রী স্ত্রী বিজয়
প্রসাদ সিংহ রায় স্বাস্থ্য প্রদর্শনী সমুহ দ্বারা যে উপকার
হয় তৎপ্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সব
প্রদর্শনী হইতে আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার আধুনিক বিজ্ঞান-
সম্মত উপায় ও আবিষ্কারগুলি জানিতে পারি। তাহার
ফলে রোগ ও মৃত্যুসংখ্যা কিছু কমিতে পারে।

জন্মনিরোধের ঔষধ ও যন্ত্র

পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশে জন্মনিরোধের ঔষধ ও
যন্ত্র বেখান-সেখানে যে-সে বিক্রী করিতে পারে না,
তৎসমুদয়ের বিজ্ঞাপনও ছাপাইতে পারে না; কারণ তাহা
সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী। কিন্তু ভারতবর্ষে নানা
দোকানে তাহা অবাধে বিক্রী হয় এবং খবরের কাগজেও
তাহার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

বঙ্গে লবণ-প্রস্তুতি

দুই সপ্তাহ হইল কলিকাতার আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত
প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বাংলা দেশে লবণ প্রস্তুত
করিবার কারখানা পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার
নিমিত্ত এক সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি বলেন,
শত বৎসর পূর্বে বঙ্গে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত। এখানকার
মল্লিক, মিত্র, ঠাকুর প্রভৃতি বংশের পূর্বপুরুষগণ লবণ
প্রস্তুত করিবার কার্যে ধনী হইয়াছিলেন। উনবিংশ
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশ হুনের জন্ত পর-
মুখ্যপেক্ষী ছিল না। কেহ কেহ যে বলেন, বাংলা লবণ-
প্রস্তুতির উপযোগী নহে, ইহা সত্য নয়; এখানে প্রচুর লবণ
প্রস্তুত হইতে পারে। বঙ্গে যে লবণ প্রস্তুত হইতেছে না,
তাহার কারণ গবন্মেণ্টের ও জনসাধারণের নিষ্কিন্দ্রতা ও
ঔদাসীন্য। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূতপূর্ব রাজস্ব-
সচিব স্ত্রী জর্জ স্টার বলিয়াছিলেন, বঙ্গে লবণ-প্রস্তুতির
জন্ত গবন্মেণ্ট অর্থসাহায্য করিবেন, কিন্তু এ পর্যন্ত

তাহা করেন নাই। তাহা করিতে গবন্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে।

কারখানার কাজে ও ব্যবসাবাণিজ্যে অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বাঙালীদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

নারীদের আইনগত অনধিকার

নিখিলভারতীয় নারীসম্মেলন সম্পর্কে নব দিল্লীতে আহূত একটি সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলিয়াছেন :—

“নারীরা এখন আর পুরুষদের হাতের কল বা খেলনা নয়। তারা নবীন উৎসাহ ও উদ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। কারও উপর জুলুম জবরদস্তী করবার জগ্রে আমরা আমাদের অধিকার দাবি করছি না—। কর্তব্যসম্পাদনের জগ্রেই তা চাচ্ছি। বর্তমানে নারীরা আইনসংপৃক্ত নানা অসুবিধা ভোগ করছে। আমরা পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক, ও নৈতিক উন্নতি বিধানের আত্মনিয়োগ করতে চাই; পুরুষদের ঘাড়ে একটা বোঝার মত হয়ে থাকতে চাই না।”

নব দিল্লীর এই সভায়, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যদিগকে এই অনুরোধ করা হইয়াছে, যে, তাঁহারা বাল্যবিবাহনিরোধ আইন সংশোধন করিয়া বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে নিবেদান্ত জারী করিবার অধিকার দানের ব্যবস্থা করুন।

উত্তরাধিকার, বিবাহ, অভিভাবকতা এবং সন্তানগণের সম্বন্ধে নারীদের আইনগত অযোগ্যতা বা অনধিকার বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন নিয়োগের জন্য এবং শীঘ্র এই সকল বিষয়ে নারীদের অনধিকার দূরীকরণার্থ আইনপ্রণয়নকল্পে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিস দিয়াছেন।

চরণ ঘোষকে প্রহার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বাজকে হত্যা করা সম্পর্কে চরণ ঘোষকে প্রহার বিষয়ে অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য পার্লামেন্টে কুমারী এলিনর রাথবেন প্রশ্ন করায়, ভারত-সচিব উত্তর দেন, যে, বঙ্গীয় গবন্মেণ্ট এখন পর্যন্ত তদন্তের রিপোর্ট পান নাই।

কোন কোন ক্ষিপ্তকারী সরকারী কর্মচারী এই অতি-জটিল ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্গদেশে ডাকাইতী বৃদ্ধি

বঙ্গদেশে ডাকাইতী বাড়িয়া চলিতেছে। লোকদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ইহার একটা কারণ। পুলিশ বিভাগিকা-

পত্নী আবিষ্কার ও দমনে বেশী ব্যস্ত থাকায় ডাকাইতী দমনে যথেষ্ট মন দিতে পারিতেছে। মেদিনীপুর জেলাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সমর্থ বয়সের হিন্দু ভদ্রলোকের প্রাক্কাল হইতে সুযোগ্য পৰ্যন্ত চলাফিরার লুপ্ত হওয়ায় এবং পুলিশের মনোযোগে তাহারা সহ অ-হিন্দু ও হিন্দু অ-ভদ্র লোকেরা ডাকাইতী ও নাকুকার্য্য করিবার অধিকতর সুবিধা পাইয়া অনুসন্ধান।

বঙ্গে কাপাসের চাষ

বঙ্গের নানা অঞ্চলে, বিশেষতঃ বীরভূম বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় সাধারণ কাপাসের চাষ বেপারে। তা ছাড়া দীর্ঘ আঁশের নরম ও চিকণ বুড়ী চাষও নানা জায়গায় হইতে পারে। বাংলা দেশে চাষ বাড়াইলে বঙ্গের ক্রমবর্ধমান হতা ও কাপড়ে গুলিকে বোম্বাই প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরাে এখনকার মত এত বেশী নির্ভর করিতে হইবে। কয়লা বঙ্গের কলগুলির কাছে আছে। তুলাও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বঙ্গের কলগুলির কাপ অত্যন্ত প্রদেশে প্রস্তুত কাপড়ের চেয়ে সস্তায় দেও হইবে।

সারদা আইন সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহনিরোধক সারদা আইন সত্ত্বেও বরাবর কাঁকি দিয়া ১৮ ও ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকার বিবাহ দিয়া আসিতেছে। কাঁকি দিবার উপায় ফরাসী গবন্মেণ্টের অধীন পণ্ডিচেরী বা চন্দন গিয়া বিবাহ দেওয়া। ফরাসী পব্লিক প্রসিকিউট এডওয়ার্ড হায়াট, ফরাসী গবন্মেণ্ট বাহাতে এই নিবারণ করেন, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার গবন্মেণ্ট ইহাতে রাজী না হওয়ায় তিনি চ ইন্তফা দিয়াছেন?

বড় ও প্রাদেশিক লাটদের অসাধারণ ক্ষ

পুরাকালে কোন কোন হিন্দু রাজা ও সম্রাট যে ও অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু যিনি যত ক্ষমতাকান, কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছামত হিন্দু আইনস্মৃতি সংহিতা নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার আক্ষমতা কোন হিন্দু নৃপতিরই ছিল না। এখন হিন্দু রাজা কেবল এক জন আছেন। তিনিও হি-

প্রসঙ্গ—বিহারের কাজ বিহারী ও ওড়িয়ার জন্য

নাহিতে বা নূতন কিছু তাহাতে
না, যদিও অত্যাচার করিতে তিনি
রাজা নামক ব্রিটেনের আশ্রিত
তাহার নৃপতিগণেরও অত্যাচার
নাহি, কিন্তু একা একা নূতন হিন্দু আইন
পারেন না।

আইন তাহাদের কোরান ও হাদিস
তাহা বদলাইবার বা তাহাতে নূতন কিছু
ক্ষমতা ও অধিকার কোন মুসলমান নৃপতির
নে ছিল না, বর্তমান কালেও নাই—যদিও
মুসলমান নৃপতি অতীত কালে কেহ কেহ ছিলেন
ও কেহ কেহ হইতে পারেন।

মহাবুদ্ধের পূর্বে খ্রীষ্টিয়ান দেশসকলে যে-সব
সম্রাট ছিলেন, তাহাদের অনেকেই নিহত ও
চ্যুত হইয়াছিলেন। বড় খ্রীষ্টিয়ান সম্রাট ও রাজা
এখন ইংলণ্ডের নৃপতি পঞ্চম জর্জ, বেলজিয়ামের
ভূতিকে বুঝায়। এই খ্রীষ্টিয়ান নৃপতিদের কাহারও
কা আইন করিবার অধিকার ও ক্ষমতা নাই।

দেশের ব্যবস্থাপক সভাসকলে আইন প্রণীত হয়।
নে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত। এক্রপ দেশসমূহের মধ্যে
এখন সকলের চেয়ে প্রবল পরাক্রান্ত। জাপানের
যং একা একা আইন করিতে পারেন না, আইন
দেশের ব্যবস্থাপক সভায়। ক্ষুদ্রতর বৌদ্ধদেশ
এখন প্রজাতন্ত্র গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত। সে দেশের
স্বয়ং ইচ্ছামত আইন করিতে পারেন না। প্রজাদের
ধরা আইন করে।

এই সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য ও স্বাধীন দেশ
হয়। তথাকার আইন তথাকার নির্বাচিত
ট অর্থাৎ দেশপতির কর্তব্য না, ব্যবস্থাপক সভা
করে।

যাতে ভারতবর্ষ-শাসনের জন্ত বিলাতী পার্লামেন্টে যে
ইন হইতেছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের বড়লাটকে
গুলির লাটদিগকে স্বয়ং নিজ ইচ্ছামত স্থায়ী আইন
ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। ইহা মানে এই, যে,
ও বর্তমান কালে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান
যে ক্ষমতা ছিল না ও নাই, এবং বর্তমান
সভ্য খ্রীষ্টিয়ান কোন দেশের রাজা ও সম্রাটের ও
গুলির প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতা নাই, পরাধীন
র গবর্নর-জেনারাল ও প্রাদেশিক গবর্নরদিগকে
তা দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকদের
বোধে এই নজীরবিহীন ক্ষমতা প্রদান কার্য
নিজেদের জন্ত স্বাধীনতাকামী ইংরেজরা

বঙ্গে বাঙালীর চাকরি

কলিকাতার পোট কমিশনারের আ
পরিদর্শকের (অডিটরের) কাজ থাকি
উপযুক্ত বাঙালী পদপ্রার্থীকে সবে
অবাঙালীকে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গবাসী
যে, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের কোন
পদপ্রার্থী এঞ্জিনিয়ার থাকা
অবাঙালী এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইবে
বথেষ্টসংখ্যক থাকা সত্ত্বেও শত শত
নিযুক্ত হয়, ইহা ত জানা কথা।

ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার্থী

এবার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন
দিতেছে প্রায় ২৫০০০ ছাত্রছাত্রী। কেহ যেন ম
করেন, এই সংখ্যা বড় বেশী। বাংলার লোক
বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যার আড়াই গুণ। গত বৎসর বোম্বাই
বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল ১৮,০০০ ছাত্র
ছাত্রী। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অধিকেরও কম
গত বৎসর ২০০০০এর উপর ছাত্রছাত্রী পঞ্জাবের ম্যাট্রিক
পরীক্ষা দিয়াছিল। অতএব বঙ্গে ২৫০০০ ছেলেমেয়ের
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া একটা কিছু অত্যাশ্চর্য
ব্যাপার নয়।

বিহারের কাজ বিহারী ও ওড়িয়ার জন্য

বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এস কে পি সিংহ
প্রস্তাব করেন, তথাকার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকার-
সমস্যা সমাধানের জন্ত পব্লিক এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
বিভাগের এবং পব্লিক হেল্থ ও এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের
সমুদয় কন্ট্রাক্ট বা ঠিকার কাজ যেন বিহারী ও
ওড়িয়াদিগকে দেওয়া হয়। সরকারপক্ষ হইতে মিঃ
এন জি ডানবার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিহার-
উড়িয়ার অধিবাসীদিগকেই এই কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে
বলিয়া কথা দেন।

বিহারী ও ওড়িয়া এবং বিহার-উড়িয়ার অধিবাসী,
এই দুই শব্দসমষ্টির অর্থ ঠিক এক নহে। বিহার-উড়িয়ার
স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন,
যাহারা বংশতঃ বিহারী বা ওড়িয়া নহেন। “বিহার-
উড়িয়ার অধিবাসী” বলিতে ঐ প্রদেশের গবর্নমেন্ট যদি
স্থায়ী অধিবাসী এই লোকগুলিকেও বুঝেন, এবং তাহাই
বুঝা উচিত, তাহা হইলে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি
করা উচিত নয়। কেবল বংশতঃ বিহারী ও
ওড়িয়াদিগকেই কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে বলিলে, অধুনা
বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মানভূমের অধিকাংশ অধিবাসী

২০০

ও বাঙালী বহু শতাব্দী ধরিয়৷ তথায় বাস
কি অপরাধে কণ্ট্রাস্ট পাইবে না ?
পূর্বোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্ন প্রচলিত
উচিত। সের সর্বত্র একুপ অবাঙালী
কে, যাঁহারা বঙ্গের স্থায়ী
নহে। তাঁহারা সন্ধ্য, কচ্ছ, পঞ্জাব প্রভৃতির
একটা বড় দল দিতেছি। যখন বহু কোটি টাকা
হতেছিল, তখন একটা বড় কণ্ট্রাস্ট
বাঙালী ব্রিঙ্ প্রস্তাবজাকে দেওয়া হয়। তিনি বাঙালী
বাহাদুর জগৎ পান নহেন।
হন, বঙ্গের ত

ডক্টর গণেশপ্রসাদ

গণেশপ্রসাদ বহু বৎসর ধরিয়৷ কলিকাতা-
য়ের “হাডিং গণিত অধ্যাপক” ছিলেন। এইটি
কিনিত-বিভাগের সার্কেল ও সার্কেলপেক্ষা অধিক
র পদ। অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ আগ্রা-অবোধা
র মানুষ। গণিত বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ
জ্ঞাতা ও প্রতিভা ছিল। তিনি উচ্চ গণিত সম্বন্ধে
কয়েকখানি বিশ্ববিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক এবং উচ্চ-গণিতবিষয়ক
মৌলিকগবেষণাপ্রস্তুত বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। মৃত্যুকালে
তাঁহার বয়স ষাটের উপর হইয়াছিল।

আমি যখন এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা কলেজের
প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম, তখন অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ ঐ
কলেজের অন্ততম গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ কাজ
তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন।

তিনি ডক্টর অব্ ম্যাথ্ (গণিতাচার্য্য) উপাধি পাইবার
পর এলাহাবাদের মেয়ো রোডের একটি বাড়িতে থাকিতেন।
বাড়ির ফাটকের একটি স্তম্ভে তিনি Dr. Ganesh
Prasad কথাগুলি একটি কাষ্টকলকে লিখাইয়া ঝুলাইয়া
দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাহাতে কোন কোন লোক
তাঁহার কাছে রোগের চিকিৎসার জন্ত আসিত। তাঁহার
ভৃত্যকে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া দিতে হইত, যে, তিনি
চিকিৎসার ডক্টর নহেন, হিসাবের ডক্টর।

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নূতন দান

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্সপেক্টর
অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, পিএইচ
ডি, প্রটেক্ট্যান্ট গ্রীটিয়ান যুবকদের শিক্ষার সাহায্যার্থ ইতিপূর্বে

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতা
লক্ষ টাকার ফণ্ড স্থাপন কা
আবার ঐ উদ্দেশ্যে কলিকাতা-বি
পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছেন।
প্রটেক্ট্যান্ট গ্রীটিয়ান যুবকদিগকে কলক
কার্য্যকরী শিক্ষা লাভের জন্ত বৃত্তি দেওয়া
শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হো
একুপ বহুৎ দান করিতে দেখা যায় না
ও তাঁহার পত্নী অত্যন্ত সাদাসিদা ভাবে
জন্মে মহৎ উদ্দেশ্য পোষণ করেন বলিয়া
করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারতে দেশী ও বিদেশী সৈনিক

ভারতবর্ষের সেনাদলে গোরা সৈনিকের বে
ভাতা জন-প্রতি বার্ষিক ৮৫০ টাকা এবং দেশী সিপাহী
বেতন ও ভাতা জন প্রতি ২৮৫ টাকা। অর্থাৎ বে
ভাতায় এক জন গোরা রাখা যায়, সেই বেতন ও
ভাতা তিন জন সিপাহী রাখা যায়। অথচ সিপাহীরা
শারীরিক বলে, কষ্টসহিষ্ণুতায় ও রণদক্ষতায় গোর
বিদ্যমাত্র ও নিকৃষ্ট নহে। অধিকন্তু তাঁহারা দেশের
তাঁহাদের পেঙ্গান প্রাপ্তির পর তাঁহাদের সক্ষিত
অভিজ্ঞতা দেশেই থাকে এবং দেশের কাজে লাগিতে
কিন্তু তথাপি, গোরা রাখিতেই হইবে। তাঁহার
“ডিকেন্স” কথাটির আমরা যে ব্যাখ্যা পূর্বে ক
তাঁহার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

ভারতীয় সৈন্যদলে ব্রিটিশ সেনানায়ক (অ
আছে ৫৩৭৩ জন, ভারতীয় সেনানায়ক আছে ১৯৫
ভারতীয়েরা সবাই নিম্নপদস্থ।

পরীক্ষান্তে ছাত্রছাত্রীদের কাজ

যে ২৫০০০ ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দি
পরীক্ষান্তে তাঁহারা তিন মাসেরও অধিক অবকাশ পাই
তাঁহাদের অধিকাংশ গ্রামের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরের অধি
তাঁহারা যদি প্রত্যেকে এই তিন মাসে অন্ততঃ তি
নিরক্ষর লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দে
হইলে দেশের কল্যাণ হইবে, এবং তাঁহারাও ভ
স্বাভ করিবেন।

এই অনুরোধ রক্ষা করা সোজা। তাঁহার
রক্ষা করিবেন না কি?

প্রসঙ্গ—বিহারের কাজ বিহারী ও ওড়িয়ার জন্য

লাইতে বা নতুন কিছু তাহাতে
না, যদিও অত্যাচার করিতে তিনি
রাজা নামক ব্রিটেনের আশ্রিত
তাহার নৃপতিগণেরও অত্যাচার
নাছে, কিন্তু একা একা নতুন হিন্দু আইন
পারেন না।

আইন তাহাদের কোরান ও হাদিস
তাহা বদলাইবার বা তাহাতে নতুন কিছু
ক্ষমতা ও অধিকার কোন মুসলমান নৃপতির
ছিল না, বর্তমান কালেও নাই—যদিও
মুসলমান নৃপতি অতীত কালে কেহ কেহ ছিলেন
নও কেহ কেহ হইতে পারেন।

মহাযুদ্ধের পূর্বে খ্রীষ্টিয়ান দেশসকলে যে-সব
সম্রাট ছিলেন, তাহাদের অনেকেই নিহত ও
নচ্যুত হইয়াছিলেন। বড় খ্রীষ্টিয়ান সম্রাট ও রাজা
এখন ইংলণ্ডের নৃপতি পঞ্চম জর্জ, বেলজিয়ামের
ভূতিকে বুঝায়। এই খ্রীষ্টিয়ান নৃপতিদের কাহারও
কা আইন করিবার অধিকার ও ক্ষমতা নাই।

দেশের ব্যবস্থাপক সভাসকলে আইন প্রণীত হয়।
মানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত। এক্রূপ দেশসমূহের মধ্যে
এখন সকলের চেয়ে প্রবল পরাক্রান্ত। জাপানের
এক একা আইন করিতে পারেন না, আইন
দেশের ব্যবস্থাপক সভায়। ক্ষুদ্রতর বৌদ্ধদেশ
এখন প্রজাতন্ত্র গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত। সে দেশের
স্বয়ং ইচ্ছামত আইন করিতে পারেন না। প্রজাদের
খিরা আইন করে।

মান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য ও স্বাধীন দেশ
তন্ত্র। তথাকার আইন তথাকার নিরীচি
ক্ট অর্থাৎ দেশপতির করেন না, ব্যবস্থাপক সভা
থাকে।

ব্যাতে ভারতবর্ষ-শাসনের জন্ত বিলাতী পার্লেমেন্টে যে
আইন হইতেছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের বড়লাটকে
গুণলির লাটদিগকে স্বয়ং নিজ ইচ্ছামত স্থায়ী আইন
ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। ইহার মানে এই, যে,
ও বর্তমান কালে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান
যে ক্ষমতা ছিল না ও নাই, এবং বর্তমান
সভ্য খ্রীষ্টিয়ান কোন দেশের রাজা ও সম্রাটের ও
গুণলির প্রেসিডেন্টের যে ক্ষমতা নাই, পরাবীর
র গবর্নর-জেনারাল ও প্রাদেশিক গবর্নরদিগকে
মতা দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকদের
সত্ত্বেও এই নজীরবিহীন ক্ষমতা প্রদান কার্য
এবং নিজেদের জন্ত স্বাধীনতাকামী ইংরেজরা
ন।

বঙ্গে বাঙালীর চাব

কলিকাতার পোটকমিশনারের আফি
পরিদর্শকের (অডিটারের) কাজ খালি হ
উপযুক্ত বাঙালী পদপ্রার্থী থাক। সত্ত্বেও তাহা
অবাঙালীকে দেওয়া হইয়াছে। সংবাদপত্রপাঠকের
যে, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায় বিশেষ বোদ
পদপ্রার্থী এঞ্জিনিয়ার থাক। সত্ত্বেও কিছুকাল পূর্বে
অবাঙালী এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়েন। বলিষ্ঠ বাঙালী
যথেষ্টসংখ্যক থাক। সত্ত্বেও শত শত অবাঙালী কনষ্টেবল
নিযুক্ত হয়, ইহা ত জানা কথা।

ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার্থী

এবার কলিকাতা-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষা
দিতেছে প্রায় ২৫০০০ ছাত্রছাত্রী। কেহ যেন মনে না-
করেন: এই সংখ্যা বড় বেশী। বাংলার লোকসংখ্যা
বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যার আড়াই গুণ। গত বৎসর বোম্বাই-
বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল ১৮,০০০ ছাত্র-
ছাত্রী। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অধিকেরও কম—
গত বৎসর ২০০০০এর উপর ছাত্রছাত্রী পঞ্জাবের ম্যাট্রিক
পরীক্ষা দিয়াছিল। অতএব বঙ্গে ২৫০০০ ছেলেমেয়ের
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া একটা কিছু অত্যাশ্চর্য
ব্যাপার নয়।

বিহারের কাজ বিহারী ও ওড়িয়ার জন্য

বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এস কে পি সিং
প্রস্তাব করেন, তথাকার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকার-
সমস্তা সমাধানের জন্ত পত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
বিভাগের এবং পত্রিক হেল্প ও এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের
সমুদয় কন্ট্রাক্ট বা ঠিকার কাজ যেন বিহারী ও
ওড়িয়াদিগকে দেওয়া হয়। সরকারপক্ষ হইতে মিঃ
এন জি ডানবার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিহার-
উড়িয়ার অধিবাসীদিগকেই এই কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে
বলিয়া কথা দেন।

বিহারী ও ওড়িয়া এবং বিহার-উড়িয়ার অধিবাসী,
এই দুই শব্দসমষ্টির অর্থ ঠিক এক নহে। বিহার-উড়িয়ার
স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন,
বাহারা বংশতঃ বিহারী বা ওড়িয়া নহেন। “বিহার-
উড়িয়ার অধিবাসী” বলিতে ঐ প্রদেশের গবর্নমেন্ট যদি
স্থায়ী অধিবাসী এই লোকগুলিকেও বুঝেন, এবং তাহাই
বুঝা উচিত, তাহা হইলে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি
করা উচিত নয়। কেবল বংশতঃ বিহারী ও
ওড়িয়াদিগকেই কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে বলিলে, অধুনা
বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মানভূমের অধিকাংশ অধিবাসী

বাঙালী বহু শতাব্দী ধরিয়া তথ্য বাস
কি অপরাধে কণ্ট্রাক্ট পাইবে না ?
পূর্বোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী নিয়ম প্রচলিত
হওয়া উচিত। বঙ্গের সর্বত্র এরূপ অবাঙালী
কণ্ট্রাক্ট পাইয়া থাকে, যাহারা বঙ্গের স্থায়ী
বাসিন্দা নহে। তাহারা সিন্ধ, কচ্ছ, পঞ্জাব প্রভৃতির
বাসিন্দা। একটা বড় দৃষ্টান্ত দিতেছি। যখন বহু কোটি টাকা
ব্যয়ে বাংলা ব্রিজ প্রস্তুত হইতেছিল, তখন একটা বড় কণ্ট্রাক্ট
রায় বাহাদুর জগমল রাজাকে দেওয়া হয়। তিনি বাঙালী
নহেন, বঙ্গের অধিবাসীও নহেন।

ডাক্তর গণেশপ্রসাদ

ডাক্তর গণেশপ্রসাদ বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতা-
বিশ্ববিদ্যালয়ের “হার্ডিং গণিত অধ্যাপক” ছিলেন। এইটি
উহার গণিত-বিভাগের সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা অধিক
বেতনের পদ। অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ আগ্রা-অবোধা
প্রদেশের মানুষ। গণিত বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ
পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা ছিল। তিনি উচ্চ গণিত সম্বন্ধে
কয়েকখানি বিশ্ববিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক এবং উচ্চ-গণিতবিষয়ক
মৌলিকগবেষণাপ্রসূত বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। মৃত্যুকালে
তাঁহার বয়স ষাটের উপর হইয়াছিল।

আমি যখন এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা কলেজের
প্রিন্সিপাল ছিলাম, তখন অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ ঐ
কলেজের অগ্রতম গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ কাজ
তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন।

তিনি ডাক্তর অব্. মায়ের্স (গণিতাচার্য) উপাধি পাইবার
পর এলাহাবাদের মেয়ো রোডের একটি বাড়িতে থাকিতেন।
বাড়ির ফাটকের একটি স্তম্ভে তিনি Dr. Ganesh
Prasad কথাগুলি একটি কাষ্ঠফলকে লিখাইয়া ঝুলাইয়া
দিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাহাতে কোন কোন লোক
তাঁহার কাছে রোগের চিকিৎসার জন্ত আসিত। তাঁহার
ভৃত্যকে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইত, যে, তিনি
চিকিৎসার ডাক্তর নহেন, হিসাবের ডাক্তর।

ডাক্তর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নূতন দান

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্সপেক্টর
অধ্যাপক ডাক্তর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্. এ, পিএইচ
ডি, প্রটেক্টেড ব্রিটিশান যুবকদের শিক্ষার সাহায্যার্থ ইতিপূর্বে

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতা
লক্ষ টাকার ফণ্ড স্থাপন কা-
আবার ঐ উদ্দেশ্যে কলিকাতা-বি-
পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছেন।
প্রটেক্টেড ব্রিটিশান যুবকদিগকে কলক
কার্য্যকরী শিক্ষা লাভের জন্ত বৃত্তি দেওয়া
শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত যে
এরূপ বৃহৎ দান করিতে দেখা যায় না
ও তাঁহার পত্নী অত্যন্ত সাদাসিদা ভাবে
হৃদয়ে মহৎ উদ্দেশ্য পোষণ করেন বলিয়া
করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারতে দেশী ও বিদেশী সৈনিক

ভারতবর্ষের সেনাদলে গেরা সৈনিকের
ভাতা জন-প্রতি বার্ষিক ৮৫০ টাকা এবং দেশী সিপাহী
বেতন ও ভাতা জন-প্রতি ২৮৫ টাকা। অর্থাৎ যে
ভাতায় এক জন গেরা রাখা যায়, সেই বেতন ও
তিন জন সিপাহী রাখা যায়। অথচ সিপাহীরা
শারীরিক বলে, কষ্টসহিষ্ণুতায় ও রণদক্ষতায় গেরা
বিন্দুমাত্রও নিকৃষ্ট নহে। অধিকন্তু তাহারা দেশের
তাহাদের পেম্যান প্রাপ্তির পর তাহাদের সঞ্চিত
অভিজ্ঞতা দেশেই থাকে এবং দেশের কাজে লাগিতে
কিন্তু তথাপি, গোত্রা বাধিতেই হইবে। তাহার
“ডিকেন্স” কথাটির আমরা যে ব্যাখ্যা পূর্বে ক
তাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

ভারতীয় সৈন্যদলে ব্রিটিশ সেনানায়ক (অর্থাৎ
আছে ৫৩৭৩ জন, ভারতীয় সেনানায়ক আছে ১৯০
ভারতীয়েরা সবাই নিম্নপদস্থ।

পরীক্ষান্তে ছাত্রছাত্রীদের কাজ

যে ২৫০০০ ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে
পরীক্ষান্তে তাঁহারা তিন মাসেরও অধিক অবকাশ পাই
তাঁহাদের অধিকাংশ গ্রামের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরের অধি
তাঁহারা যদি প্রত্যেকে এই তিন মাসে অন্ততঃ তি
নিরক্ষর লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া দেন,
হইলে দেশের কল্যাণ হইবে, এবং তাঁহারাও আত্ম
স্বাভ করিবেন।

এই অনুরোধ রক্ষা করা সোজা। তাঁহারা অ
রক্ষা করিবেন না কি ?